# মাসিক মোহাম্মদী

১ম বর্ষ ১-৭, ৯-১২ সংখ্যা
কার্ত্তিক ১৩৩৪ - বৈশাখ ১৩৩৫
আষাঢ় - আশ্বিন ১৩৩৫

তুরস্কের মছজিদ—
নূতন ও পুরাতন

# মাসিক মোহাম্মদী

প্রথম বর্ষ। | কার্ত্তিক ১৩৩৪ সাল। | প্রথম সংখ্যা

بسم الله الرحمن الرحيم

**করুণাময় কৃপানিধান আল্লার নামে।**

الحمد لله نحمده و نستعينه و نستغفره و نومن به و نتوكل عليه - و نعوذ بالله من شرور انفسنا و من سيئات اعمالنا ——

সমস্ত মহিমা আল্লার। আমরা তাঁহার মহিমা কীর্ত্তন করিতেছি, তাঁহার সমীপে শক্তি ভিক্ষা করিতেছি, তাঁহার দরগাহে ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি, তাঁহাতে বিশ্বাস স্থাপন করিতেছি, তাঁহার উপর নির্ভর করিতেছি—এবং নিজেদের মনের বিকার ও কর্ম্মের বিপর্য্যয় হইতে রক্ষা পাইবার নিমিত্ত তাঁহার শরণ প্রার্থনা করিতেছি।

و نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له و نشهد ان محمدا عبده و رسوله الذى بعثه بالحق بشيرا و نذيرا و داعيا الى الله باذنه و سراجا منيرا - و ارسله كافة للناس و جعله أسوة حسنة للسالكين و رحمة للعالمين صلى الله عليه و على جميع الانبياء و المرسلين و عباده الصالحين -

আমরা স্বীকার করিতেছি যে, আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোনও উপাস্য নাই—তিনি একক ও অদ্বিতীয় এবং মোহাম্মদ তাঁহার প্রেরণাপ্রাপ্ত রছুল। পুণ্যের সুফল সম্বন্ধে শুভসংবাদ প্রদানের এবং পাপের কুফল সম্বন্ধে সতর্ক করার নিমিত্ত, তিনি আল্লার আদেশে তাঁহার প্রতি আহ্বানকারী ও দীপ্তিকর-প্রদীপরূপে প্রেরিত হইয়াছেন। বিশ্ব-মানবের মঙ্গলের নিমিত্ত আল্লাহ তাঁহাকে পুণ্যতম পূর্ণতম আদর্শ এবং সমস্ত জগতের প্রতি নিজের অনন্ত প্রেমের সাক্ষাৎ নিদর্শন স্বরূপে প্রেরণ করিয়াছেন। তাঁহার প্রতি, এবং দুনয়ার যাবতীয় প্রেরণাপ্রাপ্ত মহাপুরুষ ও সাধু-সজ্জনগণের প্রতি আল্লার অনন্ত আশীর্ব্বাদ!

# আত্ম-নিবেদন

বিভিন্ন ভাবধারার সমবায়ে এবং পারিপার্শ্বিকতার প্রভাবে, মোছলেম-বঙ্গের স্তরে স্তরে, আজ এক অভিনব জীবন-সাধনা জাগিয়া উঠিয়াছে। এক দিকে পুরাতনের মায়া অন্য দিকে আধুনিকতার মোহ। পুরাতনের মায়া, বহু শতাব্দীর সঙ্কলিত জ্ঞান-অজ্ঞানের সমস্ত সঞ্চয় একত্রে আঁকড়াইয়া ধরিয়া প্রাণপণেও তাহাকে রক্ষা করার জন্য ব্যাকুল—আধুনিকতার মোহ, প্রত্যেক রাজসিক বিকারকে জীবনের স্পন্দন এবং উচ্ছৃঙ্খলতার প্রত্যেক বিকাশকে জ্ঞানের মুক্তি বলিয়া গ্রহণ করিতে ব্যগ্র। উভয় দিকের এই ব্যগ্র ব্যাকুল ভাবধারার প্রকাশকে অনেকে সংঘাত ও সংঘর্ষ নামে আখ্যাত করিতেছেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে উভয় ধারার মূল উৎস এবং উভয়ের চরম লক্ষ্য অভিন্ন। বাহ্যতঃ ইহা সংঘাত, কিন্তু বস্তুতঃ ইহা নূতন জীবনের সূত্রপাত। এখনকার কর্ত্তব্য, উভয় ধারাকে বাহিরের আবর্জ্জনার হাত হইতে রক্ষা করা—সত্যকে তাহার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়া উভয় ধারাকে গভীর ও নির্ম্মল করিয়া তোলা। এই প্রকারে দুই ধারার সহায়তা করিয়া, আমরা যত শীঘ্র তাহাকে খরস্রোত করিয়া তুলিতে পারিব, তাহার মধ্যকার অন্তরাল—ক্লেদ-কর্দ্দমের বর্ত্তমান ব্যবধান—তত শীঘ্রই গলিয়া ধুইয়া অপসারিত হইয়া যাইবে।

পুরাতনের সকল সঞ্চয়কে একত্রে আঁকড়াইয়া ধরিয়া কেবল ভাবপ্রবণতার অভিব্যক্তি বা রূঢ় ভাষার শরণ গ্রহণ দ্বারা, আধুনিকতার প্রবাহকে যাঁহারা প্রতিহত করিতে চাহিতেছেন—এছলামকে যথাযথরূপে বড় করিয়া দেখিবার ও দেখাইবার মত বড় নজর ও বড় দেমাগ হইতে তাঁহাদিগের অনেকেই আজ বঞ্চিত। এছলামকে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া, দলিয়া মথিয়া নিজেদের সঙ্কীর্ণ চিন্তা ও সঙ্কীর্ণ দৃষ্টির সহিত সমঞ্জস করিয়া রাখিতে তাঁহারা আজ ব্যতিব্যস্ত। তাই বাহিরের আলোকের তীব্রপ্রভায় আজ তাঁহাদিগের চোখগুলি যেন ঝলসিয়া যাইতেছে, এবং নিজেদের পরিকল্পিত এছলামকে রক্ষা করার জন্য দিশাহারার মত হইয়া আজ তাঁহারা আলোককেই অভিসম্পাত করিতেছেন—নিদানের সম্বলরূপে বহু যত্নে রক্ষিত, কাফেরী ফৎওয়ার পুরাতন পুঁটুলির দুই একখানা পচা নেকড়া গুঁজিয়া দিয়া, আসন্নভঙ্গ মগ্ন দ্বারের ছিদ্র পথগুলি বন্ধ করিয়া দেওয়ার চেষ্টা পাইতেছেন—এ সমস্ত সত্য। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ইহাও সত্য যে, পরশমণির উপর সঞ্চিত ধূলা-মাটিকেও যে আজ তাঁহারা এমন ভীত ত্রস্তভাবে আঁকড়াইয়া ধরিতেছেন, সেও সেই পরশমণিকে হারাইবার আশঙ্কায়। সে মাণিকের, সে পরশমণির অধিকারী ও রক্ষাকারী এখনও তাঁহারাই। কিন্তু তা' বলিয়া আর মায়া করা চলিবে না। যে কোন প্রকারেই হউক, আল্লার মুক্ত আলো-বাতাসে সে মাণিককে উপস্থিত করিতে হইবে—মানুষের উপেক্ষা ও অবজ্ঞা-সঞ্চিত ধূলা মাটি ঝাড়িয়া মুছিয়া তাহার আসলরূপে বিশ্বমানবের সন্নিধানে তাহাকে উপস্থাপিত করিতে হইবে। আমাদিগের সঙ্কল্পের

সাধুতা এবং নিজেদের আতঙ্কের অসারতা বুঝিতে পারিলে দুইদিন পরে তাঁহারাই আসিয়া আবার এ নৌকার হাল ধরিবেন, তাঁহাদের চরণতলে দণ্ডায়মান হইয়া আবার আমরা রিক্তমুক্ত এছলামের জয় জয়কার শুনিতে পাইব।

প্রথম দলের দৃষ্টি ক্রমে ক্রমে সঙ্কীর্ণ হইয়া পড়িলেও এখনও তাহা সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হয় নাই। কিন্তু তবুও যে তাঁহারা এছলামের সত্যকার স্বরূপকে যথাযথভাবে দর্শন করিতে পারিতেছেন না, ইহার একমাত্র কারণ—সকল দিককার সমস্ত দরজা জানালা বন্ধ করিয়া দিয়া, দর্শনীয় পরশমণিকে নিজে তাঁহারাই গাঢ় অন্ধকারে আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিয়াছেন। কাজেই দৃষ্টিশক্তির অভাব না হইলেও কার্য্যক্ষেত্রে এখন তাহা ব্যর্থ হইয়া যাইতেছে। পক্ষান্তরে আধুনিকতার মায়ামুগ্ধ তরুণের চারি পার্শ্বে আলোকের অভাব না ঘটিলেও, এছলাম সম্বন্ধে তাঁহারা আজ সম্পূর্ণ দৃষ্টিহীন। কাজেই দর্শন শক্তির অভাবে, আলোকে অবস্থান করা সত্ত্বেও, এছলামের প্রকৃত স্বরূপকে তাঁহারা আজ চিনিতে পারিতেছেন না। দুই একজন বিলাতী দোকানের রঙ্গিন চশমা ব্যবহার করিয়া আরও হিতে-বিপরীত ঘটাইতে আরম্ভ করিয়াছেন।

এখন প্রথম পক্ষকে বলিতে হইবে—"দ্বার খোল!" আলোকের পথ ছাড়িয়া দাও, সাত রাজার ধন মাণিক আমার মহিমায় গরিমায় উজ্জ্বল হইয়া বিশ্বমানবের মন মোহন করিতে থাকুক। দ্বিতীয় পক্ষকে বলিতে হইবে—"চোখ মেল!" আল্লার দেওয়া চোখ দু'টী দিয়া একবার এছলামের নয়নাভিরাম স্বর্গীয় সৌন্দর্য্য দর্শন করার চেষ্টা কর! যুক্ত প্রদেশ ও পঞ্জাবের দিকে তাকাইয়া দেখ, তাহা হইলে বুঝিতে পারিবে যে, যে আলোকের প্রথম সাক্ষাতের তীব্রতায় ঝলসিতচক্ষু তুমি,—নিজের দর্শন বিকারের প্রগল্ভ অভিব্যক্তি দ্বারা মুক্তির নামে নূতন শৃঙ্খলের জয় গান করিতেছ, সেই আলোককে যথেষ্টরূপে—তোমাদিগের অপেক্ষা বহুগুণ অধিক পরিমাণে—আয়ত্ত করা সত্ত্বেও তাহারা তোমাদিগের মত দিশাহারা হয় নাই। সুধু ইহাই নহে, সেই আলোকের সদ্ব্যবহার করিয়া তাহারাই আজ দুনয়ার প্রান্তে প্রান্তে এছলামের পুণ্যচ্ছবি উদ্ভাসিত করিয়া তুলিতেছে।

এই "দ্বার খোলা" ও "চোখ মেলার" সাধনার মধ্য দিয়া দীর্ঘ দুইটী যুগ অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে। সেই দীর্ঘ কালের সুখ স্বপ্নকে বাস্তবে পরিণত দেখার উদ্দেশ্যে, জীবন-সায়াহ্নে মাসিক মোহাম্মদীর এই নূতন সাধনা। সকলে আশীর্ব্বাদ করুন—এ সাধনা সিদ্ধিলাভ করুক! এ স্বপ্ন বাস্তবে পরিণত হউক!!

# কোরআন-হাদিস

## ১। আল্লার কালাম

اللہ لا الہ الا ھو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ
ولا نوم لہ ما فی السموات وما فی الارض من ذا
الذی یشفع عندہ الا باذنہ یعلم ما بین ایدیھم وما
خلفھم ولا یحیطون بشیٔ من علمہ الا بما شاء وسع
کرسیہ السموت والارض ولا یودہ حفظھما وھو
العلی العظیم - پارہ ۳ — رکوع ۱ سورۃ البقر—

আল্লাহ্! —তিনি ব্যতীত অন্য কোনও উপাস্য নাই, চিরঞ্জীব তিনি—স্বয়ংসত্ত ও বিশ্বসত্তার কারণ তিনি। তন্দ্রা তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না—নিদ্রাও তাঁহাকে (অভিভূত করিতে পারে না)। স্বর্গ মর্ত্তের সমস্ত (বিষয় ও বস্তু) একমাত্র তাঁহারই অধিকার ভুক্ত। কে আছে এমন ব্যক্তি আল্লার সমীপে, তাঁহার বিনা অনুমতিতে, যে সুপারিশ করিতে পারে? তাহাদিগের বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ সমস্তই তিনি অবগত আছেন। পক্ষান্তরে—তাঁহার যতটুকু ইচ্ছা তাহা ব্যতীত—তাঁহার জ্ঞানের সামান্য অংশের অভিব্যাপ্তিও তাহারা করিতে পারে না।—তাঁহার জ্ঞান সমস্ত স্বর্গ ও মর্ত্তকে ব্যাপ্ত করিয়া আছে—অথচ সেসকলের রক্ষণাবেক্ষণে তিনি ক্লান্ত হন না,—আর তিনিই মহা সম্ভ্রান্ত মহামহিম। (বকৃরা-আয়তুলকুর্সি)।

لیس البران تولوا وجوھکم قبل المشرق والمغرب
ولکن البر من آمن باللہ والیوم الاخر والملائکۃ
والکتاب والنبیین ، وآتی المال علی حبہ ذوی القربی
والیتامی والمساکین وابن السبیل والسائلین
وفی الرقاب ج واقام الصلواۃ وآتی الزکوۃ ج
والموفون بعھدھم اذا عاھدوا ع والصابرین فی الباساء
والضراء وحین الباس ط اولئک الذین صدقوا ط
واولئک ھم المتقون - بقرہ -

"তোমরা পূর্ব্ব বা পশ্চিম দিকে মুখ ফিরাইবে ইহাই (কেবল) পুণ্য নহে, বরং (প্রকৃত পক্ষে) পুণ্যবান সেই ব্যক্তি—যে আল্লাহতে বিশ্বাস করে এবং (সঙ্গে সঙ্গে) পরকালে, ফেরেশতাগণে, সমস্ত কেতাবে ও সমস্ত নবিগণে বিশ্বাস রাখে, আর যে ব্যক্তি আল্লার প্রেমবশে আত্মীয় স্বজনগণকে, পিতৃহীনদিগকে, কাঙ্গালদিগকে, (দুঃস্থ) পথিকবর্গকে, প্রার্থীদিগকে এবং (মানুষের) দাসত্ব মোচনার্থে নিজের ধনসম্পদ দান করিয়া থাকে;—এবং যে ব্যক্তি নামাজকে সুপ্রতিষ্ঠিত রাখে ও জাকাত প্রদান করিতে থাকে;—যাহারা অন্যের সহিত প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলে তাহা যথাযথভাবে পালন করিয়া থাকে;—আর যাহারা অভাবে বিপদে ও রণ-বিভীষিকায় ধৈর্য্যশীল;—(ইমানের দাবীতে) তাহারাই হইতেছে সত্যবাদী এবং একমাত্র তাহারাই পরহেজগার (সংযমশীল)।"—বকরা ১৭৭ আয়ত।

## ২। রছুলের বাণী

(১) হজরত একদা সহচরবর্গকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন:—"কে এই কথাগুলি স্মরণ করিয়া রাখিবে? কে তাহার উপর আমল করিবে? কে অন্যকে তাহা শিক্ষা দান করিবে?" আবুহোরায়রা বলিলেন—"হে আল্লার রছুল —আমি।" আবুহোরায়রার হাত ধরিয়া হজরত তখন বলিতে লাগিলেন:—

اِتَّقِ الْمَحَارِمَ تَكُنْ اَعْبَدَ النَّاسِ! وَارْضَ بِمَا قَسَمَ اللّٰهُ لَكَ تَكُنْ اَغْنَى النَّاسِ! وَاَحْسِنْ اِلٰى جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا! وَاَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا! وَلَا تُكْثِرِ الضِّحْكَ فَاِنَّ كَثْرَةَ الضِّحْكِ تُمِيْتُ الْقَلْبَ!—اخرجه الترمذى -

সমস্ত হারাম হইতে দূরে থাকিবে, তাহা হইলে তুমি শ্রেষ্ঠতম আবেদ (সাধক) হইতে পারিবে! আল্লাহ তোমাকে যাহা জুটাইয়া দেন, তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকিবে—তাহা হইলে শ্রেষ্ঠতম ধনী হইতে পারিবে। নিজ প্রতিবেশীর হিতসাধন করিতে থাকিবে—তাহা হইলে তুমি মোমেন হইতে পারিবে! যাহা তুমি নিজের জন্য পছন্দ কর, বিশ্ব-মানবের জন্য তাহাই পছন্দ করিবে—তাহা হইলে তুমি মুছলমান হইতে পারিবে! আর অত্যধিক পরিমাণে হাসিও না, কারণ অধিক হাস্য অন্তরকে অবসাদগ্রস্ত করিয়া ফেলে! —তিরমিজি।

---

قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صلعم :—اَمَرَنِىْ رَبِّىْ بِتِسْعٍ- خَشْيَةِ اللّٰهِ فِى السِّرِّ وَالْعَلَانِيَةِ- وَكَلِمَةِ الْعَدْلِ فِى الْغَضَبِ وَالرِّضَا - وَالْقَصْدِ فِى الْفَقْرِ وَالْغِنَاءِ- وَاَنْ اَصِلَ مَنْ قَطَعَنِىْ - وَاُعْطِىَ مَنْ حَرَمَنِىْ- وَاَعْفُوَ عَمَّنْ ظَلَمَنِىْ - وَاَنْ يَكُوْنَ صَمْتِىْ فِكْرًا - وَنُطْقِىْ ذِكْرًا - وَنَظَرِىْ عِبْرَةً - وَاٰمُرَ بِالْمَعْرُوْفِ

اخرجه رزين - تيسير الوصول -

(২) হজরত বলিয়াছেন, আমার প্রভু আমাকে নয়টী বিষয়ের আদেশ করিয়াছেন:—প্রকাশ্য ও নিভৃত উভয় অবস্থাতে আল্লাকে 'ভয় করিবে'। ক্রোধ ও সন্তোষ উভয় অবস্থাতেই অনাবিল ন্যায্য কথা বলিবে। অভাব ও স্বচ্ছলতা উভয় অবস্থাতে মধ্য পন্থা অবলম্বন করিয়া চলিবে। যে তোমার সহিত বিচ্ছেদ ঘটায়, তুমি তাহার সহিত মিলন করিবে। যে তোমাকে বঞ্চিত করিয়াছে, তুমি তাহাকে দান করিবে। তোমার উপর যে অত্যাচার করিয়াছে, তাহাকে তুমি ক্ষমা করিবে। আর তোমার মৌনতা হইবে ধ্যান, কথা হইবে স্তব, দর্শন হইবে শিক্ষা। আর যাহা সৎ, লোককে তাহার আদেশ প্রদান করিবে। তাইছিরুল-অছুল ২-৩৭৫ পৃষ্ঠা।

---

(৩) হজরতের তরবারীর কবজির উপর লিখিত ছিল:—

اُعْفُ عَمَّنْ ظَلَمَكَ - وَصِلْ مَنْ قَطَعَكَ - وَاَحْسِنْ اِلٰى مَنْ اَسَاءَ اِلَيْكَ - وَقُلِ الْحَقَّ وَلَوْ عَلٰى نَفْسِكَ - ايضا -

কেহ তোমার প্রতি অত্যাচার করিলে, তাহাকে ক্ষমা করিও। কেহ তোমার সহিত বিচ্ছেদ ঘটাইলেও তাহার সহিত মিলন করিও। কেহ তোমার অনিষ্ট করিলে তুমি তাহার হিতসাধন করিও। আর তোমার নিজের বিরুদ্ধে হইলেও হক কথা বলিতে কখনও কুণ্ঠিত হইও না।—ঐ, ঐ

---

(৪) এবনে আব্বাছ বলিতেছেন, আমি হজরতকে বলিতে শুনিয়াছি:—

لَيْسَ الْمُؤْمِنُ بِالَّذِىْ يَشْبَعُ وَجَارُهٗ جَائِعٌ اِلٰى جَنْبِهٖ - بيهقى - مشكواة -

"যে নিজে পেট পুরিয়া খায় আর তাহার পাশে তাহার প্রতিবাসী উপবাস করিয়া থাকে, সে মোমেন হইতে পারে না।"—মেশকাত।

---

# স্বাগতম্

[ কাজী কাদের নওয়াজ ]

( ১ )

দ্যুলোক ভূলোক আলোকেতে ভরি'
ধরণীর বুক উজল করি'
'স্বাগত' ওহে নবীন অতিথি
পুণ্য প্রভাতে তোমারে বরি'
কনক-কুম্ভে দ্রাক্ষা নিঙাড়ি
হস্তে লইয়া গুলাবের ঝারি
বসোরা গুলের মাল্যে তোমায়
বরিতেছি মোরা সগৌরবে
মদির-মন্দ্রে বাজাইয়া বাঁশী
বন্দিছে হুর পরীরা সবে।

( ২ )

অজানা দেশের বার্ত্তা বহিয়া
কামনার নিধি এসেছ আজি,
এস তবে এস—ওই শোন ওঠে
তোরণে তূর্য্য 'দামামা' বাজি।
কাকলী কণ্ঠে গাহে বুল বুল
কুঞ্জ বিতানে ফোটে ফুলকুল
কুলু কুলু তানে নদী মশ্‌গুল
নাচিছে দোদুল তরণী রাজি।
সারস-সারসী আকাশে ছুটেছে
বলাকারা বক ফুলেতে সাজি।

( ৩ )

'তহুরা শারাব' জম্‌শেদেরই
পানের দৈব পাত্র ভরি
বন্দি তোমায় হে নব অতিথি
শিরোপরি হেম ছত্র ধরি।
আগমনী তব ললিত ছন্দে
গাহিতেছে কবি পরমানন্দে
আমোদিত দিশি কুসুম গন্ধে
'শয়তান' দূরে গিয়াছে সরি,
আঁধারের 'হাদী', "মার্‌হাবা" বলি
আমরা তোমায় বরণ করি।

---

# এছলামের আদর্শ

( ১ )

"এছলামের আদর্শ" কথাটা অত্যন্ত গভীর, অত্যন্ত ব্যাপক। এছলামের প্রকৃত স্বরূপের সম্যক উপলব্ধি করিতে না পারিলে সে আদর্শের যথাযথ ধারণা করা সম্ভবপর হইয়া উঠে না। অথচ এই উপলব্ধির জন্য জ্ঞানের ও ভাবের মধ্য দিয়া যে সাধনার আবশ্যক হয়, তাহার আয়াস স্বীকারে আমরা অনেক সময় কুণ্ঠিত হইয়া থাকি। পক্ষান্তরে সে সাধনায় প্রবৃত্ত হওয়ার পূর্ব্বে যে নিষ্ঠা ও সঙ্কল্পের দরকার হইয়া থাকে, আমরা তাহারও বড় একটা ধার ধারিতে চাই না। ফলে অবস্থা এই দাঁড়াইয়াছে যে, আলোচনার সময় একদল সেই আদর্শকে টানিয়া হেঁচড়াইয়া নিজদের ধারণা ও সংস্কারের সহিত সমঞ্জস করিয়া লইতে প্রয়াস পাইতেছেন—আর একদল নিজেদের সাময়িক খিয়াল হুজুক বা পরিকল্পনার সহিত সে আদর্শকে অসমঞ্জস মনে করিয়া, সম্মোহিত মুছলমানকে তাহার মায়াপাশ মুক্ত করিয়া ফেলার জন্য ব্যাকুলি প্রকাশ করিতেছেন। এইরূপে এছলামী-আদর্শের মারাত্মক সঙ্কোচ ঘটাইয়া অথবা অন্যায়রূপে তাহার সংহার সাধনের চেষ্টা করিয়া, নিজ নিজ শিক্ষা রুচি ও আবশ্যক অনুসারে সাময়িকভাবে বর্ত্তমানে যে স্বস্তি বা তৃপ্তি লাভের চেষ্টা করা হইতেছে, বস্তুতঃ তাহা আত্মবঞ্চনার এবং সামাজিক হিসাবে আত্মহত্যার নামান্তর মাত্র।

এই আলোচনার সময় আমরা একেবারে ভুলিয়া যাই যে, সকল যুগের সকল দেশের, এবং সকল স্তরের ও সকল অবস্থার মানব সমাজের জন্য এক স্থায়ী শাশ্বত ও স্বর্গীয় আদর্শের নাম—"এছলাম।" নিজের সংস্কারের সহিত সমঞ্জস করিয়া লওয়ার জন্য তাহার সেই বিরাটতার খর্ব্ব করিতে যাওয়া যেমন অন্যায়, সাময়িক পরিকল্পনা বিশেষের সহিত অসামঞ্জস্যের আশঙ্কায় তাহাকে অস্বীকার করিতে যাওয়াও সেইরূপ অসমীচীন, অযৌক্তিক। স্মরণ রাখিতে হইবে যে, পরিবর্ত্তনশীল বর্ত্তমানের কল্পিত-বাস্তবতার মধ্যে কোন আদর্শকে আবদ্ধ করিতে যাওয়া, আর আদর্শ শব্দের মূল তাৎপর্য্যকে অস্বীকার করা, একই কথা। এছলামের আদর্শ সম্বন্ধে বিচারে প্রবৃত্ত হওয়ার সময় এই সত্যের যথাযথ প্রণিধান করা বিশেষরূপে আবশ্যক হইয়া দাঁড়ায়। বিশ্ব-মানবকে স্তবকে স্তবকে উন্নীত করতঃ তাহাকে ক্রমশঃ উন্নত হইতে উন্নততম আদর্শের দিকে আকর্ষণ করাই এছলামী আদর্শের বিশেষত্ব। لتركبن طبقا عن طبق মানুষকে নিশ্চয়ই স্তরে স্তরে আরোহণ করিতে হইবে। পক্ষান্তরে—

یاایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیه

"হে মানব! আপন 'রবের' (১) পানে (অগ্রসর হইবার জন্য) তোমাকে যথেষ্ট প্রচেষ্টা করিয়া যাইতে হইবে, তাহার পর এমন এক অবস্থা আসিবে, যখন তুমি তাঁহার "লেকা" বা মিলন লাভ করিতে পারিবে। (কোরআন, ছুরা এনশেকাক ৬ ও ১৯ আয়ত)। সেইজন্য এছলামের আদর্শ একদিকে যেমন বর্ত্তমানকে অস্বীকার করে না, অন্যদিকে বর্ত্তমানকে মাত্র অবলম্বন করিয়া তাহার মধ্যে সমাপ্ত হইয়া যায় না—সীমাবদ্ধ হইয়া থাকে না। ভবিষ্যতের অসংখ্য অনাগত বাস্তব নূতনের সৃষ্টির জন্য চিরকালই সে আদর্শের সদা-সর্জ্জন-পটীয়সী শক্তির অনুসরণ করিয়া চলিতে থাকিবে। কোরআনের বর্ণিত বিশ্ব-মানবের এই অবিরত অপ্রতিহত সাধনাকে, সুনিয়ন্ত্রিত সুপরিচালিত ও সাফল্যমণ্ডিত করার নিমিত্ত, সে আদর্শের আবশ্যক

---

(১) 'রব' শব্দের ধাতুগত অর্থ—"কোন বস্তুকে পালন করতঃ বিভিন্ন অবস্থার মধ্য দিয়া তাহাকে পূর্ণতার চরম সীমায় উপনীত করিয়া দেওয়া। (রাগেব, আজিজী প্রভৃতি)। এই ধাতু হইতে আধিক্য বাচক কর্ত্তৃবাচ্যে রব শব্দ সম্পন্ন হইয়াছে—অতএব যাঁহার মধ্যে বর্ণিত গুণ পূর্ণতররূপে বিরাজমান তিনিই রব। (এমলা প্রভৃতি।) পাঠকগণ এখানে রব শব্দের বিশেষ সার্থকতাটাও স্মরণ রাখিবেন।"

চিরকালই হইতে থাকিবে। এছলামের এই আদর্শকে তাহার যথাযথরূপে দর্শন করার প্রয়াস যাঁহারা পাইয়াছেন, এবং সঙ্গে সঙ্গে, বর্ত্তমান জগতের জ্ঞানসাধনার মূলীভূত পিপাসার উপলব্ধি করিতে যাঁহারা সমর্থ হইয়াছেন, তাঁহারা ন্যায়তঃ স্বীকার করিতে বাধ্য হইবেন যে, মানুষের চিন্তার ক্রমমুক্তি এবং তাহার জ্ঞানের ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে, এছলামের স্বরূপ ও তাহার আদর্শও অধিকতর সুন্দর, অধিকতর উজ্জ্বল এবং অধিকতর ব্যাপকরূপে বিকশিত হইতে থাকিবে, তাহার সত্যতা অধিকতর দৃঢ় যুক্তি প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত হইতে রহিবে। ইহা ভাবপ্রবণতার যুক্তি-হীন অভিব্যক্তি নহে—ভাবহীন যুক্তিবাদের অনর্থক আত্মম্ভরিতাও নহে। মধ্যাহ্ন মার্ত্তণ্ডের ন্যায় ইহা স্বয়ম্প্রকাশ ও স্বয়ম্প্রমাণ অকাট্য সত্য, আজিকার জ্ঞান-গবেষণার বহু সিদ্ধান্তকে এই দাবীর প্রমাণরূপে পেশ করা যাইতে পারে। কিন্তু বর্ত্তমান প্রবন্ধে এই আলোচনার উপক্রম স্বরূপ কএকটা মূল প্রসঙ্গের অবতারণা করা হইবে মাত্র!

( ২ )

এছলামী আদর্শের সত্যকার স্বরূপকে যথাযথভাবে জ্ঞাত হইতে ও গ্রহণ করিতে হইলে, সর্ব্বপ্রথমে জানিতে হইবে আল্লার প্রেরিত কোরআনকে—সেই কোরআনের বাহক ও বাস্তবস্বরূপ হজরত মোহাম্মদ মোস্তফাকে। প্রকৃত পক্ষে কোরআন ভাব আর মোস্তফা তাহার অভি-ব্যক্তি, কোরআন শিক্ষা এবং হজরত তাহার আদর্শ। ভাব ও অভিব্যক্তির এই মহা সম্মিলনের সারাৎসার যাহা, তাহাই হইতেছে—"এছলামের আদর্শ।" বলা বাহুল্য যে, এ আদর্শের বিচার বিশ্লেষণে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে তাহার মূল উৎসের বিশেষ পরিচয় গ্রহণ করা একান্ত আবশ্যক। এ সাধনায় প্রবৃত্ত হইতে হইলে সাধকের প্রথম দরকার হইবে—যথার্থ সত্যানুসন্ধিৎসার, তাহার গভীরতর সত্যলিপ্সার অবিচল সঙ্কল্পের। সেইজন্য কোরআনের প্রথম পারার প্রথম আয়তে, বোখারীর প্রথম পারার প্রথম হাদিছে, এই নিষ্ঠা ও সঙ্কল্পের ছবক পড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে। এই নিষ্ঠা অর্জ্জন ও সঙ্কল্প গ্রহণের পর, নিজের শক্তির পরিমাণ ও 'অধিকারের' আয়তনটুকুকে অনতিরঞ্জিতরূপে বেশ করিয়া বুঝিয়া লইতে হইবে। অন্যথায় সব সাধনাই পণ্ড হইয়া যাইবে। তাহার পর নিজ নিজ শক্তি ও অধিকার অনুসারে অনুশীলনে প্রবৃত্ত হইতে হইবে।

এখানে বিশেষরূপে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, কোন বিষয়ের সব দিকের সমস্ত বিশেষত্বের প্রতি একই সময় দৃষ্টি নিক্ষেপ করা, এবং তাহার স্বরূপের বিভিন্ন বিকাশকে একসঙ্গে অনুভব করিয়া ফেলা, দুনয়ার অধিকাংশ মানুষের পক্ষে সম্ভবপর হয় না। চাঁদের উদয় হয়, আর তাহার আলোকে দুনয়ার অন্ধকার দূর হইয়া যায়, আমরা সকলেই ইহা লক্ষ্য করিয়া থাকি। কিন্তু ইহাদ্বারা এমন সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে না যে চাঁদ সংক্রান্ত সমস্ত জ্ঞান সমস্ত তত্ত্ব আমরা সকলে ষোল আনা রকমে আয়ত্ত করিয়া ফেলিয়াছি। না, না, কখনই নহে। চাহিয়া দেখ—আধুনিক দূরবীক্ষণ হাতে জ্যোতিষী মান-মন্দিরের উচ্চ চূড়ায় দাঁড়াইয়া বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে তাহার পানে তাকাইয়া আছে, নূতন তত্ত্ব সংগ্রহের অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা সহকারে নিজের দুর্ব্বল দৃষ্টিশক্তিকে প্রখরতর করিবার জন্য ব্যাকুলতা প্রকাশ করিতেছে। আবার ঐ একই চাঁদের অন্য স্বরূপে আপনহারা আর এক বৈজ্ঞানিক, অন্তর্বিক্ষণের সনাতন যন্ত্র লইয়া, নিভৃত নিশীথে নিস্তব্ধ অবস্থায় দাঁড়াইয়া আছে। চিন্তার গভীরতার সঙ্গে সঙ্গে তাহার চোখের পাতাগুলি কি এক আবেশে অবশ হইয়া আসিতেছে, বাহিরের চোখ বন্ধ করিয়াই সে চাঁদের প্রকৃত স্বরূপকে গ্রহণ করার চেষ্টা করিতেছে। কবি তাহাকে সাধিতেছে এক রূপে; ভাবুক তাহাকে ভাবিতেছে অন্য প্রকারে। সাগরের বিশাল বক্ষ তাহাকে উপভোগ করিতে চাহিতেছে—নূতন উদ্বেলনের নবীন কল্লোলের মধ্য দিয়া, জীবদেহের ক্ষুদ্র রসকোষ তাহাকে অনুভব করিতে যাইতেছে—নূতন স্ফুরণের নবীন হিল্লোলে আবদ্ধ করিয়া। একই দৃষ্টের বিভিন্ন দিকের প্রতি বিভিন্ন দর্শনের এই যে বিভিন্ন সাধনা, ইহার পরিপূর্ণ পরিসমাপ্ত ও সম্মিলিত সিদ্ধির নামই পূর্ণদর্শন, সত্যদর্শন। বিভিন্নরূপী ও বিভিন্নমুখী মানবীয় দর্শনের এই যে ব্যাকুল সাধনা, ইহা যে কবে সমাপ্ত হইবে, বা আদৌ হইবে কিনা, কেহই তাহা বলিয়া দিতে পারিতেছে না। মস্তিষ্ক যখন জ্ঞানের প্রগলভ অভিব্যক্তি দ্বারা হৃদয়কে বিদ্রূপ করিতে আসে, তখন তাহাকে এতটুকুও স্মরণ করাইয়া দেওয়া উচিত। পক্ষান্তরে হৃদয় যখন অসঙ্গত ও অসংযত আবেগ-উচ্ছ্বাস লইয়া বাস্তব সত্যকেও

অমান্য করিতে চায়, তখন তাহাকেও উত্তমরূপে বুঝাইয়া দিতে হইবে যে, সত্য বর্ত্তমানে সীমাবদ্ধ না হইলেও, বর্ত্তমান সত্যের বাহিরেও নহে। আজিকার বাস্তব জীবন-বেদের ভিত্তির উপর মানুষের সত্য সাধনার ভাবী সিদ্ধি সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিতেছে।

( ৩ )

কোরআন সকল দেশের সকল যুগের সমস্ত মানুষের সর্ব্ববিধ মঙ্গল ও মুক্তির জন্য প্রেরিত আল্লার শাশ্বত বাণী—আর মোস্তফা হইতেছেন সেই বাণীর মূর্ত্ত স্ফূর্ত্ত বাস্তব বিকাশ। (১) অনুমান বা অনুগতির বশবর্ত্তী হইয়া এ কথা কহিতেছি না, কোরআন হাদিছের বহু দলিল দ্বারা ইহা স্পষ্টরূপে সপ্রমাণ হইতেছে, এবং মুছলমান পণ্ডিতগণ ইহা একবাক্যে স্বীকারও করিয়া থাকেন। অতএব এই হিসাবে দেখা যাইতেছে যে, কোরআনের শিক্ষায়, সকল যুগের সকল মানুষের সমস্ত সমস্যার সমাধানে এছলামের যোগ্যতায়, এবং মোস্তফাজীবনের স্বর্গীয় আদর্শে, কস্মিন কালে কোন দিক দিয়া কোনও প্রকারের স্থবিরতা স্পর্শ করিতে পারে না। তাহা চির সরস চির সবুজ, চির সজীব চির সচল। সুতরাং সকল যুগের সকল মানুষের জন্য তাহা চির বরণীয় ও চির অনুকরণীয় আদর্শ হওয়ার যোগ্য। এই জন্য হজরত স্বয়ং এছলাম ও ফেৎরত ( প্রকৃতি বা Nature ) কে অভিন্নরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। কোরআনেও 'দিন' ও 'ফেৎরত' একই অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। সংক্ষেপে ইহার তাৎপর্য্য এই যে, প্রকৃতি জিনিষটা যেমন ব্যাপক হইলেও দুনয়ার প্রত্যেক বস্তুর মধ্যে তাহার একটা স্বতন্ত্র প্রভাব বিদ্যমান, তাহা যেমন যুগপৎভাবে পুরাতন ও নিত্য উভয়ই—সেইরূপ দুনয়ার প্রাকৃতিক ধর্ম্ম এছলাম, ব্যাপক হইয়াও যুগে যুগে অভিনব স্বরূপ লইয়া প্রকটমান এবং যুগপৎভাবে তাহা সনাতন ও শাশ্বত উভয়ই। বুড়া হইয়া গিয়াছে বলিয়া প্রকৃতির আইন কানুন যেমন অচল হইয়া পড়ে না, প্রাকৃতিক ধর্ম্ম এছলামও সেইরূপ কখনও স্থানুত্বা প্রাপ্ত হয় নাই—হইবেও না। আদম চোখ মেলিয়া দেখিয়াছিলেন এই এছলামকে; জগতের সকল দেশের সমস্ত নবী রছুল, সমস্ত সত্যকার মুনিঋষি, এই এছলামেরই এক এক দিকের সাধনা করিয়া গিয়াছেন; এবং বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন ভাষায় প্রকাশিত আল্লার কালামগুলি এই এছলামের এক এক অংশের এক একটা ভাব ধারার মহিমা কীর্ত্তন করিয়া গিয়াছে। তাহা পুরাতন অথচ নিত্য, তাহা সনাতন অথচ শাশ্বত। ইহা এছলামের একটা প্রধান অভিজ্ঞান এবং স্পষ্ট করিয়া বলা আবশ্যক যে, শেষ নবী ও শেষ ধর্ম্মের তাহার যে দাবী, একমাত্র এই সত্যের উপর তাহার সমীচীনতা সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিতেছে। নচেৎ দাদা আদম হইতে হজরত ঈছা পর্য্যন্ত দুনয়ার বিভিন্ন কেন্দ্রে এই বহু সংখ্যক কেতাব ও হাজার হাজার নবী আসিবার অনুকূলে কার্য্যকারণের যে হেতুবাদ, সে কারণ পরম্পরার তিরোধান ত এখনও হয় নাই?

( ৪ )

আমরা উপরে যে সকল মতের অভিব্যক্তি করিয়াছি, অন্ততঃ "নীতির" হিসাবে তাহা সকলের স্বীকৃত। এই মতের প্রত্যেক দিকের যথাযথ আলোচনার জন্য স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র সন্দর্ভের অবতারণা করার আবশ্যক হইবে। দলিল প্রমাণ উল্লেখ করা আজ সম্ভবপর হইবে না, তাহা পূর্ব্বে নিবেদন করিয়াছি। কিন্তু এই সত্যটা পরিস্ফুট করার জন্য আজ হজরত রছুলে করিমের একটা হাদিছ—স্বয়ং তাঁহার মুখের বাণী, নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া নিতান্ত আবশ্যক বলিয়া মনে করিতেছি। (২)

হজরত আলী বলিতেছেন, একদা হজরত সমবেত ভক্তবৃন্দকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"মুছলমানদিগের উপর অতঃপর একটা ঘোর বিপদ একটা ভয়ঙ্কর পরীক্ষা উপস্থিত হইবে।" আলী বলিতেছেন, আমি আরজ করিলাম—হজরত! সে বিপদ হইতে রক্ষা পাওয়ার উপায় কি? হজরত বলিলেন:—"উপায় আল্লার কেতাব। অতীতের সব বারতা, ভবিষ্যতের সকল পয়গাম এবং বর্ত্তমানের সমস্ত করণীয় এই কেতাবে নিহিত রহিয়াছে। এই কেতাব হইতেছে দুনয়ার সকল সমস্যার সার্থক সমাধান। সাবধান! ইহাকে পরিত্যাগ করিলে অবিলম্বে তোমাদের

(১) বিবি আয়শাকে হজরতের 'চরিত্র' সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হইলে উত্তরে বলেন— خلقه القران কোরআন হইতেছে তাঁহার চরিত্রের বাস্তব বিকাশ। (২) দারমী ও তিরমিজী—মর্ম্মানুবাদ।

টুকরা টুকরা উড়াইয়া দেওয়া হইবে। ইহাকে ছাড়িয়া 'পথের' সন্ধান করিতে গেলেই তোমরা ভ্রষ্ট হইয়া পড়িবে। এই কোরআন হইতেছে—আল্লার সুদৃঢ় রজ্জু, তাঁহার প্রেরিত জ্ঞানময় শিক্ষা এবং তাঁহার নির্দ্ধারিত সহজ সরল মুক্তিপথ। অধিকন্তু এই কেতাবের বিশেষত্ব এই যে—

لا تشبع منه العلماء - ولا يخلق علي كثرة الرد ولا تنقض عجايبه -

অর্থাৎ :—(ক) বিদ্বৎসমাজ যতই তাহার অনুশীলন করিবেন, নিত্য নূতন সত্যের সন্ধান পাইয়া তাঁহাদিগের জ্ঞানলিপ্সা ততই বাড়িয়া যাইবে, সে জ্ঞানের বা জ্ঞানলিপ্সার পরিসমাপ্তি হইবে না—

(খ) পুনঃ পুনঃ ব্যবহৃত হওয়া সত্তেও তাহা কখনও পুরাতন বা অব্যবহার্য্য হইয়া যাইবে না।

(গ) এবং তাহার অভিনবত্ব কখনই শেষ হইয়া যাইবে না।

হজরত রছুলে করিমের এই হাদিছ হইতে কোরআনের ও এছলামের স্বরূপ অত্যন্ত স্পষ্টরূপে দেদীপ্যমান হইয়া যাইতেছে। এছলামের আদর্শের অনুসন্ধান করিতে হইবে এই কোরআনে—হজরতের দেওয়া এই দিব্য আলোকের সাহায্যে। অশেষ পরিতাপের সহিত বলিতে হইতেছে যে, এ জ্ঞান হইতে মুছলমান আজ নিজকে বঞ্চিত করিয়া লইয়াছে, এ আদর্শ হইতে সে আজ লক্ষ যোজন দূরে সরিয়া গিয়াছে। তাই আজ সে অবশ অচলভাবে নিজের জাতীয়জীবনকে এমন দুর্ব্বহ বলিয়া মনে করিতেছে, তাহার স্থবির পঙ্গু মস্তিষ্কটা কেবল বিভীষিকার স্বপ্ন দেখিতেছে, আর তাহার আবিষ্ট আড়ষ্ট কণ্ঠে কেবল মরণের আর্ত্তনাদ জাগিয়া উঠিতেছে।

(৫)

এছলামের প্রকৃত আদর্শের অনুশীলন ও অনুসরণ করিতে হইলে কোরআনকে অবলম্বন করিতে হইবে, একথা প্রত্যেক মুছলমানই—অন্ততঃ মৌখিকভাবে—স্বীকার করেন। কিন্তু কোরআনের সত্যকার স্বরূপকে কার্য্যতঃ অস্বীকার করিতেও অনেকে আবার কোন প্রকার কুণ্ঠা বোধ করেন না। একটা উদাহরণ দিয়া কথাটা পরিস্ফুট করার চেষ্টা করিব।

দেশাচারের চাপ, পারিপার্শ্বিকতার প্রভাব এবং পূর্ব্ববর্ত্তীগণের মতের অন্ধঅনুগতি দ্বারা মানুষের জ্ঞানবিবেক ও তাহার চিন্তার ধারা বিকৃত ও বিপথগামী হইয়া পড়ে, এবং কোন সত্যকে দর্শন বা গ্রহণ করা তাহার পক্ষে অসম্ভব হইয়া দাঁড়ায়। মানুষের মন ও মস্তিষ্ককে দাসত্বের এই লা'নৎ হইতে মুক্ত করিয়া দেওয়াই যে এছলামের একটী অন্যতম সাধনা, যাঁহারা সরাসরিভাবেও কোরআনের কোন অংশ একবার পাঠ করিয়া দেখিয়াছেন, সে কথা তাঁহাদিগকে মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করিতেই হইবে।

কিন্তু কোরআন এখন আর বিশ্বমানবের সাধারণ সম্পদ নহে; হজরতের বর্ণিত তাহার সমস্ত গুণ এখন তিরোহিত হইয়া গিয়াছে! দীর্ঘ এক সহস্র বৎসর পূর্ব্বে সে অফুরন্ত জ্ঞানভাণ্ডার সম্পূর্ণরূপে নিঃশেষিত হইয়া গিয়াছে! কারণ আমাদিগের পুরোহিত পণ্ডিতেরা ব্যবস্থা দিয়াছেন যে, কোরআন সম্বন্ধে যাহা কিছু করার ছিল, যাহা কিছু ভাবার ছিল, যাহা কিছু বলার ছিল, বোজর্গানে দিন ও ছলফে ছালেহীন বহু পূর্ব্বে সে সমস্তই ভাবিয়া ও বলিয়া শেষ করিয়া রাখিয়াছেন। কেবল ছওয়াব হাছেল করার জন্য তুমি কোরআন শরীফের আবৃত্তিমাত্র করিতে পার, ভক্তির উচ্ছ্বাস দেখাইবার জন্য তাহা চুম্বন করিতে পার, তাহাকে সুশ্রী যুজদানে পুরিয়া বরকতের জন্য ঘরের মাচার উপর তুলিয়া রাখিতে পার। কিন্তু, তাহার অন্তর্নিহিত ভাব ও শিক্ষা সম্বন্ধে কোন প্রকার আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়ার কোন অধিকার তোমার নাই—আর তুমি'ত কোন ছার, দুনয়ার শ্রেষ্ঠতম আলেমেরও আজ সে অধিকার নাই—কস্মিনকালে আর হইবেও না। অধিকন্তু তফছিরের রাবীগণ যে আয়তের যে শব্দের যে অর্থ এবং যে তাৎপর্য্য বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে এক বর্ণের এক বিন্দুর যোগ বিয়োগ হইতে পারিবে না। কারণ এজ্‌তেহাদের দরওয়াজাও বহু শতাব্দীপূর্ব্বে চিরকালের তরে সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হইয়া গিয়াছে। পাঠকপাঠিকাগণ কোরআনের ও হজরতেরবর্ণিত এছলামের সহিত, মানুষের রচিত এই অভিনব এছলামের তুলনায় সমালোচনা করিয়া দেখুন, আর বিচার করিয়া বুকে হাত দিয়া বলুন—ইহা অপেক্ষা এছলামের সর্ব্বনাশ আর কি হইতে পারে?

ফলে মানুষের মন ও মস্তিষ্কের যে নিগড়গুলি ভাঙ্গিয়া

দেওয়াই ছিল এছলামের প্রথম সাধনা, তাহাই আজ এছলাম নামে অভিহিত হইতেছে। জ্ঞানের এই মর্ম্মন্তুদ আত্মহত্যার উপমা নাই, তাই মুছলমানের এই অচিন্তনীয় অধঃপতনেরও তুলনা নাই!

অথচ কোরআন প্রেরণ করার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে স্বয়ং আল্লাহ আমাদিগকে বলিয়া দিতেছেন :—

كتاب انزلناه اليك مبارك ليدبروا آياته وليذكر اولوا الالباب —( ص )

"হে মোহ'ম্মদ! এই কল্যাণময় মহাগ্রন্থ আমরা তোমার প্রতি এই জন্য নাজেল করিয়াছি, যেন সকলে তাহার আয়ত (বচন, যুক্তি প্রমাণ) গুলি অনুশীলন করিয়া দেখে, বিশেষতঃ জ্ঞানবান ব্যক্তিগণ যেন তাহা হইতে শিক্ষা ও উপদেশ গ্রহণ করিতে পারে। (ছুরা ছাদ)। চিন্তাশীল পাঠক, আল্লার এই আয়তের সহিত বর্ত্তমান অবস্থার তুলনা করিয়া দেখুন!

কোরআনের আর একস্থানে বলা হইয়াছে :—

ولقد يسرناه للذكر - فهل من مدكر؟ —قمر

"লোকে শিক্ষা ও উপদেশ গ্রহণ করিবে এই উদ্দেশ্য, বস্তুতঃ কোরআনকে আমরা নিশ্চয়ই সহজ করিয়া দিয়াছি, অতএব আছে কি কেহ চিন্তাশীল?" (ছুরা কামর, ১০ আয়ত)। আল্লার এ প্রশ্নের উত্তর কি দিতে চাও, হে আলেম সমাজ! আল্লাহকে ভাবিয়া একবার মুক্তকণ্ঠে তাহা প্রকাশ কর। আজ অগণিত আল্লার বান্দা, তাঁহার তখতে জালালকে সম্বোধন করিয়া তোমাদিগের নামে যে নালিশ করিতেছে—তাহার উত্তর দাও! শ্রবণ কর, লক্ষ লক্ষ কণ্ঠের সমবেত আর্ত্তনাদ :—"হে আল্লাহ! আমরা তোর আহ্বানে সাড়া দিবার—তোর পবিত্র কালামের অনুশীলন করার জন্য প্রস্তুত, লালায়িত। কিন্তু তোর প্রিয় নবীর নাএব হওয়ার দাবীদারগণ আজ জোর করিয়া তোর প্রদত্ত সেই شفا ورحمت হইতে আমাদিগকে বঞ্চিত রাখিতেছে!" আল্লার রছুল কিয়ামতের দিনে পরওয়ার্দ্দিগারের হুজুরে ফরয়াদ করিয়া বলিবেন :—

رب ان قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا -

হে পরওয়ার্দ্দিগার! আমার কওম এই কোরআনকে তামাদী বলিয়া স্থির করিয়া লইয়াছিল। (ছুরা ফোর্কান)।

আল্লাহ বলিতেছেন—বিশ্বমানবের জ্ঞান আহরণের জন্য কোরআনকে সহজসাধ্য করিয়া দেওয়া হইয়াছে। আর মানুষের অভিমত তাহার প্রতিবাদ করিয়া উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করিতেছে,—কোরআন অত্যন্ত কঠিন, মানুষের পক্ষে একেবারে অবোধগম্য। আল্লাহ বলিতেছেন—সর্ব্বসাধারণকে কোরআনের অনুশীলন করিতে, জ্ঞানবান ব্যক্তি বর্গকে তাহা হইতে তত্ত্ব আহরণ করিতে। তিনি ইহাও বলিয়া দিতেছেন যে, দুনয়ায় কোরআনের আবির্ভাব হইয়াছে কেবল এই উদ্দেশ্যে। আর মানুষের ফরমান আমাদিগের জ্ঞান-গবেষণার মস্তকে লগুড়াঘাত করিয়া আমাদিগকে বলপূর্ব্বক তাহা হইতে নিবৃত্ত রাখার চেষ্টা করিতেছে। কোরআনের বাহক হজরত রছুলে করিম বলিতেছেন—ভবিষ্যতের কোনও যুগে কোরআনের অভিনবত্ব শেষ হইবে না, তাহার সজীব সচল স্বরূপের বিকাশ অনিত্য নহে, ক্ষণস্থায়ী নহে। তিনি স্পষ্ট কণ্ঠে বলিয়া দিতেছেন—বিশ্বের জ্ঞানীজনেরা যুগে যুগে যতই কোরআনের অনন্ত জ্ঞান ভাণ্ডারের সেবা করিবেন, তাহার অনন্ততার স্বরূপও সঙ্গে সঙ্গে ততই স্পষ্টতর হইয়া উঠিবে। তাহা ফুরাইয়া যাইবে না, পুরাতন হইবে না, কোন যুগে অচল বা তামাদি হইয়া যাইবে না। আর সেই রছুলের নাএবগণ বলিতেছেন :—সে ভাণ্ডার ফুরাইয়া গিয়াছে, সে উৎস শুকাইয়া গিয়াছে। এখন আল্লার বাণী অচল হইয়া পড়িয়াছে, তাহার আসন অধিকার করিয়াছে—তফছিরের রেওয়ায়ত!

এখানে প্রশ্ন হইতেছে যে, আল্লার কালাম বড় না কএকজন মৌলভীর ফৎওয়া বড়? অর্থাৎ এখন মুছলমানের চোখে আল্লাহ ও মৌলভীর মধ্যে কে বড় কে ছোট, কাহার আদেশ পরিত্যাজ্য আর কাহার হুকুম অগ্রগণ্য? এই প্রশ্নের মীমাংসার উপর মুছলমানের ও এছলামের ভবিষ্যৎ সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিতেছে। আমাদিগের মুখে এই উক্তি শ্রবণ করিয়া অনেকে হয়ত ক্রোধে অভিমানে অগ্নিশর্ম্মা হইয়া উঠিতেছেন। এমন সাংঘাতিক কথা, এমন ভীষণা উক্তি! এক আল্লার উপাসক মুছলমান, অনাবিল তাওহীদের শ্রেষ্ঠতম সেবক মুছলমান, তাহার সম্বন্ধে এমন জঘন্য অভিযোগ কি ক্ষমা করা যাইতে পারে! আমাদিগের এই উক্তি যদি বাস্তবিক কোন মুছলমানের

অন্তঃকরণে প্রকৃত ক্রোধের সৃষ্টি করিতে পারে, তাহা হইলে আমরা বিশেষ সুখী হইব। কিন্তু এক্ষেত্রে বিনীতভাবে জানাইয়া রাখিতে চাই যে, আল্লার শাশ্বত বাণী কোরআন মুছলমানের এই লজ্জাজনক অধঃপতনের আভাস দিয়া রাখিতেও ত্রুটি করে নাই। এহুদী ও খৃষ্টানদিগের পতনের চরম আদর্শ মুছলমানের সম্মুখে উপস্থিত করিয়া কোরআন নিজেই বলিতেছে :—

اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون
الله والمسيح بن مريم -

আল্লাহকে পরিত্যাগ করতঃ নিজেদের আলেম ও পীর-ফকিরদিগকেই তাহারা খোদা বানাইয়া লইয়াছে, আর খোদা বানাইয়াছে মরিয়মের পুত্র মছিহকে। এই আয়তের অর্থ ও তাৎপর্য্য কি, তাহা লইয়া বাদবিতণ্ডার কোন আবশ্যক নাই। কারণ যাঁহার উপর ইহা অবতীর্ণ হইয়াছিল, তিনি স্বয়ং এ আয়তের সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন। হাদিছের কেতাবে বর্ণিত হইয়াছে যে, আদী-এবনে-হাতেম ছাহাবী হজরতের মুখে এই আয়তের আবৃত্তি শুনিয়া একটু বিস্মিত ভাবে বলিলেন—কই, তাহারা ত নিজেদের আলেম ও পীরদিগকে খোদা বলিয়া গ্রহণ করে নাই। হজরত তখন বুঝাইয়া বলিলেন—তাহাদের পণ্ডিত ও সাধুরা যে কাজকে সঙ্গত বলিয়া ব্যবস্থা দেয়, তাহারা বিনা বিচারে তাহাকে হালাল বলিয়া গ্রহণ করে। পক্ষান্তরে ঐ আলেম ও পীর ফকীরেরা যে কাজকে নিষিদ্ধ বলিয়া ফৎওয়া দেয়, তাহারা চোখ বন্ধ করিয়া তাহাকে অন্যায় বলিয়া ধরিয়া লয়। ইহাই হইতেছে আল্লাহকে ত্যাগ করা, ইহাই হইতেছে পীর পুরোহিতকে আল্লার আসনে বসাইয়া দেওয়া, আর ইহাই হইতেছে ঐ শ্রেণীর আলেম ও পীর ফকীরদিগের স্পষ্ট খোদাই দাবী! অতএব আমরা দেখিতেছি যে, কোরআনের প্রকৃতস্বরূপের যথাযথ ধারণা করিতে হইলে মানুষকে খোদার আসন হইতে নামাইয়া ফেলিতে হইবে, বহু খোদার পূজা পরিত্যাগ করিয়া মুছলমানকে আবার এক আল্লার উপাসক হইতে হইবে, আল্লার দেওয়া মুক্ত জ্ঞানকে লইয়া মুক্ত এছলামের সেবায় প্রবৃত্ত হইতে হইবে। পথের কণ্টকগুলিকে দলিয়া মথিয়া গন্তব্যের পানে চলিয়া যাইতে হইবে। ইহাতে প্রথম প্রথম পায়ে এক আধটুকু বাজিবে—তাহা সহিয়া লইতে হইবে।

আরবী ভাষা পূর্ব্বের ন্যায় জীবন্ত ও সচল হইয়া আছে। ব্যাকরণ অলঙ্কার অভিধানাদির কত অমূল্য পুস্তক প্রকাশিত হইয়া আরবী-সাহিত্যকে পুষ্টতর করিয়া তুলিয়াছে। মুদ্রাযন্ত্রের কল্যাণে তাহার সম্পদ আজ শতগুণে বাড়িয়া গিয়াছে। দুনয়ার সমস্ত মোহাদ্দেছগণের সঙ্কলিত রত্ন-ভাণ্ডার-স্বরূপ হাদিছ গ্রন্থগুলি সমস্তই আজ আমরা একত্রে হস্তগত করিতে পারিতেছি। "দুনয়ার প্রাচীন ইতিহাস ও অজ্ঞাতপূর্ব্ব পুরাতত্ত্বের নিত্য নূতন আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে কোরআনের উপাখ্যান ভাগের সত্যতা বাস্তবতার দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়া যাইতেছে।" (১) জ্ঞান-বিজ্ঞানের কত অভিনব আবিষ্কারে কোরআনের কত অজ্ঞাত-পূর্ব্ব তত্ত্বের স্বরূপ প্রকাশ করিয়া দিতেছে। মানুষের দেওয়া আবরণের শত অন্তরাল হইতেও এছলামের নূরের আভাস দেখিয়া আজ দুনয়া তাহাকে চিনিবার জন্য ব্যাকুলতা প্রকাশ করিতেছে—ভবিষ্যতের জন্য ক্ষেত্র প্রস্তুত করিতে চাহিতেছে। অথচ ইহারা কোরআনকে লইয়া সারিয়া ফেলিতেছে—হাজার বৎসরের এক ঘুণ-ধরা দুর্গন্ধ সিন্দুকের আবর্জ্জনাস্তূপের মধ্যে। তফছিরকারগণের মত অর্থাৎ দীর্ঘ বার শত বৎসর পূর্ব্বে বর্ণিত এক ডজন রাবীর পরস্পর বিরুদ্ধ কল্পনা—যাহা বহুস্থলে কোরআন হাদিছের ও এছলাম ধর্ম্মের মূলনীতির, ব্যাকরণ অলঙ্কার ও অভিধানের, সমস্ত জ্ঞান বিজ্ঞান ও ঐতিহাসিক সাক্ষ্যের, এবং নিত্য লক্ষিত শত শত প্রত্যক্ষ সত্যের সম্পূর্ণ বিপরীত। যাহার অধিকাংশ খোশ খেয়ালের কল্পনা, অথবা এহুদী খৃষ্টান ও মজুস দিগের প্রক্ষিপ্ত পুরাণ পুঁথির প্রচলিত কিংবদন্তির বিকৃত বা অবিকল নকল ব্যতীত আর কিছুই নহে। যে রেওয়ায়ত গুলির মূল রাবীগণের মধ্যে অনেকেই পূর্ব্বতন এমাম ও চরিত-শাস্ত্রকারগণ কর্ত্তৃক অত্যন্ত কঠোর ও অপ্রীতিকর সমালোচনার বিষয়ীভূত হইয়াছেন—তাহার অন্ধ অনুকরণ না করিলে সমস্ত দীন ইমান পণ্ড হইয়া যাইবে!! এই মারাত্মক সংস্কারকে সম্পূর্ণরূপে দূর করিয়া দিতে না পারিলে এছলামের প্রকৃত আদর্শকে দেখা ও দেখান সম্ভবপর হইবে না।

(১) মিছরের স্বনামধন্য খৃষ্টান পণ্ডিত জর্জিজিদানের উক্তি।

এই চিত্রের আর একটা দিক আছে, এই প্রসঙ্গে তাহারও একটু আলোচনা হওয়া আবশ্যক। আজ কাল সমাজে এক শ্রেণীর লোক পাশ্চাত্যবাদের অন্ধ-অনুকরণে আপনহারা হইয়া পড়িয়াছেন। এই সংস্কার তাঁহাদের মন ও মস্তিষ্কের উপর এমন প্রবল ভাবে প্রভাব বিস্তার করিয়া বসিয়াছে যে, তাহার বিপরীত প্রত্যেক বিষয়কে তাঁহারা বিনা বিচারে পরিত্যাগ করিতে প্রস্তুত। বিজ্ঞানের নামে তাঁহারা অজ্ঞানের মত অনেক প্রগল্‌ভতা প্রকাশ করিয়া থাকেন। Progressive Science এর নিত্য পরিবর্ত্তনশীল থিওরীগুলি তাঁহাদের নিকট Exact Sceince রূপে গৃহীত হয়, এবং বিজ্ঞানের নামে বৈজ্ঞানিকের থিওরি মাত্রকে অবলম্বন করিয়া তাহার মধ্যবর্ত্তিতায় ধর্ম্মশাস্ত্রের সমালোচনা করার জন্য, তাঁহারা অনেক সময় আগ্রহ প্রকাশ করিয়া থাকেন। যুক্তির হিসাবে কোরআনের সমালোচনা করিতে তাঁহারা কুণ্ঠিত হন না বটে, কিন্তু পাশ্চাত্যের ভাবধারার অনুকরণ করার সময়, বৈজ্ঞানিকথিওরিগুলিকে অকাট্য সত্য বলিয়া গ্রহণ করার কালে, তাঁহাদের যুক্তিবাদের এই বহুবিশ্রুত অভিমানটীর বিশেষ কোন সন্ধান পাওয়া যায় না। পক্ষান্তরে এক শ্রেণীর পণ্ডিত কোরআনকে আধুনিকতার সহিত খাপ খাওয়াইবার জন্য অতি নির্ম্মম ভাবে যথেচ্ছাচারের পরিচয় দিয়া থাকেন। তাঁহারা ভুলিয়া যান যে ইহাও সংস্কারের দাসত্ব,, ইহাও হুজুকের গড্ডলিকা প্রবাহে আত্মসমর্পণ। এখানে তাঁহাদিগকে স্মরণ করাইয়া দিতে চাই যে, বৈজ্ঞানিকের থিওরি আর বিজ্ঞানের সত্য এক নহে, জ্ঞানের স্বাধীনতা আর প্রবৃত্তির উচ্ছৃঙ্খলতা এক নহে। পায়জামা কোর্ত্তা পরা সংস্কারের ন্যায় কোট পাৎলুন আঁটা সংস্কারগুলিও মানুষের জ্ঞানের পক্ষে সমান মারাত্মক। এছলামের প্রকৃত আদর্শকে দর্শন ও গ্রহণ করিতে হইলে, তাঁহাদিগকে এ সংস্কারের হাত হইতেও মুক্তিলাভ করিতে হইবে।

এই দীর্ঘ আলোচনার খোলাসা এই যে, এছলামের স্বর্গীয় আদর্শগুলির পরিচয় জানিতে হইলে কোরআনের আশ্রয় গ্রহণ করা ব্যতীত উপায়ান্তর নাই। আল্লার শাশ্বত বাণী এই কোরআন, সকল যুগের সকল দেশের সমস্ত মানুষের জন্য সমান ভাবে উপযোগী, সমান ভাবে কার্য্যকরী এক চিরস্থায়ী অফুরন্ত জ্ঞানভাণ্ডার। কোরআন দুনয়ার সব সমস্যার সমাধান, কোরআন বিশ্বমানবের অফুরন্ত জ্ঞানভাণ্ডার, কোরআন আল্লার প্রতিষ্ঠিত জীবন্ত আদর্শ। সুতরাং মুছলমান অমুছলমান নির্ব্বিশেষে আল্লার সকল বান্দার সমান অধিকার তাহাতে আছে, এবং চিরকাল থাকিবে। কোরআনের জীবন্ত জলন্ত ব্যাপক ও শাশ্বত স্বরূপকে উপেক্ষা করিয়া, বিশ্বমানবের এই আল্লার প্রদত্ত অধিকারকে অস্বীকার করিয়া, মুছলমান নিজের, এছলামের এবং বিশ্বমানবের ঘোর অনিষ্ট সাধন করিয়া চলিয়াছে। বর্ত্তমানের সমস্ত স্থবিরতা এবং সমস্ত অধঃপতনের মূল এইখানে। নূতন যাত্রার এই শুভ মুহূর্ত্তে, জীবন-সাধনার এই পুণ্য প্রভাতে, আমাদিগের প্রত্যেক যাত্রীকে প্রত্যেক হাদীকে, একথাগুলি সর্ব্বাগ্রে সম্যকরূপে উপলব্ধি করিয়া লইতে হইবে। সাবধান! পশ্চাতে 'ভূতের' মায়া কাঁদন, সম্মুখে আলেয়ার জলন্ত মোহ। সাবধান—

در کفے جام شریعت در کفے سندان عشق
هر هوسناکے نداند، جام و سندان باختن!

---

# ওমর খাইয়াম

[ মৌলভী কাজী নওয়াজ খোদা ]

কবির নাম 'গেয়াসুদ্দীন আবুল ফাতাহ ওমর এবনে এবরাহিম', স্বরচিত কবিতা সমূহের ভণিতায় তিনি 'খাইয়াম' উপাধি ব্যবহার করিয়াছেন। এজন্য 'ওমর খাইয়াম' নামেই তিনি সাধারণের নিকট পরিচিত। খাইয়াম আরবী শব্দ, আরবীতে খিমা বা তাঁবু সেলাইকারীকে খাইয়াম বলে। কবির পিতা এব্রাহিম তাঁবু সেলাইয়ের কাজ করিতেন, তাই কবি 'ভণিতায়' খাইয়াম নামই ব্যবহার করিয়াছেন। তাঁহার ন্যায় অন্যান্য পারস্য কবিও ব্যবসায়ের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া সাহিত্য জগতে এক একটী নামে সুপরিচিত হইয়া গিয়াছেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ কবিবর আত্তার (আতর ব্যবসায়ী) ও নাজ্জারের (সূত্রধর) নাম উল্লেখ করিতে পারি। আত্তার আতর ব্যবসায়ী ও নাজ্জারের পিতা সূত্রধরের কার্য্য করিতেন। তাঁহারা এই সকল নামে পরিচিত হওয়া গৌরব-জনক মনে করিতেন।

খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে খোরাসান প্রদেশের নেশাপুর (নাইশপুর) নগরীতে একটী সম্ভ্রান্ত বংশে কবিবর 'খাইয়াম' জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহার পিতার নাম এবরাহিম। ইহার অতিরিক্ত তাঁহার বংশাবলী ও জনক জননী সম্বন্ধে আর কিছু জানিতে পারা যায় না। সে সময় এই প্রদেশটী মহামহা সাহিত্যরথী ও নানা শাস্ত্রে সুপণ্ডিত মনিষীগণের লীলাভূমি ছিল। খাইয়ামের জীবন-সূত্রের সহিত মহাত্মা আবুল কাসেম নেজামুল মোল্‌ক্ ও হতভাগ্য হাসান এবনে সাব্বাহ, এই দুজনের নাম বিশেস ভাবে গ্রথিত। তগ্‌রল্ বেগ তাতারীর পুত্র সোলতান আল্‌পার্‌সালান্ ও পৌত্র মালেক শাহের রাজত্বকালে নেজামুলমুল্‌ক্ প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। তিনি কর্ম্মকুশলতা গুণে ভারত-বিজয়ী সুযোগ্য সম্রাট সোলতান মহ্‌মুদের অযোগ্য বংশধরের নিকট হইতে ইরাণের রাজসিংহাসন কাড়িয়া লইয়াছিলেন। এই সময় হইতেই 'সালজুকী' বংশের ভিত্তি স্থাপিত হয়।

মহাত্মা নেজামুল্‌মোল্‌ক্ 'ওসিয়াৎনামা' নাম দিয়া একখানি বিরাট গ্রন্থ লিখিয়াছেন। ইহাতে তিনি রাজনীতি, সমাজনীতি ও নানা ঐতিহাসিক তত্ত্বের আলোচনা করিয়াছেন। গ্রন্থের একস্থানে তিনি লিখিয়াছেন:—"এই সময় পারস্য দেশে মহানুভব "এমাম্ মোয়াফেক্ নেশাপুরী" সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আলেম বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন। সর্ব্বসাধারণে তাঁহার খ্যাতি, প্রতিপত্তি ও সম্মানের সীমা ছিলনা। পারস্য দেশের সে সময়ের অধিবাসিগণ এমাম সাহেবের চরণে শ্রদ্ধা ও ভক্তির পুষ্পাঞ্জলি উপহার দিয়া কৃতার্থ হইত। যিনি যত বড় পণ্ডিত হউন, এমাম সাহেবের শিষ্যের তালিকায় নাম না থাকিলে কেহই তাঁহাকে আলেম বলিয়া গণ্য করিতেন না। তাই আমার পিতা সুপ্রসিদ্ধ চিকিৎসক হাকিম আবদুস্‌সামাদের রক্ষণাধীনে আমাকে জন্মভূমি 'তূস্' হইতে নেশাপুরে এমাম সাহেবের 'খেদমতে' পাঠাইয়া দিলেন। এমাম সাহেব আমাকে বিশেষ স্নেহের চক্ষে দেখিতেন, আমি বিশেষ আগ্রহ ও পরিশ্রমের সহিত পূর্ণ চারি বৎসর তাঁহার নিকট শিক্ষালাভ করিয়াছিলাম"

"আমি নেশাপুরে আসিবার অল্পদিন পরেই 'ওমার খাইয়াম' ও হতভাগ্য হাসান এবনে সাব্বাহ্‌ পাঠার্থীরূপে এমাম সাহেবের 'খেদমতে' আসিয়া পঁহুছিলেন। এই সময় হইতে আমরা তিনজনে অকৃত্রিম বন্ধুত্ব-সূত্রে আবদ্ধ হইলাম। আমরা একসঙ্গে সতীর্থরূপে অধ্যয়নে রত থাকিতাম, আবার নানা গল্প-গুজবে ও বিভিন্ন বিষয়ের আলোচনায় অবসর কাল কাটাইয়া দিতাম। খাইয়াম নেশাপুরের এবং আমরা দুজন বিভিন্ন স্থানের অধিবাসী ছিলাম।"

"একদিন হাসান এবনে সাব্বাহ্‌ বলিলেন—ভাই, আমরা ভবিষ্যতে কর্ম্মময় জীবনে নানা সূত্রে বিভিন্ন অবস্থায় উপনীত হইতে পারি। আমাদের মধ্যে কেহ হয়তো অগাধ ধনৈশ্বর্য্য, অপরিসীম যশ প্রতিপত্তি ও উচ্চতম

পদ-মর্য্যাদার অধিকারী হইয়া সুখে স্বচ্ছন্দে কাল কাটাইতে পারি। আবার কেহ হয়ত দুঃখ দারিদ্র্যে নিষ্পেষিত ও নানা বিপদাপদে জড়ীভূত হইয়া দুর্ভাগ্যের চরম সীমায় উপনীত হইতে পারি। তখন যেন আমরা অবস্থার তারতম্য ও পদ-গৌরবের কুহকে পড়িয়া আমাদের এই অকৃত্রিম ভালবাসার কথা ভুলিয়া না যাই। সুখে দুঃখে, সম্পদে বিপদে কোন অবস্থায় আমাদের প্রীতি ও ভালবাসার বন্ধন শিথিল হইবে না বলিয়া সেই দিন আমরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলাম।"

"ইহার পর বহুদিন কাটিয়া গেল। পাঠ-সমাপ্তির পর ঘটনাস্রোতের ঘাত প্রতিঘাতে আমরা বিভিন্ন দিকে ভাসিয়া চলিলাম। আমি লেখাপড়া শেষ করিয়া দেশভ্রমণে বাহির হইলাম, নানাদেশ ঘুরিয়া ফিরিয়া গাজ্‌নী ও কাবুল হইয়া অবশেষে দেশে ফিরিয়া আসিলাম। দেশে ফিরিয়াই খোদার ফজলে আমি 'সোলতান আলপারসালানের' সুনজরে পড়িলাম। তিনি আমাকে তাঁহার প্রধান মন্ত্রীর দায়িত্বপূর্ণ পদে নিযুক্ত করিলেন। সেই অবধি আমি রাজ্যের সুশৃঙ্খলা বিধান ও প্রকৃতিপুঞ্জের হিতসাধনে ব্রতী হইলাম।"

"এই সময় হঠাৎ একদিন দুষ্ট গ্রহের ন্যায় 'হাসান' আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তাঁহার আর্থিক ও মানসিক অবস্থা তখন বড়ই শোচনীয়। আমি তাঁহার দুরবস্থায় মনে বড় ব্যথা পাইলাম। অবশেষে সোলতানের নিকট সোফারেশ করিয়া রাজ্য-সংক্রান্ত একটা উচ্চপদে তাঁহাকে 'বাহাল' করিয়া দিলাম; কিন্তু হায়! দুর্ভাগ্য-তাড়িত মানবকে সুখ-শান্তি দিবার শক্তি কাহারও নাই। হতভাগ্য হাসান্ নিজ-দোষে তাঁহার বর্ত্তমান সুখ-শান্তির মূলে কুঠারাঘাত করিলেন। তিনি স্বখাত সলিলে ডুবিয়া মরিলেন। কিছুদিন পদোচিত সম্মান ও প্রতিপত্তি ভোগ করিয়া বহু ধনসম্পত্তি ও রাজানুগ্রহ পাইয়া অবশেষে তাঁহার দুর্ম্মতি উপস্থিত হইল। তিনি অনর্থক বিদ্রোহ ব্যাপারে ও রাষ্ট্রবিপ্লব মূলক ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইয়া পড়িলেন। ব্যক্তিগত ভাবে আমার সর্ব্বনাশের চেষ্টারও ত্রুটী করিলেন না। কিন্তু সাধারণতঃ এই সকল কুকাজের যে পরিণাম হইয়া থাকে এখানেও তাহাই হইল। অচিরেই তাঁহার সকল ষড়যন্ত্র ও দুষ্ট বুদ্ধির কথা প্রকাশ হইয়া পড়িল, রাজাজ্ঞায় তিনি কর্ম্মচ্যুত ও বন্দী হইয়া কারাগারেনীত হইলেন। রাজপুরুষগণ সকলেই একমত হইয়া তাঁহার 'কাতলের' হুকুম দিলেন। কিন্তু আমি আমার সেই পাঠ-দশার প্রতিশ্রুতির কথা ভুলিতে পারিলাম না। বহু কষ্টে ও বহু চেষ্টায় সম্রাটের নিকট হইতে তাঁহার প্রাণভিক্ষা লইলাম, ফলে প্রাণান্তের পরিবর্ত্তে নির্ব্বাসন দণ্ডই তাঁহার জন্য স্থিরতর হইল। কিন্তু এখানেই তাঁহার দুর্ম্মতির অভিনয় শেষ হইল না, স্বদেশ হইতে বিতাড়িত অবস্থায় তিনি আরও নানা ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইয়া বহু বিপদে পড়িয়াছিলেন। অবশেষে 'ইস্‌-মাইলিয়া' সম্প্রদায়ের নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়া তাহাদের মধ্যে ধর্ম্ম সম্বন্ধে একটা ভ্রান্ত মত প্রচার ও খোলাখুলি ভাবে মোসল্‌-মান সমাজের বিরুদ্ধাচরণ করিতে ত্রুটী করেন নাই। এই সম্প্রদায়টী ঐতিহাসিকদের নিকট 'হাশীশিয়া' নামে বিখ্যাত। হাসানের নেতৃত্বাধীনে তাহারা কিছু দিন বেশ উন্নতির পথে অগ্রসর হইয়াছিল, হাসানও যথেষ্ট মান-সম্ভ্রম ও পশার প্রতি-পত্তি লাভ করিয়াছিলেন। ইহার পর ১০৯০ খৃষ্টাব্দে কাস্পি-য়ান হ্রদের দক্ষিণস্থ 'রুদবার' অঞ্চলের 'আলতামুৎ' নামক পার্ব্বত্য দুর্গটী হাসানের ধূর্ত্ততা ও বিশ্বাসঘাতকতার ফলে ঐ সম্প্রদায়ের হস্তগত হইয়াছিল। এই সময়েই ক্রুসেড্‌ যুদ্ধের সূত্রপাত হয়।"

"হাসানের ব্যাপার শেষ হওয়ার কিছুদিন পর "ওমর খাইয়াম আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আমি বহু যত্নে ও সমাদরে তাঁহাকে গ্রহণ করিলাম। তাঁহার পাণ্ডিত্য, কবিত্ব শক্তি, ন্যায়নিষ্ঠা বিশেষতঃ তাঁহার প্রেমপ্রবণ হৃদয়ের ভাব আমার অজানা ছিল না। আমি সোলতানের নিকট তাঁহার পরিচয় দিয়া 'হাসান' অপেক্ষাও উচ্চ রাজ-কার্য্যে তাঁহাকে বাহাল করার ব্যবস্থা করিলাম; কিন্তু খাইয়াম কিছুতেই রাজী হইলেন না। তিনি চিরদিন বিদ্যানুরাগী; জ্ঞান-চর্চ্চায় জীবন কাটাইয়া দেওয়াই তাঁহার উদ্দেশ্য। তাই লোকালয় হইতে বহুদূরে সামান্য একটা কুটীরে আবশ্যকীয় অভাবাদির হাত হইতে এড়াইয়া বিদ্যার আলোচনা ও সাহি-ত্যের চর্চ্চার সুবিধা করিয়া দিবার জন্য তিনি অনুরোধ করিলেন। অতঃপর নেশাপুরের রাজ-কোষ হইতে বার্ষিক ১২০০ বার শত মোহর তাঁহার বৃত্তি নির্দ্ধারিত হইল। কবি এইরূপে বৃত্তিলাভ করিয়া নিশ্চিন্ত মনে সাহিত্যচর্চ্চা ও নানা শাস্ত্রের আলোচনায় দিন কাটাইতে লাগিলেন। সাধারণতঃ সকল শাস্ত্রেই তিনি পণ্ডিত ছিলেন, বিশেষতঃ দর্শন, বীজগণিত ও জ্যোতির্বিদ্যায় (Astronomy) সে সময়

তাঁহার সমান আলেম আর কেহ ছিলেন বলিয়া জানা যায় না।"

"এই সময় সোলতান আল্পারসালান পরলোক গমন করিলে পুত্র 'সোলতান মালেক শাহ্ পিতৃসিংহাসনে আরোহণ করিলেন। তিনি খাইয়ামের গুণমুগ্ধ হইয়া পূর্ব্বনির্দ্ধারিত বৃত্তি বাড়াইয়া দিলেন এবং এনাম স্বরূপ আরও বহু ধনরত্ন ও খেলাতাদি প্রদান করিলেন। সে সময় কবির যশবিভা দেশময় ছড়াইয়া পড়িয়াছিল।"

"ইহার কিছুদিন পর সোলতান মালেক শাহ্ পণ্ডিত গণের পরামর্শমত একটী নূতন সনের প্রবর্ত্তনের ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন, এই কাজের জন্ত তখনকার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ৮জন পণ্ডিত লইয়া একটী পরামর্শ সমিতি গঠিত হইল, ওমর খাইয়াম সকলের মতে সভাপতি নির্ব্বাচিত হইলেন। এই সভার সভ্যগণের গভীরগবেষণা ও বহু আন্দোলন আলোচনার ফলে 'জালালী' নামে একটী নূতন সন প্রবর্ত্তিত হইল।"

পাশ্চাত্য পণ্ডিত 'গীবন' লিখিয়াছেন—সে সময়ের প্রসিদ্ধ জ্যোতির্ব্বিদ 'ওমর খাইয়াম' এই ঘটনার কিছুদিন পূর্ব্বে একটী নূতন গ্রহের আবিষ্কার করিয়া জালাল নামে অভিহিত করিয়াছিলেন, এই আবিষ্কারের সময় হইতে নূতন সনের উৎপত্তি হওয়ায় ঐ গ্রহের নামে নূতন সনের নামকরণ হইয়াছিল।

'খাইয়াম' গণিত শাস্ত্রে বহু গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন, ফরাসী ভাষায় তাহার কয়েক খানি অনূদিত ও বিশেষভাবে সমাদৃত হইয়াছে। কবি এই প্রকারে জ্ঞান-চর্চ্চা ও প্রবন্ধ রচনায় তাঁহার জীবন কাটাইয়া দিয়াছেন। পারস্য সাহিত্যের আলোচনা ও কবিতা রচনায় তিনি অধিকাংশ সময় ব্যাপৃত থাকিতেন। সে সময় কবির বীণা অভিনব সুরে বাজিয়া উঠিয়াছিল, তাই তাঁহার কবিতা প্রসঙ্গে দেশে এক নূতন সাড়া পড়িয়া গিয়াছিল।

পাশ্চাত্য লেখক Fitzgirald খাইয়ামের মাত্র পাঁচাত্তরটী 'রোবাই'র অনুবাদ করিয়াছেন, এবং একত্বভাব প্রকাশক (অথবা তাঁহার রুচির অনুকূল নয়) বলিয়া দুই শতাধিক 'রোবাই' প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। কবি 'ওমর খাইয়াম' অনেকগুলি কবিতায় একই ভাব নানা প্রকারে ফুটাইয়া তুলিয়া ভাষার সৌন্দর্য্য ও বর্ণনা-বৈচিত্র্যের পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহার ন্যায় একই ফুলে নানা রকমের মাল্য রচনার শক্তি আর কাহারও দেখা যায় না, তাঁহার 'রোবাই' গুলি একত্র করিলে এক হাজারের ও বেশী হইবে।

## ওমরের ধর্ম্মমত

পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ এবং তাঁহাদের রচনার মধ্যবর্ত্তিতায় যাঁহারা 'ওমর'কে চিনিয়াছেন, তাঁহারা সকলে মিলিয়া কবিকে 'ধর্ম্ম' সম্বন্ধে বেপরওয়া, ধর্ম্মশাস্ত্রে বর্ণিত পাপের সাজা ও পুণ্যের পুরস্কার, কেয়ামাৎ, বেহেস্ত ও দোজখ প্রভৃতি ইছলামী আকায়েদ সমূহে আস্থাহীন সাব্যস্ত করিয়াছেন। অনেকে আবার আরও কিছু দূর অগ্রসর হইয়া সর্ব্বশক্তিমান আল্লাহ তাআলার অস্তিত্বেই সন্দিহান বলিয়া তাঁহাকে নাস্তিক পণ্ডিত 'চার্ব্বাক' ও এপিকিউরিয়াসের সমান আসনে বসাইয়া দিয়াছেন। তাঁহাদের কথা :—

চার্ব্বাক বলিয়াছেন—

যাবজ্জীবেৎ সুখং জীবেৎ ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ
ভস্মীভূতস্য দেহস্য পুনরাগমনং —কুতঃ

এপিকিউরিয়ানগণ বলেন—

We are no other than a moving row
Of magic shadow—shapes that come and go
Round with the sun—illumined lantern held
In midnight by the master of the Show

—*Horace*

তাঁহারা বলেন ওমর খাইয়ামও এই সুরে সুর মিলাইয়া গাহিয়াছেন—

می خور که بزیر گل بسے خواهی خفت
بے مونس وبے حریف وبے همدم وجفت
زنهار بکس مگوایں راز نہفت
هر لاله که پژمرده نخواهد بشگفت

অর্থাৎ কিনা এই সুযোগে মদের সেবা করিয়া লও, এর পর মাটীর নীচে অঘোরে ঘুমাইয়া পড়িবে। সেখানে তুমি আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, স্ত্রী-পরিবার কাহাকেও পাইবে না। সাবধান এই গূঢ় রহস্যটী কাহাকেও বলিও না—"যে ফুলটী একবার শুকাইয়া ঝরিয়া পড়ে সেটী আর কখনও প্রস্ফুটিত হয় না।" এই 'রোবাই' টীর প্রথম দুইচরণ হইতে তাঁহারা কবিকে মাতাল ও পরবর্ত্তী দুইচরণ হইতে 'কেয়ামতে'

পুনরুত্থান সম্বন্ধে আস্থাহীন সাব্যস্ত করিয়াছেন। অথচ উভয় ধারণাই ভ্রমাত্মক।

Fitzgirald এর অনুবাদিত 'রুবাই' গুলিই (যাহার সংখ্যা ৭৫টী মাত্র) তাঁহাদের যথাসর্ব্বস্ব। সেগুলি মাত্র নাড়াচাড়া করিয়া অনুবাদকের প্রকাশিত মর্ম্মই অভ্রান্ত সত্য-রূপে ধরিয়া লইয়া প্রায় সকলেই কবিবর খাইয়ামকে মাতাল, নাস্তিক ধর্ম্ম-কর্ম্মহীন ও ধর্ম্মের বন্ধন হইতে "উচ্ছৃঙ্খল খেয়ালের" লোক ধরিয়া লইয়াছেন। দুঃখের বিষয় এতদিনের মধ্যে কবির প্রকৃত স্বরূপ নির্ণয় সম্বন্ধে কেহ স্বাধীনভাবে আলোচনা ও অনুসন্ধান করা আবশ্যক মনে করেন নাই।

আজ আমরা কবির প্রকৃত স্বরূপ, তাঁহার এছলাম ধর্ম্মে বিশ্বাস এবং Fitzgirald ও তাঁহার অনুসরণকারীদের উল্লিখিত 'রোবাইয়াতের' প্রকৃত মর্ম্ম আলোচনা, পক্ষান্তরে কবির কথায় তাঁহার স্বীকারোক্তিমতে প্রকৃত তত্ত্ব আবিষ্কারের চেষ্টা পাইব।

সাধারণতঃ ইউরোপীয়গণ জড়বাদী। ধর্ম্মের বন্ধন তাঁহাদের নিকট অসহনীয়, আবার মদও তাঁহাদের বিশেষ লোভনীয়। এরূপ অবস্থায় ওমরের ন্যায় একজন দেশপ্রসিদ্ধ মহা পণ্ডিতকে দলে টানিতে পারিলে অপরাধের গুরুত্ব যেন কিছু 'হালকা' হইয়া যায়। তাই Fitzgirald বাছিয়া বাছিয়া এই শ্রেণীর রোবাইগুলি লইয়াছেন, এবং 'মায়' অর্থে—তাঁহাদের পরিচিত 'ব্রাণ্ডি, হুইস্কী, শ্যারী, শ্যাম্পেন আদিই মনে করিয়াছেন। আবার দীন ও দুনিয়া সম্বন্ধে বৈরাগ্য প্রকাশক ভাবগুলিকে কবির ধর্ম্মের প্রতি অনাস্থা ও নাস্তি-কতা বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ফারসী ভাষায় তাঁহাদের জ্ঞানের অল্পতা ও পারস্য কবিদের কবিতার ভাবধারার সহিত পরিচয়হীনতাও ইহার কারণ বলিয়া মনে হয়। সর্ব্ববাদীসম্মত আলেমে বা-আমাল, দরবেশে কামেল পারস্য-কবিগণও মায়, সাকী ও মা'শুক এই সব লইয়া কবিতার সৌন্দর্য্য ফুটাইয়াছেন। হাফেজের ন্যায় মহা সাধক আবার মায় ও মা'শুক দিয়া সমস্ত দীওয়ানে হাফেজ ভরিয়া দিয়াছেন, জামীর ন্যায় অক্ষরে অক্ষরে ইছলাম ধর্ম্মের বিধি-নিষেধাদি পালনকারী মহাত্মাও কবিতাক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া গাহিয়াছেন—

حریفان بادها خوردند ورفتند
تهی خمخانها کردند ورفتند

যাহা কিছু মদ ছিল, আমার সতীর্থগণ তাহা পান করিয়া গিয়াছেন—মদের ঘরগুলি শূন্য করিয়া চলিয়া গিয়াছেন। ইহার পর আরও বলিয়াছেন—তাঁহাদের কল্যাণে আমার ভাগ্যে পাত্রের তলস্থিত ময়লা ছাড়া আর কিছুই জুটিল না। এ সব ক্ষেত্রে কেহ কি বলিতে চান যে, এই সব মহা মহা পরহেজগার দরবেশ ও আলেমগণ মদখোর মাতাল ছিলেন? না, কখনই না। তাঁহারা মদ স্পর্শ করাত দূরের কথা, চক্ষে কখনও দেখিয়াছেন কিনা সন্দেহ। এসব ক্ষেত্রে পারস্য কবিদের 'মায়' অর্থে আল্লার প্রেম আর সাকী অর্থে সেই প্রেমের আকর আল্লাহ।

কবি ও ছুফীদিগের মধ্যে এই শ্রেণীর আরও অনেক পরিভাষা প্রচলিত আছে। শাব্দিক অনুবাদে তাহার অর্থ বোধ করা সম্ভবপর নহে।

এইবার আমরা কবির স্ব-প্রকাশিত স্বীকারোক্তি হইতে তাঁহার ধর্ম্ম-মত সম্বন্ধে সাক্ষ্য গ্রহণ করিব :—

কবি লিখিয়াছেন :—

در دیدهٔ تنگ مور نور است ز تو
در پای ضعیف پشه زور است ز تو
ذات تو سزاست مر خداوندی را
هر وصف که نا سزاست دور است ز تو

একটী ক্ষুদ্র পিপীলিকার ক্ষুদ্রতম চক্ষের জ্যোতিঃ এবং একটী অতি নগণ্য মশকের দুর্ব্বল পায়ের শক্তিও তোমারই অনুগ্রহের দান। তুমিই ঈশ্বরত্বের অধিকারী, সমস্ত ত্রুটি তোমা হইতে দূরে অবস্থিত।

কবি অন্যত্র গাহিয়াছেন :—

گر گوهر طاعتت نسفتم هرگز
ور گرد رهت ز رخ نرفتم هرگز
نومید نیم ز بارگاه کرمت
دانی که یکی را دو نگفتم هرگز

যদিও আমি তোমার এবাদৎ বন্দেগী করিতে পারি নাই, যদিও তোমার পথে যথাযথরূপে মস্তক অবনত করিতে পারি

নাই, কিন্তু ইহা ঠিক জানিও—আমি কখনও তোমার দরবার হইতে নিরাশ নহি;—তুমি জানিতেছ, আমি একেকে (খোদাকে) কখনও দুই বলিয়া গ্রহণ করি নাই। এ আশা এবং তাহার অনুকূলে এই যুক্তির ধারা পবিত্র কোরান শরিফের অভয় বাণী হইতেই উদ্ভব হইয়াছে।

পবিত্র কোরাণের আদেশ :—

ان الله لا یغفر ان یشرک به ویغفر مادون ذلک لمن یشاء

অর্থাৎ আল্লার সহিত শেরেক করাকে তিনি কখনও ক্ষমা করেন না—এতদ্ব্যতীত সমস্ত পাপকে তিনি স্বেচ্ছামতে ক্ষমা করিবেন। ইহা অপেক্ষা খোদাওন্দ করিমের অস্তিত্ব, একত্ব, গুণাবলী ও তাঁহার কালাম কোরান শরিফের আদেশের উপর বিশ্বাস ও আস্থা স্থাপনের জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত আর কি হইতে পারে?

তারপর হজরৎ রসুলে মকবুলের রেসালাৎ ও তাঁহার 'ওম্মত' শ্রেণীভুক্ত হওয়া সম্বন্ধে কবি গাহিয়াছেন এবং এই খানেই মায় ও মাশুকের প্রকৃত স্বরূপ সম্বন্ধে তিনি সকল সন্দেহের মুলোচ্ছেদ করিয়া দিয়াছেন—

ای دل می و معشوق بکن در باقی
سالوس رها کن و مکن زرا قی
گر پیرو احمدی خوری جام شراب
زان حوض که مرتضاش باشد ساقی

অর্থাৎ হে মন, তুমি সুরা ও মা'শুকের সাধ - সেই চির-স্থায়ী অবিনশ্বর স্বরূপের মধ্যে মিটাইয়া লও, সাবধান লোক দেখান, মন ভুলান কোন কাজ করিও না। নিশ্চয় বলিতেছি তুমি যদি আহ্‌মদ মোজ্‌তাবা, মোহাম্মদ মোস্তফার অনুবর্ত্তী হও, তাহা হইলে নিশ্চয় সেই পবিত্র শারাবের পিয়ালা পান করিতে পারিবে, যাহার সাকী হইতেছেন মোর্ত্তাজা। কবির ব্যবহৃত শারাবের প্রকৃত মর্ম্ম সম্বন্ধে ইহা অপেক্ষা অধিক স্পষ্ট প্রমাণ আর কি হইতে পারে?

এখন দেখিতে হইবে যে, এছলাম ধর্ম্মে বর্ণিত বেহেস্ত, দোজখ ও কেয়ামতের কথা কবি বিশ্বাস করিতেন কিনা, তাঁহার কথা হইতেই আমরা প্রশ্নের উত্তর দিতে চেষ্টা করিব।

কবি গাহিয়াছেন :—

روز یکه شود اذا السماء انشقت
وا ندم که بود اذا النجوم انکدرت
من دامن تو بگیرم اندر عرصات
گویم صنما بای ذنب قتلت

—০—

از آتش اخرت نمی داری باک
در آب ندامت نشدی هرگز پاک
چون باد اجل چراغ عمرت بکشد
ترسم که ترا زننگ نپذیرد خاک

সেদিন, সেই—মহা হাশরের দিন তোমার দামন ধরিয়া বলিব, হে প্রিয়, হে ওমরের প্রাণের প্রাণ এতদিন ধরিয়া কি অপরাধে তোমার বিরহ-আগুণে এ অধমকে পুড়াইয়া মারিলে?

—০—

হে ওমর! তুমি কি সেই—শেষের দিনের—পরকালের আগুনকে ভয় কর না, অনুতাপ ও তৌবার পূত নির্ঝরিণীতে তোমার পাপ-কলুষ লিপ্ত দেহ ধুইয়া মুছিয়া পাক সাফ্ করিয়া লইলেনা, যেদিন মরণের ঝঞ্ঝাবায়ু তোমার জীবন প্রদীপকে চিরদিনের মত নির্ব্বাপিত করিয়া দিবে, আমার ভয় হয় কবরের মাটীও সেদিন তোমার দেহ অঙ্কে ধারণ করিতে স্বীকার করিবে না।

ইহা হইতেই নিঃসন্দেহরূপে প্রমাণিত হইতেছে যে, মহামতি ওমর একজন নিষ্ঠাবান মুছলমান, এবং এছলাম ধর্ম্মের সকল বিধি ব্যবস্থায় দৃঢ় বিশ্বাসী ছিলেন, এরূপ মহা-আত্মার পবিত্র ললাটে অবিশ্বাস ও ধর্ম্ম-হীনতার কলঙ্ক লেপন করার ন্যায় অন্যায় ও দোষাবহ কাজ আর কি হইতে পারে?

## কবির যশ ও প্রতিপত্তি

Fitzgirald আরও লিখিয়াছেন—কবি জীবিত কালে যশ ও প্রতিপত্তি লাভে সমর্থ হন নাই, সকলকে তিনি সন্তুষ্ট রাখিতেও পারেন নাই। লেখকের এই উক্তি কতকাংশে সত্য বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। কেবল ওমর বলিয়া নয়, অধিকাংশ কবি, দার্শনিক ও পণ্ডিতের ভাগ্যেই জীবনে যশোলাভ ঘটিয়া উঠে নাই। যশোলাভ ত দুরের কথা,

অনেকে দেশবাসীর দ্বারা নানা প্রকারে উৎপীড়িত, লাঞ্ছিত এমন কি অবশেষে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন। পারস্য সাহিত্যে একটি প্রবাদ আছে قدر شاعر بعد از مرگ شاعر "কবির সম্মান মৃত্যুর পরে।" মৃত্যুর পর কবিবর ওমর খাইয়ামের যশ প্রতিপত্তি ও খ্যাতি যেরূপ দেশ-বিদেশে ছড়াইয়া পড়িয়াছে, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। তিনি বহু কবিতা লিখিয়াছেন, কিন্তু তন্মধ্যে সামান্যই গ্রন্থাকারে প্রকাশিত ও সভ্য সমাজে প্রচারিত হইয়াছে। ইহার কারণ সম্বন্ধে বলা হইয়াছে যে, খাইয়াম যশপ্রার্থী ছিলেন না। তিনি ফুলের ন্যায় আপনার গন্ধে আপনি বিভোর হইয়া থাকিতেন, ও লোক-সমাজে যশ অপযশ ও সুনাম দুর্নামের দিকে তাঁহার আদৌ লক্ষ্য ছিল না। তাঁহার কবিতা সমূহ একত্রিত ও জন সমাজে প্রচারিত হওয়া তিনি পছন্দ করিতেন না। কবি অনেক সময় বলিতেন—বাঁচিয়া থাকিয়া লোকসমাজের তিরস্কার ও পুরস্কার, অনুগ্রহ ও নিগ্রহের জ্বালায় অস্থির হইয়া থাকিলাম, অন্ততঃ মৃত্যুর পরও যেন তাহাদের হাত হইতে এড়াইতে পারি। তাই—আমার ইচ্ছা, আমার সঙ্গে সঙ্গেই আমার সমস্তই যেন শেষ হইয়া যায়। আর আমাকে লোকের অনুকূল—প্রতিকূল সমালোচনার বিষয়ীভূত হইয়া থাকিতে না হয়। এই কারণেই সম্ভবতঃ তাঁহার কবিতাবলী বহুল পরিমাণে সাধারণে প্রচার লাভ করিতে পারে নাই, অধিকাংশই লোকলোচনের অন্তরালে রহিয়া গিয়াছে। কবি গাহিয়াছেন :—

در راه چنان رو که سلا مت نکنند
با خلق چنان زي که قیا مت نه کنند
در مسجد اگر روی چنان رو که ترا
در پیش نخوا نند واما مت نکنند

অর্থাৎ এমন ভাবে পথ বাহিয়া চলিয়া যাইবে, যেন কেহ তোমাকে সম্মানসূচক সালাম করিবার সুযোগ না পায়। লোক-সমাজে এমন ভাবে জীবন অতিবাহিত করিবে, যেন তোমাকে দেখিয়া কাহাকেও আসন ছাড়িয়া উঠিতে না হয়। মসজেদে এমন ভাবে যাইবে যেন তোমাকে 'এমাম' করিবার জন্য লোকে ব্যতিব্যস্ত হইয়া না পড়ে। ইহা হইতেই কবির মনের ভাব বেশ বুঝিতে পারা যাইতেছে। কিন্তু আমরা জোর করিয়া বলিতে পারি—কবির এই অজ্ঞাতবাসের ইচ্ছা আদৌ পূর্ণ হয় নাই। জীবিত কালে সুধী-সমাজে তাঁহার নাম প্রচারিত হইয়াছিল। বিশেষতঃ মৃত্যুর পর স্বদেশ ও বিদেশে সমভাবে তাঁহার যশঃদুন্দুভি বাজিয়া উঠিয়াছিল, তাঁহার প্রশংসাগীতি কবির বীণায় ঝঙ্কৃত ও তাঁহার কাব্যরসে সাহিত্যজগৎ প্লাবিত হইয়া গিয়াছিল। পাশ্চাত্য জগতে তাঁর নাম ডাক আরও বেশী।

## মৃত্যু ও সমাধি

খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে (কেহ কেহ নির্দ্দিষ্ট করিয়া ১১২৪ খৃঃ বলিয়াছেন) কবি এই মরজগৎ হইতে অমর ধামে চলিয়া গিয়াছেন। মৃত্যুর সময় তাঁহার বয়স এক শত বৎসরের কিছু বেশী হইয়াছিল। সমরকন্দনিবাসী তাঁহার প্রিয় শিষ্য খাজা নেজামী লিখিয়াছেন—ফলে-ফুলে শোভিত, ভ্রমর ও বুলবুল-কুলের ঝঙ্কারে মুখরিত, নেশাপুরের একটী রমণীয় উদ্যানে আমি কবি-গুরু 'ওমর খাইয়ামের সহিত সর্ব্বদা নানা আলোচনায় কাল কাটাইতাম। একদিন কথায় কথায় তিনি আমাকে বলিলেন—প্রিয় নেজামি, মৃত্যুর পর এমন জায়গায় আমার চির-শয্যা রচিত হইবে, যেখানে মলয় মারুৎ সব সময়ে আমার অঙ্গ-সেবা করিবে, সুচারু কুসুমরাজি গন্ধ বিলাইয়া সকাল-সন্ধ্যায় আমার অঙ্গে ঝরিয়া পড়িবে, বুলবুল ও অলিকুল তাহাদের সুমিষ্ট সঙ্গীত-ধারায় আমাকে মোহিত করিয়া রাখিবে। আমি তাঁহার এই সব কথা শুনিয়া কিছু বিস্মিত হইলাম। মনে করিলাম, এই সাধক প্রবরের কথা কখনই ব্যর্থ হইবার নয়।

ইহার পর ঘটনাক্রমে কিছুদিনের জন্য আমি তাঁহার সংসর্গ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িলাম। বহু দেশ ঘুরিয়া ফিরিয়া নানা কাজে নানা স্থানে কাটাইয়া বহুদিন পরে আবার নেশাপুরে ফিরিয়া আসিলাম। কবিবর ওমর খাইয়াম তাহার কিছুদিন পূর্ব্বে কোলাহলময় জগৎ হইতে চির-বিদায় লইয়াছিলেন, তাঁহার সমাধিক্ষেত্রে যাইয়া দেখিলাম, বাস্তবিকই কবি তাঁহার বাঞ্ছিত স্থানে চিরনিদ্রার সুখশয্যা রচনায় সমর্থ হইয়াছেন। তাঁহার দেহ পূর্ব্বকথিত বাগানের এক পাশে সমাহিত হইয়াছে, ফলভারাবনত শাখাগুলি এবং কুসুম-রাজি-শোভিত লতা-বল্লরী তাঁহার সমাধির উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে, স্থানটী সব সময়েই কুসুমগন্ধে আমোদিত এবং তাহার পাদদেশ বিধৌত করিয়া স্বচ্ছ বারিসমন্বিত একটী

ক্ষুদ্র নিঝরিণী কুলুকুলু রবে বহিয়া যাইতেছে। আমি কবির ভবিষ্যদ্বাণী বর্ণে বর্ণে সফল ও তাঁহার সকল আশা অক্ষরে অক্ষরে পূর্ণ হইতে দেখিয়া বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইয়া পড়িলাম। তাঁহার সমাধির প্রস্তর ফলকে তাঁহারই এই রোবাইটি লিখিত ছিল :—

ای دل چوزما نه میکند غمنا کت
تا که بر رود تن روان پا کت
بر سبزه نشین و خوش بزی روزی چند
زان پیش که سبزه بردمد از خا کت

হে খাইয়াম! কাল যখন তোমাকে কষ্ট দিতে বিরত হয় না এবং যখন তোমার প্রাণপাখী দেহ পিঞ্জর ছাড়িয়া যে কোন মুহূর্ত্তে উড়িয়া যাইতে পারে; তখন তোমার সমাধি-বক্ষে সবুজ তৃণরাজি উদ্গত হইবার পূর্ব্বে এই মখমল লাঞ্ছিত দূর্ব্বাদলের উপর বসিয়া কিছুদিন আনন্দে কাটাইয়া দাও।

ভারতের ভূতপূর্ব্ব বড়লাট লর্ড কার্জ্জন তাঁহার পারস্য-ভ্রমণ বৃত্তান্তে লিখিয়াছেন—পারস্য দেশের নেশাপুর নগরীটী পাশ্চাত্য-জগতে কবিবর ওমর খাইয়ামের জন্মভূমি ও চির-বিশ্রামের জায়গা বলিয়া সুপরিচিত, সে দেশে তাঁহার কবিতা ও অন্যান্য গ্রন্থ অনুবাদিত হইয়া সাদরে গৃহীত হইয়াছে, আমার বেশ মনে হয়, একজন পাশ্চাত্য লেখক কবির 'রোবাইয়াতে'র ইংরাজী অনুবাদ সমাপ্ত করিয়া উপসংহারে লিখিয়াছেন—হায়, এমন দিন কি হইবে, যেদিন আমার এই অনুবাদটী কেহ সাদরে লইয়া গিয়া কবিবর খাইয়ামের সমাধি-মন্দিরে তাঁহার দীন ভক্তের দেওয়া অর্ঘ্যস্বরূপ রাখিয়া দিবে। লর্ড কার্জ্জন দুঃখ করিয়া বলিয়াছেন—বড়ই দুঃখের বিষয় আজ আমার নিকট সে অনুবাদটী নাই, থাকিলে আমি কবির পদে উপহার স্বরূপ দিয়া অনুবাদকের মনের আশা সফল করিয়া যাইতাম।

মহাকবির সমাধি-মন্দিরের সে পূর্ব্ব সৌষ্ঠব আর নাই, পারস্যবাসীদের কাহারও আদৌ সেদিকে লক্ষ্য নাই, ইহা অপেক্ষা দুঃখের কথা আর কি হইতে পারে।

---

# ভারতবর্ষ

[ এস, ওয়াজেদ আলী বি-এ, (ক্যাণ্টাব) বার-এট-ল ]

পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে একবার আমি কল্‌কাতায় এসে-ছিলুম। তখন আমার বয়স দশ এগার বৎসর হবে। আমা-দের বাসার নিকটেই ছিল একটি মুদিখানা। তার পাশ দিয়েই আমাদের যাওয়া-আসা করতে হতো। সেই মুদিখানায় একটী বৃদ্ধ গদীর উপর বসে' একটী বিপুলকায় বই নিয়ে সাপ-খেলানো সুরে কি পড়্‌তো। বৃদ্ধের মাথায় ছিল মস্ত এক টাক, তার চার পাশে সাদা চুল। তার নাকের উপর ছিল মস্ত এক চাঁদির চশমা। গম্ভীর, শ্মশ্রুগুম্ফ শূন্য মুখ। বুড়োকে দেখে বেশ বিজ্ঞ লোক বলেই মনে হলো। একটী মধ্যবয়স্ক লোক এক একবার বৃদ্ধের কাছে বসে' পাঠ শুন্‌তো, আবার খদ্দের এলে তাদের দেখা-শুনা করতো। আমারই বয়েসী একটী ছেলে, খালি গায়ে বুড়োর কাছে বসে' থাকতো। তার পাশে বসতো দুটী মেয়ে। তারা বিশেষ ব্যগ্রতার সঙ্গেই বুড়োর সেই সুরের অনুকরণ করবার চেষ্টা করতো। তাদের মুখের ভাব দেখে মনে হতো যে, পাঠ তারা বিশেষ ভাবেই উপ-ভোগ করছে।

বুড়ো কি পড়্‌ছে জানবার জন্য আমার বিশেষ আগ্রহ হলো। বাসা থেকে বেরিয়ে মুদিখানার সামনে দাঁড়িয়ে সেই পাঠ শুন্‌তে লাগলুম। রামচন্দ্র কি করে' হনুমানদের সাহায্যে সমুদ্রের উপর সেতু বেঁধে লঙ্কা-দ্বীপে পৌঁছেছিলেন, তাই ছিল পাঠের বিষয়। সেই অপূর্ব্ব ক্রিয়াকাণ্ডের কথা শুনে ছেলে-দের মুখ আনন্দ, উৎসাহ আর আগ্রহে উজ্জ্বল হয়ে উঠতো।

আমিও যখন সেই বর্ণনার মধ্যে তন্ময় হ'য়ে যাব-যাব হতুম, তখন কেউ না কেউ এসে, আমায় সেখান থেকে ডেকে নিয়ে যেতো। সেতু বাঁধা হচ্ছিল, তাই আমি জেনেছিলুম। রামচন্দ্র সেতু পার হয়েছিলেন কিনা, আর পার হ'য়ে কিছু করেছিলেন কিনা, তা তখন জানতে পারি নি।

দু'চার দিন পর আমি আবার দেশে ফিরে গেলুম। তার পর কোথা থেকে যে কোথা গেলুম, তার ঠিকানা নেই। পরিবর্ত্তনের কত স্রোত আমার জীবনের উপর দিয়ে বয়ে গেল। সেই বৃদ্ধের আর তার সন্তান-সন্ততির নিরীহ শান্ত জীবনের কথা আমার মনের কোন্ গুপ্ত কোণে হারিয়ে গেল! তাদের অস্তিত্বের কথা আমি ভুলেই গেলুম! এমন কত শত জিনিষ রোজ আমরা ভুলে যাচ্ছি।

এই সেদিন দৈবক্রমে বেড়াতে বেড়াতে আবার সেই পথ দিয়ে যাচ্ছিলুম। পথের ঘর বাড়ী সব বদ্‌লে গিয়েছে। আগে যেখানে খোলার ঘর ছিল, এখন সেখানে বড় বড় ম্যান্‌শন ( Mansions ) মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। আগে দু চারটি রিক্‌শ আর ঘোড়ার গাড়িই সেই পথ দিয়ে যেতো। এখন বড় বড় মোটর অনবরত সেই পথ দিয়ে আনা গোনা করছে। আগে সেখানে মিটমিট করে' গ্যাসের বাতি জল্‌তো। এখন ইলেকট্রিক আলো স্থানটীকে দিনের মত উজ্জ্বল করে রেখেছে। আমি কালের পরিবর্ত্তনের কথা ভাবছি, এমন সময় হঠাৎ আমার চোখে পড়লো সেই পুরানো মুদি খানাটী। তাতে বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন হয় নি। জিনিষপত্র আগের মত সাজান রয়েছে! চাল থেকে এখনও একটী কেরোসিনের বাতি ঝুলছে, বোধ হয় পঁচিশ বৎসর আগেরই সেই বাতিটী!

আমি স্তম্ভিত হ'য়ে গেলুম কিন্তু ভিতরকার দৃশ্য দেখে! পঁচিশ বৎসর আগে যে বৃদ্ধকে দেখেছিলুম, ঠিক তারই মত একটী বৃদ্ধ, গদির উপর বসে, মোটা একটী বই নিয়ে সাপখেলানো গলায় কি পড়্‌ছিল। পঁচিশ বৎসর আগের সেই মধ্যবয়স্ক লোকের মতই একটী মধ্য-বয়স্ক লোক এক একবার এসে সেই পাঠ শুনছিল। আবার আবশ্যক মত, খদ্দেরদের দেখা-শুনা করছিল! ঠিক সেই আগের ছেলেটীর মত দেখ্‌তে একটী ছেলে, খালি গায়ে বুড়োর মুখের দিকে চেয়ে বসেছিল। তার পাশে বসেছিল, সেই আগেকার মেয়েদের মত দেখ্‌তে, দুটী মেয়ে।

কোন মায়া-মন্ত্র বলে সেই সুদূর অতীত আবার ফিরে এল নাকি? আমি অবাক হ'য়ে দাঁড়িয়ে শুন্‌তে লাগ্‌লুম। বৃদ্ধ পড়ছে রামচন্দ্রের সেই সেতু-বন্ধনের কথা—যা পঁচিশ বৎসর আগে আমি শুনেছিলুম!

আমি আর থাকতে পারলুম না; সোজা বৃদ্ধের কাছে গিয়ে বল্‌লুম "মশায়, মাফ করবেন। ঠিক পঁচিশ বৎসর আগে আমি এই ছেলেদের সামনে আপনাকে এই বই পড়্‌তে দেখেছি! এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে এরা কি আর বাড়ে নি, আর আপনার মধ্যেও কি কোন পরিবর্ত্তন হয় নি? রামচন্দ্র কি এখনও সেই সেতুবন্ধন কার্য্যে ব্যস্ত আছেন?"

বৃদ্ধ তার চোখ দুটি তুলে আমার দিকে একবার চাইলে। চশমা হাতে নিয়ে তার ধুতির খুঁট দিয়ে গ্লাস দুটীকে ভাল করে পুঁছে আবার সেটীকে নাকের উপর চড়ালে। আমার আপাদমস্তক, একবার ভাল করে' দেখে নিলে। তারপর বললে "পঁচিশ বৎসর আগে আপনি এখান দিয়ে গিয়েছিলেন?" আমি বললুম "আজ্ঞে, হাঁ!" বৃদ্ধ বললে "তা হ'লে আপনি আমার স্বর্গীয় পিতা মহাশয়কে এই রামায়ণ পড়্‌তে দেখেছেন। আমার ছেলে আর মেয়েরা তার কাছে বসে পাঠ শুনতো। ছেলেটী এখন ঐ বড় হয়েছে। ওর বয়স আপনার মতই হবে। মেয়েদের বিয়ে হ'য়ে গেছে। তারা স্বামীপুত্র নিয়ে ঘরকন্না করছে। এই ছেলেটী হচ্চে আমার পৌত্র আর এই মেয়ে দুটী আমার পৌত্রী; আমার ঐ ছেলের সন্তান! তার হাতের বইটীর দিকে সঙ্কেত করে' আমি বললুম "এ বইটী কবেকার?" স্মিতহাস্যে বৃদ্ধ বললে "এ হচ্চে কৃত্তিবাসের রামায়ণ। আমার ঠাকুর দাদা বটতলায় এটী কিনেছিলেন, সে অনেক দিনের কথা; আমার তখন জন্ম হয় নি!"

বৃদ্ধকে অভিবাদন করে' দোকান ত্যাগ করলুম। মনে হ'ল আমি দিব্য চক্ষু পেলুম। প্রকৃত ভারতবর্ষের একটা নিখুঁত ছবি আমার চোখের সাম্‌নে ফুটে উঠলো!

---

# এছলাম ও শাসন-অধিকার

[ মওলানা মোহাম্মদ মণিরুজ্জমান এছলামাবাদী ]

( ১ )

## ধর্ম্মের উদ্দেশ্য

এক অদ্বিতীয় সর্ব্বশক্তিমান নিরাকার মহাশক্তির অস্তিত্ব ও একত্ববাদ প্রচারের ভিতর দিয়া মানুষের নৈতিক উন্নতি-ও আধ্যাত্মিক শক্তির উৎকর্ষ সাধনই যে ধর্ম্মের উদ্দেশ্য —তাহা বোধ হয় কেহই অস্বীকার করিবেন না। পারলৌকিক তত্ত্ব জ্ঞাপনপূর্ব্বক, মানব জাতিকে পরজগতের শান্তির পথ প্রদর্শন এবং শাস্তির পথ হইতে নিবৃত্ত রাখিয়া অনন্ত পথের পাথেয় সঞ্চয়ের জন্য উদ্বোধিত করা, এ সকল হইল ধর্ম্মের অনুশাসন। এই সঙ্গে পৃথিবীতে মানুষ যাহাতে সুখে ও শান্তিতে বাস করিতে পারে, আর্থিক সুখসম্পদের অধিকারী হইয়া পবিত্র ভাবে জীবন যাপন করিতে পারে তাহার সুব্যবস্থা করাও ধর্ম্মের অঙ্গীভূত।

## এছলামের আদর্শ

ধর্ম্মের এই ব্যাখ্যার অনুকূলে কোরআন শরিফের নিম্নলিখিত 'আয়ৎ'টী পেশ করা যাইতে পারে :—

ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الاخرة حسنة
( سورة بقر - رکوع ۲۵ )

অর্থাৎ হে আমাদের প্রতিপালক! ইহলোকে ও পরলোকে আমাদের মঙ্গল বিধান কর ( 'ছুরা বাক্বরা', রুকু ২৫ ) এই আয়ৎ হইতে পার্থিব ও পারলৌকিক উভয়বিধ মঙ্গল বিধানই যে এছলামের আদর্শ, তাহাই প্রতিপাদিত হইতেছে।

উক্ত আয়তে যে 'হাছানা' শব্দের উল্লেখ আছে, তাহার অর্থ যে দুনয়া ও আখেরাতের উভয়বিধ মঙ্গল, তাহার পোষকতায় তফছির খাজেনের নিম্নলিখিত মন্তব্যটী দ্রষ্টব্য— (প্রথম খণ্ড ১৫৯ পৃঃ)

قيل ان الحسنة فی الدنيا عبارة عن الصحة والامن والكفاية والتوفيق الى الخير والنصر على الاعداء والولد الصالح والزوجة الصالحة
جلد اول صفحه ۱۵۹ -

অর্থাৎ—পার্থিব সম্পদ অর্থে স্বাস্থ্য, শান্তি, সচ্ছলতা, সৎকর্ম্মের ক্ষমতা লাভ, শত্রুর প্রতি জয়লাভ, সুসন্তান ও সাধ্বী স্ত্রীলাভ।

উক্ত তফছিরের উল্লিখিত পৃষ্ঠায় ইহাও লিখিত হইয়াছে—

لانه لو اضطرب على الانسان عرق من عروقه يشوش عليه حياته فی الدنيا و تعطل عن الاشغال بطاعة الله تعالى فثبت بذلك ان طلب الدنيا فی الدعاء من امر الدين فلذلك قال الله الخ

অর্থাৎ—"যেহেতু মানুষের শিরা সমূহের মধ্যে যদি একটীও বিকৃত হইয়া যায়, তাহা হইলে তাহার পার্থিব জীবন অতিষ্ঠ হইয়া উঠে এবং সে আল্লাহ্ তাআলার 'এবাদৎ, বন্দিগী' হইতে বেকার হইয়া পড়ে।" ইহা হইতে ইহাই প্রমাণিত হইতেছে যে 'মোনাজাৎ' বা প্রার্থনায় পার্থিব সম্পদ প্রার্থনা করা ধর্ম্মের অঙ্গীভূত।

প্রবন্ধের এই ভূমিকা হইতে আমরা ইহাই প্রমাণ করিতে চাহিতেছি যে, ধর্ম্মের উদ্দেশ্য দুনয়া ও আখেরাতের উভয় দিকের সম্পদ-লাভ। সুতরাং যাঁহারা দুনয়ার উন্নতি ও সম্পদকে এছলাম ধর্ম্মের উদ্দেশ্যের বিপরীত মনে করেন, তাঁহারা যে ভ্রান্ত, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। এই প্রবন্ধের মূল আলোচ্য বিষয় আরম্ভ করার পূর্ব্বে আমাদিগকে এই বিষয়টী আরও খোলাসা করিয়া দেখাইতে হইবে। কারণ বর্ত্তমানে মোছলমান আলেমগণের মুখে শুনা যায় যে, পার্থিব ধন-সম্পদ ও ক্ষমতা প্রতিপত্তি এছলাম ধর্ম্মের পরিপন্থী, দীনের হানিজনক। মোছলমান দুনয়াতে কেবল মাত্র আখেরাতের চিন্তা

লইয়াই জীবন অতিবাহিত করিবে, ইহাই হইল তাঁহাদের মতে এছলামের শিক্ষা। দুঃখের বিষয় তাঁহারা কখনও ভাবিয়া দেখেন না যে 'কোরআন' 'হাদীছ' ও 'ফেকার' কেতাব সমূহে 'এবাদাৎ' ( عبادات ) ও 'মোয়ামালাৎ' ( معاملات ) দুইটী বিভাগ আছে; এবং 'এবাদত' অর্থাৎ উপাসনা বা এবাদৎ বন্দেগী অপেক্ষা মোয়ামালাৎ—পার্থিব ব্যবহারিক জীবনের ব্যাপার সমূহের বর্ণনাই অধিক বিস্তৃত। যাহাকে 'এবাদৎ' বলা হয়, তাহাও পার্থিব সুখ-সম্পদ ব্যতীত সুসম্পন্ন হইতে পারে না। যেমন 'নামাজ'—নামাজ পড়িতে হইলে মছজেদ, জায় নামাজ' পানির 'হাওজ' কূয়া অথবা পুকুর এবং দেহের আবশ্যকীয় স্থানগুলি ঢাকিবার জন্য বস্ত্রের আবশ্যক। মছজেদের এমাম, মোয়াজ্জেন তাহাদের বৃত্তির ব্যবস্থা, মছজেদ নির্ম্মাণ ও মেরামতাদির উপকরণ ইত্যাদি অতীব প্রয়োজনীয়। এসব কি পার্থিব সম্পদ নহে? এসকল উপকরণ ব্যতীত 'পূর্ণ নামাজ' সম্পন্ন হওয়ার কি কোন উপায় আছে? সর্ব্বোপরি আল্লার এবাদাৎ বন্দেগী করার জন্য মানুষের বাঁচিয়া থাকা আবশ্যক। দুনয়ায় বাঁচিয়া থাকিয়া জীবন অতিবাহিত করার উপায় হইতেছে কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য ও চাকুরী। আমাদের শ্রদ্ধাস্পদ "দুনয়া-দোশমন্" আলেমগণ কি 'দুনয়া' বলিয়া, বাঁচিয়া থাকিবার ঐ সকল উপায়কে মহাপাপ উল্লেখে বর্জ্জন করিতে বলেন? মানুষ কি খাইয়া জীবন ধারণ করিবে? সে সম্বন্ধে তাঁহারা কি এরশাদ' করেন? এই যে 'হাদিছ' ও 'ফেকার' কেতাবে 'হোদুদ' (حدود) 'কেছাছ' (قصاص), 'কাজা' (قضا), 'এমারৎ' ( امارت ), 'বায়' ( بيع ) 'শেরা' ( شرا ), ইত্যাদি অর্থাৎ দণ্ডবিধান, বিচারও শাসন বিভাগ, ক্রয়-বিক্রয়, ইত্যাদি বিষয়ের বর্ণনায় বহু অধ্যায় বিরাজমান, এ সকলের উদ্দেশ্য কি? তারপর জেহাদ, জেহাদের উপকরণ, দেশাধিকারও তাহার শাসন-বিধি, রণ-নীতি ইত্যাদি নানা বিষয় লইয়া কোরআন হাদিছ ও ফেকা শাস্ত্র ভরপুর; এ সকল যদি ধর্ম্মের অঙ্গীভুত হয়, তাহা হইলে তাঁহারা 'দুনয়া'কে বাদ দিতে চান কোন্ সাহসে?

এখন কথা হইতেছে—এছলামের শিক্ষা দুনয়া ও আখেরাতের উভয়বিধ সম্পদ-লাভ, ইহাতে সন্দেহ করিবার কিছুই নাই। পার্থিব-সম্পদ ব্যতীত, পারলৌকিক, নৈতিক বা আধ্যাত্মিক কল্যাণের কথা কল্পনাও করা যায় না। যদি কেহ ইহার বিপরীত বলেন, তাঁহার কথা প্রলাপোক্তি ব্যতীত আর কিছুই নহে।

যাহা হউক, পার্থিব উন্নতি ও সম্পদ যখন ধর্ম্মের অঙ্গীভূত এবং পার্থিব সম্পদ পরলোকের মঙ্গলের মূল ভিত্তি, তখন 'দুনয়ার' সম্পদ ব্যতীত 'আখেরাতের' মঙ্গল সাধিত হওয়া আদৌ সম্ভবপর নহে। এই পার্থিব উন্নতি ও সম্পদের যাহা সোপান, সেই রাজ্য ও শাসনাধিকারের সহিত এছলামের কিরূপ ঘনিষ্ঠতর সম্বন্ধ, তাহা প্রমাণ করাই এই প্রবন্ধের মুখ্য উদ্দেশ্য। এক্ষণে আমরা সেই মূল আলোচ্য বিষয়ের সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি।

## মোছলেম-জাতীয় জীবনের লক্ষ্য

দুনয়ায় মোছলেম-জাতীয় জীবনের লক্ষ্য কি এবং তদ্বিষয়ে 'শরিয়তে' কি বিধান আছে, তাহাই সর্ব্বাগ্রে দেখিতে হইবে, এ সম্বন্ধে কোরাণের উক্তি—

هو الذى ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ط
( سورة صف ركوع ١ )

অর্থাৎ সেই খোদা তাআলা যিনি স্বীয় পয়গম্বর (মোহাম্মদ ছঃ) কে (দুনয়াতে) কোরআন ও এছলাম ধর্ম্মসহ পাঠাইয়াছেন, যাহাতে তিনি সেই 'এছলাম'কে যাবতীয় ধর্ম্মের উপর জয়যুক্ত করেন, যদিও ইহা বিধর্ম্মীদের অপ্রীতিকর হইবে। (ছুরা ছাফ্‌ফা ১ম রুকু)।

এই আয়াতের সারমর্ম্ম এই যে, আল্লাহ-তাআলা শেষ প্রেরিত মহাপুরুষ হজরৎ 'মোহাম্মদ'কে পবিত্র কোরআন ও এছলামসহ ইহলোকে এইজন্য পাঠাইয়াছেন যে, তিনি যেন এছলাম ধর্ম্মকে পৃথিবীর যাবতীয় ধর্ম্মের উপর প্রবল ও জয়যুক্ত করিয়া তোলেন। ইহা হইতে পরিষ্কাররূপে বুঝিতে পারা যায় যে, এছলাম 'দুনয়া'তে প্রবল হইয়া থাকিবে, দুর্ব্বল হইয়া নহে। বিজয়ী হইয়া থাকিবে, বিজিত হইয়া নহে। স্বাধীন হইয়া থাকিবে, পরাধীন হইয়া নহে। ব্যাপক ও বিস্তৃত হইয়া থাকিবে, সীমাবদ্ধ ও সঙ্কুচিত হইয়া নহে। ইহাই খোদা তাআলার অভিপ্রেত।

এখন পাঠক, চিন্তা করিয়া দেখুন, এছলাম একটী গুণ বিশেষের নাম। আধার ব্যতীত গুণের অস্তিত্ব প্রকাশ

হইতে পারে না। এছলাম প্রবল ও জয়যুক্ত হওয়ার অর্থ মোছলমান জাতির প্রবল ও জয়যুক্ত হওয়া। মোছলমানের উন্নতিবিধান ও মোছলমান জাতির ক্ষমতা প্রতিপত্তি বর্দ্ধিত না হইলে এছলামের শক্তি-বৃদ্ধির আদৌ কোন অর্থ হইতে পারে না। অতএব এই আয়ৎ জলদ গম্ভীর স্বরে ঘোষণা করিতেছে যে, দুনয়াতে মোছলমান জাতি যাহাতে প্রবল ও শক্তিশালী হইয়া থাকে, সর্ব্বদা বিজয়ী ও স্বাধীন হইয়া পৃথিবীবক্ষে বিচরণ করে, ভূপৃষ্ঠে স্বাধীনভাবে সকলের উপর কর্ত্তৃত্ব করিতে থাকে, শাসিত না হইয়া শাসকরূপে বাঁচিয়া থাকে, দুনয়াতে সর্ব্ববিষয়ে অন্য জাতির তুলনায় উন্নত ও শ্রেষ্ঠ হইয়া এছলামের বিজয়-পতাকা উড্ডীন করিয়া রাখিতে পারে, এই মহৎ উদ্দেশ্য লইয়াই শেষ-প্রেরিত নবী হজরৎ মোহাম্মদ মোস্তফা ইহলোকে প্রেরিত হইয়াছিলেন, এছলাম আল্লার ধর্ম্ম, তাঁহার ধর্ম্ম ও সেই ধর্ম্মের বাহক মোছলমান জাতি দুন্‌য়াতে দীনহীন, দুর্ব্বল ও লাঞ্ছিত এবং পরপদানত হইয়া থাকে, ইহা কখনই খোদা তাআলার অভিপ্রেত নহে। এই আয়তে মোছলেম জাতির জাতীয় জীবনের লক্ষ্য ( نصب العين ) স্পষ্ট ভাষায় বর্ণিত হইয়াছে।

এই আয়াতে এছলামের ভবিষ্যৎ বর্ণিত হইয়াছে, ইহাতে যে ভবিষ্যৎ-বাণী করা হইয়াছে, তাহা পরবর্ত্তী যুগে অক্ষরে অক্ষরে সত্যে ও বাস্তবে পরিণত হইয়াছে। জগতের ইতিহাসই তাহার জলন্ত সাক্ষী। কোরআণ যে অন্তর্য্যামী আল্লাহ্‌ তাআলার বাণী এবং সেই বাণী যে নির্ভুল ও নির্দ্দোষ, কোরআনের উক্তি যে পরবর্ত্তী সময়ে অক্ষরে অক্ষরে বাস্তবে পরিণত হইয়াছে, এই 'আয়ৎ' হইতেই তাহা প্রমাণিত হইতেছে। ইহা কোরআনের অলৌকিকতার জলন্ত নিদর্শন।

এছলাম ও মোছলমান জাতির প্রবল হওয়ার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নিদর্শন হইতেছে, তাহাদের রাজ শক্তি। পৃথিবীতে রাজ শক্তি লাভ করিয়া এছলাম-প্রচার ও এছলামের আদেশ উপদেশাদি কার্য্যে পরিণত করার কথা কেবল কোরআনের ভাষায় প্রমাণিত হইতেছে তাহা নহে; হজরৎ নবী-করিমের জীবদ্দশায় যে সকল 'জেহাদ' হইয়াছিল এবং 'মদিনা শরিফে' যে মোছলেম রাজত্বের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল তদ্দ্বারা বিশেষতঃ খোলাফায়ে রাশেদীনের দিগ্বিজয়, রাজ্য ও সাম্রাজ্য স্থাপন হইতে একথাটী আরও অধিকতর উজ্জল ভাবে প্রমাণিত হইয়াছে। কোরআনে যে কথার ইঙ্গিত করা হইয়াছিল, হজরৎ নবী করিম নিজ জীবনে ও ছাহাবায় কেরাম তৎপরবর্ত্তী যুগে নিজ নিজ কর্ম্মশক্তি ও চেষ্টার দ্বারা তাহা কার্য্যে পরিণত করিয়া দেখাইয়া দিয়াছেন।

এমতাবস্থায় আমরা উল্লিখিত আয়তের যে ব্যাখ্যা করিয়াছি, তাহাই যে সমীচীন ও বাস্তব ব্যাখ্যা, তাহাতে সন্দেহ করিবার কোনও কারণ নাই। কিন্তু পার্থিব উন্নতি-বিমুখ আলেমগণের সান্ত্বনার জন্য কয়েকজন তফছীরকারের মন্তব্য ও ব্যাখ্যার উল্লেখ করাও আবশ্যক মনে করিতেছি।

উল্লিখিত ছুরা ছাফ্‌ফার ১ম রুকুর আয়ৎপ্রসঙ্গে তফছীর খাজেনে ( تفسير خازن ) লিখিত হইয়াছে—

قوله على الدين كله الخ اى ليعليه على
الاديان المخالفة ولقد فعل ذلك فلم يبق دين من
الاديان الا و هو مغلوب و مقهور بدين الاسلام
( جلد سابع صو ٧١ )

অর্থাৎ—প্রবল হওয়ার অর্থ প্রতিকূল ধর্ম্ম সমূহের উপর প্রাধান্য স্থাপন এবং প্রকৃতপক্ষে তাহা হইয়াও গিয়াছে। পৃথিবীর এমন কোন ধর্ম্ম নাই যাহা ইসলাম ধর্ম্মের নিকট পরাজিত ও পর্য্যুদস্ত না হইয়াছে। ( সপ্তম খণ্ডে ৭১ পৃঃ )।

উপরোল্লিখিত ( هو الذى ارسل الخ ) আয়তের অনুরূপ একটী আয়ৎ কোরআনের দশম খণ্ড ছুরা তওবার ৫ম রুকুতে বর্ণিত হইয়াছে. এই আয়তের ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া প্রসিদ্ধ 'তফছীর কবিরের' ৪র্থ খণ্ডে ৬২৫ পৃঃ এমাম রাজী লিখিয়াছেন—

قوله هو الذى ارسل الخ ا علم ان كمال
الانبياء صلعم لا تحصل الا بمجموع امور - اولها كثرة
الدلائل و المعجزات الخ و ثانيها الخ و ثالثها
صيرورة دينه مستعليا على سائر الاديان عاليا عليها
غالبا لا ضدادها قاهرا لمنكريها و هو المراد من
قوله ليظهره على الدين كله الخ -

অর্থাৎ পয়গম্বরগণের প্রচার উদ্দেশ্যের পূর্ণ বিকাশ-প্রাপ্তির জন্য কয়েকটী উপায় আবশ্যক। প্রথমতঃ প্রমাণের আধিক্য ও অলৌকিকতার ছটা। দ্বিতীয়তঃ......তৃতীয়তঃ অন্যান্য ধর্ম্মের তুলনায় সেই ধর্ম্মের প্রাধান্য, অন্য ধর্ম্মের উপর

প্রাবল্য ও শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদন, বিরুদ্ধবাদীদের দমন করার শক্তিলাভ। ইহাই হইল আয়তের উদ্দেশ্য। ইহা জানিয়া রাখা আবশ্যক যে, একটী বস্তুকে অন্য বস্তুর তুলনায় প্রবল ও শ্রেষ্ঠ বলিবার উপায় হইতেছে হয় যুক্তি-তর্ক, নচেৎ সংখ্যাধিক্য, কিম্বা ক্ষমতা-প্রতিপত্তি। এখানে ক্ষমতা প্রতিপত্তির দ্বারা এছলামের প্রাবল্য ও প্রাধান্য প্রতিষ্ঠাই আমাদের মূল উদ্দেশ্য। যদি কেহ বলেন যে, এছলাম তো দুনয়ার সর্ব্বত্র ক্ষমতা ও প্রতিপত্তির দ্বারা বিস্তৃতি লাভ করে নাই; এমতাবস্থায় আয়তের অর্থ কিরূপে তাহার উদ্দেশ্যের সহিত খাপ খাইবে? ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে, পৃথিবীর সর্ব্বত্র এছলাম, প্রাধান্য ও প্রাবল্য লাভ করিতে না পারিলেও বহু স্থানে পারিয়াছে; সুতরাং আয়তের উদ্দেশ্য ও ভবিষ্যৎবাণী সফল হওয়ার পক্ষে কোন বিঘ্ন হয় নাই।

তফছীর কবীরের সমস্ত আরবী এবারৎ ও তাহার সম্পূর্ণ অনুবাদ দিতে হইলে কথা বাড়িয়া যায়, তজ্জন্য ক্ষান্ত হইতে হইল।

এ সকল আলোচনার ভিতর দিয়া পাঠকগণ এইটুকু বুঝিতে পারিবেন যে, খোদায় তাআলা এছলাম ও মোছলমানকে দুনয়ায় দুর্ব্বল ও লাঞ্ছিত হইয়া থাকিবার জন্য প্রেরণ করেন নাই, বরং এছলাম ও মোছলমান জাতি প্রবল প্রতাপশালী ও জয়যুক্ত হইয়া থাকিবার জন্য প্রেরিত হইয়াছে। এই উদ্দেশ্য সাধন করিতে হইলে দুনয়ার রাজ-শক্তি ও শাসনাধিকার প্রয়োজন। পরবর্ত্তী সংখ্যায় আমরা কোর-আনের স্পষ্ট 'আয়াৎ' সকল উদ্ধৃত করিয়া দেখাইব যে, মোছলমান দুনয়ায় বাদশাহী কায়েম করার জন্যই সৃষ্ট হইয়াছে, গোলামীর জন্য নহে।

---

# মহাপয়গাম

[ শাহাদাৎ হোসেন ]

অন্ধ তিমিরে ভরেছে ভুবন, আকাশ গিয়াছে মিশি
পাপের সিন্ধু রুদ্র গরজে ধ্বনিছে বিপুল দিশি।
মহা-তাণ্ডবে জাগে কোলাহল ঝঞ্ঝায় ওঠে রোল
এস্রাফিলের শিঙায় অকালে ধ্বংসের কলরোল।
প্রলয়ের মেঘ উঠেছে রুখিয়া রুদ্র বিষাণ গাজে
স্বেচ্ছাচারের ডঙ্কার ঘন দুন্দুভি-রোলে বাজে।
দিগ্দিগন্তে ওঠে মহামার, হাহাকারে ফাটে ধরা
মরণের বুকে লুটা'য়ে পড়েছে মুরছি' বসুন্ধরা!

সহসা হেরার তুঙ্গ শিখরে কে গো বীর নির্ভয়!
উদার কম্বু কণ্ঠে ঘোষিলে বিশ্বের বরাভয়।
শিহরি' চকিতে দেখিল চাহিয়া নিখিলের নর-নারী
দীপ্ত মুরতি কে মহা মানব যুগের তিমির বারি'

জ্যোতির রশ্মি-মণ্ডলে বসি ঘোষিতেছে পয়গাম
শাশ্বত বাণী পূর্ণ কণ্ঠে মন্দ্রিছে অবিরাম।
মরু-দিগন্ত গিরিকন্দর ধ্বনি' ওঠে বারবার
সত্য মহান্ একক আল্লা—এ-তিন ভুবনে আর
নহে পূজনীয়; নহে বরণীয়—নহে কেহ মহীয়ান
তিমির যুগের প্রভাতে আজিকে আসিয়াছে ফর্মান।
উদ্দেশে তাঁর নত কর শির, মহানিধি মহিমার
শক্তি তাঁহার চির-বিজয়িনী,—মণি-খনি করুণার।
মানুষ আমরা চিরদাস তাঁর, প্রভু তিনি সবাকার,
আকাশ-ভুবনে মহাবাণী এই ঘোষিতেছে অনিবার
সৃষ্টির বুকে বুদ্বুদ মোরা ফুটিয়া উঠেছি সবে
চির-মঙ্গল অবদান তাঁর, ধরণীর উৎসবে।
অরুণিত নব যুগের আলোকে হে মানব মতিমান!
সাধনে তোমার সার্থক কর সেই মহা অবদান।
নিখিল মানব সোদর তোমার ভুলে যাও অভিমান
মহা মিলনের সিন্ধু-সলিলে ডালি দাও ভেদ-জ্ঞান।
নিখিল ভ্রাতৃ-মিলনে আজি এ বালুময় মরু-থানে
মহা মানবতা উঠুক্ জাগিয়া সৃষ্টির কল্যাণে।
পাপের ঘূর্ণী থামিল সহসা, সিন্ধুর কলরোল
স্বেচ্ছাচারের রুদ্র নটন কোলাহল কল্লোল
থেমে এল সব, স্নিগ্ধ কিরণে উদ্ভাসি' ধরণীরে
মহা ধর্ম্মের নবারুণ ফুটে প্রাচী'র তিমির শিরে।

* * * *

বিস্ময়-হত নর-নারী সবে চেয়ে রহে অনিমেষে
সহসা দরুদ ফুটিল কণ্ঠে অজ্ঞাতে অবশেষে।
লক্ষ কণ্ঠে উঠিল ধ্বনিয়া আলায়কাস্ সালাম
ইয়া রছুল ছাল্লাল্লাহো আলায়কাস্ সালাম।

# খৃষ্টান লেখকগণের ভ্রান্তি

কতিপয় খৃষ্টান লেখক ছুরা ফাতেহার তফছির প্রসঙ্গে কতকগুলি ভ্রান্ত ও ভিত্তিহীন মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। নিম্নে তৎসম্বন্ধে আলোচনা করিতেছি।

## রডওয়েলের অন্যায় উক্তি

পাদরী রডওয়েল Rev J. M Rodwell বিছ্‌মিল্লাহ্‌ সংক্রান্ত টীকায় লিখিতেছেন :—

This formula Bismillahir' rahmanir rahim is of Jewish origin. It was in the first instant taught to the Koreirsh by Omayah of Taif...............who during his mercantile journeys......... had made himself acquainted with the sacred books and doctrines of jews and Christians. ( Kitab. al-Aghani 16 Delhi ). Mohammad adopted and Constantly used it.

এই মন্তব্যের সারমর্ম্ম এইযে তায়েফের কবি ওমাইয়া সর্ব্বপ্রথমে কোরেশদিগকে 'বিছমিল্লাহির রহমানির রহিম' পদটী শিখাইয়া দিয়াছিল। ওমাইয়া বাণিজ্যব্যপদেশে ভ্রমণকালে এহুদীও খৃষ্টানদিগের ধর্ম্মপুস্তক ও ধর্ম্মবিশ্বাসাদির সহিত পরিচিত হইয়াছিল। ফলে এই পদটী মূলতঃ এহুদীদিগের নিকট হইতে গৃহীত। ( দিল্লীর মুদ্রিত কেতাবুল আগানী পুস্তকের ১৬শ খণ্ডে ইহা বর্ণিত হইয়াছে )। মোহাম্মদ উহা গ্রহণ ও নিয়ত উহার ব্যবহার করিতে থাকেন।—১৯ পৃষ্ঠা।

নিজের দাবী সপ্রমাণ করার জন্য রডওয়েল সাহেবের প্রথমে দেখান উচিত ছিল যে, কবি উমাইয়া এহুদী ও খৃষ্টান দিগের ধর্ম্মশাস্ত্র ও ধর্ম্মবিশ্বাসাদির সহিত পরিচিত হইয়াছিল। তাহার পর এহুদী ও খৃষ্টানদিগের ধর্ম্মশাস্ত্রাদির বচন উদ্ধৃত করিয়া সঙ্গে সঙ্গে ইহাও দেখান উচিত ছিল যে, ঐ সকল শাস্ত্রের অমুক অমুক স্থানে বিছমিল্লাহির রহমানির রহিম বা তাহার মর্ম্মানুবাদ বিদ্যমান আছে। এই দুইটী বিষয় সপ্রমাণ না করিলে যুক্তির হিসাবে তাঁহার দাবীর কাণা কড়িরও মূল্য থাকে না। কিন্তু তিনি তাহা করেন নাই—করিতে পারেন নাই। সুতরাং তাঁহার এই প্রমাণহীন দাবীর কোন মূল্যই হইতে পারে না।

## আগানীর কথা

আগানীর উদ্ধৃত অভিমত সম্বন্ধে আমাদিগের প্রথম বক্তব্য এই যে, "কেতাবুল আগানী" ইতিহাস পুস্তক নহে এবং উহার রচয়িতা ঐতিহাসিক হিসাবে উহার সঙ্কলন করেন নাই। কেতাবুল আগানী নামের অর্থ—সঙ্গীত পুস্তক। আলী এস্পেহানী নামক জনৈক সঙ্গীতশাস্ত্রবিশারদ সাহিত্যিক এই পুস্তকে বহু প্রাচীন ও সমসাময়িক সঙ্গীত সংগ্রহ করিয়া তাহার সুর ও তালমান প্রভৃতি উহাতে বর্ণনা করিয়াছেন। গায়কদিগের জীবনীও ইহাতে সঙ্কলিত হইয়াছে। বলা বাহুল্য যে, সঙ্গীত চর্চ্চা করাই গ্রন্থকারের প্রধানতম উদ্দেশ্য ছিল। এই হিসাবে যে-কোন প্রাচীন কবিতা ও সঙ্গীত সংক্রান্ত যে-কোন বর্ণনা বা গল্পগুজব তাঁহার হস্তগত হইয়াছিল, ঐতিহাসিক হিসাবে তাহার বিশ্বস্ততার কোন পরীক্ষা না করিয়াই তিনি সেগুলিকে নিজের পুস্তকে স্থান দান করিয়াছেন। এজন্য শত শত ভিত্তিহীন এমনকি সত্যের বিপরীত বিবরণ তাঁহার পুস্তকে অবাধে স্থানলাভ করিয়াছে। সূক্ষ্মদর্শী পণ্ডিতমণ্ডলী এই কারণে আগানীর বর্ণনা বা রেওয়ায়তগুলিকে ভিত্তিহীন বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। এখানে ইহাও স্মরণ রাখিতে হইবে যে, আগানীর গ্রন্থকার ২৮৪ হিজরীতে জন্মগ্রহণ এবং ৩৫৬ হিজরীতে পরলোক গমন করেন। (২) পক্ষান্তরে বদর সমরে নিহত কোরেশদিগের সম্বন্ধে শোক-গাথা রচনা করার পর নবম হিজরীতে উমাইয়ার মৃত্যু হয় (৩) সুতরাং আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, আগানী-রচয়িতার জন্মের ২৭৫ বৎসর পূর্ব্বে উমাইয়ার মৃত্যু হইয়াছে। পঁচিশ বৎসর বয়সে এস্পেহানী আগানী-রচনা শেষ করিয়াছিলেন, এইরূপ হিসাব ধরিলেও

(২) এডওয়ার্ড কণ্ডিক কৃত—একতেফা ১—৩২, ৪০ পৃষ্ঠ। (৩) এছাবা ১—১৩৩।

স্বীকার করিতে হইবে যে, গ্রন্থকার নিজ পুস্তকে অন্যূন তিনশত বৎসর পূর্ব্বকার বিবরণ প্রদান করিয়াছেন। এই দীর্ঘ তিন শতাব্দী পরে তিনি যে বিবরণ প্রদান করিয়াছেন, তাহা তিনি কোন সূত্রে অবগত হইলেন এবং সে-সূত্র বিশ্বস্ত বলিয়া গৃহীত হইতে পারে কি না, তাহার আলোচনা না করিয়া ঐ শ্রেণীর বিবরণকে প্রমাণস্থলে উপস্থিত করা কখনই সঙ্গত বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না।

## পাদ্রী সাহেবের অসাধুতা

আগানীর বিশ্বস্ততার বিচার পরিত্যাগ করিয়া এখন আমরা তাহার বর্ণিত বিবরণটীর আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি। পাঠকগণ দেখিয়া বিস্মিত হইবেন যে, প্রকৃতপক্ষে আগানী পুস্তকে পাদ্রী সাহেবের উক্তির কোন সমর্থন পাওয়া যায় না। প্রমাণ স্বরূপে আমরা আগানীর বিবরণটী নিম্নে অবিকল উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি :—

ويقال ان امية قدم على اهل مكة باسمك اللهم
فجعلوها فى اول كتبهم مكان بسم الله الرحمن الرحيم
كتاب الاغانى مصرى ۴—۱۸۰ -

অর্থাৎ কথিত হইয়া থাকে যে, উমাইয়া মক্কাবাসীদিগকে "বে-এছমেকা আল্লাহুম্মা" এই পদটী শিক্ষা দিয়াছিল। তাহারা তখন হইতে "বিছমিল্লাহির রহমানির রহিম" পদের স্থলে নিজেদের পত্রাদির প্রারম্ভে ঐ কথাগুলি ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিল। (৪-১৮০)। আগানীর এই বিবরণটী যে একেবারে ভিত্তিহীন, তাহা আমরা পরে দেখাইব। এখানে আমাদিগের বক্তব্য এই যে, এই বিবরণকে বিশ্বস্ত বলিয়া ধরিয়া লইলেও, ইহা দ্বারা প্রমাণিত হইতেছে যে, উমাইয়া মক্কাবাসীকে 'বিছমিল্লাহির রহমানির রহিম' শিক্ষা দেয় নাই, বরং সে শিখাইয়াছিল—"বে-এছমেকা আল্লাহুম্মা" এই পদটী। তাহার পর আলোচ্য বিবরণ হইতে ইহাও প্রতিপন্ন হইতেছে যে, উমাইয়ার শিক্ষাদানের পূর্ব্বে "বিছমিল্লাহির রহমানির রহিম" পদের ব্যবহার মক্কাবাসীর মধ্যে যথাযথরূপে প্রচলিত ছিল। সুতরাং উমাইয়া ঐ পদটী মক্কাবাসীদিগকে শিক্ষা দিয়াছিল, এ দাবীর কোন সার্থকতা থাকিতেছে না।

## এই বিবরণের ভিত্তিহীনতা

(ক) আগানীর গ্রন্থকার এই বিবরণের পূর্ব্বে يقال ক্রিয়াপদ ব্যবহার করিয়াছেন। ইহার শাব্দিক অনুবাদ "কথিত হয়।" কোন দুর্ব্বল অবিশ্বস্ত ও ভিত্তিহীন বর্ণনা প্রসঙ্গে এই প্রকার মজহুলের ছেগা বা Passive verb ব্যবহার করা হইয়া থাকে। ইহা আরবী সাহিত্যের একটা সর্ব্বজনবিদিত সাধারণ ধারা। সুতরাং আমরা দেখিতেছি যে, আগানী-রচয়িতা নিজেই এই বর্ণনাটীকে দুর্ব্বল ও অবিশ্বস্ত বলিয়া ধারণা করিয়াছেন। সুতরাং আগানীর বরাত দিয়া এই বিবরণকে প্রমাণস্থলে উপস্থাপিত করা যে কতদূর অন্যায়, তাহা আর কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না।

(খ) কোরআনের ফোর্কান ছুরায় বর্ণিত হইয়াছে :—

واذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا مالرحمن!

"এবং তাহাদিগকে যখন বলা হয় যে, তোমরা রহমানের সন্নিধানের সেজদা কর, তাহারা বলিয়া উঠে—"রহমান আবার কি ?" মিঃ পামার তাঁহার অনুবাদের ভূমিকায় ছুরা ফোর্কানের সার সঙ্কলন-প্রসঙ্গে এই আয়ত সম্বন্ধে লিখিতেছেন :—The Quraish object to the 'Merciful' as a new God. অর্থাৎ "কোরেশগণ 'রহমান' নামে আপত্তি করিয়া বলিল—ইহা ত নূতন খোদা।" সুতরাং আমরা দেখিতেছি যে, ছুরা ফোর্কানের এই আয়ত প্রকাশিত হওয়ার সময় পর্য্যন্তও 'রহমান' শব্দটী কোরেশ দিগের নিকট সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ও অপরিচিত ছিল। সুতরাং বিছমিল্লাহির রহমানির রহিম পদটীও যে, সে সময় পর্য্যন্ত কোরেশদের অবিদিত ছিল, তাহাও এই সঙ্গে স্পষ্টরূপে বুঝিতে পারা যাইতেছে। কারণ বিছমিল্লায় রহমান শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। সুতরাং সে সময় তাহাদিগের "বিছমিল্লাহির রহমানির রহিম" পদটী জানা থাকিলে, এবং রডওয়েল সাহেবের কথামতে কোরেশগণ নিজেদের পত্রাদিতে উহার যথেষ্ট ব্যবহার করিতে থাকিলে, এই সময় রহমান শব্দ শুনিয়া তাহাদের আশ্চর্য্য প্রকাশের বা তাহাকে "অভিনব" নাম বলিয়া বিস্ময় প্রকাশের কোনই কারণ ছিল না।

সার উইলিয়ম মুয়র প্রমুখ খৃষ্টান লেখকগণ ছুরা ফোর্কানকে Fifth period বা পঞ্চম পর্য্যায়ভুক্ত বলিয়া নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। তাঁহাদিগের মতে এই পর্য্যায়ের ছুরাগুলি নবুয়তের দশম সন হইতে মদিনার হেজরত কালের মধ্যে প্রকাশিত হইয়াছিল। (হিউজ ৫০২)। সুতরাং

তাঁহাদিগের হিসাবমতেও দেখা যাইতেছে যে, হেজরতের সময় বা তাহার অব্যবহিত পূর্ব্বকাল পর্য্যন্ত, বিছমিল্লায় বর্ণিত রহমান শব্দ মক্কাবাসীদিগের তথা আরবের জনসাধারণের নিকট সম্পূর্ণ অশ্রুত ও অবিদিত ছিল। অন্ততঃ তাহারা ঐ শব্দটা কখনই ব্যবহার করে নাই। অথচ হেজরতের পূর্ব ১৩ বৎসর পূর্ব্বে কোরআনের প্রথম ছুরা নাজেল হইয়াছিল এবং প্রত্যেক ছুরার প্রারম্ভে বিছমিল্লাহির রহমানির রহিম পদটীও অবতীর্ণ হইয়া আসিয়াছিল। অতএব আমরা দেখিতেছি যে, বিছমিল্লার সহিত কোরেশদিগের পরিচিত হওয়ার বহুপূর্ব্ব হইতেই কোরআনের প্রত্যেক ছুরার সহিত 'বিছমিল্লাহ' আয়তটীও নাজেল হইয়া আসিয়াছিল। সুতরাং "মোহাম্মদ কোরেশদিগের নিকট হইতে এপদটী গ্রহণ করিয়াছিলেন"—রডওয়েল সাহেবের এই উক্তি যে কতদূর অসমীচীন, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যাইতেছে।

(গ) হজরতের জীবনী আলোচনা করিলে জানা যাইবে যে, হিজরীর ষষ্ঠ বৎসরের শেষভাগে হোদায়বিয়া নামক স্থানে হজরতের সহিত কোরেশদিগের একটা সন্ধি হইয়াছিল। এই উপলক্ষে সন্ধিপত্র লেখার সময় হজরত উহার প্রারম্ভে বিছমিল্লাহির রহমানির রহিম লিখিতে আদেশ করেন। কোরেশ-প্রতিনিধি ইহাতে আপত্তি করিয়া বলিলেন :—

فما ندری ما بسم الله الرحمن الرحيم
ولكن اكتب مانعرف باسمك اللهم - مسلم ٢-١٠٥

"এই বিছমিল্লাহির রহমানির রহিম যে কি, তাহা আমরা অবগত নহি। অতএব উহার স্থানে বেএছমেকা আল্লাহুম্মা লেখা হউক,—যাহার সহিত আমরা পরিচিত।" ( ছহি মোছলেম্ ২—১০৫ )। হাদিছের এই বিশ্বস্ততম কেতাবে বরা-বেন-আজেব নামক হজরতের সহচর ও প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষী কর্ত্তৃক বর্ণিত এই বিবরণ হইতে অকাট্যরূপে প্রতিপন্ন হইতেছে যে, হিজরীর ষষ্ঠ সনের অর্থাৎ নবুয়তের ১৯ বৎসরের শেষভাগ পর্য্যন্ত কোরেশগণ "বিছমিল্লাহির রহমানির রহিম" পদের সহিত পরিচিত ছিল না। সে সময় তাহারা নিজেদের পত্রাদির প্রারম্ভে ঐ পদ লিখিতে অভ্যস্ত হইলে, সন্ধিসভায় উপস্থিত উভয় পক্ষের বহু গণ্যমান্য লোকের সাক্ষাতে কোরেশগণ "তোমাদের এই বিছমিল্লাহ—' যে কি, তাহা আমরা জানি না বলিয়া কখনই উহার বিরুদ্ধে আপত্তি করিত না, এবং তাহা হইলে মুছলমান পক্ষ তাহাদিগের এই আপত্তির যথাযথ প্রতিবাদ করিতেও কখনই কুন্ঠিত হইতেন না। ফলে এই সকল যুক্তি প্রমাণের দ্বারা অকাট্যরূপে প্রতিপন্ন হইতেছে যে, রডওয়েল সাহেবের উক্তি কেবল প্রমাণহীন দাবীই নহে, বরং উহা স্পষ্ট ও অকাট্য প্রমাণের বিপরীত একটা কল্পিত উপকথা মাত্র।

## সেল সাহেবের অনুমান

কোরআনের বিখ্যাত অনুবাদক পাদ্রী সেল সাহেব বলিতেছেন :—এহুদী ও প্রাচ্য খৃষ্টানদিগের মধ্যে এইরূপ স্থলে বিছমিল্লার অনুরূপ একটা একটা পদের ব্যবহার দেখা যায়। "কিন্তু আমি বিশ্বাস করি Apt to believe যে, প্রকৃত মোহাম্মদ মজুসদিগের নিকট হইতেই বিছমিল্লাহ গ্রহণ করিয়াছেন। তাহারা নিজেদের পুস্তকগুলি بنام یزدان بخشا یشگر دادار এই পদের সহিত আরম্ভ করিতে অভ্যস্ত ছিল। ( ভূমিকা, ৪২ পৃষ্ঠা )। কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় এই যে, সেল সাহেব তাঁহার এই দাবীর কোন প্রকার প্রমাণ দেওয়া আবশ্যক মনে করেন নাই। এক্ষেত্রে পার্সীদিগের দুই একখানা পুস্তকের নাম উল্লেখ করা উচিত ছিল, তাহা হইলে সেই পুস্তক রচনার ও তাহার বর্ত্তমান মুসাবিদার সন তারিখ লইয়া আলোচনা করার সুবিধা হইত। কিন্তু সত্যানুসন্ধিৎসু জনসাধারণের ইহাতে সুবিধা হইলেও পাদ্রী সাহেবের সমস্ত উদ্দেশ্যই তাহা হইলে পণ্ড হইয়া যায়। এই জন্য তিনি সাবধানতার সহিত এ বিষয়টা চাপিয়া গিয়াছেন।

সে যাহা হউক, এই আলোচনা-প্রসঙ্গে আমাদিগের প্রথম বক্তব্য এই যে, পাদ্রী সাহেব এখানে বিশেষ কারণ বশতঃ পার্সীদিগের ব্যবহৃত পদটী কাটছাঁট করিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। দছাতিরেআছমানী পুস্তকে এই স্থানে উল্লিখিত হইয়াছে :—

بنام ایزد بخشایندہ بخشایشگر مہربان دادگر
سراجی پریس - دہلی — ١٢٨٠ —

এই পদটী একটু মনোযোগ সহকারে পাঠ করিলে সহজে বুঝিতে পারা যাইবে যে, ইহা অন্য কোন পদের অনুবাদ ব্যতীত আর কিছুই নহে। মূলের ভাব যথাযথরূপে প্রকাশ

করিতে অসমর্থ হইয়া অনুবাদক মূলের এক একটা শব্দের অনুবাদে বিভিন্ন প্রতি শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। এই সত্যটা ঢাকিয়া রাখার উদ্দেশ্যে পাদ্রী সাহেব পার্সীদিগের ব্যবহৃত পদটী এমন করিয়া কাটিয়া ছাঁটিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। আর বাস্তবিক সেল সাহেব ঐ সংক্ষিপ্ত পদটী যদি পার্সীদিগের কোন পুস্তকে পাইয়া থাকেন, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, তাহাদের মূল পুঁথিপুস্তকে ঐ পদটী বিদ্যমান ছিল না। পরবর্ত্তী সময়ের গ্রন্থকার বা অনুবাদকগণ অন্য কাহারও নিকট হইতে ঐ পদটা গ্রহণ এবং নিজ নিজ ইচ্ছামত তাহার বিভিন্ন প্রকারের অনুবাদ প্রদান করিয়াছেন। সেই জন্য কোন পুস্তকে بنام یزدان بخشایشگر دادار আর কোন পুস্তকে بنام ایزد بخشایندهٔ بخشایشگر مهربان دادگر বলিয়া তাহার অনুবাদ করা হইয়াছে।

মজুসদিগের ধর্ম্মগ্রন্থ আভেস্তা ও তাহার জেন্দ বা ব্যাখ্যা এবং তাহাদিগের অন্যান্য সমস্ত ধর্ম্মগ্রন্থ আলেকজন্দরের আক্রমণের পর হইতে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হইয়া যায়। তাহার পর ৩য় খৃষ্টাব্দের মধ্যভাগ হইতে সাসানীয় বংশের সম্রাটগণের চেষ্টায় পুরোহিতদিগের স্মৃতি, বাজার-প্রচলিত কিংবদন্তি এবং অন্যান্য কাগজপত্র হইতে ঐ সমস্ত পুস্তকের শিক্ষা একত্র সঙ্কলন করা হইতে থাকে। সম্রাট ২য় শাপুরের সময় (৩০৯-৩৮০ খৃষ্টাব্দ) এই সঙ্কলন কার্য্য শেষ হয়। কিন্তু হইলে কি হইবে, যে প্রাচীন ভাষায় আভেস্তা প্রভৃতি লিখিত বা পুনরায় সঙ্কলিত হইয়াছিল, তাহা বহুপূর্ব্বেই অবোধ্য হইয়া পড়িয়াছিল। কাজেই সাসানীয় বংশের শেষ রাজাদিগের সময় তাহার অধিকাংশ পুঁথিপুস্তক প্রচলিত পাহলভী ভাষায় অনূদিত হয়। ব্রিটানিকা বিশ্বকোষের লেখক এই সকল বিবরণ দিবার পর পাঠকগণকে সতর্ক করিয়া দিয়া বলিতেছেন :—

But this Sassanian origin of the Avesta must not be misunderstood……it is now impossible to draw a sharp distinction between that which they found surviviug ready to there hand and that they themselves added.

"কিন্তু আভেস্তার এই সাসানীয় মূল সম্বন্ধে কেহ যেন ভুল ধারণা না করেন।……প্রকৃতপক্ষে আভেস্তার কতটা অংশ তাহারা হস্তগত করিতে পারিয়াছিল, আর তাহাতে তাহারা নিজে যে কতটা অংশ যোগ করিয়া দিয়াছিল, এখন তাহা বাছিয়া বাহির করা অসম্ভব।

পাঠকগণ এখানে স্মরণ রাখিবেন যে, সাসানীবংশের শেষ রাজাগণের সময় এই অনুবাদ কার্য্য সমাপ্ত হইয়াছিল এবং নওশেরওয়ান আদেল, তাহার পুত্র খসরু পরভেজ প্রভৃতি হইতেছেন সাসান বংশের শেষ রাজা। নওশেরওয়াঁ হজরতের সমসাময়িক ছিল এবং সেই-ই হজরতকে গ্রেপ্তার করিয়া রাজধানীতে পাঠাইবার জন্য এমনের গবর্ণরের নিকট ওয়ারেন্টের পরওয়ানা পাঠাইয়াছিল। ইহার কএকদিন পরে তাহার পুত্র খসরু পরভেজ পিতাকে হত্যা করিয়া সিংহাসনের অধিকারী হয় এবং এই পরভেজের নিকট হজরত পত্র পাঠাইয়াছিলেন। এই পত্রের মুসাবিদা আজও সুরক্ষিত হইয়া আছে। এই পত্রের শিরোভাগে যথানিয়মে সম্পূর্ণ বিছমিল্লাহির রহমানির রহিম লিখিত আছে। সুতরাং নওশেরওয়াঁ ও খসরু পরভেজের সময় যখন পুরাতন অবোধ্য ভাষায় লিখিত পুঁথি পুস্তকের অনুবাদ এবং নূতন বিষয়ের সঙ্কলন চলিতেছিল—সম্পূর্ণ বিছমিল্লাহটী তখন যে, তাহাদিগের হস্তগত হইয়াছিল, তাহাতে আর কোনই সন্দেহ থাকিতেছে না। এই হিসাবে বলা যাইতে পারে যে, পার্সিকেরা বিছমিল্লার সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া নিজেদের পুস্তকে তাহার অনুবাদ লিপিবদ্ধ করিয়া লইয়াছিল। এই সময় বিজ্ঞান, জ্যোতিষ, ইতিহাস ও অন্যান্য নীতি কথাগুলি তাহারা যেভাবে আভেস্তার অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইতেছিল, তাহাতে বিছমিল্লার অনুবাদও যে তাহাতে শামিল করিয়া লওয়া খুবই স্বাভাবিক, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। পক্ষান্তরে আমরা ইহাও দেখিতেছি যে, হজরতের সময় তাঁহার সমসাময়িক পার্সিক পণ্ডিতগণ আভেস্তা প্রভৃতির অনুবাদ করিতেছিলেন এবং তাহাদিগের অনুবাদ সরকারী কোষাগারে আবদ্ধ থাকার অবস্থাতেই হজরত পরলোক গমন করেন। এই সময় পার্সিকদিগের দুর্ব্বোধ্য পাজেন্দ ভাষায় লিখিত তাহাদের কোন ধর্ম্মশাস্ত্র বা তাহার কোন অংশ হজরতের হস্তগত হইয়াছিল বলিয়া শত্রুপক্ষও ঘুণাক্ষরে সামান্য একটা প্রমাণ উপস্থিত করিতে পারেন নাই। এ অবস্থায় হজরত পার্সিকদিগের নিকট হইতে বিছমিল্লাহ পদটী গ্রহণ করিয়াছেন, এরূপ অনুমান না করিয়া পার্সিক-

গণই হজরতের পত্র হইতে উহা গ্রহণ করিয়াছিল বলিয়া অনুমান করাই সঙ্গত।

কিন্তু বস্তুতঃ এই প্রকার অনুমান করার কোনই আবশ্যকতা নাই। সেল সাহেবকে আমরা জিজ্ঞাসা করি, আলেফ-বে প্রভৃতি বর্ণমালা কি হজরত পার্সিকদিগের পুস্তক হইতে গ্রহণ করিয়াছিলেন? তাঁহার যুক্তির হিসাবে বলা যাইতে পারে যে, যেহেতু পার্সিকদিগের ধর্ম্মপুস্তক সমূহে এই বর্ণমালা ব্যবহৃত হইতে দেখা যাইতেছে, সুতরাং বলিতে হইবে যে, আরবীগণ পার্সিকদিগের কোন পুস্তক হইতে তাহা চুরি করিয়া থাকিবে! জেন্দ ও পাহলাভী ভাষার বর্ণমালার সমস্ত ইতিহাসকে অজ্ঞতা ও গোঁড়ামীর যূপকাষ্ঠে বলি দিয়া এইরূপ মন্তব্য প্রকাশ করা যেরূপ অসঙ্গত, প্রচলিত আভেস্তা প্রভৃতির সমস্ত ইতিবৃত্তকে অস্বীকার করিয়া কোরআনের পদবিশেষকে তাহার অনুকরণ বলিয়া সিদ্ধান্ত করাও ঠিক সেইরূপ।

পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ, প্রচলিত আভেস্তা প্রভৃতি পার্সিক ধর্ম্মপুস্তকের ইতিবৃত্ত সম্বন্ধে বিস্তারিতরূপে আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহারা সকলেই স্বীকার করিয়াছেন যে, পাহলাভী ভাষায় উহার অনুবাদ হইয়াছে ষষ্ঠ শতাব্দীতে এবং তাহার পর পারস্য দেশে আরব-অধিকার প্রতিষ্ঠা হওয়ার পরে মুছলমানেরা আরবী ও আধুনিক পার্সীভাষায় উহার অনুবাদ করেন। প্রাক্-এছলামিক যুগের ইতিহাস সঙ্কলন ব্যপদেশে তাবরী প্রভৃতি মুছলমান ঐতিহাসিকগণ তাহার অনেক অংশ নিজ নিজ পুস্তকে স্থানদান করিয়াছেন। পঞ্চতন্ত্রের আরবী অনুবাদক 'এবনুল মোকাফ্‌ফা' (মৃত্যু ১৫৮ হিজরী, ৭৭৪ খ্রীষ্টাব্দ) পার্সিকদিগের বহু পুস্তক-পুস্তিকার অনুবাদ করিয়াছিলেন, ইহা অকাট্য সত্য। (দেখ-এডওয়ার্ড ফণ্ডিক প্রণীত একৃতেফা, ব্রিটানিয়া বিশ্বকোষ Art, pahlavi প্রভৃতি)। এই শ্রেণীর মুছলমান অনুবাদকগণের প্রভাবেই যে পার্সিকদিগের প্রচলিত কোনও কোন পুস্তকে বিছমিল্লার অনুবাদ স্থান লাভ করিয়াছে, তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। এইজন্য পার্সীদিগের ধর্ম্মশাস্ত্রের এক অংশ Rewayat রেওয়ায়াত নামে অভিহিত হইয়া গিয়াছে। (দেখ ব্রাউন, ব্রিটানিকা)।

## সেল সাহেব

হজরত পার্সিদিগের কোন্ পুস্তক হইতে বিছমিল্লা পদটা গ্রহণ করিয়াছিলেন, পাদ্রী সেল সাহেব তাহা নির্দ্দিষ্ট করিয়া বলেন নাই। না-বলার অনেক কারণও আছে। কারণ পার্সিকদিগের মধ্যবর্ত্তিতায় আভেস্তা প্রভৃতির যে সকল পুরাতন মুসাবিদা পাওয়া গিয়াছে, সেগুলি সমস্তই ১৭শ বা ১৮শ শতাব্দীর লিখিত। আভেস্তার প্রাচীনতম মুসাবিদা Copenhagen নগরে রক্ষিত আছে। উহা ১২৫৮ খৃষ্টাব্দের লিখিত। হরবাদ মিহিরপান কাইখসরু নামক জনৈক পার্সির লিখিত যে চারিখানি ক্ষুদ্র মুসাবিদা Cambay ক্যাম্বে নগরে রক্ষিত আছে, তাহাও ১৩২৩ ও ১৩২৪ খৃষ্টাব্দের লিখিত। (ব্রিটানিকা—'জেন্দ')। ফলে এছলামের পূর্ব্বকার লিখিত অভেস্তা বা অন্য কোন ধর্ম্মশাস্ত্র দ্বারা যতক্ষণ না সপ্রমাণ করা হইতেছে যে, বাস্তবিক তাহাতে বিছমিল্লাহ পদটী এইরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে, তাবৎ এ সম্বন্ধে কোন কথার আলোচনাই হইতে পারে না। সেল সাহেব এই জন্যই কোন পুস্তকের নাম উল্লেখ করা সঙ্গত মনে করেন নাই।

---

# ক্রন্দসী

[ গোলাম মোস্তফা ]

আমার মনের মাঝে এ কোন্ ক্রন্দসী—
নিশিদিন বসি'
কাঁদিতেছে অবিশ্রাম ? কোন্ বেদনায়
থেকে থেকে হিয়া তার মূরছিয়া যায় ?
প্রকৃতির আঙ্গিনায় প্রতিদিন বাজে আগমনী—
ভেসে আসে জীবনের জয়যাত্রা-উৎসবের ধ্বনি,
তারি মাঝে হায়
সে শুধুই বিরহের অশ্রু-গীতি গায়।
চির-দিবসের যেন ব্যথাতুরা কোন্ বিরহিনী
মনের বিজন বনে বাজাইছে বেদন-রাগিনী।
উদয় প্রাতের নব আলোকের পুলক-ঝঙ্কার
তার প্রাণে করে নাক' আনন্দের মাধুরী সঞ্চার,
ব্যথাহত প্রাণে
সে শুধুই চেয়ে থাকে ম্লান-মৌন অস্তাচল পানে
যাহা পাইয়াছি আর যাহা পাই নাই—
সবাই সমানভাবে প্রাণে তার হানে বেদনাই।
দারা-পুত্র-পরিজন—যারা কাছে কাছে
পল্লবের মত সদা ঘিরে রহিয়াছে,
তাহাদেরে প্রাণে প্রাণে দিয়ে প্রেম-প্রীতির বন্ধন
কাছে টেনে নিতে যেই প্রাণপণ করি আয়োজন,
অমনি সে তার মাঝে অকস্মাৎ ফেলি' অশ্রু-জল
অনাহুত বেদনায় ভ'রে দেয় মোর হিয়াতল !
আধি-ব্যাধি শোক-তাপ, দু' দণ্ডের আঁখির আড়াল
পারে না সহিতে কারো ; সংশয়ের জাল
অমনি ঘনায়ে আসে। চঞ্চলিয়া ওঠে সারা বুক—
বুঝিবা হারায়ে ফেলে জীবনে সে পেয়েছে যেটুক্ !
শুধু যেন 'নাই নাই নাই'
শুধু যেন 'হারাই হারাই'—
এই ভয় প্রাণে তার জাগে অনুক্ষণ
তাই সে উন্মন।
বাহিরের পরিপূর্ণ এই হাসি-উৎসবের মাঝে
তার প্রাণে নিশিদিন অতৃপ্তির ব্যথা কেন বাজে ?
না-হারানো পাওয়া কবে পাব সুমধুর,
কবে তার অন্তরের অশ্রু হ'বে দূর।

# আহ্‌মদ ছা'দ পাশা জগলুল

[ নজির আহ্‌মদ চৌধুরী ]

মিছরের যুগসন্ধিক্ষণে—১৮৬০ খৃষ্টাব্দে কাহেরার অনতি-দূরস্থ 'আবিনিয়া' গ্রামের এক সম্রান্ত পরিবারে আহ্‌মদ ছা'দের জন্ম হয়। ষষ্ঠ বর্ষ বয়সে পদার্পণ করিয়া ছা'দ স্থানীয় মক্তবে ভর্ত্তি হন। কালে এই ছা'দ যে জগদ্বিখ্যাত

আহ্‌মদ ছা'দ জগলুল

পুরুষ এবং মিছরের সর্ব্বজনমান্য নেতা হইবেন, তখন সে কথা কেহ ভাবে নাই। তবে তাঁহার

বাল্যজীবন

মেধা ও শিক্ষানুরাগ দেখিয়া শিক্ষকবর্গ বিশেষ ভাবে মুগ্ধ হইয়াছিলেন। অল্পকাল মধ্যে সুশীল, সুবোধ ও মেধাবী বালক বলিয়া ছা'দ বয়স্কদিগের বিশেষ স্নেহ লাভে সমর্থ হন। মক্তব-শিক্ষা সমাপ্ত হইলে দ্বাদশ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে তিনি কাহেরার বিশ্ববিখ্যাত জামে আজ্‌হারে প্রবেশ লাভ করেন। 'জামে-আজহারে' অবস্থিত শত শত প্রসূনের মধ্যেও ছা'দের প্রতিভা-সৌরভ সমধিক বিস্তৃত হইয়া পড়ে। ছা'দের বহুমুখী-প্রতিভা ও জীবনসাধনার আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়ার পূর্ব্বে মিছরের অতীত জীবন সম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক।

মিছর অতি প্রাচীন দেশ। কত প্রাচীন, সে কথা তাহার স্মরাবরণও বলিতে পারে না। তবে টেম্‌স্

ইতিহাস

নদীর সুড়ঙ্গ যখন লোকসমাজের অজ্ঞাত, টেম্‌স্ যখন লোকলোচনের অগোচরে। এমন কি, ইংলণ্ডও যখন সমুদ্রগর্ভে অদৃশ্য, তখনও মিছরের বুকে অগণিত 'পিরামিড্' সগর্ব্বে দণ্ডায়মান।

মিছর আফ্রিকার প্রদেশ বিশেষ। কিন্তু আরবগণ উহাকে এশিয়ারই অংশ বলিয়া মনে করেন। ইউ-রোপীয় রাষ্ট্র পণ্ডিতগণ উহাকে ইউরোপ মহাদেশের অন্তর্গত বলিয়া ধরিয়া লন। সুয়েজ খাল খননের পর হইতে তাঁহাদের দাবী আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে। ভৌগোলিক অবস্থিতির এই বৈশিষ্ট্যের ফলে মিছরের ইতিহাস চিরবিচিত্রতাময়। কত দেশের কত ভাষা, কত সাহিত্য, কত সভ্যতার খরস্রোত আসিয়া বিশাল-বক্ষ 'ছাহ্‌রার' কঠোর প্রতিকুলতায় থামিয়া গিয়া প্রান্তবর্ত্তী মিছর দেশে আশ্রয় লইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই।

মিছরের রাষ্ট্র ইতিহাস অতিশয় শিক্ষাপ্রদ। বিশ্ববাসীর শিক্ষার জন্য অত্যাচারী রাজা ফেরআউনের জলমগ্ন শবদেহ আজও এইখানে অক্ষতভাবে সুরক্ষিত আছে। (১) আর ত্রাণকর্ত্তা মুছার অমর বজ্রবাণী আজও ঘুরিয়া ঘুরিয়া বিশ্বকে প্রতিধ্বনিত করিয়া বিশ্ববাসীকে বলিতেছে,—

(১) কোরআনে ছুরা ইউনছের — فاليوم ننجيك ببدنك আয়ৎ দেখ।—লেখক

"মুক্ত হও, স্বাধীন হও !—পরবশতার মোহপাশ ছিন্ন কর !!

ফেরআউন শুধু একটী নহে। যুগে যুগে আরও কত অত্যাচারী রাজার রাজদণ্ডের আঘাতে মিছরের বক্ষপিঞ্জর কতবার চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া গিয়াছে, এবং কতবার যে ত্রাণকর্ত্তা আসিয়া সে ক্ষত স্থানে 'মরহাম' দিয়া মিছরকে নিরাময় করিয়াছেন, তাহার ইতিহাস লিখিয়া শেষ করা যায় না। মিছরের সর্ব্বজনবিদিত প্রবাদ لكل فرعون موسى "যেখানে ফেরআউন সেখানেই মুছা" ইহার সাক্ষ্য দিতেছে।

মিছরের বিশ্ব-বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয় 'জামে' আজ্‌হার'

শামী ও ফেরআউনী অত্যাচারের অবসান হইতে না হইতে, খৃষ্টপূর্ব্ব চতুর্থ শতাব্দীর শেষ ভাগে, মিছরের বুকে আবার গ্রীক-অত্যাচার আরম্ভ হয়। অবশেষে ৬৩৯ খৃষ্টাব্দে খলিফা হজরত ওমর ফারুকের ইঙ্গিতে সে-অত্যাচারের অবসান হয়। মহাবাহু আমর-বিন্‌-আ'ছ মিছর জয় করেন। খোলাফায়ে-রাশেদীনের পর উমাইয়া, আব্বাছিয়া, ফাতেমীয়া ও ওছ্‌মানিয়া বংশের খলিফাগণ যথাক্রমে মিছর দেশ শাসন করিতে থাকেন। ফাতেমীয়াবংশের শাসনকালে মিছরের কাহেরা নগর দারুল-খেলাফতে পরিণত হয়।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে নেপোলিয়ান বোনাপার্ট মিছর আক্রমণপূর্ব্বক তথায় "দীওয়ান" বা পার্লামেণ্ট প্রতিষ্ঠা করেন। সে-অধিকার ও সে-দীওয়ান দীর্ঘস্থায়ী হয় নাই। অল্পদিন পরে মিছর আবার ওছমানিয়া সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয় সত্য, কিন্তু মিছরের শিক্ষা-সভ্যতা, ব্যবসা-বাণিজ্য ও শাসন-নীতি প্রতীচ্যের প্রভাবমুক্ত হইতে পারে নাই। মোহাম্মদ আলী কখনও তুরস্ক-ছোলতানের বিদ্রোহী হইয়া আবার কখনও বা তাঁহার প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করিয়া মিছরের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখার চেষ্টা করিয়া আসিতেছিলেন। অবশেষে ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হইলে উত্তরাধিকারিগণের অযোগ্যতা ও তুর্কী ছোলতানের দুর্ব্বলতা নিবন্ধন মিছরের স্বাতন্ত্র্য সমূলে বিনষ্ট হইয়া যায়।

১৮৬৩ খৃষ্টাব্দ যুগপত্তাবে স্মরণীয় ও শোকাবহ। এই বৎসর মোহাম্মদ আলীর পুত্র ছঈদ পাশার মৃত্যু হয় এবং ভ্রাতুষ্পুত্র এছমাঈল পাশা খদিবের সিংহাসনে আরোহণ করেন। প্রকৃত পক্ষে এই বৎসরেই মিছরের বুকে "খঞ্জরে-হেলাল" স্থলে "ইউনিয়ন জ্যাক" উড্ডীন হয়।

বৃটিশ ও ফরাসী রাষ্ট্র-পণ্ডিতগণ নানা কৌশলে প্রচার করিতেছিলেন, "মিছর প্রতীচ্যেরই ভাগে।" এমন সময় সেই—১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে প্রাচ্য গুরু ছৈয়দ জামালুদ্দীন—

কবির (১) মিছর দেশে প্রথম শুভ পদার্পণ করেন। প্রাচ্যের দ্বারদেশ স্বরূপ মিছরের এই আত্মবিস্মৃতি ও তাহার ভাবী পরিণাম চিন্তা করিয়া তিনি বিচলিত হইয়া পড়িলেন। অবশেষে তিনি ঘোষণা করিলেন, المصر للمصريين ( Egypt for Egyptians ) "মিছর মিছরবাসীর ভোগ্য। প্রতীচ্যের কোন অংশ-ভাগ ইহাতে নাই।" প্রতীচ্য পণ্ডিতগণের সহিত প্রচারযুদ্ধ

"বিদ্রোহ"

আরম্ভ হইল। জাতির পতনের সময়েও চিন্তাশীল লোকের নিতান্ত অভাব হয় না। আমরা দেখিয়াছি, পলাশী-যুদ্ধের পরও কাছেম ও টীপুর ন্যায় দূরদর্শী মনীষীও ভারতবর্ষে বর্ত্তমান ছিলেন। সিপাহী-বিদ্রোহ এবং তদানীন্তন বৃটিশারদিগের অকথ্য লোমহর্ষণ অত্যাচারের পরও ছৈয়দ আহমদ ও এছমাঈল শহীদের ন্যায় মহাপ্রাণ পুরুষের আবির্ভাব সম্ভব হইয়াছিল। মিছরেও তখন এই শ্রেণীর দুই চারিজন লোকের অভাব হয় নাই, এবং মুফ্‌তি মোহাম্মদ আবদুহু, আহ্‌মদ আরবী ( আরবী পাশা ) প্রমুখ প্রতিভাবান শক্তিশালী পুরুষগণ সগৌরবে ছৈয়দ ছাহেবের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন। ফলে অল্পদিনের মধ্যে মিছরের আত্মানুভূতি সজাগ হইয়া উঠিল—বৃটিশ পণ্ডিতগণের ভাষায় ইহাই "বিদ্রোহ।"
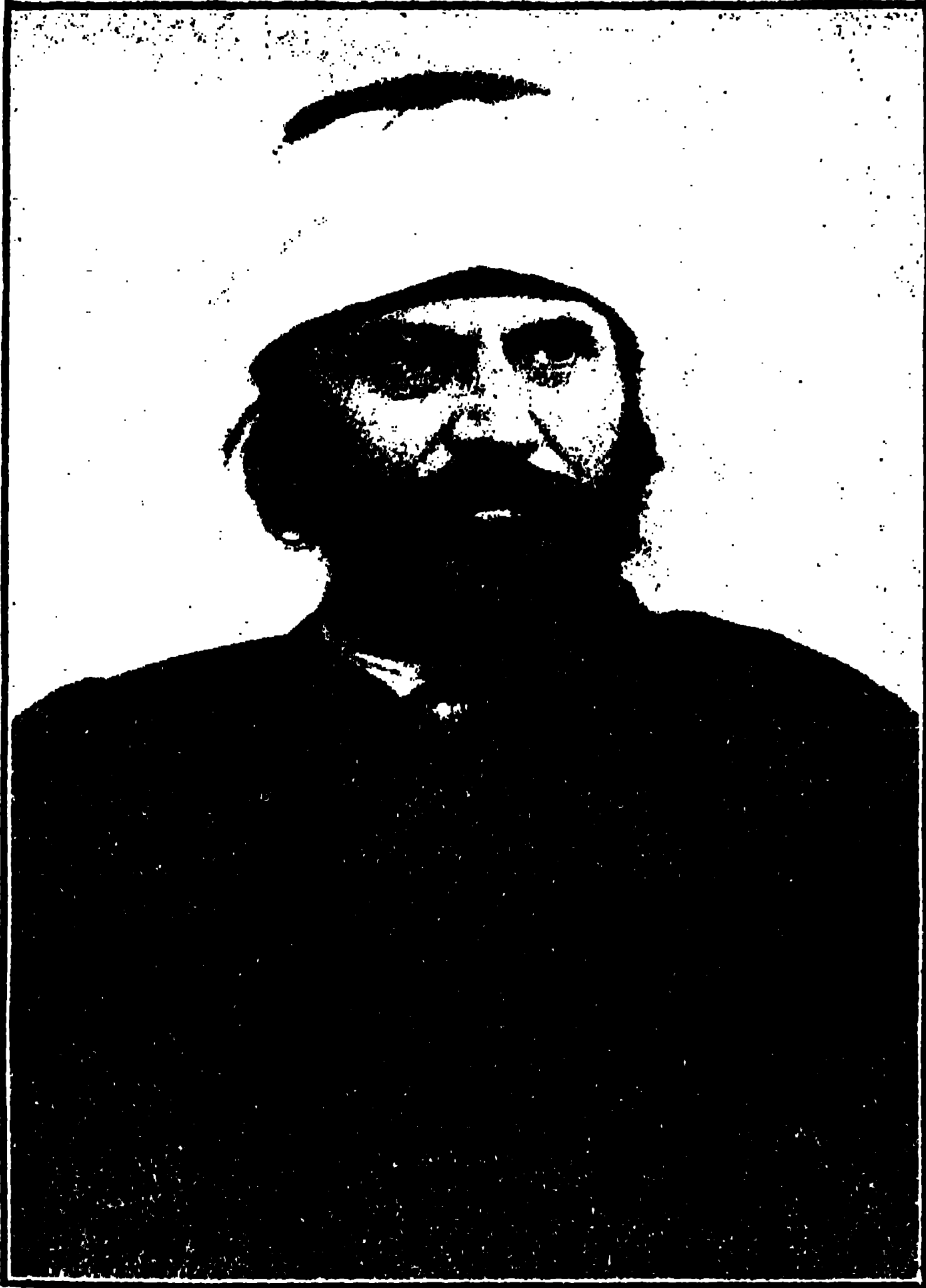
ছইয়দ জামালুদ্দিন আফগান

খদিবের পুত্র তওফিক ছৈয়দ ছাহেবের শিষ্যবর্গের শামেল ছিলেন। তওফিক গুরুর নিকট প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছিলেন,—সিংহাসন লাভ করিলে মিছরকে প্রতীচ্য প্রভাব হইতে মুক্ত করিবেন। মিছরকে সংশুদ্ধ ও শক্তিশালী করিবেন। ঘটনাচক্রে ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে তুর্কী ছোলতানের আদেশে এছমাঈল পাশা সিংহাসনচ্যুত হইলে, পুত্র তওফিক তখন মিছরের খদিব হইলেন। "মিছরে তখন তুর্কী-বৃটিশ ডুয়েল-গবর্ণমেণ্ট স্থাপিত হইল। বিশ্ববাসী বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া "বৃটিশ ডুপ্লোমেসীর" জয় কীর্ত্তন করিতে লাগিল।

কিন্তু সিংহাসনে আরোহণ করিয়া তওফিক পূর্ব্বপ্রতিশ্রুতি বিস্মৃত হইলেন। এমন কি গুরুর নির্ব্বাসনের ব্যবস্থা করিতেও তিনি কুণ্ঠিত হইলেন না। ছৈয়দ ছাহেবকে তখন অগত্যা মিছর ছাড়িয়া যাইতে হইল। তওফিক তখন বুঝিতে পারেন নাই,—গুরুর নির্ব্বাসন সহজ হইলেও, গুরুর মন্ত্র-শক্তির নির্ব্বাসন বড়ই কঠিন। জামালুদ্দীন মিছরের উর্ব্বর ক্ষেত্রে বিপ্লবের যে বীজ বপন করিয়াছিলেন, উহা তাঁহার অবস্থান কালেই অঙ্কুরিত হইয়াছিল। তিনি মিছর ত্যাগ করিলে পর, তাহা মহামহীরুহে পরিণত হইয়া শাখা-পল্লবে সমগ্র মিছর দেশ ছাইয়া ফেলিল। মিছরের যুবকগণ দলে দলে মুফ্‌তি আবদুহু ও আহমদ আরবীর পতাকা-মূলে আসিয়া সমবেত হইল, "বিদ্রোহানলে" ঝাঁপাইয়া পড়িল।

আছদাবাদের পুরুষ সিংহ ছৈয়দ জমালুদ্দীনের প্রথম নিনাদে যখন মিছরবাসীর নিদ্রা ও তন্দ্রার অবসান হইতেছিল,

(১) কবির = کبير, জামালুদ্দীন কবির = Jamaluddin, the Great —লেখক।

কর্ম্মজীবন আরম্ভ

আহমদ ছা'দ তখন বালক। বালক যৌবনে পদার্পণ করিয়া মিছরে ভাবের বন্যা দেখিলেন। মিছরের স্বাধীনতা-সংগ্রামের প্রধান বাহিনী ছিল জামেআজহারের ছাত্রবৃন্দ। ছা'দও সৈন্য

মুফ্‌তি মোহাম্মদ আবদুহু

শ্রেণীভুক্ত হইলেন। কালে মুফ্‌তি আবদুহু তাঁহার সাহিত্যিক প্রতিভার পরিচয় পাইয়া "আল-অকাএ' পত্রের সম্পাদনে ছা'দকে নিজের সহকারীরূপে গ্রহণ করিলেন। এইরূপে পঠদ্দশায় ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে ছা'দ জগলুলের কর্ম্ম-জীবনের সূত্রপাত হইল।

"বিদ্রোহ" দমন

ছৈয়দ ছাহেবের মিছর-ত্যাগের পর স্বাধীনতার আন্দোলন প্রবল হইয়া উঠিল। তওফিক প্রথমতঃ নেতৃস্থানীয় পুরুষদিগকে বন্দী-ভূত করিবার আয়োজন করিলেন। আহমদ আরবীকে সেনাপতিপদে বরণ করিলেন। তাঁহার মনোনীত ব্যক্তি-গণ মন্ত্রী নিযুক্ত হইলেন। তওফিকের এই নূতন ব্যবস্থা দেখিয়া ইংরেজ-ফরাসীর দুর্ভাবনা উপস্থিত হইল। "ডুয়েল নোট" পাঠাইয়া তাঁহারা খদিবকে জানাইলেন,—ইংলণ্ড ও ফ্রান্স "বিদ্রোহ" দমনে প্রাণপণ করিতে প্রস্তুত। খদিব

প্রলুব্ধ হইলেন। ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে আহ্‌মদ আরবীর প্রাণ-দণ্ডের আদেশ হইল। জাতীয় আন্দোলনের প্রাণস্বরূপ ব্যক্তিগণ দলে দলে নির্ব্বাসিত হইলেন। আহমদ ছা'দও ধৃত হইলেন; কিন্তু অনুসন্ধানে জানা গেল, আন্দোলনের বিশেষতঃ তওফিকের হত্যা-চেষ্টার সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ সম্বন্ধ নাই। কাজেই বিনা দণ্ডে তাঁহাকে অব্যাহতি দেওয়া হইল। অতঃপর ১৮৮২ খৃষ্টাব্দের ৩রা যে তারিখে ছা'দ আফেন্দী মিছরের স্বরাষ্ট্র সচিব নিযুক্ত হন।

মিছরের জাতীয় আন্দোলনে মোহাম্মদ আবতুহু ছিলেন মস্তিষ্ক এবং আহ্‌মদ আরবী ছিলেন তাঁহার বাহু। তাঁহাদের

আন্দোলনের নূতন ধারা

অভাবে দেশের স্তরে স্তরে বিষম অবসাদের সঞ্চার হইল। নির্ব্বাসনে থাকিয়া মুফ্‌তি মোহাম্মদ আবতুহুর মানসিক অবস্থার কিছু পরিবর্ত্তন ঘটিল। কালে স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করার পর শিক্ষা-বিস্তারের প্রতি তিনি অধিকতর মনোযোগী হইলেন। এদিকে ছা'দ আফেন্দী নানা সরকারী কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়া গুরুর পদাঙ্ক অনুসরণ করিতে লাগিলেন। সেই সময় মোস্তফা কামেল, জামালুদ্দীন কবিরের পতাকা হস্তে "হিজ্‌বুল-ওতনীর" (১) নেতা হইলেন। ইহার অল্পকাল পরে জাতীয় আন্দোলনের নেতাগণের মধ্যে মতবৈষম্যের সৃষ্টি হইল। এই মতবৈষম্যের ফলে মাঝে মাঝে দুই দলে বিরোধ উপস্থিত হয় নাই, এমন নহে। তবে দলের লক্ষ্য এক ও অভিন্ন হওয়ায় আমাদের দেশের চরমপন্থী ও মধ্য পন্থীদের ন্যায় পদে পদে এমন সংঘর্ষ উপস্থিত হয় নাই।

পাঠক পূর্ব্বেই দেখিয়াছেন, শিক্ষা অসম্পূর্ণ রাখিয়া

ব্যবহারাজীব ছা'দ

ছা'দ কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়াছেন। বাল্যকাল হইতে জ্ঞানার্জ্জনের প্রতি তাঁহার স্বাভাবিক আকর্ষণ ছিল, তাঁহার সে জ্ঞান-পিপাসার নিবৃত্তি কখনও হয় নাই! ছা'দ যেন আজীবন ছাত্র ছিলেন। আলোচ্য সময়ে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রতি তিনি বিশেষ মনোনিবেশ করিলেন, এবং ফরাসী ভাষা আয়ত্ত করিয়া তিনি ফরাসী-আইন অধ্যয়নে যত্নবান হইলেন। নিজে নিজে পড়িয়া তাহাতে তিনি বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করিলেন। মিছরে প্রচলিত ত্রিবিধ আইন-জ্ঞানে তাঁহার অসাধারণ অধিকার জন্মিল। তবে ব্যবসায় আরম্ভ করিতে তাঁহাকে একটু বেগ পাইতে হইল, তিনি শাসন কর্ত্তৃপক্ষকে বলিলেন,—"ছনদ বা সার্টিফেকেট কখনও জ্ঞান নহে, জ্ঞানের সাক্ষ্য মাত্র। আমার আইন-জ্ঞানের পরীক্ষা গৃহীত হউক।" পরীক্ষার বিশেষ ব্যবস্থা হইল। পরীক্ষকগণ তাঁহার অসাধারণ আইন-জ্ঞান দেখিয়া বিমোহিত হইলেন, অতঃপর কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহাকে আইন-ব্যবসায়ের অধিকার দান করিলেন। কালে তিনি মিছরের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ব্যবহারাজীব বলিয়া খ্যাত হন। কিছুদিন আইন-ব্যবসায় করার পর ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে ছা'দ বেক মিছরের শিক্ষা-সচীব মনোনীত হন এবং ১৯১০ সালে আইন সচীবের পদে বরিত হন।

১৯০৬ সালে স্বাধীনতার পুরোহিত মোস্তফা কামেল অকালে কালগ্রাসে পতিত হন। তখন ছা'দের ব্যক্তিত্বের বদৌলত মধ্যপন্থী মতবাদ ক্রমে অপেক্ষাকৃত প্রবল হইয়া

ছা'দের রাজনীতি

উঠিল। ত্রিপলী, বলকান ও ইঙ্গ-জার্ম্মেন যুদ্ধের সময়ে মিছর যেন আত্মপ্রত্যয় হারাইয়া বসিল, বৃটিশ মন্ত্রী-সমাজের উপর মিছরের ভাগ্য-নিয়ন্ত্রণের ভার অর্পণ করিয়া তাহারা যেন নিশ্চিন্ত হইয়া পড়িল। মোস্তফা কামেলের "হিজ্‌বুল ওতনী" পূর্ব্ববৎ বিদ্যমান ছিল; কিন্তু পূর্ব্বশক্তি আর তাহাতে ছিল না।

যুদ্ধকালে বৃটিশ মন্ত্রী-সমাজ মিছরবাসীকে নানারূপ প্রলোভন দেখাইয়াছিলেন। মহাত্মা গান্ধীর ন্যায় স্বাভাবিক সরলতা নিবন্ধন ছা'দ পাশাও তাহাতে অবিশ্বাস করিতে পারেন নাই। ১৯১৮ সালে যুদ্ধ-বিরতির পর ছা'দ পাশা জগ্‌লুল সরল বিশ্বাসে ইংলণ্ডের মন্ত্রী-সমাজের নিকট মিছরের দাবী উপস্থিত করিলেন। তিনি স্পষ্ট-ভাষায় বলিলেন,—আমার দাবী—মিছরের দাবী স্বাধীনতা—নিরপেক্ষ স্বাধীনতা। মিছরবাসী এই দাবীর কি উত্তর পাইয়াছিলেন, সে কথা বিস্তারিত ভাবে লিখিবার কোন আবশ্যকতা বোধ হয় নাই। বৃটিশ মন্ত্রী-সমাজ কর্ত্তৃক ছা'দের এই দাবী অতি নির্ম্মম ও অপ্রত্যাশিত ভাবে প্রত্যাখ্যাত ও পদদলিত হইল। উত্তরে বৃটিশ মন্ত্রীগণ চিরপ্রসিদ্ধ যুক্তির অবতারণা করিলেন,—"মিছরে বহু জাতি ও বহু ধর্ম্মাবলম্বীর বাস। অল্প সংখ্যক জাতির স্বার্থ ছা'দ পাশা বা তাঁহার দলের হাতে নিরাপদ নহে।" বৃটিশ মন্ত্রী সমাজ শুধু ইহাতে সন্তুষ্ট হন নাই। ছা'দ পাশা যখন পাশ্চাত্য

(১) "হিজবুল-ওতনী" — حزب الوطني — স্বদেশীসেবক বা স্বদেশী সঙ্ঘ।—লেখক।

জাতি সমূহকে তাঁহার দাবীর ন্যায্যতা বুঝাইতে লাগিলেন, তখন ১৯১৮ সালের ১৮ই মার্চ্চ তারিখে ছা'দ জগ্‌লুলকে এবং তাঁহার সঙ্গে মাহ্‌মুদ ও ইলিয়াছ পাশা প্রভৃতিকে মাণ্টা দ্বীপে নির্ব্বাসনে প্রেরণ করা হইল। মিছরে সামরিক আইন প্রবর্ত্তিত হইল। ভেদনীতির প্রচার আরম্ভ হইল। মিল্‌নার কমিশন বিভিন্ন সম্প্রদায়ের "অভাব-অভিযোগের" অনুসন্ধানার্থ মিছরে আসিলেন। অন্যদিকে মিছরের আত্ম-বুদ্ধি সজাগ হইয়া উঠিল। মিছরবাসীর সমস্ত মতভেদ বিদুরিত হইল। মিছরবাসী একবাক্যে মিল্‌নার কমিশন বর্জ্জনের সিদ্ধান্ত করিলেন। কমিশন নগরপল্লী ভ্রমণ করিয়া 'জগ্‌লুল-বিরোধীর সন্ধান করিলেন। কিন্তু তাহাদের সমস্ত চেষ্টা বিফল হইল, ব্যর্থ মনোরথ হইয়া কমিশন লণ্ডনে প্রত্যা-বর্ত্তন করিলেন। মিল্‌নার কমিশন বর্জ্জনে মিছরবাসী যে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহা প্রত্যেক পরাধীন দেশের পক্ষে অবশ্য শিক্ষনীয়। মিছরের কবতী অকবতী, আরব অ-আরব, এহুদী খৃষ্টান, মোছলমান আরমেনিয়ান, পাশা ফল্লাহ্‌ এক কথায় সকল মিছরবাসী যেন তখন একমুখ ও একাঙ্গ হইয়া গিয়াছিল। সকলের মুখে এক কথা,—"মিছর স্বাধীন; বিদেশীর সহিত মিছরের কোন কথা নাই, যদি জিজ্ঞাসা করিতে চাও, মিছর-মণি ছা'দ পাশাকে জিজ্ঞাসা কর।"

একদা কোন গ্রামের একজন ফল্লাহ্‌কে (কৃষককে) লর্ড মিল্‌নার জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "তুমি কি বুনিতেছ?" কিন্তু কৃষক নিরুত্তর। লর্ড মিলনার পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা করাতে ফল্লাহ্‌ বিরক্তি স্বরে বলিল, "যাও, আমাদের নেতা ছা'দ পাশা জগ্‌লুলকে জিজ্ঞাসা কর।"

মিছরে আহ্‌মদ ছা'দ পাশার স্থানে যেখানে, আয়ার্লাণ্ডে ভেলেরার এবং চীনে সানইয়াৎসেনের স্থানও সেখানে। কিন্তু ছা'দ পাশা যেমন ভাবে স্বদেশবাসীর হৃদয় জয় করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, চীন ও আয়ার্ল্যাণ্ডের নেতার ভাগ্যে তাহা কখনও ঘটে নাই। ছা'দ ছিলেন দেশের একচ্ছত্র নায়ক আর অপর দুই মনীষী ছিলেন, স্ব স্ব দলের নেতা। এখানে বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, মিছরে যেরূপ বিভিন্ন জাতি, সম্প্রদায় বা ধর্ম্মাবলম্বীর বাস, তুলনায় অপর দুই দেশে সেরূপ বিভিন্নতা নাই। অনুসন্ধান করিলে আমরা দেখিতে পাই, এই অসাধারণ সাফল্যের মূল মহাপ্রাণ ছা'দ ও তাঁহার স্বধর্ম্মাবলম্বীর উদারতা। মিছরে শতকরা ৮·২ জন অমোছলমান। কিন্তু মিছরের কেবিনেট কখনও অমোছলমান-শূন্য হয় নাই। মিছর কেবিনেটে দুই বা ততোধিক অমোছলমান বরাবরই স্থান পাইয়া আসিয়াছে। সংখ্যাগরিষ্ঠ মোছলমানের এই উদারতার ফলে ইংলণ্ডের সমস্ত ভেদনীতি ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে।

**কেবিনেটে ছা'দ**

বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট যে সকল শর্ত্তে এবং যে-যে ব্যাপারে মিছ-রের স্বাধীনতা স্বীকার করিয়াছেন, তাহা বোধ হয় এখনও পাঠকের স্মৃতিতে জাগরুক আছে। সুতরাং সে সকল বিষয়ের আলোচনার দ্বারা প্রব-ন্ধের কলেবর বৃদ্ধি করিতে চাহি না। ১৯২২ সালে নির্ব্বাসন হইতে মুক্তি পাইয়া ছা'দ পাশা স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তনপূর্ব্বক তদানীন্তন রাজনৈতিক অবস্থা দর্শনে মিছরের শাসন-পরিষদ অধিকার করাই সমীচীন মনে করিলেন এবং তদনুসারে ১৯২৪ সালের নির্ব্বাচনে সদল বলে মিছরের শাসন-পরিষদ অধিকার করিয়া প্রধান মন্ত্রীর পদে অধিষ্ঠিত হইলেন। অতঃপর ১৯২৫ ও ১৯২৬ সালের নির্ব্বাচনে তিনি মিছর পার্লামেণ্টের প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচিত হন।

**শোক-প্রবাহ**

মিছর এখনও বিশ্বদরবারে তাহার ঈপ্সিত স্থান লাভে সমর্থ হয় নাই। তাহার যে-জয়যাত্রা ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে আরম্ভ হইয়াছে, তাহা এখনও শেষ হয় নাই। লক্ষ্যস্থলে পঁহুছিবার পূর্ব্বেই তাহার পথ-প্রদর্শকের তিরোধান! মিছর আজ মণিহারা ফণী। যে মহামণির ভাস্বর দীপ্তিতে তাহার দিগন্ত উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছিল, কালের তিমিরতলে আজ তাহা বিলীন হইয়া গিয়াছে।

গত ২৩শে আগষ্ট দিবা-অবসানের সঙ্গে সঙ্গে ছা'দের জীবন-লীলার অবসান ঘটিয়াছে। শোকের নিবিড় ছায়া মিছরের প্রকৃতিকে মলিন করিয়া তুলিয়াছে। নীলের কলতরঙ্গে শোকের করুণগীতি ভাসিয়া উঠিয়াছে। নীলের উদ্দাম প্রবাহে মিছর অনেক বার প্লাবিত হইয়াছে, কিন্তু সেদিনের শোকাশ্রু প্রবাহ মিছরের বক্ষে যেরূপ প্রবল ভাবে প্রবাহিত হইয়াছিল, পূর্ব্বে আর কখনও সেরূপ হয় নাই। প্রিয় ছা'দের মৃত্যুতে সকল মিছরবাসীর মর্ম্মে একই ভাবে মর্ম্মন্তুদ শেল বিদ্ধ হইয়াছিল। সেদিন জাতিধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে সমগ্র মিছরবাসী সমবেত করুণ কণ্ঠে যে শোকগাথা

গাহিয়াছিল, আজ আমরা তাহারই প্রতিধ্বনি করিয়া বলিতেছি,—

لا اله الا الله—البقاء لله—انالله و انا اليه
راجعون رحمای یا سعدا -

"আল্লাহ্ ভিন্ন উপাস্য নাই ; তিনিই একমাত্র অবিনশ্বর। আমরা নিশ্চয় আল্লাহ্ তাআলার নিকট হইতে আসিয়াছি, এবং আমরা নিশ্চয় তাঁহার নিকট প্রত্যাবর্তন করিব। হে ছা'দ! তোমার উপর আল্লাহ্ তাআলার অনন্ত আশীর্ব্বাদ বর্ষিত হউক!

দফনের বিশেষত্ব

"বয়তুল-উম্মৎ" চিরশূন্য করিয়া ছা'দ পাশা যখন "কিছুন" মছজেদের প্রাঙ্গণে এমাম শাফেঈর পার্শ্বদেশে চির বিশ্রামে যাইতেছিলেন, কাহেরায় এমন এক অভূতপূর্ব দৃশ্য পরিলক্ষিত হইয়াছিল, সে দৃশ্য জগত বোধ হয়, আর কখনও দেখে নাই। ভারতের ইতিহাসে কবিরের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া চিরপ্রসিদ্ধ। কিন্তু সে ছিল কবিরের দেহ লইয়া টানাটানি। কবিরের শবদেহের দাহ হইবে না দফন হইবে ইহাই ছিল সে টানাটানির সার। কিন্তু মিছরবাসী প্রিয়নেতার শবদেহ লইয়া টানাটানি করে নাই। দুই জন কবতী খৃষ্টান আর পাঁচ জন মোছলমান একত্র মিলিত হইয়া সযত্নে ছা'দের শবদেহ কবরে স্থাপন করেন।

আহ্মদ ছা'দ পাশা জগ্লুলের বিদায়বাণী উপহার দিয়া আমরা এই সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধের উপসংহার করিতেছি,—

ছা'দের বাণী

"আমার নিকট পরাধীন মিছরের সর্ব্বোচ্চ পদ-গৌরব-লাভ অপেক্ষা স্বাধীন মিছরের ক্ষুদ্রতম নাগরিক হওয়াও শতগুণে শ্রেয়ঃ। মিছরের কামনা স্বাধীনতা, নিরপেক্ষ নিরবচ্ছিন্ন স্বাধীনতা। স্বাধীনতা আল্লাহ তাআলার দান। যাহার স্বাধীনতা নাই, তাহার জীবন নাই। কেননা জীবন ও স্বাধীনতা নামে ভিন্ন হইলেও বস্তুতে এক। নিঃসন্তান ছা'দ মরিয়াও অমর হইবে। কেননা, আজ প্রত্যেক মিছরবাসী এক এক জন ছা'দ; বরং ছা'দ অপেক্ষাও বড়।"

---

# কাঁটাফুল

[ শাহাদাৎ হোসেন ]

( ১ )

অজয়ের কূলে বসিয়া দুইটী বালক বালিকা আপন মনে মালা গাঁথিতেছে। কাহারও মুখে কোন কথা নাই, কোন দিকে লক্ষ্যও নাই। উভয়েই একাগ্র মনে সূক্ষ্ম সূত্রে ফুলের পর ফুল গাঁথিয়া চলিয়াছে। বিশ্ব-সংসারে এক মালা-গাঁথা ভিন্ন তাহাদের করিবার মত বুঝি আর কিছুই নাই।

সূর্য্য অস্তে গেল, দূর বনানীর বুকে সন্ধ্যার তিমির কুন্তল এলাইয়া পড়িল, অজয়ের বুকে কালো ছায়া ঘনাইয়া আসিল ; কিন্তু সেদিকে কাহারও ভ্রূক্ষেপ নাই। মালা-গাঁথা পূর্ব্বের মতই চলিতে লাগিল।

অনেকক্ষণ কাটিয়া গেল। সহসা বালক উৎফুল্ল কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, এই আমার হ'য়ে গিয়েছে।

সে মালা ছড়াটী বালিকার সম্মুখে ধরিল। তাহার বুক খানা বুঝি জয়ের গর্ব্বে ফুলিয়া উঠিল, মুখখানা আনন্দ-দীপ্তিতে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

সঙ্গীর কথা শুনিয়া এবং তাহার সুন্দর মালা ছড়াটী দেখিয়া বালিকার মুখ খানি যেন চুপ হইয়া গেল। তাহার হাতের ফুল হাতেই রহিয়া গেল। মালা-গাঁথা আর হইল না। কয়েক মুহূর্ত্ত চুপ করিয়া থাকিয়া হঠাৎ সে হাতের অর্দ্ধ সমাপ্ত মালা ও আঁচলের ফুলগুলি ছিঁড়িয়া কুটী কুটী করিয়া চারিদিকে ছড়াইয়া ফেলিল। তাহার পর সঙ্গীর দিকে পশ্চাৎ করিয়া ঘুরিয়া বসিয়া রাগে, দুঃখে অভিমানে কাঁদিয়া ফেলিল।

বালিকার কান্না ও অভিমান দেখিয়া বালকের মুখের

আনন্দ-দীপ্তি ও অন্তরের জয়গর্ব্ব মুহূর্ত্তের মধ্যে যেন কোথায় উড়িয়া গেল। তাহার বুকের মধ্যে একটা বেদনা জাগিয়া উঠিল। এই বেদনার জাগরণ আজ নূতন নয়। যখনই এই ভাবে এই অভিমানী সাথিটীর দুঃখ-অভিমানের পালা শুরু হইয়াছে, তখনই কে জানে কেন তাহার মরমের তার ব্যাথার সুর বাজিয়া উঠিয়াছে। ইতিপূর্ব্বে এই নদীকূলে, এমনই সাঁঝের ছায়ায় এই মালা-গাঁথা লইয়াই বহুবার অভিমানে বালিকার চোখে অশ্রুর বাণ ডাকিয়াছে, বহুবার সে রাগের বশে তাহার সহিত কথা কহিবে না বলিয়া 'আড়ি' দিয়াছে এবং প্রত্যেক বারই বালকের অন্তর বেদনার সুরে কাঁদিয়া উঠিয়াছে। ফলে প্রতি বারেই সে বালিকার সকল দুঃখ অভিমানের জন্য নিজেকে সম্পূর্ণ রূপে দায়ী করিয়া তাহাকে সান্ত্বনা দিতে তৎপর হইয়াছে। বালিকার স্বভাব তাহার নিকট এতই বিচিত্র ও রহস্যময় ঠেকে যে, কোন্ কথায় সে কাঁদিবে বা কোন্ কথায় হাসিবে, তাহা সে আদৌ বুঝিয়া উঠিতে পারে না এবং সেই বুঝিতে-না-পারার জন্যই সে বালিকার মান-অভিমানের বা কান্নাকাটির কারণ হইয়া দাঁড়ায়। নইলে ইচ্ছা করিয়া সে কোন দিন তাহাকে রাগায় না বা কাঁদায় না।

আজিকার ঘটনাও বালকের বুঝিতে-না-পারার ফল। তাহার মালা আগে গাঁথা হইয়াছে দেখিলে বালিকা যে রাগে অভিমানে কাঁদিয়া ফেলিবে, ইহা সে পূর্ব্বে বুঝিতে পারে নাই। আর যদিও বা পারিত, কিন্তু জয়ের গর্ব্বে ও আনন্দের আতিশয্যে তাহার সে বুঝিবার শক্তি লোপ পাইয়াছিল।

যাহা হউক, বোধশক্তি ফিরিয়া আসার ফলে ব্যাথা-কাতর বালক করুণ সান্ত্বনা-বাক্যে বালিকাকে প্রবোধ দিতে লাগিল। বালিকা দুই চোখে দুই হাত ঘসিতে ঘসিতে ফুঁপাইয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিতেছিল। বালক সস্নেহে তাহার ডান হাতখানি ধরিয়া করুণ স্বরে বলিল, এই বারটী আমায় মাফ্ কর 'রাবি', আর কখনও আমি এমন করে' জিত্‌ব না। কক্ষোনো তোর আগে মালা গাঁথ্‌বনা।

বালিকা ঝাড়া মারিয়া হাত ছিনাইয়া লইল। বালক আবার বলিল, রাগ করিস্‌নি ভাই, কাল থেকে আমি তোর কাছে খুব হার্‌ব। যতবার বল্‌বি ততবার হার্‌ব।

বালিকার ফোঁপানি অনেকখানি কমিয়া আসিল। সে চোখ রগ্‌ড়াইতে রগ্‌ড়াইতে বলিল, তুমি ভাল ফুলগুলো বেছে নিলে কেন, নইলে বুঝি আমার দেরী হ'ত?

এই অদ্ভুত অনুযোগ শুনিয়া দুঃখের মধ্যেও বালক মনে মনে একটু হাসিল। এটা যে একটা বাজে অজুহাত ব্যতীত আর কিছুই নয়, কাঁচা বুদ্ধি হইলেও এই সোজা সত্য কথাটা বুঝিতে তাহার বড় বেশী বিলম্ব হইল না। কিন্তু বুঝিলে কি হইবে, প্রতিবাদ করিবার ত উপায় নাই! কি জানি যদি আবার ঘনঘটা করিয়া বৃষ্টি নামিতে শুরু করে! এমনিই ত থামানো দায় হইয়া উঠিয়াছে, তাহার উপর প্রতিবাদ করিতে গেলে কি আর রক্ষা থাকিবে? কাজেই সে অনুযোগের উত্তরে পূর্ব্ববৎ সান্ত্বনার সুরে বলিল, আচ্ছা, কাল থেকে যত ভাল ফুল কুড়ুবো, তার একটাও আমি নেবনা, সমস্তই তোকে দোব। তাহ'লে ত হবে?

মেঘ সরিয়া গিয়া বালিকার মুখের প্রসন্ন ভাব কতকটা ফিরিয়া আসিল। সে মুহূর্ত্তের মধ্যে বক্র দৃষ্টিতে একবার বালকের মুখের পানে চাহিয়া লইয়া বলিল, শুধু ভাল ফুল নয়,—সব ফুল আমায় দিতে হবে।

অভিমানিনী সঙ্গিনীর মুখে প্রসন্ন ভাব দেখিয়া বালকের মুখেও প্রসন্নতার রেখা ফুটিয়া উঠিল। সে সাদরে বালিকার হাত ধরিয়া স্নেহ-গদ্‌গদ স্বরে বলিল, তাই দোব ভাই, এখন চল্ বাড়ী যাই, আঁধার হ'য়ে এসেছে।

বাস্তবিকই তখন আঁধার ঘনাইয়া আসিয়াছিল। জমাট আঁধারে অজয়ের কালো বুক একখানি বিস্তৃত মসীপটের মত দেখা যাইতেছিল। সেই অন্ধকারে নির্জ্জন তীরপথ ধরিয়া বালক বালিকা বাড়ীর পথে ফিরিয়া চলিল।

( ২ )

ছয় বৎসর পরের কথা। বালক খলিল এখন আঠারো বছরের যুবক আর বালিকা রাবেয়া তেরো বছরের যৌবনোন্মুখী—কিশোরী। এখন আর তাহাদের সেদিন নাই। সেই খেলা-ধূলা, কোঁচায় কাপড় আর আঁচল ভরিয়া ফুল-কুড়ানো, নিত্য সন্ধ্যায় অজয়ের কূলে বসিয়া মালা-গাঁথা,—সে-সব কিছুই নাই। চঞ্চল কুরঙ্গ-শিশুর মত যাহারা উদ্দাম আনন্দে নাচিয়া বেড়াইত, আজ তাহারা কথাবার্ত্তায়, আচার-ব্যবহারে, আকৃতি-প্রকৃতিতে সকল দিক দিয়াই গম্ভীর হইয়া উঠিয়াছে। বাল্যের সে খলিল বা রাবেয়াকে এখন আর চিনিবার উপায় নাই।

এই পরিবর্ত্তন বয়সের ধর্ম্ম—প্রকৃতির ধর্ম্ম। এই ধর্ম্মের প্রভাবে মানুষ সাধারণতঃ সুখীই হইয়া থাকে। কিন্তু সুখের নিদানভূত এই পরিবর্ত্তন, খলিল ও রাবেয়ার জীবনে দুঃখের নিদানভূত হইয়া দেখা দিয়াছে। আজ বৎসরাধিক কাল হইতে তাহাদের পরস্পরের দেখা সাক্ষাৎ বন্ধ। যাহারা একদণ্ড কালও একে অপরকে ছাড়িয়া থাকিতে পারিত না, আজ তাহাদের পরস্পরের পরস্পরকে চোখের দেখা দেখিবারও অধিকার নাই। এ-দুঃখ যে কত বড় ক্লেশকর, এ ব্যথা যে কতখানি যন্ত্রণাদায়ক, তাহা বুঝি ভুক্তভোগী ভিন্ন আর কাহারও বলিবার সাধ্য নাই। এ বুঝি শক্তিশেলের চেয়েও মর্ম্মভেদী, বজ্রের অপেক্ষাও তীব্রদাহী।

কিন্তু ইহার জন্য একমাত্র দায়ী—খলিলের পিতা আজিজ সাহেব। তিনি অভিজাত বংশের সম্পন্ন ব্যক্তি। খলিল তাঁহার একমাত্র সন্তান। সুতরাং 'চাষা' ঘরের কন্যা রাবেয়ার সহিত তিনি পুত্রকে মেলামেশা করিতে দিতে পারেন না। কি জানি 'চাষা'র মেয়েটা যদি তাঁহার ছেলেকে পাইয়া বসে! তাহা হইলে যে সর্ব্বনাশ হইবে, তাঁহার আভিজাত্যের মাথায় বজ্রাঘাত হইবে! কাজেই পূর্ব্ব হইতে তিনি সাবধানতা অবলম্বন করিয়াছেন। পুত্রের উপর তিনি কড়া হুকুম জারি করিয়াছেন, যদি আর কখনও সে ঐ 'চাষার মেয়েটা'র সঙ্গে মেশে বা তাহার মুখদর্শন করে, তাহা হইলে তাহাকে কঠিন শাস্তি ভোগ করিতে হইবে।

খলিল নিরুপায় হইয়া পিতার এই কঠোর আদেশ অক্ষরে-অক্ষরে প্রতিপালন করিয়া চলিতেছিল। সে বালক মাত্র, প্রতিবাদ করিবার মত বয়স বা সাহস তাহার হয় নাই। কাজেই নির্ব্বিকার ভাবে পিতার শাসন মানিয়া চলা ভিন্ন তাহার গত্যন্তর ছিল না।

রাবেয়া কিন্তু ব্যাপারটাকে ঠিক উল্টা বুঝিয়াছিল। তাহার ধারণা হইয়াছিল, খলিল ইচ্ছা করিয়াই তাহার সহিত দেখা-সাক্ষাৎ করে না। সমবয়স্কা সঙ্গিনীরাও এই ধরণের কথা বলিয়া তাহার মনের শিথিল ধারণাকে বদ্ধমূল করিয়া দিয়াছিল। দুই বৎসর পূর্ব্বে হইলে হয়ত রাবেয়া মনে-মনে এরূপ ধারণা করিতে বা সমবয়সীদের কথায় আস্থা স্থাপন করিতে পারিত না। কারণ, তখন খলিল ও তাহার মধ্যে যে একটা সামাজিক ব্যবধান আছে, তাহা বুঝিবার মত বোধশক্তি তাহার ছিল না। কিন্তু এখন আর সেদিন নাই। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সৈয়দ-জাদা ও 'চাষার মেয়ের' মধ্যে যে কতখানি ব্যবধান আছে, তাহা সে ভালরূপেই বুঝিতে পারিয়াছে এবং পারিয়াছে বলিয়াই খলিলের সম্বন্ধে এইরূপ ধারণা তাহার মনের মধ্যে বদ্ধমূল হইতে পারিয়াছে। তবে মধ্যে-মধ্যে তাহার মনটা যে সন্দেহ-দোলায় দুলিয়া ওঠে না, একথা নিঃসংশয়ে বলা চলে না।

রাবেয়া 'চাষা'র মেয়ে। অবশ্য এই 'চাষা' নামটা তথাকথিত 'অতি-অভিজাত' আশরাফ শ্রেণীর দেওয়া। নইলে রাবেয়ার পিতা নিজের হাতে হাল-চাষও করিতেন না, কিম্বা তিনি সাধারণ কৃষকদের ন্যায় অশিক্ষিত বা কাণ্ডজ্ঞানবিবর্জ্জিতও ছিলেন না। তবে তাঁহার পূর্ব্ব-পুরুষদের মধ্যে কেহ কেহ স্বহস্তে হাল-চাষ করিতেন এরূপ শুনা যায় এবং এই শোনা-কথার উপর নির্ভর করিয়াই রূপ-গাঁয়ের আশ্‌রাফ সাহেবান তাঁহাকে নিজেদের দল হইতে 'খারিজ' করিয়া রাখিয়াছিলেন।

যাহা হউক, 'চাষা' হইলেও রাবেয়ার পিতা শিক্ষিত সুরুচিসম্পন্ন ও আধুনিক ধরণের লোক ছিলেন। তাই আদরে-আদরে একমাত্র কন্যার পরকাল না খাইয়া তাহাকে যথোচিত ভাবে গড়িয়া তুলিবার জন্য তিনি উপযুক্ত শিক্ষা-দীক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। তিনি তাহাকে গ্রামের উচ্চ প্রাথমিক বালিকা-বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি করিয়া দিয়াছিলেন। ইহা ছাড়া নিজেও শিক্ষকের স্থান গ্রহণ করিয়া দুই বেলা নিয়মিত ভাবে তাহার পিছনে পরিশ্রম করিতেন। এ-জন্য প্রথম-প্রথম তাঁহাকে অভিজাতবংশীয়গণের কত টিট্‌কারী যে সহ্য করিতে হইয়াছিল, তার ইয়ত্তা নাই। কিন্তু সে-সমস্ত আদৌ গ্রাহ্য না করিয়া তিনি অনন্যমনে নিজের কর্ত্তব্য করিয়া গিয়াছিলেন।

প্রায় দুই বৎসর হইল রাবেয়া স্কুলের শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর প্রথম-প্রথম সে ঘরে বসিয়া নূতন উদ্যমে পড়াশুনা করিতে আরম্ভ করে। কিন্তু অদৃষ্টের বিড়ম্বনায় তাহার সে-উদ্যম এখন মর্ম্মন্তুদ ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হইয়াছে। তাহার এই ঘরে-বসিয়া পড়াশুনা করিবার প্রথম ও প্রধান উদ্যোগী ছিল খলিল। এখন সে-খলিল থাকিয়াও নাই। তাহার সাহচর্য্যে বঞ্চিত হওয়ার

সঙ্গে সঙ্গে রাবেয়ার অন্তরের উদ্যম ও উৎসাহ যেন কাহার যাদুমন্ত্রে কোথায় উড়িয়া গিয়াছে। কাজেই পড়াশুনাও একপ্রকার বন্ধ হইয়া গিয়াছে।

রাবেয়ার পিতা যে কন্যার এ ভাবান্তর লক্ষ্য করেন নাই, তাহা নহে। তিনি সমস্তই লক্ষ্য করিয়াছিলেন এবং তাহার ফলে একটু চিন্তিতও হইয়াছিলেন। কিন্তু এটাকে ততটা গুরুতর কিছু বলিয়া তাঁহার মনে হয় নাই। সাময়িক মনোবিকার বলিয়াই তিনি এটাকে ধরিয়া লইয়াছিলেন। শৈশব হইতে দুইজনে এক সঙ্গে খেলা-ধুলার ভিতর দিয়া এত বড়টী হইয়াছে, এখন হঠাৎ ছাড়াছাড়ি হইয়াছে; সুতরাং এরূপ মনোবিকার ঘটা নিতান্তই স্বাভাবিক। তিনি মনকে এই ভাবেই প্রবোধ দিয়া রাখিয়াছিলেন, বিশেষ ভাবে ইহার গুরুত্ব উপলব্ধি করেন নাই।

প্রথম যখন খলিল তাঁহাদের বাড়ীতে যাতায়াত বন্ধ করে, তখন তিনি বেশ-একটু বিস্মিত হইলেও এক পক্ষে সেটাকে মঙ্গলকর বলিয়া ধরিয়া লইয়াছিলেন। কারণ, রাবেয়া ও খলিলের পরস্পরের মেলামেশাটাকে তিনি বিশেষ প্রীতির চক্ষে দেখিতেন না। যেহেতু আজিজ সাহেব তাঁহার প্রতি পূর্ব্বাপর যেরূপ ব্যবহার বা মনে মনে যেরূপ ঘৃণা পোষণ করিয়া আসিতেছিলেন, তাহাতে তাঁহার পক্ষে খলিলের সহিত রাবেয়ার মেলামেশাটাকে প্রীতির চক্ষে দেখিবার উপায় ছিল না। তবে কোনদিন যে তিনি তাহাতে আপত্তি করেন নাই, তাহার একমাত্র কারণ তাঁহার অন্তরের কৃতজ্ঞতা ও স্নেহের দুর্ব্বলতা। চারি বৎসর বয়সে মাতৃহীন হইয়া রাবেয়া যখন নিতান্ত 'মন-মরা' হইয়া পড়িয়াছিল, পিতা হইয়াও শত চেষ্টায় তিনি তাহার মলিন মুখে হাসি ফুটাইতে পারেন নাই; তখন—সেই দুর্দ্দিনে, ভাগ্য-বিপর্য্যয়ের দুর্য্যোগ-লগ্নে একমাত্র খলিলই হাসিমাখা মুখখানি লইয়া খেলার সাথীরূপে তাহার পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। তখন সে আট বৎসরের বালক মাত্র। সেই হইতে একান্ত অন্তরঙ্গতার ভিতর দিয়া তাহাদের জীবনের দীর্ঘ আট বৎসর কাল কাটিয়া গিয়াছে। অনাবিল আনন্দের অফুরন্ত উৎসবের মধ্য দিয়া কৈশোরের স্বপ্ন-তরী যৌবনের রঙিন তটে আসিয়া লাগিয়াছে; কিন্তু দিনেকের তরেও তিনি মুখ হইতে একটা আপত্তির কথা বাহির করিতে পারেন নাই, এমন কি আভাস-ইঙ্গিতে বা আচার ব্যবহারেও কোনদিন অন্তরের অপ্রীতির কথা জানাইতে পারেন নাই। খলিল যে দুঃসময়ে তাঁহার উপকার করিয়াছে, একথা তিনি ভুলিতে পারেন নাই এবং এই না-ভোলার কারণেই কৃতজ্ঞতার দুর্ব্বলতায় খলিলের অন্তরে যাহাতে আঘাত লাগে, সেরূপ কোন কথাই তিনি মুখে উচ্চারণ করিতে পারিতেন না। ইহা ছাড়া কন্যার প্রতি স্নেহজনিত দুর্ব্বলতা ত আছেই।

তবে কন্যার ভবিষ্যৎ-সম্বন্ধে তিনি দৃষ্টিহীন ছিলেন না। তাই ভবিষ্যতে আর বেশীদিন যাহাতে তাহাদের পরস্পরের দেখা সাক্ষাৎ না হয়, তিনি ভিতরে-ভিতরে তাহার চেষ্টা করিতেছিলেন। ইতিমধ্যে অকস্মাৎ খলিলের আসা-যাওয়া বন্ধ হইয়া গেল। হঠাৎ ব্যাপারটা বুঝিতে না পারিয়া তিনি বিস্মিত হইলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে একটা সোয়াস্তির নিশ্বাসও ফেলিলেন।

* * * *

বর্ষার সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিয়াছে। সমস্ত দিন বর্ষণের পরেও আকাশের বুকে গুমোট মেঘ জমাট বাঁধিয়া আছে। রূপ-গাঁয়ের একখানি ক্ষুদ্র দ্বিতল বাড়ীর একটী কক্ষে খোলা জানালার ধারে বসিয়া খলিল একাকী নির্নিমেষ দৃষ্টিতে আকাশের বুকে বৃষ্টিধারার নৈশ নাটের সেই পরিপূর্ণ আয়োজন দেখিতেছিল। রাত্রি-প্রভাতেই তাহাকে সুদূর প্রবাস-পথের পথিক হইতে হইবে। রূপ-গাঁয়ের আজিকার এই সন্ধ্যা তাহার বিদায়-সন্ধ্যা। কে জানে কতকাল পরে আবার মাতৃপল্লীর এই সজল সন্ধ্যা তাহার তৃষিত চক্ষুর সম্মুখে ফুটিয়া উঠিবে!

খলিল গ্রামের স্কুল হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছে। উচ্চ শিক্ষা লাভের জন্য এখন হইতে তাহাকে স্থায়ীভাবে কলিকাতায় গিয়া বাস করিতে হইবে। বন্দোবস্ত সব ঠিক হইয়া গিয়াছে। প্রভাতেই তাহাকে কলিকাতায় রওয়ানা হইতে হইবে। আজিকার রাত্রিটুকু মাত্র অবসর।

বিদায়-সন্ধ্যায় আজ কত কথাই না খলিলের মনে হইতে লাগিল। শৈশব-কৈশোরের সেই খেলাধুলা,—সেই বটের দোলা, তাল পুকুরের ঘাট, খেলার মাঠ, চৌধুরি-বাগান,—সমস্তই একটীর পর একটী করিয়া তাহার অন্তরের নিভৃত কোণে জাগিয়া উঠিতে লাগিল। অবশেষে তাহার স্মৃতির সমুদ্র মথিত করিয়া ভাসিয়া উঠিল—রাবেয়ার সেই অভিমান-ছল-ছল সুন্দর মুখখানি আর সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়িয়া গেল—

সেই অজয়ের কূল, সেই মাল্য-রচনার প্রতিযোগিতা, সেই মান-অভিমানের হাসি-কান্না। বেদনার কারুণ্যে তাহার সমগ্র হৃদয় কাণায় কাণায় পূর্ণ হইয়া উঠিল। তাহার দুই চক্ষু জলভারে টলটল করিতে লাগিল।

আজ বৎসারিক কাল রাবেয়ার সহিত খলিলের দেখা-সাক্ষাৎ নাই। তবু তাহার মনে এই শান্তি বা আশাটুকু ছিল যে, চোখের আড়াল হইলেও রাবেয়া তাহার নিকট হইতে দূরে সরিয়া যায় নাই—তাহাদের পরস্পরের মধ্যে এত টুকু দূরত্বের ব্যবধান নাই। প্রয়োজন হইলে আর কিছু না হউক, দিনান্তে একবার কুশল সংবাদটাও পাওয়া যাইবে। কিন্তু আজ সে-আশারও সমাধি হইতে চলিল। রাবেয়ার সান্নিধ্য হইতে কাল তাহাকে দূরে—বহুদূরে সরিয়া যাইতে হইবে, কত নদ নদী প্রান্তর তাহাদের উভয়ের মধ্যে ব্যবধান রচনা করিবে। কুশল সংবাদ ত দূরের কথা, শত চেষ্টায়ও সে আর রাবেয়ার মরণ-বাঁচনের সংবাদটী পর্য্যন্ত পাইতে পারিবে না।

মৌন সন্ধ্যায় ব্যথা-ভরা হৃদয় লইয়া খলিল আপন মনে এই সমস্ত কথা তোলাপড়া করিতে লাগিল। এক একবার তাহার মনে হইতে লাগিল, কোনও প্রকারে গোপনে এক বার সাক্ষাৎ করিয়া তাহার নিকট হইতে বিদায় লইয়া আসিবে, কিন্তু সাহসে কুলাইলনা। দীর্ঘ এক বৎসর কাল সে রাবেয়ার সহিত সাক্ষাৎ করে নাই, আজ হঠাৎ কেমন করিয়া তাহার সম্মুখে গিয়া বিদায়-বার্ত্তা জ্ঞাপন করিবে? লজ্জা বা সঙ্কোচের মধ্যে পড়িয়া তাহার কেমন-যেন বাধ-বাধ ঠেকিতে লাগিল। তাই শেষ পর্য্যন্ত সে ভরসা করিয়া উঠিতে পারিল না।

দেখিতে দেখিতে সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া আসিল। ঘনীভূত কালো ছায়া পল্লী-প্রকৃতির শ্যামল মুখখানি সম্পূর্ণ-রূপে ছাইয়া ফেলিল। একটা মর্ম্মভেদী দীর্ঘশ্বাস ছাড়িয়া খলিল জানালা বন্ধ করিয়া দিয়া ধীরে ধীরে নীচে নামিয়া গেল।

পরদিন প্রভাতেই খলিল কলিকাতায় রওয়ানা হইয়া পড়িল। সে কল্পনায়ও ভাবিতে পারিল না যে, অদূর বাতায়ন হইতে দুইটী সজল করুণ আঁখি নির্নিমেষ দৃষ্টিতে তাহার পথের পানে চাহিয়া আছে।

( ক্রমশঃ )

---

# বাদশাহ্ আমানুল্লা ও বর্ত্তমান আফগানিস্তান

[ সৈয়দ মোহাম্মদ নজীর আবু ওবায়দুল্লা চৌধুরী ]

মহামান্য আমীর হবিবুল্লা খাঁ যখন আততায়ীর গুলিতে ইহলীলা সম্বরণ করেন, তখন সমগ্র আফগানিস্তানে অশান্তি ও অরাজকতা প্রবল হইয়া উঠে। সেই অশান্তি ও অরাজকতার মধ্যে তাঁহার সহোদর কাবুলের সিংহাসনে অধিরোহণ করেন, কিন্তু সে-অধিকারকে অধিক দিন তিনি অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারেন নাই। অনতিকাল পরেই পরলোকগত আমীরের তৃতীয় পুত্র, বর্ত্তমানের সর্ব্বজনমান্য বাদশাহ্ আমানুল্লা খাঁ জনসাধারণের প্রতিনিধিরূপে তাঁহার স্থান অধিকার করিয়া বসেন। আফগানিস্তানের রাজনৈতিক আকাশ তৎকালে ঘনঘটাচ্ছন্ন হইয়া উঠিয়াছিল, মারাত্মক আত্মকলহের ফলে দ্রুতগতিতে সে ধ্বংসের মুখে অগ্রসর হইতেছিল; সেই সময় একান্ত আকস্মিক ভাবে আমানুল্লা খাঁ বিজয়ীর বেশে আফগানিস্তানের মসনদের উপর নিজের অধিকার ঘোষণা করেন। তাঁহার সেই ঘোষণাবাণীর সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র আফগানিস্তানে অন্তর্বিপ্লবের ঝটিকা প্রশমিত হইয়া যায়, তাহার পূর্ব্বের শান্তি আবার ফিরিয়া আসে।

বাদশাহ্ আমানুল্লা খাঁর এই অভিনব জয় ও শান্তি-প্রতিষ্ঠার সম্পর্কে তৎকালে বিভিন্ন রাজনীতিকগণ নানাভাবে নিজেদের অভিমত প্রকাশ করিয়াছিলেন। সে-সকলের মধ্যে রণপ্রিয় সাম্রাজ্যবাদীগণের অভিমতই জনসাধারণ বিশেষ ভাবে গ্রহণ করিয়াছিল। তাঁহারা বলিয়াছিলেন, ১৯১৯ খৃষ্টাব্দের ইঙ্গ-আফগান যুদ্ধই আমানুল্লা খাঁর এই

অপ্রত্যাশিত বিজয়ের মূলীভূত হেতু। কিন্তু আদ্যোপান্ত সমস্ত ঘটনা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচার করিয়া দেখিলে উপরোক্ত অভিমতের মূলে কোন সত্য নিহিত আছে বলিয়া আদৌ মনে হয় না। বাদশাহ্ আমানুল্লার এই অভিনব জয়ের একমাত্র হেতু ছিল—তাঁহার প্রতি আফগান-জনসাধারণের বিশ্বাস, শ্রদ্ধা ও সহানুভূতি এবং এই বিশ্বাস, শ্রদ্ধা ও সহানুভূতি তিনি পিতার জীবন-কালেই অর্জ্জন করিয়াছিলেন। যৌবনের প্রারম্ভ কাল হইতেই আমানুল্লা খাঁ গণস্বার্থের দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়াছিলেন, তাহার ফলে জন-সাধারণ কি চায় বা তাহাদের অভাব অভিযোগ কোথায়, তাহা সম্যকরূপে হৃদয়ঙ্গম করিবার মত শক্তি তাঁহার মধ্যে জন্মিয়াছিল এবং সেই জন্য অতি সহজেই তিনি তাহাদের হৃদয় জয় করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

বাদশাহ্ আমানুল্লাহ সিংহাসনে আরোহণ করিয়া সর্ব্বপ্রথম প্রজাসাধারণের স্বার্থের দিকে দৃষ্টিক্ষেপ করেন। অভিজাতবর্গের অতি-আভিজাত্যের চক্রান্ত-ফলে আফগানিস্তানের জনগণ যে অন্তরে-অন্তরে বিশেষরূপে ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিয়াছে, সিংহাসনে আরোহণ করিয়াই একথা তিনি সুস্পষ্টরূপে বুঝিতে পারিয়াছিলেন; সেই নিমিত্ত রাজদণ্ড হাতে লইয়াই তিনি দৃঢ় কণ্ঠে ঘোষণা করিয়া দেন যে, তিনি জনসাধারণের প্রতিনিধি ব্যতীত আর কেহই নহেন। তাঁহার এই ঘোষণাবাণী প্রচারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আফগানিস্তানের অভিজাত সম্প্রদায় তাঁহার প্রতি বিশেষ ভাবে বিদ্বিষ্ট হইয়া উঠেন। কিন্তু সে-বিদ্বেষের আগুণে তাঁহারা নিজেরাই অন্তরে অন্তরে পুড়িয়া ক্ষার হইয়াছিলেন, নবীন বাদশাহের কোনই ক্ষতি সাধন করিতে পারেন নাই।

বর্ত্তমানে আফগানিস্তানের মধ্যে বাদশাহ্‌র প্রতিকুলাচরণ করিবার মত আর কোন বিশেষ দল বা সম্প্রদায় আছে বলিয়া জানা যায় না। যতদুর জানিতে পারা যায়, তাহাতে মনে হয়—প্রজাসাধারণ পরিপূর্ণ স্বাচ্ছন্দ্যের মধ্য দিয়া নিরুদ্বেগে জীবন যাপন করিতেছে। মহামান্য বাদশাহ্ এই নিরুদ্বেগ শান্তির অবসরে দেশ ও জাতি-গঠনের মহৎ কার্য্যে সম্পূর্ণরূপে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। কিছুদিন হইল তিনি রাজ্যমধ্যে ঘোষণা করিয়া দিয়াছেন যে, "আমার দেশের পূর্ব্বাঞ্চলের পার্ব্বত্য জাতিসমূহের নৈতিক এবং আর্থিক সর্ব্বপ্রকার উন্নতির আলোচনা করিবার জন্য প্রতি বৎসর একটি সাধারণ সভার অধিবেশন হইবে।" এই ঘোষণার ফলে তিনি সাধারণ-তন্ত্র-রাজ্য-প্রতিষ্ঠার পক্ষপাতী বলিয়া প্রজাসাধারণের অধিকতর প্রীতি ও শ্রদ্ধাভাজন হইয়া উঠিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত শিক্ষার উন্নতি ও ব্যাপকতার জন্যও তিনি বর্ত্তমানে গভীর ভাবে চিন্তা করিতেছেন।

বাদশাহ্ আমানুল্লার এই সমস্ত চিন্তা ও ঘোষণার ফলে প্রাচীন রীতি নীতি (বিশেষ করিয়া রাজ্য শাসন সম্পর্কীয়) আফগানিস্তান হইতে এক প্রকার দূরীভূত হইয়া গিয়াছে বলিলেই হয়। শিক্ষাদান সম্পর্কেও তিনি যে নীতির প্রবর্ত্তন করিয়াছেন, তাহাতেও পুরাতনের পরিবর্ত্তে আধুনিকতার সুস্পষ্ট প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহের সংস্কার ও শ্রীবৃদ্ধির দিকেও তাঁহার বিশেষ দৃষ্টি পড়িয়াছে। তাহার ফলে হাবিবিয়া কলেজের শিক্ষাকেন্দ্র অধিকতর সম্প্রসারিত হইয়াছে। এই শিক্ষা-কেন্দ্রে আধুনিক প্রথানুসারে কলাবিদ্যা শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা হইয়াছে। হারবিয়ার সামরিক কলেজেরও যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হইয়াছে। সেখানে আফগান জাতির প্রাণস্বরূপ তরুণ সম্প্রদায় দলে দলে যাইয়া যোগদান করিতেছেন।

আফগানিস্তানের জনসাধারণ একটা রাষ্ট্রীয় অর্থ-নৈতিক বিদ্যালয়ের জন্য এতদিন বিশেষ অভাব অনুভব করিয়া আসিতেছিল, বাদশাহ্ আমানুল্লার অনুগ্রহে তাহাদের সে অভাবও পূর্ণ হইয়াছে। উপরন্তু আফগান বালক সম্প্রদায় উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য বিদেশে যাইয়া যাহাতে ইউরোপীয় ভাষায় শিক্ষা গ্রহণ করিতে পারে, সে-উদ্দেশ্যে তাহাদের জন্য ফরাসী ও জার্ম্মাণ ভাষা শিক্ষার ব্যবস্থা হইয়াছে। বহু সংখ্যক উচ্চ শিক্ষার্থী আফগান যুবক ইতিমধ্যেই বার্লিন, প্যারি, রোম এবং মস্কোতে গিয়া উচ্চশিক্ষা লাভ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। তাহাদের মধ্যে অনেকে আবার উচ্চ শিক্ষার ডিগ্রিপ্রাপ্ত হইয়া দেশে প্রত্যাগমনও করিয়াছে এবং তাহাদের স্থান পূরণ করিবার জন্য অপর ছাত্রদলকে উপরোক্ত দেশসমূহে প্রেরণ করা হইয়াছে। ইংলণ্ডেও এই ভাবে শিক্ষার্থীগণকে প্রেরণ করা হইতেছে। আফগান-রাজ প্রত্যেক সাধারণ সভাতেই এই সমস্ত উচ্চশিক্ষার্থী ছাত্রগণের ব্যয়-ভার বহনের জন্য বিশেষ ভাবে সাহায্য প্রার্থনা করিয়া থাকেন। তাঁহার এই কার্য্য বা ব্যবস্থা যে সর্ব্ব সম্প্রদায়ের লোক মনে-প্রাণে সমর্থন করে, তাহা নহে।

অনেকে ইহার বিরুদ্ধ মতও পোষণ করিয়া থাকে। বিশেষ করিয়া পুরাতন পন্থীদলের পক্ষ হইতে এই ব্যবস্থার জন্য প্রায়ই কৈফিয়ৎ তলব করা হইয়া থাকে। কেহ কেহ এমন অভিমতও প্রকাশ করিয়া থাকেন যে, এই ব্যবস্থা বা কার্য্যকারিতার ফলে সমগ্র দেশে একটা ভীষণ গণ্ডগোলের সৃষ্টি হইবে। কারণ প্রতীচ্যের শূন্যগর্ভ চাকচিক্যের মোহ অতীব প্রবল। এমতাবস্থায় আফগানিস্তানের শিক্ষার্থী যুবকগণের পক্ষে ইউরোপের গুণাবলীর অনুকরণ অপেক্ষা তাহার বাহ্য চাকচিক্যের অনুকরণ করার সম্ভাবনাই অধিক। ফলে, যখন তাহারা দেশে ফিরিবে, তখন হয়তো বিদেশী মনোভাবের বশবর্ত্তী হইয়া চিরন্তন রীতি নীতির বিরুদ্ধে একটা বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়া বসিবে। কিন্তু এই মতবাদের সমর্থনকারীরা সংখ্যায় অধিক নহে বলিয়াই তাহারা কার্য্যতঃ কিছু করিয়া উঠিতে পারিতেছে না।

কিন্তু বিরুদ্ধমতাবলম্বী লোক আছে বলিয়া কেহ যেন একথা মনে না করেন যে, তাহারা সর্ব্ব বিষয়েই মনে-প্রাণে আফগান-রাজের বিরুদ্ধাচারী। নবীন রাজার প্রজা-পালন বা রাজ্য-শাসন-ক্ষমতার উপর তাহাদের সম্পূর্ণ আস্থা আছে। তবে এই যে মতভেদ, ইহা নিতান্তই স্বাভাবিক। কোন দেশের কোন প্রজারঞ্জক নৃপতিই এ পর্য্যন্ত এই ধরণের মতভেদের হাত এড়াইয়া চলিতে পারিয়াছেন বলিয়া আমরা শুনি নাই।

যাহা হউক, উপসংহারে আমরা এই বলিতে চাই যে, যে-কোন দেশের যে-কোন ব্যবস্থা বা নীতিই সর্ব্বতোভাবে অর্থ-নীতির মুখাপেক্ষী হইয়া থাকে। সুতরাং বর্ত্তমানের এই দ্রুত উন্নতিশীল আফগানিস্তান যদি বিশ্বের বুকে নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে চায়, তবে সর্ব্বাগ্রে তাহাকে অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য সর্ব্বপ্রকারে যত্নবান হইতে হইবে। সুখের বিষয় নবীন আফগান-অধিপতি এ সম্পর্কে সম্পূর্ণ সজাগ আছেন। ইতিমধ্যেই অর্থনীতির দিক দিয়া তিনি আফগানিস্তানকে অনেক উন্নত করিয়া তুলিয়াছেন। সেই জন্য মনে হয়, যুগসন্ধিক্ষণে নবীন আফগানিস্তানের এই প্রাণের চেষ্টা ব্যর্থ হইবে না। ঐকান্তিক সাধনার বলে অদূর ভবিষ্যতে নিজেকে পৃথিবীর অন্যান্য শ্রেষ্ঠ রাষ্ট্র-সমূহের পর্য্যায়ভুক্ত করিয়া সে বিশ্বের বুকে এক নূতন আদর্শ গড়িয়া তুলিতে পারিবে।

---

# "হজ্জে-আকবর"

[ মুহম্মদ হবীবুল্লাহ্ ( বাহার ) ]

দিলাওয়ার সাহেবকে ঠিক বড়লোক বলা চলে না। বড়লোক না হইলেও তাঁহার অবস্থা নেহাত অস্বচ্ছল ছিল না। জায়গাজমি ছিল তাঁর বিস্তর—আম-কাটাল,—গুপারী-নারিকেলের বাগান, পুকুর-পুষ্করিণী, চা বাগানের সেয়ার, মুদির দোকানের অংশ প্রভৃতি হইতেও আমদানী ছিল তাঁর প্রচুর। কৃপণ বলিলে অন্যায় হইবে—দিলাওয়ার সাহেব ছিলেন হিসেবী লোক—তাঁর জমা খরচের গোলমাল হইত না—কখনো, কিন্তু তা' বলিয়া সৎকাজে পয়সা খরচ করিতে কার্পণ্যও করেন নাই তিনি কোন দিন। পাড়ার কয়েকটি ছেলে তাঁর বাড়ীতে জায়গীর থাকিয়া লেখা পড়া করিত। কাহারো অসুখ বিসুখ হইলে ছুটিত দিলাওয়ার মিয়ার কাছে—একটু হোমিওপ্যাথিক ওষুধ, একটু বার্লি-সাগু মধু-মিশ্রির জন্য। পাড়ার লোকের অভাবের সময় সাহায্য করিতেন দিলুমিয়া, দুঃখের দিনে অশ্রু মুছাইতেন তিনি—আপদে মুসিবতে সকলের অবলম্বন ছিলেন আমাদের দিলাওয়ার হোসেন।

পাড়াগাঁয়ের লোক খাঁটি-পাকা মুসলমান বলিতে যাহাকে বুঝায়, দিলাওয়ার সাহেব অনেকটা তাহাই ছিলেন। নামাজ কাজা করিয়াছেন এমন অপবাদ তাঁহার অতি বড় শত্রুও কোনদিন দিতে পারে নাই। সোব্‌হে সাদেকের সময় মোরগের ডাকের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার ঘুম ভাঙিয়া যাইত। বছরের ৩৬৫ দিন নিয়মিতভাবেই তিনি মসজিদের মুয়াজ্জি-

নকে ঘুম হইতে জাগাইয়া দিয়াছেন! অনেক সময় দেখা গিয়াছে বাদলার দিনে চাঁদের গোলমালে অতিবড় পরহেজগার লোকেরও ত্রিশ রোজার মধ্যে এক আধটি নষ্ট হইয়াছে, কিন্তু বাদলাই হোক আর বর্ষাই হোক দিলাওয়ার সাহেবের রোজা ২৯টাত কোন দিন হয়ই নাই বরং কখনো কখনো দুই একটি বেশীই হইত। কেবল রমজানের মাসে নয় বছরের অন্য সময়ও তিনি দিনের পর দিন নফল রোজা করিয়া কাটাইয়াছেন।

জাকাতের গোলমালও তাঁর কোন দিন হয় নাই। কড়া ক্রান্তি হিসাব করিয়াই তিনি জাকাতের টাকা আদায় করিতেন।

নামাজ রোজা জাকাত হজ মুসলমানের এই চার প্রধান কর্ত্তব্যের মধ্যে প্রথম তিনটি তিনি আজীবন সম্পূর্ণ ভাবেই সম্পন্ন করিয়া আসিয়াছেন। কেবল বাকী ছিল চতুর্থটি। এজন্য তাঁহার অশান্তির অন্ত ছিল না। জীবনের ঘড়িতে বারোটা বাজিয়া গিয়াছে······কখন ওপারের ডাক আসিবে—কখন আজরাইলের দরবারে ঘণ্টা বাজিয়া উঠিবে কে বলিতে পারে? দিনের বিশ্রাম ও রাতের বিশ্রাম তাঁর ব্যারাম হইয়া উঠিতেছিল দিন দিন এই হজ্জের কারণে।

বড়লোকের বাড়ীতে কাহারো সঙ্গে মোলাকাত করিতে হইলে যেমন সকলের আগে দারোয়ান বাবাজীকে খুশী করিতে হয় তেমনি—বাঙ্গালী মুসলমানের ধারণা—বেহেস্তের দরবারে প্রবেশ করিতে হইলে ধর্ম্মের সোল্ এজেণ্ট পাগড়ী-ধারী জুব্বাপরা পীর সাহেবানের শরণাপন্ন হওয়া ছাড়া উপায়ান্তর নাই। বেহেস্তের খাস কামরার চাবি খোদার খাসবান্দা এই মহামানুষদেরই হাতে। ইহাদের খুশী করিতে না পারিলে—যতই না কেন তুমি নমাজ পড়িতে পড়িতে পায়ে 'কড়' পড়াও—যতই না কেন রোজার আতিশয্যে তোমার দেহঘর শীর্ণ-ক্লিষ্ট হোক—বেহেস্তের সদর দরজা পার হইতে পারিবে না কোন দিন...দেউড়ির বাহিরে ঘুরিয়াই মরিতে হইবে অনন্ত কাল। মুরিদ হওয়ার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে আমাদের দিলাওয়ার সাহেবের চৈতন্যও বেশ সজাগ ছিল, উপযুক্ত বয়সে জৌনপুরী মৌলানার হাতে মুরিদ হইয়া তিনি পরকালে হুরপরী উপভোগের পথ প্রশস্ত করিয়া লইয়াছিলেন।

পীর সাহেব—দিলাওয়ার মিয়ার জন্মভূমি হয়বত নগরে তশ্‌রীফ আনিয়াছিলেন—সে আজ দশ বছরের কথা। এই সুদীর্ঘ সময় পরেও সেই পুণ্যদিনের স্মৃতি গ্রামবাসীর মনে উজ্জ্বল ভাবে অঙ্কিত ছিল, আরবী কায়দায় পাগড়ী-বাঁধা, জরীর-জুব্‌বা-পরা, দাড়িতে খেজাব দেওয়া পীর সাহেব—সঙ্গে কত কারবারী দরবারী, কত বস্ত্র সম্ভার। হজরত আসিয়াছিলেন সুবৃহৎ বজরায় করিয়া। পাঁচখানি বজরা ভর্ত্তি ছিল কেবল কেতাব পুঁথিতে। এক একটা বড় বড় লাল কেতাব মজলিসে লইয়া যাইতে চারজন লোকের দরকার হইত। সব-চেয়ে বড় কেতাব যেখানি ঘণ্টাখানিক তার পাতা উল্টাইতে গিয়া গ্রামে বলিষ্ঠ বলিয়া যার সুখ্যাতি ছিল সেই রুস্তম মণ্ডলকেও হয়রান হইতে হইয়াছিল।

হুজুর কেবলার আগমনে নীরব নিস্তব্ধ লোক-বিরল হয়বত নগর সরগরম হইয়া উঠিয়াছিল। গরীব চাষী মজুররা তাঁর খেদমত—অভ্যর্থনার জন্য আয়োজনের ত্রুটি করে নাই। প্রত্যহ লাখো মনুষ্যের ধারা আসিয়া মিলিতছিল সেখানে। লাস্কর, শাকরিদ খলিফাদের অবস্থানের জন্য বড় বড় তাম্বু খাটাইয়া দেওয়া হইয়াছিল, তাদের উদর-পূর্ত্তির নিমিত্ত রোজই কুড়ি পঁচিশটা কালো খাশির আমদানী হইত। অনেকদিন মক্কা মোয়াজ্জমা, দেওবন্দ, জৌনপুর, বাস করিয়া পীর সাহেব ভাত খাওয়া একরকম ভুলিয়াই গিয়াছিলেন। বিশেষতঃ অন্য যত বড় বড় গুণই থাকুক না কেন, ভাত-খাইয়া মারফত হাসিল করা যায় না। এই কারণে হুজুরের জন্য দোসরা খানার বন্দোবস্ত করিতে হইয়াছিল। দোসরা খানা আর কিছুই নহে—সামান্য পাঁচ সের দুধ, আট দশ সের পেস্তা-বাদাম আঙ্গুর বেদানা।—এই ভাবে সল্লাহারেই হজরত জীবন কাটাইতেন। তাঁহাকে বলিতে শুনিয়াছি—আত্মার খোরাক লইয়া যে মশগুল, তার দেহের ক্ষুধা মিটাইবার অবকাশ কোথায়?

জনাবের বুজুর্গী ও কামেলিয়তের কথা গ্রামের লোকে এখনো ভুলিতে পারে নাই। ভুলিবেই বা কেমন করিয়া? কোরবান মণ্ডল ছিল বোবা—দস্তুর মত বোবা। যে পুণ্য প্রভাতে সে কেবলার পদ চুম্বন করিল, সেই মুহূর্ত্তেই তার বাক-স্ফূর্ত্তি হইয়াছিল। কেবল বাক-স্ফূর্ত্তি নয়, তার পর দিন হইতে সে এত বেশী কথা বলিতে শুরু করিয়াছিল যে, পাড়া পড়্‌শী তাহাকে দেখিলেই পলাইয়া যাইত তার অতিরিক্ত কথার

আদায়। ফজু ভুঞার স্ত্রী ছিলেন বন্ধ্যা। শতবিধ ঔষধ পত্র—রকম বেরকমের তাবিজ শিকড় কিছুই তাঁহার জননী হওয়ার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিতে পারে নাই। পীর সাহেবের এক ফোঁটা পানি খাওয়ার এক বৎসর পরেই নূতন অতিথির আগমনে ফজুর শূন্য ঘর মুখরিত হইয়া উঠিয়াছে—একজন নয় একেবারে জোড়া অতিথি। জনাব সাতদিন মাত্র হয়বত নগরে অবস্থান করিয়াছিলেন। এই সাতদিনে এই ক্ষুদ্র গ্রামে হাজার হাজার লোকের সমাগম হইয়াছিল। পীর সাহেবের নজরানা উসুল হইয়াছিল কয়েক হাজার টাকা! টাকা লইতে কেবলা প্রথমে কিছুতেই রাজী হন নাই। পরে গ্রামবাসীর কাতর ক্রন্দনে অনন্যোপায় হইয়া নজর গ্রহণ করিয়াছিলেন—পীর সাহেব নিজে নহেন—তাঁর প্রধান খলিফা। তারপর বহুদিন কাটিয়া গিয়াছে। এই সুদীর্ঘ সময়ের মধ্যে পীর সাহেব আট দশবার তশরিফ আনিয়াছেন হয়বত নগরে। খানাপিনা ঝাড়া ফুঁকা, বাহাস, মজলিশ, নজর নসিয়ত কিছুরই ত্রুটি হয় নাই কোন বার। সম্প্রতি কয়েক বৎসর ধরিয়া হুজুর দিলওয়ার সাহেবকে পীড়াপীড়ি করিতেছেন হজ সমাধা করিয়া আসিবার জন্য। আপ্রাণ চেষ্টা করিয়াও দিলু মিয়া হজরতের হুকুম তামিল করিতে পারেন নাই। এইবার সঙ্কল্প করিয়াছেন—এবৎসর হজ উদ্‌যাপন করিবেন—যেমন করিয়াই হোক।

দিলাওয়ার সাহেবের পুত্র সন্তান ছিল না, তাঁর দূর সম্পর্কীয় এক ভ্রাতুষ্পুত্র—আনোয়ার। আনোয়ারকে তিনি ছেলের মত লালন পালন করিয়াছিলেন—শৈশব হইতেই, তাঁহার জায়গা জমিদারী, ঘরবাড়ী, যা কিছু ছিল সমানতিন ভাগ করিয়া এক ভাগ কবালা করিয়া দিলেন আনোয়ারকে। আর এক ভাগ ওয়াকফ করিলেন—বাড়ীর মসজিদ মাদ্রাসাহ্, বাপদাদার কবর জিয়ারত প্রভৃতি পুণ্য কাজের জন্য। অবশিষ্ট অংশ বিক্রয় করিয়া হাজার দশেক টাকা সংগ্রহ করা হইল—এই টাকা হজব্রত উদ্‌যাপনের নিমিত্ত।

দিলাওয়ার সাহেব হজ-যাত্রার অয়োজন করিতেছেন। তীর্থ দর্শনের আশায় তাঁহার মনপ্রাণ নাচিয়া উঠিয়াছে। বেশী করিয়া তাঁহার আনন্দ হইতেছে এই কারণে যে জনাব হজরত হুজুর কেবলাও তাঁর সঙ্গী হইবেন এই তীর্থ যাত্রায়।

কোরবানের সময় আগত প্রায়। দিলু মিয়ার আয়োজনও প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে। হুজুর আসিলেই তিনি যাত্রা করিবেন। এমন সময় হয়বত নগরের দরিদ্র চাষীদের জান কোরবানী লইবার জন্যই যেন ঝড় তুফান, বন্যা সাইক্লোনআসিয়া হাজির হইল গ্রামবাসীর গৃহ প্রাঙ্গনে। সঙ্গে আসিল দুর্ভিক্ষ, মহামারী, 'হায়জা' ওলাউঠা প্রভৃতি রাক্ষসীর দল। পাড়ার ঘরবাড়ী সব ভাঙ্গিয়া চুরিয়া ছারখার হইয়া গেল। ঘরে ঘরে কান্নার রোল উঠিল। একে-একে দুয়ে-দুয়ে করিয়া শত শত মানুষের জান কোরবান লইয়া কলেরা রাক্ষসী উল্লাসে তাণ্ডব নৃত্য করিতে লাগিল।

প্রত্যহ দলে দলে দুঃস্থ চাষী মজুররা দুর্দ্দিনের বন্ধু দিলাওয়ার সাহেবের নিকট ছুটিয়া আসিতে লাগিল—সাহায্যের আশায়। দিলু মিয়া সাহায্য করিবেন কেমন করিয়া? তাঁর বিষয় সম্পত্তি সবই যে, তিনি ভাগ বণ্টন করিয়া ফেলিয়াছেন!

ব্যাপার দিন দিন সঙ্গীন হইয়া উঠিতেছিল। অবশেষে অবস্থা এমন সাঙ্ঘাতিক হইয়া দাঁড়াইল যে লাশ দফন করিবার মানুষের অভাব হইতে লাগিল।

দিলুমিয়ার পাশের বাড়ীতে এক বিধবা বাস করিত। বড় লোকের ঘরে কাজকর্ম্ম করিয়া তার দিন গুজরান হইত কোন রকমে। কলেরার আক্রমণে সে ছটফট করিতেছিল। তাহার আর্ত্তচীৎকারে গৃহপ্রাঙ্গন মুখরিত হইয়া উঠিয়াছিল—দু'তিনটি ছেলের হাহাকারে খোদার আরশও বুঝি কাঁপিয়া উঠিতেছিল এক একবার। যেদিন হঠাৎ তার ক্রন্দন থামিয়া গেল—চারিদিক সুমসাম—নীরব নিস্তব্ধ।

দিলাওয়ার সাহেব তাহাকে দেখিতে আসিলেন। আসিয়া যাহা দেখিলেন...তাহাতে তাঁহার বুক কাঁপিল... শরীর শিহরিল...পা হইতে মাথা পর্য্যন্ত সর্ব্বাঙ্গ কাঁটা দিয়া উঠিল। বিধবার প্রাণপাখী দেহ-পিঞ্জর ছাড়িয়া অসীমের দেশে চলিয়া গিয়াছে অনেক্ষণ। দু'ইটি ছেলের একটী মায়ের কাপড় ধরিয়া টানাটানি করিতেছে—আর একটি মরামায়ের স্তন আকর্ষণ করিতেছে—দুধের আশায়। মায়ের মৃত্যু-মলিন চোখ দুটির দৃষ্টি ছেলেদের উপর নয়—আকাশের দিকে।......দিলাওয়ার মিয়ার চক্ষু অশ্রুসিক্ত হইয়া উঠিল।

বাড়ী ফিরিয়া তিনি হজযাত্রার জন্য রক্ষিত দশ হাজার টাকার তোড়া বাহির করিয়া ফেলিলেন, কিছু টাকা লইয়া লোক পাঠাইলেন শহরে ঔষধ-পথ্য-ডাক্তার আনিতে।

বাকী টাকার চাউল কিনিয়া বিলাইতে লাগিলেন ঘরে ঘরে যাইয়া।

হুজুর আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দিলুমিয়া রুগ্ন-পীড়িতের সেবার কাজে ব্যাপৃত ছিলেন। তাঁহার নিশ্বাস ফেলিবার অবকাশ ছিল না। কেবলার দরবারে হাজির হইতে বেশ একটু দেরী হইয়া গেল। ক্রোধে অপমানে জনাবের গাত্র দাহ উপস্থিত হইয়াছিল। ক্রোধ-বিকৃত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন "জানো দিলাওয়ার এখানে আমি নিজের প্রয়োজনে আসি নাই।" "আমায় ক্ষমা করুন হজরত, সোনার হয়বত নগর আজ একটা বিরাট গোরস্থানে পরিণত হইয়াছে। আর্ত্তের অশ্রু মুছাইতে গিয়াছিলাম আমি। আপনার খেদমতের ত্রুটি হইয়াছে।"

"কাল আমি যাত্রা করিব—তোমার আয়োজন শেষ হইয়াছে ত?"

"আমি হজ করিব না এবার।"

"আমায় অবাক করিলে দিলাওয়ার! কেন তুমি হজ করিবে না—কারণ শুনিতে পারি কি? জান তুমি হজ করিবার প্রতিজ্ঞা করিয়া তাহা রক্ষা না করিলে আখেরে কি শাস্তি!"

"হজের টাকা আমি খরচ করিয়া ফেলিয়াছি হুজুর—আমার শত শত প্রতিবেশী আজ দুঃস্থ পীড়িত। তাহাদের দুঃখ দেখিলে অতিবড় পাষণ্ডেরও চক্ষু অশ্রুসিক্ত হয়। এতগুলি ভাই বন্ধুকে মৃত্যুর মুখে রাখিয়া কেমন করিয়া আমি হজ করিব? জানি আমি হজ না করিলে আমার বেহেস্তের পথ হয়ত বন্ধ হইবে। 'আশারফুলমখ্‌লুকাত' এতগুলি মানুষের অশ্রু মুছাইবার অপরাধে যে বেহেস্তের পথ বন্ধ হয়, চাই না আমি সে বেহেস্ত। আমার হজ এবছর মক্কায় নয়, মদিনায় নয়—আরফাতে নয়—আমার হজ এই দুর্ভিক্ষ কলেরা পীড়িত হয়বত নগরে—একেবারে খোদার আরশের সম্মুখে। পীড়িতের সেবা করিয়া, বুভুক্ষুর ক্ষুধা দূর করিয়া, রিক্তের অশ্রু মুছাইয়া আমি হজ করিব—এ কেবল হজ্জ নয়—একে 'হজ্জে আকবর' হজরত!" "মাআজাল্লাহ্! মাআজাল্লাহ! একি কোফরি কালাম আমার মুরিদের মুখে! এ রকম পাপ কথা উচ্চারণ করিলেই ইহকালে বিবী-তালাক, পরকালে হামান্‌-ফেরাউনের পাশে তোমার স্থান হইবে জানো?"

"তাই হোক, হুজুর, তাই হোক"।

---

# সঙ্কলন
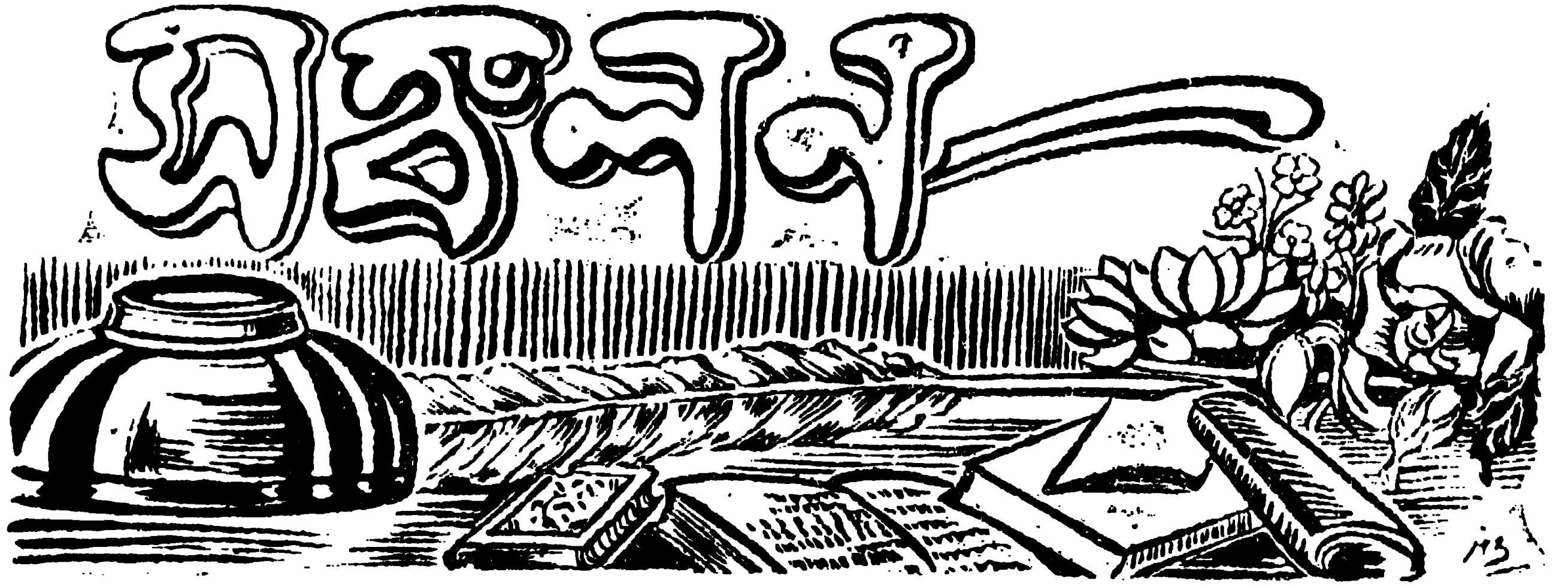
## ভারতে অন্ন-সমস্যা

প্রসিদ্ধ পাশ্চাত্য পণ্ডিত Malthus তাঁহার Principle of Population শীর্ষক প্রবন্ধে বহু পূর্ব্বে লিখিয়া গিয়াছেন —"জনসংখ্যার অনুপাতে খাদ্য সামগ্রীর অভাবই দুর্ভিক্ষ, মহামারী ও মৃত্যু-সংখ্যা-বৃদ্ধির প্রধানতম কারণ। যে দেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির অনুপাতে খাদ্যের পরিমাণ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় না, বুঝিতে হইবে অচিরে সে দেশ ধ্বংসের দিকে অগ্রসর হইবে।" ভারতের এই অন্ন-সমস্যার কথা গভর্ণমেণ্টের অনেক উচ্চ পদস্থ কর্ম্মচারী আদৌ স্বীকার করিতে চান না। তাঁহারা বলেন, "তাঁহাদের সুশাসনের গুণে ভারতবাসী বেশ সুখে, স্বচ্ছন্দে বাহাল তবিয়তে দিন গুজরান করিতেছে।" তাই আজ আমরা প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সুবিখ্যাত মনিষীগণের মত উদ্ধৃত করিয়া এবং সরকারী রিপোর্টের হিসাব নিকাশের ভিতর দিয়া অঙ্ক কষিয়া ভারতের বর্ত্তমান দুরবস্থা, তাহার কারণ ও এই বিপদ হইতে উদ্ধার পাইবার উপায় সম্বন্ধে আলোচনা করার চেষ্টা পাইব।

নিউইয়র্কের সুবিখ্যাত Dr. Sunder Land তাঁহার India, America and World brotherhood নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন—"ভারতের কোথাও না কোথাও দুর্ভিক্ষ লাগিয়াই আছে। প্লেগ, কলেরা প্রভৃতি মহামারী ভারতের ঘাড়ে চাপিয়া বসিয়াছে। মৃত্যুর বাজারও সেখানে বেশ সরগরম, আমার মনে হয় এসকলের প্রধান কারণ অন্ন-সমস্যা।"

আসাম প্রদেশের ভূতপূর্ব্ব চিফ্ কমিশনার Sir, Charles Elliot বলিয়াছেন—"ভারতের অধিকাংশ লোকই (শতকরা ৭৩ জন) কৃষিজীবি, তাহাদের মধ্যে অর্দ্ধেক লোকও বৎসরের ছয় মাস পেট পুরিয়া খাইতে পায় না।"

স্বনামধন্য মিঃ গোখেল বলিয়াছেন—"ভারতের ৬৭ কোটী লোক বৎসরের মধ্যে একদিনও পেট ভরিয়া খাইতে পায় না, ইহা হইতেই এ দেশের অন্ন-সমস্যার কথা বেশ বুঝিতে পারা যায়।"

Mr, Jhon Bright তাঁহার একটী বক্তৃতায় বলিয়াছেন—"কোনও সুজলা সুফলা দেশে অন্নাভাব ঘটিলে সে দেশের শাসনকর্ত্তৃপক্ষই সাধারণতঃ সেজন্য দায়ী।"

এক্ষণে আমরা সরকারী হিসাবের মধ্যবর্ত্তীতায় বিষয়টী পরিস্ফুট করিয়া তুলিতে চেষ্টা পাইব।

১৯২১ সালের আদম শুমারীর রিপোর্টে ভারতের লোকসংখ্যার এইরূপ শ্রেণী বিভাগ করা হইয়াছে—

| পনর বৎসর বয়সের ঊর্দ্ধ পূর্ণবয়স্ক পুরুষ | পনর বৎসরের ঊর্দ্ধ পূর্ণবয়স্কা স্ত্রীলোক | পনর বৎসরের নিম্নবয়স্ক বালক ও বালিকা |
|---|---|---|
| ৯৯৮৩২০৯৬ | ৯৪৬৫৭৭৭ | ১২৪৪৫৩৩০৭ |

প্রত্যেক পূর্ণবয়স্ক পুরুষের আহারের জন্য সাধারণতঃ দৈনিক দুই পাউণ্ড, পূর্ণবয়স্কা স্ত্রীলোকের জন্য ১$\frac{৩}{৪}$ পাউণ্ড এবং বালক বালিকাদের প্রত্যেকের জন্য গড়ে দৈনিক এক পাউণ্ড খাদ্যের আবশ্যক হইয়া থাকে। এই হিসাবে ভারতের সমস্ত অধিবাসীদের জন্য বার্ষিক মোট ৮১ মিলিয়ন টন খাদ্যের আবশ্যক।

এইবার সরকারী হিসাব হইতে ভারতের মোট উৎপন্ন ফসলের পরিমাণ হিসাব করিয়া দেখিতে হইবে। ১৯০০ সাল

হইতে ১৯২২ সাল পর্য্যন্ত সরকারী কৃষি-রিপোর্টে প্রকাশ—ভারতে প্রতি সন গড়ে ৭৬ মিলিয়ন টন শস্য উৎপন্ন হইয়াছে। ইহা হইতে পশ্বাদির আহার ও বীজের জন্য সংরক্ষণ প্রভৃতি খরচ বাবত ২৬ মিলিয়ন টন বাদ দিলে মানুষের অংশে কেবল ৫০ মিলিয়ন টন অবশিষ্ট থাকে। তাহা হইলে জমার ঘরে ৫০ মিলিয়ন টন ও খরচের ঘরে ৮১ মিলিয়ন টন দাঁড়াইতেছে। এই হিসাবে জমা ও খরচের অনুপাতে দেখা যাইতেছে যে, অন্ততঃ পক্ষে প্রতি ৩ জন মানুষের মধ্যে একজনকে সম্পূর্ণ অনাহারে না থাকিয়া আর উপায় নাই। এখানে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, ভারতে উৎপন্ন ফসলের প্রচুর অংশ প্রতি বৎসর বিদেশে রপ্তানী হইয়া যায়। এই রপ্তানীর পরিমাণ বাদ দিলে অনুপাত যে কি দাঁড়াইবে, তাহাও হিসাব করিয়া দেখা আবশ্যক।

এই বিপদ হইতে উদ্ধার পাইবার উপায় সম্বন্ধে নানা মুনির নানা মত। পাশ্চাত্য পণ্ডিত Malthus, Jhon Bright, Dr. Sunder Land প্রভৃতি মনিষীগণ এই বিষয় লইয়া বহু আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহাদের আলোচনার ফল এই যে, নিম্নলিখিত কয়েকটী উপায়ের মধ্য দিয়া এই সমস্যার সমাধান হইতে পারে।

(১) যথাসাধ্য জন্মের হার নিয়ন্ত্রণ করার উপায় অবলম্বন।

(২) যথাসাধ্য বিদেশের রপ্তানী বন্ধ করা।

(৩) শিল্প ও বাণিজ্যের উন্নতি সাধন।

(৪) আবশ্যক ও সুবিধা মত বিভিন্ন দেশে উপনিবেশ স্থাপন।

আমাদের এই পরাধীন দেশে ইহার মধ্যে যে কোন উপায়ই অবলম্বন করা হউক, শাসক সম্প্রদায়ের সাহায্য ভিন্ন তাহাতে সফলতা লাভ সম্পূর্ণ অসম্ভব। কিন্তু দুঃখের বিষয় তাঁহারা এ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন।

---

## অভিব্যক্তিবাদ

মানুষের বর্ত্তমান আকার লাভের কথা বর্ত্তমান বিজ্ঞান জগতে অনেকেই মানিয়া লইয়াছেন। কিন্তু ঠিক কোন্ জীব-দেহ পরিত্যাগ করিয়াই আমরা বর্ত্তমান অবয়ব লাভ করিয়াছি, এসম্বন্ধে জীবতত্ত্ববিদ পণ্ডিতগণ এখনও কোনও স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন নাই। এই বিষয়টী লইয়া অনেক দিন হইতে বহু আলোচনা ও গবেষণা চলিতেছে। সময় সময় বৈজ্ঞানিক সমাজ সিদ্ধান্তবিশেষে উপনীত হইয়া তাহাই অভ্রান্ত সত্য বলিয়া মনে করেন, আবার কিছু দিন পরেই সে সিদ্ধান্ত ভ্রমাত্মক বলিয়া মানিয়া লইতে বাধ্য হন। কিছুদিন পূর্ব্বে 'গরিলা' জাতীয় বানরগুলিই মানুষের পূর্ব্ব পুরুষ বলিয়া যে সিদ্ধান্ত হইয়াছিল, এখন প্রকাশ করা হইয়াছে যে সেটী ভ্রান্ত ধারণা।

বর্ত্তমানে আমেরিকাবাসী জীবতত্ত্ববিদ পণ্ডিতগণ এসম্বন্ধে নানাপ্রকার আলোচনা করিতেছেন। তাঁহাদের মধ্যে একজন বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক গিয়াছেন—বিগত দশ বৎসরের মধ্যে এই সমস্যা, সমাধানের দিকে অনেকটা অগ্রসর হইয়াছে। কোনও বৈজ্ঞানিক সমস্যার সমাধান করিতে হইলে অধীরতা প্রকাশ বা তাড়াতাড়ি করা উচিত নয়, বেশ ধীর, স্থিরভাবে সকল দিকে, সকল বিষয়ে বহুদিন ধরিয়া গবেষণা ও আলোচনার পর শেষে ধরি-ধরি করিয়াও হয়ত সত্যকে ধরা যায় না। তত্রাচ এই দশ বৎসরের মধ্যে এ বিষয়ে যে সব নূতন তত্ত্বের আবিষ্কার হইয়াছে, তাহাতে হয়ত প্রকৃত সত্যই ধরা দিয়াছে বলিয়া আমার মনে হয়।

নিম্নলিখিত পাঁচটী মত লইয়া এক্ষণে জীবতত্ত্বের বিশেষজ্ঞগণ আলোচনায় ব্যাপৃত রহিয়াছেন—

১। হীড্‌লবার্গ—জীববিশেষের মাথার খুলি, ইহা জার্ম্মাণ দেশে মৃত্তিকার নিম্নস্তর হইতে আবিষ্কৃত হইয়াছে, বহু পরীক্ষার পরে ইহাই মানব জাতির পূর্ব্ব জন্মের মাথার খুলি বলিয়া একরূপ স্থিরতর হইয়াছে।

২। ১৯২১ সালে দক্ষিণ আফ্রিকা ভ্রমণকালে একজন পাশ্চাত্য পরিব্রাজক একটী মাথার খুলি পাইয়াছিলেন, বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে অনেকেই ইহাকে মানব জাতির পূর্ব্বপুরুষ বলিয়া সাব্যস্ত করিয়াছেন।

৩। জাভার একটী গভীরতম গহ্বর হইতে এক প্রকার খুলি পাওয়া গিয়াছে। একদল বৈজ্ঞানিক ইহাকেই তাঁহাদের এতকালের গবেষণার ফল বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন।

৪। আর এক প্রকার মস্তকের খুলি আবিষ্কৃত হইয়াছে, বহু পরীক্ষার পর এই জীবদেহের গঠন প্রণালী ও অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদি সম্বন্ধে তাঁহারা অনেক তত্ত্ব জানিতে পারিয়াছেন। এমন কি ইহার সর্ব্ব শরীর ঘন লোমে আবৃত ছিল বলিয়াও তাঁহারা মত প্রকাশ করিয়াছেন। প্রাচীন পরিব্রাজকদের

মধ্যে অনেকে অষ্ট্রীয়া, আমেরিকা ও দক্ষিণ দ্বীপপুঞ্জে এই জাতীয় সজীব প্রাণী দেখিয়াছিলেন বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। আধুনিক বহু বৈজ্ঞানিক এই জীবগুলিকেই তাঁহাদের অনুসন্ধানের চরম ফল বলিয়া স্থির সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

৫। অধ্যাপক ডার্টের সিদ্ধান্তই সর্ব্বশেষ। বহু আলোচনা, বহুদিনের অনুসন্ধানের পর বিগত ১৯২৫ সালে তিনি এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—"আমি একস্থানে একটী মাথার খুলি পাইয়াছি, এটী মানুষের ঠিক পূর্ব্ববর্ত্তী জন্মের জীব-দেহ না হইয়া যায় না। ইহার শারীরিক গঠন, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদির সমাবেশ ও চোয়ালের নিম্ন ভাগের অস্থির অবস্থা এই সকল আবিষ্কার করিয়া এখন আমি এক প্রকার নিশ্চিত ভাবে বলিতে পারি যে, এতদিন পরে আমি এই সমস্যার শেষ সমাধানে উপনীত হইতে পারিয়াছি।

---

## মোসলেম জগতে সাময়িক পত্রিকা

লণ্ডনের সুবিখ্যাত টাইম্‌স্ পত্রিকা মোসলেম জগতের সাময়িক পত্রিকার ক্রমবিস্তৃতির প্রতি লক্ষ্য করিয়া চমকিয়া উঠিয়াছেন। তিনি প্রথমতঃ নব্য আফগান জাতির দিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া বলিয়াছেন—এই সেদিনও আফ্‌গানবাসীরা ঘুম-ঘোরে অচেতন ছিল, সভ্য জগতের সহিত তাহাদের কোন সংস্রবই ছিল না, কিন্তু এই অল্প কয়দিনের মধ্যে তাহারা সকল দিক দিয়া উন্নতির দিকে যেরূপ দ্রুত অগ্রসর হইতেছে, তাহা দেখিয়া আশ্চর্য্য না হইয়া পারা যায় না, মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন ও সংবাদপত্র-প্রচারের আবশ্যকতা তাহারা বিশেষ ভাবে অনুভব করিয়াছে। রাজশক্তি ও প্রজাশক্তি একযোগে এ বিষয়ে মনোযোগী হইয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছে। আফ্‌গান পত্রিকার ভাবের অভিনবতা ও ভাষার পারিপাট্য দেখিয়া মনে হয় ইহারই মধ্যে তাহারা সংবাদপত্র-সেবার ( Journalism ) কার্য্যে বেশ অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়াছে।

প্যারিসের একজন বিখ্যাত অধ্যাপক বলিয়াছেন—মোসলমান জগতে সাময়িক পত্রিকার প্রচার খুব বাড়িয়া গিয়াছে, আর সে সকলের বিশেষত্ব এই যে, বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন পত্রিকার সম্পাদকগণ সকলেই এক সুরে সুর মিলাইয়া জগতের সমস্ত মুসলমানকে এক ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ করিতে প্রাণপণে চেষ্টা পাইতেছেন। পত্রিকাগুলি পড়িয়া দেখিলে মনে হয়, তাঁহারা সকলে একই ভাবে উদ্বুদ্ধ হইয়া সকল মুসলমানের মধ্যে একই ভাবধারা বহাইয়া দিবার উদ্দেশ্যে আসরে অবতীর্ণ হইয়াছেন।

---

## বিভিন্ন দেশের অবস্থা

১৭২৮ খৃঃ পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তুরস্কে মুদ্রাযন্ত্রের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত ছিল না, এই সময় মুদ্রাযন্ত্র স্থাপনের কথা প্রথমে উত্থাপিত হয়। ইহাতেই সর্ব্বসাধারণের মধ্যে হৈ চৈ আরম্ভ হইয়া পড়ে। একদিকে লিখনপটু সম্প্রদায় তাঁহাদের অন্ন মারা যাইবে ভাবিয়া মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়েন, অন্যদিকে রক্ষণশীল সম্প্রদায় "একটা নূতন কিছু হইবে" ভাবিয়া চক্ষে অন্ধকার দেখিতে থাকেন। আবার এক শ্রেণীর আলেমের দল জায়েজ নাজায়েজের কথা লইয়া আসর সরগরম করিয়া তোলেন। আহ্‌মদ আমীন বে নামক একজন গ্রন্থকার তাঁহার রচিত The devolopment of Turkey as Measured by press নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন—মুদ্রা যন্ত্রের আবশ্যকতা বিশেষ ভাবে অনুভূত হইল; কিন্তু তাহা স্থাপনের বিরুদ্ধে আন্দোলন আলোচনাও বাড়িয়া চলিল, ধর্ম্মের 'দোহাই' দিয়াই অনেকে ইহার বিরুদ্ধাচরণ করিতে লাগিলেন। অবস্থা যখন এইরূপ সঙ্গীন হইয়া পড়িল, তখন সকলে মিলিয়া "শায়খুল্ এসলামের" নিকট 'জায়েজ নাজায়েজ' সম্বন্ধে 'ফতোয়া' তলব করিলেন। সুখের বিষয় বহু আলোচনার পর তিনি 'জায়েজের' 'ফতোয়া' জারি করিলেন। ফলে সেই সময়েই ( ১৭২৮ খৃঃ ) প্রথম তুরস্কে মুদ্রা যন্ত্র স্থাপিত হইল।

মিসরের রাজধানী কায়রো নগরী হইতে ১৮৪৮ খৃঃ ২০শে নভেম্বর তারিখে স্বনামধন্য আলেম মুফ্‌তী মোহাম্মদ আবদহুর সম্পাদকতায় তুর্কী ও আরবী ভাষার সর্ব্বপ্রথম সংবাদপত্র "আলওকায়েউল্ মিস্‌রীয়া" প্রকাশিত হয়। তারপর বেরুত হইতে ১৮৬৯ খৃঃ আরবী ও ফরাসী ভাষায় "হাদীকাতুল আখ্‌বার," ১৮৬৯ খৃঃ আরবী ভাষায় 'আলবাশীর' ও ১৮৭৭ খৃঃ 'লেসানুলহাল' বাহির হয়। অতঃপর এই সময় মিসর, শাম ও ফিলিস্তিনের বিভিন্ন স্থান হইতে অনেকগুলি সংবাদপত্র প্রকাশিত হইতে থাকে। এইরূপে কিছু দিনের মধ্যে

ঐ সকল প্রদেশে সংবাদপত্রের সংখ্যা অভাবনীয় রূপে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে ঐ প্রদেশ হইতে মাত্র ৪০ খানি পত্রিকা বাহির হইত। ক্রমশঃ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া উহার ঐ সংখ্যা ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে ১৬৯ ও ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে ১০৪৪টীতে উপনীত হয়।

তুরস্কবাসীগণ কিন্তু ১৮৩২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত সাময়িক পত্রিকার আবশ্যকতা সম্বন্ধে ভাবিয়া দেখিবারও অবসর পান নাই। সর্ব্বপ্রথম সেখানে মিঃ এন, চার্চ্চিল নামক জনৈক ইংরাজ লেখক তুর্কী ভাষায় একখানি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। ইহার পর হইতে এদিকে তুরস্কবাসীদের মনোযোগ আকৃষ্ট হইল। ফলে ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে 'তার্‌জামানুল আহ্‌ওয়াল' নামক একখানি বেসরকারী সংবাদপত্রের আবির্ভাব হইল। মিঃ ব্রাউন লিখিয়াছেন—এই সংবাদপত্রখানিই তুরস্কবাসীদের বহুদিনের সঞ্চিত জড়তা দূর করিয়া তাহাদের মধ্যে নব ভাবের বন্যা বহাইয়া দিয়াছিল; কিন্তু তুরস্কের শাসন-তন্ত্রের বজ্রবন্ধনী ও প্রেস-সেন্‌সারের কড়াকড়ি বশতঃ তখন সাময়িক পত্রিকার সংখ্যা আশানুরূপ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় নাই। ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯০১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত পত্রিকা-জগতে আদৌ কোন উন্নতি পরিলক্ষিত হয় নাই। ১৯০৮ খৃষ্টাব্দের ২৫শে জুলাই তারিখে হঠাৎ সংবাদপত্র মহলে অভাবনীয়রূপে একটা নূতন সাড়া পড়িয়া গেল। প্রেস্ আইন, প্রেস্ সেন্‌সার এ-সব বালাই দূর হইল। দেশে স্বাধীনতার বান ডাকিল। এই সময় একদিন প্রাতে তরুণ দলের 'একদাম' পত্রিকার ৬০ হাজার কপি এক এক কোরশ ( দুই আনা ) মূল্যে বিক্রয় হইয়া গেল এবং দ্বিপ্রহরের পর ২০ কোরশ দিয়াও আর কেহ তাহার এক সংখ্যাও খুঁজিয়া পাইল না। এইবার তুরস্ক রাজ্যে অসংখ্য সংবাদপত্র চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। ১৯১৪ সালে কেবল কনষ্টান্টিনোপল সহর হইতে দৈনিক ৬, বিদ্রূপাত্মক ৩, সচিত্র ৫, শিশুপাঠ্য ১১, স্ত্রীপাঠ্য ২, ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় ৬, ব্যবসা-বাণিজ্য সংক্রান্ত ৯, যুদ্ধ-সংক্রান্ত ৫ এবং বৈজ্ঞানিক পত্রিকা ৮ খানি বাহির হইত। ইহা ছাড়া অন্যান্য স্থানের পত্র পত্রিকা ত ছিলই।

নিম্নে আমরা ইস্‌লাম-জগতের বিভিন্ন স্থান হইতে প্রকাশিত সাময়িক পত্রিকার সংখ্যা প্রকাশক একটী তালিকা দিতেছি। বলা বাহুল্য, এটী যুদ্ধারম্ভের পূর্ব্বেকার হিসাব। যুদ্ধশেষ হওয়ার পর আরও বহু সংখ্যক পত্রিকার সৃষ্টি হইয়াছে।

| স্থানের নাম | ভাষা | সংবাদপত্রের সংখ্যা |
|---|---|---|
| আত্‌না | তুর্কী | ৪ |
| এড্রিয়ানোপল | ঐ | ৫ |
| ঐ | আরবী | ৫ |
| হালাব | তুর্কী | ৭ |
| ঐ | আরবী | ৫ |
| আঙ্গোরা | তুর্কী | ৪ |
| বাগ্দাদ | ঐ | ৫ |
| ঐ | আরবী | ৪১ |
| বসোরা | তুর্কী | ২ |
| ঐ | আরবী | ৬ |
| বেরুত | তুর্কী | ১ |
| ঐ | আরবী | ৪১ |
| দার্দ্দানিয়াপল | তুর্কী | ২ |
| দিয়ার বাকার | ঐ | ৫ |
| আর্জ্জরুম | ঐ | ৩ |
| হেজাজ ( মক্কা ) | ঐ | ১ |
| ঐ | আরবী | ১ |
| জেরুজালাম | তুর্কী | ১ |
| ঐ | আরবী | ১৫ |
| কস্‌তুম্‌নী | তুর্কী | ৩ |
| খারবুত | ঐ | ৩ |
| ঐ | আরবী | ১ |
| মুসল | তুর্কী | ৩ |
| ঐ | আরবী | ২ |
| সুয়েজ | তুর্কী | ৩ |
| সিরিয়া | ঐ | ১ |
| ঐ | আরবী | ২৬ |
| ওয়ান | তুর্কী | ১ |
| এমন | ঐ | ১ |
| চিন | চায়নাভাষা | ৪ |
| ঐ | আরবী | ১ |
| ভারত মহাসাগরের দ্বীপপুঞ্জে | আরবী | ৫ |

| | | |
|---|---|---|
| ভারতবর্ষ | আরবী | ১ |
| ঐ | ইংরাজী | ৩ |
| ঐ | উর্দ্দু | ১১৫ |
| ঐ | ফারসী | ২ |
| ঐ | বাঙ্গলা | ৫ |
| ঐ | গুজরাটী | ৩ |
| রুসীয়া | রুসীয়াভাষা | ৫ |

( মোহাম্মদী )

## সভ্যতার স্বরূপ

ইংলণ্ডের সুবিখ্যাত Nineteenth Century পত্রিকায় প্রকাশিত একজন বিদুষী ইংরাজ মহিলার (Mrs, Hartley) প্রদত্ত হিসাব হইতে এবং প্রসিদ্ধ ইংরাজ লেখক Sir Arch Dil এর লিখিত একটী প্রবন্ধ হইতে সভ্যতার কেন্দ্রভূমি ইংলণ্ডে কোন সনে মোট কত শিশু জন্মগ্রহণ করিয়াছে এবং তন্মধ্যে বৈধ ও অবৈধ যৌন সম্মিলনের ফল স্বরূপ শিশুদিগের পৃথক পৃথক হিসাব, পক্ষান্তরে উপদংশ ও মেহ প্রভৃতি কুৎসিৎ ব্যাধিগ্রস্ত রোগীদের সম্বন্ধে আলোচনার সার ভাগ নিয়ে উদ্ধৃত করিয়া। দিতেছি পাঠকগণ ইহা হইতে পাশ্চাত্য জগতের উৎকট সভ্যতা ও উদ্ভট নৈতিক চরিত্রের একটু নমুনা দেখিতে পাইবেন—

| সন | মোট যত শিশু জন্মগ্রহণ করিয়াছে | বৈধ সম্মিলনের ফলে জাত | অবৈধ উপায়ে জাত |
|---|---|---|---|
| ১৯১৪। | ৮৭৯০৯৬ | ৮৪১৭৬৭ | ৩৭৩২৯ |
| ১৯১৫। | ৮১৪৬২৪ | ৭৭৮৩৬৯ | ৫৪২৬৩ |
| ১৯১৬। | ৭৮৫৫২০ | ৭৪৭৮৩১ | ৩৭৬৮৯ |
| ১৯১৭। | ৬৬৮৩৪৬ | ৬৩১৩৩৬ | ৩৭০১০ |
| ১৯১৮। | ৬৬২৬৬১ | ৬২১২০৯ | ৪১৪৫২ |
| ১৯১৯। | ৬৯২৪৩৮ | ৬৫০৫৬২ | ৪১৮৭৬ |

যে সকল মৃত জারজ সন্তান ভূমিষ্ট হয়, তাহাদের সংখ্যা সরকারী হিসাবভুক্ত হয় না, তদুপরি পাশ্চাত্যের অভিনব চিকিৎসা-বিজ্ঞানের কল্যাণে ও তাঁহাদের উদ্ভাবিত বিবিধ অভিনব প্রক্রিয়ার গুণে অবৈধ যৌন সম্মিলনের অসংখ্য ফল অঙ্কুরেই বিনষ্ট হইয়া যায়। এগুলি তালিকাভুক্ত হইলে হিসাবের অঙ্ক আরও কত দূর বাড়িয়া যাইবে, তাহা সহজেই অনুমেয়।

Sir Arch Dil বলিয়াছেন—গ্রেট বৃটেনে শতকরা ৭৯ জন নাগরিক এবং অবশিষ্ট ২১ জন মাত্র পল্লীবাসে জীবন অতিবাহিত করিয়া থাকে। নগরবাসীদের মধ্যে শতকরা ১০ জন বীভৎস উপদংশ পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া থাকে, দুষিত মেহগ্রস্ত রোগীদের সংখ্যা ইহাপেক্ষাও অনেক বেশী। এটী যুদ্ধারম্ভের পূর্ব্বেকার হিসাব। যুদ্ধ শুরু হইবার সঙ্গে সঙ্গে এই সব কুৎসিৎ রোগগ্রস্ত লোকের সংখ্যা অনেক পরিমাণে বাড়িয়া গিয়াছিল। যুদ্ধের গোলযোগ শেষ হওয়ার পর দেখা গিয়াছে, —বৃটেনের অধিবাসীদের মধ্যে শতকরা ৫০জন লোক এই সব কুৎসিৎ পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া নিজের, পুত্র-কন্যার ও রমণী-গণের এমন কি স্ব স্ব বংশের সর্ব্বনাশ সাধন করিতেছে। অনেকে চিরদিনের মত স্বাস্থ্য ও শক্তি হারাইয়া এবং বহু লোক অর্থহীন হইয়া দিন দিন বেকার সমস্যা বাড়াইয়া দিতেছে। রাজ্যের প্রজাবর্গের শোণিত স্বরূপ সাধারণ তহবিল হইতে এই সব বেকার-পোষণের অভিনয়ে কোটী কোটী টাকা ব্যয় হইয়া যাইতেছে।

## ম্যালেরিয়া-প্রসঙ্গ

জনৈক অভিজ্ঞ চিকিৎসক 'অবজারভার' পত্রে লিখিয়াছেন, প্রায় ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে মশার দেহ হইতে যখন সর্ব্বপ্রথম ম্যালেরিয়ার বীজানু আবিষ্কৃত হইয়াছিল, তখন হইতে লোকের মনে এই ধারণা বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে যে, মশককুলকে বিনাশ করিতে পারিলেই ম্যালেরিয়ার মৃত্যুবাণ হানা হইবে। এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া এ-পর্য্যন্ত বিভিন্ন দেশের অধিবাসিগণ মশক ধ্বংস করিবার জন্য নানাপ্রকার উপায় অবলম্বন করিয়াছেন এবং তাহার ফলে যে, এ-যাবৎ লক্ষ লক্ষ লোকের জীবন রক্ষা হইয়াছে, এ-কথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। কিন্তু ইহাই যে ম্যালেরিয়া-নিবারণের একমাত্র উপায় নহে, "লীগ অব্ নেশন্‌স্ এর" ম্যালেরিয়া কমিশনের রিপোর্ট হইতে তাহা সুস্পষ্টরূপে উপলব্ধি করা যায়।

অনেকেই বোধ হয় জানেন যে, এখনও পর্য্যন্ত ইউরোপের ইটালী, রুশিয়া প্রভৃতি দেশে ম্যালেরিয়ার যথেষ্ট প্রাদুর্ভাব আছে। কিন্তু তৎসত্বেও ঐ সমস্ত দেশে মশক-বিনাশ-সম্পর্কে কোন প্রশ্নই উত্থাপিত হয় না। ইহা হইতেও বুঝা যায় যে, মশক-ধ্বংসই ম্যালেরিয়া নিবারণের একমাত্র উপায় নহে, ইহার অন্য উপায়ও আছে।

ইউরোপ ও প্যালেষ্টাইন ঘুরিয়া ম্যালেরিয়া কমিশন যে অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়াছেন, তাহার ফলে তাঁহারা ম্যালেরিয়া-নিবারণের জন্য দুইটী উপায় নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। প্রথম উপায়—লোকালয় হইতে মশক-কুলের উচ্ছেদ সাধন এবং দ্বিতীয় উপায় মনুষ্য-শরীর হইতে ম্যালেরিয়ার বীজাণু-বিনাশ। যে-সমস্ত জেলায় ম্যালেরিয়ার অত্যধিক প্রাদুর্ভাব, সেখানকার অধিবাসীরা নিজেদের বাড়ীঘর এমন ভাবে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখিবে, যাহাতে তৎসমুদয়ের মধ্যে আদৌ মশার বাসের উপযোগী স্থান না থাকে। এরূপ করিলে অতি অল্প দিনের মধ্যে আপনা হইতেই মশককুলের উচ্ছেদসাধন হইবে। আর মানুষের শরীর হইতে ম্যালেরিয়ার বীজাণু-নাশ করিবার জন্য কমিশন কুইনাইন ব্যবহার করিতে উপদেশ দিয়াছেন। তবে কুইনাইনের ব্যবহার অত্যধিক পরিমাণে বাড়িয়া যাওয়ায় বর্ত্তমানে ইহা দুর্ম্মূল্য ও দুষ্প্রাপ্য হইয়া পড়িয়াছে এবং সেই নিমিত্ত দরিদ্র গৃহস্থের পক্ষে প্রয়োজনমত ইহার ব্যবহারও একপ্রকার অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছে। কমিশন এ-সমস্যা-সম্পর্কেও বিবেচনা করিয়া দেখিয়াছেন এবং পরিশেষে এই মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন যে, জ্বর আসিবার আশঙ্কায় বহু লোক পূর্ব্ব হইতেই কুইনাইন ব্যবহার করিয়া থাকে, কিন্তু তাহা একেবারেই নিরর্থক। কারণ, এই প্রক্রিয়ার দ্বারা জ্বরের আক্রমণ হইতে আদৌ পরিত্রাণ পাওয়া যায় না। সুতরাং এই যে আশঙ্কা-জনিত কুইনাইন-সেবনের অভ্যাস, ইহাকে যদি লোকে পরিত্যাগ করে, তাহা হইলে নিশ্চয়ই কুইনাইন সহজপ্রাপ্য এবং স্বল্পমূল্য হইবে এবং তাহার ফলে যাহাদের জন্য ইহা অবশ্য প্রয়োজনীয় হইয়া উঠিবে, তাহারা অতি সহজেই পাইতে পারিবে।

পরিশেষে কমিশন যে আদর্শ ও মূল্যবান ব্যবস্থার কথা বলিয়াছেন, উপসংহারে আমরা তাহারই পুনরুল্লেখ করিতেছি। কমিশন বলিয়াছেন, শ্রমশিল্পের উন্নতি ও ভূমির উর্ব্বরাশক্তির বৃদ্ধি-সাধন একান্ত আবশ্যক। দারিদ্র্যই সকল রোগের মূলীভূত হেতু। শ্রম-শিল্পের উন্নতি ও জমির উর্ব্বরা শক্তি বৃদ্ধি করিয়া যদি দেশের দারিদ্র্য নিবারণ করা যায়, তাহা হইলে অল্প দিনের মধ্যেই সমস্ত আধি-ব্যাধি দেশ হইতে সমূলে দূরীভূত হইয়া যাইবে।

সাধারণতঃ দেখা যায়, গ্রামের মধ্যে যে সমস্ত জলাশয় থাকে, সেইগুলিই হয় মশককুলের সর্ব্বপ্রধান আড্ডা। এতদ্ব্যতীত যে-সমস্ত ছোট ছোট নর্দ্দমার ভিতর দিয়া জল সরবরাহ করিয়া কৃষিক্ষেত্রগুলিকে কৃষির উপযোগী করিয়া তোলা হয়, সে-সমস্ত নর্দ্দমাও প্রতিদিন বহু সংখ্যক মশকের জন্মদান করিয়া থাকে। সেই জন্য কমিশন বলিয়াছেন, গ্রামের এই দুর্গতি দূর করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে গ্রামবাসিগণকে উপরোক্ত নর্দ্দমা ও জলাশয় সমূহের অপরিচ্ছন্নতার অপকারিতা সম্যকরূপে বুঝিবার জন্য সুযোগ দিতে হইবে। অপেক্ষাকৃত উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়া যাহাতে তাহারা নিজেদের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে সম্যক বিচার করিয়া চলিতে বা বসবাস করিতে পারে, সর্ব্বপ্রকারে দারিদ্র্যমুক্ত হইয়া সহজ স্বচ্ছন্দ জীবনযাপন করিতে পারে, তাহার উপায় করিয়া দিতে হইবে। তাহা হইলে তাহা ম্যালেরিয়া নিবারণের জন্য মশককুল ধ্বংস করা অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠতর উপায় বলিয়া পরিগণিত হইবে।

বর্ত্তমানে মানুষের শরীরে রোগের বীজাণু নষ্ট করিবার প্রচেষ্টার সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের জীবনী শক্তি যাহাতে বৃদ্ধি পায়, তদ্বিষয়েও আধুনিক ভৈষজ্যবিদ্‌গণ মনঃসংযোগ করিয়াছেন। বাস্তবিকই ইহা সুখের বিষয়। এই দিকে লক্ষ্য রাখা এবং ইহার জন্য আবশ্যকমত চেষ্টা করা সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন। অবশ্য আবশ্যক হইলে যে মশক-বিনাশের প্রয়োজন নাই, এমন কথা আমরা বলিতেছি না।

( ষ্টেট্‌স্‌ম্যান )

---

## চীন-প্রসঙ্গে ইটালীয়ান মন্ত্রী

ইটালীর ভূতপূর্ব্ব প্রধান মন্ত্রী সাইনর নিটি তাঁহার অধুনা-প্রকাশিত গ্রন্থের মধ্যে চীন-সাম্রাজ্যে ইউরোপীয়গণের স্বার্থ-সাধনার আলোচনা-প্রসঙ্গে বলিয়াছেন, "এ কথা হয়ত সত্য হইতে পারে যে, বলশেভিক-প্রতিনিধিগণ চীনের মধ্যে বিদ্রোহের সৃষ্টি করিয়াছে; কিন্তু এ কথাও কি সত্য নয় যে, ইউরোপীয়গণের অনিষ্টকর কর্ম্মপদ্ধতিই চীনাদের অন্তরে শত্রুতার ভাব জাগাইয়া দিয়াছে এবং তাহারই অনিবার্য্য ফল স্বরূপ এই ধ্বংসকর শোণিত-সংঘর্ষের সংঘটন হইয়াছে? চীনজাতি বর্ত্তমানে জাতীয়তাবাদী বা সাম্যবাদী; কিন্তু তাহাদের মধ্যে এই জাতীয়তা বা সাম্যবাদ ইউরোপীয়গণের কৃতঘ্নতামূলক দস্যুতার ফলেই জাগিয়া উঠিয়াছে। চীনের এই বিদ্রোহ ইউরোপীয় বণিক সম্প্রদায়ের বর্ব্বর শোষণ-নীতির পাল্টা জবাব ব্যতীত আর কিছুই নয়।

"চীনের অধিবাসীগণ সাধারণতঃ ধৈর্য্যশীল। উপরন্তু গণ্ডগোল বা বিবাদ-বিসম্বাদের প্রতিও তাহাদের আসক্তি খুবই কম। এমতাবস্থায় ইউরোপীয়গণ যদি প্রতিনিয়ত তাহাদের সহিত অন্যায় ব্যবহার না করিত, অর্থনৈতিক সুবিধা-লাভের জন্য ষড়যন্ত্রের আশ্রয় না লইত, তবে খুব সম্ভব চীনারা ইউরোপীয়গণের ব্যবসা-বাণিজ্য সম্পর্কে কোন বিঘ্নই উৎপাদন করিত না।

"এই ইউরো-চীন-সংঘর্ষ-সমস্যায় এ পর্য্যন্ত যাহা কিছু ঘটিয়াছে বা এখনও ঘটিতেছে, তাহার মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা লজ্জাজনক ব্যপার হইতেছে—চীন দেশে ইউরোপীয় বণিক-গণের শ্রমিক খাটাইবার পদ্ধতি। আর সে-পদ্ধতি শুধু বয়স্ক শ্রমিকদিগের জন্য নয়, নিতান্ত অল্পবয়স্ক বালক বা বালিকা শ্রমজীবিগণের প্রতিও তাঁহারা সেই লজ্জাকর ব্যবস্থার প্রয়োগ করিয়া থাকেন। শ্রমিকগণ প্রতিদিন ১৫।১৬ ঘণ্টা কাল অবিশ্রান্ত পরিশ্রম করিয়া থাকে। এই কার্য্যকালের মধ্যে তাহাদিগকে অত্যল্প সময়ের জন্যও বিশ্রামের অবসর দেওয়া হয় না। এমন কি সাপ্তাহকাল পরেও তাহাদের জন্য দিনেক বিশ্রামের ব্যবস্থা নাই। কিন্তু এতখানি কঠোর অমানুষিক পরিশ্রমের বিনিময়ে তাহাদিগকে যে পারিশ্রমিক দেওয়া হয়, তাহা আদৌ অসঙ্গত ও অন্যায়। এই পারিশ্রমিক এত অল্প যে, ইংলণ্ডের প্রাথমিক শ্রমশিল্প-যুগের কারখানাওয়ালারা শ্রমিকগণের জন্য পারিশ্রমিকের যে হার নির্দ্দিষ্ট করিয়া রাখিয়াছিল, তাহার সহিতও ইহার তুলনা নাই। সে-যুগের ধনিককুলের বর্ব্বর পাশব নীতিও ইহার কাছে হার মানিয়া যায়।

"যে সমস্ত ইউরোপীয় বণিক চীনদেশে লাভের ব্যবসায়ে টাকা ঢালিয়াছেন এবং যাঁহারা বৎসর বৎসর মোটা মোটা লাভের টাকায় নিজেদের ধনাগার পূর্ণ করিতেছেন, একমাত্র তাঁহারাই বর্ত্তমানে চীনদেশে বলশেভিক-প্রচারের অভিযোগ উত্থাপন করিয়া আন্দোলন আরম্ভ করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহারা এ-কথাটা একবার ভাবিয়া দেখেন না যে, বলশেভিক-প্রচার-ফলে যদি এ সংঘর্ষের সৃষ্টি হইত, তাহা হইলে মানুষের মনে স্বতঃই ইহার প্রতি একটা ঘৃণা বা বিরক্তির উদ্রেক হইত। তাঁহারা একবার ধারণাও করেন না যে, প্রতি বৎসর চীন হইতে যে সমস্ত লাভের টাকা তাঁহাদের পকেটে আসিয়া পড়ে, তৎসমুদয়ের প্রত্যেকটাতেই দরিদ্র চীনা শ্রমিককুলের বুকের রক্ত মাখানো আছে এবং এ পর্য্যন্ত চীনদেশে তাঁহারা বয়ন শিল্পের যে উন্নতি সাধন করিয়াছেন, তাহা জগতের শিল্প-ইতিহাসকে কলঙ্কিত করিয়া রাখিবে।

"চীনে ইউরোপীয়গণের এই কার্য্য আমাদের সভ্যতার কলঙ্ক স্বরূপ। ইহা নিরবচ্ছিন্ন পাপ এবং দস্যুতা ব্যতীত আর কিছুই নয়।" (ফরওয়ার্ড)

---

# বাংলার আজীজ

[ নজরুল ইসলাম ]

পোহায়নি রাত আজান তখনো দেয়নি মুয়াজ্জিন,
মুসলমানের রাত্রি তখন আর সকলের দিন।
অঘোর ঘুমে ঘুমায় যখন বঙ্গ-মুসলমান,
সবার আগে জাগ্‌লে তুমি গাইলে জাগার গান।
ফজর বেলার নজর ওগো উঠ্‌লে মিনার' পর
ঘুম-টুটানো আজান দিলে—"আল্লাহো আকবর!"
কোরাণ শুধু পড়্‌ল সবাই বুঝ্‌লে তুমি একা,
লেখার যত ইস্‌লামি জোশ তোমায় দিল দেখা।
খাপে রেখে অসি যখন খাচ্ছিল সব মার,
আলোয় তোমার উঠ্‌ল নেচে দুধারী তলোয়ার।

চম্‌কে সবাই উঠ্‌ল জেগে ঝল্‌সে গেল চোখ
নৌজোয়ানীর খুন-জোশীতে মস্ত্‌ হ'ল সব লোক!
আঁধার রাতের যাত্রী যত উঠ্‌ল গেয়ে গান
তোমার চোখে দেখ্‌ল তারা আলোর অভিযান।
বেরিয়ে এল বিবর হ'তে সিংহ-শাবক দল
যাদের প্রতাপ দাপে আজি বাংলা টলমল!
এলে নিশান-বরদার বীর, দুশ্মন পর্দ্দার,*
লায়লা চিরে আন্‌ল নাহার-রাতের তারা-হার!
সাম্যবাদী! নরনারীরে ক'রতে অভেদ জ্ঞান,
বন্দিনীদের গোরস্থানে র'চলে গুলিস্তান!
শীতের জরা দূর হ'য়েছে ফুট্‌চে বাহার-গুল,
গুল্‌শনে গুল ফুট্‌ল যখন—নাই তুমি বুলবুল!
মশালবাহী, বিশালপুরুষ! কোথায় তুমি আজ?
অন্ধকারে হাত্‌ড়ে মরে অন্ধ এ সমাজ।
নাইক সতুন, প'ড়ছে খ'সে ইসলামের আজ ছাদ।
অত্যাচারের বিরুদ্ধে আর ঘোষ্‌বে কে জেহাদ?
যেম্‌নি তুমি হালকা হ'লে আপনা করি দান
শুন্‌লে হঠাৎ—আলোর পাখী—কাজ-হারানো গান!
ফুরিয়েছে কাজ ডাক্‌ছে তবু হিন্দু-মুসলমান,
সবার "আজীজ", সবার প্রিয়, আবার গাহ গান!
আবার এসো সবার মাঝে শক্তিরূপে বীর,
হিন্দু সবার গুরু ওগো, মুসলমানের পীর! †

---

* অবরোধ অর্থে ব্যবহৃত

† এই কবিতাটি অবসর প্রাপ্ত স্কুল ইন্‌স্‌পেক্টার মরহুম খান বাহাদুর আবদুল আজীজ সাহেবের পবিত্র স্মরণে লিখিত। দেশের জন্য, জাতির জন্য ইঁহার মত এমন নীরবে তিল তিল করিয়া জীবনটাকে বিলাইয়া দিতে বাংলার মুসলমানদের মধ্যে আর কয়জন পারিয়াছেন আমরা জানিনা। মরহুম খান বাহাদুর সাহেবকে কার্য্যোপলক্ষে পূর্ব্ববঙ্গ ও আসামের অনেক স্থানেই ঘুরিয়া বেড়াইতে হইয়াছে, যেখানেই তিনি গিয়াছেন, পশ্চাতে রাখিয়া আসিয়াছেন তাঁহার সমাজ-হিতৈষণা ও বিদ্যোৎসাহিতার একটা জলন্ত চিহ্ন। পল্লীতে পল্লীতে শুধু স্কুল প্রতিষ্ঠা করিয়া ও সমাজের উন্নতির জন্য সমিতি স্থাপন করিয়াই তিনি ক্ষান্ত থাকেন নাই। —অশিক্ষিত পল্লী সমাজে সত্য সত্যই একটা 'তরক্কী'র নেশা জাগাইবার জন্য তিনি জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। তাঁহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কীর্ত্তি চট্টগ্রামের "মুসলমান শিক্ষা সমিতি।" এই সমিতির প্রায় তিন লক্ষ টাকার সম্পত্তি আছে। চট্টগ্রামের মুসলমান ছাত্রদিগের জন্য এক সুবৃহৎ ত্রিতল হোষ্টেল নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়া এই সমিতি তাহাদের শিক্ষার পথে কি পরিমাণ সহায়তা করিয়াছে, তাহা বলা যায় না। এই হোষ্টেলে বালকদিগের জন্য শুধু বাসস্থানের বন্দোবস্ত করা হয় নাই, তাহাদের শারীরিক মানসিক উন্নতি ও চরিত্র গঠনের জন্য যে সকল ব্যবস্থা করা হইয়াছে, তাহাতে বাস্তবিকই ইহার প্রতিষ্ঠাতার চিন্তাশীলতা ও দূরদর্শিতার পরিচয় পাওয়া যায়।

শুধু বালকদিগের জন্য নহে, বালিকাদের শিক্ষার জন্যও মরহুম আবদুল আজীজ সাহেব আপ্রাণ সাধনা করিয়া গিয়াছেন। নারীকে শিক্ষিত না করিলে জাতির মুক্তি নাই—একথাতিনি মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করিয়াছিলেন। শুধু উপদেশ দিয়াই তিনি তাঁহার কর্ত্তব্যের ইতি করেন নাই। নিজ পরিবারের মহিলাদিগকে উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত করিয়া বাংলার মুসলমানদিগকে আদর্শ দেখাইয়া গিয়াছেন, তাঁহার দৌহিত্রী শামসুন্‌নাহার ১৯২৬ সনে বিশেষ কৃতিত্বের সহিত ম্যাট্রিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বর্ত্তমানে কলিকাতা ডায়োসিশন কলেজ হইতে আই, এ পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতেছেন।

# আলোচনা

## চরিত্র ও এছলাম

ভাদ্র মাসের নওরোজ পত্রে "চরিত্র" শীর্ষক একটী প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। লেখক মুছলমানদিগের চরিত্রগত অধঃপতনের আলোচনা প্রসঙ্গে বলিতেছেন :—

"মুসলমান সমাজে এই অবৈধ কামিনীচর্চ্চার পরিবর্ত্তে বৈধ কামিনীচর্চ্চার বিধি আছে একাধিক নারী পাণী গ্রহণের ভিতরে। এতে মুসলমানের জীবনে সংযম একরূপ দুর্ল্লভ হয়ে পড়েছে। ফলে আর্থিক দৈন্যের সঙ্গে সঙ্গে বৈধসংসর্গের পরিণামকে ভয় করে অনেক মুসলমান সংযমের অভাবে অবৈধ সংসর্গেই জীবনের স্বাস্থ্য, সম্পদ, লাবণ্য দ্রুত হারাতে বাধ্য হচ্ছে।"

লেখকের এই মন্তব্যটীর বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে সরল ভাষায় তাহার খোলাসা এই দাঁড়াইবে যে :—

(১) দুই একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি ব্যতীত, মুছলমান মাত্রই সংযমহীন।

(২) এছলামে একাধিক স্ত্রী গ্রহণের অনুমতি থাকাতেই মুছলমানগণ এইরূপ সংযমহীন হইয়া পড়িয়াছে।

(৩) একদিকে একাধিক স্ত্রী গ্রহণের বিধি থাকার কারণে মুছলমানগণ আদৌ সংযমহীন। অন্যদিকে তাহারা যখন নিজেদের আর্থিক দৈন্যের কথা ভাবিয়া দেখে, এবং একাধিক স্ত্রী গ্রহণ করিলে তাহাদের যে ব্যয় বৃদ্ধি হইয়া যাইবে—সঙ্গে সঙ্গে সে চিন্তাও যখন তাহারা করে, তখন একাধিক স্ত্রী গ্রহণ করাকে তাহারা অদুরদর্শিতার কথা বলিয়া মনে করে। ফলে তাহারা একাধিক বিবাহ না করিয়া অবৈধ ব্যভিচারে লিপ্ত হইয়া পড়ে এবং "জীবনের স্বাস্থ্য" ইত্যাদি দ্রুতগতিতে হারাইয়া ফেলে।

লেখকের এই সিদ্ধান্তকে সঙ্গত বলিয়া গ্রহণ করিলে তাহার স্পষ্ট অর্থ এই দাঁড়াইবে যে,

(১) একাধিক স্ত্রী গ্রহণের বিধি বা অনুমতি যে সমাজে আছে, সংযমের অস্তিত্ব সে সমাজে আদৌ থাকিতে পারে না।

(২) একাধিক স্ত্রী গ্রহণের ব্যবস্থা যে সমাজে নাই, সেই সমাজের ব্যক্তিগণের জীবন সংযমে পরিপূর্ণ।

(৩) একাধিক স্ত্রী গ্রহণের অনুমতি দিয়াই এছলামধর্ম্ম মুছলমান সমাজকে সংযমহীন ও চরিত্র-বর্জ্জিত হইতে বাধ্য করিয়াছে।

(৪) সংযমী ও চরিত্রবান পুরুষ মুছলমান সমাজে 'একরূপ দুর্ল্লভ।'

এছলাম ধর্ম্ম ও মুছলমান জাতির বিরুদ্ধে লেখকের এই অন্যায় সিদ্ধান্ত পাঠ করিয়া আমরা যাহারপরনাই দুঃখিত হইয়াছি। মুছলমানেরা যে সাধারণতঃ সংযমহীন চরিত্রহীন ও ব্যভিচারপরায়ণ, ইহাকে লেখক প্রথমে অবিসম্বাদিত সত্য বলিয়া ধরিয়া লইয়াছেন, এবং তাঁহার অন্য অভিমতগুলির ভিত্তি একমাত্র এই সিদ্ধান্তের উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কিন্তু অশেষ পরিতাপের বিষয় এই যে, এছলাম ধর্ম্ম ও মুছলমান জাতির উপর এহেন ভীষণ আক্রমণ করার সময়, তিনি নিজের মন্তব্যের সমর্থনে কোনও প্রকার যুক্তি প্রমাণের উল্লেখ করা সঙ্গত বা আবশ্যক বলিয়া মনে করেন নাই। মুছলমানেরা যে সংযমহীন চরিত্রহীন ও ব্যভিচারপরায়ণ, এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার অনুকূলে লেখক মহোদয় কি কি যুক্তিপ্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহা প্রকাশ করার জন্য আমরা তাঁহাকে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ জ্ঞাপন করিতেছি। আমাদিগের মতে লেখকের মন্তব্যটী শুধু প্রমাণহীন উক্তিই নহে, বরং উহা সমস্ত

প্রত্যক্ষ প্রমাণের বিপরীত একটা অবাস্তব কল্পনা ব্যতীত আর কিছুই নহে। আমরা যাহা বলিতেছি, তাহা নিত্য প্রত্যক্ষ জাজ্জ্বল্যমান সত্য। লেখকের কথা মতে "জীবনের স্বাস্থ্য"কে বিচারের মানদণ্ডরূপে অবলম্বন করিয়া, বঙ্গোপসাগরের উপকুল হইতে হিস্পানিয়ার সীমান্ত পর্য্যন্ত চলিয়া যাও, এবং প্রত্যেক প্রদেশের মুছলমানের স্বাস্থ্য দৈহিক গঠন ও শক্তি সামর্থ্য পরীক্ষা করিয়া দেখ, বিশেষতঃ বাঙ্গালার অনশনক্লিষ্ট অজ্ঞ মুছলমান কৃষকের পানে দৃষ্টিপাত কর, তাহা হইলে আমাদিগের কথার সত্যতা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবে। গবর্ণমেণ্টের স্বাস্থ্যবিভাগের পরম্পরাগত বিবরণ ও তাহার দার্শনিক সিদ্ধান্ত, বিগত অর্দ্ধ শতাব্দীর আদম শুমারীর ধারাবাহিক রিপোর্ট ও তাহার ন্যায় সঙ্গত স্বাভাবিক বিশ্লেষণ এবং অন্যান্য সরকারী কাগজ-পত্রগুলি একবাক্যে আমাদিগের মতের সমর্থন করিতেছে। বলাবাহুল্য যে এক্ষেত্রে প্রমাণেরভার লেখকের স্কন্ধে ন্যস্ত রাহিয়াছে, সুতরাং আজ আমরা এসম্বন্ধে আর কিছু বলিব না।

মানুষের চরিত্রগত পতনের কারণগুলির সহিত একাধিক স্ত্রী গ্রহণের অনুমতির কোনই সম্বন্ধ নাই। যৌন-সংসর্গের যে বৃত্তি জীবদেহে স্বভাব কর্ত্তৃক নিহিত রাখা হইয়াছে, তাহাকে অস্বীকার করা মানুষের পক্ষে সঙ্গত নহে, সম্ভবপরও নহে। আদৌ বিবাহের অনুমতি না থাকিলেও মানুষ স্বভাবতঃ সেই সম্ভোগ-লিপ্সার হাত এড়াইতে পারিত না। কাজেই সেই রিপুগত প্রবৃত্তির প্রভাব হইতে মানুষের মন ও মস্তিষ্ক কখনও সম্পূর্ণভাবে মুক্ত হইতে পারে না। তাহাকে অপব্যবহার ও 'অত্যাচার হইতে নিবৃত্ত' রাখা এবং প্রাকৃতিক আবশ্যকতা অনুযায়ী যথাযথ ব্যবহারের জন্য সুনিয়ন্ত্রিত করিয়া দেওয়াই ধর্ম্মশাস্ত্রের কাজ। লেখক যে যুক্তিসূত্র অবলম্বন করিয়া তাঁহার কার্য্যকারণপারম্পার্য্য নির্দ্ধারণ করিয়াছেন, তদনুসারে, চরিত্রবান হইতে গেলে মানুষকে প্রথমে সেই স্বভাব প্রবৃত্তির সম্পূর্ণ ধ্বংস সাধন করিয়া লইতে হইবে। ফলে সংযমের অর্থ দাঁড়াইবে সংহার, এবং ইহাও অস্বাভাবিক ও অধর্ম্ম। ধর্ম্মের এই নিয়ম কানুনগুলির প্রতিপালন করার নামই সংযম এবং তাহাকে অমান্য করার ফলই পতন। যে সমাজ অথবা সমাজের যে স্তর ধর্ম্মের অনুশাসনকে যে পরিমাণে অস্বীকার করিয়াছে, চরিত্রের হিসাবে তাহাদের ততই পতন হইতেছে, আশা করি একথা সপ্রমাণ করার জন্য অধিক বাক্য ব্যয়ের দরকার হইবে না। ফলতঃ এ ক্ষেত্রে যুক্তির হিসাবে এক স্ত্রী গ্রহণ বা একাধিক স্ত্রী গ্রহণের অনুমতি থাকা অথবা আদৌ স্ত্রী গ্রহণের অনুমতি না থাকা একই কথা, তাহা চরিত্রগত পতনের মূলীভূত কারণরূপে কখনই গৃহীত হইতে পারে না। ইহার একমাত্র কারণ হইতেছে ধর্ম্মের বিধানকে অস্বীকার করা এবং ধর্ম্মের নৈতিক শিক্ষাকে ভুলিয়া যাওয়া। শিক্ষা সংসর্গ ও রাজবিধান "চিন্তার মুক্তি" ও "মানুষের ব্যক্তিগত স্বাধীনতার" নামে আজকাল এই মরণের পথকে সুগম করিয়া দিতেছে।

লেখকের মন্তব্যে বলা হইয়াছে যে, মুছলমান যে সংযম ও চরিত্রহীন, একাধিক স্ত্রী গ্রহণের বিধিই তাহার একমাত্র কারণ। তাহা হইলে মোটামুটি ভাবে একথা ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে যে, যে সকল সমাজে একাধিক বিবাহের বিধি নাই, বরং নিষেধ আছে; সংযম বর্জ্জিত ও চরিত্রহীন মানুষ তাহাদের মধ্যে একপ্রকার দুর্ল্লভ। কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে আমরা ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত ফল দেখিতে পাইতেছি। ইউরোপ ও আমেরিকা একাধিক বিবাহের নামে শিহরিয়া উঠে, ইহা সকলেই অবগত আছেন। কিন্তু চরিত্রের হিসাবে ঐ সকল দেশ যে এশিয়ার তুলনায় কতদূর অধঃপতিত, তাহার পরিচয় দিতে যাওয়াও সুরুচি ও শ্লীলতার বিপরীত।

লেখকের মন্তব্যটী কতকগুলি পরস্পর-নির্ভরশীল অন্যায় সিদ্ধান্তের সমষ্টি ব্যতীত আর কিছুই নহে। মুছলমান সমাজে হাজারকরা একজন পুরুষও একাধিক স্ত্রী গ্রহণ করে না। লেখক বলিতেছেন—আর্থিক দৈন্যই ইহার একমাত্র কারণ। কিন্তু আমরা দেখিতেছি, ইহাদের মধ্যে অনেক লোক একাধিক স্ত্রীর ভরণপোষণে আদৌ অসমর্থ নহে। তত্রাচ তাহারা একাধিক স্ত্রী গ্রহণ করিতে প্রস্তুত হয় না। আবার একাধিক স্ত্রী গ্রহণ করিলে, তাহাদ্বারা সকল অবস্থার সমস্ত লোকের যে আর্থিক হিসাবে বিশেষ কোন ক্ষতি হয়, ইহাও অসঙ্গত কথা। পক্ষান্তরে একাধিক স্ত্রী গ্রহণে আর্থিক দৈন্যের যে ভাবনা মানুষের মনে জাগিয়া উঠে, অবৈধ সংসর্গে বা ব্যভিচারে লিপ্ত হইলে সে তুলনায় যে অল্প অর্থহানির আশঙ্কা থাকে, মানুষের সাধারণ অভিজ্ঞতা ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত। একাধিক বিবাহ করার ফলে আর্থিক হিসাবে মানুষ ধ্বংস হইয়া গিয়াছে, ইহার কোন নজির জনসাধারণ দেখিতে পায় না। কিন্তু অবৈধ নারী সংসর্গের ফলে বহু লক্ষপতিকে

তাহারা পথের ফকির হইতে দেখিয়াছে। ফলে কথিত অবস্থায় একাধিক স্ত্রী গ্রহণ না করিয়া তাহাদের ব্যভিচারে লিপ্ত হইয়া যাওয়ার কোনই কারণ নাই। যে এছলাম অবস্থা বিশেষে পুরুষকে একাধিক স্ত্রী গ্রহণের অনুমতি দিয়াছে, স্ত্রীর প্রতি পুরুষের অপরিহার্য্য কর্ত্তব্য এবং সেই কর্ত্তব্য ত্যাগের কুফলের কথাও সেই এছলাম যুগপৎভাবে মুছলমানকে বিশেষ তাকিদের সহিত বুঝাইয়া দিয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে দাম্পত্য জীবনের আদর্শ ও পারিবারিক জীবনের অশান্তি ইত্যাদির কথাও মুছলমানের অবিদিত নহে। এই সকল কারণে তাহারা সাধারণতঃ একাধিক স্ত্রী গ্রহণের সমর্থন করে না। মজার কথা দেখুন, একাধিক বিবাহের অনুমতি আছে —এই খিয়ালের ঔপন্যাসিক মনস্তত্ত্বের নৈয়ায়িক বিশ্লেষণের দার্শনিক সিদ্ধান্তের আধ্যাত্মিক প্রভাব ফলে, দুনয়ার চল্লিশ কোটি মুছলমান একেবারে সংযমহীন চরিত্রহীন ও ব্যভিচার-পরায়ণ হইয়া পড়িতে পারিল,—কিন্তু চরিত্রের পবিত্রতা রক্ষা সম্বন্ধে এছলাম দুনয়ায় যে স্পষ্ট শিক্ষার প্রচার ও মহৎ আদর্শ প্রতিষ্ঠা করিয়াছে, ব্যভিচারের সর্ব্বধ্বংসী মহাপাতক এবং তাহার দণ্ড ও পরিণাম সম্বন্ধে এছলাম যে উপদেশ ও ব্যবস্থা প্রদান করিয়াছে, মুছলমানের জীবনে তাহার কোন প্রভাব বিস্তারিত হওয়া সম্ভবপর হইল না! অন্যদিকে, অসংযমী মুছলমান ব্যভিচারে লিপ্ত হইয়া নিজের ও স্বজনগণের সর্ব্বনাশ সাধনে এক বিন্দুও কুণ্ঠিত হইতেছে না—"জীবনের স্বাস্থ্যের" সঙ্গে সঙ্গে সে নিজ "জীবনের সম্পদও" দ্রুতগতিতে হারাইয়া ফেলিতেছে। কিন্তু সেই অসংযমী মুছলমানই আবার পরম সংযমী দূরদর্শী অভিজ্ঞের ন্যায় সেই সম্পদের আংশিক ক্ষতি হওয়ার ভয়ে একাধিক বিবাহকে বিষবৎ পরিত্যাগ করিতেছে! এ সকল যুক্তির সারবত্তা হৃদয়ঙ্গম করা আমাদিগের পক্ষে অসম্ভব।

---

## আলেকজন্দ্রিয়ায় পুস্তকাগার

মিছর জয় করার সঙ্গে সঙ্গে মুছলমানগণ আলেকজন্দ্রিয়ার বিখ্যাত পুস্তকাগারটী ধ্বংস করিয়া ফেলিয়াছিলেন, খৃষ্টান লেখকগণের কল্যাণে একথা দুনয়াময় প্রচারিত হইয়াছে। মুছলমানদিগের সম্বন্ধে ইউরোপে এই শ্রেণীর যে সব অপবাদ আজ পর্য্যন্ত প্রচারিত হইয়াছে, তাহার অধিকাংশের মূল উৎস লাটিনভাষায় পাওয়া যায়। আবুল ফরজ জামালুদ্দিন নামক জনৈক ঐতিহাসিকের مختصر تاريخ الدول ودول المصر নামক আরবী ইতিহাসের লাটিন অনুবাদ ১৬৬৩ খৃষ্টাব্দে অধ্যাপক পোকক কর্ত্তৃক অক্‌সফোর্ড হইতে প্রথম প্রকাশিত হয়। আলেকজন্দ্রিয়ার পুস্তকাগার-ধ্বংসের অপবাদ সর্ব্বপ্রথমে এই পুস্তকের মারফতে প্রচারিত হইয়াছিল। গীবন হইতে শিবলী পর্য্যন্ত কএক জন বিশিষ্ট ঐতিহাসিক নানারূপ সূক্ষ্ম সমালোচনা করিয়া দেখাইয়াছেন যে, জামালুদ্দিনের এই উক্তি ভিত্তিহীন অপবাদ ব্যতীত আর কিছুই নহে। গীবন প্রমুখ ন্যায়নিষ্ঠ লেখকগণ দেখাইয়াছেন যে, Royal Library of Alexanduria নামক যে পুস্তকালয়ের ধ্বংস সম্বন্ধে মুছলমান-দিগের উপর দোষারোপ করা হইয়াছে, মুছলমান-আক্রমণের সময় মিছরে তাহার অস্তিত্বই ছিল না। বস্তুতঃ আরব আক্রমণের ২৫০ বৎসর পূর্ব্বে জালিনুসের Gallienus (২৬৩ খৃষ্টাব্দ) রাজত্ব কালে খৃষ্টানদিগের দ্বারাই তাহা ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। সিরাপিউমের পুস্তকালয়টীরও পূর্ব্বে এইরূপ পরিণতি হইয়াছিল। গীবন আরও দেখাইয়াছেন যে, মিছরের দুইজন বিখ্যাত খৃষ্টান ঐতিহাসিক (Eutychius and Al Makin) তাঁহাদের ইতিহাসে মুছলমানদিগের মিছর-আক্রমণের বর্ণনাকালে পুস্তকালয় সম্বন্ধে কোন প্রসঙ্গেরই অবতারণা করেন নাই। তাঁহার মতে ক্রুসেড-অভিযানের নায়ক কাউণ্ট বার্ত্তরাম (Bertram) ত্রিপলীর বিখ্যাত পুস্তকালয়টী—তাহার মধ্যে মোহাম্মদের শিক্ষা স্থানপ্রাপ্ত হইয়াছে বলিয়া—সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করিয়াদেন। খৃষ্টানদিগের এই কলঙ্ক ঢাকা দিবার জন্য তাঁহারা এই নীচ অপবাদ রটনা করিয়াছেন মাত্র। "মোছলেম আউটলুক" পত্রের জনৈক লেখক এই সকল কথার উল্লেখ করিয়াছেন। কথাগুলি যে খুবই সঙ্গত, তাহাতে আর কোনও সন্দেহ নাই।

এ সম্বন্ধে আরও অনেক কথা আছে। তাহার মধ্যে উপরোক্ত আবুল ফরজ জামালুদ্দিন সাহেবের পরিচয় একটা প্রধানতম বিষয় বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। অন্যান্য কতিপয় লেখকের ন্যায় মোছলেম আউটলুকের লেখকও যে এই "জামালুদ্দিন" নাম দেখিয়া একটু বিচলিত হইয়া পড়িয়াছেন, তাঁহার আলোচনার ধারা হইতে তাহা বেশ পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে জানা যাইবে যে, এই আবুল ফরজ জামালুদ্দিন সাহেব আদৌ মুছলমান নহেন এবং তাঁহার প্রকৃত নাম জামালুদ্দিনও নহে। প্রকৃত পক্ষে

দেশের হিসাবে তিনি আর্ম্মানী, ধর্ম্মের হিসাবে তিনি খৃষ্টান এবং ব্যবসার হিসাবে তিনি একজন পাদ্রী। তাঁহার প্রকৃত নাম Gregoreus এবং মুছলমান সাম্রাজ্যকে ধ্বংস করার জন্য আর্ম্মেনিয়ার যে সকল খৃষ্টান পরিবার ইউরোপের সহায়তায় অবিরাম ষড়যন্ত্র করিয়া আসিয়াছে, তাহারই একটী বিশিষ্ট বংশে, ৬২৩ হিজরী বা ১২২৬ খৃষ্টাব্দে ইঁহার জন্ম হয়। এই সময় সিরিয়ার খৃষ্টান সমাজ "পবিত্র ভূমি"কে হিদেন-মুছলমানের কবল হইতে মুক্ত করার জন্য ইউরোপের রাজন্যবর্গের সহিত যে সকল ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইয়াছিলেন, এবং ইউরোপের জনসাধারণকে উত্তেজিত করার উদ্দেশ্যে তাঁহারা মুছলমানের নামে যে সকল জঘন্য অপবাদ রটনা করিয়াছিলেন, ইতিহাস-পাঠকগণের তাহা অবিদিত নহে। আগামীতে আমরা তাহার দুই চারিটী নমুনা দিবার চেষ্টা করিব। আমাদিগের তথাকথিত জামালুদ্দিন সাহেব এই দলের একজন প্রধান নায়ক। ক্রুসেড যুদ্ধের শেষভাগে যখন পোপ দশম গ্রেগরী এবং সেণ্টলুইসের ষড়যন্ত্র ও অধিনায়কতার ফলে খৃষ্টান ইউরোপ নিজেদের 'মরণ কামড়' স্বরূপ ষষ্ঠ ও সপ্তম ক্রুসেড-অভিযানে লিপ্ত হয়, আমাদিগের এই জামালুদ্দিন সাহেব তখন, ক্রুসেড অভিযানের প্রধান লক্ষ্যস্থল উত্তর সিরিয়ার সর্ব্বপ্রধান পাদ্রীর পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। আমরা ইতিহাসে দেখিতে পাই যে, ১২৫০ সালে সেণ্টলুইস মুছলমানদিগের নিকট সম্পূর্ণ পরাজিত ও তাহাদের হাতে বন্দী হন। অবশেষে আট লক্ষ মোহর মুক্তিপণ ও মুছলমানদিগের ইচ্ছানুযায়ী সন্ধিপত্র লিখিয়া দিয়া তিনি মুক্তি লাভ করেন। তাহার পরও মুছলমানদিগের বিরুদ্ধে সমান ভাবে ষড়যন্ত্র ও প্রোপাগ্যাণ্ডা চলিতে থাকে এবং দশম গ্রেগরীর মৃত্যুতে ( ১২৭৬ খৃষ্টাব্দে ) এই আন্দোলন সাময়িক ভাবে মন্দীভূত হইয়া পড়িলেও, নীচ ষড়যন্ত্র যে তাহার পরও বহুদিন পর্য্যন্ত পরিচালিত হইয়াছিল, ক্রুসেডের ইতিহাসে তাহার অনেক স্পষ্ট প্রমাণ দেখিতে পাওয়া যায়। সিরিয়ার এই সর্ব্বপ্রধান ধর্ম্মযাজক, পোপ গ্রেগরীর মিতা ও বন্ধু এই পাদ্রী গ্রেগরী, তখন জামালুদ্দিন নাম গ্রহণে তাহার সুরয়ানী ভাষায় লিখিত ইতিহাসের আরবী সংস্করণ লিপিবদ্ধ করেন। সুতরাং তাঁহার পুস্তকে এই শ্রেণীর অপবাদের স্থান লাভ করাই যে স্বাভাবিক, তাহা আর কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না। এখানে আর একটা গুরুতর বিষয়ের প্রতি পাঠকগণের মনোযোগ আকর্ষণ করা অত্যাবশ্যক বলিয়া মনে হইতেছে। খৃষ্টান লেখক ও সম্পাদকগণের, বিশেষতঃ লাটিন অনুবাদকদিগের এবং তাহার মধ্যে আবার বিশেষ করিয়া পোকক সাহেবের মধ্যবর্ত্তিতায় যে সকল মূল আরবী পুস্তক বা তাহার অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার উপর আস্থা স্থাপন করার সময় বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা আবশ্যক। অন্যথায় সময় সময় পাঠককে ভয়ঙ্কর ভাবে প্রবঞ্চিত হইয়া পড়িতে হয়। এই সুরয়ানী ইতিহাস ও তাহার আরবী অনুবাদ সম্বন্ধেও সন্দেহ করার অনেক কারণ আছে। (১)

## পাশ্চাত্য গবেষণার নমুনা

পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ এছলাম সম্বন্ধে নানাপ্রকার 'গভীর গবেষণার' লিপ্ত হইয়া তাহার যে সকল উৎকট ফল দুনয়ার সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলে ক্ষোভে বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া পড়িতে হয়। ইউরোপের ধীমান পণ্ডিতেরাও সাময়িক গরজ ও রাজনৈতিক আবশ্যকতার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া কিরূপে যুগের পর যুগ ধরিয়া অতি জঘন্য মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ পূর্ব্বক একটা জাতি, একটা ধর্ম্ম ও একজন মহামানবের নামে ইচ্ছাপূর্ব্বক অতি হীন ও অতি কঠোর আক্রমণ চালাইতে পারেন, ইহা হয়ত এদেশের অনেকের জানা নাই। সেই জন্য এছলাম সম্বন্ধে কিছু জানিতে বা বলিতে হইলে তাঁহারা সোজাসুজি পাশ্চাত্য লেখকগণের দ্বারস্থ হন। অধিকাংশ সময়ই ইহাতে হিতে বিপরীত ফল ফলিয়া থাকে, তাহা বলাই বাহুল্য। আজকাল ইংরাজীর মধ্যবর্ত্তিতায় মুছলমানের ধর্ম্ম-শাস্ত্রের বাঙ্গলা অনুবাদ করাও আর দোষের কথা বলিয়া মনে করা হইতেছে না। এই শ্রেণীর সাহিত্যিক ও অনুসন্ধিৎসু পাঠকগণকে পাশ্চাত্য লেখকগণ সম্বন্ধে সতর্ক করার জন্য আজ অতি সংক্ষেপে তাঁহাদের গবেষণার কএকটা নমুনা নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

### (১) মোহাম্মদ কে ?

মুছলমান হইতেছে একটী অবিশ্বাসী ঘোর পৌত্তলিক জাতি। তাহাদের উপাস্য ভগবানের নাম—মোহাম্মাদ। মুছলমানেরা এই "মোহাম্মাদ—ভগবানের" নিয়মিত পূজা অর্চ্চনা করিয়া থাকে। ফিলিস্তীনের মুছলমানেরা এই মোহাম্মাদ ভগবানের পূজার সময় কি স্তোত্র পাঠ করিত, এক

(১) ক্রুসেড যুদ্ধ-সংক্রান্ত ইতিহাস এবং এডওয়ার্ড কর্ত্তৃক প্রণীত 'একৃতেকাউন রুম্' প্রভৃতি দ্রষ্টব্য।

মহাগবেষক তাহা উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছেন। তাহা এইরূপ :—

**"সকল প্রশংসা আমাদের ঈশ্বর দয়াময় মোহাম্মদের প্রতি। হে লোক সকল, আনন্দধ্বনি কর এবং সেই মোহাম্মদ ভগবানের উদ্দেশ্যে বলিদান কর। তবেই আমাদের ভীষণ শত্রুগণ দমিত এবং ধ্বংস প্রাপ্ত হইবে।"**

দেখ—Ecclasiastical History of England, Normandy Vol 3, pp 175—76.

## (২) যাদুকর আরব

আরব জাতিটা কেবল পৌত্তলিকই নহে। আমাদের পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা অনেক গভীর গবেষণার পর প্রকাশ করিয়াছেন যে, সঙ্গে সঙ্গে তাহারা ঐন্দ্রজালিক ভেল্কীবাজ ও ভয়ঙ্কর যাদুকর জাতি। তাঁহারা ইউরোপবাসীকে উত্তমরূপে বুঝাইয়া দিয়াছেন যে মুছলমানদিগের মধ্যে যে কিন্দী, ছাবেত-বেন-কোররাহ, গেবের, অ্যাভেসিনিয়া প্রভৃতির নাম শুনিয়া থাক, প্রকৃতপক্ষে দর্শন বিজ্ঞানের সহিত তাহাদের কোন সম্বন্ধ নাই। তাহারা হইতেছে এক একটা জবরদস্ত Daemonographer বা দৈত্যচালক। আর মোহাম্মাদ ইহাদের প্রথম শিক্ষক ও প্রধান অধ্যাপক। William of Malesbury's Chronical ১১৩—১৪ পৃষ্ঠা (১৮৮৪ সালে মুদ্রিত) এবং History of Magic প্রভৃতি দ্রষ্টব্য। এই যাদুবিদ্যার ফলে ছোলতান ছালাহুদ্দিন রিচার্ডের জন্য দুইটী ভয়ঙ্কর প্রেতিনীকে আরবীয় ঘোটকের আকারে পরিণত করিয়া দিয়াছিলেন। ভাগ্যে এক স্বর্গীয় দূত ইহা জানিতে পারিয়া রিচার্ডকে সতর্ক করিয়া দিয়াছিলেন, নচেৎ এই যাদুর ফলে তাঁহাকে যে অচিরে সসৈন্যে ধ্বংস প্রাপ্ত হইতে হইত, সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ করা যায় না। Romance of King Richard পুস্তকখানা পড়িয়া দেখিলে পাঠকগণ এ সকল অভিনব তথ্য অবগত হইতে পারিবেন।

## (৩) মুছলমানের শূকরবিদ্বেষ

পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মতে আরবেরা কুকুর বিড়ালের মাংস বিনা আপত্তিতে ভক্ষণ করিয়া থাকে। অথচ শূকর মাংসের নাম করিলে তাহারা শিহরিয়া উঠে, ইহার কারণ কি? এই প্রশ্নের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদিগের গবেষণা আরম্ভ হইয়া গেল। অনেকে অনেক কথা কহিলেন। অবশেষে বিখ্যাত ঐতিহাসিক Roger of Wendover ইহার প্রকৃত তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়া পাশ্চাত্য জ্ঞান-জগতের অশেষ ধন্যবাদের পাত্র হইলেন। তাঁহার আবিষ্কারের সারমর্ম্ম এই যে—এক দিন বিকাল বেলা মোহাম্মদ খুব মাতাল অবস্থায় নিজের বাড়ীতে বসিয়া আছেন, এমন সময় তাঁহার অভ্যস্ত মূর্চ্ছাবায়ু রোগের লক্ষণ দেখা যায়। মোহাম্মদ তখন ব্যস্তেত্রস্তে সে স্থান হইতে সরিয়া পড়িলেন। যাইবার সময় বলিয়া গেলেন যে, একজন ফেরেশতার আহ্বান মতে তিনি কোন বিশেষ কাজের জন্য স্থানান্তরে গমন করিতেছেন। এ সময় কেহ তাঁহার অনুসরণ করিলে ফেরেশতার কোপে পড়িয়া তাহাকে ধ্বংস হইতে হইবে। লোকালয় হইতে সরিয়া গিয়া তিনি ভাবিলেন, মূর্চ্ছার ফলে মাটিতে পড়িয়া গেলে বেশী ব্যথা লাগিতে পারে। তাই একটা গোবরের স্তূপের উপর উঠিয়া বসিলেন, এবং সে খানেই তিনি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। তাহার পর সেই গোবরের স্তূপের উপর গড়াগড়ি দিতে ও দাঁত কড়মড় করিতে লাগিলেন। ইহা দেখিতে পাওয়া মাত্র একদল বন্যবরাহ ছুটিয়া আসিয়া তাঁহাকে দন্তাঘাতে ছিন্ন-বিছিন্ন করিয়া ফেলিল, এবং সেই গোবরগাদার উপর এইরূপে মোহাম্মদের জীবনলীলা সমাপ্ত হইয়া গেল। শূকরের চীৎকার শুনিয়া তাহার স্ত্রী পরিজনবর্গ সেখানে আসিয়া দেখিল, প্রভুর শরীরের অধিকাংশই শূকরেরা খাইয়া ফেলিয়াছে। তখন তাঁহারা সেই অবশিষ্ট অংশগুলিকে কুড়াইয়া একটা সোণালী কাজ করা পেটির মধ্যে লুকাইয়া ফেলিল, আর জনসাধারণের নিকট ঘোষণা করিয়া দিল যে, আল্লার ফেরেশতারা প্রভুকে সশরীরে বেহেস্তে লইয়াগিয়াছে। রাণী এলিজাবেথের সময় বিখ্যাত পাদ্রী হেনরী স্মিথ মহাশয় এ গল্পটী জোর গলায় প্রচার করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। দেখ Flowers of History প্রথম খণ্ড, ১৪ পৃষ্ঠা, ১৮৪৯ সালে মুদ্রিত। ইহা ব্যতীত "গোল্ডেন লিজেণ্ড" প্রভৃতি পুস্তকে শূকর সংক্রান্ত আরও বহু অভিনবতত্ত্বের সন্ধান পাওয়া যায়। ফাদার যেরোম ডাণ্ডিলী তাঁহার Voyage to mount Libanus পুস্তকের অষ্টম অধ্যায়ে লিখিতেছেন:—প্রকৃত কথা এই যে, মোহাম্মদ মূছা প্রভৃতি নবীর মত কোন মো'জেজা দেখাইতে না পারিয়া ভারি খাট হইয়া যাইতেছিলেন। তাই

অতএব আঁটিয়া তিনি মাটির তলে কতকগুলি জলপূর্ণ পাত্র লুকাইয়া রাখেন। ইচ্ছা ছিল, পরদিন লোকদিগের সামনে বুজরুকী দেখাইবার জন্য পাত্রগুলির কথা বলিবেন। হইলও তাহাই। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে, কতকগুলি শূকর নরম মাটি দেখিয়া জায়গাটা পূর্ব্ব রাত্রেই খুঁড়িয়া ফেলে, তাহাতে পাত্রগুলি ভাঙ্গিয়া চুরিয়া তছনছ হইয়া যায়। নিজের শ্রেষ্ঠতম নবী হওয়ার সব ষড়যন্ত্র এইরূপে বিফল হইতে দেখিয়া, এই অনিষ্টের মূল কারণরূপ শূকর জাতির প্রতি মোহাম্মদ অতিমাত্রায় ক্ষুন্ন হইয়া পড়েন।

## (৪) রাজনৈতিক গবেষণা

১৭শ শতাব্দীর মধ্যভাগে তুর্কীদের সম্বন্ধে কতকগুলি নূতন গবেষণার আবশ্যক হইয়া পড়িলে, ইংলণ্ডের যাজক গবেষক ও রাজনীতিক দল আশ্চর্য্যরূপে একটা লোমহর্ষণ আবিষ্কার করিয়া ফেলেন। সঙ্গে সঙ্গে সেই আবিষ্কার ফল জনসাধারণকে জানাইবার জন্য যে পুস্তকখানা প্রকাশ করা হইয়াছিল, তাহার উপরে লিখিত ছিল :—

**"Strange and miraculous news from Turke, sent to our English Ambassador of a woman who was seen in the firmament with a book in her hand at Medina-tel-nabi"** **( London, 1642, Lowndes )**

পুস্তকখানিতে নিম্নলিখিত অভিনব তত্ত্বের সন্ধান দেওয়া হইয়াছে :—

বৃটিশ রাজদূতের নিকট তুর্কী হইতে সংবাদ আসিয়াছে যে, বিগত ২০শে সেপ্টেম্বরের নিশীথ কালে, আরবের ভণ্ড নবী মোহাম্মাদের সমাধির উপর দিয়া ভীষণ ঝঞ্ঝা বহিয়া যাইতে থাকে, পুনঃ পুনঃ অসংখ্য বজ্রনিনাদ ও বিদ্যুৎপাতের ফলে লোকজন ভয়ে ত্রাসে একেবারে হতবুদ্ধি হইয়া পড়ে। অতঃপর প্রকৃতি শান্তভাব ধারণ করিলে আকাশের গায়ে উজ্জ্বল আরবী অক্ষরে একটা লেখা দেদীপ্যমান হইয়া উঠিল। সকলে সবিস্ময়ে পাঠ করিল :—অহো! তোমরা মিথ্যাকে বিশ্বাস করিতেছ কেন?" পরদিন দুইটা হইতে তিনটার মধ্যে দেখা গেল, এক শুভ্র বেশধারী রমণীমূর্ত্তি উত্তর পশ্চিম দিক হইতে আগমন করিয়া সূর্য্যকে বেষ্টন করিয়া বসিলেন, তাঁহার হাতে পুস্তক, মুখে প্রফুল্লতা। আবার দেখা গেল, আরবী পার্সী ও তুর্কি বাহিনী একত্র হইয়া সেই রমণীকে আক্রমণ করিতে যাইতেছে। এই সময় তিনি দাঁড়াইয়া যেই নিজের হাতের কেতাবখানা খুলিলেন, মুছলমানগণ অমনি কোথায় অদৃশ্য হইয়া গেল। এক দরবেশ ইহার অর্থ মুছলমানদিগকে বুঝাইয়া দিয়া বলিতে লাগিলেন —"দেখ, মোহাম্মদের মিথ্যা ধর্ম্ম আর চলিবে না। স্বর্গের দেবী বাইবেল লইয়া সমাগত হইতেছেন। এখন মিথ্যা ধর্ম্ম ও প্রতারক নবীর স্থলে দুনয়ায় প্রভু যীশু খৃষ্টের প্রতিষ্ঠা হইবে। সমস্ত আরব, সমস্ত তুর্কি এবং সমস্ত ইরানী এক যোগে যুদ্ধ করিলেও এছলাম ধর্ম্ম আর রক্ষা পাইবে না। মুছলমানেরা এই দরবেশের উপদেশ না শুনিয়া তাহাকে হত্যা করিয়া ফেলিয়াছে।

পাশ্চাত্য গবেষণা সম্বন্ধে এই প্রকার আরও অনেক নমুনা আমাদের নিকট সংগৃহীত আছে। ইহা ব্যতীত প্রাচ্যবিদ্যা-বিশারদ orientalist পণ্ডিতগণের বহু লোমহর্ষণ গবেষণা সম্বন্ধেও বলিবার অনেক কথা আছে। আগামীতে তাহা পাঠকগণের খেদমতে উপস্থিত করার ইচ্ছা রহিল।

---

## মেও-পিলচার আন্দোলন

মিস মেও তাঁহার পুস্তকে এবং মিঃ পিলচার তাঁহার বক্তৃতায় হিন্দু নারীচরিত্র সম্বন্ধে যে সকল অন্যায় অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা লইয়া হিন্দু সমাজে ঘোর প্রতিবাদ আরম্ভ হইয়াছে। অন্যান্য সম্প্রদায়ের ন্যায়নিষ্ঠ ব্যক্তিরাও এই প্রতিবাদে যোগদান করিতেছেন, ইহা সুখের বিষয়। বিভিন্ন রুচি, বিভিন্ন শিক্ষা, বিভিন্ন মানসিকতা ও বিভিন্ন পারিপার্শ্বিক অবস্থার কোটি কোটি নরনারীর সমবায়ে যে সকল সমাজদেহ গঠিত হইয়া থাকে, তাহার বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন প্রকারের ত্রুটিবিচ্যুতি বিদ্যমান থাকা অস্বাভাবিক নহে। এই হিসাবে দুনয়ার সব সমাজে দোষ ত্রুটি আছে—হিন্দু সমাজও এই সাধারণ নিয়মের অতীত নহে। কিন্তু কোন সমাজের জাতীয় চরিত্র সম্বন্ধে কোন প্রকার আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়ার সময়, তাহার গুণগুলি সম্বন্ধে চোখ বন্ধ করিয়া লইয়া, আমরা যদি কেবল তাহার দোষভাগের অবতারণা করি, অধিকন্তু নিজেদের কোন হীন উদ্দেশ্য সফল করার জন্য সেগুলিকে যদি ফুটাইয়া তোলার চেষ্টা করি, তাহা হইলে ইহাদ্বারা আমাদিগের নিরপেক্ষতার অভাব প্রমাণিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে, মনুষ্যত্বের দিক দিয়া আমাদিগের

অধঃপতনের পরিমাণটাও প্রকটমান হইয়া উঠিবে। পক্ষান্তরে চরিত্রগুলি যদি কল্পিত বা অতিরঞ্জিত হয়, তবে তাহাদ্বারা আমাদিগের মনের নীচতা ও রুচির কদর্য্যতাই প্রতিপাদিত হইবে মাত্র।

সাময়িক উদ্দেশ্য সফল করার উদ্দেশ্যে মিস্ মেও ও মিষ্টার পিলচার আজ যাহা লিখিয়াছেন বা বলিয়াছেন, তাঁহাদের স্বজাতীয়গণ ঠিক সেইরূপ উদ্দেশ্য সম্মুখে রাখিয়া, জগতের মোছলেম নারীচরিত্রকে, অতি জঘন্য বর্ণে চিত্রিত করতঃ বহু দিন হইতে তাহা দুনয়াময় প্রচার করিয়া আসিতেছেন। ছোলতান ও খলিফাদিগের 'হেরেমের' কল্পিত কদর্য্য চিত্র, মুছলমানের অন্তঃপুরের জঘন্য ছবি, এমন কি প্রাতস্মরণীয়া সতীসাধ্বী এবং বিদুষী ও বীরাঙ্গনা মোছলেম ললনাকুলের অযথা কুৎসা রটনা করিতে তাঁহারা কখনও কোন প্রকার দ্বিধা বা লজ্জা বোধ করেন নাই। কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় দেশের প্রতিভাবান হিন্দু ভ্রাতারা এ সকলের কোনও প্রতিবাদ করেন নাই, বরং তাহা পাঠ করিয়া তাঁহারা যেন বিশেষ আমোদ ও আনন্দ উপভোগ করিয়া আসিয়াছেন। অধিকন্তু এই সব পশ্চিমা গুরু মহাশয়দিগের পদাঙ্কের অনুসরণ করিয়া, তীব্রতর ভাষায় ও জঘন্যতর ভাবে বিগত অর্দ্ধ শতাব্দী ধরিয়া মোছলেম নারীচরিত্রের উপর তাঁহারা আক্রমণ চালাইয়া আসিতেছেন। তাঁহাদের বিশিষ্ট লেখকেরা, সাধারণ মুছলমান নারীদিগের, এবং বিশেষ করিয়া সম্ভ্রান্ত মোছলেম মহিলাবর্গের চরিত্র অঙ্কনে যেরূপ কদর্য্য রুচির পরিচয় দিয়াছেন, তাহা স্মরণ করিলেও পাপ হয়। ফলতঃ নারীচরিত্রের প্রতি সম্ভ্রম প্রদর্শনের প্রবৃত্তি হইতে তাঁহারাও যে বঞ্চিত, সত্যের অনুরোধে ইহা স্বীকার করিতে হইবে। তবে গুরু মহাশয়গণের বর্ত্তমান আক্রমণটা অতিশয় কঠোর হওয়ায় এবং তাহাকে নিজেদের আশু রাজনীতিক স্বার্থের প্রতিকূল মনে করায়, আজ তাঁহারা "মাতৃজাতির" নামকরণে এই আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছেন। বস্তুতঃ গুরু শিষ্যের বর্ত্তমান সংঘর্ষটা প্রকৃতির চক্ষুদান বা ধর্ম্মের প্রতিশোধ গ্রহণ ব্যতীত আর কিছুই নহে। মুছলমান পুরমহিলাগণও যে এই মাতৃজাতির অন্তর্গত, মুছলমানের হৃৎপিণ্ডও যে রক্তমাংসে নির্ম্মিত এবং মা-ভগ্নীর চরিত্রের উপর আক্রমণ হইতে দেখিলে তাহাতেও যে গভীর বেদনার তীব্র অনুভূতি জাগিয়া উঠিতে পারে—আমাদিগের মান্যস্পদ হিন্দু লেখকেরা এখন এ কথাটা বুঝিয়া থাকিলে, মেও-পিলচারের এই পৈশাচিক আক্রমণকেও আমরা দেশের পক্ষে কল্যাণকর বলিয়া মনে করিব।

---

## শরৎ বাবুর অভিমত

গেটে বলিয়াছেন—প্রত্যেক যুগে নূতন করিয়া ইতিহাস লেখার দরকার হইয়া থাকে। নূতন অনুসন্ধানের ফলে নূতন তত্ত্ব আবিষ্কৃত হয় বলিয়াই যে কেবল ইহার আবশ্যক হয়, তাহা নহে, বরং প্রত্যেক যুগে নিজেদের সাময়িক দরকার অনুসারে ইতিহাসের চিত্রগুলিকে নূতন বর্ণে রঞ্জিত করিয়া লওয়ার আবশ্যক হইয়া দাঁড়ায়। বলা বাহুল্য যে, ইতিহাস রচনার সময় পশ্চাত্য লেখকগণ এই "সাময়িক আবশ্যকতার" প্রতি দৃষ্টি রাখিতে কোন কালেই কুণ্ঠিত হন নাই। বরং অনেক সময় এক একটা "প্রোপগ্যাণ্ডা" চালাইবার উদ্দেশ্যেই যে তাঁহারা গ্রন্থ-রচনার আয়াস স্বীকার করিয়া থাকেন, তাহা তাঁহাদিগের বহি পুস্তক হইতে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে প্রমাণিত হইয়া যায়। ক্রুসেড যুদ্ধের পূর্ব্ব হইতে গত ইউরোপীয় সমরের অবসান পর্য্যন্ত মুছলমানদিগের সর্ব্বনাশ সাধনের একমাত্র উদ্দেশ্যে ইউরোপে এই শ্রেণীর অনেক বহিপুস্তক রচিত হইয়া আসিয়াছে। ইংরাজ পাদ্রী মহাশয়গণ গ্লাডষ্টোন বা লয়েড জর্জ জাতীয় মন্ত্রীদিগের ষড়যন্ত্রকে সমর্থন করার জন্য এ সম্বন্ধে যে সকল প্রচেষ্টা করিয়া আসিয়াছেন, তাহা অনেকের বিদিত আছে। এই শ্রেণীর ইংরাজ লেখকদিগের মধ্যে পাদ্রী সেল সাহেবের নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। সেল সাহেব পরের মুখে ঝাল খাইয়া কোরআনের এক বিকৃত অনুবাদ প্রণয়ন করেন এবং কোরআনের শিক্ষাকে জঘন্যতম বর্ণেচিত্রিত করার জন্য তিনি তাহাতে সাধ্যপক্ষে চেষ্টার ত্রুটি করেন নাই। বর্ত্তমান বাঙ্গলার শ্রেষ্ঠতম ঔপন্যাসিক, শ্রীযুত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় এছলাম ধর্ম্মে নারীর মূল্য সম্বন্ধে তত্ত্বানুসন্ধিৎসু হইয়া এই সেল সাহেবের ভূমিকার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন এবং তাঁহার বর্ণিত মন্তব্যগুলিকে অবিসম্বাদিত সত্যরূপে গ্রহণ করিয়া নিজের পুস্তকে এছলামের শিক্ষা সম্বন্ধে ভ্রান্ত অভিমত প্রকাশ করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন, বাস্তবিক ইহা অত্যন্ত দুঃখের কথা। শরৎ বাবু ইচ্ছা করিলে উপযুক্ত মুছলমান বা অপেক্ষাকৃত নিরপেক্ষ অ-মুছলমান লেখকগণের বিভিন্ন বাঙ্গলা ইংরাজী পুস্তক-

পুস্তিকা হইতে এ সম্বন্ধে যথেষ্ট সাহায্য গ্রহণ করিতে পারিতেন। মুছলমান সমাজে তাঁহার বিশেষ পরিচিত এমন দুই একজনের নামও আমরা অবগত আছি, যাঁহাদিগের নিকট একটা মুখের কথা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি এ সম্বন্ধে যথেষ্ট জ্ঞান অর্জ্জন করিতে পারিতেন। সে যাহাহউক, শরৎ বাবু সেল সাহেবের মন্তব্যগুলিকে নিজের উদ্দেশ্যের অনুকূল মনে করিয়াই যদি তাহাতে তৃপ্তি লাভ করা সঙ্গত মনে করিয়া থাকেন, তবে সে স্বতন্ত্র কথা। তাহা হইলে ইহা লইয়া আলোচনা করা অনর্থক হইবে। অন্যথায় আমরা শরৎ বাবুকে সসম্ভ্রমে জিজ্ঞাসা করিতে চাই—মিস মেও ও মিষ্টার পিলচারের মন্তব্যগুলিকে অবলম্বন করিয়া কোন মুছলমান যদি হিন্দু নারী-চরিত্র সম্বন্ধে অভিমত প্রকাশ করে, তাহা হইলে তিনি কি সেই মুছলমানের সেই কাজকে ন্যায় সম্মত ও যুক্তিসঙ্গত বলিয়া মনে করিতে পারিবেন? এছলামের চরম শত্রু পাদ্রী সেলের সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করিয়া এছলামের শিক্ষা বিশেষ সম্বন্ধে বিরুদ্ধ মন্তব্য প্রকাশ করা তাঁহার পক্ষে কতদূর অন্যায় হইয়াছে, আশা করি শরৎ বাবু নিজেই তাহা বিচার করিয়া দেখিবেন।

---

## ডারউইনের উদ্বর্ত্তনবাদ

ডারউইনের উদ্বর্ত্তন বা ক্রমবিকাশবাদের কথা আমরা সকলেই অল্পবিস্তর অবগত আছি। বিগত অর্দ্ধ শতাব্দী ধরিয়া দুনয়ায় এই মতবাদের জয়জয়কার চলিয়া আসিতেছে। এই সময় প্রাচ্যের ইউরোপ-পরস্ত মনীষীরাও নিজেদের পুঁথি পুস্তক ঘাঁটিয়া এমন সব দলিল প্রমাণ আবিষ্কার করিতে ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন, যাহাদ্বারা প্রতিপন্ন হইতে পারে যে, তাঁহাদের ধর্ম্মশাস্ত্র ও দর্শন-বিজ্ঞানাদির শিক্ষা ডারউইনের মতের প্রতিকূল নহে। কিন্তু পাশ্চাত্যের বিদ্বৎ-সমাজে ডারউইনের মতবাদ সম্বন্ধে বর্ত্তমানে যে প্রতিকূল আন্দোলনের সূত্রপাৎ হইয়াছে, তাহার আলোচনা দ্বারা বোঝা যাইবে যে, সেখানকার বিশিষ্ট পণ্ডিতগণের একদল এখন তাহাকে 'অন্যায় সিদ্ধান্ত' বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিতেছেন। লণ্ডনের Evening Standard পত্র ইহার আলোচনা-প্রসঙ্গে জোর গলায় বলিতেছেন যে, আজ হইতে ৫৬ বৎসর পূর্ব্বে মানব-সৃষ্টির আদিতত্ত্ব সমূহের সঙ্কলন ও বিশ্লেষণের পর, ডারউইন যখন তাঁহার The Descend of man প্রথমে প্রকাশ করেন, তখন তাঁহার মতের সমর্থনের জন্য যথেষ্ট সাহসের আবশ্যক হইত। কিন্তু "Now it demands at least eqecual courage to suggest that Darwin was wrong" ডারউইন যে ভ্রান্ত, তাহা প্রকাশ করার জন্য আজ আবার অন্ততঃ সেই পরিমাণ সৎসাহস প্রদর্শনের আবশ্যক হইতেছে"। সার আর্থার কিথ (Kieth) ডারউইনের পক্ষ সমর্থনে যে সকল কথা কহিয়াছেন, আমাদিগের ন্যায় অনধিকারী ব্যক্তিরাও তাহা পাঠে বুঝিতে পারিবেন যে, তাহাতেও ডারউইনের যুক্তি-প্রয়োগ-প্রণালী, এমন কি তাঁহার সিদ্ধান্ত সম্বন্ধেও প্রকারান্তরে অনেক গলৎ বাহির হইয়া পড়িতেছে। বলা বাহুল্য যে, এই সকল মতভেদের সমালোচনা করা এই মন্তব্যের উদ্দেশ্য নহে। ইহা দ্বারা আমরা এইটুকু দেখাইতে চাহিতেছি যে, সায়ন্স ও ফিলজফীর যে থিওরীগুলিকে আজ আমরা অবিসম্বাদিত সত্য বলিয়া মনে করিতেছি, তাহার উপর এখনও জ্ঞানের মশ্‌ক সমানভাবে চালিয়া যাইতেছে। সুতরাং দু'দিন পরে সেগুলির আমূল পরিবর্তন হইয়া যাওয়াও অসম্ভব নহে।

Printed and Published by Md. Khairul Anam Khan from the "Mohammadi Press",
29, Upper Circular Road, Calcutta.

বাজারে ফুটবল কিনিয়া যাঁহারা ঠকিয়াছেন তাঁহারা আমাদের নিজ ফ্যাক্টরীতে প্রস্তুত উৎকৃষ্ট চামড়ার সুগোল, সুন্দর ও মজবুত ফুটবলের জন্য অর্ডার দিন। বাংলা, বিহার ও আসামের যাবতীয় স্কুল, মাদ্রাসা ও প্রাইভেট ক্লাবে আমাদের ফুটবলই প্রচলিত।

## ব্লাডার সহ ফুটবল

প্রাক্‌টিস্—৫নং ৫।০, ৪নং ৩৸০, ৩নং ৩৲, ২নং ২॥০, ১নং ১৸০।

কামাল—৫নং ৬৲, ৫নং ৪৸০, ৩নং ৩॥০।

বিজয় আটখণ্ড উত্তম চামড়ার প্রস্তুত ৫নং ৭॥০, ৪নং ৫৸০, ৩নং ৪৲।

ভিলেজ মাষ্টার - ডবল সেলাই, খুব মজবুত, ৫নং ৮॥০, ৪নং ৬৲, ৩নং ৪॥০।

স্কুল ম্যাচ—বাছাই করা ১০ খণ্ড চামড়ায় প্রস্তুত, সর্ব্বত্র উচ্চ প্রশংসিত—৫নং ৯৲, ৪নং ৬॥০, ৩নং ৫৲ টাকা।

পল্টন—১২ খণ্ড বাছাই করা চামড়ায় প্রস্তুত, বেশ মোলায়েম, বহুদিন ব্যবহারেও আকার নূতনের মত থাকে। ৫নং ১০॥০, ৪নং ৮৲, ৩নং ৬।০ আনা।

কলেজ ম্যাচ—বড় বড় ক্লাবে প্রশংসার সহিত ব্যবহৃত। ১৮ খণ্ড বাছাই করা চামড়ায় প্রস্তুত ৫নং ১২॥০, ৪নং ৯৲।



কেবল মাত্র

ব্লাডার ৫নং ২৲, ৪নং১৸০, ৩নং ১।৶০, ২নং ১৶০, ১নং ৸৶০।

ইন্‌ফ্ল্যাটার— ছোট ১।০, মাঝারি ২৲, বড় ২॥০।

হুইসেল—একমি ১।০, সাধারণ ।০, ॥০ ও ৸০ আনা।

পত্র লিখিলে বিনামূল্যে রুল বুক পাঠান হয়।

ব্যাডমিণ্টন—বেশ আরামপ্রদ খেলা।

রেকেট (বেট) ইয়েলো উড্ প্রাক্‌টিস্ ১ খানা ১।০, ঐ স্প্যাসেল ১॥০, ছেলেদের ৸০।

শাটল্‌ কক—সাধারণ প্রতি ডজন ৩০; ভাল ৫।০, ৬৲ ও ৭॥০ জাল ১৫ ফিট ৸০, ১৮ ফিট ৸৶০, ২১ ফিট ১।০, ২৪ ফিট ১॥০, রুল বুক ।০ আনা।

পুরাতন র‍্যাকেট সারানও হয়।

## বেঙ্গল স্কুল সাপ্লাই এজেন্সী

২১নং রাজা লেন, আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

---

প্রসিদ্ধ বন্দুক বিক্রেতা।

আমরা প্রচুর পরিমাণ বন্দুক, রাইফেল, রিভলভার ও বন্দুকের সরঞ্জাম আমদানী করিয়া সুলভে বিক্রয় করিয়া থাকি।



বন্দুক, রাইফেল আমদানী কারক।

মফঃস্বলের অর্ডার সযত্নে সত্বর সরবরাহ করা হইয়া থাকে। পত্র লিখিলে সচিত্র ক্যাটালগ বিনামূল্যে পাঠাই।

## শ্রীঅবিনাশচন্দ্র কুণ্ডু এণ্ড কোং

১০নং চাঁদনী চক্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

# সাহি বটীকা।

সর্ব্বপ্রকার নূতন পুরাতন জ্বর, প্লীহা ও যকৃতের দাস্ত পরিষ্কারক মহৌষধ। মূল্য বড় কৌটা ১৲ ডজন ৯৲ টাকা, ছোট কৌটা ॥০, ডজন ৪।৷০ আনা, মাশুল স্বতন্ত্র।

মন মাতান মহাসুগন্ধি—

## বেগম বিলাস তৈল।

ব্যবহারে মাথা ঠাণ্ডা থাকে, বায়ু রোগের উপসম হয়, কেশের অকালপক্কতা ও টাক রোগ দুরীভূত হয় এবং কেশ ঘন ও কুঞ্চিত হয়। মূল্য প্রতি শিশি ১৲ টাকা, মাশুল ।৷০ আনা, ডজন ৯৲ টাকা, মাশুল স্বতন্ত্র।

## সাহি সালসা।

পারাদুষ্টি, রক্তদোষ, গর্ম্মি, রক্তাল্পতা, শরীরের সর্ব্বপ্রকার ক্ষত ও চুলকানী, পাঁচড়া, ধাতুদৌর্ব্বল্য, স্নায়ু শিথিলতা, জরায়ু-দোষ ও হৃদপিণ্ডের দুর্ব্বলতা ইত্যাদি দূর করিয়া শরীর মাতঙ্গসদৃশ হৃষ্টপুষ্ট বলিষ্ঠ করিতে ইহার শক্তি অদ্বিতীয়। মূল্য ১ শিশি ২।৷০ টাকা, মাঃ ।৷০ আনা, ৩ শিশি ৭৲, ৬ শিশি ১৩৲, ডজন ২৪৲ টাকা মাঃ স্বতন্ত্র।

## প্রমেহ বিনাশ।

সর্ব্বপ্রকার নূতন পুরাতন মেহ, প্রমেহ, ধাতুদৌর্ব্বল্যের কোষ্ঠ পরিষ্কার ও বলকারক মহৌষধ ১ কৌটা ১।৷০, মাঃ ।৷০ আনা, ডজন ১৫৲ টাকা মাঃ স্বতন্ত্র।

## আক্‌চিরুল হায়াত।

নূতন পুরাতন ধ্বজভঙ্গ, পুরুষত্বহানি ও ধাতুদৌর্ব্বল্যের অব্যর্থ মহৌষধ। এই ঔষধ সেবনে হতাশ ও রোগযন্ত্রণায় আত্মহত্যাপরায়ণ ব্যক্তিও সুস্থ, সবল, যুবা সদৃশ কার্য্যক্ষম হয়। মূল্য প্রতি সেট ৭৲ টাকা, মাঃ ।৷০ আনা।

## গণোরিয়া বিনাশ।

গণোরিয়া (পুঁজ ধাতু) রোগের অব্যর্থ ঔষধ। এই মহৌষধ সেবনে প্রথম তিন দিবসেই সমস্ত উপশম হয় এবং ক্রমাগত কয়েক দিবস নিয়মিতভাবে সেবন করিলে গণোরিয়ার যাবতীয় উপদ্রব উপসর্গ সমূলে বিনাশ হইয়া রোগী তাহার পূর্ব্ব স্বাস্থ্য ফিরাইয়া পায়। গ্যারাণ্টি দিয়া এই ঔষধ দেওয়া যায়। মূল্য বড় শিশি ২৷৷০ আনা, মাশুল ।৷০ আনা, ছোট শিশি ১।৷০ আনা মাশুল ।৵০ আনা।

বিস্তারিত বিবরণ ক্যাটলগে দেখুন।

একই প্রকারের ১ ডজনের কম ক্রয় করিলে ডজন হিসাবে দাম ধরা যায় না।

## মৌলবী হাকিম এনামল হক।

প্রোঃ—ইউনানী বৈদক মেডিকেল হল্। ৫৬নং লোয়ার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।

# আমাবস্যার ঘোর অন্ধকার

রজনীর অবসান

আশার সুপ্রভাতের আলোক-রশ্মি

সুলভে মোছলেম সাহিত্য প্রচারের প্রথম

অভিনব এবং অপূর্ব্ব চেষ্টা

তাই আজ মোছলেম বঙ্গের আকাশ পাতাল

প্রতিঘাত করিয়া মোহাম্মদীর সৎ-সাহিত্য

বিতরণের এই বিরাট আয়োজনের

বিজয় দুন্দুভি বাজিয়া উঠিয়াছে।

যাহা কেহ কখনও শুনে নাই,

কল্পনা করে নাই,

এমন কি স্বপ্নেও ভাবে নাই

তাহাই আজ সফল হইল।

মোছলেম সাহিত্য প্রতিভার

জ্বলন্ত জ্যোতিষ্ক

মরহুম মীর মশর্‌রফ হোসেন সাহেবের

আসল এবং খাঁটি

## বিষাদ-সিন্ধু

# মাসিক মোহাম্মদী

সম্পাদক—
মোহাম্মদ আকরম খাঁ

বার্ষিক মূল্য সডাক তিন টাকা

প্রতি সংখ্যা সাড়ে চারি আনা

# সূচী পত্র—অগ্রহায়ণ, ১৩৩৪

# মির্জ্জা সুলতান আহম্মদ বেগমগঞ্জী

## সাহেব প্রণীত

### ১। নির্ব্বাসিতা হাজেরা।

হজরত এব্রাহিম (আঃ) এর স্ত্রী এসমাইল জবিউল্লার মাতা, লাইনে লাইনে করুণ কাহিনী! পংক্তিতে পংক্তিতে হাহাকার!! মরুভূমির সেই আর্ত্ত চীৎকার! সন্তান লইয়া ছুটাছুটি। দে জল! দে জল!! পানি! পানি!! নাহি! নাহি!! ওহো! কি ভীষণ করুণ কাহিনী! কি ভীষণ অবস্থা!! কি অপূর্ব্ব সহগুণ!! বিষাদ-সিন্ধুর বিষাদ অপেক্ষাও সহস্র গুণ বিষাদ। পাঠক হজরত হাজেরার এই সম্পূর্ণ জীবনচরিতখানা পাঠ করুন। উপন্যাসের আকারে উদ্‌ভ্রান্ত প্রেমের ভাষায় শকুন্তলার নাটকীয় সম্পদ লইয়া বাহির হইয়াছে। লেখকের লেখনী শক্তি সার্থক হইয়াছে। লেখককে অমর করিয়াছে। চকচকে সিল্কের বাঁধাই এ পর্য্যন্ত এমন সুন্দর বহি দ্বিতীয় বাহির হয় নাই। মূল্য ১।০ আনা।

### ২। মোসলেম পঞ্চসতী।

(১) **রাবেয়া**:—চিরদুঃখিনী, চির কুমারী, চির তপস্বিনী, চির বিকশিত বসরাই গোলাপ। (২) **রহিমা**:—আয়ুব (আঃ) এর স্ত্রী, পতিভক্তির চূড়ান্ত, স্বর্গের জ্যোতি, হীরার ফুল। (৩) **আছিয়া**:—ফেরাউনের স্ত্রী, ধর্ম্মের জন্য অপূর্ব্ব আত্মত্যাগ, বেহেস্তের ফুলরাণী। (৪) **খোদেজা**:-হজরতের প্রথমা স্ত্রী, পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দান কারিণী, পতি পরায়ণা সতী! (৫) **আয়েশা**:—হজরতের স্ত্রী, যিনি পরের দুঃখে দুঃখিনী, স্বামীর মন্ত্রী, সেনাপতি, পতিগত প্রাণা।

এই জগৎ শ্রেষ্ঠ পঞ্চসতীর জীবন কাহিনী পঞ্চ ফুলের হার একত্রে বাঁধাই কাগজের দরে বিক্রী। লাট নিলাম, গুদাম সাবাড়। প্রত্যেক ঘরেই শরাবন-তহুরার সৃষ্টি করিবে; উপহারের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বহি। মাতা ভগ্নি প্রত্যেকের হাতেই অবাধে দেওয়া যাইবে। মূল্য ১।০ সিকা।

### ৩। হজরত এব্রাহিম।

এছলাম ধর্ম্মের প্রকৃত প্রবর্ত্তক, হানাফি ধর্ম্মের আদিম গুরু হজরত এব্রাহিম (আঃ) এর পুণ্যময় জীবন চরিত, পৌত্তলিকতার মূলোচ্ছেদ, এক খোদাবাদের চূড়ান্ত, মহা প্রেমিকের প্রেমিকতা, অটল বিশ্বাসময় আদর্শ জীবন। কোন কোন বহি হইতে সংগৃহীত হইয়াছে পড়িয়া দেখুন "আরবের ইতিহাস" "ইহুদী জাতির ইতিবৃত্ত" "প্যালেষ্টাইনের পূর্ব্ব গৌরব" "প্রাচীন বাবিলন" "ছহি বোখারী" "ছহি মোছলেম" "এবনে হেশাম" "এবনে অল আছির" "এবনে খলদুন" "তওরাত" "কোরআন তফছিরে হোছেন" "ফায়েদা" "আবুদাউদ" "কাশ্শাফ" "হাক্কানি" "মেজেহল-কোরআন" "জালালায়েন" প্রভৃতি অমূল্য গ্রন্থ হইতে লিখিত হইয়াছে। মূল্য ১।০

### ৪। রমা-ভাঁড়।

পাতায় পাতায় হাসি পাতায় পাতায় রগড়, হাসির ঢেউ, হাসির তুফান, হাস্য রসের মতিচুর, রসে পরাণ ভরপুর, তুই কোঁড়ে রগড় কত, রঙ্গ রসের মজা যত, হো, হো, হো, হা, হা, হা, হাস্য রসে নেচে নেচে রসোগোল্লা খা; একেবারে গোপাল ভাঁড়ের মামা শ্বশুর তার সাড়ে দেড় গুণ হাসির জাহাজ। মূল্য মাত্র ।৵০ আনা।

**প্রাপ্তিস্থান ঃ—**

**ইসলামিয়া পাবলিশিং হাউস**—১৩৯ নং মেছুয়া বাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা।

**মোহাম্মদী বুক এজেন্সী**—২৯ নং আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা।

অর্ডার দিবার সময় অনুগ্রহ পূর্ব্বক—"মাসিক মোহাম্মদীর" নাম উল্লেখ করিবেন।

## সূচী পত্র—অগ্রহায়ণ, ১৩৩৪

## এম, এ, হাকিম ব্রাদার

১৬৮ নং ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট,

১ ও ২ চাঁদনী চক ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

দেশী ও বিলাতী র‍্যাগ, কম্বল ও সকল রকম শয্যাদ্রব্য, গদি, বালিশ, মশারি ইত্যাদি অতি সুলভ মূল্যে বিক্রয় হয়।

মফঃস্বলের অর্ডার সহ সিকি পাঠাইলে অতি যত্নের সহিত সরবরাহ হয়।

## মির্জ্জা মফিজদ্দিন

২৯৬নং আপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।
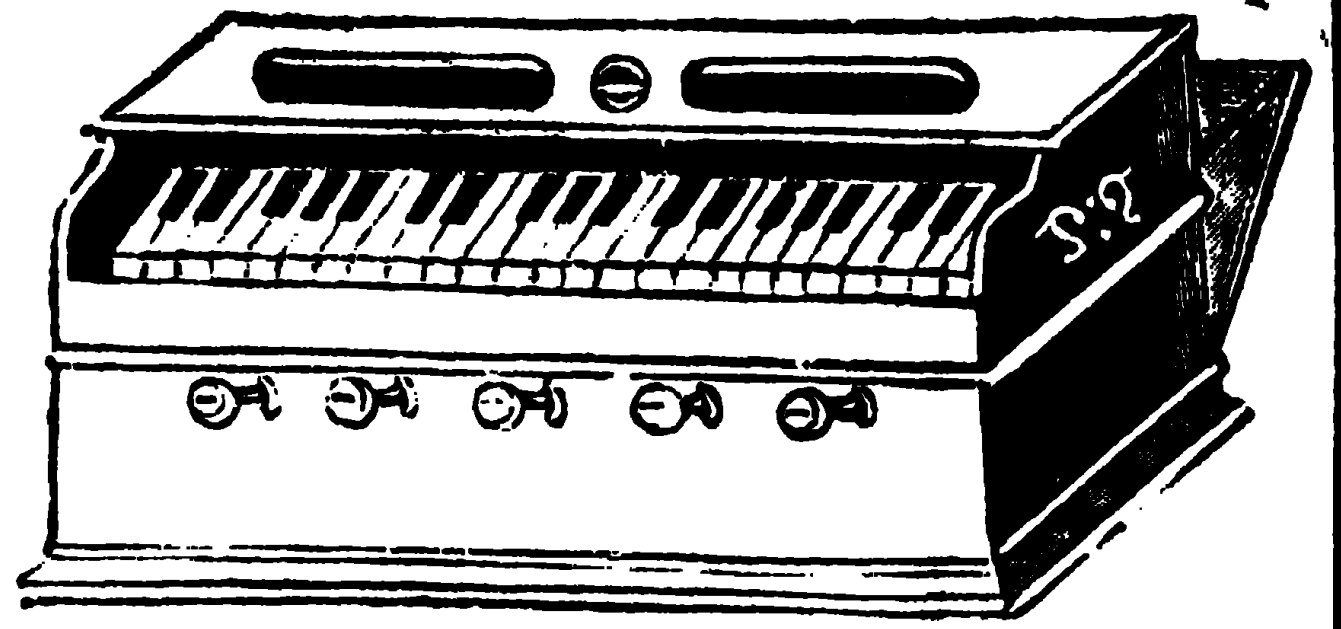
সিঙ্গেল রীড ১৪৲ হইতে ২৫৲ টাকা পর্য্যন্ত।
ডবল রীড ২৫৲ হইতে ৪৫৲ টাকা পর্য্যন্ত।

বাজারে যত. হারমোনিয়মের কারখানা আছে আমাদের প্রস্তুতীয় হারমোনিয়ম মূল্যে সকলকে হার মানাইয়াদিয়াছে।

একবার পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

# ফটো সুনীল ষ্টুডিও।

ফটো তুলিবার ভঙ্গী নির্ব্বাচন, ব্রোমাইড্. এনলার্জ্জমেণ্ট, সহর ও মফঃস্বলে দিবা বা রাত্রে ছবি তোলা, মৌখিক ভাব সাহায্যে চিত্রের পরিকল্পনা এই সব আমাদের বিশেষত্ব।

আমাদের ফটো ও ডিজাইন বহু চিত্র প্রতিযোগীতায় ও প্রদর্শনীতে পারিতোষিক প্রাপ্ত হইয়াছে।

ইংলিশম্যান কাগজে ৩০শে নভেম্বর তারিখে আমাদের চিত্রবহী প্রতিযোগীতায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়া পারিতোষিক লাভ করে তাহা দেখিয়া বহু মেম সাহেব আমাদের চিত্র চাহিয়া লইয়া গিয়া নিজেদের প্রদর্শনীতে আনন্দের সহিত প্রদর্শন করিয়াছেন ও আমাদের ভুয়শী প্রশংসা করিয়া পত্র লিখিয়াছেন।

এতদ্ভিন্ন ষ্টেট্স্ম্যান্, অমৃতবাজার পত্রিকা প্রভৃতি সংবাদ পত্রের স্তম্ভে আমাদের চিত্র শিল্পের বহুল প্রশংসা প্রকাশিত হইয়াছে।

পরীক্ষা প্রার্থনা করি। নমুনা ও প্রচার জন্য প্লেন ১২″×১০″ সাইজ ব্রোমাইড এনলার্জ্জমেণ্ট কেবলমাত্র ২৲ টাকায় দিয়া থাকি।

পোঃ বাগবাজার কলিকাতা!

# বিজ্ঞাপন-সূচী অগ্রহায়ণ,—১৩৩৪

নুতন পুস্তক! নুতন পুস্তক!

বাঙ্গালী মোসলেম মহিলার অপূর্ব্ব আদর্শ পুস্তক

# মোস্‌লেম বিক্রম

"বঙ্গীয় মোস্‌লেম মহিলা সঙ্ঘের প্রেসিডেন্ট "স্বপ্নদৃষ্টা", "আত্মদান" "জানকী বাঈ বা ভারতে মোস্‌লেম বীরত্ব" প্রভৃতি গ্রন্থ প্রনেত্রী—নুরন্নেছা খাতুন (বিদ্যাবিনোদিনী, সাহিত্য-সরস্বতী) ছাহেবার লেখনী নিঃসৃত এই অমূল্য গ্রন্থখানি আমাদের এই জাতীয় মহাদুর্দ্দিনে, তথা হিন্দু সঙ্ঘবদ্ধের সময় মুসলমান সাধারণের পাঠ করা সর্ব্বতোভাবে প্রয়োজনীয়।

আমরা স্পর্দ্ধার সহিত বলিতে পারি যে—জাতীয় বীরত্বের, তৎসঙ্গে আমাদের এই বঙ্গভূমির উপর সুদীর্ঘ পাঁচ শত চুয়ান্ন বৎসর কালব্যাপী মোস্‌লেম রাজত্বের এরূপ সঠিক বিবরণ অদ্যাবধি বাঙ্গালা ভাষায় বাহির হয় নাই।

খোলাফায়ে রাশেদীন হজরত আবুবাকর সিদ্দিকের সিংহাসনারোহণ ৬৩২ খৃঃ একাদশ হিজরী হইতে আরম্ভ করিয়া, আব্বাসী বংশাবতংশ হারুণ-অর-রশীদ ও পরবর্ত্তী খলিফাগণের রাজত্বকাল, এই ইতিবৃত্তে সংক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে।

সপ্তদশ বর্ষীয় মহারথী বীরকেশরী এমদাদ উদ্দীন মোহাম্মদ-বেন্-কাসেমের অলৌকিক বীরত্ব ও তৎসহ অসাধারণ আত্মত্যাগ, এই সঙ্গে বীরশ্রেষ্ঠ মুসার ও যুবক মহাবীর তারেকের সমস্ত উত্তর আফ্রিকা ও স্পেন বিজয় পড়িতে পাঠকের ধমনীতে মোস্‌লেম রক্ত উদ্বেলিত হইতে থাকিবে ও "বীর-ভোগ্যা বসুন্ধরা" উক্তির সার্থকতা অক্ষরে অক্ষরে উপলব্ধি করিবেন।

আরব বীরগণের পদাঙ্কানুসরণে গজনীর সোলতান সবক্তগীন ও তৎপুত্র খৃষ্টিয় দশম একাদশ শতাব্দীর বীর-শার্দ্দুল ভারত-আতঙ্ক সোল্‌তান মাহমুদ উপর্য্যুপরি ভারতবর্ষ আক্রমণে যে বীরত্বের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন; আর বীরকুলতিলক মুঈজ-উদ্দীন মোহাম্মদ ঘোরী, ভারত জয় করিয়া পৌরাণিক রাজধানী ইন্দ্রপ্রস্থকে কি প্রকারে ভারতের মোছলেম রাজধানীতে পরিণত করিয়াছিলেন, সঙ্গে সঙ্গে সোলতানের উপযুক্ত সহকারী কোতবউদ্দীন ভারতের হিন্দু রাজ-শক্তি চূর্ণ করিয়া, যে বলে এই সসাগরা হিন্দুস্থানের একচ্ছত্র রাজধানীর রাজা বলিয়া ঘোষিত হইয়া গিয়াছেন, তাহার সমস্ত বিবরণ এই লব্ধপ্রতিষ্ঠা লেখিকা তাঁহার এই জাতীয় ইতিহাসে সন্নিবেশিত করিয়াছেন।

বিধর্ম্মিগণ কর্ত্তৃক অযথা অকর্ম্মণ্য লম্পট আখ্যায় আখ্যায়িত, আজন্ম সুখের কোলে প্রতিপালিত মোস্‌লেম সম্রাট-নন্দনগণ রণোন্মাদে উন্মত্ত হইয়া আহার নিদ্রা বিসর্জ্জনে যুদ্ধক্ষেত্রের মহাকষ্ট ও কঠোরতা আনন্দের সহিত হাস্যমুখে বরণ করিয়া লইয়া রণস্থলে কিরূপ অসীম সাহসিকতা প্রদর্শন করিতে করিতে আত্মোৎসর্গ করিয়াছেন, তাহার জলন্ত দৃষ্টান্ত সকল "মোসলেম বিক্রমে" পাইবেন।

হিন্দুগণের আজকালকার বীরপূজার বীর অবতার ছত্রপতি শিবাজীর" ঘৃণ্য বিশ্বাসঘাতকতা ও ছলচাতুর্য্য ইহাতে বিশেষ ও সঠিক রূপে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। তারপর বাঙ্গালার মোছলেম শাসনকর্ত্তাগণের অতুলনীয় স্বদেশপ্রীতি, বাস্তবিকই পাঠক-পাঠিকার একটা উপভোগের জিনিষ হইবে। সাধারণে প্রচারার্থে পুস্তকের মূল্য মাত্র ২৲ দুই টাকা করা হইল। ডাক খরচ স্বতন্ত্র।

মোহাম্মদী বুক এজেন্সি ঃ—২৯নং আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা।

প্রসিদ্ধ বন্দুক বিক্রেতা।

আমরা প্রচুর পরিমাণ বন্দুক, রাইফেল, রিভলভার ও বন্দুকের সরঞ্জাম আমদানী করিয়া সুলভে বিক্রয় করিয়া থাকি।

MODEL 1908

বন্দুক, রাইফেল আমদানী কারক।

মফঃস্বলের অর্ডার সযত্নে সত্বর সরবরাহ করা হইয়া থাকে। পত্র লিখিলে সচিত্র ক্যাটালগ বিনামূল্যে পাঠাই।

## শ্রীঅবিনাশচন্দ্র কুণ্ডু এণ্ড কোং

১০নং চাঁদনী চক্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

---

বাজারের ফুটবল কিনিয়া যাঁহারা ঠকিয়াছেন তাহারা আমাদের নিজ ফ্যাক্টরীতে প্রস্তুত উৎকৃষ্ট চামড়ার সুগোল, সুন্দর ও মজবুত ফুটবলের জন্ত অর্ডার দিন। বাংলা, বিহার ও আসামের যাবতীয় স্কুল, মাদ্রাসা ও প্রাইভেট ক্লাবে আমাদের ফুটবলই প্রচলিত।

## ব্লাডার সহ ফুটবল

প্রাক্‌টিস্—৫নং ৫।০, ৪নং ৩৸০, ৩নং ৩৲, ২নং ২॥০, ১নং ১৸০।

কামাল—৫নং ৬৲, ৪নং ৪৸০, ৩নং ৩।০।

বিজয়—আটখণ্ড উত্তম চামড়ার প্রস্তুত ৫নং ৭॥৵, ৪নং ৫৸০, ৩নং ৪৲।

ভিলেজ মাষ্টার—ডবল সেলাই, খুব মজবুত, ৫নং ৮॥০, ৪নং ৬৲, ৩নং ৪॥০।

স্কুল ম্যাচ—বাছাই করা ১০ খণ্ড চামড়ার প্রস্তুত, সর্ব্বত্র উচ্চ প্রশংসিত—৫নং ৯৲, ৪নং ৬॥০, ৩নং ৫৲ টাকা।

পল্টন—১২ খণ্ড বাছাই করা চামড়ার প্রস্তুত, বেশ মোলায়েম, বহুদিন ব্যবহারেও আকার নূতনের মত থাকে। ৫নং ১০॥০, ৪নং ৮৲, ৩নং ৬।০ আনা।

কলেজ ম্যাচ—বড় বড় ক্লাবে প্রশংসার সহিত ব্যবহৃত। ১৮ খণ্ড বাছাই করা চামড়ার প্রস্তুত ৫নং ১২॥০, ৪নং ৯৲।

GUARANTEED AND SEWN

কেবল মাত্র

ব্লাডার—৫নং ২৲, ৪নং ১৸০, ৩নং ১।৶০, ২নং ১৶০, ১নং ৸৶০।

ইন্‌ফ্ল্যাটার—ছোট ১॥০, মাঝারি ২৲, বড় ২॥০।

হুইসেল—একমি ১।০, সাধারণ ।০, ॥০ ও ৸০ আনা।

পত্র লিখিলে বিনামূল্যে রুল বুক পাঠান হয়।

ব্যাডমিণ্টন—বেশ আরামপ্রদ খেলা।

রেকেট (বেট) ইয়েলো উড্ প্রাক্‌টিস্ ১ খানা ১।০ ঐ স্প্যাসেল ২॥০, ছেলেদের ৸০।

শাটোল কক—সাধারণ প্রতি ডজন ৩০, ভাল ৫।০, ৬৲ ও ৭॥০ জাল ১৫ ফিট ৸০, ১৮ ফিট ৸৶০, ২১ ফিট ১।০, ২৪ ফিট ১॥০, রুল বুক ।০ আনা।

পুরাতন র‍্যাকেট সারানও হয়।

## বেঙ্গল স্কুল সাপ্লাই এজেন্সী

২১নং রাজা লেন, আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

## ফুটবল—টেনিস্—ব্যাডমিণ্টন ও অন্যান্য যাবতীয় খেলার সরঞ্জাম

উৎকৃষ্ট ব্লাডার সহ ফুটবল—১নং ১৸৹, ২নং ২৷৷৹, ৩নং ৩৷৷৹, ৪নং ৪৷৷৹ ও ৫৲, ৫নং ৫৷৷৹ টাকা।

৫নং চ্যাম্পিয়ন ৮৲ টাকা।

শিল্ড ম্যাচ—১২ খণ্ড চামড়ার প্রস্তুত বেশ সুন্দর ১০৷৷৹, ঐ ক্রোম ১৫৲ টাকা।

শিবদাস—১৮ খণ্ড চামড়ার প্রস্তুত, খুব মজবুত ১২৲, ঐ ক্রোম ১৫৷৷৹ টাকা।

কেবলমাত্র ব্লাডার—১ নং ৸৴৹, ২ নং ১৷৴৹, ৩ নং ১৷৹, ৪ নং ১৷৷৹, ৫ নং ২৲ টাকা।

ইনফ্লাটার—১৷৹, ১৷৷৹, ২৷৹,

রবার সলিউসন—৷৹, ৷৴৹, ৷৷৹ প্রতি শিশি।

আমাদের সমস্ত ফুটবল নিজ ফ্যাক্টরীতে বাছাই করা চামড়ায় প্রস্তুত কাজেই বেশ সুগোল সুন্দর ও মজবুত।

N. DASS.
GUARANTEED

মফঃস্বলের অর্ডার সযত্নে সত্বর ভিঃ পিঃতে পাঠান হয়।

### ব্যাডমিণ্টন ব্যাট্

১৷৹, ১৷৷৹, ২৷৷৹, ৩৲, ৪৷৷৹, ৫৷৷৹ ঐ জাল—৸৹, ১৲, ১৷৹, ১৷৷৹;

সাটেলকক—৩৲, ৩৸৹, ৪৷৷৹, ৬৲, ৭৷৹ ও ৯৲ ডজন।

### টেনিস্ র‍্যাকেট্

৩৲, ৩৷৹, ৫৲, ৭৷৷৹ ও ১৫৲ টাকা; টেনিস জাল ৪৷৷৹, ৬৲, ১০৲, ১৫৲, ২২৲ ও ২৪৲ টাকা।

পুরাতন ব্যাডমিণ্টন ও টেনিস র‍্যাকেট মেরামত ও রিষ্ট্রীং করা হয়। দর অতি সুলভ। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

অন্যান্য জিনিষের মূল্য ক্যাটালগে জ্ঞাতব্য

### মজুমদার ব্রাদার্স

৮৩৷১ নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ফোন নং ৩০৩৩ বড়বাজার

---

### ডাক্তার কর্ণেল সাহেবের

# ‘গয়টার কিওর’

গলগণ্ড বা ঘ্যাক রোগের একমাত্র মহৌষধ।

ঔষধ ব্যবহারের পূর্ব্বে। ঔষধ ব্যবহারের পরে।

গলগণ্ড বা ঘ্যাগ অতি ভীষণ রোগ। ইহার একমাত্র প্রতিকার "গয়টার কিওর"। যে কোন প্রকার গলগণ্ড বা ঘ্যাগ হউক না কেন ইহা ব্যবহারে নিশ্চয় আরোগ্য হইবে। ইহাতে কোন প্রকার জ্বালা যন্ত্রণা বা ঘা হইবার আশঙ্কা নাই। মূল্য প্রতি শিশি ২৲ দুই টাকা মাশুল স্বতন্ত্র।

### ডাক্তার কর্ণেল এণ্ড কোং

৯ নং আন্থনী বাগান লেন, কলিকাতা।

---

## স্বাস্থ্য অমূল্য ধন—

সেকেন্দার পুরের হাকিম আহম্মদ হোসেন সাহেব একজন বিখ্যাত চিকিৎসক। লক্ষ্মৌর ভারত বিখ্যাত হাকিম আবদুল আজিজ সাহেবের নিকট শিক্ষা লাভ করিয়া তিনি উপযুক্ত সার্টিফিকেট লাভ করিয়াছেন। ইনি মুর্শদাবাদে কোন ধনবান ব্যক্তির আহ্বানে সেখানে আসেন এবং বর্ত্তমানে জনসাধারণের সুবিধার জন্য কলিকাতায় অবস্থান করিতেছেন।

**আরকে বুখার**—সর্ব্বপ্রকার জ্বরের মহৌষধ মূল্য ৷৷৹ আনা।

**হাব সুরফা**—হাঁপানি এবং কাশ রোগের সর্ব্বোৎকৃষ্ট ঔষধ। ১৬ বটিকার মূল্য ৷৹ আনা।

**ছোলেমানি গুলি**—সর্ব্বপ্রকার পেটের অসুখের মহৌষধ মূল্য ৷৴৹ আনা।

**হাব্বে মুকাব্বি**—সর্ব্বপ্রকার ধাতুরোগের মহৌষধ। মূল্য ৩৲ টাকা এবং ১৷৷৹ টাকা।

**আরকে মুসাফ্ফি**—চর্ম্মরোগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ঔষধ। মূল্য ২৲ টাকা।

পত্র লিখিলেই ঔষধের বিস্তৃত তালিকা পাঠান হয়।

**প্রাপ্তিস্থান**ঃ—হাকিম আহম্মদ হোসেন সাহেব
২১নং জাকারিয়া ষ্ট্রীট কলিকাতা।

# ধর্ম্ম-পুস্তক

**কোরাণ সরিফ ঃ**—১নং গয়েস পাকা জেল সোনালী—৪॥৹ ২নং ৪৲ সুপার রয়েল ৩৸৹, ৩॥৹ ও ৩৲ টাকা। রাশি ২৸৹ ও ২॥৹ টাকা। ইহা ছাড়া মোটা কাগজ খুব বড় অক্ষরে ৮।১০।১২।১৫৲ টাকা পর্য্যন্ত দামের কোরাণ শরীফ আছে।

**মৌলুদ শরীফ**—মৌঃ জদিদ ১৹, মৌঃ সহিদ ।/১০, মৌঃ দেল পিজির ৶১০, মৌঃ কহেলল বসর ৶১০, মৌঃ বাহারিয়া ৶১০, খোদাকি রহমত ৶৹, মৌঃ রাহাহল কুলুব ।/৹ মৌঃ মিলাদে মোস্তফা ৶৹, মৌঃ ছুরওয়ারে আম্বিয়া ॥৹, মৌঃ আহিয়াল কলুব ॥৹, মৌঃ জেওরে ঈমান ।৵৹। ইহা ছাড়া অন্যান্য সর্ব্বপ্রকার কানপুরী বা পশ্চিমা ছাপা ধর্ম্ম-পুস্তক পাওয়া যায়।

## বাংলা ধর্ম্ম-পুস্তক ঃ—

**শান্তি ধারা**—ইসলাম ধর্ম্মের সত্য, রূপ ও রসময় পরিচয়; সঙ্গীতের মত সুমধুর ভাষায় লিখিত, অতি উন্নত ও অনুপম সাহিত্য পুস্তক। ভাবে ও ভাষায় ইহার প্রত্যেকটী প্রবন্ধ হিরকের সমুজ্জ্বল ও বসরা কুঞ্জের প্রস্ফুটিত গোলাপের ন্যায় সৌরভময়। মূল্য ৸৹। আমপারা /১০ আহকামল জোমা ৶১০, আখরারচ্ছালাত ॥৹, ওফাতনামা ৶৹, আদম অজুদতত্ব ।/৹, বড় আছরার ছালাত ॥৹ নামাজ শিক্ষা ।৵৹, ইসলামে দিন ।১০, কাছাছল আম্বিয়া পাকা জেল ৪॥৹, হাফ জেল ৪৲, কলেমা ও মোনাজাত শিক্ষা ।৹ খোলাছাতয়েকা ৶১০, খয়রল হাসর ॥/৹, গজলে নক্সেনবী ৶৹, গজলে মোহাম্মদী ।৹, ছেকান্দর নামা ॥৵৹ ছেরাজল এছলাম ।/৹ আওয়াকল ইমান ১৲, জোব্দাতল মোসায়েল ১ম খণ্ড ১৸৹, ২য় খণ্ড ২৲, দরবেশনামা ১।৹, দেল রৌসন হাদিছ ৶৹, দিদার এলাহি ।৶৹, দাওয়াতে মোহাম্মদী ।৹ দরবেশ কাহিনী ১৸৹, নাজাতল আরওয়া ৶৹, ফজিলতে দরুদ ৶১০, বেদারল গাফেলীন ।৹, মৌঃ শরিফ ৶৹, মেপ্তাহল জেন্নাত ॥৹, মোহছেনল ইসলাম ।/৹, মেংরুল ইসলাম ।৶৹ মছায়েল ইসলাম ২৲, ধর্ম্মের কাহিনী ।৹, সামসল আহকার ।৹, সহিদে কারবালা ১।৹, হকিকতল আম্বিয়া ।৵৹, হেদায়তল ফোক্কাক ।৵৹।

**মজমুয়ে ওয়াজ শরিফ ঃ**—ইহাতে কোরাণ ও হাদিসের প্রমাণ, হজরত রছুলের প্রতি মহব্বত দরুদ পড়ার ফায়দা, শেরেকের পাপ হইতে বাঁচা, নামাজের নেকী প্রভৃতি ইসলামের বহু বিষয় পূর্ণ উপাদেয় পুস্তক মূল্য ১ম খণ্ড ১॥৹ ২য় খণ্ড ২৲ টাকা।

# হজরতগণের জীবনী

**হজরত বড় পীর আবদুল কাদের জিলানী ঃ**—মহিউদ্দিন সাহেবের বিস্তৃত জীবনীর বিশুদ্ধ বাংলা অনুবাদ। ভাষা ও ছাপা সুন্দর। বড়পীর সাহেবের অলৌকিক ঘটনাবলী পড়িয়া স্তম্ভিত ও বিমুগ্ধ হইবেন। ফুল বাইনডিং মূল্য ২৲ টাকা।

**হজরত এমাম হাসান হোসেনের জীবনী ঃ**—এরূপ বিস্তৃত জীবনী আজও প্রকাশ হয় নাই। ফুল বাইণ্ডিং প্রকাণ্ড পুস্তক ২৲ টাকা।

**মহাবীর হজরত আলীর জীবনী।** হজরতের ভূমিষ্ঠকাল হইতে শেষ দিন পর্য্যন্ত জীবনের অমানুসিক ঘটনাপূর্ণ ৬৪৹ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ সোনালী জেল মূল্য ২॥৹

**হজরত খাজা মঈনুদ্দিন চিশ্‌তির জীবনী ঃ**—বিশুদ্ধ বাংলায় চমকপ্রদ ঘটনাবলীতে পূর্ণ ফুল বাইণ্ডিং মূল্য ১।৹

**কারবালার বিষাদ সিন্ধু ঃ**—করুণ কাহিনীতে পূর্ণ অদ্বিতীয় পুস্তক ৬৬৮ পৃষ্ঠা ফুল বাইণ্ডিং মূল্য ২৲

**মহাবীর নওসাদের জীবনী ঃ**—হজরত আলী করমুল্যার পুত্র মোহাম্মদ হানিফার যুদ্ধ ও তৎপুত্র মহাবীর নওসাদের অলৌকিক যুদ্ধ ও সিংহাসন দখল প্রভৃতি ঘটনাপূর্ণ মূল্য ১৲ টাকা।

**হজরত মোহাম্মদের জীবনী ঃ**—সরল, সহজ ও সুমিষ্ট ভাষায় লিখিত মহাপুরুষ হজরত মোহাম্মদের সুমধুর জীবন চরিত—মূল্য ১॥৹

**চিকিৎসা পুস্তক ঃ**—অব্যর্থ মুষ্টিযোগ ৸৹ কম্পাউণ্ডরী শিক্ষা ১৲ ডাক্তারি শিক্ষা ২৲ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা ১৲ টাকা।

**ডিটেক্‌টিভ উপন্যাস ঃ**—দিনে ডাকাতি ৵৹ অদ্ভুত হত্যাকাণ্ড ১৲ পুলিশ কাহিনী ১।৹ ধর্ম্মের জয় ১॥৹ টাকা।

ঠিকানা—হাজী মহম্মদ নুর আলী এণ্ড কোং (পুস্তক বিভাগ।
১৫০নং আপার চিৎপুর রোড, বাগবাজার কলিকাতা।

# ইরানী দরবেশের মহাশক্তি অঙ্গুরী

## অদ্ভুত আবিষ্কার!

বহু রোগনাশক ও সৌভাগ্যদায়ক। এই মহাশক্তি অঙ্গুরীর অশেষ গুণ দেখিয়া আমরা গত ১৩০৫ সালের মাঘ হইতে ইহা ভারতে প্রচার জন্য দরবেশ মহাপুরুষের হুকুম পাইয়াছি। বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে কয়েকটী মূল্যবান ধাতুর সংমিশ্রণে এই তাড়িত শক্তি সম্পন্ন অঙ্গুরী প্রস্তুত। এই অঙ্গুরীর গঠন অতি সুন্দর এবং চিরস্থায়ী। ইহা সৌখিন ব্যক্তির আদরের সামগ্রী একাধারে ইহা সখের সুখের ও স্বাস্থ্যরক্ষার শ্রেষ্ঠ উপাদান।

**অঙ্গুরী বিভিন্ন প্রথায় ব্যবহারে বিভিন্ন ফল।**

**জ্বর জ্বালা, ধাতুদৌর্ব্বল্য, মেহ, প্রমেহ স্বপ্নবিকার, অম্ল ও স্ত্রীলোকের প্রদর ও বাধক**

প্রভৃতি রোগে প্রাতে ও সন্ধ্যায় কাচ বা পাথর পাত্রে ৷০ এক পোয়া পরিমাণ জলে এক ঘণ্টা কাল এই অঙ্গুরী ডুবাইয়া রাখিয়া ঐ জল পান করিলে তিন দিনে বিশেষ উপকার বুঝিবেন এবং ব্যাধি অতি শীঘ্র সম্পূর্ণ নিরাময় হইবে। জ্বর জ্বালা ও অম্ল ২৪ ঘণ্টা মধ্যে দূর হইবে।

**বাত, বেদনা, শূল, মাথাধরা পেটের পীড়া**—প্রভৃতি রোগে এই অঙ্গুরী ব্যাধি স্থানে দিনে রাত্রে ২।৩ বার ১৫।২০ মিনিট কাল পর্য্যন্ত বুলাইলে অতি শীঘ্র ঐ সকল রোগ আরোগ্য হইবে। ফিক্‌'বেদনা, মাথাধরা, পেটব্যথা প্রভৃতি পনর মিনিট মধ্যে দূর হইবে।

**অর্শ, ভগন্দর এবং পারা গর্ম্মী**—প্রভৃতি দূষিত ঘায়ে জলপূর্ণ তাম্রপাত্র মধ্যে এই অঙ্গুরী সমস্ত রাত্রি ডুবাইয়া রাখিয়া ঐ জল দ্বারা ব্যাধিস্থান দিনে দুইবার ধৌত করিবে। মেহরোগে (গণোরিয়া) ঐ জল দ্বারা মূত্রনালীতে দিনে দুইবার পিচকারী করিলে অল্পদিন মধ্যে ঘা শুকাইয়া যাইবে। সর্ব্বপ্রকার ঘা, পাঁচড়া ও ক্ষতরোগের ইহা একটী আশ্চর্য্য মহৌষধ।

**একশিরা কোরণ্ডের উপর**—এই অঙ্গুরী কোমরে সূতার দ্বারা বাঁধিয়া রাখিলে ৩দিন মধ্যে উহা কমিতে থাকিবে, ১৫ দিনের ব্যাধি সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবে।

**প্লীহা যকৃত ছাড়, অগ্রমাংস**—প্রভৃতি রোগে ১৫।২০ মিনিট কাল পর্য্যন্ত দিনে মাত্র ৩।৪ বার এই অঙ্গুরীর সম্মুখ ভাগ পেটের উপর বুলাইলে ৭ দিন মধ্যে প্লীহা অনেক কমিয়া যাইবে এবং অতি শীঘ্র রোগী সম্পূর্ণ আরোগ্য হইবে।

**এই অঙ্গুরী সর্ব্বদা হাতে থাকিলে**—কলেরা, বসন্ত প্লেগ প্রভৃতি সংক্রামক ব্যাধিতে আক্রমণ করিতে পারিবে না।

**হাতে হাতে আশ্চর্য্য পরীক্ষা**—বিছা, বোলতা, বিষাক্ত পোকা, ক্ষেপা কুকুর, শেয়াল কামড়াইলে এই অঙ্গুরীর সম্মুখভাগে যে সকল বৈদ্যুতিক তার সংযোগ আছে, উহা কাপড়ের উপর ৫।৭ মিনিট কাল ঘষিয়া ক্ষতমুখে লাগাইবামাত্র তাড়িত শক্তি প্রভাবে অতি অল্প সময় মধ্যে বিষবেদনা দূর হইবে।

**আর একটী কল্পনাতীত পরীক্ষা ঃ**—পারদ এত চঞ্চল পদার্থ যে উহা হাতে ধরিয়া রাখা যায় না এবং কোন দ্রব্যের সহিত মিশ্রিত হয়না ইহা সকলেই জানেন, এই ফ্লানেল প্রভৃতি গরম কাপড়ের উপর ঘর্ষণ করিয়া সম্মুখভাগ পারদে লাগাইবামাত্র অঙ্গুরীর অদ্ভুত বৈদ্যুতিক শক্তি প্রভাবে চুম্বকের ন্যায় পারদ অঙ্গুরীর মুখে পড়িবে।

**রহস্যজনক গুপ্ত পরীক্ষা**—রাত্রে শয়নকালে এই অঙ্গুরী যতক্ষণ দক্ষিণ হস্তের মুষ্টিমধ্যে রাখিবেন, ততক্ষণ, শরীরের বল, তেজ, স্ফূর্ত্তি বিন্দুমাত্র হ্রাস হইবে না।

**বিফলে মূল্য ফেরত ঃ**—এই অঙ্গুরী ব্যবহারে কোন ফল না পাইলে ১৫ দিন মধ্যে জানাইলে মূল্য ফেরৎ দিব।

**অঙ্গুরীর মূল্য ঃ**—ভারতে ঘরে ঘরে প্রচার জন্য এক লক্ষ অঙ্গুরী কেবলমাত্র ডাকমাশুল সহ ১টী ১৸৵০, ২টী ২৸৵০, ৩টী ৩৸৵০, ৬টী ৫৷৵০, ১২টী ৯৵০, ২৫টী ১৬৲ টাকা মাত্র।

ঠিকানা—ম্যানেজার পি, ব্যানার্জ্জী এণ্ড কোং (রিং ডিপার্টমেণ্ট)
১৮৬নং আপার চিৎপুর রোড, বাগবাজার কলিকাতা।

অর্ডার দিবার সময় অনুগ্রহ পূর্ব্বক—"মাসিক মোহাম্মদী" নাম উল্লেখ করিবেন

# মাসিক মোহাম্মদী

প্রথম বর্ষ। অগ্রহায়ণ, ১৩৩৪ সাল। দ্বিতীয় সংখ্যা


## এছলামে নারীর মর্য্যাদা ও অধিকার

[ মোহাম্মদ আকরম খাঁ ]

জগতের সমস্ত ধর্ম্ম-শাস্ত্র, সমস্ত ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক, সমস্ত সামাজিক ব্যবস্থা-প্রণেতা, মানুষ-সাধারণের কল্যাণের জন্য আবহমান কাল হইতে বিভিন্ন প্রকারের প্রচেষ্টা করিয়া আসিতেছেন। মানবীয় সভ্যতার ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে, দুনয়ার বিভিন্ন উন্নতিশীল জাতি, নূতন জ্ঞানের আলোকে এবং মনুষ্যত্বের নূতন অনুভূতির প্রভাবে উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত হইয়া, পুরাতনের পরিবর্ত্তন সাধন পূর্ব্বক তাহার স্থলে নূতন বিধি-ব্যবস্থা প্রণয়ন ও প্রচলন করিতে প্রয়াস পাইয়াছে। আধুনিক সভ্যতার কেন্দ্রস্থল ইউরোপ এই বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে সমাজতত্ত্বে নানা গূঢ় রহস্যের গভীর গবেষণার পর পূর্ব্বতন নিয়ম-পদ্ধতির বহু পরিবর্ত্তন করিয়াছেন ও করিতেছেন। কিন্তু অশেষ পরিতাপের সহিত বলিতে হইতেছে যে, দুনয়ার কোন ধর্ম্ম-শাস্ত্র, কোন ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক, কোন সমাজ-সংস্কারক, কোন ব্যবস্থা-প্রণেতা, নারীর মর্য্যাদা ও অধিকার সম্বন্ধে যথাযথভাবে ধারণা করিতে পারেন নাই। অধিকন্তু তাঁহাদিগের সমসাময়িক মানব-সমাজ নানাদিক দিয়া নারীর প্রতি যে সকল নির্দ্দয় ও অমানুষিক অত্যাচার চালাইয়া আসিয়াছেন, তাহার যথাযথ অনুভূতি কাহারও ছিল না। সুতরাং তাহার প্রতিকারের প্রতি যথেষ্ট মনোযোগ দিবার আবশ্যকতাও কেহ বিশেষরূপে অনুভব করেন নাই। বরং তাঁহাদের অনেকেই নানাবিধ প্রতিকূল অভিমত প্রকাশ করিয়া নারীর মর্য্যাদা খর্ব্ব করিয়াছেন, বিবিধ পক্ষপাতমূলক অন্যায় ব্যবস্থা প্রণয়ন করিয়া নারীকে তাহার ন্যায্য প্রাপ্য ও অধিকার হইতে বলপূর্ব্বক বঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছেন।

যুগে যুগে নির্ম্মমভাবে উপেক্ষিত এবং আবহমান কালের উৎপীড়িত এই নারীকে মাটি হইতে তুলিয়া তাহাকে সম্মান ও গৌরবের মছনদে বসাইয়া দিয়াছিল এছলাম, আজ হইতে সাড়ে তেরশত বৎসর পূর্ব্বে। এছলাম ও তাহার প্রেমময় পয়গম্বর হজরত মোহাম্মাদ মোস্তফা, নারীর মঙ্গল ও মুক্তির জন্য সেই সময় দুনয়ায় যে অসাধারণ পরিবর্ত্তন আনয়ন করিয়াছিলেন, নারীকে যে মর্য্যাদা ও অধিকারের আসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, তাহার সম্যক পরিচয় জানিতে হইলে চৌদ্দশত বৎসর পূর্ব্বেকার নারী জাতির সামাজিক অবস্থা এবং সর্ব্ববিধ স্বত্বাধিকারের কথা সর্ব্বপ্রথমে বিস্তারিতরূপে আলোচনা করিতে হইবে। পক্ষান্তরে এই সভ্যতার চরম উৎকর্ষের দিনে "আদর্শ সভ্য জাতি সমূহ" বস্তুতঃ

নারীকে যে স্বত্বাধিকার দান করিতে সমর্থ হইয়াছেন, সূক্ষ্মভাবে তাহারও বিশ্লেষণ করিয়া দেখিতে হইবে। তাহা হইলে একদিকে এছলামী শিক্ষার অতুলনীয় মাহাত্ম্য উপলব্ধি করা যেমন আমাদিগের পক্ষে সম্ভবপর হইবে, অন্যদিকে তেমনি যুগপৎভাবে আমরা ইহাও জানিতে পারিব যে, নারীর মর্য্যাদা ও অধিকার সম্বন্ধে এছলাম দুনয়ার কার্য্যক্ষেত্রে যে সকল বাস্তব নিয়ম কানুন প্রতিষ্ঠিত করিয়া রাখিয়াছে, তাহা সর্ব্বতোভাবে পূর্ণ পরিণত। কিয়ামত পর্য্যন্ত সে ব্যবস্থা অব্যাহত ভাবে চলিতে থাকিবে—চলিতে পারিবে।

সুতরাং এই বিষয়টীর বিস্তারিত আলোচনা যে সময়সাপেক্ষ, বিজ্ঞ পাঠকগণকে তাহা আর বলিয়া দিতে হইবে না। সে-সকল আলোচনা আপাততঃ স্থগিত রাখিয়া আজ আমরা নিজেদের সামান্য শক্তি অনুসারে দেখাইবার চেষ্টা করিব যে, এছলাম বাস্তব কার্য্যক্ষেত্রে নারীকে সত্যকার কি মর্য্যাদা ও অধিকার প্রদান করিয়াছে এবং এছলামের এই শিক্ষা মুছলমানের সামাজিক ও বৈষয়িক জীবনের পরতে পরতে কিরূপ চিরস্থায়ী ভাবে বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে।

( ২ )

সমস্ত অবস্থায় ও সকল বয়সের স্ত্রীলোকদিগের ব্যাপক স্বরূপ হইতেছে—"নারী।" তাহার পর এই নারী আবার এক একটা বৈশিষ্ট্য লইয়া জগতের সম্মুখে উপস্থিত হন, যথাক্রমে কন্যারূপে স্ত্রীরূপে ও মাতারূপে। নৃশংসতার সমস্ত ভাবধারাকে প্রতিহত করিয়া এছলাম নারী এবং তাহার এই তিনটী বিশেষ স্বরূপ সম্বন্ধে দুনয়ার বুকে যে স্বর্গের আদর্শ প্রতিষ্ঠা করিয়াছে, কোরআন ও হাদিছ হইতে তাহার কতকগুলি উদাহরণ প্রথমে উদ্ধার করিয়া দিতেছি।

## নারী—কন্যারূপে

নারী দুনয়ায় প্রথম আত্ম-প্রকাশ করে কন্যারূপে। কিন্তু ভূমিষ্ঠ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিশ্ব সংসার এমন কি স্বয়ং তাহার পিতা-মাতা যে নির্ম্মম উপেক্ষা ক্রোধ ও ঘৃণার সহিত তাহাকে স্বাগত সম্ভাষণ করিয়া থাকে, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। ইহার মধ্যে সমাজের যে সাধারণ মনোবৃত্তি লুক্কায়িত আছে, তাহার এবং তাহার অন্তর্নিহিত কারণগুলির বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে স্পষ্টভাবে জানা যাইবে যে, মানুষের সাধারণ ব্যবস্থা অনুসারে নারীগণ কন্যারূপে, স্ত্রীরূপে, ভগ্নীরূপে মাতারূপে তাহাদের নিকট যে অপমান, যে উপেক্ষা এবং অবিচার অত্যাচার লাভ করিয়া আসিতেছেন, সদ্যোজাত এই কন্যাও ভবিষ্যতে স্ত্রী মাতা ইত্যাদিরূপে অন্যের নিকট হইতে তদনুরূপ অপমান ও অত্যাচার সহ্য করিতে বাধ্য হইবে। ইহা মানুষ সহজেই অনুমান করিয়া লয়। স্নেহভাজন সন্তানের শোচনীয় দুর্দ্দশার সেই চরম চিত্র তাহাদের কল্পনা-নেত্রে প্রতিফলিত হইয়া ওঠার সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের হৃদয় ক্ষোভে ঘৃণায় এবং অপমানে অভিমানে বিমর্ষ অবসন্ন ও অধীর হইয়া পড়ে এবং সকলে মিলিয়া সেই সদ্যোজাত নিরপরাধ শিশুটির প্রতি অভিসম্পাৎ করিতে থাকে। ভাষাতত্ত্ববিদেরা 'দুখতর' 'দাদর' প্রভৃতি শব্দের উদাহরণ দিয়া কতিপয় প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ভাষার সমতা সমমূলকতা প্রতিপালন করিতে প্রয়াস পাইয়া থাকেন। এই প্রয়াসের ফলাফল এ ক্ষেত্রে আমাদের আলোচ্য নহে। কিন্তু এই সকল প্রাচীন ও সুসভ্য ভাষায় কন্যার ও নারীর জন্য সমবেতভাবে যে সকল শব্দের প্রচলন দেখা যায় আমরা এখানে তাহার প্রতি পাঠকগণের মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছি মাত্র। পার্সীভাষায় কন্যাকে "দুখ্‌তর" বলা হয়, উহা সংস্কৃত "দুঃখত্রয়।" আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক ত্রিবিধ তাপের আকর বা কারণ যে, সেই-ই দুঃখত্রয় বা দুখতর। সেকালে কন্যাদিগের প্রধান কাজ ছিল—গাভী দোহন করা, তাই তাহার নাম হইল দুহিতা। সদা কামনার বশবর্ত্তিনী বলিয়া সে কন্যা আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে। তনয়া ও পুত্রী মূলতঃ অসাধু প্রয়োগ। কারণ পিতাকে পুং নামক নরক হইতে ত্রাণ করে এবং পিতার বংশ বিস্তার করে বলিয়া পুরুষ সন্তানকে যথাক্রমে পুত্র ও তনয় বলা হয়। সুতরাং ঐ শব্দগুলিকে বলপূর্ব্বক "আকারান্ত" করিয়া লওয়া সঙ্গত বলিয়া গৃহীত হইতে পারে না। ইংরাজীর Woman শব্দটাই sums up a long history of dependence and subordinatlion বলিয়া ইংরাজ লেখকগণ মত প্রকাশ করিয়াছেন। (১) ইহা ব্যতীত কামিনী রমণী শ্রেণীর যে সকল শব্দ আমাদের মধ্যে প্রচলিত আছে, তাহার আভিধানিক বিশ্লেষণ করা সুরুচিসঙ্গত হইবে না।

(১) বৃটানিকা—Women

এই আকাশ পাতালব্যাপী শোচনীয় নির্ম্মমতার মধ্যে এছলাম—একমাত্র এছলামই—সূতিকাগৃহে প্রবেশ করিয়া দুনয়ার ঘৃণিত উপেক্ষিত সেই সদ্যোজাত শিশুকে সাদরে ও সসম্ভ্রমে কোলে তুলিয়া লইতেছে। যাহার আগমনের অশুভ সংবাদে তাহার পিতা পর্য্যন্ত দুঃখিত চিন্তিত এবং নিজকে বিপদগ্রস্ত বলিয়া মনে করিতেছে,—হতভাগিনী গর্ভধারিনী কন্যা-প্রসবের অপরাধ-চিন্তায় মূর্চ্ছার পর মূর্চ্ছা যাইতেছে—দুনয়ার সকল কল্যাণের আকর এবং অন্যায়ের বৈরী এছলাম, তাহাকে সেই সময় সান্ত্বনা দিয়া বলিতেছে, সকলে তোমাকে পরিত্যাগ করিলেও তোমার "পরমপিতা" তোমাকে ত্যাগ করেন নাই। ঐ শোন, তাঁহার শাশ্বতবাণী তোমার সম্বন্ধে ঘোষণা করিতেছে :—

واذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به ط ايمسكه على هون ام يدسه فى التراب - الا ساء ما يحكمون - سورة النحل -

"এবং যখন তাহাদিগের মধ্যকার কাহাকেও কন্যা সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার সংবাদ দেওয়া হয়, তখন তাহার মুখমণ্ডল মলিন হইয়া পড়ে আর সে যেন মরমে মরিয়া যাইতে থাকে। এই সংবাদের অকল্যাণ হইতে (রক্ষা পাইবার জন্য) সে লোক-সমাজ হইতে আত্মগোপন করিতে থাকে। লজ্জা ও অপমান বহন করিয়া সে কন্যাটীকে গ্রহণ করিবে না মাটির তলে তাহাকে আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিবে, (এই চিন্তায় তখন তাহার মন চঞ্চল হইয়া উঠে)। সাবধান! অতি কদর্য্য তাহাদের এই সিদ্ধান্ত।—ছুরা নহল

এই শাশ্বত বাণীর বাহক হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা এ সম্বন্ধে বলিতেছেন :—

اذا ولد للرجل ابنة بعث الله ملائكة يقولون السلام عليكم اهل البيت ! فيكتنفونها باجنحتهم و يمسحون بايديهم على رأسها و يقولون :— ضعيفة خرجت من ضعيفة - القيم عليها يعان الى يوم القيامة -

"মানুষের যখন কন্যা ভূমিষ্ট হয়, তখন আল্লাহ্ নিজের ফেরেশ্‌তাগণকে পাঠাইয়া দেন। তাঁহারা আসিয়া বলেন :—গৃহস্থের কল্যাণ হউক! তাহার পর নিজেদের বাহুদ্বারা কন্যাকে আবেষ্টন করিতে করিতে এবং সাদরে তাহার মাথায় হাত বুলাইয়া দিতে দিতে বলেন :—এক অবলা অন্য এক অবলা হইতে বহির্গত হইয়াছে। যে ব্যক্তি তাহার রক্ষণাবেক্ষণে মনোযোগী হইবে, কিয়ামত পর্য্যন্ত সে (আল্লার) সাহায্য লাভ করিতে থাকিবে।" এই হাদিছটী কনজুল ওম্মাল (৮—২৭৬) হইতে গৃহীত। এই মর্ম্মের আরও কয়েকটা হাদিছ এই পুস্তকে উদ্ধৃত হইয়াছে।

আল্লাহ ইচ্ছাময় জ্ঞানময় ও মঙ্গলময়। কন্যা বা পুত্র সন্তান ভূমিষ্ট হওয়া সেই ইচ্ছাময় ও জ্ঞানময় আল্লার মঙ্গল ইচ্ছার উপর সম্পূর্ণ ভাবে নির্ভর করিয়া থাকে। সুতরাং কন্যা ভূমিষ্ট হইলে অসন্তুষ্ট হওয়া আর আল্লার জ্ঞানময়ত্ব ও মঙ্গলময়ত্বকে অস্বীকার করা একই কথা। কোরআনের "শূরা" নামক ছুরায় আল্লাহ মানুষকে ইহা স্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়া দিয়া বলিতেছেন :—

لله ملك السموات والارض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء اناثا و يهب لمن يشاء الذكور - او يزوجهم ذكرانا و اناثا و يجعل من يشاء عقيما - انه عليم قدير سورة الشورى -

স্বর্গমর্ত্ত্যের রাজত্ব একমাত্র আল্লারই অধিকারভুক্ত, (ইচ্ছাময় তিনি) যাহা ইচ্ছা সর্জ্জন করিয়া থাকেন—যাহাকে ইচ্ছা কন্যা দান করেন এবং যাহাকে ইচ্ছা পুত্র দান করেন, অথবা (যাহাকে ইচ্ছা) পুত্র কন্যা উভয়ই দান করেন এবং (যাহাকে ইচ্ছা) বন্ধ্যা করিয়া দেন, নিশ্চয় তিনি জ্ঞানময় সর্ব্বক্ষম।

এই আয়ত সম্বন্ধে প্রথম দ্রষ্টব্য এই যে, এখানে প্রথমে কন্যার এবং তাহার পর পুত্রের উল্লেখ করা হইয়াছে। আরবী ভাষার সর্ব্বজনবিদিত সাধারণ নিয়ম অনুসারে কন্যার কথা অগ্রে বর্ণনা করায় তাহাকে যে কোন প্রকারে হউক, একটা গুরুত্ব বা বৈশিষ্ট্য দেওয়া হইতেছে। তফছিরকার-গণের মধ্যে গুরুত্বের প্রকার নির্ণয় সম্বন্ধে মতভেদ থাকিলেও বর্ণনার এই বিশেষত্বকে মোটের উপর তাঁহারা সকলেই স্বীকার করিতেছেন। সে যাহা হউক, এই আয়ত এবং নারীর মর্য্যাদা ও অধিকার সংক্রান্ত অন্যান্য আয়তগুলি আলোচনা করিয়া দেখিলে জানা যাইবে যে, কেবল এইরূপ ক্ষেত্রে কোরআন পুত্রের পূর্ব্বে কন্যার এবং পুরুষের পূর্ব্বে নারীর উল্লেখ করিয়াছে। আরবী অলঙ্কার শাস্ত্রের বিধানের

এবং ছনয়ার সাধারণ বর্ণনা-প্রণালীর এই ব্যতিক্রম দ্বারা কোরআন মানব-সমাজের সাধারণ ভাব-ধারাকে প্রতিহত করিয়া বলিয়া দিতেছে যে, নারী, নারী বলিয়া, আল্লার দৃষ্টিতে পুরুষ হইতে নিকৃষ্ট নহে। নারী নিকৃষ্ট, সুতরাং উৎকৃষ্টের পর তাহার উল্লেখ হইবে, ইহা সঙ্গত নহে। ইচ্ছাময় আল্লাহ্ যে মঙ্গলময় ও রহমানুররহিম স্বরূপ, নারীর মধ্য দিয়াও সেই স্বরূপের এক দিকের অভিব্যক্তি হইতেছে। ইহা তাহার নিকৃষ্টতা নহে—মঙ্গলময়ের নির্দ্ধারিত বিশেষত্ব। আয়তে দ্বিতীয় দ্রষ্টব্য এই যে, এখানে আল্লাহ্ মোহান্ধ মানবকে বুঝাইয়া বলিতেছেন, কন্যা বা পুত্র লাভ করাতে তোমাদিগের ইচ্ছা বা শক্তির কোনই দখল নাই। স্বর্গ মর্ত্ত্যের বিশাল সাম্রাজ্যের সমস্ত বস্তু ও বিষয় একমাত্র যে যে রাজাধিরাজের অধিকারভুক্ত, তিনি ইচ্ছাময় এবং নিজ মঙ্গল ইচ্ছা-প্রণোদিত হইয়া যাহা-ইচ্ছা সৃষ্টি করিয়া থাকেন। ফলে যাহাকে ইচ্ছা কন্যা এবং যাহাকে ইচ্ছা পুত্র দান করেন। অর্থাৎ পুত্র বা কন্যার মালেক তোমরা নহ, তাঁহার মঙ্গল ইচ্ছা পূর্ণ করার জন্য এই পুত্র বা কন্যা তোমার নিকট গচ্ছিত আল্লার দান। কন্যাকে ঘৃণা করিলে মঙ্গলময় রহ-মানের এই রহমতের দানকে পায়ে ঠেলা হইবে।

এমরানের স্ত্রী, নিজ গর্ভস্থ সন্তানকে আল্লার নামে উৎসর্গ করিবেন বলিয়া মানস করিলেন। কিন্তু কন্যা প্রসব করিয়া তিনি মর্ম্মাহত হইয়া বলিলেন :—আমি কন্যা প্রসব করিয়াছি, এখন কি করি! "কিন্তু খোদাতায়ালা সেই কন্যাকে অতি সমাদরের সহিত গ্রহণ করিলেন।" ছুরা আলে এমরাণে মরয়মের এই উপাখ্যানটী বর্ণিত হইয়াছে। কন্যা শুচিতা ও পবিত্রতার হিসাবে বা অন্য প্রকারে আল্লার হুজুরে উৎসর্গের অযোগ্য, এই উপাখ্যানের বর্ণনায় এই ধারণার প্রতিবাদ করা হইয়াছে। মরিয়ম সাধনায় লিপ্ত হইয়া কিরূপ সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন, তাহা আমরা যথাস্থানে আলোচনা করিব।

কন্যার লালন পালন সম্বন্ধে কয়েকটী হাদিছ নিম্নে উদ্ধৃত হইতেছে। হজরত বলিতেছেন :—

من عال جار يتين حتى تبلغا جاء يوم القيامة انا وهو هكذا و ضم اصابعه - مسلم -

ছুইটী বালিকাকে যে ব্যক্তি বয়ঃপ্রাপ্ত হওয়া পর্য্যন্ত যত্নের সহিত লালনপালন করিবে, সে আমার সহিত অভিন্ন ভাবে বেহেশ্‌তে অবস্থান করিবে।—মোছলেম।

من عال ثلث بنات او مثلهن من الاخوات فادبهن ورحمهن حتى يغنيهن الله اوجب الله له الجنة - فقال رجل يا رسول الله او اثنتين قال او اثنتين - حتى لو قالوا او واحدة لقال واحدة - مشكوة -

হজরত বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি তিনটী কন্যা বা তদনুরূপ ভগ্নীকে লালন পালন করে, তাহাদিগকে সুশিক্ষা দান করে এবং তাহাদিগের প্রতি সদয় ব্যবহার করে। তাহার পর বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে সৎপাত্রে ন্যস্ত করতঃ তাহাদিগকে স্বাবলম্বী করিয়া দেয়—বেহেশ্‌ত তাহার পক্ষে ওয়াজেব বা নিশ্চিত হইয়া গেল। একজন ছাহাবী জিজ্ঞাসা করিলেন—হজরত! ছুইটী কন্যার প্রতিপালকের সম্বন্ধে আপনার কি সিদ্ধান্ত? হজরত তখনই বলিলেন—অথবা ছুইটীর। এমন কি, আর কেহ একটা কন্যা সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলে হজরত তাহার প্রতিপালক এই প্রকার বেহেশ্‌তের খোশখবর দিতেন। —মেশকাত।

আর এক হাদিছে হজরতের প্রমুখাৎ বর্ণিত হইয়াছে—

من كانت له انثى فلم يئدها ولم يهنها ولم يؤثر ولده عليها يعني الذكور ادخله الله الجنة - ابوداود -

যে কোন ব্যক্তির কন্যা ভূমিষ্ঠ হইলে সে তাহাকে পুতিয়া ফেলিল না, তাহাকে অপমানিত করিল না, এবং তাহাকে উপেক্ষা করতঃ পুত্র সন্তানের পক্ষপাতী হইয়া পড়িল না, তাহাকে আল্লাহ্ বেহেশ্‌তে দাখিল করিবেন।—আবু দাউদ।

হজরতের সময় আরব দেশেও কন্যা হত্যা করার প্রথা প্রচলিত ছিল। হজরতের স্বর্গীয় শিক্ষার ফলে, কোন প্রকার জোর জবরদস্তি ব্যতীত, তাহা অল্পদিনের মধ্যে আরব হইতে চিরকালের তরে উঠিয়া গিয়াছিল। কোরআন, হাদিছ ও ইতিহাস ইহার নজির প্রমাণে পূর্ণ হইয়া আছে। হজরতের উপদেশ ফলে অল্পদিনের মধ্যে আরব-সমাজে নারীর যে মর্য্যাদা ও অধিকার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহার কতকগুলি উদাহরণও এই প্রবন্ধের শেষভাগে উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া হইবে।

## নারী—স্ত্রীরূপে

কামিনী কাঞ্চনের সংস্রবকে বিষবৎ জ্ঞান করিতে হইবে এবং সেজন্য এই দিন রাত্রের "বাঘিনী-ডাকিনী"গুলির ত্রিসীমা হইতে লক্ষ যোজন দূরে পলায়ন করিতে হইবে—এছলাম

এ শিক্ষার এবং নারীর প্রতি এই অমর্য্যাদার সমর্থন করে না। এছলাম নারীকে দেবীও বলে নাই, দানবীও বলে নাই। এছলাম বলিতেছে, নারীও পুরুষের ন্যায় মানুষ। এছলাম নারীকে ভগবতীর অংশভূতাও বলে নাই, আবার নারী হওয়ার অপরাধে স্বয়ং "শ্রীভগবানের বাণী" শ্রবণের অধিকার হইতে তাহাকে চিরকালের তরে বঞ্চিত করিয়াও রাখে নাই। এছলাম বলিয়াছে—যেমন পুরুষ শ্রীভগবান নহে, তদ্রূপ নারীও শ্রীভগবতী নহে। তাহারা উভয়েই সেই প্রেমময়, মঙ্গলময় ও ইচ্ছাময় রহমান্থুর-রহিমের সমান আদরের সৃষ্টি। আল্লার দেওয়া উপকরণ تقويم বা faculty গুলির সদ্ব্যবহার করিতে করিতে এই বানি-আদম এত উচ্চে উঠিতে পারে, যাহার অধিক উচ্চতার কল্পনা মানুষের পক্ষে সম্ভবপর নহে। পক্ষান্তরে সেই সকল গুণ বৃত্তি শক্তি বা তাকভিমের অব্যবহার বা অপব্যবহারের ফলে অধোগমন করিতে করিতে সে পতনের এমন ঘৃণিত স্তরে গিয়া উপস্থিত হয়, শয়তান ও পিশাচেরাও যাহার কল্পনায় শিহরিয়া উঠে। এ সম্বন্ধে নর ও নারী উভয়ের অবস্থা অভিন্ন। পুরুষ বলিয়া তাহার কোন বিশেষ দাবী বা অধিকার নাই, আর নারী বলিয়া তাহার কোন বিশেস disqualification অযোগ্যতা বা নিকৃষ্টতা নাই।

স্ত্রীরূপে নারী এছলামের নিকট হইতে কি মর্য্যাদা ও অধিকার লাভ করিয়াছে, তাহা সম্যক উপলব্ধি করিতে হইলে বিভিন্ন ধর্ম্ম ও সমাজের মধ্যে প্রচলিত বিবাহ-পদ্ধতি, ক্রিয়া কাণ্ড, প্রচলিত সাধারণ প্রথা, শাস্ত্রীয় মন্ত্রাদি এবং বিবাহে নারীর সম্মতি ও অনুমতি গ্রহণের বিধি-ব্যবস্থা সম্বন্ধে প্রথমে আলোচনা করা আবশ্যক। বিজ্ঞ পাঠকগণ তাহা হইলে বুঝিতে পারিবেন যে, দুনয়ার বিবাহ-সংক্রান্ত যে সব আদর্শ প্রচলিত আছে, তাহার মধ্যে কখনও কখনও গুরু গম্ভীর হিতোপদেশ শুনিতে পাওয়া গেলেও, বস্তুতঃ তাহার অন্তর্নিহিত সমস্ত ভাবধারা সমবেতভাবে বিবাহের দ্বারা নারীর দাসীত্বই প্রতিপাদন করিয়া থাকে। বাস্তব ক্ষেত্রে এছলাম নারীকে বিবাহে সম্মত বা অসম্মত হওয়ার যে অপরিহার্য্য স্বাধীনতা প্রদান করিয়াছে, এবং বিবাহিত-জীবনে তাহার জীবনের স্বাধীনতাকে কার্য্যতঃ যেরূপ দৃঢ়তার সহিত অক্ষুন্ন রাখিয়াছে, এই প্রবন্ধে আমরা স্বতন্ত্রভাবে তাহারও সংক্ষিপ্ত আলোচনা করিব।

এছলাম বিবাহিত-জীবনে নারীর কি মর্য্যাদা ও অধিকার প্রতিষ্ঠিত করিয়া দিয়াছে, প্রথমে তাহার কয়েকটা প্রমাণ উদ্ধৃত করিতেছি। স্ত্রী সমন্ধে কোরআন অতি সংক্ষেপে বলিয়া দিতেছে :—

هن لباس لكم وانتم لباس لهن - سورة البقرة -

স্ত্রীগণ তোমাদিগের পরিচ্ছদ এবং তোমরা হইতেছ তাহাদের পরিচ্ছদ। বকরা। এই ছয়টা শব্দের সংক্ষিপ্ত আয়তে স্বামী ও স্ত্রীর সম্বন্ধের স্বরূপ কিরূপ সুন্দর ও ব্যাপক ভাবে ব্যক্ত করা হইয়াছে, পাঠকগণ এখানে তাহা চিন্তা করিয়া দেখুন। মানুষ পরিচ্ছদ পরিধান করে, বাহিরের ধুলা-মাটির মলিনতা হইতে নিজকে নির্লিপ্ত রাখার জন্য, দুনয়ার শৈত্য বা উত্তাপ হইতে দেহকে রক্ষা করার জন্য, এবং সর্ব্বোপরি নিজের শ্লীলতা রক্ষা ও লজ্জা নিবারণ করার জন্য। বিবাহিত নর-নারীর দাম্পত্য জীবন পরস্পরের নিমিত্ত পরিচ্ছদ হইয়া এই ত্রিবিধ উদ্দেশ্য সফল করিতে থাকিবে। অধিকন্তু এজন্য উভয়ের পক্ষে উভয়ের সমান আবশ্যকতা। এ সম্বন্ধে পুরুষের কোন বিশেষ প্রাধান্য এখানে স্বীকৃত হইতেছে না। বরং, এই প্রাধান্য স্বীকারের যে ভাবধারা দুনয়ায় প্রচলিত আছে, স্বামীর অগ্রে স্ত্রীর উল্লেখ করিয়া কোরআন স্পষ্টাক্ষরে তাহার প্রতিবাদ করিতেছে।

কোরআনের অন্যত্র বলা হইতেছে :—

وعاشروهن بالمعروف فان كرهتموهن فعسى
ان تكرهوا شيئا و يجعل الله فيه خيرا كثيرا - نساء

এবং তোমরা নিজ সহধর্ম্মিনীগণের সহিত সদ্ভাবের সহিত জীবনযাপন করিতে থাকিবে। পরন্তু তোমরা যদি তাহাদিগকে ঘৃণা কর—তবে তোমরা এমন বস্তুকে ঘৃণা করিতেছ —প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ যাহাতে বহু মঙ্গল নিহিত রাখিয়াছেন।
—ছুরা নেছা।

স্ত্রী পাপের প্রস্রবণ নহে, বরং আল্লাহ তাহাকে বহু কল্যাণের আকররূপে দুনয়ায় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। সুতরাং তাহাকে ঘৃণা করিলে তোমার পক্ষে নিজের কল্যাণপুঞ্জকেই ঘৃণা করা হইবে। মুছলমানের বিশ্বাস, কোরআন আল্লার সাক্ষাৎ বাণী। তাহাতে বলা হইতেছে যে, সৃষ্টিকর্ত্তা আল্লাহ স্বয়ং স্ত্রীর জীবনকে সংসার ও সমাজের জন্য অশেষ মঙ্গলের নিদানরূপে গঠন করিয়া দিয়াছেন।

নর ও নারী উভয়েই মঙ্গলময় আল্লার আদরের। দুনয়ার

কল্যাণের জন্য উভয়কেই দৈহিক ও মানসিক হিসাবে কতকগুলি স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য দিয়া তিনি সৃষ্টি করিয়াছেন। উভয় বৈশিষ্ট্যের সদ্ব্যবহার এবং উভয়ের সাহচর্য্যের ফলে দুনয়ার দিকে দিকে তাঁহার সেই মঙ্গল ইচ্ছা জয়যুক্ত হইতে থাকুক, ইহাই তাঁহার ইচ্ছা। কিন্তু উভয়ের মধ্যে কোন এক শ্রেণী যদি নিজের এই বৈশিষ্ট্যকে নিকৃষ্টতার নিদানরূপে গ্রহণ করে বা করিতে বাধ্য হয়, এবং সে জন্য তাহারা যদি অপর শ্রেণীর বৈশিষ্ট্যকে অর্জ্জন করার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠে, তাহা হইলে নর ও নারীর স্বাতন্ত্র্য-সৃষ্টির মধ্যে আল্লার যে মঙ্গল ইচ্ছা নিহিত রহিয়াছে, তাহার বিরুদ্ধে একটা অনর্থক ও অস্বাভাবিক বিদ্রোহ উপস্থিত করা হইবে মাত্র। কোরআন উচ্ছৃঙ্খলতার প্রতিবাদ করিয়া মানুষকে বলিয়া দিতেছে যে, নর ও নারীর এই যে স্বাতন্ত্র্য এবং তাহাদের প্রত্যেকের সাধনার এই বিশেষ প্রগতি, ইহার মধ্যে কোনটাই নিকৃষ্টতার নিদর্শন নহে। বরং প্রত্যেক শ্রেণীর এই বিশেষত্ব হইতেছে তাহাদিগের প্রতি আল্লার অনুগ্রহদান বা ন্যামত। যথাযথ ভাবে এই দুই বিশেষত্বের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা এবং যুগপৎভাবে যথাযথরূপে তাহার সম্মিলন সাধনের ফলেই দুনয়া স্বস্তি শান্তি আনন্দ ও পবিত্রতায় পূর্ণ হইয়া আল্লার মঙ্গল ইচ্ছার জয়জয়কার করিতে সমর্থ হইতে পারিবে। ছুরা নেছার আর একটী আয়তে বলা হইতেছে :—

و لا تتمنوا مافضل الله به بعضكم على بعض ط
للرجال نصيب مما اكتسبوا ط و للنساء نصيب مما
اكتسبن ط و اسئلوا الله من فضله ط ان الله كان
بكل شيئى عليما ـ سورة النساء ـ

এবং (হে নর-সমাজ ও নারী-সমাজ!) তোমাদিগের এক শ্রেণীকে আল্লাহ অন্য শ্রেণীর উপর যে আধিক্য (বৈশিষ্ট্য) দান করিয়াছেন, তাহা (অন্যের সেই বৈশিষ্ট্য) লাভ করার লালসা তোমরা কখনও করিও না। পুরুষের সাধনার বৈশিষ্ট্য পুরুষেরই উপযোগী এবং নারীর সাধনার বৈশিষ্ট্য নারীরই উপযোগী। (নিজের বৈশিষ্ট্য বর্জ্জন ও অন্যের বৈশিষ্ট্য অর্জ্জনের অনর্থক চেষ্টা না করিয়া) তোমরা উভয়েই (নিজ সাধনায় সিদ্ধি লাভের জন্য) আল্লার নিকট তাঁহার অনুগ্রহ ভিক্ষা করিতে থাক। নিশ্চয় আল্লাহ সমস্ত বিষয়ের তাৎপর্য্য সম্যকরূপে অবগত আছেন (এবং সেই হিসাবে নর নারীকে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র বিশেষত্ব দিয়া সাধনার স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র দিকে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছেন)।—ছুরা নেছা।

মানুষ হিসাবে নর-নারীর মর্য্যাদার এই সমতা স্পষ্ট ও অনাবিল ভাষায় প্রকাশ করার সঙ্গে সঙ্গে কোরআন ইহাও বলিয়া দিতেছে যে, স্ত্রীর উপর স্বামীর কতকগুলি "হক" বা ন্যায্য অধিকার আছে—এ কথা সত্য বটে। কিন্তু যুগপৎ ভাবে স্বামীর উপরও স্ত্রীর **তাহার অনুরূপ** কতকগুলি ন্যায্য অধিকার আছে। স্বামীর অধিকার অনুসারে তাহার উপর কর্ত্তব্য ভার ন্যস্ত হইয়া থাকে, এবং স্ত্রীও নিজের অধিকার অনুসারে নিজ কর্ত্তব্য পালনের জন্য দায়ী হয়। আমাদের বিশ্বাস, এছলাম ব্যতীত অন্য কোনও ধর্ম্ম বা সামাজিক আইন, আজ পর্য্যন্ত স্ত্রীর অধিকারের এই সমতা এমন স্পষ্টভাষায় স্বীকার করে নাই। কোরআন আল্লার শাশ্বত বাণী, যুগে যুগে স্বামী-স্ত্রীর সম্বন্ধ লইয়া দুনয়ায় যে উচ্ছৃঙ্খলা ও ব্যভিচার প্রচলিত হইতে পারে, তৎসমুদয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া কোরআন সঙ্গে সঙ্গে ইহাও বলিয়া দিতেছে যে, প্রকৃতির বিধান অনুসারে দেহের গঠন ও শক্তি সামর্থ্যের দিক দিয়া, নারী অপেক্ষা নর কতকটা প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। প্রাকৃতিক বিধান অনুসারে নারী অনেক সময় দৈহিক হিসাবে এমন অশক্ত হইয়া পড়ে যে, পুরুষের ন্যায় শ্রমসাপেক্ষ কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া তখন তাহার পক্ষে আদৌ সম্ভবপর হইয়া উঠে না। এই শারীরিক শক্তি vitality এবং গর্ভধারণ ও সন্তান-প্রসব প্রভৃতি কারণের দিক দিয়া নারীর তুলনায় পুরুষের যে একটা প্রাধান্য আছে, কোরআন সে কথাও মানুষকে উত্তমরূপে বুঝাইয়া দিয়াছে। এই প্রাধান্য প্রতিপাদন করিয়া কোরআন নারীর অমর্য্যাদা করে নাই, বরং স্বামীকে বুঝাইয়া দিয়াছে যে, এই শারীরিক বৈশিষ্ট্যের কারণে শারীরিক শ্রম এবং উপার্জ্জন ও পরিবার প্রতিপালনের দায়িত্ব তোমার উপর ন্যস্ত হইয়াছে। তোমার স্ত্রীও তাহার দৈহিক বৈশিষ্ট্য অনুসারে অন্য প্রকারে বহু শ্রম ও কষ্ট স্বীকার করিয়া আল্লার মঙ্গল ইচ্ছাকে জয়যুক্ত করিতেছে।

ছুরা বক্রার একটী আয়তে স্বামী-স্ত্রীর অধিকারের সমতা ও কর্ত্তব্যের স্বাতন্ত্র্য সম্বন্ধে স্পষ্টাক্ষরে বলিয়া দেওয়া হইতেছে :—

ولهن مثل الذى عليهن بالمعروف ـ وللرجال
عليهن درجة ـ و الله عزيز حكيم ـ بقره ـ

"স্ত্রীদিগের উপর সঙ্গত ভাবে তোমাদিগের যে অধিকার তোমাদিগের উপরও তাহাদিগের তদনুরূপ অধিকার, এবং স্ত্রীর তুলনায় পুরুষের এক প্রকারের প্রধান্য আছে, আর আল্লাহ নিশ্চয়ই মহাক্ষমতাশালী, প্রজ্ঞাময়।—বকরা, ১০৫ আয়ত।

কোরআনে নারীর মর্য্যাদা ও অধিকার সম্বন্ধে যে সকল বাস্তব ব্যবস্থা আছে, এই প্রবন্ধের বিভিন্ন বিষয়ের আলোচনা প্রসঙ্গে তাহা পাঠকগণের খেদমতে উপস্থিত করার চেষ্টা করিব। এখানে এইটুকু বলিয়া রাখিতেছি যে, কোরআনের একটা দীর্ঘতম ছুরার নাম নেছা বা নারী, এবং উহাতে বিশেষ করিয়া নারীর স্বত্বাধিকার সম্বন্ধে বহু আবশ্যকীয় বিষয়ের আলোচনা সন্নিবেশিত হইয়াছে। ইহা ব্যতীত অন্যান্য বহু ছুরায় নারীর এই স্বত্বাধিকারের কথা নানা প্রসঙ্গে বিশদভাবে আলোচিত হইয়াছে। সুতরাং একখানা মাসিক পত্রের দুই একটা প্রবন্ধে নারী সংক্রান্ত এছলামীয় আদর্শের সম্যক পরিচয় প্রদান করা যে সম্ভবপর হইবে না, তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে।

স্ত্রীরূপে নারীর মর্য্যাদা সম্বন্ধে হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা কি প্রকার শিক্ষা দিয়াছেন, এখন তাহার একটু পরিচয় দিয়া অন্যান্য প্রসঙ্গের অবতারণা করিব। হজরত বলিতেছেন :—

اكمل المومنين ايمانا احسنهم خلقا - خياركم خياركم لنسايهم — ترمذى -

(মানুষের সহিত) ব্যবহারে যে ব্যক্তি যত উত্তম— ঈমানের হিসাবে সে তত পূর্ণ, এবং স্ত্রীর প্রতি তোমাদের মধ্যকার যাহার ব্যবহার যত অধিক সৎ—সে ব্যক্তিও তোমাদিগের মধ্যে তত অধিক সৎ।—তিরমিজী।

انما النساء شقايق الرجال احمد - ترمذى وغيره -

নারীগণ পুরুষদিগের অর্দ্ধাঙ্গিনী স্বরূপ। আহমদ, আবু দাউদ প্রভৃতি।

ليس من متاع الدنيا شيئى افضل من المراة الصالحة - مسلم - نسائي ابن ماجه احمد -

দুনয়ার উপকরণ সমূহের মধ্যে সাধ্বী স্ত্রী অপেক্ষা উৎকৃষ্ট বস্তু আর কিছুই নাই। মোছলেম, নাছাই, এবনে মাজা, আহমদ।

من تزوج فقد استكمل نصف الايمان - طبرانى كنزالعمال -

স্ত্রী গ্রহণ করিলে মানুষের (বাকী) অর্দ্ধেক ঈমান পূর্ণ হইয়া যায়।—কনজ ৮-২৩৮।

ان الله جعلها لك لباسا وجعلك لها لباسا - ايضا

আল্লা তোমার স্ত্রীকে তোমার পরিচ্ছদ করিয়া দিয়াছেন এবং তোমাকে তোমার স্ত্রীর জন্য পরিচ্ছদ করিয়া দিয়াছেন। ঐ, ৮—২৫৪।

মুছলমানের জীবন মরণের পুণ্যতম আদর্শ—গাজী বা শহিদ। সত্যের সহায়তা এবং অন্যায় ও অসত্যের মূলোৎপাটন করার জন্য যে নিজের প্রাণকে উৎসর্গ করে, এছলামের পরিভাষায় সেই হইতেছে—গাজী। আবার এই উৎসর্গীত-প্রাণ গাজী যখন অসত্যের সংঘাতে সেই প্রাণকে চিরতরে দান করিয়া ফেলে, তখন তাহাকে বলা হয়—শহীদ। নানা প্রাকৃতিক অসুবিধা ও দৈহিক দৌর্ব্বল্যের জন্য জীবন মরণের এই পুণ্য আদর্শে নারী যথাযথরূপে অংশ গ্রহণ করিতে পারে না। সুতরাং গাজী ও শহীদের মর্য্যাদা হইতে নারীকে বঞ্চিত করিয়া রাখা হইয়াছে, বাহ্যতঃ এইরূপ মনে হয়। হজরতের সময় কোন কোন নারী তাঁহার খেদমতে এই প্রকার অনুযোগ উপস্থিত করিতেও কুণ্ঠিত হন নাই। ইহার উত্তরে হজরতের বহু সংখ্যক হাদিছের উল্লেখ করা যাইতে পারে। আমরা নিম্নে তাহার মধ্যকার একটী মাত্র হাদিছ উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

المراة فى حملها الى وضعها الى فصالها كالمرابط فى سبيل الله وان ماتت فيما بين ذلك فلها اجر شهيد — كنزالعال -

অন্তঃসত্তা অবস্থায়, প্রসব অবস্থায় এবং সন্তানকে দুগ্ধ দানের অবস্থায় নারীর মর্য্যাদা ধর্ম্মসমরে চিরসংযুক্ত গাজীর অনুরূপ; আর এই সকল অবস্থার মধ্যে যদি তাহার মৃত্যু ঘটে, তাহা হইলে সেই নারী শহিদের মর্য্যাদা লাভ করিয়া থাকে। তবরানী—কনজ ৮—২৬৮।

الا ان لكم على نساءكم حقا ولنساءكم عليكم حقا الحديث - ترمذى -

সাবধান! তোমাদিগের স্ত্রীর উপরে তোমাদিগের অধি-

কার আছে এবং তোমাদিগের উপর তোমাদিগের স্ত্রীদিগেরও অধিকার আছে।—তিরমিজি।

বিভিন্ন হাদিছের বর্ণনায় জানা যায়, হজরত পবিত্রতা ও মাধুর্য্যে নারীকে সুগন্ধির সহিত তুলনা করিয়াছেন। পক্ষান্তরে নারীদিগকে হজরত "কওয়ারির" বা কাচপাত্র বলিয়াও উল্লেখ করিয়াছেন। কাচ স্বভাবতঃ স্বচ্ছ ও নির্ম্মল এবং কঠোরতর সংঘাত সহনে অক্ষম। নিরক্ষর মোস্তফার এই দুইটী উপমায় নারীর মর্য্যাদা ও মাধুর্য্য কেমন সুন্দর ও কত স্পষ্টভাবে অভিব্যক্ত হইয়া যাইতেছে, চিন্তাশীল পাঠক পাঠিকাবর্গকে তাহা আর বলিয়া দিতে হইবে না।

## মাতারূপে নারী

মাতৃভক্তি ও মাতৃসেবা সম্বন্ধে দুনয়ার অধিকাংশ ধর্ম্মশাস্ত্রে অনেক মূল্যবান উপদেশ সন্নিবেশিত হইয়া আছে। কিন্তু আমাদের মনে হয়, এছলাম এই প্রশ্নটাকে যে বিশেষত্ব দান করিয়াছে, অন্যত্র তাহার তুলনা খুঁজিয়া পাওয়া সহজসাধ্য হইবে না। এছলামের সর্ব্বপ্রথম ও সর্ব্বপ্রধান শিক্ষা তাওহিদ বা খাঁটী একেশ্বরবাদ। এই তাওহিদের শিক্ষাকে কার্য্যে পরিণত করিয়া, কিরূপে রিক্ত মুক্ত ও অনাবিল ভাবে সেই এক ও অদ্বিতীয় আল্লার এবাদত বন্দেগী বা পূজা অর্চ্চনা করিতে হইবে, কোরআনের বহু স্থানে বিভিন্ন প্রকারে তাহা বর্ণিত হইয়াছে। পিতা মাতার প্রতি আনুগত্য এবং তাঁহাদের সেবা সম্বন্ধে বর্ণিত আয়তগুলির আলোচনা কালে দেখিতে পাওয়া যায় যে, এই শ্রেণীর বহু আয়তে আল্লাহ নিজের এবাদতের আদেশের সঙ্গে সঙ্গে, অব্যবহিতরূপে, মানুষকে পিতা মাতার প্রতি ভক্তিমান, তাঁহাদের অনুগত ও সেবারত থাকার হুকুম প্রদান করিয়াছেন। ছুরা বকরা, ছুরা আন আম ও ছুরা বানি-এছরাইলের এতৎসংক্রান্ত আয়তগুলি পাঠ করিয়া দেখিলে, সাধারণ পাঠকগণ আমাদিগের কথার সত্যতা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন। ইহা ব্যতীত ছুরা আনকাবুৎ প্রভৃতিতেও এই বিষয়টী বিস্তারিতরূপে বর্ণিত হইয়াছে। নমুনা স্বরূপ নিম্নে একটী মাত্র আয়ত উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

ছুরা বানি-এছরাইলে বর্ণিত হইয়াছে :—

وقضی ربک الا تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین
احسانا ط اما یبلغن عندک الکبر احدهما او کلهما
فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا معروفا -
واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما
کما ربیانی صغیرا - بنی اسرائیل -

এবং তোমার প্রভু আদেশ করিলেন যে, তুমি একমাত্র তাঁহার এবাদত ও পিতা মাতার প্রতি সদ্ব্যবহার করিবে। পিতা মাতা বা তাঁহাদের মধ্যে একজন যদি তোমার নিকট বার্দ্ধক্য প্রাপ্ত হন, তাহা হইলে তাঁহাদিগকে বিরক্তিজনক সামান্য একট কথাও বলিও না, তাঁহাদিগকে ভর্ৎসনা করিও না, বরং তাঁহাদিগের সহিত সুসঙ্গত আলাপ করিবা এবং প্রেমপ্রসূত বিনয় সহকারে তাঁহাদিগের সমীপে অধঃনামিত হইয়া থাকিবা, আর ( প্রার্থনা করিয়া বলিবা ) প্রভুহে, যেমতে শিশু অবস্থায় ইঁহারা আমার লালন পালন করিয়াছেন, তুমিও ইঁহাদিগকে নিজের করুণা দান কর !

এই আয়তে আল্লাহ পিতা মাতার আনুগত্যকে নিজের এবাদতের হুকুমের সঙ্গে একত্রভাবে বর্ণনা করিতেছেন। বার্দ্ধক্যপ্রাপ্ত পিতা মাতার মানসিক অবস্থার যেরূপ পরিবর্ত্তন ঘটিয়া যায় এবং সেই সময় তাঁহাদের মনস্তুষ্টির জন্য যে ভক্তি ও ধৈর্য্যের আবশ্যক, আয়তে তাহাও স্পষ্ট করিয়া বলিয়া দেওয়া হইতেছে। তাহার পর আয়তে সূক্ষ্ম ইঙ্গিত দ্বারা পিতৃ মাতৃভক্ত সন্তানকে আর দুইটী গভীর তত্ত্বের কথা বলিয়া দেওয়া হইতেছে। তাহার প্রথম কথা এই যে, সৃষ্টি ও পালনের একমাত্র মালেক যে আল্লাহ, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু তাঁহার সৃষ্টি ও পালনের এই মহিমার প্রকাশ হয়, দুনয়ার বিভিন্ন "আছবাব" বা উপলক্ষ উপকরণের মধ্য দিয়া। এক্ষেত্রে পিতা ও মাতাকে আল্লাহ নিজের প্রতিনিধি "ছবব" বা উপলক্ষরূপে বর্ণনা করিতেছেন। দ্বিতীয়তঃ, পিতা মাতা বার্দ্ধক্য প্রাপ্ত হইলে, শক্তি ও মানসিকতা উভয় দিক দিয়া তাঁহারা আবার যেন শিশুত্ব লাভ করেন। শিশু কালে তোমার কত ন্যায্য অন্যায্য আব্দার সহ্য করিয়া—কত অহেতুক উপদ্রব ও কত অশিষ্ট ব্যবহার সানন্দে বহন করিয়া, তাঁহারা তোমাকে লালন পালন করিয়া এত বড় করিয়াছেন। এখন সেই জরাজীর্ণ জনক-জননী তোমার শিশু সন্তানরূপে পরিণত হইয়াছেন। সেই দৃষ্টিতে এখন তোমাকে তাঁহাদের প্রতি লক্ষ্য করিতে হইবে, সেই ভাবে সানন্দে তাঁহাদের সমস্ত আব্দার উপদ্রব সহ্য করিতে হইবে, তবে তোমার পিতৃ মাতৃ ঋণ শোধ হইতে পারিবে। মাতৃভক্তির এমন কঠোর ব্যাপক ও মহান আদেশ, এবং তাহার কার্য্যকারণ পরম্পরার এমন সূক্ষ্ম গভীর ও স্বর্গীয় বিশ্লেষণ আর কুত্রাপি পাওয়া যাইতে পারে বলিয়া আমরা অবগত নহি।

—ক্রমশঃ

# আর্টের স্বরূপ

[ গোলাম মোস্তফা ]

আধুনিক সাহিত্যে আজকাল 'আর্টের' আলোচনা প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায়। গল্পে, উপন্যাসে, কাব্যে, কবিতায়, চিত্রে, নাটকে, সঙ্গীতে—আর্ট এমন ভাবেই প্রভাব বিস্তার করিয়া বসিয়াছে যে, তাহাকে এড়াইয়া ঐ সব বিষয়ে কোন কথা বলা আজকাল একরূপ অসম্ভব ব্যাপার। সাহিত্যের বাজারে যাঁহারা বিকিকিনি করেন, তাঁহারাও এ-সম্বন্ধে খুবই সজাগ। তাই দেখিতে পাই, কোন একখানি উপন্যাস বা কাব্য প্রকাশিত হইলে সেখানি আর্টের দিক দিয়া সার্থক হইল, কিংবা "একেবারে মাটি" হইয়া গেল, মাসিক সাহিত্যের সমালোচক সে কথা উল্লেখ করিতে ভুলেন না, কেননা এ কথা তাঁহার বেশ ভাল রকমই জানা আছে যে, ঐ শ্রেণীর কোন পুস্তক সমালোচনায় আর্টের উল্লেখ না করিলে সমালোচনা এবং সমালোচক—কেহই সাধারণের চক্ষে গুরু-গম্ভীর হয় না। শুধু সমালোচনা নয়, বিজ্ঞাপনের বাজারেও আর্টের ভয়ানক নাম। যে কোন একখানা উপন্যাস বাহির হইলেই তাহার বিজ্ঞাপনে লেখা হইয়া থাকে—"আর্টে ও মনস্তত্ত্বে অনুপম," "ফরাসী আর্টের নিপুণ নিদর্শন" ইত্যাদি ইত্যাদি। আর্ট লইয়া তর্ক-বিতর্কও নিতান্ত কম হয় না। কেহ বলেন—"Art for art's sake," কেহ বলেন—"আর্ট ধর্ম্মনীতি বা সভ্যতার কোন তোয়াক্কা রাখে না।" কেহবা বলেন "গুরু মহাশয়-গীরি করা আর্টের কাজ নয়,"—এইরূপ ধরণের অনেক কথাই শুনা যায়। আর্ট জিনিষটা যে কি, সে কথা অনেকে না জানিলেও আর্ট যে কিরূপ হইবে এবং উহার সীমানা যে কতদূর যাইবে, তাহা নির্ণয় করিতে সকলেই কিন্তু তৎপর। সাহিত্যিকবৃন্দের এই সব আলোচনা শুনিলে বাহির হইতে মনে হয়—আর্টকে জানিতে চিনিতে ইঁহাদের আর বাকী নাই। আর্ট সম্বন্ধে যাঁহারা নিতান্ত অনভিজ্ঞ বা যাঁহারা এ বিষয়ে অনুসন্ধিৎসু, তাঁহারাও মুখ ফুটিয়া নিজেদের অজ্ঞতা প্রকাশ করেন না, কারণ তাহারা মনে করেন, সেরূপ করিলে সাহিত্যিক-মহলে তাঁহাদের এমন এক বিষয়ের জ্ঞানের দৈন্য ধরা পড়িয়া যাইবে—যাহা অপর সকলের নিকট নিতান্তই সোজা। বলা বাহুল্য, এই মনোভাবের জন্য সাহিত্যিকদিগের অনেকেই আর্টকে সত্যরূপে না জানিয়াও বাহিরে প্রকাশ করিতেছেন যে তাঁহারা সব জানেন।

সাধারণ লোক ত এ সম্বন্ধে একেবারেই অজ্ঞ। সাহিত্যে আর্ট আসিয়াছে, ইহাই তাহারা শোনে, কিন্তু আর্ট জিনিসটা কি, তাহা তাহারা বুঝিয়া উঠিতে পারে না। এ সম্বন্ধে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতেও তাহাদের সাহস হয় না। আর্ট যেন এই কালা-আদমীর দেশে পশ্চিম হইতে আমদানী করা এক শ্বেতাঙ্গ সুন্দরী। কতিপয় নেটীভ সাহিত্যিক তাহার সহিত প্রেম করিয়া সাহেব সাজিয়া সমাজের চোখের উপর দিয়া অবলীলাক্রমে বেড়াইয়া বেড়াইতেছে। আর্ট-সুন্দরীকে লইয়া তাহারা বিচিত্র লীলা-লাস্যে হাসিতেছে, খেলিতেছে, এবং এমন এক সাহেবী হাবভাব দেখাইতেছে, যাহাতে সাধারণে মনে করিতে পারে—"বাপ্‌রে বাপ! কি জবরদস্ত লোক এরা! 'আর্টে'র সঙ্গে এদের পরিচয়।" জনসাধারণের এই মানসিকতার সুযোগ লইয়া আর্ট-প্রেমিকগণ আর্টের নামে যথেচ্ছা আচরণ করিতেছেন। জনসাধারণ অবাক বিস্ময়ে তাঁহাদের প্রতি শুধু চাহিয়াই আছে, কোন কথা বলিতে পারিতেছে না,—পাছে বা মানহানির চার্জ্জে পড়ে!

কিন্তু প্রতিক্রিয়ারও দিন আসিয়াছে। আজ লোকে জানিতে চায় আর্ট কি, তাহার উদ্দেশ্য কি এবং তাহার সীমানা কতদূর।

আমি বাহিরের লোক হিসাবেই আর্টের কিঞ্চিৎ কুল-পরিচয় দিব। যাঁহারা আর্টের স্তাবক বা জ্ঞাতি, তাঁহারা যদি এই পরিচয়ের ভিতরে কোথায়ও কোন অসঙ্গতি বা ভ্রম-প্রমাদ দেখিতে পান, তবে অনুগ্রহ পূর্ব্বক লেখকের দৃষ্টি সেদিকে আকর্ষণ করিবেন।

## আর্ট কি ?

এই প্রশ্নের উত্তর আর্ট-প্রেমিকগণ যত সহজ মনে করিয়া বসিয়া আছেন, প্রকৃতপক্ষে কিন্তু তত সহজ নয়। আর্টবাদী হয়ত এক কথায় ইহার উত্তর দিবেন—"সৌন্দর্য্য সৃষ্টিই আর্ট।" কিন্তু এ উত্তরে মোটেই সন্তুষ্ট হওয়া যায় না। আর্ট যদি সৌন্দর্য্য-সৃষ্টিই হয়, তবে সৌন্দর্য্য জিনিষটা কি? সেটা ত আমাকে আগে বুঝিতে হইবে। কাজেই আর্ট কি, এই প্রশ্নের পূর্ব্বে সৌন্দর্য্য কি, ইহাই সর্ব্বাগ্রে আমাদিগকে মীমাংসা করিতে হইবে।

সৌন্দর্য্য কি? এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া বড় কঠিন। কতকগুলি মৌলিক বিষয় আছে, যাহাদের কোন সঠিক সংজ্ঞা দেওয়া চলে না। গন্ধ কি, আস্বাদ কি, এ সব প্রশ্নের কোন সংজ্ঞা নাই। তবে পরিপার্শ্বের অবস্থা বর্ণনা দ্বারা এই সব বিষয়ের একটা মোটামুটি ধারণা দেওয়া যাইতে পারে। অতি প্রাচীন কাল হইতেই সৌন্দর্য্য সম্বন্ধে নানা মুনির নানা মত পরিলক্ষিত হইয়া আসিতেছে এবং এই কারণেই আর্টের সংজ্ঞাও বিভিন্ন হইয়া পড়িয়াছে।

প্রাচীনকালে সৌন্দর্য্য সম্বন্ধে কাহারও কোন সঠিক ধারণা ছিল না বা এ সম্বন্ধে কোন দার্শনিক পণ্ডিত কোন গবেষণাও করেন নাই। জ্ঞানবিজ্ঞানের আদিম লীলা-ভূমি গ্রীস দেশের পণ্ডিত সক্রেটীস্, প্লেটো, এরিষ্টটল প্রভৃতির মতে "যাহাই কার্য্যকরী তাহাই সুন্দর।" অর্থাৎ তাঁহারা সৌন্দর্য্যকে মঙ্গল হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখেন নাই। কথিত আছে, সক্রেটীসের নাসা-রন্ধ্র ও মুখ-গহ্বর অতিমাত্রায় প্রশস্ত ও কদাকার হইলেও তিনি উহাদিগকেই অপেক্ষাকৃত সুন্দর বলিতেন, কেননা বাতাস ও খাদ্যদ্রব্য গ্রহণের পক্ষে উহারাই অধিকতর কার্য্যকরী ছিল। সৌন্দর্য্য সম্বন্ধে প্রাচীন কালের প্রায় সকল দার্শনিক ও পণ্ডিতই এই মত পোষণ করিতেন। শুধু প্রাচীন যুগ কেন, অষ্টাদশ শতাব্দীর পূর্ব্বে সৌন্দর্য্য-তত্ত্ব সম্বন্ধে ধারাবাহিকরূপে কেহই কোন আলোচনা বা গবেষণা করেন নাই। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে (১৭১৪—১৭৬২) জার্ম্মানীতে বমগার্টেন (Baumgarten) নামক জনৈক খ্যাতনামা দার্শনিক সৌন্দর্য্য সম্বন্ধে সুশৃঙ্খলতার সহিত আলোচনা আরম্ভ করেন। আধুনিক সৌন্দর্য্য বিজ্ঞানের (Æsthetics) তিনিই একরূপ জন্মদাতা। তাঁহার মতে সৌন্দর্য্য অনুভূতির বিষয়ীভূত। চিন্তা (thinking) দ্বারা সত্য, ইচ্ছা (wille) দ্বারা মঙ্গল এবং অনুভূতি (feeling) দ্বারা সৌন্দর্য্যকে উপলব্ধি করা যায়। এই সত্য, মঙ্গল এবং সুন্দরের মূলাধার হইতেছে—সেই একমাত্র খোদাতালা। চিন্তার ভিতর দিয়া, নৈতিক ইচ্ছার ভিতর দিয়া এবং সৌন্দর্য্যানুভূতির ভিতর দিয়া—তিন উপায়েই তাঁহাকে লাভ করা যায়। সৌন্দর্য্যের ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া তিনি বলেন, "অঙ্গ প্রত্যঙ্গের পরস্পরের মধ্যে এবং অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ও সমগ্রের মধ্যে সামঞ্জস্য-বিধানই সৌন্দর্য্য। (A correspondence of the parts in their mutual relation to each other and in their relation to the whole.) সৌন্দর্য্যের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে তিনি বলেন—আনন্দ-দান এবং অন্তরে কোন একটা কামনার উদ্রেক করাই সৌন্দর্য্যের উদ্দেশ্য। আর্ট সম্বন্ধে তাঁহার মত—"সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করাই আর্টের প্রধান লক্ষ্য, তবে প্রকৃতির ভিতর হইতেই আর্টের উপাদান সংগ্রহ করিতে হইবে, কেননা সেই চরম পরম অশরীরী সৌন্দর্য্য (Absolute Beauty) প্রকৃতির ভিতর দিয়াই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী পরিমাণে আত্মপ্রকাশ করিতেছে।

অতএব বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইতেছে, বমগার্টেনের মতে সৌন্দর্য্যের একটা স্বাধীন ও অশরীরী সত্তা (Absolute Beauty) আছে; সৌন্দর্য্যের সহিত আনন্দ ও আকাঙ্ক্ষার সম্বন্ধ আছে এবং সৌন্দর্য্যই আর্টের প্রাণ।

বমগার্টেনের অব্যবহিত পরেই সুল্‌জার, মেণ্ডেল্‌সোহ্‌ন্, মরিজ প্রভৃতি লেখকবৃন্দ আর এক নূতন মত প্রচার করেন। তাঁহারা বলেন—আর্টের লক্ষ্য সৌন্দর্য্য নয়, মঙ্গল। নৈতিক সুসম্পন্নতাই (moral perfection) আর্টের উদ্দেশ্য।

কিন্তু পরবর্ত্তী কালে উইল্‌কেনম্যান উপরোক্ত উক্তির বিরুদ্ধে এই মত প্রচার করেন যে, শুধু সৌন্দর্য্যই আর্টের লক্ষ্য, তাহার সহিত মঙ্গল ভাবের কোনই সম্বন্ধ নাই। লেসিঙ্, হার্ডার, গেটে প্রভৃতি অনেকেই এই মত পোষণ করিতেন। অবশেষে খ্যাতনামা দার্শনিক ক্যাণ্ট (Kant) সৌন্দর্য্য ও আর্ট সম্বন্ধে আর এক নূতন কথা বলেন। তাঁহার মত এইরূপ—মানুষ যে নিজে প্রকৃতির মধ্যে রহিয়াছে এবং তাহার বাহিরেও যে প্রকৃতি রহিয়াছে, এ জ্ঞান তাহার আছে। বহিঃপ্রকৃতির মধ্যে সে সত্যের সন্ধান করে এবং নিজের মধ্যে সে মঙ্গলের সন্ধান করে। চিন্তা ও ইচ্ছাশক্তির দ্বারা এই দুই

উদ্দেশ্য সাধিত হইতে পারে। কিন্তু চিন্তা ও ইচ্ছা ছাড়া মানুষের আরও একটী বিচার-শক্তি আছে—যাহা চিন্তা বা ইচ্ছার কোনই ধার ধারে না। সে হইতেছে সৌন্দর্য্যানুভূতি। কাজেই ক্যাণ্টের মতে চিন্তা বা ইচ্ছার উদ্রেক না করিয়া এবং মঙ্গলামঙ্গলের কোনই সম্বন্ধ না রাখিয়া যাহাই আনন্দ দান করে, তাহাই সৌন্দর্য্য। অন্য কথায়, সৌন্দর্য্য তাহাকেই বলা হইবে, যাহা দেখিলে আনন্দ পাওয়া যাইবে বটে, কিন্তু লাভ লোকসানের কোনই কথা উঠিবে না। আর্টের ধারণাও তাঁহার এইরূপ। তাঁহার মতে আনন্দদানই আর্টের উদ্দেশ্য।

ক্যাণ্টের পরবর্ত্তী লেখকগণের মধ্যে হিগেলের ( Hegel ) নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সৌন্দর্য্যকে তিনি আর এক ভাবে ব্যাখ্যা করেন। তিনি বলেন—খোদাতালা দুই উপায়ে আত্মপ্রকাশ করেন, (১) ভাব-রূপে ( subjectively ) এবং (২) বস্তু-রূপে ( objectively. )। বস্তুর ভিতর দিয়া সেই ভাবময়ের উজ্জ্বল বিকাশই সৌন্দর্য্য। আত্মাই প্রকৃতপক্ষে সুন্দর; বাহিরের এই সৌন্দর্য্য সেই আত্মার সৌন্দর্য্যেরই বহির্বিকাশ। হিগেলের মতে সত্য এবং সুন্দর একই জিনিষ। তফাৎ এই—সত্য হইতেছে সেই ভাবময়ের আসল বস্তু-বিহীন রূপটী ( Idea )—যাহা শুধুই চিন্তা ও ধারণার বিষয়; আর সৌন্দর্য্য হইতেছে সেই সত্যেরই বাস্তব বিকাশ। সত্য যখন বাহিরে রূপ পরিগ্রহ করে, তখন ইহা শুধু সত্য নয়, সুন্দর হইয়া দেখা দেয়।

'শিলার' নামক আর একজন খ্যাতনামা দার্শনিক বলিয়াছেন—'সসীমের মধ্যে অসীমের অনুভূতিই হইতেছে সৌন্দর্য্য এবং হৃদয়ে এই অনুভূতির উদ্রেক করাই আর্টের কার্য্য।'

এইরূপ ভাবে ফিকৃটে, হারবার্ট, ডারউইন প্রভৃতি বহু খ্যাতনামা দার্শনিক সৌন্দর্য্য ও আর্ট সম্বন্ধে নানা ভাবে নিজেদের মত প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু কেহই কোন সর্ব্ববাদীসম্মত সিদ্ধান্তে পৌঁছিতে পারেন নাই।

উপরোক্ত মতবাদগুলিকে মোটামোটি ভাবে দুই ভাগে বিভক্ত করা যায়—(১) সৌন্দর্য্যের একটা স্বাধীন অশরীরী সত্ত্বা ( Absolute Being ) আছে; (২) সৌন্দর্য্য বলিয়া আসলে কিছুই নাই, যাহাই আনন্দ দান করে, তাহাই সৌন্দর্য্য।

বলা বাহুল্য উপরোক্ত মতদ্বয়ের কোনটাই সন্তোষজনক নহে। ১মটী শুনিতে খুব গুরু গম্ভীর হইলেও, উহা নিতান্তই হেঁয়ালীপূর্ণ, দুর্ব্বোধ্য এবং ধারণার অতীত। উহার দ্বারা সৌন্দর্য্য সম্বন্ধে মনের মধ্যে কোন ধারণাই জমাট বাঁধিয়া উঠে না। ২য়টী সহজবোধ্য হইলেও নিতান্তই ভ্রমপূর্ণ ও অসম্পূর্ণ, কেননা যাহাই আনন্দ দান করে, তাহাই যদি সৌন্দর্য্য হয়, তবে সৌন্দর্য্যের কোনই আদর্শ ( standard ) থাকে না। একই বস্তু একজনের নিকট সুন্দর এবং অন্য জনের নিকট অসুন্দর বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে, কারণ সৌন্দর্য্যানুভূতি সকলের একরূপ নহে। ঠিক একই কারণে এহেন অনিশ্চিত ভিত্তির উপর দণ্ডায়মান আর্টেরও কোন স্থিরতা থাকে না; আর্টের নামে স্বেচ্ছাচার আরম্ভ হয়।

অতএব দেখা যাইতেছে, আর্টকে সৌন্দর্য্যের ভিত্তির উপর দাঁড় করাইয়া ব্যাখ্যা করিতে গেলে প্রকৃতপক্ষে কোন ব্যাখ্যাই করা হয় না; উহা এক হেঁয়ালী হইতে আর এক হেঁয়ালীতে লইয়া যায় মাত্র।

আর্ট তবে কী? আমার মতে টলষ্টয় যে সংজ্ঞা দিয়াছেন, তাহাই ঠিক। তিনি বলেন, আর্টকে সম্যকরূপে বুঝিতে হইলে সর্ব্বপ্রথম কর্ত্তব্য এই হইবে যে, সৌন্দর্য্য ও আনন্দকে বাহিরে রাখিয়া আর্টকে দেখিতে হইবে। অর্থাৎ সৌন্দর্য্য ও আনন্দের সহিত আর্টকে যোগ-সম্বন্ধ ভাবে দেখিতে হইবে না। আর্ট মানব জীবনেরই একটি ক্রিয়া বা অবস্থা; মানুষের মনোভাবের পরস্পর আদান প্রদানেরই ইহা অন্যতম উপায় স্বরূপ। বাকশক্তি যেমন মানুষের চিন্তা ও অভিজ্ঞতার বিষয় অপর সকলের নিকট পৌঁছাইয়া দেয় এবং পরস্পরের মধ্যে একটা যোগ স্থাপনা করে, আর্টও তদ্রূপ মানুষের অন্তরের অব্যক্ত অনুভূতিকে অপর হৃদয়ে পৌঁছাইয়া দেয়। মানুষ যাহা চিন্তা করে বা দেখে, তাহা কথার দ্বারা অনায়াসে সে অপরের নিকট ব্যক্ত করিতে পারে; কিন্তু অন্তরের অন্তস্তলে সে যাহা অনুভব করে, তাহা শুধু কথার দ্বারা সম্যক প্রকাশ পায় না; সেইখানে আর্টের দরকার হয়। সুতরাং আর্টকে অনুভূতির ভাষা বলা যাইতে পারে। নিজ অন্তরে যাহা অনুভব করা যায়, অপর হৃদয়ে তাহাই অবিকল পৌঁছাইয়া দিবার কলা-কৌশলই আর্ট। টলষ্টয় বলেন :—

"Art is a human activity, consisting in this, that one man consciously, by means of certain external signs, hands on to others, feelings he has lived through and that

others are infected by these feelings and also experience them."

অর্থাৎ আর্ট একটী মানবীয় ক্রিয়া, যদ্দ্বারা কোন মানুষ সজ্ঞানে কতিপয় প্রক্রিয়া দ্বারা নিজের মনের অনুভূত কোন ভাবকে এমনভাবে অপরের মনে পৌঁছাইয়া দেয় যে, অপরের মন সেই ভাবে সংক্রামিত হইয়া নিজেই উহা উপলব্ধি করিতে পারে।

কতিপয় দৃষ্টান্ত দেওয়া যাউক :—

একটী অনাথিনী বিধবা তাহার একমাত্র পুত্রের মৃত্যু শোকে নিশীথ রাত্রে করুণ কণ্ঠে এমন ভাবে কাঁদিয়া কাঁদিয়া তাহার মনের ব্যথা বাহিরে বিচ্ছুরিত করিয়া দিতেছে যে, শ্রোতার মনেও সেই বেদনা সংক্রামিত হইয়া গেল। এই খানে বলা যাইতে পারে যে, সেই ক্রন্দনের ভিতরে আর্ট আছে। স্বদেশে ও স্বজাতির লাঞ্ছনা ও দুর্দ্দশায় ব্যথিত হইয়া কোন দেশনেতা স্বদেশবাসীর সম্মুখে এমন ভাবে বক্তৃতা দান করিলেন যে, বক্তার মনের ব্যথা ও ভাব শ্রোতৃমণ্ডলীর হৃদয়েও ছড়াইয়া গেল এবং সকলেই বক্তার সহিত একমত হইয়া দেশের কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিল; এখানেও আর্ট ক্রিয়া করিল। কোন লোক জঙ্গলের মধ্যে বাঘের কবল হইতে রক্ষা পাইয়া আসিয়া তাহার বন্ধুবান্ধবদিগের নিকট এমন ভাবে উহার বর্ণনা দিল যে, সকলেই যেন সেই সেই ভাব ও অবস্থা আপন প্রাণের মধ্যে অনুভব করিতে লাগিল এবং চক্ষুর সম্মুখে যেন সেই সেই দৃশ্যাবলী দেখিতে লাগিল; এখানেও বর্ণনাকারীর বর্ণনায় যথেষ্ট আর্ট প্রকাশ পাইল। কোন ঔপন্যাসিক, কবি বা চিত্রশিল্পী কোন একটী বিষয় আপন প্রাণে উপলব্ধি করিয়া, অথবা কোন একটী প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া উপন্যাসে, কবিতায় বা চিত্রে তাহা এমন ভাবে ফুটাইয়া তুলিলেন যে, পাঠক বা দর্শক সকলেই সেই সেই ভাবের ভাবুক হইয়া পড়িলেন। এখানে তাঁহাদের সৃষ্টিতে আর্ট আসিল। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যাইতে পারে রবীন্দ্রনাথের "ক্ষুধিত পাষাণ", "মেঘ ও রৌদ্র" প্রভৃতি বিখ্যাত ছোট গল্পগুলি এবং শরৎচন্দ্রের 'বিরাজ বৌ', 'বিন্দুর ছেলে' প্রভৃতি উপন্যাসগুলি আর্টে পরিপূর্ণ, কারণ ঐ সমস্ত গল্প ও উপন্যাস পড়িতে পড়িতে পাঠক একেবারে তন্ময় হইয়া যায়,—লেখকের প্রাণে যে ভাবরাশি খেলা করিয়াছে, পাঠকও ঠিক সেই সেই ভাবরাশি আপন প্রাণে অনুভব করিতে পারে। রঙ্গমঞ্চের দৃষ্টান্ত দিয়া আর্টকে আরও সুন্দররূপে বুঝান যাইতে পারে। মনে করুন, রঙ্গমঞ্চে "সীতা" অভিনীত হইতেছে। চিত্রশিল্পী দৃশ্যচিত্রে রামচন্দ্রের রাজ-প্রাসাদ, রাজসভা, বাল্মিকীর তপোবন ও আশ্রম-কুটীর এমন ভাবে অঙ্কিত করিলেন যে, দেখিলেই মনে হয়, যেন সেই সুদূর অতীতের ছবি দেখিতেছি। রাম, সীতা, লক্ষ্মণ ও লব-কুশের ভূমিকায় যাঁহারা অবতীর্ণ হইলেন, তাঁহারা আকারে, ইঙ্গিতে, বচনে, মননে এমন ভাবে অভিনয় করিলেন যে, সমস্তই যেন জীবন্ত ও সত্যিকার বলিয়া মনে হইল। সীতার নির্ব্বাসন কালে রামচন্দ্র ও সীতার পরস্পরের মনের অবস্থা এবং পরে একদিকে রামচন্দ্রের বিরহী মনের হাহাকার এবং অপর দিকে বাল্মিকীর তপোবনে নির্ব্বাসিতা বিরহিনী সীতার গোপন ক্রন্দন—সমস্তই অভিনয়ের ভিতর মূর্ত্ত হইয়া প্রকাশ পাইল; সমস্তই স্বাভাবিক বলিয়া মনে হইল। এক্ষেত্রে বলা যাইতে পারে অভিনয়টী যথেষ্ট আর্ট-পূর্ণ। কিন্তু এমন যদি হয় যে, রামচন্দ্রের রাজসভা আঁকিতে যাইয়া চিত্রশিল্পী যথেষ্ট চেয়ার টেবিলের আমদানী করিলেন, করোগেটেড টিন দিয়া বাল্মিকীর আশ্রম-কুটীর আঁকিয়া দেখাইলেন; লক্ষ্মণ মোটর যোগে সীতাকে বাল্মিকীর আশ্রমে রাখিয়া আসিলেন এবং রামচন্দ্র, সীতা প্রভৃতি এমন অস্বাভাবিক ভাবে নিজেদের বেশভূষা ও অভিনয় করিলেন যে, তাহা দেখিয়া দর্শকের মনের উপর কিছুমাত্র দাগ পড়িল না; তবে বলিতে হইবে, সে অভিনয়ে আর্ট নাই। দৃশ্যাবলী যতই চটকদার হউক না কেন, নায়ক-নায়িকা সুন্দর ভাবে সাজসজ্জা করিয়া যতই হা-হুতাশ করুক না কেন,—বাস্তবের কাছাকাছি না হইলে কিছুতেই উহাকে আর্ট বলা যাইবে না।

অতএব দেখা যাইতেছে, স্বাভাবিকতা এবং অনুভূতির সংক্রামকতাই আর্টের প্রধান লক্ষণ। সে অনুভূতি সুখের হউক, দুঃখের হউক, সৌন্দর্য্যের হউক, কুৎসিতের হউক, আনন্দের হউক, বেদনার হউক—তাহাতে কিছু আসে যায় না। অনুভূতিবিহীন রং চং সাজ-সজ্জা, শব্দালঙ্কার বা অভিনয় আর্ট নহে,—তা সে যতই সুন্দর হউক না কেন। প্রকৃত আর্ট সৃষ্টির মূলে সত্য অনুভূতি ( Sincerity of feeling ) থাকা চাই, আর তার প্রকাশ-ভঙ্গী বা বহিঃসৌষ্ঠব ( technique ) এরূপ হওয়া চাই যেন তাহার ভিতর দিয়া আর্টিষ্টের মনের আসল ভাবটী অপর হৃদয়ে সংক্রামিত হইয়া

পড়ে। যে আর্টিষ্টের অনুভূতি যত গভীর হইবে এবং প্রকাশ-ভঙ্গী যত সহজ সুন্দর হইবে, তাহার আর্টও তত পরিমাণে সার্থক ও সুন্দর হইবে।

এ স্থলে বলিয়া রাখা ভাল, কোন লোক হাসিতে হাসিতে অপর সকলকে হাসাইলে বা হাই তুলিয়া অপরকেও হাই তুলিতে বাধ্য করিলে, তাহা আর্ট হইবে না। ব্যাঘ্র-কবলে পতিত কোন লোকের ভীতিসঙ্কুল মুখাকৃতি বা প্রাণভয়ে পলায়ন ও ভয়ার্ত্ত চীৎকার আর্ট নহে। ফটোগ্রাফিও আর্ট নহে। আর্ট কতকটা সেকেণ্ডহ্যাণ্ড জিনিষ। আগে কিছু প্রাণ দিয়া অনুভব করা চাই, পরে তাহাই সেইরূপ ভাবে প্রকাশ করা চাই, তবেই সেখানে আর্ট ফুটিবে। কোকিলের কুহু কুহু ডাকটিই আর্ট নহে; কিন্তু যদি কোন ছেলে-মেয়ে বা অন্য কেহ অবিকল কোকিলের মত করিয়া ডাকিতে পারে, তবেই সেখানে আর্ট আসিল। আর্ট স্বভাব নহে,—স্বভাবের অনুকরণ (a representation, and not a reality.)

উপরে যাহা বলা হইল, উহাই আর্ট সম্বন্ধে টলষ্টয়ের অভিমত এবং আমার বিশ্বাস, এই মতই ঠিক। বর্ত্তমান যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ আর্ট-সমালোচক বিখ্যাত ইটালীয়ান দার্শনিক বেনেডেটো ক্রোস (B. Croce)—যিনি সৌন্দর্য্য-বিজ্ঞানকে এক স্বতন্ত্র ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন,—তিনিও আর্টের যে সংজ্ঞা দিয়াছেন, তাহাও টলষ্টয়ের সংজ্ঞার সহিত অবিকল মিলিয়া যায়। ক্রোস্ বলেন—"Art is vision or intuition". অন্যত্র বলিয়াছেন—"Art is expression of impression". অর্থাৎ অনুভূতির প্রকাশই আর্ট। ইহার সহিত টলষ্টয়ের বিরোধ কোথায়? টলষ্টয়ও ত এই কথাই বলিতে চাহিয়াছেন।

এ পর্য্যন্ত যাহা বলা হইল, আশা করি আর্টকে চিনিবার পক্ষে উহাই যথেষ্ট। কিন্তু আর্টকে আরও ব্যপকতর ভাবে বুঝিতে হইলে আর্টের সহিত সত্য, মঙ্গল ও সুন্দরের কি সম্বন্ধ, তাহাই আমাদিগকে দেখিতে হইবে।

## আর্ট ও সত্য

উপরে বলা হইয়াছে, স্বভাব বা সত্যের অনুকরণই হইতেছে আর্ট। সুতরাং সত্যই হইতেছে আর্টের প্রাণ। সত্য ছাড়া আর্ট বাঁচিতেই পারে না। আর্টিষ্টের সৃষ্টি বাস্তবতার কত কাছাকাছি, তাহাই দেখিয়া তাহার সফলতার বিচার করিতে হইবে। রঙ্গমঞ্চের দৃষ্টান্তে দেখান হইয়াছে, দৃশ্যচিত্রে বা অভিনয়ে অস্বাভাবিকতা আসিলেই তাহা একেবারে ব্যর্থ হইয়া যায়। সীতা যদি হাল ব্রাহ্ম ফ্যাশানে বেশ-ভূষা করিয়া আসিয়া দাঁড়ায়, রাম যদি হ্যাট-কোট পরিয়া সিংহাসনে উপবেশন করে, শিল্পী যদি ইডেন গার্ডেনের এক কুঞ্জবনের অনুকরণে বাল্মিকীর তপোবন অঙ্কিত করিয়া দেখায়, এবং অভিনয়ে যেখানকার যে-ভাবটী সম্যকরূপে ফুটিয়া না উঠে, তবে সে অভিনয় দেখিয়া কি কেহ মুগ্ধ হইতে পারেন? কখনই না। অভিনয় তখন একটা প্রহসনে পরিণত হয় মাত্র।

অতএব দেখা যাইতেছে, অস্বাভাবিকতাই আর্টের মৃত্যুর কারণ। আর্টিষ্ট যাহাই অঙ্কিত করুন না কেন, প্রকৃতির ভিতরে থাকিয়াই তাহা করিতে হইবে। অস্বাভাবিক বা অতিপ্রাকৃতিক কোন কিছুই তিনি অঙ্কিত করিতে পারেন না, করিলে তাহা আর্ট হিসাবে একেবারে ব্যর্থ হইয়া যায়। গ্রীষ্মকালের একটী চিত্র অঙ্কিত করিতে হইলে প্রকৃতির গুমট ভাব, গরমের জ্বালায় মানুষের অস্থিরতা, গায়ের কাপড় ফেলিয়া দিয়া বা শিথিল করিয়া পাখা দিয়া বাতাস খাওয়া ইত্যাদি ভাবই ফুটাইয়া তুলিতে হইবে; কারণ ইহাই সত্য বা স্বাভাবিক। এই স্বাভাবিকতা যত পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে জীবন্ত করিয়া ফুটাইযা তুলা যাইবে, আর্টিষ্টের সৃষ্টি ততই সুন্দর বলিয়া বিবেচিত হইবে। গল্পে, উপন্যাসে, কাব্যে, সর্ব্বত্রই এই একই নিয়ম। স্বভাবকে অতিক্রম করিয়া কোন আর্টিষ্টই চলিতে পারে না।

সত্য বা স্বাভাবিকতাই যখন আর্টের প্রাণ এবং এই সত্যের মূলে যখন সকল সত্যের উৎস সেই খোদাতালা বিরাজমান, তখন এ কথা অনায়াসেই বলা যাইতে পারে যে, সকল আর্টের মূলই হইতেছে সেই সত্যময় খোদাতালা। তিনিই আর্টের কেন্দ্রস্বরূপ; তাঁহাকে ঘিরিয়াই সমস্ত আর্ট প্রকাশ পাইতেছে।

এইখানে একটা সমস্যা উঠিতে পারে, স্বাভাবিকত্ব রক্ষা করাই যদি আর্টের প্রধান লক্ষ্য হয়, তবে অনেক অশ্লীল বা কুৎসিত ভাবের চিত্রকেও আর্ট বলিয়া স্বীকার করিতে হয়, কারণ সেগুলিও স্বভাবতঃ সত্য। কুৎসিতের মধ্যেও যে আর্ট আছে, তাহাতে সন্দেহ নাই; কিন্তু আর্ট হইলেই ত

হয় না। প্রত্যেক জিনিষেরই ভাল-মন্দ ত আছে। আর্টের ভিতরেও এই শ্রেণীর আর্ট নিতান্ত জঘন্য আর্ট, ইহাদিগকে বর্জ্জন করিয়া চলা সর্ব্বতোভাবে আমাদের কর্ত্তব্য। 'বাতাস আমাদের জীবন ধারণের উপায়'—এ কথা সত্য বলিয়া গ্রহণ করিলেও আমরা যেমন প্রাণনাশক দূষিত বাতাসকে বর্জ্জন করিয়া অক্সিজেনপূর্ণ বিশুদ্ধ বাতাসেরই সন্ধান করি, আর্টের বেলায়ও অবিকল এইরূপ। আর্টে সত্য ও স্বাভাবিকতা রক্ষা করিয়া চলিতে হইবে বলিয়া যে নির্ব্বাচারে যে-সে সত্য ঘটনাকেই আর্ট-সৃষ্টির উপাদান বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে, এমন কথা কে বলিল? বাস্তবতাকে এই অর্থে গ্রহণ করিলে ভুল করা হইবে। এই শ্রেণীর আর্টকে নিছক realistic art বা প্রত্যক্ষদ্যোতক আর্ট বলে। যাহাই প্রকৃতিতে আছে, নির্ব্বিচারে তাহাই অঙ্কিত করিয়া লোক-চক্ষুর সম্মুখে ধরা এই আর্টের কর্ম্ম। বর্ত্তমানে এই শ্রেণীর আর্টবাদীর সংখ্যাই বেশী। তাহারা জীবনের আঁস্তাকুড় হইতে কুৎসিৎ পচা জিনিষ তুলিয়া আনিয়া realistic art এর নামে চালাইতে চাহিতেছেন। গল্পে, উপন্যাসে, কাব্যে ও চিত্রে এই মনোভাব অধিকাংশ লেখক-দিগের মধ্যে দেখা যাইতেছে। তাঁহারা সত্য বা স্বাভা-বিকতাকে অনুকরণ করিতে চান, করুন, ইহা খুব ভাল কথা। কিন্তু তাঁহারা যাহা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিতেছেন, তাহা সত্য সত্যই সত্য কিনা, সে টুকু ত চিন্তা করিয়া দেখিতে হইবে। নিত্য যাহা চোখের সাম্নে ঘটিতে দেখিতেছি, অনেক সময় তাহা সত্য হয় না। বাস্তবতার মধ্যেও যে মিথ্যা লুকাইয়া আছে, এ সত্য তাহাদিগকে বুঝিতে হইবে। টলষ্টয় ঠিকই বলিয়াছেন—

"Truth will be known not by him who knows only what has been, is and really happens, but by him who recognises what should be according to the will of God".

অর্থাৎ যাহা ঘটিয়া গিয়াছে, ঘটিতেছে বা ঘটে, তাহাই যে সত্য বলিয়া জানে, সে প্রকৃত সত্যকে চিনে নাই। খোদা-তালার নির্দ্দেশ অনুসারে কি ঘটা উচিৎ তাহাই যে উপলব্ধি করিতে পারে, সেই সত্যকে চিনিয়াছে।

আর্টিষ্টের সত্য-সাধনা এইরূপই হওয়া উচিৎ। অন্ধ realistic না হইয়া তাহাকে idealistic বা আদর্শবাদীও হইতে হইবে। কোন লম্পট-প্রকৃতি ধনী যুবক সমাজ-শাসন ও নীতি-ধর্ম্মকে জলাঞ্জলি দিয়া বেশ্যা ও মদ লইয়া মহাসুখে কালাতিপাত করিতেছে দেখিয়া যদি কেহ মনে করেন যে, সে প্রকৃতই সুখী, তবে তিনি ভুল করিবেন। প্রকৃত সুখী সে নয়, কেননা খোদাতালার নিয়মে ঐরূপ জীবনের মধ্যে সুখ নিহিত নাই। পক্ষান্তরে "হিতোপদেশ" বা "ঈশপের গল্প" সমূহ সত্য না হইলেও সত্য, কেননা খোদাতালার ইঙ্গিত যে কোন্‌দিকে, তাহা ঐ সব গল্পে পরিষ্কারভাবে দেখান হইয়াছে।

অতএব স্বাভাবিকতার খাতিরে অতি-স্বাভাবিকতা ভাল নয়। স্বাভাবিক সত্যের সহিত আদর্শ সত্যের যোগ থাকা চাই; নতুবা কোন শিল্পীর আর্টই সার্থক হইবে না। স্বাভা-বিক সত্যের মধ্যে যাহা অসত্য, তাহা বর্জ্জন করিতে হইবে এবং অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা স্থান বিশেষে আদর্শ সত্যেরও সৃষ্টি করিতে হইবে।

## আর্ট ও সৌন্দর্য্য

টলষ্টয় আর্টের যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন এবং আমরাও যাহা সমর্থন করিয়া আসিয়াছি, তাহাতে হয়ত অনেকে মনে করিতে পারেন, আর্টের সহিত সৌন্দর্য্যের বুঝি কোনই সম্বন্ধ নাই। এ ধারণা নিতান্তই ভুল। সৌন্দর্য্যের সহিত যে আর্টের কোনই সম্বন্ধ থাকিবে না, টলষ্টয় এমন কথা বলেন নাই। সৌন্দর্য্য ও আনন্দ হইতে আর্টকে বিচ্ছিন্ন করিয়া তিনি উহার সঠিক স্বরূপ দেখাইয়াছেন মাত্র। পূর্ব্বে লোকের ধারণা ছিল, সৌন্দর্য্য ও আনন্দ যাহার মধ্যে আছে, তাহাই আর্ট। টলষ্টয় এই ধারণাকে ভাঙ্গিয়া দিয়া আর্টকে জীবনের মধ্যে সহজভাবে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। যাহাই সুন্দর ও আনন্দদায়ক, তাহাই আর্ট—এ কথার তিনি প্রতিবাদ করিয়াছেন বটে, কিন্তু যাহাই আর্ট তাহাই যে সুন্দর ও আনন্দদায়ক হইবে না, তাহা ত তিনি বলেন নাই। বস্তুতঃ আর্টের সহিত সৌন্দর্য্যের কোন বিরোধ ত নাইই, বরং ঘনিষ্ট সম্বন্ধ রহিয়াছে। সত্য যেমন আর্টের প্রাণ, সৌন্দর্য্য তেমনই আর্টের পরিচ্ছদ। সৌন্দর্য্য ছাড়া আর্ট বাহিরে আসে না। সৌন্দর্য্যের সহিত আর্টের এতই ঘনিষ্টতা যে বাহিরের লোক তাহার এই উজ্জ্বল বহিরাবরণ দেখিয়া মনে করিয়াছে, সৌন্দর্য্য ও আর্ট একই জিনিষ।

উপরে রঙ্গমঞ্চের দৃষ্টান্তে দেখান হইয়াছে, অভিনয় ও দৃশ্যাবলী যত পরিমাণে স্বাভাবিক বা সত্য হয়, তত পরিমাণে উহা সুন্দর দেখায়। সুতরাং দেখা যাইতেছে সৌন্দর্য্যের সহিত সত্যের সম্বন্ধ আছে। সত্য যেখানে পরিষ্কার ভাবে বাহিরে আত্ম-প্রকাশ করে, তখন তাহা সুন্দর না হইয়াই পারে না। ইহা খোদাতালারই বিধান। তিনি যেমন সত্য ও মঙ্গল স্বরূপ, সেইরূপ সুন্দরও। সৌন্দর্য্যের মধ্য দিয়াই তিনি বাহিরে আত্ম-প্রকাশ করিতেছেন। আত্ম প্রকাশের জন্য সৌন্দর্য্যের প্রয়োজন খোদাতালার যেমন, মানুষেরও তেমনি। তাই দেখিতে পাই, সুন্দর হইয়া আত্ম-প্রকাশ করিবার মানুষের কি বিপুল আগ্রহ! সৌন্দর্য্যের প্রতি এ আগ্রহ খোদাতালাই মানুষের প্রাণে সন্নিবিষ্ট করিয়া দিয়াছেন। তিনি নিজে সুন্দর, তাঁর সৃষ্টিও সুন্দর। দিকে দিকে শুধু তাঁহারই সৌন্দর্য্যের লীলা-খেলা। এই সৌন্দর্য্য উপলব্ধি করিবার জন্যই যেন তিনি মানুষের মনে সৌন্দর্য্যানুভূতির উপাদান সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছেন। অন্যদিকে সৌন্দর্য্যের আবহাওয়ার মধ্যে মানুষের মন বাড়িয়া উঠিতেছে বলিয়াও সে স্বভাবতঃই সৌন্দর্য্যানুরাগী। কাজেই তার নিজস্ব সৃষ্টিতেও যে সৌন্দর্য্য থাকিবে, ইহা ত খুবই স্বাভাবিক।

এই বিশ্ব-প্রকৃতির মধ্যে মূলতঃ দুইটী জিনিষ দেখিতে পাওয়া যায়,—সুর ও রূপ। ভিতরে বাহিরে সর্ব্বত্রই সুর ও রূপের লীলা-তরঙ্গ। নীরবে কান পাতিয়া শুনিলেও সেই "আকাশ বীণার তারে তারে" সঙ্গীতধ্বনি ( Music of the Spheres ) শুনিতে পাওয়া যায়। বস্তুতঃ যে দিকেই কান পাতিয়া শুনি, যে দিকেই চোখ মেলিয়া দেখি—সেই দিকেই সুর ও রূপের লীলাখেলা দেখিতে পাই। একটু সূক্ষ্মভাবে বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে সুরও দূরীভূত হইয়া যায়, থাকে কেবল রূপ, কেননা যাহা সুর তাহাও রূপ। রূপের অন্তরালে "অরূপ রতন" বিরাজিত রহিয়াছে বটে, কিন্তু তাহাকে পাইতে হইলে এই "রূপ-সাগরেই" ডুব দিতে হয়। রবীন্দ্রনাথ তাই ঠিকই বলিয়াছেন—

"রূপ-সাগরে ডুব দিয়েছি
অরূপ রতন আশা করে।"

মানুষ এই রূপের মধ্যেই ডুবিয়া আছে। সুতরাং তাহার নিজস্ব সৃষ্টিতে যে রূপ বিদ্যমান থাকিবে, ইহা স্বতঃসিদ্ধ। সত্য যদি আর্টের প্রাণ হয়, তবে তাহার দেহ সুন্দর হইতেই হইবে; অন্যথায় সত্য সম্যকরূপে প্রকাশ পাইবে না। খোদাতা'লা প্রকৃতিকে যদি এত সুন্দর করিয়া সৃষ্টি না করিতেন, তবে তাহার নিজের আত্ম-বিকাশও হয়ত সম্পূর্ণ হইত না। অথবা এ কথাও বলা যাইতে পারে, তাঁহার সত্তা পরিপূর্ণরূপে প্রকাশ করিবার জন্যই বিশ্ব-প্রকৃতিকে তাঁহাকে এত সুন্দর করিয়া সৃষ্টি করিতে হইয়াছে। মানুষের আর্টের বেলায়ও অবিকল এইরূপ। শিল্পী যাহাই আঁকিতে চান না কেন, সৌন্দর্য্যের তুলিকা দিয়া তাহা আঁকিতে হইবে।

সৌন্দর্য্যের সহিত আর্টের এই যে প্রাণের যোগ, ইহা আর্টেরই বিশিষ্ট প্রকৃতি। বিজ্ঞান বল, দর্শন বল, প্রত্যেক বিষয়েরই একটা স্বতন্ত্র প্রকৃতি আছে। বিজ্ঞান ও দর্শনের মূল লক্ষ্য সেই সত্য ও মঙ্গলময় খোদাতালা হইলেও, প্রত্যেকের গতি-পথ কিন্তু স্বতন্ত্র। বিজ্ঞান যে পথ দিয়া চলে, দর্শন সে পথ দিয়া চলে না, সে চলে আর এক নূতন পথ দিয়া। সেইরূপ আর্টের পথও বিভিন্ন। তার পথ হইতেছে সৌন্দর্য্যের মধ্য দিয়া। এই পথ দিয়াই সে আমাদিগকে সত্যের সন্নিধানে লইয়া যায়।

অতএব দেখা যাইতেছে, আর্টের সহিত সৌন্দর্য্যের ঘনিষ্ট সম্বন্ধ আছে। সৌন্দর্য্য ছাড়া আর্ট বাহিরে প্রকাশ পাইতেই পারে না।

## আর্ট ও মঙ্গল

সত্য যদি আর্টের প্রাণ হইল, সৌন্দর্য্য যদি তাহার পরিচ্ছদ হইল, তবে লক্ষ্য তাহার কী হইবে? কোথায় কোন্ উদ্দেশ্যে সে যাত্রা করিবে?

আর্টের লক্ষ্য হইবে মঙ্গল। এই 'মঙ্গল-গ্রহের' দিকেই তাহাকে ছুটিতে হইবে। বিশ্ব-মানুষের কল্যাণ বা জগতের আধ্যাত্মিক ও মানসিক স্বাস্থ্য-বিধানই তাহার চরম লক্ষ্য হইবে।

এইখানেই আর্টের সহিত নীতির ( Moralityর ) কথা আসিয়া পড়ে। এই প্রশ্ন লইয়া যথেষ্ট মতভেদ দেখা যায়। একদল বলেন,—আর্টে ভাল মন্দ বিচার করিতে হইবে, নতুবা আর্টের নামে স্বেচ্ছাচার আরম্ভ হইবে। আর একদল বলেন—ওরূপ নৈতিক বিচার ( Moral judgement ) আর্টের বেলায় খাটিবে না। একদল বলেন—নৈতিক সুসম্পন্নতাই ( moral perfection ) আর্টের উদ্দেশ্য। অন্য

দল বলেন—নিছক আনন্দ দানই আর্টের উদ্দেশ্য ; ভাল-মন্দ বা মঙ্গলামঙ্গলের সে কোন ধার ধারে না। আর্টিষ্টের সৃষ্টিতে সৌন্দর্য্য ও আনন্দের সন্ধান পাওয়া গেল কি না, তাহাই শুধু বিচার্য্য। নীতি বা মঙ্গলের অনুশাসন মানিয়া চলিলে আর্টিষ্টের সৃষ্টি পদে পদে বাধা প্রাপ্ত হয়, কোন নূতন সৃষ্টি সম্ভবপর হয় না।

এই মতদ্বয়ের কোনটী সত্য ! আমার মনে হয়, আর্ট যে নীতির গণ্ডীর বাহিরে, ইহা হইতেই পারে না। কোন বাধাবন্ধ নাই, শাসন-শৃঙ্খলা নাই, সংযম-শুচিতা নাই,—আর্টিষ্ট যাহা খুশী তাহাই করিয়া চলিলেন, আর তাহাই আর্টের নামে কাটিয়া গেল, ইহা বাতুলের উক্তি ভিন্ন আর কি হইতে পারে ! এ ত স্বাধীনতা নয়, এ যে ঘোর উচ্ছৃঙ্খলতা। "গুরু মহাশয়গিরী করা আর্টের কাজ নয়"—ইহা না হয় স্বীকার করিলাম ; কিন্তু তাই বলিয়া আর্টে যে কোনই শ্লীলতা বা সংযম-শাসন থাকিবে না, মানব সাধারণের উহা কল্যাণকর কি অকল্যাণকর, তাহা দেখিতে হইবে না, ইহা কেমন কথা ? আর্ট মানব জীবনে এমন কী এক দুর্ল্লভ পদার্থ, যার জন্য নীতি-ধর্ম্ম ও মঙ্গলকে জলাঞ্জলি দিয়া তাহার সেবায় আত্ম-নিয়োগ করিতে হইবে ? আর্ট এমনই বা কি বস্তু, যাহার নামে অকল্যাণ ও দুর্নীতিকে অকাতরে জীবনের মধ্যে বরণ করিয়া লইয়া অধোগতির পথে যাইতে হইবে ? মঙ্গল ও সুনীতির নামে কেন এত আপত্তি ? 'নূতন সৃষ্টির' ব্যাঘাত ঘটিবে, তাই ? সৌন্দর্য্য ও আনন্দকে স্বাধীনভাবে উপভোগ করা যাইবে না, তাই ? কতটুকু ব্যাঘাত ঘটিবে ? কতটুকু লোকসান হইবে ? আমার ত মনে হয়, আর্টের নামে যাঁহারা স্বাধীনতার দাবী করেন, তাঁহারা হয়ত এ সব লাভ-লোকসানের বিষয় আদৌ চিন্তা না করিয়াই একে অপরের দেখাদেখি প্রচলিত ধুয়ার প্রতিধ্বনি করেন মাত্র ; নয় ত তাহারা আসলেই অতি বদ, তাহাদের মতলবও নিতান্ত খারাপ।

আর্টিষ্টের সৃষ্টি নৈতিক বিচারের গণ্ডীর মধ্যে আসিবে না কেন ? আর্ট যখন একটী মানবীয় ক্রিয়া ( human activity ), এবং মানুষ যখন একটী সামাজিক ও নৈতিক জীব ( social and moral being ), তখন তার সৃষ্টিতে বা কাজকর্ম্মে ভালমন্দের বিচার যে চলিবে, ইহা ত নিতান্তই স্বাভাবিক। যে কার্য্যের ভিতর কোন উদ্দেশ্য (intention) নিহিত আছে, তাহা যে নৈতিক গণ্ডীর ভিতরে আসিবে, নীতি-শাস্ত্রের ইহা ত খুবই সোজা কথা। শিল্পী যখন কাব্যে, কবিতায়, উপন্যাসে বা চিত্রে কোন সুন্দর বা কুৎসিৎ ভাব অঙ্কিত করিয়া জনসাধারণের সম্মুখে ধরেন, তখন তার মধ্যে কোন-না-কোন একটা উদ্দেশ্য ত থাকেই। তার সৃষ্টি সকলে দেখুক এবং তাহাকে সুখ্যাতি করুক—এ উদ্দেশ্য প্রত্যেক শিল্পীর অন্তরেই বিরাজিত। অন্ততঃ তার সৃষ্টিকে বাহিরে প্রকাশ করিবার আনন্দটুকু উপভোগ করতে যদি কোন উদ্দেশ্যই না থাকিবে, তবে শিল্পীরা আপন আপন সৃষ্টিকে জনসাধারণে প্রচার করিতে এত ব্যগ্র কেন ? আপনার সৃষ্টি আপনারই আত্মতৃপ্তির জন্য গোপন করিয়া রাখিলেই ত চলিত ! তাহা যখন দেখি না, তখন নিশ্চয়ই বুঝিতে হইবে, আর্টিষ্টের সৃষ্টি উদ্দেশ্যবিহীন নহে। তবে আবার আর্টের উপর ভালমন্দের বিচার কেন চলিবে না ?

আর্টিষ্ট যাহাই বলুন না কেন, তার সৃষ্টি যখন জনসমাজে প্রচারিত হয়, তখন নিশ্চয়ই তার একটা প্রভাব আছে। কাজেই সে প্রভাব ভাল কি মন্দ, সে বিচার সমাজ করিবেই। "আর্টের খাতিরে আর্ট", "নীতি ধর্ম্মের সহিত আর্টের কোন সম্বন্ধ নাই"—ইত্যাদি বলিয়া শত চীৎকার করিলেও কোন ফল হইবে না। সামাজিক জীব হিসাবে আমার যেমন কতকগুলি ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ( rights ) আছে, সেইরূপ কতকগুলি কর্ত্তব্য-বন্ধনও ( duties and obligations ) আছে। আপন বাড়ীতে স্বাধীন ভাবে কাজকর্ম্ম করিবার আমার পূর্ণ অধিকার থাকিলেও আমি যখন যাহা-ইচ্ছা-তাহাই করিতে পারি না। প্রতিবেশীর তাহাতে অসুবিধা ও আপত্তি আছে কিনা, তাহার প্রতি আমার লক্ষ্য রাখিতে হয়, নতুবা আইন আমলে আসে। সেইরূপ আর্টিষ্টের সৃষ্টিও যখন সমাজের সংস্পর্শে আসিতে বাধ্য, তখন সমাজের কল্যাণ-অকল্যাণের দিকে আর্টিষ্টকে লক্ষ্য রাখিতেই হইবে। আর্টিষ্ট যদি সমাজ-গণ্ডীর বাহিরে এক জনহীন "Palace of Art"-এ বাস করিয়া "Art for art's sake" ইত্যাদি বুলি আওড়াইতেন, এবং যাহা খুশী তাহাই করিতেন, তবে তাঁহার উপর কোন বিচারই চলিত না। কিন্তু যতক্ষণ তিনি সমাজের সহিত সম্বন্ধ রাখিয়া কোন কার্য্য করিবেন—তা সে আর্টই হউক আর অপর কিছুই হউক—ততক্ষণ তাঁহাকে ভালমন্দের বিচারাধীন থাকিতেই হইবে।

মনোবিজ্ঞানের দিক হইতে দেখিলেও আর্টকে নৈতিক গণ্ডীর মধ্যে ফেলা যায়। মানব-মনের মাত্র তিন অবস্থা :— thinking, feeling, willing. অর্থাৎ হয় সে চিন্তা করিবে, নয় সে অনুভব করিবে, নয় ত সে কিছু ইচ্ছা করিবে। এই তিন মনোবৃত্তির বাহিরে মানুষ থাকিতেই পারে না। সত্য ও জ্ঞান চিন্তা-সাপেক্ষ, সৌন্দর্য্যানুভূতি, প্রেম প্রভৃতি অনুভূতি-সাপেক্ষ এবং মঙ্গলামঙ্গল ইচ্ছা-সাপেক্ষ। অন্য কথায় "সত্য" "সুন্দর" ও "শিবের" মূল ভিত্তিই হইল thinking, feeling এবং willing. এই তিনটী মনোবৃত্তি পরস্পর স্বতন্ত্র—এমন কি স্থানে স্থানে বিরোধী হইলেও, পরস্পরের মধ্যে মিলও কিন্তু যথেষ্ট। অন্তরে যখন প্রেম জাগ্রত হয়, চিন্তা, বিবেক বা মঙ্গলামঙ্গলের কথা তখন দূরে থাকে। চিন্তা করিতে গেলে অনেক স্থলে হয় ত প্রেম করাই হয় না। আবার কার্য্যক্ষেত্রে বসিয়া কবির মত শুধু অনুভব করিতে গেলে, হয় ত সে কার্য্যই পণ্ড হইয়া যায়। যে মানুষ ডুবিয়া মরিতেছে, তাহাকে দেখিয়া যদি বসিয়া বসিয়া চিন্তা এবং অনুভব করিয়া কর্ত্তব্য স্থির করিতে হয়, তবে সে বেচারার আর উদ্ধার নাই। ইহা দ্বারাই বুঝা যাইতেছে, এই তিনটী মনোবৃত্তি পরস্পর কত স্বতন্ত্র। কিন্তু অনেক স্থলে ইহাদের মধ্যে পরস্পর মিলও যথেষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। জ্ঞান জন্মিলেই অনুভূতি জন্মিতে পারে, এবং পরে তাহা হইতে কর্ম্মপ্রবৃত্তিও জাগিয়া উঠে। স্বদেশে বা স্বজাতির লাঞ্ছনা ও দুরবস্থার কথা যখন জানিতে পারি, তখন অন্তর-তলে বেদনার অনুভূতি আপনা-আপনিই জাগিয়া ওঠে, এবং সেই অনুভূতি হইতেই দেশের কাজে আত্মনিয়োগ করিবার প্রবৃত্তি জন্মে। অনুভূতি হইতেও অনেক সময় জ্ঞানে পৌঁছিতে পারি। এইরূপে জ্ঞান, অনুভূতি এবং কর্ম্মপদ্ধতি পরস্পর পরস্পরকে অনেক সময় সাহায্য করিয়া প্রত্যেকের গতিপথ নিয়ন্ত্রিত করিয়া দেয়। পরস্পর স্বতন্ত্র হইলেও কেহই স্বাধীন ভাবে চলে না। প্রেম, ক্রোধ প্রভৃতি অনুভূতি-সাপেক্ষ মনোবৃত্তিগুলি যখন স্বাধীন ভাবে কাজ করে, তখনই জগতে মহা অনর্থ সাধিত হয়। কিন্তু তাহারা যখন বিবেক বা জ্ঞানের কথা মানিয়া চলে, তখনই তাহারা সুন্দর ও সার্থক হয়।

আর্টও যখন এই feelingএর অন্তর্ভুক্ত, তখন সেও একেবারে বিবেক ও নীতির বাহিরে থাকিতে পারে না। সত্য ও মঙ্গলের দ্বারা সংযত হইয়া চলিলেই সে প্রকৃতপক্ষে সুন্দর হয়।

উপরে বলা হইয়াছে, আর্ট হইতেছে স্বভাবের অনুকরণ। সুতরাং এইবার আমরা বিবেচনা করিয়া দেখিব, স্বভাবের মধ্যে কোন মঙ্গলভাব বা নৈতিক প্রভাব নিহিত আছে কি না। যদি থাকে, তবে আমাদের আর্টেও উহা স্বতঃসিদ্ধ ভাবে থাকিবে।

স্বভাব বা প্রকৃতির অনুকরণ করাই আর্টের কাজ। প্রকৃতিকে ছাড়িয়া আর্ট দাঁড়াইতেই পারে না। প্রকৃতিই হইতেছে আর্টের প্রতিষ্ঠাভূমি। কিন্তু এই প্রকৃতি নিজেই একটী আর্ট—স্বয়ং খোদাতালা ইহার শিল্পী। কাজেই দেখা যাইতেছে, মানুষের আর্ট হইতেছে খোদার আর্টের সন্তান। অর্থাৎ আমাদের আর্টের অবস্থা ঠিক কোন পৌত্রের অবস্থার ন্যায়। Dante ঠিকই বলিয়াছেন :—

"Nature takes its method and its ends
From God, whose mind in
skill and art shown,
Your Art, as far as may be, close behind
Follows, as scholars near
their teacher tread ;
So in your Art we may
God's grandchild find".

এখন দেখা যাউক, খোদার আর্টের মধ্যে—অর্থাৎ এই বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে খোদাতালা কোন মঙ্গল ভাব নিহিত রাখিয়াছেন, না তিনিও "Art for art's sake" বলিয়া একটা খামখেয়ালী করিয়াছেন। একটু চিন্তা করিলেই দেখিতে পাওয়া যায়, এই যে নানা বর্ণে ও বৈচিত্র্যে প্রকৃতি আমাদের সম্মুখে নিত্য নব নব মূর্ত্তিতে প্রকাশ পাইতেছে, ইহা কোন "খেয়ালী বিধির" সৃষ্টি নয়, ইহার মধ্যে মঙ্গলভাব ওতপ্রোতভাবে নিহিত রহিয়াছে। বসন্তের দখিন্ হাওয়ায়, কুসুমের হাসির হিল্লোলে, ভরা-বাদরের জল-কল্লোলে, চন্দ্র সূর্য্যের আলোক-প্রপাতে,—ফুলে, ফলে, বর্ণে, গন্ধে,—সর্ব্বত্রই কার যেন মঙ্গল হস্তের সুখ-স্পর্শ অনুভব করি। প্রভাতে অরুণ কিরণ বিচিত্র বর্ণচ্ছটায় কি অপরূপ শোভাই না ফুটাইয়া তুলে! কিন্তু সেই শোভা ও সৌন্দর্য্যের মধ্য দিয়া নিখিল বিশ্বের সুপ্ত প্রাণে সে নব-জীবনের পুলক-স্পন্দনও

আনিয়া দেয়। ফুল-শাখায় দোলা দিয়া, কচি ধানের বুকের উপর ঢেউ খেলাইয়া বাতাস বহিয়া যায়, কিন্তু তার মধ্য দিয়া সে মানুষের ঘরে-ঘরে সঞ্জীবনী-সুধাও দান করিয়া চলে। অন্ধকার রাত্রিতে তারকা-বালারা মিষ্টি চোখে মুচ্‌কি হাসি হাসিয়া ধরার মানুষকে শুধু পাগলই করে না, ধ্রুবতারা হইয়া তাহারা কত দিগ্‌ভ্রান্ত পথিকের পথও নির্দ্দেশ করিয়া দেয়। কত বর্ণে, কত গন্ধে পুষ্প বিকশিত হইয়া ওঠে, কিন্তু তাহারাও মানুষের অশেষ কল্যাণে আত্মনিয়োগ করে। ফল হইয়া মানুষের কাজে লাগাই হইতেছে ফুলের জীবনের গোপন সাধনা এবং যতক্ষণ এই সাধনা সিদ্ধ না হয়, ততক্ষণ যেন তার সৌন্দর্য্য সার্থক হইয়া উঠে না। ঝরণা-ধারা শুধু প্রকৃতির আনন্দ ও শোভাবর্দ্ধনই করে না, জনপদের ভিতর দিয়া দিকে দিকে প্রবাহিত হইয়া সে মানুষের অশেষ কল্যাণ সাধনও করিয়া থাকে। বস্তুতঃ যেদিকেই দৃষ্টিপাত করি, সেই দিকেই দেখিতে পাই—সৌন্দর্য্য ও আনন্দের মধ্য দিয়া জগতের মঙ্গল-সাধনই প্রকৃতির উদ্দেশ্য।

খোদাতালার আর্টের ইহাই যখন লক্ষ্য, তখন মানুষের আর্টে কেন ইহার ব্যতিক্রম হইবে? সত্য বটে, প্রকৃতিতে অসুন্দরের বা অমঙ্গলেরও অস্তিত্ব বিদ্যমান আছে। ঝড়, ভূমিকম্প, অনাবৃষ্টি, বন্যা প্রভৃতিও প্রকৃতির অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু তাই বলিয়া উহারাই প্রকৃতির বড় সত্য নয়। আর ঐগুলি যে প্রকৃতই অমঙ্গল, তাহারও কোন নিশ্চয়তা নাই। আমাদের জ্ঞান নিতান্তই সসীম। এই সসীম জ্ঞান লইয়া অসীমের লীলা কি করিয়া আমরা বুঝিব? তাই দেখিতে পাই, আমাদের নিকট যাহা অমঙ্গল বলিয়া অনুভূত হয়, প্রকৃতপক্ষে তাহা অমঙ্গল নয়। অতি ঊর্দ্ধ হইতে দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যায়, তথাকথিত অনেক অমঙ্গলই আর এক বৃহত্তর মঙ্গলের কারণ স্বরূপ। সুতরাং এ কথা আমরা অনায়াসে বলিতে পারি যে, খোদাতালা তাঁহার সৃষ্টিতে সর্ব্বত্রই মঙ্গল ভাব নিহিত রাখিয়াছেন।

এখানে একটা কথা উঠিতে পারে যে, প্রকৃতিতে যাহা অমঙ্গল বলিয়া মনে হয়, তাহা যদি প্রকৃতপক্ষে অমঙ্গলই না হইল, তবে মানুষের সৃষ্টিতেও যাহা আমরা অমঙ্গল বলিয়া মনে করিতেছি, তাহাও ত প্রকৃত অমঙ্গল নয়! পরিণামে সব অমঙ্গলই ত মঙ্গলপ্রদ হইবে। এ কথা অনেকটা ঠিক বটে। কিন্তু মানুষের কৃত অমঙ্গলকে মঙ্গলে পরিণত করিতে প্রকৃতি এত দীর্ঘ সময় গ্রহণ করে যে, তাহার ফল ভোগ করিবার পূর্ব্বেই বহু লোক ধ্বংস মুখে গিয়া পৌঁছে। বহিঃপ্রকৃতির অমঙ্গল ভাব অপেক্ষা মানুষের অমঙ্গল ভাব দ্রুত কার্য্যকরী, মানুষের কাজ মানুষের উপর সহজেই প্রভাব বিস্তার করিতে পারে। কাজেই কোন মানুষকেই দুর্নীতি বা অমঙ্গল ভাব প্রচার করিতে দেওয়া নিরাপদ নয়।

অনেকে বলেন, আর্টে নীতি ও মঙ্গলের শাসন চলিলে আর্টিষ্টের সৃষ্টি ব্যাঘাত প্রাপ্ত হয়, স্বাধীন সৃষ্টি অসম্ভব হইয়া দাঁড়ায়। 'স্বাধীন সৃষ্টির' দ্বারা তাঁহারা যে কি বোঝেন, তাহা ত বুঝি না। মানুষের স্বাধীন সৃষ্টির অর্থ কি? তার সৃষ্টি স্বাধীন হইতে পারে কি? কখনই নয়। মানুষের শক্তি সীমাবদ্ধ, সে অন্য-নিরপেক্ষ নয়, সুতরাং স্বাধীন-সৃষ্টি তাহার হস্তে কি করিয়া সম্ভব? একমাত্র খোদাতালাই স্বাধীন সৃষ্টি করিতে সক্ষম, কেননা অন্য কাহারও অপেক্ষায় তিনি থাকেন না। তিনি ইচ্ছাময়, ইচ্ছা করিলেই যাহা খুশী তাহাই করিতে পারেন। এ হেন স্বাধীন সৃষ্টি মানুষ কি করিয়া আশা করিতে পারে? কাজেই মানুষের স্বাধীন সৃষ্টির কোন অর্থই হইতে পারে না। তাহাকে কোন না কোন নিয়মের অধীন হইয়া সৃষ্টি করিতেই হইবে। অতএব স্বাধীন সৃষ্টির নামে নীতি ও মঙ্গলকে দূরে ঠেলিয়া ফেলা তাহার পক্ষে নিতান্তই ধোকাবাজী।

তবে এখানে এটুকু বলিতে পারি যে, "সদা সত্য কথা বলিবে, চুরি করা বড় দোষ" ইত্যাদি ধরণের নীতি বাক্যই যে বাছিয়া বাছিয়া আর্টে ফুটাইয়া তুলিতে হইবে তাহা নহে। আর্টিষ্টের নীতি-শাস্ত্র একটু স্বতন্ত্র রকমের। নীতি-শাস্ত্রের গণ্ডীর মধ্যে ফেলিয়াও তাহাকে যথেষ্ট স্বাধীনতা দেওয়া যাইতে পারে। আর্টিষ্ট তাহার সৃষ্টি দ্বারা কতখানি মঙ্গল সাধন করিলেন, তাহা বিচার না করিলেও অন্ততঃ তিনি যে কোন অমঙ্গল করিলেন না, এইটুকু লক্ষ্য রাখিলেই চলিতে পারে। পদে পদে পথ-নির্দ্দেশ করিতে গেলে তাহার সৃষ্টি ব্যাহত হয় বটে, কিন্তু এমনও ত হইতে পারে যে, একটা সীমার মধ্যে আবদ্ধ থাকিয়াও সে স্বাধীনভাবে বিচরণ করিতে পারে! আর্টিষ্টের স্বাধীনতা এই ধরণের।

এত বিধি-নিষেধ, এত সীমানা-নির্দ্দেশ মোটেই দরকার হয় না—আর্টিষ্ট যদি প্রকৃতপক্ষেই খাঁটী আর্টিষ্ট হন। যার মধ্যে প্রতিভা আছে, সত্য সাধনা আছে, অন্তর্দৃষ্টি আছে,

হৃদয় যাহার পবিত্র, উদ্দেশ্য যাহার সাধু, সেই আর্টিষ্টকে সমস্ত বাধা বন্ধন হইতে একেবারে মুক্ত করিয়া দিলেও তাহার সৃষ্টি কিছুতেই সৎ ছাড়া অসৎ হইবে না। এমন কি অসৎ জিনিষও তাঁহার তুলিকার যাদু-স্পর্শে সৎ হইয়া দেখা দিবে। কিন্তু দুষ্টবুদ্ধি লইয়া কোন সাধনা ও অন্তর্দৃষ্টি বিহীন লোক আর্টিষ্ট সাজিলেই সে কেবলই তর্ক করিবে এবং আইনের ফাঁক খুঁজিয়া নিজের প্রবৃত্তিকে সমর্থন করিবার চেষ্টা করিবে। এত তর্ক, এত আলোচনা—এ শুধু তাহাদের জন্য। সাদী, হাফেজ, রুমী, মাইকেল্ এঞ্জিলো, র‍্যাফেল প্রভৃতির জন্য নয়।

উপরে যাহা বলা হইল, আশা করি তাহা দ্বারাই স্পষ্ট বুঝা যাইবে যে, কোনদিক দিয়াই আর্টের আঙ্গিনা হইতে আমরা নীতি ও মঙ্গলকে গলাধাক্কা দিয়া বাহির করিয়া দিতে পারি না।

## আর্টের সার্ব্বজনীনতা ও সহজবোধ্যতা

এই স্থানে আর একটী প্রশ্নের মীমাংসা করিতে হইবে। শ্রেষ্ঠ আর্টের নিদর্শন কিরূপ হইবে? সত্য সুন্দর ও মঙ্গল তিনই না হয় বিদ্যমান রহিল, কিন্তু ইহা সত্ত্বেও এমনও ত হইতে পারে যে, কোন আর্ট সহজেই লোকের বোধগম্য হইতে পারে, কোন আর্ট বা নিতান্ত দুর্ব্বোধ্য ও সাধারণের উপভোগের সম্পূর্ণ অনুপযোগী হইতে পারে। এ ক্ষেত্রে কোন্ শ্রেণীর আর্টকে শ্রেষ্ঠ বলা যাইবে? যাহা আপামর সাধারণ সকলেই বুঝিতে পারে তাহাই, না যাহা কতিপয় মুষ্টিমেয় লোকই কেবল বুঝিতে পারে তাহাই?

টলষ্টয় বলেন, যাহা সর্ব্বসাধারণেই উপভোগ করিতে পারে, তাহাই শ্রেষ্ঠ আর্ট। আর্টিষ্ট যখন কোন একটা নূতন ভাব আপন প্রাণে উপলব্ধি করিয়া জনসাধারণে তাহা প্রচার করিয়া দিবার উদ্দেশ্যেই তাঁহার আর্ট সৃষ্টি করেন, তখন তাহা যত সহজে লোকের বোধগম্য হইতে পারে, ততই সুন্দর বলিয়া মনে করিতে হইবে। লোকে যদি কিছু নাই বুঝিল, তবে সে আর্টের সার্থকতা কোথায়? হজরৎ ইবরাহিমের পুত্র-কোরবাণী, ইউসফ-জোলেখার প্রেম-কাহিনী, রাম-লক্ষণ ও সীতার উপাখ্যান প্রভৃতিই টলষ্টয়ের মতে শ্রেষ্ঠ আর্ট, কারণ উহাদের অন্তর্নিহিত ভাব নিচয় সহজেই লোকে গ্রহণ করিতে পারে।

কিন্তু বর্ত্তমান আর্টবাদী ও সমালোচকবৃন্দ টলষ্টয়ের এই উক্তি মানিতে চাহেন না। তাঁহারা বলেন, ওরূপ ভাবে আর্টের বিচার করিলে নিতান্ত নিম্নস্তরের আর্টকেই শ্রেষ্ঠ আসন দিতে হয়। শিক্ষা, সাধনা বা মার্জ্জিত রুচির কোনই মূল্য থাকে না। পাঁচালি, জারি, গ্রাম্য কবি-গান, বটতলার পুঁথি, রাধাকৃষ্ণের চিত্রাবলী, এই সমস্তকেই তাহা হইলে রুমি, হাফেজ, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতির উপরে আসন দিতে হয়।

এই দুই মতের কোন্‌টী সত্য? আমার মনে হয়, দুই দিকেই সত্য নিহিত আছে। টলষ্টয়ের মতকে নির্ব্বিচারে মানিয়া লইলে বাস্তবিকই মুড়ি-মিছরী সব এক দর হইয়া যায়। এ কথা সর্ব্ববাদিসম্মত যে, শিক্ষা, সভ্যতা ও অভিজ্ঞতা দ্বারা মানুষের রুচি ও বোধ-শক্তি উন্নত ও মার্জ্জিত হয়, সাধারণ লোক যাহা বুঝিতে না পারে বা তাহার নিকট যাহা ভাল না লাগে, কোন শিক্ষিত লোকের নিকট তাহাই সহজ-বোধ্য ও আনন্দদায়ক হইতে পারে। একজন অশিক্ষিত স্থূলরুচিবিশিষ্ট গ্রাম্য লোক একজন সুশিক্ষিত মার্জ্জিত রুচি-সম্পন্ন ভদ্রলোকের সহিত কোন উন্নত ভাবকে সমভাবে হৃদয়গ্রহ করিতে পারিবে, এরূপ মনে করা নিতান্তই অসঙ্গত। প্রকৃতির গূঢ় মর্ম্ম শিক্ষিত ও উন্নতমনা ব্যক্তির নিকটেই সমধিক বোধগম্য, কোন কুলি মজুরের নিকট নয়। কাজেই দেখা যাইতেছে, সর্ব্বসাধারণের বোধগম্য করিয়া আর্ট রচনা করিতে গেলে আর্টকে অনেকখানি নীচে নামিয়া আসিতে হয়; উন্নত ভাব ও সৌন্দর্য্যানুভূতিকে আশ্রয় করিয়া আর কোন আর্ট রচনা সম্ভবপর হয় না।

কিন্তু অন্য দিকও বলিবার যথেষ্ট আছে। আজকাল এক শ্রেণীর তথাকথিত আর্টিষ্টের আবির্ভাব হইয়াছে, তাঁহারা আর্টের নামে তাঁহাদের ভাবকে এমন ঘোরালো-পেঁচালো করিয়া প্রকাশ করা আরম্ভ করিয়াছেন যে, সাধারণ লোকে ত তার মাথামুণ্ড কিছু বুঝিতেই পারে না, এমন কি স্বয়ং আর্টিষ্টও কিছুদিন পরে তাহার কিছু বুঝিতে পারিবেন বলিয়া মনে হয় না। দেশ বিদেশের এমন অনেক কবি ও শিল্পীরই নাম করা যাইতে পারে, যাঁহাদের সৃষ্টিতে অনেক সময় কোন একটা সঙ্গত অর্থ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। তাঁহাদের মধ্যে না আছে কোন ভাব, না আছে কোন সত্যানুভূতি। সাধারণকে না বুঝিতে দিয়া ঘুর-প্যাঁচ করিয়া কথার মায়াজাল রচনাই অনেক কবির কাব্যাদর্শ। মেটারলিঙ্ক ভাবলেন

প্রভৃতি ফরাসী কবিগণ হেঁয়ালি সৃষ্টির উদ্দেশ্য লইয়াই কবিতা রচনা করিয়া গিয়াছেন। এখনো অনেক ফরাসী কবির মত এই যে, কবিতায় একটা না একটা কিছু হেঁয়ালি বিদ্যমান থাকা চাই-ই, নতুবা উহা কবিতাই হইবে না। সম্ভবতঃ এই মনোভাব লক্ষ্য করিয়াই টলষ্টয় উপরোক্ত মত ব্যক্ত করিয়াছিলেন। আর্টের নামে ভাবহীন রচনা বা প্রাণহীন দেহ যে উচ্চ মূল্যে বিকাইয়া যাইবে, ইহাও ত ঠিক নয়।

এখন এ সমস্যার সমাধান হইবে কিরূপে? আর্টকে সহজবোধ্য করিতে গেলেও অনেক উন্নত ভাব আর্টে ধরা পড়ে না, আবার উন্নত ভাবের সমাবেশ করিতে গেলেও অনেক স্থলে ভাবহীন হেঁয়ালির সৃষ্টি হইয়া পড়ে। কোন্ পথ অবলম্বনীয়?

আমার মতে দুই-এর কোনটীকেই একক ভাবে গ্রহণ করা সমীচিন হইবে না। আর্টিষ্টকে দুই কুলই রক্ষা করিতে হইবে। মার্জ্জিত রুচি-সম্পন্ন ব্যক্তিদিগের জন্য যেমন উন্নত ভাবের আর্ট চাই, সাধারণের জন্যও সেইরূপ সহজবোধ্য আর্ট চাই। সাধারণের উৎপন্ন দ্রব্যে যেমন সাহিত্যিক, আর্টিষ্ট ও বড় লোকদের অধিকার আছে, সাহিত্যিক ও আর্টিষ্টদের উৎপন্ন দ্রব্যেও সাধারণের তেমনই একটা দাবী আছে। এই গণতন্ত্রের যুগে সাহিত্যে ও ললিত কলায় আভিজাত্য রক্ষা করিতে গেলে চলিবে না। সকলেরই ন্যায্য দাবী বুঝিয়া দিতে হইবে।

## "আর্টের খাতিরে আর্ট"

"Art for art's sake" বা 'আর্টের খাতিরে আর্ট' এই কথাটী প্রায়ই যার-তার মুখে শুনা যায়। আর্টে নীতির প্রশ্ন উঠিলেই অনেকে এই একটী কথার দ্বারা নীতি-বাদীর মুখ বন্ধ করিয়া দিতে চান। যেন এ কথাটা কেহই জানে না, একমাত্র তিনিই ইহার মর্ম্ম বুঝেন! কিন্তু এত আদরের এই বাঁধা বুলিটার অর্থ যে কি, তাহা যদি জিজ্ঞাসা করা যায়, তবে অনেকেরই কিন্তু চক্ষুস্থির হইয়া পড়িবে! "আর্টের খাতিরে আর্ট" এ কথাটা কোথা হইতে আসিল এবং ইহার তাৎপর্য্যই বা কি? ইহা দ্বারা আনন্দমূলক-আর্ট-বাদী কি যে বুঝেন, তাহাও বুঝি না! আর্টকে আর্টের মত করিয়াই সেবা করিতে হইবে, নীতি, ধর্ম্ম, সমাজ বা অন্য কোন কিছুর সহিত জড়িত করিয়া ইহাকে দেখিতে হইবে না, ইহাই যদি ইহার অর্থ হয়, তবে এ কথার ভিতর নূতনত্ব কি রহিল? আর নূতন যুক্তিই বা এমন কি দেখান হইল যার জন্য নীতি বা মঙ্গলের প্রবেশ একদম নিষেধ হইয়া গেল? "খাওয়ার খাতিরে খাও", "ধর্ম্মের খাতিরে ধর্ম্ম কর", "কর্ত্তব্যের খাতিরে কর্ত্তব্য কর" ইত্যাদি কথার যাহাই অর্থ হউক না কেন, ইহাদের উদ্দেশ্যের কথা ত কিছুতেই ধুইয়া মুছিয়া যায় না! তুমি খাও, কেন খাও?—খাবার খাতিরে খাও। এর কি কোন একটা সঙ্গত অর্থ আছে? খাবার খাতিরে যদি খাও, তবে ছাই-ভস্ম গু-গোবর সব খাও না কেন? তাহা হইলে নিশ্চয়ই বুঝা যাইতেছে, খাবার খাতিরে খাইলেও তোমার অন্তরে একটা কিছু উদ্দেশ্য লুক্কায়িত আছে। সেই উদ্দেশ্য সাধন করিবার পক্ষে যে সব জিনিষ উপযোগী, তাহাই তুমি খাও, আর যেগুলি উপযোগী নয়, তাহা খাও না। সেইরূপ "কর্ত্তব্যের খাতিরে কর্ত্তব্য" করিলেও তার একটা উদ্দেশ্য ত থাকিবেই। আর কিছু না থাকুক, অন্ততঃ কর্ত্তব্যের খাতিরে কর্ত্তব্য করিতে প্রবৃত্ত হওয়ার যে আনন্দ, তার উপভোগটুকুও ত একটা উদ্দেশ্য। উদ্দেশ্য বিহীন কোন কাজ জগতে আছে কি? বাতুল যাহারা, একমাত্র তাদের কাজই উদ্দেশ্যবিহীন হইতে পারে। কাজেই উদ্দেশ্য যদি থাকিল, তবে তাহার উপর বিচারও চলিবে।

বস্তুতঃ ইহা একটা যুক্তিও নয়, বা নূতন তথ্যও নয়। সংসারের সমস্ত সম্বন্ধ হইতে রিক্ত-মুক্ত হইয়া কেহই কোন কাজ করিতে পারে না। পরিপার্শ্বের সহিত যোগ-সম্বন্ধ ভাবেই আমাদিগকে সমস্ত করিতে হয়। আর্টকেও আমরা কোন মতেই পরিপার্শ্বের সমস্ত সম্বন্ধ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখিতে পারি না। আর্টিষ্ট "আর্টের খাতিরেই আর্ট" সৃষ্টি করুন, আর যাহাই করুন, তাহার সৃষ্টির সহিত পরিপার্শ্বের সম্বন্ধ না থাকিয়াই পারে না। "লাট সাহেবের বাড়ী" অঙ্কিত করিয়া দেখাইতে হইলেও পরিপ্রেক্ষণার ভিত্তিতে ( perspective view ) আনিয়া উহাকে অঙ্কিত করিতে হইবে। অর্থাৎ উহা যে কোথায় অবস্থান করিতেছে, উহার চতুষ্পার্শ্বে গাছ-পালা, বাড়ী-ঘর, রাস্তা-ঘাট কোথায় কি আছে, তাহা দেখাইতে হইবে, নতুবা কিছুই বুঝা যাইবে না! কাজেই দেখা যাইতেছে আর্টকে উহার পরিপার্শ্ব হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া সেবা করিবার উপায় নাই। সেরূপ করাও বা,

মাছকে পানি হইতে পৃথক করিয়া দেখাও তাই। "আর্টের খাতিরে আর্ট" চর্চ্চা করিতে গেলে আর্টের মৃত্যু অনিবার্য্য।

এই মারাত্মক কথাটা কোথা হইতে আমদানী হইল, তাহার সন্ধান করিতে গেলে আমাদের দাস-মনোভাবই মূর্ত্ত হইয়া ধরা দিবে। পশ্চিম হইতে আমদানি করা এই কথাটা কিরূপ নির্ব্বিচারেই না আমরা গ্রহণ করিয়াছি। অর্থ জানি না, তাৎপর্য্য বুঝি না, কবে কোথায় কিরূপ অর্থে কে ইহা প্রথম বলিয়াছিল, তাহার খবর রাখিনা, অথচ হরদম বলিয়া চলি, "Art for art's sake"! "Art for art's sake"!

কথাটার উৎপত্তি কোথা হইতে হইল, তাহা অনেক অনুসন্ধান করিয়াও নিশ্চিতরূপে স্থির করিতে পারি নাই। সম্ভবতঃ জার্ম্মাণ দেশে অষ্টাদশ শতাব্দীতে August Wilhelm Schlegel নামক এক ব্যক্তি এই মতবাদ প্রথম প্রচার করেন। যে যুগে এই কথা প্রচার করা হইয়াছিল, জার্ম্মানির পক্ষে সে যুগ বিশ্লেষণের যুগ। সমস্ত জিনিষকে তন্ন তন্ন করিয়া বিশ্লেষণ করিয়া দেখাই সে যুগের বিশিষ্টতা ছিল। তা ছাড়া ধর্ম্ম ও নীতির বন্ধনও তখন শিথিল হইয়া পড়িয়াছিল। কাজেই আর্টকে কোন লোক হয় ত বিশ্লেষণের দৃষ্টিতেও দেখিয়া থাকিবে। অথবা নীতি-ধর্ম্ম-শূন্য আনন্দ-মূলক আর্ট-বাদ (Æsthetic hedonism) হইতেই এই কথার উদ্ভব হইয়া থাকিবে। ইহা ছাড়া ইহার অন্য কোন ব্যাখ্যা নাই।

পরবর্ত্তী কালে Whistler নামক জনৈক আমেরিকান আর্টিষ্ট "Art for art's sake"—এই নীতি খুব জোরে-শোরে প্রচার করিতে আরম্ভ করেন। কিন্তু তিনি কিরূপ প্রকৃতির লোক ছিলেন, তাহা একটু জানিলেই তাঁহার মতের কতখানি মূল্য তাহা বুঝা যাইবে। তিনি ছিলেন একজন মাথা-পাগলা লোক। আর্টিষ্ট যাহাই ভাল বুঝিবে তাহাই করিবে এবং সাধারণ লোক ও সমালোচকদিগের আর্ট বুঝিবার কোন ক্ষমতা নাই—ইহাই ছিল তাঁহার ধারণা। ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে তিনি বিখ্যাত ইংরাজ আর্ট-সমালোচক রাস্কিনের বিরুদ্ধে এক মানহানির মোকদ্দমা দায়ের করেন, কারণ তিনি তাঁহার চিত্রাবলীকে "এক কৌটা রং সাধারণের মুখের উপর ছুঁড়িয়া ফেলা হইয়াছে" (a pot of paint flung in the public face), এই বলিয়া সমালোচনা করিয়াছিলেন। বিচারে তিনি রাস্কিনের বিরুদ্ধে এক ফার্দ্দিং ক্ষতিপূরণ পাইয়াছিলেন! (Vide Encyclopedia Britanica, Vol. XXXIII.)

Whistler এর দেখাদেখি ইংরাজ-লেখক Oscar Wilde ও "Art for art's sake" নীতি অনুসরণ করিয়া জীবন যাপন করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন। তিনিও অদ্ভুত মেজাজের লোক ছিলেন। তিনি তাঁহার গৃহ ময়ূরপুচ্ছ, লিলি ফুল প্রভৃতি দিয়া সাজাইয়া রাখিতেন এবং উহাদেরই মত করিয়া জীবন যাপন করিতে প্রয়াস পাইতেন।

এইরূপ ধরণের লেখক দ্বারাই "Art for art's sake" প্রভৃতি মতগুলি উদ্ভূত হইয়াছিল। উহারই ঢেউ আসিয়া বাংলার সাহিত্যক্ষেত্রকে প্লাবিত করিয়াছে।

## আর্টের অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ

যুগধর্ম্মই আর্টকে নিয়ন্ত্রিত করে। যে যুগে মানুষের মন, শিক্ষা-দীক্ষা ও নৈতিক অবস্থা যেরূপ থাকে, সে যুগের আর্টও সেই অনুযায়ী বিকাশ লাভ করে। প্রাচীন গ্রীসে ও রোমে মানুষের নীতিজ্ঞান সম্যক উৎকর্ষ লাভ করে নাই বলিয়াই এবং সৌন্দর্য্য ও মঙ্গলকে তাহারা এক করিয়া দেখিত বলিয়াই তাহাদের চিত্র-কলাতেও কোনরূপ শ্লীলতা দেখা যায় না। এপোলো, ভেনাস্ প্রভৃতি নগ্নমূর্ত্তি তাই অবাধে লোকচক্ষুর সম্মুখে তাহারা রাখিয়া গিয়াছে। বৌদ্ধযুগেও মানুষের নীতিজ্ঞান নিতান্ত অল্প ছিল বলিয়া অজন্তা প্রভৃতির ভাস্কর্য্য চিত্রাবলীতে অশ্লীল ভাবের বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। রামায়ণ, মহাভারত এবং পুরাণের যুগেও মানুষের নৈতিক জীবন নিতান্ত অনুন্নত ছিল বলিয়াই পত্নী-হরণ, ব্যভিচার অবৈধ প্রণয় এবং আরও শত রকমের দুর্নীতিমূলক উপাখ্যানের সৃষ্টি হইয়াছিল। (১) অন্ধকার যুগের আরবগণ লম্পট প্রকৃতির ছিল বলিয়াই তাহাদের কাব্যে এত কুৎসিৎ ভাব প্রকটিত হইয়াছিল। বর্ত্তমান যুগেও পাশ্চাত্য দেশে—বিশেষ করিয়া ফ্রান্সে—দুর্নীতির বন্যা চলিয়াছে বলিয়াই উপন্যাসে,

(১) অবশ্য রামায়ণ, মহাভারতে আদর্শ পতিভক্তি, ভ্রাতৃপ্রেম, সত্য-নিষ্ঠা প্রভৃতি মহৎভাবের আর্টও যে নাই, তাহা বলিতেছি না। দুর্নীতি ও অশ্লীলতার দিক দেখানোই আমার উদ্দেশ্য। —লেখক।

চিত্রে অশ্লীল ভাবের এত ছড়াছড়ি দেখা যাইতেছে। French cards ত যেখানে সেখানে বিক্রীত হইতে দেখা যায়। মোপাঁসা প্রভৃতির লেখা ত পড়াই দুষ্কর। বর্ত্তমান বাংলা সাহিত্যের কাব্য উপন্যাসের ভিতর দিয়াও বাংলার মানসিক ও নৈতিক জীবনের প্রতীক সুন্দর ভাবে দেখা যাইতেছে। "Art for art's sake" "আর্ট কোন নীতি-ধর্ম্মের তোয়াক্কা রাখে না" ইত্যাদি উক্তি যেখানে সেখানে, যার তার মুখে শুনা যাইতেছে। ইহারও কারণ নির্ণয় করা কঠিন হইতেছে না।

আর্টের এই বর্ত্তমান অধঃপতন কি করিয়া সংঘটিত হইল, টলষ্টয় তাহা অতি সুন্দর ভাবে বুঝাইয়া বলিয়াছেন। তিনি বলেন, প্রাথমিক খৃষ্টান যুগে যীশু-প্রেম, আত্মোৎসর্গ, আত্মত্যাগ, মানব-প্রেম, প্রভৃতি খৃষ্টান আদর্শ ই আর্টে প্রতিফলিত হইত। মেরীর চিত্রাবলী, যোসেফের ( ইউসফের ) কাহিনী, প্রার্থনা, ( psalms ) প্রভৃতিই তখনকার যুগে শ্রেষ্ঠ আর্ট বলিয়া বিবেচিত হইত। কিন্তু কালক্রমে মধ্যযুগে যখন লোকের ধর্ম্মবিশ্বাস শিথিল হইয়া পড়িল, পোপ ও গির্জ্জার উপর যখন জনসাধারণের আর ভক্তি-শ্রদ্ধা রহিল না, বিলাসিতা এবং ইন্দ্রিয় সুখের প্রতিই লোকের মন সমধিক আকৃষ্ট হইল, তখনই আর্টে উচ্ছৃঙ্খলতা আসিল। এই সময় যাঁহারা বিলাসী ও বড় লোক, তাঁহারাই আর্টকে নিজেদের আত্মতৃপ্তির বাহনরূপে ব্যবহার করিতে লাগিলেন। যে সব আর্টে ইন্দ্রিয়সুখ বর্দ্ধন করিতে পারে, সেই সব আর্টই তাহাদের নিকট মূল্যবান বলিয়া বিবেচিত হইতে লাগিল। আর্টিষ্ট বেচারাগণও তাহাদের পৃষ্ঠপোষকদিগের মন যোগাইবার জন্য নব নব আর্ট সৃষ্টি করিতে লাগিলেন। ললিতকলা চিরদিনই বড়লোক দিগের পৃষ্ঠপোষকতা ও অর্থানুকুল্যে প্রচারিত হইয়া থাকে। হইলও তাহাই। বড় লোকদিগের কল্যাণে এই শ্রেণীর জঘন্য আর্টই কালে কালে জনসমাজে প্রচারিত হইয়া পড়িল। আর্টের বর্ত্তমান অবস্থা এই উপায়েই সংসাধিত হইয়াছে।

আর্টের এই শোচনীয় অবস্থা বেশীদিন থাকিবে বলিয়া মনে হয় না। ইহার প্রতিক্রিয়া অনিবার্য্য। যৌন সম্বন্ধ লইয়া আর্ট রচনা করিলে সে আর কতদিন মানুষের তৃপ্তিসাধন করিতে পারিবে? উহা একঘেঁয়ে না হইয়াই পারিবে না। নব নব ভাব ( fresh feeling ) না দিতে পারিলে সে আর্ট মানুষকে বেশী দিন আনন্দ দান করিতে পারে না। তা ছাড়া মানুষ তাহার জীবনে শুধু যৌন সম্বন্ধকেই বড় করিয়া দেখে নাই। যৌন সম্বন্ধ ছাড়া তাহার আরও মহত্তর উদ্দেশ্য আছে। তাই শুধু যৌন ভাবের খোরাক দ্বারা তাহার আত্মা বাঁচিতে পারে না, আরও কোন উন্নত ভাবের খোরাক তাহার চাই। সেই খোরাক হইতেছে তাহার ধর্ম্ম। মানুষের এই যে চিরন্তন অতৃপ্তি ও বিরহ, এই যে অসীমের সহিত মিলন-কামনা, এই যে অনন্তের পানে ছুটিয়া চলা, ইহারই মধ্যে আর্টের উপাদান সংগ্রহ করিতে হইবে। এই ধর্ম্মক্ষেত্র এত প্রশস্ত যে, অনন্ত কাল ধরিয়া ইহার মধ্যে ভাব সংগ্রহ করিলেও নব নব ভাবের অভাব ঘটিবে না, কাজেই আর্টও একঘেঁয়ে হইবে না।

এই কথা দ্বারা সমস্ত আর্টিষ্টকেই যে আমি ধর্ম্মভাবে দীক্ষা লইতে বলিতেছি, তাহা যেন কেহ মনে না করেন। এখানে আমি শ্রেষ্ঠ আর্টের কথাই বলিতেছি। আর্টে ভাল-মন্দ—দুইই যুগে যুগে ছিল, আছে এবং থাকিবে। আলোকের পাশে যেমন অন্ধকার আছে, সত্যের পাশে যেমন মিথ্যা আছে সৎ আর্টের পাশে তেমন অসৎ আর্টও থাকিবে। দেহ যতদিন আছে, দেহের ক্ষুধা ততদিন থাকিবে। ইহা প্রকৃতিরই নিয়ম। এ নিয়ম হাজার চেঁচামেচি করিয়াও কেহ খণ্ডন করিতে পারিবে না। বস্তুতঃ এক হিসাবে জঘন্য বা দুর্নীতিমূলক আর্টেরও প্রয়োজন আছে। অন্ধকার যেমন background এ ( পিছনে ) থাকিয়া আলোকেরই মহিমা বাড়াইয়া তুলে, অসৎ ভাবের আর্টও তেমনি উন্নত ভাবের আর্টকে উজ্জ্বল ও মধুর করিয়া তুলে। সুতরাং কোন্ আর্ট থাকা উচিৎ আর কোন্ আর্ট থাকা উচিৎ নয়, তাহা আমাদের প্রশ্ন নয়; আমাদের প্রশ্ন হইতেছে—কোন্ আর্ট আমাদিগকে গ্রহণ করিতে হইবে।

## উপসংহার

আর্টের নানা দিক ত এতক্ষণ আমরা দেখিলাম। এখন আমাদের প্রশ্ন এই—কিরূপ আর্ট আমাদের চাই? তদুত্তরে আমি বলিব—আমাদের আর্ট সঙ্কীর্ণ হইবে না। আমরা সত্য, সুন্দর এবং মঙ্গল—তিনজনকেই চাই। যে আর্টে এই তিনেরই সমাবেশ থাকিবে, তাহাকেই আমরা শ্রেষ্ঠ আর্ট বলিব। আমাদের মনের ভিতর যখন সত্য, সুন্দর ও

মঙ্গলের মূর্ত্তীভূত উপাদান (thinking, feeling and willing) রহিয়াছে, তখন একটাকে ছাড়িয়া একটাকে গ্রহণ করা সঙ্গত হইবে না। সৌন্দর্য্য এবং আনন্দকে আমরা বয়কট করিতে চাহি না; তোমরা যেরূপ চাও, আমরাও ইহাদিগকে সেইরূপই চাই, কিন্তু তাহার সহিত সত্য ও কল্যাণকে সঙ্গে করিয়া আনিতে বলি। খোদাতালার আর্টকে আমরা সম্পূর্ণরূপে অনুকরণ করিতে চাই। তাঁহার আর্টে আমরা যেমন সত্য, সুন্দর ও মঙ্গল—তিনেরই সমাবেশ দেখি, আমাদের আর্টেও সেইরূপ সত্য, সুন্দর ও মঙ্গলকে প্রতিষ্ঠিত দেখিতে চাই। তাঁহার আর্টের প্রতি চাহিয়া থাকিলে কলুষ ভাব না আসিয়া প্রাণে যেমন অব্যক্ত পুলকের সঞ্চার হয়, সসীমের মধ্যে অসীমের অনুভূতি লাভ করি, আমাদের আর্টেও সেই আনন্দ ও সেই অনুভূতি আমরা পাইতে চাই। গৃহলক্ষ্মী ও বারবনিতা—উভয়েই নারীজাতির অন্তর্ভুক্ত হইলেও এবং উভয়েই সুন্দরী ও আনন্দদায়িনী হইলেও আমরা বারবনিতা চাই না, আমরা চাই গৃহলক্ষ্মীকে —আনন্দময়ী, অথচ হাতে তার কল্যাণ-দীপ-জ্বালা। বারবিলাসিনীর সৌন্দর্য্য ও আনন্দ কিছুই প্রসব করে না, তার প্রেমিককে সে কিছুই দান করে না, বরং দিনে দিনে তাহাকে ধ্বংসের পথে লইয়া যায়। কিন্তু গৃহলক্ষ্মীর সৌন্দর্য্য ও আনন্দ গৃহস্বামীর প্রভূত কল্যাণই সাধন করিয়া থাকে এবং পরিণামে সন্তানরূপে জন্মলাভ করিয়া তাহার জীবনকে সার্থক ও সুন্দর করিয়া তুলে। আমাদের আর্টকেও আমরা এই গৃহলক্ষ্মীর বেশে দেখিতে চাই। *

---

**প্রমাণ-পঞ্জী :—**

এই প্রবন্ধ লিখিবার জন্য নিম্নলিখিত গ্রন্থসমূহ হইতে অল্প-বিস্তর সাহায্য লওয়া হইয়াছে :—

(১) What is Art? by Tolstoy
(২) Tolstoy on Art by A. Maude
(৩) Æsthetic by Benedetto Croce
(৪) The Essence of Æsthetics...Do
(৫) A History of Æsthetics by Bosanquet
(৬) Schlegel's Æsthetic and Miscellaneous Works.
(৭) আর্ট ও আহিতাগ্নি by যামিনীকান্ত সেন
(৮) আর্ট ও সাহিত্য by ক্ষিতিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

* বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতিতে পঠিত।

# উন্মেষ *

[ কাজী কাদের নওয়াজ ]

—∞—

পূব্ আকাশের বুক চিরি ওই
লোহিত রবি উঠ্‌লরে
শাহ্ বেগমের 'গুল্‌সনে' আজ
বস্‌রাই গুল্ ফুট্‌লরে।
কোন্ তরুণীর বাগ-বীথি-মাঝ
বেল্ কুঁড়ি সব জাগ্‌লরে আজ
খোশ্ খবরের খোঁজ নিয়ে তাই
দখিণ বাতাস ছুট্‌লরে ;
হিল্লোলে তার দিল্ হ'তে আজ
সব মোহ ঘোর টুট্‌লরে।
কোন্ রূপসীর রূপ-সরে মোর
মন্ মধুকর ডুব্‌লরে
'শব্‌বু গোলে'র খোশ্‌বুতে আজ
বন্ বীথি সব পুর্‌লরে।
আস্‌মানের ঐ সিং দরজায়
হুর পরী সব পিচকারী দেয়
খুন খারাবির রং মাখি গায়
নীল দরিয়া ফুল্‌লরে,
মন্দা হাওয়ায় শ্বেত কমলের
পাপড়িগুলি খুল্‌লরে।
সপ্তলোকের সাত মহলায়
কোথায় তুমি কোন্ হুরী
সোণার কাঠির স্পর্শেতে মোর
জাগিয়ে দিলে মন কুঁড়ি।
তাইত 'আমার দিল্‌পুরী' মাঝ
হাজার বাতির ঝাড় জ্বলে আজ
কোন্ যাদুকর আস্‌মানে হায়
ছড়িয়ে দিল ফুল্‌ঝুরী ;
কৃষ্ণসারের 'নাই' হ'তে আজ
খস্‌লরে ওই কস্তুরী।

---

* প্রথম সংখ্যা 'মাসিক মোহাম্মদী' পাঠে —

# বাংলার মোছলমান ও প্রাথমিক শিক্ষা

[ আনওয়ার হোসেন ]

"বাংলার মোছলমান ও প্রাথমিক শিক্ষা" সম্পর্কে কোন কথা বলিতে গেলেই ইহার গুরুত্ব, জটিলতা ও ব্যাপকতার কথা সর্ব্বাগ্রে আমাদের মনের মধ্যে জাগিয়া উঠে। কিন্তু তৎসত্বেও প্রয়োজন-বোধে যতদূর সম্ভব সংক্ষেপে আমি আজ এই প্রসঙ্গের আলোচনা করিব।

বাংলা মোছলমান-প্রধান দেশ। এখানকার শতকরা ৫৫ জন অধিবাসী মোছলমান। কিন্তু সংখ্যায় সব-চেয়ে বেশী হইলেও মোছলমানেরা শিক্ষা-ব্যাপারে সব-চেয়ে পশ্চাৎপদ। ইহা নিশ্চয়ই আক্ষেপের বিষয়। প্রাথমিক শিক্ষার বহুল প্রচার ব্যতীত এই অধঃপতিত সমাজের আশু উন্নতির আশা নাই। সমাজের মেরুদণ্ড হইল অজ্ঞ কৃষক সম্প্রদায়। সাধারণের ধারণা, কৃষি-কাজে শিক্ষার বিশেষ প্রয়োজন নাই। স্থূলবুদ্ধি মূর্খ যাহারা, তাহাদের উপর এ কাজের ভার দিয়া আমরা নিশ্চিন্ত আছি। কিন্তু আমাদের একটা কথা ভুলিলে চলিবে না যে, শিক্ষা প্রত্যেকের জন্যই দরকারী। মানুষের মনুষ্যত্বটুকু পুরাপুরি ফুটাইয়া তুলিতে হইলে শিক্ষা ব্যতীত অন্য উপায় নাই। বিংশ শতাব্দীর উন্নত বৈজ্ঞানিক সভ্যতার যুগে শিক্ষার উপকারিতা সম্বন্ধে বক্তৃতা করিতে যাওয়া বৃথা। শিক্ষা বিষয়ে আমরা বাঙ্গালী মোছলমান কতদূর অনুন্নত, তাহা কল্পনা করিলেও নৈরাশ্যের অন্ধকার আমাদের মনকে ছাইয়া ফেলে। মোছলমান আজ ব্যবসায়, বাণিজ্য, শিল্প প্রভৃতি অর্থকরী ব্যাপারেও সব-চেয়ে পিছনে পড়িয়া আছে। উকীল, মোক্তার, কেরাণী ও নকলনবিশের কাজ হিন্দুরই একচেটিয়া। আফিস আদালতে, মহাজনের গদীতে, সওদাগর আফিসে, কিংবা রেল বা ষ্টীমার ষ্টেশনে, আমরা আজ দুই একজন মোছলমান কর্ম্মচারী দেখিতে পাই মাত্র। যেখানে কুলী মজুর, সেইখানেই মোছলমান দলে দলে দেখা যায়। তাহারা "hewers of wood and drawers of water" ব্যতীত আর কি? সমাজে তাহাদের স্থান কোথায়? তথাকথিত ভদ্র হিন্দুর মতে তাহারা মোছলমান, ভদ্র লোক নয়। এরূপ ধারণা তাহারা পোষণ করিবে ইহাতে আর বৈচিত্র্য কি? এ প্রতিযোগীতার যুগে যোগ্যতমেরই উদ্বর্ত্তন ( Servival of the fittest ) হইতেছে। যাহারা অলস অশক্ত, তাহাদিগকে জীবন-যুদ্ধে বাধ্য হইয়াই পরাজয় স্বীকার করিতে হয়। দুর্ব্বলের প্রতিষ্ঠা প্রকৃতির নিয়ম নয়। মোছলমান সব বিষয়েই দুর্ব্বল। মানসিক শক্তির পরীক্ষায়ও তাহারা হিন্দুর সঙ্গে টিঁকিয়া উঠিতে পারে না। শারীরিক, মানসিক, নৈতিক, আর্থিক—সকল দিক দিয়াই তাহারা দুর্ব্বল, পরের অনুগ্রহ-ভিখারী। আত্মপ্রতিষ্ঠার সুযোগ বা ক্ষমতা তাহাদের নাই। হিন্দু তাহাদিগকে ঘৃণা করে, এ অনুযোগ তাহাদের মুখে সর্ব্বদাই শুনা যায়। প্রবল হিন্দু জাতিকে তাহারা ভয় না করিয়া পারে না। কিন্তু এ স্বাভাবিক ভয় দূর করিবার উপায় কি? উপযুক্ত না হইলে কখনই অন্যের নিকট হইতে ভিক্ষা করিয়া কিছু আদায় করা যায় না। প্রতিবেশী হিন্দুর সঙ্গে পাল্টা দিয়া চলিয়া ধরাপৃষ্ঠে টিঁকিতে হইলে আমাদিগকে শিক্ষার পথে অতি দ্রুত অগ্রসর হইতে হইবে। কথা উঠিতে পারে, হিন্দুরা আমাদের বহুপূর্ব্বে শিক্ষাক্ষেত্রে নামিয়াছে। তাহারা আজ বহুদূর অগ্রসর। আমরা ইংরেজী শিখিবনা বলিয়া পণ করিয়া বসিয়াছিলাম। সময়ের স্রোতের সঙ্গে তাল রাখিয়া আমরা চলিতে পারি নাই। যুগধর্ম্মের অবশ্যম্ভাবী গতির সঠিক নমুনা আমরা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি নাই। পরিবর্ত্তনের বিরোধী হইয়া আমরা মহাভুল করিয়াছি। সে ভুলের জন্য আজ আমাদিগকে ভুগিতে হইবে। আমাদিগকে আজ কার্য্যক্ষেত্রে উঠিয়া পড়িয়া লাগিতে হইবে। হিন্দুরা যদি দৈনিক ১০ ঘণ্টা কাজ করিতে পারে, আমাদিগকে তখন করিতে হইবে দৈনিক ১৬ ঘণ্টা। তাহাদিগকে দৌড়িয়া ধরিতে না পারিলে আমাদের উদ্ধার নাই। কিন্তু আমাদের

মধ্যে এরূপ উৎসাহ বা উদ্যম আছে কি? আমরা আজ প্রকৃত কর্ম্মের প্রেরণায় অনুপ্রাণিত হইয়াছি কি? সমাজে চিন্তাশীল লোকের খুবই অভাব। প্রকৃত কর্ম্মীর অভাব আরও বেশী। এ সব জটিল প্রশ্নের সমাধান আমাদিগকে করিতেই হইবে। আমরা এস্থলে সংক্ষেপে প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে মোছলমানের স্থান নির্দ্দেশ করিতে চেষ্টা করিব।

প্রাথমিক শিক্ষার সার্ব্বজনীন প্রচার ব্যতীত যে কোন জাতি বাঁচিতে পারে না, একথা বলাই বাহুল্য। মিঃ ফিশার এক স্থানে বলিয়াছেন, "the capital of a country does not consist in cash or paper, but in the brains and bodies of the people who inhabit it" কি চমৎকার উক্তি! দেশের বা সমাজের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি তখনই সম্ভব, যখন জনসাধারণ উপযুক্তরূপে শিক্ষিত হইয়া উঠে। শিক্ষা ব্যতীত মানুষের অন্তর প্রকৃতির সম্পূর্ণ বিকাশ সাধিত হয় না। আর তাহা না হইলে তাহাদের পক্ষে সামাজিক বা রাষ্ট্রনৈতিক দায়িত্বের গুরুত্ব অনুভব করা একরূপ অসম্ভব। Indian Industrial Commission এবং বঙ্গীয় কৃষি-বিজ্ঞান ইঁহারা প্রত্যেকেই দেশে প্রাথমিক শিক্ষার প্রচারের প্রয়োজনীতা একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন। শতকরা ৯৯ জন বাঙ্গালী মোছলমানই কৃষি-ব্যবসায়ী। শিক্ষার অভাবে তাহারা বৈজ্ঞানিক উন্নত প্রণালীতে চাষ-বাসের আবশ্যকতা মোটেই উপলব্ধি করিতে পারে না। ভূমি চাষ করিয়া আশানুরূপ ফসল তাহারা পায় না। তাহারা চিরকালই এক ভাবে চলিয়াছে। ভিন্ন ভিন্ন ফসলের আবাদ করিয়া, উপযুক্ত সার প্রয়োগ করিয়া লাভবান হইবার প্রবৃত্তিটুকুও তাহাদের মধ্যে নাই। কৃষি-বিষয়ক শিক্ষা ব্যতীত তাহাদের নিকট হইতে এসব কিছুই আশা করা যায় না। এ দেশে কৃষি ও মোছলমান এরূপ অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত যে একটীকে বাদ দিয়া অন্যটীর বিষয় আমরা কল্পনাও করিতে পারি না। বঙ্গীয় কৃষি-বিভাগ হইতে বলা হইয়াছে যে, যদি কৃষকদের মধ্যে কৃষি-শিক্ষা প্রচার হয়, তবে দেশের কৃষক সম্প্রদায় মোটের উপর আরও আটকোটী টাকা লাভ করিতে পারে। ইহাতেই বুঝা যায় প্রাথমিক শিক্ষার অভাবে দরিদ্র মোছলমান কৃষক কতদূর ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে। তাহাদের আর্থিক ও স্বাস্থ্যনৈতিক উন্নতি একমাত্র প্রাথমিক শিক্ষার উপরই নির্ভর করে। বাহিরের জগতে কি ঘটিতেছে সে বিষয়ে তাহারা সম্পূর্ণ অজ্ঞ।

গতানুগতিকতার সঙ্কীর্ণ গণ্ডী ভাঙ্গিয়া মুক্ত প্রান্তরে আসিয়া দাঁড়াইবার ইচ্ছা তাহাদের নাই। শোষণ তাহারা করিতে জানে না, কেবল মাত্র **শোষিত** হইয়াই আসিতেছে। বর্ত্তমান প্রণালীতে চাষ করিয়া কৃষক সম্প্রদায় মোটেই লাভবান হইতে পারিতেছে না। দেনার দায়ে তাহাদের বাস্তভিটা পর্য্যন্ত মহাজনের কবলে যাইতেছে, তবুও নিস্তার নাই। সুযোগ পাইয়া সবদিক হইতেই তাহাদের উপর পুরাদমে শোষণ চলিয়াছে। তাহাদের এমনই দুর্ভাগ্য যে, নিজে সারা বৎসর খাটিয়া যাহা উৎপন্ন করে, তাহাও ভোগ করিতে পারে না। দু' বেলা পেট ভরিয়া আহার করিয়া তৃপ্ত হইবার সুযোগ তাহাদের নাই। এই অজ্ঞতা ও দারিদ্র্যের কবল হইতে তাহাদিগকে মুক্ত করিতে হইলে তাহাদের মধ্যে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার প্রচার করিতে হইবে। বাংলা দেশে বর্ত্তমানে মাত্র শতকরা ৭০॥ জন শিক্ষিত। মোছলমানদের মধ্যে শিক্ষিতের সংখ্যা আরও কম। বড় জোর শতকরা ৫ জন। ইহাতেই বুঝা যায় আমাদের শিক্ষা-দৈন্য কতদূর শোচনীয়। ইহার মধ্যেও দুই একজন ব্যতীত অন্যেরা মাত্র নিজের নাম স্বাক্ষর করিতে পারে।

মহামতি গোখেল এ দেশে প্রাথমিক শিক্ষা অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক করিবার জন্য আজীবন প্রাণান্ত চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। তিনি ১৯০৩ সনের ব্যবস্থা পরিষদের বজেট আলোচনার সময় বার্লিনের Professor Tews এর কথা উল্লেখ করিয়াছেন। প্রাথমিক শিক্ষা সম্বন্ধে ইঁহার কি মত দেখুন। তিনি বলিতেছেন, "General Education is the foundation and necessary antecedent of increased Economic activity in all branches of national Production in agriculture, small industries, manufactures, and commerce."

"The consequence of the increase of popular Education is a more equal distribution of the proceeds of labour contributing to the general prosperity, social place and

the development of all the powers of the nation".

"The Economic and Social development of a people and their participation in the international exchange of commodities, is dependent upon the Education of the masses."

দেশের জনসাধারণ শিক্ষিত না হইলে কতিপয় মুষ্টিমেয় শিক্ষিত ব্যক্তি সমাজের উন্নতির জন্য কি করিতে পারে? সামাজিক রোগের মূল কারণই হইল অশিক্ষা ও কুশিক্ষা। জাতি হিসাবে বাঁচিতে হইলে আজ আমাদিগকে শিক্ষার জন্য বদ্ধপরিকর হইতে হইবে। প্রাথমিক শিক্ষার উপরই সমাজের আশা ভরসা সম্পূর্ণ নির্ভর করে। দুই একজন উচ্চশিক্ষিত দ্বারা আমাদের সমাজ বিশেষ উপকৃত হইতে পারে না। উচ্চশিক্ষার ভিত্তিই হইল এই প্রাথমিক শিক্ষা। Encyclopaedia Britaniaতে জনৈক লেখক বলিয়াছেন, "The organisation of the higher grades of education constitutes a task of less formidable magnitude than the organisation of elementary Education." কথাটা খুবই ঠিক। গ্রামের দরিদ্র অধিবাসীদিগকে শিক্ষিত করাই আমাদের সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য। কারণ আমরা জানি, "in the cottage the NATION dwells." ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব্ব Vice chancellor বলিয়াছেন, "The planning of Primary Education is the largest educational problem now before the world." অন্যান্য দেশে আজ প্রাথমিক শিক্ষা দ্রুত বিস্তার লাভ করিতেছে। গভর্ণমেন্ট ও জনসাধরণের চেষ্টায় পল্লীতে, পল্লীতে শিক্ষার বন্দোবস্ত হইতেছে। প্রাথমিক শিক্ষায় আমরা ভারতবাসী কতদূর পশ্চাৎপদ তাহা নিম্নের তালিকা হইতে স্পষ্ট বুঝা যাইবে :—

| দেশ | শতকরা শিক্ষিত |
|---|---|
| মার্কিণ যুক্তরাজ্য | ১৯·৮৭ |
| ইংলণ্ড ও ওয়েল্‌স্ | ১৬·৫২ |
| জার্ম্মাণ | ১৬·৩০ |
| ফ্রান্স | ১৩·৯০ |
| জাপান | ১৩·০৭ |
| সিংহল | ৮·৯৪ |
| রুমানিয়া | ৮·২১ |
| রুসিয়া | ২·৬১ |
| ভারতবর্ষ | ২·৩৮ |

অন্য দেশের সহিত ভারতের শিক্ষার ব্যয়ের একটা তুলনা :—

| দেশ | মাথা-পিছু সরকারী ব্যয় |
|---|---|
| মার্কিণ যুক্তরাজ্য | ১২৲ |
| সুইট্‌জারলেণ্ড | ১০।০ |
| অষ্ট্রেলিয়া | ৮।৶০ |
| ইংলণ্ড ওয়েল্‌স্ | ৮৲ |
| কানাডা | ৭।৴০ |
| স্কটল্যাণ্ড | ৪৶১০ |
| জার্ম্মানী | ৫৵০ |
| আয়ারল্যাণ্ড | ৪৸৴০ |
| সুইডেন | ৪৶০ |
| বেলজিয়াম | ৪৲ |
| নরওয়ে | ৩৸৴০ |
| ফ্রান্স | ৩।৵০ |
| অষ্ট্রীয়া | ২।৴১০ |
| স্পেন | ১।৵০ |
| ইটালী | ১৶১০ |
| সাইবেরিয়া | ৸৵০ |
| রুসিয়া | ।৶১০ |
| ভারতবর্ষ | ৴০ (এক আনা) |

দেখুন ভারতে শিক্ষার জন্য কত টাকা ব্যয় করা হয়। আবার বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্ট প্রতি একশত জনের জন্য ২৮৲ টাকা, জাপান ২৬০৲ টাকা, ইংলণ্ড ৬৩০৲ টাকা, কানাডা ১৩৭০৲ টাকা মার্কিণ ২৭০০৲ টাকা ব্যয় করেন। জাপানে শতকরা ২ জন স্ত্রীলোক ও ১ জন পুরুষ অশিক্ষিত। আর বাংলায় শতকরা ৫ জন পুরুষ শিক্ষিত আর বড় জোর ১৷০ জন স্ত্রীলোক শিক্ষিত। বাংলার ঢাকা জেলায় শিক্ষিতের পরিমাণ নিম্নলিখিতরূপ—পুরুষ শতকরা ১৪ জন ও মাত্র ২ জন স্ত্রীলোক শিক্ষিত। এইখানে মোট পুরুষ

১৫৮২০০০ জন। এইখানে শতকরা মাত্র ৬৭ জনের জন্য শিক্ষার বন্দোবস্ত আছে। ঢাকা জেলায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়ে ৭৩০০০ জন, মাইনর ও মধ্যবাংলা বিদ্যালয়ে পড়ে ৭৫০০ জন; উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে পড়ে ২০০০০ জন। এইখানে মোট স্ত্রী ১৫৫৩০০০ জন। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়ে ২৭২০০ জন। মাইনর ও মধ্য বাংলায় পড়ে ৩২৫ জন। আর উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ে পড়ে ৬১৩ জন। শতকরা দুই জনের মাত্র শিক্ষার বন্দোবস্ত আছে। বাংলার জেলাগুলির মধ্যে ঢাকা একটী উন্নত জায়গা। সেখানেই যখন শিক্ষার এরূপ অভাব, তখন অন্যান্য জেলার অবস্থা কিরূপ তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। স্থানাভাবে আমরা অন্য জেলার বিস্তারিত বিবরণ দিতে ক্ষান্ত রহিলাম। ভারতের বরোদা রাজ্যে প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হইয়াছে। সেখানে ৩০৬৭টী প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে। ১৮৭১ সালে তথায় মাত্র ৪টী প্রাথমিক বিদ্যালয় ছিল। বরোদা-রাজ তাঁহার রাজস্বের বার ভাগের এক ভাগ অর্থাৎ ২০ লক্ষ টাকা শিক্ষার জন্য খরচ করেন। ফলে ৪০ বৎসরের মধ্যে নিরক্ষর দেশে শতকরা ১০ জন লেখা পড়া শিখিয়াছে। ত্রিবাঙ্কুর ও কোচিন ছাড়া সমগ্র ভারতের মধ্যে আর কোথাও শিক্ষিতের সংখ্যা এত অধিক নহে। কিন্তু এখানকার ২৩৯ লক্ষ মোছলমানের মধ্যে ২২৯ লক্ষ নিরক্ষর। মাত্র ৬২ হাজার মোছলমান ইংরেজী ভাষা জানে। ইহার চেয়ে অশুভ লক্ষণ মোছলমানের জন্য আর কি আছে? বাংলায় ১৯১৮—১৯১৯ সনে মোট প্রাইমারী বিদ্যালয় ছিল ৪৪৯২৫টী। তথায় শিক্ষা পাইত মোট ১৩৮৪২০১ জন ছাত্র ও ছাত্রী। ১৯১৭—১৯১৮ সনে তথায় ৪৪১১১টী স্কুল ছিল এবং তথায় ১৪০৯৩১৬ জন ছাত্র-ছাত্রী শিক্ষা পাইত। ইহা হইতে দেখা যায় যে পরবর্ত্তী বৎসর অর্থাৎ ১৯১৮—১৯১৯ সনে যদিও স্কুলের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছিল, তথাপি তদনুযায়ী ছাত্র সংখ্যা বৃদ্ধি পায় নাই। বরং হ্রাস পাইয়াছিল। ইহার দ্বারা বুঝা যাইতেছে যে, বাংলায় প্রাইমারী স্কুলের সংখ্যা বৃদ্ধি না করিয়া যাহাতে ছাত্র সংখ্যা বৃদ্ধি পায়, তাহার চেষ্টা করা উচিত। সর্ব্বত্র সমান সংখ্যক স্কুল স্থাপন করিয়া সেগুলিকে উপযুক্ত শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে রাখিতে হইবে। বাংলায় ১৯১৮—১৯১৯ সনে প্রাথমিক শিক্ষার জন্য মোট ব্যয় ৪৮০২৭৫৬৲ টাকা, মাদ্রাজে ঐ বৎসর মোট ৮০৩৯৩৮২৲ টাকা আর বোম্বাইয়ে মোট ৯১৫২০৯৭৲ টাকা। ইহা হইতে দেখা যাইবে যে, বাংলা ছাড়া অন্যত্র প্রাথমিক শিক্ষার ব্যয় কত বেশী। মাদ্রাজের জন সংখ্যা বাংলা দেশ হইতে অনেক কম। তথাপি ঐ খানে শতকরা ৭৩৷৷০ টাকা রাজস্ব হইতে ব্যয় করা হয়। আর বোম্বাইয়ের জনসংখ্যা বাংলার অর্দ্ধেকেরও কম। তথায় শতকরা ৮৬·৪ টাকা ব্যয় করা হয়। আর বাংলায় মাত্র ৪৯·৪ টাকা ব্যয়িত হয়। এরূপক্ষেত্রে বাংলা দেশে প্রাথমিক শিক্ষার জন্য যে আরও বেশী টাকা গবর্ণমেণ্ট-রাজস্ব হইতে ব্যয় করা কর্ত্তব্য একথা বলাই বাহুল্য। বাংলা দেশে জনসাধারণ কর্ত্তৃক পরিচালিত প্রাইমারী স্কুলের সংখ্যা শতকরা ৬·৯টী, মাদ্রাজে শতকরা ২৬·৯টী আর বোম্বাইয়ে শতকরা ৮০·৭টী। বাংলা দেশে ১৯০০—১৯০১ হইতে ১৯০২—১৯০৩ খৃষ্টাব্দের মধ্যে প্রাইমারী স্কুলে ছাত্রসংখ্যা শতকরা ৪৪·৮ জন বৃদ্ধি পাইয়াছিল। এ সময়ের মধ্যে লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছিল মাত্র ৭·৯ জন। ১৯১৯—১৯২০ সনে স্কুলের সংখ্যা অনেকটা বৃদ্ধি পাইয়াছিল বটে, কিন্তু ছাত্রসংখ্যা তদনুরূপ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় নাই। প্রতি $১\frac{৭}{১০}$ বর্গ মাইলের মধ্যে বাংলায় একটী করিয়া প্রাইমারী স্কুল আছে। ১৯১৪—১৯১৫ সনে প্রতি স্কুলে ছাত্র ছিল ৩৪ জন। কিন্তু ১৯১৯—১৯২০ সনে মাত্র ৩০ জন ছাত্রের অস্তিত্ব ছিল। দেখা যায়—দিন দিনই প্রাইমারী স্কুলের ছাত্র সংখ্যা হ্রাস পাইতেছে। ইহার কারণ কি? পল্লীগ্রামে পাঠশালার দুর্দ্দশা দেখিলে জাতির ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নিরাশ হইতে হয়। অশিক্ষিত বা কুশিক্ষিত শিক্ষক দ্বারাই এই সব পাঠশালা পরিচালিত হয়। দরিদ্র শিক্ষক কোনরূপে আপন পাঠশালাটী নিয়া কায়ক্লেশে বাঁচিয়া থাকে। কাহারও মাসিক বেতন ৩৲ টাকা, কাহারও ৫৲ আবার কাহারও বা ২৲ টাকা। কি সুন্দর ব্যবস্থা! শিক্ষাদান করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহের সুযোগ কোথায়? বাধ্য হইয়া শিক্ষকগণ অন্য ব্যবসায়ে মনোযোগ দেয়। অবসরমত পাঠশালায় আসিয়া দুই এক ঘণ্টা বিশ্রাম করিয়া যায় মাত্র। সুপরিচালিত স্কুল বাংলা দেশে কোথায় কয়টী আছে? কোন কোন স্কুলের অস্তিত্ব মাত্র পরিদর্শক কর্ম্মচারীর খাতা-পত্রে আছে। খাতায় কতিপয় ছাত্রের নাম লেখা আছে, সময় মত ৮৷১০ জন ছেলে পাড়া হইতে ডাকিয়া আনিয়া পরিদর্শক কর্ম্মচারীকে দেখাইয়া শিক্ষক আপন প্রাপ্য দুই একটী টাকা আদায় করিবার পথ করিয়া নেয়। মিঃ বিস্ এক স্থানে

উল্লেখ করিয়াছেন যে, "There are many GURUS who cannot read or write the matter of Bengali readers correctly. There are again many unacquainted with arithmetic beyond the first two simple rules." কথাটা একটু বিস্ময়কর হইলেও সম্পূর্ণ সত্য। যেখানে প্রাথমিক শিক্ষার এত সুন্দর (?) ব্যবস্থা, তথায় উচ্চশিক্ষা উচ্চশিক্ষা করিয়া চীৎকার করিয়া কতদূর ফল হইবে, তাহা চিন্তা করিবার বিষয় বটে! মিঃ বিস্‌এর মতে, "The greatest asset of the country is the hitherto undevoloped intelligence and unorganised strength of its masses." একথা আমরা মনে প্রাণে সমর্থন করি। জনসাধারণের বুদ্ধির পরিপুষ্টি সাধন করিতে না পারিলে আমাদের রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক মুক্তির কোন আশাই নাই। কিন্তু সেজন্য আমরা এযাবৎ কি বন্দোবস্ত করিয়াছি? স্যাড্‌লার কমিশনের রিপোর্টে বাংলার বিভিন্ন বিভাগের শিক্ষিত হিন্দু ও শিক্ষিত মোছলমানের গড় নিম্নলিখিতরূপ :—

হাজারকরা শিক্ষিতের হিসাব

| দেশ | হিন্দু পুরুষ | হিন্দু স্ত্রীলোক | মোছলমান পুরুষ | মোছলমান স্ত্রীলোক |
|---|---|---|---|---|
| ঢাকা | ২৩৮·৮ | ২৯·৫ | ৬০·১ | ১·৫ |
| প্রেসিডেন্সি | ২৪৯·৮ | ৩৫·৫ | ৯৬·১ | ৩·২ |
| বর্দ্ধমান | ২০৮·৪ | ১১·৬ | ১৫০·৪ | ৭·০ |
| চট্টগ্রাম | ২৬২·৭ | ২০·১ | ৮০·৩ | ২·২ |
| রাজসাহী | ১৩০·৫ | ৯·৪ | ৭৬·৭ | ১·৭ |

ইংরেজী শিক্ষিতের নমুনা

( হাজারকরা হিসাব )

| দেশ | হিন্দু পুরুষ | হিন্দু স্ত্রীলোক | মোছলমান পুরুষ | মোছলমান স্ত্রীলোক |
|---|---|---|---|---|
| ঢাকা | ৩৬·৯ | ·৬ | ৩·৭ | ·০৩ |
| প্রেসিডেন্সি | ৬২·৫ | ১·৮ | ৭·৯ | ·১ |
| বর্দ্ধমান | ২৬·৫ | ·৬ | ১২·৪ | ·৪ |
| চট্টগ্রাম | ৩০·৩ | ·৫ | ৪·৬ | ·০৪ |
| রাজসাহী | ১৫·৪ | ·২ | ৪·৪ | ·০২ |

উপরে যে নমুনা দেওয়া হইল, তাহা ১৯১১ সনের। বর্ত্তমানে মোছলমানেরা শিক্ষাক্ষেত্রে অনেকটা উন্নতি করিয়াছে। ১৯১৮—১৯১৯ সনে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মোছলমানের সংখ্যা শতকরা ৫১·৪ জন ছিল। সুতরাং জনসংখ্যার অনুপাতে তাহারা শিক্ষা-ব্যাপারে কতকটা অগ্রসর হইয়াছে বলিতে হইবে। বর্ত্তমানে মোছলমান ছাত্রদের শিক্ষার বিশেষ বন্দোবস্ত করিবার জন্য মক্তব প্রাইমারী স্কুলের সৃষ্টি করা হইয়াছে। ১৯১৯ সনে এইরূপ মক্তব ছিল ১১১২০টী, তন্মধ্যে ৮৩১২টী ছিল পুরুষ ছাত্রদের জন্য আর ২৮৫৮টী ছিল মেয়েদের জন্য। এই সব মক্তবে মোট ছাত্র ছিল ২৩৬৮০৮ জন আর ছাত্রী ছিল মোট ৭৩২৩৬ জন। এই সব মক্তবের জন্য গবর্ণমেণ্ট হইতে অতিরিক্ত সাহায্যের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। এতৎসত্ত্বেও আশানুরূপ ফল পাওয়া যাইতেছে না। সর্ব্বত্রই উপযুক্ত শিক্ষকের অভাব। এই সব মক্তবের আভ্যন্তরীন অবস্থা নিতান্ত শোচনীয়। মক্তবে যাহারা কাজ করে, তাহারা হয়ত স্থানীয় মস্‌জিদের এমাম বা পাড়ার মোল্লা। বাংলা লেখাপড়া জানুক আর না জানুক কোরাণশরীফ পড়া ও দুই একখানা মছলা মছায়েলের কেতাব তাহাদের কণ্ঠস্থ আছে। শিক্ষার্থী ছাত্রগণ এরূপ শিক্ষকের নিকট হইতে আর বেশী কিছু আশা করিতে পারে না।

আমরা পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি, দেশহিসাবে ভারতে প্রাথমিক শিক্ষার জন্য অন্যান্য দেশ অপেক্ষা মাথাপিছু অতি সামান্য মাত্র খরচ করা হয়। আবার প্রদেশ হিসাবে বাংলার অন্যান্য প্রদেশের চেয়ে অনেক কম ব্যয়িত হয়। প্রতি ছাত্রের শিক্ষার জন্য বাংলায় ৩·৫ টাকা ব্যয়িত হয়। আর বোম্বাইয়ে ১৫্ টাকা ব্যয়িত হয়। আবার বাংলা দেশে ছাত্র-বেতনের হার অনেক বেশী। এইখানে গড়ে মাসিক ১৷৵০ আনা ছাত্র-বেতন আদায় হয়। বিহার ও উড়িষ্যা ব্যতীত অন্যান্য স্থানে ইহার অর্দ্ধেকও আদায় হয় না। প্রাদেশিক রাজস্ব হইতে বাংলা দেশে প্রাথমিক শিক্ষার জন্য মাত্র গড়ে ·০২৯ টাকা আর বোম্বাইয়ে ·২৬৫ টাকা ব্যয় করা হয়। বাংলা দেশে জনসাধারণ-চালিত স্কুলের সংখ্যা শতকরা ৬·৯টী, মাদ্রাজে ২৬·৯টী আর বোম্বাইয়ে ৮০·৭টী। এই সব হইতে স্পষ্টই উপলব্ধি করা যাইবে বাংলায় প্রাথমিক শিক্ষার অবস্থা কিরূপ।

আমেরিকার যুক্তরাজ্যে শতকরা ২১ জন প্রাথমিক শিক্ষা পাইতেছে। কানাডা, অষ্ট্রেলিয়া, সুইটজারলেণ্ড, গ্রেটবৃটেন

ও আয়রলেণ্ড প্রভৃতি দেশে শতকরা ২০ হইতে ১৭ জন প্রাইমারী শিক্ষা পায়, ফ্রান্সে শতকরা ১৯ জন, সুইডেনে ১৪ জন, ডেনমার্কে ১৩ জন, বেলজিয়ামে ১২ জন, জাপানে ১১ জন, ইতালী, গ্রীক, স্পেন প্রভৃতি দেশে শতকরা ৮ হইতে ৯ জন, পর্ত্তুগাল ও রুসিয়ায় শতকরা ৪ হইতে ৫ জন, ফিলিপাইন দ্বীপে শতকরা ৫ জন, ভারতে বারোদা রাজ্যে শতকরা ৫ জন, আর ব্রিটিশ ভারতে মাত্র শতকরা ১·৯ জন, প্রাথমিক শিক্ষা পায়। ইহাও বাংলার প্রাথমিক শিক্ষার অবস্থার একটী বড় নজীর। ১৮৭০ অব্দে প্রথমতঃ ইংলণ্ডে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার প্রচলন করা হয়। হলাণ্ড, পর্ত্তুগাল প্রভৃতি দেশেও এই শিক্ষা বাধ্যতামূলক, কিন্তু অবৈতনিক নয়। স্পেন, গ্রীস, বুলগেরিয়া সার্ব্বিয়া, রুমানিয়া প্রভৃতি দেশে প্রাথমিক শিক্ষা অবৈতনিক অথচ বাধ্যতামূলক। তুরস্কেও প্রাথমিক শিক্ষা অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক। রুসিয়াতে যদিও এই শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হয় নাই, তথাপি সেখানে ইহা অনেকটা অবৈতনিক ধরণের। এসব দেশের সঙ্গে তুলনা করিলে ভারতের স্থান কোথায় নির্দ্দেশ করা যায়? এ তুলনাক্ষেত্রে ভারত টিঁকিতে পারে না। সুখের বিষয় এই যে, বরোদা রাজ্যে প্রাথমিক শিক্ষার অভাবনীয় উন্নতি সাধিত হইয়াছে। এখানে স্কুলে যাইবার উপযুক্ত বয়সের ছেলেদের মধ্যে শতকরা ৭৯·৬ জন লেখাপড়া শিখে। আর বৃটিশ ভারতে মাত্র ২১·৫ জন।

অন্যান্য সভ্য দেশে প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের জন্য বিপুল আয়োজন ও অজস্র অর্থ ব্যয় করা হইতেছে। রাশি রাশি অর্থ ব্যয় করিতে না পারিলে যে, প্রাথমিক শিক্ষা অবৈতনিক হইতে পারে না তাহা বলাই বাহুল্য। ইংলণ্ডে প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক একথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। তথায় ১৫ বৎসরের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষার ব্যয় ৪৫ লক্ষ হইতে ১১৫ লক্ষে উঠিয়াছে। ইহা হইতেই বুঝা যাইবে, তথায় প্রাথমিক শিক্ষার কিরূপ দ্রুত প্রসার হইতেছে। প্রায় ১৫০ শত বৎসর যাবৎ আমরা সভ্য ইংরেজ জাতির শাসনাধীনে আছি। কিন্তু আজও ৫টী গ্রামের মধ্যে ৪টীর ভিতরেই শিক্ষাদানের জন্য কোন বিদ্যালয় নাই। আর ৮ জন ছেলের মধ্যে ৭ জনই মূর্খ থাকিয়া যায়। জাপান মাত্র ৪০ বৎসর পূর্ব্বে পাশ্চাত্য সভ্যতার আলোক পাইয়াছে। তথায় বিদেশী জাতির শাসন নাই। জাতীয় গবর্ণমেণ্ট শিক্ষা বিস্তারের জন্য তথায় অকাতরে অর্থ ব্যয় করিতেছেন। জাতির নৈতিক উন্নতি সাধন করাই তাঁহাদের উদ্দেশ্য। কিন্তু আমাদের শাসক সম্প্রদায়ের স্বার্থ ও আমাদের স্বার্থ এক নয়। কাজেই তাঁহাদের নিকট হইতে আমরা বেশী আর কি উপকার লাভ করিতে পারি?

ফিলিপাইন দ্বীপ প্রথমতঃ স্পেনদের অধিকারে ছিল। সে সময় তাহাদের জন্য প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক ছিল না। কালে মার্কিণ যুক্তরাজ্যের অধীনে আসার পর হইতেই সেখানে প্রাথমিক শিক্ষা একরূপ বাধ্যতামূলক হইতে চলিয়াছে,—যদিও এযাবৎ সে জন্য কোনও আইন কানুন করা হয় নাই। মহামতি গোখেল বলিয়াছেন, "Under Spanish rule there was no system of populer Education in the Philippines. As soon as the Islands passed into the possession of the united states they drew up a regular programme of expenditure which has been systematically adhered to. The aim is to make Primary Education universal and the educational authorities advise compulsion though no compulsory Law has yet been enacted. In the matter of Education many Municipalities have introduced Compulsion local ordinances."

অতএব দেখা যাইতেছে, বর্ত্তমানে পৃথিবীর সর্ব্বত্রই প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক ও অবৈতনিক করার জন্য আয়োজন চলিতেছে। কিন্তু আমরা তজ্জন্য কি করিতেছি আর আমাদের সরকারই বা কি করিতেছেন? আমরা স্বরাজ, স্বরাজ করিয়া চীৎকার আরম্ভ করিয়াছি; কিন্তু স্বরাজ ভোগ করিবে কে? স্বরাজ কি কেবল কতিপয় শিক্ষিত ব্যক্তির একচেটিয়া অধিকার হইবে এবং তাহা হইলেই কি স্বরাজের মহত্তর উদ্দেশ্য সফল হইবে?

বহুদিন যাবৎ বাংলা দেশে প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের প্রকৃষ্ট উপায় সম্বন্ধে জল্পনা কল্পনা চলিতেছে; কিন্তু এ যাবৎ কোন কল্পনাই বাস্তবে পরিণত হয় নাই। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে গবর্ণমেণ্ট মিঃ বিসকে প্রাথমিক শিক্ষার উন্নতি সাধনকল্পে একটা স্কীম তৈয়ারী করিবার জন্য নিযুক্ত করেন। তিনি বহু অনুসন্ধান ও সাধনার পর একটী স্কীম তৈয়ার করিয়াছেন। কিন্তু এ স্কীম অনুযায়ী আজ পর্য্যন্ত দুই এক

জায়গা ব্যতীত অন্যত্র কোথাও কোন কাজ হইয়াছে বলিয়া আমাদের জানা নাই। কলিকাতার বুকে মিউনিসিপালিটীর অধীনে এই স্কীম অনেকটা কার্য্যে প্রযুক্ত করিবার বন্দোবস্ত হইয়াছে। খুলনা জেলায়ও পরীক্ষামূলক ভাবে এই স্কীম অনুপাতে প্রাইমারী শিক্ষা বিস্তারের চেষ্টা হইতেছে। ঢাকার অপর পারে জিঞ্জিরায়ও শিক্ষাদানের জন্য একটী দালান নির্ম্মিত হইয়াছে। সেখানেও অনেক ছাত্র বিনা ব্যয়ে লেখাপড়া শিখিতেছে। কিন্তু যতদিন পর্য্যন্ত না দেশের সর্ব্বস্থানে এই ব্যবস্থা হইতেছে, ততদিন পর্য্যন্ত ইহার দ্বারা সর্ব্বসাধারণের উপকার হইবে না। দেশের ধনী জমীদার সম্প্রদায় দেশের কেউ নয়। প্রজার রক্ত শোষণ করিয়া তাঁহারা বাঁচিয়া আছেন। ভোগ করিয়াই তাঁহারা সন্তুষ্ট। কিন্তু যাহাদের অর্থে তাঁহারা পরিপুষ্ট, তাহাদের জন্য তাঁহারা এ পর্য্যন্ত কতটুকু স্বার্থ ত্যাগ করিয়াছেন? Mr. Lindsay সম্প্রতি প্রাথমিক শিক্ষার উন্নতির জন্য নূতন আর এক উপায় উদ্ভাবনে ব্যস্ত আছেন। তিনি গবর্ণমেণ্টের শিক্ষা বিভাগের সেক্রেটারী। হাওড়াতে প্রথমতঃ কতিপয় উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী নিয়া এই বিষয়ে আলোচনা করিবার জন্য এক পরামর্শ সভা আহুত হয়। প্রাইমারী শিক্ষাকে সার্ব্বজনীন করিতে হইলেই বহু অর্থের প্রয়োজন। এত টাকা আসিবে কোথা হইতে? তাঁহারা মনস্থ করিলেন শিক্ষাকর বসাইয়া অর্থাগমের উপায় করিতে হইবে। স্বায়ত্ত শাসনের নামে দেশে গ্রামে গ্রামে যে সব ইউনিয়ন বোর্ড স্থাপিত হইতেছে, তাহাদের উপর শিক্ষার তত্ত্বাবধান-ভার দিবার কথা হইবে। জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট প্রভৃতি সরকারী লোকেরা শিক্ষা বিভাগের শাসনকার্য্যে সাহায্য করিবেন। বিগত জানুয়ারী মাসে ঢাকায় এক শিক্ষা-সম্মিলনের অধিবেশন হয়। ঢাকা বিভাগের বিভিন্ন জেলার ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের চেয়ারমেন ও অন্যান্য গণ্যমান্য লোক তথায় উপস্থিত ছিলেন। Mr. Lindsay সভার উদ্দেশ্য বিস্তারিত বুঝাইয়া দেন। প্রাথমিক শিক্ষার আশানুরূপ বিস্তার করিতে হইলে যে শিক্ষাকর না বসাইয়া অন্য গতি নাই তাহাও তিনি বলেন। অধিকাংশ সভ্যই এ-প্রস্তাবের সমর্থন করেন। কিন্তু এরূপ প্রস্তাব যে কতদূর যুক্তিসঙ্গত তাহা ভাবিয়া দেখা উচিত। দেশের দরিদ্র জনসাধারণ পূর্ব্ব হইতেই নানাপ্রকার করের ভারে প্রপীড়িত। চৌকিদারী টেক্স, ইনকাম্ টেক্স এরূপ আরও কত কি! তার উপর আবার শিক্ষাকর। অবশ্য শিক্ষার জন্য কর ধার্য্য করা এক দিক দিয়া ন্যায়সঙ্গত হইতে পারে, প্রাইমারী শিক্ষা ঘরে ঘরে প্রচার হউক এরূপ কামনা প্রত্যেকেই করে; কিন্তু দেশের লোক এ অতিরিক্ত করের ভার সহ্য করিতে পারিবে কিনা সে কথাও একবার ভাবিয়া দেখা উচিত। জমীদারের অন্যায় দাবী, প্রাপ্য খাজনার অতিরিক্ত সেলামী, বাজে আবওয়াব, পূজাপার্ব্বণে চাঁদা প্রভৃতি দিয়া দরিদ্র কৃষকের সংবৎসর সংসার চালানো একরূপ দায় হইয়া উঠে। তারপর মহাজনের অমানুষিক অত্যাচার। অসম্ভব রকম সুদের হার ঋণজর্জ্জরিত কৃষকের শেষ কপর্দ্দকটুকু জোর করিয়া কাড়িয়া লয়। এমতাবস্থায় শিক্ষাকর দিয়া তাহার উপার্জ্জিত যৎসামান্য অর্থের কত ভগ্নাংশ বাকী থাকিবে? জমীদারী প্রথার কল্যাণে প্রজাকে ভূমির করও অনেক বেশী দিতে হয়। এত বেশী ভূমির রাজস্ব অন্যত্র আছে কিনা আমাদের জানা নাই। এসব নানা কারণে আমাদের মনে হয় এত করের উপর আবার শিক্ষাকর বসান অনেকটা 'মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা'র মত হইবে।

গ্রাম্য চৌকিদার দিয়া গ্রামবাসীর যে কি উপকার হয়, তাহা আমাদের ধারণার অতীত। রাত্রে পাহারা দিয়া চোর ডাকাত তাড়াইয়া দিবে এই ভরসায়ই চৌকিদার নিযুক্ত হইয়াছে। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, কয়জন চৌকিদার রীতিমত গ্রামে পাহারা দেয়? গ্রামের জন্মমৃত্যুর সংবাদ থানায় বহন করা ছাড়া তাহাদের অন্য কোন কাজ আছে কি? তাহা যদি না থাকে, তবে অকারণে ট্যাক্স দিয়া তাহাদিগকে পোষণ করার সার্থকতা কি? জন্মমৃত্যুর সংবাদ অন্য ভাবেও সংগ্রহ করা যায়। ব্যক্তিগত ভাবে যদি প্রত্যেককেই এ সংবাদ থানায় দিতে বাধ্য করা যায়, তবেই ত একাজ সমাধা হয়। ইহাতে ফল এই হয় যে, যে-টাকা চৌকিদারের জন্য ব্যয়িত হয়, সেই টাকাটা অনায়াসে প্রাথমিক শিক্ষার জন্য ব্যয় করা যায়। তারপর জমীদার সম্প্রদায়ের কথা। প্রজার প্রতি কি তাঁহাদের কোনই কর্ত্তব্য নাই? তহশীলদারী করিয়া মধ্যস্থ সাজিয়া জাতীয় সম্পদের এক সারাংশ ভোগ করিয়াই কি তাঁহারা আপনাদের কর্ত্তব্য শেষ করিতে চান? বাংলা দেশের দারিদ্র্যের অন্যতম কারণ এই জমিদারী-প্রথা। এই প্রথার ফলে সমাজে একদল লোক unearned income

ভোগ করিয়া পুষ্ট হইতে থাকিবে ও দেশের সম্পদবৃদ্ধিকারী কৃষক সম্প্রদায় সারা জীবন অভাব-অনটনের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া অবশেষে মৃত্যুর মুখে ঢলিয়া পড়িবে। এ প্রথা কখনও সমীচীন হইতে পারে না। জমীদারেরা প্রজার কষ্টার্জ্জিত অর্থে পুষ্ট হন, সুতরাং এ কথা খুবই যুক্তিসঙ্গত যে, দরিদ্র প্রজাদের শিক্ষার জন্য তাঁহাদিগের সাধ্যমত অর্থ ব্যয় করা উচিত। গবর্ণমেণ্ট যদি তাঁহাদের নিকট হইতে একটা মোটা শিক্ষা-কর আদায় করেন, তাহা হইলে শিক্ষা বিভাগের বিস্তর আয় হয় ও প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্ত্তনের যথেষ্ট সুবিধা হয়।

তারপর আর এক কথা। প্রাইমারী শিক্ষা বাধ্যতামূলক করিবার প্রস্তাবের বিরুদ্ধে অনেক কথা উঠিতে পারে। এ দেশ কৃষি প্রধান দেশ। কৃষকের ছেলে ছোট কাল হইতেই ক্ষেতে পিতার সঙ্গে কাজ করিতে শিখে। নিঃসহায় পিতার পক্ষে এ কম সাহায্য নয়। তাহাদিগকে বাধ্য করিয়া যদি বিদ্যালয়ে পাঠান হয়, তবে পিতার মহাক্ষতির আশঙ্কা। কৃষিই যাহার একমাত্র সম্বল, তাহার পক্ষে উৎপাদন-কার্য্যে পুত্রের সাহায্য ত্যাগ করিয়া চলা অসম্ভব নয় কি? এরূপ আশঙ্কা করাও অন্যায় হইবে না যে, বিদ্যালয়ে শিক্ষা লাভ করিতে গেলেই উক্ত ছেলে আর কষ্ট-সহিষ্ণু থাকিবে না। শিক্ষার আবহাওয়ার মধ্যে থাকিলেই সে পরিশ্রম সাপেক্ষ কৃষিকাজের পক্ষে সম্পূর্ণ অনুপযোগী হইয়া পড়িবে। প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করিয়া সে আর ক্ষেতে কাজ করিতে চাহিবে না, এটা খুই স্বাভাবিক। পৈত্রিক ব্যবসায়ের প্রতি তাহার একটা বিদ্বেষ ভাব স্বভাবতঃই জন্মিবে। ইহার প্রমাণ বর্ত্তমানে সর্ব্বত্রই দেখা যায়। বর্ত্তমান শিক্ষা-পদ্ধতি আমাদিগকে মানুষ করিতে পারে না। আমাদের শারীরিক ও মানসিক শক্তির পঙ্গুতা সাধন করে মাত্র। সামান্যরূপে প্রাইমারী শিক্ষা লাভ করিয়া ছেলেরা ভবিষ্যৎ জীবনে কি করিবে তাহাও ভাবিবার বিষয়। দেশে সবাই যদি শিক্ষিত হইয়া পড়ে, তাহা হইলে সামান্য নীচ কাজ করাইবার জন্য চাকর মিলিবে না। ইহারা সে সব কাজকে ঘৃণা করিতে থাকবে। শিক্ষার দ্রুত বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে উন্নত প্রণালীতে জীবন যাপনের জন্য একটা সাড়া পড়িয়া যাইবে। দেশের ধন-সম্পদ আশানুরূপ বৃদ্ধি না পাইলে জীবনযাত্রা উন্নত ধরণের হইতে পারে না। কিন্তু এ বর্দ্ধিত দাবী পুরাইবার সহজ পথ কি? দেশে শিল্প, বাণিজ্য, কৃষি ও অন্যান্য অর্থকরী ব্যবসা সঙ্গে সঙ্গে উন্নতি ও বিস্তার লাভ না করিলে একটা অশান্তি ও বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হইবে। এরূপ আরও নানারকম যুক্তি তর্কের অবতারণা করিয়া প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করিবার প্রয়োজনীতাকে খর্ব্ব করা হইবে। ইহার বিরুদ্ধে ও সপক্ষে অনেক কথাই বলা যায়। মোটের উপর শিক্ষা সার্ব্বজনীন করিতে না পারিলে যে দেশের প্রকৃত কল্যাণ হইবে না এটা খুবই ঠিক কথা। যাহাতে এ-সব বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া সুন্দর, দোষমুক্ত উপায়ে শিক্ষা বিস্তার করা যায়, তজ্জন্য আমাদিকে চেষ্টা করিতে হইবে। শিক্ষা সার্ব্বজনীন করার বিরুদ্ধে আরও একটা আপত্তি উঠিতে পারে। সেটা হইল এই যে, তখন শিক্ষিত কৃষকবৃন্দকে আর যদৃচ্ছা অত্যাচার করিয়া নিরাপদে বাঁচা যাইবে না। তাহারা তখন আর নির্ব্বিবাদে অবিচার সহ্য করিবে না। তখন তাহাদিগকে আর শোষণ করা যাইবে না। Derof একস্থানে বলিয়াছেন, "There is no doubt but that it is more difficult to oppress a peasant who can read than any other man". প্রকৃত প্রস্তাবে ব্যাপার খানাও তাই। নির্ব্বাক, অসহায় কৃষকবৃন্দ শিক্ষার আলোক প্রাপ্ত হইলে আপন অধিকার পুরোপুরি অন্যের নিকট হইতে আদায় করিতে সতত যত্নবান হইবে। জমীদার, মহাজন তাহাদিগকে আপন ক্রীড়াপুত্তলি করিয়া লইবার সুযোগ হারাইবে। এক সম্প্রদায়ের ইহাতে ভয়ঙ্কর ক্ষতি নিশ্চয়ই হইবে। কিন্তু এরূপ আপত্তি নিতান্তই অযৌক্তিক। অজ্ঞ কৃষক সমাজকে সময়ের সঙ্গে পা মিলাইয়া চলিতে প্রস্তুত করিতে হইবে। কতকাল আর তাহারা অপরের ভোগ্য বস্তু হইয়া কাল কাটাইবে? সৎশিক্ষার প্রচার করিয়া তাহাদিগকেও মানুষ করিয়া তুলিতে হইবে। বর্ত্তমান যুগ শিক্ষা ও সভ্যতার যুগ। সর্ব্বত্রই একটা আন্দোলনের সাড়া পাওয়া যায়। নূতন জীবনের চাঞ্চল্যে সকলেই আজ ব্যস্ত সমস্ত। রবি ঠাকুর একস্থানে লিখিয়াছেন, "পৃথিবী জুড়ে এক উত্তাল তরঙ্গ উঠেছে। বিশ্ব-মানব-প্রকৃতির মধ্যে একটা চাঞ্চল্য প্রকাশ পেয়েছে—সবাই আজ জাগ্রত। পুরাতনের জীর্ণ সংস্কার ত্যাগ করার জন্য সকল প্রকার অন্যায়কে চূর্ণ করবার জন্য মানব মাত্রই উঠে পড়ে লেগেছে—নূতন ভাবে জীবনকে দেশেকে গড়ে তুলবে।" এই আদর্শেই আজ আমাদের জাতিকে গড়িতে হইবে। জাতি বলিতে অন্যের

ধনে পুষ্ট দুই চারি জন বিলাসী জমীদার বা মহাজন নয়। দেশের জনসাধারণই জাতি। এদের মানসিক ও নৈতিক উন্নতি সাধন করা ভিন্ন আমাদের উত্থানের আশা কোথায়?

প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করিতে গেলে আরও অনেক পর্ব্বতপ্রমাণ বাধা মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়াইবে। দেশের লোক সাধারণতঃ রক্ষণশীল। চিরাচরিত প্রথার বিরুদ্ধে যাওয়া তাহাদের স্বভাবসিদ্ধ নয়। যাহা চলিতেছে তাহাই চলুক। ইহাই তাহাদের মনোভাব। প্রাথমিক শিক্ষার জন্য তাহাদের প্রাণে একটা তীব্র ইচ্ছা জাগাইয়া তুলিতে হইবে। তাহাদিগকে সংস্কারমুক্ত করিয়া ক্রমোন্নতির রাজপথে ছাড়িয়া দিতে হইবে। প্রাথমিক শিক্ষার প্রতি দেশের লোকের বিরাগ ভাব থাকার আরও এক কারণ আছে। বর্ত্তমানে যে নিয়মে, যেরূপ পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে শিক্ষাদান করা হয়, তাহা কখনই মঙ্গলকর নয়। ছেলেদের অভিভাবক এরূপ দূষিত বায়ুর মধ্যে ছেলেদিগকে রাখিয়া কখনই নিশ্চিন্ত হইতে পারে না। তাহারা ভবিষ্যতে ইহাদের নিকট হইতে কোন উপকার পায় না। বরং কোন কোন স্থলে ঘৃণা ও অবজ্ঞার পাত্র হয় মাত্র। এ কথা মোটেই অতিরঞ্জিত নয়। বর্ত্তমান শিক্ষার কুফল আজ আমরা সর্ব্বত্রেই প্রকট দেখিতে পাই। সুতরাং এ-পদ্ধতিতে ছেলেদিগকে শিক্ষিত না করার ইচ্ছা প্রবল হওয়া খুবই স্বাভাবিক। প্রাথমিক শিক্ষাকে আরও উন্নত ও ব্যবহারিক করিতে হইবে। কৃষক, ছুতার, তন্তুবায়, কামার, জেলে ইত্যাদি নানা ব্যবসায়ী লোক গ্রামে বাস করে। ইহাদের ছেলেরা শিক্ষা পাইয়া যাহাতে ভবিষ্যৎ জীবনে স্ব স্ব পৈত্রিক ব্যবসায়ে মনঃসংযোগ করিয়া জীবিকার্জ্জনের উপায় করিয়া লইতে পারে, তাহার সুবন্দোবস্ত করিতে হইবে। প্রাথমিক ভাবে vocational এবং Technical শিক্ষার বন্দোবস্ত করা একান্ত দরকার। নচেৎ লোকে বৃথা আর ছেলে পুলেকে শিক্ষিত করিয়া অর্থ ব্যয় করিয়া নিঃস্ব হইতে চায় না। আর্থিক লাভ তাহারা চায়। ছেলে লিখন-পঠন ও গণিত শাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন হউক, শিক্ষার আলোক পাইয়া মানুস হউক—ইহা যেমন তাহারা কামনা করে, তৎসঙ্গে অর্থকরী বিদ্যা লাভ করিয়া অন্ন-সমস্যার কথঞ্চিৎ সমাধানে সাহায্য করুক ইহাও তাহারা চায়। প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তার করিয়া দেশের লোক এ সব ন্যায্য দাবী পূরণ করিতে না পারিলে এ কঠিন, দুঃসাধ্য ব্যাপারে সম্পূর্ণ কৃতকার্য্য হইবার আশা মোটেই নাই। প্রাথমিক শিক্ষার প্রকৃত স্বরূপ কি হইবে, তাহা পূর্ব্বাহ্লে ভাবিয়া দেখিতে হইবে। দেশের শিক্ষিত, চিন্তাশীল মনস্বীগণের উপরই এই দুরূহ কাজের ভার ন্যস্ত রহিল। পরিবর্ত্তন আমরা সকলেই চাই। কিন্তু উক্ত পরিবর্ত্তনে যদি বিশেষ কোনও ফল লাভ না হয়, তাহা হইলে সে পরিবর্ত্তন কাহারও বাঞ্ছনীয় হইতে পারে না। গ্রামে গ্রামে আজকাল পাঠশালা দেখা যায়। এই সংখ্যাধিক্য দেখিয়া আশান্বিত হইবার কথা বটে। কিন্তু আমরা যতদূর জানি ইহারা প্রকৃত শিক্ষা বিস্তারের কোনই সাহায্য করিতে পারে না। গ্রাম্য শিক্ষকদের মধ্যে দলাদলি ও কলহ সৃষ্টি করা হয় মাত্র। স্কুলের সংখ্যা আরও কমাইয়া দুই তিন গ্রামের এক সুবিধাজনক মধ্যবর্ত্তী স্থানে আদর্শ স্কুল স্থাপন করিতে পারিলেই প্রকৃত উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবার কথা। অধিকাংশ গ্রামেই ইউনিয়ন বোর্ড স্থাপিত হইয়াছে। প্রত্যেক ইউনিয়নে অন্ততঃ একটী কৃষি-প্রতিষ্ঠান করিয়া তথায় ছেলেদিগকে উন্নত প্রণালীতে চাষবাসের সুবিধা করিয়া দিতে পারিলে সুফল ফলিবার সম্ভাবনা আছে। এই কৃষি প্রধান দেশে কৃষিকে বর্জ্জন করিয়া আমরা কখনই প্রাথমিক শিক্ষায় বাঞ্ছিত ফল ভোগ করিতে পারিব না। ভিন্ন দেশের আদর্শ অনুকরণ করিয়া এদেশে শিক্ষা বিস্তার করিতে যাওয়া বিপদসঙ্কুল হইবে বলিয়াই মনে হয়। দেশের যাহা অভাব, যাহার জন্য দেশ অগ্রসর হইতে পারিতেছে না, তাহারই সংস্থান সর্ব্বাগ্রে আমাদিগকে করিতে হইবে।

আমরা এ স্থলে ১৯১৬—১৯১৭ হইতে ১৯২১—১৯২২ সন পর্য্যন্ত ঢাকা বিভাগে প্রাথমিক শিক্ষার উন্নতির বিষয় অতি সংক্ষেপে আলোচনা করিব। আলোচ্য সময়ে প্রতি উচ্চ প্রাথমিক স্কুলে গড়ে ৫১.৫ জন (১৯১৬—১৯১৭); ৫১.৪ (১৯১৭—১৯১৮), ৪৮.৫ (১৯১৮—১৯১৯); ৪৭.৭ (১৯১৯—১৯২০), ৪৬.১ (১৯২০—১৯২১); ৪৪.৮ (১৯২১—১৯২২)। আর নিম্ন প্রাথমিক স্কুলে গড়ে ৩৫.২ জন (১৯১৬—১৯১৭); ৩৪.৯ (১৯১৭—১৯১৮); ৩৩.৯ (১৯১৮—১৯১৯); ৩২.৮ (১৯১৯—১৯২০); ৩২.৬ (১৯২০—১৯২১); ৩২.১ (১৯২১—১৯২২)। গড়ে ১৯১৬—১৯১৭ সনে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছাত্র ছিল ৩৬.৪ জন আর ১৯২১—

১৯২২ সনে তথায় মাত্র ৩২.৮ জন। এরূপ হ্রাসের কারণ কি? ১৯২১ সনের আদমশুমারী অনুযায়ী ঢাকা বিভাগে ১৮৪৬১টী গ্রাম ও শহর ছিল। প্রতি ২.১টী গ্রামের জন্য একটী করিয়া পাঠশালা ছিল (১৯২১—১৯২২ সনে) আর ১৯১৬—১৯১৭ সনে) ছিল প্রতি ৪.১টী গ্রামে একটী করিয়া প্রাথমিক বিদ্যালয়। সুতরাং স্কুলের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে বলিয়া মনে হয়। ১৯১৭—১৯১৮ হইতে ১৯২১—১৯২২ সন পর্য্যন্ত এই পাঁচ বৎসরের শেষ ভাগে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে হিন্দু ছাত্র ছিল ৯৩৮৩৬ জন আর মোছলমান ছিল ১৯১৪৮২ জন। তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী পাঁচ বৎসরের শেষ ভাগে ছাত্র সংখ্যা ছিল ৯৪১৪৭ জন হিন্দু ও ১৭৯৭৯২ জন মোছলমান। আলোচ্য সময়ে হিন্দু ছাত্রসংখ্যা ৩১১ বা শতকরা .৩ জন কমিয়াছে। পক্ষান্তরে মোছলমান ছাত্রসংখ্যা ১১৬৯০ বা ৬.৫ জন শতকরা বৃদ্ধি পাইয়াছে। পুরুষ অধিবাসীদের শতকরা ৪.২ জন মাত্র এই প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষা লাভ করিত। তন্মধ্যে হিন্দুর সংখ্যা ছিল গড়ে ৪.৫ জন আর মোছলমান মাত্র ৪.১ জন। আলোচ্য সময়ে প্রাথমিক শিক্ষার জন্য ব্যয় হইয়াছিল মোট ২১১৫৪৯৩ টাকা আর ১৯১৬—১৯১৭ সনে ব্যয় হইয়াছিল ২০২১২৩৪ টাকা গড়ে প্রতি পাঠশালার জন্য ব্যয় ১৯২১—১৯২২ সনে ৯.০ টাকা আর ১৯১৬—১৯১৭ সনে গড়ে ৯.৬ টাকা। এ ব্যয় হ্রাসেরই বা কারণ কি? তারপর প্রতি ছাত্রের জন্য গড়ে ৩.৪ টাকা আর ১৯১৬—১৯১৭ সনে গড়ে ৩.৩ টাকা ব্যয় হইত। ১৯১৬—১৯১৭ সনে ঢাকা বিভাগে মোট ৩৬৫৩৮ জন হিন্দু ছাত্রী প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করিয়াছিল। আর মোছলমান ৪৪৯৪০ জন। ১৯২১—১৯২২ সনে হিন্দু ছাত্রী ছিল ৪০৩৮৩ জন আর মোছলমান ৬৩৯৯৫ জন। ১৯২২ সনের ৩১শে মার্চ্চের শেষ হিসাবে ঢাকা বিভাগে ৪৪২৪টী বালিকা বিদ্যালয় ছিল। (৯৩৮৭৮ জন অধিবাসীর জন্য) বালক বিদ্যালয়েও মোট ১১১০২ জন ছাত্রী শিক্ষা লাভ করিয়াছিল। ১৯১৬—১৯১৭ সনের সঙ্গে তুলনা করিলে দেখা যায়, উক্ত বৎসর ৯৫৮টী স্কুল ও ২২৮৭১ জন ছাত্র বৃদ্ধি পাইয়াছিল। শতকরা বৃদ্ধি পাইয়াছিল যথাক্রমে ২৭.৬টী ও ২৭.৮ জন। প্রতি বালিকা বিদ্যালয়ের জন্য ব্যয় হইয়াছিল ৪৪৵০ আনা এবং প্রতি ছাত্রীর জন্য ১৮৵০ আনা আর ১৯১৬—১৯১৭ সনে ব্যয় হইয়াছিল যথাক্রমে ৩৮৵০ আনা ও ১।৵০ আনা মাত্র। এরূপ অল্প খরচ বোধ হয় দুনিয়ার আর কোথাও হয় না। এত নগণ্য ব্যয়ে কখনও যথোপযোগী শিক্ষা দান করা যায় না। শিক্ষার Standard উন্নত করিতে হইলে তৎসঙ্গে ব্যয়ের পরিমাণও যথেষ্টরূপ বাড়াইতে হইবে। নতুবা দেশে সুশিক্ষার বিস্তার কখনই সম্ভবপর হইবে না। আলোচ্য বৎসরে মোছলমান মেয়েদের মধ্যে কিরূপ প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তার হইয়াছিল, তাহাই এখন সংক্ষেপে আলোচনা করিব। ১৯২১—১৯২২ সনে ১০৬৬৭২ জন ছাত্রী ঢাকা বিভাগে শিক্ষা লাভ করিয়াছে। আর ১৯১৬—১৯১৭ সনে ৮৩৭৭৩ জন। তন্মধ্যে ৬৩৯৯৫ জন ছিল মোছলমান অথবা শতকরা ৫৮.৯ জন। ১৯১৬—১৯১৭ সনে ৪৪৯৪০ জন মোছলমান ছাত্রী ছিল। মোট সংখ্যার ৪৭ জন শিক্ষা লাভ করিয়াছিল উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ে, ১৪ জন মধ্য ইংরেজী স্কুলে ও ৩৬৯১১ জন প্রাইমারী বিদ্যালয়ে। দিন দিনই মোছলমানদের মধ্যে শিক্ষার জন্য একটী তীব্র উৎসাহ জাগিতেছে বলিয়াই মনে হয়। আলোচ্য বৎসর অর্থাৎ (১৯১৬—১৯১৭ হইতে ১৯২১—১৯২২) পর্য্যন্ত হিন্দু ছাত্রীর সংখ্যা শতকরা মাত্র ১০.৫ জন বৃদ্ধি পাইয়াছিল আর মোছলমান ছাত্রীর সংখ্যা ৪২.৪ জন বৃদ্ধি পাইয়াছিল। ঢাকা বিভাগে মোটের উপর শতকরা ৭.৪ জন পুরুষ শিক্ষিত। আর .৩৯ জন মেয়ে শিক্ষিত। আর মোছলমানদের মধ্যে শিক্ষিতের সংখ্যা শতকরা যথাক্রমে ২৬.৯ জন ও ৪.৯ জন। ১৯১৭—১৯১৮ হইতে ১৯২১—১৯২২ সনের মধ্যে ২৮৭৬৮৫ জন মোছলমান ছাত্র শিক্ষা লাভ করিত। তাহাদের শতকরা হার ছিল ৫৮.৬ জন। ঢাকা বিভাগের লোকসংখ্যার অনুপাতে শতকরা ৬৯.৬ জনই মোছলমান। সুতরাং দেখা যায় এখনও মোছলমানদের মধ্যে আশানুরূপ লেখাপড়ার আলোচনা বাড়ে নাই। সংখ্যায় তাহারা খুবই বেশী। কিন্তু বিদ্যাচর্চ্চার বেলায় অমোছলমানদের অনেক পশ্চাতে। এ বিভাগে মক্তব স্কুলের খুবই শ্রীবৃদ্ধি সাধন হইয়াছে। পূর্ব্ব বাংলা ও পশ্চিম বাংলার মক্তবের মধ্যে Syllabus এর অনেক বৈসাদৃশ্য। ১৯২২ সনের ৩০শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত ঢাকা বিভাগে ৪৭৮০টী মক্তব ছিল। তথায় ছাত্র ছিল ১৩২৪৫২ জন। আর ১৯১৭ সনে ছিল ২০৪৩টী মক্তব ও ৬২৪৫৮ জন ছাত্র। মক্তবগুলি যে দেশে সমাদর লাভ করিয়াছে, এই সংখ্যা বৃদ্ধিই তাহার স্পষ্ট নিদর্শন। এই সব মক্তবে উর্দ্দু

শিক্ষা দেওয়া হয়। (অবশ্য সবগুলিতে নয়)। মোছলমানদের শিক্ষার জন্য বিশেষ করিয়া কত ব্যয় হয়, তাহা নিম্নে দেওয়া গেল। বিশিষ্ট মোছলমান পরিদর্শক কর্ম্মচারীগণের জন্য৮২১৯৲ টাকা; আর মক্তবের জন্য ১১৩৫০৫৲ টাকা। ১৯১৬—১৯১৭ সনে প্রাইমারী স্কুলে ১৬২২৩৭ জন হিন্দু এবং ২৪০৮৫৪ জন মোছলমান, ১৯১৭—১৯১৮ সনে ১৬৭৬৭৮ জন হিন্দু এবং ৫২৮৮২৫ জন মোছলমান; ১৯১৮—১৯১৯ সনে ১৭৩৩৯৪ জন হিন্দু এবং ২৫৬৩৩৮ জন মোছলমান; ১৯১৯—১৯২০ সনে ১৬০৩৯৭ হিন্দু এবং মোছলমান ২৬১০০৭ জন। ১৯২০—১৯২১ সনে ১৫৬৭৬৭ জন হিন্দু এবং ২৬৬৫৭৩ জন মোছলমান; ১৯২১—১৯২২ সনে ১৫০৩১৬ জন হিন্দু এবং ২৫৭৭৮৯ জন মোছলমান প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করিয়াছে। ১৯১৬—১৯১৭ সনে ঢাকা বিভাগে ৩২৩৮৪ জন হিন্দু বালিকা প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করিয়াছে আর মোছলমান ৪০৪১৫ জন। ১৯২১—১৯২২ সনে ৩৪৭২৮ জন হিন্দু বালিকা; এবং ৫৮২২৫ জন মোছলমান বালিকা প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করিয়াছে। Primary Stageএ মোছলমান ছাত্রীর সংখ্যা হিন্দুর চেয়ে বেশী। কিন্তু Higher Stageএ মোছলমানের সংখ্যা অতি নগণ্য। ১৯২১—১৯২২ সনে বিশেষ করিয়া মোছলমান ছাত্রদের শিক্ষার জন্য মোট ২৮১১৪টী উচ্চপ্রাইমারী স্কুল, এবং ৩৮০৮৬৬টী নিম্নপ্রাইমারী স্কুল ছিল। ঢাকা বিভাগ বাংলার অন্য বিভাগ হইতে অনেকটা উন্নত। উপরে যে সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হইল, তাহা হইতে এ বিভাগে মোছলমানদের শিক্ষোন্নতির একটা নিখুঁত ছবি পাঠকের চক্ষের সামনে ভাসিয়া উঠিবে। ময়মনসিংহ জেলায় মোছলমান অধিবাসী বেশী। কিন্তু প্রাথমিক শিক্ষা ব্যাপারে তাহারা অন্যান্য জেলা হইতে অনেক পশ্চাৎপদ।

বঙ্গের অন্যান্য বিভাগের শিক্ষা বিবরণ এ স্থলে বাহুল্য ভয়ে আলোচিত হইল না। একটা উন্নত বিভাগেই যখন শিক্ষার এরূপ শোচনীয় দৈন্যাবস্থা, তখন অন্যত্র যে কিরূপ হইবে তাহা সহজেই অনুমান করা যায়।

তারপর পাঠ্য-পুস্তকের কথা। ছেলেদের উপযোগী পাঠ্য-পুস্তক নির্ব্বাচিত না হইলে সুশিক্ষার প্রচার কখনই সম্ভবপর হইবে না। দুর্ভাগ্যবশতঃ আমাদের পাঠশালায় যে সব পুস্তক পড়ানো হয়, তাহাতে ছেলেদের মানসিক বৃত্তির পূর্ণ বিকাশ হয় না। একবার জনৈক বক্তা বলিয়াছিলেন, "Our Text-books inject Pro-British and anti-Indian mentality in the hearts of our youngsters" অর্থাৎ আমাদের পাঠ্য-পুস্তক সমূহ ছেলেদের মনে বৃটীশের সমর্থনকর এবং ভারতের বিরুদ্ধতাজনক মনোভাবের সৃষ্টি করে। ইহার ফল যে কত বিষময়, তাহা আমরা স্বীয় অভিজ্ঞতা হইতেই স্পষ্ট উপলব্ধি করিতে পারিতেছি। ছেলেদের মনে জাতীয়তার একটা সজীব ভাবের উদ্রেক করিতে না পারিলে কখনও প্রকৃত মানুষ তৈয়ারী হইবে না। এই জাতীয়তা জিনিষটার অভাব মোছলমান ছেলেদের মধ্যে আরও বেশী। ইহার এক কারণ হইতে পারে—তাহারা শিক্ষা পায় অধিকাংশ স্থানে হিন্দু শিক্ষকের নিকট; হিন্দু ছেলেদের সঙ্গে অহরহ অতি ঘনিষ্টভাবে মিশিতে গিয়া তাহারা তাহাদেরই আদর্শ অন্ধভাবে অনুকরণ করিতে থাকে। এত অল্প বয়সে তাহারা নিজেদের ভাল-মন্দ বুঝিতে পারে না। সর্ব্বদা অ-মোছলমান-প্রভাবে থাকিয়া তাহারা খাঁটী মোছলমান সাজিতে পারে না। পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রভাব তাহাদের ভাবপ্রাণ ও কচি প্রাণের উপর খুবই ক্রিয়া করে। ইহা ছাড়া যে সব পাঠ্যপুস্তক তাহাদিগকে পড়িতে দেওয়া হয়, তাহাতে তাহারা কখনই জাতীয় ভাবাপন্ন হইতে পারে না। অধিকাংশ পাঠ্যপুস্তকই হিন্দু মহাপুরুষদের জীবনী ও হিন্দু-উপকথায় পরিপূর্ণ। যে-সব ইতিহাস পড়ানো হয়, তাহাও কতকগুলি মিথ্যা, কল্পিত ও অতিরঞ্জিত ঘটনার সমষ্টি। ইহাতে প্রকৃত ইতিহাস শিখানো হয় না। মোছলমানের প্রাচীন গৌরবের কথা, অসংখ্য বীর পুরুষের কাহিনী, মোছলমান অলি দরবেশের জীবনী তাহারা কোন কালেই জানিতে পারে না। Text-book commiteeর পুস্তক নির্ব্বাচনের সময় হিন্দু ও মোছলমান উভয়ের দিকেই লক্ষ্য করা উচিত। যাহাতে উভয়েরই প্রকৃত শিক্ষার পথ উন্মুক্ত হয় এরূপ পুস্তকই নির্ব্বাচন করা উচিত। নতুবা শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য কখনই সিদ্ধ হইবে না। শিক্ষার নামে আমাদের ছেলেরা কেবলই কুশিক্ষা ও অশিক্ষা লাভ করিবে।

Mr. Lindsay সম্প্রতি প্রাথমিক শিক্ষাকে বিশ্বজনীন করার জন্য নানা উপায় অবলম্বনের চেষ্টা করিতেছেন। তাঁহার মতে প্রাথমিক শিক্ষার সকল ভার গবর্ণমেণ্ট-কর্ম্মচারীর হাতে প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষ ভাব ন্যস্ত হউক। কিন্তু এরূপ official শাসনের বিরুদ্ধেও আমাদের বলিবার

আছে। Mr Spinoza বলিয়াছেন, "That the Government will, if it controls the education of the nation, aid to restrain rather than develope the energies of men." কথাটা খুবই খাঁটী। ইউরোপ ও আমেরিকার বিদ্যালয়ে স্বাদেশিকতা ও জাতীয়তার প্রচারের জন্য বিপুল চেষ্টা হয়। কিন্তু আমাদের দেশের চিত্র সম্পূর্ণ বিভিন্ন রকমের। এদেশে জাতীয়তা ও দেশাত্মবোধের কথা তুলিলেই দোষ।

এইবার প্রাথমিক শিক্ষার জন্য অর্থাগম সম্বন্ধে আর একটী নূতন উপায়ের কথা বলিয়া আমি আমার বক্তব্যের উপসংহার করিব।

বাংলা দেশে পাটের জন্ম হয়। এখান হইতে লক্ষ লক্ষ মণ পাট বিদেশে রপ্তানী হইয়া থাকে। ফলে Central Government প্রায় ৩ কোটী টাকা লাভ করেন। ন্যায়তঃ এ টাকাটা বাংলা গবর্ণমেণ্টের প্রাপ্য। কিন্তু ন্যায় বিচারের স্থান এখানে নাই। প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক ও ফ্রি করিতে হইলে রাশি রাশি অর্থের একান্ত প্রয়োজন। টাকা প্রতি এক আনা হারে Education Cess বসাইলে হয়ত ৯০ লক্ষ টাকা আয় হইতে পারে। কিন্তু তাহাও যথেষ্ট নয়। Mr. Lindsayর প্রস্তাবানুযায়ী কাজ করিতে হইলে আরও ৬৩ লক্ষ টাকার দরকার। বঙ্গদেশে প্রায় ৯০ লক্ষ পরিবার আছে। প্রতি পরিবারে যদি অতিরিক্ত ১৲ এক টাকা হারে Education Cess বসানো হয়, তবে হয়ত আবশ্যকানুযায়ী টাকা মিলিতে পারে। এস্থলে আমরা অন্য একটী নূতন প্রস্তাব করিব। দক্ষিণ আমেরিকার চিলি দেশে প্রাথমিক ও উচ্চ শিক্ষার খুব প্রসার সাধিত হইয়াছে। Dr. Galver কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা দানকালে বলিয়াছেন, "The national acquisition of enormous wealth from the monopoly of Nitrate of Soda has furthered the progress in such a way that Chile perhaps is the only country in the world where a complete organic system of NATIONAL education form primary to university is absolutely free for all children the land." বাংলা দেশও পাট উৎপাদনে একচেটীয়া অধিকার ভোগ করিয়া আসিতেছে। এখানে প্রায় ২৩৫৮০০০ একর জমীতে পাটের চাষ হয়। এত পাট পৃথিবীর অন্য কোথাও উৎপন্ন হয় না। চিলী দেশে প্রায় ৪ কোটী লোকের বাস। বাংলা দেশেও প্রায় তদ্রূপ। কিন্তু চিলীতে প্রায় সকলেই শিক্ষিত। আর বাংলা দেশে শতকরা ৮ $\frac{1}{2}$ জন শিক্ষিত। কি অদ্ভুত ব্যাপার! চিলীতে যাহা সম্ভবপর আমাদের দেশে তাহা সম্ভবপর না হইবার কারণ কি? এ দেশে পাটের কলওয়ালারা বিস্তর লাভ করে। প্রতি বৎসর গড়ে তাহাদের প্রায় ১০ কোটী টাকা লাভ হয়। এ দেশ হইতে যে পাট রপ্তানী হয়, তাহার উপর শতকরা ১০৲ টাকা হারে শুল্ক বসানো যায়। আর যে সব পাটের তৈয়ারী জিনিষ এ দেশ হইতে অন্য দেশে রপ্তানী হয়, তাহার উপর শতকরা ২৲ টাকা হারে শুল্ক বসানো উচিত। এভাবে রপ্তানী মালের উপর শুল্ক বসাইলে কোটী কোটী টাকা আয় বৃদ্ধি পাইবে। এই টাকা হইতে দেশের বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তারের আয়োজন করা যায়। বিদেশীরা আসিয়া এ দেশ হইতে পাটের ব্যবসায় করিয়া বিস্তর অর্থোপার্জ্জন করে; সুতরাং বাংলা দেশের ঐ একচেটীয়া উৎপন্ন দ্রব্যের উপর শুল্ক বসাইয়া একটা প্রশস্ত আয়ের পথ করা যায়। চিলীতে Nitrate of Sodaর লাভ দ্বারা যদি তথাকার শিক্ষার ব্যয় নির্ব্বাহ হইতে পারে, তবে এ দেশে এই পাটের লভ্যাংশ দ্বারা শিক্ষা-বিস্তারের কি কথঞ্চিৎ সাহায্যও হইতে পারে না?

# মহাকবি সা'দী *

[ কাজী নওয়াজ খোদা

**জন্ম, বংশ-বৃত্তান্ত ও শৈশব অবস্থা**

কবির প্রকৃত নাম শরফুদ্দীন, তিনি 'মোসলেহ্' ( সংস্কারক ) উপাধি পাইয়াছিলেন। সাহিত্য-জগতে তাঁহার নাম সা'দী বলিয়াই বিখ্যাত। তাঁহার রচিত কবিতা সমূহে এই সা'দী নামই দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু অধ্যাপক E. G. Browne তাঁহার Literary History of Persia গ্রন্থে ( ৫২৮ পৃঃ ) কবির নাম সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—The poet's full name appears, from the oldest known manuscript of his works ( No. 876 of the India office, transcribed in A. D. 1328 only thirty seven years after his death ) to have been, not as generally stated muslihu'd —Din, But Musharrifu'd—Din, Muslihu'd —Din "Abdu'llah" ব্রাউন সাহেবের উল্লিখিত 'মোশাররফুদ্দীন' নামের উল্লেখ ফারসী লেখকদের কোন কেতাবেই পাওয়া যায় না, তাঁহাদের সকলেই একবাক্যে 'শারফুদ্দীন' নামই লিখিয়াছেন। কবির সমসাময়িক লেখক, তাঁহার كليات এর সংগ্রাহক আলী এবনে আহ্মদও তাহাই প্রকাশ করিয়াছেন। সম্ভবতঃ شرف الدين এর 'শিন' অক্ষরের প্রথমে কালি পড়িয়াই হউক, অথবা দেখার ভুলেই হউক, manuscript of his works এর লেখক 'শিনের' প্রথমে একটী 'মিম' আছে বলিয়া ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। তাঁহাদের পক্ষে এরূপ ভ্রমে পতিত হওয়া খুবই স্বাভাবিক। পক্ষান্তরে কবির 'মোসলেহ্' উপাধিটী লইয়া তাঁহার পিতার নামের প্রথমে জুড়িয়া দেওয়ার মূলেও কোন ঐতিহাসিক সত্য নিহিত নাই।

পারস্যরাজ সা'দের রাজত্বকালে তিনি কবিতা লিখিতে আরম্ভ করেন, তাঁহার পিতাও রাজ-সংসারে কাজ করিতেন। এই সকল কারণে নিজ নামের সহিত রাজার নামকেও চিরদিন যশোমণ্ডিত করিয়া রাখিবার উদ্দেশ্যে তিনি 'সা'দী' নাম গ্রহণ করিয়াছিলেন।

কবি এক স্থানে লিখিয়াছেন—

سعدیا مرد نکونام نمیرد هرگز
مرده آنست که نامش بنکوئی نبرند

অর্থাৎ হে সা'দী, দেশের ও দশের নিকট যাহার সুনাম প্রচারিত, মরজগতে চিরদিন সে অমর হইয়া থাকিবে। আর লোকে যাহার সুনাম না করে, সেইই প্রকৃত মৃত।

কবির জন্মের সন লইয়া ঐতিহাসিক সমাজের মধ্যে মতভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। একদল বলেন, কবি ১২০ বৎসর জীবিত ছিলেন। তাঁহাদের মতে কবির জন্ম ৫৭১ হিজরী সনে। আর যাঁহারা কবির জীবনকাল ১০২ বৎসর স্থির করিয়াছেন, তাঁহারা বলেন ৫৮৯ হিজরীতে কবি জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। পাশ্চাত্য লেখক Sir, Ousley শেষোক্ত মতের পক্ষপাতী। আমরা কিন্তু এই মতের সমর্থন করিতে পারিতেছি না। কবির প্রসিদ্ধ শিক্ষাগুরু এমাম আবুল ফারাহ্ এবনে জৌজি, সকলের স্বীকৃত মতে ৫৯৭ হিজরীতে পরলোক গমন করিয়াছিলেন। এরূপ অবস্থায় কবির জীবনকাল ১০২ বৎসর স্থির করিয়া ৫৮৯ হিজরী সনে তাঁহার জন্ম ধরিলে শিক্ষকের মৃত্যুর সময় ছাত্রের বয়স মাত্র ৯ বৎসর হয়। ইহা ঐতিহাসিক সত্যের ও কবির নিজের বর্ণনার সম্পূর্ণ বিপরীত। এই সব কারণে অনেকে তাঁহার বয়ঃক্রম ১২০ বৎসর ধরিয়া ৫৭১ হিজরীতে কবির জন্ম স্থির

* Lucy Gray প্রণীত Rose Garden of Persia, E. G. Browne কৃত Literary History of Persia, দৌলত শাহ প্রণীত বৃহৎ تذکرة الشعراء خزانه عامره مشاهیر اسلام بهارستان جامی আলতাফ্ হোসেন হালী প্রণীত حیات سعدی মৌলানা গোলাম কিবরীয়া প্রণীত প্রাচীন হস্তলিখিত احوال الشعراء এবং কবির স্বরচিত বর্ণনা সাহায্যে লিখিত। —লেখক

করিয়াছেন। আবার আর এক মতে কবি ১১০ বৎসর জীবিত ছিলেন। *

পারস্যরাজ মোজাফ্‌ফরুদ্দীনের রাজত্বকালে শিরাজ নগরে একটী সম্রান্ত বংশে সা'দী জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম "আবদুল্লাহ্‌ শিরাজী"। তিনি একজন ধর্ম্মপ্রাণ 'পরহেজ-গার' লোক ছিলেন। পিতা অতি অল্প বয়স হইতেই প্রিয় পুত্রকে নামাজ, রোজা প্রভৃতির নিয়মাবলী শিক্ষা দিয়াছিলেন। সেই সময় হইতেই ধর্ম্মের বিধিনিষেধ আদি পালনে তাঁহার বিশেষ অনুরাগ দেখা যাইত। কবির জন্মের অল্প দিন পর সম্রাট সা'দ মোজাফ্‌ফরুদ্দীনের পরিত্যক্ত সিংহাসনে আরোহণ করেন। অতি শৈশব অবস্থা হইতেই পিতা তাঁহাকে সর্ব্বদা স্বীয় কর্ত্তৃত্বাধীনে রাখিতেন। এক মুহূর্ত্তের জন্যও স্বাধীন ভাবে ছাড়িয়া দিতেন না, কোথাও যাইতে হইলে সঙ্গে লইয়া যাইতেন। তাঁহার প্রত্যেক কাজ কর্ম্ম এমন কি প্রত্যেক কথাবার্ত্তার প্রতিও তিনি বিশেষ ভাবে লক্ষ্য রাখিতেন। বালসুলভ চপলতা বশতঃ তাঁহার মুখ হইতে সামান্য একটী অসঙ্গত কথা বাহির হইলে পিতা তখনই তাঁহাকে সাবধান করিয়া দিতেন, সময় সময় বিশেষ ভাবে ভর্ৎসনাও করিতেন। একবার সা'দী পিতার সহিত স্থানান্তরে নিশাযাপন করিতেছিলেন, সেখানে আরও অনেক লোকজন ছিল। রাত্রির শেষভাগে নামাজ পড়িবার জন্য পিতা পুত্রকে উঠাইলেন, তাঁহারা দুইজনেই নামাজে মশগুল হইলেন। অন্যান্য সকলে তখন সুষুপ্তির ক্রোড়ে বিশ্রাম উপভোগ করিতেছিল। সা'দী পিতার নিকট ঐ সকল লোকের নামাজ না-পড়ার কথা উত্থাপন করিলে, পিতা বিরক্তির সহিত বলিলেন, এরূপ পরচর্চ্চার পরিবর্ত্তে তুমি নামাজ না পড়িয়া ঘুমাইয়া থাকিলেই ভাল করিতে।

কবি, পিতা মাতা প্রভৃতি গুরুজনের প্রদত্ত বাল্য শিক্ষা-কেই তাঁহার মান সম্ভ্রম ও প্রতিপত্তির মূলীভূত কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—

نه‌دانی که سعدی مکان از چه یافت
نه هامون نوشت و نه دریا شگافت
بخوردی بخورد از بزرگان قفا
خدا داش اندر بزرگی صفا

অর্থাৎ জনসমাজে সা'দীর প্রতিষ্ঠা-লাভের প্রকৃত কারণ তোমরা জান না। সে ইহার জন্য স্থলপথে ও জলপথে দেশ-বিদেশে ঘুরিয়া বেড়ায় নাই, সে বাল্য জীবনে গুরুজনের শাসন ও তাড়না পাইয়াছে, তাই খোদা তাহাকে এইরূপ মর্য্যাদা দিয়াছেন। বয়ঃপ্রাপ্ত হইবার পূর্ব্বেই শিক্ষা দীক্ষা ইত্যাদি সকল বিষয়ের অসম্পূর্ণ অবস্থাতেই কবির পিতৃবিয়োগ হয়। পিতার মৃত্যুর পর কিছুদিন তিনি জননীর শিক্ষাধীনে ছিলেন।

কোন কোন ঐতিহাসিক শিরাজের অধিবাসী বিখ্যাত আলেম কোতবদ্দীন শিরাজী (মোল্লাকেক তুকীর ছাত্র) কে সা'দীর মাতুল বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু অন্য এক সম্প্রদায় উভয়ের বন্ধুজনোচিত ভাবের হাস্য-পরিহাসের কথা তুলিয়া তাঁহাদের এই সম্পর্ক অস্বীকার করিয়াছেন। তবে তাঁহারা যে এক সময়ের লোক ও পরস্পর আত্মীয়তা সূত্রে আবদ্ধ ছিলেন, ইহা সর্ব্ববাদীসম্মত।

পিতার মৃত্যুর পর জ্ঞান-সঞ্চারের সঙ্গে সঙ্গেই কবি শিক্ষা-লাভের জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়েন। সে সময় দেশে অসংখ্য আলেম বর্ত্তমান ছিলেন। মাদ্রাসা সমূহে নানা শাস্ত্র শিক্ষা দেওয়া হইত। রাজধানী শিরাজ নগরেও অনেকগুলি সরকারী মাদ্রাসা ছিল, উপযুক্ত শিক্ষকগণ শিক্ষাদান কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। মহাত্মা আজদুদ্দৌলার প্রতিষ্ঠিত সুবিখ্যাত 'আজ-দিইয়া' মাদ্রাসা তখনও সকল মাদ্রাসার শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিল; কিন্তু তৎসত্ত্বেও শিরাজনগরীর আভ্যন্তরীন অবস্থা অতীব শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছিল। সা'দ যে একজন ধর্ম্ম-প্রাণ, প্রকৃতিপুঞ্জের হিতাকাঙ্ক্ষী রাজা ছিলেন, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু তাঁহার অসমসাহস ও দুর্দ্দমনীয় বীরত্বাভিমান বশতঃ তিনি সর্ব্বদা রাজধানী ছাড়িয়া এরাক অঞ্চলে যুদ্ধবিগ্রহে রত থাকিতেন। এদিকে রাজধানী শিরাজ নগরী দস্যু তস্কর ও বহিঃশত্রুদিগের লীলাভূমিতে পরিণত হইয়াছিল। হিজরী সপ্তম শতাব্দীর প্রথমেই আতা-বক য়ুজবেক, তৎপর সোলতান গেয়াসুদ্দীন ভীষণ ভাবে আক্রমণ করিয়া শিরাজ নগরীকে শ্মশানে পরিণত করেন। এই সময়ে অধিবাসীগণের যাবতীয় ধন সম্পত্তি লুণ্ঠিত হয় এবং রাজপথ দিয়া নরশোণিতের স্রোত প্রবাহিত হইয়া যায়।

শিক্ষালাভ

* লাহোর, নওলকিশোর প্রেসে মুদ্রিত, আলতাফ্‌ হোসেন হালী প্রণীত হায়াতে ছা'দী—১০ পৃষ্ঠা। লেখক

চতুর্দ্দিকে অশান্তি ও বিপ্লবের প্রবল ঝঞ্ঝা বহিতে থাকে। এরূপ অবস্থায় গৃহে অবস্থান করিয়া শান্তির সহিত শিক্ষালাভ করা অসম্ভব বিবেচনা করিয়া কবি জন্মভূমির মায়া পরিত্যাগ করিয়া বাগ্‌দাদ অভিমুখে যাত্রা করিতে স্থিরসঙ্কল্প হন। কবি লিখিয়াছেন—

دلم از صحبت شیراز بکلی بگرفت
وقت آن ست که پرسی خبر از بغداد م
سعد یاحب وطن گر چه حدیثی ست صحیح
نتوان مرد به سختی که من اینجا زادم

"শিরাজের সংশ্রব আমার মনে কষ্ট প্রদান করিতেছে, এ সময় বাগ্‌দাদের সংবাদ আমাকে জিজ্ঞাসা কর। হে সা'দী যদিও জন্মভূমির মায়ার কথা সত্য ; কিন্তু তাই বলিয়া দুঃখ কষ্ট ভোগ করিয়া মৃত্যুকেও তো বরণ করিতে পারা যায় না।

সে সময় মোছলেম-জগতের সর্ব্বত্রে অসংখ্য মাদ্রাসা ও শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান বর্ত্তমান ছিল। সহস্র সহস্র বিদ্যার্থী দূর দূরান্তর হইতে আসিয়া এই সকল মাদ্রাসায় শিক্ষা লাভ করিতেন। হিরাট, নিশাপুর (নাইসাপুর), ইস্পাহান, বসোরা, বাগ্দাদ, দামাস্কাস, সিরিয়া, কাহেরা, মুসল, এরাক, মিসর প্রভৃতি স্থান সমূহে অবস্থিত নাসেরিয়া, রত্তয়াহিয়া, মুস্তান্ সেরিয়া, সাহেবিয়া, নূরীয়া, সাকাফিয়া, কাহেরিয়া, আজিজীয়া, জায়নীয়া, নাফিসিয়া, আলানীয়া ইত্যাদি অসংখ্য মাদ্রাসার নাম ঐতিহাসিক এব্‌নে খাল্লেকান ও আরও অনেকে উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু বাগ্‌দাদের 'নেজামীয়া মাদ্রাসা'ই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। সে সময় এই মাদ্রাসাটী মুছলমান-জগতে শ্রেষ্ঠ শিক্ষাগার বলিয়া পরিগণিত হইত। কোন লোক 'নেজামীয়া' মাদ্রাসায় শিক্ষা লাভ করিয়াছে জানিতে পারিলে সাধারণে তাহার অসীম জ্ঞান গবেষণা ও অগাধ পাণ্ডিত্যের বিষয়ে সহজেই নিঃসন্দেহ হইত। খাজা নেজামুল্ মুল্‌ক্ তুসী কর্ত্তৃক ৪৫৯ হিজরী সনে বাগ্‌দাদ নগরে এই মাদ্রাসা স্থাপিত হইয়াছিল। বিখ্যাত দার্শনিক পণ্ডিত মহাত্মা এমাম গাজ্জালী, দেশমান্য আলেম আবদুল কাদের সোহারওয়ার্দ্দী, মহাত্মা এমাদুদ্দীন মুসলী প্রমুখ শ্রেষ্ঠ আলেমগণ এই মাদ্রাসা হইতেই শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন। তাই সা'দী নেজামিয়া মাদ্রাসায় শিক্ষা লাভ করিবার উদ্দেশ্যে বাগ্‌দাদ অভিমুখে রওনা হইলেন।

বাগ্‌দাদে উপস্থিত হইয়া সা'দী নেজামীয়া মাদ্রাসায় পড়িতে আরম্ভ করিলেন। মাদ্রাসার কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহার প্রতিভার পরিচয় পাইয়া তাঁহার জন্য মাসিক বৃত্তি নির্দ্ধারিত করিয়া দিলেন।

শিক্ষার সময় হইতেই তিনি কবিতা লিখিতে আরম্ভ করেন এবং এই সময় হইতেই তাঁহার যশোবিভা চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়ে। কবি যে সকল অধ্যাপকের নিকট শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন, আল্লামা আব্দর রহমান এব্‌নে জোজী তাঁহাদের সকলের মধ্যে সুবিখ্যাত ও শ্রেষ্ঠ আলেম ছিলেন। তিনি জামালুদ্দীন (ধর্ম্মের সুষমা) উপাধি পাইয়াছিলেন। হাদীস্ ও তফ্‌সীর শাস্ত্রে তিনি বহু গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন।

কিশোর বয়সে কবি নেজামীয়া মাদ্রাসায় মহাত্মা 'এব্‌নে জোজীর' নিকট পড়িতে আরম্ভ করেন। দৌলৎ শাহ সামারকান্দী ও Sir Onsley লিখিয়াছেন—"কবি শিক্ষা-শেষে সকল শাস্ত্রে পারদর্শী হইয়া সাধক-শ্রেষ্ঠ গওছল আজম্ সৈয়দ শেখ আবদুল কাদের জীলানীর নিকট মুরীদ হইয়া তাঁহার সাহায্যে অধ্যাত্ম সম্বন্ধে বিশেষ উন্নতি লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার সাথী হইয়া কবি নাকি সর্ব্বপ্রথম হজ্জ ব্রতও উদ্‌যাপন করিয়াছিলেন। আমাদের মতে এই সকল উক্তি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। সা'দী ৫৮৯ হিজরী সনে (মতান্তরে ৫৭১ হিঃ) জন্ম গ্রহণ করেন। হজরৎ গওছল আজম তাহার অনেক পূর্ব্বে ৫৬১ হিজরী সনে পরলোক গমন করেন (১) সুতরাং তাঁহার নিকট সাদীর মুরীদ হওয়া প্রভৃতি সমস্ত কথা ভ্রমপূর্ণ ও অনৈতিহাসিক কল্পনা মাত্র (২)। সাধক শ্রেষ্ঠ হজরত শেহাবুদ্দীন সোহারওয়ার্দ্দীর পবিত্র সঙ্গ লাভ করিয়া কবি তাঁহার নিকট মুরীদ হইয়াছিলেন। একবার তাঁহাদের উভয়ের এক সঙ্গে জল-যাত্রার একটী বৃত্তান্ত কবি বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন—

---

(১) বাহজাতুল আসরার, মানফুজ সৈয়দ আহমদ রফায়ী তোহফায়ে কাদেরিয়া, হজরত গওছল আজম এবং এড্‌ওয়ার্ড ফণ্ডিক প্রণীত একতোফাউল কমু প্রভৃতি কেতাবে এক বাক্যে হজরৎ গওছল আজমের মৃত্যুর সন ৫৬১ হিজরী লিখিত হইয়াছে। লেখক

(২) দুঃখের বিষয় আধুনিক লেখকদের মধ্যে ইদানীং যাঁহারা এই সব বিষয়ের আলোচনা করিতেছেন, পাশ্চাত্য লেখকদের মধ্যবর্ত্তীতা ছাড়া তাঁহারা স্বাধীন ভাবে গবেষণায় প্রবৃত্ত হওয়ার দিকে মনোযোগ দেওয়া আবশ্যক মনে করিতেছেন না। উপরন্তু হজরত গওছল ও শেখ সা'দী সংক্রান্ত এই ভিত্তিহীন গল্পটীও দ্বিধাশূন্য হইয়া বেমালুম নকল করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। লেখক

مرا پیردانای روشن شهاب
دواندرز فرمود برروی آب
یکی آنکه برخویشتن بین مباش
دگر آنکه بر غیر بدبین مباش

অর্থাৎ একদা জলপথে ভ্রমণকালে আমার পীর সুবিজ্ঞ শেহাবুদ্দীন আমাকে দুইটী উপদেশ দিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন—(১) কখনও নিজকে বড় মনে করিও না (২) এবং অপরের দোষ খুঁজিয়া বেড়াইও না।

বাগ্‌দাদের নেজামীয়া মাদ্রাসায় পড়িবার সময় তাঁহার সতীর্থগণ, এমন কি অনেক আলেমনামধারী মহাত্মাও তাঁহার ঈর্ষ্যা করিতেন, সা'দী তাহা জানিতে পারিয়া একদিন শিক্ষকমণ্ডলীর নিকট কয়েকজন সহপাঠীর বিরুদ্ধে নালিশ করেন। তাঁহার সমস্ত কথা শুনিয়া শিক্ষকেরা বলিয়াছিলেন—প্রিয় সা'দী, তাহারা তোমার হিংসা করিয়া অন্যায় কাজ করিয়াছে; কিন্তু তুমিও আমাদের নিকট তাহাদের কুৎসা করিয়া রসনা কলঙ্কিত করিয়াছ। এরূপ অবস্থায় উভয় পক্ষের কাহাকেও আমরা নির্দ্দোষ বলিতে পারি না।

জ্ঞান-সঞ্চারের সঙ্গে সঙ্গেই কবি 'তসাওওফের' তত্ত্বান্বেষী হইয়াছিলেন, তিনি দরবেশ ও ওলীআল্লাহ্‌দের সঙ্গ লাভ করিতে ও তাঁহাদের উপদেশ শুনিতে ভাল বাসিতেন।

এক সময়ে তিনি সঙ্গীতের বড়ই অনুরাগী ছিলেন। তাঁহার 'ওস্তাদ' মহাত্মা এব্‌নে জৌজী * অনেকবার তাঁহাকে নিষেধ করিয়াছিলেন, কিন্তু যৌবন-সুলভ চপলতা বশতঃ কিছুতেই তিনি আত্ম দমন করিতে পারেন নাই। ঘটনাক্রমে একদিন তাঁহাকে অনিচ্ছা সত্ত্বেও একজন গায়কের রাসভ নিন্দিত কণ্ঠের গান অনেকক্ষণ ধরিয়া শুনিতে হইয়াছিল এবং সেই দিন কবি সঙ্গীত শ্রবণে বীতশ্রদ্ধ হইয়া আর কখনও শুনিবেন না বলিয়া প্রতিজ্ঞা করেন, আজীবন তিনি এই প্রতিজ্ঞা পালন করিয়াছিলেন।

এই সময় আব্বাসীয়া বংশের গৌরব-রবি অস্তমিত হইয়া আসিয়াছিল। এই বংশের শেষ খলিফা মো'তাসেম বিল্লাহ্‌ বাগ্‌দাদের সিংহাসনে বসিয়া নির্ব্বাণোন্মুখ প্রদীপের ন্যায় ক্ষীণরশ্মি বিকীর্ণ করিতেছিলেন। এই অবসরে তাতারী দস্যুদল কর্ত্তৃক বাগ্‌দাদ নগরী আক্রান্ত হইল। তাহাদের দুর্দ্দমনীয় আক্রমণ প্রতিরোধ করিবার শক্তি খলিফার ছিল না। বহু যুদ্ধ-বিগ্রহ ও শোণিতপাতের পর শত্রুকর্ত্তৃক নগর অধিকৃত হইল। চারিদিকে অত্যাচারের স্রোত প্রবাহিত হইল। অসংখ্য জীবন বিনষ্ট ও নগরবাসীদের অগণিত ধন-সম্পত্তি লুণ্ঠিত হইল, ফলে অমরাবতীতুল্য চিরঐশ্বর্য্যময়ী বাগ্‌দাদ নগরী শ্মশানে পরিণত হইল। খলিফা মো'তাসেম বিল্লাহ্‌ তাতারীদের হাতে নৃশংস ভাবে নিহত হইলেন। এই সকল ঘটনা সা'দী' স্বচক্ষে দেখিয়াছিলেন, তাঁহার চক্ষের উপর এই শোচনীয় দৃশ্য অভিনীত ও আব্বাসীয়া বংশের সৌভাগ্য পট চিরদিনের জন্য পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল।

এই ঘটনায় খলিফা মো'তাসেম বিল্লার নৃশংসরূপে নিহত হওয়া সম্বন্ধে কবি শোক-সূচক কতকগুলি 'মরসীয়া' লিখিয়াছিলেন। সেগুলি সাধারণের নিকট বিশেষভাবে প্রশংসিত ও সমাদৃত হইয়াছিল। মো'তাসেম বিল্লার ন্যায় অত্যাচারী খলিফার মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করা এবং 'মরসীয়া' লেখার কথা লইয়া সিয়া সম্প্রদায় সা'দীর উপর দোষারোপ করিয়াছেন। কিন্তু ইহাতে দোষের কিছুই নাই। একজন 'খলিফার' নৃশংস হত্যাকাণ্ড স্বচক্ষে দেখিয়া কোন সহৃদয় লোক দুঃখ প্রকাশ না করিয়া থাকিতে পারে না। ইহা স্বভাবের ধর্ম্ম, প্রকৃতির চিরাচরিত নিয়ম। এরূপ অবস্থায় ভাল মন্দের কথা উঠিতেই পারে না। বিশেষতঃ আব্বাসীয়া বংশের গৌরব-রবি অস্তমিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আরবের এছলাম-জগৎ চির অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়াছিল। ইছলামের বিজয় পতাকা চিরতরে ধূলায় লুটাইয়াছিল। সুতরাং খলিফার শোচনীয় মৃত্যুতে 'মরসীয়া' লিখিয়া কবি প্রকৃতপক্ষে এছলাম জগতের দুর্দ্দশা ও অধঃপতনের শোক গীতি গাহিয়াছিলেন।

নেজামীয়া মাদ্রাসায় পাঠ সমাপ্ত করিয়া শেষ পরীক্ষায় সম্মানের সহিত উত্তীর্ণ হইয়া কবি দেশ-ভ্রমণে বাহির হইয়া পড়েন। কোন কোন ঐতিহাসিক লিখিয়াছেন—কবি জীবনের প্রথম ত্রিশ বৎসর বিদ্যার্জ্জনে, দ্বিতীয় ত্রিশ বৎসর দেশ-ভ্রমণে, তৃতীয় ত্রিশ বৎসর গ্রন্থ প্রণয়নে এবং সর্ব্বশেষ ত্রিশ বৎসর নির্জ্জনবাসে আল্লার এবাদৎ-বন্দেগীতে কাটাইয়াছিলেন।

সা'দী সকল শাস্ত্রেই জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন, কিন্তু পণ্ডিত নামের পরিবর্ত্তে কবি নামেই তিনি প্রসিদ্ধি লাভ করেন। ঐতিহাসিক সম্প্রদায় সকলেই তাঁহাকে অসাধারণ

* এমাম এবনে জৌজী কি সঙ্গীতকে নিষিদ্ধ বলিয়া মনে করিতেন? —সম্পাদক।

পণ্ডিত, 'তসাওওফ' জগতের শ্রেষ্ঠ তত্ত্বদর্শী এবং কাব্য জগতের একচ্ছত্র সম্রাট বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন।

একবার কবি সিরিয়া অথবা এরাক প্রদেশের কোন একটী সহরে কাজী সাহেবের বাড়ীতে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন—বিচিত্র বেশভূষায় ভূষিত আলেম সম্প্রদায় একটী মহতী সভায় সমবেত হইয়া নানা শাস্ত্রের আলোচনা করিতেছেন। তিনি সভাস্থলে প্রবেশ করিয়া সমবেত আলেমগণের সহিত সমানাসনে বসিয়া পড়িলেন। তাঁহার জীর্ণ বেশ-ভূষা দেখিয়া সকলেই তাঁহাকে অবজ্ঞার সহিত সেস্থান হইতে উঠাইয়া দিলেন। অগত্যা কবি সর্ব্বনিম্ন শ্রেণীতে স্থান গ্রহণ করিলেন। এই সময় একটী কঠিন সমস্যার মীমাংসা লইয়া আলেম সমাজে তর্কের স্রোত প্রবাহিত হইল। তাঁহারা বহু আলোচনা ও বাদানুবাদের পরও কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারিলেন না। তখন কবি সেই দূরবর্ত্তী স্থান হইতে সামান্য ২।৪টী কথায় সরল ও সহজ ভাষায় অকাট্য যুক্তির সহিত সেই সমস্যাটীর সমাধান করিয়া দিলেন। তাঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাইয়া সকলেই বিস্মিত হইলেন এবং সকলে একযোগে তাঁহাকে সম্মান দেখাইতে ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। তিনি কিছুক্ষণ তাঁহাদের সহিত নানা শাস্ত্রের আলোচনা করিয়া সকলের অজ্ঞাতে সেথান হইতে সরিয়া পড়িলেন। কিন্তু তখন কেহই তাঁহাকে 'সা'দী' বলিয়া চিনিতে পারেন নাই। তাঁহার চলিয়া যাওয়ার পর চারিদিকে অনুসন্ধানের সাড়া পড়িয়া গেল, এই সময় একজন বিদেশী লোকের মুখে সা'দীর আগমন বৃত্তান্ত সকলেই জানিতে পারিলেন, কিন্তু কবিকে আর খুঁজিয়া পাওয়া গেল না। *

কবি ন্যায়, দর্শন প্রভৃতি তর্কবহুল শাস্ত্রের প্রতি বিশেষ মনোযোগী ছিলেন না। ধর্ম্মতত্ত্ব, 'তসাওওফ' ও সাহিত্যের দিকেই তাঁহার বিশেষ অনুরাগ দৃষ্ট হইত। তিনি অসাধারণ বাগ্মী ছিলেন। নেজামিয়া মাদ্রাসায় পড়িবার সময় বক্তৃতা শক্তির অনুশীলনে তিনি সহপাঠীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠস্থান অধিকার করিয়াছিলেন। একবার 'বায়াল্‌বাক্‌' নগরীর জামে মসজিদে একটী বিরাট সভায় কবি বহুক্ষণ ধরিয়া এস্‌লাম-ধর্ম্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তাঁহার হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা শুনিয়া সকলেই মুগ্ধ ও ভাব-বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছিল।

সা'দী নানাদেশ ভ্রমণ এবং দীর্ঘকাল সেই সকল দেশে অবস্থান করিয়া নানা বিদেশীয় ভাষায় অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন। বুস্তাঁ ও গোলেস্তাঁয় বর্ণিত তাঁহার নিজের উক্তি হইতেই জানা যায় যে, তিনি এশিয়া ও আফ্রিকার বিভিন্ন অঞ্চলে দীর্ঘকাল ভ্রমণ করিয়া বেড়াইয়াছিলেন। সিরিয়া, এরাক, ফিলিস্তীন, মিশর, এমন ও ভারতবর্ষেও সা'দী ভ্রমণ করিয়াছেন।

Sir Ousley লিখিয়াছেন—কবি বিভিন্ন দেশের ১৮টী ভাষা শিখিয়াছিলেন। কবির লিখিত কতকগুলি কবিতা দেখিয়াই 'সার আউসলী' এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। বিদেশীয় অনেক ভাষা তাঁহার মাতৃভাষার ন্যায় হইয়াছিল, সেই সকল ভাষায় তিনি কথা কহিতে, বক্তৃতা করিতে এবং কবিতা লিখিতে পারিতেন। ফরাসী পণ্ডিত এম, গার্স্যন, ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দের এশিয়াটিক জার্ণেল পত্রিকায় লিখিয়াছেন—প্রাচ্য কবিদের মধ্যে বিদেশীয় ভাষায় কবিতা লিখিতে শেখ সা'দীই প্রথম।

অনেকে ফার্সী ও উর্দ্দু ভাষার সংমিশ্রণে মিশ্র ভাষায় লিখিত রেখ্‌তা নামক নিম্নলিখিত কবিতা কয়টী শেখ সা'দীর রচিত বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন।

قشقه چو دیدم برزخش گفتم که یه کیا دیت هی
گفتا که دُرای باوری اِس ملک کي یه ریت هے
همنا تمهن کو دل دیا تم دل لیا اور دکهه دیا
هم یه کیا تم وه کیا ایسی بهلی یه پیت هے
سعدی بگفتا ریخته در ریخته در ریخته
شیر و شکر آمیخته هم ریخته هم گیت هے

অর্থাৎ প্রিয়তমার তিলক-শোভিত ললাট দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—তোমার ললাটে এসব কি? তিনি বলিলেন এ দেশের ইহাই রীতি। আমি প্রাণের সহিত ভালবাসিয়া তোমাকে মনপ্রাণ সঁপিলাম, তুমি আমার মন লইলে আর আমাকে দুঃখ দিলে। আমি এরূপ করিলাম, তুমি ওরূপ করিলে, তোমার প্রেমের এমনই মহিমা। 'রেখ্‌তা' রচনাছলে সা'দী এই সকল মুক্তা সাজাইয়া রাখিয়াছেন, পক্ষান্তরে দুগ্ধে ও মিছ্‌রীতে মিশাইয়া দিয়াছেন, এগুলি রেখ্‌তা ও গীত দুই-ই।

Sir Ousley এবং আরও কয়েকজন জীবনী-লেখক এমন

* নফহাতুল উনস, বুস্তানের ৪র্থ বাব— লেখক।

কি 'মির্জ্জা সওদা'ও এই কবিতা কয়টী পারস্যের কবি সা'দী শিরাজীর রচিত বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু সুবিখ্যাত চরিতকার হাকীম 'কোদরুতুল্লাহ্ কাসেম' নানা যুক্তি-তর্কের অবতারণা ও নানা ঐতিহাসিক তত্ত্বের আলোচনা করিয়া দেখাইয়াছেন—ঐ 'রেখ্তা'গুলি দাক্ষিণাত্যের অন্য একজন কবির রচিত, তাঁহার লিখিত কবিতায় তিনিও সা'দী নাম ব্যবহার করিয়াছেন। এজন্য অনেকে পারস্যের মহাকবি শেখ সা'দীকেই ঐ 'রেখ্তার' রচয়িতা মনে করিয়া ভ্রমে পড়িয়াছেন।

পারস্যের কবিদের মধ্যে অনেকেই যেমন বহু দেশ ভ্রমণ করিয়াছেন, বাগ্দাদের নেজামী মাদ্রাসা হইতে বাহির হইয়া সা'দীও সেইরূপ দেশপর্য্যটনে বাহির হইয়াছিলেন।

**ভ্রমণ বৃত্তান্ত**

Sir Ousleyর মতে প্রাচ্য পরিব্রাজকদের মধ্যে 'এব্নে বতুতা'কে বাদ দিলে শেখ সা'দীই প্রধান বলিয়া পরিগণিত হইবেন। তিনি এশিয়া ও আফ্রিকার বহু স্থানে ভ্রমণ করিয়াছিলেন। 'চেম্বার্স ইন সাইক্লোপিডিয়া' হইতে তাঁহার ইউরোপ ভ্রমণের কথাও জানিতে পারা যায়। বোস্তাঁর অষ্টম বাবে কবি ভারতের বিখ্যাত সোমনাথ মন্দির দর্শন সম্বন্ধে একটী বিচিত্র ঘটনা বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা হইতে তাঁহার ধর্ম্মনিষ্ঠা ও উপস্থিত বুদ্ধির যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়।

প্রসিদ্ধ লেখক শেখ আজরী তাঁহার 'জওয়াহেরুল আসরার' গ্রন্থে লিখিয়াছেন—সা'দী দিল্লীর সুবিখ্যাত কবি আমীর খোসরোর কবিতা শুনিয়া সুদূর পারস্য দেশ হইতে কেবল তাঁহাকে দেখিবার জন্য ভারতে আসিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহাদের উভয়ের জন্ম বৃত্তান্ত বয়সের অবস্থা ও পারিপার্শ্বিক অন্যান্য ঘটনা সমূহ বিশেষ ভাবে আলোচনা করিয়া দেখিলে, এই ঘটনাটী সম্পূর্ণ অসম্ভব বলিয়া মনে হয়। 'খোসরো' ৬৫১ হিজরীতে জন্ম গ্রহণ করেন, সা'দীর বয়স তখন ৮০ বৎসর (মতান্তরে ৬১ বৎসর)। খোসরো অন্ততঃ ২৫ বৎসর বয়সে সাহিত্য-জগতে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়া থাকিলে এবং সঙ্গে সঙ্গে সুদূর পারস্য দেশ পর্য্যন্ত তাঁহার যশ ছড়াইয়া পড়া সম্ভব হইলে সা'দীর বয়স তখন ১০০ বৎসরের কিছু কম অথবা বেশী হইয়াছিল। সে সময় তিনি লোক-সমাজের সংশ্রব শূন্য হইয়া নির্জ্জনবাসে 'এবাদৎ-বন্দেগী'তে কাটাইতেন। এরূপ অবস্থায় এই শেষ বয়সে জরা ও বার্দ্ধক্য-পীড়িত, এবাদৎ বন্দেগীতে নিবিষ্ট চিত্ত মহাপুরুষ কেবল কবি নামে বিখ্যাত একজন তরুণের সহিত দেখা করিবার জন্য পারস্য দেশ হইতে সুদূর দিল্লী নগরীতে আসিয়াছিলেন, এ কথার উপর কখনও বিশ্বাস স্থাপন করা যায় না। বরং বিশ্বস্তসূত্রে জানিতে পারা গিয়াছে যে, সোলতান গিয়াসুদ্দীনের পুত্র 'মোহাম্মদ সোলতান' তাঁহার প্রিয় পারিষদ কবিবর খোসরো-রচিত কতকগুলি কবিতা শিরাজ নগরে সা'দীর নিকট পাঠাইয়া দিয়াছিলেন এবং সেই সঙ্গে তাঁহাকে ভারতে আসিবার জন্য অনুরোধ পত্র লিখিয়াছিলেন। কিন্তু কবির বয়স তখন একশত বৎসর অতিক্রম করিয়াছিল, তাই বার্দ্ধক্য বশতঃ অক্ষমতার উল্লেখ করিয়া তিনি তাঁহার আদেশ পালনে অসম্মতি জানাইয়াছিলেন, এবং খোসরো রচিত কবিতাগুলির বিশেষ প্রশংসা করিয়া নবীন কবির উৎসাহ বর্দ্ধন এবং সম্মান প্রতিপত্তি ও যশ-প্রচারের সাহায্য করিবার জন্য সুলতান মহাম্মদকে বিশেষভাবে অনুরোধ করিয়াছিলেন। *

ক্রমশঃ

---

* হায়াতে ছা'দী—২৬ পৃষ্ঠা। পারস্য প্রতিভার সুযোগ্য লেখক, আমীর খোসরোকে দেখিবার জন্য বৃদ্ধাবস্থায় সা'দীর সিন্ধু অতিক্রম করিয়া দিল্লীতে আসার কথা লিখিয়াছেন, প্রমাণস্বরূপ বুস্তাঁর 'অষ্টম অধ্যায়ে'র হাওলা দিয়াছেন। বুস্তাঁর অষ্টম অধ্যায়ে সোমনাথের বিখ্যাত মন্দিরে সা'দীর কিছুদিন থাকা ও সেখান হইতে হিন্দুস্থান হইয়া এমনের পথে হেজাজে চলিয়া যাওয়ার কথা বর্ণিত হইয়াছে; কিন্তু আমীর খোসরোর সহিত সাক্ষাতের সামান্য প্রসঙ্গও তাহাতে নাই, খোসরোর ন্যায় একজন বিখ্যাত কবির সহিত সাক্ষাৎ হইলে কখনই তিনি সে কথার উল্লেখ না করিয়া পারিতেন না। পক্ষান্তরে ঐ আখ্যানটী পড়িলেই বুঝিতে পারা যায়, সা'দী তখন আদৌ জরাগ্রস্ত হন নাই। তিনি দূর দূরান্তরের সফর করিতে এমন কি প্রাণ-ভয়ে ভীত পলায়মান ব্রাহ্মণের পিছু পিছু দৌড়িয়া গিয়া তাহাকে ধরিয়া কূয়ার মধ্যে ফেলিয়া দিতে এবং প্রস্তরাঘাতে মারিয়া ফেলিতে সক্ষম হইয়া ছিলেন। একজন বার্দ্ধক্য পীড়িত জরাগ্রস্ত বৃদ্ধের পক্ষে কখনই ইহা সম্ভবপর নহে। কবি ঐ প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন—

به هند آمدم بعد از ان رستخیز — وزانجا براه یمن تا حجیز
بتازید ومن در پیش تا ختم — نگونش بچاهی در انداختم
تمامش بکشتم بسنگ ان خبیث — که از مرده دیگر نیاید حدیث

অবস্থাঘটিত প্রমাণাদি দৃষ্টে বেশ বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, সা'দীর এই সোমনাথ ও হিন্দুস্থানে আগমনের ব্যাপার আমীর খোসরোর জন্মের অনেক পূর্ব্বেই ঘটিয়াছিল।

লেখক

# কোরআন-হাদিছ

## আল্লার কালাম।

ادْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ
الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ط إِنَّ رَبَّكَ
هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ
بِالْمُهْتَدِينَ * وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ
مَا عُوقِبْتُم بِهِ ط وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ
لِّلصَّابِرِينَ * وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا
تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ *
إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوا وَّالَّذِينَ هُم مُّحْسِنُونَ *

سورة النحل -

(হে মোহাম্মাদ!) তুমি স্পষ্ট ও দৃঢ় যুক্তিপ্রমাণের এবং উৎকৃষ্ট উপদেশের মধ্যবর্ত্তিতায় লোকদিগকে আল্লার পথের দিকে আহ্বান কর, এবং সত্তম উপায়ে তাহাদিগের সহিত আলোচনায় প্রবৃত্ত হও;—কে তাঁহার পথ পরিত্যাগ করতঃ ভ্রষ্ট হইয়া গিয়াছে, আল্লাহ্ তাহা উত্তমরূপে অবগত, পক্ষান্তরে কাহারা সৎপথ প্রাপ্ত, তাহাও তিনি উত্তমরূপে জ্ঞাত আছেন।

আর তোমরা যদি প্রতিশোধ গ্রহণ করিতে চাও, তবে যে পরিমাণে তোমাদিগের প্রতি অন্যায় করা হইয়াছে, ততটুকু মাত্র প্রতিশোধ তোমরা গ্রহণ করিতে পার;—আর তোমরা যদি (প্রতিশোধ গ্রহণ না করিয়া) ধৈর্য্যধারণ কর, তবে ধৈর্য্যশীল ব্যক্তিগণের জন্য তাহাই ত হইতেছে অত্যুৎকৃষ্ট (পন্থা)।

(হে মোহাম্মাদ!) তুমি কিন্তু ধৈর্য্য ধারণ করিয়া থাকিবে এবং তোমার ধৈর্য্যধারণও আল্লার প্রদত্ত শক্তির উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করিতেছে; আর তাহাদিগের (বিরুদ্ধাচরণে) দুঃখিত হইও না এবং তাহারা যে সকল ষড়যন্ত্র পাকাইয়া থাকে, তজ্জন্য তুমি সঙ্কীর্ণ হৃদয় হইও না।

যাহারা সংযমশীল হইয়াছে এবং যাহারা হিতপরায়ণ, আল্লাহ্ নিশ্চয়ই তাহাদিগের সহায়।

ছুরা নাহ্ল, ১২৫ হইতে ১২৮ আয়ত।

لا ينهكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ط ان الله يحب المقسطين * انما ينهكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين واخرجوكم من دياركم وظاهروا على اخراجكم ان تولوهم ج ومن يتولهم فاولئك هم الظالمون -

سورة الممتحنة -

যে সকল অমুছলমান, ধর্ম্ম লইয়া তোমাদিগের সহিত যুদ্ধ করে না এবং তোমাদিগকে স্বদেশ হইতে বাহির করিয়া দেয় না—তাহাদিগের প্রতি সদ্ব্যবহার বা সুবিচার করিতে আল্লাহ্ তোমাদিগকে নিষেধ করিতেছেন না, নিশ্চয় আল্লাহ্ ন্যায়নিষ্ঠ লোকদিগকে ভালবাসেন।

যে সকল অমুছলমান, ধর্ম্ম লইয়া তোমাদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়াছে, এবং তোমাদিগকে স্বদেশ হইতে বহির্গত করিয়াছে, এবং যাহারা (এই) বহিষ্করণের সহায়তা করিয়াছে—কেবল মাত্র সেই সকল লোকের সহিত বন্ধুত্ব করিতে তিনি তোমাদিগকে নিষেধ করিতেছেন, আর (এহেন) অমুছলমানদিগের সহিত যাহারা বন্ধুত্ব স্থাপন করে, তাহারাই ত হইতেছে অত্যাচারী।

ছুরা মোম্‌তাহেনা, ৮ম ও ৯ম আয়ত।

---

لا اكراه في الدين - سورة البقرة -

ধর্ম্ম সম্বন্ধে কোন প্রকার জোর জবরদস্তি নাই।

ছুরা বকরা, ২৫৬ আয়ত।

---

ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين * ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ط ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوة كانه ولي حميم * وما يلقها الا الذين صبروا ج وما يلقها الا ذو حظ عظيم * سورة فصلت -

যে ব্যক্তি (লোকদিগকে) আল্লার পানে আহ্বান করে এবং নিজে সৎকর্ম্মশীল হয়, আর বলে যে, বস্তুতঃ আমি (আল্লাতে) আত্মসমর্পনকারীদিগের অন্তর্ভুক্ত—তাহা অপেক্ষা অত্যুৎকৃষ্টবাক্ ব্যক্তি আর কে হইতে পারে?

এবং সৎ ও অসৎ সমান হইতে পারে না, যাহা সত্তম তাহার দ্বারা তুমি অসৎকে প্রতিহত করিতে থাক—দেখিবে, তোমার সহিত যাহার শত্রুতা, সেই যেন অভিভাবক, পরম সুহৃদ।

এবং ধৈর্য্যশীল ব্যক্তিগণ ব্যতীত এই আদর্শকে অন্য কেহই প্রাপ্ত হইতে পারে না—আর মহাভাগ ব্যক্তিগণ ব্যতীত অন্য কেহই উহাকে লাভ করিতে পারে না।

ছুরা হা-মীম সেজদা, ৩৪ ও ৩৫ আয়ত।

---

ولا يجرمنكم شنان قوم على ان لا تعدلوا ط اعدلوا هو اقرب للتقوى ز واتقوا الله ط ان الله خبير بما تعملون * سورة المائدة -

কোন জাতির শত্রুতাচরণ যেন তোমাদিগকে ন্যায়নিষ্ঠা হইতে বিরত করিতে না পারে। ন্যায়দর্শী হও, সংযমের সহিত ঘনিষ্টতর ইহাই; আর আল্লাহ (কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত অন্যায়ের প্রতিফল) কে ভয় করিয়া চল, নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাদিগের কার্য্যকলাপ সম্যকরূপে অবগত আছেন।

ছুরা মায়দা, ৮ আয়ত।

---

## রছুলের বাণী।

### প্রথম আয়ত সংক্রান্ত হাদিছ :—

(১) ওহোদের যুদ্ধে ৭৪ জন আনছার ও ৬ জন মোহাজের শহীদ হন। কোরেশ পক্ষ ইঁহাদের অনেকের বিশেষতঃ আমির হামজার লাশের সহিত অত্যন্ত দুর্ব্যবহার করে, তাঁহাদের হাত পা নাক কাণ কাটিয়া ফেলে, এবং তাঁহাদের হৃৎপিণ্ড বাহির করিয়া চর্ব্বণ করিতেও তাহারা কুণ্ঠিত হয় নাই। আনছারগণ এই সময় প্রতিজ্ঞা করেন যে, সময় পাইলেই তাঁহারা কোরেশদিগকে ইহার উপযুক্ত প্রতিশোধ দান করিবেন। তাহার পর মক্কা বিজয়ের দিন আল্লাহ তাআলা وان عاقبتم অর্থাৎ প্রথম বর্ণিত আয়ৎ অবতীর্ণ করিলেন। তিরমিজি, নাছাই, এবনে মাজা, এবনে হেব্বান, তবরাণী, হাকেম ও বাইহাকি প্রভৃতি গ্রন্থে এই হাদিছটী বর্ণিত হইয়াছে। হাদিছের এমামগণ এই হাদিছকে বিশ্বস্ত ও নির্দ্দোষ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। দেখ ফৎহুল বায়ান, ৫—২৯৩ পৃষ্ঠা। এই আয়তটী ওহোদের সময় অবতীর্ণ হইয়াছিল বলিয়া যে বিবরণ কোন কোন তফছিরে দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা অবিশ্বস্ত ও ভিত্তিহীন। এবনে কছির ৫—৪৩৩ পৃষ্ঠা। প্রথম আয়তে এছলামের ও এছলাম প্রচারের যে উদার ও মহান আদর্শ বর্ণিত হইয়াছে, তাহাকে খর্ব্ব করার জন্য একদল লোক বলিয়া থাকেন যে, জেহাদের আয়ত অবতীর্ণ না হওয়া পর্য্যন্ত এই হুকুম ছিল। তাহার পর হইতে এ আদর্শের পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে। কিন্তু পাঠকগণ দেখিতেছেন যে, জেহাদের প্রথম আয়ত নাজেল হইয়াছে বদর যুদ্ধের পূর্ব্বে, এবং এই আয়তটী অবতীর্ণ হইয়াছে তাহার ন্যূনাধিক ছয় বৎসর পরে—মক্কা বিজয়ের দিন। প্রথমতঃ কোরআনের কোন আয়ত যে অপর আয়তের দ্বারা বারিত হইয়াছে, ইহাই আলোচনা সাপেক্ষ। ইহা স্বীকার করিলেও যে আয়তটী বারিত বা মনছুখ হইবে, নাছেখ আয়তের পূর্ব্বে তাহা অবতীর্ণ হওয়া চাই। কিন্তু এখানে আমরা দেখিতেছি, "বারিত আয়াতটী" ছয় বৎসর পরে অবতীর্ণ হইয়াছে! সুতরাং তাঁহাদের কথার যে কাণা কড়িও মূল্য নাই, ইহা সহজেই বুঝিতে পারা যাইতেছে।

(২) হজরত বলিতেছেন :—

ان الله انما بعثني ادعوا الى سبيله بالحكمة والموعظة الحسنة فمن خالفني في ذلك فهو من الهالكين وقد برأت منه ذمة الله وذمة رسوله — درمنثور —

আমি সন্তোষজনক যুক্তি প্রমাণের মধ্যবর্ত্তিতায় সাত্বিক উপদেশের দ্বারা লোকদিগকে আল্লার পথের পানে আহ্বান করিব—একমাত্র এই উদ্দেশ্যে আল্লাহ্ আমাকে রছুলরূপে প্রেরণ করিয়াছেন। অতএব এই এছলাম প্রচার সম্বন্ধে যে ব্যক্তি আমার (অবলম্বিত নীতির) বিপরীত-আচরণ করিবে, তাহার ধ্বংসপ্রাপ্ত হওয়া সুনিশ্চিত। তাহার সম্বন্ধে আল্লার ও তাঁহার রছুলের সমস্ত 'দায়িত্ব' শেষ হইয়া যাইবে। দুররে মনছুর ৪—১৩৫ পৃষ্ঠা।

### ২য় আয়ত সংক্রান্ত হাদিছ :—

(১) এই আয়তটী ছুরা "মোম্‌তাহেনা" হইতে গৃহীত। এই ছুরাটী যে মদিনায়—এবং হোদায়বিয়ার সন্ধি ও মক্কা বিজয়ের মধ্যবর্ত্তী কালে অবতীর্ণ, ছুরার আয়তগুলির দ্বারা তাহা স্পষ্টভাবে সপ্রমাণ হইয়া যাইতেছে। আমাদিগের

উদ্ধৃত দ্বিতীয় আয়তটী যে হোদায়বিয়ার পর মদিনায় অবতীর্ণ হইয়াছিল, বোখারী, আহমদ, আবু দাউদ তায়ালসী, হাকেম প্রভৃতি মোহাদ্দেছগণের উদ্ধৃত বিবি আছমা ও আবদুল্লাহ এবনে জোবায়রের হাদিছ হইতে তাহা অকাট্যরূপে প্রতিপন্ন হইয়া যাইতেছে। কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় এই যে, আমাদিগের মতন-কোরআন শরীফগুলির শিরোভাগে এই ছুরাকে মক্কি বা মক্কায় অবতীর্ণ বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। ছুরার আভ্যন্তরীণ স্পষ্ট সাক্ষ্য এবং এতগুলি ছহি হাদিছকে এক সঙ্গে অগ্রাহ্য করিয়া তাঁহারা যে কেমন করিয়া এই ছুরাকে মক্কি বলিয়া উল্লেখ করিলেন, তাহা আমাদিগের পক্ষে অবোধগম্য।

এই ছুরা এবং ছুরার এই আয়তটী যে সময় অবতীর্ণ হইয়াছিল, তখন আরবের সমস্ত অমুছলমান তাহাদিগের সমস্ত দুর্দ্ধর্ষতা এবং সমস্ত শত্রুতা লইয়া "মোহাম্মাদ, তাহার ধর্ম্ম ও তাহার আশ্রয়দাতাদিগকে" দুনয়ার পৃষ্ঠ হইতে সম্পূর্ণভাবে মুছিয়া ফেলার জন্য শেষ চেষ্টায় প্রবৃত্ত ছিল। ইহারই ফলে হজরতকে এবং তাঁহার সমস্ত সহচরবর্গকে তাহারা মক্কার ত্রিসীমায় প্রবেশ করিতে দেয় নাই। বিপক্ষের অত্যাচার ও তাহাদের শত্রুতার এই চরম ভীষণতার সময়, আল্লাহ মুছলমানদিগকে বুঝাইয়া দিতেছেন যে, যে সকল অমুছলমান ধর্ম্ম লইয়া তোমাদিগের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়, এবং যাহারা তোমাদিগকে তোমাদের মাতৃভুমি হইতে বাহির করিয়া দিয়াছে, কেবল সেই সব অমুছলমানের সহিত বন্ধুত্ব করা অনুচিত। বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীদিগের সহিত কোন্ অবস্থায় কি প্রকার ব্যবহার করিতে হইবে, এই আয়তটী খুব স্পষ্ট ও খুব বিস্তারিত ভাবে মুছলমানকে তাহা শিখাইয়া দিতেছে।

আলোচ্য আয়ত হইতে আনুসঙ্গিক ভাবে ইহাও জানা যাইতেছে যে, মুছলমানের পক্ষে দুইটী জিনিষ সব-অপেক্ষা বড় :—স্বধর্ম্ম ও স্বদেশ।

চিন্তাশীল পাঠকবর্গ আয়তে ব্যবহৃত শব্দগুলির প্রয়োগভেদ এবং তাহার তাৎপর্য্যগত বিশবত্বগুলি আলোচনা করিয়া দেখিলে, আরও অনেক তথ্য অবগত হইতে পারিবেন।

### ৩য় আয়ত সংক্রান্ত হাদিছ :—

এছলামের পূর্ব্বে মদিনার বন্ধ্যা ও মৃতবৎসা স্ত্রীলোকেরা মানসা করিত যে, তাহাদের সন্তান হইয়া বাঁচিয়া থাকিলে তাহাকে তাহারা এহুদীদিগের হস্তে সমর্পণ করিবে। মদিনায় এছলামের প্রসার আরম্ভ হওয়ার পরও আনছারদিগের বহু সন্তান এইরূপে এহুদীদিগের অন্তর্ভুক্ত হইয়া ছিল। অতঃপর **চতুর্থ হিজরীর রবিউল আউওল মাসে,** বানিনাজির নামক মদিনার এহুদী গোত্রকে যখন মদিনা ছাড়িয়া যাওয়ার আদেশ দেওয়া হয়, তখন আনছার মুছলমানগণ হজরতের খেদমতে আসিয়া বলিতে লাগিলেন—এই এহুদীদিগের মধ্যে আমাদের ভ্রাতা ও পুত্রগণও অবস্থান করিতেছে। এহুদীগণ উহাদিগকে লইয়া যাইবে কোন্ হিসাবে? আমরা উহাদিগকে যাইতে দিব না।

এহুদীদিগের মেরুদণ্ড তখন চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া গিয়াছে। মুছলমানগণ ইচ্ছা করিলে এক মুহূর্ত্তের মধ্যে দুনয়া হইতে তাহাদের অস্তিত্ব লোপ করিয়া দিতে পারিতেন। দুনয়ার আইন-কানুনের হিসাবে ঐরূপ আদর্শ দণ্ড দান করাই এহুদীদিগের পাপের উপযুক্ত কর্ম্মফল বলিয়া বিবেচিত হইতে পারিত। কিন্তু তাহা হয় নাই, রহমতুল্-লিল-আলমীন মোস্তফা আনছারগণের এই সঙ্কল্পের সমর্থন করিতে পারেন নাই। আলোচ্য আয়তটী এই সময় অবতীর্ণ হইয়াছিল। আবু দাউদ, নাছাই, এবনে হেব্বান, বাইহাকি ও এবনে জরির প্রভৃতি এমামগণ এই মর্ম্মের বিভিন্ন হাদিছ বর্ণনা করিয়াছেন। হাদিছের শেষভাগে বর্ণিত হইয়াছে :—

فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صلعم قَدْ خَيَّرَ اَصْحَابَكُمْ فَاِنِ اخْتَارُوْكُمْ فَهُمْ مِنْكُمْ - وَاِنِ اخْتَارُوْهُمْ فَهُمْ مِنْهُمْ فَاَجْلُوْهُمْ مَعَهُمْ —

এই আয়তটী অবতীর্ণ হওয়ার পর হজরত বলিলেন :— আল্লা কোরআনে তোমাদিগের স্বজনগণকে স্বাধীনতা প্রদান করিয়াছেন। তাহারা যদি (এছলাম ধর্ম্ম অবলম্বন করতঃ) তোমাদিগের সঙ্গে থাকিতে ইচ্ছুক হয়, তবে তোমরা তাহাদিগকে গ্রহণ করিতে পার। আর যদি তাহারা এহুদী ধর্ম্মে থাকিয়া এহুদীদিগের সঙ্গে যাইতে চায়, তবে তাহার অধিকারও তাহাদের আছে। অতঃপর সেই মোছলেম সন্তানগণ এহুদী থাকিয়া দেশত্যাগ করিয়া গেল।

ধর্ম্ম সম্বন্ধে এছলামের শিক্ষা যে কত উদার, কত মহান, কোরআনের এই আয়ৎ ও হজরত মোহাম্মাদ মোস্তফার এই সকল হাদিছ হইতে তাহা স্পষ্টরূপে সপ্রমাণ হইয়া যাইতেছে।

**৪র্থ ও ৫ম আয়ত সংক্রান্ত হাদিছ :—**

(১) আবুজর বলিতেছেন, হজরত আমাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন :—

اتق الله حيث ما كنت - واتبع السيئة الحسنة

تمحها وخالق الناس بخلق حسن - احمد ترمذى دارمى

হে আবুজর! সর্ব্বত্র আল্লাকে ভয় করিয়া চলিবে, মন্দ ব্যবহারের পরিবর্ত্তে ভাল ব্যবহার করিবে, সদ্ব্যবহার দ্বারা অসদ্ব্যবহারের (প্রবৃত্তি) কে বিলুপ্ত করিয়া ফেলিবে। সমস্ত লোকের সহিত সৎ ও মহৎ ব্যবহার করিবে। আহমদ, তিরমিজি, দারমী প্রভৃতি।

(২) হজরত বলিয়াছেন :—

لا تكونوا امعة تقولون :—"ان احسن الناس

احسنا"– ولكن وطنوا انفسكم – ان احسن الناس

ان تحسنوا وان اساءوا فلا تظلموا – ترمذى

দুনয়ার সাধারণ ভাবস্রোতে গা ঢালিয়া দিয়া তোমরা যেন কদাচ বলিও না :—"লোকে যদি আমাদিগের সহিত সদ্ব্যবহার করে, তবে আমরাও তাহাদিগের সহিত সদ্ব্যবহার করিব।" বরং হে মুছলমান! তোমরা দৃঢ়চিত্ত হইয়া দুনয়ায় এছলামের আদর্শকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবে—লোকে তোমাদের ইষ্ট করিলে তোমরা তৎপরিবর্ত্তে সদ্ব্যবহার করিতে বাধ্য। কিন্তু কেহ যদি তোমাদের অনিষ্টসাধন করে, তাহা হইলেও তোমরা তাহার প্রতি অত্যাচার করিতে পারিবে না।—তিরমিজি।

(৩) আবু হোরায়রা বলেন, হজরত বলিয়াছেন :—

قال موسى بن عمران عليه السلام :—

يا رب! من اعز عبادك عندك؟ قال من

اذا قدر غفر – بيهقى—

হজরত মূছা আল্লাহকে জিজ্ঞাসা করিলেন :—হে আমার প্রভু! তোমার হুজুরে তোমার বান্দাদিগের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা মহীয়ান ব্যক্তি কে? আল্লাহ বলিলেন—প্রতিশোধ গ্রহণের সামর্থ্য থাকা সত্তেও যে ক্ষমা করে।—মেশ্‌কাত।

(৪) হজরত মুছলমানদিগকে সঙ্গে লইয়া মক্কায় তীর্থ যাত্রা করিলে পৌত্তলিকগণ পথে তাঁহাদিগকে বাধা দেওয়ায়, সকলকে ব্যর্থ মনোরথ হইয়া মদিনায় ফিরিয়া যাইতে হয়। এই ব্যাপারটা মুছলমানদিগের পক্ষে অসহ্য হইয়া উঠে। সকলে "মৃত্যুর প্রতিজ্ঞা" করিয়া যুদ্ধের জন্য ব্যগ্র। কিন্তু হজরতের উপদেশে তাঁহারা এই অত্যাচার নীরবে সহ্য করিতে বাধ্য হন। "এই সময় পূর্ব্ব অঞ্চলের একদল পৌত্তলিক-যাত্রী তীর্থ মানসে মক্কায় গমন করিতে থাকে। মুছলমানগণ তখন বলিতে লাগিলেন যে, পৌত্তলিকগণ আমাদিগকে যেমন সাধারণ তীর্থক্ষেত্র হইতে বারিত করিয়াছে, আমরাও সেইরূপ ইহাদিগকে মক্কায় যাইতে দিব না। পঞ্চম আয়তটী এই সময় অবতীর্ণ হইয়াছিল। এবনে কছির ৩—২৬৯।

হজরত বলিয়াছেন :—

ليس منا من دعى الى عصبية وليس منا

من قاتل عصبية وليس منا من مات على

عصبية — ابوداود —

যে ব্যক্তি লোকদিগকে সাম্প্রদায়িকতার পানে আহ্বান করে—সে আমার মণ্ডলীভুক্ত নহে। সাম্প্রদায়িক ভাবে উদ্বুদ্ধ হইয়া যে অন্যের সহিত যুদ্ধ করে, সে আমার মণ্ডলীভুক্ত

নহে। সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষে যে ব্যক্তি নিহত হয়, সে আমার মণ্ডলীভুক্ত নহে।—আবু দাউদ।

ওয়াছেলা বলিতেছেন, আমি হজরতকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"সাম্প্রদায়িকতা" কি? হজরত বলিলেন, অন্যায় কার্য্যে নিজের সমাজকে সাহায্য করার নাম—সাম্প্রদায়িকতা।—আবু দাউদ।

ওবাদা-এবনে-কাছির শামী বলিতেছেন, আমি হজরতকে জিজ্ঞাসা করিলাম ঃ—মানুষ স্বজাতি ও স্বগোত্রকে ভালবাসে। ইহা কি সাম্প্রদায়িকতা বলিয়া গণ্য হইবে? হজরত বলিলেন ঃ—

لا — ولكن من العصبية ان ينصر الرجل قومه

على الظلم — احمد — ابن ماجه —

না, তাহা সাম্প্রদায়িকতা নহে। তবে তুমি যদি কোন অন্যায় কার্য্যে স্বজাতির সহায়তা কর, তাহা হইলে তাহা সাম্প্রদায়িকতার পর্য্যায়ভুক্ত হইবে।

—আহমদ, এবনে মাজা।

---

# সমব্যথী

[ মোয়াহেদ বখ্‌ত চৌধুরী ]

প্রভাতের কলকণ্ঠ বিহঙ্গের সনে
দূরাগত লীলায়িত সান্ধ্য সমীরণে
কাল যা'রা দেখিলাম গাহিতেছে গান,
কোথা আজি—কোন্ দূরে করেছে প্রয়াণ?
নিদাঘের রৌদ্র-খর অলস বেলায়
বসন্তের হিল্লোলিত সবুজ মায়ায়
কত পান্থ দূরান্তের পথ-রেখা ধরি
এসেছিল এই পথে আপনা পাসরি।
কেবা জানে আজ তারা কোথা—কোন্ দূরে
কি গান গাহিছে বসি' কোন্ স্বপ্নপুরে।
কেহ তারা অকারণে পেয়েছে বেদনা,
ভাল বেসেছিল কেহ, কেহ আনমনা
চাহে নাই ফিরে।
তাহাদের লাগি
এ-মোর অন্তর ফিরে আশীর্ব্বাদ মাগি।

# কুড়ানো ফুল

[ চৌধুরী মোহাম্মদ শামসুর রহমান ]

কাশীতে বেড়াতে গিয়ে আলমগীর মসজেদের গেটের সামনে দেখা তার সাথে। শরমে জড়সড় হ'য়ে সঙ্কুচিত ভাবে নতমস্তকে দাঁড়িয়ে ছিল সে এক পাশে। পরণে তা'র শতছিন্ন মলিন বস্ত্র খণ্ড—কিন্তু তারই ভেতর দিয়ে ফুটে বেরুচ্ছিল তা'র অঙ্গের লাবণি। বারো তেরো বছরের মেয়ে—আধ-ঘোমটায় মুখখানা ঢাকা—তার মধ্যে বড় বড় দুটি চোখ—তাতে অন্তর্ভেদী দৃষ্টি। বালিকা করুণ নয়নে আমার পানে চেয়ে বলে, উঠ্‌ল—"মশায়, এখানে ডাক্তার কোথায় থাকে বল্‌তে পারেন ?"

সহানুভূতির স্বরে আমি জিজ্ঞাসা করলুম—"কেন, তোমার কি হয়েছে—ডাক্তার দিয়ে কি হবে ?"

বালিকা উত্তর করল—"মার বড্ড অসুখ।" কথার সঙ্গে সঙ্গে সে আমার মুখের দিকে উদ্বিগ্নভাবে চাইল উত্তরের আশায়। তা'র সে দৃষ্টিতে ফুটে বেরুচ্ছিল—মিনতির মৌন অভিব্যক্তি।

তার হাত ধরে বল্লুম "আমিই ডাক্তার চল,—কোথায় তোমাদের বাড়ী ?"

বালিকা আমাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চল্ল। ছোট্ট সেঁৎ সেঁতে একটা গলির ভিতর দিয়ে কিছুদূর গিয়ে সামনে একটা মোড় পেলুম। মোড় ঘুরেই একটা বাড়ীর দরজার সামনে বালিকা থমকে দাঁড়াল। আমি তা'র নিকটস্থ হ'লে পর সে আমায় পথ দেখিয়ে বাড়ীর ভিতর নিয়ে গেল। পিচ্ছল পথ—নর্দ্দমার দুর্গন্ধে নাড়ী বেরিয়ে আসতে চায়।

আমায় সঙ্গে করে সে একটা ঘরে প্রবেশ কল্ল। ছোট্ট ঘর—এক কোণে মিট্‌মিট্ করে একটা ছোট্ট কেরোসিনের ডিবে জ্বলছে। মাটীর উপর একটা ছেঁড়া চাটাই—তারি উপর ছেঁড়া কাঁথায় দেহ আবৃত করে পড়ে আছে—রোগিণী।

আমরা ঘরে প্রবেশ কর্ত্তেই আওয়াজ পেয়ে রোগিণী মুখ তুলে চাইল। তারপর কাপড়টা মাথার উপর টেনে দিয়ে কাতর স্বরে বল্ল—"কে লীলা ? এসেছিস্ মা" ! বালিকা যেন একটু উৎফুল্ল হ'য়ে বল্‌ল, "হাঁ মা, এসেছি। এই দেখ ডাক্তার বাবু আমার সঙ্গে এসেছেন তোমায় দেখতে। এইবার তুমি ভাল হ'য়ে উঠবে।" তারপর একখানা ছোট্ট জলচৌকী এনে সে আমায় বসতে দিয়ে নিজে মায়ের শিয়রে গিয়ে বসল এবং তার মাথায় হাত বুলাতে লাগ্‌ল।

রোগিণী তার ম্লান দৃষ্টি আমার দিতে বিস্ফারিত করে অতি কষ্টে বল্‌তে লাগল—"ডাক্তার বাবু ! আপনি কষ্ট করে অভাগিনীকে দেখ্‌তে এই পাগ্‌লী মেয়েটার কথামত এতদূর এসেছেন—কিন্তু কি দেখ্‌বেন ? আমাকে বাঁচাবার মত ওষুধ কি এ বিশ্বে আছে ? না—আমায় বাঁচাবার চেষ্টা বৃথা। আপনি এসেছেন—ভালই হয়েছে। এই হত-ভাগা মেয়েটাকে একটা ভাল লোকের হেফাজতে রেখে শান্তির সহিত মরতে পারব। আহ্—।" রোগিণী হাঁফিয়ে উঠ্‌ল—এতগুলি কথা এক সঙ্গে বল্‌তে তাকে অনেকখানি শক্তি ব্যয় কর্ত্তে হয়েছিল।

রোগিণীর নাড়ী পরীক্ষা করে আমার মন খারাপ হ'য়ে গেল। নাড়ী তার স্তব্ধ হয়ে গেছে, বুঝিবা আধ ঘণ্টার মধ্যেই সব শেষ হয়ে যায়।

লীলার ভার আমি গ্রহণ করলুম বলে তাকে আশ্বাস দিলুম। চোখের কোণে তার কৃতজ্ঞতার দীপ্তি ফুটে উঠ্‌লো।—রমণী স্বস্তির নিশ্বাস ত্যাগ করে হাঁফাতে লাগল। ক্রমে তার চোখের তারা নিভে এল—আধ ঘণ্টার মধ্যেই সব শেষ। চীৎকার করে লীলা মায়ের বুকের উপর আছড়ে পড়ল—বুক-ফাটা ক্রন্দনধ্বনিতে চারদিক মুখরিত করে তুল্‌ল—হায়রে অভাগিনী !

লোকজন ডেকে মৃতার দেহের সৎকারের ব্যবস্থা করে লীলাকে সঙ্গে করে নিয়ে এসে নিজের বাসায় উঠ্‌লুম। দুদিন পরে কাশীর বাসা উঠিয়ে উভয়ে দেশে রওয়ানা হলুম।

বাড়ীতে ফিরে এসে ভাবীর হাতে লীলাকে স'পে দিয়ে বল্লুম—"নাও ভাই, কাশীর পথে কুড়িয়ে এ মাণিক পেয়েছি—হেফাজতে রেখো।" সকল ব্যাপার শুনে ভাবী সাহেবা বিশেষ সন্তোষ প্রকাশ করলেন এবং লীলাকে নিজের বোনের মত আদর যত্ন দেখাতে লাগ্‌লেন।

( ২ )

দু' বছর পরের কথা। আমাদের সংশ্রবে লীলা ক্রমে মোসলমান হয়ে উঠল। একদিন তা'র সম্মতি অনুসারে প্রকাশ্য ভাবে তাকে দীক্ষিত করা হলো—নাম হলো ফরিদা।

এই দু' বছরে অনেক পরিবর্ত্তন হয়ে গিয়েছিল। আমি তখন পাশ করে ডাক্তার হয়েছি। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে কাল তার স্বভাবের দানে ফরিদাকে ক্রমে গরীয়সী করে তুলেছিল। কিশোরী লীলা তখন যৌবনোন্মুখী ফরিদা। তার প্রতি অঙ্গ হতে যৌবনের লাবণ্য ফুটে বেরুতে লাগ্‌ল অপূর্ব্ব সুষমায় ভরা সে রূপ। সে লাবণ্য—স্নিগ্ধ মধুরিমায় ভরা, তাতে শারদ-চন্দ্রিমার স্নিগ্ধতা ছিল—সূর্য্য-কিরণের জ্বালা ছিলনা।

সে সর্ব্বদা আমায় এড়িয়ে চল্‌বার চেষ্টা করত—কখনও দৈবাৎ চোখে-চোখে দেখা হয়ে গেলে মাথা নত করে, শরমে সঙ্কুচিতা হত।

তার সেই সঙ্কোচ-ভরা সৌন্দর্য্যের মধ্যে এমন একটা আকর্ষণী শক্তি ছিল—যার ফলে বাঁধা পড়লুম আমি। মনের এই গোপন ভাবকে মনের মধ্যেই চাপা দিয়ে সাংসারিক কাজের মধ্যে নিজকে সম্পূর্ণভাবে বিলীন করে' বিজয়ী হবার চেষ্টা করলুম, কিন্তু সবই বৃথা হলো। লক্ষ্য করলুম কাল কেবল আমারি মনে এ দাগ কাটেনি—ফরিদাও যেন দিন দিন কেমন হয়ে যাচ্ছে। সে সর্ব্বদা আমায় এড়িয়ে চল্‌বার চেষ্টা করত সত্য—কিন্তু লুকিয়ে লুকিয়ে আমায় এক নজর দেখে নেবার চেষ্টা সে বহুবার করেছে এবং তা কর্ত্তে গিয়ে কয়েকবার আমার কাছে হাতে নাতে ধরাও পড়েছে।

ফরিদা এমন করে কেন—তবে কি সে-ও আমায় ভালবাসে?—মনে মনে চিন্তা কর্ত্তে লাগলুম। তার প্রত্যেকটা কথা—প্রত্যেকটা হাব-ভাব প্রণয়ের অভিব্যক্তির আকারে মনের কোণে ভেসে উঠ্‌তে লাগ্‌ল—অনেক বিচার করে দেখ্‌লুম সত্যি সে আমায় ভালবাসে।

মনে মনে স্থির করলুম্—তাকে বিয়ে করব। মনের ভেতর থেকে কে একজন স্মরণ করিয়ে দিলে—অজ্ঞাত-কুলশীলা পথের কুড়ানো মেয়ে সে—জমিদারের ছেলে হয়ে তাকে বিয়ে করা শোভা পায় না আমার। কিন্তু তার রূপ আমার ভেতরে যে দাগ কেটেছিল, যে উন্মাদনায় বিভোর হয়ে আমি তাকে বিয়ে করবো বলে স্থির করেছিলাম, পরিণামে তারই জয় হলো। আমি ভাবী সাহেবার কাছে মনের কথা জানালুম।

প্রথমতঃ ভাবী সাহেবা আমার কথায় কিছুতেই মত দিলেন না। শেষে যখন আমি নাছোড়বান্দা হয়ে তাঁকে ধরে বস্‌লুম—যখন জানালুম যে, ফরিদাকে ছাড়া আমি আর কাকেও বিয়ে করব না, তখন অগত্যা তিনি এ সম্পর্কে ফরিদার মত কি তা' জান্‌বার চেষ্টা করবেন বলে' আমায় আশ্বাস দিলেন।

দুদিন পরের কথা। ফরিদা স্পষ্টভাবে ভাবীকে জানিয়ে দিল যে, যদি এবম্বিধ প্রস্তাব আবার করা হয়, তবে সে গলায় দড়ি দেবে—আমার সঙ্গে তার বিয়ে কিছুতেই হ'তে পারে না।

ভাবীর মুখে ফরিদার অভিমত জেনে অবধি আমার মনের শান্তি চিরতরে অন্তর্হিত হয়ে' গেল। সকল রকম কাজের সংশ্রব ত্যাগ করে নিজের লেবরেটরী ঘরেই আমি নিজেকে সম্পূর্ণভাবে আবদ্ধ করে' নিয়েছি। রাশি রাশি শিশি-বোতল ও ডাক্তারী যন্ত্রের মধ্যে নিজেকে পূর্ণ মাত্রায় ডুবিয়ে রেখে মনের অদম্য ভাবকে দমন করাই আমার উদ্দেশ্য। বাইরের কোন-কিছুর সঙ্গেই আমার আর সম্পর্ক নাই।

সেদিন দুপুরে লেবরেটরীতে নিজের কাজে মগ্ন ছিলুম। একটা শিশি হতে কয়েক ফোঁটা বিষ অন্য একটা এসিডের সঙ্গে মিশিয়ে তার শক্তি পরীক্ষা কচ্ছিলুম। পেছন দিকে এসে দাঁড়াল একটি ছায়া—ফিরে দেখি ফরিদা।

সে নীরবে দাঁড়িয়ে রইল—আমিও বিহ্বলের মত তার পানে এক দৃষ্টে চেয়ে রইলুম। কিছুক্ষণ পরে হঠাৎ হৃদয়ের শক্তি হারিয়ে ফেলুম। অগ্রসর হয়ে তার বাম হাতখানি নিয়ে নিজের মুঠোর মধ্যে চেপে ধরলুম। কোন কথা না বলে' সে নতমস্তকে নীরবে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর কি জানি কেন হঠাৎ তার মাথাটা সাম্‌নের দিকে ঝুঁকে আমার বুক স্পর্শ করল।

তার পর সহসা সে নিজের দুর্ব্বলতা ধরে ফেল্‌ল। তাড়াতাড়ি আমার মুঠোর ভিতর থেকে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে কাঁপ্‌তে কাঁপ্‌তে গৃহ হতে নিষ্ক্রান্ত হয়ে চলে গেল।

( ৩ )

পরের দিন সকালে লোকজনের গোলমালে ঘুম ভাঙল। চোখ কচ্‌লিয়ে বিছানা হ'তে উঠে বস্‌বার সঙ্গে সঙ্গেই ভাবী সাহেবা বিদ্যুতের মত ঘরে ঢুকে চীৎকার করে' উঠ্‌লেন —"নুরু, কি হবে ভাই—ফরিদা বিষ খেয়েছে।"

'ফরিদা বিষ খেয়েছে'—কথাটা বজ্রের মত আমার বুকে এসে বিঁধ্‌ল। তাড়াতাড়ি দৌড়ে ফরিদার শোবার ঘরে গিয়ে দেখ্‌লুম—কুসুম-কলিকা মাটীতে লুটিয়ে পড়ে আছে। দেহ তার অসাড়—নিস্পন্দ। বড় বড় চোখ দুটি তখনও বিস্ফারিত—যেন কত কি প্রাণের ভাষা ফুটে বেরুচ্ছে—সে চাহনীতে।

তার বিছানায় বালিশের নীচে পাওয়া গেল একখানা চিঠি। তাতে লেখা ছিল :—

"প্রিয়তম! আজ মরণ-মুহূর্তে তোমায় প্রাণের সত্যি-কারের সম্বোধনে ডেকে যাচ্ছি। তোমার বিবাহের প্রস্তাব আমি প্রত্যাখ্যান করেছিলুম সত্য—কিন্তু শোন—আমি তোমায় ভাল বাসতুম—সত্য সত্য প্রাণের সঙ্গে ভালবাস-তুম। তবু কেন তোমার প্রস্তাবে আমি রাজি হইনি আজ তাই জানিয়ে যাবো। আমার জীবনের কাহিনী—আমার পরিচয় তুমি যা' জান্‌তে, তার চেয়ে ঢের বেশী ঘৃণ্য—হেয়। শুনে রাখ—আমি পতিতার মেয়ে। আমার মা হতভাগিনী—বাল-বিধবা ব্রাহ্মণী—যৌবনের উন্মাদনায় পা' পিছলে পড়ে-ছিল নরকের পথে। আর সেই নরকের মাঝে হয় আমার জন্ম। * * * পতিতার মেয়ে আমি—আমায় গ্রহণ করে' তুমি নিজের অজ্ঞাতে অ-পবিত্র হও—এ আমি কিছুতেই সহ্য করতে পারব না। তোমায় প্রাণের সঙ্গে ভালবাসতুম বলেই প্রিয়! সর্ব্বপ্রযত্নে এ নরকের সংসর্গ হতে তোমায় বাঁচিয়ে রাখ্‌তে চেয়েছি। কাল তোমার বুকে মাথা রেখে আমি আমার নারী-জন্ম সার্থক করেছি—আমার আর কোন আকাঙ্খাই নেই। তোমার অজ্ঞাতে লেবরেটরী হতে বিষ চুরি করে খেয়েছি। অভাগিনীকে ক্ষমা কোরো প্রিয়তম জীবনসর্ব্বস্ব আমার—বিদায়! ইতি

অভাগিনী ফরিদা।"

সমস্ত বুকখানা মুহূর্ত্তের ভিতর কে যেন লোহার হাতুড়ি মেরে গুঁড়ো করে' দিল। সোজা হ'য়ে দাঁড়াতে পার্‌লুম না। সেইখানেই তার পাশে লুটিয়ে পড়লুম।

• • •

তারপর—দীর্ঘ দশ বছর কেটে গিয়েছে। কিন্তু যে স্মৃতির চিতা সে আমার বুকের ভিতর জ্বেলে দিয়ে গিয়েছে, আজ এই দশ বছরের অবিশ্রান্ত চোখের জলেও তাকে নিবুতে পারলুম না।

---

# নেপোলিয়নের ইসলাম গ্রহণ

[ কাজী নওয়াজ খোদা ]

মিসর-আক্রমণ ও বিজয়ী বেশে মিসর-প্রবেশ নেপোলিয়নের জীবনের একটী উল্লেখযোগ্য ঘটনা। তাঁহার জীবনী লেখকগণের মধ্যে অনেকেই এই ব্যাপারের বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন। ১৭৯৮ খৃষ্টাব্দের ১লা জুলাই তারিখে ফরাসী সৈন্য মিসর ভূমিতে পদার্পণ করিয়াছিল। এবং ১৮০১ খৃষ্টাব্দে তাহারা স্বদেশে ফিরিয়া যাইতে বাধ্য হইয়াছিল।

মোরাদ বেক মমলুক
মিসরের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য ইনি নেপোলিয়নের
সহিত যুদ্ধ করিয়া পরাস্ত হন।

নেপোলিয়নের মিশর আক্রমণ, মিসরে অবস্থিতি ও স্বদেশ প্রত্যাগমন ব্যাপার লইয়া ঐতিহাসিকগণ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছেন। একদল এই ব্যাপারটী নীরবে চাপিয়া গিয়াছেন। এসম্বন্ধে সামান্য আলোচনা করাও তাঁহারা আবশ্যক মনে করেন নাই। আর একদল নানা প্রকারে বিস্তৃতভাবে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সকল কথার আলোচনা করিয়া ঘটনাটীকে বেশ গুরুত্ব দিয়াছেন।

এ প্রসঙ্গে নেপোলিয়নের ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারটীই হইতেছে প্রধান সমস্যার বিষয়। তাঁহার জীবনকালে ও মৃত্যুর পর কিছুদিন পর্য্যন্ত তাঁহার স্বপক্ষ ও বিপক্ষদল এই কথা লইয়া নানা আন্দোলন আলোচনা করিয়াছেন। এক পক্ষ বলিয়াছেন, নেপোলিয়ন প্রকৃতই ইসলাম্‌ গ্রহণ করিয়াছিলেন। আবার অন্যদল বলেন, তিনি লোক দেখান ভাবে ও প্রাচ্যের অধিবাসীদিগকে ভুলাইবার উদ্দেশ্যে নিজকে মুসলমান বলিয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন। ঐতিহাসিকগণ সকলেই একবাক্যে বলিয়াছেন—মিসর পঁহুছিবার পূর্ব্বেই সেখানকার জনসাধারণকে উদ্দেশ করিয়া নেপোলিয়ন একটী ঘোষণাপত্র প্রচার করিয়াছিলেন। তাহাতে তিনি লিখিয়াছিলেন—আমি এসলাম ও কোরআনের আদৌ বিরুদ্ধবাদী নহি, বরং আমি এসলামের একজন প্রকৃত হিতৈষী। আমার ইচ্ছা এসলাম আবার পূর্ব্বের ন্যায় শক্তিশালী ও মহিমামণ্ডিত হয়, এসলামের বিধি ব্যবস্থা রীতিমত প্রতিপালিত হয় ও তাহার বিপক্ষপক্ষ সম্পূর্ণরূপে পর্য্যুদস্ত ও বিফলমনোরথ হইয়া যায়। মিসর যাইবার পথে তিনি এসলাম ধর্ম্ম সম্বন্ধে সকল আবশ্যকীয় কথা জানিয়া লইয়াছিলেন। এসলামের রীতিনীতি ও বিধিব্যবস্থা শিক্ষা করিয়াছিলেন। মিসরের আলেম ও মশায়েখ (ধর্ম্মাচার্য্য) সম্প্রদায়কে এসলামী শিক্ষা ও এসলাম ধর্ম্ম সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা দেখাইয়া বিস্মিত ও চমকিত করিয়া দেওয়াই নাকি তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। এসলামের মহিমা ও সত্যতা সম্বন্ধে তাঁহার পূর্ণ বিশ্বাস ও গভীর আস্থার কথা তিনি সকলকে প্রকাশ্য ভাবে জানাইয়া দিতেন। সেণ্ট হেলেনায় লিখিত আত্ম জীবনীতে তিনি বলিয়াছেন—মিসরের আলেমদের সহিত আমি এসলাম ধর্ম্ম সম্বন্ধে বিভিন্ন সময়ে বিস্তৃতরূপে আলোচনা করিয়াছি এবং সত্যিকার মোসলমান হইতে হইলে কি কি আবশ্যক, তাহাও আমি বিশেষ ভাবে জানিয়া লইয়াছি।

মুছলমান বেশে নেপোলিয়ন।

ঐতিহাসিকগণ স্বীকার করিয়াছেন যে, নেপোলিয়নের সৈন্য বিভাগের উর্দ্ধতন কর্ম্মচারীদিগের মধ্যে অনেকেই এসলাম গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং তাঁহারা মোসলমানদের সহিত কুটুম্বিতাসূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। ক্লীপারের হত্যার পর জ্যাক মেনোঁ মিসরের প্রধান সেনাপতি পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তিনি প্রকাশ্য ভাবে এসলাম ধর্ম্ম গ্রহণ ও একটী সম্ভ্রান্ত মোসলেম মহিলাকে বিবাহ করিয়া আবদুল্লা জ্যাক নামে অভিহিত হইয়াছিলেন।

নেপোলিয়নের বিপক্ষ দলভুক্ত খৃষ্টান লেখকগণ বলিয়াছেন—তিনি সত্য সত্যই এসলাম ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন—অন্ততঃ প্রকাশ্য ভাবে নিজকে মুসলমান বলিয়া প্রচার করিয়াছিলেন। এই দল, ধর্ম্মভ্রষ্ট 'বেদীন' বলিয়া তাঁহার উপর অভিযোগ আনয়ন করিয়াছেন।

মিসরে প্রবেশ করিয়াই নেপোলিয়ন ঘোষণা প্রচার করিয়াছিলেন—Cadis, Sheikhs, Imams, tell the people that we too are true Mussalmans, অর্থাৎ কাজী, শেখ ও এমামগণ, সর্ব্বসাধারণকে বলিয়া দিউন, আমরাও সত্য সত্যই মুসলমান। নেপোলিয়ন মিসরের জনসাধারণ এবং প্রাচ্যবাসীদের সকলকেই উদ্দেশ করিয়া বলিয়াছিলেন—দয়ামর আল্লার নামোল্লেখ করিয়া বলিতেছি; একমাত্র আল্লাহ ভিন্ন অন্য কেহ উপাস্য নাই, মহাম্মদ (দঃ) তাঁহার প্রেরিত তত্ত্ববাহক। তাঁহার ঘোষণাপত্রে লিখিত হইয়াছিল—In the name of the Merciful God; there is but one God and Mohammad is His prophet. তিনি যে খৃষ্টান ধর্ম্ম মানিতেন না, তাহা ঐতিহাসিকগণ সকলেই স্বীকার করিয়াছেন। অধিকন্তু বিশ্বস্ত সূত্রে প্রমাণিত হইয়াছে যে, নেপোলিয়ন কখন কোনও গীর্জ্জায় উপাসনায় যোগ দেন নাই। সেনানায়কদিগকে তাঁহাদের এসলাম গ্রহণ প্রকাশ্য ভাবে প্রচার করিতে ও এসলামী পোষাক পরিচ্ছদ পরিধান করিতে তিনি অনুমতি দিয়াছিলেন। তিনি স্বয়ং মছজেদে এমামের পশ্চাতে সাধারণ মুসল্লীদের শ্রেণীভুক্ত হইয়া প্রকাশ্য নামাজে যোগ দিতেন। তাঁহার জীবনী লেখকগণ লিখিয়াছেন—Throughout his Career this great Emperor denied always that he was a Christian and when we consider his repeated assertions, his good will to Muslims, and that he actually allowed his generals to openly declare their conversion, and to wear the turban and robes, it seems that in his heart Nepoleon the Great was in very truth a Musalman.

অন্য একজন লিখিয়াছেন—He never said prayers in a church but we have history to remind us that we frequently prayed in a Musque. This great man humbled himself before his

creator, and stood in line in the Musque with all True—Believers, following the Imam as he never did a priest.

নেপোলিয়নের সিরিয়া আক্রমণ উপলক্ষে ব্রিটীশ গভর্ণমেন্টের পক্ষ হইতে সার সিড্‌নী স্মিথ, সিরিয়ার খৃষ্টান জনসাধারণকে লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন—"সিরিয়ার প্রকৃত ধর্ম্মবিশ্বাসী খৃষ্টান সম্প্রদায়, তোমাদের ইংরাজ জেনারালের উপর সম্পূর্ণরূপে আস্থা স্থাপন করিবে, তিনি একজন প্রকৃত ধার্ম্মিক খৃষ্টান। পক্ষান্তরে নেপোলিয়ন চিরদিনই ধর্ম্ম বিশ্বাস হীন নাস্তিক; বিশেষতঃ এখন আবার তিনি প্রকাশ্য ভাবে এসলাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন।"

নেপোলিয়নের প্রতিদ্বন্দ্বী বিখ্যাত নৌযুদ্ধ বিশারদ লর্ড নেলসন তাঁহার ইতিহাস প্রসিদ্ধা লেডি হ্যামিলটন্‌কে লিখিয়াছিলেন—মিসরে নেপোলিয়নের ইসলাম ধর্ম্মে দীক্ষিত হওয়া ও সেই সংবাদ ভারতের অধঃপতিত নবাবদের কর্ণগোচর হওয়া আমার নিকট আদৌ অসম্ভব মনে হয় না।

ফ্রান্সের যুগ পরিবর্ত্তনের সুবিখ্যাত নায়ক, মিঃ ট্যালির‍্যাণ্ড (Talleyrand) নেপোলিয়নের জীবন বৃত্তান্তে লিখিয়াছেন—মমলুকদের উষ্ণীষ ধারণ ও তাহাদের পোষাক পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া নেপোলিয়ন মিসরের বিখ্যাত আলেম ও ধর্ম্ম-যাজকদের নিকট উপস্থিত হইতেন এবং প্রকাশ্য ভাবে বলিতেন, আমি ইসলামকে পুনর্জ্জীবিত করিতে ও তাহার বৈরী দলের সহিত 'জেহাদ' ঘোষণা করিতেই মিসরে আসিয়াছি। তাঁহার এই আচরণের জন্য তাঁহাকে জীবনে কখনও অনুতপ্ত বা দুঃখিত হইতে দেখি নাই।

নেপোলিয়নের প্রসিদ্ধ জীবনীলেখক মিঃ এলিসন বলিয়াছেন—নেলসন যদি আবুকীরের নৌবহর ধ্বংশ করিতে সক্ষম না হইতেন এবং নেপোলিয়নের ভাগ্য যদি সুপ্রসন্ন হইত, তাহা হইলে তিনি এক হস্তে কোরআন ও অন্য হস্তে কৃপাণ লইয়া ভারতের আসরে অবতীর্ণ হইতেন এবং ভারতবাসীদের নিকট প্রকাশ্য ভাবে ঘোষণা প্রচার করিতেন যে, ইসলামের বৈরীদলকে দূরীভূত করিয়া দিবার জন্যই তিনি ভারতে আসিয়াছেন।

সুবিখ্যাত মনিষী সার ওয়াল্‌টার স্কট লিখিয়াছেন—মিসরের 'শেখ' সম্প্রদায় প্রকৃত মোসলমান ভিন্ন অন্য কাহাকেও সসম্মানে অভ্যর্থনা করিতে পারেন না, ইহা জানিতে পারিয়াই বোনা পার্ট ইসলাম গ্রহণ করিতে প্রস্তুত হইয়াছিলেন।

ঐতিহাসিক 'ফিন' বলিয়াছেন—নেপোলিয়ন মিসরের মোসলমান ধর্ম্ম-নেতাদিগকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য তাঁহাদের সম্মুখে খৃষ্টান ধর্ম্মের বিরুদ্ধে অনেক কথা বলিতেন, এমন কি খৃষ্টান ধর্ম্মের বিধি ব্যবস্থা সমূহের উল্লেখ করিয়া পরিহাস করিতে এবং খৃষ্টানদিগকে গালাগালি দিতেও কুণ্ঠিত হইতেন না।

বিরুদ্ধবাদী সম্প্রদায় নেপোলিয়নের বিরুদ্ধে স্থায়ী ভাবে আন্দোলন চালাইবার উদ্দেশ্যে একটী সমিতি স্থাপন করিয়াছিলেন, সেই সমিতির পক্ষ হইতে 'টেলর' নামক একজন লেখক "নেপোলিয়নের ইসলাম গ্রহণ" নামে একটী পুস্তিকা প্রকাশ করিয়াছিলেন। এই পুস্তিকায় এক হস্তে কোরআন ও অন্য হস্তে কৃপাণসহ তাঁহার বিভীষিকাপূর্ণ একটী চিত্র অঙ্কিত হইয়াছিল।

সেণ্ট হেলনায় লিখিত নেপোলিয়নের স্বরচিত জীবনী দুই খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছে। তাহাতে তিনি মিসর সম্বন্ধীয় অনেক ঘটনার আলোচনা করিয়াছেন। এক স্থানে লিখিয়াছেন—সুযোগ পাইলে আমি একজন মুসলমান রূপে প্রাচ্য জগতে রীতিমত অভিযান করিতাম। কিন্তু "তিনি ইসলাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন" বলিয়া খোলাখুলি কোন কথা তাহাতে দেখিতে পাওয়া যায় না।

হিজরী একাদশ ও দ্বাদশ শতাব্দীতে নিম্নলিখিত স্বনামধন্য আলেমগণ মিসরে এসলাম জগতের শোভা বর্দ্ধন করিয়াছিলেন—

১। দর্‌রতুল গওয়াস্ নামক কেতাবের রচয়িতা শেহাবুদ্দীন খাফফাজী।

২। তাজুল্ ওরুস্ কেতাবের রচয়িতা সৈয়দ মোর্ত্তজা জোবেদী।

৩। ওকদুল জোম্মান ও সিরাতুশ্‌শামিয়া নামক গ্রন্থদ্বয়ের রচয়িতা শামসুদ্দীন শামী।

৪। কাওয়াকেবুদ্-দুররিয়া গ্রন্থের রচয়িতা আবুবাকার।

৫। 'সিরাতুল হালাবিয়া'র প্রণেতা নূরুদ্দীন হালাবী।

৬। খোলাসাতুল্ আসরের প্রণেতা এব্‌নে ফজলুল্লাহ মুহেব্বী।

৭। লাতায়েফুল আখ্‌বারের রচয়িতা আবুল ফাতাহ্ এসহাক

৮। নফ্‌হত্তীবের রচয়িতা আবুল আব্বাস।

৯। তোহ্‌ফাতুল্‌ বাহিয়ার রচয়িতা শামসুদ্দীন বাকরী।

১০। তোহ্‌ফাতুল্‌ আহ্‌বারের রচয়িতা এব্‌নে ইউসফ্‌।

১১। তনভীরুল্‌ আব্‌সারের রচয়িতা শামসুদ্দীন তামার তাশী।

১২। হানাফিয়া গ্রন্থের টীকাকার শারম্বলাভী।

১৩। মওয়াহেব ও মোওয়াত্তা'র টীকা রচয়িতা শেখ ইসমাইল জরকানী।

নেপোলিয়ন ১২১৩ হিজরী সনে অর্থাৎ ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথমে মিসর আক্রমণ করেন, সুতরাং উপরের লিখিত মহোদয়গণের নিকটবর্ত্তী সময়েই তাঁহার মিসর আক্রমণের ব্যাপার ঘটিয়াছিল।

মিসর ও সিরিয়ার অধিবাসী আজ্‌হারের অধ্যাপক বহু বিখ্যাত আলেম নেপোলিয়নের মিসর অধিকারের সময় বর্ত্তমান ছিলেন। তাঁহারা অধ্যাপনা, গ্রন্থরচনা ও ধর্ম্মালোচনায় ব্যাপৃত থাকিতেন। তাঁহাদের মধ্যে নিম্নলিখিত মহোদয়গণ নেপোলিয়ন ও তাঁহার উর্দ্ধতন কর্ম্মচারীদের সহিত বিশেষ ভাবে পরিচিত ও সংশ্লিষ্ট ছিলেন। নেপোলিয়ন সংক্রান্ত বহু ঘটনা তাঁহারা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।

**(১) শেখ আবদুল্লাহ্‌ শরকাভী** :—মিসরের নাগরিক সুবন্দোবস্তের জন্য 'দীওয়ান' নাম দিয়া ১৪ জন সভ্যের সমবায়ে নেপোলিয়ন একটী ব্যবস্থাপরিষদ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। মহাত্মা শেখ আবদুল্লাহ সেই সভার সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। তিনি জামেআজ্‌হারের একজন বিখ্যাত অধ্যাপক ও কুড়িটীর বেশী গ্রন্থের রচয়িতা ছিলেন। তাঁহার তোহ্‌ফাতুন্‌-নাজেরীণ গ্রন্থে তিনি নেপোলিয়নের মিসর আক্রমণ হইতে সদলবলে স্বদেশে প্রত্যাগমন পর্য্যন্ত যাবতীয় ঘটনা স্বচক্ষে দেখিয়া সংক্ষিপ্ত ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। ১১৫০ হিজরী সনে তাঁহার জন্ম ও ১২২৭ হিজরীতে (১৮১২ খৃঃ) তিনি পরলোকগমন করেন। তাঁহার বিখ্যাত তোহ্‌ফাতুন্‌-নাজেরীণ গ্রন্থ মিসরে মুদ্রিত হইয়াছে।

**(২) শেখ সোলায়মান** :—ইনিও আজ্‌হারের অন্যতম অধ্যাপক ও মিসরের ব্যবস্থা পরিষদের (দীওয়ানের) সভ্য ছিলেন। নেপোলিয়নের মিসর পরিত্যাগের পর, প্রধান সেনাপতি ক্লীপার, সোলায়মান হালাবী কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছিলেন। ফ্রান্সের সামরিক বিভাগ হইতে এই ঘটনার তদন্ত ও হত্যাকারীর শাস্তি বিধান জন্য বিশেষ ব্যবস্থা হইয়াছিল। এই ব্যাপারে শেখ সোলায়মানও নানা বিপদে জড়ীভূত হইয়া পড়িয়াছিলেন। কিন্তু অনেক আন্দোলন আলোচনার পর তিনি নির্দ্দোষ সাব্যস্ত হইয়া খালাস পাইয়াছিলেন। মিসরের তৎকালীন অবস্থা বর্ণনা করিয়া শেখ মহোদয় 'আল-ওকায়ে-ওয়ান্‌-নওয়াজেল' নামক একটী গ্রন্থ লিখিয়াছেন। ইনি ১৩৩২ হিজরী (১৮১৬ খৃঃ) সনে পরলোকগমন করেন।

শেখ আবদুল্লা শরকাভী।

শেখ ছোলায়মান ফয়ুমী।

(৩) **শেখ খলিল বাকরী** :—প্রথম খলিফা মহাত্মা আবুবাকার সিদ্দিকের বংশধর ও মিসরের ব্যবস্থা পরিষদের সভ্য ছিলেন। নেপোলিয়ন ও সরকারী কর্ম্মচারীগণ তাঁহাকে বিশেষ শ্রদ্ধা করিতেন। সময় সময় তাঁহারা খলিল বাকরীর বাড়ীতে আসিতেন এবং তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়া গিয়া আহারাদি করাইতেন। তিনি একজন প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক ও কবি ছিলেন। নেপোলিয়নের মিসর আক্রমণ প্রভৃতি ঘটনা বর্ণনা করিয়া অনেকগুলি কবিতা লিখিয়াছিলেন। ফরাসী ভাষায় ঐ সকল কবিতা অনূদিত ও প্রচারিত হইয়াছিল। ১২৩৫ হিজরী ( ১৮২০ খৃঃ ) সনে তাঁহার মৃত্যু হয়।

(৪) **শেখ মহাম্মদ মেহ্দী** :—ইনিও আজ্হারের একজন বিখ্যাত অধ্যাপক ও নেপোলিয়নের ব্যবস্থা পরিষদের সভ্য ছিলেন। "তোহফাতুল্ মোস্তায়্কেজীন" নামে তাঁহার একখানি বিরাট ঐতিহাসিক গ্রন্থ আছে। ফ্রান্সবাসীগণ সে সময় ঐ কেতাবটী সঙ্গে লইয়া দেশে ফিরিয়া যান। সেখানে তাঁহারা ফরাসী ভাষায় অনুবাদ করিয়া তাহা মুদ্রিত ও প্রকাশিত করিয়াছিলেন; ১২৩০ হিজরী ( ১৮১৫ খৃঃ ) সনে তিনি পরলোকগমন করিয়াছেন।

(৫) **আব্দর রহমান জবরতী** :—জবরং আবিসিনিয়ার অন্তর্গত একটী পল্লী, ইঁহার পূর্ব্বপুরুষগণ ঐ স্থান হইতে আসিয়া মিসরে বসবাস করিয়াছিলেন। নেপোলিয়ন ব্যবস্থা পরিষদ স্থাপন করিয়া আব্দর রহমানকে ঐ পরিষদের লেখাপড়ার কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। এইরূপে তিনি অধিকাংশ সময় নেপোলিয়নের সান্নিধ্য লাভ করিবার ও তাঁহার আচার ব্যবহারাদির ও সরকারী কাগজপত্রের সহিত বিশেষভাবে পরিচিত হইবার সুযোগ পাইয়াছিলেন। তিনি মিসরের অবস্থা বর্ণনা করিয়া "আজায়েবুল আসার" নামে একখানি বিরাট গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন। তাহা "তারিখে জবরতী নামেই প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। ঐতিহাসিক এবনে আয়াসের লিখিত মিসরের ইতিহাসে বর্ণিত ঘটনা সমূহের পরবর্ত্তী সময় হইতে আরম্ভ করিয়া তাঁহার নিজের সময় পর্য্যন্ত ( ১১৪২ হিজরী হইতে ১২৩৬ হিজরী পর্য্যন্ত ) মিসরের যাবতীয় ঘটনা ধারাবাহিকরূপে সংক্ষিপ্ত ভাবে ইহাতে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। সম্ভবতঃ ১২৪০ হিজরী ( ১৮২৫ খৃঃ ) সনে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে।

(৬) **সৈয়দ ইসমাইল খাশ্সাব** :—নেপোলিয়ান আরবী অক্ষর ও একটী আরবী মুদ্রাযন্ত্র সঙ্গে লইয়া গিয়াছিলেন, তিনি ইহার সাহায্যে আরবী ভাষায় একখানি সংবাদপত্র বাহির করিতেন, বিচার-বিভাগ ও সৈন্য-বিভাগের সমস্ত বিবরণী ঐ কাগজে প্রকাশিত হইত। এইটাই পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বপ্রথম আরবী সংবাদপত্র বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। সৈয়দ ইসমাইল এই কাগজের সম্পাদক ছিলেন। এজন্য নেপোলিয়নের রাজ-নৈতিক ও ব্যক্তিগত আচার ব্যবহার সম্বন্ধে অনেক বিষয়ের অভিজ্ঞতা লাভ করিবার বিশেষ সুযোগ তিনি পাইয়াছিলেন। ১২৩০ হিজরী সনে তাঁহার মৃত্যু হয়।

শেখ খলিল বকরী।
( নেপোলিয়নের সময় মিসরে ছৈয়দগণের সমাজপতি )

মিসরের বাহিরে আরও দুইজন সুবিখ্যাত ঐতিহাসিকের নাম দেখিতে পাওয়া যায় তাঁহাদের মধ্যে একজন 'নকুলাতোক' ও অন্যজন আমীর হায়দার মেহাব। তাঁহাদের উভয়েই মিসরের বহু ঘটনা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

'নকুলাতোক' লাবনানের একটী সম্ভ্রান্ত খৃষ্টান বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার পূর্ব্বপুরুষ কনষ্টাণ্টিনোপল হইতে আসিয়া লাবননে বসবাস করিয়াছিলেন। নেপোলিয়ানের সময়েই তিনি নেপোলিয়নের জীবনী আরবীভাষায় গ্রন্থাকারে লিখিয়া ছিলেন। তাঁহার ঐ গ্রন্থের প্রথম খণ্ড ফরাসীভাষায় অনুবাদ সহ ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে প্যারিস নগরীতে প্রচারিত হইয়াছিল। এই খণ্ডে ফরাসীদের মিসর পরিত্যাগ

করিয়া স্বদেশ প্রত্যাগমন পর্য্যন্ত সময়ের যাবতীয় ঘটনা বর্ণিত হইয়াছে। এটা নেপোলিয়নের জীবনী সম্বন্ধে সর্ব্ব প্রথম গ্রন্থ। সে সময় ইউরোপেও তাঁহার কোন জীবনী লিখিত হয় নাই। নেপোলিয়নের সিরিয়া আক্রমণের বহু ঘটনা লেখক স্বচক্ষে দেখিয়াছিলেন। ১২৪৪ হিজরী (১৮২৮ খৃঃ) সনে তিনি পরলোক গমন করেন।

আমীর হায়দার লাবনানের মেহাব নামক একটী সম্ভ্রান্ত বিদ্বান ও ধনী পরিবারে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি লাবনান ও সিরিয়ার অবস্থা বর্ণনা করিয়া কয়েকটী ঐতিহাসিক গ্রন্থ লিখিয়াছেন, নেপোলিয়নের মিসর ও সিরিয়া আক্রমণের ঘটনাও তাহাতে লিখিত হইয়াছে। তন্মধ্যে 'গোররুল-হেসান' ও নোজহাতুজ্-জামান গ্রন্থদ্বয় বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ১২৫১ হিজরী (১৭৩৫ খৃঃ) সনে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে।

ফরাসীগণ মিসরের ব্যবস্থা-পরিষদের (দীওয়ানের) সভ্যগণের সকলেরই চিত্র অঙ্কিত করিয়াছিলেন এবং প্রাচ্যের স্মরণীয়রূপে সেগুলি স্বদেশে লইয়া গিয়াছিলেন। অবরতী তাঁহাদের চিত্রাঙ্কন কার্য্যের নিপুণতা দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন।

নেপোলিয়ন আরবী মুদ্রাযন্ত্রের কার্য্যে 'মার্সেল' নামক একজন প্রাচ্য বিদ্যাবিশারদ পণ্ডিতকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। মার্সেল, 'মালুমাত্তেমেসের' নামে একখানি গ্রন্থ লিখিয়া তাহাতে উপরের বর্ণিত চিত্রগুলি প্রকাশ করিয়াছিলেন। এই সকল চিত্র হইতে তৎসাময়িক 'ওলামা' ও মাশায়েখের শারীরিক গঠন, হাব-ভাব ও পোষাক-পরিচ্ছদের আদর্শ দেখিতে পাওয়া যায়। এবং ইহা হইতেই আল্লামা এমাম জাহবী, এমাম মুজী এব্‌নে দাকীকিল্ ঈদ, তাকীয়দ্দীন সুব্‌কী হাফেজ বারজালী, হাফেজ এব্‌নে হাজার আস্‌কালানী, হাফেজ সাখাভী, জালালুদ্দীন সেউতী প্রভৃতি দেশ প্রসিদ্ধ আলেমদের লেবাস্, পোষাক ও হাব-ভাব সম্বন্ধেও অনেক পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহাদের সময় পর্য্যন্ত মিসর ও সিরিয়ার সভ্য সমাজে একই ভাবের বন্যা বহিয়াছিল। প্রায় চারি শত বৎসর পর্য্যন্ত সে দেশে কোন বিষয়ে কোন পরিবর্ত্তন দেখা দেয় নাই।

এখন প্রশ্ন হইতেছে নেপোলিয়নের এসলাম গ্রহণ সম্বন্ধে উপরের বর্ণিত সুবিখ্যাত আরবী ঐতিহাসিকগণ কি লিখিয়াছেন? তাঁহাদের ন্যায় প্রত্যক্ষদর্শী নিরপেক্ষ ঐতিহাসিকগণের সাক্ষ্য হইতেই এই সমস্যার সম্পূর্ণ সমাধান হইয়া যায়।

তাঁহারা সকলেই একবাক্যে একসুরে সুর মিলাইয়া বলিয়াছেন—মিসরের প্রসিদ্ধ আলেমদের নিকট নেপোলিয়ান প্রকাশ্য ভাবে এসলাম ধর্ম্মে দীক্ষা (بیعت) গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি সকল সময় সকল জায়গায় নিজেকে মুসলমান বলিয়া পরিচয় দিতেন। ইসলামী পোষাক-পরিচ্ছদ পরিধান করিতেন। জোমআর দিনে জামে মসজিদে এমামের পিছনে রীতিমত জামা'তে নামাজ পড়িতেন। একবার তিনি মুসলমানী পোষাকে সজ্জিত হইয়া তাঁহার ছবি তুলাইয়াছিলেন, অধ্যাপক মার্সেল্ তাঁহার গ্রন্থে সেই ছবিটাই প্রকাশ করিয়াছেন।

নেপোলিয়নের এছলাম গ্রহণ সম্বন্ধে এই সকল নিরপেক্ষ ও সমসাময়িক এমনকি তাঁহার সহকর্ম্মী ঐতিহাসিকগণের সাক্ষ্যে আরও অনেক অভিনব তত্ত্ব অবগত হইতে পারা যায়। ভবিষ্যতে এ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করার ইচ্ছা রহিল।

---

# কাঁটাফুল

[ শাহাদাৎ হোসেন ]

( পূর্ব্বানুবৃত্তি )

( ৩ )

বৎসরাধিক কালের অদর্শন সত্ত্বেও রাবেয়া মনে মনে ধারণা করিয়া বসিয়াছিল যে, কলিকাতা-যাত্রার পূর্ব্বে খলিল অবশ্যই তাহার সহিত একবার দেখা করিতে অন্ততঃ বিদায় লইতেও আসিবে। খলিলের বিদায়-যাত্রার শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত তাহার অন্তরে এ-ধারণা বলবতী ছিল, কিন্তু কার্য্যতঃ যখন তাহার সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম ঘটিল, তখন একটা দুর্জ্জয় অভিমানে তাহার অন্তর্দ্দেশ পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। তাহারই বাড়ীর সম্মুখ দিয়া গাড়ী চলিয়া গেল, অথচ খলিল একবার উঁকি মারিয়া দেখিবারও প্রয়োজন মনে করিল না। রাবেয়া ইচ্ছা করিলে সবই সহ্য করিতে পারে, খলিলের জীবনব্যাপী অদর্শনও হয়ত প্রয়োজন মনে করিলে সহিয়া যাইতে পারে, কিন্তু উপেক্ষার এই নির্ম্মম বিষ-বাণ সে আদৌ সহ্য করিতে পারে না, তাই তাহার বুকের ভিতর বহু দিনের সঞ্চিত অভিমান এই নিদারুণ আঘাতে গুমরিয়া উঠিল। নিজের হাতে আশার সমাধি রচিবার জন্য সে দৃঢ়সঙ্কল্প হইল।

দিনে দিনে সকলেই রাবেয়ার মতি গতির পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিতে লাগিল। সে যে এখন আর খলিলের নামটী পর্য্যন্ত শুনিতে রাজী নয়,—সমবয়স্কা সঙ্গিনী দল হইতে তাহার পিতা পর্য্যন্ত কাহারও আর একথা জানিতে বাকী রহিল না। কিন্তু এই আকস্মিক পরিবর্ত্তনের কারণ যে কি, কেহই তাহা তলাইয়া বুঝিবার চেষ্টা করিল না। এমন কি রাবেয়ার পিতাও নয়। কন্যার 'সাময়িক মনোবিকারের' জন্য তাঁহার মনের এক কোণে যে একটু চিন্তার মেঘ জমিয়াছিল, এত দিনে সেটুকু সরিয়া গেল দেখিয়া তিনি সোয়াস্তির নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন এবং অন্য-কিছু তলাইয়া বুঝিবার জন্য পণ্ড শ্রম না করিয়া কন্যাকে পাত্রস্থা করিবার উদ্দেশ্যে মনোমত পাত্রের সন্ধানে ব্যাপৃত হইলেন।

কিন্তু মনোমত পাত্রের সন্ধান পাওয়াটা তিনি কল্পনায় যতটা সহজ বলিয়া মনে করিয়াছিলেন, কার্য্যকালে দেখিলেন ঠিক তাহার বিপরীত। তাই দীর্ঘ এক বৎসর কালের চেষ্টার পরেও যখন তিনি সকল বিষয়ে নিখুঁত পাত্রের সন্ধান করিয়া উঠিতে পারিলেন না, তখন নৈরাশ্যের আঘাতে তাঁহার মনটা বেশ যেন একটু দমিয়া গেল। এক বৎসরের মধ্যে বহু পাত্রের সন্ধান তিনি পাইয়াছিলেন এবং ইচ্ছা করিলে যে-কোন-একটার হাতে তিনি রাবেয়াকে তুলিয়া দিতে পারিতেন; কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ তাহাদের মধ্যে একটাকেও তিনি সর্ব্বাংশে রাবেয়ার উপযুক্ত বলিয়া মনোনীত করিতে পারেন নাই। কাজেই কাহারও হাতে তাহাকে সমর্পন করিয়া তিনি নিশ্চিন্তও হইতে পারেন নাই।

কিন্তু এদিকে "ঠগ বাছ্‌তে গাঁ উজাড়" হইয়া গেল। আশে-পাশে বা অল্পদূরবর্ত্তী গ্রামে যে-সমস্ত পাত্র ছিল, তাহাদের সকলেই যখন রাবেয়ার অযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইল, তখন আর উপায় কি! কোথায়—কোন্ দূরদেশ হইতে ছেলে সন্ধান করিয়া আনিবেন, কাহারই বা খোশামোদ করিবেন। রাবেয়ার পিতা চিন্তিত হইয়া পড়িলেন।

এদিকে গ্রামের অভিজাত শ্রেণীর গুণধর পড়শীরাও 'ঝোপ বুঝিয়া কোপ' মারিতে 'কসুর' করিলেন না। সময় ও সুযোগ বুঝিয়া টিট্‌কারীর চোটে তাঁহারা রাবেয়ার পিতাকে অতিষ্ঠ করিয়া তুলিবার জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু স্থিরবুদ্ধি তিনি, সহজে ধৈর্য্য হারাইলেন না। নিজের চির-পোষিত মনোরথ পূর্ণ করিবার জন্য পূর্ব্বের মতই চেষ্টায় ব্যাপৃত হইলেন।

এই ভাবে আরও ছয়টা মাস কাটিয়া গেল। অবশেষে তাঁহার ভাগ্য প্রসন্ন হইল। [illegible] দরিদ্রা বিধবার এক [illegible]

গুণ-সম্পন্ন পুত্র আছে বলিয়া তিনি সংবাদ পাইলেন। তত্ত্ব লইয়া জানিলেন, সংবাদ সত্য। তখন আর কালবিলম্ব না করিয়া তাহারই হস্তে রাবেয়াকে সমর্পণ করিয়া তিনি সকল চিন্তা ও সমস্যার সমাধান করিয়া ফেলিলেন।

( ৪ )

এ সংবাদ শক্তিশেলের মত আসিয়াই কলিকাতায় খলিলের মর্ম্ম বিদ্ধ করিল। দীর্ঘকাল রাবেয়ার সহিত দেখা-সাক্ষাৎ না হইলেও তাহার মনোভাবের বিন্দুমাত্র ব্যতিক্রম ঘটে নাই। কৈশোরে রাবেয়া তাহার হৃদয়ের যতখানি স্থান জুড়িয়া বসিয়াছিল, এখনও ঠিক ততখানি স্থানই অধিকার করিয়া আছে। রাবেয়া তাহার দিবারাত্রির সকল চিন্তার, সকল কল্পনার, সকল স্বপ্নের নায়িকা। জীবনের আশা-আকাজ্ক্ষা, সাধনা-কামনা, গৌরব-অগৌরবের মূর্ত্ত ছবি। সেই রাবেয়া আজ একদিনে, এক মুহূর্ত্তে, একটীমাত্র কথার মার-প্যাঁচে তাহার পর হইয়া গেল! আর শুধু পর নয়, সে আজ পরের স্ত্রী।—পরের প্রণয়পাত্রী। তাহার ছায়া পর্য্যন্ত দেখিবার অধিকারও আজ তাহার নাই। এ-দুঃখ যে তাহার জীবনে কত বড় অভিসম্পাৎ, তাহা বুঝি কেবল সে-ই বলিতে পারে।

কলিকাতায় পড়িতে আসিবার পর হইতে এই দীর্ঘ দেড় বৎসর কালের মধ্যে ছুটী উপলক্ষে খলিল চারি পাঁচবার বাড়ীতে গিয়াছে। কিন্তু কোনবারেই রাবেয়ার সহিত সাক্ষাৎ করিবার সুযোগ তাহার ঘটিয়া উঠে নাই। অধিক দিন বাড়ীতে থাকিতে পারিলে হয় ত বা সুযোগ মিলিত; কিন্তু তাহার পিতা সে-পথে ঘোর অন্তরায় ছিলেন। তিনি চারি পাঁচদিনের বেশী কোনও ছুটীতে পুত্রকে বাড়ীতে থাকিতে দেন নাই। কি জানি, যদি 'চাষার' মেয়েটার সঙ্গে কোন পাকে-চক্রে আবার দেখা হইয়া যায় এবং তাহার ফলে সেই রাক্ষসী যদি ছেলেটার মাথা বিগ্‌ড়াইয়া দেয়! আজিজ সাহেবের মনে এই আশঙ্কা অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। সেই জন্য দীর্ঘ অবকাশকালেও তিনি খলিলকে চারি পাঁচ দিনের অধিক কাল বাড়ীতে থাকিতে দিতেন না। কাজেই ইচ্ছা সত্ত্বেও এই দীর্ঘকালের মধ্যে খলিল রাবেয়ার সহিত দেখা করিয়া উঠিতে পারে নাই, কিম্বা কোন পত্র লিখিবার [illegible] করিয়া উঠিতে পারে নাই।

রাবেয়ার বিবাহের জন্য তাহার পিতার প্রাণপণ চেষ্টার কথা খলিলের অজ্ঞাত ছিল না, কিন্তু তজ্জন্য সে বিশেষ চিন্তিত হয় নাই। কারণ তাহার ভরসা ছিল যে, রাবেয়া কাহারও কাছে আত্মসমর্পণ করিতে রাজী হইবে না এবং কন্যাগত-প্রাণ পিতাও কন্যার অমতে তাহাকে কাহারও হাতে তুলিয়া দিবেন না। কাজেই ইহার জন্য তাহার চিন্তা করিবার বিশেষ কোন হেতু ছিল না।

কিন্তু এদিকে যে রাবেয়ার দুর্জ্জয় অভিমান তাহার সকল আশা-আকাজ্ক্ষার মূলে কুঠারাঘাত করিয়া তাহার জীবনকে একটা তীব্র অভিসম্পাতের লীলাকেন্দ্র করিয়া তুলিতেছে, একথা সে কল্পনায়ও ভাবিতে পারে নাই। সে জ্ঞানতঃ কোন অপরাধ করে নাই, কাজেই এরূপ কল্পনা তাহার মনে না জাগাই স্বাভাবিক।

বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে খলিল একথা বুঝিতে পারিয়াছিল যে, তাহার ও রাবেয়ার মধ্যে একটা সামাজিক ব্যবধান আছে। কিন্তু সে-ব্যবধানকে তাহাদের মিলনের পথে অনতিক্রমনীয় অন্তরায় বলিয়া সে কোন দিনই মনে করিতে পারে নাই; কাজেই মিলনের আশা তাহার অন্তরে একরূপ প্রবলই ছিল বলিতে হইবে। আজ সে আশার সমাধি হইয়াছে। তাই দুর্ব্বিসহ অভিসম্পাতের তীব্র জ্বালায় খলিলের সমগ্র অন্তর জ্বলিয়া পুড়িয়া ক্ষার হইবার উপক্রম করিয়াছে।

* * * *

গ্রীষ্মের সন্ধ্যা। মেসের ত্রিতলের ছাদে একখানি চেয়ারের উপর গম্ভীর ভাবে বসিয়া খলিল নিজের অদৃষ্টের কথা চিন্তা করিতেছে। সন্ধ্যার নিবিড় ছায়া বহিঃপ্রকৃতিকে সম্পূর্ণরূপে ছাইয়া ফেলিয়াছে। খলিলের অন্তর-প্রকৃতিও নৈরাশ্যের ঘনচ্ছায়ায় সমাচ্ছন্ন। অন্তর-বাহিরের এই ছায়া-ঘন অন্ধকারের মাঝে খলিল আজ লক্ষ্যহারা জীবন-তরণীর গতি নির্দ্দেশ করিবে। কিন্তু কোন্ দিকে—কোন্ পথে?

সহসা পশ্চাদ্দিক হইতে রশীদ আসিয়া চেয়ারসমেত তাহাকে একটা ঠেলা দিয়া কহিল, কিহে, মনে মনে 'বেজায়' রকমের কবি হ'য়ে উঠ্‌লে দেখ্‌ছি যে! এত কেন?

খলিলের ধ্যান ভঙ্গ হইল। যাহার ভয়ে সে ঘর ছাড়িয়া ছাদে আসিয়া আশ্রয় লইয়াছিল, সেই-ই আসিয়া হাজির।

সে মনে মনে বিরক্ত হইয়া উঠিল, কিন্তু প্রকাশ্যে কিছুই বলিল না। একটা হুঁ শব্দ করিল মাত্র।

রশীদ খলিলের সহপাঠী। কলিকাতায় আসার পর হইতে এ-পর্য্যন্ত উভয়ে একই মেসে, একই ঘরে বাস করিতেছে। কাজেই পরস্পরের মধ্যে যথেষ্ট সৌহার্দ্দ এবং অন্তরঙ্গতা জন্মিয়াছে। রাবেয়া-ঘটিত সমস্ত ব্যাপারই খলিল রশীদকে খুলিয়া বলিয়াছিল, কাজেই রশীদের অজানা কিছুই ছিল না; কিন্তু এটাকে ততটা 'গুরুতর' কিছু বলিয়া সে আদৌ মনে করে নাই; তাই সময়ে-অসময়ে খলিলকে অনন্যমন হইয়া চিন্তা করিতে দেখিলেই সে তাহাকে ঠাট্টার চোটে অস্থির করিয়া তুলিত।

আজ কিন্তু খলিলের ভাব অন্যরূপ। রশীদের পরিহাসকে সম্পূর্ণরূপে এড়াইয়া সে আগের মতই গম্ভীর হইয়া বসিয়া রহিল। রশীদ যে তাহা লক্ষ্য করিল না, তাহা নহে। কিন্তু সে নাছোড়বান্দা। তাই আরও একটু 'রসান' দিয়া পুনরায় বলিয়া উঠিল, কাল থেকে একটু একটু অডিকলোন ব্যবহার করতে শুরু কোরো হে, নইলে দিনে-দিনে অবস্থা যা' হ'য়ে উঠ্‌ছে, তাতে শীগ্‌গির তোমায় রাঁচীর অতিথিশালায় গিয়ে 'আস্তানা' নিতে হবে।

খলিল পূর্ব্ববৎ নীরব। রশীদের কথা যেন সে আদৌ শুনিতে পায় নাই এমনি ভাবে বসিয়া রহিল। রশীদের মনে বিস্ময় জাগিয়া উঠিল। সে ত খলিলের এমন ভাব কোন দিন দেখে নাই! তবে কি সত্য সত্যই গুরুতর কিছু ঘটিয়াছে। পরিহাস বিদ্রূপের প্রবৃত্তি তাহার মন হইতে দূরে সরিয়া গেল। সে বন্ধুর গায়ে হাত দিয়া সহানুভূতিপূর্ণ কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, কি হ'য়েছে ভাই খলিল, অমন করে' বসে' আছিস্ কেন?

এবারও খলিল মুখ খুলিল না, একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিল মাত্র। রশীদের বিস্ময় উত্তরোত্তর বাড়িয়া চলিল। ব্যগ্র ব্যাকুল কণ্ঠে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল, বল্ ভাই, বল্ কি হয়েছে? কোন দুঃসংবাদ এসেছে কি?

খলিল মুখ তুলিয়া বন্ধুর পানে চাহিল। অন্ধকার না হইলে রশীদ দেখিতে পাইত—সে চাহনি কত করুণ, কত মর্ম্মস্পর্শী!

আমার একটা উপকার করবে ভাই!—খলিল ধরা গলায় বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করিল।

তাহার স্বর শুনিয়া রশীদের অন্তর গলিয়া গেল। সে সস্নেহে বন্ধুর ডান হাতখানি দুই হাতের মুঠার মধ্যে ধরিয়া সমবেদনার স্বরে জিজ্ঞাসা করিল, কি উপকার ভাই!

—আমাকে কিছু টাকা ধার দেবে?

রশীদ যেন আকাশ হইতে পড়িল। খলিলের পিতার ত টাকার অভাব নাই। তবে?—

কিন্তু সে মনোভাব সম্পূর্ণরূপে চাপিয়া রাখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কত টাকা?

—দু'শো।

একটু চিন্তা করিয়া রশীদ বলিল, দিতে পারি, কিন্তু এখানে ত কিছু নেই। যদি দেরী করতে পার, তাহ'লে বাড়ী থেকে আনিয়ে দিতে পারি।

—সে অনেক দেরীর কথা।

তাহার কণ্ঠে হতাশার সুর ধ্বনিয়া উঠিল।

—অনেক দেরী নয়, জরুরী তার করে' দিলে কাল সন্ধ্যার ভিতরেই টাকা এসে যাবে।

খলিলের মনটা যেন অনেকখানি চাঙ্গা হইয়া উঠিল। সে বন্ধুর হাত ধরিয়া মিনতির স্বরে কহিল, তবে তাই করে' দাও ভাই। কাল সন্ধ্যা পর্য্যন্ত আমি অপেক্ষা করব।

—বেশ, আমি যাচ্ছি—কিন্তু ভাই আমার একটা অনুরোধ তোমায় রাখ্‌তে হবে।

—কি?

—কি হ'য়েছে, আমায় সব খুলে বল্‌তে হবে। আমি জানি, শুধু টাকার জন্য তুমি এমন করে' ভাব্‌ছ না। তোমার এ ভাবনার কারণ কি, আমায় ভেঙে বল।

খলিল মাথা নীচু করিয়া নীরবে বসিয়া রহিল। কোন উত্তর দিল না। রশীদ আবার বলিল, চুপ করে' রইলে কেন ভাই, বল কি হ'য়েছে। যদি আমার দ্বারা তোমার এ ভাবনা দূর হবার কোন সম্ভাবনা থাকে, তা'হলে শপথ করে' বল্‌ছি, আমি প্রাণপণে তার জন্য চেষ্টা করব।

খলিল মাথা তুলিয়া বন্ধুর মুখপানে চাহিল। তাহার পর বেশ সংযত স্বরে কহিল, আজ দেড় বৎসর ধরে' আমি যা' ভেবে এসেছি এবং যা' নিয়ে এতদিন তুমি আমায় রহস্য করে' এসেছ, সেইটাই আজ জটিলতর হ'য়ে জীবন-মরণ সমস্যার কারণরূপে আমার মনের ভিতর জেগে উঠেছে। আমার মনে প্রবল আশা ছিল যে, সহস্র অন্তরায় থাকলেও

একদিন না একদিন আমাদের মিলন হবেই, প্রাণের গতি রোধ করা মানুষের সাধ্য নয় ; কিন্তু আজ আমার সে আশা, সে-ধারণার সমাধি হ'য়েছে।

বিস্মিত আগ্রহে রশীদ জিজ্ঞাসা করিল, কেন—কি হ'য়েছে।

—রাবেয়া আজ বিবাহিতা—পরস্ত্রী। মিলন ত দূরের কথা, তা'র চিন্তাও এখন আমার পক্ষে পাপ।

সমস্ত শুনিয়া রশীদ কিছুক্ষণ গম্ভীর হইয়া রহিল, তাহার পর সহসা জিজ্ঞাসা করিল, এখন তুমি কি করবে স্থির করেছ ?

—স্থির কিছু করিনি। তবে উপস্থিত কিছুদিনের জন্য আমি বাইরে চলে' যাব।

—তাতে লাভ কি হবে ?

—ভুল বুঝ্‌ছ ভাই, লাভালাভ দেখ্‌বার মত মনের অবস্থা আমার নাই। শুধু কল্‌কেতায় থাকা অসম্ভব হ'য়ে উঠেছে বলেই আমি বাইরে পালাতে চাচ্ছি।

রশীদ আর কোন প্রশ্ন না করিয়া চুপ করিয়া রহিল।

অন্য কেহ হইলে হয় ত খলিলের এই চিন্তাকে একটা সাময়িক মনোবিকার বা বাহিরে যাওয়ার এই সঙ্কল্পকে একটা উদ্দাম খেয়াল মাত্র বলিয়া উড়াইয়া দিত ; কিন্তু রশীদ তাহা করিল না। কারণ, দীর্ঘ দেড় বৎসর কালের সর্ব্বক্ষণের সাহচর্য্যের ফলে সে খলিলকে ভালরূপেই চিনিয়া লইয়াছে। তাহার অন্তর বাহিরের 'কোন-কিছু'ই তাহার কাছে গোপন নাই। খলিল যে রাবেয়া গত প্রাণ, তাহা তাহার চিন্তায়, কথাবার্ত্তায়, আলোচনা প্রসঙ্গে রশীদ বহুদিন আগেই বুঝিয়া লইয়াছে। তাই ছাত্র জীবনের কর্ত্তব্য বিসর্জ্জন দিয়া উজ্জল ভবিষ্যৎকে অন্ধকারে ডুবাইয়া খলিলের এই কলিকাতা ত্যাগের সঙ্কল্পকে রশীদ কিছুতেই উচ্ছৃঙ্খল খেয়ালের পর্য্যায়-ভুক্ত করিতে পারিল না। আজিকার এই বেদনার আঘাত খলিলের বুকে যে কতখানি বাজিয়াছে, তাহা সে মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করিল। আহারে, বিহারে, চিন্তায় এমন কি স্বপ্নেও যে রাবেয়াকে খলিল ভুলিতে পারে নাই, সেই রাবেয়া আজ অন্যের গৃহলক্ষ্মী। খলিলের জীবনের মূলসূত্র ছিঁড়িয়া গিয়াছে, তাহার বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ নৈরাশ্যের ঘনান্ধকারে ছাইয়া আসিয়াছে—ভাবিতে ভাবিতে সমবেদনায় রশীদের অন্তর গলিয়া গেল, তাহার চক্ষু দুইটী জলভারে টল্‌টল্ করিয়া উঠিল।

বেদনার নীরব আদান-প্রদানের মধ্য দিয়া অনেকক্ষণ কাটিয়া গেল। শেষে একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া রশীদ বলিয়া উঠিল, আচ্ছা তুমি ঘরে যাও, আমি টেলিগ্রাম দিয়ে আস্‌ছি।

রশীদ চলিয়া গেল। খলিল শূন্য দৃষ্টিতে নৈশ আকাশের পানে চাহিয়া রহিল।

—ক্রমশঃ

## সঙ্কলন
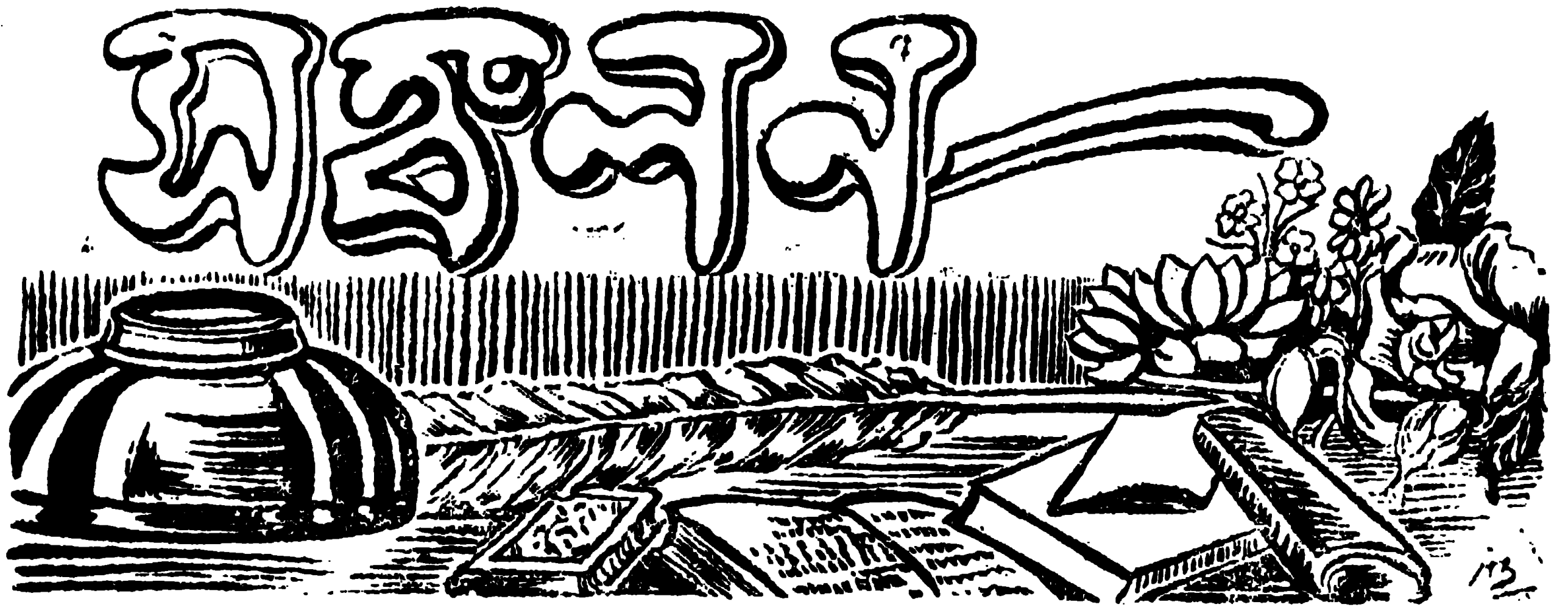
### রাজকীয় ঘোষণার মূল্য

ঐতিহাসিক ফ্রীম্যান তাঁহার এক প্রবন্ধে রাজকীয় ঘোষণাবলীকে "Chosen region of lies" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। অবশ্য সকল রাজাই যে তাঁহাদের ঘোষণার মধ্য দিয়া মিথ্যার প্রচার করেন, তাহা নহে। কেহ কেহ হয়ত সেরূপ করিতে পারেন, আবার হয়ত কাহারও ঘোষণা তাঁহার ভবিষ্যৎ বংশধরগণের দ্বারা কার্য্যে পরিণত না হওয়ায় তাহা মিথ্যার পর্য্যায়ভুক্ত হইয়া পড়ে।

স্যর সিড্‌নি লো, বড় লাটের শাসন-পরিষদে লর্ড-সিংহের নিয়োগ-সম্পর্কে তাঁহার অধুনা-প্রকাশিত "The reign of the King Edward VII" গ্রন্থে যে-সমস্ত কথার উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা পড়িবার সময় ফ্রীম্যানের উপরোক্ত উক্তি স্বতঃই আমাদের মনের মধ্যে জাগিয়া উঠে। স্যর সিড্‌নি লো বলিয়াছেন, ১৯০৮ খৃষ্টাব্দের ১লা নবেম্বর তারিখে সম্রাট সপ্তম এড্‌ওয়ার্ড, ভারতীয় রাজন্যবর্গ ও তাঁহার প্রজা সাধারণকে যে বাণী শুনাইয়াছিলেন, তাহাতে তিনি তাঁহার স্বর্গীয়া জননী মহারাণী ভিক্টোরিয়ার ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দের প্রসিদ্ধ ঘোষণা-বাণীর পুনরুক্তি করিয়া জাতি ধর্ম্ম ও বর্ণনির্বিশেষে সকল বৃটীশ প্রজার প্রতি সম আচরণ দেখাইবার এবং চাকুরীর ক্ষেত্রে সকলকে সমান অধিকার দিবার প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন। কিন্তু তিনিই আবার বড় লাটের শাসন-পরিষদে ভারতীয় সদস্য "Native member" নিয়োগ-সম্পর্কে ঘোর আপত্তি উত্থাপন করিয়াছিলেন।

বড় লাটের শাসন-পরিষদে লর্ড সিংহের নিয়োগ-সম্পর্কে ১৯০৯ সালের ২৪শে ফেব্রুয়ারী তারিখে সম্রাট সপ্তম এড্‌ওয়ার্ডের সহিত লর্ড মর্লের বহুক্ষণ ধরিয়া আলাপ-আলোচনা হইয়াছিল। তাহার ফলে লর্ড মর্লে বুঝিয়াছিলেন যে, সম্রাট ভারতীয় সদস্যকে প্রবল অন্তরায় স্বরূপ বলিয়াই মনে করেন।

এই সম্পর্কে লর্ড মর্লে সম্রাটের নিকট দুইখানি পত্রও লিখিয়াছিলেন। তন্মধ্যে প্রথম পত্রের উত্তরে সম্রাট তাঁহাকে দুঃখের সহিত জানাইয়াছিলেন যে, তিনি তাঁহার মত পরিবর্ত্তন করিতে অক্ষম। তিনি লর্ড মর্লের মতই বিষয়টা গভীর ভাবে চিন্তা করিয়া দেখিয়াছেন, কিন্তু তৎসত্ত্বেও তিনি বলিতেছেন যে, প্রস্তাবিত ব্যবস্থা বৃটীশের শাসনাধীনে ভারত সাম্রাজ্য পালনের পক্ষে বিপজ্জনক। কি জন্য বিপজ্জনক, তাহা ষ্টেট্ সেক্রেটারী বা বড় লাটের অবিদিত নাই। কিন্তু তথাপি যখন ইহার জন্য বিশেষ ভাবে চেষ্টা করা হইতেছে, উপরন্তু ক্যাবিনেটের গত অধিবেশনে গবর্ণমেণ্ট এ-সম্বন্ধে একমত হইয়াছেন, তখন ইচ্ছা-বিরুদ্ধ হইলেও তাঁহার পক্ষে পথ ছাড়িয়া দেওয়া ভিন্ন অন্য উপায় নাই। যাহা হউক, তিনি ইচ্ছা করেন,—সকলে পরিষ্কার ভাবে বুঝুক যে, তিনি অতি কঠোর ভাবে এই ব্যবস্থার প্রতিবাদ করিতেছেন। বিধাতা করুন, যেন ভারত গবর্ণমেণ্টকে এজন্য কোনরূপে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে না হয়, রাজার পক্ষে ইহার বেশী এখন আর কিছু বলিবার নাই।

লর্ড মর্লের দ্বিতীয় পত্রের উত্তরেও সম্রাট এই ব্যবস্থার তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। তাহার উত্তরে মর্লে সম্রাটকে জানাইয়াছিলেন যে, স্বর্গীয়া মহারাণী ভিক্টোরিয়ার ঘোষণা-বাণীর এই আদর্শ সাফল্য, বৃটীশ-রাজের প্রতি ভারতীয় প্রজাগণের অন্তরের গভীর শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিবে।

সম্রাট এ কথার উত্তরে বলিয়াছিলেন, আমি মনে করি যে, তিনি ( মহারাণী ভিক্টোরিয়া ) এই নূতন ব্যবস্থা অনুমোদন করিতেন না।

এখানে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, সম্রাট সপ্তম এড্-ওয়ার্ড যদি তাঁহার পূজনীয়া জননীর এই মনোভাব সম্বন্ধে সম্যক নিঃসন্দেহ ছিলেন যে, তিনি "এই নূতন ব্যবস্থা অনুমোদন করিতেন না" তাহা হইলে কেমন করিয়া তিনি তাঁহার ঘোষণাবাণীর মধ্যে সকল প্রজার প্রতি সমান ব্যবহার দেখাইবার প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন।

লর্ড মিণ্টোও এই সম্পর্কে সম্রাটের নিকট কয়েকখানি চিঠি লিখিয়াছিলেন। তাহার মধ্যে একখানির উত্তরে সম্রাট বলিয়াছিলেন, আমি মনে করি যে, বর্ত্তমানে ভারতের এই অশান্তি এবং ভারতীয়গণের ষড়যন্ত্রের যুগে যদি কোন ভারতীয়কে বড়লাটের শাসন-পরিষদে গ্রহণ করা হয়, তবে তাহা ভারত সাম্রাজ্যের পক্ষে সমূহ বিপজ্জনক হইবে। যেহেতু এমন অনেক ব্যাপার আছে, যেগুলির সহিত কোন ভারতীয়কে সংশ্লিষ্ট করা আদৌ সমীচিন হইবে না। ইহা ছাড়া যদি একজন হিন্দুকে আপনারা গ্রহণ করেন, তাহা হইলে একজন মুসলমানকেই বা গ্রহণ করিবেন না কেন? মুসলমানেরাও ইহার জন্য বিশেষ দাবী উপস্থিত করিতে পারে।......... ভারতীয় সদস্য যতই কেন বুদ্ধিজীবি হউক না, আর আপনি বা আপনার কাউন্সিল তাহাকে যতই কেন বিশ্বস্ত বলিয়া মনে করুন না, আপনি কিছুতেই স্থিরনিশ্চয় হইতে পারিবেন না যে, সে আপনার কাউন্সিলে বিপদের কারণ হইয়া উঠিবে না এবং যেসমস্ত কথা আপনার কাউন্সিল-চেম্বারের বাহিরে প্রচার হওয়া উচিত নয়, সে-সমস্ত কথা সে তাহার স্বদেশবাসীকে জানাইবে না।

উপসংহারে আমরা লর্ড মিণ্টোর নিকট লিখিত সম্রাটের আর একখানি পত্রের স্থানবিশেষের উল্লেখ করিতেছি। তাহাতে সুস্পষ্ট ভাবে বুঝিতে পারা যাইবে যে, বড়লাটের শাসন-পরিষদে শুধু ভারতীয় সদস্য নিয়োগে সম্রাটের আপত্তি ছিল না, উপরন্তু যে কেরানীর উপর গোপনীয় চিঠিপত্র নকল করিবার ভার ন্যস্ত ছিল, তাহার স্থলেও কোন ভারতীয়কে নিযুক্ত করিবার পক্ষে তাঁহার ঘোর আপত্তি ছিল। চিঠিখানির মর্ম্ম এইরূপ :—

.........আমি আপনার এই কথায় অতিমাত্র বিস্মিত হইতেছি যে, ষ্টেট্ সেক্রেটারীর সহিত যে সমস্ত গোপন পত্রের আদান-প্রদান হইয়া থাকে, তাহা ভারতীয়গণকে দেখিতে দেওয়া হইয়া থাকে এবং আপনার অফিশে ভারতীয়-গণের দ্বারা সেগুলি নকল করানো হইয়া থাকে। ইহা অত্যন্ত বিপজ্জনক এবং ঘোর আপত্তিকর ব্যবস্থা বলিয়া আমার মনে হয়। সর্ব্বাপেক্ষা আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এখনও পর্য্যন্ত এই ব্যবস্থা চলিয়া আসিতেছে।

শাসন-পরিষদে একজন ভারতীয় সদস্য গ্রহণ করা এখন স্থিরীকৃত হইয়া গিয়াছে। এখন হইতে ভবিষ্যতে আন্তরিক না হউক কার্য্যতঃ ভারত-গবর্ণমেণ্ট তাহার স্থান শূন্য হইলে অন্য একজন ভারতীয়কে বহাল করিতে বাধ্য থাকিবেন।

এই ব্যবস্থাটাকে একটা গুরুতর ব্যাপারের পূর্ব্ব সূচনা বলিয়া আমার আশঙ্কা হয়।

.........আমি বিশ্বাস করিতে পারি না যে, এই নিয়োগে মুসলমানদের মধ্যে কোন আন্দোলন জাগিয়া উঠিবে না এবং আমার মনে হয় যতক্ষণ পর্য্যন্ত না তাহারা তাহাদের স্বজাতির মধ্য হইতে একজনকে এই পদে বহাল করিবার প্রতিশ্রুতি পাইবে, ততক্ষণ কিছুতেই শান্ত হইবে না।

( মডার্ণ রিভিউ )

---

## বৃটীশ ভারতের স্বাস্থ্য

১৯২৫ সালের সরকারী রিপোর্টে বৃটীশ ভারতের অধি-বাসীগণের জন্ম, মৃত্যু ও সাধারণ ভাবে জন-সংখ্যা বৃদ্ধির হার প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা হইতেই ভারতের স্বাস্থ্যের অবস্থা সম্যকরূপে বুঝিতে পারা যায়। আমরা নিম্নে ঐ হিসাব উদ্ধৃত করিয়া দিলাম :—

| প্রদেশ | হাজার করা জন্মের হার | মৃত্যুর হার | জন সংখ্যা বৃদ্ধির হার |
|---|---|---|---|
| মধ্য প্রদেশ | ৪৩·৯ | ২৭·৩ | ১৬·৬ |
| পাঞ্জাব | ৪০·১ | ৩০·০ | ১০·১ |

| প্রদেশ | হাজার করা জন্মের বার | মৃত্যুর হার | জন সংখ্যা বৃদ্ধির হার |
|---|---|---|---|
| বিহার ও উড়িষ্যা | ৩৫·৬ | ২৩·৭ | ১১·৯ |
| বোম্বাই | ৩৪·৭ | ২৩·৭ | ১১·০ |
| মাদ্রাজ | ৩৩·৭ | ২৪·৪ | ৯·৩ |
| যুক্ত প্রদেশ | ৩২·৭ | ২৪·৮ | ৭·৯ |
| বাঙ্গালা | ২৯·৬ | ২৪·৯ | ৪·৭ |

এই হিসাব হইতেই দেখা যাইতেছে, মধ্য প্রদেশে জন্মের হার ও জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার এবং পাঞ্জাব প্রদেশে মৃত্যুর হার অন্যান্য সকল প্রদেশ অপেক্ষা অধিক। জনসংখ্যা বৃদ্ধি-হিসাবে বাঙ্গালার অবস্থা অতীব শোচনীয়। অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় বৃদ্ধির হার বঙ্গদেশে অনেক কম। ইহাই বাঙ্গালীর জীবনী-শক্তি হ্রাসের প্রধান লক্ষণ। স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা বিভাগের আবশ্যকমত উন্নতি সাধন ও অর্থনৈতিক দুরবস্থা দূরীকরণ সম্বন্ধে যথোপযুক্ত সাহায্য বিধানে গভর্ণমেন্টের উদাসীনতাই ইহার প্রধান কারণ বলিয়া মনে হয়।

---

## অদ্ভুত-সংবাদ

ইটালীর এক ষোড়শী যুবতীর (রাণা টিগরা জিয়ানা) দেহে হঠাৎ পুরুষোচিত পরিবর্ত্তনের বিকাশ আরম্ভ হইয়া কিছুদিনের মধ্যে তিনি সম্পূর্ণ পুরুষ জাতিতে পরিণত হইয়াছেন। বিজ্ঞ চিকিৎসক সম্প্রদায় বিশেষরূপে পরীক্ষা করিয়া তাঁহাকে একজন তরুণ যুবক বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন এবং সেই মূলে একখানি মন্তব্যলিপি (Certificate) লিখিয়া দিয়াছেন। কিছুদিন পূর্ব্বে রয়টার কোম্পানী এই অদ্ভুত সংবাদ পৃথিবীময় প্রচার করিয়াছিলেন, এক্ষণে বিলাতী সংবাদপত্র সমূহে ইহার বিস্তারিত খবর বাহির হইয়াছে।

বিগত আগষ্ট মাসে এই ব্যাপার ঘটিয়াছে, সম্প্রতি ঐ রমণী (এক্ষণে পুরুষ) তাঁহার সকল অবস্থা বর্ণন করিয়া সংবাদপত্রে একখানি বর্ণনাপত্র প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন—শিশুকাল হইতেই আমার মনে পুরুষ হইবার সাধ জন্মিয়াছিল, সকল বিষয়ে পুরুষ জাতির অবাধ অধিকার ও স্বাধীনতা দেখিয়া আমার মনে এই ভাবের সঞ্চার হইয়াছিল। তখন স্বপ্নেও ভাবিতে পারি নাই যে, আমার এই কল্পনার অতীত অদ্ভুত খেয়াল প্রকৃতির খেয়ালের বশে সত্য সত্যই বাস্তবে পরিণত হইবে। এখন কিন্তু আমার মনের গতি সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে, আবার সেই পূর্ব্বজীবন (নারী জীবন) ফিরিয়া পাইবার জন্য আমি ব্যাকুল হইয়াছি। হায়, আমার সেই নারী জীবন ফিরিয়া পাইলে কতই না আনন্দিত হইতাম।

উপর্য্যুপরি তিন সপ্তাহ ধরিয়া বিজ্ঞ চিকিৎসকের দল নানা আন্দোলন আলোচনা ও পরীক্ষা করিয়া সকলে একযোগে মত প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন—আমার মধ্যে নারীত্বের কোন চিহ্নমাত্র নাই, আমি এখন সম্পূর্ণরূপে পুরুষত্ব লাভ করিয়াছি। ডাক্তারদের এই শেষ সিদ্ধান্ত শুনিয়া আমার হৃদয়ে দুঃখের বান ডাকিয়া গেল, আমি দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া বালকের ন্যায় কাঁদিতে লাগিলাম। চীৎকার করিয়া বলিলাম, না, না, কখনই না, আমি কিছুতেই পুরুষ হইতে চাহি না। কিন্তু উপায় কি, প্রকৃতির বিধান পরিবর্ত্তন করিবার সাধ্য কাহারও নাই। তখন একজন ডাক্তার আমার হাত ধরিয়া বলিলেন, আর কেন, অচিরে স্ত্রীলোকের বেশ পরিত্যাগ করিয়া আমাদের ন্যায় পুরুষের সাজে সজ্জিত হও। এখন তুমি সত্যই একজন পুরুষ মানুষ।

এইবার আমার হৃদয়াধিকারী প্রেমাকাঙ্ক্ষী প্রিয়তমের কথা মনে হইল। কি বলিয়া তাঁহার নিকট এই নিষ্ঠুর সংবাদ প্রকাশ করিব তাই ভাবিয়া দুঃখে ও ক্ষোভে আমি অস্থির হইয়া পড়িলাম। অবশেষে বহু কষ্টে আত্মসম্বরণ করিয়া তাঁহার উদ্দেশে রওয়ানা হইলাম। তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বলিলাম, প্রিয়তম, প্রকৃতির নিষ্ঠুর পরিহাসে আমি আমার নারী জীবন হারাইয়াছি, এখন আমি তোমারই ন্যায় একজন পুরুষ মানুষ। সুতরাং আমার সহিত পরিণয়ের আশা তোমাকে চিরদিনের মত ছাড়িয়া দিতে হইবে। আমার এই কথা সম্পূর্ণ পরিহাস মনে করিয়া তিনি হো, হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন এবং আমার হাত ধরিয়া প্রেমাবেশে আমাকে তাঁহার দিকে আকর্ষণ করিলেন। আমি আমার পূর্ব্ব গাম্ভীর্য্য বজায় রাখিয়া বলিলাম, প্রিয়তম, আমার এই উক্তি কল্পনাপ্রসূত অথবা পরিহাসব্যঞ্জক নহে, ইহা প্রকৃতই সত্য ও প্রকৃতির অলঙ্ঘনীয় কঠোর ব্যবস্থা। এইবার চিকিৎসকদের মন্তব্যলিপি (Certificate) তাঁহাকে দেখাইলাম। তিনি কিছুক্ষণ নির্ব্বাক প্রস্তর মূর্ত্তির ন্যায় বসিয়া রহিলেন। তারপর কাতরতার সহিত একপ্রকার

অস্ফুট শব্দ করিয়া অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া গেলেন। বহুক্ষণ শুশ্রূষাদির পর তাঁহার জ্ঞান সঞ্চার হইল, তখন দুজনে যে মর্ম্মন্তুদ যাতনা অনুভব করিতেছিলাম, তাহা বর্ণনার অতীত। অবশেষে অনেক কষ্টে আত্মস্থ হইয়া এখন হইতে নূতন ভাবে অবিচ্ছেদ্য বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ হইবার জন্য উভয়ে উভয়ের নিকট প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলাম। আরও স্থিরতর হইল যে, আমরা আজীবন চিরকুমার থাকিয়া উভয়ে উভয়কে স্নেহময় সুহৃদরূপে পাইয়াই পরিতৃপ্ত হইব। এই বলিয়া আমরা প্রেমময় সুহৃদরূপে উভয়ে উভয়কে আলিঙ্গন করিলাম।

এই অভাবনীয় ঘটনা সংবাদপত্রে প্রচারিত হওয়ার পর ইউরোপের বিভিন্ন স্থান হইতে বহু ঐশ্বর্য্যশালিনী সুন্দরী রমণী আমাকে পতিত্বে বরণ করিবার জন্য লালায়িত হইয়া পড়িলেন। তাঁহাদের অসংখ্য প্রেমপত্র আমার হস্তগত হইল, তাঁহাদের পক্ষের বক্তব্য এই যে, আমি আমার নারী জীবনে রমণী-হৃদয়ের আশা, আকাঙ্ক্ষা, প্রেম ও ভালবাসার ভুক্ত-ভোগীরূপে সত্যিকার যে পরিচয় পাইয়াছি, সাধারণ পুরুষের পক্ষে তাহা পাইবার কোনও সুযোগ ঘটিয়া উঠে না, তাঁহারা কেবল নিজের ভাবেই বিভোর হইয়া থাকেন। এরূপ অবস্থায় আমার সহিত পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হইলে তাঁহারা প্রকৃতই সুখী হইবেন। বলা বাহুল্য আমি তাঁহাদের সকলের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিতে বাধ্য হইয়াছি।

মৃত্যুর পর আমার দেহ লইয়া বৈজ্ঞানিক উপায়ে বিচার বিশ্লেষণ করিবার উদ্দেশ্যে জার্ম্মান বিশ্ববিদ্যালয় আমার মৃতদেহের ভাবীস্বত্বের মূল্য স্বরূপ আমাকে এক সহস্র পাউণ্ড দিতে চাহিয়াছেন। অনেকে বলিয়াছেন, আমি বিভিন্ন দেশে ঘুরিয়া বেড়াইলে বহু অর্থ লাভ করিতে পারিব, আবার একজন চলচ্চিত্রের অধিকারী ( সিনেমা কোম্পানী ) আমার আলোকচিত্র লইয়া আমাকে কয়েক সহস্র পাউণ্ড দিবার প্রস্তাব করিয়াছেন। আমি কিন্তু তাঁহাদের কাহারও প্রস্তাবে সম্মত হইতে পারি নাই। কারণ আমার দেহটীকে আমি অর্থ উপার্জ্জনের উপকরণ স্বরূপ ব্যবহার করিতে রাজী নহি।

---

## আকের অবস্থা

বর্ত্তমান সালে সারা ভারতে মোট ২৮৯৩০০০ একর আন্দাজ জমীতে আকের আবাদ হইয়াছে। কিন্তু গত বৎসর এই সময় ২৭৫৫৫০০০ একর জমীতে আকের আবাদ হইয়াছিল।

আক আবাদ করিবার সময় আবহাওয়ার অবস্থা মোটের উপর একরূপ ভালই ছিল, এবং যেরূপ বিবরণ পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে জানা যায় যে, বর্ত্তমানে সর্ব্বত্রই আকের অবস্থা ভাল।

বর্ত্তমান সালে কোন্ প্রদেশে কি পরিমাণ আকের আবাদ হইয়াছে, নিম্নে তাহার বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া গেল।

| প্রদেশ ও ষ্টেটের নাম | ১৯২৭—২৮ একর হিঃ |
|---|---|
| যুক্তপ্রদেশ | ১৬৬০০০০ |
| পাঞ্জাব | ৪৩৯০০০ |
| বিহার ও উড়িষ্যা | ২৮৯০০০ |
| বাংলাদেশ | ২০৯০০০ |
| মাদ্রাজ | ৮৮০০০ |
| বোম্বাই প্রদেশ | ৮৮০০০ |
| আসাম | ৩৯০০০ |
| উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ | ৪৯০০০ |
| মধ্যপ্রদেশ ও বেরার | ২৪০০০ |
| দিল্লী | ৬০০০ |
| বরদা | ২০০০ |
| মোট | ২৮৯৩০০০ |

উল্লিখিত বিবরণ হইতে পাঠকগণ দেখিতে পাইবেন যে, যুক্তপ্রদেশ, পাঞ্জাব, বিহার ও উড়িষ্যা এবং বাংলাদেশেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে আকের আবাদ হয়। সুতরাং ঐ চারি স্থানের আকের আবাদ ও ইহার মোটামুটি বিবরণ অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

### যুক্তপ্রদেশ

সমস্ত যুক্তপ্রদেশে মোট ১৬৪৬০০০ একর জমীতে আকের আবাদ হইয়াছে; কিন্তু গত বৎসর ঐ স্থানে ১৫৫৯০০০ একর জমীতে আকের আবাদ হইয়াছিল।

বীজ বপন করিবার সময় জমির ও আকাশের অবস্থা বেশ ভালই ছিল। সেজন্য এই প্রদেশে গত বৎসর অপেক্ষা বর্ত্তমান সময়ে বেশী আকের আবাদ হইয়াছে। এপ্রিল মাসে বৃষ্টি হয় নাই। কয়েকটী জেলা হইতে পোকা লাগিয়া

আক নষ্ট হইয়া গিয়াছে, এরূপ সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। যাহা হউক, মোটের উপর যুক্তপ্রদেশে আকের অবস্থা উপস্থিত বেশ ভালই আছে।

রামপুর ষ্টেটে ১৪০০০ একর জমিতে আকের আবাদ হইয়াছে।

## পাঞ্জাব

পাঞ্জাবে আনুমানিক ৪৩৯০০০ একর জমিতে আকের আবাদ হইয়াছে। বীজ বপন করিবার সময় খাল হইতে সেরূপ উপযুক্ত পরিমাণে জল সেচ্ করা হয় নাই। যাহা হউক, জুলাই মাসে বৃষ্টি হওয়ায় আকের পক্ষে উপকারই হইয়াছিল, কিন্তু "পোকায় আকের অনিষ্ট করিতেছে"—এরূপ সংবাদ কয়েকটী জেলা হইতে পাওয়া গিয়াছে।

## বিহার ও উড়িষ্যা

বিহার ও উড়িষ্যায় আনুমানিক ২৮৯০০০ একর জমিতে আকের আবাদ হইয়াছে; কিন্তু গত বৎসর এই সময়ে ২৯৬০০০ একর জমিতে আকের আবাদ হইয়াছিল। পুরী ও পাটনার কোন কোন স্থান ব্যতীত প্রায় সমস্ত জেলাতেই শস্যের অবস্থা ভাল।

## বাংলাদেশ

সারা বাংলা দেশে মোট ২০৯০০০ একর জমীতে আকের আবাদ হইয়াছে। আবাদ হইবার সময় প্রথমতঃ আকাশের অবস্থা বেশ ভালই ছিল এবং সময়ে বৃষ্টি হওয়াতে চারাগুলিও শীঘ্র শীঘ্র বাড়িয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু মার্চ্চ হইতে মে মাসের ১৫ই তারিখ পর্য্যন্ত ভালরূপ বৃষ্টি হয় নাই, সেজন্য আকের ক্ষতি হইয়াছে। বিশেষতঃ পশ্চিম ও উত্তর বাংলার কয়েকটী জেলায় আকের বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে। যাহা হউক, তারপর বৃষ্টি হওয়ায় আকের অবস্থার উন্নতি হইয়াছে, এবং বর্ত্তমানে আকের অবস্থা আশাপ্রদ ও সন্তোষজনক।

## বিদেশে আকের অবস্থা

মেসার্স উইলেট ও গ্রে সাহেব অনুমান করেন যে, ১৯২৬—২৭ সালে সারা পৃথিবীতে ২৩৩৩৭০০০ টন চিনি উৎপন্ন হইবে। কিউবাতে আনুমানিক ৪৫০৮০০০ টন চিনি পাওয়া যাইবে। হাওয়েন দ্বীপে আক বেশ ভালই জন্মিয়াছে। আর্জ্জেণ্টাইনে আনুমানিক ৪০০০০০ টনের কিছু বেশী চিনি পাওয়া যাইবে। ব্রেজিলে ৭০০,০০০ টন উৎপন্ন হইবে। কিন্তু গত ৮ৎসর ব্রেজিলে ইহা অপেক্ষা ৫০০০০০ টন চিনি কম উৎপন্ন হইয়াছিল।

১৯২৭—২৮ সালে মরিসাসে অনুমান ২৩৫০০০ টন চিনি পাওয়া যাইবে। গত বৎসর এখানে ১৯৬০০০ টন চিনি উৎপন্ন হইয়াছিল। ফরমোসায় ৪১৫০০০ টন ও ফিলিপাইনে ৫৭৫০০০ টন চিনি পাওয়া যাইবে।

১৯২৭—২৮ সালে আকের অবস্থা খুব ভালই দেখা যাইতেছে। অষ্ট্রেলিয়াতে অনুমান ৪০০০০০ টন চিনি পাওয়া যাইবে। গত বৎসর অষ্ট্রেলিয়ায় ৪১৫০০০ টন চিনি হইয়াছিল, সুতরাং এবার প্রায় ১৫০০০ টন চিনি কম উৎপন্ন হইবে। তাহার কারণ প্রচুর বৃষ্টি হইয়া শস্য নষ্ট হইয়া গিয়াছে।

( ব্যবসা ও বাণিজ্য )

# আলোচনা

## এছলাম প্রচার

"এছলাম-প্রচার" কথাটা আজকাল সমাজে বিশেষরূপে পরিচিত হইয়া গিয়াছে। পূর্ব্বে এ দিকে লোকের বিশেষ কোন আগ্রহ না থাকিলেও, বর্ত্তমানে পারিপার্শ্বিকতার চাপে বাধ্য হইয়া সমাজের একদল চিন্তাশীল ব্যক্তি এ সম্বন্ধে একটা বিহিত ব্যবস্থা করিবার জন্য ঔৎসুক্য প্রকাশ করিতেছেন। ইহা যে খুবই সুখের বিষয়, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। কিন্তু আমাদের আশঙ্কা হইতেছে, এছলাম প্রচার সম্বন্ধে এছলামের আদর্শের অনুসন্ধান করিতে সমাজের বিশেষ কোন আগ্রহ দেখা যাইতেছে না।

আমাদের মতে এছলামকে যথাযথরূপে প্রকাশ করাই হইতেছে, সার্থক ও প্রকৃত এছলাম প্রচার। এই প্রকাশের জন্য প্রথম আবশ্যক, আল্লার কালাম ও রছুলের বাণীগুলি প্রাদেশিক ভাষা সমূহের মধ্যবর্ত্তিতায় অমুছলমানগণের মধ্যে বহুল পরিমাণে প্রচার করিয়া দেওয়া। এই টুকুর জন্য আমরা আল্লার নিকট দায়ী। এছলামের প্রকৃত স্বরূপকে যথাযথরূপে দুনয়ার সম্মুখে উপস্থাপিত করিয়া দিতে পারিলেই, বিশ্বের নর-নারী উন্মত্তের ন্যায় তাহার পানে ছুটিয়া আসিবে, এ বিশ্বাস আমরা দৃঢ়তার সহিত পোষণ করিয়া থাকি। এছলাম প্রচার সম্বন্ধে দ্বিতীয়—এবং বোধ হয় প্রধান—কর্ত্তব্য হইতেছে, মুছলমানকে এছলামের পবিত্র আদর্শে অনুপ্রাণিত করিয়া তোলা। এছলামের বাস্তব বিকাশরূপে মুছলমান যদি আপনাকে দুনয়ার বুকে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারে, তাহা হইলে লক্ষ মিশন প্রতিষ্ঠা করা অপেক্ষা অধিক উপকার হইবে তাহাতে। মুছলমানকে শুদ্ধি করিয়া হিন্দু বানাইয়া লওয়া হইতেছে, এরূপ সংবাদ আজকাল মধ্যে মধ্যে আমাদিগের কর্ণগোচর হইয়া থাকে। এই সকল শুদ্ধ হিন্দুর সন্ধান লইয়া দেখিলে তাহার মধ্যে প্রথমে নজরে পড়িবে—একদল ভবঘুরে অকর্ম্মণ্য যুবক, আর কতিপয় ব্যবসাদার "নব দীক্ষিত মুছলমান ভ্রাতা।" এই শ্রেণীর লোকদিগকে বাধা দেওয়া সম্ভব নহে, এবং সঙ্গতও নহে। ইহা ব্যতীত আর যাহারা শুদ্ধি হইতেছে, তাহার মূলে মুছলমান সমাজের এছলাম বিরুদ্ধ আচার-ব্যবহার, সামাজিক-ব্যবস্থা এবং অন্ধ বিশ্বাস ও কুসংস্কার বরাবরই কাজ করিয়া আসিতেছে। একে এছলাম সম্বন্ধে অজ্ঞতা, তাহার উপর মুছলমান সমাজের এই ঘৃণা ও উপেক্ষা। কাজেই অতিষ্ঠ হইয়া পার্শ্ব-পরিবর্ত্তনের জন্য তাহারা অন্য সমাজের শরণ গ্রহণ করিতে বাধ্য হইতেছে। আজ মুছলমান সমাজ যদি এছলামের প্রকৃত শিক্ষার অনুবর্ত্তী হইয়া এই আপদকে দূর করিয়া দিতে পারে, তাহা হইলে আত্মরক্ষার দিক দিয়া তাহাকে আর কোনও ভাবনা করিতে হইবে না।

আগ্রহ আছে, ঔৎসুক্য আছে, তবুও যে এছলাম-প্রচার সম্বন্ধে আমরা উল্লেখযোগ্য একটা কিছুই করিয়া উঠিতে পারিলাম না, ইহার একমাত্র কারণ এই যে, এছলাম-প্রচার সম্বন্ধে এছলামের শিক্ষা ও আদর্শের অনুসরণ আমরা করিতে পারিতেছি না। নানা দিকের নানা রাজসিক প্রবৃত্তির

প্রভাব বিভিন্ন প্রকারের অতি ক্ষুদ্র ও নিতান্ত তামসিক স্বার্থের সংঘাত, এছলাম প্রচারের মধ্যে অনধিকার প্রবেশ করিয়া, সমস্ত জিনিষটাকে একটা অসমাধ্য জটিলতার মধ্যে আবদ্ধ করিয়া ফেলিতেছে। অমুক জাতি রাজনৈতিক স্বার্থসাধনের একমাত্র উদ্দেশ্যে মিশন বা শুদ্ধি আন্দোলন পরিচালনা করিতেছেন, সুতরাং আমাদিগকেও তাহার প্রতি-ক্রিয়ারূপে এছলাম প্রচারের ব্যবস্থা করিতে হইবে! অমুক সমাজ স্বজাতিকে এক কর্ম্মকেন্দ্রে সমবেত করার মতলবে ধর্ম্মের দোহাই দিয়া গো-রক্ষা আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছেন, সুতরাং আমরাও পাল্টা জওয়াবে ধর্ম্মের দোহাই দিয়া সে আন্দোলনকে প্রতিহত করিব! আমাদের সামান্য জ্ঞানা-নুসারে ইহা এছলামের আদর্শ নহে, বরং সত্য কথা বলিতে কি, এছলাম আমাদিগকে ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত শিক্ষাই প্রদান করিতেছে। বর্ত্তমান সংখ্যার কোরআন-হাদিছ শীর্ষক সন্দর্ভে এ আদর্শের একটু আভাষ দিবার চেষ্টা করিয়াছি।

যাহাদিগের মধ্যে আমরা এছলম প্রচার করিতে যাইতেছি, এছলামের সারাৎসার স্বরূপ সেবা ও প্রেম এবং মোছলেম-উচিত উদার, মহান ও বিশাল হৃদয় লইয়া প্রথমে তাহাদের মনোপ্রাণের উপর এছলামের মহিমার প্রভাব প্রতিষ্ঠা করিয়া দিতে হইবে। রাজনীতিক লাভ লোকসানের প্রতি সামান্য একটুও ভ্রূক্ষেপ না করিয়া এছলামের সর্ব্বজনবিমোহন আদর্শকে উঁচু করিয়া তুলিয়া ধরিতে হইবে। মুষ্টিমেয় মুছলমানের সাময়িক ইষ্টানিষ্ট বা রাজনৈতিক স্বার্থাদির মুখ চাহিয়া আমরা অনেক বিষয়ে এছলামের প্রকৃত শিক্ষাকে যথাযথ ভাবে প্রকাশ করিয়া দিতে কুণ্ঠিত হই, অনেক সময় এছলামের আদর্শকে সংক্ষুব্ধ ও সংহত করিয়াও আমরা মুছল-মানের মনস্তুষ্টির জন্য ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়ি। অতিশয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়ে সন্তুষ্ট ও বিমুগ্ধ থাকার ফলে এবং তজ্জন্য দূরদর্শন শক্তির অভাবে, কোন একটা বড় রকমের ভবিষ্যৎ আমাদের চোখে প্রতিফলিত হইয়া উঠিতে পারে না।

হোদায়বিয়াতে হজরত অমুছলমান আরবদিগের সহিত সন্ধি করিলেন। হজরতের নামের সঙ্গে "রছুলুল্লাহ" লেখা ছিল, অপর পক্ষের জেদের ফলে তাহা পর্য্যন্ত কাটিয়া দেওয়া হইল। শত শত অনুরক্ত ভক্ত আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিলেন— হজরত! এ হীনতা স্বীকার করিবেন না। আমরা সকলে এক এক করিয়া আপনার চরণে আত্ম-বলি দিতে প্রস্তুত আছি, কোরেশ-দলপতিগণের এসকল শর্ত্ত স্বীকার করিবেন না। কিন্তু সাময়িক স্বার্থ বা মান অভিমানাদির প্রতি একটুও ভ্রূক্ষেপ না করিয়া হজরত সেই সন্ধিতে স্বীকৃত হই-লেন এবং এই তথাকথিত হীনতা স্বীকারকেই কোরআন, ফৎহুম্-মুবিন বা স্পষ্ট বিজয় লাভ বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিল। এই সন্ধির ফলে এছলাম সমস্ত আরব জাতির মনের উপর কি স্বর্গীয় প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল এবং অল্প দিনের মধ্যে সেই প্রাণের বৈরিগণ কিরূপে এছলামের প্রধানতম সেবক-রূপে পরিণত হইয়াছিল, হজরতের জীবনী-পাঠক মাত্রেই তাহা অবগত আছেন।

আমরা মুছলমানদিগকে তাহাদের ন্যায্য স্বত্বাধিকারগুলি ত্যাগ করিতে বলিতেছি, কেহ যেন এরূপ মনে না করেন। আমাদিগের বক্তব্য এই যে, এছলামের প্রচার এবং তাহার প্রতিপত্তির প্রসার—আর দুনয়ার কোন একটা প্রদেশের কতিপয় মুছলমানের সাময়িক স্বার্থ, পারিপার্শ্বিক আবহাওয়ায় সংঘাত জনিত মান-অভিমান ও তাহাদিগের রাজনৈতিক দূরদর্শিতা অনেক সময় সমঞ্জস নাও হইতে পারে। বিশেষতঃ সমাজ ও তাহার পরিচালকগণ যখন এছলামের আদর্শ হইতে শোচনীয় ভাবে স্খলিত হইয়া পড়েন এবং এছলাম যখন অধিকাংশ লোকের ব্যক্তিগত ও ব্যষ্টিগত রাজনৈতিক স্বার্থ-সাধনের উপকরণ মাত্রে পরিণত হইয়া যায়, তখন মুছল-মানের স্বার্থ আর এছলামের স্বার্থ পরস্পর পরস্পরের পরিপন্থী হইয়া দাঁড়ায়। এছলাম প্রচার সম্বন্ধে উদ্যোগ আয়োজনে প্রবৃত্ত হওয়ার পূর্ব্বে আমাদিগকে এই কথাগুলি বিশেষরূপে চিন্তা করিয়া দেখিতে হইবে।

---

## পাশ্চাত্য গবেষণার নমুনা

ফরাসী ও জার্ম্মানী ভাষার তুলনায় সামান্য হইলেও এছলাম, কোরআন, হজরত মোহাম্মাদ মোস্তফা এবং মোছলেম সভ্যতা সম্বন্ধে ইংরাজী ভাষাতেও অনেক বহি-পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। ইংরাজ পণ্ডিতগণ এছলামের মূল ধর্ম্মশাস্ত্র ও ইতিহাস প্রভৃতির অনেক অনুবাদও প্রকাশ করিয়াছেন। ইংরাজ পণ্ডিতগণের এই শ্রেণীর বহি-পুস্তকের বিশেষত্ব এই যে, তাহা অধিকাংশ স্থলে লাটিন, ফরাসী ও জার্ম্মানীতে প্রকাশিত অনুবাদের অনুবাদ, অধিকন্তু অধিকাংশ

স্থলে এছলামের বিরুদ্ধে "প্রোপাগাণ্ডা" করার একমাত্র উদ্দেশ্যে খৃষ্টান মিশনারী বা তাঁহাদের সহকারীদিগের দ্বারা লিখিত হইয়াছে। পাদ্রী সেল সাহেব ও তাঁহার কোরআনের অনুবাদ ইহার মধ্যে বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য।

সেল সাহেব তাঁহার ভূমিকার ( To the reader ) ১৮ ও ১৯ পৃষ্ঠায় স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন যে, একমাত্র বায়জাভীর তফছির ব্যতীত আর সমস্ত বিষয়ই তিনি এছলাম-সংক্রান্ত মূল পুস্তক ও মুসাবিদা হইতে নিজেই সঙ্কলন করিয়াছেন। কিন্তু সত্যকে চিরকাল গোপন করিয়া রাখা মানুষের পক্ষে সম্ভব হয় না। সেল সাহেব পরলোকগমন করার পর, তাঁহার একজিকিউটর ঘোষণা করেন যে, পাদ্রী জর্জ্জ সেল সাহেবের পুস্তকালয় প্রকাশ্য নীলামে বিক্রয় করা হইবে। আমাদিগের সুপরিচিত সার ই, ডেনিসন রস সম্ভবতঃ আরবী পুস্তকগুলি হস্তগত করার জন্য, এক্‌জিকিউটর কর্ত্তৃক প্রকাশিত একখানা তালিকা পুস্তক সংগ্রহ করেন। তাহার পরের কথা পাঠকগণ তাঁহার মুখে শ্রবণ করুন :—

On inspecting this catalogue, I was struck by the circumstance that the collection contained hardly any works on the Quoran. It occurred to me, therefore, that the citations from such Arabic commentators as Zamakhshari„ Jala-ad-din Suyuti, and so forth, must have been quoted by sale at second-hand.

( Sir E. Denison Ross. Bulletin of the School of Oriental Studies, London Institution. Vol. 2 Part ১ )

অর্থাৎ এই তালিকা দর্শনে আমি স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিলাম। কারণ, কোরআন সংক্রান্ত কোন পুস্তকই তাহাতে ছিলনা বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। এজন্য আমার মনে হইল, সেল সাহেব জামখশরী, জালালুদ্দিন সেউতী প্রভৃতি তফছিরকারকগণের উক্তি নিশ্চয়ই পরের নিকট হইতে ধার করিয়া লইয়াছেন।

সেলের ভূমিকায় Father Lewis Marracci নামক, কোরআনের এক লাটিন অনুবাদকের সন্ধান পাওয়া যায়। সেল সাহেব অনেক স্থলে ইঁহার টীকাগুলি বেমালুম হজম করিয়াছেন। ইনি প্রাচ্যবিদ্যাবিশারদদিগের নিকট Ludovico Marracci নামে পরিচিত। পোপ সপ্তম ক্লেমেন্টের আমলে রোমের প্রোপ্যাগণ্ডা কলেজে আরবী শিক্ষা করিয়া এছলামের ও মুছলমান জাতির বিরুদ্ধে লেখনী চালনা করিতে আরম্ভ করেন। ১৬৯১ খৃষ্টাব্দে বিরাট চারি খণ্ডে তাঁহার কোরআনের অনুবাদ প্রথম প্রকাশিত হয়। এছলাম সম্বন্ধে তাঁহার আরও অনেক বহি-পুস্তক আছে। এই সমস্ত পুস্তকে লেখক যেরূপ দুর্দ্ধর্ষতার সহিত ন্যায় ও সত্যের মস্তকে পদাঘাত করিয়াছেন, তাহা দেখিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। অথচ এই পাদ্রী মারাক্কীর বহি-পুস্তক সেল-প্রমুখ অন্যান্য ইংরাজ লেখকগণের প্রধান অবলম্বন।

এই সময়ে স্পেনের খৃষ্টানদিগের নিকট কতকগুলি প্রস্তর ফলক অত্যন্ত যত্নের সহিত রক্ষিত হইতেছিল। তাহারা উহাকে অতি প্রাচীন ও সেণ্ট জেম্‌স্ এবং তাহার শিষ্যগণের দ্বারা খোদিত বলিয়া সমবেত ভাবে বিশ্বাস করিত। "কিন্তু তাহাতে এমন সকল বিষয়ও সন্নিবেশিত হইয়াছিল, যাহা দ্বারা এছলাম ধর্ম্ম ও তাহার প্রবর্ত্তকের সমর্থন হয়।" ইনকুইজেশনের কর্ত্তাদিগের ইহা সহ্য হইল না। তাই তাঁহারা বাছিয়া বাছিয়া এই মারাক্কীকে ইহার তদন্তের জন্য নিযুক্ত করিলেন। পাদ্রী সাহেব তদন্ত করিয়া বলিলেন—সেণ্ট জেম্‌স্ বা তাঁহার শিষ্যবর্গ ওরূপ কথা লিখিতে পারেন না। সুতরাং ঐ প্রাচীন ( very old ) প্রস্তর ফলকগুলি পোপ দশম ইনোসেন্টের আদেশক্রমে বাজেয়াপ্ত হইয়া গেল। খৃষ্টান ধর্ম্মকে রক্ষা করার জন্য Inquision ওয়ালাদের বহু চিরস্মরণীয় কীর্ত্তিকলাপের মধ্যে এই ঐতিহাসিক এবং স্পেনীয় খৃষ্টানদিগের দ্বারা সম্মানিত এই ঐতিহাসিক প্রস্তর ফলকগুলিকে ধ্বংস করিয়া ফেলাও একটী ক্ষুদ্র ঘটনা।

আজকাল মুছলমানগণ ইংরাজীর মধ্যবর্ত্তিতায় এছলাম ধর্ম্ম, হজরতের জীবনী ও মোছলেম সভ্যতাদি সম্বন্ধে আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। তাঁহাদিগকে সাবধান করিয়া দিবার জন্য পাশ্চাত্য গবেষণার এই নমুনাগুলি মাসিক মোহাম্মদীতে প্রকাশ করা হইতেছে।

---

## বিশেষণে বিশেষত্ব

হজরতের সময় বা তাঁহার খলিফা চতুষ্টয়ের যুগে মক্কা, মদিনা, কা'বা, কোরআন প্রভৃতি শব্দের সঙ্গে কোন প্রকার

বিশেষণ প্রয়োগের ব্যবস্থা ছিল না। সকলে তখন সাদাসিদা ভাবে অসঙ্কোচে ঐ শব্দগুলির ব্যবহার করিতেন। খলিফাগণ ও ছাহাবীবৃন্দ যে ঐ সকল বস্তর প্রতি আমাদিগের তুলনায় কম ভক্তিপরায়ণ ছিলেন, এমন ধৃষ্টতার কথা বলিতে বোধ হয় কেহই সাহসী হইবেন না। কালক্রমে শুধু কা'বা বা শুধু কোরআন বলা মুছলমানের নিকট বে-আদবী বলিয়া মনে হইতে লাগিল এবং তাঁহারা ঐ সকল শব্দের সঙ্গে সঙ্গে এক একটা গুরুগম্ভীর বিশেষণ যোগ করিয়া দিতে ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। আমাদের দেশে বড় বড় আরবী শব্দগুলি সকলের পক্ষে সহজগ্রাহ্য না হওয়ায়, আমরা মোটামুটি ভাবে সর্ব্বত্র "শরিফ" বিশেষণের প্রয়োগ আরম্ভ করিয়া দিলাম। ফলে কোরআন শরিফ, কা'বা শরিফ ইত্যাদি পদগুলি, আমাদিগের সাধারণ স্তরেও ব্যাপক ভাবে প্রচলিত হইয়া গেল। কিন্তু এখানে ক্ষান্ত না হইয়া শরিফের বিশেষ্য সম্বন্ধে আমরা অতিমাত্রায় উদার হইয়া পড়িলাম। ইহার ফলে বর্ত্তমানে অবস্থা এরূপ হইয়া পড়িয়াছে যে, বহুল ব্যবহারের কারণে ঐ সকল বিশেষণের গুরুত্ব ও বিশেষত্বই নষ্ট হইয়া গিয়াছে। প্রথমে ছিল—কোরআন, তাহার পর হইল কোরআন শরিফ। কোরআন শরিফের দেখাদেখি বোখারি শরিফ, তাহার অনুকরণে হেদায়া শরিফ, বায়জাভী শরিফ, জালালাএন শরিফ, এমন কি পীর ছাহেবের শেজ্‌রা শরিফ। প্রথমে মক্কাকে ও কা'বাকে শরীফ বলা হইল। তাহার পর আরম্ভ হইল—আজমীর শরিফ, বিহার শরিফ, ঘুটিয়ারী শরিফ, বাঁশড়া শরিফ ও ফুরফুরা শরিফ। সেদিন একখানা লব্ধপ্রতিষ্ঠিত সাপ্তাহিকে দেখিলাম, একটা ক্ষুদ্র মন্তব্যের মধ্যে চারি পাঁচবার কা'বার "গেলাফ-শরিফের" উল্লেখ করা হইয়াছে।

পূর্ব্বেকার সেই সরল সহজ জীবন-ধারায় এই ক্রম-পরিবর্ত্তনের এবং ভক্তি-প্রকাশের বর্ত্তমান বাহ্য-আড়ম্বরের মধ্যে, সমাজের আত্মবঞ্চণার একটা শোচনীয় প্রবৃত্তি লুকাইয়া আছে। রছুলরূপী মহামানবের সাধনাকে গ্রহণ ও তাহার অনুকরণ করিতে, অথবা কোরআনরূপে প্রকাশিত কালামের শিক্ষাকে অর্জ্জন ও তাহার অনুসরণ করিতে, আমরা অসমর্থ বা অনিচ্ছুক। অথচ তাহার নামকরণে একটা সহজ ও সুলভ আত্মপ্রসাদও প্রাপ্ত করা চাই। তাই শ্রদ্ধার নামে এই আড়ম্বরের ব্যবস্থা। চিন্তাশীল পাঠকবর্গ একটু আত্মস্থ হইয়া ভাবিয়া দেখিলে, সহজে জানিতে পারিবেন যে, সমাজের সকল স্তরে আজ অন্তর্দৃষ্টির যে অভাব পরিলক্ষিত হইতেছে—হজরতের জীবনী, কোরআনের শিক্ষা এবং এছলামের আদর্শের সবগুলি দিকই যে আজ আমাদের চোখে অমন ভাসা ভাসা রূপে প্রতিফলিত হইতেছে, এই বাহ্যমুখী শব্দসম্বল ভক্তির আড়ম্বরই তাহার প্রধান কারণ। অথচ এছলামে আড়ম্বরের একটুকুও স্থান নাই। অশেষ পরিতাপের বিষয় এই যে, এই আড়ম্বর সকল দিক দিয়া মুছলমানের জীবনকে যেন সম্পূর্ণভাবে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে। কোন প্রকারের কোন মজলিসে দাঁড়াইয়া যিনি যেন-তেন প্রকারে দুই চারিটা কথা বলিতে পারেন, সংবাদপত্রের কলমে বা পুস্তক-পুস্তিকার পৃষ্ঠায় দুই চারিটা ছত্র প্রকাশ করার যাঁহার সৌভাগ্য ঘটিয়াছে, পিতা মাতার প্রদত্ত নামে সন্তুষ্ট থাকিতে তিনি আর রাজী নহেন। যে কোন প্রকারে হউক, কতকগুলি বিশেষণ তাহার অগ্রপশ্চাতে যোজনা করিয়া দিতেই হইবে। তাহাতে নামটা অশুদ্ধ অর্থহীন ও হাস্যজনকরূপে বিকৃত হইয়া পড়িলেও ক্ষতি নাই।

আজকাল এই আড়ম্বরের আর একটা ব্যাধি সংক্রামক হইয়া দাঁড়াইতেছে—সাহিত্যিক উপাধির মধ্য দিয়া কোন উপযুক্ত বা অধিকারী সাহিত্য সমাজ, যোগ্যতার পুরস্কার স্বরূপ কোন ব্যক্তিকে যদি কোন উপাধি প্রদান করেন, তাহা হইলে এরূপক্ষেত্রে তাঁহার পক্ষে ঐ প্রকার উপাধি ব্যবহার করাতে যে কোন দোষ নাই, তাহা আমরা স্বীকার করি। কিন্তু আজকাল আমাদের সাহিত্যের বাজারে যে সকল উপাধির অবাধ ব্যবহার দেখা যাইতেছে, তাহার অধিকাংশই যে ঐ শ্রেণীভুক্ত নহে, তাহা আমরা জোর করিয়া বলিতে পারি। কলিকাতা ও তাহার নিকটবর্ত্তী কোন কোন স্থানের কএকজন হিন্দু-পণ্ডিত Bogus উপাধির ব্যবসা চালাইয়া থাকেন। সামান্য দশ বিশ টাকা ব্যয় করিলে যে-কোন গোমূর্খও তাঁহাদিগের দ্বারা নানা প্রকার বড় বড় উপাধিতে-ভূষিত হইতে পারে। এই সকল উপাধির ব্যবহারে ও তাহার সমর্থনে, সমাজের আড়ম্বরপ্রিয়তা এবং সহজলভ্য আত্ম-প্রসাদের নামে আত্মবঞ্চনা করার প্রবৃত্তিটাই প্রকট হইয়া উঠিতেছে।

---

## খৃষ্টাব্দ ও ইসাব্দ

খৃষ্টান ভ্রাতারা যাঁহাকে যীশুখৃষ্ট বলিয়া উল্লেখ করেন এবং মুছলমানেরা যাঁহাকে হজরত ঈছা বলিয়া মান্য করেন, এই দুই ব্যক্তি অভিন্ন কিনা, সে-সম্বন্ধে আলোচনা করার অনেক কথা আছে। প্রথমতঃ দেখা যায়, উভয়ের ঐতিহাসিক ভিত্তি সম্বন্ধে যথেষ্ট পার্থক্য বিদ্যমান। খৃষ্টানদিগের গৃহীত যীশু খৃষ্টের প্রকৃত নাম, সে-নাম পরিবর্ত্তন ও তাহার কারণ এবং অবশেষে তাঁহাকে যীশু নাম প্রদানের বহু হেঁয়ালী আছে, এবং সে-সব হেঁয়ালীর মধ্যে অনেক রহস্য লুকাইয়া আছে। এই জন্য আধুনিক পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মধ্যে যীশুর অস্তিত্ব সম্বন্ধে একটা সন্দেহের ভাব দেখা দিয়াছে। যীশুর অস্তিত্ব অস্বীকার করিয়া পুস্তক লিখিতেও তাঁহারা কুণ্ঠিত হন নাই। Jessus—a myth বলিয়া একখানা নূতন পুস্তক সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে।

বাইবেল বর্ণিত যীশু খৃষ্ট এবং কোরআন-বর্ণিত হজরত ঈছার শিক্ষা ও জীবনের আদর্শ সম্বন্ধেও অনেক পার্থক্য দেখা যায়। বাইবেলের যীশু মানুষ নন—তিনি খোদার বেটা ও স্বয়ং খোদা। বাইবেলের মতে, তিনি অত্যন্ত মদ্যপায়ী, ভ্রষ্টা নারীদিগের সাহচর্য্য-প্রিয়, এবং জননীর প্রতি অসম্মানকারীরূপে চিত্রিত হইয়াছেন! তিনি নাকি মৃত্যুভয়ে চীৎকার ও আর্ত্তনাদও করিয়াছিলেন! এছলামের মতে কোন নবী রছুল বা সাধু মহাপুরুষের চরিত্রে এ সকল দোষদুর্ব্বলতা স্পর্শ করিতে পারে না। বিশেষতঃ হজরত ঈছার ন্যায় একজন আদর্শ মহাপুরুষ ও প্রধানতম নবীর প্রতি ঐ সকল দোষের আরোপ হওয়া এছলামের চোখে একেবারে অসহ্য। তাই আমরা বলি হয় হজরত ঈছা সম্বন্ধে বর্ণিত বাইবেলের ঐ উক্তিগুলিকে প্রক্ষিপ্ত বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে, অন্যথায় স্বীকার করিতে হইবে যে, বাইবেলের যীশু ও কোরআনের ঈছা দুই জন সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ব্যক্তি।

আমাদের কতিপয় বন্ধু "খৃষ্টাব্দের" পরিবর্ত্তে "ইসাব্দ" প্রচলিত করিতে চাহিতেছেন। তাঁহারা এই দিক দিয়া বিষয়টী চিন্তা করিয়া দেখিলে বাধিত হইব। খৃষ্টাব্দকে ইসাব্দ বলিয়া গ্রহণ করিলে উভয়ের অভিন্নতা স্বীকার করা হয়। তাহার পর এই পরিবর্ত্তনের বিশেষ কোন আবশ্যক বা সার্থকতা থাকে বলিয়া মনে হয় না। খৃষ্ট বা Christ হিব্রু মছিয়াহ ও আরবী মছিহ শব্দের প্রতিশব্দ মাত্র, ইহাও এক্ষেত্রে স্মরণ রাখিতে হইবে।

---

## ৮ রয়েল কমিশন

ভারতকে শাসন-সংস্কারের আর এক কিস্তি দান করা যাইতে পারে কি না, তাহার তদন্ত করার জন্য বৃটিশ পার্লামেণ্ট একটা কমিশন নিযুক্ত করিয়াছেন। কমিশনে একজন ভারতবাসীকেও স্থান দান করা হয় নাই। ইহা লইয়া দেশে ঘোর অসন্তোষের সৃষ্টি হইয়াছে। ভারতের বিভিন্ন সমাজের ও বিভিন্ন রাজনৈতিকদলের সমস্ত নেতা একবাক্যে কমিশন বয়কট করার প্রস্তাব করিতেছেন।

আমাদের রাজপ্রতিনিধি মহাশয় এ সম্বন্ধে যে ঘোষণাপত্র প্রচার করিয়াছেন, তাহাতে বৃটিশ শাসননীতির প্রকৃত স্বরূপটা স্পষ্টভাবে প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে। বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট হিন্দু মুছলমানের বর্ত্তমান বিবাদ-বিসম্বাদ হইতে উপকার লাভের জন্য যে কিরূপ প্রলুব্ধ হইয়া পড়িয়াছেন, এই সব ব্যাপারে তাহাও দুই প্রহরের সূর্য্যের মত দেদীপ্যমান হইয়া উঠিয়াছে।

গত দুই বৎসর হইতে মুছলমান সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টের শাসননীতির যে শোচনীয় পরিবর্ত্তন আরম্ভ হইয়াছে, এবং হিন্দু সভার মনস্তুষ্টির জন্য তাঁহারা ক্রমাগত যে সকল কার্য্য পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া আসিয়াছেন, সেগুলিকে লাট সাহেবের ঘোষণার সহিত একত্রে আলোচনা করিয়া দেখিলে, স্পষ্টতঃ জানা যাইবে যে, কমিশনকে সামাল দিবার জন্যই কর্তৃপক্ষ ইচ্ছাপূর্ব্বক বর্ত্তমান নীতি অবলম্বন করিয়াছেন।

বড়লাট বাহাদুর বলিয়াছেন—ভারতবর্ষের শাসন-সংস্কার সম্বন্ধে কোন ভারতবাসীই নিরপেক্ষ বিচার করিতে সমর্থ নহে। একথা যদি সত্য হয়—বাস্তবিকই ভারতবাসী যদি বিচারক্ষেত্রেও ন্যায্য কথা বলিতে অসমর্থ হইয়া থাকে, তাহা হইলে সাক্ষ্য দিবার সময় ত তাহারা পক্ষপাতের চরম করিয়া ফেলিবে। সুতরাং রয়েল কমিশনের জন্য সাক্ষীও বিলাত হইতে আমদানী করা উচিত।

---

# শরৎ-বিদায়

[ শাহাদাৎ হোসেন ]

ধরণীর আঙিনায়
আল্‌পনা আঁকি যায়
দিনান্তে রাঙা রবি
অস্ত-বেলায়।

সবুজ আঁচল খানি
গুটা'য়ে শরৎ-রাণী
বিদায় মাগিয়া নিল
শেষের খেয়ায়।

দিগন্তে একাকিনী
নিখিলের রূপ-রাণী
সুদূরে চাহিয়া রয়
মেঘের মালায়।

শ্যামল ছবির কোলে
শিশির-ঝালর ঝোলে
হিমানী নামিয়া আসে
কুহেলী মায়ায়।

মৌন নিথর দিশি
বনান্তে যায় মিশি
তীরে-নীরে ছায়া-রাণী
আঁচল বিছায়।

সবুজের হাসি-গান
আজি হ'ল অবসান
ছায়া-পথে মেঘ-রথে
শরৎ-বিদায়।

Printed and Published by Md. Khairul Anam Khan from the "Mohammadi Press",
29, Upper Circular Road, Calcutta.

# দুর্গাচরণ আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়।

## শক্তি সঞ্জীবন রসায়ণ।

(শুক্রবর্দ্ধক ও ধ্বজভঙ্গ নিবারক)

রীতিমত ৩।৪ মাস এই ঔষধ সেবন করিলে সপ্ততি বর্ষীয় বৃদ্ধও ষোড়শ বর্ষীয় যুবার ন্যায় রতিশক্তি সম্পন্ন হইতে পারেন। যুবা ব্যক্তি এই ঔষধ সেবনে অসাধারণ রতিশক্তি সম্পন্ন হয়। এরূপ শুক্রবর্দ্ধক ও শুক্রের গাঢ়তাকর ঔষধ অতি বিরল। ইহা দুর্ব্বলের বলপ্রদ, বৃদ্ধের যৌবনপ্রদ ও রক্ত মাংস হীনের রক্ত মাংস বর্দ্ধক। যে সকল লোক অত্যধিক বা অনৈসর্গিক উপায়ে শুক্রক্ষয় করতঃ ক্লীববৎ হইয়াছেন বা ক্লীবত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং ইন্দ্রিয় শৈথিল্য, ইচ্ছা সত্বে লিঙ্গের অনুত্থান, স্ত্রীলোক দর্শনে স্পর্শনে এমন কি চিন্তায় শুক্রক্ষরণ অত্যধিক স্বপ্নদোষ, অজীর্ণ, অগ্নিমান্দ্য, কোষ্ঠবদ্ধতা, শিরঃঘূর্ণন অনিদ্রা, চক্ষে অন্ধকার দর্শন, অকারণ ভয়, নির্জ্জন প্রিয়তা, কর্ত্তব্য কার্য্যে অনুৎসাহ, সর্ব্বদা বিষন্ন ভাব প্রভৃতি উপদ্রবে ভুগিতেছেন এবং নানাবিধ ঔষধ সেবনে কোনও উপকার লাভ করিতে পারিতেছেন না তাঁহারা রীতিমত কিছুকাল এই শক্তি সঞ্জীবন রসায়ণ ব্যবহার করিলে আশাতীত ফললাভ করিতে পারিবেন। অনেক অপুত্রক ব্যক্তি এই মহৌষধ সেবন করিয়া সুসন্তান লাভ করিয়াছেন। মূল্য প্রতি শিশি (দুই সপ্তাহের সেবনোপযোগী) ২৲ টাকা, ৩ শিশি ৫৲ টাকা ডাকমাশুলাদি স্বতন্ত্র।

## হেমবিন্দু।

### গণোরিয়ার মহৌষধ।

এইরূপ ঔষধ পূর্ব্বে কখনও আবিষ্কৃত হয় নাই। ইহা প্রমেহ রোগের মহৌষধ। প্রস্রাবকালীন জ্বালা যন্ত্রণা, প্রস্রাবের সঙ্গে পুঁজ পড়া, ফোঁটা ফোঁটা প্রস্রাব হওয়া, প্রস্রাবের ধার সরু হওয়া, স্বপ্নদোষ, প্রস্রাবকালীন সূতার ন্যায় বীর্য্য পড়া, বাহ্যে বসিয়া কোঁত দিলে বীর্য্য পড়া, প্রস্রাবের সহিত শুক্র নির্গত হওয়া, খড়ি-গোলার মতন প্রস্রাব প্রভৃতি উপসর্গ সকল এই ঔষধ সেবনের সঙ্গে সঙ্গে আরোগ্য হয়। ইহার গুণ স্থায়ী। বাজে ঔষধের ন্যায় ক্ষণস্থায়ী নহে। ইহা সেবনের সঙ্গে সঙ্গেই প্রস্রাবের জ্বালা যন্ত্রণা দূর হয়। যেরূপই বীর্য্যক্ষরণ হউক না কেন, ইহা সেবনে অতি সত্বর বীর্য্যক্ষরণ নিবারণ করে। হেমবিন্দু ব্যবহারে যত প্রকার মেহ আছে, সকল প্রকার মেহই নির্দ্দোষরূপে আরোগ্য হয়।

মূল্য প্রতি শিশি ১।০ তিন শিশি ৪।০ টাকা, ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

এতদ্ব্যতীত যাবতীয় শাস্ত্রীয় ঔষধ, আসব অরিষ্ট, মোদক প্রভৃতি অতি বিশুদ্ধভাবে সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকে। ক্যাটলগে বিস্তৃত বিবরণ জানিতে পারিবেন। মফঃস্বলের রোগীগণ রোগের অবস্থা জানাইলে অথবা ক্যাটলগের জন্য পত্র লিখিলে বিনামূল্যে ব্যবস্থা দেওয়া হয় ও ক্যাটলগ পাঠান হয়।

**কবিরাজ—শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ ভট্টাচার্য্য কবিরঞ্জন।**

৩২,এ, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা।

# সোলেমানি তিরিয়াক।

## ( নিমক )

এই তিরিয়াক সা আমির হাসন সাহেব অতি সুবন্দোবস্তের সহিত তৈয়ার করিয়াছেন। ব্যবহার করিতে অতি সুস্বাদ, অনেক হাকিম ডাক্তার কবিরাজ মহাশয়েরা বলেন এই তিরিয়াক নানাপ্রকার পেটের ব্যারাম ডিসপেপসিয়া রোগে একমাত্র উপকারি, এক শিশি ব্যবহার করিয়া দেখুন, আশু ফল না হয় ঔষধ ফেরত দিয়া মূল্য ফেরত লইবেন, ব্যবহারি অংশের মূল্য দিতে হইবে না।

### নিম্নলিখিত রোগাদির একমাত্র ঔষধ।

ভেদবমি, অজীর্ণ, কলেরা, পেটবেদনা, পেটফাঁপা, বায়ু ও অম্লের বেদনা, চুয়াঢেকুর, বুকজ্বালা, আহার করিলে হজম না হওয়া, বা কোষ্ঠ বদ্ধ থাকা, এইরূপ রোগাদিতে আবশ্যক মত বা আহারের পরে সেবন করিবেন। বালক বালিকা বা যাহার পেটেতে কেচো ক্রিমি হয়, আবশ্যকমতে, সাদা আমাশয় কি অর্শরোগের বেদনার জন্য সকালে বৈকালে তাহারা ব্যবহার করিবে। কোন প্রকার বিষধারী কীট বা বিছা কামড়াইলে ঘায়ের মুখে সামান্য পরিমাণ লাগাইয়া একটু একটু অগ্নিতাপ দিলে তৎক্ষণাৎ বিষ বেদনা নিবারণ হইবে, পাগলা কুকুর বা শিয়াল কামড়াইলে ২ মাষা পরিমাণ পূর্ণ বয়স্ক ব্যক্তিকে, ১ মাষা পরিমাণ বালকদিগকে সেবন করাইবে। ২।৩ দিন সেবন করিলে বিষ থাকিবে না।

২টী মুরগীর ডিমের হাফ বয়েল কুসুমের সহিত ৪ রতি পরিমাণ মিশ্রিত করিয়া সকালে সকালে ব্যবহার করিলে শরীরে রক্ত জন্মাইয়া শরীর পুষ্টি করিবে স্ফূর্ত্তি হইবে, গাঁটে গাঁটে বেদনা থাকিলে তাহাও সরিয়া যাইবে। আহারের পরে ১ মাষা বা কম পরিমাণ খাইলে খাদ্য দ্রব্য অতি অল্প সময়ের মধ্যে বিশুদ্ধরূপে হজম হইবে হজম শক্তিও বৃদ্ধি হইবে, আবাল বৃদ্ধ গর্ভবতী স্ত্রীলোক সকলেই আবশ্যক মতে ব্যবহার করিতে পারিবে কাহারও ক্ষতি করিবে না। প্রত্যেক ঘরে ঘরে এই তিরিয়াক ১ শিশি করিয়া রাখিলে সময় অসময়ে অনেক ফল পাইবে।

প্রকাশ থাকে যে শিশির গায়েতে সা আমির হাসন নামক মোহর দেখিয়া খরিদ করিবেন, কেহ যদি এজেণ্ট হইতে ইচ্ছা করেন শতকরা ২০৲ টাকা হিসাবে কমিশন বাদ দিয়া বাকি মূল্য নগদ দিয়া ঔষধ লইতে হইবে, বিক্রয় না হইলে মূল্য ফেরত পাইবেন।

**সেবন**—১ হইতে ৫ বৎসর বয়স্ক বালকের ২ রতি। ৫ হইতে ১০ বৎসর ৪ রতি। ১০ হইতে ১৫ বৎসর ৬ রতি। ১৫ হইতে পূর্ণ বয়স্ক ব্যক্তি ১ মাষা মুখে দিয়া শীতল জল খাইবে। আমাশয় ও কলেরা রোগেতে জলের সহিত কেওড়া বা গোলাব দিয়া ব্যবহার করিলে ভাল, অভাবে কেবল জল খাইবে।

মূল্য ফিঃ /১ সের ১০৲ টাকা ১ আউন্স শিশি ।/০ আনা ২ আউন্স শিশি ।।৵০ আনা।

পাইকারী হিঃ ফিঃ ডজন ছোট শিশি ৩৲ বড় শিশি ডজন ৬৲ টাকা ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

**ঠিকানা—কাজি রেজিষ্ট্রার মৌঃ মহাম্মদ এয়াকুব সাহেব**

**৩১।১নং হরিশচন্দ্র মুখার্জ্জির রোড, পোষ্ট অফিস ভবানীপুর, কলিকাতা।**

# মোহাম্মদী

বিষাদ সিন্ধু

## এ কি স্বপ্ন
## না কল্পনা!

স্বপ্নও নয়, কল্পনাও নয়,

একান্ত বাস্তব।

আমাদের অজস্র অর্থ ব্যয়

এবং ঐকান্তিক পরিশ্রমের ফল—

কারবালা প্রান্তরের সেই হৃদয়বিদারক ঘটনা,

হজরত রসুলে আকরমের (দঃ) নয়নমণি

এমাম হাসান হোসেনের পবিত্র

শহীদ কাহিনী—

আসল এবং খাঁটি

মরহুম মীর মোশাররফ হোসেন কৃত—

# বিষাদসি-ন্ধু

সাপ্তাহিক এবং মাসিক মোহাম্মদীর গ্রাহকগণকে মাত্র এক টাকায় উপহার দেওয়া হইতেছে।

মনে রাখিবেন এই অপূর্ব্ব সুযোগ মাত্র এক মাসের জন্য—

## বিশেষত্ব—

(১) অতি উৎকৃষ্ট বাঁধাই, (২) সোনার কালীতে নাম লেখা (৩) সুন্দর আইভরি ফিনিস কাগজে ছাপা, (৪) ইহা ছাড়া সুন্দর সুন্দর হাফটোন চিত্রে চিত্রময়। বাজারে কিনিতে গেলে দ্বিগুণ মূল্যেও পাইবেন কিনা সন্দেহ।

নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক ছাপা হইয়াছে।

**বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ**—নূতন গ্রাহক হইলে কিম্বা পুরাতন গ্রাহকগণ পুনরায় এক বৎসরের টাকা জমা দিলে এই অমূল্য উপহার লাভ করিতে পারিবেন।

মেহেরবানী করিয়া একাধিক গ্রন্থের জন্য অনুরোধ করিবেন না।

ম্যানেজার, মোহাম্মদী,

২৯নং আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা।

প্রথমবর্ষ পৌষ, ১৩৩৪ তৃতীয় সংখ্যা

সম্পাদক—

মোহাম্মাদ আকরম খাঁ

বার্ষিক মূল্য সডাক তিন টাকা

প্রতি সংখ্যা সাড়ে চারি আনা

## নবাবিষ্কৃত পাইপ-টোন আমেরিকান অর্গ্যান

## ও

# হারমোনিয়ম।

৭৫৲ হইতে ৫৫০৲

### ইহাতে—

ডবল এবং হাই পাইপ-সেল এবং এন্‌লার্জ্জড স্কেল রিড্ সংযোজিত হওয়ায় ইহার স্বর বহু মূল্যবান চার্চ্চ পাইপ অর্গ্যানের বাঁশরীর স্বরের ন্যায় মধুর ও হৃদয়গ্রাহী এরূপ আশাতীত মনোমুগ্ধকর গম্ভীর স্বর ইহার পূর্ব্বে রীড্ অর্গ্যানে সম্ভব হয় নাই। জগতের যে কোন রীড্ অর্গ্যানের স্বর ইহার মধুর স্বরের সমতুল্য হইতে পারে না।
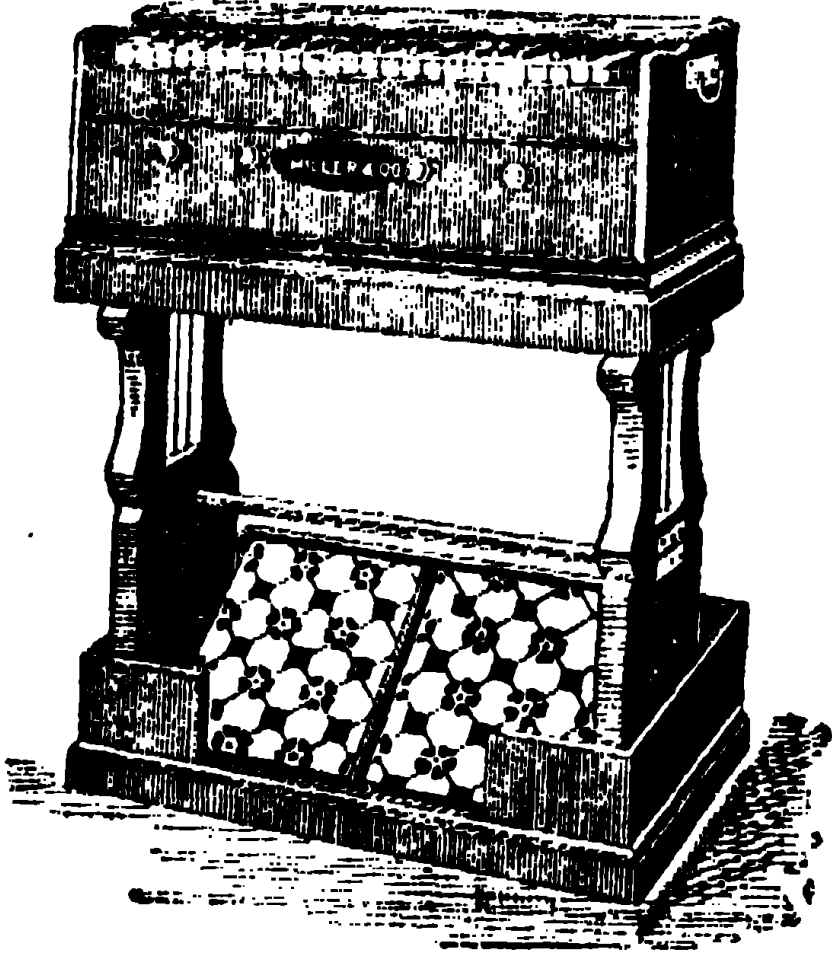
ইহার বহুল প্রচারের জন্য আমেরিকান প্রসিদ্ধ নগরি চিকাগোতে প্রস্তুত করিবার বিরাট আয়োজন করিয়াছি, যাহাতে যথাসম্ভব অল্প মূল্যে এই অতুলনীয় অর্গ্যান সকলে ক্রয় করিতে পারেন। ইহা ছাড়া প্রত্যেক অর্গ্যান ও হারমোনিয়ম আমাদের কলিকাতার সুবৃহৎ কারখানায় বহুদর্শী বিলাতী টিউনার দ্বারা টিউন ও পরীক্ষা করিয়া গ্রাহকদিগকে প্রেরণ করা হয়। অনুগ্রহ করিয়া আমাদের কারখানায় একবার শুভাগমন করুন এবং পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে কোন যন্ত্র পরীক্ষা করুন তাহা হইলে বুঝিতে পারিবেন আমাদের কথা অতিরঞ্জিত নহে।

১০০৲ হইতে ৩২৫৲
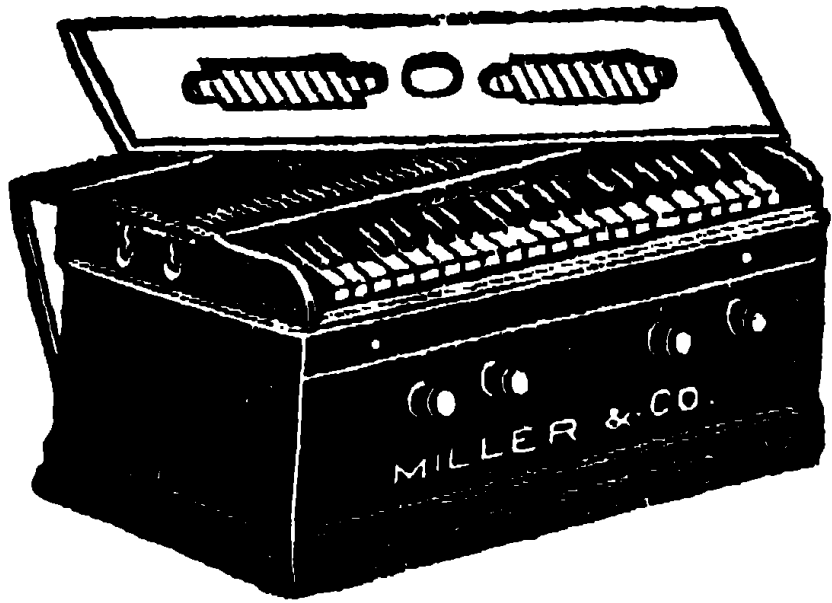
মিলার হারমোনিয়মের বিষয় আজ নূতন করিয়া লিখিতে হইবে না। ইহার সুখ্যাতি ইহার কপ্‌লার ট্রান্সপোজিং চাবী, ডবল ও সিঙ্গেল লিভার প্রভৃতির সার্থকতা আজ লক্ষ কণ্ঠে প্রশংসিত হইতেছে।

সম্রাট রাজা মহারাজা হইতে সামান্য গৃহস্থ সকলেই ইহার স্বরে ও গুণে মুগ্ধ।

২০৲ হইতে ৩৫০৲

**সচিত্র ক্যাটলগের জন্য পত্র লিখুন।**

# মিলার এণ্ড কোং

**৭৩৮ নং লোয়ার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।**

টেলিগ্রাফিক ঠিকানা—অর্‌ফেন্‌স্।

# সূচী পত্র—পৌষ, ১৩৩৪

# সূচী পত্র—পৌষ, ১৩৩৪

# বিজ্ঞাপন—সূচী পৌষ,—১৩৩৪।



## বিশেষ স্থান



## কভার

# সোলেমনি তিরিয়াক।

## ( নিমক )

এই তিরিয়াক সা আমির হাসন সাহেব অতি সুবন্দোবস্তের সহিত তৈয়ার করিয়াছেন। ব্যবহার করিতে অতি সুস্বাদ, অনেক হাকিম ডাক্তার কবিরাজ মহাশয়েরা বলেন এই তিরিয়াক নানাপ্রকার পেটের ব্যারাম ডিসপেপসিয়া রোগে একমাত্র উপকারি, এক শিশি ব্যবহার করিয়া দেখুন, আশু ফল না হয় ঔষধ ফেরত দিয়া মূল্য ফেরত লইবেন, ব্যবহারি অংশের মূল্য দিতে হইবে না।

নিম্নলিখিত রোগাদির একমাত্র ঔষধ।

ভেদবমি, অজীর্ণ, কলেরা, পেটবেদনা, পেটফাঁপা, বায়ু ও অম্লের বেদনা, চুয়াঢেকুর, বুক জ্বালা,আহার করিলে হজম না হওয়া, বা কোষ্ঠ বদ্ধ থাকা, এইরূপ রোগাদিতে আবশ্যক মত বা আহারের পরে সেবন করিবেন। বালক বালিকা বা যাহার পেটেতে কেচো ক্রিমি হয়, আবশ্যকমতে, সাদা আমাশয় কি অর্শরোগের বেদনার জন্য সকালে বৈকালে তাহারা ব্যবহার করিবে। কোন প্রকার বিষধারী কীট বা বিছা কামড়াইলে ঘায়ের মুখে সামান্য পরিমাণ লাগাইয়া একটু একটু অগ্নিতাপ দিলে তৎক্ষণাৎ বিষ বেদনা নিবারণ হইবে, পাগলা কুকুর বা শিয়াল কামড়াইলে ২ মাষা পরিমাণ পূর্ণ বয়স্ক ব্যক্তিকে, ১ মাষা পরিমাণ বালকদিগকে সেবন করাইবে। ২।৩ দিন সেবন করিলে বিষ থাকিবে না।

২টী মুরগীর ডিমের হাফ বয়েল কুসুমের সহিত ৪ রতি পরিমাণ মিশ্রিত করিয়া সকালে সকালে ব্যবহার করিলে শরীরে রক্ত জন্মাইয়া শরীর পুষ্টি করিবে স্ফূর্ত্তি হইবে, গাঁটে গাঁটে বেদনা থাকিলে তাহাও সরিয়া যাইবে। আহারের পরে ১ মাষা বা কম পরিমাণ খাইলে খাদ্য দ্রব্য অতি অল্প সময়ের মধ্যে বিশুদ্ধরূপে হজম হইবে হজম শক্তিও বৃদ্ধি হইবে, আবাল বৃদ্ধ গর্ভবতী স্ত্রীলোক সকলেই আবশ্যক মতে ব্যবহার করিতে পারিবে কাহারও ক্ষতি করিবে না। প্রত্যেক ঘরে ঘরে এই তিরিয়াক ১ শিশি করিয়া রাখিলে সময় অসময়ে অনেক ফল পাইবে।

প্রকাশ থাকে যে শিশির গায়েতে সা আমির হাসন নামক মোহর দেখিয়া খরিদ করিবেন, কেহ যদি এজেণ্ট হইতে ইচ্ছা করেন শতকরা ২০৲ টাকা হিসাবে কমিশন বাদ দিয়া বাকি মূল্য নগদ দিয়া ঔষধ লইতে হইবে, বিক্রয় না হইলে মূল্য ফেরত পাইবেন।

**সেবন**—১ হইতে ৫ বৎসর বয়স্ক বালকের ২ রতি। ৫ হইতে ১০ বৎসর ৪ রতি। ১০ হইতে ১৫ বৎসর ৬ রতি। ১৫ হইতে পূর্ণ বয়স্ক ব্যক্তি ১ মাষা মুখে দিয়া শীতল জল খাইবে। আমাশয় ও কলেরা রোগেতে জলের সহিত কেওড়া বা গোলাব দিয়া ব্যবহার করিলে ভাল, অভাবে কেবল জল খাইবে।

মূল্য ফিঃ /১ সের ১০৲ টাকা ১ আউন্স শিশি।/০ আনা ২ আউন্স শিশি ।।৵০ আনা।

পাইকারী হিঃ ফিং ডজন ছোট শিশি ৩৲ বড় শিশি ডজন ৬৲ টাকা ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

**ঠিকানা—কাজি রেজিষ্টার মৌঃ মহাম্মদ এয়াকুব সাহেব**

**৩১।১নং হরিশচন্দ্র মুখার্জ্জির রোড, পোষ্ট অফিস ভবানীপুর, কলিকাতা।**

অর্ডার দিবার সময় অনুগ্রহ পূর্ব্বক—"মাসিক মোহাম্মদী" নাম উল্লেখ করিবেন।

অর্ডার দিবার সময় অনুগ্রহ পূর্ব্বক—"মাসিক মোহাম্মদী" নাম উল্লেখ করিবেন।

# গুণের পরীক্ষা

## দুই সপ্তাহ মাত্র, স্বর্ণ-ঘটিত

# অমৃতবিন্দু সালসা

**সেবন করিয়া আপনার দেহ ওজন করিয়া**

**দেখিবেন ওজন পূর্ব্বাপেক্ষা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে**

সাতদিন মাত্র এই অমৃতবিন্দু সালসা সেবনের পরে হস্তপদের অঙ্গুলি টিপিয়া দেখিবেন শরীরে সত্য সত্যই তরল আলতার ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট বিশুদ্ধ রক্তের সঞ্চার হইতেছে কিনা। অমৃতবিন্দু সালসা রক্ত পরিষ্কারক, বলকারক, গরমি, পারা দোষ, প্রমেহ, খোস পাঁচড়া চর্ম্মরোগ নানাবিধ দৌর্ব্বল্য, শ্বেত প্রদর, রক্তপ্রদর অনিয়মিত ঋতু প্রভৃতি সমস্ত রোগ আরোগ্য হয়।

এক শিশি মূল্য ১৲ এক টাকা, মাশুল ।৵০ আনা, ৩ শিশি ২॥০ নয় সিকা, মাশুল ৸৵০ আনা। ৬ শিশি ৪।০ চারি টাকা চারি আনা, মাশুল ১।০।

**কবিরাজ—শ্রীশিশিরকুমার সেনগুপ্ত কবিরত্ন**

**নবশক্তি ঔষধালয়**

২৯৭নং আপার চিৎপুর রোড, শোভাবাজার, কলিকাতা।

---

কবিবর গোলাম মোস্তফা ছাহেবের অমূল্য লেখনী প্রসূত

**সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপন্যাস**

# ভাঙ্গাবুক

পড়িয়াছেন কি? যদি না পড়িয়া থাকেন তাহা হইলে আজই একখানা অর্ডার দিন। প্রেমের এমন মহনীয় চিত্র, বেদনার এমন করুণ মাধুরী আর কোন উপন্যাসে পাইবেন না। যদি ঘরে বসিয়া রাঙ্গামুখের হাসি দেখিতে চান, তবে "ভাঙ্গাবুকের" করুণ কাহিনী পাঠ করুন। সূক্ষ্ম মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণে কবিত্বময়ী রচনা ভঙ্গিতে আপনি মুগ্ধ হইয়া যাইবেন। লণ্ডনের বৃটিশ মিউজিয়মে একখানি রক্ষিত হইয়াছে। ছাপা ও বাইণ্ডিং সুন্দর মূল্য নাম মাত্র ১॥০ দেড় টাকা, মাশুল স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থানঃ—**মোহাম্মদী বুক এজেন্সি**, ২৯নং আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা।

বাঙ্গালা মোসলেম সমাজের আদর্শ কবিতা পুস্তক

# হাস্নাহানা

কবিতার পুস্তক ত অনেক বাহির হইতেছে, কিন্তু হাস্নাহানার মত পুস্তক আর কেহ দেখিয়াছেন কি? এ যুগের উপভোগের ও উপহারের যদি কিছু থাকে তবে তাহা হাস্নাহানা। আর্টের দিক দিয়া এমন সুন্দর পুস্তক কেহ কখনও দেখেন নাই। মূল্য মাত্র ১৲ এক টাকা মাশুল স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থানঃ—**ডি, এম, লাইব্রেরী**, ৬১নং কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা ও অন্যান্য পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য।

"রছুল-স্মৃতি" বা চীনের প্রাচীনতম মছজিদ

বিস্তারিত বিবরণ 'সঙ্কলন'-প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য।

মাসিক মোহাম্মদী

প্রথম বর্ষ। || পৌষ, ১৩৩৪ সাল। || তৃতীয় সংখ্যা

# এছলামে নারীর মর্য্যাদা ও অধিকার

[ মোহাম্মদ আকরম খাঁ ]

( ৩ )

মাতার মর্য্যাদা সম্বন্ধে হজরত তাঁহার উম্মতকে যে উপদেশ দিয়াছেন,— সে সম্বন্ধে তিনি দুনয়ায় যে অনুপম আদর্শ স্থাপন করিয়াছেন, তাহার বিস্তারিত পরিচয় দিতে হইলে একখানা স্বতন্ত্র গ্রন্থ রচনার আবশ্যক হইয়া পড়িবে। হজরত স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন—মাতার অসন্তোষ উৎপাদন মহাপাপ। আল্লাহ গফুরর্ রহিম, সমস্ত মহাপাতকের ক্ষমা তিনি করেন। কিন্তু মাতৃদ্রোহের মহাপাতকের ক্ষমা তিনি করেন না, এবং মাতৃদ্রোহী এই জীবনেই নিজের পাপের দণ্ড ভোগ করিতে বাধ্য হয়।—মেশকাত।

একজন ছাহাবী আসিয়া হজরতকে জিজ্ঞাসা করিলেন—কাহার খেদমত করা আমার কর্ত্তব্য? হজরত বলিলেন—তোমার মাতার। ছাহাবী পুনরায় বলিলেন—তাহার পর? হজরত বলিলেন—তোমার মাতার। ছাহাবী আবার জিজ্ঞাসা করিলেন—তাহার পর? হজরত উত্তর করিলেন—তোমার মাতার। ছাহাবী আবার বলিলেন—তাহার পর? হজরত বলিলেন—তাহার পর তোমার পিতার, এবং তাহার পর পর্য্যায়ক্রমে আত্মীয় স্বজনগণের।—বোখারী, মোছলেম, তিরমিজী, আবুদাউদ।

বিবি হালিমা একটী বেদুইন গোত্রের একজন সাধারণ স্ত্রীলোক। শৈশবকালে হজরত তাঁহার স্তন্যপান করিয়াছিলেন, তাই হালিমা হজরতের দুধ-মা। হজরত ছাহাবাগণকে লইয়া মজলিসে বসিয়া আছেন, এমন সময় হালিমা আসিয়া সেখানে উপস্থিত হইলেন। হজরত অন্য কাহাকে কিছু না বলিয়া নিজে উঠিলেন, নিজের গায়ের চাদর বিছাইয়া দিয়া হালিমাকে লইয়া তাহার উপর বসাইলেন।

—আবুদাউদ।

পাঠক স্মরণ রাখিবেন যে, ইহা হোনেন যুদ্ধের পরের কথা, এবং উল্লিখিত দরবারে হজরতের প্রধান প্রধান খলিফা ও ছাহাবাগণের মধ্যে অনেকেই উপস্থিত ছিলেন। এ হেন সময়ে, এ হেন দরবারে, হজরতের রেদা-মোবারকের উপর

আসন-প্রাপ্তির ন্যায় মর্য্যাদা মুছলমানের চোখে আর কিছুই হইতে পারে না।

একদা জনৈক ভক্ত আসিয়া হজরতকে বলিলেন—আমি জেহাদে প্রবৃত্ত হওয়ার ইচ্ছা করিয়াছি এবং সে জন্য আপনার পরামর্শ চাই। হজরত জিজ্ঞাসা করিলেন—তোমার মা কি বাঁচিয়া আছেন? ছাহাবী বলিলেন—"হাঁ" হজরত তখন বলিলেন—যাও, তন্ময় তদ্গত হইয়া মায়ের সেবায় প্রবৃত্ত হও। নিশ্চয় জানিও,—

ان الجنة عند رجلها

স্বর্গ মাতার চরণ সন্নিধানে অবস্থিত।—আহমদ, নাছাই, বাইহাকী।

আনাছ বলিতেছেন, হজরত বলিয়াছেন :—

الجنة تحت اقدام الامهات – خطيب - مرقات

স্বর্গ মাতার চরণ তলে অবস্থিত।—খতিব, মেশকাতের টীকা হইতে গৃহীত।

"একজন ছাহাবী আসিয়া হজরতকে জিজ্ঞাসা করিলেন—সন্তানের উপর পিতা মাতার হক্ কিরূপ? হজরত উত্তরে বলিলেন :—

هما جنتك و نارك

পিতা-মাতা তোমার স্বর্গ এবং তাঁহারাই আবার তোমার নরক।—ইব্‌নে মাজা।

ইব্‌নে ইম্‌রাণ নামক ছাহাবী হজরতের খেদমতে উপস্থিত হইয়া বলিলেন—আমি এক মহাপাতকে লিপ্ত হইয়াছি, তাহার কি কোন তাওবা আছে? হজরত বলিলেন—তোমার মা বাঁচিয়া আছেন কি? ইব্‌নে ইম্‌রাণ বলিলেন, না তিনি বাঁচিয়া নাই। হজরত পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন—মাতার সহোদরা—খালা? ছাহাবী বলিলেন—হাঁ আমার খালা বাঁচিয়া আছেন। হজরত বলিয়া দিলেন—যাও, সেই খালার খেদমত করিতে থাক। অর্থাৎ ইহাতেই তোমার মহাপাতকের প্রায়শ্চিত্ত হইবে।—তিরমিজী।

এছলাম নারীকে সম্মান ও গৌরবের যে উচ্চ আসনে সমাসীন করিয়াছে, উপরে অতি সংক্ষেপে তাহার আভাষ দিয়াছি। কিন্তু ইহাই যথেষ্ট নহে। যে বাচনিক সম্মান প্রদর্শনের সঙ্গে-সঙ্গে নারীকে তাহার খোদা-দত্ত অধিকারগুলি ভোগ করার স্বাধীনতা দেওয়া হয় নাই, তাহা অনর্থক শব্দ বিন্যাস এবং প্রবঞ্চনামূলক কপট মর্য্যাদা-প্রকাশ ব্যতীত আর কিছুই নহে। প্রকৃতপক্ষে, বাহ্যাড়ম্বরের চটকে সরল-প্রকৃতি নারীকে তাহার স্বাভাবিক স্বত্বাধিকার হইতে বঞ্চিত রাখার জন্য, উহা একটা সফল ষড়যন্ত্র মাত্র। অতএব এখন আমাদিগকে দেখিতে হইবে যে, বাস্তব কার্য্যক্ষেত্রে এছলাম নারীর কি অধিকার স্বীকার করিয়াছে এবং সমাজের বুকে তাহাকে কি প্রকারে প্রতিষ্ঠিত করিয়া রাখিয়াছে। আমাদিগের বিশ্বাস, নারীর মর্য্যাদা সংক্রান্ত এছলামের অনুপম আদর্শের বিশেষত্ব এইখানেই গৌরবে ও মহিমায় উজ্জ্বলতর হইয়া উঠিয়াছে।

## এছলামে নারীর অধিকার

দুনয়ার সকল শিক্ষা ও সকল সভ্যতার সংস্পর্শ হইতে দূরে অবস্থিত—আরব দ্বীপে, দীর্ঘ ১৪শ শতাব্দী পূর্ব্বে, তাহার নিরক্ষর নবী হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা, এছলাম ধর্ম্মের প্রচার করেন। দুনয়ার কোন আইন-কানুন তিনি জানিতেন না, কোন শাস্ত্র-ব্যবস্থা তিনি অবগত ছিলেন না। অধিকন্তু তাঁহার স্বদেশে ও স্বসমাজে নারী সম্বন্ধে যে অনাচার তখন সাধারণভাবে প্রচলিত ছিল, তাহার উল্লেখ করিতেও মনে ঘৃণার উদ্রেক হয়। এই অবস্থায় এবং এই পারিপার্শ্বিকতার মধ্যে, প্রায় ১৪ শত বৎসর পূর্ব্বে নারীর জন্য তিনি যে অধিকার প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, তাহা কেবল অপূর্ব্ব ও অনুপমই নহে, বরং সঙ্গে সঙ্গে তাহা পূর্ণ চরম ও শাশ্বত ব্যবস্থা। মনুষ্যত্বের সাধনায় এবং সত্যকার সভ্যতায় বিশ্বমানব যেদিন চরম সাফল্য লাভ করিবে, সেদিনও তাহাকে স্বীকার করিতে হইবে—আরবের নিরক্ষর-নবীর ব্যবস্থাই সকল দিকের সমস্ত হিসাবে চরম পরম ও পূর্ণতম আদর্শ। নারীর মর্য্যাদা, নারীর স্বাধীনতা ও নারীর অধিকার লইয়া ইউরোপ আজ যে কোলাহল তুলিয়াছে, অধিকারের মানদণ্ডে তুলিয়া তাহার প্রকৃত স্বরূপের বিচার বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে, স্পষ্টতঃ জানা যাইবে যে, নারীর অধিকারের এই ঢক্কানিনাদ সত্ত্বেও আজও ইউরোপ এছলামী আদর্শের বহু পশ্চাতে পড়িয়া আছে। নারীর অশ্লীল ও উলঙ্গ

চিত্র মুদ্রিত করায় অথবা রঙ্গালয়ে মডএলেন জাতীয় নারীদিগের উলঙ্গ নৃত্য দর্শনে, নারীকে স্বাধীনতা দেওয়া হয় না, সম্মানও করা হয় না। সম্মানের প্রকৃত প্রমাণ—তাহার অধিকার-স্বীকারে, আর অধিকার-স্বীকারের প্রধান পরীক্ষাস্থল দায়ভাগ বা উত্তরাধিকার আইন। ইউরোপের এই আইনগুলি পরীক্ষা করিয়া দেখিলে, তন্মধ্যে চরম সভ্যতার দাবীদার ইংরাজ জাতির আধুনিক সংশোধিত বিধিব্যবস্থাগুলির পর্য্যালোচনা করিলে, এবং এছলামের উত্তরাধিকার আইনের সহিত তাহার তুলনায় সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইলে, উভয়ের মধ্যকার আকাশ পাতাল প্রভেদ সহজেই ধরা পড়িয়া যাইবে। ১৪ শত বৎসর পূর্ব্বে দুনয়ার বিভিন্ন সভ্যতা ও বিভিন্ন ধর্ম্মশাস্ত্র নারীকে যে "অধিকার" দিয়া রাখিয়াছিল, তাহারও সঙ্গে সঙ্গে আলোচনা হওয়া উচিত। অন্যথায় এছলামের প্রতি অবিচার করা হইবে—এ কথা আমরা পুনঃ পুনঃ উল্লেখ করিতেছি, তাহার একটা গুরুতর কারণ আছে।

ইউরোপ অজ্ঞানতা ও অন্ধবিশ্বাসে সমাচ্ছন্ন হইয়া ছিল। সে জ্ঞানের স্বাদ পাইল, সভ্যতার আদর্শ দর্শন করিল—মুছলমানের সংশ্রবে আসার পর। আরব-গুরুগণের খেদমতে নতজানু হইয়া, ইউরোপ জ্ঞান বিজ্ঞান ও সভ্যতার রীতি নীতি শিক্ষা করিয়াছিল—এ কথা সকলেই জানেন এবং অনেকে স্বীকারও করেন। একটু কষ্ট স্বীকার করিয়া অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে জানা যাইবে যে, মুছলমানের সহিত শত্রু বা মিত্ররূপে সাহচর্য্য ঘটার সময় পর্য্যন্ত সমস্ত ইউরোপ—সমস্ত খৃষ্টান-জগৎ, নারীকে খোদার সাক্ষাৎ অভিশাপ এবং দানবী পিশাচীরূপে কল্পনা করিয়া রাখিয়াছিল। নারী যে আত্মাবিশিষ্ট একটা জীব, গণ্যমান্য সমাজপতি ও ধর্ম্মনায়কগণ প্রকাশ্য সভা করিয়া তাহা অস্বীকার করিতেন। কিন্তু মুছলমানের সংশ্রবে আসার পর, তাহারা চকিত মোহিত ও আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া দেখিল—নারীর এক সম্পূর্ণ বিপরীত চিত্র। সে চিত্র প্রেমে পুণ্যে নয়নাভিরাম, মহিমায় গরিমায় উজ্জল এবং স্বর্গের আশীর্ব্বাদে উদ্ভাসিত। মুছলমানদিগের এই সাহচর্য্যের পর হইতে—এবং একমাত্র এই সাহচর্য্যের ফলে—সমাজ-সংস্কারের মধ্য দিয়া নারীর দুরবস্থার অনুভূতি তাহাদিগের মধ্যে একটু একটু করিয়া জাগিয়া উঠিয়াছিল। ফলে ইউরোপে নারীর অবস্থার যতটুকু উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছে, এবং ইউরোপের অনুকরণে প্রাচ্যের বিভিন্ন জাতির মধ্যে আজ নারীর অধিকার যতটুকু স্বীকৃত হইতেছে—তাহা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে এছলামেরই কল্যাণদান। একথাগুলি কাহারও কাহারও নিকট হয়ত নূতন বলিয়া প্রতীত হইবে। কিন্তু নূতন হইলেও ইহা অনাবিল সত্য। *

## দায়ভাগে নারীর অধিকার

এই প্রবন্ধের প্রথম হইতে আমরা নারীকে কন্যা, স্ত্রী ও মাতারূপে স্বতন্ত্রভাবে আলোচনা করিয়া আসিয়াছি। কারণ ইহাই হইতেছে, নারীর স্বরূপ-প্রকাশের তিনটী মৌলিক অবস্থা। এখন আমরা এই হিসাবে নারীর উত্তরাধিকারের বিষয় আলোচনা করিব। এই আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়ার পূর্ব্বে পাঠকগণকে স্মরণ করাইয়া দিতেছি যে, বিহিতভাবে স্ত্রীর ভরণপোষণের ব্যয় বহন করিতে স্বামী ধর্ম্মতঃ বাধ্য। এমন কি অধিকাংশ পণ্ডিতগণের মতে ইহা বিবাহের একটা আবশ্যকীয় শর্ত্ত।

এছলামের দায়ভাগ আইনে প্রথম শ্রেণীর অগ্রগণ্য উত্তরাধিকারী বারজন, তাহার মধ্যে আটজন স্ত্রীলোক ও চারিজন পুরুষ।

কন্যা মাতা ও স্ত্রী এছলামের ব্যবস্থায় কস্মিন কালে কোন অবস্থায় পিতা পুত্র ও স্বামীর সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত হন না।

সন্তান থাকিলে স্ত্রী ৵০ আনা এবং নিঃসন্তান অবস্থায় স্বামীর মৃত্যু ঘটিলে, স্ত্রী তাহার সমস্ত সম্পত্তির চারি আনা রকম উত্তরাধিকার পাইয়া থাকেন।

মৃত ব্যক্তির পুত্র বাঁচিয়া থাকিলে প্রত্যেক কন্যা প্রত্যেক পুত্রের অর্দ্ধেক ভাগ পাইবেন, অন্যথায় এক কন্যা থাকিলে পিতার সমস্ত সম্পত্তির অর্দ্ধেক, এবং একাধিক হইলে $\frac{2}{3}$ অংশ সেই কন্যাগণের প্রাপ্য হইবে।

মাতা তাহার সন্তানের পরিত্যক্ত সম্পত্তি হইতে অবস্থা ভেদে এক তৃতীয়াংশ বা এক ষষ্ঠাংশ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

নারীগণও উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তির উপর সকল

* এই গুরুতর বিষয়টী লইয়া বিস্তারিত আলোচনা হওয়া আবশ্যক। আমাদিগের জ্ঞানান্বেষী শিক্ষিত যুবকদিগের মধ্যে কাহাকেও Special subject রূপে ইহার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতে দেখিলে যারপর নাই সুখী হইব।

প্রকারের "নির্ব্যূঢ়" স্বত্বে স্বত্বাধিকারিণী হইয়া থাকেন এবং ইচ্ছা মত তাহা ভোগ দখল ও দান বিক্রয়াদি করিতে পারেন।

জীবন স্বত্ব বলিয়া কোন কথা এছলামী দায় ভাগে নাই। নারিগণের উত্তরাধিকার লাভের পর সে সম্পত্তি সম্পূর্ণভাবে তাঁহাদের স্বোপার্জ্জিত সম্পত্তিরূপে গণ্য হইয়া যায়, এবং তাঁহাদিগের মৃত্যুর পর সে সম্পত্তির অধিকার প্রাপ্ত হয়—তাঁহাদের ওয়ারেছগণ।

নারীদিগের উত্তরাধিকার সম্বন্ধে আজও দুনয়ার বিভিন্ন আইন কানুনে নানাবিধ বাধাবিঘ্ন ও শর্ত্তাদির বজ্রবাঁধন দেখিতে পাওয়া যায়। এছলামে তাহার একটুও স্থান নাই। এছলাম নারীকে পিতা, পুত্র, স্বামী ও ভ্রাতার পরিত্যক্ত তাঁহাদিগের পৈতৃক, স্বোপার্জ্জিত, রেয় টাকা, ব্যবসা-বাণিজ্য ও অন্যান্য প্রকারের যাবতীয় স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তির উপর পুরুষ উত্তরাধিকারীদিগের সমান স্বত্বাধিকারের মালিক করিয়া দেয়।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, নারীর মূল্য ও মর্য্যাদার পরিমাণ নির্ণয় করিতে হইবে, তাহার প্রাপ্ত স্বত্বাধিকারের মধ্য দিয়া। অর্থাৎ যে ধর্ম্ম নারীর প্রাপ্য স্বত্বাধিকারের ন্যায্য দাবী যে পরিমাণে স্বীকার করিয়াছে, সে ধর্ম্ম-সমাজের চোখে নারীর মূল্য ও মর্য্যাদা তত অধিক। আর এই অধিকার-দানের বাস্তব পরীক্ষা ক্ষেত্র হইতেছে—সম্পত্তি। আমরা উপরে সংক্ষেপে সে অধিকারের যে পরিচয় দিয়াছি, অভিজ্ঞ পাঠকগণ দুনয়ার সমস্ত প্রাচীন ও আধুনিক আইন কানুন ও শাস্ত্রব্যবস্থার সহিত এছলামের সেই উদার বিধান গুলির তুলনা করিয়া দেখুন, তাহা হইলে তাহার অনুপমতার মহিমা তাঁহারা সম্যকরূপে উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

## বিবাহে নারীর অধিকার

বিবাহ এছলামের এক অতি সৎ, অতি মহৎ এবং অতি পবিত্র স্বর্গীয় অনুষ্ঠান। পুরুষ নারীর পাণিগ্রহণ করে—আল্লাহকে সাক্ষী করিয়া, তাঁহাকে জামিন দিয়া। অর্থাৎ পুরুষ আল্লার নিকট প্রতিজ্ঞাপাশে আবদ্ধ হয় এবং তাহার সেই প্রতিজ্ঞার উপর নির্ভর করিয়া—পুরুষ সেই প্রতিজ্ঞা পালন করিবে বলিয়া—আল্লাহ স্বয়ং পুরুষের পক্ষ হইতে জামিন হন, আর জামিন স্বরূপে তিনিই স্বয়ং নারীকে লইয়া পুরুষের হাতে সমর্পন করেন। বিবাহ ও নারীর মর্য্যাদা-সংক্রান্ত বহু শাস্ত্রীয় বচনে এছলামী বিবাহের এই স্বরূপ অতিশয় উজ্জ্বলভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। এদেশের অনেকের ধারণা—মুছলমানের বিবাহ, একটা সামাজিক চুক্তি বা Civil Contract ব্যতীত আর কিছুই নহে। Mohamadan Law নামে প্রচলিত আইন পুস্তকগুলির দ্বারা এই সম্পূর্ণ মিথ্যা ভাবটাকে দেশময় সংক্রামিত করা হইয়াছে। কিন্তু ইহা একটা স্বতন্ত্র সন্দর্ভ এবং ভবিষ্যতে স্বতন্ত্রভাবে ইহার আলোচনা করিয়া এছলামী বিবাহের প্রকৃত স্বর্গীয় স্বরূপটা পাঠকগণের সম্মুখে উপস্থাপিত করার চেষ্টা পাইব।

বিবাহ নারীর একমাত্র জীবন-মরণ সমস্যা এবং এই সমস্যার অনুকূল বা প্রতিকূল সমাধানের উপর তাহার বাস্তব জীবন ও বাস্তবমরণ সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিয়া থাকে। সুতরাং কাহাকে জীবনসঙ্গীরূপে গ্রহণ করিয়া সে সুখী হইতে পারিবে না পারিবে, সে বিষয়ে মত প্রকাশ করার অধিকার তাহার থাকা চাই, বাস্তব কার্য্যক্ষেত্রে আইনে সে মতের একটা মর্য্যাদা ও গুরুত্ব স্বীকৃত হওয়া চাই, আর—কেবল সুনীতির হিসাবে নহে—বরং অপরিহার্য্য ধর্ম্মবিধানের ও অবশ্য প্রতিপাল্য আইনের হিসাবেও তাহার একটা মূল্য থাকা চাই।

দুনয়ার সমস্ত শাস্ত্রব্যবস্থা তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান কর, এ অধিকারের খোঁজ খবর কোথায়ও পাইবে না। বরং সর্ব্বত্রই দেখিতে পাইবে ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত এক নির্ম্মম চিত্র। পাশ্চাত্য জাতি সমূহ সভ্যতা ও মনুষ্যত্বের সন্ধান পাইয়াছেন—খুবই হালে। সুতরাং তাঁহাদিগের কথা আজ আর আলোচনা না করিয়া শুধু এইটুকু বলিয়া রাখিতেছি যে, তাঁহাদিগের শাস্ত্র-ব্যবস্থা নারীর মর্য্যাদা বৃদ্ধি করে নাই, কোন একটা সামান্য অধিকার দিয়াও তাহার অবস্থার উন্নতি করিতে চেষ্টা পায় নাই। প্রাচীন সভ্যজাতি পারসিকেরা তখন মজদকীয় শিক্ষায় মোহিত হইয়া "জন্" বা নারীকে জর্ ও জমিনের ন্যায় পুরুষের সাধারণ উপভোগ্য ও যদৃচ্ছা ব্যবহার্য্য একটা তৈজস মাত্রে পরিণত করিয়াছিল। তথাকথিত বিবাহের কোন বাঁধও সেখানে ছিলনা। যে কোন পুরুষ ইচ্ছা করিলে যে কোন সময় যে কোন নারীকে উপভোগ করিতে পারিত। তাহাতে অমত করার বা বাধা দিবার একবিন্দু অধিকারও তখন নারীর ছিল না। বিবাহে নারীর মতামতকে হিন্দুস্মৃতি কস্মিন কালেও কোন মূল্য

প্রদান করে নাই। তাহার আট প্রকার বিবাহের শ্রেষ্ঠ হইতেছে—ব্রাহ্মবিবাহ, দৈববিবাহ, আর্য্যবিবাহ ও প্রজাপত্য বিবাহ। এই সকল স্থানে নারীর মতামত দিবার কোনই অধিকার নাই, এবং আইনে সে মতামতের কোনও মূল্য নাই। একজন ব্যক্তির আবশ্যক হইল—দৈববলে একটা মতলব সিদ্ধি করিয়া লওয়ার। আর সে জন্য তিনি জ্যোতিষ্টোম বা ঐ রকমের আর অকটা যজ্ঞ আরম্ভ করিয়া দিলেন। শাস্ত্র বলেন—যজ্ঞের পুরোহিতকে যদি এই সময় একটা "অলঙ্কৃতা কন্যা" **দান করা** হয়, তাহা হইলে যজ্ঞের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হওয়ার খুব সম্ভাবনা হইয়া থাকে। এরূপ ক্ষেত্রে কর্ম্মকর্ত্তা দৈবকার্য্য-সিদ্ধি-কামনায় পুরোহিতকে যে কন্যাদান করেন, তাহারই নাম ব্রাহ্মবিবাহ। ফলে এখানেও হয় দান না হয় বিনিময়ের ব্যবস্থা এবং তাহার একমাত্র মালেক পুরুষ কর্ম্মকর্ত্তা। নারীর তাহাতে 'না' বলার কোনও অধিকার নাই, বলিলেও "লোকে ধর্ম্মে" তাহা শুনিতে আদৌ বাধ্য নহে। তাহার পর আসুর বিবাহ হইতেছে—দস্তুরমত কন্যা বিক্রয়। গান্ধর্ব্ববিবাহকে বিবাহ বলিলেও পাপ হয়—বস্তুতঃ ইহা ব্যভিচারের শুদ্ধিকরণ ব্যতীত আর কিছুই নহে। নারীর আত্মীয় স্বজনকে দস্তুরমত খুনজখম করিয়া যে "রোরুদ্যমানা কন্যাকে বলপূর্ব্বক হরণ করিয়া আনা হয়," সেও পুরুষের বিবাহিত স্ত্রী। স্মৃতির পরিভাষায় ইহাকে বলা হয়—রাক্ষস বিবাহ। ইহা ব্যতীত পৈশাচবিবাহ আছে। যাঁহার দরকার হয় যথাস্থানে ইহার ব্যুৎপত্তি ও তাৎপর্য্য দেখিয়া লইবেন, আমরা অপারক। যাহা হউক, দুনয়ার কোনও শ্রুতি, কোনও স্মৃতি এবং কোনও ধর্ম্মপ্রতিষ্ঠাতা নারীকে তাহার এই জীবন-মরণ সমস্যায় নিজের স্বাধীন মত অনুসারে কাজ করার কোনও অধিকার দান করেন নাই। কিন্তু এছলাম নারী সমাজকে এই বিপদের পাথার হইতে উদ্ধার করিয়া, তাহার ন্যায্য অধিকারগুলিকে মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছে—ইহাকে চিরস্থায়ী ও অপরিহার্য্য আইনে পরিণত করিয়া দিয়াছে। ইহার দুই একটা মোটামুটি নজির এখানে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

কন্যা বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে তাহাকে অবিলম্বে পাত্রস্থ করার তাকিদ বহু হাদিছে বর্ণিত হইয়াছে। না-বালেগা কন্যার বিবাহ দিবার আদেশ বা তৎসংক্রান্ত বিশেষ কোন বিধিব্যবস্থা —আমাদের সামান্য জ্ঞান অনুসারে—কোরআনে বা হাদিছে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। একথা বলার তাৎপর্য্য এই যে, অবস্থাবিশেষে অপ্রাপ্তবয়স্কা কন্যার বিবাহ দেওয়া অসিদ্ধ না হইলেও, তাহা এছলামের আদর্শ নহে।

বিবাহের দ্বারা নরনারীর মধ্যে যে সম্বন্ধ স্থাপিত হয়, স্বামী স্ত্রীর মৃত্যুর পরও সে সম্বন্ধ বাকী থাকে—পরকালেও তাহারা স্বামী-স্ত্রীরূপে একত্রে বেহেশ্‌তের আনন্দ উপভোগ করিবে—কোরআন ও হাদিছে এসব কথা খুব স্পষ্টভাবে বর্ণিত আছে। সুতরাং বুঝিতে হইবে যে, যে কাজের দ্বারা স্বামী ও স্ত্রীর এই পবিত্র সম্বন্ধের বিচ্ছেদ ঘটিতে পারে, অবস্থা বিশেষে এছলামে তাহার ব্যবস্থা থাকিলেও, তাহা অগত্যা পক্ষের আপাদধর্ম্ম। অপরিহার্য্য অন্যায়রূপে শরিয়তে তাহার অনুমতিমাত্র দেওয়া হইয়াছে—তাহা এছলামের আদর্শও নহে, অভিপ্রেতও নহে।

বয়ঃপ্রাপ্ত না হওয়া পর্য্যন্ত পিতৃহীন বালিকার বিবাহ দেওয়া সিদ্ধ নহে। ইহা কোরআন হাদিছের স্পষ্ট ব্যবস্থা। অধিকাংশ এমাম ও আলেম এই মতের সমর্থন করেন। যাঁহারা ইহার সমর্থন করেন না, তাঁহারাও বলেন যে, দাদা ব্যতীত অন্য কোনও আত্মীয় এতিমার বিবাহ দিলে, বালেগা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে, সে কোন অজুহাত বা যুক্তি প্রমাণ না দেখাইয়া স্বেচ্ছাক্রমে নিজে সে বিবাহ অস্বীকার করিতে পারে। দাদা সম্বন্ধে এই বর্জ্জিত বিধির সমর্থনে—ফারাএজ সংক্রান্ত কিয়াছ ব্যতীত—কোন প্রত্যক্ষ প্রমাণ তাঁহাদিগের নিকট বিদ্যমান আছে বলিয়া লেখকের জানা নাই। সে যাহা হউক, যে বিবাহ বজায় রাখা বা ভাঙ্গিয়া ফেলার সম্পূর্ণ অধিকার নারীর আছে, তাহার মূল্য যে কতটুকু, পাঠক তাহা দেখিতেছেন।

শেষোক্ত দলের মতকেই সঙ্গত বলিয়া ধরিয়া লইলেও তাহার সার এই দাঁড়াইবে যে, পিতৃহীন কন্যাকে কেহ বিবাহ দিলেও সে বিবাহ ভাঙ্গিয়া ফেলার সম্পূর্ণ অধিকার তাহার আছে।

বিধবা হউক, কুমারী হউক, বয়ঃপ্রাপ্ত কন্যার বিবাহ সম্বন্ধে পিতারও কোন অধিকার নাই। সাক্ষী প্রমাণ ও অন্যান্য শর্ত্তগুলি পালন করতঃ কন্যা পিতার অনুমতি না লইয়া, এমন কি তাঁহার সম্পূর্ণ অমতে, যে কোন পুরুষকে যথাশাস্ত্র বিবাহ করিতে পারে। পিতা তাহাতে কোন প্রকার বাধাবিঘ্ন উপস্থিত করিতে পারেন না এবং সে জন্য

কন্যার উপর কোনও প্রকার দোষারোপও করা যাইতে পারে না। কারণ সে শরিয়তের দেওয়া অধিকার ভোগ করিতেছে মাত্র। ইহা এমাম আবু-হানিফা ছাহেবের ও হানাফী মজহাবের গৃহীত অভিমত। এই মতাবলম্বীরা নিজেদের মতের সমর্থনে বহু দলিল ও নজির উদ্ধার করিয়া থাকেন।

অন্যান্য আলেম ও এমামগণ বলেন যে, কুমারী বা বিধবা কন্যার অমতে বা আদৌ মত না লইয়া কোন পিতাও যদি তাহার বিবাহ দেন, তাহা হইলে সে বিবাহ যে অসিদ্ধ তাহাতে এক বিন্দুও সন্দেহ নাই। কারণ পরস্পরের—উভয় বর ও কন্যার—সম্মতিই হইতেছে বিবাহের প্রধানতম উপাদান। তাহার পর ঠিক বিবাহের সময় formal ভাবে কন্যাদিগের "এজেন" বা অনুমতি না লইলেও বিবাহ সিদ্ধ হয় না, ইহাও সর্ব্ববাদীসম্মত কথা। বিবাহে উকীল ও সাক্ষী রাখিতে হয়—এই সম্মতিদানের প্রমাণ স্বরূপে। কিন্তু এ সমস্ত স্বাধীনতা ও অধিকার থাকা সত্ত্বেও নারী পিতার অনুমতি লইতে বাধ্য। "অলির অনুমতি ব্যতীত কোন বিবাহ সিদ্ধ হইতে পারে না"—এই মর্ম্মের প্রমাণ কোরআন হাদিছ হইতে উদ্ধৃত করিয়া ইঁহারাও নিজ মতের সমর্থন করিয়া থাকেন। কিন্তু ইঁহারাও বলেন যে, কোন অলি যদি নারীর ক্ষতিজনক ভাবে তাহার বিবাহে অনুমতি দিতে অস্বীকার করে, তাহা হইলে কাজীর নিকট দরখাস্ত করিয়া নারী সে অনুমতি লাভ করিতে পারে। শাস্ত্রীয় প্রমাণের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদিগের প্রধানতম যুক্তি এই যে, সংসারের কুটিলতা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ কুমারী তরুণী, বয়স-ধর্ম্মের মোহ কর্ত্তৃক প্রলুব্ধ—অথবা দুষ্ট চঞ্চলমতি ও নীচ স্বার্থপরায়ণ পুরুষগণের দ্বারা প্রবঞ্চিত হইয়া নিজের সর্ব্বনাশ সাধন করিয়া বসিতে পারে। নারীকে এই বিপদ হইতে রক্ষা করার জন্য, পিতা প্রভৃতি অলিগণের মত লইয়া কাজ করার ব্যবস্থা হইয়াছে। অন্যপক্ষেরা যুক্তির হিসাবে বলেন—বয়ঃপ্রাপ্ত হওয়ার পর নারী—তা সে কুমারী হউক, বিধবা হউক বা বিবাহিত হউক—নিজের সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণের, ভোগ তছরুফের ও দান-বিক্রয়ের সম্পূর্ণ মালেক হইয়া যায়, এবং সে সময় তাহাকে পিতা বা স্বামীর কোন প্রকার অনুমতি লইতে আইনতঃ বাধ্য করা হয় নাই। সম্পত্তি সম্বন্ধে নারীকে যে অধিকার ও স্বাধীনতা দেওয়া সঙ্গত বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে, বিবাহ সম্বন্ধে তাহাকে সে অধিকার ও স্বাধীনতা হইতে বঞ্চিত করার কোনই কারণ নাই।

এই মতবাদগুলির সমালোচনা করা এক্ষেত্রে আমাদিগের উদ্দেশ্য নহে। বিবাহ সম্বন্ধে এছলাম নারীকে কি প্রকার অধিকার ও কি পরিমাণ স্বাধীনতা প্রদান করিয়াছে, সে বিষয়ের সমস্ত দিক পাঠক পাঠিকার সম্মুখে পরিস্ফুট করার জন্য আমরা এতগুলি কথার অবতারণা করিয়াছি। রক্ষণশীল দলের এমামগণও বিবাহে নারীর যে অধিকার স্বীকার করিয়াছেন, এই আলোচনায় তাহাও পরিষ্কার ভাবে বুঝিতে পারা যাইতেছে। কুমারী হউক, বিধবা হউক, তাহার স্পষ্ট অভিমত না লইয়া কোন 'অলি'—এমন কি তাহার পিতাও—তাহাকে বিবাহ দিবার অধিকারী নহেন, ইহা সকল পক্ষের সর্ব্ববাদীসম্মত অভিমত।

অন্য অলির কথা দূরে থাকুক, স্বয়ং পিতাই যদি কন্যার অমতে তাহার বিবাহ দেন, তাহাহইলে কন্যা ইচ্ছা করিলে তখনই সে বিবাহকে অস্বীকার ও অমান্য করিতে পারে। স্বয়ং হজরত রছুলে করিম বিভিন্ন ঘটনায় এইরূপ সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিয়াছেন এবং তাঁহার হুকুমে এই শ্রেণীর কতক গুলি বিবাহ অসিদ্ধ বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছে। পাঠকগণের কৌতুহল নিবারণের জন্য এখানে দুইটী মাত্র হাদিছ উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি :—

عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ قَالَ اَنَّ جَارِيَةً بِكْرًا اَتَتْ رَسُولَ

اللّٰهِ صلعم فَذَكَرَتْ اَنَّ اَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِيَ كَارِهَةٌ

فَخَيَّرَهَا النَّبِيُّ صلعم — ابو داؤد —

এবনে আব্বাছ বলেন, একটী কুমারী-কন্যা হজরতের নিকটে আসিয়া বলিলেন যে, তাঁহার পিতা তাঁহার বিবাহ দিয়াছেন, অথচ সে বিবাহে তাঁহার অমত। হজরত তাঁহাকে স্বাধীনতা দিলেন (অর্থাৎ বলিয়া দিলেন যে ইচ্ছা করিলে তুমি এ বিবাহ বজায় রাখিতে পার, আর ইচ্ছা করিলে উহা 'ক্যান্সিল' করিয়া দিতে পার)।—এবনেমাজা, আবুদাউদ প্রভৃতি।

عن عايشة رض ان فتاة قالت يعني

للنبي صلعم ان ابي زوجني من ابن اخيه

ليرفع بي خسيسته وانا كارهة فارسل النبي

صلعم الى ابيها فجاء فجعل الامر اليها فقالت

يا رسول الله اني قد اجزت ما صنع ابي ولكن

اردت ان اعلم للنساء ان ليس للاباء من الامر

شيئ – النسائي – تيسير الوصول –

বিবি আয়েশা বলিতেছেন—এক তরুণী হজরতের নিকটে আসিয়া বলিল—ভ্রাতুষ্পুত্রের নীচ ব্যবহার হইতে রক্ষা পাইবার জন্য পিতা তাহার সহিত আমার বিবাহ দিয়াছেন—অথচ আমার ইহাতে অমত। তখন হজরত তাহার পিতাকে ডাকাইয়া আনিয়া তাঁহার সম্মুখে ঐ তরুণীকে বলিয়া দিলেন—তোমার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা আছে, ইচ্ছা করিলে তুমি এই বিবাহ বহাল রাখিতে পার, ইচ্ছা করিলে তাহা অস্বীকার করিতেও পার। তরুণী তখন বলিতে লাগিলেন—হজরত! পিতার কার্য্যে আমি অনুমতি দিলাম। তবে এই মোকদ্দমা উপস্থিত করিয়া আমি নারীসমাজকে জানাইয়া দিতে চাহিয়াছি যে, (কন্যার উপর) পিতাদিগের কোনও প্রকার অধিকার নাই।—নাছাই, তাইছির হইতে।

হানাফী মজাহাবের প্রাচীনতম ও প্রধানতম এমাম, শামছুল আয়েম্মা ছরখছী এই হাদিছের উল্লেখ করিয়া বলিতেছেন—

ولم ينكر عليها مقالتها رسول الله صلعم —

المبسوط – ٥-٢

"অথচ হজরত যুবতীর এই উক্তির কোনও প্রতিবাদ করিলেন না।"—মবছুত ৫—২ পৃষ্ঠা। এমাম ছাহেব এই যুক্তির দ্বারা সপ্রমাণ করিতেছেন যে, হাদিছের শেষ ভাগে বর্ণিত যুবতীর অভিমতটীও হাদিছরূপে গণ্য। কারণ ইহা দ্বারা প্রমাণিত হইতেছে যে, হজরত মৌনাবলম্বন দ্বারা তাহার সমর্থন করিয়াছেন। তাহাতে একটুও অন্যায় থাকিলে হজরত নিশ্চয়ই তাহার প্রতিবাদ করিতেন। অছুলকারগণের পরিভাষায় ইহা তকরিরী-হাদিছ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে, এবং ইহা সর্ব্ববাদীসম্মতরূপে প্রত্যক্ষ হাদিছ বলিয়া পরিগণিত।

এমাম বাইহাকি ও হাফেজ এবনে হাজর শাফেয়ী মতবাদের সমর্থনের আগ্রহাতিশয্য বশতঃ প্রথম হাদিছটীর ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন যে, 'গয়ের কফুতে' বিবাহ দিবার কারণে তাহা ভঙ্গ করার অনুমতি দেওয়া হইয়াছিল। বলুগুল মরামের টীকাকার আমির মোহাম্মাদ বেন এছমাইল বলিতেছেন—ইহা শাফেয়ী মজহাবের সমর্থনের জন্য এই এমামদ্বয়ের আগ্রহাতিশয্যের ফল। বস্তুতঃ তাঁহাদের উক্তির কোনও প্রমাণ নাই। (ছোবলুছ ছালাম, আওনুল মা'বুদ ২—১৯৫) আমাদিগের মতে ইহা শুধু প্রমাণহীন কথা নহে, বরং প্রমাণের বিপরীত কথা। অন্যান্য আলোচনা পরিত্যাগ করিয়া দ্বিতীয় হাদিছটীর প্রতি নজর করিলেই আমাদের কথার সত্যতা স্পষ্টতঃ হৃদয়ঙ্গম করা যাইতে পারিবে। কারণ এই হাদিছে স্পষ্টভাবে বলা হইয়াছে যে, পিতা তাহার ভ্রাতুষ্পুত্রের সহিত কন্যার বিবাহ দিয়াছিলেন এবং হজরত সেই বিবাহ ভঙ্গ করার অধিকার কন্যাকে দিয়াছিলেন। কফুর প্রচলিত মছলাকে নির্ভুল বলিয়া ধরিয়া লইলেও, আপন চাচা'ত ভাইকে কেহই "গয়ের কফু" বলিয়া নির্দ্ধারিত করিতে পারিবেন না।

বিবাহ সংক্রান্ত মতভেদ গুলির সূক্ষ্ম সমালোচনা করা এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। কিন্তু এখানে আর একটা প্রসঙ্গে দুই একটা কথা না বলিলে, বর্ত্তমান প্রবন্ধের প্রধান উদ্দেশ্য অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে বলিয়া মনে হইতেছে।

বিবাহ সংক্রান্ত বিভিন্ন মতবাদের আলোচনা করিলে জানা যাইবে যে, এক এরাকের পণ্ডিতগণ ব্যতীত (আওনুল মা'বুদ ২—২০৫) অন্যান্য সকলে সাধারণভাবে স্বীকার করিতেছেন যে, পিতা যদি অপ্রাপ্তবয়স্কা কন্যার বিবাহ দেন, তবে সে কন্যার আর উদ্ধার নাই।

কোনও অবস্থায় সে বিবাহ ভঙ্গ করার কোনও অধিকারই আর তাহার থাকে না। আমরা এরাকীয় পণ্ডিতগণের মতকেই সঙ্গত এবং কোরআন হাদিছের সমস্ত দলিলের ভাব ও ভাষার সহিত সমঞ্জস বলিয়া মনে করি। প্রথমতঃ অন্য পক্ষের নিকট এমন কোন বিশেষ দলিল নাই, যাহাদ্বারা তাঁহারা সন্তোষজনকরূপে সপ্রমাণ করিতে পারেন যে,—অপ্রাপ্তবয়স্কা কন্যা বয়ঃপ্রাপ্তা হওয়ার পর অন্য সমস্ত অলির দ্বারা অনুষ্ঠিত বিবাহকে অস্বীকার করিতে পারে বটে, বয়ঃপ্রাপ্তা কুমারী কন্যা পিতার দ্বারা অনুষ্ঠিত বিবাহকেও অমান্য করিতে পারে বটে, কিন্তু পিতা শত অন্যায় করিয়াও অপ্রাপ্তবয়স্কা কন্যার বিবাহ দিলে, সে বিবাহ ভঙ্গ করার কোন অধিকার তাহার কস্মিনকালে ও কোন অবস্থাতেই বর্ত্তিতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ যুক্তির হিসাবে বিচার করিয়া দেখিলে, সহজে বুঝিতে পারা যাইবে যে, এছলাম বিবাহ সম্বন্ধে নারীকে যে অধিকার ও স্বাধীনতা দান করিয়াছে, এবং তাহার মূলে যে উদার মহান ও স্বাভাবিক 'নীতি' নিহিত রহিয়াছে, এই মতবাদটী সে নীতির সম্পূর্ণ বিপরীত।

অপরিণতবয়স্কা বালিকার বিবাহ দেওয়া যে এছলামের আদর্শ নহে—একথা আমরা পূর্ব্বেই আরজ করিয়াছি। বিবি আয়শার বিবাহ-বিবরণ আমাদিগের অবিদিত নহে। এই হাদিছ সংক্রান্ত সূক্ষ্ম আলোচ্য বিষয় অনেক আছে, এক্ষেত্রে তাহার বিচারের স্থানাভাব। আজ এই প্রসঙ্গে মোটের উপর শুধু এই কথাটা বলিয়া রাখিলে যথেষ্ট হইবে যে, হজরতের বিবাহ ও তাঁহার বিবিগণের বিষয়ে এমন অনেক ব্যবস্থা আছে, মুছলমান সাধারণের জন্য যাহা প্রযোজ্য হইতে পারে না।

হজরতের শিক্ষাগুণে এবং তাঁহার সময় সত্যকার এছলামী ব্যবস্থার মুক্ত আবহাওয়ার মধ্যে লালিত পালিত হওয়ার ফলে, নিজেদের দাবী প্রকাশ ও অধিকার-প্রতিষ্ঠা-ক্ষেত্রে মোছলেম তরুণীরাও যে কিরূপ সাহস ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, এই সকল হাদিছের দ্বারা তাহাও স্পষ্টতঃ প্রকাশ হইয়া যাইতেছে।

বিবাহ-বন্ধন ছেদ করা সম্বন্ধে এছলামে আরও যে সব বিধি ব্যবস্থা আছে, এই প্রসঙ্গে সম্যকরূপে তাহারও বিচার করা আবশ্যক। নচেৎ আলোচনা অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। আবার সে সম্বন্ধে কোন কথা বলিতে গেলে, তালাকের মছলার সকল দিকের বিস্তারিত আলোচনার আবশ্যক হইয়া দাঁড়ায়। এজন্য উপস্থিত আমরা সে আলোচনা হইতে বিরত থাকিতে বাধ্য হইলাম। আল্লাহতাআলা শক্তি দিলে, ভবিষ্যতে এই ত্রুটি পূরণের চেষ্টা করিব। তবে পাঠকগণকে আজ এইটুকু মাত্র বলিয়া রাখিতেছি যে, আজকাল মুছলমান সমাজ সাধারণতঃ তালাকের অধিকারের যে প্রকার অপব্যবহার করিতেছে, তাহা এছলামের আদর্শ নহে,—বরং তাহার বিপরীত একটা ঘৃণিত বেদ্‌আৎ ও অশাস্ত্রীয় ব্যভিচার মাত্র। পক্ষান্তরে এখানে ইহাও জানিয়া রাখা উচিত যে, যেমন বিশেষ বিশেষ কারণে ও বিশেষ বিশেষ অবস্থায়, স্বামী ও স্ত্রী উভয়ের মঙ্গলের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া, বিশেষ বিশেষ সতর্কতা অবলম্বনের কঠোর তাকিদ সহকারে স্বামীকে অগত্যা স্ত্রীত্যাগের অনুমতি দেওয়া হইয়াছে, সেইরূপ বিশেষ বিশেষ অবস্থায়, বিশেষ বিশেষ কারণে এবং বিশেষ বিশেষ সতর্কতার তাকিদ সহকারে এছলাম নারীকেও বিবাহবন্ধন ছেদ করার অধিকার প্রদান করিয়াছে। পুরুষ স্মার্ত্তগণের বহু শতাব্দীর নেকনজরের ফলে, শরিয়তের মূল ব্যবস্থাগুলি স্থানে স্থানে চাপা পড়িয়া গিয়াছে সত্য, কিন্তু এছলামের মূল উৎস—আল্লার কালাম ও রছুলের হাদিছকে চাপা দিবার ক্ষমতা কাহারও নাই। স্বাধীনভাবে তাহার আলোচনা আরম্ভ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে, মোছলেম-জগতের সুধীবৃন্দ আবার তাহাকে জীবন্ত করিয়া তুলিতে সচেষ্ট হইয়াছেন। সম্প্রতি মিসরের পার্লামেণ্টে বিবাহ ও তালাক সম্বন্ধে নূতন আইনের যে খসড়া পেশ হইয়াছে, তাহা আমাদিগের কথার সত্যতার সাক্ষাৎ প্রমাণ। আমাদিগের দেশে সাধারণতঃ মনে করা হইয়া থাকে, পুরুষের স্ত্রীবর্জ্জনের অধিকার কোন নিয়ম কানুনের অনুশাসন মানিতে বাধ্য নহে। পক্ষান্তরে একাধিক স্ত্রীগ্রহণ করারও তাহার নিয়মহীন শর্ত্তহীন অবাধ অধিকার আছে। এই ভ্রান্ত ধারণার ফলে, মুছলমান সমাজ—বিশেষতঃ ধার্ম্মিকতার সোল এজেন্সীর দাবিদারগণ—স্ত্রীবর্জ্জন ও একাধিক স্ত্রীগ্রহণ সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় ব্যবস্থার যে ঘোর ঘৃণাজনক ব্যভিচার আরম্ভ করিয়াছেন, তাহা চিন্তা করিতেও বুক ফাটিয়া যায়। মিসরের পার্লামেণ্ট বলিতেছেন—স্ত্রীবর্জ্জন ও একাধিক স্ত্রীগ্রহণের অনুমতিকে এছলাম যে সকল নিয়ম কানুনের কড়া অনুশাসনের অধীন করিয়া দিয়াছে, এখন কেবল

ধর্ম্মের খাতিরে কেহ আর সেগুলিকে মান্য করিয়া চলে না। কাজেই, কোরআন হাদিছ স্ত্রীবর্জ্জনের ও একাধিক স্ত্রীগ্রহণের যে সকল শর্ত্ত নির্দ্ধারিত করিয়া দিয়াছে, তাহাকেও আইনে পরিণত করিতে হইবে। এই আইনের ফলে, দরখাস্তকারীকে প্রমাণ করিতে হইবে যে, বস্তুতঃ শরিয়তের নিয়ম কানুন অনুসারে সে স্ত্রীবর্জ্জনের বা একাধিক স্ত্রীগ্রহণের অধিকারী। অন্যথায় তাহা আইন-গ্রাহ্য হইবে না। বরং অবস্থা বিশেষে পুরুষকে দেশের ফৌজদারী দণ্ডবিধি আইনের বিধান অনুসারে অর্থদণ্ডে বা কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইতে হইবে। লোকের অবস্থান্তরের সঙ্গে সঙ্গে, মানুষকে এছলাম প্রদত্ত অধিকার ভোগ করিতে দেওয়ার পূর্ব্বে, তৎসংক্রান্ত অপরিহার্য্য বিধি ব্যবস্থা ও শর্ত্তগুলি মানিয়া চলিতে বাধ্য করার জন্য, মোছলেম জগতের প্রত্যেক আবশ্যকীয় কেন্দ্রে এই শ্রেণীর আইন কানুন প্রণীত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। কারণ, ঐ সকল অনুমতির সহিত এই শর্ত্তগুলির অবিচ্ছেদ্য যৌগপতিক সম্বন্ধ। পূর্ব্বকার মুছলমানগণ স্বাভাবিক ধর্ম্মভীরুতা ও পরহেজগারীর জন্য নিজেরাই ঐ সকল শাস্ত্রোক্ত শর্ত্ত মান্য করিয়া চলিতেন—কেহ না মানিলে কাজী মুফতী প্রভৃতি খলিফার প্রতিনিধিগণের নিকট তাহার প্রতিকারের দাবী করা চলিত। কিন্তু আজকাল বিশেষতঃ আমাদিগের দেশে, সমস্ত শর্ত্ত ও সমস্ত নিয়ম লোপ পাইয়াছে—আছে কেবল স্ত্রী-বর্জ্জনের অধিকার, আছে কেবল একাধিক স্ত্রী-গ্রহণের অনুমতি।

আজকাল অনেক মুছলমান ব্যবস্থাপক সভার সদস্য হওয়ার জন্য বহু অর্থ ও শ্রমের সদ্ব্যয় বা অপব্যয় করিয়া থাকেন। তাঁহাদিগের মধ্যে কেহ কি মিসরের অনুকরণে বিবাহ-সংক্রান্ত আইনের সংস্কার-সাধনের চেষ্টা করিতে পারেন না? কেহ এজন্য প্রস্তুত হইলে আমরা তাঁহাকে যথাসাধ্য সাহায্য করিতে হাজির আছি। ইহার জন্য ঘোর আন্দোলন উপস্থিত করার আবশ্যক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। মোছলেম লীগ, জমইয়তে ওলামা ও অন্যান্য মোছলেম প্রতিষ্ঠানগুলিকে এদিকে বিশেষ মনোযোগ দিতে অনুরোধ করিতেছি। আমরা একটা নূতন কাণ্ড-কারখানা উপস্থিত করিতে বলিতেছি না। আমরা বলিতেছি—কোরআন ও হাদিছ স্ত্রী-বর্জ্জন ও একাধিক স্ত্রীগ্রহণকে, যে নিয়ম কানুন ও শর্ত্তাদির সহিত অবিচ্ছেদ্যরূপে সংশ্লিষ্ট করিয়া দিয়াছে, মুছলমান আইনে দুই তিনটা ধারা যোগ করিয়া সেগুলিকেও আইনে পরিণত করিয়া দিতে। জানিনা, এই দুর্ব্বল কণ্ঠের ক্ষীণ আর্ত্তনাদ মুছলমান সমাজে কোন প্রতিধ্বনি জাগাইয়া তুলিতে পারিবে কি না?

নারীর অধিকার সম্বন্ধে আলোচনা করিতে হইলে ভারতীয় মুছলমান সমাজের—সমাজের শরিফ ও পরহেজগার লোকদিগের—মধ্যে প্রচলিত বর্ত্তমান অবরোধ-প্রথা সম্বন্ধে আলোচনা হওয়ারও বিশেষ আবশ্যক ছিল। কিন্তু স্বতন্ত্রভাবে ও বিস্তারিত রূপে ইহার আলোচনা হওয়া আবশ্যক মনে করিয়া, তাহাও এখন স্থগিত রাখিতেছি। আমাদিগের মতে, এই পর্দ্দার অনুকূলে কোনও দলিল নাই,—বরং কোরআন, হাদিছ, খাইরুল কোরুন বা স্বর্ণযুগের ইতিহাস, সমগ্র মোছলেম জগতের অতীত ও বর্ত্তমান আচার, একবাক্যে ইহার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতেছে। এই প্রবন্ধে যে কএকটা হাদিছ বর্ণিত হইয়াছে, তাহাতেও পাঠকগণ প্রকৃত অবস্থার কতকটা সন্ধান পাইতে পারিবেন। প্রবন্ধের উপসংহার ভাগেও তাঁহারা ইতস্ততঃ, বর্ত্তমান অবরোধ-প্রথার বহু প্রতিকূল নজির দেখিতে পাইবেন। তবে এখানে পাঠকগণকে ইহাও স্মরণ রাখিতে হইবে যে, এছলাম যেমন ভারতীয় মুছলমানদিগের মধ্যে প্রচলিত বর্ত্তমান অবরোধ-প্রথার সমর্থন করেনা—ঠিক সেইরূপ, ইউরোপের বীভৎস সভ্যতার বর্ত্তমান স্বরূপের এবং সমস্ত সুনীতি ও শ্লীলতার বিপরীত তাহার এই নারকীয় নগ্ননর্ত্তনের সমর্থনও এছলামে নাই। এছলামে স্বাধীনতা আছে—উচ্ছৃঙ্খলতার প্রশ্রয় নাই, অধিকারআছে—ব্যভিচার নাই, নারীর মুক্তি আছে—মুক্তির নামে বুভুক্ষু কামকুক্কুরগণের নীচ স্বার্থপ্রণোদিত প্রচ্ছন্ন বিলাসবৃত্তির পৈশাচিক পিপাসা নাই।

---

# আমার গান

[ আবদুল কাদের ]

আমার গান হ'য়ে যায় ব্যর্থ সদাই, সে কি কভু মানি!
আমি সে কি কভু মানি!
আমার ব্যথার মুকুল বৃথা-ই ঝরে' গন্ধ নাহি দানি'—
আমি সে কি কভু মানি।

আমার ব্যথা যখন উপ্‌চে ওঠে
কণ্ঠে বাণী আপ্‌নি ফোটে ;—
বেদ্‌না-বিধুর যায় না সে সুর তোমার প্রাণে হানি'?
আমি সে কি কভু মানি!

প্রভু সুর যে তোমার রুদ্ধদ্বারে
লুটায় আসি' বারে বারে ;
—দুয়ার খুলে' নেবে তুলে' সুরের পূজা খানি।
আমি তাই যে সদা মানি।

কভু যে-ধন আমার পূজার এ মন
বইতে নারে তোমার চরণ,
গানের না'য়ে তোমার পা'য়ে যাবে সে দান—জানি।
আমি তাই যে সদা মানি॥

---

# সিপাহী বিদ্রোহ ও চিত্রের অপর দিক

[ মোহাম্মদ আব্‌দুর রজ্জাক খাঁ ]

১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে ভারতে যে সিপাহী বিদ্রোহ ঘটে, জগতের ইতিহাসে তাহার যে-সমস্ত বর্ণনা প্রকাশ পাইয়াছে, সে সমস্তই ঘটনা-চিত্রের একটী দিক মাত্র। এ চিত্রের অপর দিকটী ইতিহাসের আলোক হইতে এখনও বঞ্চিত রহিয়াছে। ইহা রাজনৈতিক ঘটনা হইলেও ইহার প্রকৃত স্বরূপ ঐতিহাসিক। যে-ঘটনা ভারতে নবযুগের সূচনা করিতে বিশেষ কার্য্যকরী হইয়াছে, ইতিহাসের পৃষ্ঠায় স্থান দিয়া তাহাকে নিজের ক্রিয়া করিতে দিতেই হইবে।

ঘটনা-চিত্রের প্রথম দিকটী বিদ্রোহী সৈন্যগণ কর্ত্তৃক লুঠ-তরাজ ও খুন-জখমের স্বরূপে জগৎ প্রত্যক্ষ করিয়াছে। এই প্রসঙ্গে উক্ত সৈন্যগণের চরম বর্ব্বরতা বিশেষ করিয়া প্রকাশ পায়—দিল্লি, লক্ষ্ণৌ ও কানপুরের কতকগুলি নিরপরাধ ইংরাজ মহিলা ও শিশুদিগের হত্যায়। মরহুম বাহাদুর শাহ-এর নিষেধ সত্ত্বেও দিল্লিতে ৫২ জন ইংরাজ বন্দীকে হত্যা করা হয়। ইহাতে ৭ হইতে ৯ জন স্ত্রীলোক ছিল। লাক্ষ্ণৌতে যে ২৫ জন ইংরাজ বন্দী তেলাঙ্গিগণ কর্ত্তৃক নিহত হয়, তন্মধ্যেও এক তৃতীয়াংশ স্ত্রীলোক ছিল। এতদ্ব্যতীত বহু স্থানে নিরস্ত্র অসহায় ইংরাজদিগের উপর আক্রমণ করিয়া তাহাদের স্ত্রীলোকদিগকে পর্য্যন্ত হত্যা করা হয়। বলা বাহুল্য যে, মনুষ্যত্ব কখনই এই সমস্ত ঘটনাকে ক্ষমা করিতে পারিবে না; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মনে রাখিতে হইবে যে, এই সমস্ত ঘটনা-চিত্রের আর একটী দিক আছে। লোকচক্ষুর অন্তরালে অবস্থিত হইলেও সে দিকটা প্রথম দিক অপেক্ষা নির্ম্মমতার সাক্ষী হিসাবে কোন অংশে কম নহে। সম্প্রতি আমেরিকার বিখ্যাত লেখক এডয়ার্ড টমসন The other side of medal নামে একখানি পুস্তকে এই চিত্রের দ্বিতীয় দিকটী অতি উজ্জ্বলরূপে জগতকে দেখাইতে চেষ্টা পাইয়াছেন। এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে তাহারই সার সঙ্কলিত হইল।

## বিদ্রোহের কারণ

বিদ্রোহ দুইটী কারণে ঘটে। প্রথম ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি কর্ত্তৃক ভারতের সমস্ত প্রদেশকে নিজেদের রাজ্যভুক্ত করিয়া লওয়া। দ্বিতীয় চর্ব্বিযুক্ত কার্তুজের প্রচলন। মিঃ এ্যানসেন সে সময় Commander-in-Chief বা প্রধান সেনাপতি ছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন:—"আমি স্বচক্ষে এই সন্দেহযুক্ত কার্তুজ দেখিয়াছি, এই বিষয়ে সৈন্যগণের বিদ্রোহ সম্পূর্ণ ন্যায়-সঙ্গত। কারণ, সিপাহীগণের ধর্ম্মমতকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করিয়া এই কার্তুজের প্রচলন করা হইয়াছে।

## মিরাটের ঘটনা

মিরাটের ৩নং রেজিমেণ্টের ৮৫ জন সিপাহিকে উক্ত চর্ব্বিযুক্ত কার্তুজ ব্যবহারে অস্বীকার করায় কোর্টমার্শাল করা হয়। বলা বাহুল্য যে, এই কার্তুজ ব্যবহারের জন্য তখন দাঁতের সাহায্য গ্রহণ করিতে হইত। এই ৮৫ জন সিপাহিকে যে ভাবে হত্যা করা হইয়াছিল, তাহা এতই নির্ম্মম ও হৃদয়-বিদারক যে, তদ্দৃষ্টে সমস্ত সৈন্যদল মধ্যে বিদ্রোহের ভাব প্রবল হইয়া উঠে এবং সে সময় তাহারা সাময়িক ভাবে তোপ ও বন্দুকের সম্মুখে নীরব থাকিতে বাধ্য হইলেও, পরে সকলেই ইংরাজের বিরুদ্ধাচরণে বদ্ধপরিকর হইয়াছিল। ইহাই বিদ্রোহের কারণ। লর্ড ক্যানিং উক্ত ঘটনা সম্বন্ধে মত প্রকাশ করিতে গিয়া বলিয়াছেন যে, "উক্ত কোর্টমার্শালের আদেশটী এতই নির্ব্বুদ্ধিতার কাজ হইয়াছিল যে, তাহারই ফলে বিদ্রোহ ঘটে।

## পেশাওয়ারের ঘটনা

১৫ই জুন ১২০ জন সৈন্যকে বন্দী করা হয়। এই বন্দীগণের মধ্যে কেহই কোন অফিসারকে হত্যা করে নাই। ইহাদের মধ্যে অনেকেই ভয়ের বশবর্ত্তী হইয়া

বিদ্রোহে যোগ দিয়াছিল। এই কয়েদীগণের মধ্যে ৫৫জন শিখ সৈন্য সম্বন্ধে মিঃ নিকলসন পেশাওয়ারের ডেপুটী কালেক্টরকে লিখিয়াছিলেন :—"আমি বিশেষ রূপে অবগত হইয়াছি যে, উহারা বিদ্রোহে যোগ দেয় নাই। অতএব উহাদিগকে ক্ষমা করিয়া অবশিষ্ট সকলকে যেন কামানের মুখে উড়াইয়া দেওয়া হয়। উত্তরে সার লরেন্স লিখেন যে, উহারা আমাদের শত্রুগণের পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিল, সেজন্য উহাদের কাহাকেও ক্ষমা করা যাইতে পারে না। তবে সকলকে ফাঁসি দিতে চাহি না। কেবল এক তৃতীয়াংশকে ফাঁসী দিয়া বক্রী সকলকে বিভিন্নরূপে এমন শাস্তি দিতে চাই, যদ্দৃষ্টে জনসাধারণের মনে আতঙ্কের সৃষ্টি হয় এবং অপরাধীগণের শিক্ষা হয়।—

তখনকার লেপ্টনাণ্ট লর্ড রবার্ট নিজের মাতাকে এক পত্রে লেখেন যে :—"আমরা ঝেলম হইতে পেশাওয়ার পর্য্যন্ত পদব্রজে আসি। পথে বিদ্রোহী সৈন্যগণের নিকট হইতে অস্ত্রাদি ছিনাইয়া লওয়া এবং তাহাদিগকে হত্যা করাই ছিল আমাদের প্রধান কাজ। কামানের মুখে উড়াইয়া দেওয়ার ফল জনসাধারণের মধ্যে বেশ কার্য্যকরী হইয়াছিল। এ দৃশ্য অতিশয় ভয়ঙ্কর হইলও ইহা ভিন্ন উপায় ছিল না। ইহা দ্বারা আমরা পাপিষ্ঠ মুছলমানগণকে বুঝাইয়া দিতে চাই যে, আল্লার সাহায্যে আমরা ভারতকে নিজেদের আয়ত্তাধীন রাখিবই।

## পাঞ্জাবের ঘটনা

একটী তোপে অতিরিক্ত বারুদ ভরিয়া একটী লোককে তাহার মুখে উড়াইয়া দেওয়া হয়। ইহার পরও জেনারেল নিকলসন মিঃ এডওয়ার্ডকে পত্রে লিখেন যে, আমাদিগকে এমন একটী আইন করিতে হইবে, যাহার সাহায্যে আমরা আমাদের স্ত্রীলোক ও শিশুদিগের হত্যাকারীগণকে জীবন্ত পুড়াইয়া মারিতে পারি—জীবন্ত অবস্থায় তাহাদের গায়ের চামড়া ছাড়াইয়া লইতে পারি। শুধু ফাঁসী দিয়া আমাদের প্রতিহিংসার জ্বালা নির্ব্বাপিত হইবে না।

মিঃ টমসন সার হেনরী কটনকে কতকগুলি মুছলমান কয়েদী সম্বন্ধে বলেন যে, "সন্ধ্যার সময় একজন শিখ আর্দালী আসিয়া আমাকে বলে যে, হুজুর বোধ হয় কয়েদীগণকে দেখিতে ইচ্ছা করেন, আমি তৎক্ষণাৎ তাহার সঙ্গে বন্দীখানায় গিয়া দেখিলাম, বন্দিগণ হাত-পা-বাঁধা উলঙ্গ অবস্থায় মাটীতে পড়িয়া শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করিবার উপক্রম করিতেছে। তাহাদের দেহের প্রত্যেক অংশে তামা তাতাইয়া দাগ দেওয়া হইয়াছে। সে দৃশ্য দেখিতে না পারিয়া আমি পিস্তল দ্বারা তাহাদের কষ্টের অবসান ঘটাইয়া দিলাম।

উত্তরে সার হেনরী বলেন যে, "তাহা হইলে তুমি এই অত্যাচারীদিগের সহিত উচিৎ ব্যবহার কি করিলে ?

## পাশবিক হত্যাকাণ্ড

সে সময় প্রত্যেক সৈন্যের বিরুদ্ধে অভিযোগ এই ছিল যে, সে ইংরাজ মহিলা ও শিশুগণকে হত্যা করিয়াছে বা হত্যায় সাহায্য করিয়াছে। তা সে যেখানেই থাকুক, আর যতই নির্দ্দোষ হউক।

লেপ্টন্যাণ্ট ম্যাজণ্ডি নিজের এক চাক্ষুষ ঘটনার নিম্নলিখিতরূপ বর্ণনা দিয়াছেন :—"এক স্থানে শিখ ও ইংরাজগণ একজন আহত সৈনিককে ক্রিচ দ্বারা আঘাত করিতেছিল। কিন্তু তাহাতে আঘাত মারাত্মক না হওয়ায় তাহারা কাঠের দ্বারা অগ্নিকুণ্ড প্রস্তুত করিয়া তন্মধ্যে তাহাকে নিক্ষেপ করে; তদানীন্তন লণ্ডন টাইমসের রিপোর্টার মিঃ রাসেলও এই ঘটনার সত্যতা স্বীকার করিয়া বলিয়াছেন যে, এই কয়েদীটীর পোড়া হাড়গুলি আমি স্বচক্ষে সেখানে দেখিয়াছি। এই সমস্ত পাশবিক অত্যাচারের বিরুদ্ধে সর্ব্ব প্রথমে এই রাসেলই আন্দোলন আরম্ভ করেন। নিজের ডায়েরীর একস্থানে তিনি লিখিয়াছেন :—"প্রতিহিংসার শাস্তি-স্বরূপ মুছলমানগণকে শুকরের চামড়ায় ফেলিয়া সেলাই করিয়া দেওয়া, হত্যা করার পূর্ব্বে তাহাদের মুখে শুকরের মাংস পুরিয়া দেওয়া এবং হিন্দুদিগের দ্বারা তাহাদের ধর্ম্মের অবমাননা করানো ইত্যাদি কাজগুলি মনুষ্যত্ব ও সভ্যতার সম্পূর্ণ বিপরীত।"

অত্যাচারের চরম হইয়া গেলে, ৩১শে জুলাই গভর্ণর জেনারেল এক ইস্তাহার জারী করেন, যাহা দ্বারা নিরস্ত্র লোকদিগকে বিনা প্রমাণে হত্যা করা, গ্রামসমূহকে ভস্মীভূত করিয়া ফেলা এবং মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার অধিকার হইতে অফিসারগণকে বঞ্চিত করা হয়।

একজন পাদরী মহিলা অহঙ্কারের সহিত লিখিয়াছেন

যে, "তিনি কতকগুলি কয়েদীকে গীর্জ্জা পরিষ্কার করিতে আদেশ করেন। সে কাজ তাহাদের ধর্ম্ম-বিরুদ্ধ বলিয়া ক্রিচের ভয় প্রদর্শনে তাহাদিগকে বাধ্য করিয়া তাহা করাইতে হইত। অনেকে কিন্তু খুব সত্বরই এই কার্য্যে সম্মত হয়। কারণ তাহারা মনে করিয়াছিল যে, ইহার দ্বারা তাহারা ফাঁসী হইতে পরিত্রাণ পাইতে পারে। বলা বাহুল্য যে, তাহাদের সেই স্থূল ধারণা অতি সত্বরই তিরোহিত হইয়া গিয়াছিল—শেষে সকলকেই ফাঁসী-কাষ্ঠে ঝুলিতে হইয়াছিল।

ম্যাজণ্ডি একস্থানে লিখিয়াছেন:—আমি সে রাত্রি মছজিদের (দিল্লির জামে) পাহারায় নিযুক্ত ছিলাম। রাত্রির অধিকাংশ সময়ই আমার কাটিয়াছিল সেই সমস্ত কয়েদী গণকে হত্যা করিতে—যাহারা দিনের বেলায় বন্দী হয়। কয়েদীগণের মধ্যে অনেকেই মৃত্যুকালে যে ধৈর্য্য ও বীরত্ব দেখাইয়াছিল, তাহার প্রশংসা না করিয়া পারা যায় না। দিল্লি অবরোধকালে উপস্থিত একজন অফিসার লিখিয়াছেন:—শত্রুরা সন্ধির জন্য আদৌ চেষ্টা করে নাই, কারণ তাহারা ভাল রকমই জানিত যে, ইংরাজগণ সন্ধি চায় না। তাহারা যদৃচ্ছা হত্যাতেই অধিক সন্তুষ্ট থাকে।

মেজর রেনাডের কানপুর যাত্রাকালে জেনারেল নাইল তাঁহাকে যে উপদেশপত্র প্রেরণ করেন, এস্থানে তাহা বিশেষরূপ প্রণিধানযোগ্য।

"যে সমস্ত গ্রাম বিদ্রোহে অংশ গ্রহণ করিয়াছে, যে সমস্ত পল্লীতে পাঠানগণের বসবাস আছে, তাহা সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করিয়া দিয়া তথাকার অধিবাসিবৃন্দকে যেন হত্যা করা হয়। বিদ্রোহী পল্টনের সমস্ত সৈন্যকে যেন ফাঁসী দেওয়া হয়।

যেহেতু ফতেপুর বিদ্রোহে যোগ দিয়াছিল, অতএব উহাকে আক্রমণ করতঃ যেন বিধ্বস্ত করিয়া দেওয়া হয় এবং তথাকার ডেপুটী কালেক্টারকে গ্রেফ্‌তার করিতে পারিলে তাহাকে ফাঁসী দিয়া তাহার মস্তক যেন সহরের উচ্চতম স্থানে স্থাপন করা হয়।

## ৫০ হাজার লোকের প্রাণনাশ

অবশেষে লর্ড ক্যানিং ও জন লরেন্স এই নরহত্যার স্রোত রোধ করেন। লর্ড বেকিন্স ত প্রথম হইতেই ইহার বিরুদ্ধে চীৎকার আরম্ভ করিয়াছিলেন।

লর্ড ক্যানিং মহারাণী ভিক্টোরিয়াকে সম্বোধন করিয়া লিখিয়াছিলেন:—প্রতিহিংসা চরিতার্থের উত্তেজনায় আমাদের লোকেরা এতই উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছে যে, তাহাদের কার্য্যকলাপ দেখিয়া আমার লজ্জায় মরিয়া যাইতে ইচ্ছা হয়। আমি আশ্চর্য্য হই যে, ইহারা কি করিয়া চল্লিশ পঞ্চাশ হাজার লোকের প্রাণনাশ করিল? এই পত্রের উত্তরে মহারাণী লিখেন; লর্ড ক্যানিং বিশ্বাস করিতে পারেন যে, ইংরাজদিগের এই বর্ব্বরতায় আমিও বিশেষ লজ্জা অনুভব করিতেছি। বিশেষতঃ ইংলণ্ডের জনসাধারণের কার্য্যে—যাঁহারা তাহাদের সৈন্যদিগের এই কার্য্যসমূহ প্রশংসার চক্ষে দেখিতেছেন।

## বেপরওয়া হত্যার বহর

সার জর্জ্জ ক্যাম্বেল নিজের জীবনীতে লিখিয়াছেন "মার্শাল-ল বলিতে তখন ভারতবর্ষে যাহা বোঝা গিয়াছিল, তাহার স্বরূপ এই যে, প্রত্যেক সৈনিকেরই অনুমতি ছিল যে, সে ইচ্ছামত নরহত্যা ও লুঠ-তারাজ করিতে পারিবে।

৬ই জুন তারিখে লর্ড ক্যানিং-এর শাসনে কয়েকটী প্রদেশে মার্শাল-ল জারী করা হয়। এই আইনের ব্যবহারে যে ভাবে কঠোর সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত ছিল, বড়ই দুঃখের বিষয়, গবর্ণমেণ্ট তাহা করেন নাই। গভর্ণমেণ্টের এই দুর্ব্বলতার ফলে নিম্নতম অফিসারগণ কর্ত্তৃক বেপরওয়া হত্যা ও অবাধ অত্যাচার চলা সম্ভবপর হইয়াছিল।

মিষ্টার রাসেল (টাইম্‌সের সংবাদদাতা) একস্থানে লিখিয়াছেন:—"এই বিদ্রোহে কেবল সৈন্যগণই যোগদান করিয়াছিল। সেজন্য কেবল সেই সৈন্যগণকেই হত্যা করা উচিত ছিল—যাহারা বিদ্রোহে যোগ দিয়াছিল। কিন্তু বিদ্রোহী সৈন্যগণের সহিত যাহাদের মাত্র সহানুভূতি ছিল, তাহাদিগকে হত্যা করা নিতান্ত কাপুরুষোচিত কাজ হইয়াছে।"

বিদ্রোহী সৈন্য কোন সহরে আসিয়া বাস স্থাপন করিলে বিদ্রোহীদিগকে আশ্রয় দিবার অজুহাতে সেই সহরের নিরপরাধ লোকদিগকে হত্যা করিয়া ফেলা যে নিতান্ত অমানুষিক অত্যাচার, কোন মানুষই তাহা অস্বীকার করিতে পারে না। সাধারণ অধিবাসীগন যে সর্ব্বদাই ইংরাজগণের প্রাণরক্ষার চেষ্টা করিয়াছে ইহা সর্ব্ববাদীসম্মত অভিমত।

প্রতিদানে ইংরাজগণ কি করিয়াছেন? কেবল বিদ্রোহী সৈন্যগণকে হত্যা করিলে কথা ছিল না, কিন্তু বহু নিরপরাধ লোককেও কেবল এই অপরাধে হত্যা করা হইয়াছিল যে, তাহারা ভারতবাসী।

## অন্ধকূপহত্যা ও ঈদের কোরবাণী

অমৃতসরের তদানীন্তন ডেপুটী কমিশনার মিঃ কোপার "পাঞ্জাবের হাঙ্গামা" নামক নিজের পুস্তকে লিখিয়াছেন:—২৬নং পল্টন ৩০শে জুলাই লাহোরে বিদ্রোহী হইয়া নিজের কমাণ্ডিং অফিসারকে হত্যা করে। যাহার শাস্তি স্বরূপ সমস্ত সৈন্যের প্রাণনাশ করা হয়।—

১৩ই মে ৩৮০০ ভারতীয় সৈন্যের নিকট হইতে অস্ত্রাদি কাড়িয়া লওয়া হয় এবং প্রায় ৩ মাস যাবৎ তাহাদের উপর শিখ ও ইংরাজ পাহারা নিযুক্ত রাখা হয়। ৩০ শে জুলাই ভয়ানক ঝড় উঠে এবং বন্দীগণের মধ্যে অসম্ভব উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। ইতিমধ্যে একজন সৈন্য তল্‌ওয়ারসহ আসিয়া নিজের সঙ্গিগণকে ইংরাজ-বধে উত্তেজিত করে এবং নিজে গিয়া কম্যাণ্ডিং অফিসারকে হত্যা করে। অতঃপর সেই ঝড়ের মধ্যে সমস্ত সৈন্য বিদ্রোহী হইয়া পলায়ন করে। তাহার মধ্যে কয়েকশত সৈন্য ইংরাজ ও শিখগণের তোপের মুখে প্রাণ হারায়। অবশিষ্টেরা রাবি নদী পাড়ি দিবার চেষ্টা করে, কিন্তু মিঃ কোপার পুলিশসহ বাধা দেন। প্রায় ১৫০ জনকে তাহারা হত্যা করিয়া কয়েক শতকে নদীর দিকে তাড়াইয়া দেয়। বিদ্রোহী সৈন্যগণ এত অধিক ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল যে, নদীতে পড়িয়া তাহাদের অধিকাংশই ডুবিয়া মরে। কিছু লোক নদী পার হইয়া বনে গিয়া লুকায়াছিল বটে, কিন্তু মিঃ কোপার দল বলসহ নদী পার হইয়া গিয়া তাহাদিগকে বন্দী করেন এবং থানায় আনিয়া একটী ক্ষুদ্র ঘরে কয়েদ করিয়া রাখেন।

পরদিন কোপারের সঙ্গী মুসলমান সৈন্যগণকে "ঈদল্ আজহা" উৎসব উপলক্ষে ছুটি দেওয়া হয় শুধু এই আশঙ্কায়—পাছে তাহারা নিজেদের মুসলমান ভাই বলিয়া বন্দীগণের উপর দয়া বা সহানুভূতি প্রকাশ করে। মুছলমান-দিগকে সরাইয়া দিয়া তাহার পরিবর্ত্তে—শিখ সৈন্য আনান হয়। কোপার কিন্তু এদিকে এক অপূর্ব্ব কোরবানির ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। তাঁহার হুকুম মতে প্রত্যেক দশজন মুছলমান বন্দীকে বাঁধিয়া বাহির করতঃ তাহাদিগকে গুলিবৃষ্টির দ্বারা হত্যা করা হইতে লাগিল। এইরূপে নিহতের সংখ্যা ২৫৭ জন হইয়া গেলে জানা গেল যে, কয়েদীগণ আর ঘরের বাহির হইতে চাহিতেছে না। অতঃপর অনুসন্ধানার্থে কয়েদ খানার ফটক খুলিয়া দেখা গেল, "অন্ধকূপ হত্যার দৃশ্য সম্মুখে বিদ্যমান। ভয়ে ও গরমে নিশ্বাস বন্ধ হওয়ায় ৪৫ জন বন্দী মরিয়া গিয়াছে। থানার নিকটে একটী কূপ ছিল, তাহাতেই সমস্ত লাশ নিক্ষেপ করতঃ মাটী দিয়া ঢাকিয়া দেওয়া হয়।

বলা বাহুল্য যে, পাঞ্জাবের চিফ কমিশনার মিঃ লরেন্স ও তৎপরবর্ত্তী লেফ্‌টেনাণ্ট গভর্ণর মিঃ মণ্ট্যাগুমারী কোপারের এই নৃশংস অত্যাচারের বিশেষ প্রশংসা করিয়া তাঁহাকে পত্র লিখিয়াছিলেন।

মণ্টাগুমরী খৃষ্ট ধর্ম্মের একজন বিশিষ্ট উৎসাহী প্রচারক ছিলেন। খৃষ্টান ধর্ম্মের বিনয়, ধৈর্য্য ও ক্ষমা গুণের খ্যাতিকে তিনি জোর গলায় প্রচার করিতেন; কিন্তু তিনিও কোপা-রের এই নৃশংসতার প্রশংসা করিতে বিরত হন নাই। অতঃপর তিনি হাডসনকেও এক পত্র লিখেন। এই হাডসনই মরহুম বাহাদুর শাহের পুত্রগণকে অতিশয় নির্ম্মম ভাবে হত্যা করে। সকল ইংরাজ ঐতিহাসিকই তাহার কার্য্যের নিন্দা করিলেও মণ্টগুমারী তাহাকে পত্রে লিখেন:—"তুমি যে শাহকে বন্দী ও তাহার পুত্রগণকে হত্যা করিয়াছ, সে জন্য আমার ধন্যবাদ জানিবা। আশা করি, এইরূপে তুমি অন্যান্য শাহজাদা-গণকেও হত্যা করিতে সমর্থ হইবে।

## একজনের পরিবর্ত্তে ৫০০ জন

একজন আহত সৈনিক বধ্যভূমিতে যাইতে অসমর্থ হওয়ায় তাহাকে সরকারী সাক্ষী করিয়া লওয়া হইল। অতঃ-পর মণ্টগুমরী কোপারকে লেখেন যে, উক্ত বন্দী এবং ২৬ নং পল্টনের ফেরারী সৈণিকগণকে বন্দী করিয়া লাহোরে আমার কাছে পাঠাইবা। তুমি যথেষ্ট হত্যা করিয়াছ, এখন আমার সৈন্যগণের জন্য কিছু লোক আবশ্যক। এই আদেশ মতে উক্ত আহত বন্দীকে অন্য ৪১ জন বন্দীসহ লাহোরে লইয়া গিয়া বিনা কৈফিয়তে হত্যা করা হয়। কোপার নিজেই স্বীকার করিয়াছে যে, কম্যাণ্ডিং অফিসারকে হত্যা করার পর দুই দিনের মধ্যে ১জনের বদলে ৫০০ জন ভারতবাসীকে হত্যা করা হইয়াছিল।

একদিকে যেমন কয়েকজন ইংরাজকে হত্যা করতঃ কানপুরের একটী কূপে নিক্ষেপ করা হয়, সেইরূপ আজ-নালার কূপে শত শত নিহত ভারতবাসীর শবদেহ নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল। রাসাল নিজের ডায়েরীতে লিখিয়াছেন "রেনাডের সৈন্যদলের সহিত নিযুক্ত জনৈক অফিসার প্রমুখাৎ আমি শুনিয়াছি যে, সকল সময় ভারতবাসীকে বিনা-বিচারে হত্যা করা হইয়াছে। দুই দিনের মধ্যে ৪২ জনকে ফাঁসি দেওয়া হয়। ১৪ জনকে, পল্টনের যাত্রাকালে অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া ছিল; এই অপরাধে হত্যা করা হইয়াছিল। পল্টনের যাত্রাপথে যে গ্রাম পড়িত, তাহা পোড়াইয়া দেওয়া হইত। তিনি লিখিয়াছেন :—বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এই নিষ্ঠুর হত্যাসমূহ কানপুরের হাঙ্গামার পূর্ব্বেই সংঘটিত হইয়াছিল। পরে হইলে তবুও আমাদের পক্ষে বলিবার কথা ছিল। একজন পাদরী লিখিয়াছেন :—"ইংরাজগণ ভারত-বাসীকে যে কতদূর ঘৃণা ও বিদ্বেষের চক্ষে দেখেন, তাহা ধারণা করা যায় না। তাঁহাদের যে সমস্ত ভারতবাসী চাকর বিদ্রোহ কালে বিশ্বস্ততার সহিত তাঁহাদের কার্য্য করিয়াছে, তাহারাও অত্যাচারের হাত হইতে পরিত্রাণ পায় নাই, কিন্তু বড়ই আশ্চর্য্য যে, এত সত্ত্বেও তাহাদের প্রভুভক্তিতে বিন্দুমাত্র ত্রুটী দেখা যায় নাই। দিল্লির অধিবাসীগণকে যখন সাধারণভাবে হত্যা করা হয়, তখন এই প্রভুভক্ত চাকর-দের অনেকেই আমাদের সফলতায় বিশেষ আনন্দিত হইয়াছিল। আমাদের জয়লাভের জন্য তহারা দোওয়া করিত। কিন্তু তাহাদের দোওয়াই তাহাদের মৃত্যুর কারণ হইয়াছিল।

কোন কোন ইংরাজ যুবক ভারতবাসীর রক্তপিপাসায় উন্মত্ত হইয়া প্রকাশ্যেই বলিত, "আমাদের ক্যাম্পে যে সমস্ত ভারতবাসী আছে, সকলকেই হত্যা করা হউক।"

কেয়ীর নিজের পুস্তকে লিখিয়াছেন যে, সে সময় গভর্ণর জেনারেল পার্লামেন্টের সহিত যে পত্রাদি ব্যবহার করিয়া-ছিলেন, তাহাতে উল্লেখিত আছে যে নিরপরাধ বৃদ্ধ, স্ত্রীলোক ও বালকদিগকে পর্য্যন্ত হত্যা করা হইত। পল্লীসমূহে অগ্নি সংযোগ করিয়া অধিবাসীগণকে তাহাতে পোড়াইয়া মারা হইত। ইংরাজগণ সে সময় অহঙ্কার করিয়া বলিত" আমরা কাহাকেও বধ না করিয়া ছাড়ি নাই"।

## কানপুরের পূর্ব্বের ঘটনাবলী

একদা কয়েকজন বালক—খেলা-স্বরূপ বিদ্রোহীগণের ন্যায় পোষাক পরিয়া পথে ঢোল বাজাইতেছিল। এই অপরাধে তাহাদিগকে গ্রেফ্‌তার করিয়া লওয়া হয় এবং মোকদ্দমা চালাইয়া তাহাদিগকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। কোর্ট মার্শালের জনৈক উচ্চপদস্থ ইংরাজ অফিসার কাঁদিতে কাঁদিতে কম্যাণ্ডিং অফিসারের নিকট গিয়া তাহাদের প্রাণ রক্ষার জন্য প্রার্থনা করেন। কিন্তু তাঁহার প্রার্থনায় কর্ণপাত না করিয়া সেই নিরপরাধ বালকগণকে ফাঁসীতে ঝুলাইয়া দেওয়া হয়।

এই সময় গ্রামে গ্রামে ইংরাজগণ ঘুরিয়া বেড়াইত এবং সম্মুখে যাহাকে পাইত, ধরিয়া গাছে ফাঁসী দিয়া দিত। পাটনার কমিশনার মিটেলারের সরকারী সাক্ষী বানাইবার এক আশ্চর্য্য ধরণ ছিল। তিনি প্রত্যেক বন্দীকে বলিতেন যে, তুমি যদি এরূপ তিনজন লোকের নাম করিতে পার—যাহাদের মৃত্যুদণ্ড হওয়া উচিত, তাহা হইলে তোমাকে মুক্তি দিব; কিন্তু সে নাম বলিয়া দিলে তাহাকে এই অজুহাতে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হইত যে, সে সমস্ত নাম তাহার জ্ঞাত ছিল।

আগরা ও সাহারানপুরে ফাঁসীটা খুব জোর চলিয়াছিল। দলে দলে গ্রামবাসীকে ধরিয়া আনিয়া বিনা বিচারে হত্যা করা হইত। বলা বাহুল্য, এই বন্দীদের মধ্যে অতি অল্প লোকই বিদ্রোহে যোগ দিয়াছিল।

১৪ই ডিসেম্বর দিল্লি জয় করা হয়। মিসেস কোপল্যাণ্ড বর্ণনা করিয়াছেন যে, ইহার এক সপ্তাহের মধ্যে ৪।৫ শত লোককে নিঃসঙ্কোচে হত্যা করিয়া ফেলা হইল। ঝাঁঝার নওয়াবকেও এই সময় ফাঁসী দেওয়া হয়। অনেক বিলম্বে নাকি তাঁহার প্রাণ-বিয়োগ ঘটে। গভর্ণর জেনারেল ২৪শে ডিসেম্বর তারিখে ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহের যে রিপোর্ট লিখিয়াছিলেন, তাহার সার মর্ম্ম এই যে ;—

এই সময় বিনা বিচারে সকলকে ফাঁসী দেওয়া হইয়াছে। ইহার মধ্যে এরূপ অনেক লোক ছিল, যাহাদের উপর মাত্র সন্দেহ করা হইয়াছে।

শত শত গ্রাম লুঠ করিয়া পরে সেগুলিকে পোড়াইয়া ভস্মীভূত করিয়া দেওয়া হইয়াছে। এই সমস্ত নৃশংসতার

জন্ম এখানকার গভর্ণমেণ্টভক্ত জাতি সমূহও অতিশয় অসন্তুষ্ট হইয়া পড়িয়াছে। উত্তর ভারতে দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়াছে; কারণ এইরূপ অশান্তির মধ্যে চাষ আবাদ সম্পূর্ণ অসম্ভব। যে সমস্ত সৈন্য ছুটিতে ছিল বা পণ্টন ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় যাহারা বাড়ী ফিরিয়াছিল, বিদ্রোহে আদৌ যোগ দেয় নাই—উপরন্তু ইংরাজগণের প্রাণ রক্ষারই চেষ্টা করিয়াছিল, তাহাদের সহিতও বিদ্রোহীগণের অনুরূপ ব্যবহার করা হইয়াছে। গভর্ণমেণ্টের অধীনস্থ অফিসার-গণের এই অমানুষিক ও মর্ম্মান্তিক ব্যবহারের ফলে দেশের লোকের মধ্যে সাধারণ ভাবে এই ধারণা বদ্ধমূল হইয়াছে যে, গভর্ণমেণ্ট হিন্দু মুসলমান উভয় জাতিকে সমূলে ধ্বংস করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছে।

ম্যাজণ্ডি লিখিয়াছেন:—রাজত্ব চলিতেছিল কেবল ফাঁসী ও নরহত্যার উপর। লাক্ষ্ণৌ জয় করার পর অসংখ্য লোককে ফাঁসী দেওয়া হইল। তখন এ বিচার ছিল না যে, বন্দী ব্যক্তি সৈনিক, কি অযোধ্যার কৃষক। চামড়া কাল হওয়াই যথেষ্ট অপরাধ মনে করা হইত।

মিঃ মার্টন "বোম্বাই টেলিগ্রাফ"এ এক প্রেরিত পত্র পাঠান। তাহাতে প্রকাশ—"আমাদের সৈন্য দিল্লিতে প্রবেশ করিয়া সম্মুখে যাহাকে পাইয়াছে, হত্যা করিয়াছে। নিহতের সংখ্যা অনেক হইয়াছিল। কারণ, কয়েকখানি বাড়ীতে ৪০।৫০ জন করিয়া লোক ধরা পড়ে। ইহারা শান্ত নগরবাসী, বিদ্রোহে যোগ দেয় নাই। সেজন্য তাহারা মনে করিয়াছিল যে, তাহাদিগকে নিশ্চয়ই ক্ষমা করা হইবে; কিন্তু তাহাদিগকে বড়ই নিরাশ হইতে হয়।

হোমেজ নিজের ইতিহাসে লিখিয়াছেন:—নিরপরাধ লোকগুলি করযোড়ে প্রাণরক্ষার জন্য প্রার্থনা করিত এবং তাহাদিগকে হত্যা করা হইত। বৃদ্ধগণ ভয় ও বার্দ্ধক্যের জন্য কাঁপিতে থাকিত এবং তাহাদিগকে কচুকাটা করা হইত। কিন্তু ইংরাজগণের পক্ষে উত্তেজনার যথেষ্ট কারণ হইয়াছিল, যেহেতু শহরে বিভিন্ন স্থানে তাহাদের কয়েকজন লোক নিহত হইয়াছিল। তিনি আরও লিখিয়াছেন যে, আমাদের দিল্লি-প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে সহরে লুঠ আরম্ভ হইয়া যায়। ভারতবাসী পাইলেই গুলি করা হইত। মদের দোকান লুঠ করিয়া ইংরাজ সৈন্যগণ অজস্র মদ্যপান করতঃ উন্মত্তবৎ ভারতবাসীগণকে আক্রমণ করিতে থাকে।

মিঃ মার্টন (ইনি টাইমসের সংবাদদাতা ছিলেন) ১৬ই নভেম্বর তারিখে লিখিয়াছেন:—"গতকল্য আমি এবং একজন অফিসার ২০ জন সৈন্যসহ শহর প্রদক্ষিণ করিতে-ছিলাম। আমরা ১৪ জন নিহত স্ত্রীলোকের শবদেহ দেখিলাম। ইহারা সকলেই নিজ স্বামীর হাতে নিহত হয়, ইহাদের লাশগুলি চাদর দ্বারা আবৃত হইয়াছিল। একটী লোককে ব্যাপার জিজ্ঞাসা করায় সে বলিল "পাছে নিজের স্ত্রী ইংরাজগণের হাতে পড়িয়া বেইজ্জত হয়, এই আশঙ্কায় স্বামীরা পূর্ব্বেই নিজ নিজ স্ত্রীকে হত্যা করিয়া ফেলিয়াছে। অতঃপর সেই ব্যক্তি আমাদিগকে উক্ত স্ত্রীলোকদিগের স্বামী-গণের শবদেহও দেখাইল। ইহারা স্ত্রীহত্যার পর নিজেরাও আত্মহত্যা করিয়া ইংরাজের হাত হইতে আত্মরক্ষা করিয়াছিল। নাদের শাহের পর, এই নগর এমন অবাধ নরহত্যার দৃশ্য আর কখনও দেখে নাই। দিল্লি-বিজয়ের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধকারীগণ শহর পরিত্যাগ পূর্ব্বক পলায়ন করে। পক্ষান্তরে যাহারা বিদ্রোহে কোনরূপে যোগ দেয় নাই; তাহারাই রহিয়া যায়। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, কোনরূপ পার্থক্য ও বিচার না করিয়াই তাহাদিগকে হত্যা করা হয়।—

## কানপুরের ঘটনা

অনেক ইংরাজ ঐতিহাসিক বলেন যে, যেহেতু বিদ্রোহী-গণ কানপুরে ইংরাজগণের উপর নৃশংস অত্যাচার করিয়াছিল, সেজন্য ন্যায়তঃ প্রতিশোধ গ্রহণের তাহারা অধিকারী ছিল। কানপুরের হাঙ্গামা সম্বন্ধে নিম্নে একটী অভিমত দেওয়া হইল, পাঠক পাঠিকা উহার দ্বারা অতি সহজে ঘটনার স্বরূপ অনুমান করিতে পারিবেন।

সার জর্জ্জ ফার্ষ্ট—"ভারতীয় বিদ্রোহ" নামক পুস্তকে লিখিয়াছেন:—"ইহা সর্ব্বতোভাবে প্রমাণিত হইয়া গিয়াছে যে, যে-সমস্ত সৈন্য ইংরাজবান্দীগণের পাহারায় নিযুক্ত ছিল, তাহারা উহাদিগকে হত্যা করিতে অস্বীকার করে। এই পৈশাচিক কাণ্ড নানার ৫ জন দুষ্টবুদ্ধি সঙ্গীগণের মধ্যে এক জনের ইসারায় সংঘটিত হয়। সেজন্য এই কার্য্যের দায়িত্ব কখনও সমগ্র ভারতবাসীর উপর দেওয়া চলে না। কোন ইংরাজ যখন ইতিহাসে পড়েন যে, একজন ইংরাজ মহিলা কোন ভারতবাসী কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছেন, তখন

তাঁহার ক্রোধের সীমা থাকে না। সেইরূপ ইহাও সর্ব্ববাদী-সম্মত সত্য যে, শত শত ভারতবাসী নারী ও বালক বালিকা ইংরাজ সৈন্যের আক্রমণে এই সংসার হইতে চিরবিদায় লইতে বাধ্য হইয়াছে। একজন ইংরাজ মহিলার শোচনীয় মৃত্যুতে যদি আমাদের সহানুভূতি থাকে, তবে ইহাও ভুলিলে চলিবে না যে, ভারতবাসীরাও মানুষ! কানপুরের কূপের ঘটনাকে কেহ প্রশংসার চক্ষে দেখিতে পারে না। কিন্তু স্মরণ রাখা দরকার যে, সে-সময় হিউলক বিদ্রোহী-গণকে পিছু হাটাইয়া কানপুরের দিকে অগ্রসর হইতে-ছিলেন। এমতাবস্থায় বিদ্রোহীগণ আমাদের ফাঁসী ও হত্যাকাণ্ডের নিদারুণ কাহিনী শ্রবণ পূর্ব্বক উত্তেজিত হইয়া নিজেদের বন্দীগণের সহিত ঐরূপ ব্যবহারই করিয়াছিল, যেরূপ তাহাদের ভাই ভগ্নিগণের সহিত করা হইতেছিল।

---

# নির্ব্বোধ

[ আকবর উদ্দীন ]

স্কুলে পড়িবার সময়, পনর বৎসর বয়সে শীতকালের সন্ধ্যায় একমাত্র শতছিন্ন বস্ত্রপরিহিত দীন ভিখারী তাহাদের বাটীর সম্মুখের রাস্তা দিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে যাইতেছে দেখিয়া হাফেজ যেদিন তাহার মাতার নিকট হইতে নাছোড়-বান্দা হইয়া চাহিয়া একটা টাকা ও একখানি কাপড় দিল, সেইদিন রাত্রিতে তাহার পিতা এই কথা শুনিয়া তাহাকে প্রহার ত করিলেনই, তাহার উপরও যখন তিনি ভবিষ্যতে তাহার হাতে একটা পয়সাও না দিবার কড়া হুকুম দিলেন, তখন সে প্রহারের যন্ত্রণা ভুলিয়া ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া চারিদিকে চাহিয়া ভাবিতে লাগিল কি তাহার অমার্জ্জ-নীয় অপরাধ,—যে জন্য তাহাকে এই দুর্ভোগ সহিতে হইল।

বাইশ বছর বয়সেও যখন সে ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করিতে পারিল না, তখন তাহার পিতা দুঃখে ও ক্রোধে স্কুল ছাড়াইয়া আনিয়া বয়স্ক পুত্রের গণ্ডে সজোরে দুই চপেটাঘাত করিয়া কহিলেন—হতচ্ছাড়া লক্ষীছাড়া বাঁদর, দোকানে কাজ শেখ্, আর লেখা পড়া কর্ত্তে হ'বে না।

গৃহিণী কর্ত্তাকে ধরিয়া পড়িলেন,—ছেলের বিয়ে দিলেই সব ভাল হ'য়ে যাবে, সংসারে মন বস্‌বে।

কর্ত্তা কহিলেন—তুমিও যেমন, এমন গাধাও জন্মাল আমার ঘরে। বড় বড় ব্যবসাদারদের এক হাটে কিনি আর এক হাটে বেচি, সেই আমি,—আমার ছেলে হ'ল কিনা এই!

গৃহিণী দুঃখ করিয়া কহিলেন, কি ক'রবে বল, বরাতের দোষ!

কর্ত্তা তিক্তস্বরে কহিলেন, বরাতের দোষ না হাতী! যেমন তুমি তেমনি তোমার ছেলে। ওর আবার বিয়ে! ওসব হ'বে না।

কিন্তু কর্ত্তা যত প্রবল ইচ্ছাশক্তিসম্পন্নই হউন না কেন, দুনিয়ার কোন স্বামীই স্ত্রীর সজল চোখের অনুরোধ এড়াইতে পারেন নাই। এক্ষেত্রেও হইল তাহাই। কর্ত্তা বিবাহে রাজী হইলেন। সেই বছরেই হাফেজের সঙ্গে বিবাহ হইল, পল্লীগ্রামের বিশেষ সম্পন্ন গৃহস্থের একমাত্র কন্যা লতিফনের সহিত। নববধূ গৃহে আসিবার সময় সঙ্গে আনিলেন বহু অর্থ, দান-পত্র, এবং উদ্ভিন্ন যৌবনের পরিপূর্ণ না হইলেও মোটের উপর সৌন্দর্য্য; সেই সঙ্গে আরও আসিল পল্লী-বধূর লাজুকতা ও কর্ম্মনিষ্ঠা।

বিবাহের পর বন্ধুবান্ধব সন্ধ্যার সময় তাহাকে ঘিরিয়া বসিল।

সাদেক জিজ্ঞাসা করিল, বৌ নিশ্চয়ই তোমার খুব পসন্দ হ'য়েছে।

সাত্তার কহিল, নইলে কি আর ভায়াকে একটুও দেখা যায় না ?

এমদাদ জিজ্ঞাসা করিল বৌয়ের সঙ্গে কি রকম ভাব হ'ল ?

উত্তরে হাফেজ মাথা নাড়িয়া কহিল, হেঁ—হেঁ

তাহার পর যেন তাহার গলায় কি বাধিয়া গিয়াছে এই ভাবে কাসিতে আরম্ভ করিল।

সকলে তাহার কাসি শুনিয়া হাসিতে লাগিল। সে ততই কাসে, শেষে মুখ চোখ লাল হইয়া উঠিল।

বন্ধুরা সকলে সমস্বরে কহিল, হাফেজ ভাই, আজ তোমাকে ছাড়্‌ছি না, ব'লতেই হ'বে, বল ত কি রকম ভাব হ'ল।

হাফেজ তখন কাসির স্রোত একটু রোধ করিয়া পকেট হইতে বাঘ মার্কা রুমাল বাহির করিয়া মুখ ও কপাল ঘসিতে লাগিল, তাহার পর পায়ের লাল সিল্কের মোজা বার দুই ঘসিয়া পাট করিয়া কহিল, সে ভাই কি আর ব'লব।

বলিয়া মাথার অবাধ্য চুলে সে যে তেড়ি কাটিয়াছিল, তাহার উপর দুই চারিবার হাত বুলাইয়া লইল।

অবশেষে অনেক কষ্টে নানা প্রকার প্রশ্ন ও জেরার ফলে সে যাহা অসংলগ্ন ভাবে কহিল, একত্র করিলে তাহার মোটামুটি অর্থ এই দাঁড়ায়—প্রথম রাত্রে নূতন বধূর আ-কোমর ঘোমটা ও কাঁদুনিতে সে ভ্যাবাচ্যাকা খাইয়া গিয়াছিল; তাহার সঙ্গে নিতান্ত ছোট দুই একটী কথা ছাড়া আর কিছুই বলে নাই। ইহার কারণ সে বলিতে পারে না।

( ২ )

ছোট সংসার প্রকাণ্ড কারবার ও প্রভূত অর্থ রাখিয়া যেদিন হাফেজের পিতা ইহলোক ত্যাগ করিলেন, সেদিন সকলেই ভাবিল, হাফেজ দুই দিনেই নিজের বোকামিতে সব উড়াইয়া দিবে। তাহার মাতা স্বামীর দুঃখ ভুলিয়া কেবলই বলিতে লাগিলেন, এত বড় কারবার এই বোকা ছেলেটা বজায় রাখিবে কি করিয়া!

তাহা হইলেও হাফেজ গদিয়ান হইয়া বসিল।

তিন দিন পর দুপুরে দূর পল্লীগ্রামের একজন বৃদ্ধ পক্ককেশ দালাল আসিয়া তাহার পায়ের উপর হঠাৎ লুটাইয়া পড়িল।

হাফেজ ত্বরিতে উঠিয়া তাহার দুই হাত ধরিয়া কহিল, হাঁ হাঁ করেন, কি করেন কি; আপনি বুড়ো মানুষ, উঠুন উঠুন।

প্রধান কর্ম্মচারী কর্কশ স্বরে কহিল, কি ছলিম মিয়া, কর্ত্তার কাছে পারনি, নূতন মুনিবকে নাবালগ পেয়ে ঠকিয়ে যাবে। ভাব্‌ছ বুঝি। তা হচ্ছে না—আমরা আছি।

বৃদ্ধ ছলিম হাপুস-নয়নে কাঁদিতে লাগিল।

হাফেজ কহিল, আঃ দেওয়ানজী করেন কি, লোকটা কাঁদছে, তাকে আপনি এমন করে ব'কছেন !

দেওয়ানজী কহিলেন, হুজুর, আমরা ওকে খুব চিনি। পাঁচ শ টাকা ধারে, দেবার নাম নেই, কেবল বাহানা ক'রে দিন কাটাচ্ছে। ওকে কিছুতেই ছাড়্‌বেন না।

হাফেজ কহিল, ব্যাপার কি ছলিম মিয়া!

ছলিম তখন মাথা তুলিয়া পা জড়াইয়া ধরিয়া কহিল, দোহাই হুজুর, ক'বছর অজন্মাতে সব গেছে, আমার একটা ছেলে—উপযুক্ত ছেলে, হুজুর, সে-ও ফাঁকি দিয়ে চলে গেছে; দুমাস আগে বাড়ী পুড়ে গেছে, আজকে আমি স্ত্রীর হাত ধ'রে পথের ভিখারী। আমি টাকা ধারি ঠিক, কিন্তু দেব কোত্থেকে।

হাফেজ জিজ্ঞাসা করিল, তোমার কিছু নেই ?

ছলিম কহিল, কিছু নেই হুজুর।

হাফেজ কহিল—তবে আর দেবে কোত্থেকে !

দেওয়ানজী গর্জ্জন করিয়া কহিলেন, যেখান থেকে পারে—টাকা কি গাছের ফল।

ছলিম করুণভাবে হাফেজের মুখের দিকে চাহিল।

হাফেজ কহিল—না থাকলে কোত্থেকে দেবে। যাও ছলিম মিয়া, তোমাকে মাফ ক'রলাম। টাকা আমি চাইনে, পারত' দিও, না পারত' এই পর্য্যন্ত।

ছলিম আবার পায়ের উপর পড়িয়া কি বলিতে যাইতেছিল, দেওয়ানজী ধমক দিয়া কহিলেন—থাম্ জোচ্চোর! হুজুর এমন করে রেহাই দিলে চল্‌বে কি ক'রে। কর্ত্তার কত কষ্টের বিষয় !

হাফেজ বাধা দিয়া কহিল—ও যেতে দিন, এক রকম চলে যাবে।

বাহিরে আসিয়া বৃদ্ধ ছলিম তাহার সঙ্গীকে কহিল—দেখ্‌লে কেমন ক'রে কাজ ফতে ক'রে নিলাম। আমরা হ'লাম পাকা ঘাগী, ও ব্যাটা ত' নাবালগ।

সন্ধ্যার পর বাড়ী গিয়া হাফেজ মাতা ও স্ত্রীর নিকট সকলের সাক্ষাতে ও অসাক্ষাৎে সেদিন যে কড়া হুকুম, শাসন, অনুনয় ও অভিযোগ শুনিল, তাহাতে সে তিক্ত ও বিরক্ত হইয়া উঠিল শুদ্ধ এই জন্য যে, বাহিরের কর্ম্মচারী হইতে ঘরের মেয়েরা পর্য্যন্ত সকলে এই যে সামান্য ব্যাপারটা লইয়া অভিনব কাণ্ড সৃষ্টি করিতেছে, ইহার সত্যকার কারণ কোথায়!

বন্ধু সাদেক আসিয়া দেখিল সে গালে হাত দিয়া ভাবিতেছে। জিজ্ঞাসা করিল—কি হে কি ভাব্‌ছ?

হাফেজ কহিল—আর ভাই বুড়া ছলিম এসে কেঁদে পড়্‌ল, ব'ল্‌ল তার ছেলে মরে গেছে; বাড়ী ঘর গেছে; অবস্থাও খারাপ হ'য়ে গেছে। আমরা যে ৫০০৲ টাকা তার কাছে পাব, তা-সে দিতে পারবে না। আমি তাকে ছেড়ে দিলাম। সবাই সেই জন্য আমাকে গালাগালি কচ্ছে। বলত' ভাই, আমি কি অন্যায় করিছি।

সাদেক কহিল, সে সব কথা আমি শুনিছি। এতে তোমার অন্যায় কিছু হয় নি। অক্ষম লোকটার কাছ থেকে আদায় কর্ত্তে হ'লে তা'র উপর, অযথা অন্যায় অত্যাচার কর্ত্তে হয়; তা করা কারুরই উচিত নয়। আমি আমার বোনদের কাছে এই কথা বলেছিলাম, তারাও ঐ কথা বলে।

এতক্ষণ পরে ঘন মেঘের ওপারে একটু আলো দেখিয়া হাফেজ প্রায় লাফাইয়া উঠিয়া কহিল, সত্যি আমি অন্যায় করি নি? এরা ত' ব'কে ব'কে আমার মাথা ঘুলিয়ে দিয়েছে। ভাবছিলাম সত্যিই বুঝি অন্যায় ক'রে ফেলেছি।

সাদেক কহিল, আমাদের মতে তুমি ন্যায্য কাজই ক'রেছ।

হাফেজ বিস্ময়ের স্বরে কহিল, তোমার বোনরাও এই কথা বল্‌লেন?

সাদেক কহিল, হাঁ।

হাফেজ কহিল, কিন্তু আমার স্ত্রী আমাকে খুব বক্‌ছিল।

সাদেক কহিল, তোমার স্ত্রী ত' Up-to-date or enlightened নয়, পুরো পাড়াগেঁয়ে, পুরাণো ধরণের।

হাফেজ মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে বলিল, তাইত'—তাইত'!

সাদেক কহিল তা এখানে বসে বসে কি ক'রবে। চল আমাদের বাড়ী থেকে বেড়িয়ে আসবে। তোমার কথা শুনে আমাদের বাড়ীর সকলে তোমাকে দেখ্‌তে চেয়েছেন।

হাফেজ একবার নিজের পোষাকের প্রতি লক্ষ্য করিয়া কহিল, এখনই? কাল বিকেলে গেলে হয় না?

সাদেক কহিল, না হে, এখনই চল না।

হাফেজ বাড়ীর ভিতরে গিয়া ভাল ভাল জামা কাপড় পরিতে লাগিল। স্ত্রী আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, রাত্রে আবার পোষাক প'রে যাচ্ছ কোথায়?

হাফেজ কহিল, সাদেকের বাড়ী।

স্ত্রী কহিল, তা রাত্রে কেন?

হাফেজ গর্জ্জিয়া কহিল, তোমরা শুধু আমাকে গালাগালি দিলে; কিন্তু দেখ, আমি যা করিছি, তাতে যাঁ'রা মানুষের মত মানুষ তাঁ'রা বলছেন, আমি কোন অন্যায় করিনি। ওদের বাড়ীর মেয়েরা আমাকে দেখ্‌তে চেয়েছেন।

স্ত্রী ক্রুদ্ধ স্বরে কহিল, 'ও—সেই বেম্মজ্ঞানী ক'টা :বোন আছে বটে তোমার বন্ধুর। বোকা পেয়ে কিছু মেরে নেবার মতলব—নয়? খোল কাপড়, শুয়ে পড়, যেতে হবেনা কোথাও।

হাফেজ একটু বিরক্ত হইয়া কহিল, কেন?

স্ত্রী কণ্ঠে বিষ মাখাইয়া কহিল, ন্যাকা, জাননা কিছু।

হাফেজ কহিল, বাঃ! ভদ্র মহিলারা আমাকে দেখ্‌তে চেয়েছেন, আর আমি যাব না? সে কি রকম?

স্ত্রী গর্জ্জিয়া উঠিয়া কহিল, তবে যাও—মর গে।

হাফেজ অবাক হইয়া স্ত্রীর ব্যবহার দেখিল। কোন কথা না বলিয়া পোষাক পরিয়া চলিয়া গেল।

( ৩ )

সাদেক, হাফেজকে লইয়া তাহার বৃদ্ধ পিতা বাহিরের ঘরে যেখানে পুরাতন সতরঞ্চ-পাতা ফরাসের উপর বসিয়া একমনে তামাকুর সদ্ব্যবহার করিতেছিলেন, সেইখানে গিয়া কহিল, এই হাফেজের কথা বলেছিলাম।

বৃদ্ধ আশরাফ সাহেব তাহার দিকে চাহিয়া কহিল, ব'স বাবা, ব'স। তোমার কথা সাদেকের কাছে শুনেছি; বেশ

বেশ যা'র পয়সা আছে, তা'র অন্তর যদি এমনি মহৎ না হয়, তাহ'লে বড্ড বেখাপ্পা ঠেকে।

ইতিমধ্যে সাদেক বাড়ীর ভিতর গিয়া হাফেজের আগমন সংবাদ প্রচার করিল। হাফেজ বাহিরে বসিয়া অন্তরালে চুড়ির রিনিঝিনি ও কাপড়ের খসখস শব্দ শুনিয়া পকেট হইতে পরীমার্কা রুমাল বাহির করিয়া মুখ মুছিয়া লইল।

আশরাফ সাহেব একটু পরই উঠিয়া গেলেন। সাদেক আসিয়া বন্ধুকে জলযোগের জন্য একটু অপেক্ষা করিতে অনুরোধ করিল।

দরজার ওধার হইতে চাপা হাসি ও চুড়ির রিনিঝিনি শব্দ হাফেজ শুনিতে পাইতেছিল। কিন্তু আড়ালের সেই নারী-দের রহস্যময়ী অ-দেখা মূর্ত্তি তাহার প্রাণে বিশেষ কোন ভাবের উদ্রেক করিতে পারে নাই।

অনেক রাত্রে এ রাস্তা ও রাস্তা ঘুরিয়া সে বাড়ী ফিরিয়া দেখিল, তাহার স্ত্রী মেঝের উপর শুইয়া আছে। দুই চারিবার ডাকিয়াও যখন কোন সাড়া পাইল না, তখন সে শুইয়া পড়িল। আহার করিবার কথা ভুলিয়া গিয়াছিল।

পরদিন সন্ধ্যার পর সে সাদেকের বাড়ী গিয়া দুই একবার সাদেককে ডাকিয়া সটান অন্দরে চলিয়া গেল। সাদেকের ভগ্নীরা তাহাকে দেখিয়া তাড়াতাড়ি সরিয়া গেল।

সাদেক ঘরের ভিতর হইতে বাহিরে আসিয়া কহিল, কে? হাফেজ?

হাফেজ বিস্মিত স্বরে কহিল, তা ওঁরা পালালেন কেন?

সাদেকের জ্যেষ্ঠা ভগ্নী আড়াল হইতে ক্রুদ্ধ স্বরে কহিল, কোথাকার ন্যাকা!

সাদেক কহিল, চল বাইরে যাই। অমন ক'রে একে-বারে বাড়ীর ভিতরে ঢুক্‌তে নাই।

হাফেজ অবাক হইয়া ভাবিল—কেন?

বৈকালে সে আবার সাদেকের বাড়ীতে যাইতেছিল। তাহাদের বাড়ীর নিকটস্থ হইয়া দেখিল একটা পুরাণো ইন্দা-রার পাশে দাঁড়াইয়া অনেকগুলি লোক হৈ চৈ করিতেছে। নিকটে গিয়া দেখিল একটী বালিকা। বালিকাটী একজন মুচির মেয়ে। ইন্দারার মধ্যে পড়িয়া গিয়াছে, কিন্তু কেহ তাহাকে রক্ষা করিবার কোন চেষ্টা করিতেছে না। কন্যার মাতা আর্ত্তনাদে দিক কাঁপাইয়া তুলিয়াছে।

হাফেজ এক জনকে কহিল, তোমরা কেউ নেমে ওকে তোল না কেন?

সে কহিল, কে এমন বোকা আছে যে, এই ভাঙ্গা ইন্দারায় নেমে প্রাণ হারাবে!

হাফেজ কহিল, যে ওকে বাঁচাবে, তাকে দশ টাকা দেব।

কেহ সম্মত হইল না; কে নিশ্চিত মৃত্যুর সম্মুখীন হইবে!

একশত টাকাতেও যখন কেহ সম্মত হইল না, তখন হাফেজ নিজে জুতা খুলিয়া সেই ভাঙ্গা ইন্দারায় নামিল। উপরে সকলে হাঁ—হাঁ করিয়া উঠিল।

ঘণ্টাখানেক পর যখন সে বহু কষ্টে বালিকাকে লইয়া উপরে উঠিয়া আসিল, তখন চতুর্দ্দিকে যে তুমুল জয়ধ্বনি উঠিল, তাহার মাঝখানে সে চুপ করিয়া বসিয়া পড়িল। প্রশ্নে প্রশ্নে যখন তাহাকে সকলে বিব্রত করিয়া তুলিল, তখন সে শুধু কহিল—তোমরা কি রকম লোক; একটু হাঁফ নিতে দাও।

এমন সময় সাদেক আসিয়া তাহাকে বাড়ী লইয়া গেল।

যখন সে রাত্রে বাড়ী ফিরিল, তখন তাহার স্ত্রী ও মাতা উভয়েই তাহাকে সমস্বরে তাহার বোকামির জন্য অজস্র বকুনি দিলেন।

মাতা অবশেষে কহিলেন—তুই এমনি ক'রে সব বিষয়টাও উড়িয়ে দিবি, জীবনটাও হারাবি।

স্ত্রী কহিল—তোমার মরণ হয় না!

সে শুধু কহিল—কিন্তু সবাই ত ভাল বলছে।

স্ত্রী কহিল—সবাইয়ের কি? শেষ বলে' দিচ্ছি ফের যদি এমন কর, ভাল হ'বে না।

সে অবাক হইয়া ভাবিতে লাগিল কি অন্যায় তাহার হইয়াছে!

দিন কয়েক পর পূর্ব্ববঙ্গের বন্যাপ্রপীড়িতদের সাহায্যার্থে দেশের গণ্যমান্য নেতৃবৃন্দ সভা করিয়া যখন ভিক্ষা প্রার্থনা করিলেন, তখন সভায় বিশেষ কিছু আদায় না হওয়ায় দোকানে দোকানে বাড়ী বাড়ী ঘুরিতে লাগিলেন।

হাফেজের গদীতে আসিয়া সাহায্য প্রার্থনা করিলে হাফেজ সন্ত্রস্ত হইয়া নেতৃবৃন্দকে অভ্যর্থনা করিয়া অবশেষে কহিল—আমি আর কি দেব।

কর্ম্মচারীকে কহিল—তহবিলে কত আছে ?

দেওয়ান কহিল—তেইশ শত পাঁচ টাকা নয় আনা।

হাফেজ হুকুম দিল—সবটাকা দিয়ে দিন!

দেওয়ানজী চক্ষু কপালে তুলিয়া কহিলেন—সে কি? লোকের ডিউ আজকে দিতে হবে যে!

হাফেজ কহিল—সে পরে দেওয়া যাবে।

নেতৃগণ টাকা লইয়া অশেষ ধন্যবাদ দিয়া চলিয়া গেলেন।

গালাগালি বকুনি ঘরে ত' হইলই, বাহিরেও সকলে বলিতে লাগিল—ছোঁড়াটা এমনি করে সব উড়িয়ে দেবে দেখছি, বাপের কুপুত্র!

বৈকালে হাফেজ আবার সাদেকের বাড়ী গেল। রাত্রিতে ফিরিয়া আসিলে স্ত্রী ঝঙ্কার দিয়া কহিল—ওখানে রোজ রোজ যাও কেন ?

হাফেজ কহিল—বেড়াতে।

স্ত্রী কহিল—বেড়াবার আর জায়গা নেই ?

হাফেজ কহিল—ওখানে বেশ ভাল লাগে।

স্ত্রী তীব্রস্বরে কহিল—তা ত' লাগবে। ধাড়ি ধাড়ি বেহায়া মেয়েরা সব, একটু লজ্জাও করে না তাদের। তোমারই বা বিচার কি? একটু বুদ্ধি নাই ?

হাফেজ অবাক হইয়া কহিল—কেন ক্ষতিটা কি ?

স্ত্রী বিষাক্ত সর্পিণীর মত গর্জ্জিয়া কহিল—বুঝ না কিছু? ওদের মতলব হচ্ছে, ছুঁড়িদের বে হচ্ছে না, তোমার সঙ্গে একটার বে' দেবে, কিছু পয়সাও নেবে।

হাফেজ আশ্চর্য্য হইয়া ভাবিল—এ বলে কি!

স্ত্রীর মুখে বিবাহের কথা শুনিয়া—তাহার সারারাত ঘুম হইল না; সে যে সাদেকের কোন ভগ্নিকে বিবাহ করিতে পারে, ইহা কোন দিন তাহার মনে হয় নাই; কিন্তু আজ ভাবিল, যাহারা তাহার নিতান্ত আপন, তাহারা ত' পদে পদে তাহার দোষ ধরিয়া আসিতেছে; সাদেকের ভগ্নিরা কেহ তাহার তথাকথিত বোকামিকে বোকামি না বলিয়া মহত্ত্ব নামে অভিহিত করিয়াছে। তাহারা শিক্ষিতা, বিদুষী। তাহাদের কাহাকেও জীবন সঙ্গিনী করিতে পারিলে তাহার দিন কি সুখেই না কাটিয়ে যাইবে। তাহার মনের উপর ঊষার অরুণাভার আনন্দ ফুটিয়া উঠিল।

পরদিন সকালে উঠিয়া হাফেজ সোজা সাদেকের নিকট গিয়া কহিল—ভাই, তোমার বড় বোন্‌কে আমি বিয়ে কর্ত্তে চাই।

সাদেক অবাক হইয়া কহিল—সে কি ?

হাফেজ কহিল—সত্যি, ভাই।

সাদেক কহিল—তা আমি ত' কিছু ব'লতে পারি না; আব্বাকে বল।

হাফেজ কহিল—তুমি তাঁকে ডেকে দাও।

সাদেকের নিকট এই প্রস্তাব যেমন অসম্ভব তেমনি হাস্যকর বলিয়া বোধ হইল। তাহার কার্য্যের প্রশংসা করিলেও সে যে নেহাৎ বোকা, এ-সম্বন্ধে সাদেকের দ্বিমত ছিল না। সে হাসিতে হাসিতে বাড়ীর ভিতর গিয়া ভগ্নিদের কহিল—হাফেজ ক্ষেপে গেছে! সে বড় বুবুকে বে' কর্ত্তে চায়।

ভগ্নীরা শুনিয়া ত' হাসিয়াই আকুল হইল।

আশরাফ সাহেব বাহিরে আসিলে হাফেজ তাঁহাকে ধরিল, তাঁহার বড় মেয়ের সঙ্গে বিবাহ দিতেই হইবে।

তিনি প্রথমে একটু আশ্চর্য্য হইয়া অবশেষে কহিলেন—তোমার এক স্ত্রী বর্ত্তমান, আমি ত' আমার মেয়ের বে' তোমার সঙ্গে দিতে পারি নে। হাতে ধরে মেয়েকে সতীনের ঘরে তুলে দিতে আমি পারব না।

হাফেজ কহিল—আমি আলাদা বাড়ী ঘর সব দেব, সম্পত্তি লেখাপড়া ক'রে দেব, যা চাইবেন তাই দেব।

আশরাফ সাহেব কহিলেন,—তা হ'লেই বা কি ক'রে দিই।

অত্যন্ত নাছোড়বান্দা হইয়া যখন হাফেজ আশরাফ সাহেবের পা জড়াইয়া ধরিল, তখন পাশের ঘর হইতে মেয়েদের চাপা হাসির গুঞ্জন স্পষ্টই শোনা যাইতেছিল।

আশরাফ সাহেব বিপন্ন হইয়া কহিলেন—আমি ত' ব'লতে পারি না, মেয়েদের আগে জিজ্ঞাসা করি।

হাফেজ বলিল—আপনি এখনই জিজ্ঞাসা করুন। তাঁরা অমত ক'রবেন না।

সাদেক পাশের ঘরে তাহার ভগ্নীদের নিকট দাঁড়াইয়াছিল। সে তাহার জ্যেষ্ঠা ভগ্নীকে জিজ্ঞাসা করিল—কি বুবু, কি বল!

জ্যেষ্ঠা ভগ্নী উত্তর করিলেন—ওকে সোজা বলে দাও, অমন বোকাকে আমরা বিয়ে করি না।

হাফেজ প্রশ্ন ও উত্তর দুই-ই শুনিতে পাইল। সে শুধু বলিল, আপনারাও আমাকে বোকা বলেন ?

সাদেকের পিতা কহিলেন, বাবা, কিছু মনে ক'র না, যে সংসারী নয়, তাকেই লোকে বোকা বলে।

হাফেজ মাথা নীচু করিয়া ভাবিতে ভাবিতে সেখান হইতে চলিয়া গেল।

তাহাকে চিন্তাকুল দেখিয়া স্ত্রী জিজ্ঞাসা করিল, তুমি এত ভাবছ কি ?

হাফেজ তাহার বিবাহের প্রস্তাব ও প্রত্যাখ্যান সম্বন্ধে সব কথা খুলিয়া বলিল, শেষে কহিল, আজ যেন মনে হচ্ছে, আমার কোন একটা অভাব আছে, যে-জন্য তোমরা সবাই ঘরে-বাহিরে আমাকে নির্ব্বোধ বল, ঠিক ঠাওর কর্ত্তে পাচ্ছি না ; ভাব্‌ছি সেটা কি।

স্ত্রী সজল চক্ষে কহিল, তোমার আর সে সব ভাব্‌তে হ'বে না। তোমাকে তা'রা অপমান করে, এত সাহস তাদের ! তুমি যেমন বোকা আছ, তেমনি থাক—এই আমার ভাল। তোমায় হাত ধ'রে গাছতলায় দাঁড়াতে হয় তাতেও আমার দুঃখ নাই, তবু সংসারের নির্ম্মম নিষ্ঠুর আবর্জ্জনারাশি যেন তোমাকে কোন দিন স্পর্শ না করে।

---

# এছলাম ও শাসন-অধিকার

[ মোহাম্মদ মনিরুজ্জমান এছলামাবাদী ]

( ২ )

ইতিপূর্ব্বে 'কোরআন শরীফের আয়াত ও তফছিরের বরাত দিয়া সাধারণ ভাবে প্রমাণ করা হইয়াছে যে, পার্থিব উন্নতি ও রাষ্ট্রীয় অধিকার লাভ এছলাম ধর্ম্মের অঙ্গীভূত। এখন আমরা ধর্ম্ম-গ্রন্থের স্পষ্ট উক্তির দ্বারা সপ্রমাণ করিতে চেষ্টা পাইব যে, রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা এছলাম ধর্ম্মের মুখ্য উদ্দেশ্য ; রাষ্ট্রীয় অধিকারলাভ ঈমানের অঙ্গ ও এছলামের অংশবিশেষ এবং সঙ্গে সঙ্গে ইহাও দেখাইতে চেষ্টা করিব যে, পাথিব উন্নতি বিশেষতঃ রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা অর্জ্জনে বিমুখ থাকা, বিপদের আশঙ্কায় বা আলস্য জড়তা নিবন্ধন শাসন-অধিকার লাভে উদাসীন ও নিশ্চেষ্ট থাকা এছলাম ধর্ম্মে মহাপাপ এবং এই পাপে পাপী হইলে অভিশপ্ত ও আল্লাহতালার গজবের ভাগী হইতে হইবে, নিম্নোদ্ধৃত ধারাবাহিক প্রমাণ রাজির দ্বারা আমাদের এ কথার সত্যতা সুস্পষ্টরূপে উপলব্ধ হইবে।

(১) وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصلحت ليستخلفنهم فى الارض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذى ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدوننى ولا يشركون بى شيئا ( سورة نور ركوع ٧ پاره ١٧ )

অর্থ—তোমাদের মধ্যে যাহারা ঈমান আনিয়াছে এবং সৎকর্ম্ম করিয়াছে, তাহাদের সহিত আল্লাহতাআলা অঙ্গীকার করিয়াছেন যে, তাহাদিগকে ভূপৃষ্ঠে রাজত্ব দান করিবেন, যেমন তাহাদের পূর্ব্ববর্ত্তী উম্মৎদিগকে দান করিয়াছেন। আরও তিনি অবশ্য তাহাদের জন্য তাহাদের ধর্ম্মকে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপন করিয়া দিবেন। সেই ধর্ম্ম তিনি তাহাদের জন্য পছন্দ করিয়া লইয়াছেন। আরও তিনি তাহাদের ভয়-ভীতি কাটাইয়া অবস্থার পরিবর্ত্তন সাধন করিয়া দিবেন। তোমরা আমার উপাসনায় রত থাক, আমার সহিত কাহাকেও শরিক করিও না। ( ছুরা নূর, ৭ম রুকু ১৮ পারা )

এই আয়ত দ্বারা নিম্নলিখিত কয়েকটী কথা প্রমাণিত হইল ১। আল্লাহ মোছলমান গণের সহিত অঙ্গীকার

করিয়াছেন, তিনি তাহদিগকে দুনয়াতে বাদশাহী দিবেন। অবশ্য তজ্জন্য সর্ত্ত এই যে তাহাদিগকে ঈমানদার বা দৃঢ় বিশ্বাসী থাকিতে হইবে এবং শরিয়তের আদেশ-নিষেধ পালন করিয়া চলিতে হইবে, ইহারই নাম সৎকর্ম্মশীল হওয়া বা নেক কাজ করা।

২। খোদাতাআলা শেষ-প্রেরিত পয়গম্বরের বিশ্বাসী উম্মৎদিগকে যেমন বাদশাহী দিবেন বলিয়া ওয়াদা করিয়াছেন, তাহাদের পূর্ব্ববর্ত্তী উম্মৎদিগকেও ঐরূপ সর্ত্তে ধর্ম্ম-বিশ্বাস বজায় রাখার ও সৎকর্ম্মশীলতার পুরস্কার স্বরূপ রাজ্য দান করিয়াছিলেন। যথা—বনী ইছরাইল প্রভৃতি।

৩। খোদাতাআলা আরবের মুষ্টিমেয় মোছলমানদিগকে যেমন রাজ্য দানের ওয়াদা দিয়াছেন, সেই সঙ্গে সঙ্গে ইহাও স্পষ্ট ভাবে বলিয়া দিয়াছেন যে, এছলাম ধর্ম্মকে তিনি রাজত্ব দানের ফলে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়া দিবেন এবং সেই এছলামই আল্লাহতাআলার মনোনীত ধর্ম্ম। এতৎসঙ্গে আল্লাহ মোছলমানের নিকট আরও একটী অঙ্গীকার করিয়াছেন—প্রাথমিক যুগে মোছলমানগণ সংখ্যায় অল্পতা ও শক্তিহীনতা নিবন্ধন সর্ব্বদাই কাফেরগণের যে অত্যাচার উৎপীড়নও ভয়-ভীতির ভিতর দিয়া সময় কাটাইতেন, তাহাদের সেই সঙ্কটকাল আর অধিক দিন থাকিবে না। তাহারা শক্তিশালী হইয়া শক্তির সহিত কাল যাপন করিতে পারিবে। হে মোছলমানগণ, এ সকল ভবিষ্যৎ আশা ও সম্পদের কথা স্মরণ করিয়া আল্লাহ্‌তাআলার এবাদৎ বন্দেগী কর। তাঁহার জাতে ও ছেফাতে অন্য কাহাকেও শরিক করিও না। অর্থাৎ তোমরা খাঁটী একত্ববাদী হইয়া থাকিবে। অংশবাদী হইও না।

এই আয়তে আরবের মোছলমানদিগকে বাদশাহী দেওয়া, তাহাদিগকে নিরাপদ ও শক্তিশালী করা, এবং এছলাম ধর্ম্মকে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করা ইত্যাদি বিষয়ের যে অঙ্গীকার ও ভবিষ্যৎ-বাণী আছে, তাহার সত্যতা ও সফলতা সম্বন্ধে দ্বিধা করিবার কিছুই নাই। কারণ আয়ৎ নাজেল হওয়ার অদূর ভবিষ্যতে আল্লাহতাআলার ঐ সকল অঙ্গীকার ও ভবিষ্যৎ-বাণী অক্ষরে অক্ষরে পূর্ণ হইয়াছিল। এতদ্বারা একদিকে যেমন মোছলমানগণের ভাবী রাজত্ব লাভের প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে, অন্যদিকে সেইরূপ কোর-আন যে বিশ্বস্রষ্টা সর্ব্বশক্তিমান আল্লার কালাম তাহাও নিঃসন্দেহরূপে প্রমাণিত হইতেছে। কোর‌আন আল্লার কালাম না হইলে তাহার উক্তি ও ভবিষ্যৎ-বাণী অক্ষরে অক্ষরে ফলিয়া যাইত না, তাহাতে কত ভুল কত ভ্রান্তি স্থান পাইত।

জগতের ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায়, কোর-আনের ভবিষ্যৎবাণী অনুযায়ী দুনয়াতে মোছলমানগণ যেরূপ বিশাল ও বিস্তৃত রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, তাহার তুলনা ও নমুনা কোন যুগে কোন দেশে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

প্রাচীন এসিরিয়ান জাতির রাজত্ব মধ্যে এসিয়া, ভারতের পশ্চিম ও আফরিকার উত্তর-পূর্ব্ব সীমা পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল, প্রাচীন মিসরীয়দের প্রভাব আফরিকার উত্তর পূর্ব্ব অংশ এবং এশিয়ার আরব ও পারস্যদেশ পর্য্যন্তই সীমাবদ্ধ ছিল। রোমানদের রাজত্ব সর্ব্বাপেক্ষা বিশাল ও বিস্তৃত ছিল সত্য; কিন্তু এশিয়ায় তাহাদের রাজত্বের বিস্তৃতি পারস্যের পূর্ব্ব দক্ষিণ সীমার বাহিরে আর যাইতে পারে নাই। গ্রীকগণের সর্ব্ব প্রধান দিগ্বিজয়ী সম্রাট আলকজাণ্ডার দি গ্রেট পূর্ব্বদিকে ভারতের মধ্যদেশ পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিলেন মাত্র। বলা বাহুল্য যে, মোছলমানের দিগ্বিজয়ের তুলনায় চঙ্গীজ খাঁর দেশ জয়ও অকিঞ্চিৎকর। চেঙ্গীজ খাঁ স্থায়ীভাবে রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করিতে পারেন নাই। শিক্ষা ও সভ্যতার ত কোন কথাই নাই।

আর এদিকে মোছলমানগণ দিগ্বিজয় ব্যাপারে ইউরোপে প্রায় বার শত বৎসর প্রবল প্রতাপের সহিত শাসন দণ্ড পরিচালনা করিয়াছেন। স্পেনে আরবগণ ৭১১ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৪৯২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত প্রায় আটশত বৎসর এবং বর্ত্তমান তুর্কী জাতি প্রায় ৪০০ চারিশত বৎসর মহা শান শওকৎ ও বিপুল প্রতাপের সহিত বাদশাহী করিয়াছেন। ইউরোপ মহাদেশে স্পেন, পর্ত্তুগাল, দক্ষিণ ফ্রান্স, ইটালী, অষ্ট্রিয়া, আমেরিকা, সার্ভিয়া, বুসিনিয়া, মণ্টিনিগ্রো, বুলগেরিয়া, রুমেনিয়া, গ্রীস, আলবেনীয়া, পোলাণ্ড, ক্রিমিয়া, ওডিসা ক্রীটদ্বীপ, সাইপ্রস দ্বীপ, সাইবেরিয়া, মঙ্গোলিয়া, এমন কি আইস্‌ল্যাণ্ড পর্য্যন্ত রাজ্য বিস্তার করিয়াছিলেন। আফরিকা মহাদেশে মিছর, সুদান, আবিসিনীয়া, সোমালীল্যাণ্ড, ত্রিপলি, টিউনিস, আলজিরিয়া, মরক্কো, রিফ, সাহারা

এবং আফরিকার আরও বিভিন্ন অংশে বহু শতাব্দী ব্যাপিয়া আরবগণ শাসন দণ্ড পরিচালনা করিয়াছেন। এশিয়া মহাদেশের কথা আর কি বলিব, শাম, ফিলেস্তীন, আরব, তুরান, ঈরান, আফগানিস্থান, বেলুচিস্থান, হিন্দুস্থান, চীন, তিব্বৎ, সিংহল দ্বীপ, যাবা, সুমাত্রা ও ফিলিপাইন এবং বিশাল রুষ রাজ্যের এসিয়াখণ্ডে বহুদূর পর্য্যন্ত রাজ্যবিস্তার করিয়াছিলেন। দুনিয়ার কোন প্রাচীন জাতি শাসন নৈপুণ্যে রাজ্যের বিস্তৃতি-সাধনে, শিক্ষা ও সভ্যতাবিস্তারে মোছলমানের সমকক্ষতা লাভ বা তাহাদের নিকটবর্ত্তী হওয়া দূরের কথা, তুলনাক্ষেত্রে দাঁড়াতেই পারে নাই। বর্ত্তমান ইউরোপের ইংরাজ, ফরাসী, ইটালী, জর্ম্মনী প্রভৃতি প্রবল জাতিকে সমবেত ভাবে গণনা ও তুলনা করিলেও তাঁহারা পূর্ব্ববর্ত্তী মোছলমানগণের তুলনায় রাজ্য বিস্তারক্ষেত্রে বহু পশ্চাৎপদ।

তৎপর শিক্ষা ও সভ্যতা বিস্তারের কথা। সেদিকেও মুছলমানগণ আধুনিক ইউরোপের শিক্ষাগুরু। ভারতবর্ষের হাতে খড়ি ত তাহাদের হাতে হইয়াছে বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

আল্লাহতায়ালার রাজ্যদানের অঙ্গীকার সূচক বর্ণিত আয়াৎ কোন্ সময়ে কেন নাজেল হইল "তফসীর খাজেনে". (৫ম খণ্ড ৭০।৭১ পৃঃ) তাহার নিম্নলিখিত রূপ হেতু প্রদর্শিত হইয়াছে, যথা—"বর্ণিত হইয়াছে 'ওহী' নাজেল হওয়ার পর হজরৎ নবী করীম মক্কায় দশবৎসর কাল স্বীয় সহচরগণসহ বাস করিয়াছিলেন এবং তদবস্থায় কাফেরগণের অত্যাচার উৎপীড়ন সহ্য করিয়া থাকিতে উপদিষ্ট হইয়াছিলেন। তাই তাঁহারা সর্ব্বদা ভয়ে ভয়ে চলিতেন, ভয়ে ভয়ে ইতস্ততঃ দৃষ্টি সঞ্চালন করিতেন। এইরূপ অশান্তি ও আশঙ্কার ভিতর দিয়া তাঁহাদের দিন কাটিত। অতঃপর তাঁহারা হেজরৎ এবং শত্রুদের সহিত জেহাদ করার জন্য প্রস্তুত থাকিতে আদেশ প্রাপ্ত হন। তাই তাঁহারা শত্রুর ভয়ে এক মুহূর্ত্তের জন্যও অস্ত্রত্যাগ করিবার সুযোগ পাইতেন না। এরূপ অবস্থায় তাঁহাদের মধ্যে একজন একদা বলিয়া উঠিলেন—হায়, আমাদের কি এমন দিন আসিবে না, যখন আমরা শান্তিতে বাস করিতে ও শান্তি-সুখ ভোগ করিতে পারিব এবং অষ্ট প্রহর অস্ত্রধারণের যন্ত্রণা হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে সক্ষম হইব? এই উক্তির প্রত্যুত্তর স্বরূপ অন্তর্য্যামী খোদাতায়ালা উপরের বর্ণিত আয়ত নাজেল করিয়াছিলেন। অর্থাৎ সেই বিপন্ন মোছলমানদিগকে অভয় প্রদান করিয়াছিলেন—শীঘ্রই তোমাদের দুঃখের অবসান হইবে, তোমরা রাজ্য-শাসনের ক্ষমতা পাইবে, তোমাদের জাতি গঠিত ও ধর্ম্ম-প্রতিষ্ঠিত হইবে, তোমাদের ভয়-ভীতি কাটিয়া যাইবে, তোমরা শান্তির সহিত জীবনযাপন করিতে পারিবে। পরবর্ত্তী সময়ে এই ভবিষ্যৎ-বাণী বাস্তবে পরিণত হইয়াছিল।

মূল আয়তে মোছলমানদিগকে খলিফা করা হইবে এই কথাই আছে। খলিফা করা কথাটীকে আমরা রাজত্ব দান বা রাজ্যাধিপতি করা অর্থে গ্রহণ করি নাই। এই মতের পোষকতায় কিঞ্চিৎ প্রমাণ প্রয়োগ করা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

قوله ليستخلفنهم الخ معناه الله ليورثهم ارض الكفار من العرب والعجم فجعلهم ملوكها وسكانها — قوله كما استخلف الذين الخ كما استخلف داؤد وسليمان لبنى اسرائيل قوله ارتضى لهم الخ قال ابن عباس يوسع لهم فى البلاد حتى يملكوها ويظهرو دينهم على سائر الاديان تفسير خازن وتفسير معالم التنزيل جلد ٥ صفحة ٧١

অর্থাৎ 'খলিফা' করার অর্থ আল্লাহতাআলা মোছলমানদিগকে ভূপৃষ্ঠের উত্তরাধিকারী করিবেন অর্থাৎ আরব ও আজমদেশের কাফেরগণের রাজ্য ও রাজত্ব আল্লাহ্‌তাআলা মোছলেম-হস্তে অর্পণ করিবেন। তাঁহারা ঐ সকল রাজ্যের বাদশাহ ও শাসক হইবেন। যেমন পূর্ব্ব-যুগে বিশ্বাসীদিগকে রাজ্যদান করা হইয়াছে। ইহার মর্ম্ম এই যে, পূর্ব্বে যেমন বনী-ইছরাইল বংশে হজরত দায়ুদ ও ছোলেমান পয়গম্বরকে বাদশাহ করা হইয়াছিল, সেইরূপ মোছলমানদিগকেও বাদশাহ করা হইবে। দিন এছলামকে মোছলমানের জন্য প্রীতিকর করা হইবে। এই উক্তির অর্থ এই যে, এব্‌নে আব্বাছ বলিয়াছেন, মোছলমানগণের জন্য এরূপ ভাবে রাজ্য বিস্তৃত করিয়া দেওয়া হইবে, যাহাতে তাঁহারা ঐসকল রাজ্যের মালিক হইতে পারেন এবং তাঁহাদের ধর্ম্মকে অপর সকল ধর্ম্মের উপর জয়যুক্ত ও প্রবল করিতে পারেন।

"তফসীর খাজেন" ও হসীয়াতে "তফছীর মাআলমৎ তানজীল" ৫ম খণ্ড ৭১ পৃঃ।

অতঃপর উক্ত উভয় তফছীরে একটী অতি দীর্ঘ হাদীছ বর্ণিত হইয়াছে, তাহাতে পারস্য-বিজয় ও মোছলমানগণের অসাধারণ ধনৈশ্বর্য্যের উল্লেখ আছে। উক্ত হাদীছ, হাদীছের প্রসিদ্ধ কেতাব "আবু দায়ুদ" ও 'এবনে মাজা' উভয় গ্রন্থেই আছে।

পাঠকগণ উল্লিখিত বিবরণ পাঠে বেশ বুঝিতে পারিয়াছেন যে, 'আল্লাহতাআলা' মোছলমানদিগকে দুনিয়াতে রাজ্যদান ও রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা প্রদানের যেরূপ অঙ্গীকার করিয়াছিলেন, সেইরূপ ভাবে পরবর্ত্তী যুগে তিনি কার্য্যে পরিণত করিয়া তাঁহার পবিত্র বাণীর মর্য্যাদা ও পবিত্রতা রক্ষা করিয়াছেন; তফছীরকারগণ অতি বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করিয়া ইহা বুঝাইয়া দিয়াছেন। অতএব ইহা হইতেই প্রমাণিত হইতেছে যে, এছলাম ও কোরআন মোছলমানের পার্থিব উন্নতির পরিপন্থী নহে। পার্থিব সম্পদ ও ঐহিক উন্নতি 'কোরআনে' ন্যামৎ বা স্বর্গীয় দান বলিয়া উল্লেখিত হইয়াছে। এরূপ অবস্থায় যাহারা মোছলমান ধর্ম্মকে রাজনীতিক আন্দোলন আলোচনা ও স্বরাজের দাবি দাওয়ার পথে প্রতিবন্ধক বলিয়া মনে করেন, তাঁহারা ভ্রান্ত ও এছলাম ধর্ম্ম সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ।

ويسئلونك عن ذى القرنين ط قل سأتلو عليكم منه ذكرا ط انا مكنا له فى الارض وآتيناه من كل شيئ سببا - سورة كهف ركوع ١١

অর্থাৎ (হে মোহাম্মদ (দঃ)) কাফেরগণ তোমার নিকট 'জুলকারনায়েন' বা আলেকজাণ্ডার দি গ্রেট সম্বন্ধে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছে, তুমি (তাহাদিগকে) বল যে শীঘ্রই আমি সে-সম্বন্ধে কিছু বিবৃতি করিব। আমি তাহাকে পৃথিবীতে (রাজত্বদানে) সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলাম এবং সর্ব্বপ্রকার সম্পদ দান করিয়াছিলাম। (সুরা কাহাফ, রুকু ১১)। এই আয়াৎ হইতে ইহাই প্রমাণিত হইতেছে যে, আল্লাহ তাআলা স্বীয় পয়গম্বরগণ মধ্যে 'জুলকারনায়েন'কে দুনিয়াতে ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি দান করিয়া শক্তিশালী করিয়াছিলেন এবং সর্ব্বপ্রকার পার্থিব সম্পদ তাঁহাকে দিয়াছিলেন। জুলকারনায়েন যে আল্লাহতাআলার বিশেষ দান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহার বর্ণনা করিয়া একদিকে খোদাতাআলা স্বীয় মহিমা প্রকাশ ও অন্যদিকে মানুষকে কৃতজ্ঞতা স্বীকারের বিষয় শিক্ষা দিয়াছেন। রাষ্ট্রীয় অধিকার প্রশংসনীয় ও খোদাতাআলার অভিপ্রেত না হইলে তিনি তাঁহার মহিমার স্বরূপ ইহার উল্লেখ করিতেন না।

الذين ان مكناهم فى الارض اقاموا الصلوة وآتوا الزكوة الخ (سورة حج ركوع ٦)

অর্থাৎ মোহাজের মোছলমান দিগকে যদি (রাজ্যদানে) পৃথিবীতে সুপ্রতিষ্ঠিত ও সম্পদশালী করিয়া দিই, তাহা হইলে তাহারা নামাজ পড়িবে ও জাকাৎ দিবে। (ছুরা হজ্জ রুকু ৬) এই আয়াৎ হইতে খোদাতাআলা প্রকারান্তরে ইহাই বুঝাইতেছেন যে, মদিনার যে সকল মোছলমান নিরুপায় অবস্থায় মক্কা হইতে হেজরৎ করিয়া আসিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে আমি যখন রাজ্যের অধিপতি করিয়া ক্ষমতা প্রতিপত্তি দিব। তখন তাঁহারা কৃতজ্ঞতার নিদর্শন স্বরূপ আল্লাহতাআলার এবাদৎ বন্দেগী করিতে বিরত হইবেন না। ইহাতেও দেখা যায়, আল্লাহতাআলা রাজ্য রাজত্ব ও ক্ষমতা প্রতিপত্তির বিশেষ প্রশংসা করিয়াছেন। সুতরাং তাহা নিন্দনীয় ও বর্জ্জনীয় হইতে পারে না।

'তফছীর খাজেন' ও 'মআলমৎ তন্‌জীল' ৫ম খণ্ড ১৬পৃঃ।

واذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم اذ انجكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون ابنائكم ويستحيون نسائكم وفى ذلكم بلاء من ربكم عظيم ط سورة ابراهيم ركوع ١

অর্থাৎ আর যখন মুছা স্বজাতীয়দিগকে বলিলেন— তোমরা আল্লার মহাদানের কথা স্মরণ কর, যে-অবস্থায় তিনি তোমাদিগকে ফেরাউন বংশের বন্ধন হইতে মুক্ত করিয়াছিলেন, তোমাদিগকে তাহারা কঠিন ও ঘৃণিত দণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছিল, তোমাদের পুত্রদিগকে তাহারা বধ করিতেছিল, তোমাদের স্ত্রীলোকদিগকে (সেবাকার্য্যের জন্য দাসীরূপে) জীবিত রাখিতেছিল এবং এই ঘটনার ভিতর তোমাদের জন্য এক বিরাট শিক্ষনীয় দৃষ্টান্ত রহিয়াছে। এসকল কথা তোমরা স্মরণ কর। (ছুরা এবরাহিম ১ম রুকু)

ولقد ارسلنا موسى بآيتنا ان اخـرج قومـك
من الظلمت الى النور وذكرهم بايم الله ط ان فى
ذلك لايت لكل صبار شكور ط

অর্থাৎ আর অবশ্যই আমি মুছাকে মো'জাজা সহ ( মিছরে ফেরউনের নিকট ) পাঠাইয়াছিলাম, এইজন্য যে তুমি তোমার স্বজাতীয় ( বনি ইছরাইল ) লোকদিগকে অন্ধকার হইতে আলোকে ( স্বাধীনতায় ) আনয়ন কর। এবং তাহাদিগকে আল্লাহ তাআলার মহাদানের কথা স্মরণ করাইয়া দাও। অবশ্য এ সকল ঘটনার ভিতর ধৈর্য্যশীল ও কৃতজ্ঞ ব্যক্তিবর্গের জন্য বহু পরীক্ষা ও শিক্ষার বিষয় আছে।

واذ قال موسى لقومه ياقـــوم اذكروا نعمة الله
عليكم اذ جعل فيكم انبياء وجعلكم ملوكا وآتكم مالم
يوت احدا من العالمين الخ سورة مائده ركوع ۴

অর্থাৎ আবার যখন মুছা তাহার স্বজাতীয়দিগকে বলিলেন, তোমরা আল্লার মহাদানের কথা স্মরণ কর, তিনি তোমাদের মধ্যে পয়গম্বর সৃষ্টি করিয়াছেন, এবং তোমাদের মধ্যে বাদশাহ পয়দা করিয়াছেন। আর তোমাদিগকে এমন সব জিনিষ দান করিয়াছেন, যাহা অপর কাহাকেও দেন নাই।

আমরা ৪।৫।৬ দফার আয়তের ভাবানুবাদ মাত্র দিয়াছি, তফসীর বর্ণনা করি নাই। কারণ, উল্লিখিত তিনটী আয়তই হজরৎ মুছা, বনী ইছরাল ও ফেরাউনের সহিত সংশ্লিষ্ট, তাই সব আয়তের তফসীর একই সঙ্গে বর্ণনা করাই সমীচীন বলিয়া মনে করিতেছি—৪র্থ দফার উল্লিখিত আয়তে আল্লাহতাআলা হজরত মুছার মধ্যস্থতায় ইছরাইল বংশীয়দিগকে একটী মহাদান ও চরম সম্পদের কথা স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন, সেই মহাদানটী হইল তাহাদিগকে প্রবল পরাক্রান্ত মিছর সম্রাট ফেরাউনের অধীনতা পাশ হইতে মুক্তিদান। ফেরাউন 'বনি ইছরাইল' গণের উপর নানা প্রকার অত্যাচার উৎপীড়ন করিতেছিল। পুরুষদিগকে যথেচ্ছা হত্যা করিয়া ফেলিত, স্ত্রীলোকদিগকে দাসীবৃত্তির জন্য বাঁচাইয়া রাখিত। আল্লাহতাআলা বনি ইছরাইলদিগকে ফেরাউনের অধীনতা পাশ হইতে মুক্তি দিয়া যে স্বাধীনতার আলোকে আনয়ন করিয়াছেন, এই মহাদানের কথা তাহাদের স্মরণ করা ও তজ্জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা কর্ত্তব্য। ৫ম দফার আয়তেও ঐ কথাই অন্যভাবে বলা হইয়াছে, এখানে আল্লাহতাআলা মুছা (আ:) কে আদেশ করিতেছেন, তুমি তোমার স্বজাতীয়দিগকে অন্ধকার হইতে আলোকে লইয়া আইস। অন্ধকার অর্থে তফছীরকারগণ কোফর ও পাপানুষ্ঠান এবং 'নূর' বা আলোক অর্থে ধর্ম্মালোক উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু এখানে এই সকল অর্থ ভালরূপে খাপ খায় না। কারণ, পরবর্ত্তী আয়তে আল্লাহতাআলা বলিয়াছেন যে, মুছা তুমি তাহাদের নিকট আমার মহাদানের কথা উল্লেখ কর, তাহাদের স্মৃতিপথে তাহা জাগাইয়া দাও। এখানে 'ন্যামৎ' বা মহাদান অর্থে পুণ্য অথবা ধর্ম্ম বুঝিবার যুক্তিযুক্ত কারণ পাওয়া যায় না। যেহেতু তাহাদিগকে অতীত কাহিনী স্মরণ করাইয়া দেওয়ার জন্য বলা হইতেছে, অতীত কালে বনি ইছরাইলগণ শামদেশে এবং তৎপর হজরত ইউছফের সময়ে ও তৎপরে তাহারা স্বাধীনতা-সুখ উপভোগ করিতেছিল, রাজত্ব তাহাদের আয়ত্বাধীন ছিল। এই যে স্বাধীনতা ও রাজ-সম্পদ তাহাকেই আল্লাহ 'ন্যামৎ' বা মহাদান বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। রাজ্য, রাজত্ব, ধনদৌলত স্বাধীনতা ও পার্থিব ক্ষমতা-প্রতিপত্তি এ সকল যদি খোদাতাআলার অনুমোদিত না হইবে, তাহা হইলে পুনঃ পুনঃ সে সকল মহাদানের কথা উল্লেখ করিয়া সর্ব্বদা তাহার স্মৃতি জাগ্রত করিয়া রাখিবার জন্য তাকিদ করা হইবে কেন ?

৬ষ্ঠ আয়াত ও তাহার সংশ্লিষ্ট পরবর্ত্তী ঘটনা আমাদের আলোচ্য বিষয়টাকে এরূপ পরিস্কার ও সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করিয়া দিয়াছে যে, তাহা পাঠ করিলে আর কাহারও মনে সন্দেহের লেশ মাত্র থাকিতে পারে না। এছলামে রাষ্ট্রীয় অধিকার লাভ করার ন্যায় উচ্চ আদর্শ আর কিছুই নাই। স্বাধীনতা আল্লাহতায়ালার অপূর্ব্ব নেয়ামৎ, অধীনতা একটা মহা অভিসম্পাত ও পাপ।

৬ষ্ঠ দফার আয়তের মর্ম্ম বুঝিবার জন্য কোরআনে উল্লিখিত বনি ইছরাইলগণের ঐতিহাসিক ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ বর্ণনা করা একান্ত আবশ্যক। মিছর অতি প্রাচীন দেশ, মিছরীয়দের সভ্যতা বহু কালের। পৃথিবীর প্রাচীন জাতি সমূহের মধ্যে তাহারা দ্বিতীয় শ্রেণীতে স্থান পাইবার যোগ্য। মিছরবাসীগণ বহু সহস্র বৎসর হইতে বংশানুক্রমে

রাজত্ব করিয়া আসিতেছিলেন। মিছরের বাদশাহগণের উপাধি হইতেছে ফেরাউন। হজরৎ এয়াকুবের (জ্যাকব বা ইছরাইল) পুত্র ইউছুফ (আঃ (তাঁহার বৈমাত্রেয় ভ্রাতাগণের ষড়যন্ত্রে কূপে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিলেন, কূপ হইতে তিনি উত্তোলিত হইয়া মিছরের বাজারে বিক্রীত হইয়াছিলেন। পরে তিনি মিছরের অধিপতি হয়েন। সেই সময় বনি ইছরাইলগণ যাইয়া সেখানে উপনিবেশ স্থাপন করেন। ক্রমশঃ সেখানে তাঁহাদের বংশ বৃদ্ধি হয় ও তাঁহারা মিছরের রাজকার্য্যে অধিকার প্রাপ্ত হন। পরে হজরৎ ইউছুফের অভাবে বনি ইছরাইলের অধোগতি আরম্ভ ও রাজ্যের শাসনাধিকার পুনরায় সেই পুরাতন রাজপরিবার ফেরাউন বংশের হস্তগত হয়। তখন হইতে বনি ইছরাইলগণের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হইয়া পড়ে। এখন হইতে তিন হাজার বৎসর পূর্ব্বে মিছরে ফেরাউন বংশীয় একজন মহাপ্রতাপশালী রাজা রাজ-সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি একবার একটী দুঃস্বপ্ন দেখেন। জ্যোতির্ব্বিদগণ ঐ সম্বন্ধে গণনা করিয়া বলেন—বনি ইছরাইলদের মধ্যে একটী সন্তান জন্মগ্রহণ করিবে, তাহার দ্বারা মিছরের ফেরাউন বংশের পতন হইবে। রাজার জীবননাশেরও আশঙ্কা আছে। এজন্য তৎসাময়িক ফেরাউন, রাজ-আদেশ জারী করে—বনি ইছরাইলের কোন স্ত্রীর পুত্র সন্তান হইলে তাহাকে মারিয়া ফেলিতে এবং কন্যাদিগকে জীবিত রাখিতে হইবে, তাহারা রাজবংশের সেবাদাসীরূপে দিন কাটাইবে। হজরৎ মুছা রাজ-পরিবারভুক্ত এক এছরাইলবংশীয় মাতার গর্ভজাত সন্তান। তিনি ভূমিষ্ঠ হইলে তাঁহার মাতা তাঁহাকে রাজাজ্ঞার ভয়ে নীল নদে ভেলায় ভাসাইয়া দেন। ঘটনাচক্রে রাজবাড়ীর সংলগ্ন ঘাটেই ভেলাটী আসিয়া লাগে। রাজমহিষী শিশুর সৌন্দর্য্য ও মনোহর চেহারা দেখিয়া তাহাকে পালকপুত্র রূপে গ্রহণ করেন। রাজসংসারের একটী ধাত্রীর দুগ্ধ ব্যতীত শিশু আর কাহারও দুগ্ধ খাইত না, বলাবাহুল্য সেই ধাত্রীই তাঁহার গর্ভধারিণী মাতা। শিশু মুছা ফেরাউন রাজপরিবারে লালিত পালিত হইয়া উত্তরকালে পয়গম্বররূপে বিধর্ম্মী সম্রাট ফেরাউন ও তাঁহার স্বজাতীয়দিগকে এছলামের দিকে আহ্বান করেন। কিন্তু সম্রাট এছলাম গ্রহণ করার পরিবর্ত্তে বনী ইছরাইলগণের প্রতি ভীষণ অত্যাচার করিতে আরম্ভ করেন। হজরৎ মুছা অনেক মো'জাজা দেখাইলেন, কিন্তু ফেরাউন কিছুতেই সৎপথে আসিল না, তাহার অত্যাচারের মাত্রা দিন দিন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে লাগিল। তখন ইছরাইলীয়দের গোলামীর বন্ধন মোচন করিবার ও তাহাদিগকে অত্যাচার হইতে রক্ষা করিবার উপায়ান্তর না দেখিয়া মুছা আল্লাহ তাআলার আদেশ অনুসারে তাঁহার স্বজাতীয়দিগকে সঙ্গে লইয়া একদা শেষ রাত্রিতে পলায়ন করেন এবং লোহিত সাগর পার হইয়া আরবের সিনাই প্রদেশে গিয়া উপনীত হন। ফেরাউন এই সংবাদ পাইয়া সসৈন্যে তাঁহাদের অনুসরণ করিয়া লোহিত সাগর পার হইবার সময় বন্যার স্রোতে ডুবিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়, অতঃপর মুছা (আঃ) তাঁহার স্বজাতীয় বনী ইছরাইলদিগকে লইয়া তাহাদের আদি বাসস্থান ও পূর্ব্বপুরুষগণের রাজ্য শামদেশে প্রবেশ করিবার জন্য সকলকে উৎসাহিত করিলেন। তখন মিছর-রাজের অধীনতা-পাশ ছিন্ন করা হইয়াছিল সত্য, কিন্তু স্বাধীনতা ও রাষ্ট্রীয় অধিকার লাভ করার গুরু কর্ত্তব্য অসমাপ্ত ছিল। তাই তিনি তাহাদিগকে শামদেশ আক্রমণ ও পিতৃরাজ্য পুনরুদ্ধার জন্য জেহাদে প্রবৃত্ত হইতে উৎসাহিত করিতে আরম্ভ করেন। কিন্তু বনী ইছরাইলগণ দীর্ঘকাল পরাধীনতার নিগড়ে আবদ্ধ হইয়া থাকায় তাহাদের উৎসাহ, উদ্যম, উচ্চ আশা-আকাঙ্ক্ষা, স্বাধীনতা-স্পৃহা, সাহস, বীর্য্য, রণনীতি ও যুদ্ধানুরাগ প্রভৃতি সৎপ্রবৃত্তি সম্পূর্ণরূপে লুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। তাই তাহারা হজরৎ মুছার উৎসাহোদ্দীপক বাক্যেও চেতনা লাভ করিল না, তাহারা জড় পদার্থে পরিণত হইয়াছিল, তাই তাহারা অগ্রগমনে একান্তই অনিচ্ছুক হইল। এই অবস্থায় কোরআনে তাহাদের সম্বন্ধে যাহা উক্ত হইয়াছে, ৬ষ্ঠ দফার আয়তেই তাহা দেখিতে পাওয়া যায়। এখন আমরা ৬ষ্ঠ দফার আয়তের যে অনুবাদ দিয়াছি, তাহার পরবর্ত্তী অংশে এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে—ছুরা মায়দা ৪র্থ রুকু ২য় আয়াৎ, হজরৎ মুছা মিছর হইতে মুক্তি প্রাপ্ত হইয়া আরবভূমে ভ্রমণশীল বনি ইছরাইলদিগকে শামের পথে বলিতেছেন—হে আমার স্বজাতীয় ভ্রাতৃগণ, তোমরা শামের পবিত্র ভূমিতে প্রবেশ কর, যাহা খোদায় তাআলা তোমাদের ভোগের জন্য নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন। সাবধান, তোমরা তোমাদের শত্রুদিগকে ভয় করিয়া পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিও না। যদি ঐরূপ কাপুরুষতার পরিচয় দাও, তাহা হইলে তোমরা

বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। কিন্তু তাহারা বলিল, হে মুছা শামদেশে এখন প্রবল প্রতাপশালী 'আমলকা' সম্প্রদায়ের বীরজাতিগণ বাস করিতেছে। তাহারা দেশান্তরে গমন করার পর আমরা তথায় প্রবেশ করিব। ইহাদের মধ্যে দুইজন মাত্র ধর্ম্মভীরু, আল্লার অনুগ্রহভাজন লোক ছিল,। তাহারা স্বজাতীয়দিগকে বলিল—তোমরা 'বয়তুল মোকাদ্দাসের' দ্বার দেশে প্রবেশ কর, 'আমলকা' বংশের দীর্ঘকায় হৃষ্টপুষ্ট, বলিষ্ঠ লোকদিগকে দেখিয়া ভয় পাইবার কোন কারণ নাই, তাহারা বাহ্যতঃ সবল দৃষ্ট হইলেও মানসিক হিসাবে মহা দুর্ব্বল। অতএব তোমরা শামদেশে প্রবেশ কর, তোমাদের জয় অবশ্যম্ভাবী। তোমরা আল্লার উপর নির্ভর কর। বনি ইছরাইলগণ বলিল হে মুছা, আমরা কখনও শামের এলাকায় প্রবেশ করিব না। আপনি ও আপনার খোদা সেখানে প্রবেশ করুন ও তাহাদের সহিত জেহাদে প্রবৃত্ত হউন। আমরা এখানেই বসিয়া থাকিব। হজরৎ মুছা বলিলেন হে খোদা, আমি নিজের ও আমার ভ্রাতার মালিক, তদ্ভিন্ন আর কাহারও উপর আমার কোনও কর্ত্তৃত্ব বা অধিকার নাই। অতএব আমার ও আমার স্বজাতীয়দের মধ্যে বিচ্ছেদ সাধন কর। আল্লা বলিলেন "( স্বাধীনতা সংগ্রামে বিমুখতা নিবন্ধন গজব স্বরূপ ) ৪০ বৎসর পর্য্যন্ত সেই রাজ্য, রাজত্ব ও স্বাধীনতা-সুখ-ভোগ হইতে আমি তাহাদিগকে বঞ্চিত করিলাম। তাহারা আরবের 'ছিনাই' প্রদেশস্থ মরু-প্রান্তরে ও জঙ্গলের মধ্যে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত অবস্থায় ঘুরিয়া বেড়াইতে থাকিবে।"

পাঠক কোরআন শরীফের অনুবাদ ও উপরের লিখিত বর্ণনা হইতে বেশ বুঝিতে পারিলেন—ইছলাম রাষ্ট্রীয় অধিকার ও স্বাধীনতা অর্জ্জন ও পরাধীনতার শৃঙ্খল ছিন্ন করার জন্য কিরূপ উৎসাহ ও বজ্রকঠোর আদেশ প্রদান করিয়াছে।

---

# অঞ্জলি

[ মোসাম্মাৎ রাজিয়া খাতুন চৌধুরাণী ]

চলিতে চলিতে যা-কিছু পেয়েছি সকলি নিয়েছি তুলি'
জানিনা ত প্রভু কোন্‌টি রতন, কোন্‌টি পথের ধূলি।
কোথাও চোখের নেশা
মোহ মুগ্ধতা-মেশা,
কোথাও পেয়েছি লাঞ্ছনা শুধু, কোথাও পেয়েছি আশা
কেহ বা দিয়েছে হৃদি নিঙাড়িয়া অফুরান ভালবাসা।

কারও ভালবাসা দু'দিনে টুটেছে কারো মোহ, কারো ছল,
কাহারও হিয়ায় বিকশি' উঠেছে সুন্দর শতদল।
তোমার অরূপ কান্তি
পরাণে দিয়েছে শান্তি
তোমার প্রেমের পুলক-পরশ হৃদয়ে ফুটা'ল ফুল
আজ মনে হয় যা কিছু পেয়েছি তুমিই সবার মূল।

* * * *

তোমারি এ দান তোমারেই পুন অঞ্জলি দিই ভরি'
যদি কলঙ্ক থাকে কিছু তায় নিও পবিত্র করি।

# রাণী ভিখারিনী

[ মিসিস্ আর এস্ হোসেন ]

আমেরিকাবাসিনী মিস মেয়ো "ভারত মাতা" নামক পুস্তকে হিন্দু নারীদের দুঃখ-দৈন্য সম্বন্ধে অতি চমৎকার চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। এই নির্ম্মম সত্য কথা বলার জন্য হিন্দুগণ মিস্ মেয়োকে যত ইচ্ছা গালাগালি করুন, কিন্তু গালির চোটে কাকের কালো রঙ বকের মত শাদা হইবে না, পরিত্যক্ত জারজ শিশু পুনর্জ্জীবন লাভ করিবে না, দ্বাদশ বর্ষীয় প্রসূতিদের বিবিধ রোগ নিরাময় হইবে না; হাঁসপাতালে রোগিনীদের সংখ্যাও হ্রাস হইবে না। এ দেশীয় কর্ত্তারা বলেন, "ভারতমাতা" পুস্তকে ভারতের কেবল নিকৃষ্ট অংশ দেখানো হইয়াছে, উৎকৃষ্ট অংশের উল্লেখ করা হয় নাই; কিন্তু কথা এই যে, যাহা ভাল, তাহা ত ভালই; তাহার পরিবর্ত্তনের প্রয়োজন নাই। যাহা মন্দ তাহাই সংশোধন করা আবশ্যক।

ডাক্তারের দ্বারা স্বাস্থ্য পরীক্ষা করাইলে, তিনি রোগীর রোগ সমূহেরই উল্লেখ করেন এবং রোগ দূর করিবারই ব্যবস্থা দেন। আপনার চক্ষু পরীক্ষা করিয়া চশমার ব্যবস্থা দিবার সময় ডাক্তার আপনার পরিপাক শক্তির প্রশংসা পত্র লিখিতে বসেন না। তারপর ভারতবর্ষের উৎকৃষ্ট অংশের প্রশংসাগীতি গাহিবার জন্য ভারতের গড়পড়তা ১৬ কোটী পুরুষত আছেই। সে-জয়ঢাকে কাটি ঠুকিবার জন্য মিস মেয়োর দরকার কি? মিস মেয়োর প্রয়োজন, সেই কথা কহিতে—যাহা এ যাবৎ আর কেহ বলে নাই,—যাহা এ যাবৎ আর কেহ বলিতে সাহস পায় নাই। সেই কথা আমিও আজ কুড়ি বৎসর হইতে বলিয়া আসিতেছি, কিন্তু আমার ক্ষীণ কণ্ঠস্বর কাহারও শ্রবণ-বিবরে প্রবেশ করে নাই—আজ মিস্ মেয়োর গর্জ্জনে সকলের টনক নড়িয়াছে!

"ভারত মাতা"-লেখিকার সহিত ভারত-পিতাগণ "চুলোচুলি" করিতেছেন, এই সুযোগে মুসলিম সমাজ! আপনারা ঐ দর্পণে নিজের মুখ দেখিয়া লউন। দেখুন ত আপনারা নিজ সমাজের রাণীকে কিরূপ ভিখারিণী সাজাইয়াছেন। এই বিশাল জগতে কোন দেশ, কোন জাতি, কোন ধর্ম্ম নারীকে কিছু মাত্র অধিকার দান করা দূরে থাকুক, নারীর আত্মাকেও স্বীকার করে নাই। একমাত্র ইসলাম ধর্ম্মই নারীকে তাহার প্রাপ্য অধিকার দান করিয়াছে; কিন্তু ভারতবর্ষে সেই মুসলিম-নারীর দুর্দ্দশার এক শেষ হইয়াছে!

কোন জাতি কন্যাকে সম্পত্তির ভাগ দেয় নাই, ইসলাম কন্যাকে পৈত্রিক সম্পত্তিতে ভ্রাতার অর্দ্ধেক অংশভাগিনী করিয়াছে। অন্যান্য জাতির স্ত্রীর সম্পত্তি রাখিবার অধিকার নাই। স্ত্রী যদি কিছু টাকা কড়ি পিত্রালয় হইতে আনে, তাহা স্বামীর কবলে পড়ে—স্ত্রী ভোগ করিতে পায় না। মুসলিম-স্ত্রী নিজের সম্পত্তি স্বচ্ছন্দে ভোগ করিবার অধিকারিণী। কেবল তাহাই নহে, সে বিবাহের সময় স্বামীর অবস্থা অনুসারে 'দেন মোহর' বাবৎ নগদ টাকা বা বিষয়ের অধিকারিণী। স্বামীর মৃত্যুর পর তাহার পুত্র কন্যা প্রভৃতি অন্যান্য উত্তরাধিকারিদের অংশ-বিভাগের পূর্ব্বে স্ত্রীর 'মোহর' (স্ত্রীধন) এবং তাহার প্রাপ্য অষ্টমাংশ আদায় করিবার ব্যবস্থা আছে। অতঃপর সম্পত্তির যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহাই অপর সকলে পায়।

হিন্দুস্ত্রীকে মৃত স্বামীর সহিত পোড়াইয়া মারিবার ব্যবস্থা আছে। বিধবাগণ এখন সহমৃতা না হইলেও জীবন্মৃতা হইয়া থাকে। তাহাদের গাড়ী-বোঝাই শাস্ত্রের ব্যবস্থা এই যে "বিধবা শুধু দ্বিতীয়বার বিবাহ হইতে বিরত থাকিলেই চলিবে না। নারীর উচিত যে, স্বামীর মৃত্যুর পর সর্ব্বপ্রকার সুখাদ্য ত্যাগ করিয়া মাত্র ফল মূল খাইয়া কোনরূপে বাঁচিয়া থাকে।" কিন্তু ইসলাম নারীকে পুনর্ব্বিবাহের অনুমতি দিয়াছে বিধবার প্রতি কোন

অত্যাচার নাই ; তাহার বসন, ভূষণ, আহার সম্বন্ধে কোন বাঁধা নিয়ম নাই।

হিন্দুগণ শাস্ত্রানুসারে স্ত্রীলোকের প্রতি গৃহপালিত পশু কিম্বা দাসীর ন্যায় ব্যবহার করিতে বাধ্য। অষ্টম বর্ষে কন্যার বিবাহ দিলে তাঁহারা গৌরীদানের ফল প্রাপ্ত হন। ইসলাম ধর্ম্মে স্ত্রীলোককে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দান করা গিয়াছে। "মাতার পদতলে স্বর্গ" বলা হইয়াছে। স্বেচ্ছাকৃত সম্মতি ব্যতীত কোন নারীর বিবাহ হইতে পারে না, ইহাতে পরোক্ষভাবে বাল্যবিবাহ রহিত করা হইয়াছে।

হিন্দু শাস্ত্র বলে, "স্ত্রীলোক লেখাপড়া শিখিলে বিধবা হয়।" আর আমাদের রসুলোল্লাহ্ বলিয়াছেন, "তালাবল ইল্‌মে ফরীজাতুন, আলা কুল্লে মুস্‌লেমীন ও মুস্‌লেমাতিন" ( অর্থাৎ সমভাবে শিক্ষালাভ করা সমস্ত মুসলেম-নর ও নারীর অবশ্য কর্ত্তব্য )।

কিন্তু কার্য্যতঃ আমরা কি দেখিতে পাই ? হিন্দুগণ কন্যাকে অংশ দিবার জন্য আইন প্রণয়ন করিয়াছেন। তাঁহারা 'উইল' করিবার ক্ষমতা লাভ করিয়াছেন। উইল দ্বারা স্ত্রী কিম্বা কন্যাকে যথাসর্ব্বস্ব দান করিতে পারেন। আর মুছলমানেরা কন্যার দ্বারা সম্পত্তিতে লা-দাবী লিখাইয়া লইয়া কন্যাকে বিষয়ের অংশ হইতে বঞ্চিত করেন। নানাবিধ জঘন্য উপায়ে নারীকে পিতা ও স্বামীর সম্পত্তিতে বঞ্চিত করা হয়।

হিন্দুগণ প্রাণপণে বিধবা-বিবাহ প্রচলনের চেষ্টা করিতেছেন। আর আমাদের তথাকথিত আশরাফগণ সপ্তম বর্ষীয়া বিধবা কন্যাকে চির-বিধবা রাখিয়া গৌরব বোধ করেন।

হিন্দুগণ বাল্য-বিবাহ রহিত করিবার জন্য আইন প্রণয়ন করিতেছেন। কন্যার বিবাহের বয়স ১৬ বৎসর বলিয়া ধার্য্য করিবার চেষ্টা করিতেছেন ( যদিও সে জন্য পণ্ডিতগণ উচ্চৈঃস্বরে তাঁহাদিগকে "অ-হিন্দু" বলিতেছেন )। আর আমাদের সমাজে দেখিতে পাই, টেলিগ্রাফযোগে কোন দূরদেশে অবস্থিত বরের সহিত অপ্রাপ্তবয়স্কা,—৯ বৎসরের বালিকার বিবাহ হইতেছে। অনেক সময় প্রাপ্তবয়স্কা কন্যা, ৬০ বৎসরের বৃদ্ধের সহিত অথবা দুশ্চরিত্র পানাসক্ত পাত্রের সহিত বিবাহের সম্বন্ধ হইয়াছে বলিয়া, বুক-ভাঙ্গা রোদনে বক্ষ ভিজাইতে থাকে—সেই হৃদয়বিদারী অশ্রু-প্রবাহের মধ্যেই বিবাহ-ক্রিয়া সমাপ্ত হয়। পাত্রী কিছুতে "হুঁ" বলিবে না,—কিন্তু অভিভাবক ও না-ছোড়-বান্দা—তাঁহারা বলপূর্ব্বক "হুঁ" বলাইয়া বিবাহের শ্রাদ্ধ করেন।

এখন হিন্দুগণ অতি উদারভাবে স্ত্রীলোকদিগকে স্বাধীনতা দান করিতেছেন। পুত্র ও কন্যাকে সমভাবে শিক্ষাদান করিতেছেন। এখন হিন্দু বালিকা চতুষ্পাঠী, পাঠশালা, স্কুল, হাই স্কুল ইত্যাদি অতিক্রম করিয়া বিশ্ববিদ্যালয় জয় করিয়াছে। আর আমাদের সমাজ আমাদিগকে শিক্ষার আলো কিছুতেই দেখিতে দিবেন না।

৬০।৭০ বৎসর পূর্ব্বে পুরুষের পক্ষেও ইংরাজী শিক্ষা নিষিদ্ধ ছিল। ইংরাজী পড়িলেই লোকে কাফের হইত। এখন কর্ত্তারা তাহার ফল ভোগ করিতেছেন। স্বাস্থ্য, অর্থ, শক্তি, সামর্থ্য, শিক্ষা প্রভৃতি সকল বিভাগের দ্বারই মুসলমানের জন্য "অযোগ্যতা"র অজুহাতে রুদ্ধ হইয়া আছে। কলিকাতা করপোরেশনে শতকরা ৫০টী চাকুরী লাভের জন্য চেঁচামেচি করিয়া মুসলমানগণ ভারতের নিকৃষ্ট শ্রেণীর (Depressed Class এর ) তালিকাভুক্ত হইয়াছেন। আমি বলি, তাঁহারা নিশ্চয়ই "অযোগ্য।" মুসলমানেরা স্বীকার করুন বা না করুন,—তাঁহারা যে অযোগ্য, ইহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। কারণ, সুশিক্ষিতা সুযোগ্যা মাতার গর্ভজাত সন্তান অপেক্ষা মুসলমানের ন্যায় অশিক্ষিতা অযোগ্যা মাতার গর্ভজাত সন্তান যে নিকৃষ্ট হইবে, ইহা ত অতি স্বাভাবিক। "অযোগ্য" বলার জন্য রাগ না করিয়া "যোগ্য" হবার চেষ্টা করাই শ্রেয়ঃ।

( আগামী বারে সমাপ্য )

# মহাকবি সা'দী

( কাজী নওয়াজ খোদা )

( পূর্ব্বানুবৃত্তি )

কবি বহু কষ্ট স্বীকার করিয়া পদব্রজে চতুর্দ্দশবার হজ্জব্রত সম্পন্ন করিয়াছিলেন। একবার তিনি হজ্জ করিবার উদ্দেশ্যে পদব্রজে যাত্রা করিয়া ২৪০০ চব্বিশ শত বর্গ মাইল বিস্তৃত "ফিদ" নামক একটী প্রান্তরে উপনীত হন। সেই জনমানবহীন, বারিশূন্য মরুপ্রান্তরে তাঁহার কষ্টের সীমা ছিল না, পথকষ্টে ও পীপাসায় প্রাণ ওষ্ঠাগত হইয়াছিল, তিনি জীবনের আশা ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। ঘটনাক্রমে সেই সময় একজন উষ্ট্রচালক উষ্ট্রসহ সেখানে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে এই ভীষণ বিপদ হইতে উদ্ধার করিয়াছিল।

হজ্জে

ভূতপূর্ব্ব পারস্যাধিপতি করিম খাঁ জন্দ, শীরাজ নগরীর বাহিরে একটী স্থান প্রাচীর বেষ্টিত করিয়া তন্মধ্যে সাতজন অজ্ঞাত নামা 'দরবেশে'র সমাধি মন্দির নির্ম্মাণ করেন। বহির্গমনের পথে দ্বারের দুইপার্শ্বে মহাকবি সাদী ও কবিবর হাফেজের দুইটী প্রস্তর মূর্ত্তি স্থাপন করিয়াছিলেন। সাদীর মূর্ত্তি দেখিয়াই তাঁহাকে একজন পরিব্রাজক বলিয়া মনে হয়, ক্লার্ক ( Clerk ) সাহেবের প্রকাশিত বোস্তাঁর ইংরাজী অনুবাদের প্রথমে, সাদীর যে আলোকচিত্রটী দেখিতে পাওয়া যায়, উল্লিখিত প্রস্তর মূর্ত্তি হইতেই তাহা গৃহীত হইয়াছে।

কবির আত্ম প্রকাশিত ভ্রমণ বৃত্তান্ত পাঠে জানিতে পারা যায়—তিনি অধিকাংশ সময় নিতান্ত নিঃসম্বল অবস্থায় ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেন, এজন্য বহুবার তাঁহাকে অসংখ্য বিপদ ও নানা দুঃখ কষ্টের সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল।

একবার তিনি দামস্ক বাসীদের উপর বিরক্ত হইয়া সহর ছাড়িয়া 'ফিলিস্তীনের' এক জনমানবশূন্য অরণ্যে বাস করিতেছিলেন। এই সময় পূর্ব্ব ত্রিপলীর সংস্কার সাধনের জন্য খৃষ্টানগণ নানা দেশ হইতে নানা উপায়ে কুলী সংগ্রহ করিতেছিল। নিঃসহায় অবস্থায় পাইয়া কবিকেও তাহারা বন্দী করিয়া লইয়া গেল, এবং সেখানে তাঁহাকে মাটী কাটিবার কার্য্যে নিযুক্ত করিল। এই কার্য্যে তাঁহার কষ্টের সীমা ছিল না। সময় সময় তাহাদের অমানুষিক অত্যাচারে পীড়িত ও সাধ্যের অতিরিক্ত পরিশ্রমে কাতর হইয়া তিনি সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়িতেন। কিছুদিন পর, হলব নগরের অধিবাসী—কবির পূর্ব্ব পরিচিত একজন সম্ভ্রান্ত লোক, ঘটনা ক্রমে হঠাৎ সেখানে আসিয়া পঁহুছিলেন। তিনি কবির এই দুর্দ্দশা দেখিয়া যার পর নাই বিস্মিত ও মর্ম্মাহত হইলেন। অতঃপর রক্ষীগণকে দশটী আশরফী ঘুষ দিয়া তাঁহাকে এই বিপদ হইতে উদ্ধার করিলেন এবং সঙ্গে লইয়া বাড়ী ফিরিলেন। তাঁহার একটী অবিবাহিতা কন্যা ছিল, কন্যাদায়গ্রস্ত পিতা বহু সাধ্য সাধনায় কবিকে সম্মত করিয়া একশত আশরফী দেনমোহরে তাঁহাকে কন্যা সম্প্রদান করিলেন। কিন্তু কবি এই বিবাহে কিছুমাত্র দাম্পত্য-সুখ পান নাই। তিনি সময় সময় মুখরা স্ত্রীর বাক্‌যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া পড়িতেন। একদিন স্ত্রী তাঁহাকে তাহার পিতার ক্রীতদাস বলিয়া ভৎ'সনা করিয়াছিল। কবি তাহার কথায় হাসিয়া বলিলেন—হাঁ সত্য বটে, তোমার পিতা আমাকে ত্রিপলী হইতে দশটী মোহরে কিনিয়া আনিয়া তোমার নিকট একশত মোহর দামে বিক্রয় করিয়াছেন, সুতরাং তাঁহার পাওনা তিনি সুদসহ আদায় করিয়া লইয়াছেন।

কবি বলিয়াছেন—

شنیدم گوسپندی را بزرگی
رهانید از دهان ودست گرگی
شبش چون کارد بر حلقش بمالید
روان گوسپند ازوی بنالید
که از چنگال گرگم در ربودی
چو دیدم عاقبت خود گرگ بودی

অর্থাৎ "আমি শুনিয়াছি একজন ভদ্রলোক বাঘের মুখ হইতে একটী ছাগলকে রক্ষা করিয়াছিলেন, পরে রাত্রি হইলে তিনি নিজেই যখন তাহার গলায় ছুরি চালাইলেন তখন ছাগলের প্রাণ কান্দিয়া বলিল, তুমি আমাকে বাঘের কবল হইতে রক্ষা করিয়াছ কিন্তু দেখিতেছি—তুমি নিজেই বাঘ।" সুন্দরী, তোমার পিতাও আমার সহিত ঠিক এই ব্যবহারই করিয়াছেন।

জনসেবা

কবি জন-সেবা ( خدمت خلق ) কে সকল এবাদতের সেরা বলিয়া জানিতেন। তিনি জেরুজালেম ও সিরিয়া প্রদেশে বহুদিন ধরিয়া স্বেচ্ছায় তীর্থ যাত্রীদের পানি সরবরাহ করিয়াছেন। আজীবন দুস্থ পীড়িত ও বিপদগ্রস্থ লোকের যথাসাধ্য সেবা করিয়াছেন।

তিনি বলিয়াছেন—

طریقت بجز خدمت خلق نیست
بہ تسبیح و سجادہ ودلق نیست

অর্থাৎ লোক-সেবা ভিন্ন 'তাসাওওফ' আর কিছুই নয় তসবিহ, জায়নামাজ ও আলখেল্লার মধ্যে দরভেশী নাই। কবি আবার বলিয়াছেন—

برآوردن کار امید وار
به از قید بندی شکستن هزار

অর্থাৎ হাজার হাজার কয়েদীকে মুক্তি দেওয়া অপেক্ষা প্রার্থীর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করা ভাল।

সাদী জীবনে বহুবার বহু বিপদে পড়িয়াছেন, কিন্তু সুখে দুঃখে সম্পদে বিপদে সকল অবস্থায় সমান সন্তোষভাব পোষণ করিতেন। কোন অবস্থায় তিনি ধৈর্য্যহারা হইতেন না। হাজার বিপদে পড়িলেও কাহাকেও মুখ ফুটিয়া কিছু বলিতেন না। সন্তোষ তাঁহার জীবনের চির সহচর ছিল। কবি বলিয়াছেন—সম্পদ ও বিপদ দুই-ই খোদাতাআলার দান, সকল অবস্থায় কৃতজ্ঞতার সহিত তাঁহাকে ধন্যবাদ দিয়া যথা সাধ্য কর্ত্তব্য পালন করিয়া যাওয়াই জীবনের সার্থকতা।

একদিন কুফা নগরে জোহরের নামাজে যোগ দিবার জন্য কবি তাঁহার বাসা হইতে দূরবর্ত্তী একটী মসজিদের দিকে যাইতেছিলেন। অগ্নিকণার ন্যায় উত্তপ্ত বালুকারাশির উপর খালি পায়ে চলিয়া যাইতে তাঁহার যারপর নাই কষ্ট হইতেছিল। কবি বলিয়াছেন—সেই সময় আমার অভাবের কথা ভাবিয়া আমি মর্ম্মন্তুদ কষ্ট অনুভব করিতেছিলাম। কিন্তু মসজিদের নিকট আসিয়া একজন পীড়িত খঞ্জ ভিখারীর দিকে আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল। তাহাকে দেখিয়াই আমি সকল কষ্ট ও সকল অভাবের কথা ভুলিয়া গেলাম। আমার অটুট স্বাস্থ্য ও সুদৃঢ় পদদ্বয়ের জন্য সর্ব্বশক্তিমানকে অশেষ ধন্যবাদ দিলাম।

এক সময় আলেকজাণ্ড্রিয়া নগরে ভীষণ দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়। অন্নাভাবে অসংখ্য লোক মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছিল, এক মুষ্টি অন্নের জন্য যথাসর্ব্বস্ব এমনকি প্রাণপ্রতিম পুত্র কন্যাকে পর্য্যন্ত অনেকে বেচিয়া ফেলিতেছিল। এই সময় সাদী সেখানে ছিলেন, তাঁহার ন্যায় গরীব মোসাফেরদের অবস্থা আরও শোচনীয় হইয়াছিল। কবি অন্নাভাবে উপবাসের পর উপবাস করিয়া আধমরা হইয়া পড়িয়াছিলেন। এই অবস্থায় একজন নীচ প্রকৃতির ধনশালী লোক দানছত্র খুলিয়া অন্নদান করিতেছিল। কিন্তু এই সুযোগে অভাবগ্রস্ত মহৎ লোকদিগকে সাহায্য করার ছলে অপমানিত ও লজ্জিত করাই তাহার আসল উদ্দেশ্য ছিল। সা'দীর সহযাত্রীদের মধ্যে অনেকে তাহার নিকট যাইয়া সাহায্য প্রার্থনা করিতে বলিলেন, কিন্তু কবি কোন মতেই তাহাতে 'রাজী' হইলেন না। তিনি বলিলেন—কুকুরের ভুক্তাবশেষ খাইয়া বাঁচিয়া থাকা অপেক্ষা সিংহ শাবকের পক্ষে অনাহারে মৃত্যুই শ্রেয়।

স্বদেশ-প্রত্যাগমন

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে মহাত্মা সা'দের রাজত্বকালে অতি অল্প বয়সে জন্মভূমির মায়া পরিত্যাগ করিয়া বিদ্যা অর্জ্জন মানসে কবি বিদেশ যাত্রা করিয়াছিলেন। সা'দ হিজরী ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষভাগে রাজ্যলাভ করিয়াছিলেন, ৬২৩ হিজরীতে তিনি পরলোক গমন করেন। তাঁহার রাজত্বকালে শীরাজ নগরের অবস্থা অতীব শোচনীয় হইয়াছিল। কবি বিদেশ যাত্রার সময়ে আতাবাক্ উজবেক ও সোলতান গিয়াসুদ্দীনের ভীষণ আক্রমণ ও শিরাজ নগরীর শোচনীয় অধঃপতন স্বচক্ষে দেখিয়া গিয়াছিলেন। পারস্য-রাজ সা'দের মৃত্যুর পর তাঁহার সুযোগ্য পুত্র আবুবাকার পিতৃ-সিংহাসনে উপবেশন করেন। নবীন নরপতি তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও কর্ম্মকুশলতা গুণে অল্পদিনের মধ্যে রাজ্যের অন্তর্বিপ্লব ও বহিশত্রুর আক্রমণ ভয় দূর করিয়া

পূর্ণশান্তি স্থাপন করিলেন। দেশময় তাঁহার সুশাসনের সাড়া পড়িয়া গেল নানাদিক হইতে ভালগোকের দল রাজধানীতে আসিতে লাগিলেন। রাজ্যের চারিদিকে অসংখ্য মাদ্রাসা, মসজিদ ও খানকাহ্ নির্ম্মিত হইল। বহু অর্থব্যয়ে শিরাজ নগরে একটী বিরাট চিকিৎসাগার স্থাপিত হইল। ফলে পারস্যদেশের পূর্ব্ব সুখসমৃদ্ধি আবার ফিরিয়া আসিল।

৬২৩ হিজরী সনে নবীন পারস্য-রাজ আবুবাকারের অভিষেকক্রিয়া মহাধুমধামের সহিত সম্পন্ন হইল। তাঁহার রাজ্যলাভের পর ৬৫৮ হিজরী পর্য্যন্ত কবি দেশে ফিরিয়া আসেন নাই। যখন নবীন পারস্যরাজের যশকাহিনী দেশ বিদেশে ছড়াইয়া পড়িল, তাঁহার প্রজাপালন ও সুশাসনের কথা দূর দূরান্তরে সকলেই জানিতে পারিল, তখন সুদূর প্রবাসে জন্মভূমির জন্য কবির প্রাণ কান্দিয়া উঠিল। তিনি সিরিয়া হইতে এরাক হইয়া কিছুদিন ইস্পাহানে কাটাইয়া বহুকাল পরে আবার শিরাজ নগরে ফিরিয়া আসিলেন।

কবি তাঁহার স্বদেশ-প্রত্যাগমন-চিত্র সুনিপুণ তুলিকায় এইরূপ অঙ্কিত করিয়াছেন —

ندانی که من در اقلیم غربت
چرا روزگارے بکردم درنگی
برون رفتم از تنگ ترکان که دیدم
جهان برهم افتاده چون موی زنگی
همه آدمی زاده بودند لیکن
چو گرگان بخونخوارگی تیزچنگی

"তুমি জাননা, আমি এতদিন বিদেশে কেন কাটাইয়াছি। তুর্কীদের অত্যাচারে দেশটা কাফ্রীদের চুলের মত বিশৃঙ্খল হইয়া পড়িয়াছিল, মানুষ হইলেও তাহারা বাঘের মত পর-রক্ত পিপাসু ছিল, এই জন্যই আমি দেশ ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছিলাম।

چو باز آمدم کشور آسوده دیدم
پلنگان رها کرده خوئی پلنگی
چنان بود در عهد اول که دیدم
جهان پرآشوب و تشویش و تنگی
چنین شد در ایام سلطان عادل
اتابک ابوبکر بن سعد زنگی

অর্থাৎ "ফিরিয়া আসিয়া দেশে পূর্ণ শান্তি বিরাজিত দেখিলাম। ব্যাঘ্রের দল হিংসা প্রবৃত্তি ত্যাগ করিয়াছে, প্রথম অবস্থায় অরাজকতা, অশান্তি ও দুঃখ দারিদ্র্যে দেশের অবস্থা সেইরূপ দেখিয়াছি। আর এখন সুবিচারক সোলতান আতাবাক আবুবাকারের সময় এইরূপ পরিবর্ত্তন হইয়াছে।

চন্দ্রে কলঙ্ক ও মানব-চরিত্রে ত্রুটী চির প্রসিদ্ধ, তাই সকল গুণের আধার হইয়াও পারস্যরাজ আবুবাকারের একটী প্রধান দোষ ছিল, তিনি ধর্ম্মজগতের নেতা আলেমদিগকে রাজনীতি ক্ষেত্রে সন্দেহের চক্ষে দেখিতেন। এইরূপ অন্যায় সন্দেহ-বশে তিনি কয়েকজন দেশমান্য আলেমকে রাজধানী হইতে বাহির করিয়া দিয়াছিলেন। আলেম-শ্রেষ্ঠ মহাত্মা সাদরুদ্দীন মহমুদ, এমাম শেহাবুদ্দীন ও মৌলানা এজ্‌জুদ্দীন কায়সীর ন্যায় জগন্মান্য আলেমদিগকেও তাড়াইয়া দিতে তিনি কুণ্ঠিত হন নাই। সৈয়দ বংশের সুধী-শ্রেষ্ঠ আল্লামা কাজী এজ্‌জুদ্দীন আলাভী সে সময় সর্ব্বপ্রধান কাজী ছিলেন। রাজাজ্ঞায় সমস্ত ধন—সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিয়া দীনবেশে তাঁহাকে দেশ হইতে নির্ব্বাসিত করা হইয়াছিল। সুবিখ্যাত সাহিত্যিক মহাত্মা সয়ীদ আমিনুদ্দীন ভূতপূর্ব্ব পারস্য রাজ সা'দের প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। সা'দ তাঁহাকে ভালবাসিতেন ও শ্রদ্ধা করিতেন। তিনিও নবীন নরপতির অত্যাচার হইতে রক্ষা পাইলেন না। অন্যায় সন্দেহের ফলে আবুবাকার তাঁহাকে ও তাঁহার সুযোগ্য পুত্র তাজদ্দীনকে বন্দী করিয়া রাখিলেন। সেই অবস্থায় কারাগারেই তাঁহাদের পবিত্র জীবনের পরিসমাপ্তি হইয়াছিল। এই সকল কারণে আলেমগণ তখন আলেমের বেশে থাকিতে ভয় পাইতেন। দরভেশ-বেশধারী ভণ্ড ফকীরদিগকেই নবীন নরপতি শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেন।

'তারিখে ওয়াস্‌সাফে' লিখিত হইয়াছে—"একজন আল-খেল্লাধারী ভণ্ড ফকীর রাজদরবারে আসিয়া উপস্থিত হইল। রাজা তাঁহাকে বিশেষ ভক্তি ও সম্মানের সহিত গ্রহণ করিলেন। কিছুক্ষণ পরে মগরেবের আজান হইল। আলেমগণের উপস্থিতি সত্ত্বেও রাজা সেই ফকিরকেই নামাজ পড়াইতে হুকুম দিলেন। সে কোরআনের একটী আয়ৎও বিশুদ্ধভাবে পড়িতে পারিল না। কিন্তু হইলে কি হয়, তাহার মূর্খতা যতই প্রকাশ হইয়া পড়িল, তাহার উপর রাজার ভক্তি ততই বাড়িয়া চলিল।" এইরূপ অবস্থায় দেশে

ফিরিয়া আসিয়া আলেন ও 'হাদী'র বেশে আত্মপ্রকাশ করা সাদীর পক্ষে সম্ভবপর হইল না। খোদা তাঁহাকে যেরূপ পাণ্ডিত্য, প্রতিভা ও অপূর্ব্ব কবিত্ব শক্তি দিয়াছিলেন, তাহাতে অল্পদিনের মধ্যে তাঁহার ভক্ত ও অনুরক্তের দল অসম্ভবরূপে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হওয়া অবশ্যম্ভাবী ছিল। এদিকে পারস্য-রাজ আবুবাকার আলেমদের লোকপ্রিয়তা ও তাঁহাদের ভক্তের দল বৃদ্ধি হওয়া আদৌ দেখিতে পারিতেন না। তিনি ইহাতে মনে মনে ভয় পাইতেন এবং অচিরে ইহার মূলোচ্ছেদ না করিয়া ক্ষান্ত হইতেন না। স্বদেশে ফিরিয়া আসিয়া এই সকল অবস্থা দেখিয়া কবি দরভেশের বেশে আত্মপ্রকাশ বা আত্মগোপন করিলেন। তিনি সাধ্যমতে রাজার সংশ্রবে যাইতেন না। ভূতপূর্ব্ব পারস্য-রাজ সা'দকে তিনি প্রীতি ও শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেন, তাই তাঁহার মৃত্যু উপলক্ষ করিয়া শোক প্রকাশক কতকগুলি কবিতা লিখিয়াছিলেন। সেগুলি সকলের নিকট প্রশংসিত ও সাদরে গৃহীত হইয়াছিল। গোলেস্তাঁ গ্রন্থখানি তাঁহার নামেই উৎসর্গ করিয়াছেন।

স্বেচ্ছাতন্ত্র শাসনাধীন দেশে থাকিয়া বিশেষতঃ পারস্য রাজ আবুবাকারের খাম-খেয়ালীর কথা অবগত হইয়াও কবি কখন বিপদের ভয়ে সত্য প্রচার করিতে, শাসন পদ্ধতির তীব্র সমালোচনা করিতে ও রাজানুগৃহীত ভণ্ড ফকীরদের ভণ্ডামী প্রকাশ করিয়া দিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। তিনি গল্প গুজব ও হাসি তামাসার ছলে এবং প্রশংসাসূচক কবিতার অন্তরালে যথাযথরূপে তাঁহার কর্ত্তব্য পালন করিয়া যাইতেন।

কবি সাধারণতঃ বিভিন্ন দেশীয় পরলোকগত নরপতিগণের বিগত জীবনের শাসন পদ্ধতি, রাজ্য পরিচালনের রীতিনীতি ও তাঁহাদের ব্যক্তিগত জীবনের ব্যবহারাদি বর্ণনচ্ছলে বর্ত্তমান রাজ-শাসনের দোষাদোষ, ত্রুটী বিচ্যুতি দেখাইয়া দিতেন। অত্যাচার অনাচারের তীব্র প্রতিবাদ করিয়া প্রতিকারের উপায় নির্দ্দেশ করিতেন। আবার কখন রাজা বা কোন রাজকর্ম্মচারীর উদ্দেশে প্রথমতঃ ২।৪টী প্রশংসাসূচক কবিতা লিখিয়া তারপর সাধারণভাবে কুশাসন ও প্রজা পীড়নের বিষময় কুফলের চিত্র অঙ্কিত করিতেন। তাঁহার লিপিকুশলতা এমন সুন্দর ও বর্ণনাভঙ্গী এরূপ হৃদয়গ্রাহী হইত যে, তাঁহার উপদেশ কখন ব্যর্থ ও নিষ্ফল হইত না।

পারস্যাধিপতি অন্ধ বিশ্বাস বশতঃ দরবেশ সম্প্রদায়কে বহুধন সম্পত্তি দান করিতেন, পক্ষান্তরে আলেমদের উপর অন্যায় সন্দেহ পোষণ করিয়া কখন তাঁহাদের কোন সাহায্য করিতেন না। এজন্য তাঁহাকে উপদেশ দিবার উদ্দেশ্যে কবি তাঁহার গোলেস্তাঁ গ্রন্থে একজন দরবেশের একটী কাহিনী বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন—কোন দেশের নিবিড় অরণ্যভূমে একজন দরবেশ সংসার-ভোগ-লালসা পরিত্যাগ করিয়া দিবারাত্রি কঠোর তপস্যায় নিমগ্ন থাকিতেন। কখন লোকালয়ে যাইতেন না, কোন লোকের সহিত মিশিতেন না, বৃক্ষপত্র ও বনজ ফলমূল খাইয়া এবাদৎ বন্দেগীতেই দিন কাটাইতেন। এই প্রকারে বহুদিন গত হইলে একদিন সেই দেশের অধিপতি সেই অঞ্চলে শিকার করিতে আসিলেন। তিনি দরবেশের কুটীর দ্বারে আসিয়া তাঁহার যোগ-মগ্ন অবস্থা দেখিয়া বিমুগ্ধ হইলেন এবং ভক্তিভরে তাঁহার পায়ে লুটাইয়া পড়িলেন। ধ্যান ভঙ্গ হইলে দরবেশ রাজাকে সাদরে আলিঙ্গন করিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। সেই হইতে সময় সময় রাজা তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিতেন। এইরূপে কিছুদিন গত হইলে, দরবেশকে রাজধানীতে বসবাস করাইবার ইচ্ছা তাঁহার মনে উদয় হইল। একদিন দরবেশের নিকট তিনি এই প্রস্তাব উপস্থিত করিলেন, প্রথমতঃ তিনি কোন মতেই রাজী হইলেন না। কিন্তু রাজার বহুসাধ্য সাধনা ও অনুরোধ উপরোধে অগত্যা রাজী হইতে হইল। তাঁহার বাসের জন্য একটী সুন্দর সুসজ্জিত প্রাসাদ নির্দ্দিষ্ট হইল। সর্ব্বপ্রকার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও ভোগবিলাসের ব্যবস্থা এবং অপ্সরানিন্দিত সুন্দরী কিঙ্করীগণ তাঁহার সেবায় নিযুক্ত হইল। এইরূপে কিছুদিন রসনাতৃপ্তিকর সুখাদ্যে উদর পূর্ণ করিয়া ও নানা ভোগ বিলাসের মধ্যে কাটাইয়া তাঁহার সেই কঠোর তপস্যা ও সংযমের দৃঢ়বন্ধন ক্রমশঃ শিথিল হইয়া পড়িল, অবশেষে তিনি সম্পূর্ণরূপে সাধনাপথভ্রষ্ট হইয়া বিলাসসাগরে ভাসিতে লাগিলেন। এই সময় একদিন মন্ত্রীকে সঙ্গে লইয়া রাজা দরবেশকে দেখিতে আসিলেন। তাঁহার সেই পূর্ব্বাবস্থার সহিত বর্ত্তমান অবস্থার বিসদৃশ পার্থক্য দেখিয়া এবং সেই ত্যাগী মহাপুরুষকে এইরূপে ভোগবিলাসে রত ও অধঃপতনের চরম সীমায় উপনীত হইতে দেখিয়া তিনি যারপর নাই দুঃখিত হইলেন। সুবিজ্ঞ মন্ত্রী বিনীতভাবে

নিবেদন করিলেন—রাজন ! অবস্থাভেদে ব্যবহারের তারতম্য হওয়া বিশেষ আবশ্যক, সাধক সম্প্রদায়ের উপর এইরূপ অযথা অনুগ্রহের গুরুভার চাপাইয়া দেওয়া কখনই সমীচীন নহে। তাঁহাদের সম্মুখে ভোগের ও প্রলোভনের উপকরণ উপস্থিত করিলে তাঁহারা ভোগবিলাসে রত হইয়া সাধনা পথ-ভ্রষ্ট হইতে পারেন। পক্ষান্তরে আলেম সম্প্রদায়ের সাংসারিক অভাব দূর করিয়া তাঁহাদের সময়োচিত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা করিলে তাঁহারা নিশ্চিন্ত মনে ধর্ম্ম প্রচার ও গ্রন্থ রচনাআদি বিবিধ সৎকার্য্যে ব্রতী হইয়া দেশের মহদুপকার সাধন করিতে সমর্থ হন।

কবি আর একস্থানে লিখিয়াছেন—একজন নৃপতি পীড়িত হইয়া বহু চিকিৎসা সত্ত্বেও রোগমুক্ত হইতে পারিলেন না, জীবনের আশা এক প্রকার ছাড়িয়া দিলেন। তিনি খোদার দরবারে কাতরে আরোগ্য কামনা করিয়া চারিশত মোহর দরবেশদিগকে দান করিবেন বলিয়া 'মান্নৎ' করিলেন। অতঃপর তিনি সম্পূর্ণরূপে নিরাময় হইলেন, তখন একজন চাকরকে চারিশত মোহর দিয়া দরবেশদের মধ্যে তাহা বণ্টন করিয়া দিতে হুকুম দিলেন। আদেশানুযায়ী রাজ-কিঙ্কর মোহর লইয়া চলিয়া গেল ও এক প্রহর রাত্রি পর্য্যন্ত নানা স্থানে ঘুরিয়া বাড়ী ফিরিয়া আসিল এবং বহু অনুসন্ধানেও কোন দরবেশের দেখা পায় নাই বলিয়া সংবাদ জানাইল। রাজা বিস্মিত হইয়া বলিলেন—এই সহরের নিকটবর্ত্তী পাহাড়ে সংসার বিরাগী বহু দরবেশ এবাদৎ বন্দেগীতে 'মশগুল' রহিয়াছেন। তুমি তাঁহাদের কাহাকেও দেখিতে পাইলে না ! চাকরটি করজোড়ে নিবেদন করিল আমি দরবেশের বেশ-ধারী অনেক লোককেই দেখিয়াছি কিন্তু যিনি প্রকৃত দরবেশ কিছুতেই তিনি অর্থ গ্রহণ করিতে রাজী হইলেন—না, আর যাহারা লইতে ইচ্ছুক তাহারা প্রকৃতপক্ষে প্রকৃত দরবেশ নহে। রাজা এই সকল কথা শুনিয়া তাহার সুবিবেচনার প্রশংসা করিলেন।

কবি এইরূপে গল্প গুজবের ছলে রাজনীতি, ধর্ম্মনীতি ও প্রজাপালন সম্বন্ধে নানা উপদেশ প্রদান করিতেন, আবার রাজা বা রাজকর্ম্মচারীদের অন্যায় কার্য্যের তীব্র প্রতিবাদ করিতেও তিনি কুণ্ঠিত হইতেন না। কবি লিখিয়াছেন—

نصیحت بادشاہان گفتن کسے را مسلم ست کہ
بیم سر ندار د وامید زر

অর্থাৎ যাহাদের প্রাণের ভয় ও টাকার লোভ নাই, বাদশাহদিগকে উপদেশ দেওয়া তাহারদেই সাজে।

পারস্যবাসীগণ সা'দীকে যেরূপ সম্মানের চক্ষে দেখিতেন, সিরিয়া আরব ও অন্যান্য দেশের লোকও তাঁহাকে সেইরূপ শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিতেন। একবার তিনি দামাস্ক নগরে হজরত এহ্‌য়া নবীর পবিত্র মাজারে কিছু দিনের জন্য মো'তাকেফ (ধ্যানমগ্ন) ছিলেন। সেই সময় আরবের একজন অত্যাচারী রাজা সেখানে আসিয়া পঁহুছিলেন। তিনি নামাজ ও মোনাজাৎ (প্রার্থনা) প্রভৃতি শেষ করিয়া সাদীর অবস্থিতির কথা জানিতে পারিলেন এবং তাঁহার নিকট আসিয়া বলিলেন—"আপনি দোওয়া করুন, আমার রাজ্য একজন দুর্দ্দান্ত শত্রু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইবার আশঙ্কায় আমি ভীত হইয়া পড়িয়াছি" সাদী বলিলেন রাজন, দুর্ব্বলের সাহায্য, আর্ত্তের ত্রাণ ও প্রজাপালন রাজার ধর্ম্ম, আপনি আপনার ধর্ম্ম পালন করিবেন, আল্লার রহমত আপনার উপর নাজেল হইবে, আপনি সকল বিপদ হইতে মুক্তিলাভ করিবেন।

সুবিখ্যাত আলেম আলীএব্‌নে আহমদ কবিরচিত গ্রন্থ সমূহ ও বিভিন্ন সময়ের বহু কবিতা একত্রিত করিয়া "কুল্লীয়াতসা'দী" (সাদীর গ্রন্থাবলী) নামে প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন :—সাদী অত্যাচারী রাজাদের যেরূপ তীব্র প্রতিবাদ করিতেন, অন্যান্য আলেমগণ একজন সাধারণ লোকের কার্য্যেরও সেরূপ প্রতিবাদ করিতে সাহসী হইতেন না। তিনি দৃষ্টান্তস্বরূপ একটী ঘঠনার উল্লেখ করিয়াছেন—এক সময় কবি হজ্জ সমাধা করিয়া ফিরিবার পথে—তাব্রিজ নগরেরের আলেমদের সংস্রব লাভ করিবার উদ্দেশ্যে ২।৪ দিন সেখানে থাকিয়া গেলেন। তাব্রিজ নগরের দুর্দ্দান্ত অধিপতি সোলতান আবাকা খাঁর সুযোগ্য মন্ত্রী খা'জা শামসুদ্দীন ও তাঁহার সহোদর খা'জা আলাউদ্দীন উভয়েই সাদীকে বিশেষ ভক্তি করিতেন। তাব্রিজ নগরে থাকিবার সময় একদিন খা'জা-ভ্রাতৃদ্বয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য কবি তাঁহাদের বাড়ীর দিকে যাইতেছিলেন। ঘটনাক্রমে মন্ত্রীদ্বয়কে সঙ্গে লইয়া তাব্রিজাধিপতি সেই পথে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সকলের দৃষ্টি বাঁচাইয়া কবি সেখান হইতে সরিয়া পড়িতে চাহিলেন ; কিন্তু মন্ত্রীদ্বয়ের দৃষ্টি তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইল। তাঁহারা তাঁহাকে চিনিতে

পারিলেন, এবং তথনই উভয় ভ্রাতা সোলতানের সঙ্গ ছাড়িয়া সওয়ারী হইতে নামিয়া ভক্তি ও সম্মানের সহিত তাঁহাকে সাদর সম্ভাষণ জানাইলেন। অতঃপর তাঁহারা রাজার নিকট ফিরিয়া গেলেন সোলতান তাঁহাদের নিকট সাদীর পরিচয় পাইয়া একদিন তাঁহাকে তাঁহার নিকট লইয়া যাইতে বলিলেন। ইহার কিছুদিন পর খাজা-ভ্রাতৃদ্বয়ের অনুরোধে কবি একদিন রাজার নিকট উপস্থিত হইলেন। সোলতান বিশেষ সমাদরে তাঁহার অভ্যর্থনা করিলেন, ২।৪টী কথার পরই কবি বিদায় প্রার্থনা করিলে সোলতান তাঁহাকে কিছু সদুপদেশ দিতে অনুরোধ করিলেন, কবি বলিলেন—

شاهیکه پاس رعیت نگاه میدارد
حلال باد خراجش که مزد چوپانی ست
وگر نه راعی خلق ست زهرمارش باد
که هرچه میخورد از جزیۀ مسلمانی ست

অর্থাৎ যে রাজা প্রজাদের ( ভাল-মন্দের ) দিকে লক্ষ্য রাখিয়া থাকেন, মজুরী স্বরূপ তাঁহার জন্য রাজস্ব গ্রহণ হালাল। আর যদি তিনি প্রজাপুঞ্জের রক্ষা কর্ত্তা না হন তাহা হইলে এসলামের 'জিজিয়া' স্বরূপ যাহা তিনি গ্রহণ করেন, তাঁহার পক্ষে তাহা বিষবৎ হউক। এইরূপে নির্ভয়ে তাঁহাকে আরও অনেক কথা বলিলেন। তাঁহার ভাষা এমন সরল, বর্ণনাকৌশল এমন হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল যে সোলতান ভাববিহ্বল ভাবে বহুক্ষণ ধরিয়া অশ্রুবর্ষণ করিতে থাকিলেন। অবশেষে বিশেষ ভক্তি, শ্রদ্ধা ও সম্মানের সহিত তাঁহাকে বিদায় দিলেন। ইসলাম-জগতের প্রবল শত্রু, ইতিহাস প্রসিদ্ধ জালেম চাঙ্গীজ খাঁর পৌত্র এবং হালাকু খাঁর বংশধর বিধর্ম্মী সম্রাট আবাকা খাঁর সম্মুখে উপদেশ ছলে তাঁহার কু-শাসনের এরূপ তীব্র প্রতিবাদ করা মহাপুরুষ সা'দী ভিন্ন আর কাহারও পক্ষে সম্ভবপর ছিল না।

**কবির উপর একটী সাধারণ অভিযোগ**

কোন অবস্থায় মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করা সমীচীন নহে, সকল দেশের সকল কালের নীতিবিৎ ও ধর্ম্ম শাস্ত্রকারগণ একবাক্যে তাহা স্বীকার করিয়াছেন। খোদার কালাম ও রসুলের বাণীও দৃঢ়তার সহিত ইহা ঘোষণা করিয়াছে।

কিন্তু সা'দী বলিয়াছেন :—

دروغ مصلحت آمیز به از راستی فتنه انگیز

অর্থাৎ বিপ্লবাত্মক সত্যের তুলনায় শান্তিপ্রদ মিথ্যা উত্তম। ইহা হইতেই মিথ্যার পরিপোষক বলিয়া অনেকে সা'দীর উপর অভিযোগ আনয়ন করিয়াছেন।

ইহার উত্তরে বলা যাইতে পারে—সাধারণ ভাবে সত্য-মিথ্যার তুলনা করিয়া সা'দী এ কথা বলেন নাই, বিশেষ অবস্থায় যখন সত্য প্রচারে বিপদের আশঙ্কা এবং কেৎনা বা বিপ্লবের ভয় উপস্থিত হয়, তখন সেই অবস্থা বিশেষে মিথ্যার আশ্রয় লইয়াও বিপ্লব দূর করা ও শান্তি স্থাপনে সহায়তা করা শ্রেয় ইহাই সা'দীর অভিমত। ধর্ম্ম শাস্ত্রের অনুশাসনও ইহার বিপরীত বলিয়া মনে হয় না। ধর্ম্মের বাণী—

الفتنة اشد من القتل

অর্থাৎ হত্যাপরাধ হইতেও বিপ্লবের সৃষ্টি অধিকতর পাপ। এখন প্রশ্ন হইতেছে, কাহারও সম্মুখে যদি এরূপ সমস্যা উপস্থিত হয় যে, ব্যক্তি বিশেষকে হত্যা না করিলে বিপ্লবের হাত হইতে দেশ অথবা সমাজকে রক্ষা করা যাইবে না ; এরূপ অবস্থায় হত্যার পাপে লিপ্ত হইয়াও বিপ্লবাগ্নি নির্ব্বাপিত করা উচিত। সাধারণ ভাবে ভাবিয়া দেখিলেও বুঝিতে পারা যায়, কাহারও সম্মুখে দুইটী বিপদ অবশ্যম্ভাবীরূপে উপস্থিত হইলে এবং দুইটীর একটীকে গ্রহণ না করিয়া উপায়ান্তর নাই এরূপ অবস্থা দাঁড়াইলে বুদ্ধিমান ব্যক্তি অপেক্ষাকৃত লঘুতর বিপদটীকেই বরণ করিয়া থাকেন। তাই সা'দীরও উদ্দেশ্য এই যে শান্তির পরিস্থাপক মিথ্যা এবং বিপ্লবাত্মক সত্য দুটীই মানবের পক্ষে বিপদ। কিন্তু যখন দুটীকে এড়াইয়া চলিবার উপায় থাকিবে না, তখন অগত্যা লঘুতর বিপদ "শান্তিপ্রদ মিথ্যাকেই" গ্রহণ করিতে হইবে।

সাধারণ ভাবে মিথ্যার দোষ কীর্ত্তন করিয়া কবি গাহিয়াছেন—

گر راست سخن باشی و در بند بمانی
به زانکه دروغت دهد از بند رهائی
راستی موجب رضای خداست
کس ندیدم که گم شد از ره راست

অর্থাৎ মিথ্যার আশ্রয় লইয়া মুক্তিলাভ করা অপেক্ষা সত্য বলিয়া বন্দী হওয়াও ভাল।

সত্যবাদীতা খোদাতায়ালার সন্তুষ্টি লাভের উপায়। ঠিক পথে চলিয়া কাহাকেও আমি পথ-ভ্রষ্ট হইতে দেখি নাই।

অনেকে সাদীর এই দুই প্রাকার উক্তির সমঞ্জস রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে বলিয়াছেন—তাঁহার প্রথম উক্তি—

( دروغ مصلحت امیز به از راستی فتنه انگیز )

দেশের ও সমাজের হিতসাধন মানসে কথিত এবং দ্বিতীয় উক্তি ব্যক্তিগত ভাবে প্রত্যেকের নিজের জন্য উল্লিখিত হইয়াছে। অর্থাৎ অনন্যোপায় হইলে মিথ্যার আশ্রয় লইয়া দেশ ও সমাজকে বিপ্লবের হাত হইতে রক্ষা করিবে কিন্তু নিজে বিপদ হইতে বাঁচিবার জন্য কোনও অবস্থাতেই কদাচ মিথ্যা কথা বলিবে না। সাদীর উক্তিটির প্রতি একটু মনযোগ দিলেই বুঝিতে পারা যাইবে যে, বস্তুতঃ এখানে দুইটী মন্দের মধ্যে তুলনায় সমালোচনা করিয়া, 'মন্দের ভাল' কি, তাহাই বলিয়া দেওয়া হইতেছে।

( ক্রমশঃ )—

---

# অনুলিখন সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ

[ নজির আহ্‌মদ চৌধুরী ]

কখন হইতে এবং কেমন করিয়া বনি-আ'দম বিচ্ছিন্ন এবং বিভিন্ন ভাষাভাষী হইয়াছিল, তাহার ইতিহাস বিস্মৃতির অন্ধকারে আচ্ছন্ন—প্রত্নতত্ত্ব ইহার সন্ধান দিতে পারে না। তবে স্মরণাতীত কাল হইতে নানা প্রাকৃতিক কারণ ও ব্যবধান হেতু তাহারা যে বিভিন্ন ভাষাভাষী হইয়া আছে, ইহা অবিসম্বাদিত সত্য—এবং ইহাও সত্য যে, তখন হইতে প্রয়োজন বশতঃ এক ভাষাভাষী মানুষ অপর ভাষাভাষীর সহিত অনুবাদের সাহায্যে ভাবের আদানপ্রদান করিয়া আসিতেছে। খৃষ্টপূর্ব্ব চতুর্থ শতাব্দীতে পারস্যরাজ দারা এবং 'হাফ্‌ত-একলীমের বাদশাহ্' ছেকান্দরের মধ্যে যে সকল পত্র ব্যবহৃত হইয়াছিল, নিশ্চয় তৎসমুদয়ের অনুবাদ হইত। রোমানগণ মিছর ও শামদেশে আধিপত্য বিস্তার করিলে, অনুবাদ ব্যতীত তদানীন্তন শাসক ও শাসিতের দৈনন্দিন জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ দুর্ঘট হইয়া যাইত। সার্দ্ধ চারি সহস্র বৎসর পূর্ব্বে এ দেশের অনার্য্যদিগকে শাসন বা দমন করার জন্য "ভল্গা-ভাষাভাষী" (১) আর্য্য ও তুর্য্যদিগকে অনুবাদের আশ্রয় লইতে হইয়াছিল। তথাপি প্রাক্-এছলামী যুগে বিভিন্ন সাহিত্যের মধ্যে সামঞ্জস্য সৃষ্টি বা বিভিন্ন জাতির চিন্তা-ধারার সমন্বয় সাধনের বিশেষ কোন চেষ্টা হয় নাই—অন্ততঃ ইতিহাস সেরূপ সাক্ষ্য দান করিতে পারে না। সুতরাং বর্ত্তমানের প্রচলিত বা প্রস্তাবিত অনুলিখনের কোন কল্পনাও সে যুগে উপস্থিত হয় নাই।

কোরআন মজিদের বর্ণিত উপাখ্যান হইতে আমরা জানিতে পারি যে, আমাদের সৃষ্টিকর্ত্তা আল্লাহ বিভিন্ন ভাষা-ভাষী জাতির নিকট ধর্ম্ম ও তওহীদ প্রচার উদ্দেশ্যে তাহাদের নিজস্ব ভাষায় নবী প্রেরণ করিতেন। অবশেষে সকল দেশ ও সকল জাতি, সকল ভাষা ও সকল সাহিত্য, সকল ভাব ও সকল চিন্তা, সর্ব্বোপরি সকল ধর্ম্ম ও সকল সভ্যতার সমন্বয় সাধন উদ্দেশ্যে আরবী কোর্-আন সহ রহমতুল্লিল্-আ'লমীন হজরত মোহাম্মদ মোস্তফাকে বিশ্ব-নবীরূপে বিশ্বকেন্দ্র মক্কা-ধামে প্রেরণ করেন। কেন প্রেরণ করেন, সে সকল কথার আলোচনা এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে সম্ভব নহে—ইহার উদ্দেশ্যও তাহা নহে। বিশ্বভাষা আরবীর ইতিহাস "উম্মুল্-আল্‌ছেনা" (ام الالسنه) বিশ্ব-নবীর জীবন "ছিরতুন্নবী" (سيرة النبى)

---

(১) ভল্গা-নদীর তীর হইতে যাহারা পৃথিবীময় ইতস্ততঃ বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে, তাহারাই আর্য্য (Aryan) তুর্য্য (Turanian) নামে পরিচিত। তাহাদের প্রকৃত ভাষা কি ছিল, তাহার সন্ধান পাওয়া যায় না। তাই তাহাদের ভাষাকে "ভল্গা" নামে অভিহিত করিলাম।
—(লেখক)

"মোস্তফা-চরিত", রহমতুল্লিল্-আ'লমীন" ( رحمة للعالمين ) প্রভৃতি বহু আধুনিক গ্রন্থেও যথেষ্ট আলোচনা হইয়াছে। এখানে আমাদের একমাত্র বক্তব্য এই যে, মহা নবীর শুভ আবির্ভাবের পূর্ব্বে বিশ্বজাতি সমন্বয়ের কল্পনা কেহ করে নাই। তখন প্রত্যেক জাতি নিজেকে লইয়াই বিব্রত বা সন্তুষ্ট ছিল। বিভিন্ন ভাষাভাষী জাতিসমূহ সাহিত্যের মধ্যস্থ-তায় ভাব সমন্বয়ের অবসর যেন পায় নাই, অথবা তাহারা তাহার প্রয়োজন বোধ করে নাই।

কোরআন মজিদ একদিকে যেমন বিশ্ব ভ্রমণ এবং বিশ্ব জাতি সমন্বয়ের আদেশ দিয়াছে ( ১ ) অন্য দিকে তেমনই তাহার পুরাণ-তত্ত্বের সুসংবাদে বলিয়া দিতেছে—মানুষ মাত্রই বনি-আ'দম এবং এলম তাহাদের পৈতৃক মিরাছ। এই এলমের ফজিলতে বাবা আ'দম ফেরেশ্‌তাকুল-পূজ্য হইয়াছিলেন। এই পরিচয় ও প্রেরণার সহিত বিশ্ব-নবী বিশ্বাসীগণকে উদ্বুদ্ধ করিতেছেন,—

الكلمة الحكمة ضالة المؤمن فحيث وجدها فهو احق بها - ( ترمذى )

"জ্ঞানকথা মো'মেনের হারানিধি। যেখানে তাহার সন্ধান পাইবে, সেখানে গিয়া সে তাহার উপর আধিপত্য বিস্তার করিবে।"

এই সকল উপদেশে উদ্বুদ্ধ হইয়া আরবের ভক্ত বিশ্বাসী-মণ্ডলী বিশ্বভ্রাতার সন্ধানে ছুটিয়া চলিলেন। যুগ যুগান্তর ধরিয়া বনি-আ'দম বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্ত ও বিভক্ত হইয়া আছে। তাই পরস্পরের মধ্যে নূতন করিয়া পরিচয় ও ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করার জন্য, বিভিন্ন ভাষাভাষী জাতি সমূহের সহিত ভাব-বিনিময়ের আবশ্যকতা সর্ব্বাগ্রে তাঁহারাই অনুভব করিলেন। এই অনুভূতির ফলে পথের দূরত্ব ও দুর্গমত্ব, ভাষার বিভিন্নতা এবং অন্যান্য বহুবিধ অন্তরায় অতিক্রম পূর্ব্বক সেই ভক্ত মোছলেমমণ্ডলী বিশ্বের বিভিন্ন জাতির সাহিত্য হইতে জ্ঞানরাশি আহরণ করিয়া যে ভাবে আরবীর ভাণ্ডার পূর্ণ করিয়াছেন, তাহা শুধু অপূর্ব্ব ও অসাধারণ নহে; উপরন্তু অভাবনীয়। তাঁহাদের এই সাধনার ফলে স্থায়ী অনুবাদের প্রথম নিয়ম প্রবর্ত্তিত হয়।

নানা প্রাকৃতিক ব্যবধানে বনি-আ'দম যেমন পরস্পর বিচ্ছিন্ন, যুগ যুগান্তের অপরিচয়ে ভাব ও চিন্তায়ও তাঁহারা তেমনই বিভিন্ন। সুতরাং ভিন্ন ভাষার সাহিত্য হইতে ভাব গ্রহণ করিতে হইলে অনেক অসুবিধা উপস্থিত হয়। প্রতিপদে এমন ভাব ও শব্দ আসিয়া অনুবাদকের সম্মুখে উপস্থিত হয়, যাহার প্রকাশোপযোগী শব্দ তাঁহার নিজের ভাষায় দুষ্প্রাপ্য, অথবা অনূদিত হইলে তাহা অবোধ্য বা দুর্ব্বোধ্য হইয়া পড়ে। তখন অনুবাদকের পক্ষে সে ভাব প্রকাশক শব্দগুলিকে নিজের ভাষায় লিপ্যন্তরিত করিয়া গ্রহণ করিতে হয়। এ লিপ্যন্তর করণ বা অনুলিখনই আমাদের আলোচ্য।

প্রাচীন আরব-সাহিত্যিকগণ লিপ্যন্তরের যে নিয়ম করিয়াছেন, তাহা অতিশয় সহজ। অনুলিখিত শব্দাবলীর উচ্চারণের বিশুদ্ধতা রক্ষায় তাঁহারা মনোনিবেশ করেন নাই। বরং তাঁহারা যথাসম্ভব অনুলিখিত শব্দগুলিকে নিজস্ব করিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। যথা,— زط জৎ বা জাঠ فرنک বা ফ্রাঙ্ক = French شارک বা শারেক = চরক, ইত্যাদি।

আধুনিক আরবী সাহিত্যিকগণও এই নিয়মেরই অনুসরণ করেন। যথা, মিকানিয়াৎ مكانيات = Mechanics, বাল'মান برلمان = Parliament, اطمبيل বা অতম্বিল = Automobile ইত্যাদি।

পাশ্চাত্য সাহিত্যিকগণও পূর্ব্বে আরব-গুরুদিগেরই পদাঙ্কের অনুসরণ করিতেন। যথা,—Master, Mister বা Musu = مصيطر, Cotton = قطن, Admiral = امير البحر

আমাদের বাঙ্গালা সাহিত্যিকগণ সম্বন্ধেও সাধারণভাবে বলা যাইতে পারে যে, তাঁহারাও ( অবশ্য আরবী ব্যতীত অন্য কোন ভাষা সম্বন্ধে ) এই সহজ নিয়মের ব্যতিক্রম করেন নাই। যেমন,—ইংরেজ English, মার্কিন—American, জ্যামিতি Geometry ইত্যাদি।

কিন্তু আরবী শব্দাবলীর অনুলিখনে প্রাচ্য সাহিত্যিকগণ সাধারণতঃ উল্লিখিত নিয়মের অনুসরণ করেন নাই। তাঁহারা আরবী শব্দাবলীর বিশুদ্ধ উচ্চারণ রক্ষার ঘোর পক্ষপাতী।

---

(১) اولم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ( ৩০-৭ )

বাহ্য দৃষ্টিতে ইহা অন্যায় বলিয়া বোধ হইবে—আরবদিগের রাজকীয় প্রভাব বা আরবী সাহিত্যিকবৃন্দের স্বার্থপরতা বলিয়া অনুমিত হইবে। কিন্তু আরব-সাহিত্যিকদিগের অভিপ্রায়ে ঐরূপ দোষারোপ করিবার সাহস আমার নাই। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, বিশ্বচিন্তা-সমন্বয়ের উদ্দেশ্যে এরূপ নিয়ম অবলম্বনে তাঁহারা বাধ্য হইয়াছেন। সে যাহা হউক, 'আহ্ছনুল কছছের' পূর্ব্ববর্ণিত শিক্ষা তাঁহারা কি ভাবে গ্রহণ করিয়াছেন, কবিকণ্ঠে তাহার নমুনা গ্রহণ করুন,—

الناس من جهة التمثال اكفاء
ابوهم آدم والام حواء

"জাতি হিসাবে মানবগণ এক, তাহারা পরস্পর সমান; কেননা, আ'দম তাহাদের সকলের বাপ আর হাওয়া তাহাদের মা।"

যেখানে আপন পর বলিয়া ভেদাভেদ নাই, সেখানে স্বার্থপরতার প্রশ্ন আসিতে পারে না। পক্ষান্তরে আমরা দেখিতেছি, ইহাতে অনারব সাহিত্যিকগণও কোন অনুযোগ করেন নাই। হেজাজ-কবির কণ্ঠে কণ্ঠ মিলাইয়া আজম-কবি প্রতিধ্বনি করিতেছেন,—

بنی آدم اعضاے یکدیگرند
کہ در آفرینش زیک جوهرند
چو عضوے بدرد آورد روزگار
دگر عضوها را نماند قرار

"মানবগণ একই দেহের বিভিন্ন অঙ্গ বিশেষ; কেননা একই উপাদান হইতে তাহাদের উৎপত্তি। সহানুভূতির অচ্ছেদ্য শৃঙ্খলে তাহারা পরস্পরে আবদ্ধ।"

ইতিহাসে আমরা দেখিতে পাই, "বিজয়ী" আরবগণ "বিজিত" রাজ্যের ভাষা পরিবর্ত্তনের কল্পনা কখনও করেন নাই। "রাজ-ভাষা" কথাটা সেই শাসক ও শাসিতের নিকট অজ্ঞাত ও অপরিচিত ছিল। বিজয়ীর ভাষাই রাজ দফ্তরের ভাষা হইবে, এ কথা তাঁহাদের কল্পনাতে স্থান পায় নাই। মহামান্য খলিফা হজরত ওমর ফারুকের সময়ে আরবের বাহিরে যে সকল রাজ্য এছলামী-সাধারণ-তন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত হয়, তাহার রাজ-দফ্তরের ভাষা পূর্ব্ববৎ বহাল রহিয়াছে; ইতিহাসই তাহার সাক্ষী। (১) কিন্তু সাহিত্যিকবৃন্দের চেষ্টায় কালে আরবী বর্ণ-সঙ্কেতে নিজেদের ভাষা লিখিবার প্রথা আজগের অধিকাংশ অঞ্চলে প্রচলিত হয়। যুগধারার অনুকূল দুর্ব্বহ বহিরাবরণ হইতে মুক্ত হইয়া প্রাচ্য ভাষা সমূহ নূতন কালেব ও নূতন জীবন লাভ করিয়া সুন্দর ও সম্পন্ন হইয়া উঠিল। 'চীন' ব্যতীত সমগ্র এশিয়া মহাদেশের প্রায় সমস্ত ভাষা আরবী সঙ্কেতে লিপিবদ্ধ হইতে লাগিল। বস্তুতঃ পৃথিবীর মধ্যে আরবীর ন্যায় এত সুপরিচিত ও সর্ব্ব-সমাদৃত বর্ণ-সঙ্কেত আর দ্বিতীয় নাই, পৃথিবীময় ইহা ব্যাপক ও বিস্তৃত হইয়া আছে।

বাঙ্গালা সাহিত্যিকগণ আরবীর অনুলিখন সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, সে-সম্বন্ধে দু' একটা কথা বলা বোধ হয় অসঙ্গত হইবে না। সংক্ষেপে এই বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, আমাদের অনেক প্রাচীন সাহিত্যিক আরবী সঙ্কেতে বাঙ্গালা ভাষা লিখিবার প্রথা প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন। বোধ হয়, আমার কথায় অনেকে বিশ্বাস করিতে পারিবেন না; বরং বিস্মিত হইয়া উঠিবেন। এই বিস্ময়-মূলক সন্দেহ নির্ম্মূল করা আমার পক্ষে খুব সহজও নহে। তথাপি ঐতিহাসিক সত্য বলিয়া আমি যাহাতে বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছি, বাঙ্গালা-সাহিত্যিকের খেদমতে তাহা উপস্থাপিত না করিয়া পারিলাম না। বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসে আমরা দেখিতে পাই, সোনা দিয়ায় (২) ইহার সৃষ্টি আর ফতেহাবাদে ইহার পুষ্টি। ফতেহাবাদ (চট্টগ্রাম) সম্বন্ধে আমি বলিতে পারি, তথায় এবং তাহার পার্শ্ববর্ত্তী জেলা সমূহে এখনও আরবী বর্ণ-সঙ্কেতে লিখিত প্রাচীন বাঙ্গালা পুঁথি যথেষ্ট সংখ্যায় পাওয়া যায়। অনুবিধ পুরাতন দলিল দস্তাবেজেরও অভাব নাই। চট্টগ্রামের এক শ্রেণীর লেখক আরবী বর্ণে বাঙ্গালা বহি-পুস্তক লিখিয়া থাকেন। 'বিস' সাহেবের প্রাথমিক শিক্ষা-প্রণালী প্রবর্ত্তনের পূর্ব্ব মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত মরহুম মওলানা মোফজ্জলুর রহমান ছাহেবের মছ্আলার কেতাব গুলি চট্টগ্রামে ব্যাপকভাবে সমাদৃত হইত। যাত্রামোহন

(১) আমার লিখিত "ফারুক-চরিত" দ্রষ্টব্য।

(২) পুরাকালে যথা বঙ্গ "নবদ্বীপ" ও "সুবর্ণদ্বীপে" বিভক্ত ছিল, কালে উহা যথাক্রমে নদিয়া ও সোনাদিয়া বলিয়া পরিচিত হয়। ইচ্ছামতী নদী হইতে বহির্গত সুবর্ণ নদী বা সোনাই নদী স্বর্ণখালি প্রভৃতি ইহার স্মৃতি বহন করিয়া এখনও বিদ্যমান আছে। —লেখক।

ইনষ্টিটিউটের প্রধান আরবী-শিক্ষক মওলভী জুলফিকার আলী ছাহেব এখনও আরবী বর্ণসঙ্কেতে বাঙ্গালা বানান শিক্ষাপযোগী পুস্তক পুস্তিকা লিখিয়া থাকেন। অবশ্য বর্ত্তমানে এ প্রণালী হিতকর ও কার্য্যকরী কিনা, সে স্বতন্ত্র কথা।

আমার বিশ্বাসের আর একটী দৃঢ় ভিত্তি আছে। পূর্ণ ছয় বৎসরব্যাপী বঙ্গদেশের রাষ্ট্র ভাষা ছিল, আরবী বর্ণ সঙ্কেতে লিখিত ফারছী। এই ফারছীর কল্যাণে ভারতের ভাষা আরবী-সঙ্কেতে লিখিত হইয়া উর্দ্দু হইয়া গিয়াছে। অথচ বাঙ্গালা সাহিত্যিকগণের উপর উহার প্রভাব বিস্তার লাভ করে নাই, তাহা কিরূপে বিশ্বাস করিব? এ সম্বন্ধে অনেক কথা বলিবার রহিল। কথায় কথায় কিছু দূরে আসিয়া পড়িয়াছি। এখন মূল বিষয় সম্বন্ধে আলোচনা করা যাউক।

অধুনা পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ অনুলিখন (Transliteration) প্রণালীর আইন-কানুন প্রণয়নে বিশেষ যত্নবান হইয়াছেন। কয়েকটি ভাষার অনুলিখন-প্রণালী নির্দ্দিষ্ট হইয়া গিয়াছে। তাঁহাদের অনুকরণে আমাদের সাহিত্যিকগণ আরবীর বাঙ্গালা অনুলিখন সম্বন্ধে কায়দা-কানুন সৃষ্টির প্রতি বিশেষ মনোনিবেশ করিয়াছেন। হিন্দু সাহিত্যিকের দ্বারা ইহার সূত্রপাত হইলেও, আজকাল মোছলেম সাহিত্যিকগণ ইহার প্রতি বিশেষ আকৃষ্ট হইয়া পড়িয়াছেন। আমার মনে পড়ে, Transliteration এর বঙ্গানুবাদ সম্বন্ধে অনেক দিন ধরিয়া সাহিত্যিকবৃন্দের বাদানুবাদ চলিতেছিল। মওলবী মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ ছাহেব সর্ব্বপ্রথমে Transliteration কে 'অনুলিখন' বলিয়া অভিহিত করেন। আজ ইহা এক রকম সর্ব্বস্বীকৃত। বাঙ্গালা সাহিত্যিকগণের আবিষ্কৃত অনুলিখন-পদ্ধতির আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব না। অনুলিখনের (Transliteration) উদ্দেশ্য ও কার্য্যকারিতা সম্বন্ধে দু' একটা কথা বলিয়া এ সন্দর্ভের উপসংহার করিব।

পৃথিবীতে ন্যূনাধিক চারি সহস্র ভাষা আছে। পণ্ডিতগণের অনুমান, প্রায় দুই হাজার রকমের বর্ণমালাও আছে। ব্যাপকভাবে অনুলিখন-প্রণালীর প্রবর্ত্তন করিতে হইলে এই হিসাবে প্রত্যেক ভাষার জন্য এবং সর্ব্বশুদ্ধ ৩৯৯৮০০০ প্রকার অনুলিখন পদ্ধতি গঠনের আবশ্যক। এ গুরুভার বহনের শক্তি দুনিয়ার কোন ভাষার নাই, তাহা বলাই বাহুল্য। সুতরাং পৃথিবীর যাবতীয় ভাষার অনুলিখন-পদ্ধতি গঠন অসম্ভব ও অনাবশ্যক।

আধুনিক অনুলিখন-প্রণালীর মুখ্য উদ্দেশ্য, উচ্চারণের বিশুদ্ধতা রক্ষা এবং ভাষাও সাহিত্যগত ব্যবধানের অপসারণ। কিন্তু আমরা দেখিতেছি, এই উদ্দেশ্য-সিদ্ধির পক্ষে বর্ত্তমান অনুলিখন-প্রণালী বিশেষ সহায়তা করিতে পারে নাই। আমার দাবী সপ্রমাণ করিবার জন্য বিশেষ বেগ পাইতে হইবে না। আধুনিক অনুলিখন-প্রণালী প্রচলিত থাকা সত্ত্বেও আরবী শব্দাবলী ঐ সকল ভাষায় কিরূপ ভাবে বিকৃত হইয়া গিয়াছে, তাহার কয়েকটা দৃষ্টান্ত উপস্থিত করিলেই যথেষ্ট হইবে। ইংরেজ সাহিত্যিকের অনুলিখন প্রণালীর কল্যাণে বিশ্ব-মোছলেমের প্রাণাপেক্ষা প্রিয় মক্কা এবং মদিনা মেক্কা (Mecca) এবং মেডিনা Medina হইয়া গিয়াছে। প্রাচ্য-গৌরব আন্‌ওর এন্‌ভার (Enver) আর কমাল কেমাল Kemal করিম কেরিম (Kerim) হইয়া আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছেন। মোছলেমের পবিত্র হরম (حرم) এখন হেরেম Herem বলিয়া অভিহিত হয়। জার্ম্মাণ সাহিত্যিকগণের অনুকরণ ফলে তুর্কী ও মোগল খানম "হানম" এবং হজরত খলিল (خليل) "হেলিল" হইয়া গিয়াছেন। ফলকথা পাশ্চাত্যের অনুলিখন-প্রণালী উচ্চারণের বিশুদ্ধতা রক্ষায় কৃতকার্য্য হয় নাই; বরং ইহার ফলে সাহিত্যে নূতন নূতন ব্যবধানেরই সৃষ্টি হইতেছে। সত্য বটে; অনুলিখন-প্রণালী প্রচলিত হওয়ার পূর্ব্ব হইতে এরূপ ব্যবধানের সৃষ্টি হইয়া আসিয়াছে, আমরা উপরে তাহার দৃষ্টান্ত উপস্থিত করিয়াছি। তবে আমাদের বক্তব্য এই যে, ব্যবধান সৃষ্টির জন্য একটি নির্দ্দিষ্ট প্রথা প্রবর্ত্তিত হইবে কেন?

বাঙ্গালা অনুলিখনের মধ্যস্থতায় আরবী শব্দাবলীর বানান শুদ্ধির চেষ্টা চলিতেছে। কিন্তু ইহাতেও নূতন ব্যবধান ও অভিনব বানান-সমস্যার সৃষ্টি হইতেছে। যেমন,—"মোছলেম," "মোস্‌লেম," "মুছলেম," "মুসলেম," "মুছলিম," "মুসলিম" প্রভৃতি। এই সমস্যার সমাধান কি, তাহাই সাহিত্যিকবৃন্দের চিন্তনীয়। আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে বানান ও উচ্চারণ তথা শ্রুতি ও দৃষ্টির ব্যবধান সম্পূর্ণরূপে বিদূরিত করা অসম্ভব হইয়া দাঁড়ায়।

অনুলিখন-প্রণালী সম্বন্ধে কতকগুলি প্রশ্ন উত্থাপন এবং সন্দেহ সৃষ্টি করতঃ এই সন্দর্ভের উপসংহার করিতেছি। সমাধান সম্বন্ধে স্বতন্ত্র প্রবন্ধে আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

---
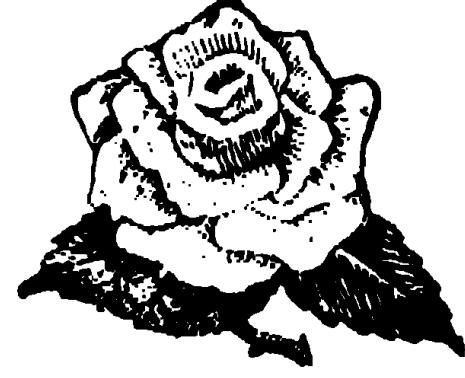
**বাদ্‌শাহ আমানুল্লাহ খাঁ**

আফগানিস্থানের স্বাধীন নৃপতি

সম্প্রতি ভারত হইয়া সস্ত্রীক ইউরোপ যাত্রা করিয়াছেন।

জনসাধারণের অভিনন্দনের উত্তরে আমীর ছাহেব বলিয়াছেন :—

"আমার রাজ্যে হিন্দু-মুছলমান ধর্ম্ম সম্বন্ধে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করিয়া থাকে।"

"ভারতের হিন্দু-মুছলমান সাম্প্রদায়িক বিসম্বাদ ভুলিয়া একযোগে নিজেদের মাতৃভূমির কল্যাণ সাধনে ব্রতী হউন—উভয় সমাজের নিকট ইহাই আমার একমাত্র প্রার্থনা।"

**হিজ্‌ হাইনেস সার আগা খাঁ**

নিখিল ভারতীয় মোছলেম-লীগের আগামী কলিকাতা-অধিবেশনে যোগদান করার জন্য ভারতে আসিয়াছেন।

ভারতীয় হেলালে-আহমর সমিতির তুর্কি মেডিকেল
মিশনের অধিনায়ক স্বনামখ্যাত জন-নেতা
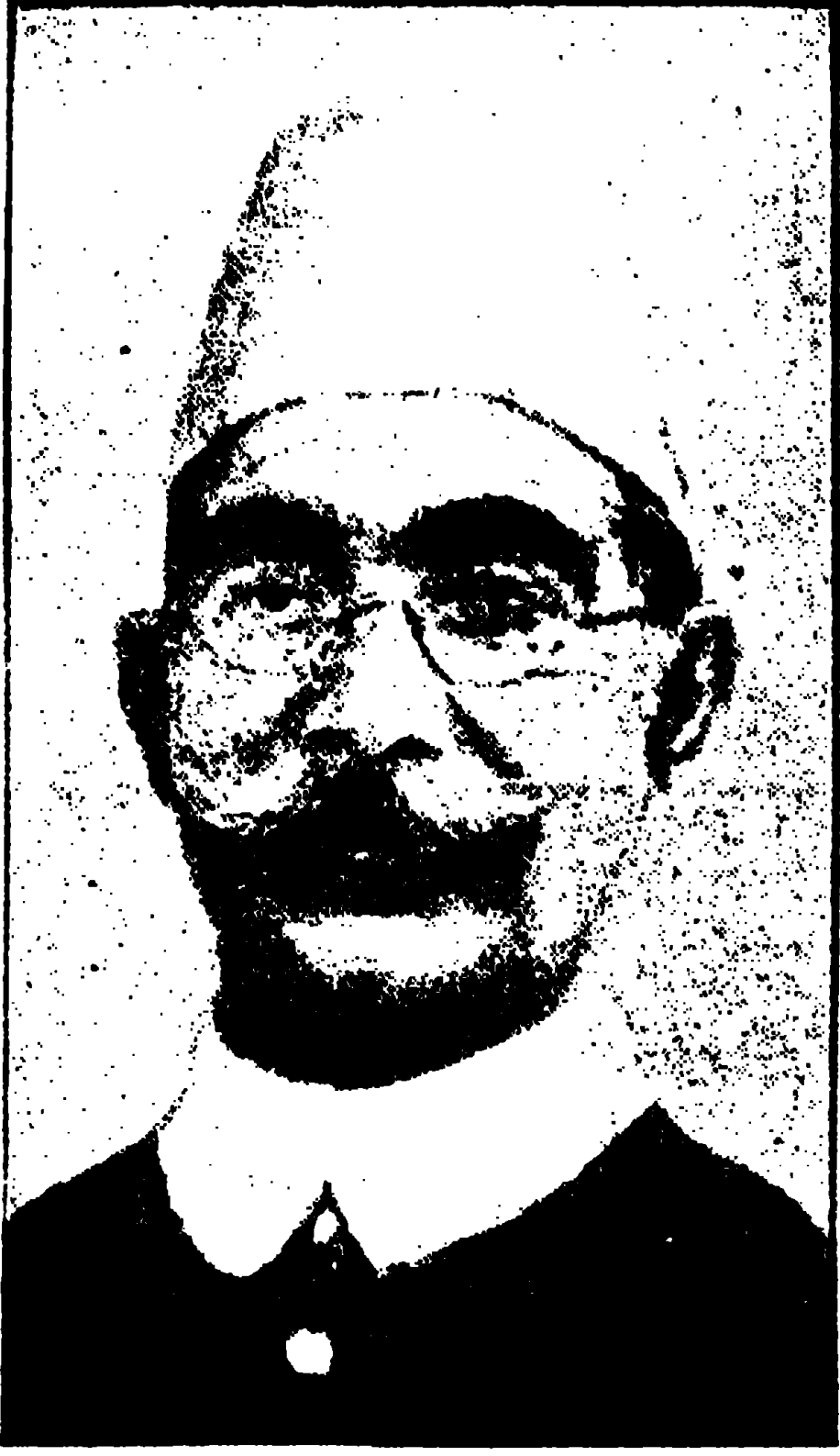
ডাক্তার
**মোখতার আহমদ আনছারী**
মাদ্রাজ কংগ্রেসের নির্ব্বাচিত সভাপতি

**মান্যবর সার হবিবুল্লাহ**
ভারতীয় শাসন-পরিষদের সদস্য।

শাসন-পরিষদের সদস্যগণের মধ্যে একমাত্র ইনি রয়েল কমিশনের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করিয়া নিজের নৈতিকবলের পরিচয় দিয়াছেন।

# ইউরোপে প্রাচ্য বিদ্যাবিশারদ

**[ কাজী নওয়াজ খোদা ]**

আরবগণ সিরিয়া ও মিসর প্রভৃতি দেশে বিজয়ীবেশে প্রবেশ করার সময় হইতে তাহাদের সহিত ইউরোপীয়গণের মেশামিশি আরম্ভ হয়। স্পেন ও পর্ত্তুগাল রাজ্য জয় করিয়া তাঁহারা ইউরোপে প্রবেশ করেন। অতঃপর হিজরী দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ শতাব্দীতে যখন বনি ও'মাইয়াগণ স্পেনের অন্দলুস নগরে স্থায়ীভাবে রাজ্য স্থাপন করিয়া বসেন, সেই সময় ইউরোপীয়গণের সহিত তাঁহাদের সম্বন্ধ আরও বাড়িয়া যায়। হিজরী তৃতীয় শতাব্দীতে সিসিলী দ্বীপ আরবদের হস্তগত হইলে ইটালীর উত্তরাংশে তাঁহাদের প্রতিপত্তি বিস্তৃত হইয়া পড়ে ইহার পর ক্রুসেড যুদ্ধ আরম্ভ হয়। ফলে আরব ও ইউরোপে যুগপৎ সংঘর্ষ ও সম্মিলন চরমে উঠে। ইউরোপীয়গণ আরবদের সভ্যতা, সদ্ব্যবহার ও বিদ্যানুশীলন দেখিয়া হতভম্ব হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাঁহারা একদিকে সমরানলে অগাধ ধনরত্ন ও অসংখ্য জীবন আহুতি প্রদান করিয়াছিলেন, অন্যদিকে প্রাচ্যশিক্ষা, শীলতা ও সভ্যতা হইতে বহু 'সবক' পড়িয়া লইয়াছিলেন। অনেক খ্রীষ্টীয় যোদ্ধা নিয়মিত ভাবে আরবী ভাষা শিক্ষা করিয়াছিলেন। তাঁহাদের অসংখ্য ধনী ও সেনানীগণ আরবী শিক্ষা ও আরবী সভ্যতার প্রতি আকৃষ্ট হইয়া পড়িয়াছিলেন।

আরবদের উন্নতির যুগে ইউরোপের বিভিন্ন স্থান হইতে আরবী ভাষা শিক্ষার জন্য স্পেনে তাঁহাদের দ্বারে বহু-ছাত্র সমাগম হইত। তাঁহারা মুসলমান শিক্ষকদের নিকট রীতিমত শিক্ষালাভ করিতেন। ইউরোপীয় ধর্ম্ম-জগতের গুরু রোমের পোপ, যিনি ৯৯ খৃষ্টাব্দে পোপের পদে অভিষিক্ত হন, তিনিও আরব-অধ্যাপকের ছাত্র ছিলেন, **'কর্‌তবা'** ও **'অশবিলিয়ায়'** আরব পণ্ডিতদের নিকট তিনি রীতিমত গণিতশাস্ত্র ও ভূগোলশাস্ত্র পড়িয়াছিলেন। লীবন ও অষ্ট্রীয়ার অধিপতিদ্বয় "কর্ডোভায়" আরবদের নিকট চিকিৎসা শাস্ত্র শিক্ষা করিয়াছিলেন।

ভলটেয়ার লিখিয়াছেন—সেকালে ইউরোপের রাজন্যবৃন্দ আরব চিকিৎসকগণকে সম্মানের সহিত তাঁহাদের দরবারে চিকিৎসা কার্য্যে নিযুক্ত করিতেন।

স্পেন ও তাহার পার্শ্ববর্ত্তী স্থান সমূহের অধিবাসিগণ মোসলমান রাজদরবারে চাকরীর সুবিধা এবং প্রাচ্য ভূখণ্ডে ব্যবসা বাণিজ্যের সুযোগ লাভের উদ্দেশ্যে বিশেষ মনযোগের সহিত আরবী ভাষা শিক্ষা করিতেন।

খ্রীষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীর প্রারম্ভে আরবীভাষা—শিক্ষার জন্য ইউরোপে রীতিমত আন্দোলন আলোচনা আরম্ভ হইয়াছিল। রোমের পোপ এশিয়া, আফ্‌রিকা, স্পেন ও সিসিলী প্রভৃতি দেশের ভিন্নধর্ম্মাবলম্বীদের নিকট খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচারের জন্য প্রচারকদল গঠন করা আবশ্যক মনে করিয়াছিলেন। কিন্তু সকলের সহিত পরামর্শ করিয়া বুঝিতে পারিলেন, আরবী ভাষায় অনভিজ্ঞ প্রচারকদের নিকট বিশেষ কোন সুফলের আশা নাই। এই কার্য্যের জন্য প্রাচ্য ভাষা বিশেষতঃ আরবী ভাষায় অভিজ্ঞতা লাভ বিশেষ আবশ্যক। তাই এ বিষয়ে আলোচনা ও ইতিকর্ত্তব্য স্থিরীকরণ-উদ্দেশ্যে ১৩১১ খৃষ্টাব্দে তাঁহার নিজের সভাপতিত্বে ভিয়ানায় একটী কনফারেন্স অধিবেশন হয়। ঐ কনফারেন্সের সভ্যগণ বহু আন্দোলন আলোচনার পর এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন যে ফ্রান্স, ইংলণ্ড, ইটালী ও স্পেন দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহে এখন হইতে আরবী, এবরানী ও সুর্‌ইয়ানী ভাষা নিয়মিতভাবে অবশ্য পাঠ্যরূপে নির্দ্দিষ্ট হইবে।

তৎপূর্ব্বে ১২২০ খৃষ্টাব্দে আরবী ভাষায় চিকিৎসাশাস্ত্র শিক্ষা দিবার জন্য ফ্রান্সে একটী আরবী তিব্বী মাদ্রাসা স্থাপিত হইয়াছিল। স্পেনের মুসলমান শিক্ষকগণ ঐ মাদ্রাসায় অধ্যাপকের কার্য্য করিতেন। আরবী ন্যায়দর্শন ও চিকিৎসা শাস্ত্রের আলোচনার সুবিধা হইবে বলিয়া ইউরোপের অন্যান্য কলেজের শিক্ষকগণও ছাত্রদিগকে যথারীতি আরব্য সাহিত্যের শিক্ষা দিতেন। ১৩৬১ খৃষ্টাব্দে মধ্য ইউরোপে সর্ব্ব প্রথম বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়, ইহার চারি বৎসর পর ভিয়েনায় আর একটী বিরাট শিক্ষাগার প্রতিষ্ঠিত হয়। তখন হইতে ইউরোপের বিভিন্ন স্থানে অসংখ্য বিদ্যালয় স্থাপিত ও তৎসমূহে রীতিমত আরবী ভাষা শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা হয়। এই সময় ইউরোপে আরবী শিক্ষার বাণ ডাকিয়াছিল। আরবী শিক্ষার এইরূপ অবাধ প্রসার দেখিয়া খৃষ্টান পাদরীদের মনে ভীতির সঞ্চার হইল। এব্‌নে রোশদ, আবুআলী এব্‌নে সীনা, এমামরাজী ও এব্‌নেজহর প্রভৃতি মুসলমান আল্লামাগণের লিখিত ন্যায় দর্শন ও এলমে কালামের গ্রন্থ সমূহের নামে পাদরীদের বুক দুরু দুরু কাঁপিয়া উঠিল। তাঁহারা এই সকল মুসলমান পণ্ডিতের গ্রন্থালোচনা খৃষ্টান ধর্ম্ম-প্রচারের পরিপন্থী ভাবিয়া শিক্ষার্থী-দিগকে এই সকল শিক্ষা হইতে বিরত রাখিবার জন্য বিশেষ ভাবে চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

সুষ্টর-ডি-সাসী

## ইটালীতে আরবী ভাষার প্রসার

পাদরীদের চেষ্টা কিন্তু আদৌ ফলবতী হইল না। তাঁহাদের বিরুদ্ধ সমালোচনা ও বাধা দেওয়া স্বত্বেও আরবী ভাষা শিক্ষা ও আরবী কেতাব পড়িবার স্পৃহা বাড়িয়াই চলিল। এই সময় ইটালীর ধনী সম্প্রদায় আরবী ভাষার প্রতি এরূপ আকৃষ্ট হইয়া পড়িলেন যে, তাঁহাদের দেশের সাধারণ লিখন-পঠনের ভাষারূপে আরবী ভাষার ব্যবহার প্রচলন করিবার জন্য চেষ্টা পাইতে লাগিলেন। তাঁহাদের সংশ্লিষ্ট লোকজন আরবী ভাষাতেই কথাবার্ত্তা বলিতেন। তাঁহাদের দরবারে আরবের অসংখ্য আলেমের ভীড় লাগিয়া থাকিত।

## সিসিলী-রাজ ও শরিফ্ ইদরিস

এই সকল ধনী সম্প্রদায়ের মধ্যে সিসিলী রাজ দ্বিতীয় রিচার্ডের নাম উল্লেখযোগ্য। ভূগোল শাস্ত্রের অসাধারণ জ্ঞানসম্পন্ন আরবের সুবিখ্যাত পণ্ডিত শরীফ্ ইদরিসী ইঁহারই দরবারে একটী রৌপ্য নির্ম্মিত গোলক ( Globe ) উপহার দিয়াছিলেন। ইহাতে সমুদ্র, পর্ব্বতমালা, নদ নদী ও পৃথিবীর সকল অংশের চিত্র সুন্দররূপে অঙ্কিত হইয়াছিল। সিসিলী-রাজের নামেই তাঁহার সুবিখ্যাত "নজহাতুল মোশতাক কি এখ্‌তেরাকিল আফাক্" নামক গ্রন্থখানি উৎসর্গ করিয়াছিলেন। তিনি সিসিলী-রাজের বহু প্রশংসা গাহিয়াছেন। তৎকালীন রোম-সম্রাট অপেক্ষাও তাঁহাকে যোগ্যতম ও ন্যায় বিচারের পক্ষপাতী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

বিখ্যাত পণ্ডিত সফ্‌দী তাঁহার "আল-ওয়াফি বিল-ওফিয়াৎ" (الوافي بالوفيات) গ্রন্থে লিখিয়াছেন—সিসিলী-রাজ মুসলমান পণ্ডিত ইদরিসীকে বলিলেন, আমি কেবল সেকালের পুঁথিগত ভূ-পরিচয়ে সন্তুষ্ট হইতে পারি না, পৃথিবীর সকল অংশে ভ্রমণ করিয়া স্বচক্ষে দেখিয়া এক্ষণে যে অবস্থা লিখিত ও চিত্রিত হইবে, আমি তাহাই দেখিবার অভিলাষী। অতঃপর ইদরিসীর পরামর্শ অনুযায়ী কতকগুলি সুযোগ্য কর্ম্ম-দক্ষ লোক পৃথিবীর সকল অংশে দলে দলে প্রেরিত হইল। তাঁহাদের সঙ্গে চিত্রকরও পাঠান হইয়াছিল।

সেই সকল লোক বহুদিন ধরিয়া পৃথিবীময় ভ্রমণ করিয়া জলস্থল, পর্ব্বত ও নদনদীর ভৌগোলিক চিত্র অঙ্কিত করিয়া লইয়া আসিয়াছিল, পৃথিবীর প্রত্যেক বিভাগের জলবায়ু ও বাসিন্দাদের সম্বন্ধেও বহু তথ্য সংগৃহীত হইয়াছিল। ইদরিসী এই সমস্ত একত্র করিয়া গ্রন্থাকারে সিসিলী রাজের নিকট পেশ করিলেন, এইবার তিনি সন্তুষ্ট হইলেন ও তাঁহার প্রকৃত আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইল। 'সফ্দী' আরও লিখিয়াছেন, দ্বিতীয় রিচার্ড ইদরিসীকে বিশেষ সম্মানের চক্ষে দেখিতেন, সওয়ারীতে চড়িয়া তাঁহার দরবারে প্রবেশ করিতে এবং সিংহাসনে তাঁহার সহিত একত্র উপবেশন করিতে বিশেষ ভাবে তাঁহাকে অনুমতি দিয়াছিলেন।

ইটালীর অন্যান্য আমীর ওমারা ও রাজন্যবর্গও আরবী ভাষার বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন। ৬ষ্ঠ ক্রুসেড্ যুদ্ধের প্রধান সেনাপতি দ্বিতীয় ফ্রেডারিক আরবী ভাষায় বিশেষ অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন। মুদ্রাযন্ত্র আবিষ্কৃত ও স্থাপিত হওয়ার পর তাঁহারা ইটালী রাজ্যে আরবী গ্রন্থসমূহ মুদ্রিত ও প্রকাশিত করেন। এড্রিয়াটীক সাগরের নিকটবর্ত্তী 'রান্ন' নগরে ১৬২৪ খৃষ্টাব্দে সর্ব্বপ্রথম মুদ্রাযন্ত্র স্থাপিত হয়, ইটালীর 'মণ্ডিসীস্' নামক বিখ্যাত ধনী সম্প্রদায়ের বংশধরগণ এই মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন করিয়াছিলেন। ইহাতেই "কোরান মজিদ" ও আরবী ভাষার চিকিৎসাশাস্ত্র ও অন্যান্য শাস্ত্রের বহু গ্রন্থ মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছিল।

সে সময় ইটালীর উল্লেখযোগ্য শিক্ষাগার সমূহে মুসলমান অধ্যাপকগণ অধ্যাপনা-কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। প্রকৃত কথা এই যে ইউরোপীয়গণের মধ্যে ইটালিয়ানগণ সর্ব্বপ্রথমে আরবী ভাষার পক্ষপাতী হইয়া পড়েন। তাঁহাদের কর্তৃক ল্যাটীন ভাষায় বহু আরবী কেতাব অনূদিত হইয়াছিল। আরাস্ত (অরিষ্টটল) ও বোকরাত্ প্রভৃতি বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণের আরবী ভাষায় অনুবাদিত বহু গ্রন্থের 'তরজমা' ইটালী ভাষায় গৃহীত হইয়াছিল। "গ্রডোক্রীমুনা" নামক একজন বিখ্যাত লেখক ল্যাটীন ভাষায় সত্তরটীর অধিক আরবী গ্রন্থের অনুবাদ করিয়াছিলেন। এক্ষণে ঐ সকল মূল আরবী কেতাব সাহিত্য-জগৎ হইতে অন্তহিত হইয়াছে; কিন্তু অনুবাদগুলি আজিও বর্ত্তমান রহিয়াছে।

ইটেন কাটর মিয়র

## পাদরীদের মাদ্রাসা

রোমের পোপ ত্রয়োদশ 'গ্রিগারী' ১৫৮৪ খৃষ্টাব্দে পাদরীদিগকে শিক্ষা দিবার জন্য একটী আরবী মাদ্রাসা স্থাপন করিয়াছিলেন। লাবনানের পার্ব্বত্য প্রদেশের অধিবাসী বিখ্যাত পণ্ডিত "জিবরাইল সয়হুনী," 'এবরাহিম হালাকানী' ও 'শাময়ান শামস্নানী' ঐ মাদ্রাসার ছাত্র। তাঁহারা বহুসংখ্যক আরবী কেতাব ল্যাটীন ভাষায় অনুবাদিত ও প্রচারিত করিয়াছিলেন। 'ইটীন কাটরমেয়ী' নামক একজন ইটালীয়ান লেখকই আল্লামা এব্নে খাল্লদুনের "মোকদ্দমা-এ-এব্নে খাল্লদুন" নামক বিখ্যাত আরবী গ্রন্থ প্রকাশিত করেন।

## স্পেন ও পর্ত্তুগাল

স্পেন রাজ্য বহুকাল মুসলমান শাসনাধীনে ছিল, প্রায় ৮০০ আট শত বৎসর পর্য্যন্ত আরবগণ সেখানে শাসনদণ্ড পরিচালন করিয়াছিলেন। আরবীই তখন সেখানকার প্রাদেশিক ও সরকারী ভাষা বলিয়া পরিগণিত হইত। স্পেনের শিক্ষিত সম্প্রদায় আরবী ভাষা লিখিতে ও সেই ভাষায় কথাবার্ত্তা বলিতে গৌরব অনুভব করিতেন। কিন্তু তবুও সেখানে বিশেষ ভাবে আরবী শিক্ষার প্রচলন হয় নাই। স্পেনের যে-অংশে খৃষ্টান অধিবাসীগণ বসবাস করিতেন, সেই অঞ্চলের 'তালিতালা' নামক স্থানে খ্রীষ্টীয়

একাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে একটী আরবী মাদ্রাসা স্থাপিত হইয়াছিল। ইহার পর ১২৫৪ খৃষ্টাব্দে 'আসিবিলীয়া' নগরে ল্যাটীন ও আরবী শিক্ষার জন্য আর একটী মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হয়। এতদসত্বেও সেদেশে আরবী শিক্ষা ইউরোপের অন্যান্য স্থানের ন্যায় প্রসার লাভ করিতে পারে নাই।

ডচ পণ্ডিত ডোজি

## ইউরোপীয়গণের আরবী গ্রন্থ সংগ্রহ

খ্রীষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দী (মতান্তরে পঞ্চদশ শতাব্দী) হইতে ইউরোপবাসীগণ আরবী গ্রন্থ সংগ্রহ করিতে মনোযোগী হন। তাঁহারা আরবী গ্রন্থ সংগ্রহের জন্য বহু অর্থব্যয়ে প্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে লোক পাঠাইতেন। ফ্রান্সের অধিপতি নবম লুইস সর্ব্বপ্রথমে তাঁহার রাজ্যে আরবী কেতাবের লাইব্রেরী স্থাপনের নিয়ম জারী করিয়াছিলেন। ক্রুসেড্ যুদ্ধের সময় যুদ্ধক্ষেত্র হইতে প্রত্যাগত সৈনিক পুরুষদের নিকট তিনি শুনিয়াছিলেন যে, মুসলমান নরপতিগণ যুদ্ধক্ষেত্রে লাইব্রেরী সঙ্গে লইয়া যান এবং গ্রন্থ পাঠে ও ওলামাদের সহিত নানা শাস্ত্রের আলোচনায় অবসর কাল যাপন করেন। এই সংবাদ শুনিয়া সম্রাট নবম লুইস ত্রয়োদশ খৃষ্টাব্দে তাঁহার নিজের জন্য একটী আরবী 'কেতাব খানা' স্থাপন করিলেন। চতুর্দ্দশ লুইস অষ্ট্রীয়ার একজন আরবী ভাষাবিৎ পণ্ডিতকে নানা শাস্ত্রের আরবী কেতাব সংগ্রহ করিবার জন্য প্রাচ্য মহাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। এইরূপে খ্রীষ্টীয় উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ইউরোপে বহুসংখ্যক আরবী কেতাব সংগৃহীত হয়। অন্যূন দুই লক্ষ হস্তলিখিত আরবী গ্রন্থ সে সময় ইউরোপের লাইব্রেরী সমূহের রেজিষ্ট্রীভুক্ত হইয়াছিল।

## ইউরোপে আরবী কেতবখানা

ইউরোপ ও আমেরিকার বিভিন্ন স্থানে আরবী কেতাবের বিরাট লাইব্রেরী আজিও বর্ত্তমান রহিয়াছে। তন্মধ্যে উল্লেখ যোগ্য কয়েকটী স্থানের নাম নিম্নে বর্ণিত হইল।

১। লেনিন গ্রেড্
২। বার্লিন
৩। প্যারিস
৪। লেপজিক
৫। মিউনিক
৬। ভিয়ানা
৭। লেডিস্
৮। অক্সফোর্ড
৯। এডিনবরা
১০। ডবলিন
১১। কেম্‌ব্রিজ
১২। নিউইয়র্ক
১৩। সিকাগো
১৪। কালিফোর্নিয়া
ইত্যাদি ইত্যাদি।

এই সকল লাইব্রেরীতে সংগৃহীত কেতাবসমূহের রীতিমত তালিকা পুস্তক (Catalogue) রক্ষিত হইয়াছে। আবার এক একটী সাধারণ তালিকা পুস্তক আছে, তাহাতে বিভিন্ন জায়গার বিভিন্ন লাইব্রেরীর গ্রন্থসমূহের আমূল বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ হইয়াছে। এই সকল লাইব্রেরীতে আরবী ভাষায় বহু অমূল্য গ্রন্থরাজি বহু আয়াসে বহু অর্থ ব্যয়ে সংগৃহীত হইয়া থাকে।
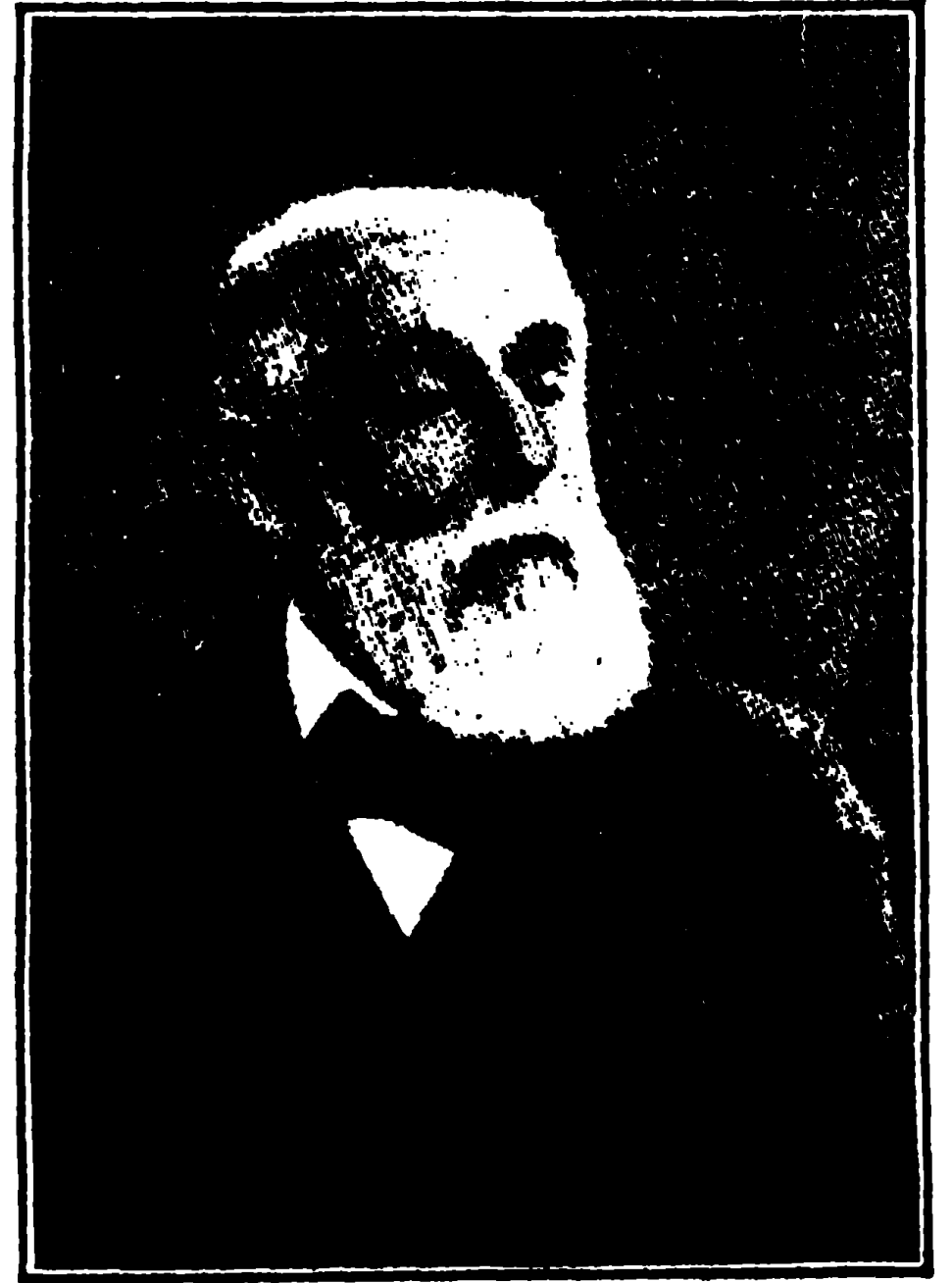
এইচ, ডেরিনবার্গ

## ইউরোপে আরবী শিক্ষা

ইউরোপবাসীগণ ধর্ম্মান্ধতা পরিত্যাগ করিয়া যখন রাজ্য বিস্তারের দিকে মনোযোগী হইলেন, তখন তাঁহারা প্রাচ্য-শিক্ষা ও প্রাচ্য সভ্যতায় অভিজ্ঞতা লাভের আবশ্যকতা অনুভব করিলেন। এই সময় "প্রাচ্য শিক্ষা বিভাগ" নামে একটী বিশেষ বিভাগ খোলা হইল। এই বিভাগ হইতে রীতিমত আরবী ভাষা শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা প্রচলিত হইল।

অষ্ট্রীয়া রাজ্যে ১৭৫৩ খৃষ্টাব্দে সর্ব্ব প্রথম প্রাচ্য ভাষা শিক্ষার জন্য একটী মাদ্রাসা স্থাপিত হয়। বিভিন্ন রাজ্যে পাঠাইবার জন্য নির্ব্বাচিত দূতগণ এবং সদাগর সম্প্রদায় এই মাদ্রাসায় শিক্ষালাভ করিতেন। এই উদ্দেশ্য সাধন জন্য ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দে ফ্রান্সেও একটী শিক্ষাগার স্থাপিত হইল। জার্ম্মানীও ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে ফ্রান্স ও অষ্ট্রীয়ার অনুসরণ করিলেন। অতঃপর রাশিয়া, ইংলণ্ড ও ইটালীও এদিকে মনোযোগী হইলেন। ইতিপূর্ব্বে খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দী হইতে সাধারণতঃ ইউরোপের সকল বিদ্যালয়ে বিশেষতঃ ইংলণ্ড, জর্ম্মানী ও হলাণ্ডের শিক্ষাগার সমূহে আরবী ভাষা অবশ্য পঠনীয় রূপে পাঠ্য তালিকাভুক্ত হইয়াছিল।

অধ্যাপক ব্রাউন

## প্রাচ্য-বিদ্যা বিশারদ ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ

ইউরোপীয় প্রাচ্য বিদ্যাবিশারদ নামজাদা পণ্ডিতগণের নামের একটী মোটামুটী তালিকা নিম্নে প্রকাশিত হইল। ইঁহারা সকলে প্রাচ্য দেশের বিভিন্ন ভাষায় অসাধারণ জ্ঞান লাভ করিয়া গভীর গবেষণা, অধ্যাপনা ও গ্রন্থ রচনার কার্য্যে জীবন অতিবাহিত করিয়াছেন।

১। জর্ম্মাণ পণ্ডিত 'লুডলফ'—প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের ২৫টী ভাষায় জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন।

২। ফ্রান্সের পণ্ডিত 'সলুস্টরডি সসী'—২০টী ভাষায় জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন।

৩। সুইটজারল্যাণ্ডের অধিবাসী পণ্ডিত 'ভনব্রসমী'—বহু ভাষাবিৎ ছিলেন।

৪। জার্ম্মাণ পণ্ডিত 'হাওমল'—বহু ভাষা আয়ত্ত করিয়াছিলেন।

৫। ডচ পণ্ডিত 'ডোজী'—৭টী ভাষায় অভিজ্ঞ ছিলেন। ইনি আরবী ভাষার বিখ্যাত 'কামুস' গ্রন্থের উপসংহার ভাগ সংগ্রহ করিয়াছিলেন।

৬। হাঙ্গেরিয়ান প্রফেসার 'রেম্বরীন'—হাঙ্গেরিয়ান, তুর্কী, এবরাণী এবং ল্যাটীন ভাষায় সর্ব্ববাদীসম্মত বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন।

৭। 'ইটীন্ কাটর্ মিয়র্'—আল্লামা এব্‌নে খাল্লদুনের "মোকদ্দামা-এ-এব্‌নে খাল্লদুন" নামক গ্রন্থের প্রকাশক। আরবী ভাষায় বিশেষ অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন।

৮। 'হাটউইক ডেরিনবার্গ'—আরবী সাহিত্য ও ইতিহাস সম্বন্ধীয় পঞ্চাশখানি গ্রন্থ প্রচার করিয়াছিলেন।

৯। ই, জি, ব্রাউন—Literary History of Persiaর রচয়িতা, ইনি পারস্য কবিদের জীবনী সংগ্রহ করিয়াছেন, প্রাচ্য ভাষায় ইঁহার আরও কয়েকখানি গ্রন্থ আছে।

১০। সার আউসলী -পারস্য কবিদের জীবনী ও পারস্য সাহিত্য সম্বন্ধে কয়েকখানি গ্রন্থ লিখিয়াছেন।

১১। কাপ্তেন ক্লার্ক—পারস্য সাহিত্য লইয়া বিশেষ আলোচনা করিয়াছেন।

১২। আমেরিকার অধিবাসিনী বিদুষী 'লুসী গ্রে' (Lucy Gray)—Rose garden of Persia নামক

গ্রন্থের রচয়িত্রী। পারস্য সাহিত্য ও পারস্য কবিদের জীবনী লইয়া আলোচনা করিয়াছেন।

ইঁহারা সকলেই তাঁহাদের অধীত প্রাচ্য ভাষা সমূহে রীতিমত কথাবার্ত্তা বলিতে, লিখিতে পড়িতে ও বক্তৃতা দিতে পারিতেন। ঐ সকল ভাষা মাতৃভাষার ন্যায় তাঁহাদের আয়ত্বাধীন হইয়াছিল, তাঁহারা সকলেই প্রাচ্য বিদ্যাবিশারদ পণ্ডিত বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন।

ইউরোপবাসীগণ আরবী ভাষা শিক্ষা দিবার জন্য কেবল মাদ্রাসা স্থাপন করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই। তাঁহারা ঐ সকল ভাষার গভীর গবেষণা ও বিশেষ ভাবে আন্দোলন আলোচনা চালাইবার উদ্দেশ্যে মহামহা পণ্ডিতগণের সমবায়ে অনেকগুলি সমিতি স্থাপন করিয়াছিলেন। ১৭৭৮ খৃষ্টাব্দে হলাণ্ডবাসীগণ এই উদ্দেশ্য সাধন জন্য জাভায় একটী সমিতি প্রতিষ্ঠা করেন। ইহার পর ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় এসিয়াটীক সোসাইটী ও ১৮০৫ বোম্বাই সহরে এই প্রকারের আর একটী সমিতি স্থাপিত হয়। কিন্তু ফ্রান্সে স্থাপিত সমিতিটী বিশেষ উল্লেখযোগ্য। প্রাচ্য বিদ্যাবিশারদ আরবী ভাষায় বিশেষ অভিজ্ঞ মহাপণ্ডিত সলুষ্টার ডি, সমি এই সমিতির স্থাপয়িতা ছিলেন। খ্রীষ্টীয় উনবিংশ শতাব্দীতে তিনিই আরবী ভাষায় শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত বলিয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন। জর্ম্মাণ, ডচ ও সুইস পণ্ডিতগণ এই সমিতি হইতে প্রাচ্য বিদ্যায় জ্ঞান লাভ করিবার বিশেষ সাহায্য পাইয়াছিলেন।

পণ্ডিত প্রবর 'সলুষ্টার' আরবী ভাষা শিক্ষার নূতন পদ্ধতি আবিষ্কার করিয়া ইউরোপীয়গণের আরবী শিক্ষা সহজ-সাধ্য করিয়া দিয়াছেন।

---

# প্রিয়

[ মোয়াহেদ বখ্‌ত্‌ চৌধুরী ]

আঁধার আমার আঁখির কোণে প্রিয়!
তোমার প্রেমের বহ্নি-শিখা দিও।
মলিন আমার মানস গেহে প্রভু
রূপের আলো ফুটিয়ে তুমি নিও।

আঁধার রাতে কুটিল পথের বাঁকে
জীবন-ভরা দুর্ভাবনার পাঁকে
এ-মন তোমায় ভুলেই যদি থাকে
আঘাত দিয়ে জাগিয়ে তারে নিও।
আঁধার আমার আঁখির কোণে প্রিয়!
তোমার প্রেমের বহ্নি-শিখা দিও॥

আকাশ-জোড়া ঐ যে তারার মেলা
চাঁদের হাটে রূপের হেলা-ফেলা
সবই যে গো তোমার মোহন-খেলা
তোমার রূপেই জগৎ আলো-প্রিয়!
আঁধার আমার আঁখির কোণে প্রিয়!
তোমার প্রেমের বহ্নি-শিখা দিও॥

# সঙ্কলন
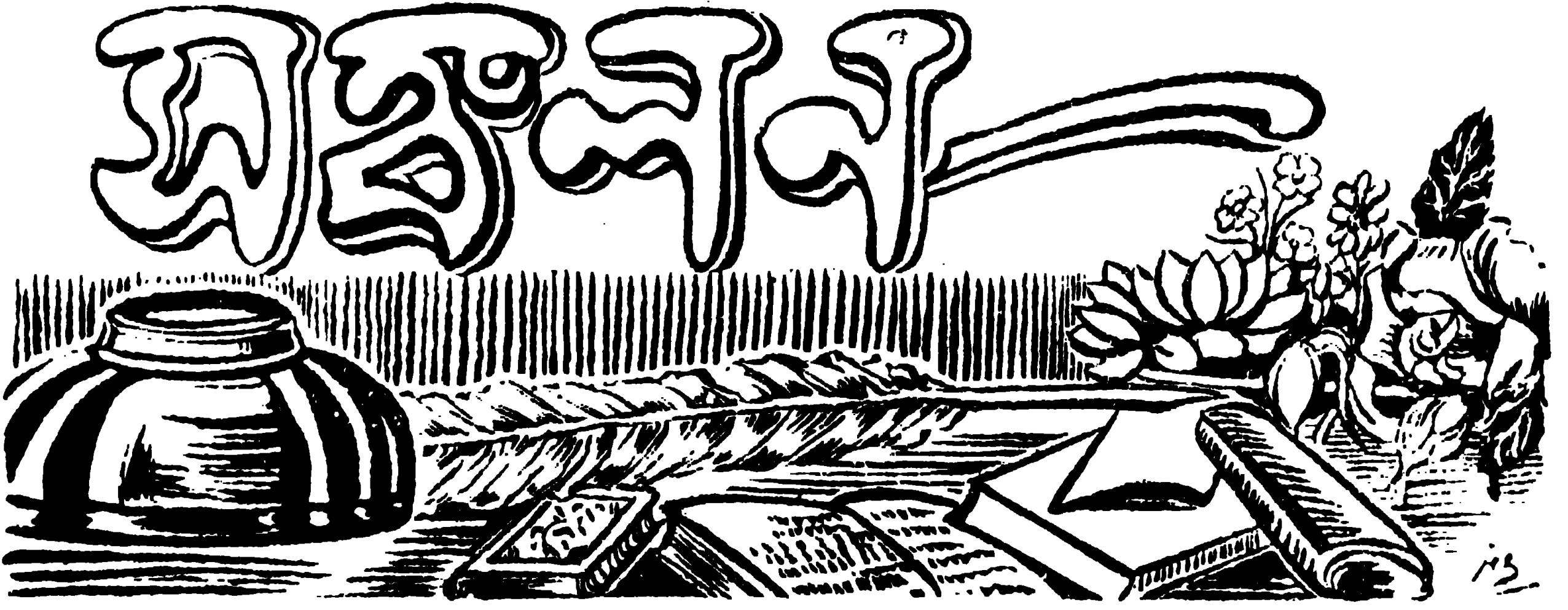
## কোরআনের একটী মো'যেজা

হজরত মুছা ও তাঁহার সহযাত্রী বনি-এছরাইলগণের অনুসরণ করিতে গিয়া ফেরাওন ডুবিয়া মরিয়াছিল, এ কথা সকলেই জানেন। এই উপাখ্যান বর্ণনা-কালে কোরআনের ইউনছ নামক ছুরায় বলা হইয়াছে যে, ফেরআওন যখন ডুবিয়া মরিতেছিল, সেই সময় আল্লাহ তাহাকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন :—

فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ

آيَةً ط وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ -

"অতএব আজ আমরা তোমার দেহকে উদ্ধার করিব—যেন তুমি নিজ পরবর্ত্তীগণের জন্য নিদর্শন হইয়া থাক ;—আর অধিকাংশ লোকই আমার নিদর্শন সমূহ সম্বন্ধে গাফেল হইয়া আছে।

এই আয়ত দ্বারা জানা যাইতেছে যে, হজরত মুছার সমসাময়িক ফেরআওনের লাশ অক্ষত অবস্থায় রক্ষিত আছে। সে লাশ যে পরবর্ত্তী লোকদিগের জন্য 'নিদর্শন' হইবে, এ কথাও আয়তে স্পষ্ট করিয়া বলিয়া দেওয়া হইয়াছে। আবার 'পরবর্ত্তী' বলিতে কেবল ঘটনার সময়কার লোকদিগকেই বুঝাইতেছে না, বরং পরবর্ত্তী সকল সময়ের সকল যুগের লোকদিগকে বুঝাইতেছে। বলা বাহুল্য যে, এই আয়তে তফছিরের কোন প্রকার মতভেদ নাই।

*　*　*　*　*

প্রায় ত্রিশ বৎসরের কথা, লাহোরের "আল্-আদিব" নামক সাহিত্যপত্রে পঞ্জাবের এক বাহাছের বিবরণ প্রকাশিত হয়। বাহাছ হইয়াছিল—সেখানকার একজন বিশেষ বোজর্গ আলেমের ও জনৈক ইংরাজ পাদ্রীর মধ্যে। পাদ্রী ছাহেব অন্য কোনও কথা না বলিয়া এই আয়তের প্রসঙ্গ তুলিয়া বলিলেন—কোরআন যে খোদার কালাম নহে, এই আয়তটাই তাহার প্রমাণ। কারণ আয়তে পরিষ্কার ভাবে বলা হইয়াছে যে, ফেরআওনের লাশ অক্ষত অবস্থায় সুরক্ষিত আছে এবং পরবর্ত্তী সময়ের মানব-সমাজের জন্য তাহা নিদর্শন ও উপদেশ হইয়া থাকিবে। কিন্তু কোরআনের পূর্ব্বে ও পরে কত দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে, ফেরআওনের লাশের কোন সন্ধান দুনয়ার কেহই জানিতে পারে নাই। অতএব মুছলমান সমাজকে হয় ফেরআওনের লাশ দুনয়ার সম্মুখে উপস্থাপিত করিতে হইবে, না হয় ন্যায়তঃ তাহাদিগকে স্বীকার করিতে হইবে যে, কোরআন আল্লার কালাম নহে। ফেরআওনের লাশ

বাহির করিতে তাঁহারা সমর্থ হইবেন না, অতএব এ অবস্থায় তাঁহারা আপনাদের কর্ত্তব্য স্থির করিয়া লউন।

মৌলভী ছাহেব নীরব নিস্পন্দ ভাবে সব কথা শুনিয়া যাইতেছিলেন। পাদ্রী ছাহেবের বক্তব্য শেষ হইলে, তিনি ধীর গম্ভীর কণ্ঠে উত্তর করিলেন :—জনাব পাদ্রী ছাহেব! আপনি যে আয়ত পেশ করিয়াছেন, তাহার যে অর্থ করিয়াছেন এবং তাহার উপর নির্ভর করিয়া যে দার্শনিক যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন, সে সমস্তই ঠিক। কিন্তু একটী মাত্র স্থানে আপনি ভুল করিয়াছেন। আপনি দাবী করিতেছেন যে, ফেরআওনের লাশ নষ্ট হইয়া গিয়াছে, তাহা অক্ষত অবস্থায় সুরক্ষিত নাই, এইটাই আপনার গুরুতর ভ্রম। আপনার উল্লিখিত আয়তের শেষ অংশ স্পষ্টভাবে ইঙ্গিত করিতেছে যে, ফেরআওনের লাশ নিশ্চয় বর্ণিতরূপে সুরক্ষিত হইয়া আছে, তবে জনসাধারণ সে সম্বন্ধে গাফেল হইয়া আছে।

হাজার হাজার বৎসর পরে দুনয়ার সম্মুখে আজ এই দাবী উপস্থাপিত করা হইতেছে। আমি আশা করি, দৃঢ়তার সহিত বিশ্বাস করি যে, সত্যময়ের সত্যবাণী কোর-আন—তিনি এই দাবী শুনিতেছেন এবং শীঘ্রই তিনি এ দাবীর উত্তর প্রদান করিবেন। আপনি শুনুন আর আমার এই কথাগুলি শুনিয়া লিখিয়া রাখুন (পাদ্রীগণের বিদ্রূপ-হাস্য) আল্লাহ নিশ্চয় ফেরআওনের অক্ষত মৃতদেহকে অনতিবিলম্বে দুনয়ার সম্মুখে উপস্থিত করিবেন। আপনারা হাসিতেছেন—হাসুন! কিন্তু আমি বলিয়া দিতেছি, আজ যেমন আপনারা এই যুক্তির হিসাবে কোরআনের অসত্যতা প্রমাণ করিতে আগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন, অদূর ভবিষ্যতে যখন ফেরআওনের লাশ আপনাদিগের চক্ষের সম্মুখে বিদ্যমান হইয়া কোরআনের এই আয়তের মো'যেজা ঘোষণা করিতে থাকিবে, তখন কিন্তু আপনারা নিজেদের এই যুক্তিবাদটা একেবারে ভুলিয়া যাইবেন।

মৌলভী ছাহেব ভক্তি ও বিশ্বাসে পূর্ণ হইয়া মোনাজাত আরম্ভ করিলেন। বিজয়-গর্ব্বে স্ফীতবক্ষ পাদ্রী সাহেব গণ ব্যঙ্গবিদ্রূপ করিতে করিতে সভা ত্যাগ করিলেন। সাধারণ মুছলমানগণ মৌলভী ছাহেবের কথায় শান্তিলাভ করিল। ইংরাজী শিক্ষিতদের মধ্যে একদল বিমর্ষ হইয়া বাড়ী ফিরিলেন।

এই বাহাছের অল্পকাল পরে মিছর ও ইউরোপের সংবাদ পত্র সমূহে তারস্বরে ঘোষণা করা হইতে লাগিল যে, দীর্ঘ ৩১টা শতাব্দী অতিবাহিত হইয়া যাওয়ার পর, হজরত মূছার সমসাময়িক ফেরআওন—সম্রাট ২য় রামসেসের ( Ramses II ) মমি বা সুরক্ষিত মৃতদেহ পাওয়া গিয়াছে।

ফেরআওন

মিছর মিউজিয়মে রক্ষিত "মমি" বা মোমিয়ায়ী مومیائی

ইউরোপের বহু বিজ্ঞানবিদ ও পুরাতত্ত্ববিশারদ পণ্ডিত মিছরে উপস্থিত হইলেন, সকলে মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিলেন যে, ইহা মূছার সমসাময়িক সেই ফেরআওনের লাশ, এই ব্যক্তির জলে ডুবিয়া মৃত্যু হইয়াছিল, এবং আবুসিম বেনে প্রাপ্ত ২য় রামসেসের Colossal Portrait Figureএর সহিত এই লাসের সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য আছে। মহা ধুমধামের সহিত ফেরআওনের সেই লাশ মিছরের যাদুঘরে স্থাপিত হইল। তাহার পর হইতে ইউরোপীয় লেখকগণও প্রায় একবাক্যে এই মমীকেই হজরত মূছার সমসাময়িক ফের-আওন বা ২য় রামসেসের লাস বলিয়া স্বীকার করিয়া লইলেন। ( দেখ, J. H. Breasted কৃত Ancient Times, ব্রিটানিকা, বিশ্বকোষ, প্রভৃতি )।

ফেরআওনের প্রতিকৃতি
( পর্ব্বত-গাত্রে খোদিত )

ফেরআওনের এই প্রস্তর মূর্ত্তির এবং মিছর মিউজিয়মে রক্ষিত তাহার মমী বা লাশের দুইখানা চিত্র এই সংখ্যায় প্রকাশিত হইল। *

*　　*　　*　　*

ফেরআওনের সুরক্ষিত মৃতদেহ কোরআনের একটা জীবন্ত মোযেজা। ইউরোপের জ্ঞানান্বেষী সমাজ গুলির চেষ্টায়—খৃষ্টানের হাতে—কোরআনের এই প্রকার আরও বহু মো'যেজা সপ্রমাণ ও সপ্রকাশ হইয়া পড়িতেছে। মিছরের সর্ব্বপ্রধান খৃষ্টান লেখক স্বনামধন্য পণ্ডিত জার্জ্জ-জীদানকেও এই স্বীকার করিতে হইয়াছে যে, পুরাতত্ত্ব ও জ্ঞান বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে, কোরআনের বর্ণিত উপাখ্যান ও সিদ্ধান্তগুলির সত্যতা দিন দিনই দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়া যাইতেছে।

কিন্তু কয়জন মুছলমান, কয়জন জ্ঞানাভিমানী শিক্ষিত ব্যক্তি, কয়জন এলেমের দাবীদার এ সকল তথ্যের সংবাদ রাখেন!

---

## ইউরোপে অদ্ভুত কর্ম্মা দরবেশ

কিছুদিন পূর্ব্বে রিউটার কোম্পানী দেশময় প্রচার করিয়াছিলেন যে, তাহের বে নামক একজন প্রাচ্য দরবেশ অলৌকিক কাণ্ড দেখাইয়া প্যারি নগরীর অধিবাসীদিগকে হতভম্ব করিয়া দিয়াছেন, বহু ডাক্তার ও বহু বৈজ্ঞানিক বিভিন্ন প্রকারে আন্দোলন আলোচনা ও দেখাশুনা করিয়াও তাঁহার অত্যাশ্চর্য্য কার্য্য সমূহের বিজ্ঞান-সম্মত কোন সমাধান করিতে পারেন নাই।

সম্প্রতি তাহের বে ইংলণ্ডে অবস্থান করিতেছেন। বগ্রাফিক পত্রের জনৈক লেখক তাঁহার সম্বন্ধে অনেক সংবাদ প্রকাশ করিয়াছেন। এই বিংশ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিক যুগে তাঁহার অলৌকিক কার্য্য দেখিয়া ইউরোপবাসীগণ অবাক হইয়া গিয়াছেন, লেখক তাহের বে ও তাঁহার আশ্চর্য্য প্রক্রিয়া সমূহের কতকগুলি চিত্র প্রকাশিত করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন—

বিগত দুই বৎসর হইতে প্যারি নগরীতে মাঝে মাঝে তাহের বেকে দেখিতে পাওয়া যায়। তিনি মধ্যমাকৃতির লোক, তাঁহার গায়ের বর্ণ জয়তুন তৈলের ন্যায়। সকল সময়েই তিনি ইউরোপীয় 'লেবাস পোষাকে' সজ্জিত হইয়া থাকেন। তাঁহার অলৌকিক কার্য্য সমূহের গূঢ় রহস্য ভেদ করিবার শক্তি কাহারও নাই। বিগত ২॥ বৎসর হইতে তাঁহার ক্রিয়াকাণ্ডে ইউরোপের ন্যায় সভ্যদেশেও হুলুস্থুল পড়িয়া গিয়াছে।

* এ সম্বন্ধে অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি আগামীতে প্রকাশ করার ইচ্ছা রহিল।
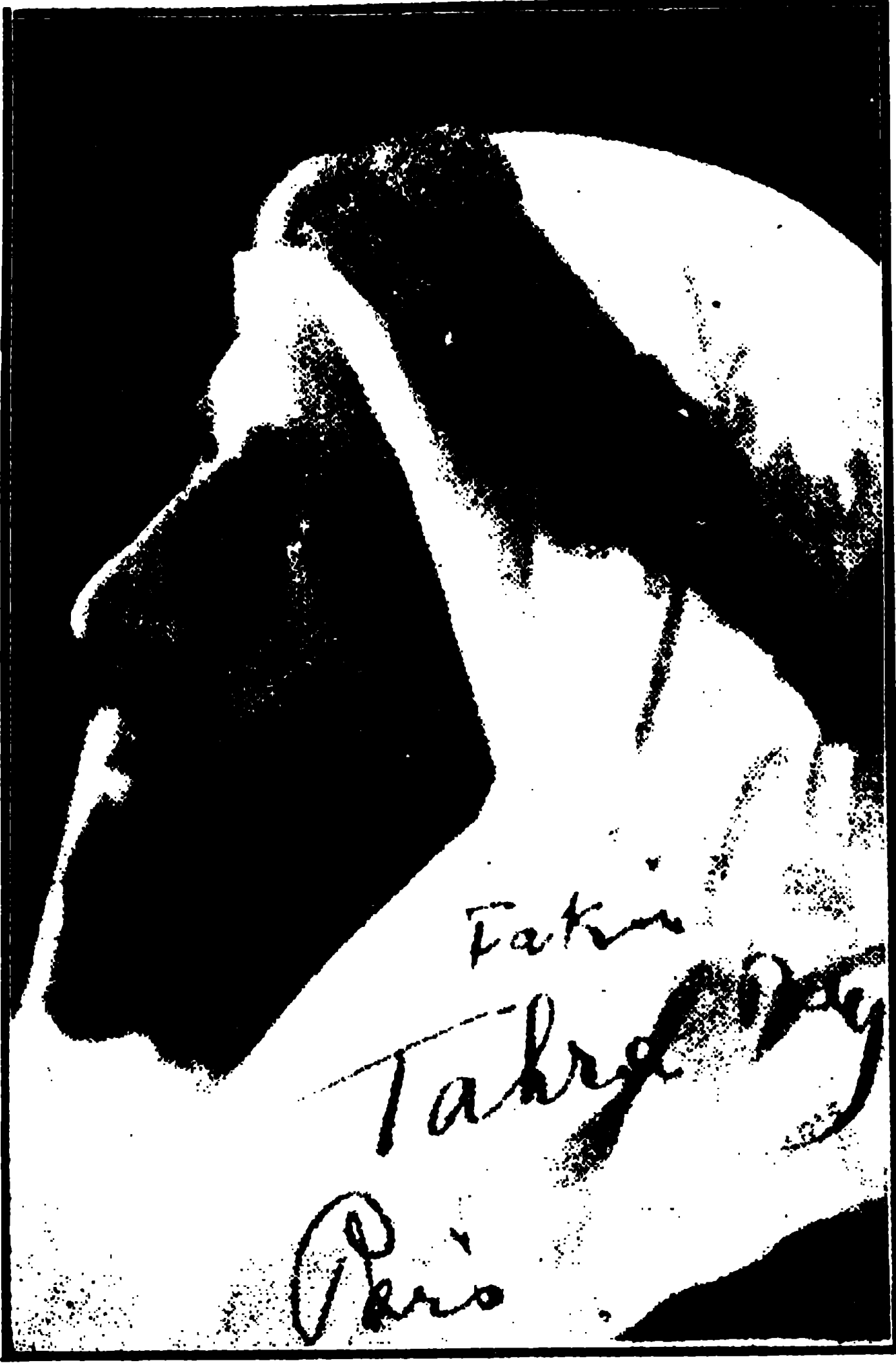
তাহের বে --দরবেশ

তাহের বে, খৃষ্টীয় ১৮৯৭ সালে 'তানজা' নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। জন্মের অব্যবহিত পরেই তাঁহার গর্ভধারিণীর মৃত্যু হয়। সে অঞ্চলের প্রাচীন প্রথানুযায়ী শিক্ষার জন্য তাঁহাকে শিশুকাল হইতেই মুসলমান ফকীরদের সংশ্রবে দেওয়া হইয়াছিল। এজন্যই বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তিনি ফকীরী ভাবাপন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে তিনি কনষ্টান্টিনোপলে আসিয়া সাধারণভাবে তুর্কী ছাত্রদের ন্যায় লেখাপড়া শিখিতে আরম্ভ করেন। ইহার কিছুদিন পর চিকিৎসা শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া সেখানকার তিব্বীয়া মাদ্রাসার 'সনদ' পাইয়াছিলেন। এইবার কনষ্টান্টিনোপল হইতে ঘরে ফিরিয়া তিনি নির্জ্জন সাধনায় প্রবৃত্ত হইলেন। দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত বাহ্য জগতের সহিত তাঁহার কোনও সংশ্রব ছিল না। বহুদিনের পর কঠোর সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়া আবার তিনি লোক সমাজে ফিরিয়া আসিলেন। ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে ভক্ত অনুরক্ত দলের মধ্যে কয়েকজনকে লইয়া তিনি একটী সমিতি গঠন করিলেন। এই সমিতির উদ্দেশ্য হইল জড়বাদী ইউরোপীয়গণের নিকট আধ্যাত্মিক শক্তির প্রভাব প্রদর্শন।

ইউরোপ, উত্তর আফ্রিকা বিশেষতঃ ইংলণ্ডের বিভিন্ন স্থানে তাহের বে ভ্রমণ করিয়াছেন। তিনি যেখানেই গিয়াছেন তাঁহার আধ্যাত্মিক শক্তির পরিচায়ক অলৌকিক কাণ্ডসমূহ দেখিয়া তত্রত্য জনসাধারণ ও বৈজ্ঞানিক সম্প্রদায় মুগ্ধ ও স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছেন। পাণ্ডিত্য ও বৈজ্ঞানিক গবেষণার মধ্যবর্ত্তিতায় তাঁহারা এ সমস্যার কোন সমাধান করিতে পারেন নাই।

১৯২৫ খৃষ্টাব্দে তাহের বে সর্ব্বপ্রথম প্যারিনগরে গমন করেন, তৎপূর্ব্বে কয়েকমাস ইটালীতে ছিলেন। রোম, নেপল্‌স প্রভৃতি বিভিন্ন স্থানে ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ তাঁহার আধ্যাত্মিক শক্তির প্রভাব দেখিয়া অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলেন। কিছুদিন পর্য্যন্ত ইটালীর সাময়িক পত্রিকা সমূহে তাঁহার এই শক্তির অভিনবত্ব ও অলৌকিক কীর্ত্তি সমূহ প্রকাশিত হইত। রোমের রাজ সভায় ও বিভিন্ন রাজ্যের দূতগণের সম্মুখে তিনি তাঁহার শক্তির পরিচয় দিয়াছিলেন। কয়েকবার স্বয়ং মুসোলিনী তাঁহাকে সম্মানের সহিত আহ্বান করিয়াছেন, রাজা ভিক্টর এমানুয়েল তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছেন। সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জ তাঁহার অভিনব কার্য্য-কলাপ দেখিবার জন্য বিশেষভাবে আগ্রহ দেখাইয়াছেন।

একবার ফ্রান্সের পণ্ডিতমণ্ডলী একত্রিত হইয়া তাঁহার শক্তি পরীক্ষা করিয়াছিলেন। সংবাদপত্রের রিপোর্টারগণও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তাঁহারা তাঁহার অত্যাশ্চর্য্য আধ্যাত্মিক শক্তির পরিচয় পাইয়া স্তম্ভিত হইয়া পড়েন এবং একযোগে মত প্রকাশ করেন যে—এসকল ব্যাপার 'সম্মোহন বিদ্যা' বা এই শ্রেণীর অন্য কোন প্রক্রিয়া প্রভাবে ঘটিতে পারে না। লণ্ডনের একটী সুবিখ্যাত রঙ্গালয়ে তিনি আধ্যাত্মিক শক্তির প্রভাব দেখাইয়াছিলেন। সেদিন সেখানে অসংখ্য লোক-সমাগম হইয়াছিল। সমবেত দর্শকদের মধ্যে ৩০ জন লোক

আশ্চর্য্য ব্যাপার দর্শনে সম্পূর্ণ সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়িয়াছিল, তাই মাঝখানেই তাঁহার কাজ বন্ধ করিতে হইয়াছিল !

তাহের বে বলিয়াছেন—এ সকল অলৌকিক ব্যাপার এসলামের অনুমোদিত আধ্যাত্মিক শক্তির প্রভাবেই ঘটিয়া থাকে। অন্য কোন কারণে ইহা আদৌ হইতে পারে না, আমি জোর করিয়া বলিতে পারি, মুসলমান ফকীর দরবেশ ভিন্ন অন্য কাহারও এই শক্তির অধিকারী হওয়া সম্ভবপর নহে। তাঁহাদের শক্তি অসীম। তিনি আরও বলিয়াছেন—কেহ অস্ত্রাঘাত করিয়া আমার কোন অনিষ্ট করিতে পারিবে না, আমি শ্বাস-প্রশ্বাস রুদ্ধ করিয়া সম্পূর্ণরূপে মৃতবৎ অবস্থায় উপনীত হইতে পারি। এরূপ করিলে বিজ্ঞচিকিৎসকের দল শতবার পরীক্ষা করিয়াও আমার জীবনীশক্তির সামান্য চিহ্নও দেখিতে পাইবেন না। দীর্ঘ সময় পর্য্যন্ত মৃত্তিকাগর্ভে সমাহিত অবস্থায় থাকিতে আমি সম্পূর্ণ সক্ষম, জীবন ও মৃত্যু আমার আয়ত্বাধীন। পরলোকগত ভালমন্দ উভয়বিধ আত্মাকে আমি আহ্বান করিতে পারি। একবার তিনি বহু ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের সাক্ষাতে শ্বাসপ্রশ্বাস ক্রিয়া রোধ করিয়া মৃতবৎ হইয়া পড়িলেন, সেই অবস্থায় তাঁহার নাক, কাণ ও মুখ-গহ্বর তুলা দিয়া বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল, অতঃপর তাঁহার দেহ একটী কাষ্ঠের বাক্সে পুরিয়া সেটী বালুকাপূর্ণ করতঃ মৃত্তিকাগর্ভে পুঁতিয়া ফেলা হইল। নির্দ্দিষ্ট সময় উত্তীর্ণ হইলে বৈজ্ঞানিকেরা বাক্সটী তুলিয়া ফেলিলেন এবং তাহার আবরণ উন্মোচন করিয়া তাহের বেকে বাহির করিলেন, তারপর কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে তাঁহার দেহে জীবনীশক্তি ফিরিয়া আসিল, তিনি ধীরে ধীরে উঠিয়া বসিলেন ও স্বাভাবিক ভাবে তাঁহার দেহে শ্বাস-প্রশ্বাস ক্রিয়া আরম্ভ হইল।

তাহের বে বলিয়াছেন —এইরূপ সমাহিত অবস্থায় শরীরে জীবনীশক্তি না থাকিলেও মস্তিষ্কের ক্রিয়া কিন্তু সজাগ ও সম্পূর্ণ অবিকৃত অবস্থায় থাকে। বরং পূর্ব্বাপেক্ষা আরও সতেজ হয়। তিনি তিন বৎসর পর্য্যন্ত মৃত্তিকাগর্ভে সমাহিত হইয়া থাকিতে পারেন। সম্প্রতি মিসরদেশে গিয়া তিনি তাঁহার এই ভীষণ সাধনার পরীক্ষা দিতে মনস্থ করিয়াছেন এবং এখন হইতে তজ্জন্য প্রস্তুত হইতেছেন। এক্ষণে তাঁহার বয়স ৩০ বৎসর। যুবাবস্থায় পরীক্ষা দেওয়াই সুবিধাজনক, প্রৌঢ় বা বৃদ্ধাবস্থায় এই প্রকার সাধনার শক্তি কমিয়া যায়।

তাহের বের কার্য্যসমূহ সাধারণ মানুষের বিচার বিবেচনার সম্পূর্ণ বাহিরে। তাঁহার এই সকল অভিনব কাণ্ড দেখিয়া ইউরোপীয় পণ্ডিতগন অবাক হইয়া গিয়াছেন। তাঁহারা ইহার বিজ্ঞানসম্মত কোন কারণই খুঁজিয়া পান নাই। তিনি তাঁহার মুখমণ্ডল, বাহু, পদদ্বয় ও দেহের বিভিন্ন স্থানে তীক্ষ্ণধার লৌহ শলাকা ও ছুরির অগ্রভাগ বিদ্ধ করিয়া থাকেন। বক্ষস্থলেও ছুরি চালাইয়া দেন, বুক হইতে ছুরি বাহির করিলে সেখান হইতে ভীষণভাবে রক্তস্রাব হয়, দর্শকমণ্ডলী ডাক্তারদের সাহায্যে মানুষের বক্ষঃনিসৃত রক্ত

তাহের বেকে বাক্সের ভিতর হইতে বাহির করা হইয়াছে। একজন ডাক্তার ধীরে ধীরে তাঁহাকে দাঁড় করাইতেছেন।

বলিয়া স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার পর তৎক্ষণাৎ তাঁহার ইচ্ছানুযায়ী রক্তস্রাব বন্ধ হইয়া যায়। নাড়ীর গতি তাঁহার ইচ্ছামত দ্রুত ও মন্দীভূত হইয়া থাকে। অসংখ্য তীক্ষ্ণধার লৌহশলাকাবিদ্ধ কাষ্ঠনির্ম্মিত তক্তার উপর তিনি অবাধে শয়ন করিয়া থাকেন, সেই অবস্থায় তাঁহার পেটের উপর ১৭৫ পাউণ্ড ( ৮৭॥০ সের ) ওজনের প্রস্তরখণ্ড রক্ষিত এবং গুরুভার লৌহ মুদ্গরের সাহায্যে তাহা চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া ফেলা হয়।

বিশ্বস্তসূত্রে জানিতে পারা গিয়াছে—এখন হইতে প্রায় চারিশত বৎসর পূর্ব্বে শেখ আবদুল ওহাব শো'রানী নামক একজন মুসলমান পণ্ডিত কাহেরায় একবার এই শ্রেণীর বহু অলৌকিক কাণ্ড একজন মুসলমান ফকিরের নিকট প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন; কিন্তু বাস্তবতঃ তিনি তাহার কোনই কারণ, খুজিয়া পান নাই।

---

## চীনের প্রাচীন মস্‌জিদ

প্রথম মস্‌জিদের মিনার

চীনে সর্ব্বপ্রথম মস্‌জিদ-নির্ম্মাণের নিদর্শনস্বরূপ মিনারে খোদিত স্মৃতিলিপি—

বোর্ড অব রেভিনিউ এবং আদম শুমারী বিভাগের সেক্রেটারী ওয়াং কুং কর্ত্তৃক খোদিত—

আমি জানি, শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া যাহা সর্ব্ব প্রকার প্রশ্নের অতীত হইয়া অপরিবর্ত্তিত অবস্থায় বিদ্যমান থাকে, তাহাই সত্য এবং শতাব্দীর ব্যবধান সত্ত্বেও মানুষ যাহার দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়া পড়ে; তাহাই প্রাণ। ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তকগণের মধ্যে সকলেরই প্রাণের ভাব-ধারা একমুখী এবং তাঁহাদের নীতি বা শিক্ষাও এক। সেই নিমিত্ত পারম্পরিক ভাবে তাঁহারা একে অন্যের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকেন এবং সে-প্রভাব যুগ-যুগান্ত পরেও পূর্ব্বের মত অক্ষুন্ন থাকে।

পৃথিবীর প্রায় সকল অংশেই ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তকগণের আবির্ভাব হইয়াছে। তাঁহারা সকলেই ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক নামে অভিহিত হইয়াছেন, কারণ তাঁহাদের পরস্পরের ভাবধারা ও শিক্ষার মধ্যে সাদৃশ্য ছিল। পাশ্চাত্যের ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক মোহাম্মদ, কনফিউনিয়াসের পরবর্ত্তী যুগে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহার বাসস্থান ছিল আরব ভূমি। তাঁহাদের উভয়ের মধ্যে স্থান ও কালের যে ঠিক কতখানি ব্যবধান ছিল, তাহা আজও আমাদের অজ্ঞাত রহিয়াছে। তাঁহাদের পরস্পরের ভাষার মধ্যে পার্থক্য ছিল, কিন্তু নীতি বা শিক্ষা ছিল এক। এরূপ হইবার কারণ কি? কারণ অন্য কিছুই নহে, তাঁহাদের অন্তরের ভাবধারা একই লক্ষ্যে প্রবাহিত হইত এবং সেই জন্যই তাঁহাদের নীতি বা শিক্ষার কোনও পার্থক্য পরিলক্ষিত হইত না। প্রাচীনেরা বলিতেন, "সহস্র ধর্ম্মগুরু অন্তরে অন্তরে একই ভাব পোষণ করিয়া থাকেন, দশ সহস্র বৎসর কাল একই শাসননীতি বলবৎ থাকে।"

কাল ও জাতির মধ্যে আজ যথেষ্ট ব্যবধান ঘটিয়াছে এবং ধর্ম্মগুরুগণও ইহলোকের অন্তরালে চলিয়া গিয়াছেন; কিন্তু তাঁহাদের চিরপবিত্র গ্রন্থাবলী আজিও অমর হইয়া আছে। তাহা হইতেই আমরা বুঝিতে পারি যে, পাশ্চাত্যের ধর্ম্মগুরু একটা অতি-মানুষিক মানসিক শক্তি লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, যে-শক্তির বলে স্বর্গ মর্ত্ত্যের যাবতীয় বস্তুর সৃষ্টি হইয়াছে, তিনি সে শক্তিকে বুঝিয়াছিলেন। জীবন-মৃত্যুর বাহ্য বা আভ্যন্তরীণ রহস্যও তিনি বুঝিতেন। তাঁহার শিক্ষার মধ্যে এমন কিছু আছে, যাহাতে মানুষ সম্পূর্ণরূপে পাপমুক্ত হইয়া পবিত্র হইতে, অল্পে সন্তুষ্ট হইতে, উপবাসের দ্বারা সহনশীলতায় অভ্যস্ত হইতে, পাপ ও অন্যায় হইতে দূরে সরিয়া আত্মোন্নতির পথে অগ্রসর হইতে এবং প্রতারণা ছাড়িয়া জনসাধারণের উপর প্রভাব বিস্তার করিবার একমাত্র পন্থা সত্যের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিতে শিক্ষা করে। তাঁহার শিক্ষায় পরিণয়-কালে পারস্পরিক ভাবে যাহাতে সকলে সকলের সহযোগীতা করে, শবদেহ সমাহিত করিবার সময় সকলে সমাধিস্থলে উপস্থিত হয়। তাহার ব্যবস্থা আছে।

নৈতিক বাধ্যবাধকতার এই সমস্ত বৃহৎ ব্যাপার ছাড়িয়া দিয়া প্রাতরুত্থান, বিশ্রাম, পান-ভোজন প্রভৃতি তুচ্ছ ব্যাপারের কথা ভাবিয়া দেখিলেও বুঝা যাইবে যে, এই সমস্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাজের মধ্যে এমন একটি কাজও নাই, যাহার জন্য একটা সঙ্গত ও নির্দ্দিষ্ট নীতি না আছে এবং যাহা সমাধা করিবার সময় প্রতি মুহূর্ত্তেই স্রষ্টার দোহাই দেওয়া না হয়। যদিও এই ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকের শিক্ষা-সমূহ পরস্পর বিভিন্নমুখী, তথাপি তাহারা পরিণামে একই লক্ষ্যে গিয়া মিলিত হইয়াছে

এবং এই লক্ষ্য বিশ্বভুবনের একমাত্র প্রভু—যিনি স্রষ্টা ও পালকরূপে চরাচরকে সৃষ্টি করিয়াছেন ও পালন করিতেছেন, তিনি ভিন্ন আর কেহ নহেন। আর সেই বিশ্বপ্রভুর উপাসনার যে পদ্ধতি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, এক কথায় বলিতে গেলে তাহা আমাদের অন্তরের বিশ্বাস বা ভক্তি ব্যতীত অন্য কিছুই নহে।

সম্রাট ইয়াও বলিয়াছেন, "বিশ্বাস বা ভক্তিই সর্ব্বশক্তিমান প্রভুকে মিলাইয়া দেয়।" সম্রাট চ্যাং বলিয়াছেন, "পবিত্র বিশ্বাস দিনে-দিনে মানুষকে উন্নতির পথে অগ্রসর করিয়া দেয়।" সম্রাট ওয়েন বলিয়াছেন "বোধশক্তি সহকারে প্রভুর উপাসনা কর।" কন্‌ফিনিয়াস্ বলিয়াছেন "যে প্রভুকে অসন্তুষ্ট করে, তাহার প্রার্থনা করিবার আর কেহই থাকে না।"

সাধারণ ভাবে এই সমস্ত কথার দ্বারাই বিভিন্ন ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তকগণের ভাব-ধারার সাদৃশ্য বুঝিতে পারা যায় এবং ইতিপূর্ব্বে ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকগণের একের অন্যের উপর প্রভাব-বিস্তারের ও যুগ-যুগান্ত পরেও সে-প্রভাব অক্ষুণ্ণ থাকার কথা যাহা বলা হইয়াছে, তাহাও সুস্পষ্টরূপে প্রমাণিত হইয়া যায়।

মোহাম্মদ, অন্যান্য ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তকগণের ন্যায় একই শিক্ষা দান করিয়া গিয়াছেন বটে, কিন্তু তাহা কেবলমাত্র পাশ্চাত্য দেশেই প্রাধান্য বিস্তার করিয়াছিল। অতঃপর সুয়ী বংশের সম্রাট কাই হোয়াংএর রাজত্বকালে তাহা চীনদেশে প্রচারিত হয় এবং ক্রমশঃ সমগ্র সাম্রাজ্য মধ্যে প্রভাব বিস্তার করে।

সম্রাট চিয়ান পা-ও, মোহাম্মদের অনুবর্ত্তীগণের জন্য Public Works এর Suprintendent লো চিয়ান চিওকে এই মসজিদ-নির্ম্মাণের ভার গ্রহণ করিবার নিমিত্ত আদেশ করেন।

সম্রাট চিয়ান পা-ওএর রাজত্বের প্রথম বৎসরের তৃতীয় মাসে এই মসজিদ-নির্ম্মাণের কার্য্য আরম্ভ হয় এবং ঐ বৎসরের অষ্টম মাসের বিংশ দিবসে সমাপ্ত হয়।

পাই-চু-আর-চি এবং অন্যান্য যাঁহারা এই মসজিদ নির্ম্মাণ-কার্য্যে সহায়তা করিয়াছিলেন, তাঁহারা সম্রাট চিয়ান পা-ওএর রাজত্বের প্রথম বর্ষের অষ্টম মাসে ( ৭৪২ খৃষ্টাব্দে ) এই স্মৃতিলিপি খোদিত করিয়াছিলেন।

---

# আরবী চিকিৎসা শাস্ত্র ও পাশ্চাত্য জগতে তাহার প্রভাব

অন্যান্য শাস্ত্রের ন্যায় অতি প্রয়োজনীয় চিকিৎসাশাস্ত্র সম্বন্ধেও মোসলমান পণ্ডিতগণ অনেক কিছু করিয়াছেন। তাঁহাদের পূর্ব্ববর্ত্তী কালেও এই শাস্ত্রের অস্তিত্ব ছিল; কিন্তু মুছলমানগণ বিশেষ ভাবে ইহার আলোচনা, গবেষণা ও উন্নতি সাধন করিয়াছেন।

পাশ্চাত্য-সভ্যতার মধ্যযুগে ( middle age ) আরবী দর্শনের ন্যায় আরবী চিকিৎসাশাস্ত্রও ইউরোপের বিদ্যালয় সমূহে রীতিমত পাঠ্য তালিকাভুক্ত ছিল। জকেরীয়া রাজী, বুআলীসীনা ( شيخ الرئيس ), এব্‌নে রুশিয়া, এবনে রোশদ, এব্‌নে জহর, এবনে তোফেল ও এবনে মসকো-ওয়ায়হ প্রভৃতি মোস্‌লেম পণ্ডিতগণের লিখিত গ্রন্থাবলীই সে সময় চিকিৎসাশাস্ত্রের গভীর গবেষণাপূর্ণ শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ বলিয়া পরিগণিত হইত। চিকিৎসা বিজ্ঞানের বর্ত্তমান উন্নতির যুগেও ক্যানন ( Cannon ) বা বুআলী সিনার "কানুন" গ্রন্থের উল্লেখ বিশেষ ভাবে দেখিতে পাওয়া যায়। খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দী পর্য্যন্ত এই গ্রন্থখানি ফ্রান্স ও রোমের চিকিৎসা বিদ্যালয় সমূহে পাঠ্য শ্রেণীভুক্ত ছিল। দর্শন শাস্ত্রের ন্যায় চিকিৎসা শাস্ত্রের আলোচনাতেও পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকগণ Avicenna, Averreos The great এবং Avempasa প্রভৃতি আরব পণ্ডিতগণের নাম ও এই শাস্ত্রে তাঁহাদের বিশেষ পারদর্শিতার কথা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন। এগুলি আরবী নাম বুআলীসীনা, এবনে রোশদ এবং এবনে বাজার অপভ্রংশ বা ইংরাজী উচ্চারণের রূপান্তর মাত্র। এই মুসলমান পণ্ডিতগণ পাশ্চাত্য জগতে কি প্রকার প্রসিদ্ধি ও প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন, ইহা হইতেই তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়। রোম ও অন্যান্য বিভিন্ন স্থানের প্রাচীন প্রতিষ্ঠান সমূহের রঙ্গীন কাচ নির্ম্মিত দরজা জানালা সমূহে আরাস্ত, ( এরিষ্টটল ) বোক্‌রাৎ ও জালিনুসের ছবির পাশাপাশি বুআলী-সীনা, এবনে রোশদ, ফারাবী ও জাকারীয়া রাজী প্রভৃতি মুসলমান চিকিৎসাবিদ্যাবিশারদ পণ্ডিতগণের চিত্র অঙ্কিত হইয়াছিল, ইউরোপের ধর্ম্মাধিপতি পোপের রাজ-প্রাসাদে আজিও ঐ কাচখণ্ডগুলি ঐতিহাসিক

সাক্ষ্যরূপে বিদ্যমান রহিয়াছে। প্রাচ্য-বিদ্যাবিৎ ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের অনেকেই তাঁহাদের রচিত গ্রন্থসমূহে উহার আলোকচিত্র প্রকাশ করিয়াছেন। আরবী চিকিৎসা-শাস্ত্রে প্রচলিত বহুশব্দ আজিও ইউরোপীয় ভাষার চিকিৎসা গ্রন্থ সমূহে বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হইতেছে। সেগুলি বাদ দিলে বহু ঔষধ ও বহুরোগ-বর্ণনার ভাষা খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না। নমুনা স্বরূপ নিম্নে এই প্রকার কয়েকটী শব্দের উল্লেখ করা হইল—

| আরবী শব্দ | | ইংরাজীতে ব্যবহৃত শব্দ |
|---|---|---|
| তামারে হিন্দী ( তেঁতুল ) | تمرهندی | Tamarind |
| ইয়া সমীন | یاسمین | Jasmine |
| এশাব | یشب | Jasper |
| তিরইয়াক | ترياق | Theriac |
| কান্দ | قند | Candi |
| র ওগনে বলসান | روغن بلسان | Balsam |
| আম্বার | عنبر | Ambar |
| কাফুর ( কর্পূর ) | کافور | Camphar |
| বেল্লোর | بلور | Balwer |
| আলআম্বীক | الانبيق | Alembic |
| আল্‌কিমিয়া | الكيميا | Alchemy |
| আলকোহল | الكحل | Alcohol |
| আলবাক ( চক্ষের দাগ বিশেষ ) | البق | Albuge |
| লোবান | لبان | Olibanum |
| র ওগনে নেফত | روغن نفط | Naptha |
| আল্‌একসীর | الاكسير | Elixir |
| কারনিয়তুল আয়েন | قرنية العين | Carnea |
| শাজারলবান | شجرالبان | Ben |
| সেম্‌সেম্ ( তিল ) | سمسم | Sesame |
| জারসুমা ( বীজাণু ) | جرثومه | Germ |
| মেস্‌ক | مسک | Musk |
| আরক | عرق | Arrack |
| নারজাস্ বা নার্গীস | نرجس | Nereissum |
| জাফরান | زعفران | Saffran |

| আরবী শব্দ | | ইংরেজীতে ব্যবহৃত শব্দ |
|---|---|---|
| শাকায়েকনন'মান | شقائق النعمان | Aneman |
| ফেলফেল | فلفل | Pepper |
| ফাদজহর | فادزهر | Bezzar |
| লেমু ( নেবু ) | ليمون | Lemon |
| সনামক্কী | سنامكى | Senna |
| মার্‌ওয়ারিদ | مروارید | Margaret |
| সাবুন | صابون | Soap |
| রব | رب | Rab |
| লুজ | لوز | Lozenge |
| ফারজাজা | فرزجه | Pessary |
| শারবাৎ | شربت | Syrups |
| লউক | لعوق | Linctus |
| রেওয়ান্দ | ريوند | Rhie |
| কারান্‌ফাল | قرنفل | Caryophylli |
| বুরক | برق | Borice |
| সোন্দল | صندل | Santal |
| করোয়া ( জিরা ) | كرويه | Carui |
| কাবাব চিনি | کبابچینی | Cubebae |
| কানাব ( ভাঙ্গ ) | قنب | Cannb |
| তারতীর | طرطير | Tartaratum |
| জানজাবীল | زنجبيل | Zingiber |
| সুম্বাল | سنبل | Sumbul |
| মরাহ | مرح | Myrrhae |
| জাল্লাব | جلاب | Jalap |
| সয়াফ | شياف | Suppo |
| মর | مر | Myrrha |

এই প্রকার অসংখ্য শব্দ প্রচলিত আছে।

খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত ইউরোপবাসীগণ চিকিৎসা সম্বন্ধে আরবীয় চিকিৎসা-প্রণালী ও আরব চিকিৎসকগণের উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিতেন। এখন প্রাচ্যদেশে কাহারও কঠিন পীড়া হইলে যেরূপ পাশ্চাত্য চিকিৎসকগণের

ডাক পড়ে, সে সময় ইউরোপীয় নরপতিগণ পীড়িত হইলে সেইরূপে মিসর ও শামদেশ হইতে আরব চিকিৎসকগণকে আহ্বান করা হইত। মোসলমান ভিষকগণের ইউরোপে অবস্থিতি ও জটিলতম ব্যাধি-সমূহে তাঁহাদের অলৌকিক চিকিৎসানৈপুণ্য প্রদর্শনের নিদর্শন আজিও ইউরোপে বিদ্যমান রহিয়াছে। ফ্রান্সের বিখ্যাত পণ্ডিত অধ্যাপক রিনড্ ( Reinaud ) তাঁহার রচিত "ক্রুসেড যুদ্ধের পর জ্ঞানচর্চ্চাক্ষেত্রে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সম্মিলন" নামক গ্রন্থে এসম্বন্ধে অনেক কিছু লিখিয়াছেন। ইউরোপের নরপতি-গণের চিকিৎসারত আরব চিকিৎসক ও তাঁহাদের ব্যবহৃত যন্ত্রপাতির বিভিন্ন চিত্র তাঁহার ঐ গ্রন্থে প্রকাশিত হইয়াছে। সিসিলি হইতে আনীত প্রাচীনতর গ্রন্থাবলীর সহিত ঐ চিত্রগুলিও পোপের রাজকীয় প্রাসাদে রক্ষিত হইয়াছিল। অনেকে সেগুলি বিশেষভাবে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া নিম্নলিখিত মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন—

( ১ ) দই চিত্রগুলি খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ অথবা চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে সিসিলীর চিত্র-শিল্পীগণ কর্ত্তৃক অঙ্কিত হইয়াছিল।

( ২ ) একটী চিত্রে জনৈক পীড়িত নরপতির চিকিৎসা কার্য্যে নিরত আরব-চিকিৎসক ও তাঁহাদের যন্ত্রপাতি ব্যবহারের চিত্র প্রদর্শিত হইয়াছে।

( ৩ ) আর একটী চিত্রে আরবের ভিষকগণ রোগীর দেহে উত্তপ্ত লৌহশলাকা প্রয়োগ করিতেছেন, ইহাই দেখান হইয়াছে, ঐ সম্বন্ধীয় যন্ত্রাদির চিত্র ও প্রয়োগ-প্রণালীর দৃশ্য ছবিটীতে বেশ ফুটিয়া উঠিয়াছে। বলা বাহুল্য সে সময় ও তাহার পর বহুদিন পর্য্যন্ত পাশ্চাত্য চিকিৎসা জগতেও ঐ প্রণালী প্রচলিত ছিল। অধুনা অনাবশ্যক বিবেচনায় পরিত্যক্ত হইয়াছে।

( ৪ ) উপরের বর্ণিত চিত্রটি সিসিলিরাজ দ্বিতীয় ফ্রেডারিকের চিকিৎসার সময় অঙ্কিত হইয়াছিল বলিয়া অনেকে মত প্রকাশ করিয়াছেন। ১২২০ খৃষ্টাব্দে তাঁহার রাজ্যাভিষেক হইয়াছিল। ফ্রেডারিক আরবী ভাষা ও আরবীয় সভ্যতার বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন। আর এক সম্প্রদায় বলিয়াছেন, এই চিত্রটী ঐ সময়ের বহুদিন পরে অঙ্কিত হইয়াছিল। তাঁহারা বলেন—নেপল্‌সরাজ দ্বিতীয় চার্লসের রাজত্বকালে ইহা গৃহীত হইয়াছিল। দ্বিতীয় চার্লস কয়েক বার মিসর ও মরক্কো হইতে আরব চিকিৎসকগণকে তাঁহার চিকিৎসার্থে আনাইয়াছিলেন, এরূপ হইলে চিত্রটী খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীর বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। নেপল্‌সরাজ দ্বিতীয় চার্লস ১৩০৯ খৃষ্টাব্দে পরলোকগমন করিয়াছেন।

ঐতিহাসিক হিসাবে চিত্রগুলি অমূল্য বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। ইহা হইতে সেকালের ইউরোপীয়গণের আরবী চিকিৎসার প্রতি অনুরাগ, আরবচিকিৎসকগণ, তাঁহাদের চিকিৎসা পদ্ধতি ও ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি সম্বন্ধে বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়।

# কাঁটাফুল

( পূর্ব্বানুবৃত্তি )

[ শাহাদাৎ হোসেন ]

৫

গভীর রাত্রির নিকষ-কৃষ্ণ অন্ধকার ভেদ করিয়া বিকট অন্ধদৈত্যের মত পাঞ্জাব মেল ছুটিয়া চলিয়াছে। তাহারই মধ্যে মধ্যম শ্রেণীর এক কোণে উপবিষ্ট খলিল বাহিরের দিকে মুখ করিয়া বিশ্বপ্রকৃতির তমোমূর্ত্তির পানে উদাসনেত্রে চাহিয়া আছে। এই যে অন্ধকার—গাঢ় ঘন দুর্ভেদ্য অন্ধকার,—ইহারও শেষ আছে, ইহারও অবসান আছে; কিন্তু যে-অন্ধকারে আজ তাহার অন্তর্দ্দেশ সমাচ্ছন্ন হইয়া আছে, তাহার ত শেষ নাই, অবসান নাই। তবে?—

খলিলের অন্তরের অন্তস্তল হইতে প্রশ্ন উঠিল—তবে?

এই বিপুল সংসারের মাঝে এমন স্থান কি কোথাও আছে, যেখানে গেলে তাহার অন্তরের এই অবিচ্ছেদ্য অন্ধকারের অবসান ঘটিবে,—এই তীব্রদাহী মর্ম্মক্ষতে শান্তি-প্রলেপ পড়িবে? না—তাহা ত নাই! তবে কোন্ আশায়, কিসের সন্ধানে সে উদ্‌ভ্রান্তের মত ছুটিয়া চলিয়াছে? তাহার এ-গতির নিবৃত্তিই বা কোথায়? কতদূরে—কোন্ কাম্য লক্ষ্যে পৌছিয়া তাহার আজিকার এই নিরুদ্দেশ-যাত্রার অবসান হইবে!

খলিল আর ভাবিতে পারিল না। নৈরাশ্যের একটা গভীর মর্ম্মভেদী দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া সে বাহিরের দিক হইতে মুখ টানিয়া লইল এবং গাড়ীর জানালা বন্ধ করিয়া দিয়া শুইবার উপক্রম করিল।

সম্মুখের বেঞ্চিতে একজন বাঙ্গালী ভদ্রলোক বসিয়াছিলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, কোথায় যাবে ভাই?

ভদ্রলোকটীর পরিধানে সাদাসিদা বাঙালীর পোষাক, তাহার মধ্যে এতটুকু আড়ম্বর নাই; কিন্তু তাঁহার সৌম্য কান্ত মুখমণ্ডলে এমন একটা দীপ্তি ফুটিয়া আছে যে, দর্শন মাত্রেই লোকের মন স্বতঃই তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধায় নত হইয়া আসে।

ভদ্রলোকের প্রশ্ন শুনিয়া খলিল মুখ তুলিয়া তাঁহার পানে চাহিল। অপরিচিতের মুখে তুমি সম্বোধন শুনিয়া তাহার মনে হঠাৎ একটা বিরক্তির ভাব জাগিয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু তাঁহার মুখের দিকে চাহিতেই সে-ভাব মুহূর্ত্তের মধ্যে দূরীভূত হইয়া গেল। সে নম্রকণ্ঠে উত্তর দিল—আগ্রা।

তাহার নিকট আগ্রা পর্য্যন্ত টিকিট ছিল।

—আগ্রা! তাহ'লে তোমার সঙ্গে আলাপ হ'য়ে ভালই হ'ল দেখ্‌ছি। অনেকখানি পথ একসঙ্গে যাওয়া যাবে' এখন। আগ্রাতে তোমার কে আছেন?

খলিলের মুখে সহসা এ-প্রশ্নের উত্তর জোগাইল না। তাই একটু ইতস্ততঃ করিয়া কহিল,—বিশেষ আত্মীয় কেউ নেই।

—তবে?

খলিল কি উত্তর দিবে! সে যেন সমস্যার মধ্যে পড়িয়া গেল।

ভদ্রলোকটী পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, বন্ধু-বান্ধব কেউ আছেন?

খলিল মাথা নীচু করিয়া উত্তর দিল, না।

—তাহ'লে কোথায় গিয়ে উঠ্‌বে?

খলিল নিরুত্তর।

ভদ্রলোকটীর মনে সন্দেহের ছায়াপাত হইল। ভিতরে একটা কিছু রহস্য আছে বলিয়া তিনি ধারণা করিয়া লইলেন, সঙ্গে সঙ্গে ইহাও ধারণা করিলেন যে, আগ্রাতে খলিলের

কোন পরিচিত লোক নাই এবং সে বাড়ী হইতে পলাইয়া বা রাগ করিয়া আসিয়াছে ; কিন্তু মুখে এই সন্দেহের ভাব কিছুমাত্র প্রকাশ না করিয়া উপস্থিত প্রসঙ্গ চাপা দিয়া তিনি পূর্ব্ববৎ সহজভাবে খলিলের পরিচয় জানিবার জন্য অন্য প্রসঙ্গের অবতারণা করিলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার বাড়ী কোথায় ?

—বীরভূম।

—নাম ?

—মোহাম্মদ খলিলুল্লাহ্।

ধুতি চাদর পরিয়া থাকায় ভদ্রলোকটী খলিলকে হিন্দু বলিয়া ধারণা করিয়াছিলেন। এক্ষণে নাম শুনিয়া তাঁহার সে-ধারণা দূর হইয়া গেল। তিনি পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, আগ্রা যাচ্ছ কেন, কোন কাজ আছে কি ?

খলিল একটু যেন আম্‌তা আম্‌তা করিয়া কহিল, না—কাজ বিশেষ কিছু নেই, এম্‌নি বেড়াতে যাচ্ছি।

ভদ্রলোক একটু সরিয়া খলিলের একেবারে সম্মুখে আসিয়া অপেক্ষাকৃত নিম্নস্বরে কহিলেন, একটা কথা তোমায় জিজ্ঞাসা কর্‌ব ভাই, গোপন কর্‌বে না ত ?

খলিল পূর্ব্ববৎ মাথা নীচু করিয়া কহিল, বলুন।

—তুমি কি বাড়ী থেকে রাগ করে' চলে' এসেছ ?

খলিল চুপ করিয়া রহিল। ভদ্রলোক আবার বলিলেন, বল ভাই, নিঃসঙ্কোচে আমার কাছে খুলে বল। অপরিচিত হ'লেও আমাকে তোমার হিতৈষী বলে' জেনো।

প্রথম দর্শনেই লোকটীর সম্বন্ধে খলিলের মনে একটা উচ্চ ধারণা জন্মিয়া গিয়াছিল। এক্ষণে তাঁহার কথাবার্ত্তায় ও সস্নেহ ব্যবহারে তাহার সে-ধারণা আরও দৃঢ় হইয়া উঠিল। তাই তাঁহার নিকট সকল কথা খুলিয়া বলাই সে যুক্তিসঙ্গত বলিয়া মনে করিল ; কিন্তু এই অল্পক্ষণের পরিচয়ে অতখানি অগ্রসর হইতে তাহার কেমন-যেন সঙ্কোচ বোধ হইতে লাগিল। সেই-জন্য একটু ইতস্ততঃ করিয়া সে সংক্ষেপে উত্তর দিল, না—রাগ করে' আসিনি ; তবে আসবার সময় কাউকে জানিয়ে আসিনি।

—কেন ?

—জানা'লে তাঁরা সম্মতি দিতেন না।

—না দিলে, না-ই আসতে। দরকার যখন কিছুই নাই, তখন না এলে ত ক্ষতি ছিল না কিছু। এমন ভাবে অভিভাবকদের না জানিয়ে দূর-পথে চলে' আসাটা ত তোমার উচিত হয়নি ভাই ?

খলিল কোন কথা বলিল না। পূর্ব্ববৎ নীরবে নত মস্তকে বসিয়া রহিল। কিছুক্ষণ পরে ভদ্রলোক আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, বাড়ীতে তোমার কে আছেন ?

—বাপ আছেন।

—মা ?

—মা নাই।

—ভাই-বোন ক'টী ?

—ভাই-বোন কেউ নাই, আমি একা।

প্রশ্নকর্ত্তার মুখে গাম্ভীর্য্যের ছায়াপাত হইল। কয়েক মুহূর্ত্ত চুপ করিয়া থাকিয়া তিনি পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি কর ?

—পড়ি।

—কোথায় ?

—কল্‌কাতায়।

—কলেজে না স্কুলে ?

—কলেজে।

—কোন্ ইয়ারে ?

—সেকেণ্ড ইয়ারে।

—এখন তুমি কল্‌কাতা থেকে আসছ না বাড়ী থেকে ?

—কল্‌কাতা থেকে।

—খামখেয়ালী আর কা'কে বলে ? ফাইনাল ইয়ারে কলেজ কামাই করে' কেউ কখনও বেড়াতে বেরোয় ? এতে ব্যক্তিগত ভাবে তোমার কতখানি ক্ষতি হবে, সেটা একবার ভেবে দেখেছ কি ?

অপেক্ষাকৃত নিম্নস্বরে খলিল বলিল, আমি আর পড়্‌বনা।

—সে কি ?

তাঁহার কণ্ঠস্বরে বিস্ময়ের সুর বাজিয়া উঠিল। খলিলের মুখের দিকে অপলক দৃষ্টিতে চাহিয়া তিনি পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, পড়্‌বে না কেন ?

খলিল চুপ করিয়া রহিল। এ কেনর উত্তর তাহার কাছে নাই, আর যদিই বা থাকে, তবে তাহা দিবার মত নয় ; কাজেই সে চুপ করিয়া রহিল।

ভদ্রলোক কিন্তু নাছোড়বান্দা। তিনি আবার বলিলেন,

বল ভাই, গোপন কোরোনা। কি এমন কারণ ঘটেছে,—যা'র জন্য তুমি পড়্‌তে নারাজ হ'য়েছ ?

এবার খলিল উত্তর দিল, কারণ এমন কিছু ঘটেনি। পড়াশুনায় মন বসে না বলেই ছেড়ে দিয়েছি।

এ-উত্তরে প্রশ্নকর্ত্তা সন্তুষ্ট হইতে পারিলেন না। তিনি বেশ বুঝিলেন, তাঁহার সন্দেহ আদৌ মিথ্যা নয়। খলিলের এই আগ্রা-যাত্রার ব্যাপার একটা জটিল রহস্যের জালে সমাচ্ছন্ন। কিন্তু কেমন করিয়া এই রহস্যের জাল ছিন্ন করা যাইবে? খলিল যে সহজে ভিতরের কথা প্রকাশ করিবে, সেরূপ কোন লক্ষণই ত দেখা যাইতেছে না। সে পূর্ব্বাপর আসল কথাটা গোপন করিয়া আসিয়াছে এবং এখনও করিবে। তবে ?—

খলিলের চেহারা ও নম্র ব্যবহার ভদ্রলোকের মনে সুস্পষ্ট ধারণা জন্মাইয়া দিয়াছিল যে, সে বিশিষ্ট ভদ্র মুসলমান পরিবারের সন্তান, ইহা ছাড়া সে যে এখনও ছাত্রজীবনকে অতিক্রম করিয়া আসে নাই, সে-পরিচয়ও তিনি তাহার মুখে পাইয়াছেন, সুতরাং তাহার ভবিষ্যৎ উজ্জল না হইলেও যে একেবারে অন্ধকারময় নয়, ভদ্রলোক অন্তরে-অন্তরে এ-কথাটা ভাল-রূপেই বুঝিয়াছিলেন এবং সেই জন্যই সামান্য পারিবারিক মনোমালিন্যের কারণে বা সাময়িক খেয়ালের বশে তাহাকে উদ্‌ভ্রান্তের মত লক্ষ্যহারা হইয়া দেশ-দেশান্তরে ঘুরিয়া বেড়াইতে দেওয়া তিনি কোন ক্রমেই সমীচিন বলিয়া মনে করিতে পারেন নাই। কারণ, তাহাতে তাহার উজ্জল ভবিষ্যৎকে অন্ধকারের ঘনছায়ায় বিলীন করিয়া দেওয়ার সুযোগ দেওয়া হইবে, যে-জীবন হয়ত দেশের বা দশের মহোপকার সাধন করিয়া একটা বিরাট জাতির আদর্শ রূপে গড়িয়া উঠিতে পারিত; তাহাকে ব্যর্থ-পরিণতির অগ্র-পথে দ্রুত অগ্রসর হইবার পক্ষে সহায়তা করা হইবে।

এই সমস্ত কথা চিন্তা করিয়া ভদ্রলোক খলিলের ভিতরের আসল কথাটা কি, তাহা জানিবার জন্য এত বেশী আগ্রহান্বিত হইয়া উঠিয়াছিলেন। তাহাকে এমন ভাবে ছাড়িয়া না দিয়া যদি কোনরূপ প্রতীকারের ব্যবস্থা করিতে পারেন বা বুঝাইয়া পড়াইয়া তাহাকে শান্ত করিয়া বাড়ী ফিরাইবার ব্যবস্থা করিতে পারেন, ইহাই ছিল তাহার উদ্দেশ্য। কিন্তু খলিলের গোপনভাব বা সঙ্কোচ তাঁহার সে-পথে অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইল! তিনি যেন একটু চিন্তিত হইয়া পড়িলেন।

ইতিমধ্যে ট্রেনের গতি মন্থর হইয়া আসিল এবং অল্পক্ষণ পরেই তাহা আলোকোজ্জল ষ্টেশনের প্ল্যাট্‌ফরমের মধ্যে প্রবেশ করিয়া ক্লান্তির নিঃশ্বাস ছাড়িয়া স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইল। কুলী হাঁকিল—মধুপুর।

লোকজনের ওঠা-নামায় একটা সোর গোল পড়িয়া গেল। খলিল জানালা খুলিয়া বাহিরের দিকে চাহিল। সঙ্গী ভদ্রলোকের প্রশ্নের সমস্যায় পড়িয়া সে দিশাহারা হইয়া পড়িয়াছিল, এখন একটু অন্যমনস্ক হইতে পাইয়া হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল। তাহার মনের ভিতর যেন নববলের সঞ্চার হইল।

কিছুক্ষণ পরে ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। গাড়ী ছাড়িয়া দিল। ভদ্রলোকটী এতক্ষণ নীরবে বসিয়া চিন্তা করিতে-ছিলেন। গাড়ী ছাড়িতেই আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, দেখ, তুমি কি সত্য সত্যই আর পড়্‌বে না, না খেয়ালের বশে বল্‌ছ ?

—খেয়ালের বশে নয়, আমি সত্য সত্যই আর পড়্‌ব না।

এবার খলিলের মুখভাব বা কণ্ঠস্বর অনেকখানি সঙ্কোচ-মুক্ত।

—তাহ'লে কি করবে ?

—উপস্থিত কিছু কর্‌ব না।

—এর পরে ?

—তা' এখনও কিছু ঠিক করিনি।

—কতদিনে বাড়ীতে ফির্‌বে ?

—তা' বল্‌তে পারিনা।

—ফির্‌বে ত ?

তা-ও বল্‌তে পারি না।

ভদ্রলোক কিছুক্ষণ গম্ভীর হইয়া রহিলেন। তাহার পর সহসা বলিতে আরম্ভ করিলেন, দেখ, তোমাকে একটা কথা বলি। আমি বেশ বুঝ্‌তে পেরেছি, এমন একটা কারণ ঘটেছে, যার জন্য বীতশ্রদ্ধ হ'য়ে তুমি বাড়ী থেকে চ'লে এসেছ, আর সেই কারণটা প্রথম থেকেই তুমি আমার কাছে গোপন করে' আসছ। কিন্তু এতে তোমার ক্ষতি ছাড়া লাভ বিশেষ কিছু হবে না। আমি তোমাকে পূর্ব্বেও বলেছি এবং এখনও বল্‌ছি যে, আমি তোমার হিতৈষী। তবে আমাকে যদি তোমার বিশ্বাস না হয়, তাহ'লে আমি

কোন কথা তোমার জিজ্ঞাসা কর্‌তে চাইনা; কিন্তু যদি বিশ্বাস হয়, তাহ'লে আমার কাছে অকপটে সকল কথা প্রকাশ করে' বল। আমি তোমাকে কথা দিচ্ছি, আমার দ্বারা তোমার ইষ্ট বই অনিষ্ট হবেনা এবং তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তোমার দ্বারা আমি কোন কাজই করাব না।

ভদ্রলোকের স্নেহের অনুযোগ ও অনুরোধ ব্যর্থ হইল না। খলিল কয়েক মুহূর্ত্ত কি যেন ভাবিয়া বিনয়নম্র স্বরে বলিল, আপনার অনুমান সত্য। আসল কারণ আমি আপনার কাছে গোপন করেছি, কিন্তু আর কিছু গোপন করিনি।

—বেশ! এখন আর আসল কারণটা বল্‌তে আপত্তি আছে কি?

খলিল পূর্ব্ববৎ নম্রস্বরে বলিল, এখন আমাকে মাফ করুন, যদি সুযোগ হয়, পরে আপনাকে সব-কথাই খুলে বল্‌ব।

ভদ্রলোক বুঝিলেন, যে-কারণেই হউক, খলিল কিছুতেই এখন আসল কথা ফাঁস করিবে না বা করিতে পারিবে না। সেই জন্য তিনি এ-সম্বন্ধে আর বিশেষ পীড়াপীড়ি না করিয়া বলিলেন, আচ্ছা যাক্‌-সে কথা। কিন্তু এ-ভাবে লক্ষ্যহারা হ'য়ে ঘুরে বেড়িয়ে তোমার লাভ কি হবে?

—লাভ কিছু হবে না—তবে মনের অবস্থা খুব খারাপ বলেই এইভাবে বেরিয়েছি।

—কিন্তু এতে তোমার মনের অবস্থা আরও বেশী খারাপ হ'য়ে উঠবে। জীবনটা একদম মাটী হ'য়ে যাবে।

—কি কর্‌ব বলুন—আমি কিছুতেই মন বসাতে পারি না।

—কিছু মানে কি? পড়াশুনার কথা বল্‌ছ? বেশ, পড়াশুনায় মন না বসে, মনকে অন্যদিকে নেবার চেষ্টা কর। একটা দিক নিয়ে ত সংসার নয়। সংসারের বিভিন্ন দিক আছে, মন যেদিকে বস্‌তে চায়, সেই দিকেই তাকে বসাও। মানুষ হ'য়ে জন্মেছ—এত বড় মূল্যবান জীবন তোমার, একদিকে মন বসলনা বলে' লক্ষ্যহারা হ'য়ে ঘুরে বেড়িয়ে তাকে ব্যর্থ করে দেবে!

খলিল মন-প্রাণ দিয়া কথাগুলি শুনিতে লাগিল। ভদ্রলোক বলিতে লাগিলেন, স্বীকার করি—তুমি আঘাত পেয়েছ, আর সে-আঘাত হয়ত খুব গুরুতর, কিন্তু তাই বলে' নিজেকে তুমি ব্যর্থ করে' দিতে পার না—সে অধিকারও তোমার নাই। কথাটা হয়ত তোমার কাছে একটু বিসদৃশ ঠেক্‌বে; কিন্তু তা' ঠেক্‌লেও এটা খাঁটী সত্য কথা। নিজের উপর মানুষের ততক্ষণ অধিকার থাকে, যতক্ষণ সে নিজের ব্যক্তিত্বের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে; কিন্তু ব্যক্তিত্বের গণ্ডী অতিক্রম করে' যখন সে নিজেকে দেশ, জাতি বা সমাজের মধ্যে ছেড়ে দেয়, দেশ বা জাতির স্বার্থের সঙ্গে ওতপ্রোত ভাবে জড়িত হ'য়ে পড়ে; তখন আর নিজের উপর তার কোন অধিকারই থাকে না। তার উপর তখন সম্পূর্ণ অধিকার জন্মায়—দেশের ও জাতির। কাজেই সহস্র কারণ ঘট্‌লেও ন্যায়তঃ সে আর নিজেকে ব্যর্থ কর্‌তে পারে না। যদি তা' করে, তাহ'লে প্রকারান্তরে দেশ বা জাতির স্বার্থকে ক্ষুন্ন করে' সে মহাপাতকী হয়। তাই বল্‌ছি—এ উদ্দাম খেয়ালকে বিসর্জ্জন দাও, মনকে সংযত কর, নইলে জাতির স্বার্থহানির এই মহাপাতক তোমাকেও স্পর্শ কর্‌বে। তুমি তরুণ, দেশের ভাবী সম্পদ, তোমার কাছ থেকে দেশ অনেক কিছু পাবে বলে' আশা করে' আছে, একটা বিরাট জাতির স্বার্থ তোমার সঙ্গে জড়িত রয়েছে; তুমি ত এমন ভাবে নিজেকে ব্যর্থতার অতলে টেনে নিয়ে যেতে পার না। সে অধিকার ত তোমার নাই।

খলিল বাহ্যজ্ঞান হারাইয়া মন্ত্রমুগ্ধের মত এই অমৃতবাণী শুনিয়া যাইতেছিল। ভদ্রলোক ক্ষান্ত হওয়ায় সহসা যেন তাহার ধ্যানভঙ্গ হইল। সে মুখ তুলিয়া তাঁহার মুখের পানে চাহিল, কিন্তু পরক্ষণেই আবার দৃষ্টি নামাইয়া লইল। ভদ্রলোক পুনরায় বলিতে আরম্ভ করিলেন, তুমি ছেলেমানুষ, আর জীবনে এই বোধ হয় প্রথম আঘাত পেয়েছ, কাজেই বেদনার ভারে ভেঙে পড়েছ। কিন্তু জাননা তুমি, সংসারে থাক্‌তে হ'লে এর চেয়ে শতগুণ গুরুতর আঘাতও তোমার নীরবে সহ্য কর্‌তে হবে। তা' যদি না পার, তাহ'লে তোমার জন্মই বৃথা। সংসার কঠোর পরীক্ষাস্থল। অবিশ্রান্ত আঘাতে ক্ষতবিক্ষত হ'য়েও যে অচল অটল থাক্‌তে পারে, পরিণামে সে-ই জয়ী হয়। ক্রমাগত ঘাত-প্রতিঘাতের ভিতর দিয়েই মানুষ, মনুষ্যত্বের পরিপূর্ণ মহিমায় ফুটে ওঠে। একটু আঘাতে যদি ভেঙে পড়্‌বে, তাহ'লে সে মানুষ হ'য়ে জন্মেছিল কেন? বুকে বল সঞ্চয় কর্‌তে হবে, যা'তে আঘাত প্রতিহত হ'য়ে ফিরে যায়। এই আশায় মন বাঁধ্‌তে হবে যে, এদিন চিরদিন থাকবে না। মেঘ ঘনিয়ে আসে, আবার কেটে

বার, বজ্র-বিদ্যুৎ প্রলয়-লীলায় গর্জ্জন করে, কিন্তু পরক্ষণেই আবার শান্তির অমিয় কিরণ ফুটে ওঠে; এ-ই সংসারের নিয়ম, প্রকৃতির চিরন্তন বিধি। সুখ বা দুঃখ এখানে পালা করে' মানুষের মুখে হাসি-কান্না ফুটিয়ে তোলে। এখানে অধীর হ'লে চল্‌বে কেন ভাই! আজ তোমার প্রাণে ব্যথা বেজেছে। সংসার তোমার কাছে শূন্য, জীবন একটা বিড়ম্বনা ছাড়া আর কিছুই নয়, নিজেকে সকল দিক দিয়ে ব্যর্থ দেখে তুমি হতাশ হ'য়ে পড়েছ; কিন্তু স্থির জেনো, তোমার এই হতাশা চিরদিন থাক্‌বে না। আজ যে ব্যর্থতাকে তুমি তোমার ধ্বংসের মূলীভূত হেতু বলে' মনে কর্‌ছ, দু'দিন পরে হয়ত দেখ্‌বে—সেই ব্যর্থতাই তোমার অন্তরকে সৃষ্টির আনন্দে ভরপুর করে' দিয়েছে। যদি জিজ্ঞাসা কর, তা' কেমন করে' হ'তে পারে, তা'হ'লে তার উত্তরে আমি এই বলছি যে, তোমার ব্যক্তিগত ব্যর্থতা একদিন দশের সার্থকতার কারণ হ'য়ে উঠতে পারে। তোমার নিজের ব্যর্থতার ভিতর দিয়ে যদি দশের সার্থকতা ফুটে ওঠে, তাহ'লে সৃষ্টির অনাবিল আনন্দে—যত কিছু ব্যক্তিগত ক্ষোভ বা দৈন্য তোমার আছে, সমস্তই ধুয়ে মুছে নিশ্চিহ্ন হ'য়ে যাবে। তোমার ত্যাগের—মনুষ্যত্বের ভিত্তির উপর তোমার জাতির আদর্শের প্রতিষ্ঠা হবে।

ভাবের প্রবল বন্যা-প্রবাহে খলিল আর নিজেকে ধরিয়া রাখিতে পারিল না। উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলিয়া উঠিল; আমি ভুল করেছি,—বুঝ্‌তে না পেরে মহাভুল করেছি, আমাকে মার্জ্জনা করুন।

বলিতে বলিতে ভাবাবেগে সে দুই হাত দিয়া বক্তার ডান হাতখানি চাপিয়া ধরিল।

ভদ্রলোক স্নেহপূর্ণ কণ্ঠে বলিলেন, মার্জ্জনা কেন ভাই, এখনও ত তুমি অপরাধ কর নি, আর যদিই করে' থাক, তাহ'লে আমার কাছে মার্জ্জনা চাইছ কেন? তোমার অপরাধের মার্জ্জনা করবে—তোমার দেশ, তোমার জাতি। দেশ ও জাতির সেবায় আত্ম-নিয়োগ কর, তাহ'লেই মার্জ্জনা পাবে।

—আমি যে কিছুই জানি না। কি উপায়ে দেশের সেবা করব, তা'ত বুঝতে পার্‌ছি না।

—আমিই তোমায় বুঝিয়ে দেব। যদি বাস্তবিক তোমার অন্তরে প্রেরণা জেগে থাকে, দেশ বা জাতির সেবায় আত্ম-নিয়োগ করবার প্রবৃত্তি প্রবল হ'য়ে থাকে, তাহ'লে এই উদ্দাম বৃত্তিকে মন থেকে ঝেড়ে ফেলে দিয়ে আমার সঙ্গে চল। দেখবে—জীবন-সাধনার কত প্রকৃষ্ট পন্থা পড়ে' রয়েছে, মানুষের মানুষ হ'য়ে ওঠবার কত দিক খোলা রয়েছে। কেমন—যেতে পারবে?

অতি-আগ্রহে খলিল বলিয়া উঠিল, নিশ্চয় পার্‌ব।

—বেশ! তাহ'লে আর কোন কথা নাই। এখন একটু ঘুমোবার চেষ্টা কর। কথায় কথায় রাত্রি প্রায় শেষ হ'য়ে এসেছে।

—আপনি ঘুমোন। আমার আর এখন ঘুম আস্‌বে না।

ভদ্রলোক শুইয়া পড়িলেন। খলিল জানালা খুলিয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া দেখিল, অন্ধকারের বুক চিরিয়া গাড়ী পূর্ব্ববৎ ঝঞ্ঝাবেগে ছুটিয়া চলিয়াছে।

(ক্রমশঃ)

# আলোচনা

## সস্তায় স্বস্তিলাভ

প্রতিবেশী হিন্দুর তুলনায় মুছলমান ইংরাজী শিক্ষায় অনেক পশ্চাৎপদ হইয়া আছে। ইহার কারণ নির্ণয় করিতে গিয়া অনেকেই সে কালের মৌলবীদিগের উপর দোষ চাপাইয়া সস্তায় স্বস্তিলাভ করিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন—ইংরাজ আমলদারীর প্রথমভাগে মোল্লা-মৌলবীরা নাকি ফৎওয়া দিয়াছিল যে, ইংরাজী পড়িলেই মুছলমান কাফের হইয়া যাইবে। মৌলবীদিগের এই ফতওয়ার জন্য, কাফের হইয়া যাওয়ার ভয়ে, মুছলমানেরা সে সময় ইংরাজীর সংস্রব হইতে দূরে পলায়ন করিয়াছিল। কাজেই তাহাদের বর্ত্তমান অধঃপতনের জন্য একমাত্র দায়ী—এই হতভাগা মৌলবী সমাজ।

মৌলবী সমাজের যে অনেক দোষ ত্রুটি আছে, তাহা আমরা জানি, মানি, ও প্রকাশ্যভাবে তাহা স্বীকারও করিয়া থাকি। কিন্তু আলোচ্য কোফরের ফৎওয়া ও সে-ফৎওয়ার তথাকথিত প্রভাবের মূলে কোনও সত্য নিহিত আছে বলিয়া আমাদিগের জানা নাই। দুরবস্থায় পড়িলে মানুষ অন্যের উপর দোষারোপ করিয়া সহজে সান্ত্বনা লাভের চেষ্টা করে, ইহা মানুষের সাধারণ অভ্যাস। আমাদিগের মতে, ইংরাজী শিক্ষা সম্বন্ধে মৌলবীদিগের উপর দোষারোপ করাও এই অভ্যাসেরই ফল। ঐতিহাসিক হিসাবে ইহার মূল আবিষ্কার করা সম্ভবপর হইবে না। বরং ইংরাজ রাজত্বের প্রথম অবস্থার ইতিহাস আলোচনা করিলে অকাট্যরূপে প্রমাণিত হইবে যে, সে-সময়কার মৌলবী সমাজ সাধারণতঃ ইংরাজের মনস্তুষ্টি সাধনের জন্য লালায়িত হইয়া পড়িয়াছিলেন। তখনকার সাহিত্য হইতে ইহার অনেক প্রমাণও উদ্ধৃত করা যাইতে পারে। ইহা ব্যতীত সে-সময়কার বিশিষ্ট ও গণ্য মান্য আলেমগণের মধ্যে অনেকেরই "মজমু-আয়ে ফতাওয়া" বা ফৎওয়া-সমষ্টি এখনও সুরক্ষিত আছে—তাহার অধিকাংশ মুদ্রিত হইয়া গিয়াছে। ইংরাজী ভাষা শিক্ষা করিলে মুছলমান কাফের হইয়া যায়, এমন অপরূপ ফৎওয়া ত তাহার কোনটাতে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। অবশ্য কেহ কেহ এরূপ মত প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, নিজের ধর্ম্ম ও ধর্ম্মশাস্ত্র সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ থাকিয়া ধর্ম্মশিক্ষাবর্জ্জিত বিদেশী ভাষা ও বিজাতীয় জ্ঞানের আলোচনা করিলে বেদিন বা ধর্ম্মহীন হওয়ার আশঙ্কাই অধিক। এ কথাগুলি যে কতদূর সত্য, চিন্তাশীল ভারতবাসী মাত্রই তাহা আজ মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিতেছেন।

আমাদিগের মতে মুছলমান যে, সে-সময় ইংরাজী শিক্ষায় এতদূর পশ্চাৎপদ হইয়া পড়িয়াছিল, তাহার কতকগুলি স্বাভাবিক ও রাজনীতিক কারণ আছে। তাহার মধ্যকার প্রথম কারণ, তখনকার মুছলমানদিগের অধঃপতিত সামাজিক জীবন—যাহার কল্যাণে স্পেন ও হিন্দুস্থানের মত মোছলেম সম্রাজ্যগুলি, খৃষ্টান-শক্তির এক ফুৎকারে তাসের ঘরের মত চোখের নিমিষে ঝরিয়া খসিয়া একেবারে চুরমার হইয়া যাওয়াও সম্ভবপর হইয়াছিল। এই অবস্থায় স্বপ্নের অগোচর

ভাবে, হঠাৎ যথাসর্ব্বস্বহারা দাসানুদাসের অবস্থায় উপনীত হইয়া, মুছলমান সমাজ একেবারে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িয়াছিল। একদিকে অদূর অতীতের জ্বালাময়ী স্মৃতি এবং সেই স্মৃতিজনিত অভিমান, অন্যদিকে সদ্যবিজিত জাতির প্রতি স্বাভাবিক বিদ্বেষ। এ সকল অবস্থা মুছলমান সমাজে ইংরাজি শিক্ষার প্রসার লাভের অনুকূল ছিলনা, বরং প্রতিকূলই ছিল। রাজ্য বিপর্য্যয়ের ফলে সমাজের উৰ্দ্ধতন স্তরের কত হাজার হাজার মুছলমানকে—তাহাদিগের আশ্রিত ও প্রতিপাল্য কত অসংখ্য নরনারীকে এই সময় এক মুহূর্ত্তে একেবারে পথের ফকির বলিয়া বসিতে হইয়াছিল, এই প্রসঙ্গে তাহাও স্মরণ রাখিতে হইবে। পক্ষান্তরে দেশের হিন্দু সমাজ বিদেশী ও বিজাতীয় শাসক জাতির পদাবনত হইতে বিশেষরূপে অভ্যস্ত হইয়াছিল। দেশে রাজ্যবিপ্লব তাঁহারাই ডাকিয়া আনিলেন, তাহার ফলভোগের জন্য সঙ্গে সঙ্গে তাঁহারা প্রস্তুতও হইতে পারিলেন। এ বিপর্য্যয়ে তাঁহাদিগের ক্ষতি ত কিছুই হইল না, বরং ইংরাজের গভীর শাসন-নীতির কল্যাণে অনেক সুবিধা সুযোগ তাঁহাদিগের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল।

রাজ্যবিপ্লবের কঠোর আঘাত কথঞ্চিৎরূপে সম্বরণ করার পর মুছলমান সমাজ যখন একটু একটু করিয়া সামলাইবার চেষ্টা করিতেছিল, ইংরাজ তখন একেবারে এক আঘাত দিয়া, বিপন্ন হৃতসর্ব্বস্ব ও ইতিকর্ত্তব্যবিমূঢ় মুছলমানের রুগ্ন ও দুর্ব্বল মেরুদণ্ডকে চূর্ণবিচূর্ণ করিয়া দিতে লাগিলেন। এই আঘাত আসিল—আয়মা, লাখেরাজ, পীরোত্তর ইত্যাদি নিষ্কর সম্পত্তিগুলি বাজেয়াপ্ত করার আইনের মধ্য দিয়া, পঞ্জাব ও বাঙ্গলায় 'কাঁঠালের আমসত্ত' জাতীয় "মাদ্রাছা শিক্ষা-প্রণালী" পরিচালনের গভীর কুটিল রাজনীতিক চালের মধ্য দিয়া, সিপাহিবিদ্রোহের পর মুছলমানের উপর অনুষ্ঠিত অমানুষিক অত্যাচারের মধ্য দিয়া। হিন্দুকে সকল প্রকার সাহায্য দিয়া বাড়াইয়া তোলা আর সঙ্গে সঙ্গে সদ্যবিজিত মুছলমানকে একেবারে চূর্ণবিচূর্ণ করিয়া ফেলা—তখন নবাগত বিজেতাদিগের সাধারণ শাসন-নীতিতে পরিণত হইয়া ছিল। এ সম্বন্ধে সরকারী কাগজ পত্র এবং ইংরাজ লেখকগণের স্বীকারোক্তি হইতেও অনেক দলিল প্রমাণ উদ্ধৃত করা যাইতে পারে। আর প্রকৃতপক্ষে ভারতের অধঃপতিত মুছলমান সমাজই তাহার জ্বলন্ত ও জীবন্ত ইতিহাস।

বড়ই দুঃখের বিষয় যে, সমাজের চিন্তাশীল ব্যক্তিরাও এসম্বন্ধে অসতর্কতা প্রকাশে কুণ্ঠিত হন না। আমাদিগের মতে ভিত্তিহীন ও প্রমাণশূন্য কথা বলা, সকল অবস্থায়—এমনকি মৌলবীদিগের বিরুদ্ধে হইলেও—অন্যায়। মুছলমান সমাজের বিশেষতঃ মোছলেম-বঙ্গের গত দুই শতাব্দীর ইতিহাস, কত জ্বালাময় রহস্য, কুটিল রাজনীতির মর্ম্মবিদারক অত্যাচার, অদৃষ্টের কত নির্ম্মম পরিহাস এবং কত লোমহর্ষণ বিভীষিকার গভীর বেদনাস্মৃতি বক্ষে ধারণ করিয়া, সাধারণ লোক-চক্ষের অগোচরে অন্ধকারে লুকাইয়া আছে—একবার তাহার অনুসন্ধান লইয়া দেখ। তাহা হইলে মুছলমানের এই দুরবস্থার প্রকৃত কার্য্যকারণ-পরম্পরা তোমার সম্মুখে সুস্পষ্টভাবে দেদীপ্যমান হইয়া উঠিবে। মোহমুগ্ধ আত্মবিস্মৃত মুছলমানের চক্ষুদানে বোধ হয় আজও ইহা একটু উপকারে লাগিতে পারে।

---

## "স্বরাজ সাধনা"

হিন্দু মুছলমান সমস্যার স্থায়ী সমাধানের জন্য দেশের রাজনীতিক নেতারা অনেক চেষ্টা করিতেছেন। এবারকার কংগ্রেসে এ-সম্বন্ধে একটা পাকাপাকি ব্যবস্থা করা হইবে বলিয়া শোনা যাইতেছে। সকল শ্রেণীর দেশনায়কগণ একত্র হইয়া একটা কাঠাম বা কালবুদ তৈরী করার জন্যও চেষ্টা করিতেছেন। এ-চেষ্টা সফল হইলে সেই কাঠাম পার্লামেণ্টের সিংহদ্বারের সম্মুখে স্থাপন করা হইবে—তাহাতে প্রাণপ্রতিষ্ঠার জন্য সকল প্রকার যাগযজ্ঞ ও মন্ত্র-তন্ত্রের আশ্রয় লওয়া হইবে। এজন্য পণ্ডিত মদন মোহন মালব্য পর্য্যন্ত সাম্প্রদায়িক বিবাদ-বিসম্বাদ মিটাইয়া ফেলার জন্য ব্যস্ততা প্রকাশ করিতেছেন। খুব ভাল কথা, এই মত পরিবর্ত্তনের জন্য আমরা তাঁহাকে অন্তরের সহিত সাধুবাদ করিতেছি।

আমরা আল্লাহ তাআলার মঙ্গলময়ত্বে বিশ্বাস করি এবং সেই হিসাবে বিশিষ্ট বন্ধুবান্ধবগণের নিকট বরাবরই বলিয়া আসিয়াছি যে, সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ-সংঘাতের এই অকল্যাণ রাশির মধ্যেও সেই মঙ্গলময়ের মঙ্গল ইঙ্গিত প্রচ্ছন্নভাবে কাজ করিতেছে। আমরা এখন তাহার স্বরূপটাকে গ্রহণ করিতে না পারিলেও, যথাসময়ে তাহা

আমাদিগের চোখের সম্মুখে সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ পাইতে থাকিবে। ঘটনা-পরম্পরার লক্ষণ দেখিয়া মনে হইতেছে, সে সময় বুঝি সমাগত হইয়াছে। তাই দেশনায়কগণের খেদমতে এসম্বন্ধে দুই একটা কথা আরজ করা আবশ্যক বোধ হইতেছে।

আমাদের মতে ইংরাজ জাতি দেবতাও নহে, ফেরেস্তাও নহে; সোজাসুজি একটা মানুষ সমাজ। মানুষের সমস্ত স্বার্থপরতা ইংরাজের মধ্যেও ষোল আনা ভাবে বিদ্যমান আর ভারতকে কার্য্যতঃ সম্পূর্ণ অধীন করিয়া রাখাই হইতেছে—ইংরাজ জাতির প্রধানতম স্বার্থ। এ স্বার্থ ত্যাগ করিতে ইংরাজ যে কস্মিন কালেও সহজে স্বীকৃত হইবে না, একথাটা আমাদিগকে সর্ব্বদা খুব ভাল করিয়া স্মরণ রাখিতে হইবে। তাহা হইতেই "স্বরাজ সাধনার" প্রকৃত অর্থ হৃদয়ঙ্গম করা আমাদিগের পক্ষে সম্ভবপর হইতে পারিবে। ইংরাজের নিকট হইতে স্বরাজ আদায় করিয়া লইতে হইলে সেজন্য বহুদিন ধরিয়া আমাদিগকে যে কি কঠিন তপস্যায় প্রবৃত্ত হইতে হইবে—নিজেকে, নিজের সমাজকে এবং নিজের দেশবাসীকে সেজন্য কিভাবে উদ্বুদ্ধ, কি চেতনায় জাগ্রত এবং কি সাধনায় উদ্যত করিয়া তুলিতে হইবে, তাহার আন্দাজ কেবল এই অবস্থায় করা যাইতে পারে।

এ সাধনার প্রথম যোগসঙ্গম হইবে জাতির মস্তিষ্ক। সঙ্কীর্ণতার সমস্ত অন্ধকার এবং অধীনতার সকল নাগ পাশ হইতে মুক্ত করিয়া তাহার স্তরে স্তরে জাগাইয়া তুলিতে হইবে—মুক্তির আকুল পিপাসা, স্বাধীনতার অনিবার্য্য আকাঙ্খা। আমাদিগের যত গলদ, যত আত্মপ্রবঞ্চনা এই খানে পুঞ্জীভূত হইয়া আছে। আমরা নিজেদের ও দেশবাসীর মস্তিষ্ককে—নিজেদের নীচ স্বার্থ উদ্ধারের জন্য—নানা কুসংস্কারের কেল্লা করিয়া রাখিতে চাই, শাস্ত্রের প্রকৃত শিক্ষা গুলি চাপা দিয়া ধর্ম্মের নামে অধর্ম্ম করিতে আগ্রহ প্রদর্শন করি, এবং মাঠের যত পচা গোবর কুড়াইয়া আনিয়া দেশবাসীর মাথার মধ্যে পূরিয়া দিয়া বলি—"তোমার মস্তিষ্ক-শুদ্ধির সর্ব্বপ্রধান স্বর্গীয় উপকরণ হইতেছে ইহাই।" তাহার পর একদিকে আমরা সকলে মিলিয়া, দল বাঁধিয়া, জন সাধারণের হৃদয় ও মস্তককে, সিমলার চটি ও দিল্লির নাগরা হইতে আরম্ভ করিয়া আধুনিক স্লিপার সু ও বুটের নিষ্পেষণে দলিয়া মথিয়া তাহাদের মনুষ্যত্বের ক্ষীণ অনুভূতিটুকুকেও খুন করিয়া ফেলিতেছি—আবার অন্যদিকে ঠিক সেই সময় সাহেব লোকদিগের বুটের বিরুদ্ধে সেই সব মস্তিষ্কে জীবনের সাড়া ও মুক্তির আকাঙ্খা জাগাইয়া তোলার জন্য জোর গলায় চীৎকার করিতেছি। নিষ্পেষণ সর্ব্বাবস্থায় সমান ফল প্রদান করে—বিলাতী বা স্বদেশী বুটের ইতর বিশেষ সেখানে নাই। আমরা ইংরাজের নিকট হইতে যে-প্রকার অধিকার পাওয়ার দাবী করিতেছি—নিজেরা দেশবাসীকে সে-অধিকার দিতে ঘোর অমত প্রকাশ করিতেছি। রুস মিছর প্রভৃতি দেশের ন্যায় ভারতের রাজনৈতিক আন্দোলন যে জন-সাধারণের মধ্যে ব্যাপকতা লাভ করিতে পারে নাই, তাহার একমাত্র কারণ এই যে, প্রকৃতপক্ষে আমরাই তাহাকে ব্যাপক হইতে দিতে চাহি না। আমরা চাই, ৩৩ তেত্রিশ কোটির নাম করিয়া ইংরাজের নিকট হইতে আর কিছু সুবিধা মাগিয়া আনিয়া নিজেরা সেগুলিকে ভোগ করিতে—তাহা দ্বারা নিজেদের নিষ্পেষণ-শক্তিকে আরও বাড়াইয়া নিতে। ধূর্ত্ত ইংরাজ ইহা জানে, এবং জানে বলিয়াই কথায় কথায় আমাদিগকে কদলী প্রদর্শন করিতে সাহসী হইতে পারে।

সেই জন্য আমরা বলি, ইংরাজের নিকট অধিকার দাবী করার পূর্ব্বে দেশের প্রত্যেক নরনারীকে বুঝাইয়া দাও যে, ঐ অধিকার গুলি হস্তগত হইলে সে নিজকে তাহার কতটা অংশভাগীরূপে দেখিতে পাইবে। ভবিষ্যতের আশা যে স্তোক নহে, ছলনা নহে, বর্ত্তমানে নিজেদের কবলগত অধিকারগুলি তাহাদিগকে ভাগ করিয়া, নিজেদের সততার প্রমাণ দান কর। কিন্তু দুঃখের বিষয় আসল গলদ ধরা পড়িয়াছে—এইখানে।

কেবল বর্ত্তমানের হিসাবে বিচার করিয়া দেখিলে বেশ বুঝিতে পারা যাইবে যে, কাউন্সিলের মেম্বরী প্রভৃতি লইয়া আজ দেশময় যে টানাটানি আরম্ভ হইয়াছে,—ইহার মূলে কাজ করিতেছে—দেশের অন্নসমস্যা। উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুরা সরকারী চাকরী বাকরীগুলি একপ্রকার একচেটিয়া করিয়া রাখিয়াছেন। অন্য কাহাকেও তাহার মধ্যে প্রবেশ-অধিকার দিতে তাঁহারা একদম নারাজ। সে নাম করিলে তাঁহারা শিহরিয়া আঁৎকাইয়া একেবারে বিচলিত হইয়া পড়েন। ইংরাজী শিক্ষার—একমাত্র না হউক—প্রধানতম কাম্য যে চাকুরী, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। মুছলমান ও অন্য শ্রেণীর হিন্দুরা ইংরাজী পড়িয়াও যখন তাহা হইতে

বঞ্চিত হন, অথচ নিজেদের সমান বা অপেক্ষাকৃত নিম্নতর যোগ্যতার লোকদিগকে তাঁহারা স্বচ্ছন্দে ও পরমানন্দে সেই সকল চতুর্ব্বর্গ উপভোগ করিতে দেখেন, তখন তাঁহাদের অন্তরাত্মা ঐ শ্রেণীর হিন্দুর বিরুদ্ধে স্বতঃই বিদ্রোহী হইয়া উঠে। যোগ্যতার প্রশ্ন তুলিয়া শাক দিয়া মাছ ঢাকার চেষ্টাটা এক্ষেত্রে আরও কুফল প্রসব করিতেছে। আমাদের অযোগ্য লোকদিগকেও চাকরী দিতে হইবে, এ আব্দার আজ পর্য্যন্ত কেহ করে নাই, করিতে পারে না। কারণ তাহারাও মানুষ এবং এই শ্রেণীর অসঙ্গত কথা বলিয়া অনর্থক উপহাসিত হইতে আর সকল মানুষের ন্যায় তাহারাও লজ্জা অনুভব করে। তাহারা বলিতেছে :— আমাদিগের মধ্যেও যোগ্য প্রার্থীর অভাব নাই। কিন্তু তোমাদিগের সর্ব্বগামী স্বার্থপরতার কল্যাণে আমাদিগের যোগ্য—এমনকি যোগ্যতর ব্যক্তিরাও 'রাজসেবায়' প্রবেশ করিতে পারে না। অতএব প্রত্যেক সম্প্রদায় ও প্রত্যেক সমাজের জন্য, তাহাদের প্রাপ্য চাকুরীর একটা আনুপাতিক সংখ্যা নির্দ্ধারিত হউক। নিপুণতার সহিত পদদায়িত্ব পালন করিতে যে চাকুরীর জন্য অন্ততঃ পক্ষে যে পরিমাণ যোগ্যতার আবশ্যক, প্রত্যেক চাকুরীর জন্য সেইরূপ একটা Minimum qualification নির্দ্ধারিত করিয়া দেওয়া হউক। তাহার পর সেই যোগ্যতাবিশিষ্ট যতসংখ্যক লোক পাওয়া যায়—তাহাদিগকে চাকরী দাও, না পাওয়া যায়— তোমরা তখন সেগুলি ভোগ করিও।

আমাদিগের বিশ্বাস, কোনও ন্যায়নিষ্ঠ ব্যক্তি এ-প্রস্তাবে অসম্মতি প্রকাশ করিতে পারেন না। আমাদিগের বিশ্বাস, এই চাকরী-সমস্যার সমাধান হইয়া গেলে আর সকল সমস্যার সমাধান খুব সহজ হইয়া যাইবে। দেশবন্ধু ইহা যথাযথ ভাবে বুঝিয়াছিলেন এবং যথেষ্ট উদারতা ও সৎসাহসের সহিত ইহার বাস্তব সমাধানের দিকে অগ্রসরও হইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার পরলোক-গমনের সঙ্গে সঙ্গে, দেশবন্ধুর অনুরক্ত ভক্ত ও মন্ত্রশিষ্যরাও তাঁহার জীবনের এই মহত্তম সাধনা, বরং প্রধানতম সিদ্ধিকে নির্ম্মমভাবে পদদলিত করিতে এক বিন্দুও দ্বিধা বা কুণ্ঠা বোধ করেন নাই।

কলিকাতার হিন্দুসভার কএকজন পাণ্ডা, ২৪ কোটী হিন্দুর নামে প্রগল্ভ আস্ফালন করিয়া ভারতে হিন্দুস্বরাজ প্রতিষ্ঠা করিবেন বলিয়া যে সকল শব্দসর্ব্বস্ব দাম্ভিকতা প্রকাশ করিতেছেন, তাহার মূলে যে এক রতিমাসা পরিমাণেও বাস্তবতা নাই, অভিজ্ঞ পাঠকগণকে বোধ হয় তাহা আর বলিয়া দিতে হইবে না। খোদার ফরমান আরম্ভ হইয়াছে—আদিম অস্পৃশ্য বা নিম্নশ্রেণীর স্পৃশ্য হিন্দুরা তাহার যথাযথ উত্তর দিতে আরম্ভ করিয়াছে। বলা বাহুল্য যে, ইহা প্রতিক্রিয়ার প্রথম বিকাশ মাত্র। উচ্চশ্রেণীর হিন্দুরা সতর্ক না হইলে ইহার ভবিষ্যৎ অনতি-বিলম্বে ভীষণ হইতে ভীষণতর আকার ধারণ করিবে। যাঁহাদের চোখ একেবারে দৃষ্টিশক্তিশূন্য হইয়া পড়ে নাই, তাঁহারা দেখিতে পাইবেন—গবর্ণমেণ্ট ভবিষ্যতের জন্য নিম্নশ্রেণীর হিন্দুদিগকেই প্রধান বাহনরূপে অবলম্বন করার জন্য প্রস্তুত হইতেছেন।

ফলে, ফাঁকি দিয়া স্বর্গলাভ একালে আর সম্ভবপর হইবে না। ইংরাজের ফাঁকির হাত এড়াইতে চাও—নিজেরা ফাঁকিবাজী ত্যাগ কর! ইংরাজের মুষ্টিগত অধিকারগুলি আদায় করিতে চাও—নিজেদের মুষ্টিগত অধিকারগুলি তাহার হকদারদিগকে ছাড়িয়া দাও! দেশকে বড় করিতে চাও—মনকে আগে বড় করিয়া লও।

Printed and Published by Md. Khairul Anam Khan from the "Mohammadi Press",
29, Upper Circular Road, Calcutta.

আমাবস্যার ঘোর অন্ধকার

রজনীর অবসান

আশার সুপ্রভাতের আলোক রশ্মি

সুলভে মোছলেম সাহিত্য প্রচারের প্রথম

অভিনব এবং অপূর্ব্ব চেষ্টা

তাই আজ মোছলেম বঙ্গের আকাশ পাতাল

প্রতিঘাত করিয়া মোহাম্মদীর সৎ-সাহিত্য

বিতরণের এই বিরাট আয়োজনের

বিজয়-দুন্দুভি বাজিয়া উঠিয়াছে।

যাহা কেহ কখনও শুনে নাই,

কল্পনা করে নাই,

এমন কি স্বপ্নেও ভাবে নাই

তাহাই আজ সফল হইল।

মোছলেম সাহিত্য প্রতিভার

জ্বলন্ত জ্যোতিষ্ক

মরহুম মীর মশর্‌রফ হোসেন সাহেবের

আসল এবং খাঁটি

বিষাদ-সিন্ধু

প্রথমবর্ষ　　মাঘ, ১৩৩৪　　চতুর্থ সংখ্যা

# মাসিক মোহাম্মদী

সম্পাদক—

মোহাম্মদ আকরম খাঁ

বার্ষিক মূল্য সডাক তিন টাকা　　প্রতি সংখ্যা সাড়ে চারি আনা

# ১৯২৮ সালের নূতন গ্রামোফন

## নির্ম্মানের বৈজ্ঞানিক নিয়ম

ভিভা টোনাল কলম্বিয়া সম্পূর্ণ আধুনিক গ্রামোফন। ইহাতে পূর্ব্বের গৃহীত সমস্ত রীতি পরিত্যাগ করিয়া আওয়াজ সম্পূর্ণরূপে নূতন করিয়া তৈয়ার করা হইয়াছে ইহা বর্দ্ধিত আকারে পুনর্ন্নির্ম্মাণের জন্য অনেকগুলি নূতন বিষয় সন্নিবেশিত হইয়াছে। ৬ অক্টেভ বাদ্যযন্ত্রের ন্যায় ইহার কলকব্জা আসল খাঁটী ও অবিকৃত।

টু জোন সাউণ্ড বক্সে গোল ও মোচাকৃতি ঝিল্লি সকল থাকায় চড়ায় ও লয়ে সমানানুপাতে আওয়াজ দেয়। চেপ্টা ঝিল্লি হইতে এরূপ আওয়াজ হইতে পারেনা। ইহার বর্দ্ধিত ঘর সমুহ সীসার পাটে প্রস্তুত বলিয়া আওয়াজ খুবই স্পষ্ট হয়।

## মূল্য ১৫০৲ টাকা হইতে ৬৭৫৲ টাকা পর্য্যন্ত

কলিকাতা ও মফঃস্বলের জন্য এজেণ্ট আবশ্যক

বিনামূল্যে বিশদ বিবরণের জন্য পত্র লিখুন।

## ডি, ই, বেভান এণ্ড কোং লিমিটেড

লণ্ডন মিউজিক্যাল ডিপো

গ্রসভেনর হাউস কলিকাতা

## গ্রস্‌ভেনর বক্স হারমোনিয়ম

এই হারমোনিয়ম আমরা বাজারের সমস্ত বক্স হারমোনিয়মের চাহিদা পূরণ করিবার জন্য সুস্বর আওয়াজ বিশিষ্ট করিয়া তৈয়ার করিয়াছি। মূল্য এতটা হিসাব করিয়া ধার্য্য করা হইয়াছে যে সকলেই যেন ইহা ক্রয় করিতে পারেন উপরন্তু যন্ত্রপাতি সমূহ এত সুন্দর ভাবে সন্নিবিষ্ট যে ইহা অপেক্ষা বেশী মুল্যের বাদ্য-যন্ত্রে এরূপ নাই। আওয়াজ উচ্চ, রীড সমূহ সুস্বর যুক্ত ও ভারতবর্ষের গান-বাজনার পক্ষে সুন্দরভাবে সন্নিবেশিত

মুল্য ৩০৲ টাকা হইতে ২২৫৲ টাকা পর্য্যন্ত

হারমোনিয়ম রীডস্

আওয়াজে ও গুণে সর্ব্বোৎকৃষ্ট ফ্রেঞ্চ রীডের সমতুল্য করিয়া অর্ডার দিয়া তৈয়রী

৩ অক্টেভ প্রতি সেট ৪৷৷০ টাকা ৩৷৷০ অক্টেভ প্রতি সেট ৫৷৷০ টাকা

দোকানদারদিগকে পৃথক ডিস্‌কাউণ্ট দেওয়া হয়।

## T. E. Bevan & Co Ltd

**GROSVENOR HOUSE CALCUTTA**

# সূচী পত্র—মাঘ ১৩৩৪

# সূচী পত্র—মাঘ ১৩৩৪

অর্ডার দিবার সময় অনুগ্রহ পূর্ব্বক—"মাসিক মোহাম্মদীর" নাম উল্লেখ করিবেন।

# আমাদের আলেক্স ব্রাণ্ড স্যু

## চামড়ার গ্যারাণ্টি দেওয়া হয়

মূল্য ৭৷৷০ টাকা

স্পেশাল স্যু ৬৷৷০ টাকা — ৫৫৫নং কাল স্যু ৫৲ টাকা

যদি আপনি সস্তা অথচ মজবুত বুট, স্যু, স্লিপার ও বর্ম্মা স্যাণ্ডেল পাইতে ইচ্ছা করেন তাহা হইলে ১৪৬।২ নং লোয়ার চিৎপুর রোডস্থ কোহিনূর ফুট অয়ার কোম্পানীতে পদার্পন করুন! সেখানে আপনি আলেক্স, আলেন ৫৫৫, পোলোওয়েলডন, কোহিনূর স্পেশাল ইত্যাদি প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ কোম্পানার প্রত্যেক সাইজের জুতা গ্যারাণ্টি সহ লই বন।

## দি কোহিনূর ফুট ওয়ার কোং

১৪৬।৩ লোয়ার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।

---

## কলিকাতায় জার্ম্মেণ চিকিৎসা

চিকিৎসায় যুগান্তর। স্বাভাবিক নিয়মে সত্বর আরোগ্য হইতে হইলে, রোগ বিবরণ লিখুন। ঔষধের মূল্য সপ্তাহ ২৲ টাকা। হিষ্টিরিয়া, উন্মাদ, বাতব্যধি, প্রমেহ, বহুমূত্র, প্রদর, অর্শ, ঘা, গণোরিয়া, সিফিলিস্ বাধক, বন্ধ্যাত্ব ও ধাতুদৌর্ব্বল্য রোগে অব্যর্থ ফলপ্রদ। স্ত্রীরোগ এবং সর্ব্বপ্রকার গোপনীয় রোগ চিকিৎসার সুবর্ণ সুযোগ। বিনামূল্যে ইংরাজী পুস্তিকা দেওয়া হয়।

ডাঃ এস, চৌধুরী বি-এ, এম-ডি

বাইওকেমিষ্ট

৭৭নং ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

---

৩ বৎসর গ্যারাণ্টি সহ

## ১৬৲ টাকায় এক রীডের হারমোনিয়াম !!
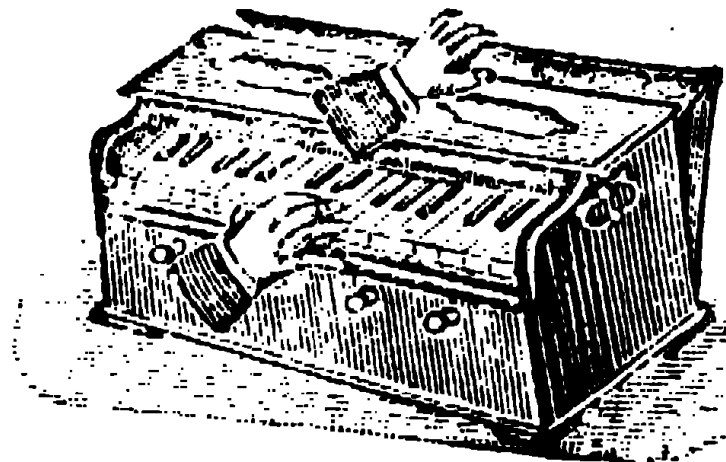
[যাবতীয় অর্গেন ও পিয়ানো মেরামতকারক।

৫৲ টাকা অগ্রিম পাঠাইতে হয়।

আর, সি, দাস এণ্ড কোং

৪।১, ফ্রি স্কুল ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

---

## শুভসংবাদ

সকল রকম পেটেণ্ট ঔষধের নাম ট্রেডমার্ক, দোকানের ও অফিসের নাম, সরিকান অংশ ইত্যাদি গবর্ণমেণ্ট হইতে রেজিষ্টারী করা আবশ্যক ও সকল প্রকার ক্যাটালগ, হ্যাণ্ডবিল, চিঠীর কাগজ ইত্যাদি ( ঘরে বসিয়া কলিকাতার দরে ছাপাইতে হইলে ও শিশি, বোতল, কর্ক ও নানাবিধ কাগজ আবশ্যক হইলে কাল বিলম্ব না করিয়া নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখুন।

দি ষ্টার কমার্শিয়াল এজেন্সী

মার্চেণ্ট কমিশন এজেণ্ট ও জেনারেল অর্ডারসাপ্লায়ার

১০ নং কালিনষ্ট্রীট, কলিকাতা, ( মাঃ মঃ )

---

## S. M. YOUSUF & Co.

**Mechanical, Electrical Engineers & Contractors.**

**Dealers in Motor Acessories & Electric Fittings.**

Repairers of Motor, Motor Car, Magneto, Dynamo, Self-starter, Rebuilding & Battery Charging & Wiring etc.

Decoration & Illumination Works & undertakings.

*120, Dharmatola Street,*
**CALCUTTA.**

# বিজ্ঞাপন—সূচী মাঘ,—১৩৩৪।

# বিজ্ঞাপন—সূচী মাঘ,—১৩৩৪।



কভার

# বিখ্যাত লেখক মৌলবী ফজলুর রহীম চৌধুরী এম, এ, প্রণীত গ্রন্থসমূহ

**বঙ্গানুবাদ—মেশকাত শরীফ ঃ—** মোছলমানের পথ প্রদর্শকশেষ পয়গম্বর হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা (দঃ) এর অমর বাণী মেশকাত শরীফ হাদিস। ইহা আরবী ভাষায় লেখা বলিয়া অনেক বাঙ্গালী মোছলমান তাহা বুঝিতে পারেন না। অথচ দীনদারী বা দুনিয়াদারী সকল কাজেই প্রত্যেক মোছলমানের হাদিস জানা দরকার। এই দারুণ অভাব দূর করিয়া ধর্ম্মের নিগূঢ় রহস্য প্রত্যেক মোছলমান ভাইকে জানাইবার জন্য বহু অর্থ ব্যয়ে উহার সঠিক অনুবাদ সরল বাংলা ভাষায় বাহির করা হইল। হাদিসখানি প্রায় সাত শত পৃষ্ঠায় সমাপ্ত, কাপড়ের বাঁধাই, দাম মাত্র সাড়ে তিন টাকা।

**কোর-আনের সুবর্ণ কুঞ্জিকা ঃ—** ইহাতে সভ্যতার ইতিহাস, আরবদের প্রাচীন ইতিহাস, বিশ্বজনীন সভ্যতা বিস্তারে এছলামের স্থান, এছলামের ভাববানী তদীয় সংক্ষিপ্ত জীবনে কি আশ্চর্য্যভাবে বিশ্ব-মানবতাকে উদ্বুদ্ধ করিয়াছেন তাহা অতি সুন্দরভাবে আলোচিত হইয়াছে। ইহা এছলামের মূলনীতি সমন্বিত কোর-আনের কুঞ্জিকা। মনোরম বাঁধাই এবং সুন্দর কাগজ ও ছাপা। মূল্য নাম মাত্র ১৲ এক টাকা।

**পয়গম্বর-কাহিনী ঃ—** ইহাতে সৃষ্টি রচনা হইতে হজরত ইউছফ পর্য্যন্ত নবীগণের ধারাবাহিক ইতিহাস সরল ও প্রাঞ্জল ভাষায় লিখিত। সুন্দর বাইণ্ডিং মূল্য ১৷৹ দেড় টাকা মাত্র।

**এছরাইল বংশীয় নবীগণ ঃ—** ইহাতে হজরত ইউছফ হইতে হজরত ইছা পর্য্যন্ত নবীগণের ধারাবাহিক ইতিহাস লিখিত আছে। সুন্দর বাইণ্ডিং মূল্য ১।৹ পাঁচ সিকা মাত্র।

**সোহরাব রুস্তম ঃ—** ৸৹ বার আনা মাত্র।

**Anglo Arabic Word Book**—৷৹ আট আনা।

**প্রাপ্তিস্থান ঃ—মোহাম্মদী বুক এজেন্সী,** ২৯নং আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা।

---

প্রসিদ্ধ বন্দুক বিক্রেতা।

আমরা প্রচুর পরিমাণ বন্দুক, রাইফেল, রিভলভার ও বন্দুকের সরঞ্জাম আমদানী করিয়া সুলভে বিক্রয় করিয়া থাকি।

MODEL 1908

H&R

বন্দুক, রাইফেল আমদানী কারক।

মফঃস্বলের অর্ডার সযত্নে সত্বর সরবরাহ করা হইয়া থাকে। পত্র লিখিলে সচিত্র ক্যাটালগ বিনামূল্যে পাঠাই।

**শ্রীঅবিনাশচন্দ্র কুণ্ডু এণ্ড কোং**

১০নং চাঁদনী চক্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

---

# ঢোল এণ্ড কোম্পানির

HAS THE LARGEST SALE IN INDIA, BURMA, CYLON, MALAY & THE STRAITS.

# দাদ ও কাউরের অব্যর্থ মলম

বিনা যন্ত্রণায় যাবতীয় দাদ, কাউর ঘা, গলল, জলগাজা ও পাঁকুই প্রভৃতি আরোগ্য না হইলে মূল্য ফেরত ও পারাবর্জ্জিত না হইলে ৫০০৲ টাকা পুরস্কার দিব মূল্য ১ কৌটা ।৹, ভিঃ পিতে ৷৵৹ একত্র ৩ কৌটায় মাশুল লাগে না ও ১২ কৌটা মাশুল সহ ২৷৹ টাকা।

**ঢোল এণ্ড কোং বরাহনগর, কলিকাতা।**

মাসিক মোহাম্মদী

প্রথম বর্ষ। || মাঘ ১৩৩৪ সাল। || চতুর্থ সংখ্যা

# এছলামে নারীর মর্য্যাদা ও অধিকার

[ মোহাম্মদ আকরম খাঁ ]

—∞—

( ৪ )

দুনয়ার সকল ধর্ম্মের সমস্ত স্মার্ত্ত, সকল সমাজের যাবতীয় ব্যবস্থা-প্রণেতা নারীর মর্য্যাদা-হানি ও তাহার অধিকার খর্ব্ব করার নিমিত্ত সমবেতভাবে যে ধারাবাহিক চেষ্টা করিয়া আসিয়াছেন, তাহার সম্যক আলোচনা করিলে ক্ষোভে ও লজ্জায় ম্রীয়মান হইয়া পড়িতে হয়। তাঁহারা নারীকে পার্থিব সকল সম্মান, সকল গৌরব ও সকল অধিকার হইতে বঞ্চিত করিয়াই তৃপ্ত হইতে ও ক্ষান্ত থাকিতে পারেন নাই। এক্ষেত্রে তাঁহাদের পক্ষপাতমূলক সঙ্কীর্ণতা ও কুসংস্কারজনিত মানসিক বিকার স্বর্গের সিংহাসনকে অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন করিয়া ফেলিতেও চেষ্টার ত্রুটী করে নাই। তাই দেখিতেছি—স্বর্গের সমস্ত করুণা, সমস্ত আশীর্ব্বাদ একমাত্র পুরুষের ভাগ্যে সম্পূর্ণভাবে একচেটিয়া হইয়া আছে, নারীর তাহাতে কোনও প্রাপ্য বা অধিকার নাই। এমন কি, যে নারী ভগবতীর সাক্ষাৎ অংশ স্বরূপা বলিয়া পরিকীর্ত্তিত, ভগবতীর বা ভগবানের পূজা অর্চ্চনা করার, তাঁহার মন্দিরে প্রবেশ করার, তাঁহার বাণীর একটী বর্ণ মুখে উচ্চারণ করার, এমন কি কাণে শ্রবণ করার অধিকারও সে নারীর নাই!

এই পক্ষপাত মূলক সঙ্কীর্ণতার এবং এই অজ্ঞতাজনিত মহাপাতকের মূলে প্রথম কুঠারাঘাত করিয়াছে—এছলাম। নারীর মহিমাকীর্ত্তনে এবং তাহার সমস্ত ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠিত করণে কোরআনের এক বিরাট অংশ পর্য্যবসিত হইয়া আছে। কোরআনের একটী বৃহৎ অধ্যায়ের নাম 'নেছা' বা নারী, আর একটীর নাম 'মরয়ম' বা মেরী। এছলামকে সাক্ষাৎভাবে অধিক লেনা-দেনা করিতে হইয়াছিল—এহুদী ও খৃষ্টান সংস্কারের সহিত। তাই কোরআন এক্ষেত্রে এহুদী ও খৃষ্টান সমাজের পুরাবৃত্ত হইতে কতিপয় সতীসাধ্বী এবং আল্লার বিশেষ আশীর্ব্বাদ ও প্রেরণা প্রাপ্ত মহিলার কথা উল্লেখ করিয়া এহুদীদিগের হঠকারিতার কঠোর প্রতিবাদ করিয়াছে। হাজেরা, ছারা, মরয়ম, বিলকিছ, আছিয়া প্রভৃতি সাধ্বী মহিলাগণের উপাখ্যানে স্পষ্ট করিয়া নারীর মর্য্যাদা ও আল্লার হুজুরে তাহার সমান ও অধিকারের কথা চোখে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

এই সকল বর্ণনার দ্বারা কোরআন খুব স্পষ্টভাবে ঘোষণা করিয়া দিয়াছে যে, নর ও নারী উভয়ই মঙ্গলময় আল্লাহ্ তা'আলার মঙ্গল সৃষ্টি, তাঁহার করুণা ও তাঁহার প্রেমে, তাহাদের উভয়েরই সমান অধিকার আছে। সেই মঙ্গলময়ের মঙ্গল ইচ্ছা পূর্ণ পরিণত করার জন্য, যে যে বিশেষ উদ্দেশ্যে তাহাদিগের প্রত্যেককে যে যে বৈশিষ্ট্য দান

করা হইয়াছে, সেই সেই বৈশিষ্ট্যকে অবলম্বন করিয়া তাহারা পরস্পরের সাহচর্য্যে সেই সেই লক্ষ্যের পানে অগ্রসর হউক, ইহাই স্বর্গের মঙ্গল ইঙ্গিত। এই হিসাবে কোরআন স্পষ্টাক্ষরে স্বীকার করিতেছে যে, পুরুষদিগের ন্যায় নারিগণও "নবী" হইতে পারেন। কেবল হইতে পারেন-ই নহে, বরং নারীরাও যে 'নবুয়ত' লাভ করিয়াছেন, কোরআনের অনাবিল ভাষা সুস্পষ্টভাবে ও সমুচ্চ কণ্ঠে জগদ্বাসীর নিকট তাহা ঘোষণা করিয়া দিয়াছে। এক শ্রেণীর পাঠকের নিকট কথাটা নিতান্ত অভিনব বলিয়া মনে হইতে পারে। তাই এ সম্বন্ধে অতি সংক্ষেপে দুই একটা দরকারী কথার উল্লেখ করিয়া দিতে বাধ্য হইতেছি।

যে সকল মহামানব আল্লার নিকট হইতে অহি ও কালাম বা প্রেরণা ও বাণী প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, এছলামের পরিভাষায় তাঁহাদিগকে "নবী" বলা হইয়া থাকে। এই নবীগণের মধ্যে যাঁহারা সেই বাণীকে বিশ্বমানবের নিকট প্রচার করিতে, দুনয়ায় প্রচলিত শয়তানের রাজ্যে সত্যের সিংহাসন প্রতিষ্ঠা করিতে এবং তজ্জন্য কঠোর কর্ম্মযোগে প্রবৃত্ত হইতে আদিষ্ট হইয়া থাকেন, সেই নবীগণকে বলা হয়—র'ছুল। সুতরাং আমরা দেখিতেছি যে, আল্লার বাণী ও প্রেরণালাভের সম্পর্ক যতটুকু, সেখানে নবী ও রছুলের মধ্যে কোন তারতম্য নাই। তারতম্য ঘটিতেছে—বাহিরের কর্ম্মযোগের বিশেষ সাধনার হিসাবে। তাই বলা হয়—সমস্ত নবী রছুল না হইলেও রছুলগণ সকলেই নবী।

পুরুষের ন্যায় নারীকেও আল্লাহ কতকগুলি বৈশিষ্ট্য দিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন, এবং সেগুলি হইতেছে তাহার প্রকৃতিগত স্বর্গীয় অবদান। স্বর্গের সকল প্রেম ও সকল করুণা, নারীর মহিমা ও গুরুত্বকে এইখানেই মনের সাধ মিটাইয়া একেবারে ষোল কলায় পূর্ণ করিয়া তুলিয়াছে। এই বৈশিষ্ট্যের মর্য্যাদা রক্ষার জন্য নারী রছুল-জীবনের কঠোর কর্ম্মসংগ্রামের সীমা হইতে দূরে অবস্থান করিতে বাধ্য—প্রকৃতিকে উপেক্ষা করা সম্ভবপর নহে। কিন্তু জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগের সাধনায় তাহার পথ সম্পূর্ণ নির্ব্বিঘ্ন। তাই নবুয়তের দর্জা লাভ করা তাহার পক্ষে অন্যায়ও নহে, অসম্ভবও নহে। আমাদের জ্ঞানবিশ্বাস মতে, এই কারণে কোরআন-হাদিছে কোন নারী রছুলরূপে বর্ণিত হন নাই—বটে, কিন্তু নারীর নবী হওয়ার যথেষ্ট প্রমাণ তাহাতে বিদ্যমান আছে। পাঠক পাঠিকাগণের কৌতূহল নিবারণের জন্য নিম্নে উহার সামান্য একটু আভাষ দিয়া রাখিতেছি।

(১) কোরআনের ছুরা মরয়ম পাঠ করিতে আরম্ভ করিলে দেখা যাইবে—সেখানে জাকরিয়া, য়্যাহয়া ও এবরাহিম প্রভৃতি প্রাতস্মরণীয় নবীদিগের বর্ণনা করা হইয়াছে, এবং সেই সকল বর্ণনার পূর্ব্বে واذكر في الكتاب পদটী যোগ করা হইয়াছে। এই প্রসঙ্গের মধ্যভাগে বিবি মরয়মের নামের উল্লেখ করা হইয়াছে এবং তাহাতে পূর্ব্ব কথিত মতে—واذكر في الكتاب مريم বলিয়া আরম্ভ করা হইয়াছে। এই দুই কারণে সঙ্গতভাবে অনুমান করা যাইতে পারে যে, কোরআন এখানে বিবি মরয়মকে নবীদিগের পর্য্যায়ভুক্ত করিয়া লইয়াছে।

(২) এই ছুরায় হজরত জাকরিয়া, বিবি মরয়ম, হজরত এবরাহিম, হজরত এছমাইল ও হজরত ইদ্রিছ প্রভৃতির ইতিবৃত্ত বর্ণনার পর স্পষ্ট ভাষায় বলা হইয়াছে :—

اولئك الذين انعم الله عليهم
من النبيين من ذرية آدم

অর্থাৎ, আদম-বংশের যে সকল নবীর প্রতি আল্লাহ অনুগ্রহ করিয়াছেন—ইঁহারা তাঁহাদিগের অন্তর্ভুক্ত।

সুতরাং বিবি মরয়মও যে হজরত এবরাহিম ও হজরত ইদ্রিছ প্রভৃতির ন্যায় আল্লার এনআম প্রাপ্ত নবীদিগের অন্তর্ভুক্ত, অর্থাৎ তিনিও যে একজন নবী, তাহা অকাট্যরূপে প্রতিপাদিত হইয়া যাইতেছে।

(৩) কোরআনে স্পষ্টতঃ বর্ণিত হইয়াছে যে, বিবি মরয়ম, হজরত মূছার মাতা, হজরত এছহাকের মাতা প্রভৃতির নিকট আল্লাহ নিজের "রূহ" অর্থাৎ জিব্রাইল ফেরেশতাকে পাঠাইয়াছিলেন। তাঁহারা আল্লার "অহি" বা প্রেরণালাভ করিয়াছিলেন, স্বর্গের সুসংবাদ তাঁহাদিগের নিকট সমাগত হইয়াছিল, এবং অহির মধ্যবর্ত্তিতায় তাঁহারা বহু অজ্ঞাত তথ্য (আম্বাউল-গ'এব) অবগত হইতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

(৪) স্বনামখ্যাত মহামনিষী আল্লামা এবনে হাজম তাঁহার মিলাল (ملل و نحل) গ্রন্থের পঞ্চম খণ্ডে

سورة النساء বা নারীর নবুয়ত নাম দিয়া একটা স্বতন্ত্র অধ্যায় সন্নিবেশিত করিয়াছেন। এমাম ছাহেব সেখানে কোর-আনের বহু যুক্তিপ্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া অকাট্যরূপে নারীর নবুয়ত সপ্রমাণ করিয়াছেন। বিপক্ষ পক্ষ এই প্রসঙ্গে যে সকল যুক্তিপ্রমাণ উপস্থাপন করিতে পারেন, এমাম ছাহেব সেগুলির উল্লেখ করতঃ সম্পূর্ণভাবে তাহার খণ্ডনও করিয়া দিয়াছেন। (১)

এছলামের প্রাথমিক ইতিহাস সম্যকরূপে আলোচনা করিলে তৎকালীন মোছলেম-নারী-সমাজ সম্বন্ধে এমন অনেক গৌরবজনক তথ্য অবগত হওয়া যায়, যাহার কল্পনা করাও বোধ হয় এখন সাধারণ মুছলমানগণের, এমন কি তাহাদের আলেম ও হাদী সমাজের অনেকের পক্ষেও সহজ সাধ্য হইবে না। হাদিছের দার্শনিক সমালোচনা অর্থাৎ রেওয়ায়তের সহিত দেরায়তের সমাবেশ করতঃ হাদিছের আভ্যন্তরিণ দিকের সূক্ষ্ম আলোচনায় প্রবৃত্তি হইতে গেলে, আজ কাল সাধারণ আলেম সমাজের অশেষ তিরষ্কার ভাজন হইতে হয়। হাদিছের কথা দূরে থাকুক, আরবী ভাষায় লিখিত থার্ড ক্লাস বাজে গল্প-পুস্তকের একটা তা-হুদ্দ গাঁজা-খুরি কথার প্রতিবাদ করিতে গেলেও প্রথমে নেচারি-নাস্তিক বেদিন-কাফের প্রভৃতি বিশেষণগুলি হজম করার জন্য প্রস্তুত হইয়া বসিতে হয়। কিন্তু হজরতের সময় এবং তাঁহার পরলোকগমনের অব্যবহিত পরবর্ত্তী যুগে, মুছলমানের মানসিকতার অবস্থা এরূপ ছিল না। হজরত মোহাম্মাদ মোস্তফার শিক্ষা মাহাত্ম্যে আরবের নারীগণও তখন পুরুষ পণ্ডিতগণের সহিত এ সকল বিষয় লইয়া অতি সূক্ষ্ম দার্শনিক আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেন, এবং পাঠকগণ শুনিয়া স্তম্ভিত হইবেন যে, অনেক সময় এই সব বিদুষী মহিলার উক্তিই ছাহাবী সমাজে যুক্তি সঙ্গত বলিয়া গৃহীত হইত। হজরত ওমরের ন্যায় প্রবল প্রতাপান্বিত খলিফা মছজিদে-নববীর মেম্বরে দাঁড়াইয়া খোৎবা দিতেছেন, শত শত ছাহাবা স্তব্ধ মুগ্ধ এবং নীরব নিস্পন্দ ভাবে তাহা শুনিয়া যাইতেছেন। এমন সময়, তিনি প্রসঙ্গক্রমে নারীদিগকে চারিশত দেরমের অধিক মোহর দিতে নিষেধ করিতে লাগিলেন—হজরতের সময় কাহারও ইহার অধিক মোহর নির্দ্ধারিত হয় নাই—ইহাই ছিল ওমরের প্রধান যুক্তি।

মজলিসের এক প্রান্ত হইতে অমনি একটা নারী কণ্ঠ গম্ভীর স্বরে ধ্বনিয়া উঠিল :—

আমিরুল মোমেনিন! ক্ষান্ত উহন! এ প্রকার আদেশ দিবার কোন অধিকার আপনার নাই।

"কারণ?"

কারণ—আল্লার কোরআন। আপনি কি পড়েন নাই, আল্লাহ বলিতেছেন—"তোমরা যদি কোন স্ত্রীকে কিন্তার বা অগাধ ধন সম্পদ মোহররূপে দান করিয়া থাক, তালাক দিবার সময়, তাহার এক কপর্দ্দকও ফিরাইয়া লইতে পারিবে না।" (২) কিন্তার বা অগাধ ধন সম্পদ যে স্ত্রীকে মোহর স্বরূপে প্রদান করা যাইতে পারে, এই আয়ত তাহার স্পষ্ট প্রমাণ।

সত্যসন্ধ ওমরের চৈতন্য হইল—তিনি উচ্চ কণ্ঠে ঘোষণা করিতে লাগিলেন—তোমাদের খলিফা ভ্রান্ত হইয়াছিল, এই নারীর কথাই ঠিক, বস্তুতঃ ইহাই এছলামের বিধান। এই মহিলা সংশোধন করিয়া না দিলে আজ ওমরের সর্ব্বনাশ ঘটিয়াছিল। তোমরা সকলে শ্রবণ কর, পুরুষ ওমর ভ্রান্ত, আর এই মোছলেম-মহিলার কথাই ঠিক।—শত শত উদাহরণের মধ্যে ইহা একটা সাধারন নমুনা মাত্র।

এই প্রসঙ্গে বিবি আয়েশার নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখ-যোগ্য। আমাদের মতে রেওয়ায়তের সূক্ষ্ম ও দার্শনিক সমালোচনার ভিত্তি মোছলেম-কুল-জননী বিবি আয়েশাই সর্ব্ব প্রথমে স্থাপন করিয়াছেন। হাদিছের আলোচনায় নানা উপলক্ষে দেখা যায়, বিশিষ্ট ছাহাবীগণ হজরতের হাদিছ বলিয়া এক একটা বিবরণ প্রদান করিতেছেন, আর বিবি আয়েশা নানাবিধ শাস্ত্রীয় ও দার্শনিক যুক্তি প্রমাণ দ্বারা তাহা টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া উড়াইয়া দিতেছেন। ছহি মোছলেমের একটী হাদিছে বর্ণিত হইয়াছে যে, স্বনামধন্য ছাহাবী এবনে-ওমর জনৈক সদ্য বিয়োগ বিধুর আত্মীয়ের

---

(১) ৩৮৪ হিজরীতে কর্ডবা বা কার্ডোভা নগরে এমাম ছাহেবের জন্ম হয় এবং ৪৫৬ হিজরীতে তিনি পরলোক গমন করেন। (এবনে-খল্লকান)। এমাম ছাহেবের এই বিশাল পুস্তক খানি দুনয়ার সমস্ত ধর্মশাস্ত্র ও ধর্মমতের সূক্ষ্ম সমালোচনা মূলক এক বিরাট বিশ্বকোষ। হিজরী চতুর্থ শতাব্দীর প্রথম ভাগে দুনয়ার সকল দেশের সকল ধর্মমতের ও তাহাদের ক্ষুদ্র বৃহৎ যাবতীয় শাখা প্রশাখা গুলির সঠিক বিবরণ এমন ব্যাপকভাবে সঙ্কলন, তাহার এমন অকাট্য সূক্ষ্ম ও দার্শনিক সমালোচনা, এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রচলিত সাধারণ অন্ধবিশ্বাসের উপর এমন তীব্র নগ্ন ও বেপরোয়া আক্রমণ, বাস্তবিকই একটা অসাধারণ ব্যাপার। (২) ছুরা নেছা।

মুখে ক্রন্দনের শব্দ শুনিয়া একজন লোক পাঠাইয়া তাহাকে চীৎকার করিয়া কাঁদিতে নিষেধ করিয়া দিলেন। নিষেধের সময় তিনি বলেন—আমি হজরতের মুখে শুনিয়াছি, আত্মীয় স্বজনের ক্রন্দনের জন্য মৃত ব্যক্তির উপর আজাব হইয়া থাকে।

এবনে-ওমরের ন্যায় একজন চরম পরহেজগার ও মহা পণ্ডিত ছাহাবী হজরতের নামে এই হাদিছের রেওয়ায়ত বর্ণনা করিতেছেন, আর বিবি আয়েশা এই রেওয়ায়ত শ্রবণ মাত্র জলদ গম্ভীর স্বরে ঘোষণা করিতেছেন—"আল্লার দিব্য, হজরত কখনও এরূপ কথা বলেন নাই যে, অপর একজনের কৃত কর্ম্মের জন্য অন্য এক ব্যক্তি দণ্ড ভোগ করিতে বাধ্য হইবে।" বিবি আয়েশা তখন মুছলমানদিগকে দুইটী কথা খুব স্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়া দিলেন:—

(১) যাঁহাদের নিকট হইতে তোমরা হাদিছ গ্রহণ করিয়া থাক, সেই ছাহাবীগণ কখনই মিথ্যাবাদী নহেন। তবে মানুষের অনেক সময় শ্রবণ-বিভ্রম ঘটিয়া থাকে, এ সম্বন্ধে খুব সতর্ক হইতে হইবে।

(২) এছলামের মূল নীতির বিপরীত কোন হাদিছই হজরতের বাণী বলিয়া গৃহীত হইতে পারে না। এছলামের মূলনীতি এই যে, আল্লাহ ন্যায়বান ও আদেল। তাই কোরআন বলিয়া দিতেছে—

لا تزر وازرة وزر اخرى

একজনের পাপের বোঝা অন্যজন বহন করিবে না। এবনে ওমরের এই হাদিছটী এছলামের এই মূলনীতির বিপরীত, সুতরাং রাবীর ব্যক্তিত্বের বিচারে প্রবৃত্ত না হইয়া প্রথমেই উহাকে তাঁহার শ্রুতি বিভ্রম বলিয়া নির্দ্ধারিত করা উচিত।

বিবি আয়েশা এইরূপ সূক্ষ্ম যুক্তির হিসাবে ছাহাবীদিগের বর্ণিত আরও কতিপয় হাদিছকে সম্পূর্ণভাবে অগ্রাহ্য করিয়া দিয়াছেন। "হজরত চর্ম্ম চক্ষে আল্লাহকে দর্শন করিয়াছিলেন"—"হজরত যাহা বলেন, বদর যুদ্ধের শহিদগণ সে সমস্তই শুনিতে পান"—ইত্যাদি হাদিছগুলির কথা উদাহরণ স্বরূপে উল্লেখ করা যাইতে পারে।

মে'রাজ সম্বন্ধেও বিবি আয়েশা দৃঢ়তার সহিত ঘোষণা করেন যে, মে'রাজের রাত্রে হজরতের শরীর তাঁহার শয্যা হইতে এক মুহূর্ত্তের তরেও তিরোহিত হয় নাই—উহা সত্যময় 'স্বপ্নযোগ' ব্যতীত আর কিছুই নহে।

প্রাথমিক যুগের মোছলেম-মহিলাগণের জ্ঞান চর্চ্চার নানা দিককার বৈশিষ্ট্যের কথা আলোচনা করিতে হইলে, সে জন্য স্বতন্ত্র প্রবন্ধ রচনার আবশ্যক হইবে। এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে তাহার সংক্ষিপ্ত বর্ণনারও স্থান সঙ্কুলান হওয়া সম্ভবপর নহে। আমরা এই প্রবন্ধে নানা প্রসঙ্গে যে সকল উদাহরণ উদ্ধৃত করিয়াছি, চিন্তাশীল পাঠক পাঠিকাগণের জন্য আপাততের মত তাহাই যথেষ্ঠ হইবে বলিয়া আশা করি।

এছলামের শিক্ষা মাথায় করিয়া সে কালের মোছলেম মহিলাগণ মানসিক বলে ও দৈহিক শৌর্য্যে-বীর্য্যে কিরূপ অসাধারণত্ব লাভ করিয়াছিলেন, সেই দিগ্বজয়ী বীর জননীগণের অনুপম কীর্ত্তিগাথাগুলি মোছলেম জগতের জীবন ইতিহাসের পত্রে পত্রে ছত্রে ছত্রে সোণার অক্ষরে লিখিত হইয়া আছে। কিন্তু মোছলেম জাতীয়তার সেই জীবনবেদ, আজ বিস্মৃত অনাদৃত অজ্ঞাত অতীতে পরিণত করিয়া দেওয়া হইয়াছে। তাই আধারের দুর্দ্দশায় আধেয়ের এই পরিণতি, জননীর অধঃপতনে সন্তানের অর্থাৎ বর্ত্তমান মুছলমান সমাজের এই পরিণাম।

## মুছলমান আজ ভুলিয়া গিয়াছে যে:—

দুনয়ার সর্ব্বপ্রথম মুছলমান, একজন নারী—বিবি খদিজা।

এছলামের সর্ব্বপ্রথম মোজতাহেদ, একজন নারী—বিবি আয়েশা।

এছলামের সর্ব্বপ্রথম শহিদ একজন নারী—আম্মার জননী বিবি ছুমিয়া।

এছলামের সর্ব্বপ্রথম হাসপাতালের সর্ব্বপ্রথম পরিচালিকা, একজন নারী—বিবি রা'ফিজা আছলামিয়া।

এছলামের ইতিহাসে জল যুদ্ধ যাত্রার সর্ব্বপ্রথম আগ্রহশালিনী ছিলেন, একজন নারী—বিবি উম্মে হারাম। অবশেষে হজরত ওছমানের খেলাফত কালে সাইপ্রস অভিযানে বীর সৈনিকের বেশে যুদ্ধের ময়দানে ঘোড়া হইতে পড়িয়া গিয়া ইনি শাহাদত প্রাপ্ত হন।

আর কত বলিব? কাহাকে বলিব? মোছলেম বঙ্গের এই জীবন গন্ধহীন শূন্য গোরস্থানে এ আর্ত্তনাদের কোন সার্থক প্রতিধ্বনি জাগিয়া ওঠা কখনও সম্ভবপর হইবে কি?

(সমাপ্ত)

# মুস্‌লিম সাহিত্যের গতি ও লক্ষ্য

[ গোলাম মোস্তফা বি-এ, বি-টি ]

বাংলা সাহিত্যের বর্ত্তমান ভাব-ধারার মধ্য দিয়া মুসলমানের জাতীয় আত্মা যে সম্যকরূপে পরিস্ফুরিত হইতে পারে না, তাহার জন্য যে স্বতন্ত্র জাতীয় সাহিত্য-সৃষ্টির প্রয়োজন, এ কথা আজকাল অনেকেই বলিতেছেন। এ সম্বন্ধে অনুভূতি যাহাদের খুবই তীব্র, এমন কতকগুলি 'মুসলমান' ইতিমধ্যেই পাক্কা 'মোছলমান' সাজিয়া বাংলার 'সোলতান'কে পর্য্যন্ত 'ছোলতান' করিয়া লইয়াছেন; এমন কি 'নিজামে'র বেশ পরিবর্ত্তনের জন্যও পীড়াপীড়ি আরম্ভ করিয়াছেন! এরূপ হঠকারিতা সঙ্গত হইয়াছে কি না, সে বিচার না করিয়াও এ কথা অনায়াসে বলা যায় যে, আত্ম-প্রতিষ্ঠারই ইহা শুভ লক্ষণ। বাহির হইতে আপনার মধ্যে ফিরিয়া আসিবার এই যে বিপুল আগ্রহ, ইহাকে আমি সারা প্রাণ দিয়া অভিনন্দন করিতেছি।

মুসলমানদিগের এই বিক্ষোভ, এই বিদ্রোহ বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে এক অভাবনীয় ব্যাপার। এত বড় বিদ্রোহ বাংলা ভাষার জীবনে আর কোন কালে সংঘটিত হইয়াছে বলিয়া আমার মনে হয় না। এ বিদ্রোহ যে এখনই পরিপূর্ণরূপে প্রকাশ পাইয়াছে, বা কোন উল্লেখযোগ্য সুফল প্রসব করিয়াছে, তাহা বলিতেছি না। একটা অনাগত বিরাট নূতন যুগের প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করিতেছে বলিয়াই ইহাকে আমি এতখানি মূল্য দান করিতেছি।

বাংলা ভাষার জন্ম ও ক্রমবিকাশের ধারা পর্য্যবেক্ষণ করিলে মুসলমানদিগের এই বিদ্রোহকে সমর্থন করা ছাড়া গত্যন্তর নাই। সকলেই জানেন, বাংলা ভাষা মূলতঃ হিন্দু সন্তান হইলেও শৈশবেই সে পিতামাতা কর্ত্তৃক অনাদৃত, লাঞ্ছিত ও পরিত্যক্ত হইয়া নিতান্ত অসহায় অবস্থায় মুসলমান গৃহে আশ্রয় লয়। মুসলমানের আদর-যত্নেই তাহার শৈশব জীবন বর্দ্ধিত ও পরিপুষ্ট হইতে থাকে।

মুস্‌লিম গৃহে লালিত-পালিত হইলেও মুসলমানগণ কিন্তু বাংলা ভাষাকে জাতীয় আদর্শে তালিম দিতে কোনই চেষ্টা করেন নাই। সন্তানকে খাঁটী মুসলমানরূপে দেখিতে চাহিলে শৈশবেই যেমন তাহাকে কোরাণ শরিফ ও ইস্‌লামী-ক্রিয়া-পদ্ধতি শিক্ষা দিতে হয়, বাংলা ভাষাকেও সেইরূপ শিক্ষা দেওয়া উচিত ছিল। কিন্তু তাহা না করিয়া অভিভাবকেরা তাহাকে 'মহাভারত' শিক্ষা দিলেন এবং অন্য কোন কাজে না লাগাইয়া জমিদারী সেরেস্তায় ঢুকাইলেন। বাংলা ভাষার ভিতরেই যে বাঙালী মুসলমানের প্রাণের রস-নির্ঝর নিহিত আছে এবং এই রসধারার বিকৃতিতেই যে বাঙালী মুসলমানের জাতীয় জীবনও বিকৃত হইয়া পড়িতে পারে, সে চিন্তা তখনকার যুগে কাহারও মস্তিষ্কেই স্থান পায় নাই। নতুবা বাংলা ভাষা এমন করিয়া আজ আমাদের হাতছাড়া হইয়া যাইত না। যে মুস্‌লিম মনীষীবৃন্দ অগ্নি-উপাসকদিগের পারস্য ভাষাকে রূপান্তরিত করিয়া জাতীয় আদর্শে গড়িয়া লইতে পারিয়াছিলেন, তাঁহাদের ন্যায় প্রতিভা ও দূরদৃষ্টি যদি সেই যুগের হুসেনশাহ্‌, পরাগল খাঁ, কবি আলাওল বা অন্য কোন মুসলমানের মধ্যে থাকিত, তবে এত বড় একটা সুযোগ হেলায় নষ্ট হইয়া যাইত না। বাংলা ভাষাকে মুসলমান করা হয় নাই বলিয়া বাঙালী মুসলমানও খাঁটী মুসলমান হয় নাই; বাংলা ভাষাকে অবহেলা করা হইয়াছে বলিয়া বাংলার মুসলমানও আজ অবহেলিত হইয়া রহিয়াছে।

এই শৈথিল্যের ফল যাহা হইবার তাহা হইল। বাংলা ভাষা দিনে দিনে বিজাতীয় ভাবাপন্ন হইয়া পড়িল। মুস্‌লিম গৃহেও তাঁহাকে কেহ বাঁধিয়া রাখিল না, লাঞ্ছিত হইবার ভয়ে হিন্দু গৃহেও সে ফিরিয়া গেল না। কিছুকাল পরে দেখা গেল, সে একজন খাঁটী বৈষ্ণব সাজিয়াছে। তাহার সেই বেশভূষা ও প্রেমলীলা দেখিয়া অনেক মূঢ় মোহগ্রস্থ মুসলমানও তাহার ভক্ত হইয়া পড়িল। এইরূপে শুধু যে বাংলা ভাষাই মুসলমাদের হাতছাড়া হইয়া গেল, তাহা নহে,

সেই সঙ্গে অনেকগুলি মুসলমানও বিকৃত হইয়া গেল এবং তাহাদের প্রভাব সমগ্র সমাজের উপর অল্প-বিস্তর ছড়াইয়া পড়িল!

বাংলা ভাষার সেই 'চৈতন্যের' যুগ হইতে 'বিদ্যাসাগরের' সময় পর্য্যন্ত এই সুদীর্ঘ কালের মধ্যে মুসলমানদিগের কিন্তু কোনই চৈতন্যোদয় হইল না। তাহারা বৈষ্ণব-প্রেমের যে লীলা-তরঙ্গে ভাসিয়া যাইতেছিল, তাহার গতি অপ্রতিহতই রহিয়া গেল। এত বড় একটা দীর্ঘ যুগের জাতীয় জীবন শুধু ভাষা-সমস্যার জন্য এমনই করিয়া ব্যর্থ হইয়া গেল।

এই অবস্থার একটা পরিবর্ত্তন সাধন করিলেন বিদ্যাসাগর মহাশয়। বৈষ্ণব বাংলাকে ধরিয়া আনিয়া তিনি তাহার কর্ণে সংস্কৃত মন্ত্র আওড়াইয়া 'শুদ্ধি' করিয়া তাহাকে ঘরে তুলিলেন! বৈষ্ণব জীবনে তবুও তাহার অঙ্গে কতকটা মুসলমানী গন্ধ ছিল, কিন্তু বিদ্যাসাগর মহাশয় সে সমস্তই ধুইয়া মুছিয়া চন্দন-চর্চ্চিত গোঁড়া হিন্দুরূপে তাহাকে সকলের সম্মুখে দাঁড় করাইলেন। এই আকস্মিক পরিবর্ত্তনের জন্য মুসলমানদিগের আত্মোপলব্ধির একটা সুযোগ জুটিয়াছিল, সন্দেহ নাই; কিন্তু তাহাও বিফলে চলিয়া গেল। মুস-মানদিগের অন্তরে একটা চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইল বটে, কিন্তু নিজেদের অবস্থা সম্বন্ধে তেমন কোন জাগ্রত বুদ্ধির উন্মেষ বা বেদনার সঞ্চার হইল না। কিছুকাল দিশাহারা অবস্থায় ঘুরিয়া ফিরিয়া তাঁহারা আবার এই আর্য্য-বাংলার ভাব ধারাতেই গা ভাসাইলেন। আজ পর্য্যন্ত তাঁহারা এই ভাব-তরঙ্গেই হাবুডুবু খাইতেছেন।

কিন্তু এবার তাঁহারা যে স্রোতে ভাসিয়া চলিলেন, তাহার গতি ও লক্ষ্য পূর্ব্বাপেক্ষা ভীষণ ও মারাত্মক। ইসলামী আদর্শ হইতে তাঁহারা এবার সম্পূর্ণ বিপরীত দিকে ধাবিত হইলেন। বাংলা ভাষার বৈষ্ণব জীবনের সহিত কোন কোন বিষয়ে মুসলমানের বরং কিছু কিছু মিল ছিল, কারণ শ্রীচৈতন্য বাংলার মাটিতে ইসলাম-তরুরই একটা নূতন ফলস্বরূপ। কিন্তু এই 'শুদ্ধ' সংস্কৃত বাংলার রূপ ও প্রকৃতি সম্পূর্ণ ইস্লাম-বিরোধী এবং তাহার লক্ষ্য হইতেছে হিন্দু সভ্যতার পুনর্জ্জাগরণ। নিতান্ত দুঃখের বিষয়, এ সভ্যতার সহিত ইসলামের কিছুতেই যেন খাপ খাইতে চাহে না। বাংলা ভাষা এই সভ্যতারই বাহু। কাজেই এ হেন বাংলা ভাষাকে সেবা করিতে গেলে মুসলমানের ধর্ম্ম ও জাতীয় আদর্শ যে ক্ষুণ্ণ হইয়া পড়িবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? যে ভাষা আজ পর্য্যন্ত 'ঈশ্বর' ছাড়া 'খোদা'কে মানিতে চাহে না, পিপাসায় প্রাণ ওষ্ঠাগত হইলেও 'জল' ছাড়া 'পানি' পান করে না; পক্ষান্তরে শৈশব জীবনের সমস্ত কথা ভুলিয়া গিয়া নিতান্ত অকৃতজ্ঞের মত মুসলমানকে 'যবন' 'নেড়ে' বলিয়া গালাগালি দেয়, সে ভাষা মুসলমানের যে কেমন হিতৈষী, তাহা না বলিলেও চলে!

সুখের বিষয়, আজ আমাদের আত্ম-মর্য্যাদা-বোধ জাগিয়া উঠিয়াছে। আজ আমরা আমাদের স্বরূপ সঠিকরূপে ধরিতে পারিয়াছি এবং এতদিনের অভিজ্ঞতায় বুঝিতে পারি-য়াছি—এই ভাষার সেবা করায় আমাদের কতখানি অধঃপতন ঘটিয়াছে। তাই আজ আমাদের এই বিদ্রোহ, তাই আজ আমাদের জাতীয় সাহিত্য-সৃষ্টির এই বিপুল প্রচেষ্টা। ইহার মধ্যে হিংসা নাই, বিরোধ নাই, আছে শুধু বাঁচিয়া থাকিবারই সহজ স্বাভাবিক প্রবৃত্তি; আছে শুধু ন্যায্য অধিকার প্রতিপন্ন করিবার দাবী। এই ভেদ-বুদ্ধির মূলে সংকীর্ণ মানসিকতা বা সাম্প্রদায়িকতা নাই। হিন্দু মুসলমানের পরস্পর সত্যকার পরিচয় ও মিলনের নিমিত্ত এবং দেশের কল্যাণ-সাধনের জন্যই মুসলিম জাতীয় সাহিত্যের আজ প্রয়োজন হইয়াছে।

জাতীয় সাহিত্য-সৃষ্টির এই যে আয়োজন; ইহা যে নূতন আরম্ভ হইল, তাহা নহে। পণ্ডিত রেয়াজুদ্দিন আহমদের সময় হইতে এ পর্য্যন্ত এ চেষ্টা অনেকেই করিয়া আসিতে-ছেন। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত কোন নির্দ্দিষ্ট কর্ম্ম-পদ্ধতি বা একটা সুস্পষ্ট লক্ষ্য কেহই আমাদিগের সম্মুখে উপস্থিত করিতে পারেন নাই। জাতীয় সাহিত্য চাই, শুধু এই কথাই সকলে বলিয়া আসিতেছেন। কিন্তু সে সাহিত্যের আকৃতি ও প্রকৃতি কিরূপ হইবে, তাহার লক্ষ্য ও পরিণতি কি হইবে, কোন্ পথে চলিলে আমরা সে লক্ষ্যে পৌছিতে পারিব, সে সব বিষয়ে কেহই নিশ্চিত নহেন। কেহ বলিতেছেন, পূর্ব্বের সেই পুঁথি-সাহিত্যের পথেই আমাদিগকে চলিতে হইবে। কেহ বলিতেছেন, বাংলা ভাষার মধ্যে হুবহু আরবী ফারসী শব্দ ঢুকাও। কেহ বা আর এক কাঠি উপরে উঠিয়া আরবী বর্ণমালা দিয়াই বাংলা জবান লিখিতে পরামর্শ দিতেছেন। অন্যদিকে কেহ বা অনুলিখন-প্রণালী (trans-literation) লইয়া খুবই ব্যস্ত। 'স' ও 'ছ', 'জ ও 'য'—

ইহাদের কোন্‌টী কোথায় ব্যবহার করিলে ইস্‌লাক বজায় থাকে ও জাতীয় সাহিত্য গড়িয়া উঠে, তাহাই নির্ণয় করিতে তাঁহারা তৎপর! বস্তুতঃ এই সমস্ত ক্রিয়া-কলাপ একেবারে উপেক্ষার বিষয় না হইলেও নিতান্তই বাহিরের। জাতীয় সাহিত্য সৃষ্টি করিতে হইলে তাহার অর্থ কি, উদ্দেশ্য কি, এবং আদর্শ কিরূপ হইবে, সেই বিষয়ে সর্ব্বাগ্রে আমাদিগকে স্থির-নিশ্চিত হইতে হইবে। নতুবা রাশি রাশি আরবী-ফারসী শব্দ ঢুকাইলেও, বা 'স' স্থলে 'ছ' ব্যবহার করিলেও জাতীয় সাহিত্য গড়িয়া উঠিবে না। বাহিরের খোলস ছাড়িয়া প্রাণের দিকে আমাদের দৃষ্টি ফিরাইতে হইবে। আমরা কি চাই, আমাদের সাহিত্য সাধনার লক্ষ্য ও বৈশিষ্ট্য কি হইবে, সেই বিষয় সর্ব্বাগ্রে স্থির করিয়া তৎপরে আমাদের সমগ্র কর্ম্মশক্তিকে তদনুসারে নিয়ন্ত্রিত করিতে হইবে।

সে লক্ষ্য তবে কি হইবে? কোন্ আদর্শে আমরা চলিব?

এ প্রশ্নের উত্তরে এক কথায় আমি বলিতে চাই—অতীত যুগের মুস্‌লিম জ্ঞান-কর্ষণার যে আদর্শ এবং যে লক্ষ্য ছিল, আমাদিগকেও সেই আদর্শে এবং সেই লক্ষ্যে চলিতে হইবে। কথাটা হয়ত একটু অস্পষ্ট হইয়া গেল; কারণ মুসলিম 'কাল্‌চারের' প্রকৃতি ও লক্ষ্য কি ছিল, তাহা যতক্ষণ পর্য্যন্ত জানিতে না পারিতেছি, ততক্ষণ পর্য্যন্ত আমাদের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে কোন সুস্পষ্ট ধারণাই মনের মধ্যে জাগিয়া উঠিতেছে না। কাজেই, একটু অপ্রাসঙ্গিক হইলেও—মুসলমানদিগের অতীত যুগের জ্ঞান-সাধনার ইতিহাস আমাদিগকে এই খানে একটু পর্য্যালোচনা করিতে হইতেছে। মুসলমান জাতি কখন্, কোথায়, কি ভাবে, কোন্ আদর্শে জ্ঞান-কর্ষণ করিয়াছিলেন এবং তাহার ফলই বা কি হইয়াছিল, সেই কথাই এইবার আমাদিগকে বুঝিয়া দেখিতে হইবে।

মুস্‌লিম কাল্‌চার অর্থে আমরা আরবীয় বা Semetic Culture-ই বুঝিয়া থাকি। (১) এই 'কাল্‌চারের' ইতিহাস আলোচনা করিতে গেলে সর্ব্বাগ্রেই আরব দেশের প্রতি আমাদের দৃষ্টি পড়ে। হজরৎ মোহাম্মদের আবির্ভাব সময়ে বা তদ্‌পূর্ব্বে আরবের যে কোনই জ্ঞান-চর্চ্চা ছিল না, তাহা নহে। কাব্য, বাগ্মিতা, জ্যোতিষ প্রভৃতি বিষয় প্রাক্ ইস্‌লামিক আরবগণের প্রিয় সাধনার বস্তু ছিল। তবে দর্শন-বিজ্ঞান বা সাহিত্য বলিয়া তেমন কিছুই ছিল না। কিন্তু ইসলামের মধ্যবর্ত্তিতায় আরবগণ এক নূতন জীবন লাভ করিল। মহাপুরুষ মোহাম্মদ তাহাদিগকে শুধু ধর্ম্মের অমৃত রসেই অভিসিক্ত করিলেন না, জ্ঞানের আলোকেও তাহাদিগকে উদ্ভাসিত করিলেন। তিনি বলিলেন—"জ্ঞানান্বেষণের জন্য যদি সুদূর চীনদেশ পর্য্যন্তও যাইতে হয়, তবে তাহাও যাও।" তিনি বলিলেন—"এক ঘণ্টার জ্ঞান-বিজ্ঞান-আলোচনা সহস্র রজনীর উপাসনা অপেক্ষা শ্রেয়।" এই মন্ত্র প্রকৃতই মন্ত্র-শক্তির ন্যায় কার্য্য করিল। হজরতের জীবদ্দশাতেই হজরৎ আলী আপন প্রাণের মধ্যে সে বাণীর বাস্তব রূপ দান করিলেন। নিজে ত নানা বিষয়ে জ্ঞান অর্জ্জন করিলেই, অপর সকলকেও জ্ঞান সংগ্রহের জন্য প্রকাশ্যভাবে উদ্বুদ্ধ করিতে লাগিলেন। এইরূপে হজরৎ মোহাম্মদের জীবনকালেই মদিনা নগরে মুসলমানজাতির বিরাট জ্ঞান-সাধনার বীজ উপ্ত হইল। আরবের মরু-বক্ষে যে বীজ বপন করা হইল, পরবর্ত্তী কালে তাহাই প্রকাণ্ড মহীরূহে পরিণত হইয়া জগতকে কি অমৃতময় ফলই না উপহার দিয়াছে!

হজরৎ মোহাম্মদের মৃত্যুর পর বিশ্বগ্রাসী ক্ষুধা লইয়া আরবগণ দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইল। এই বিজয়-অভিযানের লক্ষ্য ছিল দুইটী:—(১) দেশ-বিজয়; (২) জ্ঞান-বিজয়। জ্ঞানের দিক দিয়া দেখিতে গেলে তৎকালে জগতের অবস্থা যে নিতান্তই শোচনীয় ছিল, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। সমগ্র জগৎ তখন অন্ধকারে আচ্ছন্ন। গ্রীস, রোম, মিসর ও ভারতের প্রাচীন জ্ঞান-শিখা তখন চির-নির্ব্বাপিত। বস্তুতঃ

(১) Semetic Culture বা Saracenic Culture-এর অর্থ ইহা নহে যে আরবগণই সর্ব্বত্র জ্ঞানানুশীলন করিয়াছিলেন, অন্য দেশীয় মুসলমানগণ করেন নাই। জ্ঞান-জগতে যে সমস্ত মুসলমান মনীষী অমর হইয়া আছেন, তাঁহাদের মধ্যে প্রকৃত আরববাসী খুব কমই ছিলেন। জ্ঞান-চর্চ্চার ইতিহাসে মাত্র একজন আরববাসীর নাম জগদ্বিখ্যাত হইয়া আছে। তৎকালে আরবী ভাষার ভিতর দিয়া সর্ব্বত্র জ্ঞান-চর্চ্চা করা হইত বলিয়া সকল দেশের মুসলমানকেই আরবীয় বলিয়া মনে করা হইত এবং মুসলমানদিগের সমগ্র সাধনাকে Saracenic Culture বলা হইত। ব্যাপক ভাবে এই কালচারকেই বলা হইয়া থাকে—Semetic Culture.—Arabic thought and its place in History by O. Leary.

এশিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকা—তিন মহাদেশেই তৎকালে অজ্ঞানতা ও কুসংস্কার, পূর্ণ প্রতাপে রাজত্ব চালাইতেছিল। একমাত্র সিরিয়া ও মেসোপটেমিয়াতেই প্রাচীন গ্রীসের সেই গৌরবোজ্জ্বল জ্ঞান-প্রদীপ তখনও ধিকিধিকি করিয়া জ্বলিতেছিল। সিরিয়ান, নেষ্টোরিয়ান ও পারসিকগণই গ্রীক দর্শন-বিজ্ঞানের একমাত্র তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন। বহু গ্রীক গ্রন্থাবলী সিরিয়া ভাষায় অনূদিত হইয়াছিল এবং তাহাদের ভিতর দিয়াই গ্রীসের জ্ঞানালোক এশিয়াখণ্ডে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল।

জ্ঞান-বিজয়ে বহির্গত হইয়াই গ্রীকজাতির এই প্রাচীন জ্ঞান-সাধনা বা Hellenic Culture-এর সহিত আরবদিগের প্রথম সাক্ষাৎ ঘটিল। সিরিয়া, মেসোপটেমিয়া ও পারস্য বিজয়ের পর উম্মাইদ খলিফাগণের সময়ে রাজধানী যখন মদিনা হইতে দামেস্ক নগরে স্থানান্তরিত হইল, তখন এইখানে সিরিয়ান, পারসিক ইত্যাদি জাতির সঙ্গে তাহাদের পরস্পর পরিচয় হইতে লাগিল। এই সংস্পর্শের ফলেই মুসলমানগণ গ্রীক দর্শন-বিজ্ঞান আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু উম্মাইদ খলিফাগণ প্রতিনিয়ত যুদ্ধ-বিগ্রহে ব্যাপৃত থাকায়, তাঁহারা জ্ঞানানুশীলনের প্রতি বড় একটা মনোযোগ দিতে পারিলেন না। কাজেই মুসলমানদিগের নব-জাগ্রত জ্ঞান-পিপাসা তথায় তৃপ্ত হইল না, বরং এই অতৃপ্তির দরুণ তাহাদের পিপাসা ও ব্যাকুলতা আরও বাড়িয়া গেল।

অতঃপর আব্বাসীয় খলিফাগণের সময়ে যখন বাগদাদে রাজধানী স্থাপিত হইল, তখন হইতেই মুসলমানদিগের প্রকৃত জ্ঞান-সাধনা আরম্ভ হইল। মহামতি খলিফা মনসুরের আদেশক্রমে এরিষ্টটল্, টলেমী, ইউক্লিড প্রভৃতি গ্রীকপণ্ডিতদিগের দর্শন, বিজ্ঞান ও সাহিত্য সম্বন্ধীয় গ্রন্থাবলী আরবী ভাষায় প্রথম অনুবাদ করা হইল। শুধু গ্রীক নহে, ভারতীয় এবং পারসিক জ্ঞান-ভাণ্ডারও লুণ্ঠন করিয়া আনা হইল। তাহাদের মধ্যে যেখানে যতটুকু গ্রহণযোগ্য ছিল, সমস্তই গ্রহণ করা হইল। ষষ্ঠ খলিফা পুণ্যস্মৃতি আল-মামুনের রাজত্বকালে মুসলমানদিগের এই জ্ঞান-সাধনা চরমে উঠিল। বিশ্বের তৎকালীন সমস্ত জ্ঞান-ভাণ্ডার মুসলমানদিগের করতলগত হইল। দর্শন, বিজ্ঞান, রসায়ন, পদার্থবিদ্যা, জ্যোতিষ, খগোল, গণিত, বীজগণিত, জ্যামিতি, ত্রিকোণমিতি, চিকিৎসাশাস্ত্র, ভূগোল, ইতিহাস, কাব্য, সঙ্গীত, শিল্প-কলা প্রভৃতি নানা বিষয়ক জ্ঞানানুশীলনে তাঁহারা প্রবৃত্ত হইলেন। এশিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকা—সর্ব্বত্রই যখন গভীর অজ্ঞানান্ধকারে সমাচ্ছন্ন, সেই সময়ে একমাত্র মুসলমানগণই এইরূপে জ্ঞান-শিখা জ্বালাইয়া অন্ধকারের বিরুদ্ধে অভিযান আরম্ভ করিল।

শুধু বাগদাদেই মুসলমানদিগের এই জ্ঞান-চর্চ্চা সীমাবদ্ধ ছিল, তাহা নহে। কায়রো, মরক্কো, কর্ডোভা, গ্রানাডা, সিভিলি, টলেডো প্রভৃতি স্থানেও মুসলমানদিগের বিরাট জ্ঞান-মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইল। এইরূপে এশিয়া হইতে আফ্রিকা এবং তথা হইতে ইউরোপে সে আলোক ছড়াইয়া পড়িল। ইউরোপের খৃষ্টানগণ নানা দেশ হইতে আসিয়া স্পেনীয় মুরদিগের পাদমূলে বসিয়া জ্ঞান শিক্ষা করিতে লাগিল এবং স্বদেশে ফিরিয়া গিয়া স্বজাতীয়দিগের মধ্যে উহা প্রচার করিতে আরম্ভ করিল। ইউরোপীয় সভ্যতার এইখানেই সূচনা।

এখানে একটা প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, বিশ্ব-সভ্যতায় মুসলমানের মৌলিক দান কতটুকু? অধিকাংশই ত তাহাদের অনুবাদ। ইহা নিতান্তই ভুল ধারণা। শুধু অনুবাদের জন্য নয়, মৌলিক দানের জন্যও মুসলমান জাতি জগতে বড় হইয়া আছে। প্রত্যেক নূতন সৃষ্টির অর্থই হইতেছে সর্ব্বাগ্রে পুরাতনের সন্ধান লওয়া। কি আছে এবং কি নাই ইহা না জানিয়াই যাহারা নূতন সৃষ্টি করিতে প্রবৃত্ত হয়, তাহাদের সৃষ্টি সব সময়ে নূতন হয় না। কাজেই মুসলমানগণ সর্ব্বপ্রথমে পুরাতনের সন্ধান লইয়াছিল। তাহা ছাড়া বিশ্ব-মানুষের উন্নতি ও সভ্যতার এরূপ কোন জাতি-বিচার করাও চলে না। হাজার যুগের হাজার ধারার পরস্পর মিলন ও সংঘর্ষে মানুষের সভ্যতা গড়িয়া উঠিয়াছে। দেশ, কাল বা জাতিভেদে কোন সভ্যতাই একক ভাবে পূর্ণতা লাভ করিতে পারে নাই। কাজেই মুসলমানগণ কাহার নিকট হইতে কি ধার লইয়াছেন, সে বিচার করিতে গিয়া তাহার বিরাট দানকে অস্বীকার বা খাটো করিবার প্রবৃত্তি আদৌ প্রশংসনীয় নহে। (২) মুসলমানগণ যদি মৌলিক কিছু দান নাও করিতেন, তবুও মাত্র প্রাচীন জ্ঞান-সভ্যতাকে বাঁচাইয়া

(২) "There is a continuity in human progress. Unfair, therefore, is it to condemn mediaval Islamic civilization for having used, amplified enriched the intellectual legacies of the earlier ages."
—The Arab Civilization. by J. Hell.

রাখিবার জন্য এবং বর্ত্তমান সভ্যতার সহিত তাহার পরম্পরা ( Continuity ) সাধনের জন্যও জগৎ তাহাদের নিকট চির-ঋণী হইয়া থাকিত না কি ?

মুসলমানদিগের মৌলিক দান সম্বন্ধে আলোচনার স্থান এ নহে। তবে এখানে সংক্ষেপে এই টুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, বর্ত্তমান জগতের বিখ্যাত দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক ও সামাজিক মতবাদগুলি প্রধানতঃ মুসলমানদিগের নিকট হই-তেই ধার করা। নিউটন, গ্যালিলিও, কোপার্নিকাস, কেপ্‌লার, ডেকার্ট, লক, ডারউইন, কলম্বস, রুষো, ভল্‌টেয়ার প্রভৃতি জ্ঞান-জগতের যুগপ্রবর্ত্তকগণ সকলেই মুসলমানদিগের নিকট ঋণী। বস্তুতঃ নব্য ইউরোপের (Modern Europe) জন্মদাতাই মুসলমান। ইউরোপের ইতিহাস যাঁহারা পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন, পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ইউরোপে এক বিরাট নব জাগরণ ( Renaissance ) সংঘ-টিত হয়। এই Renaissance-এর সঙ্গে সঙ্গেই Modern Europe এর আরম্ভ। কিন্তু এই Renaissance সম্পূর্ণ-রূপে মুসলমানদিগেরই দীর্ঘ সাত শত বৎসরের জ্ঞান-চর্চ্চার অমৃতময় ফল। ইউরোপকে জাগাইবার জন্য এত দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন হইত না—যদি ইউরোপ সোজাসুজি ভাবে ইসলামের এই বিপুল জ্ঞানালোকের সংস্পর্শে আসিতে পারিত। আরবগণের দক্ষিণ ফ্রান্স আক্রমণ যদি ব্যর্থ হইয়া না যাইত, তবে এই পথ দিয়াই ইস্‌লাম তাহার আলোক-বর্ত্তিকা হস্তে ইউরোপের অন্তর্দ্দেশে গিয়া পৌছিতে পারিত, আর তাহা হইলে সাত শত বৎসর পূর্ব্বেই আমরা ইউরোপের এই নব জাগরণ দেখিতে পাইতাম। মিঃ আমির আলি ঠিকই বলিয়াছেন—

"Had the Arabs been less keen for the safety of their spoils, less divided among themselves, had they succeeded in driving before them the barbarian hosts of Charles Martel, the history of the darkest period in the annals of the world would never have been written. The Renaissance, civilization, the growth of intellectual liberty would have been accelerated by seven hundred years."

—The spirit of Islam.

বর্ত্তমান সভ্য জগৎ মুসলমান দিগের নিকট যে কতখানি ঋণী, তাহা মুস্‌লিম বিদ্বেষী ইউরোপীয় লেখকগণ স্বীকার করিতে চান না। তবুও ২১ জন উদারচেতা পাশ্চাত্য পণ্ডিত যাহা কিছু বলিয়াছেন, তাহা হইতেই কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিয়া আমার উক্তি প্রতিপাদনের চেষ্টা করিব :—

"After a chequered career in the east, it (Hellenic culture) passed over to the western Muslim community in Spain, where it had a very specialised development, which finally made a deeper impression on Christian and Jewish thought than on that of the Muslims themselvs and attained its final evolution in North East Italy, where, as an anti-ecclesiastical influence, it prepared the way for the Renaissance"

—Arabic thought and its place in History by O' Leary.

"The real home of Averroism was the University of Bologna with its sister University of Padua and from these two centres an Averroistic influence spread over all North East Italy, including Venice and Ferrara, and so continued until the 17th century"—

O' Leary.

"The adoption of the sign 'zero' ( Arabic Zifr ) was a step of the highest importance."

—Arab Civilization by J. Hell.

"About the year 820 A. D. the mathematician Alkharrizmi wrote a text book of Algebra in examples and this elementary treatise—translated into Latin—was used by western scholars down to the sixteenth century." —Arab Civilization by J. Hell.

'In the domain of Trignometry the theory of sine, cosine and tangent is an heirloom of the Arabs. The brilliant epochs of Peurbach, of Regeomontanus, of Copurnicus cannot be recalled without reminding us of the fundamental and preparatory labours of the Arab mathematicians." —J. Hell.

"Two of the oldest Muslim astronomers Al-Faragni and Al-Battani ( d. 9 29 ) were the preceptors of Europe." —J. Hell

"Up to the sixteenth century the ninth volume of the works of Razi ( Latin Rases ) and the canon of Avicina constituted the basis of lectures on medicine in the Universities of Europe." —J. Hell

অধিক উদ্ধৃত করা বাহুল্য মাত্র। আশা করি, ইহা হইতেই বুঝা যাইবে, বর্ত্তমান বিশ্ব-সভ্যতায় মুসলমানদিগের দান কতখানি। ( ১ )

এতক্ষণ যে মুসলমানদিগের জ্ঞান-চর্চ্চার ধারাবাহিক ইতিহাসের একটা মোটামুটি বিবরণ দিলাম, ইহার একমাত্র উদ্দেশ্য হইতেছে—বর্ত্তমান সভ্যতার সহিত অতীতযুগের মুসলিম সভ্যতার যোগসূত্র প্রদর্শন করা এবং মুসলিম জ্ঞান-সাধনার সার্থকতা প্রতিপন্ন করা। যে আলোক আজ সমগ্র জগতে ছড়াইয়া পড়িয়াছে, তাহা যে ফারাণ গিরির শিখর হইতেই প্রথম আবির্ভূত হইয়াছিল, এই আলোচনা হইতে তাহাই পরিষ্কারভাবে দেখা যাইতেছে। কাজেই বলা যাইতে পারে—বর্ত্তমান জগতের এই যে বিভিন্নমুখীন সভ্যতা—জ্ঞানে, বিজ্ঞানে, সাহিত্যে, শিল্পে, কলায়,—এ সমস্তই আমাদের জিনিষ; ইহাদের সহিত আমাদের রক্ত-মাংসের সম্বন্ধ আছে। এই জ্ঞানোন্নতির জন্য ইউরোপ যতটা না গৌরবান্বিত, আমরা তদপেক্ষা অধিক।

কিন্তু আমার আসল কথাটী এখনও বলা হয় নাই। মুসলমানদিগের এই যে বিরাট জ্ঞান-সাধনা, যাহার ফলে আজ সমগ্র জগৎ আলোকিত—ইহার প্রকৃতি ও লক্ষ্য কিরূপ ছিল? কোন্ আদর্শে তাঁহারা অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন?

একটু চিন্তা করিলেই দেখা যায়—অন্যান্য কর্ম্মক্ষেত্রের ন্যায় জ্ঞান-সাধনার ক্ষেত্রেও মুসলমানগণ পবিত্র কোরআনের আদর্শকেই অনুসরণ করিয়াছিলেন। 'দীন' এবং 'দুনয়া'—দুইটীই যে আমাদের কাম্য,—একটাকে ছাড়িয়া একটাকে অবলম্বন করা যে ন্যায়সঙ্গত নহে,—কোরআন হাদিসের এই শিক্ষাই মুসলমানদিগের সমগ্র জ্ঞান-সাধনাকে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছিল। সাহিত্য যেমন জাতীয় জীবন-গঠনের উপাদান, তেমনই আবার ইহা জাতীয় জীবনেরই প্রতীক। জাতির ধর্ম্ম, জীবনাদর্শ, সামাজিক রীতিনীতি ও বৈশিষ্ট্যকে আশ্রয় করিয়াই সাহিত্য গড়িয়া উঠে। সুতরাং মুসলমানের জ্ঞান-সাধনাও তাহাদের জাতীয় আদর্শের পথ ধরিয়াই যে চলিয়াছিল, এ সম্বন্ধে সন্দেহ করিবার কোন অবকাশ নাই। কথাটা আরও একটু পরিষ্কার করিয়া বলিতেছি।

জ্ঞান-বিজয়ে বহির্গত হইয়া মুসলমানগণ জগতের সমস্ত জ্ঞান-ভাণ্ডার তন্ন তন্ন করিয়া ফিরিয়াছিলেন, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। কিন্তু গ্রীক বা Hellenic Culture কেই তাঁহারা তাঁহাদের জ্ঞান-সৌধের ভিত্তিরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। ভারত এবং পারস্য হইতেও তাঁহারা কিছু কিছু গ্রহণ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাহা সেরূপ উল্লেখযোগ্য নয়। (২) ভারতীয় গণিত শাস্ত্র হইতে তাঁহারা দশমিকবিন্দু প্রথা (decimal system) জ্যোতির্ব্বিদ্যার কিয়দংশ, হিতোপদেশের গল্প এবং এই শ্রেণীর আরও কিছু গ্রহণ করিয়াছিলেন; পারস্য হইতে কাব্য, ললিতকলা ও সরস সাহিত্যের কোন কোন অংশ ধার লইয়াছিলেন, কিন্তু এই দুই দেশের কোন সভ্যতাই মুসলমানদিগের জ্ঞান-সাধনার উপর কোন প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই; কোনটীকেই তাঁহারা আদর্শরূপে গ্রহণ করেন নাই। পক্ষান্তরে পারস্য সভ্যতা মুসলমানদিগের যাদু-স্পর্শে সম্পূর্ণ রূপান্তরিত হইয়া নিজের

---

(১) এ সম্বন্ধে যাঁহারা বিস্তারিত ভাবে জানিতে চাহেন, তাঁহারা নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি পড়িয়া দেখিতে পারেন:—

(১) The Spirit of Islam—by Mr. Amir Ali
(২) Arabic thought and its place in History—by O' Leary
(৩) Arab Civilization—by J. Hell, translated by S. Khuda Buksh.
(৪) History of the intellectual development of Europe—by Draper.
(৫) Encyclopedia Britanica and Encyclopedia of Islam.

(২) ভারত হইতে মুসলমানগণ যেরূপ কিছু গ্রহণ করিয়াছিলেন, সেইরূপ আবার কিছু দানও করিয়াছিলেন। তা ছাড়া মুসলমানদিগের গ্রহণযোগ্য তেমন কোন মৌলিক সম্পদও ভারতীয় জ্ঞান-ভাণ্ডারে ছিল না। এ সম্বন্ধে মিঃ আমির আলী বলেন:—

"Al-Beruni communicated to the Hindus the knowledge of the Bagdadian School in return for their notions and traditions. He found among them the remains of Greek science which had been transported to India in the early centuries of the Christian era or perhaps earlier, during the existence of the Greco-Bactrian Dynasties. The Hindus do not seem to have possessed any advanced astronomical science of their own; for, had it been otherwise, we doubtless would have heard about it, as Sedillot rightly observes, from the Greek writers of the times of Alexander and the Seleucidæ. They, like the Chines, borrowed most of their scientific ideas from foreign sources and modified them according to their national characteristics." —Spirit of Islam.

অস্তিত্ব পর্য্যন্ত হারাইয়া ফেলিয়াছিল। ভারতবর্ষে সেরূপ কোন অবস্থা না ঘটিলেও ইসলাম যে চিরদিনই এ সভ্যতাকে উপেক্ষা করিয়া আসিতেছে, এবং ইহার ভিতর হইতে যে কোন কিছুই প্রেরণা লাভ করে নাই, ইহা অতি সত্য কথা। ভারতীয় দর্শন শাস্ত্র, বেদ, পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত—ইহাদের কোন প্রভাবই মুসলিম কালচারের মধ্যে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। একমাত্র গ্রীক কালচারই মুসলানদিগের মনের উপর সম্পূর্ণ ভাবে প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল।

কিন্তু একটা বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, ভারতীয়, পারসিক এবং গ্রীক কালচারের নিকট মুসলমানগণ অল্প-বিস্তর ঋণী হইলেও এবং এই তিন বিজাতীয় আদর্শের আবহাওয়ার মধ্যে বসিয়া দীর্ঘ সাত শত বৎসর এই জ্ঞান সাধনা করিলেও মুসলমানগণ কিন্তু ইসলাম-বিরোধী কোন আদর্শ বা ভাব-ধারাকেই গ্রহণ করে নাই। দর্শন বল, বিজ্ঞান বল, শিল্প বল, সাহিত্য বল, যেখান হইতেই যে উপকরণ সংগ্রহ করুন না কেন, প্রত্যেকটীকেই তাঁহারা রূপান্তরিত করিয়া খাঁটী ইসলামী বেশে নূতন ভাবে জগতের সম্মুখে তুলিয়া ধরিয়াছেন। ভারত এবং পারস্যের কথা ত ধর্ত্তব্যের মধ্যেই নহে; যে গ্রীক বা Hellenic Cultureকে তাঁহারা তাঁহাদের জ্ঞান-সৌধের ভিত্তিরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন, যাহা মুসলমানদিগের জ্ঞান-জীবনকে সম্পূর্ণরূপে প্রভাবান্বিত করিয়া তুলিয়াছিল, তাহার ভিতরেও যাহা কিছু অনৈসলামিক—সমস্তই তাঁহারা সতর্কতার সহিত বর্জ্জন করিয়া চলিয়াছিলেন। গ্রীক দর্শন-বিজ্ঞান এত আলোচনা করিলেও গ্রীক পৌরাণিক কাহিনী (Greek mythology) কিন্তু মুসলমানগণ কোনও দিনই গ্রহণ করেন নাই। এ সম্বন্ধে Draper তাঁহার সুবিখ্যাত "History of the Intellectual Development of Europe" নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন:—

"The Arabs never translated into their own tongue the great Greek poets, though they so sedulously collected and translated the Greek philosophers Their religious sentiments and sedate character caused them to abominate the lewdness of our classical mythology and to denounce indignantly any connection between the licentious, impure Olympean Jove and the most High God as unsufferable and unpardonable blasphemy."

বলা বাহুল্য, এই কারণেই ভারতীয় পৌরাণিক কাহিনীও মুসলমানগণ সর্ব্বথা বর্জ্জন করিয়া গিয়াছেন। তা ছাড়া, পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ভারতীয় সভ্যতার আদর্শের সহিত ইসলামের কোনই খাপ খায় না বলিয়াই মুসলমানগণ ইহাকে এমন করিয়া উপেক্ষা করিয়া গিয়াছেন। পৌত্তলিকতা, অবতারবাদ, পুনর্জ্জন্মবাদ, মানুষে মানুষে ভেদাভেদ জ্ঞান, গোঁড়ামি ও কুসংস্কার, সংসার-বিমুখতা বা বৈরাগ্য-ভাব ইত্যাদি এই সভ্যতার বিশেষত্ব। গ্রীক সভ্যতার বিশেষত্ব কিন্তু তাহা নহে। জীবনকে পরিপূর্ণরূপে উপভোগ করাই তাহাদের প্রধান লক্ষ্য। Aristotle-এর কথায় বলিতে গেলে—"to live happily and beautifully" অর্থাৎ সুখে এবং সুন্দরভাবে জীবন-যাপন করাই তাহাদের শিক্ষা ও সাধনার আদর্শ। এই আদর্শের সহিত মুসলমান জাতির কোন বিরোধ ত নাই-ই, বরং চমৎকার সাদৃশ্য আছে। বলা বাহুল্য, এই সব কারণেই মুসলমানগণ গ্রীক কাল্চারের প্রতি এত অনুরক্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন।

উপরোক্ত আলোচনা হইতে এখন স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে, মুসলমানদিগের হস্তে যে বিচিত্র জ্ঞান-সভ্যতা গড়িয়া উঠিয়াছিল, তাহা Hellenic culture এবং Semetic culture-এরই পরস্পর সংমিশ্রণ। কর্ম্মজীবনের জন্য তাঁহারা নানা বিষয়ে গ্রীকদিগের নিকট হইতে জ্ঞান-সংগ্রহ করিয়াছিলেন, কিন্তু ধর্ম্ম-জীবনের জন্য তাঁহারা জগতের কাহারও নিকট ঋণী নহেন। একমাত্র কোরআন-হাদিস হইতেই তাঁহারা আত্মার খোরাক ও প্রেরণা লাভ করিয়াছেন। Hellenic culture-এর বৈজ্ঞানিক ভাব (Scientific spirit) এবং Semetic culture-এর ধর্ম্মভাব (religious spirit) মুসলমানদিগের হস্তে চমৎকারভাবে মিশিয়া গিয়াছিল, 'দীন' এবং 'দুনয়ার' অদ্ভুত সমন্বয় সাধিত হইয়াছিল। মুসলিম জ্ঞান-সভ্যতার ইহাই বিশিষ্টতা। আত্ম-প্রকাশই তাঁহাদের জ্ঞান-সাধনার মূল লক্ষ্য ছিল, আত্ম-বিস্মৃতি বা আত্ম-বিলোপ নহে।

মুসলিম জ্ঞান-সাধনার প্রকৃতি ও লক্ষ্য কি ছিল, এতক্ষণ আমরা তাহাই দেখিলাম। এইবার মুসলিম বাংলা সাহিত্যের প্রতি লক্ষ্য করা যাউক। আমাদের এই সাহিত্য-সাধনা কোন্ পথে কোন্ লক্ষ্যে চলিয়াছে? নিতান্তই দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে, আমরা আমাদের জাতীয় আদর্শের সম্পূর্ণ

বিপরীত দিকে চলিয়াছি। এ পথ আত্ম-প্রতিষ্ঠার নহে; আত্ম-বিলোপের। বিজাতীয় ভাব, বিজাতীয় আদর্শ, আমরা বহু-বহু অনুসরণ করিয়া চলিয়াছি। রামায়ণ, মহাভারত এবং অন্যান্য পৌরাণিক কাহিনী হইতে আমরা উপমা allusion বা reference দিতে হিন্দুকেও হার মানাইয়াছি। উহাদের ভিতর হইতেই যেন আমরা আমাদের প্রেরণা ( inspiration ) লাভ করিতে চাই! তের শত বৎসর পূর্ব্বের মুসলমানগণ যাহার মধ্যে কোন প্রেরণা খুঁজিয়া পান নাই, যাহা তাঁহারা জাতীয় জীবনের হানিকর বলিয়া সতর্কতার সহিত বর্জ্জন করিয়া গিয়াছেন ; আজ আমরা সেই পৌত্তলিক ভাবাপন্ন অনৈসলামিক ভাব ও আদর্শ অনুকরণ করিতে লালায়িত! যে সভ্যতা আজ পর্য্যন্তও বিশ্ব-সভায় একটা বিশিষ্ট আসন লাভ করিতে পারিল না, সেই সভ্যতাই আমাদের আদর্শ! আদর্শের এই ক্ষুদ্রতার মধ্য দিয়া বঙ্গীয় মুসলমান জাতির জ্ঞানের অপকর্ষ ( Intellectual deterioration ) এবং দৃষ্টির সংকীর্ণতাই সূচিত হইতেছে। যাহাদের জ্ঞান-সভ্যতা গ্রহণ করিয়া নিখিল জগৎ ধন্য হইয়াছে, যাহাদের ধর্ম্ম ও জীবনাদর্শ সমগ্র জগতকে গৌরবান্বিত ও মহিমান্বিত করিয়াছে তাহাদেরই বংশধরগণ সেই সভ্যতা ও সেই আদর্শ গ্রহণ করিতে আজ লজ্জিত, সঙ্কুচিত! এ কি শোচনীয় মনের দৈন্য ও জঘন্য প্রবৃত্তি আমাদের!

জাতীয় গৌরব কাহিনী ও জাতীয় ইতিহাস ( tradition and history ) ছাড়া কোন জাতিই বাঁচিতে পারে না। কোন জাতির সাহিত্যই এই বিশিষ্টতা-বর্জ্জিত নহে। হোমার, ডান্টে, বাল্মিকী, কালিদাস, হাফেজ, রুমী, শেকস্‌পিয়ার, মিল্টন, বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথ —প্রত্যেকেই স্ব স্ব জাতীয় পৌরাণিক কাহিনী সমূহের মধ্যে প্রেরণা লাভ করিয়াছেন। প্রত্যেকের লেখাতেই জাতীয় আদর্শ পরিস্ফুট। কিন্তু বাংলার মুসলিম সাহিত্যিকদিগের এ কি মতিভ্রম! তাহাদের লেখার ভিতরে 'শিপ্রা', 'উজ্জয়িনী', 'শকুন্তলা', 'দ্রৌপদী', 'কুন্তী' 'কুরু-পাণ্ডব' সপ্তকাণ্ড রামায়ণ, মহাভারত—সমস্তই আছে, কিন্তু ইসলাম নাই! কোথায় ইস্‌লামকে কেন্দ্র করিয়া আমাদের সাহিত্য গড়িয়া উঠিবে, তাহা না হইয়া বরং ইস্‌লামের মুণ্ডপাত করিবার জন্যই এ সাহিত্যের সৃষ্টি! অথচ আশ্চর্য্যের বিষয়, এই সাহিত্যই আমাদের আদর্শ জাতীয় সাহিত্য রূপে বাজারে বিকাইতেছে এবং এই সব সাহিত্যিকই স্বাধীন চিন্তার অবতার বা যুগপ্রবর্ত্তকরূপে অভিহিত হইতেছেন! দীর্ঘ তের শত বৎসরের মুস্‌লিম সাহিত্যে এ এক নূতন যুগপ্রবর্ত্তনই বটে!

লেখকদিগের ত এই অবস্থা! আমাদের সমালোচক কি বলেন? তিনি আরও এক কাঠি সরেস! ইস্‌লামী কাহিনী, ইসলামী allusion, ইস্‌লামী ভাব ও আদর্শ থাকিলে নাকি সে সাহিত্য "বিশ্ব-সাহিত্যে" স্থান পাইবার যোগ্য হয় না, ইহাই তাহার মত! বিশ্ব-কবি হইতে হইলে নিজের ধর্ম্ম, সমাজ ও সভ্যতার নাকি কোনই ধার ধারিতে হয় না, স্বাধীন ভাবে যাহা খুশী তাহাই করিতে হয়! হিন্দু বা বৈষ্ণব আদর্শ গ্রহণ করিলে কোন ক্ষতি নাই; কিন্তু ইসলামী আদর্শ গ্রহণ করিলেই নাকি তাহা নিতান্ত একদেশদর্শী ও সাম্প্রদায়িক হইয়া পড়ে! এত বড় মারাত্মক মতিচ্ছন্নতা আমাদের মধ্যে কেন যে আত্মপ্রকাশ করিল, আমি ইহা ভাবিয়াই পাই না। বেশী দূর যাইতে হইবে না, আমাদের ঘরের কোণের বিশ্ব-কবি রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে ভাবিয়া দেখিলেই এ ভ্রান্তি সহজেই দূর হইয়া যাইবে। যাঁহার সাহিত্য-সাধনার বিরাট ফল গজ দিয়া মাপিলে এক মাইলেরও বেশী দীর্ঘ হইয়া যাইবে, তাহার মধ্যে কোন স্থানে ভুলিয়াও তিনি ইস্‌লামী allusion বা reference দিয়াছেন কি? যত "কথা ও কাহিনী" কহিয়াছেন, যত কাব্য ও নাটক লিখিয়াছেন—সকলের মধ্যেই হিন্দুয়ানী ভাব ও আদর্শ পরিপূর্ণ। 'কচ ও দেবযানী' 'উর্ব্বশী' 'শকুন্তলা' 'কোশল নৃপতি' 'শিবাজী' ইত্যাদি কত বিষয় ও ব্যক্তি সম্বন্ধেই না তিনি কবিতা লিখিয়াছেন, কিন্তু মুসলমানের একটা গৌরব-গাথাও তাঁহার হাত দিয়া কোন দিন বাহির হয় নাই। অনেকস্থলে ইসলামী ভাব ও আদর্শ গ্রহণ করিয়াছেন বটে, কিন্তু সমস্তই বেমালুম হজম করিয়া হিন্দুয়ানী বেশে প্রকাশ করিয়াছেন। চীন, জাপান, ইউরোপ, আমেরিকা, অনেক দেশেই তিনি পরিভ্রমণ করিয়া আসিয়াছেন, কিন্তু আজ পর্য্যন্ত কোন মুসলমান দেশ দেখিবার আগ্রহ তাঁহার জন্মে নাই। এমন কি যেখানে যেখানে গিয়াছেন, সেখানে কোটি কোটি মুসলমানের বাস থাকিলেও তাঁহার বক্তৃতায় বা বিবরণে তাহাদের সম্বন্ধে ভুলিয়াও একটি কথা উল্লেখ করেন নাই "বৃহত্তর ভারত" অর্থাৎ

Pan-Hinduism সৃষ্টিই তাঁহার মুখ্য উদ্দেশ্য। মুসলমানদিগের প্রতি মনোভাবের দিক দিয়া বঙ্কিম ও রবীন্দ্রনাথ উভয়েই সমান। বঙ্কিম একটু সোজা-ধরণের ছিলেন বলিয়া প্রকাশ্য ভাবেই গালাগালি দিয়া তাঁহার স্বরূপ প্রকাশ করিয়া ফেলিয়াছেন, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ চতুর বলিয়া গোপনে গোপনে নিষ্ক্রিয়ভাবে ( Passively ) তাঁহার উদ্দেশ্য সাধন করিতেছেন। কি সাহিত্যের ভিতর দিয়া, কি ব্যক্তিগত ব্যবহার ও ক্রিয়া কলাপের ভিতর দিয়া---সব দিক দিয়াই তিনি হিন্দু সভ্যতার পুনর্জ্জাগরণের চেষ্টা পাইতেছেন।

অবশ্য এ জন্য তাঁহাকে কোনই দোষ দেওয়া যায় না। তাঁহার দিক দিয়া তিনি ঠিক পথেই চলিয়াছেন। আমরা বসিয়া থাকিব, আর তিনি যে আমাদের জন্য গৌরব-গাথা লিখিয়া দিবেন, এরূপ আশা করা নিতান্তই একটা আব্দার। আমার কথা এই—আমরা কেন আমাদের জাতীয় আদর্শ ত্যাগ করি ? আমরা কেন হিন্দু ও বৈষ্ণব সাহিত্যের মধ্যে আমাদের প্রেরণা খুঁজিতে যাই ? অমুসলমান কবি ও সাহিত্যিকগণ তাঁহাদের নিজ নিজ আদর্শকে সাহিত্যে প্রতিষ্ঠিত করিতে সচেষ্ট, আর আমরা কিনা আমাদের ধর্ম্ম, আমাদের পয়গম্বর, আমাদের কোরআন হাদিস, আমাদের সভ্যতাকে গালাগালি ও নিন্দা করিতে শতমুখ! এই সাহিত্যই কি আমাদের জাতীয় সাহিত্য! এই পথই কি আমাদের মুক্তি ও কল্যাণের পথ ?

না। এ পথ আমাদের নয়। এ সাহিত্য আমরা চাই না। আমাদের লক্ষ্য ও আদর্শ এত ক্ষুদ্র নয়। হিন্দু সাহিত্যের মধ্যে পাঠোপযোগী অনেক কিছু থাকিলেও মুসলমানদিগের প্রেরণা লাভ করিবার মত কিছু নাই। স্বয়ং রবীন্দ্র নাথও এই দৈন্য বুঝিতে পারিয়াই পশ্চিমের দিকে মুখ ফিরাইয়াছেন। আজ তিনি বাংলা ভাষাকে যে গৌরব দান করিয়াছেন, তাহা প্রাচ্যের সম্পদ নয়, পশ্চিম হইতে উহা আমদানী করা। পাশ্চাত্যের রস-নির্ঝর হইতেই তিনি তাঁহার সাহিত্যিক জীবনের খোরাক সংগ্রহ করিতেছেন—যদিও তাহা সহজে স্বীকার করিতেছেন না। আমরাই কেন তবে হিন্দু-সাহিত্যের ভিতর প্রেরণা খুঁজিতে যাইব ? আমাদিগের যদি কোন প্রেরণা লাভের বা আদর্শ গ্রহণের দরকারই হইয়া থাকে, তবে তাহার মূল উৎস সেই পাশ্চাত্য সাহিত্য-রস-ধারা হইতেই লইব, কারণ উহা যে আমাদেরই সম্পদ, আমাদেরই দান! উহাতে যে আমাদেরই অধিকার।

উপসংহারে আবার বলিতেছি—অতীত যুগের মুস্‌লিম জ্ঞান-কর্ষণার যে আদর্শ ও যে লক্ষ্য ছিল, আমাদিগকেও সেই আদর্শে ও সেই লক্ষ্যে চলিতে হইবে। আমাদের জাতীয় সাহিত্যের দুইটী দিক থাকিবে, একদিকে 'দীন্', আর এক দিকে 'দুনয়া'। দুনয়ার দিক দিয়া বিশ্বের জ্ঞান-ভাণ্ডার আমরা লুণ্ঠন করিয়া ফিরিব, সুদূর 'চীন দেশে' যাইতে হইলেও যাইব, কিন্তু 'দীনের' জন্য আমরা কোরআন-হাদিসকে দৃঢ় ভাবে অবলম্বন করিয়া রহিব। আমাদের সাহিত্যে বৈজ্ঞানিক ভাব এবং ধর্ম্ম ভাব ( Scientific spirit and religious spirit ) দুইই থাকিবে, আত্মাও থাকিবে দেহও থাকিবে এবং এই দুই-এর সমন্বয়ে একটা পরিপূর্ণ জীবন্ত সাহিত্য গড়িয়া উঠিবে। ইসলামের সহিত যাহার কোন বিরোধ নাই, তাহা অকাতরে গ্রহণ করিয়া আমরা আমাদের সাহিত্য-জীবনে নব নব সৌন্দর্য্য ও বৈচিত্র্য ফুটাইব, কিন্তু যেখানে সংঘর্ষ উপস্থিত হইবে, সেখানে বাহিরের জিনিষকে অকাতরে বর্জ্জন করিয়া চলিব। যাহা লইব, তাহাও ইসলামী যাদু স্পর্শে রূপান্তরিত করিয়া এমন ভাবে দাঁড় করাইব, যেন তাহাকে দেখিলে মুসলমান বলিয়া সহজেই চেনা যায়। এইরূপে আমাদের জাতীয় জীবনাদর্শের সহিত আমাদের জাতীয় সাহিত্য একসূরে বাঁধা হইবে। আমাদের লক্ষ্য অনেক উচ্চে। এবার আর Hellenic culture নয়, এবার world culture বা জগতের সমগ্র জ্ঞান-সাধনার উপরে আমাদিগের মুন্সীয়ানা করিতে হইবে। যেখানে যেটুকু বিকৃতি ও বিচ্যুতি ঘটিয়াছে, তাহাই আমাদিগকে পূরণ করিতে হইবে। ঠিক প্রাচীন যুগের Hellenic culture-এর মতই বর্ত্তমান যুগের world culture নিতান্ত Godless বা ধর্ম্ম-ভাব-শূন্য হইয়া পড়িয়াছে। এই অভাব আমাদিগকেই পূরণ করিতে হইবে। বিশ্ব-সভ্যতার সহিত আবার আমাদের Semetic culture এর সমন্বয় সাধন করিতে হইবে। এই সংমিশ্রণের ফল গতবার অপেক্ষা যে সহস্র গুণে ব্যাপক ও মধুরতর হইবে, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। সমগ্র জগৎ সে দান হাসিমুখে গ্রহণ করিবে, আমাদের সাধনা সার্থক হইবে, জীবন ধন্য হইবে।

সে দিন কি আসিবে না? নিশ্চয়ই আসিবে। বর্ত্তমান পাশ্চাত্য সভ্যতার সহিত ইস্‌লামী সভ্যতার নিশ্চয়ই মিলন ঘটিবে। ইতিমধ্যেই এই মিলনের সূত্রপাত হইয়াছে। প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য উভয়দেশেই এই মিলন-সাধনা সমভাবে আরম্ভ হইয়াছে। বিশ্ববিশ্রুত কবি ডাঃ সার ইকবাল, মৌলানা মোহাম্মদ আলী, খাজা কামালুদ্দিন প্রভৃতি বহু পশ্চিম-ভারতীয় মুস্‌লিম মনীষী এই উদ্দেশ্যেই সাহিত্য-সাধনায় আত্ম-নিয়োগ করিয়াছেন। ইঁহাদের হস্তে পাশ্চাত্য ও ইস্‌লামী ভাবের অপূর্ব্ব সমন্বয় সাধিত হইতেছে। পাশ্চাত্য শিক্ষায় উচ্চ শিক্ষিত হইয়াও এবং বিজাতীয় পারিপার্শ্বিকতার মধ্যে বাস করিয়াও, ইস্‌লামী আদর্শ হইতে ইঁহারা বিচ্যুত হন নাই। আত্ম-প্রতিষ্ঠা এবং আত্ম-নির্ভরতাই ইঁহাদের সাধনার প্রধান লক্ষ্য। ওদিকে লর্ড হেড্‌লী, মার্ম্মাডিউক পিক্‌থল, খালেদ শেলড্রেক প্রমুখ খ্যাতনামা পাশ্চাত্য মনীষীবৃন্দও মুসলমান জাতির এই নব জাগ্রত সাধনায় তাঁহাদের সমস্ত শক্তি নিয়োগ করিয়াছেন। ফলে পাশ্চাত্য সভ্যতার বেষ্টনীর মধ্যে ইসলাম দিন দিনই প্রবেশ লাভ করিতেছে এবং ইহাকে প্রভাবান্বিত করিয়া তুলিতেছে। এমনই করিয়া একদিন ইসলাম এই পাশ্চাত্য সভ্যতা ও জ্ঞান সাধনাকে গ্রাস করিয়া ফেলিবে এবং উভয়ের পরস্পর সম্মিলনে এক অভিনব ইস্‌লামী সভ্যতা গড়িয়া উঠিবে—

"The Arab civilization will assuredly be followed by a yet greater and ampler civilization of Islam—eclectic in its principles—world embracing in its range—developing the sense of nationality and yet preserving the ineffable brotherhood of the faith."

—S. Khuda Buksh.

সে দিন কি আসিবে না! আসিবে—সে দিন আসিবে। *

---

# বাঙ্গলা সাহিত্যে আরবী-পার্সী শব্দ

[ মোহাম্মদ আবদুর রজ্জাক খাঁ ]

বাঙ্গলার মুছলমানগণ সাধারণতঃ যে সকল আরবী পার্সী শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকেন, বাঙ্গলা সাহিত্যে সে গুলির প্রচলন হওয়ায় যে কোনও দোষ নাই, আমরা তাহা স্বীকার করি এবং সময় সময় নিজেরা ঐরূপ শব্দ ব্যবহারও করিয়া থাকি। হিন্দু সাহিত্যিকদিগের লেখার মধ্যেও আজকাল দুই চারিটা নূতন আরবীপার্সী শব্দের ব্যবহারও দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। ভাষার সম্পদ বৃদ্ধির জন্য কোন বিদেশী ভাষা হইতে আবশ্যকীয় শব্দ আহরণ করা বরং অনেক সময় দরকার হইয়া পড়ে। ফলে কোন ন্যায়নিষ্ঠ সাহিত্যিকই আজ আর ইহাতে বিশেষ আপত্তি করিতেছেন না। তবে কথা এই যে, সব কাজেরই একটা মাত্রা আছে। মাত্রা পরিত্যাগ করিয়া, সঙ্গতি অসঙ্গতির দিকে লক্ষ্য না রাখিয়া, কতকগুলি আরবী শব্দ বাঙ্গলা সাহিত্যের মধ্যে গুঁজিয়া দেওয়ার সমর্থন কেহই করিতে পারিবেন না। তাহার পর, লেখক নিজেযদি ঐ শব্দগুলির প্রকৃত মর্ম্ম বুঝিতে অসমর্থ হন, এবং কল্পনা মাত্রের সাহায্যে সেগুলিকে ভুল অর্থে ব্যবহার করেন, তাহা হইলে ব্যাপারটা একেবারে অসহ্য হইয়া উঠে।

একজন সুশিক্ষিত ও বিশিষ্ট লেখকের প্রবন্ধ হইতে নিম্নে কএকটা নমুনা উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। তাহা হইলে পাঠক অবস্থার শোচনীয়তাটা ভাল করিয়া হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন। একখানা কবিতা পুস্তকের সমালোচনা প্রসঙ্গে লেখা হইয়াছে :—

"কেননা ফেরদৌস হইতে মোস্তাখরাজ (বহিষ্কৃত)

---

* দ্রষ্টব্য :—এই প্রবন্ধ লিখিবার জন্য মুস্‌লিম জাতীয় সাহিত্য সৃষ্টির অন্যতম প্রধান উদ্যোক্তা লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিক মিঃ এস্, ওয়াজেদ আলি ( বি-এ, ক্যান্টাব, বার-এ্যাট্-ল ) সাহেবের নিকট অনেক বিষয়ে আমি ঋণী। প্রবন্ধটী "তরুণ জমাতের" সাহিত্য-সভায় পঠিত। —লেখক

এবং পৃথিবীর উপর নানা বিপদে জড়িত হইয়া **কাতরে আদম নিবেদিলা বিধিপদে—"**

শেষের অংশটা পদ্য কি গদ্য কি আর কিছু, তাহার আলোচনা করিতে যাইব না, কারণ আমরা সাহিত্যিক নহি। তবে মোস্তাখরাজ শব্দের অর্থ যে, "বহিস্কৃত" কখনই নহে, এ কথা আমরা জোর করিয়াই বলিতে পারি। এখরাজ ও এস্তেখরাজ শব্দে যে আকাশ পাতাল প্রভেদ, আরবী মকতবের ছাত্ররাও তাহা বলিয়া দিতে পারে। সে যাহা হউক, যে কথার অর্থ পাঠকগণের শতকরা ৯৯ জনই অবগত নহেন, খা-মাখা তাহার ব্যবহার করার কি দরকার পড়িয়া গিয়াছিল, আমরা তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না।

"কোহিনুর বা কোহেনুর—পাহাড়ের জ্যোতি The light of the mountain"—কিন্তু আমরা এতকাল জানিয়া শুনিয়া আসিতেছিলাম যে, কোহেনুর অর্থ নূরের পাহাড় জ্যোতির পর্ব্বত Mountain of light—পাহাড়ের জ্যোতি আর জ্যোতির পাহাড় নিশ্চয়ই এক জিনিষ নহে। একবার এদেশের এক শ্রেণীর পণ্ডিতগণের মধ্যে বিচার আরম্ভ হইয়াছিল—"তৈলাধার পাত্র বা পাত্রাধার তৈল"—এই সমস্যা লইয়া। এখন দেখিতেছি, এই কোহিনূর লইয়া আমাদিগের সম্মুখে আবার সেই শ্রেণীর এক মহা সমস্যা উপস্থিত হইয়া যাইতেছে !

লেখক নিজের ব্যবহৃত আরবী শব্দগুলির মর্ম্ম বুঝাইবার জন্য সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গলা ও ইংরেজী প্রতিশব্দ ব্যবহার করিয়া থাকেন। যথা :—

১। বাস্তবিক হাকিকাতান।
২। তাবির বা সমালোচনা।
৩। মোয়াজ্জিব বা সমালোচক।
৪। মানস্তাত্বিক বা রুহুয়ানী সমালোচনা।
৫। তায়াজির বা সমালোচনা।
৬। ( অন্যত্রে ) মোতাআলা বা Recitation।

—ইত্যাদি।

এ সম্বন্ধে আমাদিগের প্রথম নিবেদন এই যে, যে কথাগুলি বাঙ্গলার মুছলমান পাঠকগণকে বুঝাইবার জন্য তাহার অগ্রে বা পশ্চাতে এক একটা প্রতিশব্দ যোগ করিতে হয়, তাহা ব্যবহার করার আবশ্যকতা ও সার্থকতা কিছুই নাই। এই শ্রেণীর মেহানে শাক্কার এরতেকাব, জনাবে মোকাররেজের পক্ষে খর্ত্তুল কাতাদ এবং তাঁহার কারেয়ীনে কেরামের জন্য তাকলিফে মা-লা-য়োতাক ব্যতীত আর কিছুই নহে।

তাহার পর আরজ এই যে, লেখক ছাহেবের অতি আগ্রহের ফলে এই আরবী শব্দগুলিকেও যথেষ্ট নিগ্রহ ভোগ করিতে হইতেছে। কারণ আরবী ভাষাতে তাবির বা তাজির শব্দের অর্থ—যথাক্রমে ব্যাখ্যা করা ও দণ্ডদান করা, মোয়াজ্জিব অর্থে আজাব করনেওয়ালা। মানস্তাত্বিক অর্থে রুহুয়ানী ( রূহানী ) কখনই হইতে পারে না—কারণ মন রূহ নহে, রূহের প্রতিশব্দ হইতেছে প্রাণ বা আত্মা। মানস্তাত্বিক অর্থে আরবীতে "নাফছিয়াতী" শব্দ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। মোতাআলা অর্থাৎ মোতালাআ অর্থ recitation হরগেজ হইতে পারে না, research উহার প্রকৃত প্রতিশব্দ।

ইহা ব্যতীত ফরমুত, আলাদা, মোজহাব প্রভৃতি বানান এহেন আরবীভক্ত লেখকের ভাষায় নিতান্তই অশোভনীয়। "আরবী লফজ মোস্তামাল" না করিয়া এস্তেমাল করিলেই ভাল হইত। মুছলমান বদনছিব হইতে পারে, কিন্তু "মুছলমানদের বদনছিব" এ হেন অদৃষ্টবাদী আমরাও হজম করিয়া উঠিতে পারিতেছি না।

---

# আজমল-বিয়োগে

[ কাজী কাদের নওয়াজ ]

—০০০—

ভারত-নভের দীপ্ত তারা হঠাৎ আজি নিভ্‌ল হায়!
আঁধার পথের লক্ষ মানুষ উঠ্‌ল কেঁদে সেই ব্যথায়!
টুট্‌ল হিমালয়ের চূড়া, লুট্‌লো 'তাজ' গৌরবের
শৌর্য্য গেল শক্তি গেল কীর্ত্তি গেল মুস্লিমের!

২

স্তব্ধ ভারত, বিনা মেঘেই প'ড়ল শিরে দারুণ 'বাজ'
কাঁদ্‌ছে সবে হাকিমী হায় লুপ্ত হ'ল বিশ্বে আজ,
ডুক্‌রে ওঠে শোকার্ত্ত ঐ হিন্দু সনে মুসলমান,
ব্যথিত বুক, দোঁহারে আর শিখাবে কে মিলন গান?

৩

অভাগা দেশ! সেদিন তব হারিয়ে গেল 'চিত্ত' হায়
আস্‌ল ছুটে সর্ব্বনাশের পান্‌সী শীতল তুহিন বায়
পাষাণ ভেদি দার্জ্জিলিংয়ের উঠ্‌ল সেকি করুণ স্বর
ভোলেনি কেউ, আবার একি শুন্‌ছি সারা ভারত পর!

৪

যতেক ভণ্ড কাপুরুষের আয়ুর হেথা অন্ত নাই
দেখ্‌ছি তারা মরণ বিহীন, শমন নাহি স্পর্শে তাই,
সাধন-সিদ্ধ শুদ্ধ বুদ্ধ যে জন ছিল দেশের প্রাণ
হায়রে কপাল! তারেও মরণ হান্‌ল' এমন নিঠুর বাণ!

৫

পাগ্‌লা ঝোরার ঝর্ণা সম ভারতবাসীর নেত্রে লোর
ঝরছে, হঠাৎ ফেরেস্তারা খুল্‌ল কণক তোরণ দোর,
ছড়িয়ে দিয়ে মন্দার দাম্‌ হুরীরা নীল্‌ আস্‌মানে
আস্‌ল সবে 'আজ্‌মলেরে' ল'য়ে যেতে রেজ্‌ওয়ানে।

———

# মহাকবি সা'দী

[ কাজী নওয়াজ খোদা ]

( ৩ )

**কবিত্ব শক্তি, তাঁহার সম্বন্ধে অন্যান্য সাহিত্যিকদের অভিমত, গ্রন্থাবলী ও জীবদ্দশায় তৎসমূহের প্রসিদ্ধি লাভ।**

মহাকবি সা'দীর কবিত্ব শক্তির সম্বন্ধে এই মাত্র বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, অধিকাংশ ঐতিহাসিকের মতে প্রাচ্য কবিদের মধ্যে এযাবৎ তাঁহার ন্যায় কবি জন্মগ্রহণ করেন নাই। তাঁহার কবিতা যেমন সরল তেমনি হৃদয়গ্রাহী, পণ্ডিত সম্প্রদায় হইতে ছাত্রের দল পর্য্যন্ত, সকল শ্রেণীর মধ্যে তাঁহার কবিতা সাদরে গৃহীত ও মুখে মুখে আবৃত্ত হইতে শুনা যায়। সাধারণ কথাবার্ত্তার মধ্যে তাঁহার বহু পদ্য ও গদ্য রচনা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এযাবৎ অন্য কোন কবির রচনা দেশ কাল ও পাত্রাপাত্র নির্ব্বিশেষে এরূপ প্রসিদ্ধি লাভ করিতে পারে নাই। সা'দীর গ্রন্থের অধিকাংশ স্থলে রাজা, প্রজা, ধনী, নির্দ্ধন, পণ্ডিত, মূর্খ সকল শ্রেণীর লোককে নির্দ্দেশ করিয়া, স্বভাবের ধর্ম্ম বজায় রাখিয়া, সরল ভাষায় হাসি রহস্য ও গল্প গুজবের ছলে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। স্বভাবের বিপরীত ঘটনা বর্ণনে প্রায় তাঁহার লেখনী পরিচালিত হয় নাই। এই সমস্ত কারণ বশতঃ পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের মধ্যে অনেকে শেখ সা'দী ও ইংরাজ কবি 'শেক্সপিয়র'কে এক ধরণের কবি বলিয়াছেন এবং শেখ সা'দীকে প্রাচ্য শেক্সপিয়ার নাম দিয়াছেন। সুখের বিষয়, সা'দীকে পাশ্চাত্য কবি মিলটন প্রভৃতির ন্যায় জীবিতকালে যশোলাভে বঞ্চিত হইতে হয় নাই। তাঁহার সময়ে অনেক প্রসিদ্ধ কবি বর্ত্তমান থাকা সত্ত্বেও তিনি সকলের নিকট যথেষ্ট যশ লাভ করিয়াছিলেন। বরং প্রতিদ্বন্দ্বিতা-ক্ষেত্রে অন্যান্য সকলকে ছাড়াইয়া বিজয়লাভে সমর্থ হইয়াছিলেন। তাঁহার সময়েই দেশ বিদেশে সকল স্থানেই তাঁহার নাম ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। কবি-ভাগ্যে জীবদ্দশায় এরূপ যশ লাভ প্রায় ঘটিয়া উঠে না।

অন্যান্য কবি ও সাহিত্যিকগণ তাঁহার সম্বন্ধে এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন—

প্রসিদ্ধ আলেম কবিবর মৌলানা আবদুররহমান জামী তাঁহার 'বাহারাস্তান' গ্রন্থে নিম্নলিখিত কবিতা দুইটীর উল্লেখ করিয়াছেন—

در شعر سه کس پیمبرانند * هرچند که لا نبی بعدی
اوصاف قصیده و غزل را * فردوسی و انوری و سعدی

এই কবিতায় অমর কবি ফেরদৌসী, কবিবর আনওয়ারী ও মহাকবি সা'দীকে কাব্য জগতের পয়গাম্বার বলা হইয়াছে। মহাত্মা জামী 'নাফ্‌হাতুল ওনস' কেতাবে সা'দী ও আমীর খোসরোর কবিতার আলোচনা করিয়া সা'দীর আসন বহু উচ্চে স্থাপন করিয়াছেন। আমীর খোসরো কবিতা রচনায় সা'দীর অনুকরণের কথা খোসরো নিজেই স্বীকার করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন—

خسرو سرمست اندر ساغر معنی بریخت
شیره از میخانهٔ مستی که در شیراز بود -

অর্থাৎ শিরাজে যে একজন ( খোদার প্রেমে ) উন্মত্ত লোক ( সা'দী ) ছিলেন, তাঁহারই মদশালার মিষ্ট রস খোসরো তাহার ভাবের পাত্রে ঢালিয়াছে।

আমীর হাসান নামক অন্য একজন কবি গাহিয়াছেন—

حسن گلی ز گلستان سعدی آورده است
که اهل معانی گلچین ازین گلستان اند -

অর্থাৎ ভাবরাজ্যের মালিকগণ সকলেই সা'দীর পুষ্পোদ্যান হইতে পুষ্প চয়ন করিয়া থাকেন, তাই হাসানও সেই বাগানের একটী ফুল তুলিয়া আনিয়াছে।

সা'দী ও 'এমামী'র কবিত্ব শক্তির আলোচনা

করিয়া কবি 'মাজ্‌দে হাম্‌গার' এমামীকে উচ্চাসন দিয়াছেন, ইহা লইয়া সাহিত্যের বাজারে মহা গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছে। কেহ তাঁহাকে কাব্য-রস-গ্রহণে অক্ষম বলিয়া মত দিয়াছেন, আবার কেহ বলিয়াছেন—সা'দী ও মাজ্‌দেহাম্‌গার এক সময়ের লোক ছিলেন, তাই সা'দীর যশ ও প্রতিপত্তি দেখিয়া 'মাজ্‌দেহাম্‌গার' মনে মনে তাঁহার হিংসা করিতেন, এজন্য তিনি সা'দীর সম্বন্ধে বিদ্বেষ-প্রসূত মত প্রকাশ করিয়াছেন। এই বিষয়টী উল্লেখ করিয়া কবিবর হাজী লোৎফে আলী লিখিয়াছেন—

یکی گفت امامی امام هری را
زسعدی فزون یافته مجد همگر*
درین ماجرا چیست رای تو گفتم
سخن گر بود مجد همگر ستمگر*

অর্থাৎ একজন বলিলেন 'মাজদেহাম্‌গার' সা'দী অপেক্ষা এমামীকে শ্রেষ্ঠ কবি পাইয়াছেন, ইহার গূঢ় রহস্য সম্বন্ধে আপনার মত কি, আমি বলিলাম মাজদেহাম্‌গার অত্যাচারী হইতেছেন, তিনি অত্যাচারী। কিন্তু মাজদেহামগারই আবার বলিয়াছেন—

اگرچه به نطق طوطي خوش نفسیم
به شکر گفتهای سعدی مگسیم -

যদিও আমরা 'তুতীর' ন্যায় সুকণ্ঠ; কিন্তু সা'দীর সুমিষ্ট বচনের মক্ষিকা স্বরূপ।

সা'দী ও তাঁহার রচনার প্রতি সকলের ভক্তি ও শ্রদ্ধার প্রমাণস্বরূপ সাহিত্যিক সমাজে নিম্নলিখিত গল্পটী প্রচলিত আছে, —

কবির সমসাময়িক একজন পণ্ডিত কবির প্রতি ও তাঁহার রচনার প্রতি মনে মনে অশ্রদ্ধার ভাব পোষণ করিতেন, তিনি রাত্রিতে স্বপ্ন দেখিলেন—বেহেশ্‌তের দ্বার খুলিয়া গিয়াছে, ফেরেশ্‌তারদল একটী জ্যোতির্ময় পাত্র হাতে লইয়া সা'দীর ভজনালয়ের (এবাদৎখানা) দিকে অগ্রসর হইতেছেন। তিনি ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন, তাঁহারা কয়েকটী কবিতা আবৃত্তি করিয়া বলিলেন, সা'দী আল্লার প্রশংসাসূচক এই কবিতাগুলি (১) লিখিয়াছেন, খোদার দরবারে তাহা 'মকবুল' হইয়াছে। আমরা তাঁহার পুরস্কার স্বরূপ বেহেশ্‌তের ফুলে রচিত স্বর্ণপাত্রে রক্ষিত এই মালাটী কবিকে দিতে আসিয়াছি। অতঃপর তিনি জাগরিত হইয়া তখনই কবির কুটীর দ্বারে ছুটিয়া আসিলেন, দেখিলেন কবি তখন সেই স্বপ্নশ্রুত 'মোনাজাৎ'টী পড়িতেছেন আর অশ্রুধারায় তাঁহার বক্ষ ভাসিয়া যাইতেছে। তিনি কবির নিকটে আসিয়া পূর্ব্বকৃত অভক্তি-জনিত অপরাধের জন্য দুঃখ প্রকাশ ও বিনীত ভাবে বার বার ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন।

এইরূপ আরও একটী গল্প আছে—সুবিখ্যাত পণ্ডিত 'ফৈজী' পারস্য ভাষায় লিখিত স্বরচিত নলদময়ন্তী গ্রন্থে খোদার মহিমা কীর্ত্তন করিয়া মহাকবি সা'দীর পূর্ব্ববর্ণিত 'মোনাজাতে'র অনুকরণে কয়েকটী হৃদয়গ্রাহী কবিতা (২) লিখিয়াছিলেন, কবিতা কয়টীর সৌন্দর্য্যে তিনি নিজেই মুগ্ধ ও গৌরবে আত্মহারা হইয়া সা'দী রচিত কবিতার পুরস্কার সম্বন্ধীয় স্বপ্ন বৃত্তান্তের কথা ভাবিতে ভাবিতে আকাশের দিকে চাহিয়াছিলেন। ঘটনাক্রমে ঠিক সেই সময়ে একটী উড়ন্ত পাখীর বিষ্ঠা উপর হইতে তাঁহার মুখে আসিয়া পড়িল। 'ফৈজী' মনে মনে লজ্জিত ও ক্ষুব্ধ হইয়া বলিলেন, شعر فهمي عالم بالا معلوم شد আকাশের বাশিন্দাদের কবিতা বুঝিবার শক্তির বেশ পরিচয় পাইলাম।

এই সকল গল্পের সত্যাসত্য সম্বন্ধে আলোচনা করিবার কোনই আবশ্যকতা নাই। সমস্ত কল্পনা প্রসূত ধরিয়া লইলেও ইহা হইতে সা'দী ও তাঁহার কবিতার প্রতি সকলের প্রীতি, ভক্তি ও শ্রদ্ধার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়।

সাহিত্য-জগতে সা'দীর আর একটী বিশেষত্ব এই যে, তিনি পদ্য ও গদ্য উভয়বিধ রচনায় সিদ্ধহস্ত ছিলেন। কবিতার ন্যায় তাঁহার গদ্য রচনাও সকলের নিকট সমভাবে আদৃত ও সাহিত্য জগতে গৃহীত হইয়াছে। তাঁহার লিখিত

---

(১) সা'দীর সেই কবিতাটী হইতেছে—

برگ درختان سبز در نظر هوشیار
هر ورقی دفتریست معرفت کردگار

(২) ফয়জীর কবিতা—

در هر بن معركه مي نهي گوش
فواره فيض اوست در جوش

বহু গ্রন্থের নাম শুনিতে পাওয়া যায়, কিন্তু সবগুলি দেখিবার সুযোগ এদেশে বোধ হয়, কাহারও ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে নাই। কেহ সা'দীর সমগ্র গ্রন্থের সমষ্টি ২২ খানি বলিয়াছেন, কেহ আরও বেশী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। 'কুল্লীয়াৎ সা'দীতে যে কয়খানি প্রকাশিত হইয়াছে, আমরা এখানে তাহারই উল্লেখ করিব।

তাঁহার মৃত্যুর ৪২ বৎসর পর মহাত্মা আলী এবনে আহ্মদ নিম্ন লিখিত গ্রন্থগুলি একত্রিত করিয়া "কুল্লীয়াৎ সা'দী" নাম দিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। যথা,—

(১) গদ্যে লিখিত একটী ক্ষুদ্র পুস্তিকা, ইহাতে 'তাসাওওয়াফ' সম্বন্ধে আলোচনা ও প্রকৃত তত্ত্বদর্শী ওলী আল্লাহ্‌দের অবস্থা বর্ণনা করিয়াছেন, এবং রাজা ও রাজকর্ম্মচারীদের উদ্দেশে বহু উপদেশ দিয়াছেন।

(২) গোলেস্তাঁ।

(৩) বোস্তাঁ।

(৪) পন্দেনামা,—এটী সাধারণের নিকট 'করিমা' নামে বিখ্যাত। অনেকে কিন্তু এটী সা'দীর রচিত নহে বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন।

(৫) 'কাসায়েদে ফারসী'—ইহাতে বিভিন্ন বিষয়ের বর্ণনায় বিভিন্ন ভাবের কবিতা লিখিত হইয়াছে।

(৬) আরবী ভাষায় লিখিত কবিতা।

(৭) তাইয়েবাৎ—কবি রচিত দীওয়ানের প্রথম খণ্ড।

(৮) 'বদায়ে'—ঐ দীওয়ানের দ্বিতীয় খণ্ড।

(৯) খাওয়াতীন—ঐ তৃতীয় খণ্ড।

(১০) কবির বাল্য রচিত কবিতা।

(১১) খাজা শমসুদ্দীনের অনুরোধে লিখিত 'সাহেবীয়া' নামক নানা ছন্দের বিভিন্ন কবিতা।

(১২) হাস্য পরিহাস ও বিদ্রূপাত্মক কবিতা সমূহ।

ইহা ছাড়া অনেকে আরও অনেক গ্রন্থের নাম করিয়া থাকেন। এগুলির মধ্যে পদ্যে রচিত বোস্তাঁ ও গদ্যে লিখিত গোলেস্তাঁ সাহিত্য-জগতে সমধিক প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। পারস্য, তুর্কী, তাতার, আফ্‌গানীস্থান ও ভারতবর্ষে বহু শতাব্দী হইতে ঐ দুটী ছাত্র-পাঠ্য গ্রন্থরূপে শৈশব জীবনে পঠিত ও শেষ জীবন পর্য্যন্ত সমভাবে আদৃত হইয়া আসিতেছে।

অন্যান্য কবিদের আরও ২।৪টী কাব্যগ্রন্থ বোস্তাঁর ন্যায় সমাদর লাভ করিয়াছে; এমন কি মৌলানা রুমীর 'মসনবী', ফেরদৌসীর 'শাহনামা' ও হাফেজের 'দীওয়ান হাফেজ' এই তিনটী মহাকাব্য প্রতিযোগিতাক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠার পথে ২।১ পদ অধিক অগ্রসর হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। 'মসনবী'তো পারস্য ভাষার কোরআন বা তাহার অনুবাদরূপেই উল্লিখিত হইয়াছে,—

هست قرآن درزبان پہلوی
مثنوی مولوی　　معنوی

কিন্তু 'গোলেস্তাঁ' সাহিত্য-জগতে সর্ব্বশ্রেণীর মধ্যে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া যেরূপ বহুল প্রচার ও প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া আসিতেছে অন্য কোন গ্রন্থ তাহা পারে নাই।

বোস্তাঁ ও গোলেস্তাঁ ইউরোপের নানা ভাষায় অনূদিত ও পাশ্চাত্য সমাজে সাদরে গৃহীত হইয়াছে। ১৮৫২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত পাশ্চাত্য ভাষায় উক্ত গ্রন্থদ্বয়ের যে সকল অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে, এন্সাইক্লোপিডিয়ায় তাহার একটী তালিকা দেখিতে পাওয়া যায়। ইউরোপবাসীদের দৃষ্টি বোস্তাঁ অপেক্ষা 'গোলেস্তাঁর' প্রতি অধিকতর আকৃষ্ট হইয়াছে। সর্ব্বপ্রথম আমষ্টর্ডনগর হইতে লাটীন ভাষায়, তৎপর ১৬৩৪, ১৭৮৯ ও ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে তিনজন ফরাসী পণ্ডিত কর্ত্তৃক ফরাসী ভাষায় গোলেস্তাঁর তিনটী অনুবাদ প্রকাশিত হয়। একজন জর্ম্মান পণ্ডিত লিখিয়াছেন—তিনি ঈরানের অধিবাসী একজন সাহিত্যিক বন্ধুর সাহায্যে ১৬৫৪ খৃষ্টাব্দে গোলেস্তাঁ ও বোস্তাঁর জর্ম্মান ভাষায় অনুবাদ করেন। ফরাসী ভাষায় ঐ অনুবাদের অনুবাদ হইয়াছে।

ইংরাজী ভাষায় গোলেস্তাঁর বহু অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে, তন্মধ্যে ১৮০৮ খৃষ্টাব্দে ও ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে লিখিত দুইখানি ও এসিয়াটীক সোসাইটীর জন্য মিঃ রসের অনুবাদিত একখানি এই তিনখানি বিশেষ ভাবে প্রচলিত ও সমাদৃত হইয়াছে। মিঃ হ্যারিংটম, ডাক্তার এ, স্প্রিঙ্গার প্রভৃতি ইংরাজ লেখকগণ গোলেস্তাঁর বহুল প্রচার কল্পে নানা প্রকার চেষ্টা ও সাহায্য করিয়াছেন এসিয়াটীক জার্ণেল পত্রিকায় গোলেস্তাঁর কয়েকটী অধ্যায়ের ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল। ইহা ব্যতীত, ১৮৫২ খৃষ্টাব্দের পর পাশ্চাত্য নানা ভাষায় ভিন্ন ভিন্ন লেখক কর্ত্তৃক ভিন্ন ভিন্ন

সময়ে বোস্তাঁ ও গোলেস্তাঁর আরও বহু অনুবাদ প্রচারিত হইয়াছে, তন্মধ্যে শিক্ষা বিভাগীয় ইনস্পেক্টার মিঃ জন প্লেটের গোলেস্তাঁর অনুবাদ, ক্যাপ্টেন ক্লার্কের ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দের অনুবাদ ও মেজর ম্যাকনিন কৃত Flowers from the Bostan নামক বোস্তাঁর অনুবাদ বিশেষভাবে উল্লেখ যোগ্য। তর্কী ও আরবী ভাষায় গ্রন্থাকারে ও সংবাদ পত্রের পৃষ্ঠায় গোলেস্তাঁর আরও অনেকগুলি অনুবাদ বাহির হইয়াছে। সম্প্রতি কিছুদিন পূর্ব্বে মিসরের জিবরীল নামক একজন বিশিষ্ট আলেম আরবী ভাষায় গোলেস্তাঁর একটী সর্ব্বাঙ্গসুন্দর অনুবাদ প্রকাশ করিয়াছেন। তাহাতে পদ্যের অনুবাদ পদ্যে ও গদ্যের অনুবাদ গদ্যে লিখিত হইয়াছে।

ভারতের বিভিন্ন ভাষায় গোলেস্তাঁর অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে, লর্ড ওয়েলেস্‌লীর শাসনকালে বিখ্যাত লেখক মির শের আলী ও তৎপরবর্ত্তী আরও অনেকে উর্দ্দু ভাষায় গুজরাটের জনৈক পণ্ডিত গুজরাটী ভাষায়, উত্তর পশ্চিমাঞ্চল-বাসী একজন লেখক 'পুষ্প বাটীকা' নাম দিয়া এবং দিল্লীর সুবিখ্যাত পণ্ডিত মোহর চাঁদ দাস আগরওয়ালা ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে পুষ্পবন নাম দিয়া 'ব্রজ ভাষায়' গোলেস্তাঁর অনুবাদ প্রকাশ করিয়াছেন।

Literary History of Persiaর লেখক Mr. E. G. Browne লিখিয়াছেন—"সকল ভাষায় সাহিত্যের গঠন প্রথমতঃ কবিতা হইতেই আরম্ভ হয়; কিন্তু তাহার বৃদ্ধি, স্থিতি ও প্রকৃত উন্নতি গদ্যের উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিয়া থাকে, কবিতা ভাষার সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করে কিন্তু গদ্য তাহাকে বাঁচাইয়া রাখে।" কবিতা রচনায় প্রসিদ্ধি লাভ কবির পক্ষে যেরূপ কষ্টকর, গদ্য লেখকেরও সাহিত্যের বাজারে 'নাম জাহির' করা তদপেক্ষা অধিক কষ্টকর। বিশেষতঃ গদ্য ও পদ্য উভয় রচনায় সমভাবে সিদ্ধিলাভ প্রায় কাহারও ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে না। পাশ্চাত্য লেখক Sir. Onsley ও এ কথা স্বীকার করিয়াছেন। মহাকবি সা'দী উভয়বিধ রচনায় সমান প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন। 'গোলেস্তাঁ' গ্রন্থখানি সাহিত্য-জগতে প্রতিযোগিতার আসরে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া বিজয়ী বেশে অন্য প্রতিদ্বন্দ্বীর অপেক্ষা করিতেছে; কিন্তু অসংখ্য সাহিত্য-রথীদের মধ্যে এপর্য্যন্ত তাহার সম্মুখে অগ্রসর হইবার সাহস কাহারও হইয়া উঠে নাই।

বিখ্যাত লেখক কাজী হামিদুদ্দীন রচিত মাকামাৎ হামিদী কাবুল এবনে সেকেন্দার প্রণীত কাবুল নামা ও শীরাজের অধিবাসী প্রতিষ্ঠাবান লেখক কাজী ফজলুল হক লিখিত 'তারিখে ওস্‌শাফ' ও অন্যান্য বহু লেখকের গদ্যে রচিত অসংখ্য গ্রন্থাবলী পারস্য সাহিত্যে দেখিতে পাওয়া যায়, ঐ সকল গ্রন্থকারদের মধ্যে পাণ্ডিত্যের হিসাবে ২।১ জনের আসন শেখ সা'দীর উপরে, কিন্তু তাঁহাদের রচিত, গ্রন্থ সমূহে ভাবের লালিত্য অপেক্ষা ভাষার আড়ম্বরই অধিক। সেই সকল গ্রন্থে ভাষার সুদৃঢ় প্রাচীর ভেদ করিয়া ভাব-রাজ্যে প্রবেশ লাভ অনেক পণ্ডিতের ভাগ্যেও ঘটিয়া উঠে না! এমন কি বহুশাস্ত্রে জ্ঞান লাভ ও পদে পদে অভিধান ও টীকা টিপ্পনীর সাহায্য গ্রহণ না করিয়া এক পদও অগ্রসর হইবার উপায় নাই।

সা'দীর মৃত্যুর বহুদিন পর মৌলানা আবদুর রহমান জামী, মাজদুদ্দীন খাওয়াফী ও 'হাবীব কায়ানী' এই তিন জন নামজাদা লেখক স্ব স্ব রচিত 'বাহারাস্তান' (উদ্যান), খারাস্তান (কণ্টকারণ্য) ও পেরেশান (বিশৃঙ্খল রচনাবলী) গ্রন্থে গোলেস্তাঁর প্রতিযোগিতা ক্ষেত্রে অগ্রসর হইয়াছিলেন, কিন্তু তাহাদের চেষ্টা সম্পূর্ণ নিস্ফল হইয়াছে, সাহিত্যিক-বৃন্দ একবাক্যে তাহা স্বীকার করিয়াছেন। 'পেরেশান' রচয়িতা মহাত্মা 'কায়ানী' লিখিয়াছেন—'গোলেস্তাঁ' পূর্ণ শশধর এবং পেরেশান খদ্যোতিকা, এরূপ অবস্থায় প্রতি-যোগিতা ক্ষেত্রে অগ্রসর হওয়া বাতুলতা মাত্র; কিন্তু একজন বিশ্বস্ত বন্ধুর অনুরোধে পড়িয়া বিশেষতঃ সা'দীর ন্যায় মহা-পুরুষের পদাঙ্কানুসরণের লোভ সম্বরণ করিতে না পারিয়া এই পথে অগ্রসর হইয়াছিলাম।

কবিবর আলী হাজীন প্রতিযোগিতা ক্ষেত্রে অগ্রসর হইয়া 'খারাবাৎ' নাম দিয়া বোস্তাঁর অনুকরণে পদ্যে একখানি ২০।২২ পৃষ্ঠার ক্ষুদ্র পুস্তিকা লিখিয়াছেন। তিনি তাহার অবতরণিকায় আত্মপ্রশংসা করিতে ও কবিবর 'রুদাকী,' নেজামী, ফেরদৌসী ও সা'দীকে খাট করিবার উদ্দেশ্যে ২।৪ টী কথা বলিতে কুণ্ঠিত হন নাই। সাহিত্যিক সম্প্রদায় এ সম্বন্ধে বহু আলোচনা করিয়া লিখিয়াছেন—খারাবাতের রচয়িতা প্রকৃতই বামন হইয়া চাঁদ ধরিতে চেষ্টা পাইয়াছেন। অনুকরণের প্রসাধনে বাহ্যতঃ 'খারাবাৎ' ও গোলেস্তাঁ দুইটী জমজ ভ্রাতার ন্যায়

সৌসাদৃশ্যপূর্ণ যুগল মূর্ত্তি বলিয়া মনে হয়। কিন্তু ভাল করিয়া দেখিলে গোলেস্তাঁ সজীব ও খারাবাৎ প্রাণহীন মূর্ত্তি, ইহা বেশ বুঝিতে পারা যায়।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে কবি রচিত গ্রন্থসমূহের মধ্যে 'গোলেস্তাঁ' সাহিত্য-আসরে বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছে, পারস্য সাহিত্যে আর কোন গ্রন্থ এরূপ প্রসিদ্ধি লাভ করিতে পারে নাই ; এক্ষণে কথা হইতেছে এই 'গোলেস্তাঁ' গ্রন্থখানি কবির বহু দিনের বহু পরিশ্রমের ফল অথবা সামান্য আয়াসে অল্পদিনে রচিত হইয়াছে, এই কথা লইয়া ঐতিহাসিকদের মধ্যে বিভিন্ন মত দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু আমরা প্রথমোক্ত মতেরই পক্ষপাতী; কারণ ইতিহাস জগৎ অনুসন্ধান করিলে প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় যে, গ্রন্থ রচনা করিতে লেখক যত পরিশ্রম স্বীকার করিয়াছেন, সেই গ্রন্থ সাধারণ্যে ততই প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। বোস্তাঁর অনুবাদক মিঃ ক্লার্ক এই মতেরই সমর্থন করিয়া দৃষ্টান্ত স্বরূপ ইটালীর প্রসিদ্ধ লেখক 'এপ্রিস্টো' এবং বিখ্যাত ইংরাজ লেখক লর্ড ম্যাকলের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। ম্যাকলের একখানি প্রসিদ্ধ গ্রন্থের 'খসড়া' লণ্ডন মিউজীয়মে রক্ষিত হইয়াছে, সেটীতে দেখিতে পাওয়া যায়, তিনি এক একটী জায়গা কতবার লিখিয়াছেন, কতবার কাটিয়াছেন, আবার লিখিয়াছেন। বিশেষতঃ যে স্থানটীতে তিনি যত অধিক কাটছাঁট করিয়া অধিক কষ্ট স্বীকার করিয়াছেন, গ্রন্থের মধ্যে সেই স্থানটীই তত অধিক প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। এ সম্বন্ধে গোলেস্তাঁর উপক্রমণিকায় কবি নিজেই লিখিয়াছেন—

برخی ازعمرگرانمایه برو خرج کردیم

অর্থাৎ আমার জীবনের এক মূল্যবান অংশ এই কার্য্যে ব্যয় করিয়াছি, কিন্তু আর একস্থানে বলিয়াছেন—

فی الجمله هنوز از گلستان یقینے مانده بود که
کتاب گلستان تمام شد -

অর্থাৎ বসন্ত সমাগমে লিখিতে আরম্ভ করিয়া বসন্ত ঋতু শেষ হইবার পূর্ব্বেই গোলেস্তাঁ গ্রন্থ শেষ হইয়াছে। কবির উভয় উক্তির সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে হইলে এইরূপ বুঝিতে হয় যে, গোলেস্তাঁর বিভিন্ন অংশ বিভিন্ন সময়ে রচনা করিতে তাঁহার জীবনের এক মূল্যবান অংশ ব্যয়িত হইয়াছে; কিন্তু সাহিত্যক্ষেত্রে উপস্থিত করিবার মত গ্রন্থাকারে সাজাইতে বেশীদিন লাগে নাই।

কবি রচিত ব্যঙ্গ ও বিদ্রূপপূর্ণ কবিতা সমূহের আলোচনা করিয়া অনেকে তাঁহার ন্যায় সভ্যতা, শ্লীলতা ও সুরুচি সম্পন্ন মহাত্মার পক্ষে এরূপ কুরুচিপূর্ণ কবিতা রচনা আশ্চর্য্যের বিষয় বলিয়া মনে করিয়াছেন। কবি নিজেই এ সম্বন্ধে কৈফিয়ৎ দিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন—প্রথম যৌবনে জনৈক রাজপুত্রের অনুরোধে পড়িয়া অনিচ্ছা সত্ত্বেও আমাকে এ সকল কবিতা লিখিতে হইয়াছিল। তাঁহার কথা না শুনিলে বিপদে পড়িতে হইত ; তাই অগত্যা আমি এই কুকার্য্য করিয়াছি। আল্লাহ্ পরম দয়ালু, আমি তাঁহার দরবারে এই পাপের জন্য ক্ষমা ভিক্ষা করিতেছি।

কবি বহুদেশ ভ্রমণ করিয়া, বহু মহা পুরুষের সংসর্গ লাভ করিয়া এবং সাংসারিক বহু সুখ দুঃখের ও বিপদ সম্পদের সম্মুখীন হইয়া যেরূপ শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন কেবল পুঁথিগত বিদ্যায় কখনই তাহা সম্ভবপর ছিল না। সুবিখ্যাত পাশ্চাত্য লেখক মিঃ মিলার লিখিয়াছেন—"মানুষ বহুদর্শিতার শিক্ষাগার হইতেই প্রকৃত শিক্ষা লাভ করে। এই শিক্ষাগারে দুঃখ ও বিপদ নামক দুইজন সুবিজ্ঞ শিক্ষক অধ্যাপনা করিয়া থাকেন।"

১৭৫৬ খৃষ্টাব্দের জুন সংখ্যার 'কলিকাতা রিভিউ' পত্রিকায় একজন পাশ্চাত্য লেখক মহাকবি সা'দী ও হাফেজ সম্বন্ধে এইরূপ একটী গল্প লিখিয়াছেন—সা'দী, হাফেজের পিতৃব্য হইতেন, একদিন হাফেজ সাদীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন, কিছুক্ষন কথাবার্ত্তার পর সাদী কার্য্যান্তরে স্থানান্তরে চলিয়া গেলেন। হাফেজ কিছুক্ষণ বসিয়া রহিলেন, এই সময় সা'দী রচিত এক চরণ কবিতার প্রতি তাঁহার দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল, তিনি তখনই সাদীর প্রতি পরিহাস সূচক আর এক চরণ কবিতা লিখিয়া প্রথম চরণের সহিত যোগ করিয়া দিলেন। কিছুক্ষন পর সা'দী ফিরিয়া আসিয়া হাফেজের কীর্ত্তি দেখিলেন এবং তখনই হাফেজকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। হাফেজ আসিলে তাঁহার প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়া অভিসম্পাৎ প্রদান পূর্ব্বক বলিলেন—তোমার রচিত কবিতা জগতে প্রসিদ্ধি লাভ করিবে, কিন্তু তাহা হইতে পাঠকদের মনে কেবল বৈরাগ্যের উদয় ভিন্ন অন্য কোন ভাবের সঞ্চার হইবে না। বলা বাহুল্য এই গল্পটীর মূলে আদৌ কোন সত্য নাই,

সা'দীর মৃত্যুর ( ৬৯১ হিজরী ) প্রায় ২৪ বৎসর পর ৭১৫ হিজরীতে হাফেজ জন্মগ্রহণ করেন, এজন্য অন্যান্য ঐতিহাসিক গণ 'কলিকাতা রিভিউ' পত্রিকায় প্রকাশিত গল্পটী সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন ও কল্পনা-প্রসূত বলিয়া মত দিয়াছেন। দুঃখের বিষয় মহাকবি সা'দীর ন্যায় মহাপুরুষও শত্রুদের হিংসা ও বিদ্বেষের হাত হইতে রক্ষা পান নাই। তিনি দুঃখের সহিত গাহিয়াছেন—

هنر بچشم عداوت بزرگتر عیبی ست
گل ست سعدی و درچشم دشمنان خارست -
توانم آنکه نیازارم اندرون کسی
حسود راچه کنم کوزخود برنج درست -

অর্থাৎ বিদ্বেষের চক্ষে গুণ মহাদোষ। সা'দী ফুলের ন্যায় কিন্তু শত্রুর চক্ষে কণ্টক স্বরূপ। আমি কাহারও মনে কষ্ট না দিতে পারি, কিন্তু শত্রুর কি করিব সে নিজে হইতেই কষ্ট ভোগ করে।

সা'দী প্রকৃত দেশ-হিতৈষী মহাপুরুষ ছিলেন। তাঁহার কোমল প্রাণ দেশের দুঃখে চিরদিনই কাঁদিয়া উঠিয়াছে, তিনি যেখানেই থাকুন দেশের দুঃখ দুর্দ্দশা দূর করিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার রচনা সমূহের সর্ব্বত্রেই তাহা স্পষ্টভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। জন্মভূমির কথা জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি خاک پاک شیراز অর্থাৎ শিরাজের পবিত্র মৃত্তিকা বলিয়া তাহার উল্লেখ করিতেন।

দেশ হিতৈষণা

সা'দী একজন স্বাধীনচেতা মুসলমান ছিলেন। কুসংস্কারের প্রশ্রয় দিবার এবং "সলফে সালেহীন ও বোজর্গানে দীনে"র নামে ( তাঁহাদেরই আদেশের বিরুদ্ধে ) খোদার দেওয়া জ্ঞানচক্ষু বন্ধ করত সাধের অন্ধ সাজিয়া খোদা রসুলের হুকুমের ন্যায় অন্য কাহারও হুকুম মানিয়া লইবার লোক তিনি ছিলেন না। শরীয়ত নির্দ্দিষ্ট আইন-কানুনের মধ্যবর্ত্তিতায় স্বাধীন ভাবে আলোচনা ও গবেষণার সাহায্যে প্রকৃত সত্য নির্দ্ধারণ করাই ইসলামের আদেশ, ইহাই তাঁহার অভিমত ছিল। মহাত্মা এবনে জৌজী ধর্ম্ম-মত সম্বন্ধে তাঁহাকে ঠিক নিজের মত করিয়া গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। সা'দী বলিয়াছেন—

কবির ধর্ম্মমত

عبادت بتقلید گمراهی ست
خنک رهرو یراکه اگاهی ست -

অর্থাৎ কাহারও অন্ধ অনুকরণ করিয়া এবাদৎ করিলে পথ-ভ্রষ্ট হইতে হয়। বুঝিয়া সুজিয়া দেখিয়া শুনিয়া পথের অবস্থা অবগত হইয়া যে, পথ-পর্য্যটন করে সেই ধন্য। ইহা হইতেই সা'দীর ধর্ম্মমতের সম্যক পরিচয় পাওয়া যায়।

অধিকাংশ ঐতিহাসিকের মতে পারস্য রাজ্য তাতারের খান বংশীয়দের হস্তগত হওয়ার পর তাঁহাদের শাসনকালে ৬৯১ হিজরী সনে ১২০ ( মতান্তরে ১০২ ও ১১০ ) বৎসর বয়সে জন্মভূমি শীরাজ নগরে মহাকবি সা'দী নশ্বর জগৎ হইতে চির বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন।

মৃত্যু ও সমাধি

তাঁহার মৃত্যু উপলক্ষে একজন কবি গাহিয়াছেন—

دربحر معارف شیخ سعدی * که در دریای معنی بردغواص
مدشوال روز جمعه روحش * بدان درگاه رفت از روی اخلاص
یکی پرسید سال فوت گفتم * زخاصان بود زان تاریخ شد خاص

অর্থাৎ সা'দী আধ্যাত্ম সমুদ্রের মুক্তা ও ভাব সাগরের ডুবুরী ছিলেন। শওয়াল মাসে; জুমআর দিনে তাঁহার আত্মা খোদার 'দরগাহে' চলিয়া গিয়াছে। একজন তাঁহার মৃত্যুর সন জিজ্ঞাসা করিলে আমি বলিলাম, তিনি খাস ( বিশেষ ) লোকদের একজন ছিলেন, তাই 'খাস' ( خاص ) শব্দটী হইতেই তাঁহার মৃত্যুর সন বাহির হইয়াছে। বলা বাহুল্য এই خاص ( খাস ) শব্দের অক্ষর কয়টী হইতেই 'আবজাদের' হিসাবে ৬৯১ হিজরী বাহির হয়। যথা—খে ৬০০ + আলেফ্ ১ + সাদ ৯০ = ৬৯১

পাশ্চাত্য পরিব্রাজক মিঃ উইলিয়াম ফ্রাঙ্কলীন তাঁহার ভ্রমণ বৃত্তান্তে লিখিয়াছেন—শিরাজ নগরের দেলকোশা নামক স্থান হইতে এক মাইল পূর্ব্বদিকে একটী পর্ব্বতের সানুদেশে কবির পবিত্র দেহ সমাহিত হইয়াছে। তাঁহার সমাধি স্থানটী বিশেষ জাঁকজমকপূর্ণ। সেখানে একটী বিরাট অট্টালিকা চতুর্ভুজাকারে নির্ম্মিত হইয়াছে, সমাধিটী প্রস্তর মণ্ডিত, দৈর্ঘ্যে ৬ ফিট, প্রস্থে ২॥০ ফিট। চতুপার্শ্বে কবির সংক্ষিপ্ত জীবনী ও কতকগুলি কবিতা লিখিত হইয়াছে, তন্মধ্যে জগতের নশ্বরতা সম্বন্ধে কবি রচিত কয়েকটী কবিতা

বিশেষ ভাবে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। কবির সমাধি দেখিতে বহু দূর হইতে যাত্রী সমাগম হইয়া থাকে। দেখিলাম সমাধি চত্বরে একখানি কুল্লীয়াৎ সা'দী রক্ষিত হইয়াছে, এক্ষণে সমাধি ও তৎসংলগ্ন অট্টালিকা জীর্ণাবস্থায় উপনীত ও তাহার পূর্ব্ব সৌষ্ঠব সম্পূর্ণরূপে অন্তর্হিত হইয়াছে। অচিরে সংস্কার করা না হইলে ভগ্নস্তূপে পরিণত ও মহাকবির চির বিশ্রামাগারটী ধরাপৃষ্ঠ হইতে বিলুপ্ত হইয়া যাইবে।

সার অসলী লিখিয়াছেন—"ইংলণ্ডের রাজা তৃতীয় জর্জ্জের রাজত্ব কালে একটী বিশেষ রাজনৈতিক ব্যাপারে তেহরান যাত্রার সময় কিছুদিন আমি শীরাজ নগরে আটক পড়িয়াছিলাম, সেই সময় একদিন মহাকবির সমাধিক্ষেত্রে যাইয়া দেখিলাম সমাধি মন্দির ও তৎসংলগ্ন অট্টালিকা সম্পূর্ণ জীর্ণ দশাগ্রস্থ হইয়াছে। কোথাও ইট খসিয়াছে, কোথাও ফাট ধরিয়াছে, আবার কোথাও কোন গৃহ চূড়া ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে। এই অবস্থা দেখিয়া আমি মিঃ ফ্রাঙ্কলীনের উক্তির সত্যতা বুঝিতে পারিলাম। স্বচক্ষে তাঁহার সমাধি মন্দিরের দুর্দ্দশা দেখিয়া হৃদয়ে মর্ম্মন্তুদ বেদনা পাইলাম। এবং যে কোন প্রকারে তাহার জীর্ণ সংস্কারে কৃত সঙ্কল্প হইলাম। তৎসাময়িক ঈরানাধিপতির পঞ্চম পুত্র পারস্যের শাসনকর্ত্তা ( Governor ) হোসেন আলী মির্জ্জা আমার সঙ্কল্পের কথা জানিতে পারিয়া স্বয়ং এই কার্য্য সমাধা করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় বহুদিন পরে আমি সংবাদ পাইয়াছি, পারস্য রাজকুমার আদৌ তাঁহার প্রতিশ্রুতি পালন করেন নাই। মহাকবির সমাধি মন্দির ভূমিসাৎ ও তৎসংলগ্ন এমারৎ সম্পূর্ণরূপে ভগ্নস্তূপে পরিণত হইয়াছে।" হায়, ইহা অপেক্ষা মোসলেম-জগতের জাতীয় অধঃপতনে চরম ও পরম নিদর্শন আর কি হইতে পারে ?

( ক্রমশঃ )

---

# হজরতের বহুবিবাহ

[ শেখ ফজলুল করিম ]

ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী হীনচেতা ব্যক্তিগণ বিশ্বনবী হজরত মোহাম্মদের ( দঃ ) পুণ্যচরিত্রে কলঙ্কারোপ করিতে যাইয়া সর্ব্বাগ্রে তাঁহার বহুবিবাহের উল্লেখ করেন। অনেক সরল-মনাঃ মুসলমানও তাঁহাদের বিচিত্র বাক্যচ্ছটায় বিভ্রান্ত হইয়া নিজেদের ধর্ম্মনেতার প্রতি অমূলক সন্দেহ পোষণ করিয়া থাকেন। কাজেই এ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা, বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

পাঠকগণের মধ্যে যাঁহারা আমাদের হজরতকে "নবী" বলিয়া বিশ্বাস করিতে কুণ্ঠিত, তাঁহারাও নিশ্চিত স্বীকার করিবেন যে, হজরত একটি পৃথিবীব্যাপী পবিত্র ধর্ম্মের প্রচারক এবং তাঁহারই কর্ম্মকুশলতা, সাহস, ধৈর্য্য এবং স্বার্থত্যাগের ফলে এক সঙ্ঘবদ্ধ মহাজাতি গড়িয়া উঠিয়াছে। কোন স্খলিত চরিত্র ব্যক্তি ধর্ম্ম বা কর্ম্মজগতের নেতা হইয়া অগণিত নরনারীর শ্রদ্ধার পুষ্পাঞ্জলি পাইতে পারেন না। অধর্ম্মই একদিন তাহার পতনের কারণ হয়। সুতরাং ধর্ম্ম এবং কর্ম্ম জগতে হজরতের এই একাধিপত্য হইতেও ইহাই প্রমাণিত হয় যে, তাঁহার চরিত্র অতিশয় নির্ম্মল, উদার এবং সহানুভূতি পরায়ণ ছিল। মনের ভিতর পাপ পুষিয়া রাখিয়া কেহই নিখিল মানবের চিত্ত জয় করিতে পারেন না। ইন্দ্রিয় পরিচালনা সম্বন্ধে হজরত রসুলে করিম ( দঃ ) যেরূপ সংযম এবং দৃঢ়তার পরিচয় দিয়াছেন, একটু চিন্তা করিয়া দেখিলেই কুৎসাকারীরা তাহা বুঝিতে পারেন ; কিন্তু বুঝা তাঁহাদের উদ্দেশ্য নহে,—কুৎসা করাই উদ্দেশ্য। কাজেই তথাকথিত লোকেরা বুঝিয়াও বুঝিতে চাহেন না। খৃষ্টান প্রচারক এবং তাঁহাদের অন্ধ অনুবর্ত্তিগণের দেখাদেখি আর্য্য সমাজীরাও আজ কাল হজতের অপবাদ রটনায় নিযুক্ত

হইয়াছেন। তাঁহারা দেখাইতে চাহিতেছেন যে, হজরত মানবজাতির অগ্রণী হইবার অযোগ্য, যেহেতু তাঁহার চরিত্র নির্ম্মল নহে, বরং তিনি বিলাসী, ইন্দ্রিয়াসক্ত ব্যক্তি ছিলেন।

অন্য ধর্ম্মের শিক্ষার প্রতি ক্রূর কটাক্ষ না করিয়া আমরা কেবল ইহাই বলিতে চাই যে, ইস্‌লাম যে-কোন জাতির পুণ্যাত্মা মহাপুরুষগণের গ্লানি প্রচার করা মহাপাপ মনে করে—ইহাই তাহার শিক্ষা। নতুবা বাইবেলের পুরাতন অংশের প্রতি অঙ্গুলিসঙ্কেত করিয়া আমরাও বলিতে পারিতাম, দেখ, হজরত দায়ুদের একশত পত্নী, হজরত সোলায়মানের সহস্র সহধর্ম্মিনী, হজরত এবরাহীমের অষ্ট সঙ্গিনী এবং হজরত ইয়াকুব প্রমুখ নবীগনের একাধিক পত্নী বর্ত্তমান ছিল! হিন্দু পুরাণাদির প্রতি লক্ষ্য করিয়াও বলিতে পারিতাম, দেখ, তোমাদের শ্রীকৃষ্ণ এবং জরাসিন্ধু মহারাজ শত শত কামিনী ভোগ করিয়া পূর্ব্বেই তোমাদের আপত্তির মাথায় ঘোল ঢালিয়া গিয়াছেন! কিন্তু আমরা তাহা বলিতে পারি না বা চাহি না। ইস্‌লাম আমাদিগকে সে শিক্ষা দেয় নাই। আমরা কেবল এতটুকু বলিতে পারি, যদি সত্য সত্যই মানবজাতির অগ্রণাগণের এইরূপ অবস্থাই হয়, তাহা হইলে উহা তাঁহাদের উচ্চ পদমর্য্যাদার পরিপন্থী নহে। সে চরিত্র সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র বস্তু।

হজরত রসুলে আক্‌রমের (দঃ) বহু বিবাহ সম্বন্ধে যাঁহারা আপত্তি উত্থাপন করেন, তাঁহারা হয় ইতিহাসে অনভিজ্ঞ, নয় গরল উদ্গীরণ করাই তাঁহাদের স্বভাব। নতুবা চোখ থাকিতে মানুষের এরূপ অন্ধ হইবার কারণ খুঁজিয়া পাই না।

পঁচিশ বৎসর বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত তিনি কোন স্ত্রীলোক সংস্পর্শে আসেন নাই, ইহা তাঁহার শত্রুরাও স্বীকার করিয়া থাকেন। ইহাই যদি সর্ব্ববাদী-সম্মত ঐতিহাসিক সত্য হয়, তবে একথাও অবশ্য স্বীকার্য্য যে, এই বয়সেই মানুষের কামলালসা অত্যন্ত বলবতী হয়, মানুষ নিয়ত রমণী সঙ্গ আকাঙ্ক্ষা করে। প্রেম ও কামের ইহাই উপযুক্ত সময়,—মানুষের হৃদয়ে নিত্য নূতন কামনা-কুসুম প্রস্ফুটিত হইয়া তাহাকে উদ্‌ভ্রান্ত করিয়া তোলে। যাঁহারা "ভাল লোক" বলিয়া সংসারে পরিচিত, তাঁহারাও নিজের নিজের পূর্ব্বজীবনের কথা স্মরণ করিলে দেখিতে পাইবেন, এই বয়সে তাঁহাদের মানসিক অবস্থা কিরূপ দাঁড়াইয়াছিল,—বর্ত্তমানের সহিত অতীতের কতখানি পার্থক্য! যৌবনে ইন্দ্রিয় দমনে অসমর্থ হইয়া মানুষ অজস্র অপকর্ম্ম করে, মান-অপমান, ঘৃণা-লজ্জা বিসর্জ্জন দেয়, ইহা কে না জানেন? জীবজগতে যৌবন যখন নব বসন্তের ডালি সাজাইয়া আনিয়া নব নব স্বপ্নে মানবকে সম্মোহিত করে, তখন নরনারীর আত্মবিস্মৃতি ঘটে; পাপপুণ্য, ধর্ম্মাধর্ম্ম সকলই তাহাদের কাছে তুচ্ছ মনে হয়। একটা বৈদ্যুতিক শক্তি শিরায় শিরায় প্রবাহিত হইয়া প্রতি মুহূর্ত্তে চিত্তচাঞ্চল্য ঘটাইয়া থাকে; ফলে ধনমানের প্রতি মানুষের দৃষ্টি থাকে না। মুকুলিত জীবনের সে একদিন!—যখন কাঙ্গালের পুত্রও রাজহর্ম্ম্যের স্বপ্ন দেখে। স্রষ্টার অপূর্ব্ব মহিমায় তাহাদের হৃদয়ে তখন যে বীজ অঙ্কুরিত হয়, তাহার সুগন্ধে কস্তুরী মৃগের মতই তাহারা উন্মত্ত আবেগে ছুটিতে থাকে। ইহা স্বভাবের নিয়ম। প্রত্যেক জীবের জীবনেই এদিন একবার করিয়া আইসে, তবে কাহারো অল্পদিনের জন্য, কাহারো কিঞ্চিৎ দীর্ঘকালের জন্য। যে নৈতিকতা এবং মনুষ্যত্বের আমরা গর্ব্ব করিয়া থাকি, কামান্ধ নরনারীর কাছে তাহার মূল্য কতটুকু! তাহারা কি এ সময় মানবতার সীমা লঙ্ঘন করিয়া পশুতে পরিণত হয় না? নীতিধর্ম্মের চক্ষে কি তাহাদের কার্য্য গর্হিত বলিয়া নিন্দিত হয় না? বাস্তবিক ১৬ হইতে ২৫ বৎসর পর্য্যন্ত এই যে কালটা—ইহা মানুষের জীবনে অত্যন্ত বিপজ্জনক সময়। প্রবৃত্তির প্রেরণায় এই সময় মানুষের মতিগতি পরিবর্ত্তিত হয়, তাহারা পদে পদে লালসার অন্ধকূপে পতিত হইয়া থাকে। শৃঙ্খলহীন মত্ত মাতঙ্গের মত যুবজনের মুক্ত মনমাতঙ্গ কেবল উদ্দাম ভাবে বিচরণ করিতেই ভালবাসে।

কিন্তু হজরত, মানবজীবনের পুষ্পিত বসন্ত—যৌবনকালটাই জিতেন্দ্রিয় যোগীর ন্যায় যাপন করিয়াছিলেন, একথা শুনিয়া কি বিস্ময়ের উদ্রেক হয় না? যাহা কেহই পারে না, তিনি তাহা পারিয়াছিলেন, ইহা কি তাঁহার পক্ষে কম গৌরবের কথা? তাঁহার উচ্চবংশে জন্মগ্রহণ এবং অনন্যসুলভ রূপযৌবনের সহিত যদি তাৎকালীক আরবললনাকুলের অধঃপতনের চিত্র পাশাপাশি রাখিয়া চিন্তা করা যায়, তাহা হইলে তদীয় পূত-পবিত্র নির্ম্মল চরিত্রের মহিমা আপনা আপনি আমাদের নয়ন-সম্মুখে উদ্ভাসিত

হইয়া উঠে। তিনি যদি চরিত্রহীন ( নাউজোবিল্লাহে মিন্ জালেকা ) হইতেন, এবং কোন রূপসী যদি তাঁহাকে পথভ্রষ্ট করিতে চাহিত, তাহা হইলে অতি সহজে উভয় পক্ষ হইতে সে কার্য্য সম্পন্ন হইতে পারিত। কিন্তু হজরত কোন অবস্থাতেই নিজের সংযম নষ্ট করেন নাই, বিশেষ সেই দেশে—সেই সময়ে ও সেই সমাজে—যেখানে নারীর "সতীত্ব" বা পুরুষের "চরিত্রবল" বলিয়া কোন বালাই ছিল না। ইহাতে কি তাঁহার চরিত্রের দুর্ব্বলতা প্রমাণিত হয়?

যে সময়ের কথা বলা হইতেছে, তখন নারী ছিল আরবে খেলার সামগ্রী। পানাসক্ত পুরুষেরা সুরার গোলাপী নেশায় মাতিয়া কেবলই নারীর রূপযৌবনের রঙ্গীন স্বপ্ন দেখিত। ফলে অনেক কুৎসিত কাব্য এবং সঙ্গীতের সৃষ্টি হইয়াছিল। এই সকল জঘন্য কাব্য এবং সঙ্গীতে অবৈধ প্রণয়ের মাধুর্য্য ঘোষণা করা হইত। নারীর মাতৃমূর্ত্তি ভুলিয়া তাহারা মোহিনীমূর্ত্তির ছবি আঁকিত; কাজেই দেশের লোকের চরিত্র বিগড়াইয়া গিয়াছিল, সমাজে অনাচারের মাত্রা বৃদ্ধি পাইয়াছিল। ( সাব্‌আ মোআল্লাকা এবং অন্যান্য কসিদা গ্রন্থ দ্রষ্টব্য )। দেশের এবং দশের যেখানে এই অবস্থা, সেখানে যদি হজরত নিজের চরিত্রের নির্ম্মলতা রক্ষা করিতে পারিয়া থাকেন, তবে সে মানুষের নিন্দা করা উচিত, কি প্রশংসা করা উচিত? এমন সংযমী পুরুষকে কি "মহামানব" বলিয়া সহজে প্রতীতি জন্মে না?

পঁচিশ বৎসর বয়সে—সংসারের প্রবেশ পথে তিনি এমন একজন বিধবা নারীকে বিবাহ করিয়াছিলেন, যাঁহার যৌবন-স্মৃতি প্রায় মুছিয়া গিয়াছিল, জীবনের দিনও ফুরাইয়া আসিতেছিল। গ্রীষ্মপ্রধান দেশে চল্লিশ বৎসর বয়স্কা রমণীর যৌবন অটুট থাকিতে পারে না, ইহা অবস্থাভিজ্ঞ প্রত্যেক ব্যক্তিই জানেন। অপেক্ষাকৃত ঠাণ্ডা মুলুক এই বাংলা দেশের মেয়েরা "কুড়িতে বুড়ী" হয়, ইহা প্রবাদবাক্য। কিন্তু বুড়ী হউক আর না হউক—চল্লিশের কোঠায় পা দিলে যে তাহাদের অনেকেরই চুল পাকে, দাঁত নড়ে, ইহা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। এরূপক্ষেত্রে হজরত যাঁহাকে বিবাহ করিয়াছিলেন, তাঁহাকে প্রৌঢ়া বলা যাইতে পারে—যুবতী নহেন। সুতরাং একজন যুবতীর কাছে কোন যুবক যাহা পাইবার আশা করিতে পারে, বিবি খাদিজার কাছে হজরত তাহা পান নাই,—পাইবার আশা করিয়াও তাঁহাকে বিবাহ করেন নাই। জীবনের সাধ আহ্লাদকে এমনভাবে যিনি স্বেচ্ছায় **বলিদান করিতে** পারেন, তাঁহাকে তুমি কি বলিতে চাও?—বিলাসী না বিলাসবিমুখ?

যৌবনের উদ্দাম লালসা-লিপ্সা কিছুই খাদিজার ছিল না,—ছিল ভাদ্রের কূলপ্লাবী বর্ষান্তে শীতশীর্ণ নদীর সংযত অনাড়ম্বর মূর্ত্তি। সে নয়নে তখন চাঞ্চল্য ছিল না, কটাক্ষ ছিল না,—মধুর বাৎসল্য ফুটিয়াছে; সে হৃদয়ে তখন কামের উত্তেজনা, কামনার আধিক্য ছিল না,—বিশ্বপ্রেমের অনাবিল-ধারা ছুটিয়াছে। এই সময় হজরত তাঁহাকে বিবাহ করিয়াছিলেন।

হজরতের সহিত উদ্বাহসূত্রে আবদ্ধ হইবার পূর্ব্বে বিবি খাদিজা আরও দুইবার পরিণীতা হইয়াছিলেন এবং তাঁহার কয়েকটী পুত্রকন্যাও জন্মিয়াছিল। তারপর বিধবা হইয়া তিনি পিতার বিষয় কর্ম্মে মন দিয়াছিলেন। তাঁহার ন্যায় বুদ্ধিমতী কর্ম্মকুশলা নারী তৎকালে কোরায়েশকুলে একটীও ছিল না বলিলেই হয়, বাণিজ্য ব্যাপারেও তিনি প্রভূত প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন। এহেন বহুগুণান্বিতা বর্ষীয়সী মহিলা লালসার খাতিরে তৃতীয়বার হজরতকে পতিত্বে বরণ করিয়াছিলেন, কে বিশ্বাস করিতে পারে? যদি তাহাই হয়, তবে হজরতের সহিত বিবাহের পূর্ব্বে আরবের-ধনীমানী-নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা যখন তাঁহাকে বিবাহ করিতে চাহিয়াছিলেন, তখন তিনি অস্বীকার করিয়াছিলেন কেন? আবার শেষে ধনী ছাড়িয়া গরীবকে হৃদয়রাজ্যের অধীশ্বর করিলেন কোন সুখে?

ইহার একমাত্র কারণ—হজরতের সাধু চরিত্রের সুখ্যাতি—যাহা ধনদৌলত এবং উচ্চ পদবী অপেক্ষাও বিবি খাদিজাকে অধিকতর মোহিত করিয়াছিল। তাই স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া তিনি এই স্বর্ণহার গলায় তুলিয়া লইয়াছিলেন।

মক্কা-মোআজ্জমার অধিবাসীবৃন্দের মতভেদহীন বহুল বর্ণনায় বিবি খাদিজার তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, অসামান্য প্রতিভা এবং জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। এহেন সজ্জনসেবিকা গুণবতী খাদিজা যে বড় বড় লোকের আগ্রহ উপেক্ষা করিয়া নিজেই হজরতকে বিবাহের প্রস্তাব করিতে বলিয়া পাঠাইয়াছিলেন এবং তাঁহার প্রস্তাবটী প্রথমে হজরতের নিকট আকাশ কুসুমবৎ অসম্ভব প্রতীয়মান হওয়ায় তিনি হাসিয়া উড়াইয়া

দিয়াছিলেন, ইহা কে না জানেন? যখন খাদিজার পক্ষ হইতে পুনঃ পুনঃ তাঁহাকে অনুরোধ জানান হয়, তখন তিনি ইহার আলোচনায় মত দেন।

বিবাহের পর বিবি খাদিজা তাঁহার ধন-মান, গোলাম-বাঁদী সমস্তই হজরতের চরণে উৎসর্গ করিয়া দিলেন। কালে তাঁহাদের ৪।৫টী পুত্র-কন্যাও জন্মিল। খাদিজার ধর্ম্মানুরাগ, স্বামীপরায়ণতা এবং পরোপকারস্পৃহা তাঁহাকে নারী-সমাজের শীর্ষস্থানীয়া করিয়া রাখিয়াছে। ৬৫ বৎসর বয়সে তিনি ইহলোক ত্যাগ করেন। তখন পর্য্যন্ত (৫০ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত) হজরত আর দ্বিতীয় দারপরিগ্রহ করেন নাই।

এখন বিবেচনা করিয়া দেখুন—

(১) ২৫ বৎসর পর্য্যন্ত হজরত অবিবাহিত পবিত্র জীবনযাপন করিয়াছেন।

(২) বর্ষীয়সী বিধবাকে বিবাহ করিয়াছেন।

(৩) সামাজিক সুবিধা এবং শক্তি থাকা সত্ত্বেও ৫০ বৎসর বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত অন্য কোন যুবতীকে বিবাহের চেষ্টা বা ইচ্ছা করেন নাই।

(৪) চরিত্রহীন লোকদের স্বভাব, নিজের বয়স এবং শক্তির দিকে না তাকাইয়া অল্পবয়স্কা রমণীর অন্বেষণ। নবীন যুবক হইয়াও হজরত কিন্তু চারিটী সন্তানের জননী এক চল্লিশ বর্ষীয়া প্রৌঢ়া বিধবার পানিগ্রহণ করিয়াছিলেন। এমন বিবাহে ভোগবিলাসী ব্যক্তির শুধু যে বিবাহের উদ্দেশ্য পণ্ড হয় তাহা নহে, বরং তেমন নারীর প্রতি ঘৃণাই হইয়া থাকে।

(৫) পর পর দুইবার যাহার স্বামী বিয়োগ হইয়াছে, কামান্ধ লোকেরা সেরূপ অলক্ষণা নারীকে বিবাহ করা অমঙ্গলজনক মনে করে; কিন্তু হজরত তাহা করেন নাই।

(৬) ২৫ বৎসর বয়সেও হজরত নিজের বিবাহের বাসনা প্রকাশ করেন নাই; শেষে খাদিজার আহ্বানে সম্মত হইয়াছিলেন।

(৭) মানব-জীবনের শ্রেষ্ঠতম অংশ—২৫ হইতে ৫০ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত—তিনি একনিষ্ঠভাবে বৃদ্ধা সহধর্ম্মিণীর সহিত সানন্দে কালযাপন করিয়াছিলেন।

(৮) ৫০ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত অন্য কোন নারীর সহিত দাম্পত্য সম্পর্ক স্থাপন করেন নাই।

ইহা হইতে তাঁহার পবিত্রতা, জিতেন্দ্রিয়তা এবং বৈরাগ্যের উৎকৃষ্টতর প্রমাণ আর কি হইতে পারে? পক্ষান্তরে বিবি খাদিজাকে ঐশ্বর্য্যশালিনী দেখিয়া ধনের লোভে হজরত তাঁহাকে চেষ্টা বা ষড়যন্ত্র করিয়া বিবাহ করেন নাই, তাহাও আমরা সুস্পষ্ট দেখিতে পাইতেছি। ধর্ম্ম সঙ্গত বৈধ উপায়ে তাঁহাদের মিলনক্রিয়া সম্পাদিত হইয়াছিল। বিবাহ-অন্তে ভাগ্যবতী খাদিজা (রাঃ) তাঁহার সমস্ত বিষয়-বিভব স্বামীপদে অর্পণ করিয়াছিলেন; কিন্তু হজরত উহা সৎকর্ম্মে ব্যয় করিতে বলিয়াছিলেন। তিনি যদি ধনলোভী হইতেন, তাহা হইলে কি স্বেচ্ছায় বিপুল বিত্ত ত্যাগ করিতেন? যাঁহারা হজরতের দৈনন্দিন জীবনের ঘটনাবলী পর্য্যালোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিবেন যে, তিনি মৃত্যুর পূর্ব্ব মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত একটি কপর্দ্দকও সঞ্চয় করিয়া রাখিয়া যান নাই, সারাজীবনে যাহা কিছু পাইয়াছেন, সমস্ত খোদার নামে দান করিয়া গিয়াছেন। সমগ্র আরবদেশ যাঁহার তর্জ্জনীহেলনে পরিচালিত হইয়াছিল, মৃত্যুকালে তিনি সামান্য "শস্য-ঋণ" শোধ দিয়া যাইতে পারেন নাই, ইহা অপেক্ষা আশ্চর্য্য ব্যাপার আর কি হইতে পারে? লোভী হইলে কি তাঁহার এই দশা ঘটিত? তাঁহার উক্তি·· ·········এবং কার্য্যাবলী হইতে ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে, সে হৃদয়ে লোভ ছিল না, মোহ ছিল না, পার্থিব কোন বস্তুর প্রতি এতটুকু আসক্তি ছিল না,—ছিল বরং ঘৃণা এবং অবজ্ঞা।

একমাত্র জীবনসঙ্গিনী বিবি খাদিজাকে হারাইবার পর ৫১ বৎসর বয়সে ভগ্নহৃদয় হজরত আর একটি বিধবা প্রৌঢ়া নারীকে বিবাহ করিয়াছিলেন; তাঁহার নাম বিবি সওদা। ৫১ হইতে ৫৫ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত তিনিই হজরতের একমাত্র সহচরী ছিলেন। যদিও এই সময়ের মধ্যে (৫১-৫৫ বৎসর) বিবি আয়েশাকে তিনি বিবাহ করিয়াছিলেন, কিন্তু অপ্রাপ্ত-বয়স্কা বলিয়া পিতামাতা তাঁহাকে তখনও স্বামীর ঘর করিতে পাঠান নাই। মক্কা মোআজ্জমা হইতে হেজ্‌রত করার দেড় বৎসর পরে হজরত যখন ৫৫ অতিক্রম করিয়া ৫৬ বৎসরে পা দিয়াছেন, তখন বিবি আয়েশা (রাঃ) প্রথম স্বামীগৃহে পদার্পণ করিয়াছিলেন।

বৈজ্ঞানিকগণ বলেন,—১৫—৩০ পর্য্যন্ত মানুষের যৌবন, ৩০—৪০ পর্য্যন্ত প্রৌঢ়ত্ব এবং ৪০—৬০ বৎসর পর্য্যন্ত বার্দ্ধক্যকাল। হজরত একাধিক বিবাহ করিয়াছিলেন

জীবনের শেষদিকে—বার্দ্ধক্যে। তখন তাঁহার শারীরিক শক্তি ক্রমেই হ্রাসপ্রাপ্ত হইতেছিল।

যে মহাপুরুষ যৌবনের অধিকাংশ কাল অবিবাহিত থাকিয়াও অতি পবিত্র জীবন যাপন করিয়াছিলেন, যিনি পঁচিশ বৎসর বয়সে চল্লিশ বর্ষীয়া প্রৌঢ়া নারীর পানিগ্রহণ করিয়া পঞ্চাশ বৎসর পর্য্যন্ত একনিষ্ঠভাবে তাঁহার সহিত গৃহধর্ম্ম পালন করিয়াছিলেন, সেই মহামানবের প্রতি কামুকতার অন্যায় দোষারোপ যাহারা করে, তাহারা কোন্ শ্রেণীর জীব ?

যদি কেহ মনে করেন, আর্থিক অসচ্ছলতা এবং দারিদ্র্য নিবন্ধন হজরত একাধিক পত্নী গ্রহণ করিতে পারেন নাই, কিম্বা কোরায়েশেরা তাঁহাকে কন্যাদান করিতে পরাঙ্মুখ ছিল বলিয়াই তিনি ইচ্ছানুরূপ বিবাহ করিতে সমর্থ হন নাই, তাহা হইলে তাঁহাদিগকে স্মরণ করাইয়া দিতেছি যে, পয়গম্বরী লাভের পর যখন হজরত প্রচারকার্য্যে ব্রতী হইয়াছিলেন, তখন কোরায়েশেরা স্ব স্ব কন্যা ভগিনীগণকে হজরতের করকমলে সমর্পণ করিবার জন্য অনেক আবেদন নিবেদন করিয়াছিল। তাহারা এ কথাও বলিয়াছিল—"যদি রাজ্যলাভের বাসনা আপনার অন্তরে উদিত হইয়া থাকে, তবে আমরা আপনাকে নিজেদের বাদশাহ্ বলিয়া স্বীকার করিতে প্রস্তুত আছি। যদি ধন রত্নের আকাঙ্ক্ষা করেন, তবে যত পরিমাণ ইচ্ছা লইতে পারেন। যদি সুন্দরী বালিকা লাভের বাসনা থাকে, তবে কোরায়েশের সেরা সেরা পরমাসুন্দরী কিশোরীদিগকে বাছাই করিয়া আনিয়া আপনার চরণে ডালি দিতে প্রস্তুত আছি; তথাপি আপনি "নবধর্ম্মের" প্রচারে ক্ষান্ত হউন এবং আমাদের পৈত্রিক ধর্ম্মের প্রতি দেশবাসীকে শ্রদ্ধাহীন করিয়া তুলিবেন না।"

কিন্তু হজরত কি তাহাদের একটি প্রস্তাবেও রাজি হইয়াছিলেন ?

জনাব রসুলুল্লাহ (দঃ) স্বীয় উচ্চ বংশমর্য্যাদা এবং উন্নত চরিত্রবলে নবী হওয়ার পূর্ব্বেই দেশবাসীর স্নেহশ্রদ্ধা অর্জ্জন করিয়াছিলেন। তাঁহার মিষ্ট-মধুর ব্যবহার, দয়া-দাক্ষিণ্য এবং অন্যান্য সাধারণ প্রতিভা সকলকেই মুগ্ধ, চমৎকৃত করিয়াছিল। হজরতের সহিত পরিচয় বা সৌহার্দ্দ্য ছিল না এমন একটি কোরায়েশ পরিবারও তখন দেশে ছিল না। সুতরাং নবুয়তের পূর্ব্বে বা পরে ইচ্ছা করিলেই তিনি অনেক বিবাহ করিতে পারিতেন; এজন্য তাঁহাকে বিন্দুমাত্র বেগ পাইতে হইত না। এই কারণে বিবি উম্মে হাবিবার (রাঃ) সহিত যখন হজরতের বিবাহের কথা তাঁহার পিতা—হজরতের চিরবৈরী—আবু সুফিয়ানের কর্ণগোচর হইয়াছিল, তখন প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা সত্ত্বেও তিনি এ বিবাহে কোন আপত্তি করেন নাই; বরং বরের যোগ্যতা ও গুণপণার কথা তুলিয়া ভুরি ভুরি প্রশংসাই করিয়াছিলেন।

৫৫ হইতে ৬৩ পর্য্যন্ত ৯ বৎসর কালের মধ্যে হজরতকে একাধিক দার পরিগ্রহের জন্য দোষী করা হয়। কিন্তু এই সময় কেবল যে তাঁহার দৈহিক ক্ষমতাই হ্রাস পাইয়াছিল তাহা নহে, শত্রুদের আক্রমণ প্রতিরোধেও বিব্রত হইয়া পড়িতে হইয়াছিল। ইসলাম প্রচার, ইসলাম রক্ষা, নবদীক্ষিত ভ্রাতা-ভগিনীগণের জীবন ও জীবিকা নির্ব্বাহের উপায় চিন্তা কার্য্যে অহোরাত্র তাঁহাকে যেরূপ ব্যস্ত ব্যাকুল থাকিতে হইত, তাহাতে তাঁহার কেন—কোন মানুষেরই কামসেবার অবসর লাভ অসম্ভব। ইতিহাস পাঠক মাত্রেই অবগত আছেন, এই ৯ বৎসরে হজরতকে ৬০ বা ততোধিক যুদ্ধের অভিযান করিতে হইয়াছিল; তন্মধ্যে ২৮ টি যুদ্ধে তিনি স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন।

ইতিহাস ও চরিত গ্রন্থাবলী সাক্ষ্যদান করিতেছে যে, কেবল আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যই এ সকল যুদ্ধের অভিনয় করা হইয়াছিল। শত্রু পক্ষীয় প্রথম আক্রমণই হজরতকে সেনা সংগ্রহ এবং সমরে প্রবৃত্ত হইতে বাধ্য করিয়াছিল।

পৃথিবী হইতে ইসলাম ও মোসলেমের উচ্ছেদ সাধন করাই শত্রুপক্ষের একমাত্র উদ্দেশ্য এবং চরম লক্ষ্য ছিল। ইসলামকেন্দ্র মদিনা নগরীতেই এক বৃহৎ শত্রুদল আড্ডা গাড়িয়া বসিয়াছিল। ইতিহাসে তাহারা "মোনাফেকিন" (কপট মুসলমান) নামে পরিচিত।

এই ঘরের ঢেঁকীরা বদরযুদ্ধ পর্যন্ত প্রকাশ্যভাবেই ইসলামের বিরুদ্ধাচরণ করিয়া আসিয়াছিল। পরে দিন দিন উহার প্রভাব প্রতিপত্তি বিস্তৃত হইতে দেখিয়া মুখে ইসলাম গ্রহণ করিলেও মনে মনে পূর্ব্ববৎ উহার মূলোৎপাটনের চেষ্টাই করিত। মদিনা নগরীর ভিতরে বাহিরে য়াহুদীদিগের অনেকগুলি সম্প্রদায় ছিল, তাহারাও সুযোগ পাইলে ভীষণ উপদ্রব করিত। আরবের যাবতীয় সম্প্রদায়—বিশেষ কোরায়েশগণ ইসলামের দীপ্তরশ্মি নির্ব্বাপিত করিতে

বদ্ধপরিকর হইয়া বহুবার মদিনা আক্রমণ করিয়াছিল। তাহাদের যুদ্ধাভিযানের সংবাদ পাইলে হজরত সেনাদল সংগ্রহ করিয়া আত্মরক্ষায় ব্রতী হইতেন। বহুবার নানা জাতি ও নানা সম্প্রদায় মুসলমানের ধনপ্রাণের বিস্তর ক্ষতি-সাধন করিয়াছে, ইসলাম প্রচার কার্য্যে প্রবলভাবে বাধা দিয়াছে। সে সকল কথা রসুলুল্লাহর "মাগাজি ও সায়র" (ধর্মযুদ্ধ ও তৎসম্পর্কীয় বিবরণ) সম্বলিত গ্রন্থাবলীতে বিস্তৃতরূপে বর্ণিত আছে।

দেশত্যাগী দরিদ্র মুসলমানেরা পূর্ব্ব হইতেই যুদ্ধের জন্য সৈন্য-রসদ, অর্থ—অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করিয়া রাখিতেন না; বরং শত্রুপক্ষের আক্রমণের খবর পাইয়া রাতারাতি তাঁহারা এ সকল বিষয়ে মনোনিবেশ করিতেন। কাজেই যুদ্ধবিগ্রহের জন্য সর্ব্বদাই তাঁহাদিগকে অশেষ অসুবিধা ভোগ করিতে হইত।

সংসারে কে সুখশান্তি কামনা না করে? কিন্তু হজরতের অদৃষ্টে একদিনের জন্যও তাহার দর্শনলাভ ঘটে নাই। প্রত্যহই তাঁহাকে কোন-না-কোন নূতন উপদ্রবের কাহিনী শুনিতে উৎকর্ণ হইয়া থাকিতে হইত, অবিরাম দুশমনের প্রতীক্ষায় সশঙ্কচিত্তে সময় কাটাইতে হইত,—এই তাঁহার জীবন। এরূপ জননায়কের প্রতি জীবন-সায়াহ্নে কামিনী-মোহে মুগ্ধ হইয়া থাকার অপবাদ দেওয়া কতখানি ঘৃণিত অপরাধ, পাঠকগণ তাহার বিচার করিবেন। হজরত মানুষকে শুধুই সংসারী হইতে বলেন নাই, সন্ন্যাসী হইতেও প্রোৎসাহিত করেন নাই। বরং আল্লার সৃষ্টিরক্ষা করিয়া **তাঁহার সেবায়** আত্মনিয়োগ করিতে বলিয়াছেন। তিনি ছিলেন তাহার **উজ্জ্বল অনুপম** আদর্শ। পবিত্র গার্হস্থ জীবনের সহিত ধর্মজীবনের সমন্বয় সাধন করিয়া মানুষ কিরূপে আল্লার সান্নিধ্যলাভ করিতে পারে, নিজের জীবনের দ্বারা তিনি তাহা জগতকে শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন। সুতরাং যাঁহারা শুধু পরকালের জন্য মাতা পিতা স্ত্রী পুত্র ফেলিয়া বনবাসী হইয়াছেন, সেই সকল অপেক্ষাকৃত অল্প মনোবল সম্পন্ন মানবের সহিত তাঁহার ন্যায় আদর্শ এবং শক্তিমান মহামানবের তুলনা করা, তারার সহিত তপনের তুলনা করার মতোই ঘোর অদূরদর্শিতার পরিচায়ক।

---

# পথের ফকির

[ আকবর উদ্দীন ]

দুই বৎসর পর পর ফসল ভাল হওয়ায় রজবালী মহাজনের দেনা শোধ করিয়া পাট বিক্রয় করিয়া চারি কুড়ি টাকা লাভ করিল; ইচ্ছা আরও কিছু জমি কিনিয়া একটা কলার বাগান করিবে।

তাহার স্ত্রী কিন্তু ধরিয়া পড়িল, মেয়ে পাচির বয়স সাত হইতে আটে পড়িতেছে, আর বিবাহ না হইলে দশ জনের নিকট ক্রমশঃ মুখ দেখান ভার হইয়া উঠিতেছে; তাহার পর মানুষের শরীর কখন আছে কখন নাই; এই ত সে দিন তাহার সই এক কুড়ি বছর বয়সে ছয়টা ছেলে মেয়ে রাখিয়া মরিয়া গেল, অথচ হতভাগিনী আট বছর বয়স্কা বড় মেয়ের বিবাহ দেখিয়া যাইতে পারিল না।

স্ত্রীর অকাট্য যুক্তি ও কাতর অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া রজবালী অগত্যা কন্যার বিবাহ স্থির করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধব গ্রামের প্রধান সকলেই কহিল, এই ত তাহার প্রথম কাজ, তাহার অবস্থাও নেহাৎ মন্দ নয়, একটু ভাল করিয়াই ত' করিতে হইবে। পাত্রটী একটু অবস্থাপন্ন ও ভাল হওয়া উচিত নইলে সম্ভ্রম বজায় থাকে না, আর বাস্তবিক রজবালীর কন্যার বিবাহ হইবে, ইহা ত' সকলেরি বিশেষ আনন্দের বিষয়, রজবালী ত' তাহাদের পর নয়; মেয়েকে দু' একখানা গহনা দিতে হইবে, জামাইকে ত' দান সামগ্রী দিতে হইবে; সমাজের সকলের সম্মানও ত' রাখিতে হইবে, নইলে চলে কি করিয়া।

রজবালী উত্তরে যাহা কহিল তাহার মোটামুটি অর্থ এই যে সে ত' সবই করিতে প্রস্তুত। কিন্তু কর্ত্তার অর্থাৎ তাহার পিতার আমলে তাহাদের অবস্থা যে প্রকার ছিল, তাহা ত' আজ আর নাই, সুতরাং টাকা কড়িই বা পায় কোথায়, এই ত' তাহার চিন্তার বিষয়।

সকলে কহিল—তা' ত' বটেই তবে কি জান, এসব ফরজ কাজ না করলেও ত' নয়, আর নিজের মান সম্ভ্রমই বা ছেড়ে দেওয়া যায় কি ক'রে। শেষ কথা এই, ক'দিনেরই বা দুনিয়া, খোদার কাজ খোদা ক'রবেনই, আমরা শুধু তাঁর যন্ত্র বই ত' নয়।

অনেক পরিশ্রম করিয়া এনায়েতপুরের ফতে আলীর পুত্রের সঙ্গে বিবাহ সাব্যস্ত হইল। অন্য যত পাত্র সে সন্ধান করে, তাহার আত্মীয় স্বজনের মত হয় না। কেহ দেখিতে ভাল নয়, কাহারও সামাজিক পদ মর্য্যাদা ভাল নয়, এই প্রকার বহু আপত্তি খণ্ডন হইল অনেকটা—যখন ফতে আলী তাহার পুত্রের বিবাহ রজবালীর কন্যার সহিত দিতে প্রস্তুত হইল।

পাঁচ পাড়ার পাঁচ প্রধান ও আত্মীয় স্বজনকে ডাকিয়া রজবালী জোড়হাতে নিবেদন করিল,—আমার মেয়ের বিয়ে ফতে আলীর ছেলের সঙ্গে ঠিক হ'য়েছে, ছেলেটা বেশ ভাল, জোয়ান, কাজ কর্ম্ম কর্ত্তে পারে, শহরে যাতায়াত আছে, পুঁথি পড়তে পারে ইত্যাদি, বাপেরও বেশ অবস্থা ভাল।

সকলেই কহিল—তা বেশ, পাত্রটা মন্দ নয়।

একটা ছোকরা একদিকে বসিয়াছিল, সে হঠাৎ কহিল—এনাতপুরের ফতে আলীর ছেলে ত'? সে যে গাঁজা খায়।

রজবালী কহিল—তা' বাবা, একেবারে ভাল কোথায় পাই বলত?

ছোকরা আবার কহিল—তা'র নজরটাও একটু খারাপ।

একজন বৃদ্ধ কহিলেন—ওসব বয়স দোষ, কালে সেরে যাবে।

রজবালী কহিল—এখন আমাকে বাঁচিয়ে—যাতে কাজটা হয় তাই আপনারা করে দিন।

সকলে অনেক পরামর্শ ও নানাপ্রকার জল্পনা কল্পনা করিয়া কহিল—তা তোমার প্রায় তিনশ' টাকা না হ'লে ত' হয় না।

রজবালী মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িল; কহিল—তিন শ'টাকা! আমাকে বেচলেও ত' হ'বে না।

কাদের বিশ্বাস কহিল—তা চিরকালকার নিয়মটা বজায় রাখ্‌তে হ'বেত?

রজবালী কহিল—তাই ত'

কাদের কহিল—ওতে আর তুমি কিন্তু ক'র না। যা না করলে নয় তা-ত' কর্ত্তেই হ'বে।

রজবালী কহিল—একটু কম করে হিসেব করুন না।

সকলে বিরক্ত হইয়া কহিল—একি শাক মাছ রে বাপু যে দরদস্তর কর্চ্ছ। মোটা খরচ হচ্ছে সমাজকে নিমন্ত্রণ করা। চিরকাল বাড়ী বাড়ী খেয়ে এসেছ, আজ সকলকে না খাওয়ালে চলবে কেন বলত?

রজবালী বাড়ীর ভিতর গেল, তাহার স্ত্রী নথনাড়া দিয়া কহিল—কেমন ধারা মানুষ গা তুমি? বন্ধক সন্ধক দিয়ে একরকম ক'রে টাকাটা জোগাড় কর, বিয়ে ত' দিতেই হ'বে। এই প্রথম কাজ, আমোদ আহ্লাদ যদি নাই হ'ল তবে আর কি কর্ত্তে।

রজবালী ভ্যাবাচ্যাকা খাইয়া বাহিরে আসিয়া কহিল—তা আমি রাজী। কিন্তু টাকা কোথায় পাই?

একজন কহিল—ফুঃ টাকার ভাবনা! কতটাকা চাই? সামনে বিশ্বেস সাহেব বসে আছে, নাও না।

গ্রামে কাদের বিশ্বাসের অবস্থা বেশ ভাল ছিল; জমি-জমা, বাগান, পুকুর, গোলার ধানে সংসার চালাইয়া প্রতি বৎসরে হাতে কিছু জমে; তাহার উপর মহাজনি কারবারেও আয় মন্দ হয় না। পূর্ব্বে সকলে রজনি ঘোষের নিকট টাকাকড়ি কর্জ্জ লইত, কিন্তু সমাজহিতৈষী নেতৃবৃন্দ যখন সকলের কানে বিশেষ্‌ করিয়া এই কথাটা প্রবেশ করাইয়া দিলেন যে হিন্দুর ঘরে টাকা তুলিয়া বিধর্ম্মী ও বিজাতীয়কে বড়লোক ও শক্তিশালী করা বৃথা, অন্ততঃ একথাটা ত' ঠিক যে মুসলমান মহাজন হিন্দু মহাজন অপেক্ষা মুসলমানের টান টানিবেই, কারণ স্বজাতি; তখন হইতে কাদেরের অবস্থা উত্তরোত্তর ভাল হইতে লাগিল। সে এখন আশ্‌পাশের আট দশ খানা গ্রামের সমাজপতি ও প্রধান, তাহার কথায় সকলেই উঠে বসে।

কাদের বিশ্বাস কহিল—হেঁ হেঁ, আমি আর কি করব। আছেই বা কি! তবে তোমরা সবাই স্বজাতি, তোমাদের

বিপদ আপদে দেখবনা ত কে দেখবে? তা তোমার আটকাচ্ছে, এতবড় একটা কাজ হচ্ছেনা, তা একরকম হয়ে যাবে আল্লার হুকুমে। যখন হয় তুমি দিও।

রজবালী প্রায় সজল চক্ষে কৃতজ্ঞতা জানাইল। সকলে কহিল—স্বজাতি মহাজনে এই ত' লাভ, এমন ক'রে দুঃখ কে বুঝবে বলত'?

*  *  *  *

রজবালীর কন্যার বিবাহ হইয়া গেল। সাতদিন সাতরাত্রি পাড়ার মেয়েদের গান, নাচ ও ঢোলের বাদ্যের ধ্বনিতে কাহারও ঘুম হইল না।

কাদের বিশ্বাস অনেক রাত্রে বসিয়া সুদের হিসাব করিতে-ছিল; অবিশ্রান্ত বাদ্যধ্বনি শুনিয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া স্ত্রীর নিকট তামাক চাহিল; সে আসিলে কহিল—দেখছ রজ্জু ব্যাটার ফটফটানি; তবু যদি ঘরে কড়ি থাকত; তা থাক, ওর ঐ আমনের জমিটা খুব ভাল, ও আমারই হবে।

বালিকাবধূ আনন্দে কলরোল মাতামাতি দাপাদাপি দেখিয়া নূতন কাপড় পরিয়া গায়ে হলুদ মাখিয়া চারিদিকে ছুটিয়া সমবয়স্ক বালক বালিকাদের সঙ্গে খেলা করিতে লাগিল। আলো ও মুচির বাজনা লইয়া বর যখন আসিল, তখন সে কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া বাহিরে আসিতে চাহিতেছিল, কিন্তু সকলে তাহাকে নিবারণ করিল। তাহার মাতা কহিল—অত বড় মেয়ে একটু বুদ্ধি নেই, তোর বিয়ে, তুই আবার বাহিরে যাবি কি? বউ হ'য়ে বস্।

বেচারী থতমত খাইয়া বসিয়া রহিল।

বিবাহ শেষ হইয়া গেল। আত্মীয় কুটুম্বকে কাপড় চোপড় দিয়া বিদায় করিয়া—রজবালী চারিদিকে চাহিয়া দেখিল গোলার ধান শেষ হইয়াছে; উপরন্তু কাদের বিশ্বাসের নিকট আরও দেড়বিশ ধান ধার করিতে হইয়াছে, জমাজমি ত' বন্ধক পড়িয়াছেই।

দাবায় বসিয়া তামাক টানিতে টানিতে বছরের খোরাক ও পরের বারে ধানের বীজ কোথায় পাইবে, এই কথা লইয়া যখন রজবালী চিন্তায় ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিল, তখন তাহার স্ত্রী আসিয়া কহিল—আর মোটে চা'র কাঠা ধান আছে, এই বেলা ব্যবস্থা কর।

রজবালী কহিল—ব্যবস্থা আর ক'রব মুণ্ডু।

স্ত্রী কহিল—না ক'রলে খাবে কি?

রজবালী নির্ব্বাক হইয়া বসিয়া রহিল।

স্ত্রী পুনরায় কহিল—নূতন জামাই শীত পড়েছে, একখানা গরম চাদর ত' দিতে হ'বে! আজ সকলে ব'লছিল।

রজবালী বিরক্ত হইয়া কহিল—দিই কোত্থেকে!

স্ত্রী কহিল—তা ত' জানি, তা হ'লেও না দিলে ত' চলে না, লোকে কি ব'লবে। আমি বলছিলাম কি, কাবুলীরা গাঁয়ে এসেছে কাপড় বেচ্‌তে; জামাই ত' এইখানেই আছে; কাবুলীকে ডেকে ধারে একখানা কিনে দাও না, পরে টাকা দিলেই হ'বে।

রজবালী কহিল—ধার আর কত ক'রব। এ দিকে ত' মাথা বিকিয়ে গেছে।

স্ত্রী কহিল—কিন্তু উপায় ত' নাই।

রজবালীও দেখিল উপায় নাই; লোকের কাছে জবাব দিবে কি বলিয়া।

কাবুলী আসিল; জামাতা উত্তম একখানি চাদর তুলিয়া লইল; শ্বশুর কিছু বলিতে পারিল না; ছয় টাকার জিনিষটার দাম কাবুলী হাঁকিল সাড়ে এগার টাকা।

ধান কর্জ্জ করিতে গেলে কাদের বিশ্বাস কহিল—আর কত দেব!

রজবালী কহিল—তা ভাই, দাও, এই ভাদ্র মাসেই শোধ দেব।

অনেক বলা কহায় ও কাতর অনুরোধে খত লইয়া কাদের ধান দিল।

*  *  *  *

দুই বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে। কাদের বিশ্বাস কয়েকমাস হইতে কড়া তাগাদা আরম্ভ করিয়াছে। শেষে কহিল—দু'বছরে নগদ টাকা একশত ত' দিলে না, ধান যা নিয়েছিলে তা'ও মোটে দেড় বিশ দিয়েছ; আর আমি ফেলে রাখতে পারি না।

রজবালী হাত জোড় করিয়া কহিল—ভাই তুমি না বাঁচালে আর কে বাঁচাবে। এবারটায় স্রেফ ধান হ'ল না। কি করি ব'ল। আসছে বারটা পর্য্যন্ত সবুর কর।

কাদের কহিল—তোমাদের অসময়ে আমার সাহায্য করা; আমার ছেলের বিয়ে সামনে আমি আর টাকা ফেলে রাখ্‌তে পারব না।

রজবালী অনুনয় বিনয় করিয়া অনেক কহিল কিন্তু কাদের যাইবার সময় শুনাইয়া দিয়া গেল যে সে শীঘ্রই নালিশ করিবে।

আদালতের সমন পাইয়া যখন সে দুই চারিজন প্রবীণের নিকট গেল, তখন তাহারা কহিল—বাপু, টাকা ন্যায্য ধার, দিতেই হ'বে। ও এক কাজ করগে; কাদেরের হাতে পায়ে ধ'রে সুদ কিছু বাদছাদ দিয়ে লাওগে, আর কতক জমি দাম ক'রে ওকে দাও; তোমার যা দু'চার বিঘে থাকবে তাই নিয়ে এক রকম চালাও গে। শেষে খোদা যদি দিন দেন, তখন দেখা যাবে।

উপদেশ মত কাদের বিশ্বাসের নিকট অনুরোধ করিলে সে কহিল—টাকা ত' আর খোলামকুচি নয়; এক পয়সাও আমি ছাড়তে পারব না, অনেক কষ্টের পয়সা।

*　　*　　*　　*

কন্যা মোটে বারয় পা দিয়াছে। এক বৎসর পূর্ব্বে সে স্থায়িভাবে শ্বশুর বাড়ী গিয়াছে। শ্বশুর শাশুড়ির আদেশ মত প্রভাত হইতে রাত্রি দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত অনুক্ষণ কাজে কর্ম্মে ব্যস্ত থাকিলেও, গুরুজনদের সে সন্তুষ্ট করিতে না পারায়, তাহার পিতামাতাকে অনেক দোষ ত্রুটির কথা শুনিতে হইয়াছে ও বিশেষণও বড় কম লাভ হয় নাই। নির্জ্জনে চক্ষের জল ফেলা ভিন্ন কোন উপায় ছিল না।

এক বৎসর পর রজবালী যখন কন্যা লইয়া আসিল তখন সে আসন্ন প্রসবা। তাহার পিতামাতা পৌত্রের মুখ দেখিবার আশায় উল্লাসিত হইয়া উঠিল।

প্রসব যথাসময়ে হইল, কিন্তু বড় কষ্টে। দুর্ব্বলক্ষীণ শিশুর তিন দিনের দিন 'টঙ্কার' আরম্ভ হইল; চতুর্থ দিনে বালিকা মাতা ও নানা নানীর ক্রন্দনের মধ্যে সে চক্ষু বুঁজিল।

পাঁচ সাত দিন হইতে কন্যারও অবিরাম জ্বর। মস্‌জিদের খতিব সাহেব ও পাড়ার মোল্লাজী ও চাঁড়াল পাড়ার বিঙ্গে ওঝা সকলেই একে একে এবং এক সঙ্গে চেষ্টা করিয়াও রোগের প্রকোপ নিবারণ করিতে পারিল না। রজবালী মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িল, তাহার স্ত্রী চীৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিল।

ভরা দুপুরে কে একজন রজবালীকে ডাক দিল। বাহিরে আসিতেই দেখিল—কাদের ও আদালতের পেয়াদা।

পেয়াদা কহিল—তোমার নাম রজবালী?

সে কহিল—হাঁ।

বলিয়া একবার পেয়াদার মুখের দিকে আর একবার কাদেরের মুখের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করিয়া চাহিতে লাগিল।

পেয়াদা কহিল—বিশ্বাস সাহেব দেনার দায়ে তোমার বাড়ী ও জমাজমি সব কিনেছেন। জমি দখল দিয়ে এসেছি, এখন বাড়ী ছেড়ে দাও দখল দেব।

রজবালী আকুল হইয়া কাঁদিয়া কাদেরের পা ধরিয়া কহিল—বিশ্বেস সাহেব, আমার মেয়ে মর মর, কয়েকটা দিন সময় দাও।

—আর বলিতে পারিল না, কেবল কাঁদিতে লাগিল।

কাদের কহিল—কি ক'রব; তিন বছর হ'তে চল্‌ল, টাকা না পেলে আমি ত' আর ফেলে রাখতে পারি না।

রজবালীর স্ত্রী আড়াল হইতে তাহাদের কথাবার্ত্তা শুনিতেছিল। সে আছাড় খাইয়া পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল। পেয়াদা মুখ ফিরাইয়া লইল।

কাদের কহিল—পেয়াদা সাহেব, তোমার কাজ তুমি কর; এসব বদমাইসি।

রজবালি কাঁদিয়া কহিল—দয়া কর, মেয়েটা একটু ভাল হ'লেই আমি সব তোমাকে ছেড়ে দেব। তাকে নড়াবার কোন উপায় নাই।

কাদের সে কথা কানে না দিয়া কহিল—ওসব কাঁদুনি আমি শুন্তে চাই না। পেয়াদা সাহেব, তুমি ওদের বা'র ক'রে দাও। টাকা নেবার বেলা নিতে পারে, দেবার নাম নাই।

পেয়াদা বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিয়া দাবার উপর মৃত প্রায় কন্যাকে দেখিয়া কাদেরকে কহিল—লোকটা মিথ্যে ব'লছে না। দুদিন সময় দিন ওকে।

কাদের রুক্ষ স্বরে কহিল—ওসব হবে না, তুমি তোমার কাজ কর।

রজবালী ও তাহার স্ত্রী কাদেরের পায়ের উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া করুণ স্বরে কাঁদিতে লাগিল। কিন্তু মহাজন অচল অটল।

অবশেষে উপায়হীন হইয়া রজবালি, তাহার স্ত্রী ও দুই একজন প্রতিবাসী মিলিয়া কন্যাকে ধরাধরি করিয়া নিকটস্থ এক আত্মীয়ের বাড়ীতে আশ্রয় লইয়া গেল। মর্ম্মন্তুদ আর্ত্তনাদে দিক ধ্বনিত হইয়া উঠিল।

যে মুচি ঢোল দিতে আসিয়াছিল, সে ঢোল দিতে দিতে একবার 'আহা' করিয়া কহিল—"এই বয়সে কতই এমন দেখ্‌লাম"

# পল্লী জননী

[ জসীম উদ্‌দীন ]

রাত থম্ থম্ স্তব্ধ নিঝুম ঘোর—ঘোর—আঁধার
নিশ্বাস্ ফেলি তাও শোনা যায় নাই কোথা সাড়া কার,
রুগ্ন ছেলের শিয়রে বসিয়া একেলা জাগিছে মাতা
করুণ চাহনি ঘুম্ ঘুম্ যেন ঢুলিছে চোখের পাতা,
শিয়রের কাছে নিবু নিবু দীপ ঘুরিয়া ঘুরিয়া জ্বলে
তারি সাথে সাথে বিরহী মায়ের একেলা পরাণ দোলে।
ভন্ ভন্ ভন্ জমাট বেঁধেছে বুনো মশকের গান
এঁদো ডোবা হ'তে বহিছে কঠোর পচান পাতার ঘ্রাণ ;
ছোট কুড়ে ঘর, বেড়ার ফাঁকেতে আসিছে শীতের বায়ু
শিয়রে বসিয়া মনে মনে মাতা গণিছে ছেলের আয়ু।
ছেলে কয় মারে কত রাত আছে কখন সকাল হবে
ভাল যে লাগে না, এমনি করিয়া কেবা শুনে থাকে কবে।
মা কয়, বাছারে! চুপটী করিয়া ঘুমোত একটি বার,
ছেলে রেগে কয় ঘুম যে আসেনা কি করিব আমি তার।
পাণ্ডুর গালে চুমো খায় মাতা সারা গায় মাখে হাত
পারে যদি বুকে যত স্নেহ আছে ঢেলে দেয় তারি সাথ।
নামাজের ঘরে মোমবাতী মানে (১) দরগায় মানে দান
ছেলেরে তাহার ভাল কোরে দাও কাঁদে জননীর প্রাণ।
ভাল কোরে দাও আল্লা রছুল ভাল কোরে দাও পীর
কহিতে কহিতে মুখখানি ভাসে লইয়া নয়ন নীর।
বাঁশ বনে বসি ডাকে কানা কুয়ো রাতের আঁধার ঠেলি
বাদুড় পাখার বাতাসেতে পড়ে সুপারীর বন হেলি।
চলে বুনো পথে জোনাকী মেয়েরা কুয়াসা কাঁপন ধরি
দুঃ ছাই! কিবা শঙ্কায় মার পরাণ উঠিছে ভরি।
সে কথা ভাবিতে পরাণ শিহরে তাই ভাসে হিয়া কোণে
বালাই বালাই, ভাল হবে যাদু মনে মনে জাল বোনে।
ছেলে কয় মাগো কালকেই আমি হয়ে যাই যদি ভাল
করিমের সাথে খেলিবার গেলে দিবে নাত তুমি গালও।
আচ্ছা মা বলো এমন হয় না রহিম চাচার ঝাড়া (২)
এখনি আমারে এত রোগ হোতে করিতে পারেত খাড়া।

---

(১) মানে=মানৎ করে। (২) ঝাড়া=মন্ত্র পড়িয়া অসুখ সারান।

মা কেবল বসি রুগ্ন ছেলের মুখ পানে আঁখি মেলে
ভাসা ভাসা তার যত কথা যেন সারা প্রাণ দিয়ে গেলে।
শোন মা আমার লাটাই কিন্তু রাখিও যতন করে ;
রাখিও ঢ্যাপের মোয়া বেঁধে তুমি সাত নরি সিকা ভ'রে।
খেজুরে গুড়ের নয়া পাটালিতে হুড়ুমের কোলা ভরি ;
ফুল ঝুরি সিকা সাজাইয়া রেখো আমার সমুক পরি।
ছেলে চুপ করে, মাও ধীরে ধীরে মাথায় বুলায় হাত ;
বাহিরেতে নাচে জোনাকী আলোয় থম্ থম্ কালো রাত।
রুগ্ন ছেলের শিয়রে বসিয়া কত কথা পড়ে মনে ;
কোন দিন সে যে মায়েরে না ব'লে গিয়াছিল দূর বনে।
সাঁঝ হোয়ে গেল তবু আসে নাকো আই ঢাই মার প্রাণ
হঠাৎ শুনিল আসিতেছে ছেলে হর্ষে করিয়া গান।
এক কোঁচ ভরা বেথুল তাহার ঝামুর ঝুমুর বাজে ;
ওরে মুখপোড়া কোথা গিয়াছিলি এমনি একালি সাঁঝে।
কত কথা আজ মনে পড়ে মার, গরিবের ঘর তার ;
ছোট খাট কত বায়না ছেলের পারে নাই মিটাবার।
আড়ঙের দিনে পুতুল কিনিতে পয়সা জোটেনি তাই ;
বলেছে আমরা মোসলমানের আড়ঙ দেখিতে নাই।
করিম সে গেল ? আজিজ চলিল ? এমনি প্রশ্ন মালা ;
উত্তর দিতে দুখিনী মায়ের দ্বিগুণ বাড়িত জ্বালা।
আজও রোগে তার পথ্য জোটেনি ওষুধ হয়নি আনা ;
ঝড়ে কাঁপে যেন নীড়ের পাখিটী জায়েড় মায়ের ডানা।
ঘরের চালেতে হুতুম ডাকিছে, অকল্যাণ এ সুর ;
মরণের দূত এল বুঝি হায় হাঁকে মায় দূর—দূর।
পচা ডোবা হ'তে বিরহিনী ডাক ডাকিতেছে ঝুরি' ঝুরি' ;
কৃষাণ ছেলেরা কালকে তাহার বাচ্চা কোরেছে চুরি।
ফেরে ভন্ ভন্ মশা দলে দলে বুড়ো পাতা ঝরে বনে ;
ফোটায় ফোটায় পাতা চোয়া জল ঝরিছে তাহার সনে।
রুগ্ন ছেলের শিয়রে বসিয়া একেলা জাগিছে মাতা ;
সম্মুখে তার ঘোর কুজ্ঝটী মহাকাল রাত পাতা।
পার্শ্বে জ্বলিয়া মাটির প্রদীপ বাতাসে জমায় খেল্ ;
আঁধারের সাথে যুঝিয়া তাহার ফুরায়ে এসেছে তেল।

---

# নূর-জাহান

[ মোহাম্মদ আবদুর রশিদ বি, এ, বিটী ]

---

নূরজাহানের নাম ভারত ইতিহাসে চিরস্মরণীয়। জগতের প্রতিভাশালিনী ও অসাধারণ শক্তি সম্পন্না রমণী-গণের মধ্যে নূরজাহানের স্থান অতি উচ্চে।

নূরজাহানের পিতামহ খাজা মোহাম্মদ শরিফ পারস্য-রাজের উজির ছিলেন। সম্ভ্রম ও প্রতিপত্তিতে তিনি পারস্যের একজন বিশেষ গণ্যমান্য লোক ছিলেন। তাঁহার প্রাসাদোপম বাড়ীতে ভোগ বিলাসের কোন দ্রব্যেরই অভাব ছিল না। অগাধ সম্পত্তি ও লোকসমাজে অতুল প্রতিপত্তি সহ তিনি তাঁহার সারা জীবন অতি সুখে অতিবাহিত করেন। তাঁহার দিন ফুরাইয়া গেলে, তিনি নশ্বরধাম ছাড়িয়া এক অবিনশ্বর পরলোকে চলিয়া গেলেন।

খাজা মোহাম্মদ শরিফ দুই পুত্র রাখিয়া যান। আকা মোহাম্মদ তাহের ও মিরজা মোহাম্মদ গিয়াস। মিরজা মোহাম্মদ গিয়াসই অলোকসামান্যারূপসী ভুবন বিখ্যাত সম্রাজ্ঞী, অতুল প্রতিভাশালিনী নূরজাহানের পিতা। উত্তরাধিকারী সূত্রে তিনি পিতার অগাধ ঐশ্বর্য্য ও রাজ দরবারে প্রতিপত্তির পরিবর্ত্তে শত্রুকুলের হিংসা প্রাপ্ত হন। তাই নিষ্কণ্টকে তিনি পৈত্রিক বিষয় বহুদিন ভোগ করিতে পারিলেন না। রাজদরবারে মিরজা গিয়াসের বহু শত্রু ছিল। তাহারা প্রতিনিয়ত পারস্যরাজকে তাঁহার বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিতেছিল। তাহারা পারস্য শাহের নিকট মিরজা গিয়াসের দোষ অতিরঞ্জিত করিয়া বর্ণনা করিত, তাঁহার সদভিপ্রায়ে কৃত কার্য্যসমূহ অসদুদ্দেশ্যে করা হইয়াছে বলিয়া শাহকে বুঝাইয়া দিত।

মির্জা গিয়াস শাহের বিরাগভাজন হইয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার কোন কথাই শাহ বিশ্বাস করিতেন না। পরন্তু বিপক্ষদলের নির্জলা মিথ্যা অকাট্য সত্য বলিয়া ধারণা করিতেন। শাহ শত্রুদলের দুরভিসন্ধির কথা জানিতে না পারিয়া মির্জা গিয়াসকে রাজ্যের অমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী বলিয়া মনে করিতেন। একদিন শত্রুদল শাহকে বুঝাইয়া দিল যে মির্জা গিয়াস যতদিন পারস্যে আছেন, ততদিন শাহের তখ্‌ত নিরাপদ নহে। মির্জা গিয়াস বিদ্রোহের ষড়যন্ত্র করিতেছেন। শাহ ইহা বিশ্বাস করিলেন। তিনি কর্ম্মচারীদিগকে হুকুম দিলেন মির্জা গিয়াসের সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াফ্‌ত করিতে আর তাঁহাকে অনতিবিলম্বে দেশ হইতে তাড়াইয়া দিতে।

দেখিতে দেখিতে শাহের কর্ম্মচারিগণ আসিয়া উপস্থিত হইল। সংবাদ শুনিয়া মির্জা গিয়াসের মাথায় যেন আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। রাজকর্ম্মচারিগণ তাঁহার আসবাবপত্র দখল করিয়া লইতে লাগিল, তাঁহাকে তাঁহার আসন্নপ্রসবা পত্নীসহ গৃহ হইতে বাহির করিয়া দিল।

কি করিবেন? কোথায় যাইবেন? পারস্যে তাঁহার মাথা রাখিবার স্থান কোথায়? অর্থ নাই নিঃসম্বল। ঐশ্বর্য্যের ক্রোড়ে প্রতিপালিত মির্জা গিয়াস দেখিলেন তিনি নিঃসহায় পথের কাঙ্গাল।

ভারত তখন ঐশ্বর্য্যের জন্য বিখ্যাত। তখনকার দিনে পারস্য, তাতার প্রভৃতি বিভিন্ন প্রদেশ হইতে দুস্থ অভাবগ্রস্ত ব্যক্তিগণ ভাগ্য পরীক্ষার নিমিত্ত ভারতবর্ষে আসিয়া বেশ দু'পয়সা উপার্জ্জন করিত, সুখে দিনপাত করিতে সমর্থ হইত।

মির্জা গিয়াস যখন তাঁহার আসন্নাপ্রসবা পত্নী ও অপরিণত বয়স্ক শিশু সন্তান লইয়া পথে দাঁড়াইয়াছেন, তখন ভারতের ঐশ্বর্য্যকাহিনী তাঁহার হৃদয়ে আশার আলোক জ্বালাইয়া দিল। তিনি ভারতে যাওয়াই ঠিক করিলেন।

একটী উষ্ট্রে তিনি স্বয়ং; তাঁহার পত্নী এসমতুন্নেছা বেগম ও তিনটী অপরিণত বয়স্ক বালক কোন প্রকারে উঠিয়া বসিলেন। সঙ্গে লইলেন মাত্র দুইদিনের খাদ্য। কি আমূল পরিবর্ত্তন! তাঁহাদের ধন, মান, ঐশ্বর্য্য মুহূর্ত্তে কোথায় বিলীন?

ঐশ্বর্য্যের ক্রোড়ে প্রতিপালিত প্রভূত প্রতিপত্তিশালী মির্জা গিয়াস আজ পথের কাঙ্গাল। তাঁহার অগাধ সম্পত্তি, বিষয়-বৈভব সমস্তই মুহূর্ত্তে যাদুমন্ত্রে কোথায় উড়িয়া গিয়াছে। তিনি এতদিন যে পারস্যের শাহের উজির ছিলেন এখন সেই পারস্যে তাঁহার মাথা গুঁজিবার স্থান নাই। অর্থহীন নিঃসম্বল অবস্থায় তাঁহাকে স্বর্গাদপি গরীয়সী জন্মভূমি হইতে চির বিদায় লইতে হইল।

তাঁহারা ধীরে ধীরে, ভারতের পথে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। অচেনা পথ, অজানা গন্তব্য স্থান। ইহাতে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক কষ্ট হইল এসমতুন্নেছা বেগম সাহেবার। তিনি আসন্নপ্রসবা। তাঁহারা একদল বণিকের পিছনে ভারতে যাইতেছিলেন। বণিকদল দ্রুত গমন করতঃ দিক চক্রবালে অদৃশ্য হইয়া গেল। তাঁহারা একাকী পিছনে পড়িয়া রহিলেন। কেহ তাঁহাদের দিকে ফিরিয়াও চাহিল না।

মরুভূমির ভিতর দিয়া গিয়াছে ভারতের পথ। দিবসে প্রচণ্ড সূর্য্যের অগ্নিবর্ষণে সে পথ পুড়িয়া যায়। সেই পথে কষ্ট সহনে অনভ্যস্ত গিয়াস-পরিবার অগ্রসর হইতেছিলেন। বেগম এসমতুন্নেছা পথশ্রমে অধীরা হইয়া কখনও বা উষ্ট্র পৃষ্ঠে কখনও বা তপ্ত বালুকা প্রান্তরে পায়ে হাঁটিয়া ধীরে অগ্রসর হইতেছিলেন। পায়ে হাঁটিতে অক্ষম, উষ্ট্রপৃষ্ঠে অবস্থানও যন্ত্রনাদায়ক দেখিয়া তিনি বিষম বিপদে পড়িলেন। কত কাফেলা তাঁহাদিগকে অতিক্রম করিয়া চলিয়া গেল এই সকল বিপদের মধ্যে নূতন আর এক বিপদ আসিয়া দেখা দিল। তাঁহারা যখন কান্দারের মরু প্রান্তর অতিক্রম করিতে-ছিলেন, সেই সময় বেগম এসমতুন্নেছার প্রসববেদনা উপস্থিত। আর অধিক চলিতে অসমর্থ হইয়া তাঁহারা মরুমধ্যে এক বৃক্ষ নিম্নে আসিয়া দাঁড়াইলেন। এই অভাব-নীয় বিপদে পতিত হইয়া মির্জ্জা গিয়াস মুক্ত উদার আকাশের দিকে চাহিয়া বিপদহরণ আল্লাহতাআলাকে স্মরণ করিতে লাগিলেন। বেগম সাহেবা প্রসবযন্ত্রনায় অধীরা হইয়া ছটফট করিতেছিলেন।

বিপদের গুরুত্ব যখন দুর্ব্বল মানব মনকে অভিভূত করিয়া ফেলে, হৃদয়-বল যখন তিরোহিত হইয়া যায় তখন খোদাতা'লার সর্ব্বতোভাবে আত্ম-সমর্পণই হৃদয়ে আশা ও বলের সঞ্চার করে। মির্জ্জা গিয়াস অত্যন্ত ধর্ম্মভীরু লোক ছিলেন। তিনি বিষম বিপদে নিপতিত হইয়াও আল্লাহ্-তা'লার উপর বিশ্বাস হারাইলেন না। পরন্তু বিপদের উপর বিপদ যখন তাঁহার মাথার উপর পুঞ্জীভূত হইতেছিল, আল্লাহ্-তা'লার উপর বিশ্বাসও তাঁহার সেই পরিমাণে বাড়িতেছিল।

হজরত ঈশার জননী কুমারী মরিয়ম ( Mary ) এই প্রকার অন্তসত্ত্বাবস্থায় পাষাণ হৃদয় হেরডের ( Herod ) শিশুহত্যার কঠোর আদেশ শ্রবণ করিয়া স্বীয় গর্ভজাত সন্তানকে তাহার ঘাতকের হাত হইতে রক্ষা করিবার নিমিত্ত বনে জঙ্গলে পাহাড়ে পর্ব্বতে নিঃসহায় অবস্থায় কিরূপে পলায়নের চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার স্মরণ হইল।

* * * *

কাছে এমন কোন রমণী নাই যে বেগম এসমতুন্নেছার প্রসব সময়ে বিন্দুমাত্রও সাহায্য করিতে পারে। তাঁহারা সঙ্গীহীন, লোকালয় হইতে বহুদূরে জনমানবশূন্য মরুপ্রান্তরে অসহায় অবস্থায় নিপতিত। এই মহা বিপদের সময় মির্জা গিয়াস যতটুকু সম্ভব তাঁহার পত্নীর সাহায্য করিয়াছিলেন। তিনি পত্নীর দুঃখের সময় সান্ত্বনা, যন্ত্রনার সময় মিষ্ট কথা বলিয়া তাঁহার যন্ত্রনা লাঘব করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। অবুঝ শিশুসন্তানগণ—ভারতবর্ষের ভাবী প্রধান মন্ত্রী ও] তাঁহার ভ্রাতা, পিতামাতার এ ভীষণ কষ্ট দেখিয়া বুঝিলেন তাঁহাদের ভীষণ বিপদ উপস্থিত তাই আপনাপন দুঃখ কষ্টের ও নিঃসহায় অবস্থা দেখিয়াও কাঁদিয়া পিতামাতাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিলেন না। তাঁহারা পিতামাতার মতনই সহনশীল হইয়া রহিলেন।

ক্রমে দীর্ঘ রাত্রির শেষ হইল। আকাশের চাঁদ ম্লান হইয়া উঠিল। প্রভাতালোকে মরুপ্রান্তর হাসিয়া উঠিল। আকাশে বাতাসে উষার লালিমা ফুটিয়া উঠিয়া সুপ্ত জগতের চেতনা সঞ্চার করিল। সেই অরুণ-রাগ-রঞ্জিত প্রান্তরে, জগতের আলো নূরজাহানের জন্ম হইল।

খোদাতা'লা যাহাদিগকে এমনি ভাবে বিড়ম্বিত করেন; তাহারা খোদাতা'লার আশীর্ব্বাদের দান সেই অবস্থায় প্রাণ খুলিয়া ধন্যবাদ দিয়া গ্রহণ করিতে পারে না। মির্জা গিয়াস ও তাঁহার পত্নী বেগম এসমতুন্নেছাও খোদাতা'লার এ অপূর্ব্ব অবদান এ অনিন্দ্যসুন্দর সন্তানমুখ দর্শন করিয়া আন-ন্দিত হইতে পারিলেন না। যে সামান্য পাথেয় তাঁহারা সঙ্গে আনিয়াছিলেন তাহা প্রায় শেষ হইয়া গিয়াছে, শিশুসন্তানের

প্রাণরক্ষার নিমিত্ত অত্যাবশ্যক দুধ বিন্দুমাত্রও তাঁহাদের সঙ্গে নাই। উষ্ট্রপৃষ্ঠে আর একটুকুও স্থান নাই যেখানে তাঁহারা শিশুসন্তানকে স্থাপন করিতে পারেন, ভাবিতে ভাবিতে গিয়াসের মাথা ঘুরিয়া গেল। ইহাকে তাঁহারা খাওয়াইবেন কি? ভারতে ইহাকে লইয়াই বা যাইবেন কি প্রকারে? কোন উপায় নাই। যিনি এক সময় সুবিশাল ভারতে রাজদণ্ড পরিচালনা করিয়া দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে ভারত শাসন করিয়াছিলেন, রূপ যাঁহার ছিল অতুলনীয়, গুণে যাঁহার সমকক্ষ কেহ ছিল না সেই অতুলনীয়া রূপসী, প্রতিভাশালিনী পারস্যকুমারীকে ভারতে লইয়া যাইবার নিমিত্ত উষ্ট্র নাই। ইহা অপেক্ষা অদৃষ্টের আর কি কঠোর পরিহাস হইতে পারে? অসম্ভব এ সন্তানকে ভারতে লইয়া যাওয়া। তাই অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া শেষে এই শিশু সন্তানকে অসংখ্য নরনারী, পশুপক্ষী, খেচর ভূচরের প্রতিপালক আল্লাহ তা'লার অপার করুণায় মৃত্যু-বিভীষিকাপূর্ণ কান্দাহারের মরুপ্রান্তরে পরিত্যাগ করিয়া যাওয়াই ঠিক করিলেন।

মির্জা গিয়াস পত্নীকে বুঝাইলেন, শেষে পাষাণে হৃদয় বাঁধিয়া এসমতুন্নেছা স্বীয় গর্ভজাত কন্যাকে নিশ্চয়-মৃত্যুর হাতে সমর্পণ করিয়া চলিয়া যাইতেই সম্মত হইলেন। তিনি বুঝিলেন খোদাতা'লার অপরিসীম কৃপা ব্যতীত অন্য কোন উপায়ে এই শিশুসন্তানের জীবন তাঁহারা রক্ষা করিতে পারিবেন না। তখন বৃক্ষতলে কচি পাতার শয্যা রচনা করিয়া মুখ ব্যতীত শিশুর সর্ব্বাঙ্গ বস্ত্রাবৃত্ত করিয়া রাখিলেন। বেগম এসমতুন্নেছা শিশুর গলায় স্বীয় হীরকাঙ্গুরীয় ঝুলাইয়া দিলেন, তারপর স্বামী স্ত্রী দুইজন শিশুকে শেষ চুম্বন দিয়া, শেষ দেখা দেখিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে উষ্ট্রে আরোহণ করিলেন। জগতের কোটি কোটি জীব জন্তুর যিনি একমাত্র প্রতিপালক, তাঁহারই উপর নূরজাহানের লালন পালন ভার ন্যস্ত করিয়া তাঁহারা ভারতের পথে যাত্রা করিলেন। যতক্ষণ দেখা গেল বেগম এসমতুন্নেছা একদৃষ্টে নূরজাহানের দিকে চাহিয়াছিলেন। তারপর সে দৃষ্টিপথ হইতে অদৃশ্য হইয়া গেল বেগম সাহেবা উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া অজ্ঞান হইয়া পড়িলেন। হায়রে অপত্য-স্নেহ।

( ২ )

নূরজাহানকে তন্দ্রাবৃত্ত অবস্থায় পথিমধ্যে ফেলিয়া গেলে সেই পথ দিয়া একদল বণিক আগমন করে। ঘটনাক্রমে সেই দলের একজন লোক বৃক্ষতলে আসিয়া উপস্থিত হইয়া দেখিল—ছায়াভরা বৃক্ষতলে এক বৃহৎ কৃষ্ণকায় সর্প ফণা বিস্তার করিয়া বিরাজ করিতেছে। হৃদয়ে সাহস সঞ্চয় করিয়া আরও অগ্রসর হইয়া সে দেখিল—প্রফুল্ল কমল-সদৃশ দিব্যাঙ্গসুন্দর এক নবজাত শিশু, সেই ফণার নীচে শুইয়া আছে। সর্পটী তাহাকে দেখিয়া চলিয়া গেল, এবং সে নিকটবর্ত্তী হইয়া নূরজাহানকে বক্ষে ধারণ করিয়া দলপতির নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল। বণিক সন্তানহীন, সন্তান কামনায় বহু সাধ্যসাধনা করিয়াছেন। তাঁহার পিতৃহৃদয় সন্তানের প্রতি অতি সদয় ও বাৎসল্যপূর্ণ। তাই নবজাত সন্তানকে সন্দর্শন করিয়া হাতে যেন আকাশের চাঁদ পাইলেন। বণিক অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া নূরজাহানের লালনপালনের বন্দোবস্ত করিলেন।

কান্দাহারের মরুপ্রান্তর পার হইয়া তাঁহারা এক গ্রামে প্রবেশ করিলেন। সেই গ্রামে কাফেলা বিশ্রাম করিতে থামিল। দলপতি নূরজাহানের প্রতিপালনের নিমিত্ত কোন ধাত্রী গ্রামে পাওয়া যায় কিনা তাহা সন্ধান করিতে লোক পাঠাইলেন।

নূরজাহানের মাতাপিতা অভাবের তাড়নায় পথশ্রমে কাতর হইয়া সেই গ্রামে বিশ্রাম করিতেছিলেন। বণিক-দলপতির প্রেরিত লোক মির্জা গিয়াসের নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, তাঁহার স্ত্রী একটী শিশু সন্তানকে দুগ্ধদান করিতে সমর্থ কিনা। পারস্যের ভূতপূর্ব্ব উজির, নিজ স্ত্রীকে আয়ার কার্য্যে নিযুক্ত করা একটী অভাবনীয় বলিয়া মনে করিলেন। বেগম এসমতুন্নেছা নিজ সন্তান পথিমধ্যে ফেলিয়া আসিয়া এখন অন্যের সন্তানের লালনপালন করিতে অনিচ্ছুক ছিলেন; কিন্তু নিজের, স্বামীর ও অন্যান্য সন্তানদিগের দুরবস্থার কথা স্মরণ করিয়া অগত্যা তাহাতেই স্বীকৃতা হইলেন। সেই লোকের সঙ্গেই স্বামী স্ত্রী দুইজন বণিক সর্দ্দারের নিকট গিয়া উপস্থিত হইলেন। বণিক সর্দ্দার ইঁহাদিগকে দেখিয়া বুঝিল ইঁহারা আর যাহা হউন না কেন ইতর লোক নন এবং ইঁহাদিগের হস্তে নূরজাহানের লালনপালন ভার ন্যস্ত করিলে ইঁহারা কর্ত্তব্য সম্পাদনে ত্রুটী করিবেন না। বেগম এসম তুন্নেছা নূরজাহানকে দুগ্ধ পান করাইতে গিয়া তাহাকে দেখিয়াই তাঁহার হৃদয় আনন্দে বিহ্বল হইয়া পড়িল। তারপর তাহার গলায়

স্বীয় অঙ্গুরীয় দেখিয়া নিজ সন্তান বলিয়া চিনিয়া তিনি আনন্দাতিশয্যে কাঁদিয়া ফেলিলেন। খোদাতালাকে অসংখ্য ধন্যবাদ প্রদান করিয়া কৃতজ্ঞতায় তাঁহার নিকট মস্তক লুণ্ঠিত করিতে লাগিলেন। মুহূর্ত্তে মির্জা গিয়াসও জানিলেন—ইহা তাঁহাদিগকে দেওয়া খোদার সেই অপূর্ব্ব দান। তিনিও হর্ষোৎফুল্ল হইয়া আনন্দ করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের আনন্দ কলরব বণিক সর্দ্দারের মনোযোগ আকর্ষণ করিল। সেও জানিতে পারিল—পথিমধ্যে প্রাপ্ত শিশু সন্তানের ইহারাই জনক জননী। কৌতূহল পরবশ হইয়া সে তাঁহাদের পরিচয় ও অবস্থার কথা জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিল যে ইঁহারা পারস্যের ভূতপূর্ব্ব উজিরের পুত্র ও পুত্রবধু। শাহের ক্রোধে নিপতিত হইয়া পারস্য হইতে বিতাড়িত। বণিক যেমন সম্মানী তেমনি উদারচেতা লোক ছিল। সে তৎক্ষণাৎ এই দুরবস্থাপন্ন সম্ভ্রান্ত পরিবারের আহার ও বাসস্থানের বন্দোবস্ত করিয়া দিল। এই বণিক সর্দ্দারের কৃপায় পথিমধ্যে তাঁহাদের আর কোন কষ্ট হয় নাই।

মির্জা গিয়াস এই বণিক সর্দ্দারের সঙ্গে ভারতের তদানীন্তন রাজধানী দিল্লীতে আসিয়া উপস্থিত হন। মির্জা গিয়াস মছউদ নামক জনৈক উজিরের গৃহে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

( ৩ )

নূরজাহান ছিল তাঁহার পরবর্ত্তী নাম। ভারত সম্রাট রূপেগুণে মোহিত হইয়া তাঁহাকে এই নাম প্রদান করেন, তদবধি তিনি বিশ্বসংসারে নূরজাহান নামেই পরিচিত। তাঁহার ভবিষ্যৎ উন্নতি, তাঁহার অলোকসামান্য প্রতিভার কথা মাতাপিতারও যখন অজ্ঞাত ছিল, তাঁহার সৌন্দর্য্য যখন পূর্ণিমার চাঁদের মত পৃথিবী উদ্ভাসিত করিতে পারে নাই, সেই সময় তাঁহার পিতামাতা তাঁহাকে আদর করিয়া নাম রাখিয়াছিলেন মেহরুন্নেছা। বর্ত্তমানে আমরা নূরজাহানকে মেহরুন্নেছা বলিয়া ডাকিব।

মেহরুন্নেছাকে লইয়া মির্জা গিয়াস ও তাঁহার পরিবার মছউদ নামক দিল্লীর জনৈক আমীরের বাড়ীতে অতি সমাদরে অবস্থান করিতে লাগিলেন। সম্রাট আকবরের নবরত্নের অন্যতম না হইলেও মছউদ তাঁহার একজন বিশিষ্ট পারিষদ ছিলেন। সম্রাটের নিকট তাঁহার যথেষ্ট খ্যাতি প্রতিপত্তি ছিল। তাঁহারই চেষ্টায় মির্জা গিয়াস সম্রাট আকবরের রাজদরবারে পরিচিত হন।

সম্রাট আকবর সময় সময় দিল্লী পরিত্যাগ করিয়া ফতেপুর শিক্রীর বিশ্রাম ভবনে অবস্থান করিতেন। সম্রাট এক সময় যখন ফতেপুরে অবস্থান করিতেছিলেন, সেই সময় মছউদ নানাপ্রকার উপঢৌকন সহ তাঁহার সমীপে উপস্থিত হন। সম্রাটের সহিত গল্প প্রসঙ্গে তিনি মির্জা গিয়াসের কথা ও তাঁহার অবস্থার ইতিহাস আনুপূর্ব্বিক বর্ণনা করেন। সম্রাট আকবর মির্জা গিয়াসের দুর্দ্দশার কাহিনী শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে তাঁহার দরবারে আহ্বান করিয়া পাঠাইলেন। তদনুসারে মির্জা গিয়াস মছউদের সঙ্গে আগ্রায় সম্রাট আকবরের দরবারে উপস্থিত হন।

সম্রাট আকবরের পিতা হুমায়ুন ভারত হইতে শের শাহ কর্ত্তৃক বিতাড়িত হইয়া পারস্যে পলায়ন করেন। পারস্যে অবস্থানকালে মির্জা গিয়াস ও তাঁহার পিতা দুর্ভাগ্য-নিষ্পেষিত হুমায়ুনের যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন হুমায়ুন পারস্যের দরবার পরিত্যাগ করিয়াও সে উপকার বিস্মৃত হন নাই। তিনি পত্রযোগে সে উপকারের নিমিত্ত তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞতা জানাইয়াছিলেন; হুমায়ুনের স্বহস্ত লিখিত সেই লিপিকা মির্জা গিয়াস পারস্য পরিত্যাগ কালে সঙ্গে করিয়া আনিয়াছিলেন। সম্রাট আকবরকে সেই লিপিকা দেখাইলে মহানুভব সম্রাট পিতার সাহায্যকারী বর্ত্তমানে অভাবে ও বিপদে নিপতিত মির্জা গিয়াসের প্রতি অতিশয় সন্তুষ্ট হন। তৎকালে দেওয়ানের পদ শূন্য থাকায় তিনি মির্জা গিয়াসকে নিজের অধীনে দেওয়ান পদে নিযুক্ত করেন।

মির্জা গিয়াস দেওয়ানের পদে নিযুক্ত হইয়া রাজপরিবারের সহিত বিশেষরূপে পরিচিত হন। বাদশাহ আকবরের অধীন কর্ম্ম করিয়া তিনি পরম সুখে ও নিরতিশয় সম্মানের সহিত কালাতিপাত করিতে লাগিলেন।

মির্জা গিয়াসের দিন ফিরিয়াছে। কান্দাহার মরু প্রান্তরের দুর্দ্দশার কাহিনী তাঁহার সুখের জীবনে রজনীতে দুঃখের স্বপ্নবৎ অল্পক্ষণস্থায়ী অলীক বলিয়া প্রতীয়মান হইল। এখন আল্লাহর কৃপায় তাঁহাদের অবস্থা স্বচ্ছল; দাসদাসী চাকর বাকর তাঁহাদের গৃহের শোভা বর্দ্ধন করিতেছে। মেহেরের তত্বাবধানের নিমিত্তও দাসদাসী নিযুক্ত হইল সে সর্ব্বদা নানাপ্রকার খেলা দিয়া শিশু মেহেরকে শান্ত রাখিত।

মির্জা গিয়াস সম্রাট আকবরের দরবারে দেওয়ানী কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন; আর তাহার কিছুদিন পরে তাঁহার পত্নী সম্রাটের অন্তঃপুরে শিক্ষকতা কার্য্যে নিযুক্ত হন। মহল মধ্যে মোগল রাজকুমারীদিগকে বেগম সাহেবা (এসমতুন্নেসা) শিক্ষা দান করিতেন। সেই সময় বাড়ীতে তিনি স্বীয় কন্যা মেহেরকেও শিক্ষা দান করিতেন।

মেহেরকেও শৈশব কালে তাঁহার মার নিকট কোরআন শরিফ পাঠ করিতে হইয়াছিল। মেহের শৈশব কালেই প্রখর স্মৃতি শক্তিশালিনী ও অসাধারণ বুদ্ধিমতী ছিলেন।

পরিণত বয়সে তাঁহার রূপ-গৌরব যেমন ভারতময় ছাইয়া গিয়াছিল, অতি শৈশব কালেও তাঁহার গুণ গরিমায় সেইরূপ সকলে মোহিত ও বিস্মিত হইয়াছিল। তাঁহার সুমধুর কোকিল কণ্ঠে কোরআন পাঠ শ্রবণ করিতে মহলের সমস্ত রমণী তাঁহার পড়িবার সময় তাঁহার চারিদিকে আসিয়া একত্রিত হইত। তাঁহার প্রতিভার পরিচয় বাল্যকালেই পাওয়া গিয়াছিল, তাই তাঁহার প্রতিভায় মোহিত হইয়া মহলের সকলেই মেহেরকে যৎপরোনাস্তি ভালবাসিত।

মাতার নিকট কোরআন পাঠ সমাপ্ত করিয়া মেহের মির্জা হাদি নামক জনৈক উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তির নিকট আরবী পার্সী ভাষা শিখিতে আরম্ভ করেন। মেহেরের বয়স যখন কেবল মাত্র দশ বৎসর তখনই তিনি পারস্যের অমর কবি সেখ সাদীর শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ গোলেস্তাঁ বোস্তাঁ বিশ্ববিখ্যাত পারস্য গ্রন্থ আনওয়ার সোহেলী, মিনাবাজার, ইউসফ জেলেখা পাঠ সমাপ্ত করেন।

এতদ্ব্যতীত আলেফ লায়লা ও অন্যান্য আরবী গ্রন্থ পাঠ করিয়া দুরুহ আরবী ভাষায় যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। বিদ্যা শিক্ষায় তাঁহার গভীর মনযোগ, একনিষ্ঠ সাধনা অসাধারণ তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, প্রচুর স্মৃতিশক্তি সাহায্যেই এত অল্প বয়সে আরবী পারসী ভাষায় এরূপ ব্যুৎপত্তি লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

দশ বৎসর বয়সে মেহের আরবী পারসী সাহিত্যের প্রাথমিক পুস্তক সমূহ সমাপন করিয়া হাদিস, ফেকা, ওছুল প্রভৃতি ধর্ম্মগ্রন্থ ও আরব জাতির ও পারসী কবিদিগের ইতিহাসালোচনায় প্রবৃত্ত হন। অল্প দিনের মধ্যে তিনি এই সকল শাস্ত্রেও অসাধারণ বুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন।

এতদ্ব্যতীত হস্ত শিল্পেও তাঁহার সমকক্ষ মোগল হেরেমে কেহই ছিল না। তছবীর আঁকায় তিনি বিশেষ পটু ছিলেন।

তখনকার দিনে মোগল হেরেমে আত্মরক্ষার উপায় শিক্ষা দেওয়া হইত। শাহাজাদীগণ শাহাজাদাগণের মত তীর নিক্ষেপ করিতেন, বন্দুক চালাইতেন, ছোরা ব্যবহার শিক্ষা করিতেন। রাজ অন্তঃপুরের মহিলাদিগের সঙ্গে মেহেরও এই সকল বিদ্যায় পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন। উত্তরকালে তিনি জাহাঙ্গীরের সঙ্গে শিকার করিতে গিয়া এরূপ স্থির লক্ষ্যের পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন যে, প্রধান প্রধান সেনাপতিগণ তাঁহার নিপুণতার যথেষ্ট প্রশংসা করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

কবিতা রচনায়ও মেহেরুন্নেছা সিদ্ধহস্ত ছিলেন। যৌবনের প্রারম্ভে কল্পনা যখন পৃথিবীকে অপরূপ বেশে সজ্জিত দেখিত, কল্পনার আলোকে যখন নিত্য নূতন নূতন রাজ্য উদ্ভাষিত হইয়া উঠিত, মেহেরের তরুণ হৃদয় তখন কবিতার সুরে ঝঙ্কার দিয়া উঠিত। কিন্তু বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সে ঝঙ্কার যেন ক্রমে ক্রমে থামিয়া যাইতে লাগিল।

বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে মেহের অন্তঃপুরের চারি-দেওয়ালে অবরুদ্ধ হন। মাতাপিতা ও আপন ভ্রাতা ভগিনী ব্যতীত অন্য কাহাকেও এমন কি ঘনিষ্ট আত্মীয় স্বজনবর্গকেও তিনি দেখিতে পাইতেন না। ইহাই তখন ইছলামের রীতি বলিয়া পরিগণিত হইত। মেহের যৌবনে পদার্পণ করিবার বহু পূর্ব্বেই অন্তপুরে আবদ্ধ হন। যুবরাজ সেলিম বা অন্য কোন লোকের সহিত দেখা সাক্ষাৎ কিছুতেই হইতে পারিত না।

মেহেরের জননী বেগম এসমাতুন্নেছা মোগল রাজ অন্তঃপুরে যাতায়াত করিতেন। এই উপলক্ষে তিনি সময় সময় মাতার সহিত বেগমদিগের নিকট বেড়াইতে যাইতেন। পথে কোন পুরুষের সহিত সাক্ষাৎ বা বাক্যালাপ করা তাঁহার পক্ষে সম্পূর্ণ অসম্ভব ছিল। যে সকল বাঙ্গালী লেখক মেহেরের বিবাহের পূর্ব্বে, যুবরাজ সেলিমের প্রতি তাঁহার অনুরাগ কাহিনী বর্ণনা করিয়াছেন, তাঁহারা মোগল মেহরেমের বিষয় সম্পূর্ণ অজ্ঞাত, তাঁহারা তৎকালীন মুসলমান অন্তপুরের কঠোর পর্দ্দার কথা একবারেই জানেন না। এক দিবস মেহের মহল মধ্যে উৎসবের নিমন্ত্রণ প্রাপ্ত হন। উৎসব শেষে সকলে বিদায় হইয়া চলিয়া গেলে মেহের যখন গৃহ হইতে বাহির হইয়াছিলেন, তখন দৈবক্রমে যুবরাজ সেলিম তাঁহার সম্মুখে পড়িলেন। তাঁহাদের মধ্যে বাক্য বিনিময় হয় নাই, হইয়াছিল—দৃষ্টি বিনিময়।

# গিবার বা জাবের এব্‌নে হাইয়ান

[ কাজী নওয়াজ খোদা ]

রসায়ন শাস্ত্রের প্রাথমিক ইতিহাসের সহিত পণ্ডিতপ্রবর গিবার ( Giber ) এর নাম ও তাঁহার কৃতিত্ব বিশেষ ভাবে বিজড়িত, তাই কিছুদিন হইতে ইংলণ্ড ও জার্মাণ প্রভৃতি দেশের পাশ্চাত্য পণ্ডিত মহলে তাঁহার সম্বন্ধে নানাবিধ আন্দোলন ও আলোচনা চলিতেছে।

ল্যাটীন ভাষায় রসায়ন শাস্ত্রের নিম্নলিখিত কয়েকখানি গ্রন্থ লিখিত ও সুধী সমাজে প্রচারিত হইয়াছিল—( ১ ) Samma ( 2 ) Perfections ( 3 ) De—Investigation Perfections ( 4 ) De - Inventions veritalis ( 5 ) Testa mention Geberis. এই গ্রন্থগুলিতে সেই প্রাথমিক যুগের রসায়ন শাস্ত্র সম্বন্ধে বহু অভিনব তত্ত্বের আবিষ্কার ও এই শাস্ত্রের আলোচনা কারীদের জন্য এক নবযুগের সৃষ্টি করা হইয়াছিল। গ্রন্থের ভাষা এমন সরল ও প্রাঞ্জল, বর্ণনা-ভঙ্গী এরূপ সুস্পষ্ট ও আড়ম্বরহীন যে জটিল হইতে জটিলতম বিষয়গুলিও সহজেই পাঠকের হৃদয়ঙ্গম হইয়া যায়।

এখন প্রশ্ন হইতেছে, গ্রন্থগুলির প্রকৃত রচয়িতা কে? তিনি কোন দেশের অধিবাসী? মূলতঃ সেগুলি কোনও পাশ্চাত্য পণ্ডিত কর্ত্তৃক ল্যাটীন ভাষায় রচিত হইয়াছিল, অথব আরবী রসায়ন শাস্ত্রের গ্রন্থাবলী হইতে পরিগৃহীত হইয়াছিল? পূর্ব্বোল্লিখিত গীবার ( Giber ) এগুলির মূল রচয়িতা হইলে তিনি কোন দেশের লোক ছিলেন? এবং সর্ব্বপ্রথমে কোন ভাষায় তিনি ঐ পুস্তকগুলি রচনা করিয়াছিলেন? এসম্বন্ধে নানাপ্রকার মতানৈক্য থাকিলেও অধিকাংশ পাশ্চাত্য লেখক 'গীবার'কেই গ্রন্থগুলির মূল রচয়িতা বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন। এজন্য পাশ্চাত্য-জগতে 'গীবারে'র ব্যক্তিগত পরিচয় সম্বন্ধে জোর আলোচনা আরম্ভ হইয়া গিয়াছে।

প্রথম উল্লিখিত Samma গ্রন্থের বিভিন্ন সময়ে মুদ্রিত কয়েক সংস্করণেই পণ্ডিতপ্রবর 'গীবার'কে আরবের অধিবাসী স্বীকার করা হইয়াছে। পাশ্চাত্য লেখক 'রসল' (Russel) তাঁহার ইংরাজী অনুবাদের প্রথমেই লিখিয়াছেন 'গীবার' আরব দেশের একজন বিখ্যাত রাজপুত্র ছিলেন। আরবীয় ন্যায়শাস্ত্রে তাঁহার বিশেষ দখল ছিল।

১৫৪১ খৃষ্টাব্দে Sammaর নূরন্‌বার্গ ( Nurenberg ) হইতে প্রকাশিত সংস্করণে তাঁহাকে একজন আরবপণ্ডিত বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে ডনজিগ ( Dunzig ) হইতে যে নূতন সংস্করণ বাহির হইয়াছিল, তাহাতে গিবারকে আরবের একজন নরপতি বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। ইউরোপের বিভিন্ন স্থানে মুদ্রিত ভিন্ন ভিন্ন সময়ে প্রকাশিত গ্রন্থের ( Sammaর ) মুখবন্ধেও গিবারকে একজন আরবের অধিবাসী বলিয়া লিখিত হইয়াছে।

বোল্‌ডিন ( Boldin ) এর বিখ্যাত লাইব্রেরিতে রক্ষিত পঞ্চদশ শতাব্দীর রচিত একখানি হস্ত লিখিত গ্রন্থে ( Linee Practicus geberis investigation perfecta magisteree ) উল্লিখিত হইয়াছে যে তিনি ইরানের অধিপতি ছিলেন। আবার Limeir guiflos naturarune vocative নামক ১৪৭৩ খৃষ্টাব্দে মুদ্রিত একখানি গ্রন্থে Samma ভারতের জনৈক নরপতি কর্ত্তৃক রচিত ও তাঁহার নাম গিবার বলিয়া লিখিত হইয়াছে। যাহা হউক গিবার যে একজন প্রাচ্য দেশবাসী পণ্ডিত ছিলেন, তাহাতে সন্দেহ করিবার কোন কারণ দেখিতে পাওয়া যায় না। পক্ষান্তরে অধিকাংশ লেখকের মত ও আনুসঙ্গিক অন্যান্য বিষয়ের বিশেষভাবে আলোচনা করিলে গীবারকে আরবের অধিবাসী বলিয়া অবিসম্বাদিতরূপে স্বীকার করিতে হয়।

মধ্য যুগের রচিত রসায়ন শাস্ত্রের অনেক গ্রন্থে গীবারের নাম দেখিতে পাওয়া যায়। সাধারণতঃ অধিকাংশ গ্রন্থকারই গীবার এবনে হায়েন (Geber eben Haen) লিখিয়াছেন। আবার কেহ কেহ জিবার ( Jiber ) ও বলিয়াছেন। ইহা

হইতেই বেশ বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, গিবার বা জিবার শব্দ আরবী জাবের ( جابر ) শব্দের অপভ্রংশ অথবা পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের ক্রমাগত উচ্চারণ বিভ্রমের ফল মাত্র। মুছলমান পণ্ডিতগণের নাম সম্বন্ধে এরূপ বিভ্রমের আরও শত শত নজির উল্লেখ করা যাইতে পারে। সুতরাং ল্যাটীন ভাষার গ্রন্থাবলীতে যেখানেই গীবারের নাম উল্লেখিত হইয়াছে সেখানেই আরবের সুবিখ্যাত রসায়ন শাস্ত্রবিৎ পণ্ডিত জাবের এবনে হাইয়ান ( جابر بن حيان ) কেই বুঝিতে হইবে। দেশ ভেদে অথবা ভাষাভেদে জে ( J )র স্থানে জি ( G ) হইয়া যাওয়া খুব স্বাভাবিক। বিশেষতঃ ল্যাটীন ভাষায় অনেকের মতে জে ( J )র উচ্চারণ নাই বলিলেই হয়। পক্ষান্তরে মিসর প্রভৃতি দেশে জে ( J )র স্থলে 'গ' ( G ) এর উচ্চারণ আজিও প্রচলিত রহিয়াছে।

এক্ষণে জাবের এব্‌নে হাইয়ান সম্বন্ধে আলোচনা করিলে জানিতে পারা যায়—অষ্টম শতাব্দীর শেষভাগে খলিফা হারুণ রশীদের সময়ে আবু মুসা জাবের এব্‌নে হাইয়ান ( ابو موسى جابر بن حيان ) নামক একজন রসায়ন শাস্ত্রবিৎ মহাপণ্ডিত বর্ত্তমান ছিলেন। চিকিৎসা শাস্ত্রেও তাঁহার বিশেষ অধিকার ছিল। অধ্যাপক রসকা ( Ruska ) রচিত পুস্তিকায় এবং ১৯২৫ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী সংখ্যার সায়েন্স প্রোগ্রেস ( Sience Progress ) পত্রিকায় প্রকাশিত ব্রিষ্টলের বিজ্ঞান কলেজের অধ্যাপক এ, জি, হলম ইয়ার্ড ( Professor A. G. Halem Yeard M. A. F. I. C. ) লিখিত একটী প্রবন্ধে 'জাবের এব্‌নে হাইয়ান' সম্বন্ধে অনেক কথা বর্ণিত হইয়াছে। ত্রয়োদশ শতাব্দীর মোসলমান ঐতিহাসিক এবনুল-কাফ্‌তী ( ابن القفطى ) তাঁহার 'তারিখুল হোকামা' ( تاريخ الحكماء ) গ্রন্থে লিখিয়াছেন—জাবের পদার্থ বিদ্যায় বিশেষতঃ রসায়ন শাস্ত্রে অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন। রসায়ন শাস্ত্রে তাঁহার রচিত অনেকগুলি গ্রন্থ আছে। তিনি একজন দার্শনিক পণ্ডিত বলিয়াও প্রখ্যাত। পক্ষান্তরে একজন মহাতাপস ও সুফী বলিয়াও তিনি সকলের নিকট প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। পরবর্ত্তী রসায়ন শাস্ত্রবিৎ মুসলমান পণ্ডিতগণ স্ব স্ব রচিত গ্রন্থাবলীতে অনেক স্থানে জাবেরের গ্রন্থ হইতে তাঁহার সিদ্ধান্ত উদ্ধৃত করিয়া আপনাপন মতের পোষকতা করিয়াছেন। এই সকল পণ্ডিত জাবেরের রসায়ন শাস্ত্রের গভীর জ্ঞান গবেষণার বিশেষ প্রশংসা করিয়াছেন।

পূর্ব্বে উল্লিখিত Samma প্রভৃতি ল্যাটীন গ্রন্থগুলি মহাত্মা জাবেরের নামের সহিত সংশ্লিষ্ট হইবার কারণ সম্বন্ধে অনুসন্ধান ও আলোচনা করিয়া এইরূপ স্থির সিদ্ধান্ত হইয়াছে যে উক্ত গ্রন্থগুলি জাবের এব্‌নে হাইয়ান-রচিত রসায়ন শাস্ত্রের মূল আরবী গ্রন্থ হইতে ল্যাটীন ভাষায় ভাষান্তরিত হইয়াছে; তাই সেগুলি 'গিবার' বা জাবেরের নামেই সাধারণের নিকট প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। পাশ্চাত্য লেখক বার্টলেট ( Bertholet ) রসায়ন শাস্ত্রে মহাত্মা জাবেরের এই মহাদানের কথা অস্বীকার করিয়া পাশ্চাত্য জগতকে তাঁহার কৃতজ্ঞতা পাশ হইতে মুক্ত করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন, তিনি Birleo The Quena Elanoit এবং Leyden প্রভৃতি কয়েকটী লাইব্রেরীর হাওলা দিয়া জাবেরের নামের সহিত সংশ্লিষ্ট রসায়ন শাস্ত্রের এক ডজন আরবী গ্রন্থের নাম উল্লেখ করিয়াছেন এবং তন্মধ্যে কয়েকটীর আসল আরবী এবারৎ O—Handas সাহেবের অনুবাদের পাশা পাশি মুদ্রিত ও প্রকাশিত করিয়াছেন, ইহা হইতে তিনি প্রমাণ করিতে চাহিয়াছেন যে O—Handas যেরূপ ল্যাটীন হইতে অনুবাদ করিয়াছেন জাবেরও সেইরূপ পাশ্চাত্য ভাষার গ্রন্থাবলী হইতে আরবী-তরজমা করিয়াছেন। এরূপ অবস্থায় তিনিই পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের নিকট ঋণী। ইহা হইতে বার্টলেট ( Bertholet ) এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে Samma প্রভৃতি ল্যাটীন ভাষার গ্রন্থসমূহ পাশ্চাত্য অন্য কোনও ভাষার মূল গ্রন্থ হইতে অনুবাদিত হইয়াছে জাবেরের রচিত আরবী গ্রন্থের সহিত সেগুলির কোনও সংশ্রব নাই। ইহার উত্তরে অধ্যাপক Ruska বলিয়াছেন—Bertholet এর প্রকাশিত আরবী অনুবাদগুলি আদৌ জাবেরের লিখিত নহে, অন্যায় ও ষড়্‌যন্ত্র মূলে ঐগুলির সহিত জাবেরের নাম সংশ্লিষ্ট করা হইয়াছে। বিশেষ আন্দোলন ও আলোচনার পর সুধী সমাজে এ সম্বন্ধে প্রকৃত সত্য প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে ফলে এক্ষণে সকলেই জানিতে পারিয়াছেন যে ঐ অনুবাদগুলির মধ্যে ২টী গ্রন্থ ভাড়াটীয়া লেখকের দ্বারা লেখাইয়া লইয়া জাল করিয়া তাহাতে জাবেরের নাম বসাইয়া দেওয়া হইয়াছে এবং অন্য

জাবেরের নামের সহিত সংশ্লিষ্ট ল্যাটীন গ্রন্থাবলী

একটিতে দুই স্থানে অনুবাদকের নাম "আবু আবদিল্লাহ্‌ মহাম্মদ এবনে এহ্‌ইয়া" উল্লিখিত হইয়াছে; সুতরাং ইহা হইতে নিঃসন্দেহরূপে বুঝিতে পারা যাইতেছে যে Berthelet এর প্রকাশিত আরবী অনুবাদের সহিত জাবেরের কোনও সম্বন্ধ বা সংশ্রব নাই।

এইবার দেখিতে হইবে Samma প্রভৃতি ল্যাটীন গ্রন্থগুলি মহাত্মা জাবেরের মূল আরবী গ্রন্থ হইতে লিখিত হইয়াছে কিনা? অধ্যাপক Ruska বলিয়াছেন, প্রথমতঃ ঐতিহাসিক সত্যের হিসাবে প্রমাণিত হইয়াছে যে আরবী গ্রন্থগুলি ল্যাটীন গ্রন্থের বহুপূর্ব্বে জাবের কর্তৃক রচিত হইয়াছিল, দ্বিতীয়তঃ আরবী ও ল্যাটীন উভয় গ্রন্থ পাশাপাশি রাখিয়া দেখিলে এবং উভয় গ্রন্থের বর্ণনা প্রণালী ও বর্ণিত বিষয়গুলির ক্রম-সমাবেশ প্রভৃতির প্রতি নিরপেক্ষ ভাবে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে ল্যাটীন গ্রন্থগুলি যে মহাত্মা জাবেরের রচিত আরবী গ্রন্থ হইতে পরিগৃহীত হইয়াছে তাহা অবিসম্বাদিত রূপে স্বীকার করিতে হইবে।

মহাত্মা জাবের রচিত আরবী গ্রন্থ হইতে উপরের লিখিত Samma প্রভৃতি ল্যাটীন গ্রন্থগুলি অনূদিত হওয়ায় অভিনবত্ব বা আশ্চর্য্যের কথা কিছুই নাই, আরবী রসায়ন শাস্ত্র ও অন্যান্য শাস্ত্রের কেতাব হইতে ল্যাটীন ভাষায় অনুবাদ গ্রহণের কার্য্য বহুকাল হইতে পাশ্চাত্য জগতে চলিয়া আসিতে ছিল, ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ আরবী ভাষা শিক্ষা এবং ল্যাটীন ও অন্যান্য পাশ্চাত্য ভাষায় আরবী গ্রন্থের অনুবাদের প্রতি বিশেষভাবে মনোযোগী হইয়াছিলেন। ইউরোপের রাজন্যবর্গ বহু দূরবর্ত্তী বিভিন্ন স্থান হইতে আরবী কেতাব সংগ্রহ ও তৎসমূহের অনুবাদ কার্য্যে বহু কষ্ট স্বীকার ও বহু অর্থব্যয় করিতেন। সর্ব্ব প্রথম মোসলমান অধিকৃত স্পেনের ওন্দলুস নগরে আরবদের সহিত ইউরোপীয়গণের সম্মিলন ও মেশামেশি আরম্ভ হয়। ঐ সময় ইউরোপের বিভিন্ন অংশ হইতে অসংখ্য তরুণ শিক্ষার্থীগণ আরব-অধ্যাপকদের নিকট আরবী ভাষা শিক্ষার জন্য দলবদ্ধ ভাবে আসিতে আরম্ভ করেন। ইহার পর কিছুদিনের মধ্যেই পাশ্চাত্য জগতে আরবী শিক্ষার অনুরাগ অভাবনীয় রূপে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিল। আরবী গ্রন্থসমূহের ল্যাটীন ভাষায় অনুবাদ গ্রহণের কার্য্যও

**পাশ্চাত্য ভাষায় রসায়ন শাস্ত্রের ও অন্যান্য শাস্ত্রের আরবী গ্রন্থাবলীর অনুবাদ**



এই সময় হইতে আরম্ভ হয়। বহুদিন ধরিয়া পর পর এক এক দল ইউরোপীয় পণ্ডিত এই কার্য্যে সম্পূর্ণরূপে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে Adel rd of Bath, Hermann of Dalmatica, Geraud of Cremona প্রভৃতি পণ্ডিতগণ এই কার্য্যে বিশেষ প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। আরব পণ্ডিতগণ পদার্থবিদ্যা ও রসায়ন শাস্ত্রে অসাধারণ জ্ঞান সম্পন্ন ছিলেন, জ্যোতির্ব্বিদ্যায় (Astronomy) সে সময় আর কেহ তাঁহাদের সমকক্ষ ছিলেন না। তাই ল্যাটীন ও অন্যান্য পাশ্চাত্য ভাষায় এই সকল শাস্ত্রের আরবী গ্রন্থাবলীর অনুবাদ বহুল পরিমাণে পরিগৃহীত হইয়াছিল। Robert of Chester দ্বাদশ শতাব্দীতে আরব পণ্ডিত 'খাওয়ারজমীর' (الخوارزمی) এলজাব্‌রার ইংরাজী ভাষায় তরজমা করিয়াছিলেন। Michigan ইউনিভার্সিটীর সুবিখ্যাত অধ্যাপক Karpenski তাঁহার গ্রন্থে এই সকল কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করিয়াছেন। রবার্ট অব চেষ্টার অনেকগুলি আরবী কেতাবের অনুবাদ প্রকাশ করিয়াছেন। তন্মধ্যে পবিত্র কোরাণ শরীফের অনুবাদ বিশেষভাবে উল্লেখ যোগ্য। আরবী রসায়ন শাস্ত্রের গ্রন্থাবলী হইতে সংগৃহীত Morienus এর Decompositione Alchemiae নামক গ্রন্থটী ল্যাটীন ভাষায় লিখিত রসায়ন শাস্ত্রের সর্ব্ব প্রথম গ্রন্থ। কেহ কেহ বলিয়াছেন এটী কোন আরবী কেতাবের অনুবাদ নহে, রবার্ট অব চেষ্টার ১১৮২ খৃষ্টাব্দের ১১ই ফেব্রুয়ারী তারিখে এই ল্যাটীন গ্রন্থখানির ইংরাজী অনুবাদ শেষ করিয়াছিলেন। আমরা কিন্তু তাঁহাদের সহিত একমত হইতে পারিলাম না। ঐ গ্রন্থখানি কোন আরবী গ্রন্থ বিশেষের অনুবাদ না হইলেও রচনা ও বিষয় বর্ণনার প্রতি লক্ষ্য করিলে ইহার বহু অংশ আরবী ভাষার বিভিন্ন গ্রন্থাবলী হইতে পরিগৃহীত হইয়াছিল তাহা নিঃসন্দেহ রূপে বলা যাইতে পারে। অধ্যাপক Ruska আর একস্থানে বলিয়াছেন—রবার্ট অব চেষ্টার ঐ ল্যাটীন গ্রন্থখানির অনুবাদক বলিয়া মনে হয় না। কারণ গ্রন্থের মধ্যে তিনি নিজেকে একজন তরুণ যুবক ও ল্যাটীন ভাষায় বিশেষ অভিজ্ঞ নহেন বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু ল্যাটীন ভাষা হইতে ইংরাজী ভাষায় অনুবাদ করিবার উপযোগী অভিজ্ঞতা তাঁহার যথেষ্ট ছিল, আমরা সে সম্বন্ধে বিশেষ প্রমাণ পাইয়াছি। ১১২৩ খৃষ্টাব্দে রবার্ট ল্যাটীন ভাষায়

কোরআন শরীফের অনুবাদ করিয়াছিলেন। ১৪৫০ খৃষ্টাব্দে বেসিল হইতে অধ্যাপক Melancthon এর লিখিত উপক্রমণিকা সহ ঐ অনুবাদটী প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহাতে রবার্ট চেষ্টারকেই তাহার অনুবাদক বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে। ইহা হইতেই জানিতে পারা যাইতেছে রবার্ট ল্যাটীন ভাষায় পণ্ডিত না হইলেও অন্য ভাষা হইতে ল্যাটীনে অনুবাদ করিতে অথবা ল্যাটীন ভাষার কোন গ্রন্থ অন্য ভাষায় ভাষান্তরিত করিতে নিশ্চয়ই সক্ষম ছিলেন। পক্ষান্তরে তরুণ যুবকের পক্ষে এক ভাষা হইতে অন্য ভাষায় অনুবাদ করিবার জ্ঞান লাভ অসম্ভব, একথার মূলে আদৌ কোন সত্য নিহিত আছে বলিয়া আমরা মনে করি না।

অতঃপর রসায়ণ শাস্ত্রের বহু আরবী কেতাব ল্যাটীন ভাষায় অনূদিত হওয়ায় পাশ্চাত্য জগতে রসায়ণ চর্চ্চার বহু সুযোগ ও সুবিধার পথ পরিষ্কৃত এবং আরব-পণ্ডিতগণের দান গ্রহণ করিয়া পাশ্চাত্যের রসায়ন-ভাণ্ডার স্ফুষ্ট ও পুষ্ট হইয়াছিল। এ সকল কথা অস্বীকার করিবার কোন উপায় নাই। প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের পণ্ডিতগণ একযোগে তাহা প্রকাশ করিয়াছেন। আরবের অন্যতম প্রসিদ্ধ রসায়ন শাস্ত্রবিৎ পণ্ডিত আবুবাকার মহাম্মদ এব্‌নে জাকারীয়া রাজী ( ابو بكر محمد بن زكريا رازى ) — প্রণীত আল আস্‌রার ( الاسرار ) ও আত্তামসআলালহেলাল ( الطمس على الهلال ) নামক রসায়ন শাস্ত্রের গ্রন্থদ্বয় ল্যাটীন ভাষায় ও পাশ্চাত্য অন্যান্য ভাষায় বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন লেখকগণ কর্ত্তৃক অনুবাদিত হইয়াছে।

এক্ষণে আমরা রসায়ন শাস্ত্রে গভীর জ্ঞান সম্পন্ন সুবিখ্যাত পণ্ডিত মহাত্মা জাবের এবনে হাইয়ানের জীবন কাহিনী ও তাঁহার রচিত গ্রন্থাবলীর আলোচনা করিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

অধিকাংশ ঐতিহাসিকের মতে খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর প্রথম ভাগে জাবের এব্‌নে হাইয়ান জন্মগ্রহণ করেন।

**জাবের এব্‌নে হাইয়ানের জীবন কাহিনী ও তাঁহার গ্রন্থরচনা**

তাঁহার জন্মস্থান সম্বন্ধে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতানৈক্য দেখিতে পাওয়া যায়। এক সম্প্রদায় বলেন—খোরাসানের অন্তর্গত 'তুস' নগরী তাঁহার জন্মভূমি। অন্য সম্প্রদায় বলিয়াছেন এরাকে আরবের অন্তর্ভূত হেরান নামক স্থানে তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, জীবনের অধিকাংশ সময় তিনি কুফা নগরীতে রসায়ন—শাস্ত্রের আলোচনা ও গবেষণায় অতিবাহিত করিয়াছেন। দুইশত বৎসর পূর্ব্বে একবার কুফানগরীতে মৃত্তিকান্তর খনন করিবার সময় তাঁহার সুবৃহৎ রসায়নাগারের ও ঐ কার্য্যে ব্যবহৃত বহু যন্ত্রতন্ত্রের ভগ্নাবশেষ আবিষ্কৃত হইয়াছিল। কিছুদিন তিনি তৎকালীন মোসলেম রাজধানী বাগদাদ নগরে অবস্থান করিয়াছিলেন। কেহ কেহ তাঁহাকে সিভিলের (Siveille) অধিবাসী বলিয়াছেন; কিন্তু ইহার মূলে আদৌ কোন সত্য নিহিত নাই। জাবের এব্‌নেআফ্‌লাহ্‌ অশবেলী ( جابر بن افلاح اشبيلى ) নামক অন্য একজন মুসলমান পণ্ডিত ঐ স্থানের অধিবাসী ছিলেন, তাই জাবেরের নাম দেখিয়াই অনেকে তাঁহাকে জাবের এব্‌নে হাইয়ান মনে করিয়া এই প্রকার ভ্রম ধারণায় উপনীত হইয়াছেন।

অনেকে বলিয়াছেন—জাবের প্রসিদ্ধ এমাম হজরৎ জাফর সাদেকের ছাত্র ও শিষ্য ছিলেন। এখানে অধ্যাপক Ruska একটী সমস্যার উল্লেখ করিয়াছেন, তিনি বলিয়াছেন, এমাম জাফর হজরৎ মহাম্মদ মোস্তফার ( দঃ ) বংশধর ও একজন ধার্ম্মিক প্রবর সাধক মহাপুরুষ ছিলেন, তাঁহার জীবনের অধিকাংশ সময় মদীনায় আল্লার এবাদৎ-বন্দেগীতে অতিবাহিত হইয়াছে, এহেন মহাপুরুষ ধর্ম্মকর্ম্ম ও উপাসনাদি ছাড়িয়া পারদ, গন্ধক প্রভৃতি দ্রব্যাদি ও তৎসমূহের রাসায়নিক পরীক্ষার জন্য যন্ত্রতন্ত্র আদি লইয়া রসায়ন শাস্ত্রের আলোচনায় ও ছাত্রদের অধ্যাপনায় সময় অতিবাহিত করিয়াছেন, এ কথা কখনও বিশ্বাস করা যায় না। ইহার উত্তরে কথিত হইয়াছে—এমাম সাহেব ধর্ম্ম-কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া রসায়ন শাস্ত্রের আলোচনায় নিযুক্ত ছিলেন এরূপ উক্তির কোনও সার্থকতা নাই। তাঁহার সময়ে দামস্ক, বাগদাদ এলেকজাণ্ড্রিয়া প্রভৃতি অঞ্চলে রসায়ন শাস্ত্রের আলোচনা ও অধ্যাপনা বিশেষভাবে প্রচলিত ছিল, এমাম সাহেবের মদীনার বাহিরে ঐ সকল প্রদেশে যাতায়াত এমন কি কিছুদিন ধরিয়া অবস্থান করার যথেষ্ট ঐতিহাসিক প্রমাণ পাওয়া যায়। এরূপ অবস্থায় কিছুদিন ( ধর্ম্ম-কর্ম্ম বজায় রাখিয়া ) রসায়ন শাস্ত্রের অধ্যয়ন ও আলোচনায় কাটাইয়া ঐ শাস্ত্রে জ্ঞান লাভ করিয়া থাকিলে, তাঁহার মহত্ত্ব ও মর্য্যাদা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে বলিয়াই আমাদের মনে হয়। পক্ষান্তরে রসায়ন শাস্ত্রের ন্যায় এরূপ একটী হিতকরী বিদ্যার

জ্ঞানলাভ করা ও আবশ্যক মত তাহার আলোচনা ও অধ্যাপনায় কিছু সময় অতিবাহিত করা তাঁহার মর্য্যাদার হানিজনক ও তাঁহার ন্যায় মহৎ লোকের পক্ষে ইহা অসম্ভব, এরূপ যুক্তির কোনও সার্থকতা আমরা বুঝিতে পারি না।

অন্য একদল বলিয়াছেন—জাবের এবনে হাইয়ান এমাম জাফর সাদেকের নিকট দীক্ষিত হইয়া কিছুদিন 'তসুও ওয়াফ্' ও ধর্ম্ম শাস্ত্র শিক্ষা করিয়াছিলেন। এজন্য জাবেরকে তাঁহার শিষ্য ও ছাত্র বলা হইয়াছে।

মিষ্টার ই, জি, হলাম ইয়ার্ড, এম, এ, এফ, আই সি লিখিয়াছেন—মোসলমান ঐতিহাসিকগণের বর্ণনার মধ্যবর্ত্তীতায় জাবেরের জীবনী সম্বন্ধে আমি যাহা কিছু জানিতে পারিয়াছি, Royal Society of medicine হইতে প্রচারিত পত্রিকার ১৯২২ খৃষ্টাব্দের সপ্তদশ সংখ্যায় তৎসমূহ প্রকাশিত হইয়াছে, তৎপর সুবিখ্যাত মোসলমান লেখক 'জল্‌দিকী'র রচিত একটী পুস্তিকা আমার হস্তগত হইয়াছে তাহাতে ও এসলামিক যুগের রসায়ম শাস্ত্র সম্বন্ধীয় তাঁহার রচিত দায়েরাতুল মায়ারেফ ( دائرة المعارف ) এবং কেতাবুল বোরহান ফি আসরারে এলমিল মিজান ( كتاب البرهان فى اسرار علم الميزان ) নামক গ্রন্থদ্বয়ের প্রথমেই তিনি লিখিয়াছেন ( ১ )—অধ্যাপক প্রবর জাবের এবনে হাইয়ান এবনে আব্দিল্লা কুফা নগরীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণ 'তূসের' অধিবাসী ছিলেন। আজাদ নামক একটী সুবিখ্যাত পরিবারে তাঁহার জন্ম হয়। এমনের অধিবাসী সুবিখ্যাত পণ্ডিত মহাত্মা "হরবী আলহামিরী"র তিনি প্রিয়ছাত্র ছিলেন। বহুদিন ধরিয়া তাঁহার নিকট জাবের নানা শাস্ত্রের অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। মহাত্মা 'হরবী' একজন প্রকৃত সুফী ছিলেন। তাঁহার ন্যায় অধিক বয়সের লোক তখন আর কেহই ছিলেন না। ঐতিহাসিকগণ তাঁহার নামের সহিত "মোয়াম্মার" ( অধিকবয়স্ক ) কথাটী বরাবর ব্যবহার করিয়াছেন। হেজরতের পূর্ব্বে তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং হিজরী ১৭০ সালের পর খলিফা হারুন রসিদের খেলাফতের সময় পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন। জাবের মহাত্মা 'হরবী'র নিকট পদার্থবিদ্যা ও রসায়ন শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, অধ্যয়ন শেষে এমাম জাফর সাদেকের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন। অতঃপর "আল্‌বরামাকা" নামক সুবিখ্যাত পণ্ডিতের সহযোগীতায় জাবের রসায়ন শাস্ত্রের আন্দোলন আলোচনা ও যন্ত্রাদির সাহায্যে তৎসম্বন্ধীয় নানা গবেষণায় বহুদিন ধরিয়া রত ছিলেন। এই সময় তিনি বাহ্যজগতের সহিত সম্পূর্ণরূপে সংশ্রব পরিশূন্য হইয়া কাটাইয়াছিলেন। ইহার কিছুদিন পর মন্ত্রীপ্রবর জাফরের সহিত তাঁহার পরিচয় হয়, জাফর তাঁহার পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হইয়া খলিফা হারুন রসিদের দরবারে তাঁহাকে লইয়া যান এবং খলিফার সহিত তাঁহার সাক্ষাৎভাবে পরিচয় করিয়া দেন, এই সময় জাবের 'কেতাব শগুফা' ( The book of Blossom ) নাম দিয়া রসায়ন শাস্ত্রে একখানি গ্রন্থ রচনা করিয়া খলিফা হারুন রসিদের নামে তাহা উৎসর্গ করেন। এই কেতাবে তিনি রসায়ন শাস্ত্র সম্বন্ধে সংক্ষেপে বহু আবশ্যকীয় বিষয়ের আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহার উৎসাহ ও পরামর্শে খলিফার আদেশমত কনষ্টান্টিনোপল হইতে গ্রীস-দর্শন, বিজ্ঞান ও রসায়ন শাস্ত্রের বহু গ্রন্থ বাগদাদের সুবিখ্যাত লাইব্রেরীতে আনীত হইয়াছিল। ন্যায় শাস্ত্রে সে সময় তিনি অদ্বিতীয় পণ্ডিত বলিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন।

সর্ব্বপ্রথমে যে বানী ওমাইয়া বংশীয় খলিফা খালেদ এব্‌নে এজীদ গ্রীস-গ্রন্থাবলী সংগ্রহ করিয়া আরবী ভাষায় অনুবাদ করাইয়াছিলেন। পরবর্ত্তী সময়ে খলিফা আলমামুনের রাজত্বকালে এই কার্য্য চরম সীমায় উপনীত হইয়াছিল। তিনি আর্ম্মেনীয়ার বিদ্যোৎসাহী নরপতি লিউ ( Leo ) এর নিকট একদল আরব পণ্ডিত পাঠাইয়া তাঁহার জগৎ বিখ্যাত লাইব্রেরী হইতে গ্রীস ভাষার বহু গ্রন্থ আরবীতে অনুবাদ করাইয়াছিলেন। রাজধানী বাগদাদ নগরীতে "বয়তুল হেকমৎ ( বিজ্ঞানাগার ) নামে একটী বিরাট অট্টালিকা নির্ম্মাণ করাইয়া তন্মধ্যে জ্যোতির্ব্বিদ্যা, ন্যায়, দর্শন প্রভৃতি নানা শাস্ত্রের আলোচনা বিশেষতঃ বিভিন্ন ভাষার গ্রন্থাবলীর অনুবাদকার্য্যের জন্য এক একটী ভিন্ন ভিন্ন বিভাগ স্থাপন করিয়াছিলেন। প্রত্যেক বিভাগে সেই বিভাগের বিশেষজ্ঞ পণ্ডিতমণ্ডলীর দ্বারা নূতন নূতন তত্ত্বের আবিষ্কার, গ্রন্থরচনা, গভীর গবেষণা ও অনুবাদের কার্য্য পরিচালনার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

( ১ ) Encyclo Pœdia

জাবের জীবনের অধিকাংশ সময় রসায়ন শাস্ত্রের আলোচনায় অতিবাহিত করিয়াছেন, অন্যান্য শাস্ত্রেও তিনি বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। ঐতিহাসিকগণ সকলেই তাঁহাকে রসায়ন শাস্ত্রের একজন বিশেষজ্ঞ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। অনেকে বলিয়াছেন—জাবের গ্রীস ভাষাতেও অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার লিখিত 'কেতাবুল ফেহ্‌রান্ত' ( كتاب الفهرست ) নামক গ্রন্থে তাঁহার স্বরচিত গ্রন্থ সমূহের একটী বিস্তৃত তালিকা প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা হইতে জানিতে পারা যায় তিনি রসায়ন শাস্ত্র ব্যতীত অন্যান্য শাস্ত্রেও বহু গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার রচিত রসায়ন শাস্ত্রের গ্রন্থ সমূহে রাসায়নিক দ্রব্য সমূহের আলোচনা এবং এক দ্রব্যের সহিত অন্য দ্রব্যের সংমিশ্রণ প্রক্রিয়া এবং যন্ত্রাদি সম্বন্ধে বিচার বিশ্লেষণ অতি সুন্দরভাবে সরল ও প্রাঞ্জল ভাষায় লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

পূর্ব্বোল্লিখিত কেতাবুলফেহ্‌রাস্তে জাবের-রচিত কেতা-বুলএসতেতাম নামক রসায়ন শাস্ত্রের একখানি কেতাবের নাম দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাতে ধাতব-পদার্থের বর্ণনা ও তৎসমূহের পূর্ণতা প্রাপ্তি সম্বন্ধে নানা প্রক্রিয়া লিখিত হইয়াছে, মৌলিক ও যৌগিক উভয় প্রকার ধাতুই রৌপ্য ও গন্ধকের সংমিশ্রণ ব্যতীত আর কিছুই নহে, ইহাই তাঁহার অভিমত। তাঁহার রচিত কেতাবুল আদাত ( Ketabul Idat ) নামক আর একখানি গ্রন্থেও ঠিক ইহাই বর্ণিত এবং ল্যাটীন ভাষার বহুগ্রন্থে এইমত প্রকাশিত হইয়াছে। কেতাবুল্ এস্‌তেতাম গ্রন্থে লবণ, ফটকিরী ( Atroments ), সীসক, সোহাগা ও সির্কা প্রভৃতির সংযোগে বিভিন্ন ধর্ম্ম ও গুণ বিশিষ্ট দ্রব্যাদি সৃষ্টির প্রক্রিয়া সমূহ বর্ণিত হইয়াছে। ল্যাটীন গ্রন্থেও ঠিক একই ভাবে এই সকল কথার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। জাবেরের রচিত 'মজমুয়ে কামাল' ( The Sum of perfection ) নামক আর একখানি গ্রন্থে রসায়ন শাস্ত্রের বহু অভিনব তত্ত্ব বর্ণিত হইয়াছে। "রোতাবাতুল হেকাম," 'হেদায়াতে জাবের,' 'কেতাবুল খাওয়াস' ও 'কেতাবুত্ তথলীস্' রসায়ন শাস্ত্র সম্বন্ধে আরবী ভাষায় লিখিত এই চারিখানি গ্রন্থও জাবের এব্‌নে হাইয়ানের রচিত।

এক্ষণে উপরের লিখিত বর্ণনা সমূহ হইতে এই কয়টী বিষয় নিঃসন্দেহরূপে প্রমাণিত হইতেছে —

(১) সুবিখ্যাত মুসলমান পণ্ডিত জাবের এবনে হাইয়ানকেই পাশ্চাত্য লেখকগণ গিবার বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

(২) জাবের একজন সর্ব্বশাস্ত্রবিৎ পণ্ডিত ও রসায়ন শাস্ত্রে গভীর জ্ঞান সম্পন্ন বিশেষজ্ঞ ছিলেন।

(৩) ল্যাটীন ভাষার যে সকল গ্রন্থের সহিত জাবেরের নাম সংশ্লিষ্ট হইয়াছে, সেগুলি তাঁহার রচিত আরবীগ্রন্থ হইতেই পরিগৃহীত ও সঙ্কলিত হইয়াছে।

( ৪ ) ল্যাটিন গ্রন্থ ও আরবী কেতাবসমূহের ভাব ও বিষয় বর্ণনার ক্রম সমাবেশের মধ্যে বিশেষ সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হইয়া থাকে।

( ৫ ) পাশ্চাত্য রসায়ন শাস্ত্র আরবী রসায়ন শাস্ত্রের নিকট বিশেষভাবে ঋণী!

মহাত্মা জাবের খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর প্রথম ভাগে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি ৯০ বৎসর বয়সে অষ্টম শতাব্দীর শেষভাগে অথবা ৯ম শতাব্দীর প্রারম্ভে নশ্বর জগৎ হইতে চির বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন। আরবী ভাষায় বিভিন্ন শাস্ত্রে তিন সহস্র গ্রন্থ তাঁহার জীবন কালে তিনি রচনা করিয়াছিলেন।

# আলোচনা

## তারতম্যের কারণ কি?

মুছলমান সমাজের বর্ত্তমান ধর্ম্মভাব-হীনতার জন্য আমরা সাধারণতঃ ইংরাজী শিক্ষাকেই অধিকতর দোষী বলিয়া সাব্যস্ত করিয়া থাকি। আদৌ ইংরাজী শিক্ষার না হউক, তাহার শিক্ষা-প্রণালীর মধ্যে যে নানা গভীর কু-মতলব অতিশয় প্রচ্ছন্ন ভাবে সন্নিবেশিত করিয়া রাখা হইয়াছে, দেশ-বিদেশের সুধীবৃন্দ একথা একবাক্যে স্বীকার করিতেছেন।

সর্ব্বপ্রথমে মুছলমান সমাজে ইংরাজী শিক্ষার বিশেষ প্রসার আরম্ভ হয় যুক্তপ্রদেশে, সার ছৈয়দ আহমদ প্রমুখ আলেমগণের আন্তরিক চেষ্টার ফলে। যুক্তপ্রদেশের—এবং ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশের—মুছলমানগণ যে, ইংরাজি শিক্ষা ও জ্ঞান চর্চ্চার অন্যান্য সকল দিকের হিসাবে বাঙ্গলার মুছলমান সমাজ অপেক্ষা বহুগুণে উন্নত, কোন অবস্থাভিজ্ঞ ব্যক্তিই একথা অস্বীকার করিতে পারিবেন না। অথচ আমরা দেখিতেছি, সেখানকার তরুণ ও প্রাচীন সমাজের কোন স্তরে কোনও প্রকার প্রগল্‌ভতা উচ্ছৃঙ্খলতা বা ধর্ম্মদ্রোহের সামান্য একটু আভাষও দেখিতে পাওয়া যাইতেছে না। বরং সত্যের অনুরোধে, মুক্তকণ্ঠে কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতে হইবে যে, 'হিন্দুস্থান' ও পঞ্জাবের ইংরাজী শিক্ষিত মনীষিগণের অক্লান্ত সাধনার ফলে আজ এছলামের বিস্মৃত গৌরবপুঞ্জ নূতন ভাবে দেদীপ্যমান হইয়া উঠিয়াছে, প্রধানতঃ তাঁহাদিগের প্রচেষ্টার ফলে এছলাম আজ দুনয়ার সম্মুখে মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়াইতে সমর্থ হইয়াছে।

কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে যে, বাঙ্গলার অবস্থা ইহার বিপরীত। মিঃ আমির আলীর চিরস্মরণীয় খেদমতের পর মোছলেম বঙ্গের ইংরাজী শিক্ষিত সমাজে এমন একটী লোকও জন্মগ্রহণ করিল না, যাহার কোনও প্রকার প্রতিভা বা বিশেষত্ব লইয়া আমরা বাঙ্গলার বাহিরে এতটুকু গৌরব বা আনন্দ প্রকাশ করিতে পারি—ধর্ম্মের খেদমতের কথা ত বলাই বাহুল্য। অথচ কলেজের কোর্সের দর্শন-বিজ্ঞানের দুই চারিটা পরিভাষার সহিত পরিচয় ঘটার সঙ্গে সঙ্গে—স্থানে স্থানে আদৌ পরিচয়ের সুযোগ না ঘটিয়াও—এদেশে এমন বিদ্যার বদ্‌হজম আরম্ভ হইয়া যায় যে, তাহার সশব্দ দুর্গন্ধ উদ্গারে সমাজকে সময় সময় ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িতে হয়। এখন প্রশ্ন হইতেছে যে, বাঙ্গলা ও হিন্দুস্থানের এই তারতম্যের কারণ কি? বাঙ্গলার আবহাওয়াই যদি এজন্য দায়ী হয়, তবে এই বাঙ্গলা আমির আলীকে পয়দা করিল কিরূপে? পক্ষান্তরে মিঃ আমির অলি আজীবন ইংরাজী শিক্ষা ও সভ্যতা এবং ইংরাজী পারিপার্শ্বিকতার মধ্যে সম্পূর্ণভাবে পরিবেষ্টিত থাকিয়াও এছলাম ধর্ম্ম ও মোছলেম সভ্যতার এমন অসাধারণ খেদমত করিতে সমর্থ হইলেন, ইহারই বা হেতু কি?

এই কথাগুলি একটু গভীরভাবে চিন্তা করিয়া দেখা অত্যন্ত আবশ্যক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আমাদের মতে এই তারতম্যের মূল কারণ দুইটী :—

## প্রথম কারণ

এই তারতম্যের প্রধান কারণ হইতেছে—গবর্ণমেণ্টের হাতে বাঙ্গলার আর্ব্বিশিক্ষার সর্ব্বনাশ। গবর্ণমেণ্টের অর্থে প্রতিষ্ঠিত বা সরকারী সাহায্যে পরিচালিত আরবী মাদ্রাছা গুলি বিগত অর্দ্ধশতাব্দী ব্যাপিয়া মুছলমানদিগকে আরবী পার্সী ভাষার মধ্যবর্ত্তিতায় যে "শিক্ষা" দান করিয়া আসিয়াছে, তাহাতে কোরআন ছিলনা, হাদিছ ছিলনা, ইতিহাস ছিলনা, এছলামী সভ্যতা ও মোছলেম কাল্চারের সামান্য একটু আভাষও ছিলনা। বস্তুতঃ প্রথম অবস্থায় কেরাণী সৃষ্টি করার একমাত্র উদ্দেশ্যে যে এজেন্সীগুলি খোলা হইয়াছিল, তাহাই কালে মুছলমানের ধর্ম্মশিক্ষার প্রধান কেন্দ্ররূপে প্রতীত হইতে লাগিল। ইহারই ফলে বাঙ্গলার মুছলমান ধর্ম্মচর্চ্চা, জ্ঞানসেবা, জাতীয় সভ্যতা প্রভৃতির উচ্চ আদর্শ হইতে একেবারে স্খলিত হইয়া পড়িল।

এই সকল মাদ্রাছার শেষ পরীক্ষা বা উলা-পাস করিয়া যে সকল ছাত্র আলেমের বেশে দেশময় সংক্রামক হইয়া পড়িতে লাগিলেন, ধার্ম্মিক ও দার্শনিক প্রত্যেক দিকেই তাঁহারা সম্পূর্ণ নিঃসম্বল, নিজেদের শিক্ষা সভ্যতা ও কালচার সম্বন্ধে তাঁহারা একেবারে অজ্ঞ, কোরআন হাদিছের শিক্ষার নৈতিক সাংসারিক ও আধ্যাত্মিক ভাবধারা হইতে তাঁহারা অতি শোচনীয়রূপে বঞ্চিত হইয়াছিলেন। বিশেষতঃ আধুনিক শিক্ষা সভ্যতা ও চিন্তাধারার সংস্পর্শ হইতে তাঁহাদিগকে অতি সন্তর্পনে দূরে রাখা হইয়াছিল। ফলে, যাহা এছলাম— ইঁহারা তাহা প্রকাশ করিতে পারিলেন না। পক্ষান্তরে তাঁহারা যাহা প্রকাশ করিলেন—মোটের উপর তাহা এছলাম নহে। অধিকন্তু জ্ঞানবিজ্ঞানের সহিত তাঁহাদিগের প্রকাশিত ধার্ম্মিকতার একটা বাহ্য সংঘর্ষও দিন দিন প্রকট হইয়া উঠিতে লাগিল। এইরূপে নিজস্ব বিষয়গুলির অজ্ঞতার সঙ্গে সঙ্গে পরস্ব জ্ঞানের প্রতি একটা ঘোর বিদ্বেষ তাঁহাদিগের অন্তঃ-করণকে একেবারে দখল করিয়া বসিল। তখন এই বিদ্বেষের ক্রিয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাহার কঠোর প্রতিক্রিয়াও স্বাভাবিক ভাবে আরম্ভ হইয়া গেল, এবং মোছলেম-বঙ্গের শিক্ষিত সমাজের দুইটী শাখা ও এই শাখাদ্বয়ের চিন্তা ও সাধনা—পরস্পরের সাহচর্য্যে সম্পন্ন ও সুফলপ্রদ হওয়ার পরিবর্ত্তে—পরস্পরের সহিত কঠোর সংঘর্ষে লিপ্ত হইয়া উভয়ই সম্পূর্ণরূপে দুর্ব্বল ও নিষ্ফল হইয়া পড়িল।

## দ্বিতীয় কারণ

আমাদের মতে এই তারতম্যের দ্বিতীয় কারণ হইতেছে, ইংরাজী শিক্ষা প্রণালী সম্বন্ধে মোছলেম বঙ্গের বিশেষ অবস্থা। শৈশবকাল হইতে আরম্ভ করিয়া বিদ্যালয় পরিত্যাগ করা পর্য্যন্ত, বাঙ্গলা ও ইংরাজীর মধ্যবর্ত্তিতায় তাহাদিগকে ক্রমাগত এমন শিক্ষা দেওয়া হইল, যাহাতে তাহার জাতীয় আত্মসন্মান জ্ঞান, তাহার অতীতের গৌরবগাথা এবং তাহার ভবিষ্যতের আশা-আশঙ্কার কোনই স্থান নাই। শুধু ইহাই নহে, বরং এই সঙ্গে আমাদের বালক ও যুবকগণের মন ও মস্তিষ্কের উপর একদিকে যেমন ছাপ মারিয়া দেওয়া হইতে লাগিল যে, সৎ মহৎ ও উত্তম বলিয়া দুনয়ায় গর্ব্বের গৌরবের ও আনন্দের যাহা কিছু আছে, সে সমস্তই হইতেছে ভারতের ও ইংলণ্ডের আর্য্যদিগের একচেটিয়া সম্পত্তি; অন্যদিকে যুগপৎভাবে তাহার অন্তঃকরণে ইহাও উত্তমরূপে বদ্ধমূল করিয়া দেওয়া হইল যে, সে সকল গৌরবে তাহার যে কোন অধিকার নাই—কেবল তাহাই নহে, বরং দুনয়ার সকল অকল্যাণ ও সমস্ত অমঙ্গলের একমাত্র কারণ হইতেছে—সে ও তাহার এছলাম।

হিন্দুস্থানেও এ চেষ্টার ত্রুটি করা হয় নাই। কিন্তু সেখানে তাহা ফলবতী হইতে পারে নাই যে যে কারণে, বাঙ্গলায় তাহার সম্পূর্ণ অভাব ঘটিয়াছিল। এই অভাবের জন্যই বাঙ্গলা ও হিন্দুস্থানের ইংরাজী শিক্ষিত সমাজের ভাব, চিন্তা ও সাধনার ধারায় আজ এমন আকাশ পাতাল পার্থক্য দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। আমরা সংক্ষেপে ও স্বতন্ত্রভাবে এই কারণগুলির উল্লেখ করিতেছি :—

(১) পাশ্চাত্যবাদের দমকা তুফান ভারত উপকূলে প্রচণ্ড আকারে দেখা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হিন্দুস্থানের দূরদর্শী সুধীবৃন্দ তাহার আক্রমণ হইতে স্বজাতিকে রক্ষা করার জন্য দৃঢ়তার সহিত প্রস্তুত হইয়াছিলেন। তাহার ফলে সে তুফান তাঁহাদের কোন অহিত ত করিতেই পারিল না, বরং তাহাকে দিয়া তাঁহারা কএক শতাব্দীর পুঞ্জীকৃত আবর্জ্জনা জঞ্জাল পরিষ্কার করাইয়া লইলেন, এবং তাহার পর নির্ম্মল উজ্জল সত্যকার এছলামকে সগর্ব্বে উর্দ্ধে তুলিয়া ধরিলেন—বিমূঢ় উদভ্রান্ত তরুণ যাত্রীদিগের চোখের সম্মুখে! এছলামের সে রূপ দেখিয়া

তাহারা আশ্বস্থ ও আশ্বস্ত হইল, শান্তি ও তৃপ্তিতে তাগদের মনোপ্রাণ পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল।

(২) পঞ্জাব ও হিন্দুস্থানে মুছলমান বালক ও যুবকগণের শিক্ষার ভার পড়িয়াছিল, সাধারণতঃ তাহাদিগের স্বজাতীয় শিক্ষকগণের উপর। ইহাতে যথেষ্ট সুফল ফলিয়াছিল, অন্ততঃ এ দেশের মত মারাত্মক কুফল ফলিবার কারণ সেখানে উপস্থিত হয় নাই।

(৩) পঞ্জাব ও হিন্দুস্থানের মুছলমান ছাত্র শৈশব হইতে বিদ্যালয় ত্যাগ করা পর্য্যন্ত আরবী পার্সী বা উর্দ্দু ভাষার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সম্বন্ধ স্থাপন করিতে অভ্যস্ত হইয়া থাকে। সুতরাং চোখে ঠুসি দিয়া তাহাকে অন্ধ করিয়া রাখা কাহারও পক্ষে সম্ভবপর হয় নাই।

বাঙ্গলার অবস্থা ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত, তাই বাঙ্গলা ও হিন্দুস্থানের মধ্যে এই তারতম্য। বাঙ্গলার যে কয়টী শিক্ষিত মুছলমান পরের অনুকরণে নিজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিতে ব্যগ্রতা প্রকাশ করিতেছেন, তাঁহাদের শিক্ষার গণ্ডী সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে, পাঠকগণ আমাদিগের কথার সত্যতা সম্যকরূপে উপলব্ধি করিতে পারিবেন। বিগত অর্দ্ধ শতাব্দীর মোছলেম ভারতের—এমন কি মোছলেম জগতের—ইতিহাসে যে সকল সুধী ও মনীষী ব্যক্তি নিজেদের অসাধারণ প্রতিভা ও জ্ঞান চর্চ্চার বা অন্য কোনও প্রকার কৃতিত্বের ফলে, মুছলমানকে দুনয়ায় সম্মুখে উচু করিয়া তুলিয়াছেন, তাঁহাদের প্রত্যেকের শিক্ষার বৈশিষ্ট্য লইয়া এই সঙ্গে আলোচনা করা হইলে, চিত্রের দুইটী দিক তাহার সমস্ত কারণ উপকরণ সহ দেদীপ্যমাম হইয়া উঠিবে।

মোছলেম-ভারতের কথা বাদ দিয়া হিন্দু ভারতের যুগপ্রবর্ত্তক মহা-মনীষিগণের জীবন-ইতিহাস আলোচনা করিয়া দেখিলে সেখানেও এছলামের মহিমা এবং মোছলেম সাধনার প্রভাব পূর্ণতরভাবে বিদ্যমান দেখিতে পাওয়া যাইবে। কবিরও চৈতন্য হইতে আরম্ভ করিয়া রামমোহন, দেবেন্দ্রনাথ, রামকৃষ্ণ পরমহংস প্রভৃতি মহাজনগণের সাধনা ও সিদ্ধি, এছলামের জ্ঞান ও ভাবধারার নিকট যে কি পরিমাণে ঋণী, ইঁহাদের জীবনীগুলি সরাসরি ভাবে আলোচনা করিয়া দেখিলেও তাহার একটা মোটামুটি আভাষ পাওয়া যাইতে পারে। কিন্তু আমাদেরই কতিপয় সাহিত্যিক, চিন্তাচর্চ্চা ও জ্ঞানমুক্তির শাব্দিক আড়ম্বর মাত্রের উপর নির্ভর করিয়া, এই সব হিন্দু মহাজনের প্রতি ইঙ্গিত করতঃ, শিক্ষিত যুবকগণকে ধর্ম্মোদ্রোহী করিয়া তোলার চেষ্টা পাইতেছেন। তাঁহাদিগের সমস্ত যুক্তিবাদের সারাংকার এই যে, এছলামের গণ্ডী ও কোরআন হাদিছের বচনের প্রভাব হইতে মুক্ত হইতে পারে নাই বলিয়া, মুছলমান সমাজে নানক-চৈতন্য এবং রামমোহন-রামকৃষ্ণ প্রভৃতির ন্যায় মহাজন পয়দা হইতে পারিতেছেন না। অথচ নানক নানক হইয়াছেন, রামমোহন যুগপ্রবর্ত্তকরূপে আত্ম প্রতিষ্ঠা করিতে পারিয়াছেন—একমাত্র না হউক—প্রধানতঃ কোরআন হাদিছের স্বর্গীয় শিক্ষার বরকতে, এবং মুছলমান সাধু মহাপুরুষগণের পুতপবিত্র জীবন-আদর্শের অনুশীলন ও অনুসরণের ফলে।

---

## নোবেল প্রাইজ

রবীন্দ্রনাথ নোবেল-প্রাইজ লাভ করাতে তাঁহার গৌরব বিশেষ বর্দ্ধিত হইয়াছে কিনা—জানি না। কিন্তু একথা সত্য যে, এই ব্যাপারে নোবেল-প্রাইজের নাম ও তাহার গুরুত্ব এদেশে খুবই বাড়িয়া গিয়াছে। এই নোবেল-প্রাইজের জন্য ইউরোপের বিভিন্ন জ্ঞান-কেন্দ্র হইতে আজ পর্য্যন্ত মাত্র দুইজন ভারতীয় মুছলমানের নাম প্রস্তাবিত হইয়াছে। তাহার মধ্যে প্রথম হইতেছেন—হেজাজীয় অমৃত-মদিরার অনুরক্ত ভক্ত স্বনামধন্য—একবাল। আর একজন হইতেছেন—ক্যাম্‌ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের র‍্যাংলার, বহুভাষাবিশারদ পণ্ডিত মাওলানা মোহাম্মাদ এনায়তুল্লা খাঁ এম-এ, এফ-আর এস। উর্দ্দু ভাষায় তফছিরের একখণ্ড ভূমিকা লিখিয়াই তিনি পাশ্চাত্য মনীষীদিগের নিকট এই recognition লাভে সমর্থ হইয়াছেন।

পাশ্চাত্যজগতের অন্তরাত্মা জড়বাদের রুদ্র তাপে শুকাইয়া শুকাইয়া এক রসহীন, ছায়াহীন, শান্তিহীন, তৃপ্তিহীন উষর মরুক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে। তাই দীর্ঘকালের আত্ম-বিস্মৃতির পর এই ভোগময় জ্বালাময় জীবনের অতৃপ্তি নিবারণ করার জন্য সেখানে একটা ব্যাকুল আগ্রহ জাগ্রত হইয়া উঠিতেছে। খৃষ্টান সন্ন্যাসীদিগের বৈরাগ্যের পরীক্ষা ইউরোপ উত্তমরূপে করিয়া দেখিয়াছে এবং বিফল ও মারাত্মক বলিয়া তাহাকে সে দূরে ছুঁড়িয়া ফেলিয়াছে। ভোগের ও স্বেচ্ছাচারের

চরমও সে করিয়া দেখিয়াছে এবং তাহার ব্যক্তিগত ও ব্যষ্টিগত জীবনের প্রত্যেক স্তরে, তাহার মারাত্মক কুফল গুলি চরম চণ্ডতা সহকারে আত্মপ্রকাশ করিয়া, আজ তাহাকে মরণের পয়গাম দিতে উদ্যত হইয়াছে। ভাবহীন ভক্তিহীন নাস্তিকতার পথেও সে প্রাণপনে ছুটাছুটি করিয়া দেখিয়াছে এবং সহস্র নরকের নিদারুণ জ্বালা বুকে ধরিয়া সে অবশেষে কোনও এক অজ্ঞাত রসধারার সন্ধান লাভের জন্য অস্থির হইয়া পড়িয়াছে। তাই ইউরোপ আজ আবার নিজের প্রথম গুরুর পাদমূলে সমবেত হইতে বাধ্য হইতেছে। ইহা ব্যতীত তাহার জীবন রক্ষার উপায়ন্তর নাই।

রবীন্দ্রনাথের ও নোবেল প্রাইজের প্রসঙ্গে গীতাঞ্জলীর কথা মনে আসে। এক্ষেত্রে গীতাঞ্জলীর সমালোচনা করিতে যাইব না, কারণ আমরা অনধিকারী। কিন্তু অনধিকারী হইলেও, সাধারণ বাঙালী পাঠকের হিসাবে গীতাঞ্জলীর সহিত যতটুকু পরিচিত হইতে সমর্থ হইয়াছি, তদনুসারে আমরা দৃঢ়তার সহিত বলিতে পারি যে, পার্সী ও উর্দ্দুর দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্তরের অনেক কবি গীতাঞ্জলীর সাধ্য-সন্দর্ভে ইহা অপেক্ষা অনেক উচ্চ স্তরের জ্ঞান ভাব ও কল্পনার সমাবেশ সাধনে এবং মধুরতর রস সৃষ্টি করিতে সমর্থ হইয়াছেন। উভয়ের মধ্যে তুলনায় সমালোচনা করিয়া ইহা খুব সহজে প্রতিপন্ন করিয়া দেওয়া যাইতে পারে।

কিন্তু ভাদ্রের ভরাগঙ্গার তীরে বসিয়াও যে হতভাগা পিপাসায় আত্মঘাতী হইতে উদ্যত, তাহার জীবন রক্ষার কোন উপায় দুনয়ায় খুঁজিয়া পাওয়া কখনই সম্ভবপর হইবেনা।

---

## Favouritism এর মিথ্যা অপবাদ

জানুয়ারি মাসের মডার্ণ-রিভিউ পত্রে মিঃ জে, টি, সণ্ডর্ল্যাণ্ড নামক জনৈক শ্বেতাঙ্গ ভদ্রলোক হিন্দু-মুছলমানের দাঙ্গাহাঙ্গামা শীর্ষ দিয়া একটী গবেষণা মূলক প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন। প্রবন্ধের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় এই যে, ভারতের ও ইংলণ্ডের আমলাতন্ত্রের নায়কেরা নিজেদের শাসন ও শোষণ যন্ত্রগুলিকে সুপ্রতিষ্ঠিত ও সুপরিচালিত করার জন্য, ইচ্ছাপূর্ব্বক হিন্দু-মুছলমানের মধ্যে বিরোধের সৃষ্টি করিয়া থাকেন, এবং সিমলা ও লণ্ডনের এই সমবেত দুরভিসন্ধির ফলেই এ দেশে এমন ভাবে সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ সংঘটিত হইতে এবং তাহা এরূপ শোচনীয় আকার ধারণ করিতে পারে। লেখকের মতে নিজেদের এই দুরভিসন্ধি সফল করার জন্য আমলাতন্ত্র দুইটী উপায় অবলম্বন করিয়া থাকেন —

(১) Favouritism shown by the Government to Mohamadans মুছলমানদিগের প্রতি গবর্ণমেণ্টের বিশেষ অনুগ্রহ বা পক্ষপাত প্রদর্শন।

(২) Communal election বা সম্প্রদায়িক নির্ব্বাচন।

আমলাতন্ত্র গবর্ণমেণ্ট নিজেদের অভিসন্ধি সাধনের জন্য বিগত দুই শত বৎসর হইতে প্রকাশ্যে বা গোপনে যে সমস্ত কার্য্য পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া আসিতেছেন, প্রকাশ্য ভাবে তাহার আলোচনা হওয়া যে নিতান্ত আবশ্যক হইয়া দাঁড়াইয়াছে, প্রত্যেক অবস্থাভিজ্ঞ ব্যক্তি তাহা স্বীকার করিবেন। কিন্তু দেশবাসী সকল সম্প্রদায়ের চক্ষু দানের জন্য এই মায়াবীদিগের কুহকজালগুলি সম্বন্ধে তাহার সত্য ও নিরপেক্ষ সমালোচনা হওয়ার দরকার, নচেৎ হিতে বিপরীত ঘটিবার আশঙ্কাই অধিক। মিঃ সণ্ডর্ল্যাণ্ড যে ভাবে এই আলোচনার সূত্রপাত করিয়াছেন, তাহা দ্বারা মুছলমান সমাজের—চক্ষুদানের পরিবর্ত্তে—মায়া-মৌতাত আরও বাড়িয়া যাওয়ার আশঙ্কা আছে। তাহার পর তাঁহার কথাটা পক্ষপাত বর্জ্জিতও নহে।

মুছলমানের বিরুদ্ধে আজ পর্য্যন্ত যে সকল direct action ইংরাজ কর্ত্তৃক অবলম্বিত হইয়াছে, অন্ততঃ এক শ্রেণীর মুছলমান—মুখে না বলুন—মনে মনে সে গুলি সম্যকরূপে উপলব্ধি করিয়া থাকেন। এই সকল প্রত্যক্ষ আক্রমণে মুছলমানের তত ক্ষতি সাধিত হয় নাই—যত ক্ষতি হইয়াছে, ইংরাজের অপ্রত্যক্ষ আক্রমণে বা তাঁহাদের সর্ব্বনাশী মায়ার মারাত্মক কুহক মন্ত্রে।

মুছলমান যে অনুন্নত পশ্চাৎপদ আত্ম-নির্ভর শক্তি বর্জ্জিত একটী অপদার্থ জাতি, এই মহা-সর্ব্বনাশকর মিথ্যা প্রতীতি মোছলেম জনসাধারণের অন্তরে বদ্ধমূল হইয়া-গিয়াছে, এই কুহকের ছলনায়।

হিন্দুর তুলনায় ইংরাজরাজ মুছলমানের প্রতি সমধিক Favour বা অনুগ্রহ প্রদর্শন করিয়া থাকেন, ইহা হইতেছে বিলাতী মায়ার দ্বিতীয় কুহক।

এই দুই মায়ার মারাত্মক মৌতাতে মুছলমান আজ

একেবারে অন্ধ আবিষ্ট আত্মবিস্মৃত, সুতরাং দুনয়ার জীবন সংগ্রামে আত্ম-প্রতিষ্ঠায় সম্পূর্ণ অসমর্থ। বাস্তবের শত শত তীব্র কষাঘাতও আজ তাহার এই মরণ মৌতাতের মোহ তন্দ্রা ভাঙ্গিয়া দিতে সমর্থ হইতেছে না। এ অবস্থায় বিলাতী বণিকের রাজনৈতিক-বিপণি হইতে নূতন নূতন মোহ-মদিরা আমদানী করিয়া, এই শোচনীয়তার চিত্রকে যাঁহারা শোচনীয়তর করিয়া তুলিতে চাহিতেছেন, তাঁহারা দেশের শত্রু— কারণ তাঁহারা মুছলমানের শত্রু।

সণ্ডরল্যাণ্ড সাহেব, সার বমফিল্ড ফুলারের Favourite wife বা সুয়োরাণীর কথা পাড়িয়া নিজের দাবী সপ্রমাণ করিতে চাহিয়াছেন। কিন্তু আমাদের মতে ইহাই তাঁহার উক্তির ভিত্তিহীনতার একটা প্রধানতম প্রমাণ। বিশেষ অনুগ্রহ প্রদর্শন ত দূরে থাকুক, মুছলমানকে ইংরাজরাজ যদি সাধারণ ভাবেও গণনার গণ্ডীর মধ্যে আমল দিতে কুণ্ঠিত না হইতেন, তাহাহইলে সাতকোটী মুছলমানের গভীর মর্ম্মবেদনার প্রতি অমন নির্ম্মমভাবে উপেক্ষা প্রদর্শন পূর্ব্বক বঙ্গব্যবচ্ছেদ রহিত করিয়া দিতে একটু দ্বিধা বোধ করিতেন।

সর্ব্বত্রই এই অবস্থা। কার্য্যক্ষেত্রের এরূপ বহুনজির উদ্ধৃত করিয়া দেখান যাইতে পারে যে, ইংরাজের শাসননীতি মুছলমানের প্রতি কস্মিন কালে কোনও প্রকার বিশেষ অনুগ্রহ প্রদর্শন করে নাই। বরং প্রায় সর্ব্বত্রই ন্যায্য প্রাপ্য হইতে বঞ্চিত রাখিয়া উহা মুছলমানের প্রভূত অনিষ্ট সাধনই করিয়া আসিয়াছে।

তবে একটা কথা খুবই সত্য যে, ইংরাজ রাজকর্ম্মচারিদিগের মধ্যকার কোন কোন উচ্চপদস্থ ব্যক্তি, তাঁহাদিগের সাময়িক আবশ্যকতার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া কোন কোন সময় মুখের কথায় মোছলেম-প্রীতির বাণ ডাকাইয়া দিয়াছেন। কিন্তু মানুষের—বিশেষতঃ শ্বেতবর্ণ মানুষের— কথায় ও কাজে সর্ব্বত্র সামঞ্জস্য রক্ষিত হওয়ার নিশ্চয়তা একটা স্বীকৃত বিষয় বলিয়া কখনই গৃহীত হইতে পারে না। এজন্য প্রতিপক্ষের কর্ত্তব্য, ইংরাজরাজ কোন সূত্রে কোন মুছলমানের প্রতি কি প্রকারে কোন "অনুগ্রহ" প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহার দুই চারিটার নাম করিয়া হাতে কলমে তাহা ধরাইয়া দেওয়া। আমরা দাবী করিয়া বলিতে পারি, বিশেষ অনুগ্রহের আশঙ্কায় আতঙ্কগ্রস্ত অমুছলমান অথবা বিশেষ অনুগ্রহের মায়ামন্ত্রে সম্মোহিত মুছলমান, ঐ বহুবিশ্রুত অশ্বডিম্বের বাস্তব সত্তার একটা নিদর্শনও দেখাইয়া দিতে পারিবেন না।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি—কোন কোন উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী নিজেদের গূঢ় অভিসন্ধি সাধনের জন্য, মধ্যে মধ্যে মুখের কথায় মোছলেম প্রীতির বাণ ডাকাইতে কুণ্ঠিত হন নাই। কিন্তু ইংরাজ শাসনের বিগত ১৭০ বৎসরের প্রকাশ্য ও গোপনীয় কাগজপত্রগুলি একটু মনোযোগ পূর্ব্বক অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে, তাঁহাদের শাসননীতির মোছলেম প্রীতির প্রকৃত স্বরূপ ও বাস্তব তাৎপর্য্য সম্বন্ধে অনেক বিপরীত তথ্য অবগত হইতে পারা যাইবে। সণ্ডরল্যাণ্ড সাহেব সেগুলি প্রকাশ করিয়া দিলে তাহাদ্বারা দেশের প্রভূত উপকার সাধিত হইবে বলিয়া আশা করি।

---

# মছিহুল্-মুল্ক হাকিম আজমল খাঁ

[ নজীর আহমদ চৌধুরী ]

মোছলেম জগতের গৌরব রবি, অকৃত্রিম ভারত বন্ধু, মছিহুল্-মুল্ক জনাব হাকিম মোহাম্মদ আজমল খাঁ ছাহেব আর এ জগতে নাই। স্বদেশের তেত্রিশ কোটি নরনারীকে **অনন্ত** শোক সাগরে ভাসাইয়া—তিনি ১৯২৭ সালের ২৮শে ডিসেম্বর তারিখে অনন্তধামে মহাপ্রস্থান করিয়াছেন।

ইন্না লিল্লাহে অ-ইন্না ইলায়হে রাজেউন!

হাকিম আজমল খাঁ ছাহেব একদিকে কোরআনের হাফেজ, শরিয়তের আলেম, এবং ইউনানী চিকিৎসাশাস্ত্রের মহা পণ্ডিত ছিলেন—অন্যদিকে দেশ বিদেশের নানা জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সাহিত্যদর্শনেও তিনি বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। তাঁহার কর্ম্মময় জীবন ও জীবনময় ত্যাগ, মধুরে গম্ভীরে অনুপম তাঁহার চরিত্র, পুণ্যেপ্রেমে পরিপূর্ণ তাঁহার প্রাণ, ন্যায়ে সত্যে সাহসে বীর্য্যে উদ্বুদ্ধ তাঁহার হৃদয়। মরহুম হাকিম ছাহেবের সেই বিভিন্নমুখী প্রতিভা, সেই চরিত্রগত অসাধারণ মাহাত্ম্য এবং সেই জীবনব্যাপী অক্লান্ত সাধনা সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করা এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে, কারণ এ দীন লেখকের পক্ষে এখন তাহা সম্ভবপর হইবে না।

১৯২৭ সালের ২৮শে ডিসেম্বর তারিখে এবারকার মত কংগ্রেসের কাজ শেষ হইয়া যায়—হিন্দু মুছলমানের মিলন প্রস্তাব গ্রহণ করিয়া। ইহাই ছিল হাকিম ছাহেবের কর্ম্মময় জীবনের শেষ সাধনা—শেষ সাধনার চরম সিদ্ধি। এই সিদ্ধির সন্দেশ তাঁহার কর্ণগোচর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে, উপর হইতে ডাক আসিয়াছিল—আজমল! আমার তেত্রিশ কোটি সন্তানের অকৃত্রিম সেবক! তোমার কর্ত্তব্য শেষ হইয়াছে; তোমার সাধনা সার্থক হইয়াছে। কোটি কণ্ঠের ব্যাকুল আশীর্ব্বাদ ভূষিত হইয়া, হে প্রিয়তম! আমার রহমতের কোলে ফিরিয়া আইস!

আজমল চলিয়া গেলেন—তাঁহার কর্ম্মজীবনের পুণ্য আদর্শ আমাদিগকে দান করিয়া, অমর হইয়া।

* * * *

সিপাহী যুদ্ধের অল্পকাল পরে অতীত গৌরবের স্মৃতি-শ্মশান দিল্লীনগরে শরিফ মনজিলে স্বনামখ্যাত শাহী-হাকিম খান্দানে আজমলের জন্ম হয়। বংশগত আত্মসম্মান জ্ঞানের তীব্র তাড়ণায় পিতা তাঁহাকে নাছারার ভাষা শিক্ষা দিতে সম্মত হন নাই—দাস মনোভাব হইতে পুত্রকে রক্ষা করার আগ্রহাতিশয্যের ফলে। কিন্তু পূর্ব্ব পুরুষের গৌরব রক্ষার জন্য তিনি পুত্রকে সকল প্রকার প্রাচ্য জ্ঞানবিজ্ঞান ও সাহিত্য দর্শনে পারদর্শী করিয়া তুলিতে চেষ্টার ত্রুটি করেন নাই। দিল্লীর আধ্যাত্মিক শাহ-পরিবারের শেষ প্রদীপটী তখনও নির্ব্বাপিত হয় নাই। হাকিম আজমল খাঁ সেখানে কোরআন হাদিছের শিক্ষা সম্পন্ন করিয়া ছনদ লাভ করেন। ফলে পিতার জীবদ্দশায় হাকিম ছাহেবের বিভিন্নমুখী যশোরাশি ভারতময় ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল, ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হাকিম বলিয়া তিনি সর্ব্বত্রই সমাদৃত হইতে লাগিলেন।

হাকিম ছাহেব একজন প্রকৃত মুছলমানরূপে জীবন অতিবাহিত করিয়া গিয়াছেন। বিশ্বের যা-কিছু সৎ যা-কিছু মহৎ, সমস্তই মুছলমানের হারাধন, যেখানে পাইবে, সেখান হইতে তাহা কুড়াইয়া নিয়া নিজের ভাণ্ডার পূর্ণ করিবে—হজরতের এই মহীয়সী বাণী ছিল তাঁহার জ্ঞান-সাধনার পথের আলোক। এছলামের এই উদার শিক্ষাকে যথাযথ ভাবে তিনি গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং এই জন্যই তিনি আজ দেশে হিন্দু-মোছলেম মিলনের প্রধান প্রতীকরূপে পরিকীর্ত্তিত হইতেছেন। তাঁহার অক্ষয় কীর্ত্তি "তিব্বিয়া কলেজই" ইহার একটা প্রধানতম নিদর্শন।

চলচ্চিত্তং চলদ্বিত্তং চলজ্জীবন যৌবনম্
চলাচলমিদং সর্ব্বং কীর্ত্তির্যস্য স জীবতি।

( হাকিম আজমল্ খাঁ )

هرگز نمیرد آنکه دلش زنده شد بعشق
ثبت است بر جریدهٔ عالم — دوام ما

হাকিমী ও আয়ুর্ব্বেদী দুই চিকিৎসা বিজ্ঞানকে একসঙ্গে মিশাইয়া দিবার কল্পনা প্রথমে হাকিম ছাহেবের মস্তকে জাগিয়া উঠে, এবং বহু দিনের অক্লান্ত পরিশ্রম ও প্রভূত অর্থ ব্যয়ের পর তিনি নিজের এই কল্পনাকে বাস্তবে পরিণত করার সূত্রপাত করিতে সমর্থ হন। ইউনানী-আয়ুর্ব্বেদিক কনফারেন্স ও তাহার বর্ত্তমান সাধনাগুলি সেই আন্তরিক চেষ্টার অমৃতময় ফল।

দিল্লীর তিব্বিয়া কলেজ কর্ম্মবীর ত্যাগবীর হাকিম আজমল খাঁ ছাহেবের এক অক্ষয় কীর্ত্তিস্তম্ভ। হাকিম ছাহেব দিল্লী শহরের সমস্ত রোগীকে বিনাপয়সায় চিকিৎসা করিতেন

—কোন জাতি বা ধর্ম্ম বলিয়া সেখানে কোনই ভেদাভেদ ছিল না। শুনিয়াছি, দিল্লীর কোন লোকের নিকট হইতে ভিজিট পর্য্যন্ত তিনি লইতেন না। তত্রাচ তাঁহার দাওয়াখানার আমদানী ছিল—বৎসরে দুই তিন লাখ টাকা। ভারতের প্রায় সমস্ত রাজা মহারাজা ও নওয়াব সুবা তাঁহার বাঁধা খরিদার ছিলেন, অন্যান্য বড় লোকদিগের ত কথাই নাই। এ দিক দিয়াও তাঁহার প্রচুর আয় ছিল। দানবীর আজমল দীর্ঘকাল অক্লান্ত পরিশ্রম ও অগাধ ধন ব্যয় করিয়া তিব্বিয়া কলেজকে, আয়ুর্ব্বেদও এলোপেথির সমবায়ে নূতন ভাবে গড়িয়া তোলার চেষ্টা করিলেন এবং তাঁহার সেই আন্তরিক চেষ্টার ফলে মৃতপ্রায় ইউনানী চিকিৎসা-বিজ্ঞান নূতন জীবন লাভ করিতে সমর্থ হইল। অধিকন্তু লক্ষ লক্ষ টাকা আয়ের সম্পত্তি যে দাওয়াখানা, তাহাও তিনি তিব্বিয়া মাদ্রাছার নামে ওয়াক্‌ফ করিয়া দিলেন।

সিপাহী-যুদ্ধের যুগসন্ধিক্ষণের অল্পকাল পরে, বিশেষতঃ দিল্লী নগরে জন্মগ্রহণ করিয়া স্বাধীনতার মর্য্যাদা তিনি যেরূপ বুঝিয়াছিলেন, ভারতবর্ষে আর কয়জন সেরূপ বুঝিয়াছেন, তাহা জানি না। যে কোন মূল্য দান করিয়া তিনি স্বাধীনতা লাভেরই পক্ষপাতী ছিলেন। ভারতের স্বাধীনতা লাভের পথে এদেশের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মনোমালিন্যই একমাত্র অন্তরায়, তাহা তিনি মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করিতেন। বিভিন্ন সম্প্রদায় এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মিলন সাধনে তিনি যেরূপ অক্লান্ত শ্রম স্বীকার করিয়াছেন এবং অসাধারণ ত্যাগ মহিমার পরিচয় দিয়াছেন, তাহা ভারতের ইতিহাসে দুর্লভ। ১৯১৯ সালের অমৃতসর মোছলেম লীগের সভাপতিরূপে তিনি যে অভিভাষণ পাঠ করিয়াছিলেন, তাহাতে সমস্ত দেশ চমৎকৃত হইয়াছিল, তাঁহার অসাধারণ ত্যাগ ও অপূর্ব্ব সৎসাহস দেখিয়া।

হিন্দু মানসিকতার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া তিনি স্পষ্ট ভাষায় মুছলমানদিগকে যথাসাধ্য গো-জবেহ্ বন্ধ করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে শরিয়তের ব্যবস্থার সহিত তাঁহার উপদেশের সামঞ্জস্য এমনই ভাবে প্রমাণিত করিয়া দেখাইয়াছিলেন যে, বিরুদ্ধবাদীদিগকে পর্য্যন্ত স্তম্ভিত হইয়া অবনত মস্তকে তাহা গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। গুণগ্রাহীগণ শতমুখে তাঁহার সৎসাহসের প্রশংসা করিতে লাগিলেন। যে গো-কোর্ব্বানীর খাতিরে মুছলমান শত শত জীবন বলিদান করিয়াছে, তাহা বন্ধ করার পরামর্শ সত্যসত্যই তখন অচিন্তিতপূর্ব্ব ছিল। বস্তুতঃ এমন নির্ভীকভাবে স্বসমাজের ন্যায্য অধিকার ত্যাগের প্রস্তাব ভারতবর্ষের কোন সমাজপতি যে আজ পর্য্যন্ত করিতে পারেন নাই, তাহা আমরা দৃঢ়কণ্ঠে বলিতে পারি। বাঙ্গলার দধীচি দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, তাঁহার সমাজকে মুছলমান সমাজের ন্যায্য অধিকার স্বীকার করিয়া লইতে উপদেশ দিয়া নানা বিড়ম্বনা ভোগ করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু ভারত-বন্ধু আজমল খাঁ স্বসমাজকে তাহার ন্যায্য অধিকার ত্যাগের উপদেশ দিয়া সমাদর লাভ করিয়াছিলেন। অবশ্য মুষ্টিমেয় একদল মুছলমান, যাহারা উদারতা এবং স্বাধীনতার কোন মূল্য বুঝে না, তাহারা হাকিম ছাহেবের বিরুদ্ধাচরণের চেষ্টা করিয়াও ব্যর্থকাম হইয়াছে। রাজনৈতিক মতভেদের দলাদলি নিবারণে হাকিম আজমল খাঁর কৃতিত্ব কতদূর, দিল্লীর বিশেষ কংগ্রেস সম্বন্ধে যাঁহাদের সামান্য মাত্র জ্ঞান আছে, তাঁহারা অবশ্য তাহা অবগত আছেন। কংগ্রেস রাজ-নীতিকগণ পরিবর্ত্তন কামী (Swarajists) ও পরিবর্ত্তন বিরোধী ( No-Changers ) দলে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। এই দুই দলের ভীষণ আত্মকলহ দমন করিয়া কংগ্রেস বা ভারতের জাতীয় মহাসমিতিকে ধ্বংসের হাত হইতে রক্ষা করিয়াছেন, আল্লামা আবুল কালাম আজাদ। মরহুম হাকিম আজমল খাঁ ছিলেন, আবুল কালামের সবল বাহু। পরাধীন ভারতের রাজনীতির সহিত সামান্য মাত্র সম্পর্ক যাঁহার আছে, তিনিই স্বীকার করিতে বাধ্য হইবেন, দিল্লীর বিশেষ কংগ্রেসে পূর্ব্বোক্ত দুই দলের মিলন সম্ভব না হইলে এদেশে বর্ত্তমান শতাব্দীতে স্বরাজ ও স্বাধীনতার কথা মুখে আনা পর্য্যন্ত ভার হইত।

মছিহুল-মুল্ক নামে যেমন আজমল ছিলেন, তেমন কাজেও ছিলেন আজমল ( সর্ব্বগুণাকর )। সেই সর্ব্বগুণাকরের কোন্ গুণ ও কোন্ কীর্ত্তিকে বাদ দিয়া কোন্ গুণ ও কীর্ত্তির আলোচনা করিব, স্থির করিতে পারিতেছি না। তাই ভারতের হিন্দু-মুছলমান সমস্যার সমাধানের শেষ চেষ্টায় তাঁহার যে অসীম কৃতিত্ব আছে, সংক্ষেপে তাহার আভাস দিয়া ক্ষান্ত হইতেছি। অসহযোগ আন্দোলনের নেতাগণ একে একে প্রায় সকলেই যখন কারারুদ্ধ, তখন

অযুত ভক্তের শেষ অর্ঘ্য
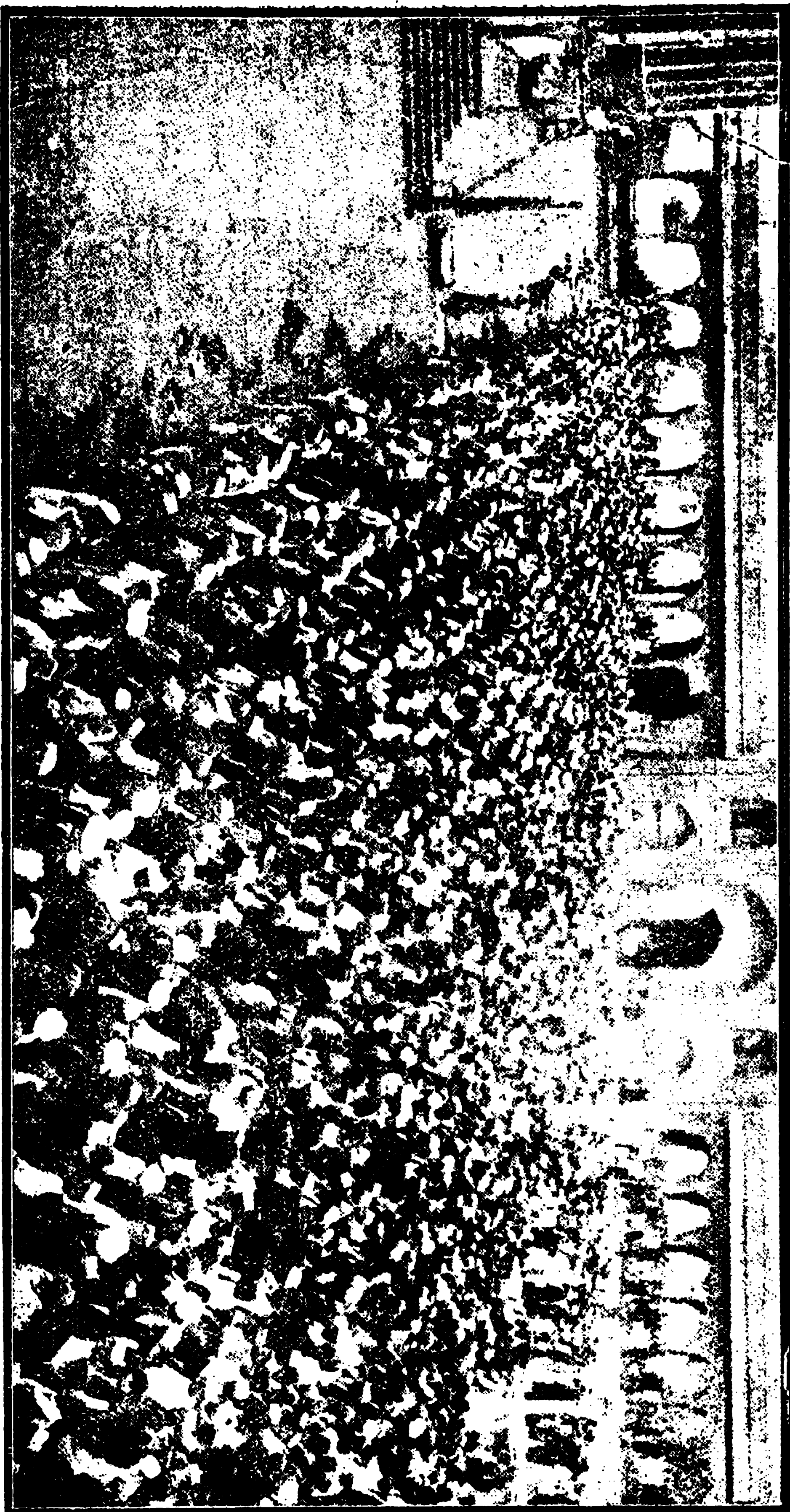
অমর আজমলের জানাজার দৃশ্য

সদাশয় বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের শেষ অনুগ্রহ দৃষ্টি পড়িয়াছিল, মহাত্মা গান্ধীর উপর। গান্ধীজী রাজ অতিথিশালায় নীত হইলে তিনি মরহুম হাকিম আজমল খাঁ ছাহেবের হাতে সেই বিরাট আন্দোলনের কর্ত্তৃত্বভার অর্পণ করেন। তিনিই তখন ভারতের জাতীয় আন্দোলনের "ডিক্টেটর" নির্ব্বাচিত হন। তখন তিনি প্রতি মুহূর্ত্তে অতিথিপরায়ণ রাজ সরকারের পরওয়ানার অপেক্ষায় রাজ অতিথির যোগ্যতা অর্জ্জনে বিশেষ মনোনিবেশ করেন। আশৈশব ভোগ বিলাসের ক্রোড়ে লালিত পালিত হইয়াও, আজমল খাঁ খাট-পালঙ্ক এবং মখমলের গদী তোষক ছাড়িয়া খদ্দরের চাদর ও কম্বল মাত্র সম্বল করতঃ মেজের উপর শুইবার অভ্যাস করিতে ব্যস্ত হইয়া পড়েন। এক দিকে চির অভ্যাসের বিপর্য্যয়ে এবং অন্য দিকে স্বার্থপর পর পদলেহী দলের নানা ষড়যন্ত্রের ফলে দেশে যে সকল ভীষণ সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষের সূত্রপাত ঘটে, তাহা দেখিয়া তাঁহার স্বাস্থ্য ভঙ্গ হয়। কিন্তু শরীর তাঁহার দুর্ব্বল ও অসুস্থ হইয়া পড়িলেও তাঁহার মন কখনও নিরাশ ও নিস্তেজ হয় নাই। মহাত্মা গান্ধী যখন ২১ দিনের উপবাস ব্রতের পর অবসন্ন হইয়া পড়িলেন, তখনও জনাব মছিহুল্ মুল্ক হাকিম আজমল খাঁ দেশকে গৃহ বিবাদের বা আত্মধ্বংসের হাত হইতে রক্ষা করার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করেন। দিল্লীর নেতৃ সম্মিলন হইতে শিমলার মিলন-বৈঠক পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র মিলন-প্রস্তাবের অন্যতম অগ্রদূত ছিলেন—আজমল খাঁ। তাঁহার সেই আন্তরিক যত্ন ও চেষ্টা এবার মান্দ্রাজ কংগ্রেসে সুফল প্রসব করিয়াছে, তাঁহার সাধনা সফল হইয়াছে।

অবশেষে জনাব মছিহুল মুল্ক হাকিম মোহাম্মদ আজমল খাঁ ছাহেবের আর একটী কীর্ত্তির পরিচয় দিতে ইচ্ছা করি। জাতীয় শিক্ষার প্রতি তাঁহার স্বাভাবিক আকর্ষণ ছিল। জীবনে তিনি কত শত জাতীয় শিক্ষাগারের সাহায্য ও পৃষ্ঠপোষকতা করিয়াছেন, তাহার শুমার করা কঠিন। নিজের বুদ্ধি বা বাহুবলে হাকিম ছাহেব যত অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছেন, ভারতবর্ষে অন্য কোন ব্যক্তি, অন্ততঃ আইন চিকিৎসা প্রভৃতি ব্যবসায়ী কোন বুদ্ধিজীবি, এত অর্থ উপার্জ্জন করেন নাই, তাহা সুনিশ্চিত। তাঁহার সোপার্জ্জিত সেই অগাধ অর্থ সম্পূর্ণ তিনি নিজের এবং নিজের পরিবারের ভোগ বিলাসে ব্যয় করেন নাই। তাই অবশেষে জাতীয় শিক্ষা বিস্তার কল্পে জাতীয় বিশ্ব-বিদ্যালয় বা জামেআ মিল্লিয়ার সেবায় তিনি আত্মনিয়োগ করেন। জামেআ-মিল্লিয়ার পরিচয় বোধ হয়, অনাবশ্যক। অসহযোগ আন্দোলনের উহা একমাত্র না হইলেও সর্ব্বপ্রধান স্মৃতি। বঙ্গব্যবচ্ছেদ কালীন স্বদেশী আন্দোলনের ফলে ভারতবর্ষে বহু কাপড়ের কল স্থাপিত হয়। কিন্তু অসহযোগ আন্দোলনের বৈশিষ্ট্য চরখা ও চরখার সূতা তেমন ভাবে দৃশ্যমান হয় নাই। তবে জাতীয় শিক্ষার নামে স্বদেশী আন্দোলনের ফল স্বরূপ যে "ন্যাশনাল কৌন্সিল অব এডুকেশন" এবং তাহার পরিচালিত ডাক্তারী স্কুলটীকে জাতীয় শিক্ষা বলা চলে কিনা, তাহাতে যথেষ্ট মতভেদ আছে। কিন্তু গত অসহযোগ আন্দোলনের স্মৃতি দিল্লীর National university বা জামেআ মিল্লিয়া প্রতি বর্ণে জাতীয়। আলিগড়ে স্থাপিত হইয়া বর্ত্তমানে উহা দিল্লীতে স্থানান্তরিত হইয়াছে জামেআর অর্থ-সঙ্কট দূর করারও হাকিম ছাহেবের পৃষ্ঠপোষকতা লাভের জন্য এই ব্যবস্থা। কিন্তু প্রচুর অর্থ সাহায্য সত্ত্বেও নানা কারণে হাকিম ছাহেব তিব্বিয়া কলেজের ন্যায় উহাকে দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠা করিয়া যাইতে পারেন নাই। কাজেই জামেআ আজ তাঁহার গুণগ্রাহীগণের সাহায্যের মুখাপেক্ষী। নদীর জোয়ারের ন্যায় পরাধীন জাতির জীবনে এক একবার জোয়ার আসে আর চলিয়া যায়, "জামেআ-মিল্লিয়ার" মত এক একটা খাদ রাখিয়া। এই খাদ হইতে উপকার গ্রহণ নির্ভর করে, জাতির সুবুদ্ধি ও কর্ম্মকুশলতার উপর।

হাকিম ছাহেবের গুণানুরক্ত ভক্তগণ তাঁহার এই অসমাপ্ত সাধনাকে পূর্ণপরিণত ও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিয়া তোলার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা ও যত্নের ত্রুটি করিবেন না, এ আশা আমাদিগের আছে।

হাকিম ছাহেবের পুণ্যস্মৃতিকে জাগাইয়া রাখার একমাত্র উপায় হইতেছে—হিন্দু-মুছলমানের সম্মিলিত শক্তিকে স্বরাজ সাধনে নিয়োজিত করাতে।

---

# মোছলেম মনীষীবৃন্দ

## মান্যবর সার এবরাহিম রহিমতুল্লাহ্

ভারতীয় শিল্প ও বাণিজ্য কংগ্রেসের সভাপতি।

সার এবরাহিম বোম্বের একজন উচ্চ শিক্ষিত রাজনীতি ও অর্থনীতি বিশারদ পণ্ডিত। বোম্বের বণিক সমাজের মধ্যে ইনি একজন প্রধান ধনকুবের। ইনি বর্ত্তমানে বোম্বে ব্যবস্থাপক সভার সভাপতি পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। ভারতীয় মোছলেম লিগের আগ্রা অধিবেশনে সার এবরাহিম রহিমতুল্লাহ সভাপতিরূপে যে অভিভাষণ দিয়াছিলেন, তাহাতে মোছলেম-ভারতের রাজনৈতিক চিন্তার ধারা একটু পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। এবারও তাঁহার বক্তৃতা ভারতবাসীর সম্মুখে চিন্তা ও আত্মানুভূতির একটা নূতন দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছে।

## মিঃ তৈয়ব আলী বার-এট-ল।

সভাপতি

ইষ্ট-আফ্রিকান ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস

মিঃ তৈয়ব আলী উদয়পুরের একজন ধন-কুবের। জাঞ্জিবারের ছোলতানের ইউরোপ ভ্রমণকালে মিঃ তৈয়ব আলী তাঁহার প্রাইভেট সেক্রেটারীর পদে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি বিরাট কফী ক্ষেত্রের মালিক। পূর্ব্ব আফরিকায় ভারতবাসীদের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য মিঃ তৈয়ব আলী বিশেষভাবে যত্ন লইয়া থাকেন। ১৯২৩ সালে Kenya ও Tangikar পক্ষ হইতে ইংলণ্ডে যে ডেপুটেশন প্রেরিত হইয়াছিল, মিঃ তৈয়ব আলী তাহার একজন বিশেষ মেম্বর ছিলেন।

হাজী লর্ড হেডলি ফারুক

সভাপতি—তবলীগ কনফারেন্স

বোম্বের শিক্ষা-সচীব
সার শেখ গোলাম হোছেন হেদায়তুল্লা

সভাপতি
গুজরাট শিক্ষা-কনফারেন্স

তবলীগ কনফারেন্সের নায়কগণ
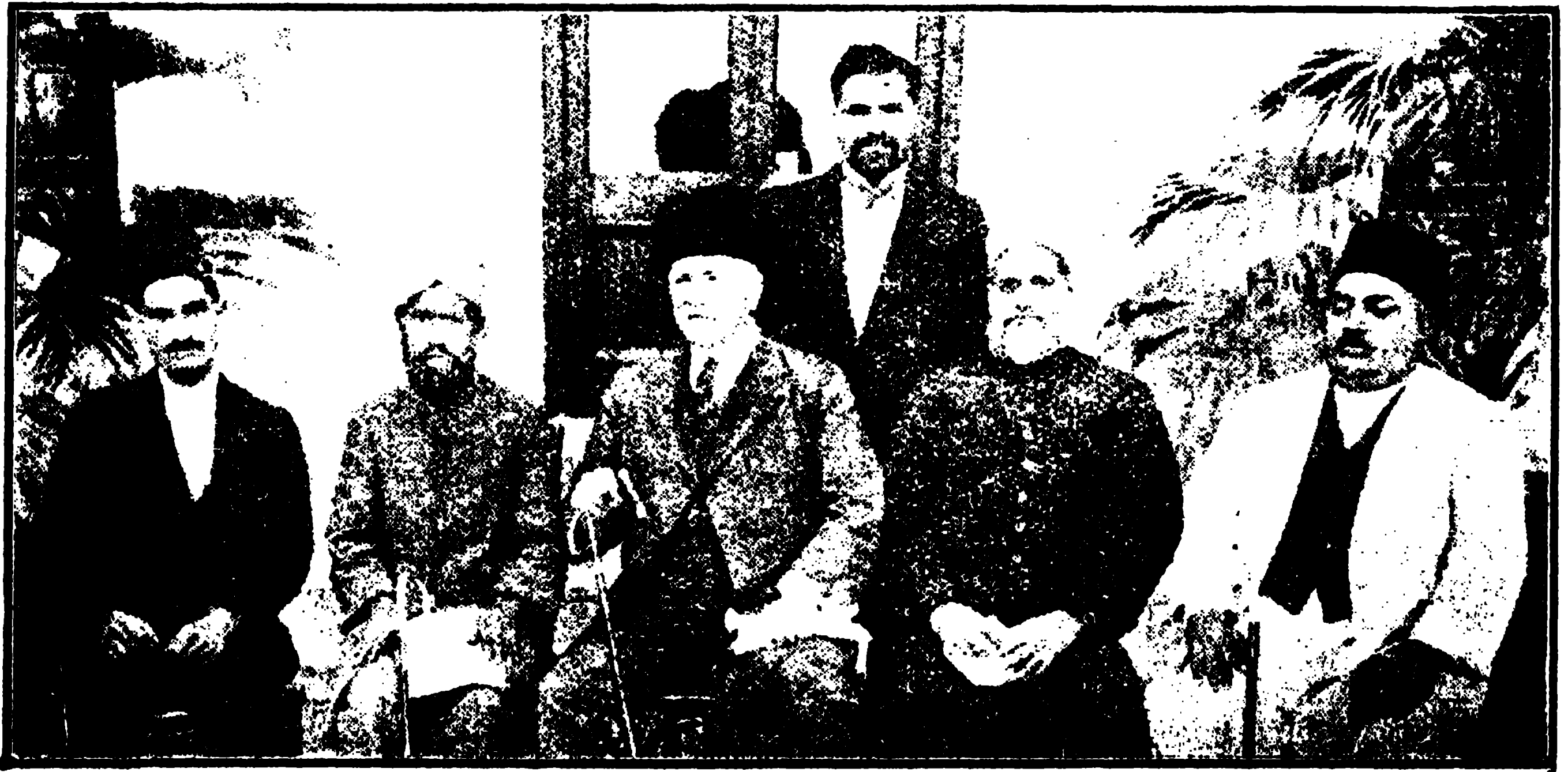
মধ্যস্থলে উপবিষ্ট লর্ড হেডলী ফারুক

# দর্শন ও ঈমান *

( এস, ওয়াজেদ আলী—বি-এ, ( ক্যান্টব ) বার-এট-ল )

আধুনিক জীবন তাহার অফুরন্ত জ্ঞান, পরিবর্ত্তনশীল সামাজিক রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমস্যা এবং বিশ্বাস ও যুক্তির বিরোধের মধ্য দিয়া মানুষকে এমন একটা দুরূহ সমস্যার ভিতর আনিয়া ফেলিয়াছে; যাহার সমাধান জীবনের অত্যল্প সময়ের মধ্যে মানুষকে করিতেই হইবে ;—তা' সে যেমন করিয়াই হউক না কেন। এই সমস্যার সঠিক সমাধান মানুষের জীবনকে সফল ও সুখময় করিয়া থাকে এবং ভুল সমাধান অনিবার্য্যরূপে তাহাকে ব্যর্থতার উষর মরুক্ষেত্রে পরিণত করিয়া দেয়।

গভীর ভাবে চিন্তা ও বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে, ইহা সেই চিরন্তন সমস্যা ব্যতীত আর কিছুই নয়—যাহা হইতে দর্শন বা ধর্ম্মের উৎপত্তি হইয়াছে। সংক্ষেপে "আমি কে" "কোথা হইতে আসিতেছি" এবং কোথায় যাইব"—এই তিন প্রশ্নের দ্বারাই ইহা অভিব্যক্ত হয়।

যে সমস্ত বাক্‌সর্ব্বস্ব সফিষ্ট, দর্শনের জন্মদাতা সোক্রেটীসের প্রিয় জন্মভূমিতে যথা-তথা দলবদ্ধ হইয়া বাক্‌বিতণ্ডা আরম্ভ করিয়া দিত, সোক্রেটীস্ তাহাদিগকে উপদেশ দিয়াছিলেন—"আগে নিজেকে চিনিয়া লও।" বহু শতাব্দী পরে এই সোক্রেটীসেরই সমকক্ষ এবং অন্যান্যদিকে তদপেক্ষা মহত্তর পুরুষ, ইস্‌লামের পয়গম্বর হজরৎ মোহাম্মদ তাঁহার অনুবর্ত্তীগণকে ঠিক এই সোক্রেটীসেরই অনুরূপ উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন, "নিজেকে জানিয়া লও, কারণ যে ব্যক্তি নিজেকে জানে, সে আল্লাকেও জানে।" বস্তুতঃ আর কোন্ উপদেশ ইহা হইতে অধিক দৃঢ়, অনুসন্ধিৎসু ও উৎকৃষ্ট হইতে পারে? আত্মার ভিতরে বা বাহিরে যে সমস্ত শক্তি কার্য্য করিয়া থাকে, যে ব্যক্তি তাহাদিগকে না চিনে, জীবনের এই বিশাল কর্ম্মক্ষেত্রে তাহার অস্তিত্বের কোন বাস্তব অর্থই থাকিতে পারে না।

একদল উপদেষ্টা আছেন, তাঁহারা উপরোক্ত সমস্যাকে উপেক্ষা করতঃ অন্তরেন্দ্রিয় সমূহ রুদ্ধ করিয়া জীবনের পথে অগ্রসর হইতে উপদেশ দিয়া থাকেন। উপদেশটী শুনিতে খুব সোজা বটে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে মানুষকে এযাবৎ যত রকমের উপদেশ দেওয়া হইয়াছে, তন্মধ্যে কার্য্যকালে এইটাই সর্ব্বাপেক্ষা দুষ্কর। জন্ ষ্টুয়ার্ট মিল যখন বলিয়াছিলেন,—"তৃপ্ত পশু অপেক্ষা অতৃপ্ত সোক্রেটীস্ হওয়াই বাঞ্ছনীয়"—তখন তিনি মানবাত্মার চিরন্তন গভীর আকাঙ্ক্ষাকেই ভাষা দিয়াছিলেন। মানুষ চির দিনই "তৃপ্ত পশু" হইতে অসম্মতি জানাইয়াছে, ভবিষ্যতেও জানাইবে এবং অতৃপ্ত সোক্রেটীস্ হইতে চিরকালই সে আগ্রহ প্রকাশ করিবে। যেমন জলের নিম্নগতি রোধ করা গেলেও তাহার স্বভাবের পরিবর্ত্তন করা যায় না, সেইরূপ মানুষের এই চিরন্তন স্বভাবের ব্যতিক্রম ঘটানোও আদৌ সম্ভবপর নহে। মনোবিজ্ঞান মতে যে-উপদেশ পালন করা মানুষের পক্ষে একেবারেই অসম্ভব, সেরূপ উপদেশ প্রদান করা নির্ব্বুদ্ধিতা ব্যতীত আর কিছুই নয়।

কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এই সমস্ত দার্শনিকের জীবন ও তাঁহাদের কার্য্যাবলী, তাঁহাদের মতবাদের ঘোর বিরোধী। তাঁহারা দৃঢ় বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া অন্যের জন্য অজ্ঞেয়তাবাদ প্রচার করিয়াছেন, কিন্তু নিজেদের জন্য একান্ত জটিল ও দুর্ব্বোধ দর্শন সমূহ সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন।

আমি আপনাদিগকে কোন দার্শনিক নীতি বা কোন শান্তিপ্রদ দর্শনকে অবলম্বন স্বরূপ গ্রহণ করিতে বলিতেছি না। তবে বাস্তব জীবনে বিজ্ঞান ও অভিজ্ঞতার ফলে যাহা বুঝিয়াছি, তাহাতে আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, আমাদের একটী শান্তিপ্রদ দর্শনের প্রয়োজন আছে।

এখন এই নৈসর্গিক ও মানসিক সমস্যার প্রকৃতি সম্বন্ধে আলোচনা করা যাউক। আমাদের একদিকে আছে, অনুভূতি সম্পন্ন আত্মা এবং অন্যদিকে আছে অনুভূতির

---

* Muslim-review পত্রের Philosophy and Faith প্রবন্ধের মর্ম্মানুবাদ।

দ্বারা উপলব্ধি করিবার যোগ্য এই নৈসর্গিক জগৎ। এই নৈসর্গিক জগৎ অনুভূতি সম্পন্ন মানুষের মনে তাহার বাতায়ন সদৃশ ইন্দ্রিয় নিচয়ের মধ্য দিয়া আঘাত করিয়া থাকে এবং এই আঘাত-জনিত অনুভূতির মধ্য দিয়াই জ্ঞানের স্থূল উপকরণ সমূহ সৃষ্ট হইয়া থাকে। অতঃপর মনের আপন রীতি অনুযায়ী এই সমস্ত অনুভূতি সজ্জিত ও শ্রেণীবদ্ধ হয়। এই ভাবে এই বিস্ময়কর বিশ্বজগৎ তাহার সকল সৌন্দর্য্য, সকল মহিমা এবং সকল বিশালতা লইয়া আমাদের চক্ষুর সম্মুখে ফুটিয়া উঠে। এখানে আমি জ্ঞান সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা করিতে চাই না, শুধু এই কথাটা সকলকে স্মরণ রাখিতে বলি যে, আত্মা এবং পদার্থ এই দুইটী বস্তুর পারস্পরিক ক্রিয়ার ফলেই জ্ঞানের উৎপত্তি।

এই দুইটি বস্তুর প্রয়োজনীয়তা এবং প্রত্যক্ষতা এত সুস্পষ্ট যে, ইহাদের সম্পর্কে আমার এই উক্তিকে অনেকেই পুরাতনের পুনরাবৃত্তি বলিয়া মনে করিবেন। কিন্তু দর্শনের মধ্যে যে সমস্ত ভ্রান্ত যুক্তি সন্নিবেশিত হইয়াছে, তাহার অর্দ্ধেকেরও অধিক এই দুইটী বস্তুর সম্পর্কে অসম্পূর্ণ ধারণার ফল। আপনারা বোধ হয়, Association of Psychologist এর নাম শুনিয়াছেন। এই Association এর সদস্যগণ খৃষ্টীয় অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে ইংলণ্ডে এক বিশেষ প্রভাবশালী সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন এবং তাঁহাদের বাণী বৃটীশ চ্যানেল অতিক্রম করিয়া দূর দূরান্ত পর্য্যন্ত ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। তাঁহারা Locke, Hume Mill, Bain. এবং Spencer এর ন্যায় প্রতিভাপন্ন ও শক্তিশালী লোক সকলকে নিজেদের সঙ্গভুক্ত করিয়া লইয়াছিলেন—এবং কিছুকাল পর্য্যন্ত পৃথিবীর ইংরাজী ভাষাভাষী জনসাধারণের উপর তাঁহাদের চিন্তাধারা বিশেষভাবে প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। কিন্তু করিলেও, তাঁহাদের মূল নীতি এই ভ্রান্ত মতবাদের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল যে, মানুষের মন এক খণ্ড স্বচ্ছ ফলকের ন্যায়, ধারণার স্বাভাবিক সহায়তার ফলে তাহাদের মধ্যে জ্ঞানের জন্ম হইয়া থাকে। জ্ঞানের উৎপত্তি সম্বন্ধে এই মতবাদের স্বাভাবিক পরিণাম হইতেছে জড়বাদ। বিখ্যাত জার্মাণ দার্শনিক Emanuel Kant এই মতবাদের অস্বাভাবিকতা প্রদর্শন করিয়া মানব জাতির অশেষ কল্যাণ সাধন করিয়া গিয়াছেন।

উপরোক্ত সঙ্ঘ একদিকে যেমন জ্ঞানোৎপত্তির ব্যাপারে মনের কোন কার্য্যকারিতা আছে বলিয়া স্বীকার করেন নাই, অন্য দিকে তেমনই মনস্তত্ত্ব হেতুবাদীগণ এই ব্যাপারে বাহ্য জগতের কোন কার্য্যকারিতা আছে বলিয়া স্বীকার করেন নাই। শেষোক্ত হেতুবাদীগণের মতে মানুষের উপর বাহ্য জগতের কার্য্যকারিতার ফলে জ্ঞানের উৎপত্তি হয় না, উপরন্তু উহা প্রজ্ঞাবান আত্মার অন্তর্বিধান অনুযায়ী বিকাশ ব্যতীত অপর কিছুই নয়। এই মতবাদীদলের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রতিভাবান প্রতিনিধি Leibnitz এমনও বলিয়াছেন যে, আমরা বাহ্য জগৎ হইতে আদৌ কোন অনুভূতি বা ভাব লাভ করিতে পারি না। আমাদের অভিজ্ঞতা সমূহ আমাদের মনের কার্য্যকারিতার ফলে সমুদ্ভূত বিবিধ দৃশ্য-পরম্পরা ব্যতীত অন্য কিছুই নয় এবং মনের সহিত বাহ্যজগতের যে সংযোগ, তাহা একটা বিস্ময়কর দৈব সংঘটন।

এখানে একথা বলাই বাহুল্য যে, আমাদের স্বাভাবিক জ্ঞান এই ধারণা বা ভাবের বিদ্রোহবাদী। কারণ, অযৌক্তিকতা বা অসম্ভবতার স্থান কোথাও নাই, এমন কি দর্শন-শাস্ত্রেও না। কথিত আছে, জগদ্বিখ্যাত আইরিশ বিশপ বার্কেলির "দৃশ্যমান বস্তু মাত্রই মায়া" এই অভিমত শ্রবণ করিয়া ডাক্তার জনসন্ তাঁহার প্রকাণ্ড ভ্রমণ যষ্টি সজোরে মাটীতে ঠুকিয়া চীৎকার করিয়া বলিয়াছিলেন—"আমি এই ভাবে বার্কেলির মতবাদ খণ্ডন করিতেছি।" সূক্ষ্ম বিশ্লেষণী শক্তি বা তর্কশাস্ত্রের অভিজ্ঞতা এবং নিপুণতা ধরিয়া বিচার করিতে বসিলে হয়ত বার্কেলির সহিত ডাক্তার জনসনের তুলনা সমীচীন বলিয়া মনে হইবে না, কিন্তু মূলতত্ত্ব ধরিয়া বিচার করিলে বুঝা যাইবে যে, এক্ষেত্রে জনসনের ধারণাই অভ্রান্ত এবং বার্কেলির ধারণা ভ্রান্ত। যে দর্শন সাধারণ জ্ঞানের বিরোধী, যে কোন প্রকারেই হউক, তাহার প্রতিবাদ করিতে হইবে। ইহার জন্য যদি ডাক্তার জনসনের চরম উপায় অবলম্বন করিতে হয়, তাহাও করিতে হইবে। এই জন্য এই সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় কথাটী স্মরণ রাখিবার নিমিত্ত আমি আপনাদিগকে পুনরায় অনুরোধ করিতেছি যে, জ্ঞানোৎপত্তির মূলে দুইটী জিনিষ বিদ্যমান আছে। প্রথম—আত্মা বা অন্তর প্রকৃতি, দ্বিতীয়—বাহ্যজগৎ বা বহিঃ-প্রকৃতি।

প্রথমতঃ দেখা যাউক, এই আত্মার স্বরূপ কি? পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, আত্মা মানুষের বাতায়ন-সদৃশ ইন্দ্রিয়

নিচয়ের মধ্য দিয়া জ্ঞানের স্থূল উপকরণ সমূহ আহরণ করিয়া থাকে। একথা আমাদিগকে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, পঞ্চ-বোধেন্দ্রিয় আমাদের জ্ঞানার্জ্জনের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয় জিনিষ। ইহার মধ্যে অন্য কোন দুর্জ্ঞেয় রহস্য নাই। তবে আমরা যে চারিটী ও ছয়টীর পরিবর্ত্তে পাঁচটী বোধেন্দ্রিয় লাভ করিয়াছি, তাহার কারণ, ক্রমবিকাশের দৈব ঘটনা ব্যতীত অন্য কিছুই নয়। আমাদের বহুকাল পূর্ব্বের পূর্ব্ব-পুরুষগণের এক স্পর্শেন্দ্রিয় সম্বল ছিল, সেই স্পর্শেন্দ্রিয় ক্রমবিকাশের ফলে ধীরে ধীরে পাঁচটী বিশেষ বোধেন্দ্রিয়ে রূপান্তরিত হইয়াছে। সুদূর ভবিষ্যতে হয়ত আরও এমন বোধেন্দ্রিয়ের বিকাশ সম্ভব হইবে, যাহা বর্ত্তমানে আমাদের কল্পনারও অতীত। এখন দেখা যাউক, ইহা হইতে আমরা কি বুঝিতে পারি।

ক্ষুদ্র কীট বা ঐ শ্রেণীর নিকৃষ্ট জীব—যাহারা স্পর্শ বা অনুভূতির উপযোগী একটীমাত্র ইন্দ্রিয় লাভ করিয়াছে, তাহাদের নিকট এই জগৎ মূলতঃ পৃথকরূপে বা পৃথকভাবে প্রতিভাত বা অনুভূত হয়। লতাপুষ্পের মনোমুগ্ধকর বর্ণ-বৈচিত্র্য, প্রাণীকুলের সুসমঞ্জস গঠন-সৌন্দর্য্য, মানুষ এবং পক্ষীর সঙ্গীতের সুর-সঙ্গতি;—এক কথায়, যে-সমস্ত রূপ বা অনুভূতির বলে এই পৃথিবী স্বর্গতুল্য মনে হয়, যাহা আমাদের অন্তরের মধ্যে চরমোৎকর্ষ লাভের প্রবল আকাঙ্ক্ষা জাগাইয়া দেয়, এই ক্ষুদ্র কীট বা তৎশ্রেণীর জীবের জীবনে তৎসমুদয়ের আদৌ কোন স্থান নাই। মানুষের মধ্যে যে বিধিদত্ত প্রতিভা বিদ্যমান আছে, যাহার উপর তাহার বিজ্ঞান, ধর্ম্ম, দর্শন, রাজনীতি—এক কথায় তাহার জীবনের সমস্ত-কিছু নির্ভর করে, সেই প্রতিভা-বর্জ্জিত হইয়া এই দুর্ভাগ্য কীট, বস্তুসমূহের ক্রমপর্য্যায় সম্বন্ধে ধারণা করিতে পারে না; কার্য্যকারণ পরম্পরা বা সহবর্ত্তন-ক্রিয়া তাহার নিকট সম্পূর্ণ অজ্ঞাত এবং এই নিখিল সৃষ্টি যে সুশৃঙ্খলার সহিত সুনিয়ন্ত্রিত, এরূপ ধারণা করা তাহার সঙ্কীর্ণ জ্ঞানশক্তির অতীত। ইহা হইতেই বুঝা যায়, বোধেন্দ্রিয় সমূহের আধিক্য বা অল্পতার দরুণ জীবিত প্রাণীকুলের মধ্যে পার্থক্য কত অধিক!

এক্ষণে এমন একটা প্রাণীর সম্বন্ধে আলোচনা করা যাউক, যে ক্রমবিকাশের দিক দিয়া ক্ষুদ্রকীট অপেক্ষা বহুগুণে শ্রেষ্ঠ এবং ইন্দ্রিয় সংখ্যার হিসাবে যে মানুষ অপেক্ষা একটীমাত্র কম ইন্দ্রিয়ের অধিকারী। মনে করুণ—ছুঁচা। শুনা যায়, ছুঁচা অন্ধ প্রাণী। তর্কের খাতিরে যদি আমরা তাহার এই অন্ধত্বকে স্বীকার করিয়া লই, তাহা হইলে বলিতে হইবে, তাহার অন্ধত্ব ব্যতীত অন্যান্য যে সমস্ত বোধেন্দ্রিয় মানুষের আছে, সে তাহার সকলগুলিরই অধিকারী। সে শুনিতে পায়, ঘ্রাণ লইতে পারে, আস্বাদ গ্রহণ বা স্পর্শ করিতে পারে, কেবলমাত্র দেখিবার শক্তি তাহার নাই। তাহার জগৎ কেবলমাত্র শীতাতপসম্পন্ন জড়বস্তু নহে, তাহার মধ্যে (বেসুরো হইলেও) সে সঙ্গীত শুনিতে পায়, (তীব্র হইলেও) আঘ্রাণ পায়, ইহা ছাড়া দ্রুত গতিশীল পদলাভ করায় এবং চঞ্চল ভাবে চলাফেরা করিতে পারায় তাহার জগৎ আকারে ও গঠনে ক্ষুদ্রকীটের ধূলিসর্ব্বস্ব সঙ্কীর্ণ জগৎ অপেক্ষা দূর-প্রসারী ও বৈচিত্র্যপূর্ণ বলিয়া মনে হয়। কিন্তু তবুও আমাদের এই জাঁকজমকপূর্ণ সৌন্দর্য্যময় জগতের সহিত এই ছুঁচার জগতের কোনই সাদৃশ্য নাই।

নীল আকাশের উদার প্রসার, নক্ষত্রপুঞ্জের মনোমুগ্ধকর প্রশান্ত জ্যোতি, লতাপুষ্পের পেলব সৌন্দর্য্য তাহার নিকট সম্পূর্ণ অপরিজ্ঞাত। তুষারমণ্ডিত শৈলরাজির বিপুল গরিমা, সমুদ্র-তরঙ্গের উন্মাদ নর্ত্তন, বর্ষাস্ফীতা তটিনীর প্রবল প্রবাহ তাহার অন্তরে কোন ভাব বা উচ্ছ্বাসের উদ্রেক করিতে পারে না এবং এই অনুভূতির অভাব বশতঃ তাহার জগৎ তাহার নিকট অসমঞ্জস বক্রতা সম্পন্ন, তীব্র গন্ধ বিশিষ্ট কতকগুলি কোমল ও কঠিন বস্তুর সমষ্টি ব্যতীত আর কিছুই নয়।

ক্রমশঃ

সংকলন
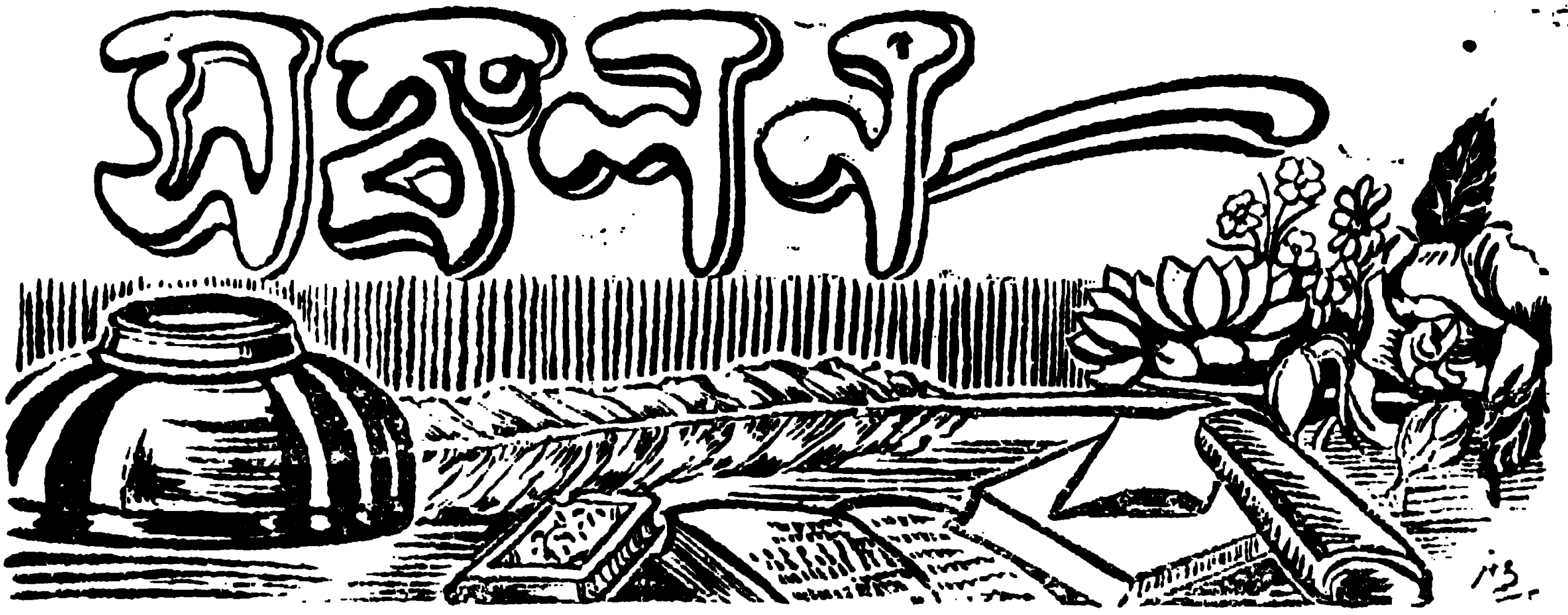
## সপ্তম শতাব্দীর মোসলেম নির্ম্মিত একটী অদ্ভুত ঘড়ি

কাহেরার তয়মুরীয়া লাইব্রেরীতে একখানি ঐতিহাসিক গ্রন্থের কতকাংশ পাওয়া গিয়াছে, অপরাংশ নষ্ট হইয়া যাওয়ায় গ্রন্থ ও গ্রন্থকারের নাম জানিতে পারা যায় নাই। ইহাতেও সাধারণ আরব ঐতিহাসিকদের ন্যায় সনের হিসাবে পর পর ঐতিহাসিক ঘটনাসমূহ বর্ণিত ও হিজরী ৬২৬ সাল হইতে ৭০০ সাল পর্য্যন্ত সময়ের বিস্তৃত অবস্থা লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

গ্রন্থকার লিখিয়াছেন—হিজরী ৬৩৩ সালে একটী তিব্বীয়া মাদ্রাসা ও তৎসংলগ্ন চিকিৎসালয়ের বিরাট সৌধ নির্ম্মাণের কার্য্য শেষ হইয়াছিল। খলিফা 'মোস্তানসের্ আব্বাসী' 'মোস্তানসেরিয়া' মাদ্রাসার সম্মুখ ভাগে ঐ তিব্বিয়া মাদ্রাসা ও চিকিৎসাগার নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। এই ঘটনার বর্ণনা উপলক্ষে গ্রন্থকার একটী অদ্ভুত ঘড়ির কথা উল্লেখ করিয়াছেন, ইহা হইতে আরবদের অসাধারণ শিল্প-নৈপুণ্যের পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি লিখিয়াছেন—হিজরী ৬৩৩ সালে তিব্বীয়া মাদ্রাসা ও চিকিৎসাগার নির্ম্মাণ-কার্য্য শেষ হইল, ইহাতে শিক্ষকগণের অধ্যাপনার স্থান ও ছাত্রদের বসিবার আসন পৃথক পৃথক ভাবে অতি সুন্দররূপে নির্ম্মিত হইয়াছিল। এই স্থানটীর সম্মুখের প্রাচীরে আকাশের চিত্র অঙ্কিত ও তাহার দুই পার্শ্বে দুইটী দ্বার ছিল। ঐ দ্বার দুইটীর মধ্যভাগে দুইটী স্বর্ণাধারে স্বর্ণ-নির্ম্মিত দুইটী শ্যেন পক্ষী পরিস্থাপিত হইয়াছিল। পাখী দুইটীর পশ্চাৎদিকে দুইটী পিত্তলের গোলক ছিল, সম্মুখ দিক হইতে গোলক দুইটী দেখা যাইত না, দিবসের এক একটী যাম পূর্ণ হইলে পশ্চাৎস্থিত গোলকদ্বয় পাখী দুইটীর সম্মুখভাগে আসিয়া সজোরে স্বর্ণাধারের উপর পতিত হইত, সঙ্গে সঙ্গে উল্লিখিত দ্বার দুইটী আপনা হইতে উদ্ঘাটিত হইত এবং গোলকদ্বয় তন্মধ্যে অদৃশ্য হইয়া যাইত। ঘণ্টার পর ঘণ্টা এইরূপে সমস্ত দিন ধরিয়া উক্ত ঘটিকাযন্ত্রে সময় নির্দ্দেশের কার্য্য নির্দ্দোষ ও নির্ভুলরূপে নির্ব্বাহিত হইতে থাকিত।

পক্ষান্তরে প্রত্যহ সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই প্রাচীরে অঙ্কিত আকাশমার্গে কয়েকটী স্বর্ণনির্ম্মিত অর্দ্ধচন্দ্রের উদয় হইত, সূর্য্যের সঙ্গে সঙ্গে সেগুলি পূর্ব্ব হইতে পশ্চিম দিকে ঢলিয়া পড়িত, অবশেষে সূর্য্যাস্তের সময় সেগুলিও লোকচক্ষু হইতে অন্তর্হিত হইয়া যাইত।

এদিকে সূর্য্যাস্তের পর সেই চিত্রিত আকাশমার্গে আবার ক্ষীণপ্রভ কয়েকটী চন্দ্রের উদয় হইত, তন্মধ্যে যথাক্রমে এক একটী চন্দ্রের পরিধি ও প্রভা ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া ঘণ্টাপূর্ণ হওয়া মাত্র সেটী পূর্ণচন্দ্রে পরিণত ও তাহার কিরণচ্ছটায় সেই স্থানটী সম্পূর্ণরূপে আলোকিত হইয়া পড়িত। এই প্রকারে উষা সমাগম পর্য্যন্ত প্রতি ঘণ্টায় একটীর পর একটী চন্দ্র পূর্ণাবয়ব প্রাপ্ত ও আলোকমালায় চতুর্দ্দিক উদ্ভাসিত করিয়া নিশাকালে সময় নিরূপণ করিত।

এই অদ্ভুত ঘটিকা যন্ত্রের নির্ম্মাতা আরবের অধিবাসী নূরুদ্দীন আলী এবনে সা'লব। ৬০১ হিজরী সনে তিনি জন্মগ্রহণ ও ৬৮৩ হিজরী সনে পরলোক গমন করেন। তাঁহার সমস্ত জীবনকাল এই প্রকার অদ্ভুত ঘড়ি নির্ম্মাণ ও তৎসম্বন্ধীয় আন্দোলন আলোচনা ও গভীর গবেষণায় অতিবাহিত হইয়াছে।

## বিজ্ঞান কংগ্রেস

ভারতীয় বিজ্ঞান-কংগ্রেসে এদেশের শিল্প সম্বন্ধে কথাও হইয়াছে। অবশ্য কংগ্রেসে যে সকল আবিষ্কারের বিষয় বিবৃত হইয়াছে, সে সকল বিজ্ঞানাগারে পরীক্ষার ফল—বিস্তৃতভাবে কাজ করিলে তাহাতে ফল কিরূপ হইবে, তাহা কার্য্যক্ষেত্রে দেখা যাইবে। গত শুক্রবারে অধ্যাপক এইচ, কে, সেন ২টি আবিষ্কারের বিষয় বিবৃত করিয়াছেন :—

( ১ ) গেঁওকাঠের করাতের গুঁড়া হইতে "এবসোলিউট আলকোহল" বা সুরাসার পাওয়া যায়। অন্যান্য দেশেও কাঠের গুঁড়া হইতে সুরাসার নিষ্কাষণের চেষ্টা হইয়াছে। কিন্তু কুত্রাপি ১ টন গুঁড়া হইতে ২২ গ্যালনের অধিক সুরাসার পাওয়া যায় নাই। কিন্তু ১ টন গেঁওকাঠের গুঁড়া হইতে ৬০ গ্যালন সুরাসার পাওয়া গিয়াছে। বাঙ্গালায় গেঁওকাঠের অভাব নাই। গেঁওকাঠ মজবুত নহে বলিয়া তাহাতে সস্তায় জিনিষ প্রস্তুত করা হয় ; কাঠও অপেক্ষাকৃত অল্পমূল্য। কাজেই ইহার গুঁড়া অল্পমূল্যে পাওয়া যাইতে পারে। বর্ত্তমানে এই গুঁড়া বিশেষ কোন কাজে লাগে না। যদি সুরাসার প্রস্তুত করিবার জন্য ইহা ব্যবহৃত হয়, তবে অনেক লাভ হইবে।

(২) ১ শত মণ শুষ্ক কচুরীপানা হইতে ১২ মণ সার পাওয়া যায় এবং সেই ১২ মণে শতকরা ৯৫ ভাগ বিশুদ্ধ পোটাসিয়াম ক্লোরাইড, ৩৫ হইতে ৬০ গ্যালন সুরাসার এবং ৩২ মণ নিকৃষ্ট শ্রেণীর মদ্য প্রস্তুত হইতে পারে। ১০ বৎসর পূর্ব্বে কলিকাতার কোন কোম্পানী কচুরীপানা হইতে সারের জন্য পোটাসিয়াম উৎপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু সে চেষ্টা ফলবতী হয় নাই—অর্থাৎ খরচ পোষায় নাই। তাহার পর এখন দেখা যাইতেছে, সে চেষ্টা সফল হইতে পারে। এদেশে সারের প্রয়োজনের অন্ত নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না—যদি কচুরীপানা হইতে সার উৎপন্ন করা যায়, তাহা হইলে একদিকে যেমন কচুরীপানা নষ্ট করিবার উপায় হইবে, অন্যদিকে তেমনই দেশে কৃষিকার্য্যের জন্য সার সুলভ হইবে।

---

## আফ্গান-রাজমহিষী

কাহেরা হইতে প্রকাশিত "কওকবে শর্ক্" নামক আরবী সংবাদ পত্রে প্রকাশ—অনেকেই হয়ত জানেন না যে বর্ত্তমান আফ্গান-রাজমহিষী শামদেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার শৈশব ও কৈশোর সে দেশেই অতিবাহিত হইয়াছে, তিনি সেখানেই শিক্ষা লাভ করিয়াছেন। তাঁহার পিতা আফ্গানবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তিনি শাম দেশেই বসবাস করিতেন। মাতা শাম দেশের খাঁটী আরব বংশীয়া ছিলেন।

১৯১৯ খৃষ্টাব্দের বৃটীশ-আফগান যুদ্ধের সময় আফ্গান-রাজ-মহিষী রাজ্যের হিত কামনায় অনেক কিছু করিয়াছিলেন। তিনি স্বয়ং যুদ্ধস্থলে সৈনিক ছাওনীতে ঘুরিয়া বেড়াইতেন, প্রত্যেক সেনাপতি ও সৈনিক পুরুষগণকে দেশের স্বাধীনতা, বিদেশীর হাত হইতে আফ্গান রাজ্য ও আফ্গান জাতির 'ইজ্জৎ আবরু' রক্ষার জন্য উদ্দীপনাময়ী ভাষায় উপদেশ প্রদান করিতেন। তিনি আড়ম্বরহীন সাধারণ অবস্থায় আফগান-রাজের সহিত ছায়ার ন্যায় সর্ব্বত্র উপস্থিত থাকিয়া তাঁহার সকল কার্য্যের অংশ গ্রহণ করিতেন। এই সময় তাঁহারা আহারে, বিহারে, পোষাক-পরিচ্ছদে সকল অবস্থায় সাধারণ সৈনিকের ন্যায় অতিবাহিত করিতেন। এই অবস্থায় মুহূর্ত্তের জন্যও কেহ মহিষীর মুখে বিষাদ বা বিরক্তির চিহ্ন দেখিতে পায় নাই। ইহা হইতেই তাঁহার স্বদেশ-প্রীতি, মহানুভবতা ও কর্ত্তব্য পালনে দৃঢ়তার সম্যক পরিচয় পাওয়া যায়।

আফ্গানিস্থানের অধিবাসীগণ সকলেই তাঁহার গুণ-মুগ্ধ। বিশেষতঃ আফ্গান রমণীগণের শিক্ষা দীক্ষার সুব্যবস্থা ও সকল বিষয়ে তাহাদের উন্নতি সাধনের ঐকান্তিক যত্ন ও চেষ্টা লইয়া যেরূপ ভাবে তিনি কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছেন, তাহাতে শত মুখে তাঁহার প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না।

পাশ্চাত্য প্রদেশের সকল স্থানে ঘুরিয়া, তাহাদের শিক্ষা, তাহাদের শিল্প ও বাণিজ্য প্রভৃতি সকল বিভাগ বিশেষভাবে পরিদর্শন ও তৎসম্বন্ধে সময়োচিত বিশেষ জ্ঞান লাভ করিয়া, স্বদেশের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি সাধনমানসে সম্প্রতি আফগান-রাজ সুদূর ইউরোপ-ভ্রমণে বাহির হইয়াছেন! এই দূর দূরান্তরের সফরে স্বভাবতঃ তাঁহাদিগকে সময় সময় নানা অসুবিধা ও নানা কষ্টের সম্মুখীন হইতে হইবে, তাহা জানিয়া শুনিয়াও মহিষী স্বামীর সহগামিনী হইতে কুণ্ঠাবোধ করেন নাই।

---

## নির্ভীক মোসলেম রমনী

হজরৎ আলীর ( রাঃ ) পরলোকগমণের পর দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ আমীর মাবিয়া তাঁহার দরবারে পারিষদগণকে একদিন জিজ্ঞাসা করিলেন—জারকা বেনতে আদী নাম্নী একটী রমণীর কথা কি আপনারা জানেন? যেদিন সিফ্‌ফিনের ভীষণ যুদ্ধে উভয় পক্ষের সৈনিকবৃন্দ ক্লান্ত ও বহুক্ষণ ধরিয়া যুদ্ধ করার ফলে অবসাদগ্রস্থ হইয়া পড়িয়াছিল, সেই সময় সেই ভীষণ জীবন মরণ সমস্যার কালে উভয় সৈন্যের মধ্যস্থলে একটা রক্তবর্ণের উষ্ট্রের উপর দাঁড়াইয়া উদ্দীপনাময়ী ভাষায় বজ্রগম্ভীর স্বরে 'জারকা' আলীর ( রাঃ ) সৈন্যগণকে উৎসাহ দান ও যুদ্ধের জন্য উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল। তাহার কথায় বিপক্ষ সৈন্যের মধ্যে এক অভাবনীয় বৈদ্যুতিক ভাবের প্রবাহ ছুটিয়াছিল, তাহারা দুর্দ্দমনীয় শক্তি লাভ করিয়া আমার দিকে অগ্রসর হইয়াছিল, মারওয়ানের কূট কৌশল ও আমার সৌভাগ্য একযোগে সহায় না হইলে বৈরিদলের হাত হইতে সেদিন আমার রক্ষা পাইবার কোন উপায় ছিল না! আমার মনে হয় সেই অসাধারণ রমণীর সেই দিনের কথা আজিও কেহ ভুলিয়া যান নাই। সকলেই সমস্বরে বলিয়া উঠিলেন, হাঁ আমীরুল মুমেনীন! সেই স্ত্রীলোকটী ও তাহার সেদিনের সকল কথাই আমাদের মনে আছে। মাবিয়া বলিলেন— জারকা আজিও বাঁচিয়া আছে এবং আমার রাজত্বে কুফা নগরীতে বসবাস করিতেছে, তাহার সহিত এক্ষণে কিরূপ ব্যবহার করা আপনারা সমীচীন মনে করেন? সকলেই সমস্বরে "জারকার কতলের" ফতওয়া জারী করিলেন, মাবিয়া রুষ্ট হইয়া বলিলেন, না, কখনই না, রাজ্য লাভের পর আপনারা আমাকে স্ত্রী-হত্যা পাপে লিপ্ত ও জগতের সম্মুখে এই ভীষণ অপরাধে অপরাধী স্বরূপ উপস্থিত করিতে চাহিতেছেন। অতঃপর তিনি কুফা হইতে বিশেষ সম্মানের সহিত 'জারকা'কে রাজ-দরবারে পাঠাইয়া দিবার জন্য কুফার গভর্ণরের প্রতি আদেশ জারী করিলেন।

কিছুদিন পর কুফা হইতে 'জারকা' দরবারে আসিয়া হাজির হইলেন। মাবিয়া তাঁহাকে সাদরে আহ্বান করিয়া নিকটে বসাইলেন এবং সময়োচিত কুশলাদি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন। অতঃপর তাঁহাদের মধ্যে এইরূপ কথোপকথন আরম্ভ হইল—

মাবিয়া—আপনি আসিবার সময় পথিমধ্যে কোন প্রকার কষ্ট পাইয়াছেন কিনা? রাজকর্ম্মচারীগণ আপনার সহিত কোনরূপ অসদ্ব্যবহার করিয়াছে কি না, অকপটে নির্ভয়ে আপনি তাহা প্রকাশ করুন।

জারকা—মুসলমান নরনারী খোদা ভিন্ন আরকাহাকেও—তা-সে সসাগরা পৃথিবীর অধিশ্বর হইলেও ভয় করে বলিয়া আমার জানা নাই। তিনি ছাড়া, একমাত্র সেই দীন দুনয়ার মালিক ছাড়া ভয় করিবার আর কেহ আছে আমার ঈমান তাহা বলেনা, রাস্তায় আমার কোন কষ্ট হয় নাই, রাজকর্ম্মচারীগণ আমাকে বেশ আরাম দিয়াছেন।

মাবিয়া—আপনি কি জানেন, আমি আপনার সহিত কিরূপ ব্যবহার করিবার জন্য আপনাকে এখানে আনাইয়াছি।

জারকা—আমি অপরের মনের কথা বলিতে পারিনা, খোদাই একমাত্র 'গায়েবে'র কথা জানেন।

মাবিয়া—সিফ্‌ফিনের যুদ্ধে উভয় পক্ষের সৈন্যের মধ্যস্থলে উষ্ট্রোপরি দাঁড়াইয়া আমাকে হত্যা করিবার জন্য আমার বিপক্ষের সৈন্যবৃন্দের সম্মুখে আপনি যে উদ্দীপনাময়ী বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন, সে কথা কি আপনার মনে আছে? আপনি কেন সেরূপ করিয়াছিলেন? আমার সহিত আপনার কি শত্রুতা ছিল?

জারকা—হাঁ সবই আমার মনে আছে, আমি যাহা করিয়াছি, সত্য ও ন্যায়ের মর্য্যাদা রক্ষার্থেই তাহা করিয়াছি, আবশ্যক হইলে আপনার বিরুদ্ধে ভবিষ্যতেও আমি তাহা করিব, একবার নয় শতবার, সহস্র বার করিব।

মাবিয়া—আপনি আলীর প্রত্যেক কার্য্যে সহায় ছিলেন, আলীর প্রত্যেক ঘর্ম্ম বিন্দুর সহিত আপনি আপন রক্তবিন্দু মিশাইয়াছেন।

জারকা—আপনার কথা সত্য হউক, আপনার মুখে ফুলচন্দন পড়ুক, আলী কেন, তাঁহার বংশধরগণ এমন কি তাঁহার দাসানুদাসের জন্যও যেন আমি আমার জীবন উৎসর্গ করিতে পারি। হজরত রসুলে করিম তাঁহার বংশধরগণের সহিত এইরূপ ব্যবহার করিতেই আদেশ দিয়াছেন। আপনি স্বার্থান্ধ হইয়া, সত্যের মস্তকে পদাঘাত করিয়া তাহা অস্বীকার করিতে পারেন; কিন্তু অন্য কোন মুসলমান তাহা পারে না।

আমীর মাবিয়া এই স্পষ্ট ও তেজোদীপ্ত কথা শুনিয়া কিছুক্ষণ নির্ব্বাক ও নিস্পন্দভাবে সম্মোহিত অবস্থায় বসিয়া রহিলেন; অতঃপর জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি আমার নিকট কিছু প্রার্থনা করুন, আপনি যাহা চাহিবেন, বিনা বাক্যব্যয়ে আমি আপনাকে তাহা দান করিব। ইহার উত্তরে 'জারকা' যাহা বলিলেন, তাহা অভাবনীয়, অচিন্তনীয়, তিনি বলিলেন—আমি একমাত্র খোদাতালার দরবার ভিন্ন অন্য কাহারও নিকট কিছু প্রার্থনা করা এসলাম ধর্ম্মে মহা পাপ বলিয়া বিশ্বাস করি, বিশেষতঃ আমি সেই দু জাহানের মালিকের নাম লইয়া সপথ করিয়াছি একমাত্র তাঁহার ভিন্ন অন্য কাহারও নিকট সুখে, দুঃখে, বিপদে, সম্পদে কোন অবস্থায় কিছু যাচ্ঞা করিব না।

জারকার এই সকল কথা শুনিয়া আমির মাবিয়া ভাবমুগ্ধ অবস্থায় অনেকক্ষণ ধরিয়া অশ্রু বর্ষণ করিলেন। অবশেষে তিনি জারকার জন্য কুফা অঞ্চলে একটী জায়গীরের ব্যবস্থা করিয়া দিয়া বড় সম্মানের সহিত তাঁহাকে বিদায় দিলেন।

———

## বৃটীশ শাসিত জাতি সমূহ

| | |
|---|---|
| ভারতীয় | ২৪৪৩০৩০০০ |
| আরব | ৫৭৫৩০০০ |
| আফগান | ১৫৫০০০০ |
| পারশিক | ১০০০০০ |
| এহুদী | ১০৮৪০০০ |
| অন্যান্য জাতি | ৩১৫০০০০ |

### ( ইউরোপীয়ান )

| | |
|---|---|
| বৃটনের অধিবাসী 'ফরাসী'<br>কানাডার অধিবাসী 'বুয়ার' প্রভৃতি | ৬৪২৭৬০০০ |

### ( কৃষ্ণকায় )

| | |
|---|---|
| নিগ্রো | ৪৬১৬৬০০০ |
| ভারতীয় | ৬১৫০০০০০ |
| অষ্ট্রেলিয়ার আদীম অধিবাসী | ৬০০০০ |

### পীত জাতি

| | |
|---|---|
| মলয়বাসী প্রভৃতি | ৯৫৫৬০০০ |
| বার্ম্মীজ | ৭৮৯০০০০ |
| তুর্কী | ৬১০০০ |
| চাইনীজ | ২৩০৮০০০ |
| তিব্বতীয় | ৩০০০০০ |
| মূর | ৫৩০০০ |
| আমেরিকার আদিম অধিবাসী | ১৫৬০০০ |

### খৃঃ ১৯২১। জন্মের হার

| | |
|---|---|
| আমেরিকা | ১৯'৫ |
| ইংলণ্ড | ২২'৪ |
| ফ্রান্স | ১৮'৫ |
| জার্ম্মেনী | ২০'৫ |
| জাপান | ২৪' |
| ভারতবর্ষ | ৩১'৮৩ |
| নিউজিল্যাণ্ড | ২১'৭৪ |

## বিভিন্ন দেশ সমূহে হাজারকরা মৃত্যুর হিসাব

| দেশের নাম | মোট জন সংখ্যা | ১৯২১ খৃঃ মৃত্যুর হার | ১৯২৫ খৃঃ মৃত্যুর হার |
|---|---|---|---|
| আমেরিকা | ১০০০০০০০০ | ১২'৯ | ৯'৫ |
| ইংল্যাণ্ড | ৪৫৪০০০০০ | ১৪'৬ | ১১ ৭ |
| ফ্রান্স | ৩৯২০৯৫১৮ | ১৩'৭ | ১১'৫ |
| জার্ম্মেনী | ৬০০০০০০০ | ১৬'৪ | ১৩'২ |
| জাপান | ৬১০৮১৯৫৪ | ১৬'২ | ১৪'৫ |
| ভারতবর্ষ | ৩১৯৩৬১০০০ | ২৪'২ | ৩০'২ |
| নরওয়ে | ২৬০০০০০ | ১৩'২ | ১১ ৮ |
| নিউজিল্যাণ্ড | ১২০০০০০ | ৯'৫ | ৯'২ |
| সুইডেন | ৬০০০০০০ | ১৩'৮ | ১১'৭ |

### খৃঃ ১৯২৫। মধ্য বয়স্ক লোকের হার

| | |
|---|---|
| ইংলণ্ড ও ওয়েলস্ | ৫১ ৫ |
| আমেরিকা | ৫৫'৫ |
| নিউজিল্যাণ্ড | ৬০'০ |
| ফ্রান্স | ৪৮'৫ |
| জার্ম্মেনী | ৪৭'৪ |
| ইটালী | ৪৭'০ |
| জাপান | ৪৪'৩ |
| ভারতবর্ষ | ২৩'৭ |

## বিভিন্ন দেশের হাজারকরা শিশু মৃত্যুর হিসাব

| | |
|---|---|
| ইংলণ্ড ও ওয়েলস্ | ৫৭ |
| ফ্রান্স | ৮৫ |
| বেলজিয়াম | ১০৭ |
| জার্ম্মেণী | ১০৮ |
| স্পেন | ১৪৫ |
| ইটালী | ১৬১ |
| জাপান | ১৬৬ |
| ভারতবর্ষ | ১৯৪ |
| নিউজিল্যাণ্ড | ৪৫ |

## ভারতের অন্ধ, মুক, পাগল ও কুষ্ঠরোগগ্রস্থ লোকের হিসাব ( ১৯২১খৃঃ )

| বিভাগের নাম | | বিকৃত মস্তিষ্ক | | মুক | | অন্ধ | | কুষ্ঠরোগ গ্রস্ত | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | পুরুষ | স্ত্রীলোক | পুঃ | স্ত্রী | পুঃ | স্ত্রী | পুঃ | স্ত্রী |
| মাদ্রাজ | ... | ৫০৩৫ | ৩৫০৪ | ১১৯৪৭ | ৯৩৩৭ | ১৮২৩০ | ১৮২৬৭ | ১১৬০৯ | ৩৯৮৯ |
| বোম্বাই | ... | ৫৭০২ | ৩২৫৮ | ৬৫০২ | ৪২৩০ | ১৬৯৬৯ | ১৮০৮৯ | ৫৫৩৫ | ২৪২৮ |
| বাঙ্গলা | ... | ১১১০২ | ৭৭৯১ | ১৮৯৩৯ | ১২৩২৫ | ১৮৭০১ | ১৪৭৬৬ | ১১৪৪৮ | ৪০০৩ |
| ইউ, পি, | ... | ৪৮৩৭ | ২৩৩৮ | ১৪৩১১ | ৮৩৬৭ | ৫০৭৭৯ | ৫৪২৯৩ | ১০১০৬ | ২১৯০ |
| পাঞ্জাব | ... | ৪১১১ | ১৮৫৯ | ১১৭৯৩ | ৬৫২১ | ২৯১৬৬ | ২৪৪৯ | ১১৮৮ | ৪৩৯ |
| বর্ম্মা | ... | ৬২৮৫ | ৫২৮৮ | ৬৪৪৭ | ৫৪৩০ | ১১৩২৫ | ১৩১৯৮ | ৬৫৮৯ | ৩১৭৬ |
| বিহার ও উড়িষ্যা | ... | ২৩৩৪ | ১২০৩ | ১১৪২৩ | ৭২২৪ | ১৩৮৫২ | ১৪৩১৪ | ৭৮৪২ | ২৭৫৪ |
| সি, পি, | ... | ২০৮৫ | ১২১৮ | ৭৬০৫ | ৫২০২ | ১৫০১৪ | ২২৪৮২ | ৪৪৫০ | ২৭৬৬ |
| আসাম | ... | ২১৮৭ | ১৬৬৫ | ৩১১৫ | ২২৫৫ | ১২৭৪৭ | ৩৪৫৯ | ৩২০৮ | ১১০২ |

## বৃটিশ শাসিত ভারতের ১৯২৪।খৃঃ জন্ম ও মৃত্যুর হার ( হাজার করা )

| বিভাগের নাম | জন-সংখ্যা | জন্মের হার | জন্মের সমষ্টি | মৃত্যুর হার | শিশু মৃত্যুর হার | মৃত্যুর সমষ্টি | জ্বরে মৃত্যু | কলেরায় মৃত্যু | বসন্তে মৃত্যু | শ্বাস পীড়ায় মৃত্যু |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| মাদ্রাজ | ৪১০০২৬০৬ | ৩৪'৯ | ১৪৩০৮৫৮ | ২৪'৫ | ১৭৯'০২ | ১০০৬০৪৩ | ৩২৪২৫৬ | ৫১৯৭১ | ১৮৮১০ | ৬৪৭৮২ |
| বোম্বাই | ১৯১৫৫৬১৪ | ৩৫'৬ | ৬৭৯৩২১ | ২৭'৬৩ | ১৯০'৩৬ | ৫২৯৫৭৬ | ২১৪৫৬৩ | ৮২৩৬ | ১১১৫২ | ২৮৯২৬ |
| বাঙ্গলা | ৪৬৫২২২৯৩ | ২৯'৫ | ১৩৭০১১৪ | ২৫'৯ | ১৮৩'৯ | ১২০৩২৪১ | ৯১২৪০৩ | ৪৮৫১৪ | ৫৫৬৭ | ২৬৬৪৯ |
| ইউ, পি, | ৪৫৩৭৫৭৮৭ | ৩৪'৭২ | ১৫৭৩৮১০ | ১৮'২৯ | ১৯১'৬০ | ১১৮৩৮৭১ | ৯৪৭৮০৭ | ৬৭০০০ | ২৭২৪ | ২৭৪১২ |
| পাঞ্জাব | ২০৫১৭৬০৬ | ৪০'১ | ৮২১৬৮৫ | ৪৩ ৪৩ | ২১২'৪৯ | ৮৯১০২৬ | ৪৫২১৮৭ | ৩৩৫১ | ৪০৪০ | ৫৪৪৮৮ |
| বর্ম্মা | ১০৮২২৬১৮ | ২৭'৪০ | ২৯৩৫৮৫ | ২১'৫১ | ১৯৭'৫২ | ২৩৩১৬৪ | ৭৫২৮৮ | ৮০৮৩ | ২৫০১ | ১১০৯৮ |
| বিহার ও উড়িষ্যা | ৩৪০০২১৯৮ | ৩৫'৭ | ১২১৪১৪৬ | ২৯'১ | ১৫৮'২০ | ৯৮৯৭৬৩ | ১১০৬৩৫ | ৭৭৪৮০ | ৬৯৩২ | ৬৯০৬ |
| সি, পি, | ১৩৯১২৭৬০ | ৪৪'১৮ | ৩১৪৬৬৮ | ৩২'৫৯ | ২৩৪'৫০ | ৪৫৩৩৬২ | ২৪০৯৪৪ | ৯৭০৪ | ৯৭৮ | ৩৭১৩৬ |
| আসাম | ৬৮৫২২৪২ | ৩১ ০৪ | ২১২৭৫৫ | ২৭'৩০ | ১৮৪ ৩২ | ১৮৭১২৭ | ১১৩১৯৮ | ১৯১৮২ | ১৬৪৭ | ৬৭০৮ |

Printed and Published by Md. Khairul Anam Khan from the "Mohammadi Press",
20, Upper Circular Road, Calcutta.

# বি, গাঙ্গুলী

## মেগাফোন এজেন্সী

### ৪৭নং ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

মেগাফোন এখন বাজারে উৎকৃষ্ট বলিয়া পরিচিত। কলিকাতায় আমরাই মেগাফোনের একমাত্র এজেণ্ট। সিঙ্গেল স্প্রীং চোং সমেত ৪৩৲ চোংশূন্য ৩৫৲ ডবল স্প্রীং ৫০৲ হইতে ৭৫৲ এবং ট্রিপিল স্প্রীং ১২৫৲। হারমোনিয়াম সিঙ্গেল রীড ১৫৲ ডবল রীড ২৫৲ পাইবেন।

**জিনিস সুন্দর ও মজবুত না হইলে নিজেদের খরচায় ফেরত লই।**

আমরা পাইকারী ও খুচরা মাল সরবরাহ করিয়া থাকি। যে কোন রকমের গ্রামোফোন পার্ট সরবরাহ করিয়া থাকি। আমরা তিন মাসের জন্য এই কাগজে লিখিব অনুগ্রহ করিয়া ঠিকানা রাখুন।

**গ্রামোফোন, হারমোনিয়ম ও বাদ্য যন্ত্রের জন্য আমাদের লিখুন।**

---

বহুদিনের পরিচিত ও প্রসিদ্ধ

## হারমোনিয়ম ফ্যাক্টরী

১৫৲ টাকা হইতে ৩০০৲ টাকা পর্য্যন্ত।

আজকাল বাজারে ভূরি ভূরি হারমোনিয়মের কারখানা প্রতিষ্ঠিত হইতেছে ও উঠিয়া যাইতেছে। কিন্তু আমাদের ফ্যাক্টরী বহুকাল পূর্ব্বে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং দিন দিন উন্নতির পথে যাইতেছে। ইহাতেই প্রমাণ হয় যে আমাদের ফ্যাক্টরীতে প্রস্তুতীয় জিনিস সকলের বিশেষ পছন্দ সই। সমস্ত বড় বড় সহরে আমাদের হারমোনিয়ম বিশেষ আদরের সহিত গৃহীত হইয়া আসিতেছে। দরের বিশেষত্ব এই যে খরচের উপর সামান্য মাত্র মুনাফা রাখিয়া থাকি। সুতরাং মুল্যের দিক দিয়াও দেখিতে গেলে আমাদের প্রস্তুতীয় হারমোনিয়ম বাজারের সমস্ত হারমোনিয়ম অপেক্ষা সুলভ। একবার পরীক্ষা করিয়া দেখুন না?

**নজবুল হক ১৫০, লোয়ার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।**

প্রথমবর্ষ ফাল্গুন, ১৩৩৪ পঞ্চম সংখ্যা

# মাসিক মোহাম্মদী

সম্পাদক—

মোহাম্মাদ আকরম খাঁ

বার্ষিক মূল্য সডাক তিন টাকা

প্রতি সংখ্যা সাড়ে চারি আনা

POST BOX NO. **SIKRI & CO.** 2287, CALCUTTA.

S I K R I & C O

# শিক্‌রি এণ্ড কোং

পোষ্ট বক্‌স নং ২২৮৭
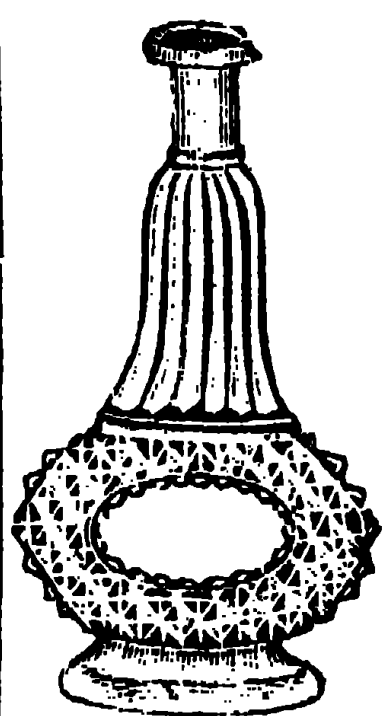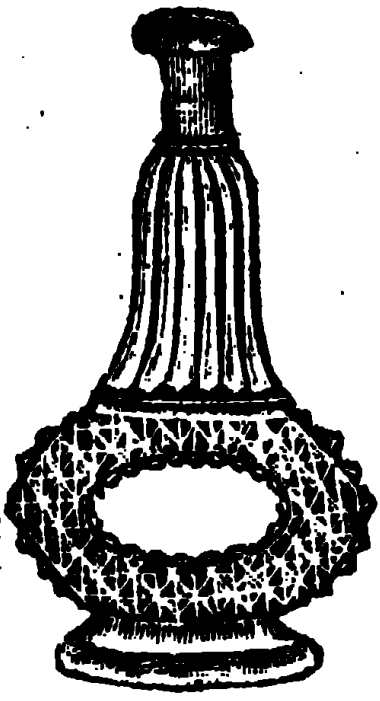
কলিকাতা

আমাদের এখানে সকল প্রকারের সুগন্ধী তৈল, সাবান প্রস্তুতের সর্ব্বপ্রকার সরাঞ্জাম সদাই বিক্রয়ার্থে প্রস্তুত থাকে। সর্ব্বপ্রকার ব্যবসায়ের উপযোগী খালী শিশি, বোতল, কর্ক, কর্ক স্ক্রু, হোয়াইট অয়েল, ক্যাষ্টর অয়েল ল্যাভেণ্ডার ইত্যাদি মৌজুদ থাকে। বোম্বাইএর প্রসিদ্ধ কারখানার কামিনীয়া অয়েল অটো দিলবাহারের আমরাই এজেণ্ট—

## শিক্‌রি এণ্ড কোং

৫৫।৮ ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

**SIKRI & CO.**

55/8, CANNING STREET, CALCUTTA.

# বিজ্ঞাপন সূচী—ফাল্গুন,—১৩৩৪।

অর্ডার দিবার সময় অনুগ্রহ পূর্ব্বক—"মাসিক মোহাম্মদী"র নাম উল্লেখ করিবেন।

প্লেটো। আফলাতুন। ও আরস্তু

প্লেটো ও আরস্তু এথেন্সের বিখ্যাত জ্ঞান মন্দিরের সিঁড়ি দিয়া নামিয়া আসিতেছেন। সোক্রাতের শিষ্য প্লেটো, উর্দ্ধে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিতেছেন—ভাবরাজ্য ও আধ্যাত্ম-জগৎই হইতেছে জ্ঞান সাধনার মূল লক্ষ্য। পক্ষান্তরে তাঁহার শিষ্য আরস্তু পৃথিবীকে দেখাইয়া বলিতেছেন—প্রকৃতি ও বস্তুতত্ত্বকে উপেক্ষা করা পূর্ণ জ্ঞান সাধকের পক্ষে উচিত হইবে না। প্লেটোর হাতের বইখানির উপর যাহা লেখা আছে—তাহার মর্ম্ম হইতেছে—ভাব ও ভক্তি। আরস্তুর হস্তস্থিত পুস্তকের লেখার অর্থ—ETHICS বা নীতি শাস্ত্র। ইঁহারা উভয়ে একই সময় এথেন্সের বিদ্যাগারে শিষ্যদিগকে জ্ঞানশিক্ষা প্রদান করিতেন।

"মোহাম্মদী প্রেস"

মাসিক মোহাম্মদী

প্রথম বর্ষ। || ফাল্গুন ১৩৩৪ সাল। || পঞ্চম সংখ্যা

# এমাম বোখারী

[ কাজী নওয়াজ খোদা ]

---

এমাম বোখারীর নাম, তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্য ও হাদিস শাস্ত্রের সেবার কথা না জানেন, এরূপ লোক মুছলমান সমাজে অতি বিরল। তাঁহার নাম আবু আবদুল্লাহ মোহাম্মদ। এমাম সাহেবের ঊর্দ্ধতন চারি পুরুষ পর্য্যন্ত বংশলতা এইরূপ:—

বারদেজ্‌বাহ্
|
মুগীরা
|
এবরাহিম
|
ইসমাঈল
|
মোহাম্মদ (এমাম বোখারী)

এমাম বোখারীর পূর্ব্ব পুরুষগণ সকলেই সম্ভ্রান্ত পারসিক পরিবারে জন্মগ্রহণ ও "জরদশ্‌ৎ" ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। এই বংশের অধিকাংশ লোকই পুরুষ পরম্পরায় ঈরানের রাজ দরবারে উচ্চ কার্য্যে জীবন অতিবাহিত করিয়াছেন। পারস্য দেশ এসলামের পবিত্র জ্যোতিঃতে উদ্ভাসিত হওয়ার পর এমাম সাহেবের ঊর্দ্ধতন তৃতীয় পুরুষ "মুগীরা" নৈশাপুরের তৎকালীন শাসনকর্ত্তা 'ইয়ামান জকী'র নিকট এসলাম ধর্ম্ম গ্রহণ করেন। এমাম সাহেবের পিতার নাম ইসমাঈল, তিনি একজন প্রকৃত মুছলমান ও মহা পণ্ডিত এবং হাদিস শাস্ত্রে আল্লামা আবদুল্লা এবনে মোবারকের ছাত্র ছিলেন। 'জাহবী' লিখিয়াছেন—ইসমাঈল একজন বিত্তশালী 'পরহেজগার আলেম ছিলেন। বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন মোহাদ্দেসের নিকট তিনি হাদিস-শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। মহা মনস্বী মোহাম্মদ আহ্‌মদ এবনে জা'ফর ও নসর্ এবান হোসেন তাঁহা হইতে হাদিছ রেওয়ায়ৎ করিয়াছেন।' এমাম মোহাম্মদ এবনে হাফস্ বলিয়াছেন তিনি একজন সত্যের সাধক ন্যায়বান আলেম ছিলেন, তাঁহার মৃত্যুর সময় আমি তাঁহার নিকট উপস্থিত ছিলাম, তিনি তখন বলিয়াছিলেন, খোদার হাজার 'শোকর' আমার ধন-সম্পত্তির মধ্যে একটী পয়সাও কখন অসৎ উপায়ে অর্জ্জন করি নাই; অতএব সে সবই হালাল, পাক। ইহার বেশী তাঁহার সম্বন্ধে আর কিছু জানিবার উপায় নাই (১)।

---

(১) এবনে হাব্বান লিখিত কেতাবুস্ সেকাৎ (كتاب الثقات) বোখারী লিখিত তারিখে কবীর (تاريخ كبير) কৎহল বারী ১ম খণ্ড ও জহ্‌বী লিখিত তারিখে এসলাম (تاريخ اسلام)। —(লেখক)

এমাম বোখারী ৩১শে শওয়াল শুক্রবার ১৯৪ হিজরী সনে বোখারায় জন্মগ্রহণ করেন, সেখানেই তাঁহার শৈশবকাল অতিবাহিত হয়।

জন্ম

শিক্ষা দীক্ষা সকল বিষয় অসম্পূর্ণ থাকার অবস্থায় শৈশবেই তাঁহার পিতা পরলোক গমন করেন। পিতৃহীন বালক একমাত্র মায়ের যত্নে, স্নেহে প্রতিপালিত ও তাঁহার শিক্ষাধীনে থাকিয়াই পরিবর্দ্ধিত হইয়াছিলেন। কথিত আছে, শিশুকালেই এমাম সাহেব চক্ষুরত্ন হারাইয়াছিলেন, কিছুদিন পর তাঁহার জননী স্বপ্নে দেখিলেন—মহাপুরুষ হজরত এবরাহিম ( আঃ ) তাঁহাকে বলিতেছেন—সাধ্বি ! তোমার ঐকান্তিক প্রার্থনার ফলেই সর্ব্বশক্তিমান আল্লাহ তাআলা তোমার অন্ধ পুত্রের চক্ষুদান করিলেন। এসলামের খেদমতেই তাহার জীবন অতিবাহিত হইবে, সে এসলাম-জগতে মহা সম্মান ও প্রতিপত্তি লাভ করিবে। মাতা নিদ্রা হইতে উঠিয়া দেখিলেন, অন্ধ পুত্র চক্ষুষ্মান হইয়াছে, তাহার দৃষ্টিশক্তির আর কোন দোষ নাই। তিনি তখন খোদার 'দরবারে' হাজার হাজার 'শোকর' করিলেন। (১) এই বর্ণনার সত্যতা যে তদন্ত সাপেক্ষ, তাহা বোধ হয় আর কাহাকে বলিয়া দিতে হইবে না। এমাম সাহেব শৈশবে যখন অন্যান্য বালকের সহিত 'খেলাধূলা' করিতেন, তখনও সকল বিষয়েই তাঁহার বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হইত।

এমাম সাহেব দশম বর্ষে পদার্পণ করার পরই হাদিস শিক্ষার্থীরূপে মোহাদ্দেসদের খেদমতে উপস্থিত হইলেন।

শিক্ষা ও প্রতিভা

সেকালে হাদিস শাস্ত্র একত্রিত বা গ্রন্থাকারে সংগৃহীত হয় নাই। বিভিন্ন হাদিস, বিভিন্ন মোহাদ্দেসের নিকট ভিন্ন ভিন্ন স্থানে গিয়া শিখিতে হইত। এজন্য হাদিসের শিক্ষার্থিগণকে বহুকষ্ট স্বীকার করিয়া দূরদূরান্তরে 'সফর' করিতে এবং ভিন্ন ভিন্ন হাদিস ভিন্ন ভিন্ন মোহাদ্দেসের নিকট এমনকি একই হাদিস বিভিন্ন 'রওয়ায়তে' বিভিন্ন বিশেষজ্ঞের নিকট শিক্ষা লাভ করিবার জন্য বহুদেশে ঘুরিয়া বেড়াইতে হইত। শিক্ষার্থিগণ ওস্তাদের নিকট যখন যে হাদিসটী শুনিতেন, তখনই সেটী বিশেষ সতর্কতার সহিত লিখিয়া রাখিতেন। নচেৎ অসংখ্য হাদিস রাবীদের নামের শৃঙ্খলার সহিত মনে করিয়া রাখা সম্ভবপর হইত না। পক্ষান্তরে হাদিস-শাস্ত্রের পাঠার্থী দিগকে সর্ব্বপ্রথমে "আসমাউর্‌রেজাল" ( রাবীদের জীবনের সমস্ত অবস্থা বর্ণনা সূচক ঐতিহাসিক ঘটনাবলী ), ইতিহাস ও তাৎকালীন ভৌগলিক তত্ত্বসমূহ সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করিতে হইত। মিথ্যা হাদিস রচনাকারীদের (وضّاعين) কুহক জাল ছিন্ন করিয়া প্রকৃত ও অপ্রকৃত হাদিস চিনিয়া লইবার ইহা ভিন্ন অন্য কোন উপায় ছিল না। সে সময় হাদিস-শাস্ত্র শিক্ষা করা শিক্ষার্থীদের পক্ষে কিরূপ মেধা, প্রতিভা, কষ্ট ও শ্রম সাপেক্ষ ছিল, ইহা হইতেই তাহা বেশ বুঝিতে পারা যাইতেছে।

এই সব গোলযোগের বিষয় বিবেচনা করিয়া 'আসমাউর্‌রেজাল', হাদিস সম্বন্ধীয় ঐতিহাসিক ঘটনাবলী, ভৌগলিকতত্ত্ব ও আনুষঙ্গিক অন্যান্য অনেক বিষয় এই সময় হইতে বিশেষ সতর্কতার সহিত লিখিয়া রাখিবার ব্যবস্থা সুধীসমাজে প্রচলিত হইয়াছিল। এমাম মালেক এবনে আনাস, এমাম অকী, হাম্মাদ এবনে সালমা প্রমুখ পণ্ডিতগণ হাদিস শাস্ত্র নির্ভুল ও অবিকৃত অবস্থায় রাখিবার উদ্দেশ্যে এই কার্য্যে বিশেষ ভাবে মনোযোগী হইয়াছিলেন।

অন্যান্য শিক্ষার্থীগণ সকলেই 'ওস্তাদের' নিকট হাদিস শুনিয়া তৎসমূহ বিশেষ সাবধানতার সহিত লিখিয়া রাখিতেন, কিন্তু এমাম বোখারী একদিনের জন্য একটী হাদিসও লিখিতেন না, কাগজ কলমের সহিত তাঁহার কোন সংস্রব ছিল না। অন্যান্য সকলে যখন লিখিয়া যাইতেন, তিনি তখন নিশ্চিন্ত ভাবে চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতেন। সতীর্থগণ তাঁহার এই নিশ্চিন্ততা ও উদাসীনতার ভাব দেখিয়া হতভম্ব ও অবাক হইয়া যাইতেন। সময় সময় হিতৈষী বন্ধুরূপে অনেকে তাঁহাকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিতেন এবং ভবিষ্যতে সাবধান হইতে উপদেশ দিতেন। কিন্তু তিনি কোন দিনই তাঁহাদের কথায় কর্ণপাৎ করিতেন না, ঈষৎ হাসিয়া চুপ করিয়া থাকিতেন। তাঁহার অন্যতম সতীর্থ বন্ধু হামেদ এবনে ইসমাঈল, মোহাম্মদ এবনে ওরাকা নামক অন্য একজনের নিকট বর্ণনা করিয়াছেন—এমাম বোখারী হাদিস-শাস্ত্রের অধ্যয়নে আমার সঙ্গী ছিলেন, সে সময় তাঁহার বয়স ১১ বৎসরের বেশী ছিল না, আমরা সকলে

---

(১) ঐতিহাসিক গঞ্জার লিখিত তারিখে বোখারা, ফৎহুল বারী প্রথম খণ্ড।

অধ্যাপকের নিকট হাদিস শুনিয়া বিশেষ সাবধানতার সহিত তৎক্ষণাৎ তাহা লিখিয়া রাখিতাম, কিন্তু তিনি কোন দিন কাগজ কলমের সহিত সংশ্রব রাখিতেন না, একদিনের জন্যও তাঁহাকে লেখনী ধারণ করিতে দেখি নাই। তাঁহার এই আচরণে দুঃখিত হইয়া একদিন আমি তাঁহাকে হিতৈষীভাবে হাদিস সমূহ লিখিয়া রাখিতে অনুরোধ করিলাম, তিনি হাসিয়া বলিলেন, আমার অপেক্ষা তোমাদের হাদিস শাস্ত্রে জ্ঞান ঢের বেশী; কিন্তু আমি মৌখিক আবৃত্তি করিয়া যাইতেছি, প্রথম দিন হইতে অদ্যাবধি তোমাদের লিখিত হাদিস সমূহের সহিত মিলাইয়া লইতে পার। এই বলিয়া তিনি পনর সহস্রের অধিক হাদিস মুখে মুখে আবৃত্তি করিলেন, আমরা পত্রে পত্রে, ছত্রে ছত্রে মিলাইয়া যাইতে লাগিলাম, তাঁহার আবৃত্তি শেষ হইলে দেখিলাম একটী শব্দে এমন কি একটী অক্ষরেও তাঁহার ভুল হইল না। কেবল হাদিসের আবৃত্তি নয়, সেই সঙ্গে বোখারী প্রত্যেক হাদিসের রাবীগণের বিস্তৃত অবস্থাও বর্ণনা করিয়াছিলেন, তাঁহার এক বর্ণেও সামান্য একটী বিচ্যুতি পরিলক্ষিত হইল না। এই ব্যাপারে তাঁহার অসাধারণ ধী-শক্তি ও আশ্চর্য্যজনক প্রতিভাব পরিচয় পাইয়া আমরা বিস্মিত, স্তম্ভিত ও অবাক হইয়া কিছুক্ষণ নিস্পন্দ ভাবে সম্মোহিত অবস্থায় বসিয়া রহিলাম। বেশ বুঝিলাম, তাঁহার সহিত অন্য কাহারও প্রতিযোগিতা ক্ষেত্রে অগ্রসর হওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব। (১) ইহা অপেক্ষা এমাম সাহেবের প্রতিভা ও স্মৃতি-শক্তির অধিক পরিচয় আর কি হইতে পারে? এই অসাধারণ শক্তির প্রভাবেই তিনি হাদিস-শাস্ত্রে জগৎ বিখ্যাত পণ্ডিত ও অপ্রতিদ্বন্দ্বী 'মোহাদ্দেস' হইয়া ছিলেন।

এমাম বোখারী যে হাদিস শুনিতেন, তাহার প্রতি অক্ষরটী, এমন কি যে মোহাদ্দেসের নিকট শুনিতেন প্রতি শব্দে তাঁহার উচ্চারণ ভঙ্গী, স্থান, কাল ও সেই সময়ে সেই হাদিসের অন্যান্য শ্রোতাদের নাম পর্য্যন্ত বিশেষত্বের সহিত স্থায়ীভাবে তাঁহার স্মৃতি-ফলকে অঙ্কিত হইয়া যাইত। তিনি প্রথম অবস্থায় হাদিস লিখিত ও গ্রন্থাকারে সংগৃহীত হওয়ার বিরুদ্ধবাদী ছিলেন। তিনি বলিতেন—"এরূপ অবস্থায় কেবল লিখিত কাগজের প্রতি সকলেই নির্ভরশীল হইয়া পড়িবে, সতর্কতার সহিত তৎসমূহ কণ্ঠস্থ করিয়া রাখার দিকে আদৌ আর কাহারও লক্ষ্য থাকিবে না। ফলে এমন এক সময় আসিবে, যখন "হাফেজে হাদিস" বলিতে দুনয়ার আর কেহ থাকিবে না। তখন লিখিত হাদিসের ভুল ভ্রান্তি নিরাকরণের লোক আর কোথাও খুজিয়া পাওয়া যাইবে না। হাদিস শাস্ত্রের পক্ষে এরূপ অবস্থা শুভজনক হইবে বলিয়া আমার মনে হয় না।" কিন্তু কিছুদিন পর সাধারণ শিক্ষার্থীদের তেমনতের দুর্বলতা বিশেষতঃ তাহাদের স্মৃতি শক্তির অল্পতা দেখিয়া তাঁহার পূর্ব্বমত পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল। তখন হইতে তিনি নিজেও হাদিস সমূহ লিখিয়া রাখিতে আরম্ভ করেন। এমাম সাহেব স্বীয় অসীম স্মৃতি শক্তির উপর এরূপ বিশ্বাস করিতেন যে কোন হাদিসই শুনিবা মাত্র লিখিতেন না, শিক্ষার্থী ও মোসলেম জগতের উপকারার্থে দীর্ঘকাল পরে ইচ্ছামত সেগুলি লিপিবদ্ধ করিতেন। অধিকাংশ স্থলে দেখিতে পাওয়া যায়, যে হাদিস তিনি শামদেশে কোনও মোহাদ্দেসের নিকট শুনিয়াছেন, মিসরে অবস্থানকালে তাহা লিখিয়া রাখিয়াছেন, আবার মিসরে যে হাদীস শুনিয়াছেন 'হেজাজে' সেটী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

মোহাম্মদ এবনে আওরাক ( محمد بن اوراق ) নামক একজন সমসাময়িক আলেমের নিকট এমাম সাহেব আপন পাঠ্যজীবনের অবস্থা বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—আমি দশ বৎসর বয়সে সর্ব্বপ্রথম শিক্ষাক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়াছিলাম। অতঃপর দশবৎসর পর্য্যন্ত অক্লান্ত পরিশ্রম, প্রাণপণ যত্ন ও অসীম আগ্রহের সহিত বিদ্যার্জ্জনে অতিবাহিত করিয়াছি। হাদিসশাস্ত্রে বিশেষ অভিজ্ঞতা লাভ করিবার উদ্দেশ্যে আমি বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন মোহাদ্দেসের 'খেদমতে' বহুকষ্ট স্বীকার করিয়া বহুদিন ধরিয়া অবস্থান করিয়াছি। কত সময় কতকষ্টে দিন গিয়াছে। কখন অনশনে, কখন অর্দ্ধাশনে আমার ছাত্রজীবন অতিবাহিত হইয়াছে। কতদিন আবশ্যকীয় বস্ত্রাভাবে শীতের প্রকোপে আমার দেহ জমিয়া গিয়াছে, আবার কখন গ্রীষ্মের প্রখর তাপে আশ্রয় অভাবে মরুপ্রান্তরে জীবন মরণ সমস্যায় উপনীত হইয়াছি। কিন্তু কোন দুঃখ ও কোন কষ্টই আমাকে আমার সঙ্কল্পচ্যুত করিতে পারে নাই। ধীর ও স্থিরভাবে সকল সময়ে আমি আমার কর্ত্তব্যপালন করিয়া গিয়াছি। সাধনায় সিদ্ধিলাভ

(১) ফৎহল্ বারী জেকরুস্‌সেহাহ্। ( লেখক )

করা ব্যতীত এজীবনে দেখিবার, শুনিবার অথবা উপভোগ করিবার অন্য কিছু আছে বলিয়া আমার জানা ছিল না। কোনও মোহাদ্দেসের নিকট একটী মাত্র সহীহ্ হাদিসের সন্ধান পাইলে আমি তাহা শিখিয়া লইয়া পরম পরিতৃপ্তি লাভ করিতাম। তখন আমার ক্ষুধাতৃষ্ণা দূর হইয়া যাইত, আমার সকল দুঃখ কষ্ট কোথায় অন্তর্হিত হইত। এই প্রকারে সকল আপদ বিপদকে তুচ্ছ করিয়া নানাদেশে নানাস্থানে আমি জ্ঞান-আহরণে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছি। এই সময় একদিন আমি সুবিখ্যাত আলেম 'এমাম সুফ্‌ইয়ানের' নিকট গিয়াছিলাম; তখন তিনি উপস্থিত ছাত্রমণ্ডলীর নিকট 'হাদিস' বর্ণনা করিতেছিলেন। আমিও বসিয়া শুনিতে লাগিলাম। একটী হাদিসের বর্ণনা উপলক্ষে তিনি বলিলেন, এই হাদিসটী এবরাহিমের নিকট হইতে আবু-জোবের শুনিয়াছেন। আমি বলিলাম না, কখনই না, এবরাহিম হইতে আবুজোবের কোন হাদিস রেওয়ায়ৎ করেন নাই, সে সময় আমার বয়স এগার বৎসর মাত্র। সুফইয়ান আমার কথায় অসন্তুষ্টি প্রকাশ করায় আমি তাঁহাকে বুঝাইয়া বলিলাম, আপনি এই হাদিসটী যে মূল গ্রন্থে লিখিয়া রাখিয়াছেন, সেটী বাহির করিয়া দেখিয়া লইলেই সকল বিষয়ের মীমাংসা হইয়া যাইবে। অতঃপর তিনি মূল মুসাবিদা বাহির করিয়া দেখিলেন, এবং পুনরায় আমার বক্তব্য বিষয় খুলিয়া বলিতে অনুরোধ করিলেন। আমি বলিলাম—আবুজোবের এবরাহিমের মুখ হইতে কোন হাদিস শোনেন নাই; জোবের এব্‌নে আদী নামক একজন রাবী এবরাহিমের নাম দিয়া হাদিস রেওয়ায়ৎ করিয়াছেন। তিনি আমার উক্তির সত্যতা উপলব্ধি করিয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহার কেতাব সংশোধন করিয়া লইলেন। (১)

এমাম বোখারী বলিয়াছেন—আমি ষোলবৎসর বয়সে পণ্ডিত প্রবর আবদুল্লা এব্‌নে মোবারক এবং এমাম অকীর অসংখ্য কেতাব মুখস্থ করিয়াছিলাম। পক্ষান্তরে ফেকাহ শাস্ত্রবিৎ পণ্ডিতগণের মতবাদ সমূহ সম্পূর্ণরূপে আমার আয়ত্তাধীন হইয়াছিল। সতের বৎসর বয়স হইতেই আমি গ্রন্থ রচনা ও বিশিষ্ট মতবাদ সমূহ লিপিবদ্ধ করিয়া সুধী সমাজে উপস্থিত করিতে মনস্থ করিলাম। আঠার বৎসর বয়সেই "কাজায়াস্ সাহাবাতে ওয়াত্তাবেয়ীন" (قضايا الصحابة والتابعين) নামে একখানি গ্রন্থ রচনার কার্য্য শেষ করিয়া ফেলিলাম। সাহাবা ও তাবেয়ীদিগকে ব্যক্তিগত ভাবে যে সকল ঘটনার সম্মুখীন হইতে হইয়াছে, এই কেতাবে আমি বিশেষ ভাবে তৎসমূহের উল্লেখ করিয়াছি, সঙ্গে সঙ্গে তৎসম্বন্ধীয় যাবতীয় প্রশ্নের সমাধানও করা হইয়াছে। অতঃপর হজরৎ রসুলে করিমের পবিত্র সমাধি সন্নিধানে বসিয়া জ্যোৎস্নার আলোর সাহায্যে "তারিখে কবীর" নামক আর একখানি গ্রন্থ লিখিয়াছিলাম। এই গ্রন্থে যাঁহাদের অবস্থা বর্ণিত হইয়াছে, তাঁহারা ব্যতীত আরও বহু মহাপুরুষের বিস্তৃত জীবন বৃত্তান্ত আমার জানা ছিল। বলিতে কি, মোস্‌লেম জগতের মহাপুরুষ গণের জীবনী ও তৎসম্পর্কীয় ঐতিহাসিক তথ্য সম্বন্ধে আমার অজানা বিষয় খুব কমই ছিল; কিন্তু বাহুল্য ভয়ে উক্ত গ্রন্থে বিস্তৃতভাবে সকল অবস্থার উল্লেখ করিতে পারি নাই (২)।

দেশ ভ্রমণ

এমাম সাহেব হাদিসের শিক্ষার্থীরূপে দুইবার মিসর ও শাম দেশে গিয়াছিলেন। হেজাজ প্রদেশে তিনি উপর্য্যুপরি ছয় বৎসর অবস্থান করিয়াছেন। সে সময় কুফা এবং বাগদাদ নগরী বিভিন্ন শাস্ত্রবিৎ মহা মহা পণ্ডিতগণের কেন্দ্রস্বরূপ ছিল, তিনি অনেক বার ঐ সকল জায়গায় গিয়াছেন এবং বহুদিন সেখানে অতিবাহিত করিয়াছেন। চারি বার বসরা গিয়াছিলেন। কেবল হজ্জের সময় প্রতি বৎসর মক্কা গমন করিতেন এবং হজ্জ সমাপন করিয়া পুনরায় বসরায় ফিরিয়া আসিতেন। (৩)

সমসাময়িক সুবিখ্যাত মোহাদ্দেসগণের সংগৃহীত লক্ষ লক্ষ হাদিসের মধ্যে তাঁহার অজানা হাদিস কিছু ছিল বলিয়া মনে হয় না। তবুও নূতন হাদিস শিক্ষার এমন নেশা তাঁহাকে পাইয়া বসিয়াছিল যে, এক একটী জায়গায় এক একজন মোহাদ্দেসের নিকট তিনি বহুবার যাতায়াত করিয়াছেন, কিন্তু অধিকাংশ স্থলে কেহ তাঁহাকে নূতন হাদিস শুনাইতে পারেন নাই। পক্ষান্তরে বিখ্যাত মোহাদ্দেসগণ তাঁহার নিকট হইতে বহু নূতন তত্ত্বের সন্ধান পাইয়াছেন।

---

(১) ফৎহুলবারী ১মখণ্ড ৫৬৪ পৃঃ
(২) ফৎহুলবারী প্রথম খণ্ড। (লেখক)
(৩) এব্‌নে খাল্লেকানে' وفيات الاعيان (লেখক)

এমাম সাহেব সর্ব্বপ্রথম কোন্ মোহাদ্দেসের নিকট হাদিস শিখিতে আরম্ভ করেন, তাহার বিস্তৃত সংবাদ জানিবার কোন উপায় নাই। কিন্তু একথা সকলেই স্বীকার করিয়াছেন যে علی بن عیاش এবং اسحق ابن راهویه র নিকট তিনি শিক্ষার হিসাবে বিশেষভাবে ঋণী ছিলেন। সাধারণতঃ তাঁহার শিক্ষক মণ্ডলী পাঁচ শ্রেণীতে বিভক্ত।

**এমাম সাহেবের শিক্ষক-শ্রেণী**

( ১ ) মোহাম্মদ এব্‌নে আব্দিল্লা আনসারী, অকী এব্‌নে এবরাহিম, আবু আসেম এব্‌নে নবীল, ওবেদুল্লা এব্‌নে মুসা, আবুনয়ীম, খাল্লাদ এব্‌নে য়াহয়া, আলী এব্‌নে আইয়াশ প্রভৃতি। ইঁহারা সকলেই তাবেয়ীন দলভুক্ত ছিলেন।

( ২ ) আদম এব্‌নে আবি আয়াস, আবু মসহের, সঈদ এব্‌নে আবী মরয়াম, আইউব এব্‌নে সোলেমান প্রভৃতি। ইঁহারা সকলেই তাবেয়ীদের সমসাময়িক ছিলেন, কিন্তু তাঁহাদের তাবেয়ীন শ্রেণীভুক্ত থাকার কথা বিশ্বস্তভাবে প্রমাণিত হয় নাই।

( ৩ ) সোলায়মান এবনে হারব, কোতায়বা এবনে সঈদ, নঈম এবনে হাম্মাদ, আলী এবনে মদিনী, ইয়াহইয়া এবনে মুঈন, আহমদ এবনে হাম্বাল, এস্‌হাক এবনে রাহ-ওয়ায়হ, আবী শায়বার উভয় পুত্র—আবুবাকার ও ওসমান। ইঁহারা তাবেয়ীদের মধ্যে কাহাকেও দেখেন নাই, পরবর্ত্তী সময়ের আলেমদের ( تبع تابعین ) নিকট হাদিস শিখিয়াছিলেন। এই শ্রেণীর মোহাদ্দেসদের নিকট এমাম বোখারী ও এমাম মোসলেম উভয়ে একত্রে হাদিস শুনিয়াছেন।

( ৪ ) মোহাম্মদ এবনে য়াহয়া, আবু হাতেম রাজী মোহাম্মদ এবনে আব্দীর রহীম, আবদ্ এবনে হামীদ, আহমদ প্রভৃতি। ইঁহারা সকলেই এমাম সাহেবের সহযোগী, কিন্তু তাঁহার শিক্ষাক্ষেত্রে প্রবেশ করার পূর্ব্বেই কোন কোন মোহাদ্দেসের নিকট তাঁহারা হাদীস শুনিয়াছিলেন। এমাম সাহেবের যে হাদিসগুলি বাদ পড়িয়াছিল, সতীর্থ হইলেও তাঁহাদের নিকট হইতে সেগুলি শুনিয়া লইয়াছিলেন। ইহা হইতে বেশ প্রমাণিত হইতেছে যে, শিক্ষা ক্ষেত্রে সেকালের মহা মনস্বীগণের লজ্জা বা কুণ্ঠা বলিয়া কিছু ছিল না, তাঁহারা যাহা জানিতেন না সতীর্থ এমন কি ছাত্রগণের নিকট হইতেও নিঃসঙ্কোচে তাহা শিখিয়া লইতেন।

( ৫ ) আবদুল্লা এবনে হাম্মাদ, আবদুল্লা এবনে আবিল কাজী খাওয়ারাজমী, হোসেন এবনে মোহাম্মদ প্রভৃতি। ইঁহারা সকলেই এমাম সাহেবের ছাত্র শ্রেণীভুক্ত।

এমাম বোখারি বলিয়াছেন—কামেল মোহাদ্দেস হইতে হইলে পূর্ব্ববর্ত্তী আলেম, সমসাময়িক সহযোগীবৃন্দ এমন কি ছাত্রদের নিকট হইতেও আবশ্যক মত হাদিস শিখিতে হয়। ইহা ব্যতীত কেহ হাদিসশাস্ত্রের শিক্ষায় পূর্ণতা লাভ করিতে পারেনা। ( ১ )

ইহা ছাড়া আরও বহু শিক্ষকের নিকট হইতে এমাম সাহেব শিক্ষা লাভ করিয়াছেন। মোহাম্মদ এবনে আবী-হাতেম বলিয়াছেন—আমি এমাম সাহেবের নিজের মুখে শুনিয়াছি—তাঁহার 'শেখের' সংখ্যা ১০৮০ জন।

**প্রসিদ্ধি লাভ**

এমাম সাহেব আঠার বৎসর বয়সে স্বদেশে ও বিদেশে সকল স্থানে এসলাম জগতের শ্রেষ্ঠতম আলেম বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। এই বয়সেই তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্য ও গভীর গবেষণার পরিচয় পাইয়া তৎসাময়িক দেশবিখ্যাত প্রবীণ আলেমগণ অবাক ও স্তম্ভিত হইয়া যাইতেন। সর্ব্বসাধারণের উপকারার্থে তিনি মোহাম্মদ এবনে ইউসফের বৈঠকখানায় বসিয়া ছাত্রদিগের অধ্যাপনা কার্য্য করিতেন। তাঁহার একজন ছাত্র বলিয়াছেন—এই অল্প বয়সে তাঁহার অধ্যাপনার যশ দেশময় ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। মোহাম্মদ এবনে ইউসফ ২১২ হিজরী সনে পরলোক গমন করেন, সুতরাং তাঁহার মৃত্যুর সময় এমাম সাহেবের বয়স ১৮ বৎসর পূর্ণ হয় নাই।

ছাত্রজীবনেই এমাম সাহেবের যশ দেশময় ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। তাঁহার অমানুষিক প্রতিভা ও হাদিস শাস্ত্রে অগাধ পাণ্ডিত্যের কথা সর্ব্বত্র এরূপ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল যে, বিখ্যাত মোহাদ্দেসগণও তাঁহার সহিত প্রতিযোগীতা ক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে সাহসী হইতেন না। সুবিখ্যাত প্রবীণ মোহাদ্দেসগণ যাঁহারা সকল সময় অসংখ্য ছাত্রদলে পরিবেষ্টিত হইয়া সতত অধ্যাপনা কার্য্যে নিযুক্ত থাকিতেন, দূর দূরান্তর হইতে যাঁহাদের নিকট হাদিস শিক্ষার জন্য দলে দলে ছাত্র সমাগম হইত, দীর্ঘকালব্যাপী হাদিস শাস্ত্রের আলোচনা ও অধ্যাপনাকার্য্যে যাঁহারা অসীম অভিজ্ঞতা

( ১ ) ফৎহুলবারী ৫৭৪,৪৭৫ পৃঃ ( লেখক )

অর্জ্জন করিয়াছিলেন, তাঁহারাও নিজেদের সংগৃহীত হাদিসের বিরাট গ্রন্থসমূহ সংশোধন করার উদ্দেশ্যে অষ্টাদশ বর্ষ বয়স্ক যুবক মোহাম্মদ এবনে ইসমাইলের নিকট পাঠাইয়া দিতেন। তিনি তাহা দেখিয়া হাদিস সমূহের সহীহ, জইফ প্রভৃতি হিসাবে শ্রেণী বিভাগ করিতেন। মোহাদ্দেসগণ সকলেই অবনত মস্তকে এই যুবকের সিদ্ধান্ত মানিয়া লইতেন। অধিকন্তু মোহাম্মদ এবনে ইসমাইলের বিচারে এই সকল হাদিস সহীহ বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে—সগৌরবে এই কথা উল্লেখ করিয়া তাঁহারা সেই হাদিসগুলি সুধী সমাজে উপস্থাপিত এবং আবশ্যক মত প্রমাণ স্বরূপে ব্যবহার করিতেন।

এই সময়ে হাদিস পড়িবার উদ্দেশ্যে দেশ দেশান্তর হইতে অসংখ্য ছাত্র তাঁহার 'খেদমতে' উপস্থিত হইত। হাফেজ এবনে হাজর বলিয়াছেন—এমাম সাহেবের ছাত্র সংখ্যা নব্বই হাজার ছিল। ( ১ )

একদিন পণ্ডিত প্রবর সলীম এবনে মোজাহেদ অন্যতম বিখ্যাত আলেম মোহাম্মদ এবনে ছালামের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন। মোহাম্মদ বলিলেন, কিছুক্ষণ পূর্ব্বে আপনি এখানে আসিলে এমন একটী বালকের সহিত আপনার পরিচয় করিয়া দিতাম, যিনি সত্তর হাজার সহীহ হাদিস কণ্ঠস্থ করিয়া রাখিয়াছেন। ঘটনাক্রমে সেই দিনই সলীমের সহিত এমাম সাহেবের সাক্ষাৎ হইল। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, সত্যই কি, সত্তর হাজার হাদীস আপনি মুখস্থ করিয়াছেন? এমাম সাহেব হাসিয়া বলিলেন তারও বেশী হাদিস আমি আয়ত্ত করিয়াছি। কেবল তাই নয়, ঐ সকল হাদিসের রেওয়ায়তে যে সমস্ত সাহাবা ও তাবেয়ীন প্রভৃতির নাম উল্লিখিত হইয়াছে, তাঁহাদের সকলেরই বিস্তৃত জীবন ইতিবৃত্তও আমার জানা আছে। আমি যে হাদিস উল্লেখ করিব, তাহার পোষকতায় কোর-আন শরীফের আয়ৎ ও অন্য হাদিসও উপস্থিত করিতে পারি। তৎসাময়িক সুবিখ্যাত মোহাদ্দেস এসহাক এবনে রাহওয়ায়হ একদিন জোম্মার নামাজে 'খোৎবা' পড়িবার সময় একটী হাদিসের উল্লেখ করিলেন। কিন্তু সেই হাদিসের 'সনদ' বর্ণনা করিতে রাবীদের নামে ভুল করিয়া ফেলিলেন। এমাম সাহেবও 'খোৎবা' শুনিতেছিলেন, তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁহার ভ্রম সংশোধন করিয়া দিলেন। বলিতে কি, বৃদ্ধ মোহাদ্দেস ( এসহাক ) অবনত মস্তকে বালকের কথা মানিয়া লইতে বাধ্য হইলেন।

২৫০ হিজরী সনে এমাম বোখারী নৈশাপুর ভ্রমণে গিয়াছিলেন, সেই খানেই রমজানের রোজা আরম্ভ হইল। কিন্তু এমাম সাহেব পীড়িত থাকা বশতঃ রোজা রাখিলেন না। এই সময় মোহাদ্দেস এসহাক এবনে রাহওয়ায়হ তাঁহাকে দেখিতে আসিলেন। ঘটনাক্রমে এমাম সাহেবের রোজা না রাখার কথা জানিতে পারিয়া বিস্ময়ের সহিত কারন জিজ্ঞাসু হইলেন। উত্তরে এমাম সাহেব এমন কয়েকটী সহীহ্ হাদিস পেশ করিলেন, যাহা এসহাক আদৌ জানিতেন না।

এমাম সাহেব বিখ্যাত মোহাদ্দেসগণের সংগৃহীত অসংখ্য 'সনদে'র কেতাব পড়িয়াছিলেন, ত্রিশ বৎসর বয়সে দুই লক্ষ হাদিস তাঁহার কণ্ঠস্থ ছিল, তন্মধ্যে একলক্ষ সহীহ ও এক লক্ষ জইফ প্রভৃতি।

একদিন এসহাক কথা প্রসঙ্গে এমাম বোখারীকে গৌরবের সহিত বলিলেন—আমি এমন একজন মোহাদ্দেসের কথা জানি যাঁহার সত্তর হাজার হাদিস কণ্ঠস্থ আছে। এমাম সাহেব হাসিয়া বলিলেন—এই বৈচিত্র্যময় জগতে আমিও এমন একজন লোককে জানি, যে দুই লক্ষ হাদিস মুখস্থ করিয়াছে। হাদীস-জগতে যে সময় এমাম বোখারীর অভ্যুদয় হইয়াছিল, সে সময় সহীহ জইফ, প্রকৃত অপ্রকৃত হাদিস লইয়া দেশময় মহা আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছিল। একদল এসলাম-বৈরী এমন ভাবে মিথ্যা হাদিসের সৃষ্টি ও কুট কৌশলের সহিত তাহার জাল 'সনদ' তৈয়ার করিতে আরম্ভ করিয়াছিল যে, প্রবীন মোহাদ্দেসগণের পক্ষেও তাহা বাছিয়া লওয়া এবং ভাল মন্দ হাদীসের প্রভেদ ঠিক করা অত্যন্ত কষ্টকর হইয়া পড়িয়াছিল। অন্যায় ও অসত্যের মূলোচ্ছেদকারী রবীদের খরধার কৃপাণ বহু মিথ্যা হাদীস সৃষ্টিকারীর ধ্বংস সাধন করিলেও সেই প্রকারের বহু পাষণ্ড তখনও গুপ্তভাবে তাহাদের কার্য্য চালাইতেছিল। তখনও এই দলের বহুলোক নানাস্থানে এইরূপ কুকার্য্যে রত ছিল। কথিত আছে—এই দলের একজন লোক কোর-আন শরীফ পাঠের গুন বর্ণনাসূচক চারি সহস্র মিথ্যা হাদিস সৃষ্টি

(১) ফাৎহুলবারী—( লেখক )

করিয়াছিল। সে বলিত—মোসলমানদের উপকারার্থেই সে এ-কাজ করিয়াছে।

এই বিপদ হইতে এসলাম জগৎকে রক্ষা করিবার জন্য পক্ষান্তরে হাদিস শাস্ত্র হইতে এই সকল আবর্জ্জনা দূর করিবার উদ্দেশ্যে, তৎসাময়িক মোহাদ্দেসগণ বহু আলোচনা করিয়া স্ব স্ব বিবেচনা মত বহুবিধ উপায় ও নানা পন্থা আবিষ্কার করিয়াছিলেন, কিন্তু কিছুই আশানুরূপ সুফল প্রদান করিতে পারে নাই। ঠিক এই সময় এমাম সাহেব কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। তিনি এজন্য যে বিচার ধারা ও নিয়ম 'কানুন' সৃষ্টি করিলেন, তাহা অভিনব। তাহার ফলে হাদিস জগতে এক নূতন বাতাস বহিয়া গেল। তাঁহার রচিত নিয়মের কড়াকড়ির ফলে অন্য মোহাদ্দেসদের স্বীকৃত অনেক সহীহ হাদিসও 'জইফ' শ্রেণীতে স্থান প্রাপ্ত হইল বটে, কিন্তু মৌজু (জাল) হাদিসকে প্রকৃত সহীহ হাদিস বলিয়া চালাইয়া দিবার পথ তাহার কল্যাণে সম্পূর্ণরূপে চিরতরে বন্ধ হইয়া গেল। এমাম সাহেব মোট ছয় লক্ষ হাদিসের মধ্যে তাহার নির্দ্ধারিত নিয়মের সূক্ষ্ম ও কঠোর নিয়মের মধ্যবর্ত্তীতায় বাছিয়া লইয়া মাত্র ৭২৭৫ হাদিস নিঃসন্দেহরূপে সহীহ বলিয়া সহীহ বোখারী কেতাবে একত্রিত ও এসলাম জগতে প্রচারিত করিয়াছিলেন। সহীহ হাদিস পরীক্ষা করিবার জন্য এরূপ অভিনব পন্থার আবিষ্কার ও তাহার সাহায্যে এতগুলি খাঁটী সহীহ হাদিসের একত্র সমাবেশ এক অভাবনীয় ও অচিন্ত্যনীয় ব্যাপার। এই ঘটনায় এমাম সাহেব মোসলেম-জগতকে অপরিশোধ্য কৃতজ্ঞতার বন্ধনে আবদ্ধ করিয়াছেন।

তিনি দামস্ক, শাম, বলখ, নৈশাপুর, হেজাজ, মিসর প্রভৃতি বহুদেশ পর্য্যটন করিয়াছেন। দুঃখের বিষয় বিশ্বস্ত সনদের সহিত তাঁহার ভ্রমণ বৃত্তান্ত বিস্তৃত ভাবে জানিবার কোন উপায় নাই।

শত্রুদলের অন্যায় আচরণের ফলে এমাম সাহেব বলখ্ ও নৈশাপুরে বেশীদিন থাকিতে পারেন নাই, অন্যান্য স্থানে বহুদিন ধরিয়া অবস্থান করিয়াছেন।

এমাম সাহেব যখন যেখানে থাকিতেন, সেখানকার অধিবাসীগণ তাঁহার নিকট হইতে অশেষবিধ উপকার প্রাপ্ত হইত। বিশেষতঃ আলেম সম্প্রদায় তাঁহার সাহায্যে সকল প্রশ্নের মীমাংসা, সকল সমস্যার সমাধান ও সকল সন্দেহের ভঞ্জন করিয়া লইতেন। তিনি বাসরায় অবস্থান কালে সকল সময় আলেম সম্প্রদায় ও অসংখ্য ছাত্রদলে পরিবেষ্টিত হইয়া থাকিতেন।

তিনি বহুদেশ ভ্রমণ করিয়াছেন, তন্মধ্যে বাগদাদ, সমরকান্দ, বাসরা ও নৈশাপুরের বৃত্তান্তই বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য। এই সকল স্থানে দীর্ঘকাল অবস্থান ও আলেম-গণের উত্থাপিত অংখ্য জটীল প্রশ্নাদির সদুত্তর প্রদানের ফলে সুধীসমাজে তাঁহার অভাবনীয় প্রতিভা ও হাদিস শাস্ত্রের অগাধ-পাণ্ডিত্যের কথা অবিসম্বাদিত রূপে স্বীকৃত ও দেশময় প্রচারিত হইয়া পড়িয়াছিল। (ক্রমশঃ)

---

# নব-পর্য্যায় না নব-পর্য্যয় !

[ মোহাম্মদ আকরম খাঁ ]

( ১ )

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক কাজী আবদুল অদুদ ছাহেব "নব পর্য্যায়" নামক একখানা পুস্তক প্রকাশ করিয়াছেন। এই পুস্তকে সাধারণভাবে এবং তাহার "সম্মোহিত মুসলমান" শীর্ষক প্রবন্ধে বিশেষরূপে এমন কতকগুলি অভিমত প্রকাশিত হইয়াছে, যাহা যুক্তির হিসাবে অপ্রামাণ্য, ইতিহাসের হিসাবে ভিত্তিহীন, এবং ধর্ম্মের হিসাবে মারাত্মক।

কিছুদিন পূর্ব্বে কাজী ছাহেব সংবাদ পত্রের সাহায্যে নিজের প্রতিপক্ষকে তাঁহার রচিত এই নবপর্য্যায় এবং তদীয় বন্ধু অধ্যাপক আবুল হোছেন সম্পাদিত "শিখা" পাঠ করিয়া দেখার জন্য সদর্প উপদেশ দিয়াছিলেন। বিশেষ আগ্রহ থাকা সত্বেও এতদিন আমরা নানা কারণে তাঁহার অনুরোধ পালন করিয়া উঠিতে পারি নাই। সম্প্রতি "শিখার" কএকটা প্রবন্ধ এবং কাজী ছাহেবের পুস্তকখানা পড়িয়া দেখার সৌভাগ্য আমাদের ঘটিয়াছে। কাজী ছাহেবের ও অন্যান্য কএকজন বন্ধুর পরামর্শমতে আমরা নবপর্য্যায়ের "সম্মোহিত মুসলমান" প্রবন্ধটী বিশেষ মনোযোগ সহকারে পড়িয়াছি—এবং পড়িয়া এই স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি যে, কাজী ছাহেব নব-পর্য্যায়ের নামে বস্তুতঃ এছলামের বিপর্য্যয় সাধন করারই চেষ্টা করিয়াছেন। ইচ্ছায় হউক আর অনিচ্ছায় হউক, জীবনের জটিলতার সমাধান করার জন্য এই সকল লেখায় যে ভাষাগত জটিলতার আশ্রয় গ্রহণ করা হইয়াছে, তাহার মধ্য হইতে লেখকের মূল বক্তব্য ও প্রতিপাদ্য বিষয়গুলি উদ্ধার করিয়া লওয়া আমাদের মত সাধারণ পাঠকগণের পক্ষে সহজসাধ্য নহে, একথা স্বীকার করিতে বোধ হয় কাহারও আপত্তি হইবে না। একটু ধৈর্য্য ধারণ করিয়া তাঁহার লেখার ভিতরে প্রবেশ করিতে পারিলে দেখা যাইবে যে, সেগুলি কেবল যুক্তিহীন দাবীই নহে, বরং উহা যুক্তির বিপরীত, এমন কি পরস্পর বিরোধী, কতকগুলি প্রমাণহীন দাবীর সমষ্টি মাত্র। অধিকন্তু নিজের জ্ঞানের অহমিকা এবং প্রতিপক্ষের প্রতি অন্যায় বিদ্বেষের তীব্র জ্বালা তাঁহার লেখার মধ্য দিয়া সর্ব্বদাই যেন পরিস্ফুট হইয়া উঠিতে দেখা যায়।

প্রত্যেক ব্যক্তি স্বাধীনভাবে নিজের মতামত প্রকাশের অধিকারী। বরং আমি নিজের জ্ঞান বিশ্বাস মতে যাহা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করি, তাহা প্রকাশ না করাই আমার পক্ষে অমার্জ্জনীয় অপরাধ। কিন্তু, আমি যাহা বিশ্বাস করি, বৈষয়িক দূরদর্শীদের মত ভবিষ্যতের ভাবনা ভাবিয়া বর্ত্তমানে তাহার কতক অংশ গোপন করা; অথবা প্রতিপক্ষকে প্রতারিত করার জন্য নিজকে তাহাদের চিন্তা ভাব ও সংস্কারের আংশিক শরিক বলিয়া প্রকাশ করা, কখনই সঙ্গত বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না। দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে যে, কাজী ছাহেবকে আমরা এই সকল অপরাধে অপরাধী সাব্যস্ত করিতে বাধ্য হইয়াছি। এই প্রকার রূঢ় মন্তব্য প্রকাশের জন্য আমরা আন্তরিক দুঃখিত হইলেও, সত্যের অনুরোধে এই অপ্রিয় অভিমত ব্যক্ত করা ব্যতীত গত্যন্তরও আমাদের নাই।

আলোচনার সুবিধার জন্য আমরা প্রথমে কাজী ছাহেবের মন্তব্যগুলি, অবিকল তাঁহারই ভাষায় উদ্ধৃত করিয়া দিব, এবং পরে তাহার বিচার বিশ্লেষণে প্রবৃত্ত হইব। আমাদের আলোচনা এবং সিদ্ধান্ত সঙ্গত হইল কি না, পাঠকগণ তাহার বিচার করিবেন।

( ক ) কাজী ছাহেব তাঁহার নব-পর্য্যায় নামক পুস্তকের "সম্মোহিত মুসলমান"--শীর্ষক প্রবন্ধের প্রথমে বলিতেছেন :—

**হজরত মোহাম্মদ যে একজন মহাপুরুষ, অর্থাৎ, সত্য তিনি শুধু কথায় প্রচার করেন নি তা তাঁর সমগ্র জীবনের ভিতরে এক আশ্চর্য্য-**

দৃঢ় রূপ ধারণ ক'রেছিল, সে সম্বন্ধে তর্ক বিচার করার কাল বোধ হয় উত্তীর্ণ হয়ে গেছে।

কাজী ছাহেবের এই স্বীকারোক্তি মতে প্রতিপন্ন হইতেছে যে:—

(১) হজরত মোহাম্মদ একজন মহাপুরুষ।

(২) যিনি শুধু কথায় সত্য প্রচার করিয়াই ক্ষান্ত হন না, বরং কথার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার নিজের সমগ্র জীবনের ভিতরে সেই সত্য আশ্চর্য্য ও দৃঢ় রূপ ধারণ করিয়া থাকে, প্রকৃত মহাপুরুষ তিনি।

(৩) হজরত মোহাম্মদের **সমগ্র জীবন** অর্থাৎ তাঁহার জীবনের প্রত্যেক কার্য্য, প্রত্যেক ভাব, প্রত্যেক শিক্ষা ও প্রত্যেক সাধনা সুদৃঢ় সত্যের দ্বারা পরিপূর্ণ, তাহার কোন স্তরের কোন দিকে অসত্যের সংস্পর্শ মাত্রও নাই।

(৪) মহাপুরুষের জীবনের ভিতরে সত্য এমন একটা রূপ ধারণ করে, দৃঢ় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যাহা অন্যের পক্ষে আশ্চর্য্যজনকও হইয়া থাকে।

(৫) যে সকল ব্যাপারের সহিত আমরা পরিচিত, যে সকল কার্য্য সম্পাদনে আমরা নিজদিগকে সমর্থ বলিয়া মনে করি, তাহা আমাদের মনে কোন প্রকার আশ্চর্য্য বা বিস্ময়ের সৃষ্টি করিতে পারে না। অতএব হজরতের সমগ্র জীবনের ভিতরে সত্য আশ্চর্য্য-দৃঢ় রূপ ধারণ করিয়াছিল, একথার একমাত্র তাৎপর্য্য এই যে, তাঁহার মত সত্যকে সমগ্র জীবনের ভিতরে দৃঢ়রূপে ধারণ করা অন্যের পক্ষে অদ্ভুত ও অসম্ভব।

(৬) এক একটা অভিমত বা সিদ্ধান্তের এমন একটা সময় উপস্থিত হয়, যখন সঙ্গতভাবে বলা যাইতে পারে যে, সে সম্বন্ধে তর্ক বিচার করার সময় উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে।

(৭) হজরতের সমগ্র জীবনের ভিতরে সত্য যে এক আশ্চর্য্য-দৃঢ় রূপ ধারণ করিয়াছিল—এসম্বন্ধে তর্ক ও বিচারের কাল উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে,—এ উক্তির স্পষ্ট তাৎপর্য্য এই যে, তর্ক ও বিচারের দ্বারা চরম সিদ্ধান্ত হইয়া গিয়াছে যে, বস্তুতঃ হজরতের সমগ্র জীবন এক আশ্চর্য্য দৃঢ় সত্যে পরিপূর্ণ ছিল। এখন পুনরায় সে সম্বন্ধে আলোচনা করিতে যাওয়া হঠকারিতা ব্যতীত আর কিছুই নহে।

সম্মোহিত মুছলমান লেখক ইহার পর বলিতেছেন:—

(খ) "কিন্তু মহাপুরুষ মোহাম্মদের অভক্ত যে তাঁর জীবনের এই জটিলতায় বিড়ম্বিত হয়েছেন সে আর কতটুকু দুঃখের বিষয়। তার চাইতে অনেক বেশী শোচনীয় ব্যাপার তাঁর অনুবর্ত্তী ভক্তদের ভিতরেই ঘটেছে,—তাঁরাও তাঁর এই বিচিত্র অথচ ভগবন্মুখী জীবনে বিড়ম্বিত হয়েছেন, সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মহাসাধনাকে বিড়ম্বিত করেছেন।—তাঁরা তাঁর পানে যে-দৃষ্টিতে চেয়েছেন ও যে-দৃষ্টিতে চাইবার জন্য অপরকে আহ্বান করেছেন, তাতে এই সহজ অথচ বড় সত্য আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে যে, জগতের অনন্তকোটী মানুষের মতো হজরত মোহাম্মদও একজন মানুষ;—মানুষের ইতিহাসের **এক বিশেষ স্তরে শক্তি-মাহাত্ম্যে তিনি সুপ্রকট,** কিন্তু তাঁর শক্তি-মাহাত্ম্য লাভই সে ইতিহাসের চরম কথা নয়, তার চাইতে গভীরতর কথা এই,—জগৎসংসারের যিনি চিরজাগ্রত নিয়ামক অনন্তকাল ধরে তিনি এমনিভাবে **শক্তিমান আর সাধারণ** এই দুই শ্রেণীর চক্রের সমবায়ে সংসার-রথকে চিরচলন্ত রেখেছেন। বাস্তবিক, মহাপুরুষ **যে সর্ব্বজ্ঞ** নন, মানুষের **সর্ব্বময় প্রভু** নন, মানুষের জীবনসংগ্রামে তিনি একজন বড় বন্ধু মাত্র—অবশ্য যেমন বন্ধু সমুদ্রচারী পোতের জন্য আলোকস্তম্ভ; **তাঁর কথা ও চিন্তার দ্বারা** চিরকালের জন্য **মানুষের পথকে নিয়ন্ত্রিত ক'রে দিয়েছে** একথা বিশ্বাস করলে মানুষরূপে তাঁর সাধনাকে যে চরম অপমানে অপমানিত করা হয়, কেননা সমস্ত সাধনার যা লক্ষ্য সেই আল্লাহর **উপলব্ধি** মানুষের দৃষ্টিপথ থেকে রুদ্ধ হয়ে যায়—যে আল্লাহ্ চির-জাগ্রত, **চিরবিচিত্র,** বিশ্বজগতের রন্ধ্রে রন্ধ্রে দেশে দেশে যুগে যুগে **মানুষের অন্তহীন শুভ চেষ্টায় যাঁর মহিমা প্রকটিত;** হজরত মোহাম্মদের অনুবর্ত্তীরা সেই প্রাণপ্রদ সদাস্মর্ত্তব্য কথা অদ্ভুত ভাবেই মন থেকে দূর ক'রে দিয়েছেন;—হয়ত **তারই ফলে** অন্যান্য ছোটখাটো প্রতিমার সামনে নতজানু হওয়ার দায় থেকে কিছু নিস্কৃতি পেলেও **"প্রেরিতত্ব"রূপ এক প্রকাণ্ড প্রতিমার সামনে নত-দৃষ্টি হয়ে** তাঁরা যে জীবন পাত করেছেন, আধ্যাত্মিকতা নৈতিকতা সাংসারিকতা সব দিক থেকেই তা শোচনীয়রূপে দুঃস্থ ও বিভ্রান্ত।"

আমাদের মনে হয়, কাজী ছাহেবের প্রবন্ধের মূল প্রতিপাদ্য এই উদ্ধৃতাংশের মধ্যে সন্নিহিত আছে। সেই জন্য এই অংশের বিশ্লেষণ করার পর আমরা প্রথমে তাহার বিচারে প্রবৃত্ত হইব, অন্যান্য কথার আলোচনা এবং ঋজুতার ভঙ্গিমা, জীবনের বহু ভঙ্গিমতা ও সেই বহু ভঙ্গিমতার একমুখিত্ব প্রভৃতি পদগুলির তাৎপর্য্য নির্দ্ধারণের চেষ্টা পরে করিব।

(১) কাজী ছাহেব স্বীকার করিতেছেন যে, হজরত "এক পরমাশ্চর্য্য অধিকার" লাভ করিয়াছিলেন, এবং তিনি "মানুষের ইতিহাসের এক বিশেষস্তরে শক্তি মাহাত্ম্যে প্রকট" হইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার অভিযোগ এই যে, হজরত মোহাম্মদও যে জগতের অনন্ত কোটি মানুষের মত একজন মানুষ, তাঁহার অনুবর্ত্তীদের মধ্যে কাহারও দৃষ্টি সেদিকে পড়ে নাই।

(২) জগৎ সংসারের যিনি চিরজাগ্রত নিয়ামক, অনন্ত কাল ধরিয়া এমনিভাবে শক্তিমান ও সাধারণ এই দুই শ্রেণীর চক্রের সমবায়ে তিনি সংসার রথকে চির চলন্ত রাখিয়াছেন—একথাও হজরত মোহাম্মদের অনুবর্ত্তীরা জানে না।

(৩) হজরত মোহাম্মদের অনুবর্ত্তীরা জানে না যে, মহাপুরুষ সর্ব্বজ্ঞ নহেন, মানুষের সর্ব্বময় প্রভুও তিনি নহেন। বস্তুতঃ মানুষের জীবন সংগ্রামে তিনি একজন বড় বন্ধু মাত্র—অবশ্য যেমন বন্ধু সমুদ্রচারী পোতের জন্য আলোক স্তম্ভ। তাঁহার কথা ও চিন্তারধারা চিরকালের জন্য মানুষের দৃষ্টি পথকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া দিয়াছে, একথা বিশ্বাস করিলে আল্লার উপলব্ধি মানুষের দৃষ্টিপথ হইতে রুদ্ধ হইয়া যায়।

(৪) আল্লাহ চিরজাগ্রত, চিরবিচিত্র, বিশ্ব-জগতে দেশে দেশে যুগে যুগে মানুষের অন্তহীন শুভ চেষ্টায় তাঁহার মহিমা প্রকট হইয়া আছে। হজরত মোহাম্মদের অনুবর্ত্তীরা এই প্রাণপ্রদ সদা স্মরণীয় কথাটা মন হইতে অদ্ভুত ভাবেই দূর করিয়া দিয়াছেন।

(৫) ইহার ফলে হজরত মোহাম্মদের অনুবর্ত্তীরা "প্রেরিতত্ব" বা রেছালৎরূপী এক প্রকাণ্ড প্রতিমার সম্মুখে নতজানু হইয়া ঘোরতর পৌত্তলিক সাজিয়াছে। হজরত মোহাম্মদকে আল্লার রছুলরূপে মান্য করার এই যে ঘোর পৌত্তলিকতা ও প্রকাণ্ড প্রতিমা পূজা, আধ্যাত্মিকতা নৈতিকতা ও সাংসারিকতার সবদিক দিয়া মুছলমান শোচনীয়রূপে দুঃস্থ ও বিভ্রান্ত হইয়াছে—এই পৌত্তলিকতারই কল্যাণে।

এইগুলি হইতেছে কাজী ছাহেবের দাবী ও সিদ্ধান্ত। আমাদিগের "শত শত বৎসরের পুরাতন বিধি" অনুসারে কোন দাবী করিলে তাহার দলিল দিতে হয়, কোন অভিমতকে চরম সিদ্ধান্তরূপে উপস্থাপিত করিতে হইলে সেই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার অনুকূল যুক্তি প্রমাণও সঙ্গে সঙ্গে বলিয়া দেওয়া আবশ্যক হয়। কিন্তু কাজী ছাহেবের মতে ঐ সকল জরাজীর্ণ পুরাতনকে মানিয়া চলা "সেই কৃপার পাত্রগুলির" কাজ যাহারা অলেম বলিয়া নিজের পরিচয় দেয়। বোধ হয় এই জন্য তিনি যুক্তি প্রমাণের পুরাতন জঞ্জালের ত্রিসীমায় পদার্পণ করা মোটেই সঙ্গত বলিয়া মনে করেন নাই।

এই প্রবন্ধে কাজী ছাহেবের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় এই যে, হজরত মোহাম্মদের অনুবর্ত্তীরা ঘোর পৌত্তলিক—কারণ তাহারা মহাপুরুষের প্রেরিতত্বে বিশ্বাস করে, অর্থাৎ তাহারা মনে করে যে হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা আল্লার প্রেরিত বা রছুল! তাঁহার মতে হজরতকে আল্লার রছুল বলিয়া বিশ্বাস করা আর অতি নিকৃষ্ট শ্রেণীর প্রতিমা পূজা করা, একই কথা। এই প্রতিমা পূজার কল্যাণেই এছলামের "ইতিহাসটা বহুল পরিমাণে ব্যর্থতার ইতিহাসে" পরিণত হইয়াছে, এবং এই জন্যই "আধ্যাত্মিকতা নৈতিকতা ও সাংসারিকতার সকল দিকে মুছলমানকে শোচনীয়রূপে দুঃস্থ ও বিভ্রান্ত হইয়া পড়িতে হইয়াছে।

চিন্তাশীল পাঠকগণ একটু ভাবিয়া দেখিলে সহজে বুঝিতে পারিবেন যে, কাজী ছাহেব বাহ্যতঃ "হজরত মোহাম্মদের অনুবর্ত্তিগণের" উপর আক্রমণ করিলেও প্রকৃত পক্ষে সে আক্রমণের মূল লক্ষ্য হইতেছেন—স্বয়ং হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা এবং তাঁহার প্রচারিত এছলাম ধর্ম্ম। মুছলমান সমাজ হজরতকে মান্য করে—সত্যের মহা সাধক বলিয়া, তাওহীদের শ্রেষ্ঠতম শিক্ষক বলিয়া, মানব সমাজের চরম ও পরম আদর্শ বলিয়া, কোরআনের ও এছলামের বাহক বলিয়া। কাজী ছাহেবের লেখায় প্রকাশ পাইতেছে যে, হজরত রছুলে করিমের জীবনব্যাপী সাধনা সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে, তাঁহার শিক্ষা ও আদর্শ সমগ্র মুছলমান সমাজকে—তাওহীদের শিক্ষায় উদ্বুদ্ধ করা ত' দূরে থাকুক—ঘোর পৌত্তলিকতার পানেই টানিয়া লইয়া গিয়াছে!

হজরত মোহাম্মদ মোস্তফাকে মুছলমানেরা আল্লার প্রেরিত ও তাঁহার নিকট হইতে প্রেরণাপ্রাপ্ত রছুল বলিয়া

বিশ্বাস করে—একথা খুবই সত্য। ইহা পৌত্তলিকতা হইলে, মুছলমান সমাজ যে একটা ঘোর পৌত্তলিকের সমষ্টি মাত্র, তাহাতেও কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু এই দাবীর বিচার করার পূর্ব্বে জিজ্ঞাসা করিতে চাই—এই রছুল মান্য করার শিক্ষা কি স্বয়ং হজরতই মুছলমানকে প্রদান করেন নাই? তাঁহার সমগ্র জীবনের ভিতরে এই শিক্ষাই কি একটা প্রধান স্থান অধিকার করে নাই? "আমি আল্লার প্রেরিত রছুল"—২৩ বৎসর ধরিয়া শয়নে স্বপনে জাগরণে সর্ব্বক্ষণই কি তিনি ইহাকে সর্ব্বতোভাবে বিশ্বাস করেন নাই? আল্লাহ তাঁহাকে নিজের রছুল করিয়া পাঠাইয়াছেন এবং আল্লাহ স্বয়ং তাঁহাকে ইহা অবগত করিয়াছেন—একথা কি স্বয়ং হজরত মোহাম্মদই তেইশ বৎসর ব্যাপিয়া তন্ময়ভাবে প্রচার করেন নাই? মনুষ্যই চিরকাল আল্লার রছুল হইয়া আবির্ভূত হইয়া থাকে এবং হজরত মোহাম্মদ সেই রছুলদিগের মধ্যকার একজন—কোরআন কি পুনঃ পুনঃ এই বাণী প্রচার করে নাই? রছুল বিরোধী দিগের প্রতিবাদেই কি কোরআনের একটা প্রধান অংশ পর্য্যবসিত হয় নাই? লা-ইলাহা ইল্লাল্লার সঙ্গে সঙ্গে মোহাম্মাদুর রছুলুল্লাহ কে স্বয়ং হজরত মোহাম্মদ কি আল্লার উক্তি বলিয়া এছলামের প্রথম কলেমার অন্তর্ভুক্ত করিয়া দেন নাই?

কি আশ্চর্য্য কথা! একজন মানুষ আল্লার নাম করিয়া, তাঁহার সাক্ষাৎ বাণী বলিয়া, চরম সত্য বলিয়া, মানুষের মুক্তির অবলম্বন বলিয়া, তেইশ বৎসর ধরিয়া, সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করিয়া প্রচার করিতেছেন যে, তিনি সত্যকার রছুল আল্লাহ তাঁহাকে প্রেরণ করিয়াছেন। এই রছুলকে বিশ্বাস করা যদি মহাপাতক হয়, পৌত্তলিকতা হয়, মানুষের সর্ব্বনাশের প্রধান কারণ হয়, তাহা হইলে সেই পৌত্তলিকতার জন্য, সেই মহাপাতকের জন্য এবং কোটি কোটি মানবের সেই চরম সর্ব্বনাশের জন্য প্রধান দায়ী সেই ব্যক্তি। পক্ষান্তরে যাহারা আপনাদের জ্ঞানবিশ্বাস মতে তাঁহার সেই সর্ব্বনাশী শিক্ষাকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে, তাহারা বিভ্রান্ত হইলেও তাহাদের অপরাধ তাঁহার তুলনায় খুবই কম। কাজী ছাহেবের মনের খবর আমরা বলিতে পারি না, কিন্তু তাঁহার লেখা পড়িয়া মনে হয়, স্বয়ং হজরতের প্রতি এই অন্যায় ও ভয়াবহ ধারণা জন্মাইয়া দিবার জন্যই তিনি ছদ্মবেশী ভাষার সাহায্যে, বাহ্যতঃ মুছলমান সমাজকে আক্রমণ করিয়াছেন।

কেহ যদি বাস্তবিকই নিজের জ্ঞান-বিশ্বাসমতে উপরোক্ত-রূপ ধারণা পোষণ করিতে বাধ্য হইয়া থাকেন, তাহা হইলে তিনি স্বচ্ছন্দে নিজের মনের কথা মুখে ব্যক্ত করিতে পারেন। তাহাতে আপত্তি করার ন্যায়-সঙ্গত অধিকার কাহারও নাই। বিশেষতঃ মুছলমানের ইহাতে ক্ষুব্ধ বা বিচলিত হওয়ারও কিছুই নাই, কারণ এছলামের ইতিহাসে ইহা মোটেই নূতন ব্যাপার নহে। যে পাশ্চাত্যের ছিটেফোটার "ছটাকি" আমরা—সেওত নিজের জ্ঞান-বিজ্ঞান, মনীষা প্রতিভা, অগাধ ধনভাণ্ডার ও অসাধারণ সুযোগ লইয়া বহুশতাব্দী ধরিয়া এছলামের সহিত শক্তি পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছে! সুতরাং মুছলমানের ইহাতে অসন্তোষের বা আতঙ্কের কিছুই নাই। কাজী ছাহেবও একবার ময়দানে আসিতে চান, আসুন! তাহাতে আমাদের কোনই আপত্তি নাই। আমরা শুধু অনুরোধ করিতেছি—ভাষার ছদ্মবেশ পরিত্যাগ করিতে। এই শ্রেণীর ছদ্মবেশের মধ্যে কত গভীর ষড়যন্ত্র, কত কুটিল কু-মতলব লুকাইয়া থাকিতে পারে, এই প্রবন্ধেই তাহার কতকটা নিদর্শন পাওয়া সম্ভব হইতে পারিবে। উপরের বিশ্লেষণে পাঠকগণ তাহার প্রথম আভাস পাইয়াছেন।

এখন পাঠকগণ বিচার করিয়া দেখুন—কাজী ছাহেব তাঁহার রচনার প্রথমভাগে স্পষ্টাক্ষরে স্বীকার করিতেছেন যে, হজরত মোহাম্মদ একজন মহাপুরুষ ছিলেন, সত্য তাঁহার সমগ্র জীবনের ভিতরে যে এক আশ্চর্য্য দৃঢ়রূপ ধারণ করিয়াছিল, তর্ক ও বিচারের দ্বারা তাহা চরম ভাবে স্থির সিদ্ধান্ত হইয়া গিয়াছে। ইহার অর্থ এই যে, হজরত মোহাম্মদের সমগ্রজীবনের অর্থাৎ তাঁহার জীবনের প্রত্যেক কার্য্য, প্রত্যেকভাব, প্রত্যেক শিক্ষা ও প্রত্যেক সাধনা, সুদৃঢ় সত্যের দ্বারা পরিপূর্ণ—তাহার কোন স্তরের কোনদিকে অসত্যের সামান্য লেশমাত্রও ছিল না। কাজী ছাহেবের এই উক্তি যদি সত্য হয়, তাহা হইলে তাঁহাকে বাধ্য হইয়া স্বীকার করিতে হইবে যে, "হজরত মোহাম্মদকে আল্লার রছুল বলিয়া বিশ্বাস করাতে গোটা মুছলমান সমাজ ঘোর পৌত্তলিকতার মহাপাতকে অভিশপ্ত হইয়াছে"—এই উক্তিটী নিতান্ত অসত্য এবং স্বয়ম্বিরোধী। কারণ তাঁহার

স্বীকারোক্তি মতে হজরতের জীবনের কোনস্তরে কোনদিকে একবিন্দু অসত্যের সংস্পর্শ মাত্রও থাকিতে পারে না। সঙ্গে সঙ্গে ইহাও অস্বীকার করার উপায় নাই যে, নিজকে আল্লার রছুল বলিয়া প্রচার এবং মুছলমানকে তাহাতে বিশ্বাস করিতে উদ্বুদ্ধ করাই ছিল হজরত মোহাম্মদের জীবনব্যাপী এক অন্যতম সাধনা। হজরতের সমগ্রজীবন যদি বাস্তবিকই সত্যে পরিপূর্ণ হইয়া থাকে, তাহা হইলে তাঁহার জীবনের এই বিরাট সাধনাটাও সেই সত্যের অন্তর্ভুক্ত। অতএব এই রছুল-বিশ্বাসে অসত্যের ও অধর্ম্মের লেশমাত্রও নাই। পৌত্তলিকতা ঘোর অধর্ম্ম ও নিতান্ত অসত্য, সুতরাং রছুল বিশ্বাস বা "প্রেরিতত্ব" স্বীকার কোন ক্রমেই পৌত্তলিকতা বলিয়া গৃহীত হইতে পারে না। অতএব মুছলমানের প্রতি কাজী ছাহেবের এই অভিযোগটী তাঁহারই স্বীকারোক্তি মতে মিথ্যা ও অন্যায়।

পক্ষান্তরে তাঁহার দ্বিতীয় কথা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে স্বীকার করিতে হইবে যে, তাঁহার প্রথম উক্তিটি সম্পূর্ণ মিথ্যা। অর্থাৎ, মানুষকে আল্লার রছুল বলিয়া স্বীকার করা যদি ঘোর পৌত্তলিকতা ও নিকৃষ্ট শ্রেণীর প্রতিমা পূজা বলিয়া পরিগণিত হয়, তাহা হইলে বাধ্য হইয়া স্বীকার করিতে হইবে যে, হজরত মোহাম্মদ আল্লার নামে মিথ্যা প্রচার করিয়াছেন—আল্লার তাওহীদের পরিবর্ত্তে দুনয়ার কোটি কোটি মানবকে ঘোর পৌত্তলিকতা ও নিকৃষ্ট শ্রেণীর প্রতিমা পূজায় লিপ্ত হইতে শিক্ষা দিয়া, তিনি দুনয়ার সর্ব্বপ্রধান মহাপাতককে, চরমতম অসত্যকে, চিরকালের তরে প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন! হজরত মুখে একেশ্বরবাদ প্রচার করিয়াছেন, কিন্তু কার্য্যতঃ তিনি শিখাইয়াছেন—পৌত্তলিকতা। সুতরাং সত্যের সাধকরূপে জগতে তাঁহার কোনও স্থান নাই, তাওহীদের শিক্ষকরূপে তাঁহার সমস্ত সাধনা ব্যর্থতা ও ভণ্ডামীর নামান্তর মাত্র, এবং তাঁহার আদর্শ সম্পূর্ণ ব্যর্থ—একটী মানুষকে তাহা সৎপথ প্রদর্শন করিতে পারে নাই, বরং তাহার প্রত্যেক অনুবর্ত্তীকে সম্পূর্ণভাবে পথভ্রষ্ট ও দিন দুনয়ার সকল দিকে শোচনীয় রূপে দুঃস্থ ও বিভ্রান্ত করিয়া রাখিয়াছে।

লেখক যে সকল দাবী করিয়াছেন এবং যে সকল সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, তাহা শুধু যুক্তি প্রমাণ হীনই নহে, বরং দুনয়ার সমস্ত যুক্তির ও সকল প্রমাণের স্পষ্ট বিপরীত তাঁহার ব্যক্তিগত খোশ খেয়ালের অভিব্যক্তি মাত্র। এই দাবীগুলি যে কিরূপ ভিত্তিহীন এবং এই সিদ্ধান্তগুলি যে কতদূর অন্তঃসার শূন্য, নিম্নের আলোচনায় তাহার সম্যক পরিচয় পাওয়া যাইবে।

"হজরত মোহাম্মদ যে জগতের অনন্ত কোটি মানুষের মত একজন মানুষ"—হজরত মোহাম্মদের অনুবর্ত্তীরা একথা জানে না বা মানে না, তাহাদিগের প্রতি ইহা একটা সম্পূর্ণ নূতন অভিযোগ। মুছলমানের জ্ঞানে বিশ্বাসে ও তাহার কর্ম্মজীবনের প্রত্যেক স্তরে ইহার অসংখ্য নিদর্শন বিদ্যমান, কোরআন ও হাদিছ এই শিক্ষায় পরিপূর্ণ, হজরতের নবীজীবনের পুণ্য আদর্শে এই শিক্ষা পরিস্ফুট, তাওহীদ শিক্ষার সহিত ইহাও সত্যকার মোছলেম জীবনের অন্তস্তল পর্য্যন্ত অঙ্গাঙ্গীভাবে প্রবাহিত—কলেমায় শাহাদাতের "আবদুহু" ইহার একটা অন্যতম প্রমাণ। পক্ষান্তরে "মহাপুরুষ যে সর্ব্বজ্ঞ নহেন" এবং তিনি যে "মানুষের সর্ব্বময় প্রভু" নহেন, একথাও মুছলমানেরা জানে, এবং বোধ হয় একমাত্র তাহারা ব্যতীত আর কেহই তাহা ঠিক জানার মত জানে না। বিশ্ব-জগতের রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবিষ্ট এবং যুগে যুগে দেশে দেশে অনুষ্ঠিত এই শ্রেণীর নরপূজার মস্তকে বে-পানাহ কুঠারাঘাত করিয়াছে মুছলমান—আল্লার কেতাব ও তাহার সত্যনবী হজরত মোহাম্মদ মোস্তফার স্পষ্ট অনাবিল তাওহীদ শিক্ষার মাহাত্ম্যে। ফলে এছলামের যাহা সাধনা এবং মুছলমানের যাহা সিদ্ধি, মধ্যাহ্ন মার্ত্তণ্ডের ন্যায় যাহা সুবিদিত ও সুপ্রতিষ্ঠিত, কাজী সাহেব এহেন সত্যকে অস্বীকার করিয়াছেন, সত্যকে মিথ্যায় পরিণত এবং মিথ্যাকে সত্যে পরিণত করিয়া তিনি প্রকাশ্যতঃ হজরত মোহাম্মদ মোস্তফার অনুবর্ত্তিগণের এবং প্রকৃততঃ স্বয়ং হজরতের উপর অতি কদর্য্য ও অতি অসত্য দোষের আরোপ করিয়াছেন। এই সকল উক্তির সন্তোষজনক প্রমাণ আমরা পরে উদ্ধৃত করিব।

---

# আওরঙ্গজেবের হিন্দু-বিদ্বেষ !

[ কাজী নওয়াজ খোদা ]

সম্রাট আওরঙ্গজেব সম্বন্ধে হিন্দু ঐতিহাসিকগণ যে মতবাদ প্রচার করিয়া থাকেন, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। তাঁহারা সম্রাটের পূত পবিত্র ছবি মসী লিপ্ত করিয়া জগৎ সমক্ষে উপস্থিত এবং তাঁহাকে হিন্দু-বিদ্বেষী, মন্দির বিধ্বংসী, মহা জালেমরূপে পরিকীর্ত্তিত করিয়া থাকেন। অনেকে আবার এমনও বলিয়াছেন যে আওরঙ্গজেব হিন্দুধর্ম্ম ও হিন্দুজাতির প্রবল শত্রু ছিলেন; তিনি অসংখ্য দেবমূর্ত্তি ধ্বংস করিয়াছেন, অসংখ্য মন্দির ভাঙ্গিয়া মসজিদ গড়িয়াছেন, ইত্যাদি ইত্যাদি। যদিও মুসলমান লেখকগণ বিশ্বস্ত ইতিহাস হইতে সত্য উদ্ধার করিয়া দেখাইয়াছেন যে আওরঙ্গজেব সম্বন্ধে উল্লিখিত উক্তিসমূহের মূলে আদৌ কোন সত্য নিহিত নাই। বরং ঐ সকল অভিযোগ সম্পূর্ণ অসত্য ও বিদ্বেষ বিজৃম্ভিত। কিন্তু তবুও হিন্দু লেখকগণ এ সকল কথা কাণে তোলেন না। তাঁহারা চিরাচরিত প্রথা অনুসারে সাধাগলায় সেই বাঁধা সুর গাহিয়াই চলিয়াছেন। তাই, আজ আমরা ফারসী ভাষায় লিখিত সম্রাট আওরঙ্গজেবের একখানা ফরমান ও তাহার শাব্দিক অনুবাদ প্রকাশ করিতেছি। ইহা হইতেই পাঠকবর্গ তাঁহার উদারতা ও হিন্দু মুসলমান নির্ব্বিশেষে প্রজাপালনের আন্তরিক আগ্রহের যথেষ্ট পরিচয় পাইবেন।

১৯১১ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে পারস্যভাষাবিৎ লেফ্‌টেনেণ্ট কর্ণেল, ডি, সি, ফ্লিট বানারস গিয়াছিলেন। সেখানে নিম্নোদ্ধৃত 'ফরমানে'র একটী ফটোগ্রাফ তাঁহার হস্তগত হয়। তিনি আসলটী না দেখিয়া নিঃসন্দেহ হইতে পারিলেন না; তাই কিছুদিন পর আবার বানারস যাত্রা করিলেন। সেখানে খান বাহাদুর শেখ মোহাম্মদ তাইয়েবের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। তাঁহার সাহায্যে বানারস নগরের মঙ্গলগোরী মহল্লার অধিবাসী মঙ্গল পাঁড়ের বাড়ীতে মূল 'ফরমান' টী ফ্লিট সাহেবের হস্তগত হয়। খান বাহাদুর সাহেব বলিয়াছেন—"বানারস সহরের উল্লিখিত মহল্লায় গোপী উপাধ্যায় নামক একজন ব্রাহ্মণ বাস করিতেন, পনর বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। মঙ্গল পাঁড়ে তাঁহার দৌহিত্র ও একমাত্র উত্তরাধিকারী। মাতামহের মৃত্যুর পর অন্যান্য দলিলাদির সহিত এই সাহী 'ফরমান'টীও তাহার অধিকারে আসিয়াছিল। ইহার কিছুদিন পর স্নান যাত্রীদের পৌরহিত্য লইয়া তাহার সহিত অন্য একজনের গোলযোগ উপস্থিত হয়। ফলে মঙ্গল পাঁড়ে ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে বানারসের সিটী ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে মামলা রুজু করে। ঐ মামলার প্রাথমিক তদন্তভার খান বাহাদুর সাহেবের উপর অর্পিত হয়। সেই সময় তদন্ত উপলক্ষে কয়েকটী দলিল 'দস্তাবেজ' পেশ করা আবশ্যক হইলে মঙ্গল পাঁড়ে কতকগুলি পুরাতন কাগজ পত্র তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত করে, সেই সঙ্গে 'ফরমান'টীও ছিল। অন্যান্য কাগজ পত্র দেখিতে দেখিতে সেটী খান বাহাদুর সাহেবের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তিনি প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত পড়িয়া দেখিলেন এবং ঐতিহাসিক হিসাবে সেটী বিশেষ মূল্যবান মনে করিয়া তাহার একটী 'ফটোগ্রাফ' উঠাইয়া লইলেন।

লেফ্‌টেনেণ্ট সাহেব মঙ্গল পাঁড়ের নিকট হইতে আসল ফর্ম্মানটী আনাইয়া স্বচক্ষে দেখিলেন, পক্ষান্তরে খান বাহাদুর সাহেবের নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া তাহার অকৃত্রিমতা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হইলেন। 'ফরমান'টীর পৃষ্ঠদেশে সম্রাট আওরঙ্গজেবের পুত্র সাহজাদা মোহাম্মদ সোলতানের মোহর অঙ্কিত ছিল। বানারসের তৎকালীন শাসনকর্ত্তা আবুল হোসেনের নামে এই ফর্ম্মানটী প্রচারিত হইয়াছিল।

আসল ফর্ম্মান এইরূপ—

بسم الله الرحمن الرحيم

منشور لا مع النور اورنگ شاه بهادر غازی محمد اورنگ زیب شاه بهادر غازی ابن صاحبقران ثانی لائق العنایة والرحمة ابوالحسن بالتفات شاهانه امیدوار بوده بداند که چون بمقتضای مراحم ذاتی و مکارم جبلی همگی همت والا نهمت و تمامی نیت حق طویت مابررفاهیت جمهور انام و انتظام احوال طبقات خواص و عوام مصروف ست — وازروی شرع شریف و ملت منیف مقرر چنین ست که دیرهای دیرین برانداخت نشود — و درین ایام معدلت انتظام بعرض اشرف اقدس ارفع اعلی رسید که بعض مردم ازراه عنف وتعدی به هنود سکنۂ قصبۂ بنارس و برخی امکنۂ دیگرکه نواحی ان واقع ست و جماعۂ برهمنان سدنۂ ان محال که سدانت بت خانه های قدیم انجابانها تعلق دارد مزاهم و متعرض مشیوند و میخواهند که از سدانت ان که ازمدت مدید بایشها متعلق ست بازدارند واین معنی باعث پریشانی و تفرقه حال این گروه میگردند لهذا حکم والا صادر شد که بعد ازورود این منشور لا مع النور مقرر کنند که من بعد احدی بوجوه بے حساب تعرض و تشویش باحوال برهمنان و دیگر هنود متوطنه آن محال نه رساند تا انها بدستور ایام پیشین بجاه و مقام خود بوده به جمعیت خاطر بدعاء بقای دولت خداداد ابد مدت ازل بنیاد قیام نمایند - درین باب تاکید داند - بتاریخ ۱۵ شهر جمادی الثانیه ۱۰۲۹ هجری -

প্রীতি ও করুণা ভাজন আবুল্-হাছন !

সম্রাটের অনুগ্রহের প্রতি আশান্বিত থাকিয়া অবগত হউন ! যেহেতু সম্রাটের স্বাভাবিক করুণা ও তাঁহার প্রকৃতিগত মহিমার বিধানানুসারে তাঁহার সমস্ত শক্তি ও সমস্ত সঙ্কল্প সর্ব্বসাধারণ মানবের মঙ্গল সাধনে এবং সকল শ্রেণীর সমস্ত মানুষের অভাব অভিযোগের প্রতিকারে নিয়োজিত হইয়া আছে—এবং যেহেতু ধর্ম্মের ব্যবস্থা ও শরিয়তের বিধান অনুসারে—নূতন প্রতিমালয় প্রস্তুতের আদেশ না থাকিলেও—পুরাতন "দেবমন্দির" ধ্বংস করা তাহাতে নিষিদ্ধ হইয়াছে। মহিমান্বিত সম্রাটের এই সুবিচারের যুগে হুজুরের কর্ণগোচর হইল যে, কোন কোন লোক অন্যায়ভাবে ও অত্যাচার মূলে, বানারস নগরের ও তাহার পার্শ্ববর্ত্তী স্থানগুলির হিন্দু অধিবাসীদিগের এবং উল্লিখিত স্থান সমূহের পুরাতন হিন্দু দেবমন্দির গুলির সেবায়ত ও পুরোহিত-ব্রাহ্মণ সমাজের ( ধর্ম্ম ) কার্য্যে বাধাবিঘ্ন উপস্থিত করিতেছে এবং হিন্দুদিগকে তাহাদের চিরাগত অধিকার হইতে বঞ্চিত করার চেষ্টা পাইতেছে। ফলে হিন্দু সম্প্রদায়ের পক্ষে ইহা নানা উৎকণ্ঠা ও অবস্থা বিপর্য্যয়ের কারণ হইয়াছে।

অতএব সম্রাটের এই হুকুম প্রচারিত হইতেছে যে, এই ফরমান প্রচারের পর কোনও ব্যক্তি ঐ সকল অঞ্চলের ব্রাহ্মণ ও অন্যান্য হিন্দুদিগের কার্য্যে বাধা প্রদান না করে। সে মতে ইহারা যেন চিরাচরিত পদ্ধতি অনুসারে নিজেদের সাবেক পদ ও সম্মান মোতাবেক সন্তুষ্টচিত্তে এই খোদাদাদ ( ভগবদ্দত্ত ) সাম্রাজ্যের মঙ্গল কামনা করিতে থাকে !

১৫ই তারিখ, জামাদিউচ্ছানী, ১০২৯ হিজরী।

---

# হিংসুকের প্রতি

[ কাজী কাদের নওয়াজ ]

সত্যই সে যে ফুলের মতন
নির্ম্মল অকলঙ্ক
হিংসুক তুই গায়ে দিস্ বৃথা
অন্যায় পাপ-পঙ্ক
শুভ্র ধবল কমলের গায়
কুলীরক যদি কাদা দিয়ে যায়
তাহাতে তাহার অমল হৃদয়
হয় কি সমল ক্লিষ্ট
যে যেমন তার কাজ বাঁধা আছে
এযে বিধাতার সৃষ্ট

( ২ )

কুবলয় তার স্বভাবের গুণে
ছড়ায় পরাগ হরদম
কর্কট সে যে খেয়ালের বশে
ছিটায় 'সেরেফ্' কর্দ্দম
যে যেমন লোক তেমনি তাহার
কাজ বাঁধা আছে বিবিধ প্রকার
প্রভেদ তাদের আকাশ পাতাল
সততই এযে সত্য
তবে এ 'খেয়াল' কোথা হ'তে তোর
কোথা পেলি এই তথ্য

( ৩ )

নয়ন মেলিয়া চেয়ে দেখ তুই
মন করি থির শান্ত
হিংসুক সে যে আপনার বিষে
আপনারে করে ক্লান্ত
পলে পলে এই হিংসা জহর
অনলের সম দহে যে অন্তর
আপনার বিষে জ্ব'লে মরা এযে
আপনারে শুধু হত্যা
শান্তি কখন পশেনা হেথায়
শুধুই ঝঞ্ঝা বাত্যা

( ৪ )

(এই ) শ্যাম-শোভাময়
নিখিল ধরায়
সোহাগের নাহি অন্ত
যেদিকে তাকাবি, শুধু ভালবাসা
শুধু প্রেম চিরশান্ত
দহনে গহনে শশী তারকায়
ভূধরে সরিতে নভো নীলিমায়
আছে শুধু প্রীতি শুধু ভালবাসা
মিলনের মধুগন্ধ
সবারে হেরিয়া তবু কিরে তোর
ঘুচিবেনা মোহধন্ধ

( ৫ )

( তুই ) ছন্নছাড়ার মলিন ভূষণ
টান মেরে ছুড়ে—ফেলেদে
প্রাণ খুলে দিয়ে অনাবিল প্রেম
সকলের বুকে—ঢেলেদে
কৌমুদী-স্নাত রজনীর কোলে
গন্ধ আকুল দখিনার দোলে
( তুই ) সজল জলদ গগনের পানে
অচল নয়নে—চেয়ে থাক
( তোর ) প্রেমের তরণী পাল তুলে দিয়ে
হৃদয় সাগরে—বয়ে যাক

( ৬ )

( তুই ) ফুলের কোমল কর্ণ কুহরে
মধুপের মত—গেয়ে যা
মলয়ের সনে দিকে দিকে শুধু
কুসুম পরাগ—বয়ে যা
( তুই ) মাধুরীর দেশে সুন্দর বেশে
গান গেয়ে যা মোহন আবেশে
আবেগে সোহাগে সকল বিশ্ব
স্নিগ্ধ মধুর-করেদে
তহুরা সাকীর গোলাপী শারাব
সকল জনেরে-ভরে দে

( ৭ )

( তোর ) মানব জনম সার্থক হবে
সেই দিন, ওরে সেই দিন
হিংসা-হাবিয়া নিভে যাবে সব
বক্ষে বাজিবে প্রেম-বীণ
( তুই ) আপনার ভুল সেই দিন ধরি
জগৎ সমুখে হাত জোড় করি
মার্জ্জনা চাবি, মার্জ্জনা পাবি
গঞ্জনা যাবে সরিয়া
( শুধু ) গরল ভখিয়া কত কাল আর
রহিবি জীবনে মরিয়া

# আরব কবি আবুল আতাহিয়া

[ আবদুল হক ফরিদী ]

( ক )

আরবী সাহিত্যের ইতিহাসে কবি আবুল আতাহিয়ার নাম সুবিখ্যাত। উচ্চশিক্ষিত পাঠক হইতে নিরক্ষর বেদুঈন পর্য্যন্ত সর্ব্ব শ্রেণীর লোকই তাঁহাকে চিনে ও তাঁহার কবিতা আবৃত্তি করিয়া থাকে। তিনি আরব আজমে ( আজম= আরব ব্যতীত অন্যান্য দেশ ) সর্ব্বত্র সমভাবে পরিচিত। যেখানেই আরবী ভাষা ও সাহিত্যের চর্চ্চা আছে, সেখানেই আবুল আতাহিয়ার কবিতা পঠিত ও আদৃত হইয়া থাকে। 'ভন ক্রেমার' নামক প্রসিদ্ধ পাশ্চাত্য সমালোচক মনে করেন যে 'আবু নওয়াসের চেয়ে আবুল আতাহিয়ার কাব্য-প্রতিভা অধিকতর ছিল।' ( ১ ) ফার্সী সাহিত্যে শেখ সা'দীর যে-স্থান আরবী সাহিত্যে আবুল আতাহিয়া সেই স্থান অধিকার করিয়াছেন। 'তাঁহার সরল, অনাড়ম্বর ও স্বাভাবিক লিখনভঙ্গী বাস্তবিক প্রশংসনীয়।' ( ২ ) তাঁহার বিস্তৃত খ্যাতি ও উচ্চ সম্মানের মূলে রহিয়াছে তাঁহার সহজ সরল ভাষা ও অবাধগামী ছন্দ। ইহার সহিত যুক্ত হইয়াছে তাঁহার উচ্চ দার্শনিক ভাবরাশি। তাঁহার ভাবধারা অনাবিল জলস্রোতের ন্যায় সহজগামী এবং ভাষার শ্রেষ্ঠ শব্দ-সম্পদ দ্বারা ভূষিত। "আরবী সাহিত্যের ইতিহাসে তিনিই সর্ব্ব-প্রথম এবং হয়ত সর্ব্বশেষ দেখাইয়াছেন যে কাব্যের সৌন্দর্য্য-হানি না করিয়াও অতি সহজ ও সাধারণ ভাষা ব্যবহার করা যায়। ( ৩ ) ছন্দের অনুরোধে কখনও তাঁহাকে দুর্ব্বোধ্য ও অপ্রচলিত শব্দ ব্যবহার করিতে অথবা ভাবকে সঙ্কুচিত করিতে হয় নাই। ভাষা ও ছন্দের উপর তাঁহার এতদূর অধিকার ছিল যে তিনি অনায়াসে পদ্যে অনর্গল কথা বলিতে পারিতেন। এরূপ হঠাৎ-রচা তাঁহার কতকগুলি পদ্য আছে যাহা তাঁহার অন্যান্য রচনার সহিত স্থান পাইবার যোগ্য। তিনি বলিতেন যে ইচ্ছা করিলে তিনি সর্ব্বদা পদ্যে কথা বলিতে পারেন। ( ৪ )

ধর্ম্মনিষ্ঠা, মৃত্যু, সন্তোষ, কালের কুটিলগতি, এই সব বিষয় নিয়েই তিনি অধিকতর কবিতা রচনা করিয়াছেন। তিনি সর্ব্বদাই আমাদিগকে স্মরণ করাইয়া দেন যে "এ নশ্বর সংসার চিরন্তন নয়, ইহা শুধু দুদিনের পান্থশালা, এক অনন্ত জীবন আমাদের সম্মুখে রহিয়াছে ; সে জীবনে শুধু ধর্ম্মনিষ্ঠা ও সৎকর্ম্মই কাজে আসিবে। কাজেই সেজন্য আমাদের প্রস্তুত হওয়া উচিত। ইংরেজ সমালোচক ডাক্তার নিকল্‌সন বলেন,—

His poetry breathes a spirit of profound melancholy and hopeless pessimism. Death and what comes after death, the frailty of misery of man the vanity of worldly pleasures and the duty of renouncing them—these are the subjects on which he dwells with monotonous re-iteration, exhorting his readers to live the ascetic life and fear God and lay up a stone of good works against the Day of Reckoning." ( ৫ )

অর্থাৎ—তাঁহার কাব্য গম্ভীর বিষাদ ও নিরাশ দুঃখবাদে পরিপূর্ণ। মৃত্যু এবং তাহার পরবর্ত্তী অবস্থা, মানব-জীবনের অসহায়তা ও দুঃখ, পার্থিব সুখের মিথ্যা গৌরব এবং তাহা বর্জ্জন করার কর্ত্তব্য—এই সব বিষয় নিয়ে তিনি পুনঃ পুনঃ একঘেয়ে ভাবে আলোচনা করিয়াছেন। তিনি তাঁহার পাঠকদিগকে ধর্ম্মজীবন যাপন করিতে, খোদাকে ভয় করিতে এবং শেষ বিচারের দিনের জন্য পুণ্য সঞ্চয় করিয়া রাখিতে উপদেশ দিয়াছেন।

১। Nicholson —Literary History of the Arabi—৩০৫পৃ:
২। ঐ ২৯৮ পৃ:
৩। ঐ ২৯৯ পৃ:
৪। Clement Huart—আরবী সাহিত্যের ইতিহাস ৭৫ পৃ:
৫। Nicholson. ২৯৮ পৃ:

নিকল্‌সন সাহেব তাঁহাকে 'বিমর্ষতা ও নিরাশ দুঃখবাদের' অপবাদ দিয়াছেন, কিন্তু ইসলাম-কোষ ( Encyclopaedia of Islam ) সঙ্কলকগণের মত অন্য প্রকার। তাঁহারা বলেন—"তাঁহার দর্শনে রমণীসুলভ থ্যানথ্যানানির স্থান নাই, সহর্ষ আনন্দপূর্ণ না হউক, উহা সতেজ, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ও প্রত্যয়শীল; অনিবার্য্য দরকার বলেই তিনি জীবন-ভার বহন করিতেছেন।" ( ৬ )

অনেকের ধারণা যে আরবী সাহিত্যে আবুল আতাহিয়াই সর্ব্বপ্রথম ও একমাত্র দার্শনিক কবি। ( ৭ ) কিন্তু দার্শনিক ভাবাপন্ন হইলেও তাঁহার কাব্যে খাছ ইসলামী মত প্রচুর পরিমাণে রহিয়াছে। ( ৮ ) কাজেই তাঁহার কাব্য সহজেই মুসলিম হৃদয় স্পর্শ করিয়া থাকে।

আরবী ছন্দ-শাস্ত্রকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়া তিনি অনেক সময় কাব্য রচনা করিয়াছেন। কিন্তু অতি কঠোর সমালোচককেও স্বীকার করিতে হইয়াছে যে কাব্য হিসাবে উহার সৌন্দর্য্য অপূর্ব্ব। একবার তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল, 'আপনি ছন্দ-শাস্ত্র জানেন কি?' উত্তরে তিনি বলেন,— انا اكبر منه আমি উহার উপরে; ( ৯ )

বহুসংখ্যক কবিতার মধ্যে আবুল আতাহিয়ার রচনা সহজেই বাছিয়া নেওয়া যায়। অনাবিল ভাবধারা ও সহজ ভাষা দ্বারাই উহার পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। মরুকাব্যের বাগাড়ম্বরকে তিনি সম্পূর্ণরূপে ঘৃণা করিতেন; কারণ অবস্থার পরিবর্ত্তনে উহা শুধু কৃত্রিমতায় পর্য্যবসিত হইয়াছিল। (১০)

তিনি বলেন,

اشدّ الجهاد جهاد الهوى

وما كرم المرء الا التقى

প্রবৃত্তি-সংযমই কঠিনতম যুদ্ধ; এবং সাধুতাই মানবকে সম্মানিত করে।

কি সরল ও মনোরম ভাবধারা! অথচ ইহাতে একটা চিরন্তন সত্য প্রকাশিত হইয়াছে।

( খ )

মদীনার নিকট "আইনুৎ-তামার" একটি গ্রাম। ১৩০ হিঃ ( ৭৪৮ খৃঃ ) আবুল আতাহিয়া এখানে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পূর্ণ নাম—আবু ইস্‌হাক ইসমাঈল ইব্‌ন কাসেম।

কথিত আছে যে তাঁহার পিতা ছিলেন ক্ষৌর ব্যবসায়ী হাজাম। নীচ বংশের অপবাদ দেওয়ায় একবার তিনি বলিয়াছিলেন—

الا انما التقوى هو العز والكرم -

وحبك للدنيا هو الفقر والعدم -

وليس على عبد تقيّ نقيصة -

اذ اصحّ التقوى وان حاك او حجم -

সাধুতাই হইতেছে প্রকৃত মর্য্যাদা ও সম্মান; সংসারের লোভ কেবল দারিদ্র্য ও অভাব সৃষ্টি করে! প্রকৃত ধার্ম্মিক ও সাধু ব্যক্তি জোলা বা ক্ষৌরকার হইলেও কোনও দোষ হয় না।

এই সামান্য দুই চরণে একটি মহান সত্য নিহিত রহিয়াছে।

তিনি অন্যত্র বলিয়াছেন,—

وان تنا سبت الرجال فما ارى

نسبا يقاس بصالح الا عمال -

'মানুষ বংশের গর্ব্ব করে; কিন্তু আমি দেখি বংশগৌরব কখনও সৎকর্ম্মের সমকক্ষ হয় না।'

কূফা নগরে তিনি প্রতিপালিত হন। কথিত আছে যে পারিবারিক কুম্ভকারশালায় স্বীয় ভ্রাতা ও অন্যান্য সকলের সহিত তিনি কাজ করিতেন, এই জন্য তিনি 'আলজর্‌রার' ( কুম্ভবিক্রেতা ) নামে পরিচিত ছিলেন। ১১ এবিষয়ে তাঁহাকে একবার প্রশ্ন করা হইলে তিনি বলেন যে 'আমি মিল ও ছন্দের কুম্ভকার'। জনৈক সমসাময়িক ব্যক্তি লিখিয়া গিয়াছেন,—"আমি দেখিয়াছি, আবুল আতাহিয়া

৬। There is no qustion of effeminate whimpering iu his Philosophy, robust and determined, if not glad and joyous, he bears the burden of life Simply because it must bo so. —*Ency of Islam*—p79.

৭। ঐ

৮। Nicholsou—২৯৯

৯। দীওয়ান—৭পৃঃ

১০। ইসলাম কোষ—৭৯ পৃঃ

১১। C. Huart ৭৪ পৃঃ

যখন কুম্ভকারের কাজ করিতেন তখন সাহিত্যামোদী বহু যুবক তাঁহার নিকট যাইত; তিনি কবিতা আবৃত্তি করিতেন এবং তাহারা ভগ্নমৃৎপাত্রে উহা লিখিয়া লইত।' ১২

সুখ্যাতি ও গৌরব পসন্দ করিতেন বলিয়া তাঁহার 'কুণিয়ত' হইয়াছিল "আবুল আতাহিয়া" (১৩) এই শব্দ দুইটীর অর্থ 'গর্ব্ব বা উন্মত্ততার জনক'। তাঁহার জীবন ও কাব্যে তাঁহার নামের সার্থকতা সম্পূর্ণরূপে প্রমাণিত হইয়াছে। কারণ এই নাম দ্বারাই তিনি সাহিত্য জগতে অমর হইয়া রহিয়াছেন। তিনি ছিলেন সুশ্রী ও গৌরবর্ণ। মাথায় কালো কোকড়ানো চুল। আড়ম্বরপূর্ণ ও মার্জ্জিত-রুচি এবং ব্যবহারে অমায়িক।

প্রসিদ্ধ সমালোচক আছ্‌মায়ী বলিতেন, 'আবুল আতাহিয়ার কাব্য যেন রাজদরবারের প্রাঙ্গণ,—ধুলা মাটি, ফলের বীজ, স্বর্ণ, মনিরত্ন সবই আছে।' ইহাতে তাঁহার বিষয় বৈচিত্র্য ভালরূপে বুঝা যায়।

আবুল আতাহিয়া যখন বুঝিতে পারিলেন যে তাঁহার কবিত্ব শক্তি আছে, তখন তিনি ইব্‌রাহীম নামক জনৈক মুছোল বাসীর সহিত সে যুগের জ্ঞানকেন্দ্র বাগ্দাদ যাত্রা করিলেন। কিন্তু শীঘ্রই তাঁহারা পৃথক হইয়া পড়িলেন এবং আবুল আতাহিয়া হিরাতে অবস্থান করিতে লাগিলেন। তাঁহার সুখ্যাতি বিস্তৃত হইলে খলীফা মেহ্‌দী তাঁহাকে বাগ্দাদে ডাকিয়া পাঠান। আবুল আতাহিয়া তথায় গিয়া মেহ্‌দীর বন্দনা করিয়া পুরস্কার গ্রহণ করেন। খলীফা হাদী, রশীদ ও মা'মুনের সহিতও তিনি পরিচিত ছিলেন, ইঁহারা সকলেই তাঁহার কাব্যের গুণগ্রাহী ছিলেন।

আবুনওয়াস প্রভৃতি কয়েকজন সুধীকে আবুল আতাহিয়া সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করায় তাঁহারা বলিয়াছিলেন যে, "জিন ও ইন্‌সানের মধ্যে তিনি শ্রেষ্ঠ কবি।"

মেহ্‌দীর দরবারে থাকিয়া আবুল আতাহিয়া কিছুদিন তাঁহার অনুগ্রহ ও পুরস্কার ভোগ করিতে থাকেন। কিন্তু মেহ্‌দীর কৃতদাসী (?) উত্‌বা'র প্রেমে পড়িয়া কাব্যে তাহার উল্লেখ করিতে থাকেন। * ইহাতে মেহ্‌দী বিশেষ অসন্তুষ্ট হইয়া উহাকে বন্দী করেন। কয়েদখানায় বসিয়া আবুল আতাহিয়া স্বীয় অপরাধ স্বীকার ও মার্জ্জনা ভিক্ষা করিয়া একটি কবিতা লেখেন। ইহাতে খলিফা মেহ্‌দীর দয়ার উদ্রেক হয় এবং কবি মুক্তি লাভ করেন। (১৫)

হারূণের সহিত মিশিতেন বলিয়া আবুল-আতাহিয়ার প্রতি হাদী অসন্তুষ্ট ছিলেন। কাজেই তিনি সিংহাসন আরোহণ করিলে কবি কিছুদিন লুকাইয়া থাকেন। খলীফার অনুগ্রহ ভিক্ষা করিয়া একটি কবিতা রচনা করতঃ আবুল আতাহিয়া হাদীর নিকট পাঠাইয়া দেন। তিনি কবির প্রতি প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে ডাকিয়া পাঠান। হাদীর মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত আবুল-আতাহিয়া তাঁহার দরবারে সসম্মানে অবস্থান করেন।

আবার হারূনুর-রশীদ যখন সিংহাসন-আরোহণ করেন, আবুল-আতাহিয়া তাঁহার দরবারে আসিয়া তাঁহার বন্দনা করেন। হারূনের সহিত তাঁহার খুব ঘনিষ্ঠতা ছিল। এমন কি প্রবাসেও তিনি খলীফার সঙ্গী হইতেন। পুরস্কার এবং উপহারাদি ব্যতীত খলীফা, তাঁহাকে বার্ষিক পঞ্চাশ হাজার দির্‌হাম দিতেন।

কিন্তু মাঝে মাঝে দরবারী জীবনের প্রতি তাঁহার বিতৃষ্ণা জন্মিয়া যাইত। "বাল্য হইতেই তিনি জীবনকে গাম্ভীর্য্য ও বিরাগের সহিত গ্রহণ করিয়াছিলেন। কাজেই দরবারী জীবনের তরলতার প্রতি তাঁহার বিতৃষ্ণা ধরিয়া গিয়াছিল। এমন কি হারূণের সিংহাসনারোহণের পর কাব্য রচনার অহমিকা একেবারে ছেড়েই দিতে চেয়েছিলেন। (১৬)

সমসাময়িকদের মধ্যে কেহ কেহ তাঁহাকে নাস্তিকতার অপবাদ দিয়েছেন! কিন্তু ইহাতে কবির প্রতি ঘোর অবিচার করা হইয়াছে।

নিকলসন সাহেব বলেন, "আবুল আতাহিয়াকে নাস্তি-

---

১২। দীওয়াণ ভূমিকা ৩পৃঃ

১৩। কিতাবুল আগানী ৩য় খণ্ড ১২৩পৃঃ

(আগানীর এই অভিমত কতদূর সঙ্গত, তাহা বিবেচনা সাপেক্ষ। ধাতুগত হিসাবে কুনিয়াতের তাৎপর্য্য নির্দ্ধারণ করিতে যাওয়া কি সমীচীন?—সম্পাদক)

১৫। দীওয়ান—৭পৃঃ

* উত্‌বা মেহদীর কৃতদাস বলিয়া মনে হয়। কবিদিগের সম্বন্ধে প্রচারিত এই প্রকার প্রেম কাহিনীগুলি অনুসন্ধান কালে প্রায়ই মিথ্যা বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। এরূপ শত শত মিথ্যা কাহিনী তাজ্‌কেরা সমূহে লিপিবদ্ধ হইয়া আছে।—সম্পাদক।

১৬। ইস্‌লাম-কোষ—৭৯পৃঃ

কতার অপবাদ দেওয়া হইত। অভিযোগ এই যে তাঁহার কাব্যে মৃত্যু সম্বন্ধে তিনি অনেক কথা বলিয়াছেন, কিন্তু কিয়ামৎ ও বিচারের কোনও উল্লেখ তাহাতে নাই। তাঁহার দীওয়ানের বহুস্থানে এই কুৎসার বিপরীত প্রমাণ রহিয়াছে। ( ১৭ )

আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, খোদা, ধর্ম্ম প্রভৃতি বিষয় সম্বন্ধে অন্য কোনও কবি এত অধিক কবিতা লেখেন নাই। নিম্নলিখিত পদে তিনি উপরোক্ত অভিযোগের উল্লেখ করিয়াছেন :—

فسد الناس وصاروا ان رأوا
صالحا فى الدين قالوا مبتدع -

"মানুষ কলুষিত হইয়া পড়িয়াছে ; কাজেই কাহাকেও নিষ্ঠাবান দেখিলেই তাহাকে অধর্ম্মের অপবাদ দিয়া থাকে।" ১৮

নিকলসন সাহেব পুনঃ পুনঃ এই অপবাদের প্রতিবাদ করিয়াছেন। যথা—"তাঁহার কাব্যে এমন কিছু নাই যাহাতে অতি নিষ্ঠাবান মুসলমানের মনে আঘাত লাগিতে পারে।" ১৯

"আবুল আতাহিয়ার কাব্যে—" বিশিষ্ট ইসলামী মতবাদ প্রচুর পরিমাণে রহিয়াছে, বিশেষতঃ কিয়ামৎ ও পরকাল সম্বন্ধে। (২০)

কয়েকটি নমুনা দেওয়া যাইতেছে :—

لدوا للموت وابنوا للخراب - فكلكم يصير الى تباب

"মৃত্যুর জন্যই বংশবৃদ্ধি ; ধ্বংসের জন্যই অট্টালিকা নির্ম্মাণ। সকলকেই বিনাশের পথে যাইতে হইবে।"

سأسأل عن امور كنت فيها
فما عذرى هناك وما جوابى -
بأية حجة احتج يوم الحسا
ب اذا دعيت الى الحساب ·

"এখানে থাকিয়া কি কি করিয়াছি সে বিষয় যখন আমাকে জিজ্ঞাসা করা হইবে তখন কি ওজর দেখাইব এবং কি উত্তর দিব? কিয়ামতের দিন যখন আমার হিসাব দেওয়ার জন্য ডাকা হইবে তখন কোন্ যুক্তি দ্বারা নিজের পক্ষ সমর্থন করিব?" ( ২১ )

একবার আবুল-আতাহিয়া ( দুশজানবাসী ) খলীল-ইব্‌ন-আসাদের নিকট যাইয়া বলেন, "লোকে আমাকে নাস্তিকতার অপবাদ দেয় ; অথচ আমার ধর্ম্ম সত্য সনাতন তৌহীদ ( একেশ্বরবাদ )। খলীল বলিলেন, "তাহা হইলে এমন কিছু বলুন যাহা দ্বারা লোকের অভিযোগ খণ্ডন করা যায়।"

আবুল আতাহিয়া বলিলেন :—

الا اننا كلنا بائد - واى بنى آدم خالد -
وبدؤهم كان من ربهم - وكل الى ربه عائد -
فيا عجبا كيف يعصى الاله - ام كيف يجحده الجاحد -
وفى كل شيء له آية - تدل على انه واحد -

"আমাদের সবাইকে যাইতে হইবে। আদম-সন্তান কেহই অমর নহে। তাহাদের আরম্ভ বিশ্বপ্রভুর নিকট হইতে ; এবং সকলকেই স্বীয় প্রভুর কাছে ফিরিয়া যাইতে হইবে। আশ্চর্য্য! লোকে কিরূপে খোদার অবাধ্য হয় ; কিরূপেই বা তর্কবাগিশ তাঁহাকে অস্বীকার করে? প্রত্যেক বস্তুতেই নিদর্শন আছে যাহা সাক্ষ্য দেয় যে তিনি একক।" ( ২২ )

কাজেই ইহা দ্বারা স্পষ্টতঃ প্রমাণিত হইতেছে যে তিনি পাক্কা মুসলমান ছিলেন ; খোদার একত্ব, কিয়ামৎ ও পরকালে সম্পূর্ণ আস্থাবান ছিলেন।

আবুল আতাহিয়াকে কৃপণতার অপবাদও দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু ইহাও তাঁহার বাক্যে প্রকাশিত মতের বিরোধী বলিয়া মনে হয়। তিনি পুনঃ পুনঃ অল্পে তুষ্টি, সন্তোষ বা 'কিনাআৎ' এর প্রশংসা করিয়াছেন। এক ব্যক্তি একই সময়ে কৃপণ ও অল্পে তুষ্ট হইতে পারে না। লোভ ও কৃপণতা অভেদ্য অথচ উহা সন্তোষের সম্পূর্ণ বিপরীত। অথচ কবিকে তাহার কাব্যের ভিতর দিয়াই বুঝিতে হইবে। "জীবিত ব্যক্তি সম্বন্ধে বিবেচনার সহিত মত প্রকাশ করিতে

১৭। Nicholsen—২৯৬ ৭ পৃঃ
১৮। দীওয়াণ—১৫৩ পৃঃ
১৯। Nichol. ২৯৭ পৃঃ
২০। ঐ—২৯৯ পৃঃ
২১। দীওয়াণ—২৬পৃঃ
২২। Encyclopædea Arabe ২৪৬ পৃঃ

হইবে। কিন্তু মৃত ব্যক্তি সম্বন্ধে শুধু সত্য প্রকাশ করিতে হইবে" ( We owe Consideration to the living, to the dead we only owe Truth ) ভল্‌টেয়ারের এই অমর বাক্য স্মরণ করিয়া আমি সাহসের সহিত বলিতেছি যে মৃতব্যক্তি সম্বন্ধে তথাকথিত 'সত্য' গ্রহণ করিতে খুব সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত। কারণ যখন আমরা মনে করি যে ব্যক্তি বিশেষ সম্বন্ধে শেষ কথা বলা বা লেখা হইয়া গিয়াছে, তখনও কোন নূতন গবেষণার ফলে আমাদের সব মতামত পরিবর্ত্তিত হইয়া যায় এবং সম্পূর্ণ ভিন্ন রকমের মত পোষণ করিতে হয়।

অবশ্য মানুষ কথায় এক প্রকার ও কার্য্যে অন্য প্রকার হইতে পারে। আবুল আতাহিয়ার কার্পণ্য সম্বন্ধে যে সব রহস্যপূর্ণ গল্প প্রচলিত আছে তাহাও এই ভাবেই আমরা গ্রহণ করিতে পারি।

মামুনের রাজত্বকাল পর্য্যন্ত আবুল-আতাহিয়া বাঁচিয়াছিলেন। তখন তিনি বন্ধুদের সাহায্য পরিত্যাগ করিয়া ফকিরী গ্রহণ করেন এবং কিছুদিন পরেই কালরোগে আক্রান্ত হন। মৃত্যু দূতের আগমন ধ্বনি অনুভব করিয়া কবি পুনঃ পুনঃ বলিতে আরম্ভ করেন :—

الہی لا تعذ بنی فانی - مقر بالذی کان منی -

فمالی حیلتی الاخطائی - لعفوک ان عفرت وحسن ظنی -

وکم من زلۃ فی الخطایا - وانت علی ذو فضل ومن -

اذافکرت فی ندی علیہا - عضضت انامانی وقرعت سنی -

'প্রভু আমার, আমায় শাস্তি দিও না; আমি স্বকৃত (পাপ) স্বীকার করিতেছি।

তোমার মার্জ্জনার আশা ব্যতীত আমার উপায়ান্তর নাই। আমার সে শুভ আশা অনুসারে আমায় ক্ষমা করিবে কি?

কতবার পাপ-প্রলোভনের পথে পদস্খলন করিয়াছি। কিন্তু তবুও তুমি আমাকে দয়া ও অনুগ্রহ করিয়াছ।

যখন আমি এ বিষয়ে চিন্তা করি তখন লজ্জা ও অনুপাতে আমি অঙ্গুলি কর্ত্তন ও দন্ত ঘর্ষণ করিয়া থাকি।' (২৪)

খোদার প্রতি তাঁহার কিরূপ গভীর বিশ্বাস ও নির্ভর ছিল, ইহা হইতে তাহা বেশ বুঝা যায়।

আবুল-আতাহিয়ার মৃত্যু তারিখ সম্বন্ধে মতভেদ আছে ২১০ ও ২১৩ হিজরীর মধ্যে। তবে একথা সত্য যে সুপক্ক (প্রায় ৮০ বৎসর) বয়সে উচ্চ সম্মান ভোগ করিয়া খলীফা মামুনের রাজত্বকালে তিনি পরলোক গমন করেন।

বাগদাদের পশ্চিম উপনগরে তাঁহাকে সমাহিত করা হয়, সমাধিগাত্রে অঙ্কিত করিবার জন্য যে কবিতাটি রচনা করিয়াছিলেন, তাহার শেষ পংক্তি এইরূপ :—

لیس زاد سوی التقی - فخذی منہ او دعی

'পুণ্যের ন্যায় কোন সঞ্চয় নাই। হয় ইহা অর্জ্জন কর নচেৎ দূর হও।' (২৫)

( গ )

আবুল আতাহিয়ার সমুদয় রচনা সংগ্রহ করা সম্ভব হয় নাই। (২৬) বাস্তবিক তাঁহার রচনার এত প্রাচুর্য্য ছিল যে তাহা একত্র করা প্রায় অসম্ভব। বিশেষতঃ অনেক সময় হঠাৎ তিনি ( Extempore )-কবিতা আবৃত্তি করিতে থাকিতেন যাহা অল্প লোকেই স্মরণ রাখিতে পারিত।

'কিতাবুল আগানী'তে আছে যে 'বশ্শার' بشار 'আস-সৈয়দ' ও আবুল আতাহিয়া সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্বভাব-কবি। অতি প্রাচুর্য্যের জন্য এযাবৎ কেহ তাঁহাদের সমুদয় রচনা সংগ্রহ করিতে সক্ষম হয় নাই।" (২৭)

আবুল আতাহিয়ার কবিতাগুলি তাঁহার জীবনকালে যেখানে-সেখানে ছড়ান ছিল, তাঁহার মৃত্যুর পর উহার কতকাংশ "দীওয়ানে-আবিল-আতাহিয়া" নামে সংগৃহীত হয়। আরবী কবিতায় প্রত্যেক ছত্রের শেষ অক্ষর প্রথম ছত্রের শেষ অক্ষরের সহিত মিল থাকে। কিন্তু বাংলা ইংরাজীতে ওরূপ কোনও নিয়ম নাই। দীওয়ান বা কবিতা সংগ্রহ পুস্তকে প্রত্যেক কবিতার শেষ অক্ষরের

২৩। دائرۃ المعارف —২৪৭ পৃঃ

২৪। দীওয়ান—১৩ পৃঃ ভূ

২৫। দীওয়ান—১৪ পৃঃ

২৬। ইস্‌লাম কোষ ৭৭পৃঃ

২৭। কিতাবুল আগানী—৩য়—১২২ পৃঃ

বর্ণমালার ক্রম অনুযায়ী কবিতাগুলি সজ্জিত হয়। এইরূপে আলিফ ( الف ) হইতে য়া ( یا ) পর্য্যন্ত ক্রমিক পর্য্যায়ে কবিতাগুলি সংযোজিত হয়। দীওয়ানে আবিল আতাহিয়াতেও এই নিয়ম অনুসৃত হইয়াছে!

বর্ত্তমান যুগের একজন আরবী কাব্য সংগ্রাহক লিখিতেছেন,—"কাব্যের মনোরঞ্জক ও চিত্তবিনোদক শক্তি উপলব্ধি করিয়া আমি কয়েকখানা ভাল কাব্য পুস্তক প্রকাশ করিতে কৃত সংকল্প হই। এই উদ্দেশ্যে আমি অনেকগুলি দীওয়ান অধ্যয়ন করি। কিন্তু পবিত্র ভাব, মার্জ্জিত রুচি, সরল ভাষা ও মধুর ছন্দের দিক দিয়া আবুল আতাহিয়ার দীওয়ানই আমার নিকট শ্রেষ্ঠ প্রতিপন্ন হইয়াছে।" (২৮)

ইহা হইতে আবুল আতাহিয়ার বিশিষ্টতা ও শ্রেষ্ঠতা প্রমাণিত হইতেছে।

তাঁহার দীওয়ানের প্রথম ছত্র :—

الخير والشر عادات واهواء - وقد يكون من الا حباء اعداء

"ভাল ও মন্দ অভ্যাস ও প্রবৃত্তির ফল; বন্ধুও অনেক সময় শত্রুতে পরিণত হয়।"

এই ছত্রটিতে একটি সহজ সত্য ও দার্শনিকতত্ত্ব প্রকাশিত হইয়াছি। আবুল আতাহিয়ার কাব্য গ্রন্থের প্রথম ছত্র হইবার উপযোগী বটে।

তরলমতি যুবক পাঠকগন হয়ত তাঁহার কাব্যে চিত্তবিনোদন বিশেষ কিছু পাইবেন না। হয়ত নিরাশ হইয়া বলিয়া উঠিবেন, 'এ কি! এ কেমন ধারা কবি। এ কাব্যের কোথাও প্রেমের গান, বিরহের জ্বালা, রমণী সৌন্দর্য্যের বর্ণনা নাই। ইহা অপাঠ্য! কিন্তু বৈধ ও অবৈধ প্রেমের চিত্রাঙ্কন, প্রাকৃতিক ও নারী সৌন্দর্য্যের উজ্জ্বল বর্ণনা, প্রিয় মিলনের সুখ ও বিরহের দুঃখ বর্ণনাই যদি শুধু কবিতা বিচারের মাপকাটি হয়, তাহা হইলে অবশ্য আবুল আতাহিয়া ভাল কবি নহেন বা মোটেই কবি নহেন। কিন্তু প্রকৃত কাব্য এরূপ সঙ্কীর্ণ সীমায় আবদ্ধ নহে। বরং ইহা প্রশস্ততর, উচ্চতর ও মহত্তর। ইহা মানব জীবন ও দৈনন্দিন সত্য সমূহের মনোরম অভিব্যক্তি, মানুষের ভাব চিন্তা, সুখ দুঃখ, আশা নিরাশায় একটি সুন্দর বিকাশ। মানবের গোপন অনুভূতি কবির ছন্দে মূর্ত্ত হইয়া ধরা দেয়। তাহাদের হাসিকান্না সুখ দুঃখের ইতিহাস তাহার বাঁশির সুরে প্রকাশ পায়। এই ভাবে যদি আমরা আবুল আতাহিয়ার কাব্য বিচার করি, তাহা হইলে আমাদিগকে বাধ্য হইয়া স্বীকার করিতে হইবে যে তিনি একজন উচ্চ শ্রেণীর কবি;—আরব ও আজমে তাঁহাকে যে উচ্চ সম্মান দেওয়া হইয়াছে তাহার উপযুক্ত বটে।

নিম্নলিখিত ছত্রটি তাঁহার একটি শ্রেষ্ঠ বাণী বলিয়া কথিত হয় :—(২৯)

تجرد من الدنيا فانك انما
وقعت الى الدنيا وانت مجرد ٠

সংসার হইতে পৃথক হও; কেননা একাই তুমি সংসারে আসিয়াছ।"

সন্তোষ সম্বন্ধে বলিতেছেন :—

نعم الفراش الارض فاقنع به
وكن عن الشر قصير الخطى -
ما اكرم الصبر و ما احسن
الصدق وازينه بالفتى -

'কি সুন্দর এই শ্যাম ভূমির গালিচা; ইহাতেই তুষ্ট থাক। পাপের পথ হইতে পদসংবরণ কর।

ধৈর্য্য অতি মাধুর্য্যময়; সত্য অতি মনোরম এবং যুবকের ইহা শ্রেষ্ঠ ভূষণ।'

আবুল আতাহিয়ার মতে অল্পে তুষ্ট ব্যক্তিই উচ্চতম সম্মানের অধিকারী।

لم يزل القانعون لشرفنا

'আমাদের তুষ্ট ব্যক্তিগণই চিরদিন সম্মানিত।' (৩০)

সংসারত্যাগী সাধুকেও তিনি বিশেষ প্রশংসা করিয়াছেন।

اذا اردت شريف الناس كلهم
فانظر الى ملك فى زى مسكين -

২৮। দীওয়ান—ভূমিকা—৩ পৃঃ

২৯। Encyclopadea Arabe ২৫২ পৃঃ

৩০। দীওয়ান—১২৮ পৃঃ

যদি শ্রেষ্ঠ মানবকে দেখিতে চাও তবে কাঙ্গালবেশী রাজাধিরাজের প্রতি দৃষ্টিপাত কর। (৩১)

জীবন মৃত্যু সম্বন্ধে তাঁহার ধারণা বেশ সুন্দর ও স্পষ্ট। তিনি বলেন—

عمر الفتى ذكره لا طول مدته
وموته خزيه لا يومه الداني -
فاحي ذكرا بالاحسان تفعله
يكن كذالك فى الدنيا حياتان -

'সুখ্যাতিই মানুষের প্রকৃত জীবন—অধিকদিন বাঁচিয়া থাকা নয়; অখ্যাতিই মানুষের মৃত্যু—সমাগত শেষ দিন নয়। সৎকর্ম্ম দ্বারা তোমার খ্যাতিকে সজীবিত কর-- তাহা হইলে এই নশ্বর জগতেই তুমি দুইটি জীবনের অধিকারী হইবে।

অন্যত্র বলিতেছেন :—

حياتك انفاس تعد فكلما
مضى نفس منها نقصت بها جزءا -
يميتك مايحييك فى كل ساعة
ويحدوك حادما يريد بك الهزءا -

'তোমার জীবন কয়েকটি গুন্তি করা নিশ্বাস মাত্র;— যখনই শ্বাস গ্রহণ কর এক অংশ কমিয়া যায়। যাহা দ্বারা বাঁচিয়া আছ প্রতি মুহূর্ত্তে তাহাই তোমার মৃত্যু আনয়ন করিতেছে; তোমাকে একজন চালক হাঁকাইতেছে; সে তোমার সাথে নম্র হইতে চাহে না। (৩২)

জনৈক মৃত বন্ধুর শোক প্রকাশ উপলক্ষে বলিতেছেন,—

مالى مررت على القبور مسلما
قبر الحبيب فلم يرد جوابي -
لوكان ينطق بالجواب لقال لى
اكل التراب محاسنى وشبابى -

'বন্ধুর কবরের কাছে গিয়া সালাম করিবাম কিন্তু দুঃখের বিষয় কোন উত্তর আসিল না।

যদি উত্তরে কথা চলিত তাহা হইলে সে নিশ্চয় বলিত যে, মাটি আমার সৌন্দর্য্য ও যৌবন গ্রাস করিয়াছে। (৩৩)

অন্যত্র বলিতেছেন :—

الا كل ما هو آت قريب - وللارض من كل حى نصيب

ভাবী সবই নিকটবর্ত্তী। প্রত্যেক জীবিতের শরীরেই মাটীর প্রাপ্য অংশ রহিয়াছে। ( ৩৪ )

খোদার স্তুতি বন্দনা করিতেছেন :—

سبحان من يعطى بغير حساب
ملك الملوك ووارث الاسباب -

'যিনি অগণিত দান করেন তাঁহার প্রশংসা করিতেছি' রাজাধিরাজ ও জগৎ কারণের অধিকারী।' ৩৫

ইহাতেও তাঁহার খোদা-বিশ্বাস প্রমাণিত এবং নাস্তিকতার অভিযোগ খণ্ডিত হইতেছে। এরূপ আরও অনেক কবিতা আছে।

কিরূপ সামান্য বস্তু হইতে আমাদের উৎপত্তি এবং মৃত্যুর পর আমাদের কি অবস্থা হইবে, তাহা স্মরণ করাইয়া দিয়া তিনি আমাদিগকে পুনঃ পুনঃ বিনয়ী হইবার উপদেশ দিয়াছেন।

من تراب خلقت لا شك فيه - وغدا انت صائر الى التراب

'মৃত্তিকা হইতে সৃষ্ট হইয়াছ; ইহাতে সন্দেহ নাই। আগামী কল্য আবার মৃত্তিকাতেই পরিণত হইবে।' ৩৬

কবির পুত্র মোহাম্মদ বর্ণনা করিতেছেন যে কিন্‌আন হইতে আগত এক ব্যক্তি তাহার বংশের গৌরব করিতেছিল। তাহাতে কবি হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন :—

دع عنى من ذكر اب وجد - ونسب يعليك سور المجد
ما الفخر الا فى التقى والزهد - وطاعة تعطى جنان الخلد -

'পিতা পিতামহ ও যে-বংশ তোমাকে সম্মান-শিখরে তুলিয়াছে তাহার গৌরব আমার কাছে করিও না। যে সাধুতা, ধর্ম্মনিষ্ঠা ও বৈরাগ্য চিরন্তন বেহেশ্‌ত লাভের উপায় তাহাই কেবল গৌরবের বস্তু।' ( ৩৭ )

তাঁহার পরকালে বিশ্বাস, ছন্দের উপর অধিকার ও হঠাৎ মুখে মুখে কবিতা রচনা করিবার শক্তি ইহা দ্বারা প্রমাণিত হইতেছে। আমরা ইহাও বুঝিতে পারি যে

৩১। ঐ ২৪৭ পৃঃ
৩২। দীওয়ান—১০ পৃঃ ৩৩। ঐ—১৮ পৃঃ
৩৪। ঐ ২৬পৃঃ ৩৬। ঐ ৩১পৃঃ ৩৫। ঐ ৩০ পৃঃ ৩৭—ঐ৬৯পৃঃ

ইচ্ছা করিলে তিনি সর্ব্বদা পদ্যে কথা বলিতে পারিতেন—সে কথার মূলে কিছু সত্য নিহিত আছে।

অধিক বচন উদ্ধৃত করিয়া পাঠকদের ধৈর্য্য পরীক্ষা করিব না। কেবল আর একটি কবিতা উদ্ধৃত করিয়াই ক্ষান্ত হইব। যাঁহারা অধিক জানিতে চাহেন তাঁহারা তাঁহার দীওয়ান' পাঠ করিলে পরিশ্রম ও সময় ব্যয় সার্থক মনে করিবেন।

নিম্নের সাত ছত্র তাঁহার দীওয়ানের শেষপূর্ব্ব কবিতার অংশবিশেষ :—

زغیف خبز یابس - تا کله فی زاویة
وکوز ماء بارد - تشربه من صافیه
وغرفة ضیقة - نفسک فیہا خالیة
اومسجد بمعزل - عن الوری فی ناحیة
تدرس فیہا دفترا - مستندا بساریة
معتبرا بمن مضی - من القرون الخالیه
خیر من الساعات فی - فیئ القصور العالیه

"এক খণ্ড শুষ্ক রুটি—কোনে বসিয়া ভক্ষণ কর ;
এক পাত্র শীতল জল—পবিত্র ভাবে পান কর ;
একটি সঙ্কীর্ণ কুটির—তুমি সেখানে একা থাক ;
কিংবা বিজনে মস্‌জিদ—লোকাবাস হইতে দূরে অবস্থিত ;
পুস্তক পাঠে তুমি রত তথায়—বালিসের উপর ঠেস দিয়া
অতীতের যাহারা চলিয়া গিয়াছে—তাদের থেকে জ্ঞান অর্জ্জন কর—উচ্চ অট্টালিকার ছায়াতলে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটাইয়া দেওয়ার চেয়ে ঢের ভাল।" ৩৮

ইহার উপর টিকা টিপ্পনী নিষ্প্রয়োজন।

৩৮। দীওয়ান—২০০ পৃঃ

# আমি যবে যাব চলে

[ মোয়াহেদ বখ্‌ত চৌধুরী ]

ক্ষণ-সৌরভ ফুলের মতন ক্ষণিকের তরে হাসি
জীবনের গান শেষ হ'লে মোর বেদনার বাণে ভাসি
আমি যবে যাব চলে,—

চিরতরে চাঁদ ডুবে যায় যদি রবি যদি পড়ে ঢলে,
প্রণয়ীরা সব মধুনিশি যদি নাহি যাপে মন-সুখে
আবেশ-আলসে কপোতী না চায় কপোতের প্রিয় মুখে,
আকুল কাঁদনে যদি না লুটায়—বিরহিনী মোর প্রিয়া
ফুলের গন্ধে বিহগের গানে আকুল না করে হিয়া,
দুনয়ার আলো ম্লান হ'য়ে আসে অকারণে অবহেলে
কিবা আসে যায় বন্ধু আমার
আমি যবে যাব চলে ?

মধু-বসন্ত বায়
বার বার মোর বাতায়ন দিয়া নাহি যদি ডেকে যায়,
নীলিমায় নিভে আলোর মালিকা থেমে যায় হাসি গান
তটিনীর বুকে নাহি যদি ফুটে উরমি-নটীর গান,
আমার গোলাব কুঞ্জে যদি না মৌমাছি আসে ভোরে
কিবা ক্ষোভ মোর—কিবা আসে যায়
আমি যবে যাব সরে।

# রমজানের সাধনা।

[ মোহাম্মদ আকরম খাঁ ]

( ১ )

আল্লার অস্তিত্ব ও একত্বে যাঁহারা বিশ্বাস করেন, তাঁহারা সকলে তাঁহাকে মঙ্গলময় বলিয়াও স্বীকার করিয়া থাকেন। কারণ বস্তুতঃ আল্লার মঙ্গলময়ত্বকে অস্বীকার করা আল্লাহকে অস্বীকার করার নামান্তর মাত্র।

"আল্লাহ মঙ্গলময়"—এ কথার তাৎপর্য্য এই যে, তাঁহার সৃষ্টির প্রত্যেক বস্তু ও প্রত্যেক বিষয়ে অশেষ মঙ্গল নিহিত আছে। যথাযথ ভাবে সেই সকল বস্তুর বা বিষয়ের সদ্ব্যবহার করিলে তাহাদ্বারা বিশ্বসংসার নানা উপকার লাভ করিতে পারে। অবশ্য অ-ব্যবহারে বা অপব্যবহারে প্রকারতঃ সেই সকল বস্তু বা বিষয়ের দ্বারা যে অনিষ্ট সাধিত হয়, তাহা ব্যবহারের দোষ, বস্তু বা বিষয়ের নহে। যথাযথ ব্যবহারের ফলে অতি তীব্র হলাহল জীবজীবনের পক্ষে অমৃতের কাজকরে, আবার ব্যবহারের দোষে দুগ্ধ প্রভৃতির ন্যায় বস্তুগুলিও সময় সময় মারাত্মক হইয়া দাঁড়ায়।

আল্লার সৃষ্টির মধ্যে মানুষই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া কথিত হয়। এই মানুষের মধ্যে কতকগুলি রিপু বা প্রবৃত্তি আছে, যাহার দ্বারা তাহার ভিতর-বাহিরের সমস্ত ভাব ও কর্ম্মের উৎপত্তি ও অভিব্যক্তি হইয়া থাকে। এই উৎপত্তি ও অভিব্যক্তি সম্বন্ধে বিভিন্ন মানুষের মধ্যে বিভিন্ন প্রকারের বিকাশ দেখা যায়। অসহায় সতীসাধ্বী নারীর উপর পাশবিক অত্যাচার করিতে সমর্থ হইয়া একজন নিজকে কৃতার্থ মনে করিতেছে, আর একজন সেই নারীকে রক্ষা করার জন্য আত্মবলিদান-কেই নিজের মানবজীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সফলতা বলিয়া বিশ্বাস করিতেছে। একটি দিন-মজুর নিজের বহুকষ্টে অর্জ্জিত কয় আনা পয়সার মধ্য হইতে দুইটা বাহির করিয়া অন্ধ আতুরের হাতে দিয়া স্বর্গীয় আত্মপ্রসাদ লাভ করিতেছে, আর একজন বড়লোক নিজেরই আত্মীয় স্বজন বা অপর দীন দুঃখীদের যথাসর্ব্বস্ব হরণ করিয়া মহা আনন্দ ও অশেষ গৌরব অনুভব করিতেছে। মানব সমাজের বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যেই ভাব ও কর্ম্মের এই অসামঞ্জস্য সীমাবদ্ধ হইয়া নাই। একই ব্যক্তির জীবনের বিভিন্ন স্তরে বা একই স্তরের বিভিন্ন অবস্থায়, তাহার ভাব ও কর্ম্মের মধ্যে ঘোর অসামঞ্জস্য দেখা যায়। নিজেদের সামাজিক ও ব্যক্তিগত জীবনের ভাব ও কর্ম্মধারার বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে, তাহার মধ্যে এই প্রকারের শত শত তারতম্য, শত শত অসামঞ্জস্য আমাদের দৃষ্টিপথে পরিস্ফুট হইয়া উঠিবে।

মানুষের মানসবৃত্তিগুলির আত্মপ্রকাশে তাহার ভাব ও কর্ম্মধারার মধ্যে এই যে ঘোর অসামঞ্জস্য, ইহার মূল কারণ কোথায়? বিভিন্ন মানুষ কি বিভিন্ন উপাদান দ্বারা গঠিত হইয়াছে? তাহাদের প্রত্যেকের মধ্যে কি তবে বিভিন্ন ও পরস্পর বিরোধী প্রকৃতি সন্নিহিত করিয়া দেওয়া হইয়াছে? জীবনের বিভিন্নস্তরে ও বিভিন্ন অবস্থায় তবে কি মানুষের রিপু ও প্রবৃত্তিগুলির অদল-বদল ঘটিয়া থাকে।

না—আমরা একথা বলিতে পারি না। কারণ আমরা এক সর্ব্বশক্তিমান সৃষ্টি-কারণের অস্তিত্বে বিশ্বাস করি। আল্লাহ আছেন, তিনি ওয়াহেদ বা একক এবং তিনি সর্ব্বশক্তিমান—এ বিশ্বাসের অবশ্য-গ্রহণীয় তাৎপর্য্য এই যে, যুগপৎভাবে তিনি মঙ্গলময়ও বটেন। সৃষ্টির মূলে সৎ ও অসৎ রূপ দুইটি বিভাগ যদি বিদ্যমান রহিয়া থাকে, তাহা হইলে বলিতে হইবে যে, আল্লাহ মঙ্গলময় নহেন, অথবা অমঙ্গলের সৃষ্টিকর্ত্তা আর এক খোদা তাঁহার সৃষ্টিরাজ্যের আট আনা শরিক হইয়া আছেন—পার্সিকেরা যেমন ঈজদ ও আহরমনরূপে দুই খোদার কল্পনা করিয়া থাকে। অসৎ ও অমঙ্গলকে গ্রহণ করা যদি মানুষের পক্ষে অপরাধ বলিয়া পরিগণিত হয়, তাহা হইলে সে জন্য আসল বা প্রধান অপরাধী হইবেন তিনি, সেই অসৎকে সৎরূপে সৃষ্টি করার বা আদৌ সৃষ্টি না করার ষোলআনা ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও, যিনি তাহার সৃজন করিয়া দিয়াছেন।

এই আলোচনার দ্বারা আমরা দেখিতে পাইতেছি যে,

আল্লাহ বিভিন্ন মানুষের মধ্যে সৎ বা অসৎরূপী বিভিন্ন প্রকৃতি সৃজন করিয়া দিয়াছেন, অথবা তিনি একই মানুষের মধ্যে সময় ও অবস্থা ভেদে সৎ ও অসৎ প্রকৃতির অদল বদল ঘটাইয়া থাকেন—এরূপ ধারণা সম্পূর্ণ অসঙ্গত এবং বস্তুতঃ উহা আল্লাহকে অস্বীকার করার প্রকার ভেদ মাত্র। একথা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে স্বীকার করিতে হইবে যে, সমস্ত মানুষকে আল্লাহ একই উপাদান দ্বারা সৃজন করিয়াছেন এবং সে উপাদানের সৃষ্টিতে অসৎ ও অমঙ্গলের সংস্পর্শ মাত্রও নাই। (১)

এখানে আসিয়া একটা সহজ জিজ্ঞাসা আমাদের মনে জাগিয়া উঠিবে—সৃষ্টির মূলে যখন কোন অসৎ ও কোন অমঙ্গলের সংস্পর্শ নাই, সৃষ্টির শ্রেষ্ঠজীবরূপে পরিকীর্ত্তিত মানুষ আমি, এই যে ক্ষণে ক্ষণে পাশবিক কর্ম্মে ও পৈশাচিকভাবে সহস্র আজাজীলকে পর্য্যন্ত লজ্জিত করিয়া দিতেছি—কেন? আল্লার সৃষ্ট আমার রিপু প্রবৃত্তি ও প্রকৃতিই কি তাহার কারণ নহে?

( ২ )

মুছলমান পণ্ডিত মণ্ডলীর চিন্তার ধারা এখানে আসিয়া বহুধা বিভক্ত হইয়া গিয়াছে। একদল পণ্ডিত নিজেদের চিন্তার অনুকূলে কোরআনের কতকগুলি আয়ত উপস্থাপিত করিয়া প্রতিপন্ন করিতে চাহিয়াছেন যে, ইচ্ছা বা শক্তি বলিয়া মানুষের হাতে কিছুই নাই। কাঠ পাথরের মত সে শক্তিহীন, আল্লার ইচ্ছামাত্রে সে নড়াচড়া করিয়া থাকে। অথচ ইঁহারা স্বীকার করেন যে, এই যে ইচ্ছাহীন শক্তিহীন এবং একমাত্র আল্লার হুকুমে যন্ত্রবৎ চালিত মানুষ—নিজের কর্ম্মের জন্য আল্লার নিকট দায়ী হইতে হইবে ইহাকেই, এজন্য দণ্ড বা পুরস্কার ভোগ করিবে এই অক্ষম যন্ত্ররূপী মানুষ! এই মতবাদ যাঁহারা পোষণ করেন, অন্যদের নিকট তাঁহারা "জবরিয়া" আখ্যা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

আর এক শ্রেণীর পণ্ডিতেরা বলিয়া থাকেন যে, মানুষের এবং তাহার ভিতর বাহিরকার সমস্ত উপাদান সমস্ত রিপু ও প্রবৃত্তির সৃষ্টিকর্ত্তা যে একমাত্র মঙ্গলময় আল্লাহ, তাহাতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই। মানুষ সৃষ্টির শ্রেষ্ঠতম জীব, ইহার অর্থ এই যে, মানুষের ভিতরে এমন কতকগুলি বিশেষত্ব সেই সৃষ্টিকর্ত্তা কর্ত্তৃক নিহিত রহিয়াছে—যাহা মানুষ ব্যতীত আর কাহারও নাই। সেই বিশেষত্ব হইতেছে তাহার সদসতের স্বতন্ত্র উপলব্ধিশক্তি এবং মানুষের নিজের স্বাধীন সঙ্কল্প অনুসারে সেগুলির যদৃচ্ছা প্রয়োগ করার ক্ষমতা। এই শক্তি ও এই স্বাধীনতা আছে বলিয়া আল্লার হুজুরে মানুষ নিজ কৃতকর্ম্মের জন্য দায়ী হইবে এবং সেই দায়ী হওয়া সঙ্গত হইবে। কোরআনের বহু আয়ত ও অন্যান্য যুক্তি প্রমাণ দ্বারা ইঁহারাও নিজেদের অভিমত সপ্রমাণ করিতে প্রয়াস পাইয়া থাকেন। ইহাদিগকে কদরিয়া বলা হইয়া থাকে।

"ছুন্নত জামাআৎ" বলিয়া যাঁহারা নিজেদের পরিচয় দেন, তাঁহারা জাবরিয়া ও কাদরিয়া মতবাদের মধ্যে একটা মধ্যপথ আবিষ্কারের চেষ্টা করিয়াছিলেন। এই দলের পূর্ব্ববর্ত্তী আলেমগণের এই শুভ প্রচেষ্টা ক্রমে ক্রমে সফলতার দিকে অগ্রসর হইতেছিল এবং তক্‌দির ও তদ্‌বির সমস্যার সমাধান সাধনে তাঁহারা কতকটা সফলও হইয়াছিলেন। কিন্তু পরবর্ত্তীদের হাতে পড়িয়া এ আলোচনা আর অগ্রসর হইতেত পারিলই না, অধিকন্তু এই দলের পরবর্ত্তী আলেমগণ, এক দিকে মো'তাজেলাদিগের(২) আড়িতে এবং অন্যদিকে তক্‌লিদ বা অন্ধঅনুকরণের ব্যাপক ও বিষাক্ত আবহাওয়ার সর্ব্বনাশকর পরিবেষ্টনের কল্যাণে এমন আড়ষ্ট ও আবিষ্ট হইয়া পড়িলেন যে, জবরিয়াদিগকে গোমরাহ ও জহান্নমী ফেরকা বলিয়া গালাগালি দিলেও, বাস্তবে নিজেদের অজ্ঞাতসারে তাঁহারা এখন পুরাদমে জবরিয়া হইয়া গিয়াছেন। একথার প্রমাণ—বর্ত্তমান আলেম সমাজের তক্‌দির সংক্রান্ত সাধারণ বিশ্বাস।

৬ষ্ঠ শতাব্দীর প্রথম ভাগেও তাঁহারা বিশ্বাস করিতেন

---

(১) নিশ্চয় মানুষকে আমরা উৎকৃষ্টতম উপাদান দ্বারা সৃষ্টি করিয়াছি—(কোর-আন তীন ছুরা)।

(২) মো'তাজেলা অর্থে যে একদিকে সরিয়া যায়। কথিত আছে—মো'তাজেলা সম্প্রদায়ের এমাম ওয়াছেল-এব্‌নে-আতা' হাছন-বাছ্‌রীর মজলিস হইতে সরিয়া গিয়াছিলেন, এই জন্য তাঁহার এই নাম পড়িয়া যায়। মো'তাজেলাগণ اصحاب العدل والتوحيد বা ন্যায় ও তওহীদ অবলম্বীদল বলিয়া নিজেদের নামকরণ করিয়া থাকেন।—তাফ্‌তাজানী।

যে, মানুষ যে সকল কাজের জন্য দায়ী তাহা সম্পাদন করার স্বাধীন এখ্‌তিয়ার তাহার আছে। (১)

(৩)

তক্‌দিরের মছলা বা কর্ম্মবাদ ও অদৃষ্টবাদ সম্বন্ধে বিচার করা আজিকার এই সন্দর্ভের উদ্দেশ্য নহে। উপরের আলোচনার দ্বারা আমরা এইটুকু দেখিতে চাহিয়াছি যে, কদরিয়া বা মো'তাজেলা এবং ছুন্নৎ জমাআৎ, সকলেই মোটের উপর একথা স্বীকার করিতেছেন যে, যে কাজ করার বা না করার দায়িত্ব এবং সেই দায়িত্বের ফলাফল মানুষকে বর্ত্তাইবে, সেই কাজ করা বা না-করা মানুষের ইচ্ছা ও শক্তির অধীন।

আল্লাহ আমার মধ্যে প্রবৃত্তি সৃষ্টি করিয়া দিয়াছেন এবং তাহাকে সঙ্গত বা অসঙ্গত ভাবে ব্যবহার করার অথবা আদৌ ব্যবহার না করার শক্তিও আমাকে দান করিয়াছেন। এই প্রবৃত্তিগুলিকে নিজের আয়ত্তাধীন করিয়া রাখিতে পারিলে, তাহাকে সংযত সুনিয়ন্ত্রিত করিয়া লইতে পারিলে সেগুলি আমার অশেষ উপকারে আসিতে পারে। পক্ষান্তরে আমি যদি নিজেই প্রবৃত্তির অধীন হইয়া পড়ি, প্রবৃত্তিই যদি আমার পরিচালক হইয়া দাঁড়ায়, তাহা হইলে সেগুলি তখন আমার সর্ব্বনাশেরই কারণ হইয়া থাকে।

ক্রোধ মানুষের একটা প্রধান রিপু। দুনয়ার নানা নীতিকার নানাভাবে এই ক্রোধের নিন্দাকীর্ত্তন করিয়াছেন। বাস্তবিক এই ক্রোধ যে কত প্রকারে মানুষের কত ভয়ঙ্কর অনিষ্ট সাধন করিতেছে, নিজেদের নৈমিত্তিক জীবনে আমরা তাহার বহু নিদর্শন দেখিতে পাই। কিন্তু কেহ কি একথা বলিতে পারেন যে, ক্রোধ মূলতঃ অমঙ্গল জনক, অথবা ক্রোধের সৃষ্টি করিয়া আল্লাহ একটা অমঙ্গলের সৃষ্টি করিয়াছেন? আমাদের বিশ্বাস, কোনও জ্ঞানবান ব্যক্তিই একথা বলিতে পারেন না। কারণ ইহা ক্রোধের দোষ আদৌ নহে, বরং প্রকৃতপক্ষে ক্রোধরূপী রিপুকে অসংযত ও অবাধ্য হইয়া উঠিতে দেওয়ার অর্থাৎ ঐ প্রবৃত্তির অসদ্ব্যবহারের অবশ্যম্ভাবী কুফল। মানুষের জীবনে এমন অবস্থা অনেক সময় উপস্থিত হইয়া থাকে, যখন ক্রোধই তাহার মনুষ্যত্বকে অপচয়ের হাত হইতে রক্ষা করিতে সমর্থ হয়। সে সব অবস্থায় যাহার শরীরে ক্রোধের উদ্রেক না ঘটে, সত্যকার মনুষ্যত্বের পরিভাষায় তখন সে কাপুরুষ ও নীচাশয় বলিয়া কথিত হয়। চিন্তা করিয়া দেখিলে অন্যান্য রিপু ও বৃত্তিগুলি সম্বন্ধেও অতি সহজে এই সত্যের উপলব্ধি করা যাইতে পারিবে।

এই প্রবৃত্তি বা নাফ্‌ছকে সংযত ও সুনিয়ন্ত্রিত করিয়া সঙ্গত ও যথাযথভাবে তাহার ব্যবহার করাই এছলামের প্রবর্ত্তিত তাক্‌ওয়া আত্মশুদ্ধি বা আত্মসংযম। এই নাফ্‌ছ আবার কোরআনের ভাষায় অবস্থাভেদে তিনটী বিভিন্ন বিশেষণে আখ্যাত হইয়াছে—আম্মারা, লাউওয়ামা ও মুৎমাইন্না। আম্মারা মানুষকে কেবল পাপের দিকে প্ররোচিত করে এবং পাপানুষ্ঠানে তৃপ্তিলাভ করিয়া থাকে। ইহা হইতেছে নাফছের নিকৃষ্ট বা অধম অবস্থা। যে অবস্থায় নাফ্‌ছ পাপের আকর্ষণ হইতে মানুষকে সর্ব্বত্র বারিত করিয়া রাখিতে না পারিলেও, পাপানুষ্ঠানের পর তাহাতে স্বতঃ একটা গ্লানি ও অনুতাপের ভাব জাগিয়া উঠে, তাহাকে বলা হয়—লাউওয়ামা। ইহা হইতেছে নাফ্‌ছের মধ্যম বা সাধারণ অবস্থা। সংকল্প ও সাধনার অভাব ঘটিলে মানুষ এই স্তর হইতেই নিকৃষ্ট স্তরে অধঃপতিত হইয়া থাকে। আবার সেই সংকল্প ও সাধনার ফলে সে এখান হইতে ক্রমে ক্রমে উপরে উঠিতে উঠিতে এমন স্তরে গিয়া উপস্থিত হয়, যেখানে কোন অসৎ ও অন্যায়ের অনুষ্ঠান করা কার্য্যতঃ তাহার পক্ষে অসম্ভব হইয়া দাঁড়ায় এবং শান্তি ও সন্তোষে তাহার জীবন পরিপূর্ণ হইয়া উঠে। ইহাই হইতেছে নাফছের উত্তমস্তর এবং ইহাকে বলা হয়—মুৎমাইন্না। সাধনার অভাব ঘটিলে এখানেও অধঃপতনের আশঙ্কা আছে। পক্ষান্তরে এই অবস্থায় আত্মা যদি ভৌতিক দেহ পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হয়, তাহা হইলে তাহার সম্মুখে সন্তোষের, সৌন্দর্য্যের, শান্তির ও মাধুর্য্যের, রা-জিয়া-তাম্মার্জিয়ার সহস্র নয়নাভিরাম "রেজওয়ান" রহমতের অনন্ত অবদান লইয়া তখনই মূর্ত্ত ও স্ফূর্ত্ত হইয়া উঠে।

---

(১) এমাম নছফী বিরচিত আকাএদ দেখ।—বর্ত্তমান কালের মনোবিজ্ঞানবিদ পণ্ডিতগণের অনুরূপ তাঁহারাও মানুষের ক্রিয়া কলাপকে حركة البطش Automatic action এবং حركة الاختيار Voluntary action বা ইচ্ছাবিশিষ্ট ও ইচ্ছাশূন্য ক্রিয়ায় বিভক্ত করিয়া বলিয়াছিলেন—দ্বিতীয় শ্রেণীর ক্রিয়া করা বা না করার পুরা শক্তি মানুষের আছে।

অতএব মানুষের দরকার হইতেছে—আজীবন সাধনার, ছেরাতুল্ মুস্তকিম লাভের গভীর অটল সংকল্পের। এছলাম মানব জীবনের এই আত্মশুদ্ধি ও সংযম সাধনার যে পদ্ধতি নির্ণয় করিয়া দিয়াছে, কোরআনের পরিভাষায় তাহারই নাম "ছিয়াম" বা আত্মসম্বরণ—নিতান্ত তাচ্ছিল্যের সহিত আমরা সাধারণতঃ যাহার অর্থ করিয়া থাকি রোজা বা উপবাস বলিয়া।

রোজা বা উপবাসও যে ছিয়ামের একটা অংশ—এবং বিশেষ অংশ—তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, ইহা ছাড়াও ছিয়ামের আরও কতকগুলি খুব দরকারী অংশ আছে। সেই অংশগুলি সম্বন্ধে স্বয়ং হজরত রছুলে করিমের দুই একটা বাণী পাঠক পাঠিকার নিকট উপস্থিত করিবার জন্যই আজ এই সন্দর্ভের অবতারণা।

রমজান মাসের ছিয়াম সাধনা সম্বন্ধে কোরআনে যে সকল আয়ত সন্নিবেশিত আছে, তাহার প্রথম অংশ এই:—

يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما

كتب على الذين من قبلكم - لعلكم تتقون-

হে মোমেনগণ! তোমাদিগের পূর্ব্ববর্ত্তী (উম্মত) দিগের ন্যায়, ছিয়ামকে তোমাদিগের জন্যও অবশ্য প্রতিপাল্য কর্ত্তব্যরূপে নির্দ্ধারিত করিয়া দেওয়া হইল, **যেন তোমরা সংযমশীল হইতে পার।**

(ছুরা বকর—আয়ত)

এখানে আমরা স্পষ্টভাবে দেখিতে পাইতেছি যে, ছিয়ামের আদেশ দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এই সাধনার সাধ্য ও উদ্দেশ্যটাও আয়তে খুব পরিষ্কাররূপে নির্দ্ধারিত করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

কোন সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিতে হইলে আবশ্যক হয় নিয়ত বা সংকল্পের, মনঃসংযোগ বা রিয়াজতের এবং সাধনার সাধ্যকে সর্ব্বপ্রথমে অনাবিল ভাবে নির্দ্ধারিত করিয়া লওয়ার। ছিয়াম আল্লার হুকুম—তাহা আমরা সকলে জানি ও মানি। কিন্তু আমার কোন্ মঙ্গলের জন্য আল্লাহ এই আদেশ প্রদান করিয়াছেন, তাহা যদি আমি বুঝিয়া লইতে না পারি, তাহা হইলে সে অবস্থায় রোজা রাখিয়া আল্লার হুকুম হয়ত পালিত হইতে পারে, এবং সেজন্য শরিয়তের বাহ্যদৃষ্টিতে আমি রোজাদার বলিয়াও গৃহীত হইতে পারি। কিন্তু এই আল্লার হুকুম মাত্র পালনে সেই হুকুমের উদ্দেশ্যকে যে নির্ম্মম ভাবে উপেক্ষা করা হইবে, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। এই উপেক্ষায় অতি মারাত্মকরূপে অভ্যস্ত হইয়া পড়ার ফলে, নামাজ রোজা হজ্জ জাকাত প্রভৃতি এবাদত গুলি, সাধারণতঃ মোছলেম জীবনের ভিতরে বাহিরে তাহার উদ্দিষ্ট প্রভাব বিস্তার করিতে আদৌ সমর্থ হইতেছে না। উদ্দেশ্য যেখানে অজ্ঞাত বা উপেক্ষিত, অভীষ্টের প্রতিষ্ঠা সেখানে কি করিয়া সম্ভব হইতে পারে!

এমাম গাজালী ও শাহ অলিউল্লাহ প্রমুখ প্রাতস্মরণীয় আলেমগণ, এছলামের এই শ্রেণীর আদেশ নিষেধগুলির নিগূঢ়তথ্য ও মূল উদ্দেশ্য মুছলমানকে বুঝাইয়া দিবার জন্য আজীবন চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। (১) কিন্তু দুঃখের বিষয় আমাদের আলেম-সমাজ সাধারণতঃ এদিকটার প্রতি দীর্ঘ কাল হইতে বিশেষ অবহেলা প্রদর্শন করিয়া আসিতেছেন। এমন কি, এইরূপ প্রসঙ্গ উঠিলে প্রশ্নকারীর প্রতি কঠোর মন্তব্য প্রকাশ করাও সঙ্গত বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে। সহস্র সহস্র আলেমের সমবেত কণ্ঠের অবিরাম প্রচার সত্ত্বেও যে মুছলমান সমাজ আজ এছলামের আদেশ নিষেধ সম্বন্ধে আস্থাহীন হইয়া পড়িতেছে, পক্ষান্তরে নামাজ রোজা ইত্যাদি পালন করিয়াও যে আজ আমাদের নৈতিক সাংসারিক ও আধ্যাত্মিক জীবন, ঐ সকল মহা যোগের মূল অভীষ্টের প্রভাব হইতে সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত হইয়া থাকিতেছে—আমাদের দৃঢ়বিশ্বাস, আলেম সমাজের এই উপেক্ষাও অবহেলাই তাহার জন্য প্রধানতঃ দায়ী। সাময়িক উপযোগিতার হিসাবে আজ আমরা ছিয়ামের সাধনাকেই উদাহরণ রূপে উপস্থিত করিব।

( ৪ )

ছিয়াম শব্দের ধাতুগত মূল অর্থ—কোন বস্তু বিষয় বা কর্ম্ম হইতে বারিত হইয়া থাকা। (রাগেব, কবির প্রভৃতি)। এছলামের ব্যবহারিক অর্থে, ছিয়াম পালনকারীকে

(১) এহ্ইয়াউল-ওলুম ও হুজ্জাতুল্লাহিল-বালেগা প্রভৃতি দ্রষ্টব্য।

কোন্ কোন্ বস্তু কোন্ কোন্ বিষয়, বা কোন্ কোন্ ভাব ও কর্ম্ম হইতে নিজকে বারিত করিয়া রাখিতে হইবে?—এ প্রশ্নের উত্তর আমরা পাইতে পারি, আল্লার কোরআনে এবং তাঁহার রছুলের হাদিছে। কোরআনে এ সম্বন্ধে দুইটী ব্যবস্থা পাওয়া যাইতেছে। প্রথম—উষার প্রারম্ভ হইতে সূর্য্যাস্ত কাল পর্য্যন্ত সর্ব্বপ্রকার পানাহার হইতে বারিত থাকা। দ্বিতীয়—এই সময় পর্য্যন্ত যৌন-সংসর্গের সংস্পর্শ হইতে আত্ম সম্বরণ করা।

কোরআন এই সঙ্গে ছিয়াম পালনের অভীষ্টও নির্দ্ধারণ করিয়া দিয়াছে—তাহা হইতেছে তাক্ওয়া বা আত্মসম্বরণের "অভ্যাস।" সুতরাং দেখা যইতেছে যে, প্রবৃত্তি ও প্রেরণার যে যে উচ্ছৃঙ্খল প্রকাশ মানুষকে এই অভীষ্ট হইতে দূরে সরাইয়া দেয়, সে সমস্তের বর্জ্জন এই ছিয়াম-সাধনার অন্তর্ভুক্ত। হজরত রছুলে করিম স্বয়ং একথা গুলি স্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়া দিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন:—

من صام رمضان و عرف حدوده و تحفظ مما ينبغى
ان يتحفظ كفرما قبله

যে ব্যক্তি ছিয়ামের সবদিক অবগত হইয়া ও তাহার অবশ্য বর্জ্জনীয় সব বিষয়কে বর্জ্জন করিয়া রমজানের ছিয়াম পালন করে, তাহার পূর্ব্বপাপ সমূহ স্খলিত হইয়া যায়।

هو شهر الصبر ... و شهر المواساة

রমজান ধৈর্য্যধারণের মাস—সততা ও সদ্ব্যবহারের মাস।

الصيام جنة مالا يخرقها - قيل و بم يخرقها ؟
قال بكذب او غيبة

ছিয়াম মানুষের পক্ষে ঢালের কাজ করে যাবৎনা মানুষ নিজে তাহাকে ভাঙ্গিয়া ফেলে। জিজ্ঞাসা করা হইল—কি কাজ করিলে ঐ ঢালকে ভাঙ্গিয়া ফেলা হয়? হজরত বলিলেন—মিথ্যার দ্বারা, পরনিন্দার দ্বারা।

الصيام جنة - فاذا كان يوم صوم احدكم فلا يرفث و لا
يصخب فان شاتمه احد اوقاتله فليقل- " انى صايم " !!
" انى صائم " !!

ছিয়াম হইতেছে (মানুষের আত্মরক্ষার) ঢাল, অতএব ছিয়াম পালনকারী যেন অশ্লীলতা বর্জ্জন করে, যেন সে কলহ কোন্দল বর্জ্জন করে। এই সময় কেহ যদি তাহাকে গালি দেয়, কেহ যদি তাহাকে প্রহার করিতে আসে বা প্রহার করে, সে অবস্থাতেও (ছিয়াম পালনকারী ধৈর্য্যধারণ করিয়া থাকিবে এবং অত্যাচারীকে) বলিবে—আমি ছাএম, আমি ছাএম! অর্থাৎ তোমার অন্যায় অত্যাচারের প্রতিবাদ করিতে গেলেও আমার ব্রতভঙ্গ হইয়া যাইবে।

رب صائم ليس له من صيامه الا الجوع

অনেক ছাএম এরূপ আছে যে উপবাস করিয়া মরা ব্যতীত ছিয়ামের দ্বারা অন্য কোন উপকার সে লাভ করিতে পারেনা।

من لم يدع قول الغرور والعمل به فليس لله حاجة
فى ان يدع طعامه و شرابه

যে ব্যক্তি নিজের কাজে ও কথায় কপটতা প্রবঞ্চনা ও অসত্যকে বর্জ্জন করিতে পারেনা, আল্লার হুজুরে তাহার ক্ষুধা ও পিপাসা ভোগের কোনই সার্থকতা নাই।

خمس يفطرن الصايم : الكذب والغيبة والنميمة
والفحش والجفاء والخصومة والمراء -

ছাএমের ছিয়াম পাঁচটি কারণে নষ্ট হইয়া যায়—(১) মিথ্যা (২) পরনিন্দা (৩) চোগলখুরি (৪) অশ্লীলতা ও অত্যাচার (৫) শত্রুতা ও কলহ।

ان الصيام ليس من الاكل والشرب فقط - انما
الصيام من اللغو والرفث فان سابك احد اوجهل
عليك فقل انى صايم - ابن حبان، نسائى، حاكم،
بيهقى - كنزالعمال ٤—٣٠٦

কেবল পানাহার পরিত্যাগ করাই ছিয়াম নহে। সমস্ত অনর্থক ও সমস্ত অসাধু (ভাব ও কর্ম্ম) কে বর্জ্জন করার নামই ছিয়াম। অতএব ছিয়ামের অবস্থায় কেহ যদি তোমাকে গালাগালি দেয় অথবা তোমার প্রতি অন্যায় ব্যবহার করে, সে অবস্থাতেও তুমি (নিষ্ক্রিয়ভাবে আত্মসম্বরণ করত:) বলিয়া দিবে, আমি ছাএম। অর্থাৎ তোমার কথার প্রতিবাদ করিতে গেলেও আমার ব্রত ভাঙ্গিয়া যাইবে—আমার ছিয়াম নষ্ট হইয়া যাইবে।

ان الله تبارك و تعالى قال—من لم تصم جوارحه

عن محارمی فلا حاجة فی ان یدع طعامه و شرابه من اجلی
ابو نعیم - کنز العمال - ایضاً—

মহিমাময় আল্লাহ বলিতেছেন:—যাহার সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ আমার নির্দ্ধারিত হারাম হইতে ছিয়াম না করে, আমার নামে তাহার পানাহার ত্যাগ করার কোনই দরকার নাই। (১)

কোরআনের বর্ণিত ছিয়ামের উদ্দেশ্যের সহিত হজরত রছুলে করিমের এই হাদিছগুলির একত্র আলোচনা করিয়া দেখিলে ছিয়াম-সাধনার প্রকৃত স্বরূপটার উপলব্ধি করিয়া লওয়া সহজ হইয়া যাইবে। অশেষ পরিতাপের বিষয় এই যে, এছলামের এহেন মহীয়সী সাধনাগুলি, আমাদের অজ্ঞতা বা উপেক্ষার ফলে এমন শোচনীয় ভাবে বিফল হইয়া যাইতেছে! ছিয়াম আমাদের আত্মশুদ্ধি ও আত্ম-সম্বরণ সাধনার ত্রিশ দিবারাত্রি ব্যাপী মহা রিয়াজত। কিন্তু পূর্ণ ছিয়ামের প্রতি উপেক্ষা করিয়া এবং ছিয়াম সাধনার অভীষ্টকে বিস্মৃত হইয়া এখন তাহা কয়েক ঘণ্টার উপবাস মাত্রে পর্য্যবসিত হইয়া গিয়াছে। এখন রোজার সময়ই আমাদের ভোগের আয়োজন বৃদ্ধি পায়, রোজাদারদিগের মজলিসেই পরনিন্দার আসর বেশী জমে, রোজা রাখিলেই আমাদের ক্রোধ বৃত্তি অধিকতর প্রচণ্ড হইয়া উঠে, রোজা-দারদের মধ্যেই প্রত্যেক বৈকালে নানা অহেতুকী কলহ কোন্দলের সৃষ্টি হয়, ইহা অপেক্ষা দুঃখের কথা আর কি হইতে পারে?

আমরা পূর্ব্বে নিবেদন করিয়াছি যে, প্রবৃত্তিকে বিবেকের শাসন মানিতে অভ্যস্ত করিয়া লওয়াই ছিয়ামের উদ্দেশ্য। প্রবৃত্তি ও বিবেক এই দুইয়ের জয় পরাজয় লইয়া মানুষের মধ্যে পশুত্ব ও দেবত্বের (২) জয় পরাজয় সূচিত হইয়া থাকে। অর্থাৎ প্রবৃত্তি যখন বিবেককে অতিক্রম করিতে সমর্থ হয়,—মানুষের দৈবভাবের অপচয় ঘটে তখনই, সৃষ্টির শ্রেষ্ঠত্ব ও আশরফুল মখলুকাতের সমস্ত মহিমার বিপর্য্যয় ঘটিয়া যায় তখনই, এবং মানব-জন্ম লাভ করিয়াও "সে পশু অপেক্ষা নিকৃষ্টতর অবস্থা (৩) প্রাপ্ত হয় তখনই। এইজন্য একদিকে যেমন প্রবৃত্তিকে সংযত রাখার অভ্যাস অর্জ্জন করিতে হয়, অন্যদিকে সেইরূপ চেষ্টা করিতে হয়—বিবেককে মুক্ত নির্ব্বিকার ও জাগ্রত রাখিবার। ব্যাধিগ্রস্ত দেহের জন্য কুপথ্য বর্জ্জনের সঙ্গে সঙ্গে পুষ্টিকর সুপথ্য গ্রহণেরও আবশ্যক। প্রকৃত পক্ষে এই অর্জ্জনের সার্থকতার জন্যই বর্জ্জনের দরকার। রমজানের সাধনায় এই অর্জ্জনেরও একটা দিক আছে। সংক্ষেপে রোজায় দান, রোজার ফেৎরা, রোজাদারের পুণ্য কর্ম্মের অশেষ ছওয়াব, রমজানের নির্জ্জন নিশীথের তাহাজ্জদ ও এবাদত, নির্ব্বাক নিষ্কর্ম্ম এ'তেকাফের নিভৃত ধ্যান ধারণা ও নির্লিপ্ত মনঃসংযোগের এছলামী সন্ন্যাস—এ সমস্তই হইতেছে সেই অর্জ্জনের দিক। রমজান-সাধনার অভীষ্টকে লাভ করিতে হইলে এই দিকটার দরকার যে কত, যে কোন হাদিছ গ্রন্থের রমজান অধ্যায় পাঠ করিয়া দেখিলে তাহা বোঝা যাইতে পারে। বস্তুতঃ এই অর্জ্জনের পূর্ণ পরিণতির নামই-ত শবে-কদর।

আসুন পাঠক পাঠিকা! আমরা সেই মঙ্গলময়ের নিকট পরস্পরের জন্য প্রার্থনা করি—আমাদের ছিয়াম সফল হউক! আমাদের রমজান সার্থক হউক!! অনন্ত কল্যাণের অযুত রাইয়ান আমাদের বুকে বুকে প্রকট হইয়া উঠুক!!!

---

(১) সপ্তম হাদিছটী এমাম গাজ্জালীর এহ্ইয়াউল ওলুম হইতে গৃহীত (১—১০৮) এমাম ছেয়ুতী দাইলমী প্রভৃতি হইতে এই মর্ম্মের একটী হাদিছ বর্ণনা করিয়াছেন। (কনজ—৪—৩০৪)। প্রথমোক্ত হাদিছগুলি বোখারী মোছলেম, তরগিব ও মেশকাত প্রভৃতি হইতে গৃহীত। শেষের হাদিছ দুইটাও ছয়ুতী নাছাই, হাকেম, বাইহাকি ও আবুনাইম হইতে বর্ণনা করিয়াছেন। দেখ—ঐ - ঐ।

(২) বহিমী ও মালকুতীর অনুবাদ। (৩) কোরআন।

# যৌবনের শেষ

[ আকবর উদ্দীন ]

দিন কয়েকের অবিরল বৃষ্টিধারা শুষ্ক ধরণীর তৃষ্ণার্ত্ত বুক অপ্রত্যাশিত ভাবে শীতল করিলেও জীবজগত তাহাতে অকর্ম্মণ্য হইয়া উঠিতেছিল; এই অবিরাম বর্ষণে চারিদিকে যে ম্লান বিষাদের ছবি বাহিরের জগতে মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছিল, তাহা মানুষের দেহ-মন পর্য্যন্ত ব্যস্ত করিয়া তাহাদিগকে গৃহ কোণে জমাট করিয়া রাখিয়াছিল।

এমনি এক বারিবিধৌত প্রভাতে প্রৌঢ় জয়েদ নিদ্রা ভঙ্গে প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া নিত্য অভ্যাসবশতঃ পাঠাগারের জানালার পাশে আসিয়া বসিল। অন্যমনস্ক ভাবে প্রাতরাশ সমাপন করিতে করিতে সম্মুখের বিশাল প্রান্তরের ওপারে ঘন বৃক্ষরাজির মধ্যে যে শূন্য ও ভগ্নপ্রায় বাড়ী দেখা যাইতেছিল, সেই দিকে চাহিয়া রহিল। সঙ্গে সঙ্গে কত আশা ও আকাঙ্খার স্বপ্নের কথা তাহার স্মৃতির দ্বারে আঘাত করিতে লাগিল।

হঠাৎ তাহার মনে হইল সেদিন বর্ষ শেষ; দিনের এই সূর্য্যের পর আবার যে চাঁদ উঠিবে, তাহা অনাগতের বাণী লইয়া পৃথিবীর দ্বারে আঘাত করিবে। তাহারও জীবনে একদিন উষার আলো বিকশিত হইয়াছিল, আজ আবার সম্মুখের ঐ বাড়ীখানির প্রতি চাহিয়া চাহিয়া পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বকার যৌবনের আনন্দময়ী প্রভাতে যে বসন্তের বাণী তাহার দিকে দিকে ধ্বনিয়া ও রণিয়া উঠিয়াছিল, তাহা আজ আবার নূতন করিয়া জাগিয়া উঠিল।

চিন্তাস্রোত ছিন্ন করিয়া চাকর একটী বালককে সঙ্গে লইয়া কক্ষে প্রবেশ করিয়া কহিল—এই ছেলেটা আপনার সঙ্গে দেখা কর্ত্তে চায়।

জয়েদ বালকের প্রতি কতকটা অন্যমনস্ক ভাবে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল—কি খোকা, তুমি কি চাও?

বালক চারিদিকে চাহিয়া জামার পকেটে হাত দিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

জয়েদ চাকরকে কহিল—তুই বাহিরে যা।

সে চলিয়া গেলে বালক একখানি পত্র বাহির করিয়া জয়েদের হাতে দিয়া কহিল এর জবাব চেয়েছেন।

জয়েদের কৌতূহল জাগিয়া উঠিল। সে পত্র হাতে লইয়া উপরের লেখা দেখিয়া কে লেখক তাহা আন্দাজ করিবার চেষ্টা করিল; লেখাটা চেনা চেনা হইলেও ঠিক চিনিতে পারিল না। অবশেষে পত্র বাহির করিয়া যে নাম দেখিল তাহাতে তাহার বাক্যস্ফূর্ত্তি ত হইলই না, বরং চিন্তাশক্তি পর্য্যন্ত লুপ্ত হইবার উপক্রম হইল। একবার মনে হইল, বিধাতার এই খেলাঘরে তাহাকে আজ যে অবস্থায় আসিয়া পড়িতে হইয়াছে, তাহাতে ইহা যে কাহারও নিষ্ঠুর পরিহাস নহে তাহা অবিশ্বাস করিবার কোন কারণ ত' সে খুঁজিয়া পাইতেছে না।

যন্ত্র চালিতের মত পত্র পড়িতে পড়িতে মনে হইল এইত সেই হস্তাক্ষর! তবে বুঝি এতকাল পরে তাহার একান্ত সাধনার ফলে যে তাহাকে একদিন জাগাইয়া তুলিয়াছিল, সে আবার আসিয়াছে!

পত্রখানি এই :—

"বন্ধু, আজ বন্ধু ভিন্ন আর কিছু বলিয়া ডাকিবার অধিকার হয়ত' আমার নাই! যাক্ সে কথা! আমার স্বামী তিন বছর পূর্ব্বে মারা গিয়াছেন। এই তিন বছর আমার একমাত্র কন্যাকে লইয়া বহুকষ্টে নানা বাধা বিপত্তির মধ্যেও স্বামীর গৃহে ছিলাম; কিন্তু আর সেখানে থাকা অসম্ভব হওয়ায় আবার সেই পুরাতন স্মৃতি জড়ানো গৃহে ফিরিয়া আসিলাম। আমি আজ দিশেহারা, পথহারা। জানিনা আমাকে তোমার মনে আছে কিনা; তবু অতীতের দাবীতে আমি আজ তোমার দ্বারে উপস্থিত। তুমি আজ বৈকালে একবার আসিও, অনেক কথা তোমার সঙ্গে আছে; তোমাকে আমার কন্যা দেখাইব, সে আমারই মত হইয়াছে। যদিও আজ আমার আর সেদিন নাই, তবু আমি জানি তুমি আসিবে। ইতি— হাসিনা।

পত্র পড়িয়া তাহার বুকের ভিতর থর থর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল।

মুহূর্ত্তে তাহার মন পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে যেদিন সে তাহার উচ্ছৃঙ্খল উদ্দাম গতিপথে নিগড় বাঁধিয়া মায়া রাজ্যের সৃষ্টি করিবার প্রয়াসী হইয়াছিল, সেই দিকে ফিরিয়া গেল। তাহার পর সেই স্বল্প গণা দিনগুলির আদর সোহাগ, মান অভিমানের খেলার স্মৃতি প্রত্যক্ষ ভাবে জাগিয়া উঠিল। শেষ একদিন যখন তাহার উচ্ছৃঙ্খলতার দোষ দিয়া হাসিনার পিতামাতা একমাত্র কন্যার বিবাহ দিতে অস্বীকার করিলেন, অথচ সেই কন্যারই বিবাহ দিলেন এক ধনবান প্রৌঢ় জমিদারের সঙ্গে, তখন সে যে মূর্চ্ছাহত হইয়া পড়িয়াছিল ও তাহার চক্ষুর সম্মুখ হইতে এত বড় বিরাট বিশ্বের সমস্ত আলোকমালা নিভিয়া গিয়াছিল, তাহা মনে করিয়া—আজ আবার তাহার অন্তরের পুরাতন ক্ষতমুখ হইতে রক্তধারা প্রবাহিত হইতে লাগিল বাহিরের ঐ বৃষ্টিধারার মত এবং যে বেদনার উপর নিরাশ ও হতাশার পর্দ্দা পড়িয়া চাপা পড়িয়া গিয়াছিল, তাহাই আজ আবার তাহাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল।

যেদিন তাহার স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল, সেদিনের পর হইতে সে এই সুদীর্ঘ পঁচিশ বৎসর তাহার অন্তরে অথবা গৃহে কাহাকেও প্রতিষ্ঠা করে নাই সত্য, কিন্তু এই অবলম্বন ও উদ্দেশ্যহীন জীবনের চলার পথে যৌবনকে ত কোনদিন অস্বীকার করিতে পারে নাই; যাহাকে সিংহাসনে বসাইয়া নিজকে রিক্ত করিয়া দান করিয়াছিল, তাহাকে চিরজাগ্রত রাখিতে গিয়া কালের গতির সাদা ছায়ার পরশ ভুলিয়া গিয়া সে তাহার অন্তরকে সদা সচেতন ও জাগ্রত রাখিয়াছিল। আজ এতকাল পরে সেই সিংহাসনের অধিকারিণীর ডাক শুনিয়া স্থির থাকা তাহার পক্ষে সম্ভবপর নয়। বালককে কহিল যাও, তুমি বল, আমি বৈকালে যাব।

বালক চলিয়া গেলে, সে উঠিয়া কক্ষমধ্যে পায়চারি করিতে লাগিল; হঠাৎ সম্মুখের দর্পণে নিজের প্রতিবিম্বের প্রতি তাহার নজর পড়িল। মনে করিল—"সে নিশ্চয়ই আমার চাহিতে বুড়া হ'য়ে গেছে; আমাকে বয়স হিসাবে এত ছোট দেখাচ্ছে দেখে নিশ্চয়ই সে খুব আশ্চর্য্য হবে।"

সারাদিন সে এই স্বপ্ন রাজ্যে বাস করিয়া বৈকালে সতর্ক ভাবে উত্তম বেশ ভূষা করিয়া মাঠের ওপারের বাড়ীটার দিকে গেল। গৃহে প্রবেশ করিবার সময় তাহার আপাদ মস্তক কাঁপিয়া উঠিল, বুকের ভিতর অজানা কারণে দুরু দুরু করিয়া উঠিল।

বাহিরের কক্ষে প্রবেশ করিতেই যে মহিলা আসিয়া তাহাকে সম্বর্দ্ধনা করিলেন, তাহাকে কখনও জায়েদ দেখিয়াছে বা চেনে বলিয়া মনে হইল না। তাহার পরিধানে আড়ম্বর হীন সাদা কাপড় মাথার চুল বরফের মত সাদা মুখের উপর অপরিসীম বিষাদ ও ব্যথার চিহ্ন। জায়েদ অবাক হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল!

সে কহিল—আমাকে চিন্তে পারছ না!

জয়েদ অসংলগ্ন ভাবে কহিল – এ কি তুমি!

হাসিনা নিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিল হাঁ আমি, আজও তুমি তোমার কাছ থেকে যৌবনকে তাড়িয়ে দাও নি, তা তোমাকে দেখে বেশ বুঝা যাচ্ছে, কিন্তু আমি বুড়ো হয়ে গেছি, নিরন্তর দুঃখ ও জ্বালায় দাহ হ'য়ে আমি আজ আর সে হাসিনা নাই। যাক সে সব কথা! তুমি ভিতরে এসে বস; আগে আমার মেয়েকে তোমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিই; সে আমারই মত হ'য়েছে, এ আমি নয়, সেই পুরাণো আমি।

জয়েদকে বসাইয়া হাসিনা কন্যাকে ডাকিয়া আনিয়া কহিল—এঁকে সালাম কর। এই আমার মেয়ে।

কন্যা সালাম করিল; কিন্তু জয়েদ তাহাকে দেখিয়া কোন কথাই বলিতে পারিল না। সে দেখিল; এই ত তাহার হাসিনা; ঐ ত সেই চক্ষু, সেই মুখ, সেই কপোল, সেই গালের টোল, সেই হাসি, সেই কথা বলিবার ভঙ্গী। একবার হাসিনার প্রতি একবার কন্যার প্রতি চাহিয়া ভাবিল—এই বৃদ্ধা ত' আমার সে নয়, আমার সে ত এই।

তাহার পর হাসিনা অদূরে বসিয়া সুদীর্ঘ পঁচিশ বছরের কত সুখ দুঃখের কাহিনী বলিতে লাগিল; তাহার কন্যাও মাঝে মাঝে কথা বলিতেছিল। জয়েদ হতভম্ব হইয়া এই নূতন ও পুরাতনের পানে চাহিয়া ভাবিতেছিল ইহার কোনটা তাহার মানসীমূর্ত্তি। এতদিন একাগ্র সাধনা যাহার সে করিয়া আসিয়াছে, তাহার চিত্র ফুটাইয়া তুলিবার চেষ্টা সে বহুবার করিল, কিন্তু প্রত্যেক বারেই তাহার মনে হইল বৃথা

চেষ্টা; সম্মুখের এই পুরাতন তাহার সে নহে, ক্রমে ক্রমে তাহার চক্ষুর সম্মুখ হইতে দুই বিভিন্ন মুখী ধারার চিহ্ন মুছিয়া গিয়া জাগিয়া রহিল কেবল ঐ নবীনা যাহার মধ্যে সে তাহার চিরন্তন মানসীকে দেখিতে পাইল।

বাড়ী ফিরিবার পথে তাহার মনে অবিরাম সংগ্রাম চলিতে লাগিল; মাঝে মাঝে তাহার মনে হইতেছিল, যেন তাহার বুকের ভিতরটা জমিয়া বরফ হইয়া গিয়াছে।

যখন সে গৃহে আসিয়া পৌছিল, তখন সন্ধ্যা পার হইয়া গিয়াছে; মেঘে সেদিনকার আঁধার আরও ভারী হইয়া উঠিয়াছে।

টেবিলে যে আলো জ্বলিতেছিল, তাহার পাশে দাঁড়াইয়া সে আর একবার অতীতের কথা ভাবিল; মনে পড়িল, পঁচিশ বছর পূর্ব্বে সেও ছিল চঞ্চল সুন্দর উদ্দাম যুবক। আজ—মনে হইতেই সামনের বড় মুকুরের দিকে চাহিয়া দেখিল, সেখানে প্রতিফলিত হইয়াছে যাহার ছায়া সেত' পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বকার জয়েদ নহে, সে ছায়া এক প্রৌঢ়ের, যাহার চুল সাদা হইয়া আসিতেছে, কপালে চিন্তা ও যাতনার কথা স্পষ্টভাবে দেখা যাইতেছে, সর্ব্বাঙ্গে কালের অপ্রতিহত প্রভাবও লেখা বিরাজিত।

হতাশ ভাবে পাশের ইজিচেয়ারে বসিয়া পড়িয়া মর্ম্মন্তুদ যাতনার আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল; তাহার চক্ষের সম্মুখে আকাশ কালো হইয়া আসিল।

---

# ইসলাম ও বিজ্ঞান *

[ কাজী আবদুল হালিম ]

—:০:—

অনেকেই বোধ হয় অবগত আছেন যে আজকাল তারহীন তাড়িত ও টেলিভিসন্ বা দূরদর্শন কিরূপ অসাধারণ উন্নতি লাভ করে যা' কখন হওয়া সম্ভব ব'লে কেউ ধারণা ক'র্‌তে পা'র্‌ত না তাও ঘটাচ্ছে। লোকচক্ষের সামনে ধ'রে দিয়ে মানুষের "আশ্‌রাফুল্ মখ্‌লুকাৎ" নামের সার্থকতা সম্পাদন ক'রছে।

অধুনা এটা স্থির সিদ্ধান্তে পরিণত হ'য়েছে যে জ্যোতি ও শব্দতরঙ্গ কখনও বিনষ্ট হয় না। অর্থাৎ যুগে যুগে যে সমস্ত লোক ও প্রাণী জন্মেছে, তাদের সকলের প্রতিকৃতি এই জ্যোতি-তরঙ্গে মুদ্রিত ও তাদের কণ্ঠস্বর এই শব্দ তরঙ্গে মিশ্রিত হ'য়ে অবিকৃত ভাবে সর্ব্বদাই বিবর্ত্তমান রয়েছে, এবং তাড়িত সাহায্যে সে সকলকে অবিকল ভাবে একত্র ক'রতে পারা যায়। সে দিন কোনও সংবাদ পত্রের মন্তব্য দেখলাম, তাতে সভয়ে লেখা হ'য়েছে যে, বেতার তাড়িতের যন্ত্রাদির উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে এই বিংশ শতাব্দিতেও মহাত্মা যিশুখৃষ্টের মুখনিঃসৃত অবিকৃত উপদেশাবলী সুস্পষ্টভাবে শ্রবণ করা এবং কিরূপ ভাবে তিনি পাহাড়ে দাঁড়িয়ে উপদেশ দিতেন তা দর্শন করা সম্ভব হবে। তাহ'লে একথা এখন বেশ স্পষ্টভাবে বোঝা যাচ্ছে যে আজকালকার লোকের উক্ত যন্ত্রাদি সাহায্যে খৃষ্ট ধর্ম্মগুরুর বক্তৃতা শুনে ও তাঁকে দেখে ধন্য হবার অবসর ঘটবে এই দু' দু' হাজার বৎসর পরেও। আমরা অবগত আছি যে দূরদর্শনের অভিনব আবিষ্কারের সম্ভাবনায় খৃষ্টধর্ম্ম বিশ্বাসী বা আধুনিক খৃষ্টানগণের ভয়ের হেতু কি। হেতু

* 'দি লাইটের' ডি, জি, আন্নুন সাহেব লিখিত ইসলাম ও বিজ্ঞান ( Islam and Science ) প্রবন্ধ অবলম্বনে লিখিত। লেখক।

এই যে, যদি এই সমুদয় সম্ভব হয় তা হ'লে তিন ঈশ্বরের মধ্যে ( তাঁদের মতে ) দ্বিতীয় ঈশ্বর লোকের গোচরীভূত হ'য়ে প'ড়লে তাঁকে ঈশ্বর ভাবা এক গুরুতর ব্যাপার হ'য়ে দাঁড়াবে! তা ছাড়া আধুনিক খৃষ্টানগণ বিশেষতঃ বার্মিং-হামের বিসপ্ বার্ণেস্ ( Bishop Barnes of Birmingham ) প্রমুখ পাদ্রীসাহেবগণ—যাঁরা যিশুকে ঈশ্বর ব'লে বিশ্বাস না ক'রলেও, যাঁরা বিশ্বাস করেন তাঁদের জেব হ'তে মোটা মোটা তনখা মা'রছেন, সে সব মহাশয়রা যে ঈদৃশ সম্ভাবনার ভয়ে আতঙ্কে থরহরি কম্পমান হবেন, সে বিষয়ে আর সন্দেহ কি? স্ত্রীপুরুষ নির্ব্বিশেষে সকলে যখন অবিকল যিশুখৃষ্টের মুখনিঃসৃত বাণী শুনতে ও তিনি কিরূপ ভাবে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ ক'রেছিলেন সে সমুদয় দেখতে পাবে, তখন যে খৃষ্টধর্ম্মের কঠোর পরীক্ষার সময় আসবে; সে কথা বলাই বাহুল্য।

আর সব চেয়ে কঠোরতম পরীক্ষা তখনই হবে যখন একথা জানতে পারা যাবে যে তিনি শূলিতে প্রাণত্যাগ ( Cross ) ক'রেছিলেন না তা হ'তে উদ্ধার পেয়ে বাইবেল মোতাবিক "যারা হারিয়ে গিয়েছিল ( Those who were lost )" তাদের সন্ধানে আফগানিস্থান বেলুচিস্থান ও কাশ্মীরে গিয়ে তাদিকে পেয়েছিলেন এবং সেই কাশ্মীরেই তাঁহার মহজ্জীবনের ইতি হয়েছিল! কিন্তু কোন্ কথা ব'লতে ব'লতে কোথায় এসে প'ড়েছি!

আমাদের মুসলিম সম্প্রদায়ের এতে কোনও রূপ ভয়ের কারণ ত নাই-ই। উপরন্তু এই সমুদয় আবিষ্কার ইসলামের সহায়তা ক'রবে ও বিশ্বাসী নরনারীর সংখ্যা বৃদ্ধি করতঃ জগতের অশেষ কল্যাণ সাধন ক'রবে। কোর-আনের সুসমাচার বাহক আল্লার রসুল ( দঃ ) নিরক্ষর হ'য়েও প্রকৃতিতে এমন অনেক অভিনব জিনিষের অস্তিত্বের কথা ভেবে গিয়েছেন, যা বের করতে বিজ্ঞানকে এখনও যুগ যুগ ধ'রে খাটতে হবে! কোরআন শরিফে আছে :—যাবতীয় পদার্থের জীবন ও স্ত্রী পুরুষ ভেদ আছে। আর আধুনিক বোটানি সেদিন মাত্র এই সত্য আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়েছে। সুতরাং এই সমস্ত আবিষ্কার কোরআন শরিফের সত্যতাই প্রমাণ ক'রেছে ও ক'রবে। আবার কিন্তু আমরা আমাদের বক্তব্য হ'তে দূরে এসে পড়েছি। আমাদের বক্তব্য হচ্ছে এই যে, জগতের উপর এই বেতার তাড়িত আবিষ্কারের কিরূপ প্রভাব বিস্তার করা সম্ভব। ইসলামের মহানবীর বাণী, জীবনী ও কর্ম্মাবলী সুদৃঢ় ঐতি-হাসিক ভিত্তির উপর অবধানতার সহিত প্রতিষ্ঠিত। তাতে পরিবর্ত্তনের মধ্যে বড় জোর এই হতে পারে যে, কতকগুলি জইফ্ হাদিস আরও বিশদভাবে বাতিল প্রমাণিত হবে—তা ছাড়া আর কিছুই নহে। পক্ষান্তরে, যে স্বর্গীয় অনুপ্রেরণা যে অনুপম আদর্শ আরবের দুর্দ্ধর্ষ বেদুইনকে অনতিকাল মধ্যে সমগ্র পৃথিবীর অধিপতি ও সারে জাহানের অবিসংবাদিত শিক্ষাগুরুর আসনে উন্নীত ক'রেছিল, মুসলিম আবার যদি সেই যোগীকুলধ্যেয় নবীকুলরাজের অমৃতময়ী বাণী শ্রবণ এবং তাঁহার সেই নূরে রহমতে দীপ্ত বদন মোবারক দর্শন করার সৌভাগ্য লাভ করে, তবে আর চাই কি? তাই আমাদের মনে হয় যে, বেতার ও দূরদর্শনের আবিষ্কার সমূহ ( ইস্লামের পরিপন্থী হওয়া দূরে থাক ) সর্ব্বকালের জন্য সমভাবে উপযোগী এবং ইস্লামের হৃৎপিণ্ড সদৃশ 'আল্লা ব্যতীত আর কেহ উপাস্য নাই মহম্মদ ( দঃ ) তাঁহার প্রেরিত নবী ( তত্ত্ববাহী ),—এই সনাতন সত্যটী সমগ্র মানব জাতির কণ্ঠে ধ্বনিত ক'রে তোল্‌বার সহায়তা ক'রবে—না কেবল সহায়তা ক'রবে কেন,—ধ্বনিত ক'রে তুলবে।

কিন্তু অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বীদের নিকট বিজ্ঞানের এই উন্নতি ও আবিষ্কার যে কেবল অসুখ-দায়ক হবে—তাই নয়,—বরং ভীতিপ্রদ ব'লেই প্রতীয়মান হবে। পূর্ব্বেই খৃষ্টধর্ম্মের ভয়ের কারণগুলি নির্দ্দেশ ক'রেছি। বৌদ্ধধর্ম্ম ও ইহাদের হাত হ'তে পরিত্রাণ পাবে না, কারণ রাজকুমার গৌতমের বাল্য হ'তে নির্ব্বাণ পর্য্যন্ত বহুবিধ কল্প-কথাও এমন সব আজগুবি কাহিনী পরিপূর্ণ যে তাতে সহজে আস্থা স্থাপন করা সম্ভবপর নহে। বিজ্ঞান এই ভারতীয় রাজপুত্রের সঠিক জীবন ইতিহাস বের ক'রে দিলে সকলেই জানতে পা'রবে যে বুদ্ধদেব কে? বৌদ্ধরা এখন যেমনটী ক'রে দেখাচ্ছেন—তিনি ও তাঁর বাণী ঠিক তেমনটী নয়, তাতে অনেক প্রক্ষিপ্ত এসে জুটেছে। জারেস্তারিয়ানদের অবস্থাও তদনুরূপ। হিন্দু মুনীঋষি ও "অবতার" গণের নামে প্রচারিত অসংখ্য সংস্কার, বিশ্বাস ও ক্রিয়াকলাপ এই বেতার ও দূরদর্শন দ্বারা অলীক প্রমাণিত হ'য়ে যাবে, এ কথাও বেশ জোর ক'রে বলা চলে। শ্রীকৃষ্ণজী সত্য সত্যই

গোপিনীগণ সহ কেলি ক'রতেন—অথবা কেহ কেহ যেমন মনে করেন, ও সব প্রক্ষিপ্ত, পরে এসে জুটেছে? কংস নামক দৈত্যের যে বিকট প্রতিকৃতি সচরাচর আমরা হিন্দুগৃহে দেখতে পাই, সত্যসত্যই তার আকৃতি কি তদনুরূপ ছিল? শ্রীকৃষ্ণের বর্ণ আজকাল যেরূপ মসীলিপ্ত **নীলবর্ণ** ক'রে প্রচার করা হয় তাঁহার প্রকৃত বর্ণও কি তেমনই ছিল? পুরাকালে তাঁহার বাঁসরি শুনে যেমন সকলে মুগ্ধ ও মোহিত হ'য়ে যেত, আধুনিক ভারতবাসীও কি সে বাঁশী শুনে বিমোহিত হ'য়ে প'ড়বে না? এই প্রশ্নগুলির উত্তর অদূর ভবিষ্যতে বিজ্ঞান ও বেতার যুক্তি প্রিয় লোকের মনমত ক'রে দেবে।

---

# কাঁটাফুল

[ শাহাদাৎ হোসেন ]

( পূর্ব্বানুবৃত্তি )

৬

সংসারের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্নার আবর্ত্তনের মধ্য দিয়া দিনের পর দিন চলিয়া যায়। রাবেয়ার বিবাহের পরও দেখিতে দেখিতে দীর্ঘ দুইটী মাস সুখ-দুঃখের সহস্র স্মৃতি পশ্চাতে ফেলিয়া অনন্তের উদ্দেশে চলিয়া গেল।

রাবেয়া পূর্ব্ববৎ পিতৃগৃহেই অবস্থান করিতেছে। অবশ্য ইহার মূলে তাহার নিজের কোন ইচ্ছা বা অনিচ্ছা ছিল না, এ সম্বন্ধে পিতা এবং শ্বাশুড়ীর উপরেই সে সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়াছিল। বিবাহের পর মাত্র দুই দিনের জন্য সে একবার শ্বশুরালয়ে গিয়াছিল, তাহার পর এ পর্য্যন্ত তাহার শ্বাশুড়ীও আর তাহাকে লইয়া যাইবার সম্পর্কে কোন উচ্চবাচ্য করেন নাই, সে নিজে বা তাহার পিতাও আর কোন কথা বলেন নাই; কাজেই সে পিত্রালয়েই অবস্থান করিতেছে।

রাবেয়ার শ্বশুর বাড়ীতে স্বামী এবং বৃদ্ধা শ্বাশুড়ী ব্যতীত অপর কেহই ছিল না। তাঁহাদের অবস্থাও ছিল নিতান্ত খারাপ। মাতাপুত্রের ভরণপোষণেরই কোন উপায় ছিল না, তাহার উপর বধূকে গৃহে আনিয়া আবার একটা নূতন বাঝা বাড়াইতে রাবেয়ার শ্বাশুড়ী বড় একটা ইচ্ছুক ছিলেন না। তাঁহার মনে মনে আশা—বেয়াই ছেলের উপার্জ্জনের যাহা হউক একটা বন্দোবস্ত করিয়া দিলেই তিনি বধূকে ঘরে আনিয়া ফেলিবেন। অবশ্য তাঁহার এ-আশা দুরাশা নয়। রাবেয়ার পিতা কন্যাদানের পূর্ব্বে বেয়ানকে এইরূপ আশা ভরসা দিয়াই তাঁহাকে এই বিবাহের ব্যাপারে রাজী করিয়াছিলেন। নচেৎ দৈন্যের সংসারে পুত্রের বিবাহ দিয়া পোষ্য বাড়াইবার ব্যাপারে তাঁহাকে সম্মত করা বড় সহজ কাজ ছিল না।

যাহা হউক, আশা ভরসা দিলেও রাবেয়ার পিতা এ পর্য্যন্ত জামাইএর সম্বন্ধে বিশেষ কোন বন্দোবস্ত করিয়া উঠিতে পারেন নাই। কাজেই রাবেয়ারও স্বামীর ঘর করিতে যাওয়া ঘটিয়া উঠে নাই।

বিবাহের পর রাবেয়ার পিতা একবার মনে মনে সঙ্কল্প করিয়াছিলেন—লতিফকে ঘর-জামাই হিসাবে নিজের বাড়ীতে আনিয়া রাখিবেন, কিন্তু রাবেয়ার নিকট আভাসে কথা পাড়িয়া যখন বুঝিলেন যে, সে এ-ব্যবস্থার ঘোর বিরোধী; তখন মনের সঙ্কল্প মনের মাঝেই লীন করিয়া দিয়া তিনি অন্য বন্দোবস্তের চেষ্টায় ফিরিতে লাগিলেন

কিন্তু হঠাৎ কোন বন্দোবস্ত হওয়া ত সম্ভব নয়। বিশেষ তাঁহার আশা উচ্চ, জামাইকে যাহা হউক করিয়া কোন একটা হীন কাজে তিনি লাগাইয়া দিতে পারিবেন না, সুতরাং কিছুদিন বিলম্ব হওয়াই স্বাভাবিক; কিন্তু বিলম্বেও বিপত্তি কম নয়। লতিফের এমন কোন আয় নাই, যাহা দ্বারা তাহাদের মাতাপুত্রের ভরণপোষণ চলিতে পারে। সেই জন্য অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া শেষ পর্য্যন্ত তিনি জামাইএর জন্য একটা মাসোহারার বন্দোবস্ত করিবার সঙ্কল্প করিলেন। যতদিন পর্য্যন্ত চাকুরী বাকুরীর কোন ব্যবস্থা না হয়, ততদিন সেই মাসোহারা দিয়াই কোন রকমে তাহাদের দিন চালাইয়া দিবেন। কিন্তু তাঁহার এ সঙ্কল্পও ব্যর্থ হইল। লতিফের মাতা কিছুতেই বেয়াইএর এই মাসিক দান লইতে সম্মত হইলেন না। তিনি বেয়াইকে স্পষ্টই বলিয়া দিলেন, যা'তে চিরকালের জন্য ছেলেটার একটা কিনারা করে' দিতে পারেন, তার চেষ্টা দেখুন; উপস্থিত কোনও রকমে আমি চালিয়ে নিতে পারব। খোদাতায়ালা এতদিন যেভাবে চালিয়েছেন, এখনও সেই ভাবে চালাবেন। আপনি সেজন্য কোন চিন্তা করবেন না। বেয়ানের দৃঢ়সঙ্কল্প দেখিয়া রাবেয়ার পিতা এ সম্বন্ধে আর কোন উচ্চবাচ্য করিলেন না।

* * * *

রাত্রি প্রায় দশটা। আহারাদি-শেষে শয্যার আশ্রয়ে রাবেয়া চক্ষু মুদিয়া পড়িয়া আছে। পলে-পলে, দণ্ডে-দণ্ডে সময় কাটিতেছে, কিন্তু ঘুম আর আসে না। আসিবে কেমন করিয়া? দুঃসহ চিন্তাভারে তাহার মন ও মস্তিষ্ক ভারাক্রান্ত। সে-ভার হইতে মুক্ত করিয়া তাহার দেহে-মনে শান্তির শীতল পরশ বুলাইবার সাধ্য ঘুমের নাই। দুর্ব্বহ—দুঃসহ জীবন। পলে পলে মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে কঠোর অগ্নি-পরীক্ষা। আর কতদিন এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া সে নিজেকে বাঁচাইয়া চলিতে পারিবে, হাসির আবরণে অশ্রুকে আর কতদিন ঢাকিয়া রাখা চলিবে? দিবারাত্রি তাহার বুকের মাঝে বিশ্বদাহী চিতানল জ্বলিতেছে। শান্তি শোয়াস্তির সহিত তাহার সকল সম্পর্ক ছিন্ন হইয়াছে। নিদ্রা আসিবে কেমন করিয়া?

কিন্তু এই দুঃসহ ক্লেশকর চিন্তা রাবেয়ার সমগ্র অন্তর্দ্দেশ আচ্ছন্ন করিয়া থাকিলেও বাহিরে সে সেই পূর্ব্বের রাবেয়াই আছে। সেখানে এতটুকু ব্যতিক্রম ঘটে নাই। সে যে এত বড় একটা দুর্ব্বহ জীবন বহন করিতেছে, নিদারুণ নৈরাশ্যে ও অন্তর্দ্দাহে দগ্ধ হইয়া দিনে দিনে ভস্ম-পরিণতির দিকে অগ্রসর হইতেছে, তাহার বাহিরের দিক দেখিয়া তাহা বুঝিবার কোন উপায়ই ছিল না। সংযমের কঠোর বাঁধে সে অশ্রুর বন্যাকে আটকাইয়া রাখিয়াছিল, অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে দীর্ঘশ্বাস ও হাহাকারকে অবরুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল, মর্ম্মদ্বারে তাহার অবিশ্রান্ত প্রবল আঘাতে বুকখানা ভাঙিয়া চুরমার হইয়া গেলেও সে তাহাকে বাহিরে আসিতে দিতনা ভিতরের আগুন ভিতরেই জ্বলিত, আর ভিতরে-ভিতরে সে পুড়িয়া ক্ষার হইত। দহনের সে তীব্র জ্বালা সে একাই ভোগ করিত, কাহাকেও তাহার অংশভাগী করিতনা। তাহার বাহিরটা ছিল অমৃতময়, অগ্নি-জ্বালার পরিবর্ত্তে সেই অমৃতেরই শীতল পরশ সে পাড়া-পড়শী আত্মীয়-স্বজন ও সমবয়সীদের দেহে ও মনে বুলাইয়া দিত। সেই জন্য বাহিরের লোকে বুঝিত—রাবেয়া সুখী হইয়াছে, পরিপূর্ণ আনন্দের উদ্দাম জোয়ারে জীবনের তরী ভাসাইয়া অদূর অতীতের ক্ষণিকের ব্যর্থতার সাময়িক দুঃখকে সে সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃত হইয়াছে। তাহার জীবন এখন বসন্ত-কুঞ্জের মত অফুরন্ত আনন্দের লীলাকেন্দ্র—আলোক-সঙ্গীতের একটা অপূর্ব্ব সমারোহ।

নিদ্রার আরাধনায় এ-পাশ ওপাশ করিয়া অনেকক্ষণ কাটিয়া গল। তথাপি নিদ্রা আসিল না। রাবেয়া যতই জোর করিয়া মন হইতে চিন্তাকে ছাড়াইতে চেষ্টা করে, ততই যেন সে দৃঢ় হইয়া চাপিয়া বসে। রাবেয়া যেন অস্থির হইয়া উঠিল। এমন সময় বাহিরে কাহার পদশব্দ শোনা গেল। সঙ্গে সঙ্গে দরজার কড়া নড়িয়া উঠিল। রাবেয়া দরজা খুলিয়া দিল। ঘরের মধ্যে যে প্রবেশ করিল, সে লতিফ—রাবেয়ার স্বামী।

লতিফ ঘরে ঢুকিয়াই জিজ্ঞাসা করিল, তুমি কি ঘুমোওনি?

—না।

—এত রাত হ'য়েছে, তবু জেগে ছিলে?

—এই খানিক আগেই শুয়েছি। পচার মা এতক্ষণ বসে' ছিল, তার সঙ্গে গল্প কর্‌ছিলুম।

কথা শেষ করিয়া রাবেয়া বাহিরে যাইবার উপক্রম করিল। লতিফ জিজ্ঞাসা করিল, কোথায় যাও?

—পচার মাকে তুলে দিই।

—তাকে তুল্‌তে হবে না। সে বোধ হয় এখনও বাইরে দাঁড়িয়ে আছে। সে-ই আমাকে পাঁচিলের দরজা খুলে দিয়েছিল। কেন, তা'কে কি দরকার?

—খাবার কিছু আছে কি না দেখুক।

—কিছু দরকার নেই, আমি খেয়ে এসেছি।

—কোথায় খেলে?

—হরিশপুরে এক বন্ধুর বাড়ীতে দাওত ছিল—সেইখানে।

—আচ্ছা পানি এনে দিক। মুখ হাত ধোবে ত?

—হাঁ, তা' আন্‌তে বল।

রাবেয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। লতিফ বিছানার উপর বসিয়া গায়ের জামা কাপড় খুলিতে আরম্ভ করিল।

এ-ভাবে শ্বশুর বাড়ীতে আসা লতিফের আজ নূতন নয়। বিবাহের পর পাঁচ সাত বার সে এ-বাড়ীতে আসিয়াছে। তাহার মধ্যে প্রথম দুই তিন বার আসিয়া চারি পাঁচ দিন করিয়া কাটাইয়া গিয়াছে, কিন্তু তাহার পর হইতে কোন বার সে আর একদিনের অধিক সময় এ-বাড়ীতে কাটায় নাই। সকালে দুই প্রহরে বা রাত্রিতে হঠাৎ অপ্রত্যাশিত ভাবে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে, আবার পরদিন প্রভাত হইতেই চলিয়া গিয়াছে। তাহার এরূপ যাতায়াতের মূলে ছিল তাহার মায়ের নিষেধ। প্রথম প্রথম যখন সে শ্বশুর বাড়ীতে আসিয়া চারি পাঁচ দিন করিয়া কাটাইতে আরম্ভ করে, তখন তাহার মাতা খোলাখুলি ভাবে তাহাকে এই কথাটা বুঝাইয়া দিয়াছিলেন যে, এমন ভাবে রাত দিন শ্বশুর বাড়ীতে গিয়া পড়িয়া থাকিলে লোকে মনে করিবে যে, বাড়ীতে ইহার অন্ন জোটে না, তাই পেটের জ্বালায় রাত্রি দিন শ্বশুর বাড়ীতে আসিয়া পড়িয়া থাকে; অবশ্য শ্বশুর জামাই উভয়ের অবস্থা যদি সমান হইত, তাহা হইলে কেহ এরূপ ভাবিতে পারিত না; কিন্তু তাহা যখন নয়, তখন লোকের মনে এরূপ ধারণা হওয়া স্বাভাবিক। তিনি পুত্রকে ইহাও বুঝাইয়া দিয়াছিলেন যে, তুমি অন্নের কাঙাল হইতে পার, কিন্তু তাই বলিয়া লোকে তোমায় পর-পোষ্য বলিবে কেন? নিজের মনুষ্যত্বকে তুমি খাটো করিবে কেন?

মহীয়সী জননীর একথা পুত্র মর্ম্মে-মর্ম্মে উপলব্ধি করিয়াছিল। যদিও সে রাবেয়া বা শ্বশুরের মধ্যে কোন দিন কোন অবজ্ঞার ভাব দেখে নাই, উপরন্তু যথোচিত যত্ন ও সমাদর লাভ করিয়াছিল, তথাপি জননীর এই জ্ঞানগর্ভ উপদেশ তাহার মোহমুগ্ধ মনকে সজাগ করিয়া তুলিয়াছিল। তাহার সত্যই বিশ্বাস হইয়াছিল যে, এরূপ ভাবে শ্বশুর বাড়ীতে গিয়া পড়িয়া থাকা তাহার মত লোকের পক্ষে আদৌ শোভা পায় না। ইহা বাস্তবিকই মনুষ্যত্বের হানিকর। তাই মোহের প্রবল আকর্ষণ সত্ত্বেও সে এ-বাড়ীতে একাধিক দিবা বা রাত্রি যাপন একেবারেই পরিত্যাগ করিয়াছে। তাহার শ্বশুর বা রাবেয়া তাহার এই ব্যবহারে যে বিস্মিত হয় নাই বা অনুযোগ করে নাই, তাহা নহে; কিন্তু সে কাজের অজুহাত দেখাইয়া কোনও রকমে তাঁহাদিগকে বুঝাইয়া দিয়াছিল। আসল কথাটা আর প্রকাশ করে নাই, করিতে পারেও নাই।

লতিফ জামা কাপড় খুলিয়া বসিলে একটু পরেই রাবেয়া বারান্দায় জলপূর্ণ লোটা রাখিয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া বলিল, পানি এনেছি, মুখ হাত ধুয়ে এস।

লতিফ ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। রাবেয়া ততক্ষণ বিছানাটী উত্তমরূপে ঝাড়িয়া ঝুড়িয়া, তাহার উপর হইতে আধ-ময়লা চাদরখানি তুলিয়া লইয়া একখানি সদ্যধৌত চাদর পাতিয়া দিল।

লতিফ ঘরের মধ্যে পুনঃ প্রবেশ করিয়া হাসিমুখে জিজ্ঞাসা করিল, আমি যেদিন আসি, সেদিন বোধ হয় আগে থেকেই তোমার আরোয়ায় খবর পৌছে যায়?

কথাটা শেষ করিয়াই সে একবার রাবেয়ার মুখের পানে চাহিল, কিন্তু চাওয়াটা তাহার সম্পূর্ণই ব্যর্থ হইয়া গেল। রাবেয়ার চোখে বা মুখে এতটুকু কৃত্রিম কোপাভাস বা সলজ্জ হাসির রেখামাত্র ফুটিয়া উঠিল না। সেই স্বভাব-গম্ভীর মুখখানি, স্থির প্রশান্তদৃষ্টিসম্পন্ন চক্ষু দু'টী—লতিফ কোন স্থলেই এতটুকু ব্যতিক্রম দেখিতে পাইল না।

রাবেয়া স্বামীর প্রশ্নের কোন উত্তর না দিয়া বলিল, রাত অনেক হ'য়েছে,—শুয়ে পড়্‌লে হ'ত।

স্বামীর এই ধরণের প্রশ্নগুলিকে রাবেয়া বরাবরই চাপা দিয়া আসিয়াছে। তাহা ছাড়া গত্যন্তরও ছিল না। সে বেশ বুঝিয়াছিল যে, স্বামীর সহিত প্রেমালাপ করিবার অধিকার তাহার আদৌ নাই। তাহা যদি সে করে, তাহা হইলে তাহাকে দস্তুরমত অভিনেত্রী সাজিয়া অভিনয় করিতে হইবে; কিন্তু তাহা ত সম্ভব নয়। স্বামী-স্ত্রীর স্বর্গীয়

সম্বন্ধের ভিত্তির উপর দাঁড়াইয়া ত অভিনয় করা চলে না। সে যে নিছক প্রতারণা, অমার্জ্জনীয় বিশ্বাসঘাতকতা। এই প্রতারণা ও বিশ্বাসঘাতকতার কলঙ্ক ছাপ আঁকিয়া সে দাম্পত্য জীবনের পবিত্র আদর্শকে ম্লান করিতে চায় না; কাজেই প্রেমের কথা উঠিলেই সে সাধ্যমত সেটাকে চাপা দিয়া অন্য প্রসঙ্গ উত্থাপন করে। এবারও তাহাই করিল। স্বামীর জিজ্ঞাসার কোন উত্তর না দিয়া সে বলিয়া উঠিল, রাত অনেক হ'য়েছে—শুয়ে পড়্‌লে হ'ত।

পত্নীর ঔদাসীন্য দেখিয়া লতিফের মনে বেশ একটু আঘাত লাগিল। ইতিপূর্ব্বে লতিফ আরও কয়েকবার প্রেমালাপ করিতে যাইয়া বিফলমনোরথ হইয়াছে বটে, কিন্তু তজ্জন্য রাবেয়াকে সে যতটা দায়ী না করিয়াছিল, তদপেক্ষা অধিক দায়ী করিয়াছিল—বিবাহের পর নব-বিবাহিতার স্বাভাবিক সঙ্কোচ-জড়তাকে। তাহার ধারণা ছিল, এভাব বেশীদিন থাকিবে না, প্রথম মিলনের এই বাধ-বাধ ভাব কাটিয়া গেলে সব ঠিক হইয়া যাইবে। কিন্তু আজ আর সে-ধারণাকে সে যেন মনের মধ্যে ধরিয়া রাখিতে পারিল না। দিনে দিনে রাবেয়ার সকল সঙ্কোচই ত দূর হইয়াছে, তবে প্রেম-সম্ভাষণের সময় এ সঙ্কোচ কেন? আর ইহাকে সঙ্কোচই বা বলা যায় কেমন করিয়া?—এ যে ঔদাসীন্য। রাবেয়া যেন নিজকে এই প্রেমের ব্যাপার হইতে দূরে—বহুদূরে সরাইয়া রাখিতে চায়। কিন্তু কেন চায়? তবে কি মায়ের ধারণাই সত্য? ইহারা কি সত্য সত্যই আমাকে পোষ্য মনে করে? না—তাহা ত মনে হয় না, তাহা যদি করিত, তাহা হইলে সকল বিষয়েই তাচ্ছিল্য প্রকাশ পাইত। তবে?—

লতিফ কিছুক্ষণ নতমস্তকে বসিয়া আপন মনে এই সমস্ত কথা তোলাপাড়া করিল। তাহার পর একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া ধীরে ধীরে শুইয়া পড়িল।

রাবেয়া বেশ বুঝিতে পারিল; তাহার নির্ব্বিকার ঔদাসীন্য স্বামীর অন্তরে অনেকখানি বেদনা জাগাইয়া দিয়াছে কিন্তু কি করিবে সে? এ-বেদনার শান্তি-প্রলেপ দেওয়া যে তাহার সাধ্যের অতীত। তাহার আয়ত্বের মধ্যে যাহা আছে,—সেবা, ভক্তি, অন্তরের শুভেচ্ছা;—যাহা কিছু কল্যাণকর, যাহা কিছু প্রীতিকর,—তাহার সমস্তই সে প্রাণের পাত্র উজাড় করিয়া নিঃশেষে স্বামীর পায় ঢালিয়া দিতে পারে, এমন কি প্রয়োজন হইলে অকাতরে হাসিমুখে জীবন পর্য্যন্ত ডালি দিতে পারে; কিন্তু প্রেম?—তাহা ত দিবার নয়। তাহা যে সম্পূর্ণরূপে তাহার আয়ত্বের বাহিরে চলিয়া গিয়াছে, জীবন বিনিময়েও আর ত তাহা ফিরিয়া পাওয়া যাইবে না। কিন্তু স্বামী যে তাহার সেই দুর্ল্লভ বস্তুরই প্রার্থীরূপে তাহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। কেমন করিয়া সে তাঁহার প্রার্থনা পূর্ণ করিবে? অথচ না করিলেও মহাপাপভাগিনী হইতে হয়; নারী-জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য, সার ধর্ম্মকে বিসর্জ্জন দিতে হয়। ক্ষোভে, দুঃখে রাবেয়ার চক্ষু ফাটিয়া জল আসিতে চাহিল। কোনরূপে উদ্গত অশ্রু সম্বরণ করিয়া, সে বিছানার এক পাশে শুইয়া পড়িল।

লতিফ এতক্ষণ শুইয়া পড়িয়া বিবাহের পর হইতে এ পর্য্যন্ত রাবেয়ার প্রতি কার্য্যের, প্রত্যেক কথার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করিতেছিল।—যদি কোথাও তাহার এই ঔদাসীন্যের নির্ব্বিকার ভাবের গুপ্ত তত্ত্ব নিহিত থাকে, কিন্তু তাহার সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হইল। সে ইহার কোন যুক্তিসঙ্গত সঠিক কারণ নির্ণয় করিয়া উঠিতে পারিল না। ফলে তাহার মনের মধ্যে একটা অশান্তির, একটা সন্দেহের ছায়া ঘনাইয়া আসিতে লাগিল। কেমন-যেন একটা অস্বস্তির তাড়নায় সে ডাকিয়া উঠিল, রাবেয়া!

—কি?

—তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করব—সত্য উত্তর দেবে ত?

রাবেয়ার বুকের ভিতর দুরু দুরু করিয়া উঠিল। সে হঠাৎ কোন উত্তর দিতে পারিল না।

তাহার এই নীরবতায় লতিফের মনের অশান্তি ও সংশয় যেন দ্বিগুণ বাড়িয়া উঠিল। সে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল, চুপ করে' রইলে কেন? বল—যা জিজ্ঞাসা করব, তার সত্য উত্তর দেবে ত?

—কি?

রাবেয়ার কণ্ঠস্বর ঠিক স্বাভাবিক নয়, একটু যেন বিকৃত।

লতিফ জিজ্ঞাসা করিল, আমার এখানে এমন ভাবে যাতায়াত কি তুমি পছন্দ কর না?

রাবেয়ার বুকের স্পন্দন দ্রুততর হইল। কথা বলিবার শক্তি যেন লোপ হইয়া আসিতে লাগিল।

লতিফ আবার বলিল, বল—সত্য বল, আমার এখানে যাতায়াত কি তুমি পছন্দ কর না ?

রাবেয়া দুই হাতে মুখ ঢাকিল। উত্তর দিল না।

লতিফের অন্তরে আশার যে ক্ষীণ রশ্মি-রেখা এতক্ষণ অস্ফুট আলোক বিকীর্ণ করিতেছিল, এইবার তাহা নিশ্চিহ্ন হইয়া মুছিয়া গেল। তাহার সমগ্র অন্তর সংশয়ের ঘনকৃষ্ণ মেঘে সম্পূর্ণরূপে ছাইয়া আসিল। সে গম্ভীর কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, তাহ'লে আমার ধারণা সত্য !

—না।

এবার আর রাবেয়া চুপ করিয়া থাকিতে পারিল না। সমস্ত শক্তি সংযোগে বুকের ভিতরকার প্রলয় আন্দোলনকে শুদ্ধ করিয়া সে বলিয়া উঠিল,—না।

—না ? সত্য বল্‌ছ ?

লতিফ উন্মাদের মত উঠিয়া বসিল।

রাবেয়ার ইচ্ছা হইল ডাক ছাড়িয়া চীৎকার করিয়া বলে—না—না—ওগো না। তোমার ধারণা সত্য নয়। কিন্তু পারিল না। একবার না বলিতে গিয়া সে বুঝি তাহার সমস্ত শক্তি নিঃশেষ করিয়া ফেলিয়াছিল। তাই স্বামীর এই উন্মাদ প্রশ্নেও সে আর সাড়া দিতে পারিল না।

লতিফ তখন রাবেয়ার মুখের উপর হইতে তাহার ডান হাতখানি সবলে টানিয়া লইয়া নিজের দুই হাতের মধ্যে জোরে চাপিয়া ধরিয়া পূর্ব্ববৎ স্বরে আবার জিজ্ঞাসা করিল, বল—চুপ করে রইলে কেন ? সত্য বল্‌ছ—আমার ধারণা সত্য নয় ?

রাবেয়া মুহূর্ত্তের জন্য একবার স্বামীর মুখের পানে চাহিল। ক্ষণেকের মধ্যে চারি চক্ষের মিলন হইয়া গেল। লতিফ দেখিল, রাবেয়ার দুই চক্ষু জলভারে টলটল করিতেছে, তাহার দৃষ্টি করুণ মমতায় ভরা। সে চমকিয়া উঠিল। সেই সজল আঁখির করুণ দৃষ্টির সম্মুখে তাহার অন্ধ উত্তেজনা মুহূর্ত্তের মধ্যে কোথায় উড়িয়া গেল। সে বিস্ময়-ভরা কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল এ কি রাবেয়া! তুমি কাঁদছ কেন! কাঁদ্‌বার মত কোন কথা ত আমি তোমায় বলিনি।

স্বামীর কথায় রাবেয়ারও যেন চমক ভাঙ্গিল। তাইত! এ আবার সে কি করিয়া বসিল! এত দুর্ব্বল সে! এতটুকু সহ্য করিবার শক্তি তাহার নাই। এই সামান্য ব্যাপারেই সে ভিতরের দুর্ব্বলতাকে বাহিরে প্রকাশ করিয়া দিল! সে মনে মনে নিজেকে ধিক্কার দিতে লাগিল।

লতিফ পুনরায় বলিল, বল রাবেয়া—কাঁদ্‌চ কেন! আমি কি এমন রূঢ় কথা বলেছি—যা' তোমার কাঁদ্‌বার কারণ হ'য়ে উঠেছে।

রাবেয়া যতদূর সম্ভব নিজেকে সংযত করিয়া লইয়া বলিল, কাঁদ্‌ব কেন, অনেকক্ষণ থেকে শুয়ে আছি—ঘুম আস্‌ছেনা, গত রাত্তিরেও ভাল ঘুম হয়নি। এতক্ষণ চোখ জ্বালা কর্‌ছিল, এখন পানি ঝর্‌ছে, এইবার বোধ হয় ঘুম আস্‌বে। কথা শেষ করিয়াই রাবেয়া পাশ ফিরিয়া শুইল। লতিফের মনের মধ্যে সমস্যা জটিলতর হইয়া উঠিল, কারণ রাবেয়ার উত্তরে সে আদৌ বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারিল না। রাবেয়া যেন রহস্য-নায়িকা রূপে আজ তাহার চোখের সম্মুখে ফুটিয়া উঠিল। সে কিছুই ঠিক করিতে পারিল না, সব যেন কেমন গোলমাল হইয়া যাইতে লাগিল। কিছুক্ষণ হতভম্বের মত চুপ করিয়া বসিয়া থাকিয়া সে শয্যার উপর দেহ ঢালিয়া দিল।

( ক্রমশঃ )

# দর্শন ও ঈমান

( এস, ওয়া.জদ আলী—বি-এ, ( ক্যাণ্টব , বার-এট-ল )

[ পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর ]

এখন কল্পনা করিয়া ধরিয়া লওয়া যা'ক যে, হঠাৎ কোনও এক আশ্চর্য্য উপায়ে বর্ত্তমান বোধেন্দ্রিয় সকল ছাড়া ছুঁচাটি বিচার বুদ্ধিরও অধিকারী হইয়াছে। তাহা হইলে অবস্থাটা কিরূপ দাঁড়াইবে ? যে অসম্পূর্ণ উপকরণ গুলি তাহার নিকট বিদ্যমান আছে, তাহার সাহায্যে নিজের এই বিচার বুদ্ধির দ্বারা সে যে কোন ধরণের জগৎ সৃষ্টি করিয়া তুলিবে, তাহা সহজে বুঝিতে পারা যায়। দর্শনেন্দ্রিয়ের অভাববশতঃ সে অধিকতর উপাদান সংগ্রহ করিবে ঘ্রাণশক্তির মারফতে। অধিকাংশ সময় আঘ্রাণের সাহায্যে এবং মধ্যে মধ্যে স্পর্শের দ্বারা সে দ্রব্যাদির পরিচয় গ্রহণে স্বাভাবিকরূপে বাধ্য হইবে। দ্রব্যাদির তারতম্য নির্দ্ধারণ ও তাহার শ্রেণীবিভাগও এই নিয়মে হইতে থাকিবে। এখন ছুঁচার আঘ্রাণ উপলব্ধ জগৎ, আর আমাদের এই পরিদৃশ্যমান জগতে যে কত পার্থক্য, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যাইবে। এই কল্পতঃ বিচার বুদ্ধি সম্পন্ন ছুঁচাটি অনুভব করিবে যে, তাহার পার্শ্ববর্ত্তী বস্তুগুলির উত্তাপ একটা নির্দ্দিষ্ট সময়ান্তরে হ্রাস ও বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। দৃষ্টিশক্তির অভাব বশতঃ সে সূর্য্যকে দেখিতে পাইবে না। সুতরাং এই উত্তাপের হ্রাসবৃদ্ধির প্রকৃত কারণটী তাহার নিকট অজ্ঞাত রহিয়া যাইবে। তখন সে বলিতে আরম্ভ করিবে যে, বস্তু সমূহের অন্তর্নিহিত একটা স্বতঃগুণের প্রভাবে তাহাদের এই উত্তাপের হ্রাসবৃদ্ধি ঘটিয়া থাকে। এই সিদ্ধান্তকে ভিত্তি করিয়া সে যথাসময়ে বৈজ্ঞানিক অনুমান ও ধারণার সমস্ত অবয়বটা গড়িয়া লইবে। তখন এই বিচার বুদ্ধিসম্পন্ন ছুঁচা ও তাহার মতানুবর্ত্তীরা ক্রমে ক্রমে উপরোক্ত Law of Periodicity বা প্রাগভাব নিয়মকে একটা প্রধানতম প্রাকৃতিক বিধান বলিয়া মনে করিবে—বর্ত্তমানে অভিব্যক্তি বাদকে আমরা যেভাবে দর্শন করিতেছি। আমাদের হার্বার্ট-স্পেন্সারের মত কোনও সূক্ষ্মবিচারনিপুণ দার্শনিক তাঁহারই ন্যায় শৃঙ্খলানুরাগ লইয়া নিশ্চয়ই কোন এক সময় তাহাদের মধ্যে আবির্ভূত হইবে, সে আসিয়া নিজ সম্প্রদায়ের সমস্ত বিজ্ঞাননীতির সমাবেশ সাধন করিবে। সে সূক্ষ্ম ও আপাতসত্য যুক্তি তর্কের দ্বারা বুঝাইয়া দিবে যে, বস্তুর স্বভাবজ শৈত্য ও উত্তাপের মধ্যেই জগৎ সীমাবদ্ধ, তাহার বাহিরে জগতের অস্তিত্ব নাই। তাহার স্বজাতির মধ্যে কএকটা হতভাগ্য ছুঁচা যদি সে সময় বুকে বল সঞ্চয় করিয়া বলে যে, এই বিশাল জগতের কোন দিকে এমন কতকগুলি উপাদান বিদ্যমান থাকা অসম্ভব নহে, যাহা হয়ত আমাদের বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে নাই—তাহা হইলে বৈজ্ঞানিক নিশ্চয় এই 'বেচারী' গুলির প্রতি খুব কঠোর মন্তব্য প্রকাশে এবং অত্যন্তরূঢ় ভাষা প্রয়োগে কুণ্ঠিত হইবেন না।

এখানে তর্কস্থলে ধরিয়া লওয়া যা'ক যে, ক্রমবিকাশের নিয়ম অনুসারে এমন একটা অভিনব জীবের উৎপত্তি হইল, যাহার আকার ছুঁচার ন্যায়, অথচ একটা অপ্রকৃষ্ট ও অপরিস্ফুট দৃষ্টিশক্তিও তাহার আছে। অন্ধ ছুঁচাগুলির যাহা ধারণার অতীত, এই জীবটী যে তেমন কতকগুলি বিষয়ের উপলব্ধি করিতে পারিবে, সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ থাকিতে পারে না। এই জীবটী তাহার দস্তুর স্বজাতীয়গণের নিকট, এই দৃশ্যমান জগতের বিস্ময়কর ব্যাপার গুলি যে কতখানি তন্ময়তার সহিত বিবৃত করিবে, তাহা সহজে অনুমান করা যাইতে পারে। অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে সঙ্গে সে গগন মণ্ডলস্থ গ্রহ নক্ষত্রের নিশ্চয়ই উল্লেখ করিবে—সে বলিবে যে, বস্তুতঃ ঐ গ্রহ নক্ষত্রগুলিই আলোক ও উত্তাপের কারণ। ছুঁচা সমাজে ইহার এই নূতন কথাটী কিরূপ লাগিবে ? তাহারা যে ছুচা ইহার একটী কথার উপরও বিশ্বাস করিবে না, একথা সঙ্গত ভাবে বিশ্বাস করা যাইতে পারে। তাহাকে ইহারা পাগল বলিয়া ভণ্ড বলিয়া মনে করিবে। তাহারা ইহার

অবমাননা করিবে, তাহার বিরুদ্ধাচরণ করিবে, এবং সম্ভবতঃ তাহাকে হত্যা করিয়া ফেলিতেও পারে। তাহার উত্তরাধিকারের কেহ না থাকিলে তাহার অস্তিত্বের সঙ্গে সঙ্গে তাহার স্মৃতিটাও লোপ পাইয়া যাইবে।

কিন্তু তাহাদিগের অপেক্ষা অধিকতর বিচার শক্তি সম্পন্ন আমরা এ অবস্থায় নিশ্চয়ই বলিব যে, এই জীবটা যে মত প্রকাশ করিয়াছিল, প্রকৃত পক্ষে তাহাই হইতেছে ঠিক মত, আর তাহার উৎপীড়কগণ নিশ্চয়ই ভ্রান্ত মত পোষণ করিতেছিল। আমরা যখন পয়গম্বর ও মহা পুরুষদের সম্বন্ধে আলোচনা করিতে বসি, তখন এই ব্যাপারটা কি আমাদের সম্বন্ধেও খাটিয়া যায় না? আমরা ও আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ দ্বারা এই শ্রেণীর যে সকল লোক নির্য্যাতিত হইয়াছেন—এই দৃষ্টিশক্তি সম্পন্ন প্রাণীটার মত তাহারাই সত্য প্রাপ্ত; আর আত্মতৃপ্তির কোলাহলের মধ্যে অন্ধ ছুঁচাগুলির মত—ভ্রান্ত ছিলাম আমরাই, এমন হওয়া কি সম্ভবপর নহে? কারণ আমাদের জ্ঞানকে পূর্ণ জ্ঞানের তুলাদণ্ডে ওজন করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যাইবে যে, ঐ অন্ধ ছুচাঁর জ্ঞানের মত তাহা অসম্পূর্ণ ও অন্যসাপেক্ষ। বর্ত্তমানে আমরা উপলব্ধি করার যে উপাদানগুলি প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহাতে যে নূতন অভিব্যক্তির আর কোনও সম্ভাবনা নাই, একথা বিশ্বাস করার ত কোনই হেতু নাই। এমন কি বর্ত্তমান সময়েও যে এই বিশাল বিশ্বজগতের কোনও সুদূর প্রদেশে, আমাদের অপেক্ষা উচ্চস্তরে উপনীত এমন কোন প্রাণী থাকিতে পারে না—যাহারা আমাদের অধিকৃত জ্ঞানেন্দ্রিয় অপেক্ষা আমাদের কল্পনাতীত কোন এক নূতন জ্ঞানেন্দ্রিয়ের অধিকারী হইয়াছে, এরূপ বিশ্বাস করারও ত কোন হেতু নাই। তাহারা হয়ত বস্তুতত্ত্ব সম্বন্ধে আমাদের অপেক্ষা সূক্ষ্মতর ও পূর্ণতর উপলব্ধি লাভে সমর্থ হইয়া থাকিবে। যতই বলি না কেন, এই সীমাবদ্ধ জ্ঞান একটা খাঁটি আপেক্ষিক ব্যাপার মাত্র এবং কর্ম্মজগতের অভাব পূরণে তাহার সার্থকতাটুকুর উপরই তাহার মর্য্যাদা সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিতেছে।

আমাদের বর্ত্তমান উপলব্ধি-যন্ত্রগুলির বিকাশ ঘটিয়াছে ক্রম অভিব্যক্তির মধ্য দিয়া,—এই পদ্ধতির নিয়ন্ত্রণ ঘটিতেছে কতকটা অন্যান্য সজীব সত্তার সহিত আমাদের জীবন সংঘর্ষের ফলে, আর কতকটা নিজেদের পরিবেষ্টনগুলিকে আপন দরকার অনুসারে পরিবর্ত্তিত করিয়া লওয়ার চেষ্টার কারণে। সুতরাং এই যন্ত্রগুলি আমাদের দৈহিক জীবন যাত্রার পক্ষে নিশ্চিতরূপে বিশেষ উপকারী হইলেও, অতীন্দ্রিয় সত্যগুলির আবিষ্কারের উপযোগী নহে। মানুষ বস্তুসমূহের অধিকতর ঘনিষ্ঠ মৌলিকতত্ত্ব ও প্রাথমিক তথ্য অবগত হইতে পারে, এই অঘটন সংঘটন পটীয়সী প্রকৃতি কি এরূপ কোনও আধ্যাত্মিক দৃষ্টিযন্ত্র আবিষ্কার করিতে সমর্থ হইয়াছে?

বর্ত্তমান যুগে অজড় শক্তি সংক্রান্ত গবেষণা যেরূপ অসাধারণভাবে উৎকর্ষ সাধন করিতেছে, দিন দিন যেরূপ মানব মনের নূতন নূতন শক্তির বিষয় আবিষ্কৃত হইতেছে, যখন mesmerism, সুষুপ্তিপ্রক্রিয়া hypnotism সম্মোহন প্রক্রিয়া ও Thought-transference চিন্তাচালন প্রক্রিয়া, অতীন্দ্রিয় জ্ঞান ও শক্তির অনুশীলন ক্ষেত্রে একটা সর্ব্ববিদিত ও সর্ব্বস্বীকৃত সাধারণ স্থান অধিকার করিয়াছে—এ যুগে আধ্যাত্মিক জ্ঞানার্জ্জনের জন্য মানুষের একটা বিশেষ 'বৃত্তি' থাকার কথা উনবিংশ শতাব্দীর dogmatic যুগের তুলনায় সহজ হইবে বলিয়া মনে হয়। ইতিহাসের প্রথম প্রকাশ দিন হইতেই মানুষ যে কোনরূপে হউক, এই বৃত্তির অস্তিত্বের কথা স্বীকার করিয়া আসিতেছে। ধর্ম্ম-ইতিহাসের সমস্ত শ্রেষ্ঠব্যক্তি নিজেদের এই বৃত্তির অধিকারের কথা প্রকাশ করিয়াছেন, সমস্ত পরমার্থবাদী ও সাধুসজ্জন ঐ বৃত্তি লাভ করার দাবী করিয়াছেন, এবং জগতের অধিকাংশ মহা কবি ও মহাভাবুকও ঐ বৃত্তির অস্তিত্ব ও উপলব্ধির কথা প্রচার করিয়াছেন। জগতের ধারাবাহিক ইতিহাসের মধ্য দিয়া এই সত্যটা চমৎকার ভাবে ফুটিয়া উঠিতেছে যে, এই বিশেষ বৃত্তির অধিকারের দাবী যাঁহারা করিয়াছেন—মানবের অন্তর্জগতে তাঁহারাই কেবল একটা গভীর ও স্থায়ী প্রেরণার সৃষ্টি করিয়া দিতে সমর্থ হইয়াছেন। সকল দেশের ও সকল যুগের ধার্ম্মিক পুরুষগণ যাহা বলিয়া গিয়াছেন, বহু বৎসরের সংশয়বাদের পর আজ মনোবিজ্ঞান তাঁহাদের সেই মতবাদের চারিপাশে আশ্রয় লইতে আরম্ভ করিয়াছে। বর্ত্তমান যুগের পরম শক্তিশালী ভাবুক পণ্ডিত বার্গসন ও উইলিয়ম জেম্‌স, নিজ নিজ চিন্তার দিক দিয়া অহি, ঐশিক প্রত্যাদেশ বা revelationএর সত্যতার সমর্থন করিয়াছেন। জেমসের Varieties of religious

experience এতৎসংক্রান্ত সমস্ত জ্ঞাতব্য বিষয়ের খনি বিশেষ; বার্গসনের Creative evolution বর্ত্তমান সাহিত্যের একটা শ্রেষ্ঠতম সম্পদ।

এই আধ্যাত্মিক বৃত্তির নে'মত যাঁহারা প্রাপ্ত হইয়াছেন, ধর্ম্ম সম্বন্ধে বড় বড় সত্যের উপলব্ধি ও আবিষ্কার করিতে কেবল তাঁহারাই সমর্থ হইয়াছেন—ইহা বেশ দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। হজরত এবরাহিম হইতে হজরত মোহাম্মাদ পর্য্যন্ত সামীয় শাখার সমস্ত মহামহিম পয়গাম্বর এই বৃত্তি লাভ করিয়াছেন বলিয়া দাবী করিয়া গিয়াছেন। গৌতম বুদ্ধ ইহার দাবী করিয়াছেন, আর মানুষের মন ও মানসিক বৃত্তির সূক্ষ্মদ্রষ্টা ও নিয়ামক সোক্রাটিসও এই বিশেষ বৃত্তি লাভের দাবী করিয়াছেন। এই সকল মহা-মানবের দাবী যে অলীক নহে, বরং তাঁহারা যে বস্তুতই এই বিশেষ বৃত্তির অধিকারী ছিলেন, মানুষ আজ তাহার উপলব্ধি করিতে আরম্ভ করিয়াছে।

সাধারণ লোকের ভিতরও এই বৃত্তির সমাবেশ আছে একথা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু সেই সঙ্গে সঙ্গে আমাদিগকে ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে, সাধারণ মানুষের মধ্যে তাহা অতিশয় অপরিস্ফুট আকারে অবস্থান করিয়া থাকে। আরস্ত বা নিউটনের মত বিচার শক্তি প্রত্যেক মানুষের নাই। কিন্তু ইহা সত্তেও প্রত্যেক মানুষ মনে করিতে পারে যে, বিচার শক্তি তাহারও আছে। আধ্যাত্মিক বৃত্তি সম্বন্ধে কিন্তু একথা খাটিতে পারে না। আমাদের বিকাশের বর্ত্তমান অবস্থায় অধিকাংশ মানুষের মধ্যে এই বৃত্তিটী নিতান্ত স্থূল ও অপরিস্ফুট ভাবে বিরাজ করিতেছে। এমন কি অনেকে হয়ত তাহাদের Conste-tution এ ইহার অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ পর্য্যন্ত করিতে পারে না। এইরূপ হওয়াই স্বাভাবিক। আমাদের বোধেন্দ্রিয় গুলির উৎপত্তির বহুকাল পরে এই বিশেষ বৃত্তিটীর উদ্ভব ঘটিয়াছে, এবং আমাদের দৈনন্দিন জীবনে ইহা বিশেষ একটা কাজে লাগে না বলিয়া ইহার ত্বরিত বিকাশে বাধা উপস্থিত হইতেছে। অতীতকালে ও বর্ত্তমান যুগে এমন কতকগুলি লোক ছিলেন ও আছেন, এই বৃত্তিটী যাঁহাদের ভিতরে বেশ একটু উন্নতভাবে অবস্থিত—অধিকন্তু অন্যান্য মানবীয় বৃত্তির ন্যায় ইহাও যে উৎকর্ষ সাধন-সাপেক্ষ, এ কথাগুলি নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে।

অহি বা ঐশিক প্রেরণা সত্যপ্রাপ্তির একটা সঙ্গত পন্থা এবং কেবল এইরূপ প্রেরণাপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণই মানব সমাজের পথপ্রদর্শনের শক্তি ও অধিকার অর্জ্জন করিয়াছেন—একথাগুলি স্বীকার করিয়া লওয়ার পর প্রশ্ন উঠিতেছে যে, বিভিন্ন জন-শিক্ষকের শিক্ষাগুলি অন্ততঃ বাহ্যিক ভাবে যখন অসমঞ্জস ও পরস্পর বিরোধীরূপে দেখা যাইতেছে, তখন মানুষ তাহার বিচার করিবে কি উপায়ে? ইহার উত্তরে বলা যাইতে পারে যে, ঠিক যেমন সমস্ত বৈজ্ঞানিক প্রকৃতিরহস্যের তথ্যগুলি সমান স্পষ্ট দৃষ্টিতে দেখিতে পান না—সেইরূপ সমস্ত ধর্ম্মদ্রষ্টা আধ্যাত্ম জগতের সমস্ত সত্য গুলিকে সমান স্পষ্টরূপে উপলব্ধি করিতে সমর্থ হন না। কেহ কেহ তাহার এমন একটা 'ঝলক' দেখিতে পান যাহাদ্বারা তিনি নিজ জীবনের গতিপথ নির্দ্ধারণ করিয়া লইতে সমর্থ হন বটে, কিন্তু অন্যের সাধনমার্গকে উদ্ভাসিত করিয়া তোলার জন্য তাহা যথেষ্ট নহে। পক্ষান্তরে কেহ কেহ এমন এক বিশ্বব্যাপী দীপ্তির সাক্ষাৎ লাভ করেন, যাহার প্রভায় তাঁহার নিজের জীবন'ত পুলকিত হয়-ই, অধিকন্তু তাঁহার পার্শ্ববর্ত্তী এমন কি দূর দূরান্তরস্থিত মানব সমাজের জীবন পথও তাহাদ্বারা দীপ্ত ও উদ্ভাসিত হইয়া উঠে।

এই অসম্পূর্ণ জগতে আমাদের প্রত্যেককে বুঝিয়া লইতে হইবে যে, এই সকল শিক্ষকের মধ্যকার কোন্ ব্যক্তির শিক্ষা আমার নিজের জীবনের জন্য সমধিক হিতকরী হইবে। এইরূপে শিক্ষক নির্ব্বাচনের পর ফলাফল চিন্তা নিরপেক্ষ হইয়া সম্পূর্ণ নির্ব্বিকল্প ভাবে সেই শিক্ষার অনুসরণ করিয়া চলিতে হইবে। বিভিন্ন শিক্ষকের বাণীর মর্য্যাদা নির্দ্ধারণের সময় নিজেদের সমস্ত বৃত্তির দাবীগুলির মধ্যদিয়া সমা-লোচনায় প্রবৃত্ত হইতে হইবে—অর্থাৎ যাঁহার শিক্ষা আমাদিগের আধ্যাত্মিক, নৈতিক, প্রাজ্ঞিক ও রসবৈদিক বৃত্তিসমূহ, পরস্পরের প্রতি উপযুক্ত ও সঙ্গত আনুগত্য সহকারে উৎকর্ষ লাভ করিতে সমর্থ হয়, তাঁহার শিক্ষাই আমাদের জীবনের আদর্শ হওয়া উচিত।

* * * *

কিন্তু এখানে প্রশ্ন উঠিবে যে, আমাদের দ্রষ্টার নিকট প্রকটিত যে জ্ঞান, তাহাই যে সত্য ও নির্ভুল, তাহার প্রমাণ কি?

আমাদের এই চিন্তাশীল আত্মার বাহিরে কোনও একটা সত্য-সত্তা যে বিদ্যমান আছে, দার্শনিক হিসাবে তাহা নিঃসন্দেহরূপে প্রমাণিত হয় নাই। দর্শন শ্রবণ বা স্পর্শেন্দ্রিয়ের কতকগুলি অনুভূতির মধ্যদিয়া চিন্তাশীল মানুষ মনে করে যে সে জেমস বা আবদুল্লা নামক একটী মানুষকে দর্শন করিতেছে। বিভিন্ন প্রকারের আর একটা অনুভূতি-ধারার সংস্পর্শে আসিয়া সে এই সিদ্ধান্ত করিয়া লয় যে, সে একখানা চলন্ত রেল ট্রেন লক্ষ্য করিতেছে; আত্মনিরপেক্ষভাবে মানস সীমার বাহিরে একটা বাহ্যসত্তার অস্তিত্ব মানুষ স্বীকার করে—এইসকল অনুভূতির প্রভাবলব্ধ অনুমানের মধ্যদিয়া। এমনও হইতে পারে যে, বাহিরের বস্তু হইতে এই শ্রেণীর যে সকল অনুভূতি সৃষ্টি হওয়ার কথা স্বীকার করা হইতেছে, প্রকৃতপক্ষে কোন বাহ্যসত্তার সহিত তাহার কোনই সম্বন্ধ নাই—বস্তুতঃ তাহা মানুষের মনের কতকগুলি রহস্যপূর্ণ ক্রিয়া মাত্র। কিন্তু দার্শনিক যদি আমাদের মানসসীমার বাহিরে কোন বাহ্যসত্তা অস্বীকার করেন, তাহা হইলে তাঁহাকে আমরা কতই না বিদ্রূপ করি। অধিকন্তু আমরা যেমন আমাদের অস্তিত্ব সম্বন্ধে বিশ্বাস করি, আমরা বাহিরের বাহ্য সত্তার অস্তিত্বও ঠিক সেইরূপ দৃঢ়তার সহিত বিশ্বাস করিয়া থাকি।

কিন্তু, কেন করি? কারণ, সমস্ত দ্বিধা সংশয় ও সন্দেহকে অতিক্রম করিয়া একটা শক্তিশালী স্বাভাবিক অনুপ্রেরণা আমাদিগকে বিশ্বাস করিতে বাধ্য করে যে, এই বিশ্বটা ন্যায় ও সততার উপর প্রতিষ্ঠিত, এবং আমরা আমাদের বোকামী খিয়ালের প্রতারণার পাত্র নহি—বরং আমাদিগের অপেক্ষা এক বৃহত্তর শক্তি আমাদের ভাগ্যনির্ণয় করিতেছে—আমাদের জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করিতেছে। আত্মা ও খোদা সংক্রান্ত আমাদিগের অভিমত গুলি শুনিয়া নাস্তিক যখন বিকার বকিতে থাকে, সংশয়বাদী যখন ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ আরম্ভ করিয়া দেয়, এবং জড়বাদী যখন হাস্যরোলে চারিদিক ধ্বনিত করিয়া তোলে, সে সময়ও তাহারা নিজেদের অন্তরের অন্তস্থলে স্বীকার করিতে থাকে যে—বিশ্বজগতের মধ্যে একটা সত্য আছে, আর কতকগুলি পরমাণুর রাসায়নিক সংযোগের অপেক্ষা একটা মহত্তর তাৎপর্য্য আত্মার আছে।

এই বিশ্বের সমস্ত দেনালেনা চলিয়া যাইতেছে—কেবল বিশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়া। জীবনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেনা লেনা সম্বন্ধে একথা যেমন সত্য, বিরাট বিশ্বজগতের বিশালতর দেনালেনা সম্বন্ধেও এসত্য তেমনই সমান ভাবে প্রযুজ্য। বিশ্বাসের বর্ণনাতীত নে'মতের এই অমূল্যদানের জন্যই এই বিশ্বজগৎটা মহাশূন্যে পরিণত হইয়া যায় নাই, অন্যথায় এই শৃঙ্খলার জগৎটা চিরকালই সৃষ্টির প্রাক্কালিন সেই কথিত অপঞ্চীকৃত মহা বিশৃঙ্খলার আকর হইয়াই থাকিত। অন্যান্য গ্রহনক্ষত্রগণও তাহাদের ন্যায় কক্ষে কক্ষে বিচরণ করিতে থাকিবে, এ বিশ্বাস না থাকিলে একটী নক্ষত্রও কি তাহার গতিপথে একটুকুও অগ্রসর হইতে পারিত? পাখাগুলি দেহের ভার বহন করিতে সমর্থ হইবে, এ বিশ্বাস না থাকিলে পাখী কি শূন্যে উঠিবার উদ্যম করিতে কোনও দিন সাহসী হইত? মা আদরে কোলে তুলিয়া লইবে—এ বিশ্বাস শিশুর মনে বদ্ধমূল না থাকিলে, শিশু কি মায়ের নিকট ছুটিয়া যাওয়ার চেষ্টা করিতে কোনও দিন উদ্যত হইত? সেনাপতিগণের সুপরিচালনার উপর বিশ্বাস না থাকিলে সৈনিক কি কোনদিন সমরক্ষেত্রের পানে এক পাও অগ্রসর হইতে সমর্থ হইত? চাকর বাকরেরা আমাদের পানীয় বা খাদ্যের সহিত বিষ মিশাইয়া দিবে না, এ বিশ্বাস না থাকিলে আমাদিগের জীবন ধারণ করা কি সম্ভবপর হইত?

আমাদের সমস্ত আচার ব্যবহার নির্ভর করিতেছে এই বিশ্বাসের উপর, আমাদের সমস্ত ব্যবসা বাণিজ্য নির্ভর করিতেছে এই বিশ্বাসের উপর, আমাদের সমগ্র সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবন নির্ভর করিতেছে—এই বিশ্বাসের উপর, আমাদের সমস্ত জ্ঞান বিজ্ঞান নির্ভর করিতেছে এই বিশ্বাসের উপর, ফলতঃ এই বিশ্বাসই আমাদের এবং এই বিরাট বিশ্ব-জীবনের ভিত্তিস্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

এই বিশ্বাসের সমর্থন করার অর্থ ইহা নহে যে, আমি কাহাকে দর্শন সম্বন্ধে তাহার অবলম্বিত বিচার পদ্ধতির পরিবর্ত্তন করিতে বলিতেছি। না, কখনই নহে। আমার একমাত্র নিবেদন এই যে, বিজ্ঞানের এবং জীবনের অন্যান্য উপলব্ধির বিচার করার সময় দর্শনের যে সকল মহান নীতিগুলির অনুসরণ করার আবশ্যক হইয়া থাকে, সঙ্গত ও ন্যায়নিষ্ঠভাবে এ বিচারেও তাহার অনুসরণ করা অবশ্য-কর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচিত হওয়া উচিত। মানুষের জীবন ভিত্তির মূলীভূত অন্য সমস্ত অনুপ্রাণনার অনুসরণ আমরা করিব, আর এই সুবিরাট সুগভীর আধ্যাত্ম্য অনুপ্রাণনাটাকে তাহার মধ্য হইতে অন্যায়রূপে বাদ দিয়া ফেলিব—আমার আপত্তি হইতেছে এই অসঙ্গত বিচার পদ্ধতির বিরুদ্ধে।

# বাঙ্গলা সন

[ মোবারক আলী খাঁ ]

জগতে অসংখ্য ঘটনাস্রোত অবিরাম গতিতে চলিয়া যাইতেছে, মুহূর্ত্তকালের জন্যও তাহার বিরাম নাই। এই অনন্ত ঘটনাস্রোতের মধ্যে কোন একটী বিশিষ্ট ঘটনা লইয়া সাল বা অব্দ গণনা করা হয়। যীশুখৃষ্টের জন্ম হইতে খৃষ্টীয় সাল এবং হজরত মোহাম্মাদের (দঃ) মদিনা গমন হইতে হিজরী সন প্রচলিত হইয়া আসিতেছে। ভারতের ইতিহাসের প্রতি দৃষ্টিপাৎ করিলে দেখা যায় যে, অপ্রচলিত বা অতি অল্প স্থানে প্রচলিত বিক্রমসাল লইয়া কতই না বাকবিতণ্ডা চলিতেছে। কিন্তু বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয় যে, বঙ্গদেশের সর্ব্বত্র প্রচলিত বঙ্গাব্দের নাম নিশানা পর্য্যন্ত উহাতে দেখিতে পাওয়া যায় না। এই দৈনিক ব্যবহার্য্য সালের উৎপত্তি জানিবার জন্য কাহারও বিশেষ আগ্রহও দেখি না।

বাঙ্গলা এখন ১৩৩৪ সাল। অনুমান হয় ১৩৩৪ বৎসর পূর্ব্বে কোন এক মহাত্মার জীবিতকালে কোন একটা বিশিষ্ট ঘটনা ঘটিয়াছিল। বর্ত্তমান ইংরাজী সন ১৯২৭ হইতে ১৩৩৪ বিয়োগ করিলে আমরা ৫৯৩ খৃষ্টাব্দ পাই। এখন দেখিতে হইবে, এই সময়ে জগতে কোন মহাত্মা জীবিত ছিলেন কিনা? আমরা ইতিহাস পাঠে জানিতে পারি যে ৫৭০ খৃষ্টাব্দ হইতে ৬৩২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত হজরত মোহাম্মাদ জীবিত ছিলেন, এবং ৫৯৩ খৃষ্টাব্দে তাঁহার বয়স মাত্র ২৩ বৎসর। এই ২৩ বৎসরের সময় তাঁহার জীবনের বিশেষ কিছু প্রসিদ্ধ ঘটনা ঘটে নাই। তবে ৪০ বৎসর বয়সের সময় যখন তাঁহার উপর রেছালত বা প্রেরিতত্বের ভার অর্পিত হয়, সেই সময় হইতে তাঁহার জীবনের শেষ পর্য্যন্ত যত কিছু বিশিষ্ট ঘটনা সংঘটিত হইয়া গিয়াছে। তাঁহার জীবনের কোন ঘটনা হইতে বঙ্গাব্দ গণনা করা হইয়া থাকিলে, তাঁহার জন্মকাল হইতে হইতে পারে, তাঁহার উপর যে সময় হইতে ঐশ্বরিক বাণী অবতীর্ণ হইতে আরম্ভ হয় সে সময় হইতেও হইতে পারে, অথবা হিজরী সনের ন্যায় তিনি যে সময়ে মদিনায় প্রস্থান করেন, সে সময় হইতেও হইতে পারে। কিন্তু হিসাব করিলে ইহার কোনটার সহিত মিল হয় না। অতএব তাহার কোনটাই গ্রহণ করিতে পারি না। ৫৯৩ খৃষ্টাব্দে বঙ্গে, এমন কি ভারতে এমন কোন প্রসিদ্ধ ঘটনার উল্লেখ পাওয়া যায় না যাহা হইতে এই সাল গণনা করা হইয়া আসিতে পারে। তবে কি বাঙ্গলা সন কোন প্রসিদ্ধ ঘটনার সহিত সংশ্লিষ্ট না হইয়া আপনা আপনিই গজাইয়া উঠিয়াছে?

বাবু আনন্দ নাথ রায় তাঁহার প্রণীত "বার ভূঞার" ২০২ পৃষ্ঠায় বাঙ্গলা সন সম্বন্ধে কিছু লিখিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন,—"আকবর বাদশাহের রাজত্বকালে হিন্দুসম্প্রদায় বাদশাহের নিকট জ্ঞাপন করেন:—"আমাদের ধর্ম্ম-কর্ম্ম সম্বন্ধীয় অনুষ্ঠানে হিজরী সন ব্যবহার করিতে ইচ্ছা করি না, আপনি আমাদের জন্য একটী পৃথক সন নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিন। মহাযশা আকবর ধর্ম্মমত সম্বন্ধে উদার ছিলেন, তিনি হিন্দু প্রজার মনোরঞ্জনার্থে হিজরী সন হইতে "দশ, এগার" বৎসর ন্যূন করিয়া এলাহী নামে একটি সনের প্রচলন করিলেন, যাহা আমাদের বঙ্গদেশের সন বলিয়া চলিয়া আসিতেছে। বর্ত্তমান সময়ে হিজরী ১৩২৯।৩০ চলিয়া আসিতেছে। এখন বাঙ্গলা ১৩১৮, ষোড়শ শতাব্দীর এই সন পরিবর্ত্তন ইতিহাসে উল্লেখ যোগ্য।"

আকবর বাদশাহের সময় হইতে যে বঙ্গাব্দ বা এলাহী সন প্রচলিত হইয়াছে, তাহা আনন্দ বাবু ঠিক ধরিয়াছেন, কিন্তু কেমন করিয়া হইল, তাহা বুঝিতে না পারিয়া মহা ভ্রান্তিতে পড়িয়াছেন বলিয়া আমার মনে হইল। তিনি বলিতেছেন—"হিজরী সন হইতে ১০।১১ বৎসর ন্যূন করিয়া এলাহী সনের প্রচলন করেন", কিন্তু সেই সময়কার (১৩১৮ বঙ্গাব্দের) যে হিসাব তিনি দিয়াছেন, তাহাতেই দেখা যাইতেছে যে পার্থক্য ১০।১১ না হইয়া ১১।১২ বৎসর হইতেছে। কারন ১৩২৯।৩০ হইতে ১৩১৮ বিয়োগ করিলে

১১।১২ বৎসর হইবে। সুতরাং আনন্দ বাবু যাহা দেখা-ইতে গিয়াছেন সেইখানেই তাহার ব্যতিক্রম হইয়াছে। আনন্দ বাবু বুঝিয়াছেন যে উক্ত দুই সনের মধ্যে প্রথমে যে পার্থক্য থাকিবে, চিরকালই তাহা রহিয়া যাইবে। কিন্তু তাহা হইতে পারে না। কারণ হিজরী সন চান্দ্রবৎসর এবং বাঙ্গলা সন সৌর গণনা হিসাবে হয়। চান্দ্র বৎসর ৩৫৫ দিনে এবং সৌর বৎসর ৩৬৫ দিনে। সুতরাং এই দুই সনের মধ্যে প্রত্যেক বৎসর ১০ দিন করিয়া পার্থক্য থাকিয়া যায়। অতএব যত বেশী বৎসর হইবে, এই দুই সনের মধ্যে পার্থক্য তত বেশী হইবে।

বর্ত্তমান সনের মোহাম্মদী পঞ্জিকার ভূমিকায় লেখা আছে যে, হিন্দুদিগের পূজা পার্ব্বণে হিজরী সন ব্যবহার করার অসুবিধা হওয়ায় তাঁহারা আকবর বাদশাহের নিকট নূতন সন প্রার্থনা করেন। তদনুসারে বাদশাহ হজরত মোহাম্মদের মৃত্যু সময় হইতে গণনা করিয়া আসিয়া বাঙ্গলা সন প্রচলিত করেন।

কিন্তু ইহাও যে নিতান্ত ভ্রান্তমতের উপর স্থাপিত, তাহা সহজেই দেখাইয়া দেওয়া যায়। হজরত ৬৩২ খৃষ্টাব্দে ইহলোক পরিত্যাগ করেন। এখন আমরা যদি বর্ত্তমান ইংরাজী সন ১৯২৭ হইতে ৬৩২ বিয়োগ করি, তাহা হইলে ১২৯৫ বৎসর পাই; সুতরাং এই হিসাব মত বাঙ্গলা সন ১২৯৫ হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু বাস্তবিক বর্ত্তমান বাঙ্গলা সন হইতেছে ১৩৩৪। সুতরাং উক্ত পঞ্জিকা লেখকও যে মহাভ্রমে পড়িয়াছেন তাহা বেশ বুঝা যাইতেছে।

পরলোকগত খান সাহেব কাজী ইমদাদুল হক মরহুম তাঁহার প্রণীত ঐতিহাসিক পাঠ ২য় ভাগের ১৭৩ পৃষ্ঠার ফুটনোটে লিখিয়াছেন—"সম্রাট আকবরের রাজত্বের পূর্ব্বে হিজরী সনেরই প্রচলন ছিল। কিন্তু আকবর হিজরী বৎসরকে সৌর বৎসরে পরিণত করিয়া নূতন গণনা আরম্ভ করেন। আকবরের এই সৌর বৎসরে পরিণত হিজরী সালই আমা-দের বাঙ্গলা সাল"।

খান সাহেব বলিতেছেন—হিজরী বৎসরকে সৌর বৎসরে পরিণত করা হইল—কিন্তু কি ভাবে পরিণত করা হইল, তাহা পরিষ্কার ভাবে কিছুই বলেন নাই। এখন দেখা যাউক, যদি আমরা তাঁহার উক্তি অনুসারে হিজরী সনের উৎপত্তি কাল হইতে সৌর বৎসর গণনা করিয়া আসি, তাহা হইলে এই বর্ত্তমান ১৯২৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত কত বৎসর হয়। ১৯২৭ হইতে ৬২২ বিয়োগ করিলে আমরা ১৩০৫ পাই। সুতরাং এই হিসাব মত বাঙ্গলা সন আজ ১৩৩৪এর স্থানে ১৩০৫ হওয়া উচিত ছিল। সুতরাং খান সাহেবের কথা মিলে কই?

এইখানে একটু অনুসন্ধান করিলে প্রকৃত তথ্য বোধ হয় পাওয়া যাইতে পারে।

আকবর বাদশাহ হিন্দু প্রজামণ্ডলীকে সন্তুষ্ট করিবার জন্যই যে হিজরী সনকে সৌর বৎসরে পরিণত করিয়া এলাহী সন প্রচলিত করেন, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। তবে তিনি হিজরী সনের উৎপত্তিকাল ( ৬২২ খৃঃ অঃ ) হইতে গণনা করিয়া আসেন নাই। তিনি হিজরীর যে সনে সিংহাসনারোহণ করেন, সেই সন হইতে সৌর বৎসরের হিসাব করিয়া এলাহী সনের প্রচলন করেন। তাঁহার সিংহাসন আরোহণের সন ৯৬৩ হিজরী; সুতরাং তাহার পর ৩৬৫ দিন হইলেই ৯৬৪ এলাহী সন বা বঙ্গাব্দ হইল। অতএব আকবর বাদশাহের সিংহাসন আরোহণ কাল পর্য্যন্ত বাঙ্গলা সনেরই প্রথমাংশ হিজরী সন এবং সিংহাসনারোহণের পর হইতে উহা হিজরী সনের শাখা স্বরূপ পৃথক হইয়া আসিয়াছে।

উপরে যে কথা বলা হইল, এখন তাহার সত্যাসত্য হিসাব করিয়া দেখিতে হইবে। আকবর বাদশাহ খৃষ্টীয় ১৫৫৬ অব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন; সুতরাং সে আজ ( ১৯২৭—১৫৫৬=৩৭১ ) ৩৭১ বৎসরের কথা। এখন দেখিতে হইবে যে, এই ৩৭১ সৌর বৎসরের সহিত আকবর বাদশাহের সিংহাসনারোহণ কালে হিজরী সনের ৯৬৩ যোগ করিলে যোগফল বর্ত্তমান বাঙ্গালা সনের সহিত মিলে কিনা। ৩৭১+৯৬৩=১৩৩৪ হয়। আবার বর্ত্তমান বাঙ্গালা সনও ১৩৩৪ ঠিক মিলিয়া গিয়াছে।

এই বিষয়টি আরও পরিষ্কার ভাবে বুঝাইবার জন্য নিম্নে সন প্রকাশক কয়েকটি রেখা টানা হইল।

O ৬২২ ১৫৫৬ ১৯২৭
খৃষ্টীয় সন
হিজরী সন
৯৬৩ বাঙ্গালা সন
১৩৩৪
হিজরী সন
১৩৪৬

প্রথম রেখাটাকে খৃষ্টীয় সন বলিয়া ধরা হইয়াছে এবং যেখানে শূন্য (০) লেখা আছে ঐ খানেই মনে করুন যিশু খৃষ্টের জন্ম হইয়াছে। তাহার পর ৬২২ সন হইতে হিজরী সন আরম্ভ হইয়াছে। এই হিজরী সনের ৯৬৩ হইতে বঙ্গাব্দ বাহির হইয়া খৃষ্টীয় সনের সহিত সমান্তরালভাবে চলিয়া গিয়াছে। সমান্তরালভাবে চলিয়া যাওয়ার অর্থ এই যে উভয়ই সৌর বৎসর, সুতরাং এই দুই সনের পার্থক্য সকল সময়ই সমান থাকিবে। যথা:—আকবর বাদশাহের সিংহাসনারোহণ কালে খৃষ্টীয় সন ১৫৫৬ হইতে ৯৬৩ বিয়োগ করিলে, বিয়োগফল ৫৯৩ হইবে; আবার বর্ত্তমান ১৯২৭ খৃষ্টাব্দ হইতে বর্ত্তমান বাঙ্গালা সন ১৩৩৪ বিয়োগ করিলেও সেই ৫৯৩ হইবে। কিন্তু আকবরের সিংহাসন আরোহণ কালে হিজরী সন ৯৬৩ ছিল, এবং বাঙ্গালা সনও ৯৬৩ ধরিয়া লওয়া হইয়াছে। তাহার পর হইতে এই দুই সনের মধ্যে প্রতি বৎসর ১০ দিন করিয়া তফাৎ হইতে হইতে বর্ত্তমানে ১১ বৎসরের তফাৎ হইয়া পড়িয়াছে। এখন হিজরী সন ১৩৪৫, বাঙ্গালা সন ১৩৩৪, উভয়ের তারতম্য ১১ বৎসর। আগামী আষাঢ় মাসে যখন হিজরীর নূতন বৎসর পড়িয়া হিজরী সাল ১৩৪৬ সনে পরিণত হইবে, তখন এই দুই অব্দের পার্থক্য ১২ বৎসরে দাঁড়াইবে।

আকবর বাদশাহ তাঁহার নব প্রচলিত সনকে এলাহী সন নামে অভিহিত করিয়াছিলেন। বর্ত্তমান সময়ে খৃষ্টীয় সন যেমন ভারতের রাজকার্য্যে সর্ব্বত্র ব্যবহৃত হয়, তাঁহার সময়েও সেইরূপ এই এলাহী সন তাঁহার শাসিত ভারতবর্ষের সর্ব্বস্থানে ব্যবহৃত হইত। বাঙ্গলা দেশে ইহা সাগ্রহে গৃহীত হয়। মোগল শাসনের অন্তর্ধানের পরও বঙ্গের সর্ব্বত্র এই সনের অবাধ প্রচলন থাকায় এখন ইহাকে বাঙ্গালা সন বা বঙ্গাব্দ বলা হয়। সুতরাং আমরা দেখিলাম যে, বাঙ্গালা সন ও এলাহী সনের মধ্যে বিন্দুমাত্রও পার্থক্য নাই।

---

# প্রকৃত বীরত্ব

[ আবদুল কাদের ]

ভারতের বক্ষ হইতে পাঠান সাম্রাজ্যের অস্তিত্ব চিরতরে মুছিয়া গিয়াছে। মোগল-কেশরী হুমায়ুন-পুত্র আকবর দিল্লীর সিংহাসনে আরোহন করিয়াছেন। তাঁহার প্রবল পরাক্রমে গুজরাট, বিহার, উড়িষ্যা, কাবুল, কাশ্মীর, সিন্ধু, কান্দাহার, খান্দেশ, বেরার প্রভৃতি প্রাচীন পাঠান-খণ্ড রাজ্যগুলি মোগল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভূক্ত হইয়া গিয়াছে।

কিন্তু বঙ্গভূমি তখনও স্বাধীন। সু-প্রসিদ্ধ "বার-ভূঞার" অধীনে বঙ্গদেশ প্রায় অজেয় হইয়া উঠিয়াছিল। তাই বাঙ্গালার প্রতিও সম্রাটের শ্যেন-দৃষ্টি নিপতিত হইল। মোগল-সৈন্য পঙ্গপালের ন্যায় বাঙ্গলা আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল! মোগলের প্রবল বাহিনীর নিকট বাঙ্গলার অধিকাংশ ভৌমিকই মস্তক অবনত করিতে বাধ্য হইলেন। কিন্তু খিজিরপুরের ঈসা খাঁর প্রকৃতি ভিন্ন উপাদানে গঠিত। তিনি কিছুতেই মোগলের অধীনতা স্বীকার করিতে সম্মত হইলেন না। বাঙ্গালার বিভিন্ন অংশ হইতে দলে দলে পাঠান-সৈন্য আসিয়া তাঁহার পতাকা-তলে সমবেত হইতে লাগিল। ঈসা খাঁর পরাক্রমে মোগল-সৈন্য ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিল। সম্রাট ক্রুদ্ধ হইয়া অবশেষে প্রখ্যাতনামা সেনাপতি শাহবাজ খাঁকে প্রেরণ করিলেন অচিরে উভয় পক্ষে রণ-পরীক্ষা আরম্ভ হইল। বিজয়-লক্ষ্মী কখনও পাঠানের, কখনও মোগলের অঙ্কশায়িনী হইতে লাগিলেন। কিন্তু অবশেষে ঈসা খাঁকেই পরাজয় স্বীকার করিতে হইল।

পরাক্রান্ত মোগল বাহিনীর বিরুদ্ধে বাঙ্গালার সামান্য একজন ভৌমিক কতকাল আত্মরক্ষা করিবেন ? ঈসা খাঁ পরাভূত হইলেন কিন্তু স্বাধীনতা বিসর্জ্জন দিয়া মোগলের অধীনতা স্বীকার করিতে পারিলেন না। পরাধীন হওয়া অপেক্ষা রাজ্যহীন হওয়াই তিনি শ্রেয় মনে করিলেন। কিন্তু তাই বলিয়া বীর-হৃদয় ঈসা খাঁ নিরাশ হইলেন না। তিনি সসৈন্যে নৌকাযোগে দক্ষিণাভিমুখে প্রস্থান করিলেন এবং বিজয় লাভের উপায় উদ্ভাবনে নিরত হইলেন।

শাহ বাজ খাঁও নিরস্ত হইলেন না। অসংখ্য নৌকা সংগ্রহ করিয়া জলপথে ঈসা খাঁর পশ্চাদ্ধাবন করিয়া মেঘনা নদীর সুবিস্তৃত মোহনায় উপস্থিত হইলেন। মেঘনার মোহনায় অসংখ্য দ্বীপ ছিল। মোগল সেনাপতি আপন নামে একটী বৃহৎ দ্বীপের নাম "শাহ্‌বাজপুর" রাখিয়া তথায় শিবির সন্নিবেশ করিলেন।

গভীর অন্ধকার রজনী। মোগল সৈন্য নিদ্রাদেবীর শান্তিময় ক্রোড়ে অচেতন। সহসা অদূরে বন্দুকের শব্দ হইল। তন্দ্রালস-প্রহরী সচেতন হইয়া উঠিয়া বসিল। ক্রমে শব্দ অতি নিকটে শ্রুত হইল। প্রহরী বিপদ সূচক ঘণ্টাধ্বনি করিল। কিন্তু সে শব্দ সমুদয় সৈন্যের কাণে পহুছিল না। যাহারা শুনিল তাহারা জাগিয়া উঠিল, কিন্তু যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইবার অবসর পাইল না। ঈসা খাঁর বজ্রনাদী কামান তাহাদিগকে প্রস্তুত হইতে দিল না। মোগল বাহিনীর অধিকাংশই যুদ্ধক্ষেত্রে শায়িত হইল, মোগল সেনাপতি কয়েকজন মাত্র অনুচরসহ কোনরূপে জীবন রক্ষা করিয়া দিল্লী অভিমুখে পলায়ন করিলেন। শাহ্‌বাজ খাঁ চিরতরে বাঙ্গালা ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। শুধু শাহ বাজপুর দ্বীপ বাঙ্গালার বুকে তদীয় স্মৃতি জাগাইয়া রাখিল। বিখ্যাত সেনাপতির এবংবিধ শোচনীয় পরাজয়ে সম্রাট আকবর বাঙ্গালীর বাহুবল অনুভব করিতে সমর্থ হইলেন।

ঈসা খাঁ এক্ষণে ফিরিয়া আসিয়া স্বীয় আবাসস্থান সুদৃঢ় করিতে মনোনিবেশ করিলেন। এবং যথাসাধ্য শক্তিবৃদ্ধি করিতে মনোযোগী হইলেন, সুবর্ণ গ্রাম ও এগার সিন্দুরের দুর্গদ্বয় সুসংস্কৃত হইল। হাজিগঞ্জ, ত্রিবেনী ও সেরপুর প্রভৃতি স্থানে কয়েকটী সুদৃঢ় দুর্গ নির্ম্মাণ করিলেন। এইরূপে স্বরাজ্যের দৃঢ়তা সাধন করিয়া তিনি রাজ্য বিস্তারে প্রবৃত্ত হইলেন। নিকটবর্ত্তী কোচ-রাজ্য ও কামরূপের রাজধানী রাঙ্গামটী তাঁহার রাজ্যভুক্ত হইল। এইরূপে ক্রমশঃ ময়মনসিংহ, ঢাকা রঙ্গপুর ও কামরূপ প্রভৃতি জেলায় ঈসা খার একাধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হইল। এইবার রাজ্যের সর্ব্ববিধ উন্নতি সাধনে তিনি মনোযোগ প্রদান করিলেন। ফলে চতুর্দ্দিকে যুগপৎভাবে তাঁহার বীরত্ব ও সুশাসনের সাড়া পড়িয়া গেল, দেশ ধন্যধান্যে পূর্ণ হইল। *

ঈসা খাঁর ক্ষমতা-বৃদ্ধির কথা সম্রাট আকবরের কর্ণগোচর হইল। তিনি এই পাঠান বীরের গর্ব্ব খর্ব্ব করিবার জন্য তদীয় প্রধান সেনাপতি মহারাজ মানসিংহকে শাহ্‌বাজ খাঁর পরাজয়ের দশ বৎসর পরে ( ১৫৯৫ খৃষ্টাব্দে ) বঙ্গদেশে পাঠাইয়া দিলেন, মানসিংহ খিজিরপুরের উপর আপতিত হইলেন। ঈসা খাঁ প্রবল বীরত্ব সহকারে তাঁহার আক্রমণ ব্যর্থ করিবার চেষ্টা করিলেন কিন্তু মোগল-সৈন্যের সংখ্যাধিক্য বশতঃ অবশেষে তাঁহাকে খিজিরপুরের দুর্গ পরিত্যাগ করিয়া সপরিবারে এগার-সিন্দুরের দুর্ভেদ্য দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইল। মানসিংহও তাঁহার পশ্চাদ্ধাবন করিলেন। এগার-সিন্দুরের দুর্গের সম্মুখবর্ত্তী বিশাল প্রান্তরে শিবির সন্নিবেশ করতঃ উভয় পক্ষ শক্তি পরীক্ষায় প্রবৃত্ত হইলেন। দুই দিবস যুদ্ধ হইল। প্রথম দিনের যুদ্ধে মানসিংহের জামাতা নিহত হইলেন। উভয় পক্ষের বহু সৈন্য মৃত্যু বরণ করিল। যুদ্ধে এইরূপ সৈন্যক্ষয় দেখিয়া ঈসা খাঁর কোমল প্রাণ ব্যথিত হইল। তিনি এই বৃথা নরহত্যা নিবারণ মানসে দ্বৈরথ যুদ্ধের প্রস্তাব করিয়া মানসিংহের নিকট দূত প্রেরণ করিলেন। অবশেষে উভয়ের স্বীকৃতি মতে এইরূপ নির্দ্ধারিত হইল যে দ্বৈরথ যুদ্ধে যাহার পরাজয় ঘটিবে তাহাকে অন্যপক্ষের অধীনতা স্বীকার করিতে হইবে।

ক্ষীণকায়া ব্রহ্মপুত্র নদ এগার সিন্দুরের পাদদেশ বিধৌত করিয়া নির্ম্মল সলিলা জাহ্নবীর সংমিশ্রণে কল কল নাদে প্রবাহিত হইতেছে। তীরে অসংখ্য সুসজ্জিত শিবির মোগল সম্রাট আকবরের মহিমা

* "Isha had the reputation of a good ruler ... Famine was unknown during his rule ; rice used to sell at 4 mds per rupee. The taxes imposed by him were so very light that popular songs used to mention it with applause."
Vide, Harendra Kumar Sarkar M, A ; s' "Heroes of Bengal." P. 86.

প্রকাশ করিতেছে। শিবির সম্মুখে সুশৃঙ্খল মোগলবাহিনী বিরাজিত। অদূরে প্রান্তরের বিপরীত দিকে বাঙ্গলার শ্রেষ্ঠ ভৌমিক ঈসা খাঁর পাঠান সৈন্যদল সম্মুখে রাখিয়া এগার সিন্দুরের দুর্ভেদ্য দুর্গ মস্তক উত্তোলন করিয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছে। অনেকক্ষণ হইল, নিশাবসান হইয়াছে, তরুণ রবির হৈম ছবি পুব আকাশে দেখা দিয়াছে, কিন্তু এখনও যুদ্ধের বাদ্য-ধ্বনি শুনা যাইতেছে না। সৈনিক মণ্ডলীর রক্ত-পিপাসু বিভীষণ মূর্ত্তি আজ শান্তভাব ধারণ করিয়াছে। তাহারা সকলেই যেন কাহারও আগমনের প্রতীক্ষা করিতেছে। কোন অনিশ্চিত আশঙ্কায় তাহাদের হৃদয় দুরু দুরু করিয়া কাঁপিতেছে। সমগ্র রণক্ষেত্রে উদ্বেগ বিজড়িত গভীর নিস্তব্ধতা বিরাজ করিতেছে।

আজ দিল্লীশ্বরের প্রধান সেনাপতি মানসিংহ ও বঙ্গ-বিখ্যাত বীর কেশরী ঈসা খাঁর দ্বন্দ্ব-যুদ্ধে মোগল পাঠানের ভাগ্য-গতি নির্ণিত হইবে।

কিছুক্ষণ পরে পূর্ণ রণ-সাজে সজ্জিত হইয়া দুইটী বীর-পুরুষ অশ্বারোহণে যুদ্ধক্ষেত্রে উপনীত হইলেন। বলা বাহুল্য ইঁহাদের একজন ঈসা খাঁ এবং অপরজন মানসিংহ।

বীরদ্বয় পরস্পরকে সাদর সম্ভাষণ করিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। প্রথমআক্রমণ মোস্‌লেম-রীতি বহির্ভূত। উপক্রুত না হইয়া আক্রমণ করা ইস্‌লাম-ধর্ম্ম অনুমোদন করে না। তাই মানসিংহই প্রথমে ঈসা খাঁকে তরবারির দ্বারা আঘাত করিলেন; ঈসা খাঁ সুদৃঢ় ঢালে তাহা উড়াইয়া দিয়া মানসিংহের প্রতি প্রতি আক্রমণ করিলেন। মানসিংহও তাহার প্রতিদান দিতে ক্রটী করিলেন না। আঘাতে আঘাত উড়িয়া গেল। উভয়েই তুল্য বীর—উভয়েই তরবারি চালনায় সমান পারদর্শী। যুদ্ধ সমভাবে চলিতে লাগিল। বিজয়-লক্ষ্মী কাহার গলদেশে বর-মাল্য অর্পণ করিবেন, বহুক্ষণ পর্য্যন্ত কেহই তাহা বুঝিতে সমর্থ হইলেন না। ক্রমে সূর্য্য প্রাচ্য গগণ অতিক্রম করিয়া মধ্য গগণে উপনীত হইলেন। এমন সময় সহসা ঈসা খাঁর এক আঘাতে মানসিংহের তরবারি ভগ্ন হইয়া গেল। মানসিংহ নিরস্ত্র হইয়া ঈসা খাঁর অস্ত্রাঘাতে মৃত্যু সুনিশ্চিত ভাবিয়া জীবনাশায় জলাঞ্জলি দিলেন। মানসিংহের এই দুরবস্থা দেখিয়া মোগল সৈন্যদলে হাহাকার পড়িয়া গেল। সেনাপতির জীবনাশঙ্কায় ইহারা প্রমাদ গনিল। পক্ষান্তরে পাঠান শিবিরে বিজয়-ভেরী বাজিয়া উঠিল।

মানসিংহের নিরস্ত্র অবস্থা দেখিয়া ঈসা খাঁ উলঙ্গ কৃপাণ হস্তে তাঁহার দিকে অগ্রসর হইলেন। সকলেই ভাবিল—এই বুঝি, মানসিংহের জীবন-লীলার পরিসমাপ্তি হইল,—এই বুঝি, ঈসা খাঁর শানিত কৃপাণ মোগল সৈন্যাধ্যক্ষের হৃদয়-শোণিতে রঞ্জিত হইল, এইবার ঈসা খাঁ মানসিংহের সম্মুখবর্ত্তী হইয়া কহিলেন, "মহারাজ আপনি নিরস্ত্র! আপনাকে নিহত করিয়া বিজয় লাভ করা এক্ষণে আমার পক্ষে সহজ সাধ্য। কিন্তু কাপুরুষের ন্যায় নিরস্ত্র শত্রুকে বধ করা বীরের কাজ নহে। আপনি আমার এই তরবারী গ্রহণ করিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হউন। পাঠান তরবারী চায় না। পাঠান-বীর বিনা অস্ত্রেও যুদ্ধ করিতে জানে।" এই বলিয়া ঈসা খাঁ মানসিংহকে স্বীয় তরবারী প্রদান করিলেন। মানসিংহ মন্ত্র-মুগ্ধের ন্যায় বিস্ময় বিমুগ্ধ হইয়া রহিলেন। ঈসা খাঁর অপূর্ব্ব বীরত্ব ও অলৌকিক উদারতা দর্শনে তাঁহার হৃদয় অসীম বিস্ময়ে পরিপূর্ণ হইয়া গেল। তিনি কৃতজ্ঞতাপূর্ণ হৃদয়ে অশ্ব হইতে অবতরণ করতঃ ঈসা খাঁকে বক্ষে ধারণ করিয়া বলিলেন—"পাঠানরাজ! তুমিই প্রকৃত বীর।" পশুর ন্যায় যুদ্ধে শত্রু বধ করিতে অনেকেই জানে, কিন্তু জীবনের মায়া বিসর্জ্জন দিয়া পরাজিত শত্রুর হস্তে স্বীয় তরবারী অর্পণ করিতে এ জগতে কয়জন লোক পারে? এরূপ অলৌকিক মহত্ত্ব কয়জন লোক প্রদর্শন করিতে সক্ষম হয়? আজ হইতে আমি তোমাকে আমার ঘনিষ্ট বন্ধু বলিয়া গ্রহণ করিলাম। বন্ধুর সহিত যুদ্ধ নিষ্প্রয়োজন। আমি বিনা যুদ্ধেই তোমার নিকট পরাজয় স্বীকার করিলাম।" * ঈশা খাঁর এই অপূর্ব্ব উদারতায় মোগল পাঠান উভয় সৈন্যদলই বিস্ময় সাগরে নিমগ্ন হইল। অসংখ্য কণ্ঠের "জয় ঈসা খাঁ" রবে এগার সিন্দুরের গগন পবন মুখরিত হইয়া উঠিল।

* "Both the parties eagerly waited the result of the duel......None of the combatants gained a distinct advantage over the other for a long time. At length Man Singha's sword gave way and flew to pices. The noble Isha khan at once desisted from the duel, and left the lists after handing over his weapon to Man Singha. Isha was too chivalrous to take mean advantage of his opponent's sad plight. This generosity made Man Singha his fast friend" "Heroes of Bengal"—P. 85.

## জীবাণু-পরীক্ষায় তন্ময়

লুইস পাস্তুর

জগতের যে সকল মহাপুরুষ নিজেদের গভীর জ্ঞান-সাধনার দ্বারা বিশ্বসংসারের অশেষ হিত সাধন করিয়াছেন, ফরাসী পণ্ডিত লুইস পাস্তুর তাঁহাদের মধ্যকার একজন মহা পণ্ডিত। Mircrobe বা জীবাণু তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়া পাস্তুর জীব ও জড়দেহের সমস্ত রোগ ও সকল প্রকার বিকৃতির মূল কারণগুলি চিকিৎসা জগতের গোচরীভূত করিয়া দেন, ইহাতে সকল প্রকার ব্যাধির বিশেষতঃ সংক্রামক রোগগুলির প্রতিকার করা ক্রমশই সহজ সাধ্য হইয়া দাঁড়াইতেছে। ক্ষিপ্ত শৃগাল কুক্কুরাদির দংশনে জীবদেহে যে সব মারাত্মক রোগের সৃষ্টি হইয়া থাকে, পাস্তুরের পূর্ব্বে তাহার কোন চিকিৎসা ছিল না বলিলেই হয়। পাস্তুর বহু গবেষণার ফলে এই সকল

রোগের মূল জীবাণুগুলি আবিষ্কার করিয়া ফেলেন। কি উপায়ে রাসায়নিক প্রক্রিয়ার দ্বারা জীব দেহস্থ সেই জীবাণুগুলির ধ্বংস সাধন করা যাইতে পারে, তিনি তাহারও আবিষ্কার করেন। একমাত্র এই পাস্তরের গবেষণার কল্যাণে এখন এই সকল রোগের সফল চিকিৎসা সম্ভবপর হইয়াছে।

পাস্তর দিন রাত্রির মধ্যে অধিকাংশ সময়ই নিজের এই সাধনার জন্য অশেষ তন্ময়তার সহিত পরিশ্রম করিতেন। তাঁহার জীবনের আদর্শ ছিল :—

**"Travailler, travailler, toujours"**

বা

**"সাধনা, অবিরাম অবিশ্রাম সাধনা"**

---

ফোয়াদ ও ফাইছল

ভূতপূর্ব্ব হেজাজ রাজের পুত্র বর্ত্তমানে ইংরাজের আশ্রিত ও এরাকের নামমাত্র শাসনকর্ত্তা আমির ফাইসল ইংলণ্ড হইতে ফিরিবার পথে মিসর রাজ ফোয়াদের সহিত সাক্ষাৎ করিতেছেন। চিত্রের দক্ষিণে ফাইসল ও বামদিকে ফোয়াদ—মোছাফাহা করিতেছেন।

## প্লেটো-একাডেমি বা ফ্লাতুঁর মাদ্রাছা
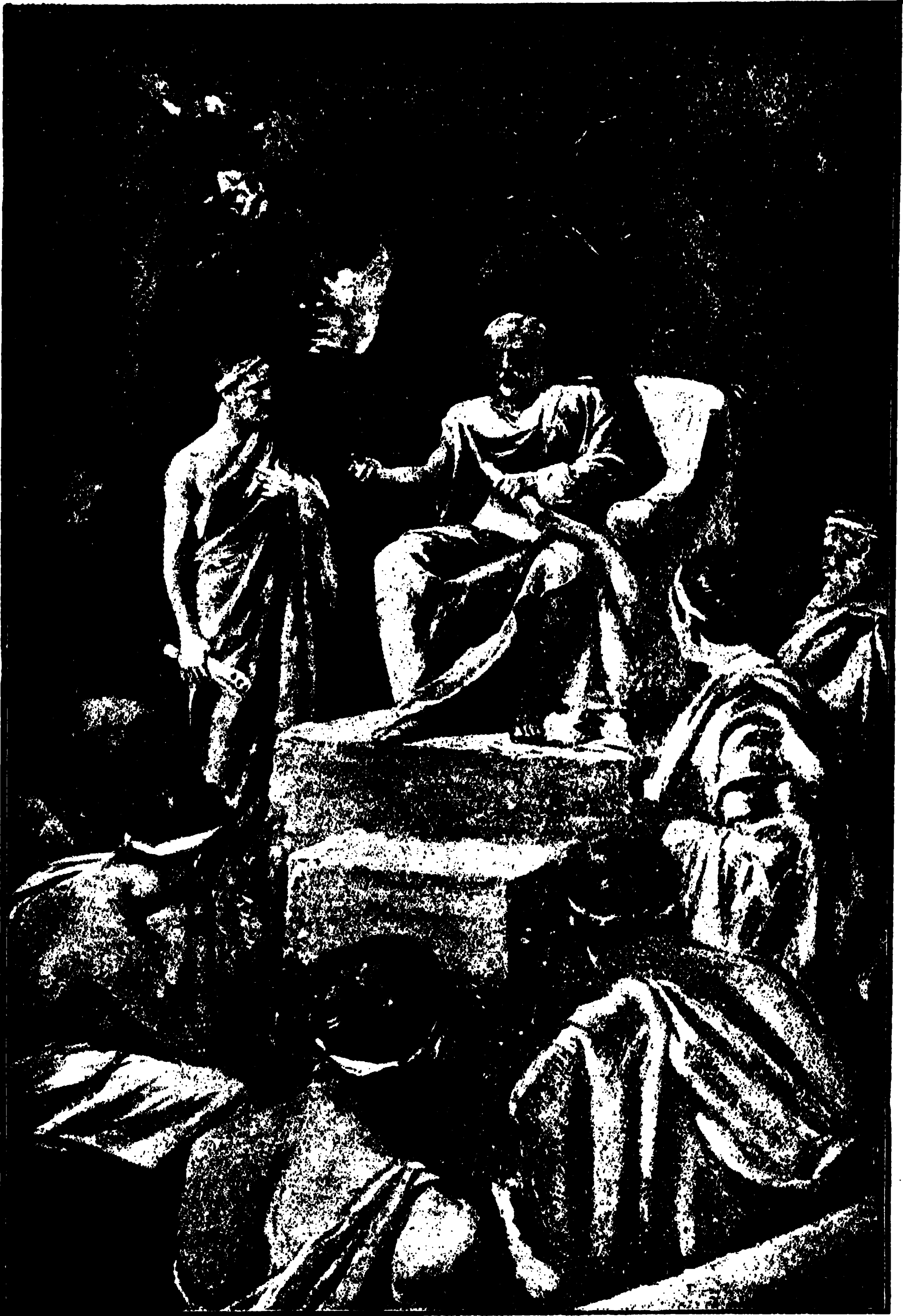
গ্রিকের Academus একাডেমস নামক এক বীরের অধিকার ভুক্ত থাকায়, এথেন্সের নিকটবর্ত্তী একটি সুন্দর স্থান একাডেমী নামে খ্যাত হইয়া যায়। মুক্ত সমতল ক্ষেত্রে জয়তুন বৃক্ষের ছায়াতলে বসিয়া প্লেটো বা ফ্লাতুঁ ( আফলাতুন ) জ্ঞান পিপাসু শিষ্যগণের নিকট নানা জটিল দার্শনিক তত্ত্ব আলোচনা করিতেছেন। প্লেটোর মৃত্যুর বহু শতাব্দী পর পর্য্যন্তও এই স্থানটী বহু দার্শনিক পণ্ডিতের জ্ঞান সাধনার প্রধান কেন্দ্রে পরিণত হইয়া ছিল।

## সোক্রাটিসের বিষ পান

বিশ্বের প্রাচীনতম জ্ঞানগুরু সোক্রাত বা সোক্রাটিস ঘোষণা করিলেন :—বিশ্বমানবের পক্ষে সর্ব্ব প্রধান আবশ্যকীয় বিষয় হইতেছে—জ্ঞান। আবার ইহার মধ্যে শ্রেষ্ঠ হইতেছে নিজকে চিনিয়া ও বুঝিয়া লওয়ার জ্ঞান। কারণ নিজকে চিনিবার শক্তি যতই তোমার বাড়িবে, তোমার অধিকৃত জ্ঞানের অকিঞ্চিৎকরতার উপলব্ধিও তোমার ততই হইতে থাকিবে—সঙ্গে সঙ্গে তুমি ইহাও বুঝিতে পারিবে যে, জ্ঞান বলিয়া তুমি যত টুকুর অধিকারী নিজকে মনে করিতেছ, তাহার কি পরিমাণ ভুল সম্পূর্ণ বলিয়া প্রতিপন্ন হইতে পারে।

কিন্তু রাজকীয় বিচারকগণ ঘোষণা করিলেন—সোক্রাটিস নব্য এথেন্সকে কুপথগামী করার চেষ্টা করিতেছেন, সুতরাং নিজ হস্তে হেমলক-হলাহল পান করাই তাঁহার উচিতদণ্ড। উপরের চিত্রে দেখা যাইতেছে—সোক্রাত এই আদেশ অনুসারে সানন্দভাবে হলাহল পান করিতেছেন। এই সময় তাঁহার মুখে একটুও অপ্রফুল্লতার ভাব দেখা যায় নাই। মৃত্যুর পূর্ব্ব মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত তিনি সম্পূর্ণ নির্ব্বিকার ভাবে শিষ্যমণ্ডলী ও স্বজনগণের সহিত কথাবার্ত্তা কহিয়াছিলেন।

ভারতীয় ও প্রাদেশিক কাউন্সিল সমুহের সভাপতি ও সহকারী সভাপতিগণ।

মধ্যস্থলে শুভ্র খদ্দর পরিহিত মিঃ প্যাটেল ও তাঁহার পশ্চাতে দণ্ডায়মান মিঃ য়্যাকুব হোছেন যথাক্রমে ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার সভাপতি ও সহকারী সভাপতি।

হাজী লর্ড হেডলী ফারুকের ওয়াজ।
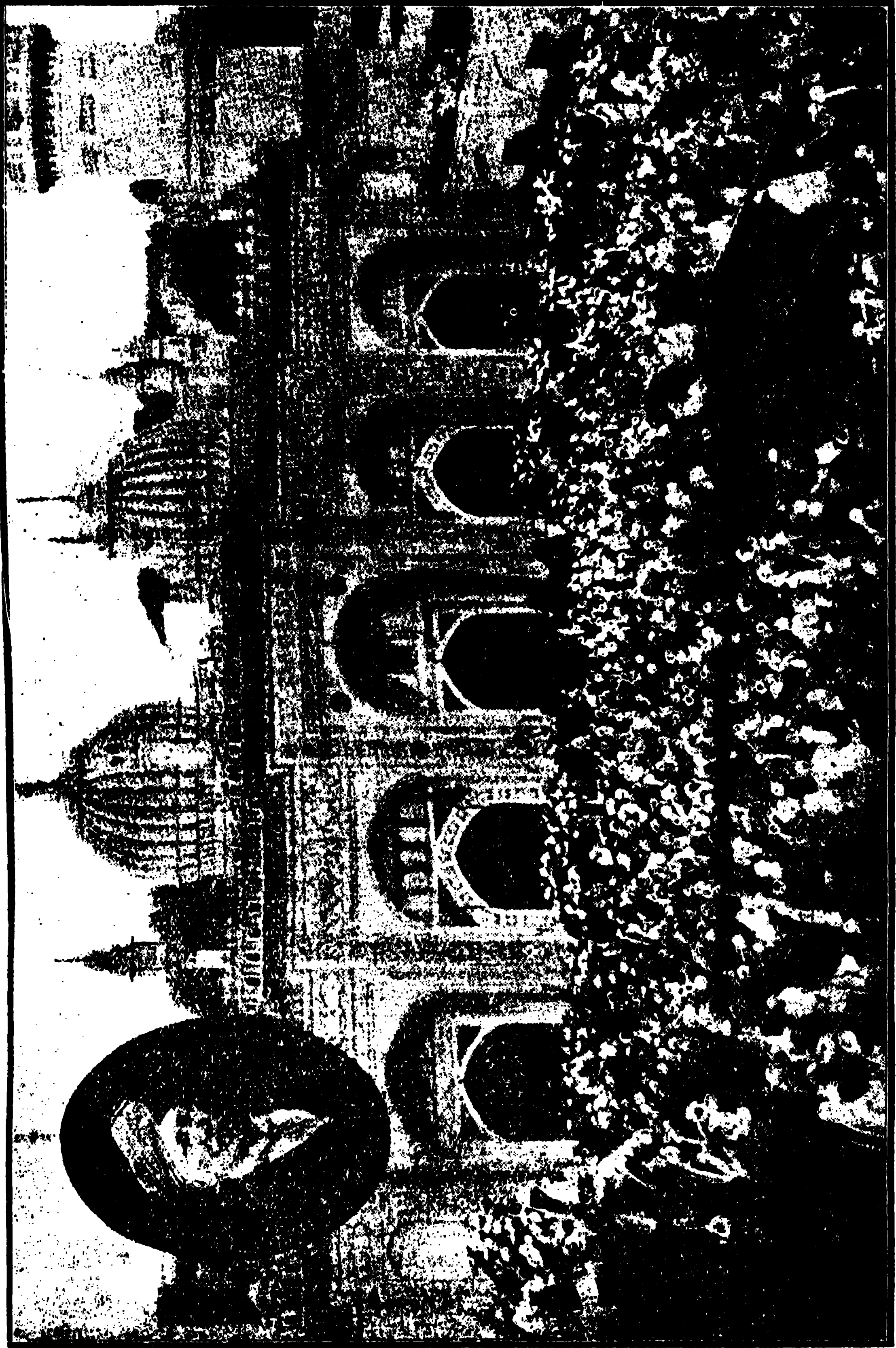
হাজী লর্ড হেডলী ফারুক ছাহেব পেশাওয়ারের নবনির্ম্মিত বিরাট জুমআ মছজিদের দ্বার দেশে দাঁড়াইয়া স্থানীয় পাঠান শ্রোতা দিগকে এছলামের মাহাত্ম্য সম্বন্ধে উপদেশ দিতেছেন। চিত্রের উপরি ভাগে বাম দিকে তাঁহার স্বতন্ত্র একটা ছবিও দেওয়া হইল।

সঙ্কলন
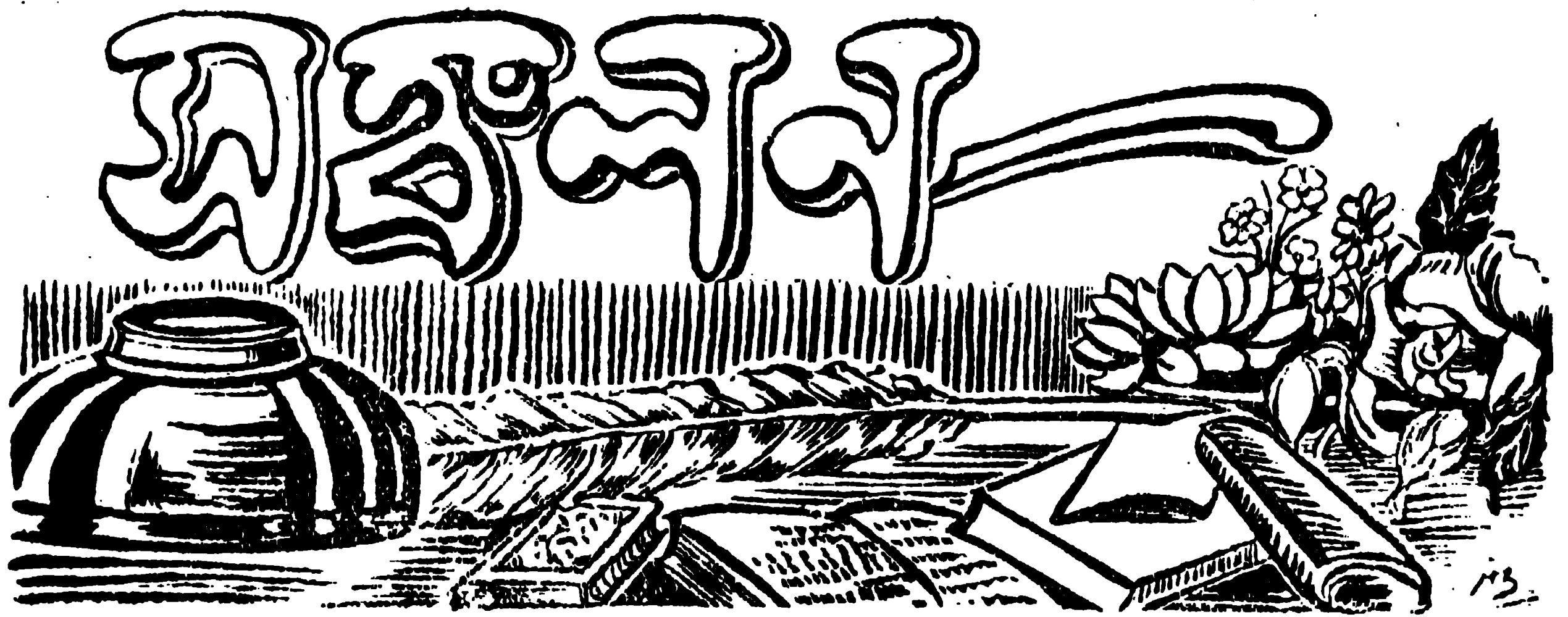
## অদ্ভুত হাত

উপরে যে হাতখানির ছবি দেওয়া হইল, বর্ত্তমানে তাহা বৃটনের বহু কৌতূহলী নরনারীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছে। এই হাতটি নাকি রোগ নিরাময় করিবার পক্ষে অসাধারণ শক্তি সম্পন্ন। মিঃ আর্থার য়্যাডামস্ নামক জনৈক ভূ-পর্য্যটক মিসর ভ্রমণ কালে ইহা আবিষ্কার করেন। নানা দিগ্‌দেশ হইতে আগত দর্শকবৃন্দের কৌতূহল চারিতার্থ করিবার জন্য বর্ত্তমানে ইহাকে লণ্ডন নগরীর ওয়েষ্ট মিনিষ্টার এবির সম্মুখস্থ 'স্যার আর্থার কোনান ডয়লের "সাইকিক মিউজিয়মে" রক্ষা করা হইয়াছে।

মিঃ য়্যাডামস ডেলী ডেস্‌প্যাচের কোন প্রতিনিধির নিকট বলিয়াছেন—"আমি এই হাতখানি মিসর ভ্রমণকালে আবিষ্কার করিয়াছি। মিসরের যে হোটেলে আমি অবস্থান করিতাম, তাহার অধ্যক্ষ কথা প্রসঙ্গে একদিন আমাকে বলেন যে, সেখানকার কোন সম্পন্ন ব্যক্তির নিকট ঔষধি দ্বারা সংরক্ষিত একখানি অতি প্রাচীন হাত আছে। সেই হাতখানি তিনি কোন গোরস্থানে ২৫,০০০ পাউণ্ড মূল্যের একটি স্বর্ণ পেটিকায় আবদ্ধ অবস্থায় প্রাপ্ত হইয়াছিলেন! কয়েক বৎসর পূর্ব্বে উহা কুষ্ঠ রোগীদের নিকট ধন্বন্তরী-হস্তরূপে পরিগণিত হইত। তাহাদের ধারণা ছিল—হাত খানি কোনও প্রকারে একবার স্পর্শ করিতে পারিলেই তাহারা নিরাময় হইয়া উঠিবে।

মিসরীয় ভদ্রলোকটি হাতখানিকে রোগ এবং ভৌতিক আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য সর্ব্বদা সঙ্গে সঙ্গে রাখিতেন। আমি পেটিকাটি বাদ দিয়া কেবল হাত খানিকেই ৫০ পাউণ্ড মূল্যে ক্রয় করিয়াছি। ইংলণ্ডে প্রত্যাগমন করিয়া আমি বৃটিশ মিউজিয়মের কর্ত্তৃপক্ষের নিকট উপস্থিত হই। তাঁহারা হাতখানি দেখিয়া ইহাকে ৩৫০০ বৎসরের প্রাচীন হাত বলিয়া অনুমান করেন এবং ইহা যে কোন রাজ পরিবারের অথবা সম্ভ্রান্ত বংশীয় মহিলার হাত, অনুমানের দ্বারা এই অভিমতও ব্যক্ত করেন। তাঁহাদের মতে হাতখানি বিশেষ বিস্ময়কররূপে রক্ষিত হইয়াছে। তাঁহারা ইহার মূল্য বাবদ আমাকে ১০০ শত পাউণ্ড দিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু আমি আমার কাছে রাখাই সমিচীন মনে করিয়াছিলাম।

সমাধি হইতে যখন এটিকে উদ্ধার করা হয়, তখন ইহার সহিত বহু সুদৃশ্য স্বর্ণালঙ্কারও ছিল, কিন্তু ইহা যে কাহার হাত তাহা নির্ণয় করিবার উপযোগী কোন খোদিত লিপি কিম্বা তদনুরূপ নিদর্শন দেখা যায় নাই। কাজেই ইহা রহস্যময় হস্তরূপেই এ যাবৎ লোকের বিস্ময় উৎপাদন করিয়া আসিতেছে।

এই হাত খানির সব চেয়ে বিস্ময়কর ব্যাপার এই যে, সব সময়েই ইহাতে স্বাভাবিক উষ্ণতা অনুভূত হইয়া থাকে, এবং ইহা স্পর্শ করিলে স্পর্শকারীর হস্তে একটা আরামপ্রদ স্পন্দন জাগিয়া উঠে। অনেকে বলিয়া থাকেন যে ইহা বহু লোককে রোগমুক্ত ও সৌভাগ্যশালী করিয়াছে। কোন মহিলা পক্ষাঘাত রোগে আক্রান্ত হইয়াছিলেন। তাহার ফলে ১০ বৎসর যাবৎ তাঁহার একখানি হাত বুকের উপর তুলিতে পারেন নাই। কিন্তু শেষে এই অদ্ভুত হাত স্পর্শ করায় তাঁহার রোগদুষ্ট হাতখানি সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য লাভ করে। এবং তিনি যদৃচ্ছা হাত সঞ্চালন করিতে সমর্থ হন।"

মিসেস্ এষ্টেলী ষ্টীডের (Mrs Estelle stead) আধ্যাত্মিক তত্ত্ব সমিতির প্রধান মনস্তত্ত্ববিৎ মিঃ ডবলিউ, ই, ফোষ্টার এই রহস্যপূর্ণ হস্তের নিম্নলিখিতরূপ বর্ণনা প্রকাশ করিয়াছেন।

"এই হাত একজন অত্যধিক আত্মমর্য্যাদা জ্ঞান সম্পন্ন এবং কঠোর কর্ত্তব্য পরায়ণ মহিলার। তাঁহার অসাধারণ মনস্তত্ত্ব জ্ঞানই হইয়াছিল তাঁহার কাল! থিবেস নগরস্থ আমেন-রা মন্দিরের বিবদমান পুরোহিত বৃন্দের নিকট তিনি তাঁহার উন্নত মস্তক অবনত করেন নাই। সেই জন্যই তাঁহাকে আমেন-রার বেদীতে বলি প্রদান করা হয়। তিনি অত্যন্ত স্নেহ-প্রবণ ছিলেন। তাঁহার মধ্যে ত্রুটিকর কিছু ছিল না। তাঁহার আত্মা সম্পূর্ণরূপে দোষমুক্ত—পবিত্র ছিল।

পুরোহিতগণ তাঁহার অসাধারণ মনস্তত্ত্ব শক্তিকে তাহাদের অভীষ্ট সিদ্ধির উপায় স্বরূপে ব্যবহার করিতে চাহিয়াছিলেন। উক্ত পুরোহিতগণ অত্যন্ত নির্ম্মম এবং অত্যন্ত প্রতিহিংসা পরায়ণ ছিলেন। পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বী পুরোহিতগণের মধ্যে যখন ভীষণ যুদ্ধ আরম্ভ হয়, এই অদ্ভুত শক্তি সম্পন্না মহিলা আত্ম শক্তিতে সম্পূর্ণ আস্থাবান থাকিয়া নিজেকে নিষ্কলঙ্ক রাখিয়াছিলেন।

পুরোহিতগণ তাঁহার এই অসাধারণ শক্তিকে তাঁহাদের নির্দ্দেশমত পরিচালিত করিতে চাহিয়াছিলেন। তাঁহাদের ধর্ম্মমত বিভিন্ন ছিল। তিনি তাহার আদর্শ রক্ষার্থে তাহাদের সকল প্রকার উৎকোচ ও সুবিধাদানকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন এবং তাহার ফলেই তাহাকে মরণ-বরণ করিতে হয়।

মিশরের প্রকৃত গৌরব এবং মাহাত্ম্য বর্ত্তমানে পাশ্চাত্য জগতে প্রচার হইয়া পড়িতেছে। এই হাতখানি পাশ্চাত্যের আধ্যাত্মিক জ্ঞান ও শিক্ষার উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারিবে।"

---

## প্রাচ্য ও বলশেভিক বাদ

মস্কোনগরে "ভাগ্যহীন প্রাচ্য ইউনিভার্সিটী" নামে একটী বিশ্ববিদ্যালয় আছে, তাহাতে বহু সহস্র শিক্ষার্থী শিক্ষা লাভ করিয়া থাকে। ঐ সকল ছাত্রের আহার ও বাসস্থানের ব্যবস্থা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষগণই করিয়া থাকেন; অধিকন্তু অন্যান্য খরচবাবত প্রত্যেক ছাত্রকে মাসিক দশ রুবল হিসাবে সাহায্য দেওয়া হয়। শিক্ষার্থীগণ সকলেই প্রাচ্যের অধিবাসী। রুস রাজ্যের অন্তর্ভূক্ত মঙ্গোলিয়া, তুর্কীস্থান ও গুর্জ্জীস্থান হইতেই অধিকাংশ ছাত্র পাঠার্থীরূপে এখানে আসিয়া থাকে। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদিগকে বিশেষ করিয়া বলশেভিকবাদ শিক্ষা দেওয়া হয়। এই হেতু অন্যান্য রাজ্যের সহিত সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইয়া বানিজ্য সম্বন্ধ স্থাপন ও সৌহার্দ্দ্যবর্দ্ধন উদ্দেশ্যে সোভিয়েট গভর্ণমেণ্ট ভিন্ন রাজ্যের অধিবাসীদিগকে এই বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্ত্তী করা আইনত নিষিদ্ধ বলিয়া ঘোষণা প্রচার করিয়াছেন।

১৯২১ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডের সহিত রুশিয়ার যে বাণিজ্য সন্ধি হইয়াছে, তাহাতে বৃটিশের অধিকৃত রাজ্যে বলশেভিকবাদ প্রচার করা হইবে না বলিয়া রুস গভর্ণমেণ্ট প্রতিশ্রুত হইয়াছেন, সেই অবধি তাঁহাদের প্রতিশ্রুতি পালনের প্রমাণস্বরূপ উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে ভিন্ন রাজ্যের ছাত্রদিগকে ভর্ত্তী করিবার প্রথা বিশেষরূপে রহিত করিয়া দিয়াছেন। কিন্তু তবু তাঁহারা বিদ্বেষভাব প্রচার ও বৈরিভাব পোষণের অভিযোগ হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে পারেন নাই।

মস্কো সহরে বলশেভিক সমিতি নামক আর একটী বে-সরকারী প্রতিষ্ঠান আছে, এই সমিতির পক্ষ হইতে সকল রাজ্যে সকল দেশে বলশেভিকবাদ প্রচারের ব্যবস্থা হইয়া থাকে। নামজাদা বিশিষ্ট বলশেভিক নেতাদের সমবায়ে এই সমিতি গঠিত। তাহারা ইঙ্গ-সোভিয়েট সন্ধির ধার ধারে না, রুস গভর্ণমেন্টের বিধি নিষেধও মানিয়া চলে না, মানুষের হিসাবে সকলের অধিকার সমান, ইহাই তাহাদের মূলমন্ত্র। ভারতবর্ষ, চিন, তুর্কীস্থান ও অন্যান্য সকল দেশেই তাহাদের মতাবলম্বী লোক আছে, কিন্তু শাসক ও ধনিক সম্প্রদায়ের চাপে পড়িয়া তাহারা বিশেষ কিছু করিয়া উঠিতে পারে না। কারণ এই দুই সম্প্রদায়ই বলশেভিকবাদ প্রচারের প্রধান অন্তরায়। কিন্তু তবু তাহারা মুহূর্ত্তের জন্য হতাশার ভাবকে মনে স্থান দিতে চায় না, তাহাদের মতে প্রাচ্যে একশ্রেণীর তরুণ সম্প্রদায়ের অভ্যুদয় হইয়াছে, তাহারা সকল বাধাবিঘ্ন পদদলিত করিয়া ফেলিবে, তাহাদের সাহায্যেই সময়ে প্রাচ্যের সকল দেশে সকল সম্প্রদায়ে বলশেভিকবাদ প্রতিষ্ঠালাভ করিবে। মোস্তফা কামাল ও তাঁহার দলের মুষ্টিমেয় কয়েকজন মিলিয়া যেমন তাঁহাদের দেশে স্বাধীনতার ভাবধারা বহাইয়া দিয়াছেন, প্রত্যেক তুরস্কবাসীর হৃদয়ে অধীনতার পাশ ছিন্ন করিবার দুর্দ্দমনীয় আকাঙ্খা জাগাইয়া তুলিয়াছেন, ফলে সহস্র বজ্রবন্ধনীর মধ্য হইতেও তুরস্ক আজ স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে, সেইরূপ বলশেভিক সমিতির এই নগণ্য সেবকদের সাহায্যে প্রাচ্যের অধিবাসীগণ সাম্য ও স্বাধীনতার মর্য্যাদা বুঝিতে পারিবে এবং অদূর ভবিষ্যতে প্রাচ্যজগৎ বলশেভিকমন্ত্রে দীক্ষা লাভ করিবে।

অধুনা ভারতীয় দেশ-সেবকগণের এক সম্প্রদায় রুষ-রাজ্যে অবস্থিতি করিতেছেন। ইউরোপীয় মহা সমরের সময় তাঁহারা ভারতভূমি পরিত্যাগ করিয়া জর্ম্মণীতে গমন করিয়াছিলেন, কিন্তু কিছুদিন পর যুদ্ধে জর্ম্মাণীর পরাজয় হইলে তাঁহারা সকলেই রুষরাজ্যে চলিয়া আসেন, প্রথম প্রথম সেখানে তাঁহারা বেশ সুখে স্বচ্ছন্দে ছিলেন ; কিন্তু অবশেষে অর্থাভাবে ও খাদ্যাভাবে তাঁহাদের অবস্থা অতীব শোচনীয় হইয়া পড়ে। সেই সময় অনেকে পুনরায় জার্ম্মাণীতে ফিরিয়া যান। অবশিষ্ট অনেকেই সেই অবধি রুস রাজ্যে রহিয়া গিয়াছেন। এই দলে ডাক্তার আব্দল হাফীজ নামক একজন রসায়ন শাস্ত্রবিৎ মোসলমান পণ্ডিত ছিলেন এক সময় ভারতের ভূতপূর্ব্ব বড়লাট লর্ড কর্জ্জন বলিয়াছিলেন যে ডাক্তার আব্দল হাফীজ আফ্‌গানীস্থানে, ভারতের সীমান্ত প্রদেশের সন্নিকটে কামান ও গোলা বারুদের একটী কার-খানা স্থাপনের জন্য রুষ গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়াছেন।

অনেকে আবার এইরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে ভারতবর্ষে বলশেভিকপ্রভাব বিস্তৃত হওয়ার সম্ভাবনা অতি অল্প। মহাত্মা গান্ধীর রাজনৈতিক প্রোপাগাণ্ডা লেনীনের মতের সম্পূর্ণ বিপরীত ; অধিকন্তু ভারতে ধনিক সম্প্রদায়ের স্বার্থ বৃটিশ বণিকের স্বার্থের সহিত সমভাবে বিজড়িত, তাই এই উভয় সম্প্রদায়ই শ্রমিক দলকে দাবাইয়া রাখিয়া 'কাজ হাসিল' করিতে চান। এজন্য ক্ষমতা ও প্রতিপত্তিশালী অধিকাংশ ভারতবাসীই সাম্য, স্বাধীনতা ও বলশেভিকবাদের সম্পূর্ণ বিরোধী ; সুতরাং এরূপ অবস্থায় কথায় কথায় বলশেভিক জুজুর ভয়ে কাহারও চমকিয়া উঠিবার কারণ আছে বলিয়া মনে হয় না।

---

## রবীন্দ্রনাথের একখানি পত্র

* * *

তারুণ্য নিয়ে যে-একটা হাস্যকর বাহ্বাস্ফোটন আজ হঠাৎ দেখ্‌তে দেখ্‌তে মাসিক সাপ্তাহিকের আখড়ায় আখড়ায় ছড়িয়ে প'ড়ল এটা অমরাবতীবাসী ব্যঙ্গ-দেবতার অট্টহাস্যের যোগ্য। শিশু যে আধো-আধো কথা কয় সেটা ভালোই লাগে, কিন্তু যদি সে সভায় সভায় আপন আধো-আধো কথা নিয়েই গর্ব্ব ক'রে বেড়ায়, সকলকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখাতে চায় "আমি কচি খোকা," তখন বুঝ্‌তে পারি কচি ডাব অকালে ঝুনো হ'য়ে উঠেছে। তরুণের স্বভাবে উচ্ছৃঙ্খলতার একটা স্থান আছে, স্বাভাবিক অনভিজ্ঞতা ও অপরিণতির সঙ্গে সেটা খাপ খেয়ে যায়, কিন্তু সেইটেকে নিয়ে যখন সে স্থানে অস্থানে বাহাদুরী ক'রে বেড়ায়, "আমরা তরুণ, আমরা তরুণ" ক'রে আকাশ মাত ক'রে তোলে, তখন বোঝা যায় সে বুড়িয়ে গেছে, বুড়ো-তারুণ্যের অজ্ঞানকৃত প্রহসনে হেসে উঠে জানিয়ে দিতে হবে, যে এটাকে আমরা মহাকালের মহাকাব্য ব'লে গণ্য করিনে। চিরকাল দেখে এসেচি তরুণ অন্য নিজেকে তরুণ

ব'লে কম্পান্বিত ক'রে দেখায়, তরুণ স্বাস্থ্য নিজেকে সম্পূর্ণ ভুলেই থাকে।—আজকাল তারুণ্য হঠাৎ একটা কাঁচা রোগের মতো হ'য়ে উঠ্‌ল, সে নিজেকে ভুল্‌চে না, এবং পাড়াসুদ্ধ লোককে চব্বিশ ঘণ্টা মনে করিয়ে রাখ্‌চে যে, সে টন্‌টনে তরুণ, বিষফোড়ার মত দগ্‌দগে তার রঙ। শুধু তাই নয় তরুণরা যে তরুণ, বুড়োদের অধ্যাপকপাড়া থেকে তার প্রমাণপত্র সংগ্রহ করা চল্‌চে। এর মধ্যে কৌতূহলের কথাটা হচ্চে এই যে, তারুণ্যটা হ'ল বয়সের ধর্ম্ম, ওটা স্বভাবের নিয়ম,—ওটার জন্ম রুষীয় সাহিত্যশাস্ত্র থেকে নোট মুখস্থ ক'রে কাউকে এগজামিন পাশ ক'রতে হয় না,—বিধাতার বিধানে ঐ বয়সটাতে মানুষ আপনিই আসে। কিন্তু আজকালকার দিনে তারুণ্যের বিশেষ ডিক্রী-ধারীরা নিজেদের দুঃসহ তরুণতা সম্বন্ধে প্রেমচাঁদ-রায়চাঁদের থীসিস্ লিখ্‌তে সুরু করেচে। তারা বল্‌চে আমরা তরুণ-বয়স্ক ব'লেই সবাই আমাদের সমস্বরে বাহবা দাও,—আমরা যুদ্ধ করেচি ব'লে না, প্রাণ দিয়েচি ব'লে না, তরুণ বয়সে আমরা যা-ইচ্ছে-তাই লিখচি ব'লে। সাহিত্যিকের তরফে বল্‌বার কথা এই যে, যেটা লেখা হয়েচে সাহিত্যের আদর্শ থেকে তাকে হয় ভালো নয় মন্দ ব'ল্‌ব, কিন্তু তরুণ বয়সে লেখার একটা স্বতন্ত্র আদর্শ খাড়া কর্‌তে হবে এতো আজ পর্য্যন্ত শুনিনি। বাংলা দেশে সাহিত্যের বিচারে দুই-জাতের আইন, দুই-জাতের জুরি রাখ্‌তে হবে, একটা হ'চ্ছে আঠারো থেকে পঁয়ত্রিশ বছর বয়সের লেখকদের জন্যে, আর একটা বাকি সকলের জন্যে, এই বিধানটাই পাকা হবে নাকি? এখন থেকে লেখকদের কুষ্ঠি মিলিয়ে তবে লেখার ভালোমন্দ ঠিক কর্‌তে হবে? কোনো তরুণ-বয়স্কের লেখার নির্লজ্জতাদোষ ধর্‌লে নালিষ উঠবে যে, সেটাতে কেবলমাত্র লেখার নিন্দা করা হোলো না, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যেখানে যত তরুণ আছে সবাইকেই গাল দেওয়া হোলো!

* * *

( শনিবারের চিঠি )

## গোলাপের কথা

বাগানে একটী গোলাপ ফুল ফুটেছিল। যেমন তার রংএর বাহার, তেমনি গন্ধ। তার রূপে মুগ্ধ হয়ে এক বুলবুল খুব কাছের একটী গাছের ডালে এসে বসলো, আর প্রণয়-গদ্‌গদ্ ভাষায় বললে, "ওগো গোলাপ সুন্দরী, তোমায় দেখে আমি একেবারে বিহ্বল—পাগল হ'য়ে গেছি। নিশিদিন কেবলই তোমারই স্বপ্ন দেখছি, আর তোমার কথাই ভাবছি। তোমায় ছেড়ে এত দিন কি করে বেঁচে ছিলুম, আমি তা বুঝতে পারছি না। আমার মন আমায় বলছে, তোমায় ভালবাসার জন্যই আল্লা আমায় সৃষ্টি করেছেন। এ ছাড়া আমায় সৃষ্টি করার তাঁর অন্য উদ্দেশ্য থাকতেই পারে না! প্রিয়া আমার, দয়া করে তোমার রাঙ্গা মুখখানি তুলে আমার পানে একবার চাও। তোমার হাসি-মাখা মুখ দেখে জীবন আমার সার্থক করি।"

বুলবুলের এই প্রীতি-মাখা কথা শুনে গোলাপের মুখে আপনা থেকেই হাসি ফুটে উঠলো। সে ভাবলে, কি মিষ্ট এই বুলবুলের কথা, আর কি সরস এর প্রাণ! আমার অন্তর ওকেই চায়, ওর অন্তরও দেখছি আমাকেই চায়! আল্লা নিশ্চয় পরস্পরকে ভালবাসার জন্যই সৃষ্টি করেছেন। এ ছাড়া তাঁর কি আর উদ্দেশ্য থাকতে পারে!

হঠাৎ বুলবুলের ডানা দুটীর উপর তার নজর পড়লো। সংশয়ের কালো মেঘ এসে ক্ষণেকের জন্য তার মনকে আচ্ছন্ন করে তুললো। সে ভাবলে, তাইতো, ওর যে ডানা রয়েছে! ওতো আমার মত এক যায়গায় বসে থাকবে না। উড়ে বেড়ানোই যে ওর স্বভাব! আজ ও আমায় ভাল বাসছে, কাল হয়তো আর কাকেও ভাল বাসবে। আমার কথা তখন ওর মনেও থাকবে না!"

বুলবুলের দিকে তার সুন্দর মুখখানি তুলে অনুযোগের স্বরে গোলাপ বললে, "আজ আমায় অমন কথা বলচো, কাল হয়তো আর কাউকে ঠিক এই সব কথাই বলবে। আমার কথা তখন তোমার মনেও থাকবে না!"

একান্ত আদরে গোলাপের মুখে চুম্বন বর্ষণ করে আর্দ্র কণ্ঠে বুলবুল বললে, "কখনও না! তোমার এই লাল ঠোঁটের কসম, কখনও না! তুমি ছাড়া কখনও কাউকে আমি ভালবাসিনি আর কখনো বাসবও না! যতদিন বাঁচবো, ততদিন আমি তোমারই ধ্যান করবো। আর বিধিনির্ব্বন্ধে যখন এই নশ্বর জীবন আমায় ছেড়ে যেতে হবে, তখন দেখবে তোমারি কথা ভাবতে ভাবতে আমি মরেছি।"

মরণের কথায় গোলাপের প্রাণ কেমন আতঙ্কে শিউরে উঠলো! তার অভিমান সে একেবারে ভুলে গেল। প্রেমগদ্‌গদ্ কণ্ঠে বুলবুলকে সম্বোধন করে সে বললে,

"তোমায় কি অবিশ্বাস করতে পারি, প্রিয়তম? তোমার জন্য আমি জন্মেছি, আর তুমিও আমার জন্যই জন্মেছ! কেবল এই পৃথিবীতে কেন, আমাদের আত্মা যখন তাদের নশ্বর দেহ ত্যাগ করে অমর লোকে চলে যাবে, তখন সেখানেও তোমায় আমি এখনকার মতই ভালবাসবো। আমার ভালবাসায় কোন প্রভেদ হবে না। যুগ যুগ ধরে এ ভালবাসা এমনি অটুট থাকবে। তুমিও চিরকাল আমায় এমনি ভালবাসবে, প্রিয়?"

বুলবুল বললে, "গোলাপ সুন্দরী! তুমি ছাড়া আর কাউকে আমি কখনও জানিনি, আর জানবোও না। অনন্ত কাল আমি তোমারই প্রেমের দাসানুদাস হয়ে থাকবো।"

প্রেমের আবেশে তারা সব ভুলে পরস্পরের অধর-সুধা পান করতে লাগলো, বিহ্বল, বিবশ···।

বিকালে এক প্রেমিক বাগানে এল—তার প্রিয়ার জন্য একটি গুলদাস্তা ( ফুলের তোড়া ) তৈয়ার করতে। ফুল তুলতে তুলতে সে সেই গোলাপের কাছে গিয়ে দাঁড়ালো। সদ্যফোটা সুন্দর গোলাপটীকে দেখে সে বললে, "কি সুন্দর ফুল! মাশুক আমার এ ফুল পেলে কত খুশী হবে! গুলদাস্তার ঠিক মাঝখানে একে রাখতে হবে।" গোলাপ-টীকে সে ডাল থেকে ভাঙতে উদ্যত হল।

"ওগো আমায় এখান থেকে সরিও না গো, তোমার পায়ে পড়ি, আমায় এখান থেকে সরিও না! আমাকেও যে একজন ভালবাসে! আমায় দেখতে না পেলে সে কেঁদে কেঁদে মরে যাবে"—বলতে বলতে করুণ নেত্রে গোলাপ সেই নিষ্ঠুর প্রেমিকের দিকে চাইলে। সে কিন্তু ফুলের সে ভাষা বুঝলো না। তিল মাত্র ইতস্ততঃ না ক'রে গোলাপটীকে ডাল থেকে ভেঙ্গে সে তার গুলদাস্তার সামিল করলে।

গুলদাস্তাটী মাশুকের সামনে পেশ ক'রে কোমল মধুর দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে প্রেমিক ব'ললে, "প্রেয়সি! সদ্য ফোটা এই গোলাপটি দেখে তোমার টুকটুকে মুখখানির কথা আমার মনে পড়ছিল। এটিকেও তাই গুলদাস্তার সামিল করে তোমার জন্য নিয়ে এসেছি। ফুলের এ সৌন্দর্য্য একদিন বই থাকবে না; আমার ভালবাসা কিন্তু অনন্তকাল এই ফুলের মতই ফুটে থাকবে।"

মাশুক ব'ললে, "কি বললে, প্রিয়, অনন্তকাল? হায় —দুদিন পরেই তুমি আমায় ভুলে যাবে! নূতন মাশুককে তখন নূতন গুলদাস্তা উপহার দেবে! আমার কথা তখন তোমার মনেও থাকবে না!"

আবেগ বিগলিত কণ্ঠে প্রেমিক ব'ললে, "ছি প্রেয়সি! আমায় তুমি এমন অপদার্থ মনে কর! তুমি ছাড়া জীবনে আমি কাউকে কখনও ভালবাসিনি, আর বাসবোও না। আমার অন্তর আমায় বলছে, তোমায় ভালবাসবার জন্যই আল্লাহ আমায় সৃষ্টি করেছেন, আর আমায় ভালবাসবার জন্য তোমায় সৃষ্টি করেছেন। অনন্তকাল ধরে আমার অন্তরের সমস্ত ভালবাসা দিয়ে তোমায় আমি ভালবাসবো। তোমারই মোহিনী মূর্ত্তি জন্ম-জন্মান্তরে আমার হৃদয়পটে বিরাজ করবে। আর কারও সেখানে কখনও স্থান হবে না।"

ঘন কম্পমান সুরভি নিশ্বাসে প্রেমিকের প্রাণে আনন্দের এক অবর্ণনীয় হিল্লোল তুলে মাশুক তার ওষ্ঠাধরে চুম্বন রেখা অঙ্কিত করে বললে, "প্রিয়তম, অনন্তকাল ধরে তোমায় আমি ভালবাসবো—আমার অন্তরের সমস্ত ভালবাসা দিয়ে তুমিই আমার হৃদয়ের একমাত্র অধীশ্বর হয়ে থাকবে। আর কারও কথা কখনও স্বপ্নেও আমি মনে আনবো না।" হৃদয়ের আবেগে প্রেমিক দুই বাহু দিয়ে মাশুককে তার বুকের মধ্যে চেপে ধরলে।

আপন মনে গোলাপ বললে, "হায় আমাদের ভালবাসাও ঠিক এই রকমই ছিল! কিন্তু নিয়তির কি নিষ্ঠুর বিধান! আমার প্রাণের বুলবুলের সঙ্গে এ জন্মে আর দেখা হবে না! মৃত্যুর পর, হে আল্লা, আবার যেন তাকে দেখতে পাই।" দুঃখের ভারে, গোলাপের মাথা নুয়ে পড়লো।

প্রেমিক বললে, "আহা গোলাপটী নুয়ে পড়েছে। ওকে আলাদা একটি ফুলদানিতে রেখে দেও, না হলে বেচারা শুকিয়ে যাবে।"

আনন্দের বিচিত্র তরঙ্গ তুলে সুন্দরী সেই পুষ্পগুচ্ছ নিয়ে তার শয়নাগারে চলে গেল, আর সযত্নে গোলাপটীকে একটি সুন্দর ফুলদানীতে সাজিয়ে জানালার পাশে রেখে দিলে। গোলাপ বেচারা বাগানের দিকে চেয়ে ব্যথাতুর মনে তার বুলবুলের কথাই ভাবতে লাগলো।

সূর্য্য ধীরে ধীরে অস্তাচলে গেলেন। রাত্রির অন্ধকার এসে সমস্ত বাগানের উপর তার কালো পর্দ্দা বিছিয়ে দিলে। বিরহ-বিধুর গোলাপ অশ্রুজল-চোখে সেই ফুলদানিতে ঘুমিয়ে পড়ল। তার প্রণয়ীর সঙ্গে সেদিন আর তার দেখা হলো না।

যখন সকাল হ'ল, গোলাপের পাপড়িগুলি তখন শুকিয়ে আসছিল। মৃত্যুর তন্দ্রায় তার দুই চোখ ঢল ঢল করছিল। সেই অন্তিম তন্দ্রার ঘোরে এক এক বার তার প্রেমিকের সেই কমনীয় মূর্ত্তি চোখের সামনে ভেসে উটছিল। বেদন-বিধুর কণ্ঠে সে ডাকছিল, "হে আল্লা, মরণের আগে একবার যেন তাকে দেখতে পাই! আমার এই শেষ প্রার্থনা তুমি পূর্ণ করো, দয়াময়!"

তরুণ সূর্য্যের অরুণ রাগে বাগান জ্বল্‌জ্বল্‌ করে উঠলো, প্রকৃতির মুখে যখন নূতন জীবনের নূতন হাসি দেখা দিলে, মুমূর্ষু গোলাপটীও তখন ক্ষণিকের জন্য নূতন আশায়, নূতন আশঙ্কায় সঞ্জীবিত হল। ব্যগ্র উৎসুক নয়নে সে বাগানের দিকে চাইলে—তার প্রেমাস্পদকে দেখবার জন্য!

ঐযে, বাগানের ঐ সবুজ পাতার মধ্যে তার প্রেমাস্পদের মুকুট-শোভিত শির ঐ দেখা যায়! মরণোন্মুখ গোলাপের চেহারা আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। জানালা থেকেই তার প্রেমিককে উদ্দেশ করে সে বললে, "প্রিয় আমার, নিষ্ঠুর নিয়তির নির্ব্বন্ধে আমাকে অকালে তোমায় ছেড়ে যেতে হ'চ্ছে। তুমি কিন্তু আমায় ভুলনা প্রিয়তম, পর-লোকে তোমার জন্য ব্যাকুল প্রাণে আমি প্রতীক্ষা করবো। সেখানে আবার আমাদের মিলন হবে।" বুলবুলকে ভালো ক'রে দেখবার জন্য কষ্টে সে তার মাথা একটু উঁচু করে বাগানের দিকে চাইলে। এক মর্ম্মান্তিক দৃশ্য তার অন্তরকে শেলের মত বিদ্ধ করলে। তার সাধের বুলবুল মোহমুগ্ধ দৃষ্টিতে এক সদ্য প্রস্ফুটিত গোলাপের দিকে চেয়ে আছে। মুখে তার লালসার আবেশ!

"একি, এর অর্থ কি!" বলতে বলতে মুমূর্ষু গোলাপ তার সমস্ত শক্তিকে ক্ষণিকের জন্য পুঞ্জীভূত করে বাগানের দিকে অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে রইলো। বুলবুলের কণ্ঠস্বর তার কাণে এল। বীণানিন্দিত কণ্ঠে সে সেই বাগানের সদ্য প্রস্ফুটিত গোলাপকে সম্বোধন করে বলছিল, "ওগো গোলাপ সুন্দরি, তোমায় দেখে আমি একেবারে পাগল হ'য়ে গেছি। নিশিদিন কেবল তোমারই স্বপ্ন দেখছি, আর তোমার কথাই ভাবছি। তোমায় ছেড়ে এতদিন কি ক'রে যে বেঁচে ছিলুম, আমি তো তা বুঝতে পারি না। আমার অন্তর আমায় বলছে, তোমায় ভালবাসবার জন্যই আল্লা আমায় সৃষ্টি করেছেন। এ ছাড়া আর কোন উদ্দেশ্য থাকতেই পারে না! প্রিয়া আমার, দয়া করে তোমায় রাঙ্গা মুখখানি তুলে আমার দিকে একবার চাও। তোমার হাসিমাখা মুখখানি দেখে জীবন আমার সার্থক করি।"

জানালার গোলাপের চোখ দুটী আপনা থেকেই বুজে এল। আবর্ত্তের শেষ ভরসা সেই করুণাময়কে স্মরণ করে সে বললে, "আল্লা! আর আমায় যাতনা দিও না। শীঘ্র আমায় ডেকে নাও।"

তরুণ তরুণীও ঠিক সেই সময়ে কক্ষের মধ্যে প্রবেশ করলে। ফুলটীকে দেখে তরুণী করুণকণ্ঠে বললে, "আহা, বেচারী মারা গেছে!"

তরুণ বললে, "ফুলের জীবন একদিনের, মানুষের জীবন দুদিনের, প্রেমেরই কেবল মৃত্যু নাই।"

তরুণের ওষ্ঠাধরে আবেগ ভরা একটী চুম্বন অঙ্কিত করে তরুণী বললে, "আমিও ঠিক ঐ কথাই বলতে যাচ্ছিলুম, প্রিয়! ঐ শোন, বাগানে বুলবুল কি মধুর কণ্ঠে প্রেমের মহিমা কীর্ত্তন করছে। বুলবুলই হচ্ছে জগতের আদর্শ প্রেমিক।"

অনুযোগের স্বরে তরুণ বললে "আর আমি?"

তরুণকে তার কোমল বাহুপাশে আবদ্ধ করে তরুণী বললে, "তুমিই আমার বুলবুল!"

তরুণীর ইয়াকুতের মত ওষ্ঠাধরে তরুণ চুম্বনের পর চুম্বন বর্ষণ করতে লাগলো।

মরণোন্মুখ গোলাপটীর মুখে ক্ষীণ হাসির রেখা দেখা দিল। কষ্টে তার মুখ আকাশের দিকে তুলে "প্রভু হে, তোমার সৃষ্টির মর্ম্ম তুমিই বোঝ" বলতে বলতে মৃত্যুর অনন্ত নিদ্রায় সে তার চোখ দুটী মুদ্রিত করলে।

( বিচিত্রা এস, ওয়াজেদ আলী )

# বেকার

[ চৌধুরী মোহাম্মদ শামসুর রহমান ]

( ১ )

দীর্ঘ দু' বছর ধরে' শহরের পথে পথে ঘুরে হয়রাণ হ'য়ে পড়েছি। রোজ সকালে ষ্টেট্‌স্‌ম্যান অফিসের দরজায় টাঙ্গানো নিউজবোর্ডে Wanted কলম দেখা এবং তারপর যা' তা' দুটো খেয়ে নিয়ে এ-অফিস সে-অফিসএর দরজায় ধন্না দেওয়া এবং বড় বাবুদের পায়ে তেল মালিশ করা—এ দু'বছর ধরে শুধু এই করে' এসেছি। কিন্তু চাকুরী ?—তা ত ভাগ্যে জোটে উঠেনি—ওযে সাত রাজার ধন। ম্যাট্রিক পাশ-করা বাঙালী 'বাবু'র ভাগ্যে এ দুর্লভ রত্ন লাভ যে 'ঘুঁটে কুড়ুনীর' ছেলের ভাগ্যে এক রাজকন্যা ও আধা রাজ্য-লাভেরই মতন। তাই, এত চেষ্টা করেও কোথাও একটা চাকুরী জুটিয়ে উঠতে পারিনি।

আর ভাল লাগেনা—এ ঘুরাঘুরি। দু'বছর ধরে' অবিরত পথে পথে ঘুরে দেখেছি—কিন্তু কি লাভ হয়েছে ? কিচ্ছুই না। কোথাও বেরুনো বন্ধ কর্‌লুম, সারা দিন মেসের মধ্যেই বিছানা আঁকড়ে পড়ে' থাকি, আর ভাবি—বেকার বাঙালী যুবকদের অদৃষ্টের কথা। যারা শুধু কলম-পেশাই শিখে—আর কিছু না, আত্ম-নির্ভর-শীল হবার শিক্ষা যারা কোন দিনই পায়নি, তা'দের অদৃষ্টে এরূপ পথে পথে ঘোরা ছাড়া আর কি সুব্যবস্থাই বা হ'তে পারে ? নিজের উপর ঘৃণা জন্মে যায়। ইচ্ছা হয় নিজের মাংস নিজেই কাম্‌ড়ে খাই—কেন এমন অকর্ম্মণ্য হ'য়ে জন্মালুম !

নীচে পথের মাঝে কে গেয়ে উঠে, "বারা বরছ হুয়া পিয়া কাহাঁ গেইল্‌"। কোন্ সে বিরহিনী তা'র বার বৎসরের নিরুদ্দিষ্ট প্রিয়ের উদ্দেশে ভ্রমণ করে' কেঁদে ওঠে। মন আর বিছানায় থাকৃতে চায়না—গিয়ে দাঁড়াই পথের পাশে বারান্দায়। নীচের দিকে ঝুঁকে দেখি, কিন্তু কাকেও দেখ্‌তে পাই না। একদিন হঠাৎ চোখে পড়ে' গেল একটা চৌদ্দ-পনের বছরের সুন্দর ফুট্‌ফুটে মেয়ে, কপালের মাঝখানে উল্কী করে' টিপ আঁকা, দু'হাতে দু'-গাছা পিতলের বালা। পরণে তার শতছিন্ন ময়লা শাড়ী। ডান হাতে একটা এলোমিনিয়ামের ছোট্ট পেয়ালা—তাই হাতে নিয়ে সে গান গেয়ে যায়। সঙ্গে তার একটা কালো কাট খোট্টা জোয়ান, বড় বড় চুলের উপর পাগ্‌ড়ী বাঁধা, গলায় একটা হারমোনিয়াম ঝুলানো ; গানের তালে তালে সে সুর দিয়ে যাচ্ছে। গান শেষ করে' যুবতী তার বড় বড় চোখ দুটো উপরের দিকে বিস্ফারিত ক'রে চাইল। ডান হাতে পেয়ালাটি বাড়িয়ে ধরে' বল্‌ল—"রাজা বাবু! একঠো পায়সা !" তার সে করুণ আবেদন আমার অন্তরের অন্তস্তল পর্য্যন্ত গিয়ে পৌছুল। পকেটে হাত দিয়ে দেখি—দুটো পয়সা আছে, তখনি বার ক'রে নীচেয় ফেলে দিলুম। পয়সা দুটো কুড়িয়ে নিয়ে হাত দুটো মাথায় ঠেকিয়ে সে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বল্‌ল—"রাজা বাবু! জয় হোক তোমার।"

পরদিনও ঠিক তেম্‌নি সময়ে পথের মাঝে তার সুর শোনা গেল, সঙ্গে সঙ্গে হারমোনিয়ামটাও বেজে উঠ্‌ল। দাঁড়ালুম গিয়ে আবার বারান্দায়। ইচ্ছা হ'ল তাকে ডেকে এনে সাম্‌নে বসিয়ে দু'টো গান শুনি—প্রাণের ব্যথার উপর একটু শান্তি প্রলেপ দিই। পকেটে হাত দিয়ে দেখলুম, পয়সা আছে ত ? ঘরে ডেকে আন্‌লে চার আনা পয়সা না দিলে ত চল্‌বে না ? দূর হ'ক, দুদিন না হয় নাস্তা করব না। হাত ইশারা করে' তাকে ডাকৃলুম।

সে এসে দরজার গোড়ায় মেঝের উপর ব'সে পড়্‌ল। সঙ্গী লোকটা এক পাশে ব'সে হারমোনিয়ামে সুর ধর্‌ল, সে গেয়ে যেতে লাগল। একটা-দুটো-তিন্‌টে গান গেয়ে মাথা তুলে সে আমার মুখের দিকে চেয়ে বল্‌ল,—"বাবু! আরো !" অন্যমনস্কভাবে ব'লে ফেল্‌লুম,—"না থাক, কাল আবার এসো।"—একটা সিকি বালিশের নীচে থেকে বার করে' তার সাম্‌নে ফেলে দিলুম।

যুবতী উঠে, হাত তুলে মাথায় ঠেকিয়ে অভিবাদন কর্‌ল। তার চোখের পানে চাইলুম, দেখলুম সেখানে এক বিন্দু জল। সে আস্তে আস্তে সিঁড়ি বেয়ে নেমে গেল—আমি উদাসীনের মত চেয়ে রইলুম।

পরদিনও ঠিক সময়ে সে এসে হাজির হ'ল। হাত তুলে

অভিবাদন করে' দরজার পাশে বসে' পড়ে', বল্‌ল,—"বাবু! কি গাইব?" "যা হয় গাও একটা।" সে গেয়ে গেল। একের পর আর করে' ক্রমান্বয়ে কয়েকটা গান—যেন শৃঙ্খলাবদ্ধ ব্যথার ইতিহাস। বালিশ হ'তে মাথা তুলে বল্‌লুম,—"অনেক দেরী হ'য়ে গেল" একটা সিকি তার হাতে তুলে দিলুম। তার সঙ্গী লোকটা বিলম্বের জন্য বড় অধীর হ'য়ে তাড়াতাড়ি সিঁড়ি বেয়ে নেমে গেল। সে ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল, আমার মুখের উপর করুণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে' প্রশ্ন কর্‌ল। "কালকে আসব বাবু!" না—বল্‌তে পারলুম না। বল্‌লুম "এসো।" সে সিঁড়ি পর্য্যন্ত যেতেই ডেকে জিজ্ঞাসা কর্‌লুম "কি নাম তোমার?" উত্তর—হ'ল লছমী, তারপর সে আস্তে আস্তে সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে গেল।

( ২ )

'লছমী' রোজ আসে। কোন দিন তার সঙ্গে আসে পূর্ব্বের সেই কালো জোয়ানটি; আবার কোন কোন দিন একটা আট দশ বছরের ছোকরা। ছোকরাটীও বেশ সুন্দর বাজায়। এখন আর সব দিন তাকে পয়সা দিতে হয়না। যেদিন তার সঙ্গে জোয়ান লোকটি আসে, সেদিন সে পয়সার জন্যে পেয়ালাটি বাড়িয়ে ধরে। আর যেদিন ছোকরাটী আসে, সেদিন পয়সা দিলেও যাবার সময় হাত বাড়িয়ে বালিশের কোনে রেখে যায়। জিজ্ঞাসা কল্লে বলে,—"রোজ পয়সা কিসের বাবু!"

সেদিন তার সাথে এসেছিল, সেই ছোট্ট ছোকরাটী। গান-গাওয়া শেষ হ'লে লছমী পেয়ালা হ'তে একটা পয়সা নিয়ে ছোকরাটীর হাতে দিয়ে বল্লে,—"এক পয়সার পান নিয়ে আয়ত দাদ্‌!" ছোকরা পান কিন্‌তে নীচে চলে গেল।

লছমী তার বড় বড় চোখ দুটি বিস্ফারিত করে' করুণ স্বরে বলল,—"বাবু! তুমি আমায় এ নরক হতে উদ্ধার কর্ত্তে পারনা? এদের সাথে দেশ দেশান্তরে ঘুরতে যে আর ভাল লাগেনা!"

বেকার বাঙালী যুবক আমি, নিজের উদরান্নেরই সংস্থান কর্ত্তে পারিনা, তার উপর একটা নারীর ভার নেব কেমন করে? একটু ভেবে নিয়ে বল্লুম "লছমী; আমার চাকরী বাক্‌রী নেই। নিজের ভারই বহন কর্ত্তে পার্চ্ছিনা, তার উপর তোমার ভার বহন করব কেমন করে?"

সে চুপ করে' আমার কাপুরুষোচিত কথাগুলি শুনে গেল, কিছু বল্লে না। তার চোখ দুটি কেবল সজল হ'য়ে উঠল। ছোকরা পান নিয়ে ফিরে এলে সে উঠে দাঁড়াল। কিছু না বলে' মাথা নত করে' একটা নীরব অভিবাদন জানিয়ে সেদিনকার মত বিদায় নিল। বালিশের মধ্যে মাথা গুঁজে আমি ভাবতে লাগ্‌লুম—নিজের অক্ষমতার কথা। যে পুরুষ একটা আশ্রয়-ভিখারিণী নারীর বোঝা বইতে অক্ষম, মনের মধ্যে তার বিরুদ্ধে একটা উদ্দাম বিদ্রোহ জেগে উঠ্‌ল, বিছানায় পড়ে নিস্ফল ক্রোধে এপাশ ওপাশ কর্ত্তে লাগ্‌লুম।

পরদিন সকাল ৭টায় ঘুম হ'তে উঠে গোছল করে' চা খাচ্ছি মাত্র। লছ্‌মী, তার সঙ্গী সেই কালো লোকটি ও ছোকরাটীকে নিয়ে উপস্থিত হল। লছ্‌মী দরজায় দাঁড়িয়ে আমায় অভিবাদন করে' করুণ স্বরে ডাক্‌ল "বাবু!" আর কিছু সে বল্‌তে পারলনা—নীরবে দাঁড়িয়ে রইল। মুখ তুলে লছ্‌মীর পানে চাইলুম—নিজের অক্ষমতার লজ্জা চেপে রেখে বল্লুম—"কি বলছ, লছমী!"

"আমরা আজই এ শহর ছেড়ে চলে' যাচ্ছি বাবু!—আর আস্‌বনা এ দেশে"—সে আর কিছু বল্‌তে পারলনা, সজোরে নিজের বুক চেপে দরজার পাশে ধপ্‌ করে' বসে পড়্‌ল। তার সঙ্গের লোকটি তার এই বিহ্বল ভাব দেখে নিকটে এসে কাঠখোট্টা গলায় বল্‌ল, লছমী উঠ্‌, জল্‌দি—লছমী যেন ভয় খেয়ে উঠে দাঁড়াল। তার পর মাথা নত করে' আমায় অভিবাদন জানিয়ে বল্‌ল—"যাই বাবু! আর আসব না"—সে সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে গেল। আমি মাথায় হাত দিয়ে বসে নিজের কাপুরুষতার কথা ভাব্‌তে লাগ্‌লুম।

লছ্‌মী চলে গেছে আজ দু'মাস। কাপুরুষ আমি—এখনও শহরের পাথরের পথের উপর অবিরত ঘুরে বেড়াচ্ছি। কিন্তু কোনও চাকুরীর ব্যবস্থা হয়নি। ভরা-দুপুরে পথে ঘুরতে ঘুরতে যখন পরিশ্রান্ত হ'য়ে পথিপার্শ্বে কোন বাড়ীর রোয়াকে বসে' একটু জিরুবার চেষ্টা করি, চোখের সামনে ভেসে উঠে লছ্‌মীর বিদায়-বেলার সেই করুণ চাহনি। বুক ফেটে কান্না আসতে চায়—দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করে' বলি, হায় অভিশপ্ত বেকার বাঙালী—!!

———

# আলোচনা

## ছাআদৎ কলেজ ম্যাগাজিন

করটিয়া ছাআদৎ কলেজ, বাঙ্গলার দ্বিতীয় মোহছেন কর্ম্মবীর জনাব মৌলবী ওয়াজেদ আলী খান-পনী ছাহেবের বহু সৎকর্ম্মের মধ্যকার একটা প্রধানতম প্রতিষ্ঠান। মৌলবী এবরাহিম খাঁ ছাহেব কলেজের অধ্যক্ষের দায়িত্ব গ্রহণ করায় সোণায় সোহাগার কাজ হইয়াছে, এবং আমাদের বিশ্বাস, আলোচ্য ম্যাগাজিনখানি তাঁহার ও তাঁহার সহ-কর্ম্মিগণের প্রকৃত ছাত্র হিতৈষণার একটা উজ্জ্বল প্রমাণ।

"ম্যাগাজিন"—শব্দটী পাঠ করিয়া অতীতের কি এক জ্বালাময়ী স্মৃতি হঠাৎ মনে জাগিয়া উঠিল। কিন্তু "ম্যাগাজিন" আজ ইংরাজী কথা, সুতরাং সে সম্বন্ধে কিছু বলার অধিকার বোধ হয় আমাদের নাই।

"ম্যাগাজিন" উপহার পাইয়া এবং তাহার কতকগুলি প্রবন্ধ পাঠ করিয়া আমরা যাহার পর নাই আনন্দিত ও আশান্বিত হইয়াছি। প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর তরুণ যুবকদের নূতন হাতের মধুর রচনাগুলি আমাদের বেশী ভাল লাগিয়াছে বোধ হয় ইহা বয়সেরই ধর্ম্ম। লেখাপড়া শেখার আসল উদ্দেশ্য নিজের মধ্যে কর্ত্তব্য জ্ঞানের উন্মেষ সাধন এবং সেই কর্ত্তব্য পালনের শক্তি অর্জ্জন। জ্ঞানসেবা, ধর্ম্মসেবা, জনসেবা প্রভৃতি সেই কর্ত্তব্যেরই এক একটা দিক। বর্ত্তমানের কলেজ ও মাদ্রাছাগুলির মধ্যেই আমাদের ভবিষ্যৎ গঠিত হইয়া যাইতেছে। ছাআদত কলেজ ম্যাগাজিন পড়িয়া বুঝিলাম—সেখানকার অধ্যাপক ও ছাত্রগণ সেই ঈপ্সিত ভবিষ্যতের ভিত্তি নির্ম্মাণের জন্য সমবেত ভাবে চেষ্টা করিতেছেন। ব্যর্থ বাবদুকতা এবং অনর্থক সমাস বিন্যাসের পরিবর্ত্তে তাঁহারা বাস্তব ও সত্যকার তরুণের অভিযান আরম্ভ করিয়াছেন—সাধনা ও তপস্যার মধ্য দিয়া। উগ্রতীব্র চণ্ডরুদ্র প্রভৃতি শব্দগুলি কবিতার ছন্দবন্ধের সৌষ্ঠব সাধনে উপকার জনক হইলেও, তরুণের অন্তঃকরণ তাহার স্থান আদৌ নহে। নিজের ভিতরকার অসংখ্য উত্তেজনা লইয়াই সে অস্থির, তাহার উপর বিকাশের নামে নূতন বিকারের সৃষ্টি করা, আর তাহার সংযম, সাধনা ও তপস্যার মস্তকে নির্ম্মমভাবে লগুড়াঘাত করা একই কথা। শান্ত সংযত এবং স্বায়ত্ত মন ও মস্তিষ্ক ব্যতীত কোন সাত্ত্বিক সাধনাই সিদ্ধিলাভ করিতে পারে না—তরুণ সাধকগণের জন্য একথা বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য। সুখের বিষয়, ছাআদাৎ কলেজের ছাআদৎ-মন্দ তরুণগণ নিজেদের শুভানুধ্যায়ী পরিচালকগণের তত্ত্বাবধানে এই সত্যটি উপলব্ধি করিয়াছেন। ছাআদত কলেজ, কলেজ ম্যাগজিন এবং তাহার সমস্ত শুভ প্রচেষ্টা আল্লার আশীর্ব্বাদ মণ্ডিত হউক!

---

## লেখকগণের প্রতি

যে সকল মহানুভব ভ্রাতা ভগিনী অনুগ্রহপূর্ব্বক মাসিক মোহাম্মদীর জন্য প্রবন্ধাদি পাঠাইয়া থাকেন, তাঁহাদিগকে আমরা আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি, এবং অনেক সময় অনেক লেখকের প্রবন্ধ ও কবিতা পত্রস্থ করিতে পারিনা বলিয়া তাঁহাদের খেদমতে বিনীত ভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। যে সকল সদাশয় বন্ধু তাঁহাদের লেখা প্রকাশ না হওয়ার কারণ জানিবার জন্য পুনঃ পুনঃ তাকিদ পত্র পাঠাইয়া থাকেন, তাঁহাদের খেদমতে নিবেদন করিতে বাধ্য হইতেছি যে, এই প্রকার কৈফিয়ৎ দেওয়া আমাদের পক্ষে সম্ভব নহে, সঙ্গতও নহে। কারণ, তাহা সকল সময় সকলের

পক্ষে প্রীতিকর নাও হইতে পারে। অবশ্য অমনোনীত প্রবন্ধগুলি যাহাতে যথাসম্ভব সত্বর ফেরৎ পাঠাইবার ব্যবস্থা হয়, সে সম্বন্ধে যথাসাধ্য চেষ্টার ত্রুটি হইবে না। এ প্রসঙ্গে স্পষ্ট করিয়া বলিয়া দেওয়া দরকার যে, মাসিক পত্রের সম্পাদকগণ ভাল প্রবন্ধ পাওয়ার জন্য নিজেরাই ব্যগ্র হইয়া থাকেন, এমনকি এজন্য অবস্থাভেদে লেখকগণের খেদমতে কিছু নজরানা পেশ করিতেও তাঁহারা কুণ্ঠিত হন না। আমাদের মনে হয়, মুছলমান-মাসিকের কর্ত্তৃপক্ষকে এই শ্রেণীর লেখকের দৈন্যটা খুব বেশী রকম অনুভব করিতে হয়। তত্রাচ কতকগুলি লেখা যে কেন প্রকাশিত হয় না, তাহার কারণ সকলে সহজেই নির্দ্ধারণ করিতে পারেন।

কবিতা লেখক বন্ধুগণের খেদমতে আমাদের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ—তাঁহারা যেন নকল রাখিতে বিস্মৃত না হন। কবিতা ফেরৎ পাঠান আমাদের পক্ষে সম্ভবপর হইবে না। কারণ, কবিতার নকল রাখিয়া লওয়া লেখকগণের পক্ষে মোটেই কষ্টকর নহে। পক্ষান্তরে প্রত্যেক সপ্তাহে এত বেশী কবিতা আমাদের হস্তগত হয় যে, পড়ার সঙ্গে সঙ্গে আবার সেগুলি ফেরৎ পাঠাইবার ব্যবস্থা করিতে হইলে, সেজন্য একজন স্বতন্ত্র কর্ম্মচারীর আবশ্যক হইয়া পড়ে।

মুছলমান লেখকগণ জ্ঞানগর্ভ ও গভীর গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধ লিখিতে অভ্যস্ত হউন, জ্ঞানের নূতন তত্ত্ব ও সাধনার অভিনব বৈশিষ্ট্য দ্বারা সমাজকে আনন্দ ও গৌরবদান করিতে থাকুন, ইহাই হইতেছে আমাদের অন্তরের আকাঙ্খা। ভাসা ভাসা ও হাল্‌কা হাল্‌কা বিষয়ে আত্মতৃপ্তি লাভের বর্ত্তমান সাধারণ আগ্রহটা কিন্তু এ আকাঙ্খার সম্পূর্ণ প্রতিকূল। কোন একটা বিষয় সম্বন্ধে কিছু বলিবার পূর্ব্বে তাহার সব দিককার সব কথা প্রথমে ভাল করিয়া জানা শোনার দরকার, এবং সেজন্য সাধনা ও আগ্রহের খুবই আবশ্যক হইয়া থাকে। কিন্তু গভীর দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে যে, এই সাধনার বিশেষ কোনও আভাস আজও আমাদের মধ্যে পাওয়া যাইতেছে না। শাস্ত্রে সাহিত্যে, দর্শনে বিজ্ঞানে, ভূগোলে খগোলে, ইতিহাসে সমাজতত্ত্বে, এক কথায় আমাদের অতীতে ও বর্ত্তমানে ভাবার ও সাধনার বিষয় অনেক আছে। কিন্তু সে দিকটার প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করাই যেন আমাদের শ্রম-বিমুখ সাধন-বিমুখ বর্ত্তমান সমাজ জীবনের একটা বৈশিষ্ট্যে পরিণত হইয়াছে। নিতান্ত লঘু অস্থায়ী ও অন্তঃসার শূন্য বিষয়-গুলিই তাই আমাদের আত্মতৃপ্তির উপকরণে পরিণত হইয়াছে। দুঃখের কথা আর কি বলিব, যাঁহারা কোন ভাল বিষয় লিখিতে চেষ্টা করেন, তাঁহাদের অনেকেই আবার এত অল্পে তৃপ্ত যে, অতিশয় সহজলভ্য Second hand "বিক্রি ওয়ালার" দোকানের বাহিরে যাইতে তাঁহারা খুব কমই প্রস্তুত হইয়া থাকেন। নিতান্ত আবশ্যক হইয়া পড়ায় এই অপ্রীতিকর কথাগুলি এমন খোলাখুলি ভাবে আরজ করিতে বাধ্য হইলাম। আশা করি, সমাজের বিচক্ষণ ব্যক্তিগণ এই নিবেদনটীকে যথাভাবে গ্রহণ করিতে কুণ্ঠিত হইবেন না।

---

## সম্পাদকের কৈফিয়ৎ

দ্বিতীয় সংখ্যায় মাসিক মোহাম্মদীতে উন্মেষ শীর্ষক একটী কবিতা প্রকাশিত হইয়াছে। এই কবিতাটী কিছুকাল পূর্ব্বে অন্য কোন মাসিকে প্রকাশিত হইয়াছিল—এই অজুহাতে একখানা সংবাদপত্র আমাদিগকে তাঁহার বিশিষ্ট ভাষায় আক্রমণ করিয়াছেন। এ সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য এই যে, আলোচ্য কবিতাটী, তাহার রচয়িতা নিজেই আমাদিগকে দিয়া গিয়াছিলেন। অধিকন্তু যে মাসিকে উহা প্রকাশিত হইয়াছে বলিয়া অভিযোগ, এ অধমের পক্ষে আজ পর্য্যন্ত তাহা পাঠ করার সৌভাগ্য ঘটিয়া উঠে নাই।

---

Printed and Published by Md. Khairul Anam Khan from the "Mohammadi Press,"
29, Upper Circular Road, Calcutta.

চৈত্র, ১৩৩৪ ষষ্ঠ সংখ্যা

মাসিক

# মোহাম্মদী

সম্পাদক—

বার্ষিক মূল্য সডাক তিন টাকা মোহাম্মদ আকরম খাঁ প্রতি সংখ্যা সাড়ে চারি আনা

# সূচীপত্র—চৈত্র ১৩৩৪

# বি, গাঙ্গুলী

## মেগাফোন এজেন্সী

### ৪৯নং ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

মেগাফোন এখন বাজারে উৎকৃষ্ট বলিয়া পরিচিত। কলিকাতায় আমরাই মেগাফোনের একমাত্র এজেন্ট। সিঙ্গেল স্প্রীং চোং সমেত ৪৩৲ চোংশূন্য ৩৫৲ ডবল স্প্রীং ৫০৲ হইতে ৭৫৲ এবং ট্রিপিল স্প্রীং ১২৫৲। হারমোনিয়াম সিঙ্গেল রীড ১৫৲ ডবল রীড ২৫৲ পাইবেন।

**জিনিস সুন্দর ও মজবুত না হইলে নিজেদের খরচায় ফেরত লই।**

আমরা পাইকারী ও খুচরা মাল সরবরাহ করিয়া থাকি। যে কোন রকমের গ্রামোফোন পার্ট সরবরাহ করিয়া থাকি। আমরা তিন মাসের জন্য এই কাগজে লিখিব অনুগ্রহ করিয়া ঠিকানা রাখুন।

গ্রামোফোন, হারমোনিয়ম ও বাদ্য যন্ত্রের জন্য আমাদের লিখুন।

---

## মিশ্রিত ধাতুর গহনা

তাম্র, দস্তা, পিতল ইত্যাদি ধাতুর সংমিশ্রণে নূতন বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায়,: এই মেডেল আবিষ্কৃত হইয়াছে ইহা ব্যবহারে আসল গিনি স্বর্ণের ন্যায় রং থাকে। বাজে কেমিকেল নয়—

অনন্ত

১নং অনন্ত প্রমাণ ও মাঝারি ১ জোড়া ৪৲ ছোট ২॥০ ১নং পালং পাতা বালা প্রমাণ ও মাঝারি ১জোড়া ৩॥০ ছোট ফিতা পেটান ১ জোড়া ১৷০ গুলী বিছা হার ১ ছড়া ২।০ ঝার বরফি চুড়ি ১২ গাছা মূল্য ২৲।

স্প্রিং বরফি চুড়ি ইহা ছোট বড় সকল হাতে পরান মূল্য ২।০ ১নং মটর মালা মূল্য ৩।০ সিতি ২.ছড়া ২৲ বিস্কুট হার ১ ছড়া ৬৲ টাকা।

**আবদুল গোফুর**

১৬।১নং হ্যারিসন রোড, রুম নং ১৪ কলিকাতা।

---

بسم الله الرحمن الرحيم
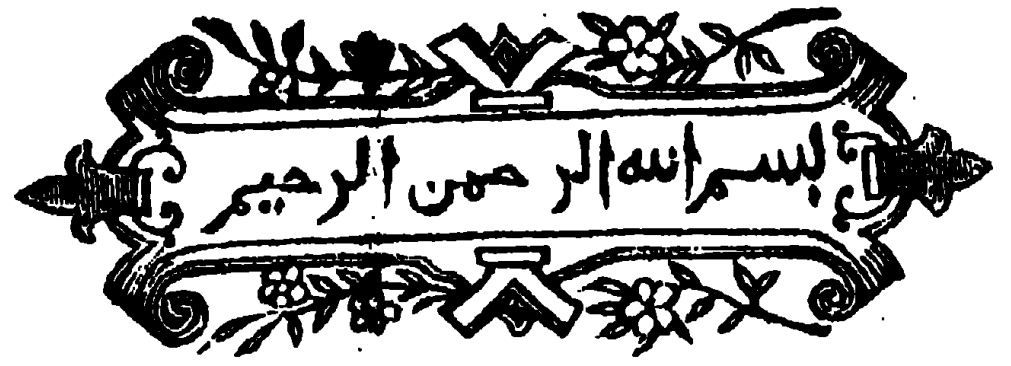
নিম্নোক্ত ঔষধগুলি ২১ বৎসর যাবৎ দেশে বিখ্যাত। অনারোগ্যে মূল্য ফেরৎ। অন্যথায় ৫০ টাকা দণ্ড দেওয়ার আইন হইল।

ঔষধগুলি ফকিরের দেওয়া। তাঁহার আদেশ এই যে প্রত্যেক রোগী ঔষধ ব্যবহারের পূর্ব্বে আল্লার নামে /৫ পয়সা ভিক্ষুককে দান করিবেন।

ধ্বজভঙ্গ ১১ দিনে আরোগ্য হয়। মূল্য ২৸/০
ধাতুদৌর্ব্বল্য ৭ দিনে " " " ২৸/০
সর্ব্বপ্রকার মেহ ৭ দিনে " " " ২।০
প্লীহা যকৃতাদি ৬ দিনে " " " ১।/০
সর্ব্বপ্রকার জ্বর ১দিনে " " " ॥০

**ডাঃ এম, এ, জাহির**

নাভার সিংহাসনচ্যুত এবং ইংরাজ-কবলে বন্দী হতভাগ্য মহারাজ

রিপু দমন সিংহ

( বিশেষ বিবরণ আলোচনা প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য )

"মোহাম্মদী প্রেস"

# মাসিক মোহাম্মদী

প্রথম বর্ষ || চৈত্র ১৩৩৪ সাল। || ষষ্ঠ সংখ্যা


## বাংলাভাষা ও মুসলমান


[ সৈয়দ এমদাদ আলী ]


মুসলমানদের মধ্যে কেহ কেহ আজকাল বলিয়া থাকেন, লেখ্য ভাষা নামে যে ভাষা বাংলা সাহিত্যে চলিয়া আসিতেছে, উহাকে সাহিত্যের প্রাঙ্গণ হইতে দূর করিয়া দিয়া সেই স্থানে কথ্য ভাষাকে বসাইয়া দাও, নতুবা বাংলা ভাষার মুক্তি লাভ ঘটিবে না, মুসলমান বাংলা-সাহিত্য শক্তি সঞ্চয় করিয়া গড়িয়া উঠিবে না।' লেখ্য ভাষা বিকট, বিশ্রী, উহা আবার সাহিত্যে স্থান পাইবার যোগ্য! কথাটা হিন্দুগণ যত না বলেন, কয়েকজন মুসলমান লেখক তার চেয়ে চারগুণ জোর গলায় বলেন। তাঁহারা মনে করেন, তাঁহাদের আদেশ মুসলমান লেখক মাত্রেই মান্য করিয়া চলিবেন এবং তাহার ফলে তাঁহারা আলাউদ্দীনের আশ্চর্য্য-প্রদীপের সহায়ে বাংলা ভাষার নিজস্ব যে রূপ, তাহা বদলাইয়া দিতে পারিবেন।

তাঁহারা সকলেই ইংরাজী ভাষা ও সাহিত্যে সুপণ্ডিত আমাদের মত নিরেট বোকা ও মূর্খ নহেন। তাঁহাদিগকে আজ আমরা খোলাখুলি ভাবেই জিজ্ঞাসা করি, ইংরাজী ভাষার সুবিশাল সৌধ কি,লেখ্য ভাষাকে বর্জ্জন করিয়া কথ্য ভাষার উপরেই গড়িয়া উঠিয়াছে, না কথ্য ভাষাকে সুমার্জ্জিত করিয়া লেখ্য ভাষার সৃষ্টি হইয়াছে এবং সেই লেখ্য ভাষার আশ্রয়েই ইংরাজী সাহিত্য শক্তি সঞ্চয় করিয়া বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাহিত্যে পরিণত হইয়াছে? তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ Continental Literature এর সহিতও সুপরিচিত বলিয়া জানি, তাঁহারা একথা কি বলিতে পারেন যে, ইউরোপের প্রধান ভাষাগুলি লেখ্য ভাষাকে বর্জ্জন করিয়া কথ্য ভাষাকে আশ্রয় করিয়াই প্রতিষ্ঠা ও প্রতিপত্তি অর্জ্জন করিয়াছে? যুগে যুগে, দেশে দেশে ভাষা ও সাহিত্য আপনার শক্তিতে গড়িয়া উঠিয়াছে, কিন্তু তাহা লেখ্য ভাষাকে বর্জ্জন করিয়া হয় নাই, হইতে পারে না।

'আগে ভাষার সৃষ্টি হইয়াছে, পরে সাহিত্যের সৃষ্টি হইয়াছে। ভাষার সৃষ্টির মূলে কথ্য ভাষাই বর্ত্তমান।' আদিযুগে মানবগণ যে ভাবে কথা বলিতেন, তাহাকেই কোনও অপরিসীম শক্তিশালী পুরুষ ভাষা নাম দিয়া কতকগুলি নিয়মের অধীন করিয়া দেন। তখন সাহিত্যের রচনা হইত মুখে মুখে। কিন্তু যেমন দিন যাইতে লাগিল, মানবের চিন্তা শক্তিরও সেইরূপ উন্মেষ হইতে লাগিল, তখন সর্ব্বাপেক্ষা বড় প্রয়োজন দাঁড়াইল লিপি-প্রণালীর

প্রচলন। কবে কোন্ সুদূর অতীতে কাহারা এই লিপি প্রণালী প্রচলন করিয়াছিলেন, ইতিহাসে সে বিষয় লেখা নাই, তবুও তাঁহারাই যে মানব জাতির উন্নতির মহান সূচনা করিয়া দিয়াছিলেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। বর্ণমালার সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গেই সাহিত্যের সৃষ্টি আরম্ভ হইল, প্রথমতঃ কথ্য ভাষার ভিতর দিয়া। এইরূপে' যেমন দিন যাইতে লাগিল, তেমনি অল্প অল্প করিয়া কথ্য ভাষার সংস্কার হইতে লাগিল, শেষে কথ্য ভাষার স্থান সাহিত্যে অতি সামান্যই রহিয়া গেল—মার্জ্জিত ভাষা লেখ্য ভাষা নামে সাহিত্যের বিরাট দেহ অধিকার করিয়া বসিল।'

'কেবল আমাদের দেশেই যে কথ্য ভাষাকে স্থানচ্যুত করিয়া লেখ্য ভাষা সাহিত্যের আদর্শ ভাষা হইয়া দাঁড়াইয়াছে এমন নহে, সকল দেশেরই সাহিত্যের আদর্শ ভাষা হইল লেখ্য ভাষা। ইংরাজী সাহিত্যের কথাই ধরুন। ইংল্যাণ্ড, স্কটল্যাণ্ড ও ওয়েল্‌সের ভাষা ইংরাজী। কিন্তু কাউন্টি ভেদে তথায় ও যে কথ্য ভাষায় যথেষ্ট পার্থক্য বিদ্যমান রহিয়াছে, ইংরাজী উপন্যাস ও নাটক পাঠে তাহার কতকটা পরিচয় পাওয়া যায়।' যাঁহারা সে দেশে বাস ও ভ্রমণ করিবার সুযোগ ও সৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা ত উহা বিশেষ ভাবেই লক্ষ্য করিয়াছেন। বর্ত্তমান জগতে ইংরজী ভাষা ও সাহিত্যের শ্রেষ্ঠত্ব অবিসংবাদিত কিন্তু আমরা কি জিজ্ঞাসা করিতে পারি, ইংরাজী সাহিত্য কি কথ্য ভাষার ভিতর দিয়াই নিজের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে, না লেখ্য ভাষাকে অবলম্বন করিয়াই উহা উহার এই বর্ত্তমান সম্পদ ও গৌরবের অবস্থায় আসিয়া পঁহুছিয়াছে ?

'আমাদের দেশে যাঁহারা কথ্যভাষার দালালী করেন, তাঁহারা যদি একথা বলেন যে, খাঁটি কথ্য ভাষায়ই তাঁহারা সাহিত্য রচনা করেন, তাহা হইলে কি ইহা বুঝিতে হইবে না যে, তাঁহারা সত্যের পথ হইতে অনেক দূরে সরিয়া পড়িয়াছেন ? তাঁহারা লেখ্য ভাষাকে আশ্রয় করিয়াই তাঁহাদের উজ্জ্বল রচনা গুলি গাঁথিয়া তুলেন, পরিবর্ত্তনের মধ্যে তাঁহারা এই করেন যে, সাধারণ বাংলা ক্রিয়াপদ গুলিকে তাঁহারা কেবলমাত্র পশ্চিম বঙ্গের কথ্য ভাষার আকার দিয়া থাকেন। এইটুকু করিয়াই তাঁহারা মনে করেন যে, বাংলা ভাষার রূপ তাঁহারা আমূল পরিবর্ত্তন করিয়া দিয়াছেন!' মোট কথা এই যে, তাঁহাদের ও আমাদের আসল বেসাতী লেখ্য ভাষা ব্যতীত আর কিছুই নহে। উহা লইয়াই আমরা উভয় দল বেচাকেনা করি, 'পার্থক্য কেবল ক্রিয়াপদের সমাবেশের মধ্যে।' আমরা একথা বলিনা যে, বীরবলি ভাষা অচল, অকেজো; উহা চলিতেছে, চলুক। উহাকে গতি দিয়াছেন রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথের প্রভাবে বাংলা সাহিত্যে এই সামান্য পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে সত্য, কিন্তু বাংলার দৈনিক, সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্র ও পত্রিকাগুলির পৌনে ষোল আনার ও বেশীর ভাগ লেখ্য ভাষার প্রাধান্যই কীর্ত্তন করিতেছে। বাংলার কথা সাহিত্যের আদর্শ ও লেখ্য ভাষাকে অতিক্রম করিয়া কথ্যভাষা হইয়া দাঁড়ায় নাই। ইহার অর্থ এই যে, লেখ্যভাষা নিজের স্থানেই সুপ্রতিষ্ঠিত আছে এবং চিরদিনই থাকিবে। কথ্যভাষার প্রচলন চেষ্টা একটা সাময়িক উচ্ছ্বাস মাত্র। এই উচ্ছ্বাস জল-বুদ্‌বুদের মত কালের বুকে মিলাইয়া যাইবে।' কেন এমন হইবে তাহা খুলিয়া বলা দরকার।

সকলে জানেন,'পশ্চিম বঙ্গের নানা জিলার কথ্য ভাষা নানারূপ। আবার পূর্ব্ববঙ্গ বা উত্তর বঙ্গের কথ্য ভাষার সহিত যেমন পরস্পরের মিল নাই, তেমনি উহার কাহারও সহিত পশ্চিম বঙ্গের কথ্য ভাষারও মিল নাই। কিন্তু এই প্রভেদকে ডুবাইয়া দিয়া বাঙ্গালীর জন্য যে এক সাধারন ভাষার সৃষ্টি হইয়াছে, তাহাই লেখ্যভাষা নামে পরিচিত হইয়াছে। এই লেখ্য ভাষাকে বর্জ্জন করিয়া কথ্য ভাষার প্রচলন করিতে গেলে বাংলার অধিবাসীকে বহুধা বিভক্ত করিয়া দিতে হয়। আমাদের প্রতিপক্ষগণ হয়ত বলিবেন, লেখ্য ভাষাকে কথ্য ভাষার অর্থাৎ কলিকাতার কথ্যভাষার ছাঁচে ঢালিয়া চালাইলেই সকল গোল মিটিয়া যাইতে পারে। কিন্তু তাঁহারা যখন একথাটা বলেন, তখন তাঁহারা Climatic influence বলিয়া যে একটা কথা আছে, তাহা ভুলিয়া যান। কথ্যভাষার ভিতরকার আব-হাওয়ার এই প্রাধান্য তাঁহারা রোধ করিবেন কি করিয়া ? দুই চারিজন শিক্ষিত ব্যক্তি পশ্চিম বঙ্গের কথ্যভাষার আবৃত্তি করিলে বা করিতে সক্ষম হইলেই যে, উহা দেশের আপামার সাধারণের গ্রহণীয় হইয়া গেল বা তাহারা উহা গ্রহণ করিল, কোন প্রকারেই একথা বলা যায় না।'

বাংলা ভাষার গতি নির্দ্দেশ করিতে গেলে একটা বিষয়

খুব বড় হইয়া আমাদের চোখে ঠেকে। সে হইতেছে সরল, প্রাঞ্জল ও হৃদয়গ্রাহী ভাষা দ্বারা ভাব প্রকাশের চেষ্টা। কাদম্বরীর ভাষায় এখন আর কেহ সাহিত্য সৃষ্টি করেন না। রাজা রামমোহন, বিদ্যাসাগর, অক্ষয় দত্ত, বঙ্কিম চন্দ্র, কালী প্রসন্ন ঘোষ বা অক্ষয়চন্দ্র সরকার প্রভৃতির ভাষাও এখন Classicএর সামিল হইয়াছে। এখন সহজ, সরল শব্দ ও ছোট ছোট বাক্যের দ্বারা ভাব প্রকাশের রীতি তাহাদের স্থান অধিকার করিয়াছে বা করিতেছে। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতির রচনা তাহার নিদর্শন। ইহার মূলে যে আদর্শ বিদ্যমান রহিয়াছে, তাহার উদ্দেশ্যকে মহান আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে, কারণ এতদ্দ্বারা নানাবিধ কথ্য ভাষা প্রচলিত বাংলা দেশে সকলের উপযোগী, সর্ব্বসাধারণের বুঝিবার উপযোগী, এক সাধারণ ভাষা গড়িয়া উঠিতেছে। 'বাংলা সাহিত্যকে যদি আমরা বাঙ্গালী হিন্দু-মুসলমানের মিলনক্ষেত্র বলিয়া ধরিয়া লই, তাহা হইলে এইরূপ ভাষা প্রচলনের যে সার্থকতা আছে, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। ইহার ফলে ভাব প্রকাশের জন্য অনুকূল যে সকল আরবী ফারসী ও তুর্কী শব্দ বাংলা ভাষায় বহুদিন হইতে প্রচলিত আছে, তাহাদের ব্যবহার অনিবার্য্য হইয়া পড়িবে। সকল দেশেই নানা ভাষা হইতে নিত্য নূতন নূতন শব্দ গৃহীত হইতেছে, ভাষার শক্তি ও সম্পদ বৃদ্ধি করিবার জন্য। কেবল বাংলা সাহিত্যেই কি একদল লোকের গোঁড়ামীর জন্য তথাকথিত ভাষার পবিত্রতা রক্ষার উদ্দেশ্যে মুসলমানী শব্দের প্রচলন বন্ধ রাখিতে হইবে? যাঁহারা বাংলা ভাষার বুক হইতে মুসলমানী ছাপটি অবলীলাক্রমে মুছিয়া ফেলিতে তৎপর, তাঁহারা যে হিন্দু-মুসলমান অধ্যুষিত এই বাংলা দেশের পরম শত্রু, তাহাতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই।'

মুসলমানী শব্দের প্রচলন-বিরোধী যেমন একদল আছেন, অত্যধিক আরবী, ফারসী শব্দের প্রচলনকামীও আর একদল আছেন। ইঁহারা মনে করেন হিন্দী ভাষার ভিতরে অত্যধিক আরবী ফারসী শব্দের প্রচলন করিয়া যদি উহাকে উর্দ্দু ভাষায় পরিণত করিয়া খুব ভাল রকমেই কাজ চলিতে পারে, তবে আমরা কেন বাংলা ভাষাকে ঠিক তেমনি ভাবে রূপান্তরিত করিতে পারিব না? করিতে পারিবেন না এই জন্য যে, উহাতে বাংলা ভাষার দ্বিখণ্ডিত হইবার সম্ভাবনা খুব বেশী এবং এইরূপ দ্বিখণ্ডিত করার ফলে দেশের কোন মঙ্গল হইবে না। হিন্দী ও উর্দ্দু ভাষার একই বুনিয়াদ। যাঁহারা হিন্দী জানেন, কিন্তু উর্দ্দু জানেন না, তাঁহারাও উর্দ্দু মোটামুটি ভাবে বুঝিতে পারেন। উর্দ্দু ভাষার পক্ষেও ঠিক সেই কথাই প্রয়োগ করা যাইতে পারে। কিন্তু বাংলা ভাষাকে যদি এমন ভাবে দ্বিখণ্ডিত করা হয় যে, একপক্ষ কেবল সংস্কৃত ভাষার আনুগত্য স্বীকার করিয়া চলিবেন, আর একপক্ষ কেবল আরবী ফারসীর দামামা বাজাইবেন, তাহা হইলে দুই দলের মধ্যে এমন পার্থক্য দাঁড়াইয়া যাইবে যে, কেহ আর কাহারও ভাষা বুঝিবেন না। তখন বাঙ্গালী হিন্দু ও বাঙ্গালী মুসলমানের ভাষা স্বতন্ত্র হইয়া পড়িবে। আমাদের মনে হয়, মধ্যপথ অবলম্বন করিলেই সকল দিক বজায় থাকিতে পারে। হিন্দু ও প্রচলিত মুসলমানী শব্দকে বর্জ্জন করিবেন না, মুসলমানও অত্যধিক আরবী, ফারসী শব্দের প্রয়োগ করিয়া বাংলা ভাষার যাহা নিজস্ব রূপ, তাহা বদ্‌লাইয়া দিবেন না।

আজকাল আমাদের মধ্যে দু-একজন মুসলমান লেখক তাঁহাদের রচনার মধ্যে বহু দুর্ব্বোধ ও কঠিন অনাবশ্যক আরবী, ফারসী শব্দের অবাধ প্রচলনে বিশেষ মনোযোগী হইয়াছেন। আরবী ফারসী অভিধানের সাহায্য না লইয়া সেই সকল শব্দের অর্থ গ্রহণ করা বাংলা সাহিত্যের সাধারণ মুসলমান পাঠকদের পক্ষে অসম্ভব, হিন্দুর ত কথাই নাই। ইঁহাদের যে কোন বাংলা রচনার অর্দ্ধেকই ঐরূপ শব্দে ভরা থাকে এবং ইঁহারা এত বিবেচক যে, দয়া করিয়া ফুট নোটেও তাহাদের প্রতিশব্দ দেন না। ফলে এই হয় যে, তাঁহাদের রচনা মাঠে মারা যায়, ততটা কষ্ট স্বীকার করিয়া কেহ উহা পড়িতে চাহেন না। কোন কোন হিন্দু লেখক নিজেদের রচনায় সহজ ও দেশ-প্রচলিত আরবী ফারসী শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকেন। উহাতে ভাষার সৌষ্টব ও সম্পদ বৃদ্ধি পায়। ইঁহারা দেশ ও জাতির দিক দিয়া প্রকৃতই ধন্যবাদার্হ। পরলোকগত কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তই সর্ব্বপ্রথম তাঁহার রচনায় মুসলমানী শব্দ ব্যবহার করিতে আরম্ভ করেন, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে এ জন্য তাঁহার নাম তাঁহার কবি-প্রতিভার মতই চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে।

কবি নজরুল ইসলাম তাঁহার কবিতা-নিচয়ে বহু আরবী ফারসী শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকেন। আমাদের মনে হয়, বাংলা ভাষার শক্তি ও শব্দ সম্পদ বৃদ্ধি করিবার জন্যই তিনি ঐরূপ করিয়া থাকেন। আমরা একথা স্বীকার করিতে বাধ্য নই যে, তাঁহার বাংলা শব্দের সঞ্চয় কম বলিয়াই তিনি মিলের সন্ধানে ছুটিয়া যান আরবী ফারসীর দিকে। বাংলা ভাষার চেয়ে যদি তিনি আরবী ফারসীতে বেশী সুপণ্ডিত হইতেন, তবুও বরং একথা বলা উচিত। তিনি তাহা নন বলিয়াই আমরা এই বীরবলী মতটি গ্রহণ করিতে একান্ত নারাজ। নজরুল ইসলামের মতের উপাসক না হইয়াও বাংলা কবিতায় আরবী ফারসী শব্দের সুপ্রয়োগকে আমরা ভাষার শব্দ-সম্পদ বৃদ্ধির সহায়ক বলিয়া সমর্থন করি। নজরুল ইসলাম যে সকল আরবী ফারসী শব্দ ব্যবহার করেন, তিনি সেই সকল শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ দিতে কৃপণতা করেন না। তাহাতে এই সুফল ফলিয়াছে যে, নজরুল ইসলামের ব্যবহৃত অনেক আরবী ফারসী শব্দ তরুণ হিন্দু কবিগণ অবাধে ব্যবহার করিয়া থাকেন। ভাব প্রকাশের পক্ষে উহাদের প্রয়োজন অত্যধিক বলিয়াই তাঁহারা ঐরূপ করেন।

কিন্তু একথাও আমরা বলিতে বাধ্য যে, আরবী-ফারসী অভিধান খুলিয়া কঠিন কঠিন শব্দোচ্চারণ পূর্ব্বক উহাদিগকে খুব বেশী করিয়া ব্যবহার করিলেই বাংলা সাহিত্যে ইসলামের প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হইবে না। সকলের আগে ব্যবহার করিতে হইবে সেই সকল শব্দ, যাহা বাংলার মুসলমান সমাজে নিত্যপ্রচলিত এবং যাহা বুঝিতে বাঙ্গালী হিন্দুর কোনই কষ্ট হয় না। আমাদের আসল কাজ হইল ইসলামী ভাব ও আদর্শ প্রচার—ইসলামের স্বরূপ, সভ্যতা ও কাল্‌চার (culture) বাংলার অধিবাসীদের সম্মুখে উপস্থাপিত করা। আজ ইংল্যাণ্ডে ওকিং মসজিদের শ্রদ্ধাস্পদ প্রচারকগণ যে ইংরাজী ভাষায় ইসলাম প্রচার করিতেছেন, তাহার মধ্যে কি তাঁহারা গাড়ী বোঝাই করিয়া আরবী-ফারসী শব্দের আম্‌দানী করেন? না, তাহা করেন না, করিলে তাঁহাদের সকল শ্রম ব্যর্থ হইয়া যাইত, কোন ইংরাজই তাহা হইলে তাঁহাদের বক্তৃতা শ্রবণ করিতেন না বা রচনা আগ্রহ সহকারে পাঠ করিতেন না। ইংরাজী সাহিত্যের আদর্শ ও আভিজাত্যকে অক্ষুন্ন রাখিয়াই তাঁহারা খাঁটি ইংরাজের ভাষায় তাঁহাদের পবিত্র ব্রত উদ্‌যাপন করিতেছেন—ইসলামের মহানবাণী প্রচার করিতেছেন। ইহার সুফল এই দাঁড়াইয়াছে যে, প্রতিদিন মোসলেম ইংরাজের সংখ্যা বাড়িয়াই চলিয়াছে। ইহাকে ইংরাজের দেশে, যে দেশ হইতে ইসলামকে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী করিয়া আক্রমণ করা হইয়াছে সেই দেশে, ইসলামের বাণী ও আদর্শের জয় বলিয়া আপনারা ধরিয়া লইতে পারেন।

বাংলা ভাষাকে দ্বিখণ্ডিত না করিয়া প্রচলিত ভাষার মধ্য দিয়াই মুসলমানদিগকে ইসলামের বাণী ও মহত্ত্ব প্রচার করিতে হইবে। এতদুপলক্ষে অনেক আরবী ফারসী শব্দ ক্রমে ক্রমে বাংলা ভাষার অধিকার-সীমার মধ্যে নিজেদের স্থান করিয়া লইতে পারিবে। ইহা হইতে কেহ যেন মনে না করেন যে, উর্দ্দু ভাষার মত বাংলা ভাষায়ও এত আরবী ফারসী শব্দের আমদানী হইবে যে, তাহা পরিশেষে আরবী ফারসী শব্দেরই আগার হইয়া যাইবে। প্রাচীন বাংলা পুঁথির ভিতর দিয়া এ চেষ্টা একবার হইয়াছিল, কিন্তু ভাষা ও সাহিত্যের হিসাবে তাহার ফল শুভ হয় নাই। বাংলা পুঁথির ভাষা নিজের গণ্ডী ছাড়াইয়া উপরে উঠিতে পারে নাই। পূর্ব্বে বলিয়াছি, কেবল কতকগুলি শব্দের প্রয়োগ দ্বারা ভাষা ও সাহিত্যে ইসলামী ছাপ আঁকিয়া দেওয়া অসম্ভব। আবার বলিতেছি উহা নিরর্থক প্রয়াসই হইবে। ট্রেডমার্ক ব্যবসায় ক্ষেত্রে চলিতে পারে, চলিয়া থাকে; কিন্তু সাহিত্যে উহার একেবারেই স্থান নাই,—উহা একেবারে অচল। এই কথাটা ভুলিলে চলিবেনা যে, কোন রচনার শ্রেষ্ঠত্ব কতকগুলি কঠিন ও অপ্রচলিত ভিন্ন ভাষার শব্দের প্রয়োগ দ্বারা নির্ণীত হয় না, উহা হয় সরল, প্রাঞ্জল ও হৃদয়-গ্রাহী করিয়া ভাব ও আদর্শকে রূপ দিতে পারিলে। বাংলা ভাষার সময়োচিত সেবা না করিয়া অপরাধ আমরা করিয়াছি, তাহার প্রায়শ্চিত্তের ভার অন্যের ঘাড়ে চাপাইলে চলিবে না, সে আমাদেরই করিতে হইবে।

এখন আমাদের সাহিত্যকে হিন্দুগণ গ্রাহ্য করেন না, সে জন্য দুঃখ করিয়া লাভ নাই। আমাদিগকে বিপুল সাধনায় আত্মনিয়োগ করিতে হইবে। এই সাধনার ভিতর দিয়া আমরা যে সাহিত্য গড়িয়া তুলিব, সে সাহিত্য নিশ্চয়ই কাহারও উপেক্ষার জিনিষ হইবে না,—সে সাহিত্যকে সসম্মানে বাংলার সকল জাতিকেই গ্রহণ করিতে হইবে।

আপনারা মনে রাখিবেন ইহা নিরর্থক আশা নহে। বাংলার শিক্ষিত মুসলমানদের এই আশাকে সফল করিয়া দিয়া প্রমাণ করিতে হইবে যে, চিরদিন পতিত ও পদানত থাকিবার জন্যই বাংলার মুসলমানের জন্ম হয় নাই। আমরা জাগরণের বাণী শুনিয়াছি, সাহিত্যের ভিতর দিয়া আমাদের এই জাগরণকে মূর্ত্ত করিয়া তুলিতে হইবে।

বাংলা ভাষা এতদিন হিন্দুর দান গ্রহন করিয়াছে, এইবার তাহাকে মুসলমানের দানও গ্রহণ করিতে হইবে—অনুগ্রহ করিয়া নহে, আগ্রহের সহিতই গ্রহণ করিতে হইবে। বাংলার তরুণ মোস্‌লেম সাহিত্যিকদের রচনায় আমরা যে আশার আলোক দেখিয়াছি, তাহা অসাধারণ না হইলেও উপেক্ষণীয় নহে। তাঁহারা আমাদের সাহিত্যিক সাধনার প্রথম যাত্রীর দল, দুর্য্যোগের মধ্য দিয়াই তাঁহাদিগকে চলিতে হইবে, বন্ধুর পথকে সুগম করিয়া দিয়া। ইহাই তাঁহাদের কাজ, পরবর্ত্তীদল সেই পথ বহিয়াই জয়যাত্রা করিবেন।

বাংলা সাহিত্যের তরুণ মোসলেম সাধকগণ, তোমাদের মধ্যে কে বড়, কে ছোট তাহা ভাবিবার অবসর এখন তোমাদের নাই, ওদিকে তোমরা মন দিও না। তোমরা কাজ করিয়া যাও,—ইসলামের জন্য, নিজের দেশ ও জাতির জন্য, সকল ভুলিয়া তোমরা সাহিত্য সাধনার আত্মনিয়োগ কর। একথা ভুলিওনা যে, আল্লাহ তোমাদের হাতেই বাংলার মুসলমানের সকল প্রকার মঙ্গলের ভার দিয়াছেন। এখন বড় ছোটর বিচার করিতে গেলে তোমাদের মধ্যে বিরুদ্ধ মতের বিভিন্ন দল গড়িয়া উঠিবে এবং তাহার অবশ্যম্ভাবী ফলে যে হিংসার ভাব মাথা তুলিয়া দাঁড়াইবে, তাহা তোমাদের সকল শ্রম এবং আমাদের সকল আশাকে ব্যর্থ করিয়া দিবে।

লেখ্য ভাষা চলিবে কি কথ্য ভাষা চলিবে, সে-বিরোধে যোগ দিয়া আমাদের কাজ নাই। আমাদের কাজ কেবল সাহিত্য সৃষ্টি—ইসলামী আদর্শপূত সাহিত্য সৃষ্টি। আমাদের লক্ষ্য হইবে এক ও অনন্য—মোসলেম বাংলার বোধগম্য সাহিত্যের সৃষ্টি করিয়া জাতির ভিতরে জাগরণ আনয়ন। এই জাগরণের ফলেই আমাদের মধ্যে যাহা কিছু অসত্য আছে, তাহা লোপ পাইবে—সত্য আপনার গৌরবে জয়যুক্ত হইয়া দর্শন দিবে—অশুভের তিরোধান হইয়া শুভ যাহা, তাহার আগমন হইবে।

---

# অকরুণা

[ মোয়াহেদ বখ্‌ত্‌ চৌধুরী ]

স্বপনের জালে ঘেরা তব ওই সুন্দর তনুখানি
কেন ধরিলে গো মুগ্ধ আমার নয়ন-সমুখে আনি,
কেন সখি বল মোরে

এমন নিঠুর চুম্বন দিলে ফাগুনের রাঙা ভোরে ?
কেন উষা আজ উতরোল হ'ল অরুণের অনুরাগে,
এমন করিয়া রাঙিয়া উঠিল সিঁদুরি মেঘের ফাগে ?
নয়ন তারার নয়ন বাণেতে নীরব হইল আঁখি
বনানীর বুকে উৎসব তোলে মুখর বনের পাখী।
কেন বল মোরে রাণী,

এমন স্বপন মোহমাখা তব অবগুণ্ঠনখানি।
কেন তব পানে চাহিতে গো আঁখি আঁখির বারতা ভোলে
মরমের কথা লুকাইয়া যায় ও ভাঙা গালের টোলে।
কেন আমি নাহি জানি—
হেন অকরুণ কৌতুক কর মোর ল'য়ে ওগো রাণি।

# এমাম বোখারী

## [ কাজী নওয়াজ খোদা ]

( ২ )

এমাম বোখারীর দেশ-ভ্রমণ ব্যাপারের বর্ণনা উপলক্ষে তাঁহার বিভিন্ন দেশের শিক্ষক মণ্ডলীর নিম্নলিখিত মত তালিকা তাঁহার জীবনীকারগণ প্রকাশ করিয়াছেন :—

**মক্কা**—আবুল ওলীদ আহ্‌মদ এব্‌নে মোহাম্মদ আজরকী, আবদুল্লা এব্‌নে মকারবী, ইসমাইল এব্‌নে আবু সালেম, আবুবকর আবদুল্লা এবনে হামিদী।

**মদিনা**—এবরাহিম এবনে মনজের হেজামী, মোতারেক এবনে আব্দিল্লা, এবরাহিম এব্‌নে হামজা, আবু সাবেত মোহাম্মদ এব্‌নে ওবায়দিল্লা, আবদুল আজীজ এব্‌নে আব্দিল্লা ওয়ায়সী।

**শাম**—মোহাম্মদ এব্‌নে ইউসফ ফারইয়াবী, আবু নসর এসহাক এব্‌নে এবরাহিম, আদম এব্‌নে আবি আয়াস, আবুল ইয়ামান হাকাম এবনে নাফে, হায়াৎ এবনে শোরায়হ।

**বোখারা**—মোহাম্মদ এব্‌নে সালাম বয়কন্দী, আবদুল্লা এব্‌নে মোহাম্মদ মসনাদী, হারুণ এব্‌নে আশয়াস্।

**মারভ্**—আলী এব্‌নে হাসান এব্‌নে শকীক, আবদান, মোহাম্মদ এব্‌নে মকাতেল।

**বালাখ**—মক্কী এব্‌নে এবরাহিম, এহইয়া এব্‌নে বেশর, মোহাম্মদ এব্‌নে আবান, হাসান এব্‌নে শোজা, এহইয়া এবনে মুসা, কোতায়বা।

**হিরাত**—আহ্‌মদ এব্‌নে আবিল ওলীদ।

**নৈশপুর**—এহইয়া এব্‌নে এহইয়া, বশর এব্‌নে হাকাম, এসহাক এব্‌নে রাহওয়ায়হে, মোহাম্মদ এব্‌নে রাফে, মোহাম্মদ এব্‌নে এহইয়া জহলী।

**রাই**—এবরাহিম এব্‌নে মুসা।

**বাগদাদ**—মোহাম্মদ এব্‌নে ঈসা, মোহাম্মদ এব্‌নে সাবেক, সুরীজ এব্‌নে নো'মান, আহ্‌মদ এব্‌নে হাম্বল।

**ওয়াসেৎ**—হাস্‌সান এব্‌নে হাস্‌সান, হাস্‌সান এবনে আব্দিল্লা, সঈদ এব্‌নে সোলায়মান।

**বাসরা**—আবু আসেম নবীল, সফওয়ান এব্‌নে ঈসা, বদল এব্‌নে মোহাব্বর হরমী এব্‌নে ওমারা, আফফান এব্‌নে মোসলেম, মোহাম্মদ এবনে আবু আরা, সোলায়মান্ এব্‌নে হারাব, আবুল ওলীদ তয়লসী, আরেম মোহাম্মদ এব্‌নে সেনান্।

**কুফা**—ওবায়দুল্লা এব্‌নে মুসা, আবু নোয়ায়ম্ আহমদ্ এব্‌নে ইয়াকুব, ইসমাইল, হাসান এব্‌নে রবী, খালেদ, সা'দ এব্‌নে হাফস, তলক্ এব্‌নে গান্নাম, ওমর এব্‌নে হাফস্ ফরুত, কবিসা এব্‌নে ওকবা, আবু গাসসান।

**মিসর**—ওসমান এব্‌নে সালেহ, সঈদ এব্‌নে সাবি মরইয়াম, আবদুল্লা এব্‌নে সালেহ, আহ্‌মদ এব্‌নে শবিব, আস্‌বাগ এব্‌নে ফারজ, সঈদ এব্‌নে ঈসা, সঈদ এব্‌নে কসীর এব্‌নে গফীর, এহইয়া এব্‌নে আব্দিল্লা।

**দ্বীপপুঞ্জ**—আহ্‌মদ এব্‌নে আব্দিল মালেক হারানী, আহ্‌মদ এব্‌নে এজীদ হারাণী, ওমর, এব্‌নে খলফ, ইসমাইল এব্‌নে আব্দিল্লা রকী।

ইঁহাদের সমসাময়িক আরও বহু মোহাদ্দেসের নিকট হইতে এমাম সাহেব শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন। উপরিলিখিত স্থান সমূহে তিনি হাদিস শিক্ষার্থে একাধিকবার গিয়াছেন এবং বহু দিন ধরিয়া মোহাদ্দেসগণের সংশ্রবে অবস্থান করিয়াছেন। (১)

---

(১) মৌলানা আহ্‌মাদ আলী সাহারণপুরী প্রকাশিত সহীহ বোখারীর মুখবন্ধ ২ পৃষ্ঠা। (লেখক)

## বাসরা ভ্রমণ

এবনে মরওজী লিখিয়াছেন—এমাম বোখারী ২২০ অথবা ২২১ হিজরী সনে ২৬।২৭ বৎসর বয়সে বাসরা গিয়াছিলেন, কিন্তু অন্য একজন ঐতিহাসিক প্রতিবাদ করিয়া বলিয়াছেন, আমি একদিন বাসরার মসজিদে একটী স্তম্ভের আড়ালে একজন প্রৌঢ় লোককে নামাজ পড়িতে দেখিলাম, তাঁহার দিকেই আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল। তখন বহু লোককে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, তিনিই এমাম বোখারী। কেহ কেহ এই ঐতিহাসিকদ্বয়ের উক্তি পরস্পর বিরোধী মনে করিয়া প্রকৃত ঘটনা নির্ণয় করিবার উদ্দেশ্যে তর্ক বিতর্কের অবতারণা করিয়াছেন। ইহার উত্তরে আবার অনেকে বলিয়াছেন, এমাম সাহেব একাধিকবার বাসরা গিয়াছেন; সুতরাং একবার যৌবনে ও একবার প্রৌঢ়াবস্থায় বলিয়া উভয় উক্তির মধ্যে সামঞ্জস্য রক্ষা করত দুজনের উক্তিই প্রকৃত ধরিয়া এই সমস্যার সমাধান করা যাইতে পারে।

ইউসুফ এব্‌নে মুসা বর্ণনা করিয়াছেন—একদিন বাসরা নগরীর গলিতে গলিতে এইরূপ ঘোষণা প্রচার করা হইতেছিল—হে বিদ্যোৎসাহী বসরাবাসীগণ; তোমাদের সৌভাগ্যক্রমে মোহাদ্দেসপ্রবর আল্লামা আবু আব্দিল্লা মোহাম্মদ এবনে ইসমাইল বোখারী বাসরা নগরে শুভ পদার্পণ করিয়াছেন। জামে' মসজিদে সকলেই তাঁহার সাক্ষাৎলাভের সুযোগ পাইবেন। এই কথা শুনিবামাত্র আমি জামে' মসজিদ অভিমুখে রওনা হইলাম। সেখানে গিয়া দেখিলাম, সুবিখ্যাত আলেমগণ সমবেত হইয়াছেন, সাধারণ জন-মণ্ডলীর ত কথাই নাই। ইহাদের মধ্যে একধারে একজন সুদর্শন যুবা পুরুষ মসজিদের একটী স্তম্ভের আড়ালে 'নামাজ' পড়িতেছেন, অনুসন্ধানে জানিলাম তিনিই এমাম বোখারী। নামাজ শেষ হইলে সকলে তাঁহাকে ঘিরিয়া বসিলেন, তখন তিনি সকলের সহিত আলাপ আপ্যায়ন ও শাস্ত্রের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলেন। উপস্থিত আলেমগণ তাঁহার গভীর জ্ঞান-গবেষণার পরিচয় পাইয়া মুগ্ধ ও স্তম্ভিত হইয়া পড়িলেন। অবশেষে সকলে মিলিয়া এমাম সাহেবকে সসম্মানে জানাইলেন যে, তাঁহারা তাঁহার নিকট হইতে সহীহ্‌ হাদিস জানিতে ও হাদিসশাস্ত্র সম্বন্ধে তাঁহার গবেষণা-পূর্ণ মীমাংসা-আদি শুনিতে অভিলাষী। এমাম সাহেব তাঁহাদের প্রস্তাবে সানন্দে সম্মতি জানাইলেন, ফলে তৎক্ষণাৎ সহরময় এসংবাদ প্রচারিত হইল। ঘরে বাহিরে, রাস্তাঘাটে সর্ব্বত্রে কেবল এই কথার আন্দোলন আলোচনা চলিতে লাগিল, সকলেই সাগ্রহে নির্দ্ধারিত দিনের অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। অবশেষে নির্দ্দিষ্ট দিনে নিশাবসানের পূর্ব্ব হইতেই লোক সমাগম আরম্ভ হইল, পণ্ডিত মূর্খ, ধনী নির্ধন নির্ব্বিশেষে অসংখ্য জনমণ্ডলীর সমাগমে নির্দ্দিষ্ট জায়গায় তিল ধারণের স্থান রহিল না। এমাম সাহেব উচ্চ বেদীতে আরোহণ করিলেন, দেশবিখ্যাত অসংখ্য মোহাদ্দেস, ফকীহ (ব্যবহারশাস্ত্রবিৎ) ও মোনাজেরের (তর্কশাস্ত্র বিশারদ) দল বৃত্তাকারে তাঁহার চতুর্দ্দিকে ঘিরিয়া বসিলেন। এমাম সাহেব দণ্ডায়মান হইয়া গুরুগম্ভীর স্বরে বলিলেন, হে আলেম সম্প্রদায়, আপনারা আমাকে হাদিস বর্ণনা করিতে অনুরোধ করিয়াছেন, আমি আপনাদের আদেশ পালন করিব। আজ আমি এই বাসরার অধিবাসীদের সম্মুখে কেবল বাস্‌রাবাসী বিশ্বস্ত রাবীদের বর্ণিত সহীহ হাদিস সমূহ উপস্থিত করিব, সম্ভবতঃ এখানকার উপস্থিত মোহাদ্দেসগণ ঐ সকল হাদিস ও তাহার রাবীদের সম্বন্ধে কোন 'খোঁজখবর' রাখেন না। এই বলিয়া এমাম সাহেব পর পর অসংখ্য সহীহ্‌ হাদিস বলিতে এবং সঙ্গে সঙ্গে সুশৃঙ্খল ভাবে রাবীদের নাম ও তাঁহাদের বিস্তৃত জীবনী বর্ণনা করিতে লাগিলেন। সমবেত মোহাদ্দেসগণ নতমস্তকে মানিয়া লইতে বাধ্য হইলেন এবং সকলেই বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইয়া পড়িলেন। পক্ষান্তরে আলেম সমাজের উত্থাপিত সন্দেহ ভঞ্জন ও তাঁহাদের সকল সমস্যার সহজ ও সরল ভাবে সমাধান করিয়া দিয়া এমাম সাহেব তাঁহাদিগকে আরও বিস্ময়-বিমুগ্ধ করিয়া ফেলিলেন। (১)

## সমরকন্দ

এমাম সাহেব সমরকন্দ ভ্রমণে গিয়া কিছুদিন সেখানে অবস্থান করিয়াছিলেন। তাঁহার পাণ্ডিত্যের কথা সামারকন্দের আলেম সম্প্রদায়ের অবিদিত ছিল না, সকলে মিলিয়া হাদিস শাস্ত্রে এমাম সাহেবের পরীক্ষা গ্রহণ করা স্থিরতর

(১) মোকদ্দমায় ফৎহুলবারী শেরকস্ সেহাহ (লেখক)

হইল। ফলে চারিশত মোহাদ্দেসের সমবায়ে একটী সমিতি গঠিত ও উপর্য্যুপরি সাতদিন ধরিয়া এই সমিতির অধিবেশনে নানাবিধ প্রস্তাবনা ও আলোচনা চলিতে লাগিল। অবশেষে তাঁহারা সকলে মিলিয়া বিভিন্ন স্থানের রাবীদের বর্ণিত একশত হাদিস লইয়া সেগুলির মধ্যে নানা হেরফের ও গোলযোগের সৃষ্টি করিলেন। এক হাদিসের ভাষা ও শব্দের সহিত অন্য হাদিসের ভাষা ও শব্দ বেমালুম জুড়িয়া দিলেন। রাবীদের নামেও ভীষণ হেরফের করিলেন, এরাকের রাবীদের সহিত এমনের রাবীদের, শামের সহিত মিসরের আবার এমনের সহিত হেজাজের এবং হেজাজের সহিত এমনের রাবীদের নাম বিশেষ কৌশল সহকারে মিশাইয়া ফেলিলেন। এইবার হাদিসগুলির 'এবারতে'ও রাবীদের নামের শৃঙ্খলায় এরূপ গোলযোগ বাধিয়া গেল যে, বহু গবেষণা ও পরিশ্রম ব্যতীত তাঁহারা নিজেও আর তাহা ঠিক করিতে পারিবেন বলিয়া মনে করিলেন না। তখন দিন স্থির করিয়া একটী সভায় এমাম সাহেবের নিকট এই বিকৃত হাদিসগুলি পেশ করা স্থিরতর হইল। অতঃপর এমাম সাহেবের সম্মতিমতে একটী সাধারণ সভার অধিবেশন হইল, সেই প্রকাশ্য সভায় অসংখ্য আলেম ও প্রবীণ মোহাদ্দেসগণের উপস্থিতিতে তাঁহারা একটী একটী করিয়া সেই বিকৃত হাদিসগুলি তাঁহাদের মনগড়া রাবীদের নামের শৃঙ্খলার সহিত পড়িয়া যাইতে লাগিলেন, তাঁহাদের পড়া শেষ হইলে এমাম সাহেব অতি সহজ সুন্দর ও সরলভাবে সমস্ত গোলযোগের নিরাকরণ করিয়া সঠিকরূপে প্রকৃত হাদিসগুলি আবৃত্তি করিলেন, প্রত্যেক স্থানের রাবীদের নাম পৃথক পৃথক করিয়া সুশৃঙ্খলার সহিত বলিয়া দিলেন। উপস্থিত জনমণ্ডলীর বিশেষতঃ আলেম ও মোহাদ্দেসগণের বিস্ময়ের সীমা রহিল না, তাঁহারা অবাক ও স্তম্ভিত ভাবে এমাম সাহেবের দিকে চাহিয়া রহিলেন। (১)

## বাগদাদ

এমাম সাহেবের বাগদাদে আহ্বান কালেও সেখানকার আলেমগণ ঠিক উপরোক্ত ভাবেই তাঁহাকে পরীক্ষা করিয়াছিলেন। বাগদাদের মোহাদ্দেসগণ এমাম সাহেবের স্মৃতিশক্তি ও পাণ্ডিত্যের পরিচয় গ্রহণ উদ্দেশ্যে উল্লিখিতরূপে একশত হাদিসের ভাষা ও রাবীদের নাম বিবৃত করিয়া দশজনে পালাক্রমে দশ দশটী করিয়া হাদিস তাঁহার সাক্ষাতে পড়িয়া দিলেন। এক একজনের পড়া শেষ হইলে "এই হাদিসগুলি আমার অজ্ঞাত," এমাম সাহেব এইরূপ অভিমত প্রকাশ করিতে লাগিলেন, অবশেষে সকলের পড়া সমাপ্ত হইলে তিনিও পালাক্রমে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় হিসাবে এক একজনকে সম্বোধন করিয়া তাঁহাদের প্রত্যেকের উল্লিখিত বিকৃত হাদিসগুলি সহীহ্ করিয়া পড়িয়া গেলেন এবং রাবীদের শৃঙ্খলাও ঠিক করিয়া দিলেন। (২)

## বলখ্

এমাম সাহেবের অধ্যাপকগণের প্রত্যেকের বর্ণিত হাদিস সমূহের মধ্যে কেবল মাত্র একটী করিয়া সহীহ্ হাদিস শুনাইয়া দিবার জন্য বলখের মোহাদ্দেসগণ তাঁহাকে ধরিয়া বসিলেন, সেই হিসাবে এমাম সাহেব ভিন্ন ভিন্ন রাবীর উল্লিখিত মোট এক সহস্র সহীহ্ হাদিস তাঁহাদিগকে শুনাইয়াছিলেন।

## নৈশাপুর

এই সময় নৈশাপুর হাদিস শাস্ত্রের কেন্দ্র স্বরূপ ছিল। সহীহ্ মোসলেমের সংগ্রাহক এমাম মোসলেম এবনে হাজ্জাজ এবং তাঁহার সুযোগ্য ওস্তাদ এমাম জহলী এই নৈশাপুরের সুসন্তান। এই সকল মনস্বীদের জন্যই নৈশাপুরের নাম বিশ্ব জগতে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। এমাম জহলীর ন্যায় মোহাদ্দেসের উপস্থিতিতে সে প্রদেশে হাদিস শাস্ত্রে প্রসিদ্ধি লাভ করা সহজ ব্যাপার ছিল না।

২৫০ হিজরী সনে এমাম বোখারী নৈশাপুর ভ্রমণে গিয়াছিলেন। সুবিখ্যাত ঐতিহাসিক হাকেম এবং জগন্মান্য মোহাদ্দেস এমাম মোসলেম তাঁহার নৈশাপুর প্রবেশের চিরস্মরণীয় ঘটনা বর্ণনা করিয়াছেন, তাঁহারা বলিয়াছেন—এমাম বোখারীর নৈশাপুর প্রবেশের সময় নৈশাপুরের অধিবাসীগণ যেরূপ বিরাট আয়োজনে তাঁহার অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন তাহা বর্ণনাতীত। কোন শাহান্শাহ্ বা অপর কোন পণ্ডিতের ভাগ্যে পূর্ব্বে এরূপ সম্মান লাভ ঘটিয়া উঠে নাই। নৈশাপুর হইতে তিন ক্রোশ দূর

(১) মোকদ্দমায় ফৎহুলবারী। (২) কংহুলবারী এবনে খাল্লেকানের। (লেখক)

পর্য্যন্ত সেখানকার অধিবাসীগণ সকলেই বিরাট মিছিল করিয়া তাঁহাকে স্বাগত সম্বর্দ্ধনা করিয়া আনিতে গিয়াছিলেন।

এমাম সাহেব নৈশাপুরে আসিয়াই হাদিস শাস্ত্রের অধ্যাপনা আরম্ভ করিয়াছিলেন। তদানীন্তন আলেমগণ সকলেই অধিকাংশ সময় তাঁহার অধ্যাপনাগারে উপস্থিত থাকিতেন। এমাম মোসলেম প্রত্যহ নিয়মিত ভাবে তাঁহার নিকট হাদিসের 'সবক' লইতেন। একদিন তিনি এমাম সাহেবের গভীর গবেষণা, স্মৃতি শক্তির প্রাখর্য্যে ও বর্ণনা-চাতুর্য্যে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার ললাট দেশ চুম্বন করিলেন এবং ভাবমুগ্ধ ভাবে বলিলেন, হে হাদীস-জগতের রাজ-রাজ্যেশ্বর, আমাকে অনুমতি দিন, আমি আপনার পদচুম্বন করিয়া জীবন সার্থক করিব।

এমাম জহলী তাঁহার ছাত্রদিগকে এমাম সাহেবের অধ্যাপনাস্থলে উপস্থিত হইবার জন্য সাধারণভাবে অনুমতি দিয়াছিলেন। কিছুদিনের মধ্যে অবস্থা এইরূপ দাঁড়াইল যে, এমাম জহলী ও অন্যান্য প্রবীণ মোহাদ্দেসদের অধ্যাপনাগারগুলি সম্পূর্ণরূপে ছাত্রশূন্য হইয়া পড়িল। পক্ষান্তরে এমাম সাহেবের নিকট পাঠার্থীর সংখ্যা দিন দিন বাড়িয়া চলিল।

একদিন এমাম জহলী সকলকে বলিলেন যে, আমি আগামী কল্য এমাম বোখারীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইব। যাহার ইচ্ছা আমার সঙ্গী হইতে পার। সহরময় তাঁহার এই কথার আন্দোলন আলোচনা আরম্ভ হইল। পরদিন বহুলোক তাঁহার সঙ্গী হইয়া এমাম সাহেবের 'খেদমতে' উপস্থিত হইল। ফলে এত অধিক লোকসমাগম হইয়াছিল যে, সেখানে তিল ধারণের স্থান ছিল না। এমাম জহলী তাঁহার উপস্থিতিতে এমাম সাহেবের সহিত বিরোধীয় কোন 'মসলা' লইয়া আলোচনা উপস্থাপিত করিতে তাঁহার সঙ্গীদিগকে নিষেধ করিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু এমাম সাহেবের বিদ্বেষপরায়ণ ষড়যন্ত্রকারীগণ এই সুযোগ ত্যাগ করিতে পারিল না। তাহারা কোরআন শরীফের শব্দসমূহ অনাদি বটে কি না, এই জটীল দার্শনিক সমস্যার অবতারণা করিল। বলাবাহুল্য এই বিষয়টীতে নানা মুনির নানামত, বহুকাল হইতে এসম্বন্ধে নানাজনে নানা সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিয়া আসিতেছেন, একের মত অন্যের মতের সম্পূর্ণ বিপরীত। এই সমস্যা লইয়া 'মোতাকাল্লেমীন'দের মধ্যে ন্যায় ও দর্শনের সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম যুক্তি ও কুটাসুকুট তর্ক বিতর্কের বান ডাকিয়াছে। তবুও তাহার সর্ব্ববাদীসম্মত মীমাংসা হয় নাই, ভবিষ্যতে কখনও হইবে বলিয়াও মনে হয় না। (১) যাহাহউক, এমাম সাহেব তাহাদের ষড়যন্ত্র ও কু-অভিসন্ধির কথা বুঝিতে পারিয়া একবার, দুইবার, তিনবার পর্য্যন্ত তাঁহাদের প্রশ্নের কোনও উত্তর দিলেন না। কিন্তু অপর পক্ষ কোন প্রকারে নিরস্ত হইল না, বারংবার তাঁহাকে এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে ও উত্তরের জন্য পীড়াপীড়ি করিতে লাগিল। অবশেষে বাধ্য হইয়া সকল দিক বজায় রাখিয়া এমাম সাহেব উত্তর দিলেন—

القرآن كلام الله غير مخلوق و لفظى بالقرآن
الفاظنا و الفاظنامن افعالنا و افعالنا مخلوقة —

অর্থাৎ কোরআন আল্লার কালাম অনাদি। কোরআন হইতে আমাদের উচ্চারিত শব্দ সমূহ আমাদের কার্য্যের অন্তর্ভূত; সুতরাং (আমাদের অন্যান্য কার্য্যাবলীর ন্যায়) তাহা আদি ও নশ্বর। বিচারের দিক দিয়া দেখিলে এমাম সাহেবের এই সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর উত্তর সকলেরই অবনত মস্তকে মানিয়া লওয়া উচিত ছিল। কিন্তু হইলে কি হয়,

حسود راچکنم کز خود برنج درست

হিংশুকের ভিন্ন গোঠ, তাহাদের সন্তোষ বিধান করিবার শক্তি কাহারও নাই। এমাম সাহেবের এই সুযুক্তিপূর্ণ উত্তর শুনিয়াও তাহারা নিরস্ত হইল না, বরং এই মতবাদ সম্বন্ধে তাঁহার উপর নানাজনে নানা দোষারোপ করিতে লাগিল। তিনি আল্লার কালাম কোরআন শরিফকে নশ্বর ও সৃষ্ট বলিয়াছেন এই মিথ্যা ধূয়া ধরিয়া সাধারণের নিকট 'জোর শোরে' তাঁহার কুৎসা প্রচার আরম্ভ করিয়া দিল। ফলে কিছুদিনের মধ্যে এমাম সাহেবের পসার প্রতিপত্তি, সুনাম ও ভক্তি-শ্রদ্ধার প্রবাহে ভাঁটা পড়িল। তাঁহার প্রতিপক্ষ আলেমের দল এই সুযোগে তাঁহার বিরুদ্ধে 'ফৎওয়া' জারী করিলেন, তাঁহারা বলিলেন—এমাম বোখারীর সংশ্রবে যাওয়া এমনকি তাঁহার সহিত কথা বলা 'নাজায়েজ'। ইহার পর তাঁহার ভক্ত ও অনুরক্তের দল তাঁহার নিকট হইতে ক্রমশঃ সরিয়া পড়িল। তাঁহার অধ্যাপনার স্থান ছাত্রশূন্য হইল। নিরপেক্ষ

(১) 'কালাম' সংক্রান্ত প্রস্তাবলী দ্রষ্টব্য।—লেখক।

আলেম সম্প্রদায়ের প্রকৃত ঘটনা বুঝিতে বাকী রহিল না, মনে মনে তাঁহারা এমাম সাহেবের বিশেষ পক্ষপাতী হইলেও বিরুদ্ধবাদীদের ভয়ে আত্মপ্রকাশ করিতে সাহসী হইলেন না। কিন্তু এমাম মোসলেম এবং এমাম আহমদ এব্‌নে সালমা কিছুতেই দমিলেন না। তাঁহারা প্রকাশ্যভাবে এমাম সাহেবের পক্ষ সমর্থন করিয়া বিরুদ্ধবাদীদের সহিত বাদ প্রতিবাদ আরম্ভ করিলেন। এদিকে ক্রমশঃ তাঁহার শত্রুর দল বাড়িয়া চলিল. প্রকাশ্য ও গোপন ভাবে তাঁহার বিরুদ্ধে নানা ষড়্‌যন্ত্র আরম্ভ হইল। এমাম সাহেব বিপদের গুরুত্ব অনুভব করিয়া নৈশাপুর পরিত্যাগ করত অন্যত্র চলিয়া যাওয়াই স্থির করিলেন। তিনি বন্ধু বান্ধব ও হিতৈষীবর্গের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া স্বীয় জন্মভূমি বোখারা অভিমুখে যাত্রা করিলেন। বোখারার সাধারণ অধিবাসী ও আমীর ওমারাগণ এই সংবাদে যারপর নাই আনন্দিত হইলেন এবং সকলে মিলিয়া দুই ক্রোশ দূর হইতে এমাম সাহেবকে সাদরে অভ্যর্থনা করিয়া লইয়া আসিলেন। কথিত হইয়াছে,—এমাম সাহেবের বোখারায় শুভ পদার্পণ উপলক্ষে তাঁহারা দরিদ্রদিগকে বহু অর্থ বিতরণ করিয়াছিলেন।

সাংসারিক জীবন ও বিশেষত্ব

এমাম সাহেব সম্পূর্ণ নির্লোভ ও সুখে দুঃখে সকল অবস্থায় খোদার উপর নির্ভরশীল ছিলেন। জীবনে কখনও আমীর ওমরাদের দরবারমুখী হন নাই। ধনী সম্প্রদায়ের নিকট যাতায়াত ও তাহাদের সাহায্য প্রার্থনা করা আলেম সম্প্রদায়ের পক্ষে ঘৃণার্হ এবং দীনী এলমের সম্মানের হানিকরবলিয়া মনে করিতেন। এজন্য অনেক সময় তাঁহাকে ক্ষমতাপ্রিয় বিত্তশালী সম্প্রদায়ের বিরাগভাজন ও নানা বিপদের সম্মুখীন হইতে হইয়াছে। তিনি ন্যায়ের আদর্শ ও সত্যের জলন্ত প্রতিমূর্ত্তি ছিলেন। অন্যায়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ উপস্থিত করিতে এবং অসত্যের বিরুদ্ধে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইতে কখনই পশ্চাৎপদ হইতেন না। এসব ব্যাপারে তাঁহার হৃদয় কুলিশ-কঠোর ছিল। ধর্ম্মের সামান্য অবমাননা ও কর্ত্তব্য পালনে একটু উদাসীনতা দেখিলে তিনি কখনই সহ্য করিতে পারিতেন না। পক্ষান্তরে কাহারও সামান্য একটু দুঃখ কষ্ট দেখিলে সহানুভূতিতে তাঁহার হৃদয় পূর্ণ হইয়া যাইত। দুঃখীর দুঃখ মোচন, আর্ত্তের ত্রাণ ও বিপন্নের উদ্ধার তাঁহার জীবনের প্রধান লক্ষ্য ছিল।

এমাম সাহেব শর-সন্ধানে ও লক্ষ্যবেধে সিদ্ধহস্ত ছিলেন, এ কার্য্যে তিনি বেশ প্রীতি অনুভব করিতেন। ঐতিহাসিক গাঞ্জার বলিয়াছেন, সারা জীবনে মাত্র দুইবার তাঁহার শর লক্ষ্য ভ্রষ্ট হইয়াছিল। একদিন আবদুল্লা সাহারণী নামক জনৈক বিখ্যাত 'তীরআন্দাজের' সহিত শর-সন্ধানের উদ্দেশ্যে অশ্বারোহণে এমাম সাহেব ফরীর নগরের বহির্দ্দেশে গমন করিয়াছিলেন, ঘটনাক্রমে তাঁহার শরাঘাতে নিকটবর্ত্তী সেতুর কাষ্ঠ নির্ম্মিত একটী বিরাট স্তম্ভ দ্বিখণ্ডিত হইয়া যায়। এমাম সাহেব তৎক্ষণাৎ আবদুল্লা ফরীরকে সেতুর অধিকারীর নিকট পাঠাইয়া দিলেন এবং একটী স্তম্ভ নিজ ব্যয়ে নির্ম্মাণ করিয়া দিতে অথবা তাঁহার ইচ্ছামত সম্পূর্ণ ক্ষতি পূরণ বহন করিতে রাজী হইয়া বলিয়া পাঠাইলেন। সেতুর মালিক আবদুল্লার মুখে সকল কথা শুনিয়া আবেগভরে বলিয়া উঠিলেন, কি! আমি এমাম বোখারীর নিকট ক্ষতি পূরণ আদায় করিব? তিনি মোসলেম জগতের গৌরব, ধর্ম্মের নিয়ামক, আমি তাঁহার পবিত্র চরণে আমার সমুদয় ধন-সম্পদ উৎসর্গ করিতে পারিলে আমার জীবন সার্থক বলিয়া মনে করিব। আপনি ফিরিয়া গিয়া তাঁহাকে বলুন, আমি তাঁহার কৃত সমস্ত ক্ষতি খাসারার দাবি সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করিলাম। এমাম সাহেব এই সংবাদে যারপর নাই আহ্লাদিত হইলেন, আনন্দের চিহ্ন তাঁহার মুখমণ্ডলে ফুটিয়া উঠিল, তিনি বলিলেন আমি রক্ষা পাইলাম। এই ক্ষতিজনিত পাপের পরকালের জওয়াব-দিহি হইতে বাঁচিয়া গেলাম। সেই দিনই তিনি বাড়ী আসিয়া দুই শত 'দেরহাম' গরীব দুঃখীদিগকে 'খয়রাৎ' করিলেন। এমাম সাহেবের ধর্ম্মপ্রাণতার এইরূপ আর একটী দৃষ্টান্ত উল্লেখিত হইয়াছে—একদিন তিনি আবুল মা'শর নামক একজন লোকের বাড়ী গিয়া বিনীত ভাবে বলিলেন,—আপনি আমার অপরাধ মার্জ্জনা করুন, নচেৎ খোদার নিকট আমাকে দায়ী হইতে হইবে। আবুল মা'শর অবাক হইয়া বলিলেন হে মুসলমান জগতের এমাম! আপনার কোন দোষ বা ত্রুটীর কথা আমি অবগত নহি। এমাম সাহেব বলিলেন—একদিন আমি একটী সভায় হাদিস বর্ণনা করিতেছিলাম, আপনি তাহা শুনিয়া ভাবমুগ্ধ অবস্থায় এরূপ অঙ্গভঙ্গী ও হস্তপদ সঞ্চালন করিয়াছিলেন যে, তাহা দেখিয়া অনিচ্ছা স্বত্বেও আমি হাসিয়া ফেলিয়াছিলাম। সেইদিন

হইতেই অনুতাপ-অনলে আমি দগ্ধ হইতেছি। সেই শেষ বিচারের দিন 'খোদার দরবারে' এজন্য আমাকে "জবাব দিহী" করিতে হইবে, তাই আপনার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতে আসিয়াছি, দয়া করিয়া আমায় ক্ষমা করুন। আবুল মা'শর এমাম সাহেবের এই বিনয়নম্র প্রকৃতি ও ধর্ম্মভয় বিহ্বলভাব দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন, তিনি অশ্রুসজল চক্ষে বলিলেন, হে ধর্ম্মপ্রাণ মহাপুরুষ, আপনি নিশ্চিন্ত হউন, আমি সর্ব্বান্তঃকরণে আপনার এই সামান্য ত্রুটী মাফ করিলাম। এমাম সাহেব এই মার্জ্জনার কথা শুনিয়া আহ্লাদে উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন এবং আবুল মা'শরকে বক্ষে ধারণ করিয়া তাঁহার ইহ পরকালের জন্য আল্লার দরবারে বহুক্ষণ ধরিয়া প্রার্থনা করিলেন।

এমাম সাহেব পরনিন্দা ও পরচর্চ্চা হইতে বিশেষ ভাবে পরহেজ করিয়া চলিতেন। ঐতিহাসিক ঘটনা বর্ণন এবং হাদীসের রাবীদের চরিত্র অঙ্কন করিতে গিয়াও 'পরনিন্দা হইয়া পড়িবে', এই ভয়ে তিনি সন্ত্রস্ত থাকিতেন। যে রাবীর চরিত্রে দুর্ব্বলতার বশতঃ আধিক্য ও ন্যায়পরায়ণতার অভাব তাঁহার কৃত রেওয়ায়েৎ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইতেন। সে রাবীর চরিত্র বর্ণন করিতে গিয়াও তিনি কেবল এইমাত্র বলিতেন যে, এই রাবীর অবস্থা সন্দেহজনক ও বিশেষ বিবেচ্য।

একদিন নামাজ পড়িবার অবস্থায় তাঁহার দেহের বিভিন্ন স্থানে সতের জায়গায় বৃশ্চিক দংশন করিয়াছিল। কিন্তু তিনি উপাসনায় এরূপ তন্ময় ও ভাব-বিমুগ্ধ হইয়াছিলেন যে, নামাজের মধ্যে দংশনের জ্বালা কিছুমাত্র অনুভব করিতে পারেন নাই, নামাজ শেষ হইলে যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া পড়িয়াছিলেন।

এমাম সাহেব একজন স্বভাবকবি ছিলেন, দুঃখের বিষয় তাঁহার রচিত বহু কবিতার মধ্যে কয়েকটী মাত্র সুধী সমাজে প্রচলিত আছে। তন্মধ্যে এই দুইটী পাঠকবর্গকে উপহার প্রদান করিলাম—

اغتنموافي الفراغ فضل ركوع
فعسى ان يكون موتك بغتة *

كم من صحيح رايت من سقم
ذ هبت نفسه الصحيحة فلتة *

অর্থাৎ উপাসনারত অবস্থায় অবসর কাল যাপন করা সৌভাগ্য বলিয়া মনে করিবে। কি জানি, হঠাৎ কখন তোমাকে মৃত্যুর সম্মুখীন হইতে হইবে। আমি দেখিয়াছি, কত স্বাস্থ্যবান লোক হঠাৎ মৃত্যুর ক্রোড়ে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন।

এমাম সাহেব 'দুনয়াদার' লোক ছিলেন না। সংসারের চক্রান্ত ও কুটীলতার সহিত তাঁহার কোন সংশ্রব ছিল না।

পরিচ্ছন্নতা

তিনি সরল সাদাসিদা ভাবে ধর্ম্ম-জীবন যাপন করিতেন। সকল সময়ে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার প্রতি তাঁহার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি থাকিত, পোষাক পরিচ্ছদ, বাড়ী ঘর এমন কি তাঁহার ব্যবহৃত সামান্য জিনিষ পত্রের পরিচ্ছন্নতার দিকেও তিনি বিশেষ লক্ষ্য রাখিতেন। অবশ্য তাহাতে বিলাসিতার নাম গন্ধ ছিল না। একদিন তিনি বহু সংখ্যক আলেম ও ছাত্রের দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া হাদিস শাস্ত্রের অধ্যাপনায় তন্ময় হইয়াছিলেন। সেই সময় সামান্য একটী তৃণখণ্ড তাঁহার বিছানায় পড়িয়া থাকিতে দেখিয়া তিনি স্বয়ং উঠিয়া গিয়া সেটী নীচে ফেলিয়া দিয়া আসিলেন। ইহা হইতেই ইসলামে পরিচ্ছন্নতার আবশ্যকতা বেশ উপলব্ধি হইয়া থাকে।

তিনি বহুগ্রন্থ প্রণয়ন ও সঙ্কলন করিয়াছেন। তন্মধ্যে এই কয়খানি মোসলেম জগতে বিশেষ বিখ্যাত :—জামে সহীহ

গ্রন্থাবলী

( جامع صحيح ), কাজায়াস সাহাবাতে ওয়াৎ তাবেয়ীন ( قضايا الصحابة والتابعين ), আদবল মোফ্‌রাদ ( ادب المفرد ), বেররুল ওয়ালেদায়েন ( برالوالدين ), কেতাবুল হেবাতে ( كتاب الهبة ), তারিখে কবীর ( تاريخ كبير ), তারিখে আওসৎ ( تاريخ اوسط ), তারিখে সগীর ( تاريخ صغير ), খালকোআফ্‌আলিল এবাদ ( خلق افعال العباد ), কেতাবুজ্ জোয়াফা ( كتاب الضعفاء ), আল জামেউল কবীর ( الجامع الكبير ), আল মসনাদুল কবীর ( المسند الكبير ), কেতাবুল আশরবাতে ( كتاب الاشربة ) আসামীসসাহাবাতে ( اسامى الصحابة ), কেতাবুল মবসুত ( كتاب المبسوط ), কেতাবুল এলাল ( كتاب العلل ), কেতাবুল বেজদান ( كتاب الوجدان ), কেতাবুল ফওয়ায়েদ ( كتاب الفوائد ), রাফউল ইয়াদায়নে

ফিস্‌সালাৎ ( رفع اليدين في الصلوة ), কেরআতো খাল ফিল এমাম ( قراءة خلف الامام ) ইহার মধ্যে জামে' সহীহ ( সহীহ বোখারী ), তারিখে কবীর ও তারিখে সগীর এদেশের সর্ব্বত্র সহজ প্রাপ্য।

সহীহ বোখারী

সহীহ বোখারী সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করিতে হইলে একখানা স্বতন্ত্র গ্রন্থের আবশ্যক হইয়া পড়ে। সুতরাং সে সম্বন্ধে দুই চারিটী কথা বলিয়া বিদায় গ্রহণ করিব।

ইহার প্রকৃত নাম 'আলজামেউস্ সহীহুল মসনাদো মিন হাদিসে 'রসুলিল্লাহ' ( الجامع الصحيح المسند من حديث رسول الله ) এই গ্রন্থে প্রায় দশ হাজার হাদিস বর্ণিত হইয়াছে। এমাম সাহেব নিজেই বলিয়াছেন, ছয় লক্ষ হাদিসের মধ্য হইতে বিশেষ ভাবে দেখিয়া শুনিয়া বাছিয়া লইয়া সহীহ বোখারীর হাদিস সমূহ সংগৃহীত হইয়াছে। এই গ্রন্থে ১৬০টী অধ্যায় বা কেতাব ও ৩৪৫০টী পরিচ্ছেদ বা বাব আছে। যে সকল মোহাদ্দেসের বর্ণিত হাদিস ইহাতে একত্রিত করা হইয়াছে, তাঁহাদের সংখ্যা ২১৯। এবনে সালাহ বলিয়াছেন, সহীহ্ বোখারীতে সংগৃহীত হাদিসের মোট সংখ্যা ৭২৭৫। কিন্তু হাফেজ এবনে হাজার আস্‌কালানী বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করিয়া দেখাইয়াছেন যে, সহীহ বোখারীতে সংগৃহীত সমগ্র হাদিসের সমষ্টি ৯০৮২। হাদিসের অসংখ্য কেতাবের মধ্যে সহীহ বোখারী ও সহীহ মোসলেম এই দুইটী কেতাব মোসলেম জগতে সর্ব্ববাদী সম্মতরূপে অধিক প্রামাণ্য বলিয়া স্বীকৃত ও পরিগৃহীত হইয়াছে। اصح الكتب بعد كتاب الله الصحيح البخاري والمسلم অর্থাৎ সিদ্ধ শুদ্ধ ও প্রামাণ্যের হিসাবে কোরান শরীফের পরেই সহীহ বোখারী এবং সহীহ মোসলেমের আসন। সহীহ বোখারীর অসংখ্য সারাহ বা টীকা আছে, তন্মধ্যে ৫৩।৫৪টী সুধী-সমাজে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে।

সহীহ বোখারী ও সহীহ মোসলেমের মধ্যে আবার কোন্‌টী সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, তাহা লইয়া মতভেদ আছে। বহু বাদ প্রতিবাদ ও বিচার-বিশ্লেষণের পর অধিকাংশ সুধী মণ্ডলী সহীহ বোখরীকেই অগ্রগণ্য বলিয়া মানিয়া লইয়াছেন। একজন আরব্য কবি নিম্নলিখিত কবিতা দুইটীতে এই সমস্যার সমাধান করিয়া দিয়াছেন—

تنازع قوم في البخاري ومسلم
لدي وقالوا اي ذين يقدم *
فقلت لقد فاق البخاري صحة
كما فاق في حسن الصناعة مسلم *

অর্থাৎ একদল লোক বোখারি ও মোসলেম সম্বন্ধে আমার সম্মুখে বাদ প্রতিবাদ আরম্ভ করিলেন এবং আমাকে বলিলেন, এই দুইয়ের মধ্যে কাহাকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে? আমি বলিলাম—দুজনই সমান, এমাম বোখারী যেমন সহীহ হাদীসের সংগ্রাহক হিসাবে সকলকে পশ্চাতে ফেলিয়াছেন, এমাম মোসলেমও সেইরূপ সম্পাদন-সৌষ্ঠবে সকলকে পরাজিত করিয়াছেন।

এমাম বোখারী আমিরুল মুমেনীন ও মোহাদ্দেস সম্প্রদায়ের এমাম ছিলেন। এমাম বোখারী তাঁহার সমসাময়িক আলেমদের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন। (১) এমাম বোখারী তাঁহার সময়ে দ্বিতীয় ওমর ফারুক বলিয়া পরিগণিত হইতেন। তিনি সাহাবীদের সমসাময়িক হইলে তাঁহাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ আসন অধিকার করিতে পারিতেন। (২) এমাম বোখারীর সমকক্ষ লোক পৃথিবীতে বিরল ( ৩ ) এমাম বোখারী যে হাদীস জানেন না, তাহা মোহাদ্দেসদের নিকট হাদীস বলিয়া পরিগণিত হইতে পারেনা। একজনের বয়স অন্যকে দেওয়া সম্ভব হইলে আমি আমার বয়সের অধিকাংশ এমাম বোখারীকে দিয়া তাঁহার জীবন-কাল বাড়াইয়া দিতাম; কারণ আমার ন্যায় লোকের মৃত্যুতে জগতের কোন ক্ষতি বৃদ্ধি নাই, কিন্তু এমাম সাহেবের তিরোধানে জগৎ হইতে হাদীস শাস্ত্র বিলুপ্ত হইয়া যাইবে। ( ৪ ) জগতে সকল কর্ম্ম অপেক্ষা এমাম বোখারীর সহিত সাক্ষাৎ লাভ অধিকতর প্রীতিজনক। ( ৫ ) এমাম বোখারীর পবিত্র দেহের একটী নগণ্য লোম হইয়া জন্মগ্রহণ করিতে পারিলে আমি ধন্য হইয়া যাইতাম। (৬)

এমাম সাহেব সম্বন্ধে অন্যান্য সুধীগণের মতামত

(১) ঐতিহাসিক এবনে কসীর। (২) এমাম এব্‌নে কোতায়বা। (৩) এমাম মোসলেম। (৪) এহইয়া এব্‌নে জা'ফর। (৫) মিসরের আলেম সম্প্রদায়। (৬) আবদুল্লা এব্‌নে হাম্মাদ আমেলী।

এমাম বোখারী জন্মভূমি বোখারা নগরে আসিয়া কিছুদিন বেশ সুখে শান্তিতে কাটাইয়াছিলেন। কিন্তু বেশী-

পরলোক গমন

দিন তাঁহার ভাগ্যে এই সুখ-ভোগ ঘটিয়া উঠে নাই। ঐতিহাসিক গাঞ্জার লিখিয়াছেন—একদিন বোখারার অধিপতি সহীহ বোখারী ও তারিখে কবীর লইয়া এমাম বোখারীকে তাঁহার দরবারে আসিতে আদেশ দিলেন। ঐ দুইখানি গ্রন্থ তাঁহার নিকট অধ্যয়ন করা রাজার উদ্দেশ্য ছিল, ইহাও তিনি বলিয়া পাঠাইলেন। কিন্তু এমাম সাহেব কিছুতেই এই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন না, তিনি স্পষ্টভাবে উত্তর দিলেন—নরপতির যদি একান্তই হাদিস শাস্ত্র অধ্যয়নের স্পৃহা বলবতী হইয়া থাকে, তাহা হইলে অন্যান্য মুছলমানদিগের ন্যায় তিনিও আমার কুটীরে অথবা মসজিদে অধ্যাপনাক্ষেত্রে আসিতে পারেন। বোখারার অধিপতি এই কথা শুনিয়া যারপর নাই অসন্তুষ্ট হইলেন। নৈশাপুরের শাসনকর্ত্তা এই অসন্তুষ্টির কারণ অন্যরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—রাজপ্রাসাদে আসিয়া রাজপুত্রদিগকে হাদিস পড়াইবার জন্য রাজা তাঁহাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। কিন্তু "দীনীএল্‌মের" সম্মান হানি হইবে বলিয়া এমাম সাহেব এই আদেশ পালন করিলেন না, তিনি বলিলেন—পড়িবার ইচ্ছা থাকিলে শাহ্‌জাদাগণ আমার নিকট আসিয়া সাধারণ পাঠার্থীদের সহিত একত্রে শিক্ষালাভ করিতে পারেন। যাহা হউক, যে কারণেই হউক, বোখারার অধিপতি তাঁহার প্রতি বিরক্ত ও অসন্তুষ্ট হইলেন। ফলে বোখারা ছাড়িয়া অন্যত্র চলিয়া যাইবার জন্য রাজাদেশ জারী হইল। অগত্যা এমাম সাহেব সেখান হইতে নৈশাপুরের অন্তর্গত ফারতাঙ্গ নামক একটী ক্ষুদ্র পল্লীতে তাঁহার জনৈক আত্মীয়ের নিকট চলিয়া গেলেন। দুঃখের বিষয় সেখানে গিয়া অল্প দিনের মধ্যেই এমাম সাহেবের স্বাস্থ্যভঙ্গ হইল। দিন দিন তাঁহার পীড়া বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, দুর্ব্বলতাবশতঃ শয্যাশায়ী হইলেন। তাঁহার বোখারা পরিত্যাগ ও পীড়িত হওয়া সংবাদ শুনিয়া সমরকন্দের অধিবাসীগণ সমরকন্দ নগরে যাইবার জন্য তাঁহার নিকট আবেদন-পত্র প্রেরণ করিলেন। এমাম সাহেবও তাঁহাদের প্রস্তাবে সম্মত হইলেন; কিন্তু হায়, তাঁহার আর সেখানে যাওয়া ঘটিয়া উঠিল না, নিয়তি আর তাঁহাকে অবসর দিল না। ২৫৬ হিজরী সনে ঈদল ফেতরের রাত্রিতে এমাম সাহেব এই পাপতাপময় নশ্বর জগৎ পরিত্যাগ করিয়া অমরধামে চলিয়া গেলেন। সমরকন্দ হইতে দুই ক্রোশ দূরে 'খারকানা' নামক পল্লীতে ঈদের দিন মহা সমারোহে তাঁহার পবিত্র দেহ সমাহিত হইল। তাঁহার কোন পুত্র সন্তান ছিল না।

জনৈক আরব কবি তাঁহার জন্ম ও মৃত্যুর সন এবং বয়সের হিসাব নিম্নলিখিত কবিতা দুইটীতে বর্ণনা করিয়াছেন

كان البخاري حافظا و محدثا

جمع الصحيح مكمل التحرير *

۱۹۴

ميلاده صدق و مدة عمره

۲۵۶ ۶۲

فيها حميد وا نقضى فى نور *

অর্থাৎ এমাম বোখারী হাফেজ ও মোহাদ্দেস ছিলেন। তিনি সহীহ্‌ হাদিস সমূহ একত্রিত করিয়া গিয়াছেন। এমাম সাহেব ১৯৪ হিজরী সনে জন্মগ্রহণ এবং ২৫৬ হিজরী সনে চির শান্তি-নিকেতনে মহাপ্রস্থান করিয়াছেন। সত্যই তাঁহার জীবনের ব্রত ছিল তাই আরবী সেদ্‌ক্ صدق ( সত্য ) শব্দ হইতে তাঁহার জন্মের সন ( সাদ ৯০ + দাল ৪ + কাফ ১০০ = ১৯৪ ), তাঁহার জীবন ধর্ম্মের জ্যোতিতে পূর্ণ ছিল তাই 'নূর' نور ( জ্যোতি ) শব্দ হইতে মৃত্যুর সন ( নূন ৫০ + ওয়াও ৬ + রে ২০০ = ২৫৬ ) এবং সকলের তিনি প্রশংসিত ছিলেন তাই হামীদ حميد ( প্রশংসিত ) শব্দ হইতে তাঁহার বয়সের পরিমাণ ( হায়হুত্তী ৮ + মিম ৪০ + ইয়া ১০ + দাল ৪ = ৬২ ) জানা গিয়াছে। ( ১ )

---

(১) ফৎহলবারী, এবনে খাল্লেকান, এব্‌নে হাব্বান লিখিত কেতাবুস্‌ সেকা, তারিখে কবীর, জহ্‌বী লিখিত তারিখে এসলাম, ঐতিহাসিক গাঞ্জার লিখিত তারিখে বোখারা, মোহাদ্দেস মৌলানা আহ্‌মদ আলী সাহারণপুরী প্রকাশিত সহীহ্‌ বোখারীর মুখবন্ধ প্রভৃতি গ্রন্থ অবলম্বনে লিখিত। ( লেখক )

# প্রায়শ্চিত্ত

[ চৌধুরী মোহাম্মদ শামসুর রহমান ]

( ১ )

রাস্তার পাশে একটা ভাঙা পুরোণো বাড়ী, আর তা'রই নীচে গহ্বরের মত ছোট্ট একটা ঘর। প্রায় জানালার মত ছোট্ট একটা দরজা দিয়ে কোন রকমে অতি কষ্টে তা'র ভেতর প্রবেশ করা যায়। দিন রাত চব্বিশ ঘণ্টাই সেখানে অন্ধকার জমাট বেঁধে আছে। যদি কখনও ছোট দরজাটার ফাঁক দিয়ে সামান্য একটু সূর্য্যের বা চাঁদের আলো তা'র ভেতর প্রবেশ করে, তা'হ'লে ভেতরের জমাট-বাঁধা আঁধারের মাঝখানে তা'রা সম্পূর্ণরূপে নিজেকে হারিয়ে ফেলে; তাদের চিহ্ন পর্য্যন্ত আর খুঁজে পাওয়া যায় না।

বৃদ্ধ ইহুদী সলোমন তা'র পৌত্রী মরিয়মকে নিয়ে এই গহ্বর-গৃহে বাস করে। সংসারে এই পৌত্রী ছাড়া তা'র আর কোন অবলম্বন নেই। সে আজ প্রায় দশ বছরের কথা,—সলোমনের বয়স তখন ষাট বছর, সেই সময় তা'র স্ত্রী বিহোভার আহ্বানে সাড়া দিতে দুনিয়ার হিসাব-নিকাশ শেষ করে' পারের পথে পাড়ি দিয়েছিল। তা'র মৃত্যুর অল্প-দিন পরেই বৃদ্ধের বুকখানা ভেঙে চুরমার করে' দিয়ে তা'র একমাত্র পুত্র যেকোবও ইহলোকের সকল সম্বন্ধ ঘুচিয়ে চলে যায়; আর যাবার সময় পেছনে রেখে যায় পাঁচ বছরের কন্যা মরিয়ম ও স্ত্রী রেবেকাকে। কিন্তু রেবেকাও যখন অল্প-দিন পরে এক মোসলমান যুবককে বিয়ে করে' গৃহত্যাগ করে' চলে' গেল, তখন—সেই দুর্দ্দিনে, বৃদ্ধ সলোমন তা'র শেষ সম্বল স্নেহের পৌত্রী মরিয়মকে নিবিড় স্নেহে বুকে আঁকড়ে ধরে' জিজ্ঞাসা করেছিল, "দাদু, একে একে সবাই ত এ বুড়োকে ছেড়ে চলে' গেল; তুইও কি শেষে ফাঁকি দিবি?"

বালিকা মরিয়ম তা'র কচি হাত দু'খানি দিয়ে দাদার জলভরা চোখ দু'টী মুছিয়ে দিতে দিতে বলেছিল, "তুমি কেঁদোনা দাদা, আমি তোমায় ছেড়ে কোথাও যাব না,—কখনো না।"

ক্ষুদ্র বালিকার এই অতি ক্ষুদ্র আশ্বাসবাণীতে বৃদ্ধ সেদিন যেন বড় একটা আশ্রয় খুঁজে পেয়েছিল; সব-হারাণোর মাঝে এই ছোট্ট আশ্বাসের কথায় 'সব-কিছুই' ফিরে-পাওয়ার আনন্দে যেন তার বুকখানা ভরে' উঠেছিল।

তার পর দেখ্‌তে দেখ্‌তে দীর্ঘ দশটী বছর অতীতের আঁধার কোলে মিশে গেছে। এই দশ বছর ধরে' বৃদ্ধ সলোমন যৌবনের উৎসাহ নিয়ে অবিচলিত ভাবে সংসারের সঙ্গে সংগ্রাম করে' এসেছে। নিজে ক্ষত-বিক্ষত হ'য়ে গিয়েছে, তবু মরিয়মের গায়ে আঁচড়টী লাগ্‌তে দেয়নি।

আজ তিন মাস হ'ল সলোমন শয্যাশায়ী। একে বার্দ্ধক্য, তার উপর আঘাতের পর আঘাত পেয়ে বৃদ্ধের জীবনীশক্তি শেষ হ'য়ে এসেছে। যতদিন সুস্থ ছিল, স্বজাতীয় বড় লোকদের দরজায় ভিক্ষে করে' সলোমন কোন রকমে তা'র ক্ষুদ্র সংসারটী চালিয়ে এসেছিল, কিন্তু মরণাপন্ন অবস্থায় তিন মাস যাবৎ বিছানায় পড়ে থাকায়, এখন সংসার একেবারে অচল হ'য়ে উঠেছে। অভাবের তাড়নায় অস্থির হ'য়ে অনেকদিন মরিয়ম বাইরে ভিক্ষে কর্‌তে যেতে চেয়েছে, কিন্তু বৃদ্ধ কিছুতেই তা'তে সম্মতি দেয়নি। ঘরে সামান্য দু' একখানা আসবাব-পত্র যা' ছিল, একটা একটা করে' বিক্রী করে' কোন রকমে এ-যাবৎ চলে' এসেছে, কিন্তু এখন আর তা-ও নেই। আজ তিন দিন ধরে' বৃদ্ধের পথ্য বন্ধ, মরিয়মও উপবাসী। তা'দের গিলে খাবার জন্য দারিদ্র্য যেন সেই ছোট্ট ঘরখানিতে বিরাট হাঁ করে' বসে' আছে।

( ২ )

মলিন শয্যায় জীর্ণ উপাধানে মাথা রেখে শুয়ে আছে সলোমন, আর তা'র শিয়রে বসে'—করুণার প্রতিমূর্ত্তি মরিয়ম। তা'র পরিধানে শত ছিন্ন মলিন সাড়ী, গায়ে বহুস্থানে তালি-দেওয়া কত দিনের পুরোনো একটা সেমিজ, গলায় ছেঁড়া-চাদরের একটা টুক্‌রা জড়ানো। মাথায় তা'র

একরাশ কালো কোঁকড়া চুল, এলোমেলো ভাবে কাঁধে, পিঠে ও মুখের উপর ছড়িয়ে পড়ে' রয়েছে। মরিয়ম নীরবে রোগশীর্ণ দাদার মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছিল। কিছুক্ষণ এই ভাবে কেটে গেলে, সে করুণ-কোমল কণ্ঠে বলে' উঠ্‌ল, "হাঁ দাদা, এমন করে' ক'দিন আর উপোস করে থাক্‌বে, উপোস করে' মানুষ ক'দিনই বা বাঁচতে পারে?"

বৃদ্ধ কোন উত্তর দিল না। ক্ষীণ দৃষ্টি তুলে একবার পৌত্রীর মুখের পানে চাইল মাত্র।

কিছুক্ষণ নীরব থেকে মরিয়ম আবার বল্ল, "আচ্ছা তুমি যে বল জিহোভার অনুগ্রহ মানুষকে সকল অবস্থাতেই ঘিরে থাকে। কিন্তু কই? দেখ্‌তে দেখ্‌তে তিন-তিনটে দিন কেটে গেল, তবু ত আমাদের কোন কিনারা হ'ল না।

বৃদ্ধ পূর্ব্ববৎ নীরব।

মরিয়ম কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে পুনরায় ডাক্‌ল "দাদা!"

বৃদ্ধ আর একবার পৌত্রীর মুখের পানে চাইল, তার পর উত্তর দিল—"কি!"

"এমন ভাবে ঘরে পড়ে' উপোস করে' না থেকে আমি একবার বাইরে যাই না কেন, আমাদের দুঃখের কথা শুন্‌লে কারও মনে কি দয়া হবে না? কেউ কি আমাদের একটু সাহায্য কর্‌বে না?"

বেদনায় বৃদ্ধের মুখখানা যেন কেমন হ'য়ে গেল। সে উপাধানে মুখ লুকিয়ে কি যেন ভাব্‌তে লাগ্‌ল। যিহোভার অনুগ্রহের কথা মনে করে' যে নিষ্ঠুর সত্যটাকে জোর করে' সে এতদিন দূরে ঠেলে রেখেছিল, সেটাকে এমন নগ্ন মূর্ত্তিতে মরিয়ম চোখের সাম্‌নে ধরে' দিল যে, সমস্ত অন্তরটা তা'র বেদনায় ভেঙে পড়্‌বার উপক্রম হ'ল। যে মরিয়মকে পাঁচ বছর বয়স থেকে বৃদ্ধ বুকের ধনের মত সঙ্গোপনে আগ্‌লে এসেছে, আজ এতদিন পরে কোন্ প্রাণে তা'কে পথের ভিখারিণী রূপে একলা ছেড়ে দেবে? সলোমনের চক্ষু দু'টী জলভারে টলটল করে' উঠ্‌ল।

মরিয়ম, গলায় জড়ানো চাদরের ছেঁড়া টুকরোটার এক কোণ দিয়ে বৃদ্ধের চোখ মুছাতে মুছাতে বল্ল,—"কাঁদ্‌ছ কেন, দাদা! আমায় যেতে দাও, আধ ঘণ্টার ভেতরেই আমি কিছু নিয়ে ফিরে আসব।"

সলোমন খানিকক্ষণ চুপ করে কি ভাব্‌ল, তারপর শীর্ণ ডান হাতখানি তা'র মাথার উপর রেখে গদগদ স্বরে বলল, —"যাও, দাদু! যিহোভা তোমার রক্ষা কর্‌বেন। তবে, একটা কথা—কোন মোসলমানের দোরে যেন যেয়োনা। নিজে উপযাচক হ'য়েও যদি কোন মোসলমান তোমায় কিছু দিতে চায়, তা'ও নিয়োনা—মনে রেখো তোমার জন্ম মোসলমানের দয়া হারাম।" শেষ কথাগুলি বল্‌বার সময় বৃদ্ধের নিষ্প্রভ চক্ষু দু'টী সহসা যেন উদ্দীপ্ত হয়ে উঠ্‌ল; আর তার মধ্যে ফুটে উঠ্‌ল—ঘৃণা আর হিংসার অগ্নি-জ্বালা!

মোসলমানের প্রতি বৃদ্ধ সলোমনের এ বীতরাগের কারণ মরিয়মের অজ্ঞাত ছিল না। তা'র মা রেবেকা যে দিন এক মোসলমান যুবককে বিয়ে করবার জন্ম গৃহত্যাগ করে যায়, সে দিন থেকেই সমস্ত মোসলমান জাতটার উপর সলোমনের মনে একটা দারুণ বিতৃষ্ণা জেগে ওঠে। তার পর আজ পর্য্যন্ত এই দীর্ঘ দশ বছর ধরে সে সেই বিতৃষ্ণার আগুনে কেবল ইন্ধনই যুগিয়ে এসেছে, নিতান্ত বিপন্ন হয়ে পড়লেও কোন দিন ভ্রমেও সে কোন মোসলমানের কাছে দয়ার প্রার্থী হয় নি। মরিয়ম এ সব ভাল রকমই জান্‌ত। তাই, বৃদ্ধ যখন তা'কে মোসলমানের কাছে হাত পাত্‌তে বারণ কর্‌ল, তখন ভিখারী দাদার এই অদ্ভুত আভিজাত্য দেখে সে মোটেই বিস্মিত হলো না; উপরন্তু মাথা নেড়ে সে তা'র কথায় সম্মতি জ্ঞাপন কর্‌ল।

* * * *

পথে বেরিয়ে লোকজনের মাঝে পড়ে মরিয়ম প্রথমটা কেমন যেন ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল। জীবনে কখনও সে এত মানুষের সংস্পর্শে আসেনি। জন্মাবধি সে দেখে এসেছে—বৃদ্ধ দাদা সলোমন আর পরিবারের জনকয়েক লোককে। বাইরের সংসার তা'র কাছে এক রকম অপরিচিতই ছিল। তাই, প্রথমটা তা'র কেমন যেন বাধ-বাধ ঠেক্‌তে লাগ্‌ল, কিন্তু সে ভাব্‌টা বড় বেশীক্ষণ রইল না। একটু পরেই তা'র জড়তা কে'টে গেল। সে এক পা' এক পা' করে অগ্রসর হ'তে লাগ্‌ল।

চৌরাস্তার এক কোণে এসে মরিয়ম ফুটপাথের এক পাশে জড়সড় হয়ে দাঁড়াল। তা'র সামনে দিয়ে কল-কোলাহলে জন-স্রোত চলেছে, কি কর্‌বে সে এই বিরাট জন-সমুদ্রের মাঝে! নিজের পরিধেয় বস্ত্রের পানে চেয়ে লজ্জায় তা'র কর্ণমূল পর্য্যন্ত লাল হয়ে উঠ্‌ল। এতক্ষণ এদিকে সে খেয়ালই করেনি! তাই, হঠাৎ এদিকে লক্ষ্য

পড়ায় সে যেন কেমন বিব্রত হয়ে পড়্‌ল। কাপড়-জামা এ'দিকে ও'দিকে টেনে কোন রকমে সে তা'র লজ্জাকর দৈন্যটুকু ঢাকার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা কর্‌তে লাগ্‌ল।

নিজেকে সাম্‌লে নিতেই তা'র অনেকখানি সময় কে'টে গেল, তারপর এল ভিক্ষার পালা! প্রতি মুহূর্ত্তেই সে মনে করতে লাগ্‌ল, এইবার কোন ভদ্রলোক সাম্‌নে দিয়ে গেলেই সে তাঁর কাছে হাত পাত্‌বে। কিন্তু মনে করাই সার হ'ল, অবাধ্য হাত খানাকে সে কিছুতেই আর এগিয়ে ধর্‌তে পার্‌ল না। তা'র ভাষাও যেন হারিয়ে যেতে লাগল; কাজেই ভিক্ষা চাওয়া তা'র আর হ'য়ে উঠল না।

দেখতে দেখতে দিনের আলো নিবু-নিবু হ'য়ে এল। হঠাৎ যেন ম'রিয়মের চৈতন্য হ'ল। তাই ত! সন্ধ্যা যে হয়-হয়! কিন্তু এখনও যে তা'র একটা পয়সাও সংগ্রহ হয়নি!

ঠিক সেই সময়ে একটি মোসলমান তরুণকে তা'র সাম্‌নে দিয়ে চলে যেতে দেখা গেল। অন্তরের সমস্ত শক্তি দিয়ে বাইরের লজ্জা-সঙ্কোচকে ঠেলে ফেলে, এবার মরিয়ম তার সামনে গিয়ে দাঁড়াল; কিন্তু দাঁড়িয়েই যেন কেমন থতমত খেয়ে গেল। তা'র মনের কোণে ভেসে উঠল—দাদা সলোমনের শেষ উপদেশ। কোন মোসলমানের কাছে হাত পাত্‌তে যে দাদা তা'কে নিষেধ করে দিয়েছে! তবে?—

এক অপরিচিতা তরুণীকে এমনভাবে হঠাৎ সামনে এসে দাঁড়াতে দেখে যুবকও থম্‌কে দাঁড়াল। তারপর তরুণীর মুখের দিকে চেয়ে কোমল কণ্ঠে জিজ্ঞাসা কর্‌ল,—"কি চাই তোমার?"

মরিয়ম প্রথমটা এ প্রশ্নের কোনও জওয়াব দিতে পার্‌ল না—তখনও সে দাদার শেষ উপদেশের কথাই ভাব্‌ছিল।

যুবক পূর্ব্ববৎ স্বরে আবার বল্‌ল,—"চুপ ক'রে রইলে কেন, বল কি চাই তোমার?"

যুবকের স্নেহ বাক্যে মরিয়মের মন গলে গেল। সে আর অগ্র-পশ্চাৎ না ভেবে সাহসে ভর ক'রে বলে ফেল্‌ল,—"আমরা বড় দুঃখী।"—এই ছোট্ট কথাটার ভেতর কি ছিল জানি না, কিন্তু তা'তেই ভিখারিণীর সমগ্র অন্তর যুবকের নিকট প্রকাশ হয়ে পড়ল, কিছুই আর তার বুঝতে বাকী রইল না।

কোন কথা না বলে যুবক, পকেটে হাত দিয়ে একখানি পাঁচ টাকার নোট বের ক'রে মরিয়মের হাতে দিয়ে প্রশ্ন কর্‌ল,—"কি নাম তোমার?"

"মরিয়ম।"

"কোথায় থাক তোমরা?"

"গোলদিঘীর দক্ষিণে যে ছোট গলিটা আছে, সেই খানে।"

"বেশ এখন যাও। যদি আর কোন দিন আমার সাথে দেখা কর্‌তে হয়, সন্ধ্যার সময় এখানে এসো।"

যুবক নিজের পথে চলে গেল।

যতক্ষণ যুবককে দেখা গেল, মরিয়ম তা'র পানে চেয়ে রইল। পরে, একটা দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেলে ধীরে ধীরে বাড়ীর পথে ফিরে চল্‌ল।

মরিয়ম বাইরে চলে যাওয়ার পর থেকে সলোমন তা'র অপেক্ষায় পথ চেয়ে বসেছিল। তা'র ফির্‌তে যত দেরী হচ্ছিল, বৃদ্ধ ততই অস্থির হ'য়ে উঠ্‌ছিল। সন্ধ্যা হ'য়ে আসছে দেখে সে আর স্থির থাকতে পার্‌ল না—অতি কষ্টে বিছানা ত্যাগ করে হামাগুড়ি দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে সামনের ঢিবিটার উপরে গিয়ে বস্‌ল।

কিছুক্ষণ পরেই মরিয়ম এসে উপস্থিত হলো। সলোমনকে অমন ভাবে বসে থাকৃতে দেখে সে তা'র কাছে গিয়ে অনুযোগের স্বরে বল্ল,—"অসুখ শরীর নিয়ে আবার বাইরে এলে কেন দাদা।"

বৃদ্ধ কোন উত্তর দিল না, তা'র দু' চোখ ছাপিয়ে জল নেমে এল। মরিয়ম তা'র হাত ধরে তুলে ধীরে ধীরে ঘরের ভিতর নিয়ে গেল।

শয্যায় শুয়ে বৃদ্ধ হাঁপাতে লাগ্‌ল। একটু প্রকৃতিস্থ হ'লে তারপর জিজ্ঞাসা কর্‌ল,—"কেউ মুখ তুলে চাইল কি—কিছু পেলে কি দাদু!"

মরিয়ম ভাব্‌তে লাগল, কেমন করে সে দাদাকে মোসলমান যুবকের মহাপ্রাণতার কথা বল্‌বে! যদি সলোমন জান্‌তে পারে যে, এক মোসলমান যুবকের অনুগ্রহ-দান নিয়ে সে হাসিমুখে গৃহে ফিরেছে, তবে হয়ত তা'র আক্ষেপের আর অবধি থাকবে না। এখনি হয়ত নোট খানা ছিঁড়ে টুক্‌রো টুক্‌রো করে সে পথে ফেলে দেবে। তাই, একটু ভেবে প্রকৃত ঘটনা গোপন করে সে সলোমনকে

জানিয়ে দিল যে, সে বেশ কিছু পেয়েছে। এক ভদ্র যুবক তা'কে দয়া করে' পাঁচটী টাকা দিয়েছেন। ভবিষ্যতে যদি কখনও অভাব হয়, তা'হলে সন্ধ্যার সময় চৌরাস্তার মোড়ে দেখা কর্‌লে তিনি আরো কিছু সাহায্য ক'রবেন ব'লেছেন।

বৃদ্ধ আর কিছু জিজ্ঞাসা কর্‌ল না—একটা সোয়াস্তির নিশ্বাস ত্যাগ ক'রে চোখ বু'জল।

( ৩ )

টাকা পাঁচটী অবলম্বন ক'রে কষ্টে-সৃষ্টে মরিয়ম প্রায় পনরটা দিন কাটিয়ে দিল। সলোমনের অবস্থা দিন দিন আরো খারাপ হ'য়ে এসেছিল। এখন আর বিছানা থেকে উঠতে পারে না—ক্রমেই সে মরণ-পথে এগিয়ে চলেছে।

দুপুরের পর হ'তে বৃদ্ধ ঘন ঘন অজ্ঞান হ'য়ে পড়্‌তে লাগ্‌ল। মরিয়ম অতিমাত্রায় ব্যাকুল হ'য়ে উঠ্‌ল। দেখ্‌তে দেখ্‌তে সন্ধ্যা হ'য়ে এল। সে প্রতিবেশিনী এক বৃদ্ধাকে ডেকে এনে কিছুক্ষণের জন্য তাকে দাদার নিকটে বসিয়ে সেই সহৃদয় যুবকের সন্ধানে চৌরাস্তার মোড়ে গিয়ে উপস্থিত হলো। বেশীক্ষণ অপেক্ষা কর্‌তে হলো না। যুবক ঘুর্‌তে ঘুর্‌তে এসে উপস্থিত হলো।

মরিয়মকে সামনে দেখে যুবক অতিমাত্রায় আনন্দিত হ'য়ে জিজ্ঞাসা কর্‌ল,—"কই এ কয়দিন ত তোমায় দেখিনি, আর আসনি কেন ?"

মরিয়ম অশ্রুপূর্ণ স্বরে উত্তর দিল,—"আমার দাদা মরণ-শয্যায়। আপ্‌নি দয়া ক'রে আমার সঙ্গে……।" সে আর কিছু বল্‌তে পার্‌ল না, তা'র দু'চোখ বেয়ে অশ্রুর ঝর্‌ণা নেমে এল।

যুবক মরিয়মের কথায় কোনরূপ দ্বিরুক্তি না করে' বল্‌ল,—"বেশ্‌ত চল। আমি এখনই যাচ্ছি,"

কৃতজ্ঞতায় মরিয়মের হৃদয় ভরে উঠ্‌ল। আর মুহূর্ত্ত কালও বিলম্ব না করে' সে যুবককে সঙ্গে নিয়ে বাড়ীর দিকে অগ্রসর হ'লো।

* * * *

এক অপরিচিত মোসলমান যুবকের ( যুবকের পরিধানে মোসলমানী পোষাক ছিল ) সহিত মরিয়মকে গৃহ-প্রবেশ কর্‌তে দেখে আসন্ন সময়েও সলোমনের বুকের ভিতরটা যেন কেঁপে উঠ্‌ল। সে ইঙ্গিতে মরিয়মকে যুবকের পরিচয় জিজ্ঞাসা কর্‌ল।

মরিয়ম দাদার শিয়রে বসে' তা'র কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে কাঁদতে কাঁদতে বল্‌ল,—"ইনিই সেদিন আমায় টাকা দিয়ে সাহায্য করেছিলেন, আজ আবার তোমার এই অবস্থার কথা শুনে তোমাকে দেখ্‌তে এসেছেন্‌।"

বৃদ্ধের বুকের মধ্যে তখন অসহ্য যন্ত্রণা আরম্ভ হয়েছিল। ক্ষণে ক্ষণে তা'র মুখে বিকৃত ভাব ফুটে উঠ্‌ছিল। যন্ত্রণা একটু কমে এলে সে মাথা তুলে যুবকের মুখের পানে একবার চাইল। পরক্ষণেই আবার তা'র মাথাটা নীচু হ'য়ে এল। ইঙ্গিতে যুবককে কাছে ডেকে বৃদ্ধ ক্ষীণ কণ্ঠে বল্‌ল,—"আমার ভুল ভেঙে গেছে ভাই। একজনের দোষে আমি সারা জাতিটাকে দোষী করে' রেখেছিলুম্‌। এর জন্য আমি মহাপাপ ভাগী হয়েছি, আজ সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত কর্‌ব।"—বল্‌তে বল্‌তে বৃদ্ধ হাঁপিয়ে পড়্‌ল।

খানিকক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে সে মরিয়মের হাতখানি ধরে' যুবকের হাতের উপর রেখে পূর্ব্ববৎ স্বরে আবার বল্‌ল,—"এই নাও ভাই, তোমার মাহাত্ম্যের পুরস্কার। এতদিনে আমি নিশ্চিন্ত।"

বৃদ্ধ খুব জোরে টেনে একটা নিশ্বাস ফেল্‌ল। তারপর জড়িতস্বরে বলে' উঠ্‌ল,—"প্রায়শ্চিত্ত—প্রায়শ্চিত্ত !"

সহসা তার বাক্‌রোধ হয়ে এল। সঙ্গে সঙ্গে মুখখানা বিকৃত হয়ে উঠ্‌ল। তারপর—তারপর সব শেষ !

মরিয়ম করুণ চীৎকারে অন্ধকার গৃহকুট্টিম মুখরিত করে' মৃতের বুকের উপর লুটিয়ে পড়্‌ল।*

---

* মেরী করেলীর ছায়ানুসরণে।—লেখক

# নব পর্য্যায় না নব পর্য্যয়

মোহাম্মদ আকরম খাঁ

(২)

হজরত মোহাম্মদ মোস্তফার ভক্ত ও অনুবর্ত্তীরা যে এমন শোচনীয়রূপে "দুঃস্থ বিভ্রান্ত ও বিড়ম্বিত হইয়াছেন, অধ্যাপক ছাহেবের মতে হজরতের জীবনই তাহার জন্য দায়ী। এই বিষয়ের বর্ণনা প্রসঙ্গে লেখক নিজের যে আদর্শ-মানসিকতা ও অপরূপ দার্শনিকতার পরিচয় দিয়াছেন, আমরা যথাক্রমে সে-আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব। হজরতের জীবন দ্বারা মুছলমান সমাজ—সেই খাদিজা ও আবুবাকর হইতে আরম্ভ করিয়া কাজী আবদুল অদুদ ছাহেবের এই মহামূল্য প্রবন্ধ লেখার পূর্ব্ব মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত—এমন শোচনীয় ভাবে বিড়ম্বিত হইয়া থাকিল কেন—লেখক তাহার কতকগুলি ছোট বড় কারণ আবিষ্কার করিয়াছেন—তাহার মধ্যকার বড় কারণ এই যে—"জগতের অনন্ত কোটি মানুষের মত হজরত মোহাম্মদও যে একজন মানুষ" মুছলমান সমাজ তাহা এতদিন জানিতে বা বুঝিতে পারে নাই।

কাজী ছাহেব সংবাদপত্রে প্রবন্ধ লিখিয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, তিনি ও তাঁহার দলস্থ সাহিত্যিক মুছলমানগণ কোরআন হাদিছের বচনের পাল্লার বাহিরে চলিয়া গিয়াছেন। ইহা দ্বারা বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, শাস্ত্রের বচনের সহিত ইহাদের বধ্য-ঘাতক সম্বন্ধ, সেই জন্যই সম্ভবতঃ তিনি ঐ গুলিকে একটু ভয়ের চোখেও দেখিয়া থাকেন। সে যাহা হউক, প্রত্যেক লোকের আত্মরক্ষার চেষ্টা করাই স্বাভাবিক, সুতরাং তিনি কোথায় পৌছিয়াছেন, কোন অস্ত্রশস্ত্রের পাল্লার কতটা বাহিরে তিনি চলিয়া গিয়াছেন, সেটা আমাদের মোটেই আলোচ্য ছিলনা। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, কাজী ছাহেব এছলামকে ছাড়িয়া, এমনকি তাহাকে সম্পূর্ণভাবে অস্বীকার করিয়া, অথচ এছলামের উপর সম্পূর্ণ বিপরীত অভিযোগের আরোপ করিয়া এছলামের সমালোচনা করিতে বসিয়াছেন! আর্য্য খৃষ্টান প্রভৃতি এছলাম-বৈরী পণ্ডিতগণ এছলাম ও মুছলমান সমাজের বিরুদ্ধে অনেক প্রকার আন্দোলন আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহাদের বহিপুস্তক গুলি পড়িলে সাধারণতঃ মনে হয়, নিজেদের দুরভিসন্ধি সার্থক করার জন্য তাঁহারা এছলামের ধর্ম্ম ও শাস্ত্র ও মুছলমানের প্রাথমিক যুগের ইতিহাস তন্ন তন্ন করিয়া আলোচনা করিতে যত্ন ও চেষ্টার ক্রটি করেন নাই। কিন্তু আমাদের কাজী ছাহেবের দার্শনিকতার ভঙ্গিমতার গভীর একমুখিত্ব দর্শন করিয়া আমরা বিস্মিত না হইয়া থাকিতে পারি নাই, প্রতিপক্ষের প্রতি দোষারোপ করিতে হইলে স্বপক্ষ সমর্থনের জন্য যুক্তিপ্রমাণ উপস্থাপন করাও যে একটা দরকারী কাজ, তাঁহার জীবনের গভীর অনুভূতির এবং আত্মার বিবিধ উপলব্ধির মধ্যে একথাটার একটুও স্থান নাই।

ন্যায়নিষ্ঠ দার্শনিকের মত আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলে তিনি প্রথমে সপ্রমাণ করিয়া দেখাইতেন যে, বাস্তবিক হজরত মোহাম্মদও জগতের অনন্ত কোটি মানুষের মত একজন মানুষ। আবার এই দাবীর অনুকূল প্রমাণ প্রয়োগের পূর্ব্বে দাবীটাকে ছদ্মবেশী ভাষার বাহিরে আনিয়া সকলকে স্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়া দিতেন যে, অনন্ত কোটি মানুষের মত হজরতও একজন মানুষ—এই কথার প্রকৃত উদ্দেশ্য কি? তিনি কি বলিতে চান যে, মানুষে মানুষে কোনও তারতম্য বা বিশেষত্ব নাই, সমস্ত মানুষ জ্ঞানে, কর্ম্মে, ভাবে সাধনায় ও সিদ্ধিতে পরস্পর পরস্পরের সমান। সুতরাং একজন আর এক জনের কথার অনুসরণ করিবে—আর একটা মানুষ হজরত মোহাম্মদ মোস্তফার আনুগত্য স্বীকার করিয়া লইবে, ইহাতে মানুষের আত্মার ঘোর অধঃপতন হয়। অথবা তিনি বলিতে চাহিতেছেন যে, হজরত ঈশ্বর নহেন, ঈশ্বরের অংশ অংশী বা অবতার নহেন, অতিমানব নহেন—

এই হিসাবে অন্য মানুষের সহিত তাঁহার কিছুই তারতম্য নাই। প্রথম তাৎপর্য্যের সার দাঁড়ায়—হজরতকে রছুল বলিয়া মান্য করা অন্যায়, এই দাবী। আর দ্বিতীয় তাৎপর্য্যের খোলাসা হইতেছে—রছুলকে খোদার শরিক ও সমান বলিয়া গণ্য করা অন্যায়, এই দাবী। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এই দুই দুই দাবীর মধ্যে তাঁহার উদ্দিষ্টটীকে পরিষ্কার ভাষায় প্রকাশ করিয়া দিয়া তাঁহার দৃঢ় অকাট্য যুক্তিপ্রমাণ দ্বারা প্রতিপন্ন করা উচিত ছিল যে, তিনি যেটাকে সত্য ও সঙ্গত বলিয়া মনে করিতেছেন, বাস্তবিক যুক্তির হিসাবে সেইটাই সত্য ও সঙ্গত এবং অন্যটী বস্তুতঃই অসত্য ও অসঙ্গত। তাহার পর, তিনি মুছলমানদিগের প্রতি যে সব অসত্য ও অসঙ্গত বিশ্বাস পোষণ করার অভিযোগ আনিয়াছেন, প্রকৃতপক্ষে এছলাম ধর্ম্ম যে মুছলমানকে সেই বিশ্বাস পোষণ করিতে বাধ্য করিতেছে, একথা মুছলমান দিগের মানিত ধর্ম্মশাস্ত্রের বচন উদ্ধৃত করিয়া, দাবীর এই দ্বিতীয় অংশ প্রতিপন্ন করাও তাঁহার কর্ত্তব্য ছিল। আমাদের ক্ষুদ্র জ্ঞান অনুসারে ইহারই নাম দার্শনিক আলোচনা। বড়ই দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে যে, কাজী ছাহেবের সমস্ত লেখার মধ্যে সূক্ষ্ম দার্শনিক দৃষ্টি বা সঙ্গত নৈয়ায়িক গবেষণার নাম গন্ধ মাত্রও খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

কাজী ছাহেবের উক্তির উল্লিখিত দুইটী তাৎপর্য্যের মধ্যে কোনটাই যে কোন ক্রমে সঙ্গত বলিয়া গৃহীত হইতে পারে না, নিম্নে স্বয়ং কাজী ছাহেবের নিজের কথা হইতে তাহা সপ্রমাণ করিয়া দিয়া, এই প্রসঙ্গের অন্যান্য আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি।

অধ্যাপক ছাহেবের উক্তির প্রথম তাৎপর্য্য গৃহীত হইলে তাহার সার এই দাঁড়াইবে যে; দুনয়ার অনন্ত কোটি মানুষে আর হজরত মোহাম্মদে কোনও তারতম্য নাই, অর্থাৎ হজরত তাহাদের তুলনায় কোনও বিশেষ শক্তি সাধনা বা সিদ্ধির অধিকারী নহেন, তাঁহার মধ্যে অসাধারণত্ব কিছুই নাই।

কাজী ছাহেব সঙ্গে সঙ্গে ইহা স্বীকার করিতেছেন যে—হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা "মানুষের ইতিহাসের এক বিশেষ স্তরে শক্তি মাহাত্ম্যে সুপ্রকট"; অধিকন্তু এই জগৎ সংসারের চিরজাগ্রত নিয়ামক যিনি, তিনিই যে মানব সমাজকে "সাধারণ ও শক্তিমান এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া দিয়াছেন, একথাও জনাব কাজী ছাহেব অল্প পরেই স্বীকার করিয়াছেন। অতএব মানুষ যে সাধারণ ও অসাধারণ এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত, অসাধারণ মানুষেরা যে একটা বিশেষ স্তরে উপনীত হইয়া থাকেন—অর্থাৎ সাধারণ মানুষ তাঁহাদের সে স্তরে পৌছিতে পারে না, তাঁহারা যে এমন একটা শক্তি মাহাত্ম্যে সুপ্রকট হইয়া পড়েন, সাধারণ মানুষ যে কারণে হউক, তাহা আয়ত্ত করিতে সমর্থ হয় না,—আর সব চাইতে গভীরতর কথা এই যে, বিশ্ব জগতের নিয়ামক আল্লাহ তাআলাই স্বয়ং মানুষকে সাধারণ ও শক্তিমান রূপে দুইটী স্বতন্ত্র শ্রেণীতে বিভক্ত ও নিয়ন্ত্রিত করিয়া আসিয়াছেন, সুতরাং দুনয়ার সব মানুষ যে পরস্পর সমান নহে, সুতরাং (প্রথম তাৎপর্য্য অনুসারে) হজরত মোহাম্মদও যে অনন্ত কোটি মানুষের মত একজন মানুষ নহেন, বরং তিনি বিশেষ স্তরে উপনীত, বিশেষ শক্তি-মাহাত্ম্যে সুপ্রকট এবং আল্লার অনন্ত কালের নিয়ম ও নিয়ন্ত্রণ অনুসারে তিনি দুনয়ার অনন্ত কোটি সাধারণ মানুষ অপেক্ষা স্বতন্ত্র বিশিষ্ট ও অসাধারণ মহিমার অধিকারী—ইহার প্রত্যেকটী কথা কাজী ছাহেবের নিজের স্পষ্ট স্বীকারোক্তি দ্বারা নিঃসন্দেহরূপে সপ্রমাণ হইয়া যাইতেছে।

উপরের বর্ণিত তাৎপর্য্য অনুসারে, দুনয়ার অনন্ত কোটি মানব যে সব বিষয় সকলের সমান, একথা বলার ন্যায় বিরাট অজ্ঞতা দুনয়ায় বোধ হয় আর একটাও নাই। বাহিক রূপ, দৈহিক গঠন, শারীরিক শক্তি, ঐন্দ্রিয়ক সামর্থ্য প্রভৃতি বিষয়ে এক মানুষের সহিত অন্য মানুষের যেমন তুলনা হইতে পারে না, সেইরূপ তাহাদের আত্মিক মানসিক ও অতি-ঐন্দ্রিয়ক শক্তি প্রবৃত্তি এবং তাহার প্রেরণা ও সার্থকতায়ও বিস্তর তারতম্য, এমন কি স্থান বিশেষে আকাশ পাতাল পার্থক্য বিদ্যমান। অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল যে, সে ত শক্তিমানের প্রতি নির্ভরশীল হইতে বাধ্য। সাংসারিক জীবনের স্তরে স্তরে শক্তিমানের প্রতি, অসাধারণের প্রতি, সাধারণের এই নির্ভরশীলতার শত শত প্রমাণ আমরা সকলে নিত্য প্রত্যক্ষ করিয়া থাকি।

তাহার পর কাজী ছাহেবের উক্তির দ্বিতীয় তাৎপর্য্য যদি গৃহীত হয়, তাহা হইলে তাহার খোলাসা এই দাঁড়াইবে যে (ক) হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা খোদা নহেন, খোদার অংশ

বা অংশী নহেন, তিনি খোদার অবতাররূপে আবির্ভূত হন নাই। (খ) মুছলমানেরা এই সত্যকে জানে না ও মানে না।

এই তাৎপর্য্যের প্রথমাংশ খুবই সত্য এবং প্রত্যেক জ্ঞানবান ও ন্যায়নিষ্ঠ ব্যক্তি অবনত মস্তকে এই সত্যকে স্বীকার করিয়া লইতে বাধ্য হইবে। কিন্তু উহার দ্বিতীয় বা (খ) চিহ্নিত অংশটী স্পষ্ট সত্যের বিপরীত একটা অতি জঘন্য এবং নিতান্ত অবাস্তব কল্পনা মাত্র। আমরা কাজী ছাহেবকে প্রকাশ্য ভাবে আহ্বান করিয়া বলিতেছি, তিনি কোরআন বা হাদিছের কোনও স্থান হইতে ইহার সামান্য একটা প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া নিজের দাবীর সত্যতা প্রমাণ করিতে কখনই সমর্থ হইবেন না। তিনি আলেম সমাজ সম্বন্ধে নীচ আক্রমণ করিতে কুণ্ঠিত হন নাই, নিতান্ত ধৃষ্টের ন্যায় অতীত ও বর্ত্তমানের সমস্ত মুছলমানকে পৌত্তলিক বা মোশরেক বলিয়া বর্ণনা করিতে লজ্জিত হন নাই, হজরত মোহাম্মদ মোস্তফার এবং তাঁহার শিক্ষা ও চরিত্রের প্রতি প্রকারতঃ বা প্রকাশ্যতঃ খৃষ্টান, আর্য্য সমাজী এমন কি আবুজেহেল ও আবুলাহব অপেক্ষাও নিকৃষ্টতম আক্রমণ করিতে দ্বিধা বোধ করেন নাই কিন্তু তাঁহার যত দ্বিধা যত কুণ্ঠা, নিজের উক্তির প্রমাণ দিবার সময়। এই প্রকার মনোবৃত্তি লইয়া যাঁহারা সূক্ষ্ম বিচারের ভাণ ও দার্শনিকতার স্পর্দ্ধা প্রদর্শন করিয়া থাকেন, বাস্তবিক দয়ার পত্র—তাঁহারাই।

মৌলুদের গল্পে শুনিয়াছি—সে কালে পাথরের কঙ্কর না কি হজরতের দাবীর সত্যতার সাক্ষ্য দিয়া মক্কার কোরেশ দলপতিকে শুম্ভিত করিয়া তুলিয়াছিল। পাথরের কঙ্করের কথা কহিবার কাহিনীটা যে কত দূর সত্য, এক্ষেত্রে তাহা আমাদের আলোচ্য নহে। কিন্তু আমরা কোরআনের একটা জীবন্ত মো'জেজা দেখিতেছি যে, কাজী আবদুল অদুদ ছাহেবের ন্যায় "হজরত মোহাম্মদের অভক্ত ও অনুবর্ত্তী" ব্যক্তিও এ ক্ষেত্রে নিজের মুখেই নিজের দাবীর অসত্যতা সম্পূর্ণ ভাবে স্বীকার করিতেছেন। আলোচ্য পুস্তিকার ২৭ পৃষ্ঠায় তিনি—"আনা বশরুম মেসলোকুম, (অর্থাৎ) আমি তোমাদেরই মত একজন মানুষ" কোরআনের এই আয়তটীকে "হজরত মোহাম্মদের বাণী" বলিয়া নিজেই স্বীকার করিয়াছেন। কোরআনের নির্দ্দেশ ও হজরত রছুলে করিমের বাণীর বিপরীত কোন কথা কাজ ভাব ও বিশ্বাসকে এছলামের মাথার উপর চাপাইয়া দেওয়া যে কত দূর অন্যায়, তাহা আর কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না। হজরত যে অতি মানব নহেন, খোদা, খোদার অংশ বা তাঁহার অংশী নহেন, মানব-আকারে ঈশ্বরের অবতার নহেন, একথা কোরআন হাদিছের বহুস্থানে নানাভাবে নানারূপে খুব স্পষ্ট ভাষায় বর্ণনা করা হইয়াছে। বরং এছলামের শিক্ষার সহিত সামান্য সংশ্রবও যাঁহাদের আছে, তাঁহারা স্বীকার করিবেন যে, এই শ্রেণীর নর-পূজা এবং অবতারবাদ ও অতি-মানব-বাদের প্রতিবাদ করাই কোরআন শরিফের শিক্ষার ও হজরত মোহাম্মদ মোস্তফার জীবনের একটা অন্যতম সাধনা। হজরতের সময় হইতে আজ পর্য্যন্ত, এছলামের সমস্ত আলেম এমাম এবং সাধু ও সাধক ব্যক্তিগণ এক বাক্যে এই কথা প্রচার ও প্রমাণ করিয়া, এবং এই বিষয়ে প্রতি পক্ষের প্রতিবাদ করিয়া অসিতেছেন। মুছলমানের কলেমার মধ্যে পর্য্যন্ত এই শিক্ষাকে অভেদ্যরূপে সন্নিবেশিত করিয়া দেওয়া হইয়াছে এবং মুছলমান হইতে ও থাকিতে হইলে তাহাকে কায়মনোবাক্যে এই সত্য গ্রহণ করিতে হয় যে—

اشهد ان لا الــه الا الله وحده لا شريک لــه
و اشــهد ان محمدا عبده و رســوله

"আমি ঘোষণা করিতেছি যে আল্লাহ ব্যতীত প্রভু আর কেহই নাই—তিনি একক ও অদ্বিতীয় এবং আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, মোহাম্মদ তাঁহার রছুল (প্রেরিত) ও তাঁহার দাস। অতএব আমরা দেখিতেছি মুছলমানের কর্ম্মজীবনের বীজমন্ত্র এই যে, একমাত্র আল্লাই মানুষের প্রভু ও মালেক এবং সে প্রভু একক ও অদ্বিতীয়। পক্ষান্তরে হজরত মোহাম্মদ হইতেছেন—সেই অদ্বিতীয় নিরংশ প্রভুর ইচ্ছাধীনে প্রেরিত এবং তাঁহার আজ্ঞাবহ দাস। মুছলমানের নমাজে 'আত্তাহিয়াত' বলিয়া একটা জিনিষ আছে, কাজী ছাহেবের তাহা জানা থাকিতে পারে। তিনি অনুগ্রহপূর্ব্বক ঐ জিনিষটার একটু আলোচনা করিলে দেখিতে পাইবেন যে, হজরতের মানবত্বের, শুধু মানবত্বের নহে আল্লার দাসত্বের বিশ্বাস মুছলমানের নামাজের অঙ্গীভূত। সে প্রত্যেক দিন ফরজ ছোন্নৎ ও নফল নামাজে কতবার মোছলেম জীবনের বীজমন্ত্র ও নামাজের অপরিহার্য্য অংশ

বলিয়া এই সত্যটাকে স্বীকার ও গ্রহণ করিয়া থাকে, পাঠক তাহা হিসাব করিয়া দেখুন। হজরতের মানবত্বের এমন কি দাসত্বের বিশ্বাস যে মুছলমানের ধর্ম্ম জীবনের প্রতিস্তরে প্রতি রন্ধ্রে, তাহার অন্তরের অন্তস্তলে এমন গভীর এমন স্পষ্ট এবং এমন স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত—যুগে যুগে দেশে দেশে এবং দুনয়ার রন্ধ্রে রন্ধ্রে পীর পয়গম্বরগণের অতি-মানবতা প্রভৃতি অন্যায় সংস্কারের বিরুদ্ধে একমাত্র যে সমাজ কঠোর প্রতিবাদ ধ্বনিকে বজ্রকণ্ঠে জাগরিত করিয়া রাখিয়াছে; তাহাদের প্রতি হজরতকে "মানব" বলিয়া স্বীকার না করার অভিযোগের ন্যায় জঘন্য মিথ্যা আর কি হইতে পারে?

( ৩ )

কাজী ছাহেব নিজেই স্বীকার করিতেছেন যে :—

(১) হজরত মোহাম্মদ একজন মহাপুরুষ এবং সত্য তাঁহার সমগ্র জীবনের মধ্যে এক আশ্চর্য্য দৃঢ়রূপ ধারণ করিয়াছিল।

(২) হজরত মোহাম্মদ মানুষের ইতিহাসের বিশেষ স্তরে শক্তি-মাহাত্ম্যে সুপ্রকট হইয়াছিলেন।

(৩) আল্লার হুকুমে সাধারণ ও শক্তিমান বলিয়া মানুষের দুইটা বিভাগ অনন্ত কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে।

কিন্তু এসব কথা স্বীকার করার পর তিনি আপত্তি করিয়া বলিতেছেন :—"তাঁর কথা, চিন্তার ধারা চিরকালের জন্য মানুষের পথকে নিয়ন্ত্রিত করে দিয়েছে, একথা বিশ্বাস করলে মানুষরূপে তাঁর সাধনাকে যে চরম অপমানে অপমানিত করা হয়, কারণ সমস্ত সাধনার যা লক্ষ্য, সেই আল্লার উপলব্ধি মানুষের দৃষ্টিপথ থেকে রুদ্ধ হয়ে যায়।"

আল্লার উপলব্ধি মানুষের দৃষ্টিপথ থেকে রুদ্ধ হয়ে যায়—এ পদটীর তাৎপর্য্য ও সাহিত্যিক বৈশিষ্ট্য উদ্‌ঘাটন করিতে আমাদের মত অনেককে বোধ হয় প্রমাদ গণিতে হইবে। প্রথমতঃ উপলব্ধি হইতেছে দৃষ্টিপথে, আবার সে উপলব্ধি রুদ্ধ হইয়া যাইতেছে সে দৃষ্টিপথ হইতে। অদার্শনিক ও অসাহিত্যিক আমরা, কাজী ছাহেবের এই বাণীর কষ্টে-চেষ্টায় যতটুকু মর্ম্মোদ্ধার করিতে পারিয়াছি, তাহার সার এই যে, হজরতের কথা এবং তাঁহার চিন্তা চিরকালের তরে মানুষের গতিপথকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া দিয়াছে—এরূপ বিশ্বাস করিলে হজরত মোহাম্মদ মোস্তফার মানুষরূপে কৃত সাধনাকে চরম অপমানে অপমানিত করা হয়। ইহা হইতেছে অধ্যাপক ছাহেবের দাবী—এবং প্রমাণ শূন্য দাবী। আর এক প্রমাণশূন্য দাবী দ্বারা প্রথম দাবীটা সপ্রমাণ করার উদ্দেশ্যে তিনি খুব গম্ভীরভাবে বলিতেছেন—কেননা ঐরূপ বিশ্বাস করিলে চিরজাগ্রত চিরবিচিত্র আল্লার উপলব্ধি করার পথ বন্ধ হইয়া যায়। এখন কেহ যদি বলে, "অধ্যাপক ছাহেবের উল্লিখিত দাবী দুইটী সম্পূর্ণ মিথ্যা, উহার সহিত সত্যের কোনও সম্বন্ধ নাই। বস্তুতঃ হজরত মোহাম্মদের কথা ও চিন্তার ধারা মানুষের গতি পথকে চিরকালের তরে নিয়ন্ত্রিত করিয়া দিয়াছে, একথা বিশ্বাস করিলে তাঁহার সাধনাকে প্রকৃত সম্মানে সম্মানিত করা হয়। কেননা তিনি নিজের সত্যময় জীবনে বিশেষ শক্তির-মাহাত্ম্যে আল্লাকে প্রাপ্ত হওয়ার ও তাঁহাকে উপলব্ধি করার সরল শাশ্বত সাধন পথকে সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করিয়া লইয়াছিলেন, চিরজাগ্রত চিরবিচিত্র আল্লার পূর্ণ উপলব্ধি লাভে হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা বিশেষ ভাবে সমর্থ হইয়াছিলেন"—তাহা হইলে কাজী ছাহেবের দার্শনিকতার তুলনায় এই সাম্প্রদায়িক মুছলমানের অদার্শনিকতার মূল্য কোন অংশে কম হইবে না। কাজী ছাহেব বলিবেন—তোমাদের এ কথাগুলি আমরা শুনিব না, কারণ উহার সমর্থনে কোনও যুক্তি প্রমাণ তোমরা প্রদান করিতে পার নাই। তখন কাজী ছাহেবের উত্তরে হাজী ছাহেবের দলও সমান গম্ভীরতা সহকারে উত্তর করিবেন—কোন প্রকার দাবী করিলে তাহার সমর্থনে কথ্যভাষায় কতিপয় অবোধ্য ও অকথ্য কঠিন শব্দের অশুদ্ধ প্রয়োগ দ্বারা জটিল সমাস বিন্যাস পূর্ব্বক কতকগুলি দীর্ঘ পদের সৃষ্টি করিয়া দেওয়াই যথেষ্ট, দার্শনিকতার আধুনিকতার ইহাই হইতেছে একটা বিশেষ ভঙ্গিমতা এবং তাহার সর্ব্বাপেক্ষা অকাট্য প্রমাণ হইতেছেন—স্বয়ং অধ্যাপক কাজী আবদুল অদুদ ছাহেব। ন্যায়নিষ্ঠ পাঠক তাহা হইলে এই হাজী ছাহেবদের কথাগুলিকে, অন্ততঃ উপস্থিতের মত, একেবারে অগ্রাহ্য করিয়া দিতে বোধ হয় সমর্থ হইবেন না। ভবিষ্যতে লেখনী ধারণের সময় কাজী ছাহেব তাঁহার বর্ত্তমান রীতির একটু পরিবর্ত্তন করিয়া দিলে আমরা বিশেষ আনন্দিত ও অনুগৃহীত হইব।

কাজী ছাহেবের এই মন্তব্যের দ্বারা বোঝা যাইতেছে যে, মুছলমানগণ হজরত মোহাম্মদের কথা ও তাঁহার চিন্তার ধারাকেই মানুষের গতিপথের চিরনিয়ামক বলিয়া মনে করে। "তাঁর কথা", "তাঁর সাধনা", "তাঁর চিন্তার ধারা"—ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা এইরূপে তিনি একটা বিরাট অসত্যকে সত্যের আসনে বসাইয়া দিয়া মুছলমান সমাজকে প্রবঞ্চিত করার প্রয়াস পাইয়াছেন। মুছলমানেরা হজরত রছুলে করিমের নির্দ্দেশমতে এছলাম ধর্ম্মে বিশ্বাস করে, একথা খুবই সত্য। কিন্তু এছলামকে হজরত মোহাম্মদের কথা, তাঁহার সাধনা, তাঁহার চিন্তার ধারা বলিয়া একজন মুছলমানও কস্মিনকালে বিশ্বাস করে নাই, কারণ তাহা এছলামের শিক্ষার সম্পূর্ণ বিপরীত। মুছলমানেরা বিশ্বাস করে যে, হজরত মোহাম্মদ মোস্তফার জীবনের সমস্ত কাজ সমস্ত ভাব, সমস্ত শিক্ষা ও সমস্ত সাধনা অনাবিল সত্যে পরিপূর্ণ। তাহার কোন স্তরের কোন অংশে অসত্যের সামান্য একটু সংস্পর্শ মাত্রও নাই। তিনি মহাপুরুষ, মানুষের ইতিহাসের এক বিশেষ স্তরে একটা অসাধারণ শক্তি-মাহাত্ম্যে তিনি প্রকট। এই হজরত মোহাম্মদ মোস্তফার "সমগ্র জীবনের" প্রধানতম সাধনা ও শ্রেষ্ঠতম সিদ্ধি হইতেছে কোরআন-প্রাপ্তি, তাহার প্রচার এবং নিজের ভিতর বাহিরকে কোরআনের আদর্শে সম্পূর্ণ নিখুঁৎভাবে গড়িয়া তুলিয়া কোরআনের সব সাধনার চরম সাধ্য আল্লার ও তাঁহার সৃষ্টির প্রেমে তন্ময় তদ্গত হইয়া যাওয়া। মুছলমানেরা মনে প্রাণে বিশ্বাস করে যে, এই কোরআন হজরতের কথা নহে, তাঁহার আবিষ্কার নহে, তাঁহার চিন্তা কল্পনা বা সাধনার কোনও সংস্পর্শ কোন প্রভাব তাহাতে নাই, তাহার প্রত্যেক আয়ত ও প্রত্যেক শব্দ এবং প্রত্যেক অক্ষর সাক্ষাৎ ভাবে আল্লার কালাম—চিরজাগ্রত চিরবিচিত্র বিশ্বনিয়ামকের অমর শাশ্বত বাণী। আল্লার এই বাণী—হজরত মোহাম্মদের কথা বা চিন্তার ধারা নহে—মানুষের গতিপথকে চিরকালের তরে নিয়ন্ত্রিত করিয়া দিয়াছে। এই কোরআন যে হজরত মোহাম্মদের রচনা নহে, তাঁহার কথা নহে, বরং উহা স্পষ্ট অনাবিল ও সাক্ষাৎভাবে সম্পূর্ণতঃ একমাত্র আল্লাহ তাআলার কালাম, কোরআন শত শত স্থানে একথা খুব পরিষ্কার করিয়া বলিয়া দিয়াছে, হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা ২৩ বৎসর ধরিয়া অবিরাম এই কথারই প্রচার করিয়া গিয়াছেন, এবং ইতিহাসজ্ঞ পাঠকমাত্রই অবগত আছেন যে, এই কোরআনকে আল্লার কালাম বলিয়া মান্য করা না-করা লইয়াই কোরেশ ও অন্যান্য পৌত্তলিক সমাজের সহিত যত সংঘাত সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়াছিল। তাহারা হজরতকে আমিন, ছাদেক অর্থাৎ সাধু ও সত্যবাদী বলিয়া স্বীকার করিত, কিন্তু তাঁহার প্রতি অবতীর্ণ কোরআনকে আল্লার কালাম বলিয়া স্বীকার করিতনা। বর্ত্তমান যুগের ছদ্মবেশী গুপ্ত শত্রু এবং সে সময়কার প্রকাশ্য বৈরীদিগের মত ও পথের সামঞ্জস্য দেখিয়া স্তম্ভিত হইতে হয়। সে সময় হজরতের সাধনার প্রধানতম শত্রু স্পষ্ট কণ্ঠে বলিয়াছিল—

يا محمد! انا لا نكذبك و لكن نكذب بما جئت به ( او كما قال )

"হে মোহাম্মদ! আমরা তোমাকে মিথ্যাবাদী বলি না, কিন্তু তুমি যে বাণীকে আল্লার কালাম বলিয়া প্রকাশ করিতেছ, আমরা মিথ্যা বলি তাহাকে।

উপরের আলোচনায় পাঠক দেখিলেন যে, মুছলমানগণ হজরত মোহাম্মদ মোস্তফাকে এবং তাঁহার মধ্যবর্ত্তিতায় প্রকাশিত কোরআন শরিফকে স্বীকার করে যথাক্রমে আল্লার নিকট হইতে অনুপ্রাণন প্রাপ্ত বলিয়া—প্রত্যক্ষ আল্লার কালাম বলিয়া। কাজী ছাহেব ইহাকে হজরতের কথা, তাঁহার সাধনা ও তাঁহার চিন্তার ধারা বলিয়া বর্ণনা করিয়া সত্যের মস্তকে ন্যায়ের মস্তকে এবং দার্শনিক বিচার-পদ্ধতির মস্তকে অতি নির্ম্মম ভাবে কুঠারাঘাত করিয়াছেন। মুছলমানেরা কোরআনকে মান্য করে,—হজরতের কথা বলিয়া, এছলামকে স্বীকার করে হজরতের চিন্তা-ধারার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত একটা পথ বলিয়া—একথা না বলিয়া তিনি যদি বুক ঠুকিয়া মনের কথা ব্যক্ত করিয়া বলিতে পারিতেন যে, মোহাম্মদ স্বরচিত কতকগুলি বচনকে মিথ্যা ভাবে আল্লার কালাম বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। বোকা মুছলমানগুলা তাহাদের এই ভণ্ড ও মিথ্যাবাদী পয়গম্বরের প্রবঞ্চনায় বিশ্বাস স্থাপন করিয়া ভ্রান্ত ও ভ্রষ্ট হইয়া পড়িয়াছে। ( معاذ الله - نقل كفر كفر نباشد ) তাহা হইতে তর্কের হিসাবে একটা আলোচনার সূত্রপাত হইত। একজন মানুষের ব্যক্তিগত মতামত—তা তিনি যত বড় লোকই হউন না কেন—মানুষের গতিপথকে চিরকালের জন্য নিয়ন্ত্রিত

করিয়া দিয়াছে, এ বিশ্বাস পোষণ করিলে, কাজী ছাহেবের কথা মতে, সেই চিরজাগ্রত ও চিরবিচিত্র আল্লাকে উপলব্ধি করার পথ রুদ্ধ হইয়া যায়, বিশ্ব-জগতের রন্ধ্রে রন্ধ্রে দেশে দেশে যুগে যুগে মানুষের অন্তহীন শুভ চেষ্টায় যাঁহার মহিমা প্রকটিত। কিন্তু সেই অনাদি অনন্ত চিরজাগ্রত চিরবিচিত্র আল্লাই নিজের শাশ্বত বাণী মানুষকে দান করতঃ তাহার দ্বারা মানুষের গতিপথকে চিরকালের জন্য নিয়ন্ত্রিত করিয়াছেন, একথা স্বীকার করিলে এই শ্রেণীর যুক্তির আর একটু সার্থকতাও থাকে না। অবশ্য কোরআনকে কালাম বলিয়া বিশ্বাস করা সঙ্গত কি অসঙ্গত, সে হইতেছে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ও উপস্থিত ক্ষেত্রে একেবারে অবান্তর প্রশ্ন।

পাঠক কাজী ছাহেবের উপরি-উদ্ধৃত বাণীটী মনোযোগ সহকারে পাঠ করিলে তাহার মধ্যে অনেক প্রকার বৈশিষ্ট্য দর্শন করিতে পারিবেন। উদাহরণ স্থলে এখানে তাঁহার **চিরকালের জন্য** পদটীর উল্লেখ করিতেছি। চিরকালের জন্য—এই কথাটার যদি কোন সার্থকতা থাকে, তবে বুঝিতে হইবে যে, মানুষবিশেষের কথা ও চিন্তার ধারা অচিরকালের জন্য মানুষের গতিপথকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া দিতে পারে। তাহা হইলে বোঝা যাইতেছে যে, অচিরকালের জন্য প্রেরিতস্বরূপ প্রকাণ্ড প্রতিমার সম্মুখে নতজানু হওয়াতে কোনও দোষ নাই! জিজ্ঞাসা করি, চিরাচিরের তারতম্যের এই উদ্ভট ন্যায়ের ভিত্তিস্থাপন করা হইয়াছে, কোন নীতি কোন যুক্তি এবং কোন দর্শনের উপর? তাহার পর অচিরকালের জন্য যদি হজরত মোহাম্মদ মোস্তফার 'কথা ও তাঁর চিন্তার ধারার' পক্ষে মানুষের গতিপথকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া দেওয়া সম্ভব ও সঙ্গত হইয়া থাকে, তাহা হইলে তাঁহার পরবর্ত্তী কোন সময় আবার সে নিয়ন্ত্রন বিধান তামাদী দোষে বারিত হইয়া যাইবে, তাহার মীমাংসা কে করিয়া দিবে এবং কোন্ বিচারনীতির অনুসরণ দ্বারা সেই মীমাংসায় উপনীত হওয়া সঙ্গত বলিয়া বিবেচিত হইতে পারিবে? অধ্যাপক ছাহেব ও তাঁহার বন্ধুরা ইংরাজী আইন কানুনের সহিত খুবই পরিচিত। তাঁহারা দেখিয়াছেন—মানুষের একটা ন্যায্য স্বত্ব এবং একটা সত্যকার অধিকার নির্দ্দিষ্ট কালের পর তামাদী হইয়া যায়। তাঁহারা মনে করেন, ইংরাজী আইনের স্বত্বের ন্যায় সত্যও কালক্রমে তামাদী ও অচল হইয়া যায়। সত্য যে শাশ্বত অবিনশ্বর অক্ষয় অব্যয় অপরিবর্ত্তনীয় ও অপরিবর্জ্জনীয়, একথা বোধ হয় তাঁহারা চিন্তা করিয়া উঠিতে পারেন না। কিন্তু চিন্তাশীল পাঠক মাত্রই অবগত আছেন যে, সত্য পূর্ণপরিণত রূপে সুপ্রকট ও সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর তাহার কোনও প্রকার পরিবর্ত্তন পরিবর্দ্ধন অসম্ভব।

মানুষরূপে হজরতের সাধনাকে চরম অপমানে অপমানিত করার যুক্তিবাদের মধ্যে কি অভিনব দার্শনিকতা নিহিত আছে, তাহা আমরা ভাল করিয়া বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না। কাজী ছাহেবের কথার দ্বারা বোঝা যাইতেছে যে, হজরত মোহাম্মদের একটা সাধনা ছিল এবং সেই সাধনার অপমান করা খুবই অন্যায়। বেশ কথা, এখন আমরা জিজ্ঞাসা করিতেছি—হজরতের সেই সাধনা কি, তাহার মূল কোথায় আর তাহার লক্ষ্য কে? এই কথাগুলি কাজী ছাহেব ঐতিহাসিক প্রমাণ দ্বারা প্রদর্শন করুন, তাহা হইলে বোঝা যাইবে যে, প্রকৃতপক্ষে হজরতের সাধনাকে চরম অপমানে অপমানিত করার গভীর সঙ্কল্প ও কুটিল ষড়যন্ত্রকে কতকগুলি বাহ্য শব্দবিন্যাসের কপট ছদ্মবেশে ঢাকিয়া রাখিতে চায়, কোন নরাধমের দল?

হজরতের সাধনাকে চরম সম্মানে সম্মানিত করা হয় বুঝি তাহার প্রচারিত সমস্ত বাণীকে মিথ্যা বলিয়া, তাঁহার অবলম্বিত প্রত্যেক সাধন-পন্থাকে বিদ্রূপ করিয়া বিদ্বেষ করিয়া? ২৩ বৎসর জীবনে তিনি একটা মানুষকেও সুপথ প্রদর্শন করিতে পারেন নাই, তাঁহার শিক্ষা ও আদর্শকে অবলম্বন করিয়াই প্রথম দিন হইতে আজ পর্য্যন্ত দুনয়ার প্রত্যেক মুছলমান ও সমস্ত মুছলনান ঘোর পৌত্তলিক এবং সর্ব্বতোভাবে অধোগামী হইয়াছে, আমি আল্লার প্রেরিত এবং কোরআন আল্লার বাণী—প্রভৃতি মিথ্যা কথা বলিয়া তিনি ধর্ম্মের নামে সত্যের নামে ও আল্লার নামে বিশ্বজগৎকে প্রবঞ্চিত করিয়াছেন, কোটি কোটি আল্লার বান্দাকে চিরকালের মত সব দিক দিয়া দুঃস্থ ও বিভ্রান্ত করিয়া দিয়াছেন—কাপুরুষের ছদ্মবেশী ভাষার মধ্য দিয়া এই প্রকার ধৃষ্টতা প্রকাশ করিলেই বুঝি হজরতের সাধনাকে চরম সম্মানে সম্মানিত করা হইত?

কাজী ছাহেবের লেখাগুলি মনোযোগ সহকারে পাঠ করিলে সহজে বোঝা যায় যে, ইংরাজী শিক্ষিত মুছলমান যুবকদিগকে এছলামের প্রত্যেক ভাব প্রত্যেক

শিক্ষা প্রত্যেক বিশ্বাস ও প্রত্যেক অনুষ্ঠানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী করিয়া তোলাই হইতেছে তাঁহার সমস্ত বাণীর একমাত্র উদ্দেশ্য। কিন্তু সে সম্বন্ধে তাঁহার নিজের কোন একটা নির্দ্দিষ্ট পথ বা মত নাই। তাই আমরা দেখিতেছি—একবার তিনি হজরতের রেছালতকেই সমস্ত সর্ব্বনাশের নিদান বলিয়া প্রকাশ করিতেছেন, আবার পরমুহূর্ত্তে এমন কথা কহিতেছেন, যাহা দ্বারা জানা যায় যে, তাহার আপত্তি নবীতে নয়, শেষ নবী স্বীকার করিতে।

মুছলমানেরা বিশ্বাস করিয়া থাকে যে, আল্লাহতাআলা হজরত মোহাম্মদ মোস্তফার মারফতে যে ধর্ম্ম দুনয়ায় প্রেরণ করিয়াছেন, তাহাতে পূর্ণ সত্য ষোল আনারূপে প্রকাশিত ও প্রতিষ্ঠিত হইয়া আছে, তাহা সকল যুগের সকল ধর্ম্মের সমন্বয়, তাহা সকল দেশের সমস্ত লোকের পক্ষে সমান ভাবে সঙ্গত ও সমঞ্জস। সুতরাং তাহা অক্ষয় ও শাশ্বত। অবশ্য মানুষের নানা দোষ ত্রুটির ফলে এবং বিবিধ প্রকারের প্রতিকূল পারিপার্শ্বিকতার আকর্ষণে তাহার বুদ্ধি বিভ্রম ও বিচার বিভ্রাট অনেক সময়ই ঘটিতে পারে। পক্ষান্তরে মানুষের কর্ম্মজীবনে সময় সময় এমন এক একটা সমস্যা উপস্থিত হইতে পারে, যাহা বাহ্যতঃ অভিনব এবং যাহার সমাধান করিয়া লওয়া মানুষের পক্ষে আবশ্যক হইয়া দাঁড়ায়। এ সমাধানের পথ এছলাম রুদ্ধ করিয়া দেয় নাই। এছলামের এজমা, কিয়াছ এবং এজতেহাদও এছলামের ন্যায় শাশ্বত, সমস্ত সমস্যার সমাধান এইখানে হইতে পারে। শতাব্দীতে শতাব্দীতে মোজাদ্দেদ আবির্ভাব হওয়ার কথাও এছলামে খুব স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করিয়া দেওয়া হইয়াছে। এই মোজাদ্দেদগণের হাতে আল্লাহ তাঁহার 'দিনের' তাজদিদ Renew......করিয়া দিবেন—ইহাও হাদিছের ঘোষণা। কোন অভিনব সুন্দরের প্রবেশ নিষেধ এছলামে নাই এবং দুনয়ার কোন সমস্যার সমাধান করিতে এছলামের শক্তি সামর্থ্যের অভাব কোনকালে ঘটে নাই, কস্মিন কালে ঘটিবেও না। সুদ, সঙ্গীত, চিত্রশিল্প ইত্যাদি কতকগুলি সুবিধাজনক ভাবে নির্ব্বাচিত বিষয়কে উপলক্ষ করিয়া আজকাল এছলামের বিরুদ্ধে যে সকল সমস্যা উপস্থিত করা হইতেছে, আমরা তাহার ও তাহার মূলীভূত অভিসন্ধিগুলির বিষয় বিস্তারিতরূপে অবগত আছি। মাসিক মোহাম্মদী বাঁচিয়া থাকিলে এবং আল্লাহ-তাআলা শক্তিদান করিলে এ সমস্ত প্রসঙ্গ লইয়া আলোচনার ত্রুটি হইবে না। তখন সকলে দেখিতে পাইবেন যে, কতকগুলি আরবী ও ইংরাজী পুস্তকের ভারবাহী জ্ঞানাভিমানী অতি পণ্ডিতদিগের দৃষ্টি হীনতার সমস্যা ব্যতীত, এছলামের সম্মুখে বস্তুতঃ একতিল মাত্রও সমস্যা নাই।

( ক্রমশঃ )

---

# হতাশের আশ্রয়

[ মোসাম্মাৎ রাজিয়া খাতুন চৌধুরাণী ]

সুখে-দুঃখে-ভরা এই সুবিপুল বিচিত্র সংসার,
তারি মাঝে তৃপ্তিহীন শত কোটী কামনা আমার
হাতছানি দেয় মোরে মোহময় মায়াময় সুরে,
ল'য়ে যায় তোমা হ'তে বহু দূর—দূরান্তরে মোরে।

তবু যবে সংসারের সুনির্ম্মম কঠোর আঘাত
আমার হিয়ার পরে বজ্রসম বাজে অকস্মাৎ
সেই দিন—সব ছেড়ে ছুটে আসি তোমার আশায়,
সব আশা না ফুরালে তোমারে ত মন নাহি চায়।

চাহি আমি ধন-জন ঋদ্ধি-কীর্ত্তি বিলাস-ব্যসন
বাঞ্ছাকল্পতরু তুমি নির্ব্বাচারে করিছ পূরণ।
বুঝি না ত হে গোপন, কি তোমার অন্তরের ভাষা,
এত দিয়ে প্রতিদানে কেন কিছু নাহি কর আশা!

দিগন্ত বিথার এই অন্তহীন নৈরাশ্য আঁধার
আছ শুধু চিরন্তন সে আঁধারে আশ্রয় আমার।

# খান দাওরান নাস্‌রাৎ জঙ্গ বাহাদুর

[ আবু লোহানী ]

মোসলমান-শাসিত ভারতবর্ষের ইতিহাস আলোচনা করিলে এমন অনেক মহাপুরুষের নাম দেখিতে পাওয়া যায়—যাঁহাদের গৌরবময় কীর্ত্তিকলাপের স্বর্ণোজ্জ্বল কিরণ সম্পাতে একদিন মোসলেম জগত সমুদ্ভাসিত ছিল। আজ আমরা ভারত ইতিহাসের একপৃষ্ঠা হইতে 'মোহাম্মদীর' পাঠকগণের তৃপ্তির জন্য সেইরূপ একজন মহাজনের সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদান করিতেছি।

প্রবন্ধের শিরোভাগে যাঁহার নামটী উল্লিখিত হইল, তিনি স্বনামখ্যাত সম্রাট শাহজাহানের সমসাময়িক একজন ইতিহাসপ্রসিদ্ধ লোক। তাঁহার প্রকৃত নাম ছিল খাজা সবির। তাঁহার পিতার নাম ছিল খাজা হিসারী এবং তিনি নকশবন্দ তরিকায় দীক্ষিত ছিলেন। সম্রাট জাহাঙ্গীর খাজা হিসারীকে উচ্চ রাজকার্য্যে নিযুক্ত করিয়া দাক্ষিণাত্যে প্রেরণ করিয়াছিলেন। পুত্র খাজা সবির পিতার আদেশে শিক্ষালাভের জন্য রাজধানীতেই অবস্থান করিতেছিলেন। প্রধান মন্ত্রী খান্ খানান্ আমীন উদ্-দাওলা আসফ খান যুবকের অসাধারণ বুদ্ধি-প্রাখর্য্য দেখিয়া তাঁহার যথোচিত শিক্ষার বন্দোবস্ত করিয়া দেন। কিন্তু যুবক সবির লেখাপড়া শিক্ষা করাকে কষ্টসাধ্য দেখিয়া খান্ খানানের সংস্রব ত্যাগ করিয়া দাক্ষিণাত্যে পলায়ন করেন এবং নিজাম শাহের দরবারস্থিত জনৈক বন্ধুর সাহায্যে তথায় শাহের দেহরক্ষী নিযুক্ত হন। লক্ষ্মী সরস্বতীর সহিত চির বিরোধ বর্ত্তমান বলিয়া হিন্দু লেখকগণ যেরূপ বলিয়া থাকেন, বোধ হয় তদ্রূপই যাঁহারা বীরকার্য্যের জন্য পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেন—তাহারাও পুস্তক-কীটের ন্যায় পঠিতব্য গ্রন্থাবলী-সমুদ্রেই আমরণ নিমজ্জিত থাকাকে অনভিপ্রেত বলিয়া মনে করেন। যাহা হউক, খাজা সবির রাজধানী হইতে পলায়নপূর্ব্বক নিজাম শাহের অধীনে কার্য্য গ্রহণ করিলেও তথায় তিনি বেশীদিন অবস্থান করেন নাই। নিজাম শাহের দেহরক্ষীর কার্য্য তাঁহার মনঃপূত না হওয়ায় খাজা সবির উক্ত পদে ইস্তাফা প্রদানপূর্ব্বক যুবরাজ শাহ জাহানের নিকট উপস্থিত হন। গুণের সম্মান-কারী যুবরাজ শাহজাহান খাজা সবিরকে পার্শ্বচর নিযুক্ত করিয়া 'নাসিরী খান' উপাধি প্রদান করেন। খাজা শাহজাহানের নিকট খুব বিশ্বস্ততার সহিতই কার্য্য করিতে থাকেন। তিনি যুবরাজের কার্য্যে এমনই ভাবে আত্ম-নিয়োগ করিয়াছিলেন যে, সময় সময় যুবরাজের ঘোড়ার জিন ও লাগাম স্বহস্তে ঠিক করিয়া দিতেও দ্বিধাবোধ করিতেন না। তুনিসের যুদ্ধে খাজা সবির নাসিরী খান শাহজাহানের সৈন্যবাহিনীর অধিনায়কত্ব করিয়াছিলেন এবং অসামান্য বীরত্বের পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন।

শাহজাহান তাঁহার সিংহাসনারোহণের দ্বিতীয় বর্ষে এই বীরত্বের পুরস্কার স্বরূপ নাসিরীখানকে তিন হাজারী পদে উন্নীত করিয়াছিলেন। পর বৎসর খান জাহান লোদী ও মালিক নিজাম শাহ প্রভৃতির বিরুদ্ধে সম্রাট শাহজাহান যখন গজরাজসিংহের নেতৃত্বে এক বিপুল সেনাদল প্রেরণ করেন, তখনও নাসিরীখান উক্ত বাহিনীর সহযাত্রী হইয়াছিলেন। কিন্তু এই উচ্চাকাঙ্খী বীর যুবক সামান্য সেনানায়কের কার্য্যে সন্তুষ্ট না থাকিয়া এক পত্রে সম্রাটকে লিখিয়া জানান যে, যদি তালিখণা ও কান্দাহার-বিজয়ে সম্রাট রাও রতনকে না পাঠাইয়া তাঁহাকেই পাঠান, তবে তিনি অতি অল্পদিনের মধ্যেই সম্রাটের বাসনা পূরণে সক্ষম হইবেন। পত্র পাঠান্তর সম্রাট নাসিরীখানকে চারহাজারী পদে উন্নীত করতঃ 'নসরৎজঙ্গ' উপাধী প্রদান পূর্ব্বক তাঁহাকেই কান্দাহার বিজয়ে প্রেরণ করেন।

নাসরৎজঙ্গ কান্দাহার-অভিযানের ভারপ্রাপ্ত হইয়াই ত্বরিৎ গতিতে কান্দাহারে উপনীত হন এবং তত্রত্য শাসন-কর্ত্তা সরফরাজ খানকে সম্মুখ যুদ্ধে পরাস্ত করতঃ দুর্গ

অবরোধ করেন। অবরুদ্ধ দুর্গ রক্ষার জন্য আদেলশাহ কর্তৃক মোবারক খান, বাহলুল খান এবং রনদৌলা খান প্রেরিত হইয়াছিলেন। ইঁহারা সকলেই নাসিরীখান নাসরৎজঙ্গের অতুলনীয় সাহস, রণদক্ষতা ও অধ্যাবসায় দর্শনে অতিমাত্র বিস্মিত হইয়া বহু আয়াসে আত্মরক্ষা করিতে থাকেন। কিছুকাল এইরূপেই অতিবাহিত হয়, ঠিক এই সময়ে দাক্ষিণাত্যের সুবাদার আজম খান আসিয়া নাসরৎজঙ্গের সহিত যোগদান করেন। সুতরাং দুর্গরক্ষার আর উপায়ান্তর না দেখিয়া দুর্গরক্ষকগণ শত্রুহস্তে আত্ম-সমর্পণ করিতে বাধ্য হন এবং ৪ মাস ১৯ দিন অসীম সাহসে দুর্গরক্ষার পর ইয়াকুত খোদাওন্দ খানের জামাতা মোহাম্মদ সাদিক দুর্গের চাবি নাসরাৎজঙ্গের হস্তে অর্পণ করেন। অতঃপর নাসরাৎ জঙ্গ সদল বলে দুর্গে প্রবেশ পূর্ব্বক দুর্গ-শীর্ষে মোগল বাদ্‌শাহের বিজয় পতাকা উড্ডীন করিলেন।

কান্দাহার-বিজয় শাহজাহানের সাম্রাজ্যলাভের চতুর্থ বৎসরে অর্থাৎ হিজরী ১০৪০ অব্দে ( ১৬৩০ খৃঃ ) ঘটিয়াছিল এবং এই বিজয় কার্য্যের পুরস্কার স্বরূপ সম্রাট নাসরাৎজঙ্গকে আরও এক হাজার অশ্বারোহীর আধিপত্য প্রদান করিয়া-ছিলেন। অতঃপর নাসরাৎজঙ্গ এই বৎসরেই মাহী মোরাতিবের সহিত দাক্ষিণাত্যের বালাঘাটে প্রেরিত হন এবং ইহার পর বৎসর তিনি মালবের গবর্ণর নিযুক্ত হন। সম্রাটের রাজত্বের ষষ্ঠ বর্ষে মহাবীর মহাব্বৎ খান দৌলতাবাদ ধ্বংসের জন্য প্রেরিত হইয়াছিলেন এবং এই কার্য্যে তাঁহার সহায়তার জন্য নাসরাৎ জঙ্গও প্রেরিত হইয়াছিলেন। দৌলতাবাদের যুদ্ধে তিনি অসীম বীরত্ব ও বিপুল অধ্যবসা-য়ের পরিচয় প্রদান করেন। সম্রাট শাহজাহান তাঁহার কার্য্যে সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে পাঁচ হাজারী পদে উন্নীত করতঃ 'খান দৌরান' উপাধীতে ভূষিত করেন।

অপর একটী ঘটনা হইতেও নাসরাৎ জঙ্গের অমানুষিক বীরত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। কথিত আছে, জওহার নামে পরিচিত একজন দুর্দ্দান্ত দস্যু তৎকালে দাক্ষিণাত্যে খুব উৎপাত আরম্ভ করিয়াছিল, সম্রাটের ও দেশীয় রাজগণের লোকজন কোনরূপেই তাহাকে দমন করিতে পারিতেছিল না। জওহার ক্ষিপ্রকারিতা, শারীরিক শক্তি ও দস্যুবৃত্তিতে এমনই ওস্তাদ হইয়া উঠিয়াছিল যে, প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধবীরগণও তাহার সম্মুখীন হইতে ভয় পাইত। এই দস্যুদল কখনও সম্মুখযুদ্ধে অগ্রসর হইত না; অতি সংগোপনে আত্মরক্ষা করতঃ সময় ও সুযোগ বুঝিয়া পথিক বণিকদল, রাজস্ববাহী সৈন্যদল এবং শান্তিপূর্ণ ধনী নাগরিকগণকে আক্রমণ, লুণ্ঠন ও পীড়ন করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিত। ইহারা অতর্কিত ভাবে সহস্র প্রহরী-বেষ্টিত শিবিরমধ্যে প্রবেশ করিয়া নিমেষমধ্যে আপনাদের কার্য্যোদ্ধার করতঃ ভোজবাজীর ন্যায় অদৃশ্য হইয়া যাইত। কিন্তু নাসরাৎ জঙ্গ কিছুতেই ভীত বা পশ্চাৎপদ হইবার লোক ছিলেন না এবং আরব্ধ কার্য্য সমাপন না করিয়া তিনি কখনই নিশ্চিন্ত হইতেন না। দাক্ষিণাত্যে অবস্থান কালে তিনি এই দস্যুপতিকে সমুচিত শিক্ষা প্রদানের নিমিত্ত কৃতসংকল্প হন এবং একদা বহু অনুসন্ধানের পর জওহারের সাক্ষাৎ লাভ করেন। তখন ইহারা পিতাপুত্রে একস্থানে কোন বিষয়ের গুপ্ত পরামর্শ করিতেছিল। দূর হইতে দেখিতে পাইয়াই নাসরাৎজঙ্গ একটী তরবারী হস্তে উহাদের সম্মুখীন হন এবং কিছুক্ষণ উভয়ের সহিত যুদ্ধ করতঃ জওহার ও তাহার পুত্রের মস্তক দেহচ্যুত করিয়া সম্রাট-সদনে উপহার প্রেরণ করেন। সম্রাট শাহজাহান নাসরাৎ জঙ্গের এই অমানুষিক সাহসের জন্য তাঁহাকে 'বাহাদুর' উপাধি প্রদান করেন।

রাজত্বের ত্রয়োদশ বর্ষে সম্রাট শাহজাহান নাসরাৎ জঙ্গকে কোন রাজনৈতিক কারণে দাক্ষিণাত্য হইতে স্বসকাশে আহ্বান করিয়াছিলেন এবং তিনি কাশ্মীর গমন কালে নাসরাৎ জঙ্গকেও সঙ্গে লইয়াছিলেন। কাশ্মীর হইতে প্রত্যাবর্ত্তন কালে নাসরাৎজঙ্গ লাহোরের দিকে অগ্রসর হন এবং একদা নগর হইতে দুই মাইল দূরে শিবির সন্নিবেশ করতঃ রাত্রিযাপন করিতেছিলেন। যখন শিবিরের লোকজন সমস্তই গভীর নিদ্রায় নিমগ্ন ছিল, সেই নিশীথ সময়ে জনৈক খালেজাদ যুবক-অনুচর শয়নকক্ষে প্রবেশপূর্ব্বক তাঁহার পেটে অস্ত্রাঘাত করতঃ 'নেমকের' মর্য্যাদা রক্ষা করে। অনুচরটী কাশ্মিরী ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল এবং স্বেচ্ছায় ইসলাম ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া জঙ্গ বাহাদুরের কৃপাপ্রার্থী হইয়াছিল। জঙ্গ বাহাদুর যুবকের সুন্দর গঠন সৌষ্ঠব ও দুরবস্থা দেখিয়া কৃপাবশে আপনার অনুচর করিয়া লইয়াছিলেন। যাহা হউক, জঙ্গবাহাদুর এইরূপ আকস্মিক ভাবে আহত হইয়াও আল্লাহর ইচ্ছাকেই মানিয়া লইয়া নির্ব্বিকারচিত্তে আঘাতযন্ত্রণা সহ্য করিতে লাগিলেন এবং

জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত নিকটবর্ত্তী জানিয়া আপনার সম্পত্তি-বিভাগে মনোনিবেশ করিলেন। নগদ টাকা এবং অস্থাবর সম্পত্তি সমস্তই তিনি আপন পুত্রগণের মধ্যে বিভাগ করিয়া দিলেন এবং স্থাবর সম্পত্তি রাজসরকারে দান করিলেন। এই সমস্ত কার্য্য সমাধা করিয়া পরে তিনি সম্রাটকে জানাইলেন যে, গুপ্তঘাতকের অস্ত্রাঘাতে তিনি আহত হইয়াছেন। ইহার পরেই যন্ত্রণা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল এবং পরের রাত্রিতেই তিনি নশ্বর দেহপিঞ্জর পরিত্যাগ করিয়া হিজরী ১০৫৫ অব্দে (১৬৪৫ খৃঃ) জন্নাতবাসী হইলেন। সম্রাট শাহজাহানের আদেশে খান দৌরান নাসরাৎ জঙ্গ বাহাদুরের দেহ গোয়ালিয়রের শাহী 'কবরস্থানে' সমাহিত করা হয়।

খান দাওরান্ নাসরাৎ জঙ্গ বাহাদুর অতি ন্যায়পরায়ণ, সাধু প্রকৃতি ও সৎকর্ম্মশীল লোক ছিলেন। বীরত্ব ও স্থৈর্য্য একাধারে তাঁহার চরিত্রের গৌরব বর্দ্ধন করিত। অতিরিক্ত ধনলিপ্সা তাঁহার নির্ম্মল চরিত্রকে কখনও কলুষিত করিতে পারে নাই। তিনি যখন যে কার্য্যে নিযুক্ত হইতেন, তাহাতেই অপরিসীম ধৈর্য্য, ঐকান্তিক যত্ন ও অমানুষিক ন্যায়পরায়ণতার পরিচয় দিতেন। তিনি কখনও কোন বিষয়ে অকৃতকার্য্য না হইলেও সাফল্য সম্বন্ধে খুব সন্দিহান হইয়াই নিজেকে সর্ব্ববিষয়ে প্রস্তত করিতেন; যেন পরিণামে অকৃতকার্য্যতার মনস্তাপে দগ্ধ হইতে না হয়। নসরৎ জঙ্গবাহাদুর নিজে যেমন কর্ত্তব্যপরায়ণ ছিলেন—অন্যকেও তেমনি কর্ত্তব্যপরায়ণ দেখিতে ভালবাসিতেন। এই জন্য অনেক সময় অধীনস্থ ব্যক্তিগণের প্রতি তাঁহাকে কঠোর ব্যবহার করিতে হইত। ফলে আলস্যপরতন্ত্র ব্যক্তিগণ—বিশেষতঃ যাহারা ফাঁকতালে কাজ বাজাইতে চেষ্টা করিত—তাহাকে দুই চক্ষে দেখিতে পারিত না। নসরৎ জঙ্গ বাহাদুরের শোচনীয় মৃত্যুসংবাদ বুরহানপুরে পৌছিলে এই প্রকৃতির অনেকেই হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিয়াছিল—এমন কি কেহ কেহ এই শোক-সংবাদে আনন্দ প্রকাশও করিয়াছিল।

মৃত্যু সময়ে নসরৎ জঙ্গ বাহাদুরের সাঈদ মোহাম্মদ, সাঈদ মাহ্‌মুদ ও আবদুন নবী নামে তিনটী পুত্র বর্ত্তমান ছিল। সম্রাট শাহজাহান তাঁহাদের সকলকেই যথাযোগ্য জায়গীর প্রদান করিয়াছিলেন এবং প্রথম দুই ভ্রাতাকে এক হাজারী ও শেষোক্ত অল্প বয়স্ক বালক আবদুন নবীকে পাঁচশতী পদে নিযুক্ত করিয়া যথাক্রমে এক হাজার ও পাঁচশত অশ্বারোহীর অধিনায়কত্ব প্রদান করিয়াছিলেন।

বুরহানপুরের অধিকাংশ সৌধাবলীই নাসরাৎ জঙ্গের আমলে নির্ম্মিত হইয়াছিল। বুরহানপুর ও সিরোঞ্জের মধ্যে যে সমস্ত পান্থশালা বর্ত্তমান আছে, তাহাও তাঁহারই দ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছিল। খান দাওরানের নির্ম্মিত একটী পান্থশালার ধ্বংসাবশেষ অদ্যাপি গোয়ালিয়রে দেখিতে পাওয়া যায়; উহার তোরণ ও প্রাচীর ব্যতীত অপর সমস্তই নষ্ট হইয়া গিয়াছে। উক্ত ধ্বংসাবশেষ হইতে ন্যূনাধিক দুইশত গজ দূরে নাসিরী খানের মস্‌জিদ নামে বিখ্যাত একটী মসজিদ বর্ত্তমান আছে। উহার পূর্ব্বদিকের প্রাচীরে নিম্নলিখিত ফারসী কবিতাটী খোদিত আছে :—

مسجدے شد بدور شاهجهان
مصد افیض و مظهر ایمان -
بانی آن مسجد بصدق و نیاز
خادم اهل دین نصیری خان -
چون خرد جست سال تا ریخش
بجهان عرش زد نمور عیان -

ভাবার্থ :—রহমতের উৎস এই মসজিদ সম্রাট শাহ জাহানের শাসনকালে নির্ম্মিত হইয়াছে। আল্লাহর নাম এখানে পরিকীর্ত্তিত হইয়া থাকে; ইহার নির্ম্মাতা নাসিরী খান দীন ইসলামের খাদেম, পরম ধার্ম্মিক এবং নম্র স্বভাব ছিলেন, যখন ইহা নির্ম্মিত হইয়াছিল—আকাশ মণ্ডল তখন বিস্ময় বিস্ফারিত লোচনে পৃথিবীর পানে চাহিয়া দেখিয়াছিল।

দক্ষিণদিকের প্রাচীর গাত্রেও অনুরূপ একটী কবিতা লিখিত আছে; যথা :—

بدور شهنشاه شاه جهان
بنا کرد مسجد بفردوس شان -
جوان و جوانمرد و فرخنده بخت
پسر خان دوران نصیری خان -
چو تاریخ او جست عقلم ز طبع
بگفتا بد ینجاے فضل وامان -

ভাবার্থ :—সম্রাট শাহ জাহানের রাজত্বকালে এই

স্বর্গতুল্য মসজিদ ভাগ্যবান বীরযুবক খান দাওরান নাসীরি-খানের আজ্ঞায় নির্ম্মিত হইয়াছে। যখন আমার উদ্ভাবনী প্রতিভার সাহায্যে ইহার নির্ম্মাণ-দিবস স্থায়ী করিবার কথা উঠে—তখন কে যেন বলিয়াছিল "এই খানেই শান্তি ও রহমত।"

কাল-প্রভাবে মস্জিদটীর সমস্ত সৌন্দর্য্য অপহৃত হইয়াছে; অশনিপাতে উহার ছাদটীও ধ্বসিয়া গিয়াছে; বর্ত্তমানে কেবল দেওয়াল কয়খানিই ছোট ছোট গুম্বজ মাথায় করিয়া দণ্ডায়মান আছে। মসজিদের সম্মুখস্থ প্রাঙ্গণে একটী কৃত্রিম উৎস রহিয়াছে। কিন্তু ছাদের খিলান ও কক্ষের প্রাচীরগুলি ধ্বসিয়া পড়ায় উহা হইতে বিস্ফুরিত খণ্ড খণ্ড ইষ্টকে উৎস ও প্রাঙ্গন উভয়ই বন্ধ হইয়া গিয়াছে। উৎসের এক পার্শ্বে কয়েকটী ঘর দেখিতে পাওয়া যায়, তন্মধ্যে একটী খুবই সুন্দর। সম্ভবতঃ উহাই খান দাওরানের সমাধি। সমাধিগুলির গাত্রে কোনারূপ স্মৃতিফলক নাই; তবে মাত্র একটীর গায়ে 'কলেমা তৈয়ব' খোদিত দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু অক্ষরগুলি এমনই অস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে যে, অতি কষ্টে তাহার পাঠোদ্ধার করিতে হয়। সাধারণে প্রকাশ—মস্জিদটীর ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য অনেকগুলি গ্রাম লাখেরাজ ছিল। পূর্ব্বে মস্জিদের প্রাঙ্গণ সন্নিকটে একটী সুন্দর উদ্যান ছিল; বর্ত্তমানে উহা জঙ্গলে পূর্ণ হইয়া গিয়াছে।

আগ্রার বিশ্ব-বিখ্যাত তাজমহলের পূর্ব্বদিকে সৈয়দ আহমদ বোখারী নামক সুপ্রসিদ্ধ তাপসের সমাধির পার্শ্বে একটী প্রাচীন অট্টালিকা অদ্যাপি দণ্ডায়মান আছে। উহাই খান দাওরান নাসরাৎ জঙ্গ বাহাদুরের আবাসস্থান ছিল। উহার প্রবেশ-পথের তোরণটী সংস্কার অভাবে পতনোন্মুখ হইয়া পড়িয়াছে। অট্টালিকার উত্তর পশ্চিম্ কোণে নদীর ধারে একটী তেতালা মঞ্চ বর্ত্তমান; মঞ্চের উপর হইতে পদতল ধৌতকারিণী প্রবাহিণী যমুনার দৃশ্য অতি সুন্দর দেখায়। এই অট্টালিকাটী বর্ত্তমানে একটী ট্যানারিতে পরিণত হইয়াছে। সপ্তদশ শতাব্দীর একজন ইতিহাস প্রসিদ্ধ মহাবীরের আবাসস্থলের এই শোচনীয় পরিণাম দেখিয়া কবির ভাষায় সদুঃখে বলিতে হয়—

"জাম্ শিয়েদের সুরায় পিছল্ খাস্ দেয়ালের খিলান মাঝ
বাস বেঁধেছে আজকে সেথায় টিকটিকি আর সিংহরাজ!
রাজার সেরা রাজ-শিকারী বহ্রাম কোথায় ঘুমিয়ে রয়—
আজকে তো তার মাথার পরে চাট্ মেরে যায় বন্য হয়!" *

---

# শক্তি-পরীক্ষায় মুসলমান

[ গোলাম মোস্তফা, বি-এ, বি-টি ]

শক্তি-পরীক্ষায় মুসলমান জাতি যে অদ্ভুত বীরত্বের পরিচয় দান করিয়াছে, জগতের ইতিহাসে তাহা অতুলনীয়। বর্ত্তমান যুগের যুদ্ধ-প্রণালীর কথা বলিতেছি না, কারণ এ যুগে বৈজ্ঞানিক অস্ত্র-শস্ত্র এবং ছল-চাতুরীর উপরেই যুদ্ধের জয়-পরাজয় নির্ভর করে। প্রকৃত বীরত্বের স্থান আধুনিক যুদ্ধক্ষেত্রে নাই বলিলেই হয়। কিন্তু অতীত কালে যে সমস্ত যুদ্ধ-বিগ্রহে সত্যকার শক্তিপরীক্ষা হইয়া গিয়াছে, সেখানে মুসলমানগণ যে অমানুষিক শৌর্য্য-বীর্য্য প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা সত্যই জগতের ইতিহাসে এক বিস্ময়কর ব্যাপার। কেবল মাত্র সংখ্যাধিক্যের মধ্যেই যে শক্তি নিহিত থাকে না, শক্তি যে অন্তরের জিনিস, আর এই অন্তরের শক্তি লইয়া অতি অল্পসংখ্যক হইয়াও যে বিপক্ষদলের শত গুণ সেনাকে অবলীলাক্রমে পরাস্ত করা যায়, মুসলমান জাতিই তাহার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত-স্থল। মুসলমান জাতির দিগ্বিজয়ের ইতিহাস পাঠ করিতে বসিলে এই কথাই সর্ব্বাপেক্ষা বড় হইয়া মনে জাগে যে, সত্য যদি শক্তির ভিত্তি

* আনিরুল উমারা, তওয়ারিখে ফেরেস্তা, বাদশাহ্ নামা, Beale's Biographical Dictionary প্রভৃতি অবলম্বনে লিখিত।

হয়, আর ভিতর হইতে যদি প্রেরণা জাগে, তবে পার্থিব কোন শক্তিই সে শক্তির সম্মুখে দাঁড়াইতে পারে না—দুর্নিবার স্রোতের মুখে তৃণগুচ্ছের মত তাহা কোথায় ভাসিয়া যায়। সত্য-সাধক মহাপুরুষ হজরত মোহাম্মদের জীবন-সাধনার প্রতি লক্ষ্য করিলে এ উক্তির সত্যতা অনায়াসে হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে। একটা মানুষের পদতলে সমগ্র বিশ্বের সমবেত শক্তি কেমন করিয়া মাথা নোয়াইল ? কোন্ ভয়ে, কোন্ অস্ত্রাঘাতে শত্রুপক্ষ অমন করিয়া হার মানিল ? শত চেষ্টা সত্ত্বেও কেন তাহারা হজরতের গতিপথে বাধা দিতে সমর্থ হইল না ? কোথায় ছিল হজরতের তরবারি, কোথায় ছিল তাঁর বর্ম্ম ও অস্ত্র-শস্ত্র ? একা—একান্তরূপে একা—নিঃসহায়, দুর্ব্বল, অস্ত্রহীন শত্রু-পরিবেষ্টিত একটী প্রাণ সমগ্র বিশ্বের মিথ্যার বিরুদ্ধে অভিযান করিতেছে ! শত প্রকারের অত্যাচার হইতেছে, প্রাণনাশের ষড়যন্ত্র চলিতেছে, ভ্রুক্ষেপ নাই। তিনি যে সত্য-সাধ্যক,—সত্য যে জয়যুক্ত হইবেই হইবে, মিথ্যা যে কিছুতেই জয়ী হইতে পারিবে না,—এই দৃঢ় আত্ম-বিশ্বাস শত নিরাশার মধ্যেও তাঁহাকে অনুপ্রাণিত করিতেছে। "জোর যার মুলুক তার" এ কথা যে কত বড় মিথ্যা, হজরত মোহাম্মদ অপেক্ষা আর কেহই বোধ হয় তাহা এত স্পষ্ট করিয়া জগদ্বাসীকে দেখাইতে পারেন নাই।

হজরতের যে সাধনা, প্রকৃত মুসলমানেরও সেই সাধনা। তাই দেখিতে পাই, হজরতের অনুকরণে মোসলেম গাজী-গণও জীবনে বহু সফলতা লাভ করিয়া গিয়াছেন। সংখ্যায় এবং অনুপাতে বহুগুণে ন্যূন হইয়াও তাঁহারা যেরূপ অসাধারণ বীরত্বের সহিত অগণিত শত্রু-সেনার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, জগতের ইতিহাসে সেরূপ দৃষ্টান্ত নিতান্তই বিরল। মুষ্টিমেয় আরব-সেনা এশিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকার মত তিনটী মহাদেশে যুদ্ধ করিয়া সর্ব্বত্র বিজয় লাভ করিতেছে, এ দৃশ্য দেখিবার বিষয়। একদিকে তিনটী মহাদেশের কোটী কোটী সুসজ্জিত ও সুশিক্ষিত সেনাবাহিনী এবং বিপুল রণ-সম্ভার, অপর দিকে নগণ্য মরুময় আরবের মুষ্টিমেয় মুসলিম সন্তান ! কী পর্ব্বত প্রমাণ বিসাদৃশ্য। অথচ আশ্চর্য্যের বিষয়, এই নগণ্য মুসলিমগণই সর্ব্বত্র সমভাবে বিজয়ী ! এ কোন্ শক্তি—যাহা সংখ্যার মধ্যে, অস্ত্রের মধ্যে বা দুর্গ-প্রাকারে সীমাবদ্ধ নয় ? সত্যের দুর্জ্জয় শক্তি এ ! ইসলামের বৈশিষ্ট্য এ !! উভয় পক্ষে সংখ্যার যত বৈষম্যই থাকুক, একদিকে সত্য এবং অপর দিকে যে মিথ্যা একদিকে আল্লা, অপর দিকে যে শয়তান, এবং প্রকৃত পক্ষে সংঘর্ষ যে এইখানেই, তাহাতে ত কোনই সন্দেহ নাই ! তাই জয়ী হইবার কালে সত্যই জয়যুক্ত হইয়াছে ! আল্লাই শয়তানকে পরাস্ত করিয়াছেন ! ইহা ত অবশ্যম্ভাবী ! মুসলিম বীরপুরুষগণ এ কথা মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন, তাই তাঁহাদের শত্রুপক্ষের সংখ্যার গুরুত্ব-লঘুত্বের প্রশ্ন অথবা অন্যান্য সুবিধা-অসুবিধার কথা ধর্ত্তব্যের মধ্যেই আনিতেন না। মহাবীর খালেদ কোন যুদ্ধের প্রাক্কালে এ কথা স্পষ্ট করিয়াই ঘোষণা করিয়া দিয়াছিলেন যে, শয়তানেরা সৈন্য সংখ্যায় অগণিত হইলেও আল্লার ফৌজের সঙ্গে কিছুতেই পারিবে না ! ইহা বাস্তবিকই অতি সত্য কথা। নিম্নে আমরা কতিপয় ঐতিহাসিক প্রমাণ দ্বারা এই কথার সত্যতা প্রতিপন্ন করিতে প্রয়াস পাইব। মুসলিম বীরপুরুষগণ যে কিরূপ অসম অনুপাতে যুদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, পক্ষান্তরে তাঁহাদের বিজয় লাভের অনুপাত যে কতগুণ বেশী, পাঠক তাহা লক্ষ্য করিবেন :—

## কোরেশদিগের সহিত যুদ্ধ

বদর যুদ্ধই বিধর্ম্মীদিগের সহিত ইসলামের সর্ব্বপ্রথম প্রকাশ্য যুদ্ধ। হজরত মোহাম্মদ স্বয়ং এই যুদ্ধে উপস্থিত ছিলেন। এই যুদ্ধে কোরেশ-সেনার সংখ্যা ছিল সহস্রাধিক ; তাহাদের সকলেই নানা অস্ত্রে শস্ত্রে সুসজ্জিত। অন্যদিকে নব দীক্ষিত মুসলমান সৈন্যের সংখ্যা মাত্র ৩১৩। তাহাদের

বদর যুদ্ধ

বেশভূষা এবং অস্ত্রপাতির দিক দিয়া দেখিতে গেলে তাহাদিগকে আর সৈন্য বলা চলে না ; কতিপয় পুরাতন অস্ত্রশস্ত্র লইয়া তাহারা আত্মরক্ষায় দণ্ডায়মান। একজন মাত্র তাহাদের অশ্বসাদী। কিন্তু ফলে কোরেশগণই ছত্রভঙ্গ হইয়া পলায়ন করে এবং বহু সংখ্যক মুসলমানদিগের হস্তে বন্দী হয়।

—মওলানা মোঃ আকরম খাঁ সাহেবের মোস্তফা চরিত।

তারপরই হইতেছে "ওহদের ভীষণ অগ্নি পরীক্ষা।" এই যুদ্ধে কোরেশ সেনার সংখ্যা ৩০০০। তাহাদের

ওহদ যুদ্ধ

সকলেই সুসজ্জিত। কিন্তু মুসলমানগণ সংখ্যায় মাত্র ১০০০। ইহার মধ্যে মাত্র

২ জন অশ্বসাদী; ১০ জন বর্ম্মাবৃত এবং ৫০ জন তীরন্দাজ। অপর সকলে নগ্নদেহ পদাতিক, কাহারো হাতে তরবারি, কাহারো হাতে বর্শা। এই ভীষণ যুদ্ধে কতিপয় মুসলিম সৈন্য হজরতের নির্দ্দেশমত কার্য্য না করায় বহু ক্ষতি হইলেও পরিণামে প্রকৃতপক্ষে মুসলমানগণই বিজয়ী হন। কোরেশ-গণের উদ্দেশ্য সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয়।

—মোস্তফা চরিত।

## খৃষ্টানদিগের সহিত যুদ্ধ

দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়া মুসলমানদিগকে যে সমস্ত ভীষণ যুদ্ধের সম্মুখীন হইতে হয়, তাহার মধ্যে এরমুকের যুদ্ধ অন্যতম। এই যুদ্ধে রোমক সৈন্যের সংখ্যা ২৪০,০০০ এবং মুসলমান সৈন্যের সংখ্যা মাত্র ৪০,০০০। কিন্তু এই ভীষণ যুদ্ধে রোমানগণই সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হয়। তাহাদের নিহতের সংখ্যা ১৪০,০০০, অথচ মুসলমানদিগের নিহতের সংখ্যা মাত্র ৩০০০।

এরমুক যুদ্ধ

—History of the Saracens.

কিন্তু 'গিবন' সাহেবের সুপ্রসিদ্ধ—"Decline and fall of the Roman Empire" নামক গ্রন্থে এক লক্ষ চল্লিশ হাজার খৃষ্টান সৈন্যের হিসাব দেওয়া হইয়াছে। আবার Ockly লিখিয়াছেন—

"সেনাপতি আবু ওবায়দা খলিফা ওমরের নিকট যুদ্ধ বর্ণনা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—আমরা এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার খৃষ্টান সৈন্য নিহত করি এবং চল্লিশ হাজার বন্দী করি।" (১)

আজনদিনের যুদ্ধে রোমক শাসনকর্ত্তা ওয়ার্দ্দানের সৈন্য সংখ্যা ছিল ৭০,০০০ এবং মুসলমানদিগের সংখ্যা ছিল ৪৫,০০০। এই যুদ্ধেও রোমকগণ সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হয়। প্রায় ৫০,০০০ খৃষ্টান সৈন্য যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত হয়। কিন্তু মুসলমানদিগের নিহতের সংখ্যা মাত্র ৪৭০ জন।

আজনদিন যুদ্ধ

—Decline and fall of the Roman Empire,
also "ইস্‌লামের ইতিহাস" by Kazi Akram Hossain, M. A.

মিঃ আমির আলি এই যুদ্ধ সম্বন্ধে বলেন—"Their (Roman) army was entirely destroyed only a few escaped with their chief" অর্থাৎ রোমান সৈন্যদল প্রায় সম্পূর্ণরূপেই ধ্বংস হইয়াছিল।

হজরৎ ওসমানের শাসনকালে মিশরের শাসনকর্ত্তা আবদুল্লাহ্ ৪০,০০০ আরব সেনাকে উত্তর আফ্রিকার মরুভূমির মধ্যে পরিচালিত করেন। যথাসময়ে রোমান শাসনকর্ত্তা গ্রেগরীয়াস্ ১২০,০০০ হাজার সৈন্য লইয়া বাধা প্রদান করিতে আসেন। ত্রিপলির যুদ্ধে রোমকগণ সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হয়।

ত্রিপলি যুদ্ধ

—Decline and fall of the Roman Empire.

খলিফা প্রথম অলিদের সময় শাসনকর্ত্তার অনুমতি লইয়া মহাবীর তারেক মাত্র ৭০০০ সৈন্য লইয়া জিব্রাণ্টারে অবতরণ করেন। সৈন্যগণ বাধা প্রদান করিতে আসিয়া সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত হয়। অতঃপর তারেক টলেডা অভিমুখে অগ্রসর হন। স্পেন সম্রাট রডারিক ১০০,০০০ লক্ষ সৈন্য লইয়া বাধা দান করেন। মেডিনা সিডোনিয়ার যুদ্ধে গথগণ সম্পূর্ণরূপে পরাভূত হয় এবং রডারিক পলায়ন করিতে যাইয়া গোয়া-ডেলেট নদীগর্ভে নিমজ্জিত হন।

স্পেন বিজয়

—History of the Saracens.

রোমান সম্রাট ডাইওজেনিস্ দুই লক্ষ সৈন্য লইয়া এশিয়া আক্রমণ করিতে আসিতেছেন শুনিয়া তুর্ক সুলতান আল্‌প আরসলান মাত্র চল্লিশ হাজার অশ্বা-রোহী সৈন্যের সহিত সীমান্ত অভিমুখে ধাবিত হন। এই যুদ্ধে ডাইওজেনিস্ সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইয়া কতিপয় অপমানজনক সর্ত্তে সন্ধি করিতে বাধ্য হন।

তুর্ক সীমান্তে যুদ্ধ

—ইস্‌লামের ইতিহাস।

## পারসিক দিগের সহিত যুদ্ধ

কাদেসিয়ার চিরস্মরণীয় যুদ্ধে পারসিক সৈন্য সংখ্যা এক লক্ষ বিশ হাজার এবং আরব সৈন্যের সংখ্যা ১২ হইতে ৩০ হাজারের মধ্যে। এই যুদ্ধ পারসিকগণ ছত্রভঙ্গ হইয়া পলায়ন করে। ত্রিশ হাজার

কাদেসিয়ার যুদ্ধ

(১) "We killed of them," says Abu Obaida to the Caliph, "one hundred and fifty thousand and made prisoner forty thousand. —Ockly, Vol. I pp. 241

পারসিক নিহত হয়, পক্ষান্তরে মুসলমানদিগের নিহতের সংখ্যা সাত হাজার মাত্র।

—Historians' History of the World, also Decline and fall of the Roman Empire.

মাদাদ যুদ্ধে সেনাপতি 'কারণ' ১০০,০০০ সৈন্য লইয়া মুসলিমদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে আসিলেন। মহাবীর খালেদ কারনের আগমন সংবাদ পাইয়া মাত্র ১৩,০০০ সৈন্য লইয়া যাত্রা করিলেন। এই যুদ্ধে মুসলমানগণই বিজয় লাভ করেন।

মাদাদ যুদ্ধ

মহাবীর খালেদ বিন অলিদ।
by Moulvi Farrokh Ahmed

## ভারতবাসীর সহিত যুদ্ধ

ভারতের সর্ব্বপ্রথম মুসলমান আক্রমণকারী মহাবীর মোহাম্মদ বিন্ কাসিম বসরার শাসনকর্ত্তা হেজাজের অনুমতিক্রমে মাত্র ৬০০০ সৈন্য লইয়া সিন্ধু প্রদেশ আক্রমণ করেন। তৎকালে তাঁহার বয়ঃক্রম ২০ বৎসর মাত্র। সিন্ধুরাজ দাহিরের সহিত 'আলোরে' বিন কাসিমের সাক্ষাৎ হয়। দাহিরের সৈন্য সংখ্যা ছিল ৫০,০০০। কিন্তু যুদ্ধে দাহির সম্পূর্ণ রূপে পরাস্ত হন। —Elphinstone's History of India

সিন্ধু বিজয়

মোহাম্মদ ঘোরীর সহিত যখন দ্বিতীয় বার পৃথ্বিরাজের যুদ্ধ হয়, তখন পৃথ্বিরাজের সৈন্য সংখ্যা ছিল—৩০০,০০০ অশ্বারোহী, ৩০০০ হস্তীসৈন্য এবং অসংখ্য পদাতিক। অথচ মোহাম্মদ ঘোরীর সৈন্যসংখ্যা সর্ব্বশুদ্ধ ১২০,০০০ মাত্র। এই যুদ্ধে ভারতের হিন্দু-কুল-সূর্য্য চিরদিনের মত অস্তমিত হয়। ভারতের মুসলমান রাজত্বের ইহাই সূত্রপাত।

পৃথ্বিরাজের সহিত যুদ্ধ

—Ferista, English Translation by John Briggs.

সম্রাট আকবর মাত্র ৫০০০ সৈন্য লইয়া চিতোর অবরোধ করেন। চিতোরের রাণা ৮০০০ সৈন্য চিতোর দুর্গে নিয়োজিত রাখিয়া সপরিবারে অন্য একটী সুরক্ষিত স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করেন। একদিন রাত্রিযোগে দুর্গাধিপতি জয়মলকে স্বয়ং আকবর কৌশল পূর্ব্বক গুলি করিয়া নিহত করেন। ইহাতেই রাজপুতগণ ভীত হইয়া 'জহর ব্রত' পালন করে। আকবর তাহা বুঝিতে পারিয়া তৎক্ষণাৎ দুর্গ আক্রমণ করেন। সমস্ত রাজপুত সৈন্য নিহত হয়, অথচ মোগল সৈন্য মাত্র ১ জন মারা যায়। এইরূপে মাত্র ১ জন সৈন্যের প্রাণ বিনিময়ে চিতোর বিজিত হয়।— –Ferista.

চিতোর বিজয়

দাক্ষিণাত্যের সুলতান মোহাম্মদ শাহ্ মাত্র ৯০০০ হাজার অশ্বারোহী সৈন্যসহ বিজয় নগরের রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে যান। তিনি এত ক্ষিপ্রতার সহিত অগ্রসর হন যে, রাজা ভয় পাইয়া পালাইয়া যান। মোহাম্মদ শাহ পশ্চাদ্ধাবন করিয়া ৭০,০০০ হাজার হিন্দু সৈন্যকে নিহত করেন এবং বহু হস্তী ও রত্নসম্ভার লাভ করেন।—Ferista.

চিরস্মরণীয় পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধে আহমদ শাহ্ আবদালীর সৈন্য-সংখ্যা ছিল মোট ৫৩,০০০। পক্ষান্তরে মারাঠাদিগের সৈন্যসংখ্যার পরিমাণ—৩০০,০০০ লক্ষেরও অধিক। এই যুদ্ধে মারাঠাজাতির যে শোচনীয় পরিণাম সংঘটিত হইয়াছিল, তাহা ভারতের ইতিহাসাভিজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রেই অবগত আছেন। এই যুদ্ধক্ষেত্রে মারাঠাদিগের ২০০,০০০ লক্ষ সৈন্য নিহত হয়।

পাণিপথের তৃতীয় যুদ্ধ

—Elphinstones' History of India

১১৯৮ খৃষ্টাব্দে বীরকেশরী মহম্মদ বখতিয়ার খিলজী যেরূপভাবে বঙ্গবিজয় করেন, জগতের ইতিহাসে তাহা এক বিস্ময়কর ব্যাপার। মাত্র ১৭ জন সৈন্য লইয়া কোন বীর কোন কালে কোন দেশ বিজয় করিতে পারিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। এই ঘটনা অনেক হিন্দু ঐতিহাসিক বিশ্বাস করিতে চান না। কিন্তু মুসলিম বীর পুরুষদিগের নিকট ইহা যে নিতান্তই স্বাভাবিক ব্যাপার, তাহা উপরোল্লিখিত বিভিন্ন দেশবিজয়ী মুসলিম বীর-কেশরী-দিগের বিজয়-কাহিনী পাঠ করিলেই বুঝা যাইবে। বখতিয়ারের বিহার-বিজয়ের কাহিনী পাঠ করিলেও এই বঙ্গ-বিজয় ব্যাপার নিতান্ত স্বাভাবিকতার গণ্ডীর মধ্যেই আসিয়া পড়ে। যে বীর মাত্র ২০০ দুইশত সৈন্য লইয়া বিহার জয় করিতে পারেন (২) তিনি যে ১৭ জন সৈন্য লইয়া বঙ্গবিজয় করিবেন,

বঙ্গবিজয়

(২) It is said by credible person that he ( Bakhtier ) went to the gate of the fort of Behar with only two hundred horses and began the war by taking the enemy unawares. —Editor

তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি ? তাহা ছাড়া, মহাবীর খালেদ, মুছা, তারেক, মোহাম্মদ বিন্ কাসেম, সুলতান মাহমুদ, আহমদ শাহ আবদালী প্রভৃতি বীরগণের বিজয়-কাহিনী বঙ্গ-বিজয়ের ব্যাপারকে নিতান্তই সহজ করিয়া তুলে না কি ? যাহারা ভীরু, কাপুরুষ, যুদ্ধক্ষেত্রে যাহাদের বীরত্ব প্রদর্শন করিবার কোন সুযোগই জীবনে জুটে নাই, তাহাদের নিকটই ইহা অবিশ্বাস্য বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে, কিন্তু বীরজাতি মুসলমানের নিকট ইহা আদৌ অস্বাভাবিক নহে। এ ঘটনাকে অস্বীকার বা অবিশ্বাস করার মধ্যে চরম ভীরুতা ও কাপুরুষতাই উঁকি মারিতেছে।

উপরে যে সমস্ত যুদ্ধের বিবরণ দেওয়া হইল, তাহাদের সবগুলিই গুরুতর ও ভাগ্যনিয়ামক। এতদ্ব্যতীত ছোট খাটো কত যে যুদ্ধ-বিগ্রহ সংঘটিত হইয়াছে, তাহার ত ইয়ত্তাই নাই। এই সমস্ত যুদ্ধের কেবল মাত্র ফলাফলের মধ্যেই যে মুসলমানদিগের জাতীয় গৌরব নিহিত রহিয়াছে, তাহা নহে; প্রত্যেক যুদ্ধক্ষেত্রেই মুসলমানগণ যে অপূর্ব্ব বীর-মনোভাবের ও আত্ম-নির্ভরতার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, তাহাও নিতান্ত বিস্ময়ের বিষয় এবং তাহাও মুসলমান জাতির পক্ষে এক পরম গৌরব। এইখানেই মুসলিম জাতির শৌর্য-বীর্য্যের মূল উৎসের সন্ধান পাওয়া যায়। সে সমস্ত কাহিনী পড়িতে বসিলে এ কথা জোর করিয়াই মনের উপর দাগ কাটিয়া বসে যে, সংকল্প দৃঢ় হইলে এবং এক প্রাণ, একলক্ষ্য হইয়া কার্য্যে অবতীর্ণ হইলে উদ্দেশ্যের সফলতা অবশ্যম্ভাবী। বর্ত্তমান জগতে মহাবীর কামাল পাশা, গাজী আমানুল্লাহ, রেজা খাঁ, আবদুল করিম প্রভৃতি ক্ষণজন্মা বীরপুরুষগণ এই কথারই সত্যতা প্রমাণ করিতেছেন। জগতে টিকিয়া থাকিবার মত শক্তি ও তেজ যে ইসলামের কতখানি, তাহাও এই সব বীর-কেশরীদিগের ভিতর দিয়া প্রতিপন্ন হইয়া যাইতেছে।

আত্ম-বিস্মৃত মুসলমান জাতি! উপরোক্ত "পচা" অতীতের 'পচা' কাহিনীর মধ্য হইতে প্রেরণা লাভ করিবার মত তোমার কি কিছুই নাই? আত্মোপলব্ধিই আজিকার দিনে তোমার চরম সাধনা হউক। (১)

---

(১) আজ কাল যেমন ঘরে বাহিরে মুছলমানের কাণে অবিরত কলমা দেওয়া হইতেছে যে, সে নগণ্য জঘন্য অকর্ম্মণ্য একটা অতি দুঃস্থ ও দুর্ব্বল জীব মাত্র, কোনও বড় কাজ, বড় ভাব ও বড় সাধনার শক্তি বা অধিকার তাহার নাই, দুনয়ার এই জীবন সংগ্রামের কোনও দিকে কাহারও সহিত মোকাবিলা বা প্রতিযোগিতা করার সামর্থ্য হইতে সে চির-বঞ্চিত—সুতরাং সংসারের কোনও কর্ম্মক্ষেত্রে কোন প্রকারে আত্ম প্রতিষ্ঠা করা মুছলমানের পক্ষে যুগপৎভাবে অন্যায় ও অসম্ভব। মুছলমানের জীবন বেদের সমস্ত রহস্য লুকাইয়া আছে পরনির্ভরশীলতার এই জোলমাতের মধ্যে। এই অবিরাম শিক্ষার ফলে কোনও প্রকার সাধারণ প্রতিযোগীতার নাম শুনিলে বাঙ্গলার মুছলমান আজ যেন মুসড়িয়া মুর্চ্ছিয়া মুরঝিয়া পড়িতে থাকে। কিন্তু লেখক যে কালের মুছলমান সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন তখনকার শিক্ষা ও পারিপার্শ্বিকতা ছিল অন্যরূপ। তখন মুছলমান বুঝিত—আমি অস্ত্র শস্ত্র, উপলক্ষ মাত্র। জয় পরাজয়ের মূল মালিক যিনি, তিনি আমার সঙ্গে আছেন। আমি নিজের কর্ত্তব্য পালন করিয়াই খালাস, সফলতা বিফলতার কৈফিয়তের জন্য আমি দায়ী নহি। পক্ষান্তরে মোছলেম অন্তরের অন্তস্তলে তখন কোরআনের এই শিক্ষাটা অতি গম্ভীর অতি ব্যাপক ও অতি স্থায়ীভাবে বদ্ধমূল হইয়া ছিল যে—বিশ জন ধৈর্য্যশীল মোছলেম দুই শত বৈরীর উপর বিজয় লাভে সমর্থ—এক শত সত্যকার মুছলমান এক হাজার বৈরীকে পরাজিত করিতে সমর্থ।......যাহারা নিতান্ত নিম্ন শ্রেণীর দুর্ব্বলচেতা মুছলমান, তাহারাও একশত দুইশতের মুকাবিলা করিতে এবং তাহাদের উপর জয়লাভ করিতে নিশ্চয়ই সক্ষম হইবে। (কোরআন, আনফাল) তখন মুখের ন্যায় মোছলমানের বুকে বুকেও ঝঙ্কৃত হইত :—

كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة باذن الله — والله مع الصابرين -

কত নগণ্য সংখ্যক দল আল্লার হুকুমে কত কত বিরাট বাহিনীকে বিধ্বস্ত করিয়া দিয়াছে—আল্লাহ ত ধৈর্য্যশীলদিগের সঙ্গেই আছেন। (বাকুরা)। ফলে একটা সত্যকে কেন্দ্র করিয়া তাঁহারা জীবিত ছিলেন এবং নিজেও তাঁহারা যথাযথভাবে সেই সত্যেকে স্বীকার ও বিশ্বাস করিতেন। ফলে বিশ্বাসের দুর্জ্জয় শক্তিই ছিল তাঁহাদের প্রধান সম্বল। আর এখন সেই ঈমানের ও আত্মবিশ্বাসের একান্ত অভাব ঘটাতে বাঙ্গলায় শতকরা ৫৫ জন হইয়াও, নিকৃষ্ট ও অক্ষম কীট পতঙ্গের মত মুহূর্ত্ত অপরের দ্বারা কবলিত হওয়ার আশঙ্কায় প্রতি মুহূর্ত্তেই আমরা যেন আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিতে থাকি।

—সম্পাদক।

# অলৌকিক আত্মত্যাগ

[ আবদুল কাদের ]

১৭৬০ খৃষ্টাব্দে ইংরেজের কৃপায় বিশ্বাসঘাতক মীর জাফরের শাসনকালের অবসান ঘটিলে তদীয় জামাতা নবাব নসির-উল্-মুল্‌ক্ ইম্-তিয়াজ উদ্দৌলা মীর মোহাম্মদ কাসেম আলি খাঁ নসরৎ জঙ্গ বাহাদুর বঙ্গ বিহার ও উড়িষ্যার সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। মীর কাসেম দেখিলেন, রাজ-কোষ অর্থশূন্য। অথচ অর্থ-বলে বলীয়ান না হইলে হৃদয়-নিহিত মহান আশা সফল করিবার কোনই সম্ভাবনা নাই। তজ্জন্য তিনি সিংহাসনে আরোহণ করিবার পর সর্ব্বপ্রথম ধনাগমের উপায়-উদ্ভাবনে সচেষ্ট হইলেন। বহু বৎসর পূর্ব্বে মোগল সম্রাট আওরঙ্গজেব সিরীয়-রাজ নুরুদ্দীন, পাঠান-রাজ নাসীর উদ্দীন, মিসর-সম্রাট সালাহুদ্দিন প্রভৃতি মোসলেম নরপতিগণ বিশাল সাম্রাজ্যের অধীশ্বর হইয়াও বিলাসিতাকে চিরতরে বিসর্জ্জন দিয়া বিশ্ব-জগতে রাজর্ষি নামে পরিকীর্ত্তিত হইয়াছিলেন। প্রজা-বৎসল স্বাধীনচেতা নবাব মীর কাসেমও তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী রাজন্যগণের দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিলেন। তাঁহার কঠোর আদেশে রাজ-পুরী হইতে গীতবাদ্য অন্তর্হিত হইল, অনাবশ্যক দাস দাসী বিদায় গ্রহণ করিল—বিলাসিতার যাবতীয় উপকরণ একে একে দূরীভূত হইল। প্রজার উপকারের জন্য, স্বজাতির সম্মান রক্ষার জন্য ও সর্ব্বোপরি স্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য মীর কাসেম ভোগ-বিলাস পরিত্যাগ করিয়া আড়ম্বরহীন "দরবেশ" জীবন যাপন করিতে লাগিলেন !!

রাজ্যে তখন ভীষণ অশান্তি। ইংরেজ তখন পূর্ব্ব-ভারতে সর্ব্বে-সর্ব্বা। রাজ-কর্ম্মচারীগণের শাসন এবং নবাবের ভ্রুকুটী অগ্রাহ্য করিয়া কুটিল-হৃদয় স্বার্থান্ধ ইং রজ বণিক রাজ্যের সকল স্থানে বিনাশুল্কে বাণিজ্য করিয়া বেড়াইতে-ছিল। দেশের যাবতীয় ধন-সম্পদ বাণিজ্য-লক্ষ্মীর কৃপায় ইংরেজের করতলগত হইতেছিল। ইংরাজেরা বিনাশুল্কে বাণিজ্য করিত; দেশীয় বণিকদিগকে শুল্ক দিতে হইত। সুতরাং প্রতিযোগিতায় দেশীয় বাণিজ্য টিঁকিতে পারিল না। ধনহীন হইয়া স্বর্ণ-প্রসূ বঙ্গ-ভূমি উৎসন্ন যাইতে বসিল। যে সকল দেশীয় বণিক, জমিদার ও অধিবাসী স্বদেশের সর্ব্বনাশে ব্যথিত হইয়া ইংরাজ বণিকের অবাধ বাণিজ্যে ব্যাঘাত জন্মাইবার চেষ্টা করিল, তাহারা খৃষ্টান সৈন্যগণের হস্তে অমানুষিক উৎপীড়ন সহ্য করিয়া ইহলোক হইতে চির-তরে অপসৃত হইতে লাগিল। ইংরাজের অত্যাচারে দেশে হাহাকার উঠিল। কোটী কণ্ঠের করুণ আর্ত্তনাদে বঙ্গ বিহার উড়িষ্যার গগন-পবন মুখরিত হইয়া উঠিল। মীর কাসেম ইংরাজ বণিক-সভার নিকট অভিযোগ উত্থাপন করিয়া এবং কোম্পানির কর্ম্মচারিগণের বাণিজ্যের শুল্কহার নির্দ্ধারিত করিয়া দিয়া প্রজাবর্গের দুরবস্থার প্রতিকার সাধনে চেষ্টিত হইলেন। কিন্তু তাঁহার চেষ্টা ফলবতী হইল না। অগত্যা তিনি বাণিজ্য-শুল্ক একেবারে রহিত করিয়া দিলেন। ইহাতে ইংরেজের স্বার্থে আঘাত পড়িল। দেশীয় বাণিজ্যের সর্ব্বনাশ-সাধনই তাহাদের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল। মীর কাসেমের এই কার্য্যে তাহাদের সে-উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইল। তাহারা বাহুবলে স্বাধিকার প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য যুদ্ধযাত্রা করিল। মহাবীর মীর কাসেমও নির্ভয়-চিত্তে ইংরেজের অত্যাচার হইতে প্রজার ধন প্রাণ ও জন্মভূমির স্বাধীনতা রক্ষার জন্য সসৈন্যে রণ-সাজে সজ্জিত হইলেন।

বুদ্ধিমান মীর কাসেম দিব্যচক্ষে ভবিষ্যৎ-বিপদ দর্শন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তাই জন্মভূমির স্বাধীনতা রক্ষার্থে তিনি ইংরাজের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়াই স্থির করিলেন। ইংরাজের পাশব অত্যাচার নিবারণ, প্রজাকুলের

মঙ্গল-সাধন এবং স্বদেশ ও স্বজাতির গৌরব রক্ষার্থে, পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে সিরাজউদ্দৌলা তাঁহারই স্বদেশীয়গণের নির্ম্মম বিশ্বাসঘাতকতায় প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন। বীর-হৃদয় মীর কাসেমও জন্মভূমির স্বাধীনতা ও প্রজারক্ষার জন্য আত্ম-বিসর্জ্জনে প্রস্তুত হইলেন।

মীর কাসেমের সুশিক্ষিত অশ্বারোহী সেনাদলের নায়ক মোহাম্মদ তকী খাঁ বাহাদুর নবাবের আদেশে মুর্শিদাবাদ রক্ষার্থে প্রেরিত হইয়াছিলেন। অজয় নদের তীরে নবাব-সেনার সহিত ইংরেজ-সেনার প্রথম শক্তি পরীক্ষার পর মহাবীর তকি খাঁ দ্রুতপদে কাটোয়ার রণক্ষেত্রে উপনীত হইলেন। বাঙ্গলার ইতিহাস হিংসা-বিদ্বেষ ও বিশ্বাস-ঘাতকতার ইতিহাস। অসংখ্য স্বদেশদ্রোহী, অকৃতজ্ঞ ও বিশ্বাস-ঘাতকের ইতিবৃত্ত বক্ষে ধারণ করিয়া বাঙ্গলার ইতিহাস কলঙ্কিত। সে-ইতিহাস লিখিতে ঘৃণায় লেখনী সঙ্কুচিত হইয়া আসে। তকী খাঁ যখন ইংরাজদিগকে বাধা-দানে প্রস্তুত হইতে লাগিলেন, তখন তাঁহার সেনা-নায়কগণ তকি খাঁর পদ-গৌরব ও তাঁহার দেশব্যাপী যশোলাভে ঈর্ষান্বিত হইয়া একযোগে যুদ্ধ করিতে অসম্মত হইল। নবাব মীর কাসেমের অন্নে, অর্থে ও অনুগ্রহে যাহারা সেনাপতির পদে অধিষ্ঠিত হইয়া দেশবাসীর সম্মানের পাত্র বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিল—যাহাদের রণ-কৌশল ও প্রভুভক্তির উপর নির্ভর করিয়া মীর কাসেম ইংরাজ-বিতাড়নে অগ্রসর হইয়াছিলেন, হিংসা ও বিদ্বেষের বশবর্ত্তী হইয়া, বাঙ্গলা-বিহার ও উড়িষ্যার সেই মহা বিপদের দিনে এইরূপে তাহারা তাঁহার কৃতজ্ঞতার ঋণ পরিশোধ করিতে, প্রভুভক্তি ও স্বদেশ-প্রেমের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিতে উদ্যত হইল! সেনাপতিগণের অচিন্তিতপূর্ব্ব জঘন্য ব্যবহার প্রত্যক্ষ করিয়া মোহাম্মদ তকি খাঁ অত্যন্ত মর্ম্মাহত হইলেন। কিন্তু তাঁহার হৃদয় হইতে প্রভুভক্তি বিলুপ্ত হইল না। প্রভুর ভবিষ্যৎ বিপদ ভাবিয়া তকি খাঁর বীর-হৃদয় অধীর হইয়া উঠিল। অধস্তন সেনানায়কগণের সাহায্যে বঞ্চিত হইয়াও তিনি নিরুৎসাহ হইলেন না। ১৭৭৫ খৃষ্টাব্দে পলাশীর রণক্ষেত্রে মীর জাফর প্রভৃতি নবাব-সিরাজউদ্দৌলার সেনাপতিগণ যখন তাঁহার পক্ষে যুদ্ধ করিতে অস্বীকৃত হইয়াছিল, তখন মোহনলাল ও মীর মদন সসৈন্যে ইংরাজের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া স্বদেশ ও স্বজাতি-প্রেম এবং প্রভুভক্তির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। ১৭৬৩ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসের ঊনবিংশ দিবসে বাঙ্গলার অমর বীর মোহাম্মদ তকি খাঁ বাহাদুরও ব্যূহ রচনা করিয়া কাটোয়ার যুদ্ধক্ষেত্রে ইংরাজের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন।

যুদ্ধ চলিতে লাগিল। আহতের আর্ত্তনাদে, কামান-গর্জ্জনের গগনভেদী শব্দে, অশ্বের হ্রেষারবে, রণভূমি মহাপ্রলয়ের মহা প্রান্তরের ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল। অসংখ্য মৃতদেহে যুদ্ধক্ষেত্র আচ্ছন্ন হইল। প্রবল বেগে রক্ত-স্রোতস্বিনী প্রবাহিত হইল। মহাবীর মোহাম্মদ তকি খাঁ বাহজ্ঞানহারা হইয়া প্রবল পরাক্রমে রণক্ষেত্রে শত্রু দলন করিতে লাগিলেন। তদীয় আফগান এবং মোগল সৈন্যগণ ও অলৌকিক বীরত্ব সহকারে বিপক্ষ বাহিনী মথিত করিয়া ইংরাজগণের অন্তরে বিভীষিকার সঞ্চার করিতে লাগিল। যুদ্ধক্ষেত্রের অবস্থা-দৃষ্টে বোধ হইল বিজয়-লক্ষ্মী মোহাম্মদ তকি খাঁরই অঙ্কশায়িনী হইবেন—ইংরাজের জয়াশা চিরকালের জন্য বিলুপ্ত হইবে—কাটোয়ার রণক্ষেত্রে নবাব মীর কাসেমের বিজয় দুন্দুভি বাজিয়া উঠিবে। কিন্তু মীর কাসেমের দুর্ভাগ্য! বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যার দুর্ভাগ্য! তাই ঘটনা স্রোত হঠাৎ বিপরীত দিকে প্রবাহিত হইল। ভীষণ বেগে যুদ্ধ চলিতেছিল। অকস্মাৎ ইংরাজ-সৈন্যের কামানের গোলা আসিয়া তকি খাঁর এক পদ বিদ্ধ করিল। তিনি আহত হইলেন; তদীয় অশ্বের প্রাণহীন দেহ ভূমি-তলে পতিত হইল। আহত পদ বা অশ্বের মৃতদেহ কোন দিকেই তাঁহার দৃক্‌পাত নাই। প্রথম অশ্ব নিহত হইবা মাত্র তিনি দ্বিতীয় অশ্বে আরোহণ করিয়া তেজোময় উৎসাহ বাক্যে সৈন্যগণকে ইংরাজ-দলনে উত্তেজিত করিয়া দ্বিগুণ তেজে বিপক্ষ সৈন্য-শোণিতে তাঁহার তীক্ষ্ণধার কৃপাণ রঞ্জিত করিতে লাগিলেন। ঠিক সেই মুহূর্ত্তে আবার একটী বন্দুকের গুলি তাঁহার স্কন্ধ দেশের এক পার্শ্বে প্রবিষ্ট হইয়া অপর পার্শ্ব দিয়া বহির্গত হইয়া গেল। ক্ষত-মুখে অজস্র শোণিত-স্রাব হইতে লাগিল। কিন্তু এই খানেই বিপদের শেষ হইল না। শত্রু-পক্ষের নিক্ষিপ্ত অপর একটা গুলিতে তাঁহার দ্বিতীয় অশ্বটীও প্রাণত্যাগ করিল। নিজে আহত, অশ্ব নিহত, কিন্তু কি আশ্চর্য্য! এত বড় ভীষণ আঘাত—এত বড় বিপদেও মোহাম্মদ তকি খাঁর বদন মণ্ডলে বেদনার চিহ্ন মাত্র দেখা গেল না। সৈন্যদল নিরুৎসাহ না হয়,

তিনি তাহারই চেষ্টায় মনঃসংযোগ করিলেন। মহাবীর অগৌণে আহত স্থান বস্ত্রাবৃত করিয়া তৃতীয় অশ্বে * আরোহণ পূর্ব্বক নবোদ্যমে ইংরাজ-দলনে অগ্রসর হইলেন। এবার ইংরেজেরা এই স্বদেশপ্রাণ প্রভুভক্ত বীর যুবকের ভীমপ্রতাপ সহ্য করিতে পারিল না। তাহারা পশ্চাতে হটিয়া যাইতে বাধ্য হইল। যুদ্ধক্ষেত্রের সম্মুখে একটী ক্ষুদ্র স্রোতস্বতী প্রবাহিত হইতেছিল। একদল ইংরাজ-সৈন্য ঐ নদী-খাতের মধ্যে ঝোপের আড়ালে লুক্কায়িত ছিল। নবাব সৈন্য ঐ স্থানে উহাদের অবস্থিতি সম্বন্ধে কিছুই জানিত না, বীরবর তকি খাঁ নদী-তীরে উপস্থিত হইয়া ইংরাজদের সহিত 'হাতাহাতি' যুদ্ধ করিবার জন্য নদী উত্তীর্ণ হইবার পথ অনুসন্ধান করিতেছিলেন। এমন সময় লুক্কায়িত ইংরাজ সৈন্য সহসা একযোগে আক্রমণ করিল। তকি খাঁর অধিকাংশ সৈন্যের প্রাণহীন দেহে নদীতীর আচ্ছন্ন হইল। শত্রু পক্ষের একটী গুলি তকি খাঁর মস্তিষ্কে প্রবিষ্ট হইল। তাঁহার অসাড় দেহ অশ্ব পৃষ্ঠ হইতে ভূমিতলে পতিত হইল। মোসলেম পূর্ব্ব-ভারতের গৌরব-প্রদীপ নির্ব্বাপিত হইল, অন্যায় সমরে কাটোয়ার রণক্ষেত্রে ইংরাজেরা জয় লাভ করিল *। ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে পলাশীর মহাশ্মশানে বীরবর মীর মদন জন্মভূমির স্বাধীনতা ও স্বীয় প্রভুর সম্মান রক্ষার জন্য আত্ম-বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন, ১৭৬৩ খৃষ্টাব্দে সেই ঘটনার ৬ বৎসর পর কাটোয়ার রণক্ষেত্রে মোহাম্মদ তকি খাঁ "অলৌকিক আত্মত্যাগে" জগতে অক্ষয় কীর্ত্তি অর্জ্জন করিলেন।

ভীরু বলিয়া বাঙ্গলা বিশ্বে অপবাদগ্রস্ত। তকি খাঁ বাঙ্গালার সে কলঙ্ক অপনোদন করিয়াছিলেন। বাঙ্গলা যখন ঘৃণ্য স্বার্থের জন্য সুদূর প্রতীচ্যের একটা ব্যবসায়ী জাতির নিকট স্বদেশের স্বাধীনতা-বিক্রয়ের হীন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত—মীর জাফর, জগৎশেঠ, রাজবল্লভ, কৃষ্ণচন্দ্র, উমিচাঁদ প্রভৃতি অসংখ্য 'নেমক হারাম' বিশ্বাসঘাতকের জন্ম গ্রহণে যখন বঙ্গভূমি কলঙ্কিত—দেশের লোক যখন স্বাধীনতার মূল্য ও প্রভুভক্তি বিস্মৃত, তখন মোহাম্মদ তকি খাঁ এইরূপ অপূর্ব্ব আত্মত্যাগ, অলৌকিক বীরত্ব, অদ্ভুত স্বদেশ-প্রেম এবং অতুলনীয় প্রভুভক্তি প্রদর্শন করিয়াছিলেন।

হলদি-ঘাটে প্রতাপের বীরত্ব ও দেশ-প্রেম তকি খাঁর বীরত্ব ও স্বদেশ-প্রীতির তুল্য নহে। হলদী-ঘাটে প্রতাপের স্বদেশবাসীরা একযোগে তাঁহার পতাকা-তলে সমবেত হইয়াছিল, কিন্তু কাটোয়ার রণক্ষেত্রে তকি খাঁর সেনা-নায়কেরা সসৈন্যে তাঁহার পক্ষ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। শুধু নিজ সৈন্যগণের এবং স্বকীয় বীরত্বের উপর নির্ভর করিয়াই তকি খাঁ ইংরেজ-দলনে অগ্রসর হইয়াছিলেন। থার্ম্মপলির গ্রীক-বীর লিওনিডাসের ন্যায় তকি খাঁরও মুষ্টিমেয় অনুচর এই স্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষার্থে রণক্ষেত্রে আত্মোৎসর্গ করিয়াছিলেন। হলদিঘাট ও থার্ম্মোপলি তীর্থস্থলে পরিণত হইয়াছে; কিন্তু কাটোয়া অজ্ঞাত হইয়া রহিয়াছে। প্রতাপ ও লিওনিডাসের নাম আজ জগদ্বাসীর নিকট পরিচিত;—তাঁহাদের বীরত্ব ও আত্মত্যাগ লইয়া কত কাব্য মহাকাব্য পর্য্যন্ত রচিত হইয়াছে। কিন্তু জগদ্বাসী ত দূরের কথা, যে বাঙ্গলার জন্য তকি খাঁ বাহাদুর আত্মবিসর্জ্জন করিয়াছিলেন, সেই বাঙ্গালীরাও আজ তকি খাঁর নাম বিস্মৃত হইয়া গিয়াছে। কেবল তাহাই নহে, স্কট, মেলিসন প্রভৃতি ইউরোপীয় ঐতিহাসিকগণ বিস্ময়-বিমুগ্ধ চিত্তে যে তকি খাঁর বীরত্ব, প্রভুভক্তি ও দেশ-প্রেমের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন, বাঙ্গলা ঔপন্যাসিক ইংরাজ-কর্তৃক নবাব শিবির আক্রমণ-কালে সেই তকি খাঁকে শিবিরে নৃত্য গীতের 'মজ্‌লিসে' বসাইয়া রাখিয়া এবং বারবনিতা 'দলনীর' দ্বারা পদাঘাত খাওয়াইয়া তাঁহার পূর্ব্ব স্বদেশ-হিতৈষণা, আত্মত্যাগ ও প্রভুভক্তির প্রতি সম্মান (?) প্রদর্শন করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন! জানিনা কৃতঘ্নতার ইহা অপেক্ষা জলন্ত দৃষ্টান্ত বিশ্ব-ইতিহাসে আর কিছু আছে কিনা।

তকি খাঁর অপূর্ব্ব বীরত্ব ও দেশ-প্রেম ইংরাজেরাও মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন। তকির স্বদেশ-প্রেম ও

---

* স্কটের মতে তৃতীয় অশ্বে আরোহণের পর তকি খাঁর মৃত্যু হয়, কিন্তু মুতাআখ্‌খরীণকার বলেন যে, দ্বিতীয় অশ্বে আরোহণের পর তকি খাঁ দেহ ত্যাগ করেন। আমরা অশ্ব-বিষয়ে স্কটের এবং অন্যান্য বিষয়ে মুতাঅখ্‌খরীণকারের অনুসরণ করিলাম। —লেখক।

"Mohammad Takky (?) khan attacked them ( English )...He had two horses killed under him and had mounted a third, when a ball lodging in his forehead, he expired." —Scott's "History of Bengal".

মহাবীর তকি খাঁ বাহাদুরের অপূর্ব্ব আত্মত্যাগ, অদ্ভুত প্রভুভক্তি ও অলৌকিক বীরত্বের বিস্তৃত ইতিহাস জানিবার জন্য মুন্‌শী গোলাম হোসেনের "সায়ের-উল্ মুতাখ্‌খারীণ" বা উহার ইংরেজী অনুবাদ অথবা মহাপ্রাণ অক্ষয় কুমার মৈত্রের প্রণীত "মীর কাসেম" দ্রষ্টব্য।—লেখক

প্রভুভক্তির দৃষ্টান্তের তুলনা জগতের ইতিহাসে বিরল। বাঙ্গালীর হৃদয়ে স্বদেশ-প্রেম থাকিলে কাটোয়া প্রান্তর, হলদিঘাট ও থার্ম্মোপলীর ন্যায় তীর্থস্থানে পরিণত হইত। বাঙ্গলায় প্রকৃত স্বদেশ-প্রাণ ঐতিহাসিক, কবি, নাট্যকার ও ঔপন্যাসিক থাকিলে বাঙ্গলার ইতিহাস, কাব্য—মহাকাব্য নাটক ও উপন্যাসে তকি খাঁ বাহাদুরের অতুল বীরত্ব, স্বদেশ-হিতৈষণা, আত্মত্যাগ ও প্রভুভক্তির কথা বিঘোষিত হইত। প্রতাপ সিংহ ও লিওনিডাসের ন্যায় তকি খাঁর নামও আজ দেশবাসীর কণ্ঠে ভক্তিভরে উচ্চারিত হইত।

বাঙ্গালার নিরপেক্ষ ঐতিহাসিক, মোসলেম সমাজের ভক্তিভাজন বাবু অক্ষয় কুমার মৈত্রেয় মহাশয় এ সম্বন্ধে সমালোচনা-প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন "বাঙ্গালার ইতিহাস নিরবচ্ছিন্ন কলঙ্ক কাহিনীতে পরিপূর্ণ হইয়া রহিয়াছে!...... যে দুই একজনের ললাট কলঙ্ক-মুক্ত, তাঁহাদিগের কথাও এদেশে সহজে বিস্মৃত হইয়া গিয়াছে! নচেৎ মোহাম্মদ তকি খাঁর ন্যায় কর্ত্তব্য-পরায়ণ বীরপুরুষের নামে উপন্যাসে কলঙ্ক-সংযোগের সাহস হইত না। এইরূপ বীর-চরিত্রে কলঙ্ক লেপন করিতে যাহাদের হৃদয় বিন্দুমাত্র ব্যথিত হয় না, তাহাদের দেশেই জনসাধারণের নিকট তাহাদের উপন্যাস অকৃত্রিম উৎসাহ লাভ করিয়াছে, অভিনয় স্থলেও রঙ্গমঞ্চ করতালিধ্বনিতে মুখরিত হইয়া উঠিয়াছে!......হায়! তকি খাঁর শরীরে সর্ব্বজন সমক্ষে বার-বনিতার পদাঘাত;—বঙ্গ-রঙ্গ-ভূমির দুরপনেয় কলঙ্ক!" এই মন্তব্যের উপর টীকা টিপ্পনী নিষ্প্রয়োজন।

---

# হাকিম আজমল খাঁ।

[ মোল্লা নাসিরুল হক্ ]

দুই মাসেরও অধিক কাল গত হইতে চলিল, হাকিম আজমল খাঁ জান্নাতবাসী হইয়াছেন। তাঁহার তিরোধানে ভারতীয় মুসলমানের তথা সমগ্র ভারতীয় জাতির যে কতখানি ক্ষতি হইয়াছে,—দেশ বা জাতিকে ভালবাসিবার সৌভাগ্য যাঁহাদের হইয়াছে, বুকের রক্ত ঢালিয়া মাতৃভূমির সেবা করিয়া যাঁহারা ধন্য হইয়াছেন, তাঁহারই তাহা মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করিতেছেন। হাকিম আজমল খাঁ দেশের বা জাতির কি ছিলেন, ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে তাঁহার স্থান কোথায়—তাহা বিচার করিবার সময় এখনও আসে নাই, আর সে-বিচারের ক্ষমতাও আমার নাই। তবে তাঁহার সাধনা ও সংযমপূত জীবনের আদর্শ মানুষ মাত্রেরই অনুকরনীয়, তাই আজ সেই পুণ্য আদর্শকে সর্ব্বসাধারণের চক্ষুর সম্মুখে উপস্থাপিত করিবার জন্য আমার এই দুঃসাহসিক প্রয়াস।

হিন্দুস্থানে মুসলীম-গৌরবের সমাধি-শ্মশান দিল্লী নগরীতে ১২৪৮ হিজরীর ১৭ই সওয়াল তারিখে পুণ্য-শ্লোক হাকিম আজমল খাঁ জন্মগ্রহণ করেন। যে বংশে তাঁহার জন্ম হয়, তাহা অতি প্রাচীন অভিজাত বংশ। হাকিমজীর পূর্ব্ব পুরুষগণ মধ্য এশিয়ার তুর্কীস্থানের কাশার নামক প্রসিদ্ধ নগরে অধিবাস করিতেন। তাঁহাদের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম যিনি হিন্দুস্থানে আগমন করেন, তিনি সম্রাট বাবর শাহের একজন পদস্থ কর্ম্মচারী ছিলেন। তিনি বাবর শাহের ভারত-অভিযান-কালে একশত অশ্বারোহী সৈন্যের অধিনায়করূপে এদেশের মাটীতে পদার্পণ করেন।

পরবর্ত্তী কালে বাবর শাহের এই কীর্ত্তিমান সৈন্যাধ্যক্ষের বংশধরগণের মধ্যে খাজা হাশেম ও খাজা কাসেম নামক দুই ভ্রাতা হায়দ্রাবাদ ও সিন্ধুদেশে আসিয়া বসবাস করিতে আরম্ভ করেন এবং অত্যল্প কাল মধ্যেই নিজেদের ন্যায়নিষ্ঠা, ধর্ম্মপরায়ণতা ও সততার গুণে বিশেষরূপে জনপ্রিয় হইয়া উঠেন। ইহার কিছুকাল পরে অসাধারণ জ্ঞানী ও মনীষী মোল্লা আলী কারীর উদ্ভবে এই বংশের যশঃ ও কীর্ত্তি-কথা ভারতের প্রায় সর্ব্বত্র প্রচারিত হইয়া পড়ে।

প্রসিদ্ধ হাকিম ফজল খাঁ, এই মোল্লা আলী কারীরই সুযোগ্য পৌত্র। ইঁহার সময়ই এই বংশে ইউনানী চিকিৎসা শাস্ত্রের আলোচনার সূত্রপাত হয় এবং তাহার পর হইতেই চিকিৎসা-ব্যবসায় ইঁহাদের বংশপরম্পরাগত হইয়া উঠে। এ কথা বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হইবে না যে, ইঁহারাই সর্ব্বপ্রথম ভারতে ইউনানী চিকিৎসা-শাস্ত্রের প্রবর্ত্তন করিয়া ভারতীয় মুসলমানের অন্তরে জাতীয় চিকিৎসার প্রেরণা জাগাইয়া দিয়াছিলেন।

হাকিম ফজল খাঁর ব্যবসায়ের ক্ষেত্র ছিল—দিল্লী ও সমগ্র উত্তর ভারত। তাঁহারই চিকিৎসা-নৈপুণ্যের গুণে উত্তর ভারতের জনগণ ইউনানী চিকিৎসার প্রতি শ্রদ্ধাবান হইয়া পড়ে।

অতঃপর হাকিম শরীফ খাঁর ( ইনি হাকিম আজমল খাঁর পিতামহ ) সময়ে এই বংশ ইউনানী ভেষজালোচনায় উন্নতির সর্ব্বোচ্চ সোপানে উন্নীত হয়। এই সময় নানা দিগ্দেশ হইতে চিকিৎসকগণ আসিয়া তাঁহার সহিত দুরারোগ্য জটিল ব্যাধি সমূহের প্রতীকারের উপায় সম্বন্ধে আলোচনা করিতেন এবং তাঁহার ব্যবস্থাকেই চরম ব্যবস্থা বলিয়া মানিয়া লইতেন।

হাকিম শরীফ খাঁর লোকান্তর গমনের পর তাঁহার সুযোগ্য পুত্র হাকিম মাহ্‌মুদ খাঁ পিতার নির্দ্দিষ্ট পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া ইউনানী চিকিৎসা-বিজ্ঞানের উন্নতিকল্পে আত্মনিয়োগ করেন। এই হাকিম মাহ্‌মুদের ঔরসেই বিশ্রুত-কীর্ত্তি হাকিম আজমল খাঁর জন্ম হয়।

শৈশব হইতেই হাকিম আজমল খাঁ মেধাবী ও তত্ত্বানুসন্ধিৎসু ছিলেন। ইউনানী চিকিৎসা শাস্ত্রের প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ছিল। সেই নিমিত্ত কিশোর বয়স হইতেই তিনি ইহার আলোচনা আরম্ভ করেন। অল্প বয়সে পিতৃবিয়োগ হওয়ায় তিনি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হাজিক উল্ মুল্ক হাকিম আবদুল মজিদ খাঁর নিকট হইতেই এতৎসম্পর্কে সাহায্য গ্রহণ করিতেন।

যৌবনে হাকিম সাহেব বিভিন্ন ইস্‌লামিক প্রতিষ্ঠান সমূহ হইতে ইস্‌লামিক রীত্যনুসারে আরবী পার্শী ও উর্দ্দূ সাহিত্যে, তর্ক জ্যোতিষ এবং গণিত শাস্ত্রে বিশেষরূপ শিক্ষা লাভ করেন। তিনি ইংরাজী ভাষা শিক্ষা করেন নাই, কিন্তু উত্তর কালে ইউরোপের নানাদেশ পর্য্যটনের ফলে ইংরাজী ভাষায় যথেষ্ট জ্ঞান অর্জ্জন করিলেও তিনি ইংরাজী ভাষার সাহায্যে কথোপকথন করিতে নিতান্ত সঙ্কোচ বোধ করিতেন।

১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে হাকিম সাহেব মেসোপটেমিয়া গমন করেন। ইহাই তাঁহার জীবনে সর্ব্বপ্রথম বহির্ভ্রমণ। এই সময় তিনি বসরা ওসাইর, কুত-অল্-আমারা, বাগদাদ, জুলকিফি, কুফা, নাজাফ এবং কারবালা প্রভৃতি নগরে ভ্রমণ করিয়া তত্তৎস্থানের তীর্থ সমূহ দর্শন করেন। এতদ্ব্যতীত ঐ সকল স্থানের পুস্তকালয় সমূহ হইতে দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ সমূহ সংগ্রহ করিয়া তিনি গভীর ভাবে অধ্যয়ন করেন এবং বিভিন্ন পন্থী বৈজ্ঞানিক ও চিকিৎসকগণের সহিত আলাপ আলোচনা করিয়া চিকিৎসা-বিজ্ঞান-ক্ষেত্রে অশেষ জ্ঞান লাভ করেন। এই ভাবে সুদীর্ঘ ভ্রমণ শেষ করিয়া হাকিমজী ঐ বৎসরের মে মাসে স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে ইউরোপ গমন করিয়া হাকিমজী তিন মাসকাল তথায় অবস্থান করেন। ৭ই জুন তারিখে তিনি লণ্ডন নগরে উপস্থিত হন এবং আলীগড় এম, এ, ও, কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ স্যর থিওডোর মরিসন সাহেবের সাহায্যে তত্রত্য প্রধান প্রধান চিকিৎসালয় ও ভৈষজ্য বিদ্যালয় সমূহ পরিদর্শন কালে ইণ্ডিয়া আফিশ ও বৃটীশ মিউজিয়মের পুস্তকালয় সমূহে বহু মূল্যবান গ্রন্থ অধ্যয়নের সুযোগ লাভ করেন। লণ্ডন হইতে তিনি অক্সফোর্ড ও কেম্‌ব্রিজ নগরে গমন করেন। কেম্‌ব্রিজে অবস্থান কালে তিনি তত্রত্য বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ই, জি, ব্রাউন সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করেন। অতঃপর লণ্ডনে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া ৭ই জুলাই তারিখে সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জের অভিষেকোৎসবে যোগদান করেন।

স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তনকালে হাকিমজী প্রায় সমগ্র ইউরোপ ঘুরিয়া আসেন। প্যারী নগরীতে কয়েকজন বন্ধুর সহায়তায় তিনি তথাকার সরকারী হাঁসপাতাল ( state Hospital ) ও অন্যান্য ইতিহাস-প্রসিদ্ধ স্থান পরিদর্শন করেন। অতঃপর প্যারী হইতে তিনি বার্লিনে গমন করেন এবং দিল্লীতে স্বীয় অভিলষিত কলেজ প্রতিষ্ঠার জন্য তত্রত্য হাঁসপাতাল সমূহের বিধি-ব্যবস্থা সম্বন্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপ অনুশীলন করেন। প্রাচ্য পুস্তকালয়েও ( Oriental Library ) তাঁহাকে ইচ্ছামত গ্রন্থ অধ্যয়নের সুযোগ

দেওয়া হইয়াছিল। ভিয়েনা নগরেও তিনি উপরোক্তরূপ তত্ত্বানুসন্ধানে ব্যাপৃত ছিলেন।

প্রত্যাবর্ত্তন-পথে যখন তিনি কন্‌স্তন্তিনিয়ায় আগমন করেন, তখন তাঁহার অভ্যর্থনার জন্য বিপুল আয়োজন হইয়াছিল। কায়রো নগরেও তিনি কিছুদিন অবস্থান করিয়াছিলেন। সেই সময় তিনি ভুবন-বিখ্যাত আল্ আজহার বিশ্ববিদ্যালয় পরিদর্শন করেন।

ভারতের রাজধানী দিল্লীতে স্থানান্তরিত হইলে তদানীন্তন বড়লাট-পত্নী লেডি হার্ডিঞ্জ যখন ব্যাধিগ্রস্ত ভারতীয়গণের অবস্থা অবলোকন করিয়া তাহাদের রোগ মুক্তির সুবন্দোবস্ত করিবার জন্য চিকিৎসা-প্রতিষ্ঠান সমূহের সংখ্যা বৃদ্ধি করিতে বদ্ধপরিকর হন, তখন সেই মহৎকার্য্য সংসাধন-ব্যাপারে হাকিমজী প্রাণপণে তাঁহাকে সাহায্য করিয়াছিলেন। অতঃপর লর্ড হার্ডিঞ্জ যখন বোমার দ্বারা গুরুতররূপে আহত হন, তখন—সেই সঙ্কট সময়ে হাকিমজী রাজপ্রতিনিধির সেই আকস্মিক বিপদে যথেষ্ট সহানুভূতি প্রদর্শন করিয়াছিলেন এবং সেই সময় হইতেই তিনি ব্যক্তিগতভাবে লর্ড হার্ডিঞ্জের সহিত সখ্যসূত্রে আবদ্ধ হন।

চিকিৎসা-শাস্ত্রে অভিজ্ঞতা ব্যতীত হাকিমজী স্বরচিত "ভৈষজ্য পদ-সমূহের ভূমিকা" ( Introduction to medical terms ) ও "মহামারী বা প্লেগ" ( A taunt or the plague ) প্রভৃতি কতিপয় গ্রন্থ রচনা করিয়াও চিকিৎসা-জগতে প্রচুর খ্যাতি অর্জ্জন করিয়া গিয়াছেন।

ইউরোপ গমনের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত হাকিমজী কেবল নিজের সম্প্রদায়ের স্বার্থের প্রতি লক্ষ রাখিয়া কার্য্য করিয়াছিলেন; কিন্তু ইউরোপ হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পর হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়েরই স্বার্থের প্রতি সতর্ক লক্ষ্য রাখিয়া নূতন উদ্যমে কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর হন। ১৯১৮ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তিনি প্রকাশ্যভাবে ভারতের রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগদান করেন নাই। ঐ বৎসর ডিসেম্বর মাসে দিল্লীতে যে কংগ্রেসের অধিবেশন হয়, হাকিমজী তাহার অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি মনোনীত হন এবং সেই সময় হইতেই তিনি প্রকাশ্যভাবে রাজনীতিক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন।

১৯১৯ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে নিতান্ত আকস্মিক ভাবে পাঞ্জাব বিপ্লবের উদ্ভব হইলে হাকিমজী সর্ব্বকার্য্য ত্যাগ করিয়া জনসাধারণের মধ্যে শান্তি স্থাপনের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহার সে-চেষ্টা ফলবতীও হইয়াছিল। তাঁহারই ঐকান্তিক আগ্রহ ও প্রচেষ্টার ফলে সে-সময়ে দিল্লীর জনসাধারণ সামরিক আইনের ( Martial law ) হাত হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়াছিল। ইহার কিছুদিন পরেই সামরিক আইনের নির্ম্মম বিধানে লাহোর ও অমৃত-সহরে দুইটী লোমহর্ষণ ঘটনার অভিনয় হইয়া যায়। হাকিমজী তৎসম্পর্কে তাঁহার কোন এক ইংরাজ বন্ধুকে লিখিয়াছিলেন "১৯১৯ খৃষ্টাব্দে পাঞ্জাবে সামরিক আইনের প্রয়োগে শাসন-বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষগণের অন্যায় আচরণ দেখিয়া আমার রাজনৈতিক অভিমত সম্পূর্ণরূপে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে।"

১৯২০ খৃষ্টাব্দে ভারত গবর্ণমেণ্টের সম্মতিক্রমে যখন সে-ভারের সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হয়, তখন সরকারের প্রতিজ্ঞা-ভঙ্গের ব্যাপারে অধিকতর অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া হাকিমজী মহাত্মা গান্ধীর একজন প্রবল সমর্থক হইয়া উঠেন এবং জাতীয় আন্দোলনে যোগদান করিয়া কায়মনে দেশের মুক্তির জন্য চেষ্টা করিতে থাকেন। তাঁহার সেই ঐকান্তিক স্বদেশানুরাগের ফলস্বরূপ দেশবাসী, তাঁহাকে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের বন্দীদশায় আহমদাবাদ কংগ্রেসের সভাপতি মনোনীত করিয়া সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্মানে সম্মানিত করিয়াছিল।

মহাত্মা গান্ধীর কারাবরণের পর কিছুদিনের জন্য হাকিমজীর উপর সমগ্র ভারতের নেতৃত্বের ভার অর্পিত হয়। সেই সময় শারীরিক অসুস্থতা ও দুর্ব্বলতা সত্ত্বেও হাকিমজী প্রাণ-পণে তাঁহার গুরু কর্ত্তব্য সাধনে যত্নবান হইয়াছিলেন। এই সময়ে ডাক্তার আন্‌সারীর সহিত তাঁহার বিশেষ ঘনিষ্টতা জন্মে। মহাত্মার জেলে অবস্থান কালে হাকিমজী এক পত্রে তাঁহাকে লিখিয়াছিলেন :—

"………আমাদের দেশের উন্নতি যে হিন্দু মুসলমান ও ভারতীয় অন্যান্য জাতির পরস্পরের মিলনের উপরে নির্ভর করিতেছে, তদ্বিষয়ে আর সন্দেহ নাই,……; দেশ যদি অন্য কোন দিকে অগ্রসর না হইয়া কেবল এই মিলনের পথে অগ্রসর হয়, তাহা হইলেই খেলাফৎ ও স্বরাজ-সমস্যার আপনা হইতেই সমাধান হইয়া যাইবে।"

উপরোক্ত পত্রের উপসংহারে তিনি লিখিয়াছিলেন, "তবে

আমি আপনার সাধনায় যোগদান করিলাম, কিন্তু স্বাস্থ্য-হানির নিমিত্ত দেশমাতৃকার সেবায় সম্পূর্ণরূপে আত্মনিয়োগ করিতে পারিতেছি না, তবে না পারিলেও আপনি নিশ্চয় জানিবেন, মিঃ সি, আর, দাশের কারামুক্তি না হওয়া পর্য্যন্ত এই কর্ত্তব্য সম্পাদন করিতে আমি প্রাণপণে চেষ্টা করিব।"

সাধুস্বভাবসুলভ বিনয়, নম্রতা ও শিষ্টাচারের জন্য জাতি ধর্ম্মনির্ব্বিশেষে দিল্লীর জনসাধারণ হাকিমজীকে অন্তরের অন্তস্থল হইতে শ্রদ্ধা ও সম্মান করিত। দীন দুঃখীর জন্য হাকিমজীর গৃহদ্বার চিরদিনই অবারিত ছিল। যে-কোন ব্যক্তি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া নিঃসঙ্কোচে মনের কথা ব্যক্ত করিতে পারিত।

১৯২২ খৃষ্টাব্দের শেষ ভাগে যখন জনরব উঠে যে, হাকিম আজমল খাঁ শীঘ্রই সরকার কর্ত্তৃক গ্রেপ্তার হইবেন, তখন দিল্লীর জনসাধারণ অসম্ভবরূপে উত্তেজিত হইয়া উঠে, কিন্তু হাকিমজী ধীর শান্ত ভাবে সকলকে বুঝাইয়া তাহাদের মন হইতে উত্তেজনার ভাব দূরীভূত করিয়া দেন। মহাত্মা গান্ধীর বন্দী দশায় এরূপ পবিত্র সরল উন্নতচেতা জননায়কের নেতৃত্বাধীনে যদি জাতি পরিচালিত না হইত, তাহা হইলে হয়ত সমগ্র দেশে একটা বিষম বিপ্লব মাথা তোলা দিয়া উঠিত।

হাকিম আজমল খাঁর নৈতিক চরিত্র ও তাঁহার জীবনের আদর্শ বাস্তবিকই সর্ব্বথা অনুকরণীয়। দিল্লীতে হিন্দু মুসলমানের সদ্ভাব যখন টুটিয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছিল, তখন একমাত্র হাকিম সাহেবেরই অসাধারণ দৃঢ়তা ও মনোবলের প্রভাবেই তাহা সংরক্ষিত হইয়াছিল। উভয় সম্প্রদায়ের প্রবুদ্ধ জনমণ্ডলী চতুর্দ্দিক হইতে যখন বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিত, তখন যে দৃঢ়তা ও প্রাণশক্তির বলে হাকিমজী সেই উন্মত্ত জনমণ্ডলীকে শান্ত করিতেন, তাহা বাস্তবিকই অবর্ণনীয়।

দেশের জন্য অতিরিক্ত পরিশ্রম করিয়া হাকিমজীর স্বাস্থ্য ভঙ্গ হয়। ভগ্ন স্বাস্থ্য পুনঃপ্রাপ্ত হইবার নিমিত্ত তিনি ১৯২৫ খৃষ্টাব্দের ১০ই এপ্রিল তারিখে ইউরোপ যাত্রা করিয়া ২২শে এপ্রিল তারিখে মার্সেলিস নামক স্থানে উপনীত হন।

ইউরোপ গমন করিয়াও হাকিমজী ভগ্নস্বাস্থ্যের পুনরুদ্ধার করিতে পারেন নাই। রাজনীতি ক্ষেত্র ও জনহিতকর কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিতে পারিলে হয়ত তিনি স্বাস্থ্য লাভ করিতে পারিতেন, কিন্তু দেশের ও জাতির চরম দুর্ভাগ্য যে, জীবনে তাঁহার সে-অবসর ঘটে নাই। গত ২৮শে ডিসেম্বর তারিখে হিন্দু-মুসলমান মিলনের এই সুদৃঢ় ভিত্তি ধ্বসিয়া পড়িয়াছে। ভারতের জাতীয় গৌরবের হিমাচল চূড়া ধূলিসাৎ হইয়াছে। যে মধ্যাহ্ন মার্ত্তণ্ডের প্রদীপ্ত কিরণে সমগ্র হিন্দুস্থান আলোকিত হইয়াছিল, আজ তাহা কালের আঁধার গর্ভে ডুবিয়া গিয়াছে। তাই আজ করুণ আর্ত্ত ক্রন্দনে ভারতের আকাশ বাতাস কাঁপিয়া উঠিয়াছে।

হাকিম আজমল খাঁর অমর কীর্ত্তি তিবিয়া কলেজ। ইউনানী চিকিৎসার এই বিরাট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হইতে শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া সহস্র সহস্র চিকিৎসক আজ ভারতে ও এশিয়ার সর্ব্বত্রে ছড়াইয়া পড়িয়াছে এবং ইউনানী চিকিৎসার শ্রেষ্ঠত্ব ও গৌরব প্রচার করিয়া মুসলমানের জাতীয় চিকিৎসা-বিজ্ঞানকে জগতের বুকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া তুলিয়াছে।

আজ হাকিম আজমল খাঁ নাই; কিন্তু তাঁহার স্মৃতি আছে। সে-স্মৃতি ভারতবাসী কখনও ভুলিতে পারিবে না। দেশের ও জাতির মর্ম্ম-মুকুরে অনন্ত কাল তাহা উজ্জ্বল বিভায় প্রতিফলিত হইয়া থাকিবে।

# পথ-মাঝে

[ মোহাম্মদ সেকান্দর আলী ]

ফাগুনের আগুনে
জ্বলে সে যে জ্বল্ জ্বল্
ঢলঢল লাবণিয়ে
বরতনু টল্‌টল্ ।
ঘিরে তায় শত দিঠি—
মিলনের চিঠি গো,
বুকে বুকে পদ-পাত
জাগে মিঠি মিঠি গো ।
পাখা মেলি সবুজের
তৃণ ওঠে শিহরি,
গাছে গাছে উৎসবে
মাতে পিক কুহরি ।
ছুটে আসে সমীরণ
বাঁধ-ভাঙ্গা চঞ্চল
ঠেলে ফেলে দিতে চায়
রূপ-ঢাকা অঞ্চল ।
কি বালাই পায় পায়
পথ চলা হ'ল ভার,
তরু-বাহু হুতাশে
ধরিল গো সাড়ী তার ।
চাহিতেই চোখে চোখে
ম'লো সে যে মরমে,
প'ল সাড়া যৌবনে
গাল রাঙা সরমে ।
লালিমার ভারে মুখ—
সিঁদূরে সে আম হায় !
পাতা-ফাঁকে পালাতে
পারে তো গো বেঁচে যায় ।

# কাঁটাফুল

[ শাহাদাৎ হোসেন ]

( পূর্ব্বানুবৃত্তি )

৭

শুভ্র জ্যোৎস্নাময়ী রাত্রি। এলাহাবাদ শহর হইতে কিছুদূরে গঙ্গাকূলে একটী ক্ষুদ্র মাটীর স্তূপের উপর বসিয়া খলিল একাকী।

সতীশ বাবুর ( ট্রেণে-পরিচিত ভদ্রলোকের ) সহিত এখানে আসিয়া আজ দুই মাস কাল খলিল তাঁহার আশ্রমে বাস করিতেছে। আশ্রমের যাবতীয় কাজ কর্ম্মের ভার এখন একরূপ তাহারই উপর ন্যস্ত হইয়াছে। দিবা-রাত্র অলসভাবে বসিয়া থাকিলে দুশ্চিন্তা আসিয়া মানুষের দেহ ও মনকে অকর্ম্মণ্য করিয়া তুলে। খলিলের মনের অবস্থা যেরূপ, তাহাতে তাহাকে নিষ্কর্ম্মা বসিয়া থাকিতে দেওয়া যুক্তিসঙ্গত নহে, এই ভাবিয়া সতীশ বাবু এই দীর্ঘ দুই মাসের মধ্যে তাহাকে আদৌ অবসর গ্রহণ করিবার সুযোগ দেন নাই। রাত্রিতে আহারাদির পর সকাল পর্য্যন্ত নিদ্রায় বিশ্রাম লাভের জন্য যে সময়টুকু অবসর না দিলে স্বাস্থ্যভঙ্গ হইবার আশঙ্কা আছে, কেবল সেই সময়টুকুই তিনি খলিলের অবসর কালরূপে নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন। নইলে প্রভাত হইতে এক প্রহর রাত্রির মধ্যে অবসর গ্রহণের আর কোন সুযোগই সে এ-পর্য্যন্ত পাইয়া উঠে নাই।

খলিলের মাথার উপর গুরু দায়িত্বের বোঝা চাপাইয়া, সর্ব্ব সময়ে কাজে ব্যাপৃত রাখিয়া তাহার উদাসীন মনকে পুনরায় কর্ম্মের পথে ফিরাইয়া আনিবেন, ইহাই ছিল সতীশ বাবুর আন্তরিক অভিপ্রায় এবং এই জন্যই তিনি খলিলের নিমিত্ত এই আপাতকঠোর ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। তিনি খলিলকে ভালরূপেই বুঝিয়াছিলেন, তাহাকে গড়িয়া তুলিতে পারিলে ভবিষ্যতে সে যে একটা মানুষের মত মানুষ হইয়া উঠিবে, সে সম্বন্ধে তিনি এক প্রকার নিঃসন্দেহ হইয়াছিলেন, তাই আশ্রমের সমস্ত কর্ত্তৃত্ব তাহার উপর অর্পণ করিয়া, অল্পে অল্পে তাহার অন্তরে কর্ম্মের প্রেরণা জাগাইয়া তিনি ধীরে ধীরে অভীষ্ট-সিদ্ধির পথে অগ্রসর হইতেছিলেন।

সতীশ বাবুর এই মনোভাব খলিল সম্যকরূপেই বুঝিতে পারিয়াছিল, তাই তাঁহার ব্যবস্থা তাহার পক্ষে কঠোর এবং দুঃসহ হইলেও সে কোন উচ্চবাচ্য করে নাই। সে বুঝিয়াছিল এবং মনে মনে দৃঢ় বিশ্বাসও করিয়াছিল যে, সতীশ বাবু তাহার পরম হিতৈষী, তিনি যাহা করিতেছেন বা ভবিষ্যতে যাহা করিবেন, তাহা তাহারই মঙ্গলের জন্য, তাঁহার নিজের স্বার্থ তাহার মধ্যে এতটুকুও নাই। এই বিশ্বাস ও ধারণার বশবর্ত্তী হইয়াই সে নির্ব্বিচারে তাঁহার নির্দ্দেশ অনুসারে কাজ করিয়া যাইত। কোন দিন মুহূর্ত্তের জন্যও বিরক্তি বা অসন্তোষ প্রকাশ করিত না। দিবা-রাত্র নিজেকে কর্ম্মের মধ্যে ডুবাইয়া রাখিয়া সংযম ও সাধনার সাহায্যে সে চিত্ত-শুদ্ধির প্রয়াস পাইতেছিল।

কিন্তু পাইলে কি হইবে? স্মৃতি ত মুছিবার নয়। সুযোগ পাইলেই সে যে বুকের ভিতর লক্ষ শিখায় জ্বলিয়া উঠে। মুহূর্ত্তের দহনে তাহার সমস্ত কর্ত্তব্য, সাধনা ও সংযমকে পুড়াইয়া ভস্ম করিয়া দিতে চায়, তাহার অস্তিত্বকে বিলীন করিয়া দিবার উপক্রম করে। তখন নিজেকে রক্ষা করিবার আর কোন উপায়ই সে খুঁজিয়া বাহির করিতে পারে না। সে মরিয়া হইয়া প্রাণপণে বুকখানি চাপিয়া ধরে, কিন্তু সব বৃথা। সে আগুন ত দমিবার নয়—নিভিবার নয়।

* * * *

আজ আবার আগুন জ্বলিয়াউ ঠিয়াছে। তাই ঘরের মধ্যে বিছানার উপর চক্ষু বুঁজিয়া পড়িয়া থাকিতে না পারিয়া এই গভীর রাত্রিতে সে জাহ্নবীর কূলে, শুভ্র নিরাবিল জ্যোৎস্নার শীতল বর্ষণের মধ্যে ছুটিয়া আসিয়াছে। যদি এতটুকু শান্তিও পায়।

কিন্তু কোথায় শান্তি? ধূ ধূ করিয়া বুকের মাঝে চিতানল জ্বলিতেছে। সাত সমুদ্র তের নদীর জলেও সে অনল নিভিবার নয়। বহিঃ-প্রকৃতির রূপালী সৌন্দর্য্যের মধ্যে কতটুকু শান্তি, কতটুকু শীতলতা আছে যে, তাহাকে সান্ত্বনা দিবে?

জ্বালা যেন অসহ্য হইয়া উঠিল। মরিয়া হইয়া খলিল সঙ্কল্প করিল, এখনই ছুটিয়া বাহির হইয়া পড়িবে। কর্ত্তব্যে, সাধনায় জলাঞ্জলি দিয়া, সমাজ ধর্ম্মে বিসর্জ্জন দিয়া সেই দূরে—দূরান্তরে ছুটিয়া যাইবে;—যেখানে রাবেয়া অবাধ মিলনের নিস্তরঙ্গ স্রোতে জীবনের তরী ভাসাইয়া পরিপূর্ণ ভোগের মধ্যে নিজেকে সার্থক করিয়া তুলিতেছে। তাহার জীবনের সেই একটানা স্রোতোমুখে সে হিমাচলের মত আকাশস্পর্শী শির তুলিয়া গতিরোধ করিয়া দাঁড়াইবে, অন্তরের পুঞ্জীভূত বেদনার গৈরিক জ্বালায় তাহাকে জর্জ্জরিত করিয়া তুলিবে, প্রচণ্ড অগ্নিশ্বাসে তাহার সাধের উৎসব-বাসরকে এক মুহূর্ত্তে ভস্মে পরিণত করিয়া দিবে।

মুহূর্ত্তের মধ্যে খলিল অসম্ভবরূপে উত্তেজিত হইয়া উঠিল। কিন্তু সে-উত্তেজনা বেশীক্ষণ স্থায়ী হইতে পারিল না। পরক্ষণেই যখন তাহার মনে হইল, আজ তাহার ও রাবেয়ার মধ্যে কতখানি ব্যবধান। কত নদ-নদী গিরি-প্রান্তর তাহাদের সাক্ষাতের পথে অন্তরায় রচিয়া বসিয়া আছে, তখন তাহার উন্মাদ কল্পনা, উদ্দাম মনোবৃত্তি যেন আপনা হইতেই দমিয়া আসিল; কেমন যেন একটা মানসিক অবসাদে সে শ্রান্ত হইয়া পড়িল। তাহার পর যখন তাহার মর্ম্মসিন্ধু মথিত করিয়া তিন বৎসর আগে-দেখা কিশোরী রাবেয়ার সেই কত্র মুখচ্ছবি ধীরে ধীরে ভাসিয়া উঠিল, তখন তাহার সমগ্র হৃদয় উদ্বেল হইয়া উঠিল, অশ্রুর বন্যায় চোখের দৃষ্টি ঝাপ্‌সা হইয়া আসিল। প্রেম ও করুণায় ঢল ঢল সেই সুন্দর মুখখানি, সেই শান্ত কোমল স্নিগ্ধ দৃষ্টি, অঙ্গে অঙ্গে ললিত লাবণ্যের সেই অমিয় ধারা;—খলিলের অন্তরের অন্তস্তল হইতে কে যেন বলিয়া উঠিল, না—না—এ ত অপরাধী নয়, অপরাধ একে স্পর্শ করিতে পারে না। এ যে নিরপরাধ, নিষ্পাপ, নিষ্কলঙ্ক; নন্দনের আধ ফুটন্ত অনাঘ্রাত পারিজাত বৃন্তচ্যুত হ'য়ে মর্ত্ত্যের কঠিন মাটিতে ঝরে' পড়েছে। তুমি মূর্খ, কামনার মদিরায় উন্মত্ত, তাই অপরাধী সাব্যস্ত করে' একে প্রতিহিংসার অগ্নিজ্বালায় দগ্ধ কর্‌তে কৃতসঙ্কল্প হ'য়েছ।

উত্তেজনা অনুতাপে পরিণত হইল। খলিলের চোখে নির্ঝর-ধারা নামিয়া আসিল। ঠিক সেই সময়ে পশ্চাৎ হইতে গম্ভীর কণ্ঠে কে ডাকিল, খলিল!

চমকিত খলিল পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিল, সতীশ বাবু। নির্জ্জন নদীতটে নিশীথের গম্ভীর স্তব্ধতার মাঝে সতীশ বাবু যে এমন আকস্মিক ভাবে দেখা দিবেন, খলিল ইহা কল্পনাও করিতে পারে নাই। তাই 'হাতে নাতে' ধরা পড়িয়া সে যেন লজ্জায় মরিয়া গেল। সতীশ বাবুর আহ্বানে সে সাড়া দিতে পারিল না, নীরবে মাথা নীচু করিয়া বসিয়া রহিল।

খলিল প্রথম যেদিন সতীশ বাবুর আশ্রমে প্রবেশ করে, সেদিন সে তাঁহার সম্মুখে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল, সমস্ত চিন্তা মন হইতে ঝাড়িয়া ফেলিবে, একমাত্র কর্ম্মের মধ্য দিয়াই সে জীবনকে সার্থক ও সুন্দর করিয়া তুলিবে; কিন্তু সে প্রতিজ্ঞা সে রক্ষা করিতে পারে নাই। তবে না পারিলেও তজ্জন্য সে কোন দিন লজ্জা বা সঙ্কোচ অনুভব করে নাই, কারণ তাহার মনে মনে ধারণা ছিল, সতীশ বাবু তাহার এই দুর্ব্বলতার কথা আদৌ অবগত নহেন; কিন্তু আজ দৈবক্রমে হঠাৎ তাঁহার সম্মুখে পড়িয়া গিয়া সে আর মাথা তুলিতে পারিল না। তাঁহার ডাকে সাড়া দেওয়া ত দূরের কথা, তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া থাকিতেও যেন তাহার মাথা কাটা যাইতে লাগিল।

তাহাকে নিরুত্তর দেখিয়া সতীশ বাবু পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, খলিল, এত রাত্রিতে এমন ভাবে এখানে বসে' আছ কেন?

খলিল পূর্ব্ববৎ নিরুত্তর।

যে এতটুকু সন্দেহ আবছায়ার মত সতীশ বাবুর মনকে ঘেরিয়া ছিল, এইবার তাহা নিঃশেষে সরিয়া গেল। আসল ব্যাপারটা তাঁহার চোখের সম্মুখে পরিষ্কার হইয়া গেল। কিন্তু তিনি সামান্য মাত্রও অসন্তোষ বা রাগের ভাব প্রকাশ করিলেন না। উপরন্তু তাহার হাত ধরিয়া তুলিয়া সস্নেহে পিঠ চাপড়াইয়া বলিলেন, লজ্জা কি খলিল, আমার কাছে কিছু গোপন কর্‌তে চেষ্টা কোরোনা। অতীত জীবনের স্মৃতিকে এখনও যদি তুমি ভুলতে না পেরে থাক, তাহ'লে

বল্‌তে দোষ কি ? তুমি নিঃসঙ্কোচে আমার কাছে তোমার অন্তরের দুর্ব্বলতা প্রকাশ কর্‌তে পার ; আমি তাতে কিছুমাত্র অসন্তুষ্ট বা বিরক্ত হবনা। তবে একথাও তুমি জেনে রেখ' যে-ব্রত তুমি গ্রহণ করেছ, তা'তে এ-সমস্ত দুর্ব্বলতা একেবারেই তোমার মন থেকে ঝেড়ে ফেলে দেওয়া উচিত ; নইলে তোমার সাধনায় বিঘ্ন ঘটবে, কর্ত্তব্যে ত্রুটী হবে।

খলিল নতমস্তকে রহিয়াই বলিল, আমি অন্যায় করেছি ; আমায় মাফ করুন।

—চাইবার আগেই আমি তোমায় মাফ করেছি। তুমি অন্যায় করেছ বটে, কিন্তু এ-অন্যায় ততটা দোষাবহ নয়। মানুষের ভিতর যে চিরন্তন দুর্ব্বলতা আছে, তার বশেই তুমি এই অন্যায়ের অনুষ্ঠান করেছ ; সেই জন্য সাধারণ দিক দিয়ে এটাকে আমি ততটা দূষণীয় বলে' মনে করি না এবং করিনা বলেই তোমাকে মাফ করেছি ; কিন্তু এ ছাড়া আরও একটা দিক আছে, সেটা হ'চ্ছে তোমার ব্যক্তিগত দিক। সে-দিক দিয়ে বিচার কর্‌লে আমি আদৌ তোমাকে মাফ কর্‌তে পারি না। কারণ দেশের ও দশের সেবাব্রত তুমি গ্রহণ করেছ। তোমার সাধনা অনন্যসাধারণ, উদ্দেশ্য মহৎ, কর্ত্তব্য কঠোর। আর সেই সাধনা, উদ্দেশ্য ও কর্ত্তব্যের সঙ্গে জড়িত রয়েছে—দেশের ও দশের সাধনা, উদ্দেশ্য এবং কর্ত্তব্য। সুতরাং এ-হিসাবে তোমার পক্ষে এই দুর্ব্বলতা যে কতখানি মারাত্মক, তা' বোধ হয় তুমি নিজেই বেশ বুঝ্‌তে পার্‌ছ।

সতীশ বাবু নীরব হইলেন। খলিলও নীরব। রাত্রি তখন প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছিল। গঙ্গার শীকর-সম্পৃক্ত বাতাসে উভয়েই অল্প অল্প শীত অনুভব করিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া সতীশ বাবু আবার বলিয়া উঠিলেন, রাত শেষ হ'য়েছে, এখন চল, একটু শোওয়া যাক্‌গে।

খলিল দ্বিরুক্তি করিল না। উভয়েই ধীরে ধীরে গঙ্গাতীর ধরিয়া আশ্রমের দিকে অগ্রসর হইলেন।

*　　*　　*　　*

ঘরে গিয়া খলিল শয্যার আশ্রয় লইল বটে, কিন্তু ঘুম আসিল না। যতক্ষণ সতীশ বাবু কাছে ছিলেন, তাঁহার ব্যক্তিত্বের প্রভাব ততক্ষণ তাহাকে অভিভূত করিয়া রাখিয়াছিল। এখন সতীশ বাবুও নাই, তাঁহার প্রভাবও নাই। খলিলের মন মুক্তবল্গ তুরঙ্গের মত মুহূর্ত্তের মধ্যে আবার অজয়-কূলের সেই শ্যামল পল্লীর বুকে ছুটিয়া গেল। কিছুতেই সে আর মনকে সংযত করিতে পারিল না। কিছুক্ষণ এ-পাশ ও-পাশ করিয়া একান্ত অধীর ভাবে সে উঠিয়া বসিল এবং আলো জ্বালিয়া পত্র লিখিতে আরম্ভ করিয়া দিল।

সুদীর্ঘ পত্র। দীর্ঘকাল পরে আজ খলিল রাবেয়ার খোঁজ লইতে বসিয়াছে। পত্র সুদীর্ঘ ত হইবেই। অনেক কাটাকুটী অদল বদলের পর সে লিখিল—

রাবেয়া !

দীর্ঘকাল পরে পত্রের মারফৎ আজ তোমার সহিত কথা বলিতে বসিয়াছি। যদিও এভাবে তোমার সহিত পত্র ব্যবহার করা আমার পক্ষে একান্ত অন্যায়, তথাপি প্রয়োজন-বোধে আমাকে একাজ করিতে হইতেছে। যদি পার, ত্রুটী মার্জ্জনা করিও।

আজ তোমা হইতে আমি দূরে—বহুদূরে। তোমার ও আমার মাঝে আজ অসংখ্য নদনদী, অগণিত গিরি-প্রান্তর ব্যবধান রচিয়া পড়িয়া আছে, কিন্তু তথাপি তুমি আমার অন্তর হইতে দূরে সরিয়া যাইতে পার নাই। আর তুমিও আমাকে মন হইতে মুছিয়া ফেলিতে পার নাই।

শৈশব-কৈশোরের অনাবিল আনন্দ-নর্ত্তনের মধ্যে আমাদের অন্তরে কোন্ এক অজ্ঞাত মুহূর্ত্তে আশার বীজ অঙ্কুরিত হইয়া উঠিয়াছিল, যৌবন-মুখে সেই ক্ষুদ্র বীজ বিরাট মহীরুহের আকারে সমগ্র অন্তর্দ্দেশ পত্র-পল্লবে ছাইয়া ফেলিয়াছিল ; কিন্তু পরিপূর্ণ আনন্দের নিরাবিল স্রোতমুখে এমন নিশ্চিন্তে আমরা জীবনের তরী ভাসাইয়া দিয়াছিলাম যে, সেদিকে ভ্রূক্ষেপ করিবার অবসর আমাদের ছিল না। তাহার পর যখন বিচ্ছেদের কাল মেঘ আসিয়া উভয়ের মধ্যে অন্তরাল সৃষ্টি করিল, আনন্দ-মধুর জীবন-স্রোত একটানা গতিপথে সহসা বাধা পাইয়া থমকিয়া দাঁড়াইল, তখন হঠাৎ চক্ষু মেলিয়া চাহিলাম। কিন্তু সে অতি বিলম্বে। অন্ধকারের নিবিড়তায় তখন চতুর্দ্দিক ছাইয়া আসিয়াছে, হিমাচলের মত বিরাট অন্তরায় গতিপথ রোধ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। নিরুপায় হইয়া করুণ আর্ত্তনাদে সেই অন্তরায়ের পাষাণ-প্রাচীরে মাথা খুঁড়িলাম। সব বৃথা হইল। অন্তরের আকুল ক্রন্দন অন্তরেই গুমরিয়া মরিল,

মর্ম্মন্তুদ দীর্ঘশ্বাসের অগ্নিজ্বালায় মুহূর্ত্তের মাঝে পল্লবিত আশা-তরু দগ্ধীভূত হইল। বহিঃসংসারের কেহ জানিল না, দেখিল না শুনিল না।

কিন্তু দায়ী কে? তুমি না আমি? শুধু এই কথাটাই আজ আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতে চাই। আজ আমি তোমার কেউ নই, সে-হিসাবে হয়ত তোমাকে একথা জিজ্ঞাসা করিবার অধিকারও আমার নাই। কিন্তু এমন একদিন ছিল, যেদিন আমি তোমার সর্ব্বস্বেরও অধিক ছিলাম। সেই দাবী লইয়া আজ আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি—দায়ী কে! আমি ত নিজেকে বাঁধিয়াছিলাম, এখনও পর্য্যন্ত বাঁধিয়া রাখিয়াছি; তবে তুমি কেন নিজেকে বাঁধিলে না? যদি প্রতিশোধ লইবার জন্য একাজ করিয়া থাক, তবে কাহার উপর প্রতিশোধ লইলে? তোমার নিজের উপর, না আমার উপর?

প্রতিশোধ লইয়া যদি সুখী হইয়া থাক, তবে আর তোমাকে আমার জিজ্ঞাসা করিবার কিছু নাই। এ-পত্রের উত্তরও তোমাকে দিতে হইবে না। উত্তর না পাইলেই বুঝিব—তুমি সুখী হইয়াছ। আর তাহা হইলেই আমি মনকে প্রবোধ দিতে পারিব। ইতি—

হতভাগ্য—

খলিল

দূর বৃক্ষচূড়ে ভোরের পাখীর কূজন শোনা গেল। খলিল পত্রখানি খামে বন্ধ করিয়া অলস ভাবে শয্যার উপর শুইয়া পড়িল। (ক্রমশঃ)

---

# জন্ম-শাসন ও বাঙ্গালী মুসলমান

[ তোরাব আলী ]

যেখানে জন্মের হার অধিক, সেখানকার লোক সাধারণতঃ অধিক দরিদ্র। জন্ম-হার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে খাদ্য সামগ্রীর পরিমাণ বৃদ্ধি না হইলে মহামারী দুর্ভিক্ষ প্রভৃতি সাক্ষাৎ আজরাইল অচিরেই জাতির ধ্বংশ সাধন করে। এই মহাসত্যের প্রচারক পণ্ডিত Matlhus দেশ ও জাতিকে ধ্বংশের কবল হইতে রক্ষা করিবার নিমিত্ত দুইটী উপায় স্থির করিয়াছেন।

১। সংযম-সাহায্যে গর্ভ-নিয়ন্ত্রণ।

২। ঔষধ প্রয়োগে বা অন্য কোনও বৈজ্ঞানিক উপায়ে জন্ম-শাসন।

অর্থনীতিবিদ্ মনীষিগণের মতে আবশ্যক মত জন্ম-শাসন করিলে জাতি ধ্বংশের মুখ হইতে রক্ষা পাইয়া মহামারী, শিশু-মৃত্যু, দারিদ্র্য ও বেকার-সমস্যার হাত এড়াইয়া ক্রমোন্নতির দিকে অগ্রসর হইতে থাকে।

যেখানে খাদ্য সামগ্রী বৃদ্ধি না পাইয়া অবাধে কেবল জন্মহার বৃদ্ধি পাইতেছে, সেখানে খাদ্যাভাবে, অর্থাভাবে, চিকিৎসাভাবে এবং সৎশিক্ষার অভাবে জাতি সর্ব্ববিষয়ে অবনতির দিকে দ্রুত অগ্রসর হইতেছে। একটী সবল শিক্ষিত সচ্চরিত্র এবং দীর্ঘায়ু সন্তান, দশটী দুর্ব্বল চরিত্রহীন অশিক্ষিত ও অল্লায়ু সন্তানের চেয়ে যে অধিক বাঞ্ছনীয়, তাহা সহজেই অনুমেয়। জন্ম শাসন না করায় গর্ভের সংখ্যা ও জন্মহার যেমন বৃদ্ধি পায়, নানা কারণে মৃত্যুহারও তেমনি অধিক পরিমাণে বাড়িয়া চলে। পক্ষান্তরে যাহারা বাঁচিয়া থাকে তাহারাও নির্জ্জীব, নিস্তেজ ও মৃতপ্রায় জাতিতে পরিণত হয়। বিবেচনা করিয়া দেখিলেই বুঝা যায় জন্ম-শাসন না করিলেই যে জন-সংখ্যা বৃদ্ধি পাইবে এরূপ সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন।

আমরা এখানে বাঙ্গালী মুসলমানের নিম্নলিখিত অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করিয়া বিষয়টী সংক্ষেপে আলোচনা করিতে প্রয়াস পাইব।

১। বর্ত্তমানে বাঙ্গালাদেশে মুসলমানের মৃত্যু হিন্দু অপেক্ষা অধিক।

২। গর্ভিনীর নিয়ম পালনে এবং সন্তান পালনে উদাসীনতা।

৩। এদেশে মুসলমান সম্প্রদায়ই অধিক হিসাবে অধিক দরিদ্র।

৪। ম্যালেরিয়া, কলেরা, বসন্ত প্রভৃতি সংক্রামক ব্যাধিতে তাহারাই সাধারণতঃ অধিক আক্রান্ত হইয়া থাকে।

৫। শারীরিক, মানসিক এবং নৈতিক বলে বাঙ্গালী মুসলমান ক্রমেই হীন হইতে হীনতর হইয়া পড়িতেছে।

প্রথমটীর বিপক্ষে অনেকেই বলিবেন যে, বিগত পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে বাঙ্গালী মুসলমান হিন্দু অপেক্ষা সংখ্যায় অনেক বেশী হইয়াছে। তাহাদের মধ্যে মৃত্যুর আধিক্য কিছুই ক্ষতি সাধন করিতে পারিতেছে না। সুতরাং জন্ম শাসন নিষ্প্রয়োজন।

ধরিয়া লওয়া যাউক, মুসলমানের মধ্যে হাজার করা জন্মহার ৩৪ এবং মৃত্যু হার ৩২। অর্থাৎ হাজার করা দুই জন করিয়া মুসলমান সংখ্যায় বৃদ্ধি পাইতেছে। এইরূপ শুধু জন্মহারের আধিক্য দেখিয়া আনন্দিত হইবার কোন কারণ নাই। অন্যান্য দেশে জন্ম-শাসন সাহায্যে যেরূপ সু-ফল ফলিয়াছে, তাহা হইতে আমরা ধরিয়া লইতে পারি যে, এখানেও সুবিবেচনার সহিত গর্ভ নিয়ন্ত্রণ করিলে আমাদের জন্মহার হয়ত হাজার করা ৩০শে নামিয়া আসিবে, অপর দিকে মৃত্যু-হারও সঙ্গে সঙ্গে কমিয়া যাইবে। এই হিসাবে মৃত্যুহারও ২৮শের অধিক হইবে না। একথা আমরা ধরিয়া লইতে পারি। তাই জন্ম-শাসনের কথা শুনিয়াই কাহারও আঁতকাইয়া উঠিবার কোন কারণ নাই।

অধুনা আমাদের মেয়েদের এত অল্প বয়সে বিবাহ হয় যে, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই প্রথম প্রসবের সময় ইহলীলা সাঙ্গ করেন, প্রথম সন্তানও অধিকাংশ স্থলে বাঁচেনা। যাহারা প্রথম অবস্থায় মৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা পায়, তাহারাও অল্পায়ু হয়। আবার অবস্থা এরূপও দাঁড়ায় যে, একটী অপরিণত বয়স্কা স্ত্রীলোক বৎসরান্তর উপর্য্যুপরি ক্রমশঃ ৪।৫টী সন্তান প্রসব করার পর তাহাকে আর খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। ইহা হইতেই বেশ বুঝিতে পারা যায়—আমাদের দেশবাসীগণ নারীকে সন্তান প্রসবের যন্ত্র ভিন্ন আর কিছু মনে করেন না।

আমাদের সমাজের স্ত্রীলোকেরা—সন্তান-পালনে ও প্রসূতির কর্ত্তব্য-সাধনে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ, একথা অস্বীকার করিবাব উপায় নাই। শিক্ষাহীনতাই ইহার একমাত্র কারণ। বাল্য-বিবাহ প্রথার মূলোচ্ছেদ ও স্ত্রীশিক্ষার সুব্যবস্থা হইলে শিশু-মৃত্যু এবং মৃত-শিশু-প্রসবের সংখ্যাও আমাদের সমাজে অনেক পরিমাণে হ্রাসপ্রাপ্ত হইবে। তৎপূর্ব্বে—সংযম-সাহায্যে গর্ভ-নিয়ন্ত্রণ ব্যতীত এই বিপদ হইতে উদ্ধার পাইবার অন্য কোন উপায় আছে বলিয়া মনে হয় না।

তারপর দারিদ্র্য। এই দারিদ্র্যই মুসলমানের সর্ব্ববিধ উন্নতির অন্তরায়। পেট পুরিয়া ভাত পায়, এরূপ মুসলমান এদেশে বিরল। আবার এরূপ অবস্থায় যদি এক একজনের ৪।৫টী করিয়া সন্তান হয়, তাহা হইলে অবস্থা যে আরও ভীষণ ও শোচনীয় হইয়া দাঁড়ায়, তাহা অধিক ভাবিবার বিষয়। অন্ন-চিন্তায় পিতামাতার কি দুর্দ্দশা হয়, তাহা অবর্ণনীয়। অন্নাভাবে সন্তানগণও স্বভাবতঃ অশিক্ষিত, স্বাস্থ্যহীন ও অল্পায়ু হয়।

এক অভাবের জন্যই আমরা ক্রমেই শারীরিক মানসিক এবং নৈতিকবলে হীন হইয়া পড়িতেছি। এখন মুসলমানোচিত পোষাক পরিচ্ছদ না থাকিলেও চিনিতে কষ্ট হয় না, যাহারা নির্জ্জীব নিস্তেজ ও স্বাস্থ্যহীন তাহারাই মুসলমান। জ্ঞানের দিক দিয়াও তাহারা সকলের পশ্চাতে পড়িয়া আছে। যাহাদের শিক্ষা ধর্ম্মতঃ ফরজ, তাহাদের শতকরা ৫ জনও শিক্ষিত নয়। চীনদেশে যাইয়া শিক্ষালাভ করা ত দূরের কথা, ম্যালেরিয়া ও দুর্ভিক্ষের পীড়নে বাড়ীর নিকটস্থ অবৈতনিক বিদ্যালয়েও পড়িতে যাইতে অক্ষম।

এখন কথা হইতেছে, একমাত্র জন্ম-শাসন করিলে কি এ সকল বিপদের হাত হইতে রক্ষা পাওয়া যাইবে? উত্তরে আমরা বলিতে চাই যে, এই উপায়ে রাতারাতি জাতীয় উন্নতির সমুদয় অন্তরায় অন্তর্হিত না হইলেও জন্ম-সংরোধের ফলে দুর্ভিক্ষের পীড়ন ও দারিদ্র্যের হাত হইতে কথঞ্চি নিষ্কৃতিৎ পাওয়া যাইতে পারে।

জ্ঞানের এবং শারীরিক বলের নিকট শুধু সংখ্যার কোন মূল্য নাই। একজন মুসলমান ১০ দশ জন বিধর্ম্মীর সমান, বর্ত্তমান বাংলায় আজ ইহা অর্থ-হীন উক্তি মাত্র। এখন অবস্থা দাঁড়াইয়াছে, তিনজন মুসলমান একজন অমুছলমানের

সমান। সুতরাং কেবল সংখ্যা বৃদ্ধি দেখিয়া উৎফুল্ল হইবার কোন কারণ নাই।

জন্ম-সংরোধ সম্বন্ধে হয়ত কেহ পাপের কথা তুলিতে পারেন, আমরা বলি একটী জাতিকে ধ্বংসের মুখে তুলিয়া দেওয়া কি পাপ নয়? একটী অপরিণতবয়স্কা স্বাস্থ্যহীনা দুর্ব্বলা রমণীর দ্বার বে-হিসাবে সন্তান প্রসব করাইয়া তাহাকে মারিয়া ফেলাও কি পাপ নয়? আমাদের দেখিতে হইবে এই গুলির ভিতর কোনটী অধিক মারাত্মক। যে কার্য্যের সাহায্যে অসংখ্য পাপের পথ রুদ্ধ করা যায়, বহু বিপদের হাত হইতে রক্ষা পাওয়া যায়, সে-কার্য্য কি পাপ পর্য্যায়ভুক্ত হইতে পারে? যাহা হউক, এ সম্বন্ধে মোসলেম সুধীসমাজে বিশেষ ভাবে আন্দোলন আলোচনা উপস্থিত হওয়া উচিত বলিয়া আমরা মনে করি।

Mathusএর দ্বিতীয় উপায়টীর বিরুদ্ধে আপত্তি হওয়া খুবই স্বাভাবিক। ঔষধ প্রয়োগ বা কোনরূপ অস্বাভাবিক বৈজ্ঞানিক উপায় অবলম্বন না করিয়াও যে সংযমের সাহায্যে জন্ম-শাসন করিতে ও জাতিকে বিপদের হাত হইতে রক্ষা করিতে পারা যায়, ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। সাধারণতঃ যাহারা গর্ভ-সংরোধের জন্য দ্বিতীয় উপায়টী অবলম্বন করিয়া থাকে তাহাদের অধিকাংশেরই উদ্দেশ্য অবাধ কাম প্রবৃত্তি চরিতার্থ করা। আমাদের মনে হয় এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য জন্ম-শাসন বাস্তবিকই পাপ। কিন্তু জাতির কল্যাণ সাধন করিবার ও নারী জাতীর প্রতি কার্য্যতঃ সহানুভূতি দেখাইবার উদ্দেশ্যে প্রথম উপায়টী শরার হিসাবে বৈধ ও অবশ্য প্রতিপাল্য। উপসংহারে আমাদের বক্তব্য—পরিমিত বয়সে মেয়েদের বিবাহের ব্যবস্থা করা উপার্জ্জনক্ষম না হওয়া পর্য্যন্ত পরিণয় কার্য্য স্থগিত রাখা, স্ত্রী স্বাস্থ্যহীন অথবা দুর্ব্বল হইলে সংযম রক্ষা করিয়া চলা এবং কুৎসিৎ রোগগ্রস্ত লোকের হাতে কন্যা দান না করা প্রভৃতি বিষয়-গুলি মানিয়া চলিলে এই উপায়ে যে জন্ম-শাসন হইবে, তাহার ফলে পাপ সঞ্চয় না হইয়া বহু পুণ্যের অধিকারী হইতে পারা যাইবে।

---

# আরব্য কবি মোতানাব্বী

[ ফকীর আহ্‌মদ ]

হিজরী ৩০৩ অব্দে কুফানগরে 'কান্দাই' গ্রামে মোতানাব্বীর জন্ম হয়। শৈশবে এই কুফা নগরেই তিনি লালিত পালিত ও বর্দ্ধিত হইয়াছিলেন। তৎকালে প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী ভাল ভাল ছাত্রদিগকে পাঠ সমাপন করিবার জন্য দূরদেশে পাঠান হইত। সেই হিসাবে প্রতিভাবান ছাত্র মোতানাব্বীকেও তাঁহার অভিভাবকগণ সুদূর দামেস্কে পাঠার্থীরূপে প্রেরণ করিয়াছিলেন। বলাবাহুল্য তিনি যথাসময়ে কৃতিত্বের সহিত তথাকার নির্দ্ধারিত 'নেসার' সমাপন করিয়া অল্পবয়সেই সিরিয়ায় গমন করেন এবং তথায় অবস্থিতি কালে সিরিয়ার বিভিন্ন স্থানে পরিভ্রমণ করিয়া সাহিত্য চর্চ্চায় মনোযোগ প্রদান করেন। এইরূপে অল্পকাল মধ্যেই তিনি একজন শক্তিশালী সাহিত্যিক বলিয়া সুধীসমাজে পরিচিত হইলেন। তাঁহাকে অনেকে শব্দকোষ বলিয়া অভিহিত করিত। তৎকালে তদ্দেশে তাঁহার সহিত প্রতিযোগীতা করিবার কেহই ছিল না। তাঁহার ব্যবহৃত শব্দাবলী সম্বন্ধে কেহ তাঁহাকে কিছু জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি আরব্য সাহিত্য হইতে তৎক্ষণাৎ তাহার একাধিক সনদ উপস্থিত করিতেন।

মোতানব্বীর প্রকৃত নাম ছিল আবুতৈয়ব আহমদ বেন হাসান। একবার তিনি নবুয়তের দাবী করিয়াছিলেন; তজ্জন্য তিনি মোতানাব্বী নামে অভিহিত হইয়াছেন। বনি কাল্‌ব প্রভৃতি দলের অনেকে তাঁহাকে নবী বলিয়া

স্বীকার করিয়া লইয়াছিল। অচিরেই 'একসিধি' বংশের আমীর 'লু'লু' তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিয়া বহুদিন বন্দী করিয়া রাখেন। তখন তাঁহার উন্মত সম্প্রদায়ের দুর্দ্দশার সীমা রহিল না, তাহারা ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল। অবশেষে তাহারা তওবা করিতে বাধ্য হইল। বহুদিন পরে মোতানাব্বীও তওবা করিলেন। ফলে তিনি মুক্তিলাভ করিলেন।

বন্ধনমুক্ত হইয়া মোতানাব্বী নানাদেশ ভ্রমণ করিয়া বেড়াইলেন। তখন হইতে তিনি ধনী সম্প্রদায়ের গুণকীর্ত্তন সূচক কবিতা রচনা করিতে আরম্ভ করিলেন। অবশেষে তাঁহার ভাগ্য সুপ্রসন্ন হইল। ৩৩৭ হিজরীতে তিনি এলেপ্পো নগরের খলিফা সাইকোদ্দৌলা এব্‌নে হামদানের দরবারে গমন করিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন এবং ভাগ্যক্রমে তাঁহার সুদৃষ্টি আকর্ষণ করিতে সক্ষম হইলেন। অবশেষে খলিফা তাঁহাকে সভাকবি পদে বহাল করিলেন। অতঃপর তিনি খলিফার দরবারে সুদীর্ঘ নয় বৎসর কাল সসম্মানে অতিবাহিত করেন। এই সময় তিনি খলিফা সাইকোদ্দৌলার সদ্‌গুণরাজীর উল্লেখ করিয়া একটী সুন্দর কাসীদা রচনা করেন। খলিফা তাহা শুনিয়া যার পর নাই সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন এবং কবিকে বহু মূল্যবান উপহার প্রদান করিয়াছিলেন, এবং তাঁহাকে স্থান বিশেষের শাসনকর্ত্তার পদে নিযুক্ত করিবার প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন। কিন্তু খলিফা কয়েকটী কারণ বশতঃ তাঁহার প্রতিশ্রুতি পালন করিতে পারেন না। খলিফা ভাবিলেন যখন কবি মোতানাব্বী নবুয়তের দাবী করিতে পশ্চাৎপদ হন নাই, তখন একদিন সাহী তখ্‌তের দাবী করিয়া বসাও তাঁহার পক্ষে অসম্ভব নয়। এই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়াই খলিফা তাঁহাকে শাসনকর্ত্তার পদ প্রদান করিতে পারেন নাই।

সাইকোদ্দৌলা খুব সাহিত্য রসামোদী খলিফা ছিলেন। দিবাভাগে রাজকার্য্যের আধিক্যবশতঃ ফুরসুত পাইতেন না। তজ্জন্য রাত্রিতেই তাঁহার দরবারে কবি ও আলেম ফাজেল সম্প্রদায়ের সমাবেশ হইত। তাঁহারা খলিফার সম্মুখে নানা বিষয়ের আন্দোলন আলোচনা করিতেন। কথিত হইয়াছে প্রসিদ্ধ ব্যাকরণবিৎ পণ্ডিত 'ইব্‌নে খালবিয়া'র সহিত কবির একবার মতবিরোধ উপস্থিত হয়। তর্কযুদ্ধে পরাজিত হইয়া ইব্‌নে খালবিয়া চাবির গুচ্ছ দিয়া মোতানব্বীকে সজোরে আঘাত করেন। ফলে মোতানব্বী আহত হন। তাঁহার আহত স্থান হইতে রক্তের ধারা ছুটিলে ইব্‌নে খালবিয়া প্রাণ লইয়া পলায়ন করেন। এই ঘটনার পর ৩৪৬ হিজরীতে মোতানাব্বী সাইকোদ্দৌলার দরবার ত্যাগ করিয়া চলিয়া যান।

তৎকালে মিশরে কাফুরুল একসিদি খলিফা ছিলেন। কবি তথায় গমন করিয়া তাঁহার সভাকবি নিযুক্ত হইলেন। তাঁহার গুণমুগ্ধ হইয়া কাফুর তাঁহাকে উচ্চ সম্মানে ভূষিত করেন। মোতনব্বী সর্ব্বদা সৈনিকের সাজে খলিফার অন্তরঙ্গ বন্ধু ও উপদেষ্টারূপে দরবারে হাজির থাকিতেন। কোথাও যাইতে হইলে সরকারী দেহরক্ষী পরিবেষ্টিত হইয়া অশ্বারোহণে গমন করিতেন।

বিশেষ কয়েকটী কারণে মোতানব্বীর সহিত কাফুরের মতবিরোধ ঘটিলে, তিনি কাফুরের নামে একটী ব্যঙ্গপূর্ণ কবিতা লিখিয়া ৩৫০ হিজরী বকরঈদের রজনীতে মিশরের রাজদরবার ত্যাগ করেন। কাফুর মোতানব্বীর সন্ধানে চতুর্দ্দিকে অশ্বারোহী সৈন্য প্রেরণ করিলেন। কিন্তু কোন সন্ধান পাইলেন না।

এবার তিনি পারস্যে গমন করেন। সাহিত্যসেবী পারস্যরাজ 'আজাদুদ্দৌলা' বেন 'দেয়লোম' তাঁহার কবিত্ব প্রতিভায় মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে বহুমূল্যবান খেলাতাদি প্রদান করেন। কিছুদিন উক্ত দরবারে অবস্থিতির পর তিনি তথা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া প্রথমে বাগদাদ এবং তৎপরে কুফা নগরে গমন করেন।

সা'বান মাসের ৯ম দিবসে মোতানব্বী কয়েকজন বন্ধুবান্ধব লইয়া কোন কার্য্যোপলক্ষে গমন করিতে ছিলেন, এই সময় 'কাতেক' বিন 'আব্‌ইয়াল' এবং 'জাহেলুল আহাদি'র সঙ্গে তাহার বিরোধ উপস্থিত হয়। বিপক্ষপক্ষ তাঁহাকে আক্রমণ করিল। অবশেষে আততায়ীদের অত্যাচারের ফলে তাহাদের হস্তে কবি নৃশংসভাবে নিহত হইলেন। নিম্নলিখিত আরবী কবিতাটী কবি মোতানব্বীর রচিত।

فالخيل و الليل و البيداء تعرفني
و الحرب و الضرب و القرطاس و القلم

# বসন্তের পরশ

[ আজিজুল হাকিম ]

বসন্তেরি উতল হাওয়া কোন্ বাণী আজ আন্‌ল বয়ে ?
উঠ্‌ল কেঁপে হৃদয়খানি কোন্ অজানার পরশ পেয়ে !
পুষ্প-পাতায় কানাকানি
কোরক-লতায় জানাজানি
জাগ্‌ল প্রাণের গোপন আশা বুলবুলেরি আভাস পেয়ে।

রসাল-শাখে কোকিল ডাকে সুর-সায়রে লহর তুলে
গাইছে অলি, ফুট্‌ছে কলি মলয় হাওয়ায় দোদুল দুলে,
বইছে বাতাস ছুট্‌ছে সুবাস
বাঁশীর তানে পরাণ উদাস
ফুলের রাণী বঁধুর সনে সোহাগ ভরে হাওয়ায় দুলে।

কোন্ রাগিনী উঠ্‌ল বেজে ফোটা ফুলের ফাগুণ বনে
কোন্ সাহানার রেশ জাগে সে প্রিয়ার বুকের গোপন কোণে।
কার মিলনের আকুল আশায়
সলাজ বধূ গোপন ব্যথায়
আগুণ-ছোঁয়া গরম নিশাস ছাড়ছে আজি ফাগুন বনে।

ভূপাল রাজ্যের ভূতপূর্ব্ব শাসন-কর্ত্রী ও বর্ত্তমান নওয়াব-মাতা
ছোলতানা জাহাঁ বেগম

নিখিল ভারতীয় মহিলা-সম্মেলনের সভা-নেত্রী

গত মাসে দিল্লীতে একটি নিখিল ভারত মহিলা মজলিস বসিয়াছিল। ভারতের নানা প্রদেশের শিক্ষিতা মহিলারা তথায় নারীজাতির কল্যাণ বিষয়ে আলোচনা করিয়াছিলেন এবং দেশের শাসনকার্য্য পরিচালনে পরামর্শ দিবার অধিকার যাহাতে তাঁহারা লাভ করিতে পারেন, মজলিসে তাহারও দাবী করিয়াছিলেন

* * * *

এই মজলিসের সভানেত্রী ভূপালের রাজমাতা যে কয়েকটি উপদেশ দিয়াছিলেন, যাঁহারা এই অনুষ্ঠানের উদ্যোগিনী তাঁহারা সেইগুলি প্রণিধান করিলে বর্ত্তমান কালের স্ত্রীজাতির মঙ্গল-সাধন করিতে পারিবেন। যাহাতে বালিকারা ঘরকন্না শিখিতে পারে, গার্হস্থ্যবিজ্ঞানে যাহাতে তাহাদের অধিকার জন্মে, সন্তান পালন ও স্বাস্থ্য-তত্ত্বে যাহাতে তাহারা জ্ঞানলাভ করিতে পারে, তিনি স্ত্রীজাতিকে সেই শিক্ষায় শিক্ষিতা করিতে বলিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, যাহাতে বালিকারা যথাকালে উত্তমা জননীর স্থান অধিকার করিতে পারে, তাহাদিগের জন্য সেই শিক্ষাই আবশ্যক

* * * *

তিনি দুঃখের সহিত বলিয়াছেন, স্বদেশীয় ভাষা ও স্বদেশীয় সাহিত্যে জ্ঞানলাভ করা যে একান্ত আবশ্যক, এই মজলিসের সকলে তাহা সম্যক্‌রূপে উপলব্ধি করেন না। তিনি দৃষ্টান্তস্বরূপ সভার কার্য্য ইংরাজী ভাষায় পরিচালিত হইবার বিষয় উল্লেখ করিয়াছিলেন। তিনি বলেন, বিজাতীয় ভাষার সাহায্যে আপনাদের এইরূপ কার্য্য পরিচালন উন্নতির পরিচায়ক নহে।

প্রীতি-ভোজে সম্মিলিত

দিল্লীর মহিলা সম্মেলনের প্রতিনিধিগণ

সার্ব্বজনীন—"দাদী বিবি।"

বেলগ্রাম এতদিন নিজের সুশিক্ষিত ও অসাধারণ প্রতিভাশালী সন্তানগণের জন্য দেশময় সুখ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিল। সম্প্রতি এই বেলগ্রামের একজন ১১৬ বৎসরের মুছলমান মহিলার বিবরণ জানা গিয়াছে। বেলগ্রাম অঞ্চলের সমস্ত লোক তাঁহাকে দাদী বিবি বলিয়া সম্বোধন করিয়া থাকে। ইঁহার প্র-পৌত্রের সন্তান বিদ্যমান আছে। দাদী বিবি একটু কুব্জ এবং সামান্য ভাবে দৃষ্টি শক্তিহীন হইলেও এখনও তিনি অচল বা শয্যাশায়ী হন নাই।

## ভারতীয় পোলো টুর্ণামেণ্টে বিজয়ী ভুপাল

কলিকাতার পোলো খেলায় ভুপালের যুবক নওয়াব ও তাঁহার দলের খেলওয়াড়গণ পোলো কাপের পাল্লায় বিশেষ কৃতিত্বের সহিত বিজয় লাভ করিয়াছেন। শেষ বিজয়ের পর নওয়াব বাহাদুরের চিত্র উপরে দেওয়া হইল।

## আনওয়ার খাঁ

ভুপাল দলের একজন সিদ্ধহস্ত খেলওয়াড়। ইঁহার খেলার বাহাদুরী দেখিয়া সকলে স্তম্ভিত হইয়াছিলেন।

---

## আল্‌ওয়ারের মহারাজা, ভুপালের নওয়াব এবং বড়লাট আরউইন

পোলো খেলার পর একত্রে ইঁহাদের ছবি তোলা হইয়াছে।

দিল্লীর প্রিন্স অফ ওয়েল্‌স টুর্ণামেণ্টেও ভূপালের নওয়াব ও তাঁহার পোলো টিম বিশেষ গৌরবের সহিত বিজয় লাভ করিয়াছেন। খেলার ময়দানের বিভিন্ন অবস্থার দুইখানা চিত্র এখানে দেওয়া হইতেছে।

মল্লযুদ্ধে বিশ্ববিজয়ী ভ্রাতৃযুগল

গামা ও এমাম বখ্‌শ।

## লাহোর ওলিম্পিক প্রতিযোগীতায় বিজয়ী মুছলমান যুবকগণ
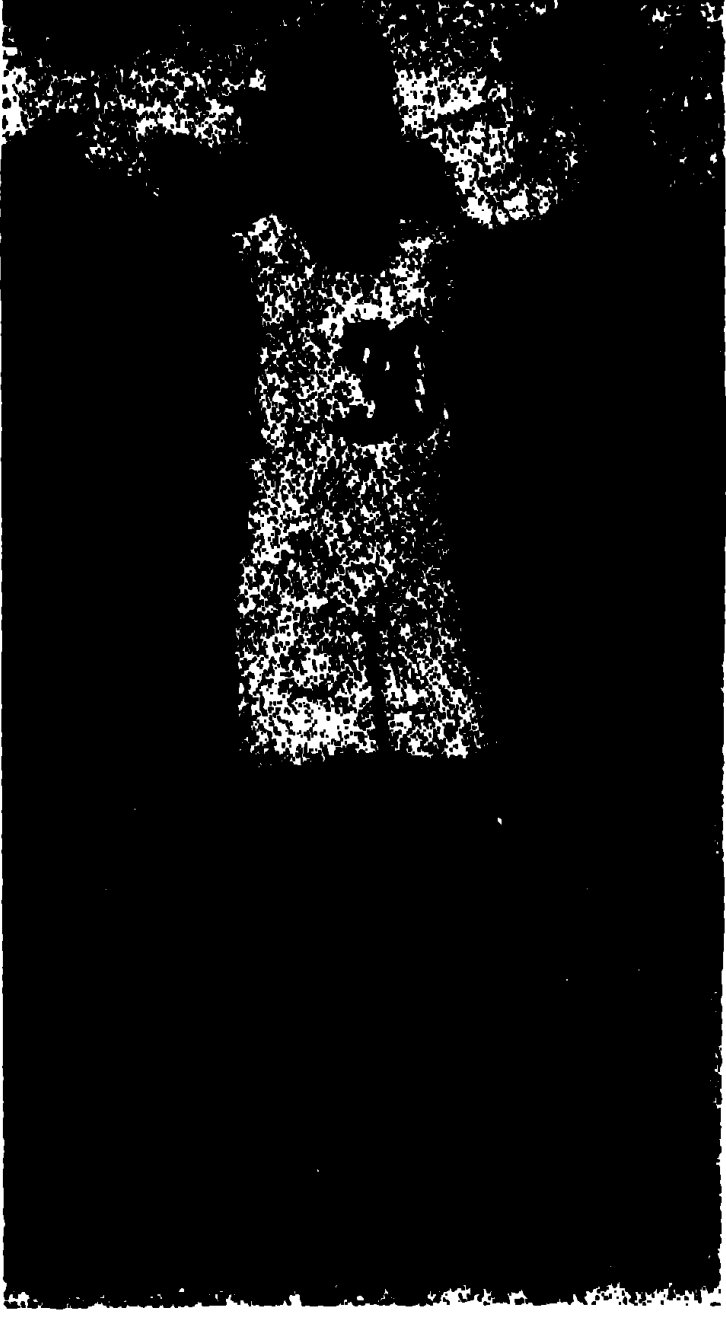
### আবদুল হাম্মিদ

৪৪০ গজ দৌড়ে ইনি প্রথম স্থান অধিকার করেন, মাত্র ৫১।। সেকেণ্ড সময়ের মধ্যে তিনি ঐ ৪৪০ গজ পথ অতিক্রম করিয়াছিলেন। ইহা ব্যতীত বেড়া ডিঙ্গান দৌড়ে ১২০গজ১৬ সেকেণ্ডে ও ২২০ গজ ২৬ সেকেণ্ডে অতিক্রম করিয়াছিলেন।

### আফজাল খাঁ

এই পাঞ্জাবী তরুণ যুবকটী অৰ্দ্ধ মাইল দৌড়ে বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছে। অৰ্দ্ধ মাইল দৌড়িতে ইহার সময় লাগিয়াছিল ২ মিমিট ৫।। সেকেণ্ড।

---

লর্ড এস, পি, সিংহ ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে জন্ম-গ্রহণ করেন। কৰ্ম্ম-জীবনে বিচক্ষণ ব্যবহারাজীব ব্যারিষ্টার হিসাবেই ইনি প্রথমতঃ খ্যাতি অৰ্জ্জন করিয়াছিলেন। ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে ভারত গবর্ণমেণ্টের ষ্ট্যাণ্ডিং কাউন্সিল এবং ১৯০৮।৯ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গলার এডভোকেট জেনারেল হন। ১৯০৯। ১০ খৃষ্টাব্দে ভারত গভর্ণমেণ্টের আইন-সচিব ছিলেন। ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে বোম্বাই কংগ্রেসের সভাপতিরূপে রাজনৈতিক অভিমত ব্যক্ত করেন, তাহা ব্রিটীশ শাসনের প্রতি তাঁহার অনুরাগ, শ্রদ্ধা এবং বিশ্বাসের নিদর্শন। ইনি লর্ড উপাধি পাইয়া সহকারী ভারত-সচিবের পদ লাভ করেন। ১৯২১ খৃষ্টাব্দে বিহারের গভর্ণর হন। কিছুদিন পরে নানা কারণে পদত্যাগ করেন। বৰ্ত্তমান সনের ৪ঠা রবিবার দিবা গতে রাত্রি ২।।টার সময় হঠাৎ হৃদ-যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হওয়ায় ইনি পরলোক গমন করিয়াছেন।
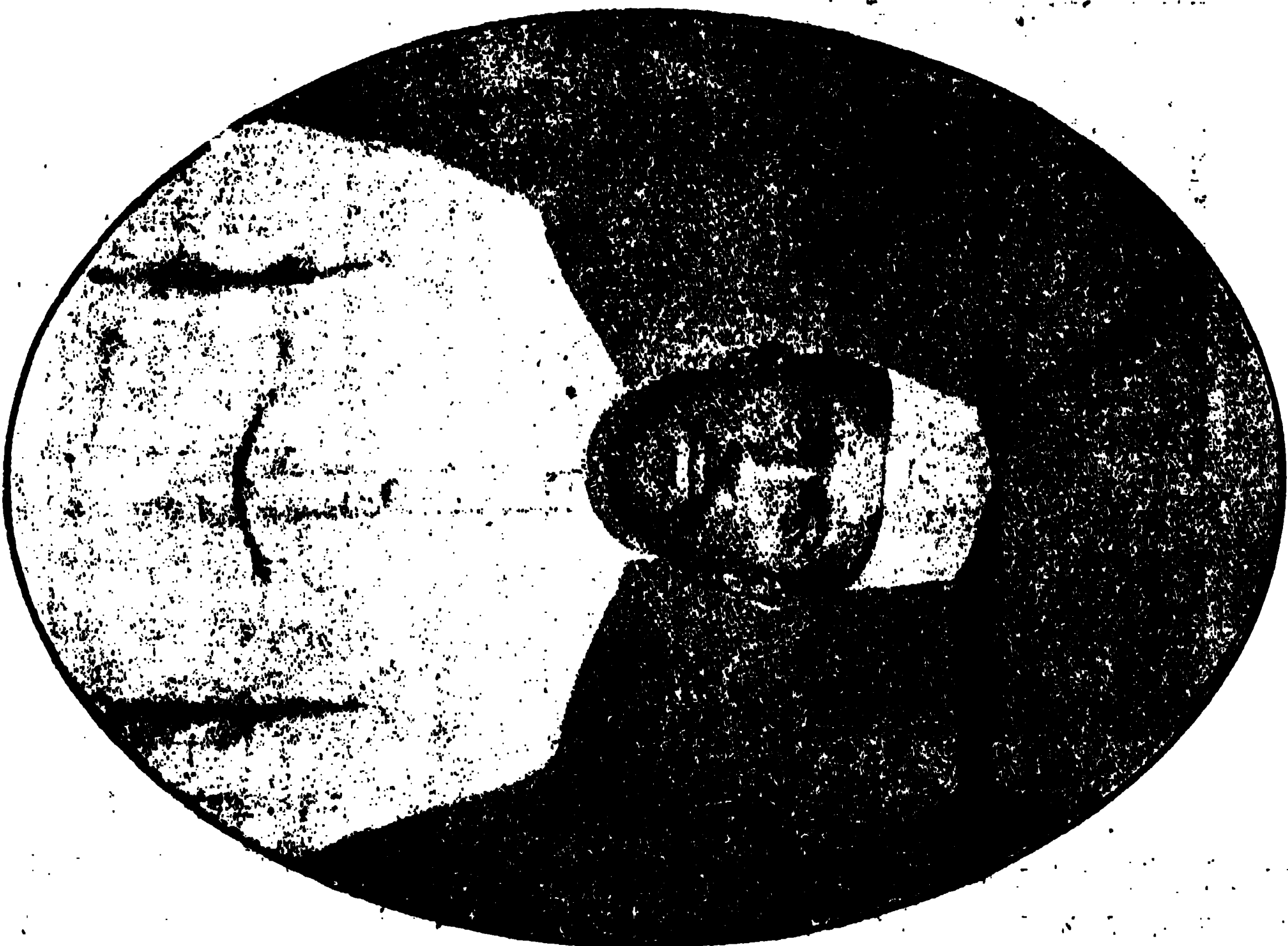
ড সিংহ

মছিহুল মুল্‌ক মরহুম হাকিম আজমল খাঁ

বার্লিনের নূতন মসজিদ

গত ফেব্রুয়ারী মাসের শেষভাগে এই মসজিদের দ্বারোদ্‌ঘাটন হইয়াছে।
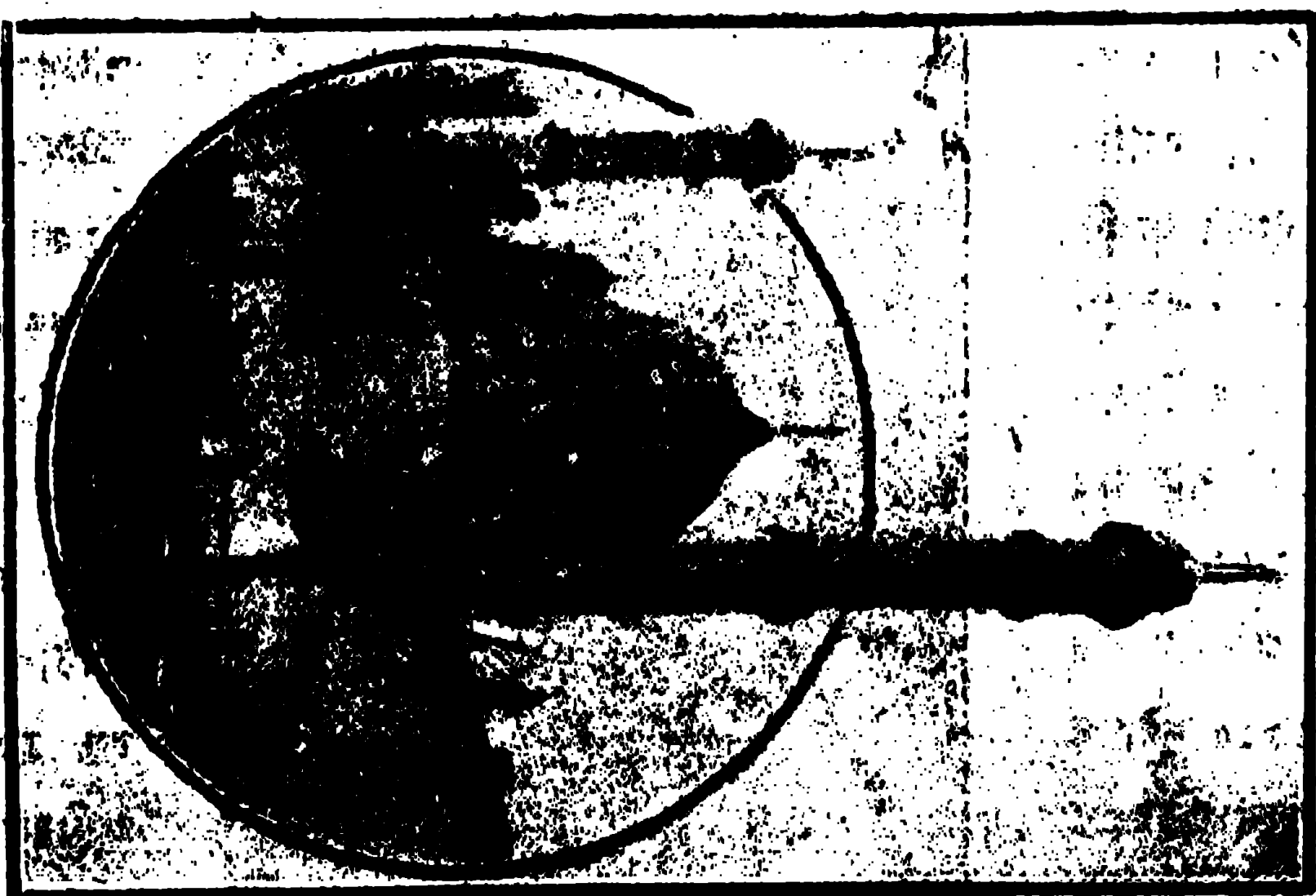
## হেজাজ-রাজ ছোলতান এবনে ছউদ

ফিলিস্তিনের এক বে-সরকারী সংবাদে প্রকাশ পাইয়াছিল, ছোলতান এবনে ছউদ বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে জেহাদ ( Holy War—ধর্ম্ম যুদ্ধ ) ঘোষণা করিয়াছেন। অন্য দিকে প্যারী ও লণ্ডন প্রভৃতি স্থানেও তাহা সমর্থিত হয়। এমন কি পরে জানা যায়, বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট ছোলতান এবনে ছউদের সৈন্য বাহিনীর প্রতি আক্রমণ চালাইবার জন্য ভারত, মিছর ও এরাকের বিমান বহর সজ্জিত করিয়াছেন। ৭টি ট্যাঙ্ক ও২২ এ্যারোপ্লেন আকবা বন্দরের দিকে অগ্রসর হইয়াছে—এরূপ সংবাদ ও পাওয়া যায়। অতঃ-পর এই সকল সংবাদ সঠিক নহে বলিয়া প্রকাশ পাইয়াছে।

এরাক ও শর্কে আর্দ্দন ( Transojordonia ) বৃটিশ গবর্ণ-মেণ্টেরই অধিকারে। বৃটিশ রাজ নীতিকগণ, শরীফ হোছেনের গুণধর পুত্র ফয়ছল ও আবদুল্লাহ্‌কে এখনও সোণার স্বপ্ন দেখাইতেছেন।

অন্য দিকে ছোলতান এবনে ছউদকে ভয় প্রদর্শন করিতেছেন। এই উদ্দেশ্যে নজদের কবিলা বিশেষের উপর এ্যারোপ্লেন হইতে গোলা বর্ষণের দ্বারা এরাকের ইংরাজ কর্ত্তরা নিতান্ত বর্ব্বরতার পরিচয় দিতেও কুণ্ঠিত হন নাই। এ সকল অবস্থা দেখিয়া অনায়াসে বুঝা যায়, আপাততঃ যুদ্ধ স্থগিত থাকিলেও যুদ্ধের আশঙ্কা আদৌ দূর হয় নাই।

# সঙ্কলন

## মোছলেম খর্পরে গির্জ্জা প্রতিষ্ঠা

মালটা ৬০ বর্গ মাইল পরিধিবিশিষ্ট একটী ক্ষুদ্র দ্বীপ। আমীর মাবিয়ার শাসনকালে এই দ্বীপটী মোসলমান শাসনাধীনে আসিয়াছিল। এসলামের সাম্য; ভ্রাতৃত্ব ও সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া অল্প দিনের মধ্যেই মালটাবাসীগণ সকলেই স্বেচ্ছায় এসলামের সুশীতল ছায়ার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। ক্রমশঃ আরবগণ আসিয়া এই দ্বীপে উপনিবেশ স্থাপন করিলেন। কিছুদিনের মধ্যে মালটাবাসী মোসলমানগণ সকল বিষয়ে উন্নতির চরম সীমায় উপনীত হইলেন, এই কোফ্‌র স্থানটী অল্পদিনের মধ্যে দারুল এসলামে পরিণত এবং জগৎবাসীর নিকট শিক্ষা দীক্ষা ও সর্ব্বপ্রকার এসলামী সভ্যতার কেন্দ্র বলিয়া পরিগণিত হইল। মোসলমানগণ অসংখ্য মসজেদ নির্ম্মাণ ও নানা শাস্ত্র শিক্ষার জন্য অগণিত এসলামী মাদ্রাসা স্থাপন করিলেন। দ্বীপের আদিম অধিবাসীগণের উপর এসলামী প্রভাব সম্পূর্ণরূপে বিস্তৃতি লাভ করিল। তাহাদের হাব-ভাব, কথাবার্ত্তা, চালচলন ও পোষাক পরিচ্ছদ সবই আরবদের ন্যায় হইয়া গেল, আরব মোসলমানদের সদ্ব্যবহার, সুবিচার ও এসলামের মহিমাময় সৌভ্রাতৃত্বের গুণে সেখানে একজনও অমুসলমান রহিল না।

মোসলমানগণ সকল দিক দিয়া এই দ্বীপের উন্নতি সাধন জন্য যাহা কিছু করিয়াছেন, মালটার গগন পবন ও ধূলিকণা পর্য্যন্ত কখনও তাহা ভুলিতে পারিবে না। সেখানকার মাটী অনুর্ব্বর ও মরুসদৃশ ছিল, মোসলমানগণ জাহাজে করিয়া আফ্রিকার তীরবর্ত্তী মোসলেম শাসিত 'তারাবলস্ ( ত্রিপলি ) হইতে সরস মৃত্তিকারাশি আমদানী করিয়া দ্বীপের ক্ষেত্র সমূহের উর্ব্বরতা শক্তি বৃদ্ধি করিলেন। ফলে কিছুদিনের মধ্যে এই মরু দ্বীপটী সুজলা সুফলা শস্য শ্যামলা হইয়া উঠিল।

অবশেষে খৃষ্টানগণের অন্যায় অত্যাচারে স্পেন হইতে বনীওমাইয়া-শাসনের অবসান হইলে পাশ্চাত্য দস্যুগণের দৃষ্টি মোসলেম অধ্যুষিত মালটা দ্বীপের প্রতি আকৃষ্ট হইল, তাহারা দলে দলে এখানে আসিয়া অবতরণ করিল, দ্বীপের অধিবাসী মোসলমানগণের উপর অত্যাচার ও অনাচারের প্রবল স্রোত প্রবাহিত হইল। অমানুষিক অত্যাচার ও নৃশংস হত্যার ভয় দেখাইয়া জোরপূর্ব্বক বহু মুসলমানকে খৃষ্টান ধর্ম্মে দীক্ষিত হইতে বাধ্য করিল। যাহারা ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিতে 'রাজি' হইল না, তাহাদের সকলকেই ভীষণ নৃশংসতার সহিত হত্যা করিয়া ফেলিল। মালটার পথ দিয়া মোসলমানের শোণিত-স্রোত প্রবাহিত হইল। এই প্রকার অত্যাচারের ফলে কিছুদিনের মধ্যে দ্বীপটী সম্পূর্ণরূপে মোসলমান শূন্য হইল।

খৃষ্টান সম্প্রদায়ের সেই অমানুষিক বর্ব্বর অত্যাচারের চিহ্নস্বরূপ আজিও মালটা দ্বীপে একটী গীর্জ্জা বর্ত্তমান রহিয়াছে। ভিন্ন দেশীয় কোন লোক সেখানে উপস্থিত হইলে অধিবাসীগণ সাধারণতঃ এই গীর্জ্জাটীর দিকে তাহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া থাকেন। কথিত হইয়াছে—সেই সময় মালটার এত অধিক সংখ্যক মোসলমান, খৃষ্টান হস্তে নিহত হইয়াছিলেন যে, খৃষ্টানগণ ইষ্টক ও প্রস্তরের পরিবর্ত্তে মোসলমান শহীদগণের মাথার খুলি দিয়া তাহাদের পাশবিক অত্যাচারের বিজয়চিহ্ন স্বরূপ ঐ গীর্জ্জাটী নির্ম্মাণ করিয়াছিল। মোসলেম আমলের অসংখ্য

মসজিদ ভাঙ্গিয়া তৎপরিবর্ত্তে গীর্জ্জাসমূহ নির্ম্মিত হইয়াছিল। একজন মোসলমান ভ্রমণকারীর নিকট মালটার বহু সংখ্যক খৃষ্টান অধিবাসী বলিয়াছে যে, তাহারা আজিও এসলাম ধর্ম্মের প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা ও অনুরাগ পোষণ করিয়া থাকে, খৃষ্টান সম্প্রদায়ের অত্যাচারের ভয়ে খৃষ্টান ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে সক্ষম হইতেছে না। কোন বিশিষ্ট মোসলেম-শক্তির সাহায্য ও পৃষ্ঠপোষকতা পাইলে আবার তাহারা দলে দলে এসলামের পবিত্র ক্রোড়ে ফিরিয়া আসিবে।

---

## চীনে মোসলমান

চীনদেশে তিন কোটী মোসলমানের বাস। দুঃখের বিষয় জগতের অন্যান্য স্থানের মোসলমানগণ তাহাদের সম্বন্ধে বিশেষ কোন খোঁজ খবর রাখেন না। খৃষ্টান পাদরীগণ এসম্বন্ধে সত্য মিথ্যা যাহা কিছু প্রচার করিয়া থাকেন, চক্ষু বন্ধ করিয়া তাহাই বিশ্বাস করিয়া লওয়া ভিন্ন গত্যন্তর নাই। অন্যান্য দেশের মোসলেম সম্প্রদায় তাঁহাদের চীনের ভ্রাতৃবৃন্দ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অন্ধকারে রহিয়াছেন। পক্ষান্তরে এসলাম-বৈরী পাদরীর দল তাঁহাদের প্রত্যেক কার্য্যের, প্রত্যেক চালচলনের এমনকি প্রত্যেক ভাবধারার সহিত সুপরিচিত। মোসলমানের পক্ষে ইহা অপেক্ষা লজ্জা ও পরিতাপের বিষয় আর কি হইতে পারে?

১০২০। খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডে অবস্থান কালে একজন প্রাচ্য ভ্রমণকারী বৃটীশ মিউজিয়মের নিকটবর্ত্তী প্রাচ্য ভাষার গ্রন্থ বিক্রেতাদের দোকানে সময় সময় যাতায়াত করিতেন। একদিন দেখিলেন জনৈক মৃত প্রাচ্য অধ্যাপকের পরিত্যক্ত অনেকগুলি গ্রন্থ নীলামে বিক্রয় হইতেছে, তন্মধ্যে একখানি কেতাবের দিকে তাঁহার দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল, সেটী চিনীয় ভাষায় অনুবাদসহ লিথোর ছাপা একখানি আরবী গ্রন্থ, অন্যান্য কেতাবের সহিত তিনি সেই গ্রন্থখানি কিনিয়া লইলেন। চীনে বর্ত্তমান জাতীয় আন্দোলন আরম্ভ হওয়ার পর চীন দেশীয় একজন মোসলমান আলেম কর্ত্তৃক এই গ্রন্থ লিখিত হইয়াছিল। প্রাচ্যের সুদূর পূর্ব্বসীমা হইতে প্রতীচ্যের সর্ব্বপশ্চিম প্রান্তদেশে গ্রন্থখানি আমদানী হইয়াছে অথচ সুবিস্তৃত মধ্যদেশীয় প্রাচ্যের অধিবাসীগণ সে সম্বন্ধে কোন সংবাদই রাখেন না, ইহা অপেক্ষা বিস্ময়ের ও ক্ষোভের বিষয় আর কি আছে?

সুখের বিষয় বর্ত্তমান যুগপরিবর্ত্তনের ভাবধারা চীনবাসী মোসলমান সম্প্রদায়ের হৃদয়ে নতূন আশা ও নূতন প্রেরণা জাগাইয়া তুলিয়াছে। চীনের সাংহাই নগর হইতে একখানি এসলামী মাসিক পত্রিকা চীন ভাষায় প্রকাশিত হইয়া থাকে, তাহার মলাটের ( টাইটেল পেজ ) উপরিভাগে আরবীভাষা ও আরবী অক্ষরে পত্রিকাটার নাম আলএ'লাম ( الاعلام ) এবং من جمعية الاسلام العلمية الصينية الشهرى العلمى الادبى الدينى - অর্থাৎ চীনদেশের মোসলেম সমিতির পক্ষ হইতে জ্ঞান, সাহিত্য ও ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় মাসিক পত্রিকা, এবং মধ্যস্থলে চীনাভাষায় ও সর্ব্বনিম্নে ইংরাজী ভাষায় The Chiana Muslim এবং Literary Society লিখিত হইয়াছে। ঠিকানা ৮নং, টিসন চোগলী, কুঙ্গপেটন রোড, সাংহাই চীন। ১৯২৬ সালের জানুয়ারী মাস হইতে পত্রিকাখানি নিয়মিতরূপে প্রকাশিত হইতেছে।

---

## তোগলক শাহের সহস্র মাদ্রাজা

দিল্লী হইতে ছয় ক্রোশ দূরবর্ত্তী একটী স্থানের নাম "তোগ্‌লোক্ আবাদ"। এই স্থানটী সোলতান মোহাম্মদ তোগলোকের 'ইয়াদগার' ( স্মৃতিচিহ্ন )। তিনিই ইহার স্থাপয়িতা ছিলেন, তাঁহার সময় এই সহরটী শিক্ষা, বাণিজ্য, স্থাপত্য ও অন্যান্য বিদ্যার আলোচনার দিক দিয়া সকল বিষয়ে গৌরবমণ্ডিত ও উন্নতির চরম সীমায় উপনীত হইয়াছিল, কিন্তু আজ তাহার সেই পূর্ব্ব গৌরব ও অপূর্ব্ব সৌষ্ঠব কিছুই নাই, সবই অতীতের গর্ভে লীন হইয়াছে। গগনস্পর্শী প্রাসাদ সমূহের ভগ্নাবশেষ এবং বিরাট কীর্ত্তি সমূহের ধ্বংসাবশেষ কেবল মাত্র অতীতের সাক্ষ্য স্বরূপ আজিও বর্ত্তমান রহিয়াছে। ফেরেস্তা প্রভৃতি সুবিখ্যাত ঐতিহাসিকগণ সোলতান মোহাম্মদ তোগ্‌লকের অপূর্ব্ব বীরত্ব বর্ণনা করিয়া ও যুদ্ধাভিযানের চিত্র অঙ্কিত করিয়াই কর্ত্তব্যের পরিসমাপ্তি করিয়াছেন। তাহা পড়িলে কেবল সোলতানের রক্তপিপাসু মূর্ত্তিই চক্ষের সম্মুখে ভাসিয়া উঠে। আমরা আজ এসকল বিষয়ের সত্যাসত্য সম্বন্ধে আলোচনা

করিব না। বিশ্বস্ত ঐতিহাসিক গ্রন্থ কেতাবুল খতৎ ( كتاب الخطط ) হইতে সোলতানচরিত্রের গৌরবময় আর একটী দিকে আলোক সম্পাৎ করিতে চেষ্টা পাইব। তাঁহার ন্যায় সুপণ্ডিত, আলেম সম্প্রদায়ের একনিষ্ঠসেবক ও দান-প্রিয় নরপতি খুব কমই দেখিতে পাওয়া যায়।

মোহাম্মদ তোগলক সাহ নিজে একজন বিশিষ্ট ফাজেল, বহুশাস্ত্রবিদ্ আলেম এবং হাফেজে কোরান ছিলেন। সমগ্র কোরান শরীফ্ ও অন্যান্য শাস্ত্রের আরও অনেক গ্রন্থ তাঁহার কণ্ঠস্থ ছিল। 'ফেকহ' শাস্ত্রের চারিখণ্ডে বিভক্ত সুবিখ্যাত 'হেদায়া' নামক বিরাট গ্রন্থখানি তিনি আদ্যন্ত মুখস্থ করিয়াছিলেন। এ কালের 'এই সস্তায় কাজ সারার' দিনে পণ্ডিতম্মন্য বহু আলেম একথা কল্পনাতেও ভাবিয়া উঠিতে পারিবেন না। একালের ছাত্রের দল অনন্যকর্ম্মা হইয়া দুই বৎসর যাবৎ মাদ্রাসা সমূহে নিয়মিতভাবে পাঠ করিয়াও এই বিরাট গ্রন্থ শেষ করিতে পারেন না। বিলাস বেষ্টিত এবং রাজ্যশাসন, যুদ্ধাভিযান ও অন্যান্য অসংখ্য রাজকার্য্যে লিপ্ত সোলতানের এই বিদ্যানুরাগ ও নানাশাস্ত্রের অনুশীলনের কথা ভাবিয়া দেখিলে বিস্মিত ও অভিভূত হইতে হয়। ন্যায়, দর্শন ও জ্যোতির্ব্বিদ্যায় (Astronomy) তাঁহার অসাধারণ অধিকার ছিল। চিকিৎসা ও কবিতা রচনায় বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুকালীন রচিত একটী কবিতা পড়িয়া জগতের নশ্বরতা ও সাংসারিক ধনৈশ্বর্য্যের অনিত্যতার ছবি স্বতঃই চক্ষুর সম্মুখে ফুটিয়া উঠে। মৃত্যুর কিছুক্ষণ পূর্ব্বে সকলকে লক্ষ্য করিয়া তিনি বলিয়াছিলেন—

عيش دنيا را بقائی نيست ديدی غنچه را
يك تبسم کرد عمری در پريشانی گزشت -

অর্থাৎ দুনয়ার সুখৈশ্বর্য্যে আদৌ স্থায়িত্ব নাই, একটী কুসুমকোরকের দিকে চাহিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারিবে, কুঁড়িটী একবার মাত্র সুখের হাসি হাসিয়া প্রস্ফুটিত হইলেই তাহার পরবর্ত্তী সমগ্র জীবন দুঃখ কষ্টে কাটিয়া যায়।

তিনি সকল সময় শিক্ষার্থী ও আলেম সম্প্রদায়ে পরি-বেষ্টিত এবং তাঁহাদের সহিত বিদ্যালোচনা, বিভিন্ন শাস্ত্রের জটীল প্রশ্নাদির বিচার বিশ্লেষণ ও আন্দোলন আলোচনায় সময় অতিবাহিত করিতেন।

তাঁহার শাসন কালে রাজধানী দিল্লী নগরে এক সহস্র এসলামী মাদ্রাসা স্থাপিত এবং বিশেষ সুশৃঙ্খলার সহিত পরিচালিত হইত। শাফেয়ী মাজ্হাবের 'ফেকহ্' ও অন্যান্য শাস্ত্র শিক্ষা দিবার জন্য একটী স্বতন্ত্র মাদ্রাসা ছিল। এই প্রতিষ্ঠান সমূহের যাবতীয় ব্যয়ভার সোলতানের রাজ-কোষ হইতে বহন করা হইত। এখন দেখা যাইতেছে, এই সকল মাদ্রাসার প্রত্যেকটী হইতে শিক্ষা সমাপন করিয়া প্রতি বৎসর গড়ে একজন করিয়া আলেম বাহির হইলেও এক মাত্র দিল্লী সহরেই বৎসরে এক সহস্র আলেমের একটী বিরাট সম্প্রদায় সৃষ্টি হইত। ইহার সহিত ভারতের অন্যান্য প্রদেশের তৎকালীন শিক্ষার অবস্থা ও শিক্ষা বিস্তারের প্রতি সোলতানের আগ্রহাতিশয্য পক্ষান্তরে তৎসম্পর্কীয় বিরাট ব্যয়ভার বহনের কথা ভাবিয়া দেখিলে স্তম্ভিত হইতে হয়।

আল্লামা মকরিজী লিখিয়াছেন—সোলতান মোহাম্মদ তোগ্লকের শাসন কালে ভারতবর্ষে ন্যায়, দর্শন, জ্যোতি-র্ব্বিদ্যা ও 'দীনী এলমে'র শিক্ষা এরূপ বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল যে, তৎসাময়িক ভারতীয় ক্রীতদাসীদের মধ্যেও অনেকে কোরআন শরীফ হেফ্জ্ ( মুখস্থ ) ও দীনী এল্মে বিশেষ অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিত। এজন্য মিসর ও হেজাজ অঞ্চলে সে সময় এক একটী ভারতীয় দাসী বিশ সহস্র আশরফী মূল্যে বিক্রীত হইত। এদিকে দিল্লী নগরে তখন দাসীর মূল্য সাধারণতঃ আট আশরফীর বেশী ছিল না।

সোলতান নামাজ রোজা প্রভৃতি এসলামী ধর্ম্মানুষ্ঠানগুলি স্থায়ীভাবে বিশেষ সাবধানতার সহিত পালন করিতেন। রমজান শরীফের রোজার সময় সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বে সহরের বহু সংখ্যক আলেম ফাজেল সোলতানের মজলিসে উপস্থিত হইতেন, তিনি তাঁহাদের সকলের সহিত একত্রে এক 'দস্তরখানে' 'এফ্তার' করিতেন। তাঁহার দানের কথা জগৎ প্রসিদ্ধ ছিল। দীন দরিদ্র ও অভাবগ্রস্ত লোকদিগকে মুক্ত হস্তে দান করিতেন। বিশেষতঃ আলেম সম্প্রদায়ের জন্য তাঁহার রাজকোষ সর্ব্বদা মুক্ত ও অবারিত থাকিত। একবার মাওরাওন্নাহার প্রদেশে বিতরণের জন্য তিন লক্ষ আশরফী পাঠাইয়া দিয়াছিলেন, তন্মধ্যে এক লক্ষ আলেম সম্প্রদায়ের সাহায্যার্থে, এক লক্ষ দীন দরিদ্রদিগকে ও

অবশিষ্ট একলক্ষ আশরফী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান সমূহে বিতরিত হইয়াছিল।

একবার পারস্য দেশ হইতে দর্শন শাস্ত্রের কয়েকখানি কেতাব লইয়া একজন লোক তাঁহার দরবারে আসিয়াছিল, তন্মধ্যে সুবিখ্যাত মুসলমান দার্শনিক পণ্ডিত আবু আলী এবনে সীনার রচিত 'কেতাবুশ শেফা' নামক গ্রন্থখানি সোলতান একটী মহামূল্য জহরতের বিনিময়ে ক্রয় করিয়াছিলেন, জহরৎটীর মূল্য বিশ হাজার আশরফীরও বেশী ছিল।

সমরকন্দের সর্ব্বজনমান্য আলেম মহামতি আল্লামা শেখ বোরহানজ্‌জিয়াআজ্‌জীর ( شیخ علامہ برہان الضیاء عزجی ) এল্‌ম্ ও ফজলের 'শোহরৎ' শুনিয়া সোলতান তাঁহার নিকট পঞ্চাশ হাজার আশরফী উপহার স্বরূপ পাঠাইয়া দিয়াছিলেন।

সোলতান যখন 'জেহাদের' উদ্দেশ্যে অসংখ্য সৈন্য বাহিনী লইয়া অভিযান করিতেন, তখন বহু সংখ্যক কেতাবের একটী বৃহৎ কোতবখানা ( Library ) ও আলেম সম্প্রদায়ের একটী দল তাঁহার সঙ্গে থাকিত।

তাঁহার শাসন কালে দিল্লী নগরীর পরিধি চল্লিশ বর্গ মাইল ছিল। এই বিংশ শতাব্দীর সভ্যতার যুগ হইতে ছয় শত বৎসর পূর্ব্বে হিজরী অষ্টম শতাব্দীতে ভারতবর্ষে মোসলেম শাসন কালে এই অভাবনীয় বিদ্যা চর্চ্চা ও অবাধ অবৈতনিক ( Free Education ) শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহের কথা ভাবিলে আবাক হইয়া যাইতে হয়। انقدح بشکست و ان ساقی نماند হায়, সেই সুখময়, শান্তিময় ও গৌরবময় শাসন দিনের কথা আজ কল্পনায় পরিণত হইয়াছে। (১)

---

## কলিকাতার অতীত বাজার দর

এক টাকা মূল্যে প্রাপ্ত শস্যের হিসাব

| খৃষ্টাব্দ | চাউল | গম | সরিষার তৈল |
|---|---|---|---|
| ১৭৩৮ | ২ মন ৩০ সের | ২ মন ২০ সের | ১২ সের |
| ১৭৫০ | ২ মন ১০ সের | ২ মন ১০ সের | ১০ „ |
| ১৭৫৮ | ১ মন ৩০ সের | ১ মন ৩৫ সের | ৮॥ „ |
| ১৭৮২ | ১ মন ৫ সের | ১ মন ৫ সের | ৭ „ |
| ১৮২৫ | ৩০ সের | ৩২ সের | ৬ „ |
| ১৮৫৮ | ১৫ সের | ১৮ সের | ৫ „ |
| ১৮৮০ | ১২ সের | ১১ সের | ৪॥ „ |

( ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির অপ্রকাশিত রিপোর্ট—লণ্ডন মিউজিয়ম।

শস্য রপ্তানির নমুনা

| | | |
|---|---|---|
| চাউল | প্রতেক মিনিটে | ১১৮ মন |
| গম | „ „ | ৬৫ „ |
| মসুর | „ „ | ৫৫ „ |
| অড়হর | „ „ | ৫০ „ |
| মুগ | „ „ | ৫৫ „ |

( সরকারী রিপোর্ট )

দৈনিক আয়ের খতিয়ান

| | | |
|---|---|---|
| আমেরিকা | প্রত্যেক ব্যক্তির আয় | ১৪।/০ |
| ফ্রান্স | „ „ | ৭।০ |
| ইংলণ্ড | „ „ | ৬।৵০ |
| জাপান | „ „ | ৪॥৴০ |
| ভারতবর্ষ | | ৬ পয়সা। |

( আন্তর্জাতিক রিপোর্ট—১৮৯০ )

মাংসের জন্য ভারতবর্ষ হইতে প্রত্যেক মিনিটে একটী গরু বিদেশে রপ্তানি করা হইয়া থাকে।—( ব্লু-বুক ১৮৮০ )

---

(১) কেতাবুল খতৎ দ্বিতীয় খণ্ড ( کتاب الخطط جلد ۲ ) হইতে সঙ্কলিত।

# আলোচনা

## নাভার মহারাজ

ভারতের বৃটিশ সরকারের আদেশে নাভার মহারাজ রিপু দমন সিংহ বাহাদুর গত ১৮ই ফেব্রুয়ারী রাজ্যাধিকার ও রাজোপাধি হইতে বঞ্চিত হইয়াছেন। ইনি এখন মাদ্রাজ অঞ্চলে নির্ব্বাসন-দণ্ড ভোগ করিতেছেন। প্রকৃত পক্ষে ইনি ১৯২৩ সালেই এই দণ্ডাদেশ প্রাপ্ত হন। তবে সরকারী কারছাজীতে তখন ইহাকে "স্বেচ্ছায় সিংহাসন ত্যাগ" বলিয়া ব্যখ্যা করা হয়।

এতদিন বিনা বিচারে বৃটিশ-প্রজার নজরবন্দী চলিয়া আসিতেছিল। পরন্তু তাহাতে গবর্ণমেণ্টকে এইরূপ ঘোষণা করিতে হয় যে, অমুক বিশেষ ক্ষমতা বলে অমুক প্রজাকে নজরবন্দ করা হইল। দেশীয় রাজরাজড়াগণের বেলায় দেখিতেছি, তাহারও কোন আবশ্যকতা নাই। মহারাজা রিপু দমন সিংহ বাহাদুরের বিরুদ্ধে বৃটিশ-সরকারের একমাত্র অভিযোগ —বিশ্বাসঘাতকতা।" কিন্তু এই বিশ্বাসঘাতকতার স্বরূপ কি, অথবা কোন অজ্ঞাত বিশ্বাসঘাতকতার ফলে নাভাধিপতিকে সিংহাসনচ্যুত করিবার অধিকার বৃটিশ সরকারের আছে কিনা; তাহার কোন কথাই তাঁহারা প্রকাশ করেন নাই। সুতরাং ইহাতে অনায়াসে প্রতিপন্ন হইয়া যাইতেছে যে, ভারতের সমস্ত রাজগণের সিংহাসনচ্যুতির জন্য বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের কোন কারণ প্রদর্শন অথবা কোন চুক্তির মর্য্যাদা রক্ষার প্রয়োজন নাই। তাঁহারা ইচ্ছা করিলেই কোন ব্যক্তিকে সিংহাসনে বসাইয়া অথবা তাহা হইতে নামাইয়া দিতে পারেন। বস্তুতঃ একজন সামন্তরাজের মান ও অধিকার বড়লাটের চাপরাশীর সমতুল্য। বড়লাট অসন্তুষ্ট হইয়া যেমন তাঁহার চাপরাশীর সমস্ত বিশেষ পোষাক-পরিচ্ছদ কাড়িয়া লইতে পারেন, তেমনই যে কোন সামন্ত রাজাকে তাঁহার সমস্ত অধিকার হইতে তিনি বঞ্চিতও করিতে পারেন। তবে উভয়ের মধ্যে পার্থক্য এই যে, আইনের সাহায্য ব্যতিরেকে বড়লাট চাপরাশীর স্বাধীনতা হরণ করিতে পারেন না। কিন্তু সামন্ত রাজের স্বাধীনতা হরণ করিতে তাঁহার এরূপ কোন মাথা ব্যথার দরকার হয় না। অতএব আজ প্রশ্ন হইতেছে, ভারতের সামন্তরাজগণ বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের এরূপ দাসত্ব স্বীকারে প্রস্তুত আছেন কিনা? এরূপ দাসত্ব স্বীকার অপেক্ষা রাজমুকুট পরিত্যাগ করা সহস্রগুণে শ্রেয়ঃ। ইহাপেক্ষা নিকৃষ্ট দাসত্ব আর কি হইতে পারে? যে রাজার মান-ইজ্জত ও স্বাধীনতা অন্য রাজার কর্ম্মচারী বিশেষের ইচ্ছামাত্রের অধীন, তাহার অধিকার দাসত্ব হইতে নিশ্চয় নিকৃষ্ট। নাভা মহারাজের ব্যাপার হইতে সমস্ত সামন্ত রাজগণের শিক্ষালাভ করা উচিত। আজ যে-ভাবে নাভার মহারাজা সিংহাসনচ্যুত হইয়া বন্দী হইয়াছেন। কাল অন্য সামন্ত-রাজেরও ঠিক সেই ভাবে সিংহাসনচ্যুতি ঘটিতে পারে। ইতিপূর্ব্বে ইন্দোর, ভরতপুর, হায়দরাবাদ প্রভৃতি রাজ্যের প্রতি যে দুর্ব্ব্যবহার হইয়াছে, তাহাতে যেন সামন্তরাজগণের চৈতন্য উদয় হয় নাই। ফলে আজ নাভা-রাজের এই দুর্দ্দশা! এখনও যদি তাঁহারা কাপুরুষোচিত নীরবতা অবলম্বন করেন, তবে ইহারপরিণাম নিতান্ত শোচনীয় হইবে।

ভারতের বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট 'নাভা-অত্যাচারের অজুহাতে বলিতেছেন, মহারাজ বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছেন। কিন্তু কোন বিজ্ঞ লোকের নিকট এই অজুহাত টিকিতে পারে না। কেননা বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট ও নাভা মহারাজের সম্পর্ক চুক্তি বলে প্রতিষ্ঠিত। সেই চুক্তি অনুসারে বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট এরূপ ভীষণ শাস্তি প্রদানের অধিকারী নহেন। মালওয়া এবং ভারত-সীমান্তের অন্যান্য দেশীয় রাজ্য সম্বন্ধে বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট ১৯০৮ সালে ঘোষণা প্রচার করিয়াছেন,—"তাঁহাদের (সামন্তরাজগণের) স্ব স্ব রাজ্যে রাজোচিত অধিকার তেমনিভাবে বলবৎ থাকিবে, যেমন ভাবে বৃটিশ অভিভাবকত্ব স্বীকারের পূর্ব্বে ছিল।"

বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে রাজা মলুন্দর বাহাদুরকে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন,—"রাজা বাহাদুর এবং তাঁহার ভাবী উত্তরাধিকারগণ বর্ত্তমানে এবং ভবিষ্যতে নিরাপদে ও স্বচ্ছন্দে তাঁহাদের পৈতৃক রাজ্যে যাবতীয় রাজোচিত সুবিধা ভোগের সম্পূর্ণ অধিকারী হইবেন। রাজা ছাহেবের প্রজা, জায়গীরদার, আত্মীয় স্বজন ও কর্ম্মচারীবৃন্দের কোন অভিযোগ সম্বন্ধে বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট হস্তক্ষেপ করিবেন না। আভ্যন্তরীণ শাসন ও খান্দানী ব্যাপারে তাঁহারই প্রণীত আইন-কানুন প্রবর্ত্তিত থাকিবে। বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট তাহাতে কোনরূপ হস্তক্ষেপ করিবে না।"

এই সকল স্পষ্ট ও পরিষ্কার চুক্তি ও ঘোষণা বাণী এখনও মওজুদ আছে। ইহাতে এমন কোন ইঙ্গিত পর্য্যন্ত নাই, যদ্দারা বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট নাভারাজ্যের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতে পারেন—মহারাজ গুরুচরণ সিংহ বাহাদুরকে তখ্‌ত হইতে নামাইয়া দিয়া তাঁহাকে বন্দী করিতে পারেন।

হাঁ, উপরোক্ত সন্ধি পত্রের এই শর্ত্ত অবশ্য আছে, নাভার মহারাজকে বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের প্রতি 'ওফাদার' (Loyal) থাকিতে হইবে। ইহার অর্থ কি এই যে, সাক্ষ্য-প্রমাণ ব্যতীত বিশ্বাসঘাতকতার বাহানা করিয়া মহারাজকে সিংহাসচ্যুত এমনকি স্বাধীনতা হরণ পূর্ব্বক বন্দী করিতে হইবে? গোপন বিশ্বাসঘাতকতার গোপন সংবাদ পাইয়া গোপনে বাদী ও বিচারক সাজিয়া এইভাবে একজন দেশীয় শাসনকর্ত্তার স্বাধীনতা হরণের অধিকার ভারতের বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের কখনও নাই। বস্তুতঃ সন্ধি সূত্রে আবদ্ধ একজন মিত্ররাজের প্রতি এরূপ দুর্ব্ব্যবহার করা বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের নিজের পক্ষে বিশ্বাসঘাতকতা ব্যতীত আর কিছুই নহে, এবং এজন্য ভারত গবর্ণমেণ্টের লজ্জিত হওয়া উচিত।

১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে বরোদার মহারাজের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ আনীত হইয়াছিল, এবং পরিণামে মিথ্যা সাব্যস্ত হইলে তদানীন্তন ভারত গবর্ণমেণ্টকে কিরূপ ভাবে লজ্জিত হইতে হইয়াছিল, তাহা বর্ত্তমান আমলাতন্ত্রের স্মরণ রাখা উচিত। "রেসিডেণ্টকে" বিষ দানে হত্যা করিবার চেষ্টা হইয়াছিল বলিয়া বরোদার মহারাজকে সিংহাসনচ্যুত করা হয়। কিন্তু প্রকাশ্য আদালতে প্রমাণাভাবে ভারত গবর্ণমেণ্টকে বিষদানের অভিযোগ প্রত্যাহার করিতে হইয়াছিল।

ভূপালের ভূতপূর্ব্ব শাসনকর্ত্তা নওয়াব ছিদ্দিকুল হাছন খাঁর বিরুদ্ধেও এই প্রকার অভিযোগ আনয়ন করিয়া বিনা বিচারে তাঁহাকে সিংহাসনচ্যুত করা হয়। তাহার পর বহু দিনের চেষ্টা চরিত্রের পর তদন্ত দ্বারা তিনি নিরপরাধ বলিয়া প্রমাণিত হন, এবং ভূপালের গদি তাঁহাকে পুনরায় অর্পণ করা হয়। কিন্তু দুঃখে শোকে এবং অপমানে ও অভিমানে এতদিনে তাঁহার শরীর ও মন একেবারে জর্জ্জরিত হইয়া পড়িয়াছিল, এবং গদী লাভের অল্প দিনের মধ্যে তিনি এই অপমানপূর্ণ গোলামীর রাজ্য হইতে চির বিদায় গ্রহণ করেন।

নাভা মহারাজার বিরুদ্ধে প্রচারিত "বে-ওফাই" অভিযোগ যে ভিত্তিহীন নহে, তাহা কে বলিতে পারে? প্রমাণের অভাব না হইলে, প্রকাশ্য আদালতে ইহার বিচার হয় না কেন?

---

## কাট মোল্লা ও আকাট পণ্ডিত

হাজার হাজার বৎসরের অনাচার অত্যাচারের ফলে শাস্ত্রের নামে নানা প্রকার মারাত্মক অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কার হিন্দু সমাজের স্তরে স্তরে পাকাপাকি রকম আসর জমাইয়া বসে। প্রকৃত শাস্ত্র আর পণ্ডিতদিগের রচিত ব্যবস্থা, শাস্ত্রের বচন আর উপকথা, ঐশী গ্রন্থের বচন আর মুনিঋষিদিগের ও বিবিধ মতাবলম্বী দার্শনিক ও নৈয়ায়িকগণের রচিত শ্লোক, এমন শোচনীয়রূপে এক সঙ্গে মিশ্রিত ও এক পর্য্যায়ে সন্নিবেশিত হইয়া গিয়াছিল যে, দুইটাকে পৃথক করিয়া

বাছিয়া লওয়া এবং বাছিয়া লওয়ার পর প্রত্যেকটিকে তাহার উপযুক্ত স্থানে স্থাপন করা তখন হিন্দু সমাজের শক্তি ও প্রবৃত্তির অতীত হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। তাহার পর, নানা যুগের নানা অবস্থায় রচিত স্মৃতি ও নীতিকথাগুলি শেষকালে একসঙ্গে "ধর্ম্মশাস্ত্র" পর্য্যায়ভুক্ত হইয়া পড়ায়, অতীতের বিভিন্ন স্তরের বিভিন্ন রুচির, বিভিন্ন মতের, বিভিন্ন স্বার্থের বিভিন্ন পারিপার্শ্বকতার দ্বারা উৎপন্ন সেই সকল পরস্পর বিরোধী এবং সমাজের বিভিন্ন স্তরের স্বার্থ সন্ধান ও অধিকারের ঘোর পরিপন্থী ব্যবস্থা সমষ্টি, ইংরাজ আমলদারীর স্বাধীনতার যুগে একদম দুর্ব্বহ হইয়া উঠিতে লাগিল।

সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্মশাস্ত্রের নানা বিধিব্যবস্থা ইংরাজী শিক্ষিত হিন্দুর নিকট নিতান্ত গর্হিত বলিয়া প্রতিপন্ন হইতে লাগিল। একদিকে অভিনব পাশ্চাত্য শিক্ষার উত্তাল তরঙ্গ, অন্যদিকে খৃষ্টান মিশনরীদিগের মর্ম্মান্তিক শ্লেষ—অথচ পণ্ডিতবৃন্দের ও ধর্ম্মশাস্ত্রের ব্যবস্থা দুর্জ্জয় গিরিশ্রেণীর মত তাহাদের মুক্তিমার্গের সমস্ত ফটককে সম্পূর্ণভাবে আটক করিয়া আছে। এতদিন তাহারা সতীদাহ করিত ধর্ম্ম মনে করিয়া, কিন্তু পাশ্চাত্য সভ্যতার কল্যাণে তাহারা বুঝিতে পারিল—এ ধর্ম্ম নয়, ধর্ম্মের নামে একটা জঘন্যতর অমানুষিক বর্ব্বরতা। গঙ্গা সাগরে জীবন্ত সন্তান বিসর্জ্জন দেওয়া, দেবীর সন্তোষলাভের জন্য নরবলিদান, শিশু কন্যার বিবাহকে 'গৌরীদান' ও অবশ্য কর্ত্তব্য শাস্ত্রীয় বিধান মনে করা, বিধবার বিবাহ দেওয়াকে মহা অধর্ম্ম বলিয়া বিশ্বাস করা, নানাপ্রকার পাশব বিবাহকে শাস্ত্রীয় বিধানরূপে মান্য করা, সমুদ্র-যাত্রায় জাত যাওয়া, জাতি বিচার ও বর্ণ-বৈষম্য, মানুষকে—এমন কি স্বধর্ম্মাবলম্বী হিন্দুকে—ধর্ম্মের হিসাবে বংশ পরম্পরাক্রমে চিরস্থায়ী নীচ ও অস্পৃশ্য বলিয়া মনে করা, এবং এই প্রকারের শত সহস্র গলদ শিক্ষিত হিন্দু সমাজের জ্ঞান ও বিবেককে তখন আলোড়িত করিয়া তুলিল। ফলে তাঁহাদের নেতা ও নায়কগণ যখন দেখিলেন যে, প্রচলিত ধর্ম্মশাস্ত্রই হিন্দু সমাজের সকল অনাচার ও সকল মহাপাতকের মূলীভূত কারণ, এবং বর্ত্তমান যুগে এই সমষ্টিকে চালাইয়া লওয়া হিন্দু সমাজের উন্নতির—এমন কি তাহার অস্তিত্বেরও প্রতিকূল, তখন এই সব শাস্ত্রের বিরুদ্ধে তাঁহারা বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়া দিলেন। এই বিদ্রোহ নানা দিকে নানা ভাবে ও নানা রূপে ফুটিয়া উঠিতে লাগিল, শাস্ত্রের প্রতি উপেক্ষা ও অবমাননা প্রদর্শন করা একদল শিক্ষিত হিন্দুর নিকট প্রধান কর্ত্তব্য বলিয়া প্রতীত হইতে লাগিল, এবং সময় সময় ম্লেচ্ছ রাজার সহায়তা গ্রহণ করিয়া তাহারা নূতন নূতন আইনের সহায়তায় ধর্ম্মশাস্ত্রের সংস্কার বা সংহার সাধন করিতে লাগিলেন। এ-চেষ্টা আজও সমান ভাবে চলিয়া আসিতেছে।

হিন্দু সমাজের এই ধর্ম্মবিপ্লবের ইতিহাসে চিন্তাশীল মুছলমানের পক্ষে ভাবিবার ও শিখিবার অনেক আছে। এই ইতিহাসের ভূমিকার সারমর্ম্ম এই যে, প্রচলিত হিন্দু ধর্ম্মশাস্ত্র হিন্দু জাতির মঙ্গল ও মুক্তির প্রতিকূল। এই শাস্ত্রের বচন ও সেই বচনের প্রচলিত ব্যাখ্যা বলবৎ হইয়া থাকিলে নিকট ভবিষ্যতে নানা দিক দিয়া হিন্দুজাতির অস্তিত্ব পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইবার আশঙ্কা। তাহার পর এই শাস্ত্র বর্ত্তমান যুগের নূতন শিক্ষা ও সভ্যতার সঙ্গে মোটেই খাপ খাইতে পারে না। এই প্রকার বিবিধ কারণে হিন্দু নেতাদিগের মধ্যে কেহ ষোল আনা আর কেহ আংশিকভাবে শাস্ত্রকে শাস্ত্ররূপে মান্য করিতে অস্বীকার করিলেন। কেহবা তাহার সময়োপযোগী আখ্যাব্যাখ্যা সঙ্কলনে মনোনিবেশ করিলেন, আর কেহ কেহ ঘোষণা করিলেন—শাস্ত্র মানিনা, কিন্তু শাস্ত্র বচনের **পিছনে** যে সত্য আছে, তাকে খুবই মানি। রাজা রামমোহন রায় হইতে শ্রীযুত অরবিন্দ ঘোষ পর্য্যন্ত সকল নেতা ও সমস্ত সংস্কারকের ইহাই হইতেছে প্রধান সাধনা এবং সমস্ত 'প্রবর্ত্তন' ও 'উদ্বোধনের' ইহাই হইতেছে সার নির্য্যাস।

এই সাধনা অনেক দিক দিয়া নানাভাবে ও বিবিধরূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে—একথা পূর্ব্বেই আরজ করিয়াছি। নূতন ভাবে উদ্বুদ্ধ বাঙ্গালী হিন্দুর পূর্ণ এক শতাব্দীর সাহিত্য এই বিভিন্নমুখী সাধনাকে বহিয়াই সার্থক ও সজীব হইয়া আছে।

বাঙ্গলার মুছলমান সমাজে সাধারণভাবে ইংরাজী শিক্ষার প্রসার ঘটিয়াছে—গত পঁচিশ ত্রিশ বৎসরের মধ্যে। কতকটা মাতৃভাষার স্বাভাবিক আকর্ষণের ফলে, আর কতকটা তখনকার স্কুল কলেজের ব্যবস্থা-বৈগুণ্যের কারণে, মুছলমান শিক্ষার্থী একদিকে বাঙ্গলা ভাষার চর্চ্চা করিতে এবং অন্যদিকে স্বধর্ম্ম সম্বন্ধে অজ্ঞ হইয়া থাকিতে বাধ্য হইয়া পড়িল। তখন বাঙ্গলা সাহিত্যে মুছলমানের জানিবার বা শিখিবার কিছুই ছিল না, (এখনই বা বিশেষ কি

আছে ? ) হিন্দু লেখকগণের গরল-মাখান কাব্য উপন্যাস হজম করাও মুছলমানের পক্ষে সম্ভবপর হইল না। কাজেই, চিন্তাশীল ও মেধাবী যুবকেরা হিন্দু সমাজের ধর্ম্ম-বিপ্লবের সাহিত্যকে নিজেদের অবলম্বন রূপে বাছিয়া লইল এবং সেখানে তাহারা আপনাদিগকে অপেক্ষাকৃত নিরুপদ্রুত বলিয়া মনে করিতে লাগিল।

একদিকে তাহারা নিজেদের ধর্ম্ম সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ, অন্যদিকে বাঙ্গলা ও ইংরাজীতে তাহারা ক্রমাগত পড়িয়া আসিয়াছে, ভারত ও ইউরোপের ধর্ম্মবিপ্লবের উত্তেজনাকর ইতিহাস। তাহার উপর এই সময় সোণায় সোহাগা করিয়া দিতে লাগিলেন—মোছলেম-বঙ্গের কুসংস্কার-জর্জ্জরিত অদূরদর্শী ও জাহের পরস্ত মৌলবী সমাজ। তাঁহারা এই সময় এছলামের যে স্বরূপ প্রকাশ করিতে লাগিলেন, তাহা দেখিয়া স্বধর্ম্মজ্ঞ শিক্ষিত যুবকগণ লজ্জায় মাথা হেঁট করিয়া লইল, ঘৃণায় নাসিকা কুঞ্চিত করিতে লাগিল। তখন আরম্ভ হইল—এ পক্ষের কথার বহর আর ফৎওয়ার শাসন। স্থান-কাল-পাত্র বিবেচনা করিয়া কথা বলা তাঁহারা ত এক প্রকার জানেনই না, তাহার উপর জমাট বাঁধা তক্‌লিদ (১) এবং সম্পূর্ণ অনৈছলামিক বোজর্গানে দিন-পূজায় বা সেই পূজার বাহানায় স্বর্গের শাশ্বত বাণী পবিত্র কালামুল্লার আর হজরত রছুলে করিমের প্রচারিত মূল ধর্ম্মশাস্ত্র হইতে তথা প্রকৃত এছলাম হইতে এই আলেম সমাজ নিজেরাই দূরে সরিয়া পড়িয়াছিলেন। সুতরাং এই শ্রেণীর কাটমোল্লা ও আকাট পণ্ডিতের মধ্যে তখন একটা তুমুল সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়া গেল, এবং একদিকে যেমন আকাট পণ্ডিতের প্রত্যেক কথাকে "নউজু বিল্লা—কুফরী কালাম—বিবি তালাক" ইত্যাদি যুক্তিপ্রমাণের দ্বারা কাটমোল্লার দল "হাবাআম্-মনছুরা" করিয়া উড়াইয়া দিতে চাহিলেন, অন্যদিকে ইউরোপের ও হিন্দুসমাজের অনুকরণ মাত্রকে সম্বল করিয়া আকাট পণ্ডিতের দল কাটমোল্লার কুসংস্কারের সঙ্গে সঙ্গে তাহার ধর্ম্মানুষ্ঠান প্রভৃতির বিরুদ্ধেও যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া দিলেন। অথচ এই উভয় দলই পরের অনুকরণে অন্ধ—এছলামের প্রকৃত স্বরূপ কাটমোল্লার নিজের দেখিবার ও দেখাইবার শক্তি ছিল না, আকাট পণ্ডিত ও তাহার সন্ধান করিয়া দেখার কোনও আবশ্যকতা অনুভব না করিয়া—যেহেতু মোল্লারা তাহার সমর্থন ও সাহেব লোকেরা তাহার প্রতিবাদ করিতেছে—চোখ বন্ধ করিয়া হিন্দুদের অবলম্বিত ভাষা ও পরিভাষাগুলির গলাধঃকরণ উদ্গারণ ও চর্ব্বিত চর্ব্বণ আরম্ভ করিয়া দিলেন। তাঁহারা এতটুকু কথা চিন্তা করিয়া দেখার অবকাশ পাইলেন না যে, খৃষ্টান বা হিন্দুধর্ম্ম সভ্যতা ও উন্নতির আলোক সহ্য করিতে পারে নাই বলিয়া এছলামও যে পারিবে না, তাহার কোন মানে নাই। তাহাদের দেখা ও দেখান উচিত ছিল যে, এছলামের অমুক বিশ্বাস বা অমুক অনুষ্ঠান মানুষের উন্নতির বা বর্ত্তমান সভ্যতার পরিপন্থী। তাহা তাঁহারা করেন নাই—এবং করিতে পারিবেনও না।

পক্ষান্তরে এক্ষেত্রে আলেম সমাজের যাহা কর্ত্তব্য ছিল, তাহাও তাঁহারা পালন করেন নাই—করিতে পারেন নাই। সুখের বিষয়, আজ কাল একটু একটু সুলক্ষণ দেখা দিতে আরম্ভ হইয়াছে, এবং আমরা আশা করিতে পারি যে, কাটমোল্লা ও আকাট পণ্ডিতদিগের মূঢ়তার কোন্দল কোলাহল হইতে মুক্ত হইয়া সত্যসনাতন এছলামের প্রকৃত স্বরূপকে দর্শন ও গ্রহণ করা সত্যান্বেষী সাধকের পক্ষে এখন সহজসাধ্য হইয়া উঠিবে।

বাঙ্গালী মুছলমানের একটা বিশেষত্ব এই যে, তাহার ভাবিয়া শিখিবার এবং দেখিয়া শিখিবার যোগ্যতার পরিচয় প্রায়ই পাওয়া যায় না, অনেক সময় কার্য্যক্ষেত্রে দেখা যায় যে, ঠেকিয়া শিখিবার যোগ্যতাও তাহার লোপ পাইয়াছে। হিন্দু-বঙ্গের অতীত যুগের তামাদী আন্দোলনের অনুকরণে যাঁহারা সেই পুরাতন ভাব ভাষা ও যুক্তি প্রমাণ লইয়া মুছলমান সমাজের সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছেন—তাঁহারাও আমাদের এই দাবীর স্পষ্ট প্রমাণ। হিন্দুরা কবে কি করিয়া-ছিলেন—তাহার অনুকরণ করিতে তাঁহারা ব্যতিব্যস্ত। কিন্তু তাঁহারা এই প্রসঙ্গে একেবারে ভুলিয়া যান যে, হিন্দু সমাজের ধর্ম্ম-বিপ্লবের সে যুগ অতিবাহিত হইয়া

---

(১) যাহারা নিজদিগকে গাএর মোকাল্লেদ বলিয়া আস্ফালন করিয়া থাকেন, প্রকৃত পক্ষে জমাত হিসাবে আমি তাঁহাদিগকেও ঘোর মোকাল্লেদ বলিয়াই বিশ্বাস করি

গিয়াছে। এখন শিক্ষিত হিন্দু মাত্রই স্বধর্ম্মে আস্থাবান, হিন্দুধর্ম্মের নিকৃষ্ট শ্রেণীর পৌত্তালিকতার সমর্থনের জন্যও বড় বড় দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক হিন্দু যুক্তি প্রমাণ প্রদর্শনে কুণ্ঠিত হইতেছেন না। চিত্তরঞ্জন দাশ, বিপিনচন্দ্র পাল, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ মনীষীরা শাল গ্রাম শিলা, গণেশের মূর্ত্তি, বৈষ্ণব ধর্ম্ম এমন কি প্রচলিত সাধারণ হিন্দু ধর্ম্মে পূরাদস্তর ভক্তিশ্রদ্ধা ও তন্ময়তা প্রকাশ পূর্ব্বক আনন্দলাভ করিতেছেন।

দার্শনিকতা ও বৈজ্ঞানিকতার প্রথম উচ্ছ্বাসে, জড়বাদী পাশ্চাত্য সভ্যতার বিকৃত শিক্ষার নূতন উন্মাদনার ফলে, হিন্দু সমাজে কিছুদিনের জন্য একটা বিপ্লবের বাণ ডাকিয়াছিল। কিন্তু আত্মজ্ঞানের উদয়ে এবং পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রকৃত স্বরূপ নির্দ্ধারণে সমর্থ হওয়ার ফলে হিন্দু সমাজ মোড় ফিরিয়াছে অনেক দিন। তত্রাচ হিন্দু বিপ্লববাদীদিগের এই অন্ধ অনুকারীর দল বর্ত্তমানকে উপেক্ষা করিয়া তাহাদের সেই বারিত পরিত্যক্ত অতীতের বাঁধা বুলি গুলি যেমন আওড়াইয়াই চলিয়াছেন!

ইংরাজী শিক্ষায় তথা পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞান, এবং বিভিন্নমুখী শিক্ষা ও সভ্যতার আলোচনায় এই মুছলমানগণ হিন্দুদের তুলনায় যে নিতান্ত নগণ্য, তাহা বোধ হয় কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না। এখন মজা দেখুন, কলিকাতার হিন্দু ছাত্রেরা ব্রাহ্ম কলেজে সরস্বতী পূজা করার জন্য যখন হিন্দু বাঙ্গলার আকাশ পাতাল তুমুল আন্দোলনে মুখরিত করিয়া তুলিয়াছে—ঠিক সেই সময় ঢাকার ন্যায় একটা মুছলমান প্রধান শহরে, জোর করিয়া প্রকাশ্যভাবে রমজানের ন্যায় এছলামের একটা পবিত্র সাধনাকে অবমানিত করার একমাত্র উদ্দেশ্যে সেখানকার কএকজন শিক্ষিত এবং মুছলমান নামধারী ছাত্র ও অধ্যাপক আদালতের আশ্রয় লইতেও কুণ্ঠিত হইতেছে না। দুই আদর্শে কত তফাত!



Printed and Published by Md. Khairul Anam Khan from the "Mohammadi Press,"
29, Upper Circular Road, Calcutta.

মাসিক মোহাম্মদী

প্রথম বর্ষ ‖ বৈশাখ ১৩৩৫ সাল। ‖ ৭ম সংখ্যা

# নব পর্য্যায় না নব পর্য্যায়

[ মোহাম্মদ আকরম খাঁ ]

( ৪ )

নব পর্য্যায়ের সম্মোহিত মুছলমান লেখক গম্ভীর কণ্ঠে ঘোষণা করিতেছেন :—"বাস্তবিক মহাপুরুষ যে সর্ব্বজ্ঞ নন, মানুষের সর্ব্বময় প্রভু নন, মানুষের জীবন সংগ্রামে তিনি এক জন বড় বন্ধু মাত্র—অবশ্য **যেমন বন্ধু সমুদ্রচারী পোতের জন্য আলোক স্তম্ভ।**"

কাজী ছাহেব এছলামী শাস্ত্রবচনের পাল্লা হইতে যে বহুদূরে সরিয়া গিয়াছেন, এ কথা তিনি বাঙ্গালী মুছলমানকে গৌরবের সহিত জানাইয়া দিয়াছেন। তাঁহার আলোচনার ভঙ্গিমা দেখিয়া মনে হয়, বাস্তবিকই কথাটা খুবই ঠিক। অন্যথায় মহাপুরুষ সর্ব্বজ্ঞ বা মানুষের সর্ব্বময় প্রভু নহেন—এ উপদেশ লইয়া মুছলমানের সম্মুখে উপস্থিত হইতে নিশ্চয়ই তিনি একটু কুণ্ঠা বোধ করিতেন। কাজী ছাহেব মহাপুরুষের **সর্ব্বময়** প্রভুত্ব অস্বীকার করিতেছেন, কিন্তু এছলাম তাঁহার কোনও প্রকারের আংশিক প্রভুত্বও স্বীকার করেনা। এছলামের প্রথম ও চরম কথা হইতেছে—লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ, অর্থাৎ আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোনও প্রভু নাই। ফলে এই কলেমায় তাওহীদে বা এছলামের বীজমন্ত্রে গাইরুল্লার প্রভুত্বমাত্রকেই আদৌ অস্বীকার করা হইয়াছে, এবং পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে ইহাই হইতেছে এছলামের প্রথম ও পরম কথা।

শাস্ত্র ও তৎসংশ্লিষ্ট বস্তু ও ব্যক্তিগুলিকে অতটা ঘৃণা বা আতঙ্কের চোখে না দেখিলে কাজী ছাহেব সহজেই জানিতে পারিতেন যে, মানুষের সর্ব্বজ্ঞতাও এছলাম কোন দিন স্বীকার করে নাই। এছলাম সর্ব্বজ্ঞ বলিয়া বিশ্বাস করে—একমাত্র সর্ব্বশক্তিমান আল্লাহকে। কারণ, সর্ব্বজ্ঞতা হইতেছে আল্লার গুণ صفت বা attribute, এবং সৃষ্টির ক্ষুদ্র বৃহৎ কোনও বস্তু বা ব্যক্তি যে আল্লার কোন গুণেরও একবিন্দু বিসর্গ অংশী হইতে পারে না, কোরআন ও হাদিছ বজ্রমন্দ্রে এই সত্যকে প্রচার করিয়াছে শেরক-কলুষিত বিশ্বের কেন্দ্রে কেন্দ্রে; আল্লার কালাম ও তাঁহার রছুলের বাণী এই সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে দুনয়ার সকল কুফর-স্থানের রন্ধ্রে রন্ধ্রে।

মুছলমান মাত্রই কোরআনে পড়িয়া থাকে :—

انما الغيب لله

একমাত্র আল্লাহ ব্যতীত আর কেহই সর্ব্বজ্ঞ নহে, (ইউনছ)। অন্যত্র বলা হইতেছে :—

لا يعلم من فى السموات و الارض الغيب الا الله

অর্থাৎ :—স্বর্গে ও মর্ত্তে একমাত্র আল্লাহ ব্যতীত আর কেহই সর্ব্বজ্ঞ নহে, (নমল)। ছুরা আনআমে আদেশ হইতেছে :—

হে মোহাম্মদ! বলিয়া দাও,—আমি যে দৈব ভাণ্ডারের অধিকারী, এরূপ কথা বলিতেছি না। না, আমি সর্ব্বজ্ঞ নহি। ইহাও বলিতেছি না যে পার্থিব হিসাবে আমি কোন রাজশক্তির অধিকারী। না, এসব কিছুই নহে। আমি ত একমাত্র সেই ভাববাণীর অনুসরণ করিয়া থাকি, সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বশক্তিমান আল্লার হুজুর হইতে যাহা আমার নিকট প্রেরিত হইয়া থাকে। (ভাবার্থ)।

অন্যত্র স্পষ্ট করিয়া বলা হইতেছে : —

আমার নিজের আত্মারই কোন ইষ্ট বা অনিষ্টের মালিক আমি নহি, আল্লাহ যাহা ইচ্ছা করেন, তাহাই হয়, আমার ইচ্ছার কোনও দখল তাহাতে নাই। আর দেখ, আমি যদি সর্ব্বজ্ঞ হইতাম, তাহা হইলে ত অশেষ মঙ্গলের অধিকারী হইয়া যাইতে পারিতাম, পক্ষান্তরে কোন অমঙ্গলই তাহা হইলে আমাকে স্পর্শ করিতে পারিত না। আমি ত বিশ্বাসী সমাজের জন্য পাপের পরিণাম এবং পুণ্যের পুরস্কার সম্বন্ধে সতর্ককারী ও সুসংবাদ বাহক মাত্র। (আ'রাফ, ভাবার্থ)।

কোরআনের সর্ব্বত্রই এই মর্ম্মের এক একটা আয়ত দেখিতে পাওয়া যায়। আশা করি, ন্যায়নিষ্ঠ পাঠকগণের জন্য ইহাই যথেষ্ট হইবে।

মহাপুরুষ সর্ব্বজ্ঞ নহেন, মানুষের সর্ব্বময় প্রভু নহেন—এ কথাগুলি প্রচার করার জন্য কাজী ছাহেব যে কেন এত কষ্ট স্বীকার করিয়াছেন, গত সংখ্যায় তাহা নিবেদন করিয়াছি। প্রকৃত পক্ষে কাজী ছাহেব কোরআনকে হজরত রছুলে করিমের রচনা বলিয়া প্রতিপাদন করিয়া এছলামের মূল শিকড়টা কাটিয়া দিতে চান। কিন্তু হঠাৎ স্পষ্ট করিয়া এরূপ কথা বলিয়া ফেলিলে উদ্দেশ্যের দিক দিয়া নানা অসুবিধার সম্মুখীন হইতে হয়, তাই এই শনৈঃ কন্থা শনৈঃ পন্থার বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থা। উপরে ছুরা আনআমের আয়তে এছলাম-বৈরীদিগের মনের এই গোপন রোগটী কেমন স্পষ্ট করিয়া ধরিয়া দিয়াছে, পাঠকগণ একবার তাহা আলোচনা করিয়া দেখুন।

এই আয়তে হজরতের মুখ দিয়া ঘোষণা করা হইতেছে যে, আধিদৈবিক বা আধিভৌতিক কোন বিশেষ শক্তি সামর্থ্যের অধিকারী আমি নহি। ভাবিয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যাইবে যে, মানুষ দুনয়াতে নরপূজার সূচনা করিয়াছে, কেবল এই শক্তি দুইটার দোহাই দিয়া। একদল বলিতেছে—আমরা রাজা, সুতরাং তোমাদের প্রভু, সুতরাং আমাদের দাসত্ব স্বীকার করাই তোমাদের ধর্ম্ম। আর এক দলের নামকরণে বলা হইতেছে যে, অমুক ভগবান, অমুক অবতার অমুক ঈশ্বরের এক তৃতীয়াংশ, অমুক তাহার একজাত ও ঔরষজাত পুত্র। এ দলেরা মানবের এই অতিমানবতার দোহাই দিয়া কোটি কোটি আল্লার বান্দাকে সাক্ষাৎভাবে নরপূজা করিতে বাধ্য করিতেছে। এই আয়তের ভাষায় হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা বিশ্ববাসীকে স্পষ্ট কণ্ঠে জানাইয়া দিতেছেন যে, আমি রাজাও নহি, অতিমানবও নহি, এবং সে হিসাবে আমার "ব্যক্তিগত কথা" বা আমার ব্যক্তিগত চিন্তাধারার নিকট কাহাকেও আমি আত্মসমর্পণ করিতে বলিতেছি না। আমি প্রকৃতপক্ষে মানুষকে অবনমিত হইতে বলিতেছে—তাহার সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বময় এবং করুণানিধান ও সর্ব্বশক্তিমান এক অদ্বিতীয় প্রভুর সন্নিধানে, তাঁহার বাণীকে শ্রবণ করিয়া গ্রহণ করিয়া। এই বাণী প্রত্যক্ষভাবে ও অবিকৃতরূপে সেই মঙ্গলময় ও সর্ব্বশক্তিমান প্রভুর নিজ হুজুর হইতে আমার নিকট প্রেরিত হইয়াছে। সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বময় প্রভুর স্পষ্ট আদেশ—বনি-আদম এই বাণীকে স্বীকার করিয়া মান্য করিয়া চলুক, এবং তাহাদের ইহ পরকালের সমস্ত মঙ্গল ও মুক্তি ইহারই উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করিতেছে।

প্রকৃতপক্ষে মুছলমানে অমুছলমানে আসল বাদ বিতণ্ডার সূচনা হইতেছে এখানে আসিয়া। মক্কার কোরেশ দলপতিগণের সময় হইতে আরম্ভ করিয়া বর্ত্তমানের আর্য্য, ব্রাহ্ম ও খৃষ্টান মিশনরীগণের সময় পর্য্যন্ত এছলামের পরিপন্থী সমাজ হজরতের এই নবুয়ত বা প্রেরিতত্বের দাবীকে অস্বীকার করিয়া আসিতেছেন। ইঁহাদের মধ্যকার একদল আদৌ মানুষের নবুয়ত প্রাপ্তির কথা স্বীকার করেন না। তাঁহারা বলেন—মানুষের নিকট আল্লার কোন প্রত্যক্ষ বাণী সমাগত হইতে পারে না। সুতরাং কোরআন যে আল্লার বাণী, এ কথা আদৌ সঙ্গত নহে। অন্য দলের পণ্ডিতেরা

ইহার সঙ্গতি বা সম্ভবপরতা সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন করেন না, কারণ তাঁহাদের অবলম্বিত ধর্ম্মবিশ্বাস সম্বন্ধে ইহা অপেক্ষা অনেক গুরুতর প্রশ্নের সম্মুখীন তাঁহাদিগকে হইতে হয়। মানুষ ঈশ্বর ও অবতার হইতে পারে, বেদ ও বাইবেল সাক্ষাৎভাবে ভগবৎ-বাণী ও ঈশ্বর নিশ্বসিত বাক্য হইতে পারে, কিন্তু সেই মানুষ আল্লার রছুল হইতে পারে না—কোরআন আল্লার কালাম হইতে পারে না,—একই নিশ্বাসে এই প্রকার পরস্পর বিপরীত উদ্ভট সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিলে মানুষ সমাজে হাস্যাস্পদ হইতে হয়।

এই সকল কারণে উভয় দলের মিশনরী পণ্ডিতেরা হজরতের জীবন চরিত আলোচনা করার জন্য ব্যগ্র হইয়া পড়েন, এবং তাহার সহায়তায় হজরতকে তাঁহারা ভণ্ড, ভ্রান্ত, নীচ অভিসন্ধি পরায়ণ, মানসিক বিকারগ্রস্ত অসৎ অসাধু চরিত্রের লোক বলিয়া প্রতিপন্ন করার জন্য নিজেদের মনীষা ও ধনভাণ্ডারের প্রচুর অপব্যয় করিতে একটুও দ্বিধা বা কুণ্ঠা বোধ করেন নাই।

অধিক চতুর পাশ্চাত্য লেখকেরা এ সম্বন্ধে এখন একটা নূতন বৈজ্ঞানিক প্রণালীর আবিষ্কার করিয়াছেন। নিন্দা করার সফল সার্থক ও আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রণালী এই যে যাহারা নিন্দাবাদ করা ও যে ব্যক্তির মূল সাধনাকে পণ্ড করিয়া দেওয়া উদ্দেশ্য হইবে, বাহিরের বিষয়গুলি সম্বন্ধে প্রকাশ্যভাবে তাহার জোর গুণগান করিয়া যাইতে হইবে। ষড়যন্ত্রমূলক কোন নীচ অভিসন্ধি যে তাঁহার অন্তরে কখনও স্থানলাভ করিতে পারে নাই, বস্তুতঃ আত্মসত্যের একটা সুগভীর ও সুদৃঢ় বিশ্বাস লইয়া, এক মহৎ উদ্দেশ্যে অনুপ্রাণিত হইয়াই যে, তাঁহার জীবন নানা মহিমায় উজ্জ্বল ও নানা শক্তি-মাহাত্ম্যে প্রকট হইয়া উঠিয়াছিল, এ সব কথা খুব শ্রবণ মধুর ও ভাবপ্রবণ ভাষায় ব্যক্ত করিয়া নিজের মনের নিরপেক্ষতা, সত্যানুরাগ প্রভৃতির প্রভাব পাঠক সমাজের মনের উপর ভাল করিয়া জমাইয়া লইতে হইবে, এবং তাহার পর পাঠক সাধারণের এই বিশ্বাসের দ্বারা অতি নিপুণতার সহিত নিজের আসল উদ্দেশ্যটা সফল করিয়া লইতে হইবে। বলিতে হইবে—সদুদ্দেশ্য প্রণোদিত হইয়া হজরত মোহাম্মদ যে সকল ছোট বড় ভুল ভ্রান্তি করিয়াছেন—সেজন্য তাঁহার প্রতি কোনও প্রকার দোষারোপ করা আদৌ সঙ্গত নহে, বরং এই ভুল ভ্রান্তির মধ্য দিয়া তাঁহার জীবনটা আরও মধুর এবং আরও উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে।

ঢাকার অধ্যাপক যুগলও ঠিক এইভাবে কথা কহিতে আরম্ভ করিয়াছেন। কেন করিয়াছেন, পূর্ব্বে তাহা বিশদভাবে প্রদর্শন করিয়াছি। এই প্রসঙ্গে আমাদের নিবেদন এই যে, এক সঙ্গে দুইটী বিপরীত অভিমতকে রক্ষা করিয়া বিচারে প্রবৃত্ত হওয়া সম্ভবও নহে, সঙ্গতও নহে। হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা স্পষ্টকণ্ঠে ও অনাবিল ভাষায় কোরআনকে সম্পূর্ণভাবে আল্লার প্রত্যক্ষ বাণী বলিয়া ঘোষণা করিতেছেন, নিজকে সেই বাণীর বাহক বলিয়া প্রচার করিতেছেন, এবং বিশ্বমানবকে তাহা গ্রহণ করার জন্য আকুল হৃদয়ে আহ্বান করিতেছেন। কতকগুলি কাজ ও কথাকে তিনি নিজের ব্যক্তিগত কাজ ও কথা বলিয়া বাছিয়া দিতেছেন, আর সঙ্গে সঙ্গে বলিয়া দিতেছেন যে এগুলি আমার নিজস্ব চিন্তা ও অনুমানের ফল। এ সব বিষয় মান্য করা বা না করা তোমাদের ইচ্ছাধীন। অধিকন্তু এই সকল বিষয়ে তোমাদের ন্যায় আমারও বিচার-বিভ্রম সংঘটিত হইতে পারে। পক্ষান্তরে অন্য বিষয়গুলি সম্বন্ধে তিনি স্পষ্ট ও দৃঢ়কণ্ঠে ঘোষণা করিতেছেন যে, এগুলি হইতেছে সাক্ষাৎভাবে আল্লার বাণী—তাঁহার প্রদত্ত আদেশ নিষেধ, আমার মারফতে এগুলি তোমাদিগের নিকট প্রেরিত হইয়াছে মাত্র। আমার ইচ্ছা, আমার সঙ্কল্প, আমার চিন্তা বা আমার কাজের বিন্দুবিসর্গ দখল তাহার মধ্যে নাই। পক্ষান্তরে কোরআনের অহি এবং কোরআন ব্যতীত অন্যান্য অহিকেও আবার যথাক্রমে বিভাগ করিয়া দেওয়াও হইতেছে।

মুছলমানেরা হজরতকে সত্যবাদী ভ্রম-প্রমাদশূন্য এবং সর্ব্বতোভাবে বিশ্বাস্য বলিয়া একিন করে, এবং এই জন্য তাহারা কোরআনকে আল্লার কালাম বলিয়া গ্রহণ করিয়া তাহার নিয়ন্ত্রিত গতিপথকে আল্লার নির্দ্ধারিত মুক্তিমার্গ বলিয়া মনে প্রাণে গভীর বিশ্বাস পোষণ করিয়া থাকে। যাঁহারা হজরত মোহাম্মদকে নবী রছুল বা আল্লার প্রেরিতরূপে এবং তাঁহার প্রমুখাৎ প্রচারিত কোরআনকে আল্লার কালাম বলিয়া গ্রহণ করিতে প্রস্তুত নহেন, তাঁহাদিগকে বলিতে হইবে যে, "মোহাম্মদ হয় ঘোর প্রবঞ্চক, না হয় মহা ভ্রান্ত।" তাঁহার রেছালত বা "প্রেরিতত্বের" দাবী

প্রবঞ্চনা হইলে তাঁহার জীবনটা বিশ্বমানবের ঘোর অনিষ্ট জনক একটা জঘন্য প্রবঞ্চণা ব্যতীত আর কিছুই নহে। পক্ষান্তরে তাঁহাকে নিজের রছুল হওয়ার বা কোরআন পাওয়ার দাবীতে ভ্রান্ত বলিয়া গ্রহণ করিলে বলিতে হইবে যে, একটা তীব্র অদ্ভূত ভীষণ ও জীবনব্যাপী জ্ঞান-বিভ্রম এবং মানসিক বিকারের বাহ্য বিকাশের নাম—মোহাম্মদ! ইহার মধ্যে তৃতীয় মতের আদৌ কোন স্থান নাই।

যদি কেহ এই দুইটীর মধ্যকার কোন একমত পোষণ করেন, তাহা হইলে তিনি স্বচ্ছন্দে নিজমত স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করুন, নিজের মতের অনুকূল ঐতিহাসিক ও দার্শনিক যুক্তি প্রমাণ সাধারণ্যে উপস্থাপিত করুন, এবং "হজরত মোহাম্মদের অনুবর্ত্তী"দিগকে নিজেদের মত প্রকাশের ও প্রতিকূল প্রমাণাদি খণ্ডনের সুযোগ প্রদান করুন! তাহার পর শিক্ষিত মুছলমান সমাজ নিজ নিজ জ্ঞান বিবেক অনুসারে উভয় পক্ষের যুক্তি প্রমাণের বিচার করিয়া আপন আপন কর্ত্তব্য স্থির করিয়া লউক—যেন

لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ

স্পষ্ট প্রমাণের বিচারে যাহার ধ্বংস হওয়া উচিত,—তাহা বিধ্বস্ত হইয়া যাউক, পক্ষান্তরে স্পষ্টপ্রমাণের বিচারে যাহার বাঁচিয়া থাকার বিধান—তাহা বাঁচিয়া থাকুক!— (আন্‌ফাল—৪২)।

কাজী ছাহেবের যে বাণী আমরা এই প্রবন্ধের প্রথম ভাগে উদ্ধৃত করিয়াছি, পাঠকগণকে তাহা আর একবার মনোযোগ সহকারে পাঠ করিয়া দেখিতে অনুরোধ করিতেছি। কারণ, তাহা হইলে তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন যে, হজরতের একমাত্র সাধনার বিরুদ্ধে সংগ্রাম ঘোষণা করিলেও, কাজী ছাহেবের মুখ দিয়া তাঁহার অনিচ্ছা সত্ত্বেও সত্য কেমন উজ্জ্বলরূপে আত্ম-প্রকাশ করিয়াছে। বস্তুতঃ ইহা হজরত রছুলে করিম ছাল্লাল্লাহো আলায়হে অ-ছল্লমের একটা জীবন্ত মো'জেজা। তিনি কেমন সুন্দর ভাবে বলিয়া দিতেছেন:—

মানুষের জীবন সংগ্রামে তিনি (হজরত) একজন বড় বন্ধু মাত্র—অবশ্য যেমন বন্ধু **সমুদ্রচারী পোতের জন্য আলোক স্তম্ভ!**

এই উপমায় উপমান ও উপমেয়ের সাদৃশ্যটা একটু বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে পাঠকগণ আমাদের দাবীর সত্যতা স্বীকার করিবেন বলিয়া আশা করি।

অকূল সমুদ্রের মধ্য দিয়া একখানা জাহাজ ছুটিয়াছে—অবিরাম গতিতে নিজের অভীষ্ট লক্ষ্যের দিকে। জাহাজে নাবিক আছে, কল কব্জা আছে, দিক্‌দর্শনযন্ত্র আছে। কিন্তু তবু তাহার দরকার হইতেছে একটী বড় বন্ধুর—আলোকস্তম্ভের।

কেন?

কেননা জাহাজের পক্ষে তাহার এই গতিপথে এমন সব গুরুতর ও মারাত্মক বিপদ আপদ বিদ্যমান আছে, যাহার কোন একটীর সাক্ষাতে বা সংঘাতে জাহাজ বিপন্ন, লক্ষ্যভ্রষ্ট ও ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়া যাইতে পারে। জাহাজের এই গতিপথে কত প্রতিকূল স্রোত ধারা আছে, কত চোরা বালির গুপ্ত চূড়া আছে, কত অচল-চূড়া সাগর-সলিলে আত্মগোপন করিয়া আছে। পক্ষান্তরে ঝড় ঝঞ্ঝার আশঙ্কা সব সময় লাগিয়া আছে, মেঘাচ্ছন্ন রজনীর বিশ্বগ্রাসী অন্ধকার, আর কুয়াশা কুজ্ঝটিকায় সমাচ্ছন্ন দিবসের দিগন্ত প্রসারী জোলোমতি জাহাজকে দিশাহারা লক্ষ্যহারা করার প্রচেষ্টাও অনেক সময় করিয়া থাকে। তাই এই শ্রেণীর আপদ বিপদে জাহাজকে রক্ষা করার এবং লক্ষ্যের পানে তাহার গতিপথকে সুনিয়ন্ত্রিত করিয়া দিবার জন্য নাবিকের পক্ষে দরকার হয়—আলোকস্তম্ভের। আলোকস্তম্ভ মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়াইয়া আছে, আর কোটি কান্দিলের দূর-দূরান্তর প্রসারী উজ্জ্বল জ্যোতি প্রবাহের দ্বারা দিশাহারা নাবিককে বলিয়া দিতেছে—এই উত্তর এই দক্ষিণ, এই পূর্ব্ব এই পশ্চিম। ঐ দিকে তোমার লক্ষ্য, এই দিকে তোমার গতিপথ। সাবধান, আলোকের এ ইঙ্গিতের ব্যতিক্রম করিও না—আলোকস্তম্ভকে অমান্য করিয়া লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার পরিবর্ত্তে সাগর গর্ভে সমাধি রচনার আয়োজন করিও না। শোন, শোন, নাবিক! তোমার সম্মুখে এক সর্ব্বনাশী ঘূর্ণিপাক—জাহাজের মুখ ফিরাইয়া ধর। তোমার বামে ভীষণ পর্ব্বত-চূড়া দুই হাত পানির তলে আত্মগোপন করিয়া আছে, প্রতিকূল স্রোত ধারা তাহার সহিত সংঘাত

ঘটাইবার জন্য প্রবলবেগে তোমার জাহাজকে সেই দিকে টানিয়া লইয়া চলিতেছে। এ দিকে আসিও না, ওদিকে যাইও না, অমুক পথ ছাড়িও না, আলোকস্তম্ভ নাবিককে কেবল এই শ্রেণীর উপদেশ দিতে থাকে।

এখন কোন অতি বুদ্ধি নাবিক যদি বলে—আলোকস্তম্ভ যে একটা খুব ভাল জিনিষ, নাবিকের একটা "বড় বন্ধু" তাহা আমি শতমুখে ও উচ্চকণ্ঠে স্বীকার করিতে প্রস্তুত আছি—কিন্তু তাই বলিয়া তাহার নির্দ্দেশ তাহার নির্দ্ধারণ আমার জাহাজের গতিপথকে **চিরকালের** জন্য নিয়ন্ত্রিত করিয়া দিয়াছে, এ কথা স্বীকার করিলে আমার লক্ষ্যের চাইতে আলোকস্তম্ভটাকেই যে বড় বলা হয়, আমার জাহাজের কল কব্জা ও যন্ত্রপাতি এবং আমার অগাধ নৌবিদ্যাকে যে "চরম অপমানে অপমানিত করা হয়"—তাহা হইলে কাজী ছাহেবের ন্যায় দার্শনিক ব্যক্তিরাত সর্ব্বপ্রথমে তাঁহাকে উন্মত্ত বা বাতুল বলিয়া নির্দ্ধারণ করিবেন। আলোকস্তম্ভের মহিমা শতমুখে স্বীকার করি বলিয়া নাবিক প্রথমে যে অভিমত প্রকাশ করিয়াছিল—তাহাকে তাহারা হয় পাগলের প্রলাপ, না হয় কাপুরুষের কপটোক্তি বলিয়া নিশ্চয়ই নির্দ্ধারণ করিবেন। তাঁহারা বলিবেন—যে নাবিকের সামান্য এতটুকু জ্ঞান বুদ্ধি আছে, আর যে বাস্তবিকই আলোকস্তম্ভকে আলোকস্তম্ভ বলিয়া স্বীকার করে, সে তাহার নির্দ্দেশকে কখনই অস্বীকার ও অমান্য করিতে পারে না।

মুছলমানেরা হজরতের সম্বন্ধে কি ধারণা পোষণ করিয়া থাকে, কোরআনের ভাষায় তাহা শ্রবণ করুণ! আল্লাহ বলিতেছেন :-

يايها النبى انا ارسلنك شاهدا ومبشرا
و نذيرا وداعيا الى الله باذنه و سراجا منيرا ـ

"হে নবি! আমি তোমাকে নিশ্চয় সুসংবাদের বাহক রূপে, সতর্ককারী রূপে, আল্লার অনুমতিক্রমে তাহার পানে আহ্বানকারী রূপে **এবং দীপক প্রদীপরূপে** প্রেরণ করিয়াছি। (আহজাব)

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, কাজী ছাহেবের বর্ণিত আলোকস্তম্ভে আর কোরআনের উল্লিখিত দীপক প্রদীপে কোনই প্রভেদ নাই। কোরআন এখানে ও অন্যান্য বহু স্থলে খুব স্পষ্ট করিয়া বলিয়া দিতেছে যে, এই আলোকস্তম্ভই পরম পথের যাত্রীর চরম লক্ষ্য নহে। বরং তাহার মূল উদ্দেশ্য ও চরম সার্থকতা হইতেছে—ছেরাতুল-মোস্তাকিম বা সরল সহজ সোজা ও নিরাপদ পথকে নিজের জ্যোতি-প্রবাহের দ্বারা স্পষ্ট ও উজ্জ্বলরূপে উদ্ভাষিত করিয়া তোলা, আর বিভিন্ন প্রকারের আপদ বিপদের সংশ্রব সংঘাত হইতে রক্ষা করিয়া পথিক বা ছালেককে তাহার মুরাদ বা চরম কাম্যের সান্নিধ্যে উপনীত হইতে সমর্থ করিয়া দেওয়া।

মানুষ ভবসাগরে নিজের জীবন-তরী ভাসাইয়া দিয়াছে এবং তাহার লক্ষ্য হইতেছেন—আল্লাহ। মানুষের কাছে জ্ঞান আছে, বিবেক আছে, বিচার শক্তি আছে, সব স্বীকার করি। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বিবেকের বিকার, জ্ঞানের বিভ্রম, মায়া মোহের অন্ধকার, প্রবৃত্তির প্রতিকূল স্রোতধারা, জ্ঞানের ছদ্মবেশে অজ্ঞানের প্রবঞ্চণা, কত কুয়াশা কত অন্ধকার, কত আপদ কত বিপদ অহর্নিশি তাহাকে মরণের পথে টানিয়া লওয়ার চেষ্টা করিতেছে, কত প্রকারে তাহাকে দিশাহারা ও লক্ষ্য ভ্রষ্ট করার প্রয়াস পাইতেছে। এ অবস্থায় লক্ষ্যকে মানুষের সম্মুখে দীপ্ত ও জাগ্রত করিয়া রাখার জন্য, স্বর্গের অভ্রান্ত নূরে তাহার বর্জ্জনীয় কুপথ ও গ্রহণীয় সুপথকে সর্ব্বদা উদ্ভাষিত ও আলোকিত করিয়া তোলার জন্য, তাহার আবশ্যক হইয়া থাকে—আলোকস্তম্ভের, এবং জনাব কাজী আবদুল অদুদ ছাহেব হজরত মোহাম্মদ মোস্তফাকে নিজ মুখে সেই আলোকস্তম্ভ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। "হজরত মোহাম্মদের অনুবর্ত্তীরা" ত ইহার অধিক কিছুই বলিতে চাহে না। পার্থক্য এই যে, কাজী ছাহেব আলোকস্তম্ভকে স্বীকার করিতেছেন—কিন্তু তাহার আলোককে স্বীকার করিতেছেন না। আর মুছলমান পক্ষ বলিতেছে—আলোককে স্বীকার করাতেই আলোকস্তম্ভ স্বীকারের সত্যকার সার্থকতা নিহিত আছে।

সমুদ্রচারী পোতের জন্য আলোকস্তম্ভ যেমন একটা বড় বন্ধু, সেইরূপ মানুষের জীবন সংগ্রামে হজরত মোহাম্মদও ঐ আলোকস্তম্ভবৎ একজন বড় বন্ধু। এ কথা কাজী ছাহেব খুব স্পষ্ট ভাষায় স্বীকার করিয়াছেন। এখন দেখুন, এই হজরত মোহাম্মদ রূপী আলোকস্তম্ভের দিক্‌-দিগন্তপ্রসারী জ্যোতিচ্ছটা মানুষকে দেখাইয়া দিতেছে—এইটা তোমার লক্ষ্য এবং এই লক্ষ্যে উপনীত হইতে হইলে

তোমার অবলম্বনীয় পথ এইটী। ইহার ব্যতিক্রম করিয়া আশপাশের বিপদ সঙ্কুল পথ অবলম্বন করিলেই তুমি দিশাহারা লক্ষ্যহারা হইয়া পড়িবে, সাংঘাতিক বিপদ আপদের সংঘর্ষে তোমার জীবন-জাহাজখানা ভাঙ্গিয়া চুরমার হইয়া যাইবে। হজরত মোহাম্মদের অনুবর্ত্তীরা বলিতেছেন—নিজেদের জ্ঞান-বিশ্বাসমতে হজরত মোহাম্মদ মোস্তফাকে যখন এই বিপদ সঙ্কুল ভবসাগরের আলোক-স্তম্ভ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছি, তখন সে আলোকের নির্দ্ধারিত সুপথ ও কুপথের সিদ্ধান্তকে মানিয়া চলা আমার মানব জীবনের সর্ব্বপ্রথম কর্ত্তব্য—সর্ব্বপ্রধান সার্থকতা। নচেৎ বলিতে হয়—ওটা আলোকস্তম্ভ নয়, ও হইতেছে আলেয়ার আলো, যাদুকরের তেলেসমাত! পক্ষান্তরে কাজী ছাহেব বলিতেছেন—আলোকস্তম্ভকে খুবই স্বীকার করি, কিন্তু তাহার আলোকচ্ছটা যে নাবিকের গতিপথকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া দিবে, এ কথা আমরা কোন মতেই স্বীকার করিতে পারি না। কি উৎকট দার্শিনকতা!

পথ নিয়ন্ত্রণ করিয়া দেওয়ার অর্থ কি? এ পথ ধরিলে তোমার অভীষ্ট লাভ নিশ্চিত, আর ও-পথে চলিলে তোমার পক্ষে লক্ষ্যহারা হওয়া এবং নানা বিপদ আপদের সংস্পর্শে তোমার বিধ্বস্ত হইয়া যাওয়া সুনিশ্চিত—এইরূপে গম্য ও ত্যজ্য যাত্রামার্গকে স্পষ্ট ও স্বতন্ত্রভাবে নির্দ্ধারণ করিয়া দেওয়ার নামই পথ-নিয়ন্ত্রণ করা। এ ছাড়া আলোক-স্তম্ভের সার্থকতা আর কি থাকিতে পারে? সুতরাং আমরা দেখিতেছি যে, অভিধানের সমস্ত অশিষ্ট বিশেষণ প্রয়োগ পূর্ব্বক কাজী ছাহেব হজরতের যে স্বরূপকে ব্যর্থ ও ব্যাহত করার জন্য এতটা পণ্ডশ্রম স্বীকার করিয়াছেন, সর্ব্বশক্তিমান ও "মানুষের সর্ব্বময় প্রভু" আল্লার কুদরতে অনিচ্ছা সত্ত্বেও তিনি নিজেই তাহাকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া দিতেছেন।—এইজন্য বলিতেছিলাম—কাজী ছাহেব বাস্তবিকই হজরত রছুলে করিমের একটা জীবন্ত মো'জেজা।

কাজী ছাহেবের দার্শনিকতায় আর একটা নমুনা গ্রহণ করুন। নিজের গুপ্ত অভিসন্ধি সফল করার উদ্দেশ্যে তিনি বলিতেছেন:—

"তাঁর (হজরতের) কথা ও চিন্তার ধারা চিরকালের জন্য মানুষের পথকে নিয়ন্ত্রিত করে দিয়েছে একথা বিশ্বাস করলে মানুষরূপে তাঁর সাধনাকে যে চরম অপমানে অপমানিত করা হয়, কেননা সমস্ত সাধনার যা লক্ষ্য সেই আল্লাহর উপলব্ধি মানুষের দৃষ্টিপথ থেকে রুদ্ধ হয়ে যায়—যে **আল্লাহ চিরজাগ্রত, চির বিচিত্র,** বিশ্বজগতের রন্ধ্রে রন্ধ্রে দেশে দেশে যুগে যুগে মানুষের অন্তহীন **শুভ চেষ্টায়** যাঁর মহিমা প্রকটিত।"

এই উদ্ধৃতাংশের অন্যান্য বিষয় সম্বন্ধে পূর্ব্বে আলোচনা করা হইয়াছে। এখানে তাহার চিরজাগ্রত ও চিরবিচিত্র বিশেষণের ও তাহার অন্তর্নিহিত অভিসন্ধি সম্বন্ধে সংক্ষেপে দুই একটা কথা নিবেদন করিব।

আল্লাহ চিরজাগ্রত, মুছলমান আমরা একথা খুব উত্তমরূপে জানি ও মানি। কোরআন বলিয়া দিয়াছে:—

لا تاخذه سنة و لا نوم

"তন্দ্রা বা নিদ্রা তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না।" কিন্তু "আল্লাহ চির বিচিত্র"—একথার তাৎপর্য্য ভাল করিয়া বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না। যথাপূর্ব্ব, কাজী ছাহেব এই পদের কোন ব্যাখ্যাও দেন নাই, প্রমাণও দেন নাই। সে যাহা হউক, আল্লাহকে যাহারা স্বীকার করে, তাহারা তাঁহাকে সঙ্গে সঙ্গে অনাদি অনন্ত বলিয়াও স্বীকার করিয়া থাকে। এ প্রসঙ্গে আর একটা মৌলিক সত্য এই যে, আল্লার 'জাত' বা essence এর ন্যায় তাঁহার ছেফাৎ বা attribute গুলিও অনাদি অনন্ত। পক্ষান্তরে আল্লার জাত বা পরম সত্তা হইতে তাঁহার কোন গুণকে কোন সময় বিচ্ছিন্ন করা যায় না। অর্থাৎ আল্লার যাহা যাহা গুণ, অনাদি কাল হইতে অবিচ্ছেদ্যরূপে তাহার অস্তিত্ব আছে এবং অনন্তকাল পর্য্যন্ত সে সমস্ত সম্পূর্ণভাবে বিদ্যমান থাকিবে। তাঁহার সত্তার কোন দিকে কোন অংশে যেমন কোন প্রকার হ্রাস-বৃদ্ধি অসম্ভব, সেইরূপ তাঁহার গুণের কোন দিকের কোন অংশেরও কোন প্রকার অদল বদল সম্ভবপর হইতে পারে না। কারণ, আল্লাহ পূর্ণ ও ত্রুটিহীন। ১৩ শত বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার কতকগুলি গুণ ছিল—এখন আর তাহা নাই; এখন যাহা আছে পূর্ব্বে তাহা ছিল না এবং পরেও তাহা থাকিবে না, এরূপ কথা বলা আর নাস্তিকতাবাদের প্রচার করার কোনও

পার্থক্য নাই। কারণ এই উক্তি দ্বারা আল্লাহকে সাদি সান্ত সসীম ও অসম্পূর্ণ বলিয়া নির্দ্ধারণ করা হয়, সুতরাং বস্তুতঃ ইহা দ্বারা তাঁহার অস্তিত্বের প্রকৃত স্বরূপকে স্পষ্টতঃ অস্বীকার করা হয়।

এখন "আল্লাহ বিচিত্র"—এই পদের তাৎপর্য্য সম্বন্ধে পাঠক একটু চিন্তা করিয়া দেখুন। চিরবিচিত্র = চির + বি + চিত্র। চিরশব্দ দীর্ঘ ও নিত্য এই দুই অর্থেই ব্যবহার হইয়া থাকে। কাজী ছাহেবের প্রতিপাদ্যের প্রতি লক্ষ্য করিলে বলিতে হইবে যে, তিনি এখানে চিরশব্দ নিত্য-অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন। বিচিত্র শব্দের বি-উপসর্গের বুৎপত্তি অনুসারে কএক প্রকার অর্থ গ্রহণ করা যাইতে পারে। যথা :—সম্যক্ ও বিশেষ অর্থে যেমন—বিজ্ঞান। বিপরীত অর্থে, যেমন—বিপক্ষ। বিহীন অর্থে, যেমন—বিকর্ণ। বিকৃত অর্থে, যেমন—বিবর্ণ। নানা অর্থে, যেমন—বিবিধ। বিগত অর্থে, যেমন—বিতৃষ্ণা। ভিন্ন অর্থে, যেমন—বিধর্ম্মী। একটু অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে জানা যাইবে যে, এখানে বিচিত্র শব্দটা নানা ও বহু, অথবা বিপরীত, এই দুইটার মধ্যে একটি অর্থে নিশ্চয়ই ব্যবহৃত হইয়াছে। প্রথম অর্থ গ্রহণ করিলে, "আল্লাহ চির-বিচিত্র" পদের তাৎপর্য্য এই দাঁড়ায় যে, তিনি বহু চিত্র বা নানাগুণ বিশিষ্ট এবং তাঁহার সে গুণগুলি চির অর্থাৎ নিত্য। তাই যদি হয়, তাহা হইলে কাজী ছাহেবের আসল অভিসন্ধিটা এখানে একদম মাঠে মারা যাইতেছে। আল্লাহকে চির-বিচিত্র বলিয়া আমাদের এই দার্শনিক বন্ধু প্রতিপন্ন করিতে চান যে, সাড়ে তেরশত বৎসরের অতীত যে এছলাম, তাহা আর এখন চলিতে পারে না। কারণ, প্রথমতঃ, আল্লাহ চির-বিচিত্র হইলে সে সন্ত তাঁহার সৃষ্টির মধ্যকার সত্যগুলি যে যুগে যুগে অসত্য হইয়া যাইবে, পাগলেও বোধ হয় এরূপ কথা বলিতে পারিবে না। বিষের ও আগুণের মধ্যে যথাক্রমে মারণ ও দাহন গুণ নিহিত আছে—দূর অতীতের কোন এক স্মরণাতীত যুগ হইতে। আল্লাহ চির-বিচিত্র—একথা স্বীকার করিলে ইহাও কি যুক্তির হিসাবে স্বীকার করিতে হইবে যে, আগুণের দাহন গুণ আর বিষের মারণ গুণ এখন বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে? এছলাম যদি মিথ্যা হয়, তাহা হইলে পূর্ব্বেও তাহা মিথ্যাই ছিল এবং এখন তাহা মিথাই আছে এবং চিরকালই তাহা মিথ্যাই থাকিয়া যাইবে। কালক্রমে তাহা কস্মিনকালেও সত্যে পরিণত হইতে পারিবে না। পক্ষান্তরে এছলাম যদি সত্য এবং পূর্ণ সত্য হয়, তাহা হইলে পূর্ব্বেও যেমন তাহা সত্য ছিল, এখনও সেইরূপ সত্য আছে এবং যুগে যুগে অনন্তকাল পর্য্যন্ত তাহা ঠিক সেইরূপ সত্যই থাকিয়া যাইবে। আল্লাহ বিচিত্র বলিয়া কালক্রমে তাহা মিথ্যায় পরিণত হইয়া যাইতে পারে না। তাহার পর একটু ভাবিয়া দেখিলে সহজেই বুঝিতে পারা যাইবে যে, বিচিত্রের "চির"—বিশেষণটাই কাজী ছাহেবের মূল প্রতিপাদ্যের স্পষ্ট প্রতিবাদ করিয়া দিতেছে। কারণ, "চির" শব্দের একমাত্র গ্রহণীয় অর্থ যে এখানে "নিত্য"—তাহা আমরা পূর্ব্বে দেখিয়াছি। আলোচ্য পদটার বিশ্লেষণের দ্বারা ইহাও আমরা দেখিয়াছি যে, বিচিত্র শব্দের প্রথম সাম্ভব্য তাৎপর্য্য অনুসারে, আল্লাহ চির-বিচিত্র—এই পদের একমাত্র অর্থ এই দাঁড়ায় যে, আল্লাহ বহু গুণের অধিকারী **এবং তাঁহার সেই গুণগুলিও নিত্য**। যাহা নিত্য, তাহাতে কোন প্রকার রদবহাল কস্মিন কালেও সম্ভবপর হইতে পারে না। বরং তাহা যুগে যুগে সমানভাবে বলবৎ হইয়া থাকিবে। সুতরাং অধ্যাপক ছাহেবের এই দাবীটা যে কতদূর অন্তঃসার-শূন্য ও আত্ম-বিরোধী, আশা করি এই আলোচনা দ্বারা বিজ্ঞ পাঠকগণ সম্যকরূপে তাহার উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন।

বি-উপসর্গের "নানা" ও "বহু" অর্থ গ্রহণ করিলে আলোচ্য পদটার তাৎপর্য্য কিরূপ দাঁড়ায়, উপরে তাহারই মাত্র আলোচনা করা হইয়াছে। "বিপরীত" বলিয়া যদি উহার অর্থ করা হয়, তাহা হইলে ব্যাপারটা কিরূপ দাঁড়াইবে, তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে! এ অবস্থায় "আল্লাহ চির বিচিত্র"—পদটার তাৎপর্য্য এই দাঁড়াইবে যে, আল্লাহ এমন কতকগুলি গুণের অধিকারী, যাহা যুগপৎভাবে নিত্য ও পরস্পর বিপরীত। এ অবস্থায়, কাজী ছাহেবের 'মিশন' কতকটা সফল হইতে পারে বটে, কিন্তু যে আল্লার মহিমা ও অস্তিত্বের কথা তিনি, যে কোন কারণে হউক, এত জোর গলায় প্রচার করিয়া আসিয়াছেন—এই তাৎপর্য্যের দ্বারা তাঁহার সত্তা ও স্বরূপের—তাঁহার অস্তিত্বের—ঘোরতর প্রতিবাদই করা হইবে। দুইটা পরস্পর বিপরীত গুণ—যেমন আলোক ও

অন্ধকার অথবা সত্য ও অসত্য—সদাসত্য সদাপূর্ণ ও সদাপ্রভু আল্লার 'জাতে' নিত্যরূপে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া আছে; তিনি নিত্য ও অনিত্য, তিনি পূর্ণ ও অপূর্ণ, তিনি সত্যময় ও মিথ্যাময় ইত্যাদি প্রকার হঠোক্তির সমর্থন না করিয়া, সুতরাং তাঁহাকে সম্পূর্ণভাবে অস্বীকার না করিয়া, এরূপ অন্যায় অভিমত প্রকাশ করা সামান্য জ্ঞান বিশিষ্ট মানুষের পক্ষেও সম্ভবপর হইতে পারে না।

উপরের উদ্ধৃত অংশে অধ্যাপক ছাহেব বলিতেছেন—"মানুষের অন্তহীন **শুভ চেষ্টায়**" আল্লার মহিমা প্রকটিত হইতেছে। বেশ কথা! কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, মানুষ কি কেবল শুভ চেষ্টাই করিয়া যাইতেছে; অশুভ অমঙ্গল ও অন্যায়ের স্থান কি সে চেষ্টার মধ্যে মোটেই নাই? যদি থাকে, তাহা হইলে সেই শুভ ও অশুভকে যাঁচাই বাছাই করিয়া লওয়ার উপায় কি? পক্ষান্তরে সমস্তই যদি শুভ হয়, তাহা হইলে অশুভ বলিয়া মানুষের কতকগুলি প্রচেষ্টাকে অন্যায় বলিয়া ধিক্কার দেওয়া হয়—কোন দার্শনিক যুক্তি বলে? এছলামের অনুবর্ত্তনের মধ্যে "যুগে যুগে, দেশে দেশে" কোটি কোটি মানুষের যে প্রচেষ্টা নিহিত আছে—কাজী ছাহেব তাহারই বা নিন্দাবাদ করিতেছেন কোন হিসাবে? যদি মানুষের চেষ্টার মধ্যে অশুভ বলিয়া কিছু না থাকে, তাহা হইলে মানব সাহিত্যের সমস্ত অভিধান হইতে সু-কু, পাপ-পুণ্য, ন্যায়-অন্যায় প্রভৃতি শব্দগুলিকে একদম মুছিয়া ফেলা উচিত। অবশ্য দার্শনিকতার খেয়ালটা এক্ষেত্রে মস্তিষ্কের কোণ হইতে কিছু কালের জন্য সরাইয়া দিতে হইবে। নচেৎ কোন অজ্ঞান কাটমোল্যা বলিয়া বসিতে পারে যে, সু ও কু, পাপ ও পুণ্য এবং ন্যায় ও অন্যায় বলিয়া যে পার্থক্যটাকে আজ বাতিল করিয়া দেওয়া হইতেছে—তাহাও ত বিশ্ব-মানবের সমবেত সকল প্রচেষ্টার সারাৎসার, সুতরাং তাহাও নিশ্চয় শুভ ও অন্তহীন হইবে। অতএব তাহাকে কোনক্রমে বাতিল বা বারিত করা যায় না। আর যদি বল, সদসতের এই পার্থক্য অন্যায়, তাই উহাকে বাতিল করা হইতেছে, তাহা হইলে তোমার এই যুক্তিইত বলিয়া দিতেছে যে, দেশে দেশে যুগে যুগে এবং তুনয়ায় রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রতিষ্ঠিত বিশ্ব-মানবের সমবেত চেষ্টাও অন্যায় বা অশুভ বলিয়া প্রতিপাদিত হইয়া যাইতে পারে।

এখানে প্রশ্ন উঠিবে—কোনটা শুভ আর কোনটা অশুভ, কোনটা ন্যায্য আর কোনটা অন্যায়, তাহা স্থির করার উপায় কি? জ্ঞান ও বিবেকের দোহাই দিয়া এক্ষেত্রে আত্মরক্ষা করার সম্ভাবনা আদৌ নাই। কারণ, কোনটা জ্ঞান আর কোনটা অজ্ঞান, বিবেকের সিদ্ধান্ত কোনটা আর রিপুর মোহ ও প্রবৃত্তির বিকারই বা কোনটা, এ সমস্যার সমাধান করার জন্য আর একটী স্বতঃসিদ্ধ বিচারকের তখন আবশ্যক হইয়া দাঁড়াইবে। আবার এ সমস্তের পূর্ব্বে জ্ঞান, বিবেক প্রভৃতির সংজ্ঞা, স্বরূপ এবং মানুষের ঐন্দ্রিয়ক ও অতীন্দ্রিয় কর্ম্মে ও ভাবে সেগুলির শক্তি সামর্থ্যের পরিমাণ নির্দ্ধারণ লইয়া এমন এক অন্তহীন শুভ আলোচনার সৃষ্টি হইবে, বিশ্বের সমস্ত নৈয়ায়িক দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিকেরা বহু শতাব্দীব্যাপী মসিযুদ্ধে লিপ্ত হইয়াও যাহার কোন প্রকার চরম মীমাংসা করিয়া উঠিতে পারিতেছেন না।

এই প্রবন্ধের দ্বিতীয় কিস্তিতে এ সমস্ত প্রসঙ্গ লইয়া আলোচনা করার ইচ্ছা রহিল।

(ক্রমশঃ)

# "এপ্রেল ফুল"

[ রাজিয়া খাতুন ]

"গাড়ী যে এসে গেল বেগম সা'ব, আপনার সাজা কি হয় না? ও-রূপে সাজতে হয় না। ও-এমনিই দুনিয়া আলো করে।" "দূর মুখপোড়া বাঁদরি!" বলিয়া সপ্তদশ বর্ষীয়া যুবতী তাহেরা আয়নার সম্মুখ হইতে সরিয়া আসিল। তাহার পরনে একখানা ফিকা নীল রং‌এর সাচ্চা কাজ করা রেশমী শাড়ী ও সেই রকমই ব্লাউস, জ্যোৎস্না নিন্দিত বর্ণে সেই সজ্জা দেখিয়া বোধ হইতেছিল—নক্ষত্রমালা খচিত নীল আকাশ যেন তার রূপ-মোহে মুগ্ধ হইয়া ধরণীতে নামিয়া আসিয়াছে। শাড়ীখানা নব্য ধরনে পরা। সাজ-সজ্জার কোন বাহুল্য নাই। হাতে মিহি দুইগাছা জড়োয়া ব্রেসলেট। গলায় বড় বড় মুক্তার এক ছড়া মালা ও কাণে দুইটী হীরার দুল। কাঁধের উপর মুক্তার ব্রোচ, এ ছাড়া অন্য অলঙ্কার ছিল না! চুলগুলি সাদাসিধাভাবে প্লেন করিয়া আঁচড়ানো। ঝি ও ছোট দেবরটীকে ডাকিয়া লইয়া সে বেড়াইতে চলিয়া গেল। নীচে বৃদ্ধা পিস-শাশুড়ি বক্ বক্ করিয়া বকিতে লাগিলেন; "বাপু তুই হলি ঘরের বউ, তোর কেন ধিঙ্গি হ'য়ে বেড়ানো! মোটে এক বছর হলো বিয়ে হ'য়েছে! আমাদের দেশের বউয়েরা পাঁচ ছেলের মা হ'য়েও ঘোমটা ফেলে কথা কয় না। আবার বেড়াতে যাওয়া! আর তো দিনরাত স্বামীর সঙ্গে মুখো-মুখি হ'য়ে গল্প আর "ইনজিরি" কেতাব পড়া; তুই কি উকিল ব্যালেষ্টর হ'বি? তা ঘর-কান্নার কাজ কর্ম্ম রাঁধা বাড়া বউ ভালই করে। করলে কি হয়? ফোরসৎ পেলেই ওই কেতাব পড়া আর বেড়ানো। বউ মানুষ, কাজ কম্মে অবসর হ'য়ে গল্প-সল্প করবি। তাস দাবা দশ পঁচিশ খেলবি। না হয় দু'দণ্ড ঘুমুলি। তোদের এখন ওই করবার সময়। তা-না যত সব অনাছিষ্টি কাণ্ড। বেড়াতে যাবি বিয়ের বেণারসী শাড়ীখানা পরে হাতে দশ ভরির ব্রেসলেট, পায়ে পনের ভরির মল। চুড়ি হার, সেফলেন, সাত লহরী চিক-বালা আংটি, বাজু, জশম, তাবিজ, ইয়ারিং সব পরবে, চুলগুলি ভুরু অবধি নামিয়ে সিঁথি পরে জাদের খুপি দিয়ে পেরজাপতি খোঁপা বেধে জরির জুতা পায়ে দিয়ে যাবে, তবে তো লোকে বলবে যাঁ হো বউ বটে।" আল্লার নামে বড়াই ক'রে বলতে পারি, এখনো এমন সাজানো সাজিয়ে দেব যে দশ গাঁয়ের লোকে দেখে চেয়ে থাকবে। দাঁতে একটু মিশি নেই, চোখে কাজল নেই, হাতে মেহদি নেই। একে কি লোকে বউ বলে? গট্ গট্ ক'রে বেরিয়ে গেল যেন এক খিষ্টেন মাগি! অবাক করলে মা—অবাক করলে! কাকেই বা কি দোষ দেব, ছেলের পছন্দও তেমনি। নইলে আমার ভাশুর ঝি হামিদা ছিল, চৌদ্দ বছরের মেয়ে। ঐটুকু মেয়ের কি গুণ? একশত লোককে রেঁধে বেড়ে খাওয়াতে পারে। তা ছাড়া ইনজিরি পড়তে আর জামা সেলাই করতে না জানলেও কাঁথা সেলাই করতে আর উকুন বাছতে তার জুড়ি নেই। সুর করে যখন রোস্তম সোহরাবের পুঁথি পড়ে, তখন চোখে পানি এসে যায়। সে মেয়ের কাছে এ বৌ! হুঃ!" সহসা রাঁধু-নীকে প্রবেশ করিতে দেখিয়া তাঁহার চিন্তাস্রোত অন্যদিকে ফিরিল। তিনি তস্‌বিহ হাতে করিয়াই রান্নাঘরের দিকে চলিলেন।

তাহেরা কলিকাতার কোন সম্ভ্রান্ত পরিবারের সন্তান। তাহার পিতার কলিকাতায় দু'তিন খানা বাড়ী ছিল। নিজেও একজন প্রতিপত্তিশালী ব্যারিষ্টার। সুতরাং মাসে প্রায় ৪।৫ হাজার টাকা আয় হইত। প্রকাণ্ড ত্রিতল বাড়ী। লাইট, ফ্যান, মোটর, দাসদাসী, বিলাসীতার আবশ্যকীয় সরঞ্জাম সব ছিল। ছিল না শুধু গৃহের শোভা, নয়নের আলো পুত্র-কন্যা। অবশেষে বহু আরাধনার পর মধ্য বয়সে এই তাহেরা জন্মগ্রহণ করে। বলাবাহুল্য নিঃসন্তান পিতা মাতার নিকট ইহাই শত-পুত্র তুল্য। তাহেরা বহু

যত্নে প্রতিপালিতা হইয়াছিল। বেথুন স্কুলে ম্যাট্রিক ক্লাস পর্য্যন্ত পড়িয়াছিল। পিতা মাতার ইচ্ছা ছিল কন্যাকে উচ্চ শিক্ষা দিবেন। কিন্তু পরীক্ষার দুইমাস পূর্ব্বে হঠাৎ বিবাহ হইয়া যাওয়ায় সে আশা ফলবতী হইল না। জামাতা লুৎফল হোসেন অর্থবানের ছেলে হইলেও অসাধারণ প্রতিভা, উন্নত চরিত্র, মধুর প্রকৃতি সৎবংশ ও প্রভাময় রূপ দেখিয়া পিতামাতা তাহেরার বিবাহ দিয়াছিলেন। তাঁহাদের আশাও ফলবতী হইয়াছিল। বিবাহের দুইমাস পরেই লুৎফল হোসেন এলাহাবাদে ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের পদে নিযুক্ত হয়। তাহার স্নেহ-ভালবাসায় তাহেরাও খুব সুখী হইয়াছিল।

বিবাহের পূর্ব্বে স্থানীয় অন্য একজন ব্যারিষ্টার আতাহার আলী সাহেবের কন্যা তাহার সমান রূপগুণ সম্পন্না সহপাঠিকা ও সমবয়স্কা একটী মেয়ের সঙ্গে অত্যন্ত প্রণয় হইয়াছিল। বাসা কাছাকাছি হওয়ায় দুইজনে খুব চিঠিপত্র লেখালেখিও চলিত। বিবাহের পর সুদীর্ঘ কাল দেখা হয় নাই। সম্প্রতি তাহারও বিবাহ হইয়াছে। তাহার স্বামী এলাহাবাদেই উকিল হইয়া আসিয়াছেন। তাই আজ তাহেরা সখী সন্দর্শনে গিয়াছে।

সেখানে উপস্থিত হইয়া সে দেখিল—আরও দুই চারি জন ভদ্রমহিলা নিমন্ত্রিতা হইয়াছেন। সকলেই সুন্দরী ও সুসজ্জিতা। কিন্তু তাহেরার সমকক্ষ একজনও ছিল না। তাহাকে দেখিয়া একটা মৃদু গুঞ্জন উঠিল। সখী ছুটিয়া আসিয়া জড়াইয়া ধরিল। খাওয়া দাওয়া সারিয়া সকলেই বারান্দায় আসিয়া বসিলেন। একজন জিজ্ঞাসা করিলেন—"লতিফা এখন কেমন আছে ভাই?" আর একজন উত্তর দিলেন,—"কেমন আর থাকবে? আগে যা এখনও তাই। বেচারী না পেল স্বামীর ভালবাসা, না পেল জীবনে সুখ-শান্তি। অল্প বয়সে বিয়ে দিয়ে মা-বাপ ওর ভবিষ্যৎটাই মাটি ক'রে দিয়েছে।" মুনসেফ গৃহিণী মৃদু হাসিয়া বলিলেন—যা বল ভাই বঙ্কিমচন্দ্র ঠিকই লিখেছে। পুরুষ মানুষগুলি হাঁড়ি কলসী বই কিছুই নয়। দু'দিন না দেখলেই ছুঁতে আর নোংরা হ'য়ে যাবে। সর্ব্বদা মাজ, ঘস, পরিষ্কার কর, তবেই ঝকঝকে থাকবে।" বলিয়া সকলের মুখের পানে চাহিলেন। সাব-জজ গৃহিণী একটু দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া মুখ অবনত করিলেন। কারণ তাঁহার স্বামী ভয়ানক বিলাস-ব্যসন ও পানাসক্ত। বয়স প্রৌঢ়ত্বে আসিয়া ঠেকিয়াছে। তবুও চরিত্র সংশোধিত হইল না। সে মজলিসে সাব-জজ গৃহিণীর ন্যায় রত্নালঙ্কার কাহারও ছিল না। কিন্তু রত্নালঙ্কারে যদি সুখ হইত তবে রাজা বাদশার ঘরে রাণী ও বেগমগণ মনিমুক্তা খচিত পর্য্যঙ্কে শুইয়া মুক্তার ঝালর দেওয়া বালিশে মুখ লুকাইয়া কাঁদিত না। একজন তাহেরার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন—"আপনি এমন মুখ বুঁজে বসে আছেন কেন? গল্প সল্প করুন না? তাহার সখী বলিয়া উঠিল "কথা বলবে কি, স্বামীর সোহাগেই ও-ভরপুর। আমাদের কথা কি ওর মনে স্থান পায়?" তাহেরার গণ্ড দু'টী শরম-রঞ্জিত হইয়া উঠিল। বাস্তবিকই স্বামীর ভালবাসায় তাহার হৃদয়খানি পরিপূর্ণ ছিল।

চারিটার পূর্ব্বেই মেহমানগণ চলিয়া গেলেন। কারণ সকলেরই স্বামী আফিস হইতে ফিরিবেন। কিন্তু তাহেরার যাওয়া হইল না। বহুদিন পরে সখীর সাক্ষাৎ। এত শীঘ্র কি বিচ্ছেদ হইতে পারে? বহুক্ষণ ভাব ও কথার বিনিময়ের পর সখী তাহেরাকে জিজ্ঞাসা করিল—"আচ্ছা তাহেরা তোর স্বামী তো এত বুদ্ধির বড়াই করেন ওঁকে কোনমতে ঠকালে হয় না?" তাহেরা হাসিয়া বলিল—"তুমি জব্দ করনা ভাই, আমি কি মানা করি?" তখনই দুই সখীতে বহুক্ষণ ধরিয়া পরামর্শ হইল। সন্ধ্যার কিছু পরে তাহেরা বিদায় গ্রহণ করিল। বাসায় আসিয়া দেখিল স্বামী উদ্‌গ্রীব হইয়া পথের পানে চাহিয়া বসিয়া রহিয়াছেন। অন্যদিন এ সময় তিনি ক্লাবে চলিয়া যান। আজ এখনও তাহার প্রতীক্ষা করিতেছেন। আসিতেই বলিলেন—"সইকে পেয়ে একেবারে বাড়ীঘর সব ভুলে যাওয়া হ'য়েছে। আমাদের কথা তো মনে থাকবার কথাই নয়।"—বলিয়া তাহার নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া ক্লাবে চলিয়া গেলেন।

তাহেরা তাড়াতাড়ি কাপড় চোপড় ছাড়িয়া রান্নাঘরে প্রবেশ করিল। ফুফু সাহেবা তসবিহ হাতে করিয়া একখানা জল-চৌকীর উপর বসিয়াছিলেন। রাঁধুনী মোরগ কুটিয়া ধুইতেছিল। তাহেরা ঢুকিয়াই চুলার উপর ডেগচি দিয়া মশলা কষিতে লাগিল। ফুফু সাহেবা ঝনঝনে গলায় বলিয়া উঠিলেন,—"বাপু আমরাও এককালে বউ ছিলাম। এমন কাণ্ড কখনও দেখি নি। এই সাদা পানা কাপড় আর দু'খানা গয়না পরে লোকের বাড়ী ধেই ধেই করে যাওয়া আর রাতের অর্দ্ধেক কাটিয়ে আসা। বাছা আমার দিন

থাকতে এসে মুখ চুণ করে বসে রয়েছে, এত কেন বাপু? তুমি আমার হ'লে তো আমি তোমার?" বলিয়া উঠিয়া নিজ শয়ন কক্ষে চলিয়া গেলেন। রাঁধুনী দ্বারের প্রতি চাহিয়া মৃদু কণ্ঠে কহিল—"তুমি গেছ পর্য্যন্ত উনি ওই কথা নিয়েই আছেন মা, আমি সাতেও নেই পাঁচেও নেই। নেহাৎ কাণে তুলো দিইনি বলে শুনতে হয়েছে।" তাহেরা কিছুই বলিল না। নতমুখে গোশতগুলি দেগচিতে ঢাকিয়া দিল। এক বৎসর যাবতই সে এই রুক্ষ প্রকৃতি কর্কশ-ভাষিনী ফুফু শাশুড়িকে সহ্য করিয়া আসিয়াছে। স্বামীর কানে এসব দিলে তিনি তৎক্ষণাৎই তাঁহার অন্যত্র থাকার ব্যবস্থা করিয়া দিতেন কিন্তু বিলাসের মধ্যে প্রতিপালিত হইলেও সে অত্যন্ত চাপা ও সহিষ্ণু প্রকৃতির মেয়ে ছিল। বিশেষতঃ প্রেমে যাহার বুকভরা, এসব তুচ্ছ বিষয় সে গ্রাহ্যও করে না। তাহেরার পিতা তাহাকে নারীর উপযোগী সমুদয় শিক্ষাই দিয়াছিলেন। সে বায়রণ মিল্টন হইতে সাদী ও হাফেজের কাব্যসুধা সমস্তই আস্বাদন করিতে পারিত। স্কুলের পড়া ছাড়াও পিতার নিকট তাহাকে অতিরিক্ত পড়িতে হইত। তদ্ব্যতীত গৃহ কর্ম্ম ও সেলাই রান্না হইতে ঘর ঝাঁট দেওয়া পর্য্যন্ত সব কার্য্যেই সে সুনিপুণা ছিল।

৪।৫ দিন পরের কথা। লুৎফল হোসেন সাহেব আফিসে যাওয়ার সময় তাহেরা আসিয়া মৃদুকণ্ঠে বলিল, "আজ একটু সইদের ওখানে যেতে হ'বে; সে অনেক ক'রে বলেছে, না গেলে রাগ করবে।" তিনি কহিলেন "বেশতো, যেতে পারে। একেবারে সব ভুলে থেকনা যেন।

সেদিন ডেপুটি সাহেব তিনটার সময়ই ফিরিয়া আসিলেন। তাঁহার শরীর কিছু অসুস্থ থাকায় সকাল সকাল ফিরিয়াছেন। আসিয়া কাপড় চোপড় ছাড়িয়া সোফায় পড়িয়া সিগারেট টানিতে লাগিলেন। একটু পরে টেবিলের ড্রয়ারটি খুলিলেন। তাহাতে তাহেরের প্রসাধনের চিরুণী, রেশমী ফিতা, স্নো ও কাঁটা ছিল। সেগুলির মধ্য হইতে একটা স্নিগ্ধ মৃদু সৌরভ বায়ু হিল্লোলে ভাসিয়া আসিল। লুৎফল হোসেন চিরুণীখানা লইয়া ওষ্ঠে ছোঁয়াইল। তৎপর আর এক ড্রয়ার খুলিতেই তাঁহার চক্ষু আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। তাহেরার একটি ক্ষুদ্র হস্তিদন্ত নির্ম্মিত বাক্স ছিল। সে'টি সে স্বামীর সম্মুখে কখনও খুলিত না। এই বাক্স লইয়া বহু বিবাদ বিসম্বাদ ঝগড়া ও মান-অভিমান হইয়া গিয়াছে, তবুও তাহেরা দেখিতে দেয় নাই। চাবিটি একটী ক্ষুদ্র আংটির ন্যায় রিংএ সংবদ্ধ হইয়া তাহেরার চুড়ির সঙ্গেই থাকিত। আজ সেই অমূল্য চাবিটি ড্রয়ারের ভিতর রহিয়াছে। লুৎফল হোসেনের দুই চক্ষু ব্যগ্র আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সে চাবিটি ও বাক্স লইয়া সোফার উপর বসিয়া তাড়া-তাড়ি খুলিয়া ফেলিল। দেখিলেন, ফিকানীল রংয়ের বড় বড় চৌকা প্রায় একশত খানা খাম গোলাপী ফিতায় আবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। একখানা খুলিয়া বাহির করিতেই দামী এসেন্সের তীব্র গন্ধে ঘর আমোদিত হইল। প্রেম পত্র যে তাহাতে কোন সন্দেহই নাই। প্রত্যেক লেপাফার উপরই তারিখ অনুসারে নম্বর দেওয়া আছে। প্রথম পত্র খানা খুলিয়া দেখিল তাহাতে লেখা আছে—

কলিকাতা
১৬ই জানুয়ারী

মানসী আমার!

ঊষর এ হৃদয় মরুভূতে কোথা হ'তে এলে তুমি? হেথা গান নেই, প্রাণ নেই, আলো নেই। কি নিয়ে তুমি তৃপ্ত হ'বে? তোমায় দেখে মনে হয় তুমি আমায় ভালবাস। যদি তাই হয়, তবে হে প্রিয়া! আমার সর্ব্বস্ব ঢেলে দিলুম তুমি গ্রহণ কর।

তোমার পত্রের আশায় তৃষ্ণার্ত্ত চাতকের ন্যায় উদ্‌গ্রীব হ'য়ে রইলুম।"

তোমারই
"মজিদ"।

অন্য একখানায় লেখা ছিল—

প্রিয়তমা!

কাল তোমায় পেয়েছি। কি পরিপূর্ণ সে পাওয়া তোমায় বুকে টেনে নিয়ে চুলগুলি খুলে দিলুম! গোলাপী গণ্ড দু'টীতে চুম্বন এঁকে দিলুম। হাতে পবিত্র প্রণয়ের নিদর্শন স্বরূপ অঙ্গুরীয় পরিয়ে দিলুম। তুমি আপত্তি করলে না। তাতে বুঝলুম তুমি আমারই। আজ মন আমার খুশীতে ভরপুর।

তোমার প্রণয় কাঙ্গাল
মজিদ

আর একটায় লেখা

রাণী আমার!

আজ তুমি আমায় ছেড়ে অন্যের হ'য়ে যাচ্ছ। জানি তুমি চিরদিন আমার হ'য়ে থাকতে পার না। সে দুরাশা। ওগো প্রিয়া নিতান্তই দুরাশা। আকাশের চাঁদ কখনো ধরায় ধূলায় ফোটা পদ্মের কাছে নেমে আসে না। আসতে পারে না। আশীর্ব্বাদ করি সর্ব্বদুঃখ আমায় দিয়ে তুমি সুখী হও।

তোমার সুখ-বঞ্চিত
"মজিদ"

সবগুলি পত্রই বিবাহের পূর্ব্বের লেখা। প্রত্যেক পত্রই এইরূপ আবেগময়ী ভাষায় লেখা। পড়িয়া লুৎফল হোসেনের মাথার ভিতর অগ্নি জ্বলিয়া উঠিল। সে বজ্রাহতের ন্যায় দুই হাতে মাথা চাপিয়া ধরিয়া বসি পড়িল। উঃ! কি নিদারুণ বিশ্বাসঘাতকতা! এই কলঙ্কিনী দুশ্চারিণীও অন্যাসক্তা নারীকেই সে প্রাণদিয়া ভালবাসে! একবার মনে করিল বুঝি অন্যের পত্র তাহেরাকে রাখিতে দিয়াছে। কিন্তু প্রত্যেক পত্রের উপর বড় বড় অক্ষরে তাহেরার নাম লেখা। দৃপ্তকণ্ঠে সে বলিয়া উঠিল "হয় তোমার কলঙ্কিত জীবনের অবসান হ'বে, না হয় আমি আত্ম-হত্যা ক'রব।" পরক্ষণেই তাহেরার সারল্য মণ্ডিত আসল ও ভালবাসার কথা মনে পড়িয়া তাহার নয়ন হইতে অনর্গল অশ্রু নির্গত হইতে লাগিল। যে চক্ষু হইতে একটু পূর্ব্বে অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ নির্গত হইয়াছে তাহাই এক্ষণে সাগরে পরিণত হইল। ইতিমধ্যে কখন যে বহির্দ্বারে একখানা গাড়ী আসিয়াছে ও দুইটা যুবতী আসিয়া দ্বারের ছিদ্রপথে সমস্তই দেখিতেছে তাহা সে লক্ষ্যও করে নাই। হঠাৎ একটী দাসী আসিয়া তাহার হাতে ঠিক সেই রঙ্গের একখানা খাম দিল। বিস্ময়ে অবাক হইয়া লুৎফল হোসেন ক্ষিপ্রহস্তে পত্র বাহির করিল। তাহাতে পরিষ্কার ও ঠিক চিঠিরই লিখিত অক্ষরে বড় বড় করিয়া লেখা

"এপ্রেল ফুল"

মজিদা খাতুন ওরফে
"মজিদ"

পর মুহূর্ত্তে হাসি মুখে তাহেরা গৃহে প্রবেশ করিয়া বলিল "কিগো! কান্নাকাটি শেষ হ'ল! সইয়ের চিঠিগুলি চুরি ক'রে পড়া হচ্ছে যে!" দ্বারান্তরাল হইতে মজিদার শাড়ীর আঁচল দেখা যাইতেছিল ও সেই এসেন্সের তীব্র সৌরভ পাওয়া যাইতেছিল। সে ব্যঙ্গ ভরা স্বরে কহিল "এত শিগ্‌গীরই শেষ হবে? পদ্মায় জোয়ার এসে গেছে যে!" লুৎফল হোসেন পূর্ব্ববঙ্গবাসী, তাই এ পরিহাস। পঞ্জিকা খানাও ১লা এপ্রেলের ছাপ লইয়া মূর্ত্তিমান বিদ্রূপ রূপেই দেয়ালে বিরাজমান!

---

# প্রকৃত বীর

[ জছিমউদ্দিন আহমদ, এম, এ, বি, টি ]

( শেখ সাদী হইতে )

বীর কভু নহে সেই কহে জ্ঞানিগণ,
উন্মত্ত মাতঙ্গ সনে যেবা করে রণ;
কিন্তু মহাবীর সেই কহে সুধীজনে,
নিশিদিন দ্বন্দ্ব যেবা করে ক্রোধ সনে।

---

# এমাম্ ফখ্রুদ্দিন্ রাজী *

[ এ, জেড্ নুর আহমদ ]

এল্মে কালামের দীপ্ত তিলক, মোছলেম জাহানের গৌরব-রবি এমাম ফখ্রুদ্দিন রাজী ৫৪৪ হিজরী সনে রায় প্রদেশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার বাল্য নাম ছিল—মোহাম্মদ এব্নে ওমর; কিন্তু তিনি সমগ্র বিদ্বান সমাজে ফখ্রুদ্দিন রাজী নামেই সুপরিচিত। তাঁহার পিতা আরবী ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন, সুতরাং তাঁহার বাল্যশিক্ষা পিতার নিকটেই সুসম্পন্ন হইয়াছিল। বাল্যকালে তিনি 'কামাল্ সমাণী'র নিকট ও বহুদিন ফেকাহ-শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন।

অতঃপর দর্শন বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় সূক্ষ্ম তত্ত্বজ্ঞানের প্রবল আকাঙ্ক্ষা তাঁহার নবীন হৃদয়েই জাগিয়া উঠিল, ইহার ফলে তিনি আত্মীয় স্বজন ও স্বদেশের মায়া ত্যাগ করিয়া প্রসিদ্ধ দার্শনিক 'মজ্দউদ্দীন 'হাবিলীর' সহিত 'মরাগায়'—যাইয়া উপস্থিত হইলেন; এবং তথায় সুদীর্ঘ কাল অবস্থান পূর্ব্বক দর্শনশাস্ত্রে অসীম জ্ঞান অর্জ্জন করতঃ খাওয়ারজ্ম প্রদেশে গমন করেন।

প্রথম 'খাওয়ারজ্ম' ও তৎপর 'মা-ও-রায়াহার' নামক স্থানে এলমে আকায়েদ সম্বন্ধে অনেক আলেমের সহিত তাঁহার মোনাজারা বা বিচার বিতর্ক হয়; ফলে বহুলোক তাঁহার বিদ্রোহী হইয়া উঠে এবং তাঁহার দার্শনিক মতের তীব্র প্রতিবাদের সূত্রপাত হয়। ইহাতে অচিরেই তিনি প্রাগুক্ত দেশ ত্যাগ পূর্ব্বক স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে বাধ্য হন।

স্বদেশ প্রত্যাবর্ত্তনের পর তাঁহার ভাগ্য পরিবর্ত্তনের সূচনা আরম্ভ হইল। রায় নগরে সেই সময় এক বহু লক্ষপতি বণিক বাস করিতেন; তাঁহার একমাত্র দুহিতার সহিত এমাম সাহেবের পুত্র পরিণয় সুত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। বিবাহের অব্যবহিত পরেই বণিকের মৃত্যু হওয়াতে তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি এমাম সাহেবের অধিকারভুক্ত হয়। এমাম সাহেব এই সূত্রে এত অগাধ সম্পত্তির মালিক হইয়াছিলেন যে; দেশ বিদেশের বড় বড় শাসন কর্ত্তা ও রাজা বাদশাহগণ তাঁহার নিকট হইতে ঋণ গ্রহণ করিতেন। ভারতবিজয়ী সুলতান্ শেহাবউদ্দীন মোহাম্মদ ঘোরী এমাম সাহেবের নিকট হইতে প্রভূত অর্থ ঋণ স্বরূপ গ্রহণ করিয়াছিলেন। বস্তুতঃ জ্ঞানে ও ধনে তখন তিনি অদ্বিতীয় ছিলেন বলিয়া সর্ব্বত্র তাঁহার অতুল সম্মান ও প্রতিপত্তি ছিল।

সবদিক দিয়া প্রবল প্রতিপত্তি লাভের ফলে জনসাধারণের ন্যায় রাজা-বাদশাহগণও একান্তমনে তাঁহার ধর্ম্মবিষয়ক বক্তৃতা শ্রবণ করিতেন। একবার তিনি এক মহতী সভার সভাপতিরূপে হেরাত গমন করিয়াছিলেন; সেই সভায় তথাকার শাসনকর্ত্তা হোসায়ন্ শাহ তাঁহার দক্ষিণ পার্শ্বে ও শেহাবউদ্দীন ঘোরীর ভাগিনেয় সুলতান মোহাম্মদ ঘোরী তাঁহার বাম পার্শ্বে উপবিষ্ট ছিলেন। এমাম সাহেব মানব আত্মার স্বরূপ সম্বন্ধে অতি হৃদয়গ্রাহী ও প্রাঞ্জল বক্তৃতা দ্বারা শ্রোতৃ মণ্ডলীকে বিমুগ্ধ করিতেছিলেন—এমন সময় ঘটনাক্রমে একটি কবুতর বাজপক্ষী কর্ত্তৃক বিতাড়িত হইয়া এমাম সাহেবের সম্মুখে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিল। ঐ সভায় 'শরফ্উদ্দীন নামক কবিও উপস্থিত ছিলেন, তিনি ঐ মুহূর্ত্তেই এমাম সাহেবকে উদ্দেশ করিয়া স্বরচিত নিম্নলিখিত কবিতাটি আবৃত্তি করেন:—

مَن نَبَّأَ الورقاء ان محلكم - حَرَمٌ وانك ملجاءُ
للخائف -

হে এমাম! আপনার আস্তানা যে ( হেরেম ) নিরাপদ

---

* এব্নে খালকান; তব্কাতুল্ আতিব্বা এবং শামসুল ওলামা শিবলী নোমাণীর এল্মুল কালাম হইতে সংগৃহীত।—লেখক।

স্থান, আর আপনি যে ভয়ভীতদের আশ্রয়দাতা তাহাই বা এই কবুতরকে কে বলিল।"

এমাম সাহেব কবির উপস্থিত বুদ্ধিতে বড়ই মুগ্ধ হইয়া পড়িলেন আর সভাভঙ্গের পর তাঁহাকে পুরস্কার স্বরূপ বহু স্বর্ণমুদ্রা প্রদান করতঃ গুণগ্রাহীতা ও উদার হৃদয়ের পরিচয় প্রদান করিলেন।

এমাম সাহেব জীবনের অধিক কাল হেরাতেই অতিবাহিত করিয়াছেন। সুলতান্ খাওয়ারজম্ শাহ্ এমাম সাহেবের জন্য বহু সাজ সরঞ্জামে সজ্জিত এক শাহী প্রাসাদ হেবা স্বরূপ দান করিয়াছিলেন; তিনি ঐ প্রাসাদেই বাস করিতেন। এই প্রকার পার্থিব সম্পদের সহিত ঐহিক জ্ঞানের সমন্বয় অতি কম ভাগ্যবান লোকের জীবনেই পরিলক্ষিত হয়। তাঁহার অসাধারণ মনীষা, অনন্য সাধারণ প্রতিভা ও অতলবারিধি প্রায় জ্ঞানের বিজয় বারতা বিশ্ববীনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে মধুর ঝঙ্কার তুলিয়াছিল। মুসলিম জগতের দেশ-দেশান্তর হইতে শত শত যোজন পথ পায়ে দলিয়া, জ্ঞানপিপাসুগণ এই শান্তশীতল নির্ঝরিণীর পাশে জ্ঞান-পিপাসা মিটাইতে আসিতেন। দিগ্বিজয়ী প্রতাপশালী সম্রাটদের ন্যায় ভ্রমণ কালে তাঁহার দক্ষিণে বামে প্রায় তিনশত আলেম ভ্রমণ করিতেন। আলেম সমাজ তখন তাঁহাকে 'ফখরুদ্দিন অদ্‌দুনিয়া' আখ্যা প্রদান করিল। বাস্তবিক তাঁহার অসীম কৃতিত্বের সামনে তা-মোটেই অতিরঞ্জন হয় নাই।

এমাম সাহেব অতিসুষ্ঠু মধ্যম আকারের অতি সুপুরুষ ছিলেন। বিশ্বের জ্ঞানভাণ্ডারে অফুরন্ত দান রাখিয়া, মুসলিম-জাঁহানে কৃতিত্বের চির-জাগন্ত স্মৃতি রাখিয়া এই জ্ঞানবীর এমাম রাজী—অতি প্রিয়স্থান হেরাতে ৬০৬ হিঃ সনে নশ্বর জগত হইতে চির রোখসত গ্রহণ করেন।

এমাম সাহেবের বিরাট জীবনের সুবিস্তৃত আলোচনার স্থান এই ক্ষুদ্রতম প্রবন্ধ মোটেই নহে। তথাপি সে সম্বন্ধে অল্পবিস্তর কিছু না বলিলে তাঁহার কৃতিত্বের প্রতি ঘোর অবিচার করা হয়। আরবী ফেকাহ্, ওসুল ও তফসীর শাস্ত্রে তিনি যে প্রকার অদ্বিতীয় পণ্ডিত ছিলেন, দর্শন ও অন্যান্য সূক্ষ্ম জ্ঞানেও তাঁহার সমকক্ষ খুব কমই পরিলক্ষিত হয়। দর্শন শাস্ত্রের অবোধগম্য জটিল সমস্যা সমূহের সরল সমাধানে তিনি যে প্রকার কৃতিত্বের ও বিশিষ্টতার পরিচয় দিয়াছেন, তাহা আধুনিক ও প্রাচীন কোনও দার্শনিকের জীবনীতে প্রায়ই খুজিয়া পাওয়া যায় না। আফলাতুন ও আরাস্তুর জটিল সমস্যাগুলির সঠিক সমাধান এমাম রাজীর লেখাতেই পাওয়া যায়।

সর্ব্বপ্রথম এমাম রাজী সাহেবই দর্শনকে ধর্ম্মবিজ্ঞানের ছাঁচে আকার দান করেন। তিনি জগতের হিতার্থে সারাজীবন ব্যাপী সাধনা প্রসূত এক মূল্যবান রত্নভাণ্ডার রাখিয়া গিয়াছেন নিম্নে তাহার অতি অল্প কয়েকটির নাম দেওয়া গেল। *

তাঁহার সুচিন্তিত 'তফসীরে কবিরকে' তিনি যুক্তিতর্কের (Rationalism) ভিত্তির উপর স্থাপিত করিয়া নিজ বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিয়াছেন। নেহায়েত আজগুবি ধরণের গল্পগুলিকে যুক্তি তর্কের কষ্টিপাথরে সূক্ষ্ম বিচার করিয়া ন্যায়সঙ্গত মত প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার পূর্ব্বে যে সমস্ত 'তফসীর' লেখা হইয়াছে, যুক্তি তর্কের মাপ কাটিতে তাহাদের মূল্য অতি কম। যুক্তি তর্কের উপর কোরআনের ব্যাখ্যা লেখকদের আদিপুরুষ ইস্পিহান দেশীয় এমাম আবু মোসলেমের তিনি প্রথম তফসীরের এই নীতিকে যথাযথ-ভাবে অবলম্বন করিয়াছিলেন। আর তাঁহার পথ অনুসরণের কারণ সম্বন্ধে এমাম সাহেব বলেন:—

وابو مسلم حسن الكلام فی التفسیر كثیر الغوص
علی الد قائق و اللطائف-

"আবু মোছলেম তফছির সম্বন্ধে অনেক সুন্দর কথা বলিয়াছেন। কোরআনের সূক্ষ্ম তত্ত্ব ও নিগূঢ় তথ্য সম্বন্ধে তিনি অশেষ গবেষণা করিয়াছেন।" দূরদর্শী এমাম সাহেব

* مطالب عالیه - نهایة العقول - اربعین فی اصول الدین - محصل -
البیان و البرهان - مباحث عمادیه - تهذیب الدلایل - تاسیس المتقدمین - اجوبة المسائل - ارشاد
النظار الی لطائف الاسرار - تحصیل الحق - البینات فی شرح اسماء الله و الصفات - كتاب القضاء و القدر -
عصمة الانبیا - كتاب الخلق و البعث -

স্বীয় তফসীরে কোরআন শরীফের কেচ্ছা সমূহ এবং অন্যান্য জটিল আয়তের বিশুদ্ধ ব্যাখ্যা দ্বারা সারা মুসলিম সমাজের ভক্তির পাত্র হইয়া গিয়াছেন। কোরআনের অনেক স্থলে বনি-এস্রাইল বংশীয় নবীগণেরও পূর্ব্ববর্ত্তী 'উম্মতদের' সম্বন্ধে অনেক গল্প বর্ণিত আছে। সেই সমস্ত গল্পে কতিপয় তফছিরে অনেক অসত্য ও অযৌক্তিক সংস্কারের প্রশ্রয় দেওয়া হইয়াছিল।

বস্তুতঃ এই সমস্ত অতি রঞ্জিত কেচ্ছা কাহিনী এতই হৃদয়গ্রাহী ছিল যে নামজাদা বক্তাগণ তাহাদ্বারা লোকের বাহবা অর্জ্জন করিবার ও নিজের বাহাদুরি প্রকাশের মহাসুযোগ পাইত। পক্ষান্তরে চিন্তাশীল বিধর্ম্মীগণ ঐ সমস্ত অযৌক্তিক কাহিনী দ্বারা মুসলমান ধর্ম্মের ও কোর-আনের দোষ প্রমাণের সুযোগ করিয়া লইত।

এই সম্বন্ধে দুই চারিটি উদাহরণ আশা করি, সহৃদয় পাঠক বন্ধুদের খেদমতে অপ্রাসঙ্গিক বোধ হইবে না। সেকালের সব চেয়ে প্রসিদ্ধ তফসীর প্রণেতা 'আবু জাফর মোহাম্মদ এবনে হারীর' পর্য্যন্ত এহেন চিরাচরিত ভ্রান্তি হইতে মুক্তি পান নাই। হাবেল সহরের 'জোহরা' নাম্নী বারাঙ্গনা এসমে আজমের শক্তিতে আকাশে যাইয়া যে 'জোহরা সেতারার' রূপ ধরিয়া রহিয়াছে; এই প্রকার অযৌক্তিক ও ভিত্তিহীন কাহিনীও তাঁহার তফসীরে স্থান পাইয়াছে।

আবার পূর্ব্ববর্ত্তী অনেক তফসীরে নিম্নলিখিত কতকগুলি ভ্রান্ত কাহিনী বিদ্যমান ছিল; যাহাতে পূত চরিত্র নারীদের উপর ও দোষারোপ করা হইয়াছে; যেমন :—

( ক ) হজরত ইউসুফের পাপকাজে লিপ্ত হওয়ার নিমিত্ত প্রস্তুত হওয়া।

( খ ) হজরত আইউবের উপর সয়তান ক্ষমতাবান হওয়া এবং সয়তান তাঁহার ধনসম্পত্তি ও আত্মীয় পরিজনকে ধ্বংস করা।

( গ ) হজরত অদমের সয়তানের পরামর্শানুসারে স্বীয় পুত্রের নাম আবদুল হারেস্ রাখা। আবদুল হারেস অর্থ সয়তানের দাস।

( ঘ ) হজরত ইব্রাহিম জীবনে তিনবার মিথ্যা কথা বলা। ইত্যাদি।

এমাম রাজী যুক্তি তর্কের সাহায্যে এই সমস্ত ভ্রান্তিমূলক কাহিনীকে মিথ্যা প্রমাণ করিয়া; অসীম হৃদয়বলের, স্বাধীন ও অনন্য সাধারণ মনীষার পরিচয় দিয়াছেন। গতানুগতিক অন্ধবিশ্বাসের মূলচ্ছেদন পূর্ব্বক সর্ব্বত্র যুক্তিবাদের আলোকস্তম্ভ স্থাপন করিয়াছেন। বস্তুতঃ পূর্ব্বপন্থীদের মতের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশ করা তাঁহার মোটেই অভিপ্রেত ছিল না; বরং তাঁহাদের মতকে বারবার আঘাত করিয়া, যুক্তি তর্কের মাপ কাঠিতে তৌল করিয়া তাহা হইতে সত্যের পত্তন করাই তাঁহার জীবনের সার সাধনা ও শ্রেষ্ঠ আকাঙ্ক্ষা ছিল।

ইহার নিমিত্ত বার বার সমালোচনার তীব্র আঘাতে তাঁহার দেহকে ক্ষত বিক্ষত করিয়াছে; কিন্তু তিনি ছিলেন নিজ সঙ্কল্পে অচল, নিজ সিদ্ধান্তে অটল; আপন কর্ম্ম-পদ্ধতিতে দৃঢ়বিশ্বাসী স্বীয় সাফল্যে প্রবল আস্থাবান। (১)

---

(১) বহু শাস্ত্র বিশারদ মহামনীষী এমাম ফখরুদ্দিন রাজীর অগাধ পাণ্ডিত্য, অসাধারণ প্রতিভা এবং অদ্ভুত বিচারশক্তির তুলনা খুঁজিয়া পাওয়া বাস্তবিকই দুষ্কর। ধর্ম্মের ও জ্ঞানের দিকদিয়া এছলামের ও মুছলমানের যে খেদমত এমাম ছাহেব করিয়া গিয়াছেন, মুছলমান সমাজ তাহা কখনই বিস্মৃত হইতে পারিবে না। কিন্তু ন্যায়ের খাতিরে প্রত্যেক সুক্ষ্ম সমালোচককে স্বীকার করিতে হইবে যে, তাঁহার এই সকল বিচার বিতর্ক এবং আলোচনা গবেষণার মধ্যে অনেক গলৎ ও দোষ দুর্ব্বলতা রহিয়া গিয়াছে। আমাদের মতে এমাম ছাহেবের বিচার বিতর্কের বিশেষতঃ তাঁহার বিরাট তফছিরের প্রধান ত্রুটি এই যে, কোরআনের অভীষ্ট স্বর্গীয় অনুপ্রেরণার কোনও ঝঙ্কার তাহার মধ্যে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। সুক্ষ্ম জটিল দার্শনিক যুক্তি-জ্ঞানের দীর্ঘপরম্পরা প্রতিপক্ষের মতবাদ খণ্ডনের জন্য নৈয়ায়িক কূটবিতণ্ডার এবং অন্যান্য দিক দিয়া বহু উপাদেয় ও মূল্যবান তথ্য সেখানে পাওয়া যায় বটে—কিন্তু সাধকের আত্মার খোরাক যাহা, এমাম ছাহেবের তফছিরে তাহার সন্ধান খুব কমই পাওয়া যায়।

এমাম আবু মোছলেম এস্পেহানীর জ্ঞানালোকের

প্রভাবে হউক, অথবা অন্য কোন স্বতন্ত্র কারণে হউক, স্থানে স্থানে এমাম রাজী যে স্বাধীন চিন্তার পরিচয় দিয়াছেন, তাহা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু সত্য কথা এই যে, অধিকতর স্থানে তিনি অন্ধ গতানুগতিবাদের প্রশ্রয় দিতেও কুণ্ঠিত হন নাই। প্রবন্ধ লেখক এমাম এবনে জরির তাবরীর উপর ভিত্তিহীন অযৌক্তিক গল্প গুজব সঙ্কলনের যে দোষারোপ করিয়াছেন, এমাম রাজীও যে সম্বন্ধে মোটেই পশ্চাদ্পদ নহেন।

অনেক সময় মনে হয়, এমাম ছাহেব যেন নিজের মনের কথাগুলি মুখে ব্যক্ত করার মত যথেষ্ট সাহস পাইয়া উঠিতেছেন না। মো'তাজেলা সম্প্রদায়ের ও এমাম আবু মোছলেমের প্রতিবাদ স্থলে অনেক স্থানে দেখা যায় যে, তাঁহাদের মোকাবেলায় এমাম ছাহেব এমন কতকগুলি যুক্তি প্রমাণ উপস্থিত করিতেছেন, যাহা বাস্তবিকই যথেষ্ট বা সন্তোষজনক বলিয়া কখনই গৃহীত হইতে পারে না। অনেকে মনে করেন, ঐ সকল স্থলে গোপনে ও প্রকারান্তরে প্রতিপক্ষের মতবাদতে প্রতিষ্ঠিত করাই এমাম ছাহেবের প্রকৃত উদ্দেশ্য, কিন্তু সাধারণ অন্ধ-বিশ্বাসী আলেম সমাজের বিরুদ্ধাচরণের ভয়ে তিনি প্রকাশ্যভাবে তাহা স্বীকার করিতে পারেন নাই।

ফেকহ ও আকাএদ সম্বন্ধে এমাম ছাহেব শাফেয়ী মজহাবের গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ হইয়াছিলেন, এবং এজন্য এই সকল বিষয়ে তিনি একজন অসামান্য ধীমান উকীলের হিসাবে আমাদের বিশেষ সম্মানের পাত্র হইলেও, আবুবাকর রাজী, এবনে হাজ্‌ম, এবনে তাইমিয়া প্রভৃতির ন্যায় বিচারকের আসন তিনি গ্রহণ করিতে পারেন নাই। মানুষের স্বাধীন চিন্তা আর সৎসাহসের সত্যকার পরিচয় পাওয়া যায় তখন, যখন সত্যের অনুরোধে তাহাকে নিজের মজহাব গত সংস্কারের বিরুদ্ধে কথা বলিতে শোনা যায়। এমাম ছাহেবের নিকট এই শ্রেণীর স্বাধীন চিন্তার বিশেষ কোনও পরিচয় পাওয়া গিয়াছে বলিয়া আমাদের জানা নাই।

আল্লার কোরআনের সর্ব্বপ্রধান ব্যাখ্যাতা হইতেছেন—হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা, যাঁহার নিকট এই কালাম অবতীর্ণ হইয়াছিল। কোরআনের আয়ত সম্বন্ধে সেই হজরত মোহাম্মদ মোস্তফার মারফতে আমরা যে ব্যাখ্যা প্রাপ্ত হইতে পারি, তাহাই সমস্ত তফছিরকারের প্রধান অবলম্বন হওয়া উচিত। আমাদের মতে এমাম ছাহেব তাঁহার তফছিরে এ সম্বন্ধে যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করেন নাই।

এল্‌মে কালামের প্রথম রচয়িতাদিগের সময় হইতে মুফ্‌তী আবদুহু এবং সার ছৈয়দ ও মাওলানা শিবলী প্রভৃতির যুগ পর্য্যন্ত একটা অতিভ্রান্ত যুক্তিধারা সাধারণভাবে যুক্তিবাদের নামে মুছলমান সমাজকে ঘরের অন্ধানুকরণের স্থলে পরের অন্যায় অনুগতি করিতে স্বভ্যস্ত করিয়া ফেলিয়াছে। এই শ্রেণীর যুক্তিবাদীরা সর্ব্বপ্রথমে দেখিয়া লন যে, বর্ত্তমান যুগের ন্যায় দর্শন ও বিজ্ঞান, ধর্ম্মের সহিত সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলি সম্বন্ধে সাধারণতঃ কি প্রকার অভিমতকে স্বতঃসিদ্ধরূপে গ্রহণ করিয়াছে। তাহার পর তাঁহারা এছলামকে সেই সকল অভিমতের সহিত সমঞ্জস করিয়া লওয়ার জন্য 'টানা হেঁচড়া' করিতে থাকেন। ইহাতে যে ঘোর অনিষ্টের সৃষ্টি হইয়াছে, এখানে বিস্তারিতরূপে তাহার আলোচনা সম্ভবপর নহে। সংক্ষিপ্ত আভাসের হিসাবে এইটুকু বলিলে যথেষ্ট হইবে যে, তাঁহাদের এই সামঞ্জস্য সাধনের উৎকট আকাঙ্ক্ষার ফলে সেই সেই যুগের বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক থিউরিগুলি কালক্রমে মুছলমানের আকিদার অন্তর্ভুক্ত হইয়া পড়িয়াছে। তাহার পর গাড্ডরিক ধর্ম্মের চিরাগত নিয়ম অনুসারে সমাজের সম্মুখে শীঘ্র এমন অবস্থা উপস্থিত হয়, যখন ঐ বৈজ্ঞানিক থিউরিগুলি আমূল পরিবর্ত্তিত হইয়া গেলেও, তাহার সহিত সমীকৃত আকাএদ সংক্রান্ত সাময়িক সমাধান গুলিকেই সমাজ অপরিবর্ত্তনীয় এছলামী আকিদা বলিয়া আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকে। তখন পূর্ব্ব যুগের তামাদী বৈজ্ঞানিক থিউরি গুলির ন্যায় তাহার সহিত সমীকৃত আকিদা সংক্রান্ত এই সিদ্ধান্তগুলিও জ্ঞানী সমাজে হাস্যস্পদ হইতে থাকে।

আমাদের মতে এক্ষেত্রে প্রথম কর্ত্তব্য—সেই নৈয়ায়িক দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক মতবাদগুলির সত্যতার বাস্তব ও Positive প্রমাণগুলির অনুসন্ধান করিয়া দেখা। কারণ দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক দিগের অবলম্বিত সমস্ত থিউরি আর দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক সত্য যে এক বস্তু নহে, ঐ থিউরি গুলির ইতিবৃত্তই তাহার প্রধানতম প্রমাণ। এখানে ইহাও স্মরণ রাখিতে হইবে যে বিজ্ঞান ও ঈমান দুইটী সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র জগতের বস্তু। দর্শন বিজ্ঞানের লোহা ওজন করা

পাল্লায় ঈমানের হীরক কণাগুলি ওজন করা সঙ্গত হইতে পারে কিনা—এক্ষেত্রে তাহাও একটা প্রাথমিক প্রশ্ন।

একটা জায়গায় পৌঁছিয়া দর্শন বিজ্ঞান চীৎকার করিয়া বলিতেছে, এই গগন-চুম্বী পর্ব্বত চূড়ার অন্তদিকে কিআছে, তাহা আমরা জানি না। সেখানে যে কিছু নাই, এ দাবী বিজ্ঞান করে না—করিতে পারে না। করিতে পারে না—কারণ সে দেশটা বিজ্ঞানের মোটেই জানা নাই। যাহা আমার ইন্দ্রিয় গোচর হয় নাই, তাহার অস্তিত্ব সম্বন্ধে আমি সন্দিহান হইতে পারি বটে, কিন্তু তাহার নাস্তিত্বের দাবী করা কোনও ক্রমেই আমার পক্ষে সঙ্গত হইবে না। পক্ষান্তরে আদমের বা সভ্য মানবের আত্ম-প্রকাশের প্রথম দিন হইতে আজ পর্য্যন্ত যুগে যুগে দেশে দেশে ধারাবাহিকরূপে নবী, রছুল, অলি এবং সাধু ও সিদ্ধ মহাপুরুষগণ আসিয়া উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করিতেছেন যে—বিজ্ঞানের অজ্ঞাত সেই দেশটাকে তাঁহারা স্পষ্ট ও অনাবিলরূপে বাস্তব ও সাক্ষাৎ ভাবে দর্শন করিয়াছেন। এই দর্শনের সাক্ষ্য তাঁহারা সকলে সমবেত কণ্ঠে, বিভিন্ন ভাষায় কিন্তু অভিন্নভাবে প্রদান করিয়া গিয়াছেন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এই সাক্ষী পরম্পরার প্রত্যেক ব্যক্তি জিতেন্দ্রিয়' পরহিতপরায়ণ, স্বার্থ-সংশ্রবশূন্য, মহামনীষী এবং এক আদর্শ সত্যময় জীবনের অধিকারী বলিয়া শত্রু মিত্র সকলের দ্বারা সমান ভাবে পরিকীর্ত্তিত হইয়া আসিতেছেন। বিজ্ঞানের অজানা এবং এই সাক্ষী পরম্পরার সকলের বিশেষ ভাবে ও সমান ভাবে জানা সেই দেশটাকে লইয়াই ধর্ম্মের আসল লেনাদেনা। অবিকৃত মস্তিষ্ক এবং সাত্বিক জ্ঞানের অধিকারী সত্যান্বেষীকে এরূপ অবস্থায় বিচারের কোন পন্থা অবলম্বন করিতে হইবে, মূলনীতির হিসাবে এখানে তাহা প্রথমে আলোচনা করিয়া দেখা উচিত। দুঃখের বিষয় আমাদের কালাম শাস্ত্রকারেরা এই সকল—এবং এই শ্রেণীর অন্যান্য বহু আবশ্যকীয়—বিষয়ের প্রতি আদৌ মনোযোগ প্রদান করেন নাই। ফলে একদিকে মোহাদ্দেছগণের অবলম্বিত অছুলগুলির প্রতি সমাজকে আস্থাহীন করিয়া তোলা হইল, অন্যদিকে সমাধানের নামে বহু গুরুতর সমস্যাকে এছলামের ধর্ম্ম-বিজ্ঞানের মধ্যে চিরস্থায়ীভাবে প্রবেশ করাইয়া দিতে বিপরীত ঘটাইয়া দেওয়া হইল। তাঁহাদের সেই সামঞ্জস্য ও সমাধানগুলিই আজ এছলামের ও মোছলেম জাতির পক্ষে 'কাল' হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বলা বাহুল্য যে এমাম ফখরুদ্দিন রাজীর বিরুদ্ধেও এই অভিযোগগুলি সমান ভাবে প্রযুজ্য।

এখানে একটা সূক্ষ্ম ভ্রম সম্বন্ধে সাধারণ পাঠকগণকে সতর্ক করিয়া দেওয়া আবশ্যক বলিয়া মনে করিতেছি। আমরা উপরে বিজ্ঞানের অজানা দেশের কথা কহিয়াছি মাত্র। বিজ্ঞানের অজানা যেমন একটা দেশ আছে, তাহার জানা দেশও একটা আছে। বিজ্ঞানের সেই জানা দেশটার মধ্যে যে ব্যাপারগুলির অস্তিত্ব বা নাস্তিত্ব চরম ও চূড়ান্তরূপে সপ্রমাণ হইয়া গিয়াছে, সত্যকার এছলামী ধর্ম্মবিশ্বাসে তাহার বিন্দুবিসর্গ মাত্রও বিরোধ নাই। বরং এই শ্রেণীর সত্যগুলি দ্বারা তাহা অধিকতর সুদৃঢ় ও সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া যাইতেছে। কিন্তু এখানে দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে যে, এই পার্থক্যের প্রতি লক্ষ্য না করিয়া অন্য পক্ষের অন্ধ অনুকারী রক্ষণশীলের দল পূর্ব্বপুরুষগণের উল্লিখিত সামঞ্জস্য সাধন বা ভ্রান্ত নৈতিক এলমে-কালামের চাপে এবং অন্যান্য প্রকার অন্ধত্ব ও বদ্ধতার প্রভাবে বর্ত্তমানে এমনই দিশাহারা হইয়া পড়িয়াছেন যে, জ্ঞান-বিজ্ঞানের নির্দ্ধারিত শত শত নিত্য সত্যকে নিজেদের অন্ধ বিশ্বাসের যূপকাষ্ঠে বলিদান করিতে তাঁহারা একটুও কুণ্ঠিত হইতেছেন না। মজার কথা এই যে, এই প্রকার কার্য্য পদ্ধতিদ্বারা এছলামকে দুশ্‌মনের হামলা হইতে রক্ষা করিতেছেন বলিয়া স্পর্দ্ধা করিতেও তাঁহারা কুণ্ঠিত হন না। অথচ প্রকৃত পক্ষে সব চাইতে এছলামের ক্ষতি করিয়াছে ও করিতেছে—তাঁহাদের এই অজ্ঞানের অহমিকতা। পূর্ণিমা ও আমাবস্যা ব্যতীত যে চন্দ্রগ্রহণ ও সূর্য্যগ্রহণ হয় না, হইতে পারে না—ইহা একটা সনাতন সত্য। বর্ত্তমান সময়ের প্রাথমিক স্কুলের বালকেরা পর্য্যন্ত ইহা উত্তমরূপে স-প্রমাণ করিয়া দিতে পারে। এরূপ অবস্থায় যদি কোন তাবেয়ী বা অপর কেহ বলেন যে, হজরতের সময় চাঁদের ১১ই তারিখে সূর্য্যগ্রহণ হইয়াছিল, তাহা হইলে মোশাহাদা বা প্রত্যক্ষ সত্যের বিপরীত বলিয়া, সরাসরি বিচারেই আমরা তাঁহার বর্ণনাকে অগ্রাহ্য করিয়া দিতে পারি। কিন্তু অনুসন্ধিৎসু পাঠক দেখিয়া স্তম্ভিত হইবেন যে, অগ্রাহ্য করা ত দূরে থাকুক, এরূপক্ষেত্রে বিদ্রূপের কটাক্ষ সহকারে অট্টহাসি হাসিয়া তাঁহারা উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করিতেছেন :—"পূর্ণিমা ও আমাবস্যা ব্যতীত চন্দ্র ও সূর্য্যগ্রহণ হইতে পারে না বলিয়া জাহেল-জ্যোতির্ব্বিদের দল যে মূর্খতা প্রদর্শন করিয়া থাকে, এই রেওয়ায়েতের দ্বারা তাহা একেবারে বাতিল হইয়া গেল!"

অবশ্য সকল যুগে ও সকল দেশে অল্প-বিস্তর এরূপ একদল আলেমের অস্তিত্ব বিদ্যমান ছিল, ঘরের বা পরের কাহারও অন্ধ অনুকরণ না করিয়া সত্যকার মুক্ত স্বাধীন ও সাত্বিক বিবেক এবং সত্যকার মুক্ত বিচার বুদ্ধির সহায়তা গ্রহণ করিয়া এছলামের প্রকৃত স্বরূপকে গ্রহণ ও প্রকাশ করার আন্তরিক চেষ্টা যাঁহারা চিরকাল করিয়া আসিয়াছেন। একটা ক্ষুদ্র টিপ্পনী লিখিতে গিয়া কথা অনেকটা বাড়িয়া গিয়াছে, সুতরাং সে সব কথা আজ স্থগিত রাখাই সঙ্গত।

---

# বিধাতার ভিক্ষা

[ আবুল হাশেম বি, এ, ]

হাশরের দিন বিচারে বসিয়া
সুধা'বে জগৎ-স্বামী
"তুমিতো আমারে কর নাই সেবা
রুগ্ন ছিলাম আমি !"
কহিবে সেজন "তব সেবা হায়
ওগো নিখিলের প্রভু,
সাধ্য কি মোর ? নারিনু বুঝিতে।"—
কহিবে তখন বিভু,—
"ভৃত্য আমার রুগ্ন আছিল
সে কথা কি মনে আছে ?
সেবিলে তাহারে মোর দেখা তবে
পাইতে তাহার কাছে।"

আবার বিধাতা সুধাবে তখন—
"আদমের সন্তান,
ক্ষুধায় কাতর অন্ন চেয়েছি
করনি আমায় দান !"
কহিবে মানব "রাজ্জাক ওগো
তুমি নিখিলের স্বামী,
তোমারে কেমনে অন্ন দিতাম ?
নারিনু বুঝিতে আমি।"
কহিবেন খোদা "বান্দা আমার
অন্ন চাহিল দান,
যদি তারে দিতে, আজি হেথা তবে
পেতে তার প্রতিদান।"

আবার কহিবে "আদম তনয়,
চাহিলাম আমি জল ;
পিপাসার বারি দাওনি আমায়
এত ছিলে বিহ্বল !"
কহিবে সেজন, "তুমি পরমেশ,
তুমি চেয়েছিলে বারি ?
তোমার পিপাসা, অখিলের প্রভু
আমি কি মিটাতে পারি ?"
আল্ল কহিবে "বান্দা আমার
মাগিল তৃষায় জল,
দাওনি তাহারে, দিতে যদি তবে
আজি পেতে তার ফল।"

( মুছলীম, আবুহুরায়রা। )

# অসীম ধর্ম্মানুরাগ *

[ আবদুল কাদের ]

দ্বিতীয় 'খলিফা' 'হজরত' ওমর পরলোক গমন করিয়াছেন। প্রবল পরাক্রমে সার্দ্ধ দশবর্ষ কাল মোস্‌লেম জগতের শাসনদণ্ড পরিচালনা করিয়া মিসর ও পারশ্য সাম্রাজ্যে ইস্‌লামের বিজয়-বৈজয়ন্তী উড়াইয়া সেই মহাপ্রাণ বীরপুরুষ (৬৪১ খৃষ্টাব্দে) গুপ্ত ঘাতকের শাণিত অস্ত্রাঘাতে শহীদ হইয়াছেন, এবং ওস্‌মান ইস্‌লাম-তরণীর কর্ণধাররূপে তৃতীয় খলিফার পদে অভিষিক্ত হইয়াছেন।

মহাবীর আমারের বীরত্বে মিসরদেশ গ্রীক শাসন হইতে মুক্ত হইয়া মোস্‌লেম সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল। খলীফা ওমর তাঁহাকে তদীয় বীরত্বের পুরস্কার স্বরূপ বিজিত রাজ্যের শাসন কর্ত্তৃত্ব প্রদান করিয়াছিলেন। ওসমান খলীফা পদ প্রাপ্ত হইয়াই আমারকে মদিনায় আহ্বান এবং আবদুল্লাহ্ এব্‌নে সা'দকে মিসরের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিয়া পাঠাইলেন।

শূরবর আমার গ্রীক জাতির গর্ব্ব খর্ব্ব করিয়াছিলেন। তাঁহার মিশরে অবস্থানকালে গ্রীকগণ তাঁহার বিরুদ্ধে মস্তক উত্তোলন করিতে সাহসী হয় নাই; গ্রীক্ সম্রাটও মিসরে বৃথা অভিযান প্রেরণ করিয়া স্বীয় অপমানের ভার বৃদ্ধি করেন নাই। কিন্তু আমারের মিসর পরিত্যাগসংবাদ তাঁহার কর্ণগোচর হইলে তিনি হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করিতে মনস্থ করিলেন। অসংখ্য সৈন্যসহ সেনাপতি ম্যানুয়েল মিসর হইতে মোছলমানদিগকে বিতাড়িত করিতে প্রেরিত হইলেন। গ্রীক সেনাপতি আলেকজেন্দ্রিয়া অবরোধ করিলেন। নগরবাসী খৃষ্টানগণের বিশ্বাসঘাতকতা তাঁহার বিজয় লাভের সহায়তা করিল। আমার কর্ত্তৃক আলেকজেন্দ্রিয়া অধিকারের চারি বৎসর পরে পুনরায় উহা গ্রীক সম্রাটের হস্তগত হইল। মিসরে সমগ্র ভূ-খণ্ড গ্রীক্‌দের চির-পরিচিত। কিন্তু আবদুল্লাহ্ তথায় নবীন আগন্তুক। সম্পূর্ণ অজ্ঞাত দেশে তিনি গ্রীক্‌বাহিনী বিতাড়িত করিবার যথোচিত উপায় অবলম্বন করিতে সমর্থ হইলেন না। পক্ষান্তরে মিসর সম্বন্ধে আমারের পূর্ণ অভিজ্ঞতা ছিল। আলেকজেন্দ্রিয়ার পতনে মিশরবাসীরা আমারের অভাব বিশেষভাবে অনুভব করিল। আমারকে পুনরায় মিসরে প্রেরণ করিবার জন্য তাহারা খলীফার নিকট আবেদন করিল। এই ঘটনায় খলিফাও স্বীয় ভ্রান্তি বুঝিতে পারিলেন। ফলে অবিলম্বে মহাবীর আমার পুনরায় মিসরে প্রেরিত হইলেন। তাঁহার আগমনে ঘটনা-স্রোত সম্পূর্ণ বিপরীত দিকে প্রবাহিত হইল। ভীষণ যুদ্ধে শোচনীয়রূপে পরাভূত হইয়া ধ্বংসাবশিষ্ট সৈন্যসহ রোমক সম্রাটের খ্যাতনামা সেনাপতি জলপথে কনষ্টান্টিনোপলে পলায়ন করিলেন।

এইরূপে মিশরে পূর্ণ শান্তি স্থাপিত হইলে খলীফা পুনরায় আব্‌দুল্লাহ্‌কে মিশরের শাসনকর্ত্তৃত্ব প্রদান করিলেন। পূর্ব্ব পরাজয়ের অপমান-স্মৃতি তাঁহার হৃদয়ে দৃঢ়ভাবে জাগরূক ছিল। তিনি মিশরের পশ্চিম প্রান্তের অজ্ঞাত প্রদেশ সমূহ স্বীয় অধিকারভুক্ত করিয়া পূর্ব্ব অপমানের কলঙ্ক ভার দূর করিতে দৃঢ়সঙ্কল্প হইলেন। তদনুসারে আব্‌দুল্লাহ্ চল্লিশ সহস্র সৈন্যসহ লিবিয়ার ভীষণ মরু-প্রান্তর অতিক্রম করতঃ ত্রিপলী নগরের সন্নিকটে উপস্থিত হইলেন। যে গ্রীক্ সৈন্যদল নগরবাসীদের সাহায্যার্থ আসিয়াছিল, তাহারা মোছলমানগণের হস্তে সমূলে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইল। আবদুল্লাহ্ সসৈন্যে ত্রিপলী অবরোধ করিলেন। কিন্তু নগর অধিকারের পূর্ব্বেই আবদুল্লাহ্‌কে এক ভীষণ বিপদের সম্মুখীন হইতে হইল। গ্রীক্ সম্রাট কনষ্টান্টাইনের আদেশে

---

* ধর্ম্মবীর জোবেরের পবিত্র জীবনের একটা গৌরবময় ঘটনা লইয়া এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধ বিরচিত হইল। ঘটনাটী বিখ্যাত ইংরেজ ঐতিহাসিক সাইমন্ অক্‌লী বি, ডি প্রণীত "আরব জাতির ইতিহাস" নামক ইংরেজী গ্রন্থাবলম্বনে লিখিত। ২৬৫—২৭৪ পৃষ্ঠা।—লেখক।

রোমক সেনাপতি গ্রেগরি ( Gregory ) একলক্ষ * সুসজ্জিত সৈন্যসহ মোছলেম-বাহিনী পর্য্যুদস্ত করিতে ত্রিপলী যাত্রা করিলেন। তাঁহার উপস্থিতিতে আবদুল্লাহ্‌কে নগর অবরোধ পরিত্যাগ করিয়া গ্রীক্ সেনাপতির সহিত শক্তি পরীক্ষায় প্রবৃত্ত হইতে হইল। ত্রিপলীর সম্মুখস্থ বিশাল বালুকাময় প্রান্তরে যুদ্ধ চলিতে লাগিল। প্রত্যহ সূর্য্যোদয় হইতে মধ্যাহ্নকাল পর্য্যন্ত যুদ্ধ হইত। সূর্য্য মধ্যগগনে উপনীত হইলে রণ-ভূমির বালুকারাশি জলন্ত অগ্নিবৎ উত্তপ্ত হওয়ায় বাধ্য হইয়া উভয় পক্ষকেই রণে ক্ষান্ত দিয়া স্ব স্ব শিবিরে আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইত। এইরূপে কিছুদিন ভীষণ সংগ্রাম চলিল। কিন্তু জয়-পরাজয় অনিশ্চিত রহিল। সৈন্যগণের সংখ্যাধিক্য সত্বেও আরববাহিনীকে পর্য্যুদস্ত করিতে পারিতেছেন না দেখিয়া গ্রেগরী অত্যন্ত চিন্তান্বিত হইয়া পড়িলেন। অবশেষে তিনি মোছলেম সেনাপতির নিধন সাধন করতঃ আরববাহিনীকে নেতৃহীন ও নিঃসহায় করিয়া তাহাদের ধ্বংস সাধন করিবার উদ্দেশ্যে কৌশল-জাল বিস্তার করিলেন। তাঁহার যুদ্ধ বিদ্যাকুশলা এক অতুলনীয়া রূপ-লাবণ্যবতী দুহিতা † ছিল। কন্যা স্বীয় জনকের সহকারিণীরূপে যুদ্ধে যোগদান করিয়া বিপক্ষ সৈন্য দলন করিতেন। তদীয় অনুপম সৌন্দর্য্যরাশি উভয় পক্ষের যুবক সৈনিকগণের মনঃপ্রাণ হরণ করিত। গ্রেগরী ঘোষণা করিলেন, কি গ্রীক, কি মোছলেম—যে কেহ মোছলেম সেনাপতির মস্তক তাঁহাকে প্রদান করিবেন, তিনিই সেই কন্যারত্ন লাভের অধিকারী হইবেন। কেবল তাহাই নহে, তাঁহাকে এতদুপরি আরও একলক্ষ স্বর্ণমুদ্রা পুরস্কার স্বরূপ প্রদত্ত হইবে। এই ঘোষণাবাণী শ্রবণে গ্রীকগণ আবদুল্লার জীবননাশের জন্য প্রাণপণে চেষ্টিত হইল। গ্রেগরী মনে করিয়াছিলেন, তাঁহার সৈন্যগণ মোছলেম সেনাপতির প্রাণবধে অসমর্থ হইলে অন্ততঃ কোন মোছলেম সৈন্য সেই অমূল্য পুরস্কার লোভে আবদুল্লার প্রাণনাশ করিবে। কিন্তু গ্রীক সেনাপতি আরব-চরিত্র সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করিয়াছিলেন। ভোগ-বিলাস ও লোভ-লালসা তখন আরব জাতির হৃদয়ে আদৌ প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ হয় নাই। আবদুল্লার ছিন্ন মস্তক গ্রীক্-শিবিরে প্রেরণ দূরের কথা, যাহাতে গ্রীক সৈন্যের হস্ত হইতে তাঁহার জীবন নিরাপদ থাকে, তজ্জন্য তাঁহারা বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করিলেন। সেনাপতির মৃত্যু তাঁহাদের পক্ষে পরাজয়েরই নামান্তর মাত্র, তাহা তাঁহারা বিশেষ ভাবে বুঝিতে পারিয়াছিলেন। তাই সৈনিকদের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে আবদুল্লাহ্ রণ-ক্ষেত্র পরিত্যাগ করতঃ শিবিরে অবস্থান করিতে বাধ্য হইলেন।

এই সময় জোবের নামক একজন বিখ্যাত রণ-নিপুণ আরব সেনানায়ক সৈন্যসহ আবদুল্লার সাহায্যার্থ যুদ্ধক্ষেত্রে উপনীত হইলেন। তিনি দেখিলেন আরব সৈন্যগণ বিশৃঙ্খল ভাবে যুদ্ধ করিতেছে। ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিবার জন্য তিনি চতুর্দ্দিকে সেনাপতির অনুসন্ধান করিলেন। কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রের কোথাও তাঁহার সাক্ষাৎ পাইলেন না। অবশেষে অবগত হইলেন আবদুল্লাহ্ গ্রীকদের ঘোষণা-বাণী শ্রবণে ভীত হইয়া জীবনাশঙ্কায় শিবিরে অবস্থান করিতেছেন। ত্রিপলী প্রান্তরে আফ্রিকার উপর গ্রীক মোস্লেমের ভাগ্য-পরীক্ষা চলিতেছে, আর মোস্লেম-সেনাপতি শিবিরে বসিয়া বিশ্রাম-সুখ উপভোগ করিতেছেন!! প্রবল ক্ষোভে ও ক্রোধানলে জোবেরের হৃদয় দগ্ধীভূত হইতে লাগিল। তিনি তৎক্ষণাৎ যুদ্ধস্থল পরিত্যাগ করিয়া অশ্বারোহণে সেনাপতির শিবিরে উপস্থিত হইলেন। জোবের আবদুল্লাহ্‌কে শিবিরে উপবিষ্ট দেখিয়া তীব্র ভর্ৎসনার সহিত বলিলেন ছি, ছি, "শিবির-ই কি মোস্লেম-সেনাপতির যোগ্য স্থান?" জোবেরের তিরস্কার বাক্য শ্রবণ করতঃ আবদুল্লাহ্ তাঁহাকে গ্রীক-সেনাপতির ঘোষণার কথা শুনাইলেন, "এই ব্যাপারে তিনি নিরপরাধ। বন্ধু-বান্ধবগণের অনুরোধে বাধ্য হইয়া অনিচ্ছা সত্বেও তাঁহাকে শিবিরে অবস্থান করিতে হইতেছে তিনি কৈফিয়ৎ স্বরূপ ইহাও বলিলেন।" বীরবর জোবের উত্তর দিলেন—নিশ্চয়ই আপনি অপরাধী; বন্ধুবর্গের কাপুরুষোচিত উপদেশের

---

* কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে রোমক সেনাপতির নাম 'গ্রে'গ্রয়াস' এবং রোমক সৈন্য সংখ্যা একলক্ষ বিংশতি সহস্র ছিল। প্রচলিত বাঙ্গালা ইতিহাস সমূহ এই মতের পরিপোষক। আমরা এস্থলে "মিলজার" মতের অনুসরণ করিলাম। গ্রীক-সৈন্য সংখ্যা একলক্ষ বিংশতি সহস্র ধরিলেও উহা মোস্লেম সৈন্যের তিন গুণ ছিল।

† আক্ষেপের বিষয় আমরা এই মহিলার নাম সংগ্রহ করিতে পারিলাম না। কি মিলুস্, কি অক্লী—কি বাঙ্গালী ঐতিহাসিকগণ, সকলেই তাঁহার নাম সম্বন্ধে নির্ব্বাক।—লেখক।

বশবর্ত্তী হওয়াই আপনার অপরাধ। এইভাবে শিবিরে বসিয়া থাকায় আপনার ভীরুতাই প্রকাশ পাইতেছে। গ্রীক-সেনাপতি আপনার মস্তকের মূল্য নির্দ্ধারিত করিয়া দিয়াছেন; আপনিও গ্রেগরীর মস্তকের মূল্য নির্দ্দিষ্ট করিয়া মোসলেম-সৈন্য মধ্যে ঘোষণা প্রচার করুন,—যিনি গ্রেগরীর মস্তক আনয়ন করিবেন, তিনিই তাঁহার বন্দিনী কন্যা এবং লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা প্রাপ্ত হইবেন।" বীরবর জোবেরের এই বাক্যে আবদুল্লার জ্ঞানচক্ষু উন্মিলিত হইল। তিনি তদ্দণ্ডেই জোবের সহ যুদ্ধক্ষেত্রে উপনীত হইয়া ঘোষণা প্রচার করিলেন—যে বীরপুরুষ গ্রেগরীর মস্তকচ্ছেদন করিতে সমর্থ হইবেন, তাঁহাকে গ্রেগরী-দুহিতা এবং এক লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা পারিতোষিক প্রদত্ত হইবে।

এই ঘোষণা আরব সৈন্য মধ্যে তড়িৎ শক্তির ন্যায় কার্য্য করিল। তাঁহারা বহু চিন্তা করিয়া অবশেষে গ্রীক্-বাহিনী বিধ্বস্ত করিবার এক অভিনব উপায় উদ্ভাবন করিলেন। পর দিবস প্রাতঃকালে উভয়পক্ষে যথারীতি যুদ্ধ আরম্ভ হইল। কিন্তু এ দিবস আরব সৈন্যের একাংশ মাত্র যুদ্ধে যোগদান করিল। অবশিষ্ট সৈন্যগণ জোবেরের পরামর্শে শিবিরের অভ্যন্তরে লুক্কায়িত হইয়া রহিল। পক্ষান্তরে সমুদয় গ্রীক সৈন্য যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। ফলে আরববাহিনীর এক বৃহদংশ সম্পূর্ণ ক্লান্তিহীন অবস্থায় অবসরের প্রতীক্ষায় রহিল।

ত্রিপলীর ভীষণ মরু-প্রান্তর। মধ্যাহ্ন-সূর্য্য-কিরণে বালুকণা অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ন্যায় উত্তপ্ত হইয়া উঠিল। উর্দ্ধে প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড-তাপ নিম্নে অগ্নিবৎ উত্তপ্ত বালুকারাশি। সৈন্যদল সে প্রখর তাপ সহ্য করিতে অসমর্থ হইয়া যুদ্ধে বিরত হইয়া স্ব স্ব শিবিরে প্রস্থান করিল। রণক্লান্ত আরব ও গ্রীক সৈন্যগণ অস্ত্রশস্ত্র ও অন্যান্য যাবতীয় যুদ্ধ সজ্জা পরিত্যাগ করিয়া বিশ্রামসুখ উপভোগ করিতে প্রবৃত্ত হইল। গ্রীকগন ক্ষণমাত্র বিশ্রাম লাভ করুক ইহা জোবেরের অভিপ্রেত ছিল না। সংগ্রাম নিয়োজিত ক্লান্ত আরব-সৈন্যগন শিবিরে প্রত্যাগত হইবামাত্র, যে সমুদয় সৈন্য যুদ্ধে যোগদান করে নাই, তাহারা জোবেরের ইঙ্গিতে লুক্কায়িত স্থান হইতে বহির্গত হইল; এবং পূর্ণ রণসাজে সজ্জিত হইয়া জোবেরের অধিনায়কত্বে গ্রীক শিবিরাভিমুখে অগ্রসর হইল। শ্রান্ত গ্রীক-সৈন্যদল অসময়ে আরবগণের এইরূপ অপ্রত্যাশিত আক্রমণে নিতান্ত বিস্মিত ও শঙ্কিত হইল। তাহারা সত্বর অস্ত্রশস্ত্র গ্রহণ করিয়া আরবদিগকে বাধা প্রদান করিতে শৃঙ্খলা সহকারে দণ্ডায়মান হইল, কিন্তু কোনই ফললাভ করিতে পারিল না। শ্রান্ত গ্রীকসৈন্য তেজোদীপ্ত ধর্ম্মোন্মাদ আরববাহিনীর প্রচণ্ড আক্রমণ সহ্য করিতে না পারিয়া অল্পক্ষণ মধ্যেই ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল। গ্রীকশিবির বিধ্বস্ত এবং বহু সহস্র গ্রীক হতাহত হইল। স্বয়ং সেনাপতি গ্রেগরীও ভব-যন্ত্রণা হইতে বিমুক্ত হইলেন। নিহত গ্রীকগণের দেহ-নিসৃত শোণিত-স্রোতে শুষ্ক মরুভূমি প্লাবিত হইল। যাহারা কোনরূপে প্রাণরক্ষা করিতে সমর্থ হইল, তাহারা যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিয়া সুজেতলা ( Sujetala ) নগরীতে আশ্রয় গ্রহণ করিল। বীরবর জোবের ও সসৈন্যে তাহাদের পশ্চাদ্ধাবন করিয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। নগর প্রাচীর তাহাদের অগ্রগতিতে বাধা প্রদান করিল; কিন্তু বিজয়োৎসাহী মোসলেম সৈন্যের সম্মুখে সে বাধাও টিকিতে পারিল না। প্রথম আক্রমণেই প্রাচীর বিধ্বস্ত ও নগর অধিকৃত হইল। গ্রেগরীর বীর দুহিতা বীরত্ব-ব্যঞ্জক বাক্যে স্বীয় সৈন্যগণকে উদ্দীপ্ত করিয়া কিয়ৎকাল মোসলেম-সৈন্য দলের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষা করিলেন কিন্তু তাঁহার বীরত্ব—তাঁহাকে শেষ পর্য্যন্ত রক্ষা করিতে পারিল না। তিনি আরব-সৈন্য হস্তে ধৃত হইয়া আবদুল্লার সম্মুখে আনীত হইলেন। ধ্বংসাবশিষ্ট গ্রীক-সৈন্যগণ আরব-বাহিনীর হস্তে নিহত ও বন্দিকৃত হইল। গ্রীকদের ধনাগার মোসলেম সৈন্যগণের হস্তগত হইল। আবদুল্লাহ্ সমুদয় অর্থই যুদ্ধজয়ী সৈনিকগণের মধ্যে বিভাগ করিয়া দিতে আদেশ প্রদান করিলেন। ঐ অর্থরাশির পরিমাণ এত অধিক ছিল যে, প্রত্যেক অশ্বারোহী দুই সহস্র এবং প্রত্যেক পদাতিক এক সহস্র স্বর্ণ মুদ্রা প্রাপ্ত হইয়াছিল।

এইরূপে ত্রিপলী-বিজয় সম্পন্ন ও আবদুল্লার প্রনষ্ট গৌরবের পুনরুদ্ধার সাধন হইল। পক্ষান্তরে ত্রিপলী ও সুজেতলায় মাত্র চল্লিশ সহস্র মোসলেম-সৈন্য হস্তে মহান গ্রীক সম্রাটের একলক্ষ সুশিক্ষিত সুসজ্জিত রোমক-সৈন্য সমূলে ধ্বংস প্রাপ্ত হইল। সুদূর আফ্রিকার অনন্ত-বিস্তৃত বালুকাময় মরুভূমিতে ইসলামের বিজয়-পতাকা উড্ডীয়মান হইয়া গ্রীক সম্রাটের সৌভাগ্য-রবির চির অস্তগমন ঘোষণা করিল।

যুদ্ধশেষে আবদুল্লাহ গ্রেগরীর হত্যাকারীকে প্রতিশ্রুত পুরস্কার গ্রহণার্থ আহ্বান করিলেন। কিন্তু তাঁহার আহ্বান ব্যর্থ হইল। কেহই পুরস্কার দাবী করিতে অগ্রসর হইল না। মানুষ কিরূপে ঈদৃশ বিপুল লোভ সংবরন করিতে পারে, ইহা ভাবিয়া আবদুল্লাহ্ অতি মাত্রায় বিস্মিত হইলেন। কিন্তু গ্রেগরী-হত্যাকারী দীর্ঘকাল আত্মগোপন করিতে সমর্থ হইলেন না। ঘটনা-চক্রে পরিশেষে তাঁহাকে আত্মপ্রকাশ করিতে হইল। অন্যান্য সৈনিকগণের সহিত বীরবর জোবেরও তথায় উপস্থিত ছিলেন। গ্রেগরী-দুহিতা বন্দিনীভাবে আবদুল্লার নিকটেই অবস্থান করিতেছিলেন। সহসা জোবেরের প্রতি দৃষ্টিপাত হওয়া মাত্র পিতৃশোকাতুরা কন্যা বিকট স্বরে চীৎকার করিয়া উঠিলেন। ইহা হইতেই সকলে বুঝিতে পারিল, জোবের-ই গ্রেগরীর হত্যাকারী। বিপুল অর্থ ও অনুপম লাবণ্যময়ী ললনার প্রতি জোবেরের এই বীতস্পৃহা দর্শনে বিস্মিত হইয়া আবদুল্লাহ্ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কেন আপনার বিজয়-লব্ধ ন্যায্য প্রাপ্য দাবী করিতেছেন না?" ইহা শুনিয়া ধর্ম্মপ্রাণ বীর-পুরুষের বীরহৃদয় সংক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল। তিনি বলিলেন, "আমি ধর্ম্মের জন্য সংগ্রাম করিয়াছি। কোন প্রকার হীন উদ্দেশ্যে প্ররোচিত হইয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হই নাই, আমি মাত্র আল্লার জন্য অস্ত্রধারণ করিয়াছিলাম। আমার আকাঙ্ক্ষা সফল হইয়াছে। ত্রিপলীর দুর্গ শীর্ষ হইতে খৃষ্টানের ক্রুশ-লাঞ্ছিত পতাকা অন্তর্হিত ও ইসলামের বিজয় বৈজয়ন্তী উড্ডীয়মান হইয়াছে। ইহাই আমার শ্রেষ্ঠ পুরস্কার। গ্রীক-সেনাপতি আমার হস্তে মৃত্যুবরণ করিয়াছেন বলিয়া আপনি আমাকে যে পুরস্কার প্রদান করিতে চাহিতেছেন, আপনার সেই অকিঞ্চিৎকর পার্থিব পুরস্কার অপেক্ষা ইহা সহস্র গুণে শ্রেয়ঃ।" * এই বলিয়া ধর্ম্মাত্মা জোবের সেই বিপুল বৈভব ও সুন্দর রমণীরত্ন অবজ্ঞাভরে প্রত্যাখ্যান করিলেন। সেনাপতি আবদুল্লাহ্ এবং উপস্থিত জনমণ্ডলী জোবেরের এই নিঃস্বার্থ ধর্ম্মানুরাগ এবং নির্লোভ প্রকৃতির উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত-দর্শনে বিস্ময়ে নির্ব্বাক হইয়া রহিলেন। কিন্তু আবদুল্লাহ্ তজ্জন্য স্বীয় প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করিয়া মহাগ্রন্থ কোর-আনের কঠোর আদেশ † অগ্রাহ্য করিতে সাহসী হইলেন না। ঊর্দ্ধতম কর্ম্মচারীর অলঙ্ঘ্য আদেশে বাধ্য হইয়া সম্পূর্ণ অনিচ্ছাসত্ত্বেও জোবেরকে প্রতিশ্রুত পুরস্কার গ্রহণ করিতে হইল। (১) কেবল তাহাই নহে, সমুদয় সেনানায়কগণের মধ্য হইতে আবদুল্লাহ্ একমাত্র জোবেরকেই নির্ব্বাচিত করিয়া মহামান্য খলীফাকে ত্রিপলী বিজয়ের সুসংবাদ জ্ঞাপন করিবার জন্য মদিনায় প্রেরণ করতঃ তাঁহার ধর্ম্মানুরাগ ও সামরিক প্রতিভার উপযুক্ত সম্মান প্রদর্শন করিলেন।

বীর-শ্রেষ্ঠ জোবেরের ধর্ম্মপ্রাণতা অনুপম। স্বর্ণের চাক্‌চিক্য, রমণীর অতুল সৌন্দর্য্য—কিছুই তাঁহার ধর্ম্মময় বীর-হৃদয় বিক্ষুব্ধ করিতে সমর্থ হয় নাই। তাঁহার ধর্ম্ম ভাবের নিকট সমুদয় লালসাই সমুদ্র-স্রোতে তৃণের ন্যায় ভাসিয়া গিয়াছিল। পুরস্কার গ্রহণার্থ সেনাপতির আহ্বান-বাণী শ্রবণেও তিনি নিজকে গ্রেগরির হত্যাকারী বলিয়া দাবী করেন নাই। দৈবক্রমে তাঁহার কৃতকার্য্য প্রকাশিত না হইলে তিনি যে কিছুতেই প্রতিশ্রুত পুরস্কারের লোভে আত্মপ্রকাশ করিতেন না, তাহা ধ্রুব-নিশ্চিত। শাসনকর্ত্তার আদেশ অমান্য করিবার তাঁহার ক্ষমতা ছিল না। যদি থাকিত, তবে তিনি সে পুরস্কার আদৌ গ্রহণ করিতেন না, যে তেজোদীপ্ত ভাষায় তিনি তাঁহার বক্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন—তাহাতে তাঁহার যে অলৌকিক ধর্ম্মপ্রাণতা প্রকাশ পাইয়াছে, জগতের অন্যান্য জাতির ইতিহাসে তাহার তুলনা বিরল।

* "Why do you not claim the rich reward of your conquest ?" inquired Abdullah, in astonishment at the modesty or indifference of Zobeir at the sight of so much beauty. "I fight," replied the enthusiast, for glory and religion, and despise all ignoble means,"—Mills. Vide Simon Ockley B. D's "History of the Saracens", pp 274-

† " وا وفوا بالعهد - ان العهد كان مسؤ و لا "— قران مجيد

"And be faithful to your promise; verily a promise shall be enquired of"—Holy Qoran Chapter xvii. 36.

(১) জোবের পরিশেষে ঘোষিত পুরস্কার গ্রহণ করিয়াছিলেন কিনা, সে সম্বন্ধে বাঙ্গালা ঐতিহাসিকগণ কোন উচ্চবাচ্য করেন নাই। মিলস্ বলেন, "The general of the Saracens, however, forced upon the reluctant chief the virgin and the gold." অর্থাৎ তাঁহার মতে সারাসেন সেনাপতি জোবেরকে তাঁহার অনিচ্ছাসত্ত্বেও সেই কুমারী এবং অর্থ গ্রহণে বাধ্য করিয়াছিলেন। অকলা এ বিষয়ে একেবারে নীরব। তিনি মিলসের বর্ণনা উদ্ধৃত করিয়া দিয়াই কর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়াছেন। আমরা বরাবর মিলসের অনুসরণ করিয়া আসিয়াছি সুতরাং এ স্থলেও তাঁহারই মত গ্রহণ করিলাম। বাধ্য-বাধকতার উপর লোকের কোন হাত নাই। জোবের যখন বাধ্য হইয়াই সেই পুরস্কার গ্রহণ করিয়াছিলেন, তখন তাহাতে তাঁহার ধর্ম্মানুরাগের আদৌ কোন হানি হয় নাই বলিয়াই আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস। বরং ঐ আদেশ পালন না করিলেই সেনাপতির অবাধ্যতা দোষে জোবেরকে দোষী হইতে হইত।—লেখক।

# হোরার যুদ্ধ ও মদিনা ধ্বংস

( মোহাম্মদ আবদুর রশীদ বি, এ, বি, টী )

এক দিবস হজরত মোহাম্মদ ( দঃ ) মদিনা শরিফ হইতে সৈন্যসহ তিন মাইল দূরবর্ত্তী হোরা নামক প্রান্তরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি চলিতে চলিতে হঠাৎ প্রান্তরের মধ্যস্থলে বসিয়া পড়িলেন। ইহা দেখিয়া সাহাবাগণ বিস্ময় বিমুগ্ধ এবং অজ্ঞাত আশঙ্কায় স্তম্ভিত হইলেন। তাঁহারা নবীয়ে আকরামের সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, তাঁহার দুনয়ন দিয়া অশ্রুধারা প্রবাহিত হইতেছে। ভীত হইয়া তাঁহারা তাঁহাকে এই আকস্মিক শোকের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। হজরত রছুলে করিম উত্তর দিলেন "এই স্থান আমি আমার শত শত প্রিয় সাহাবাগণের রক্তে রঞ্জিত দেখিতেছি। আমার সাহাবাগণ ধর্ম্মের শত্রুও মোসলেম জাতির শত্রু নিচয়ের সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে এই প্রান্তরে সকলেই এক সময় সহিদ হইবেন। তাই আমি এই স্থান সাহাবা রক্তে কর্দ্দমাক্ত দেখিতেছি। তাহাদিগের শোণিত স্রোতের উপর দিয়া আমার চরণ চলিতে চাহিতেছে না।" হজরত নীরব হইলেন।

হোরার যুদ্ধ কারবালার যুদ্ধ অপেক্ষা শোচনীয়। কারবালায় এমাম হোসায়েন সত্যের নিমিত্ত বীরত্ব সহকারে প্রতিপক্ষ সৈন্যদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়া সহিদ হইয়াছিলেন, সৈন্যদিগের মধ্যে হজরত মোহাম্মদ ( দঃ ) এর অমৃতময়ী বাণী শ্রবণকারী সাহাবা কেহ ছিলেন না বলিলেই হয়। কিন্তু হোরার যুদ্ধে মোসলেম সাম্রাজ্যের প্রাচীন রাজধানী মদিনার যাবতীয় সাহাবা, তাবেইন, তাবে-তাবেইন সকলেই সহিদ হওয়ায় মোসলেম সাম্রাজ্যের ও ইসলাম ধর্ম্মের যে ভীষণ ক্ষতি ও অনিষ্ট সাধিত হইয়াছিল সে ক্ষতি পরে কিছুতেই পূরণ করা যায় নাই, সে অনিষ্টের তুলনা নাই।

কারবালায় এমাম হোসায়েন ও তাঁহার সঙ্গীগণকে পানীয় অভাবে ভীষণ কষ্টে ফেলিয়া অমানুষিক বর্ব্বরতার সহিত সহীদ করিয়া এজিদ্ যে কলঙ্ক অর্জ্জন করিয়াছিল, হোরার যুদ্ধের নৃশংস অত্যাচার ও অমানুষিক বর্ব্বরতার বিষয় চিন্তা করিলে হোরার যুদ্ধই এজিদের পক্ষে তদপেক্ষা অধিক কলঙ্কজনক বলিয়া প্রতীয়মান হয়, সে বর্ব্বরতা, নৃশংসতা, অত্যাচার কাহিনী ও হত্যাকাণ্ডের বিবরণ সম্যক-রূপে লেখনী প্রকাশ করিতে অক্ষম।

পাপাসক্ত এজিদ এমাম হোসায়েনের শাহাদতের পর বিপদের গুরুত্ব অনুভব করিয়া এমাম হোসায়েনকে সহিদ করিবার দায়িত্ব অস্বীকার করতঃ হত্যাকারীকে শাস্তি বিধানের চেষ্টা করিয়াছিল এবং এমামের পুরমহিলাবৃন্দকে সসম্মানে মদিনায় ফিরিয়া যাইবার সুবন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছিল। *

এমামের পুরমহিলাবৃন্দের মদিনায় প্রত্যাবর্ত্তনের পর মদিনাবাসিগণ এজিদের উপর যৎপরোনাস্তি ক্ষুব্ধ হন, তার পর তাহারা এজিদের দুষ্কর্ম্ম-কাহিনী শুনিয়া তাহাকে খলিফা বলিয়া অস্বীকার করিয়াছিল। কিন্তু বিজ্ঞ ও দূরদর্শী সাহাবাগণ তাহাকে খলিফা বলিয়া অস্বীকার করিবার পূর্ব্বে আবদুল্লা বিন-খানজালা, আবদুল্লা বিন-আবি-উমর ও জুবায়ের-তনয় মখজুমী ও মনজুরী প্রভৃতি মদিনার শরিফদিগকে এজিদের চরিত্র অনুসন্ধানের নিমিত্ত দামেস্কে পাঠাইয়া দেন।

এজিদ তাঁহাদিগকে সাদরে গ্রহণ করিয়াছিল। তাঁহারা কিছুদিন দামেস্কে অবস্থানপূর্ব্বক এজিদের ঘৃণিত কার্য্যাবলি পর্য্যবেক্ষণ করিয়া মদিনায় ফিরিয়া আসেন। তাঁহারা দামেস্ক হইতে চলিয়া আসিবার পূর্ব্বে সুচতুর এজিদ খানজালা-তনয় আবদুল্লাকে এক লক্ষ দেরেম পুরস্কার দিয়া সম্মানসূচক খেলআত প্রদান করিয়াছিল। তাঁহার দলের অন্যান্য ব্যক্তিবর্গের প্রত্যেককে দশ সহস্র দিনার উপহার দিয়া বিদায় দিয়াছিল।

---

* তারিখে ইবনে খলেদুন।

মদিনার শরিফবর্গ অর্থে বশীভূত হইবার পাত্র ছিলেন না। তাই খানজালা-তনয় আবদুল্লা এক লক্ষ দিনার পাওয়া সত্বেও যাহা সত্য বলিয়া জানিতে পারিয়াছিলেন তাহা প্রকাশ করিতে ইতস্ততঃ করেন নাই।

তাঁহারা মদিনায় ফিরিয়া আসিলে মদিনাবাসিগণ সবিশেষ অবস্থা পরিজ্ঞাত হইবার নিমিত্ত তাঁহাদের চতুর্দ্দিকে সমবেত হইলেন। তাঁহাদিগের প্রশ্নের উত্তরে খানজালা-তনয় আবদুল্লা বলিলেন "আমরা এরূপ অপদার্থ লোকের নিকট হইতে ফিরিয়া আসিয়াছি তাহার না আছে কোন ধর্ম্ম, না আছে কোন মজহাব। সে মদ্য পান করে * ঢোল বাজাইয়া নর্ত্তকীদের নৃত্য দেখে। আল্লার নামে শপথ করিয়া বলিতেছি—যদি আল্লাহ্ এ সময় এমাম মেহদীর মত কোন লোককে প্রেরণ করিতেন তাহা হইলে তিনি নিশ্চয়ই এজিদের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করিতেন।

এজিদের সম্বন্ধে এইরূপ শুনিয়া তাঁহারা ঠিক করিলেন এ ধর্ম্মহীন অমুসলমান নৃপতিকে খলিফা বলিয়া মানিবেন না। ভাগ্যে যাহা লিখিত আছে তাহাই ঘটিবে।

মদিনাবাসিগণ এজিদকে খলিফা বলিয়া অস্বীকার করিলেন। ওছমান বিন মোহাম্মদ সেই সময় এজিদের পক্ষে মদিনার শাসনকর্ত্তা ছিলেন। তিনি এই সমুদয় বিষয় এজিদকে লিখিয়া পাঠাইলেন। মদিনাবাসিগণ যখন ইহা জানিতে পারিলেন, তখন তাঁহারা ওছমানকে মদিনা হইতে বাহির করিয়া দিলেন।

যুদ্ধের নিমিত্ত মদিনার চারিদিকে সাজ সাজ রব পড়িয়া গেল। আনছার সম্প্রদায় আবদুল্লা বিন খানজালাকে ও কোরেশগণ আবদুল্লা বিন মতিকে তাহাদিগের নিজ নিজ নেতা নিযুক্ত করিলেন, তারপর সকলে সম্মিলিত হইয়া মদিনা নগরীর যাবতীয় বনি ওমাইয়াদিগকে বহিস্কৃত করিয়া দিলেন। ২

এজিদ এই সমস্ত ঘটনা জানিতে পারিয়া মদিনা-বাসীদিগের উপর যারপর নাই ক্রুদ্ধ হইল। পাপাত্মা তখন মদিনার অধিবাসীদিগকে বিনষ্ট করিয়া উহাদিগের কার্য্যের সমুচিত প্রতিফল প্রদান করিতে স্থিরসঙ্কল্প হইল সে তাহার সেনাপতিদিগকে মদিনায় যুদ্ধ যাত্রায় সেনাপতি হইতে আদেশ প্রদান করিল কিন্তু কেহই সেই পবিত্র নগরীর বিরুদ্ধে অভিযান করিতে সাহসী হইল না। অবশেষে পাপমতি এজিদ, কারবালায় এমাম-সহিদকারী সৈন্যদিগের সেনাপতি ওমর বিন ছা'দকে সসৈন্যে অভিযান পূর্ব্বক মদিনা ধ্বংস করিতে আদেশ করিল। ওমর ছা'দ এ হেন পাপ কর্ম্ম সাধনে ভীত হইয়া অস্বীকার করিল। ইহার পর এজিদ পাপিষ্ঠ ওবায়দুল্লা বিন জিয়াদকে মদিনার বিরুদ্ধে অভিযান করিতে আদেশ করিল। সে পাপাত্মাও নানা প্রকার ওজর আপত্তি দেখাইয়া পশ্চাদ্‌পদ হইল। এজিদ আরও অনেক সেনাপতিকে মদিনায় যুদ্ধ যাত্রা করিতে আদেশ করিল কিন্তু কেহই রাজি হইল না, পরিশেষে মোসলেম বিন আকবা নামক জনৈক অজ্ঞাত কুলশীল, নারকী সেনাপতি মদিনার বিরুদ্ধে অভিযান করিতে স্বীকৃত হইল।

মোসলেম ১২ হাজার সৈন্যসহ মদিনার দিকে অগ্রসর হইল। এজিদ তাহার সহিত কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া তাহাকে উপদেশচ্ছলে বলিয়া দিল "যদি তুমি প্রয়োজন মনে কর তাহা হইলে হাসান বিন নমিরকে তোমার সহকারী নিযুক্ত করিবে। মদিনায় উপস্থিত হইয়া মদিনাবাসীদিগকে বিষয়টী ভাল করিয়া বিবেচনা করিয়া দেখিবার নিমিত্ত তিন দিনের সময় দিবে। তাহাদিগকে নানা প্রকারে বুঝাইয়া সন্ধি করিতে চেষ্টা করিবে। যদি ইহাতে তাহারা অস্বীকার করে তাহা হইলে ইতস্ততঃ না করিয়া যুদ্ধ আরম্ভ করিবে। আল্লাহর কৃপায় যদি তোমরা বিজয় লাভ কর তাহা হইলে তিন দিবস পর্য্যন্ত মদিনা নগরে যাহাকে যে স্থানে পাইবে নিহত করিবে। ৩ ইহার জন্য কাহারও নিকট জবাবদিহি করিতে হইবে না। সৈন্যগণের মধ্যে যে যাহা লুণ্ঠন করিবে তাহা তাহারই হইবে। হজরত জয়নাল আবেদীনকে কোন প্রকারে কষ্টে কি বিপদে ফেলিও না কারণ আমি যতদূর জানিতে পারিয়াছি বর্ত্তমান বিদ্রোহে তাঁহার কোন হাত নাই।"

তার পর মঞ্জিলের পর মঞ্জিল অতিক্রম করিয়া মোসলেমের অধীন দানববাহিনী "ওয়াদিলকারা" নামক প্রান্তরে আসিয়া উপস্থিত হইল। এই স্থানে মদিনা হইতে বিতাড়িত বনি ওমাইয়া বংশীয়গণ মোসলেম সৈন্যের সহিত মিলিত হইল। মোসলেম বনি ওমাইয়াদিগের নিকট হইতে

* তা'রিখে ইবনে খলেদুন। ২ রওজাতেল হাসানয়ন। ৩ তারিখে ইবনে খলেদুন ও রওজাতেল হাসানয়েন।

মদিনার অবস্থা পরিজ্ঞাত হইয়া জিন্‌নথ্‌লা নামক স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইল। এই স্থান হইতে সে মদিনাবাসী-দিগকে বলিয়া পাঠাইল "আমিরুল মোমেনীন আপনাদিগকে 'শরীফ' বলিয়া মনে করেন। আর আমিও আপনাদিগকে হত্যা করিতে ইচ্ছা করি না, এজন্য আমি আপনাদিগকে তিন দিবসের অবসর প্রদান করিতেছি—যদি আপনারা এই তিন দিনের মধ্যে সত্যপথ অবলম্বন করেন তাহা হইলে আমি অনতিবিলম্বে মদিনা শরিফ ছাড়িয়া মক্কা শরিফে চলিয়া যাইব। যদি আপনাদিগের কোন বিষয়ে কোন ওজর থাকে তাহা হইলে উহা আমার নিকট প্রকাশ করিবেন। *

ক্রমে তিন দিবস গত হইল। মোসলেম পুনরায় তাঁহাদিগকে বলিয়া পাঠাইল "আপনারা যুদ্ধে অভিলাষী অথবা সন্ধির প্রয়াসী?" মদিনাবাসিগণ বলিলেন "আমরা জালেমের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিব" মোসলেম তাঁহাদিগকে অনেক কিছু বুঝাইয়া বলিল, মদিনাবাসিগণ তাহার কথায় কর্ণপাত করিলেন না। তাঁহারা পাপীষ্ঠ খলিফার বয়য়ত গ্রহণ করা অপেক্ষা মৃত্যুই শ্রেয় মনে করিলেন। তাঁহারা চারি দিকে পরিখা খনন করিয়া নগর সুরক্ষিত করিলেন, পরিশেষে দুই দল হোরা নামক প্রান্তরে পরস্পর সম্মুখীন হইল।

জোবায়্‌র্‌-তনয় আবদুর রহমান পরিখাস্থিত সৈন্যদিগের, আবদুল্লা বিন মতি কোরেশ বংশীয় সৈন্যের এবং মাআফুল বিন ছেনান মহাজেরীনদিগের সেনাপতি নিযুক্ত হইলেন। এই সমস্ত সৈন্যদল পরিচালনা করিবার ভার প্রাপ্ত হইলেন খাঞ্জালা তনয় আবদুল্লা। তিনিই হইলেন সমগ্র সৈন্যদলের অধিনায়ক।

হোরা প্রান্তরে রণ-দামামা বাজিয়া উঠিল। মদিনাস্থিত মহাজেরীন ও আনসার সম্প্রদায় ধর্ম্মদ্রোহীদিগকে বিনাশ করিতে ধাবিত হইলেন, আর এদিকে মোসলেম সৈন্যসহ তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিল। আবদুল্লা বিন মতি অমিত বিক্রমশালী কোরেশ বংশীয়দিগকে লইয়া সিরিয়াবাসীদিগের আক্রমণ প্রতিহত করিতে দণ্ডায়মান হইলেন। কোরেশ বংশীয় বীরগণের আক্রমণ সহ্য করিতে অসমর্থ হইয়া সিরিয়ার সৈন্যগণ ছত্রভঙ্গ হইয়া পলায়ন করিল। অশ্বারোহীদিগকে পলায়নপর দেখিয়া মোসলেম তাহার পদাতিক সৈন্য লইয়া মদিনাবাসীদিগকে আক্রমণ করিল। সেনাপতি আবদুল্লা বিন মতির অনুমতি লইয়া ফজিল তনয় আব্বাছ পদাতিক সৈন্যসহ সিরিয়াবাসীদিগের বিরুদ্ধে অগ্রসর হইলেন। দুই দলে প্রবল যুদ্ধ হইতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরে সিরিয়ার সৈন্যগণ মদিনাবাসীদিগের আক্রমণ সহ্য করিতে অসমর্থ হইয়া পৃষ্ঠভঙ্গ দিয়া পলায়ন পূর্ব্বক আত্মরক্ষা করিল।

অতঃপর ফজিল-তনয় আব্বাছ তীরন্দাজ সৈন্য লইয়া সিরিয়াবাসীদিগের উপর এরূপ অব্যর্থ লক্ষ্যে শর নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিলেন যে; সিরিয়ার সৈন্যগণ যুদ্ধক্ষেত্রে তিষ্ঠান অসম্ভব দেখিয়া সকলেই পলায়নপর হইল। মোসলেম দেখিল তাহার পরাজয় অবশ্যম্ভাবী, তাহার ১২ হাজার সৈন্যের মধ্যে মাত্র ৫ শত তাহার নিকট যুদ্ধক্ষেত্রে অবস্থান করিতেছে আর সকলেই পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিয়াছে।

এদিকে মদিনাবাসী সৈন্যগণ দেখিল যুদ্ধে তাহাদের জয় হইয়াছে। সিরিয়াবাসিগণ যুদ্ধক্ষেত্র ছাড়িয়া পলায়ন করিতেছে, তাই তাহারা বিজয় লাভে আনন্দোৎফুল্ল হইয়া শত্রু-শিবির লুণ্ঠন করিবার নিমিত্ত ছত্র ভঙ্গ হইয়া পড়িল। বিপক্ষ দলপতি সুচতুর মোসলেম ইহা দেখিল। বুঝিল আক্রমণ করিবার এই উপযুক্ত সময়। সে সিরিয়ার পলায়নপর সৈন্যদিগকে আহ্বান করিল। তাহারা অনেকে তাহার সে আহ্বানে ফিরিয়া আসিল। তারপর মোসলেম অপ্রতিহত প্রভাবে মদিনার ছত্রভঙ্গ সৈন্যদলের উপর আপতিত হইল। মদিনাবাসিগণ তাহার সে প্রচণ্ড আক্রমণ সহ্য করিতে পারিল না।

অহোদ-ক্ষেত্রে হজরত মোহাম্মদ (দঃ) এর অধী-নায়কতায় মদিনাবাসিগণ আশুবিজয় লাভাশায় লুণ্ঠন করিবার প্রবৃত্তি দমন করিতে অসমর্থ হইয়া স্থানচ্যুত ও বিশৃঙ্খল হইয়া যেরূপ বিপদে পতিত হইয়াছিল, এইবার ছত্রভঙ্গ হওয়ার ফলে মদিনাবাসীদের তদপেক্ষা অধিক সর্ব্বনাশ হইল।

মদিনার সৈন্যগণ মোছলেম-হস্তে পরাজিত ও বিতাড়িত হইয়া পরিশেষে পরিখায় আশ্রয় গ্রহণ করিল। কিন্তু তাহারা এখানেও তিষ্ঠিতে পারিল না। সিরিয়ার সৈন্যগণ

* তারিখে ইবনে খল্‌দুন।

অচিরকাল মধ্যে পরিখা অধিকার করিয়া লইল। মদিনাবাসিগণ যুদ্ধ করিতে করিতে শাহাদতের শান্তিময়-ক্রোড়ে আশ্রয় গ্রহণ করিতে লাগিলেন। কেহ কেহ পলায়ন পূর্ব্বক মদিনায় আশ্রয় লইল কিন্তু তাহাতেও রক্ষা পাইল না। সিরিয়ার সৈন্যগণ মদিনা অধিকার করিয়া লইয়া, আবাল বৃদ্ধ বনিতা নির্ব্বিশেষে যাহাকে যেস্থানে পাইল হত্যা করিতে লাগিল। মদিনার রাজপথ দিয়া নিরাপরাধ নাগরিকদিগের শোণিত-স্রোত প্রবাহিত হইতে লাগিল। সমস্ত সাহাবা যুদ্ধ করিতে করিতে শহিদ হইলেন। আবদুল্লা বিন খাঞ্জালা তাহার পুত্রগণ সহ শহিদ হইলেন। ফজিলতনয় আব্বাছও তাহার অনুগমন করিয়াছিলেন। মদিনার প্রধান প্রধান সৈন্য ও সেনাপতিগণ শহিদ হইয়া অমর ধামে চলিয়া গেলেন।

সিরিয়াবাসী সৈন্যদিগের অধিনায়ক দুর্ব্বৃত্ত মোসলেম এজিদের আদেশ প্রতিপালন মানসে মদিনা অধিকার করিয়া সৈন্যদিগকে আদেশ করিয়াছিল "মদিনাবাসী যাহাকে যেস্থানে পাইবে নির্ব্বিচারে নিহত করিবে। তাহাদের ধন দৌলত লুণ্ঠন করিবে। ইহার জন্য কাহাকেও জবাবদিহি করিতে হইবে না।"

সিরিয়ার বর্ব্বর সৈন্যগণ তাহার আদেশ সম্পূর্ণরূপে পালন করিয়াছিল। তিনদিন পর্য্যন্ত তাহারা মদিনাবাসীদিগকে হত্যা করিয়াছিল—স্ত্রী পুরুষ বালক বালিকা কেহই তাহাদিগের হাত হইতে রক্ষা পায় নাই।

যে তিন দিবস সিরিয়ার পাষণ্ড সৈন্যগণ মদিনাশরিফ লুণ্ঠন করিয়া মদিনাবাসীদিগকে হত্যা করিয়াছিল, সেই তিনদিন মদিনার মসজিদে নবভীতে আজান দেওয়া ও জমায়তে নামাজ পড়া বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। মসজিদে নবভী সিরিয়ার সৈন্যদলের অশ্ব রাখিবার আস্তাবলে পরিণত হইয়াছিল!

হায়! হজরৎ রছুলে করিম স্বয়ং প্রস্তরাদি বহন করিয়া এই মসজিদ নির্ম্মাণে সাহায্য করিয়াছিলেন, সাহাবাগণ আল্লাহর প্রশংসাবাদ কীর্ত্তন করিয়া মসজিদ নির্ম্মাণ কার্য্যে যোগ দিয়াছিলেন। হজরত তাঁহার বাকী জীবন এই মসজিদের মেম্বরে বসিয়া মদিনাবাসীদিগকে ধর্ম্মের পুণ্য কাহিনী বর্ণনা করিয়াছিলেন। খোলফায়ে রাশেদিন হজরত আবুবকর সিদ্দিক, হজরত ওমর ও হজরত ওছমানের কতই পুণ্য-স্মৃতি ইহার প্রতি ধূলিকণার সহিত বিজড়িত হইয়াছিল।

জালেমের হস্তে সেই মসজিদে নবভীর এই দুর্দ্দশা হইল, হোরার যুদ্ধের ফলে মদিনার গৌরবরবি চির অস্তমিত হইল। যে স্থানে পূর্ব্বে বহু বসতিপূর্ণ লোকালয় ছিল, তাহা লোকশূন্য হইয়া পড়িল। ইসলামের ইতিহাসপ্রসিদ্ধ পবিত্রস্থান সমূহ ও হজরতের পবিত্র-স্মৃতি বিজড়িত অসংখ্য চিহ্ন পরবর্ত্তীযুগে আর খুঁজিয়া বাহির করিবার উপায় রহিল না।

---

# জেবুন্নেসা বেগম (১)

[ কাজী নওয়াজ খোদা ]

আবহমান কাল হইতে জগতের সকল দিকে, সকল ক্ষেত্রে সত্যের সহিত অসত্যের সংমিশ্রণ চিরাচরিত রূপে চলিয়া আসিতেছে। ধর্ম্মের পবিত্র বাজারে ধর্ম্মের নামে কত মিথ্যা কুসংস্কার চলিয়া গিয়াছে, কত রসম-রেওয়াজের (رسم و رواج), কত অনাচার ও কদাচারের ভেজাল গুদামজাত হইয়াছে। আবার সাহিত্য ক্ষেত্রে কত আগাছা ও বিষবল্লরীর সৃষ্টি হইয়াছে। ইতিহাসরাজ্যের দুর্গ প্রাকার ভেদ করিয়াও এইরূপ কত সংক্রামক মারাত্মক ব্যাধির বীজাণু প্রবেশ লাভ করিয়াছে, ফলে অসংখ্য ঐতিহাসিক দেব-চরিত্র ইতিহাসের পৃষ্ঠায় দানব ও শয়তানের

* তারিখে ইবনে খলদুন। (১) বঙ্গীয় মোসলমান সাহিত্য সম্মিলনীর বশিরহাট অধিবেশনে পঠিত।

চিত্রে অঙ্কিত হইয়াছে। বাঙ্গলার নবাব সিরাজুদ্দৌলা, গজনীরাজ সোলতান মহমুদ ও ভারত-সম্রাট মহামতি আওরঙ্গজেব প্রভৃতি প্রাতঃস্মরণীয় মোসলেম মহামনীষী-গণের বিকৃত ঐতিহাসিক চিত্র ইহার দৃষ্টান্ত স্বরূপ উপস্থিত করা যাইতে পারে, বলিতে কি মোসলমান সম্রাটগণের হেরেমের অন্তর্বর্ত্তী অসূর্য্যম্পশ্যা বাদশাহজাদীগণও এই অত্যাচারের হাত হইতে রক্ষা পান নাই। আওরঙ্গজেব-দুহিতা বিদূষী জেবুন্নেসাই ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। তাঁহার শুভ্রধবল পূতপবিত্র চরিত্রেও কলঙ্ক-কালিমা লেপন করিতে চেষ্টার ত্রুটি হয় নাই। কতজনে কত দিক দিয়া তাঁহার প্রতি ঘৃণিত মিথ্যা অপবাদ আরোপ করিয়া সত্য ও ন্যায়ের মস্তকে পদাঘাত করিয়াছে। তাঁহার জীবন-কাহিনী বর্ণনা করা আমাদের এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে, তদীয় পূত চরিত্রের প্রতি ইতিহাসের নামে যে কটাক্ষপাত করা হইয়াছে তাহার মূল সূত্র লইয়া আলোচনা ও সেই মূলের ভুলটী ধরিয়া দেওয়াই বক্ষ্যমান প্রবন্ধের একমাত্র উদ্দেশ্য।

সাহজাদী জেবুন্নেসা চিরকুমারী ছিলেন, তাঁহার চির-জীবন ধর্ম্মকর্ম্ম, জ্ঞানচর্চ্চা ও পিতৃরাজ্যের হিতকামনায় অতিবাহিত হইয়াছে। ঐহিক জীবনের অন্য কোন আশা আকাঙ্ক্ষা ও ভোগ-লালসা পরিতৃপ্তি সাধনের দিকে চাহিয়া দেখিবার অবসর তাঁহার আদৌ ঘটিয়া উঠে নাই। তিনি কুসুম কোরকের ন্যায় ফুটিয়া আপন গন্ধে আপনি বিভোর হইয়া ও যশঃ সৌরভে দিগ্দশ আমোদিত করিয়া অবশেষে অমল ধবল নির্ম্মল নিষ্কলঙ্ক ফুলটীর মতই ঝরিয়া পড়িয়াছেন। কিন্তু একদিকে চিরকৌমার্য্য ও অন্যদিকে পারস্য সাহিত্যের 'দীওয়ান মুখফী' নামক কাব্যগ্রন্থের কবিতা সমূহ তাঁহার পূত চরিত্রে কলঙ্ক প্রচারের ভিত্তিস্বরূপ পরিগণিত হইয়াছে, কুৎসাকারীর দল চোর ডাকাত, ষণ্ডা গুণ্ডা নির্ব্বিশেষে যাহাকে ইচ্ছা ধরিয়া সাহজাদীর প্রেমাস্পদরূপে খাড়া করিয়াছে, এবং প্রমাণ স্বরূপ দীওয়ান মুখফীর 'বয়েৎ' আওড়াইয়া আত্মপক্ষ সমর্থন করিতে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়া গিয়াছে! কিছুদিন পূর্ব্বে সংবাদ পত্রের পৃষ্ঠায় জনৈক হিন্দুলেখক শিবাজীর ন্যায় দুর্দ্ধর্ষ ইসলাম বৈরীকে কল্পনার সাহায্যে দীওয়ান মুখফীর 'বয়েতের' দোহাই দিয়া সাহজাদীর প্রেমাস্পদরূপে উল্লেখ করিতে কুণ্ঠা বোধ করেন নাই। সুতরাং দেখা যাইতেছে, দীওয়ান মুখফীর প্রেম-নিবেদন সূচক এবং হতাশ প্রেমের ভাবব্যঞ্জক কবিতাগুলিই তাঁহাদের সকল অভিযোগের মূল ও সকল প্রমাণের সেরা। তাই আজ আমরা তাঁহাদের এই মূল ভিত্তি লইয়া স্বাধীন ভাবে আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব। দীওয়ান মুখফীর প্রকৃত রচয়িতা কে? এবং বিদূষী জেবুন্নেসাকে তাহার রচয়িত্রী স্থির করিয়া লওয়ার মূলেই বা কতটুকু সত্য নিহিত আছে? বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা বিশেষভাবে এই দুইটী বিষয়ের বিচার বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইতে চেষ্টা পাইব।

বিদূষী জেবুন্নেসার পাণ্ডিত্য ও মহিয়সী প্রতিভার কথা জগৎবিখ্যাত। দীওয়ানমুখফী নামক কাব্যগ্রন্থখানি তাঁহারই রচিত বলিয়া সাধারণতঃ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য জগতে সুপরিচিত। তাজকেরায়ে শাম্‌য়ে আঞ্জমন ( تـزکـرة ) ( شمـع انجمـن ), সুবহে গোলশান ( صبـح گلشـــن ), রিয়াজুল আফ্‌কার ( رياض الافكار ), তাজকেরাতুল খাওয়া-তীন ( تزكرةالخواتين ), প্রভৃতি গ্রন্থ সমূহেও এই মতের সমর্থন করা হইয়াছে। ডাক্তার স্পৃঙ্গার (১), ডাক্তার রিউ (২), মিসেস ওয়েষ্ট ব্রুক (৩) প্রভৃতি পাশ্চাত্য সুধীগণও জেবুন্নেসাকে দীওয়ান মুখফীর রচয়িত্রী বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন।

এখন বিশেষভাবে দেখিতে হইবে গ্রন্থখানি প্রকৃতই জেবুন্নেসার রচিত কিনা? এবং উপরের বর্ণিত লেখকগণের বর্ণনার মূলে কোন ঐতিহাসিক সত্য নিহিত আছে অথবা তাঁহারা কোন ভাবের বন্যায় ভাসিয়া এই বাজার গুজবের সৃষ্টি করিয়াছেন? এই প্রশ্নের সমাধান সম্বন্ধে আমরা দুইটী পথ অবলম্বন করিয়াছি। প্রথমতঃ তদানীন্তন লেখকগণের লিখিত বিশ্বস্ত ঐতিহাসিক গ্রন্থাবলীর আলো-চনা, দ্বিতীয়তঃ দীওয়ান মুখফীর কবিতা সমূহের বিচার বিশ্লেষণ ও তৎসমূহের ভাবধারার মধ্যবর্ত্তিতায় প্রকৃত রচয়িতার স্বরূপ নির্ণয়।

---

(১) আউধের সাহী কোতব খানায় রক্ষিত হস্তলিখিত গ্রন্থসমূহের তালিকা পুস্তক ৪৮০ পৃষ্ঠা।

(২) লণ্ডন ব্রিটিস মিউজিয়মে রক্ষিত পারস্য গ্রন্থসমূহের তালিকা পুস্তক ৭০২ পৃঃ।

(৩) প্রতীচ্যের এই বিদূষী রমণী Wisdom of east series নাম দিয়া দীওয়ান মুখফীর প্রাথমিক ৫০টী গজলের একখানি ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার মুখবন্ধে তিনি জেবুন্নেসাকেই এই দীওয়ানের রচয়িত্রী বলিয়া স্থির করিয়াছেন। (লেখক)

দীওয়ান মুখফী জেবুন্নেসার রচিত বলিয়া যাঁহারা 'ফতোওয়া' জারী করিয়াছেন তাঁহারা সকলেই বহু পরবর্ত্তী-যুগের লেখক, তাঁহার সমসাময়িক ও অব্যবহিত পরবর্ত্তী সময়ের লেখকগণের বিশ্বস্ত ঐতিহাসিক গ্রন্থসমূহে তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্য, অমানুষিক প্রতিভা ও অসীম বিদ্যানুরাগ সম্বন্ধে বিশেষভাবে বিস্তৃতরূপে আলোচনা করা হইয়াছে। তাঁহার সম্পর্কীয় অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনাও তাঁহারা লিপিবদ্ধ করিতে ভুলিয়া যান নাই; কিন্তু এই শ্রেণীর বিভিন্ন লেখকের বিভিন্ন ঐতিহাসিক গ্রন্থাবলী তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়া দেখিলেও জেবুন্নেসার 'মুখফী' তখল্লোস ( تخلص ) ও তাঁহার রচিত সামান্য একখানি কবিতাগ্রন্থের নামও দেখিতে পাওয়া যায় না। এমন কি অন্যান্য নানাগুণের পরিচয় দিতে যাইয়াও তাঁহারা এই গুণবতী রমণীর কবিত্ব শক্তি সম্বন্ধে ইঙ্গিতেও কোন কথা প্রকাশ করেন নাই।

মআসেরেআলমগিরী ( ما ثرعالمگیری ) নামক বিখ্যাত ও বিশ্বস্ত ঐতিহাসিক গ্রন্থে তাঁহার সম্বন্ধে লিখিত হইয়াছে। *

و از تحصیل علوم عربی و فارسی بهرهٔ تمام اندوخته وازاقسام خطوط نستعلیق و نسخ و شکسته نصیبهٔ وافی حاصل کرده - واز بسکه همت قدسی آن قدرشناس رتبهٔ علم و هنر بجمع کتب و تصنیف و تالیف مصروف بود — و عنان توجه بترفیه حال ارباب فضل و کمال معطوف — درسرکار علیه کتاب خانهٔ گرد آمده بود که بنظر هیچ یکی در نیامده باشد — و بسیاری از علما و فضلا و صلحا و شعرا و منشیان بلاغت دثار و خوشنویسان سحرنگار باین ذریعه کامیاب افضال آن صدر آرای مشکوی عزت و جلال بوده اند - چنانچه ملا صفی الدین اردبیلی بموجب امر علیه در کشمیر سکونت گرفته بخدمت ترجمه تفسیر کبیر که مسمی به زیب التفاسیر ست اقدام داشت و دیگر رسائل و کتب بنام نامیه ترتیب یافته است

অর্থাৎ—সম্রাট দুহিতা জেবুন্নেসা আরবী ফারসী ভাষায় বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন, ঐ সকল ভাষার নানাপ্রকার লিপি কুশলতায় ( نسخ - شکسته - نستعلیق ) তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন। বিভিন্ন শাস্ত্রের অসংখ্য গ্রন্থাবলী সংগ্রহে, গ্রন্থরচনা ও সঙ্কলন কার্য্যে সকল সময় ব্যাপৃত থাকিতেন। আলেম, ফাজেল প্রভৃতি পণ্ডিত সম্প্রদায়ের অবস্থার উন্নতি সাধনে সর্ব্বদা মনোযোগী হইতেন, তাঁহার গ্রন্থাগারে এত অধিক সংখ্যক গ্রন্থ সংগৃহীত হইয়াছিল যে সে সময়েও অন্য কোন কোতবখানায় তত অধিক গ্রন্থের সমাবেশ দেখিতে পাওয়া যাইত না। অসংখ্য আলেম-ফাজেল, পুণ্যবান মনীষীবৃন্দ, কবিরদল, লেখক সম্প্রদায় ও লিপিকলা বিশারদ খোশ-নাবীস ( خوش نویس ) (১) শ্রেণী সকল সময় তাঁহার অনুগ্রহ লাভে সফলকাম হইতেন। তাঁহার আদেশে মোল্লা সফীউদ্দীন আর্দ্দবেলী ( ملا صفی الدین اردبیلی ) কাশ্মীরে অবস্থানপূর্ব্বক 'জেবৎতফাসীর' নাম দিয়া 'তফসীর কবীরের ন্যায় বিরাট গ্রন্থের একটী অনুবাদ প্রকাশ করিয়াছিলেন। (২) অন্যান্য বহু পুস্তক ও পুস্তিকাও তাঁহার নামে সঙ্কলিত হইয়াছে।

এই প্রকারে মেরআতুল আলম ( مرأة العالم ) (৩), তারিখে আলমগিরী ( মেরআতে জাহানোমা ) (৪), মের অতুলখয়াল مرأة الخيال ( নওসেরওয়াঁ খাঁ লুদী লিখিত ), কালেমাতুশ্‌ শোয়ারা كلمة الشعرا ( আফ্‌জলুদ্দীন খাঁ সারখোশ ), আলমগীর নামা ( খাফী খাঁ ),

---

* মোহাম্মদ সাকী মোসতায়েদ খাঁ লিখিত ( ১৮৭১ খ্রীঃ ) কলিকাতায় মুদ্রিত মআসেরে আলমগিরী ৫৩৮ পৃষ্ঠা ( লেখক )

( ১ ) যাহাদের অক্ষর সুন্দর। ( লেখক )

( ২ ) জেবৎ তফাসীর ধরার পৃষ্ঠা হইতে লুপ্ত হইয়াছে ইহাই সাধারণের অভিমত। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নয়, বোডলীন লাইব্রেরীতে ( অক্সফোর্ড ) এই বিরাট গ্রন্থের ৫ম খণ্ড আজিও বর্ত্তমান রহিয়াছে এই খণ্ডটি ৬১৬ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। শেষকালে আবজদের হিসাবে গ্রন্থ সমাপনের হিজরী সন বর্ণনা উপলক্ষে এই কবিতাটী লিখিত হইয়াছে— خرد بهرتاریخ گفتا که شد * زلطف ازل جلد پنجم تمام ইহা হইতে ১০৮১ হিজরী সন বাহির হয়। গ্রন্থ শেষে ১০৮১ সন লেখকের স্বাক্ষরেও লিখিত হইয়াছে, ইহা হইতে উক্ত লাইব্রেরীর তালিকা লেখক অনুমান করিয়াছেন যে এই গ্রন্থখানিই অনুবাদকের স্বহস্ত লিখিত। ( লেখক )

(৩) হস্তলিখিত 'মেরআতুল আলম' কলিকাতায় বোহার লাইব্রেরীতে রক্ষিত ২০৮ পৃঃ

(৪) হস্তলিখিত মেরআতে জাহানোমা ঐ ৫০৮ পৃঃ ( লেখক )

মোন্তাখাবুল লোবাব منتخب اللباب ( কাজেম এবনে আমীন ), ও তৎসাময়িক অন্যান্য ঐতিহাসিকগ্রন্থ ও জীবনী সমূহে জেবুন্নেসার গুণাবলীর বিস্তৃত পরিচয় প্রদান করা হইয়াছে, তাঁহার রচিত এমন কি তাঁহার নামে অন্যান্য লেখকদের প্রচারিত গ্রন্থ সমূহের বিস্তৃত তালিকাও এই সকল গ্রন্থে প্রকাশিত হইয়াছে; কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই বিদুষী রমণীর কবিত্বশক্তি ও কবিতাক্ষেত্রে তাঁহার 'তথল্লোসের' কথা ইঙ্গিতেও উল্লেখ করা হয় নাই। তিনি প্রকৃতই কবিপ্রতিভার অধিকারিণী ও দীওয়ান মুখফীর ন্যায় কাব্যগ্রন্থের রচয়িত্রী হইলে এই সকল সমসাময়িক লেখকগণ তাঁহার এই মহিয়সী শক্তির উল্লেখ করিতে কখনই বিরত হইতেন না। এরূপ অবস্থায় 'দীওয়ান মুখফী' জেবুন্নেসার রচিত" একথার মূলে বিশ্বাসযোগ্য ঐতিহাসিক প্রমাণের সম্পূর্ণ অভাব, বরং তৎসাময়িক বিশ্বস্ত ইতিহাস ও জীবনীগুলি বিশেষভাবে পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে অবস্থা ঘটিত প্রমাণের বলে ইহার বিপরীত সিদ্ধান্তই মানিয়া লইতে হয়।

এইবার আমরা দীওয়ানমুখফীর কবিতা সমূহের বর্ণনা ও তাহার ভাবধারার সাহায্যে গ্রন্থের প্রকৃত রচয়িতাকে পর্দ্দার আড়াল হইতে লোক চক্ষুর সম্মুখে ধরিয়া দিতে চেষ্টা পাইব।

বর্ত্তমান যুগে বিভিন্ন ছাপাখানায় মুদ্রিত ও হস্তলিখিত দীওয়ান মুখফীর আদৌ অভাব নাই, যে কোন কেতাবের দোকানে দেখিলে অথবা যে কোন লাইব্রেরীতে অনুসন্ধান করিলে সহজেই পাওয়া যাইতে পারে। একসঙ্গে মিলাইয়া দেখিলে সে গুলির মধ্যে বিশেষ কোন 'গরমিলও' পরিলক্ষিত হয় না। এই প্রবন্ধ রচনার সময় আমাদের সম্মুখে ৫টী দিওয়ানমুখফী রহিয়াছে—৩টী হস্তলিখিত এবং একটী লক্ষ্ণৌ নৌলকিশোর প্রেসের ও অপরটী কানপুর মজিদী প্রেসের মুদ্রিত। পাঠকগণের সুবিধার জন্য আমরা কানপুর মজিদী প্রেসের নির্ভুল মুদ্রিত সংস্করণ হইতেই আবশ্যকীয় কবিতাবলী পত্রাঙ্কের হাওলা দিয়া উদ্ধৃত করিয়া দেখান সমীচীন মনে করিতেছি, কবি গাহিয়াছেন—

(১) بـوعلـی روزگارم از خـراسـان آمـد ٭
ازپئے اغـراض بـردرگا ٭ سـلطان آمد ٭ *
حیـرتے دارم‌که یارب اند رین‌گرداب هند
طوطئ فکـرم پئے شکر زرضو ان آمد ٭ *
بسـکه دریا دِ و طن‌نا دیده ماتم داشتـم
تابدامانِ دلم چاک گـریبان آمد ٭ *

অর্থাৎ জগৎ বিখ্যাত পণ্ডিত 'বুআলী সীনার' সমতুল্য হইয়াও আজ আমি 'গরজে পড়িয়া' সুদূর খোরাসান হইতে সোলতানের দরবারে আসিয়াছি। আশ্চর্য্যের বিষয় সুফল লাভের আশায় স্বর্গোদ্যান হইতে আসিয়া ভারতের এই ঘূর্ণীপাকে জড়াইয়া পড়িয়াছি। প্রিয় জন্মভূমির স্মরণে দুঃখের অবধি নাই, এমন কি আমার প্রাণ ছিন্ন ভিন্ন বেশে বাহির হইয়া দামনে আসিয়া পড়িতেছে। এই কবিতা কয়টী হইতেই বুঝা যাইতেছে—কবি ( দীওয়ান মুখফীর রচয়িতা ) পারস্যের অন্তর্গত খোরাসানের অধিবাসী, তিনি গরজে পড়িয়া, দায়ে ঠেকিয়া ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন। পক্ষান্তরে জেবুন্নেছা সম্রাট আওরঙ্গজেবের দুহিতা, ভারতবর্ষই তাঁহার জন্মভূমি, এখানেই তিনি লালিত পালিত বর্দ্ধিত ও অবশেষে এখানকার মৃত্তিকা গর্ভেই তাঁহার চিরশয্যা রচিত হইয়াছে।

আর এক স্থানে 'মুখফী কবি' খোলাসাভাবেই বলিয়াছেন—খোরাসানের অন্তর্গত 'এস্‌তখ্‌র' তাঁহার প্রিয় জন্মভূমি।

(২) تو از ملک خراسانے باصطخراز وطن داری
بخواب شب اگر درد رغم هندوستان بینی *

কবি অন্যত্র গাহিয়াছেন—

(৩) مخفیا چند بدل حسرت دیدار وطن
عنقریب ست که درخاک فنایت وطن ست*

—হে মুখফী, আর কত দিন জন্মভূমির দর্শন লালসায় মানসিক যন্ত্রণা ভোগ করিবে, হয়ত অচিরে ধ্বংসের মৃত্তিকাই তোমার চির বাসস্থানে পরিণত হইবে।

---

(১) মজিদী প্রেসে মুদ্রিত দীওয়ান মুখফী ১১৮ পৃষ্ঠা　(২) ১০৬ পৃঃ (৩) ৩৬ পৃঃ ( লেখক )

‡ زخان زمان چوبگزشتی چه در گلشن چه در گلخن
گـرفتار محبت هـرکجا افـتـد وطـن دارد

—যখন তুমি জন্মভূমি ছাড়িয়া বিদেশে আসিয়াছ, তখন তোমার পক্ষে উদ্যান ও আঁস্তাকুড় দুই-ই সমান, যে প্রেম-শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়াছে সর্ব্বত্রই তাহার আবাস-ভূমি।

(১) نادان اگر نبودی در ملک هند مخفی
اجزای عمـر خودراشیراز گم نمی‌کرد *

—মুখফী জ্ঞানহীন না হইলে ভারতে আসিয়া তাহার জীবন এরূপ বিপর্য্যস্ত করিয়া ফেলিত না।

তাঁহার ফারসী কবিতা ভারতের সুধীসমাজে সাদরে গৃহীত হওয়া সম্বন্ধে কবি লিখিয়াছেন—

(২) آفـرین بـر جگـرم باد که در کشور هند
سـکهٔ نقـد سخن رائج ایـران زده‌ام *

—ধন্য আমার সাহস, ইরানের টাকশালে মুদ্রিত কবিতার সিক্কা আমি ভারতের বাজারে চালাইয়া দিয়াছি।

(৩) دل آشفتهٔ مخفی بفنّ خود ارسطوی ست
بهند افتاده است اما خراسان ست یونانش *

—মুখফী তাহার সাধনা ক্ষেত্রে আরস্ত সদৃশ, যদিও সে ভারতে পড়িয়া আছে; কিন্তু খোরাসানই তাহার পক্ষে গ্রীসের তুল্য।

আমাদের বিশ্বাস এই সকল অকাট্য প্রমাণের বিষয় অবগত হইয়া পক্ষান্তরে গ্রন্থরচয়িতার নিজমুখে গ্রন্থের বিভিন্ন স্থানে তাঁহার এই আত্ম-পরিচয় পাইয়া আর কেহ বিদুষী জেবুন্নেসাকে মুখফী ভাবিয়া এবং দীওয়ান মুখফী তাঁহার রচিত মনে করিয়া ভ্রমে পতিত হইবেন না। সম্ভবতঃ পরবর্ত্তী যুগের জীবনীকারগণ দীওয়ান মুখফীর ন্যায় সুধীসমাজে সমাদৃত কাব্য গ্রন্থটীকে জেবুন্নেসার নামের সহিত জুড়িয়া দিয়া তাঁহার যশের মাত্রা আরও বাড়াইয়া দিবার লোভ সম্বরণ করিতে না পারিয়া এই অবাস্তব ও অনৈতিহাসিক স্বকপোল কল্পিত উক্তির সৃষ্টি করিয়াছেন, কিন্তু ইহার দ্বারা বিদ্বেষ পরায়ণ কুৎসাকারীগণের কুৎসা প্রচারের পথ যে সুগম করিয়া দেওয়া হইতেছে, তাহা তাঁহারা আদৌ ভাবিয়া দেখিবার সুযোগ পান নাই। একজন আরব্য কবি সত্যই বলিয়াছেন—

بنیت بیتا وهدمت مصـرا * اردت یسرا فنلت عسرا

অর্থাৎ তুমি একখানি গৃহনির্ম্মাণ করিতে গিয়া একটী সহর উজাড় করিয়া দিলে। তুমি বিষয়টীকে সহজসাধ্য করিতে চেষ্টা পাইলে কিন্তু আরও জটিল করিয়া তুলিলে।

এইবার মুখফী কবির স্বরূপ নির্ণয় ও ভারতে কোন সময় কোন সোলতানের দরবারে তিনি আসিয়াছিলেন, এসম্বন্ধে স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার চেষ্টা করিতে হইবে। কবি গাহিয়াছেন—

بـدر سلطان عصـر حیف ندارم دگـر
تا که رسا ند بعـرض مقصد ارکان او-
ثانی صاحبقران بادشـه انس و جان
انکه فلک سـرنهد برخط فـرمان او-

-সোলতানের দুয়ারে আসিতে আর আমার কোন দুঃখ নাই, সভাসদগণই আমার আশা আকাঙ্ক্ষার কথা তাঁহার নিকট পঁহুছাইয়া দিবেন। বীরত্ব প্রতাপে তিনি দ্বিতীয় সাহেব কেরান (صاحبقران ثانی)। (৪) মানুষ

‡ ৫০ পৃঃ (১) দীওয়ান মুখফী ৬১ পৃঃ (২) দীওয়ান মুখফী ৭৫ পৃঃ (৩) দীওয়ান মুখফী ১০৪ পৃঃ (লেখক)

(৪) উর্দ্দু সাহিত্যে طلسم هوش‌ربا - طلسم هفت پیکـر- طلسم نورافشان - صندلی نامـه - ایـرج نامه প্রভৃতি বিরাট গ্রন্থসমূহের নাম অনেকেই জানেন। ঐ সকল গ্রন্থে কাল্পনিক ঘটনা সমূহের অবতারণা করিয়া 'আমীর হামজা' কর্ত্তৃক সমগ্র পৃথিবী জয়ের কল্পিত কাহিনী বর্ণিত এবং এই অদ্ভুত বীরত্বের জন্য তাঁহাকে প্রথম সাহেবকেরান (صاحبقران اول) নামে অভিহিত করা হইয়াছে। মহামতি তৈমুরও প্রথম সাহেবকেরান নামে অভিহিত হইতেন। সম্রাট সাহ জাহানের নামের পূর্ব্বে তাঁহার প্রশংসা সূচক দ্বিতীয় সাহেবকেরান (صاحبقران ثانی) উপাধি ব্যবহৃত হইত, তাই দ্বিতীয় সাহেবকেরান বলিতে ভারতের মোসলমান সম্রাটগণের মধ্যে সাহ জাহানকেই বুঝাইয়া থাকে। ফারসী ভাষার ইতিহাস পাঠকগণের নিকট ইহা আদৌ অবিদিত নহে। (লেখক)

ও জেন উভয় জাতিরই তিনি অধিপতি, আকাশও তাঁহার আদেশে মস্তক অবনত করিয়া থাকে।

ফারসী ভাষার ইতিহাস পাঠকগণ সকলেই অবগত আছেন, এই দ্বিতীয় সাহেবকেরান ( صاحبقران ثانی ) বলিতে একমাত্র সম্রাট সাহজাহানকেই বুঝাইয়া থাকে। ইহা হইতেই সপ্রমাণ হইতেছে যে 'কবি মুখফী' সাহ্‌জাহান বাদশার' আমলেই জন্মভূমি খোরাসান হইতে ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার পক্ষে এই সফর আদৌ সুখজনক হয় নাই। তিনি এখানে নানা বিপদ আপদের চাপে পড়িয়া দেশে ফিরিবার জন্য ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। কবি এই অবস্থায় গাহিয়াছেন—

(১) وجود بے وجودمن بمن همواره در جنگ ست
که مشت استخوانش را برم سوی خراسانش -

অর্থাৎ "আমার অস্তিত্বহীন দেহ তাহার অস্থিগুলি খোরাসানে পঁহুছাইয়া দিবার জন্য সর্ব্বদা আমার সঙ্গে বিগ্রহ উপস্থিত করিয়া থাকে।" কিন্তু এদেশে আরও বহু দুঃখ কষ্ট ভোগ তাঁহার কপালে ছিল, তাই সহজে কবির এই আকাঙ্ক্ষাপূর্ণ হয় নাই। ইহার পর ভাগ্য-বিপর্য্যয়ে তাঁহাকে একটী নূতন বিপদের সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল, অভাবনীয় কবিত্বশক্তি ও মহীয়সী প্রতিভা দর্শনে হিংসাজর্জ্জরিত হইয়া অনেকে তাঁহার শত্রু হইয়া পড়িল, তাহারা নানা ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার করিয়া তাঁহার প্রতি বিপ্লব বাদের অভিযোগ আনয়ন করিল ফলে দরিদ্র ও নিঃসহায় কবি রাজ-রোষে পতিত ও রাজার আদেশে কারাগারে বন্দী হইলেন। কবি কারাক্লেশে ব্যথিত ও দুঃখ কষ্টে জর্জ্জরিত হইয়া অনেকগুলি শোক-গাথা গাহিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—

(২) مشق سودائی جنونم باز دامنگیرشد
رشتهٔ دانائیم در پای من زنجیرشد -
شد چنان کوتاه عمر عافیت در دورما
کز فراق دیدن روی جوانی پیرشد -

مژده ده باد صبا از ما بار باب نشاط
کز سرشک ما زمین هند چون کشمیرشد -
نیست امید رهائی تا برو ز رستخیز
خاک غربت هرکرادر مهد دامنگیر شد -

কবি বলিতেছেন, হায়, উন্মত্ততা আমাকে পাইয়া বসিয়াছে, আমার গুণাবলীই আমার পায়ের শৃঙ্খল হইয়াছে, আমার সুখ সৌভাগ্যের জীবনকাল এত অল্প যে যৌবনের মূর্ত্তি না দেখিয়াই তাহার বিচ্ছেদে স্থবিরত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। হে প্রভাত-বায়ু, সুখীজনের নিকট আমার পক্ষ হইতে সুসংবাদ বহন করিয়া লইয়া যাও, তাহাদিগকে বলিও—আমার অশ্রুধারায় ভারতের মৃত্তিকা কাশ্মীরের ক্ষেত্রের ন্যায় উর্ব্বরতা শক্তি লাভ করিয়াছে। প্রথম হইতেই প্রবাসের মৃত্তিকা যাহাকে আঁকড়াইয়া ধরিয়াছে কেয়ামতের দিন পর্য্যন্ত তাহার মুক্তিলাভের কোন আশা নাই।

একটানা নিরাশার জীবন বহন করা বুঝি স্বভাবের ধর্ম্ম নয়, তাই এক সময় ক্ষীণ আশার রশ্মি দেখিয়া বন্দী দশায় কবি গাহিয়াছেন—

(৩) کشاید هر که بندد در بر رویت
مخور مخفی غم و مردانه می باش -

—হে মুখফী যিনি তোমার জন্য দ্বার বন্ধ করিয়াছেন তিনিই আবার খুলিয়া দিতে পারেন। তবে আর অনর্থক ভাবিয়া মর কেন? বীরের ন্যায় সাহস সঞ্চয় করিয়া দিন কাটাইয়া দাও।

از گدایان توام شاه خراسان مددی
که چون مرغان حرم در حرمت جاگیرم -

—"হে শাহ খোরাসান ( হজরৎ এমামরেজা ), আমি আপনার দ্বারের ভিক্ষুকশ্রেণীভুক্ত, আপনি আমাকে এরূপ সাহায্য করুন যেন আপনার বিপদবারণ পবিত্র স্থানে আমি আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারি।

শাহ খোরাসান ( شاه خراسان ) অর্থাৎ হজরৎ এমামরেজার নিকট কবি বিপদে সাহায্য প্রার্থনা

(১) দীওয়ান মুখফী ১০৩ পৃষ্ঠা (২) দীওয়ান মুখফী ৬৩ পৃঃ (৩) দীওয়ান মুখফী ৬৩ পৃষ্ঠা। ( লেখক )

করিতেছেন। (১) এই কবিতাটীতে কবির ধর্ম্মমতের সন্ধান পাওয়া যায়। সাধারণতঃ শিয়া সম্প্রদায়ের মধ্যেই বিপদে আপদে এই প্রকার সাহায্য প্রার্থনা প্রচলিত আছে, তাই অনেকে তাঁহাকে শিয়া মতাবলম্বী বলিয়া স্থির করিয়াছেন। পক্ষান্তরে আওরঙ্গজেব-দুহিতা জেবুন্নেছা খাঁটী সুন্নী মোসলমান ছিলেন, ভুলিয়াও কেহ তাঁহাকে শিয়া ভাবাপন্ন বলিতে পারেন না, বিশেষতঃ এছলাম ধর্ম্মের স্পষ্ট ও দৃঢ় অনুশাসনের বিপরীত আচরণ করিয়া মৃত غیر الله কে غائبانہ حاضر و ناظر জানিয়া তাহার নিকট এইরূপ সাহায্য প্রার্থনা জেবুন্নেসার স্থায় দীনী-এল্‌মে বিশেষ অভিজ্ঞতা-শালিনী দীনদার, মোওয়াহ্‌হেদা موحدہ (একেশ্বরবাদিনী) মহিলার পক্ষে কখনই সম্ভবপর নয়। এরূপ অবস্থায় 'শিয়া মুখফীর' রচিত দীওয়ানটী জেবুন্নেসার নামের সহিত জুড়িয়া দিবার কোন ক্ষীণ যুক্তিও খুজিয়া পাওয়া যায় না।

১০৯১ হিজরী সনে সম্রাট-তনয় সাহজাদা আকবর পিতার (আওরঙ্গজেব) বিদ্রোহাচরণে প্রবৃত্ত হইলে তাঁহার সাহায্যকারিণী সন্দেহে সম্রাট কিছুদিনের জন্য জেবুন্নেসাকে সলীমগড় দুর্গে আটক করিয়া রাখিয়াছিলেন এই সুযোগে "হায়াৎ-জেবুন্নেসার" (জেবুন্নেসার জীবনী) সংগ্রাহক 'মুখফীর' কারাজীবনের রচিত কবিতাগুলি জেবুন্নেসার নামে চালাইয়া দিতে চেষ্টা পাইয়াছেন, কিন্তু আমরা পূর্ব্বেই মুখফীর ঐ সময়ের কবিতা উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছি, তাঁহার ধর্ম্মমত সম্বন্ধেও আলোচনা করিয়াছি, সকলে তাহা হইতে নিঃসন্দেহ রূপে বুঝিতে পারিয়াছেন যে ঐ কবিতাগুলি কোন মতেই জেবুন্নেসা-রচিত হইতে পারে না, তৎসমূহের প্রকৃত রচয়িতা খোরাসানের 'কবিমুখফী'।

কিছুদিন পর সম্রাটের দরবারে কবির নির্দ্দোষতা প্রকাশ হইয়া পড়ায় তিনি কবিকে কারাযন্ত্রণা হইতে অব্যাহতি দিলেন, কবি মুক্তিলাভ করিয়া নিম্নলিখিত কবিতাটী লিখিয়াছিলেন—

(২) بہ تہمت کردہ در زند ان مرادشمن بحمد اللہ
بزور صبر بشکستم کلید قفل زند انش -

—মিথ্যা অপবাদ দিয়া বৈরীর দল আমাকে কারারুদ্ধ করিয়াছিল, আল্লাই সকল প্রশংসার অধিকারী, একমাত্র 'সবরের' (সহনশীলতা) শক্তি মাহাত্ম্যেই আমি কারাগারের তালা ভাঙ্গিতে সক্ষম হইয়াছি।

কারামুক্ত হইয়া কবি বাঙ্গালা দেশে আসিয়াছিলেন, সম্ভবতঃ এখানেই তিনি কিছুদিন শান্তিলাভ করেন। কবি বলিয়াছেন—

جستجو کردم بسی مخفی چو در گرداب هند
نشہ آسودگی جائی بجز بنگالہ نیست -

ভারতের ঘূর্ণাবর্ত্তে পড়িয়া শান্তিকামনায় বহুস্থানে আমি ঘুরিয়া বেড়াইয়াছি; কিন্তু বাঙ্গলাদেশ ভিন্ন অন্য কোথাও শান্তি আছে বলিয়া মনে হয় না।

কিছুদিন অবস্থিতির পর এখানেও কবি স্থির হইতে পারিলেন না, মদীনা শরিফের জিয়ারতের জন্য তাঁহার প্রাণ কান্দিয়া উঠিল। কবি গাহিয়াছেন—

---

(১) 'সাহ্‌ খোরাসান' বলিতে সাধারণতঃ হজরৎ এমাম রেজাকেই বুঝাইয়া থাকে। হজরৎ আত্তার লিখিয়াছেন—

شہ من در خراسان چون دفین شد — همہ ملک خراسان انگبین شد -
بوقت کردن کی من سیزدہ سال — بہ مشهد بودہ ام خوش وقت وخوشحال -

উর্দ্দু শিয়া কবি মির্জ্জা দেলগীর বলিয়াছেন—

کیا شاہ خراسان کی زیارت کا شرف ہی — فردوس کا رخ زائر مولا کی طرف ہی -
مد فون جہان موسی کاظم کا خلف ہے — اس خاک کا جوذرہ ہے سو در نجف ہے -
اس تختۂ دیبا پہ اگر عرش برین ہے — حقا وہ زمین ہے وہ زمین ہے وہ زمین ہے -

(২) দীওয়ান মুখফী ১০৩ পৃষ্ঠা।

(১) بستہ ام از دل و جان نیت طرف حرمت
گر دھد پیک اجل فرصت از ین طوفانم -
یا رسول عربی جذ بۂ شوق کہ چو ابر
سالہا شد بہ تمنای درت گریانم -

—"হে রসুলুল্লাহ, আমি স্থির সংকল্প হইয়াছি যদি মরণের দূত কিছুদিন আমাকে অবসর দেয় তাহা হইলে নিশ্চয় আপনার পবিত্র ভূমির তওয়াফে ( প্রদক্ষিণ ) হাজীর হইব। আপনার দ্বারে হাজীর হইবার তীব্র আকাঙ্ক্ষায় বহু বৎসর ধরিয়া আমি অজস্রধারে অশ্রুবর্ষণ করিতেছি।" সুখের বিষয় কবির এই প্রাণের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইয়াছিল, তিনি রসুলে করিমের রওজা মোবারকের জিয়ারতে হাজীর হইতে সক্ষম হইয়াছিলেন। কবি লিখিয়াছেন—

از در حجرۂ تو تا بدر روضۂ خلد
صف زدہ خیل ملک بہر شفاعت بنگر -
مخفئی عاصی و عاجز بتو دار د امید
نیست جز درگہ تو پشت و پناہی دیگر -

این سیہ روی بامید عطا آمدہ است
بامید ت زکجا تا بکجا آمدہ است

—হে রসুলুল্লাহ, আপনার হোজরাপাকের দরজা হইতে বেহেস্তের দ্বার পর্য্যন্ত পাপীদের 'শাফাআতের' জন্য অসংখ্য ফেরেস্তার দল শ্রেণীবদ্ধ ভাবে দাঁড়াইয়া আছে। পাপী ও নিঃসহায় 'মুখফী' আপনার আশাই হৃদয়ে পোষণ করিয়া থাকে। আপনার দরজা ভিন্ন তাহার অন্য কোন আশ্রয়-স্থান নাই। পাপ-কালিমা লিপ্ত মুখ লইয়া সে আপনার অনুগ্রহের ভরসায় এখানে আসিয়া হাজীর হইয়াছে, আপনার আশাতেই সে কোথা হইতে কোথায় আসিয়া পড়িয়াছে।

এখানে আর একটী কথা বলিবার আছে—দীওয়ান মুখফীর মধ্যে একটী গজল ও একটী রোবায়ী জেবুন্নেসার নাম ব্যবহারে রচিত হইয়াছে। আমরা এখানে গজলটী উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি—

دختر شاہم و لیکن رو بفقر آوردہ ام
زیب وزینت بس ہمینم نام من زیب النساست -

এই কবিতাটী জেবুন্নেসার রচিত ধরিয়া লইলেও ইহা হইতে বরং ইহাই প্রমাণিত হইতেছে যে তিনি কচিৎ ২।১টী কবিতা লিখিলেও তাঁহার মুখফী তখল্লোস ছিল না, স্বরচিত কবিতায় তিনি পূরা নামই ব্যবহার করিতেন সুতরাং দীওয়ান মুখফী আদৌ তাঁহার রচিত হইতে পারে না। পরবর্ত্তী কালে সাহজাদীর অন্ধ ভক্তের দল এই দীওয়ানটী তাঁহার নামে চালাইয়া দিবার উদ্দেশ্যে তাঁহার রচিত এই কয়টী কবিতা উহার মধ্যে ঢুসিয়া দিয়াছেন, সুতরাং সেগুলি প্রক্ষিপ্ত ভিন্ন আর কিছু হইতে পারে না।

কবি, মুখফী ( লুক্কাইত ) হইয়াই এতদিন কাটাইয়াছেন। এইবার আমরা তাঁহাকে 'জাহের' করিয়া দিয়া অবসর গ্রহণ করিব। জীবনীকারগণ সাধারণতঃ 'মুখফী' তখল্লোসধারী কয়েকজন কবির নাম উল্লেখ করিয়াছেন কিন্তু তাঁহারা কেহই সম্রাট সাহ জাহানের রাজত্বকালে ভিন্নদেশ হইতে ভারতে আসেন নাই, অধিকন্তু তাঁহাদের মধ্যে কেহই সাহ জাহানের সমসাময়িক কবি ছিলেন না। আমরা ইতিহাস ও কবিজীবনী সমূহের সম্যক আলোচনা করিয়া "মেরঅতে আফ্‌তাব নোমা" مرآۃ افتاب نما , মাজমাউন্ নাফায়েস مجمع النفائس , রিয়াজুল আফ্‌কার ریاض الافکار, তাজকেরায়ে তকী আওহদী تذکرۂ تقی اوحدی এবং গোলশানে সুবহ্‌ گلشن صبح প্রভৃতি গ্রন্থে "মুখফীয়ে রশ্‌তী" নামক একজন কবির নাম ও তাঁহার জীবনের ঘটনাবলী অবগত হইয়াছি। সকল দিক দেখিয়া ও সকল বিষয়ের বিশেষরূপে আলোচনা করিয়া তাঁহাকেই দীওয়ান মুখফীর প্রকৃত রচয়িতা বলিয়া আমরা স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি। "ওয়ালয়ে দাগস্তানী" ( والۂ داغستانی ) রিয়াজুশ শোয়ারা ( ریاض الشعراء ) গ্রন্থে তাঁহার সম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়াছেন। (২)

(১) দীওয়ান মুখফী ১১৫ পৃষ্ঠা।
(২) বোহার লাইব্রেরীর রক্ষিত ( ریاض الشعراء ) ৩৮২ পৃষ্ঠা।

مولانا مخفی رشتی - نام میرزا مغفور - در تذکرۂ تحفۃ السامی این قطعہ را ازوی ذکر کردہ ... ... ... ومیرزا طاہر نصرآبادی نیز در تذکرۂ خود ذکروی باین طرز نمودہ کہ در خدمت امام قلی خان سلگیربیگی بہ فارس می بود - و تقی اوحدی در تذکرۂ کعبۂ عرفان نوشتہ کہ او اوقات در ہند گذاشتہ - جمع دراقوال اینہا باین نحو می تواند شد کہ از زمان شاہ طہماسپ مغفور تا زمان شاہ عباس مبرور بایران بودہ و بعد از مصاحبت امام قلی بہ ہند آمدہ باشد -

অর্থাৎ তাঁহার নাম মৌলানা মুখফীরশতী। তোহ্‌ফাতুসসামী নামক গ্রন্থে এই কবিতাটী………তাঁহার রচিত বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। মির্জ্জা তাহের নসরাবাদী তাঁহার সঙ্কলিত জীবনীতে লিখিয়াছেন—তিনি (মুখফীরশতী) পারস্যদেশে এমাম কুলী খাঁর সংশ্রবে কাটাইয়াছেন, তকী আওহদী তাজকেরায়ে কা'বায়ে এরফানে লিখিয়াছেন—তিনি ভারতবর্ষে জীবনের অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করিয়াছেন। কবি প্রথমতঃ পারস্যরাজ শাহ তহমাস্পের সময় হইতে শাহ আব্বাসের রাজত্বকাল পর্য্যন্ত পারস্যের শাসনকর্ত্তা এমামকুলী খাঁর সংশ্রবে কাটাইয়া তারপর ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন। এইরূপ বর্ণনার সাহায্যে উল্লিখিত ঐতিহাসিকদ্বয়ের দুইটী বিভিন্ন উক্তির মধ্যে সামঞ্জস্য রক্ষা করা যাইতে পারে। অন্যান্য ঐতিহাসিক গ্রন্থেও তাঁহার সম্বন্ধে ইহাই লিখিত হইয়াছে। অধিকন্তু কোন কোনটীতে স্পষ্টভাবেই উক্ত হইয়াছে যে মুখফী প্রথমতঃ পারস্যদেশের এমামকুলী খাঁর সংশ্রবে কাটাইয়া তারপর সম্রাট সাহজাহানের রাজত্বকালে ভারতে চলিয়া আসিয়াছিলেন।

সাহজাহান হিজরী ১০৩৭ সাল হইতে ১০৬৮ সাল পর্য্যন্ত (১৬২৭ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৬৫৭ খৃষ্টাব্দ) রাজত্ব করিয়াছিলেন, এবং এমামকুলী খাঁ হিজরী ১০৪৩ সালে (১৬৩৩ খৃঃ) অমরধামে চলিয়া গিয়াছেন, এরূপ অবস্থায় এমাম কুলীখাঁর মৃত্যুর পর সম্রাট সাহজাহানের রাজত্বকালে 'মুখফীরশতীর' ভারতবর্ষে চলিয়া আসা ঐতিহাসিক প্রমাণ ও যুক্তির হিসাব উভয় প্রকারেই সাব্যস্ত হইতেছে। অধিকন্তু জীবনীকারগণ জীবনকাহিনী বর্ণনা উপলক্ষে তাঁহার যে কয়টী কবিতা উদ্ধৃত করিয়াছেন ঠিক সেইগুলি অবিকল দীওয়ান মুখফীতেও স্থান প্রাপ্ত হইয়াছে।

এক্ষণে আমাদের উল্লিখিত এই সকল যুক্তি ও ঐতিহাসিক প্রমাণ হইতে নিঃসন্দেহরূপে দুইটী বিষয় প্রমাণিত হইতেছে :—

(১)—বিদুষী জেবুন্নেসার সহিত 'দীওয়ান মুখফীর' কোন সংশ্রব নাই।

(২)—খোরাসানের অধিবাসী 'মুখফীরশতীই' এই দীওয়ানের প্রকৃত রচয়িতা। *

---

* স্বপক্ষ ও বিপক্ষমত সংগ্রহে যে সকল গ্রন্থের সাহায্য লওয়া হইয়াছে—

۱ دیوان مخفی ۔ ۲ تذکرۂ شمع انجمن ۔ ۳ صبح گلشن ۔ ۴ ریاض الافکار ۔ ۵ تذکرۃ الخواتین ۔ ۶ مرآۃ العالم ۔ ۷ مرآۃ جہان نما ۔ ۸ مرآۃ الخیال ۔ ۹ کلمۃ الشعراء ۔ ۱۰ عالمگیر نامہ ۔ ۱۱ منتخب اللباب ۔ ۱۲ مرآۃ افتاب نما ۔ ۱۳ مجمع النفائس ۔ ۱۴ تذکرۂ تقی اوحدی ۔ ۱۵ ریاض الشعراء ۔ ۱۶ تذکرۂ کعبۂ عرفان ۔ ۱۷ Wisdom of the East Series ۔ ۱۸ معجم البلدان ۔ ۱۹ مآثر عالمگیری - (লেখক)

# ঈদ-উৎসব

[ এ, মালেক ]

বরষের পরে হরষ লইয়া—বিনাশি' সকল পাপ-বোঝা,
নূতন করিয়া এসেছে আবার আজিকে ঈদের নওরোজা।
জেগে দেখি আজি ভোরের বেলায় মুখর হ'য়েছে দশ দিশি,
নূতন ভূষায় ছেয়ে গেছে ধরা পোহায়েছে যেন দুখ-নিশি।
ঘুচেছে সকল দুঃখ-দৈন্য, ঘুচে গেছে সব মলিনতা,
মুছ্‌লিম যে গো ভাই ভাই তাই কোলাকুলী আজি যথাতথা।
শত্রু হ'য়েছে মিত্র আজিকে' ভুলে গেছে সবে হিংসা দ্বেষ,
মিলেছে সবাই হরষচিত্তে-বিষাদের আজি নাহিকো লেশ।
ছুটেছে নবীন পুলক-ফোয়ারা আজি সবাকার চোখে মুখে,
নব অনুরাগে মাতিয়া সবাই মিলিতেছে ওই বুকে বুকে!
খোদার আশিস্ নামিয়া এসেছে আজিকে বিশ্বজন-পরে,
নব আনন্দ করিছে বিরাজ আজি সবাকার ঘরে ঘরে!
প্রচার করিল যে মহাপুরুষ এ নব তথ্য বিশ্বমাঝ,
পরা'ল যে জন ধরার অঙ্গে এহেন নূতন দৃশ্য সাজ,
তেরশ' বছর চ'লে গেল তবু নড়েনি আজিও বিধান যাঁর,
হৃদয়ের সব ভক্তি-অর্ঘ্য নিবেদিনু আজি চরণে তাঁর।

* * * * *

ইরাণ, তুরাণ, হেজাজ, মেছের, মরক্কো আর আফ্‌গানে,
বাজিছে বাঁশরী সারা দুনয়ায় মহা মিলনের জয়গানে।
সুনীল গগনে উড়িতেছে দেখ বিজয়-নিশান জাগাতে দীন,
আজিকার এই পুণ্য দিবসে জাগো বাঙ্‌লার মুছলেমিন!

# আক্কেল-সেলামী

( কে, এ, বসির )

---

( ১ )

রোস্তম সর্দ্দার জমিদার বাড়ীর প্রধান লাঠিয়াল। তার লাঠির চোটে হাম্‌ছায়া যত লোক সকলেই তাকে খুব ভয় কর্ত্ত। অনাদায়ী মহালে তার প্রতাপ আরো বেশী ছিল। মহালে ঢুকেই রোস্তম চেঁচিয়ে বলত "কোন শালার খাজানা বাকী আছে, দিবিত দে, নইলে এই ডাণ্ডার চোটে ঠাণ্ডা করে দোব!" প্রজারা জানিত জমিদারের অর্থ আছে, শক্তি নাই, রোস্তম তাঁহার শক্তি। রোস্তমের ডাণ্ডার ভয়ে সকলেই এসে খাজানা দিত। বলতে কি, পাহলোয়ান রোস্তম-ই কার্য্যতঃ জমিদার ছিল। সকলেই শক্তের ভক্ত, জমিদার সাহেবেরও কোন ক্ষমতা ছিলনা যে, তার বিরুদ্ধে কথা ক'ন। পরাণ জেলে একদিন টের পেয়েছিল যে, জমিদার অপেক্ষা তার সর্দ্দারের ক্ষমতা বেশী। সেই অবধি সে রোস্তমকে খুব ভয় কর্ত্ত। বড় রুই মাছটা দিতে একটু ইতস্ততঃ করার জন্ত সে খুব শক্ত একটা চড় খেয়েছিল। চিরদিন কখনও সমান যায় না। একদিন সন্ধ্যাবেলা রোস্তমের জর হল, সে জর আর আরোগ্য হ'ল না। রোস্তম মরে গেল—রেখে গেল শুধু তার বংশের চেরাগ রহমতকে

( ২ )

ছেলেবেলা থেকে রোস্তম তার পুত্র রহমতকে পাহলোয়ান করে উঠাতে চেষ্টা করেছিল। রহমত কিন্তু তার কোন চেষ্টাই সফল হ'তে দেয়নি। রহমত যে রোস্তমের কোন কথায় কাণ দিত না তার বিশেষ কারণ এই ছিল যে, সে খুব বোকা ও অহঙ্কারী ছিল। লোকের মুখে সে যখন তার বাবার প্রশংসা শুনত তখন সে আহ্লাদে আত্মহারা হয়ে যেত যে, সে বীরের বেটা বীর। চাটুকারের মুখে যখন সে তার ভবিষ্যৎ নামজাদা পাহলোয়ান হওয়ার আশ্বাসবাণী শুনত তখন সে দেমাগে ভরপুর হয়ে যেত। রহমতের স্বভাব সেই সকল লোকদের মত ছিল যারা— উচ্চ বংশে জন্মগ্রহণ করে গর্ব্বিত কিন্তু নিজেদের চরিত্র ও ব্যবহার অতি জঘন্ত। যারা পূর্ব্বপুরুষদিগের সুকৃতির কথা মনে করে মদমত্ত হয় অথচ নিজেরা সেরূপ হতে যত্নবান হয় না। আপন কর্ম্মদ্বারাই যে মানুষ দুনয়ায় প্রতিষ্ঠাবান হতে পারে এ ধারণা এদের আদৌ জন্মে না।

রোস্তম যখন তার ছেলেকে লাঠি ভাঁজতে শিখতে বলত তখন সে লাঠিটার দিকে বেশ করে তাকাত আর চিন্তা করত। বাবার লাঠিটা থাকলে আমি ঐ লাঠির বরকতেই সব শিখে ফেলব। রোস্তম বেচারা বেশ বুঝতে পেরেছিল যে, তার হতভাগ্য পুত্র থেকে তার সকল গর্ব্ব খর্ব্ব হবে। চোরা না শুনে ধর্ম্মের কাহিনী—রহমত মনে মনে শুধু একটা মস্তবড় আহমক বীর হ'য়ে র'ল।

( ৩ )

জমিদার বাড়ীতে রহমত কয়েকদিন ছিল কিন্তু জমিদার সাহেব তার নামর্দ্দমি ও নির্বুদ্ধিতা দেখে তাকে জবাব দিয়ে দিলেন। এতেও রহমত বুঝতে পার্লেনা যে কেন তার এত অনাদর হল। সে ভ্রমেও একবার চিন্তা কর্লনা যে বাবার বীরত্বের দোহাইতে পুত্রের চাকুরী বহাল থাকে না।

পরাণ যেদিন রোস্তমের হাতে মার খেয়েছিল, তার ছেলে গোবিন্দ তা দেখেছিল। তখন থেকেই তার মনে হচ্ছিল যদি শক্তি থাকত তাহলে রোস্তম সর্দ্দার মাছ নিয়ে দাম-ই দিত—চড় দিত না। সেদিনকার কথাটা সে কিছুতেই ভুলতে পার্লেনা। একদিন সে রফিক সর্দ্দারের

কাছে যেয়ে বল্লে, "সর্দ্দার সাহেব, আপনাকে অমনি রোজ মাছ দোব, আমাকে গোটাকতক লাঠির প্যাচ শেখাতে হবে।" সেত হেসেই অবাক! মাছধরা জেলে নাকি আবার পাহলোয়ান হবে! রফীক বল্লে, "হ্যারে গোবিন্দে, তোরাও আবার জোরওর হবি নাকি? তোদের জাতে আবার কবে হাতিয়ার চালাতে শিখেছিল? দেখিস না জমিদারীর যত গোলমাল আমরা সব মোছলমান সর্দ্দারেরা লাঠি চালিয়ে ঠিক করে ফেলি? বে-দখলী জায়গা দখল কর্ত্তে আগে লাঠি চাই।"

গোবিন্দ একটু সঙ্কোচিত হল লজ্জায় তার মাথা নুয়ে পড়ল। আবার তার সেই পিতৃ-অপমানের কথা মনে হল। সে একটু ছলনা করে বল্লে, "না সর্দ্দার সাহেব, শুনেছি আপনাদের গায়ে বড় শীত কম লাগে। তাই ভাবছিলাম একটু প্যাচ ট্যাচ শিখতে পার্লে শীতটা কম মালুম হত। আর গায়ের কাপড় খানাও ছিঁড়ে গেছে।" রফীক তার একান্তই শেখবার জেদ দেখে বল্লে, "আচ্ছা, রোজ একখানা লাঠি নিয়ে আসিস্! তোর সঙ্গেত কুস্তীর প্যাচ খেলা যাবে না। তুই জেলে তোর শরীরে মাছের আসটে গন্ধ। তোকে লাঠির হাত শিখিয়ে দোব।" জেলের ছেলে জানে প্রাণে সব অভ্যাস কর্ত্তে লাগল। তার সাধনার সবাবে সে একজন পাড়াগেঁয়ে লেঠেল হল।

( ৪ )

রহমতের মা একদিন বল্লে, "রহমত! কতদিন শুধু-ভাত গেলা যায়, তুই মাছ ধর্ত্তেও পার্ব্বিনা কিনেও আনতে পার্ব্বিনা। রহমত রেগেই লাল। সে রোস্তমের বেটা—সে নাকি মাছ ধর্ব্বে! ঘর থেকে তার বাবার সেই পাকান লাঠি গাছটা নিয়ে সে বেরুল। সেদিন রহমত মাছ না নিয়ে ফিরবে না এই তার প্রতিজ্ঞা হল। যে জেলে বাধা দেবে, মাছ দিবে না, সে সেই লাঠির ঘায়ে জব্দ হবে।

পরাণ সেদিন জমিদারের বিলে মাছ ধরছিল। রহমত এসেই পরাণকে হেঁকে বল্লে, "পরাণ মাছ দে"! পরাণ কিছু বল্লেনা দেখে রহমত আবার বল্লে, "পরাণ মাছ দে!" পরাণ এবার তার দিকে চেয়ে বল্ল, "পয়সা এনেছ"?

পয়সা চাওয়াতে রহমতের খুব রাগ হল। সে বল্লে, জেলের জাত বড় পাজি। মিষ্টি কথায় তোদের কাছ থেকে মাছ পাওয়া যাবে না। দে, শীগ্‌গির মাছ দে! নইলে এই ডাণ্ডা মেরে চুরি করে মাছ ধরার দাদ তুলব। জেলের ছেলের সেই পুরাণো রাগ ছিল সে বল্লে, "মাছ দোবনা, কি কর্ব্বে কর দেখি"? গোবিন্দের এই উত্তর শুনে রহমতের ভারী গোস্বা হল, সে হুঙ্কার দিয়ে লাঠি নিয়ে ছুটল। "হারামজাদা, এতদূর স্পর্দ্ধা! জানিস আমি রোস্তম সর্দ্দারের বেটা?" এই বলে রহমত তাকে তেড়ে মার্ত্তে গেল। পরাণের সেই চড়ের কথা মনে হতেই সে সরে গেল। গোবিন্দ এসে রহমতের হাত থেকে লাঠিটা কেড়ে নিল। রহমত স্বপ্নেও ভাবে নাই যে জেলের হাতে এমন ভাবে অপমান হতে হবে। সে বোকা হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। গোবিন্দ বল্লে, "মিঞা শুধু লাঠি থাকলেই শক্তি হয় না, লাঠির সঙ্গে পরিচয় কর্ত্তে হয়। শক্তির সাধনা না কর্লে কখনও শক্তি হয় না।" গোবিন্দের সেই কথাগুলি রহমতের প্রাণে খুব আঘাত কর্ল। সে সেদিন প্রাণে উপলব্ধি কর্লে যে নিজে বীর হওয়ার সে মূল্য কেবলমাত্র বীরের বংশধর বলে পরিচয় দেওয়ায় তার তুলনায় কোন মূল্য নাই। যারা ঘুমের ঘোরে দিন কাটিয়ে শুধু পৈতৃক পাহলোয়ানীর স্বপ্ন দেখে, তাদের এমন আক্কেল সেলামী হওয়া খুব উচিত।

# কুঁড়ি

[ কাজী কাদের নওয়াজ ]

রয়েছে এক বকুল কুঁড়ি
পাতার ফাঁকে আদুল গায়ে
দোদুল দোলে দখিন্ বায়ে।
ভ্রমরা তার ঘোমটা খুলি
নিয়ত কয় প্রেমের বুলি
শোনে না সে, সুপ্তি-মগন
তরুর বুকে শীতল ছায়ে,
দোদুল দোলে দখিন্ বায়ে।

২

যামিনী যায়, ভোরের বাতাস
গুম্‌রে' তাহার বুকের প'রে
দরদী সব বুলবুলী ধায়
প্রণয় মাগি' সোহাগ ভরে।
মিটেনাক' তাদের তৃষা
প্রজাপতি হারায় দিশা,
খোলেনা সে হৃদয়-দুয়ার
মৌমাছিদের করাঘাতে
দোদুল দোলে হাওয়ার সাতে

৩

সহসা কোন্ পথিক কবির
গানের সুরে অফুট কুঁড়ি
ফুট্‌ল—হঠাৎ দিল্ হ'তে এক
বাহির হ'ল হিরণ হুরী।
পরীরা তায় দেখ্‌তে পেয়ে
আস্‌ল সবে ধরায় ধেয়ে
চ'লল ল'য়ে কবিরে সেই
হুরীর সনে স্বর্গ-পথে
দোদুল দোলা কণক-রথে।

# সতী

[ মোহাম্মদ গোলাম জিলানী, বি-এ, বি-টি ]

হাঁ, দেখিয়াছিলাম তাকে সেদিন। যৌবনের উচ্ছল লীলা-তরঙ্গের উদ্বেল আবেগে তখনও তার হৃদয়-যমুনা কানায় কানায় পূর্ণ হয় নাই। কোকিলের কুহুতান, ফুলের গন্ধ আর মলয় মারুৎ কেবল তার বুকের মঞ্জুমধুবনে শিহরণ জাগিয়েছে বটে, কিন্তু তখনও মত্ততার লক্ষণ প্রকাশ পায় নাই। সে ছিল স্নিগ্ধ জ্যোছনা, দ্বাদশীর চাঁদ, পূর্ণ যৌবনের মোহঘোরে পঞ্চদশের পূর্ণতার শুভ-উন্মেষের দিকেই ছিল তার ঝোঁক বেশী। বিকচ-কমল পূর্ণযৌবন স্বপ্নপারের সৌধচূড়ায় উপবেশন করে ইঙ্গিতে তাকে ডাকছিল। এমনি সময়ে তার সুখের স্বপ্ন ভেঙ্গে গেল!.........নাম তার কুহেলিকা; এবং কি আশ্চর্য্য! এই কবিত্বমাখা মধুর নামটীকে বাস্তবিকই সার্থক করে তার জীবনও কুহেলিকায় সমাচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছে, সেই খবর নিয়ে সে নিজেই আমার সামনে এসে দাঁড়াল! সে সদ্য-বিধবা হয়েছে !!

দুই চোখ অশ্রুতে ভরা! বিবাহ বাসরের ফুলের বাস, অগুরুর গন্ধ, শিথির সিঁদুর, ফিরোজা-রংয়ের শাড়ী, জরির আঙ্গরাখা, হিরকদুল, কঙ্কণ, নূপুর, চন্দ্রহার, করবীপুষ্প, কিছুই অঙ্গচ্যুত হয় নাই—সবই আছে। নাই কেবল সেই, যার জন্য তার এই সমস্ত আভরণের দরকার হয়েছিল। মূর্ত্তিমতি শোক-গাথা, শরীরী বেদনা! একবুক ক্রন্দন নিয়ে সে আমার সামনে এসে দাঁড়াল! আমার হৃদয়ের বহুদিন সঞ্চিত বেদনা গুমরিয়া বলে উঠল,—"তারপর?"

কেন এই প্রশ্ন তাই আজ বলছি।

খুবই ভাল বেসেছিলাম তাকে কিন্তু পাই নাই। কেননা সে যেখানে দাঁড়িয়েছিল, আমি সেখানে ছিলাম না। আমাদের দুই জনের মাঝখানে পর্ব্বৎ-প্রমাণ ব্যবধানের সৃষ্টি করে চোখ রাঙিয়ে দাঁড়িয়ে পাহারা দিচ্ছিল নির্ম্মম-নিষেধ। ইস্পাতের মত শক্ত তার মন, বরফের মত ঠাণ্ডা তার শরীর, জলন্ত অঙ্গারের মত রক্তবর্ণ তার চক্ষু; পর্ব্বতের মত ছিল সে অটল, এবং সাহারার মত ছিল সে প্রাণহীন।

কুহেলিকা সারাপ্রাণ দিয়ে ভালবেসেছিল আমাকে। খুব কেঁদেছিলাম দুজনে। খুব চেয়েছিলাম ভিতরে বাইরে নিকটে আসতে—একটু অশ্রু, একটু স্পর্শ, একটু তপ্ত-নিশ্বাস অনুভব করতে। আর.........? আর চেয়েছিলাম দুজনে এক হতে—নিয়মের বাঁধনে!

.........পারি নাই। তার আর আমার মাঝে যে লৌহ প্রাচীর সগর্ব্বে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছিল, তাকে ভাঙ্গবার সাহস তারও হয় নাই—আমারও ছিল না। সে বরণ করল এক পরদেশীকে! যার প্রাণে না ছিল তার জন্য একটু করুণা, না ছিল সহানুভূতি বা প্রেম। তবু সে ছিল তার স্বজাতী !! প্রাণের দাবী উপেক্ষিত হল, বাহিরের মিথ্যা খোলসের মায়ায়!

পরদেশীর প্রাণহীন দেহ গৃহের অঙ্গন ছেড়ে তখনও বাহির হয় নাই। কুহেলিকা আমার খুব কাছে এসে আমার দু'খানি পা অশ্রুতে সিক্ত করে, নত হয়ে মাটিতে মিশে যেয়ে, করুণ স্বরে আমাকে বলল—'তবে আসি।' কণ্ঠ তার কেঁপে গেল। আমি চুপ করে রইলাম—আজ তার একি ব্যবহার?

কিছুই বুঝতে পারলাম না। সে চলে গেল। আমার মাথা যেন ঘুরতে লাগল। শয্যা গ্রহণ করলাম। বাহিরের বিরাট বিশ্ব অশ্রান্ত গতিতে চলেছে। কর্ম্মের হুড়াহুড়ি, স্বার্থের কাড়াকাড়ি আর তথাকথিত ধর্ম্মের বাড়াবাড়ি—সমস্তই তার বুকের উপর তাণ্ডব লীলা করছে। বসুধা বিপুল বেদনায় কেবল দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়ছে। তার প্রাণের ক্রন্দন শরীরী হয়ে—বিশ্বব্যাপী সুরের মাঝে আপনাকে হারিয়ে দিয়ে সজল করুণ দুটী আঁখি বিস্ফারিত করে

অসাড়ের মত পড়ে রয়েছে। তার এ বেদনার শেষ কোথায় ?

সন্ধ্যার ঘুমঘোরে কে যেন আমায় বলে গেল কুহেলিকা মরেছে! তাহার আত্মীয়স্বজন খুব ধুমধামের সহিত তার মৃতদেহ দাহ করবার জন্য পতির সহিত তাকে শ্মশান ঘাটে নিয়ে গিয়েছে!

সেই সন্ধ্যার অন্ধকারে অদূরে গঙ্গার দিকে ছুটে চললাম। অন্ধকারের বুকচিরে দুইটি চিতা ধূ ধূ করে করে জ্বলছে। পার্শ্বে বৃত্তাকারে দণ্ডায়মান কুহেলিকার আত্মীয় স্বজন। তারা তার জয়গান করছে, বলছে— "স্বামী বিরহ সহ্য করতে না পেরে সতী বিষে প্রাণত্যাগ করেছে! ধন্য তার জীবন! আর শত ধন্য সেই দেশ, যে দেশ এই ঘোর কলি যুগেও এমন সতীকে বক্ষে ধারণ করতে পারে!!"

---

# ঈদুল-ফিত্‌র্

[ আবদুল হক ফরিদী ]

৩০শে রমজান! কাল পবিত্র ঈদুল ফিৎর্। আসন্ন উৎসবের আনন্দে সবারই মুখ প্রফুল্ল, প্রাণ মাতোয়ারা। কিন্তু বিশ্ববিশ্রুত ঐতিহাসিক ওয়াকিদীর মুখে আজ হাসি নাই, তিনি চিন্তিত বিমর্ষ। ঘরে ছেলেপিলে আছে, তাতে একটি পয়সা নেই। ভাব্‌ছেন কি করে এই ঈদের আনন্দকে সার্থক ও সুন্দর করে বরণ কর্‌বেন।

স্ত্রী এসে বল্‌লেন, দেখ, শুধু আমাদের জন্য হলে কোনো চিন্তা ছিল না। কিন্তু কষ্ট হয় এই ছেলে মেয়েদের জন্য। কাল যখন উৎসববেশে সজ্জিত প্রতিবেশী সঙ্গীদের আনন্দ কর্‌তে দেখবে, তখন নিজেদের ছিন্নমলিন কাপড় দেখে এদের মনে যে ক্ষোভ ও দুঃখ হবে, তা ভাব্‌তেও আমার কান্না আসছে। শুধু ওদের কাপড়ের জন্য কিছু টাকার যোগাড় হয় না ?'

তাঁর ছিল দুই বন্ধু। স্ত্রীর কথা শুনে একজনের কাছে তিনি কিছু সাহায্যের জন্য লিখে পাঠালেন। কিছুক্ষণ পরেই তিনি হাজার টাকার একটি শীলমোহর করা তোড়া পাঠিয়ে দিলেন।......

তখনও নিশ্বাস নিয়ে সারেন নাই, এমন সময় অপর বন্ধুর পত্র পেলেন—তাঁরও একই অবস্থা। তৎক্ষণাৎ তিনি তোড়াটি যেমন এসেছিল তেমনি তাঁর কাছে পাঠিয়ে দিলেন। তারপর মস্‌জিদে গিয়ে রাত্রি কাটালেন; কারণ স্ত্রীকে মুখ দেখাবার সাহস তাঁর ছিল না।

ভোরে যখন ঘরে ফিরে এলেন, স্ত্রী তাঁর কাজের সম্পূর্ণ অনুমোদন করলেন ও তিরস্কার করলেন না।......

তাঁদের কথা হচ্ছিল, এমন সময় পূর্ব্বোক্ত প্রথম বন্ধু গত কল্যের টাকার তোড়াটি হাতে করে এসে বল্‌লেন, ঠিক করে বল তো, খবর কি ?

ওয়াকিদী বন্ধুকে সব কথা খুলে বল্‌লেন। শুনে তিনি হেসে বল্‌লেন, বেশ মজা হয়েছে ত! আমি যখন তোমার চিঠি পাই, তখন আমার হাতে ঐ তোড়া ছাড়া আর কিছু ছিল না। ওটা তোমাকে পাঠিয়ে আমাদের অপর বন্ধুকে আমার অভাবের কথা জানালুম। তিনি আমারই শীল মোহর করা তোড়াটি আমাকে পাঠিয়েছেন দেখে আমি তো বিস্ময়ে অবাক। তাই ভোর না হতেই তোমার কাছে দৌড়ে এসেছি।

সবাই তখন একচোট হেসে নিলেন। তারপর একশ' টাকা ওয়াকিদীর স্ত্রীর জন্য রেখে বাকী ন'শ টাকা তিন বন্ধু সমান ভাগ করে নিয়ে মহানন্দে ঈদপর্ব্ব সমাধা করলেন। *

---

* 'ধর্ম্মাঠ',—( মুরুজোজ্-যাহাব )—মসূউদী।

জগলুলের উপযুক্ত স্থলাভিষিক্ত—

মোস্তফা নাহাছ পাশা

মোস্তফা নাহাছ পাশা প্রধান মন্ত্রীর পদে বরিত হওয়ায় মিসর গবর্ণমেণ্ট ইংলণ্ডের সর্ব্বনাশকর সন্ধিশর্ত্ত প্রত্যাখ্যান করিতে সমর্থ হইয়াছেন।

## শাহ আমানুল্লার সম্বর্দ্ধনা

ডোভারে বাদশাহ আমানুল্লাহকে ইংলণ্ডের যুবরাজ সম্বর্দ্ধনা করিতেছেন।
যুবরাজ সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জের পশ্চাতে দাঁড়াইয়া আছেন।

## অভিনন্দন পত্র প্রদান

ইংলণ্ডের গিল্ডহলে শাহ আমানুল্লাহকে ইংলণ্ডবাসীর পক্ষ হইতে অভিনন্দন পত্র দেওয়া হইতেছে। সম্মুখে উপবিষ্ট (বাম দিক হইতে) ডচেস-অফ-ইয়োর্ক, বাদশাহ আমানুল্লাহ, ইংলণ্ডের লর্ড মেয়র এবং রাণী ছোরাইয়া বেগম।

## শাহ আমানুল্লাহ

সম্প্রতি ইংলণ্ড হইতে জার্ম্মানী গমন করিয়াছেন।

## আফগান-রাণী ছোরাইয়া বেগম ও সম্রাজ্ঞী মেরী
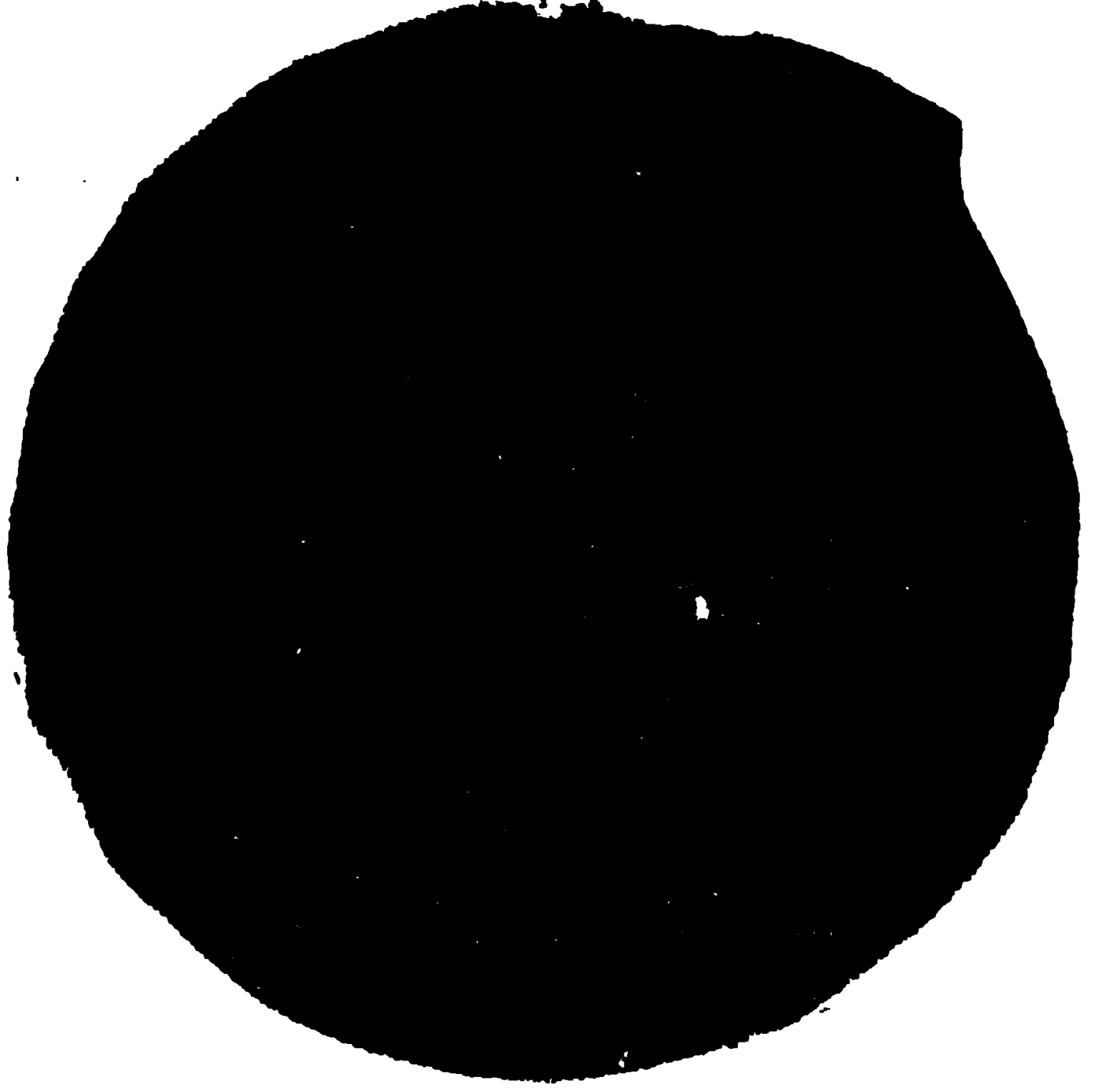
লণ্ডনের ভিক্টোরিয়া ষ্টেশন হইতে বাকিংহাম প্রাসাদে গমন করিতেছেন।

## মহিশূরের দেওয়ান

## মির হালম্বা হোছেন
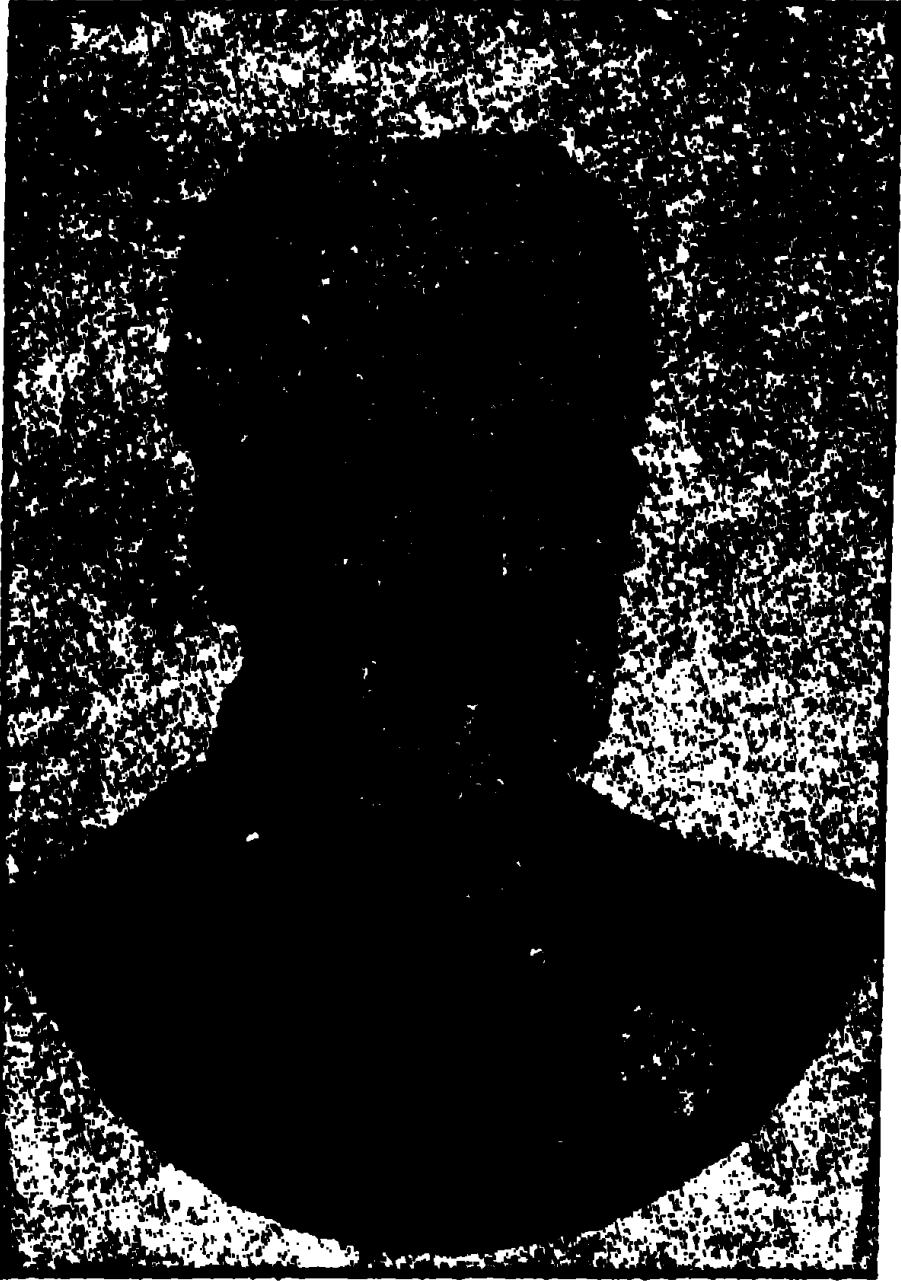
ইনি সম্প্রতি পরলোক গমন করিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ। ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে রাজকীয় কার্য্যে প্রবেশ করেন এবং পুলিশ বিভাগের ডিষ্ট্রীক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট হইতে ইনস্পেক্টরের পদে উন্নীত হন।

## ডাঃ ছোলেমান

ইনি সম্প্রতি এলাহাবাদ হাইকোর্টের আস্থায়ী প্রধান বিচারপতি নিযুক্ত হইয়াছেন।

# বাগেরহাট খাঁজাহান কীর্ত্তি *

[ ডাঃ মোহাম্মদ আবুল কাসেম ]

চিরদিন ইতিহাসপ্রসিদ্ধ স্থানগুলি দেখিবার লালসা আমার হৃদয়ে অত্যন্ত বলবতী থাকায় সুদূর কুমারিকা হইতে কাশ্মীর পর্য্যন্ত পরিভ্রমণ করিয়াছি; কতদিন কত বিপদের সম্মুখীন হইয়াছি; কত অনাহার অনিদ্রা অম্লানবদনে সহ্য করিয়াছি, কিন্তু তবু সে আশা মিটিল না। দূর দূরান্তে গমন করিবার পূর্ব্বে আমাদের গৃহপ্রাঙ্গনে যে সকল ঐতিহাসিক ঘটনা সংঘটিত হইয়াছে তাহার খবর লওয়া হয় নাই। তাই সুযোগমত গত চৈত্র-পূর্ণিমায় জনৈক বন্ধু ও ফটোগ্রাফার সহ খাঞ্জালি দরগা ও তাঁহার কীর্ত্তিদর্শন মানসে প্রাচীন রাজধানী "হাবেলি" যাত্রা করি। খুলনা ঘাট হইতে ফেরিষ্টীমার যোগে রূপসা ঘাটে অবতরণ করতঃ বাগেরহাটছোট গাড়ীতে আরোহণ করিয়া যথাসময়ে "ষাটগুম্বজ" ষ্টেশনে উপস্থিত হইলাম। আমার সহযাত্রী বন্ধুবর সফিউদ্দিন সাহেবের সঙ্গ-সুখে পথের কষ্ট আদৌ অনুভব করিতে পারি নাই। পদব্রজে দীর্ঘ চারি মাইল পথ অতিক্রম করিয়া দশানি গ্রামে জনৈক বন্ধুর গৃহে বিশ্রাম লাভ করিলাম। তথাকার অর্দ্ধমাইল দীর্ঘ সুবৃহৎ "পচাদিঘী" খাঁজাহান আলির প্রধান শিষ্য বুড়ো খাঁর অন্যতম কীর্ত্তি। এই দীঘিটী উত্তর দক্ষিণে বহুদূর বিস্তৃত এবং দৈর্ঘ্যের অনুপাতে বিস্তার অপেক্ষাকৃত অল্প। এত বড় দীঘি দশানি অঞ্চলে আর না থাকিলেও ইহার জল পানের উপযুক্ত নহে, ইহা বর্ত্তমানে দামদল ও শৈবালে পূর্ণ রহিয়াছে।

অতঃপর বেলা ১২টার সময় আমরা খাঁজাহান আলির স্মৃতিমণ্ডিত কীর্ত্তিসমূহ দেখিবার জন্য "হাবেলি" যাত্রা করিলাম এবং এক ঘণ্টার মধ্যে আমরা ঈপ্সিত স্থানে পৌছিয়া প্রথমতঃ ঠাকুরদীঘির উত্তর প্রান্তে অবস্থিত খাঁজাহানের সমাধি প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইলাম এবং একে একে তাঁহার সমাধি-সৌধ, মসজিদ, বাবুর্চিখানা পীরালির সমাধি ও অসংখ্য হর্ম্ম্যের ভগ্নাবশেষ দর্শন করিলাম। সার্দ্ধচারিশত বৎসর পূর্ব্বে এই সকল সুন্দর সুন্দর অট্টালিকা বিপুল অর্থব্যয়ে নির্ম্মিত হইয়াছিল—কত জাঁকজমকের সহিত খাঁজাহান আলি শিষ্য সহ এখানে অবস্থিতি করিতেন। শত শত নগররক্ষী সৈন্য নিষ্কোষিত তরবারি হস্তে রাজধানির চতুর্দ্দিক প্রদক্ষিণ ও কুচ্‌কাওয়াজ করিত—কত দাসদাসী ও রাজকর্ম্মচারী তাঁহাদের সেবায় ব্যাপৃত থাকিত। আর আজ! সময়ের আবর্ত্তনে কিছুই নাই, সব লোপ পাইয়াছে। রাজধানীর প্রান্তবর্ত্তী স্থানসমূহ এখন জঙ্গলাকীর্ণ, শ্বাপদকুল ও বন্যবরাহ প্রভৃতি হিংস্র জন্তুর আবাস ভূমি হইয়াছে। কালস্রোতে সবই ভাসিয়া গিয়াছে আছে শুধু ইতিহাস, আর ব্যর্থতার করুণ স্মৃতি। কবি সত্যই বলিয়াছেন :—

*　*　*　*

"ভাসে তার কত ছবি কত পুণ্য কথা  
কত বরষের হায়, কত শত ব্যথা,  
মনে পড়ে এই পথে এমনি সময়  
বীর যোদ্ধা অগণন চ'লে যেত—আর আজি হায়,  
ভাঙ্গিতে এ নীরবতা ঝিল্লী ভয় পায়।"

*　*　*　*

আজ সেই পুরাতন কীর্ত্তিগুলি সমস্ত যেন ধ্বংসের অবতার রূপে দণ্ডায়মান থাকিয়া শুধু খাঁজাহানের প্রাচীন গৌরব-মহিমা জগত সমক্ষে বজ্রনির্ঘোষে ঘোষণা করিতেছে। এখন তাহাদের দিকে চাহিতে স্বতই হৃদয়ে আতঙ্কের সঞ্চার হয়। বড়ই পরিতাপের বিষয়—আজিও এই ইতিহাস প্রসিদ্ধ স্থাপত্য কীর্ত্তিসমূহ গবর্ণমেণ্ট বা কোন সাধারণ প্রতিষ্ঠান কর্ত্তৃক সু-সংস্কৃত হয় নাই। যাহা হউক এখন আমরা 'ঠাকুরদীঘি' সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

---

* বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সম্মিলনীর বশীরহাট অধিবেশনে পঠিত।

'ঠাকুরদীঘি' নামকরণ সম্বন্ধে সাধারণের মধ্যে অনেক রকম কিংবদন্তী প্রচলিত আছে। কথিত আছে, ঠাকুরদীঘি খননকালে ঘাট গজ মাটির নিম্নে একটি মসজিদ বাহির হয়, তন্মধ্যে একজন সন্ন্যাসী কঠোর ধ্যানে মগ্ন ছিলেন। আবার কাহারো মতে একটি পাথরের যোগী মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছিল বলিয়া এই বিস্তৃত জলাশয়ের নামকরণ হয় 'ঠাকুরদীঘি"। এই মূর্ত্তিটী এখন যে গ্রামে পূজিত হইতেছে সে গ্রামের নাম শিববাড়ী। এই দীঘিকার দৈর্ঘ্য প্রস্থ প্রায় সমান,—দৈর্ঘ্য প্রায় ১৮০০ শত ফুট হইবে, ইহার উত্তর পাহাড় ব্যতীত অন্য তিনটী পাহাড়ের উপর নিবিড় অরণ্য হইয়া পড়িয়াছে; বস্তুত তাহা এত বিভীষিকাময় ও ভয়সঙ্কুল যে দিবাভাগে তাহার ভিতর দিয়া গমনাগমন করা বাস্তবিকই অসম্ভব। উত্তর পার্শ্বে একটি বাঁধানো ঘাট আছে, উহার প্রস্থ প্রায় ৬০ ফুট এবং ইহারই উপর প্রাচীর বেষ্টিত তাপস প্রবর খাঁজাহান আলির অত্যুচ্চ এক গুম্বজওয়ালা সমাধি-সৌধ বিদ্যমান রহিয়াছে। (১) এই বিস্তীর্ণ জলাশয়ের অনেক স্থান শৈবাল ও নাটাবনে পরিপূর্ণ থাকিলেও ইহার জল অত্যন্ত পরিস্কৃত, স্বচ্ছ ও স্বাদু। স্থানীয় অধিবাসীরা এই দীঘির পরিশ্রুত জল পান করিয়া থাকে। ইহার মধ্যে অসংখ্য প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড মৎস্য ও কুমীর আছে। কথিত আছে, খাঁজাহান সাধনা-বলে মানুষের চিরশত্রু হিংস্র জীবের হিংসাবৃত্তি ভুলাইয়া জগতকে দেখাইবার মানসে স্বেচ্ছায় ধলাপাহাড় ও কালাপাহাড় নামক দুইটী কুমীর দীঘিতে ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। খাঁজাহানের অন্তরে হিংসার লেশ মাত্র ছিল না বলিয়াই বোধ হয় নরমাংস প্রিয় জন্তুগণও তাঁহার উন্নত স্বভাবের অনুকরণ করতঃ হিংসাবৃত্তি পরিহার করিয়াছিল। সেই অতীত কালের ধলাপাহাড় ও কালাপাহাড় এখন নাই বটে, কিন্তু তাহাদের বংশধরেরা আজিও বর্ত্তমান রহিয়াছে। এক্ষণে তাহাদের সংখ্যা অগণিত। ইহারাও এখন নরমাংস ভক্ষণ করিতে নিতান্তই নারাজ। প্রতি বৎসর চৈত্র-পূর্ণিমায় এই দীঘির কূলে একটি বিরাট

বাগের হাট ঠাকুর দীঘি

(১) সমাধি-সৌধের চিত্র প্রারম্ভে দ্রষ্টব্য।
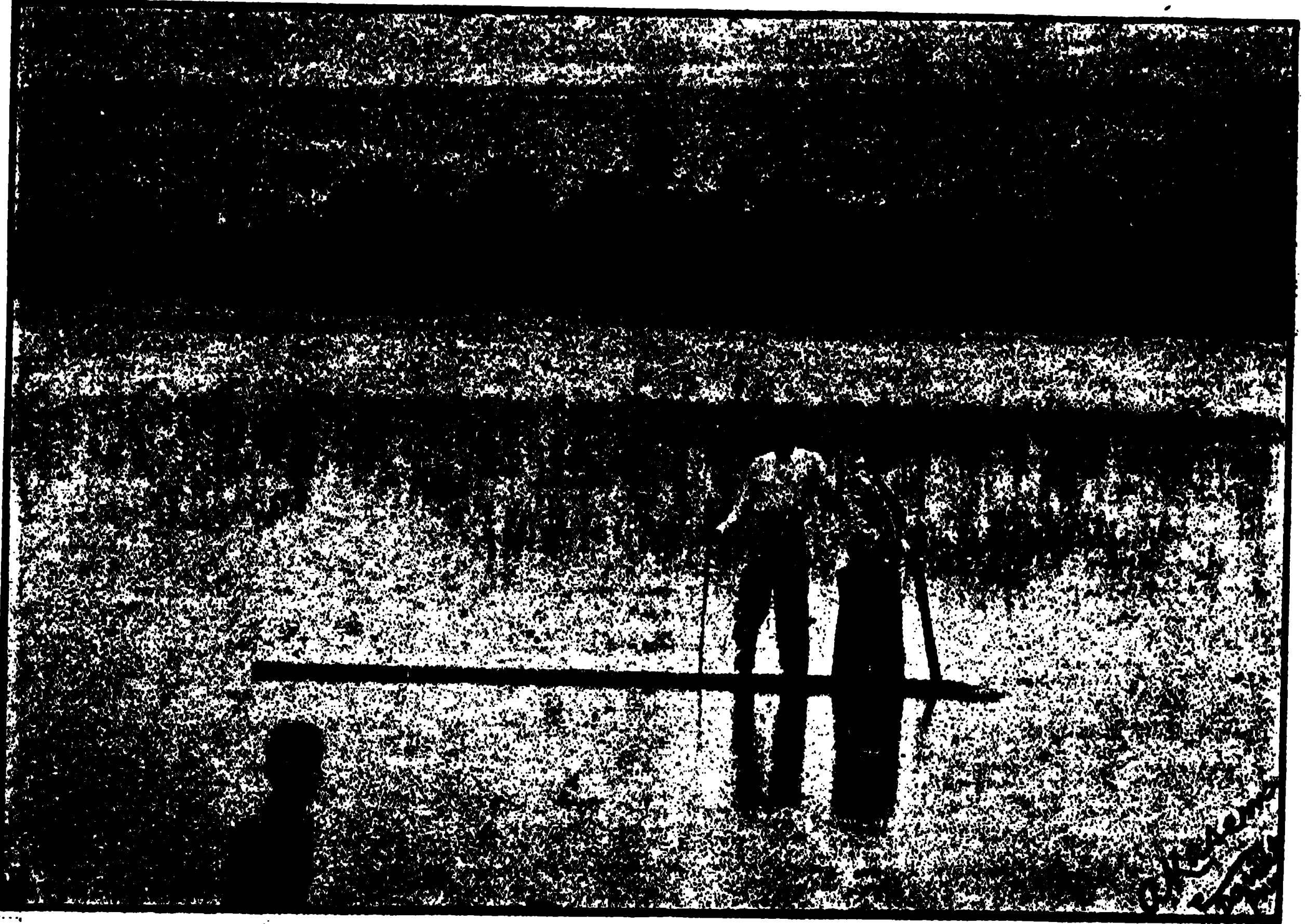
খাজালি উৎসবের অনুষ্ঠান হইয়া থাকে। তাহাতে বহুদূর হইতে লক্ষ লক্ষ হিন্দু-মুসলমান নরনারী পঙ্গপালের মত ছুটিয়া আসিয়া থাকে এবং অভীষ্ট সিদ্ধির আশায় দীঘির তীরে দাঁড়াইয়া কালাপাড় ও ধলাপাড়কে "আয় আয়" বলিয়া ডাকে; অমনি ঘাটের পার্শ্বে ইতস্ততঃ ছোট বড় কুম্ভীর শির উন্নত করিয়া আহার্য্য প্রার্থনা করে। তখন হিন্দু-মুসলমান সকলে চিড়ে, মুড়ী, বাতাসা, পায়রা, মোরগ ও পাঁঠা প্রভৃতি জলে নিক্ষেপ করে; আর কুমীরগুলি পোষা জানোয়ারের মত সিঁড়ির উপরে আসিয়া তাহা লইয়া যায়। অনেক যাত্রী তখনো দীঘির জলে নামিয়া অবগাহনে নিরত থাকে, আবার কেহবা জলের উপরে প্রতিষ্ঠিত প্রস্তর ফলকের উপর উপবিষ্ট হইয়া কুমীরের গতিবিধি ও স্ফটিকবৎ সলিলরাশির নিম্নে মৎস্যের চলাফেরা লক্ষ্য করতঃ নির্ম্মল আনন্দ উপভোগ করে। আমরা ঠাকুরদীঘির ফটো লইবার সময় একখানি তালের ডোঙ্গায় আরোহণ করিয়া ভাসিতে ভাসিতে দীঘির মধ্যে বহুদূর পর্য্যন্ত গিয়াছিলাম—মুহূর্ত্তের জন্যও আমরা কোনরূপ বিপদের আশঙ্কা করি নাই। খাঁজাহান আলি জাতি নির্ব্বিশেষে সকলকে ভালবাসিতেন—তাই তিনি আজিও প্রাতস্মরণীয় ও সর্ব্বজনপ্রিয় হইয়া রহিয়াছেন।

খাঁজাহান আলির সমাধি গৃহ সমচতুষ্কোণ; উহার বাহিরের মাপ ৪৬´ × ৪৬´ ফুট। উহার চারি কোণে চারিটী নাতিদীর্ঘ স্তম্ভ দেওয়ালের সঙ্গে গাঁথা আছে, প্রায়ই দেখা যায়, নোনা দেশের অট্টালিকা মাটী হইতে তিন চারি ফুট ঊর্দ্ধ পর্য্যন্ত নোনা ধরিয়া ক্রমশঃ ক্ষয়প্রাপ্ত হইতে থাকে; উত্তরকালে খাঁজাহানের নিজের সমাধিতে নোনা ধরিয়া ধ্বংস হইয়া না যায়—এই উদ্দেশ্যে তিনি জীবিতকালে চট্টগ্রাম (ইছলামাবাদ) হইতে পাথর আনাইয়া তিন ফুট পর্য্যন্ত গাঁথাইয়া স্বীয় কবরটীকে চির-দিনের মত স্থায়ী ও অটুট করিয়াছিলেন। পরে তাঁহার মৃত্যু হইলে উক্ত কবরের অভ্যন্তরে সেই পূত দেহ সমাহিত করিয়া মাত্র তারিখটি বসাইয়া দেওয়া হয়। সাধারণতঃ তাঁহার সমাধি প্রস্তরগুলি ২´ ফুট লম্বা, ১´ ফুট প্রস্থ এবং ৯´´ ইঞ্চি পুরু। ঘরের ভিত্তি ৮´—৩´´ ইঞ্চি। ইহার বাহিরের দেওয়াল চতুষ্কোণ কিন্তু ভিতরের দেওয়াল

সমাধি শিলালিপি

অষ্টকোণ বিশিষ্ট এবং ২৪´ ফুট দীর্ঘ হইয়া তথা হইতে একটি গোলাকৃতি বৃহৎ গুম্বজ প্রস্তুত হইয়াছিল। ইহার উপর লতা, পাতা, ফুল প্রভৃতি সুন্দরভাবে উৎকীর্ণ ছিল। কালে সে সব লোপ পাইয়াছে। এখন গৃহটী কারুকার্য্যবিহীন হইলেও গুম্বজের উপরিস্থ জমাট এত মজবুত ও সুদৃশ্য যে অদ্যাপি এক প্রকার বিনা সংস্কারে গৃহটী অটল অবস্থায় রহিয়াছে। ইহার সৌন্দর্য্য স্থায়ী ও উপভোগ্য। সমাধি মন্দিরের পূর্ব্বদক্ষিণ ও পশ্চিমদিকে তিনটী বৃহৎ দরজা আছে। উত্তর দিক দ্বারশূন্য। দরজাগুলি ৬´—১০´´ ইঞ্চি বিস্তৃত। ইহারই মধ্যে কৃষ্ণ পাথরে আবৃত সমাধির নিম্নে খাঁজাহান চির বিশ্রাম লাভ করিয়াছেন। ইহার চতুষ্পার্শ্বে দুই স্তরে আরবী ও পারসী ভাষায় তাঁহার জীবন-ইতিহাস ও মৃত্যু তারিখ সঙ্ক্ষেপে সুন্দরভাবে উৎকীর্ণ হইয়াছে। সে সব শিল্প চাতুর্য্য ও ভাস্করলিপি দেখিলে সহজেই প্রতীয়মান হয় যে, এ সমস্ত যথেষ্ট ব্যয়, শ্রম ও সময়সাপেক্ষ। আমরা কবরের উত্তর পার্শ্বের শিলালিপির ফটো গ্রহণ করিয়াছি, সুতরাং এই পার্শ্বে ও দক্ষিণ পার্শ্বে যাহা লেখা আছে আমরা নিম্নে তাহার অনুবাদ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। "আল্লা এক এবং অদ্বিতীয়; মোহাম্মদ তাঁহার রছুল (প্রেরিত)।" ঐ অর্দ্ধ গোলাকৃতি প্রস্তরের উপরিভাগে প্রথম দুই লাইনে আছে:—"হে খোদা! আমাকে শয়তানের প্রলোভন হইতে রক্ষা কর; আমি তোমার দয়াল, করুণাময় নামে আরম্ভ করিতেছি।" ইহারই নিম্নে অধিকাংশ স্থান ২০৪টী চতুষ্কোণ ক্ষেত্র দ্বারা পূর্ণ। উহার প্রথম পাঁচটী চতুষ্কোণের মধ্যে লিখিত হইয়াছে:—"খোদা, একমাত্র অদ্বিতীয় খোদা, যিনি—" ইহারই পর অবশিষ্ট ৯৯টী চতুষ্কোণের মধ্যে খোদাতায়লার গুণকীর্ত্তন উদ্দেশ্যে এক একটী বিশেষ শব্দ লিখিত রহিয়াছে। উহার সবগুলি এখানে অনূদিত করা নিষ্প্রয়োজন। কতকগুলি দৃষ্টান্ত:—"রাজা, রাজরাজেশ্বর, সত্য, নিত্য, অনন্ত, অমূল্য, অতুল্য, আদি, অন্ত, প্রকাশিত, জাগ্রত, গুপ্ত, উপ্ত, রক্ষক, শাসক, পালক, স্রষ্টা, নির্ম্মাতা, শ্রোতা, দর্শক, সর্ব্বব্যাপক, জ্ঞানী, ন্যায়বান, বিচারক, বিবেচক, দয়ালু, ক্ষমাশীল, পথের আলো, পথিকের সঙ্গী এই নিরনব্বইটী বিশেষণের নিম্নে লেখা আছে:—"আল্লাহর তুলনা নাই, তিনি স্রষ্টা ও শ্রোতা, তিনি সকলের তুষ্টি সম্পাদন করেন; তিনি সর্ব্বপ্রধান প্রভু, শ্রেষ্ঠ সহায়ক। * * * পুরুষ প্রধান খাঁজাহান আলির এই সমাধি স্বর্গীয় কাননের অংশ বিশেষ। খোদা তাঁহার প্রতিকৃপালু হউন। ৮৬৩ হিজরী, ২৬শে জেলহজ্জ তাঁহাকে সমাহিত করা হয়। যিনি আল্লাহর দাসানুদাস, যিনি বৃদ্ধ, দুর্ব্বল ও কৃপা ভিখারী, যিনি খোদার রসুলের (মোহাম্মদের) বংশধর, যিনি সুধীবর্গের প্রকৃত বন্ধু এবং অবিশ্বাসীর শত্রু, যিনি মুসলমানের সহায় এবং ইসলাম ধর্ম্মের পৃষ্ঠপোষক—তিনি দেহত্যাগ করিয়াছেন! ১৪৫৯ খ্রীষ্টাব্দ, ২৩শে অক্টোবর।" কোন কোন লব্ধপ্রতিষ্ঠ ঐতিহাসিকের মতে তিনি একশত বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করেন। কবরের নিম্নস্থ প্রস্তরফলকে অনেক গাথা উৎকীর্ণ রহিয়াছে। উহার অনেকগুলি অস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে তাহার পাঠোদ্ধার আজ পর্য্যন্ত হইয়াছে কিনা, জানিতে পারি নাই। সাণ্ডার্স সাহেব অনুমান করেন, সেগুলি মহাগ্রন্থ কোর-আন হইতে উদ্ধৃত তত্ত্ববাণী।

প্রাতঃস্মরণীয় খাঁজাহান আলির সমাধি-সৌধের পশ্চিমে প্রাচীর বেষ্টিত তাঁহার প্রধান মন্ত্রী পিরালি মোহাম্মদ তাহিরের সমাধি বিদ্যমান। কবরটী কষ্টিপাথর দিয়া গাঁথা এবং তদুপরি তাঁহার মৃত্যুর তারিখ, খোদার প্রশংসা প্রভৃতি সুন্দরভাবে উৎকীর্ণ। ইতিহাসে পাওয়া যায়,—মোহাম্মদ তাহিরের জীবিতকালে খাঁজাহান বন্ধুর স্মৃতিস্বরূপ এই সমাধি নির্ম্মাণ করিয়া বন্ধুপ্রীতির অক্ষয় নিদর্শন রাখিয়া গিয়াছেন। কিন্তু মোহাম্মদ তাহিরের দেহ এই কবরে সমাহিত হয় নাই, তিনি কোন কার্য্য উপলক্ষে বিদেশে গিয়াছিলেন তথায় তিনি পরলোকগমন করেন। পিরালির এই সমাধিগর্ভ ফাঁকা, একটি সিঁড়ি দিয়া তন্মধ্যে অবলীলাক্রমে অবতরণ করা যায়। পীরালির অন্যান্য ইতিবৃত্ত প্রসঙ্গক্রমে পরে বলিব। তবে এই সমাধিগাত্রে আরবী ভাষায় যাহা লেখা আছে নিম্নে তাহার হুবহু অনুবাদ দেওয়া গেল:—"এই স্থান স্বর্গীয় কাননের অংশ বিশেষ এবং ইহা এক বিশেষ বন্ধুর সমাধি, তাহার নাম মোহাম্মদ তাহির, তারিখ ৮৬৩ জেলহজ্জ।"

এই সমাধি মন্দিরের পশ্চিম পার্শ্বে অবস্থিত যে বিরাটকায় অত্যুচ্চ এক গুম্বজযুক্ত পাকা ইমারত—ইহার

খাঁজাহানের বাবুর্চিখানা

নাম "বাবুর্চিখানা" বা রন্ধনশালা। আর্ত্তের বন্ধু খাঁজাহান আলি জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত অসংখ্য গরীব-দুঃখী, দুস্থ, অসহায় ও বন্ধুবান্ধবদিগকে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে তৃপ্তি সহকারে ভোজন করাইতেন। এই বাবুর্চিখানা হইতেই বহু পাচক খাঁজাহানের নির্দ্দেশমত হরেক রকম আহার্য্য সরবরাহ করিতেন। এই ইমারতটী ইষ্টক নির্ম্মিত এবং ইহা অদ্যাপি অবিকৃত অবস্থায় রহিয়াছে। এই দালানটীর বাহিরের মাপ ৪০´×৪০´ ফুট; ভিতরের মাপ ২৬´×২৬´ ফুট; ভিত্তি ৭´ ফুট এবং গুম্বজের উচ্চতা ৩৬´ ফুট। ইহার পশ্চিমদিকে কোন দরজা নাই। ইহার উত্তরদিকে একটি, দক্ষিণ দিকে একটি এবং পূর্ব্বদিকে তিনটী দরজা আছে। মাঝের তোরণটী অপেক্ষাকৃত বৃহৎ। ইহার বিস্তার ৬´ ফুট এবং উত্তর দক্ষিণের অন্যান্য দরজা সমূহের বিস্তার যথাক্রমে ৪´—১০´´ ইঞ্চি করিয়া। দক্ষিণ পশ্চিম কোণ হইতে ইহার ফটো গৃহীত হইয়াছে। এই ইমারতটীর পশ্চিমে খাঁজাহান মাদ্রাসা নামক একটী মাদ্রাসা স্থানীয় কতিপয় বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তির সমবেত চেষ্টায় স্থাপিত হইয়াছে। সম্প্রতি এই মাদ্রাসায় সরকারী সাহায্যের ব্যবস্থা হইয়াছে। এখান হইতে পশ্চিমদিকে তির্য্যকভাবে চারি পাঁচ মিনিটকাল হাটিলে ঠাকুর দীঘির পশ্চিমোত্তর কোণে জঙ্গলের ভিতর একটি অর্দ্ধভগ্ন সমাধি গৃহ দেখিতে পাওয়া যায়। সাধারণে ইহাকে জেন্দাপীরের কবর বলিয়া থাকে। চারিটী সুদৃঢ় প্রস্তর স্তম্ভের উপর ময়টী গুম্বজ এবং চতুর্দ্দিকে ইষ্টক গাঁথুনি প্রাচীন স্থাপত্য বিদ্যার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। এই সমাধির উপর নানাশ্রেণীর লতা-পাতা ও আগাছা গজাইয়া ক্রমশঃ ধ্বংসের পথে লইয়া যাইতেছে। খাঁ জাহান আলী নিজে অসীম ক্ষমতাসম্পন্ন ফকির ছিলেন এবং তিনি সাধু দরবেশের সংসর্গ ভালবাসিতেন; তজ্জন্য তিনি চট্টগ্রাম, শ্রীহট্ট প্রভৃতি দূরবর্ত্তী স্থান হইতে সাধুপুরুষদিগকে আনয়ন করতঃ খলিফাতাবাদে (বর্ত্তমান বাগেরহাট) পীরোত্তর সম্পত্তি দিয়া বাড়ী নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন। তাঁহারা অহরহঃ খাঁজাহান আলির সহিত

মিশিয়া আধ্যাত্মিক বিষয়ে আলোচনা করিয়া আত্মোন্নতির পথ সুগম করিতেন। অদ্ভুত ক্ষমতা সম্পন্ন চাঁদ খাঁ ও বাঘ খাঁ নামক দুইজন ফকিরকে তিনি ফরিদপুর হইতে আনিয়া স্বীয় রাজধানীর মধ্যে গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন। এই জেন্দাপীর প্রথমে শ্রীহট্টে শাহ্‌জালালের সঙ্গী ছিলেন পরে খাঁ জাহান তাঁহাকে তথা হইতে আনিয়া স্বীয় পার্শ্বচর করিয়া লন। কথিত আছে, জেন্দাপীর কঠোর সাধনার ফলে খোদার নৈকট্য লাভ করিয়াছিলেন; তাঁহার অনুগ্রহে তিনি প্রতিরাত্রে এক সহস্র সুবর্ণ মুদ্রা পাইতেন। কাহারো মতে প্রতিদিন পাঁচটী আশরফি পাইতেন এবং ফজরের নামাজ সমাপনান্তে সেই সমস্ত অর্থ নানাবিধ সৎকর্ম্মে খরচ করিতেন। একদিন তাঁহার সহধর্ম্মিণী লোভের বশবর্ত্তী হইয়া পীর সাহেবের অজ্ঞাতে একটি মোহর লুকাইয়া রাখিয়াছিলেন—তদবধি অভাবনীয়রূপে খোদা-দত্ত মোহর প্রাপ্তি সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হইয়া গেল। এই অদ্ভুত ঘটনার কিয়দ্দিবস পরে তিনি একখানি কোরআন শরীফ হাতে লইয়া পড়িতে পড়িতে কবরের অভ্যন্তরে ঢুকিয়া যান, তারপর আর তিনি উঠেন নাই। জেন্দাপীরের আসল নাম কি ছিল তাহা কোন ইতিহাসে পাওয়া যায় না। তবে কোন কোন পুঁথিতে জেন্দাপীরের নাম মোহাম্মদ সাহ বলিয়া উক্ত এবং তিনি বাঘের উপর চড়িয়া ভ্রমণে বাহির হইতেন, ইহাও লিখিত হইয়াছে। যাহা হউক তাঁহার প্রকৃত নাম যাহাই হউক তবে জেন্দাপীর তাঁহার উপাধি, ইহাই আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস। এ সম্বন্ধে বারান্তরে বিশদভাবে আলোচনা করিবার বাসনা রহিল। তবে বর্ণিত পুঁথিতে আরো উক্ত হইয়াছে, জেন্দাপীর তাঁহার সমাধির পশ্চিমে "রেজায়খোদা" নাম দিয়া একটি মসজিদ প্রস্তত করিয়াছিলেন। তাহার ভগ্নাবশেষ আজিও বর্ত্তমান রহিয়াছে।

ইতিহাসে পাওয়া যায়—যখন ধার্ম্মিক প্রবর ফিরোজশাহ্‌ প্রবল-প্রতাপে দিল্লী শাসন করিতেছিলেন, সেই সময় তাঁহার অধীনস্থ প্রজাবৃন্দ তাঁহার সুশাসনে যারপর নাই সুখে ছিল। বিচক্ষণ খাঁজাহান আলি ছিলেন তখন তাঁহার প্রধান মন্ত্রী। ১৪৮৮ খ্রীষ্টাব্দে ফিরোজশাহ্‌ কালগ্রাসে পতিত হইলে তদীয় অপ্রাপ্ত বয়স্ক পুত্র পিতার শূন্য সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। কিছুকাল এই ভাবে রাজকার্য্য পরিচালনা করিবার পর তাঁহার পালিত পুত্র ইব্রাহিম শাহকে জৌনপুরে রাজ্যভার দিয়া নিজে সৈন্য-সামন্ত, ধন-দওলত লইয়া পূর্ব্বাঞ্চলে ইছলাম ধর্ম্মের বিজয় বৈজয়ন্তী উড্ডীন মানসে প্রবল প্রতাপে অভিযান করেন। খাঁ জাহান ছিলেন সাত্ত্বিক, নিষ্কামচরিত্র সাধুব্যক্তি; ধর্ম্ম প্রচারার্থে শেষ জীবন অতিবাহিত করিবেন ইহাই ছিল তাঁহার মুখ্য উদ্দেশ্য। পক্ষান্তরে পাঠান নরপতিদিগের মধ্যে অনেকেই তৎকালে ধর্ম্মার্থে জীবন উৎসর্গ করিয়া ধন্য ও গৌরবান্বিত হইতেন। রাজা লক্ষণসেনের আমলে অদ্ভুত ক্ষমতাশালী একজন সাধক ইস্‌লামের অপার মহিমা ঘোষণা করিবার সঙ্কল্প করিয়া শ্রীহট্টে গমন করেন, তথায় তাঁহার সমাধি ও দরগা আছে। এই ইছলাম-দোস্ত ফকিরের নাম মহাত্মা শাহ্‌জালাল। খাঁজাহান একজন সমাজ হিতৈষী মহাত্মা ছিলেন, তিনি ১০০ একশত শিষ্য সহ যশোহর জেলার অন্তর্গত বারবাজার নামক স্থানে আস্তানা স্থাপন করেন, পূর্ব্বে এই স্থানের নাম ছিল "চাম্পাই অথবা ছাপাই।" তথায় এখনো খাঁজাহানের অগণিত কীর্ত্তিমণ্ডিত মস্‌জিদ, দীঘি প্রভৃতি তাঁহার পুণ্যের মহিমা ঘোষণা করিতেছে। তথা হইতে লোকলস্কর লইয়া খাঁজাহান মুড়লীতে আসেন এবং উক্ত স্থানকে নগরে পরিণত করেন। কস্‌বায় খাঁজাহানের শিষ্য গরিবশাহ্‌ ও বেরাম খাঁর দরগা অদ্যাপি হিন্দু মুসলমানের তীর্থসম হইয়া রহিয়াছে। এই স্থানে তিনি শিষ্যাদি লইয়া দশ বার বৎসর বাস করেন। বুড়ো খাঁ ও তদীয় পুত্র ফতে খাঁ প্রভৃতি কয়েকজন খাঁজাহানের প্রিয় শিষ্য তাঁহার আদেশে সদলবলে কপোতাক্ষ পথে দক্ষিণাঞ্চলে ধর্ম্ম প্রচারার্থে অভিযান করেন। তাঁহাদের যাইবার পথে অসংখ্য মসজিদ ও দীঘি প্রভৃতি তাঁহাদের গৌরবময় জীবনের মাহাত্ম্য ঘোষণা করিতেছে। খুলনা জেলার অন্তর্গত আমাদি গ্রামে একটি চাঁপাগাছ তলায় বুড়ো খাঁ ও ফতে খাঁর সমাধি আছে। আমাদির নিকটবর্ত্তী নগরে বেড় নামক স্থানে প্রকাণ্ড লস্কর দীঘি এবং মসজিদ, কুড়গ্রামে একটি নগুম্বজ মস্‌জিদ পিতাপুত্রের অমরস্মৃতি বুকে লইয়া দাঁড়াইয়া আছে। কালস্রোতে মস্‌জিদটী জঙ্গলাবৃত ও মৃত্তিকা নিম্নে প্রোথিত হইয়া গিয়াছিল; কিছুকাল আগে মাটী খুঁড়িয়া

উহাকে বাহির করা হইয়াছে বলিয়া স্থানটীর বর্ত্তমান নাম হইয়াছে "মস্‌জিদ কুড়" !

খাঁজাহান আলি সদলবলে মুড়লী হইতে দীঘি, মস্‌জিদ ও রাস্তা প্রভৃতি নির্ম্মাণ করিতে করিতে ক্রমাগত পূর্ব্বমুখে অগ্রসর হন। সেই সমস্ত কীর্ত্তিকে লোকে "খাঁঞ্জালি কীর্ত্তি" বলিয়া থাকে। বাঙ্গলাদেশে এমন শিক্ষিত লোক খুব কমই আছেন যিনি খাঁজাহানের কীর্ত্তির কথা জানেন না। খাঁজাহানের অভিযান কালে যদি কেহ তাঁহার গতিরোধ করিতে অথবা বাধা দিতে চেষ্টা করিত তবে তিনি তাহাদের সহিত যুদ্ধ করিতেন, অবশেষে তথায় শান্তি স্থাপন করতঃ স্বীয় অভীষ্ট পথে অগ্রসর হইতেন। ইসলামের বিজয় পতাকা উড়াইবার জন্য তিনি সমস্ত ভয়-ভীতি ও বিপদ উপেক্ষা করিয়া অগ্রসর হইতেন। অনেকে বলিয়া থাকে— এক একটা কীর্ত্তি তিনি এক একরাত্রে সমাপ্ত করিতেন। প্রভাত হওয়ার পূর্ব্বে যদি সে রাত্রির কীর্ত্তি শেষ করিয়া উঠিতে না পারিতেন তাহা হইলে সেটী অসম্পূর্ণই থাকিয়া যাইত। তাঁহার সঙ্গে অসংখ্য সৈন্য থাকিত, যুদ্ধোপযোগী অস্ত্র-শস্ত্র ও প্রত্যেকের কাছে এক একখানি করিয়া কোদাল ও ঝুড়ি থাকিত।

এইরূপে খাঁজাহানের পুণ্যকীর্ত্তি দর্শনে, মধুর বচন ও ধর্ম্ম উপদেশ শ্রবণে অনুপ্রাণিত হইয়া বহু অমুসলমান তাঁহার কাছে সত্য সনাতন ইছলাম ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিল। মুসলমানেরা সাধারণতঃ পূর্ব্ব পশ্চিমে লম্বা করিয়া জলাশয় খনন করিয়া থাকেন, কিন্তু হিন্দুদের চিরাচরিত রীতি অনুসারে এইরূপ জলাশয়ের জল তাঁহাদের পক্ষে অব্যবহার্য্য। খাঁ জাহান এই নিমিত্ত এই নীতি সর্ব্বদা মানেন নাই ; তাঁহার বহু সংখ্যক দীঘি উত্তর দক্ষিণে বিস্তৃত দেখা যায়। ইহাতে সহজেই প্রতীয়মান হয় যে, তিনি জাতিধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে প্রজাপালন ও তাহাদের সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি লক্ষ্য করিতেন। এইরূপ পুণ্যকার্য্য করিতে করিতে তিনি পয়োগ্রাম-কস্‌বায় উপনীত হন এবং কয়েক বৎসরের মধ্যে ইহাকেও তিনি কস্‌বায় পরিণত করেন। এখানে ভৈরবকূলে অদ্যাপি তাঁহার দরবার ও মস্‌জিদের ভগ্নাবশেষ, সুন্দর কষ্টিপাথর ও একখানি রাজমহল অথবা চট্টগ্রামের পাথর আছে। স্থানীয় অধিবাসীরা বিশেষ বিশেষ পর্ব্বোপলক্ষে এখানে নামাজ পড়িয়া থাকেন।

অবশেষে খাঁজাহান পয়োগ্রাম হইতে মুড়লী গ্রামের মধ্য দিয়া একটি সুবিস্তৃত প্রকাণ্ড ছায়াবহুল রাস্তা নির্ম্মাণ করেন। গ্রামটী রাস্তার দুই পার্শ্বে বিভক্ত হইয়া উত্তর ডিহি ও দক্ষিণ ডিহি নামে অভিহিত হইয়াছে। এই দুই ডিহিতেই বড় বড় বিস্তীর্ণ তড়াগ সমতুল্য দীঘি বর্ত্তমান রহিয়াছে। পয়োগ্রামে বহুসংখ্যক শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত মুসলমান বাসকরতঃ বিভিন্ন উচ্চ রাজকার্য্যে নিযুক্ত আছেন। মৌলবী আকরম হোসেন এম-এ ; সাহেবের লিখিত "ইস্‌লামের ইতিহাস" দেশ বিদেশে খ্যাতি লাভ করিয়াছে। পয়োগ্রামে অধিষ্ঠানকালে চেঙ্গুটিয়া পরগণার তদানীন্তন আত্মাভিমানী জমিদার দক্ষিণা নাথ রায় চৌধুরীর সহিত খাঁজাহানের বিবাদ হয়, এবং এই কলহের ফলে দক্ষিণা ঠাকুর পরাস্ত ও পরাভূত হন। তখন দক্ষিণারায়ের দুই পুত্র কামদেব ও জয়দেব বাধ্য হইয়া খাঁজাহানের সঙ্গে সম্প্রীতি স্থাপন করতঃ তাঁহার কর্ম্মচারী পদে বহাল হইলেন। ইহার অব্যবহিত পূর্ব্বে একজন হিন্দু স্বেচ্ছায় ইছলাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া খাঁঞ্জালির পথ প্রদর্শক হইয়া এদেশে আসিয়াছিলেন। তাঁহার ঐছলামিক নাম মোহাম্মদ তাহির ; উত্তরকালে এই নও-মোছলমান অত্যন্ত গোঁড়া ও স্বাধীনপন্থী হইয়া পড়েন। খাঁজাহান পয়োগ্রামে যখন স্থায়ীভাবে শাসনকর্ত্তারূপে রাজকার্য্য পর্য্যালোনা করিতেছিলেন তখন এই তাহিরই তাঁহার প্রধান মন্ত্রীর পদে নিযুক্ত হন। এই মোহাম্মদ তাহিরই পরে পীরালি আখ্যায় অভিহিত হইয়া ধর্ম্মযাজকরূপে ইছলামের মাহাত্ম্য প্রচারে ব্রতী হন এবং খাঞ্জালি তাঁহাকে সর্ব্ববিষয়ে সাহায্য করিতে থাকেন। রোজার (উপবাসের) দিনে তাহির একটী লেবু লইয়া শুকিতেছিলেন, কামদেব ও জয়দেব তদ্দর্শনে সংস্কৃত শ্লোক আওড়াইয়া প্রমাণ করিয়া দিলেন যে, "ঘ্রাণে অর্দ্ধেকভোজন" সুতরাং রোজা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। ইহার উত্তরে তাহির তাঁহাদিগকে মুখে কিছু না বলিলেও মনে মনে তাঁহাদের উপর ভয়ানক অসন্তুষ্ট হইলেন. এবং এই অপমানের উপযুক্ত প্রতিশোধ দিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়া সুযোগের প্রতীক্ষায় রহিলেন। সুযোগ জুটিল,—একদিন পলাণ্ডু সংযোগে যেখানে গোমাংস রন্ধন হইতেছিল তাহের কৌশলে জয়দেব ও কামদেবকে তথায় আনাইলেন। কিন্তু উহারা যেমন গন্ধ পাইয়া

নাকে কাপড় দিয়াছেন অমনি "ঘ্রাণে অর্দ্ধেক ভোজন" বাক্যটী পুনরাবৃত্তি করিয়া সভামধ্যে রটাইয়া দিলেন উঁহারা মুসলমান হইয়াছেন। পরে উঁহারা ধর্ম্মান্তর গ্রহণে বাধ্য হন। তখন তাঁহাদের দুই ভ্রাতার নাম যথাক্রমে কামাল-উদ্দিন খাঁ ও জামালউদ্দিন খাঁ রাখা হয়। পরে ইঁহাদের বংশ ২৪ পরগণা ও খুলনার বহুস্থানে ব্যপ্ত হইয়া পড়ে। শ্রদ্ধাস্পদ মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ ছাহেব ও তাঁহার আত্মীয়গণ ইঁহাদেরই বংশধর। পয়োগ্রাম ও সাতক্ষীরার নিকটবর্ত্তী কয়েকটী স্থানে কায়স্থ ও ব্রাহ্মণ জাতীয় পীরালি মুসলমানের বাস আছে। এই পীরালি তাহিরের সমাধি খাঁজাহান আলির কবরের পার্শ্বে অদ্যাপি বর্ত্তমান রহিয়াছে। তাহা কষ্টিপাথরে নির্ম্মিত। পূর্ব্বে আমরা সে সম্বন্ধে কিছু কিছু আলোচনা করিয়াছি।

( ক্রমশঃ )

---

# বাঙ্গালী মুসলমানের সাহিত্য সমস্যা *

[ এস, ওয়াজেদ আলি বি, এ ( কেন্টাব ) বার-এট-ল ]

' উর্দ্দু আর বাঙ্গলার কলহ এখন এক রকম শেষ হয়ে গেছে। বাঙ্গলা দেশে উর্দ্দু ভাষা প্রচলনের চেষ্টা যাঁরা করেছিলেন, তাঁরা তাঁদের প্রয়াসের অবশ্যম্ভাবী নিস্ফলতার কথা বুঝতে পেরে, নিজেদের সংযত করে নিয়েছেন। ভবিষ্যতে আবার সে চেষ্টা যে কেউ করবে, তার বড় একটা সম্ভাবনা নাই। এই democracyর যুগে সাধারণের সুবিধা এবং স্বার্থের বিরুদ্ধে কোন চেষ্টা যে কার্য্যকরী হবে না, সে কথা বলতে কোন দুঃসাহসের প্রয়োজন হয় না। সুতরাং উর্দ্দুর বিভীষিকা নিয়ে ভাবনা করবার বিশেষ দরকার এখন আর আমাদের নাই। '

বাঙ্গলা ভাষাকে মাতৃভাষারূপে বরণ করে নেওয়াতে কিন্তু কতকগুলি নূতন সমস্যা আমাদের সামনে এসে হাজির হয়েছে। সে সবের উচিত সমাধান আমাদের সাহিত্যের এবং কালচারের মঙ্গলের জন্য বিশেষ দরকারী।' সেই সব সমস্যারই দুই একটী আজ আপনাদের সামনে উপস্থিত করবো, আর তাদের সমাধান কিরূপ হওয়া উচিত তা নিয়ে দুচার কথা বলবো। আমার আজকার এই মন্তব্য শুনে যদি সমস্যাগুলির বিষয় নূতন করে চিন্তা করবার আবশ্যকতা আপনারা অনুভব করেন, তা হলেই আমার শ্রম সফল হয়েছে বলে আমি মনে করবো। জীবন্ত ভাষার কোন স্থায়ী আকার প্রকার নাই। জীবন্ত প্রাণী যেমন ক্রমাগত তার রূপ বদলাতে থাকে, জীবন্ত ভাষাও ঠিক তাই করে। পরিবর্ত্তনই হচ্চে জীবনের নিয়ম। ভাষার বেলাতেও সে নিয়মের ব্যতিক্রম হয় না। অন্য ভাষার কথা ছেড়ে দিন। আমাদের এই বাঙ্গলা ভাষাই বিদ্যাসাগরের সময় থেকে এখন পর্য্যন্ত কয়েকবার রূপান্তর গ্রহণ করেছে—একবার বঙ্কিমের যুগে, একবার রবীন্দ্রনাথের প্রাথমিক যুগে, আবার একবার আমাদের এই বর্ত্তমান যুগে। এই অল্পকালের মধ্যে আমাদের মাতৃভাষা যে কতটা বদলে গেছে, তা, এখন একবার বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সীতার বনবাসটী খুলে পড়লেই বুঝতে পার্ব্বেন।

কথ্যভাষার এবং জাতীয় রুচির পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে লিখিত ভাষাও পরিবর্ত্তিত হয়ে থাকে। বিদ্যাসাগরের যুগ থেকে এখন পর্য্যন্ত বাঙ্গালীর কথ্যভাষায় এবং রুচিতে যে পরিবর্ত্তন হয়েছে, তার অবশ্যম্ভাবী প্রতিক্রিয়া স্বরূপ তার জাতীয় সাহিত্যের ভাষাও বদলে গেছে। আমি এখানে অবশ্য বাঙ্গালী হিন্দুর কথাই বলছি। 'দুঃখের সঙ্গে আমায় স্বীকার করতে হচ্চে, বাঙ্গালী মুসলমানের অস্তিত্বের প্রভাব বাঙ্গলা সাহিত্য এখন পর্য্যন্ত বিশেষ ভাবে অনুভব করেনি। বাঙ্গালী মুসলমান এতদিন পর্য্যন্ত বাংলা ভাষার চর্চ্চাকে

* বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সম্মিলনীর বশীরহাট অধিবেশনে পঠিত।

দোষনীয় বলেই মনে করে এসেছিলেন। তাঁদের কথ্য-ভাষার এবং রুচির পরিবর্ত্তনের সঙ্গে যে বাঙ্গলার সাহিত্যিক ভাষার কোন Organic সম্বন্ধ আছে, বা থাকতে পারে, সে তাঁরাও ভাবেননি আর তাঁদের প্রতিবেশী হিন্দুরাও ভাবেননি। বাঙ্গলা ভাষা বলতে এতদিন সকলে বাঙ্গালী হিন্দুর ভাষাই বুঝতো, আর "বাঙ্গলা সাহিত্য" ছিল বাঙ্গালী হিন্দু সাহিত্যের নামান্তর মাত্র।

সুখের বিষয়ই বলুন আর দুঃখের বিষয়ই বলুন, বাঙ্গলা ভাষা এবং সাহিত্যের উপর বাঙ্গালী হিন্দুর সেই একাধিপত্য এখন শেষ হয়েছে। অনেক দেখে এবং অনেক ঠকে বাঙ্গালী মুসলমান শেষে পরের মাতৃভাষাকে ছেড়ে নিজের মাতৃভাষাকেই তার সাহিত্যের ভাষারূপে বরণ করেছে। অনেক প্রতিভাশালী মুসলমান লেখক এখন মাতৃভাষায় জাতীয় সাহিত্য সৃষ্টির চেষ্টায় তাঁদের শক্তি নিয়োগ করে-ছেন। তাঁদের প্রভাব আমাদের সাহিত্য অনুভব করতে আরম্ভ করেছে। তার সঙ্গে কিন্তু নূতন নূতন সমস্যা এসে বঙ্গের সুধীমণ্ডলীকে চঞ্চল করে তুলেছে।

সকলেই জানেন, বাঙ্গালী মুসলমানের কথ্যভাষা, বাঙ্গালী হিন্দুর কথ্যভাষার নামান্তর মাত্রই নয়। বাঙ্গালী হিন্দুর কথ্যভাষায় যেমন সংস্কৃত মূলক শব্দের প্রাচুর্য্য দেখতে পাওয়া যায়, বাঙ্গালী মুসলমানের কথ্যভাষায় তেমনি আরবী, ফার্সি এবং উর্দ্দু ভাষা মূলক শব্দের প্রাচুর্য্য দেখা যায়। প্রথম সমস্যা হচ্চে, আমাদের ব্যবহৃত আরবী, ফার্সি এবং উর্দ্দু মূলক শব্দগুলি ত্যাগ করে, তাদের পরিবর্ত্তে আমাদের হিন্দু প্রতিবেশীদের ব্যবহৃত সংস্কৃত মূলক শব্দগুলি গ্রহণ করবো, না আমাদের নিজস্ব শব্দগুলিকেই বাঙ্গালা সাহিত্যে চালাবার চেষ্টা করবো।

আমাদের দ্বিতীয় সমস্যা হচ্চে প্রথম সমস্যার চেয়েও গুরুতর। বাঙ্গালা ভাষাকে সে দিনকার দুগ্ধপোষ্য শিশু বলা অসঙ্গত হবে না। এখন পর্য্যন্ত এ ভাষা বর্ত্তমান যুগের ভাব এবং অভিজ্ঞতা প্রকাশের জন্য যথেষ্ট নয়। ঊনবিংশ শতাব্দির প্রথমার্দ্ধে বৈজ্ঞানিক পরিভাষা বলে বাঙ্গলায় কিছু ছিল না। উক্ত শতাব্দির দ্বিতীয়ার্দ্ধের প্রারম্ভে অক্ষয় কুমার সরকার প্রমুখ মনস্বীরাই বাঙ্গলার বৈজ্ঞানিক পরিভাষার ভিত্তি স্থাপন করেন। তাঁরা সকলেই ছিলেন হিন্দু, সুতরাং সংস্কৃত ভাষার ভাণ্ডার থেকেই তাঁরা সেই পরিভাষা আহরণ করেন। পরবর্ত্তী যুগের লেখকেরা তাঁদের নির্দ্দেশিত পন্থারই অনুসরণ করে এসে-ছেন। আমাদের বাঙ্গলা সাহিত্যের আসরে নামতে কিন্তু এখন জটিল এক সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। আমার প্রতিভা-শালী বন্ধু প্রফেসার আবদুল মজিদ প্রমুখ সাহিত্যিকেরা সংস্কৃতের পরিবর্ত্তে আরবী থেকে বৈজ্ঞানিক পরিভাষার আমদানির জন্য আমাদের উপদেশ দিচ্ছেন।

প্রফেসার সাহেবের যুক্তি হচ্চে, আমরা মুসলমান, আর আমাদের Culture এর ভাষা হচ্চে আরবী। মাতৃ-ভাষা আমাদের বাঙ্গলা বটে, কিন্তু সে ভাষার নিজস্ব কোন বৈজ্ঞানিক পরিভাষা নাই। আমাদের প্রতিবেশী হিন্দুরা তাদের Classical language সংস্কৃত থেকে মাতৃভাষার অভাব পূরণের জন্য চেষ্টা করছেন। আমরা সংস্কৃত জানি না। আরবী আমাদের এখনও শিখতে হয়, আর বরাবরই হবে। কেননা আরবীই হচ্চে আমাদের Classical language। হিন্দুরা যদি সংস্কৃত থেকে মাতৃভাষার জন্য পরিভাষার আমদানী করতে পারেন, আমরা তাহলে তার জন্য আরবী ভাষার রত্নময় ভাণ্ডারে কেন যেতে পারি না?

উর্দ্দুর বৈজ্ঞানিক পরিভাষা আরবী থেকে আমদানি করা হয়েছে। তুরস্ক, ইরান প্রভৃতি দেশের সুধীরাও আরবী থেকেই তাঁদের মাতৃভাষার পরিভাষা আহরণ করেছেন। বাঙ্গলা ভাষাতেও আমরা যদি তাই করি তাহলে তাতে আপত্তি করার কি আছে?

অবশ্য এ পথে গেলে আমাদের বাঙ্গলা ভাষা হিন্দুর ভাষা থেকে অনেকটা ভিন্ন আকার ধারণ করবে, সেরূপ হওয়া কিন্তু একান্তই স্বাভাবিক, কেননা এই দুইটী জাতির Culture এর বনিয়াদ হচ্চে ভিন্ন। যুক্তপ্রদেশের মুসলমানের হিন্দুস্থানী ভাষা যেমন হিন্দুর হিন্দুস্থানী ভাষা থেকে ভিন্ন আকার ধারণ করেছে, আমাদের বাঙ্গলা দেশের মুসল-মানের বাঙ্গলাও যদি সেইরূপ হিন্দুর বাঙ্গলা থেকে ভিন্ন আকার ধারণ করে তাতে আমাদের ক্ষতি কি?

আমাদের তৃতীয় সমস্যা হচ্চে বাঙ্গলা ভাষার লিখন প্রণালী নিয়ে। বর্ত্তমান বাঙ্গলাবর্ণমালা মুসলমানের দরকারের জন্য একেবারেই যথেষ্ট নয়। সে বর্ণমালার সাহায্যে আমাদের নামগুলিও যথাযথভাবে লেখা যায় না—

অন্ত পরে কা কথা। বাঙ্গলা বর্ণমালার এই অসম্পূর্ণতার জন্ম কি আমরা চিরকাল আমাদের জাতীয় ভাষাকে বিকৃত করে রাখবো, না বর্ণমালার সংস্কার করে আমাদের Culture এর অভাব পূরণ করবো ?

আর একটী মাত্র সমস্তার উল্লেখ এখানে করবো। পূর্ব্বে লিখিতভাষার আকার প্রকার কথ্যভাষার আকার প্রকার থেকে ভিন্ন ছিল। আমার গুরু স্থানীয় বন্ধু শ্রীযুক্ত প্রথম চৌধুরী প্রমুখ সাহিত্যিকদের প্রচেষ্টায় সে বৈষম্য দূরীভূত হতে চলেছে। এই নূতন দলের সাহিত্যিকেরা পশ্চিম বঙ্গের কথ্যভাষাতেই সাহিত্য রচনা করতে আরম্ভ করেছেন। তাঁরা অন্ত লেখকদেরও তাঁদের অনুসৃত পথে চলতে উপদেশ দিচ্ছেন। প্রাচীন পন্থী সাহিত্যিকেরা কিন্তু এই নূতন পথের অনুসরণ করাকে বাঙ্গলা সাহিত্যের পক্ষে মঙ্গলজনক বলে মনে করেন না। তাঁরা বলেন লিখিত এবং কথ্য ভাষার মধ্যে যে স্বাতন্ত্র আবহমান কাল থেকে চলে আসছে; সেটা কায়েম রাখা, সাহিত্যের মঙ্গলের জন্ম বিশেষ দরকারী। লিখিত ভাষাকে সাহিত্যের আসর থেকে তাড়াবার কোন অধিকার কথ্য ভাষার নাই। আর, তা ছাড়া, পশ্চিম বঙ্গের কথ্য ভাষার এমন কোন বিশেষত্ব নাই, যার জন্ম তাকে বাঙ্গলার অন্যান্য অংশের কথ্য ভাষার উপর প্রাধান্য দেওয়া যেতে পারে।

সমস্তাগুলির তো একে একে ওজকেরা করা গেল। এখন তসফিয়ার বিষয় কিছু বললেই আমার কথা শেষ হয়।

প্রথম সমস্যা হচ্ছে বাঙ্গলা সাহিত্যে মুসলমান সমাজে ব্যবহৃত আরবী, ফার্সি এবং উর্দ্দু শব্দের প্রয়োগ নিয়ে। এ বিষয় সেকেলে ধরণের মুসলমান লেখকদের চেয়ে হিন্দু লেখকদের মধ্যে বেশী উদারতা দেখতে পাই। আজকাল অনেক প্রতিষ্ঠাবান হিন্দু সাহিত্যিকই তাঁদের লেখায় প্রচুর পরিমাণে মুসলমানি শব্দের আমদানি করতে আরম্ভ করেছেন। পক্ষান্তরে আমাদের সমাজে এক দল শুদ্ধতা ব্যাধিগ্রস্ত লেখক দেখা দিয়েছেন যাঁহারা সংস্কৃতমূলক শব্দ ছাড়া অন্ত কোন রকম শব্দ বাঙ্গলা ভাষায় আমদানি করতে একেবারেই নারাজ! তাঁদের এই মানসিকতা যে নিতান্তই হাস্যাস্পদ, সে বিষয় কোন সন্দেহ থাকতে পারে না। 'হিন্দুর ব্যবহৃত সংস্কৃত মূলক শব্দ যদি আমাদের সাহিত্যে অবাধে চলতে পারে, তাহলে আমাদের ব্যবহৃত আরবী-ফার্সি-মূলক শব্দ যে কেন চলবে না, তার কোন যুক্তি যুক্ত কারণ আমি তো খুঁজে পাই না। মুসলমানদের নিত্য ব্যবহৃত ভাষা ছাড়া তাদের মনের ভাব যথোচিত ভাবে ব্যক্ত করা যায় না। ভাবের প্রকাশই যদি সাহিত্যের চরম লক্ষ্য হয়, তাহলে মুসলমানের ভাব প্রকাশের জন্ম তার স্বাভাবিক ভাষা সাহিত্যে যতটা আনতে পারা যায়, সাহিত্যের এবং ভাষার পক্ষে ততই মঙ্গল।'

বৈজ্ঞানিক পরিভাষার সমস্যাটী বড়ই জটিল। একথা সত্য যে প্রত্যেক জাতি তার Culture এর ভাষা থেকেই তার বৈজ্ঞানিক পরিভাষা আহরণ করেছে। ইংরাজ, ফ্রেঞ্চ, ইটালিয়ান প্রভৃতি জাতিরা ল্যাটিন এবং গ্রীক থেকে তাদের বৈজ্ঞানিক পরিভাষার আমদানি করেছে। তুর্কি, ইরাণী, হিন্দুস্থানী প্রভৃতি মুসলমান জাতিরা আরবী থেকে তাদের বৈজ্ঞানিক পরিভাষার আমদানী করেছে। ভারতবর্ষের বিভিন্ন ভাষা ভাষী হিন্দুরা সংস্কৃত সাহিত্যের ভাণ্ডার থেকে তাদের পরিভাষার আমদানি করেছে। এ হিসাবে বাঙ্গালী মুসলমানকেও হিন্দুস্থানী মুসলমানদের মত আরবী থেকে তাদের পরিভাষার আমদানী করা উচিত। আমাদের পুঁথি সাহিত্য যদি ক্রমোন্নতি লাভ করে আধুনিক যুগের উপযোগী সাহিত্যে পরিণত হতে পারতো তা হলে যে তাই ঘটতো সে কথা নিঃসঙ্কোচে বলা যেতে পারে। বাঙ্গালী মুসলমানের শৈথিল্য বশতঃ কিন্তু তা হয়নি। পুঁথি সাহিত্যকে আল্লার হাতে ছেড়ে আমরা এক নূতন দুনয়ায় এসে পড়েছি। এখন আবার পুঁথি সাহিত্যের জগতে ফিরে যাওয়া কতটা সম্ভবপর এবং বাঞ্ছনীয় সেইটাই হচ্চে ভাববার বিষয়।

মজিদ সাহেবের মতের অনুসরণ করে যদি এখন আমরা পুথি সাহিত্যের পথে ফিরি তা হলে অদূর ভবিষ্যতে হিন্দুর বাঙ্গলা সাহিত্য থেকে মুসলমানের বাঙ্গলা সাহিত্য সম্পূর্ণ ভিন্ন মূর্ত্তি পরিগ্রহ করবে। হিন্দুর সাহিত্য তখন মুসলমানের দুর্ব্বোধ্য হয়ে উঠবে এবং মুসলমানের সাহিত্য হিন্দুর ও দুর্ব্বোধ্য হয়ে উঠবে। মুসলমানের মন হিন্দুর কাছে রুদ্ধ হয়ে যাবে, আর হিন্দুর মন মুসলমানের কাছে রুদ্ধ হয়ে যাবে। আমাদের উভয় জাতির স্বার্থ যখন এক, আর আমাদের পরস্পরের মিলন এবং সহানুভূতির উপর আমাদের ভবিষ্যত যখন একাগ্রভাবে নির্ভর করে, তখন সেই

মিলনের পথে এত বড় একটা অন্তরায়ের সৃষ্টি করা যুক্তি যুক্ত বলে আমার মনে হয় না। সেই হিসাবে সমগ্রভাবে অপরিবর্ত্তিত আকারে মজিদ সাহেবের মত গ্রহণ করতে আমি নারাজ।

তবে মজিদ সাহেবের মত বৈজ্ঞানিক যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। সম্পূর্ণরূপে তাকে অগ্রাহ্যও করা যায় না। আমার মনে হয় বর্ত্তমান পন্থার মধ্যে এবং মজিদ সাহেবের নির্দ্দেশিত পন্থার মধ্যে এমন একটা সামঞ্জস্য আনা দরকার যার ফলে উভয় দিকই রক্ষা হতে পারে। ধর্ম্ম সম্পর্কীয় যতগুলি বিষয় আছে (যেমন তফসির, হাদিস, ফেকাহ, তসওওফ প্রভৃতি) সে সবের পরিভাষা আরবী থেকেই আমদানি করা উচিত। নামাজকে উপাসনা কিম্বা মোর-শেদকে গুরু বলার কোন প্রয়োজন নাই। পক্ষান্তরে যে সব এলমের সঙ্গে ধর্ম্মের কোন সম্বন্ধ নাই, সে সবের পরিভাষা কতকটা সংস্কৃত থেকে, কতকটা আরবী থেকে, কতকটা ইংরাজী থেকে, আর কতকটা আমাদের কথ্যভাষা থেকে নিলেই চলতে পারে। এবিষয় হিন্দুকেও উদারতা দেখাতে হবে, আর মুসলমানকেও উদারতা দেখাতে হবে। আর উভয়কে চেষ্টা করে মাতৃভাষাকে যতদূর সম্ভব অন্য ভাষার (তা সে আরবিই হোক আর সংস্কৃতই হোক) ব্যাকরণের এবং অভিধানের প্রভাব থেকে মুক্ত এবং আত্মনিয়ন্ত্রণশীল করে তুলতে হবে। তা যদি করতে পারি তা হলে অন্য ভাষার গুরুত্ব নিয়ে মাতৃভাষার সাধকদের মধ্যে ঝগড়া কলহ আর থাকবে না। তবে রবীন্দ্র নাথের মত বিশ্ববিশ্রুত এবং বিশ্বপ্রেমিক সাহিত্যিকও যখন বাঙ্গলায় দুই একটী উর্দ্দু কথার আমদানি দেখে চমকে উঠেন তখন সেই শুভদিন এখনও যে অনেক দূরে সে কথা বেশ স্পষ্টই বুঝা যায়।

বাঙ্গলা বর্ণমালার বিষয় কিছুকাল পূর্ব্বে আমি সাহি-ত্যিকে একটী প্রবন্ধ লিখেছিলুম। সেখানে যে মত প্রকাশ করা হয়েছে, এখন সংক্ষেপে তারই পুনরুক্তি করবো। বর্ত্তমান বাঙ্গলা বর্ণমালা আমাদের দরকারের জন্য একেবারেই যথেষ্ট নয়। আমাদের প্রয়োজন সাধন করতে হলে কতকগুলি নূতন হরফের সৃষ্টি ছাড়া গত্যন্তর নাই। নূতন হরফগুলির আকার প্রকার আবার এমন হওয়া দরকার যে তাদের প্রবর্ত্তনের দরুণ ভাষার এবং সাহিত্যের মধ্যে কোন-রূপ বিভ্রাটের সৃষ্টি না হয়। সেরূপ করা যে সম্ভবপর তা আমি উক্ত প্রবন্ধে বিষদভাবে দেখিয়েছি। কতকগুলি নূতন হরফেরও আমি সৃষ্টি করেছি। বাঙ্গলার সুধিসমাজ যদি আমার উদ্ভাবিত সেই হরফগুলি গ্রহণ করেন তা হলে সহজেই এই জটিল সমস্যার একটা উচিত সমাধান হয়ে যায়। *

কথ্যভাষা থেকেই লিখিত ভাষার উৎপত্তি, আর পৃথিবীর সর্ব্বত্র, লিখিত ভাষা সমাজের অভিজাত সম্প্রদায়ের কথ্য ভাষারই অনুসরণ করে আসছে। সাহিত্যের এ ছাড়া অন্য পথ নাই। বাঙ্গলার রক্ষণশীল সাহিত্যিকও কিছু আকাশ থেকে লিখিত ভাষার আমদানি করতে পারেন না। আজকাল আমরা যাকে লিখিত ভাষা বলি, তাও এক কালে কথ্যভাষাই ছিল। কালের প্রবাহে, সমাজ সেই পুরাণো কথ্যভাষাকে ছেড়ে অনেক দূরে এসে পড়েছে। এখন চেষ্টা করে লিখিত ভাষা যাতে বর্ত্তমান কথ্যভাষার নাগাল ধরতে পারে সে বিষয় তাকে সাহায্য করাই হচ্চে আমাদের কর্ত্তব্য। বিদ্যাসাগরী যুগের লিখিত ভাষা এখন autho-rised version এর Bible এর ইংরাজীর মতই dead langoageএ পরিণত হয়েছে। এই democracyর যুগে সেই dead langoageএ পুস্তক রচনা করার কোন সার্থকতা নাই।

লিখিত উর্দ্দু ভাষা লাক্ষ্ণৌ এবং দিল্লীর অভিজাত সম্প্রদায়ের কথ্যভাষা হতে অভিন্ন। লিখিত ফার্সি ভাষা সম্ভ্রান্ত ইরানির কথ্যভাষা হতে অভিন্ন। এমন কি আল্লার কালাম কোরান শরিফও মক্কার তৎকালীন অভিজাত সম্প্রদায়ের কথ্যভাষা হতে অভিন্ন। আমাদের সাহিত্যিকেরা যে কেন এই জাগতিক নিয়মের বিরুদ্ধে যাবার চেষ্টা করেন, তা আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধির অগম্য। প্রবীন সাহিত্যিকদের তাঁদের চিরাচরিত পথ ছেড়ে নূতন পথে আসতে আমি বলছিনা; তবে নূতন সাহিত্যিকদের আমি অবশ্য বলবো, তাঁরা যেন মরা ভাষা ছেড়ে জীবন্ত ভাষাতেই সাহিত্য সাধনা

* এই সমস্যার সমাধানের জন্য বিভিন্ন মনে বিভিন্ন প্রণালী অবলম্বন করতে পরামর্শ দেন। শ্রদ্ধেয় লেখক সাহিত্যিকে এ সম্বন্ধে যে আলোচনা ও প্রস্তাবনা ক'রেছেন, তাঁর সেই প্রস্তাবিত প্রণালী অপেক্ষাকৃত সহজ ও স্বাভাবিক ব'লেই আমাদের মনে হয়। (সহঃ সম্পাদক (

করেন। অন্যথায় তাঁদের প্রয়াস ব্যর্থ হবে বলেই আমার বিশ্বাস।

অপত্তিকারীরা বলেন বাঙ্গলার বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন কথ্য ভাষা প্রচলিত আছে। এমন অবস্থায়, কোন বিশেষ অংশের কথ্য ভাষাকে সাহিত্যের ভাষারূপে গ্রহণ করলে কি পক্ষপাতীত্ব করা হবে না।

'কথ্য ভাষার সাহিত্যিকেরা পশ্চিম বঙ্গের কথ্য ভাষাই ব্যবহার করছেন। পূর্ব্ব কিম্বা উত্তর বঙ্গের কথ্য ভাষা কোন সাহিত্যিককে ব্যবহার করতে দেখি নি। সুতরাং বিষয়টীর গুরুত্ব এখনও Theoretical stage অতিক্রম করে নি। তবু তর্কের চূড়ান্ত নিষ্পত্তির জন্য দু'এক কথা এ বিষয়ে এখানে বলা আবশ্যক বলে মনে করি।'

' বাঙ্গলা দেশ এক, বাঙ্গালী জাতি এক, আর বঙ্গভাষার সাহিত্যও এক। সেই একত্বের যায়গায় বহুত্ব আনতে নিশ্চয়ই আমরা চাই না। সুতরাং বিভিন্ন কথ্য ভাষার মধ্যে কোন বিশেষ একটীকে আদর্শ ভাষারূপে গ্রহণ করা ছাড়া আমাদের গত্যন্তর নাই। পৃথিবীর সব দেশের লোকই তাই করেছে, আমাদের এ বিষয় কোন বিশেষত্ব নাই। বিলাতের বিভিন্ন শায়ারের ( Shire ) অশিক্ষিত লোকদের মধ্যে বিভিন্ন কথ্য ভাষা চলে আসছে; শিক্ষিত সম্প্রদায় কিন্তু লণ্ডনের অভিজাত সম্প্রদায়ের কথ্য ভাষাকেই আদর্শ ভাষারূপে গ্রহণ করেছেন। ফ্রান্সের শিক্ষিত সম্প্রদায় সেইরূপ paris এর কথ্য ভাষাকে আদর্শ ভাষারূপে গ্রহণ করেছেন। আমাদের দেশের উর্দ্দু-ভাষী মুসলমানও অন্যান্য স্থানের ভাষাকে ছেড়ে লক্ষ্ণৌ এবং দিল্লীর উর্দ্দুকেই আদর্শ ভাষারূপে গ্রহণ করেছেন।

পশ্চিমবঙ্গের কথ্যভাষার সঙ্গে লিখিত ভাষার যেমন সাদৃশ্য আছে, বঙ্গের অন্য কোন অংশের কথ্য ভাষার সঙ্গে তেমন নাই। পশ্চিম বঙ্গের কথ্যভাষা বাঙ্গলার বিভিন্ন অংশের অধিবাসীরা যেমন সহজে বুঝতে পারেন, অন্য কোন অংশের কথ্যভাষা তেমন সহজে বুঝতে পারেন না। পশ্চিম বঙ্গের কথ্যভাষা অন্যান্য অংশের কথ্যভাষার তুলনায় অপেক্ষাকৃত সুমার্জ্জিত এবং শ্রুতিমধুর। বাঙ্গলার রাজধানী কলিকাতা পশ্চিম বঙ্গেই অবস্থিত, আর এই কলিকাতাতেই বাঙ্গলার বিভিন্ন অংশের অধিবাসীদের ভাবের এবং চিন্তার বিনিময় হয়ে থাকে। এই সব কারণ পরম্পরায় একান্ত স্বাভাবিক ভাবেই পশ্চিম বঙ্গের কথ্য ভাষা সমগ্র বঙ্গদেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের কথ্য এবং সাহিত্যিক ভাষায় পরিণত হচ্ছে। এতে দুঃখ কিম্বা আপত্তি প্রকাশ না করে, শীঘ্র যাতে এই স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া পূর্ণ পরিণতি প্রাপ্ত হয়, তার জন্য চেষ্টা করাই হচ্ছে সুধীজনের কর্ত্তব্য। যখন তা হবে, তখনই বাঙ্গলা সাহিত্য বাঙ্গালীর প্রকৃত জাতীয় সাহিত্য বলে গণ্য হবে, আর তখনই সে সাহিত্য বাঙ্গলার ভাব এবং চিন্তাধারাকে উপযুক্তরূপে অভিব্যক্ত করবে।'

---

# সহধর্ম্মিণী

[ মোছলেম খাঁ ]

যসর-সমরে মুছলমানদিগের ভীষণ পরাজয়ের পর, "বোএব" নামক স্থানে পার্সিকদিগের সহিত তাঁহাদের আর এক সংঘর্ষ উপস্থিত হয়—এবং কাদেসিয়ার ভীষণ অগ্নি-পরীক্ষার সূত্রপাত হয় এইখানে।

পূর্ব্বপরাজয়ের অভিজ্ঞতার ফলে প্রধান সেনাপতি মোছান্না এবার মহিলাদিগকে সমরক্ষেত্র হইতে দূরে রাখিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। মহিলারা নিজেদের ক্যাম্প হইতে মোজাহেদগণের জন্য খাদ্য প্রস্তুত করিয়া পাঠাইতেন, সে ভাবনা আর কাহাকেও ভাবিতে হইত না।

মহিলারা নিজেদের ক্যাম্পে এই সব কর্ত্তব্য পালনে ব্যস্ত আছেন এমন সময় এক বৃদ্ধা চীৎকার করিয়া উঠিলেন :—

আরবের কন্যাগণ! সাবধান, চক্রবালের ঐ ঘন ধূলি-পুঞ্জের মধ্যে শত্রুবাহিনী আমাদের দিকে অগ্রসর হইতেছে।

সহস্রকণ্ঠে অস্ফুটধ্বনি জাগিয়া উঠিল—নাজানি পুরুষদিগের ভাগ্যে কি ঘটিয়াছে। পুত্রের, পিতার, ভ্রাতার ও স্বামীর চিত্র মুহূর্ত্তেকের জন্য তাঁহাদের মানস দর্পনে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল—কি ভীষণ পরীক্ষা!

আগ্নেয়গিরির অগ্নিস্ফুলকের ন্যায় 'খনছার' কবিতা মুহূর্ত্তেকের মধ্যে সব অবসাদ সব শোক তাপকে পুড়াইয়া ভস্ম করিয়া দিল।

"আমরা মুছলমানের ভগিনী, মুছলমানের জননী এবং মুছলমানের সহধর্ম্মিনী, কাফেরের দাসী হওয়ার জন্য আল্লাহ আমাদিগকে পয়দা করেন নাই। আমাদিগের একটি জীবন্তদেহ কোনক্রমেই শত্রুর হস্তগত হইতে পারিবে না।"

সহস্র কণ্ঠে প্রতিধ্বনি উঠিল—"পারিবে না কখনই পারিবে না।"

মহিলাদিগের সঙ্গে ছিলেন—এক সদ্যবিবাহিতা নববধু। স্বামী ২৩ বৎসরের নবীন যুবক—মোছান্নার অধীন সহকারী সেনাপতি। তাহার চোখের মৌন ব্যাকুলি আর চেহরার নীরব ভাষা অভিমানে প্রতিহিংসায় গুমরিয়া গুমরিয়া উঠিতেছে। মুহূর্ত্তেক পুর্ব্বকার সে লজ্জা সে সঙ্কোচ কোথায় ধৌত হইয়া গিয়াছে।

ইহার অঙ্গশোভা বর্দ্ধন করিতেছিল বিবাহের মূল্যবান লাল রেশমী ওড়নাখানা। তাহাই হইল মহিলাবাহিনীর ফতে-নিশান। নববধুর উপর সেই পতাকা ধারণের ভার দিবার সময় খনছা বলিলেন—

তুমি মুছলমান! তুমি আরব কন্যা! তুমি আমাদের বীর সেনাপতি ওমরের স্ত্রী। সাবধান! এ পতাকা মাটিতে লুটাইতে দিও না। তোমার স্বামী যদি শহিদ হইয়া থাকেন, তবে শহিদের রক্তরাগ মাখিয়া স্বর্গে তাঁহার সঙ্গে মিলিত হও, আর তিনি যদি জীবিত থাকেন—তাহা হইলে জগতকে বুঝাইয়া দাও যে, "আরব কন্যা শুধু বাসর ঘরের বিলাস-তৈজস নহে—তাহারা বীর মোছলেমের বীরাঙ্গনা কন্যা, তাহারা বীর স্বামীর জীবনে মরণে উপযুক্ত সহধর্ম্মিনী!"

নববধু সাগ্রহে হাত বাড়াইয়া সে পতাকা গ্রহণ করিলেন, তাঁহার কণ্ঠে অস্ফুট ধ্বনি উঠিল—"ইনশা আল্লাহ!"

তাম্বুর কাঠ খুঁটি ইত্যাদি ভাঙ্গিয়া আনিয়া সকলে সজ্জিত হইলেন, বালক বালিকাদিগকে পশ্চাতে সরাইয়া দেওয়া হইল। প্রধান সেনাপতির কন্যা ফাতেমা সেনানেত্রীর বেশে পতাকার দক্ষিণ পার্শ্বে দাঁড়াইয়া নিয়মিত ব্যূহ রচনা করিয়া দিলেন।

মোকাবেলার জন্য সকলে প্রস্তুত।

শত্রুবাহিনী আরও নিকটবর্ত্তী হইলে ফাতেমা তাঁহার কাঠের নেজাখানা উর্দ্ধে আন্দোলিত করিয়া না'রা দিলেন—"আল্লাহো আকবর!"

তাওহিদের অগ্নিমন্ত্রে এবং ঈমানের বজ্রমন্দ্রে সমর প্রান্তরকে মুখরিত রোমাঞ্চিত করিয়া সহস্র নারীকণ্ঠে ধ্বনিয়া উঠিল—"আল্লাহো আকবর!"

ধূলিপুঞ্জে সমাচ্ছাদিত সমাগত সৈন্যবাহিনী অযুত কণ্ঠে তাহার প্রতিধ্বনি করিয়া উঠিল—"আল্লাহো আকবর!"

যুবক সেনাপতি অগ্রসর হইয়া দেখিলেন—তাঁহারই নববিবাহিতা স্ত্রী পতাকাধারণ করিয়া বীরদর্পে সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছেন, আর ফাতেমা সেনানায়িকার কাজ নিতান্ত ক্ষীপ্রতার সহিত আঞ্জাম দিতেছেন।

অল্পক্ষণে সমস্ত রহস্য ব্যক্ত হইয়া পড়িল। যুদ্ধজয়ের খোশখবর লইয়া সহকারী সেনাপতি ওমর-বেন-আবদুল মছিহ একদল সৈন্যসহ মহিলানিবাসে প্রেরিত হইয়াছিলেন। মহিলারা ইঁহাদিগকে শত্রু মনে করাতেই তাঁহাদের এই রণসজ্জা।

ফাতেমাকে সানন্দে অভিবাদন করিয়া ওমর সামরিক কায়দায় বলিয়া উঠিলেন—

"সেপাহ ছালার! আমরা আত্মসমর্পণ করিতেছি।"

ফাতেমা:—"তুমি পরাজিত বন্দী!"

(পতাকা ধারিনীর প্রতি লক্ষ্য করিয়া)

ভগ্নি! তোমার সৎসাহস ও স্বামীভক্তির পুরস্কার স্বরূপ এই বন্দীকে তোমার হাতে সমর্পণ করিলাম। আজ হইতে এ বন্দী তোমার.... ....

(হাসির গব্‌রায় শেষের অংশ শোনা গেল না)

কিন্তু সাবধান—বন্দীর প্রতি সদয় ব্যবহার করিতে কখনও ভুলিও না, ইহাও ধর্ম্মের আদেশ। যাও! এখন এই ক্ষুধার্ত্ত বন্দীকে তাম্বুতে লইয়া গিয়া কিছু খাইতে দাও। *

* তাবরী প্রভৃতি হইতে ইহার সারাংশ সঙ্কলিত হইয়াছে।

# সম্মেলন

## বঙ্গীয় মুছলমান সাহিত্য সম্মিলন

এবার বঙ্গীয় মুছলমান সাহিত্য সম্মেলনের অধিবেশন বশীরহাটে অধিষ্ঠিত হইয়াছিল। জনাব মওলানা মুনীরুজ্জমান এছলামাবাদী ছাহেব সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার অভিভাষণ ও সভায় পঠিত অন্যান্য প্রবন্ধ সম্বন্ধে আগামী মাসে আলোচনা করার ইচ্ছা রহিল। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি বশীরহাটের কৃতী সন্তান জনাব মৌলবী ছৈয়দ মোকররম আলী ছাহেব তাঁহার অভিভাষণে মোছলেম-বশীরহাটের ইতিহাস সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি :—

বাঙ্গালায় পাঠান রাজত্বের অবসানের পূর্ব্ব হইতেই এখানে মুসলমানগণ বসতি স্থাপন করেন। আপনাদের সম্মুখে ঐ প্রাচীন মস্‌জিদ্‌ই তাহার চির সাক্ষী। কত যুগ চলিয়া গিয়াছে, কাল-চক্র ক্ষুদ্র পল্লীর বুকের উপর দিয়া বিঘুর্ণিত হইয়া কত চিহ্নই না রাখিয়া গিয়াছে; কিন্তু ঐ বিরাট সৌধ অটল হিমাদ্রির মত আজও অক্ষত দেহে দাঁড়াইয়া আছে। এই মস্‌জিদ্‌ অবলম্বন করিয়া পল্লী-বাসিগণের কত কর্ম্ম কেন্দ্রই না গঠিত হইয়াছে।

আরবী ও ফার্সী ভাষার উপর যখন ভারতীয় মুছল-মানগণের রাষ্ট্রীয়, সামাজিক ও নৈতিক সাহিত্য নির্ভর করিত, এক কথায় যখন এই দুই ভাষা ব্যতীত ভারতীয় মুছলমানের ভাবের আদান প্রদান সম্ভবপর ছিল না, তখন এখানকার মুসলমান সমাজে এমন কয়েকজন মনীষীর আবির্ভাব হইয়াছিল, যাঁহাদের কথা এখনও পর্য্যন্ত সমগ্র বঙ্গদেশে সুপরিচিত আছে। পরলোকগত প্রাতঃস্মরণীয় মৌলবী রুহল্‌ আমীন্‌ ও মৌলবী গোলাম মখদুম্‌ সাহেব সারা জীবনের অক্লান্ত সাধনায় বাঙ্গালার তৎকালীন ‘উলামা’বর্গের ভক্তি ও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের চিন্তার ধারা এখন পর্য্যন্ত বাঙ্গালার শেষ রাজধানী মুর্শিদাবাদের আধ্যাত্মিক চর্চ্চায় মধ্য দিয়া ফল্গু নদীর মত প্রবাহিত হইতেছে।

মৌলবী ফরাগৎ আলি সাহেব তদানীন্তন্‌ হুগলী মাদ্রাসার ছাত্র মণ্ডলীর মধ্যে যে ভাব ও প্রেরণার সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তাহা বহুকাল পর্য্যন্ত বাঙ্গালার মুসলমান সমাজের মধ্যে ক্রিয়াবান্‌ ছিল।

মৌলবী গোলাম এহিয়া ও মৌলবী রহমতল্‌ হক সাহেব আরবী ও ফার্সী ভাষার অনুশীলনে জীবন উৎসর্গ করিয়া-ছিলেন। শেষোক্ত মহাপুরুষের জ্যেষ্ঠ পুত্র মৌলবী সেরাজল হক সাহেবের ফার্সী কবিতাবলী সুধীবৃন্দের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছে। বাহুল্যের ভয়ে অতীত কালের আরও অনেক কৃতবিদ্যের নাম উল্লেখ করা গেল না।

এ হইল, সে যুগের কথা, যে যুগে বাঙ্গালার মুসলমান সাহিত্য কুঞ্জ হইতে ‘বুল্‌বুল্‌’ নির্ব্বাসিত হয় নাই এবং সাহিত্যিকগণের অঙ্গ হইতে ‘আমামা’ ও ‘চোগা’ স্খলিত হয় নাই। সে যুগে এই পল্লীকে ইরাণের একটা অনুকরণ বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না।

ইহার পর এই ক্ষুদ্র পল্লীর ইতিহাসে যে যুগের সূচনা হইল, তাহার সহিত বর্ত্তমান যুগের অতি নিকট সম্বন্ধ। এই যুগ-সন্ধ্যায় আরবী ও ফার্সী ভাষার গতি সর্ব্বপ্রথম বাধা প্রাপ্ত হইল। ইংরাজী ভাষা রাজকীয় ভাষা স্বরূপে সমগ্র জাতির নিকট এক অপরিহার্য্য অবলম্বন বলিয়া পরিগণিত হইল। অভাব অভিযোগের প্রসারতার সঙ্গে সঙ্গে

বাঙ্গালা ভাষার প্রতি অনুরাগ বর্দ্ধিত হইল। এই দ্বিবিধ শক্তির সম্মিলিত চাপে বহুকাল সেবিত ফার্সী ভাষা দূরে সরিয়া দাঁড়াইল। যাঁহারা আরবী ফার্সীর একনিষ্ঠ সাধক ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকে প্রয়োজনের অনুরোধে বাঙ্গালা ভাষার প্রতি ঝুঁকিয়া পড়িলেন। এই যুগে যাঁহারা এই পল্লীতে এবং এই মহকুমার অন্তর্গত অন্যান্য পল্লীতে আবির্ভূত হইয়া বাঙ্গালা ভাষার সেবকরূপে লেখনী ধারণ করিলেন, তাঁহাদের নাম আজ বিশেষরূপে উল্লেখ যোগ্য। সমগ্র বাঙ্গালার মুসলমান সাহিত্য সম্মিলনের সঙ্গে ইঁহাদের নাম জড়িত থাকিবে।

বাঙ্গালার অতি প্রাচীন পুঁথি "জঙ্গনামার" রচয়িতা পরলোকগত মুন্‌শী মহম্মদ ইয়াকুব এই মহকুমায় জন্মগ্রহণ করিয়া পুঁথি সাহিত্যের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হইয়াছেন।

"উচিৎকথার" পরলোকগত লেখক ও অর্দ্ধ শতাব্দী ব্যাপী শিক্ষক মুন্‌শী গোলাম কিবরিয়া সাহেব বশিরহাটের মুসলমান সমাজকে বাঙ্গালা ভাষায় প্রথম উপহার প্রদান করেন। মুন্‌শী শেখ আব্দর রহিম সাহেব আজ প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী কাল ব্যাপিয়া বাঙ্গালা ভাষায় লেখনী চালনা করিতেছেন। এই একনিষ্ঠ সেবক বাঙ্গালার মুসলমান সাহিত্যের 'প্রথম প্রভাত' হইতে আজ পর্য্যন্ত সংবাদ পত্র পরিচালনা ও গ্রন্থাবলী রচনা করিয়া সমগ্র বাঙ্গালার মুসলমানের শিক্ষার পথ প্রশস্ত করিয়াছেন। বোধ হয় ইনি বাঙ্গালা মুসলমান সংবাদ পত্রের প্রথম প্রতিষ্ঠাতা। ইনিই সর্ব্বপ্রথম বাঙ্গালা ভাষায় হজরত মহম্মদের জীবন চরিত লিখিয়া দেশের নিকট হইতে শ্রদ্ধার অঞ্জলি পাইয়াছেন।

মৌলভী ছৈয়দ ওসমান আলি সাহেবের উর্দ্দু ভাষার প্রতি আধিপত্য ভারতের উর্দ্দু ভাষা সেবক মণ্ডলীর নিকট সুবিদিত। ইনি কিছুকাল 'The Aligarh Institute Gazette' নামক সুপ্রতিষ্ঠিত উর্দ্দু পত্রিকায় সহকারী সম্পাদকরূপে বাঙ্গালার মুখোজ্জ্বল করিয়াছেন। বঙ্গ ব্যবচ্ছেদের যুগে ইনি কিছুকাল পর্য্যন্ত 'সুধাকর' সম্পাদক পদে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া কৃতিত্বের সহিত লেখনী চালনা করিয়াছিলেন। 'ফণা জামালি' নামে লিখিত ইঁহার বহু সুচিন্তিত প্রবন্ধ বোধ হয় আজও অনেকে বিস্মৃত হন্ নাই। ইনি বাঙ্গালার মুসলমান সমাজের প্রথম ইংরাজী সংবাদ পত্র The Moslem Chronicleএর সহকারী সম্পাদকরূপে কিছুকাল দেশের ও সমাজের সেবা করিয়াছিলেন।

চিরকুমার ও দৃঢ় প্রতিজ্ঞ একনিষ্ঠ সমাজ সেবক, মৌলভী মুজিবর রহমান সাহেব, সমগ্র বাঙ্গালার একমাত্র ইংরাজী মুখ পত্র ,The Mussulman"এর সম্পাদকতার গুরুভার বহুকাল হইতে অম্লান বদনে বহন করিয়াও আবার খাদেমের সম্পাদকরূপে সমাজের খেদমৎ করিতেছেন !

"মোহাম্মদী" সম্পাদক মওলানা মোহাম্মদ্ আকরম্ খাঁ সাহেব, বাঙ্গলা ভাষার সাহায্যে প্রাচীন ও বর্ত্তমান ইসলাম জগতের প্রবাহ সুদূর বাঙ্গালার দ্বারে দ্বারে প্রবাহিত করিতেছেন। ইঁহার 'মুস্তফা চরিত' বাঙ্গালার বিদ্বন্মণ্ডলীর নিকট সুপরিচিত হইয়াছে।

'হানিফি' সংবাদ পত্রের প্রতিষ্ঠাতা ও বহু ধর্ম্ম সংক্রান্ত গ্রন্থ প্রণেতা মাওলানা রুহল্ আমীন্ সাহেব এই বসিরহাট মহাকুমায় জন্মগ্রহণ করিয়া দেশের গৌরব বর্দ্ধন করিয়াছেন।

মৌলভী মহম্মদ শহীতুল্লাহ্ সাহেব সুদূর জার্ম্মাণিতে বসিয়া ভাষাতত্ত্ব ও সংস্কৃত ভাষার অনুশীলন করিতেছেন। দেশে ফিরিয়া আসিয়া ইনি বাঙ্গালার মনীষী বৃন্দের মধ্যে আসন প্রতিষ্ঠিত করিয়া মহাকুমার গৌরব বর্দ্ধন করিবেন।

তরুণ কবি শাহাদৎ হোসেনও এই মহাকুমায় জন্মগ্রহণ করিয়া দেশের গৌরব বর্দ্ধন করিয়াছেন। বহু শক্তিশালী লব্ধপ্রতিষ্ঠ হিন্দু সাহিত্যিক এই বসিরহাট মহাকুমায় জন্মগ্রহণ করিয়া আমাদের গৌরব বর্দ্ধন করিয়াছেন।

অতীতের কথা বিস্মৃত হইলেও বর্ত্তমানে এই সব কৃতী সন্তানের জন্মভূমি বলিয়া বসিরহাট মহকুমার আলোচনা বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্যসম্মিলনের অন্যতম বিষয় বলিলে, বোধ হয় অত্যুক্তি হইবে না।

---

## অভিনব চিকিৎসা।

ওয়েষ্ট মিনিষ্টার হাসপাতালের জনৈক বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক স্থূলকায় লোকের চিকিৎসার জন্য বৈদ্যুতিক শক্তিসম্পন্ন এক প্রকার অভিনব চেয়ারের আবিষ্কার করিয়াছেন। তাহার সাহায্যে বৈদ্যুতিক শক্তির প্রভাবে দেহের অতিরিক্ত মেদ প্রতি ঘণ্টায় ৬ পাউণ্ড হিসাবে কমিয়া যায়। তিনি এই প্রক্রিয়ায় কয়েকটী লোকের ২৮ পাউণ্ড মেদ তিন দিনে কমাইয়া দিয়াছেন।

## বানরের ভাষা

বিবর্ত্তনবাদের রহস্য আবিষ্কারমানসে ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ বহুদিন হইতে বানরের ভাষা শিখিবার ও বুঝিবার চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন। সম্প্রতি ২জন পণ্ডিত উহাদের ভাষা শিক্ষা ও তৎসম্বন্ধে গ্রন্থ রচনার প্রতি বিশেষ ভাবে মনোনিবেশ করিয়াছেন। তাঁহারা এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ২টী বানর শিশু পুষিয়াছিলেন, প্রথম হইতেই তাহাদের প্রত্যেক শব্দ ও ভাব ভঙ্গীর প্রতি তাঁহারা বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখিতেন, ফলে কিছুদিন হইতে বানরের অনেক কথা বুঝিতে আরম্ভ করিয়াছেন, যাহা বুঝিতেছেন তাহা লিখিয়া রাখিতেছেন, ইহার মধ্যে তাঁহারা এসম্বন্ধে ২টী গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহাদের পরীক্ষার ফল ও অভিজ্ঞতার বিবরণ বিস্তৃতভাবে উক্ত গ্রন্থদ্বয়ে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। তাঁহারা লিখিয়াছেন—বানরের ভাষায় 'গাক' অর্থে আহার করা। "কাহ্ আ, হা, হা," শব্দ করিলে বুঝিতে হইবে এইবার তাহারা খুব আনন্দিত হইয়া হাস্য করিতেছে। পক্ষান্তরে "হো ও হো" তাহাদের পক্ষে ভীতি-প্রকাশক শব্দ। এই দুইজন পণ্ডিতের মধ্যে একজনের নাম ডাক্তার ক্রক। বানরের বাক্‌শক্তির পরিচায়ক অনেক বিশেষ চিহ্ন তিনি একজন বিশেষজ্ঞরূপে তাহাদের মুখগহ্বরে দেখিতে পাইয়াছেন। তাঁহার মতে বানরজন্মই হইতেছে মানুষের নিকটতম পূর্ব্বজন্ম। তিনি ইহাও বলিয়াছেন যে বিশেষভাবে বহুদিন ধরিয়া বানরের ভাষাতত্ত্ব লইয়া আলোচনা করিলে সময়ে তাহাদের সকল কথা বুঝিতে ও তাহাদের সহিত ভাবের আদান প্রদান করিতে পারা যাইবে। পক্ষান্তরে বানর শিশুকে বহুদিন ধরিয়া বিশেষ প্রণালী অবলম্বনে শিক্ষা দিলে তাহারা মানুষের মত কথা বলিতে ও মানুষের কথা বুঝিতে সক্ষম হইবে।

---

## আমেরিকায় স্ত্রীধন

আমেরিকায় ৫ লক্ষ মহিলা আয়কর দিয়া থাকেন, তাঁহাদের প্রত্যেকের বার্ষিক আয় গড়ে ২৫২৯৯১১৪৫ পাউণ্ড। বিবাহিতা স্ত্রীলোকের মধ্যে ৭৭৫৫৮ জনকে তাঁহাদের স্বাধীনভাবে স্বোপার্জ্জিত আয়ের উপর ট্যাক্স দিতে হয়। তাঁহাদের প্রদত্ত মোট ট্যাক্সের পরিমাণ ১০৬৯৬৮০৮৫ পাউণ্ড।

## অদ্ভুত প্রাণী।

পাশ্চাত্য জীবতত্ত্বান্বেষীগণ আফরিকার নিবিড় বনভূমিতে এক প্রকার অদ্ভুত প্রাণীর সন্ধান পাইয়াছেন। তাঁহারা বলিয়াছেন ইহার নাম Ornitharynchus Paradoxes। ইহাদের মধ্যে অণ্ডজ ও দুগ্ধপেয়ী উভয় জাতীয় প্রাণীর বিশেষত্বের এক অদ্ভুত সমাবেশ দেখিতে পাওয়া যায়। এই প্রাণীর দেহের উচ্চতা ১॥ ফুট। সাধারণতঃ স্থলভাগেই থাকে; কিন্তু জলচর প্রাণীর ন্যায় অবাধে জলমধ্যেও বিচরণ করিতে পারে। পদদ্বয় এরূপ কৌশলে নির্ম্মিত যে তাহার সাহায্যে সন্তরণের কাজ ও মৃত্তিকা খননের কাজ দুই-ই সমভাবে নির্ব্বাহিত হইয়া থাকে। চতুষ্পদ জন্তুর ন্যায় পুচ্ছধারী, কিন্তু দন্তহীন। পক্ষীর ন্যায় দীর্ঘ ও সুদৃঢ় চঞ্চু আছে। ইহারা এক সঙ্গে কয়েকটী ডিম পাড়ে, ডিম ফুটিয়া ছানা বাহির হয়, ছানাগুলি বাহির হইয়াই দুগ্ধ পান করে, ইহাদের স্তন নাই, ছানা শরীরের যে কোন স্থানে মুখ দিয়া টানিলেই দুগ্ধক্ষরণ হয়। সম্প্রতি প্রাণীতত্ত্ববিৎ বিশেষজ্ঞ পণ্ডিত ডাক্তার ডব্লিউ, টি, হরণ্ডে এই প্রাণী সম্বন্ধে ফ্রান্সে একটী বিস্তৃত বক্তৃতা দিয়াছেন।

---

## অতিকায় মোমবাতি

একজন জর্ম্মান শিল্পী সম্প্রতি একটী অভিনব মোমবাতি তৈয়ার করিয়াছেন, ইহার দৈর্ঘ্য ১৬ ফিট, পরিধি ৫ ফিট, ওজন একটন। এটী ইটালীর একটী বিখ্যাত গির্জ্জায় পাঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে। প্রতি বৎসর ২রা নভেম্বর তারিখে উক্ত গীর্জ্জায় বাতিটী ২৪ ঘণ্টা করিয়া জ্বালান হইবে। হিসাব করিয়া দেখা হইয়াছে, এই প্রকারে কয়েক শতাব্দী পর্য্যন্ত ইহার কাজ চলিবে।

---

## অভিনব বন্দুক

নিউ ইয়র্কের পুলিশ-প্রদর্শনীতে সম্প্রতি একটী অদ্ভুত বন্দুক দেখান হইয়াছে। আবশ্যক মত সেটী মুড়িয়া মুষ্টির মধ্যে লুকাইয়া ফেলা চলে; আবার তৎক্ষণাৎ খুলিয়া প্রতি সেকেণ্ডে বারটী গুলি নিক্ষেপ করা হইয়া থাকে। এই বন্দুকের ভীষণ গুলি ৩ ইঞ্চি পুরু লোহার পাত অবাধে ভেদ করিয়া চলিয়া যায়।

## আমেরিকায় আত্মহত্যা।

আমেরিকার যুক্তরাজ্য হইতে একটী সরকারী রিপোর্ট বাহির হইয়াছে। তাহাতে গড়ে এক বৎসরের হিসাবে দেখা যাইতেছে—এক বৎসরের মধ্যে সেখানে ১৫৫৩০ জন লোক আত্মহত্যা করিয়াছে, ইহার মধ্যে ১৫ বৎসরের অনধিক বয়স্ক বালক বালিকার সংখ্যা ৯০০০ নয় হাজার। চিকিৎসক সম্প্রদায়ের অভিমত—এই সকল বালক ও বালিকার বাল্যবিবাহই ইহাদের আত্মহত্যার কারণ। তাঁহারা আর একটী হিসাব দিয়াছেন, তাহাতে প্রকাশ—সেখানে আলোচ্য বৎসরে ১৬০০ যোল শত বালক ও ১২০০ বালিকার ১৫ বৎসরের কম বয়সেই বিবাহ দেওয়া হইয়াছে। ৪৭০০ বালিকা ১৪ বৎসর বয়সেই সন্তানের জননী হইয়াছে, এই অপ্রাপ্তবয়স্কা জননীদের মধ্যে ২২০০ জন আত্মহত্যা করিয়াছে। এই সকল বালিকা-প্রসূতিদের স্বাস্থ্যহীনতাই সাধারণতঃ আত্মহত্যার কারণ বলিয়া নির্দ্দেশিত হইয়াছে।

---

## সমুদ্রের তলদেশের ফটো গ্রহণ

বহুদিন হইতে পাশ্চাত্যের অধিবাসীগণ সমুদ্রের গভীর তলদেশের ফটো গ্রহণের চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন। সম্প্রতি এই চেষ্টায় তাঁহারা বিশেষ সফলতা লাভ করিয়াছেন। তাঁহাদের গবেষণার ফলে এই কার্য্যের জন্য এক প্রকার বিশেষ যন্ত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে। তাহার সাহায্যে সহজেই সমুদ্র-তলস্থ জীবজন্তু ও অন্যান্য সমস্ত জিনিষের ছবি তোলা হয়। তাঁহারা এক্ষণে প্রাচীন রুমেনীয়া নগরের ফটো গ্রহণের ব্যবস্থা করিতেছেন। এই নগরটী বহুকাল পূর্ব্বে সমুদ্রগর্ভে লুপ্ত হইয়াছে। তাঁহাদের এই চেষ্টা সম্পূর্ণ সফল হইলে অসংখ্য প্রাচীন ঐতিহাসিক লুপ্তকীর্ত্তির পুনরুদ্ধার ও তৎসম্বন্ধীয় বহু জটিল সমস্যার সমাধান হইবে।

## অতি প্রাচীন কালের মনুষ্য-খর্পর আবিষ্কার

অক্সফোর্ডের জনৈক জীবতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত নূতন তত্ত্বের আবিষ্কার মানসে কিছুদিন হইতে ফিলিস্তীন অঞ্চলে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলেন, সম্প্রতি একস্থানে ১৮ ফিট মৃত্তিকার তলদেশে তিনি কতকগুলি মাথার খুলি পাইয়াছেন। সেগুলি লইয়া জীবতত্ত্ব-বিৎ পণ্ডিতগণের মধ্যে মহা হৈ, চৈ, পড়িয়া গিয়াছে, তাঁহারা বহু আন্দোলন আলোচনা ও গভীর গবেষণার ফলে জানিতে পারিয়াছেন—ইতিহাস সৃষ্টির হাজার হাজার বৎসর পূর্ব্বে ঐস্থানে এই জাতীয় মানুষের বসতি ছিল। তাঁহারা আরও স্থির করিয়াছেন যে বনী ইসরাইল সম্প্রদায় ফিলিস্তীনে প্রবেশ করিবার ২০ হইতে ৪০ সহস্র বৎসর পূর্ব্বে ফিলিস্তীন অঞ্চলে ইহারা বসবাস করিত।

---

## আমেরিকায় শ্মশ্রু রক্ষা সমিতি।

আমেরিকার চিকিৎসকগণ "শ্মশ্রুমুণ্ডন স্বাস্থ্যের হানিজনক" বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন, ফলে নিউইয়র্ক সহরে "শ্মশ্রুরক্ষা সমিতি" নামে একটী সমিতি স্থাপিত হইয়াছে। ঐ সমিতির সভ্যগণ শ্মশ্রুমুণ্ডন প্রথার মূলোচ্ছেদ করিবার উদ্দেশ্যে প্রচার কার্য্য চালাইতেছেন। সমিতির বর্ত্তমান সভ্যসংখ্যা ৮০০০ হাজার। ইহার মধ্যে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সংখ্যা প্রায় অর্দ্ধেক। সম্প্রতি এই সমিতির উদ্যোগে দীর্ঘ শ্মশ্রুধারীদের একটী প্রদর্শনী খোলা হইয়াছিল। তাহাতে পুরস্কার বিতরণের ব্যবস্থাও ছিল। লিংস্টন নামক একজন আমেরিক্যান ও হ্যারিংটন নামক একজন ইংরাজ প্রতিযোগীতায় প্রথম ও দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়া পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়াছেন। তাঁহাদের দাড়ির দৈর্ঘ্য যথাক্রমে ১৭ ও ১২ ফিট।

---

## আলোচনা

### বিবাহের বয়স নির্দ্ধারণ

ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় বিবাহের বয়স নির্দ্ধারণ সম্বন্ধে একটী আইনের খষড়া আলোচাধীন আছে। এই আইন বর্ত্তমান অবস্থায় পাস হইয়া গেলে, ১৮ বৎসরের কম বয়সের বালকের এবং ১৪ বৎসরের কম বয়সের বালিকার বিবাহ দেওয়া দণ্ডনীয় বলিয়া গণ্য হইবে। পূর্ব্বে কেবল হিন্দু সমাজের জন্য এই শ্রেণীর আইনগুলি সীমাবদ্ধ করা হইয়াছে। কিন্তু মিঃ সারদারের এই খষড়া ব্যাপকভাবে হিন্দুমুছলমান প্রভৃতি সকল জাতির ভারতীয়দের জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য হইবে। এই আইন পাস হইয়া গেলে উপরোক্ত নির্দ্ধারণের কম বয়সের বালক বালিকার বিবাহ দিলে অপরাধীকে কারাদণ্ডে দণ্ডিত করার প্রস্তাব হইয়াছে। সম্ভবতঃ আইনটাকে যথাযথভাবে বলবৎ করার জন্য সমস্ত বিবাহ রেজিষ্ট্রী করারও ব্যবস্থা হইবে। জনমত সংগ্রহের জন্য আইনের সংশোধিত খষড়া সাধারণ্যে প্রচার করার ব্যবস্থা হইয়াছে। ইহার বিস্তারিত আলোচনা সেই সময় করিব। বর্ত্তমানে মোটের উপর আমরা এই আইনের সমর্থন করিতেছি।

আমাদের মতে এছলাম ধর্ম্মের দিক দিয়া এই আইনের মূলনীতির সমর্থন না করিয়া থাকা যায় না। এছলামে বিবাহের একটা প্রধানতম অঙ্গ হইতেছে—উভয় স্বামীও স্ত্রীর পক্ষ হইতে স্বেচ্ছায় সজ্ঞানে পরস্পরের প্রতি আত্ম-সমর্পণ, মুছলমানের সামাজিক পরিভাষায় ইহাকে ঈজাব-কবুল বলা হয়। এই ঈজাব-কবুল বা পরস্পরের স্বেচ্ছাকৃত সম্মতি না হইলে কোন বিবাহই সিদ্ধ হইতে পারে না। এই হিসাবে সহজে দেখা যাইতে পারে যে, বয়োপ্রাপ্ত হওয়ার পর বিবাহ করাই হইতেছে এছলামের অভিপ্রেত ও আদর্শ। কারণ, অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালক বালিকার মতামতের কোন মূল্য শরিয়তের আইনে নাই।

শরিয়তের প্রত্যেক কার্য্য প্রত্যেক অনুষ্ঠান এবং প্রত্যেক আদেশ-নিষেধ মানুষের মঙ্গল সাধনের নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। চেষ্টা করিলে তাহার ভিতরকার এই তত্ত্বগুলি আমরা অবগত হইতে পারি, আবার যথেষ্ট গবেষণার অভাবে তাহার সমস্ত বিষয়ের সম্পূর্ণ তত্ত্ব হয়ত সময় সময় আমাদের গোচরে নাও আসিতে পারে। কিন্তু তাহার মূলে যে মানবহিতৈষণার একমাত্র উদ্দেশ্য নিহিত আছে, স্বয়ং শরিয়তই তাহার প্রধান সাক্ষী। বিবাহ তালাক প্রভৃতি এছলামী আইন কানুনগুলি এই নীতির অধীন, সুতরাং অন্যায়ভাবে কোন মানুষকে ক্ষতিগ্রস্ত করার কোন বিধান তাহাতে নাই—থাকিতে পারে না।

একদল লোক এখানে বলিবেন—নাবালেগ্ বালক বালিকার বিবাহ দিবার নিয়মও ত শরিয়তে পাওয়া যায়, অতএব এ নীতির মর্য্যাদা রক্ষা হইতেছে কৈ? তাঁহারা বলিবেন—প্রত্যেক অলি নাবালেগ বালক বালিকার বিবাহ দিতে পারে, বাপ ও দাদা এইরূপ বিবাহ দিলে বালেগ হওয়ার পর সে বিবাহ বন্ধন ভঙ্গ করার অধিকারও স্ত্রীর থাকে না। অতএব এছলামের বিধান অনুসারে যাহা সিদ্ধ ও সঙ্গত, প্রস্তাবিত আইন মুছলমানের সেই ধর্ম্মসঙ্গত অধিকার কাড়িয়া লইতে চাহিতেছে—সুতরাং তাহা অন্যায়। ইহার উত্তরে বলিবার কথা অনেক আছে, আজ অতি সংক্ষেপে তাহার মধ্যকার কএকটা বিষয়ের একটু আভাস দিয়া রাখিতেছি:—

(১) এতিমা বা পিতৃহীন বালিকার বিবাহ—তাহার বালেগ না হওয়া পর্য্যন্ত—অন্য কোন অলিতে দিতে পারে কিনা—ইহা লইয়া আলেম সমাজে গুরুতর মতভেদ বিদ্যমান আছে। যাঁহারা এই বিবাহকে অসিদ্ধ বলিয়া মনে করেন, তাঁহাদের দলিল প্রমাণগুলিও সহজে উড়াইয়া দিবার মত নহে। এই সকল যুক্তি প্রমাণের দ্বারা এছলামের ঐ মৌলিক নীতির সমর্থন হইতেছে।

(২) সকলেই স্বীকার করেন যে, বাপ ও দাদা ব্যতীত অন্য কোন অলিতে কোনও অপ্রাপ্ত বয়স্কা বালিকার বিবাহ দিলে, বয়ঃপ্রাপ্ত হওয়ার পর সেই বালিকা বিনা কারণে ঐ বিবাহ বাতিল করিয়া দিতে পারে। সুতরাং—তাঁহাদেরই স্বীকারোক্তি অনুসারে—এ বিবাহের মূল্য যে কতটুকু, তাহা খুব সহজেই বুঝিতে পারা যাইতেছে।

(৩) বাপ ও দাদা অপ্রাপ্ত বয়স্কা বালিকার বিবাহ দিলে সে বিবাহ খণ্ডন করার অধিকার যে তাহার থাকে না—কোরআন হাদিছের কোন স্পষ্ট প্রমাণ বা নজির হইতে এরূপ কথা সপ্রমাণ হয় না বলিয়াই আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস। বিশেষ চেষ্টা সত্ত্বেও এরূপ কোনও প্রমাণ আমাদের হস্তগত হয় নাই। যাবৎ অপর পক্ষ এরূপ কোন প্রমাণ উপস্থিত করিতে না পারিতেছেন—তাবৎ তাঁহাদিগকে ধর্ম্মের হিসাবে স্বীকার করিতে হইবে যে, বাপ ও দাদার দেওয়া নাবালেগ কন্যার বিবাহ আর অন্যান্য অলির দেওয়া বিবাহে কোন তারতম্য নাই।

(৪) বালিকা বয়ঃপ্রাপ্ত হওয়ার পর স্বেচ্ছায় এবং কোন প্রকার কারণ প্রদর্শন না করিয়া একটা মুখের কথায় যে বিবাহ ভাঙ্গিয়া দিতে পারে, বাস্তবিক তাহা বিবাহ নামেরই যোগ্য নহে এবং তাহা কখনও এছলামের আদর্শ বিবাহরূপে পরিগণিত হইতে পারে না। পক্ষান্তরে তাঁহাদের অবলম্বিত এই মছলাটিই বলিয়া দিতেছে যে, বয়োপ্রাপ্ত হওয়ার পূর্ব্বেকার যে বিবাহ—তাহা বস্তুতঃ একটা প্রাথমিক উদ্যোগ আয়োজন মাত্র, বয়ঃপ্রাপ্ত হওয়ার পর স্ত্রী তাহাতে সম্মতি দিলে তবে তাহা বিবাহে পরিণত হইবে।

সুতরাং বয়ঃপ্রাপ্ত স্বামীস্ত্রীর স্বেচ্ছা প্রণোদিত ঈজাব-কবুলের দ্বারা অনুষ্ঠিত বিবাহই যে এছলামের আদর্শ, তাহাতে সন্দেহ করার কোনই কারণ থাকিতেছে না।

এছলামের বিবাহ বিধানগুলিও যে মানুষের মঙ্গল সাধনের মূল ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, তাহা পূর্ব্বে নিবেদন করিয়াছি। অল্প বয়সে বালক বালিকার বিবাহ দেওয়াতে মুছলমান সমাজের যে সর্ব্বনাশ হইতে আরম্ভ হইয়াছে, চিন্তাশীল পাঠকগণকে বোধ হয় তাহা আর বলিয়া দিতে হইবে না। আদম শুমারীর গত ত্রিশ বৎসরের রিপোর্ট একসঙ্গে আলোচনা করিয়া দেখিলে জানিতে পারা যায় যে, যে সংখ্যার বড়াই মাত্রের উপর নির্ভর করিয়া বাঙ্গলার মুছলমান আত্মবিস্মৃত হইয়া আছেন, এই প্রকার অন্যায় বিবাহের অবশ্যম্ভাবী কুফলে তাহারও মূল খাইয়া যাইতে আরম্ভ হইয়াছে। এখন দেখা যায়—শিশু যুবক বৃদ্ধ সব মিলাইয়া মুছলমানের সংখ্যা অধিক হইলেও, বয়ঃপ্রাপ্ত মুছলমানের সংখ্যা অমুছলমানের তুলনায় ক্রমশঃ কমিয়া যাইতে আরম্ভ হইয়াছে। অনুসন্ধানে জানা যায়, শিশু মৃত্যুর অনুপাত ক্রমশঃ বাড়িয়া যাওয়াই এই সর্ব্বনাশের একমাত্র কারণ।

অল্প বয়স্ক বালক বালিকাদের বিবাহ দিয়া তাহাদের পিতামাতা আমরা তাহাদের সর্ব্বনাশ করিতেছি, শত সহস্র শিশুর অকাল মৃত্যুর সহায়তা করিতেছি, আর এমনি ভাবে মুছলমান জাতির মহা সর্ব্বনাশ সাধনে প্রবৃত্ত হইতেছি। অপরিণত দেহের কিশোর কিশোরী যে জাতির ভবিষ্যৎ বংশধরদিগের জনক জননী হইয়া দাঁড়ায়, এমন কি দশ এগার বৎসরের শিশুকেও যেখানে জননিত্বের অভিশাপ হইতে প্রাণ রক্ষার জন্য হাঁসপাতালের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়, এক ভীষণ ভয়াবহ ভাবী বিনাশের কবলগত হওয়া ব্যতীত তাহাদের আর কোনও গত্যন্তর নাই।

মানুষ যখন পাগল হইয়া নিজের ঘরে আগুন দিতে যায়, নিজ হাতে নিজের সন্তান হত্যা করিতে চায়, তখন তাহাকে ধরিয়া তাহার হাত পা বাঁধিয়া দিতে হয়। এই হিসাবে আমরা প্রস্তাবিত আইনের সমর্থন করিতেছি।

---

## সংশোধন

জনৈক বন্ধু জানাইতেছেন—মাসিক মোহাম্মদীতে জনাব কাজী আবদুল অদুদ ছাহেবকে ঢাকা ইউনিভার্সিটীর অধ্যাপক বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। ইহা ভুল, কাজী ছাহেব ঢাকা Intermediat কলেজের অধ্যাপক। এই সংশোধনের জন্য আমরা পত্র লেখক ছাহেবকে ধন্যবাদ জানাইতেছি।

## সাহিত্যিক মোকদ্দমা

সাহিত্যের আদালতে আজকাল একটা তুমুল মোকদ্দমা চলতে আরম্ভ হয়েছে। এই মোকদ্দমার বাদী হচ্ছেন শ্রীযুত দন্ত্য-স মহাশয়। ছ-নামক বাঙ্গলার এক ব্যঞ্জনবর্ণের নামে তাঁহার নালিশ। বাদীর দাবী ও তাহার কারণ এবং প্রতিবাদী পক্ষের বক্তব্য পক্ষগণের আরজী জওয়াবে প্রকাশ পাইতেছে। সাহিত্যামোদী পাঠক পাঠিকাগণের কৌতূহল চরিতার্থ করার জন্য বাদী প্রতিবাদীর আরজী জওয়াবের জাবেতানকল নিম্নে উদ্ধৃত করে দেওয়া হচ্ছে। দুই পক্ষের উকীল বাবুদের ছওয়াল জওয়াবের সারমর্ম্ম যতটা সংগ্রহ করতে পেরেছি, তারও একটা সংক্ষিপ্ত রিপোর্ট প্রকাশ করবার চেষ্টা পাব।

বিনীত ছেখ ছমছের আলী
ছাকিন ছদানন্দপুর।

স্বত্বসাব্যস্তমতে ঘোষণামূলক ডিক্রি পাওয়ার দরখাস্ত

বাদী—

শ্রীদন্ত্য-স,
জন্মস্থান—দন্তমূল, বর্ণ—অল্পপ্রাণ।
হাল সাকিন—বাঙ্গলা সাহিত্য।

প্রতিবাদী—

শ্রী—ছ,
জন্মস্থান—জিহ্বামূল, বর্ণ—মহাপ্রাণ
সাং—ঐ

বাদীর দরখাস্ত এই যে—

(১) উভয় বাদী ও প্রতিবাদী মূলতঃ একই ৺ প্রাকৃত ভাষার বংশধর। স্মরণাতীত কাল হইতে বাদী ও প্রতিবাদী নিজেদের পৈতৃক সম্পত্তির মধ্যকার নিজ নিজ হিস্বায় পরম শান্তির সহিত বসবাস করিয়া আসিতেছিল।

(২) কথিত সম্পত্তির মধ্যে নিম্নের লিখিত ক-চৌহদ্দি-স্থিত সম্পত্তিতে বাদীর সম্পূর্ণ ষোল আনা ও নিব্যূঢ় স্বত্বাধিকার হইতেছে এবং বাদী দ্বাদশ বৎসরের বহু উর্দ্ধকাল হইতে ঐ সম্পত্তিতে ষোল আনা রকমে এবং অন্যের "নিরাংশে" ও বিরুদ্ধ দখল জনিত স্বত্বে স্বত্ববান ও দখলিকার থাকিয়া তাহা যদিচ্ছা ভোগ দখল ও তছরুপাদি করিয়া আসিতেছে।

(৩) উপরের লিখিত "ক"—চৌহদ্দিস্থিত সম্পত্তিতে প্রতিবাদীর কোন প্রকার স্বত্বস্বামিত্ব বা দখলাধিকারের উদ্ভব হয় নাই।

(৪) কিন্তু প্রতিবাদী সম্প্রতি, কতকগুলি দুষ্টবুদ্ধি মুসলমানের দুরভিসন্ধি ও সহায়তার ফলে, বাদীকে তাহার স্বত্বাধিকারভুক্ত ঐ পৈতৃক সম্পত্তির এক অংশ হইতে বলপূর্ব্বক বেদখল করিয়া, কথিত মুসলমান গুণ্ডাদিগের সহায়তায়, নিজে তাহার উপর অন্যায় দখল জমাইয়া বসিয়াছে। সেমতে ইংরাজী ১৯২০ সালের প্রারম্ভে বাঙ্গলাদেশে বাদীর নালিশের কারণ হইয়াছে।

(৫) বাদী নিতান্ত 'ক্ষুদ্রপ্রাণ' ও নিঃসহায় হওয়া বিধায় ঐ মহাপ্রাণ ও শক্তিশালী দায়াদের সঙ্গে বলে আঁটিয়া উঠিতে পারিতেছে না।

(৬) সেকারণ, "অত্র" দরখাস্ত দাখিল করিয়া প্রার্থনা :—বিবাদীয় সম্পত্তিতে বাদীর ষোল আনা দখল ও স্বত্বাধিকার থাকার এবং প্রতিবাদীর দখলকে অন্যায় ও বেআইনী দখল সাব্যস্তে বাদীকে ঘোষণামূলক ডিক্রি দিবার আজ্ঞা হয়।

(৭) আইনমতে ও আদালতের ন্যায় বিচারে বাদী আর আর যে সকল প্রতিকার পাওয়ার অধিকারী, তাহাকে তৎ তৎ প্রতিকার দেওয়াইবার আজ্ঞা হয়।

শ্রীদন্ত্য-স

এই আরজীর লিখিত সমস্ত বিবরণ আমার জ্ঞান বিশ্বাস মতে সত্য।

নিঃ—শ্রীস।

( স্বাক্ষর ) চিনি আমি
মোহাম্মদ ঈশা খাঁ।

নালিশী সম্পত্তির চৌহদ্দি

আরবী পার্সি নামক যাবনিক ভাষার সাদ, সিন ও সে বর্ণের বাঙ্গলা অনুলিখন।

---

## প্রতিবাদীর জওয়াব

( ১ ) বাদীর এই নালিশের কোন কারণ বা অধিকার নাই।

( ২ ) বাদীর দাবী সত্য হইলেও তাহা তামাদী দোষে বারিত।

( ৩ ) বাদীর দাবী স্বকীয় কার্য্যজনিত বাধা ও উপেক্ষা দোষে বারিত।

( ৪ ) প্রকৃতপক্ষে বিবাদীয় সম্পত্তির উপর বাদীর কখনও কোন ন্যায্য স্বত্বাধিকার বর্ত্তায় নাই।

(৫) এ সম্পত্তিতে বাদীর অক্তের নিরাংশে দখলিকার থাকার উক্তি সম্পূর্ণ মিথ্যা।

(৬) প্রকৃত কথা এই যে মুছলমান জাতি এযাবৎ বাঙ্গলা ভাষার প্রতি উপেক্ষা করায় এবং হিন্দুজাতি ইচ্ছা বা অবজ্ঞাপূর্ব্বক মুছলমানী শব্দগুলির মুণ্ডপাত করিয়া আসিতে থাকায়, তাহা তথা তাহার 'ছিন' 'ছাদ' ও 'ছে' বর্ণ লা-ওয়ারেছ রাজভাগাড়ের মত সকল প্রকার জীব জন্তুর দ্বারা ক্রমাগত পদদলিত হইয়া আসিতেছিল, এবং যেহেতু প্রতিবাদী পূর্ব্বে বাদীর উকিল ও নিকটবন্ধুদিগের জ্ঞাতসারে যথাসাধ্য সততার সহিত এ সম্পত্তির এক অংশের রক্ষণাবেক্ষণ করিয়া আসিতেছিল, আরও যেহেতু বাদী নিতান্ত বেআইনী ও অন্যায়ভাবে তাহার অন্যাংশের গুরুতর ক্ষতিসাধন করিয়া আসিতেছিল, সে কারণ ঐ সম্পত্তির বঙ্গদেশীয় উত্তরাধিকারিগণ তাহা ষোল আনা রকম প্রতিবাদীকে পত্তনি দিলে পর প্রতিবাদী নিতান্ত শান্তিপূর্ণভাবে তাহার উপর নিজের স্বত্বাধিকার বলবৎ করার চেষ্টা করিয়াছে মাত্র।

(৮) আরবী ভাষাকে পক্ষভুক্ত না করার পক্ষাভাব দোষে এই মোকদ্দমা ডিসমিসের যোগ্য। এই জওয়াবের স্পষ্ট স্বীকারোক্তি ব্যতীত প্রতিবাদী আরজীর অন্য কোন কথা স্বীকার করে না, সুতরাং বাদী তৎসমুদয় সপ্রমাণ করিতে বাধ্য।

(৯) বাদীর মোকদ্দমা খরচাসহ ডিসমিসের যোগ্য।

শ্রীছ

চিনি আমি

আবুজাকাখেল ছৈয়দ ছোলতান উল্-হক।

(সত্যপাঠ ইত্যাদি)

উভয় পক্ষের উকীল বাবুদের ছওয়াল জওয়াব শুনিয়া হাকিম নিম্নলিখিত ইস্যু ধার্য্য করিয়াছেন:—

(১) নালিশী সম্পত্তির উপর বাদীর কোন প্রকার আইন সঙ্গত স্বত্ব স্বামিত্ব আছে কিনা।

(২) নালিশী সম্পত্তির বা তাহার কোন অংশের উপর বাদীর একচেটিয়া দখল থাকার উক্তি সত্য কিনা?

(৩) বাদীর দখল প্রমাণ হইলে—বস্তুতঃ বাদী ঐ দখলি সম্পত্তির ক্ষতি খেসারত করিয়াছে কিনা?

(৪) নালিশী সম্পত্তির উপর প্রতিবাদীর কোন স্বত্বাধিকার আছে কিনা?

(৫) তাহার দখল বেআইনী কিনা?

(৬) আরবী ভাষাই যদি বস্তুতঃ নালিশী সম্পত্তির প্রকৃত মালিক থাকে, তবে তাহার মূল স্বত্বের বিরুদ্ধ কোন কার্য্য অধীন স্বত্বাধিকারী করিতে পারে কিনা?

(৭) আরবী ভাষাকে পক্ষভুক্ত না করার পক্ষাভাব দোষে মোকদ্দমা ডিসমিসের যোগ্য কিনা?

(জ্যৈষ্ঠ মাসের মাসিক মোহাম্মদীতে এই মোকদ্দমার বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যাইবে বলিয়া জনাব "ছেখ শাহেব" আশা দিয়াছেন, আমরা অপেক্ষায় রহিলাম।—সম্পাদক)

---

## জবাবদিহি

(জনাব কাজী আবদুল অদুদ ছাহেবের জবাবনামা নিম্নে প্রকাশিত হইল, পাঠকগণ আমাদের লেখার সঙ্গে মিলাইয়া নিজেরাই তাহার বিচার করুন। এই পত্র সম্বন্ধে দুই একটা কথা আমরা আগামী সংখ্যায় আরম্ভ করিব। অবশ্য সত্যের অনুরোধে স্বীকার করিতে হইতেছে যে, গত মাসের লেখায় বস্তুতই স্থানে স্থানে উগ্রতার পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। এজন্য কাজী ছাহেবের পত্র পাওয়ার পূর্ব্বেই আমরা বন্ধু বান্ধবগণের নিকট দুঃখ প্রকাশ করিয়াছি এবং এখনও করিতেছি।—সম্পাদক)।

মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ সাহেব তাঁর "নব পর্য্যায় না নব পর্য্যয়" শীর্ষক আলোচনার চৈত্রের কিস্তিতে নব পর্য্যায়ের লেখককে দুইটি প্রশ্নের সোজাসুজি উত্তর দিতে বলেছেন। তার একটি ৩৪৮ পৃষ্ঠার প্রথম কলমের ৮ লাইনে, অন্যটি ৩৫১ পৃষ্ঠার দ্বিতীয় কলমের ১১ লাইনে। প্রথমটি অবান্তর, কেননা কোর-আন হাদিসের নির্দ্দেশ অনুসরণ করেই মুসলমান সম্মোহিত হয়েছে এটি নব পর্য্যায়ের লেখকের প্রতিপাদ্য নয়। দ্বিতীয়টি সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে হজরত মোহম্মদের সাধনা ও তাঁর সার্থকতা সম্বন্ধে কিছু কিছু ইঙ্গিত নব পর্য্যায়ের বিভিন্ন লেখায় ও পরে পরের অন্যান্য প্রবন্ধে করা হয়েছে, এবং ভবিষ্যতেও যে এ-সম্বন্ধে আলোচনা চল্‌বে এটি স্বাভাবিক।

বলা বাহুল্য, আধুনিক কালে কোন্ নূতন দৃষ্টিতে আল্লাহর বাণী মানুষের সাধনা ইত্যাদির দিকে চাইলে তা মানুষের চিত্তের জন্য বন্ধন না হয়ে তার মুক্তির পথ হবে তার অবলম্বন সেই চেষ্টাই নবপর্য্যায়ে করা হয়েছে,—অবশ্য এই চেষ্টার সার্থকতার বিচারক কাল।

মওলানা সাহেব কিছু রোষপরবশ হয়ে নবপর্য্যায় আলোচনা শুরু করেছেন, তাই অনেক জায়গাই তাঁর দৃষ্টি আচ্ছন্ন হচ্ছে। সত্য ও কল্যাণ জিজ্ঞাসার পথে এই রোষ-পরবশতার কি প্রয়োজন আছে বোঝা যাচ্ছে না। তিনি বর্ষীয়ান ব্যক্তি—তাই প্রার্থনা, বয়সের অনুযায়ী সত্যদৃষ্টি ও প্রেম তাঁর কাছ থেকে তাঁর সম্প্রদায়ের লোক ও দেশের লোক লাভ করুক।

সত্য অনেক সময়ে পাওয়া যায় খনির সোনার মত,—তাকে সংগ্রহ করতে হয় পরম প্রয়াসে। কিন্তু তাতে অসহিষ্ণু হলে শুধু নির্ব্বাসন দেওয়া হয় নিজেরই ভাগ্য।

Printed and Published by Md. Khairul Anam Khan from the "Mohammadi Press,"
29, Upper Circular Road, Calcutta.

# পঃ দেবী-প্রসাদ প্রয়াগ দত্ত

## ৮৯নং লোয়ার চিৎপুর রোড,

## কলিকাতা।

বিনামূল্যে নমুনা! বিনামূল্যে নমুনা!

## সুন্দরী সূর্ত্তি।

ইহা উত্তমরূপে সুবাসিত ও সুগন্ধবিশিষ্ট। সামান্য পরিমাণে পানের সহিত ব্যবহার করিলে মুখ সুগন্ধে ভরপুর হইয়া উঠে। ইহা বাস্তবিকই পানসেবীদিগের পক্ষে বিলাস দ্রব্য। অভিজ্ঞ হাকিম, কবিরাজ ও ডাক্তারগণ কর্ত্তৃক ইহা পরীক্ষিত এবং ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। এক আনার টিকিট সহ বিনামূল্যে নমুনা চাহিয়া পাঠান। অর্দ্ধ পাউণ্ড ওজনের এক প্যাকেটের মূল্য ।৵০ আনা।

## অটো সুন্দরী।

বাজারে ইহাই একমাত্র রুমালে ব্যবহার্য্য সুগন্ধি দ্রব্যরূপে দেখা দিয়াছে। রুমালে মাত্র এক ফোঁটা মাখাইলেই ৫।৬ দিন পর্য্যন্ত এই আতরের মনোমুগ্ধকর সুগন্ধ স্থায়ী রহিবে; এবং যখনই আপনি পকেট হইতে রুমালখানা বাহির করিবেন, তখনি আপনার পার্শ্বস্থিত ভদ্রমহোদয়গণ মুক্তকণ্ঠে ইহার প্রশংসা করিবেন। ইহার একমাত্র কারণ এই যে এই আতর এমনি সুমিষ্টরূপে সুবাসিত যে ইহার সুগন্ধ ঘ্রাণে তাপিত সন্তপ্তজন অবিলম্বেই সকল দুঃখ কষ্টের কথা ভুলিয়া যাইতে বাধ্য হইবেন। ১ ড্রাম শিশির মূল্য ৸৵০ আনা, অর্দ্ধ ড্রাম শিশির মূল্য ।৵০নয় আনা।

## সুন্দর বিলাস কেশ তৈল।

এই মহোপকারী কেশ তৈল আজকাল প্রভূত পরিমাণে কেশ প্রসাধনে ব্যবহৃত হইতেছে। ইহা কেশমূলে মাখাইলেই মস্তিষ্ক সম্বন্ধীয় যাবতীয় পীড়া ত্বরায় উপসমিত করে। এই বিশিষ্ট কেশ তৈলের প্রধান উপাদান সমূহই প্রচুর পরিমাণে কেশ বৃদ্ধির পক্ষে হিতকর ও সহায়ক গুণবিশিষ্ট। ইহার গুণ অত্যাশ্চর্য্য রকমে সুফল প্রদান করে এবং এই জন্যই সর্ব্বপ্রকার শিরঃপীড়াভোগী ব্যক্তিবর্গের নিকট হইতে অযাচিত প্রশংসা পাইয়া আসিতেছে। প্রত্যেক শিশির মূল্য এক টাকা। পাইকারদিগের পক্ষে বিশেষ সুবিধা আছে।

এতদ্ব্যতীত আমাদের এখানে সকল প্রকারের বিলাতী এসেন্স, আতর এবং কেশ তৈলাদি প্রচুর পরিমাণে বিক্রয়ার্থে মজুদ থাকে। আমাদের পাইকারী দরের মূল্য তালিকার জন্য পত্র লিখুন।

## পঃ দেবী-প্রসাদ প্রয়াগ দত্ত।

৮৯নং লোয়ার চিৎপুর রোড,

কলিকাতা।

Cover printed at The Mohammadi Press, Calcutta.

প্রথম বর্ষ আষাঢ়, ১৩৩৫ নবম সংখ্যা

# মোহাম্মদী

সম্পাদক—
মোহাম্মদ আকরম খাঁ

বার্ষিক মূল্য সডাক তিন টাকা
প্রতি সংখ্যা সাড়ে চারি আনা

আর দিবার সময় অনুগ্রহ পূর্ব্বক —“মাসিক মোহাম্মদী” নাম উল্লেখ করিবেন।

# সূচীপত্র—আষাঢ় ১৩৩৫

অর্ডার দিবার সময় অনুগ্রহ পূর্ব্বক "মাসিক মোহাম্মদী" নাম উল্লেখ করিবেন।

# সূচীপত্র—আষাঢ় ১৩৩৫

অর্ডার দিবার সময় অনুগ্রহ পূর্ব্বক—"মাসিক মোহাম্মদীর" নাম উল্লেখ করিবেন।

১০৬৭নং রেজিষ্টারীকৃত জারমানি

# মিঠা বড়ি।

ইহার আশ্চর্য্যতা এই যে খাইতে সুস্বাদু এবং রোগীর ইচ্ছামত ঔষধের পথ্য। ১ দিনে জ্বর ছাড়ে ৩ দিনে প্লীহা যকৃত কমে। জ্বরে বিজ্বরে সেবন চলে! প্যাকেট ॥০, ডজন ৪৲ গ্রোস ৪০৲। **সর্ব্বত্র এজেন্ট চাই।**

ভারতের সোল এজেন্ট :—**ডাক্তার এ, এণ্ড ব্রাদার্স,** নড়াইল পোষ্ট, (যশোহর)

---

## মামীরার সোর্ম্মা

কেবলমাত্র দুই সপ্তাহ কাল ব্যবহার করিলে ধুনি, ছানি, জ্বালা, রাতকাণা, ধান্ধা, ঝাপসা, সকল সময় জল নির্গমন এবং সর্ব্বপ্রকার চক্ষু রোগ বিশেষ উপকার হয়। একটীবার পরীক্ষা প্রার্থনীয়। এতদ্ব্যতীত যে কোন প্রকার চক্ষু-রোগের বিস্তারিত বিবরণ লিখিয়া জানাইলে সেইমত সোর্ম্মা প্রেরণ করা হয়। প্রত্যেক শিশির মূল্য ২৲, ১।০, ॥০ মাশুল স্বতন্ত্র।

**এস, আবদুস্ সামাদ কান্দুই**

সমবায় মেনশন্, ১।১ হক্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

## শরীর রক্ষক কবচ

কি? যাহা গ্রহণে শরীর অটুট ও অক্ষয় থাকে। শরীর সুস্থ রাখিতে হইলে কি কি নিয়মে চলিতে হয় এইরূপ একখানি গ্রন্থ বিনামূল্যে বিতরণ করা হইতেছে। উহা লইয়া পাঠ করিয়া দেখুন, শরীর রক্ষক কি না? নিম্ন ঠিকানায় কার্ড লিখিলে বিনা মাশুলে ঘরে বসিয়া পাইবেন। ঐ গ্রন্থখানির নাম **কামশাস্ত্র।**

প্রাপ্তিস্থান :—

**বৈদ্যশাস্ত্রী।**

২১৪নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

---

# ধবল ও কুষ্ঠ চিকিৎসা।

## প্রশংসাপত্র

ঢাকা হইতে স্বনামধন্য জনাব মৌঃ মোঃ সাহাবুদ্দিন দেওয়ান সাহেব লিখিয়াছেন :—"আমি ১১ বৎসর যাবৎ নিম্নলিখিত কুষ্ঠ রোগে ভুগিতেছিলাম যথা,—

১। শরীরে বিবিধ বর্ণের চাকা চাকা দাগ; ২। শরীরে পিপড়া হাটিতেছে বোধ হইত; ৩। বাম হাতের তিনটী অঙ্গুলী বক্র হইয়াছিল; ৪। শরীরে অধিকাংশ স্থান অসাড় হইয়া গিয়াছিল; ৫। পায়ের তালুতে ৯ ইঞ্চি পরিমান ক্ষত ছিল, ৬। শরীর হইতে দুর্গন্ধ বাহির হইত ও দাস্ত পরিষ্কার হইত না; ৭। শরীরে সূচবিদ্ধবৎ বেদনা হইত, মাঝে মাঝে শরীর হইতে ফুস্ফুরি বাহির হইত ও তজ্জন্য জ্বর হইত; ৮। কুষ্ঠ রোগ হইবার পূর্ব্বে আমার উপদংশ রোগ হইয়াছিল।

ইতিপূর্ব্বে আমি এই রোগের জন্য বহু চিকিৎসালয়ে বিফল মনোরথ হইয়া অবশেষে কুষ্ঠ চিকিৎসক কবিরাজ প্রবর শ্রীযুক্ত বিনয়শঙ্কর রায় বৈদ্যশাস্ত্রী মহাশয়ের নিকট চিকিৎসাধীনে থাকিয়া বর্ত্তমানে আমি নির্দ্দোষ আরোগ্য হইয়া কার্য্যক্ষম হইয়াছি। আমি খোদাতায়ালার নিকট প্রার্থনা করিতেছি, কবিরাজ মহাশয় দিন দিন যশোন্নতি লাভ করুন।"

শালিখা কুষ্ঠাশ্রম হইতে নমুনা স্বরূপ বিতরণ হইতেছে—এক ইঞ্চি স্থানে প্রলেপে উপকার হয় ভিঃ পিঃ খরচ ।/০ আনা। **বিনা মুল্যে দশ হাজার ধবল কুষ্ঠের প্যাকেট বিতরণ**

**শালিখা কুষ্ঠাশ্রম—কবিরাজ শ্রীবিনয়শঙ্কর রায় বৈদ্যশাস্ত্রী**

( কুষ্ঠ চিকিৎসা তত্ত্ববিদ্ )

**৪ নং হরগঞ্জ রোড, পোঃ শালিখা হাওড়া।**

---

অর্ডার দিবার সময় অনুগ্রহ পূর্ব্বক—"মাসিক মোহাম্মদী" নাম উল্লেখ করিবেন।

# —ঠিক মাল—

## সুবিধা দর।

আমরা নানাবিধ হার্ডওয়ার গ্যালভানাইজ ( কলাই করা ) বল্টু, নট্, স্ক্রুপ, পেরেক, করগেট টিন ( ঢেউ টিন ) সমস্ত রকম ইমারতি লোহার মাল, বেড়ার জন্য কাঁটা তার প্রভৃতি লোহা ও পিতলের মাল বরাবর জার্ম্মানী ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশ হইতে আমদানি করিয়া বিক্রয় করিতেছি। পাইকারদিগের দর স্বতন্ত্র।

অর্ডার পাইবামাত্র মাল চালান দেওয়া হয়।

**পরীক্ষা প্রার্থনীয়।**

ঠিকানা—**বেঙ্গল এজেন্সী** ( ইণ্ডিয়া )

**৮৪এ, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।**

---

Nice Opportunity ! Nice Opportunity !! Nice Opportunity !!!

# WELLESLY PHARMACY.

PHARMACUTICAL CHEMISTS

DEALERS IN :—

**Patent medicines, Injectihn productf Infant and Invalid foods, nursery and sick-roon Requisites, Soilet & prepartions.**

You need not walk from place to place for the above mentioned necessary articles. We keep them ready for you. **Prescriptions** are carefully served with **Genuine medicines at moderate rates in** your farm. Urine, Blood, Stool, Sputum are examined with care by experts in our laboratory. Above all, The expirienced **Dr. S K. Sen** L.M. F. (cal.) specialist in deseases of women and children attends punctually form 8—to 11 A.M. and 6—9 P.M. and takes special care for the comforts and welfare of Patients. What more do you want ? From one and the same place place you get your prescriptions served carefully with genuine medicine ; you toilets. Invalid and Infant foods, Patents ready ; Blood, Stool, Urine. Sphtum and examined with care and above all nn expereinced Physician for helf and consultation.

# বিজ্ঞাপন সূচী—জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৫

# ভাগলপুরী তসরের কাপড়

আমরা বহু পরিশ্রম ও অর্থ ব্যয় করিয়া তসর ও রেশমী রংবেরংয়ের কাপড়ের কারখানা খুলিয়াছি। আমাদের কাপড় সুন্দর ও মজবুত বলিয়া সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ সিল্ক, এণ্ডি ও চিলা সিল্ক ইত্যাদি সর্ব্বোৎকৃষ্ট কাপড় এবং শাড়ী, লুঙ্গি, চাদর, পাগড়ী, রেশমী কাশী সিল্ক ও সূতীর লুঙ্গি সর্ব্বদা বিক্রয়ার্থে প্রস্তুত থাকে। অর্ডার পাইলে সত্বর তৈয়ারী করিয়া দিয়া থাকি। দুই পয়সার ডাক টিকিট পাঠাইলে নমুনা পাঠান হয়।

## প্রাপ্তিস্থান :—

**মোহাম্মদ তাহের ও আকবর আলী** ক্লথ মার্চ্চেণ্ট

কারখানা

৭০নং সিন্দুরিয়াপটি কলিকাতা। চম্পানগর ভাগলপুর।

---

ELECTRO

# THERMÆ

*7a, British Indian St,*
or
*50, Bentinck St,*
Phone No 3497 CALCUTTA.

FOR

## BATHS

## MASSAGES

&

**ELECTRIC TREATMENT.**

UNDER THE SUPERVISION OF EXPERTS.

**Trial Solicited.**

*CHARGE MODERATE.*

UP-TO-DATE ARRANGEMENT.

---

DIGESTIN

DIGESTIN AN UNRIVALLED REMEDY FOR INDIGESTIVE ACIDITY, COLIC PAIN ETC.

ডাইজেষ্টিন
গলাজ্বালা
পেটব্যাথা
বুকজ্বালা
অম্বল ও
বদহজমীর
অব্যর্থ
ঔষধ

মূল্য ॥০ আনা মাত্র

ڈائجسٹن

**AVAILABLE EVERYWHERE**

*Sole Agents,*

**AFTABUDDIN & Co.,**

*21 Colootolla Street.*

একমাত্র এজেন্ট—আফতাবুদ্দিন এণ্ড কোং

২১নং কলুটোলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

**নূতন পুস্তক !** **নূতন পুস্তক !!**

## বাঙ্গালী মোসলেম মহিলার অপূর্ব্ব অবদান

# মোস্‌লেম বিক্রম

"বঙ্গীয় মোস্‌লেম মহিলা সঙ্ঘের প্রেসিডেন্ট "স্বপ্নদ্রষ্টা", "আত্মদান" "জানকী বাঈ বা ভারতে মোস্‌লেম বীরত্ব" প্রভৃতি গ্রন্থ প্রনেত্রী—নুরন্নেছা খাতুন (বিদ্যাবিনোদিনী, সাহিত্য-সরস্বতী) ছাহেবার লেখনী নিঃসৃত এই অমূল্য গ্রন্থখানি আমাদের এই জাতীয় মহাদুর্দ্দিনে, তথা হিন্দু সঙ্ঘবদ্ধের সময় মুসলমান সাধারণের পাঠ করা সর্ব্বতোভাবে প্রয়োজনীয়।

আমরা স্পর্দ্ধার সহিত বলিতে পারি যে—জাতীয় বীরত্বের, তৎসঙ্গে আমাদের এই বঙ্গভূমির উপর সুদীর্ঘ পাঁচ শত চুয়ান্ন বৎসর কালব্যাপী মোস্‌লেম রাজত্বের এরূপ সঠিক বিবরণ অদ্যাবধি বাঙ্গালা ভাষায় বাহির হয় নাই।

খোলাফায়ে রাশেদীন হজরৎ আবুবাকর সিদ্দিকের সিংহাসনারোহণ ৬৩২ খৃঃ একাদশ হিজরী হইতে আরম্ভ করিয়া, আব্বাসী বংশাবতংশ হারুণ-অর-রশীদ ও পরবর্ত্তী খলিফাগণের রাজত্বকাল, এই ইতিবৃত্তে সংক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে।

সপ্তদশ বর্ষীয় মহারথী বীরকেশরী এমদাদ উদ্দীন মোহাম্মদ-বেন্-কাসেমের অলৌকিক বীরত্ব ও তৎসহ অসাধারণ আত্মত্যাগ, এই সঙ্গে বীরশ্রেষ্ঠ মুসার ও যুবক মহাবীর তারেকের সমস্ত উত্তর আফ্রিকা ও স্পেন বিজয় পড়িতে পাঠকের ধমনীতে মোস্‌লেম রক্ত উদ্বেলিত হইতে থাকিবে ও "বীর-ভোগ্যা বসুন্ধরা" উক্তির সার্থকতা অক্ষরে অক্ষরে উপলব্ধি করিবেন।

আরব বীরগণের পদাঙ্কানুসরণে গজনীর সোলতান সবক্তগীন ও তৎপুত্র খৃষ্টিয় দশম একাদশ শতাব্দীর বীর-শার্দ্দুল ভারত-আতঙ্ক সোল্‌তান মাহ্‌মুদ উপর্য্যুপরি ভারতবর্ষ আক্রমণে যে বীরত্বের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন; আর বীরকুলতিলক মুঈজ-উদ্দীন মোহাম্মদ ঘোরী, ভারত জয় করিয়া পৌরাণিক রাজধানী ইন্দ্রপ্রস্থকে কি প্রকারে ভারতের মোছলেম রাজধানীতে পরিণত করিয়াছিলেন, সঙ্গে সঙ্গে সোলতানের উপযুক্ত সহকারী কোতবউদ্দীন ভারতের হিন্দু রাজ-শক্তি চূর্ণ করিয়া, যে বলে এই সসাগরা হিন্দুস্থানের একচ্ছত্র রাজধানীর রাজা বলিয়া ঘোষিত হইয়া গিয়াছেন, তাহার সমস্ত বিবরণ এই লব্ধপ্রতিষ্ঠা লেখিকা তাঁহার এই জাতীয় ইতিহাসে সন্নিবেশিত করিয়াছেন।

বিধর্ম্মিগণ কর্ত্তৃক অযথা অকর্ম্মণ্য লম্পট আখ্যায় আখ্যায়িত, আজন্ম সুখের কোলে প্রতিপালিত মোস্‌লেম সম্রাট-নন্দনগণ রণোন্মাদে উন্মত্ত হইয়া আহার নিদ্রা বিসর্জ্জনে যুদ্ধক্ষেত্রের মহাকষ্ট ও কঠোরতা আনন্দের সহিত হাস্যমুখে বরণ করিয়া লইয়া রণস্থলে কিরূপ অসীম সাহসিকতা প্রদর্শন করিতে করিতে আত্মোৎসর্গ করিয়াছেন, তাহার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত সকল "মোসলেম বিক্রমে" পাইবেন।

হিন্দুগণের আজকালকার বীরপূজার বীর অবতার ছত্রপতি শিবাজীর" ঘৃণ্য বিশ্বাসঘাতকতা ও ছলচাতুর্য্য ইহাতে বিশেষ ও সঠিক রূপে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। তারপর বাঙ্গালার মোছলেম শাসনকর্ত্তাগণের অতুলনীয় স্বদেশপ্রীতি, বাস্তবিকই পাঠক-পাঠিকার একটা উপভোগের জিনিষ হইবে। সাধারণে প্রচারার্থে পুস্তকের মূল্য মাত্র ২্ দুই টাকা করা হইল। ডাক খরচ স্বতন্ত্র।

**মোহাম্মদী বুক এজেন্সি ঃ—২৯নং আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা।**

# কৃত্রিম দন্ত, চশমা এবং ঘড়ি

## দন্ত বিভাগে

সকল প্রকার পাথরের দাঁত, সোণার ক্রাউন, বিনাপ্লেটে দাঁত এবং যাবতীয় দন্ত চিকিৎসা আধুনিক আমেরিকান বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে সুদক্ষ ডাঃ শ্রীযুক্ত তারাচরণ ঘটকের তত্ত্বাবধানে করা হইয়া থাকে এবং বিনা যন্ত্রণায় দাঁত তোলা, দাঁতের পাথুরী পরিষ্কার করা হয়।
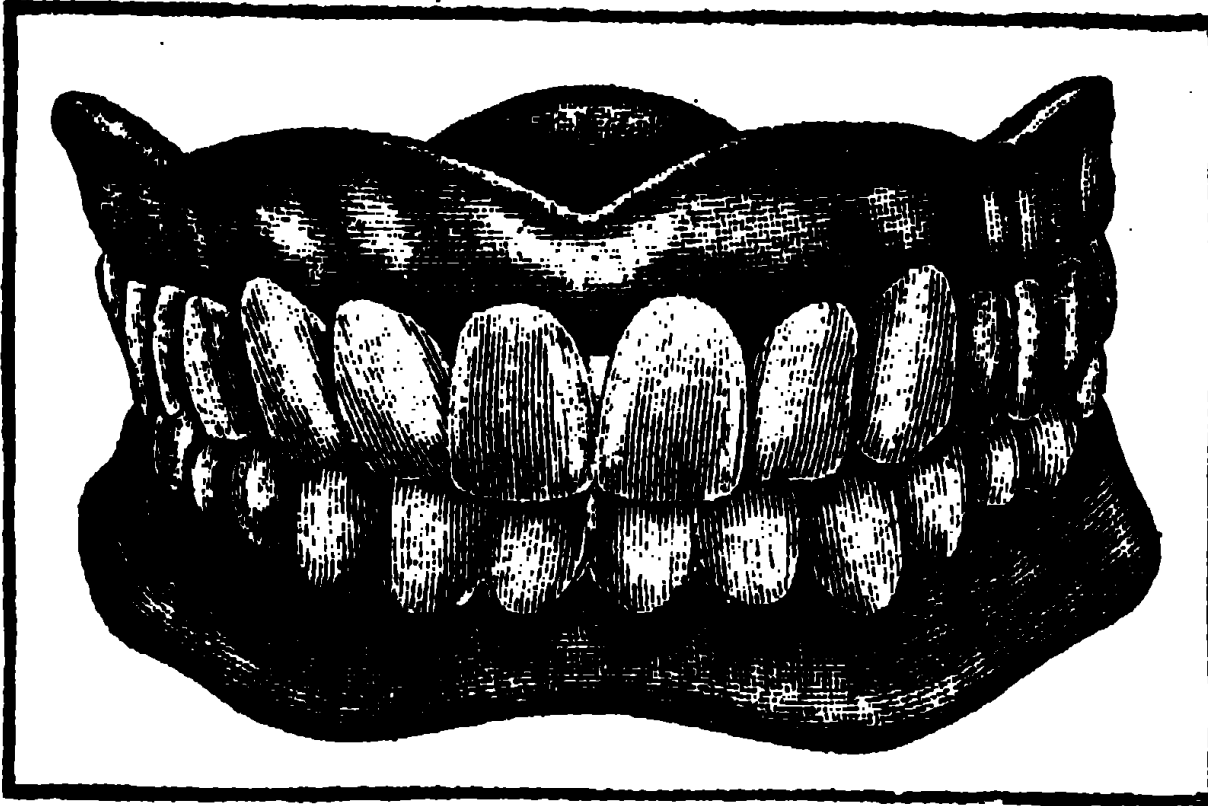
## চশমা বিভাগে

সকল প্রকার নিকেল, রোল্ডগোল্ড যাবতীয় সেলুলাইড ফ্রেম এবং সকল নম্বরের ব্রেজিল পাথর, কৃষ্টল এবং সকল প্রকার চশমার কেস বহু পরিমাণে সর্ব্বদা বিক্রয়ার্থ মজুত থাকে। চক্ষু পরীক্ষা করিয়া চশমা দেওয়া হয়।

## ঘড়ি বিভাগে
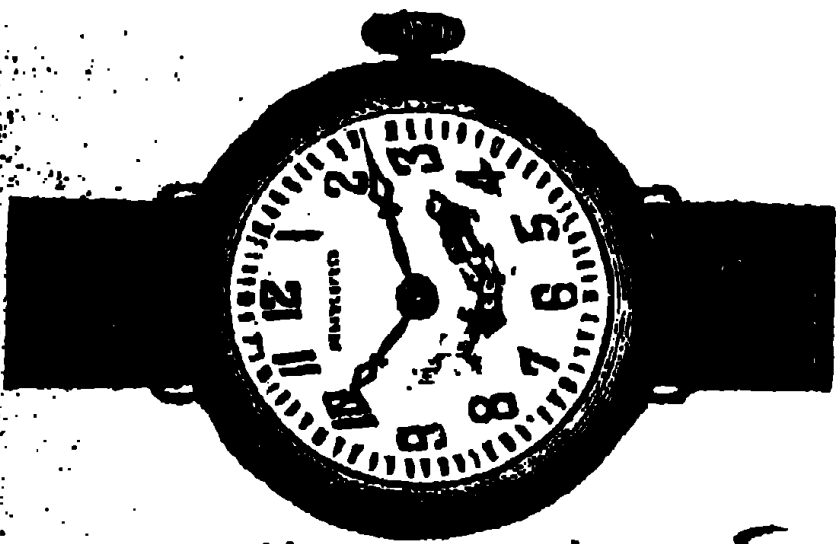
সকল প্রকার রিষ্ট ওয়াচ, পকেট ওয়াচ, ক্লক, এলারম, টাইমপিস, চেইন, ব্যাণ্ড পাওয়া যায় অধিকন্তু অভিজ্ঞ কারিকর দ্বারা গ্যারাণ্টি দিয়া যাবতীয় ঘড়ি মেরামত করা হয়।

**গ্রাহকগণের সুবিধার জন্য সকল দ্রব্য অতি সুলভেই দিয়া থাকি।**

**আবদুল হাই এণ্ড সন্স ৯০নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।**

---

কাল রং ক্যাপস্থলে সাদা মস্‌জিদ মার্কা

গোলাপ নির্য্যাসই আসল।

# সেখ ফসিউল্লার

## গোলাপ নির্য্যাসে ভীষণ প্রতারণা।

গোলাপ নির্য্যাসের জাল নিবারণের জন্য আমরা বহু অর্থ ব্যয়ে আমাদের আসল গোলাপ নির্য্যাসের মুখের কর্কের উপর বিলাতি কাল ক্যাপস্থলের উপর সাদা রংয়ের মস্‌জিদ মার্কা করিয়া দিলাম। যে নির্য্যাসের কর্কের উপর সাদা মস্‌জিদ না থাকিবে তাহা নকল বলিয়া জানিবেন। সহর ও মফঃস্বলের দোকানদারগণও দুষ্ট লোকের প্রলোভনে ভুলিয়া আসল বলিয়া নকল নির্য্যাস বিক্রয় করিতেছেন। অতএব গ্রাহকগণ সাবধান—গোলাপ নির্য্যাস খরিদ করিবার পূর্ব্বে শিশির কর্কের উপর সাদা মস্‌জিদ দেখিয়া খরিদ করিবেন।

এখানে যাবতীয় খাঁটি ও উৎকৃষ্ট আতর, ফুলেল তৈল, লক্ষ্মীবিলাস তৈল, দেলবাহার, মনোহর আতর, সুবাসিত তিল তৈল ইত্যাদি সুলভ মূল্যে পাইবেন। ভিঃ পিতে মাল পাঠাই।

**আমাদের গোলাপ নির্য্যাস চক্ষু ও মস্তিষ্কের বিশেষ উপকারী।**

সেখ ফসিউল্লার জ্যেষ্ঠ পুত্র

**সেখ আসিক আলি।**

১১৯।৪ পুরাতন চিনাবাজার, কলিকাতা।

# BENARES OPTICAL CO
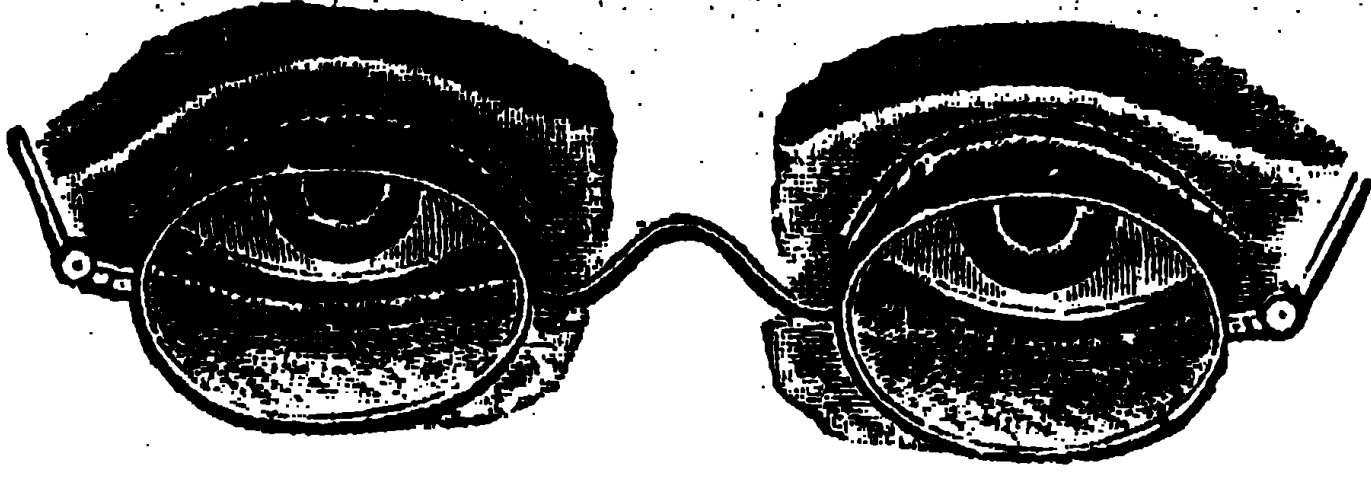
**Commission Agent
and
Order Suppliers.**
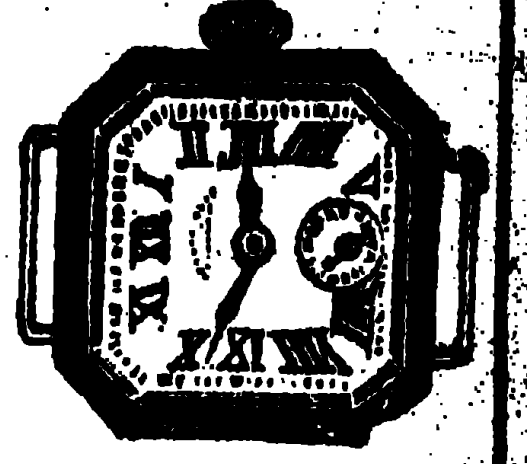
*85, ELLIOT ROAD, CALCUTTA.*

DON'T SPOIL YOUR EYES

For we give you exactly to your requirements all kinds of spectacles, Brazles, Pebbles and all accessories are always in stock.

**Oculists Prescription accurately made up**

**CHARGES ARE MODERATE.**

*N. B.* Spectacles and watches neatly repaired........

## বেনারস অপটিক্যাল কোং

কমিশন এজেন্ট এণ্ড অর্ডার সাপ্লায়ার্স

৮৫নং ইলিয়ট রোড, কলিকাতা।

---

## এন, এল, পাল এণ্ড সন্স

N. L. PAUL & SONS

# ইউনিক হোমিও হল।
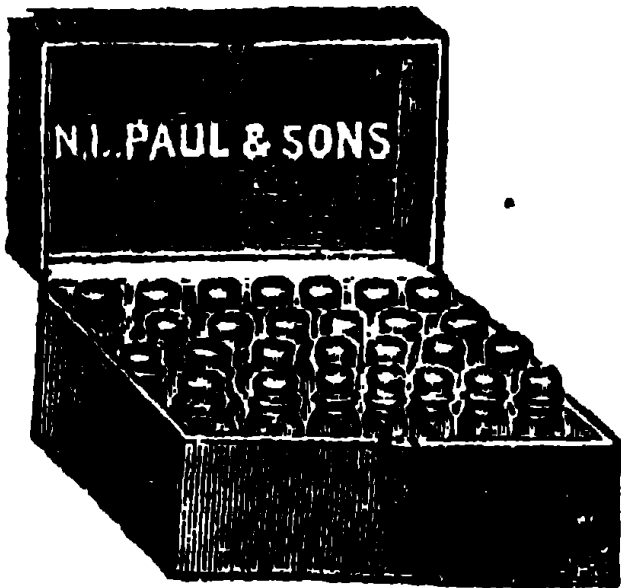
৮৩৷১ ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

## বিশুদ্ধ হোমিওপ্যাথিক ঔষধ।

সমস্তই টাট্কা—ড্রাম ⁄৫ পয়সা

আমরা সর্ব্বসাধারণের সুবিধার্থে নিম্নোক্ত ঠিকানায় আমেরিকার সুপ্রসিদ্ধ বোরিক এণ্ড ট্যাফেলের নিকট হইতে বিশুদ্ধ হোমিওপ্যাথিক ঔষধ, শিশি, কর্ক, গ্লোবিউলস্, সুগার অফ মিল্ক, মেজার গ্লাস এবং হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা সম্বন্ধীয় সরঞ্জাম, পুস্তক, বাইওকেমিক ঔষধ ও ঔষধের বাক্স প্রভৃতি প্রচুর পরিমাণে আমদানি করিয়া বিক্রয়ার্থে মজুত রাখি। আমরা বিশেষ সাবধানতা অবলম্বনপূর্ব্বক খুব তৎপরতার সহিত ঔষধ সরবরাহ করিয়া থাকি। একবার দয়া করিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন।

### ঔষধপূর্ণ সেগুন কাষ্ঠের বাক্স।

গৃহস্থ ও চিকিৎসকগণের সুবিধা:—এক বাক্স হোমিওপ্যাথিক ঔষধ কাছে থাকিলে নানাবিধ রোগের চিকিৎসা ও ও ব্যবসা করিতে পারিবেন। বিশেষতঃ ওলাউঠা বা কলেরা রোগ হইতে বহুসংখ্যক লোকের জীবন রক্ষা করিতে পারা যাইবে। সামান্য বাংলা ভাষা জানিলেই বাক্সের সহিত যে পুস্তক থাকে তাহা দেখিয়া স্ত্রীপুরুষ মাত্রেই ঔষধ ব্যবহার করিতে পারিবেন।

### কলেরা ও গৃহচিকিৎসার সম্পূর্ণ বাক্স।

কলেরা ও সকল প্রকার রোগ চিকিৎসা করিবার উপযুক্ত একখানি পুস্তক, একটী ফোঁটা ফেলিবার যন্ত্র এবং কলেরা বাক্সে এক শিশি রুবিনির ক্যাম্ফর সহ ১২, ২৪, ৩০, ৪৮, ৬০, ৮৪ ও ১০৪ শিশি বাক্সের মূল্য যথাক্রমে ২৲, ৩৲, ৩।০ ৫।০, ৬।৵০, ৯৲ ও ১০৸৵০ আনা ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

অর্ডার দিবার সময় অনুগ্রহ পূর্ব্বক—"মাসিক মোহাম্মদীর" নাম উল্লেখ করিবেন।

“মোহাম্মদী”

মরুর বুকে প্রেমের ধারা—

“আমি দু'হাত পেতে আছি, তুমি দাও যদি বাঁচি।”

মাসিক মোহাম্মদী

প্রথম বর্ষ || আষাঢ় ১৩৩৫ সাল || ৯ম সংখ্যা

# সমস্যা ও সমাধান

[ মোহাম্মদ আকরম খাঁ ]

( ১ )

ঐতিহাসিক ঘটনা পরম্পরার অভ্যন্তরে এক একটা জাতির উত্থান পতনের ও জীবন-মরণের নিগূঢ় তত্ত্বগুলি নিহিত থাকে। সেই তত্ত্বগুলির আবিষ্কার এবং নিজেদের জীবন সংগ্রামে তাহা হইতে উপদেশ গ্রহণ করাই ইতিহাস আলোচনার প্রধান সার্থকতা। এই হিসাবে মুছলমান জাতির উত্থান পতনের ইতিহাস ধীরভাবে আলোচনা করিয়া দেখিলে, অতীত ও বর্ত্তমানের এই শোচনীয় তারতম্যের কার্য্যকারণ পারম্পর্য্যটা খুব স্পষ্টরূপে প্রকট হইয়া উঠে, এবং তাহারই মধ্য দিয়া জাতির জীবন-বেদের সন্ধান লাভ করা আমাদের পক্ষে সহজ হইয়া দাঁড়ায়। তখন আমরা একদিকে যেমন বুঝিতে পারি যে, মোছলেম জাতীয় জীবনের সমস্ত সফলতার মূল প্রতীক ছিল—এছলাম। মুছলমান এই সফলতার অধিকারী হইয়াছিল, এছলামকে গ্রহণ করিয়া, এছলামের শিক্ষাকে সম্পূর্ণভাবে অর্জ্জন করিয়া—বর্জ্জন করিয়া নহে। অন্য দিকে এ সত্যটাও সঙ্গে সঙ্গে আমাদের চোখের ছামনে খুব উজ্জ্বল ভাবে উদ্ভাসিত হইয়া উঠে যে, জ্ঞানের, ভাবের ও বিশ্বাসের দিক দিয়া নিজেদের খোশ খেয়ালের যে পরিকল্পনাকে আজ আমরা এছলাম বলিয়া ধরিয়া লইতেছি, সত্যকার এছলামের সহিত তাহার মিল অপেক্ষা অমিলের পরিমাণটাই অধিক। এই সত্যের উপলব্ধি, তাহাকে গ্রহণ করার শক্তি, তাহাকে সামাজে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করার সঙ্কল্প আর সেই সঙ্কল্পকে বাস্তবরূপ দান করার সৎসাহস আজ মুছলমান সমাজ এক প্রকার হারাইয়া বসিয়াছে—বসিয়াছে বলিয়াই আজ দুনয়ার সমস্ত অনর্থ সমস্ত সমস্যা ভীষণ বিভীষিকারূপে গোটা জাতিটাকে ত্রস্ত অবসন্ন ও কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় করিয়া ফেলিয়াছে।

মুছলমানের জাতীয় ইতিহাসের প্রথম ভাগে আমরা এছলামের একটা খুব সরল, খুব সহজ ও খুব সুন্দর স্বরূপ দেখিতে পাই। নিরক্ষর বেদুইন নরনারী হইতে আরম্ভ করিয়া শ্রেষ্ঠমত পণ্ডিতগণ পর্য্যন্ত, সকলেই আপনাপন অধিকার অনুসারে সে স্বরূপকে গ্রহণ করিতে সমর্থ হইতেন। তখন আল্লার কালাম আর রছুলের হাদিছগুলি প্রত্যেক মোছলেম নরনারীর সাধারণ সম্পত্তি ছিল—তাঁহারা প্রত্যেকেই সে সম্বন্ধে স্বাধীন ভাবে আলোচনা করার অধিকারী ছিলেন। "আমিরুল-মোমেনিন! আপনি ভুল ব্যবস্থা দিতেছেন। আপনার এই ব্যবস্থা কোরআনের

অমুক আয়তের বিপরীত, সুতরাং অগ্রাহ্য"—এক একটী বৃদ্ধা নারী দাঁড়াইয়া খোৎবার মজলিসে হজরত ওমরের ন্যায় প্রবল প্রতাপশালী খলিফার সম্মুখে এই প্রকার মন্তব্য প্রকাশ করিতে তখন এক বিন্দু ভীত বা কুণ্ঠিত হইতেন না। ইহা অপেক্ষাও বড় কথা এই যে, সেই স্বর্ণ যুগের প্রধান প্রধান ছাহাবী, তাবেয়ী ও এমামগণ এই শ্রেণীর প্রতিবাদ শুনিয়া খুব আনন্দিত হইতেন, অন্য পক্ষের সহিত সরল ভাবে বিচারে প্রবৃত্ত হইতেন এবং নিজের ভ্রম সপ্রমাণ হইলে তৎক্ষণাৎ প্রকাশ্য ভাবে তাহা স্বীকার করিতেন—ভ্রম সংশোধনের জন্য প্রতিবাদকারীর সাধুবাদ করিতেন। ইহাতে প্রতিবাদকারী যে তাঁহার সম্মান হানি করিলেন—এ ধারণা তখন কোন মুছলমানের মনে স্থান লাভ করিতে পারিত না। যেহেতু অমুক বড় খলিফা, অমুক বড় ছাহাবী, অমুক বড় এমাম বা অমুক বড় মোহাদ্দেছ এইরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন, অতএব তাহা অভ্রান্ত ও ধ্রুব সত্য—এরূপ ধারণা পোষণ করাকে মুছলমান তখন অন্যায় ও অনৈছলামিক মহাপাতক বলিয়াই মনে করিতেন। প্রত্যেক খলিফার, প্রত্যেক বড় ছাহাবীর এবং প্রত্যেক এমামের জীবন-চরিত আলোচনা করিয়া দেখিলে আমরা এই মহান আদর্শের শত শত প্রমাণ দেখিতে পাইব।

প্রাতঃস্মরণীয় এমাম আবু হানিফা ছাহেবের নামঅবগত নহেন, মুছলমান সমাজে এরূপ লোক বোধ হয় খুবই বিরল। প্রচলিত চারি মজহাবের মধ্যে এমাম ছাহেবের নামকরণে যে হানাফী মজহাবের উৎপত্তি হইয়াছে, জগতের অধিকাংশ মুছলমানই তাহার অনুবর্ত্তী। এই এমাম ছাহেবের জীবন জ্ঞানে-কর্ম্মে এবং ত্যাগে-তপস্যায় কত মহান ও কত মধুর এবং মিথ্যা ভক্ত ও নীচমনা শত্রুদিগের দৃষ্টির বাহিরে তাঁহার প্রকৃত মহিমা কোথায় কিরূপে অসাধারণভাবে উজ্জ্বল হইয়া আছে, সে আলোচনা বর্ত্তমান প্রবন্ধে সম্ভবপর হইবে না। আজ তাঁহার ও তাঁহার শিষ্যবর্গের সম্বন্ধে একটা প্রাসঙ্গিক নজিরের উল্লেখ করিয়াই ক্ষান্ত হইব।

এমাম আবু হানিফা ছাহেবের প্রধান শিষ্য ছিলেন এমাম মোহাম্মদ, কাজী আবু উইছফ প্রভৃতি। এই শিষ্যগণ বহু স্থানে প্রকাশ্য ভাবে নিজেদের মহামান্য এমামের মতামতের প্রতিবাদ করিয়াছেন। পাঠকগণ ইঁহাদের রচিত ও সঙ্কলিত যে কোন বহি-পুস্তক এবং হানাফী ফেকার যে কোন প্রধান কেতাব খুলিলেই আমাদের কথার সত্যতার শত শত প্রমাণ দেখিতে পাইবেন। উদাহরণ স্বরূপে এমাম মোহাম্মদ কৃত "মোয়াত্তা"র এবং হেদায়া প্রভৃতি ফেকার কেতাবের নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। মোয়াত্তার প্রায় প্রত্যেক পৃষ্ঠাতে দেখা যাইবে—এমাম ছাহেব এক একটা হাদিছের উল্লেখ করিয়া বলিতেছেন—"আবু হানিফা এই হাদিছ অনুসারে ফৎওয়া দিয়াছেন, আমাদের মতও ইহাই" অথবা "আবু হানিফা এইরূপ বলিয়াছেন, কিন্তু আমরা এক্ষেত্রে তাঁহার মত গ্রহণ করি না, কারণ তাহা অমুক হাদিছের বিপরীত।" হেদায়ায় দেখা যাইবে—"এমাম ছাহেব এইরূপ বলিয়াছেন, তাঁহার শিষ্যদ্বয় তাহার বিপরীত মত প্রকাশ করিয়াছেন, এখানে শিষ্যদ্বয়ের মতানুসারে ফৎওয়া।"

ফলে স্বাধীনভাবে কোরআন হাদিছের আলোচনা করা, এবং এছলাম সম্বন্ধে ব্যষ্টি বা সমষ্টি বিশেষের সিদ্ধান্তের অন্ধ অনুকরণ করাকে অন্যায় ও অধর্ম্ম বলিয়া মনে করাই ছিল তখনকার মুছলমানের একটা উজ্জ্বল বিশেষত্ব। এই স্বাধীন চিন্তার যথেষ্ট প্রভাব বিদ্যমান ছিল বলিয়াই তখনকার যুগে এত মহামহিম এমাম ও মোহাদ্দেছ আমাদের মধ্যে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, এবং তাহার অভাব ঘটার একমাত্র কারণেই বহু শতাব্দীর মধ্যেও সে দর্জ্জার একটী মানুষও আমাদের মধ্যে ফুটিয়া উঠিতে পারিতেছে না।

( ২ )

এছলামী ধর্ম্মশাস্ত্রের পরিভাষায় এজমা, কিয়াছ ও এজতেহাদ নামে তিনটী শব্দ বহুল ভাবে প্রচলিত আছে। এই বিষয় তিনটীর ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ লইয়া অছুল শাস্ত্রে অনেক সূক্ষ্ম ও জটিল আলোচনা এবং বাদ-বিতণ্ডার অবতারণা করা হইয়াছে। কোরআন হাদিছের যে সকল দলিল প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া এই তিনটী বিষয়ের সমীচীনতা ও প্রামাণ্যতা প্রতিপাদন করা হইয়াছে, তাহা মূলতঃ খুবই সহজ ও সরল। কিন্তু বিভিন্ন মতবাদের অনুবর্ত্তী আলেমগণের ওকালতির অন্যায় আকর্ষণ বিকর্ষণের ফলে মোটের উপর সমস্ত বিষয়টা যেন একটা গোলক ধাঁধাঁয় পরিণত হইয়াছে। তাহার পর গ্রীক ন্যায়দর্শনের তৎকালীন ধারা কারা ও পরিভাষাগুলিকে অনেক সময় এই আলোচনার

বাহনরূপে গ্রহণ করায় ঐ দলিল প্রমাণের মর্ম্ম মুছলমানের পক্ষে দুর্ব্বোধ্য হইয়া পড়িয়াছে। অতএব বর্ত্তমানে সে আলোচনায় লিপ্ত হওয়া আমাদের পক্ষে সম্ভবপর হইতেছে না। উপস্থিতের জন্য ঐ শব্দ তিনটীর একটা মোটামুটি ধরণের পরিচয় দিলেই বর্ত্তমান প্রবন্ধের জন্য যথেষ্ট হইবে বলিয়া মনে করি।

কোরআন-হাদিছে অভিজ্ঞ, আরবী সাহিত্য ব্যাকরণ ও অলঙ্কার শাস্ত্রে বিজ্ঞ, জ্ঞানী চরিত্রবান ও সত্যনিষ্ঠ মুছলমান—কোরআন ও হাদিছের যথাযৎ অনুশীলন করিয়া তাহা হইতে যে মছলা বা তত্ত্ব আবিষ্কারের চেষ্টা করেন, তাহাকে এজতেহাদ বলা হয়, যিনি এজতেহাদ করেন, তাঁহাকে বলা হয়—মোজ্‌তাহেদ। এই প্রকার মোজতাহেদগণ কোরআন হাদিছের নিয়ম ও নীতি অনুসারে শরিয়তের কোন ব্যাপার সম্বন্ধে সংবেত ভাবে যে সিদ্ধান্ত করেন, তাহাকে এজমা বলা হয়। কোরআন হাদিছ ও এজমার কোন সিদ্ধান্তের ব্যতিক্রম না হয়—এমন ভাবে কোরআন হাদিছ ও এজমার দলিলগুলির সাদৃশ্য মূলক বিশ্লেষণ Analogical reasoning দ্বারা উক্ত দলিলগুলির আদেশকে কোনও একটা অভিনব বিষয়ে প্রযুক্ত করাকে কিয়াছ বলা হয়। কোরআন, হাদিছ, এজমা ও কিয়াছ হইতেছে যথাক্রমে এছলামের চারিটী 'আসল' বা মূল ভিত্তি। আমাদের সকল সম্প্রদায়ের আলেমগণ মোটের উপর এই সকল কথা সমবেত ভাবে স্বীকার করিয়া থাকেন এবং এজমা ও কিয়াছের সিদ্ধতা ও সমীচীনতার বহু শাস্ত্রীয় প্রমাণও তাঁহারা উদ্ধৃত করিয়া থাকেন।

কিন্তু জাতীয় অধঃপতনের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের শ্রদ্ধাস্পদ আলেমবৃন্দ হঠাৎ একদিন বলিয়া বসিলেন যে, এজতেহাদ জিনিষটা খুবই সত্য এবং শাস্ত্রসঙ্গত। কিন্তু এমাম আহমদ-বেন-হাম্বলের পর এজতেহাদ করার শক্তি ও অধিকার শেষ হইয়া গিয়াছে। পূর্ব্ববর্ত্তী মোজ্‌তাহেদ বিশেষের অন্ধ অনুকরণকে স্বীকার করিয়া ২য় ও ৩য় দরজার অধীন স্বত্বের যে এজতেহাদ এমাম আহমদের পরেও কিছু দিন প্রচলিত ছিল, তাহাও এখন রহিত অসিদ্ধ ও বাতিল হইয়া গিয়াছে। এজমা লইয়া কথাকাটাকাটি অনেক করা হইয়াছে ও হইতেছে—কিন্তু সে সব দূর অতীতের এজমার কথা! তাঁহাদের মতে এজমা বহুদিন হইতে অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বর্ত্তমানে কার্য্যতঃ তাহা অচল হইয়া গিয়াছে। তাহার পর কিয়াছকে লইয়া তাঁহারা টানাটানি করেন নিজ গণ্ডীর কতকগুলি মতামতকে, "তর্ক যুদ্ধে" জয়যুক্ত করার আবশ্যক হইলে। কিন্তু ঠিক সেই প্রকারের অবস্থায় নিজেদের এই গণ্ডীগত গরজ যেখানে নাই—তাঁহারাই আবার সেই কিয়াছকে অস্বীকার করিতে এক বিন্দুও কুণ্ঠিত হন না। যব-গমের উপর কিয়াছ করিয়া ধান চাউলের দ্বারা ফেৎরা আদায় করার ব্যবস্থা তাঁহারা দিয়া থাকেন। কিন্তু এদেশে প্রচলিতসূতী বা উলী মোজার উপর মছহ مسح করার কথা উঠিলে তাঁহারাই আবার বলিতে থাকেন যে, হজরতের সময় আরব দেশে যে যে প্রকারের মোজা প্রচলিত ছিল এবং যাহার যাহার উপর 'মছহ' করার দলিল পাওয়া যায়, ঠিক সেই সেই প্রকারের মোজা ব্যতীত অন্য কোনও মোজার উপর মছহ করা জাএজ হইবে না। এই প্রকার অসংলগ্নতার শত শত উদাহরণ উদ্ধৃত করা যাইতে পারে।

মুছলমানের জ্ঞানগত পতনের সূত্রপাত হইয়াছে এই পথ ধরিয়া। এই সর্ব্বনাশটা পাকাপাকিভাবে জমিয়া ওঠার সঙ্গে সঙ্গে মুছলমানের মন ও মস্তিষ্কের উপর স্থবিরতার একটা হিমালয় পাহাড় স্থায়ী আসন জমাইয়া বসে। তখন এই হিমালয়ের চাপে মুছলমানের জাতীয় মস্তিষ্ক এমন নিষ্পেষিত ও হিমাড়ষ্ট হইয়া পড়ে যে, তখন ধর্ম্মশাস্ত্র ত অনেক দূরের কথা, —তৎকালীন প্রচলিত ন্যায় দর্শন ও বিজ্ঞানকেও তাঁহারা চরম এবং চিন্তা ও বিচারের অতীত বলিয়া বিশ্বাস করিয়া লইলেন। ইতিহাস প্রভৃতি জ্ঞান-সেবার প্রত্যেক বিভাগেই মুছলমানের এই দুর্দ্দশা উপস্থিত হইল। আমাদের 'হজরত সাহেবেরা' বড় বড় আছা ও কাফেরী ফৎওয়া লইয়া সমাজের মাথার উপর প্রকট হইয়া জোর গলায় ঘোষণা করিতে লাগিলেন—এই স্থবিরতার নামই প্রকৃত এছলাম। অবশ্য এই হিমালয়কে ঠেলিয়া ফেলার জন্য সময় সময় চেষ্টা চরিত্রও যে কিছু কিছু হইয়াছিল, তাহা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু দুঃখের সঙ্গে বলিতে হইতেছে যে, এই চিন্তার নায়কেরা মশাল ধরিয়া ছিলেন নিজেরা চোখ বন্ধ করিয়া। ফলে নিজেদের এই অজ্ঞতার অবস্থার সহিত অন্ধকে পথ দেখাইবার অস্বাভাবিক ব্যবস্থাটা খাপ খাইয়া উঠিতে পারিল না। বর্ত্তমান যুগে এই স্থবিরতার ফলে অবস্থা যে কিরূপ শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহা আর কাহাকেও বলিয়া

দিতে হইবে না। একদিকে আমাদের আলেম সমাজ সত্যকার এছলামকে নিজেদের সংস্কার ও খেয়ানের আবরণে চাপা দিয়া আত্মপ্রাসাদ লাভ করিতেছেন। সত্যকার এছলাম অপেক্ষা এই খেয়ালগুলির মর্য্যাদা যে তাঁহাদের নিকট অধিক, তাহা প্রত্যেক ক্ষুদ্র বৃহৎ পরীক্ষা দ্বারাই প্রমাণিত হইয়া যাইতেছে। অন্যদিকে মূলতঃ অসদুদ্দেশ্যে প্রবর্ত্তিত ইংরাজী শিক্ষার ফলে এবং যুগের সর্ব্বব্যাপী সাধারণ আবহাওয়ার প্রভাবে ধর্ম্মের প্রতি একটা অনাস্থার ভাব দেশময় সংক্রমিত। এই ভাবের প্রভাবে অভিভূত হইয়া মোছলেম-বঙ্গের ইংরাজী শিক্ষিত যুবকগণ একটু বেসামাল হইয়া পড়িয়াছিল। ভাষা সমস্যার ও মাদ্রাছা শিক্ষা প্রণালীর কল্যাণে এদেশে সে সময় হিন্দুস্থানের মত এমন মনীষীর উদ্ভব হইল না, যাঁহারা হিন্দুস্থানের আলেম ও ইংরাজী শিক্ষিত পণ্ডিতগণের মত এই অনাস্থার মূলোৎপাটন করিতে সমর্থ হইতেন। বরং তাঁহারা পূর্ব্ব কথিত আছা ও কাফেরী ফৎওয়ার উপর নির্ভর করিয়া যে জিনিষটাকে এছলামরূপে তাহাদিগের সম্মুখে উপস্থাপিত করিলেন, তাহা দেখিয়া নব্য সমাজের মনের অজ্ঞাত অন্তস্তলে একটা অস্ফুট আর্ত্তনাদের সৃষ্টি হইল—ধর্ম্ম আর বিবেককে এক সঙ্গে অন্তরে স্থান দান করা তাহারা যেন কষ্টকর বলিয়া মনে করিতে লাগিল। পক্ষান্তরে যে সহজিয়া ও স্বেচ্ছাচারীর দল ধর্ম্ম ও নীতির ভয়ে এতদিন আড়ষ্ট হইয়া বসিয়া ছিল, চিরন্তন নিয়ম অনুসারে এই সুযোগে তাহারা কোমর বাঁধিয়া ময়দানে আসিল। আলেম সমাজের দ্বারা উপস্থাপিত এই তথাকথিত এছলামকে দেখাইয়া ইংরাজী শিক্ষিত যুবকগণকে তাহার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিতে উদ্বুদ্ধ করার জন্য তাহারা নিজেদের সমস্ত দুষ্ট প্রতিভা ব্যয় করিয়া ফেলিতে কুণ্ঠিত হইল না।

( ৩ )

কোরআন ও হাদিছের স্পষ্টদাবী এই যে, সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বশক্তিমান আল্লাহ এছলামকে সর্ব্বযুগের এবং সর্ব্বদেশের জন্য এক চিরস্থায়ী চিরসচল ও চিরশাশ্বত ধর্ম্মরূপে দুনয়ায় প্রেরণ করিয়াছেন। আমাদের আলেম সমাজ ইহা বিশেষরূপে জানেন, এবং একথা তাঁহারা বিশেষ তাকিদ সহকারে ঘোষণাও করিয়া থাকেন। অথচ সঙ্গে সঙ্গে তাঁহারা সেই মুখেই আবার প্রচার করিয়া থাকেন যে, এছলামের ধর্ম্মশাস্ত্র এজ্‌তেহাদের যে বিধান প্রচলিত করিয়াছিল এবং কোরআন হাদিছের অনুজ্ঞামতে যে এজ্‌মা ও কিয়াছ এছলামের তৃতীয় ও চতুর্থ ভিত্তিরূপে নির্দ্ধারিত হইয়াছিল—বোজর্গানে দিনের নির্দ্দেশমতে খোদা রছুলের সে সব বিধিব্যবস্থা এখন অচল বা বাতিল হইয়া গিয়াছে। তাঁহারা একবারও ভাবিয়া দেখেন না যে, হজরত রছুলে করিমের উপস্থিতি কালে'ত উম্মতীদের এজ্‌তেহাদ এবং এজ্‌মা ও কিয়াছের বিশেষ কোন দরকারই ছিল না। এছলাম তাহার ব্যবস্থা দিয়াছিল—হজরতের পরবর্ত্তী সময়ের অভিনব সমস্যাগুলির সমাধানের জন্য। এছলামে এজ্‌মা কিয়াছ, এবং তাজদিদ ও এজতেহাদের বিধান আছে বলিয়াইত তাহার শাশ্বত্বের দাবী—চিরস্থায়ী মানব ধর্ম্ম হইয়া থাকার অধিকার যুক্তিসঙ্গত হইতে পারিয়াছে। তাহার সেই দাবী ও সেই অধিকারকে অস্বীকার করা আর এছলামকে শেষধর্ম্ম ও হজরতকে শেষ নবী বলিয়া অস্বীকার করা যে একই কথা—ইহা ভাবিয়া দেখার অবসর তাঁহাদের নাই।

হজরতের সময় জুম্‌আর দিন মাত্র একটী আজান দেওয়া হইত—যেমন অন্যদিন ও অন্যান্য অক্তের নামাজের জন্য দেওয়া হইয়া থাকে। পর পর তিন খলিফার সময় পর্য্যন্ত এই নিয়ম বহাল ছিল। তাহার পর ৩য় খলিফা হজরত ওছমান সাময়িক অবস্থার বিচার বিবেচনা করিয়া খোৎবার কিছুকাল পূর্ব্বে আর একটী আজান দেওয়াইবার ব্যবস্থা করিলেন। কোরআন সঙ্কলন ও হাদিছ লিপিবদ্ধ করা প্রথমে নিষিদ্ধ বলিয়া অনেকের বিশ্বাস ছিল। তাহার পর অবস্থাগতিকে ছাহাবাগণ এছলামের মূলনীতিকে সম্মুখে রাখিয়া এ ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন করিয়া দিলেন। হজরতের সময় এক মজলিসে তিন তালাক দিলে তাহা এক তালাক বলিয়া গণ্য হইত। হজরতের পর প্রথম খলিফার সময় এই ব্যবস্থা বহাল রহিল। দ্বিতীয় খলিফা হজরত ওমরও কিছুকাল পর্য্যন্ত এই ব্যবস্থা বজায় রাখিলেন—কিন্তু অবশেষে লোকের অবস্থান্তর ঘটায় তিনি যখন দেখিলেন যে, তালাকের ন্যায় একটা গুরুতর ব্যাপারকে মানুষ হাসিঠাট্টা বানাইয়া লইয়াছে, তখন তিনি আদেশ প্রচার করিলেন—এখন হইতে এক মজলিসের তিন তালাক তিন তালাক বলিয়াই গণ্য হইবে। হজরতের

প্রায় সমস্ত ছাহাবা তখন বাঁচিয়াছিলেন, এবং সকলে ওমরের এই এজ্‌তেহাদকে বিনা প্রতিবাদে স্বীকার করিয়া লইলেন। ফলে পূর্ব্বে যাহা হালাল ছিল, এই ব্যবস্থায় তাহা হারামে পরিণত হইল! নামাজের এমামত করার জন্য পারিশ্রমিক বা বেতন লওয়া পূর্ব্বে হানাফী মজহাবেও হারাম বলিয়া গণ্য হইত। কালক্রমে অবস্থাগতিকে তাঁহারা কিছুদিন হইতে এ ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন করিয়া লইয়াছেন। হাদিছে আছে—ছয়টী জিনিষের আদান প্রদানে সুদ হয়। জাহেরী মতবাদীরা তাই বলিয়া থাকেন যে, ঐ ছয়টা বস্তু ব্যতীত আর কিছুতেই সুদ হইতে পারে না। কিন্তু এইরূপ কাটখোট্টা অর্থ করিলে ধানের "বাড়ী" লওয়াও হারাম হইতে পারে না। তাই আলেমেরা বলিলেন—হজরত ছয়টা বস্তুর নাম করিয়াছেন, সেই বস্তুগুলির সমপ্রকারের সমস্ত জিনিষই তাহার পর্য্যায়ভুক্ত হইবে। কারণ, অন্যথায় সুদসংক্রান্ত এছলামের মূল অছুলের ব্যত্যয় ঘটিয়া যায়। চাউলের দ্বারা ফেৎরা আদায় করার হাদিছ কোন মৌলভী ছাহেবই দেখাইতে পারিবেন না। অথচ আমরা চাউলের দ্বারা ফেৎরা আদায় দিয়া থাকি—'চাউলকে যব গমের উপর কিয়াছ করিয়া।' এই প্রকারের শত শত নজিরের উল্লেখ শরিয়তের ইতিহাসে বিদ্যমান আছে।

আমরা বর্ত্তমান যুগের আলেম সমাজকে জিজ্ঞাসা করি:—

(১) এজ্‌তেহাদ পূর্ব্বে সিদ্ধ ছিল এখন আর তাহা সিদ্ধ নহে—কোরআন হাদিছে ইহার অনুকূল কোন প্রমাণ তাঁহারা দেখিতে পাইয়াছেন কি?

(২) যদি পাইয়া থাকেন—তাহাহইলে কোন শতাব্দীর কোন সন পর্য্যন্ত এজ্‌তেহাদ চলিত থাকার এবং তাহার পর তাহা তামাদী হইয়া যাওয়ার হুকুম সেই আয়ত বা হাদিছে বর্ণিত হইয়াছে, তাঁহারা তাহা প্রকাশ করিয়া দিলে বাধিত হইব।

(৩) যদি না থাকে, তাহা হইলে "এখন আর এজ্‌তেহাদ সিদ্ধ নহে" বলিয়া তাঁহারা কি খোদা রছুলের ফর্ম্মাণের উপর কলম চালাইতেছেন না?

(৪) এছলামের চারিটী ভিত্তি—কোরআন, হাদিছ, এজ্‌মা, কিয়াছ। এই চারিটীর মধ্যে দুইটী এখন বাতিল হইয়া গিয়াছে—এইরূপ কথা বলিয়া তাঁহারা কি নিজেরাই এছলামের ভিত্তির মূলে কুঠারাঘাত করিতেছেন না? যে এমারতের চারিটা ভিতের মধ্যে দুইটা ধ্বংস হইয়া যায়, তাহাকি কখনও টিকিয়া থাকিতে পারে?

(৫) এজ্‌তেহাদ এবং এজ্‌মা ও কিয়াছের বিধান আল্লাহ্-রছুলের হুকুম অনুসারেই বলবৎ হইয়াছিল, একথা বলার সঙ্গে সঙ্গে যখন তাঁহারা ইহাও বলিতে থাকেন যে, বর্ত্তমানে এজ্‌তেহাদ বা এজ্‌মা ও কিয়াছ অচল হইয়া গিয়াছে, তাহা হইলে ইহা দ্বারা তাঁহারা কি স্বীকার করিয়া লইতেছেন না যে, এছলামের মূল অছুল (অন্যে পরে কা কথা) বা আসল ভিত্তি যাহা, কালক্রমে তাহাও অচল হইয়া যায়। এই কথা স্বীকৃত হওয়ার পর, কোন বেদিন ব্যক্তি যদি বলিয়া বসে যে, এছলামের অমুক হুকুম আমি মানি না, তাহা এখন আর চলিতে পারে না—তাহা হইলে সেই বেদিন ব্যক্তির উপর রাগ করা তাঁহাদিগের পক্ষে সঙ্গত হইবে কি?

ফলতঃ আল্লাহ্-রছুলের প্রবর্ত্তিত যে এছলাম, তাহাতে কস্মিনকালে কোন অসমাধ্য সমস্যা উপস্থিত হইতে পারে না, কোন প্রকারের পঙ্গুতা তাহাকে কখনও স্পর্শ করিতে পারিবে না। যত সমস্যা ও যত পঙ্গুতা আজ এছলামকে ও মুছলমান জাতিকে আক্রমণ করিতেছে—সে সমস্তই মানুষের সৃষ্ট। মানুষ আল্লার-কালাম ও হজরতের বাণীকে কালক্রমে কার্য্যতঃ অচল করিয়া দিয়াছে, খোদার ধর্ম্মের উপর খোদকারী চালাইয়াছে, কোরআন-হাদিছের ব্যতিক্রম ও অতিক্রম করিয়াছে বলিয়াই আজ যত সমস্যা।

পঞ্চম শতাব্দীর প্রথম হইতে এই প্রকার জমাট বাঁধা অন্ধকার সমাজকে আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিয়াছে এবং সেই হইতে মুছলমান সমাজ এই ঘোর অধর্ম্মকেই প্রকৃত ধর্ম্ম বলিয়া বরণ করিয়া লইয়াছে।

আমরা যতদূর জানি, মোছলেম-জগতের আর সমস্ত কেন্দ্র হইতে এই অন্ধকারের ঘনঘটা দ্রুত অপসারিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। অন্ধ অনুকরণের লা'নতের ঠুঁসি চোখ হইতে অপসারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেখানকার মুছলমান বুঝিতে পারিয়াছে যে, এজ্‌তেহাদ বন্ধ হইয়া যাওয়ার হুকুম আর এজমা ও কিয়াছকে অচল করিয়া রাখার ব্যবস্থা দ্বারা মুছলমান পণ্ডিতেরা আল্লার কালাম ও হজরতের ফর্ম্মাণকে বারিত করিয়া বস্তুতঃ এছলামের কি মহা সর্ব্বনাশ সাধন করিয়াছেন!

কিন্তু বাঙ্গলা দেশের অবস্থা স্বতন্ত্র। পুরাতন অজ্ঞতা ও অন্ধ-অনুকরণের মেঘ অপসারিত হওয়ার পূর্ব্বে এখানে নিত্য নূতন কালমেঘের সৃষ্টি করা হইতেছে। এখানে একদিকে এছলামের সর্ব্বনাশ করিতেছেন—বাঙ্গলার আলেম সমাজ। নিজেদের মন গড়া আফৎ বালাইগুলিকে এছলামের ঘাড়ে চাপাইয়া দিয়া, তকলিদের অন্ধতায় প্রকৃত এছলামকে হারাইয়া ফেলিয়া, নিজেদের খেয়াল কুসংস্কার ও অন্ধ বিশ্বাস গুলিকে—অর্থাৎ কোরআন-হাদিছের বিপরীত স্বরচিত এছলামকে—তাঁহারা দুনয়ার সম্মুখে তুলিয়া ধরিতেছেন।

সকল সমাজে সকল যুগে একদল স্বেচ্ছাচারী সহজিয়া মতবাদী লোকের প্রাদুর্ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। মুছলমান সমাজেও এইরূপ একদল লোক চিরকাল ছিল এবং এখনও আছে। সহজিয়া ও নেড়ার ফকিকের দল উচ্ছৃঙ্খলা ও স্বেচ্ছাচার প্রবর্ত্তিত করার জন্য নিজেদের গ্রাম্য ভাষায় যে সকল উৎকট মতবাদ এতদিন প্রচার করিয়া আসিতেছে, তাহারই একটা জাঁকাল ঘোরাল ও বাহ্যাড়ম্বর পূর্ণ সংস্করণ এখনও সমাজের কোন কোন স্তরে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া আছে। উচ্ছৃঙ্খলতা ও ব্যভিচারের সর্ব্বপ্রধান বৈরী হইতেছে এছলাম, তাই তাহাদের নিকট এছলাম একটা ঘোর বিভীষিকা। নিজেদের গতিপথ হইতে এই বিভীষিকাকে অপসারিত করাই তাহাদের সমস্ত সাধনার মূল। সেই জন্য তাহারা সর্ব্বদাই এরূপ বিষয়ের সন্ধানে থাকে, যাহার প্রচার দ্বারা সাধারণ মুছলমানকে দেখান যাইতে পারে যে, এছলাম বর্ত্তমান যুগে একেবারে অচল হইয়া গিয়াছে। আমাদের আলেম সমাজ মুখে ইহাদের বিরুদ্ধে অনেক কঠোর মন্তব্য প্রকাশ করেন বটে, কিন্তু কার্য্যতঃ তাঁহারাই হইতেছেন এই "বিদ্রোহী" দলের সর্ব্বপ্রধান সহায়! এছলামের কতকগুলি মৌলিক ব্যবস্থাকে তাঁহারা নিজেদের খেয়াল মাত্রের উপর নির্ভর করিয়া বাতিল ও বারিত করিয়া রাখিয়াছেন। অথচ তাহাদের উপস্থাপিত সমস্যাগুলির সমাধান ঐ ব্যবস্থাগুলির দ্বারা খুব সহজেই হইয়া যাইতে পারিত।

এই অনিষ্টের স্রোত এখানে আসিয়াই বন্ধ হয় নাই। সমাজের সাধারণ স্তরের লোক এই দুই চরম পন্থীদলের সংঘাত ও সংঘর্ষে দিশাহারা হইয়া পড়িতেছে। এছলামকে তাহারা মান্য করে, শরিয়তকে মাথায় করিয়া চলার জন্য তাহারা লালায়িত। কিন্তু জীবন-সংগ্রামের যাত্রাপথের এই সমস্যাগুলিকে ত মানুষের মন অস্বীকার করিয়া চলিতে পারে না। কাজেই অজ্ঞাতসারে একটা সন্দেহের ভাব তাহাদের মস্তিষ্কের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়া বসিতেছে। বর্ত্তমান যুগে ইহাই হইতেছে মোছলেম বঙ্গের ধর্ম্মসংক্রান্ত সর্ব্ব প্রধান সমস্যা। এই সমস্যার সমাধান করিয়া বাঙ্গালী মুসলমানকে ধর্ম্মহীনতার মহাপাতক হইতে রক্ষা করিতে হইলে, আমাদের আলেম সমাজকে আবার একটু সৎসাহস অবলম্বন করিতে হইবে—রিক্ত মুক্ত খাঁটি এছলামকে নিজেদের সঞ্চিত জঘন্য আবর্জ্জনা পুঞ্জের মধ্য হইতে বাহির করিয়া তাহাকে দুনয়ার সম্মুখে তুলিয়া ধরিতে হইবে। এইপ্রকার সত্যকার এছলামকে মুক্তরূপে প্রকট করিয়া দিতে পারিলেই বর্ত্তমানের ও ভবিষ্যতের সমস্ত সমস্যার সমাধান স্বতই হইয়া যাইবে। এমনকি, তখন আমরা দেখিতে পাইব যে, আজ যে ব্যাপার গুলিকে সমস্যারূপে গ্রহণ করিয়া অনেকেই দিশাহারা হইয়া পড়িতেছেন, বস্তুতঃ তাহা আদৌ কোন সমস্যাই নহে। এছলামের শিক্ষা ও আদর্শকে পরিত্যাগ করাতেই মুছলমান সমাজ আজ তাহাকে সমস্যা বলিয়া মনে করিতে বাধ্য হইতেছে, এবং সত্যকার এছলামকে গ্রহণ করাই তাহার একমাত্র প্রতিকার।

"বিদ্রোহী"দলের কাগজপত্রের সন্ধান লইয়া এবং কতিপয় বন্ধুবান্ধবের সহিত আলোচনা করিয়া উপস্থিত যে "সমস্যা"গুলির সন্ধান পাইয়াছি, তাহার মধ্যকার প্রধান কয়েকটী সম্বন্ধে এই প্রবন্ধে আলোচনা করিয়া নিজেদের এই দাবী সপ্রমাণ করার চেষ্টা পাইব।

## সমস্যার তালিকা ঃ—

(১) **সুদ সমস্যা**—সুদ হারাম, ইহা এছলামের স্পষ্ট আদেশ। অথচ সুদ খাওয়া ও সুদ দেওয়া ব্যতীত আজকাল দুনয়াদারী একদম চলিতে পারে না। কাজেই সুদ হারাম হওয়া সংক্রান্ত এছলামের আদেশটা এখন আর চলিতে পারে না। বিদ্রোহীদল ইহাতে আরও অনেক যেহেতু-অতএব যোগ করিয়া এছলামকে একদম একটা অচল অকর্ম্মণ্য ও তামাদী ধর্ম্ম এবং তাহার ঐশিক ধর্ম্ম হওয়ার দাবীকে মিথ্যা প্রমাণ করার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন। আমাদের মতে এই সুদ সমস্যাটাই হইতেছে তাঁহাদের ম্যাগাজিনের প্রধান অস্ত্র।

(২) **সঙ্গীত সমস্যা**—সঙ্গীত হইতেছে বর্ত্তমানের সভ্যদুনয়ার প্রধানতম কলা-সম্পদ, এবং এই কলাই হইতেছে আজকাল মানুষের আত্মার প্রধান খোরাক। এই প্রধান খোরাক হইতে বঞ্চিত করিয়া রাখিয়া এছলাম মানুষের আত্মাকে হত্যা করারই হুকুম দিয়াছে। অতএব এছলামের এই হুকুম এখন আর চলিতে পারে না, সুতরাং এছলাম সর্ব্বযুগের শাশ্বত ধর্ম্ম নহে, অতএব তাহা খোদার প্রেরিত ধর্ম্ম নহে—ইত্যাদি।

(৩) **চিত্র সমস্যা**—চিত্রশিল্পের দরকার ও উপকার সম্বন্ধে জানা বা শোনা কথার পুনরাবৃত্তি করিয়া তাঁহারা বলিতেছেন—এছলাম ধর্ম্ম এখন আর চলিতে পারে না, কারণ জীবজন্তুর ছবি প্রস্তুত বা ব্যবহার করা তাহার মতে নিষিদ্ধ। এমনকি কাগজে ছবি ছাপাকে আমাদের খাটি ধার্ম্মিকেরা প্রকাশ্যভাবে মূর্ত্তিপূজা বলিয়া প্রকাশ করিতেও দ্বিধা করিতেছেন না।

(৪) **পর্দ্দা সমস্যা**—নারীজাতিকে অবরোধ হইতে মুক্তিদান করাই হইতেছে, বর্ত্তমানে সভ্যজগতের প্রধানতম সাধনা। এই ঘৃণিত অবরোধ প্রথাই হইতেছে মুছলমানের সব অনিষ্টের মূল। অথচ এছলাম এই অবরোধের কড়া হুকুম জারি করিতেছে। কাজেই বর্ত্তমানের সভ্য ও উন্নত দুনয়ায় এছলামের এই সব বিধিবিধান একদম চলিতে পারিবে না।

(৫) **মজহাব সমস্যা**—বর্ত্তমান যুগে মুছলমান সমাজ নানা পরস্পর বিরোধী মজহাবে এমন মারাত্মক ভাবে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছে যে, তাহার প্রত্যেকটী অন্য সমস্ত দলকে বেদিন বিভ্রান্ত এমন কি কাফের বলিয়া প্রকাশ করিয়া থাকে। সম্মিলনই ছিল এছলামের প্রধান শক্তি এবং একতাই ছিল তাহার একটা শ্রেষ্ঠতম বাণী। এ বাণী এখন কার্য্যতঃ অচল, সুতরাং মুছলমানও আজ অচল। এছলামকে বর্জ্জন না করিতে পারিলে মুছলমানকে এ অচলতার হাত হইতে উদ্ধার করা সম্ভবপর হইবে না।

(৬) **কৌলিন্য সমস্যা**—'মোল্লা মৌলবীর দল' প্রচার করেন যে সাম্যবাদই এছলামের প্রধানতম বৈশিষ্ট্য। কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে দেখা যাইতেছে—বাঙ্গলার সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান প্রতিপত্তিশালী পীর সাহেবও ফৎওয়া দিতেছেন যে, "আতরাফ লোকেরা" তাঁহাদের সঙ্গে বসিয়া এক মজলিসে খানা খাওয়ার অধিকারী নহে, তা তাহারা যত বড়ই দিনদার পরহেজগার হউক না কেন! পক্ষান্তরে 'মোল্লা মৌলুবীর দল' বিবাহ সম্বন্ধে কফু كفو বা কুলীন-অকুলীন বিচার করার ফৎওয়া দিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন—কেতাবের মধ্যে এতটুক লেখা আছে যে, কোন শরিফ ঘরাণার লেড়কী গয়র কফুর সঙ্গে শাদী করিলে খাছহালতে তাহা খোদ-বোখোদ বাতেল হইয়া যাইবে। এ সমস্তই যখন কেতাবের খবর আর এছলামের ব্যবস্থা, তখন বেশ বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, এছলামের সাম্যবাদের দাবী মিথ্যা। বস্তুতঃ পংক্তিভোজন ও কৌলিন্যবাদ প্রভৃতি সমস্ত সঙ্কীর্ণ মহাপাতকই তাহাতে পূর্ণভাবে বিরাজমান আছে, অতএব এ এছলামকে বর্জ্জন করিয়া না ফেলিলে মুছলমান জাতির রক্ষা নাই।

আমাদের মতে এই গুলিই হইতেছে মোছলেম বঙ্গের বর্ত্তমান সমস্যা, এবং এই গুলিকে উপলক্ষ করিয়া সমাজের নানাদিক হইতে নানাপ্রকার উজান ভাটি টানাটানি আরম্ভ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। আমরা এই প্রবন্ধে ইহার প্রত্যেক বিষয় স্বতন্ত্রভাবে আলোচনা করিয়া দেখাইব, [illegible] বাস্তবিক ঐগুলি সম্বন্ধে এছলামের ব্যবস্থা কি, আর দুই চরমপন্থীদলের টানাটানির ফলে তাহা এখন দাঁড়াইয়াছে কি? তাহা হইলে 'সমস্যার' প্রকৃত স্বরূপ প্রকাশ হইয়া পড়িবে এবং সমাধানের জন্য আমাদিগকে দিশাহারা হইয়া পড়িতে হইবে না। (১) (ক্রমশঃ)

---

(১) বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক সমস্যা ও তাহার সমাধান সম্বন্ধে পরে বিস্তারিত রূপে আলোচনা করার ইচ্ছা আছে।

# সাহিত্যে অ-সাম্প্রদায়িকতা

[ গোলাম মোস্তফা বি-এ, বি-টি ]

এবারকার বার্ষিক সওগাতে "সাহিত্যে সাম্প্রদায়িকতা" নামক একটা প্রবন্ধ প্রকাশিত হ'য়েছে। প্রবন্ধটী কিছুদিন পূর্ব্বে মৌলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ সাহেবের সভাপতিত্বে বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতির এক সভায় পঠিত হয়েছিল, আর তা শুনে শ্রোতৃমণ্ডলী সবাই একবাক্যে তার প্রতিবাদ করেছিলেন! অবশ্য সেই সমালোচনার কশাঘাতে লেখক এবার বহুস্থানে তাঁর উক্তি ও ধারণাকে ওলট পালট ক'রে দিয়েছেন—কিন্তু উভয় কুল রক্ষা ক'রতে গিয়ে এত গোঁজামিল ও আত্ম-বিরোধী উক্তি এবার এতে স্থান পেয়েছে যে, ইহা একেবারেই অপাঠ্য হ'য়ে পড়েছে। লেখকের নিজের মত যাই হোক না কেন, তাঁর বক্তব্য বিষয়ের মধ্যে পূর্ব্বাপর যদি একটা সামঞ্জস্য বা সুসঙ্গতি থাক্‌তো, তাহ'লেও লেখাটা ধৈর্য্য ধ'রে পড়া যেতো। কিন্তু কোন দিক দিয়েই কিছু হয়নি। প্রবন্ধটী পড়ে স্পষ্টই মনে হ'ল—লেখক কি যে বল্‌তে চান, তা তিনি নিজেই জানেন না।

প্রবন্ধের শিরোনামা এবং ভঙ্গিমা দেখেই মনে হয়, লেখক সাহিত্যে সাম্প্রদায়িকতার বিরোধী। তিনি আরম্ভ ক'রেছেনও সেই ভাবে। গোড়াতেই তিনি বল্‌ছেন—"সাহিত্য চিরন্তনের সাধনা ক্ষেত্র। ইহাতে সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িকতার স্থান নাই।" অর্থাৎ সাহিত্যের বাণী হ'বে দেশ, কাল ও পাত্রাতীত। কিন্তু একটু অগ্রসর হয়েই তিনি বল্‌তে বাধ্য হয়েছেন যে, "সাহিত্যের অন্তরভাগ চিরন্তনের সাধনা-ক্ষেত্র হ'লেও তার বহির্ভাগ দেশ কাল পাত্রেরই লীলাভূমি।" এমনকি এ কথাও বলে ফেলেছেন—"এই প্রকাশভঙ্গী—(অর্থাৎ বহিরঙ্গ) দেশ-কাল পাত্রানুযায়ী করিতে না পারিলে সাহিত্য-সৃষ্টিই সার্থক হয় না, সুন্দর হয় না—অস্বাভাবিক হইয়া উঠে।"

শুধু তাই নয়,—বাঙ্গলা সাহিত্য যে মুসলমানদিগের হস্তে "অত্যন্ত স্বাভাবিক রূপেই মুসলমানী রূপ পাইতে আরম্ভ করিয়াছে" এবং এই স্বাভাবিক প্রকাশ-ভঙ্গিকে চিরন্তনের দোহাই দিয়ে হিন্দুগণ যে 'অভিশপ্ত' করবার মতলবে আছেন, এতে তিনি হিন্দুদিগকেও খুব খানিক গালিমন্দ দিয়েছেন। তিনি বল্‌ছেন—"ধর্ম্মাদর্শের পার্থক্যে হিন্দু-মুসলমানের জীবন-যাত্রা প্রণালীতেও (তথা সাহিত্যেও) যে একটা পার্থক্য ঘটিবে, ইহাতে বিচিত্রতা কিছুই নাই;" শুধু যে তিনি ভাবের দিক দিয়া মুসলমানী রূপের কথা বলেছেন, তা নয়;" ভাষায় মুসলমানী রূপ" সম্বন্ধেও তিনি হিন্দুদিগকে নছিহৎ কর্‌তে কসুর করেন নাই। তাঁর মত এই যে, বাঙ্গলা সাহিত্যে "ভাবে" এবং "ভাষায়" অর্থাৎ "অন্তরভাগে" এবং "বহির্ভাগে" —সর্ব্বত্রই মুসলমানের নিজস্ব রূপ থাকা স্বাভাবিক।

পাঠক! লেখকের দুরবস্থা দেখ্‌লেন! কোথা থেকে বা তিনি আরম্ভ করেছিলেন আর কোথায় বা এসে গড়িয়েছেন! প্রথমে বলে এলেন, "সাহিত্যে সাম্প্রদায়িকত্বের গণ্ডি নাই," আবার একটু পরেই এসে বলছেন—এ গণ্ডি না থাক্‌লেই চল্‌বে না—"অস্বাভাবিক" হয়ে উঠ্‌বে। শুধু "ভাষা" নয়,—"ভাবের" দিক দিয়াও বাঙ্গলা ভাষাকে "মুসলমানী রূপ" দিতে হ'বে। কোথায় গেল অ-সাম্প্রদায়িকতা, কোথায় বা গেল "অন্তরভাগ" আর "বহির্ভাগ"! ভিতরে-বাহিরে—সর্ব্বত্রই তিনি সাম্প্রদায়িকতার গণ্ডী টেনে দিলেন! তাঁর কোন্ মতটা এখন গ্রহণ করব?

ধরে নেওয়া গেল—লেখক পূর্ব্বমত শুধ্‌রে নিয়েছেন এবং এখন তাঁর মতটা এই দাঁড়াচ্ছে যে, সাহিত্য চিরন্তনের সাধনা ক্ষেত্র হ'লেও দেশ-কাল পাত্র ভেদে তার ভাব ও ভাষার স্বতন্ত্র রূপ চাই। কিন্তু ওঃ কপাল! মুসলমানের দিকে যেই ফিরে দাঁড়িয়েছেন অমনি তাঁর মুখে আবার নূতন কথা! এইখানে এসে তিনি আবার সাম্প্রদায়িকতার বিরোধী হ'য়ে দাঁড়ালেন! তিনি বল্‌ছেন—"এইত গেল সাহিত্য সম্বন্ধে হিন্দু মনোভাবের কথা। মুসলমান

**সমাজেও সাহিত্যে সাম্প্রদায়িকতা দেখা দিয়াছে।"** এমন কি "মুসলমান সাহিত্য" কথাটাই তিনি বুঝ্‌তে পারলেন না—ওটা নাকি অর্থশূন্য একটা প্রলাপ মাত্র। 'ইংরাজী সাহিত্য', 'পারশী সাহিত্য' ইত্যাদি ব'লে কথা হ'তে পারে, কিন্তু "মুস্‌লিম সাহিত্যের"—কোন মানে হয় না! বলি এওকি চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিতে হ'বে যে তাঁর বর্ণিত "ভাব" এবং "ভাষার" **"মুসলমানী রূপ"**-ই হচ্ছে "মুসলমানী সাহিত্য!" "ভাবে" এবং "ভাষায়" যে সাহিত্য "মুসলমানী রূপ" ধর্‌তে পার্‌ল,—কোনই আপত্তি উঠ্‌ল না,—পরিচয় দিবার বেলায় সেই সাহিত্যকেই "মুসলমানী সাহিত্য" বল্‌তে এত লজ্জা করল কেন? জাতি হিসাবে যখন সাহিত্যের নামকরণ হয়, তখন বুঝ্‌তে হ'বে সেই জাতির বিশিষ্ট ভাব, আদর্শ ও ধারণাই ভাষার মধ্যে মূর্ত্তি পরিগ্রহ করেছে। হিন্দু-সাহিত্য, গ্রীক-সাহিত্য, জাপানী-সাহিত্য—এ সব কথা কি নিতান্তই অর্থশূন্য? তা' যদি হয়, তবে ভাষা হিসাবেই বা সাহিত্যের কেন নামকরণ হ'বে? সাহিত্য ত চিরন্তন মানবের প্রাণ-বাণী; তার আর আরবীই কি, আর ইংরেজীই কি? ইহাও কি নিতান্ত অর্থশূন্য নয়? বস্তুতঃ বিশ্লেষণ কর্‌লে দেখ্‌তে পাওয়া যাচ্ছে—যে 'জাতিত্ব' তিনি সাহিত্যে আরোপ করতে নারাজ, সেই জাতিত্বের আলোকে তুলে না ধরলে তাঁর আরবী, ইংরাজী—কোন সাহিত্যেরই কোন ব্যাখ্যা হয় না। ফরাসী-সাহিত্য অর্থে ফরাসী জাতির ধ্যান-ধারণা ও জীবনাদর্শকেই বুঝ্‌তে হয়। বাংলা সাহিত্য বল্‌তে বাঙ্গালী জাতির চিন্তা ও ধারণাই আমরা বুঝি। বাঙ্গালী জাতির ভিতর হিন্দু, মুসলমান, বৈষ্ণব প্রভৃতি সম্প্রদায় আছে ব'লে এবং তাদের ধর্ম্ম ও জীবনাদর্শ স্বতন্ত্র ব'লে "মুসলমানী সাহিত্য", "বৈষ্ণব সাহিত্য" প্রভৃতি-স্বতন্ত্র নামের প্রয়োজন হ'য়েছে। এই সহজ কথাটাও যিনি না বুঝ্‌তে পারেন, তাঁর সাহিত্য সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখ্‌তে যাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র!

পাঠক লক্ষ্য ক'রেছেন, উপরে লেখক ভাষার ন্যায় ভাবের দিক দিয়াও অর্থাৎ "অন্তরভাগেও" মুসলমানী রূপের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করে এসেছেন। কিন্তু এখন আবার বল্‌ছেন—"বাঙ্গলা সাহিত্যের যে একটা মুসলমানী রূপ আছে, তাহা আমরা জানি এবং মানি। কিন্তু ইঁহাদের (কাহাদের?) কথার ভাবে বুঝা যায়—ইঁহারা শুধু মুসলমানী রূপের কথাই বলেন না;—সাহিত্যের অন্তরটাকেও ইঁহারা মুসলমান করিয়া লইবেন। কিন্তু তাহা হয় না; কারণ তাহা করিতে গেলে সাহিত্য 'মুসলমানীতে' পূর্ণ হইতে পারে, কিন্তু তাহাতে 'সাহিত্য' টিকিয়া থাকিবে না। সাহিত্যের অন্তর মানুষের বাণীতে পূর্ণ।" এই অসম্বদ্ধ উক্তির কোন মানে আছে? সাহিত্যের "মুসলমানী রূপ" অর্থে লেখক বুঝি এতক্ষণ উহার খোলস ( form ) এর কথাই বলেছেন—ওর অন্তরের কথা বলেন নি! তাই বটে! নয়ত তিনি 'অন্তর'টাকে মুসলমান ক'রতে এত নারাজ কেন? (অথচ পূর্ব্বে বলে এসেছেন যে 'অন্তরভাগেও' মুসলমানী রূপ থাকা চাই!) বলি, সাহিত্যের 'অন্তর'টাই যদি মুসলমানী রূপ না পেল, তবে আর পেল কি? লেখক চান—শুধু খোলসটা হ'বে মুসলমানী, আর কিছু নয়—তার ভিতরে যাই থাকুক না কেন। ভিতরে যদি মুসলমানী ভাব থাকে, তবে সে সাহিত্য 'মুসলমানিত্বেই' ভ'রে উঠ্‌বে—মানবাত্মার চিরন্তন বাণী তার মধ্যে থাক্‌বে না, কাজেই তা "সাহিত্য" পদবাচ্য হ'বে না! এ যেন ঠিক "ভদ্রলোক" ও "মুসলমানের"—পার্থক্যের মত। "মুসলমান" হ'লে সে "ভদ্রলোক" হয় না, এতদিন এই শুন্‌তাম, এখন্ লেখক মহাশয়ের নিকট শুন্‌ছি—সাহিত্যে ইসলামী ভাব ঢুক্‌লে তা আর সাহিত্য হয় না! অন্য কথায়—মুসলমান হ'লে সে আর—'মানুষ' হয় না, কাজেই তার সৃষ্ট সাহিত্যে "মানবতার বাণী" থাকে না এবং কাজেই সেটা "সাহিত্য" হয় না- কেননা সাহিত্য হ'চ্ছে চিরন্তন মানবাত্মার বাণী—মুসলমানের বাণী নয়!!

পাছে মুসলমানেরা ক্ষেপে গিয়ে একটা অনর্থের সৃষ্টি করে, এই ভয়ে লেখক আবার বল্‌ছেন—"মুসলমান চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিতে পারে কি, মুসলমান কি মানুষ নয়? তাহার বাণী কি মানুষের বাণী নয়? নিশ্চয়ই, তাহা কেহই অস্বীকার করে না। (অথচ উপরে ক'রে এসেছেন!) মুসলমান নিশ্চয়ই মানুষ এবং মানুষ হিসাবে তাহার স্থান নিশ্চয়ই সাহিত্যে আছে।" তাহার বাণী নিশ্চয়ই মানুষের বাণী এবং মানুষের বাণী হিসাবে তাহার স্থানও সাহিত্যে আছে। কিন্তু তাহা মানুষের বাণী হিসাবেই আছে—মুসলমানের বাণী হিসাবে নহে।"

যাক্! মর্‌তে মর্‌তে বেঁচে গেল! মুসলমানের কপাল জোর বল্‌তে হ'বে, লেখক এবার যখন বল্‌ছেন যে,

মুসলমান নিশ্চয়ই মানুষ, তখন মুসলমান নিশ্চয়ই মানুষ! কিন্তু জিজ্ঞাসা করি—চিরন্তন মানবাত্মার বাণীর নামই যদি ইস্‌লাম হয়,—অন্য কথায় 'চিরন্তনের' সঙ্গে ইস্‌লামের তথা "মুসলমানীত্বের" যদি কোনই বিরোধ না থাকে, তবে তখন "মুসলমানী সাহিত্য" সাহিত্য পদবাচ্য হ'তে পারে কিনা? চিরন্তন মানুষ অর্থে লেখক কি বলেন, তাহা আমরা জানি না। তিনি যদি চোর, ডাকাত, লম্পট, মিথ্যাবাদী, বিদ্রোহী, নাস্তিক, বেশ্যা, ইত্যাদি বুঝে থাকেন, আর তাদের প্রাণের চিরন্তন বাণীকেই সাহিত্য বলেন, তবে একথা আমরা একশ' বার স্বীকার কর্‌ছি যে, "মুসলমানী সাহিত্য" নিশ্চয়ই সাহিত্য নহে—ও নিতান্তই সাম্প্রদায়িক! খোদাতালার সহিত বিচ্ছেদ জনিত বিরহের বেদনা ও মিলনের অতৃপ্ত কামনা, তাঁহার নিকট সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ, নিয়মানুবর্ত্তিতা, মানুষে মানুষে ভ্রাতৃভাব, সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতা, প্রীতি, প্রেম, সত্যনিষ্ঠা, দয়া, মায়া, আশা-আকাঙ্ক্ষা—ইত্যাদিই যদি মানব-মনের চিরন্তন বাণী হয়, তবে তাকে মানববাণী বলা আর ইস্‌লামের বাণী বলা—একই কথা নয় কি? মানব মনের পরিপূর্ণ বাণী একমাত্র ইস্‌লামেই আছে, সুতরাং তা নিয়ে অনায়াসে সাহিত্য-সৃষ্টি করা চলে; তাতে ভয় বা লজ্জা পাবার কোন কারণ নেই। বিশ্ব-সাহিত্যে যুগে যুগে যে উচ্চ ভাবধারা ব'য়ে চ'লেছে, তার সাথে ইস্‌লামের কোন বিরোধ নাই। আর যদি কোথায়ও সাহিত্যের সঙ্গে ইস্‌লামের বিরোধই বা দেখ্‌তে পাওয়া যায়, তাতেই বা ভয় কি? ইস্‌লামকে সাহিত্যের কষ্টিপাথরে এনে ক'ষে দেখ্‌বার দরকার নাই, বরং সাহিত্যকেই ইস্‌লামের কষ্টিপাথর দিয়ে পরখ ক'রে দেখ্‌তে হ'বে। সাহিত্য মানুষেরই সৃষ্টি, মানুষ যাকে চিরন্তন বাণী বল্‌ছে, মানুষ যাকে সাহিত্য বল্‌ছে—তাই যে খাঁটী চিরন্তন বাণী, তাই যে খাঁটী সাহিত্য, একথা কে বলেছে? চিরন্তন বাণীর কোন সংজ্ঞা কেহ দিতে পারেন কি?

সাহিত্য-সৃষ্টি উদ্দেশ্যবিহীন নহে। সাহিত্য যেমন মানুষ গড়ে, মানুষও তেমনি সাহিত্য গড়ে। কাজেই মানবজীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষা, লক্ষ্য, পরিণতি ইত্যাদিও সাহিত্যের বিষয়ীভূত। মানুষের জীবন ও ধর্ম্মাদর্শই সাহিত্যের সম্পদ। ক্ষণিক উত্তেজনা বা তরল আনন্দদানই সাহিত্যের লক্ষ্য নহে। কাজেই ধর্ম্ম-বিধি ও জীবনাদর্শকে বাদ দিয়া সাহিত্যসৃষ্টি করা চলে না। কিন্তু লেখকের সাহিত্য স্বতন্ত্র রকমের। ধর্ম্ম বা জীবনাদর্শের কথা উঠ্‌লেই তিনি তাকে সাহিত্য বল্‌তে নারাজ, কেননা তাতে তিনি সাম্প্রদায়িকতার গন্ধ অনুভব করেন। কিন্তু একটু ধীর ভাবে চিন্তা ক'রে দেখ্‌লেই বুঝা যায়—কোন সাহিত্যই সাম্প্রদায়িক ছাড়া হ'তে পারে না। লেখকের নির্দ্দেশিত অসাম্প্রদায়িক সাহিত্যও ন্যায়শাস্ত্রের নিয়মানুসারে (logically) ঘোর সাম্প্রদায়িক। তাঁর সাহিত্যে যদি 'মুসলমানিত্ব', 'হিন্দুত্ব', 'খৃষ্টানত্ব' ইত্যাদি নাই থাক্‌ল, তবে সে ও ত এক স্বতন্ত্র সাম্প্রদায়িক গণ্ডীর মধ্যে এসে পড়্‌ল। কোনও ধর্ম্ম না-মানাও যে এক ধর্ম্ম! অসাম্প্রদায়িক হওয়াও যে এক সাম্প্রদায়িকতা!

'সাহিত্য' আর 'ধর্ম্ম' নিয়ে যখন কথা উঠেছে, তখন ধর্ম্মকে ফেলে একমাত্র সাহিত্যকে নিয়ে আমরা চল্‌তে পারি না। সাহিতের চেয়ে ধর্ম্ম বড়। যুগধর্ম্মের কল্যাণে বা মানুষের বিকৃত মনোবৃত্তির ফলে সাহিত্য যদি তার লক্ষ্য পথ থেকে ভ্রষ্ট হ'য়ে যায় এবং দুনিয়ার অধিকাংশ মানুষই যদি সেই বিকৃত সাহিত্যকেই চিরন্তন মানুষের প্রাণের বাণী ব'লে ধরে নেয়, তবে তার জন্য ধর্ম্মবিধান দায়ী নহে—মানুষই দায়ী। এক্ষেত্রে সাহিত্যের খাতিরে ধর্ম্মবিধানগুলিকে বিদ্রূপ ক'রে দূরে ঠেলে দেওয় মূঢ়তা বৈ আর কিছুই নহে। দৃষ্টি ব্যাহত হওয়ায় যদি আমরা আমাদের উচ্চ আদর্শকে দেখ্‌তে না পাই, তবে সে দোষ কারো নয়—আমাদেরই।

যাহাদের সৃষ্ট সাহিত্য বিশ্বে চিরন্তন হ'য়ে আছে, তাদের সম্বন্ধেও যে আমাদের প্রচলিত ধারণা নির্ভুল এবং দৃষ্টি অভ্রান্ত, সে সম্বন্ধেও কোন নিশ্চয়তা নাই। যে সেকস্‌পিয়ার সম্বন্ধে বর্ত্তমান জগৎ এত উচ্চ ধারণা পোষণ করে, সেই সেকস্‌পিয়ারের গ্রন্থ সম্বন্ধেই ঋষি টলষ্টয় নিতান্ত হীন ধারণা পোষণ ক'রে গিয়েছেন। তার ভিতরে তিনি এমন জঘন্য রুচি ও নিকৃষ্ট ভাবের পরিচয় পেয়েছেন যে, তা চিরন্তন মানুষের বাণী ত হ'তেই পারে না, সাহিত্য নামেরও সেগুলি অযোগ্য। টলষ্টয় বলেছেন—

I remember the astonishment I felt When I first read Shakespeare. I had expected to receive a great æsthetic pleasure, but on reading, one after another, the works regarded as

his best—king Lear, Romeo guliet, Hamlet and Macbeth, not only did I not experience pleasure, but I felt an insuperable repulsion and tedium and a doubt whether I lacked sense, Since I considered works in significant and simply bad, which are regarded as the summit of perfection by the whole educated world.

ভাবার্থ—সমগ্র শিক্ষিত জগৎ শেকসপিয়ারের যে গ্রন্থ গুলিকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও নিখুঁৎ ব'লে মেনে নিয়েছে, তা পড়েও টলষ্টয় কোন আনন্দ পান নাই। বরং ঘৃণায় এবং বিরক্তিতে তাঁর মন ভ'রে উঠেছে। কি কি কারণে টলষ্টয় শেকসপিয়ারের গ্রন্থাবলীকেএত জঘন্য বলেছেন, তা বিস্তৃতভাবে তিনি আলোচনা ক'রে দেখিয়েছেন। এখানে সে সব কথার উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন। মোটের উপর বুঝা যাচ্ছে—বাজারে যা শ্রেষ্ঠ সাহিত্য ব'লে বিকিয়ে যায়, তা যে বাস্তবিকই শ্রেষ্ঠ, এরূপ নিশ্চিত মত প্রকাশ করবার মত কোন মাপকাঠি আমাদের নাই। কাজেই সাহিত্যের ভাল-মন্দ বিচার ক'রতে হ'লে সর্ব্বশেষে আমাদিগকে ধর্ম্ম ও নীতির কষ্টিপাথরে যাচাই করতেই হয়। কোনটী যে মানুষের চিরন্তন প্রাণের বাণী কোনটী যে তার চরম মঙ্গল (ultimate good) তা একমাত্র ধর্ম্ম ও নীতির বিধানই বলে দিতে পারে। লেখক মোটেই শাস্ত্রকে দুচোখ পেতে দেখ্‌তে পারেন না। সাহিত্যে তাহার একদম প্রবেশ নিষেধ। কিন্তু এটুকু স্বীকার করেছেন যে, "কোন কোন শাস্ত্রবাণীও সর্ব্বমানবগ্রাহ্য হইতে পারে। কিন্তু তাহা সার্ব্বজনীন বাণী হিসাবেই সাহিত্যে গৃহীত হয়—শাস্ত্রবাণী হিসাবে নহে। সাহিত্যে সার্ব্বজনীনতা আছে বলিয়াই তাহা সর্ব্বমানবগ্রাহ্য। তাই এক জাতির সাহিত্য পড়িয়া অপর জাতি উপকৃত হয়, একের বাণী বিশ্বের বাণী হইয়া দাঁড়ায়।"

এত পরস্পর বিরোধী-মতের মধ্যে কোন্‌টী যে লেখকের খাঁটী মত, তা বুঝাই একরূপ দায় হ'য়ে পড়েছে। একবার বলেন, সাহিত্যে শাস্ত্র ঢুক্‌লে সাহিত্যের জাতি যায়, আবার বলেন, কোন কোন শাস্ত্রবাণীও সাহিত্যে স্থান পেতে পারে। এই আত্মবিরোধ উপেক্ষা করলেও তিনি যা বল্‌তে চেয়েছেন, তা আরও মারাত্মক। সাহিত্যে মুসলমানী শাস্ত্রের কথা ঢুকলে তা একদম "মুসলমানিত্বে" পূর্ণ হ'য়ে উঠে—"সাহিত্য" হয় না, একথা তিনি পূর্ব্বেই বলে এসেছেন। এখন আবার বল্‌ছেন—"কোন কোন শাস্ত্রবাণীও সাহিত্যে—স্থান পেতে পারে আর তা বিশিষ্ট কোন শাস্ত্রের বাণী হ'লেও বিশ্ব মানুষের প্রাণের বাণী ব'লে গৃহীত হ'য়ে থাকে।" এর দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যাচ্ছে যে, বিশ্বমানুষের চিরন্তন বাণী হিসাবে অন্যান্য শাস্ত্রবাণী অনায়াসে সাহিত্যে স্থান পেতে পারে, কিন্তু পারেনা কেবল ইস্‌লাম। ইস্‌লাম শাস্ত্রের বেলায় হবে সেটা "সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িকতা" আর অন্যান্য শাস্ত্রের বেলায় হবে সেটা "বিশ্বমানুষের প্রাণের বাণী!" কি সাংঘাতিক উক্তি!!

যদি ধরা যায় যে, "কোন কোন শাস্ত্রবাণী" অর্থে "শাস্ত্রের কোন কোন বাণী," তা হলেও লেখকের উক্তি যে নিতান্তই অন্তঃসারশূন্য তা প্রমাণ ক'রতে একটুও দেরী লাগে না। শাস্ত্রের কোন কোন বাণী সাহিত্যে স্থান পেতে পারে, লেখকের যদি সে বিশ্বাস থাকে, তবে এ কথা তাঁকে স্বীকার করতেই হ'বে যে ইসলামের কোন কোন বাণীও বিশ্বমানুষের প্রাণের বাণী হ'তে পারে। কিন্তু "কোন কোন" বাণীকে যদি তিনি স্বীকার করেন, তবে তাঁকে সবটুকুকেই স্বীকার করতে হয়। 'যে বাণী আজ চল্‌ছে না' তা যে কাল চল্‌বে না, তা তাঁকে কে বলেছে? তা ছাড়া যে বাণীগুলি "বিশ্ব মানুষের প্রাণের বাণী" ব'লে আজ সাহিত্যে স্থান লাভ ক'রেছে, তার নির্ব্বাচন যে নিতান্তই খেয়ালী (conventional) সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই। লেখক যদি বলেন যে এটা চল্‌বে ওটা চল্‌বে না, তা নির্ব্বিচারে সকলেই মেনে নেবেনা। আমরাও ব'লতে পারি—এটা চল্‌বে, ওটা চল্‌বে না। কাজেই "কোন কোন" শাস্ত্রবাণীকে স্বীকার ক'রলে, গোটা শাস্ত্রটাকেই বাধ্য হ'য়ে স্বীকার করতে হয়।

এক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে—সাহিত্যের সঙ্গে শাস্ত্রবাণীর কোন বিরোধ নাই। তবে এ কথা ঠিক যে, শুধু শাস্ত্রবাণীই সাহিত্য নয়; কিন্তু যা সাহিত্য, তার মধ্যে শাস্ত্রবাণীও থাক্‌তে পারে, তাতে কোন বাধা নেই।

লেখক শাস্ত্রবাণীর বিরুদ্ধে এত খড়্গহস্ত, তার একমাত্র কারণ হচ্ছে—শাস্ত্র অতীতের। অতীতকে তিনি দুচোখ পেতে দেখ্‌তে পারেন না। তাই তিনি সব্বাইকে বর্ত্তমানের সঙ্গে পা মিলিয়ে চল্‌তে উপদেশ দিয়েছেন। লেখকের মতে

"অতীত অতীতই, তাহা মরিয়া ভূত হইয়া গিয়াছে।" অতএব অতীত-প্রীতি আমাদের মৃত্যুরই অরিষ্ট লক্ষণ।" অতীত যদি ম'রে ভূত হ'য়ে গিয়ে থাকে, তবে একথা স্বতঃই স্বীকার ক'রতে হয় যে সেই অতীতের গর্ভে যে শাস্ত্র-বাণী ছিল, তাও ম'রে ভূত হ'য়ে গেছে। তার কোন দরকারই—বর্ত্তমানে নাই বা থাকতে পারে না।

লেখক অতীতের প্রতি যে রায় দিয়েছেন, তা টিকতে পারে কি? অতীত কখনই ম'রে ভূত হ'তে পারে না। সে চিরদিন বেঁচে আছে। বরং লেখকের অতি-সাধের—বর্ত্তমানেরই বাস্তবে কোন অস্তিত্ব নাই। কাকে তিনি বর্ত্তমান বলেন? অনাগত ভবিষ্যৎ প্রতি মুহূর্ত্তে অতীতে পরিণত হচ্ছে, এই উভয়ের সন্ধিক্ষণ—যাকে কল্পনা ছাড়া ধরা যায় না—সেইটুকুই আমাদের বর্ত্তমান। সুতরাং "বর্ত্তমানের সঙ্গে তাল রাখিয়া চলা"র অর্থও হচ্ছে—সেই অতীতেরই নির্দ্দেশ মত চলা। বাড়ী হ'তে পা ফেলে কোন গন্তব্য স্থানে পৌছে গিয়ে দেখি—বর্ত্তমান আমাকে সেখানে নিতে পারেনি, পূর্ব্ববর্ত্তী অতীতই আমাকে আমার গন্তব্য স্থানে পৌছে দিয়েছে। গন্তব্য স্থানের শেষ পাদক্ষেপের মধ্যে অতীতই জেগে বসে ছিল, গোপনে গোপনে সেই কাজ ক'রে গেছে- সে ম'রেনি। অতীতের সঙ্গে বর্ত্তমানকে যোগসম্বন্ধভাবে রেখেই তবে না আমি আমার লক্ষ্যে উপনীত হ'তে পেরেছি। অতীত নিজে পিছিয়ে গিয়েছে বটে, কিন্তু আমাকে সে এগিয়ে রেখে গিয়েছে। কাজেই অতীতকে অস্বীকার ক'রে শুধু বর্ত্তমানকে ধরে বসে থাকলে আমার আর এগিয়ে যাওয়া হয় না,—এগিয়ে যাওয়াকে ফিরিয়ে দিতে হয়। অদূর অতীত সম্বন্ধে যে কথা, সুদূর অতীত সম্বন্ধেও ঠিক একই কথা। বর্ত্তমান ব'লে যদি কিছু থাকে, তবে অতীতই তার নিয়ামক। সুতরাং কেমন ক'রে অতীতকে উড়িয়ে দেওয়া সম্ভব হ'তে পারে? অতীতকে উড়িয়ে দিলে মানুষের জীবন ধারণ একেবারেই অসম্ভব হ'য়ে দাঁড়ায়। অতীতের ভিত্তির উপরেই বর্ত্তমান খাড়া র'য়েছে, সুতরাং অতীতকে ভেঙ্গে ফেল্‌লে সেই সঙ্গে বর্ত্তমানও যে চুরমার হ'য়ে ধূলিসাৎ হ'য়ে যায়। বৃক্ষের অন্তরাত্মা ফুল হ'য়ে ফুটে উঠে যদি বলে যে, অতীতের এই কাণ্ড ও শাখা প্রশাখা আমি চাই না, দূর করে দাও এদিগকে, তবে সে ফুল তখন কোথায় থাকে? পর্ব্বতের শিখরদেশে আরোহণ করে যদি কেউ বলে—যা অতিক্রম ক'রে এসেছি, তা ধ্বংস কর, আর যদি কেউ নীচে থেকে পর্ব্বতমূল ধ্বংস ক'রে দেয়, তবে সে নিজে কোথায় দাঁড়ায়? বস্তুতঃ কাল অখণ্ডরূপে এক। ইহাকে তিনভাগে বিভক্ত ক'রলেও এদের মধ্যে কোন গণ্ডীকাটা, বা প্রাচীর তোলা নাই। ভবিষ্যতের গর্ভে কি নিহিত আছে, তা আমরা জানি না, কাজেই ভবিষ্যৎ আমাদিগকে কর্ম্মক্ষেত্রে কোনই সাহায্য ক'রতে পারে না। একমাত্র অতীতই আমাদের বর্ত্তমানের সহায়-সম্বল। তাই মানুষ কর্ম্মক্ষেত্রে নেমে অতীতের পানে তাকায়। অতীত যার গৌরবোজ্জ্বল, সে কখনো নিরাশ হয় না; অতীত গোপনে গোপনে তার প্রাণে নব প্রেরণার সঞ্চার করে; গোপনে গোপনে সে তার কাজ ক'রে যায়। রবীন্দ্রনাথ তাই বলেছেন—

"হে অতীত, তুমি গোপনে গোপনে
কাজ ক'রে যাও ভুবনে ভুবনে।"

বাস্তবিকই জগতের যত বড় বড় কাজ, তা অতীতেরই কীর্ত্তি। কাজেই অতীতকে কেমন ক'রে আমরা বাদ দিতে পারি? লেখক যদি অতীতের প্রতি এমনই বিরুদ্ধ ভাব পোষণ করেন, তবে তিনি যেন মনে রাখেন—তাঁর এই লেখাটাও এখন অতীতের গণ্ডীর ভিতর গিয়ে পড়েছে, সুতরাং তাঁর উক্তি বাতিল হ'য়ে গেছে! বস্তুতঃ লেখক খাঁটী বর্ত্তমান বাদী নন—হ'তে পারেন না। বাধ্য হ'য়ে তাঁকে অতীতকে স্বীকার ক'রতেই হ'চ্ছে, তবে কি না তিনি সুদূর অতীতকে চান না। বর্ত্তমানের কাছাকাছি যে অতীত, তাকে স্বীকার ক'রতে তাঁর কোন আপত্তি নেই—কারণ উপায়ান্তর নেই! কিন্তু এক্ষণে আমাদের জিজ্ঞাস্য এই—কতদূর পর্য্যন্ত অতীত, আর কতদূর পর্য্যন্ত বর্ত্তমান?—কোন্ পর্য্যন্ত পিছিয়ে গেলে "অতীতের ভূত" ঘাড়ে চাপবার ভয় আছে, আর কোন্ পর্য্যন্ত গেলে বর্ত্তমানের সীমানার মধ্যে নিরাপদে থাকা যায়? এর একটা চৌহদ্দী ঠিক ক'রে তিনি যেন দেন! তা হ'লে আমাদের পথ চলার সুবিধা হ'বে।

যে কথাটার জন্য লেখক এই অতীতের সমস্যাটা উত্থাপন করেছিলেন, সেটা নিয়ে যদি আলোচনা ক'রতে যাই, তবে লেখকের বোধশক্তি ও বিচারবুদ্ধি দেখে পাঠক নিশ্চয়ই মুগ্ধ হ'বেন। কিছুদিন পূর্ব্বে আমি "মুসলিম

সাহিত্যের গতি ও লক্ষ্য" শীর্ষক একটী প্রবন্ধ লিখেছিলাম। তাতে আমি বলেছিলাম, "অতীতকালে মুসলিম জ্ঞান-কর্ষণার যে লক্ষ্য ও যে আদর্শ ছিল, আমাদিগকেও সেই লক্ষ্যে ও সেই আদর্শে চলিতে হইবে।" অর্থাৎ ইসলামী বিশেষত্ব বজায় রেখে আমাদিগকে দীন্-দুনিয়ার সকল জ্ঞানই অর্জ্জন ক'রতে হ'বে। এ প্রবন্ধের কুত্রাপি একথা বলিনি যে, আমাদিগকে আবার সেই সুদূর অতীতে ফিরে যেতে হ'বে। আমাদের লক্ষ্য ও আদর্শ যে অতীত যুগের মুসলিম আদর্শের ও লক্ষ্যের অনুসরণ ক'রবে -- এই কথাই মাত্র বলা হ'য়েছে। কিন্তু আমাদের বিজ্ঞ লেখক এই কথাটা কিরূপ ভাবে গ্রহণ করেছেন, তা দেখুন। তিনি বলছেন—"এক শ্রেণীর মুসলমান সাহিত্যিক বাঙ্গলা সাহিত্যকে কলমা পড়াইয়া মুসলমান করিয়া লইবার উদ্ভট চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। এই উদ্দেশ্যে তাঁহারা বাঙ্গালী মুসলমান জাতিকে অতীত মুসলমানী গৌরবের যুগে ফিরিয়া যাইতে আদেশ জারী করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহারা ভুলিয়া যান যে অতীত অতীতই, তাহা মরিয়া ভূত হইয়া গিয়াছে।......এই অতীত মোহের কবলে পড়িয়া এই শ্রেণীর সাহিত্যিকগণ পুরাতন Semetic Culture কে ফিরাইয়া আনিবার স্বপ্ন দেখিতেছেন।" (১)

Semetic Culture এর অন্তর্নিহিত সেই আদর্শ ও লক্ষ্যটাকে গ্রহণ ক'রতে বল্‌লে যে Semetic Culture-কেই ফিরিয়ে আনা বুঝায়, এ ন্যায়শাস্ত্র আমাদের জানা ছিল না। এখানে লেখককে স্বীকার করতেই হ'বে—হয় তিনি উপরোক্ত কথাগুলির ভাব গ্রহণ করতে পারেন নি, নয়ত তিনি বল্‌তে চেয়েছেন যে, Semetic Culture এর যে লক্ষ্য বা যে আদর্শ ছিল, তা বর্ত্তমানে চল্‌তে পারে না, কারণ সে অতীতের আদর্শ। শেষোক্ত মতই যদি সত্য হয়, তবে দাঁড়ায় এই যে—Semetic Culture-এর মূলে যে ইসলামী আদর্শ ও বৈশিষ্ট্য ছিল, তা আর বর্ত্তমানে চল্‌বে না। অর্থাৎ ও সব বাদ দিয়ে সাহিত্য-সৃষ্টি ক'রতে হ'বে। কি উদ্ভট উক্তি! অতীত কালের কুক্ষিগত হওয়ার একমাত্র অজুহাতে মানবের চিরন্তন আদর্শ ও লক্ষ্যগুলিকেও কি এমনি ভাবে পদদলিত ক'রে ফেল্‌তে হ'বে? আমার প্রবন্ধে দেখান হয়েছিল—কোরাণের আদর্শেই Semetic Culture-এর গতিপথ নিয়ন্ত্রিত হয়েছিল, অর্থাৎ তার মধ্যে 'দীন' ও 'দুনিয়া' দুইই ছিল। কাজেই Semetic Culture-এর আদর্শ যদি এখন না চলে, তবে বুঝ্‌তে হ'বে কোরাণের আদর্শই আর এখন চল্‌বে না! তা হ'তে পারে, কোরাণ সেই তের শ বছর আগেকার মান্ধাতার আমলের বাণী ত! ও "ভূত" ঘাড়ে না চাপে, সেই ভাল! ধর্ম্মাদর্শ যায় যাবে, সাহিত্য ত বেঁচে থাক্‌বে!

তারপর আর একস্থানে লেখক বলছেন--ভবিষ্যতের culture বর্ত্তমান cultureএর forward step হইবে—b ckward step নহে।" এ অযাচিত সতর্কবাণীর সার্থকতা কোথায়? কে বলেছে লেখককে যে ভবিষ্যৎ culture বর্ত্তমান cnltureএর backward stepই হ'বে? আমার প্রবন্ধে এ কথা পরিষ্কার ভাবেই বলা হইয়াছে যে—

"আমাদের লক্ষ্য অনেক উচ্চে। এবার আর Hellenic culture নয়—এবার world culture বা জগতের সমগ্র জ্ঞান সাধনার উপরে আমাদিগকে মুন্সীয়ানা করিতে হইবে। যেখানে যেটুকু বিকৃতি ও বিচ্যুতি ঘটিয়াছে, তাহা আমাদিগকেই পূরণ করিতে হইবে।...... এমনি করিয়া একদিন ইসলাম এই পাশ্চাত্য সভ্যতাকে গ্রাস করিয়া ফেলিবে এবং উভয়ের পরস্পর সম্মিলনে এক অভিনব ইসলামী সভ্যতা গড়িয়া উঠিবে।"

অতএব স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে, লেখকের সমগ্র প্রবন্ধটাই অন্তঃসার শূন্য। বিশ্লেষণের ফলে এইটুকুই শেষকালে পাওয়া যাচ্ছে যে ধর্ম্ম বা নীতিকে তিনি সাহিত্যে স্থান দিতে নারাজ। সাহিত্যে ইসলামী আদর্শ বা ধ্যান-ধারণা ঢুকালে তা কখনও বিশ্ব-সাহিত্যে আসন পাবে না, তা হ'বে একটা সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িক সাহিত্য। আর "অতীতের ভূত যে পর্য্যন্ত না আমাদের ঘাড় হইতে নামিয়া যাইতেছে, ততদিন আমাদের এই অভিশপ্ত জীবনের ভার বহন করিয়া চলিতেই হইবে।" কিন্তু সুখের বিষয়, লেখক এই নিরাশার

(১) এইখানে আমি "গায়ে পড়ে ঝগড়া বাধানো" গোছের করছি। লেখক স্পষ্টাক্ষরে কাহারো নামোল্লেখ না করলেও আমার সেই প্রবন্ধকে লক্ষ্য করেই যে উপরোক্ত কথাগুলি বলেছেন, তা বিশ্বাস করবার আমার যথেষ্ট কারণ আছে। তর্কের খাতিরে যদি তিনি এটা অস্বীকারও করেন তবে আমার Challenge এই—তিনি "এই শ্রেণীর সাহিত্যিক"দের দুই একজনের নামোল্লেখ করুন, অথবা কাহারও লেখা থেকে নজির উদ্ধৃত করে তাঁর উক্তির সমর্থন করুন। —লেখক

মধ্যেও আশার আলোক দেখতে পেয়েছেন, কেননা "মুসলমান সমাজেও স্বাধীন চিন্তার স্ফুরণ" দেখা দিয়েছে। "মুসলমান সৃষ্ট সাহিত্যেও এই স্বাধীন চিন্তার আলোক স্পর্শ করিয়াছে।" দেখা যাক, এই আলোকে কোন নূতন বিশ্ব-সাহিত্য গড়ে ওঠে!

আমরা গোঁড়ামী বা অন্ধ অনুকরণ প্রিয়তাকে মোটেই পছন্দ করি না। সেগুলি নিশ্চয়ই দোষের। স্বাধীন চিন্তার স্ফুরণ হওয়া যে নিতান্তই দরকার, তাও মানি; কিন্তু তাই বলে স্বাধীনতার নামে উচ্ছৃঙ্খলতাকে ত মান্‌তে পারি না! ধর্ম্ম, নীতি ও জাতীয় আদর্শ সম্বন্ধে কোন সাহিত্যিককে সজাগ হ'তে বল্লেই যে সেটা একটা ঘোরতর চিন্তার বন্ধন ব'লে মনে করতে হবে; ইস্‌লামী বিশিষ্টতাকে সাহিত্যে ফুটিয়ে তুল্‌তে গেলেই যে সেটা একটা অস্পৃশ্য সাম্প্রদায়িক সাহিত্য হ'য়ে দাঁড়াবে,—স্বাধীন চিন্তার ফল যদি এমনই হয়, তবে চিন্তার পক্ষে এর চেয়ে বড় বন্ধন ও বড় অভিশাপ আর হ'তে পারে না। যে কোন সাহিত্য সম্বন্ধে চিন্তা ক'রে দেখ্‌লেই দেখ্‌তে পাওয়া যায়—বিশ্বসাহিত্যের সমস্ত স্রষ্টাই নিজ নিজ জাতীয় বৈশিষ্ট্য, ভাব ও আদর্শকে বজায় রেখেই সাহিত্য-সৃষ্টি করেছেন, এবং সেই "সাম্প্রদায়িক" সাহিত্যই বিশ্বসাহিত্যরূপে পরিগৃহীত হ'য়েছে। মিল্‌টন, সেকস্‌পিয়ার, হাফেজ, রুমী—কাকে রেখে কাকে উল্লেখ ক'রব? রবীন্দ্র নাথের বিশ্ব-সাহিত্য সম্বন্ধেও ঐ একই কথা। বস্তুতঃ বিশ্ব-সাহিত্যের স্বরূপ ও প্রকৃতিই এই। বিশ্ব-সাহিত্য মানে নূতন কোন অশ্বডিম্ব নয়। আকাশ থেকেও তা মাটিতে পড়ে না। একটা বিশিষ্টরূপ নিয়েই তাকে আবির্ভূত হ'তে হয়।

যে "তাজমহল" যুগে যুগে সকল জাতির, সকল দেশের—ভক্তি, বিস্ময় ও গৌরবের পাত্র হ'য়ে আকাশে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে, কে না জানে তাহা মুসলমানের দান? বিশ্বের শাশ্বত যে প্রেম, তাহা মুসলমানের হাতে ইসলামী রূপ ও বিশিষ্টতা নিয়েই জগতে আত্মপ্রকাশ ক'রেছে, কিন্তু কই, সেজন্য ত তা'কে কেহ সাম্প্রদায়িক ব'লে মনে করে না! সকলের অন্তরেই সে যে সমানভাবে আসন পেয়েছে! তাজমহলে যদি মুসলমানের লজ্জা বা অগৌরবের কোন কিছু না থাকে, তাজমহলকে যদি সারা-জগতের লোক আদর ক'রে গ্রহণ করতে পারে, তবে ইসলামী সাহিত্যকে কেন না ক'রবে—যদি তা আমরা দিবার মত দিতে পারি? আমরা সাহিত্যের সেই তাজমহলই গড়্‌তে চাই।

---

# নও-জামানার গান

[ গোলাম মোস্তফা ]

তোরা শুন্‌তে কি পাস্ দূর পথে ওই নও-জমানার গান।
কা'রা আস্‌ছে দেখ্ ওই বাজিয়ে ভেরী-দুন্দুভি-বিষাণ ॥

তাদের হস্তে নূরের ঢাল-তলোয়ার, শীর্ষে উজল তাজ
তা'রা উড়িয়ে দেছে আস্‌মানে আল্-হেলাল্-নিশান ॥

তা'রা অন্ধকারের কাট্‌ছে মাথা সেই তলোয়ারে
আর বাঁধন কেটে মুক্ত ক'রে দিচ্ছে সবার প্রাণ ॥

চির শান্তি-সেনার দল যে তারা—মুক্ত-পিয়াসী।
এবার বিশ্ব-ধরায় আন্‌ছে তারা বিজয়-অভিযান ॥

যদি যোগ দিবি সেই বিশ্বজয়ী মুক্তি-জেহাদে
তবে সাজ ক'রে আজ চল্‌রে ছুটে বঙ্গ-মুসলমান ॥

# যিজ্য়া

( রেজাউল করিম )

( ৩ )

মুসলমানগণ ভিন্নদেশ অধিকার করিয়া তথাকার অধিবাসীদের ( জিম্মী ) প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিয়াছিল তাহা পূর্ব্বেই কতক কতক উল্লিখিত হইয়াছে। যখনই মুসলমান কোন দেশ অধিকার করিয়াছে, তথাকার অধিবাসিদের প্রতি সদ্ব্যবহার করিবার জন্যই যেন স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া তাহাদের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব-ভার তাহারা নিজ স্কন্ধে গ্রহণ করিয়াছিল। শুধু রক্ষা করিবার ভার গ্রহণ করিয়াই ক্ষান্ত থাকে নাই, যাহাতে কোন কর্ম্মচারী তাহাদের প্রতি অসদ্ব্যবহার না করিতে পারে তজ্জন্য কঠোর ব্যবস্থাও প্রবর্ত্তিত ছিল। জিম্মীদিগকে সর্ব্ববিধ আপদ বিপদ হইতে রক্ষা করিবার জন্য তাঁহারা সর্ব্বদাই বিশেষ চেষ্টা করিতেন। দেশে শান্তিরক্ষা করিতে হইলে, সৈন্যের বিশেষ প্রয়োজন। সৈন্য দেশ রক্ষা করে, দেশের অন্তর্বিপ্লব দমন করে, তাহারা আপন আপন বুকের রক্ত পাত করিয়া স্বদেশের গৌরব রক্ষা করে। দেশে সর্ব্বদা Standing army না থাকিলে, দেশ বিদ্রোহ বিপ্লবের লীলা নিকেতন হইয়া উঠে। সেই জন্য সকল দেশের রাজনীতিবিদগণ, রক্ষী সৈন্যের সমর্থন করিয়া থাকেন।

সুতরাং মুসলমানগণ যখন বিভিন্ন প্রদেশে রাজ্য বিস্তার করিয়াছিলেন, তখন দেশ রক্ষার জন্য সৈন্য পোষণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। কিন্তু অর্থ ও প্রজাগণের সমবেত সাহায্য ব্যতিরেকে এই বিরাট বাহিনী কোথা হইতে সংগ্রহ করিবেন? যদি মুসলমান শাসকবর্গ আইন পাস করিয়া প্রত্যেক জাতিকে সৈন্য শ্রেণীভুক্ত হইতে বাধ্য করিতেন, তাহা হইলে প্রজাগণ কি তাহাতে সন্তুষ্ট হইতে পারিত? বিজিত জাতি ইহাকে অত্যাচার মূলক কঠোর আইন বলিয়া মনে করিত। এ যুগের কুটিলমতি রাজনীতিকগণ মুসলমানের এই উদার ব্যবহারের মধ্যে কূটনীতির গন্ধ পাইয়া নাসিকা কুঞ্চিত করিতে পারেন। কিন্তু মুসলমান সরলচিত্তে উদার নীতি অবলম্বন করিয়া প্রত্যেক বিজিত জাতিকে সৈন্য শ্রেণীভুক্ত হইতে বাধ্য করেন নাই! পক্ষান্তরে তাহাদের সৈন্য শ্রেণীভুক্ত হইতে কোন বাধাও ছিল না। এই কার্য্যে প্রত্যেক অমুসলমান সাদরে গৃহীত হইত! একথাও এখানে বিশেষ ভাবে স্মরণ রাখিতে হইবে।

অতএব বিজিত দেশবাসীকে সকল প্রকার আপদ বিপদের শঙ্কা হইতে রক্ষা করিবার ভার পড়িল মুসলমানদের উপর। মুসলমান বাদশাহ ও খলিফাগণ, প্রত্যেক মুসলমানের জন্য বাধ্যতামূলক সামরিক শিক্ষা প্রবর্ত্তিত করিলেন, ফলে প্রত্যেক বয়ঃপ্রাপ্ত মুসলমান যুবক, সৈন্য শ্রেণীভুক্ত বলিয়া গণ্য হইল। এই সার্ব্বজনীন সামরিক বিধান হইতে কোন মুসলমানের অব্যাহতি পাইবার উপায় ছিল না। এক্ষণে আমরা ন্যায় ও সত্যের খাতিরে বলিতে পারি যে, যেখানে রাজ্য রক্ষার জন্য এক শ্রেণীর প্রজা যুদ্ধক্ষেত্রে বুকের রক্ত ঢালিয়া দিত, সেক্ষেত্রে অসামরিক প্রজার নিকট এই রক্তের বিনিময়ে করস্বরূপ কিঞ্চিৎ অর্থ আদায় করা আদৌ অসমীচীন হয় নাই। এরূপ সাহায্য না করিলে বরং ভিন্নধর্ম্মাবলম্বীদের পক্ষে অন্যায় হইত, ন্যায় ও সত্যের মর্য্যাদা লঙ্ঘিত হইত। এই প্রকারে, যুদ্ধকার্য্য হইতে অব্যাহতি প্রাপ্ত আশ্রিত ( জিম্মী ) প্রজার নিকট যে কর আদায় করা হইত ইতিহাসে তাহাই জিজিয়া নামে অভিহিত। এইরূপে রাষ্ট্রের জন্য যে সকল প্রজা যুদ্ধক্ষেত্রে দেহের রক্তপাত করিয়া সাহায্য করিতে বাধ্য হইত না, কেবলমাত্র তাহাদেরই নিকট হইতে এই কর আদায় করা হইত।

এরূপ অবস্থায় যিজয়ার নাম শুনিয়া ভীত হইবার কোন কারণ নাই। উহা একটা সামরিক কর মাত্র। যুদ্ধকার্য্যের ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য এই কর সেই সকল অমুসলমান প্রজার নিকট আদায় করা হইত, তাহারা রাষ্ট্রের নিরাপদতার জন্য অন্য কোন প্রকারে সাহায্য করিত না। মুসলমান রাজারা অমুসলমান প্রজাদিগকে যুদ্ধের কঠোর দায়িত্ব হইতে অব্যাহতি দিয়াছিলেন, সুতরাং প্রাণের বিনিময়ে তাহাদিগের নিকট যুদ্ধের সাহায্য বাবদ করস্বরূপ কিছু অর্থ আদায় করা মোটেই অন্যায় নহে। এই উদ্দেশ্যেই অমুসলমান প্রজার উপর যিজয়া কর প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। যিজয়া যে সামরিক কর ভিন্ন অন্য কোন ভয়াবহ কর ছিল না, তাহা প্রমাণ করিবার জন্য বিশেষ কোন গভীর গবেষণার প্রয়োজন নাই। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, অমুসলমান প্রজাদের সৈন্য শ্রেণীভুক্ত হইতেও কোন বাধা ছিল না, তাহারা ইচ্ছা করিলেই সৈনিকের ব্রত গ্রহণ করিতে পারিত। এইরূপে যদি কোন অমুসলমান, সৈন্য শ্রেণীভুক্ত হইত, তাহা হইলে সঙ্গে সঙ্গে তাহাকে যিজয়া হইতে অব্যাহতি প্রদান করা হইত। অনেক অমুসলমান প্রজা নির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্য সামরিক দায়িত্ব গ্রহণ করিত, তাহাদিগকেও সেই সময়ের জন্য যিজয়া হইতে অব্যাহতি দেওয়া হইত। যিজয়া যে সর্ব্বব্যাপক এবং সম্মানের হানিজনক কোন কর ছিলনা তাহা প্রমাণিত করিবার জন্য ইহা অপেক্ষা জাজ্বল্যমান প্রমাণ আর কি হইতে পারে?

সিরিয়া বিজয়ের সময় মুসলিম সেনাপতি আবু ওবায়দায় এই যিজয়া আদায় উপলক্ষে তথাকার অমুসলমানদের প্রতি যে অপূর্ব্ব মহানুভবতার পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন, তাহার তুলনা জগতের ইতিহাসে খুবই বিরল। হজরত আবু ওবায়দা সিরিয়া প্রদেশের বিভিন্ন নগর অধিকার করিয়া, ইসলামী প্রথামত উল্লিখিতরূপে বিজিত প্রজার নিকট হইতে যিজয়া কর আদায় করিয়াছিলেন। এইরূপে বহু লক্ষ মুদ্রা সংগৃহীত হইয়াছিল। কিন্তু ইতিমধ্যে তথায় অধিক সংখ্যক রোমান সৈন্য আসিয়া পড়ায়, মুসলমানগণ আপনাদিগের বিজয় সম্বন্ধে সন্দিহান হইলেন। বিজিত প্রজাকে রক্ষা করিবেন বলিয়া যে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন, তাহা পূরণ করা এখন হয়ত সম্ভব হইবে না। সুতরাং সেনাপতি অবিলম্বে আদেশ প্রচার করিলেন:—জিম্মীদের নিকট যিজয়া স্বরূপ যে কর আদায় করা হইয়াছে তাহা সমুদয় প্রত্যর্পণ করা হউক। বলা বাহুল্য, বিনা বাক্যব্যয়ে এই আদেশ প্রতিপালিত হইল। য়িহুদী ও খৃষ্টানগণ মুসলমানগণের এই অপ্রত্যাশিত উদারতা দেখিয়া বিস্ময়ে অভিভূত হইল।

হজরত ওমর বিভিন্ন দেশের মুসলমান শাসনকর্ত্তার নামে যে সকল ফরমান প্রেরণ করিয়াছিলেন, তাহাতে স্পষ্ট লেখা ছিল যে যিজয়া সামরিক কর মাত্র। তিনি একদা এরাকের শাসনকর্ত্তার নামে আর একটি ফরমান পাঠাইয়াছিলেন, তাহাতে লিখিত ছিল—যাহাদের নিকট দৈহিক সামরিক সাহায্য গ্রহণ করিবে, খবরদার তাহাদিগের নিকট যিজয়া কর আদায় করিও না। তাঁহার সহিত, আরমেনিয়াবাসীদের যে চুক্তি হয় তাহাতে তিনি লিখিয়া দিয়াছিলেন যে, আরমেনিয়ানগণ মুসলমানগণকে সামরিক সাহায্য করিবে, সুতরাং তাহারা যিজয়া হইতে মুক্তি পাইবে।

এরূপ উদারতার দৃষ্টান্ত কেবল যে শুধু হজরত ওমরের সময় ঘটিয়াছিল তাহা নহে, তাঁহার পরবর্ত্তী যুগেও মুসলমান খলিফাগণ এইরূপে সামরিককরভাবেই যিজয়া আদায় করিয়াছিলেন। হজরত ওছমানের সময়, হবিব এবনে মোসলেমা, **জরাজেমা** সম্প্রদায়ের লোকের উপর যুদ্ধে জয়লাভ করেন। তৎসন্নিহিত অন্যান্য সম্প্রদায়ের নিকট যিজিয়া কর আদায় করা হইত, কিন্তু উক্ত বংশের সমুদয় লোক স্বেচ্ছায় মোসলিম সৈন্যবাহিনীতে প্রবেশ করায় তাহারা অনায়াসে যিজয়া হইতে অব্যাহতি প্রাপ্ত হয়! ফলতঃ যে কোন প্রদেশে মুসলমানগণ রাজ্য বিস্তার করিয়াছে, তাহারা সেই প্রদেশের অমুসলমান প্রজার উপর সামরিক সাহায্যের বিনিময়ে যিজিয়া কর প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। এমন কি কোন কোন সম্প্রাদায়ের লোক কেবলমাত্র এক বৎসরের জন্য সামরিক সাহায্য করিয়াছে, তাহাদিগকে সেই এক বৎসরের জন্য যিজিয়া হইতে অব্যাহতি দেওয়া হইয়াছিল।

এই সকল ঘটনা হইতে স্পষ্ট প্রতিপন্ন হইতেছে যে, যিজিয়া সামরিক কর মাত্র; যিজিয়ার নামের সহিত যে বিভীষিকার ভাব জড়িত আছে তাহা অমূলক অপবাদ মাত্র। তাহাতে আদৌ কোন সত্য নিহিত নাই। মুসলমান বুকের রক্ত দিয়া রাজ্য রক্ষা করিত, অমুসলমানগণ অর্থ সাহায্য

দ্বারা সেই কার্য্যে সহায়তা করিত, ইহার মধ্যে ভীতি বিভীষিকার কারণ ত কিছুই থাকিতে পারে না। প্রথম প্রথম এই কর ব্যাপক ভাবে প্রচলিত হয় নাই! কারণ কর দিবার ভয়ে অনেকেই সৈন্যশ্রেণীতে নাম লিখাইত। ইংলণ্ডে যে ফিউডাল প্রথা প্রচলিত ছিল, তদনুসারে প্রত্যেক ফিউডাল প্রজাকে বাধ্য হইয়া সামরিক সাহায্য করিতে হইত। দ্বিতীয় হেনরী Scutage কর প্রবর্ত্তিত করিলে অনেকে স্বেচ্ছায় এই কর দিয়া দৈহিক সামরিক সাহায্য করিতে বিরত থাকিত। এইরূপে ধীরে ধীরে ইংলণ্ড হইতে ফিউডাল প্রথা উঠিয়া যায়। মুসলিম রাজ্যেও এইরূপ ভাবে সামরিক সাহায্য উঠিয়া গিয়া ব্যাপকভাবে যিজয়া কর প্রচলিত হয়।

এই সামরিক করের পরিমাণও অতি অল্প ছিল, ইহা প্রদান করিতে কোন প্রজার মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া যাওয়ার ভয় ছিল না! বরং সকলে আনন্দের সহিত এই কর প্রদান করিত। সেইজন্য যিজয়ার বিরুদ্ধে অমুসলমানদের পক্ষ হইতে কখনও কোন প্রতিবাদ হয় নাই, বা তজ্জন্য কোন বিদ্রোহ বিপ্লব সংঘটিত হয় নাই। যে যুগে গুরুতর কর ভারে পীড়িত হইয়া ইউরোপের প্রত্যেক প্রদেশের প্রজাবৃন্দ রাজশাসনের বিরুদ্ধে তুমুল আন্দোলন উত্থাপন করিয়াছিল, সেই যুগে মুসলিম রাজ্যের অমুসলমান প্রজা, কেবলমাত্র যিজয়া কর প্রদান করিয়া পরমানন্দে কালহরন করিত। যিজয়া অতি সামান্য কর তাহার maximam হইতেছে বার্ষিক ২০ টাকা। কোটিপতিকেও কোনও কালে ২০৲ টাকার অধিক দিতে হইত না। যাহাদের ধন সম্পত্তির উপর এ যুগের ন্যায় কোন প্রকার আয় কর বা অন্য কোন প্রকারের ট্যাক্স ছিল না, তাহাদিগের জন্য ঐ কুড়ি টাকা অতি সামান্য। ইহাতে তাহাদিগকে সামান্য মাত্রও বেগ পাইতে হইত না। ধনী দরিদ্রের অবস্থানুসারে এই করের আবার তারতম্য হইত, সাধারণ মধ্যবিত্তগণের নিকট বার্ষিক ছয় টাকার অধিক কর আদায় করা হইত না। বহু প্রজার নিকট আরও নিম্নতম হারে আদায় হইত। এতদ্ব্যতীত স্ত্রীলোক, বালক, বৃদ্ধ, দুর্ব্বল ক্ষীণ ও দরিদ্রদিগকে একেবারেই যিজয়া হইতে অব্যাহতি দেওয়া হইয়াছিল। এই ত সামান্য নাম মাত্র কর—তদুপরি কত শত বর্জ্জিত বিধি। এই ব্যবস্থা অনুসারে স্ত্রীলোক এবং বৃদ্ধ ও অক্ষমদিগকে বাদ দিয়া যাহারা অবশিষ্ট থাকে, তাহাদের ৬ টাকা বার্ষিক কর—বিশেষতঃ ইহাই যখন তাহাদের একমাত্র কর—তখন ইহা যে কত সামান্য তাহা সহজেই বোঝা যাইবে।



মুসলমান নৃপতিগণ যিজয়া বাবদে যে কর আদায় করিতেন, তাহা যে সামরিক কর ব্যতীত আর কিছুই ছিল না, তাহা আর একটি ঘটনা হইতে বেশ বুঝিতে পারা যায়। মুসলমান সম্রাটগণ যিজিয়ালব্ধ অর্থ অন্য কোন রাজকার্য্যে ব্যয় না করিয়া ইহার সমুদয় অংশ সামরিক কার্য্যের জন্য ব্যয় করিতেন। সৈনিকগণের পোষাক পরিচ্ছদের জন্য ইহার কিয়দংশ ব্যয়িত হইত মাত্র। সীমান্ত রক্ষার জন্য যে প্রচুর অর্থ ব্যয় হইয়া থাকে ব্রিটিশ শাসিত ভারতবাসীর তাহা অজ্ঞাত নহে। যিজিয়ার কিয়দংশ এই সীমান্ত রক্ষার কার্য্যেও ব্যয়িত হইত। এতদ্ব্যতীত পুরাতন দুর্গ এবং যুদ্ধ-বিগ্রহের কারণে যে সকল দুর্গ ভাঙ্গিয়া যাইত, যিজয়ার অর্থ সে গুলি পুনর্নির্ম্মাণের জন্য ব্যয়িত হইত। এই সকল কার্য্যের ব্যয় নির্ব্বাহের পর যদি কিছু উদ্বৃত্ত থাকিত তাহা দেশের সাধারণ শিক্ষার উন্নতির জন্য ব্যয় করা হইত।

( ৪ )

মুসলমানগণ যিজয়া কর হইতে মুক্ত ছিলেন, এবং কেবলমাত্র অমুসলমানদের নিকটই এই কর আদায় করা হইত, এই কথাটা মনের মধ্যে উদিত হইবা মাত্র এ যুগের খৃষ্টান ও হিন্দুদের প্রাণ যেন আতঙ্কে শিহরিয়া উঠে। যে উদ্দেশ্যে যিজিয়া প্রবর্ত্তিত হয় তাহা জানিতে চেষ্টা না করিয়া, তাঁহারা কেবল কতকগুলি অপবাদের বোঝা মুসলমানদের ঘাড়ে চাপাইয়াই নিশ্চিন্ত থাকেন। তাঁহারা ইহাকে ধর্ম্মগত কর মনে করেন। কিন্তু তাঁহাদের এ ধারণা নিতান্ত ভ্রান্তি মূলক। এই সামরিক করের মধ্যে মুসলমান অমুসলমান সমস্যা উঠিতেই পারে না, ইহার মধ্যে বিজাতি বিদ্বেষরূপ কোন প্রকার হীনভাব জাগিতেই পারে না। সেযুগে মুসলমান সম্রাটগণ, কর আদায় ব্যাপারে মুসলমান অমুসলমান প্রজার পার্থক্য ভাবিতেই পারেন নাই, তাঁহারা ভাবিয়াছিলেন সামরিক অসামরিক প্রজার কথা। যে প্রজা রাষ্ট্রকে সামরিক সাহায্য করিবে, সে কর হইতে অব্যাহতি পাইবে আর যে ঐরূপ সাহায্য করিবে না, তাহাকে রক্তের বিনিময়ে ঐ সামান্য কর প্রদান করিতে হইবে।

আর এক কথা, যিজিয়া প্রদানকারী প্রজা ও তাহা হইতে মুক্তি প্রাপ্ত প্রজাদিগের মধ্যে অধিকার ও স্বত্ব স্বামীত্বের ব্যাপার লইয়া কোনরূপ পার্থক্য ছিল না, সকলেই সমান অধিকার উপভোগ করিত।

এই বিংশ শতাব্দীতে সাম্য মৈত্রী ও সভ্যতার আলোকে উদ্ভাসিত যুগেও কি সুসভ্যদেশে কর আদায়ের তারতম্য নাই? যে সকল দেশে প্রজাতন্ত্র শাসন প্রণালী প্রতিষ্ঠিত আছে, প্রজার ইচ্ছায় যে সকল দেশের শাসনদণ্ড পরিচালিত হইয়া থাকে, সে দেশেও কি কর আদায় বিষয়ে কোনই তারতম্য দৃষ্টিগোচর হয় না? আজকাল সকল দেশেই আয়কর আদায় হইয়া থাকে, ইহাতে কি ধনীগণ মনে মনে সন্তুষ্ট থাকিতে পারেন? আমরা বলিতে পারি এযুগে অর্থশালী হওয়া মস্ত অপরাধ বরং দরিদ্র হইয়া থাকাই ভাল, কেননা অর্থশালী হইলেই তোমার উপর আয়কর চাপান হইবে! যিজিয়ার নামে যাঁহারা ভয়ত্রস্ত হইয়া পড়েন, তাঁহাদিগকে একবার এযুগের করের তালিকা দেখিয়া লইতে অনুরোধ করি! দোকানদার, উকিল, মোক্তার প্রভৃতি ব্যবসায়ীগণ যে ভাবে হিসাবের খাতে চুরি করিয়া আয়ের পরিমাণ অল্প করিয়া লিখিয়া থাকেন, তাহা কি ঐ ইনকম্ ট্যাক্সের ভয়ে নহে? চৌকিদারী ট্যাক্স, মিউনিসিপাল ট্যাক্স, পথকর, জলকর, ফলকর, প্রভৃতি করভারে ভারতবাসী কি প্রকারে প্রপীড়িত তাহা সকলেই জ্ঞাত আছেন, প্রত্যেক ভারতবাসীই এ বিষয়ে ভুক্তভোগী। এই সকল প্রত্যক্ষ সাক্ষ্য উপস্থিত থাকিতেও কেন যে সমালোচকগণ জিজিয়ার নামে এরূপ আঁতকাইয়া উঠেন, তাহা আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারি না।

পৃথিবীর মোসলেম রাজ্যের অপরাপর অঞ্চলের ন্যায় ভারতীয় মুসলমান নৃপতিগণও স্বীয় রাজ্যে প্রজার উপর অসামরিক যিজয়া কর প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন। এই কর পাঠানদের আমলে সর্ব্বপ্রথম প্রবর্ত্তিত হয়, সে যুগের হিন্দুগণ সামরিক সাহায্যের বদলে এই নাম মাত্র কর প্রদান করিয়া সামরিক দায়িত্ব হইতে মুক্তি পাইতেন। কয়েক শতাব্দী পর্য্যন্ত গৌরব ও স্পর্দ্ধার সহিত রাজত্ব করার পর পাঠান-শক্তি হীনবল হইয়া পড়ায়, যখন মোগল বংশ সে স্থান অধিকার করিয়া বসিল, সে সময় তাঁহারাও অসামরিক প্রজার উপর এই কর প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন। কিন্তু নানা কারণে আকবর হিন্দু প্রজার নিকট যিজয়া কর রহিত করিয়া দেন। মহামতি আকবর এই কর রহিত করিয়া এক মস্ত পলিটিকাল চাল চালিয়াছিলেন! তিনি দেখিলেন—ভারতবর্ষে পাঠানশক্তিকে সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত করিতে না পারিলে, ভবিষ্যতে শের শাহের মত অন্য কোন শক্তি সম্পন্ন পাঠান উত্থিত হইয়া আবার পাঠান রাজত্বের পত্তন করিতে পারে। সেই জন্য তিনি পাঠানশক্তিকে চূর্ণ করিবার উদ্দেশ্যে হিন্দুগণকে দলে দলে সৈন্যশ্রেণীভুক্ত করিতে লাগিলেন। বহুদিন যুদ্ধ কার্য্য হইতে অবসর প্রাপ্ত হইয়া হিন্দুদের ক্ষাত্রশক্তি নষ্ট হইতে বসিয়াছিল, তাহারা দেখিল—আবার হীনবীর্য্য জাতির মধ্যে তেজ ও উদ্দীপনার প্রবাহ বহাইয়া দিবার এই উপযুক্ত অবসর। সুতরাং তাহারা স্বেচ্ছায় দলে দলে আকবরের সৈন্য-শ্রেণীভুক্ত হইতে লাগিল। এইরূপে মোগলবাহিনী লক্ষ লক্ষ হিন্দু সৈন্যে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। সুতরাং আকবরের সময় অসামরিক প্রজা কেহই রহিল না, অতএব যিজয়ারও কোন আবশ্যকতা রহিলনা। তিনি যিজয়া কর রহিত করিয়া দিলেন। আকবরের উদারতা ও মহত্ব দেখাইবার জন্য অনেক হিন্দু লেখক বলিয়া থাকেন তিনি যিজয়া কর রহিত করিয়া দেন, কিন্তু "রহিত" বলিলে ঠিক কথা বলা হইল না। বরং ইহাই বলা উচিত যে, আকবরের সময় প্রত্যেক অমুসলমান প্রজাকেই দৈহিক সামরিক সাহায্য করিতে হইত বলিয়া যিজয়ার কোন প্রয়োজন হয় নাই। সম্রাট জাহাঙ্গীর ও শাহ্‌জাহান, আকবরের নীতি অনুসরণ করিয়াই চলিতেন, সুতরাং তাঁহাদের সময় হিন্দুগণ পূরা দস্তর ভাবে সৈন্য শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত ছিল, তাই তাহাদিগের উপর যিজয়া কর প্রবর্ত্তিত করিবার প্রয়োজন হয় নাই।

সম্রাট আকবর, ও জাহাঙ্গীরের শিথিলতায় ভারতবর্ষে মোসলেম রাজ্যে হিন্দু আধিপত্য অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠিল। তাঁহাদের কুটিল কৌশলে ইতঃপূর্ব্বেই পাঠানশক্তি চূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। রাজ্যমধ্যে শক্তিশালী পাঠান মুসলমানগণের বিলোপ ঘটায় হিন্দুগণ সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়া উঠিলেন। এমনকি তাঁহাদের অনেকে গুপ্তভাবে ষড়যন্ত্র করিয়া মোসলেম রাজ্য ধ্বংস করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। মহামতি আওরঙ্গজেব সিংহাসনে আরোহণ করিয়া মোসলেম রাজ্যের এই শোচনীয় পরিণতি দেখিয়া ভয়াকুল হইয়া পড়িলেন।

তাঁহার তীক্ষ্ণদৃষ্টি ও দূরদর্শিতা তাঁহাকে স্পষ্টতঃ জানাইয়া দিল যে, এই অবস্থার প্রতিকার না করিলে অচিরে ভারত হইতে মোসলেম জাতির অস্তিত্ব বিলীন হইয়া যাইবে। মুসলমান ভারত হইতে চিরকালের মত নির্ম্মূল হইয়া যাইবে। তাই এই শোচনীয় অবস্থার প্রতিকার মানসে, তিনি অবহেলিত ও পদদলিত পাঠান শক্তির মধ্যে নবজাগরণের সঞ্চার করিয়া দিবার জন্য তাহাদিগকে সামরিক কার্য্যে নিযুক্ত করিলেন। প্রথমতঃ পাঠানদিগকে আসিতে দেখিয়া হিন্দুরা ক্রমে ক্রমে সরিয়া দাঁড়াইতে লাগিল; তাহার পর যাহারা থাকিল, তাহাদের অনেকেই বিশ্বাসঘাতকতার সুযোগের অপেক্ষা করিতেছিল মাত্র।

নিয়ম অনুসারে যে মুহূর্ত্তে হিন্দুগণ সামরিক কার্য্য হইতে অপসারিত হইল, সেই মুহূর্ত্তেই তাহাদের জন্য জিজয়া প্রদান অপরিহার্য্য হইয়া পড়িল। তাই আওরঙ্গজেব হিন্দু প্রজার উপর জিজিয়া কর প্রবর্ত্তিত করিলেন। তিনি শুধু হিন্দুর নিকট হইতে জিজিয়া আদায় করিয়াই ক্ষান্ত থাকিতেন না, মুসলমানের নিকট তিনি কঠোর ভাবে জাকাত, সদকা আদায় করিয়া সাধারণ ভাণ্ডারে জমা রাখিতেন। ইহা ছাড়া জিজয়ার অন্যান্য নিয়মাদির প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া কর আদায় করিতেন। আওরঙ্গজেব কি অবস্থায় পতিত হইয়া জিজিয়া কর প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন তাহা আমরা দেখাইলাম। যে যুক্তি ও সত্যনিষ্ঠার উপর নির্ভর করিয়া প্রাথমিক যুগের মুসলমানগণ স্বরাজ্যস্থ খৃষ্টান য়িহুদী প্রভৃতি অমুসলমানগণের উপর জিজয়া কর প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন, রাজর্ষি আওরঙ্গজেব সেই আদর্শ হইতে বিচ্যুত হন নাই, তিনিও সেই সত্যনিষ্ঠার অনুরোধে ভারতীয় হিন্দু প্রজার উপর জিজয়া প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন। রাজ্যস্থিত হিন্দুগণের ষড়যন্ত্রজাল হইতে মুসলিম শক্তিকে রক্ষা করিবার জন্য তিনি যদি হিন্দুকে ধীরে ধীরে সামরিক কার্য্য হইতে অবসর দিয়াই থাকেন, তাহাও ন্যায় নীতির অননুমোদনীয় কার্য্য হইতে পারে না। আওরঙ্গজেবের এই কার্য্য ন্যায় কি অন্যায় হইয়াছিল তাহার উত্তর আমরা দিব না—জগতের ইতিহাস তাহার উত্তর প্রদান করিবে। জগতের ইতিহাস হইতে যথার্থ প্রত্যুত্তর পাইয়াও যদি হিন্দুগণ আওরঙ্গজেবের উপর দোষারোপ করেন—তাহা হইলে আমরা নাচার —আমাদের বলিবার আর কোন কথা নাই।

আশা করি, আমাদের হিন্দু ভ্রাতৃগণ জিজয়া সম্বন্ধে যে ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করেন তাহা অন্তর হইতে বিদূরিত করিয়া দিবেন। তাঁহারা মুসলমানদের সম্বন্ধে এই প্রকার আরও অনেক অমূলক অপবাদ রটনা করিয়া থাকেন —যতদিন এই অমূলক ধারণা সমূহ তাঁহাদের অন্তর হইতে অন্তর্হিত না হইবে, ততদিন উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে বিদ্বেষ-বর্জ্জিত সত্যিকারের মিলন প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না।

---

# বিদায়-হজ্জ্

[ আবুল হাশেম বি, এ, ]

"লা শরীক তুমি, অখিলের স্বামী
আল্লাহ্ দয়াময়,"
হজরত কহে গভীর কণ্ঠে
"প্রভুগো তোমার জয়"
আরবের মাঠ মুক্ত গগন,
দীপ্ত তপন শান্ত পবন,
লক্ষ হৃদয় মুগ্ধ মগন—
শুনি সে বচন চয়।

কত দিন কত মাস, ক্ষণ কত,
দীর্ঘ বরষ পরে,
পরবাসী পুনঃ এসেছে ফিরিয়া
জন্মভূমির ক্রোড়ে;
এনেছে বহিয়া সম্পদ তার,
শেষ বিদায়ের সওগাত ভার,
ভুলে অপমান দিতে উপহার
বিশ্ব মানব করে।

হেথায় মিলেছে দিশি দিশি হ'তে
বিপুল মানব ধারা—
শত তটিনীর সঞ্চিত নীর
মহা বারিধির পারা;
নাহি হুঙ্কার, নাহি তাণ্ডব,
শান্ত মুগ্ধ স্তব্ধ নীরব;
নত হ'য়ে যত বিদ্রোহী ঢেউ
জল হ'য়ে গেছে হারা।

শুধু আনছার মহাজেরীনের
নহে আজি সমাবেশ,
মহা মানবের মহা আহ্বানে—
মেতেছে সকল দেশ ;
যে জন মাথায় হানিল কৃপাণ,
যে করিল পথে কণ্টক দান,
এ মিলন হ'তে তারো সন্তান
রহে নাই অবশেষ !

সম্বোধে নবী অম্বুধি সম
"হে প্রিয় মুছ্‌লেমীন,
মহা পবিত্র এই জ্বিল হজ্জ্‌
এই স্থান এই দিন ;
হেথায় শুদ্ধ অযুত পরাণ
কামনা করে না সম্পদ মান,
সংযত কোষে বদ্ধ কৃপাণ
রক্ত পিয়াসা হীন।

নিদেশ আমার গেঁথে লও মনে—
এই ধরণীর পরে
অপরের মান, অর্থ, রুধির
হারাম সবার তরে ;
নিঠুর কুসীদ ব্যভিচার স্রোত,
চরণের তলে করিলাম রোধ,
করিলাম রোধ রক্তের শোধ
বংশ পরম্পরে।

আল্লার ডাকে যাইব যখন,
যেন তোমাদের হাতে
করোনা মলিন এ "দীন্" আমার
ভ্রাতৃ রক্ত পাতে ;
সাবধান সবে ! সেই মহাক্ষণ
দাঁড়ায়ে যে দিন বিভুর সদন,
পিতার পুণ্য মুক্তির লাগি
যাবে না পুত্র সাথে।

চরণে দলিনু অন্ধ যুগের
বংশ-অহঙ্কার,
ভাই ভাই মিলি মুছলিম যত
এক মহা পরিবার ;
নাহি ভেদাভেদ আজমী আরবী,
এক আদমের সন্তান সবি,—
ধূলায় রচিত আদম তনয়
গৌরব কিবা তার ?

নহে সে শরীফ আছে শুধু যার
বংশের পরিচয়,
সেই আশরাফ—জীবন যাহার
পুণ্য প্রভাব ময় ;
হাবশীও যদি সত্যের পথে
বরণীয় হয়, তবু এ জগতে
তারি নির্দ্দেশ নত মস্তকে
মানিবে সুনিশ্চয়।

বন্ধুবা মোর সাবধান সব,
দাস ! তোমাদের দাস !!
যে আহার তব তাই তারে দিও,
দিও তারে তব বাস ;
দিওনা তাহারে, দিওনা যে ভার
বহিতে শকতি নাহিক তাহার,
সেও মুছলিম ভাই যে তোমার,
লহ তারে নিজ পাশ।

সাবধান ভাই, সাবধান সব !
নারী ! তোমাদের নারী !!
পুণ্য শপথে বরিয়া লয়েছ
মহাদান বিধাতারি ;
তাহাদের প্রতি তোমা সবাকার
দিয়েছে বিধাতা যেই অধিকার
তোমাদেরো পরে সেই অধিকারে
তাহারাও অধিকারী।

তোমাদের কাছে রেখে গেনু আজি
দুটী মহা উপহার—
বিধাতার মহা মঙ্গল বাণী,
মম উপদেশ আর ;
যত দিন সবে পরম আদরে
আকড়ি রাখিবে ধরি দুই করে
হারাবেনা পথ ঝঞ্ঝা ও ঝড়ে,
সংসার-সাহারার।

"বল ভাই সবে, আল্লার বাণী
শুনায়েছি আমি সব ?"
"শুনায়েছ তুমি," "শুনায়েছ নবী"
চারিদিকে কলরব
"করেছি সে সব ?" সুধাল আবার—
"যাহা কিছু মোর ছিল করিবার" ?"
"করেছ" "করেছ" ধ্বনি চারি ধার
উঠিল কণ্ঠ রব।

বদনে ভাতিল হর্ষ আলোক,
নয়নে ঝরিল লোর,—
"অন্তর্য্যামি! সাক্ষী রহিও"
কহে করি করযোড়।
ধীরে আঁখি মেলি জনতার পানে
কহিল "যাহারা আছ এইখানে
যারা নাই যেন তাহাদের স্থানে
দিও এ বচন মোর।

হয়তো জীবনে হজের ভাগ্য
আসিবে না ফিরে পুনঃ,
কবে বিধাতার আহ্বান হবে
নাহি তার নিরূপণ!
স্মরণ রাখিও নিদেশ আমার
ইহাই আমার যাছিল দিবার
চির বিদায়ের শেষ উপহার,
বিদায়, বন্ধুগণ!"

# কবির সমাধি

( গল্প )

[ জাহিদুল হুসাঈন ]

শওকতুল মজিদ বিবাহ করিয়া সস্ত্রীক তালতলার একটা ভাড়াটে বাড়ীতে আসিয়া উঠিল। বাড়ীতে একটী ঝি ছাড়া আর চতুর্থ প্রাণী কেহ ছিল না। একটী নিরঙ্কুশ নির্জ্জনতা প্রেম-উন্মুখ এই দুই প্রাণীর চারিদিকে পুষ্প-গন্ধময় দক্ষিণ বায়ুর মত ঘিরিয়াছিল। সেই নির্জ্জনতার রসে মজিদের প্রেম শতদলের মত ফুটিয়া উঠিতেছিল, আর নব-পরিণীতা পত্নী মজিদা খাতুন সেই প্রেমময় অবকাশকে আপনার কবি-কল্পনা দিয়া ভরিয়া তুলিতেছিল। মজিদা খাতুন ত্রিপুরার লাকসাম-অঞ্চলের এক জমিদারের কন্যা; সুন্দরী এবং হাল্-ফ্যাশানে বস্ত্র পরিধানে অভ্যস্তা। তাঁহার মাতা, পিতামহীরা উর্দ্দু-সাহিত্যের সমজদার পাঠিকা, কিন্তু সেই মহলে পরিবর্দ্ধিতা হইয়াও তিনি বাংলা সাহিত্যের প্রতি বেজায় ঝুকিয়া পড়িয়াছেন এবং বিবাহের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত যেসব কবিতা বিভিন্ন মাসিকে প্রকাশিত করিয়াছেন, তাহাতে বাঙ্গালা-সাহিত্যমহলে একটা জল্পনা-কল্পনা চলিতেছিল যে, অচির ভবিষ্যতে বাংলা সাহিত্যে তাঁহার কাব্য-প্রতিভা শতদলের মত বিকশিত হইয়া উঠিবে। এত উজ্জ্বল যাহার ভবিষ্যত, তাহার সাধনায় যদি হঠাৎ বাধা পড়িয়া যায়, তাহা হইলে তাহার মনে যে কি বেদনার সঞ্চার হয়, তাহা অপরকে বুঝাইবার উপায় নাই।

বিবাহের দরুণ যে তাঁহার সাধনায় বাধা পড়িয়াছে, একথা বলা যায় না; কেননা বিবাহের পরও যে-কয়টি কবিতা লিখিয়াছেন, সেগুলি পূর্ব্বের কবিতা চেয়ে ভালই হইয়াছে; তবে বাধা যদি কিছু পড়িয়া থাকে, সে স্বামীর দ্বারা। স্বামী বিবাহ করিয়াছেন প্রেমময়ী রমণীকে—কবিকে নয়। যৌবন চাহে যৌবন;—কবিতা নয়। প্রেমের আবেগে যৌবন তাহারই উপর খড়্গহস্ত হইয়া উঠে, যে প্রিয়তমার উপর ছায়া বিস্তার করিতে আসে। প্রেম সতীন সহিতে পারে না।

মজিদা খাতুন যখন স্ত্রীরূপে শওকতুল মজিদের গৃহে প্রবেশ করেন তখন কবিতার খাতাটা তোরঙ্গের তলায় কাপড় চোপড়ের নীচে নিদ্রা যাইতেছিল। প্রেমের এই গুপ্ত ঘাতক-টির খবর শওকতুল জানিত না। কিন্তু এক দুর্ভাগ্য মুহূর্ত্তে তোরঙ্গের তলা হইতে কবিতার খাতাটি যখন টেবিলের উপর উঠিয়া আসিল, তখন হইতে দুইটি প্রাণের মাঝখানে একটা কালো যবনিকা ধীরে ধীরে পড়িতে লাগিল।

যৌবনের প্রেম বড় একাগ্র, সে যাহাকে চায় তাহাকে পরিপূর্ণ রূপে চায়। সকল চিন্তায়, সকল কাজে, সকল ধ্যানে, সে অণুতে অণু হইয়া মিশিয়া থাকিতে চায়। মজিদার মন যে তাহাকে ছাড়িয়া কোন্ অশরীরী কল্পনার রাজ্যে ঘুরিয়া বেড়াইবে—সেখানে যে শওকতের কোনও প্রবেশাধিকার থাকিবে না—এই চিন্তা শওকতের মনকে চঞ্চল করিয়া তুলিল। মজিদাকে কবিতা লিখিতে দেখিলেই শওকতের মনে এক অশরীরী প্রতিদ্বন্দ্বীর রূপ ফুটিয়া উঠিত।

মজিদার মনের বাসরে শওকত বিরাজ করিতেছিল—পরিপূর্ণ প্রেমে! কিন্তু তাহারই এক নিভৃত অন্তরালে—মজিদার মনে—এক ছন্দময়ী রমণী লুকাইয়াছিল—সে তার কাব্য-প্রতিভা। বাসরে যেমন আতর-লোবানের গন্ধ প্রেমিক-প্রেমিকাকে নিয়ত ঘিরিয়া থাকে—তেমনি মজিদার প্রেম-লোকে সেই ছন্দময়ী বাণী ঘুরিয়া মরিতেছিল। সে বাণী তাহার উন্মুখ প্রেমকে আরও গাঢ় করিয়া তুলিতেছিল; কিন্তু শওকতুল প্রেমের চাঞ্চল্যে তাহাকে প্রেমের অন্তরায় বলিয়া বুঝিল। শওকতুল মজিদার কবিতা লেখার অন্তরায় হইয়া উঠিল। মজিদাও তাহা বুঝিতে পারিল।

ফলে উভয়ের ভিতরে বেদনা জমিয়া উঠিতে লাগিল;—মজিদা খাতুন কবিতার খাতা গোপন করিল। এই গোপন

করা শুভ হইল না;—মজিদার বিদ্রোহ এবং শওকতের সন্দেহ বাড়িয়া উঠিতে লাগিল। শওকত আফিস হইতে ফিরিয়া জিজ্ঞাসা করে—"আজ ক'কুড়ি কবিতা হলো।"

মজিদা মুখ ভার করিয়া চলিয়া যায়। শওকত মুচ্কিয়া হাসিয়া গুন গুন করিয়া আপন মনে গায়—

"নূতন কবি ভাবে
কবে খাতা ভর্ত্তি হবে!"

মজিদা আহত হইয়া চলিয়া যায় অথবা ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলে—দেখো রোজ রোজ সেই এক ঘ্যানঘ্যানানি সইতে পারিনা।"

শওকত বলে—তোমাকে কি আমি বল্‌চি?

মজিদা বিদ্ধ হইয়া বলে—আমাকে না শুনায়ে বল্লে ত' প্রাণ ঠাণ্ডা হয়না! আমি কবি একথা কে তোমাকে বল্লে!

শওকত হঠাৎ শিহরিয়া পিছনে হটিয়া বলে—তবে কি 'এমাজন্?'

এত দুঃখেও মজিদা হাসিয়া ফেলে।

কিন্তু এই বিদ্রূপ-গর্ভ হাসিঠাট্টাও বেশী দিন চলিল না; একদিন শওকত আদেশ করিয়া বসিল—"এই কবিগিরী ছেড়ে দিতে হবে।"

এই আদেশের একটা বিচিত্র কারণ আছে। একদিন শওকত রাইটার্স বিল্ডিংএ জনৈক উর্দ্ধতন কেরানী বন্ধুর সঙ্গে দেখা করিতে গেল। এক ভদ্রলোককে সম্মুখে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিল—"মশাই, কালিবাবু কোথায় বল্‌তে পারেন?"

ভদ্রলোকটি বলিল—কোন্ কালীবাবুর কথা বল্‌চেন? কমলা দেবীর স্বামী কালীবাবু?

শওকত হতভম্ব হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল; এমন সময় কালীবাবু আসিয়া উপস্থিত হইলে ভদ্রলোকটি বলিল—"এই কালীবাবুকে খুঁজ্‌চেন ত? উনিই নভেলিষ্ট কমলা দেবীর স্বামী।"

বন্ধুর নিকট এই পরিচয়ে কালীবাবুর মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল না।

সেই দিন বাসায় ফিরিয়া মজিদার কবিতার খাতা যাহা পাওয়া গেল তাহা শওকত জানালা গলাইয়া নীচে ফেলিতে লাগিল। মজিদা দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিল—প্রতিবাদের একটি শব্দও উচ্চারণ করিল না। আজ সে একটা চিঠি পাইয়াছিল—সে চিঠি পাওয়া অবধি মন তাহার ভারী খারাপ হইয়া আছে। চিঠিটা একটা কবিতার খাতার ভিতরে ছিল। শওকত সেই খাতাটা খুলিয়া ওটা কবিতার খাতা কিনা পরীক্ষা করিতেই খামের চিঠিটার উপরে মুক্তার মত অক্ষরগুলি দেখিয়া খুলিয়া দেখে ইহার প্রেরক—ফজ্‌লুল কাদির। ভ্রূ তাহার কুঞ্চিত হইয়া উঠিল এবং এক নিশ্বাসে যেন চিঠিটা পড়িয়া ফেলিল।

ফজ্‌লুল কাদির বাংলা-সাহিত্যে একজন নামজাদা কবি। শওকত যদিও এই সব সাহিত্যিকের ধার ধারিত না, তবু লোক পরম্পরায় ফজ্‌লুল কাদিরের নাম শুনিয়াছিল কিন্তু কবিটি যে মজিদার সঙ্গে চিঠি লেখালেখিও করিয়া থাকেন, এ-খোশ খবরটা ত তাহার জানা ছিল না। চিঠির কথাগুলি সরল কিন্তু সারল্যের ভিতরে সে বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারিল না! চিঠিতে ছিল:—

প্রিয় ভগিনী,

আপনার চিঠি পাইলাম। শিলংএ বেড়াতে গিয়েছিলুম বলে জবাব দিতে দেরী হলো। কিছু মনে করবেন না।

আজকাল কাগজে আপনার লেখা দেখ্‌তে পাচ্ছিনা বলে দুঃখিত; আপনার মত একটা প্রতিভাকে হারাতে পারি না। আপনার স্বামী শিক্ষিত; আশা করি সেদিক থেকে কোনো বাধা পাবেন না। বিয়ে হয়ে গেলে দুনিয়াদারীতে জড়িয়ে পড়েন বলে ছুতা ধরে অনেকে লেখা ছেড়ে দেন—সে ছুতা নিছক মিথ্যা, এর মূলে শুধু অলসতা। বোধ হয় আপ্‌নি সে-কাফেলার অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাননি।

আপনার সঙ্গে দেখা করলে আপনি যে খুসী হতেন এবং আমিও খুসী হবো, সে সত্য, কিন্তু তাহলে যে-সূত্রটি ধরে আমি নারীজাতিকে জাগাতে চাই, তা ছিন্ন হয়ে যাবে। ইতিমধ্যেই আমার বিপক্ষে অনেকে অস্ত্রধারণ করেচে; ওরা মনে করে, আমি অন্তরে দুরভিসন্ধি পোষণ করি। এ-যখন সত্যই অন্তরে আমি মিথ্যা বলে জানি, তখন তর্ক করে শক্তি নষ্ট করতে চাই না। কিন্তু বিপক্ষের প্রতিবাদেরও অতীত হতে চেষ্টা করতে হবে আমাকে। আমাদের এম্‌নি বিশ্বাসী হতে হবে যেন, আবুজাহেলের মত বিপক্ষেরাও বলে—'তোমাদের অবিশ্বাস করচি না কিন্তু তোমাদের মতের উপর আমাদের আস্থা নাই।' সেই

জন্যেই যতদিন আপনার স্বামীর সঙ্গে পরিচয় না হয় এবং তিনি আপনাকে আদেশ না দেন ও আমাকে বন্ধুরূপে গ্রহণ না করেন, ততদিন দেখা কর্‌তে পার্‌বো না।

যে-মেয়েরা সমাজের মিথ্যা শিকলটাকে কাট্‌তে চান, তাদের মধ্যে কেউ কেউ মনে করেন, তাঁরা একেলা নিজের শক্তিতে স্বাধীন হয়ে উঠ্‌বেন। এটা ভুল; স্বামীস্ত্রী মিলে যেদিন এ-বাঁধনটাকে কেটে ফেল্‌বে, সেদিন আমাদের শুভদিন। আপনাকে বলে রাখ্‌চি, আমাদের পুরুষদের জীবন-যাত্রা যখন এই মলিনতা কাটিয়ে বৈচিত্র্যময় হয়ে উঠবে, তখন মেয়েদের বাইরে ওরা নিজেরাই ডেকে নেবে কিন্তু মেয়েদের চাই অগ্নিময় সাড়া।

আমাদের মেয়ে-সাহিত্যিকদের লেখা পড়ে অনেক জায়গায় আমি হতাশ হয়েচি; ওদের লেখা পড়ে আমাদের পাড়ার কোঁদলী বুড়ীটির কথা মনে পড়ে। সত্যি বল্‌চি, অনেকের মধ্যে সৃষ্টির বেদনা নেই; আছে মিথ্যা বাক্‌চাতুরী। আলোচনার চাইতে সৃষ্টিই বড়, এটা মনে মনে রেখে আমাদের মেয়েদের কলম চালাতে হবে। কথার খৈএর চাইতে কাজের যোগ্যতার মূল্য অনেক বেশী। এটা অবশ্য সাধনা-সাপেক্ষ,—সহজের পথ আমাদের জাতির জন্য নয়।

এই সাধনার পাঠ পুরুষের নিকট শিখ্‌তে হবে।

আপনার লেখা চিঠিটা এর সঙ্গে পাঠালাম; দুটা চিঠিই আপনার স্বামীকে দেখাবেন। এতে আপনারও সুবিধা হবে, তাঁরও ভাব্‌বার বিষয় পাওয়া যাবে। মনে কর্‌বেন না যেন যে, আপনার চিঠির উপর আমি 'সেন্‌সার্‌-শিপ্' বসাচ্চি; আপনার একটা ভাল কবিতা যদি স্বামীকে শুনিয়ে সুখ পান, তবে নিজের ব্যথা বেদনার কথা স্বামীকে না দেখাবার কোনো উপযুক্ত কারণ ত আমি খুঁজে পাইনে! জান্‌বেন যে, গোপনের মধ্যে পাপ সহজে আশ্রয় নেয়—খোলাখোলি ভাল। আপনার স্বামীকে না-দেখিয়ে কারো কাছে চিঠিপত্র দেবেন না—তাহলে আপনাদের স্বাধীনতা অনেক পিছিয়ে যাবে। আমি ভাল; আপনার মঙ্গলপ্রার্থী।

আপনার ভাই
ফজ্‌লুল কাদির।

রাইটার্স বিল্ডিংএ কালীবাবুর স্ত্রীর নামে পরিচয়ের লজ্জাটার সঙ্গে খ্যাতনামা কবির তাঁহারই স্ত্রীর নিকট চিঠি লেখাটা শওকতের নিকট ঠিক অনুরূপ মনে হইল। তাই হুকুম করিল—"এই কবিগিরী ছেড়ে দিতে হবে।"

মজিদা বলিল—"তুমি যা' বল্‌বে তাই কোর্‌ব।" বলিয়া কক্ষান্তরে চলিয়া গিয়া ঝর্‌ঝর্‌ করিয়া রুদ্ধ অশ্রু ছাড়িয়া দিল।

প্রভুত্বের একটা অভিমান আছে; কোনো পুরুষ স্ত্রীর নামে পরিচিত হইতে অভিলাষী নহেন;—শওকাতও ত পুরুষ। আজ কালীবাবু ঔপন্যাসিক স্ত্রীর নামে পরিচিত, কাল যে শওকত কবি স্ত্রীর নামে পরিচিত হইবে না, এর কি ভরসা আছে? তাই যদি হয়, তবে তার চেয়ে মৃত্যু ভাল!

বিশেষতঃ খান্দানী মহলের আব-হাওয়ায় বর্দ্ধিত হইয়া, শওকত ইহা ভাবিতেও পারে না যে, তাহারই স্ত্রী অন্য পুরুষের নিকট চিঠি লিখিয়া বেড়াইবে! শুধু ইহাই নহে, কবিকে দেখিতে পাইলে তাহারই স্ত্রী খুসীই হইবে এবং এই মর্ম্মে নিমন্ত্রণ-পত্র পাঠাইয়া তাহাকে আহ্বান করাও হইয়া গেছে। যদিও কবির চিঠিতে সরলতা বিদ্যমান এবং তিনি মজিদার চিঠিটা ফেরত পাঠাইয়া শওকতকে আপ্যায়িত করিয়া দিয়াছেন, তবু এই আপ্যায়নে শওকতের মন সাড়া দিল না। সে স্পষ্টই বুঝিতে পারিল, কবি মজিদাকে দেখিবার জন্যই শওকতের মনে একটা বিশ্বাস জাগাইবার চাল চালিয়াছেন। সে ইংরেজ কবিদের জীবনী যাহা পরীক্ষা পাশের জন্য পড়িয়াছিল, তাহাতে সে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়াছিল যে, কবিদের চরিত্র সাধারণত সুবিধাজনক নয়। এই কবিও ত তাঁহাদেরই 'জাত' ভাই। কিন্তু শওকতের বিপদ হইল যে সে সম্পূর্ণভাবে মজিদার প্রেমে আপনাকে ছাড়িয়া দিয়াছিল। মজিদার সৌন্দর্য্যের মাধুর্য্য, কণ্ঠস্বরের অপূর্ব্ব সুষমা তাহাকে মুগ্ধ, সম্মোহিত করিয়া তুলিয়াছিল। তাই যদিও ইচ্ছা করিতেছিল, চিঠি দুইটা ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দেয়, তবু এত বড় একটা আঘাত দিতে সাহস হইল না। বিশেষতঃ তাহাদের প্রেমের আকাশে কবি যে ক্ষীণ পাত্‌লা মেঘখানির মত উদয় হইলেন, আঘাতে হয়ত সেই মেঘখানি প্রকাণ্ড হইয়া একটা তুমুল তুফানের সম্ভাবনা জাগাইয়া তুলিতে পারে। অতএব নীরবে সেই মেঘখানি অপসারিত হইতে দেওয়া ভাল। তাই সে চিঠি দুটি পকেটে রাখিয়া দিল এবং বিকালে বেড়াইতে বাহির

হইয়া চিঠি দুইটি বাহির করিয়া ছিঁড়িয়া হাওয়ায় উড়াইয়া দিয়া বলিল—বল মন্—নাই !!

শওকত বিকালে বেড়াইতে বাহির হইয়া গেলে, মজিদার মরিয়া যাইতে ইচ্ছা হইল। স্বামীর নিকট চিঠির ব্যাপারে সে বড় রকমের তিরস্কারের ভয় করিয়াছিল কিন্তু স্বামী যখন মাত্র 'কবিগিরী ছেড়ে দিতে হবে' বলিয়া চুপ করিয়া গেলেন, তখন তাহার এই ভয় ও আশঙ্কা রহিয়া গেল যে, এই চুপ করিয়া যাওয়ার মধ্যে একটা তুমুল ঝঞ্ঝা রুদ্ধ হইয়া ফিরিতেছে! তাই সে অবশিষ্ট সমাপ্ত, অসমাপ্ত কবিতা যাহা ছিল, সেগুলি জড়ো করিয়া আগুণ জ্বালাইয়া দিল এবং দাঁড়াইয়া বাষ্প-আকুল নয়নে এই অগ্নি-ক্রিয়ার দিকে চাহিয়া রহিল! পুড়িয়া যখন ছাই হইয়া গেল, তখন অঞ্জলি পুরিয়া সেই ছাইগুলি জানালা গলাইয়া হাওয়ায় উড়াইয়া দিয়া বলিল—বল মন্—নাই !!

মজিদার লেখা বন্ধ হইল এবং সে নিজে ইচ্ছা করিয়া পুস্তকাদি পড়া ছাড়িয়া দিল। সত্যই ত সে কি ভুল করিতেছিল? কবি না হইলে তাহার দিন কাটিবে, কিন্তু স্বামীর সোহাগ হইতে বঞ্চিত হইলে ত তাহার জীবনের অনন্ত মাধুর্য্য চিরতরে বিলুপ্ত হইবে! তাই সাপের মত খোলস্ ছাড়িয়া সেই পূর্ব্ব জীবনে সে হঠাৎ প্রত্যাবর্ত্তন করিল।

সেই স্বামী-সেবা, সেই হাসি, সেই প্রতীক্ষা—সব ফিরিল; কিন্তু কই শওকতের মন ত পূর্ব্বের মত আনন্দে ভরিয়া উঠিতেছে না। মজিদা তাহাকে পূর্ব্বের চেয়ে বেশীই সেবা করে কিন্তু সেই সেবাতে শওকত যে প্রাণের আনন্দের অভিব্যক্তি খুঁজিয়া পায় না! মজিদা আগের চাইতে বেশীই হাসে কিন্তু এই হাসিতে ত হৃদয়ের মাধুর্য্যের সেই বিকাশ মিলে না! প্রতীক্ষা করিয়া বসিয়া থাকে সত্য কিন্তু তাহাতে মনের গোপনে মনোরাজ্যে আহ্বানের ধ্বনি আসিয়া পৌছেনা। এই বাহুল্যে শওকতের মন হাঁপাইয়া পড়িল। বাহুল্য! বাহুল্য !! এত বাহুল্য তোমার নিকট কে চাহে?—চাই সারল্য! কিন্তু অসরলতাও ত শওকাত খুঁজিয়া পায় না,—পায় না বলিয়াই বেদনার অন্ত নাই!

শওকত একদিন বিকালে আফিস হইতে ফিরিয়া বলিল—শুন, দিনদিন তুমি এ কেমন হতে চল্লে বলো দিকি? তোমার কাজকর্ম্ম, আদর-সোহাগ, যেন ঠিক বায়স্কোপের ছবির মত হয়ে পড়েচে—একেবারে প্রাণশূন্য!

মজিদা করুণ দৃষ্টি তুলিয়া উদাস কণ্ঠে বলিল—আমি বুঝ্‌তে পার্‌চি, তুমি আমার ব্যবহারে সন্তুষ্ট নও কিন্তু কি কর্‌লে যে তুমি সন্তুষ্ট হবে, সে আমি যেন খুঁজে পাচ্চি না। তুমি বলে দাও, কি কর্‌লে তুমি খুশী হবে। তুমি যা-ই বলো তা-ই কর্‌বো!

শওকত বলিল, স্বামী স্ত্রীর সম্বন্ধটা মাষ্টার-ছাত্রীর সম্বন্ধ ত নয় যে, আমি যা বলব তুমি তা-ই করবে। এর চাইতে বরং কবিতা লেখো, তবু তোমাকে একটু পাবো। এ আর আমি সইতে পারি না—এ জ্বালা হতে আমাকে রেহাই দাও।

মজিদা কাঁদ-কাঁদ কণ্ঠে বলিল—না-না, ও-আমি আর লেখ্‌বো না। ও লেখেই আমার এ-দুর্গতি। আগে যা' করেচি এর জন্যে তোমার কাছে মাপ চাইচি। পায়ে পড়ি আমায় আর মেরো না" বলিয়া সত্যই গিয়া পায় পড়িয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

শওকত মজিদার হৃদয়ের এই করুণ দুর্ব্বোধ্য বেদনার অভিব্যক্তির জন্য মোটেই প্রস্তুত ছিল না; তাড়াতাড়ি তাহাকে তুলিয়া বুকে ধরিয়া আবেগে চুম্বন করিল।

হায়রে, জীবনের সমস্যাকে উপযুক্ত মূল্যে চুকাইয়া না দিয়া সন্ধি করার মত ব্যর্থতা বুঝি আর নাই। আত্মসমর্পণ, বক্ষে ধারণ এবং মিলনের চুম্বন দেওয়া হইল বটে কিন্তু কেহ কাহারও হৃদয় খুঁজিয়া পাইল না—উভয়েই যেন মনে মনে বিপরীত দিকে চোখ ঠারিতে লাগিল।

শওকত বুঝিল, এ-সমস্যার সমাধান এইরূপে হইবে না। বুঝিল, সে-যেমন যন্ত্রপাতি দ্বারা নূতন নূতন জিনিষ প্রস্তুত করিয়া আনন্দ পায়, তেমনি মজিদাও তাহার ভাবের দ্বারা কবিতা সৃষ্টির প্রসাধনে একটা আনন্দ পায়। এই আনন্দ হইতে বঞ্চিতা হইয়া বাহুল্যের দ্বারা ভালবাসার দারিদ্র্য মজিদা আরো বাড়াইয়া তুলিতেছে। অথচ সে ত এই দারিদ্র্যকে ঘুচাইতে কম চেষ্টা করিতেছে না!

পূর্ব্বে অনেক অনুরোধ করিয়াও শওকতের দ্বারা কোনো পত্রিকা মজিদা কিনিয়া আনাইতে পারে নাই; অধুনা শওকত আফিস হইতে ফিরিতে দু'একখান করিয়া মাসিক কিনিয়া আনিয়া টেবিলের উপর রাখিতে লাগিল। টেবিল বোঝাই হইয়া উঠিল কিন্তু পত্রিকাগুলি নিজেদের সম্পদ লইয়া নিজেদের ভিতরেই সীমাবদ্ধ রহিয়া গেল।

এটা শওকাত লক্ষ্য করিতেছিল কিন্তু অনুরোধের দ্বারা সুফল না-ও হইতে পারে মনে করিয়া পত্রিকা আনিয়া আনিয়া প্রলোভন সৃষ্টি করিয়া যাইতে লাগিল। সে ত জানে মজিদার হৃদয়ের কত বড় একটা প্রলোভনের বস্তু এই গুলির মধ্যে নিহিত আছে! কিন্তু তার সব নিস্ফল! এত কোমল অথচ এত কঠোর!

সেদিন শওকত একটা পত্রিকা তুলিয়া একটা জার্মাণ গল্পের তরজমা পড়িতেছিল! পড়িতে পড়িতে সে মুগ্ধ হইয়া গেল। গল্পটা শেষ হইলে 'বাহ! বেশ, তো!' বলিয়া পত্রিকাটা নামাইতেই দরজায় দাঁড়াইয়া মজিদা বলিল—"তোমার নাশ্‌তা আন্‌ব?"

শওকত সে কথার জবাব না দিয়া বলিল—এই গল্পটা পড়েচ? এই 'উগচণ্ডা' গল্পটা?

"নাঃ! ও আমি পড়ি-টড়ি না!"

কেন?

"ছেড়ে দিয়েচি!"

বলিয়াই সে বাহির হইয়া গেল। কবি ফজ্‌লুল কাদিরের চিঠি পাওয়ার দিন যে ঘটনাটা ঘটিয়াছিল, সেই ঘটনার দিন হইতে এম্নি জরিপ্‌ করিয়া করিয়া সে কাজকর্ম্ম করিতেছিল, যাহাতে স্বামীর ভালবাসায় এতটুকু আঘাত না লাগে। কিন্তু বহি সম্বন্ধে তাহার একটা মস্ত দুর্ব্বলতা ছিল; ছিল বলিয়াই স্বামী যে তাহারই জন্ম পত্রিকা আনিতেছেন তাহা জানিয়াও সেগুলি সে পড়ে নাই। কিন্তু স্বামী যখন এই দুর্ব্বল খাঁতেই ঘা হানিলেন, তখন তাঁহার প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়া তাহার অশ্রু আসন্ন হইয়া পড়িল। তাই স্বামীর মনে আঘাত লাগিবে জানিয়াও অশ্রু গোপন করিতে সেস্থান হইতে সে প্রস্থান করিল এবং নিজের কক্ষে ঢুকিয়া খাটের উপর লুটাইয়া পড়িয়া বালিসে মুখ দিয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

পুস্তক-পাঠের মধ্যে যে একটা নেশা আছে, সে-নেশাটা সব নেশার চেয়ে মারাত্মক। এই মারাত্মক নেশাটাই সে বিসর্জ্জন দিয়া স্বামীর সোহাগ সঞ্চয় করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিল; পড়িতে হইলেই লিখিতে হইবে এবং লিখিলেই সেই কালসাপটি বাহির হইয়া আসিবে। তাই সে পড়া ছাড়িয়া দিয়াছিল কিন্তু স্বামী যখন ঐটারই উল্লেখ করিলেন, তখন নয়নে বাষ্প ছাইয়া আসিল। বিছানায় লুটাইয়া পড়িয়া, তাহার মনে হইল, সে কি স্বামীর সোহাগ পাইতেছে? একূল, ও-কুল দুই কুল গেল!

মজিদার এই হঠাৎ সরিয়া পড়ায় কৌতূহল বশে শওকত কক্ষে ঢুকিয়া স্তব্ধ হইয়া গেল। মজিদা ফুঁপাইয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিতেছে; কান্নার আবেগে সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতেছে! বাস্তবিক তাহার দুঃখ হইল, সে কি সর্ব্বনাশ করিয়া বসিয়াছে! কিন্তু এই সব-ব্যাপারটা আর এক আলোকে দেখিবারও একটা দিক আছে! না-হয় সে কবিতা লিখিতে মানা করিয়াছিল কিন্তু তাহার সেই দোষটা এই পত্রিকা-পুস্তকাদি আনার মধ্যে কি ডুবিয়া যাওয়ার চেয়েও গুরুতর? এত কখনও নহে! শওকত যেন আজ স্পষ্ট বুঝিতে পারিল, এই কান্নার মূলে তাহার সেই নিষেধ নহে!—এর মূলে রহিয়াছে, একটা অতৃপ্ত বাসনার বিরহ! অথচ এই বিরহের বেদনা প্রকাশ করিবার উপযুক্ত বাহন এই শওকতের মহলে নাই। তাই ত কান্না! দিব্য চক্ষে দেখিতে পাইল, মজিদার শরীরটা মাত্র এইখানে পড়িয়া কাঁদিতেছে! পরিপূর্ণ প্রেমের অবদান লইয়া তাহার হৃদয় এই মুহূর্ত্তেই কবির কক্ষে সেই কবির পাশেই বসিয়া আলাপ করিতেছে, হাসিতেছে, অভিমান করিতেছে! ছিঃ! ছিঃ! লজ্জা! লজ্জা!! এই অসাড় শূন্য দেহটার জন্য সে এখন ক্ষুধিত হইয়া ঘুরিতেছে! হৃদয় তাহার ভালবাসার এই অপমানে তিক্ত হইয়া উঠিল; এতদিন যাহা সন্দেহের কুয়াশা আকারে ছিল, তাহাই আজ বিশ্বাসের মেঘে পরিণত হইয়া ডাকিয়া উঠিল। বলিল—তুমি এসব কি কর্‌চ শুনি? তোমার মনের কথাটি কি, খুলেই বলে ফেল না!

শওকত যে তাহাকে অনুসরন করিয়া তাহার এই কাণ্ড দেখিতে আসিবে, মজিদা তাহা ভাবেও নাই। তাই শওকতের গলার আওয়াজে চমকিত হইলেও অব্যক্ত লজ্জায় না-পারিল উঠিতে, না-পারিল জবাব দিতে। উদ্বিগ্ন শওকত বলিল—কবির কাছে চিঠি লিখ্‌লে কলিজা ঠাণ্ডা হবে ত? তবে তাই করো!

এই চূড়ান্ত আঘাতে শওকত মনে করিয়াছিল, মজিদা বিদ্যুদ্বেগে উঠিয়া পড়িয়া ইহার প্রতিবাদ করিবে কিন্তু সে রকম ত কিছু হইল না! উঠিল বটে কিন্তু সে অতি ধীরে! যেন অতি শ্রান্ত! উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—

আমি আগেই বুঝ্‌তে পেরেছি, তুমি আমায় সন্দেহ করেচ কিন্তু আমি কোনো কিরা-কসম্‌ কর্‌তে চাই না। তোমার পায় ধরে জিজ্ঞেস্‌ কর্‌চি, কি কর্‌লে তোমার এ-সন্দেহ ঘুচ্‌বে। বলো—যা' বল্‌বে, তাই কোর্‌ব। বলিয়া বসিয়া শওকতের দুই পা দুই হাতে ধরিয়া রহিল।

যৌবনের সাড়া জাগিবার পূর্ব্বেই মজিদা কবিতা লেখা শুরু করিয়াছিলেন। নব-যৌবনের সময়ও সে কবিতা লেখায় এমনই মশ্‌গুল্‌ হইয়া পড়িয়াছিল যে, নারী-যৌবনে যে পুরুষের বাণী আছে, তাহাকে সে আমল দিবার ফরসুৎ পাইয়া উঠে নাই। মাঝে মাঝে এমনও মনে হইয়াছে, বিবাহ না করিয়া কবিতা লিখিয়া জীবন কাটাইয়া দিতে পারিলেই সে সুখী হইবে। কবিদের নিকট চিঠিপত্র লিখিত কবি বলিয়া, পুরুষ বলিয়া নয়। ফজলুল কাদিরের কবিতার বেশী ভক্ত ছিল বলিয়া, তাঁহারই সহিত রীতিমত চিঠিপত্রের আদান-প্রদান চলিত। কিন্তু সেইসব চিঠিপত্রে ভালবাসার কিছুই থাকিত না; থাকিবে কি, পুরুষকে সে এক রকম অস্বীকার করিয়াই বসিয়াছিল। কিন্তু যখন বিবাহ হইয়া গেল, তখন এই নব-আবিষ্কারে আশ্চর্য্য হইয়া গেল যে, পুরুষের প্রেমোদোত্থানটা কবিতার চেয়েও মধুর ও মনোরম। শওকতকে নিয়া যে কি করিবে ভাবিয়া পাইত না। শওকতের পুষ্ট সুন্দর বাহুতে মাথা রাখিয়া মজিদা যে কতদিন নিবিড় ভাবে তাহার চক্ষু চাপিয়া রাখিয়াছে, কোমল গণ্ড পেষণ করিয়াছে এবং চুম্বনে আবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। শওকতের চক্ষু দুইটি তাহাকে পাগল করিত। শওকত যখন পরিপূর্ণ দৃষ্টি তুলিয়া তাহার দিকে চাহিত, তখন সে বলিত—"তুমি এমন করে চেয়ো না! কলেজা যেন কেটে নেয়!" শওকাত হাসিয়া চোখ বন্ধ করিলে মজিদা বলিত—"এইবার কেটেই ফেলেছে!" এই নিয়া হাসাহাসি। এত গভীর উন্মাদ ভালবাসার মধ্যে যখন সন্দেহ জাগে, তখন ভয়টাও অতি ভয়ঙ্কর হইয়া উঠে। তাই সেই চিঠি পাওয়ার পর হইতে স্বামীর সন্দেহের ছায়া একটা ঝঞ্ঝার পূর্ব্ব লক্ষণ বলিয়া মনে করিয়া স্বামীকে খুশী রাখিবার জন্য অত্যন্ত সজাগ হইয়া উঠিল। কিন্তু সব ব্যর্থ হইতেছিল; তাই সে হৃদয়ে গভীর ভাবে ক্লান্ত হইয়া পড়িতেছিল। কবিতা লেখা ছাড়িল,—এত প্রিয় পুস্তকগুলি মূক রহিতে দিল কিন্তু তবু ফল হইল না। আজ স্বামীর সেই সন্দেহটা যখন ফাটিয়া পড়িল, তখন সে নিশ্চয় বুঝিল, তাহার দিন ঘনাইয়া আসিয়াছে। কিন্তু দিন যখন ঘনাইয়া আসিয়াছে বলিয়া মনে হয়, তখনই হারাইবার ভয়ের আকুলতা বাড়িয়া যায়। সেই আকুলতা নিয়া নিজের অশ্রুর দুর্ব্বলতাটাকে চাপিয়া স্বামীর দুইটি পা ধরিয়া মাথা নোওয়াইয়া সে বসিয়া রহিল। বলিল -বসো, তুমি যা বল্‌বে, তাই করব।

শওকত স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল; নড়িতেও পারিল না, কিছু বলিতেও পারিল না।

মজিদা বলিল—বলো, বলো। তোমার পায়ে মাথা কুটে বল্‌চি, বলো।

এই সাংঘাতিক কথাটা বলিয়াই শওকত লজ্জায় মরিয়া গেল। এমন লজ্জাজনক কথা যে তাহার মুখ দিয়া বাহির হইয়া গেছে, তাহার বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হইলনা। কিন্তু সত্যই ত কথাটা মজিদকে বিদ্ধ করিতে তাহারই মুখ দিয়া বাহির হইয়া গেছে। তাই এই কয়দিন সে মজিদার দৃষ্টি হইতে নিজেকে গোপন করিয়া বেড়াইতে লাগিল। মজিদা নিকটে আসিতে চাহিলে একটা কাজের ভান করিয়া নীচের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া শওকত অন্য দিকে চলিয়া যায়। মজিদা যে তাহারই জন্য ধীরে ধীরে ঘুরে সে দৃষ্টি না তুলিয়াও তাহা বুঝিতে পারে; পারে বলিয়াই ত্রস্ত শঙ্কিত হইয়া থাকে। মজিদারও লজ্জা হইতেছিল কিন্তু স্বামীর এই পলাইয়া পলাইয়া বেড়ানো দেখিয়া লজ্জা আরো বাড়িয়া গেল, বুঝি বা একটু অভিমানও হইল। মজিদা কি স্বামীর পক্ষে এমনই একটা মারাত্মক ভয়ের বস্তু হইয়া দাঁড়াইয়াছে? হায়রে হতভাগিনীর অভিমান! এই লজ্জা ও এই অভিমান টুকুর জন্য সেও কথা বলিতে পারিল না। সাংসারিক কাজকর্ম্ম চলিতে লাগিল কিন্তু কথা অচল হইয়া রহিল।

শওকত যদিও বুঝিতেছিল, 'এসো' বলিলেই মজিদা লুটাইয়া তাহার বুকে পড়িবে, তবু তাহাকে আহ্বান করিতে পারিল না। একে ত এত বড় দুর্ব্বাক্যটার লজ্জা, তার উপর তাহার সব খুটিনাটি ব্যবহারের সংযোগ। নীরবতা দিন দিন বাড়িয়া চলিল। শওকত কবির চিঠির ব্যাপারের পর হইতে কত দিন সামান্য কাজের ছুতা ধরিয়া একটা অভিমান দেখিবার শঙ্কা বুকে লইয়া অসময়ে বাসায় আসিয়াছে কিন্তু কিছুই না দেখিয়া হয়ত একটা খাতা,

হয়ত একটা চিঠি লইয়া আবার আফিসে ফিরিয়াছে! মজিদা কি এই সবের গূঢ়ার্থ বুঝিতে পারিত না? নিশ্চয়ই বুঝিতে পারিত। শওকতের হৃদয়ের হীনতার ছবিগুলি আজ যেন জীবন্ত হইয়া তাহার সম্মুখে অভিনয় করিতে লাগিল!

শওকত সেদিন আফিসে যাইবার সময় দরজার আড়াল হইতে একটু অগ্রসর হইয়া মজিদা বলিল—তা'হলে আমার সঙ্গে কথাই বল্‌বে না?

শওকত হঁ্যা-না-তা প্রভৃতি একটা অসংলগ্ন কথা বলিয়া তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া গেল কিন্তু তাহার বুক হইতে যেন একটা বোঝা নামিয়া গেল।

দিন তিন পরে শওকত বলিল—আমার একটা কথা রাখ্‌তে হবে!

মজিদা বলিল—কি কথা বলো—রাখ্‌বো!

শওকত যেন অতি ব্যস্ত আছে, এই ভাবে বলিল—আমার এক বন্ধুর বিয়ে হচ্চে। ও ধরে বসেচে, ওকে একটা প্রীতি-উপহার দিতে হবে। জানইত আমি লিখ্‌তে পারি না। ওটা তোমাকে লিখে দিতে হবে। খুব ভাল মিল হওয়া চাই, শুন্‌তে বেশ সুন্দর, খুব মিঠা।

মজিদা স্তম্ভিত হইয়া গেল। সে এইরূপ অনুরোধ সত্যই প্রত্যাশা করে নাই কিন্তু তাহার বড় দুর্ভাগ্য, তাহা না হইলে এই কথাটাই একটু মিলনের হাওয়া বহিবার সময়ই কাল-বৈশাখী ঘনাইয়া আনিবে কেন?

শওকত মজিদাকে নীরব দেখিয়া বলিল—দিবেত?

না—ও আমি পারবো না।

না—তোমাকে ওটা লেখে দিতেই হবে। আজ আমি ওজর আপত্তি কোনো শুনবো না। বলিয়া মজিদাকে টানিয়া টেবিলের কাছে আনিয়া চেয়ারে চাপিয়া বসাইয়া দিয়া এক টুকরা কাগজ, দোয়াতটা, কলমটা ঠিক করিয়া দিয়া বলিল—হঁ্যা লেখো।

সত্যই শওকত পূর্ব্বেকার জীবনে ফিরিতে ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছিল। সে বুঝিতে পারিতেছিল, এই লেখার জন্যে মজিদাকে সে এমন বিদ্ধ করিয়াছে, যাহার দরুণ মজিদার প্রেমের উৎস রক্তে ভরিয়া গিয়াছে। সেই রক্তপাতে মজিদাও কাহিল হইয়া পড়িয়াছে, আর শওকত সেই রক্ত-মিশ্রিত উৎসের জলপান করিয়া বড়ই হালাক্‌ হইয়া পড়িয়াছে। মজিদাও যেমন নিজেকে আর বহিতে পারে না, সেও তেমনি এই দারুণ পিপাসা আর সহিতে পারে না। পারে না বলিয়াই আজ বড় আগ্রহে ভালবাসার প্রভুত্ব খাটাইয়া প্রীতি-উপহার লিখিবার সূত্রে মজিদাকে সে তার কবিতার কুঞ্জে ফিরাইয়া আনিবার জন্য একটা আরম্ভের সূচনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে। আশা, যদি প্রীতি-উপহারটি লেখাইয়া লওয়া যায়, তবে ক্রমে ক্রমে কবিতা আসিবে এবং সেই আনন্দের জীবন ফিরিয়া আসিবে। কেন জানিনা তাহার বিশ্বাস হইয়া গিয়াছিল, মজিদাকে কবি-জীবনে ফিরাইতে না পারিলে আর তাহার সুখ হইবে না। তাই তাড়া দিয়া বলিল—হঁ্যা লিখ, ধর এই কলম।

মজিদা বলিল—না। আমি পারবো না। আমায় মাপ করো।

মজিদা বাস্তবিকই অন্তরে স্বামীর এই অনুরোধে বিচলিত হইয়া উঠিতেছিল। কিন্তু ইহাও মনে হইল, এই টেবিলের উপর হইতে কবিতার খাতা এই জানালা দিয়া নীচে পড়িয়া গেছে। এই টেবিলের কাছ হইতেই স্বামী নিষেধ জারী করিয়াছেন। এইখানে দাঁড়াইয়া কবির ও তাহার চিঠি পকেটে পুরিয়াছেন এবং কতদিন অসময়ে সন্দেহের আঁখি লইয়া তাহাকে পরীক্ষা করিতে, পাহারা দিতে স্বামী এই কক্ষে ঢুকিয়াছেন এবং এই সেই দিন সেই লজ্জাকর কথাটা স্বামী নিজের মুখেই বলিয়া ফেলিয়াছেন! আজ হয়ত প্রীতি-উপহারটা লিখিয়া দিলে স্বামী খুশী হইবেন কিন্তু এর পরে যে কবিতা লেখার অনুরোধ আসিবে, ইহা সে স্পষ্ট নয়নেই দেখিতে পাইতেছে! কবিতা আসিলে হয়ত সেই কবির পুরাতন চিঠিটাও আবার রাহুর মত আসিয়া মিলন-চন্দ্রকে গিলিতে থাকিবে। না-না, সে ত আর কবিতা লিখিতে পারিবে না! আর পূর্ব্বের মত কি সে লিখিতে পারিবে? তা-ও ত যেন সে পারিবে না! কই, প্রাণের বীণায় ছন্দ ত বাজে না? মনের বনে বাঁশী ত কাঁদিয়া উঠে না? হৃদয়ের শাখায় কোকিল ত গাহে না? কোথায় সেই বাঁশী? কোথায় সেই ছন্দ! কোথায় সেই সুর! মন যেন লুটাইয়া কাঁদিয়া উঠিল—"শওকত! শওকত!! সে যেন কোথায় হারিয়ে ফেলিচি! এইখানে এই বুকে

কি যেন ছিল, হারিয়ে ফেলিছে! তার স্মৃতিও যে আজ মনে আন্তে পার্‌চি না শওকত।"

আকুল আবেগে সে উঠিয়া নিবিড় ভাবে স্বামীর দুটা হাত তুলিয়া আনিয়া বুকের উপর রাখিয়া স্বামীর বুকে মাথা লুটাইয়া কাঁদিয়া উঠিল! বলিল মাপ করো! ও আমি আর লিখ্‌তে পার্‌বো না! চেষ্টা কর্‌লেও পারবো না! আমি কিছু চাই না। আমি তো কবি নই—আমি যে তোমার মজিদা—তুমি শুধু আমায় আগের মত ভালবাসো!"

শওকত ব্যাকুল হইয়া উঠিল! দীর্ঘ বিরহের পর আজ মজিদাকে সে বুকে পাইয়া নিবিড় ভাবে জড়াইয়া ধরিল! মজিদাও আকুল ভাবে তাহাকে বাহুতে আবদ্ধ করিল! আলিঙ্গন আবিষ্ট এই দুইটি তপ্তবক্ষের অন্তরালে কবি মজিদার সমাধি হইয়া গেল!

---

# 'আমাতে কি আমি আছি!'

[ মোয়াহেদ বখত্ চৌধুরী ]

তোমরা আমারে দূষিও না মিছে আমাতে কি আমি আছি,
জীবনের মধু পান করে বসি' মরণের মৌমাছি!
সেই লাজ সেই শোকে,
সারা হিয়া মোর মরণ-বিবশ দেখিতে পাইনা চোখে।
দিবসের আলো উৎসব শেষে সন্ধ্যা ঘনায়ে আসে,
সে আঁধার ব্যথা বুকে পশি মোর প্রিয়া আঁখি জলে ভাসে;
ভয়ে আর বিস্ময়ে
চাওয়া চোখ দুটী ঢুলে পড়ে ঘুমে তারই পানে চেয়ে চেয়ে।

প্রাতে উঠি আমি শুনিনু যাদের হরষের হাসি গান
কেমনে কোথায় চলে গেল তারা হলো সব অবসান।
জীবন সায়েরে কলসী ভরিতে আজিকে সকাল সাঁঝে,
কপট-কালার মরণ বাঁশরী কেন হায় হেন বাজে।
শেফালির হাসি ম্লান হয়ে যায় বকুল বিরাগে ঝরে,
গোলাপের লাল অধর হইতে পাপড়ি খসিয়া পড়ে।
কি আর কহিব আমি—
আমারে হারায়ে বাসনার ফাঁদে কাঁদিতেছি দিবা যামী॥

# হজরত ওমরের খেলাফৎ-কালে ভুমির রাজস্ব

[ আবু লোহানী ]

অখিল বিশ্বের প্রতি আল্লাহ্‌র আশীর্ব্বাদ—রসুলে-করিম হজরত মোহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলায়হে ও-সাল্লামের আবির্ভাবের পূর্ব্বে আরব দেশে ভূমি-রাজস্বের কোনই সুবন্দোবস্ত ছিল না। ইতিহাসে দেখিতে পাওয়া যায়, হজরত মোহাম্মদ কর্ত্তৃক 'খাএবার' বিজিত হইলে তত্রত্য ইহুদী অধিবাসিগণ তাঁহার নিকট আবেদন করিয়াছিল—আমরা কৃষিজীবি—সুতরাং স্ব-স্ব ভূমির স্বত্ব ভোগ করিবার অধিকার আমাদিগকে প্রদান করা হউক। রসুলে করিম তাহাদের ন্যায্য প্রার্থনা মঞ্জুর করতঃ ভূমির নাম মাত্র একটা রাজস্ব নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছিলেন। ইহার পর প্রথম খলিফা হজরত আবু বকর যখন ইরাকের অংশ বিশেষ জয় করেন তখন তিনি তথাকার প্রচলিত পদ্ধতিই রক্ষা করিয়াছিলেন—রাজস্বের কোনরূপ পরিবর্ত্তন সাধন করা প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে করেন নাই।

অতঃপর হিজরী ষোড়শ অব্দে দ্বিতীয় খলিফা হজরত ওমর ইরাকের সমুদয় ভূভাগ এবং ইয়ারমুক জয় করেন। ইয়ারমুকের মহাবিজয়ের পর যখন তিনি দেখিতে পাইলেন—দুর্দ্দান্ত রোমান-শক্তি চিরতরে বিধ্বস্ত হইয়াছে এবং উহার পক্ষে মোসলমানদের বিরুদ্ধে পুনরুত্থানের সহসা আর কোন আশঙ্কাই নাই তখন তিনি ভূমির বিলি ব্যবস্থা ও প্রচলিত রাজস্বের সংস্কার করিতে মনঃসংযোগ করিলেন। কিন্তু এই উদ্দেশ্য সাধনের পূর্ব্বেই তাঁহাকে এক ঘোরতর সমস্যার সম্মুখীন হইতে হইল। দেশের তৎকালীন প্রথা অনুযায়ী বিজেতা মোসলেম সৈন্যগণ বিজিত ভূভাগের উর্ব্বর ও কর্ষনোপযোগী ভূমি সকল 'জায়গীর' রূপে এবং তত্রত্য 'জিম্মি' অধিবাসিগণকে দাসরূপে পাইবার জন্য দাবী করিয়া বসিল। রাজর্ষি ওমর হঠাৎ কোনরূপ সিদ্ধান্ত না করিয়া প্রথমে বিজিত দেশের জরিপ ও আদমশুমারী গ্রহণের জন্য সা'দ-বিন্‌-অক্কাস্‌কে নিযুক্ত করিলেন। যথাসময়ে সা'দ তাঁহার রিপোর্ট দাখিল করিলেন; তদনুসারে দেখাইলেন প্রত্যেক বিজেতা আরবের অংশে তিন জন করিয়া 'জিম্মি' অধিবাসী পড়ে। হজরতের অন্যতম সাহাবা সেনাপতি আবদুর রহমানও সৈন্যগণের দাবীবই সমর্থন করিতে লাগিলেন। খলিফা ওমর এই সমস্যা নিরাকরণের জন্য এবং সৈন্য ও সেনাপতিগণের কেহই যাহাতে অসন্তুষ্ট হইতে না পারে সেই উদ্দেশ্যে একটী প্রতিনিধি সভা আহ্বান করিবার জন্য বিভিন্ন দেশ, প্রদেশ ও সুবা হইতে সমাগত বিভিন্ন জাতি, সম্প্রদায় ও দলের প্রতিনিধিগণের সকলকে অনুরোধ করিয়া বলিলেন—"যদি বিজিত রাজ্যের ভূমি সকল সৈনিকগণের মধ্যে বিভাগ করিয়া দেওয়া হয় এবং উহার অধিবাসীবৃন্দকে দাসরূপে পরিণত করা হয়—তবে ভবিষ্যতে সৈন্য সংগ্রহ, ব্যয় নির্ব্বাহ, অন্তর্বিদ্রোহ দমন, এবং রাজ্যের শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার বিষয়ে সমূহ অসুবিধা উপস্থিত হইবে; সুতরাং আপনারা সকল দিক বিবেচনা করিয়া যথা-কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করুন।" হজরত ওসমান, হজরত আবু তাল্‌হা প্রভৃতি এক বাক্যে হজরত ওমরের সমর্থন করিলেন। কিন্তু বিপক্ষ দলেরও সমর্থনের অভাব হইল না। সুতরাং সভার কার্য্য দিনের পর দিন চলিতে লাগিল। শেষ দিবসে হজরত ওমর তাঁহার যুক্তিগুলি এমনই দৃঢ়তার সহিত সভায় উপস্থিত করিলেন যে সমবেত জনগণের কেহই উহার বিরুদ্ধাচরণ করিতে পারিল না; অধিকন্তু সকলেই সমস্বরে তাঁহার জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল। মহামতি খলিফা সর্ব্বসম্মতিক্রমে ঘোষণা করিলেন—"বিজিত রাজ্য ও ভূমি সকল অতঃপর সর্ব্বত্র ও সর্ব্বকালে সরকারী সম্পত্তি বলিয়া গণ্য হইবে এবং অধিবাসিগণ নির্দ্দিষ্ট রাজস্বের বিনিময়ে স্ব স্ব ভূমিতে দখলিকার থাকিয়া যথারীতি কৃষিকার্য্যাদি করিতে অধিকারী হইবে।"

## ইরাক

আরবের একান্ত সন্নিহিত এবং আরবগণের দ্বারাই অধ্যুষিত বলিয়া ইরাক প্রকৃতপক্ষে আরবেরই একটী সুবারূপে পরিগণিত হইত। কিন্তু তথাপি পারস্য রাজগণের আধিপত্যের সময়ে ইরাকে রাজস্বের ভিন্ন ভিন্ন নিয়ম প্রচলিত ছিল। কায়কোবাদই সর্ব্বপ্রথম নিয়ম করিয়াছিলেন ভূমির দেয় রাজস্ব তিন কীস্তিতে আদায় করা হইবে। সম্রাট নওশেরওয়াঁর সময় যে নিয়ম প্রবর্ত্তিত হয় তদনুসারে রাজস্বের পরিমাণ ভূমির উৎপন্নের অর্দ্ধেকের বেশী কোনরূপেই হইতে পারিত না। সম্রাট ইয়াজগর্দ ইহার উপরও কিছু কিছু পরিবর্ত্তন সাধন করিয়াছিলেন এবং খসরু পর্ভেজের সময়ে রাজস্বের পরিমাণ বর্দ্ধিত হইয়া চরমে উঠিয়াছিল হজরত ওমর প্রতিনিধি-সভার নির্দ্দেশ অনুসারে ইরাকের রাজস্বের একটী স্থায়ী পরিমাণ নির্দ্ধারণের জন্য ওস্মান-বিন্ হানিফ ও হাফিজ-বিন্-ইমানকে ইরাক জরিপ করিতে পাঠাইলেন। ভূমির জরিপ সংক্রান্ত কার্য্যে ওস্মান এমনি পারদর্শী ছিলেন যে, কাজী আবু ইউসুফ তাঁহার "কিতাবুল-খিরাজ নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থে লিখিয়াছেন—"বস্ত্র ব্যবসায়ী যেমন বিক্রয়কালে বস্ত্রখণ্ডকে চুল পরিমাণও বাদ না দিয়া অতি যত্নসহকারে পরিমাপ করিয়া থাকে, তেমনি ওস্মান সমগ্র ভূভাগকে অতি বিচক্ষণতার সহিত মাসের পর মাস ধরিয়া জরিপ করিয়াছিলেন। তাঁহার পরিমাপ অনুসারে ইরাকের আয়তন ৯০,০০০ বর্গমাইল নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল; তন্মধ্যে পর্ব্বত, বন জঙ্গল ও নদনদী সকল বাদে কর্ষনোপযোগী ভূমি মোট ৩,৬০,০০,০০০ জরিব (এক জরিব=৬০ বর্গগজ) বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছিল। ইরাকের জরিপ সমাধা হইলে খলিফা নির্দ্দেশ করিলেন—যে সকল ভূমি ও বনজঙ্গলের কোনও মালিক নাই, অথবা যাহা কোন রাজকীয় সম্পত্তি বলিয়া পরিগণিত হইত, অথবা যাহা বর্ত্তমানে বিদ্রোহী ও পলাতকগণের সম্পত্তি মধ্যে গণ্য তাহা অতঃপর সরকারে গ্রহণ করা হইবে এবং নূতন প্রার্থনাকারিগণের মধ্যে উহা পত্তন দেওয়া হইবে। এইরূপ ভূমি ও বন জঙ্গলের 'পত্তনী' হইতে বার্ষিক ৭০ লক্ষ দিরহাম পাওয়া যাইত এবং তাহা সমুদয়ই জন-হিতকর কার্য্যে ব্যয়িত হইত। সময় সময় এই সমুদয় ভূমি ও বনানী হইতে রাজপুরুষ অথবা ব্যক্তিবিশেষকে তাহার সততা ও কার্য্যের পুরস্কার স্বরূপ অংশবিশেষ জায়গীর দেওয়া হইত—কিন্তু তাহাদিগকেও সরকারে নির্দ্দিষ্ট কর দিতে হইত। হজরত ওমর ইরাকের ভূমিকর এইরূপ নির্দ্দিষ্ট করিয়াছিলেন :—

(১) যে সকল ভূমিতে গোধুম উৎপন্ন হয় তাহার রাজস্ব বার্ষিক জরিব প্রতি ২ দিরহাম; (২) জওয়ারী ভূমির প্রতি জরিব ১ দিরহাম; (৩) ইক্ষুর জমির প্রতি জরিব ৬ দিরহাম; (৪) তুলার জমি প্রতি জরিব ৫ দিরহাম; (৫) আঙ্গুর ক্ষেত প্রতি জরিব ১০ দিরহাম; (৬) খর্জ্জুর ক্ষেতের প্রতি জরিব ১০ দিরহাম; (৭) তিল তিসি সরিষা প্রভৃতির প্রতি জরিব ৮ দিরহাম।" কোন কোন স্থানে আবার ভূমির উর্ব্বরা শক্তির তারতম্যানুসারে এই হারের ব্যতিক্রম করা হইত এবং কোথাও জমির প্রতি জরিব ৪ দিরহাম, জওয়ারী জমির ২ দিরহাম, এবং পতিত জমির অর্দ্ধ দিরহাম রাজস্ব নির্দ্দিষ্ট ছিল। এই হিসাবে সমগ্র ইরাকের রাজস্ব আটকোটি ষাট লক্ষ দিরহাম ছিল।

বিভিন্ন দেশের আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, খলিফা ওমরের পূর্ব্বে রাজস্ব সম্বন্ধে কোন দেশেই সুবন্দোবস্ত ছিল না। ফলতঃ হজরত ওমর ভূমির উর্ব্বরাশক্তি ও উৎপন্ন দ্রব্যের বিচার করিয়া যে নীতি অবলম্বন করিয়াছিলেন তাহা তৎকালে যেমন ন্যায়-সঙ্গত বলিয়া বিবেচিত হইত তেমনি জনসাধারণের পক্ষেও তাহা আদায় দেওয়া সহজ সাধ্য ছিল। এই রাজস্ব সংগ্রহ ব্যাপারে বিশেষ সতর্কতা ও সমদর্শিতা অবলম্বন করা হইত। ইরাকের 'জিম্মি'গণের নিকট হইতে রাজস্ব আদায় কালে যাহাতে কোনরূপ বলপ্রয়োগ বা অত্যাচার অনুষ্ঠিত না হয় তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখিবার জন্য হজরত ওমর ইরাকের শাসনকর্ত্তাদ্বয়ের উপর কড়া আদেশ জারী করিয়াছিলেন। এমন কি তিনি মোসলমানগণের মধ্যে জমিদারী বা তালুকদারী করা অবৈধ বলিয়া নির্দ্ধারিত করা সত্ত্বেও 'জিম্মি'গণের মধ্যে যাহারা জমিদার বা তালুকদার ছিল তাহাদিগকে চিরাচরিত সুখ-সুবিধা ভোগ হইতে বঞ্চিত করেন নাই। তাঁহার এই সুচিন্তিত ও অপক্ষপাত ব্যবস্থায় অচিরকাল মধ্যেই ইরাকের কৃষিকার্য্যের বিশেষ উন্নতি সাধিত হইয়াছিল, সমুদয় পতিত জমি ও বন জঙ্গলাদি কর্ষনোপযোগী হইয়া নানারূপ ফসলের

জমিতে পরিণত হইয়াছিল। ফলে বৎসরেক পরেই দেখা গেল—রাজস্বের পরিমাণ ষাট কোটি ষাট লক্ষ হইতে দশ কোটি বিশ হাজার দিরহামে পরিণত হইয়াছে। ইহার পর প্রতি বৎসরই এই হিসাবে রাজস্বের বৃদ্ধি হইতে থাকে। ন্যায়ের রক্ষক প্রজানুরঞ্জক খলিফা হজরত ওমর রাজস্ব আদায়ের মুসেম গত হইলে প্রতি বৎসর কুফা ও বসরা হইতে দশজন করিয়া সত্যবাদী বৃদ্ধকে দরবারে তলব দিয়া আনয়ন করিতেন এবং তাহাদিগকে তত্রত্য 'জিম্মি' কি মোসলমান অধিবাসিগণের কাহারও প্রতি রাজস্ব আদায় সম্বন্ধে কোনরূপ অত্যাচার অনুষ্ঠিত হইয়াছে কিনা শপথপূর্ব্বক প্রকাশ করিতে অনুরোধ করিতেন। এইরূপেই তিনি প্রজানুরঞ্জন করিতেন।

## মিশর

মিশরের সম্বন্ধে ফেরাউন কর্ত্তৃক সমগ্র দেশ জরিপের পর নিম্নলিখিতরূপ ব্যবস্থা প্রচলিত হইয়াছিল :—

( ক ) নগদ মুদ্রা অথবা শস্যাদির অংশের দ্বারা রাজস্ব সংগ্রহ ;

( খ ) কয়েক বৎসরের ভূমির উৎপন্নের অনুপাতে মোটামুটি একটি হার নির্দ্দিষ্ট করিয়া তদনুসারে রাজস্ব সংগ্রহ ;

( গ ) প্রতি চারি বৎসরে একবার করিয়া সমুদয় বকেয়া বাকীর পূর্ণ সংগ্রহ। এই ব্যবস্থা টলেমিস্ এবং শেষে রোমান শাসনকাল পর্য্যন্ত প্রচলিত ছিল। তবে রোমানগণ ইহার উপর আরও একটি বিশেষ ব্যবস্থার প্রচলন করিয়াছিল যে প্রতি বৎসর সরকারী রাজস্বের সঙ্গে সঙ্গেই মিসরবাসিগণকে সৈন্যাবাসে বহুল পরিমাণে রশদ যোগাইতে হইবে। এই রশদ পত্রের কোনই মূল্য দেওয়া হইত না—এবং দেয় রাজস্ব হইতেও উহার মূল্য বাবদ কথঞ্চিৎ বাদ দেওয়া হইত না। কোন কোন ইউরোপীয় লেখক এইরূপ ইঙ্গিত করিয়াছেন যে হজরত ওমরের সময়ও রশদ যোগান দেওয়ার ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল এবং মদিনায় দুর্ভিক্ষের সময় মিশর হইতে বহুল পরিমাণ খাদ্য দ্রব্য আরবে চালান দেওয়া হইয়াছিল। এই সব লেখক প্রকৃত ঐতিহাসিক সত্যের অনুসন্ধান না করিয়া অথবা ভ্রান্ত মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়া প্রকৃত পক্ষে ইসলাম বিদ্বেষেরই পরিচয় দিয়াছেন। ইঁহাদের লক্ষ্য করা উচিত ছিল—মিশর হইতে মদিনায় যে রশদ প্রেরিত হইয়াছিল তাহা রোমানগণের ন্যায় বিনামূল্যে গৃহীত হয় নাই অথবা এইরূপ রশদ যোগান দেওয়ার জন্য মিশরবাসিগণকে কোনরূপেই দায়ী করা হইত না। অধিকন্তু মদিনার দুর্ভিক্ষ পীড়িত জনসাধারণের জন্য খলিফার আদেশে মিসরের প্রকাশ্য বাজারে উহা উচিত মূল্যে ক্রয় করা হইত। তবে যে সকল অধিবাসী গৃহে পর্য্যাপ্ত শস্য মজুত থাকা সত্ত্বেও নগদ মুদ্রা দ্বারা রাজস্ব দিতে কষ্ট বোধ করিত, মাত্র তাহাদের নিকট হইতেই রাজস্বের অনুরূপ শস্যাদি গ্রহণ করা হইত। সুতরাং হজরত ওমরের সময়কার এই রশদ সংগ্রহ ব্যাপারকে রোমানগণের অনুষ্ঠিত বর্ব্বর নীতির সহিত সমশ্রেণীভুক্ত করিলে ঐতিহাসিক সত্যের অপলাপই করা হয়।

নীলনদের মরজীর উপরই সাধারণতঃ মিসরের উৎপন্ন দ্রব্যের হ্রাসবৃদ্ধি নির্ভর করিত। কারণ কখন যে নীলের জলোচ্ছ্বাস আরম্ভ হইবে তাহা কোনও গণৎকারই ঠিক করিয়া বলিতে পারিত না ; সুতরাং কোন্ বৎসরে উৎপন্ন দ্রব্যের পরিমাণ কি দাঁড়াইবে তাহা ও পূর্ব্ব হইতে ঠিক করা যাইত না। এই কারণে মিসরের রাজস্ব সকল বৎসর একরূপ হইত না। ইহাতে রাজস্ব আদায়ের জন্য বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করিতে হইত। হজরত ওমর প্রত্যেক প্রদেশ হইতে প্রধান ও 'রইস্'গণকে আহ্বান করিয়া দেশের উৎপন্ন দ্রব্যের পরিমাণ জানিয়া লইতেন এবং তদনুসারে প্রত্যেক জিলা ও তালুকের রাজস্বের পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিতেন। যাহারা শস্যের দ্বারা রাজস্ব প্রদান করিতে ইচ্ছুক হইত তাহাদের মোট উৎপন্ন দ্রব্যের মধ্য হইতে প্রথমে ভজনালয় ও সাধারণ গোসলখানার জন্য নির্দ্দিষ্ট অংশ বাদ দিয়া বাকী অংশের উপর রাজস্ব গ্রহণ করা হইত ; এই নিয়মানুসারে প্রতি জরিব তিন 'আরদাব' ( ওজন বিশেষ ) শস্য অথবা এক দিনার ( ৯॥ শিলিং ) নগদ রাজস্ব আদায় করা হইত। হজরত ওমরের খেলাফৎকালে মিসরের মোট রাজস্ব ১,২০,০০,০০০ এক কোটী বিশ লক্ষ দিনার অর্থাৎ ৫,০৬,০০,০০০ পাচ কোটি ছয় লক্ষ টাকা ছিল। ইরাকের ন্যায় মিসরের রাজস্বেরও ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইতেছিল। পূর্ব্বে বনি-ওমাইয়া ও বনী আব্বাসের সময় মাত্র ৩০,০০,০০০ ত্রিশ লক্ষ দিনার মিশরের রাজস্ব ছিল ; হাশিম-বিন

আবদুল মালেক দ্বিতীয় বার জরিপ করিয়াও ৪০,০০,০০০ চল্লিশ লক্ষ দিনারের বেশী আদায় করিতে সমর্থ হন নাই। অথচ সেই মিসরের রাজস্বই হজরত ওমরের সময় এক কোটী বিশ লক্ষ এবং পরে হজরত ওসমানের খেলাফৎ কালে এক কোটী চল্লিশ লক্ষ দিনারে পরিণত হইয়াছিল। এইরূপ কথিত হয় যে মিসরের রাজস্বের এইরূপ ক্রম-বৃদ্ধিতে আনন্দিত হইয়া একদিন হজরত ওসমান আমর-বিন আসকে বলিয়াছিলেন—"উষ্ট্রীটি এত অধিক দুগ্ধদান করিতেছে দেখিয়া আমি খুবই আনন্দিত।" প্রত্যুৎপন্ন-মতি-সম্পন্ন আমর তৎক্ষণাৎ রহস্যচ্ছলে উত্তর দিয়াছিলেন—"কিন্তু শিশুটি এখনও অভুক্ত রহিয়াছে।"

## সিরিয়া

কথিত আছে সিরিয়ায় রোমান আধিপত্যের সময় কোন ন্যায়-পরায়ণ রাজা নিয়ম করিয়াছিলেন ভূমির উর্ব্বরতা শক্তি ও উৎপন্ন দ্রব্যের পরিমাণ হইতেই রাজস্ব নির্দ্ধারিত হইবে। হজরত ওমর এই নিয়মের কোন ব্যতিক্রম করেন নাই। তাঁহার সময়ে সিরিয়ার রাজস্বের পরিমাণ মোট ১,৪০,০০০০০ এক কোটী চল্লিশ লক্ষ দিনার ছিল। ইরাণের ন্যায় সিরিয়াতেও এই হারে রাজস্ব আদায় করা হইত। সুতরাং এখানে তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

হজরত ওমরের খেলাফৎ কালে বিভিন্ন দেশের রাজস্বের এইরূপ ব্যবস্থা হওয়ায় এবং উহা পূর্ব্বাপেক্ষা বহুলাংশে বর্দ্ধিত হওয়ায় কেহ যেন মনে করিবেন না যে তিনি অধিবাসিগণকে অভুক্ত রাখিয়া অথবা তাহাদের সুখ-সুবিধার প্রতি কোনরূপ মনোযোগ না দিয়া আমাদের দেশের সুসভ্য ইংরেজ রাজপুরুষগণের ন্যায় কেবল রাজস্ব বৃদ্ধির দিকেই অধিক মনোনিবেশ করিতেন এবং যে-কোন উপায়ে বিজিত দেশ সমূহের অর্থ শোষণ করিয়া রাজভাণ্ডার পূর্ণ করিতেন। তিনি রাজস্ব বৃদ্ধির জন্য দেশের কৃষি-বানিজ্যের কিরূপ শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিয়াছিলেন, আমরা নিম্নে তাহারই আলোচনা করিতেছি।

## বিভিন্ন সংস্কার

হজরত ওমরের যে সকল সংস্কারের দ্বারা বিজিত দেশ সমূহের সুখ সমৃদ্ধি ও ঐশ্বর্য্য পরিবর্দ্ধিত হইয়াছিল জমিদারী ও জায়গীর প্রথার উচ্ছেদ সাধন তন্মধ্যে অন্যতম। রাজানুগৃহিত জমিদার ও জায়গীরদারগণ প্রজাসাধারণের উপর কিরূপ নির্ম্মম অত্যাচার ও উৎপীড়ন করিত তাহা ইতিহাস পাঠকমাত্রেই অবগত আছেন। এইসব অমানুষিক অত্যাচার ও উৎপীড়ন দমন করিবার উদ্দেশ্যেই ন্যায়-পরায়ণ খলিফা ওমর জমিদারী প্রথা রহিত করেন, কার্য্যের পুরস্কার স্বরূপ সৈনিক ও রাজপুরুষগণকে জায়গীর প্রদানের ব্যবস্থা ও বিজিতগণের মধ্য হইতে দাসগ্রহণ-বিধির উচ্ছেদ সাধন করেন। তিনি বিজিত দেশের সমুদয় ভূমি অধিবাসিগণের হাতেই ছাড়িয়া দিতেন এবং মোসলমানের পক্ষে বিজিত দেশে ভূসম্পত্তি ক্রয় ও গৃহাদি নির্ম্মাণ অবৈধ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। এমন কি তিনি আরবগণকে ভিন্ন দেশে কৃষিকার্য্যের দ্বারা জীবিকা সংস্থানেরও অনুমতি প্রদান করিতেন না। কথিত আছে—মিসরের গভর্ণর আমর্-বিন্-আস্ কায়রো নগরীতে একটী বাসস্থান নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন বলিয়া খলিফা তাঁহাকে বিশেষভাবে লাঞ্ছিত করিয়াছিলেন। একজন আরব সৈনিকের বহুদিনের বেতন বাকী পড়ায় সে গভর্ণরের অনুমতিক্রমে সামান্য কিছু সরকারী জমী পত্তন লইয়া তাহাতে কৃষিকার্য্য করিতেছিল। এই সংবাদ হজরত ওমরের নিকট পৌছিলে তিনি অতিমাত্র কুপিত হইয়া তাহাকে রাজবিধি লঙ্ঘনের অপরাধে শাস্তি গ্রহণের জন্য মদিনায় ডাকিয়া পাঠাইয়াছিলেন।

খলিফা ওমরের প্রবর্ত্তিত রাজস্ব সংস্কারই অনেক ক্ষেত্রে মোসলমানদের বিজয় পরম্পরার কারণ হইয়াছিল। কারণ রোমানদের অত্যাচার-উৎপীড়নে ও তাহাদের অত্যধিক শোষণের ফলে সকল দেশের অধিবাসীবৃন্দই তাহাদের উপর বিদ্বিষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল। সুতরাং মোসলমানগণ রাজ্য-জয়-ব্যপদেশে কোন দেশে উপস্থিত হইলে জনসাধারণের পক্ষ হইতে তাঁহাদিগকে কোনরূপই বাধা অতিক্রম করিতে হইত না; কেবলমাত্র বিপক্ষীয় সৈন্যবাহিনীর ও রাজশক্তির বিরুদ্ধেই যুদ্ধ করিতে হইত। এমন কি কোন কোন ক্ষেত্রে তাঁহারা অধিবাসীবর্গের নিকট হইতে সাহায্য প্রাপ্ত হইতেন। ইতিহাসে দেখিতে পাওয়া যায় মিসরের অধিবাসী কপ্ত কৃষকগণ রোমান শাসনে এমনই উৎপীড়িত হইয়া উঠিয়াছিল যে মোসলমানগণ উপস্থিত হইলে তাহারা উহাদিগকে মুক্তির দূত বলিয়া অভিনন্দিত করিয়াছিল। আরও দেখিতে পাওয়া যায়—দামাস্কাস ও হিম্সের খৃষ্টান অধিবাসিগণ

সম্রাট হিরাক্লিসের বিরাট বাহিনীর পক্ষে নগরদ্বার রুদ্ধ করিয়া মোসলমানগণের নিকট দূত প্রেরণ করিয়াছিল যে — তাহার রোমানদের অত্যাচারমূলক শাসনাপেক্ষা মোসলমান শাসনেরই অধিক পক্ষপাতী।

হজরত ওমর সমদর্শিতা ও ন্যায়পরায়ণতার জন্য মোসলমান অমোসলমান নির্ব্বিশেষে সকলেরই প্রিয়পাত্র ছিলেন। তিনি যেমন মোসলমানগণের স্বার্থের প্রতি নজর রাখিতেন তেমনি খৃষ্টান ইহুদী প্রভৃতি অমোসলমানগণের স্বার্থরক্ষারও ব্যবস্থা করিতেন। তাঁহার সামান্য কার্য্যের মধ্যে বিজিত দেশসমূহের ভূমির উর্ব্বরতা ও জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রচেষ্টা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কৃষিকার্য্যের সুবিধার জন্য তিনি পতিত, অনুর্ব্বর ও বন্ধুর প্রদেশে বাসস্থান নির্ম্মাণ করিবার জন্য জনসাধারণকে উৎসাহিত করিতেন—তাহাদিগকে বহুল পরিমাণে ভূ-সম্পত্তি দান করিয়া কৃষিকার্য্যের প্রসারের ব্যবস্থা করিতেন। অধিকন্তু কেহ ভূমিগ্রহণ করিয়াও তিন বৎসরের মধ্যে উহার কর্ষণের ব্যবস্থা না করিলে তাহার নিকট হইতে উক্ত জমি পুনঃ গ্রহণ করিয়া অপরকে দান করিতেন। হজরত ওমরের এই ব্যবস্থার ফলে রাজ্যমধ্যে পতিত জমি প্রায়ই দেখা যাইত না। যাহারা যুদ্ধের সময় অথবা মড়ক ও দুর্ভিক্ষের জন্য দেশ পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র চলিয়া গিয়াছিল মহামতি ওমরের অভয় হস্ত তাহাদিগকেও স্ব স্ব বাসভূমিতে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে বাধ্য করিয়াছিল। তিনি কৃষিজীবিগণকে এতই স্নেহ করিতেন যে তাহা প্রবাদবাক্যে পরিণত হইয়াছিল। কথিত আছে একদা এক 'জিম্মি' কৃষক হজরত ওমরের নিকট উপস্থিত হইয়া নিবেদন করিয়াছিল যে মোসলমান সৈন্যগণ তাহার শস্যক্ষেত্রের উপর দিয়া গমন করায় তাহার সমুদয় শস্য নষ্ট হইয়া গিয়াছে। খলিফা অনুসন্ধানে তাহার অভিযোগ সত্য বলিয়া জানিতে পারিয়া বিনষ্ট শস্যের মূল্যস্বরূপ তাহাকে ১০,০০০ দশ হাজার দিরহাম ক্ষতিপূরণ প্রদান করিয়াছিলেন।

## খাল, তড়াগ ও জলাশয়াদি খনন

যে সকল দেশে জলাভাবে কৃষিকার্য্যের উৎকর্ষ সাধিত হইতে পারিত না তথা যথোপযুক্তরূপে জলসিঞ্চনের জন্য হজরত ওমর সর্ব্বপ্রথম 'জলসিঞ্চন বিভাগ' (Irrigation Department) প্রবর্ত্তন করেন। আল্লামা-ই-মক্‌রেজী লিখিয়াছেন মিসরে জলসিঞ্চনের ব্যবস্থা করিবার জন্য হজরত ওমরের আদেশে একলক্ষ বিশ হাজার লোক প্রত্যহ সমস্ত দিন কাজ করিয়া পূর্ণ এক বৎসরে তথায় অসংখ্য খাল, তড়াগ, কৃত্রিম হ্রদ, জলাশয়, বাঁধ ও কূপ খনন করিয়াছিল। এই বিরাট কার্য্যের সমুদয় ব্যয়ভার 'বয়তুলমাল' তহবিল হইতেই নির্ব্বাহ করা হইয়াছিল। খোরাসান ও আহওয়াজ প্রদেশেও খলিফার আদেশে জাজ-বিন্-মাবিয়া অসংখ্য খাল খনন করিয়াছিলেন।

৬৩৯ খৃষ্টাব্দে আরবে ভয়ানক দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইয়াছিল এবং এই সময়েই সিরিয়াতেও মড়ক লাগিয়াছিল। ফলে সমগ্র আরব দেশে খাদ্যদ্রব্য ও পরিধেয় বস্ত্রাদি অতিশয় দুর্ম্মূল্য হইয়া উঠিয়াছিল। বিদেশ হইতে খাদ্যশস্যের ও পরিধেয় বসনের আমদানী করিতে না পারিলে আরববাসিগণের পক্ষে জীবনযাপন করা অসহনীয় হইয়া উঠিয়াছিল। এই আসন্ন বিপদ হইতে দেশবাসীগণকে মুক্ত করিবার অভিপ্রায়ে মহাপ্রাণ ওমর লোহিত সাগরের সহিত নীলনদের সংযোগ স্থাপন করিয়া বৈদেশিক বাণিজ্যের সুবিধার জন্য মিসরের গভর্ণরকে আদেশ দেন। তদনুসারে বাবিলন (old cairo) হইতে কায়রো পর্য্যন্ত 'খালিজ' নামে পরিচিত পুরাতন খালটী পুনর্ব্বার খনিত হইয়া লোহিত সাগরের ক্লীজ্‌মা (Klysma) নামক স্থানে পতিত হন। এই খালকে নহরে খলিফাতুল মোসলেমিন নামে অভিহিত করা হইত এবং ইহারই ভিতর দিয়া মিসর হইতে অসংখ্য বাণিজ্যতরণী লোহিতসাগর তীরবর্ত্তী জাম্বু ও গড্ডা নামক স্থানে আসিয়া পৌছিত। ফলে একদিকে আরবের সহিত মিসরের ও অন্যান্য দেশের বহির্ব্বাণিজ্যের যেমন সুবিধা হইয়াছিল অপরদিকে মিসরের উৎপন্ন খাদ্যশস্য ও পরিধেয় বস্ত্রাদি মক্কা ও মদিনার বাজারে বিক্রয়ার্থ উপস্থিত হওয়ায় তথায় খাদ্যদ্রব্য ও বসন ভূষনাদি সস্তা ও সহজ লভ্য হইয়া উঠিয়াছিল।

## 'জিম্মি' ও মোসলমানগণের অধিকার

ভূমির স্বত্বের তারতম্যানুসারে উহাকে 'খিরাজী' ও 'উশরী' দুই ভাগে বিভক্ত করা হইত। উপরে আমরা

রাজস্ব সংক্রান্ত যে সকল ব্যবস্থার উল্লেখ করিয়াছি তাহা 'খিরাজী' জমির পক্ষেই প্রযুজ্য। মোসলমানগণই 'উশরী' জমির মালিকানা ভোগ করিত। উহাকে নিম্ন লিখিতরূপে বিভাগ করা যাইত :—

(১) আরবের অন্তর্গত এরূপ জমি যাহার মালিকগণ প্রাথমিক যুগেই ইসলাম গ্রহণ করিয়াছিল।

(২) এরূপ জমি যাহা বর্ত্তমানে মোসলমানের অধিকারে আসিয়াছে এবং যাহার পূর্ব্ববর্ত্তী 'জিম্মি' অধিকারী নিঃসন্তান মরিয়াছে, দেশত্যাগ করিয়াছে, বিদ্রোহী হইয়াছে অথবা উহার স্বামীত্ব পরিত্যাগ করিয়াছে।

(৩) এরূপ জমি ( দাবীদার না থাকায় ) যাহা সম্প্রতি মোসলমানগণের অধিকারে আসিয়াছে।

উর্ব্বরা শক্তির তারতম্যানুসারেই 'উশরী' জমিরও রাজস্ব নির্দ্ধারিত হইত। হজরত রসুলে করিম বলিতেন— 'যাহা জমিতে জন্মে, প্রাকৃতিক বারিবর্ষণে অথবা বন্যারজলে সঞ্জীবিত হয় তাহার রাজস্ব 'উশর' বা উৎপন্নের এক দশমাংশ ; কিন্তু যাহার জন্য কৃত্রিম উপায়ে জল সিঞ্চনের ব্যবস্থা করিতে হয় তাহার রাজস্ব উহার অর্দ্ধেক।" প্রকৃত পক্ষে 'উশর' রাজস্ব হিসাবে গণ্য না হইয়া 'জাকাত'রূপেই গণ্য হইত। হজরত ওমর নিয়ম করিয়াছিলেন যে সকল জমির জন্য 'জিম্মি'গণের দ্বারা খনিত খাল হইতে জল সিঞ্চনের ব্যবস্থা করিতে হয়, তাহার মালিকগণকে জমির উৎপন্ন শস্যের উপর উক্ত 'উশর' ব্যতীত একটা অতিরিক্ত কর দিতে হইবে।

হজরত ওমরের অধীনে বিধর্ম্মী 'জিম্মি'গণ কতকগুলি বিশেষ সুবিধা ভোগ করিত :—(১) মোসলমানগণকে ঘোড়া, গরু, উট প্রভৃতি গৃহপালিত জন্তু ও নগদ মুদ্রার জন্য নির্দ্দিষ্ট কর দিতে হইত, কিন্তু জিম্মিগণকে উহা দিতে হইত না। (২) কোন মোসলমানকেই 'উশর' হইতে রেহাই দেওয়া হইত না, পক্ষান্তরে 'খিরাজ' হইতে জিম্মি'গণকে সম্পূর্ণ বা আংশিক ভাবে অনেক সময়েই রেহাই দেওয়া হইত। (৩) 'উশর' প্রত্যেক ফসলী মরশুমের শেষেই অর্থাৎ বৎসরে একাধিকবার দিতে হইত—পক্ষান্তরে 'খিরাজ' বৎসরে মাত্র একবার দিতে হইত। সুতরাং দেখা যাইতেছে, হজরত ওমরের খেলাফতকালে মোসলমানগণকেই অধিক রাজস্ব দিতে হইত এবং 'জিম্মি' বা অমোসলমানগণ অপেক্ষা তাহাদিগকেই অধিক অসুবিধা ভোগ করিতে হইত। আজ যাহারা মোসলমান শাসনকর্ত্তা, খলিফা, বাদশাহ ও নবাবগণকে অত্যাচারী, পরমত অসহিষ্ণু ও লুঠেরা বলিয়া চিত্রিত করিতে ব্যস্ত তাহারা জগতের ইতিহাস হইতে হজরত ওমরের এই উদার ব্যবস্থার অনুরূপ একটী ব্যবস্থারও উল্লেখ করিতে পারেন কি ?

---

# নারী-হরণ

( পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর )

[ মোহাম্মদ শাহ্‌জাহান ]

( ৬ )

মাস দুই পরে একদিন রাজা বিমলেন্দ্র রায় খাস-মহলে বসিয়া যখন চিফ্‌-ম্যানেজারের সহিত ইউরোপ ভ্রমণের তালিকা সংশোধন করিতেছিলেন, তখন তাঁহাদের মধ্যে অনেক কথাই হইতেছিল। কিছুদিন হইতে রাজাবাহাদুরের মানসিক অবস্থা ভাল নাই। সেই জন্যই এ দেশ ভ্রমণের উদ্যোগ। প্রবীণ ম্যানেজার বাবু তালিকা-পত্র তন্ন তন্ন করিয়া দেখিতেছিলেন। সমস্ত কাজেই তাঁহার অসাধারণ দক্ষতা।

বহুদিন হইল এই ষ্টেটের কোন মফস্বল কাছারির সামান্য মুহুরীর পদ হইতে ক্রমশঃ উন্নীত হইয়া প্রায় ত্রিশ বৎসর পরে কৃতান্ত বাবু চিফ্‌-ম্যানেজার হইয়াছেন। ম্যানেজার হইয়া তিনি ষ্টেটের যথেষ্ট উন্নতি করিয়াছেন। তাঁহার মত বুদ্ধিমান, কৌশলী, কার্য্যদক্ষ কর্ম্মচারী পাওয়া জমিদারের পক্ষে গৌরবের কথা। ম্যানেজার বলিলেন, "এ দীর্ঘকাল সুদূর বিদেশে থাকা মহারাজের পক্ষে অনেক অসুবিধার কথা।"

"না, না, বেশী বিলম্ব কর্‌ব না। মন ভাল হলেই ফির্‌ব। কিন্তু তবুও অনেক দিন থাক্‌তে হবে।"

"আমি বলি কি, রাণী-মা আপনার সঙ্গে গেলে বেশ হয়।"

রাজাবাহাদুর হাসিয়া বলিলেন, "ক্ষেপেছেন আপনি! ভারত-ছাড়া হ'লে যাঁদের হিন্দুত্ব মুছে যায় তাঁরা যাবেন ইউরোপে? বড় জোর কাশ্মির পর্য্যন্ত যেতে পারেন। কিন্তু ও সব ফ্যাসাদ না জড়ানই ভাল।"

"তা ঠিক হুজুর! তা ঠিক" বলিয়া ম্যানেজার বাবু প্রোগ্রামখানা দেখিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে বলিলেন, "তালিকাটা একরূপ মন্দ হয় নাই কিন্তু মহারাজের আনন্দ উপভোগ থাতে ব্যয়ের বরাদ্দ আদৌ উল্লেখ করা হয়নি।"

"আপনি অন্যান্য কথা দেখুন। ও বিষয়টা উষার মত-অনুসার ঠিক কর্‌তে হবে—ওতে কত টাকার দরকার।"

চোর যেমন অপহরণ কালে চুরির অন্যান্য মালের সহিত হঠাৎ কোন বহুমূল্য দ্রব্য পাইলে আনন্দিত হয়, ম্যানেজার বাবুও তেমনই মনিবের মুখে উষার নাম শুনিয়া স্মিতমুখে বলিলেন, "উষা কি আপনার সঙ্গে যাচ্ছে?"

"যাচ্ছে কেমন! তার জন্যই ত এত তাড়াতাড়ি। কিন্তু সে কি আপনাকে কিছুই বলেনাই? আশ্চর্য্য লোক বটে!" বলিয়া রাজাবাহাদুর একটু মিষ্টি হাসি হাসিলেন।

উষা ম্যানেজার বাবুর কন্যা। পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে সে বিধবা হয়, তখন তাহার বয়স চৌদ্দ বৎসর। তখনই সে একদিন রাজাবাহাদুরের শুভ দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে সক্ষম হয়। সে সময় কৃতান্ত বাবু একটা নিম্নতর পদের মফস্বল কর্ম্মচারী ছিলেন। মফস্বল যাইয়া রাজাবাহাদুর উষাকে দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া পড়েন। কৈশোর যৌবনের সন্ধিক্ষণে দণ্ডায়মানা পরমা সুন্দরী, শুভ্রবসনা, আলুলায়িত কুন্তলা, নিরাভরণা উষা একদিন নিভৃত কক্ষে রাজাবাহাদুরকে তাম্বুল দিতে আসিলে তিনি প্রথম সুযোগ প্রাপ্ত হন। তারপর কৃতান্ত বাবুকে বলিয়া তিনি উষাকে রাজবাড়ীতে লইয়া আসেন। কৃতান্ত বাবুও দ্রুতগতিতে প্রমোসন পাইয়া কার্য্যদক্ষতা গুণে অবশেষে চিফ্‌ ম্যানেজার পদে পাকা হইয়া পড়েন। যুবতী উষা শুধু রূপের গরবে গরবিনী নহে! আধুনিক শিক্ষায় সে আদর্শ শিক্ষিতা মহিলা! সঙ্গীতেও তাহার অদ্ভুত অধিকার।

পরদিন খাজাঞ্চি আসিয়া রিপোর্ট পেশ করিলেন যে, অদ্যাবধি শ্রাদ্ধের চাঁদা বাবদ পঁচাত্তর হাজার টাকা সদরে

ইরসাল্ হইয়াছে। কিন্তু ভ্রমণ খরচার টাকা আসিয়াছে মাত্র দশ হাজার।

রিপোর্ট পাইয়া ম্যানেজার বাবু একটু চিন্তিত হইলেন। রিপোর্ট খানা তিনি খাস দরবারে পাঠাইয়া দিলেন। ঘন্টা দুই পরে রাজাবাহাদুর ম্যানেজারকে ডাকিয়া পাঠাইলেন।

"আশ্চর্য্য হয়ে যাচ্ছি আমি আপনার ব্যবহারে, ম্যানেজার বাবু! জাহাজের টিকিট কেনা হয়ে গেল আর এখন টাকা দেখ্ছি মাত্র দশ হাজার! বলুন ত কি বিপদেই না ফেল্লেন আপনি!"

"বৎসরটাও ভাল নয়, তারপর শ্রাদ্ধের চাঁদাও আশাতিরিক্ত আদায় হয়েছে। এর পর খাজনা আছে—তবুও দশ হাজার টাকা আদায় হ'ল।"

"ওটা সন্তোষ জনক কৈফিয়ত নয় ম্যানেজার বাবু! টাকা আমি চাইই। জানেন এবার মফঃস্বলের কি সুন্দর অবস্থা। পনের ষোল টাকা পাটের মন। এ বছর যদি লাখ্ দেড়েক টাকা বাজে ইরশাল্ করতে না পারেন তবে ষ্টেট্ চল্‌বে কেমন করে?" রাজার কথা শুনিয়া ম্যানেজার বাবু জোড়হাত করিয়া বলিলেন, "হুজুরের অনুগ্রহ দৃষ্টি থাক্‌লে আমি সন-আখেরী পর্য্যন্ত দেড় লাখ্ টাকাই আদায় করে দেব।"

"বেশ আপনার কথাই মঞ্জুর হ'ল, তবে ভ্রমণ খরচের টাকাটা এখন আপনার নামে হাওলাত লেখা থাক্‌বে। যখন আদায় হয়ে ওটা বাজে রোকড়ে জমা দেখাবেন সেই সময় আপনার এ হাওলাতি দেনাটা শোধ হবে। বুঝ্‌লেন?" বলিয়া রাজা বাহাদুর হাসিলেন। পরে আবার মৃদু মৃদু হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "দেড় লাখের উপর যা আদায় করবেন সে টাকাটা আপনাকে পুরস্কার দেওয়া হবে।"

"হুজুরের জয় হ'ক" বলিয়া প্রৌঢ় ম্যানেজার বাবু রাজার পদধূলি মাথায় লইয়া বিনম্র ভাবে বলিলেন, "কিন্তু ইহাত আমি একা পাব না মহারাজ! সদর হ'তে মফঃস্বল পর্য্যন্ত অনেক কর্ম্মচারীকে কিছু লোভ না দেখালে টাকা আদায় হয় না। বহুত পরিশ্রমে টাকা আন্‌তে হয় মহারাজ!"

"আপনার ন্যায় প্রবীণ লোকের পক্ষে ও সমস্ত কিছুই মুস্কিল নয়। মনোযোগ দিয়ে কাজ করবেন। গত বৎসরের ন্যায় এবার সুদ বিভাগে যথেষ্ট টাকা আদায় করা চাই। বিবিধ বিভাগে আরও বেশী আশা করি।"

"ষ্টেটের মঙ্গলার্থে কি করব না করব সে আমি রাজআদেশের প্রতীক্ষায় থাকি না। তবে গুজস্তা জমার বেশী এ বৎসর খাজনা বিভাগে আদায়ের সম্ভাবনা নাই।"

"ষ্টেটের উদ্দেশ্যও তাই বটে। গুজস্তা জমার পরিমাণে আদায় হওয়াই উচিৎ। বকেয়া-বাকী না পড়্‌লে প্রজা জব্দ থাকে না, সুদ ও অন্যান্য পাওনা যথেষ্ট আদায় হয় না। তবে দেখ্‌বেন যেন গুজস্তার কম্‌তি আদায় না হয়" বলিয়া রাজা বাহাদুর দরবার কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

( ৭ )

জমিদারগণের ঘাড়ে যে সমস্ত উপদেবতা নির্ভর করে তন্মধ্যে তাঁহাদের নিষ্কর্ম্মা আত্মীয় স্বজনই থাকে বেশীর ভাগ। সুরেন্দ্র নাথ ছিল রাজার আত্মীয়—শ্যামলেন্দ্রের বন্ধু বা মোসাহেব। শ্যামলের মৃত্যুর পর তাঁহার সাধের বন্ধু-পার্টি যখন হতভম্ব হইয়া পড়িল তখন কিন্তু সুরেন্দ্র নাথ রাজ বাড়ীতেই থাকিয়া গেল।

সে দিন সুরেন্দ্র তাহার কাঁটার মত তীক্ষ্ণ চুলগুলি বিন্যাস করিতে করিতে যখন অনেকখানি পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিল, তখন বড়রাণী সে কক্ষে প্রবেশ করিয়া বলিলেন, "রাত দিন তুই কেবল কেশ-বিন্যাস করবি আর অন্দরেই পড়ে থাকবি! এ অনাচার আমি সহ্য করতে পারব না। বেরো হতভাগা এখান থেকে।"

বড়রাণীর স্বভাব ছিল অন্য রকমের। তাঁহার পদ, মর্য্যাদা, ক্ষমতা যত বড়ই হউক না কেন কিন্তু তাঁহাকে কেহই তেমন গ্রাহ্য করিত না কারণ তিনি অতি কোমল স্বভাবা। তাঁহার দূর সম্পর্কীয় ভ্রাতা সুরেন রাণীর এই দুর্ব্বলতার যথেষ্ট সুযোগ লইত। সুরেন বলিল, 'একটু সবুর কর দিদি! এই হোল' বলিয়া সে অসমাপ্ত কার্য্যে আবার মনোনিবেশ করিল। বড়রাণী রাগিয়া বলিলেন, "আর হয়ে কাজ নেই! উনি অন্দর মহলে বসে কেশ বিন্যাস করুন আর সে বেচারি ঘরের মধ্যে আটক থাকুক!—নচ্ছার কোথাকার।"

বড় রাণীর শেষের কথায় সুরেন একটু হাসিয়া বলিল, "আমি বাঘ না ভালুক! আমার দেখে অত লজ্জা কেন

ওর” বলিয়া হি হি করিয়া হাসির মাত্রা চড়াইয়া দিল। বড়রাণী আরও বিরক্ত হইয়া বলিলেন, “যতদিন চপলা এখানে থাক্‌বে ততদিন তুই অন্দরে আস্‌তে পারবিনে বল্‌ছি।” সুরেনও একথাটার একটা চূড়ান্ত মীমাংসা করিতে প্রস্তুত ছিল। সে বলিল, “আমি ত বাজে লোক নই দিদি যে, তুমি যা বল্‌বে তাই মেনে নেবো! রাজ-বাড়ীতে আমার অবাধ অধিকার। তোমার এ হুকুম আমি তামিল কর্‌ব না।”

“মহারাজকে বলে তোকে আজই রীতিমত শায়েস্তা কর্‌ব” বড়রাণীর কথায় সুরেন কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া তাহার অপরিপাট্য চুলগুলি হাত দিয়া বৃথা সুশৃঙ্খল করিতে করিতে বলিল, “কিন্তু মহারাজ তোমার কথা হাসিয়াই উড়াইয়া দিবেন। তিনি তোমার মত সংকীর্ণচেতা লোক নন।”

সুরেনের কথায় বড়রাণী একটু নরম হইলেন। কথাটা তিনি সুরেনকে যেন নিতান্তই অন্যায় ভাবে বলিয়াছেন এইরূপ বুঝিলেন। তিনি বলিলেন, “আচ্ছা সে যাহা হয় হবে, এখন তুই একটু বাইরে যা—জ্বালাতন করিসনে বল্‌ছি।”

“কিসে তুমি জ্বালাতন হও দিদি! আমি যাবনা—যাবনা—যাবনা” বলিয়া সুরেন কক্ষ হইতে কিন্তু তখনই বাহির হইয়া গেল।

সময় মত সুরেনের কথা বড়রাণী রাজাবাহাদুরকে বলিলেন। রাজা বাহাদুর উত্তর করিলেন, “আমি দুঃখিত হচ্ছি বড়রাণী যে, তোমার পারিবারিক অভিজ্ঞতা আদৌ হ’লনা! হিন্দু-ঘরের যুবতী-বিধবা লয়ে বাস কর্‌তে হ’লে ও রকম অনাচার একটু সহ্য কর্‌তে হয়” বলিয়া তিনি বিষয়টা যে আমল দিবারও অযোগ্য এমন ভাবে উপেক্ষা-দৃষ্টিতে বড়রাণীর দিকে চাহিলেন। বড়রাণী স্বামীর কথায় উত্তর দিবার ভাষা পাইলেন না। কেবল একটা অমঙ্গলের অস্পষ্ট ইঙ্গিতে শিহরিয়া উঠিলেন।

কয়েক দিন পরে চপলার পিতা অতুল বাবু কন্যা ও স্ত্রীকে লইতে আসিয়া চপলাকে বলিলেন, “তোমার ব্যবহারে আমি বড়ই সন্তুষ্ট হয়েছি মা! উইলে সাক্ষি হয়ে তুমি ভালই করেছ। আমার যা আছে এই আমি কি কর্‌ব স্থির কর্‌তে পার্‌ছিনে।—কি হবে মা পরের বিষয় সম্পত্তি?”

অতুল বাবুর কোন কথাই চপলা পরিষ্কার বুঝিল না। শ্যামলেন্দ্র তাঁহার যাবতীয় সম্পত্তি উইল করিয়া বিমলেন্দ্রকে দিয়া গিয়াছেন চপলা তাহা কিছুই অবগত ছিল না। অতুল বাবু উইলের কথা তাঁহার এক ব্যবহারাজীবি বন্ধুর নিকট শুনিয়াছেন। তিনি আরও শুনিয়াছেন যে, উইলটা সন্দেহজনক। জীবিত কাল পর্য্যন্ত মাত্র একশত টাকা মাসহারাতে চপলা যে উইলে সম্মতি দিবে ইহা সত্যই অবিশ্বাসের কথা। এই কথাটা স্পষ্টভাবে জানিবার জন্য অতুল বাবু নিভৃত স্থানে পাইয়া চপলাকে উইলের বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলেন। কিন্তু উইল জাল হইলেও তাঁহার ক্ষোভ ছিল না। অতুল বাবু ধনকুবের। তাঁহার একমাত্র সন্তান চপলা যেদিন বিধবা হইয়াছে সেই দিন তাঁহার সমস্ত আশা আকাঙ্ক্ষা একান্তই নির্ম্মূল হইয়া গিয়াছে। কিসের জন্য তাঁহার অর্থ সম্পদের প্রয়োজন আর? তিনি বলিলেন, “কিন্তু রাজা বাহাদুর আমাকে কিছু জিজ্ঞাসা না করেই তাড়াতাড়ি উইলের প্রবেট নিয়েছেন। মানুষের মন এতই সন্দেহপূর্ণ” এই বলিয়া তিনি মনে মনে একটু দুঃখের হাসি হাসিলেন। পিতার কথায় চপলা গুপ্ত ষড়যন্ত্রের আসল বিষয়টা মুহূর্ত্তে বুঝিতে পারিল। সে আর্দ্রকণ্ঠে বলিল, “কিন্তু আমিত কোন উইলের কথা জানিনে বাবা!”

“জাননা? আশ্চর্য্য কথা!”

“না বাবা জানিনে।”

“তবে কি উইল জাল?”

“নিশ্চয় জাল। এর একটা প্রতিশোধ নিতেই হবে বাবা!”

“কি কর্‌তে চাও?”

“আমি উইল-রদের মোকদ্দমা কর্‌ব।”

“আরে পাগলি বেটী তাতে তোর লাভ?”

“লাভ লোকসান তোমরা খতিয়ে দেখো বাবা! আমি কেবল এদের সমস্ত অনাচার জগৎকে জানিয়ে দেব। তুমিত জাননা বাবা কি করেছে এরা! বাবা—বাবা” চপলা আর বলিতে পারিল না। তাহার সমস্ত প্রতিশোধ-স্পৃহা কিসের একটা প্রবল ধাক্কায় তখনই বক্ষপঞ্জর ভাঙ্গিয়া কেবলই হাহাকার করিয়া উঠিল। চপলার জননী কক্ষান্তর হইতে ছুটিয়া আসিয়া দেখিলেন, চপলা পিতার ক্রোড়ে পড়িয়া আছে আর অতুল বাবু শুষ্ক দৃষ্টিতে চাহিয়া মূর্চ্ছিতা কন্যার মাথায় আস্তে আস্তে হাত বুলাইয়া দিতেছেন।

দিন পাঁচ ছয় পরে অতুল বাবু চপলাকে লইবার কথা রাজা বাহাদুরকে বলিলে রাজা বাহাদুর বলিলেন, "বৌমাকে আর জোর ক'রে রাখার অধিকার আমার ত নেই! ওঁর মত অনুসারে কাজ করুন।"

কিন্তু চপলা বাঁকিয়া বসিল। সে কিছুতেই যাইতে সম্মত হইল না। কেন? কিসের জন্য তাহার এ জিদ! জগতে যাহার কোন স্পৃহাই নাই, যেখানে তাহার পদে পদে বিপদ—শত লাঞ্ছনা নিশিদিন বিদ্যমান যেখানে, সেখানে থাকিতে তাহার কেন এ অস্বাভাবিক সাধ! আছে, ইহার অন্তরালে একটা শান্তি আছে। স্মৃতি—স্মৃতি! স্মৃতিই মানুষের শেষ অবলম্বন। শ্যামলেন্দ্রের প্রত্যেক স্মৃতি চপলার নিকট কোটী কোহিনুর অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ। সেই অমরস্মৃতি ত্যাগ করিয়া সে স্বর্গেও যাইতে চায় না। চপলা গেল না।

মাতা পিতা চলিয়া গেলে সেই দিন চপলা আবার খানিক কাঁদিল। কিন্তু তাহার পর সে আর কোন দিনই কাঁদে নাই। তাহার অনুপরমাণু দিয়া সতত কেবলই প্রতিহিংসার কালানল জলিত। সে মরু-চক্ষে অশ্রু ছিল না।

সে দিন ছিল একাদশী। শ্বেত পাথরে আরাস্তা করা মেঝের উপর অভুক্ত চপলা শয়ন করিয়া কত কি ভাবিতে ভাবিতে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। স্বর্গচ্যুতা কোন্ নিদ্রিতা অপ্সরী যেন ধবলগিরিতে শায়িতা রহিয়াছে!

চোরের মত আস্তে আস্তে সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া সুরেন দেখিল, স্খলিত বসনা যুবতী চপলা তাহার সম্মুখে লুণ্ঠিতা। যেন সাগর সলিলে একটা স্ফুটিত পদ্ম ভাসিয়া যাইতেছে। সুরেন থম্‌কিয়া দাঁড়াইল।

মদ্যপায়ী পর-পদলেহী চির ইতর যে, সে এই স্বর্গীয় ছবি দেখিয়া কাম লালসায় ক্ষিপ্ত হইয়া পড়ে। সুরেন আস্তে আস্তে দরজার অর্গল বন্ধ করিয়া দিল।

বারুদস্তূপের সামান্য একটা অংশে অগ্নিসংযোগ হইলে মুহূর্ত্তে যেমন প্রলয় কাণ্ড ঘটিয়া যায়, পরপুরুষের ঈষৎ স্পর্শে নিদ্রিত চপলা তেমনই সহসা ভীষণ বহ্নিস্তূপে পরিণত হইল। চপলার ঘুম ভাঙ্গিল। সুরেন তখন প্রেমের প্রাথমিক-পর্ব্ব অনুনয় বিনয়ের আরজি চপলার পদ-প্রান্তে পেশ করিতে তৎপর। এমন সময় নিজের আসন্ন বিপদ বুঝিয়া চপলা নরাধম সুরেনের বক্ষে সজোরে পদাঘাত করিয়া তাহাকে ফেলিয়া দিল। সুরেন উঠিতে না উঠিতেই চপলা অদূরে বালিসের তলে লুকানো গুলিভরা পিস্তল লইয়া অর্দ্ধোত্থিত সুরেনের মস্তক লক্ষ্য করিয়া উপর্য্যুপরি কয়েকটা গুলি করিয়া অবশেষে সে নিজেও পড়িয়া গেল।

পিস্তলের শব্দে রাজা বাহাদুর স্বীয় কক্ষ হইতে ছুটিয়া আসিলেন। চারিদিকে একটা আতঙ্কের সাড়া পড়িয়া গেল। আরও লোক আসিল। অর্গলবদ্ধ কক্ষের দরজার ফাঁক দিয়া তখনও ধূমরাশি বাহির হইতেছে। অন্য সমস্ত লোককে দূরে যাইবার আদেশ দিয়া রাজাবাহাদুর ম্যানেজারকে ডাকিলেন।

অর্গল ভাঙ্গিয়া ভিতরে প্রবেশ করিয়া সুরেনের রক্তাক্ত দেহপার্শ্বে মূর্চ্ছিতা চপলাকে দেখিয়া রাজাবাহাদুর ইহা অবৈধ প্রেমের শেষ পরিণাম বুঝিতে পারিলেন। কিন্তু চপলা জীবিত কি মৃত তাহা বুঝা গেল না। চপলার একটা পদ সুরেনের দেহ স্পর্শ করিয়া আছে দেখিয়া তিনি সুরেনের দেহও পরীক্ষা করিতে পারিলেন না।

কৃতান্ত বাবু আসিয়া সমস্তই বুঝিলেন। তিনি রাজা বাহাদুরকে সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন, "কোনই চিন্তা নাই। সদর গেট বন্ধের আদেশ দিয়ে আমি এখুনি আসছি। বড়রাণীমাকে ছোটরাণীর শুশ্রূষা করতে বলুন। সুরেনটার মৃত্যু হয়েছে।"

বহুক্ষণ শুশ্রূষার পর চপলার জ্ঞান হইল। আস্তে আস্তে চক্ষু খুলিয়া বুঝিল সে ভিন্ন কক্ষে বড়রাণীর কোলে শয্যাশায়ী। সকল কথাই তাহার মনে হইল। ক্ষণিক উত্তেজনায় সে যে একটা অমানুষিক কাণ্ড করিয়াছে একথা স্মরণ হওয়ায় বড়রাণীর আরও বুকের কাছে যাইয়া তাহার গলাবেষ্টন করিয়া ধরিয়া বলিল, "আমার কি ফাঁসী হবে দিদি?"

উপস্থিত দুর্ঘটনায় বড়রাণী কিন্তু আদৌ ক্ষুব্ধা নহেন। বরং সতীর আদর্শ যে চপলা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে ইহা বুঝিয়া তাঁহার নারী-হৃদয় আনন্দ-উচ্ছ্বাসে ভরিয়া গেল। তিনি বলিলেন, "ভয় কি বোন! রাজবাড়ীতে হত্যাকাণ্ড আজ নূতন নয়। কিছু হবেনা ওতো তুমি বেশ করেছ, সতীর উপযুক্ত কাজই হ'য়েছে। স্বর্গ থাকলে এতক্ষণ তোমার

উপর পুষ্প-বৃষ্টি হ'ত, কিন্তু থাক সে কথা। তুমি একটু ঘুমোওত লক্ষ্মি! বড়ই শ্রান্ত হয়ে পড়েছ।"

বড়রাণীর মুখের কাছে মুখ লইয়া আবেগকণ্ঠে চপলা বলিল, "সত্য বলছ দিদি, ঠিক কাজ হয়েছে?"

"আমি মিথ্যা কথা বলিনে" বলিয়া বড়রাণী চপলার চুলমধ্যে অঙ্গুলি সঞ্চালন করিতে লাগিলেন।

(৮)

প্রজার জলপান করিবার কোন অধিকার না থাকায় দেওয়ানী আদালতের হুকুম মোতাবেক পুষ্করিণী খনন অপরাধে জমি গুলি মালিকের অধিকারে চলিয়া গেল। ইহাতে সারা গ্রামে যে তীব্র হাহাকার পড়িয়া গেল, তাহা ভূমি কম্পনের বিভীষিকা অপেক্ষাও ভীষণ! কিন্তু পানি খাওয়ার দুঃসহ-ইচ্ছা-অপরাধে মাত্র চির অধিকার-ভুক্ত জমি গুলি জমিদারের গ্রাসে যাইয়াও পাপের সম্পূর্ণ প্রায়শ্চিত্ত হইল না। এই বিদ্রোহী প্রজাগণকে দমন করিবার জন্য জমিদার তাঁহার দোর্দ্দণ্ড শাসনের সমস্ত পরাক্রম নীতিই যথাযথভাবে চালাইতে আরম্ভ করিলেন। কথাটা একটু পরিষ্কার করিয়া বলি।

পুষ্করিণী সমেত জমিগুলি খাস দখল পাইয়া প্রথমতঃ জমিদার একটু সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। কিন্তু ঐ সমস্ত জমি যথারীতি দখল লইয়া তাহা উচ্চমূল্যে বন্দোবস্তের নোটীশ দিয়াও যখন কেহই তাহা লইল না, তখন হইতেই প্রজা সাধারণের ধ্বংস-প্রচেষ্টা আরও ভীষণ হইয়া উঠিল।

প্রজারা জোটবদ্ধ হইয়া প্রকাশ্য বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়াছে যে, তাহারা কোনও প্রজার কোনও স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি নিলাম খরিদ করিবে না—কি বন্দোবস্ত লইবে না। প্রজার এই অস্বাভাবিক একতার সংবাদ পাইয়া ম্যানেজার কৃতান্ত বাবু জলিয়া উঠিলেন।

জমির উর্ব্বরাশক্তি, শস্যমূল্য ও জমির পরিমাণ বৃদ্ধি কারণ-অকারণে কর বৃদ্ধি; এবং গাছ কাটা, জমির অবস্থার পরিবর্ত্তন, বছরে চারিবার একই জমির খাজনার নালিশ ও খাজানা ওয়াশীলছাট বাবৎ কত রকম-বেরকমের শয়তানী জুলুম আরম্ভ হইল। ফলে সে স্থানে একটা তীব্র হাহাকার পড়িয়া গেল।

গ্রামের অবস্থা দর্শনে দীন দয়াল চট্টোপাধ্যায় নায়েব মহাশয়কে বলিলেন, "যথেষ্ট হয়েছে! এ বিপদ হ'তে রক্ষা করুন আপনি!"

নায়েব মহাশয় বলিলেন, "বেশ ত, আমি মিট্‌মাটের প্রস্তাব সদরে জানাতে রাজী আছি। কিন্তু টাকায় চারি আনা বৃদ্ধির কমে কিছুই হবে না। আর উপযুক্ত নজর ও আমলান খরচা ত দিতেই হবে।"

দয়াল ঠাকুর আমলান-খরচা দিতে স্বীকার করিলেন কিন্তু বৃদ্ধি খাজানা ও নজর দিতে সম্মত হইলেন না। বলিলেন, "বছর পাচেক পূর্ব্বে হাতী-খরচের ধান লইয়া ষ্টেটের সহিত যে বিরোধ হয়, সেই সময় দেওয়া বৃদ্ধিকর বহন করাই প্রজার পক্ষে কষ্টকর। উহার উপর আবার বৃদ্ধি দেওয়া একেবারেই অসাধ্য। মাম্‌লা মোকদ্দমায় প্রজাত একান্তই নিঃস্ব। নজর দেওয়া ক্ষমতা তাহাদের আদৌ নাই।"

সদরে সমস্ত কথা জানাইবেন বলিয়া নায়েব মহাশয় তাহার শেষ অস্ত্র ভেদনীতি-বাণ দয়াল ঠাকুরের উপর নিক্ষেপ করিলেন। তিনি বলিলেন, "দেখুন চাটুয্যে মশায়! আপনি এ ফ্যাসাদের মধ্যে থাকবেন না। হিন্দু হইয়া আপনার আমরা ক্ষতি কর্‌তে চাইনে। আপনি গ্রামের মধ্যে গণ্যমান্য লোক, চেষ্টা কর্‌লে সব্বাই আপনার কথা শুন্‌বে। প্রস্তাব মত কাজ করুন। আপনাকে যথেষ্ট সুবিধা দেওয়া হবে। বুঝলেন ত কথাটা!"

দয়াল ঠাকুর সমস্তই বুঝিলেন। তিনি বলিলেন, "কিন্তু লোকের অবস্থাও ত দেখ্‌তে হবে।"

শিকার ফাঁদে পড়িতে পারে এই আশায় নায়েব মশায় বলিলেন, "কাহারও অবস্থা চিরদিন হীন থাকে না। চাষী প্রজার অবস্থাত উন্নতই। মনে রাখ্‌বেন, মুসলমান আর ইতর শ্রেণীর হিন্দুর অবস্থা দেখা ভদ্রলোকের কর্ত্তব্য নয়। আমাদের প্রতিপালন কর্‌তেই ত ভগবান ওদের সৃষ্টি করেছেন। ব্রাহ্মণ আপনি, শাস্ত্রের এতবড় কথাটা বুঝ্‌তে পারেন না?"

দয়াল ঠাকুর হঠাৎ যেন নরকের দ্বার হইতে নন্দনে ফিরিয়া আসিলেন। তিনি বলিলেন, "কিন্তু তাদের নির্য্যাতনের বিনিময়ে আমি কোন সুবিধাই চাইনে। আমার প্রতিবাসী তাহারা—হোক সে মুসলমান বা অস্পৃশ্য হিন্দু। তাহাদের কোন অত্যাচারই আমি নীরবে দেখ্‌ব না।"

বিদ্রূপ স্বরে নায়েব মহাশয় বলিলেন, "কি কর্‌বেন আপনি?"

দয়াল ঠাকুর ইহার কোন সঠিক উত্তর না পাইয়া বলিলেন, "ভগবান সে পথ দেখিয়ে দিবেন।"

নায়েব মহাশয়ও অবস্থা বুঝিয়া ব্যবস্থা করিতে জানেন। তিনি আর একটা নূতন ফাঁদ পাতিলেন। এক লহমায় কণ্ঠস্বর হইতে সমস্ত কোমলতা ঝাড়িয়া ফেলিয়া কর্কশ স্বরে তিনি বলিলেন, "হিন্দু কুলাঙ্গার ব্রাহ্মণ! তোমার সমস্ত আচরণই আমি অবগত আছি। তোমার বিজাতীয় প্রতিবেশী মকবুলের সহিত যে কি সম্বন্ধ তাহাও আমি জানি। কিন্তু এ সব আচরণ তোমার হিন্দু মালিক কখনই নীরবে সহ্য কর্‌বে না। তোমার বিধবা মেয়েটীর শুভ প্রণয়ে বাধা পড়্‌বে বলেই বুঝি তুমি তাদের জোট ভাঙ্গতে চাও না?"

কাহাকে হঠাৎ জলন্ত অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করিলে তাহার মুখের যে অবস্থা হয়, দয়াল ঠাকুরও সেই রকম বিবর্ণ মুখে স্তম্ভিত দৃষ্টিতে নায়েবের দিকে চাহিয়া রহিলেন। তিনি শূন্যে কি জমিনে তাহা তাঁহার জ্ঞান ছিল না। হঠাৎ নায়েবের হুঙ্কারে তাঁহার চমক ভাঙ্গিয়া গেল। বজ্রকণ্ঠে নায়েব মহাশয় বলিলেন, "কে আছিস্ এই হিন্দু কুলাঙ্গারকে এখান থেকে বের ক'রে দে।—কিন্তু ঠাকুর! মনে ক'রনা যে, আমরা এই সমস্ত পাপ-ব্যবসায় তোমাকে অবাধে চালাতে দেবো! পুণ্যশীল হিন্দু জমিদারের এলাকায় এ লীলা চল্‌বে না—এই নিয়ে যা একে!"

আড়ষ্টভাবে টলিতে টলিতে দয়াল ঠাকুর তখনই সে স্থান হইতে চলিয়া গেলেন। নায়েবের কোন কথার উত্তর দেওয়ার শক্তি তখন তাঁহার ছিল না।

ক্রমশঃ

---

# আফগান কবিদের কথা

[ মুসাফির ]

আজ আফগানিস্থান নূতন করিয়া আবার জাগিতেছে। আফগানিস্থানের এই জাগরণের ব্যাপার দেখিয়া আমাদের দেশে প্রচলিত একটী প্রাচীন রূপকথার বিষয় স্মরণ হয়। কে এক যুবরাজ তেপান্তরের মাঠ পার হইয়া নিদ্রিত এক স্বপ্নপুরীতে আসিয়া সোনার কাঠীর স্পর্শে ঘুমন্ত রাজকুমারীকে জাগাইয়াছিল! আজ আফগানিস্থানের নিদ্রিত পুরীতে সহসা আবার সেই যুবরাজ দেখা দিয়াছে—হাতে তাহার সেই সোনার কাঠী! তাহার স্পর্শে আজ বিংশ-শতাব্দীর কর্ম্ম-মুখর জগতে সমগ্র আফগানিস্থান জাগিয়া উঠিয়াছে। জগৎ আজ নির্নিমেষ বিস্ময়ে তাহার জাগরণ-দীপ্ত আননের দিকে ফিরিয়া আছে!

আজ আফগানিস্থানের কোণে কোণে সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। কোথায় কোন মাটীর তলায় কিসের খনি লুকাইয়া আছে—তাহার বৈজ্ঞানিকেরা তাহার অনুসন্ধান করিতেছে; কেমন ভাবে জগৎ-সভায় তাহার দেশের লোক শিক্ষায়-দীক্ষায় সমান আসন গ্রহণ করিতে পারে—এই চিন্তায় দেশের মনীষীরা বিভোর! এই জাগরণের শুভ-সন্ধি-ক্ষণে যদি বাংলার এই ম্লান চন্দ্রোদয়ে একটী মন প্রতিবেশীর অন্তরের অতীতলোকে ধ্যান-যাত্রা করিয়া সেখানকার গুপ্ত-রত্ন আহরণ করিতে পারে তাহা হইলে এই দুই জাতির পরিচয় আরও প্রগাঢ় হয়—আত্মীয়তার বন্ধন সু-দৃঢ় হয়। তাই এ সামান্য প্রচেষ্টা।

জগতের অতীত ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে এক জাতির সঙ্গে আর এক জাতির তখনই ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তা জন্মায়—যখন সেই দুই জাতির অন্তরের ভাবের আদান-প্রদান হয়। যখনই এই ভাবের আদান প্রদানের পথ বন্ধ হইয়া যায়—

তখনই জাতিতে জাতিতে বিরোধ জাগে। আমরা তাই কলিকাতার রাস্তায় 'কাবুলীওয়ালা' দেখিয়া যদি আফগানিস্থানকে বুঝিতে চেষ্টা করি তাহা হইলে তাহা অপেক্ষা দুঃখের জিনিষ আর কিছুই হইতে পারে না।

জাতির অন্তর তাহার সাহিত্যের রঙ-মহলে বিরাজ করে। আফগানিস্থানের অন্তর তাহার অপূর্ব্ব কবিতার মধ্যে স্পন্দমান।

আমরা পারস্য-কবিতার সঙ্গেই বেশী পরিচিত। আকাশের দিকে চাহিলেই ওমরের শূন্য-পাত্রের কথা স্মরণে জাগে—আমাদের চিন্তার বিরাট ভবনে গুলিস্তাঁ ও বোঁস্তার সৌরভ ঘুরিয়া ফিরিতেছে—আজও শূন্য মনের নির্জ্জন পথে লায়লী একাকী কাঁদিয়া ফিরিতেছে। কিন্তু আফগানিস্থানও তাহার কবিতার অপূর্ব্ব সৌরভ পৃথিবীর রসামোদীকে উপহার দিয়াছে। সেগুলিও তেমনি করুণ, তেমনি গম্ভীর ও তেমনি চিরন্তন বার্ত্তাবহ।

যে ধারা একদিন পারস্যের কুঞ্জভবনে গোলাব ফুটাইয়াছিল সেই একই ধারা আফগানিস্থানের কঠিন পাথরের বুকে ডালিমের ফুলে হৃদয়ের রঙ ফুটাইয়া তুলিয়াছে। সমস্ত আফগান কবিতার মূলে রহিয়াছে সূফীবাদ। সেই বিরাট একের অনুসন্ধানে ও তাঁহার প্রেম ও বিরহে আফগান-কবিতা ভরপুর। এই পৃথিবীর সরাইখানায় আমরা দুদিনের পান্থমাত্র; যে-পাত্র অধরে তুলি—তারই অন্তরালে বিরাজ করে এক নির্ম্মম পরিসমাপ্তি; আকাশের পাণ্ডুর চাঁদ সে যেন প্রিয়তমার আহ্বানের আকৃতি; কালো চুলে, আর কালো তিলে লেখা যেন বিদায়ের বাণী। এই পৃথিবী তো চিরকালের বাসা নয়—এতো শুধু ক্ষণিকের প্রবাস। আত্মার চিরবাসস্থান সে তো পৃথিবীর উর্দ্ধে—এক অদেখা লোকে—যেখানে অনন্ত একক-গৌরবে প্রিয়তম বিরাজ করিতেছেন। প্রেমের মধ্য দিয়া সেই নিত্যধামে পৌছিতে হইবে—এই বাণী বলে পারস্য কবিতা—এই বাণী বলে আফগান কবিতা।

## আবদুর রহ্‌মান

সমস্ত আফগান কবিদের মধ্যে আবদুর রহ্‌মানই সব চেয়ে প্রিয় এবং পরিচিত। ঈশ্বরের প্রতি প্রেমই তাঁহার সমস্ত কবিতার মূল-বস্তু এবং সেই প্রেমকে ব্যক্ত করিবার জন্য তিনি সূফীবাদের নিগূঢ় তত্ত্বের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার কবিতার একটী বিশেষ গুণ হইতেছে—যে অন্তরের ব্যাকুল বাসনাকে তিনি এক অপূর্ব্ব সহজরূপ দিয়াছেন; অন্তরের বাসনার মধ্যে যেমন তাঁহার ক্লেদ কিছু নাই, তেমনি ভাব-প্রকাশের মধ্যে আড়ম্বরময় কিছু নাই। শিশুর সরল আহ্বানের মত তাহা সহজ ও পবিত্র।

পেশোয়ারের অন্তর্গত হাজারখানি গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত আফগান বংশে আবদুর রহ্‌মান জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার প্রথম জীবনের বিষয় বিশেষ কিছু জানা যায় না। তিনি একজন সবিশেষ জ্ঞানী পুরুষ ছিলেন এবং যৌবনে বহুবিদ্যা অর্জ্জন করেন। যৌবনের শেষে তিনি সংসারের সহিত সকল সম্বন্ধ ছিন্ন করিয়া দরবেশের জীবন যাপন করেন। তিনি ভিখারীদের ধর্ম্মসঙ্গীত শুনিতে ভালবাসিতেন এবং প্রায়ই তাহাদের আহ্বান করিয়া আনিয়া তাহাদের সহিত রাত্রির পর রাত্রি কাটাইতেন।

জীবনের শেষ-প্রহরের দিকে কাব্য-লক্ষী তাঁহার অন্তর-ভবনে উদিত হন। জনশ্রুতি আছে যে সেই সময় হইতে কিছুকাল তিনি একান্ত নির্জ্জন-বাস করিতে লাগিলেন; এমন কি আপনার শিষ্যদের সহিত দেখা করিতেন না। দিবারাত্রি দেখা যাইত যে তাঁহার গণ্ডদেশ দিয়া অশ্রু ঝরিয়া পড়িতেছে এবং প্রবাদ যে সত্য সত্যই নিত্য অশ্রুপাতে তাঁহার গণ্ডদেশ ক্ষত হইয়া গিয়াছিল।

এই সময় তিনি মসজিদে যাওয়া ও বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন—ঘরের ভিতর হইতে বাহিরে কিছুতেই আসিতেন না। এই ব্যাপার দেখিয়া কতকগুলি গোঁড়া লোক তাঁহার নামে মিথ্যা কলঙ্ক প্রচার করিয়া বলিয়া বেড়াইতে লাগিল যে আবদুর রহমান নাস্তিক হইয়া গিয়াছে—নতুবা মসজিদে আসিবে না কেন? এই আন্দোলনের জন্য আবদুর রহমানকে অনেক গঞ্জনা ভোগ করিতে হইয়াছিল; কিন্তু যার অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে তিনি করুণ স্পর্শ দিয়াছেন—বাহিরের গঞ্জনা তাহার কি করিবে? সেই সময় কবি লিখিয়াছিলেন,

"কত কাল ধরিয়া এমনি বসিয়া আছি—অন্তর আমার শুকাইয়া আসিল; নয়ন আমার জলে ভরিয়া উঠিল।

আজ এই একান্ত নির্জ্জনতায়; হে প্রিয় তুমি আমারই

মধ্যে একসঙ্গে সৃষ্টি করিলে, সাগর আর মরুভূমি। আমার নয়নে সাগর, অন্তরে মরুভূমি! × × × ×

তুমি কে, তুমি কোথায়, তুমি কেমন, সে তত্ত্ব-আলোচনার আমার সময় কই? আমার অনন্ত কালের প্রত্যেকটী স্পন্দনে যে তুমি রহিয়াছ—তোমাকে আলাদা করিয়া ভাবি এমন সময় আমার কোথায়? × × ×

হে প্রিয়, তোমার কালো চুলে আমার প্রাণ হারাইয়া-গিয়াছে—ঘন অমাবস্যার অন্ধকারে কালো ফুল যেমন হারাইয়া যায় × × ×

পৃথিবীকে ছাড়িয়া ভাল ছিলাম; কিন্তু এই পরিহাস, তোমাকে পেলাম বলে, পৃথিবী আজ আমারই গঞ্জনা গাইছে।"

## চয়ন

সুধী পাঠকবর্গের অবগতির জন্য নিম্নে আবদুর রহমানের কবিতা হইতে কিছু কিছু চয়ন করিয়া দেওয়া হইল।—

(১)

অশ্রুতে অন্তর ভরিয়া আসিল—তবুও তুমি ফিরিয়া চাহিলে না, হে প্রিয়তম,—

আমার প্রত্যেকটী কথা যদি জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মণির সমতুল হয়—তবুও সে তাহা মালা করিয়া গলায় পরিবে না—এমনি প্রিয়তম,—

যদি তুমি অঘোরে ঘুমাইয়া থাকিতে—নিশ্চয়ই আমার এ ক্রন্দনে তুমি জাগিয়া উঠিতে,—

কিন্তু তুমি তো জাগিয়া আছ—তবু ও সাড়া দিলে না, দিলে না, হে প্রিয়তম,—× × ×

(২)

কুমোরের মত ভাগ্য আমাদের নিত্য ভাঙ্গিতেছে—আর নিত্য গড়িতেছে। তাহার আপন খেয়ালে সে আমাদের রূপ দিয়া চলিয়াছে। তোমার আমার মত কত লোক সে গড়িয়াছে—তোমার আমার মত কত লোককে সে ভাঙ্গিয়াছে। × × ×

জগতের প্রতি প্রস্তর-কণা তুলিয়া দেখ—দেখিতে পাইবে তাহা পাথর নয়—হৃদয়ের কঙ্কাল—রাজার হৃদয়ের—ভিখারীর হৃদয়ের— × × ×

(৩)

এই সরাইখানার যেদিকে মুখ ফিরাই—এক মুখ মনে জাগে—সে তোমার!

এই সরাইখানায় যদি কিছু চাই—একমাত্র সে তোমার!

যেদিকে হৃদয়ের কাণ দিয়ে শুনি—আমি শুনি শুধু তোমার প্রেমের হাটের অশ্রান্ত গুঞ্জণ—; আমি একটী স্বর শুধু শুনি, সে তোমার—

(৪)

আমার কালো চোখ কাঁদিয়া শাদা হইয়া গেল, হে প্রিয় তোমার বিরহে!

আবার হৃদয়ের রক্তে আজ সন্ধ্যায় সেই পাংশু চোখ রক্তবর্ণ হইয়া উঠিয়াছে, হে প্রিয় তোমার বিরহে! × × ×

তোমার কুটীরের পথের আমি যদি ধুলা হইতাম—নিত্য আমার দেহ তোমার চরণের স্পর্শ পাইত, হায় প্রিয়তম! আমার দেহকে যদি গুঁড়াইয়া তোমার নয়নের সুর্ম্মা করিতে পারিতাম—

হয়ত একবার তোমার দৃষ্টিতে বাঁচিয়া উঠিতাম, হায় প্রিয়তম!

( ক্রমশঃ )

# "জাতীয় সভা"

[ মোছলেম খাঁ ]

"এত বড় একটা ব্যাপার, এখন চুপ কোরে বোসে থাকা নিতান্ত অমানুষের কাজ, মুছলমানদের পক্ষ থেকে একটা কিছু করা চাই"— কএকজন 'ভবঘুরে যুবক' চার পাঁচ দিন শহরময় এই কথা প্রচার করার ফলে সেদিন মুছলমান সমাজের নেতা, আলেম, কাউন্সিলের মেম্বার, পীর, বক্তা ও সম্পাদক শ্রেণীর অনেক গণ্যমান্য লোক এক সভায় সমবেত হ'য়েছিলেন। আমাদের মত বাজে লোকও সভায় যোগদান করেছিল, তবে তাদের সংখ্যা ছিল খুবই কম।

মৌলবী মুফীজুর রহমান সাহেব সর্ব্বসম্মতিক্রমে সভাপতির কর্ত্তব্যপালন করেছিলেন। আসন গ্রহণ কোরে মৌলবী সাহেব একটা নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা দিয়ে বালুরঘাটের দুর্ভিক্ষ ও অন্যান্য স্থানের শোচনীয় অবস্থার উল্লেখ কোরে সকলকে তার প্রতিকারের জন্য বদ্ধপরিকর হোতে উৎসাহিত কল্লেন। সভাপতি বিশেষ কোরে বোল্লেন:—বালুরঘাট প্রভৃতি স্থানে দুর্ভিক্ষ পীড়িতদের মধ্যে অধিকাংশই মুছলমান। তারা না খেতে পেয়ে নিজের সন্তান পর্য্যন্ত বিক্রি কোরে ফেলছে, গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা কোচ্ছে! সহৃদয় হিন্দু ভ্রাতারা তাদের সাহায্যের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা কোচ্ছেন— আর মুছলমান বোলে, মুছলমানের নেতা বোলে, তাদের প্রতিনিধি বোলে বড় গলায় আস্ফালন করা সত্বেও আমরা সকলে এ সব দেখে-শুনে চুপ কোরে বসে আছি। এর চাইতে বেশী নির্লজ্জতার কথা মুছলমানের পক্ষে আর কি হতে পারে! আমাদের মধ্যে এমন লোকের সংখ্যা কম নেই, যাঁরা হিন্দুর সঙ্গে এক জায়গায় বোসে দেশের কাজ কোত্তে যাওয়াকেও মুছলমানের পক্ষে ঘোর অন্যায় বলে মনে করে থাকেন—আজ হাজার হাজার মুছলমান সেই হিন্দুর সাহায্যে নিজের ও নিজ পরিজনবর্গের প্রাণরক্ষা কোচ্ছে, অথচ এখন তাঁদের "জাতীয় আত্ম-সম্মান জ্ঞানে" একটুও আঘাত লাগছে না—এ অবস্থার উপলব্ধি, এ বেদনার অনুভূতি সামান্য পরিমাণেও তাঁদের প্রাণে জেগে উঠছে না!! পীর ছাহেব, আলেম ছাহেব, বক্তা ছাহেব, সম্পাদক ছাহেব, আজ অনেকে এখানে উপস্থিত আছেন। তাঁদের কাছে জিজ্ঞেস কোত্তে চাই—কেবল নজর নায়াজের টাকা লওয়ার সময়, ভোট ভিক্ষা করার সময়, নিজেদের চাঁদা ও সাহায্য আদায়ের সময়, সভার দাওত কবুলের সময়, আড়াই কোটি মুছলমানের দোহাই দিয়ে নিজেদের কাজ হাসিল করার সময় শতকরা ৫৪এর নজির দিয়ে চাকরীর দাবী করার সময়, সমাজকে তাঁরা চিন্তে পারেন?........."

সভাপতির বক্তৃতার সময় বড় বড় জাঁদ্‌রেল নেতা, পীর ও সম্পাদক ছাহেবেরা সময় সময় যেন বেশ একটু অস্বস্তি বোধ কচ্ছিলেন বলে মনে হচ্ছিল। অনেকক্ষণ চুপ-চাপ থাকার পর সভাপতি বাধ্য হ'য়ে একজন নেতা ও আলেম ছাহেবকে এখনকার কর্ত্তব্য সম্বন্ধে কিছু এরশাদ ফরমাইতে অনুরোধ কোল্লেন। তাতে আমাদের Leader No. one সর্ব্বপ্রথমে গাত্রোত্থান কোরে, টাকে হাত বুলুতে বুলুতে বলতে লাগলেন:—ছাদর ছাহেব আড়াই ক্রোর মুছলমানের কথা বলেছেন—কিন্তু আমার মাথার উপর ছারা হিন্দুস্তানের ছাত ক্রোর (বক্তা ছাহেব:—সাত কোটি নয় দশ কোটি!) মুছলমানের বোঝা আছে। ছাইমন কমিশন আবার ফিরে আসছে, এস্তেখাবের মামলা আছে, বেহুদা লোকদের ফেৎনা ফাছাদ আছে, আমি একেলা আর কত কোর্ব্বো। আমার কোশেশে মুছলমানের পক্ষে শতকরা ৪৫টি চাকরী পাওয়া (আওয়াজ—চাকরী পাওয়া না চাকরী পাওয়ার সারকুলার পাওয়া?)—ছাদর ছাহেব! আমি এরূপ বাধা প্রাপ্ত হতে পছন্দ করিনে, এ সভায় আমি আর কিছু বোলতে চাইনে। (আসন গ্রহণ ও ধূমপান)

একজন দুই নম্বরের নেতা তারপর দাঁড়িয়ে আচকানের বোতাম খুঁটতে খুঁটতে ইংরেজীতে বক্তৃতা আরম্ভ কোল্লেন। আমার ইংরেজী বিদ্যে খুব বেশী বোলে সব কথা বুঝতে পারিনি, যতটুকু বুঝেছিলেম, তার খোলসা এই যে, সমাজ হিতৈষণার এসব কেচ্ছা কাহিনী শুনে নষ্ট করার মত সময় তাঁর নাই। আর সমাজ সেবার যা পুরস্কার, তা তাঁর বেশ জানা হয়েছে, এ সব Thankless taskএর মধ্যে লিপ্ত হোয়ে বোকা বনার জন্য আর তিনি প্রস্তুত নন—ইত্যাদি।

নেতা ছাহেব আসন গ্রহণ করার পর আলেম, পীর, সম্পাদক ও বক্তা ছাহেবেরা অনেকেই কিছু কিছু বলেছিলেন। কিন্তু বলবার সময় কেহ বসে, কেহ দাঁড়িয়ে, আবার কথনও বা দুই তিন জন একসঙ্গে এরশাদ ফরমাবার ফলে সব কথা সকলে শুন্তে পান নি। যতটুকু শোনা গিয়েছিল আর তার যতটুকু আমার মত লোকের বুদ্ধির গম্য হয়েছিল, নিম্নে তা উদ্ধৃত কোরে দিচ্ছি :—

"দু দিনের দুনয়ারে বাবা—আখের ফানা, আখের ফানা। সব সেই মা'বুদের মর্জ্জি হচ্ছে। সব হালের উপর ছবর করা চাই!"

"মোমেন লোকের ওয়াস্তে দুনয়ার মেছাল হোচ্ছে যেমন-কে কএদখানা। আপনাদের মধ্যে বাজে বাজে লোক কএদখানা ত দেখে এসেছ বাবা; আখেরী জামানা, কাফেরের তেরেক্কির সময় এখন, হোশয়ার হয়ে যাও ভাই মুছলমান, এ কএদখানা হতে যাঁহাতক জল্‌দি ছুটকারা গোমকেন হয় ততই বেহতের………"

"আমরা দিনের ও দিনী এলেমের খেদমত করি, এসব দুনয়াদারী মাআমেলাতের মধ্যে আমাদেরকে টেনে আনবেন্ না। আপনারা করুন, বেশ ভাল কথা, আমরা দোওয়া কোচ্ছি খোদাওন্দ করিম আপনাদিগকে তওফিকে খাএর এনায়ত করুক।"

"হিন্দুরা টাকা দিচ্ছে, চেষ্টা কোরে মুছলমানের জান বাঁচাচ্ছে—এতে আমাদের উপর তাদের যে বড় একটা অনুগ্রহ করা হয়েছে, একথা স্বীকার কোত্তে কোন মুছলমান প্রস্তুত নহে—অন্ততঃ আমি কোন মতেই প্রস্তুত নহি। (আওয়াজ—সাধু! সাধু!!) এসব স্বরাজী শয়তানদের একটা ভণ্ডামী ও ধাপ্পাবাজী ছাড়া আর কিছুই নহে। তারা স্বরাজ চায়, দেশের স্বাধীনতার দাবী করে, মুছলমানকে ভাই ভাই কোরে বেহায়ামোর পরিচয় দেয় (আওয়াজ—কী হায়দার!) তারা যে কপট নয়, ভণ্ড নয়, একথা তারা প্রমাণ কোত্তে বাধ্য। তবে যেসব হিন্দুর ফেনচাটা খদ্দরধারী স্বরাজী শয়তান, ফেরাওন হামান শাদ্দাদ নমরূদ—

সভাপতি :—আপনি বসুন! (হট্টগোল—বসুন, বস, বএঠযাও বেতামিজ!)।

সভার একধারে আবুঅনল দামালুদ্দিন কামালী সাহেব বসে বসে মাসিক কাগজ—অথবা কাগজের মধ্যে লুকান মুখস্থ বক্তৃতার মুসাবিদা (রাবীলোক এখানে এখতেলাফ করিতেছেন) পাঠ কোচ্ছিলেন, আর মধ্যে মধ্যে পাণ্ডিত্য-গাম্ভীর্য্য-তাচ্ছিল্য প্রকাশক ভঙ্গিমায় মুচকে মুচকে হাসছিলেন। এবার সভাপতির অনুমতি নিয়ে কামালী সাহেব বক্তৃতা আরম্ভ কোল্লেন :—

আমি বিস্ময়ের সঙ্গে দেখলুম যে আপনারা মানুষকে অস্বীকার কোরে গ্রহণ কোল্লেন হিন্দু মুসলমানকে। কিন্তু আপনারা বুঝতে পাল্লেন না যে এতে ক'রে আপনারা বিড়ম্বিত-ই কোল্লেন সেই চিরন্তনের বাণীকে- বেদনা আর তার অনুভূতিকে অতিক্রম কোরে যা শাশ্বতরূপে জাগ্রত হয়ে আছে সমগ্র বিশ্বের রসকোষের রন্ধ্রে রন্ধ্রে। সাম্প্রদায়িকতার তপ্তশ্বাস দিয়ে, শাস্ত্রের নীরস রুদ্রতা দিয়ে, আর দুর্ভিক্ষের অসাহিত্যিক চণ্ডতা দিয়ে তাকে শুকিয়ে ফেলতে আমরা—এই তরুণ ভাবুকের দল প্রস্তুত নাও হোতে পারি। বিরাট-বিপুল বিশ্বসৌন্দর্য্যের পূর্ণপরিকল্পনা যে আনন্দরসের মধ্যে অবস্থিত—সে রস গাঢ়ত্বে গাম্ভীর্য্যে, মহিমায় মাধুর্য্যে অনুপম হোয়ে আমাদের চলার পথ ও পথের চলাকে সম্বলে পূর্ণ কোরে তুলেছে। রসতত্ত্বের এই গূঢ় রহস্যটা প্রথমে স্মরণ কোরে নিতে হবে যে দৃষ্টি আর সৃষ্টি দুটি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র জিনিষ। নিজকে নূতন কোরে লাভের জন্য মনোরাজ্যের অজানা ব্যাপারীর সঙ্গে নিতি নিতি যে লেনাদেনা আমাদের—এর জন্য প্রথম দরকার হয় সৃষ্টির সুতরাং বাহিরের প্রয়োজনকে অতিক্রম করার। দুঃখ অভাব বেদনা, অশ্রুধারা ও আর্ত্তনাদ, আর এই রকম ধারা যে জিনিষগুলির খতিয়ান নিয়ে আজ আপনারা সমাজে

একটা নূতন নীরসতার সৃষ্টি কোচ্ছেন, আওয়াজ—(আমঁরাও তা হ'লে স্রষ্টা ?) সৃষ্টি কোচ্ছেন, কোচ্ছেন—একটু জল— এক গ্লাস পানি, দেখুন এমন কোরে বাধা দেওয়া উচিত নয়, (জলের অপেক্ষায় উপবেশন, মাসিক পত্রের মধ্য হতে একখানা কাগজ বার কোরে হাওয়া খাওয়া, এবং সুযোগ মত তাড়াতাড়ি সবটার উপর চোখ বুলাতে বুলাতে জল খাইয়া) বলছিলাম—আজ আপনারা যে নূতন নীরসতার সৃষ্টি কোচ্ছেন, এর জন্যে কোরে মানুষের আর ভাবনা করা চোলবেনা। চিরন্তনের সেই সব-পাসরী বাঁশরী আজ আবার উদাস সুরে ঝঙ্কার দিয়ে উঠেছে সমগ্র সৃষ্টির বুকের পিণ্ডে পিণ্ডে (আওয়াজ—এইবার পিণ্ড দানের পালা। বক্তা কোন দিকে ভ্রুক্ষেপ না কোরে খুব তাড়াতাড়ি বলে চোল্লেন) তার তরঙ্গ প্রবাহকে আমাদের আজ স্বীকার কোত্তেই হবে—সোণার তরীতে সপ্তরঙ্গী ইন্দ্রধনুর পাল তুলে দিয়ে (জনৈক অধ্যাপক—ইন্দ্রধনু—এর মধ্যে অনৈছলামিক অবৈজ্ঞানিক ট্রাডিশন রয়েছে, কওজ কাজাহ বলুন) এ যুগের নবীন সিন্ধুবাদকে আজ সেই অচিন দেশের রূপসাগরে পাড়ী দিতেই হবে। কলকল খলখল কোরে সেই অজ্ঞাত অনাগতের অনন্ত তরঙ্গভঙ্গ মাভৈরবী ভৈরবীর এক নূতন প্রভাতীর করুণ মূর্চ্ছনা জাগিয়ে তুলেছে তরুণ বক্ষের কক্ষে কক্ষে—রূপদক্ষের যক্ষের ধন শিল্প সৃষ্টির শাশ্বত সৌন্দর্য্যে প্রাণারাম নয়নাভিরাম হোয়ে আছে যেখানে—এই অনুভূতির পেছনকার যে অনুভাব—

(আওয়াজ—অনুভূতি অনুভাব বুঝিয়ে দিন, বহু কণ্ঠে—বুঝিয়ে দিন, আবৃত্তিটা শেষ কোত্তে দিন, ইত্যাদি। সভাপতির থামুন থামুন চীৎকার ও টেবেল চাপড়ান) না, এখানে আর কিছুই বলতে চাইনা। (বজ্রবাণী, অনল কীট প্রভৃতিকে লইয়া গর গর কোর্ত্তে কোর্ত্তে সভা ত্যাগ।)

"মগরেবের ওয়াক্ত করিব হয়েছে বাবা; আমার অজুর পানী, এস্তেঞ্জার কমূখ অগায়রার বহুত পরহেজ আছে। আচ্ছা এখন আসি—আচ্ছালাম আলায়কুম।"

"ছদর ছাহেব! আপনার এজাজত চাই—৭॥ টার সময় ক্যালক্যাটা ক্লাবে ডিনারে শামেল হোতে হবে। বেশ আপনারা চেষ্টা করুন, আমার moral sympathy আপনাদের সঙ্গে আছে।"

সভাপতি—আপনাদের যে অত্যাবশ্যক কাজের জন্য কষ্ট দেওয়া হয়েছিল, তার কি ব্যবস্থা আপনারা কোরে যাচ্ছেন?

আওয়াজ—কোরে যাচ্ছেন এছলামের আদ্যশ্রাদ্ধ আর মুছলমানের চাল্লিশা। যেতে দিন ওঁদেরকে।

জনৈক যুবক—ভাই, প্রথমেইত বলেছিলাম!

"বলেছিলে সত্যি, কিন্তু তখন বুঝতে পারিনি যে, জাতির ধর্ম্মের ও বাঙ্গলার আড়াই কোটি মুছলমানের নাম কোরে যারা দুনয়াময় এমন ডঙ্কা পিটে বেড়ায়, তাদের হৃদয় এমন পাষাণ, তাদের প্রকৃতি এমন কপটতার আকর। তাই এই ঝকমারী কোত্তে গিয়েছিলাম। বেশ শিক্ষা হয়েছে, এখন চল, নিজেরা ভিক্ষের ঝুলি কাঁধে কর। এক মুঠা চা'ল সময় গতিকে একটা মানুষকে ধ্বংসের হাত হোতে রক্ষা কোত্তে পারে—চল ভাই, যতটুকু পারি, চেষ্টা কোরে দেখি।"

সভাপতি:—তোমরা তাই কর বাবা সকল! মুছলমানের জান—আর তার চাইতে বড়—মুছলমানের মান রাখার জন্য তোমরা প্রস্তুত হও, আমাদের সঙ্গে নিয়ে অগ্রসর হও, খোদা তোমাদের চেষ্টাকে নিশ্চয় জয়যুক্ত কোর্ব্বেন। বিলম্বের সময় নেই, সকলে আল্লার নামে কোমর বেঁধে লেগে যাও। আমরা মুছলমান আমরা মানুষ, আল্লার কাছে বান্দার কাছে একথা বলার মুখ যেন আমাদের থাকে! (আল্লাহো আকবর—সভা ভঙ্গ)

# চিত্রে—মক্কা-তীর্থ

কা'বা—হজ-মওছুমে
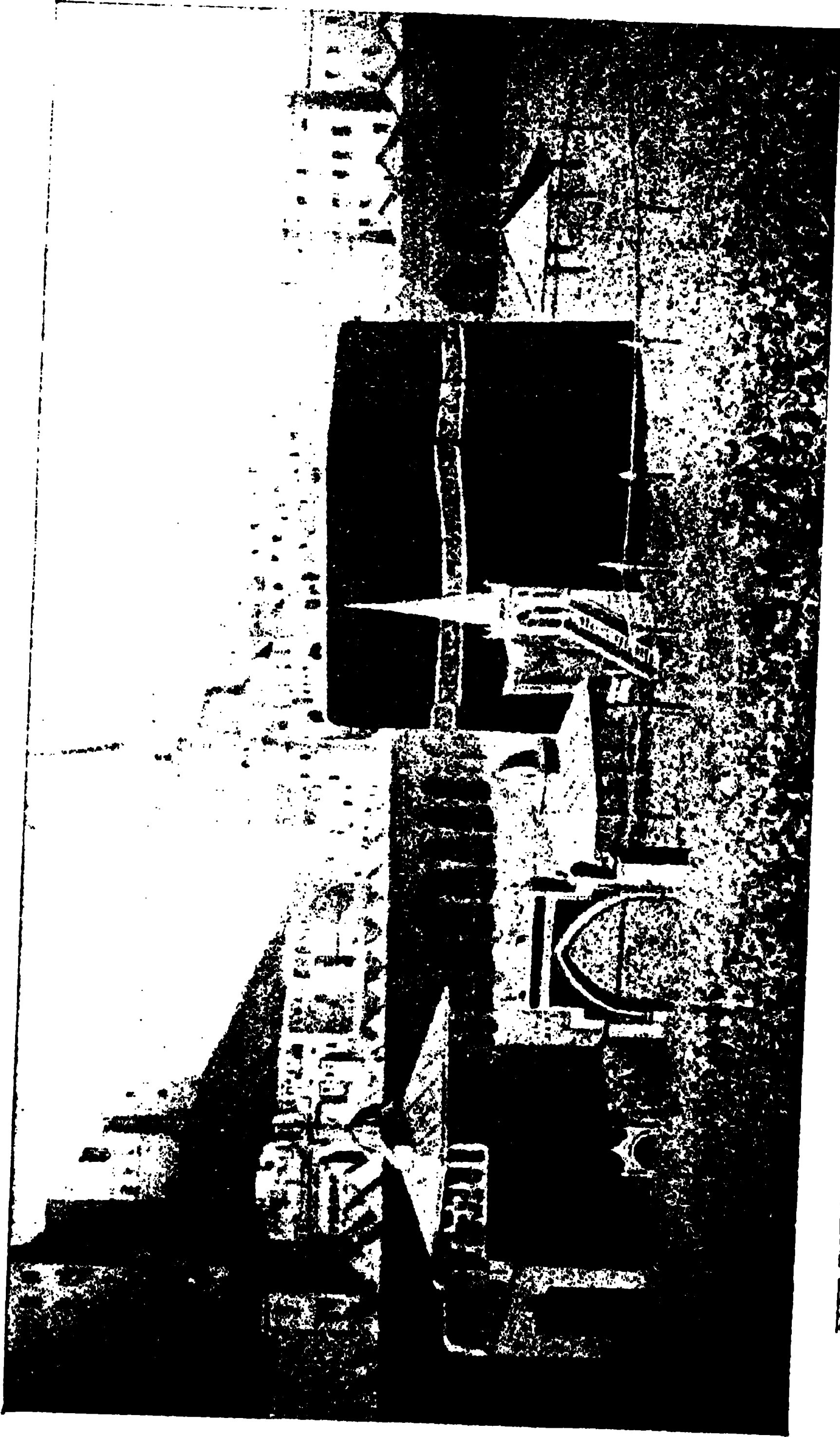
হজের মওছুমে লক্ষ লক্ষ ভক্ত মুছলমান মক্কায় সমবেত হইয়া কা'বার তওয়াফ করিতেছেন। হজের সময় দিবারাত্রি এই বিপুল জনস্রোত অযুত-কণ্ঠে আল্লার নামে জয়ধ্বনি তুলিয়া অবিরাম গতিতে এইরূপে কা'বার তওয়াফ করিতে থাকে।

হজ্জের মওছমে আরফাত পর্ব্বত-প্রান্তর

কয়েকদিন পূর্ব্বে লক্ষ লক্ষ হজযাত্রী এই প্রান্তরে সমবেত হইয়া হজব্রত সমাধা করিয়াছেন বৎপূর্ব্ব হইতে তাহার আয়োজন আরম্ভ হইয়াছিল। সাড়ে তেরশত বৎসর পূর্ব্বে রহমতুল্-লিল্-আলামীন হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা যেস্থানে দণ্ডায়মান হইয়া দুনয়াকে প্রেম ও সাম্যের চরম বাণী দান করিয়াছিলেন—পর্ব্বত-শিখরস্থ উচ্চ মিনার তাঁহার সন্ধান বলিয়া দিতেছে। হজ্জের সময় এমাম ঐখান হইতে খোৎবা দান করিয়া থাকেন। পর্ব্বতের অধিত্যকা ভূমিতে হজযাত্রীদের জন্য হাজার হাজার বস্ত্রাবাস স্থাপিত হয়।

## শয়তান মারার স্থান

হজরত এবরাহিম ও হজরত এস্মাইল যখন যথাক্রমে পুত্র বলি ও আত্ম-বলিদানে প্রস্তুত হইয়া মেনার পথে অগ্রসর হইতেছেন—তখন মায়ারূপী শয়তান তাঁহাদের কর্ত্তব্যপালনে বাধা দিবার জন্য চেষ্টা করিতে থাকে। কিন্তু এবরাহিমের ঈমানই এক্ষেত্রে জয়যুক্ত হইয়াছিল। সেই হইতে তীর্থ-যাত্রীরা—হজরত এবরাহিমের অনুকরণে—কর্ত্তব্য কর্ম্মে বাধাদানকারী শয়তানকে লক্ষ্য করিয়া কঙ্কর নিক্ষেপ করিয়া আসিতেছেন। উপরে গিরিসঙ্কটের সেই অপরূপ দৃশ্য প্রদর্শিত হইতেছে।

জবলে নূর বা হেরা-পর্ব্বত

এই হেরা পর্ব্বত-চূড়ায় দীর্ঘ দিবানিশি নিভৃত ধ্যান-ধারণায় তন্ময় থাকার পর হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা সেই স্বর্গ-মর্ত্তের নূরের প্রথম রূপ দর্শন করেন। এই পর্ব্বত-শিখরে,—আল্লার বাণী সর্ব্বপ্রথমে তাঁহার মনোপ্রাণে মুখরিত হইয়া উঠে। হেরার এই পর্ব্বত-প্রান্তর হজরতের সাধনা ও সিদ্ধির পুণ্যস্মৃতি।

# সাময়িক চিত্রাবলী

অলিম্পিক খেলায় ভারতবর্ষ

বর্ত্তমান য়ুরোপে আবার প্রাচীন গ্রীসের আদর্শে অলিম্পিক ক্রীড়ার উদ্বোধন করা হইয়াছে। এই প্রতি-যোগিতার মূলে একটি বৃহৎ আদর্শ আছে। সকল জাতির মধ্যে ক্রীড়ার মধ্য দিয়া একটা প্রীতির বন্ধন-যোগ রাখাই এই প্রতিযোগিতার উদ্দেশ্য।

প্রত্যেক জাতির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ খেলোয়াড়গণ এই প্রতিযো-গীতায় যোগদান করেন। আমরা চিরকাল ধরিয়া শুনিয়া আসিতেছি আমরা দৈহিক শক্তি পরীক্ষায় ও ক্রীড়া-কৌতুকে পশ্চাদ্‌পদ। কিন্তু আমরা বিদেশীয়দের মুখে অনেক কথাই শুনি যাহা সত্য নয় এবং এই অপবাদ তাহার মধ্যে একটী। ক্রীড়া-কৌতুকেও ভারতবর্ষ জগৎ-সভায় আপনার গৌরবের স্থান অধিকার করিয়া লইয়াছে।

এই সেদিন পাতিয়ালার বিখ্যাত পালোয়ান গামা জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পালোয়ানের পদবী অর্জ্জন করিয়াছেন। আজ আর একটী নূতন দল আর একটী নূতন বিভাগে জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গৌরবের আসন অধিকার করিয়াছে।

এইবারের অলিম্পিক হকি-প্রতিযোগিতায় ভারতবর্ষ যোগ্‌দান করে। এই হকি প্রতিযোগিতায় ভারতবর্ষ জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গৌরবের অধিকার অর্জ্জন করিয়াছে। প্রথমে গিয়াই ইংলণ্ডে মাত্র একটী বার এই দল পরাজিত হয়; তারপর সমস্ত খেলায় ভারতবর্ষ সন্দেহাতীত ভাবে জয়লাভ করে। পনেরো থেকে উনিশ গোলে বহু শক্তিশালী বিপক্ষ পরাজিত হয়। অলিম্পিক খেলায় যথাক্রমে বেলজিয়াম, হলাণ্ড, জার্ম্মাণী প্রভৃতিকে নিদারুণ ভাবে পরাজিত করিয়া ভারতবর্ষীয় হকিদল জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হকি খেলোয়াড় বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। ইহাদের খেলার পদ্ধতি দেখিয়া য়ুরোপীয় খেলোয়াড়রা আপনাদের পদ্ধতি সংশোধন করিয়া লইয়াছেন এবং তাঁহারা সকলেই একবাক্যে স্বীকার করেন যে ভারতীয় পদ্ধতি য়ুরোপীয় পদ্ধতি অপেক্ষা উন্নততর।

ভারতীয় হকিদল য়ুরোপে যাইয়া সর্ব্বশুদ্ধ ১৩৮টী গোল দিয়াছে এবং মোটে ১৮টি গোল খাইয়াছে। যুক্তপ্রদেশের খেলোয়াড় ধ্যানচাঁদ সকলের চেয়ে বেশী যশ অর্জ্জন করিয়াছেন। কলিকাতার সৌকৎ আলী, মধ্য-প্রদেশের ফিরোজ খাঁ প্রভৃতি যে যশ অর্জ্জন করিয়াছেন তাহা য়ুরোপীয়রা বহুদিন স্মরণে রাখিবে।

হলণ্ডে অলিম্পিক প্রতিযোগিতায় যোগদান করিবার জন্য ভারতীয় দল যখন হারলামে উপস্থিত হন তখন এই অন্তর্লগ্ন ছবিটী তোলা হয়।

## স্যার মুথাইয়া চেটিয়া
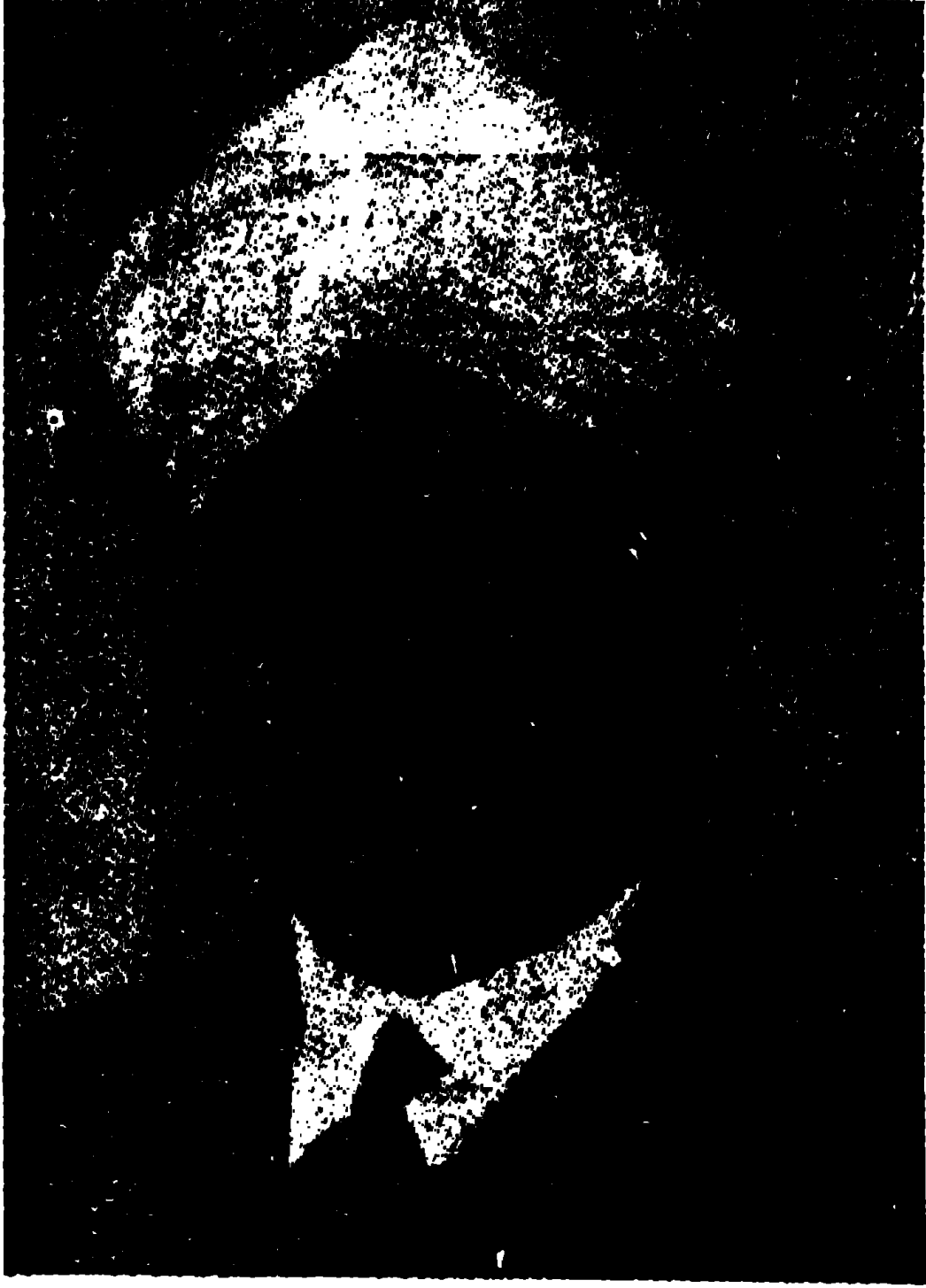
স্যার মুথাইয়া চেটিয়া মাদুরাতে একটী বিশ্ব-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা-কল্পে তেত্রিশ লক্ষ টাকা দান করিয়াছেন। স্যার মুথাইয়া নাট্টু কোটাই চেটিয়া সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত। ইঁহারা ভারতের মধ্যে এক অতি বিখ্যাত ধনী সম্প্রদায়। সিংহল, মালয় উপদ্বীপ প্রভৃতি স্থানে ইঁহাদের বিস্তৃত ব্যবসায় চলিতেছে।

## মিঃ আব্বাস আলি, বার-এট্-ল

মিঃ আব্বাস আলী খাঁ, বার-এট্-ল, রমনাদের পাবলিক প্রসিকিউটার ছিলেন। সম্প্রতি তিনি মাদ্রাজের প্রধান প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটের পদে অভিষিক্ত হইয়াছেন।

## শ্বেত হস্তী

বৌদ্ধদিগের "পবিত্র শ্বেত হস্তী" ইউরোপ ভ্রমণ করিয়া সম্প্রতি কলিকাতায় আসিয়াছে। কলিকাতা পশুশালায় আট আনা ফি দিয়া প্রত্যহ বহুলোক ইহা দর্শন করিতেছে।

## কা'বার গেলাফ

প্রত্যেক বৎসর মিছর হইতে কা'বার গেলাফ প্রেরিত হইত। এই বৎসর ভারতবর্ষ সেই সৌভাগ্য অর্জ্জন করিয়াছে। ভারত হইতে জাহাজে উত্তোলন করার সময় শত শত উৎসুক হস্ত সেই পবিত্র গেলাফের মর্য্যাদা রক্ষা করিবার জন্য উত্তোলিত হয়।

## ইংলিস্তান জাহাজ
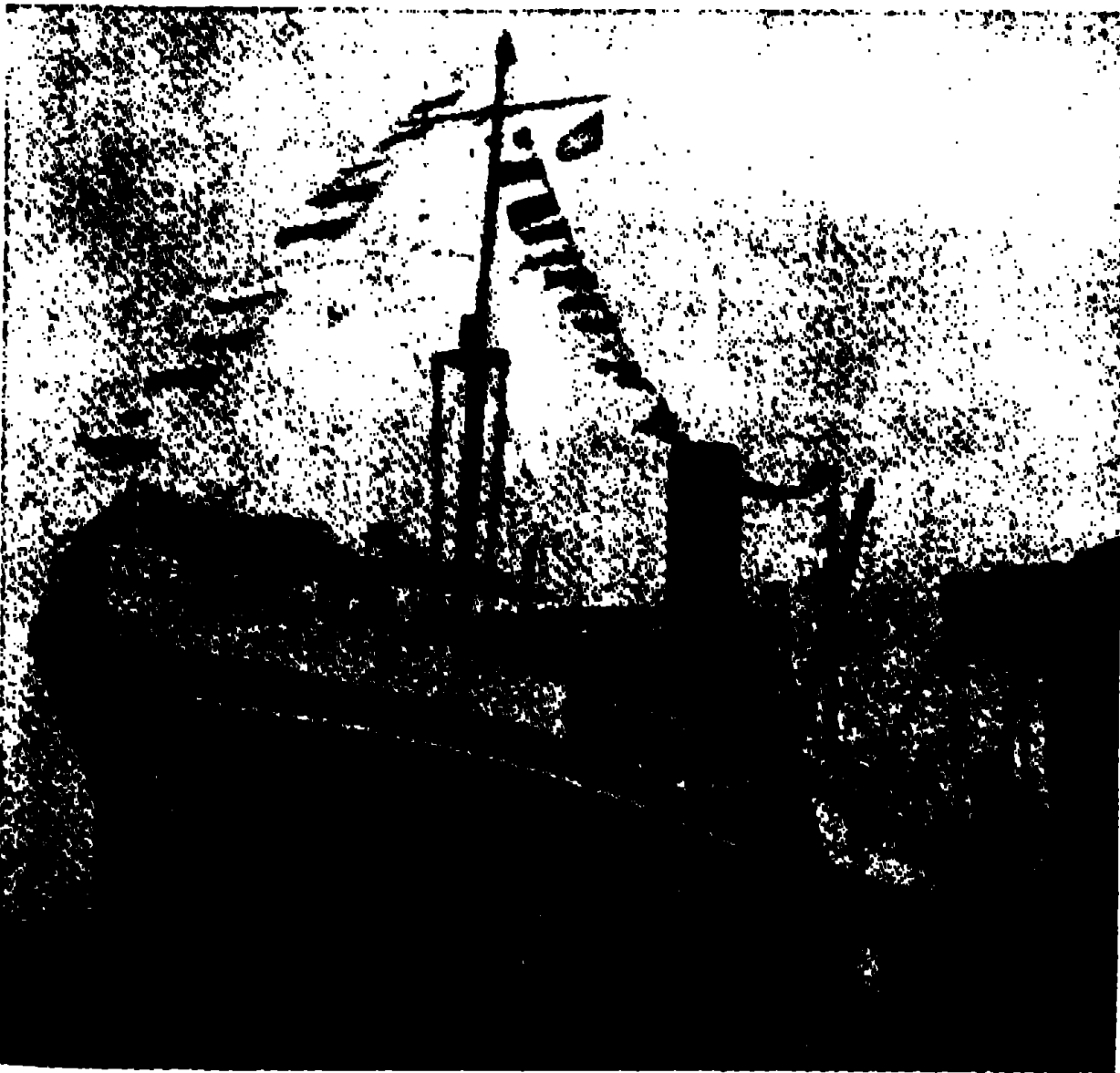
এই জাহাজে করিয়া ভারত হইতে পবিত্র গেলাফ কা'বার অভিমুখে প্রেরিত হইয়াছে।

বহু-ভাষাবিদ পণ্ডিত অধ্যাপক

মিরজা কাজেম শিরাজী

# সফল সন্ধ্যা

[ জসীম উদ্দীন ]

কি যেন সই কুড়িয়ে পেলাম,
সাঁঝ-গলা এই গাঁয়ের গাঙে
কাঁখের কলস ভাসিয়ে গেলাম।
বঁধুর রাঙা চুমোর মত
রাঙা মেঘের পাপড়ি গুলো
বেলা-শেষের আলোর ছোঁয়ায়
আমার বুকে লুটিয়ে প'ল।
চাউনী পাখীর ডানার ঘায়ে
সাঁঝের গগণ দুলছে ঘন
শ্বাসের হাওয়ায় মেঘের রেণু
রঙীন করে পরাণ মন।

পায়ের নুপুর হারিয়ে গেছে
খুলেছে সই বুকের বসন
যাক-না ও-সব চুলোয় সখি—
চুল বাঁধিবার সময় এখন ?
মতির মালা ? না-ই গাঁথিলি
ছিঁড়েছে যা যাক-না ছিঁড়ে
গেয়ো গাঙে সাঁঝ ভাসে সই
-- কারে যেন পেলাম ফিরে।

ওই যে সাঁঝের মেঘের মত
কাহার যেন ঠোঁটের হাসি,—
সখী আমার বড় ব্যথা
চোখের জলে যায় যে ভাসি।
হয়ত তারে পাবনা আর,
অভাগিনীর কাঁদার জনম
তাহার সোনার চরণ ছোঁয়ায়
হবে না আর উজল কখন।
তবু যে এই দারুণ ব্যথা
আঁচল খানি জড়িয়ে নিলাম—
ব্যথায় ব্যথায় পড়ছে মনে
কারে যেন কুড়িয়ে পেলাম।

সম্পাদকীয়
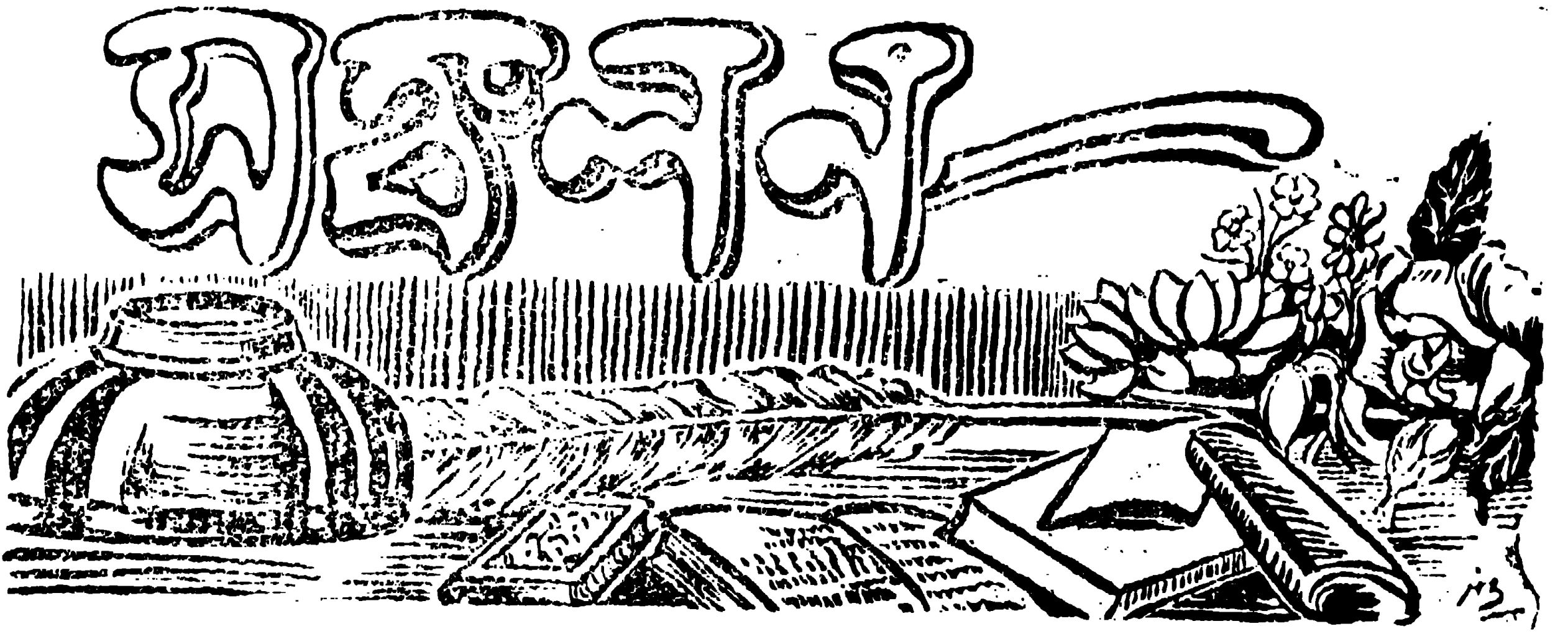
## ভারতের স্বাধীনতা

"ফরওয়ার্ডের" বিশেষ সংবাদদাতার পত্রে প্রকাশ,—আফগানিস্থানের সংবাদপত্র সমূহে কাবুলের রাজনৈতিক মতবাদ কতটা প্রতিফলিত হয় তাহা বলা যায় না, কিন্তু তবুও সমরকন্দের 'আলমুজাহীদ' নামক সংবাদ পত্রে বাদশাহ্ আমানুল্লাহ খাঁর ভারত ভ্রমণ সম্বন্ধে যে প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে তৎপ্রতি সকলেরই বিশেষ মনোযোগ আকর্ষিত হইয়াছে। এই প্রবন্ধে নানা প্রকার যুক্তি প্রমান দ্বারা প্রতিপন্ন করা হইয়াছে যে, "ভারতের স্বাধীনতার অর্থে সমগ্র প্রাচ্যের মুক্তি"।

উক্ত পত্র বলিয়াছেন—বাদশাহের এই ভারত ভ্রমণের ফলে ভারতবাসী হিন্দু মুছলমান, বিদেশীর কবল হইতে সদ্য-মুক্ত প্রতিবেশী আফগানের বিপুল শান-সওকত ও শক্তি সামর্থ্য প্রত্যক্ষ করিবার সুন্দর সুযোগ প্রাপ্ত হইয়াছেন। আলমুজাহীদ আশা করেন যে, শাহে আফগানের এই ভ্রমণ হইতে ভারত অনেক কিছু শিক্ষা করিবে এবং সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হাঙ্গামা দূরীকরণার্থে চিন্তাশীল ভারতীয়গণ আবার তাঁহাদের সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করিবেন। কারণ এসব বৃটিশ সরকারেরই কারসাজী।

উক্ত পত্র আরো বলিয়াছেন,—বাদশাহ ভারতের হিন্দু মুছলমানের ভিতর ঐক্য সংস্থাপনের জন্য যে মূল্যবান উপদেশ প্রদান করিয়াছেন তাহা সকল সম্প্রদায়ই গ্রহণ করিয়াছেন। বাদশাহের ইউরোপ-ভ্রমণ উদ্দেশ্যে ভারত ত্যাগের কএক দিন পরেই, পূর্ণ স্বাধীনতাই যে ভারতের মুখ্য এবং প্রধান উদ্দেশ্য, এরূপ একটি প্রস্তাব ভারতের জাতীয় রাষ্ট্রীয় সমিতিতে গৃহীত হইয়াছে। গত সুদীর্ঘ এক চল্লিশ বৎসর বয়সে এবং এমনকি মহাত্মা গান্ধীর সেই গৌরবময় প্রভাবের দিনেও, কংগ্রেস 'স্বায়ত্ব শাসনের' অধিক বেশী কিছু দাবী করা ত দূরের কথা, ভাবিতেও পারে নাই। বাদশাহের অভ্যর্থনার ব্যাপারে কয়েকটি গুরুতর ত্রুটির জন্য আলমুজাহীদ পত্র ভারত গবর্ণমেণ্টকে বিশেষভাবে অভিযুক্ত করিয়াছেন। তাহার মধ্যে সব চেয়ে গুরুতর ত্রুটি এই যে ভারত সরকার ভারতীয় রাজা ও নওয়াবদিগকে বাদশাহের অভ্যর্থনায় আহ্বান করেন নাই। হায়দ্রাবাদের নিজাম বাহাদুর বেসরকারী ভাবে বাদশাহের সাক্ষাৎপ্রয়াসী হইয়াছিলেন, কিন্তু বৃটিশ সরকারের ইঙ্গিতে তাঁহাকে বোম্বাই যাইতে দেওয়া হয় নাই। বোম্বাইয়ের অভ্যর্থনা সমিতিকেও সরকারের ইঙ্গিতে অভিভাষণ পাঠ করিতে দেওয়া হয় নাই। বাদশাহ্ যেদিন বোম্বাই আগমন করেন সেদিন বড় লাটের অসুখের অজুহাতে বড় লাটের পক্ষে বোম্বাইয়ের লাট তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিতে আসিলে বাদশাহ্ রাজকীয় অতিথিরূপে বোম্বাই পদার্পণ করিতে অস্বীকার করেন। পরে বোম্বাইয়ের গবর্ণরকে ভারত সম্রাটের প্রতিনিধি করিয়া লণ্ডন হইতে তার আসে এবং তখন বাদশাহ সেই অভ্যর্থনা গ্রহণ করেন। এই সকল ত্রুটির জন্যই বাদশাহের উদ্দেশ্যে যে সকল ভোজ সভার আয়োজন হইয়াছিল, বাদশাহ তাহার আমন্ত্রণ গ্রহণ করেন নাই।

* * * *

বৃটন ( Divide and rule ) …………নীতি অবলম্বন করিয়া ৩৪ কোটি ভারতবাসিকে বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত করিয়া ফেলিয়াছেন। কিন্তু বর্ত্তমানে ভারতীয় নেতৃবর্গ সাম্প্রদায়িক মনোমালিন্য দূর করিয়া জাতীয় এবং স্বাধীন

শাসন প্রণালীর খসড়া প্রস্তুত করিতেছেন। ভারতীয়গণ এখনও স্বাধীন জাতীয় গবর্ণমেণ্ট গঠন করিবার উপযুক্ত হয় নাই, ইহা প্রমাণ করিবার জন্যই সায়মন কমিশন প্রেরিত হইয়াছিল। কিন্তু ভারতের বর্ত্তমান আন্দোলনের ফলেই কমিশনকে সকলে বয়কট করিয়াছেন। কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভায় কমিশন বয়কট প্রস্তাব গৃহীত হওয়ায় এবং লণ্ডন ও দিল্লী গবর্ণমেণ্টের বারবার পরাজয়ে ইহা বেশ প্রতীয়মান হইয়াছে যে বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট আর মোটেও জনপ্রিয় নহেন। ভারতবাসীরা বর্ত্তমানে দাবী করিতেছেন যে ভারতীয় জননেতা এবং রাজনীতিকগণের সমবায়ে এক সম্মিলনের অনুষ্ঠান করা হউক এবং তাহাতে ভারত সরকার ভারতের স্বাধীনতা সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া এক সন্ধিবদ্ধ হউন।

আলমুজাহীদ পত্র আশা করেন, "যে কোন উপায়ে হউক, খোদাকরুন ভারত যেন অচিরেই বৃটিশের কবল হইতে মুক্তি লাভ করিয়া বিশ্বের বুকে উচ্চশিরে দণ্ডায়মান হইতে পারে। আল-মুজাহীদ আরও বলেন—ভারত রক্ষার্থে ভারতের প্রতিবেশী এসিয়ার অন্যান্য রাজ্য গুলির শক্তিহীন হইয়া থাকা বা তাহাদিগকে শক্তিহীন করিয়া রাখার দরকার খুব অধিক। তাই বলা যাইতে পারে যে ভারতের মুক্তি অর্থে সমগ্র প্রাচ্যের মুক্তি।

---

## ভদ্রমহিলা ও নাট্যাভিনয়

ভদ্রমহিলাদের সাধারন নাট্যশালায় আসা নিয়ে একটা কথা উঠেছে। 'আত্মশক্তি'র 'চন্দ্রশেখর' ভদ্র নারীদের ষ্টেজে আসা সমর্থন করিয়া লিখিয়াছিলেন ( ২ই এপ্রিল, ১৩৩৪ )। আমি ঐ লেখার প্রতিবাদ করিয়াছিলাম ( 'আত্মশক্তি'—৭ই বৈশাখ ১৩৩৫ )। ভদ্রমহিলাদের সাধারণ নাট্যশালায় আসা অনুমোদন কেন করি নাই এই প্রবন্ধে পুনরায় বুঝাইতে চেষ্টা করিলাম। ভদ্রমহিলাদের ষ্টেজে আসার প্রথম প্রতিবন্ধক ষ্টেজে আসিতে হইলেই জীবনকে ষ্টেজের আবহাওয়ার অনুরূপ করিয়া গড়িতে হইবে। সাধারন নটীরা যেরূপ 'abnormal' ( সামাজিক অদর্শ-বহির্ভূত ) জীবন যাপন করে সেইরূপ ভাবে জীবন যাপন করিতে বাধ্য হইবে। অনেকে বলিতেছেন ঐ যে 'abnormal' জীবন যাপন উহারই প্রতিকার করিতে হইবে, এতে যদি আলাদা নাট্যশালা গড়ে তুলতে হয় তাতেও রাজী।

ঐ অবস্থার প্রতিকার কি করিয়া হইতে পারে তাহা ত বুঝিতে পারি না। নারীকে যদি পুরুষের সঙ্গে নিয়ত মিলিত হইতে হয় তবে কি সেই নারী বা পুরুষ আপনাদিগকে প্রলোভন হইতে রক্ষা করিতে পারিবেন? যদিই এখানে ধরিয়া লওয়া যায় নারী এবং পুরুষ সকলেই নির্ম্মল চরিত্র এবং শিক্ষিত হইবে, কিন্তু তাহা হইলেও পুরুষ ষ্টেজের ওপর যদি নারীর সহিত অবাধে মেলা-মেশার অধিকার পায় তবেই সে ক্ষেত্রে 'appeal of sex' ( কামাবেগ ) সম্ভাবনা। কারণ প্রকৃতির নিয়ম স্ত্রী পুরুষের অবাধ মেলা মেশায় পুরুষ এবং স্ত্রী উভয়ের মধ্যেই 'আসঙ্গ-লিপ্সা' জন্মায়। সুতরাং 'Abnormality' ( সমাজিক আদর্শের বিচ্যুতি ) দূরীভূত করার কল্পনা ভুল।

ওদেশে থিয়েটারের নটীদের বিবাহ হয় এবং তাহারা সাধারণ ভাবে জীবন যাপন করিতে সক্ষম হয়। কিন্তু আমাদের সামাজিক অবস্থা ওদেশের মত নয় সুতরাং ভদ্রমহিলাদের ষ্টেজে আসার কল্পনা ভুল।

আমাদের দেশে যে-মহিলা Stageএ ( রঙ্গমঞ্চে ) আসবেন, বাধ্য হয়েই তাঁর 'চরম ও পরম আদর্শ' সাধারন গৃহস্থ-রমণী হইতে অনুরূপ হইবে। সুতরাং যাকে আমরা গৃহিণীর কর্ত্তব্য বলি তার সঙ্গে স্বাধীন জীবিকার্জ্জনে নিযুক্তা নারীদের যে সঙ্গতি থাকিবে না সে কথা 'বিশেষ করিয়া না বলিলেও চলে'।

ইহাই যদি হয় তবেই দেখা যাইতেছে যে ঐ যে 'Abnormalityর' ( সামাজিক আদর্শ-বিচ্যুতির ) প্রতিকার চাওয়া হইয়াছে তাহা ভুল, কারন যে নারী ষ্টেজে আসিবেন' তাঁর 'চরম ও পরম আদর্শ' যদি গৃহস্থ-রমণী হইতে 'বিভিন্ন' হয় এবং 'গৃহিণীর কর্ত্তব্য' বলিতে যাহা বুঝা যায় তাহার সহিত যদি 'সঙ্গতি না থাকে' তবে বুঝিতে হইবে যে ঐ সকল নারীর জীবন এমনি ধারায় চলিতেছে যাহা গৃহিণী হইতে বিভিন্ন। অর্থাৎ—'Abnormal' ( সামাজিক আদর্শ বহির্ভূত )। Aristocratic' ( বড় ঘরের ) মেয়েরা আজকাল থিয়েটার করিতেছেন বটে কিন্তু তাঁদের একাজ শিল্প সাধনার জন্য, জীবিকার্জ্জনের জন্য নয়। সুতরাং এক্ষেত্রে 'abnormality' আসিবার সম্ভাবনা নাই। যাঁরা জীবিকার্জ্জনের জন্য থিয়েটার করিবেন তাঁদের রাত্রির পর রাত্রি পরপুরুষের সাথে মিলিত হইতে হইবে। সুতরাং

তাদের চরিত্র বিশুদ্ধ থাকিবে এরূপ ভুল বিশ্বাস বোধ হয় কারো নাই। ভদ্রমহিলাদের ষ্টেজে আসা সম্বন্ধে 'কেতকী' 'আত্মশক্তিতে' যাহা বলিয়াছেন তাহাই আমি এ সম্বন্ধে 'চূড়ান্ত মিমাংসা' বলিয়া মনে করি। সুতরাং এ সম্বন্ধে আর কিছু না বলিয়া আমি তাঁহার কথাই তুলিয়া দিলাম।

'আর্টিষ্ট হিসাবে যে সব তরুণীরা ষ্টেজে নামবেন তাহাদিগকে কি ঘরের দিকে পেছন ফিরে অগস্ত্য যাত্রা করতে হবে, ষ্টেজে নামবার সঙ্গে সঙ্গে কি ঘরের দিকে মায়া কাটান একান্ত প্রয়োজন? কথাটা শুনলেই একটা খট্‌কা লেগে যায়, মনের সঙ্গে কিছুতেই খাপ খাওয়াতে পারি না এই কথাতে যারা আমাদের আনন্দ দান করবে তাদের নির্ব্বাসিত করে রাখাই দরকার।

কিন্তু প্রাচীন ভারতেও এই ব্যবস্থা ছিল। নটীদের সমাজে একটা বিশিষ্ট স্থান ছিল সেটা অসম্মানজনক মোটেই ছিল না। কিন্তু তাঁরা কোন গৃহিণী, মাতা, কন্যা বা বধূ ছিলেন না। তাঁরা নটীই ছিলেন.............। আর যদি মহিলারা ষ্টেজে নামেন সখের হিসাবে, তাহ'লে ঘর বার দুই রাখা চলতে পারে। কিন্তু রূপদক্ষের মত যদি পাষাণের ভেতরকার গান গেয়ে বলতে চান...............তাঁকে হতে হবে শুধু নটী।' ভদ্র মহিলারা ষ্টেজে নামতে পারে কিন্তু যাকে বলে ঠিক গৃহ তাতে ফিরে যেতে পারবেন না।

( বাংলার বাণী )

## এসলামী-তসওউফ

ডাক্তার নিকলসন নামক স্বনাখ্যাত প্রাচ্যবিদ্যাবিশারদ পণ্ডিত বহু আলোচনা ও গবেষণার পর এসলামী-তসওওফের প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হইয়াছেন। এসলামী-তসওওফের বাস্তবতা, সত্যতা, কার্য্যকারিতা ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিয়া তিনি পূর্ব্বে একখানি গ্রন্থরচনা করিয়াছেন, সম্প্রতি ক্যাম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষ এসম্বন্ধে তাঁহার আর একখানি গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন। এই গ্রন্থখানির নাম The Idia of Personality in Sufism. তিনি ইহাতে প্রমাণ করিয়া দেখাইয়াছেন যে ইসলামের আধ্যাত্ম-বাদ (Sufism) ধর্ম্মের ভিত্তির উপর স্থাপিত এবং আত্মার পূর্ণতৃপ্তি সাধনের পক্ষে ইহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপায়।

## কীট ধ্বংসের নূতন উপায়

সময় সময় কৃষিক্ষেত্রে কীটের উপদ্রব এরূপ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া থাকে যে তাহাদের উপদ্রবে ক্ষেত্রের ফসল নষ্ট হইয়া যায়, ফলে কৃষকগণ যারপর নাই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সম্প্রতি আমেরিকার কৃষিতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণ এক প্রকার ঔষধ আবিষ্কার করিয়াছেন, ঐ ঔষধ বৎসরে ৩ বার মাত্র (মে, জুন ও ডিসেম্বর) জমীতে ছিটাইয়া দিলে কীট বংশ সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হইয়া যায়। এক গ্যালন ঔষধ ৮৬০ বর্গফিট জমীতে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। মূল্যের হিসাবেও বেশ সুলভ।

## শিল্প ও কারিগরী শিক্ষা

বর্ত্তমান যুগে শিল্প ও কারিগরী শিক্ষার দিকে সাধারণতঃ সকল দেশেই একটা সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। ভারতবর্ষই এ বিষয়ে সকলের পশ্চাতে। নিম্নে ইংলণ্ডের শিল্পশিক্ষার্থী ও শিক্ষকগণের একটী হিসাব প্রদত্ত হইল। ইহা হইতেই ইংলণ্ডবাসিগণের শিল্পানুরাগের বেশ পরিচয় পাওয়া যায়—

| সন | শিল্পশিক্ষার্থীর সংখ্যা | শিল্পশিক্ষকের সংখ্যা |
|---|---|---|
| খৃঃ ১৯১৩—১৪ সাল | ২৭৩২১২ | ২০০০০ |
| খৃঃ ১৯২১—২২ সাল | ৪৮৬৪৬০ | ৪০০০০ |

এই চল্লিশ সহস্র শিক্ষকের মধ্যে ১৩৩৮৪ জন সকল কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া কেবল শিক্ষাকার্য্যেই আত্ম-নিয়োগ করিয়াছেন।

## অগ্নি নির্ব্বাণের সহজ উপায়

এতদিন অগ্নিনির্ব্বাণ কার্য্যে পানি ও ধূলি ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছিল; কিন্তু সকল সময়ে সকল জায়গায় উহা প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায় না; তাই জর্ম্মাণ বৈজ্ঞানিকগণ সম্প্রতি ইহার জন্য একটী অভিনব উপায় আবিষ্কার করিয়াছেন। তাঁহারা ধূলির ন্যায় এক প্রকার গুঁড়া তৈয়ার করিয়াছেন, বারুদের পরিবর্ত্তে ঐ গুঁড়ায় প্রস্তুত কার্টিজ বন্দুক ও পিস্তলে পুরিয়া লেলিহান ভীষণ অগ্নির দিকে ছুড়িলেই সহজে ও অবিলম্বে আগুণ নিবিয়া যায়।

# বাদল বিরহী

[ আবু নয়ীম মোহাম্মদ বজলর রশীদ ]

কালো কালো মেঘ, গেঁয়ো নদী-বুকে আঁধার করিয়া আসে,
বালি হাঁসগুলো ছুটাছুটি করি' উচ্ছল ঢেউ-এ ভাসে ;
বলাকার সারি মেঘের দেশেতে জমায় তাদের পাড়ি ,
ছোট ছোট গাঁও বালু-চড়া আর কত কাশবন ছাড়ি।
সবুজ ক্ষেতের গাঢ় রঙ যেন সজল হয়ে ওঠে,
মেঘের করুণ ব্যথাখানি যেন ওর বুকে মুখে ফোটে।
ও-যেন মেঘের কত আপনার ও-যেন মেঘের হাসি,
ও-যেন মেঘের করুণ কাঁদন অশ্রুতে ওঠে ভাসি' !
ওর ছোট ছোট শীষগুলি যেন মেঘ-বালাদের ডাকে,
বলে, তোরা ভাই কাঁদিস্‌নে আর একেলা মাঠের বাঁকে।
এত ব্যথা হায় ঝরে ঝরে পড়ে তবু ত হয় না শেষ!
সারা দুনয়ার ব্যথিতের জল ভিজা'য়েছে কি গো কেশ।
গেঁয়ো ছেলেগুলি ময়ূরের মত মেঘের চমকে নাচে,
ওর সাথে যেন মিতালী ওদের দেখলেই যেন বাঁচে।
নদীর সজল কাজল আঁখিতে তড়িতের লতা হাসে,
ওর কালো চোখে কিসের ব্যথায় বন্যা বহিয়া আসে।
বুকের ব্যথায় বিরহিনী বালা বাজায় বিষের বাঁশী,
নিবিড় আঁধারে খুঁজে ফেরে কারে পাগলের মত হাসি'।
ওদের মতন বিরহী যাহারা অশ্রুতে ভরপূর,
বাদলের সাথে ব্যথা বেজে' ওঠে বাদলের সাথে সুর!

## বৈজ্ঞানিক-কুসংস্কার

আমরা অনেক সময় বলিয়াছি যে, প্রত্যেক বৈজ্ঞানিক থিউরী বৈজ্ঞানিক সত্য নহে। এই সঙ্গে আরও বলা আবশ্যক যে, ধর্ম্ম ইতিহাস ও দর্শনাদি শাস্ত্রকে উপেক্ষা করিয়া যেমন অনেক সময় কতকগুলি বিশ্বাস ও সংস্কার ধর্ম্ম ইতিহাস ও দর্শনের ভাণ করিয়া তুনয়ামর চলিত হইয়া থাকে, সেইরূপ কতকগুলি গুরুতর ভ্রান্ত ধারণা বিজ্ঞানের নামে জন সাধারণের, এমন কি শিক্ষিত সমাজের মধ্যেও বদ্ধমূল হইয়া যায়। এগুলিকে আমরা বৈজ্ঞানিক-কুসংস্কার বলিয়া উল্লেখ করিতে পারি।

আমেরিকা যুক্তরাজ্যের কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটীর বার্ণার্ড কলেজের মনোবিজ্ঞানের অধ্যাপক মিঃ হলিংওয়ার্থ বহুদিনের পরীক্ষা ও অনুসন্ধানের পর অন্যান্য জ্ঞাতব্যসহ—এই প্রকার বৈজ্ঞানিক কুসংস্কারের একটা তালিকা প্রকাশ করিয়াছেন। ঐ তালিকার একস্থানে তিনি বলিতেছেন—জ্ঞাতী ভাই-ভগিনীদের মধ্যে বিবাহের ফলে উৎপন্ন সন্তানগণ ক্ষীণজীবী ও দুর্ব্বলমস্তিষ্ক হয় বলিয়া শিক্ষিত সমাজের মধ্যে একটা ধারণা বদ্ধমূল হইয়া আছে। লোকে ইহাকে বৈজ্ঞানিক সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিয়া থাকে। কিন্তু বস্তুতঃ বিজ্ঞানের সহিত ইহার কোনই সংশ্রব নাই, বরং প্রকৃতপক্ষে ইহা একটা সম্পূর্ণ বিজ্ঞান-বিরুদ্ধ কুসংস্কার ব্যতীত আর কিছুই নহে।

এছলামে জ্ঞাতী ভাই-ভগিনীদিগের মধ্যে বিবাহের অনুমতি আছে। একদল লোক উপরোক্ত বৈজ্ঞানিক-কুসংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে মন্তব্য প্রকাশ করিয়া আসিতেছেন। পূর্ব্বে দুই একবার এই শ্রেণীর দুই একজন পণ্ডিতের সহিত আমাদের এ সম্বন্ধে আলোচনা হইয়াছিল। আমরা তাঁহাদিগকে বলিয়াছিলাম—যে জিনিষটাকে বৈজ্ঞানিক সত্য বলিয়া আপনারা দাবী করিতেছেন, তাহা যে বাস্তবিকই বৈজ্ঞানিক সত্য—কুসংস্কার নহে, এ কথা আপনারা প্রথমে যুক্তির হিসাবে সপ্রমাণ করুন! কিন্তু বৈজ্ঞানিক বাজারের জনশ্রুতি ব্যতীত আধুনিক দর্শন বিজ্ঞানের সহিতও এই শ্রেণীর পাণ্ডিত্যাভিমানীদের সম্বন্ধ খুবই অল্প, কাজেই এবিষয়ে গভীরভাবে বিচারে প্রবৃত্ত হইতে তাঁহারা কখনও প্রস্তুত নহেন। সে যাহা হউক, সাহেব লোকের মুখে এই তত্ত্ব অবগত হওয়ার পর এখন বোধ হয় অনেকেই স্বস্তিলাভ করিতে পারিবেন!

---

## "মোল্লা-প্রভাবের অনিষ্টকারিতা"

স্বজাতির ও স্বদেশের মঙ্গল চিন্তায় উদ্বুদ্ধ হইয়া যাঁহারা জাতির ও দেশের বিভিন্ন মানব-সমাজের অবস্থাদির সমালোচনায় প্রবৃত্ত হন, তাঁহারা জ্ঞানী ব্যক্তি মাত্রেরই ধন্যবাদার্হ। কারণ এই প্রকার সমালোচনার অভাব ঘটিলে নিজের দোষ ত্রুটিগুলির উপর সমাজের নজর পড়িতে পারে না, সুতরাং তাহার সংস্কার চেষ্টাও সম্ভবপর হইয়া উঠে না। কিন্তু এই প্রকার মন্তব্য প্রকাশের সময় যাঁহারা পক্ষপাত ও একদেশদর্শিতার মহাপাতক হইতে নিজেদের মন ও মস্তিষ্ককে মুক্ত রাখিতে সমর্থ না হন, সমাজ সংস্কারকের দায়িত্বপূর্ণ আসনে উপবিষ্ট হইয়া যাঁহারা সমালোচনা ও প্রোপ্যাগেণ্ডার

পার্থক্য বুঝিয়া অগ্রসর হইতে না পারেন, তাঁহাদের আলোচনায় সমাজে কোন গভীর আত্ম-চিন্তার উদ্রেক ত হইতেই পারে না—পক্ষান্তরে তাহাদ্বারা হিংসা-বিদ্বেষ ভেদ ও আত্মকলহের ভাবে জাতির অন্তরাত্মা পূর্ণ হইয়া উঠে মাত্র। সাময়িকভাবে কোন একটা দলের অনুকূলে বা প্রতিকূলে ইহাদ্বারা একটা প্রোপ্যাগেণ্ডার কাজ সমাধা হইতে পারে, কিন্তু আলোচনার মূল উদ্দেশ্য ইহাতে পণ্ড হইয়া যায়, অধিকন্তু হিতে বিপরীত ফল ফলিতে আরম্ভ হইয়া থাকে।

এদেশের আলেম সমাজের যে অনেক দোষ-ত্রুটি আছে এবং সমাজের মঙ্গলের জন্য সে গুলির প্রতিকার যে নিতান্ত আবশ্যক, একথা আমরা অনেকদিন হইতে বলিয়া আসিতেছি। এই সব দোষ-ত্রুটি, তাহার কার্য্য-কারণ ও সেগুলির প্রতিবিধানের উপায় সম্বন্ধে, নিজেদের সামান্য জ্ঞান অনুসারে, আমরা বারম্বার বিস্তারিতরূপে আলোচনা করিয়াছি—এবং সেজন্য আমাদিগকে অন্ধ-বিশ্বাসী ও সংস্কার বিরোধী আলেম সমাজের যথেষ্ট বিরাগভাজনও হইতে হইয়াছে। সুখের বিষয় বাঙ্গলার কএকজন আলেম নিজেদের মারাত্মক অবস্থা সম্যকরূপে উপলব্ধি করিয়াছেন এবং তাহার মূলীভূত কারণগুলির অনুসন্ধান করিয়া সে সমুদয়ের প্রতিকারে জন্য তাঁহারা যথাসাধ্য চেষ্টারও ত্রুটি করেন নাই। দুঃখের কথা এই যে, উচ্চ শিক্ষিত ও উচ্চ পদস্থ মুছলমানেরাই তাহাদের সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া দিতে "সদাশয় গভর্ণমেণ্ট বাহাদুরের" সহায়তা করিয়াছেন। মোছলেম-বঙ্গের গত ত্রিশ বৎসরের ধারাবাহিক ইতিহাস আলোচনা করিয়া দেখিলে আমাদের কথার সত্যতা সহজে হৃদয়ঙ্গম করা যাইতে পারিবে। বাঙ্গলার আলেম সমাজের বর্ত্তমান অবস্থার জন্য সরকারী মাদ্রাছার মারাত্মক শিক্ষা-প্রণালীকে প্রধানতঃ দায়ী করা যাইতে পারে। সেজন্য বাঙ্গলার আলেম সমাজই উহার সংস্কারের জন্য আন্দোলন উপস্থিত করেন। এই আন্দোলনের ইতিহাস ও তাহার বর্ত্তমান পরিণতি সম্বন্ধে যাঁহারা খোঁজ-খবর রাখেন, তাঁহারা আমাদের কথার সত্যতা অস্বীকার করিতে পারিবেন না।

হাফেজ বলিয়াছেন—তুমি যদি ন্যায়দর্শী সমালোচক হও, তাহা হইলে মন্দের দোষগুলি কীর্ত্তন করার পর তাহার গুণ টুকুর কথাও সঙ্গে সঙ্গে বলিয়া দিও! দুঃখের বিষয়, আজকালকার এক শ্রেণীর লেখক এ নীতিটীর প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করাই সঙ্গত মনে করিয়া থাকেন। মোল্লাদের সম্বন্ধে হাতে মাথা কাটার ব্যবস্থা দিবার সময় তাঁহারা ভুলিয়া যান যে, জাতি ও রাষ্ট্র সম্বন্ধে আলেম সমাজের সাধনাগুলিকে বাদ দিয়া কথা বলিলে মোছলেম ভারতের গত দেড় শত বৎসরের ইতিহাসে উল্লেখ যোগ্য প্রায় কিছুই বাকী থাকে না। বাঙ্গলা দেশেরও ঐ এক কথা। সব চাইতে বড় কথা এই যে, জাতিকে এছলামহীন মুছলমানে পরিণত করার জন্য আকবর বাদশাহের আমলদারী হইতে আজকার দিন পর্য্যন্ত ঘরে বাহিরে নানা সূত্রে যে সব চেষ্টা চরিত্র চলিয়া আসিতেছে, সেই সমস্ত চেষ্টাকে বিফল করিয়া আজও মুছলমানকে মুছলমান স্বরূপে বাঁচাইয়া রাখিয়াছে এই মোল্লা মৌলবীর দল—যাহার ফলে অন্ততঃপক্ষে আমাদের "শিক্ষিত সমাজ" শতকরা ৪৫ ও ৫৫ এর দোহাই দিয়া রাজপ্রাসাদের দ্বারদেশে 'ধর্ণা' দিতে সমর্থ হইতেছেন!

পীর হইলেই তিনি ভাল হইবেন অথবা পীর হইলেই তিনি মন্দ হইবেন, এই দুই মতকেই আমরা অর্ব্বাচীনতা বলিয়া মনে করিয়া থাকি। পক্ষান্তরে পীর ছাহেবদিগকে আমরা মানবীয় দোষদুর্ব্বলতার অধীন বলিয়াই মনে করি। অতএব কোন একজন পীর কতকগুলি ভাল কাজ করিতেছেন—এই অজুহাতে আমরা সেই পীরের সমস্ত কাজকেই নিশ্চিতরূপে সঙ্গত বলিয়া মানিয়া লইতে প্রস্তুত নহি। পক্ষান্তরে মানবীয় দোষ দুর্ব্বলতার ফলে যদি কোন পীর কখন দুই একটা গর্হিত কাজ করিয়া ফেলেন, তাহার জন্য তাঁহার সমস্ত সৎকীর্ত্তিকে বিস্মৃত হইয়া লোক সমাজে তাঁহাকে নরকের কীটরূপে প্রতিপন্ন করার চেষ্টাকেও আমরা যুগপৎভাবে অমানুষের কাজ ও সমাজের পক্ষে ক্ষতিজনক বলিয়া মনে করি। আমাদের সহিত অন্যান্য সংস্কারপন্থী ও সংহার প্রয়াসীদের পার্থক্য এই খানে। পীর ছাহেবদের বিষয় এই হিসাবে আলোচনা করিলে আমাদের মূল উদ্দেশ্য সহজে সফল হইতে পারে।

ন্যাশনালিষ্ট মুছলমানদিগের কার্য্য কলাপে এবং ভারতের স্বাতন্ত্র্য লাভের পথে "মোল্লা শক্তি একটা বিরাট বাধা স্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে"—এ কথা শুনিয়া আমরা হাসি সম্বরণ করিতে পারি নাই। ন্যাশনালিষ্ট মুছলমানদের দলের ও তাঁহাদের দলপতিগণের একটুও সন্ধান যাঁহারা রাখেন, তাঁহারা এই মন্তব্যকে কখনই সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে

পারিবেন না। প্রাতঃস্মরণীয় মাওলানা ছৈয়দ আহমদ বেরেলভী ছাহেবের সময় হইতে আজ পর্য্যন্ত ভারতের স্বাতন্ত্র্য লাভ সম্বন্ধে এ দেশে মুছলমানদের পক্ষ হইতে যতটা চেষ্টা চরিত্র হইয়া আসিয়াছে, সে সমস্তের নায়কতা করিয়াছেন আমাদের আলেম সমাজ। এ জন্য কত আলেমকে কালাপানিতে পচিয়া মরিতে হইয়াছে, কত বিখ্যাত আলেমকে গাছের ডালে ডালে ফাঁসিতে ঝুলিয়া প্রাণ দিতে হইয়াছে, কত প্রাতঃস্মরণীয় আলেমকে সম্মুখ সমরে প্রাণ বিসর্জ্জন দিতে হইয়াছে, তাহা মোছলেম ভারতের একটা বাস্তব ইতিহাস। সেই হইতে আজ পর্য্যন্ত দেশে ও বিদেশে ভারতের স্বাতন্ত্র্য লাভের যত প্রকার চেষ্টা মুছলমানদের দ্বারা সম্পন্ন হইয়া আসিতেছে, তাহার প্রত্যেকটীর নায়কত্ব করিয়াছেন ও করিতেছেন এই আলেম সমাজই। মাওলানা বরকতুল্লা, মাওলানা ওবেদুল্লা কি মোল্লা ছিলেন না? অসহযোগ ও স্বরাজ আন্দোলনের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন—ভারতের এই আলেম সমাজই। ইংরাজী-ওয়ালাদের অধিকাংশইত সুখের পায়রার মত দুই দিনের মধ্যেই ময়দান ছাড়িয়া উধাও হইয়া গিয়াছেন! কিন্তু ভারতের রাজনৈতিক সমরের এই ঘোর অবসাদের দিনেও ন্যাশনালিজম ও স্বরাজের পতাকা উঁচু করিয়া ধরিয়া রাখিয়াছেন—এই আলেম সমাজ। যাঁহারা মধ্যে মধ্যে দুই একটা বোলচাল দেওয়া ছাড়া, ভারতের স্বাতন্ত্র্য সাধনার কর্ম্মক্ষেত্রের এক আধটুকু খোঁজ খবর রাখার সুযোগ পাইয়াছেন, তাঁহারা এই বাস্তব সত্যকে অস্বীকার করিতে পারিবেন না।

অবশ্য দুই একজন পীর ও মৌলবী মধ্যে মধ্যে জাতীয় দলের ও স্বরাজ সাধনার বিরুদ্ধে নানা প্রকার অসঙ্গত অভিমত প্রকাশ করিয়া থাকেন—একথাও খুবই সত্য। সকলে মিলিয়া সমস্বরে এই শ্রেণীর আলেম বা পীর দিগের অন্যায় কার্য্যের প্রতিবাদ করা উচিত। কিন্তু এখানে মজার কথা এই যে, এই শ্রেণীর পীর ছাহেবেরা এরূপক্ষেত্রে পরিচালিত হইয়া থাকেন—ইংরাজী শিক্ষিত বড় লোকদিগের দ্বারাই। এই ইংরাজী ওয়ালারা পীর ছাহেব কেবলার খেয়াল শরিফের মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দেন যে, কংগ্রেস ওয়ালা "খদ্দর ধারী শয়তানের দল" স্বরাজ স্বরাজ করিয়া মুছলমান সমাজের সর্ব্বনাশ করিতে উদ্যত হইয়াছে। হুজুর কেবলা একটা ফর্মান জারি করিয়া না দিলে কওম আর রক্ষা পাইবেনা। পীর ছাহেব তখন এই শ্রেণীর ভক্তদিগের এবং সঙ্গে সঙ্গে আংরেজ লোকের মনস্তুষ্টি সাধনের ব্যবস্থা করিয়া দেন। নির্ব্বাচনের সময়ও ঠিক এই অবস্থা ঘটিয়া থাকে। ফলে ইহার জন্য ইংরাজী শিক্ষিতরাই প্রধানতঃ দায়ী। আর যে দেশাত্মবোধ, ন্যাশনালিজম ও স্বরাজ-সাধনাকে উপলক্ষ করিয়া এত তীব্র মন্তব্য প্রকাশ করা হইয়াছে, ইংরাজী শিক্ষিত সমাজ সাধারণভাবে তাহার যে কোনও ধারই ধারেন না, বরং তাঁহারা যে "ভারতের স্বাতন্ত্র্য সাধনা"কে নিতান্ত অন্যায় ও গর্হিত কার্য্য বলিয়া মনে করিয়া থাকেন, ভারতের শতকরা ৯৯ জন ইংরাজী শিক্ষিতই তাহার প্রমাণ!

তাহার পর যে পীরপূজার অন্যায় প্রভাবে সমাজের সমূহ ক্ষতি হইতেছে, ইহার জন্যও আমাদের "শিক্ষিত" এমনকি আদর্শ উচ্চশিক্ষিত ও উচ্চপদস্থ ভ্রাতারাই যে প্রধানতঃ দায়ী, অবস্থাজ্ঞ ব্যক্তিবর্গকে একথা বোধ হয় বলিয়া দিতে হইবে না। অন্ধবিশ্বাস, গতানুগতি ও গড্ডালিকা প্রবাহে গা ঢালিয়া দিবার জন্য পূর্ব্বে আমরা মোল্লা মৌলবীর দলকেই দোষী করিতাম। কিন্তু এখন অবস্থা দেখিয়া বলিতে বাধ্য হইতেছি যে, আমাদের উচ্চশিক্ষিত ভ্রাতারা এ সম্বন্ধে অতি নিকৃষ্ট শ্রেণীর কাটমোল্লাদিগকেও অতিক্রম করিয়া গিয়াছেন। ধীরস্থিরভাবে বিচার করিয়া সঙ্গত পন্থা অবলম্বন করার ইচ্ছা বা শক্তি যে ইঁহাদের অনেকেরই নাই, কার্য্যক্ষেত্রে তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। ইউরোপের অন্ধ-অনুকরণ করার সময় একদিকে ইঁহারা চোখ বুজিয়া খোদা-রছুলকে পর্য্যন্ত অস্বীকার করিয়া দিতেছেন—পক্ষান্তরে ধার্ম্মিকতার উদ্রেক হওয়ার সঙ্গে পীরের আস্তানা ও হজরত ছাহেবের খানকায় উপস্থিত হইয়া ইঁহারাই আবার পীরকে খোদার আসনে বসাইয়া দিতে কুণ্ঠিত হইতেছেন না। উভয় স্থানে বিচার বুদ্ধির অভাব, উভয় স্থলেই ভেড়াধর্ম্মের প্রবল প্রভাব। কলিকাতা ও মফস্বলের ইংরাজী শিক্ষিত উচ্চপদস্থ মুছলমান দিগের তালিকা সংগ্রহ করিয়া দেখিলে প্রত্যেক ন্যায়নিষ্ঠ পাঠকই আমাদের কথার সত্যতা স্বীকার করিতে বাধ্য হইবেন।

রাজনীতি সম্বন্ধে মোল্লারা যে কিছুই বোঝেনা, আর সমস্ত ইংরাজী শিক্ষিত যে সবটাই ষোল আনা রকম বুঝিয়া

থাকেন, সাধারণভাবে এরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিলে সত্যের অপলাপ করা হয়। ভারতের বিভিন্ন স্থানে নানা প্রকার রাজনৈতিক সম্মেলন ও পরামর্শ সভায় উপস্থিত হওয়ার সুযোগ আমাদের অনেকবার ঘটিয়াছে এবং সেখানে ভারতের আলেমগণ প্রধান প্রধান হিন্দু নেতাদিগের সমক্ষে নিজেদের গভীর রাজনৈতিক জ্ঞানের যে পরিচয় দিয়াছেন—তাহাতে মহাত্মা গান্ধী, পণ্ডিত মতিলাল নেহরু, এমন কি পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য পর্য্যন্ত প্রকাশ্য সভায় পুনঃ পুনঃ তাঁহাদের যেরূপ প্রশংসাবাদ করিয়াছেন—আলোচনার কঠিন সময় জটিলতর সমস্যার সমাধানে অসমর্থ হইয়া বড়বড় রাজনৈতিক নেতারা অবশেষে যেরূপে আলেমদিগের সাহায্য প্রার্থী হইয়াছেন এবং যেভাবে তাঁহারা সহজে তাহার সমাধান করিয়া দিয়াছেন, সে সমস্ত ব্যাপার আমাদের চোখের সম্মুখে উদ্ভাসিত হইয়া আছে। কাজেই এই প্রকার মন্তব্যকে আমরা সত্যের অপলাপ বলিয়া মনে করিতে বাধ্য। প্রকৃতপক্ষে এসিয়ার রাজনীতির জন্মদান করিয়াছে এই মোল্লার দল এবং আজও আগা মুইত্বল এছলাম ও মাওলানা আবুল কালাম আজাদ প্রভৃতি প্রাচ্যের শ্রেষ্ঠতম রাজনীতি-বিশারদ পণ্ডিত বলিয়া প্রসংশিত হইয়া থাকেন। এই সকল বর্ত্তমান বাস্তবকে স্বীকার করাও এখন আবশ্যক বলিয়া মনে করা হইতেছে না! প্রকৃত কথা এই যে, উভয় সমাজে জ্ঞানী ও অজ্ঞ উভয় শ্রেণীর লোকই বিদ্যমান আছেন। কংগ্রেসের সময়, ওয়লিংটন স্কোয়ারে ফুটপথে দাঁড়াইয়া গ্রাজুয়েট স্কুল-সব-ইনস্পেক্টর কংগ্রেসের নাম শুনিয়া নিতান্ত সপ্রতীভভাবে "কংগ্রেসটা কি কায়স্থ সভা" ববিয়া প্রশ্ন করিয়াছেন—এই কারণে সমস্ত ইংরেজী শিক্ষিতকে রাজনীতি সম্বন্ধে অজ্ঞ বলিয়া মন্তব্য প্রকাশ করা কখনই সঙ্গত হইবে না।

যোগ্যতা স্বার্থনিষ্ঠা ও উচ্চাকাঙ্ক্ষার দিক দিয়া বিচার করিলেও এদেশের ইংরেজী শিক্ষিত সমাজ নিজেদের সম্বন্ধে বিশেষ গর্ব্ব করার অধিকারী হইবেন না। তনজিম, তবলিগ যুবক সমিতি, ছাত্র সমিতি, প্রভৃতি ইহার টাটকা নজির। কুলকাটি ও মন্ত্রীগিরি, কাউন্সিলের মুছলমান মেম্বরদিগের ঢলাঢলি এবং এই প্রকারের আরও অনেক কথা উদাহরণ স্থলে পেশ করা যাইতে পারে।

আসল কথা কোন জাতির যখন পতন হয়, তখন সেই পতনের কারণ গুলি তাহার সমস্ত অঙ্গে সমানভাবে সংক্রামক হইয়া উঠে। মুছলমানের জাতীয় দুর্দ্দশার মূলীভূত পাপ গুলিও সমাজের সমস্ত শাখা-প্রশাখার মধ্যে সমানভাবে সংক্রামিত হইয়া পড়িয়াছে, ইংরেজী-ওয়ালা আর আরবী-ওয়ালার কোন পার্থক্য এখানে নাই।

Printed and Published by Md. Khairul Anam Khan from the "Mohammadi Press,"
29, Upper Circular Road, Calcutta.

SARAJINI COOKER.

REGD. No. 25375

OUTER PART

INNER

COOKING PORT

SPRIT LAMP

COMPLIT COOKER

SARAJINI COOKER

COVER

LOWER PART

সরোজিনী কুকার

এক পয়সা খরচে এক ঘণ্টার মধ্যে পাঁচ প্রকার খাদ্য সুপক্ক ভাবে প্রস্তুত হয়। জগতের মধ্যে ইহার শ্রেষ্ঠ কুকার আর নাই, দেখিয়া যান নচেৎ আফশোষ করিবেন— কমিসন, এজেণ্ট, অর্ডার সাপ্লায়ার্স

ম্যানেজার—এস, জি, দাস ৬০নং হ্যারিসন রোড কলিকাতা

---

# আধ্যাত্মিক বলে কিনা হয়?

আধ্যাত্মিক শক্তিসম্পন্ন অব্যর্থ ফলপ্রদ কেরামতী নিয়মিতরূপে গৃহে জ্বালাইলে স্বাস্থ্য, সম্পদ, সুখ ও শান্তি পূর্ণ মাত্রায় উপভোগ করিতে পারিবেন, সন্দেহ নাই। ওলি-দরবেশগণের অদ্ভুত অমানুষিক ক্রিয়া-কাণ্ডের অনুষ্ঠান বিষয়ে কাহারও সন্দেহ থাকিলে পারে না। ইহাও ঠিক তদ্রূপ যথার্থ কেরামতের নিদর্শন। আল্লাহ-তা'লার ফজল ও করমে ইহা দ্বারা প্রধানতঃ—(১) চিকিৎসায় অসাধ্য রোগ সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়। (২) ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির ঋণ অচিরে পরিশোধ হয়। (৩) দরিদ্রের দারিদ্র্য দুঃখ দূর হয়। ( ) সকল প্রকার বিপদ আপদ হইতে মুক্তিলাভ হয়। (৫) নিঃসন্তানের সন্তানলাভ হয়। (৬) যাহাকে ইচ্ছা এমন কি প্রাণের শত্রুকেও সবশে আনিতে পারা যায়। ৪০ দিবস উপযোগী মূল্য ৩৲ টাকা।

প্রাপ্তিস্থান ঃ—কেরামতি গদ্দি

৭৪নং নারিকেলডাঙ্গা নর্থ রোড,

কলিকাতা।

সুবিখ্যাত দাঁত প্রস্তুতকারক মহিলা

---

বঙ্গীয় মুছলমান সমাজের গৌরব

কবি শ্রেষ্ঠ শাহাদাৎ হোছেন ছাহেবের

—"মৃদঙ্গ"—

শীঘ্রই বাহির হইতেছে

আপনি যদি একখণ্ড পাইতে চান তবে আজই

মোহাম্মদী বুক এজেন্সি

২৯নং আপার সারকুলার রোড ঠিকানায় অর্ডার বুক করুন।

---

FREE! কামশাস্ত্রের "তান-দি"

৫ জন বাঙ্গালী ভদ্রলোকের নাম, ধাম সহ পত্র লিখিলে—

বিনামূল্যে পাইবেন!

ইহাতে স্ত্রীপুরুষের অনেক নিগূঢ় তত্ত্ব সন্নিহিত আছে

রসায়নঘর—পোঃ হেষ্টিংস, কলিকাতা।

# মোহাম্মদী

বিষাদ সিন্ধু

## একি স্বপ্ন,
## না কল্পনা!

স্বপ্নও নয়, কল্পনাও নয়,

একান্ত বাস্তব।

আমাদের অজস্র অর্থ ব্যয়

এবং ঐকান্তিক পরিশ্রমের ফল—

কারবালা প্রান্তরের সেইহৃদয় বিদারক ঘটনা

হজরত রসুলে আকরমের (দঃ) নয়নমণি

এমাম হাসান হোসেনের পবিত্র

শহীদ-কাহিনী—

আসল এবং খাঁটি

মরহুম মীর মোশাররফ হোসেন কৃত—

# বিষাদ-সিন্ধু

সাপ্তাহিক এবং মাসিক মোহাম্মদীর গ্রাহকগণকে মাত্র এক টাকায় উপহার দেওয়া হইতেছে।

মনে রাখিবেন এই অপূর্ব্ব সুযোগ মাত্র এক মাসের জন্য—

## বিশেষত্ব—

(১) অতি উৎকৃষ্ট বাঁধাই, (২) সোনার কালীতে নাম লেখা (৩) সুন্দর আইভরি ফিনিস কাগজে ছাপা, (৪) ইহা ছাড়া সুন্দর সুন্দর হাফটোন চিত্রে চিত্রময়। বাজারে কিনিতে গেলে দ্বিগুণ মুল্যেও পাইবেন কিনা সন্দেহ।

নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক ছাপা হইয়াছে।

**বিশেষ দ্রষ্টব্য** ঃ—নূতন গ্রাহক হইলে কিম্বা পুরাতন গ্রাহকগণ পুনরায় এক বৎসরের টাকা জমা দিলে এই অমূল্য উপহার লাভ করিতে পারিবেন।

মেহেরবানী করিয়া একাধিক গ্রন্থের জন্ত অনুরোধ করিবেন না।

ম্যানেজার, মোহাম্মদী—২৯নং আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা।

"THE MONTHLY MOHAMMADI" Regd. No. C. 1613

...র্ষ শ্রাবণ, ১৩৩৫ JULY, 1928 দশম সংখ্যা

# মাসিক মোহাম্মদী



সম্পাদক—
মোহাম্মদ আকরম খাঁ

...লা সডাক তিন টাকা
প্রতি সংখ্যা সাড়ে চারি আনা

# সূচীপত্র—শ্রাবণ ১৩৩৫

# গুণের পরীক্ষা

## দুই সপ্তাহ মাত্র, স্বর্ণ-ঘটিত

# অমৃতবিন্দু সালসা

সেবন করিয়া আপনার দেহ ওজন করিয়া

দেখিবেন ওজন পূর্ব্বাপেক্ষা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে

সাতদিন মাত্র এই অমৃতবিন্দু সালসা সেবনের পরে হস্তপদের অঙ্গুলি টিপিয়া দেখিবেন শরীরে সত্য সত্যই তরল আলতার ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট বিশুদ্ধ রক্তের সঞ্চার হইতেছে কিনা। অমৃতবিন্দু সালসা রক্ত পরিষ্কারক, বলকারক, গরমি, পারা দোষ, প্রমেহ, খোস পাঁচড়া চর্ম্মরোগ নানাবিধ দৌর্ব্বল্য, শ্বেত প্রদর, রক্তপ্রদর অনিয়মিত ঋতু প্রভৃতি সমস্ত রোগ আরোগ্য হয়।

এক শিশি মূল্য ১৲ এক টাকা, মাশুল ।৴০ আনা, ৩ শিশি ২।০ নয় সিকা, মাশুল ৸৴০ আনা। ৬ শিশি ৪।০ চারি টাকা চারি আনা, মাশুল ১।০।

12 কবিরাজ—শ্রীশিশিরকুমার সেনগুপ্ত কবিরত্ন

**নবশক্তি ঔষধালয়** ২৯৭নং আপার চিৎপুর রোড, শোভাবাজার, কলিকাতা।

---

# ধবল ও কুষ্ঠ চিকিৎসা।

## প্রশংসাপত্র

ঢাকা হইতে স্বনামধন্য জনাব মৌঃ মোঃ সাহাবুদ্দিন দেওয়ান সাহেব লিখিয়াছেন :—"আমি ১১ বৎসর যাবৎ নিম্নলিখিত কুষ্ঠ রোগে ভুগিতেছিলাম যথা,—

১। শরীরে বিবিধ বর্ণের চাকা চাকা দাগ; ২। শরীরে পিপড়া হাটিতেছে বোধ হইত; ৩। বাম হাতের তিনটী অঙ্গুলী বক্র হইয়াছিল; ৪। শরীরে অধিকাংশ স্থান অসাড় হইয়া গিয়াছিল; ৫। পায়ের তালুতে ৯ ইঞ্চি পরিমান ক্ষত ছিল, ৬। শরীর হইতে দুর্গন্ধ বাহির হইত ওদাস্ত পরিষ্কার হইত না; ৭। শরীরে সূচবিদ্ধবৎ বেদনা হইত, মাঝে মাঝে শরীর হইতে ফুস্কুরি বাহির হইত ও তজ্জন্য জ্বর হইত; ৮। কুষ্ঠ রোগ হইবার পুর্ব্বে আমার উপদংশ রোগ হইয়াছিল।

ইতিপূর্ব্বে আমি এই রোগের জন্য বহু চিকিৎসালয়ে বিফল মনোরথ হইয়া অবশেষে কুষ্ঠ চিকিৎসক কবিরাজ প্রবর শ্রীযুক্ত বিনয়শঙ্কর রায় বৈদ্যশাস্ত্রী মহাশয়ের নিকট চিকিৎসাধীনে থাকিয়া বর্ত্তমানে আমি নির্দ্দোষ আরোগ্য হইয়া কার্য্যক্ষম হইয়াছি। আমি খোদাতায়ালার নিকট প্রার্থনা করিতেছি, কবিরাজ মহাশয় দিন দিন যশোন্নতি লাভ করুন।"

শালিখা কুষ্ঠাশ্রম হইতে নমুনা স্বরূপ বিতরণ হইতেছে—এক ইঞ্চি স্থানে প্রলেপে উপকার হয় ভিঃ পিঃ খরচ ।৴০ আনা। **বিনা মূল্যে দশ হাজার ধবল কুষ্ঠের প্যাকেট বিতরণ**

**শালিখা কুষ্ঠাশ্রম—কবিরাজ শ্রীবিনয়শঙ্কর রায় বৈদ্যশাস্ত্রী**

(কুষ্ঠ চিকিৎসা তত্ত্ববিদ্)

16 ৪ নং হরগঞ্জ রোড, পোঃ শালিখা হাওড়া।

# জহরলাল পান্নালাল এণ্ড কোং

বেনারসী শাড়ী, শাল, আলোয়ান সকল রকম কাপড়, ও পোষাক বিক্রেতা

ব্র্যাঞ্চ— ] **কলিকাতা** [ ব্র্যাঞ্চ—

গোধুলিয়া, বেনারসসিটি ] [ শড্ডিওলা বাজার, অমৃতসহর

**কলিকাতা**—আমাদের কলিকাতার সকল দোকানে বেনারসী শাড়ী, জোড়, চাদর, ওড়না, ভেল, সুন্দর ২ ফ্যান্সি সিল্ক শাড়ী, পার্শী, বোম্বে ও মান্দ্রাজী শাড়ী, চেলি, তসর, গরদ, মটুকা, এণ্ডি, দেশী তাঁতের ও মিলের কাপড় প্রভৃতি আদি স্থান হইতে একত্রে খরিদ করায় কত সস্তা দরে বিক্রয় করিতে সক্ষম, তাহা একবার দেখিতে অনুরোধ করি। এতদ্ভিন্ন হোসিয়ারী দ্রব্য এবং নানাবিধ তৈয়ারী পোষাক সর্ব্বদাই পাইবেন। যদি কেহ বেনারসী কাপড় আমাদের বেনারসের দোকান হইতে গিয়া আনিতে ইচ্ছা করেন, অনুগ্রহ করিয়া সেখানে পত্র লিখিলেই ভিঃ পিঃতে পাঠাইয়া দেওয়া হয়।

**গোধুলিয়া, বেনারস সিটি**—এখানে আমরা আমাদের নিজ ফ্যাক্টারির তৈয়ারী বেনারসী শাড়ী, জোড়, চাদর, ওড়না, ভেল, কিংখাপ, ক্র:কড্, মসলন্দ, বেনারসী পরদা প্রভৃতি জিনিষের কিরূপ একত্রে সমাবেশ করিয়াছি, তাহা যাঁহারা বেনারসে গিয়াছেন, তাঁহারা দেখিয়া আসিয়াছেন। কেহ ইচ্ছা করিলে এখানে লিখিলে ভিঃ পিঃতে পাঠাইয়া দেওয়া হয়।

**অমৃতসহর**—পাইকারী হিসাবে যাঁহারা কাশ্মিরী শাল, আলোয়ান প্রভৃতি গরম কাপড় খরিদ করিতে ইচ্ছা করেন, আমাদের এইঠিকানায় লিখিলেই আমরা সিদা তাঁহার ঠিকানায় ভিঃ পিঃতে পাঠাইয়া দিয়া থাকি। আর খুচরা আবশ্যক হইলে আমাদের কলিকাতার ঠিকানায় পাইবেন। **পরীক্ষা প্রার্থনীয়।**

6 বিশেষ দ্রষ্টব্য—মফঃস্বলের অর্ডারের সহিত সিকি টাকা অগ্রিম পাইলে বাকী টাকা ভিঃ পিঃতে লইয়া থাকি।

---

১০৬৭নং রেজিষ্টারীকৃত জারমানি

# মিঠা বড়ি।

ইহার আশ্চর্য্যতা এই যে খাইতে সুস্বাদু এবং রোগীর ইচ্ছামত ঔষধের পথ্য। ১ দিনে জ্বর ছাড়ে ৩ দিনে প্লীহ যকৃত কমে। জ্বরে বিজ্বরে সেবন চলে! প্যাকেট ||০, ডজন ৪৲, গ্রোস ৪০৲। **সর্ব্বত্র এজেন্ট চাই।**

25 ভারতের সোল এজেন্ট :—**ডাক্তার এ, এও ব্রাদার্স**, নড়াইল পোষ্ট, (যশোহর)

---

## মামীরার সোর্ম্মা

কেবলমাত্র দুই সপ্তাহ কাল ব্যবহার করিলে ধুনি, ছানি, জ্বালা, রাতকাণা, ধাঁন্ধা, ঝাপসা, সকল সময় জল নির্গমন এবং সর্ব্বপ্রকার চক্ষু রোগ বিশেষ উপকার হয়। একটীবার পরীক্ষা প্রার্থনীয়। এতদ্ব্যতীত যে কোন প্রকার চক্ষু-রোগের বিস্তারিত বিবরণ লিখিয়া জানাইলে সেইমত সোর্ম্মা প্রেরণ করা হয়। প্রত্যেক শিশির মূল্য ২৲, ১||০, ||০ মাশুল স্বতন্ত্র।

**এস, আবদুস্ সামাদ কান্দুই**

42 সমবায় মেন্‌শন, ১|১ হক্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

## শরীর রক্ষক কবচ

কি? যাহা গ্রহণে শরীর অটুট ও অক্ষয় থাকে। শরীর সুস্থ রাখিতে হইলে কি কি নিয়মে চলিতে হয় এইরূপ একখানি গ্রন্থ বিনামূল্যে বিতরণ করা হইতেছে। উহা লইয়া পাঠ করিয়া দেখুন, শরীর রক্ষক কি না? নিম্ন ঠিকানায় কার্ড লিখিলে বিনা মাশুলে ঘরে বসিয়া পাইবেন। ঐ গ্রন্থখানির নাম **কামশাস্ত্র**।

প্রাপ্তিস্থান :—**বৈদ্যশাস্ত্রী।**

14 ২১৪নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

---

অর্ডার দিবার সময় অনুগ্রহ পূর্ব্বক—"মাসিক মোহাম্মদীর" নাম উল্লেখ করিবেন।

# বিজ্ঞাপন সূচী—শ্রাবণ ১৩৩৫

# সচিত্র লজ্জতন্নেছা

যে পুস্তক পাঠের আশায় বাঙ্গালার পাঠকগণ এতকাল নিরাশ হইয়াছিলেন ইহা সেই যুগান্তকারী ভোজরাজ মন্ত্রী কোকা পণ্ডিত বিরচিত সকলের আকাঙ্ক্ষিত সচিত্র লজ্জতন্নেছা। যে কামশাস্ত্র জ্ঞানের অধিকারী হওয়ায় মন্ত্রী কোকা পণ্ডিত রূপবান ভোজরাজ অপেক্ষাও অধিক সম্মানিত হইয়াছিলেন ইহাতে সেই কোকা পণ্ডিতের জ্ঞানভাণ্ডার সম্পূর্ণ লিপিবদ্ধ আছে। ইহাতে জগতের স্ত্রী পুরুষের শ্রেণী, বর্ণ, স্বভাব, আকাঙ্ক্ষাদির বিবরণ, সতী ও অসতী নিরূপনের উপায়, সৎ ও অসৎ, অল্পায়ু ও দীর্ঘায়ু সন্তান হইবার কারণ, ইচ্ছামত পুত্র কন্যা লাভ, সহবাস রীতি, পুরুষের প্রতি স্ত্রীর অনুরাগ বৃদ্ধির উপায় ইত্যাদি কামশাস্ত্রীয় সকল গুপ্ত বিষয় বিশদভাবে বর্ণিত আছে। কোকা পণ্ডিতের ন্যায় কামশাস্ত্রে পারদর্শী হইয়া দীর্ঘ জীবন লাভের আশা করিলে এই সুদুর্ল্লভ লজ্জতন্নেছা পাঠ করিতে ভুলিবেন না। মূল্য ১খানি ১৲ মাঃ।০ আনা।

# নূরজাহান।

## ঐতিহাসিক উপন্যাস

সম্রাট জাহাঙ্গীর রূপমোহে মুগ্ধ হইয়া বর্দ্ধমানের শাসনকর্ত্তা শের আফগানের বিধবা পত্নী মেহেরউন্নিসাকে 'নূরজাহান' উপাধি দানে সম্রাজ্ঞী পদে বরণ করেন। ইহাতে একাধারে প্রেম, ভালবাসা, অভিমান, প্রত্যাখ্যান, রমণীর কূটনীতি, আদর, সোহাগ, প্রীতি, সমস্ত বর্ত্তমান। নূরজাহানের রূপ যেমন পৃথিবীতে একটী আশ্চর্য্য মধ্যে গণ্য, তাহার অসীম গুণাবলী পাঠে পাঠক পাঠিকা ধন্য হউন। মূল্য মাশুলসহ ৸৵০ আনা।

## প্রাপ্তিস্থান :—এস, সি, শীল

১৫।৩ লক্ষ্মীদত্ত লেন, বাগবাজার,

কলিকাতা।



অর্ডার দিবার সময় অনুগ্রহ পূর্ব্বক —"মাসিক মোহাম্মদী" নাম উল্লেখ করিবেন

# অপূর্ব্ব জয়যাত্রার বিরাট আয়োজন

## বার্ষিক মোহাম্মদী

কল্পনার আকাশ হইতে বাস্তব জগতে পদার্পণ করিয়াছে। পরিপূর্ণ মূর্ত্তি ও রূপ গ্রহণ করিতে দীর্ঘ চারি মাস সময় লাগিবে।

——তার পর ?——

তারপর শরতের এক স্নিগ্ধ প্রভাতে দেখিতে পাইবেন

### সাহিত্য-জগতে হৈ-হৈ রৈ-রৈ ব্যাপার !

## বার্ষিক মোহাম্মদীর আবির্ভাব !

প্রতি নগরে, প্রতি পল্লীতে, বিপুল হর্ষ-কলরোল !

### —কেন না হইবে ?—

বিভিন্ন বিষয়ক গবেষণাপূর্ণ অমূল্য প্রবন্ধাবলী, সরস কবিতা, গল্প, উপন্যাস, নাটক, —সবদিক দিয়াই যে এই নব-বার্ষিকী **অপূর্ব্ব** ও **অনুপম** হইয়া দেখা দিবে !

### শুধু কি তাই ?—

চিত্র সম্পদেও "বার্ষিক মোহাম্মদী"র তুলনা মিলিবে না। বহু সংখ্যক রঙিন চিত্র, ব্যঙ্গ চিত্র ও নক্সার বিচিত্র সমাবেশ আর কোথায় দেখিতে পাইবেন ? এক কথায় নয়ন-মনের পরিপূর্ণ আনন্দ লইয়া "বার্ষিক মোহাম্মদী" আসিতেছে।

বাঙ্গলার শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক বৃন্দ "বার্ষিক মোহাম্মদীর" জন্য লেখনী ধারণ করিয়াছেন।

আজই আপনার নাম রেজিষ্ট্রী করিয়া রাখুন।

### ম্যানেজার—মোহাম্মদী কার্য্যালয়

( বার্ষিক বিভাগ )

২৯নং আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা।

70

চীনের নব-জন্মদাতা সান-ইয়াৎ-সেন

"চল্লিশ বৎসর ধরিয়া জাতির জাগরণ-সংগ্রামে আত্ম-নিয়োগ করিয়াছিলাম। সেই চল্লিশ বৎসরের অভিজ্ঞতার ফলে বুঝিয়াছি যে জন-সাধারণকে জাগাইতে না পারিলে স্বাধীনতা-সংগ্রাম বৃথা ; এবং সে সংগ্রামে জয়ী হইতে হইলে যে সমস্ত জাতি বিশ্ব-কল্যাণের জন্য আত্ম-নিয়োগ করিয়াছে তাহাদের সহায়তা গ্রহণ করিতেই হইবে।"

সান-ইয়াৎ-সেনের উইল

# মাসিক মোহাম্মদী

প্রথম বর্ষ || শ্রাবণ ১৩৩৫ সাল || ১০ম সংখ্যা


## পাণ্ডুয়ার মিনার

( মোজাম্মেল হক—শান্তিপুর )

প্রাচীন কালে মুসলমানগণ যে ভূমিতে পদাঙ্ক স্থাপন করিয়াছিলেন, সেই ভূমিতেই তাঁহারা ইসলামের অর্দ্ধ-চন্দ্র-খচিত বিজয় বৈজয়ন্তী উড়াইয়াছিলেন, সেই ভূমিতেই তাঁহারা বহু সুশোভন অট্টালিকা এবং মসজিদ মিনার প্রতিষ্ঠা করিয়া আপনাদের গৌরব বৃদ্ধির সহিত পতিত দেশের শ্রীসম্পদ ও সুখ সমৃদ্ধি বাড়াইয়া তুলিয়াছিলেন। ইরাণ, তুরাণ, মিসর, মরক্কো, তুরস্ক, তাতার, স্পেন ও ভারতের এমন কোনও নগর নাই, যেখানে মুসলমান বিবিধ কারু-কার্য্যখচিত ইমারতাদি নির্ম্মাণ করিয়া আপনাদের শিল্প ও স্থাপত্য-জ্ঞান, সুরুচি ও সভ্যতার পরিচয় প্রদান করেন নাই। যদিও শতাব্দীর পর শতাব্দী চলিয়া গিয়াছে, কালের কঠিন প্রভাবে বর্ষা-বাদল, ঝটিকা-ভূকম্পনে সেই সব অট্টালিকা, মস্জিদ মিনারের অধিকাংশ ভগ্ন-পতিত, ধ্বংস-স্তূপে পরিণত হইয়াছে, তথাপি আজও যে দিকে তাকাইবেন, সেই দিকেই ইসলামের বিমানস্পর্শী মিনার বা মসজিদের শীর্ষদেশের সুগঠিত সুন্দর শ্রেণীবদ্ধ গুম্বজ সর্ব্বাগ্রে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে। ফলতঃ এই সব মসজিদ মিনার যে মুসলমান জাতির ধর্ম্মানুরাগের উজ্জ্বল নিদর্শন, তাহাদের সভ্যতা ও সৌন্দর্য্য-জ্ঞানের প্রকৃষ্ট পরিচয়, তাহা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। এইরূপ একটী মিনারের বিবরণ আজ আমি মাসিক মোহাম্মদীর পাঠকগণের নিকট উপস্থিত করিব।

হুগলী জেলার খন্যান ষ্টেশনে উপস্থিত হইলেই রেল-পথের উত্তর পশ্চিম দিকে আম তেঁতুল বাঁশ প্রভৃতি বৃক্ষের ভিতর দিয়া একটী স্তম্ভ-শীর্ষ আকাশ ভেদ করিয়া যাত্রীদের নজরে পড়িয়া থাকে। ইহাই পাণ্ডুয়ার মিনার—প্রায় ছয় শত বৎসর পূর্ব্বে দিল্লীর পাঠান বাদশাহ্ ফিরোজ শাহ্ তোগলকের রাজত্ব কালে নির্ম্মিত হয়। ইহার প্রতিষ্ঠাতার নাম হজরত সৈয়দ শাহ সফিউদ্দীন। সাধারণ লোকে তাঁহাকে শাহ্ সুফী সুলতান বলিয়া থাকে। শাহ সফিউদ্দীন যেমন বীর, তেমনি ধীর ও ধার্ম্মিক ছিলেন। বিষয়-বাসনা তাঁহার অন্তরে নিমেষের জন্যও স্থান পাইত না। তিনি ইসলামের পুণ্যক্রিয়াগুলি যথারীতি পালন করিয়া আনন্দে কাল কাটাইতেন। ফিরোজ শাহের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল—বাদশাহ্ তাঁহার মাতুল হইতেন।

১১৯৯ খৃঃ অব্দে বখতয়ার খিলজী বাঙ্গলা বিজয় করিলেও সমগ্র বাঙ্গলা দেশ তখনও মুসলমান শাসনাধীনে আইসে নাই, স্থানে স্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হিন্দু রাজারা আপনাদের ক্ষুদ্রায়তন রাজ্যে স্বাধীন ভাবে রাজত্ব করিতেন। সেই আমলে পাণ্ডুয়ার ( অন্য নাম প্রদ্যুম্ননগর ) একজন

হিন্দু রাজা ছিলেন। রাজার নাম পাণ্ডু বা পাণ্ডুদাস। পাণ্ডুদাস রাজার বল বিক্রম খুব ছিল, লোক লস্করও যথেষ্ট ছিল। ধন-জন-বল-বিক্রমে গর্ব্বিত হইয়া তিনি দিল্লীর বাদশাহকেও ভয় করিয়া চলিতেন না।

পাণ্ডুদাসের রাজধানীতে কয়েকজন মুসলমানের বসবাস ছিল। তাঁহারা দুর্গের বাহিরে তফাতে পৃথক পল্লীতে বাস করিতেন এবং তন্মধ্যে একজন রাজকর্ম্মচারী ছিলেন। এই রাজকর্ম্মচারী আরবী ফারসী ভাষাভিজ্ঞ ধার্ম্মিক এবং সৈয়দ বংশীয় লোক ছিলেন। দিল্লীর শাহী দরবার হইতে যে সব চিঠিপত্র আসিত, তাহা পাঠ করিয়া রাজার গোচর করা এবং তাহার উত্তর লেখাই সৈয়দ সাহেবের কার্য্য ছিল। রাজা ইঁহাদিগকে বিদ্বেষের চক্ষে দেখিতেন এবং নগরস্থ হিন্দুরাও তাঁহার অনুকরণ করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না।

একদা সৈয়দ সাহেব তাঁহার একটী পুত্রের আকিকা উপলক্ষে দুইটী ছাগল জবেহ করিয়া উৎসব কার্য্য সম্পন্ন করেন। তিনি মুসলমানদের সাধারণ-সংস্কার অনুযায়ী আকিকার ছাগলের হাড়, চামড়া, নাড়ীভুঁড়ি তফাতে একটী বৃক্ষের তলে পুঁতিয়া রাখিয়াছিলেন। কিন্তু রাত্রিকালে শৃগাল কুকুর তৎসমুদয় বাহির করিয়া ফেলিয়া ভক্ষণ করিতে থাকায় নগরবাসীরা দুই একজন তাহা দেখিতে পায়। তাহাদের মুখে একথা প্রচার হওয়ায় নগরবাসীরা বুঝিল— নিশ্চয় উহা গো-হাড়, মুছলমানেরা রাত্রিতে গো-হত্যা করিয়া খাইয়াছে, এবং তাহার মোটা মোটা হাড়গুলি তো আর খাইতে পারে না,—তাই সেগুলিকে গোপনে মাটীতে পুঁতিয়া রাখিয়াছিল—এখন ঘটনাক্রমে তাহা বাহির হইয়া পড়িয়াছে। ছাগল হইলে তাহার হাড় অত মোটা হইত না এবং তাহা পুঁতিয়া ফেলারও দরকার হইত না—নগরবাসীরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া রাজার নিকটে অভিযোগ উপস্থিত করিল যে, সৈয়দ সাহেব গো-হত্যা করিয়া তাহার মাংসে পুত্রের জন্মোৎসব ক্রিয়া সম্পন্ন করিয়াছেন। হিন্দুর রাজ্যে গো-বধ—অতি অবৈধ ও পাপের কার্য্য। রাজা পাণ্ডুদাস মহা ক্রুদ্ধ হইলেন এবং অভিযোগের সত্যাসত্য সন্ধান না করিয়া দারুণ ক্রোধের বশে সৈয়দ সাহেবকে কঠোর নির্য্যাতন করিলেন। যাহার জন্মোৎসবের জন্য এ পাপকার্য্য হইয়াছে, তাহাকে হত্যা করাই ইহার প্রায়শ্চিত্ত, ইহা বলিয়া সৈয়দ সাহেবের সম্মুখেই সেই কোমল প্রাণ শিশুর প্রাণ সংহার করিয়া তাহার তপ্ত তরল শোণিত দিয়া স্বরাজ্য হইতে গোহত্যার কলঙ্ক কালিমা ধুইয়া ফেলিয়া শান্তিলাভ করিলেন। (১)

এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডে সৈয়দ সাহেব প্রাণে যে কি মর্ম্মান্তিক বেদনা পাইলেন, তাহা আর বলিবার নহে। ফলতঃ এই দুরাচার রাজার রাজ্যে তাঁহার এক দণ্ডও থাকা উচিত নহে, ইহা স্থির করিয়া তিনি দারুণ ক্লেশে অধীর হইয়া পাণ্ডুয়া হইতে বাহির হইয়া গেলেন। যথাকালে এই করুণ কাহিনী দিল্লীর শাহী দরবারে পৌছিলে দিল্লীশ্বর ফিরোজ শাহ তোগলক সাতিশয় মর্ম্মাহত হইলেন এবং ইহার প্রতিকার অবশ্যকর্ত্তব্য বিবেচনা করিয়া বারো হাজার মজাহেদ সৈন্য এবং চৌদ্দ জন রণদক্ষ সিপাহ-সালার সঙ্গে দিয়া আপন ভাগিনের সৈয়দ শাহ সফিউদ্দিনকে অচিরে পাণ্ডুয়া অভিমুখে প্রেরণ করিলেন। শাহ সফিউদ্দীন বিরাট বাহিনী লইয়া পাণ্ডুয়ায় সমাগত হইলে রাজা পাণ্ডুদাসের চমক ভাঙ্গিল— বিপদ সঙ্গীন বুঝিয়া নিজের সৈন্য-সমাবেশ করিলেন। ভীষণ যুদ্ধ উপস্থিত হইল—উভয় পক্ষের বহু সৈন্য হতাহত হইয়া ধরাশায়ী হইল। অবশেষে রাজা পাণ্ডদাস পরাজিত ও নিহত হইলেন,—তাঁহার দুষ্কৃতির ফল হাতে হাতে ফলিল। পাণ্ডুয়া মুসলমান যোদ্ধগণের পদানত হইল— ইস্লাম প্রভাব তথায় আনন্দে খেলিয়া বেড়াইতে লাগিল।

শাহ সফিউদ্দীন ধর্ম্মপ্রাণ দরবেশ ছিলেন। * তিনি

---

(১) ১২৭২ সালে শ্রীরামপুর তমোহর যন্ত্রে মুদ্রিত "ভারতবর্ষীয় রেলওয়ে" নামক পুস্তকে লিখিত আছে—নগরস্থ হিন্দুরা গো-হত্যার কথা জানিতে পারিয়া ক্রোধান্বিত হইয়া সৈয়দ সাহেবের শিশু পুত্রের প্রাণনাশ করে। কিন্তু একথা সত্য নহে। একজন রাজকর্ম্মচারীর পুত্রকে বিনা দোষে রাজার অজ্ঞাতসারে হত্যা করা প্রজাদের সাহস ও সাধ্যের অতীত।—লেখক

* পূর্ব্বযুগের অনেক সাধক মহাপুরুষ, আলেম মোহাদ্দেছ ও দার্শনিক পণ্ডিতের জীবনে জ্ঞান কর্ম্ম ও ভক্তিযোগের এইরূপ একটা আশ্চর্য্য সমাবেশ দেখিতে পাওয়া যায়। মুছলমানের গৌরব ইতিহাসের সেই সব পৃষ্ঠায় আমরা দেখিতে পাই—সংসার বিরাগী অলি দরবেশ এবং মহামনীষী এমাম ও মোহাদ্দেছগণ কর্ত্তব্যের আহ্বান শ্রবণ মাত্র রণক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া প্রধান সেনানায়কের পদ গ্রহণ করিতেছেন। হজরত মোহাম্মদ মোস্তফার আদর্শকে তাঁহারা সম্যকভাবে গ্রহণ করিতে পারিয়াছিলেন বলিয়া এছলামের এই ত্রিমার্গগামী সাধনায় তাঁহারা যুগপৎভাবে সিদ্ধিলাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। বর্ত্তমান যুগের মুছলমান সমাজের সকল স্তরের আদর্শ যে ইহার সহিত কতদূর অসমঞ্জস, পাঠকগণ তাহা একবার ভাবিয়া দেখিলে সুখী হইব।—সম্পাদক

পাণ্ডুয়া শান্তিপূর্ণ মনোরম স্থান দেখিয়া বড়ই প্রীত হইলেন এবং তাহা দরবেশ-জীবন যাপনের উপযুক্ত মনে করিয়া আর দিল্লীতে ফিরিয়া যাইতে মনস্থ করিলেন না, পাণ্ডুয়াতেই বাস করিতে প্রস্তুত হইলেন। কেবল তিনি নহেন,—তাঁহার সহগামী সিপাহ-সালার ও সহযাত্রীদিগের অনেকেই পাণ্ডুয়ায় রহিয়া গেলেন। তাঁহাদের প্রচেষ্টায় নগরের অধিকাংশ অধিবাসীই ইসলাম কবুল করিল। তখন মুসলমানের কল-কোলাহলে পাণ্ডুয়া মুখরিত হইয়া উঠিল। সুলতান সফিউদ্দীনের নির্দ্দেশানুসারে অল্পদিনের মধ্যেই পাণ্ডুয়ায় শান্তিস্থাপন ও মসজিদ-মিনার, দীঘি-পুষ্করিণী, মোসাফেরখানা ও সকলের বাসযোগ্য গৃহ প্রভৃতি হইল—পাণ্ডুয়ার প্রকৃতির ছবি চকিতে রূপ-বদল করিয়া ফেলিল।

শাহ শফিউদ্দীনের প্রতিষ্ঠিত একটী মসজিদের নাম 'বাইশ-দুয়ারী' মসজিদ। ইহা ৬৬টী গুম্বজ বিশিষ্ট ছিল। এই মসজিদের অঙ্গনের পূর্ব্বসীমায় এই মিনার বা বিজয়-স্তম্ভ শূন্য-পৃষ্ঠে মস্তক তুলিয়া দাঁড়াইয়া পূর্ব্বতন মোস্‌লেম প্রভাবের সুখ-স্মৃতি জাগাইয়া দিতেছে। এই মিনারটীকে লোকে বিজয়-স্তম্ভ বলুক আর যাহাই বলুক; কিন্তু ইহা পবিত্র আজান গাহ,—আজান প্রদানের উদ্দেশ্যেই ইহার নির্ম্মাণ, ইহা ভিন্ন আর কিছুই নহে। তৎকালে মোয়াজ্জেন ইহারই শীর্ষদেশে দাঁড়াইয়া উচ্চকণ্ঠে ইসলামের একেশ্বরবাদ-মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া বিশাল পাণ্ডুয়া নগরীর নবাগত ও নব দীক্ষিত মুসলমানগণকে নমাজে আহ্বান করিতেন।

মিনারের নির্ম্মাণ কৌশল অতি সুন্দর। ইহা গোলাকার এবং পাঁচটী স্তবকে বিভক্ত। মূল স্তবকটীর উপরে অপর স্তবক গুলি ক্রমশঃ সঙ্কীর্ণ হইতে সঙ্কীর্ণতর হইয়া উর্দ্ধদিকে উঠিয়াছে। প্রত্যেক স্তবকে একটী দরজা আছে এবং স্তবকের বাহিরে চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইবার স্থান আছে। এই সমস্ত স্তবকে এবং মিনারের উপরে উঠিবার জন্ম মিনারের ভিতরে সিঁড়ি আছে। সিঁড়ি ঘূর্ণিতভাবে নির্ম্মিত। বর্ত্তমানে সিঁড়ির ধাপের সংখ্যা ১৬১টী। ২৮টী ধাপ অতিক্রম করিলে প্রথম স্তবকে উঠা যায়। এখানে মিনারের ভিত্তির বহির্ভাগের বেড়ের মাপ ১২৪ হাত। ৫৪টী সিঁড়ির পরে দ্বিতীয় স্তবক, এখানকার বাহিরের মাপ ১০০ হাত। ১০২টী সিঁড়ির পর তৃতীয় স্তবকের বাহিরের মাপ ৭২ হাত। ১২৯টী সোপান ছাড়াইয়া চতুর্থ স্তবকে উঠিতে হয়। এখানকার পরিধির মাপ ৪৬ হাত। ১৬১টী সোপানের উপরে পঞ্চম স্তবক স্থাপিত। এখানকার পরিধি ২৮ হাত। ইহার উপরে গুম্বজাকৃতি ক্ষুদ্র কুঠরী গুম্বজের উপরে একটী লৌহদণ্ড স্থাপিত, সেখানে উঠিবার উপায় নাই। এই কুঠরীকে ষষ্ঠ স্তবক বলিলেও বলা যাইতে পারে। ইহার ভিতরে এবং পঞ্চম স্তবকের উপরে মোয়াজ্জিনের দাঁড়াইবার স্থান। মিনারের মূলদেশের চারিদিকে রাশীকৃত খোওয়া মাটী থাকায় তথাকার পরিধির মাপ জানিতে পারা যায় নাই। ফলতঃ ইহা যে কলিকাতার মনুমেণ্ট অপেক্ষা ৪।৫ গুণ অধিক স্থূল তাহাতে সন্দেহ নাই। মিনারের দরজা কৃষ্ণবর্ণ পাথরে নির্ম্মিত। দ্বারের নিকটে এক খণ্ড স্থূল লৌহ প্রোথিত আছে। ইহা প্রোথিত হইয়াছিল কেন?—জানিবার উপায় নাই।

১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে মুদ্রিত "ভারতবর্ষীয় রেলওয়ে" নামক পুস্তকে মিনারের উচ্চতা ১২০ ফুট লিখিত হইয়াছে। কি আশ্চর্য্য বিরাট ব্যাপার!! বর্ত্তমানে মিনারের কিয়দংশ মাটীর মধ্যে বসিয়া গিয়াছে বলিয়া শুনিতে পাওয়া যায়। ফলতঃ বসিয়া গেলেও এখনও উহার শীর্ষদেশে উঠিলে সর্ব্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হইয়া উঠে, বুক দুরু দুরু কাঁপিতে থাকে, চারিদিকে তাকাইলে সুদূর দৃশ্যের এক অভাবনীয় ছবি নয়নে পড়ে এবং নিম্নভাগে বয়স্ক ব্যক্তিদিগকে ছোট শিশুর মত দেখায়! সুতরাং ব্যাপারটী যে সামান্ত নহে, তাহা কে না বলিবে?

এই মিনার ও মসজিদের বয়স এক্ষণে প্রায় ছয় শত বৎসর। এই সুদীর্ঘ কালের মধ্যে কত বর্ষা-বাত্যা ইহাদের মাথার উপর দিয়া চলিয়া গিয়াছে—কালের অলক্ষ্য প্রভাবে ভাঙ্গা জীর্ণ, পলিত, স্খলিত হইয়াছে। ভীষণ ভূকম্পনে "বাইশ-দুয়ারী" ধরাশায়ী হইয়াছে, মিনারটীর উপরিভাগ ভগ্ন ও ভূপতিত হইয়া কিছুদিন শ্রীহীন অবস্থায় ছিল। পরে গবর্ণমেন্টের দৃষ্টি সে দিকে পড়ে। প্রাচীন কীর্ত্তি সংরক্ষণ ব্যবস্থার ফলে ইহার জীর্ণ-সংস্কার হইয়াছে শুনিয়াছি এই সংস্কার ব্যাপারে গবর্ণমেন্টের এগার হাজার টাকা ব্যয়িত হইয়াছে। পুণ্য হস্ত প্রতিষ্ঠিত এই পুণ্য কীর্ত্তি রক্ষিত হইয়াছে, ইহাতে কে না আনন্দিত হইয়া থাকিতে পারে?

# ছন্দ-পাগল

মোহাম্মদ গোলাম জিলানী

( ১ )

থাকি মেসে, পড়ি এম, এ, বিবাহিত। পত্নী সুদূর পল্লী-গৃহে বাস করেন। সখী তার মিনা। সে আমার বন্ধুপত্নী। বন্ধু আনোয়ার কলেজের ক্লাস-ফ্রেণ্ড।

প্রিয়ার চিঠি পেলাম, কত কি লিখেছে। তার মধ্যে মিনা সম্বন্ধে এই কয়টা কথা আছে।—

"তুমি আমার কাছে চিঠি লেখ পদ্যে। এত কথাও তুমি মিল কর্‌তে পার। তোমার পদ্যের ছড়াছড়ি দেখে মিনার ভারি হিংসা হয়। সেদিন সে আনোয়ারের কাছে দুঃখ করে পত্র লিখেছে—'আপনি বন্ধুর মত পদ্য রচনা করতে পারেন না? দেখুন আমার ভারি ইচ্ছে হয় বন্ধু যেমন সখীর কাছে পত্র লিখেন পদ্যে, আপনিও সেইরূপ আমার কাছে লিখবেন। ভারি মজা হবে!'—আচ্ছা মিনাকে একটা কবিতা লিখে দিতে পার না?" মিনারা উভয়ে আমাকে বন্ধু বলে ডাকে।

উত্তরে আমি লিখলাম—"মিনার বুঝি কবিতার উপর ভারি ঝোঁক,—কেমন? আচ্ছা সে কেন কবিতা-লেখা একটা বর দেখে বিয়ে করল না? আহা বেচারি, কি ভুলটা করেছে? আনোয়ারটা এমন বেরসিক! বেচারির এত বড় সাধ পূরণ করতে তার একটুও চেষ্টা নাই! যাক' আমিই না হয় তার জন্য খুব ভাল একটা কবিতা লিখে দেব। মিনাকে ব'ল কেমন কবিতা লিখতে হবে, তাতে কি কি মনের ভাব থাকবে, দুঃখের না আনন্দের, বিরহের না মিলনের। আমি এমন এক কবিতা লিখে দেব যে সেইটে নকল করে মিনা যদি আনোয়ারের কাছে পাঠায় তবে আর যায় কোথা? সে ঠিক তার উত্তর কবিতায় না দিয়ে পারবেই না।"

প্রেয়সীর জবাব আসল, লিখেছে, "মিনা কি তার মনের ভাব বলতে চায়! তবে অনেক সাধ্য সাধনার পর বলেছে —"এই ধর যারে ভালবাসি সে ভালবাসে না কেন? পুরুষ মানুষ ভারি নিষ্ঠুর" ইত্যাদি।"

আমি লিখলাম, "মিনা মনের ভাব ভাল করে খুলে বলে নাই। তাই কবিতাও ভাল হল না। সে যেমন দু কথায় সেরেছে, কবিতাও তেমনি ছোট হল। যা হক এটা নকল করে যেন সে আনোয়ারের নিকট পাঠায়।

নিঠুর প্রণয়েশ,
দয়ার নাহি লেশ,
আমার সব শেষ,
একি দায়!
প্রাণের ধারে তার
কাঁদিব কত আর
সাধিব বার বার
বৃথা হায়!
কাঁদিয়া দিন যায়
একাকিনী;
জীবনে জাগি একা
বিষাদিনী!
নিবিড় বেদনায়
হৃদয় ভরে যায়,
রাখিব প্রাণ হায়
কেন তবে?
জীবন যদি এত
ভার হবে!

( ২ )

কয়েকদিন পরে আনোয়ার তার পত্নীর পত্রখানা হাতে করে নিয়ে আমার ঘরে ঢুকল। বল্‌ল, দেখছ হে আমার

ঘরেও কবিতা ঢুকেছে! এই দেখ মিনা আমার কাছে পত্রে কেমন ছন্দের ছড়াছড়ি করেছে। ওর এই বাতিক আমাকে অস্থির করে তুলল। জান ভাই আমার ওসব রসটস নেই। নিতান্ত শুষ্কং কাষ্ঠং। এখন কি করি বলত? দু'ছত্র না লিখে দিলেই বা মান থাকে কি করে? নেহাৎ কি মনে করবে!

আমি বললাম, ভয় কি ভায়া! এ বান্দা থাকতে তোমাকে মাঠে পড়ে মরতে হবে না। দাও দেখি পত্রখানা পড়ে দেখি। পত্রখানি দেখে মনে মনে হাসলাম বটে, কিন্তু উত্তর তো দেওয়া চাই। তাই লিখে দিলাম—

সঁপেছি প্রাণ যায়,
সে কেন কভু হায়,
বুঝেনা হৃদয়ের,
ব্যথা মোর!
নীরব সব ভাষা,
বিফল যত আশা,
একেলা ফেলি তাই,
আঁখিলোর।
তবু হায়, একি জ্বালা
তারি লাগি;
নিশিদিন আঁখি তারা
রহে জাগি।
যে কথা মনে মনে,
কাঁদিছে খণে খণে,
যে ব্যথা গুমরিছে
নিতি দুখে।
যে তারা পথ-হারা
যে নদী মৃত-ধারা
কাঁদিছে সব তারা
ভাঙ্গা বুকে!

প্রেয়সীর নিকট থেকে পত্র পেলাম। অনেক আবোল তাবোল বকেছে। মিনা সম্বন্ধে লিখেছে,—"মিনার বর কবিতা পড়ে ভারি চটেছে, বলেছে ওসব বাজে কাজে বেশী সময় নষ্ট করতে নাই। মেয়ে মানুষের কবিতা লেখা ঠিক না। ইহাতে লোকে বেহায়া বলে।" কিন্তু মিনা যে কবিতা পাগল! সে কি তা শুনে? ওর স্বামীর কয় লাইন কবিতা সে সমস্ত দিন পড়ে। তুমি খুব বাহাদুর যা হ'ক! মিনা বলে 'বন্ধুর কৃপায় কবিতা আদায় করেছি বটে! সে কিন্তু আনোয়ারের শাসন মানতে রাজি নয়। তোমার উপর আবার ফরমায়েশ হয়েছে কবিতার জন্য!'

আমি প্রিয়ার পত্রে আনোয়ারকে গাল দিয়ে লিখলাম;—

আনোয়ার ভাই, জানোয়ার ঠিক
বুদ্ধি নাই তার ঘটে
মিষ্টিমুখের ইষ্টি কথায়
নইলে কি সে চটে!
প্রিয়ার প্রেমে পাগল হলে
এমন কি আর হয়?
ঠিক বুঝিলাম মিনার বরের
প্রাণটী পাষাণময়!

তারপরে আনোয়ারের নিকট পাঠানর জন্য মিনাকে এই কয় ছত্র পদ্য লিখে দিলাম।

প্রণয়ে এত যদি, বেদনা নিরবধি
এত প্রেম কেন প্রাণ মাঝে হায়?
বেসেছি ভাল যারে কেন ভালবাসি তারে,
ভালবেসে প্রাণ যদি ব্যথা পায়!
অথবা প্রেম কেন উপজয়,
অঙ্গেতে রূপ যদি নাহি রয়,
কেন এত অভিমান মান অপমান জ্ঞান
প্রতিদান আশে প্রাণ যদি যায়।

( ৩ )

এবার স্ত্রীর পত্র পেলাম—অভিমানে ভরা! তার অভিযোগ, আমি আজ কাল শুধু মিনার কথাই লিখি। মিনার জন্য কবিতা রচনা করি, মিনার কথা ভাবি। এমন কি আনোয়ারের পত্রের কবিতাও আমার লেখা বলে সে সন্দেহ করে। মিনাও নাকি সে কথা তাকে বলেছে, আর দুঃখ করেছে এই বলে যে 'ধার-করা কবিতায় তার তৃপ্তি হয় না। তার স্বামী যদি সত্য সত্যই তাকে উদ্দেশ করে এই সব কবিতা লিখিত!"

পত্র পেয়ে ত হো হো করে আমি একচোট খুব হেসে

নিলাম। খোদাই জানেন যে সে হাসির আড়ালে আর কিছু ছিল কিনা! তবে রসটা আরও একটু জমকালো করবার জন্যে দুষ্টুমি করে লিখলাম ;—

"ঠিক ধরেছ প্রিয়ে, পুরুষের মন ভ্রমর—এক ফুলে কখনও তৃপ্ত হয় না! সে চায় নিত্য নূতন!

বাসি ফুল বিলকুল একঘেয়ে ছাই,
ভ্রমরের আদরের কিছু তাতে নাই!

তারপর মিনা? তার কথা ত সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র! সে যে চির-নূতন চির-প্রিয়! ফুল দেখলেই যে ভাল বাসতে ইচ্ছা করে। তার সম্বন্ধে আমার মনের ভাব কিরূপ শুনবে?

কণ্ঠ তাহার বটে সুধা
ঝঙ্কারে প্রাণ মোহন বীণায় ;
সজল কাজল করুণ আঁখি
হর্ষ আনে বুকের ছিনায়!
বাহু-লতার বন্ধনী তার
কাঁপন জাগায় হিয়ার মাঝে ;
স্বপন বনের চপল হরিণ
ডাকছে আমায় উদাস সাঁজে!

তার পরে তার রূপ? হা, হা, তার কি আর বর্ণনা হয়? কবির কল্পনাও সেখানে হার মানে!

জোছনার আলো মাখা অপরূপ বর্ণ
সারা দেহে ঢালা তার ঝলমল স্বর্ণ!
বুলবুল পাপিয়ার কেড়ে-নেওয়া কণ্ঠে
প্রাণ-কাড়া সঙ্গীতে সুধা-ধারা বণ্টে!
নব-যৌবনা আধফোটা সৃষ্টি,
বিজড়িত-লাজ-ভয় চঞ্চল দৃষ্টি।
সুন্দরী সঙ্গিনী কবিতার ভক্ত,
কাব্যের রস-সুধা ভোগে অনুরক্ত!
সে যে মম হৃদয়ের চিরসুখশান্তি
যৌবন-মন-বন-শিহরণ-কান্তি!

বুঝলে ত? অতএব এখন হতে সাবধান!

পত্রখানা ডাকে দিয়া একবার মনের গভীর অতলের দিকে চাইলাম। সেখানে দেখি সবই ঠিক আছে—তবে আর এ সামান্য ঠাট্টায় দোষ কি?

অর্দ্ধাঙ্গিনীর পত্র পেতে এবার মোটেই দেরী হল না। এত কান্নাও মেয়েমানুষে কাঁদতে পারে? তার পত্রের প্রতি ছত্রে রয়েছে কেবল বুকভাঙ্গা ক্রন্দন, ব্যর্থ প্রেমের সকরুণ দীর্ঘ নিঃশ্বাস আর হাহুতাশ। সে লিখেছে—"হায় কি কুক্ষণে আমি মিনাকে তোমার সহিত পরিচয় করে দিয়েছিলাম। সে যে আমার সর্ব্বনাশ করবে তাকি আর জানতাম! বড় ব্যথা প্রিয়তম, বড় ব্যথা! আজ যদি একবার এখানে আসতে তবে দেখতে আমার কি অবস্থা হয়েছে। হায় পোড়া কপাল! এ পোড়া বুকের সমস্ত ভালবাসা দিয়েও কি তোমাকে ফিরাতে পারিনে? মিনা! সার্থক তোর জীবন, ধন্য তোর নারী জন্ম! আর শতধিক আমার এই পোড়া জীবনে! তোমাকে পেয়ে কি সুখীই না হয়েছিলাম কিন্তু হতভাগিনী আমি, তাই সে সুখ আমার সইল না।"

লেখা কি সত্য হয়ে উঠবে! ছিঃ!

পত্রের উত্তরে লিখলাম—"ছিঃ অমন করেও কাঁদতে আছে? তোমার একটুও বুদ্ধি নাই। সামান্য ঠাট্টাও তুমি সহ্য করতে পার না? তুমি কোন মুখে বল আমাকে তুমি খুব ভালবাস? একবার তোমার বুকে হাত দিয়া দেখ দেখি, সে কি বলছে? আমি তোমাকে ভালবাসি কি না সে উত্তর সেই খানেই পাবে। আজ আমি বুঝছি তুমি আমাকে মোটেই ভাল বাস না, তাই আমাকে অত সন্দেহ করছ। আমি যে তোমার বুকের ভাষা নিশিদিন আমার প্রাণের মাঝে শুনতে পাই! প্রেম কি বাহিরের দূরত্ব মানে?

আমার পুরান চিঠিগুলি একবার খুলে দেখো দেখি। তুমিই না বলতে তোমার কাছে আমি যে কবিতা লিখি, তা দেখে মিনার তোমার উপর হিংসা হয়। মনে নাই, লিখেছিলাম,

প্রতিদিন আমি তোমারে ঘিরিয়া
কতশত আঁকি ছবি,
তোমার নয়ন অশ্রু মুকুতা
আমারে করেছে কবি।

তোমার প্রেম, তোমার বেদনা যে আমার কবি করেছে, সে কথা আর কতকাল বলব? তোমার পাগল তোমার কাণ্ড দেখে আজ ভাবছে।

তার, নিষ্পাপ প্রাণে, নিষ্ফল প্রেম, হাহাকার ক্রন্দন
হায় চিত্তের তার ভৃত্যের সম, কেন এই বন্ধন!
কেন চক্ষের জলে দুঃখের দিন বৃথা কেটে যায় তার।
তব কুঞ্চিত কাল চিক্কিত চুলে কেন বিষ ভোমরার?

বিকালে আনোয়ার এসে জিদ ধরল, এবার তাকে খুব ভাল করে একটা কবিতা লিখে দিতে হবে, যাতে তার অকবি নাম ঘুচে যায়। মনে মনে ভাবলাম এ খেলা আর চালানো ভালো নয়। কিন্তু বাইরে বললাম, 'তথাস্তু।' তাকে এবারেও একটা কবিতা লিখে দিলাম।

ওগো সুন্দরি আমি মন ধরি আছি শুধু তব কামনায়,
মম কুণ্ঠিতচিত্ত লুণ্ঠিত আজ তব পথপাশে হায়।
এই ভক্তের সেরা রক্তের দাগে আঁকিয়াছে তব নাম,
ওগো বাঞ্ছিত ধন, সঞ্চিত সুধা! কেন তবু এত বাম?
আজ বন্দিছে কবি নন্দিত তব সুন্দর এলো চুল,
সে যে বক্ষের ধন, চক্ষেতে তব, নাহি তাতে কোন ভুল।
তব বঙ্কিম দেহ ভঙ্গিমা আনে স্বর্গের ফুলবাস,
তব বক্ষের সুধা কক্ষের মাঝে ভরা আছে মধুমাস!

আনোয়ার মহাখুশী হয়ে কবিতাটী নকল করে মিনার নিকট পাঠিয়ে দিল।

কয়দিন পরে প্রেয়সীর পত্র পেলাম। চিঠিতে তার প্রাণের কি আবেগ মাখান রয়েছে। সে লিখেছে—"ওগো কবি, ওগো প্রলয়ের যাত্রি, তুমি অমন করে ঝঙ্কার সৃষ্টি ক'র না। তোমার প্রাণসাগরের উত্তাল তরঙ্গে ক্ষুদ্র তরীর ত্রাণ কই? এযে কত জনকে ডুবাবে তা কে বলবে? আমার ঘাট হয়েছে; ক্ষমা কর। আমি আর তোমাকে সন্দেহ করব না।" তারপরে মিনার কথা লেখেছে, "তার স্বামী তাকে শাসন করে, আবার কবিতাও লিখে পাঠায়! এবারকার কবিতা তার বড্ড ভাল লেগেছে। আচ্ছা, তোমার পত্র ও কবিতার উপর তার এত ঝোঁক কেন? তার যে কি ভীষণ ক্ষুধা! তোমার পত্র পেলে সে যেন গিলে খেতে চায়! তুমি ত জান, তোমার পত্র দেখাবার জন্য কত আগে তোমার নিকট হতে অনুমতি নিয়েছি! এখন তোমার পত্র এলে সে আমার আদেশের অপেক্ষাও করে না। নিজেই খুলে পড়ে। সে দিন দেখি আমার ঘরে এসে, বাক্স খুলে তোমার সব পত্রগুলো বাহির করে পড়ছে। তারপর সে গুলোকে বুকে করে নিয়ে ঘুমিয়ে আছে! আহা বেচারি!"

সহসা এই সরল পত্রের ভিতর দিয়া আর এক ব্যথিতা নারীর অভিমান-ক্ষুব্ধ মুখ অস্পষ্টভাবে জেগে উঠল! কে এ ছন্দ-পাগল! ছন্দের খেলায় কোথায় চলেছি আমি!

আমার স্ত্রীর নিকট লিখিত পত্রের কবিতা নকল হয়ে দেখি আনোয়ারের কাছে এসেছে। সেই পত্রখানা নিয়ে আনোয়ার এসে আবার একটী কবিতা দাবী করল। মন আর কিছুতেই এ খেলায় সায় দেয় না। বন্ধুর তাগাদায় অনুগ্রহও কম নয়। অগত্যা লিখতে হলো,—

স্বর্গ থেকে আশীষ বারি বিধির দেওয়া প্রেমের নেশা,
মর্ত্তভূমে স্বর্গসুখ পুণ্যভবে সেইত পেশা।
বিশ্ব-জগৎ দূরে ফেলে বস প্রিয়ে আমার পাশে;
বীনাখানি জাগিয়ে তুলে সুরটী তোমার শুনাও দাসে।
গোলাব রঙীন্ অধর দুটীর মিষ্টি মধুর একটী চুমো,
আগল আঁখির পাগল চাওয়া নাইক তাতে একটু ঘুমও।
সেইত ধরম সেইত সুখ শান্তি-বারি বিধির দান,
প্রিয়ার যুগল বাহুর পরশ অমর করে রাখবে প্রাণ!

কবিতা নকল করে, খামে পুরে চিঠি লিখে পোষ্ট আফিসে ফেলে আনোয়ার ঘরে চলে গেল। আমিও রজনীর অন্ধকার বুকে শয্যা পাতলাম।

( ৪ )

সব যেন ঝাপসা ঠেকছে। সুন্দরের মূর্ত্তি আর ভাল করে দেখতে পাচ্ছিনে! কুয়াশায় যেন তাকে ঢেকে ফেলেছে! এ বুঝি আমার জীবন-নাটকের পঞ্চাঙ্ক?…………না একে প্রশ্রয় দেওয়া নয়। ঝড় যদি জোর করেই ঘরে ঢুকে, তবে দরজা জানালা বন্ধ করে তাকে রুখতেই হবে। তাই যদি না পারব তবে এত কালের নিষ্ঠার যে কোন মানে থাকেনা।

স্ত্রীর কাছে পত্র লিখলাম,—"তোমার পত্রে আজকাল বড্ড বাজে কথা থাকে। অপরের কি হল, না হল, কি করছে না কি করছে, তা নিয়ে তোমার মাথা ঘামানর দরকার কি? ফের যদি কাহারও কবিতার ফরমায়েশ বা বার্তা উল্লেখ করে পত্র লেখ, তবে মনে রেখ তোমার স্বামী

তোমাকে আর ক্ষমা করবেন না! তোমার সখীর বাড়াবাড়ি চরমে উঠেছে বলে তোমাকে সাবধান করতে হল।"

পাঠে মন-সংযোগ করবার চেষ্টা করছি, কলেজেও রীতিমত যাচ্ছি। সেদিন সন্ধ্যার পর আনোয়ার এসে তার বিশাল দেহ খানা চেয়ারের উপর ছেড়ে দিয়ে হাঁফাতে হাঁফাতে বলল, "আচ্ছা বন্ধু, এ সব টের পেল কি করে?" আমি জিজ্ঞাসুনেত্রে তাহার দিকে তাকালে সে বলল, "এই দেখনা, তোমার নিকট হতে যে সব কবিতা নিয়ে মিনার নিকট পাঠিয়েছিলাম, সে তা সব ফিরিয়ে দিয়েছে, আর লিখেছে 'অপরের পায়ে ধরে কবিতা লিখে স্ত্রীর নিকট পাঠাও—লজ্জা করে না? আমি কোরান শরিফ ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করেছি, আর কখনও কবিতা পড়ব না। তুমি যদি আবার কবিতা পাঠাও তবে আমি বিষ খেয়ে মরব।"

আমি বললাম—"মিনার সখীই এসব গণ্ডগোলের মূল। তার জন্যই এই সমস্ত অনর্থের সৃষ্টি হয়েছে।"

স্ত্রীর নিকট থেকে পত্র পেলাম, মিনা শ্বশুর বাড়ী চলে গিয়েছে। প্রতিজ্ঞা করে গিয়েছে আর কখনও আসবে না।

---

# বাদ্‌লা দিনে।

[ আবু নয়ীম মোহাম্মদ বজলুর রশীদ ]

( কথিকা )

আকাশে মেঘ করে আসে। ঝুপ্‌ ঝুপ্‌ করে বৃষ্টি পড়ে।......মার বুকে ব্যথা বাজে।..... কোলের ছোট্ট শিশুটী কোল-ছাড়া......তাই এমন। স্বামীর শেষের দান ছিল ওটী। সেদিন তার হাতে শিশুটীকে দিয়ে চির-বিদায় নিলো সে......অনেক দিনের কথা।

......এম্‌নি কত বাদলের দিনে ওকে বুকে করে .....যত সুখ-দুঃখের কথা ভাব্‌তো সে। বিদ্যুৎ চম্‌কে উঠ্‌তো......শিশুটীকে বুকে আক্‌ড়ে' ধরে' চুমোয় চুমোয় কচি গাল দু'টী ভরে দিতো......নিবিড় আনন্দে।......তারপর হঠাৎ একটা ঝড়ের ঝাপ্‌টা এসে তার সে-সুখের দীপ্‌টা নিবিয়ে দিলো।......

ঝুপ্‌...ঝুপ্‌.. ঝুপ্‌...! সে নাই। আজো তেম্‌নি করে মেঘ ডাকে......বৃষ্টি পড়ে......শুধু সে নাই।.........মা ডুক্‌রে কেঁদে ওঠে... ওরে ফিরে আয়......ফিরে আয়।......কবরের বুকে শুয়ে আছে সে......দরদীর ডাক কি তার কানে যায়?........

# সমস্যা ও সমাধান

[ মোহাম্মদ আকরম খাঁ ]

( ২ )

## সুদ-সমস্যা

( ১ )

সুদ-সমস্যা ও তাহার সমাধান সম্বন্ধে আমাদের দেশে বহুদিন হইতে নানা প্রকার আন্দোলন আলোচনা চলিয়া আসিতেছে। একদল আলেম কোরআন হাদিছের আলোচনা করিয়া প্রমাণ করিতে চাহিয়াছেন যে, কোরআনের নিষিদ্ধ রেবা এবং আমাদের দেশে প্রচলিত সকল শ্রেণীর সুদ এক জিনিষ নহে। এক কথায়—Intrest ও Usury এর মধ্যে প্রভেদ প্রতিপাদন করতঃ তাঁহারা Usury কে রেবা ও হারাম বলিয়া নির্দ্ধারণ করেন, পক্ষান্তরে Intrest তাঁহাদের মতে কোরআনের বর্ণিত রেবা-পর্য্যায়ভুক্ত নহে, সুতরাং তাহার আদান প্রদান হারামও নহে। আর একদল হানাফী মজহাবের বিশেষ মতবাদকে অবলম্বন করিয়া দারুল-হরব ও হর্ব্বির তর্ক তুলিয়া এদেশে, বিশেষতঃ অমুছলমানের নিকট হইতে, সুদ গ্রহণের অনুকূলে অভিমত প্রকাশ করিয়া আসিতেছেন। এই দুইদল ব্যতীত সমাজে আর একটী দলের সৃষ্টি হইয়াছে। মুছলমানের ইষ্টানিষ্টের সহিত কার্য্যক্ষেত্রে তাঁহাদের কোন প্রকার সম্বন্ধ কখনও দেখিতে পাওয়া যায় না, অথচ সুদের ব্যাপার লইয়া তাঁহারা প্রায়শই নাড়াচাড়া করিয়া থাকেন। তাঁহারা দেখাইতে চান যে, এছলাম বর্ত্তমান যুগে চলিতে পারেনা, সুদ সমস্যাকে এজন্য তাঁহারা প্রধান নজির স্বরূপে পেশ করিয়া থাকেন।

এখানে গভীর দুঃখের সহিত বলিতে বাধ্য হইতেছি যে, এই সকল দলের মধ্যে কেহই সুদের মছলার শাস্ত্রীয় দিকটার প্রতি সম্যক দৃষ্টিদানের চেষ্টা করেন নাই। ধর্ম্মের আদেশ নিষেধ নিরপেক্ষ হইয়া, যাহারা মুছলমানের অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান কল্পে সমাজে সুদের আদান প্রদান প্রচলিত করার জন্য দীর্ঘকলেবর প্রবন্ধ রচনা করিতে অভ্যস্ত, তাঁহারাও যে অর্থনীতির দিক দিয়া এই ব্যাপারটাকে একটু ব্যাপক ভাবে দেখিবার ও গভীর ভাবে বুঝিবার চেষ্টা করিয়াছেন, তাঁহাদের আলোচনার ভঙ্গিমা ও যুক্তি প্রমাণের ধারা দেখিয়া সেরূপ বিশ্বাস করা কঠিন হইয়া দাঁড়ায়। বর্ত্তমান জগতের সমস্ত অর্থ-নৈতিক সংগ্রামের মৌলিক দ্বন্দটী কোথায় লুকাইয়া আছে, মানব সাধারণের সাধারণ হিতাহিতের সহিত ধনের নিকেন্দ্রীকরণ আন্দোলনের সম্বন্ধ কি, ইত্যাদি ব্যাপার সম্বন্ধে একটু মোটামুটি ভাবে চিন্তা করিয়া দেখিলে, এই প্রকার দুঃসাহসিকতা প্রকাশ করা তাঁহাদের পক্ষে কখনই সম্ভবপর হইত না।

এই সকল বিষয়ের বিচার বিশ্লেষণে প্রবৃত্ত হওয়া এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। এখানে আমি সংক্ষেপে এইটুকু দেখাইতে চাই যে, সুদ সম্বন্ধে নানা দিক দিয়া মুছলমানের সম্মুখে যে 'সমস্যা' উপস্থাপিত করিয়া দেওয়া হইয়াছে ও হইতেছে, বস্তুতঃ তাহা সমস্যাই নহে। কোরআন হাদিছের সরল ও সহজ বাণীগুলির প্রতি সম্যকরূপে ও যথাযথভাবে নজর না দিয়া এবং এছলামের মূল নীতিগুলির প্রতি মারাত্মকরূপে উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়া আমরা নিজেরাই একটা সমস্যার সৃষ্টি করিয়া ফেলিয়াছি, এবং অবশেষে চরম ধৃষ্টতার সহিত তাহাকে আল্লার পবিত্র ও শাশ্বত বিধান—এছলামের ঘাড়ে চাপাইয়া দিয়া নিজেদের অজ্ঞতার সহিত একটা নূতন অপকর্ম্মকে যোগ করিয়া দিয়াছি মাত্র।

( ২ )

এছলামের আদেশ নিষেধগুলি সম্বন্ধে একটু ধীরভাবে চিন্তা করিয়া দেখিলে সহজেই জানা যাইবে যে, সেখানে প্রত্যেক নিষেধের সহিত একটা আদেশ এবং প্রত্যেক বর্জ্জনের সঙ্গে একটা অর্জ্জন অঙ্গাঙ্গীভাবে সুসজ্জিত হইয়া আছে—সেই

বর্জ্জন ব্যতিরেকে অর্জ্জন নিস্ফল, বহুক্ষেত্রে অসম্ভব। অনেক সময় আমরা এই অর্জ্জন ও বর্জ্জনের দুইটা দিকের মধ্যে একটাকে ত্যাগ করিয়া বসি, এবং বিচারের সময় একদিকের অর্দ্ধেক মাত্র সম্মুখে রাখিয়া দুই দিকের সম্পূর্ণ জিনিষটার পূর্ণ কল্যাণ তাহার মধ্যে খুঁজিয়া হয়রাণ হইয়া পড়ি। বীজের একটা ভাগ বা এক একটা ভাগকে স্বতন্ত্রভাবে মাটিতে পুতিলে তাহাতে যেমন অঙ্কুর-উদ্গম হইতে পারে না, এই শ্রেণীর আদেশ নিষেধগুলিকে পরস্পর হইতে পৃথক করিয়া, আল্লাহ-রছুলের নির্দ্ধারিত কল্যাণকে প্রাপ্ত হওয়া তেমনি মুছলমানের পক্ষে সম্ভব হইয়া উঠে না।

অধিকাংশ স্থলে মানুষ সুদ দিতে বাধ্য হয়—অভাবে পড়িয়া। দৈব দুর্ব্বিপাকে এ অভাবের হাতে জন সাধারণকে অনেক সময়ই পড়িতে হয়। এই অভাবের সময়ই মানুষ শাইলকরূপী নরখাদক মহাজনগণের দ্বারস্থ হইতে এবং উচ্চ হারে সুদ স্বীকার করিয়া তাহাদিগের নিকট হইতে টাকা কর্জ্জ করিতে বাধ্য হইয়া থাকে। মানুষের এই সব সাময়িক অভাব পূরণের সুব্যবস্থা যতদিন না করা হয়, ততদিন তাহাকে কর্জ্জ করিতে নিষেধ করা একটা নিস্ফল ও অস্বাভাবিক প্রহসন মাত্র। আমাদের আলেম সমাজ এই প্রহসনের ব্যর্থ অভিনয় অবিরামভাবে করিয়া চলিয়াছেন। কিন্তু এই সকল ওয়াজ নছিহত কোন অভাবগ্রস্তের তীব্র জ্বালাকে নিবারণ করিতে বা সুদখোর মহাজনের দ্বার হইতে তাহাকে সরাইয়া আনিতে সমর্থ হয় নাই। সুদ খাওয়া ও সুদ দেওয়া **উভয়ই সমান**—এই হাদিছটী লক্ষ কণ্ঠে প্রতিধ্বনিত হওয়া সত্ত্বেও আজ হাজার হাজার মুছলমান বিধর্ম্মী মহাজনের করাল কবলে আত্মসমর্পণ করিয়া পথের ভিখারী হইয়া যাইতে বাধ্য হইতেছে—ইহার কারণ কি?

আল্লার কোরআন যেমন সুদকে বর্জ্জন করার আদেশ প্রদান করিয়াছে, সেইরূপ সঙ্গে সঙ্গে জাকাত প্রদান করার কড়া হুকুমও প্রচার করিয়া দিয়াছে। 'সঙ্গে সঙ্গে' বলিলে ভুল হয়—জাকাতের বিধি ব্যবস্থাকে মুছলমান সমাজে উত্তম রূপে প্রচার ও প্রতিষ্ঠা করিয়া দিয়া, তাহার পর অবশেষে সুদকে হারাম বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে। সুদের আরং ও জাকাতের আরম্ভের ইতিহাস অনুসন্ধান করিলে ইহা সহজেই জানা যাইতে পারিবে।

প্রত্যেক অবস্থাপন্ন মুছলমানকে তাহার সমস্ত উদ্বৃত্তের শতকরা আড়াই টাকা এবং সমস্ত কৃষিজাত ফলশস্যের দশম—অবস্থাভেদে (১) ২০ ভাগের এক ভাগ—জাকাতরূপে আমানৎ করিতে হয়। গরু ছাগল মেষ মহিষ উট ঘোড়া প্রভৃতি পশুরও নিয়মিতভাবে বৎসর বৎসর জাকাত আদায় করিতে হয়। সুদ যেরূপ কঠোর ভাবে নিষিদ্ধ হইয়াছে, জাকাতও সেইরূপ দৃঢ়ভাবে ফরজ করা হইয়াছে। হজরত আবুবকরের সময় মুছলমানের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করা হইয়াছিল—এই জাকাত দিতে অস্বীকার করায়।

জাকাত কিরূপে ও কাহাকে কাহাকে দিতে হইবে, কোরআনে তাহাও স্পষ্টভাষায় বলিয়া দেওয়া হইয়াছে। সকল প্রকার দুঃস্থ ও অভাবগ্রস্ত মুছলমানই জাকাত পাওয়ার **অধিকারী**। ইহা ভিক্ষা বা অনুগ্রহ দান নহে, কাঙ্গালের বিপন্নের ও অভাবগ্রস্ত মুছলমানের—এমনকি অমুছলমানেরও—তাহাতে 'হক' বা স্বত্ব আছে।

সুদ হারাম হওয়া আর জাকাত ফরজ হওয়া এছলামের দুইটী যৌগপতিক আদেশ। জাকাতের ফরজকে অস্বীকার বা উপেক্ষা করিয়া সুদকে বর্জ্জন করা কখনই সম্ভবপর হইতে পারিবে না। পক্ষান্তরে জাকাতের আদেশকে যথাযথ ভাবে পালন করার পর দেশে এমন একটীও অভাবগ্রস্ত মুছলমান বর্ত্তমান থাকিতে পারে না—দৈবদুর্ব্বিপাকের বা সাময়িক অভাবের জন্য যাহাকে দায়ে ঠেকিয়া সুদখোর মহাজনের দ্বারস্থ হইতে হইবে। আমার একজন বিশেষজ্ঞ বন্ধু সংযত ভাবে হিসাব করিয়া দেখাইয়াছেন যে, এক বাঙ্গলার মুছলমান যথাবিধি জাকাতের আদেশ পালন করিয়া চলিলে এদেশ হইতে বাইতুল মাল তহবিলে প্রতি বৎসর অন্ততঃ তিন কোটি টাকা সংগ্রহ হইতে পারে। এই বাঙ্গলা দেশে দুই একস্থানে এখনও এই বাইতুল মালের সুব্যবস্থা আছে এবং সেজন্য স্থানীয় মুছলমানদিগকে কখনই সুদখোর মহাজনের দ্বারস্থ হইতে হয় না। সুদ দেওয়া হারাম আর জাকাত দেওয়া ফরজ অর্থাৎ জাকাত না দেওয়া হারাম। দুইটীই কোরআনের আদেশ, দুইটীই এছলামের ব্যবস্থা এবং একে অন্যের উপর নির্ভরশীল। আমরা আল্লার হুকুমের এক অংশকে জোরে আঁকড়াইয়া ধরার চেষ্টা

(১) পানি সেচিয়া ফসল করিলে এই ব্যবস্থা।

করিতেছি বটে, কিন্তু তাহাকে সার্থক করার জন্য অন্য যে অংশের অগ্রেই আবশ্যক হইয়া থাকে, তাহাকে নিতান্ত উপেক্ষার চক্ষে দেখিতেছি। তাই আমাদের অজ্ঞতা ও অবজ্ঞা এক সঙ্গে মিলিয়া দুনয়ার যত সমস্যা আনিয়া আমাদের চলার পথকে বিঘ্নসঙ্কুল করিয়া তুলিতেছে—আর আমরা নিজেদের অজ্ঞতা ও অবজ্ঞার এই কুফলগুলিকে অবলীলাক্রমে এছলামের স্কন্ধে চাপাইয়া দিয়া, সংস্কার বা সংহারের নামে বাবদুকতা প্রকাশে কুণ্ঠিত হইতেছি না।

( ৩ )

সাধারণভাবে এই কথাগুলি নিবেদন করার পর আমি এখন সুদসংক্রান্ত কয়েকটী আয়ত ও হাদিছের প্রতি বিজ্ঞ-পাঠকবর্গের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। ইহাদ্বারা আমার বক্তব্য বিষয়টী শাস্ত্রের হিসাবে আরও পরিষ্কার হইয়া যাইবে। সুদ খানেওয়ালা আর দেনেওয়ালা দোনোঁ বরাবর—সুদের ওয়াজ ও আলোচনা প্রসঙ্গে সর্ব্বদাই এই হাদিছটীর আবৃত্তি করা হইয়া থাকে। আবার "আধুনিক" লেখকেরাও এই হাদিছের প্রতি ইঙ্গিত করিয়া অন্যান্য মোল্লা মৌলবীদিগকে জব্দ করার প্রয়াস পাইয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন—যখন উভয়ের গোণাহ বরাবর, আর যখন হাজার হাজার মুছলমান সুদ দিয়া নিত্যই সর্ব্বস্বান্ত হইয়া যাইতেছে, তখন দশ পাঁচজন সুদ খাইতে আরম্ভ করিলে তাহাদের উপর খড়্গহস্ত হওয়ার কোন কারণ নাই। সুতরাং আমরা দেখিতেছি যে, এই হাদিছটীকে সকল পক্ষই বেশ ভাল করিয়া জানেন ও মানেন, এবং জনসাধারণের মধ্যেও এই হাদিছের যথেষ্ট প্রচারও আছে। এই জন্য আমরা সর্ব্বপ্রথমে এই হাদিছটীর মূল ও অনুবাদ উদ্ধার করিয়া দিতেছি :—

হজরত রছুলে করিম সুদের দাতা গৃহীতা এবং লেখক ও সাক্ষীগণকে লা'নৎ করিয়াছেন—এই মর্ম্মের কএকটী হাদিছ কিছু কিছু পরিবর্ত্তন সহকারে মোছলেম নাছাই ও কনজুল ওম্মাল প্রভৃতি হাদিছ গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে। "তাহারা সমান" এই অংশটী মোছলেমে জাবেরের রেওয়ায়তে পাওয়া যায়। নাছাই হজরত আলী হইতে বর্ণনা করিতেছেন :—

عن علی انه سمع رسول الله صلعم : لعن اکل
الربوا و موکله و کاتبه و مانع الصدقة

আলী বলেন—আমি হজরতকে সুদ দাতার সুদ গৃহীতার, তাহার লেখক ও সাক্ষীগণের এবং জাকাত দানে অস্বীকৃত ব্যক্তির উপর লা'নৎ করিতে শুনিয়াছি। (১)

হজরত জাবেরের হজরত আলীর এবং অন্যান্য ছাহাবাগণের বিভিন্ন রেওয়ায়তগুলি এক সঙ্গে করিয়া লইলে আমরা হাদিছটী পূর্ণ আকার প্রাপ্ত হইতে পারি। এই হিসাবে হাদিছের ভাবার্থ এইরূপ দাঁড়ায় :—হজরত সুদ দাতা, সুদ গৃহীতা, সুদের সাক্ষী, সুদ সংক্রান্ত দলিলের লেখক ও জাকাত প্রদানে অসম্মত ব্যক্তির উপর লা'নৎ করিলেন এবং বলিলেন—তাহারা সমান। (২) আমরা এখন দেখিতে পাইতেছি যে, হজরত রছুলে করিম জাকাতদানে অসম্মত ব্যক্তিকে সুদদাতা ও গৃহীতা প্রভৃতির সহিত এক পর্য্যায়ভুক্ত করিয়া দিতেছেন। কারণ সুদ দিয়া, সুদ সংক্রান্ত দলিলের লেখক ও সাক্ষী হইয়া একদল লোক যেমন মহাজনকে সুদ খাইতে সাহায্য করিয়া থাকে, সেইরূপ জাকাত দানে অসম্মত ব্যক্তি জাকাত বন্ধ করিয়া অভাবগ্রস্ত ব্যক্তিকে সুদী কর্জ্জ লইতে বাধ্য করিয়া থাকে। ফলে এই ব্যক্তিই হইতেছে তাহার কর্জ্জ লওয়ার ও সুদ দেওয়ার প্রধান কারণ। সে ও তাহার সমশ্রেণীর অবস্থাপন্ন লোকেরা যথাবিধি জাকাত আদায় দিলে বাইতুল মাল তহবিল হইতে সাহায্য গ্রহণ করিয়া গরিবটী বর্ত্তমান অভাবের দায় হইতে মুক্তি পাইতে পারিত, সুতরাং মহাজনের দ্বারস্থ হওয়ার কোন কারণই তাহার ঘটিত না।

যদি কেহ হজরত জাবের ও হজরত আলীর বর্ণিত হাদিছ দুইটীকে দুইটী স্বতন্ত্র ঘটনার বিবরণ বলিয়া নির্দ্ধারণ করিতে চান, তাহাতেও আমাদের আপত্তি বা ক্ষতি কিছুই নাই। হজরত একই পদে সুদখোর সুদদাতা প্রভৃতির সহিত জাকাত দিতে অসম্মত ব্যক্তিকে এক পর্য্যায়ভুক্ত

(১) এই হাদিছটী কনজুল ওম্মালেও বিভিন্ন রাবী কর্ত্তৃক বর্ণিত হইয়াছে।

(২) 'সব সমান' কথার সচরাচর যে অর্থ করা হয়, তাহা ঠিক নহে। একজন অর্থ গৃধ্নুতার জন্য বিপন্ন প্রতিবেশীর হৃৎপিণ্ড চর্ব্বণ করিতে উদ্যত, আর একজন নিতান্ত দায় ঠেকিয়া নিরুপায় অবস্থায় তাহাকে সুদ দিতে স্বীকৃত হইয়া আপাততের মত আত্মরক্ষা করিতে চেষ্টা করিতেছে—এই দুই জনের পাপ সমান, ইহা কখনই হাদিছের উদ্দেশ্য নহে। দেখ মেরকাত প্রভৃতি।

এবং একই লা'নতের ভাগী করিয়া বর্ণনা করিতেছেন। জাকাত দিতে অসম্মতি ও সুদের প্রসার বৃদ্ধির মধ্যে কার্য্য-কারণ সম্বন্ধ আছে বলিয়াই হজরত এখানে সুদের কথার সঙ্গে সঙ্গে জাকাতের প্রসঙ্গের এমন ভাবে অবতারণা করিয়াছেন, অন্যথায় তাহা অবান্তর বলিয়া নির্দ্ধারিত হইত। পাঠক দেখিতেছেন, যে হাদিছটীকে উপলক্ষ করিয়া আমাদের বিভিন্ন দলের সমালোচকেরা মুছলমানের সম্মুখে সুদসমস্যাটাকে বিভিন্ন কারণে এমন ঘোরাল করিয়া তুলিয়াছেন, বস্তুতঃ তাহা সমস্যাত মোটেই নহে; বরং প্রকৃত পক্ষে সমস্ত সমস্যার চরম সমাধান তাহারই মধ্যে অতি স্পষ্ট ও অতি সুন্দররূপে নিহিত হইয়া আছে।

বিজ্ঞ পাঠক পাঠিকাবর্গকে এখন আমরা ছুরা বকরার ৩৮ রুকু এবং ছুরা রুমের ৪র্থ রুকু—উপক্রম উপসংহার সহ—পাঠ করিয়া দেখিতে অনুরোধ করিতেছি। এই রুকু দুইটী মোটামুটি ভাবে পাঠ করিলেও সকলেই দেখিতে পাইবেন যে, সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বশক্তিমান আল্লাহ তাআলার শাশ্বতবাণী কোরআন ঐ সকল স্থানে সুদ বর্জ্জনের সহিত জাকাতকে কিরূপ অভেদ্যভাবে একত্র গ্রথিত করিয়া দিয়াছে। সুরা বকরার ৩৮ রুকুতে প্রথমে দানশীলতার মহিমা কীর্ত্তন করা হইয়াছে এবং তাহার অব্যবহিত পরে কুসীদজীবীর মানসিক বৃত্তির কঠোর নিন্দাবাদ করিয়া সঙ্গে সঙ্গে বলিয়া দেওয়া হইতেছে :—

يمحق الله الربوا و يربي الصدقات ؕ والله لايحب كل كفار اثيم

"আল্লাহ সুদকে কল্যাণ প্রাপ্ত হইতে দেন না এবং জাকাতকে তিনি বর্দ্ধিত করিয়া থাকেন, আর কোন অকৃতজ্ঞ মহাপাতকীকে আল্লাহ ভালবাসেন না।" (৩১৬)। ইহার পরবর্ত্তী আয়তে আবার বলা হইতেছে—"যাহারা বিশ্বাসী ও সৎকর্ম্মশীল এবং যাহারা নামাজকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া রাখে ও **জাকাত প্রদান করিতে থাকে,** স্বীয় প্রভুর সন্নিধানে তাহাদের পুরস্কার (নির্দ্ধারিত হইয়া) আছে, তাহাদের কোনও ভয় নাই আর তাহারা মর্ম্মাহতও হইবে না।

ছুরা মরয়মেরও খুব সংক্ষেপে একটু নমুনা দিতেছি। আল্লাহ বলিতেছেন :—"অতএব স্বজনগণকে এবং কাঙ্গাল ও (দুঃস্থ) বিদেশী পথিকদিগকে তাহাদের প্রাপ্য (পরিশোধ করিয়া) দাও, আল্লার সন্তোষ প্রার্থনা যাহারা করে—তাহাদের পক্ষে ইহাই উত্তম ;- আর এই সব লোকই হইতেছে সফলকাম ; (৩৮) আর পরের ধনকে গ্রাস করিয়া বর্দ্ধিত হইবে মনে করিয়া তোমরা যে ধনসম্পদ সুদে খাটাইয়া থাক, আল্লার সন্নিধানে তাহা কদাচিৎ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে পারিবে না, কিন্তু

ما اتيتم من زكوة تريدون وجه الله - فاولئك هم المضعفون —

আল্লার সন্তোষ লাভের উদ্দেশ্যে তোমরা যে জাকাত প্রদান করিয়া থাক,—(জানিয়া রাখ) এই শ্রেণীর লোকেরাই ত (জাতীয় সম্পদ) বহুগুণে বর্দ্ধিত করিয়া থাকে (৩৯)।

এছলামের সাধারণ নীতির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া, বিশেষতঃ উপরোক্ত আয়ত ও হাদিছগুলির প্রতি সম্যকভাবে দৃষ্টিদান করিয়া আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলে, আমরা স্পষ্টভাবে দেখিতে পাইব যে, এছলামের আদেশ নিষেধগুলিকে এক সঙ্গে গ্রহণ করিয়া কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে পারিলে সুদখোর মহাজনদিগের দ্বারস্থ হওয়ার কোন দরকারই মুছলমানের থাকিবে না। মুছলমানের জাতীয় জীবনে এই সমস্যা উপস্থিত না হইতে পারে, এই জন্য সর্ব্বজ্ঞ আল্লাহতাআলা প্রথমে জাকাতকে তাহাদের মধ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া দিয়া তাহার পর সুদের নিষেধাজ্ঞা প্রচার করিয়াছেন। তাহার পর, আল্লাহ ও তাঁহার রছুল সুদের বর্ণনা প্রসঙ্গে পুনঃ পুনঃ স্পষ্টভাষায় বলিয়া দিতেছেন যে, অভাবগ্রস্ত দীন দরিদ্র ও বিপন্ন জনগণকে সুদের হাত হইতে রক্ষা করার একমাত্র উপায়—জাকাতের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত বাইতুলমাল তহবিল। মুছলমান সমাজ আজ সাধারণভাবে জাকাত দেওয়া বন্ধ করিয়া দিয়াছে। যাঁহারা জাকাত দিয়া থাকেন—বলিয়া প্রকাশ, তাঁহাদের মধ্যে ঠিকমত হিসাব করিয়া যোলআনা জাকাত এক সঙ্গে বাহির করিয়া থাকেন, এরূপ লোক খুব কমই আছেন। আবার এই জাকাতের টাকাগুলি, দাতাদিগের অনুগ্রহ দানের ন্যায়, নিতান্ত অসঙ্গত ও অসংযত ভাবে এবং শরিয়তের নির্দ্ধারিত বিধি ব্যবস্থার বিপরীত প্রকারে, ধনীদিগের খোশ-খেয়াল অনুসারে ইতস্ততঃ বিতরিত হইয়া থাকে। সেজন্য অপাত্রে দানের ফলে দাতাদিগের যশের সঙ্গে সঙ্গে সমাজে অকর্ম্মা ভিক্ষুকের সংখ্যা বাড়িয়া

যাইতে থাকে মাত্র—জাকাতের ব্যবস্থার মধ্যে আল্লার যে মঙ্গল উদ্দেশ্য নিহিত ছিল, বর্ত্তমান ব্যবস্থায় তাহা আংশিক ভাবেও সফল হইতে পারে না।

( ৪ )

পরন্তু অপহরণের অদম্য লোভই সুদখোর মহাজনের জীবনের একমাত্র সাধনা। মানুষের সমস্ত সৎবৃত্তিকে সম্পূর্ণভাবে বিসর্জ্জন দিতে না পারিলে, দুঃস্থ দুর্দ্দশাগ্রস্ত মানুষের শোণিত শোষণের এই নিষ্ঠুর ব্যবসা কেহ কখনই অবলম্বন করিতে পারে না। এই অভিশপ্ত জীবনের নর-শার্দ্দুলদিগের সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটাইয়া মুছলমান সমাজ যে কিরূপ উপকৃত হইতে পারিবে, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়।

রেবার ব্যাখ্যা সম্বন্ধে বিশেষভাবে আলোচনা করিয়া দেখিলে মনে হয়—সমবায় সমিতির মুনাফার অংশ, ব্যাঙ্কের গচ্ছিত টাকার সুদ, এবং এই শ্রেণীর আরও কতকগুলি জিনিষ ঠিক রেবা পর্য্যায়ভুক্ত হইতে পারেনা। এই জন্য মিসর ও ভারতের বহু গণ্যমান্য আলেম ঐ সকল সুদ গ্রহণের অনুকূলে—প্রত্যক্ষতঃ বা প্রকারতঃ—মত প্রকাশ করিয়াছেন। ভারতের বর্ত্তমান আলেমদিগের মধ্যে মাওলানা মুফতি মোহাম্মদ কিফায়তুল্লাহ এবং আহলে হাদিছ সম্প্রদায়ের নেতা ও আমিরে-শরিয়ত মাওলানা আবুল-অফা ছানাউল্লা ছাহেবের নাম এই প্রসঙ্গে বিশেষ ভাবে উল্লেখ করা যাইতে পারে।

এই সংক্ষিপ্ত আলোচনায় আমি কেবল এইটুকু মাত্র দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি যে, সুদের সমস্যা মুছলমানের সম্মুখে উপস্থিত হইতে পারিতেছে এছলামকে অতিক্রম করিয়া—তাহাকে অবলম্বন করিয়া নহে। এছলাম এ সমস্ত সমস্যার সম্পূর্ণ সমাধানের সম্যক ব্যবস্থা করিয়াই সুদের নিষেধাজ্ঞা প্রচার করিয়াছে। কোরআনের বর্ণিত "রেবা" শব্দের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করিয়া তাহার স্বরূপ ও প্রকার সম্বন্ধে বিচারে প্রবৃত্ত হওয়া এ প্রবন্ধের আদৌ উদ্দেশ্য নহে, তাহা আমার পক্ষে সহজ সাধ্যও নহে। আজকাল আমাদের দেশে "রেবার" স্বরূপ ও প্রকার সম্বন্ধে বিচারে প্রবৃত্ত হওয়া সাধারণতঃ যেরূপ সহজ মনে করা হইয়া থাকে, আমাদের পূর্ব্ববর্ত্তী এমাম ও মোহাদ্দেছগণ তাহাকে ততটা সহজ বলিয়া ধারণা করিতে পারেন নাই। তাঁহারা স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন :—

"و باب الربا من اشکل الابواب علی کثیر من اهل العلم"

"সুদের অধ্যায়টী অধিকাংশ আলেমের নিকট একটা কঠিনতম বিষয় বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে।" অতএব আমার মত অল্পপুঁজী লেখকের পক্ষে ইহা যে কতদূর কষ্টসাধ্য ব্যাপার, তাহা সহজে অনুমান করা যাইতে পারে।

উপসংহারে বাঙ্গলার ভক্তিভাজন আলেম মহোদয়গণের খেদমতে আমাদের বিনীত নিবেদন—এখন হইতে তাঁহারা মুছলমানের প্রত্যেক পল্লীকে এছলামের বিধান অনুসারে জমাআৎবদ্ধ করিয়া নিয়মিত ভাবে জাকাত আদায়ের ও তাহার যথাবিধি সদ্ব্যয়ের সুব্যবস্থা করার জন্য নিজেদের সমস্ত শক্তি ব্যয় করুন। সুদের অর্থাৎ দিন-দুনয়ার সকল প্রকার ধ্বংসের হাত হইতে মুছলমানকে রক্ষা করিতে হইলে, কোরআনের ধারা ও তাহার স্পষ্ট শিক্ষা অনুসারে, সর্ব্বপ্রথমে বাইতুল মাল তহবিল গঠনের প্রাণপণ চেষ্টা তাঁহাদিগকে করিতে হইবে। তাঁহাদের স্মরণ রাখা উচিত যে, জাকাত আদায়ের ও বাইতুলমাল তহবিলের সমস্ত ব্যবস্থা সম্পূর্ণভাবে শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত সুদের নিষেধাজ্ঞা প্রচারিত হয় নাই। হজরত ওমর ত ইহাকে আহকাম সংক্রান্ত শেষ আয়ত বলিয়াই উল্লেখ করিয়াছেন। সমস্ত বিধিব্যবস্থা সম্পন্ন করার পর সকলের শেষে সুদের নিষেধাজ্ঞা মূলক আয়ত কেন অবতীর্ণ হইয়াছিল, এখানে তাহাও একবার ভাবিয়া দেখা উচিৎ। তাঁহারা এতদিন কোরআনের শিক্ষা এবং এছলামের কর্ম্মধারাকে উপেক্ষা করিয়া সুদ বন্ধ করার চেষ্টা করিয়া আসিয়াছেন, সেই জন্যই তাঁহাদের সমস্ত চেষ্টা এ যাবৎ বিফল হইয়া গিয়াছে।

( ক্রমশঃ )

# অচেনা

[ আজিজুল হাকিম ]

নিশীথ রাতে আলোক পথে
কোন্ হুরী যায় হাওয়ায় ভেসে
দীপ্ত চোখে মেঘের ফাঁকে
কোন্ পরী চায় মধুর হেসে।
সকাল সাঁঝে নূপুর বাজে
কোন্ রূপসীর চটুল পায়ে
কোন্ মোহিনীর রক্ত-কপোল
দীপ্তি জাগায় ঊষার গায়ে।
কোন্ সুরী হায় বায়ুর সনে
গান গেয়ে যায় মোহন সুরে
কোন্ কিশোরীর গোপন-ব্যথা
ব্যক্ত কুসুম-কানন জুড়ে।
দুগ্ধ ধবল ছায়া পথের
বিমল বুকে চরণ ফেলে
শারদ চাঁদের পাশ কাটিয়ে
স্বর্ণ বরণ আঁচল মেলে।
কোন্ নূরী যায় মৃদুল বায়ে
কাশের বনে লহর তুলে
রাঙিয়ে দিয়ে শিউলি মূলে
জাগিয়ে চুমায় সুপ্ত ফুলে।
পল্লী মায়ের শান্ত বুকে
সবুজ আঁচল এলিয়ে দিয়ে
যায় ধীরে কোন্ সব্জা পরী
সাঁঝ সমীরে দোলন খেয়ে।
কোন্ মায়াবীর চোখের জলে
মুক্তাফলে দুর্ব্বাদলে
কোন্ উষসীর হাসির পরাগ
শরৎ সাঁঝের লাল কপোলে।
আলো ছায়ায় লুকোচুরি
নিত্য খেলে চাঁদের সনে
দোলায় কলি নাচায় অলি
ফুলের বুকে আপন মনে।
দেয়না ধরা অন্তরালে
নিত্য থাকে কোন্ সে রাণী
বিশ্ব-বীণার তারে বাজে
নিতুই সে কার মৌনবাণী।

# আফগান কবিদের কথা

[ মুসাফির ]

( পূর্ব্ব প্রকাশিতেরপর )

## মির্জ্জা খাঁ আনসারী

ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে আফগানিস্থানে রোসহান্ সম্প্রদায় বলিয়া একটী দলের সৃষ্টি হয়। এই সম্প্রদায়ের নেতা ছিলেন পীর রোসহান। পীর রোসহান সুফী মতাবলম্বী ছিলেন, কিন্তু পরে ধর্ম্মের আধ্যাত্মিকতা পরিহার করিয়া এক যোগীর পাল্লায় পড়িয়া তান্ত্রিক আচার অনাচারে লিপ্ত হইয়া পড়েন। তিনি আপনি পীর রোসহান্ এই নাম পরিগ্রহণ করেন। আফগানিস্থানের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পীর ও সাধু পুরুষ আখুন্দ দরবেশ পীর রোসহানের নাম বদলাইয়া দিয়া পীরে তারিক অর্থাৎ পন্থা গুরু এই নাম রাখিয়াছিলেন।

এই পীরের বংশেই ভক্ত-কবি মির্জা খাঁ আনসারী জন্মগ্রহণ করেন। প্রথম জীবনে মির্জা খাঁ তাঁহার পূর্ব্বগামী পীরের অধীনে আসিয়া পড়েন এবং তাহার জন্য সুধী-সমাজে তিনি তখন গণ্যমান্য হইতে পারেন নাই। কিন্তু জীবনের অপরাহ্ন কালে আসিয়া মির্জা খাঁ আপনার ভ্রান্তি উপলব্ধি করিয়া এক খোদার চিন্তায় জীবন উৎসর্গ করেন। তিনি দেশ পর্য্যটন করিতে অত্যন্ত ভালবাসিতেন এবং হিরাট হইতে আগ্রা পর্য্যন্ত এমন স্থান নাই যেখানে তিনি ভ্রমণ করেন নাই। শেষ জীবনে তিনি হিন্দুস্থানেই বস-বাস করেন এবং হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের সমান শ্রদ্ধার পাত্র হইয়া থাকেন। মোগল ও রাজপুতের সেই নিশিদিন কলহের মধ্যে একদিকে যেমন রাজপুত রাজারা তাঁহাকে রাজ্যের পরম অভ্যাগত অতিথি ভাবিতেন, অপর দিকে তেমনি বাদশাহ আলমগীর স্বয়ং কবিকে প্রতি মাসে অর্থ সাহায্যের বিনিময়ে উপঢৌকন পাঠাইতেন। অনেক ভ্রান্ত লোক মির্জা খাঁর হিন্দু প্রীতি দেখিয়া আলমগীরের নিকট তাঁহার ধর্ম্ম-বিশ্বাস সম্বন্ধে নানা কথা বলিত। আলমগীর স্বয়ং মির্জা খাঁকে আপনার সভায় নিমন্ত্রণ করিয়া আনাইয়া তাঁহার সহিত ধর্ম্মালোচনায় পরম প্রীত হন।

মির্জা খাঁ একজন মস্তবড় পণ্ডিত ছিলেন। তিনি সংস্কৃত ভাষা বেশ ভাল রকম জানিতেন এবং তাঁহার কবিতার মধ্যে মাঝে মাঝে সংস্কৃত উক্তিও পরিলক্ষিত হয়।

আবদুর রহমানের কবিতার মধ্যে যেমন একটা প্রসাদ গুণ প্রথমেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে, ঠিক তাহারই অনুরূপ একটা ভাবের ও তত্ত্ব-জ্ঞানের জটিলতা মির্জা খাঁর কবিতায় পরিলক্ষিত হয়। মির্জা খাঁর কবিতার মধ্যে অনুভূতির প্রাধান্যের অপেক্ষা তত্ত্বালোচনার গভীরতাই বেশী। তাই আবদুর রহমান যেরূপ ভাবে জাতির সর্ব্বসাধারণের চিত্তে অধিবাস করেন মির্জা খাঁ সেরূপ অধিকার করিয়া লইতে পারেন নাই।

মির্জা খাঁর শেষ জীবন সম্বন্ধে কিছুই জানা যায় না। তবে মনে হয় তিনি হিন্দুস্থানেই এন্তেকাল করেন।

### চয়ন

( ১ )

কেমন করিয়া জানাইব যে আমি কে ?

তাঁরই মধ্যে আমি চির বিদ্যমান অথচ আমি চির সত্ত্বাহীন ! কেমন করিয়া জানাইব যে আমি কে ?

কখনও আমি সূর্য্য-রশ্মির অন্তর্নিহিত একটী সামান্য অগ্নিস্ফুলিঙ্গ, কখনও আমি অসীম সাগরের অতল বুকে মাত্র একটী জলকণা ! কেমন করিয়া জানাইব যে আমি কে ?

এক হইতে আমিই বহু হইয়াছি ; সান্ত হইতে অনন্ত হইয়াছি।

জীবনের গূঢ় আদিপ্রাণ-ধারা হইতে আমার জীবনের প্রদীপখানি জ্বালাইয়া লইয়াছি—

জগতের সকল আলোয় আমি আছি।

সকল দৃষ্টিতে আমার দৃষ্টি লুকাইয়া আছে, সকল ভাষায় আমার কথা আছে—

পুণ্যাত্মার মনের মধুচক্রে আমি মধু হইয়া আছি,

অনুতাপীর চিত্তে আমি বিদ্ধ-কুশাঙ্কুর হইয়া আছি,

তবুও কেমন করিয়া জানাইব যে আমি কে?

( ২ )

প্রিয়তমার কুঞ্চিত কেশদাম তাহার আননকে ঘিরিয়া আছে—ছায়ার মত—

তাহার প্রত্যেকটী কালো চুল মরণের রজ্জু, আহত হৃদয়ের মৃত্যুবাণ!

তাহার সারা দেহখানি যেন চন্দন-তরু; চুলগুলি সাপের মত শাখায় শাখায় বেড়িয়া আছে;

নয়নে তাহার বহ্নি-শিখা! আজ দেখি আবার বহুদিন পরে প্রিয়তমার দেহে রূপের সহস্র প্রদীপ জ্বলিয়া উঠিয়াছে।

হায়রে আহত হৃদয়, অমনি পতঙ্গের মত দীপ্ত শিখার দিকে ছুটিয়া চলিয়াছ!

( ৩ )

দেহের গতি-শক্তি হইতেছে হৃদয়; হৃদয়ের গতি-শক্তি, আত্মা।

তবে হৃদয়হীন হইয়া এই পৃথিবীতে আর কতদিন থাকিব?

মির্জা, জীবনের শেষ নিশ্বাসটীও ফুরাইয়া আসিতেছে, আর অসহায় চাঞ্চল্যে কি ফল!

তবুও মির্জা বলে এই মরণ সেও ভাল, প্রিয়া-হীন লক্ষ জীবনের চেয়ে।

## আবদুল হামিদ

সম্ভবত সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে মাশুখেল নামক গ্রামে আবদুল হামিদ জন্মগ্রহণ করেন। পেশোয়ারে তাঁহার ছাত্র-জীবন অতিবাহিত হয় এবং যৌবনে ধর্ম্ম-জীবন যাপন করিবার মানসেই তিনি শিক্ষাদীক্ষা প্রাপ্ত হন। যৌবনে তাঁহার শিক্ষা-দীক্ষার এতদূর খ্যাতি হয় যে সমগ্র আফগানিস্থান হইতে পেশোয়ারে তাঁহার নিকট শিক্ষা লাভের আশায় নিত্য লোক আসিত।

আফগান কবিদের মধ্যে তিনিই ছিলেন বৈরাগী কবি—ইংরাজীতে যাহাকে cynical poet বলা হয়। অনেকে তাঁহাকে পশ্‌তু ভাষার শেখ সাদী বলিয়া অভিহিত করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার সমস্ত কবিতার মধ্যে একটা বৈরাগ্যের সুর ধ্বনিয়া উঠে। জগতের সমস্ত পার্থিবতার বিরুদ্ধে তাঁহার বাণী বিদ্রোহ ঘোষণা করে। মানুষের জীবনের লোভ, যশ, আশা, আকাঙ্খাকে ক্ষণিকের মোহ বলিয়া তিনি ঘৃণা করিতেন। নিত্য সত্তার জন্য, আত্মার শাশ্বত কল্যাণের জন্য এক উদাত্ত বাণী তাঁহার সকল কবিতায় মধ্যে প্রতিধ্বনিত হইতেছে। যে গৃহে হামিদ বাস করিতেন, সে গৃহ ভগ্নাবস্থায় আজও পড়িয়া আছে। পথিকেরা পথে যাইতে যাইতে সেই ভগ্নাবশেষকে দেখিয়া আজও শ্রদ্ধায় মাথা নোয়াইয়া চলিয়া যায়।

### চরণ

( ১ )

হে বন্ধু, এ পৃথিবী তোমারও নয়, আমারও নয়।

এ যেন এক রূপসী বারবনিতা—আজ তোমাকে রূপ দিয়া ভুলাইতেছে, কাল আমাকে ভুলাইবে। ভুলানই ইহার স্বভাব।

তাই তার এত অঙ্গরাগ। তাই তার ওড়নায় প্রজাপতির পাখার রঙ!

( ২ )

কেমন করিয়া এই বন-পথ দিয়া চলি—তুমি যে পাশে নাই!

কি করিব এই গোলাব আর যুঁথী লইয়া—তুমি যদি পাশে না থাকো!

তুমি যে আমার নয়নের আলো—তুমি যদি নাই এলে—তবে বৃথাই বনফুল ফুটিল—বৃথাই অরণ্য সুন্দর হইয়া উঠিল!

মুসাফিরের মত তোমার দ্বারে আমি দাঁড়াইয়া আছি। আমার সেই সুখ!

তুমি যদি না আস—কি হবে আমার গৃহে, কি হবে আমার দেশে, কি হবে আর স্বর্গে!

( ৩ )

সুন্দরের লাগিয়া আমি ডুবিয়া গেলাম।

পারস্ত-সাগরে যেমন করিয়া প্রস্তর-খণ্ড ডুবিয়া যায়।

যাহারা জানে না, আমার রক্তিম মুখের দিকে চাহিয়া তাহারা বলে, ঐ মুখে অস্ত-রবির রক্ত-আলো লাগিয়াছে !

আমি তো জানি যে বুকের রক্তে আমি সন্ধ্যার আকাশকে পর্য্যন্ত রক্তরঙে ডুবাইয়া দিয়াছি।

অন্তরে যার বিরহের বাণ বিঁধিয়াছে ,—

সেই শুধু পারে কবরের গাঢ় অন্ধকারে প্রেমের দীপ্ত শিখাকে হাতে লইয়া যাইতে।

( ২ )

কালো চোখে সে যখন সুর্ম্মা লাগায়,

তখন এক বিপদ হইতে অন্য বিপদ জন্মায়। × × ×

কালো চোখ, কালো চুল আর কালো ভ্রূ, এরা দৈত্য, নর-ঘাতক ! × × ×

হে খোদা, সুন্দরের এই নিত্য অত্যাচার থেকে তোমার হামিদকে বাঁচাও !

( ৩ )

এই পৃথিবীর কোনও লোকের মোহে মুগ্ধ হইও না।

তুমি তো জান না, কত হীন, কত নীচ, কত ক্রূর মাটীর মানুষের দল !

মৃত-দেহ লইয়া যেমন পথের কুকুরেরা কাড়াকাড়ি আর চেঁচামেচি করে,

তেমনি এরা নিত্য আপনাদের লোভ আর মোহকে ঘিরিয়া চীৎকার করিতেছে—চীৎকার করিয়া মৃত্যুকে ডাকিয়া আনিতেছে।

( ক্রমশঃ )

---

# আল-কিন্দী

[ কাজী নওয়াজ খোদা ]

মোসলমান দার্শনিক পণ্ডিতগণের মধ্যে আলকিন্দীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। যদিও তাঁহার পরবর্ত্তী কালে দর্শন-ক্ষেত্রে এব্‌নেসীনা, ফারাবী প্রভৃতি মহা-রথীগণের সমাগম হইয়াছিল, কিন্তু প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য পণ্ডিত-গণ একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন যে, আরবী ভাষায় দর্শন-আলোচনার তিনিই সর্ব্বপ্রথম পথ-প্রদর্শক, পরবর্ত্তী খ্যাতনামা মোসলমান দার্শনিকগণ তাঁহারই প্রদর্শিত পথে চলিয়াছেন এবং তাঁহারই পরিস্থাপিত ভিত্তির উপর সৌধ-নির্ম্মাণ করিয়াছেন। সুতরাং এ পথের প্রদর্শক ও এই সৌধ-ভিত্তির পরিস্থাপক হিসাবে যশঃমাল্য লাভ করিবার তিনিই প্রকৃত অধিকারী। এই জন্যই মোসলমান ঐতি-হাসিকগণ এবং প্রাচ্য-বিদ্যা-বিশারদ পাশ্চাত্য মনীষীবর্গ তাঁহাকে মোসলমান জাতির "প্রথম দার্শনিক পণ্ডিত" নামে অভিহিত করিয়াছেন। তাঁহার পূর্ব্বে আর কোন মোসলমান এই শাস্ত্রের উল্লেখযোগ্য আলোচনা করিয়াছেন বলিয়া জানা যায় নাই।

আল-কিন্দী কেবল দর্শন শাস্ত্রের আলোচনাতেই জীবন অতিবাহিত করেন নাই, অন্যান্য শাস্ত্রেও বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার বিভিন্ন শাস্ত্রের আলোচনা-গবেষণা ও ঐ সকল শাস্ত্রে গ্রন্থ রচনার ঐতিহাসিক প্রমাণ আজিও বর্ত্তমান রহিয়াছে। দুঃখের বিষয় এখন আর সোজাসুজিভাবে তাঁহার রচিত গ্রন্থ সমূহের মধ্যবর্ত্তীতায় তাঁহাকে চিনিবার উপায় নাই, ইতিহাসের সাহায্যে ও পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের বর্ণনা হইতেই আমরা তাঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্য, অমানুষিক প্রতিভা ও বিভিন্ন শাস্ত্রে তাঁহার রচিত অপূর্ব্ব গ্রন্থ সমূহের পরিচয় পাইয়া থাকি। সাধারণতঃ তিনি দার্শনিক পণ্ডিত নামেই বিখ্যাত, কিন্তু তাঁহার বিভিন্ন শাস্ত্রে রচিত গ্রন্থাবলির তালিকা দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। যে কোন শাস্ত্রে রচিত তাঁহার যে কোন গ্রন্থের সহিত যিনি পরিচিত হইয়াছেন, তিনি তাঁহাকে সেই শাস্ত্রের একজন বিশেষজ্ঞ পণ্ডিত বলিয়া অভিমত প্রকাশ না করিয়া থাকিতে পারেন নাই। ইহা হইতেই আল-কিন্দীর

অসাধারণত্ব ও বিশেষত্বের সম্যক পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহার সারাজীবন বিদ্যালোচনা, দার্শনিক গবেষণা ও গ্রন্থরচনায় অতিবাহিত হইয়াছে। তাঁহার নাম ইয়াকুব এবনে এসহাক কিন্দী।

জন্মের সন

আরবদের লিখিত ঐতিহাসিকগ্রন্থসমূহ অনুসন্ধান করিয়া আল-কিন্দীর জন্ম ও মৃত্যুর সন-তারিখ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। কেহ কেহ বলিয়াছেন, তিনি হিজরী তৃতীয় শতাব্দীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ এসম্বন্ধে বিশেষভাবে আলোচনা করিয়াছেন। ডি, বুয়ার কেবল মৃত্যুর সন বর্ণনা করিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছেন। জর্মাণ পণ্ডিত 'ফ্লুগল' লিখিয়াছেন—আলকিন্দী খৃষ্টীয় ৯ম শতাব্দীর প্রথম ভাগে জীবিত ছিলেন, ৮৬১ খৃষ্টাব্দের পর তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। ইটালীয় প্রাচ্য-বিদ্যা-বিশারদ দার্শনিকপণ্ডিত অধ্যাপক 'নজী' * লিখিয়াছেন—৮৭৩ খৃষ্টাব্দে ( হিঃ ২৫৮ ) আলকিন্দী পরলোক গমন করিয়াছেন, ১৯৮ হিজরী সনে তিনি জীবিত ছিলেন। ইহা হইতে সাব্যস্ত হইয়াছে যে, মৃত্যুর সময় তাঁহার বয়স অন্তত ৬০ বৎসর হইয়াছিল। বাগ্দাদ নগরী তাঁহার প্রিয় জন্মভূমি।

সুবিখ্যাত পণ্ডিত জামালুদ্দীন আলকত্‌ফী ( جمال الدين القطفى ), আবুল কাসেম সায়েদ এবনে আহমদ আলওন্দলসী এবং এবনে আরবী তাঁহার সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—

لم يكن في الاسلام من اشتهر عند الناس بمعاناة علوم الفلسفة حتى سموه فيلسوفا غير يعقوب (১)

অর্থাৎ মোসলমানদের মধ্যে ইয়াকুবের ( আলকিন্দী ) ন্যায় দর্শনশাস্ত্রে মহাপ্রাজ্ঞ ও মহাপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত আর কেহ জন্মগ্রহণ করেন নাই। দার্শনিকজ্ঞান সম্বন্ধে আলকিন্দীর যশখ্যাতি এত ব্যাপক হইয়া পড়ে যে, শেষে নাম না ধরিয়া কেবল "দার্শনিক" বলিলেই ইয়াকুব ব্যতীত আর কাহাকেও বুঝাইত না। চতুর্থ হিজরীর সর্বজনমান্য আলেম, মোসলেম নরপতি হেশাম আলমোয়াইয়দবিল্লার দরবারের রাজ-চিকিৎসক স্পেনের অধিবাসী সোলায়মান বিন্ হাস্‌সান ( ইনি সাধারণত এবনে জুল্‌জুল্ নামে বিখ্যাত ) লিখিয়াছেন—

لم يكن في الاسلام فيلسوف غيره احتذى في تواليفه حذو ارسطوطاليس (২)

অর্থাৎ আলকিন্দীর ন্যায় এরিষ্টটলের পদাঙ্ক অনুসরণকারী দার্শনিক পণ্ডিত আর কেহ ছিলেন না। প্রসিদ্ধ দার্শনিক আলফারাবী ২৫৯ হিজরী সনে জন্মগ্রহণ করেন এবং ৩৩৯ হিজরী সনে পরলোক গমন করেন (৩), পক্ষান্তরে আলমোয়াইয়দ বিল্লাহ ৩৬৬ হিজরী সনে রাজ্যলাভ করেন এবং ৩৯৯ হিঃ সনে সিংহাসন-চ্যুত হয়েন। তবকাতুল আতিব্বা নামক গ্রন্থে এবনে জুল্‌জুল্-রচিত একখানি কেতাবের রচনার সন ৩৭২ হিঃ লিখিত হইয়াছে (৪), সুতরাং গ্রন্থকার ৩৭২ হিঃ সন পর্য্যন্ত নিশ্চয়ই জীবিত ছিলেন। এরূপ অবস্থায় বেশ বুঝা যাইতেছে যে, মহামনীষী ফারাবীর জন্মগ্রহণ ও পরলোক গমনের পরও এবনে জুল্‌জুল্ আলকিন্দী সম্বন্ধে উপরের বর্ণিত অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। (৫) প্রসিদ্ধ জ্যোতির্ব্বিদ আবুমা'শার জা'ফর বিন্ মোহাম্মদ আল্ বলখী জীবনের প্রথম ভাগে মনে মনে আলকিন্দীর হিংসা পোষণ করিতেন, তাঁহার সম্বন্ধে নানা প্রকার কুৎসা প্রচার করিয়া বেড়াইতেন। অবশেষে প্রৌঢ়াবস্থায় ৪৮ বৎসর বয়সে তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিতে লালায়িত হইয়া পড়েন। ফলে বহুদিন ধরিয়া আলকিন্দীর নিকট

---

* অধ্যাপক 'নজী' খ্রীষ্টীয় উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে পরলোক গমন করিয়াছেন, আরবী দর্শন শাস্ত্র লইয়া তিনি বিশেষভাবে আলোচনা করিয়া গিয়াছেন। আলকিন্দী রচিত কয়েকখানি দার্শনিক গ্রন্থের ল্যাটীন ভাষায় অনুবাদ প্রকাশ করিয়াছেন। ( লেখক )

(১) আখবারুল হোকামা ( জালালুদ্দীন কফ্‌তী ) ২৪১ পৃঃ; মিসরে মুদ্রিত তবকাতুল ওমম ৮১পৃঃ, তারিখ মো তসরুল ওল ২৫৯ পৃঃ।

(২) عيون الانباء لابن ابى اصيبعة ২০১ পৃঃ

(৩) ঐতিহাসিক গ্রন্থ সমূহে 'ফারাবীর' জন্মের সন খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, তৎসমূহে কেবল তাঁহার মৃত্যুর সন বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু এবনে খল্লেকান ফারাবীর মৃত্যুকালীন বয়স ৮০ বৎসর লিখিয়াছেন, ইহা হইতেই তাঁহার জন্মের সন ২৫৯ হিজরী জানিতে পারা যায়। মিসরে মুদ্রিত এবনে খল্লেকান ২য় খণ্ড ৭৭ পৃঃ।

(৪) মিসরে মুদ্রিত তবকাতুল আতিব্বা ২য় খণ্ড ৪৮ পৃঃ

(৫) মিসরে মুদ্রিত এবনে খল্লেকান ২য় খণ্ড ৪৮ পৃঃ ( লেখক )

জ্যোতিষশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। আবু ম'শার স্বরচিত المذكرات নামক গ্রন্থে জ্যোতিষের নিয়মের ও হিসাব নিকাশের বাহিরে মধ্যে মধ্যে যে সকল দৈব ঘটনা সংঘটিত হইয়া থাকে, তৎসমূহের বর্ণনা উপলক্ষে লিখিয়াছেন—মোসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে নানা শাস্ত্রেপারদর্শিতার হিসাবে নিম্নলিখিত চারি জনকে শ্রেষ্ঠ আসন প্রদান করা যাইতে পারে—(১) হনীন বিন্ এসহাক (২) সাবেত বিন্ কোররাতিল হরানী (৩) ওমর বিন্ ফরখান তবরী এবং (৪) ইয়াকুব বিন্ এস্‌হাক আলকিন্দী। *

প্রাচ্য বিদ্যাবিশারদ সুবিখ্যাত ইটালিয়ান পণ্ডিত William Cardino (১) লিখিয়াছেন—আমার মতে পৃথিবীর রঙ্গমঞ্চে অভাবনীয় মনীষা ও অসাধারণ প্রতিভা সম্পন্ন দশজন মহাপুরুষের আবির্ভাব হইয়াছে; মহাত্মা আলকিন্দী তাঁহাদের অন্যতম। খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দী পর্য্যন্ত এরূপ পণ্ডিত আর কেহ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া আমার মনে হয় না।

মধ্যযুগের সুবিখ্যাত পাদরী পণ্ডিত 'রজার বেকন' লিখিয়াছেন—আলকিন্দী ও এবনুল্ হৃসীম অভিনবতত্ত্বের আবিষ্কার ও গ্রন্থ রচনার হিসাবে মহাপ্রাজ্ঞ 'বৎলিমুসের' সমকক্ষ বলিয়া পরিগণিত হইবার যোগ্য। ইটালীয় পণ্ডিত 'জিরার্ড অব ক্রিমানো' আলকিন্দী-রচিত কয়েকখানি গ্রন্থের অনুবাদ প্রকাশ করিয়াছেন।

মোসলমান পণ্ডিতগণের প্রতিভা, জ্ঞানগরিমা ও গ্রন্থাবলী সম্বন্ধে পাশ্চাত্য মনীষীগণ বিশেষভাবে আন্দোলন-আলোচনা করিয়াছেন; কিন্তু সুযোগ ও সুবিধামত তাঁহাদের অযথা নিন্দা প্রচারের লোভও তাঁহারা সম্বরণ করিতে পারেন নাই—বিশেষ সাবধানতার সহিত উদারতা ও সত্যবাদিতার 'মুখোস' ব্যবহার করিলেও সকল সময় তাঁহাদের প্রকৃত স্বরূপ গোপন করিতে সক্ষম হন নাই।

'ইনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটেনিকা'র Arabic Philosophy'র বর্ণনা উপলক্ষে লিখিত হইয়াছে—আলকিন্দী এসলাম ধর্ম্মের বিরুদ্ধে সর্ব্বপ্রথম বিদ্রোহের ধ্বজা উত্তোলন করিয়াছিলেন। তিনি দার্শনিক যুক্তি তর্কের অবতারণা করিয়া এসলামিক মতবাদের প্রতিকূল আলোচনা করিয়াছেন। আলকিন্দী রচিত গ্রন্থসমূহের সম্যক আলোচনা, ঐতিহাসিক বর্ণনা ও তাঁহার স্বপক্ষ ও বিপক্ষ দলের মতামত বিশেষভাবে পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে তাঁহার প্রতি আরোপিত এই সকল অভিযোগ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন ও বিদ্বেষপ্রসূত বলিয়া নিঃসন্দেহরূপে বুঝিতে পারা যায়। তিনি এসলাম ধর্ম্মের মূল নীতি ও আকায়েদ সম্বন্ধে আদৌ কোন বিরুদ্ধমত প্রকাশ করেন নাই। তবে বাহিরের খুঁটিনাটি সংক্রান্ত কোন বিষয়ে ব্যক্তি বিশেষ বা সম্প্রদায় বিশেষের মতবাদের বিরুদ্ধে কোন কথা বলিয়া থাকিলে তাহা এসলাম ধর্ম্মের বিরুদ্ধাচরণ নামে পরিকীর্ত্তিত হইতে পারে না। এরূপ মতানৈক্য মোসলমান সুধী সমাজে সকল সময়ে সকল যুগেই বিদ্যমান ছিল, ভবিষ্যতেও চিরকাল থাকিবে। মানুষের বিদ্যা, বুদ্ধি, প্রতিভা ও বিচারশক্তির তারতম্যের হিসাবে এরূপ হওয়াই স্বাভাবিক। সুতরাং আলকিন্দীকে ইসলাম-বিরোধী বলিয়া তাঁহারা ঘোর অবিচার করিয়াছেন। তাঁহাদের মোসলমান ধর্ম্ম সম্বন্ধে জ্ঞানের অল্পতা অথবা বিদ্বেষ-বিষ-দুষ্ট ধারণাই ইহার প্রকৃত কারণ বলিয়া মনে হয়।

এরিষ্টটলের মতানুসরণ করিয়া আল্লামা আলকিন্দী আল্লার জাত বা পরমসত্তা (Essence) হইতে বিচ্ছিন্ন হইতে পারে এমন কোন স্বপ্রতিষ্ঠ গুণের (صفت مطلقه) অস্তিত্ব স্বীকার করিতেন না, ইহাই তাঁহার অপরাধ। আমরা দেখিতেছি এসলাম ধর্ম্মে দৃঢ় বিশ্বাসী অন্যান্য আলেমগণও صفات الهيه (আল্লার গুণাবলী) সম্বন্ধে এইরূপ মতই পোষণ করিতেন। তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী যুগের এব্‌নে আতা, আমর এব্‌নে ওবেদ, আবুলহসীম এবং জাহেজ প্রমুখ বিখ্যাত আলেমগণের নাম দৃষ্টান্ত স্বরূপ উল্লেখ করা যাইতে পারে। সুতরাং এই মতবাদের ধূয়া ধরিয়া তাঁহার প্রতি এরূপ ভীষণ অভিযোগ আরোপ করা সম্পূর্ণ অন্যায়। তিনি এসলাম ধর্ম্মে পরম আস্থাবান ও চরম বিশ্বাসী ছিলেন।

তাঁহার রচিত গ্রন্থাবলীর পরিচয় তাঁহার গ্রন্থের সাহায্যে সোজা পথে যাইবার কোন উপায় নাই। সে সকল রত্নরাজি

* তবকাতুল আতিব্বা প্রথম খণ্ড ২০৭পৃঃ

(১) William Cardino ১৫২৭ খ্রীঃ পরলোক গমন করিয়াছেন। (লেখক)

গ্রন্থ রচনা

সম্পূর্ণরূপে লোক চক্ষুর অন্তরালে অন্তর্হিত হইয়াছে। বিভিন্ন ঐতিহাসিক আলোচনা ও তাঁহার রচিত গ্রন্থ সমূহের বিভিন্ন তালিকা হইতে যাহা কিছু জানিতে পারা গিয়াছে। তাহাই একমাত্র সম্বল। আলকিন্দীর ন্যায় আরও অসংখ্য মোসলমান আলেমগণের নাম ইতিহাসের পৃষ্ঠায় দেখিতে পাওয়া যায়, দুঃখের বিষয় তাঁহাদের রচিত অমূল্য গ্রন্থরাজিও আজ ধরার পৃষ্ঠা হইতে সম্পূর্ণরূপে লুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

সুবিখ্যাত ঐতিহাসিক এব্‌নে নদীম ( ابن نديم ) ও আলকফ্‌তী ভিন্ন ভিন্ন সতেরটী শাস্ত্রে তাঁহার বিশেষ অভিজ্ঞতা লাভ ও গ্রন্থ রচনার কথা বলিয়াছেন; কিন্তু বিশেষ ভাবে ঐতিহাসিক আলোচনায় ইহার অতিরিক্ত আরও অন্যান্য শাস্ত্রে তাঁহার গ্রন্থরচনার পরিচয় পাওয়া যায়।

ভূতত্ত্ব ও খনিজ পদার্থ-বিদ্যায় তিনি নিম্নলিখিত দুইখানি গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন—

رسالة فى تلويم الزجاج (১)

কাচ গলান ও রং করা সম্বন্ধে পুস্তক।

رسالة فى انواع الحديد و السيوف و جيدها و مواضع انتسابها (২)

লৌহ ও তরবারীর প্রকার ভেদ এবং শ্রেষ্ঠ জাতীয় লৌহ ও তরবারীর বিবরণ।

রসায়ন শাস্ত্রেও তাঁহার রচিত অনেকগুলি গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া যায়। তন্মধ্যে এই কয়খানি বিশেষ উল্লেখযোগ্য—

১। رسالة فى العطر وانواعه
প্রত্যেক বস্তুর নির্য্যাসের প্রকার ভেদ—

২। رسالة فى كيمياء العطر
নির্য্যাসের রাসায়নিক বিবরণ

৩। رسالة فى التنبيه على خدع الكيمائيين
রাসায়নিকদের প্রবঞ্চনা সম্বন্ধে সতর্কীকরণ

৪। رسالة فى الطبعية
প্রকৃতি বিজ্ঞান সম্বন্ধে

৫। رسالة فى الاجرام الغائصة فى الماء
জলস্থ জীবাণু তত্ত্ব

৬। رسالة فى الاجرام الهابطة
বন-বিহারী জীবাণু তত্ত্ব

৭। رسالة فى عمل المرايا المحرقة
দাহ্য গুণবিশিষ্ট দৃশ্যমান পদার্থ সমূহের ক্রিয়া সম্বন্ধে।

আখবারুল হোকামা নামক গ্রন্থে আল্‌কফ্‌তী সতেরটী বিভিন্ন শাস্ত্রে তাঁহার রচিত গ্রন্থ সমূহের একটী বিস্তৃত তালিকা প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি ইহাও লিখিয়াছেন যে—

وله كتاب سماه تسهيل سبيل الفضائل فى اداب النفس

এই কেতাবের নাম হইতেই বুঝিতে পারা যাইতেছে যে তিনি ব্যবহারিক জীবনে আত্মশুদ্ধি সম্বন্ধেও গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন (১)। আলকফ্‌তী আবার লিখিয়াছেন—

وله كتاب فى معرفة لاقاليم المعمورة وغيرها (২)

বলা বাহুল্য এই কেতাবটী ভূগোল শাস্ত্রে লিখিত। দুঃখের বিষয় আলকিন্দী রচিত এই সকল অমূল্য গ্রন্থরাজির আর কোন সন্ধানই পাওয়া যায় না। সুদূর ইউরোপের কোন কোন লাইব্রেরীতে আজিও ২।১ খানি বর্ত্তমান রহিয়াছে বলিয়া শুনা গিয়াছে। পাশ্চাত্য বিভিন্ন ভাষায় তাঁহার বহু গ্রন্থের অনুবাদ প্রকাশিত ও সুধী সমাজে সাদরে গৃহীত হইয়াছে। মিঃ ব্রকমিন তাঁহার প্রকাশিত তালিকায় লিখিয়াছেন— (৩) আলকিন্দী রচিত হস্তলিখিত কোন কোন গ্রন্থ আজিও ইউরোপের বিভিন্ন লাইব্রেরীতে মওজুদ রহিয়াছে। তিনি আরও বলিয়াছেন—আলকিন্দীর তিন-খানি কেতাবের অনুবাদ ল্যাটীন ভাষায় প্রচারিত হইয়াছে। ইহা ব্যতীত আরও ২ খানির ল্যাটীন—অনুবাদের খবর তিনি পাইয়াছেন। ইহার মধ্যে একখানি তাঁহার রচিত

(১) মিসরে মুদ্রিত আখবারুল হোকামা ( اخبار العلماء ) ২৪১ পৃঃ।
(২) ঐ ঐ
(৩) ইউরোপে প্রকাশিত মিঃ ব্রকলমীন লিখিত আলকিন্দীর গ্রন্থাবলীর তালিকা পুস্তক। ( লেঃ.ক )

৫টী গ্রন্থের সমষ্টি, এটার অনুবাদ ইতালীর প্রাচ্য বিদ্যা বিশারদ পণ্ডিত 'নজী' কর্ত্তৃক ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে বার্লিন হইতে প্রকাশিত হইয়াছে।

আলকিন্দী সঙ্গীত শাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শী এবং সেকালে সুধীসমাজে একজন অসাধারণ সঙ্গীতজ্ঞ বলিয়া প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। সঙ্গীতের সাহায্যে তিনি জটিল রোগগ্রস্ত রোগীর চিকিৎসা বিধানের অভিনব পদ্ধতি আবিষ্কার করিয়াছিলেন। অসংখ্য রোগী জীবনে হতাশ হইয়া অবশেষে তাঁহার চিকিৎসাধীনে আরোগ্যলাভ করিত।

আল-কিন্দীর প্রতিবাসীদের মধ্যে একজন ধনবান বণিক ছিলেন, একমাত্র পুত্রের হস্তে তাঁহার বহুবিস্তৃত কারবার ও অগাধ ধনসম্পত্তির সম্পূর্ণ ব্যবস্থার ভার অর্পিত হইয়াছিল। একদিন হঠাৎ পুত্রটী পীড়িত ও সঙ্গে সঙ্গে সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়িল। ব্যবসা বাণিজ্যসংক্রান্ত দেনা পাওনার হিসাব নিকাশ জানিতে না পারিয়া বিশেষতঃ পুত্রের সঙ্কটাপন্ন অবস্থা দেখিয়া বণিকের দুর্ভাবনার সীমা রহিল না। বাগদাদ নগরীর সুবিখ্যাত চিকিৎসকগণ সকলে মিলিয়া চিকিৎসার ভার গ্রহণ করিলেন; কিন্তু কোন প্রকারেই রোগীর জ্ঞান সঞ্চার হইল না, অবশেষে সকলেই রোগীর জীবনাশা ছাড়িয়া দিলেন। পুত্রের ক্ষণিক জ্ঞান-সঞ্চারের বিনিময়ে পিতা চিকিৎসকগণকে বহু অর্থ দিতে স্বীকৃত হইয়াও কোন ফল পাইলেন না। অতঃপর হিতৈষী-গণের মধ্যে অনেকেই আল-কিন্দীর অভিনব চিকিৎসার কথা উত্থাপন করিয়া তাঁহার নিকট যাইতে বলিলেন, আল-কিন্দীর অগাধ পাণ্ডিত্য ও প্রসিদ্ধির কথা শুনিয়া অনেকদিন হইতে বণিক তাঁহার প্রতি বিদ্বেষের ভাব পোষণ করিতেন, হিংসা-জর্জ্জরিত হইয়া প্রকাশ্যভাবে তাঁহার অযথা কুৎসা রটনা করিয়া বেড়াইতেন। এরূপ অবস্থায় প্রথমত তিনি এই প্রস্তাবে রাজী হইতে পারিলেন না। কিন্তু অবশেষে দায়ে ঠেকিয়া তাঁহাকে আল-কিন্দীর শরণাপন্ন হইতে হইল। আল-কিন্দী বণিকের শোক-কাতর মুখ দেখিয়া ও তাঁহার বিপদের কথা শুনিয়া স্থির থাকিতে পারিলেন না 'উদ্'নামক বাদ্য-যন্ত্র বাদনে সিদ্ধহস্ত চারিজন শিষ্যকে সঙ্গে লইয়া তিনি বণিকের বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন। অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত রোগীর নাড়ী পরীক্ষা করিয়া, হৃৎপিণ্ডের উত্তেজনা সাধক সুর বিশেষ উক্তযন্ত্রে বাজাইবার জন্য শিষ্যগণকে আদেশ দিলেন এবং তাহার অভিনব প্রণালী সম্বন্ধে তাঁহাদিগকে উপদেশ প্রদান করিলেন। তিনি রোগীর নাড়ি ধরিয়া বসিয়া রহিলেন, ওদিকে সুনিপুণ হস্তে বাদ্যযন্ত্র অভিনব সুরে বাজিয়া উঠিল। শ্রোতৃবৃন্দের শিরায় শিরায় তাড়িত-শক্তি খেলিয়া গেল। কিছুক্ষণ পরে ধীরে ধীরে রোগীর লুপ্ত-নাড়ি ফিরিয়া আসিল, নিশ্বাস প্রশ্বাসের ক্রিয়া আরম্ভ হইল, তাহার তুষার-হিম দেহ উষ্ণ হইয়া উঠিল, অবশেষে মৃতকল্প রোগী চক্ষু খুলিয়া উঠিয়া বসিল। এই সময় বৈষয়িক ব্যাপারের আবশ্যকীয় প্রশ্নাদি রোগীকে জিজ্ঞাসা করিবার জন্য আল-কিন্দী বণিককে ইঙ্গিত করিলেন! পিতা এক এক করিয়া প্রশ্ন করিতে লাগিলেন, পুত্র তাহার যথাযথ উত্তর দিলেন, একজন লোক তাহা লিখিয়া লইলেন। এই ব্যাপার পরিসমাপ্তির পর বাদকদলের ভ্রান্তিবশতঃ হঠাৎ তালভঙ্গ হইল, বাদ্য-যন্ত্র বেসুরা বাজিয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে বণিকপুত্র অসাড়দেহে পূর্ব্ববৎ জ্ঞানশূন্য অবস্থায় ঢলিয়া পড়িল। আল-কিন্দী বলিলেন—হায়, মৃত্যু যাহার অনিবার্য্য, তাহাকে রক্ষা করিবার সাধ্য কাহারও নাই। দেখিতে দেখিতে মৃত্যুলক্ষণ প্রকাশ পাইল, রোগীর প্রাণশূন্য দেহ পড়িয়া রহিল। (১)

এই প্রকারে জীবজগতে সঙ্গীতের অভাবনীয় প্রভাবের আরও অনেক কথা শুনিতে পাওয়া যায়।

সেই সকল ঐতিহাসিক ঘটনার বিষয় অবগত হইলে সঙ্গীতের সাহায্যে আলকিন্দীর চিকিৎসার ব্যবস্থা ও তৎ-সংক্রান্ত অসাধারণ ঘটনা সমূহের বাস্তবতায় সন্দেহ করিবার আর কোন কারণ থাকে না।

এইবার আমরা বিভিন্ন ইতিহাস হইতে নমুনা স্বরূপ তাঁহার ২।১টী গদ্য ও পদ্য রচনা পাঠকগণকে উপহার প্রদান করিব—

তিনি প্রেমাস্পদের উদ্দেশে প্রেম-নিবেদন শীর্ষক কবিতায় গাহিয়াছেন—

و فـی اربع منی دخلت منک اربع
فما انا ادری ایها هاج لی کـــری
آرجهک فی عینی او الطعم فی فمی
او النطق فی سمعی ام الحب فی قلبی (২)

(১) আখবারুল হোকামা ২৪৬—২৪৭ পৃঃ।

(২) মিসরে মুদ্রিত তবকাতুল আতিব্বা ১ম খণ্ড ২০৯ পৃঃ। (লেখক)

অর্থাৎ হে প্রিয়তম, তোমার চারিটী জিনিষ আমার চারিটীতে প্রবেশ লাভ করিয়াছে; কিন্তু আমি ঠিক বুঝিতে পারিতেছি না তন্মধ্যে কোনটী আমার অধিক যন্ত্রণার কারণ হইয়াছে। তোমার সুন্দর মুখ-মণ্ডল আমার দর্শনেন্দ্রিয়ের পীড়া, তোমার চুম্বনের স্বাদ আমার মুখের ক্লেশ, তোমার সুমিষ্ট স্বর আমার কর্ণকুহরের যন্ত্রণা, অথবা তোমার ভালবাসা আমার হৃদয়ের বেদনা বৃদ্ধি করিয়াছে?

কতকগুলি কবিতায় তিনি সাংসারিক বিপদাপদ ও দুঃখ কষ্টের জন্য কালচক্রের দোষকীর্ত্তন করিয়াছেন, পক্ষান্তরে তাহার পেষণ-যন্ত্র হইতে আত্মরক্ষার জন্য উপদেশ দিয়াছেন—(১)

انانف الذنابي على الرؤوس
فغمض جفونك او نكس

তুমি চক্ষু বন্ধ করিয়াই থাক অথবা মস্তক অবনত করিয়াই লও বেশ বুঝিতে পারিবে, একালে নীচজনে মাথায় চড়িয়া বসিয়াছে।

وزائل سوددک وا قبض يدیک
وفی قعر بیتک فاستجلس

—এরূপ অবস্থায় তুমি আত্মগরিমা ধ্বংস করিয়া ফেল, সকল কাজ কর্ম্ম হইতে হাত গুটাইয়া লও এবং তোমার ঘরের মধ্যে নির্জ্জন সাধনায় আত্মনিয়োগ কর।

وعند مليكك فاطلب العلو
وبالوحدة اليوم استأنس

—তুমি একমাত্র প্রভুর দরবারে সম্মান প্রার্থনা কর আর নির্জ্জন বাসে অভ্যস্ত হও।

এই সকল কবিতা ও এই শ্রেণীর অন্যান্য কবিতা পড়িয়া মনে হয় তাঁহার জীবনকাল বেশ সুখশান্তির সহিত অতিবাহিত হয় নাই, সময় সময় দুঃখ কষ্টের ঝঞ্ঝাবায়ু মাথার উপর দিয়া বহিয়া গিয়াছে, বিপদাপদের ঘনঘটা জীবনাকাশকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে; তাই তাঁহার দুঃখ ভারাবনত হৃদয়ের ভাব এই সকল কবিতায় ফুটিয়া উঠিয়াছে। কেবল আল-কিন্দী বলিয়া নয়, জগতের অধিকাংশ মহামনীষীগণ জীবনে সুখ-সৌভাগ্য লাভ করিতে পারেন নাই, কষ্টেই তাঁহাদের মহৎ জীবনের অবসান হইয়াছে। একজন কবি গাহিয়াছেন—

ازمن بگیر عبرت وکسب هنر مکن
با بخت خود عداوت هفت آسمان مخواه

—আমার অবস্থা দেখিয়া তোমরা সকলে সাবধান হও, কদাচ যোগ্যতার্জ্জনের পথে অগ্রসর হইওনা, সে পথে পদার্পণ করিলে সমগ্র জগৎ এমনকি সপ্ত-আকাশ পর্য্যন্ত তোমার সুখ সৌভাগ্যের শত্রু হইয়া পড়িবে।

আলকিন্দী গদ্য রচনায় চিকিৎসক মণ্ডলীকে উদ্দেশ করিয়া লিখিয়াছেন—

ليتق الله تعالى المتطبب ولا يخاطر فانه ليس
عن الانفس عوض

—হে চিকিৎসার ভাণকারীগণ, আল্লাহ্‌কে ভয় করিও, এরূপ ভাবিওনা যে লোকের প্রাণের পরিবর্ত্তে কোন সাজা পাইতে হইবে না।

كمايجب ان يقال انه كان سبب عافية العليل
كذلك فليعذر ان يقال انه كان سبب تلفه وموته -

—যেমন অবশ্যই ইহা বলা হইয়া থাকে যে চিকিৎসকগণ রোগীর আরোগ্যলাভের কারণ, সেইরূপ ইহাও বলিতে হইবে যে তাঁহারাই আবার জীবন-নাশের হেতু হইয়া থাকেন।

মৃত্যু

আলকিন্দী হিজরী ২৫৮ সনে (৮৭৩খৃঃ) ৭০ বৎসর বয়সে এই নশ্বর জগৎ পরিত্যাগ করিয়া অমরধামে চলিয়া গিয়াছেন।

# শুধু নিমেষের ভুল

[ জাহিদুল হোসাইন ]

রসুলাবাদের পল্লী-রাজনীতিতে যে কথাটা খুব বেশী করিয়া এই কয়দিন বিশেষ ভাবে আলোচিত হইবে তাহা খুব সকালেই সমস্ত গ্রামে রাষ্ট্র হইয়া গেল। ঘটনাটা ঘটিতে এক মিনিটও লাগে নাই কিন্তু তাহার জের যে বেশ রুচিকর হইবে, তাহা স্পষ্টই বোঝা যাইতেছিল কারণ অধুনা গ্রাম্য দলাদলিটা বেশ উগ্র হইয়াই উঠিতেছিল। কথাটা এই, গত কল্য সন্ধ্যার পরে কবির কোন্ অজ্ঞাত কারণের দরুণ তাহার স্ত্রীকে দাবী-দাওয়া হইতে মুক্তি দিয়াছে।

ঘটনাটা এমন কিছু নয়। কিন্তু মানুষের জীবনে এমন এক একটী মুহূর্ত্ত আসে যে তাহাকে ফিরাইবার মানুষের কোনও শক্তি থাকে না! সেই একটী নিমেষের ভুলের জন্য তাহার সমস্ত জীবনটাকে পণ করিতে হয়। কবির হাট হইতে ফিরিয়া স্ত্রীকে তামাক সাজিবার জন্য হুকুম দিয়াছিল কিন্তু স্ত্রী তখন কড়াইটা উনানে চাপাইয়া তৈল প্রদান করিয়াছিল বলিয়া তামাক সাজিতে একটু দেরী হইবে বলায়, কবির তাহাকে সমস্ত কর্ম্ম হইতে নিষ্কৃতি দিয়া বসিল।

সারাদিনের খাটুনী ও মনের অশান্তিতে কবিরের চিত্ত নিত্য আলোড়িত হইয়া থাকিত। প্রতিদিন সে দেখিতে পাইত সে এক অজানা গহ্বরের দিকে আগাইয়া চলিয়াছে—অথচ তাহাকে ধরিয়া রাখিবার কেহ নাই। সে গহ্বর—দারিদ্র্য। ধীরে ধীরে তাহার মনের সকল কোমলতা যে সে কখন দারিদ্র্যের নিকট আত্মসমর্পণ করিয়াছিল—তাহা নিজেই জানিত না। তাই সেই সামান্য ব্যাপারে এত বড় একটা কাণ্ড করিয়া ফেলিতে তাহার তখন কোথাও বাধিল না। এক মুহূর্ত্তে স্ত্রী জোবেদার মুখটা একেবারে কালী হইয়া গেল, তৈল পুড়িয়া ছাই হইল এবং উনানের আগুণটা নিবিয়া গেল কিন্তু জোবেদা তেমনি বসিয়া রহিল—বজ্রাহতার মত।

জোবেদার পিতার বাড়ী তিনখানা বাড়ী তফাত—তাহার ভাই আসিয়া তাহাকে সেই রাত্রেই লইয়া গেল। লোক সমাগমও হইয়াছিল—অনেক রাত্রে একে একে সবাই চলিয়া গেলে, কবির বিনা-আহারে শয্যাগ্রহণ করিল।

দিনের আলোয় মনের উত্তেজনার বশে সে যাহা করিয়া ফেলিয়াছিল—রাত্রির মমতাময় অন্ধকারে তাহার গুরুত্ব স্পষ্ট হইয়া উঠিল। সে সহসা কি করিয়া ফেলিয়াছে ভাবিয়া শিহরিয়া উঠিল। শয্যাগ্রহণ করিলেই যদি নিদ্রা আসিত, তাহা হইলে নিদ্রাটা এত মধুর ও রুচিকর বলিয়া বিবেচিত হইত না। কবিরের নিদ্রা আসিল না—যাহা আসিল, তাহা ক্লেদদায়ক দুশ্চিন্তা।

আজ পাঁচ বৎসর হইল সে বিবাহ করিয়াছে—এই বিবাহের পর হইতে তাহার সর্ব্বনাশের একশেষ হইয়া গিয়াছে। সমস্ত দুঃখ ক্লেশকে বে-দখল করিয়া সে এক ভাবে জীবন অতিবাহিত করিয়া আসিতেছিল, কিন্তু আজ একি সর্ব্বনাশ সে করিয়া বসিল। বেদনার আঘাতে মানুষ এমন করিয়াই কি পাগল হয়!

রূপের সঙ্গে গুণের সমন্বয় নারীজাতির মধ্যে অতি বিরল—পল্লী-সমাজের মধ্যে এই রকম একটা ধারণা আছে। কিন্তু জোবেদার যেমনি রূপ, তেমনি গুণ। এমন রূপ বোধ হয় নবাব মহলেও বিরল এবং এমন গুণ শিক্ষিতাদের মধ্যেও খুব বেশী নাই।

কবির রূপে মুগ্ধ হইয়াই জোবেদাকে বিবাহ করিয়াছিল। এই বিবাহ করিতে তাহাকে কত বেগই না পাইতে হইয়াছিল। কবিরের তখন যৌবনের প্রথম আবেগ; মোটা মোটা কাঠের মত শক্ত বাহু! এক হাতের চেয়েও প্রশস্ত বুকের পাটা,—অর্থাৎ এই বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, ঘটনাক্রমে এক দারোগা তাহাকে দেখিতে

পাইয়া পুলিসের চাকুরী দিতে চাহিয়াছিল কিন্তু সে তাহা গ্রহণ করে নাই। সেই উন্মুখ যৌবনের দিনে কবির জোবেদার রূপে মুগ্ধ হইয়াছিল; মুগ্ধ হইয়া প্রতি বিকালে মাথাটা তেলে চুব চুবে' করিয়া কাঁধে রঙ্গীন গামছটা ফেলিয়া বাঁশের বাঁশীটা ফুকিতে ফুকিতে জোবেদাদের পুকুরের পাড়ের উপর দিয়া যে রাস্তাটা পড়িয়াছে, সেই রাস্তা দিয়া নিজেকে একটা দর্শনীয় বস্তু ভাবিয়া এবং কোনো একটি বিশিষ্ট-জীবকে দর্শনের আশায় আড় নয়নে চাহিয়া চলিয়া যাইত এবং মাঝে মাঝে সেই জীবটিকে দেখিয়া তাহার মনেও আশ্বাস জন্মিয়াছিল যে, সেও তাহারই মত মুগ্ধ হইয়া গিয়াছে!

এই আশ্বাসের বলে কবির বিবাহের প্রস্তাব করিল এবং বিবাহও হইয়া গেল। হইয়া গেল বটে কিন্তু তাহাকে গুনিয়া দুইশ' টাকা পণ দিতে হইল এবং তাহার যখন দুনিয়ায় মাতা পিতা, ভাই বোন, খেশ-বেরাদর্ বিশেষ কেহই নাই, তখন পাড়া প্রতিবেশীদের হাত ভিজাইতে হইল।—ইহাতে ও বাজে খরচে আড়াই শতের মত টানিল।—এই সাড়ে চারি শ' টাকার জন্ম তাহার বিশেষ কিছু হাঙ্গামা হয় নাই।—অছিমদ্দিন সরকারকে সঙ্গে লইয়া গিয়া গয়াচরণ সাহার গদিতে একটা কাগজে দস্তখত করিয়া এতগুলি টাকা চাদরের কোণে বাঁধিয়া কোমরে গুঁজিয়া লইয়া আসিতে হইয়াছিল মাত্র।

সাড়ে তিন বৎসর পরে গয়াচরণ সাহাকে আটশ' টাকার দলিল দিয়া সাড়ে এগারো শ' টাকার ডিক্রিটা কিনিয়া লইয়া অছিমদ্দিন সরকার কবিরের জমিগুলি নিজের চাষ-ভুক্ত করিয়া লইলেন এবং দয়া করিয়া খাজানা দিয়া কবিরকে সেই বাড়ীতেই রহিয়া যাইতে দিলেন। কবিরের বিশেষ কিছু পরিবর্তন হইল না; আগের মত হাঁড়িতে জলের সঙ্গে চাউল দিয়া গরম করিলে সুন্দর সুন্দর ভাতই ফুটিয়া উঠে, কোনো অখাদ্য ত হয় না! কিন্তু এই হাঁড়িটা গরম করিতে হইলেই চাউলের সবিশেষ প্রয়োজন—এর আয়োজনের জন্ম জাফরগঞ্জের হাট হইতে মূলা, কাঁচা লঙ্কা ও চাউল কিনিয়া কুট্টির বাজারে বিক্রয় করিতে সে শুরু করিল। বর্ষার সময় পার্ব্বত্য ত্রিপুরায় গিয়া শন, বাঁশ কাটিয়া এবং ধান-ব্যাপারীদের ধান তিপ্রা ও মেন্নী বাড়ী হইতে নদীর ঘাটে নামাইয়া দিত!—এমনি করিয়া দিন বহিয়াই চলিল! পার্ব্বত্য ত্রিপুরায় জমির দর সস্তা দেখিয়া এবং রোজগারের সুবিধা আছে বলিয়া সে জোবেদাকে অনেক অনুরোধ করিয়াও অছিমদ্দির অধীনতা হইতে মুক্তিলাভ করিয়া পার্ব্বত্য ত্রিপুরায় গিয়া স্বাধীনভাবে জীবন-যাপন করিতে স্বীকার করাইতে পারিল না। অতএব এ-হাটে কিনিয়া ও-হাটে বিক্রয়ের তেজারতীটাই আপাততঃ চালাইতে হইল।

আজ বিছানায় এ-পাশ ও-পাশ করিতে করিতে এই সব কথাই তাহার মনে হইতে লাগিল! সেও কি জোবেদাকে কম ভালবাসিয়াছিল! যেদিনের কথা বলিতেছি, তখন পল্লীগ্রামে সাবান বড়ই দুর্লভ ছিল;—কবির তাহার স্ত্রীকে জলে-ভাসা সাবানও ত কিনিয়া দিয়াছিল। শুধু তাহাই নহে,—সে জোবেদাকে নীলাম্বরী কাপড়ও ত কিনিয়া দিয়াছিল। কিন্তু ইহাও ত সত্য, জোবেদাও ত তাহাকে বড় ভালবাসিত! গত বৎসর শন কাটিতে যাইয়া শন-ক্ষেতে কবিরের সঙ্গে একটা জীবন্ত বাঘেরই সাক্ষাৎ হইয়াছিল!—রক্ষা যে এক ?রসং ঠাকুর 'চালান্' দিয়া বাঘটাকে তাড়াইয়া দিয়াছিল! জোবেদাকে সে এই কথা বলিয়া ফেলিয়াছিল। জোবেদা আর এ-বৎসর সেই জন্ম তাহাকে বনেই যাইতে দিল না! খাওয়া-দাওয়া সম্বন্ধে সে বারে বারে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছে, তাহাকে না খাওয়াইয়া জোবেদা কোন দিনই নিজের পেট ভরিতে বসিয়া যায় না!

জোবেদার এত প্রাণভরা ভালবাসা, এত আদর যত্ন যে ভুলিয়া গিয়া সে তাহাকে তালাক দিয়া বসিয়াছে, সে একথাটা যেন আজ বিশ্বাসই করিতে পারিল না! জোবেদা আর তাহার ঘর সংসারে সুব্যবস্থা করিবে না, প্রতি সন্ধ্যায় তাহার জন্ম প্রতিক্ষা করিয়া থাকিবে না, কাছে বসিয়া ব্যাকুল আগ্রহে অন্ন-পরিবেশন করিবে না, হাসিবে না, কাঁদিবে না, রাগ করিবে না—জোবেদা আর তাহার জন্ম কিছুই করিবে না। বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তিও হয় না!—কিন্তু তবুও বিশ্বাস করিতেই হইবে! সে যে নিজ হাতেই তাহাকে জবাই করিয়া দিয়াছে! আজ তাহাকে হারাইয়া হঠাৎ যেন সে অবিষ্কার করিয়া বসিল, তার হাসিটি কি সুন্দর ছিল! তার কান্নাটিও এত সুন্দর

লাগিত। আর জোবেদা কি চমৎকার রাগই করিতে জানিত।

মানুষের এমনই পোড়া কপাল যে, কাছে যে সহজ ভাবে থাকে, তাহার বিশেষত্ব সে তখনই বুঝিতে পারে যখন সে বস্তু দূরে চলিয়া গিয়া দুর্লভ হইয়া উঠে।

ভাবিতে ভাবিতে কখন যে সে ঘুমাইয়া পড়িল, তাহা নিজেই ঠাহর করিতে পারিল না। স্বপ্নে সে দেখিল জোবেদাদের পুকুরের পাড়ে বসিয়া তাহারই দেওয়া নীলাম্বরী পরিয়া তাহাকে সে ডাকিতেছে। মাথার উপরের বকুল গাছ হইতে দুইটী বকুল ঝরিয়া তাহার শিথিল কেশে আসিয়া পড়িয়াছে। কবির যেই তাহাকে ব্যাকুল আলিঙ্গনে ধরিতে যাইবে, অমনি প্রভাতের প্রথম মোরগের ডাকে তাহার ঘুম টুটিয়া গেল,—জাগিয়া দেখে শূন্য ঘরে জোবেদার মলিন পাদুকাটী পড়িয়া আছে। সেই শূন্যতার দিকে চাহিয়া তাহার সমস্ত অন্তরাত্মা কাঁদিয়া উঠিল। কেন সে এমন করিল? খোদাতা'লা কেন তাহার কাঁধে শয়তানকে ভর করাইয়া দিলেন?

হায়রে, দুর্ব্বল মর্ত্তের মানুষ! তাহার ক্রোধ ও ক্ষোভকে যখন লড়াইএ মাতাইয়া তুলিবার জন্য কোন শত্রু খুঁজিয়া পায় না, তখন এমনি করিয়াই বুঝি নির্ব্বাক আল্লাতা'লাকে আক্রমণ করিয়া থাকে! দুর্ব্বল শিশু ক্রোধবশে মাকে মারিয়া যেমন মায়ের বুকেই মাথা লুকায়, তেমনি কবিরও আজ খোদার ঘাড়ে দোষ চাপাইয়া খোদারই পায়ে লুটাইবার জন্য উঠিয়া নামাজ পড়িতে উদ্যত হইল। জোবেদা শত চেষ্টা করিয়াও নামাজে রত করিতে পারে নাই, কিন্তু আজ সে নিজেই নামাজ পড়িতে প্রস্তুত হইল।—হায়, আজ জোবেদা যদি থাকিত, তাহা হইলে সে কতই না সুখী হইত। নামাজ পড়িয়া আজ তাহার বড়ই মধুর লাগিল। নামাজ যদি এত মিষ্ট, তবে সে-ই বা এতদিন পড়ে নাই কেন? আজ তাহার মনে হইল সে যেন বড় হতভাগা, জগতে সে যেন একা, ঊর্দ্ধ আকাশের দিকে দুইটী কম্পিত ভীরু কর উত্তোলন করিয়া কবির কথা বলিতে গিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। নিরুদ্ধ কণ্ঠে শুধু বাহির হইল, "হায়, খোদা আমার মুখের কথা তাই সত্য হল—অন্তরের কথা আমার তুমি কি জান না?" সম্মুখের বকুল গাছের উপরের একটী শাখায় প্রভাত সূর্য্যের যেটুকু আলোর রেখা পড়িয়াছিল তাহা সেখান হইতে সরিয়া আসিয়া কবিরের মুখে আসিয়া পড়িল—খোদার আশীর্ব্বাদের মত।

( ২ )

দিনের আলোকে গ্রামখানি যখন মুখরিত হইয়া উঠিল, কবিরের ভারী লজ্জা করিতে লাগিল, এ-পোড়া মুখ সে কেমন করিয়া মানুষের কাছে দেখাইবে। দুর্ভাগ্যের দরুণ মানুষের কাছে নিজেকে যখন প্রকাশ করিবার আর একেবারেই অবকাশ থাকেনা, তখন মন কেন যে মানুষেরই কাছে সান্ত্বনা লাভের অবকাশ খুঁজিয়া মরে, তাহার হেতু ঠিক করা যায় না। নিজেকে মানুষের দৃষ্টি হইতে একান্ত অন্তরাল করিয়া কবির মোল্লা সগির আহমদের ঘরে সোজাসুজি আসিয়া উঠিল। মোল্লা সাহেব তখন কোর-আন শরীফ্ তেলায়ত করিতেছিলেন। কোর-আন্‌খানি যুযদানে বাঁধিয়া কবিরকে বসিতে বলিলেন। তার পর নিজের মনেই যেন বলিয়া উঠিলেন—'কাজটা ভাল হয় নাই!"

বেড়ায় ঠেশ দেওয়া হুঁকাটা তুলিয়া লইয়া কবির তামাক সাজিতে লাগিয়া গেল—কোনো উত্তর দিল না।

মোল্লা সাহেব বলিতে লাগিলেন—"ঘর সংসার কর্‌তে হ'লে কাজিয়া ফসাদ্ হ'য়েই থাকে। তোমাদের মধ্যে কাজিয়া ফসাদ কোনো দিন ত হয়নি—কেন এমন কর্‌লে বেটা?"

যেখানে শুধু নিষ্ঠুরতাই প্রাপ্য, সেইখানে করুণার সঞ্চার হইলে বিপ্লব আসন্ন হইয়া উঠে। এই করুণ স্নেহসিক্ত স্বরের কৈফিয়ত তলবে কবির হাউমাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিয়া বলিল—মোল্লাসা'ব, আপনার চটিজুতা দিয়া জুতাইয়া আমাকে—লাল্ করে দেন—ওর দোষ নাই, সব দোষ আমার—আমি বে-আকল্!......"

যে ব্যক্তি এতটুকু নিন্দার পরিবর্ত্তে রক্তপাত করিতে চাহিত, সে যে আজ যাচিয়া নিজের বিচারের ভার অন্যের উপর অর্পণ করিতেছে, সে যে কতবড় দাগার, তাহা বুঝিতে পারিয়া এই শুক্ল-কেশ বৃদ্ধ মোল্লা সাহেবের চক্ষু সজল হইয়া উঠিল। তিনি এই গ্রামে পঁচাত্তর বৎসরের অভিজ্ঞতা লইয়া বসবাস করিতেছেন; প্রায় প্রত্যেক পুরুষ-মেয়ের স্বভাব-চরিত্র সম্বন্ধে তাহার অল্পবিস্তর জানা আছে।

মোল্লা সাহেব বেদনা-মিশ্রিত স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন—"সত্যই কি তিন তালাক দিয়াছ?" কবির 'হাঁ' বলিয়া উত্তর দিলে তিনি বলিলেন—"তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, খোদার কসম্ মিছা বলো না। আচ্ছা, এখন কি তোমার মনে এর জন্য খুব কষ্ট হচ্ছে? তাকে নিয়ে ঘর-সংসার কর্‌তে তোমার কোনো আপত্তি নাই?"

কবির আবোল-তাবোল করিয়া যে উত্তর দিল, তাহার সারমর্ম এই যে, সে যদি মিথ্যা বলে, তবে তার উপর আসমানটা ভাঙ্গিয়া পড়ুক—সত্যই তাহার অনুতাপ হইয়াছে এবং জোবেদাকে ফিরিয়া পাইলে কত যে সুখী হয়, তাহা ভাষায় ব্যক্ত করা একেবারেই অসম্ভব।

মোল্লা সাহেব একখান কেতাব খুলিয়া একটা কাগজে আরবীতে কি লিখিয়া এবং নিজের নাম সহি দিয়া বলিলেন,—"তোমাদের দুজনের তওবা কর্‌লেই হবে! গাঁয়ে যে রকম দলাদলি, শেষে যাতে কোনো গোলমাল না হতে পারে, সে-জন্যে নবিপুরের মৌলানা সাহেবের দস্তখত নিয়ে এস। তাঁকে নজর দেবার জন্যে কিছু......বুঝলে ত?"

প্রবাসী নব-বিবাহিত যুবক-স্বামী প্রিয়তমার হাতের প্রথম চিঠি পাইলে যেমন উৎফুল্ল হইয়া উঠে, তেমনি আনন্দের আতিশয্যে গৃহে ফিরিয়া পাঁচটি টাকা লইয়া তখনই সে নবীপুর রওয়ানা হইল। নবিপুরের মৌলানা সাহেব কাগজখানি দেখিয়া চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া ধনুষ্টঙ্কারের রোগীর মত হাত পা নাড়িয়া বলিতে লাগিলেন যে, অল্প পানীর পুঁটি-মাছ মোল্লাদের এমন দুর্মতি না হইলে, দীনে ইসলাম এমন বরবাদ হইয়া যাইবে কেন? বাংলা-দেশের বিদ্যা ত! হিন্দুস্থান হইতে পড়িয়া না আসিয়া যাহারা কেতাব ধরে, তাহাদিগকে ভাল করিয়া সাজা দেওয়া উচিত! একটা সাংঘাতিক কিছু ঘটিয়া গিয়াছে এইরূপ চঞ্চলভাবে কিছুক্ষণ পায়চারি করিবার পর কবিরের দিকে চাহিয়া পরিষ্কার ভাষায় বলিয়া দিলেন যে, সাফ্ তালাক হইয়া গেছে! অন্যত্র যদি ও বিবির বিবাহ হয়, এবং সেই খসম্ যদি বিবিকে তালাক দেয়, তাহা হইলে কবির আবার হিলা-শরাহ অনুসারে বিবিকে সাদী করিতে পারে।

কবিরের কথা বলিবার সমস্ত পথ বন্ধ হইয়া গেল!—এই অনলোদ্গারের মুখে সে পাঁচটি টাকার প্রস্তাবই করিতে পারিল না। শেষে সাহসে ভর করিয়া মৌলানা সাহেবের পা জড়াইয়া ধরিয়া পাঁচটি টাকা দিয়া অশ্রুপ্লাবিত কণ্ঠে বলিল যে, মারিলেও তিনি, বাঁচাইলেও তিনি—হয় তিনি বাঁচাইবেন, নয় এই পায়েই তাহার মৃত্যু হউক। বাধ্য হইয়াই মৌলানা সাহেব সেই কাগজটিতে দস্তখত দিয়া দিলেন! কবির সেই কাগজখানি লইয়া যে উল্লাসে গৃহে ফিরিল, বোধ করি পলাসীর যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া ক্লাইভও এত বেশী উল্লাসিত হন্ নাই!

(৩)

বিকাল-বেলায় সেই কাগজখানি আধা-আস্তীনের বুকের জেবে রাখিয়া কবির শশুর-বাড়ীর দিকে রওয়ানা হইল। উদ্দেশ্য, ওবাড়ীর কর্ত্তার সঙ্গে আলাপ করিয়া তওবার সময়টা নির্দ্দেশ করা এবং গোলমালটা চুকাইয়া ফেলা। যদিও লজ্জা করিতেছিল, তবু বুকের ঐ কাগজটির নিকট হইতে সাহস সংগ্রহ করিয়া সে সোজাসোজি শশুর-বাড়ীর উঠানে গিয়া উঠিল।

তখন রসদ-ঘরের দাওয়ায় বাড়ীর কর্ত্তা শম্‌শের এবং ও-পাড়ার জহিরুদ্দিন সরকার বসিয়া কথাবার্ত্তা কহিতেছিল। তাহাকে দেখিয়াই, কথা বন্ধ হইয়া গেল—বুঝিতে বাকী রহিল না যে, তাহার সম্বন্ধেই কথাবার্ত্তা হইতেছিল। জহিরুদ্দিন সরকার যে ইতিমধ্যেই শম্‌শেরের এত নিকটতম আত্মীয় হইয়া গিয়াছে, ইহাতে তাহার তাজ্জব মালুম হইল। কিন্তু এখন আর তাহার রাগ দেখাইবার সময় নাই—কোনোরূপ অভ্যর্থনা না পাইলেও সে দাওয়ায় উঠিয়া বসিল। কোনো পক্ষ হইতে কোনো কথাবার্ত্তা উঠিল না—সকলেই নীরব হইয়া বসিয়া রহিল। রাজনীতি-বিদ্ জহিরুদ্দিন সরকার, সমাজনীতিবিদ্ শমশের খাঁ এবং যুদ্ধ-বিশারদ্ কবির আহমদ একই স্থানে বসিয়া, অথচ কোনো আলাপ-আলোচনা নাই, পল্লী-সমাজে ইহা এক সাংঘাতিক দুর্ঘটনা—বোধ করি এই দুর্ঘটনাটাকে একটু লাঘব করিবার জন্যই জহিরের মুখে হুঁকাটা জলিয়া-পুড়িয়াও ফটকট করিতে লাগিল। খানিক পরে জহিরুদ্দিন উঠিতে উদ্যত হইয়া বলিল যে, হাতে অনেক কাজ আছে বলিয়া এখন আর সে বসিতে পারে না—শম্‌শের তাহাকে বিশেষ অনুরোধ করিয়া

বসাইল। এইরূপে কথা উঠিয়া বাড়িতে বাড়িতে কথা চলিতে লাগিল—কবিরও মাঝে-মাঝে দু'একটা কথা গায়ে-পড়া-ভাবেই বলিয়া ফেলিল। এক সময় কর্ত্তাকে সম্বোধন করিয়া বলিল—"আমাদের মোল্লা সাবের কাছেও জিজ্ঞাসা করেছিলাম, তিনিও বল্লেন আর নবীপুরের মৌলানা সাব থেকেও সহি এনেছি, তওবা কর্লেই হবে। কোন্ সময় হলে সুবিধা হয়।"

যাহাকে উদ্দেশ্য করিয়া প্রশ্ন করা হইল, সে জবাব দিবার পূর্ব্বেই জহির বলিয়া উঠিল—"বল কিহে কবির! সগির মোল্লাও তওবা কর্লেই হবে বলেছে? নবীপুরের মৌলানার কথা ছেড়ে দাও, ও টাকার ভুঁখা কিন্তু বুড়ো মোল্লার উপর যতই বে-দলো হোক, একটা ইমান ছিল। বুড়ো হলেই দুনিয়াদারীর মায়াটা বেড়ে যায় কি-না! কত টাকা নিলে শুনি?—যাক্, ওতে আমার কি দরকার। তোমরা যদি মিলেমিশে যাও, সে ভালই। কিন্তু বলি কি, শেষে একটা গণ্ডগোল যেন না হয়! দেখ্‌ছ ত, আজ সাত বছর ধরে কি দলাদলি- দুই সমাজে খাওয়া, দুই জমাতে নামাজ পড়া, খায়্‌না-মোকদ্দমা, লাঠা-লাঠি, অছিমদ্দির ভাগ্নেটা আমাদের জহুরটাকে খুন্‌ই করে ফেল্লে—সে-বেচারাও ফাঁসি হ'য়ে গেল। যাক, যা' শেষ হয়ে গেছে, তা নিয়ে আর গোল-যোগ করে কি লাভ!—না হয় আমি ঠক্‌লামই,—তাই ত আছি সেদিন যখন মিল্‌তে চাইল, মিলে গেলাম। সমাজে নামাজে যখন এক হয়ে গেছি, তখন ঠক্‌লেও ত লজ্জা নেই! আমার ভাই-পো' মজিদ্‌ও তাই বল্লে! সে বলে কি—'চাচাজি, আপনি সবুর করেই থাকেন—একটু সয়ে যান, জমাতে নমাজ পড়া কত বেশী সওয়ার।' আমি ভাবি,, মা'শা' আল্লা, একটুখানি ছেলে, বুদ্ধি কত—জেনেরও জোর ভাল, হাদিস-দলিলও তো বুঝে। এবার বুঝি পাশ্ করবে—আসচে বার থেকে কুমিল্লায় আর কেহ তাকে পড়াতে পারবে না, মনে করেছি, হয় হিন্দুস্থান নয় কলিকাতা পাঠিয়ে দিব।

যদিও তাহার নিজের বিদ্যার দৌড় পাঠশালার দ্বিতীয় বর্ষের ঊর্দ্ধে নয়, তবু ভ্রাতুষ্পুত্রের এই জ্ঞান-সাধনার মহা অভিযানে সবিশেষ গর্ব্ব অনুভব করিতে লাগিল এবং বলিল—"এই বিষয়টা নিয়ে আজকে দুফুরে মজিদের সঙ্গে আলাপ হল, সে বল্ল তওবা কর্লে হতেই পারে না, কি-কি কেতাবের নাম করে সে বল্লে, সাফ্ তালাক হয়ে গেছে—যে বলে, তওবা কর্লে হবে, সে কাফের। আর যদি ওরা তওবা করে মিশে যায়, ওরাও কাফের হয়ে যাবে আর ওদের সঙ্গে যারা মেলামেশা করবে, তাদের বিবি তালাক হয়ে যাবে। তাই বলি কি, বুঝে-সুঝে দু'দশটা পাশ-করা মৌলবী থেকে ফতোয়া নিয়ে বিষয়টা মিটালে ভাল হয়, কি বল, শমশের নাতি।" শমশের নাতি কোনো জবাব দিল না—জবাব দিবার লক্ষণও দেখা গেল না।

কবির চারিদিকের আবহ'ওয়া বুঝিতে পারিয়া তিক্তকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "আমি মূর্খ মানুষ, এত সব বুঝি-সুজি না, মোল্লা সা'ব আর মৌলানা সা'ব যখন ফতোয়া দিয়েছেন, তখন তোমার মত আছে কিনা শমশের ভাই খোলাখোলাই বলে ফেলো।"

জাহিরুদ্দিন বাধা দিয়া বলিল—"ও আর খোলাখোলী কি বল্‌বে, তুমিই খোলাখোলী বলে ফেলো না, কত টাকা দিয়ে ফতোয়াটা তৈয়ার করেছ।

কবিরের মনে সহসা যেন আগুন জ্বলিয়া উঠিল। কিন্তু একটী করুণ কোমল মুখের ছায়া তাহার সম্মুখে ভাসিয়া উঠিতেই সে শান্ত হইয়া গেল এবং বলিল—"সরকার, তোমাকে জিজ্ঞাসা করি না, ওকে জিজ্ঞাসা করি।"

ধনুকের গুণ কাটিয়া দিলে যেমন হঠাৎ সোজা হইয়া যায়, তেমনি সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া জহির বলিল—"কি, আমার সঙ্গে চোখরাঙানী, দুনিয়ায় আর মানুষ খুঁজে পাওনি, কচি বাছুর সেজে বাঘের লেজে নিয়ে খেলা কর্‌তে চাও, আমি জহির সরকার, অছিমদ্দিন নয়!"

কবির হাতটা বাড়াইয়া দিয়া শূন্যের মাপে একটা কাল্পনিক বোঝাকে ওজন করিতে করিতে বলিল—"দেখ সরকার এত জোর দেখাতে যেও না, এই গাঁয়ে কার কয় ছটাক জোর আছে, আমার এই হাতে ওজন করে দেখেছি।" আর যায় কোথা, জহিরুদ্দীন অষ্টমে গলা চড়াইয়া দিয়া মাথার কিশ্‌তি টুপিটা কোমরে গুঁজিয়া গায়ের চারদটা লাফাইয়া লাফাইয়া কোমরে দ্রুত বাঁধিতে লাগিল। শমশের তাড়াতাড়ি উঠিয়া তাহাকে জড়াইয়া ধরিল। যাহাদের যত বেশী জোর কম, কার্য্যক্ষেত্রে কাহাকেও মধ্যস্থ

পাইলে, তাহাদের তত বেশী জোর যেন বাড়িয়া যায়—প্রতিদ্বন্দ্বীর জন্ম না বাড়ুক, অন্ততঃ মধ্যস্থের জন্ম বাড়ে ত। শমশেরকে ঠেলিয়া ঠেলিয়া রুখিয়া রুখিয়া পা উচাইয়া, হাত তুলিয়া কবিরের নৈকট্য লাভ করিতে জহির সরকার যারপর নাই চেষ্টা করিতে লাগিল,—কবির নির্ব্বিকার বসিয়া রহিল, শমশেরের বৃদ্ধ মাতা মরণ-কান্না জুড়িয়া দিয়া দাওয়ায় আসিয়া হাজীর হইল; শমশেরের দুতিনটা ছেলেমেয়ে 'মাগো মাগো বলিয়া দে-ধুম চীৎকার শুরু করিল; নিকটবর্ত্তী যে যেখানে ছিল, হাতের কাজ ফেলিয়া দৌড়াইয়া আসিল; দূরে যাহারা ছিল, কেহ আগুণ লাগিয়াছে মনে করিয়া, কেহ ছেলেপুলে পানিতে পড়িয়াছে ভাবিয়া, কেহবা দলাদলির লড়াই শুরু হইয়া গেছে মনে করিয়া, সমস্তই এ বাড়ীতে আসিয়া ভাঙিয়া পড়িল। ক্ষনেকের মাঝে যেন একটা কারবালা কাণ্ড বাঁধিয়া গেল।

এই সমস্ত কাণ্ডকারখানার মধ্যে কবির কিন্তু স্থির হইয়াছিল। সে শুধু ভাবিতেছিল যে চোখের দৃষ্টি যদি পাচিল ভেদ করিয়া যাইতে পারিত! তাহার লোমকূপগুলি যেন চক্ষু হইয়া শুধু একটা প্রাণীকে খুঁজিতেছিল।

কবিরকে নির্ব্বিকার ভাবে হুঁকা টানিতে এবং জহির সরদারকে প্রাণপণে লাফালাফি করিতে দেখিয়া সমাগত সমস্তই মনে করিল, এই এজিদ কবির পূর্ব্বাহ্নে জহির সরদারকে দুই চার ঘা বসাইয়া দিয়াছে; তাই অপরাহ্নে জহির বকিয়া এবং লাফাইয়া তাহার প্রতিশোধ নিবার চেষ্টা করিতেছে। জহিরের পক্ষের দুই চার জনেরও রক্ত গরম হইয়া উঠিল এবং কবিরকে মারিবার জন্ম রুখিয়া উঠিল। কয়জন মাঝে পড়িয়া তাহাদিগকে থামাইতে চেষ্টা করিল। এক বৃদ্ধ হাত ধরিয়া টানিয়া বাহিরে আনিয়া কবিরকে বলিল—"তুমি বাড়ী যাও, এখানে আর থেকো না।"

কবির "যাই কিন্তু একটা কথা" বলিতে না বলিতেই সমস্বরে প্রায় সকলেই বলিয়া উঠিল—"আর একটা কথাও না।" কবির বজ্রস্বরে বলিল—"তোমাদের কিছু বল্‌ছিনা, আমার শাশুড়ীকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি।"

সকলেই ঔৎসুক্যের সহিত চুপ করিল এবং দাওয়ায় দণ্ডায়মানা শাশুড়ীও কথাটায় কর্ণপাত করিলেন। কবির বলিল—"অন্যের কথা আমি শুনতে চাই না, আপনি ত সব কথা শুনেছেন, আপনাদের কি মত।"

ও-ধারে জনবেষ্টিত দণ্ডায়মান জহির সরকার কি একটা গোলমাল করিতে যাইতেছিল কিন্তু শাশুড়ী সাহেবের সুমিষ্ট কথায় সব গোলমাল মিটিয়া গেল। তিনি বলিলেন—"আমাদের কি মত! নফরের পো, লোচ্চর পো, তোর কপালে জুতা ডলি। তুই আমার সোণার মেয়েটাকে উপাসে উপাসে ছাই করে দিয়েছিস্, তোর ঘরে ফের মেয়ে দিব। আরে আমার সোনার চাঁদ জামাইরে, গলায় দড়ি দিয়া মর গিয়া বাদীর পো, তোর চৌদ্দপুরুষের গুর জেয়ারত ক'রে আমি ঠাণ্ডা হই!" বলিয়া তিনি ঠাণ্ডাত হইলেন না বরং বে-আরামীর মত হাঁপাইতে লাগিয়া গেলেন, কবির কথাটি মাত্র না বলিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিল এবং তাহার পিছনে এতগুলি লোকের টিটকারীর রোল পড়িয়া গেল!

পথে নামিয়া তাহার মনে হইতে লাগিল যে তাহার পায়ের তলায় যেন পথ নাই। সম্মুখে যতদূর চাহিয়া থাকে—চোখে শুধু অন্ধকার লাগে। বাসন্তী অপরাহ্নের সমস্ত রক্তরাগ তাহার চক্ষের সম্মুখে আজ গাঢ় অমারাত্রির অন্ধকারের মত মনে হইতে লাগিল।

কিছুক্ষণ চলিবার পর তাহার মনে হইল কে যেন তাহার নাম ধরিয়া ডাকিতেছে। সে বহু চেষ্টা করিয়া পিছনে ফিরিয়া চাহিল। অনেকক্ষণ চাহিয়া থাকিবার পর সে বুঝিল কেহ ত ডাকে নাই—তাহারই মনের ভুল বুঝি বা! কিন্তু কিছুক্ষণ যাইতে না যাইতেই আবার সেই আহ্বান! এবার যেন আরও কাছে। সে চমকাইয়া উঠিল! চারিদিকে ফিরিয়া চাহিল—কোথাও কেহ নাই! শুধু অন্ধকারে আর আলোয় এক বিচিত্র রঙ তাহার চক্ষের সম্মুখে ভাসিতেছে! অথচ সে স্পষ্ট আহ্বান-ধ্বনি শুনিতে পাইতেছে। কে যেন কাঁদিতেছে—আর সহস্র মিষ্টনামে তাহাকেই ডাকিতেছে। বিহ্বলের মত সে পথের পাশে বসিয়া পড়িল! সেখানে সামান্ত ঘাসফুল ফুটিয়া উঠিয়াছিল। কবিরের মনে হইল সেই ঘাসফুলের মধ্য হইতে যেন সে আহ্বান আসিতেছে! ধীরে মাথা নামাইয়া সে মাটীতে কাণ রাখিল; সেখানেও সে যেন শুনিতে পাইল যে মাটীর বুক হইতে সেই আহ্বান ধ্বনি আসিতেছে! ক্ষিপ্ত হইয়া সে আকাশের দিকে চাহিল। সেখানে সন্ধ্যার একটী তারা শুধু ফুটিয়া উঠিয়াছে—সেই তবে বুঝি কাঁদিয়া

কাঁদিয়া তাহাকে ডাকিতেছে! কোনও রকমে বুক চাপিয়া সে আবার চলিল—কাণে জোর করিয়া আঙুল দিয়া সে ভাবিল যে সে ধ্বনি সে আর শুনিবে না। সহসা সে চমকিয়া উঠিয়া শুনিল যে তাহারই বুকের মধ্যে বসিয়া তাহার ডাক নাম ধরিয়া তাহাকে কে ডাকিতেছে!

কোনও রকমে ঘরের দরজায় আসিয়া সে অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া গেল!

( ৪ )

দিন যায়—রাত আসে। অন্ধকার একা ঘরে কবিরেরও দিন চলিয়া যাইতেছিল। জোবেদা চলিয়া যাইবার সময় আলনায় সাড়ীখানি তেমনি রাখিয়া গিয়াছিল। কবির কখনও কখনও উদ্‌ভ্রান্তের মত সেই সাড়ীখানির সঙ্গেই কথা বলে। আপনার কাণ্ড দেখিয়া আবার আপনি হাসিয়া উঠে। মাটীর দেয়ালে সে কাঁচা হাতে জোবেদার নাম লেখে আর মুছিয়া ফেলে। এমনি করিয়া তাহার দিন যায়—একা একা!

তাহার খালি মনে হইত কোনও রকমে একবার জোবেদার সঙ্গে দেখা করা যায় কেমন করিয়া। তাহাকে ছাড়িয়া জোবেদা কেমন আছে—এইটী জানিবার জন্য সে ব্যাকুল হইয়া উঠিত। এমনই কি একা একা তাহার দিন কাটিতেছে—কে জানে!

এক একবার সে ভাবে সে পুরুষ মানুষ, তার কি এ দুর্ব্বলতা সাজে? কিন্তু হায়, পুরুষ যখন দুর্ব্বল হয়—তার মত দুর্ব্বল পৃথিবীতে কেউ থাকে না আর।

সেদিন হাটবার। সামান্য কিছু সওদা করিয়া সে ফিরিতেছিল। সম্মুখের ডাক্তারখানায় সে দেখিল শমশের ওষুধ লইয়া বাহির হইতেছে। সহসা কবিরের বুকের মধ্যে ছাৎ করিয়া উঠিল। শমশের কবিরকে দেখিয়াই মুখ ফিরাইয়া আগাইয়া চলিল।

কবিরের মনের মধ্যে কে যেন বলিয়া দিল যেন জোবেদার অসুখ করিয়াছে। কেমন করিয়া সে জানিতে পারে?

তাড়াতাড়ি সে আগাইয়া গিয়া অতি কষ্টে হাসিয়া শমশেরকে ডাকিয়া কুশল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিল। শমশের কোনও রকমে জবাব দিয়া এড়াইয়া চলিল।

লজ্জার মাথা খাইয়া কবির জিজ্ঞাসা করিয়া ফেলিল, "কার অসুখ বাড়ীতে, শমশের ভাই!"

শমশের কোনও রকমে ঠোঁটের ফাঁক দিয়া বলিল, "জোবেদার!"

কবির কাতর হইয়া শমশেরের হাত ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি অসুখ? বাড়াবাড়ি কিছু?"

"আর ন্যাক্যামি করতে হবে না! খেয়ে খেয়ে দুষমনের মত চেহারা করেছ নিজের—আর নিজের বউকে দু'বেলা দু'মুঠো খেতে দিতে না, মনে পড়ে না? ন্যাকা—

কবির বিস্মিত হইয়া বলিল, কি বলছ শমশের ভাই! আমি তাকে খেতে দিতাম না!"

"না হলে অমন কাল রোগ হয়! এখন বুক থেকে রক্ত বেরুচ্ছে—ওটুকুও খেয়ে ফেলতে পারনি!" বলিয়াই রাগে গরগর করিতে করিতে শমশের চলিয়া গেল!

কবির আর যেন চলিতে পারিল না। তাহার হাতের সওদা পথে পড়িয়া গেল! সে মনে মনে খোদার কাছে জানাইল, তুমি ত জান এ রক্ত কিসের—ওরা জানবে কেমন করে!"

কবির আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া জোবেদাদের বাড়ীর আশে পাশে ঘুরিয়া বেড়াইত। কত লোককে জিজ্ঞাসা করিত—কেহই কিছু বলিত না। একদিন সে আর থাকিতে না পারিয়া জোর করিয়া জোবেদাদের বাড়ীতে ঢুকিতে গিয়াছিল—তাহাকে মারিয়া বাহির করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। এই কয়েক মাসের মধ্যে কবিরের চেহারা একেবারে বদলাইয়া গিয়াছে। গ্রামের পথে বাহির হইলে ছোট ছেলেরা তাহাকে দেখিয়া ভয়ে পালাইয়া যাইত। কেহ কেহ আবার ঢিল ছুঁড়িয়া মারে।

কবির শুধু ভাবিত জোবেদা কেমন আছে। একি বিধির বিড়ম্বনা! একদিন সে ভুল করিয়াছিল বলিয়া এমনি করিয়া সে ভুল সংশোধন করিতে হইবে!

একদিন বিকাল বেলাই বর্ষা নামিয়াছে। কবির আপনার ঘরের রোয়াকে বসিয়া আছে। এমন সময় দেখে তাহারই ঘরের দিকে শমশের আসিতেছে। সে প্রথমে বিশ্বাস করিতে চাহে নাই। কিন্তু সত্য সত্যই শমশের যখন তাহার নাম ধরিয়া ডাকিল, তখন সে চমকাইয়া উঠিল।

শমশের মুখ-ভার করিয়া বলিল, "জোবেদা তোমাকে ডেকেছে—আসবে ?"

ক্ষিপ্তের মত কবির লাফাইয়া চলিল—যেন সে হাওয়ায় চলিয়াছে।

জোবেদাদের বাড়ীর সম্মুখে আসিয়া সে থামিয়া গেল। বাড়ীতে ঢুকিতে তাহার শক্তিতে কুলাইতেছিল না। কোনও রকমে কাঁপিতে কাঁপিতে সে বাড়ীতে প্রবেশ করিল। তাহার শাশুড়ী আসিয়া ক্রুদ্ধ ও ক্ষুব্ধ স্বরে বলিল, "এস, এই ঘরে দেখে যাও তোমার কীর্ত্তি !"

চোরের মত কবির ঘরে ঢুকিয়া দেখিল, জোবেদার প্রেতাত্মা শুইয়া আছে! কোথায় সে রূপ, কোথায় সে শ্রী!

উন্মাদের মত কবির জোবেদার পায়ের তলায় লুটাইয়া পড়িল! কান্না-ভরা কণ্ঠে সে বলিল, "জোবেদা, তুই তো আমার মনের খবর জানিস্—বল্ আমার মাফ করেচিস্ !"

জোবেদার দুটী শীর্ণ হাত একবার কাঁপিয়া উপরের দিকে উঠিল—আবার পড়িয়া গেল! আর উঠিল না!

* * *

রসুলাবাদের পল্লী-জীবন হইতে এই কাহিনীর স্মৃতি বহুদিন হইল মুছিয়া গিয়াছে। রসুলাবাদের গ্রাম্যপথে এক পাগল ঘুরিয়া বেড়ায়। কাহারও সহিত সে কথা বলে না কাহারও কোনও সে অনিষ্ট করে না। গ্রামের দুই একজন বৃদ্ধ লোক শুধু বলে যে, ও-লোকটা বউএর শোকে পাগল হয়েছে—এমনি অপদার্থ!

---

# বিদায় দিনে

[ ডাঃ এ, মালেক এল-এম-এফ ]

আমি যদি যাই চ'লে আজ কারও প্রাণে লাগ্‌বে না,
বিদায়-চুমো নেবার আশে
দাঁড়িয়ে থেকে দুয়ার পাশে —
অশ্রু-সজল নয়ন মেলে কেউত আমায় ডাক্‌বে না।
কারও প্রাণে লাগ্‌বে না।

গোপন ব্যথা বক্ষে ল'য়ে,
আকুল প্রাণে ব্যাকুল হ'য়ে
একটী দিনও ঘরের কোণে কেউত ব'সে থাক্‌বে না।
কারও প্রাণে লাগ্‌বে না।

সিক্ত-বকুল-শাখার পরে,
জোছনা যখন প'ড়বে ঝ'রে
কেউত তখন বুকের মাঝে আমার পরশ মাগ্‌বে না।
কারও প্রাণে লাগ্‌বে না।

নিশীথ নিঝুম বাদল রাতে
এক্‌লা ব'সে বিছানাতে
আমার স্মৃতির মালা গেঁথে কেউত নিশি জাগ্‌বে না।
কারও প্রাণে লাগ্‌বে।

# মোগল সাম্রাজ্যের স্মৃতি

[ শ্রী নৃপেন্দ্র কৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় ]

## মোগলরাজের ঐশ্বর্য্য

মোগল ভারতের ঐশ্বর্য্যের কথা আজ প্রবাদ বাক্য। ভারত তখন ছিল ঐশ্বর্য্যের খনি। তাই তখন প্রজাদের জীবনকে উদ্ব্যস্ত করে রাজ-কোষ বাড়াতে হত না। অপর্য্যাপ্ত উদ্বৃত্ত অর্থ মোগল বাদশাহের অবসরকে সৌন্দর্য্য মণ্ডিত করে রেখেছিল। ঐশ্বর্য্যের সুমেরুশিখরে অধিরোহণ করে তাঁরা রূপের চরম কল্পনা করে গিয়েছেন এবং পৃথিবীকে সৌন্দর্য্যের আবাস করে অনাগত মানুষদের হাতে রেখে গিয়েছেন। আজও ভারতের ঐশ্বর্য্যের ভাণ্ডার শূন্য নয়—তবে তার চাবী বিদেশীদের হাতে। তাই আজ আমাদের জীবনের চারিদিকে এক কদর্য্য রূপ ফুটে উঠেছে। এই সুন্দর পৃথিবীর যে-দিকে চোখ তুলে চাই—সেদিকেই দেখি মৃত্যুর কাল-ছায়া। নিস্তব্ধ আকাশের সুদূর দিগন্ত-রেখা আর সৌন্দর্য্যের ইঙ্গিতে আমাদের ডাকে না—দুর্ভিক্ষের রক্ত-হীন অঙ্গুলীর আর্ত্ত আহ্বান আমাদের মাথার উপরের আকাশকে ম্লান করে আছে। বাংলার শ্যামল মাটীর বুকে যে-সব ফুল আজ ফোটে তাতে যেন মৃত্যুর গন্ধ ভরা।

কিন্তু এই ভারতবর্ষের একটা ঐশ্বর্য্যের, একটা প্রাচুর্য্যের যুগ ছিল। অপর্য্যাপ্ত অর্থও ছিল—ব্যবহার সামগ্রীও অতি অল্প মূল্যের ছিল। সায়েস্তা খাঁর আমলে এক টাকায় লোকে বড় মানুষী করে গিয়েছে। এ সব কথা স্বপ্ন বলে মনে হয়। কিন্তু ইতিহাসকারগণ বলেন যে এসব অতি সত্য কথা—যেমন সত্য কথা যে আজ ভারতবাসী নিরন্ন।

মোগলযুগের ঐতিহাসিক ( ১৬৪৮ ) আবদুল হামিদ লাহোরী সেই সময়কার রাজস্বের পরিমাণ নির্দ্ধারণ করেন কুড়ি কোটী টাকা। সেই সময়কার একটী টাকা বর্ত্তমান দু' শিলিং তিন পেন্সের সমতুল।

শাজাহান তাঁহার রাজত্বের প্রথম বিশ বৎসরের মধ্যে সাড়ে ন' কোটী টাকা দানে ব্যয় করেন। তাহা ব্যতীত প্রাসাদ, মসজিদ ইত্যাদি নির্ম্মাণে তিনি দু' কোটী সাড়ে বাহাত্তর লক্ষ টাকা ব্যয় করেন। কোথায় ও কি ভাবে কত খরচ হয়, তাহার একটী তালিকা নিম্নে দেওয়া হল, :—

| | |
|---|---|
| আগ্রায় :—কেল্লার অভ্যন্তরের বাগান, প্রাসাদ ও মতি মসজিদের জন্য— | ৬০ লাখ |
| তাজমহল :— | ৫০ " |
| দীল্লিতে প্রাসাদ সমূহ— | ৫০ " |
| জুম্মা মসজিদ :— | ১০ " |
| দিল্লীর প্রাচীর :— | ৪৷৷০ " |
| লাহোরে :—প্রাসাদ, উদ্যান ও পয়োঃপ্রণালীতে | ৫০ " |
| কাবুলে :—মসজিদ, কেল্লা, প্রাচীর, প্রাসাদ— | ৫০ " |
| কাশ্মীরে :—উদ্যান ও প্রাসাদ— | ৮ " |
| কান্দাহারে :—কেল্লা, | ৮ " |
| আজমীরে :—প্রাসাদ— | ১২ " |
| মুখ্‌লিশ্‌পুরে :—যুবরাজ দারা সেকোর প্রাসাদ— | ৮ " |

রাজকীয় অলঙ্কারের মূল্য ছিল প্রায় পাঁচ কোটী টাকা। শাজাহানের নিজের অঙ্গ ভূষণের দাম ছিল প্রায় দু'কোটী টাকা। তাঁর জপের মালার মধ্যে ৫ খানা রুবী ছিল এবং ত্রিশটা মুক্তা ছিল এবং সর্ব্বশুদ্ধ তার মূল্য ছিল দু'লাখ টাকা।

রাজ-ভাণ্ডারে ক্রমান্বয়ে বহু মণি-মুক্তা জমা হয়ে উঠেছিল। শাজাহান ভাবলেন যে এসব মুক্তা ভাণ্ডারে জমিয়ে রেখে কি হবে? তাই তিনি বিখ্যাত কারিকর বেওয়াদল খাঁকে ডেকে জগৎ-বিখ্যাত ময়ূর-সিংহাসন নির্ম্মাণের আজ্ঞা দেন। কারিকরদের মাহিনা ছাড়া ময়ূর-সিংহাসন তৈরী করতে এক কোটী টাকা খরচ হয়েছিল। সিংহাসনের যে হাতার উপর শাজাহান হাত রাখতেন—সেই টুকুরই মূল্য ছিল দশ লাখ। সিংহাসনের দেহে মাণিক্যের অক্ষরে কুড়ি লাইনে একটী কবিতা লেখা ছিল। কবির নাম হাজী মহম্মদ জান কুদসী। এই সব দেখে শুনে মনে হয়, হায় রে, সে যুগে যদি ভিখারী হয়েও জন্মাতাম!

## তাজের নির্ম্মাতা কারা ?

যে রাজা তাজের কল্পনাকে আপনার ধ্যানের মধ্যে পেয়েছিল—জগৎ তারই নাম চিরদিন স্মরণে রেখেছে কিন্তু যে সমস্ত কলা কৌশলী শিল্পীরা আপনাদের জীবনের সমস্ত সাধনা দিয়ে সেই অসম্ভব কল্পনাকে সম্ভব করেছিল—তাদের নাম নিয়ে কোনও কবি কোনও কবিতা লিখলো না—কোনও পান্থ পূর্ণিমা রাত্রে তাজের স্বপ্নময় মর্ম্মর-মূর্ত্তির দিকে চেয়ে তাদের স্মরণ করে একটাও দীর্ঘশ্বাস ফেল্লো না! সৃষ্টির আড়ালে তারা বিলুপ্ত হয়ে গেল! মোমতাজ বেগমের কবরকে সুন্দর করে তোলবার সময় তারা কি জানতো যে, যে-সৌন্দর্য্য তারা সৃষ্টি করলো সেই তাদের কবর হবে? আজ এই দূর কালে বসে বাংলার বর্ষা-বিহ্বল এক ক্লান্ত অপরাহ্নে হে বিলুপ্ত-যশ মহাশিল্পীরা, আমি ক্ষীণ কণ্ঠে আতপ্ত শ্রদ্ধার তোমাদের নাম উচ্চারন করি! সৌন্দর্য্যের রূপমহল সৃষ্টি করতে যুগে যুগে যারা আত্মাহুতি দিল—তাদের সবার নামে তোমাদের স্মরণ করি।

ইতিহাস পর্য্যালোচনা করে তাদের নাম যে পাওয়া যায় না—তা নয়। তাজের সমগ্র কাজ মুকাররামৎ খাঁ ও মির আবদুল করিমের তত্ত্বাবধানে হয়। যে সমস্ত প্রধান শিল্পীদের নাম পাওয়া যায়—তার মধ্যে নিম্নলিখিত আট জন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

(১) আমানৎ খাঁ শিরাজী। ইঁহার বাড়ী কান্দাহার।
(২) ওস্তাদ্ ইশা। রাজমিস্ত্রি। আগ্রার অধিবাসী।
(৩) ওস্তাদ্ পীর্-সা। সূত্রধর। দিল্লী অধিবাসী।
(৪-৬) বান্নুহর, জাটমল, ঝোরাওয়ার, ভাস্কর। দিল্লীর অধিবাসী।
(৭) ইসমাইল খাঁ রুমী। গম্বুজ-নির্ম্মাতা।
(৮) রামমল কাশ্মিরী। উদ্যান-নির্ম্মাতা।

## সায়েস্তা খাঁর কীর্ত্তি

বাংলার সুখ-শান্তি ও প্রাচুর্য্যের সঙ্গে সায়েস্তা খাঁর নাম বিজড়িত। প্রতিদিন আট টাকা মণের চালের ভাত খেতে খেতে মনে হয় যে এমন একটা সময় ছিল যখন ঐ টাকায় একটা গ্রামকে ভোজ দেওয়া যেত। সায়েস্তা খাঁর নানা কীর্ত্তির মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি সর্ব্বপ্রধান:—

(১) তিনিই বাংলাদেশকে পর্ত্তুগীজ জলদস্যুদের অমানুষিক অত্যাচারের হাত থেকে রক্ষা করেন। এই সমস্ত জলদস্যুদের হাঙ্গামায় বাংলার জনসাধারণের জীবন অশান্তিতে ভরে আসে। চাটগাঁ দখল করে তিনি বাংলাদেশ থেকে এই হাঙ্গামা বিতাড়িত করে বাংলার তদানীন্তন প্রত্যেক নর নারীর কৃতজ্ঞতা ভাজন হয়েছিলেন।

(২) প্রজাদের অভাব অভিযোগ শোনবার জন্য তিনি প্রত্যহ প্রত্যক্ষ ভাবে দরবারে আসতেন। পাছে বিচারের অমর্য্যাদা হয় সেই আশঙ্কায় তিনি অসুস্থ হলেও দরবারে অনুপস্থিত হতেন না।

(৩) সায়েস্তা খাঁর পূর্ব্বে চাষী অথবা কারিকরেরা বড় বড় মহাজনদের হাতের মুঠোর মধ্যে ছিল। এই সমস্ত মহাজনেরা প্রায়ই রাজদরবারের লোক হত। দেশের উৎপন্ন জিনিষ তারা সস্তাদরে চাষাদের কাছ থেকে কিনে নিয়ে এক চেটিয়া ব্যবসা করতো এবং প্রায়ই ক্রেতাদের বহু উচ্চহারে সেই সমস্ত জিনিষ কিনতে হত। এই উপায়ে দেশের সাধারণ দরিদ্র লোকেরাই—হয় ক্রেতা না হয় বিক্রেতা রূপে—নানারূপ অসুবিধা ভোগ করত। সায়েস্তা খাঁ এই একচেটিয়া ব্যবসা আইন করে তুলে দেন এবং তাতে দেশের সর্ব্বসাধারণের মধ্যে জীবনযাত্রা অত্যন্ত সহজ হয়ে আসে।

(৪) অন্যান্য প্রদেশের ব্যবসাদারেরা নৌকা করে বাংলার বন্দরে বিক্রীর জন্যে হাতী কিংবা অন্য কোনও জানোয়ার আনলেই বন্দরের কর্ত্তা অধিকাংশ সময় সেই সমস্ত মাল কোর্ক করে আপনার খুসী মত দর দিয়ে কিনতো। এতে করে বহির্বাণিজ্যের অসুবিধা হয়। সায়েস্তা খাঁ এই প্রথা তুলে দেন।

(৫) নিজস্ব জায়গীরের পরগণাতে নির্দ্দিষ্ট সংখ্যার বেশী কর সংগৃহীত হলে তিনি উদ্বৃত্ত অর্থ চাষাদের ফিরিয়ে দিতেন।

(৬) সেই সময় কি হিন্দু, কি মুসলমান, কেউ যদি অন্য প্রদেশ থেকে বাংলায় আসতো, ব্যবসা কিংবা পর্য্যটনের জন্য, প্রত্যেকের নিকট থেকে তাদের আয়ের এক চতুর্থাংশ ভাগ গ্রহণ করা হত। মহাপ্রাণ সম্রাট আলমগীর এই প্রথাকে মোগল সাম্রাজ্য থেকে উচ্ছেদ করবার জন্য চেষ্টা করেন। বাংলাদেশে সায়েস্তা খাঁ আলমগীরের এই আদর্শকে কার্য্যে পরিণত করেছিলেন।

(৭) সায়েস্তা খাঁ অত্যন্ত দানশীল ছিলেন। প্রতিদিন প্রভাতে তিনি স্বয়ং বহু আতুর লোকদের আবেদন শুনতেন এবং তৎক্ষণাৎ তার প্রতিকার করতেন। অনেক সময় তিনি পথ হতে বহু লোক নিমন্ত্রণ করে এনে এক সঙ্গে আহার করতেন। রাজ্যের চারিদিকে তিনি আতুর-আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। প্রবাদ আছে সায়েস্তা খাঁর দানের দৌলতে সে সময় পয়সা দিয়ে মুটে মজুর পাওয়া দুর্লভ ছিল।

(ক্রমশঃ)

# বীর-সোলতানা *

[ আবছুল কাদের ]

১৫৯৫ খৃষ্টাব্দ ভারতের ইতিহাসে এক অতি স্মরণীয় বৎসর। সেই বৎসর দাক্ষিণাত্যের বিখ্যাত মোসলেম-রাজ্য আহ্‌মদনগরের অপ্রাপ্ত বয়স্ক নরপতি বাহাতুর নিজাম শাহের অভিভাবিকা চাঁদ সুলতানার অপূর্ব্ব বীরত্বের কথা সমগ্র ভারতে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়ে।

মোগল-সম্রাট আকবর পানিপথের মহা-সমরে পাঠান-সম্রাটের সেনাপতি হিমুকে পরাজিত করিয়া উত্তর ভারত হইতে পাঠান সাম্রাজ্যের অস্তিত্ব বিলুপ্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু ইহাতেও তাঁহার তৃপ্তি সাধন হয় নাই। দাক্ষিণাত্য হইতে পাঠানদিগকে বিতাড়িত করিয়া তথায় স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করাই তাঁহার শেষ জীবনের কাম্য হইয়া দাঁড়াইল। তিনি শুধু সুযোগের প্রতীক্ষায় রহিলেন। সুযোগও শীঘ্রই উপস্থিত হইল। আহ্‌মদনগর রাজ্যের কতিপয় সম্রান্ত ব্যক্তি কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া সম্রাট আকবর দাক্ষিণাত্যে সৈন্য প্রেরণ করিলেন। ১৫৯৫ খৃষ্টাব্দে আকবরের পুত্র যুবরাজ মুরাদ সম্রাটের আদেশে গুজরাট হইতে এবং সেনাপতি মির্জ্জা খাঁন মালব হইতে দক্ষিণাভিমুখে সসৈন্যে অগ্রসর হইলেন। আহ্‌মদনগর হইতে অল্প দূরে উভয় সৈন্যদল পরস্পরের সহিত সম্মিলিত হইল। শত সহস্র মোগল সৈন্য পঙ্গপালের ন্যায় আহ্‌মদনগর ছাইয়া ফেলিল।

আহ্‌মদনগরের তখন অতি দুরবস্থা। রাজ্য তখন প্রকৃত পক্ষে রাজ-শূন্য। রাজা দ্বিতীয় বুরহান তখন পরলোকে। নাগরিকেরা তখন বিভিন্ন দলে বিভক্ত হইয়া আত্ম-কলহে নিমগ্ন। প্রত্যেক দলপতিই স্বার্থপরতার বশবর্ত্তী ও স্বদেশ-প্রেম বিস্মৃত হইয়া স্বয়ং সিংহাসন অধিকারের জন্য প্রাণপণে চেষ্টিত। এইরূপ অবস্থায় চতুর্দ্দিকে শত্রু পরিবেষ্টিত আহ্‌মদনগরের প্রতি মুহূর্ত্তেই স্বাধীনতা নষ্টের আশঙ্কা ঘনীভূত হইয়া আসিতেছিল। এমন সময় আহ্‌মদনগরবাসীর সৌভাগ্য বশতঃ এক বীরাঙ্গনার আবির্ভাবে চির-স্বাধীন আহ্‌মদনগরের স্বাধীনতা অব্যাহত রহিল। এই বীর-বালা ইতিহাসে চাঁদ বিবি বা চাঁদ সোলতানা নামে প্রসিদ্ধা। স্বকীয় জন্মভূমির এবম্বিধ শোচনীয় অবস্থা প্রত্যক্ষ করিয়া তিনি তৎপ্রতীকারে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইলেন। স্বরাজ্যে ত গৃহ-বিবাদ লাগিয়াই ছিল। তদুপরি বিজাপুর রাজ্যের সহিত পূর্ব্ব হইতেই আহ্‌মদনগরের যুদ্ধ চলিতেছিল। রাজনীতিজ্ঞা সোলতানা দেখিলেন, মোগলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে হইলে বিজাপুরকে হয় স্বপক্ষ ভুক্ত নতুবা যুদ্ধে নিরস্ত রাখিতে হইবে। তাহা না হইলে এই উভয় শত্রুর বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার চেষ্টা করা সম্পূর্ণ অসম্ভব। তজ্জন্য তিনি বিজাপুরে দূত প্রেরণ করিয়া বিজাপুর রাজকে বুঝাইয়া দিলেন যে, উপস্থিত বিপদ একা আহ্‌মদনগরের নহে; সম্রাট আকবর শুধু আহ্‌মদনগর জয় করিতে সৈন্য প্রেরণ করেন নাই। বিপদ সমগ্র মোস্‌লেম দাক্ষিণাত্যের। এমতাবস্থায় বিজাপুর রাজের পক্ষে আহ্‌মদনগরের শত্রুতাচরণ করা আর স্বপদে কুঠারাঘাত করা একই কথা। বিজাপুরাধিপতি চাঁদ সোলতানার যুক্তি উপলব্ধি করিলেন। চাঁদ সোলতানার অসাধারণ বুদ্ধি-কৌশল কার্য্যকরী হইল। বিজাপুর-রাজ পূর্ব্ব শত্রুতা বিস্মৃত হইয়া আহ্‌মদনগরের সহিত মৈত্রী বন্ধনে আবদ্ধ হইলেন। এমন কি তিনি তাঁহার পূর্ব্ব শত্রু আহ্‌মদনগরের সাহায্যার্থে একদল সৈন্য প্রেরণ করিতেও কুণ্ঠিত হইলেন না। অতঃপর এই অসামান্যা বুদ্ধিমতী মহিলা স্বরাজ্যের

---

* চাঁদ বিবি আহমদ নগরের অধিপতি হোসায়ন নিজাম শাহের কন্যা। বিজাপুর-রাজ আদিল শাহের সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। পঞ্চবিংশ বৎসর বয়ঃক্রম কালে তিনি অপুত্রক অবস্থায় স্বামী-হারা হন। তৎপরে কতিপয় বৎসর বিজাপুর রাজ্যের শৃঙ্খলা-বিধানে অতিবাহিত করিয়া তিনি পিতৃরাজ্যে আগমন করেন। ঐ সময়ের একটা ঘটনাই এই প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়।—লেখক।

বিবাদানলে শান্তিবারি প্রক্ষেপ করিয়া উহা নির্ব্বাপিত করিতে চেষ্টা করিলেন। এক্ষেত্রেও তাঁহার চেষ্টা সাফল্য-বিমণ্ডিত হইল। তদীয় অক্লান্ত চেষ্টা, অকাট্য যুক্তি ও অনুপম বুদ্ধি কৌশলে আহ্‌মদনগরের বিবাদমান শক্তি সমূহও স্বদেশের স্বাধীনতার জন্য প্রাণপণে যুদ্ধ করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইল। নগরের বাহিরেও তাঁহার যুক্তিবত্তার অনুরূপ ফল ফলিল। জনৈক দেশদ্রোহী দলপতি সোলতানার যুক্তিতে ভ্রম বুঝিতে পারিয়া এতদূর অনুতপ্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, মোগলেরা যখন নগর অবরোধে ব্যাপৃত ছিল, তখন তিনি পরাক্রান্ত মোগলবাহিনী ভেদ করিয়া সসৈন্যে নগরে প্রবেশ করিলেন। নগরের বাহিরে অবস্থান করিয়া আরও দুইজন দলপতির হৃদয়েও আত্মগ্লানির সঞ্চার হইয়াছিল। তাঁহারা সদলবলে বিজাপুর-রাজ প্রেরিত যে সৈন্যদল আহ্‌মদনগরের সাহায্যার্থ আগমন করিতেছিল, তাহাদের সহিত সম্মিলিত হইয়া মোগল বিতাড়নে বদ্ধপরিকর হইলেন। বীর মহিলা চাঁদ সোলতানা স্বয়ং নগরস্থ শক্তি সমূহের নেতৃত্ব গ্রহণ পূর্ব্বক জগতের তদানিন্তন শ্রেষ্ঠ রাজশক্তির বিরুদ্ধে রণাঙ্গনে অবতীর্ণা হইলেন।

মোগল সৈন্য নগর অবরোধ করিয়া রহিল। কিন্তু সু-উচ্চ প্রাচীর অতিক্রম করিয়া নগরে প্রবেশ করিতে পারিল না। তাহাদের দুর্গ-ধ্বংস যন্ত্রসমূহও সেই গভীর প্রাচীরের কোন ক্ষতি সাধন করিতে সমর্থ হইল না। নিরুপায় হইয়া তাহারা ভূগর্ভে সুড়ঙ্গ খনন পূর্ব্বক বারুদের সাহায্যে প্রাচীর ভগ্ন করিয়া নগর-প্রবেশ পথ বাহির করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। তাহারা দেওয়ালের নিম্নদেশে যে দুইটী সুড়ঙ্গ খনন করিয়াছিল, চাঁদ সোলতানার প্রহরিগণের সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে উহা আবিষ্কার হইয়া গেল। বীর সোলতানা স্বয়ং শ্রমিকদের অধিনায়কত্ব গ্রহণ করিয়া নিজের জীবন সমভাবে বিপন্ন করতঃ মোগলদের চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া দিলেন। * কিন্তু মোগলেরা ইহাতে নিরুৎসাহ হইল না। তাহারা নবীন উদ্যমে অন্যত্র সুড়ঙ্গ খনন করিয়া ফেলিল। এই সুড়ঙ্গ খনন-বার্ত্তাও চাঁদ বিবির সতর্ক প্রহরীবৃন্দের অগোচর রহিল না। মোগলদের কার্য্যে বাধা প্রদানের জন্য ঘটনাস্থলে সৈন্য প্রেরিত হইল। তাহারা সর্ব্বশক্তি সহকারে স্বকার্য্যে প্রবৃত্ত হইল; কিন্তু তাহাদের চেষ্টা সফল হইল না। চাঁদ বিবির যে সমুদয় সৈন্য সুড়ঙ্গ মুখে অবস্থান করিয়া সুড়ঙ্গ খনন ব্যর্থ করিবার চেষ্টায় নিরত ছিল, তাহারা মোগলের কামানের গোলার মুখে তুলার ন্যায় উড়িয়া গেল। মোগল বাহিনী নগর প্রাচীরের এক বৃহৎ অংশ ভগ্ন করিয়া ফেলিল। এতদ্দর্শনে সোলতানার সৈন্যগণ অত্যন্ত ভীত হইয়া স্থান ত্যাগ করতঃ পলায়ন করিয়া নগর প্রবেশোদ্যত মোগল সৈন্যগণের প্রবেশ পথ উন্মুক্ত করিয়া দিবার উপক্রম করিল! আহ্‌মদনগরের স্বাধীনতা সূর্য্য অস্তাচলে গমন করিতে বসিল!

সৈন্যগণের এই ভীষণ দুরবস্থা সন্দর্শন করিয়া বীরবালা চাঁদ সোলতানার বীর-হৃদয়ে ক্রোধাগ্নি প্রজ্জলিত হইয়া উঠিল। পরাধীন জীবন যাপন অপেক্ষা যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রু হস্তে মৃত্যুবরণ তাঁহার নিকট সহস্র গুণে শ্রেয়স্কর বলিয়া মনে হইল। তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন, হয় আহ্‌মদনগরের স্বাধীনতা অব্যাহত রাখিবেন; নতুবা মোগলের অস্ত্রাঘাতে আত্মবিসর্জ্জন করিবেন। এই প্রতিজ্ঞা করিয়া চাঁদ বিবি বর্ম্ম পরিধান পূর্ব্বক অবগুণ্ঠনে মুখ-মণ্ডল আবৃত করতঃ যাবতীয় অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া উলঙ্গ কৃপাণ হস্তে স্বয়ং সুড়ঙ্গ মুখে উপনীতা হইলেন। তাঁহার তীব্র ভৎসনা বাক্যে পলায়নোদ্যত সৈন্যগণ ঘটনাস্থলে প্রত্যাবর্ত্তন করিল। যে সমুদয় মোগল সৈন্য ভগ্ন স্থান দিয়া নগরে প্রবেশ চেষ্টা করিতেছিল, চাঁদ বিবি স্বয়ং অসীম সাহস ও অতুলনীয় বীরত্ব সহকারে তাহাদিগকে তরবারী মুখে নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। স্বয়ং সোলতানাকে শত্রু দলনে প্রবৃত্তা দেখিয়া নগরের যে সমুদয় সৈন্য তখনও যুদ্ধে বিরত ছিল, তাহারাও লজ্জিত হইয়া যুদ্ধস্থলে আসিল এবং প্রবল উৎসাহে শত্রু সংহার করিতে লাগিল। ফলে মোগলদের নগর প্রবেশ চেষ্টা ব্যর্থ হইল। ‡ কিন্তু চাঁদ বিবি ইহাতেও নিরস্ত হইলেন না।

* ... they were rendered useless by the counterminers of the besieged, Chand Bibi herself superintending the workmen, and exposing herself to the same dangers as the rest,"

Elphinstone's "History of India", 512.

‡ "But they were soon recalled by Chand Bibi, who flew to the breach in full armour, with a veil over her face, and a naked sword in her hand; and having thus checked the first assault of the Moguls, she continued her exertions till every power within the place was calledforth against them,"

Vide, Elphinstone's "History of India", pages 512.

তিনি মোগলদিগকে ভগ্ন স্থান হইতে দূরে বিতাড়ন করিতে দৃঢ়-সঙ্কল্প করিলেন। তাঁহার জলন্ত উৎসাহ বাক্যে আহ্মদ নগরের সৈন্তগণ যেন দৈববলে বলিয়ান হইয়া পূর্ণ উদ্যমে প্রাণপণে বিপক্ষ-সৈন্ত-শোণিতে স্ব স্ব তরবারি রঞ্জিত করিতে লাগিল। চাঁদ সোলতানা স্বহস্তে বন্দুক ধারণ করিয়া শত্রু সৈন্তের উপর গুলিবৃষ্টি করিতে লাগিলেন! যখন গুলি নিঃশেষিত হইয়া গেল, তখন তিনি ক্রমাগত তাম্র, রৌপ্য এবং স্বর্ণমুদ্রা বন্দুকে পুরিয়া মোগল সৈন্তের প্রতি নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন! যখন উহাও নিঃশেষিত হইয়া গেল, তখন এই স্বাধীনচেতা বীর-নারী এমন কি স্বকীয় বহুমূল্য মনিময় গাত্রালঙ্কার পর্য্যন্ত বন্দুকে পুরিয়া দুর্দান্ত মোগল-বাহিনীর উপর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন! *

ক্রমে সূর্য্যদেব অস্তাচলাবলম্বী হইল এবং সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিল। বহুক্ষণব্যাপী ভীষণ লোমহর্ষক ও বহুলোক ক্ষয়-কর যুদ্ধের পর মোগলেরা সন্ধ্যাকালে যুদ্ধক্ষেত্র পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইল। রাত্রি প্রভাত হইবার পূর্ব্বে তাহারা আর আক্রমণের চেষ্টা করিল না। কিন্তু চাঁদ সোলতানার আরাম 'হারাম' করিয়াছিলেন। তিনি নিদ্রা যাওয়া দূরের কথা, সমগ্র দিবসের রণ-ক্লান্তি অপনোদনের জন্ত এক মুহূর্ত্তও বিশ্রাম না করিয়া স্বহস্তে ইষ্টক আনয়ন করতঃ ভগ্ন স্থানে রাখিয়া দিতে লাগিলেন। বীর সোলতানার অনুপম দৃষ্টান্ত দর্শনে সৈন্তগণ এতদূর উৎসাহিত হইল যে, তাহারাও বিশ্রাম সুখের আশা বিসর্জ্জন দিয়া ইষ্টকাদি আনয়ন করতঃ রাত্রি মধ্যেই ভগ্নস্থান পুনর্নির্ম্মাণ করিয়া ফেলিলেন। প্রাতঃকালে মোগলেরা দেখিতে পাইল যে, প্রাচীরের ভগ্নস্থান এত উচ্চ করিয়া পুনর্নির্ম্মিত হইয়াছে যে, পুনরায় সুড়ঙ্গ খনন করিয়া উহা ভঙ্গ করাও সহজ সাধ্য নহে। এতদ্দর্শনে মোগলেরা অবাক্ হইয়া গেল।

মোগলেরা বীরের জাতি। অর্দ্ধ-এশিয়া-বিজয়ী বীরবর তৈমুরের শোণিত মোগল সেনাপতির শিরায় শিরায় প্রবাহিত। সৈন্তাধ্যক্ষ যুবরাজ মুরাদ পাঠান বিধ্বংসী মহামনা সম্রাট আকবরের বীরপুত্র। সৈন্তে মুরাদের বীর-হৃদয় এই "বীর-সোলতানার" অশ্রুতপূর্ব্ব বীরত্ব ও স্বদেশের স্বাধীনতা-রক্ষার্থে অসাধারণ আত্মত্যাগ দর্শনে বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইলেন। চাঁদ সোলতানার প্রতি তাঁহাদের অন্তঃকরণ ভক্তি ও সহানুভূতিতে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। এইরূপ স্বাধীনচেতা বীর-নারীর বিরুদ্ধে সংগ্রাম পরিচালনা করা তাঁহাদের নিকট ঘোর অন্যায় বলিয়া বোধ হইল। মোগলেরা তখনও সংখ্যায় অধিক ছিল, কিন্তু তাহারা আর যুদ্ধ করিল না। উভয় পক্ষে সন্ধি স্থাপিত হইল এবং মোগল সৈন্ত আহ্মদ্ নগর হইতে প্রস্থান করিল, এইরূপে একজন রাজ-কুল-সম্ভূতা বীর-নারীর অপূর্ব্ব বীরত্বে আহ্মদ্ নগরের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রহিল। ‡

ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীর সন্ধিক্ষণে এইরূপ বীরাঙ্গণার জন্মগ্রহণে মোসলেম-ভারত গৌরবান্বিত হইয়াছিল। ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে ভারতের মোসলেম-ললনা এইরূপ স্বাধীনতা-মন্ত্রে দীক্ষিতা ছিলেন। কিন্তু এক্ষণে ঘটনাচক্র বিঘূর্ণিত হইয়া গিয়াছে। পরাধীনতার কঠোর-নিগড়ে আবদ্ধ করিয়া মোসলেম পুরুষগণই তাঁহাদের বীরত্ব হারাইয়া ফেলিয়াছেন; সঙ্গে সঙ্গে নারীজাতির বীরত্বও অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছে। কে বলিবে, কবে ভারতের সেদিন আসিবে—কবে আবার স্বাধীন ভারতের স্বাধীনা নারী ষোড়শ শতাব্দীর এই বীর সোলতানার ন্যায় যুদ্ধক্ষেত্রে বিচরণ করিয়া জগতের বিস্ময় উৎপাদন করিবে?

---

* "... when her (Chand Sultana's) shot was expended, she loaded hers guns successively with copper, with silver, and with gold coin, and that it was not till she had begun to fire away jewels."

Vide Elphinston's "History of India," pages 512.

‡ "... though the Moguls were still superior in the field, they were unwilling of a battle; ... and both partes were well satisfied to come to terms."

Vide, Elphinstone's "History of India," pages 512.

# নারী-হরণ

( পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর )

[ মোহাম্মদ শাহ্‌জাহান ]

( ৯ )

গ্রামের সকলেই যখন শুনিল যে, জমিদার পক্ষ মিটমাটের প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিয়াছে, তখন তাহারা আরও চিন্তিত হইয়া পড়িল। কিন্তু চিন্তা দেখিয়া ত অত্যাচার চলিয়া যায় না! বরং অত্যধিক অত্যাচারে মানুষ যখন কেবলই হা হুতাশ করে, তখন অত্যাচারের উপর অত্যাচার আসিয়া তাহাকে ক্রমাগতই জর্জ্জরিত করিতে থাকে।

মাস তিনেকের মধ্যে দরিয়াপুরের চেহারা একেবারে পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। মামলা মোকদ্দামা করিবার সামর্থ্য আর কাহারও রহিল না। ফলে এখন হইতে সমুদয় মোকদ্দমাই একতরফা বিচার হইতে লাগিল। ডিক্রিতে ডিক্রিতে গ্রামটী যেন গিলিয়া ফেলিল। যাহাদের অবস্থা অপেক্ষাকৃত ভাল ছিল, তাহারাও প্রথম ধাক্কা সামলাইয়া এখন অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে। নানাবিধ ডিক্রীর দেনায় প্রত্যেকের অস্থাবর—তৈজস, গরু, ছাগল সমস্তই আদালতে নিলাম হইতে লাগিল। পরে বাসগৃহ, ক্ষেতের ফসলও নিলাম হইল। অবশেষে যখন কিছুই থাকিল না, তখন স্থাবর সম্পত্তি ক্রোক বিক্রয় হইতে লাগিল।

এ দিকে প্রজারাও একতাবদ্ধ হইয়া কেহ অপরের কোন সম্পত্তিই খরিদ করিল না—খরিদ করিবার অর্থও তাহাদের ছিল না। এই কারণে জমিদার পক্ষেরও ক্ষতি হইল। কারণ, অস্থাবর সম্পত্তি গ্রাস করিয়া জমিদার কিছু টাকা পাইলেন বটে, কিন্তু স্থাবর জমাজমি গুলি কেহই নিলাম খরিদ বা বন্দোবস্ত হইল না।

খাস খামার জমি কেন বে-বন্দোবস্তে পড়িয়া আছে সদর হইতে মফস্বল কর্ম্মচারীর নিকট তাহার কৈফিয়ত তলব হইল। কর্ম্মচারী প্রজাগণের বিদ্রোহ ও অন্যান্য কথা সদরে জানাইলেন। সদর হইতে উপদেশ আসিল, "ভেদ-নীতি চালাও।"

সে দিন কৃষ্ণপক্ষের দ্বাদশী। নৈশ-আঁধারে গ্রামখানি ডুবু ডুবু। নীরব নিথর গভীর রজনীর বক্ষ ভেদ করিয়া হঠাৎ বহু লোকের কোলাহলে মকবুলের ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। মকবুল দেখিল তাহার বাড়ীখানা উজ্জ্বল আলোকে আলোকিত হইয়া গিয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে মকবুলের জননী চীৎকার করিয়া বলিলেন, "মকবুল ওঠ্ ত রে! বামুন পাড়ার দিকে যেন আগুন হ'য়েছে।" মকবুল লাফাইয়া উঠিল।

বৃদ্ধ দয়াল ঠাকুর সে দিন বাড়ী ছিলেন না। নায়েব মহাশয় আবার তাঁহাকে ডাকাইয়া লইয়া গিয়াছেন। কিন্তু আজ তাঁহার সে দিনের মত মেজাজ ছিল না। কোন কুহকী যেন তাহা একান্তই মোলায়েম করিয়া দিয়াছে! সেই দিনের সেই মিথ্যা কুৎসা কথাটার জন্য নায়েব মহাশয় যেন যথার্থই অনুতপ্ত! কতকগুলি অতি গুরুতর আলোচনা রাত্রিতে শেষ হইবে বলিয়া অনিচ্ছা সত্ত্বেও দয়াল ঠাকুরকে সেখানে রাত্রি বাস করিতে হইয়াছে।

দয়াল ঠাকুর কিন্তু নেহায়েত দায় না ঠেকিলে কোন দিনই কোন স্থানে রাত্রি যাপন করেন না। এক মাত্র বয়স্থা বিধবা কন্যাকে একাকিনী রাখিয়া তিনি অন্যত্র থাকিতে সাহসী হন না। কিন্তু আজ তিনি গ্রামবাসীদের মঙ্গলার্থে ও নায়েবের আশ্বাসে বাড়ীর চিন্তা ভুলিয়া গিয়াছেন। বিশেষতঃ তাঁহার গুরুদেব পণ্ডিত বিশ্বানন্দ স্বামী কয়েক দিন পূর্ব্বে তাঁহার বাড়ীতে পদধুলি দিতে আসিয়া আজও শিষ্যের উপর কৃপা বিতরণ করিতেছেন। কাজেই কন্যার জন্য দয়াল ঠাকুরের আজ আদৌ চিন্তা ছিল না।

মকবুল আসিয়া দেখিল, দয়াল ঠাকুরের খড়ো বাড়ীখানা চতুর্দ্দিক হইতে আগুনে ঘিরিয়া ফেলিয়াছে। গ্রামের অন্যান্য লোক সাধ্যমত দরিদ্র ব্রাহ্মণের বাড়ীখানা অগ্নি-গ্রাস হইতে রক্ষা করিবার বৃথা চেষ্টা করিতেছিল। গভীর

রাত্রি বলিয়া অনেকে যথাসময় আসিতে না পারায় বিপদের মাত্রা এত বৃদ্ধি হইয়া পড়িয়াছে।

দক্ষিণ-দ্বারী অর্গলবদ্ধ ঘরের দ্বারে সজোরে পদাঘাত করিয়া মকবুল বুঝিল বাহির হইতে দরজার শিকল দেওয়া আছে। ঘরে কি কেহ নাই? করুণা করুণা করিয়া চীৎকার করিয়া ঘরের মধ্যে কাহারও সাঁড়া পাইল না। শিকল খুলিয়া অগ্নি আলোকে মকবুল যাহা দেখিল তাহাতে নিমেষে সে কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় হইয়া পড়িল। মকবুল দেখিল, দরজার সম্মুখে মাটির উপর করুণার মুর্চ্ছিত দেহ লুণ্ঠিত। আলুথালু স্খলিতবসনা করুণার অপরূপ লাবণ্যমাখা জ্যোতির্ম্ময়ী মূর্ত্তির দিকে মকবুল চাহিয়া দেখিবার অবসর পাইল না। কে যেন তাহার দেহের ভিতর একটা জাগ্রত তাড়িত-শক্তি প্রবাহিত করিয়া দিল! করুণার জ্ঞানশূন্য দেহ সাপটাইয়া ধরিয়া মকবুল ঘর হইতে বাহির হইয়া পড়িল। এমন সময় সশব্দে দগ্ধিভূত গৃহখানা পড়িয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে একটা অগ্নি-পিণ্ড মকবুলের পৃষ্ঠের উপর সজোরে ছিট্‌কিয়া পড়াতে সে আর্ত্তনাদ করিয়া করুণাকে লইয়া পড়িয়া গেল।—কতক্ষণ সে অজ্ঞান ছিল তাহা সে জানে না। কিন্তু যখন তাহার জ্ঞান হইল তখন সে সরকারী হাসপাতালে শয্যাশায়ী। সকল কথাই তাহার মনে পড়িল।

পরদিন মকবুল অবগত হইল যে, সে মাত্র হাসপাতালের রোগী নহে—নারী-হরণ অপরাধে সে আসামীও বটে।

( ১০ )

শিষ্যের অনুপস্থিতে গুরুদেব বৃথা কাল হরণ করিতে পারিলেন না। তিনি নিজেই পুলিসে এজাহার দিলেন যে, তাঁহার শিষ্য দিন দয়াল চট্টোপাধ্যায় বাড়ীতে না থাকায় সেই সুযোগে দুর্ব্বৃত্ত মকবুল কতিপয় দুষ্ট লোকের সহযোগে করুণাকে হরণ করিবার উদ্দেশ্যে ঘরে আগুন দিয়া তাহাকে লইয়া পালাইতেছিল। কিন্তু স্বয়ং ব্রহ্মা সতীর সতীত্ব রক্ষা করিয়া আসামীকে ধৃত করিয়াছেন!

কথাটা শুনিয়া মকবুল স্তম্ভিত হইয়া পড়িল। কি ভয়ঙ্কর ষড়যন্ত্র এ! নিজের জীবন বিপন্ন করিয়া যাহাকে সে রক্ষা করিয়াছে, তাহার এই প্রতিদান! এমন জঘন্য মিথ্যা অভিযোগ মানুষের দ্বারা সম্ভব হয়? মকবুল আর ভাবিতে পারিল না।

মকবুলের অন্তরে যে তুফান উঠিয়াছে তদপেক্ষাও ভীষণ তুফানে দয়াল ঠাকুরের অন্তর বিক্ষুব্ধ হইতেছিল। যে পিতৃহীন শিশুকে তিনি পক্ষ আবরণে রক্ষা করিয়া শত্রুর সমস্ত আক্রমনই ব্যর্থ করিয়া দিয়াছিলেন, সেই অরুতজ্ঞ মকবুল কাল ভুজঙ্গরূপে তাঁহাকে আজ যে তীব্র দংশন করিল, তাহাতে যে কতবড় যন্ত্রণা, তাহা মাত্র তিনিই বুঝিলেন। মানুষের হৃদয় কোন্ উপাদানে গঠিত তাহা ভাবিয়া ভাবিয়া তিনি ক্ষিপ্ত প্রায় হইয়া উঠিলেন। হায় প্রচ্ছন্ন পাশব শক্তি! তোমার কি মহিমা!

করুণা যখন বলিল যে, সে প্রথম জাগরিত হইয়া দরজার অর্গলমুক্ত করিয়া বুঝিল বাহির হইতে শিকল বন্ধ আছে, তখন সে আরও ভয় পাইয়া পড়িয়া যায় এবং যখন তাহার জ্ঞান হইল তখন সে দেখিল মকবুল তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া আছে, তখন হইতে দয়াল ঠাকুরের ব্রহ্ম তেজোদীপ্ত আঁখি দিয়া কেবলই তীব্র অভিশাপ মকবুলের উপর পতিত হইতেছিল।

সাক্ষীর অভাব হইল না। নায়েব মহাশয় প্রমাণ দিলেন, ঘটনার দিন দয়াল ঠাকুর জমিদারের কাছারিতে ছিলেন। গুরুদেব নায়েবের কথা সমর্থন করিলেন এবং তিনি ঘটনা স্বচক্ষে দেখিয়াছেন বলিলেন! আরও কতকটা নগদ মূল্যের সাক্ষীও যোগাড় হইল। সকলেই মকবুলকে বদলোক বলিয়া জানে এবং সে যে একটা ভীষণ গুণ্ডা সাক্ষীরা তাহাও বলিল। আজও মকবুল নির্ব্বাক-চিত্তে সমস্তই শুনিল। তাহার স্বজাতীয় কয়েকজন লোক তাহার দুরবস্থা দেখিয়া মাত্র মর্ম্মাহত হইল। চাষা মানুষ তাহারা! এ নিবিড় ষড়যন্ত্র-জাল ছিন্ন করিবার ক্ষমতা তাহাদের ছিল না।

মকবুলের বিশ্বাস ছিল, করুণা কখনই তাহাকে সন্দেহ করিবে না। কিন্তু তাহার সাক্ষ্য গোপনে লিপিবদ্ধ হওয়ায় সে কি বলিল না না বলিল, মকবুল তাহা কিছুই জানিতে পারিল না।

ঘটনা সত্য বলিয়া পুলিশ রিপোর্ট দিলেন। যথা সময় মহকুমা হাকিমের নিকট মোকদ্দমা দায়ের হইল।

দয়াল ঠাকুর আপাততঃ বাড়ীখানা আর সংস্কার করিলেন

না। এই মুসলমান-সংখ্যা-গরিষ্ঠ স্থানের উপর তাঁহার আর মমতা ছিল না। যাহাদের মঙ্গল কামনায় তিনি একটা প্রবল জমিদারের অত্যাচার নিবারণ কল্পে জীবন পাত করিবেন ইচ্ছা ছিল, সে অকৃতজ্ঞ মানবগুলির উপর তাঁহার একটুও শ্রদ্ধা নাই।

গুরুদেব তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া বড় বড় নামজাদা হিন্দুদের দ্বারে দ্বারে ঘুরিতে লাগিলেন। সংবাদ পত্রে এই নারী-হরণ ব্যাপার লইয়া তুমুল আন্দোলন আরম্ভ হইল। অথচ গুরুদেব যে কাহার মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া মুসলমানের এই সমুচিৎ শাস্তির যোগাড় করিতেছেন, দয়াল ঠাকুর সে গূঢ় রহস্য কিছুই জানিতে পারিলেন না। কিন্তু সে কথা যাঁহার নিকট গোপন ছিল না তিনিও যেন হৃষ্টচিত্তেই সমস্তই সহ্য করিতেছিলেন।

গুরুদেব বলিলেন, "বাবা! চলো একবার কাশী যাই।"

"এখন থাক গুরুদেব! টাকা নেই হাতে।"

"টাকার অভাব হবে না। এই বাইশ কোটী হিন্দু থাকতে যদি এ সব অনাচারের প্রায়শ্চিত্তটাও না হয় তবে হিন্দুধর্ম্মের অস্তিত্ব থাক্‌বেনা। কিন্তু সনাতন হিন্দুধর্ম্ম ত চিরদিনই থাক্‌বে বাবা!" গুরুদেবের কথায় দয়াল ঠাকুরের আঁখি দুইটী অশ্রুসিক্ত হইয়া উঠিল। তিনি কোন কথা না বলিয়া এমন বিশ্বপ্রেমিক গুরুর পদধূলি মাথায় লইলেন।

পরামর্শদাতাগণ করুণাকে আপাততঃ কোন নিরাপদ স্থানে রাখিবার সুযুক্তি দিলেন। ঠিক হইল, প্রায়শ্চিত্ত অন্তে করুণা অন্যত্রে থাকিবে। মোকদ্দমা শুনানির সময় আসিলেই চলিবে।

গুরুদেবের ঐকান্তিক চেষ্টায় মাখনা ষ্টেট এই মোকদ্দমার ভার গ্রহণ করিতে সম্মত হইলেন এবং যাহাতে প্রাথমিক বিচারের জন্য মামলাটা সেই বৈদেশিক হাকিমের আদালত হইতে কোন হিন্দু ডিপুটীর হস্তে ন্যস্ত হয়, তজ্জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা চলিতে লাগিল।

( ১১ )

মন্দির প্রাঙ্গনে অকস্মাৎ অতুল বাবুর সহিত স্বামীজির সাক্ষাৎ হওয়ায় স্বামীজি শীঘ্র কথা বলিতে পারিলেন না। নিজেকে অনেকখানি সামলাইয়া তিনি বলিলেন, অনেক দিন পরে সাক্ষাৎ হ'ল বাবা! কবে এসেছ এখানে? সর্ব্বাঙ্গিন মঙ্গল ত?" অতুল বাবু তখন গুরুদেবের পদরেণু মাথায় লইতে ব্যস্ত ছিলেন। তাড়াতাড়ি সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, "আর মঙ্গলামঙ্গল কি গুরুদেব! সর্ব্বনাশের কথা সমস্তই জানেন বোধ হয়!"

অতুল বাবুর শোক-কথা এখানেই বন্ধ করিবার জন্য স্বামীজি তাড়াতাড়ি বলিলেন, "মানুষের বড় ভুল এখানেই হয় অতুল বাবু! শোক-তাপ দুঃখ-দৈন্য, আর সুখ-সম্পদ একই পর্য্যায়ের জিনিস। জ্ঞানী যাঁরা তাঁহারা উহাতে কোনই পার্থক্য দেখেন না। যাক, ও এখনকার কথা নয়। কবে এসেছ এখানে?"

"পরশু—কোথায় আছেন আপনি?" গুরুদেব হাসিয়া বলিলেন, "স্থানের ত অভাব নাই বাবা! ভগবান যখন যেখানে নিয়ে যাচ্ছেন সেখানেই থাকি। একটা ধর্ষিতা ব্রাহ্মণ কন্যার প্রায়শ্চিত্তের জন্য আপাততঃ কাশীতে আস্‌তে হ'ল, শীঘ্রই অন্যত্র যাব।"

না জানি কোন হতভাগিনীর উপর কি ভীষণ অত্যাচার হইয়াছে ভাবিয়া অতুল বাবু বলিলেন, "কে সে অভাগিনী গুরুদেব? কোথায় আছে সে?"

"এক আশ্রয়হীনা দরিদ্র ব্রাহ্মণ কন্যা বাবা! ব্রাহ্মণটী মাখনা-রাজের প্রজা। রাজষ্টেটের অনুরোধে আমাকেই মোকদ্দমার যোগাড় করতে হচ্ছে। মোকদ্দমাটী এখনও বিচারাধীন। শীঘ্রই তাকে নিয়ে দেশে ফির্‌ব। কিছুদিনের জন্য আমাদের আশ্রয় দাও বাবা!"

স্বামিজীর কথায় অতুল বাবু ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "এ আর বেশী কথা কি গুরুদেব! নিয়ে আসুন তাঁকে ১০৩নং গণেশ মহল্লায় আছি আমরা। কিন্তু মাখ্‌না রাজের প্রজা বলে আমার কাছে পরিচয় না দেওয়াই ভাল ছিল। আপনার চপলা তাঁদের উপর আর কোন দাবীই আর রাখে না। কি হবে আর বিষয় সম্পত্তি! চপলার দুর্দ্দশাটা স্বচক্ষে দেখ্‌লে সবই বুঝবেন গুরুদেব! আমি যে তাকে কোন সান্ত্বনাই দিতে পারিনে" বলিয়া অতুল বাবু রুমালে চোখ মুছিলেন।

কন্যার বৈধব্য-দশা দেখিয়া অতুল বাবুর মনে এত বড় বিষয় বৈরাগ্য জন্মিয়াছে, স্বামীজির তাহা ধারণা ছিল না। অতুল বাবু হঠাৎ তেমন ঈপ্সিত কথা বলায় স্বামীজি স্বস্তি অনুভব করিলেন। তিনি যে জন্য অতুল বাবুর সাক্ষাতে

প্রথমতঃ অপ্রস্তুত হইয়াছিলেন, সে প্রসঙ্গটাই অতুল বাবু আমল দিতে চান না, এমন কি তিনি যে স্বামীজির উপর কোন সন্দেহ করিয়াছেন, এমনও বোধ হইল না। স্বামীজি হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলেন।

শ্যামলেন্দ্রের চরম-পত্র বা জাল উইলে স্বামীজি সাক্ষী ছিলেন। স্বামীজির আশঙ্কা ছিল, এই কারণে অতুল বাবু তাঁহার উপর কতই না অসন্তুষ্ট হইয়াছেন। কিন্তু অতুল বাবু সে প্রকৃতির লোকই নহেন। উইল সম্বন্ধে অনুসন্ধান লওয়া দূরের কথা, উহার কোন আলোচনা করাও তাঁহার নিকট একান্তই ইতর কাজ। গুরুদেবকে লইয়া অতুল বাবু ট্যাক্সিতে আরোহন করিলেন।

স্বামীর মৃত্যুর পর চপলার স্বভাব আশ্চর্য্যরূপে পরিবর্ত্তন হইয়া পড়ে। স্বামী-হত্যার প্রতিশোধ-স্পৃহার পরিবর্ত্তে তাহার জীবনের উপর একটা উৎকট-ধিক্কার আসে।

চপলার সহিত করুণার শীঘ্রই ঘনিষ্ঠতা জন্মিয়া গেল। শুধু নিরাভরণা ও শুভ্রবসনা বলিয়াই এই বিধবা যুবতীদ্বয়ের মধ্যে সমভাব সৃষ্টি হয় নাই। একজন ধনী আর একজন দরিদ্র দুহিতা হইলেও তাহাদের মধ্যে একটা অতি বড় অভিসম্পাত আসিয়া উভয়ের ভেদ-রেখা মুছিয়া দিয়াছিল। প্রায় সমবয়সী এই বিধবাদ্বয়ের মানব জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ হারাইয়া যাওয়ায় তাহারা আর নিসম্বল জীবনের উচু নীচু দেখিল না।

নির্জ্জনে পাইয়া চপলা করুণাকে বলিল,—"তোমার নাম কি ভাই?"

"করুণা"

"তুমি কি জন্য এসেছ দিদি?"

"প্রায়শ্চিত্ত করতে"

"কি পাপ ছিল? কাওকে হত্যা করেছ?"

"না ভাই পারিনি!"

"তাকে হত্যা করা তোমার ইচ্ছা ছিল না বুঝি? ভালবাস তাকে?" চপলার কথা শুনিয়া করুণার বক্ষের স্পন্দন যেন থামিয়া গেল। কে এই অদ্ভুত নারী! তাহার জীবনের অতি গুঢ় গভীর রহস্য ব্যঙ্গচ্ছলে জ্যোতির্ব্বিদের ন্যায় অসঙ্কোচে প্রকাশ করিয়া দিতেছে? করুণা ভাবিয়া পাইল না। কিন্তু সেত জানে না যে, চপলা তাহার নিজের অতীত কাহিনীটা করুণাকে উপলক্ষ মাত্র করিয়া অভিমান ভরে বলিয়া যাইতেছে। করুণাকে নিরুত্তর দেখিয়া চপলা বলিল,—"কিন্তু যদি ভাল না বাস, তবে খুন কর্‌লে না কেন বোন?"

করুণার কথা ফুটিল। সে বলিল, "কি বল্‌ছেন আপনি? আমি ত কাওকে ভালবাসিনে!"

"অথচ তার অমঙ্গল চিন্তা করতেও চাও না?"

"কার অমঙ্গল কর্‌ব দিদি! সে আমার সর্ব্বনাশ করেছে, কি আমি তার সর্ব্বনাশ কর্‌ছি, তাই যে আমি মীমাংসা কর্‌তে পার্‌ছিনে। কেমন করে বুঝ্‌ব—কি উদ্দেশ্য ছিল তার!"

করুণার কথা শুনিয়া চপলা বুঝিল যে, করুণা আর সে ঠিক একই অবস্থায় পড়ে নাই। কথাটা ভাল ভাবে বুঝিবার জন্য তাহার কৌতুহল বাড়িল। করুণাকে সে চাপিয়া ধরিল যে, সমস্ত কথা সে না শুনিয়া ছাড়িবে না। চপলার জেদ দেখিয়া করুণা বলিল, "গুরুজীর কাছে শুনো।"

এই অপরিচিতাকে পাইয়া কন্যার মন বেশ প্রফুল্ল হইয়াছে ইহাতে চপলার মা করুণার উপর একটু প্রসন্ন হইলেন। করুণার দিকে চাহিয়া তিনি বলিলেন,—"দিব্বি মেয়েটী! তা বাছা তোমারও কপাল পুড়ে গেছে দেখ্‌ছি! ভগবানের বিধান মা ওতে কাহারও আপত্তি উঠ্‌তে পারে না। তোমার নাম কি মা?"

করুণা কোন কথা না বলিতেই চপলা বলিল, "ওঁর এক এক নাম করুণা, আর এক নাম ত কি?" বলিয়া করুণার দিকে অর্থ পূর্ণ দৃষ্টিতে চাহিতেই করুণা চপলার হাতে ঈষৎ চাপ দিয়া চপলার মাতাকে প্রণাম করিয়া বলিল, "আমি আশ্রয়হীণা দরিদ্র ব্রাহ্মণ কন্যা মা!"

নিজের মনে যে গভীর শোক সদাই জাগিতে থাকে করুণাও সেই দুঃসহ শোকের মূর্ত্ত আলেখ্য জানিয়া চপলার মাতার মনের রুদ্ধ যাতনা সহসা উথলিয়া উঠিল। ছলছল নেত্রে তিনি বলিলেন,—"সবই কর্ম্মফল মা! কিন্তু তাই বলে ত চির জন্মের শাস্তি নয়। একটা জন্ম না হয় ব্যর্থই গেল! এ জন্মে সত্যবাদিনী ও শুদ্ধচারিণী হও মা, পরজন্মে সীতা সাবিত্রী হবে।"

এই মাতৃসমা রমণীর শেষ কথায় করুণা হঠাৎ চমকাইয়া উঠিল। "শুদ্ধচারণী" ও "সত্যবাদিনী" এই দুইটী কাজের একটারও দাবী সে করিতে পারে কিনা, এই মৌন-প্রশ্নের

কোন সদুত্তরই সে পাইল না। তবুও তাহার মনে হইল অজ্ঞানকৃত পরপুরুষের স্পর্শ-অপরাধে হয়ত তাহার দেহের পবিত্রতা নষ্ট হয় নাই, কিন্তু সেত সত্যবাদিনী নয়। জীবনে বোধ হয় এই সর্ব্ব প্রথম সে মকবুলের বিরুদ্ধে কয়েকটা মিথ্যা কথা অন্যের প্ররোচনায় বলিয়াছে। গুরুজী তাহাকে আরও কত কি মিথ্যা কথা বলিবার জন্য পিড়াপিড়ী করিতেছেন। অথচ মকবুল তাহাকে হরণ করিতে আসিয়াছিল কি তাহার প্রাণ বাঁচাইতে আগুণের মধ্যে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছিল, ইহা সে এখনও বুঝিতে পারে নাই। করুণা আর ভাবিতে পারিল না।

পরদিন গুরুদেব অতুল বাবুকে সমস্তই খুলিয়া বলিলেন এবং এই সমস্ত ধরণের মোকদ্দমা মিথ্যাই হউক আর সত্যই হউক, ইহাতে প্রত্যেক হিন্দুর সাহায্য করা যে খুবই কর্ত্তব্য, এক কথা তিনি শাস্ত্র বচন দ্বারা বুঝাইয়া দিলেন। হিন্দু-কুল-রত্ন মাখনার রাজা প্রজাদের মধ্যে ভেদনীতি পরিচালিত করিয়া প্রকৃত পক্ষে হিন্দুরই উপকার করিয়াছেন—একথা বুঝাইতে যাইয়া তিনি বলিলেন, "দেখ বাবা! এই যে বৎসর বৎসর বহু হিন্দু-বিধবা ভিন্ন ধর্ম্মে আশ্রয় নিচ্ছে, এটা রোধ করতে হ'লে এই রকম পন্থাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। মুসলমান যখন বুঝবে যে, হিন্দু বিধবা বিবাহ করা নিরাপদ নয় এবং হিন্দু বিধবাও জানবে, মুসলমান হওয়ার অপরাধ হিন্দু সমাজ নীরবে সহ্য করবে না, তখনই হিন্দু বিধবার এই ধর্ম্মান্তর গ্রহণ প্রথা চিরতরে বন্ধ হবে।"

কিন্তু স্বামীজির যুক্তিপূর্ণ বক্তৃতায় অতুলবাবু মুগ্ধ হইলেন না। তিনি বলিলেন,—"কথাটা আত্মরক্ষা হিসাবে সাময়িক ভাবে কার্য্যকরী হ'তে পারে। কিন্তু অন্যায়রূপে চিরদিন এই ভাবে নির্য্যাতন চালানো নিশ্চয় অসম্ভব। ভিতরের কথা যতই প্রকাশ হ'বে, ততই মন্দ ফল!

"কাহাকে অন্যায় বলছেন অতুল বাবু! হিন্দু ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে, আর আমরা শুধু ন্যায়-নীতি নিয়ে নিশ্চিন্ত থাকছি। মনে রাখবেন কাঁটা তুলতে হয় কাঁটা দিয়ে।"

অতুল বাবু স্বামিজীর কথার কোন উত্তর দিতে পারিলেন না। কিন্তু এই সমস্ত আলোচনা হইতে তিনি বুঝিলেন, করুণা সত্যই ধর্ষিতা নহে। একটা মিথ্যার বোঝা তাহার ঘাড়ে চাপাইয়া তাহার দ্বারা হিন্দুত্ব রক্ষা করা হইতেছে।

কিন্তু এ অত্যাচার কাহিনী তিনি গোপন করিতে পারিলেন না। মাখনা-রাজের পীড়ন নীতি কত জঘন্য, তাহা তিনি সেই দিন গৃহিনীকে সমস্তই বলিলেন। করুণাকে মায়া-মৃগ রূপে সাজাইয়া তাহার যায় প্রজাদের মধ্যে আত্মকলহের সৃষ্টি করা কত ঘৃণিত কর্ম্ম, ইহা শুনিয়া গৃহিনীও দুঃখিত হইলেন।

সন্ধ্যার রঙিন ছায়া গঙ্গার অপরপার হইতে সিন্দুর-রঞ্জিত কুলবধূর মত ঘোমটা খুলিয়া প্রেমাস্পদের অপেক্ষায় আলু থালু বেশে এলাইয়া পড়িয়াছে। দিগন্ত পথ সেই অপূর্ব্ব শোভায় উদ্ভাসিত। এমন সময় হাসিতে হাসিতে আসিয়া চপলা বলিল, "ওগো সুন্দর বনের বাঘ! তুমি মানুষের সংস্রবে কেন? বনে যাও।"

"কেন, আমি ত এখনও নররক্ত খাইনি! যেতে হয় তুমিই যাও!" বলিয়া করুণা কষ্টকষ্টে হাসি সম্বরণ করিল। চপলা ঢিলটা ছুড়িয়া পাটকেল আঘাতে আহত হইল না। সে বীরাঙ্গনার মতই বলিল, "কিন্তু ব্যাঘ্রটী যখন শিকারীর কবলে পড়বার উপক্রম হয়, তখন সে নিজের বিপন্ন-জীবন রক্ষার্থে শিকারীর ঘাড় ভেঙ্গে রক্তপান করলে দোষ হয় না। তাই বলে অন্যায় করে একটা নিরপরাধ জীবনকে হত্যা করাও মানুষের কাজ নয়। বুঝলেত বাঘা দিদি!"

"ছাই বুঝলুম"—

"কেন, এই যে একটা মিথ্যা মোকদ্দমায় ফেলে নিজের জীবন রক্ষা কারীকে হত্যা করতে যাচ্ছ, আর এই সব ভণ্ডামি প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা তোমার হিংস্র-নখরগুলি আরও শানিয়ে নিচ্ছ!—কেন এ করছ তুমি?"

"কে বললে? তোমার মনগড়া কথা এ।"

"না গো না, তোমাদের হিন্দু ধর্ম্মের পতন দেখে যাঁদের প্রাণ আকুল হয়েছে, সেই দলের অন্যতম নেতা স্বামিজী স্বয়ং বাবার কাছে এ সমস্ত কথা বলেছেন।"

নিশ্বাস বন্ধ করিয়া করুণা বলিল,—"কি বলেছেন তিনি?"

"বলেছেন, মাখনাষ্টেটের বিদ্রোহী প্রজার মধ্যে দলাদলি সৃষ্টি করা এই মোকদ্দমার পরোক্ষ উদ্দেশ্য এবং হিন্দু-বিধবার প্রাণে ভীতি সঞ্চার করা হইবে প্রত্যক্ষ নীতি।"

"এ মোকদ্দমা তবে মিথ্যা?"

"মিথ্যা নয়ত কি সত্য? যে লোকটী নিজপ্রাণ বিপন্ন করে তোমাকে রক্ষা করলে তার প্রতিদান তুমি দিচ্ছ তাকে জেলে দিয়ে—যাকে দেওয়া উচিৎ ছিল তোমার এই অপ্রয়োজনীয় জীবনটা।" বলিয়া চপলা সহসা করুণার গলা বেষ্টন করিয়া বলিল,—"এত বড় অন্যায় করোনা দিদি!" বাহু বন্ধনীর মধ্যে তখন করুণা কি ভাবে পুড়িতেছিল—চপলা তাহা বুঝিতে পারিল না।

(ক্রমশঃ)

# চীনের স্বাধীনতার সমর

[ শেহাবুদ্দীন আহম্মাদ ]

বহুকাল আগেকার কথা। তখন য়ুরোপের বনে জঙ্গলে বন্য জন্তুদের সহিত নগ্নাবস্থায় মানুষ ঘুরিয়া বেড়াইত—সেই সময় এশিয়ায় চীন-সভ্যতা আত্ম-বিকাশ করে। এই সভ্যতার সমবয়সী জগতে এখন দুই একজন আছে মাত্র অথবা নাই বলিলেও চলে। বর্ত্তমান সভ্যতার বহু উপাদান প্রাচীন চীন জগৎকে উপহার দিয়াছিল। তাহার বিনিময়ে সে ক্রমে ক্রমে যাহা পাইতেছিল—তাহার প্রসার প্রতিরুদ্ধ না হইলে চীনকেও ভারতের মত কবরের ফাটা-মাটীর উপর বসিয়া আকাশের দিকে চাহিয়া থাকিতে হইত। চীনের এত বড় গৌরবের জীবন কেমন করিয়া ধীরে ধীরে অসহায় দুর্ব্বলতার মধ্যে আত্মবিলুপ্ত হইয়া যাইতেছিল — তাহারই কাহিনী এখানে সামান্য ভাবে বলিতে চেষ্টা করিব এবং এই কাহিনী শোনায় আমাদের লাভ আছে। কারণ যে বেদনায় আজ চীন কাঁদিতেছে, সেই একই বেদনায় ভারত মুমূর্ষু। চীনের সৌভাগ্য যে তাহার অন্তরের স্পন্দন থামিয়া যাইবার পূর্ব্বেই খোদা তাহার মুক্তির জন্য এমন কয়েকজন লোককে পাঠাইয়াছিলেন যাহারা আত্মাহুতি দিয়া চীনকে আজ স্বাধীন করিয়া দিয়া যাইতে পারিয়াছেন। চীনের এই স্বাধীনতা লাভের উৎসবে আমাদেরও সাধ যায় উচ্চকণ্ঠে জয়গান গাই—কিন্তু গাহিতে গিয়া চোখ অশ্রুতে ভরিয়া আসে—আমাদের গাহিবার অধিকার নাই। বুঝি বা ভারতের অন্তরের স্পন্দনও থামিয়া গিয়াছে।

চীনের নব জন্ম-দাতা সান-ইয়াৎ-সেন

প্রাচীন চীনের ইতিহাস বিবৃত করিবার এখানে কোনও বিশেষ প্রয়োজনীয়তা নাই। তবে এইটুকু জানা দরকার যে শত শত বৎসর ধরিয়া চীন আপনার একচ্ছত্র সম্রাটের অধীনে স্বাধীন ভাবে জীবন যাপন করিয়া আসিতেছিল এবং বহির্জগতের জীবনের ধারার সঙ্গে তাহার কোনও যোগ ছিল না। বাহিরের জগতের সঙ্গে যোগ রাখাকে তাহারা কোনও দিন প্রয়োজনীয় বলিয়া বোধ করে নাই। এমন কি চীনেরা বিদেশীদের বর্ব্বর বলিয়া ঘৃণা করিত। কোনও দিন বিদেশীয়দের আক্রমণও ভোগ করিতে হয় নাই।

বহুশত বর্ষ ধরিয়া চীন আপনার মনে আপনার স্বাধীনতা ভোগ করিয়া আসিতেছিল। এই আভ্যন্তরিক শান্তি ও বহির্জগতের সহিত একান্ত নির্লিপ্ততার দরুণ চীন একদিকে যেমন জ্ঞান ও বিজ্ঞানের সাধনায় অতি উচ্চ স্তরে উঠিয়াছিল—তেমনি নিষ্ক্রিয় ও অলস হইয়া উঠিতেছিল। জাতির দেহ-শক্তি কমিয়া আসিতেছিল। এমন কি মধ্য যুগে সৈন্যরা সকলে কৃষি-জীবন যাপন করিয়া শান্ত গৃহী হইয়া উঠে। বর্ত্তমানযুগের প্রারম্ভে জলপথ আবিষ্কার হওয়ার পর যখন পশ্চিমের অন্য জাতিদের সঙ্গে চীনের দেখা সাক্ষাৎ হইল তখন চীন নির্জীব, নিস্তেজ, বৈজ্ঞানিক যন্ত্র শক্তিতে দীক্ষিত পশ্চিমের নিকট চীন নিতান্ত অপদার্থ বলিয়া মনে হইল। চীনের সঙ্গে বর্ত্তমান য়ুরোপীয়দের মিলন ও সংঘর্ষের ফলে চীন যুগ-মগ্ন নিদ্রার মোহ কাটাইয়া সভয়ে দেখিল সে ঘরে বাইরে বন্দী। বর্ত্তমান চীনের স্বাধীনতার সমর সেইখান থেকেই সূত্রপাত হয়।

মিসেস্ সান-ইয়াৎ-সেন
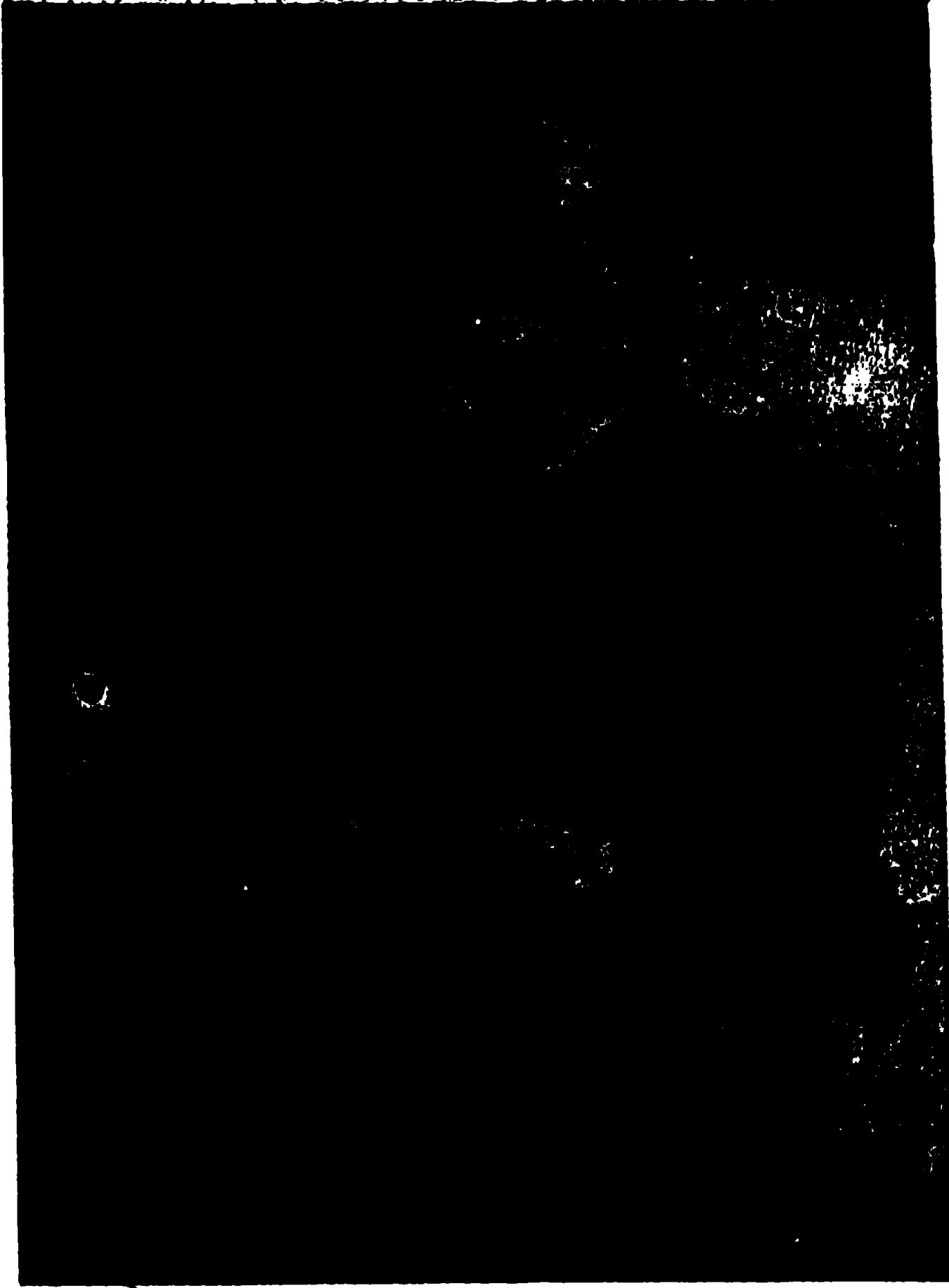
উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে য়ুরোপে বিজ্ঞানের উন্নতির ফলে কল-কব্জার সংখ্যা ভয়ানক বাড়িয়া যায়। কল-কব্জাকে চলিতে হইলে তেল ছাড়া আর একটী বিশেষ প্রয়োজনীয় জিনিষ লাগে—সেটী হইতেছে কাঁচা মাল। মাঞ্চেষ্টারের কাপড়ের কলকে ভাল ভাবে চলিতে হইলে রীতিমত তূলোর সরবরাহ দরকার অথচ ইংলণ্ডে তূলো জন্মায় না। সেই জন্য ইংলণ্ডের এমন দেশের প্রয়োজন যেখানে প্রচুর পরিমাণে তূলো জন্মায়। সেই রকম অন্যান্য ব্যবসায় ও নানা প্রকারের কাঁচা মালের প্রয়োজন। য়ুরোপে কল-কব্জার যুগ প্রতিষ্ঠা হওয়ার দরুণ য়ুরোপীয় জাতিরা যে সমস্ত দেশে কাঁচা মাল পাওয়া—তাহার সন্ধানে বাহির হইল। য়ুরোপ এশিয়ায় আসিয়া দেখিল যে এখানকার মাটীতে সোণা। সেই সোণার লোভে য়ুরোপ এশিয়ায় উপনিবেশ স্থাপন করিতে লাগিল। এই সমস্ত উপনিবেশ স্থাপনের আর একটী বিশেষ প্রয়োজনীয়তা আছে। কল-কব্জার সৃষ্টির ফলে জিনিষ বেশী করিয়া তৈয়ারী হইতে আরম্ভ হইল। যত বেশী জিনিষ উৎপন্ন হয় কারখানার মালিকের ততই সুবিধা। এবং এক সঙ্গে বেশী জিনিষ উৎপাদন না করিলে কারখানা টিকে না। এখন এই সমস্ত উৎবৃত্ত জিনিষ কে কিনিবে? য়ুরোপের কলে যে সমস্ত জিনিষ তৈয়ারী হইল তাহার বিক্রয়ের জন্য তো বাজার চাই! য়ুরোপ নিবীর্য্য এশিয়ার দিকে চাহিয়া দেখিয়া বুঝিল য়ুরোপের বাণিজ্যের মস্ত বড় বাজার পড়িয়া রহিয়াছে। শুধু কোনও রকমে বাজার অধিকার করিয়া বসা। য়ুরোপ তাহার বিজ্ঞানশালা হইতে বাছা বাছা আগ্নেয়াস্ত্র লইয়া এশিয়ায় বাজার প্রতিষ্ঠা করিতে আসিল। পলাশীর আম্রবনের অন্তরালে ভারতের সূর্য্য ডুবিয়া গেল। চীনের শান্ত জীবনের পাত্রে বিষ ভরিয়া উঠিল। এই খানে সেই কাহিনীই বলিব শুধু।

১৮০৪ সালে ইংলণ্ডের রাজা তৃতীয় জর্জ্জ চীন-সম্রাট কিয়ান্ লুঙকে এক পত্র লিখিয়া রাজদূত পাঠান। তখন নেপোলিয়নের অভ্যুদয়ের ফলে ইংলণ্ড ফরাসী জাতির উপর ভয়ানক বিদ্বেষ পোষণ করিত। চীনে ফরাসীদের পথ-রোধ

করিবার মানসেই সেই পত্র লেখা হয়। * অত্যন্ত বিনয় ও একান্ত নম্রতার সহিত সেদিন ইংলণ্ডের রাজা লিখিয়াছিলেন যে, ফরাসী জাতিদের মধ্যে নেপোলিয়ান নামে এক অতি দুর্বৃত্ত বিদ্রোহী উঠিয়াছে—চারিদিকে সে বিদ্রোহ জাগাইয়াছে; অতএব তাহার জাতির কাহাকেও যেন চীনে ব্যবসা করিতে না দেওয়া হয়।

চীন সম্রাটরা তখন ভাবিতেন যে সারা বিশ্বের মালিক তাঁরা। চীনের বাইরে সকলেই অসভ্য আর বর্ব্বর। তাই সেদিন চীন-সম্রাট গম্ভীর ভাবে উত্তর দিয়াছিলেন—"সাগরের ওপারে থাকিয়াও তুমি যে চীন-সম্রাটের মহত্ত্ব ও প্রভুত্ব স্বীকার করিয়া ভক্তি ও শ্রদ্ধার উপহার পাঠাইয়াছ তাহা পাইয়া চীন-সম্রাট খুসী হইয়াছেন। * * * কিন্তু অন্য আর এক জাতির ব্যবসা প্রতিরোধের জন্য তুমি যাহা লিখিয়াছ তাহার সম্বন্ধে মহামহিম চীন-সম্রাট বলেন যে সে প্রার্থনা অন্যায়। চীন-সম্রাট উদার এবং তিনি সকল জাতির লোকদের উদার অনুকম্পার চোখে দেখেন। অতএব তোমার প্রার্থনা গ্রাহ্য হইবে না।" চীন-সম্রাট ভাবিয়াছিলেন যে জগৎ তখন ও শৈশব অবস্থায় আছে। চীন-সম্রাট যতখানি উদার ছিলেন ঠিক ততখানি যদি তাঁহার জগৎ সম্বন্ধে জ্ঞান থাকিত, তাহা হইলে তিনি ঐ প্রকার চিঠি লিখিতে পারিতেন না। ইংরাজদের আর যাহাই দোষ থাকুক, অধ্যবসায় নাই ইহা কেহই বলিতে পারিবে না। ইংরাজরা অবশেষে একমাত্র ক্যান্টন শহরে বাণিজ্য করিবার অধিকার পাইল। ক্যান্টনে তখন ফরাসী, ওলন্দাজ জাতিরাও আসিয়া জুটিয়াছে।

জাতীয় দলের সেনাপতি চ্যাং-কাই-সেক

চা লইয়া ব্যবসা সুরু হয়; অবশেষে আফিঙ্গে গিয়া দাঁড়াইল। যাঁহারা নিত্য কমলাকান্ত শর্ম্মার মত অহিফেন সেবন করেন, তাঁহারা জানিয়া রাখুন যে চীনের সমস্ত গণ্ডগোল, যুদ্ধ-বিগ্রহের মূলে ছিল—অহিফেন। চীনরা আফিংখোর জাতি বলিয়া জগতে নিন্দিত। কিন্তু চীন আফিংখোর জাতি ছিল না। বিদেশীরা চীনে আফিং ঢুকাইয়া চীনের চোখে তন্দ্রা আনিয়া দিয়াছিল। অবশ্য ষষ্ঠ খৃষ্টাব্দ হইতে চীনে অহিফেন ব্যবহৃত হইত; কিন্তু সে একেবারে ঔষধ হিসাবে। প্রথমে ১৬৫০ সালে জাভার ওলন্দাজ উপনিবেশ হইতে অহিফেন নেশার রূপ ধরিয়া চীনে প্রবেশ করে। চীন সম্রাটের প্রতিবাদ সত্ত্বেও পর্ত্তুগীজরা প্রথম চীনে আফিং আমদানী করে। ১৭৭৩ সাল হইতে ধীরে ধীরে ইংরাজরা চীনে আফিঙ্গের ব্যবসা আরম্ভ করে। এবং কয়েক বৎসরের মধ্যে চীন ইংরাজের আফিঙ্গে ভরিয়া গেল। চীনের ঘরে ঘরে আফিঙ্গের নেশা প্রবেশ করিল চীন সম্রাটের বহু হুমকি সত্ত্বেও আফিঙ্গের ব্যবসা চলিতে লাগিল। ১৮৩৯ সালে চীন ইংরাজের মারফৎ এক বৎসরে ৩,৩২০,২৮০ পাউণ্ড আফিং আমদানী হয়। † ১৮৩৯ সালে চীন সম্রাট যে কোনও প্রকারে আফিঙের ব্যবসা বন্ধ করিবার হুকুম জারী করেন। "আফিঙ চীন সৈন্যকে নষ্ট করিয়াছে—এবং অচিরেই দেশের শিক্ষিত সকলকেই করিবে।" * তারপর চীনে অহিফেন ব্যবসায়ীদের নির্য্যাতন আরম্ভ হয়। বন্দরে জাহাজ আটকাইয়া অহিফেন কাড়িয়া লওয়া হয় এবং ইংরাজদের উপর নির্য্যাতন করা হয়। ক্রমশঃ এই সংঘর্ষ গড়াইতে গড়াইতে ১৮৪০
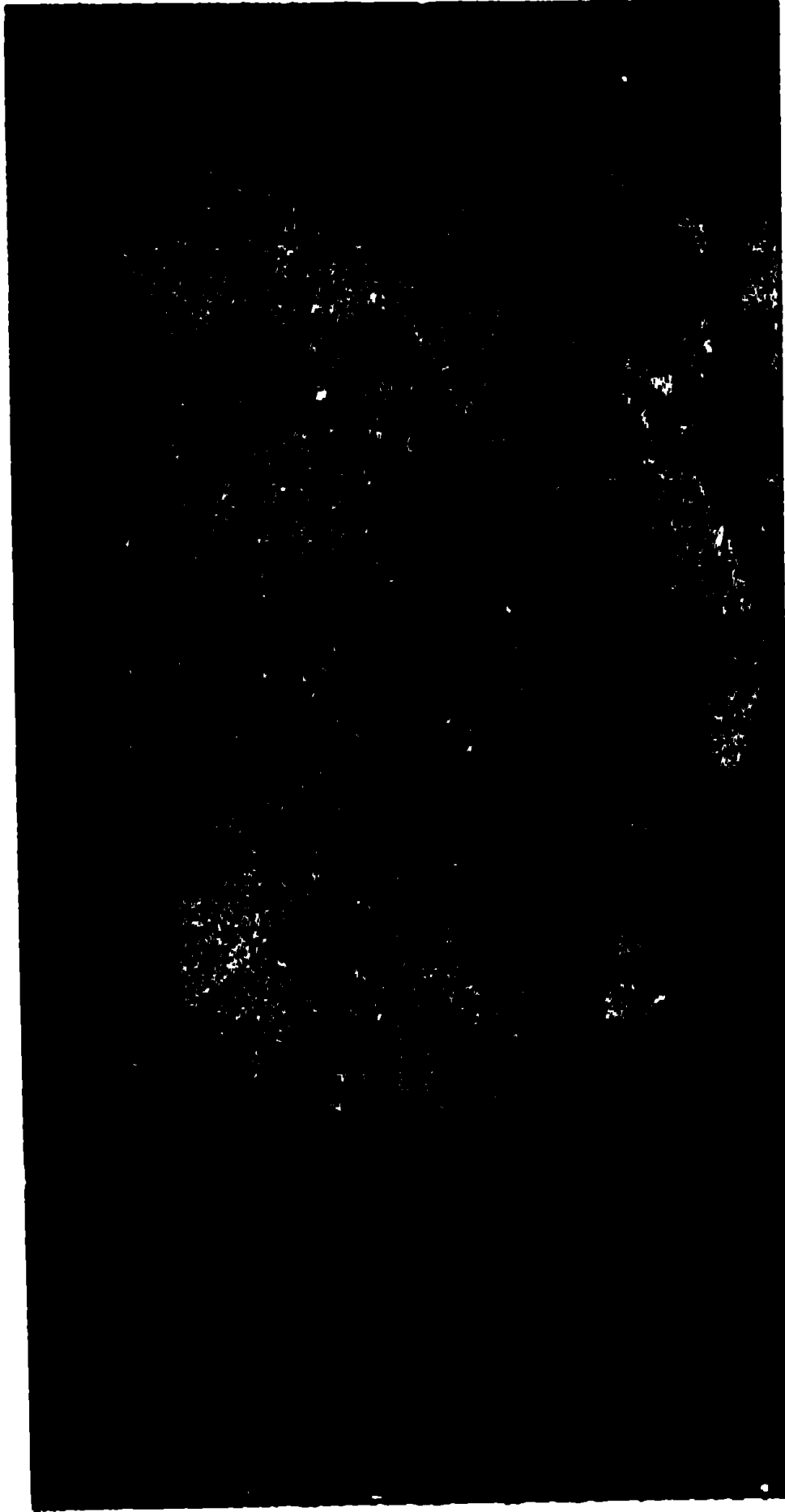
---

* China and the West—Sooth hill.

† Ching tin sia's Studies in Chinease Diplomatic History. * Wong's China and the Nations.

সালে যুদ্ধে পরিণত হয়। এই যুদ্ধের নামই বিখ্যাত অহিফেন যুদ্ধ। ( The opium war. )

চীন এই যুদ্ধে পরাজিত হয় এবং এই পরাজয়ের ফল স্বরূপ বিদেশীদের অনুজ্ঞা মত চীনের যে সর্ত্তে সন্ধি করিতে হয় তাহাই চীনের বর্ত্তমান অসন্তোষের মূল কারণ। এবং এই সর্ত্তের সুড়ঙ্গ পথ দিয়া বিদেশীরা চীনে তাহাদের দাবী প্রতিষ্ঠা করিল। বিদেশীদের মধ্যে ইংরাজ, আমেরিকান ও ফরাসীরাই প্রধান। আজ চীন জাতীয় দল বিদেশীদের যে সমস্ত অন্যায় দাবীর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতেছে তাহা এই পরাজয়েই প্রতিষ্ঠিত হয়। চীনের বর্ত্তমান অবস্থা বুঝিতে হইলে এই সমস্ত সর্ত্তের বিষয় জানা একান্ত প্রয়োজন।

(১) এই সর্ত্তের ফলে হংকং ইংরাজদের অধিকারে আসে।

(২) ক্ষতিপূরণ স্বরূপ দু' কোটী দশলক্ষ পাউণ্ড ইংলণ্ডকে দিতে হইবে। নতুবা ইংরাজ রণ-পোত চীন-বন্দর ত্যাগ করিবে না।

(৩) চীনকে Open door policy গ্রহণ করিতে হইবে। আগে বিদেশীদের চীনে বাণিজ্য করিবার কোনও অধিকার ছিল না। Open door policy মানে চীনের বন্দরে বিদেশীদের বাণিজ্য করিবার অবাধ অধিকার দিতে হইবে।

(৪) Extraterritoriality-এই দাবীর অর্থ হইতেছে বিদেশীদের আত্মরক্ষার জন্য এই সমস্ত বন্দরের খানিকটা অংশ বিদেশীদের শাসনে থাকিবে। চীনে বিদেশীদের উপর চীন-আইন প্রয়োগ চলিবে না। এবং বিদেশীদেরা আত্ম-রক্ষার জন্য আপনাদের আইন-আদালত ও সৈন্য-সামন্ত ব্যবহার করিতে পারিবে।

(৫) বাণিজ্য বিষয়ে কর-নির্দ্ধারণে চীনের একক প্রভুত্ব থাকিবে না। দেশজ-শিল্প ও বাণিজ্যকে বিদেশী প্রতি-যোগীতার হাত হইতে রক্ষা করিবার জন্য বিদেশী আমদানীর উপর উচ্চহারে যে কর ধার্য্য করা হয় তাহার নাম Protective Tariff অতঃপর চীন আপনার দেশজ-বাণিজ্য রক্ষার হেতু আর সংরক্ষণ আইন রাখিতে পারিবে না। এই সর্ত্তের ফলে বিদেশী মাল চীনা বাজার ছাইয়া ফেলে এবং দেশজ কুটীর শিল্পের সমূহ ক্ষতি করে।

অহিফেন যুদ্ধের পরাজয়ের ফলে চীনে বিদেশীদের দাবী রীতিমত ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইল। অহিফেন যুদ্ধের পর ক্রমান্বয়ে চীনের বন্দরে বন্দরে ইংরাজদের সঙ্গে ছোটখাটো যুদ্ধ চলিতে লাগিল। Arrow নামে একখানি ইংরাজ জাহাজ ১৮৫৬ সালে ১৮ই অক্টোবর গোপনে আফিং আমদানী করার অপরাধে ধরা পড়ে এবং জাহাজের সমস্ত যাত্রীদের বন্দী করা হয়। এই ব্যাপার লইয়া ইংরাজরা উত্তেজিত হইয়া উঠে এবং তাহারা ক্যান্টন শহর আক্রমণ করে। চীনারাও ক্যান্টনে ইংরাজদের কারখানায় আগুন ধরাইয়া দেয়।

এই সূত্রে যে যুদ্ধের আয়োজন হয়, তাহাকেই Arrow war বলা হয়। বলাবাহুল্য এই যুদ্ধেও চীন পরাজিত হয় এবং চীনের অন্যান্য বন্দর ও নগর বিদেশীদের অধিকারে গিয়া পড়িল। ধীরে ধীরে চীনের অভ্যন্তরে পরাধীনতার কাল-ছায়া আসিয়া পড়িতেছিল। চীনের উপকূলে উপকূলে বাণিজ্যের অধিকারের দাবী করিয়া বিদেশীরা ক্রমশঃ স্থায়ী উপনিবেশ স্থাপন চেষ্টা করিতে লাগিল। এ ধারে মাঞ্চু-রাজশক্তি দিন দিন হীনবল হইয়া আসিতেছিল এবং চীন রাজ-কর্ম্মচারীরা সামান্য ঘুষের লোভে বিদেশীদের সঙ্গে যে কোনও হীন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইতে দ্বিধা বোধ করিত না। এই সময় চীনের চারিদিকে জনসাধারণের মধ্যে বিদ্রোহের বীজ অঙ্কুরিত হইয়া উঠিতেছিল। মাঞ্চু-রাজের দুর্ব্বলতার সহায় লইয়া বিদেশীরা চীনে আধিপত্য বিস্তার করিতেছে দেখিয়া জনসাধারণ মাঞ্চু-রাজবংশের উপর অত্যন্ত ক্ষুব্ধ ও ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিতেছিল; এবং মাঞ্চু-রাজবংশ ধ্বংস করিবার জন্য গোপনে বিদ্রোহীর দল গড়িয়া উঠিতে লাগিল। এই বিদ্রোহ ক্রমে প্রকাশ্য যুদ্ধে পরিণত হইল। চীনের রাজ-নৈতিক ইতিহাসে ইহা তাইপিং বিদ্রোহ ( ১৮৫১-১৮৬১ ) বলিয়া খ্যাত এবং এত বড় বিদ্রোহ চীনের ইতিহাসে আর হয় নাই। এই বিদ্রোহের ফলে চীনে দশ কোটী লোক মৃত্যুমুখে নিপতিত হয়।

১৮১৩ খৃঃ অঃ হং-সিউ-সিউএন নামে এক ব্যক্তি ক্যানটন শহরে জন্মগ্রহণ করে। হং-সিউ এক নূতন ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠা করেন এবং নিজে ধর্ম্ম-গুরু হিসাবে তাই-পিং

অর্থাৎ শান্তির স্বর্গ-দূত এই উপাধি গ্রহণ করেন। এই ধর্ম্ম-আন্দোলন শেষে রাজনীতি-আন্দোলনে পরিণত হয় এবং মাঞ্চু-রাজবংশ উচ্ছেদ করিবার জন্য এই তাইপিঙ দল যুদ্ধ ঘোষণা করে। চীনের ইতিহাসে এই তাইপিঙ বিদ্রোহ অত্যন্ত স্মরণীয় ঘটনা। অতীতের জড়তার স্মৃতি-চিহ্ন স্বরূপ চীন এই বিদ্রোহের দিনে প্রতিজ্ঞা করিয়া টিকি কাটিয়া ফেলে এবং চীনের স্বাধীনতা-কামী প্রত্যেক চীন অহিফেন আর গ্রহণ করিবে না বলিয়া প্রতিজ্ঞা করে। ক্রমান্বয় দশ বৎসর ধরিয়া চীনে ভীষণ হত্যাকাণ্ড চলিতে লাগিল। মাঞ্চু-রাজ কোনও মতে এই বিদ্রোহ দমন করিতে না পারিয়া বিদেশী ইংরাজের সহায় গ্রহণ করিল। ইতিহাস-বিখ্যাত সেনাপতি গর্ডনের সাহায্যে ইংরাজরা তাইপিঙ বিদ্রোহ দমন করেন এবং এই মহৎ-কার্য্যের ফলস্বরূপ চীনে তাহাদের অধিকার আরও কায়েমী হইল। আরও নূতন নূতন সর্ত্তে মাঞ্চু-রাজ বিদেশীদের হাতে চীনের স্বাধীনতাকে তুলিয়া দিল। এই সময় চীন তাহার তিনটী প্রধান উপনিবেশ বিদেশীদের হাতে সমর্পণ করিতে বাধ্য হয়। বর্ম্মা, সায়াম ও আনাম চীনের অধীনে ছিল। তাইপিঙ বিদ্রোহের পর ফরাসীরা যুদ্ধের হুমকি দেখাইয়া আনাম অধিকার (১৮৮৪) করিয়া বসে। ফরাসীদের আনাম অধিকার করিতে দেখিয়া ইংরাজ শঙ্কিত হইয়া উঠিল। ভারতবর্ষ হইতে ফরাসীদের দূরে রাখিবার জন্য ইংরাজরা দেখিল ফরাসীদের অধিকার আর বিস্তৃত করিতে দেওয়া উচিৎ নয়। সুতরাং বর্ম্মায় ইংরাজের আধিপত্য প্রয়োজন। এবং অচির কালেই বর্ম্মা ইংরাজের অধীনে আসিল। সায়াম দুই মিত্র-শক্তিতে ভাগ করিয়া লইল। দুর্ব্বল মাঞ্চু-রাজ সিংহাসনে বসিয়া নির্ব্বাক ভয়ে এই সব দেখিল।

এই সময়কার চীনের ইতিহাসের ধারা পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে মনে হয় চীন যেন এক অন্ধধনী ব্যক্তি; তাহার জিনিষ-পত্র দেখিবার কোনও লোক নাই, সে নিজেও অন্ধ। যে আসিতেছে সেই একটীর পর একটী জিনিষ লইয়া যাইতেছে—প্রতিবাদ করিবার উপায় বা সঙ্গতি নাই। ১৮৯৭ সালে দুইজন জার্ম্মাণ প্রচারক চীনে নিহত হয়। তার ফলে জার্ম্মাণী চীনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে এবং কাউচাউ বন্দর অধিকার করে। রুষিয়া আসিয়া উত্তর-পূর্ব্ব চীনে বসিল। জাপান শঙ্কিত হইয়া উঠিল। কোরিয়া এতদিন চীনের দখলে ছিল। জাপান শঙ্কিত হইয়া উঠিল যে রুষিয়া যদি কোনও রকমে কোরিয়া অধিকার করে তবে জাপানের বিপদ। অতএব জাপান কোরিয়ায় যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া কোরিয়া দখল করিয়া বসিল। রুষিয়া আগাইয়া আসিয়া পোর্ট আর্থার বন্দর অধিকার করিল। এইরূপে রুষো-জাপান যুদ্ধের সূত্রপাত হইল। চীন ও জাপান যুদ্ধের (১৮৯৪) ফলে চীন পরাজিত হয় এবং একুশটী হীন সর্ত্তে জাপানের সঙ্গে সন্ধি করিতে বাধ্য হয়। প্রশান্ত মহাসাগরের কূলে জাপানের প্রতাপ ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। পাশ্চাত্য জাতিরা শঙ্কিত হইয়া জাপানের দিকে ফিরিয়া চাহিল।

চীনের পর-রাষ্ট্র সচিব ইউজিন চেন

এই সমস্ত বিদ্রোহ ও পরাজয়ের ফলে চীনের ভিতরে একদল যুবক জাগিয়া উঠিতেছিল—যাহারা চীনকে বিদেশীদের এই অত্যাচার হইতে মুক্ত করিবার জন্য জীবন-পণ করিয়াছিল। ১৯০০ সালের প্রারম্ভে আবার চীনে মুক্তি-সংগ্রাম আরম্ভ হইল। মাঞ্চু-রাজ বংশ ধ্বংস ও তাহার সহিত বিদেশীদের চীন হইতে একেবারে নির্ব্বাসিত করিবার জন্য চীনে এক নূতন বিদ্রোহ দেখা দিল। এই বিদ্রোহের নাম বক্সার যুদ্ধ। মাঞ্চু-রাজবংশ ভীত হইয়া বক্সার বিদ্রোহীদের সহিত যোগদান করিল এবং তখন বিদ্রোহীদের সমস্ত শক্তি বিদেশীদের বিরুদ্ধে নিয়োজিত হইল। বক্সার বিদ্রোহীদের পতাকায় লেখা ছিল, "দূর কর বিদেশীদের"।

এই বিদ্রোহের বিরুদ্ধে জগতের আটটী প্রধান রাজ-শক্তি চীনের বিরুদ্ধে দাঁড়ায় এবং বলা বাহুল্য চীন এবারে ও পরাজিত হয়, এবং এই পরাজয়ে চীনের সকল শক্তি একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়ে। পিকিঙ্ শহর ইংরাজের হাতে গিয়া পড়ে এবং চীনের বন্দরে বিদেশীদের প্রভুত্ব রীতিমত দৃঢ় হয়।

এই সময় চীনের এক নিভৃত গ্রামে এক দরিদ্র কৃষাণ পরিবারে চীনের ভাগ্য-বিধাতা সান-ইয়াৎ-সেন জন্মগ্রহণ করেন। অতি শৈশবেই বালক তাহার জীবনের চারিদিকে চাহিয়া দেখিত। চারিদিকের অসামঞ্জস্য দেখিয়া বালকের মনে কত ব্যাকুল প্রশ্ন জাগিয়া উঠিত! সেই সময়কার রাজনৈতিক গণ্ডগোলের জন্য চীনের মধ্যে দস্যুর উৎপাত অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠে। সানের গ্রামে প্রায়ই এই সমস্ত দস্যুর দল কোথা হইতে আসিয়া লুটপাট করিয়া চলিয়া যাইত। গৃহস্থরা সর্ব্বদাই শঙ্কিত হইয়া থাকিত। সেই কিশোর কালেই সানের মনে এক প্রশ্ন জাগে যে, দেশে রাজা নাই যে এদের শাসন করে? সান কৈশোরে এক ইংরাজ মিশনারীর অধীনে পাশ্চত্য শিক্ষায় দীক্ষিত হন; এবং যৌবনের প্রারম্ভে তিনি ডাক্তারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ডাক্তার সাজিয়া ক্যান্টন শহরে গিয়া বসিলেন। ছাত্রাবস্থাতেই সান্ গোপন সমিতিতে যাতায়াত করিতেন এবং রোগীর চিকিৎসা অপেক্ষা দেশের চিকিৎসার কথা তাঁহার মনে অধিকতর স্থান অধিকার করিয়া বসিয়াছিল। সানের ডাক্তারখানা বিদ্রোহিদের আড্ডা হইয়া উঠিল। তখন চীনের অভ্যন্তরে অতীতের জড়তা হইতে মুক্ত হইয়া এক নবীন যুবকের দল জাগিয়া উঠিতেছিল। সান্ তাহাদের লইয়া "তরুণ চীন" সমিতি গঠন করেন। সান্ দেখিলেন যে দেশের জনসাধারণ অশিক্ষিত; দেশের অবস্থার বিষয় তাহাদের কোনও ধারণা নেই। এধারে রাজ-শক্তি দুর্ব্বল ও সহায়সম্পত্তিহীন। সানের প্রেরণায় দলে দলে শিক্ষিত যুবকের দল চীনের সুদূর গ্রামে গ্রামে গিয়া বিপ্লবের বাণী প্রচার করিয়া বেড়াইতে লাগিল। "তরুণ চীন" সম্প্রদায় অচিরেই মাঞ্চু রাজের পুলিসের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল এবং তরুণ চীন সম্প্রদায়ের লোকদের গ্রেপ্তার ও সঙ্গে সঙ্গে ফাঁসী অবাধে চলিতে লাগিল। সানের উপর চীন হইতে নির্ব্বাসন দণ্ড জারী করা হইল। ছদ্মবেশে সমস্ত পৃথিবী পরিভ্রমণ করিয়া সান্ অস্ত্রশস্ত্র ও অর্থ সংগ্রহ করিতে লাগিলেন এবং নানারূপ নির্য্যাতন ও বিপদের মধ্যদিয়া তিনি চীনের স্বাধীনতার সমরে ইন্ধন জোগাইতে লাগিলেন।— ছদ্মবেশ ধরিয়া তিনি চীনে আসিতেন এবং বহুবার জীবন বিপন্ন করিয়াছেন। সানের মাথার উপর লক্ষাধিক মুদ্রার পারিতোষিক ঘোষণা করা হয় কিন্তু সান্ নির্ভয়ে চীনে বিপ্লবের কাজ করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন! ক্রমশঃ তরুণ চীন সম্প্রদায় প্রকাশ্য ভাবে মাঞ্চু-রাজশক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিল। নানারূপ বিঘ্ন বিপদের মধ্য দিয়া তরুণ চীন সম্প্রদায় শক্তিশালী হইয়া উঠিতে লাগিল। এই সময় চীনের নবীন ছাত্রদল যে অসীম ত্যাগ ও দেশভক্তির পরিচয় দিয়াছে—তাহা জগতে বিরল। জীবনমরণ পণ করিয়া চীন যুবক সানের পতাকার তলে আসিয়া দাঁড়াইল। সান্ অবসর বুঝিয়া মাঞ্চু-রাজের প্রবল প্রতাপান্বিত সেনাপতি ইয়ান-সি-কাইএর সহিত ষড়যন্ত্র করিয়া সৈন্যদল হাত করিলেন; এবং ১৯১১ সালে ইয়ান্-সি-কাইএর নেতৃত্বে চীন সৈন্য একে একে চীনের নগর দখল করিতে লাগিল। মাঞ্চু-রাজ বংশ বিপদ্ বুঝিয়া সিংহাসন পরিত্যাগ করিল এবং

সানের সুযোগ্য পুত্র সান্-পো

চীনে কোয়ামিন্টাঙ্ (চীনের জাতীয় দল) কর্ত্তৃক গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইল। সর্ব্বসম্মতিক্রমে ১৯২১ সালের প্রথম দিনে সান-ইয়াৎ-সেন চীন গণতন্ত্রের প্রথম সভাপতি বলিয়া জগতে বিঘোষিত হইলেন।

গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করিয়া সান্ দেখিলেন যে চীন এখনও অতীতের অন্ধকারে ডুবিয়া আছে। নানারূপ সর্ত্তের বাঁধনে চীন বিদেশীদের হাতে বাঁধা। সান্ দেখিলেন যে চীনকে জগতের শক্তিশালী জাতিদের মধ্যে শক্তিশালী হইয়া বাঁচিয়া থাকিতে হইলে চীনের আভ্যন্তরিক উন্নতির জন্য সকল চেষ্টা নিয়োজিত করিতে হইবে। চীনের জাতীয় দলের আদর্শ ও কার্য্য-প্রণালী সম্বন্ধে স্বয়ং সান্-ইয়াৎ-সেনের লেখা হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া হইল। *

"চীনের আয়তন প্রায় বিয়াল্লিশ লক্ষ বর্গ মাইল; তার জনসংখ্যা প্রায় চল্লিশ কোটী। চীনের খনিজ সম্পদ্ জগতে অতুলন—তবুও চীন সাম্রাজ্যবাদী জাতির কবলে।× × × চীনের আভ্যন্তরিক উন্নতির ব্যবস্থা সমস্তই চীনকে করিতে হইবে।× × × চীনের জাতীয় দলের সকল কাজের পিছনে তিনটী প্রধান আদর্শ থাকা উচিৎ। (এই তিনটী আদর্শকেই "The Three Principles of Sun-yet-Sen বলা হয়)।

(১) Peoples Nationalism জাতীয়তার দিক দিয়া চীনকে বিদেশীয়দের সকল প্রকার অন্যায় সর্ত্তের বন্ধন হইতে মুক্ত হইতে হইবে।

(২) Peoples Sovereignty—শাসনের আদর্শের দিক দিয়াসমগ্র জাতির মধ্যে গণতন্ত্রের আদর্শকে রক্ষা করিতে হইবে। শিক্ষা-বিস্তার বিষয়ে সর্ব্বপ্রথমে নজর দিতে হইবে।

(৩) Peoples Livelihood—জাতির অর্থ-নৈতিক উন্নতির দিক দিয়া শ্রমকে সম্মান করিতে হইবে। বিদেশী বাণিজ্যের প্রসার বন্ধ করিয়া দেশজ শিল্পকে গড়িয়া তুলিতে হইবে এবং শ্রমিকদের অবস্থার উন্নতি বিধান করিতে হইবে।"
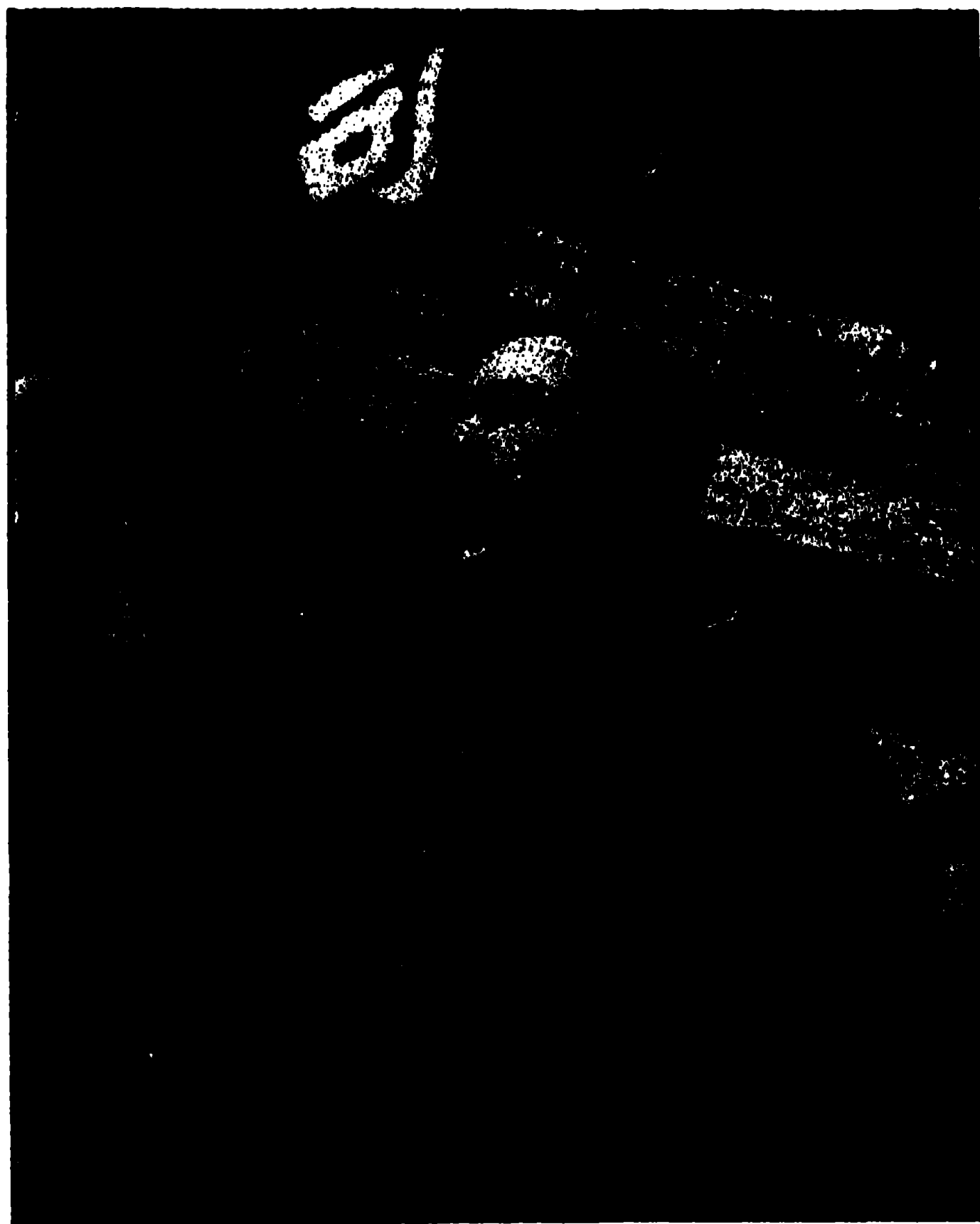
চীনেবলশেভিক-নেতা বরোদীন

মাঞ্চু-রাজবংশ ধ্বংস হইয়া যাওয়ার পর চীনের মধ্যে আর এক বিপত্তি জাগিয়া উঠিল। চীন আঠারটী প্রদেশে বিভক্ত। প্রত্যেক প্রদেশের হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতারূপে একজন করিয়া শাসনকর্ত্তা নিয়োজিত ছিল। মাঞ্চু-আমলে এই সমস্ত শাসন-কর্ত্তাদের প্রতাপ অত্যন্ত প্রবল ছিল। দক্ষিণ চীনে সান্-ইয়াৎ-সেন কর্ত্তৃক গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইলে এই সমস্ত প্রাদেশিক শাসন-কর্ত্তারা আপনাদের অবস্থা সম্বন্ধে শঙ্কিত হইয়া উঠিয়া চীনের জাতীয় দলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিল। চীনে পুনরায় অন্তর্বিপ্লব আরম্ভ হইল। চীন আবার দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া গেল; একদলের নাম দক্ষিণ-বাহিনী (Southernes) অপর দলের নাম (Northernes) উত্তর-বাহিনী। উত্তর-বাহিনী দলের প্রাদেশিক নেতারা চীনের একাধিপত্য অধিকার করিবার লোভে আপনাদের মধ্যে সংগ্রামে রত হইল। দক্ষিণ-বাহিনী জাতীয় দলের নেতা হইল তরুণ সেনাপতি চ্যাংকাইসেক। উত্তরবাহিনী

* Sun-Yet-Sen's International Development of China

দলের দুইজন প্রধান লোক ছিল—একজন উ-পি-ফু আর একজন চ্যাং-সো-লিন। উ-পি-ফু জাতীয় দলের নিকট পরাজিত হইলে তাহার সমস্ত সৈন্য জাতীয় দলে আসিয়া যোগদান করে। চ্যাংসোলিন জাতীয়দলের প্রধান শত্রু ছিলেন এবং সেই জন্য চ্যাংসোলিন বিদেশীদের সাহায্য পাইত। এধারে সোভিয়েট রুষিয়া আসিয়া চীন জাতীয়-দলের সহিত যোগদান করিল। রুষ-রাজনৈতিক বরোদীন আসিয়া নূতন করিয়া চীন জাতীয়দলের সৈন্য গড়িয়া তুলিতে লাগিলেন। এই অন্তর্বিপ্লবের মধ্যে ১৯২৫ সালে চীনের নব-জন্মদাতা সান-ইয়াৎ-সেন ইহলোক পরিত্যাগ করেন। সানের মৃত্যুতে সানের বিধবা পত্নী মহিয়সী নারী মিসেস্ সান্-ইয়াৎ-সেন জাতীয় দলের নেতৃত্বের ভার গ্রহণ করেন। সান্ মরিয়া গিয়াছেন কিন্তু সানের আদর্শ সজীব হইয়া প্রত্যেক চীনের বুকে কর্ম্ম-প্রেরণারূপে জ্বলিতেছে। গত দুই বৎসরের ঘটনা শুধু চ্যাংকাইসেক ও চ্যাংসোলিনের সংঘর্ষের ব্যাপার। আজ চ্যাংসোলিনকে পরাজিত করিয়া চীন জাতীয়দল চীনকে অন্তর্বিপ্লব হইতে মুক্ত করিয়াছে। জগতের শক্তির রাজ-সভায় তাহারা স্বাধীন চীনের ঘোষণা বাণীকে পাঠাইয়া দিয়াছে।

মাঞ্চু-রাজের আমলে বিদেশীরা যে সব সর্ত্তে চীনকে বাঁধিয়া ফেলিয়াছিল—স্বাধীন চীন সে সব সর্ত্তের পুনারাবৃত্তি করিতে চায়। চীন আজ শক্তিশালী। বিদেশীর রণ-পোতের রক্ত-আঁখিকে ভয় করিতে সে ভুলিয়া গিয়াছে।

প্রশান্ত মহাসাগরের উপকূলে এক বিরাট ঝড়ের সম্ভাবনা আকাশ ছাইয়া আছে। বাংলার শান্ত নারিকেল কুঞ্জ-ছায়ে বসিয়া আমরা শুধু আকাশের দিকে চাহিয়া আছি। চীনের স্বাধীনতা কি এশিয়ার পূর্ব্ব-গৌরবকে ফিরাইয়া আনিবে—না স্বাধীন চীন স্বাধীন জাপানের মত এশিয়ার সমগ্র স্বাধীনতার আর একজন শত্রু হইবে—কে জানে?

---

# গান

[ জসীম উদ্‌দীন ]

( ভাটিয়াল সুর )

এই না গাঙের কোণে রে বন্ধু,
এই না গাঙের কোণে—
আমার কূলের কোল ভাঙালিরে ( ওরে ওরে ও দরদী)
এই ছিল তোর মনে।

বয়না হাওয়া বয়না ঢেউ
তবুও ইহা জান্‌ত কি কেউ
রাঙা মুখের রঙ দেখিতে
ঢেউ লাগে যে মনে? ( হায় হায় )

এ কূল যদি ভাঙে গাঙের
ও কূল চেয়ে বাঁধে;
কূল কি তার হয় রে এমন
যার লাগি মন কাঁদে?

আমার ব্যথার বাসর রাতে
সেকি ঘুমায় ঘুমের সাথে,
সোহাগে সে এলায় কি গা
আমার কাঁদন শুনে?

# চিত্রে সাময়িকী

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ

মৃত্যু-তিথি স্মরণে

"এনেছিলে সাথে করি মৃত্যুহীন প্রাণ
মরণে তাহাই তুমি করে গেলে দান।"

## স্যার জর্জ্জ গ্রীয়ারসন
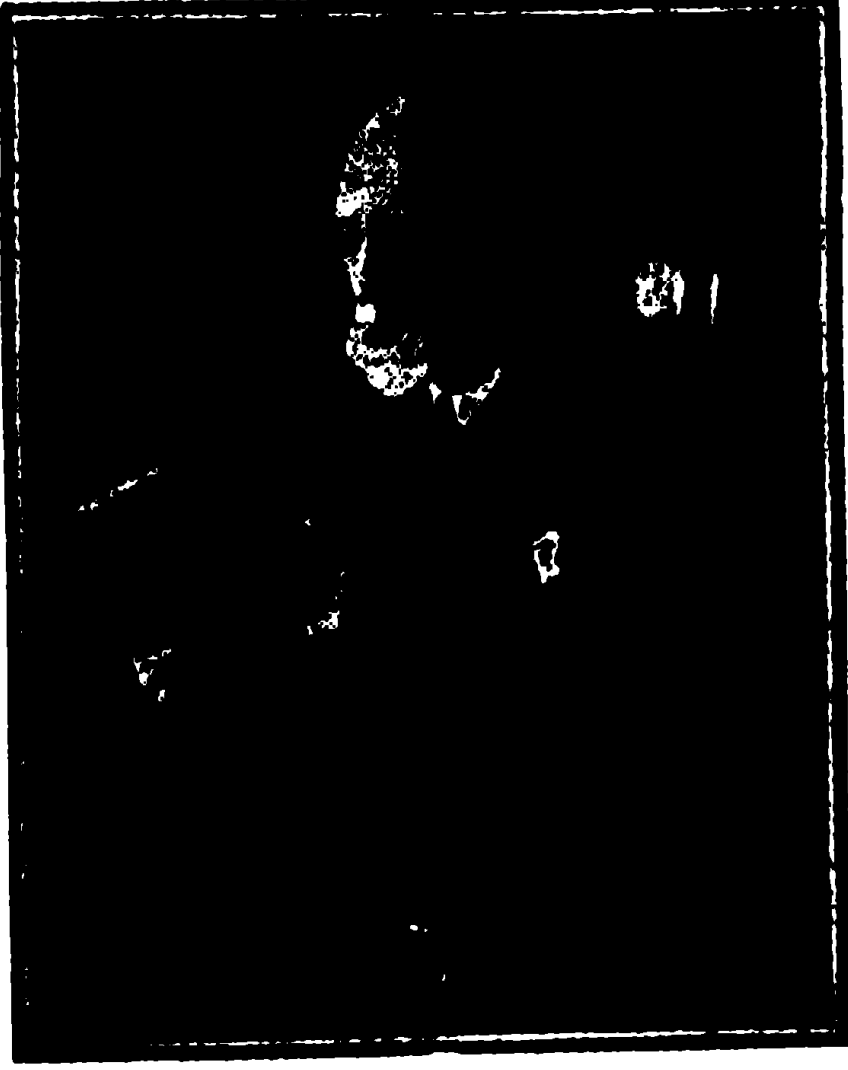
ভারতের সমস্ত ভাষা-তত্ত্ব সংগ্রহ কার্য্য সমাপ্ত করিয়া ইনি সম্প্রতি রয়েল এসিয়াটিক সভার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন। স্যার গ্রীয়ারসন জগতের অন্যতম সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভাষাতত্ত্ব-বিদ্ এবং তিনি ৫৫৪ ভাষার সহিত সম্যক্ ভাবে পরিচিত এবং বহু বিভিন্ন ভাষার তিনিই প্রথম ব্যাকরণ তৈয়ারী করেন।

## আহাদ হোসায়েন

ইনি বিগত নৈনিতাল টেনিস খেলায় চ্যাম্পীয়ান বলিয়া বিঘোষিত হইয়াছেন।

## মিসেস হামিদ আলী
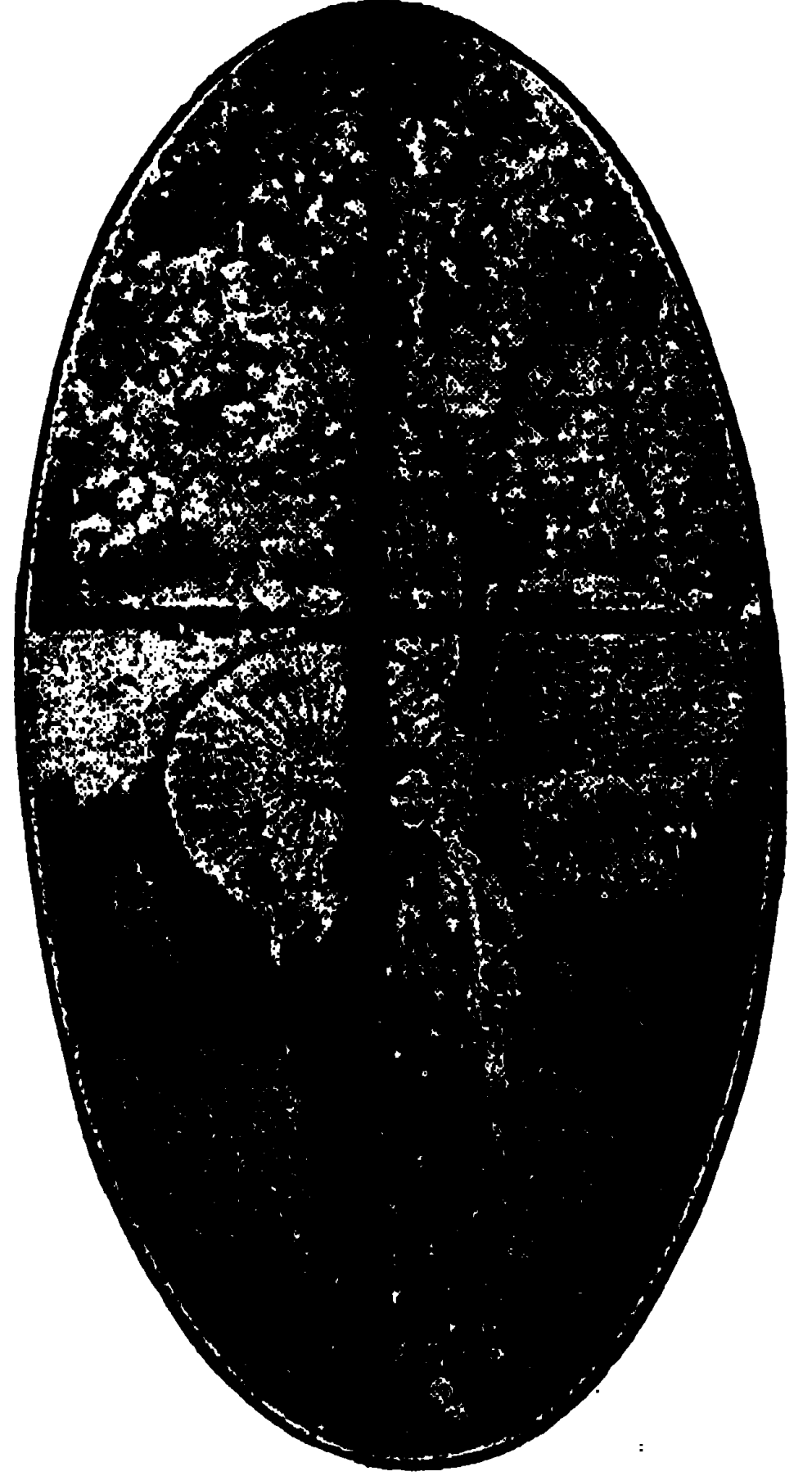
এবারের শ্রীনগরে যে নারী শিক্ষা-সমিতির বিরাট অধিবেশন হইবে ইনিই তাহার সভানেত্রী নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

মহামান্য নবাব স্যার মহম্মদ আহ্ মাদ্ সৈয়দ খাঁ

স্যার মুডিমানের আকস্মিক মৃত্যুর ফলে ইনি যুক্তপ্রদেশের অস্থায়ী শাসন কর্ত্তারূপে মনোনীত হইয়াছেন।

স্যার আলেকজাণ্ডার মুডিমান

স্যার মুডিমানের মৃত্যুতে ভারতের রাজনৈতিক সংঘর্ষে লিপ্ত একজন প্রধান ব্যক্তি অন্তর্হিত হইল। তিনি ছয়মাস পূর্ব্বে যুক্ত-প্রদেশের শাসন-কর্ত্তার পদ-গ্রহণ করেন। তাহার পূর্ব্বে তিনি ব্যবস্থাপক সভা ও কাউন্সিল অফ্ ষ্টেটের সভাপতি-রূপে ছিলেন।

স্যার মহম্মদ হাসান খাঁ, সি, আই, ই

সম্প্রতি ইনি খয়রপুর ষ্টেটের প্রধান মন্ত্রীর পদ-গ্রহণ করিয়াছেন।

## শ্রীমতী শ্যামকুমারী নেহরু

ইনি পণ্ডিত মতিলাল নেহরুর ভ্রাতুষ্পুত্রী। এলাহাবাদের আইন পরীক্ষায় ইনি সর্ব্ব প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছেন; এবং স্যার তেজ বাহাদুর সপ্রুর নিকট শিক্ষা-নবিশ হিসাবে তিনি শীঘ্রই হাই-কোর্টে যোগদান করিবেন।

## হাউই বিমান পোত
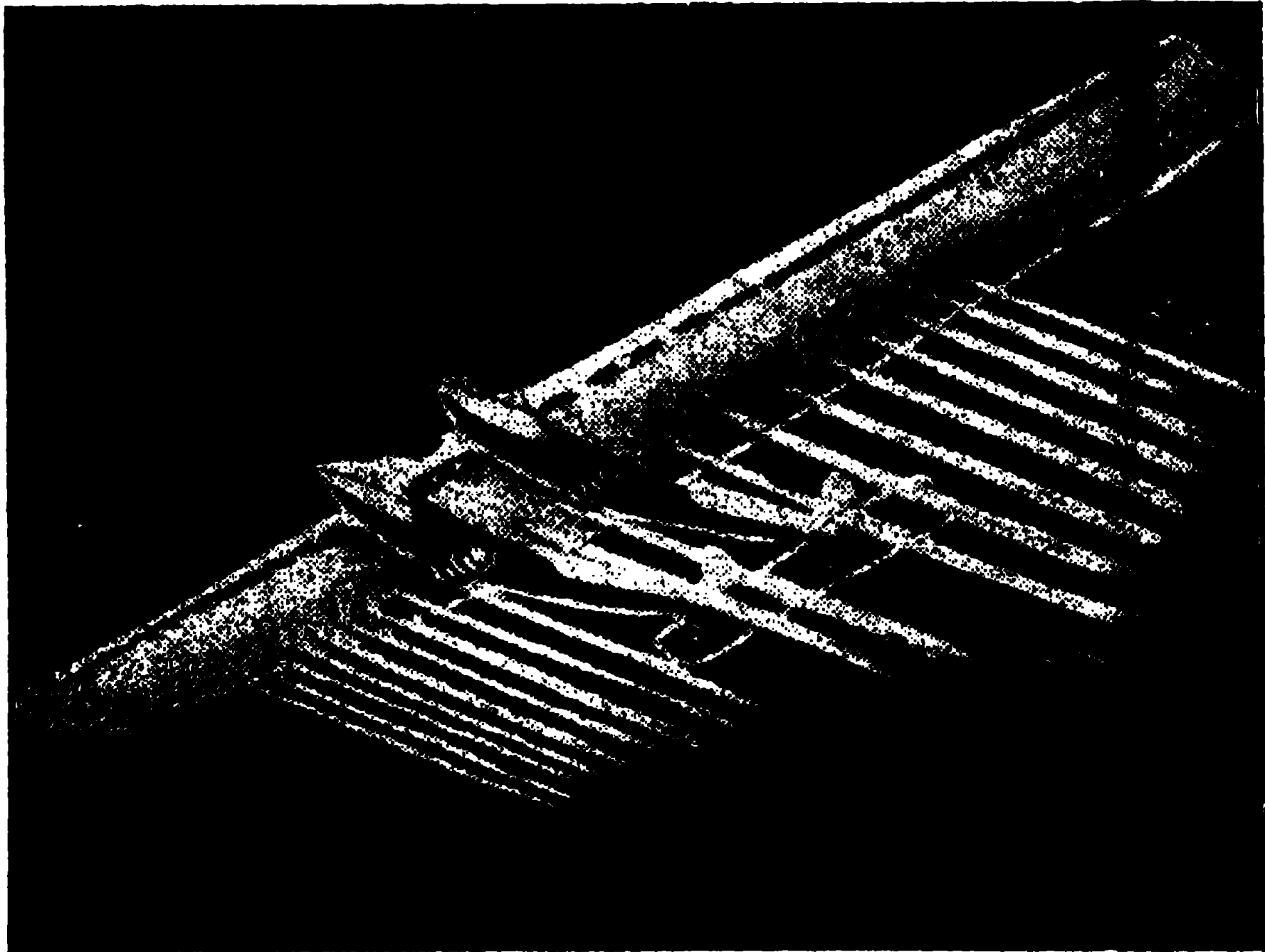
সম্প্রতি জার্ম্মাণীতে এই আশ্চর্য্য বিমান-পোত নির্ম্মাণ চলিতেছে। ইহা ঘণ্টায় তিন হাজার ছয় শত মাইল যাইবে। হাউইএর সাহায্যে ইহা চলিবে বলিয়া ইহার নাম ঐরূপ হইয়াছে। ইহার নির্ম্মাণ কার্য্য শেষ হইলে জগতের মধ্যে একটী অত্যাশ্চর্য্য জিনিষ বলিয়া পরিগণিত হইবে।

## জীবন-যুদ্ধে এখনও নবীন।

( বাঁ দিক হইতে প্রথমে উপবিষ্ট )

মীর জাওয়াদ আলী ১৮১২ সালে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং এখনও পর্য্যন্ত ১১৭ বৎসর বয়সে পুত্র পৌত্রদের লইয়া সমান উদ্যমে জীবন যাপন করিতেছেন। মীর সাহেব সপরিবারে জলগাঁও প্রদেশে থাকেন।
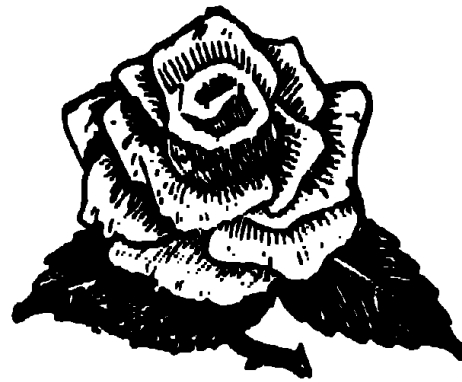
# মহা-কবি চসার

[ কাজী কাদের নওয়াজ ]

কবিবর চসার ১৩৪০ খৃঃ অব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার বাল্যকাল লণ্ডন সহরের টেম্‌স্ ষ্ট্রীটে এক নদী তীরে অতিবাহিত হয়। এই নদী সৈকতেই বালক কবির মনে সর্ব্বপ্রথম ভাবের উন্মেষ হয়। উচ্ছল জল-তরঙ্গ ও দাঁড়ী মাঝির অদ্ভুত পোষাকপরিচ্ছদ কবি একমনে নদীতটে বসিয়া দেখিতেন। তাঁহার রচিত 'ক্যাণ্টারবারী গল্পগুচ্ছ' ( Canterbury tales ) হইতে আমরা এ বিষয়ের সত্যতা কতকটা উপলব্ধি করিতে পারি। সে সময়ের মাঝিদের লক্ষ্য করিয়া কবি তাঁহার ক্যাণ্টারবারী গল্পে অনেক কথাই লিখিয়াছেন। তাহাদের কথাবার্ত্তা শুনিয়া ও সাজসজ্জা দেখিয়া কবি বিশেষ আশ্চর্য্যান্বিত হইতেন। তাঁহার মনে হইত তাহারা যেন কোন্ অচিন তেপান্তর হইতে তরী বাহিয়া আসিতেছে। সে স্বপ্নের রাজ্যে মুক্তার ফুল ও হীরার মুকুল যেন বাগানের শোভা বর্দ্ধন করিতেছে। এই ছিল কবির বাল্য জীবনের প্রথম অবস্থা।

কবির পিতা ছিলেন একজন সুরাব্যবসায়ী। রাজ দরবারেও তাঁহার যথেষ্ট সম্মান ছিল এবং তজ্জন্যই সতের বৎসর বয়সের সময় কবি রাণী এলিজাবেথের সহচররূপে নিযুক্ত হন। যাহা হউক উনিশ বৎসর বয়সে রাজার পক্ষ হইয়া তাঁহার সৈন্য বাহিনীর পরিচালকরূপে কবি একটী যুদ্ধে গমন করেন এবং পরাজিত হইয়া অরাতিকর্ত্তৃক কারারুদ্ধ হন। অবশেষে বহু অর্থ বিনিময়ে তাঁহাকে শত্রুর হাত হইতে উদ্ধার করা হয়।

অতঃপর কবি পুনরায় লণ্ডনে ফিরিয়া আসেন এবং কয়েক বৎসরের মধ্যেই ফিলিপা রোয়েট ( Philippa Roet ) নাম্নী এক সুন্দরী যুবতীর পাণিগ্রহণ করেন। এই বিবাহে তাঁহার জীবন সুখময় ও শান্তিময় হইয়াছিল কিনা সে সম্বন্ধে নানাজনের নানা মত। কেহ কেহ বলেন কবির এই দাম্পত্য জীবন আদৌ সুখময় হয় নাই। প্রমাণ স্বরূপ তাঁহারা তাঁহার কয়েকটী বাল্য কবিতা উপস্থিত করেন। কিন্তু এ সম্বন্ধে কেহই কোন স্থিরসিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন নাই।

১৩৭২ খৃঃ অব্দে কবি ইটালী গমন করেন। এই সময়েই তাঁহার কবি-প্রতিভার আশ্চর্য্যরূপ বিকাশ সাধিত হয়। ইংরাজী সাহিত্যে তিনি যে কাব্য-মধুচক্র রচনা করিয়া গিয়াছেন এবং যাহার সুধাধারা পান করিয়া বিশ্বের সুধীবৃন্দ মুগ্ধ ও পরিতৃপ্ত, তাহার অধিকাংশই এই ইটালীতে রচিত। এই সমস্ত দেখিলে কবির রচনায় ইটালী-সাহিত্যের প্রভাব বহুল পরিমাণে পরিদৃষ্ট হওয়ার কারণ সহজেই অনুমিত হয়।

১৩৮৬ খৃঃ অব্দে কবি পার্লিয়ামেণ্টের একজন 'মেম্বর' নির্ব্বাচিত হন। সে সময় তিনি সাহিত্যক্ষেত্রে সুপরিচিত। তাঁহার রচিত অধিকাংশ কাব্যই তখন সাহিত্যিক মহলে বিশেষ ভাবে খ্যাতি লাভ করিয়াছিল। কবি হইয়াও এ সময় তিনি রাজনীতি ব্যাপারে অধিক সময় অতিবাহিত করিতেন। কিন্তু তাহা হইলেও সাহিত্যচর্চ্চায় তিনি কখনও উদাসীন থাকিতেন না। কবিতা রচনাই তাঁহার জীবনের মূলমন্ত্র ছিল এবং ইহাতেই তিনি অনির্ব্বচনীয় আনন্দ উপভোগ করিতেন। তাই সেই রাজনৈতিক জীবনেও কবি অবসর মত সাহিত্যালোচনায় ব্যাপৃত থাকিতেন। বাঙ্গলার কবি গাহিয়াছেন :—

"হায় মা ভারতী চিরদিন তোর কেন এ অখ্যাতি ভবে
যে জন সেবিবে ও রাঙ্গাচরণ সেই কি দরিদ্র হবে"

অন্যান্য কবিদের ন্যায় কবিচসারও এই দরিদ্রতার কবল হইতে রক্ষা পান নাই। বার্দ্ধক্যজীবনে অর্থাভাবে তিনি যথেষ্ট কষ্ট পাইয়াছেন এবং তজ্জন্যই "শূন্যথলির প্রতি অভিযোগ" (Complaints to an empty purse) শীর্ষক একটী কবিতা লিখিয়াছেন। কবিতাটী ইংলণ্ডেশ্বরের

দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং তিনি কবির জীবিকা নির্ব্বাহের উপায় স্বরূপ মসাহারা নির্দ্ধারিত করিয়া দেন। দুঃখের বিষয় বেশী দিন তাহাকে তাহা ভোগ করিতে হয় নাই। ইহার অল্পকাল পরেই কবি ইহলোক পরিত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৬০ বৎসর হইয়াছিল।

## গ্রন্থ পরিচয় ও প্রসিদ্ধিলাভ

কবিবর চসারের সমস্ত কাব্যই সেকালের সেই পুরাণো ইংরাজীতে লেখা, সে জন্য সাধারণ পাঠকের পক্ষে সেগুলি বুঝিয়া উঠা বিশেষ কষ্টকর। স্থানে স্থানে এমন অনেক শব্দ দেখিতে পাওয়া যায় যাহা আধুনিক ইংরাজী সাহিত্যে কচিৎ ব্যবহৃত হয়। কবির কাব্যজীবন সাধারণতঃ তিনভাগে বিভক্ত। কৈশোর, যৌবন ও বার্দ্ধক্য। কিশোর জীবনে সর্ব্বপ্রথম Romance of the Rose নামক একটী উপাদেয় গ্রন্থ কবি কর্ত্তৃক প্রকাশিত হয়। এটী ফরাসী ভাষায় রচিত Roman de la rose কাব্যের অনুবাদ হইলেও মাধুর্য্যে অনুপম। অনূদিত কবিতার ছত্রে ছত্রে কবি নিজের কবিত্বশক্তির পরিচয় দিয়াছেন। কাব্য হিসাবে কবিরচিত গ্রন্থসমূহের মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট না হইলেও এটী সে সময় সাহিত্যসমাজে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিল। ইহার আখ্যান ভাগ এইরূপ—

বাগানে অসংখ্য গোলাপ ফুটিয়া রহিয়াছে। জনৈক যুবক সেগুলি চয়ন করিতেছেন। কবি ঐ সুন্দর ও সুগন্ধি গোলাপ গুচ্ছগুলিকে প্রণয়িনী এবং পুষ্পচয়নকারীকে তাহাদের প্রণয়াকাঙ্ক্ষী প্রেমাস্পদরূপে বর্ণনা করিয়াছেন।

এই সময়ের সর্ব্বোৎকৃষ্ট কাব্য হইতেছে কবিরচিত Book of the Duchesse। ইহা কবির সাহায্যকারী বন্ধু মিঃ জন্‌গণ্টের পত্নীবিয়োগ উপলক্ষে লিখিত। অন্যান্য কবিতার মধ্যে কবিরচিত এ, বি, সি নামক প্রার্থনা-মূলক একটী কবিতা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইহা হইতেই পাঠক সম্প্রদায় কবি রচিত বিখ্যাত 'ব্যালেড্' শ্রেণীর কবিতা সমূহের সহিত পরিচিত হন।

যৌবনের প্রারম্ভে কবি 'ট্রয়লাস ও ক্রিসেডা' নামক আট হাজার লাইনের একটী সুদীর্ঘ কবিতা লেখেন। এই কবিতাটীর ভাবানুসরণে মহাকবি সেক্সপিয়ার তাঁহার 'ট্রয়লাস্ ও ক্রেসিডা' রচনা করেন।

ইহার পর কবি House of Fame ( যশোভবন ) নামক একটী সুন্দর কবিতা লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। দুঃখের বিষয় কবি এই কবিতাটী শেষ করিয়া যাইতে পারেন নাই। ভাবের গভীরতা ও ভাষার সরলতার এরূপ অপূর্ব্ব সমাবেশ সে সময় কোন কবিতায় দেখিতে পাওয়া যায় না। মাঝে মাঝে কতকগুলি দ্ব্যর্থব্যঞ্জক শব্দ থাকিলেও আলোচ্য কবিতাটীর ছন্দ সুমধুর কিন্তু আলুলায়িত। তজ্জন্য অনেক সমালোচক কবিতাটীকে পদ্মরাগমণির সহিত তুলনা করিয়াছেন।

কবি বলিতেছেন—একদিন স্বপ্নে দেখিলাম যে একটী ঈগলপাখী আমাকে 'ভেনাস্' দেবের ক্ষণভঙ্গুর গীর্জ্জা হইতে জনমানবহীন এক প্রান্তরে লইয়া গেল। সেখান হইতে পক্ষীটী পুনরায় আমাকে বহন করিয়া "যশোভবনে"র অলিন্দের নিকট আসিয়া উপনীত হইল। আলোচ্য গ্রন্থে কবি এই স্বপ্নের বৃত্তান্তটী বর্ণনা করিতে আরম্ভ করিয়া-ছিলেন, কিন্তু তাহা শেষ হয় নাই। যাহা হউক অসমাপ্ত হইলেও কবি তাঁহার সুনিপুণ তুলিকায় যশোভবনের যে সুন্দর চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন তাহা অপূর্ব্ব। কবিতাটী পড়িবামাত্রই মনে হয় যেন কি এক অদ্ভুত গৃহ মানসচক্ষে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। সেই সঙ্গে বলিতে ইচ্ছা হয়—

"সপ্তলোকের সাত মহলায়
তুলির লেখা লিখ্‌ছো কে
দাও গো মোরে অযুত আঁখি
কুলায় না যে দুই চোকে"

এইবার আমরা কবিরচিত Legend of the good women নামক বিখ্যাত কাব্য সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করিব। ইহার রচনা সম্বন্ধে এইরূপ কথিত আছে—সবুজ শষ্পাচ্ছাদিত মাঠে একদিন কবি বসিয়া আছেন, তাঁহার চারিপাশে রাশি রাশি ডেজি ( Daisy ) ফুল ফুটিয়া রহিয়াছে। মাঝে মাঝে মৃদুমন্দ হাওয়া বহিতেছে। কবি অচিরেই ঘুমাইয়া পড়িলেন এবং স্বপ্নে দেখিলেন—একদল সুন্দরীললনার শোভাযাত্রা বাহির হইয়াছে। মিছিলটী ক্রমে ক্রমে কবির নিকটবর্ত্তী হইলে তিনি দেখিলেন যে সর্ব্বপ্রথম, রমণীগণে পরিবৃত হইয়া প্রেমের দেবতা কিউপিড্, সতীর আদর্শ এল্‌কেষ্টিসের হাত

ধরিয়া তাঁহার সম্মুখে অগ্রসর হইতেছেন। অন্যান্য যুবতীগণ আসিয়া তখন কবিকে বেষ্টন করিলেন। অতঃপর 'কিউপিড' কবির পূর্ব্বরচিত 'রোমান্স অফ্ দি রোজ' ও নারীর লাঞ্ছনাপূর্ণ অন্যান্য কবিতা লেখার জন্য তাঁহাকে তিরস্কার করিতে লাগিলেন। ইহা দেখিয়া 'এল্‌কেষ্টিস্' কবির পক্ষ হইয়া তাঁহার নিকট ক্ষমা চাহিলেন এবং কবিকে নারীর বীরত্ব ও গুণাবলীর প্রশংসাসূচক কতকগুলি কবিতা রচনা করিতে অনুরোধ করিলেন। কবি এই প্রস্তাবে সম্মত ও দৃঢ় অঙ্গীকারে আবদ্ধ হইলেন, সহসা তাঁহার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল এবং তিনি জাগিয়া উঠিয়াই কবিতা লিখিতে আরম্ভ করিলেন। উল্লিখিত Legend of the good women তাঁহার সেই কবিতা সমূহের সমষ্টি।

বার্দ্ধক্যজীবনে কবি 'ক্যাণ্টারবারী'র গল্প রচনায় বিশেষ ভাবে মনোনিবেশ করেন। ইংরাজী সাহিত্যে আজিও এই গল্পগুলি অমূল্য সম্পদ। চসারকে ইংরাজী সাহিত্যে সর্ব্বপ্রথম কবি বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তাঁহার পূর্ব্বে অনিয়মিতরূপে লিখিত কবিতার সন্ধান পাওয়া যায়, কিন্তু নিয়মের বশবর্ত্তিতায় কাব্য গ্রন্থ রচনায় তিনিই প্রথম পথপ্রদর্শক। 'রাইম্‌রয়েল' নামক একটী নূতন ও অভিনব ছন্দের তিনিই আবিষ্কারক। পারস্যকবি 'রুদাকী'র সহিত চসারের অনেকাংশে সৌসাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। 'রুদাকী'র পূর্ব্বে পারস্য সাহিত্যে নিয়মের অনুবর্ত্তীতায় সুশৃঙ্খলার সহিত কবিতা রচনার কোন পদ্ধতি ছিল না। তিনিই 'রুবাঈ' নামক চারিচরণ বিশিষ্ট পারস্য কবিতার সর্ব্বপ্রথম রচয়িতা এবং তাহা গ্রন্থকারে প্রকাশিত করিবার তিনিই অগ্রপথিক।

---

# পারস্যের রসিকতা

এক বাদসাজাদার দরবারে একজন বাগদাদের আর একজন মিশরের ভাঁড় বসিয়া পরস্পর চুপে চুপে আলাপ করিতেছিল, বাদসাজাদা তাহাদের জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা মানিকজোড় দুইয়ে মিলিয়া কোন মিথ্যাউক্তি তৈরী করিতেছ?

ভাঁড়দ্বয় সমস্বরে উত্তর করিল :—হুজুরের প্রশংসা।

---

এক ব্যক্তি কাজিকে গিয়া প্রশ্ন করিল :—আমি যদি কিছু খেজুর খাই, ধর্ম্মে বাধিবে কি?

কাজি। না, বাধিবে কেন?

"সেই সঙ্গে যদি কিছু জল খাই?" "তাও দোষের নয়।" "তার সঙ্গে যদি আরো কতকটা আঙ্গুরের রস খাই?" "এও খাওয়া যায়, এতে কোন দোষ নাই।"

"বেশ, এই তিন বস্তু দিয়েই ত মদ তৈরী হইয়াছে—তবে মদ খাওয়া নিষেধ করেন কেন?

কাজি উত্তরে বলিল :—তোমার মাথায় যদি আমি একমুঠ ধুলা দেই তুমি আঘাত পাবে কি?

ঐ ব্যক্তি বলিল—কখনো না।

"তারপর যদি একটু জল দেই?" "তাতেও আমি ব্যথা পাব না।" "বেশ এখন যদি ঐ জল ধুলা মিশিয়ে ছাঁচে ফেলিয়া একটি ইট তৈরী করিয়া ফেলি আর তা' তোমার মাথায় ছুড়িয়া মারি কেমন লাগিবে?"

"ওরে বাপ, ওতে আমার মাথাই ভেঙ্গে যাবে।"

কাজি :—তোমার প্রশ্নের উত্তর পেলেত?

---

এক দরজী সৈনিকবৃত্তি অবলম্বন করিয়া যুদ্ধে যায় এবং মস্তকে একটি গুলি লাগে। ডাক্তার আসিয়া বলে যে, তাহার কোন ভয় নাই; কারণ গুলি মগজ ভেদ করে নাই। সৈনিক উত্তর করিল—মগজ ভেদ করিবে সে ভয় আমার নাই। মগজই যদি থাকিত, তবে দরজীগিরি ছাড়িয়া কি এই যুদ্ধক্ষেত্রে আসি?

---

এক ব্যক্তি জোর গলায় বলিতেছিল—হাজার টাকা পাইলেও আমি মিথ্যা কথা বলিব না। এক ব্যক্তি কথাটি শুনিয়া বলিল—এই আর মিথ্যা উক্তিটা কিন্তু এক কপর্দ্দক না পাইয়াই করিলে। (বাংলার বাণী)

# সঞ্চয়ন

## স্বদেশে আমীর আমানুল্লা

য়ুরোপের জয়-যাত্রা শেষ করিয়া আফগান-রাজ স্বদেশে ফিরিয়া আসিয়া স্বদেশবাসীর প্রাণ-মাতানো অভ্যর্থনার উত্তরে বলিয়াছেন,—

"আমি আরামের জন্য দেশ-ভ্রমণে বহির্গত হই নাই। আমার মন্ত্রীগণের পরামর্শ ও ইচ্ছা অনুযায়ী আমি আফগানিস্থানকে জগতের সকলের নিকট সুপরিচিত করিয়া দিবার উদ্দেশ্যেই জগৎ-ভ্রমণে বহির্গত হইয়াছিলাম।" বক্তৃতা প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে খোদার অসীম করুণায় তিনি আবার স্বদেশে ফিরিয়া আসিতে পারিয়াছেন এবং তাঁহার মনে তিনি এক অপরিসীম আনন্দ অনুভব করিতেছেন, শুধু এই ভাবিয়া যে স্বদেশের উন্নতিকল্পে অন্য দেশের শিক্ষা-দীক্ষা অনুশীলন করা তাঁহার বৃথা হয় নাই। "বহু দেশ আফগানিস্থানের সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করিতে চায় কিন্তু আফগানিস্থানের আজ সর্ব্বপ্রথম ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রয়োজন হইতেছে শিক্ষা।" সভা ভাঙ্গিয়া গেলে আমীর আমানুল্লা জাতির অন্তরের সহিত একাত্মীয় প্রমাণ করিবার জন্য সকলের সমক্ষে আপনি আসন হইতে নামিয়া আসিয়া একজন ছাত্র, একজন সৈনিক ও একজন কেরাণীর সহিত আলিঙ্গন করিলেন।

———

## আমেরিকা ও আমীর আমানুল্লা

আমীর আমানুল্লা য়ুরোপের বিজয়-যাত্রা শেষ করিয়া স্বদেশে ফিরিয়া আসিয়াছেন। সকলেই জানেন যে এই ভ্রমণ-ব্যাপারের সঙ্গে জগতের ভবিষ্যৎ রাজনৈতিক-জীবন সংশ্লিষ্ট। আফগানিস্থানের ভূগৌলিক অবস্থিতির জন্য আফগানিস্থান রাজ-নৈতিক জগতে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে। স্থল-পথে ভারতে প্রবেশ করিতে হইলে আফগানিস্থানই একমাত্র পথ। তাই য়ুরোপের বিভিন্ন শক্তি আমীরকে হাতে রাখিবার জন্য যে বিরাট অভ্যর্থনার আয়োজন করিয়াছিলেন সেই প্রসঙ্গে আমেরিকার বিখ্যাত কাগজ দি নিউ রিপাবলিক্ লিখিতেছে,—

"আমীরের য়ুরোপবিজয়-যাত্রা আরম্ভ হইবার কিছু পরেই য়ুরোপের খবরের কাগজ মহলে একটা কথা চলিতে লাগিল যে তাস্‌কান্দ হইতে কাবুল পর্য্যন্ত একটা বিমানপথ খোলা হইবে এবং সেটা আবার মস্কোর বিমানপথের সহিত যুক্ত হইবে। এই সমস্ত কাজের তত্ত্বাবধান ও রুষ গভর্ণমেণ্ট লইয়াছে। এই সংবাদে রুষ ও ইংরাজ স্বার্থ সমানভাবে আলোড়িত হইয়া উঠিয়াছে। ইংলণ্ডের রাজা আফগানিস্থানের আমীর ও বেগম সাহেবকে ডবল রাজকীয় সম্মান দেখাইয়াছেন, কোথায়ও বিগত ইঙ্গ-আফগান যুদ্ধের কথা উল্লেখ করেন নাই, এবং গাড়ীতে যখন ভ্রুক্ষেপ-হীন আমীর আঙ্গুল দিয়া নাক পরিষ্কার করিয়াছিলেন তখন ভদ্রভাবে তাহা তাঁহাকে দেখিতে হইয়াছিল। রুষরাও প্রতিদ্বন্দ্বিতা-মূলক অভ্যর্থনার আয়োজন করিয়াছে। যদি তাহাদের আতিথ্য রাজা পঞ্চম জর্জ্জের অনুরূপ না হয়, তাহা হইলেও মনে হয় তাহারা গোপনে সুবিধা পাইবে। আমীর আমানুল্লা সরাই-যাত্রীদের সঙ্গে মিশিয়া বাড়ী ফিরিতে অভ্যস্ত। এবার বোধ হয় তিনি রুষ বিমানপোতে বাড়ী ফিরিবেন।

———

## ভবিষ্যৎ মহা-সমর

১৯১৪ সালের মহাযুদ্ধ জগতের যে মহাক্ষতি সাধন করিয়াছিল, আজও তাহার পরিপূরণ হয় নাই। কিন্তু এই যুদ্ধের পরও য়ুরোপের সাম্রাজ্যবাদী জাতিরা সমরকে ঘৃণা করিতে শিখে নাই। জাতীয় মহা-সভার অনুষ্ঠান করিয়া তাহারা শান্তি-স্থাপনের একটা আড়ম্বর করিয়াছে মাত্র। ভিতরে ভিতরে প্রত্যেক জাতি যে যাহার অস্ত্র শাণাইতেছে এবং অচিরেই বোধ হয় প্রলয়ঙ্কর আর এক মহাযুদ্ধ দেখা দিবে এবং সে যুদ্ধের পরিণাম যে কি ভয়াবহ হইবে, তাহা অনুমানও করা যায় না। এই সময় একদল শান্তি-বাদী দার্শনিক দেখা দিয়াছেন, যাঁহারা সাহিত্য

ও প্রচারের মধ্য দিয়া এই সম্ভাব্য যুদ্ধকে নিবারণ করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছেন। সেই সমস্ত মহাত্মাদের আদর্শের আলোচনা প্রসঙ্গে মহামতি এণ্ডরুজ লিখিয়াছেন,—

"মানুষের ভাগ্যের দিক দিয়া বিচার করিয়া দেখিতে গেলে দেখা যায় যে বর্ত্তমান সময়ে মানুষের ভাগ্যাকাশকে ছাইয়া অন্ধকারের যে নিবিড় মেঘ জমা হইয়া উঠিতেছে তাহার তুল্য ভীষণ অন্ধকার মানব-ইতিহাসে বুঝি আর ঘটে নাই। প্রত্যেক জ্ঞানী লোক আজ স্বীকার করিবেন যে আর একটা যুদ্ধ মানে সমস্ত মানব-সমাজের আত্মহত্যা। গত মহাযুদ্ধের ফলাফল অতি ভীষণ হইয়াছিল। কিন্তু তাহার পর যুদ্ধ-বিজ্ঞান আরও এতদূর অগ্রসর হইয়াছে যে ভবিষ্যতে একদিনের একটা যুদ্ধে যে ফলাফল ঘটিবে অতীতের এক বৎসরের যুদ্ধেও তাহার তুলনা হইত না। গতযুদ্ধে যেখানে একখানি এরোপ্লেনের ভয়ে এক একটা নগর কম্পিত; এবার যদি যুদ্ধ হয় সেখানে একখানির বদলে হাজার খানি হইতে বোমা পড়িবে—আর মানুষ, নগর, সভ্যতা একরাত্রে বিলুপ্ত হইয়া যাইবে। প্রত্যেক জাতি নানারূপ রাসায়নিক বিষ-বাষ্প সৃষ্টি করিয়াছে; তাহার প্রভাবে নিঃশ্বাসে নিঃশ্বাসে মানুষ মরিয়া যাইবে। এই রাসায়নিক যুদ্ধ আরও ভয়াবহ।

"এই সমস্ত বিপদের সম্ভাবনা জানা সত্ত্বেও যুদ্ধের আয়োজন অন্তরালে অন্তরালে বাড়িয়াই চলিয়াছে এবং যে অসদ্ভাবের দরুণ জাতিতে জাতিতে সংঘর্ষ হয়, তাহাও তীব্রবেগে বর্দ্ধিত হইতেছে।

মানবতার এই নিদারুণ বিপদের মধ্যে কিন্তু আমি আজ অভিনব আশার আলোর স্পর্শ অনুভব করিতেছি। নিদারুণ অন্ধকারের বুকেই বিদ্যুৎ-ঝলকের সহিত আলো আসিতেছে। মানবের আত্মার কল্যাণের দিকে চাহিয়া আজ যাঁহারা মানব সমাজের আত্মিক উন্নতির আশায় আত্মনিয়োগ করিতেছেন আমি আমার অন্তরে তাঁহাদের সাদরে বরণ করি। সমগ্র মানবের কল্যাণের কথা আজ আমার কাছে আর স্বপ্ন বলিয়া মনে হয় না—আমার কাছে উহা সুনিশ্চিৎ।

---

## কাইজারের নূতন বুলী

গত মহাযুদ্ধের সময় য়ুরোপের সাম্রাজ্যবাদীরা সকলে মিলিয়া শক্তি ও দম্ভের প্রচারের যে বিরাট আয়োজন করিয়াছিলেন, আজ তাহা পরিসমাপ্ত না হউক, জগতের নানা স্থান হইতে রীতিমত প্রতিরোধ পাইয়াছে। ভূতপূর্ব্ব জার্ম্মাণ সম্রাট উইলহেম কাইজার ও সেই শক্তি-মদ-মত্তদের মধ্যে একজন ছিলেন। কিন্তু কালের চক্রে তাঁহার মদ-শক্তি আজ হ্রাস হইয়া আসিয়াছে।

দ্বিতীয় জার্ম্মাণ যুবরাজ সেদিন আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছিলেন, "আমি সমগ্র জার্ম্মাণীকে সাক্ষ্য রাখিয়া বলিতে পারি যে আমার দু'বেলার বাসের পয়সা পর্য্যন্ত নাই।" কাইজারের পতনের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার সুরও নামিয়া আসিয়াছে। একদিন যে লোভের সময়ে তিনি অগ্নি-প্রদান করিয়াছিলেন, আজ সেই সময়কে লক্ষ্য করিয়া তিনি সাম্রাজ্যবাদী সকল জাতিকে তিরস্কার করিয়া বলিতেছেন,—

"জগতের লাঞ্ছিত দুর্ব্বল জাতিদের মধ্যে জাগরণের সংগ্রাম চলিয়াছে। আজ যদি শ্বেত-শক্তি এই জাগরণের দাবীকে সম্মান না করিতে শিখে, তাহা হইলে অচিরেই এক ভয়াবহ দণ্ড তাঁহাদের জন্য অপেক্ষা করিতেছে।

"কৃষ্ণ-বর্ণ জাতিরা আত্ম-সম্মানে উদ্বুদ্ধ হইতেছে, তাহার কারণ তাহাদের অনেকে যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়া তাহাদের প্রভুর শক্তির স্বল্পতা দেখিয়া আসিয়াছে।

এই নব-জাগরণকে নির্ম্মূল করিবার কোনও অধিকার শ্বেত-শক্তিদের নাই। কেবলমাত্র তাহারা অস্ত্র-শস্ত্রে ইহাদের শ্রেষ্ঠ বলিয়া ইহাদের দাবাইয়া রাখিবার অধিকার তাহাদের নাই। প্রত্যেক জাতি অপর জাতির অধিকারকে শ্রদ্ধা করা উচিৎ। প্রত্যেক জাতির ধর্ম্ম ও শিক্ষাকে সম্মান করা প্রত্যেক জাতির কর্ত্তব্য। আমাদের শ্বেত-সভ্যতার পাগলামী গুলিকে অপর জাতির উপর জোর করিয়া চালান শুধু অবিচার নয়—পাপ। আজ য়ুরোপের শক্তিশালী সমস্ত জাতি এক হীন স্বার্থপর নীতি অনুসরণ করিয়া চলিতেছে এবং এই প্রকার চলিলে অচিরে য়ুরোপকে তাহার ফলভোগ করিতে হইবে।"

যে কাইজার জার্ম্মাণ যুদ্ধের সময় বেলজিয়ামের বুকের উপর দিয়া কামান চষিয়া চলিয়া গিয়াছিল, সে কখনও এইরূপ বলিত না! অবস্থা মানুষকে এই রকমই করে!

---

## সমুদ্র-পীড়া ও মনস্তত্ত্ব

"বৃটীশ মেডিক্যাল জার্ণালে" ডাক্তার আলেন বেনেট সাহেব সমুদ্র যাত্রীদের এই অবশ্যম্ভাবী পীড়ার কারণ ও নিবারণ নির্দ্দেশ করার উপলক্ষে বলিয়াছেন,—

"যে ব্যক্তিকে জাহাজে চড়িয়া বিদেশে যাইতে হইবে প্রথমেই তাহার Sea Sickness অর্থাৎ সমুদ্র-পীড়ার কথা মনে পড়ে। অসুখটা এমন বিচিত্র যে স্থলে বসিয়া ইহার প্রকৃতি কি তাহা পূর্ব্ব হইতে জানিবার কোনও উপায় নাই। অথচ জলে ভাসিলেই উহা ধরিবে। তাই যাত্রা করিবার পূর্ব্বে ঐ অজানা অসুখটীর সম্বন্ধে নানা ভয়াবহ কল্পনা যাত্রীর মনকে পাইয়া বসে। আগে হইতেই মন ব্যাধির আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হইয়া থাকে; এবং অধিকাংশ স্থলে সমুদ্র-পীড়ার একমাত্র কারণই হইতেছে পূর্ব্ব হইতেই ঐ ব্যাধির সম্ভাবনা সম্বন্ধে আশঙ্কা করা। তাহার পর যাবার দিন সাধারণ মানুষের মন যাত্রার আয়োজনে ও বিদায়ের পালায় এত বেশী উত্তেজিত হইয়া থাকে যে, জাহাজ দুলিতে দুলিতে তাহার দেহ অবসন্ন হইয়া আসে। এবং তখন দেহ ও মনে ঐ ব্যাধিকে প্রতিরোধ করিবার মত কোনই শক্তি থাকে না। তাহার উপর অনেকে একটা বিশেষ ভুল করিয়া বসেন। স্নায়বিক ও মানসিক দুর্ব্বলতাকে ক্ষুধা-জনিত দুর্ব্বলতা মনে করিয়া অনেকে প্রচুর খাদ্য গ্রহণ করেন এবং তাহার ফলে সমুদ্র-পীড়া রীতিমত ভাবে পাইয়া বসে। অসুস্থ স্নায়ু ও মন কখনই অপর্য্যাপ্ত খাদ্য সহ্য করিতে পারে না। বমন হইতে আরম্ভ হয়। সেই জন্য জাহাজে কখনও গুরুভোজন করিতে নাই এবং সমুদ্র-পীড়া প্রতিরোধ করিতে হইলে মনে পূর্ব্ব হইতে কোনও আশঙ্কা পোষণ করিতে নাই। সমুদ্র-পীড়া সারাইবার জন্য যত রকম ঔষধ আছে তাহার মধ্যে মানসিক শক্তি সংগ্রহ করাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া আমার মনে হয়।"

## জীবন-যুদ্ধে ভারতবর্ষ

সম্প্রতি হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে, আমরা সকলের অপেক্ষা দিন দিন অল্প-পরমায়ু হইয়া উঠিতেছি। অন্যান্য দেশের আয়ুর হারের তুলনায় আমাদের জীবন সন্ধ্যার বাতাসে ফুটিয়া উঠিতে পারে না—মধ্যাহ্নের মাঝ-পথেই বিশুষ্ক হইয়া ঝরিয়া পড়িয়া যায়। নিম্নের তুলনা-মূলক আয়ুর হার দেখিলেই এ বিষয়ের সত্যতা উপলব্ধি হইবে।

| দেশ | আয়ুর হার |
|---|---|
| ইংলণ্ড | ৫১.৫ |
| আমেরিকা | ৫০.০ |
| ফ্রান্স | ৪৮.৫ |
| জার্ম্মানী | ৪৭.৪ |
| ইটালী | ৪৭.০ |
| জাপান | ৪৪.৩ |
| ভারতবর্ষ | ২৪.৭ |

অথচ কিছুকাল আগেই—এই দেশেই সাধারণতঃ লোকে "নাতি-পুতি" রাখিয়া শতাধিক বৎসর পর্য্যন্ত পরমানন্দে জীবন অতিবাহিত করিয়া গিয়াছেন।

---

## মিলিত-এশিয়া ও কামাল পাশা

সম্প্রতি কামালপাশা তুরস্কে অবস্থান কালে আমীর আমানুল্লাকে ব্যক্তিগত ভাবে যে অভিনন্দন প্রদান করিয়াছেন, সেই প্রসঙ্গে তিনি মিলিত-এশিয়ার মহা আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া এক সুন্দর বক্তৃতা দিয়াছেন। তুরস্কের ও আফগানিস্থানের অতীতের একতা ও মিলনের কথা প্রসঙ্গে বলিতেছেন যে,—

"একদিন মধ্য-এশিয়ার একই যুক্ত প্রান্তর হইতে আমাদের দুইজনারই প্র-পিতামহেরা জগতের চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। আফগানদের সহিত আমাদের পূর্ব্ব পুরুষদের যে গভীর সম্বন্ধ ছিল জগৎ তাহা ভাল রকমই জানে। অতীতের ইতিহাসের পাতা খুলিলেই যে সমস্ত অমর-কীর্ত্তি-গাথা চোখে পড়ে সে সমস্তই আমাদের পূর্ব্ব সম্বন্ধের গৌরব সূচক। তাই সেই মহাপুরুষদের বংশধররূপে আমরা যেন বর্ত্তমান কালে আমাদের জীবনের মধ্য দিয়া আরও গভীর প্রেম ও নিষ্ঠায় সেই সম্বন্ধ সমুজ্জ্বল করিয়া রাখি।"

এক বিরাট স্বাধীনতা-বোধ এই দুই জাতিরই মেরুদণ্ড স্বরূপ ছিল। সেই স্বাধীনতার স্বরূপ সম্বন্ধে বলিতে গিয়া তিনি বলেন যে,—

"যে জাতি সত্য সত্যই স্বাধীনতাকে ভালবাসিয়াছে জাতি-হিসাবে তাহাদের সর্ব্বপ্রধান ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কাম্য হইতেছে—পরিপূর্ণ স্বাধীনতা—যে স্বাধীনতার মধ্যে কোনও সর্ত্ত নাই। সেই স্বাধীনতা রক্ষা করিতে যদি জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধন বিসর্জ্জন দিতে হয়, যদি তাহার জন্য সর্ব্বশেষ মানুষটীরও আত্মহুতির প্রয়োজন হয় তবুও সে স্বাধীনতা বরণীয়।"

আফগান ও তুরস্কের যে নূতন মিলন হইল কামালপাশা তাহাকে ভবিষ্যৎ মিলিত-এশিয়ার ভিত্তি মনে করেন।

"আজ যে নব সূর্য্য জগতের এই অংশটুকুর আকাশের উপর উঠিয়াছে তাহারই কিরণের উপর, যে সমস্ত জাতির আকাশ শতাব্দীর নির্য্যাতনের অন্ধকারে মগ্ন তাহাদের ভাগ্য নির্ভর করিতেছে।"

---

## যন্ত্র-বিজ্ঞানে জার্ম্মাণী

বিমান-পোত ব্যবহারে জার্ম্মাণী এখন জগতের সকল জাতির শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া আছে।

"তাহারা ১৪৫০০০ মাইল পথ বিমান পোতে যাত্রী-বহনের বন্দোবস্ত করিয়াছে। এবং এ পর্য্যন্ত ৬,৮৯,০০০ মাইল পর্য্যন্ত তাহাদের বিমান পোতগুলি যাতায়াত করিয়াছে।

জার্ম্মাণীর পরেই যুক্ত রাষ্ট্রের স্থান। জার্ম্মাণী যন্ত্র-বিজ্ঞানের দিক দিয়া আবার জগতের প্রধান স্থান অধিকার করিতে চলিল কি? সম্প্রতি জার্ম্মাণীতে এক প্রকারের নূতন বিমান-পোত তৈয়ারী হইতেছে, যাহা ঘণ্টায় ৩,৬০০ মাইল যাইবে।

# আলোচনা

## মহররম

মহররম মাসের দশম দিনে কারবালা প্রান্তরে হজরত এমাম হুসাএন শাহাদৎ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। পূর্ব্ব হইতে হজরত আলী ও আমির মাআবিয়ার মধ্যে খেলাফতের স্বত্বাধিকার লইয়া যে সর্ব্বনাশকর গৃহ বিবাদের সূত্রপাত হইয়াছিল, এমাম ছাহেবের এই নির্ম্মম হত্যাকাণ্ড তাহারই একটা শোচনীয় পরিণাম। ধর্ম্মের বিধান এবং ঐতিহাসিক সত্যগুলিকে সম্মুখে রাখিয়া এই ব্যাপারের বিচার-বিশ্লেষণে প্রবৃত্ত হইতে গেলে, মুছলমান সমাজের বর্ত্তমান সংস্কারগুলির সহিত সমঞ্জস করিয়া কথা বলা সকল সময় সম্ভবপর হইয়া উঠে না।

বর্ত্তমান সময় মহররম উপলক্ষে এদেশের শীয়া ও অশীয়া মুছলমানেরা যে সব অনুষ্ঠান পালন করিয়া থাকেন, ধর্ম্মের ব্যবস্থায় বা প্রাথমিক যুগের ইতিহাসে তাহার কোন প্রমাণ বা নজির দেখিতে পাওয়া যায় না। তবু ন্যায়ের অনুরোধে স্বীকার করিতে হয়, শীয়াদের অনুষ্ঠানগুলির ভিতরে-বাহিরে বাস্তবিকই শোক ও সংযমের একটা গভীর পরিচয় পাওয়া যায়। ছুন্নী বলিয়া পরিচিত সাধারণ মুছলমানেরা মহররম উপলক্ষে যে সব ক্রিয়া কাণ্ডের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন, তাহাতে শোকও নাই সংযমও নাই। পূর্ব্বে এই সময় "আখাড়া" উপলক্ষে শহরবাসী সাধারণ মুছলমানদের মধ্যে লাঠি, বাঁক, তরবারী, পাটা প্রভৃতি খেলার একটা প্রবল উৎসাহ দেখা যাইত, দশ দিবারাত্রি আখড়ায় আখড়ায় নিপুণ ওস্তাদেরা শিক্ষার্থী-দিগকে ঐ সকল বিষয়ের তালিম দিতেন। তাহার ফলে সাধারণস্তরের অধিকাংশ মুছলমানই লাঠি ধরিতে অল্প বিস্তর অভ্যস্ত হইয়া যাইত। কিন্তু এখন, দারুণ দৈন্যের প্রভাবে ও পুলিশের কঠোর শাসনের কুফলে, অনুষ্ঠানের এদিক-টাও এক প্রকার লোপ পাইতে বসিয়াছে।

শিক্ষিত ভদ্র ও ধার্ম্মিক আমরা—ইহাদের প্রতি ঘৃণা বা উপেক্ষা চিরকালই প্রকাশ করিয়া আসিয়াছি; কিন্তু ইহাদিগকে সামলাইয়া লওয়ার ইচ্ছা আমাদের মনে কখনই উদিত হয় নাই। ইহারা ছোটলোক হইতে পারে, 'মাতাল-দাঁতাল' হইতে পারে, আর সে জন্য তাহাদের প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করা আমাদের পক্ষে হয়ত সঙ্গতও হইতে পারে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একথা ভুলিলে আমাদের পক্ষে খুবই অন্যায় হইবে যে, জাতির বিপদের সময় এই ঘৃণিত উপেক্ষিত "ছোট-লোকগুলিই" আমাদের ধন প্রাণ মান সম্ভ্রম এবং ধর্ম্ম ও ইজ্জত রক্ষা করার জন্য বীরের ন্যায় আত্মদান করিয়া থাকে। নিজেরা খুন জখম হইয়া, দলে দলে কারাবরণ করিয়া, সভ্য শিক্ষিত ও ধার্ম্মিক আমাদিগকে আততায়ীর হাত হইতে রক্ষা করিয়া থাকে ইহারাই। সেই ঘোর বিপদের সময়, ইহাদের সাহস ও স্ফূর্ত্তি, সঙ্ঘবদ্ধ-ভাবে কাজ করার আশ্চর্য্য ক্ষমতা, গোরার গুলির সম্মুখে হাসিতে হাসিতে ইহাদের বুক পাতিয়া দেওয়ার জীবনপ্রদ দৃশ্য, আমরা অনেকবার স্বচক্ষে দর্শন করিয়াছি।

কিন্তু উদ্যত লাঠি মাথার উপর হইতে সরিয়া যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমরা ইহাদিগকে এবং শত্রু করস্থিত যষ্টির পুনরুত্থিতির সম্ভবপরতাকে একেবারেই ভুলিয়া যাই। তখন ইহারা বেদ্‌জাতী ও ছোট লোক, আর আমরা ধার্ম্মিক ও ভদ্রলোক! এই উপেক্ষা ও অকৃতজ্ঞতার ফলে এই জাতীয় শক্তিকে সুগঠিত ও সুপরিচালিত করা, তাহাকে পুষ্ট ও হৃষ্টভাবে গড়িয়া তোলা, তাহাকে সংযত ও সঙ্ঘত ভাবে নিয়ন্ত্রিত করিয়া দেওয়া, সমাজের পক্ষে সম্ভবপর

হইয়া উঠিতেছে না। ফলে এই শক্তিটুকুও ক্রমে ক্রমে লোপ পাইয়া যাওয়ার উপক্রম হইয়াছে।

ইহার প্রতিকার দরকারী মনে করিলে আমাদিগকে সর্ব্বপ্রথমে ইহাদিগের সহিত মেলামেশা করার চেষ্টা করিতে হইবে। শিক্ষা ও সভ্যতার প্রভাব মুক্ত থাকায় ইহাদের অন্তঃকরণ এখনও সরলতা ও কৃতজ্ঞতার ভাবে পরিপূর্ণ। আমাদিগের নিকট হইতে সামান্য সাহায্য সহানুভূতি পাইলে ইহারা আমাদের কাছে সানন্দে আত্মসমর্পণ করিবে।

'মহররমের আখড়া বন্ধ করিয়া দাও'—হঠাৎ একথা বলিলে কোন সুফল ফলিবে না। উপস্থিত তাহাদের সঙ্গে মিশিয়া তাহাদের মনেপ্রাণে প্রকৃত অবস্থার অনুভূতি ক্রমে ক্রমে জাগাইয়া দিতে হইবে। তাহার পর, সঙ্গে সঙ্গে ঈদের উৎসবকে বিরাট ও ব্যাপক ভাবে জীবন্ত করিয়া তুলিতে হইবে। সভ্য শিক্ষিত ও ধার্ম্মিক আমাদিগকে সে উৎসবে তাহাদের সহিত মুক্তপ্রাণে যোগদান করিতে হইবে এবং এই ভাবে শনৈঃ শনৈঃ ঈদের উৎসব-কেই প্রবল ও সর্ব্বব্যাপী জাতীয়-উৎসবে পরিণত করিয়া ফেলিতে হইবে। ঈদের উৎসবে যোগদান করা, তাহাতে লাঠিখেলা ও আনন্দ করা যে স্বয়ং হজরত মোহাম্মদ মোস্তফার কল্যাণময় ছুন্নৎ, একথা নিজেদের কাজ ও কথার দ্বারা তাহাদিগকে উত্তমরূপে বুঝাইয়া দিতে হইবে। তাহা হইলেই মহররমের এই অনুষ্ঠানকে ক্রমে ক্রমে আমরা যথা ধর্ম্ম সমাজের কল্যাণে নিয়োজিত করিতে সমর্থ হইতে পারিব।

---

## ডাঃ লিবোঁর পয়গাম

ডাঃ গস্তাও লিবোঁ ফরাসীরএকজন অন্যতম মহামনীষী। তাঁহার "আরব সভ্যতা", "ভারত সভ্যতা" প্রভৃতি বিরাট গ্রন্থগুলি সুধীসমাজে সুপরিচিত। মিসরের জনৈক প্রবাসী ছাত্র ডাঃ লিবোঁর বিশেষ স্নেহলাভে সমর্থ হইয়াছিলেন। সম্প্রতি الزهراء নামক মিসরের একখানি সাহিত্য পত্রে তিনি "লিবোঁর চিন্তা ধারা" শীর্ষক একটী সন্দর্ভ প্রকাশ করিয়াছেন। তাহাতে তিনি বলিয়াছেন :—

"অধ্যয়ন শেষ করার পর দেশে ফিরিবার পূর্ব্বদিন আমি ডাঃ লিবোঁর নিকট বিদায় নিতে উপস্থিত হইলাম। তিনি আমার সম্বন্ধে সাধারণ শুভ ইচ্ছা প্রকাশের পর বলিলেন—প্রাচ্যের অতীত ও বর্ত্তমান জীবন-ধারার আলোচনা করাই আমার সমস্ত সাধনার প্রধান লক্ষ্য ছিল। আমি এ সম্বন্ধে কএকটা সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি। তুমি এখন ছাত্র জীবন শেষ করিয়া মিসরের নাগরিক জীবনে প্রবেশ করিতে যাইতেছ। তুমি ও তোমার মত প্রাচ্যের অন্যান্য সুশিক্ষিত যুবকেরা চেষ্টা করিলে সমস্ত এসিয়ায় একটা নূতন স্পন্দনের সৃষ্টি হইতে পারে। সেই জন্য তোমাকে সেই কথা কয়টী বলিতে চাই।

আমি বিশেষ আগ্রহ সহকারে অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। ডাক্তার কিছুক্ষণ মৌন অবলম্বন করার পর গম্ভীর ভাবে বলিতে লাগিলেন :—

"প্রাচ্যকে আমি যতদূর দেখিতে ও বুঝিতে সমর্থ হইয়াছি, তাহাতে আমার দৃঢ় বিশ্বাস, তাহার পতনের প্রধানতম কারণ হইতেছে—ধর্ম্ম সম্বন্ধে তাহার অনাচার। নানাবিধ কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাসের আবর্জ্জনা রাশির মধ্যে তাহারা প্রকৃত ধর্ম্মকে হারাইয়া ফেলিয়াছে। ধর্ম্মের প্রাণস্বরূপ যে সব জ্ঞান এবং ধর্ম্মসাধনার যাহা প্রকৃত লক্ষ্য, সেদিকে কেহই নজর দিতে চায় না। এইরূপে নিজেরা ধর্ম্মকে না চিনিয়া ও চিনিবার কোন চেষ্টা না করিয়া প্রাচ্যের ইউরোপ-প্রত্যাগত শিক্ষিতের দল পক্ষান্তরে ধর্ম্মের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিতেছে। উভয় পন্থাই তাহা-দিগকে মরণেরই দিকে অগ্রসর করিতেছে। এই দুই চরম পন্থা পরিত্যাগ করিতে না পারিলে প্রাচ্য স্বর্গের কল্যাণ ও মুক্তিকে কখনই প্রাপ্ত হইতে পারিবে না। প্রাচ্যের জন্য এখন এই শ্রেণীর সংস্কারের একান্ত আবশ্যক। তোমরা নূতন আলোকে ধর্ম্মকে যথাযথরূপে দর্শন ও দৃঢ়ভাবে গ্রহণ করার জন্য কৃতসঙ্কল্প হও! পূর্ব্বপুরুষের ক্ষুদ্র বৃহৎ সমস্ত সুকীর্ত্তি ও সমস্ত সাধনাকে আঁকড়াইয়া ধর, তাহাকে উজ্জ্বল-রূপে ফুটাইয়া তোল, তাহারই অনুসরণ করার জন্য বদ্ধ পরিকর হও!"

"দেশভেদে মানুষের বাহ্যরূপ ও আকার প্রকারের যেমন তারতম্য হয়, সেইরূপ ঐ কারণে তাহার অন্তর-প্রকৃতিরও পার্থক্য ঘটিয়া থাকে। প্রাচ্যের জাতীয় প্রকৃতির এই যে স্বভাবজাত স্বাতন্ত্র্য, ইহাকে অস্বীকার করিলে চলিবে না।

পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত যুবকগণ বিনাবিচারে ইউরোপের অনুকরণ করিতে যাইয়া মানব প্রকৃতির বিরুদ্ধেই বিদ্রোহ ঘোষণা করিতেছে।"

"যে কোন জাতি দুনয়াতে উন্নত হইয়া বাঁচিয়া থাকিতে চায়,—নিজের বর্ত্তমানকে অতীতের সঙ্গে যোগ করিয়া দেওয়া, পুরাতনের প্রত্যেক শুভ প্রচেষ্টাকে আনন্দ ও গৌরবের সহিত সম্মান দান করা, তাহার প্রধান কর্ত্তব্য হওয়া উচিত।"

"প্রাচ্যের আধুনিকতা-জ্ঞানের একটা পরিতাপজনক সাধারণ ধারা এই যে, ইউরোপের অনুকরণের সময়, ইউ-রোপীয় জাতি সমূহের চরিত্রের আসল দর্শনীয় দিকটার প্রতি নির্ম্মমভাবে উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়া, কেবল তাহার বাহিরের দিকটার প্রতি নজর দেওয়া হয়। ফলে যে জিনিষটার দ্বারা ইউরোপ আজ এত বড় হইতে পারিয়াছে, তোমরা তাহা দেখিতে পাওনা—দেখিতে চাও না। দেখিতে পাইলেও তাহার বিরুদ্ধাচরণ করাকেই তোমরা নিজেদের আধুনিকতার প্রধানতম গৌরব বলিয়া মনে করিয়া থাক! পক্ষান্তরে ইউরোপের জীবনবেদের বাহিরের যে সাময়িক উচ্ছৃঙ্খলা, উন্নতির চরম নিদান বলিয়া তাহাকেই তোমরা আঁকড়াইয়া ধরিতে চাও। তোমাদের জাতীয় জীবনের স্তরে স্তরে ইহার হিতেবিপরীত ফল ফলিতে আরম্ভ হইয়াছে।"

"জাতিকে গড়িয়া তুলিতে হইলে তাহার ব্যক্তিগণকে আত্মস্থ হইতে হইবে। আত্মের প্রতি ঘৃণা যাহাদের গৌর-বের বস্তু, জাতি হিসাবে আত্মপ্রতিষ্ঠা করা সেই আপনহারা হতভাগ্যদের পক্ষে সম্পূর্ণ অসম্ভব। তোমাদের দেশবাসীকে বলিয়া দিও—এই আত্মবিস্মৃতি ও অন্ধ অনুকরণ পাশ্চাত্যের মনীষী সমাজের মনে তোমাদের জন্য কোন শ্রদ্ধার ভাব জাগাইয়া তুলিতে পারিতেছে না—বরং ইহাতে তাঁহাদের চোখে তোমাদের অযোগ্যতাই প্রকট হইয়া উঠিতেছে।"

"এখনও সময় আছে—দেশে গিয়া এই ধারার পরিবর্ত্তন করিতে সচেষ্ট হও—প্রাচ্যের নিকট ইহাই আমার শেষ পয়গাম!"

আমাদের শিক্ষিত যুবকগণ মনীষী লিবোঁর এই উপদেশ-গুলি সম্বন্ধে একটু চিন্তা করিয়া দেখিলে বাধিত হইব।

——

## মারহাবা!

মৌলবী মোহাম্মদ শহিদুল্লাহ ছাহেবকে জানেন না, এরূপ লোক বোধ হয় বাঙ্গলার শিক্ষিত মুছলমান সমাজে খুব কমই আছেন। তাঁহার বহু ভাষা জ্ঞান, তাঁহার সাহিত্য সাধনা এবং তাহার স্বধর্ম্মনিষ্ঠার পরিচয় সকলেই অবগত আছেন। মৌলবী ছাহেব নিজের জ্ঞান সাধনাকে সম্পূর্ণ করার জন্য দুই বৎসর হইতে ইউরোপে অবস্থান করিতেছিলেন। সম্প্রতি ঢাকার মৌলবী নূর আহমদ ছাহেবের নিকট প্যারী নগরী হইতে মৌলবী শহিদুল্লাহ ছাহেবের যে পত্র আসিয়াছে, তাহাতে জানা যায় যে, শিক্ষার কাজ সমাধা করিয়া তিনি আগষ্ট মাসের শেষভাগে দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন।

এই সংক্ষিপ্ত পত্রে মৌলবী ছাহেবের যে মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যাইতেছে, তাহাতে আমরা যাহার পর নাই আনন্দিত ও উৎসাহিত হইয়াছি। তিনি স্পষ্টই হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন, আমাদের সব শিক্ষাদীক্ষা আর সমস্ত রস-পিপাসা ব্যর্থ হইয়া যাইবে, যদি তাহা সমাজের কল্যাণকে আঁকড়াইয়া না ধরিয়া শুধু হাওয়ার ফুলের মত শূন্যে ফুটিয়া থাকে। তাই তিনি পত্রে লিখিয়াছেন—"মুসলমানের ঘরে একটা মস্ত লেখক জন্মালে, মুসলমান সমাজ সুখী হবে না—যদি না সে তারই একজন হয়।" প্রতিভার আগুনের অস্তিত্বই প্রতিভার স্বার্থকতা নয়। তিনি বলিয়াছেন—"আগুন যদি ঘর জ্বালায়, মসজিদ পোড়ায়, কে তা সহ্য করবে?" দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া তিনি এই আদর্শে মোছলেম বঙ্গে এমন একটা "সাহিত্যিক সঙ্ঘ" গড়িয়া তুলিতে চান—"যারা বাংলাবীণায় হেজাজ ও শীরাজের অপূর্ব্ব রাগিনীর ঝঙ্কার দিয়ে বাঙ্গালী মুছলমানের মরা প্রাণে ভাবে ভরা বান বওয়াবে—যারা সাহিত্যের মন-মাতান রক্ত-নাচন সুরে বাঙ্গলার মুছলমানকে টেনে এক নূতন গৌরব ও আনন্দের দেশে নিয়ে যাবে।"

আমরা আল্লার নিকট প্রার্থনা করিতেছি—মৌলবী শহিদুল্লাহ ছাহেব শরীর ও মনের পূর্ণ স্বাস্থ্য লইয়া আমা-দের কাছে ফিরিয়া আসুন, তাঁহার আশা বাস্তবে পরিণত হউক! বাঙ্গলা বীণার তারে তারে হেজাজের বিস্মৃতসুর আবার জাগিয়া উঠুক!!

——

## কুমারীর সন্তান !

কুমারীর সন্তান প্রসবের কথা পূর্ব্বে খুব অভিনব বলিয়া মনে করা হইত। সেই জন্য অতীত কালে এরূপ সংবাদ শুনিলে মানুষ খুব আশ্চর্য্য বোধ করিত, এবং সময় সময় সেরূপ সন্তানকে তাহারা ঈশ্বর বা ঈশ্বরের ঔরসজাত পুত্র বলিয়া স্বীকার করিতেও কুণ্ঠিত হইত না। কিন্তু ইউরোপের বর্ত্তমান সভ্যতার কল্যাণে কুমারীর সন্তান প্রসব করা একটা সাধারণ ব্যাপারে পরিণত হইয়াছে। রুষিয়ার মুক্তিকামী বা মুক্তকামীদের কল্যাণে সে দেশে এই কয় বৎসরের মুক্তির ফলে, জারজ সন্তানের সংখ্যা বহুলক্ষে পরিণত হইয়াছে। আমাদের দেশেও একদল বলসেবী ও কামসেবী লোকের অভ্যুদয় হইয়াছে। তাঁহারাও সুসভ্য ও সুশিক্ষিত খৃষ্টান জগতের আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করিতেছেন যে, বিবাহের নাগপাশের বাঁধনে প্রেম জিনিষটা একেবারে আড়ষ্ট হইয়া পড়ে, শাস্ত্রের ১৪৪ ধারা জারি করিয়া যে বিবাহ, তাঁহাদের মতে, তাহা ধর্ম্ম হইতে পারে, কিন্তু প্রেমের সংশ্রব তা তে থাকিতে পারে না। ফলে এই মুক্তিকামীর দল মানব সমাজকে এতদিন পরে শৃগাল কুকুরের সমাজে পরিণত করিয়া ফেলিতে চান।

ইঁহাদের এই উদ্ভট মতবাদের প্রতিবাদ যাঁহারা করিয়া থাকেন, তাঁহাদের মধ্যকার অনেককে আবার কার্য্যতঃ এই মতবাদের সহায়তা করিতেই দেখা যায়। তাঁহাদের আমোদ আনন্দ এমনকি ধর্ম্মশিক্ষারও প্রধান অবলম্বন হইতেছে—বেশ্যা। থিয়েটারে ও উৎসবে বেশ্যার নাচ গান না হইলে ইহাদের জাত হজম হয় না, বায়স্কোপের নারকীয় অশ্লীল দৃশ্যগুলি ইঁহারা পরম তৃপ্তি সহকারে উপভোগ করিয়া থাকেন, এবং অনেকে আবার বেশ্যার বাড়ী বসিয়া একটু আমোদ আহ্লাদ করিয়া আসাকেও খুব নির্দ্দোষ কাজ বলিয়া মনে করেন। সীতা সাবিত্রীর আদর্শে স্ত্রী-কন্যাদিগকে অনুপ্রাণিত করিয়া তোলার মহৎউদ্দেশ্যে ইঁহারা এখন স্ত্রী-কন্যাদিগকেও থিয়েটারে লইয়া যাইতে আরম্ভ করিয়াছেন। আমাদের পবিত্র অন্তঃপুর গুলিতেও এইভাবে কালের কলুষ প্রবেশ করিতে আরম্ভ করিয়াছে।

মুছলমান সমাজের পতনটাকে পূর্ণ পরিণত করিয়া তোলার জন্য একদল মুছলমান, বেশ্যা ও থিয়েটারের মহিমাকে সমাজের বুকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া দিতে প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছেন। বাজারের বেশ্যাকে পুরমহিলাদের আদর্শরূপে খাড়া না করিতে পারিলে তাঁহাদের আর স্বস্তি হইতেছে না। বেশ্যা আর ব্যভিচার অল্পবিস্তর সকল দেশে সকল সময় বিদ্যমান ছিল, কিন্তু কলার নামে, প্রেমের নামে আর মুক্ত জ্ঞানের নামে, তাহাকে সমাজে এমন ভাবে সচল করিয়া দিবার বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থা ও দার্শনিক যুক্তিবাদ আর কখন কোন দেশে প্রচলিত ছিল বলিয়া শুনিতে পাওয়া যায় নাই।

এ ব্যাপারে আশার কথা এই যে, শ্রীপাট ইউরোপ ধামে এই উচ্ছৃঙ্খলার চরম হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেখানকার মহা মনীষীগণ "Enough of this freedom" বলিয়া ঘোর প্রতিবাদ আরম্ভ করিয়াছেন। সমাজতত্ত্ববিদ্ ও চিকিৎসা বিজ্ঞান বিশারদ পণ্ডিতেরা চীৎকার করিয়া বলিতেছেন—"এই উচ্ছৃঙ্খলতার মাত্রা হ্রাস করার জন্য আশু চেষ্টা আরম্ভ না হওয়ায় এবং স্বাধীনতার নামে উচ্ছৃঙ্খলতার প্রশ্রয় দেওয়ার ফলে, ইউরোপের স্ত্রীলোকেরা ক্রমে ক্রমে নারীত্ব পর্য্যন্ত বর্জ্জিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে, তাহাদের সন্তান উৎপাদিকা শক্তি ক্রমে ক্রমে লোপ পাইয়া আসিতেছে। তাহার পর, সতীত্বের মূল্য মর্য্যাদা ক্রমশঃ কমিয়া আসায় জাতির জীবনে নানাদিক দিয়া যে সকল মারাত্মক হলাহল প্রবেশ করিতেছে, আর কিছু কাল পরে তাহার প্রতিকার দুঃসাধ্য হইয়া দাঁড়াইবে। ইটালীর শক্তিমান শাসনকর্ত্তা মুসোলিনী ইতোমধ্যে আইন প্রণয়ন করিয়া এই অনাচারের প্রতিকার করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। অন্যান্য দেশেও আইন প্রণয়ন করার সুর উঠিয়াছে। ইউরোপ এই প্রতিক্রিয়ার দিকে আর একটু অগ্রসর হইলেই আমরা হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিতে পারি। কারণ এখন যেমন উচ্ছৃঙ্খলতা ও অনাচার হইতেছে যুগধর্ম্ম, তখন তাহার প্রতিক্রিয়াটাই আবার যুগধর্ম্ম হইয়া দাঁড়াইবে। আমাদের এই শ্রেণীর লোকগুলি শুকনা কুটার মত হালকা, যখন যে দিকটার বাতাস বহিবে, ইঁহারা সে বাতাসে উড়িয়া বেড়াইবে। ইহাই হইতেছে বহুবিশ্রুত Time spirit বা যুগধর্ম্ম কথাটার খোলাসা মৎলব।

এই মন্তব্যটা লিখিবার সময় মিস সলভা প্যাং শ্রীষ্টের সন্তান প্রসবের বিবরণ একখানা সংবাদ পত্রের পৃষ্ঠায় দৃষ্টিগোচর হইল। গত যুদ্ধের পূর্ব্বে এই কুমারী

প্যাংক্রীষ্টের নামে ইংলণ্ডে কি হুলস্থূলই না বাধিয়াছিল। নারীর ভোটের অধিকার আদায় করার জন্য সে সময় বিলাতে যে ঘোর অশান্তি উপদ্রব আরম্ভ হইয়াছিল, কুমারী প্যাংক্রীষ্ট ছিলেন, তাহার প্রধান নায়িকা। যুদ্ধের সময় হইতে আজ পর্য্যন্ত এই কুমারীর আর কোন সাড়াশব্দ পাওয়া যায় নাই। সম্প্রতি সংবাদপত্রে প্রবন্ধ লিখিয়া ও স্বতন্ত্র পুস্তিকা ছাপাইয়া, কুমারী বিশেষ সপ্রতিভভাবে প্রকাশ করিয়াছেন যে—সম্প্রতি তিনি একটী হৃষ্টপুষ্ট পুত্র সন্তান প্রসব করিয়াছেন। এই পুত্রের পিতাকে তিনি নিজের "সোহাগের স্বামী" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। বিবাহ অপেক্ষা ব্যভিচার যে কি প্রকার সুখশান্তিপ্রদ, সে সম্বন্ধেও তিনি অনেক কথা কহিয়াছেন! তাঁহার প্রথম ছত্রটী পাঠ করিলেই তাহার নমুনা বুঝিতে পারা যাইবে। কুমারী বলিতেছেন :—তালাক বিভাগের এলাকা আমাদের উপর নাই। ইংলণ্ডে আজ তালাকের যে এত ছড়াছড়ি, তার একমাত্র কারণ—স্বামী-স্ত্রীর স্বাধীনতার অভাব। বিবাহ করিলে তাহাদের পরপুরুষের বা পরনারীর সহিত আশক্তি করার অধিকার থাকে না—কাজেই এজন্য তাহাদিগকে বিবাহবন্ধন ছিন্ন করিতে হয়। আমাদের কিন্তু এ ভাবনা নাই। আমি আর আমার সোহাগের স্বামী এ সম্বন্ধে কাহারও স্বাধীন প্রবৃত্তিতে কোনও প্রকার বাধা দিতে সম্মত নহি। কাজেই আমাদের নিস্বার্থ প্রেম খুব গাঢ় ও খুব গভীর হইয়া আছে।

মিস প্যাংক্রীষ্ট ইংলণ্ডের এক সম্ভ্রান্ত পরিবারের কন্যা। গত আন্দোলনে তিনি যেরূপ কৃতকার্য্যতা লাভ করিয়াছিলেন, সংবাদপত্র পাঠকগণের তাহা অবিদিত নাই। এখন তাঁহার বয়স ৪৬ বৎসর উত্তীর্ণ প্রায়। এই শ্রেণীর স্ত্রীলোকেরাও নিজের ভ্রষ্টতার দার্শনিক যুক্তিবাদ লইয়া ইংলণ্ডের বুকে অবাধে বিরাজ করিতেছেন। আমাদের বিলাতী মোকাল্লেদের দল নারীর স্বাধীনতার নামে যে আদর্শের অনুসরণ করিতে যাইতেছে, এই শ্রেণীর কুমার কুমারী এবং সোহাগের স্বামীস্ত্রীরাই হইতেছেন তাহার খুব উচ্চস্তরের নমুনা। মধ্য ও নিম্নস্তরের কথা বলিতে আমরা অসমর্থ। কারণ প্রথমতঃ পুলিশ আইনের ভয়, দ্বিতীয়তঃ আমাদের আধুনিক সুসভ্যজনোচিত সুরুচি ও সৎসাহসের অভাব।

**Printed and Published by Md. Khairul Anam Khan from the "Mohammadi Press," 29, Upper Circular Road, Calcutta.**

# প্রসিদ্ধ কপির বীজ ও গাছ বিক্রেতা

রোপণ বপনের উপযুক্ত সময় উপস্থিত। আপনার অর্ডার পাঠাইতে দেরী করিবেন না।

এই সময়ের বপনোপযোগী নূতন আমদানী আমেরিকান সব্জী বীজের প্রতি তোলার মূল্য :—বাঁধাকপি ফ্লোরিডা হেডার ১৲ রিড্ল্যাণ্ড ড্রামহেড, (ব্রান সুইফ) ১৲, নারিকেলী ড্রামহেড, অল্‌হেড ক্যাফ্রি, স্যাভয় ও লাল বাঁধাকপি প্রত্যেক ১৲, ফুলকপি আর্লি-স্নোবল (ফুলকপির রাজা) ৪৲, রিলায়েবল ২৲ আলজিয়ার্স, লিনরমণ্ডস্ আর্লি পারিস প্রত্যেক ১৷০, ফুলকপি আর্লি লণ্ডন ১৲, ওলকপি সাদা ও বেগুনে প্রত্যেক ১৲ ও ৮০, শালগম, গাজর বীট ও লাল সাদা ও বেগুনে প্রত্যেক ।০, বাঁধা ছালাদ, ট্যামাটো, কাঁটাশূন্য ৴৬ সেরা বেগুন ২৲ চীনের মিষ্ট লঙ্কা, হরিদ্রা বর্ণের বড় পেঁয়াজ, প্রত্যেক ৮০ সেলেরি শতমুখী বাঁধাকপি, রোকলি, বৃহদাকার লাউ, কুমড়া, সাদা পেঁয়াজ প্রত্যেক ৮০, আমেরিকান মটর শুঁটী ফ্রেঞ্চবীন ৴০ (সের ৪৲)। পাটনাই ফুলকপি ॥০, পেঁয়াজ ।৴০, কাঁথির লাল মূলা ৵০ (সের ৬৲), বোম্বাই লাল মূলা ৶০ (সের ১২৲), বোম্বাই লম্বাকৃতি পেঁপে ৮০, কাঁটাযুক্ত বেড়ার বীজ আউন্স ৶০ (সের ৪৲); এই সময়ে বপনোপযোগী ১০ রকম দেশী শাক-সব্জীর বীজ ডাক খরচ সহ ১॥০। মনোহর মরসুমী ফুলের বীচ প্রত্যেক রকম ।০, ৫ প্যাকেট ৫ প্রকার একত্র ডাক খরচসহ ১॥০, তামাক বীজ ৵০ প্যাকেট। অন্যান্য বীজের মূল্য ক্যাটালগে দ্রষ্টব্য। ১৲ টাকার কম মূল্যের বীজ ভিঃ পিঃতে পাঠান হয় না। মাশুলাদি ক্রেতাকে দিতে হয়।

আমাদের নিজ উদ্যানের পরীক্ষিত বৃক্ষের প্রস্তুত নানাবিধ ফল ফুলের চারা ও কলম এবং ক্রোটন্, পাম, পাতাবাহারের গাছ সর্ব্বজন প্রশংসিত, অকৃত্রিম ও সুলভ। পরীক্ষা প্রার্থনীয়। অর্দ্ধ আনার ডাক-টিকিটসহ পত্র লিখিলে গাছ ও বীজের ক্যাটলগ বিনামূল্যে পাঠান হয়। গাছের অর্দ্ধমূল্য অগ্রিম পাঠাইতে হয়।

695 ইষ্ট বেঙ্গল নর্শরী—২৫৬ নং অপার চিৎপুর রোড, পোষ্ট বাগবাজার কলিকাতা।
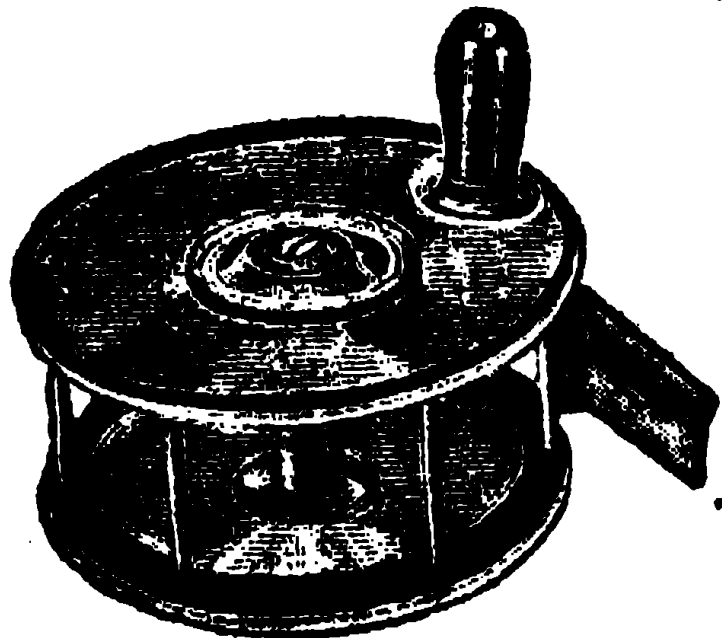
---

## মৎস ধরা হুইল

হুইল ২৲ ইঃ গায়ে হ্যাণ্ডেল ২।০, ২॥০, ইঃ ২৸৴০।। বিলাতী হুইল পিতলের ৩।০, ২৸০ ষ্টীলের ৪॥০, ৩৸০। নিকেল ৩৸০, ৩৲। মুগা সূতা ১।০ ও ১।০ ভরি, বঁড়শী—জোড়া ৵০, ৶০। ছিপের কড়া ১২টী ।০, ফাৎনা ১টি ৵০, বিলাতী বঁড়শী হাজার ৪॥০ টাকা! মাছ ধরা চার কৌটা ।৵০ আনা। ডাক মাশুল স্বতন্ত্র। 496;

ইষ্ট বেঙ্গল ষ্টোর—২৫৬নং আপার চিৎপুর রোড, পোঃ বাগবাজার কলিঃ।

---

## ডাঃ আর, এল, মজুমদার কৃত ফসফো পিল

শুক্রতারল্য, ধ্বজভঙ্গ, ও স্নায়ুবিক শক্তিহীনতার মহৌষধ।

যৌবনের অপরিমিত অহিতাচরণের বিষময় ফলে যাঁহাদের শুক্রতারল্য, ধ্বজভঙ্গ, অজীর্ণ ও স্নায়বিক শক্তিহীনতা, আসিয়াছে এবং আরোগ্য বিষয়ে হতাশ হইয়াছেন, যৌবনে বার্দ্ধক্য এবং বার্দ্ধক্যে জীবনীশক্তি অভাব ও আনন্দশূন্যতা অনুভব, করিতেছেন, তাঁহারা ফস্‌ফো পিল সেবন করুন। নষ্টশুক্র, তেজ, বল, মেধা আবার ফিরিয়া আসিবে। মূল্য প্রতি শিশি ১।।০ দেড় টাকা। মাশুলাদি স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান :—ডাঃ আর, এল, মজুমদার এণ্ড কোং

694 আপার চিৎপুর রোড. (৮৪নং রাজারাজবল্লভ ষ্ট্রীট, বাগবাজার) কলিকাতা।

একশিশি "মোহিনী সুগন্ধি" দ্বারা অর্দ্ধ সের বা দুই আউন্সের আট শিশি অতি উৎকৃষ্ট মহাসুগন্ধি কেশ তৈল প্রস্তুত হয়।

# "মোহিনী সুগন্ধি"

স্পিরিট বর্জ্জিত পুষ্পসার। খাঁটী এসেন্স বা সেণ্ট। অতি সুলভে

মহাসুগন্ধি কেশ তৈল প্রস্তুতের একমাত্র নূতন জিনিষ। ইহা বাজারে বিক্রীত স্পিরিট মিশ্রিত সেণ্ট বা এসেন্স নহে। ইহা খাঁটী জিনিষ। অর্দ্ধ আউন্স শিশির এক শিশি "মোহিনী সুগন্ধি" (যে কোন প্রকারের গন্ধ বিশিষ্ট হউক না কেন) অর্দ্ধ সের তিল, বাদাম বা নারিকেল তৈল মিশাইলে সেই তৈলে অতি আশ্চর্য্যরূপ সুগন্ধ যুক্ত হয়। বাজারে বিক্রীত সুগন্ধি কেশ তৈল ক্রয় না করিয়া "মোহিনী সুগন্ধি" দ্বারায় সুবাসিত কেশ তৈল প্রস্তুত করুন; আপনার অনেক পয়সা রক্ষা হইবে। দেশী আতর বা বিলাতী এসেন্সের পরিবর্ত্তে ২।৩ ফোঁটা মাত্র রুমালে বা কাপড়ে দিলে চারি দিক সুগন্ধে আমোদিত হইবে এবং সেই সুগন্ধ বহুদিন থাকিবে। বিড়ি, সাবান, দোক্তা, তামাক, দন্তমঞ্জন ইত্যাদিও "মোহিনী সুগন্ধি" দ্বারা অতি উত্তমরূপে সুবাসিত হয়। সত্য মিথ্যা একবার পরীক্ষা করিলেই বুঝিতে পারিবেন। যদ্যপি সুবাসিত না হয় তবে আমরা ইহার মূল্য ফেরত দিব। ৩০ প্রকার গন্ধের "মোহিনী সুগন্ধি" আছে। তন্মধ্যে নিম্নে ১০ প্রকার গন্ধের নাম ও মূল্য দেওয়া হইল। পত্র লিখিলে ইংরাজি বিজ্ঞাপন পাঠান হয়। "মোহিনী সুগন্ধি" অর্দ্ধ আউন্স শিশিতে বিক্রয় হয়। প্রতি অর্দ্ধ আউন্স শিশির মূল্য যথা :—

| | | | |
|---|---|---|---|
| ১। গোলাপগন্ধ ( Rose ) মোহিনী সুগন্ধি ... | ১।৷০ | ৬। পদ্ম গন্ধ ( Lily ) মোহিনী সুগন্ধি ... | ১৲ |
| ২। হেনা গন্ধ ( Hena ) " " ... | ১।৷০ | ৭। কুমুদ গন্ধ ( Lotus ) " " ... | ১৲ |
| ৩। যুঁই গন্ধ ( Jasmin ) " " ... | ১।৷০ | ৮। কমলা গন্ধ ( Orange ) " " ... | ১৲ |
| ৪। কদম্ব গন্ধ ( Kadamba ) " " ... | ১।৷০ | ৯। সুবাসিত গন্ধ ( SWeet ) " " ... | ১৲ |
| ৫। বকুল গন্ধ ( Bokul ) " " ... | ১।৷০ | ১০। মিশ্র গন্ধ ( Mixed ) " " ... | ।৷০ |

গোলাপ, কদম্ব, যুঁই বকুল, পদ্ম ও কুমুদ গন্ধ "মোহিনী সুগন্ধিতে" ঐ সকল ফুলের গন্ধ পাইবেন। সুবাসিত অথবা মিশ্র গন্ধ "মোহিনী সুগন্ধি" প্রত্যহ ব্যবহারের পক্ষে বিশেষ সুবিধাজনক ও মূল্যে সুলভ। অর্ডার দিবার কালীন কোন গন্ধ "মোহিনী সুগন্ধি" চাই তাহা লিখিতে ভুলিবেন না। উপহার :—প্রত্যেক ক্রেতাকে তৈল লাল রং করিবার জন্য এক প্যাকেট এলক্যানেট রুট্ বিনামূল্যে উপহার দেওয়া হয়।

66 এস, পাল এণ্ড কোং, পারফিউমারস্; (মহা) ৪নং হসপিটাল ষ্ট্রীট, ধর্ম্মতলা, কলিকাতা।
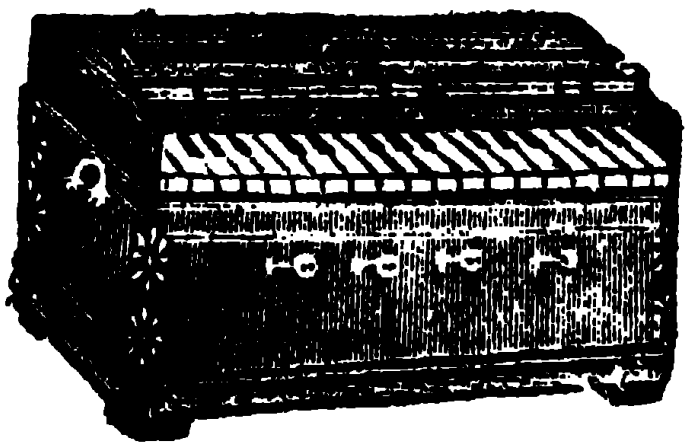
Our **"Mohni Flute"** Harmoniums are made of best seasoned teak-wood under expert supsrvision by skilled labour. Hence they leads and others follow. Quality Harmoniums they are in Quality, melody and durability. They are the ministering angels that cheer every Home.

আমাদের মোহিনী ফ্লুট খুব সস্তা সুন্দর ইহা ছাড়া অন্যান্য সর্ব্বপ্রকার বাদ্যযন্ত্র আমাদের এখানে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত থাকে।

দি হারমোনিয়ম ম্যানুফ্যাকচারিং কোং
১২নং লোয়ার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।

THE
**HARMONIUM MFG. CO.,**

9 *12 Lower Chitpore Road, CALCUTTA.*

আনন্দ সংবাদ! আনন্দ সংবাদ!

সন ১৩১৮ সালে স্থাপিত।

কি চাই? হারমোনিয়ম বহু দিনের পুরাতন দোকান—কেন আমজদ এণ্ড কোম্পানীর দোকান হইতে লউন না—আমাদের হারমোনিয়ম যেরূপ দেখিতে সুন্দর, তেমনি দীর্ঘকাল স্থায়ী। আওয়াজ গম্ভীর ও স্পষ্ট এবং মফঃস্বলের খরিদ্দারের জন্য পাইকারী দামও খুব সুবিধা করিয়া দিয়াছি। খরিদ করিবার আগে পরীক্ষা করিয়াই দেখুন না, পত্রলিখিলেই মূল্যতালিকা পাঠাইয়া দিই।

অন্যান্য জিনিষের দাম স্বতন্ত্র।

| এঃ——মণ্ডল ফ্লুট | এঃ মহিনী ফ্লুট—— |
|---|---|
| ডবল রিড—৩৬৲ | ডবল রিড—২৬৲ ২৮৲ ৩২৲ |
| সিঙ্গেল রিড ২০৲ | সিঙ্গেল রিড ১৬৲ ১৮৲ ২০৲ |

আমজেদ এণ্ড কোং

69 ৩৭৪নং আপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।

# মাসিক মোহাম্মদী

মরহুম সৈয়দ আমীর আলী

সম্পাদক—

# ডালমীরা এণ্ড কোং
১০ নং লোয়ার চিৎপুর রোড
কলিকাতা

Dulmira & Co.

## অর্গ্যান ও হারমোনিয়ম

প্রত্যেক পর্দ্দায় এক একটী নিখুঁত ও ভরাতী সুর পাইবেন।

ক্রয় করিবার পূর্ব্বে, একবার পদার্পণ করিতে অনুরোধ করি।

ফোল্ডিং অর্গ্যান—১০০৲ হইতে ১৫০৲
ক্যাবিনেট অর্গ্যান—১৫০৲ হইতে ৫০০৲
হারমোনিয়ম—২৫৲ হইতে ৩২০৲

সচিত্র ক্যাটলগের জন্য পত্র লিখুন।

P. DATTA & CO.

---

ভারতের এক মাত্র শ্রেষ্ঠ ও অকৃত্রিম আয়ুর্ব্বেদীয় আশ্রম

# বংশীধর আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়

২২নং বনফিল্ড লেন কলিকাতা

### শিবশক্তি বটিকা :—

সর্ব্বপ্রকার জ্বরের যম ইহার এক বটী সেবনে জ্বর ছাড়ে সপ্তাহ সেবনে আর জ্বর হয় না দেশীয় গাছগাছড়ায় প্রস্তুত এরূপ মুগ প্রমাণ বটীর শক্তি দেখিয়া মোহিত হইবেন। মূল্য ১০০ বটী ১৲ ১০০০ বটী একত্রে ৮৲ ডাঃ মাঃ ।/০ পাঁচ আনা মাত্র।

### রতি রঞ্জন :—

রতি ক্রিয়া ইচ্ছুক ব্যক্তি ও যুবকগণের পক্ষে রতি রঞ্জন একটী অমূল্য বস্তু ইহা সেবন করিয়া অত্যধিক রতি ক্রিয়া করিলেও ধাতুদৌর্ব্বল্য জন্মিতে পারে না। ১ কৌটা ১৲ ডাঃ মাঃ ।৵০

### সঞ্জীবনী সালসা :—

রোগা শরীর মোটা করে পারাদোষ নষ্ট করে, ভগ্ন স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার করে ও দেহে নূতন রক্তের সঞ্চার করে। এক শিশি—১৲ ৩শিশি ২॥০ ডাঃ মাঃ স্বতন্ত্র।

### গুঞ্জন তৈল :—

যাঁহাদের ইন্দ্রিয় দৌর্ব্বল্য ও পুরুষত্বহানী ঘটিয়াছে তাঁহাদের ইহা স্থানীয় মালিশে শিরা সকলের সঙ্কোচ ভাব দূর করিয়া দ্বিগুণ উত্তেজনা শক্তি প্রদান করে। দুর্ব্বল ইন্দ্রিয় সতেজ করিয়া সপ্তাহে শিথিল ইন্দ্রিয় সুদৃঢ় করে। ১শিশি ১॥০ ডাঃ মাঃ ।৵০

ইহার সহিত রতি রঞ্জন ব্যবহার করিলে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়।

**বিনামূল্যে বিতরণ :**—দশ জন ভিন্ন ভিন্ন গ্রামের লোকের নাম ও ঠিকানা ও এক আনা টিকিট সহ পত্র লিখিলে ৪ মাত্রা মকরধ্বজ বিনামূল্যে দেওয়া হয়।



অর্ডার দিবার সময় অনুগ্রহ পূর্ব্বক—"মাসিক মোহাম্মদীর" নাম উল্লেখ করিবেন।

# সূচীপত্র—ভাদ্র ১৩৩৫

# সবল স্বাস্থ্য অনুভূতি

চেহারা দেখিলেই আপনি বলিবেন যে তিনি একজন সুখী ব্যক্তি। তাঁহার বদন মণ্ডল হইতে স্বাস্থ্যের আলো বিকীর্ণ হইতেছে এবং তাঁহার উৎসাহ-ব্যঞ্জক হাবভাব দেখিয়া প্রতীয়মান হয় যে তিনি বলিষ্ঠ এবং স্বাস্থ্যবান ব্যক্তি।

তিনি যেখানেই থাকুন তাঁহার উপর যে বহু প্রশংসা-ব্যঞ্জক দৃষ্টি পতিত হইবে তাহাতে আশ্চর্য্যের বিষয় কিছুই নাই।

আপনিও স্যানাটোজেন ব্যবহার করিয়া ইঁহার ন্যায় স্বাস্থ্যবান হইতে পারেন। কারণ স্যানাটোজেন এর মধ্যে এমন কতকগুলি উপাদান নিহিত আছে যদ্দারা বলিষ্ঠ ও স্বাস্থ্যবান হওয়া যায়। অদ্য হইতে স্যানাটোজেন ব্যবহার করিতে আরম্ভ করুন; অনতিকাল মধ্যেই আপনি সুস্থ ও সবল হইয়া সমস্ত সুখ সম্পূর্ণরূপে উপভোগ করিতে পারিবেন।

# SANATOGEN

## যথার্থ বলকারক খাদ্য

সমস্ত ঔষধের দোকানে ও বাজারে প্রাপ্তব্য

অর্ডার দিবার সময় অনুগ্রহ পূর্ব্বক "মাসিক মোহাম্মদী" নাম উল্লেখ করিবেন।

## সূচীপত্র—ভাদ্র ১৩৩৫

# ৩০০০৲ টাকার মাল গ্রাহকগণ বিনামূল্যে পুরস্কার পাইবেন !!

## ৪।০ টাকা ডর্জ্জন দাদের মলম লইলে ৩০ প্রকার বহুমূল্য জিনিষ পুরস্কার !! ফ্যাশানেবল "ট্রায়" রিষ্ট ওয়াচ এবং পকেট ঘড়ি পুরস্কার পাইবেন !!!

## উপহারের জিনিষ দেখিলে চমকিত হইবেন।

নূতন পুরাতন যে কোন প্রকারের কুৎসিত দাদ এই ঔষধ লাগাইবা মাত্র ২৪ ঘণ্টার মধ্যে বিনা কষ্টে সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য হইবে। এই ঔষধের ১২ কৌটার মূল্য ৪।০ এবং ইহার সহিত নিম্নলিখিত ৩০ রকম জিনিষ বিনা-মূল্যে পুরস্কার দেওয়া হয়।

পুরস্কারের জিনিষ :—এক শিশি ভাল আতর ভাল কাঁচি, ভাল ব্রুস, সোণার কানের লবঙ্গফুল সোণার নাকফুল, সুন্দর রুমাল, রবারের চিরুণী আয়না, ৩০ খানি ভাল বায়স্কোপ, বিলাতী চাকু, সুন্দর পানের কৌটা, হাতের ও গলার বোতাম বিলাতী হোল্ডার ১টী, কান ও দাঁত খুঁচকি, শব্দওয়ালা পিস্তল ও ছাররা, পাথর বসান আংটী, ভাল তাস এক জোড়া, ভাল মনিব্যাগ ১টী, যাদুর বাক্স একটী আশ্চর্য্যজনক যাদুর সাপ, বিনা ম্যাচে সিগারেট বিড়ি ধরাইবার যন্ত্র ১টী, ফাউণ্টেন পেন ১টী, সুন্দর চশমা ১টী, দেব দর্শন আংটী ১টী, মুখে বাজান হারমোনিয়ম ১টী, জর্দ্দা রাখিবার কৌটা ১টী, জলতরঙ্গ, বাঁশী, রিষ্ট ওয়াচ এবং পকেট ওয়াচ। এক ডর্জ্জনের কম ঔষধ লইলে পুরস্কার দেওয়া হয় না।

### প্রাপ্তিস্থান :—দি ফ্রেণ্ডস্ অফ ইণ্ডিয়া

২৮১, আপার চিৎপুর রোড,

কলিকাতা।

# মহর্ষি চরকের বাণী—আমাদের কথা নহে।

"ইহা সেবনে বৃদ্ধ ব্যক্তিও আত্মজাত সন্তানের মুখ দেখে এবং সন্তান অক্ষয় হইয়া থাকে। ......ইহার প্রয়োগ দ্বারা পুরুষ বপুষ্মান স্নিগ্ধ, বলবর্ণযুক্ত ও হৃষ্টেন্দ্রীয় হইয়া ক্রমাগত আট বৎসর সুন্দরীগণ......সমর্থ হইবেন।"——বঙ্গানুবাদ, চরক সংহিতা।

চরক সংহিতার আসিক্ত ক্ষীরিয় বাজীকরণ পাদের সর্ব্বপ্রধান রত্ন "চরকান্ত" (আমাদের দেওয়া নাম)। ব্যবহার করুন। দ্বিধা করিবেন না, সন্দেহ করিবেন না—মহর্ষিদের মুকুটমনি, মহর্ষি চরকের এই বাণী।

একবার ব্যবহার করিয়া দেখুন, শীরায় শীরায় বিদ্যুতের প্রবাহ ছুটিবে, শরীরের রক্ত টগ্‌বগ্‌ করিয়া ফুটিয়া উঠিবে, মনের মধ্যে সহস্র বসন্তের হিল্লোল বহিয়া যাইবে, উচ্ছসিত আনন্দের তরতর প্রবাহে ভাসিয়া যাইবেন।

একবার ব্যবহার করিয়া দেখুন—নারীর নিকট পুরুষত্বের সমস্ত মর্য্যাদা বিসর্জ্জন দিয়া আর লজ্জার করুণ হাসি হসিতে হইবে না।

ইহা নব বিবাহিতের বাধা বন্ধনহীন আনন্দ স্রোতে প্লাবনের সূচনা করে, প্রৌঢ়ের মনে পুলকের শিহরণ জাগায়, নিরুপায় অক্ষমের কানে কানে আশার মোহিনী বাণী শুনাইয়া দেয়—বধুয়ার কথা বেশী দিন নয়, মাত্র ২০ দিন—২০ দিন মাত্র ব্যবহার করিয়া ঘড়ি ধরিয়া দেখুন।......অবাক হইয়া প্রশ্ন করিবেন একি ঔষধ না মন্ত্রশক্তি—মন্ত্রশক্তি নহে—ঔষধ, তবে মহর্ষি চরকের বাজীকরণ অধ্যায়ের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, মর্ত্তে মন্দাকিনী সুধা, শাস্ত্রীয় পদ্ধতির সহিত বর্ণে বর্ণে অক্ষরে অক্ষরে মিলান। এ হচ্ছে সেই ঔষধ যাহার ব্যবহারে মধু যামিনী দেখিতে দেখিতে ফুরাইয়া যায়, কিন্তু ভোগ বাসনার তৃপ্তি হয় না।

"চরকান্তের" মূল্য মাত্র ১॥০

## এস, দাস গুপ্ত বি, এস্ সি।

## ৪৪।৪৫এ, ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট,

## কলিকাতা।

# বিনামুল্যে !

## নব-বর্ষের

# বক্সী পকেট-পঞ্জিকা

সবেমাত্র সন ১৩৩৫ সালের পঞ্জিকা অভিনব বেশে বাহির হইয়াছে। মুল্য ।৴০ আনা ডাক মাশুল ৲১০ পয়সা।

কিন্তু যাঁহারা "মোহাম্মদী"র নামোল্লেখ করতঃ অর্ডার দিবেন—তাঁহারা ইহা বিনামুল্যে ও বিনা মাশুলে পাইবেন।

অদ্য নিম্নলিখিত ঠিকানায় কাড লিখুন।

## ম্যানেজার এস, এ, বি, বক্‌সী এণ্ড কোং

১৪ **পোষ্ট বক্স নং ১১৪ কলিকাতা**

---

ডাক্তার কর্ণেল সাহেবের

## 'গয়টার কিওর'

গলগণ্ড বা ঘ্যাক রোগের একমাত্র মহৌষধ।

ঔষধ ব্যবহারের পূর্ব্বে। ঔষধ ব্যবহারের পরে।

গলগণ্ড বা ঘ্যাগ অতি ভীষণ রোগ। ইহার একমাত্র প্রতিকার "গয়টার কিওর"। যে কোন প্রকার গলগণ্ড বা ঘ্যাগ হউক না কেন ইহা ব্যবহারে নিশ্চয় আরোগ্য হইবে। ইহাতে কোন প্রকার জ্বালা যন্ত্রণা বা ঘা হইবার আশঙ্কা নাই। মূল্য প্রতি শিশি ২৲ দুই টাকা মাশুল স্বতন্ত্র।

**ডাক্তার কর্ণেল এণ্ড কোং**

১৩৩ ৯ নং আন্তনী বাগান লেন, কলিকাতা।

---

গভর্ণমেণ্ট হইতে রেজেষ্টারীকৃত—

## —অলিনা—

অলিনা একদিন মালিস করিলে উৎকট ধ্বজভঙ্গ রোগ একদিনে উপশম এবং ১০।২০ দিনে সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য হয়।

যৌবনের প্রারম্ভেই অপরিমিত অত্যাচারের ফলে ইন্দ্রিয় শৈথিল্য ইত্যাদি উৎকট ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়। আমাদের "অলিনা" ইন্দ্রিয় স্থানে মালিস করিলে অল্পদিন মধ্যেই শীরা সমূহের শিথিলতা দূরীভূত হইয়া পূর্ব্বের চেয়ে বেশী শক্ত ও মজবুত হয়। বক্রতা নষ্ট হইয়া সরল রেখার ন্যায় সোজা হয়। বৃদ্ধের জন্যেও ইহা বিশেষ উপকারী, অধিক প্রশংসা বাহুল্য, কথার সভ্যতা "কলেন পরিচিয়তেঃ"।

3 অলিনা ৸০ আনা শিশি।

**হাকিম মৌলবী এম, এ, হাদি**
**২২ নং জ্যাকারিয়া ষ্ট্রীট, কলিকাতা**

কাল রং ক্যাপসুলে সাদা মসজিদ মার্কা

গোলাপ নির্য্যাসই আসল।

# সেখ ফসিউল্লার

## গোলাপ নির্য্যাসে ভীষণ প্রতারণা।

গোলাপ নির্য্যাসের জাল নিবারণের জন্য আমরা বহু অর্থ ব্যয়ে আমাদের আসল গোলাপ নির্য্যাসের মুখের কর্কের উপর বিলাতি কাল ক্যাপসুলের উপর সাদা রংয়ের মস্‌জিদ মার্কা করিয়া দিলাম। যে নির্য্যাসের কর্কের উপর সাদা মস্‌জিদ না থাকিবে তাহা নকল বলিয়া জানিবেন। সহর ও মফঃস্বলের দোকানদারগণও দুষ্ট লোকের প্রলোভনে ভুলিয়া আসল বলিয়া নকল নির্য্যাস বিক্রয় করিতেছেন। অতএব গ্রাহকগণ সাবধান—গোলাপ নির্য্যাস খরিদ করিবার পূর্ব্বে শিশির কর্কের উপর সাদা মস্‌জিদ দেখিয়া খরিদ করিবেন।

এখানে যাবতীয় খাঁটি ও উৎকৃষ্ট আতর, ফুলেল তৈল, লক্ষ্মীবিলাস তৈল, দেলবাহার, মনোহর আতর, সুবাসিত তিল তৈল ইত্যাদি সুলভ মূল্যে পাইবেন। ভিঃ পিতে মাল পাঠাই।

আমাদের গোলাপ নির্য্যাস চক্ষু ও মস্তিষ্কের বিশেষ উপকারী।

সেখ ফসিউল্লার জ্যেষ্ঠ পুত্র

**সেখ আসিক আলি।**

78 ১১৯।৪ পুরাতন চিনাবাজার, কলিকাতা।

---

# মরামানুষ বাঁচাইবার উপায়

আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য; কিন্তু যাহারা জ্যান্তে মরণের ন্যায় হইয়া রহিয়াছে, মেহ, প্রমেহ, প্রদর, অজীর্ণ, অম্ল, বহুমূত্র, বাত, হিষ্টিরিয়া, পুরুষত্বহানি প্রভৃতি রোগে ভুগিয়া জীবনে নিরাশ হইয়াছে, তাহারা বাঁচিতে পারে। পরীক্ষা করুন, আমেরিকার সুবিখ্যাত ডাক্তার পেটেলের আবিষ্কৃত তাড়িৎশক্তি বলে প্রস্তুত "ইলেকট্রিক সলিউসন" ব্যবহার করুন। ঔষধের আশ্চর্য্য শক্তি দেখিয়া মন্ত্রমুগ্ধ হইবেন। প্রতি বৎসর অসংখ্য মুমূর্ষ রোগী নবজীবন লাভ করিতেছে। মূল্য প্রতি শিশি ১৲ টাকা ডাঃ মাঃ ৷৷০ আনা।

# ম্যালেরীণ

নূতন পুরাতন ম্যালেরিয়া জ্বর, কম্পজ্বর, মজ্জাগত জ্বর, পালাজ্বর, কুইনাইনে আটকান জ্বর প্রভৃতি জ্বরের মহৌষধ, ব্যবহারে আশু ফল পাইবেন। মূল্য প্রতি শিশি ৷৷৶০ আনা মাশুলাদি ৷০ আনা। অনুগ্রহ করিয়া নাম ও ঠিকানা স্পষ্ট করিয়া লিখিবেন।

**সোল এজেণ্টঃ—ডাঃ ডি, ডি, হাজরা।**

ফতেপুর গার্ডেনরিচ পোষ্ট, কলিকাতা

ও

897 কলিকাতার প্রধান প্রধান ঔষধালয়ে পাওয়া যায়।

# উক্ত কথাগুলিতে বুঝা যায় আমাদের

# "জীবন প্রাণ" কি!

রাজ্য মধ্যে রাজাই প্রধান। যে সহরে রাজা নাই কিংবা কোন কারণ বশতঃ রাজার বুদ্ধিভ্রম ঘটিলে সে রাজ্য যেমন ঠিক ভাবে চলে না এবং প্রজারা নানারূপ অত্যাচার উৎপাড়ন এবং ক্লেশ সহ্য করে সেইরূপ মানুষের শরীর ও একটা রাজ্য। ইহাতে হাড়, মাংস, খুন, কফ, পিত্ত, বায়ু, মেদ মজ্জা সবই প্রজা। ইহাদের শাসন কর্ত্তা একমাত্র বীর্য্য যদি ইহা কুৎসিৎ সঙ্গদোষে খারাপ হইয়া যায় তাহা হইলে স্বপ্নদোষ, শুক্রতারল্য, প্রস্রাবের পূর্ব্বে কিম্বা পরে বীর্য্যপাত হওয়া স্ত্রী সঙ্গমের সময় মুহূর্ত্ত মধ্যে বীর্য্য স্খলন হওয়া, শিরোঘূর্ণন, সব সময় অলসতা বদহজমী হওয়ার দরুণ পায়খানা পরিষ্কার না হওয়া, চক্ষুজ্বালা, হাত পা জ্বালা এবং অন্যান্য কুৎসিৎ রোগ জন্মে। ইহা ছাড়াও বাল্যাবস্থায় কুৎসিৎ সঙ্গে মিশিয়া নানারূপ অত্যাচারে—ধাতুদৌর্ব্বল্য, গণোরিয়া, মেহ, প্রমেহ প্রভৃতি রোগ জন্মে। ইহার জন্য শরীর জীর্ণ শীর্ণ হইয়া যায় স্মরণশক্তি হ্রাস পায় শরীরের চঞ্চলতা চেহারার কান্তি, ঢল ঢলে যৌবন অকালেই বিনষ্ট হইয়া যায়। এই সমস্ত কারণে আমরা বহু কষ্টে উপরোক্ত ঔষধ প্রস্তুত করিয়াছি। মূল্য কেবল দুই সপ্তাহ ১৷৷০ এক মাস ২৷৷০ টাকা। এই ঔষধ সেবনে আপনি সম্পূর্ণ রোগমুক্ত হইতে পারিবেন, শুক্র গাঢ় হইবে, বদনের মনোরম কান্তি পুনরায় ফিরিয়া পাইবেন।

## "স্ত্রী-জীবন রক্ষা" সম্বন্ধে লোকে কি বলে :—

Gorahkpur  
2nd july 1928.

Dear Sirs,

About a month ago I orderd and received from you the medicine "stri jiwan rachha" for the cure of pradhar disease from which my wife is suflering. My wife used your said medicine for about a month and got some relief in her disease, but she has not been perfectly cured of all her troubles. please send some of this medicine........

Yours faithfully,  
......Stenographar Judge court  
Gorahkpur

নাগপুর—১০-৭-২৮

মহাশয়,

আপনি যে দুই শিশি "স্ত্রীজীবন রক্ষা" পাঠাইয়াছিলেন তাহা খাওয়াইয়া অল্প ফল পাইয়াছি। সেজন্য আমার অনুরোধ পুনরায় আর ৩ শিশি ভিপি যোগে নিম্ন ঠিকানায় পাঠাইবেন। .... ........যদি ইহাতে আরও ফল পাই তবে আরও ৪ জন রোগীর জন্য উক্ত ঔষধ আনাইবার ইচ্ছা আছে।

আপনার—জেলার সেণ্ট্রাল জেল  
নাগপুর।

বিসরামপুর—১২-৭-২৮

শ্রীমান মহোদয়জী

আপনি যে ১ শিশি স্ত্রীরোগের ঔষধ (স্ত্রীজীবন রক্ষা) পাঠাইয়াছিলেন তাহাতে আমি বেশ ফল পাইয়াছি। সেজন্য আপনাকে সহস্র সহস্র ধন্যবাদ। এক শিশিতে সম্পূর্ণ নিরাময় হইয়াছি। এই ঔষধের প্রশংসা অবর্ণনীয়। সমস্ত জীবন আমি ইহার গুণগান করিব। এই ঔষধের বিজ্ঞাপন "হিন্দু পঞ্চ" কাগজে দেখিয়া পরীক্ষার্থ এক শিশি আনাইয়াছিলাম। আমি এতদিন অন্যান্য ঔষধে প্রায় এক হাজার টাকা নষ্ট করিয়াছি, কিন্তু কোন ফল পাই নাই। আপনার এক শিশিতেই ফল পাইয়াছি আমি আজীবন ইহার প্রচার করিব। অনুগ্রহ পূর্ব্বক আরও ২শিশি ভিঃ পিঃ যোগে পাঠাইবেন।

পরমানন্দ গুপ্তা  
বিসরামপুর (সি পি)

## "স্ত্রী জীবন রক্ষা" কি?

প্রদর নাশক, রজদোষ নাশক, সর্ব্বপ্রকার স্ত্রীরোগে ইহা অব্যর্থ মহৌষধ। মাসিক ঋতু সময়মত না হওয়া, ঋতুপাতের সময় ব্যথা হওয়া রক্ত বন্ধ হওয়া, শরীর ম্যাজম্যাজ করা কোমর এবং পেটে বেদনা উঠা প্রভৃতি নানা প্রকারের রোগ যাহা মাসিক ঋতুপাতে হইয়া থাকে সমস্তই আরোগ্য করে। ইহা সেবনে বন্ধ্যা নারীর সন্তান জন্মে। মূল্য সাত দিনে ১৷৷০ ১৫ দিন ২৷৷৴ এক মাস ৫৲, ডাক মাশুল ও প্যাকিং স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান :—চড্ডা কেমিকাল ওয়ার্কস  
পোষ্ট বক্স নং ১১৪৪৪, কলিকাতা।

অর্ডার দিবার সময় অনুগ্রহ পূর্ব্বক—"মাসিক মোহাম্মদীর" নাম উল্লেখ করিবেন।

এই সুন্দরী মোছলেম মহিলাটির বাস-স্থান কশ তুর্কীস্থানে। মস্কো শহরে যে বিরাট নারী-সম্মিলন হইয়। গিয়াছে এই বিদুষী নারী আপনার দেশের প্রতিনিধিরূপে উক্ত সভায় যোগদান করেন।

"Mohammadi" Press.

মাসিক মোহাম্মদী

প্রথম বর্ষ || ভাদ্র ১৩৩৫ সাল || ১১শ সংখ্যা

# ধর্ম্ম ও সমাজ

[ এস, ওয়াজেদ আলী বি, এ ( ক্যান্টাব ) বার-এট-ল ]

প্রিয় বন্ধু,

তুমি ধর্ম্মের বিষয় যে সব দুরূহ প্রশ্ন আমায় করেছ সে সবের সন্তোষজনক উত্তর দেওয়া বড় সহজ কাজ নয়। কেবল কর্ত্তব্যের অনুরোধে আর বন্ধুত্বের খাতিরেই আমি তোমায় আজ এই লম্বা চিঠি লিখছি, তা না হলে এ সব জটিল সমস্যা নিয়ে আমি নিজেকেও বিব্রত করতুম না আর অপরকেও বিব্রত করবার চেষ্টা করতুম না।

তুমি লিখেছ "Augustine Comte এর নীতির অনুসরণ করে আল্লা, ঈশ্বর প্রভৃতি বিভীষিকাগুলিকে পরিত্যাগ করে এখন যদি আমরা বিশ্বমানব ( Humanity ) নামক প্রত্যক্ষ দেবতাটীকে আমাদের আরাধ্য স্থির করে নিই, তাহ'লে তার পূজা-অর্চ্চনার দ্বারাই আমাদের ধর্ম্মবৃত্তি সার্থক হতে পারে; অথচ সেই বৃত্তির তুষ্টি সাধনের জন্য ভবিষ্যতে জ্ঞান বিজ্ঞানের সঙ্গে দ্বন্দ করবার কোন প্রয়োজন হয় না।"

হজরত এব্রাহিম খলিলুল্লাহ অন্ধকার রাত্রের নক্ষত্র খচিত আকাশের উজ্জল একটী তারকাকে লক্ষ্য করে বলেছিলেন, "হাজা রব্বি ( এই আমার ঈশ্বর )।"

নির্দ্দিষ্ট সময়ে তারকাটি সেই অনন্ত আকাশে লীন হয়ে গেল—এব্রাহিম দেখলেন তারকার গৌরব চিরস্থায়ী নয়। আমাদেরই মত সেও নিয়তির নির্দ্দেশে আকাশ পথে আবির্ভূত হয়, আর নিয়তির নির্দ্দেশে আকাশ থেকে অদৃশ্য হয়। তার অস্তিত্ব, তার গতিবিধি অন্যের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। এব্রাহিম বললেন—"লা উহিব্বুল—আফেলিন।" যারা অস্ত যায়—তাদের আমি ভালবাসি না।

পশ্চিম আকাশে পূর্ণিমার চান্দ দেখা দিলো। তার আলোয় সমস্ত পৃথিবী উজ্জল হয়ে উঠলো। এব্রাহিম ভাবলেন এবার খোদার সন্ধান তিনি পেয়েছেন—ঐ জ্যোতির্ম্ময়, প্রসন্ন মূর্ত্তি চান্দই তাঁর খোদা!

চান্দ ও কিন্তু, তার কাল শেষ হতে, তারকারই মত সেই অন্তহীন আকাশ সমুদ্রে তলিয়ে গেল। নিয়তির বিধানকে সেও ব্যর্থ করতে পারলে না। এব্রাহিম তখন তটস্থ হয়ে পড়লেন। করুণ মিনতির কণ্ঠে অজ্ঞাত স্রষ্টাকে উদ্দেশ্য করে বললেন—"হে স্রষ্টা! তুমি যদি আমার পথ প্রদর্শক না হও, তাহলে, নিশ্চয় আমার থাকতে হবে পথভ্রষ্ট লোকেদের সঙ্গে!"

সূর্য্য যথাসময় পূর্ব্বাকাশে দেখা দিলো। বিশ্ব চরাচর তার আলোকের সঞ্জীবনী সুধা পান করে জেগে উঠলো।

পশু পক্ষীর আনন্দ গীতিতে আকাশ বাতাস মুখরিত হয়ে উঠলো। বিস্ময় বিমুগ্ধ এব্রাহিম সূর্য্যের গৌরব আর মহিমা দেখে বলে উঠলেন, "ইনিই আমার খোদা; ইনিই সকলের চেয়ে মহান !"

কালের আবর্ত্তনে কিন্তু সূর্য্যেরও গৌরব অস্তমিত হল। অন্ধকার এসে আবার বিশ্ব চরাচরকে ঢেকে ফেললে। ইব্রাহিম দেখলেন গ্রহ নক্ষত্রাদির মত সূর্য্যের গৌরবও কালের অধীন। এক নির্দ্দিষ্ট সময় পর্য্যন্ত সে আকাশে বিরাজ করে, তারপর, কোন্ এক অদৃশ্য শক্তির আদেশে আকাশের বিস্তৃত প্রাঙ্গণ ছেড়ে কোন্ অজানা লোকে চলে যায়।

এব্রাহিমের দিব্য চক্ষু তখন খুলে গেল। যে আল্লাকে তিনি খুঁজছিলেন—তাঁর স্বরূপ তাঁর চোখের সামনে ফুটে উঠলো। দেশবাসীদের সম্বোধন করে বিশ্বাসের দৃঢ় অবিচলিত কণ্ঠে তিনি বললেন—

اِنِّی بَرِیٌ مِمَّا تُشْرِکُوْن - اِنِّی وَجَّهْتُ وَجْهِیَ
لِلَّذِی فَطَرَ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضَ حَنِیْفًا - وَمَا اَنَا
مِنَ الْمُشْرِکِیْنَ —

( যে সব জিনিষকে তোমরা আল্লার অংশী স্থির করেছ আমি সে সবের প্রভাব থেকে মুক্ত। আমি এবার তাঁরই দিকে আমার মুখ ফিরালুম—যিনি একাই সমস্ত জমীন এবং আসমানকে সৃষ্টি করেছেন। আমি আর অংশীবাদীদের দলের মধ্যে নই। )

হজরত এব্রাহিমের এই উক্তির মধ্যে গভীর এক তত্ত্ব-জ্ঞান অন্তর্নিহিত আছে। আমরা মূল কার্য্য কারণকে ছেড়ে তার ক্ষণিক কোন অভিব্যক্তির পূজা করতে পারি না। গাছকে ছেড়ে তার ফলের পূজা করতে পারি না। গৃহস্থকে ছেড়ে তার গৃহের পূজা করতে পারি না। প্রেমাস্পদকে ছেড়ে তার প্রণয় লিপির পূজা করতে পারি না। আর মানুষের স্রষ্টাকে ছেড়ে মানুষেরও পূজা করতে পারি না।

মানুষ অনাদিও নয়, অনন্তও নয়, আর স্বয়ম্ভূও নয়। কার্য্য-কারণ-পরম্পরার দরুণ তার আবির্ভাব, আর কার্য্য কারণ-পরম্পরার দরুণই তার তিরোধান। তার জীবন-মরণ নির্ভর করে তার চেয়ে শক্তিশালী কোন বিশ্ব-শক্তির উপর। তার জীবন মরণের নিয়ন্তা—সেই বিশ্ব-শক্তিকে ছেড়ে আমরা তুচ্ছ মানবের পূজা করতে পারি না; হজরত এব্রাহিম যেমন গ্রহ নক্ষত্র প্রভৃতির স্রষ্টাকে ছেড়ে আকাশের সেই জ্যোতিষ্কগুলির পূজা করতে পারেন নি।

তুমি বলবে যে বিশ্ব-শক্তির উপর মানুষের অস্তিত্ব নির্ভর করে, তার স্বরূপ আমাদের অজ্ঞাত এবং অজ্ঞেয়। সুতরাং তাকে নিয়ে ভাবা কিম্বা চিন্তা করা সময়ের অপব্যবহার ছাড়া আর কিছু নয়।

মানুষকে জীবনের মূল কার্য্য-কারণের বিষয় ভাবতে নিষেধ করা হচ্ছে ঠিক সেই রকম নিষ্ফল উপদেশ—যেমন পাখিকে উড়তে নিষেধ করা, কিম্বা মানব শিশুকে হাঁটতে নিষেধ করা। প্রকৃত পক্ষে তাকে ভাবতে নিষেধ করার এই Negative উপদেশও তো তাকে এক বিশেষ ধারায় ভাবতে বলারই উপদেশ মাত্র! আমাদের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি জীবনের মূল কার্য্য-কারণের বিষয় আমাদের ভাবতে বাধ্য করে। সে প্রবৃত্তি ব্যর্থ করবার শক্তি আমাদের নাই।

বিশ্ব-শক্তি বা বিশ্ব-নিয়ন্তাকে অজ্ঞাত এবং অজ্ঞেয় বলবার কারণ আমি তো খুঁজে পাইনা। তাঁকে অজ্ঞাত বলে জানলেও তো এক রকম জানাই হল। তা ছাড়া ধর্ম্মগ্রন্থে বিশ্বনিয়ন্তার যে গুণগুলি কীর্ত্তিত হয়েছে—সে গুলি যে কাল্পনিক, সে কথা বলবার কি অধিকার তোমার আছে? সত্য এবং ধর্ম্মকে যদি আমরা জীবনের মূলগত কারণ বলে মেনে না নিই, তাহলে জ্ঞান বিজ্ঞানেরও কোন ভিত্তি থাকে না—আর সামাজিক এবং নৈতিক জীবনেরও কোন ভিত্তি থাকে না। সবই তাহলে কেবল মাত্র সংস্কারে পরিণত হয়। সত্য মিথ্যা এবং ন্যায়অন্যায়ের আলোচনা তখন বাতুল প্রলাপ হয়ে দাঁড়ায়!

তুমি লিখেছ, "ধর্ম্মগ্রন্থ কোরআন শরিফ যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত নয়, এলহাম বা Inspiration এর উপর প্রতিষ্ঠিত। আর এই এলহামের বৈধতা বা প্রামানিকতা স্বীকার করলে সভ্যতার ক্রমবিকাশ অসম্ভব হয়ে পড়ে। "মানব জীবন পরিবর্ত্তনশীল। তার জন্য নিত্য নূতন

ব্যবহার বিধির প্রয়োজন। তা ছাড়া মানব সভ্যতা প্রত্যহ উন্নতির উচ্চ থেকে উচ্চতর সোপানে আরোহন করছে। আজ যা তার পক্ষে আবশ্যকীয় পাথেয়—কাল তাই তার পক্ষে বোঝা হয়ে দাঁড়াচ্ছে। এরূপ অবস্থায় সমাজকে বিধি-নিষেধের কোন বিশেষ এক শৃঙ্খলে বদ্ধ করে রাখা; আর তার উন্নতির পথ চিরতরে রুদ্ধ করে দেওয়া, একই কথা। হজরতের যুগে যা জ্ঞানের চরম অভিব্যক্তি বলে মনে হত, আজ অনেক বিষয় out of date হয়ে গেছে। ধর্ম্মের অনুশাসনকে আল্লার প্রত্যাদেশ বলে মেনে নিয়ে কালের সঙ্গে তাল রক্ষা করে চলা এখন আমাদের পক্ষে অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই ধর্ম্মকে বাদ দিয়া কালোচিত ব্যবহার বিধির প্রণয়ণ করা আমাদের পক্ষে এখন দরকার হয়ে পড়েছে।"

এলহামি ধর্ম্মের তিনটা দিক আছে, যথা, (১) বৈজ্ঞানিক ও ঐতিহাসিক (২) ব্যবহারিক (৩) আধ্যাত্মিক। খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইউরোপে ধর্ম্মের বৈজ্ঞানিক এবং ঐতিহাসিক তথ্যগুলি নিয়ে যথেষ্ট আন্দোলন-আলোচনা চলেছিল। যুক্তিবাদীরা বলতেন—ধর্ম্মের বৈজ্ঞানিক এবং ঐতিহাসিক তথ্যগুলি অতীত যুগের কাল্পনিক রূপকথা বা অতিরঞ্জিত জনপ্রবাদ ছাড়া আর কিছু নয়। আর ধর্ম্ম যখন সেই সব রূপকথার সমষ্টি মাত্র, তখন ধর্ম্ম ও মনুষ্য রচিত শাস্ত্র ছাড়া আর কিছু নয়।

পক্ষান্তরে ধর্ম্মের সমর্থনকারীরা ( Apologists ) ধর্ম্মের সেই বৈজ্ঞানিক এবং ঐতিহাসিক তথ্যগুলিকে অকাট্য এবং প্রামাণ্য সত্য বলেই ঘোষণা করতেন। যুক্তি তর্কের দ্বারা সে মতবাদ সমর্থন করা যখন অসম্ভব হয়ে দাঁড়ালো, তখন তারা সেই তথ্যগুলির Sybmolical এবং allegorical ( রূপক ) ব্যাখ্যা রচনায় আত্মনিয়োগ করলেন। তাঁদের কোন ব্যাখ্যাই কিন্তু সাধারণের মনঃপূত হয়নি।

না হবারই কথা। কালকে সাদা আর সাদাকে কাল কোন যুক্তি তর্কের দ্বারাই প্রমাণ করা যায় না। যা স্পষ্টই রূপকথা বলে বুঝা যায়, তার কোন দুর্ব্বোধ্য এবং জটিল ব্যাখ্যা না করে তাকে রূপকথা বলে মেনে নেওয়াই যুক্তি সঙ্গত বলে আমি মনে করি। আদম হাওয়ার উপাখ্যানটী গল্প হিসাবে সুন্দর। এর কোন বৈজ্ঞানিক কিম্বা Symbolical ব্যাখ্যা না করে এটীকে শিক্ষাপ্রদ রূপ-কথা বলে মেনে নেওয়াই যুক্তিসঙ্গত। এ হিসাবে Rationalists দের যুক্তিই ঠিক। কিন্তু আদম হাওয়ার উপাখ্যানটীকে এবং এলহামী ধর্ম্মের অন্যান্য উপাখ্যানগুলিকে উপদেশ মূলক রূপকথা বলে মেনে নিলে ধর্ম্মের ভিত্তি যে তাতে কি করে শিথিল হয়ে যায়, আমি তো তা বুঝতে পারি না। আমাদের মা বাপেরা যে সব কথা কাহিনী বলে ছেলেবেলায় আমাদের আনন্দ এবং শিক্ষা দিয়েছেন, আমরা বড় হয়ে তাদের সেই গল্পগুলিকে গল্প বলে বুঝতে পেরে কি তাঁদের মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করবো ?

জীবন্ত, জাগ্রত, সর্ব্বময় এবং সর্ব্বনিয়ন্তা আল্লাহতালা, তাঁকে World-Soulই বল, আর পরব্রহ্মই বল, আর God Almightyই বল, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রত্যেক ঘটনাটীকে তিনিই নিয়ন্ত্রিত করছেন। তাঁর আদেশ বিনা একটী পাতাও গাছ থেকে পড়ে না, আর একটী কুটাও বাতাসে উড়ে না। তারই ইচ্ছা, তাঁরই প্রজ্ঞা জীবনের ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতম ঘটনাটীর মধ্যেও মূর্ত্ত হয়ে প্রকটিত হচ্ছে। মানব-সভ্যতা স্রোতের অন্যতম মূল পরিপোষক ইসলামের মধ্যে তিনি যে আত্মপ্রকাশ করেননি সে কথা কোন মতেই বলা যায় না। কিভাবে তার মধ্যে তিনি আত্মপ্রকাশ করেছেন—তাই হচ্চে বিচার্য্য বিষয়।

লেখক আত্মপ্রকাশ করেন তার গ্রন্থের মধ্যে। Platoর Republicity পড়ে আমরা বুঝতে পারি দার্শনিকপ্রবর এই গ্রন্থের মধ্যে তাঁর সমস্ত প্রাণটীকে ঢেলে দিয়েছেন। অন্য কথায় এই গ্রন্থের মধ্যে পূর্ণরূপে তিনি আত্মপ্রকাশ করেছেন। কিন্তু সমস্যা হচ্চে গ্রন্থের কোন অংশের মধ্যে তিনি আত্মপ্রকাশ করেছেন! গ্রন্থের কাগজগুলির মধ্যে অবশ্য তিনি আত্মপ্রকাশ করেননি, কেননা সেগুলি তৈয়ের হয়েছে তাঁর মৃত্যুর অনেক পরে। সেই রকম গ্রন্থের মলাট, ছাপা, টাইপ প্রভৃতির মধ্যেও তিনি আত্মপ্রকাশ করেননি। অথচ স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে—এই সবকে অবলম্বন করেই তিনি আত্মপ্রকাশ করেছেন। কাগজ যদি খারাপ হয়, সে দোষ প্লেটোর নয়; মলাট যদি খারাপ হয়, সে দোষ প্লেটোর নয়, টাইপ যদি খারাপ হয়, সে দোষ প্লেটোর নয়; আর ছাপা যদি খারাপ হয়, সে দোষও প্লেটোর নয়। এসব জিনিষের মধ্যে প্লেটো নিজেকে প্রকাশ করেছেন বলেই এসবের এত আদর, এত গৌরব। এসবের ত্রুটি

এবং অসম্পূর্ণতা প্লেটোর গৌরবের কোন হানি করে না।

সাধারণ জীবন থেকে একটা দৃষ্টান্ত নিন। কোন একটা কোটা বাড়ির কথা একবার ভাবুন। স্থপতি সেই কোটা বাড়ির মধ্যে আত্মপ্রকাশ করেছে। চুণ-সুরকির মধ্যে কিছু তিনি আত্মপ্রকাশ করেন নি। চুণ-সুরকি অন্য লোক তাঁকে সরবরাহ করেছে। কোটা বাড়ির ইট পাথরের মধ্যেও তিনি আত্মপ্রকাশ করেন নি। কেননা ইট পাথরও সরবরাহ করেছে অন্য লোকে। দরজা জানালা, কড়ি, বরগা প্রভৃতির বিষয়ও ঠিক সেই একই কথা বলা যায়। অথচ এই সব উপাদানকে নিয়েই যে শিল্পী আত্মপ্রকাশ করেছেন, সে বিষয়ও আমাদের কোন সন্দেহ নেই। উপাদানগুলির দোষ ত্রুটির জন্য শিল্পীর আমরা নিন্দাবাদ করতে পারি না। যে উপাদান তিনি পেয়েছেন তাই ব্যবহার করেছেন। শিল্পী তাদের ব্যবহার করেছেন বলেই উপাদান গুলির গৌরব এবং বিশেষত্ব। তাদের দোষ এবং অসম্পূর্ণতা কিন্তু তাঁকে স্পর্শ করে না।

কোর-আন শরিফে আল্লাতা'লার আত্মপ্রকাশও Platoর এবং স্থপতির আত্ম-প্রকাশেরই মত। কোর-আনের ভাষা এবং ব্যাকরণের মধ্যে তিনি আত্ম-প্রকাশ করেন নি; আরব জাতির প্রচলিত ভাষা এবং ব্যাকরণই তিনি গ্রহণ করেছেন। কোর-আনের ইতিহাস, পুরাণ এবং রূপ কথার মধ্যেও তিনি আত্ম-প্রকাশ করেন নি। সেমিটিক জাতির মধ্যে প্রচলিত ইতিহাস, পুরাণ এবং রূপকথাই তিনি আত্ম-প্রকাশের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করেছেন। কোর-আনের বৈজ্ঞানিক তথ্যগুলির মধ্যেও তিনি আত্ম প্রকাশ করেন নি। সেই যুগের বৈজ্ঞানিক সংস্কারগুলিকেই তিনি আত্ম-প্রকাশের জন্য ব্যবহার করেছেন। অথচ নির্ব্বিকার মনে কোর-আন শরিফ পড়লে আল্লাতালা যে তাতে আত্ম-প্রকাশ করেছেন—আর এমন ভাবে আত্ম প্রকাশ করেছেন যে তেমন ভাবে আর কোথাও আত্ম প্রকাশ করেন নি, সে কথা বেশ স্পষ্টই বুঝা যায়। এখন প্রশ্ন হচ্ছে—কি ভাবে তিনি কোর-আন শরিফে আত্ম প্রকাশ করেছেন।

এ বিষয় অবশ্য প্রত্যেকের নিজ নিজ ব্যক্তিগত মত আছে এবং থাকবে। সকলকে এক মতাবলম্বী করবার ইচ্ছা যদি আল্লাতালার থাকতো তাহলে পৃথিবীতে এতদিন মতভেদ থাকতো না। তবে নিজের মত ব্যক্ত করবার অধিকার সকলেরই আছে; আর সেটা কোন অধিকার মাত্রই নয়, সেটা কর্ত্তব্যও বটে। সত্যের প্রত্যেক সাধকই হচ্ছে আল্লার ধর্ম্ম-রাজ্যের এক একটী শিল্পী। সাধ্যমত সত্যের অনুসন্ধান করা, আর নিজের চেষ্টা-লব্ধ সত্য অন্য সাধকদের সামনে পেশ করাই হচ্ছে তার পরম এবং চরম কর্ত্তব্য। সাধকদের চেষ্টার সমসাময়িক ফল যে শেষে কি দাঁড়াবে—সে কথা আল্লাতা'লা ছাড়া আর কেউ জানে না। আমাদের অবস্থা কতকটা মৌচাকের মৌমাছিদের মত। প্রত্যেকটী মৌমাছি মোম এবং মধু এনে তার কর্ত্তব্য সম্পাদন করে যাচ্ছে। শেষে যে মধু-চক্র রচিত হয়ে উঠছে সেটী কিন্তু তার স্বপ্নের এবং কল্পনার অতীত। আমরাও প্রত্যেকে তেমনি সত্য নামক মধু অনুসন্ধান করছি আর তাকে আহরণ করে পৃথিবীতে ছেড়ে যাচ্ছি। আমাদের এই সাধনার শেষ ফল কি হবে, কি ভাবের মধুচক্র আমাদের সমসাময়িক চেষ্টার ফলে গড়ে উঠবে—সে রহস্য আমাদের কাছে রহস্যই থেকে যাবে।

কেবল চিন্তা এবং গবেষণা দ্বারা আল্লাতালার স্বরূপ জানতে পারা যায় না, তাঁর সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ কি তাও জানতে পারা যায় না, আর জীবনের চরম সার্থকতা যে কোথায়, তাও জানতে পারা যায় না। এসব বিষয় জানবার জন্য দরকার—আল্লাহতালার হেদায়েত, divine guidance, দিব্য জ্ঞান। বর্ত্তমান যুগের শ্রেষ্ঠ দার্শনিক Henri Bergson ধর্ম্ম-জ্ঞান লাভের জন্য যে আমাদের Reason এর অতীত Instinct নামক একটী শক্তি আছে তা বিশেষ ভাবেই দেখিয়েছেন। সে শক্তিকে উদ্বুদ্ধ এবং পরিচালিত করবার জন্য আল্লার সংবাদবাহী নবীদের প্রয়োজন। চিন্তার এবং গবেষণার অতীত সত্যের সংবাদ এবং সন্ধান আমাদের দেওয়াই হচ্ছে তাঁদের কথা। আমাদের হজরত মহাম্মদ হচ্চেন আল্লার সংবাদবাহী নবীদের শেষ নবী, আর মহাগ্রন্থ কোর-আন হচ্চে আল্লা-তা'লার শেষ হেদায়েত। এই গ্রন্থে আল্লাতা'লা তাঁর স্বরূপ যতটা আমাদের নিকট প্রকাশ করা দরকার ততটা প্রকাশ করেছেন, আমাদের সঙ্গে তাঁর সম্বন্ধের বিষয় যতটা জানা দরকার ততটা আমাদের জানিয়েছেন, আর

জীবনের চরম সার্থকতার বিষয় যতটা মানুষকে বলা দরকার, ততটা বলেছেন। সেই হিসাবে কোর-আন শরিফে আল্লাতালা যে ভাবে আত্ম-প্রকাশ করেছেন—আর কোন গ্রন্থে সে ভাবে করেন নি। এই হচ্চে কোরআনের বিশেষত্ব, আর তার সার্থকতা।

Republic এর ছাপা এবং কাগজের ত্রুটির জন্য আমরা Plato র দোষ ধরি না, অট্টালিকার উপকরণের ত্রুটির জন্যও আমরা স্থপতির দোষ ধরি না—সেইরূপ, ধর্ম্মগ্রন্থেই ঐতিহাসিক এবং বৈজ্ঞানিক তথ্যের ত্রুটি বিচ্যুতির জন্য আমার ধর্ম্মগ্রন্থের দোষ ধরতে পারি না। গায়কের গলা মোটা হলে, হাফেজের গজলও রুক্ষ শোনাবে। হাফেজের গজলে কিন্তু সেই হাফেজের গজলই থাকবে, আর কারও হয়ে যাবে না। হাফেজের গুন-গ্রাহীর পক্ষে সে গজলকে হাফেজের বলে চিনতে কোন অসুবিধা হবে না। যার অন্তরে আল্লাহতালা সত্যকে চিনবার অমূল্য শক্তি জাগিয়ে দিয়েছেন, সেও সেই রকম আল্লার বাণী শুনলেই চিনতে পারবে, তা সে যে ভাষা, যে ইতিহাস, যে বিজ্ঞান আর যে কথা-কাহিনীর মধ্যে দিয়েই সে বাণী আসুক না কেন!

ধর্ম্মগ্রন্থে প্রাচীন কথকতার এবং প্রাচীন বিজ্ঞানের ব্যবহার দেখে সেটাকে ভ্রান্ত মনুষ্য রচিত গ্রন্থ বলে সিদ্ধান্ত করাও ভুল, আর সেই গ্রন্থে ব্যবহৃত রূপ-কথা এবং প্রাচীন বৈজ্ঞানিক মতবাদগুলিকে অকাট্য এবং চিরন্তন সত্য বলে প্রমান করবার চেষ্টা করাও ভুল। যুক্তি এবং জ্ঞানের সাহায্যে যেটাকে আল্লার গ্রন্থ বলে আমারা বিশ্বাস করবো—তার মধ্যে কি ভাবে তিনি আত্মপ্রকাশ করা উপযুক্ত মনে করেছেন—তার অনুসন্ধানই হচ্চে সত্য লাভের তথা আল্লাতালার সান্নিধ্য লাভের প্রকৃষ্ট উপায়।

এখন ধর্ম্মের ব্যবহারিক অংশের আলোচনা করা যাক। প্রত্যেক ধর্ম্মেরই একটা ব্যবহারিক অংশ আছে। সমাজকে সুপ্রতিষ্ঠিত এবং সুসম্বদ্ধ রাখবার জন্যই ব্যবহার শাস্ত্রের আবির্ভাব। একথা সকলেই এখন মেনে নেন যে, যে যুগে ইসলামের আবির্ভাব হয়েছিল, সে যুগে ইসলামের ব্যবহার শাস্ত্রের মত উন্নত কোন ব্যবহার-শাস্ত্র পৃথিবীতে ছিল না। ইসলামের আবির্ভাবের পর পৃথিবীতে নূতন নূতন ব্যবহার শাস্ত্রের আবির্ভাব হয়েছে। অনেকে এখন বলচেন সেই সব নূতন ব্যবহার শাস্ত্রের বিধানগুলির তুলনায় ইসলামের ব্যবহার বিধিগুলি অপেক্ষাকৃত অনুন্নত এবং Primitive। তাঁরা আমাদের ইসলামের ব্যবহার পরিত্যাগ করে সেই সব নূতন ব্যবহার গ্রহণ করতে উপদেশ দিচ্ছেন। কেউ কেউ আবার বিবেকের ভিত্তিতে সম্পূর্ণ এক নূতন ব্যবহার বিধি প্রণয়ণ করবার জন্য আমাদের উপদেশ দিচ্ছেন। নূতনত্বকামী এই উভয় দলেরই মত হচ্চে,—ইসলামের ব্যবহার বিধি বর্ত্তমান যুগের উপযোগী নয়। সে বিধি ত্যাগ করে সম্পূর্ণ নূতন পথে চলাই হচ্চে এখন আমাদের পক্ষে মঙ্গলকর।

প্রত্যেক মানুষেরই শরীর এবং মন প্রত্যেক মুহূর্ত্তে বদলে যাচ্চে। আজকের মানুষ গত কালের মানুষ থেকে ভিন্ন। আগত কল্যের মানুষ আবার এই উভয় দিনের মানুষ থেকে ভিন্ন হবে। গত কল্য যে পথ্য কোন মানুষ বিশেষের পক্ষে উপযোগী ছিল, খুব সম্ভব আজ সে পথ্য তার উপযোগী নয়। আবার আজ যে পথ্য তার পক্ষে মঙ্গলকর, খুব সম্ভব কাল সে পথ্য জীর্ণ করা তার পক্ষে সম্ভবপর হবেনা। শিশুর পক্ষে যে পথ্য উপযোগী এবং উপাদেয়, যুবকের পক্ষে সে পথ্য উপযোগী এবং উপাদেয় নয়। পক্ষান্তরে, যুবকের পক্ষে যে পথ্য উপযোগী এবং উপাদেয় বৃদ্ধের পক্ষে সে পথ্য উপযোগী এবং উপাদেয় নয়। বিজ্ঞ হাকিম কখনও শিশুর পথ্য যুবকের জন্য, কিম্বা যুবকের পথ্য বৃদ্ধের জন্য ব্যবস্থা করেন না।

ব্যক্তির বিষয় যা বলা গেল সমাজের বিষয়ও ঠিক তাই বলা চলে। Pastural (পশুপালক) সমাজের পক্ষে যে ব্যবহারিক নিয়ম উপযোগী এবং যথেষ্ট, Agricultural (কৃষিজীবী) সমাজের পক্ষে সে নিয়ম সম্পূর্ণভাবে উপযোগী এবং যথেষ্ট নয়। পক্ষান্তরে, Agricultural সমাজের পক্ষে যে ব্যবহারিক নিয়ম বিশেষ উপযোগী, Industrial (বাণিজ্য প্রধান) সমাজের পক্ষে সে নিয়ম খুব সম্ভব যথেষ্ট নয়। প্রশ্ন হচ্চে—ব্যষ্টির এবং সমষ্টির এই অপরিহার্য্য পরিবর্ত্তন-শীলতার মধ্যে ইসলামিক শরিয়তের স্থান কোথায়?

নব্যতান্ত্রিকেরা বলেন, এই পরিবর্ত্তনশীল জগতে অপরিবর্ত্তনীয় কোন বিধি-নিষেধ সমষ্টিকে আঁকড়ে ধরে থাকা মঙ্গলপ্রসূ হতে পারে না। সুতরাং ইসলামিক

শরিয়ৎকে বর্ত্তমান অবস্থায় সম্পূর্ণ ভাবে পরিত্যাগ করা ছাড়া আমাদের গত্যান্তর নাই।

পক্ষান্তরে প্রাচীন-পন্থীরা বলেন—ইসলামের শরিয়ৎকে সর্ব্বকালের এবং সর্ব্ব-সময়ের উপযোগী করেই আল্লাহ্‌তালা সৃষ্টি করেছেন। মানুষ যে অবস্থাতেই থাকুক না কেন, আমাদের শরিয়ৎ তার মঙ্গলের জন্য, এবং তার জীবনের সুনিয়ন্ত্রনের জন্য যথেষ্ট। পরিবর্ত্তনের কোন প্রয়োজন সে শরিয়তের মধ্যে নাই।

আমরা কি এই দুই পরস্পর-বিরোধী মতবাদের মধ্যে কোন একটীকে গ্রহণ করতে বাধ্য? যুক্তির কোন মঙ্গলময় মধ্যপথ আবিষ্কার করা কি আমাদের ক্ষমতার অতীত?

শিশু যুবক হতে ভিন্ন বটে, এবং যুবক বৃদ্ধ হতে ভিন্ন বটে, আর তিন জনেরই ভিন্ন ভিন্ন পথ্যের, ভিন্ন ভিন্ন আবশ্যকীয়ের প্রয়োজন আছে বটে, কিন্তু এই তিন জনের জীবনের মধ্য দিয়েই যে গভীর এক ঐক্য অন্তঃসলিলা ফল্গুনদীর মত অবিরত ধারায় প্রবাহিত হচ্ছে—সে কথা ভুললেও চলবে না। তাদের সেই ঐক্য আছে বলেই একই চিকিৎসক তাদের চিকিৎসা করতে পারে, একই রাষ্ট্র এবং সমাজ তাদের শাসন ও নিয়ন্ত্রন করতে পারে। আর একই আদর্শ তাদের মন প্রাণকে উদ্বুদ্ধ করতে পারে।

ব্যষ্টির জীবনের মত সমষ্টির জীবনেরও মূল সূত্রগুলির মধ্যে দেশ, কাল এবং পাত্রের প্রভেদ নাই। প্রভেদ আছে কেবল সেই মুল সূত্রগুলির উপর প্রতিষ্ঠিত সাময়িক এবং স্থানীয় ব্যবহার বিধির মধ্যে। নির্ম্মল বাতাসের দরকার সব মানুষেরই আছে, তবে ঘরের জানালা (যার কাজ হচ্ছে বাতাস সরবরাহ করা) উত্তর দিকে কি দক্ষিণ দিকে, পুব দিকে কি পশ্চিম দিকে হওয়া উচিত নির্ভর করে স্থানের বিশেষত্বের উপর। ভ্রাতৃত্ব এবং সহানুভূতি আমাদের মঙ্গলের জন্য সর্ব্ব স্থানে এবং সর্ব্বকালেই বাঞ্ছনীয়। কিন্তু এই অনুভূতিগুলির অভিব্যক্তি কিভাবে হওয়া উচিৎ—নির্ভর করে স্থান, কাল এবং পাত্রের বিশেষত্বের উপর। ইসলামিক ব্যবহার বিধির details গুলি স্থান, কাল এবং পাত্রের বিশেষত্বের উপর নির্ভর করে, তাদের মূল-সূত্রগুলি কিন্তু শাশ্বত এবং চিরন্তন—স্থান, কাল এবং পাত্রের অতীত। বিরোধ যা কিছু হয়, ইসলামিক আদর্শের details গুলি নিয়েই হয়, সে আদর্শের মূলসূত্রগুলি নিয়ে প্রকৃত কোন বিরোধ হয়নি এবং হতেও পারেনা—কেননা সেগুলি আল্লার অনন্ত জ্ঞানের অটল ভিত্তির উপর সুপ্রতিষ্ঠিত।

মোস্‌লেম জাতির ব্যবহার-শাস্ত্র একটী নয়, কয়েকটী। শিয়া এবং সুন্নিদের ভিন্ন ভিন্ন ব্যবহার-শাস্ত্র তো আছেই, তা ছাড়া আমাদের এই সুন্নত জমায়েতেরও চারিটী ভিন্ন ভিন্ন ব্যবহার শাস্ত্র আছে। অথচ এই সবগুলি ব্যবহার বিধিই কোরআন এবং হাদিসের উপর প্রতিষ্ঠিত। এ থেকে স্পষ্টই বুঝা যায়, ব্যবহারের বিষয় মতভেদ হলেই মোসলেমের জাতি চ্যুতি ঘটে না। কারও সঙ্গে মতভেদ হলে তাকে কাফের কিম্বা মোলহেদ বলবার কোন দরকার নেই। মতভেদ ইসলামে চিরকাল থেকেই চলে আসছে। ইসলাম স্বাধীন-চিন্তার পথ রুদ্ধ করেনি। ইসলাম কোন pope, গুরু, পীর বা মহাত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করে না। এও ইসলামের মস্ত বড় একটা বিশেষত্ব।

এমাম আবু হানিফাই ফেকাহ শাস্ত্রের ভিত্তি স্থাপন করেন। তিনিই সর্ব্বপ্রথম বাচনিক তকলিদ ছেড়ে Inferential Reasoningএর উপর ইসলামের ব্যবহার শাস্ত্র প্রতিষ্ঠিত করেন। তিনি এ পথের প্রথম পথ প্রদর্শক বলেই যে তাঁকে শেষ পথ-প্রদর্শক বলেও গ্রহণ করতে হবে—এর কোন যুক্তিযুক্ত কারণ নেই। কেয়াস (Inferential Reasoning) কিছু হজরত আবু হানিফাতেই শেষ হয়নি। দরকার হলে আমরাও ইসলামিক ব্যবহার শাস্ত্রকে Inferential Reasoningএর দ্বারা স্থান, কাল এবং পাত্রোপোযোগী করতে পারি।

তফসির শাস্ত্রের একটী মূল ওসুল হচ্ছে, কোরআন শরিফের কোন আয়েত বিশেষের দুটী সম্ভবপর (Possible) ব্যাখ্যার মধ্যে যেটী জ্ঞান এবং যুক্তির অনুকূল সেইটীই গ্রহণীয়, আর যেটী জ্ঞান এবং যুক্তির প্রতিকূল সেটী পরিত্যক্ত। আমরা যদি এই জ্ঞান-গর্ভ ওসুলটী মনে রাখি, আর এরই দ্বারা আমাদের ধর্ম্ম-চিন্তাকে নিয়ন্ত্রিত করি, তা হলে ধর্ম্মের সঙ্গে বিজ্ঞানের বিরোধের পথ চিরতরে রুদ্ধ হয়ে যায়, আর মানবের মহত্তম দুটী বৃত্তির মধ্যে শান্তিময় এক সামঞ্জস্য সংসাধিত হয়।

কোন প্রস্তাবিত ব্যবহারিক নিয়ম শাস্ত্র-সম্মত কিনা তার বিচারের ভার এমাম আবু হানিফা সাহেব দিয়েছেন এজমা অর্থাৎ আলেমদের মতের ঐক্যের উপর। এমাম

সাহেবের যুগে প্রতিনিধিত্ব মূলক শাসন প্রণালী প্রচলিত ছিল না। এখন প্রতিনিধিত্ব মূলক শাসন প্রণালী পৃথিবীর সর্ব্বত্রই প্রবর্ত্তিত হচ্চে। এখন যদি আলেমদের এজমার পরিবর্ত্তে মোসলেম-সমাজের যথাযথ ভাবে নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিদের এজমার উপর সেই প্রস্তাবিত নিয়মের বৈধতার বিচারের ভার ছেড়ে দিই—তাহ্‌লে তাতে কি অনিষ্ট হতে পারে ?

জনমত অভ্রান্ত নয়, আর জনমতের প্রতিনিধিরাও অভ্রান্ত নন। কিন্তু ওলামারাই কি অভ্রান্ত? শাস্ত্রের বাচনিক জ্ঞান অবশ্য সাধারণের প্রতিনিধিদের চেয়ে ওলামাদের বেশী থাকা সম্ভবপর, কিন্তু সমাজের অবস্থার বিষয়, সমাজের প্রয়োজনের বিষয়, এবং যুগধর্ম্মের দাবীর বিষয় সাধারণের সেই প্রতিনিধিরা যে উলেমাদের চেয়ে বেশী অভিজ্ঞ হবেন সে বিষয় সন্দেহ নাই। আর সেই জন্য আমাদের এই সমস্যাবহুল এবং জটীলতা পূর্ণ যুগের তারাই যোগ্য নিয়ামক—উলেমারা নহেন।

আমরা যদি শরিয়তের বিষয় এই প্রতিনিধিত্ব মূলক শাসন-প্রণালী গ্রহণ করি তাহ'লে শিয়া সুন্নী, হানাফী মহাম্মদী প্রভৃতির অশোভন কলহ সমাজ থেকে চিরতরে বিদূরিত হয় আর ইসলামের একতা এবং ভ্রাতৃত্ব কেবল ধর্ম্মগ্রন্থের মধ্যেই আবদ্ধ থাকে না, পক্ষান্তরে সমাজের বাস্তব জীবনেও মূর্ত্ত হয়ে উঠে। অবশ্য একথা বলা বাহুল্য যে ইসলামিক শরিয়তের বৈধতার বিচার মুসলেম সমাজের মুসলেম প্রতিনিধিরাই করতে পারেন, আর কারও তাতে হস্তক্ষেপ করবার অধিকার নাই।

তুমি বলবে—ইসলামিক ব্যবহার বিধিকে যদি আমাদের প্রয়োজন মত ভাঙ্গতে গড়তে হয়, ইসলামকে তাহলে একটা মানবীয় প্রতিষ্ঠান ছাড়া আর কিছু বলা চলে না। তার divine origin, তার স্বর্গীয়ত্বের দাবী, তার এলহামিয়েৎ তাহলে উর্ব্বর কবি-কল্পনা প্রসূত রূপ-কথাতেই পর্য্যবসিত হয়।

নিপুণ ভাস্কর গঠিত মৃন্ময় মূর্ত্তি দেখতে ঠিক জীবন্ত মানুষেরই মত, সেটা কিন্তু জীবন্ত মানুষ নয়। আপাতঃমৃত শবদেহ দেখতে ঠিক জীবন্ত প্রাণীরই মত, সেটা কিন্তু জীবন্ত প্রাণী নয়। জীবন্ত মানবের মধ্যে এবং জীবন্ত প্রাণীর মধ্যে প্রাণ নামক অবর্ণনীয় একটা জিনিষ আছে যা মৃন্ময় মূর্ত্তির মধ্যে কিম্বা শবদেহের মধ্যে নাই। এলহামী ধর্ম্মের আদেশ অনুশীলনের মধ্যেও সেইরূপ একটা ঐশী শক্তির প্রেরণা আছে যা সাধারণ মানবীয় আদেশ অনুশাসনের মধ্যে নাই। জীবন্ত মানুষ যেমন তার পোষাক, কিম্বা তার আবাস, কিম্বা তার ব্যবসার পরিবর্ত্তন করলেই তার মানবত্ব হারিয়ে ফেলে না, জীবন্ত ধর্ম্মও তেমনি কতকগুলি বাহ্যিক আচার অনুষ্ঠানের রদবদল করলে তার স্বত্বা, তার বিশেষত্ব হারিয়ে ফেলে না। স্থান কালভেদে যেমন মানুষের পোষাক পরিচ্ছেদ, আবাস নিবাসের পরিবর্ত্তন করা দরকার, ধর্ম্মেরও সেই রকম স্থান কাল পাত্রভেদে তার আদেশ নিষেধের আবশ্যক মত পরিবর্ত্তন করা দরকার।

ধর্ম্মের প্রকৃত কাজ সমাজের কোন বিশেষ একটা রূপকে চিরস্থায়ী করা নয়। সমাজের নিত্য পরিবর্ত্তনশীল রূপের মধ্যে আত্ম-প্রকাশ করাই হচ্চে ধর্ম্মের প্রকৃত কাজ। কোন বিশেষ ব্যবহারিক নিয়মের সঙ্গে ইসলামের কোন চিরন্তন সম্বন্ধ নাই। ইসলামের সম্বন্ধ হচ্চে সেই ব্যবহারিক নিয়মের অন্তরতম সত্যের সঙ্গে, আর তার নিগূঢ়তম প্রেরণার সঙ্গে। কোরআণ শরিফের কথায় :—

لیس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق
والمغرب ولكن البر من امن بالله واليوم الاخر
والملئكة والكتب والنبيين واتى المال على
حبه ذوى القربى واليتامى والمسكين وابن السبيل
والسائلين وفى الرقاب —

( ভাবার্থ—ধর্ম্ম পূবদিকে কিম্বা পশ্চিম দিকে নামাজ পড়ার নাম নয়। আল্লাহতালায় ঈমান আনা, কেয়ামতের উপর, ফেরেস্তাদের উপর, এলহামী কেতাব সমূহের উপর, আর নবীদের উপর বিশ্বাস স্থাপন করা এবং দরিদ্র আত্মীয় স্বরূপ, এতিম, গরিব, মোসাফের, ফকির, বান্দী,

গোলাম প্রভৃতি দুস্থ লোকেদের তোমার সামর্থ্য দিয়ে সাহায্য করা—এই সবেরই নাম হচ্চে ধর্ম্ম।) *

তুরস্ক, আফগানিস্থান, ইরাণ, মিসর প্রভৃতি দেশের মুসলমানেরা তাঁদের ব্যবহার নীতির রদ বদল করে যে ইসলামের বিরুদ্ধতা করছেন—সে কথা বলা যেতে পারে না। পক্ষান্তরে নব প্রবর্ত্তিত বিধানগুলি যদি প্রকৃতই সমাজের পক্ষে মঙ্গলকর হয়, তাহলে সেগুলি যে পবিত্র ইসলামের অনুমোদিত সে কথা বলতেও আমার দ্বিধা বোধ হয় না। আল্লাহতালা আমাদের মঙ্গল ছাড়া অমঙ্গল চান না, সুতরাং যা আমাদের পক্ষে মঙ্গলকর তাতে যে তাঁর কোন আপত্তি নাই তা খুব জোরের সঙ্গেই বলা যায়।

এখন ধর্ম্মের আধ্যাত্মিক অংশের বিষয় আলোচনা করা যাক। আধ্যাত্মিক অংশ বলতে আমি বুঝি—(১) ধর্ম্ম-নির্দ্দেশিত ব্যক্তিত্বের আদর্শ এবং (২) আল্লাতালার সান্নিধ্য লাভের ধর্ম্ম নির্দ্দিষ্ট পন্থা। কোর-আন মজিদে মানবতার যে আদর্শ নির্দ্দেশিত হয়েছে, তার তুল্য ব্যাপক, বিরাট এবং সর্ব্বকালোপোযোগী আদর্শ পৃথিবীর কোন ভাষায়, কোন সাহিত্যে এবং কোন ধর্ম্মে খুঁজে পাওয়া যায় না।

تخلقوا با خلا ق الله —

"আল্লাহতালার আখলাকের (গুণাবলীর) অনুসরণ কর।" (১) এর চেয়ে মহত্তর কোন আদর্শ মানুষ কল্পনাও করতে পারে না। আল্লাহতালার আখলাকের যে সংজ্ঞা কোর-আন শরিফে দেওয়া হয়েছে, তার তুলনায় মানব-কল্পনা-প্রসূত শ্রেষ্ঠতম আদর্শও হীন এবং নিস্প্রভ বলে মনে হয়। অভ্রভেদী হিমাচলের মত ইসলামের এই বিরাট আদর্শ যে অনন্তকাল ধরে বিশ্বমানবের জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করবে—সে কথা খুব জোরের সঙ্গেই বলা যেতে পারে। এই হিসাবে ইসলামই হচ্চে জগতের শ্রেষ্ঠ এবং শেষ ধর্ম্ম, কেননা ইসলামের আদর্শের চেয়ে কোন মহত্তর আদর্শ মানুষ কখনও কল্পনা করতে পারেওনি এবং পারবেও না। সেই জন্যই কোর-আন শরিফ নাজেল শেষ করার সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহতালা বলেছেন—

اَلیَومَ اَکمَلتُ لَکُم دِینَکُم - وَ اَتمَمتُ عَلَیکُم نِعمَتِی • وَرَضِیتُ لَکُمُ الاِسلاَمَ دِینًا —

ভাবার্থ—আজ তোমাদের ধর্ম্ম তোমাদের জন্য আমি পূর্ণ করে দিলুম। আজ আমার দান তোমাদের জন্য নিঃশেষিত করে দিলুম। ইসলামকেই তোমাদের ধর্ম্ম নির্দ্দিষ্ট করে দিলুম।

এখন ধর্ম্মের আধ্যাত্মিক অংশের দ্বিতীয় বিষয়টার আলোচনা করা যাক। রব্বোল আলামিনের সান্নিধ্য লাভ যে জীবনের শ্রেষ্ঠতম নিয়ামত সে কথা বুঝাবার জন্য লম্বা বাহাসের দরকার নেই। সমস্যা হচ্চে—সে নিয়ামত কি করে হাসেল করা যেতে পারে।

তুমি যদি রসায়ন শাস্ত্র শিখতে চাও—তাহলে রসায়ন শাস্ত্রবিদের নিকট সবক নিতে যাবে, তুমি যদি আইন শিখতে চাও—তাহলে আইনজ্ঞ ব্যবহার-শাস্ত্রবিদের নিকট দীক্ষা নিতে যাবে, তুমি যদি কুস্তি শিখতে চাও—তাহলে কুস্তিগির পাহালওয়ানের কাছে তাল ঠুকতে যাবে; মোটের উপর যা তুমি শিখতে চাও, সে বিষয়ে যে অভিজ্ঞ এবং পারদর্শী তারই কাছে তুমি তালিম নিতে যাবে; অন্য কোন বিষয় কেউ যত বড় জ্ঞানীই হোক না কেন, তোমার শিক্ষণীয় বিষয়ে যদি তার কোন অভিজ্ঞতা না থাকে, তাহলে সে বিষয় তার কাছে দীক্ষা নিতে কখনও যাবে না।

আধ্যাত্মিকতার বিষয়ও ঠিক এই নীতিরই অনুসরণ করতে হবে। আল্লাতালার সান্নিধ্য লাভের উপায় তাঁরাই আমাদের শেখাতে পারেন, তাঁর সান্নিধ্য লাভের সৌভাগ্য যাঁরা হাসেল করেছেন, আর কেউ পারেন না। আমাদের রসুলে করিম এবং অন্যান্য নবীরা যে আল্লাহতালার সান্নিধ্য লাভ করেছিলেন, সে বিষয় কোন সন্দেহই থাকতে পারেনা। সুতরাং এ বিষয় তাঁরাই আমাদের শ্রেষ্ঠ পথ প্রদর্শক!

আম্বিয়া এবং ধর্ম্ম প্রবর্ত্তক মহাপুরুষদের মধ্যে এক হজরত মহম্মদের বিষয়ই আমাদের স্থির ঐতিহাসিক জ্ঞান

* বের শব্দের অর্থ ধর্ম্ম নহে—পুণ্য। আর তোয়াল্লু ক্রিয়া পদের অর্থ মুখ ফিরান—মুখ ফিরাইয়া নামাজ পড়া উহার অর্থ নহে।—সম্পাদক।

(১) ইহা কোরআন নহে—হজরতের বাণী বা হাদিছ।—সম্পাদক।

আছে, আর এক মাত্র তাঁরই শিক্ষা অবিকৃত এবং অপরিবর্ত্তিত অবস্থায় আমাদের নিকট এসে পৌছেছে। তা ছাড়া, তাঁর জীবনে এবং শিক্ষায় ধর্ম্মযোগ ও কর্ম্মযোগের যে অপূর্ব্ব সমন্বয় দেখতে পাওয়া যায়, তার তুলনা ধর্ম্মের ইতিহাসে নাই। এরূপ অবস্থায় খোদাপ্রাপ্তির দুর্গম এবং বিভীষিকা বহুল পথের তিনি-ই যে শ্রেষ্ঠতম এবং বিশ্বস্ততম পথ—প্রদর্শক—সে বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকতে পারে না। এই জন্যই কোরআন শরিফে তাঁহাকে রহমাতুল্লাহেলিন আলামিন—বিশ্বের জন্য আল্লাহতালার রহমত বলা হইয়াছে—কেননা তিনি বিশ্ববাসীকে কুসংস্কার এবং ভ্রান্তির বিভীষিকাময় মরুভূমি থেকে শান্তির এবং ঈমানের ফলফুল-শোভিত ফেরদৌসে নিয়ে যান; আর পাপতাপক্লিষ্ট আত্মাকে লেকায়ে এলাহির আবেহায়াৎ পান করিয়ে অমরত্ব দান করেন। এর চেয়ে বড় রহমত আর কি হতে পারে?

'তুমি বলেছ, "ধর্ম্ম নিয়ে মারামারি, কাটাকাটি চিরকাল থেকেই চলে আসছে। কেবল খৃষ্টান এবং মুসলমান, হিন্দু এবং বৌদ্ধ প্রভৃতি বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীরা কেন; এক মুসলিম সমাজেরই শিয়া সুন্নি, হানাফি, মহাম্মদী প্রভৃতি বিভিন্ন ফেরকার লোকেরা ধর্ম্মের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আনুষ্ঠানিক বিষয়ের জন্য অম্লান বদনে পরস্পরের রক্তপাত এবং সর্ব্বনাশ সাধন করে আসছে। ধর্ম্মের সঙ্গে বিরোধের যখন অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ, তখন ধর্ম্মকে সমাজ থেকে যত শীঘ্র তাড়াতে পারা যায়, সমাজের পক্ষে ততই মঙ্গল।"

রাস্তা হাঁটার দরুণ প্রত্যহ কত লোকের যে অপমৃত্যু ঘটছে—তার ইয়ত্তা করা যায় না। তারা যদি শান্ত, শিষ্ট শিশুটীর মত সমস্ত দিন ঘরের দেওয়ালের চৌহদ্দির মধ্যেই আবদ্ধ থাকতো তাহলে অকালে প্রাণ হারাতো না। কিন্তু এই অপমৃত্যুর আশঙ্কার জন্য তাই বলে কি পথ-হাঁটা বন্ধ করে দিতে হবে?'

শিক্ষা এবং বিজ্ঞানের সাহায্যে কত লোক জাল জুয়াচুরি করছে, কত ভণ্ড সুফি এবং সাধু লোক ঠকিয়ে খাচ্ছে, কত স্বার্থ-সর্ব্বস্ব রাজনীতিক এবং সমাজনীতিক জনসাধারণকে কুপথে পরিচালিত করে তাদের সর্ব্বনাশ এবং নিজেদের উদর পূর্ত্তি করছে। কিন্তু এই কুফলের আশঙ্কায় শিক্ষাকে তাই বলে কি সমাজ থেকে নির্ব্বাসিত করতে হবে?

সংসার ধর্ম্ম করে কত লোক কত বিপদে পড়ছে, কত লোক কত জ্বালা যন্ত্রণা ভোগ করছে, কত লোক কত অপকাণ্ড করছে; কিন্তু সংসারের দুঃখ যন্ত্রণা থেকে বাঁচবার জন্য তাই বলে কি আমাদের বনবিহারী সন্ন্যাসী হতে হবে?

অবশ্যই না। এমন কোন মঙ্গলময় আচার, এমন কোন মঙ্গলময় অনুষ্ঠান, এমন কোন মঙ্গলময় প্রতিষ্ঠান নাই, যার দরুণ কিম্বা যাকে উপলক্ষ্য করে সমাজে কোন না কোন অনর্থের সৃষ্টি হয়নি। কিন্তু কেবল সেই অনর্থ টুকুর জন্য সেই আচার, কিম্বা সেই অনুষ্ঠান, কিম্বা সেই প্রতিষ্ঠানকে বর্জ্জন করা যেতে পারে না। কোন প্রতিষ্ঠান বিশেষের মঙ্গলের অংশ বেশী, কি অমঙ্গলের অংশ বেশী, ন্যায়ের তুলাদণ্ডে তা আমাদের বিচার করে দেখতে হবে। বিচারে যদি দেখি যে প্রতিষ্ঠানটীর মঙ্গলের অংশ তার অমঙ্গলের অংশের চেয়ে বেশী—তাহলে তাকে সমর্থন করতে হবে। এ ছাড়া আমাদের অন্য পথ নাই। অমঙ্গলের আশঙ্কায় যদি মঙ্গলময় অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠানগুলিকে বর্জ্জন করতে আরম্ভ করি, তাহলে কোন অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠানই সমাজে আত্মরক্ষা করতে পারবে না। ধর্ম্মকে বর্জ্জন করবার খেয়াল ছেড়ে, কোন ধর্ম্ম আমাদের জীবনের পক্ষে অপেক্ষাকৃত মঙ্গলকর, তা স্থির করতে হবে, আর জ্ঞান বিজ্ঞান এবং চিন্তার সাহায্যে সেই ধর্ম্মকে আমাদের অবস্থার উপযোগী করে নিতে হবে।

ধর্ম্মের কুৎসা করা আমাদের দেশে একটা Fashion হয়ে দাঁড়িয়েছে। দুএক জন অপরিপক্ক-মস্তিষ্ক বাঙ্গালী-মুসলমানের লেখা পড়লে মনে হয়, ইসলামই আমাদের সর্ব্বনাশ করেছে। ইসলাম না-থাকলে আমারা (বাঙ্গালী মুসলমানেরা) রোমানদের মত দুনিয়ার উপর বাদশাই করতুম, না হয় গ্রীকদের মত আর্ট, সাহিত্যে এবং বিজ্ঞানে অতুলনীয় কীর্ত্তি-স্তম্ভরাজির সৃষ্টি করতুম। ইসলামের বিষময় নিশ্বাসই আমাদের অমূল্য প্রাণ-শক্তিকে নষ্ট করে দিয়েছে।

এসব লেখকেরা ভুলে গেল যে আরবেরা ইসলামের প্রেরণাতেই পৃথিবী জয় করেছিল, তারা ভুলে গেল যে এই ইসলামের প্রেরণাতেই মধ্যযুগের মুসলমানেরা সাহিত্যে এবং বিজ্ঞানে জগতের দীক্ষা-গুরুর পদলাভ করেছিলেন; তারা ভুলে গেল যে এই ইসলামের প্রেরণাতেই পারস্য-বাসীরা জগতের শ্রেষ্ঠ কাব্যসাহিত্যের সৃষ্টি করেছেন। তাঁরা ইসলামের এবং মুসলিম জাতির গৌরবের এবং কীর্ত্তির

কথা ভুলে গেল। তাঁরা কেবল মনে রাখেন বাঙ্গালী মুসলমানের দৈন্যে কথা, আর বাঙ্গালী মুসলমানের দুর্দ্দশার কথা।

ইসলাম যদি ভারতবর্ষের তথা বঙ্গদেশে না আসতো তাহলে আজ যারা বাঙ্গালা দেশে নিজেদের মুসলমান বলে পরিচয় দেন তাদের সাধারণ অবস্থা যে কিরূপ হত সে কথা কি লেখক সাহেবদের খেয়াল শরিফে কখনও এসেছে। কল্পনার সাহায্য নিতে তাঁদের আমি বলছিনা। একবার তাঁরা মাদ্রাজে গিয়ে অব্রাহ্মণের অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করে আসুন। আর ব্রাহ্মণেতর জাতির বিষয় মনুসংহিতার বিধানগুলি একবার তাঁরা পড়ে দেখুন। এই দুটী কাজ যদি তাঁরা করেন, তাঁদের জ্ঞান-চক্ষু তাহলে খুলে যাবে। ইসলামকে তাহলে বাঙ্গালী মুসলমানের শত্রুরূপে না দেখে আল্লার প্রেরিত মুক্তির দূত রূপেই তাকে তাঁরা দেখতে শিখবেন। 'ইসলামই বাঙ্গালী মুসলমানকে মনুষ্যত্বের অধিকার দিয়েছে; আর ভবিষ্যতে এই ইসলামের বুনিয়াদে সুপ্রতিষ্ঠ হয়েই বাঙ্গালী মুসলমান উন্নতির উচ্চ শিখরে আরোহণ করবে। দুর্ব্বুদ্ধির পরিচালনায় যদি বাঙ্গালী মুসলমান কোনদিন ইসলামকে ত্যাগ করে তাহলে অতি অল্পকালের মধ্যেই সে মনুষ্যত্ব বিবর্জ্জিত দাস মানসিকতা পূর্ণ পশুতে পরিণত হবে। বাঙ্গালার সাধারণ মুসলমান এই গূঢ় সত্যটীকে তার সহজ বুদ্ধিতে উপলব্ধ করে বলেই সে ইসলামের জন্য সর্ব্বদা প্রাণ পর্য্যন্ত দিতে প্রস্তুত! শিক্ষিত মুসলমানের কাজ হচ্চে তার সহজ বুদ্ধিলব্ধ এই জ্ঞানকে মঙ্গলের পথে পরিচালিত করা; তার সহজ বুদ্ধিকে তর্কের কুহেলিকায় আচ্ছন্ন করে তাকে মৃত্যুর পথে নিয়ে যাওয়া কখনও শিক্ষিত মুসলমানের যোগ্য কথা হতে পারে না।'

ধর্ম্ম হচ্চে একটা স্বাভাবিক জিনিষ। ধর্ম্ম না হলে মানুষ থাকতে পারে না। ধর্ম্ম ছাড়া মানুষের মহত্তর বৃত্তিগুলি বাঁচতে পারে না। ধর্ম্ম ছাড়া প্রত্যেক মানুষের অন্তরে যে বিশ্বমানবটী, যে world soulটী আছে, সে কখনও শান্তি পায় না।

— لا تطمئن القلب إلا بذكر الله

(আল্লাকে স্মরণ না করে আমাদের আত্মা কখনও শান্তি পেতে পারে না)।

যা মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক তা থেকে তাকে বঞ্চিত করলে তার জীবন পঙ্গু হয়ে যায়। খেলাধুলা সুস্থ বালকের পক্ষে স্বাভাবিক। তা থেকে তাকে বঞ্চিত কর, দেখবে তাদের জীবন পঙ্গু হয়ে গেছে। বন্ধু সহবাস মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক। তা থেকে তাকে বঞ্চিত কর, দেখবে তার জীবন পঙ্গু হয়ে গেছে। নারী সংসর্গ পুরুষের পক্ষে স্বাভাবিক, তা থেকে তাকে বঞ্চিত কর দেখবে তার জীবন পঙ্গু হয়ে গেছে। ধর্ম্মও সেই রকম মানুষের পক্ষে একান্তই স্বাভাবিক। তাকে তাকে বঞ্চিত কর, দেখবে তার জীবন পঙ্গু হয়ে গেছে।

তবে খেলার দরকার আছে বলে জুয়াখেলা বাঞ্ছনীয় হতে পারে না। বন্ধু সহবাসের দরকার আছে বলে চোর গাঁট কাটার সংসর্গ বাঞ্ছনীয় হতে পারে না। নারী সংসর্গের দরকার আছে বলে বারবিলাসিনীর বন্ধুত্ব কাম্য হতে পারে না। সেই রকম ধর্ম্মের প্রয়োজন আছে বলেই শব সাধনার প্রতিষ্ঠা করা যেতে পারে না, আর নরবলির প্রবর্ত্তন করা যেতে পারে না। সব জিনিষের যেমন ভাল মন্দ আছে, ধর্ম্মেরও সেই রকম ভাল মন্দ আছে। মন্দ ধর্ম্মকে ছেড়ে ভাল ধর্ম্মকে গ্রহণ করতে হবে। এটীও আমাদের মনুষ্যত্বের অন্যতম কর্ত্তব্যের মধ্যে একটী।

ধর্ম্মের নামে যে মানুষ অনেক অনর্থের সৃষ্টি করেছে সে কথা সত্য; কিন্তু এমন কোন আদর্শ কি পৃথিবীতে আছে, যার নাম করে দুষ্ট প্রকৃতির লোক তাদের নীচ স্বার্থ-সিদ্ধির উদ্দেশ্যে নানা অনর্থের সৃষ্টি করে নি? Patriotism, Nationalism, Justice, Humanity প্রভৃতির নামে যে কত পাপের, কত অন্যায়ের, কত অত্যাচারের অনুষ্ঠান হয়েছে এবং হচ্চে কে তার সংখ্যা করতে পারে? শয়তান এখনও মরে নি, আর আদম হাওয়ার বংশধরেরা যতদিন ধরাপৃষ্ঠে থাকবে ততদিন সে মরবেও না। মানবের প্রত্যেক মঙ্গলময় অনুষ্ঠানকে ব্যর্থ করবার জন্য সে অনুক্ষণ ব্যস্ত আছে। ধূর্ত্ত রাজনীতিকের মত—যে সব অনুষ্ঠান, প্রতিষ্ঠানকে আমার অন্তরের সঙ্গে ভালবাসি এবং শ্রদ্ধা করি, সেই সব অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠানের দোহাই দিয়ে এবং সেই সবেরই মধ্যবর্ত্তিতায় আমাদের

সর্ব্বনাশ সাধনের জন্য সে অবিরত ভাবে কাজ করে যাচ্ছে। তার প্ররোচনায় যদি আমরা আমাদের জীবনের শ্রেষ্ঠতম সম্পদকে পরিত্যাগ করি তাহলে সে অবশ্য তার সাধনাকে সার্থক বলে মনে করবে। সেই মূঢ়তার ফলে কিন্তু আমাদের মৃত্যু অনিবার্য্য নয় কি ?

তুমি লিখেছ, "ধর্ম্মবাদীরা জীবনকে সমগ্রভাবে দেখতে পারেন না। জীবনের একটা বিশেষ অংশকে তাঁরা এমন বাড়িয়ে তুলেন যে এই বিচিত্র জীবনের অন্যান্য অংশের গুরুত্ব এবং প্রয়োজনীয়তা অনুভব করবার শক্তি তাঁদের আর থাকে না। ফলে সেই বিষময় মানসিকতার সৃষ্টি হয় যার নাম হচ্ছে Fanaticism। এই সংকীর্ণ মানসিকতা মানুষের প্রত্যেক উন্নতিশীল প্রচেষ্টারই অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায় আর জীবনের প্রত্যেক নূতন অভিব্যক্তিকে ব্যর্থ করবার জন্য সমাজে বিষম অনর্থের সৃষ্টি করে। ধর্ম্মকে যতদিন আমরা সমাজের অপরিহার্য্য এক অঙ্গ বলে মনে করবো, ততদিন এই Fanaticism আমাদের প্রত্যেক উর্দ্ধগামী প্রয়াসকে ব্যর্থ এবং লাঞ্ছিত করবে।"

'ধর্ম্মের গোঁড়ামি প্রকৃত ধার্ম্মিকদের মধ্যে দেখা যায় না, সেটা দেখা যায়, ধর্ম্মকে যারা নিজের স্বার্থ-সিদ্ধির উদ্দেশ্যে ব্যবহার করে, সেই বক-ধার্ম্মিকদের মধ্যে। উন্নতির পরিপন্থী ধার্ম্মিকরা নয়, উন্নতির পরিপন্থী হচ্ছে ধর্ম্ম-ব্যবসায়ী বক-ধার্ম্মিকেরা। অশিক্ষিত এবং অনুন্নত সমাজে যে এই ভণ্ড ধর্ম্ম ব্যবসায়ীদের প্রভাব অত্যন্ত বেশী এবং সে প্রভাব যে জাতীয় উন্নতির বিষম পরিপন্থী সে কথা অবশ্য সত্য। এই ধর্ম্ম ব্যবসায়ী ভণ্ডদের হাত থেকে সমাজকে মুক্ত করা যে এখন আমাদের একটী প্রধান কর্ত্তব্যের মধ্যে সে বিষয় আমার মনে কোন সন্দেহ নাই। তবে তার জন্য অবশ্য ধর্ম্মকে ত্যাগ করবার কোন দরকার নেই।'

ছোট দরওয়াজা দিয়ে ঘরে ঢুকবার জন্য নিজের মস্তককে স্কন্ধচ্যুত করা অনাবশ্যক। মাথা একটু হেঁট করলেই অবাধে মতলব হাসেল হতে পারে। পুরোহিতের হাত থেকে সমাজকে মুক্ত করবার জন্য ধর্ম্মকে বর্জ্জন করাও সেই রকম অনাবশ্যক। শিক্ষা এবং সভ্যতার বিস্তার, নির্দ্দোষ আমোদ প্রমোদের সংস্থান, আর্ট এবং সাহিত্যের প্রচার প্রভৃতির দ্বারা সে উদ্দেশ্য অনায়াসে সাধন করা যেতে পারে। সে চেষ্টা এখন প্রত্যেক মোসলেম দেশেই হচ্ছে, আর অদূর ভবিষ্যতে এই মঙ্গলময় আন্দোলন যে সাফল্য মণ্ডিত হবে সে কথা জোরের সঙ্গেই বলা যেতে পারে।

আমার পত্র অত্যন্ত দীর্ঘ হয়ে গেছে। এখন এর উপসংহার করা দরকার। ধর্ম্ম কতকগুলি dead formula-র সমষ্টি নয়, কতকগুলি উদ্দেশ্যহীন আচার অনুষ্ঠানের ভেলকি বাজী নয়, কতকগুলি নৈতিক উপদেশের নীরস তালিকা মাত্র নয়। ধর্ম্ম হচ্ছে জীবনের Vital force, রুহে রওয়ান!

এই ধর্ম্মের বলেই মানুষ অসাধ্য সাধন করে, এই ধর্ম্মের বলেই মানুষ ফেরেস্তা হয়ে উঠে, এই ধর্ম্মের বলেই মানুষ জরা মৃত্যুর জুলমাত অতিক্রম করে, অনন্ত জীবনের আবে-হায়াৎ লাভ করে। কায়মনে প্রাণে এই ধর্ম্মের জন্য আল্লার কাছে প্রার্থনা করা, আর জীবনের সমস্ত শক্তি দিয়ে এই ধর্ম্মের জন্য সাধনা করাই হচ্ছে শ্রেষ্ঠতম এবাদত। মহাকবি একবালের "দোয়া" হচ্ছে এই এবাদতের একটী অমূল্য অভিব্যক্তি :—

یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے
جو قلب کو گرما دے جو روح کو تڑپا دے
پھر وادی فاران کے ہر ذرے کو چمکا دے
پھر شوق تماشا دے پھر ذوق تقاضا دے
محروم تماشا کو پھر دیدۂ بینا دے
دیکھا ہے کچھ مین نے اوروں کو بھی دکھلا دے
بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوے حرم لے چل
اس شہر کے خوگر کو پھر وسعت صحرا دے
پیدا دل ویران مین پھر شورش محشر کر
اس محمل خالی کو پھر شاہد لیلا دے
اس دور کی ظلمت مین ہر قلب پریشان کو
وہ داغ محبت دے جو چاند کو شرما دے
رفعت مین مقاصد کو ہمدوش ثریا کر
خودداری ساحل دے - آزادی دریا دے
بے لوث محبت ہو - بیباک صداقت ہو
سینون مین اجالا کر - دل صورت مینا دے
احساس عنایت کر آثار مصیبت کا
امروز کی شورش مین اندیشۂ فردا دے
مین بلبل نالان ہون اک اجڑے گلستان کا
تاثیر کا سائل ہون محتاج کو داتا دے

---

# পথের স্মৃতি

[ জসীম উদ্‌দীন ]

পথে পথে ঘুরি। কত জনের সাথে পরিচয় হয়। কেউ আদর করে, কেউ অনাদর করে। কাউকে মা বলিয়া, কাউকে ভাই বলিয়া ডাকি। আমার এই ভবঘুরে জীবনে আমার আত্মীয়-স্বজন আপনার জনেরা যেন আমারই আগে আগে ছুটিয়া চলিয়াছেন। পল্লীর অচেনা অঙ্গণের বাহির হইতে যখন স্নেহ-ক্ষুধিত অন্তরে মা বলিয়া ডাকিয়া উঠি, যখন সেই অজানা গৃহের লক্ষ্মী সন্তান-বাৎসল্যের মহিমাময়ী মূর্ত্তিতে আসিয়া আমার সম্মুখে দাঁড়ান তখন মনে হয় সেই সুদূর পল্লীপথের মোড়ে কলাপাতার হাওয়ায় মুখর একখানা ছোট্ট কুটীর হইতে আমারই সেই চিরচেনা মা'টী যেন আজ নূতনরূপ লইয়া এখানে বাসা বাঁধিয়াছেন। সম্মুখে সুদূর গ্রামের আকাশ-ছোঁয়া কাল-কাজল যবনিকা সরাইয়া প্রতিদিন এই মায়ের নূতন নূতন মূর্ত্তি দেখিয়া আমার প্রবাসের জীবন কাটে। নিখিল বন্ধনের মাঝে আমি তবুও চির-প্রবাসী।

নূতনের সাথে পরিচয়, আবার তার কাছ হইতে বিদায় লওয়া-এযেন কতকটা গা সওয়া হইয়া গিয়াছে। আগে কোন পরিচিত স্থান হইতে বিদায়কালে কাঁদিয়া বুক ভাসাইতাম। সেই অসহ্য বেদনা কিছুতেই ভুলিতে পারিতাম না। আজও কোন স্থান হইতে বিদায় কালে প্রাণ দুলিয়া উঠে কিন্তু এখন বেদনা আর অশ্রু হইয়া ঝরিয়া পড়ে না—অন্তরের তেপান্তরে নীরবে তাহার সমাধি রচনা করি। মাঝে মাঝে একলা রাতে সমস্ত ভিতর যেন দুলিয়া উঠে; বেশ বুঝিতে পারি যে ভিতরের কবর-গুলি নড়িতেছে; প্রিয় নাম জপ করিতে গিয়া ভয়ে নাম ভুলিয়া যাই।

মনে পড়ে কবেকার কথা—বাইরের জগতের কাছে সে কথা হয়ত নিতান্ত অপ্রয়োজনীয়---অতি তুচ্ছ জীবনের তুচ্ছতম কথা। কিন্তু যে দেবতা আমার জীবনের পথে আলো দেখাইয়া লইয়া চলিয়াছে - যাত্রারম্ভে সেই আমার কাণে কাণে বলিয়া দিয়াছে যে, সহজের রাজ-পথ দিয়া সুন্দরতমের আবির্ভাব হয়। সেই আমাকে বলিয়া দিয়াছে যে সমস্ত আকাশের রহস্য একটী শিশির বিন্দুতে আছে - একটী অজানা অশ্রু জলে নিখিলের মর্ম্ম ব্যথার কাহিনী লেখা আছে! তাই কলা-পাতার একটু দোলা, নদীর ধারে শরিষা ক্ষেতের একটী শরিষা ফুল আমার অন্তরকে আনন্দের রহস্যে ভরিয়া দেয়।

একটী পথে চলা রাখাল ছেলের চকিত চাউনি আমার অন্তরে আসিয়া নাড়া দেয়। যে সমীরণের আভাস কচি ধানের শীষ ধরিতে পারে না তারই অনুরণনে আমার সমস্ত দেহ বীণা-যন্ত্রের মত কাঁপিয়া উঠে!

একদিন পথে যাইতে যাইতে একটী ছোট মেয়েকে কাঁদিয়া চলিয়া যাইতে দেখিয়াছিলাম; আজ এত লোকের মধ্য দিয়া চলিয়া আসিয়াছি তবুও সেই ছোট্ট মেয়েটীর কবেকার সেই কান্নাটুকু আমার বুকে লাগিয়া আছে; কত রাত নদী চরে একলা বসিয়া ভাবিয়াছি, আকাশের ছায়াপথ দিয়া সেই ছোট্ট মেয়েটী কাঁদিয়া চলিয়াছে, তারই কান্নার কাঁপনে তারারা কাঁপিতেছে।

এমনি আর একদিনের আর একটী ছোট্ট কথা।

একদিন গাঁয়ের পথে যাইতে যাইতে তার সাথে পরিচয় হয়। কারও সাথে সম্বন্ধ পাতাইতে আমার বেশীক্ষণ লাগে না। মিছেমিছি হাসিতে হাসিতেই তাকে দোস্ত বলিয়া ডাকিয়া ফেলিলাম। সে চাষীর ছেলে। আমার মত একজন সার্টকোট-পরা লোক তাকে দোস্ত বলিয়া ডাকিল। এ যেন তার কাছে একেবারেই অসম্ভব। সে আমার দিকে চোখ দুটী যেন কেমন করুণ করিয়া চাহিয়া রহিল। আমি বলিলাম, কেন ভাই তুমি আমার দোস্ত হবে না।

"আপনারা বড় লোক, আপনাগর সাথে কি আমাদের দোস্তী ঐতে পারে ?"

আমি বলিলাম, কেন হ'তে পারে না ভাই ? তোমরা কত ভাল। তোমাদের এই গাঁয়ের সহজ জীবনযাত্রা আমার বড্ড ভাল লাগে।

আমার এই বলার মধ্যে কতটুকু আন্তরিকতা ছিল জানি না কিন্তু আমার এই কথাগুলি সে এমনি ভাবে শুনিল যে মনে হইল বনোকুরঙ্গ বুঝি এমনি করিয়া ব্যাধের বাঁশীতে ভুলিয়া তীরবদ্ধ হয়।

তার সাথে আমার অনেক কথা হইল। বাড়ীতে তার মা আছে, ছোটী একটী বোন আছে। তাদের দশ বিঘা জমি। সে নিজে লাঙ্গল বায়। তাতেই তাদের সংসার চলে।

কয়েকদিন কাটিয়া গিয়াছে। তার সাথে আর বিশেষ করিয়া কোন আলাপ হয় নাই। গ্রামের লোকদের কাছে আমি যেন সেই রূপকথার দেশের লোক। যেথানে দালান কোঠা সারী সারী, গাড়ী ঘোড়া কেবল চলিতেছে আর চলিতেছে সেই সহরের লোক আমি। দলে দলে চাষীরা আসিয়া আমাকে ঘিরিয়া দাড়ায়। তাদের নস্য দিয়া, ঘড়ি খুলিয়া দেখাইয়া, কলের বাত্তী জ্বালাইয়া, আমি একেবারে অবাক করিয়া তুলি। ওরা আমাকে গান শুনায়, বাঁশী বাজাইয়া শুনায়। এ যেন ভীন্ দেশের গালীভার লিলী পুটীয়ান্‌দের দেশে আসিয়াছে। আমি যেন আকাশের তারালোক হইতে খসিয়া আসিয়া ওদের দেশে পড়িয়াছি। ওদের উৎসুক দৃষ্টি যেন আমার কাছে সেই তারালোকের কাহিনী শুনিতে চায়। আমার ও দিনগুলি ওদের সাথে বেশ কাটিয়া যাইতেছিল। ওদের সাথে হল্লা করিয়া, গল্প করিয়া পল্লীর জীব-বিরল জীবনের মত আমার দিনগুলিও বিরলে কাটিয়া যায়। কবে যে সেই চাষী ছেলেটীকে দোস্ত বলিয়া ডাকিয়াছি তাহা আমি ভুলিয়াই গিয়াছি। সে কিন্তু আমাকে ভুলে নাই।

আমার বিদায়ের দিন ঘনাইয়া আসিয়াছে। তিন চারিদিন পরে আবার এক নূতন গ্রামে যাইব। এই সব ভাবিতেছি এমন সময় দেখি সেই চাষী যুবকটী আমার মুখের দিকে চাহিয়া আছে। আমি আবার রহস্যভরে তাকে দোস্ত বলিয়া ডাকিলাম, কিগো দোস্ত খবর কি? সে কেমন জড়িত কণ্ঠে উত্তর দিল, শুনই হেন, আমরার বাড়ীত একদিন দাওয়াত রাখতি ঐবি।

আমার প্রবাসের জীবনে দাওয়াত বড় ঘটিয়া উঠে না। লোকের বাড়ীতে চাহিয়া চিন্তিয়াই খাইতে হয়। তাই তার দাওয়াত পাইয়া খুব খুসী হইয়াই স্বীকৃত হইলাম। কথা হইল পরের দিন সকালে তার বাড়ীতে খাইব।

ছোট তিন খানা খড়ের ঘর। এক খানা রান্না-ঘর আর এক খানায় তারা থাকে। বাহিরে এক খানা খড়ের দোচালা, তাদের গরুর ঘর। তাহাতে তিন চারিটী হৃষ্ট পুষ্ট গরু গলার ঘুঙুর দোলাইয়া ঘাস খাইতেছে।

বাড়ীখানা ছোট হইলেও বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। উঠান ঘর বেশ লেপাপোছা, যেন রূপার পাতে ঝক্‌ঝক্ করিতেছে। এখানে ওখানে মরিচের গাছ, বেগুনের গাছ ফলে ফুলে নুইয়া পড়িয়াছে। জাঙলা ভরিয়া লাউ কুমড়ার লতা। মেয়েলী স্নেহের সহজ অনাবিল যত্নে বাড়ীখানা যেন পটে আঁকা ছবিটীর মত।

আমাকে লইয়া সে তাদের বড় ঘরে একটী মাদুর বিছাইয়া বসিতে দিল। ঘরেরই এক পাশে ভাতের হাড়ী, তরকারীর হাড়ী সামনে করিয়া একটী বিধবা মেয়ে বসিয়া আছে। ওপাশে পা ছড়াইয়া একটী আট দশ বছরের মেয়ে সুপারি কাটিতেছিল। কাঁচা সোণার মতন তাহার গাখানা। গয়না না পরিয়াও তার সুন্দর হাত পা গুলো যেন গয়নায় ঝলমল করিতেছিল। মেয়েটী এখনও ঘোমটা দিতে শেখে নাই। আমার দিকে এক দৃষ্টে চাহিয়া রহিল। তার হাতের চিকণ সুপারী গুলো ঝরঝর করিয়া আঁচলে পড়িয়া গেল। তার সরল চাহনীর ভিতরে অজানাকে জানিবার সেই চিরন্তন কৌতুহল। দোস্ত বলিল, ও আমার ছোট বোন সখিনা। মা দোস্তের ভাত বাড়ুইন।

দুখানা চীনের রেকাবীতে আমার আর দোস্তের ভাত বাড়া হইল। একটী ফটীকের গ্লাশে জল। বোধ হয় রেকাবী ও গ্লাশ তারা আর কারও বাড়ী হইতে ধার করিয়া আনিয়াছিল।

খাওয়ার ভিতরে এমন বিশেষ কোন উল্লেখ যোগ্য কিছু ছিল না। গরীব মানুষ। তবু তাদের সাধ্যে যা কুলাইয়াছে তাহা আমার জন্য তৈরী করিয়াছে। কিন্তু

তাদের এই খাওয়ানের ভিতরে তাদের পল্লীমনের যে সহজ ঐকান্তিকতার ইঙ্গিত পাইলাম তাহা কখনও ভুলিতে পারিব না। খাওয়ার পর পান মুখে দিয়া দুই দোস্ত গল্প করিতে বসিলাম। দোস্তের মা বাইরের কাজকর্ম্ম দেখিতে গেল। বোনটী ওপাড়ায় বেড়াইতে বাহির হইল।

কথায় কথায় অনেক কথা হইল। ওপাড়ার তিরু বিশ্বাসের মেয়ে ফুলীকে সে ভালবাসে। তার চেহারা যেমন আবে কাঞ্চন জলে। দোস্ত কতদিন বাঁশের কচি পাতা দিয়া তার নাকের নথ গড়াইয়া দিয়াছে, কতদিন তাদের বাড়ীর পাশের খেতে পাট কাটিতে যাইয়া তাকে রাখালী গান শুনাইয়াছে, মেয়েটী কেমনে বাড়ীর সামনের ডোবায় ছল করিয়া পায়ের খাড়ু হারাইয়া তাকে দিয়া খোঁজাইয়া লইয়াছে, ভাদ্রমাসে কবে ওদের বাড়ীর পাশ দিয়া ভেলায় ভাসিয়া যাইতেছিল—ফুলী তাদের ঘাটে স্নান করিতেছিল, এমন সময় দোস্তের কোমরে গোজা কাস্তেখানা জলে পড়িয়া গেলে কেমন করিয়া মেয়েটীও তার সাথে তাহা খুজিতে আসিলে তাদের হাতে হাতে ছোঁয়াছুয়ী হইয়াছে—এই সব কথা দোস্ত আমাকে বলিল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, দোস্ত, তুমি ওকে বিয়ে কর না কেন? দোস্ত বলিল যে বিবাহ ত যেমনে চিনি সন্দেশ নয় খাইয়া ফেলিলেই হইল। তিরু বিশ্বাস একেবারে কঞ্জুস। চার কুড়ী টাকার কমে পণ নিবে না। গাঁয়ের মোড়ল অনেক বলিয়া কহিয়া তিন কুড়ীতে স্বীকার করাইয়াছে। সে গরীব মানুষ অত টাকা কোথায় পাইবে। এক বিঘা জমীতে সে পাট বুনিয়াছে খোদা করিলে এই পাট বেচিয়া এবার ভাদ্র মাসেই সে বিবাহ জোড়া দিবে। দোস্ত আরও বলিল, সেই এক বিঘা পাট নিড়াইতে যাইয়া তার শুধু ফুলীর কথাই মনে পড়ে! ফুলীর 'ঝাটরা' মাথার চুলের মত এক রাশ পাতা ওয়ালা পাট গুলোর মাথা যে সে কতদিন জড়াইয়া ধরিয়াছে তার ইয়ত্তা নাই।

এই সব গল্প করিতে করিতে সন্ধ্যা হইয়া আসিল। বাঁশ ঝাড়ের কচি কচি পাতা গুলোর আড়াল হইতে রাঙা সাজের রাঙা আলো বাঁশ ঝাড়ের দোলন লাগিয়াই বুঝি ঝিকমিক করিতেছিল। দোস্ত ঘরের চালের বাতায় গোঁজা বাঁশের বাঁশীটী লইয়া বাজাইতে বসিল। অতি করুণ ভাটীয়াল সুরে সুর ভাসিয়া চলিল। এ সুর যেন পল্লীর বহু কালের জানা। এই সুরেই একদিন বিরহী আমীর সাধু সারীন্দা বাজাইয়া তার বেলয়াকে খুজিয়াছিল। এই সুরে আজও বিরহিণী বেহুলাকে 'গাংকুড়ের' ঢেউএ ভাসাইয়া কত প্রেমিক কৃষাণের বিনিদ্র রজনী কাটিয়া যায়। দোস্ত সুরের পর সুর বাজাইয়া চলিল। সেই করুণ বিষাদমাখা সুরে সন্ধ্যার গলা হইতে বুঝি মেঘের মতীর মালা খসিয়া পড়িল। সমস্ত পল্লী-প্রকৃতি নীড়ে নীড়ে পাখীর গান থামাইয়া গা হইতে পল্লী-শিশুদের কোলাহলের নুপুর খুলিয়া ঘন অন্ধকারের নিবিড় নির্জ্জন আসনে ধ্যানস্থ হইল। দোস্ত বাঁশী বাজাইয়া চলিল।

আজ ওর বাঁশীর এক একটা সুর যেন আমার মনের কাছে সেই অজানা অচেনা কৃষাণ মেয়েটীর রূপখানি আঁকিয়া দিতেছিল। কখন তার সোণার বাহুখানি কখন তার রাঙা মুখ খানি। আজ গায়ের বিরল কুটীরে বসিয়া এই দুটী বিভিন্ন গায়ের দুটী প্রাণকে যেন আমি স্পষ্ট দেখিতে পাইলাম। অনেক রাত্ত হইলে দোস্ত নিজে কাঁদিয়া ও আমাকে কাঁদাইয়া আমাকে বিদায় করিল।

এমনি করিয়া তার সাথে আমার আলাপ বেশ জমিয়া উঠিল। আমি নিজে কাউকে কথা কহিয়া আলাপ করিয়া মাতাইয়া তুলিতে পারি না। কিন্তু আমার ভিতরে একজন স্রষ্টা রহিয়াছে। সে নীরবে সকলেরই কথা একান্ত ভাবে শুনিতে পারে এবং তাহাতে অনেকের সুখ দুঃখের ভাগীই আমাকে হইতে হয়। এই জন্য দেখিয়াছি যাদের ব্যথা আছে তারা যেন আমাকে খুব ভালবাসে। আমাকে হয়ত সে অমনই তার ব্যথার দোসর ভাবিয়াছিল।

সেদিন ঘুম হইতে উঠিয়া দেখি, আমার বিছানায় কে কতকগুলি পাকা ডুমুরের ফল রাখিয়া গিয়াছে। মনে পড়িল সেই ছেলেবেলার কথা ছোট ছোট ছেলেরা মিলিয়া গাছ হইতে পাকা পাকা ডুমুরের ফল কুড়াইয়া আনিয়া ভাগ করিতাম। তার সাথে একটী ছোট মেয়ের কথাও মনে পড়িল, তার ভাগে বেশী ডুমুর দিয়া ফেলিতাম, যাক সে কথা। মুখ হাত ধুইয়া একে একে সবগুলি ডুমুর খাইয়া ফেলিলাম।

সেদিন পথ দিয়া একা একা চলিতেছি, ও পাড়ার বউ কথা কউ পাখীটী ডাকিয়া ডাকিয়া হয়রান—এমন সময় দেখি দোস্ত পিছন হইতে দৌড়াইয়া আসিতেছে। তার হাতে

একরাশ লটকোনা ফলের থোক। হাপাইতে হাপাইতে দোস্ত বলিল, এগুলি অনেক দুঃখে আনছি আপনার জন্মে। খাউহেন। গাঁয়ের একটা হালটের সামনে বসিয়া আমার গেঁয়ো দোস্তের দেওয়া এই দানের সদ্ব্যবহার করিলাম।

কিন্তু দোস্তের এত আকর্ষণও আমাকে এ গাঁয়ে বেশীদিন বাঁধিয়া রাখিতে পারিল না। কক্ষচ্যুৎ গ্রহের মত কোথায় যে সুদূর অচেনার পথে ছুটিয়া চলিয়াছি তা আমিই জানি না। সম্মুখে যত যাই ততই নূতন চলার নেশা আমাকে পাইয়া বসে। না জানি কত যুগ যুগান্তর পরে আমার পায়ের শৃঙ্খল আজ কাটিয়া গিয়াছে। এতদিনের বন্ধন-জড়িত আমার সেই দুরন্ত চলার নেশা আজ দুখানা পায়ে আসিয়া ভর করিয়াছে। কোন স্নেহ নাই, কোন মায়া নাই—সম্মুখে দুরন্ত পথ, আর সেই পথে চলিবার জন্য চঞ্চল দুই পদ—এছাড়া যেন আমার আর কোন আকর্ষণ নাই। কিন্তু এ কথা যে আমার মনের সত্যিকার কথা নয় তা সেকথা সেদিন বুঝি নাই।

যা হোক আমি নূতন জায়গায় যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলাম। একে একে গাঁয়ের সকলের কাছ হইতে বিদায় লইলাম। একটী বৃদ্ধা বিদায়ের সময় কাঁদিয়া ফেলিল। তার মরা ছেলেটীর মত আমাকে দেখিতে। "বাছারে আবার আসিস। তোকে দেখলে আমার তার কথা মনে পড়ে।" সত্যই মনটী যেন বড় ভারি লাগিতেছিল। সমস্ত মন সেই বৃদ্ধার দুই পায়ে যেন লুটাইয়া পড়িল তার দুই হাতের সেই স্নেহপূর্ণ আশীর্ব্বাদ এ যেন সেই অনন্ত কালের পল্লীলক্ষ্মীর মঙ্গলবারি। হয়ত বা এরই জন্য আমার এই দুরন্ত হিয়া অনন্ত পথের ক্ষুধার সন্ন্যাসী।

সকলের কাছে বিদায় লইয়া গাঁয়ের পথ দিয়া চলিলাম, মেয়েরা একদৃষ্টে আমার দিকে চাহিয়া আছে—পিছন ফিরিয়া দেখিতে দেখিতে দুই তিন বার হোঁচট খাইলাম। দোস্ত অনেক দূর পর্য্যন্ত আমার সাথে সাথে আসিল। তায় কাঁধের উপর হাত রাখিয়া বলিলাম, দোস্ত আর কত দূর যাবে? দোস্ত ফ্যাল করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। আমি বলিলাম, আবার আমি তোমাদের দেশে আসব। সেবার অনেকদিন থাকব। তখন দোস্তানীর হাতের রান্না খেয়ে দিন যাবে। দোস্তের মুখখানা একটু রাঙা হইয়া উঠিল। কোচার খোটে বাঁধা কচুর পাতার ঠোঙা হইতে একছড়া সাপলা ফুলের মালা দোস্ত আমার গলায় পরাইয়া দিল। সাপলা ফুল দিয়া এতদিন আমি কত মালা গাথিয়া বিলের জলে ভাসাইয়া দিয়াছি দোস্ত হয়ত তা দেখিয়াছিল। গলা হইতে মালাটী খুলিয়া লইয়া দোস্তের গলায় পরাইয়া দিতে দিতে বলিলাম, এমনি ক'রে সাপলা ফুলের মালা গেঁথে তুমি আমার দোস্তানীর গলায় পরিও। দোস্তের মুখখানা লজ্জায় রাঙা হইয়া উঠিল! একটী নেকড়ায় কতকগুলী চিড়ে মুড়ী বাধা। আমাকে দিয়ে দোস্ত বলিল পথে কোথাও খাইবেন। তখন মাঠের শেষে বাঁশ বনের আড়ালে সূর্য্য পাটে বসিতেছিল। পকেট হইতে একটা ছোট পুঁটলী বার করিয়া দোস্তের হাতে দিয়া বলিলাম—দু'দিনের দোস্তের এই স্নেহটুকু নাও ভাই—

দোস্ত চমকিয়া উঠিয়া বলিল—"এযে টাকা"—

আমি হাসিয়া বলিলাম—"এই দিয়ে তুমি দোস্তানীকে ঘরে নিয়ে আসবে এই আমার আশা।"

দোস্ত কাঁদিয়া উঠিল। জোর করিয়া হাত ছাড়াইয়া বিদায় লইয়া চলিলাম। পিছনে ফিরিয়া চাহিতে পারিলাম না। যখন চাহিলাম তখন সূর্য্য অস্ত গিয়াছে—পিছনের সকলই অন্ধকার হইয়া গিয়াছে—না, সূর্য্য তখনও আকাশে আছে, আমার চোখে শুধু বাদল-অন্ধকার নামিয়াছে। কে জানে?

* * * *

করে এ ভব-পুরে জীবনের শেষ হবে জানি না। এই যাযাবর হিয়া কোন্ অন্তরে তার চিরন্তন নীড় বাঁধিবে কে জানে? বহুদিন পরে তবুও আজ সকল কাজের মাঝে সহসা থামিয়া যাই—ভাবি, দোস্তের হয়ত সেই মেয়েটীর সাথে বিবাহ হইয়াছে, হয়ত বা হয় নাই। হয়ত সেই বৃদ্ধা আজও পথের দিকে চাহিয়া থাকে আমার ভিতর দিয়া তার হারান ছেলেটীকে পাইবার জন্য। হয়ত আজও সরল কৃষাণ দুলালটী তার নূতন বউটীর কাছে আমার গল্প করে। কিন্তু পথ আমাকে ডাকে অনন্ত রূপসীর মত—এত সব ভাবিবার কি অবসর আছে আমার?

# বিদায় দিনে

[ ডাঃ এ, মালেক এল-এম-এফ ]

আমি যদি যাই চ'লে আজ, কারো প্রাণে লাগ্‌বে না,
বিদায়-চুমো নেবার আশে
দাঁড়িয়ে দূরে ঘরের পাশে—
নীরব নত নয়ন মেলে কেউত আমায় ডাক্‌বে না—
কারও প্রাণে লাগ্‌বে না!

গোপন-ব্যথা বক্ষে ল'য়ে
আকুল চোখে ব্যাকুল হ'য়ে
একটী দিনও শূন্য প্রাণে কেউত ব'সে থাক্‌বে না—
কারও প্রাণে লাগ্‌বে না!

সিক্ত-বকুল-শাখার পরে
জোছ্‌না যখন প'ড়বে ঝ'রে
কেউত তখন বুকের মাঝে আমার পরশ মাগ্‌বে না—
কারও প্রাণে লাগ্‌বে না!

উদাস প্রাণে বাদল রাতে
অশ্রু নিয়ে নয়ন-পাতে
আমার স্মৃতি বক্ষে ধ'রে, কেউত নিশি জাগ্‌বে না।
কারও প্রাণে লাগ্‌বে না।

# ভারতের দুর্ভিক্ষ ও তাহার প্রতিকার

[ ফজলুল করিম আহ্‌মদ ]

ভারতের দুর্ভিক্ষের কোন ধারাবাহিক ইতিহাস না থাকিলেও পার্সি ও সংস্কৃত সাহিত্য হইতে জানা যায় যে বহু বৎসরের অনাবৃষ্টি ও অজন্মার ফলে হিন্দু-যুগে দুর্ভিক্ষ হইয়াছিল মাত্র ছয় বার,—বলা বাহুল্য যে দুর্ভিক্ষের সময় রাজকোষের টাকা প্রজাদের জন্য ব্যয়িত হইত। মোসলমান রাজত্বের সময় ৫০০ বৎসরে দুর্ভিক্ষ হইয়াছে মাত্র চার বার। অনাবৃষ্টি ছাড়া যে উক্ত দুর্ভিক্ষের অন্য কোন কারণ ছিল তাহা কোন ঐতিহাসিক বলিতে পারে নাই—Smith, Elphinstone এর মত ঐতিহাসিক ও না। দুর্ভিক্ষের প্রতিকার করিতে যাইয়া উদার-প্রাণ বাদশাহেরা মুক্তহস্তে রাজকোষের টাকা যে ব্যয় করিয়াছেন তাহা প্রত্যেক নিরপেক্ষ ঐতিহাসিক স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। হিন্দু ও মোসলমান যুগের দুর্ভিক্ষ ও তাহার ফলাফল আলোচনা করিবার প্রয়োজন মোটেই নাই। আমাদের কর্ত্তব্য বৃটিশ রাজত্বে দুর্ভিক্ষের কারণ নির্ণয় করিয়া তাহার প্রতিকার যাহাতে হয় তাহার চেষ্টা করা।

ইংরাজ যুগে ১৭৭০ খৃঃ হইতে ১৯০০ খৃঃ পর্য্যন্ত ১৩০ বৎসরে দুর্ভিক্ষ হইয়াছে ২২ বার। ১৭৭০ খৃঃ অনাবৃষ্টির ফলে দুর্ভিক্ষ হয় ও সঙ্গে সঙ্গে কোম্পানির কুশাসনের ফলে এই দুর্ভিক্ষ ভীষনাকৃতিতে দেখা দেয়। মোটামুটী হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে ৮০ লক্ষ লোক উক্ত দুর্ভিক্ষে মারা যায়। ১৭৮৪ খৃঃ উত্তর ভারতে যে দুর্ভিক্ষ হয় তাহার প্রতিকার গবর্ণমেণ্ট করে নাই। ১৭৮৪-৯৩ খৃঃ পর্য্যন্ত মাদ্রাজে ৬বার, বোম্বাই প্রদেশে ২বার দুর্ভিক্ষ হয়। উক্ত দুর্ভিক্ষের সময় নিপীড়িত ভারতবর্ষের অবস্থা যে কত শোচনীয় ছিল তখনকার বড় লাটের কথায় শুনুন—"I am sorry to say that from Boxur to opposite boundary I have seen nothing but the complete devastation in every village." উক্ত দুর্ভিক্ষের কারণ নির্দ্দেশ করিতে যাইয়া 'ভারত-বন্ধু' Warren Hastings পর্য্যন্ত স্বীকার করিয়াছে—"I have reason to fear that the causes existed prinipally in a defectvie, corrupt and oppressive adminstration."

আমাদের সৌভাগ্য, দেশে যে দুর্ভিক্ষ হইয়াছিল তাহা বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট মানিয়া লইয়াছেন। এখন দেখা যাউক দুর্ভিক্ষ নিবারণের জন্য কি উপায় অবলম্বন করা হইয়াছিল। যে বাণিজ্যের ভিতর দিয়া এ দেশে ইংরাজরা পত্তনি করিয়াছিল নজর ও পড়িল প্রথমে সেই বাণিজ্যের উপর। দেশে তখন অন্তর্বাণিজ্যের কোন অসুবিধা না থাকিলেও বিদেশীরা তেমন সুবিধা করিতে পারে নাই। ক্রমে ধীরে ধীরে ইংরাজরা যেভাবে ভারতের অর্থ শোষণ করিতে আরম্ভ করিল তাহা দেখিয়া লর্ড ক্লাইভ ও স্তম্ভিত হইয়া বলিয়াছিলেন, "যেভাবে ইংরাজ ভারত দখল করিতেছে তাহাতে দেশ দরিদ্রতম হইয়া পড়িবে, এমন কি যেদিন ইংরাজ ভারত পরিত্যাগ করিবে সেদিন ভারতবাসী অন্ন পায় কিনা সন্দেহ।" সেই সময় দুর্ভিক্ষের প্রধান কারণ ছিল ধানের অভাব। ভারতে যে ধান জন্মিত তাহার অধিকাংশ তখন বিলাতে রপ্তানি হইত। এই রপ্তানি বন্ধ করিবার জন্য দেশে আন্দোলন হইলে সুচতুর ইংরাজ বণিক রাজ্য বিস্তারের খাতিরে সত্য সত্যই ধান রপ্তানি বন্ধ করিয়া দিল। এদিকে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বিরুদ্ধে যখন বিলাতে তুমুল আন্দোলন আরম্ভ হইল এবং কোম্পানীও যখন দেখিল যে ধান রপ্তানি বন্ধ করিলে দেশী ভাইরা মারা যায় তখন ১৮১২ খৃঃ উক্ত আইন রহিত করিয়া দিল! এই অন্যায় আচরণের জন্য যখন ভারতবাসী আবার কান্নাকাটি আরম্ভ করিল তখন Sir Richard গম্ভীর হইয়া বলিয়া ফেলিলেন যে প্রচুর পরিমাণে ভারতীয় ধান বিলাতে পাঠান হইলেও ভারতবর্ষে ধানের অনটন হয় না। কাজেই ভারতবাসীর বেশী কিছু বলিবার মত রহিল না।

ইংরাজদের এসিয়ায় রাজ্য-বিস্তারের খরচ জোগাইতে

ভারতকে ১২বার দুর্ভিক্ষে ভুগিতে হইয়াছে। ১৮৬৫-৬৬ খৃ উড়িষ্যায় যে দুর্ভিক্ষ হয় তাহা গবর্ণমেণ্ট স্বীকারও করে নাই। ১৮৬৯ খৃঃ পাঞ্জাব দুর্ভিক্ষের স্মৃতিতে ভারতবাসী এখনও শিহরিয়া উঠে। ১৭৭৪-৭৬ খৃঃ যথাক্রমে বাঙ্গলা ও দাক্ষিণাত্যে যে দুর্ভিক্ষ হয় তাহা দুই বৎসরের মধ্যে যুক্ত প্রদেশে ছড়াইয়া পড়ে। ভারতবাসীর করুণ বিলাপে এই বার সরকার বাহাদুর "New Famine Relief Bill" পাশ করিলেন। এদিকে প্রথম বিলের নিয়ম মতে জন সাধারণই দুর্ভিক্ষে সাহায্য করিবার কথা ছিল, এইবার গবর্ণমেণ্ট স্বয়ং সাহায্যার্থ দাড়াইলেও ভক্ত রাজকর্ম্মচারীরা জনসাধারণের বদান্যতার অজুহাত দেখাইয়া গবর্ণমেণ্টের টাকা গ্রহণ করিত না। যাহাতে কর্ম্মচারিরা উক্ত টাকা গ্রহণে অসম্মত না হয় এই বিলে তাহারও উল্লেখ ছিল।

তবুও উক্ত দুর্ভিক্ষে ৭০ লক্ষ লোক অনাহারে মারা যায়। ১৮৭৪ খৃঃ Sir R. Stracheyর সভাপতিত্বে দুর্ভিক্ষ কমিশন নিযুক্ত করা হয়। দেশের আর্থিক ও নৈতিক অবস্থার বিশেষ খোঁজ করিয়া যে রিপোর্ট দেওয়া হয় তাহাতে বিশেষভাবে উল্লেখ আছে যে দুর্ভিক্ষের সময় ভারতবাসীর বদান্যতা প্রশংসনীয় কিন্তু বেশী দিন করিলে demorallised হইয়া যায় বলিয়া গবর্ণমেণ্টের উক্ত আইন রহিত করা দরকার। সুতরাং কমিশনের রিপোর্ট মতে গবর্ণমেণ্ট টাকা দিতে পারেন না। এই দিকে ভারতবাসীও গবর্ণমেণ্টের অতিরিক্ত দান পাইয়া নৈতিক চরিত্র হারাইল না, গবর্ণমেণ্টের উক্ত আইন রহিত করিয়া কমিশন প্রস্তাব করিলেন যে বেকার সমস্যার মীমাংসা না করিলে ভারতবর্ষকে দুর্ভিক্ষ হইতে রক্ষা করা যাইতে পারে না। এই প্রস্তাবের ফলাফল আলোচনা করা বৃথা।

উক্ত কমিশনের এত পরিশ্রম সত্ত্বেও ভারতের অবস্থা কিরূপ ছিল দেখা যাক্। ১৮৮৯ খৃঃ মান্দ্রাজে যেই দুর্ভিক্ষ আরম্ভ হইল তিন বৎসরের মধ্যে তাহা আজমির, বিহার ও বাঙ্গালা দেশ পর্য্যন্ত ছড়াইয়া পড়িল। পর বৎসর বর্ম্মা মুলুক পর্য্যন্ত নিস্কৃতি পাইল না। ইহা নিখিল ভারত দুর্ভিক্ষ নামে খ্যাত। দেশবাসীর বিপুল চেষ্টা ও সাহায্যে কয়েক বৎসর ভালই দেখাইল কিন্তু ১৮৯৭ খৃঃ আবার যখন দুর্ভিক্ষ আরম্ভ হইল ও সঙ্গে সঙ্গে উত্তর ভারতও নিষ্পেষিত হইল তখন সদাশয় গবর্ণমেণ্ট Sir James Layallএর সভাপতিত্বে কমিশন নিযুক্ত করিয়া স্বাধীনভাবে নিখিল ভারতে বিচরণ করিবার জন্য ছাড়িয়া দিলেন। উক্ত কমিশনকে সমর্থন ও ধন্যবাদ দিয়াই Sir James সাহেব ভ্রমণ শেষ করিতেছিলেন। তাঁহারা দুর্ভিক্ষ পীড়িত ভারতবাসীর অবস্থা রিপোর্ট দিবার জন্য প্রেরিত হইয়াছিলেন—ভ্রমণোদ্দেশ্যে নয়—এই সোজা কথাটা যখন ভারতবাসীর আন্দোলনের ফলে তাঁহারা বুঝিতে পারিলেন তখন সাহেব বিদায়ের সময় বলিয়া গেলেন যে যদি জনসাধারণের সাহায্যে কুলি, মজুর, পার্ব্বত্যজাতি প্রভৃতির অভাব দূর না হয় তাহা হইলে গবর্ণমেণ্ট সাহায্য করিবে। ঐ "ছোট জাতের" অভাব নাই বলিয়াই গবর্ণমেণ্ট সাহায্য করেন না—নইলে করিতেন বই কি।

তবুও ১৯০০ খৃঃ পাঞ্জাব, রাজপুতনা, মধ্যপ্রদেশে দুর্ভিক্ষ আরম্ভ হইলে Sir Antony Macdonald এর সভাপতিত্বে চতুর্থ কমিশন নিযুক্ত হইলেও কোন ফল হইল না।

বিলাতি কমিশন ভারতীয় দুর্ভিক্ষের প্রধান ও প্রকৃত কারণ ঢাকা দিয়া যাইতেছে দেখিয়া তিলক, রমেশ দত্ত, এ, রসুল প্রভৃতি ভারতপ্রসিদ্ধ নেতাগণ স্পষ্টই দেখাইয়াছিলেন যে এসিয়াতে বৃটিশ রাজত্ব বিস্তারে যে সমস্ত টাকা খরচ হইয়াছে তাহা সুদে আসলে ভারত হইতে আদায়ের ফলে ভারতে দুর্ভিক্ষ হইতেছে। ইহার প্রতিবাদ করিতে যাইয়া, যখন সন্তোষজনক উত্তর দিতে পারিল না তখন বিলাতে মুক্তকণ্ঠে সবাই স্বীকার করিল যে ভারতে দুর্ভিক্ষ হয় নাই, কেন না ভারতবাসী গাছের পাতা খাইতে আরম্ভ করে নাই। এত স্বত্বেও তাহাদের হিসাবে আড়াই কোটী লোক অনাহারে মারা যায়।

পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি সাহেবদের মতের্ কৃষিজাত দ্রব্যের, বিশেষতঃ ধানের অভাব ভারতে নাই, বিদেশে রপ্তানি স্বত্বেও না। তবে অভাব কিসের? Sir Richard বলেন যে ভারতে টাকার অভাব। অর্থাৎ শিল্প বাণিজ্য তখন ধ্বংস হইয়াছিল, কৃষিজাত দ্রব্যও টাকার বিনিময়ে না লইলে বিলাতি ব্যবসা বাচিবে কেমন করিয়া? শুধু ইহা নয়-টাকা রোজগারের একটা সুন্দর পথ দেখাইয়া দিলেন। সেভিংসব্যাঙ্কে যেই সব টাকা জমা থাকে তাহা সব রাজকর্ম্মচারীর ও ব্যবসায়ীর, কিন্তু কৃষকেরা ঐ সেভিংস্

ব্যাঙ্কে টাকা জমা রাখে না বলিয়াই তাহাদের টাকার অভাব সুতরাং দুর্ভিক্ষে ভোগেও বেশী তাহারা।

এ সব ছেলে ভুলান "বিলাতী কারণে" রাগ করিয়া রমেশ বাবু প্রমুখ মনিষীরা ঘোষণা করিলেন যে, যদি পাশ্চাত্য সভ্যতাকে ভারতবাসী আকড়াইয়া না ধরিত তাহা হইলে ভারতে দুর্ভিক্ষ হইত না। এই গেল "স্বদেশী-বিদেশী" কারণ।

এখন প্রতিকারের ধারা আলোচনা করা যাক। প্রতিকারের প্রথম দফাতেই রেলের বন্দোবস্ত হইল; কারন দুর্ভিক্ষের সময় অন্য স্থান হইতে খাদ্য সংগ্রহ করা নিতান্ত কষ্টকর ছিল। দ্বিতীয় প্রতিকার ভারি মজার কিন্তু, ৪০৪ ফিট উচ্চে নাকি জলবাহক মেঘ (Rain-bearing cloud) থাকে। যেখানে ঘন ঘন জঙ্গল আছে সেখানে উক্ত উচ্চতার দরুন ঠাণ্ডা থাকে বলিয়া বৃষ্টির খুব সম্ভাবনা রহিয়াছে, সুতরাং জঙ্গলের যে বিশেষ দরকার তাহা সকলেই বুঝেন। বৃষ্টির জন্য না হইলেও অন্তত কোটী কোটী টাকা উপার্জ্জন করিবার জন্য সেগুন কাষ্ঠের বাগান ও Reserve forest গবর্ণমেণ্টের চাই-ই তাহা আমরা জানি। তাহাদের মতে না হয় ঘোর অরণ্যে বৃষ্টি হইল—তাহাতে কৃষির কি লাভ? তৃতীয় প্রতিকারের ব্যবস্থা হইল—বিদেশী উপনিবেশ যাহাতে স্থাপিত না হয় তাহারই ব্যবস্থা করা ভারত গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তব্য—কেন না বিদেশীরা এখানে আসিয়া শুধু যে বসবাস করে তাহা নয় ভারতবাসীকে বিলাসী করিয়া তুলিয়াছে। ইহা যে রমেশ বাবুর উক্তির রূপান্তর মাত্র তাহা বলাই বাহুল্য, চতুর্থতঃ প্রচলিত বাণিজ্য ও কৃষির উন্নতি করিতে হইবে। তারপর দুর্ভিক্ষ ফাণ্ড হইতে কিছু টাকা লইয়া দরিদ্র কৃষকদের ধার দেওয়া—যাহাতে কৃষির উন্নতি হয়। পঞ্চম প্রস্তাব ভারি রহস্যজনক, কৃষকেরা নাকি পরের জমিতে যেমন পরিশ্রম করে নিজের জমিতে তেমন করে না সুতরাং চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত না দেওয়া উচিত। এই প্রতিকারের ফল আর কিছু হউক আর না হউক দরিদ্রদের পদদলিত করিবার সুন্দর ব্যবস্থা তাহা সহজে অনুমেয়।

দুর্ভিক্ষের প্রধান কারণ যে উক্ত রাজপ্রতিনিধিদের খসড়ায় বাদ পড়িল শুধু তাহা নয়—দুর্ভিক্ষ নিবারণের ছলে যে রাজ্যশাসনের পথ প্রশস্ত করিয়া লইল-তাহা বুঝিতে পারিয়া গোখলে, রমেশ বাবু, জিন্না প্রভৃতি দেশনায়ক অবিলম্বে কয়েকটা আবশ্যকীয় প্রস্তাব পাঠাইলেন কিন্তু তাহাতে গবর্ণমেণ্ট কর্ণপাত করেন নাই বলিয়া মনে হয়।

এসিয়ায় বৃটিশ উপনিবেশ স্থাপনের খরচ ভারত হইতে আদায় না করিবার জন্য বহুবার প্রস্তাব হইয়াছিল কিন্তু তাহাতে কোন ফল না হওয়ায় যখন ভারতবাসী দেখিল যে উক্ত খরচ তাহাদের দিতে হইবেই তখন তাহারা বলিতে লাগিল যাহাতে অন্তত রাজ্যরক্ষার আংশিক খরচ ইংলণ্ড দেয়, তাহাতে ভারতের করের হার হ্রাস হইবে। Military Force এর খরচ যদি ইংলণ্ডই দিল তাহা হইলে ভারত জয়ে ইংরাজের কি লাভ—তাহা ভারতবাসী বুঝিল না, দুর্ভাগ্য বটে।

"Defective, Corrupt and oppressive adminstration" এর ফলে যে ভারতে দুর্ভিক্ষ হইতেছিল স্বয়ং বড়লাটের কথায় তাহার প্রমান। প্রশ্ন হইতে পারে উক্ত শাসনের কারণ কি? Central power অনেক দূরে বলিয়া প্রজাদের করুণ বিলাপ সহসা রাজার কানে পৌছে না; সুতরাং অত্যাচারের ও কুশাসনের প্রতিবিধান করা সহজে হয় না। যদি গ্রামবাসীর উপর গ্রামের শাসন ভার দেওয়া হয় অত্যাচার হইবার সম্ভাবনা থাকিবে না, শুধু তাই নয়, দুর্ভিক্ষের সময় গ্রামবাসীরা যত সতর্ক ভাবে চলিতে পারিবে ও সঠিক কারণ নির্ণয় করিয়া সরকারকে জ্ঞাত করিতে পারিবে বিলাত হইতে নূতন সাহেব আসিয়া তত পারিবে না—এই সোজা কথাটাই দেশমান্য তিলক বলেন। কিন্তু কথা হইল এই যে যদি শাসনভার দিল—ইংরাজের হাতে রহিল কি? সুতরাং অগ্রাহ্য হইবার কথা!

ভারতবর্ষ কৃষিপ্রধান দেশ সুতরাং জমির উপর কৃষকদের বিশেষ অধিকার না থাকিলে কৃষির উন্নতির আশা নাই। সুতরাং জমির মূল্য ধার্য্য করিয়া দেওয়া উচিত যাহাতে কৃষকেরা জমি ক্রয় করিবার সুযোগ পায়।

বেকার সমস্যা যে দুর্ভিক্ষের অন্যতম কারন পূর্ব্বে তাহা উল্লেখ করিয়াছি। এই সমস্যার মীমাংসা করিতে যাইয়া গবর্ণমেণ্ট ভারতবাসীকে চাকরী করিবার পরামর্শ দেন। এই পরামর্শ গ্রহণেও যখন দুর্ভিক্ষ কমিল না তখন এ, রসুল বলিলেন যে, যতদিন ভারতবাসী তাহাদের লুপ্ত শিল্প বাণিজ্যের উদ্ধার সাধন না করিবে ততদিন ভারতে

দুর্ভিক্ষ আছেই, সুতরাং আইন মতে ভারতীয় শিল্প বাণিজ্যে যোগদান করিবার জন্য ভারতবাসীকে বাধ্য করিতে হইবে। East Indian Companyর বিপুল আয়োজনের ফলে দেশী শিল্প বাণিজ্য যে ধ্বংস হইয়াছে তাহা ভারতবাসী না জানিলেও ইংরাজ জানে সুতরাং উক্ত আইন করা যে মহা পাপ তাহা সকলেই বিশ্বাস করিবেন।

বৈদেশিক উপনিবেশ দুর্ভিক্ষের অন্যতম কারণ বলিয়া যে রাজপ্রতিনিধি প্রস্তাব করিয়াছিলেন ব্যক্তিগত ভাবে স্বদেশে কত লাঞ্ছনা তাঁহাকে সহ্য করিতে হইয়াছে জানিনা—ভারতে কিন্তু তাহার তীব্র প্রতিবাদ করিয়া সরকার বলেন যে এই প্রস্তাব সম্পূর্ণ অমূলক। সুতরাং যত ইচ্ছা ইংরাজ ভারতে আসিয়া নিরাপদে বাস করিতে পারে। চাষারা টাকার অভাবে চাষ করিতে না পারিলে Takabi loan দেওয়ার ব্যবস্থা হইল, অর্থাৎ চাষ হইলে পর তাহা ফেরৎ দিতে হইবে।

১৮৭০ খৃঃ Sir Strachyর প্রস্তাব মতে ২ কোটী টাকা দুর্ভিক্ষ ভাণ্ডারের জন্য ভারতীয় প্রজা হইতে সংগ্রহ করিয়া (১) কিছু টাকা দরিদ্রের প্রতি বিতরণ (২) কিছু টাকা দিয়া "Takabi loan" (৩) এবং অবশিষ্ট সমস্ত টাকা দিয়া Railway নির্ম্মাণ ও সংস্কার করিতে হইবে। দুর্ভিক্ষ পীড়িতদের টাকা নিয়া এক বিচিত্র ব্যবস্থা হইয়া গেল। অন্নহীনের টাকা Railwayর জন্য খরচ করিয়া কতকগুলি ইংরাজ কোম্পানীকে লাভবান না করিলে কি হইত? অথচ ইহাও দুর্ভিক্ষ নিবারণের একটা উপায়।

বাণিজ্যের অনুন্নতিতে যখন ভারতবাসী চঞ্চল হইয়া উঠিল তখন বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট বলিলেন যে শুল্ক কমান ছাড়া কোন সহায়তা তাহারা করিতে পারে না। সঙ্গে সঙ্গে তাহা করিয়াছে, ভবিষ্যতে আরও করিবে বলিয়া আশা করা যায়। স্বদেশী আন্দোলনের ফলে যখন ভারতবাসীর বিলাতি বর্জ্জনের সঙ্গে সঙ্গে বিলাতি ধনীরা মাথায় হাত দিতেছিল তখন বিলাতি দ্রব্যের শুল্ক কমাইয়া যে স্বদেশী দ্রব্যের সঙ্গে প্রতিযোগিতা দেওয়া হইতেছিল ভারতবাসী তাহা বুঝে। সরকারের এই নীতি যে ভারতীয় বাণিজ্যের ধ্বংস সাধনের যন্ত্র তাহা সরকারও অস্বীকার করিতে পারে না।

বেকার ভারতবাসীর জন্য এখনও কাজ জোটে নাই তবুও সরকার মুষ্টিমেয় বিদেশী বেকারের জন্য কাজ জোগাইতে যাইয়া আহার নিদ্রা ছাড়িয়াছে। অথচ এই বিদেশী বেকার লোকদের বাহির করিয়া দিবার জন্য তাহাদের নিয়োজিত দুর্ভিক্ষ কমিশনই অনেকবার বলিয়াছে। লক্ষ লক্ষ বেকার প্রজার দিকে নজর না দিয়া কয়েকটী বিদেশী কুলি মজুরের জন্য কাঁদিয়া বেড়ান সহৃদয়তার পরিচয় বটে।

Katherine Mayo সরকারকে উদ্ধার করিতে যাইয়া বৃটিশের একটা গোপনীয় কথা বলিয়া ফেলিয়াছে "50/c. cows are reckoned unprofitable in India. Because of their uneconomic value the food they consume, little as it is, is estimated to represent an annual lose to the county of £117, 600, 000 or over four times more than the total land revenue of British India (Mother India P. 202.) সরকার তাহার প্রতিকার করিতে যাইয়া যখন দেখিল যে তাহাদের কোন লাভ নাই তখন সম্পূর্ণ নীরব হইয়া গেল। কিন্তু তাহাদেরই নির্দ্দিষ্ট কারণ লইয়া যখন ভারতবাসী আলোচনা আরম্ভ করিল তখন সরকার বিরক্ত হইয়া বলিয়া ফেলিল যে ভারতে দুর্ভিক্ষ হইবেই। ইহা প্রকৃতির নিয়ম—ভারতের বিধিলিপি। "Modern Famine policy is thus a struggle against nature—" তাহা হইলে ভারতবাসীর বুঝা উচিত অনাহারে মরিবার জন্যই তাহাদের জন্ম।

# মানুষের গান *

[ গোলাম মোস্তফা ]

মানুষ আমরা, মানুষ আমরা, সুন্দর ও মহান্।
আল্লার রাজপ্রতিনিধি মোরা ধরায় মূর্ত্তিমান ।।

সৃষ্টির সেরা-সৃষ্টি আমরা—নহি ত তুচ্ছ দীন ।
অমৃতের চির-সন্তান মোরা, জীবন মৃত্যুহীন ।।
আমাদের চেয়ে বড় কেহ নাই, মোরা চির গরীয়ান।
গাও আজি সেই শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানুষের জয়গান ।।

মনে পড়ে আজি সৃষ্টির সেই প্রথম পুণ্য দিন।
মানুষের পায়ে প্রণতি জানালো যত ফেরেশতা-জীন ।।
নিখিল জগৎ চরণে মোদের করিল অর্ঘ্য দান ।
গাও আজি সেই চির-বরেণ্য মানুষের জয়গান ।।

খুলেছি আমরা খোদা'র দিলের গোপন কক্ষদ্বার—
আমাদের কাছে গচ্ছিত আছে কুঞ্জি সে দরজার ।
কেহ জানেনা কো—মোরা জানি সেই অজানার সন্ধান—
গাও আজি সেই মাটির-তৈরী মানুষের জয়গান ।।

আঁধার পথে কে কেঁদে চলে যায় ঘৃণ্য পশুর প্রায় !
পশু ন'স্ তুই—তুই যে মানুষ—ফিরে আয়, ফিরে আয়!
আল্লা মোদের আদি ও অন্ত—যাব মোরা সেই স্থান ।
হে মানুষ! এস, গাও আজি সেই মানুষের জয়গান ।।

---

* বর্দ্ধমান ইয়ংমেন্‌স মুসলিম এসোসিয়েশানের প্রথম সাংবাৎসরিক উৎসবে গীত।

# ঈদের চাঁদ

[ রাজিয়া খাতুন চৌধুরাণী ]

—১—

"আম্মা একটু পানি,—"

"বেশী পানিও তো নেই বাবা, সন্ধ্যা না হ'লে পানি আনাও যাবে না, যে লোকের ভিড়,—"

"ভিড় কেন আম্মা ?"

"আজ যেরে ঈদ ?"

"ও—মোটেই মনে ছিল না, বাবা একবার ঈদের সময় আমাকে সিল্কের আচকান আর জরির টুপী কিনে দিয়েছিলেন সেগুলি কি হ'ল মা ?"

"তোমার ছোট হ'য়ে যাওয়ায় বিলিয়ে দিয়েছি।"

মাতা পুত্রে কথা হইতেছিল। বাহিরে তখন আকাশে সূর্য্য সোণার কিরণে সন্ধ্যার নীলাম্বরীর পাড় বুনিতেছিল।

"কি খেলেন আজ ?"

"যা ছিল তাই খেয়েছি—তোর অত কথার কি দরকার ?"

"তা আম্মা সত্যি কথাটা বলুন,—"

"দু'টো মুড়ি ছিল তাই খেয়েছি।"

"কেন চাল নেই ?"

মা কথা কহিলেন না, দূর দিগন্তের পানে চাহিয়া চোখ দু'টী অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিল। বেশী দিনের কথা তো নয়, মাত্র পাঁচটি বছর আগে এই দিনে তিনি ও যে কতরকম রাঁধিয়া দশজনকে খাওয়াইয়াছেন, আর আজ ঘরে এক মুঠা চাউল নাই, রুগ্ন পুত্রটীর পথ্য নাই। সম্মুখে ওই জমিদার বাড়ী! তিনিও তো একদিন বধূ-বেশে সেই বাড়ীতেই আসিয়াছিলেন। বর্ত্তমান জমিদার তখন বালক মাত্র, এক মাথা কোঁকড়া চুল, বড় বড় চোখ, হৃষ্ট পুষ্ট বার চৌদ্দ বছরের ছেলেটি আসিয়া সন্দেহ-মিশ্রিত ভয়ের সহিত লাল বেনারসী জড়ানো পুঁটুলির পানে চাহিয়া ডাকিয়া ছিল, "ভাবি!" সদ্য ভ্রাতৃ-হারা ষোল বছরের মেয়েটি সে মুখে বুঝি মৃত ভ্রাতার সাদৃশ্য পাইয়াছিল, ঘোমটা একটু ফাঁক করিয়া চাহিয়া দেখিয়াছিল, ঠিক তেমনই তো।

বালক মৃদু কণ্ঠে কহিয়াছিল, "আম্মা দেখলে বকবেন, আপনাদের ঘরে আসতে মানা কিনা! একটু কথা বলুন না।" কিশোরীর দুই চক্ষু ছাপাইয়া অশ্রু নির্ঝর ছুটিল, সে কম্পিত কণ্ঠে বলিল, "বস ভাই।" সহসা একটি স্থূলকায় চাকরাণী আসিয়া ঘাড় কাত করিয়া গালে হাত দিয়া বলিল, "আ আমার কপাল! আমি রাজ্যি খুঁজে হয়রান! আর আপনি এখানে? সে কথা মনে নেই বুঝি?" বালকের মুখ শুকাইয়া উঠিল, তবুও সে নব-বধূর সম্মুখে একটু নির্ভিকতা দেখাইয়া বলিল, "যা যা অত ফাজলামো করিসনে," "আমি ফাজলামো করি! আচ্ছা বলিগে তবে আম্মার কাছে," বালক আর কথাটি না কহিয়া নীরবে তাহার অনুসরণ করিল।

এমন ঘটনা বহুবার ঘটিয়াছে, তবুও দেখা যাইত এই দু'টিতে রৌদ্র-দীপ্ত মধ্যাহ্নে ছায়া-শীতল বৃক্ষ-ছায়ায় বসিয়া নানা উপায়ে আহরিত টক কুল ও কাঁচা পেয়ারার সদ্ব্যবহার করিতেছে, কোন দিন বোনটি সযত্নে নানাপ্রকার আহার্য্য প্রস্তত করিয়া ভাইটির প্রতীক্ষা করিত, চোরের মত দু' একবার তাহাদের বাড়ীর দিকে উঁকিঝুঁকিও দিত, হঠাৎ দুরন্ত বালক দমকা হাওয়ার ন্যায় ঘরে ঢুকিয়া মাটিতে লুটাইয়া হাসিতে হাসিতে বলিত, "আম্মাকে এমন ঠকিয়েছি আপা! এমনিতো আসতে দেবে না, তাই পায়খানায় যাব বলে বদনা নিয়ে এসে বদনাটা পায়খানায় রেখেই চম্পট দিয়েছি।" কিশোরী বোনটি এক মুহূর্ত্তে প্রবীনার ন্যায় গম্ভিরা হইয়া বলিত, "ছি ভাই!—মাকে ফাঁকি দিতে নেই, মার সঙ্গে মিথ্যে বললে আল্লা রাগ করেন।" বালক সঙ্কিত নয়নে মিটিমিটি চাহিত, তখন বোনটি বলিত "আচ্ছা আজ যা করেছ মাফ চাইলে আল্লা মাফ করবেন, আর কখখনো অমন কাজ করো না।" এই রকম কত ছোট-

খাট ঘটনা! স্বামী ইহাতে সন্তুষ্টই হইতেন, তাঁর নিজেরও আর কেউ ছিল না, বধূটির তো চতুর্দ্দিকই শূন্য।

আজহারের পিতা মৃত্যু কালে বড় বিশ্বাসে একমাত্র পুত্রটিকে ভাইয়ের হাতে সঁপিয়া দিয়াছিলেন, তা পিতৃব্য কর্ত্তব্যের ক্রটি করেন নাই, সেকেণ্ডক্লাশে থাকিতেই স্কুল হইতে ছাড়াইয়া লইলেন, বলিলেন—"ও জমিদারের ছেলে জমিদার, লেখাপড়ার জন্য কষ্ট করবে কোন দুঃখে?—নিজের যা আছে তাই-ই বুঝে নিতে শিখুক," ফলে স্কুল হইতে ছাড়াইয়া আজহারকে সেরেস্তার সিংহাসনে বসান হইল, কিন্তু আমলাদের উপর গুপ্ত নিষেধ রহিল কেহ যেন কোন দলিল পত্র তাহাকে না দেখায়, তবুও বালক বুদ্ধি-বলে অল্পদিনেই বুঝিল যে তার নিজের বড় বেশী কিছু নাই, সবই বাকী খাজনার দায়ে নিলাম পড়িয়াছে, বেনামীতে রাখিয়াছেন ওই ভ্রাতুষ্পুত্র-বৎসল পিতৃব্য।

আরো কিছুদিন গেল, সহসা একদিন ঝড় উঠিল, জমিদার সাহেব ভ্রাতার নাম করিয়া আফসোস করিতেই বালক আজহার তীব্রকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "আর মায়াকান্না কাঁদবেন না চাচা সাহেব! বাবার শোকে আমাকে তো পথের ফকির করিয়াছেন।" তার অল্পদিন পরেই পিতামাতা এবং সহায়সম্পদহীনা বনিয়াদী বংশের কন্যা এই বধূটিকে ভ্রাতুষ্পুত্রের গলায় গাঁথিয়া আম বাগানের ওপারে একখানা গৃহ এবং কয়েকখানা জমিপত্র দিয়া বলিলেন, "তোমাদের সবই এতে রইল"—লোকের কাছে বলিয়া বেড়াইতে লাগিলেন, "আজকালকার দিনে এত কেউ করেনা। ভাই যেমন সঁপে দিয়েছিল তেমনই লেখাপড়া শিখিয়েছি, বিয়ে দিয়ে সংসারীও করে দিয়েছি," সবাই বলিল, "ঠিক তো"

তার পরে বালক জমিদারের জমিদারী ছ'মাসের মধ্যেই উড়িয়া গেল, কেননা বেশী কিছু তো ছিল না। যখন সম্পত্তি পাওয়া গেল তার একমাস পরেই সুর্য্যাস্তের লাট, অত আসে টাকা কোথা হইতে?—পিতৃব্য বলিতে লাগিলেন "আমি কি করব?—ওর নসীবে নেই, নাহ'লে আমি তো সব চুল চিরে বুঝিয়ে দিয়েছি, জমিদারী রাখা কি এসব ছেলে ছোকরার কাজ?"—এবারও বিজ্ঞ ব্যক্তিরা মাথা নাড়িয়া বলিল, "খুব ঠিক।" পরের বৎসর আল্লাহতা'লার আশীর্ব্বাদের মত—ফুলের মত ছোট্ট ও সুন্দর ফরহাদ আসিল, তরুণী মা'টি লজ্জা-রক্তিম মুখে স্বামীর পানে চাহিল, নবজাগ্রত স্নেহ-ভরা অন্তরে তরুণ পিতা শিশুর মুখের উপর মুখ রাখিয়া বলিল, "কি সুন্দর!—"পরের দিন ভাইটী আজহার আসিয়া চিৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল "ওগো আপা! কি সুন্দর পুতুলের মত বাচ্চা!—ওকে আমি নেব—"একটু পরেই অভিমান ভরা সুরে বলিল, "এবার আমাকে কম আদর করবেন নাতো?" "না-রে পাগলা!" বলিয়া সে স্নেহময়ী বড় বোনটির মতই তাহার মাথায় হাত বুলাইয়া দিয়াছিল।

তার পর কত দুঃখের দিনও গিয়াছে, আজহার পড়িতে কলিকাতায় চলিয়া গেল। একটা দোকানে হিসাব লিখিয়া সে মাসে দশটি টাকা পাইত, আরও দু'চার জায়গায় ছেলে পড়াইয়া কায়ক্লেশে সংসার চালাইতে লাগিল। তবু—কি সুখেই যে ছিল তারা? বাহিরের অনটনের দুঃখ এবং প্রাচুর্য্যের সুখ এই দুয়ের মধ্যে কে যে জয়ী হইয়াছিল তাতো তার অজানা নাই।

যোলটা বৎসর ঠিক যেন যোলটা মুহূর্ত্তের মত চলিয়া গেল, বিদায় বেলায় আজহার দুই হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিয়াছিল, "আর সময় নেই মেহের! বড় সুখেই জীবনটা কাটল, সব সময় আল্লাহতালার উপর নির্ভর ক'রো, তিনি সর্ব্বশক্তিমান, সর্ব্বজ্ঞ ও করুণাময়, তাঁর কাছে কেউ বিমুখ হয় না, ফরহাদ ঘুমিয়েছে, ওকে জাগিয়ো না, যেমন ক'রে পার মানুষের মত করার চেষ্টা ক'রো—বিনা চিকিৎসায় অকালে আমার দিন ফুরিয়ে গেল, অথচ আমার সবই ছিল, আছে। মানুষের উপর নির্ভর ক'রো না, কারো কাছে হাত পেতো না, বিশেষতঃ ওবাড়ীতে, আজহারের উপর কত আশা করেছিলে, সম্পদের নেশায় সেও সব ভুলে গেল, প্রতিজ্ঞা কর কখনো ওদের কাছে কিছু চাইবে না, না খেয়ে মরলেও না"—চোখের পানিতে ভাসিয়া মেহের প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল। আজহারের মুখেও বড় সুখের হাসিই ফুটিয়াছিল।

"আম্মা? মা?"

অতীতের রূপসী মেহের কল্পনায় মিলাইয়া গেল, অকাল বৃদ্ধা জননী স্বপ্নাবিষ্টার ন্যায় উত্তর দিল, "কেন বাবা?" "সারাদিন এমনি না খেয়ে থাকবে? তার চেয়ে বরং রহমতের মাকে ডেকে ওবাড়ীতে পাঠাও না।" মা'র দুই চক্ষু দিয়া যেন অগ্নি বর্ষিত হইল, তীব্র কণ্ঠে শুধু বলিল "ফরহাদ!"

—২—

"আজ ঈদ নয়—"

"কে বলেছে ?"

"কাল মেঘের জন্য কিছু দেখা যায় নি, সবাই ভেবেছে চাঁদ উঠেছে বুঝি, আজ কলকাতা থেকে তার এসেছে কাল ঈদ, আজ উঠবে চাঁদ।"

"এত পোলাও, কোর্ম্মা, ফিরনি, জরদা যে রাঁধা গেল—এগুলোর কি হ'বে ?"

"আরে তাকি পড়ে থাকবে ?"

"আচ্ছা ঈদ যদি না ই হবে তবে ওদের কাপড় চোপড় গুলি একটু বদ্‌লে আনুক না।"

"আবার কি বদ্‌লাবে ?"

"হেনার শাড়িটা ফিকা হল্‌দে রং এনেছে, ফিকা নীল কি সবুজ হ'লে ভাল হ'তো, ও ফরসা তো, আর শিউলি একটু ময়লা, ওরই কাপড় এনেছে ঘন নীল, ওটা আনুক গোলাপী।"

জমিদার সাহেব ও বেগম সাহেবা কথা বলিতেছিলেন। বেগম সাহেবা দেখিতেও মন্দ নন, বেশ ফরসা রং, দোহারা শরীর, বয়স তেইশ চব্বিশ। যাইতে যাইতে সহসা মুখ ফিরাইয়া বলিলেন, "ওই যাঃ ভুলে গেছি, ওবাড়ীর ফরহাদের নাকি বড় অসুখ, ওদিকে চিকিৎসা দূরে থাক পথ্যও চলে না।"

"কেন চলবে না ? বাপ তো শুনি বাবার সঙ্গে ঝগড়া ক'রে আমাদের কত বিষয় পর্য্যন্ত উড়িয়ে দিল, তা মা'টির হাতে কি কিছু জমাও নেই ?"

"আমি তো জানিনে কি হ'য়েছে না হ'য়েছে, এ বাড়ীতেই যা বদনাম, না হ'লে গাঁশুদ্ধ লোকে ভাই সাহেবের তারিফ করে, আপাকেও তো মন্দ লাগে না।" আপার নাম স্মরণে সহসা আতাহারের মনের বন্ধ ঘর যেন এক ঝলক প্রভাত কিরণে প্লাবিত হইয়া উঠিল, কত দিনের সেই স্মৃতি ! একটি বোন ও একটি ভাই ! সেই স্নেহে কোমলা ও কর্ত্তব্যে কঠোরা আপা! সেই ফুলের পুতুল ফরহাদ! আজতো তাহাদিগকে সে মনেও করে না, কত জঞ্জালের আবরণে তাহাদের স্মৃতি চাপা পড়িয়া গিয়াছে, আপাওতো একটু খোঁজ নেয় না, সেকি অভিমান করিয়াছে ? অভিমানিনী বোনটি, সে ডাকিলেও কি আসিবে না ?

—৩—

"ফরহাদ !"

"মা !"

"উঠে বসতে পারবিনে বাবা ?"

"না আম্মা বড় দুর্ব্বল লাগে, আলোটা আড়াল কর, আঁধার বেশ মিষ্টি, ওমা চেয়ে দেখ ওই বনটায় কেমন জোনাকি জ্বলে, ঝিঁঝিগুলি ডাকে, ওরা যেন ডাকে "আয়" "আয়," কি যেন কখন ফেলে এসেছি, বলে "খুঁজে নিবি আয়।" আচ্ছা, আমি মরে গেলে অমনি বনে রেখে দেবেতো ? গোরস্থানটায় বড় জঙ্গল হ'য়েছে।"

"ফরহাদ ! বাবা জানিসনে কি এসব বল্‌লে আমার কত কষ্ট হয় ?"

"হোকনা একটু, আমিতো চিরদিন তোমাকে কষ্টই দিয়েছি, আজ যাওয়ার সময় আর অন্য কি দেব ?"

"আমি না যেতেই তুই যাবি ?"

"সময় হ'লে কি করব ? ডাক পড়ল যে ! কত দুঃখ যে তোমার অদৃষ্টে আছে ! বাবা চলে গেলে কত কষ্ট ক'রে নিজ হাতে গাছ গাছড়া লাগিয়ে, সেলাই ক'রে এতদিন কাটালে, আমা হ'তেও তো কোন সাহায্য পাওনি, মন দিয়ে শুধু পড়েছি আর ভেবেছি এতেই তোমার দুঃখ ঘুচবে, এখন দেখি সব ভুয়া, মানুষ চোর হয় কেন, ডাকাতি করে কেন কিছু বুঝেছ ? আমি বেঁচে থাকলে যারা পরকে ঠকিয়ে কোর্ম্মা পোলাও খেয়ে ভুঁড়িওয়ালা হয় তাদের ভুঁড়ি কেটে টাকা বের করে আমার মত দুঃখীদেরে দিয়ে দিতাম, একে অন্যায় বল আর যা-ই বল। নইলে কেউ পোলাও কোর্ম্মা নর্দ্দামায় ঢেলে দেয়, কেউবা তিন দিনেও খেতে পায় না কেন ? চিরদিন জেনে এসেছি স্রষ্টার বিচারে কোন ভুল নেই, কিন্তু—"

"ওরে ওই বিশ্বাসেই যে তৃপ্তি আর শান্তি মেলে !"

"তা মিলতে পারে, কিন্তু ভাত যে মিলে না এটা ঠিক, এইযে দুনিয়া জুড়ে হাহাকার উঠেছে "অন্ন চাই" "বস্ত্র চাই"—কেন তা মিলে না ?

"যখন সময় হ'বে মিলবে, সময় হয়নি তাই মিলে না।"
"হাঁ খুব সত্যি কথাইতো, টাকার চাপে কতকগুলি লোক হাঁফিয়ে উঠছে, অথচ তাদেরই চোখের সম্মুখে অসংখ্য

প্রাণী "হা অন্ন," "হা বস্ত্র," বলে কবরের দিকে পাড়ি দিচ্ছে, আর সময় হ'বে কখন ?"

"তারা হয়ত সময় থাকতে শক্তির অপব্যবহার করে, তারপর অসময়ে প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হয়। যেদিন লোকে শক্তি ও সময়ের মূল্য বুঝবে এবং সদ্ব্যবহার করতে শিখবে সে দিনই অনেকটা দুঃখ ঘুচবে।"

"ঠিক কথা ?"

"আমার জীবনের অভিজ্ঞতায় তো এটুকুই বুঝেছি,—আর বাজে বকিসনে বাবা, মন খারাপ কোরে কি লাভ ?—তুই নিজে মানুষ হ, প্রত্যেকে যদি নিজের ঘরের দুঃখ ঘুচাতে চেষ্টা করে তাহলেই তো দুনিয়ার অভাব অনটন ঘুচে যায়।" "না আম্মা !—নিজের সঙ্গে সঙ্গে অপরের দুঃখও মোচনের চেষ্টা করা উচিত। বড় দুষ্টু হ'য়েছি আমি, তোমার সঙ্গে তর্ক করি,—না ?—আচ্ছা আর কথা বলব না, তোমার পা দুটি আরও কাছে আন, আজকাল তো শুধু-পায়ে বেড়াও—তবুও কি নরম !—যেন একরাশ ফুল, তোমার চোখ দুটি মাগো ভোরের তারা।"

সম্মুখে কতকটা পড়ো জমি, তাতে কতকালের দুই চারিটা শুষ্ক-প্রায় গাছ, তার পরেই বিস্তীর্ণ ধানক্ষেত, অনেক দূরে দু'একটা আলো কাঁপিয়া কাঁপিয়া জ্বলিতেছে। ছেলের চুলগুলিতে হাত বুলাইতে বুলাইতে মা সেই দিকেই চাহিয়াছিলেন। রুক্ষ চুলগুলি মুখের চতুর্দ্দিকে উড়িতেছে। সন্ধ্যা-তারার ন্যায় চোখ দুটি বিষাদে ম্লান হইয়া আসিয়াছে। তিনি ভাবিতেছিলেন অল্পক্ষণ পূর্ব্বে ছেলে যে কথাগুলি বলিয়াছিল তাই —সত্যই তো দুনিয়ায় কেহ অতিরিক্ত সুখী আর কেহ অতিরিক্ত দুঃখী—কেন ? মানুষ মাত্রেই একে অপরের ভাই, কেহ সেকথা ভাবে না কেন ?

"আম্মা ?"

আবার চিন্তা স্রোতে বাধা পড়িল, মা উত্তর দিলেন "কি বাবা"। "তোমারহাতটা আমার গায়ে দাও—আজ যেন মনে হচ্ছে তুমি অনেক দূরে বসে আছ, আচ্ছা—তুমি না বলেছিলে ও বাড়ীর ছোট চাচাকে তুমি খুব ভালবাসতে—তাঁর সাহায্যও কি নেওয়া যায় না ?" "না বাবা, অভাবে পড়লে কোন আত্মীয়ের সাহায্য নেওয়া যায় না, বরং পরের কাছে সাহায্য-প্রার্থী হওয়া যায়। যখন সে ছোট ছিল একদিন বলেছিল সে বড় হয়ে নাকি তার বাড়ীতে আমাদের সকলকেই নিয়ে যাবে, তোমাকে বিয়ে দিয়ে পরীর মত বৌ আনবে, কত কি বলত, আর একবার—বছর দশেক আগে—তোমার বাবার অসুখ হওয়ায় অনেক মিনতি করেছিল যেতে"—"গেলে না কেন ?" "সময় হয়নি বলে যাইনি, তাকেও ঠিক এই কথাই বলেছি, যেদিন সে মনের সমস্ত মলিনতা মুছে ফেলে বংশগত বিদ্বেষ ভুলে ছোট্ট ভাইটির মত হ'বে সেদিনই সময় হ'বে,—যাক্—সেদিন যদি না-ও আসে এই টুকুই আল্লাতা'লার কাছে চাই যেন কারো অনুগ্রহ ভিক্ষা করতে না হয়।"

"সেদিন আসবে না আম্মা, গরীব কোনদিন বড় লোকের কাছে আত্মীয়তার দাবী করতে পারে না, যদি তার গায়ে জোর না থাকে।"

"এত কথা তুই কোথায় শিখলিরে ?"

"এই সহজ সত্যটাও কি কারো কাছে শিখতে হয় ? এইতো চোখের সামনে বড় মানুষ ভাই—বিষয় সম্পত্তি সব থাকতেও বাবা বিনা চিকিৎসায় মারা গেলেন, আমারও আজ সেই অবস্থা, কিন্তু ওই জমিদারীর অর্দ্ধেকের চেয়েও বেশী যে আমাদের !"

"সবই জানি, কি করব বল ?" "তাই হক্—আর তো কোন বন্ধন তোমার থাকবে না, মিথ্যে মায়ায় কাজ কি, চাচা যদি কোনদিন সাহায্য করতেও চান সে ভিক্ষা নিওনা।"

"আচ্ছারে তাই হ'বে, এখন তুই একটু চুপ করে থাক, মুখ শুকিয়ে যাবে যে !—কথায় কথায় সন্ধ্যা হ'য়ে উঠেছে, আমি নামাজটা পড়ে নি—"

"আমাকে একটু বুকে নাও মা"—"কেনরে ? আজ আবার বাচ্চা হ'য়ে গেলি নাকি ?" মা'র বুকে মাথা রাখিয়া অপলক দৃষ্টিতে সে মুখের পানে চাহিয়া রহিল, সেই দেখাটুকু বুঝি তার দীর্ঘপথের পাথেয় ! "একটু পানি !" "খাও,—ওকিরে ?—পানি পড়ে যায় কেন ?" "কিছুনা আম্মা, আমার মাথাটা উত্তর দিকে করে দিন, কিছু হয় নেই, মনে আছে তো—"ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না এলায়হে রাজেউন" সকলেই তাঁর কাছে যাবে তো একদিন, তবে আর দুঃখ কিসের ?"

"বাবা !—ফরহাদ !"

"মাগো সন্ধ্যা হলো বুঝি—আমার সামনের জানালা খুলে দাও—আমি আকাশ দেখবো—আজ না ঈদ—ঈদের চাঁদ এসেছে আমার জন্যে—না আম্মা—"

অনাথিনীর বুক দুলিয়া উঠিল; কাতর স্বরে সে ডাকিল—"ফরহাদ!"

ফরহাদের চোখে সন্ধ্যার ছায়া ঘনাইয়া আসিতেছিল—নির্জ্জন মরুপ্রান্তরে যেমন ধীরে নিঃশব্দ চরণে রাত্রি নামিয়া আসে।

ফরহাদের সর্ব্বশরীর একবার শুধু কাঁপিয়া উঠিল। তাহার পর দুই কম্পিত কর চাঁদের শীর্ণ রেখাটীর দিকে একবার নড়িয়া পড়িয়া গেল!

মেহেরের বুকে অশ্রুর সাগর গর্জ্জিয়া উঠিল!

এমন সময় দূরে অস্পষ্ট কোলাহল শুনা গেল, যেন আনন্দ-ধ্বনি, বেড়ার ফাঁক দিয়া একটা বাতি দেখা গেল, ক্রমে নিকটে আসিল, যে আসিয়াছিল সে দুয়ারের কাছে আসিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল, উৎকর্ণ হইয়া একটু প্রতীক্ষা করিল, তারপর ঘরে ঢুকিয়া পড়িয়া মৃদুকণ্ঠে বলিল, "ফরহাদ ঘুমিয়েছে বুঝি? যাক্- টাউনে লোক পাঠিয়েছি, ভোরে সিভিল সার্জ্জন নিয়ে ফিরবে—ও সেরে উঠলে আপনাকে শুদ্ধ ও বাড়ীতে নিয়ে যেতে চাই, ও'র লেখাপড়ার ভাল রকম বন্দোবস্ত করতে হবে,—অমন করে চেয়ে রইলেন কেন?—ঈদের চাঁদ উঠেছে কিনা তাই সালাম করতে এসেছি, আজকের দিনে আমাকে মাফ করে দিন আপা? ছোট ভাইয়ের দোষ কি মনে করে রাখে?—আজ নিশ্চয়ই আপনার কাছে এতদিনের বে-আদবীর বদলে স্নেহই পাব, এখন ও কি সময় হয়নি?—

মা স্থির দৃষ্টিতে মৃত পুত্রের মুখ পানে চাহিয়া রহিলেন। উদাস করুণ দৃষ্টি তুলিতেই চোখে পড়িল চন্দ্রলেখা! ঈদের চাঁদ! হায়রে ঈদ!

দুই কান ভরিয়া বাজিতে লাগিল সেই যুগ-যুগান্তের ব্যথাভরা অমর বাণী—গরীব কখনো বড় লোকের কাছে আত্মীয়তার দাবী করতে পারে না, যদি তার গায়ে জোর না থাকে।

জোর গায়েও নাই, মনেও নাই, সব দেনা-পাওনা তো ফুরাইয়াই গেল, শূন্য তহবিলে আর কিসের কারবার? অস্ফুট কণ্ঠে উত্তর দিলেন, "মাফ?—মাফ তো বহু পূর্ব্বেই করেছি ভাই, কিন্তু তোমার সাহায্য নেওয়ার সময় আর এ জীবনে হবে না, ফিরে যাও, পথ ফুরিয়ে এসেছে, এ সময় আর পথ-ভ্রষ্ট করো না, দুঃখীর দুঃখ মোচনের চেষ্টা করো, সেই-ই আমার সেবা হ'বে।"

ক্রমশঃ রাত্রির গাঢ়তায় চাঁদ ডুবিয়া গেল।

---

# মোগল-সাম্রাজ্যের স্মৃতি

[ শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় ]

[ পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর ]

## জাহাঙ্গীরের দ্বাদশটী অনুজ্ঞা

সিংহাসনে আরোহণ করিবার পরই আমি নগরের মধ্য-ভাগে সুবিচার প্রতিষ্ঠার জন্য একটী বৃহৎ শৃঙ্খল রাখিয়া দিবার ব্যবস্থা করিলাম। এই শৃঙ্খলটী ধরিয়া নাড়া দিলে রাজপ্রাসাদ পর্য্যন্ত শব্দ আসে। যদি কেহ রাজকর্ম্মচারীদের দ্বারা উৎপীড়িত হয় অথবা বিচারের বিড়ম্বনা ভোগ করে—তাহাদের সুবিধার জন্য এই শৃঙ্খল প্রতিষ্ঠা করিলাম। এই শব্দ শুনিলে আমি স্বয়ং আসিয়া উপস্থিত হইব।

আমার রাজ্যের মধ্যে অতঃপর নিম্ন-লিখিত দ্বাদশটী অনুজ্ঞা সর্ব্বদা ও সর্ব্বত্র প্রতিপালিত হইবে।

( ১ ) আপনাদের স্বার্থসিদ্ধি ও লাভের জন্য জায়গীর-দাররা নিজেদের জমিদারীতে প্রজাদের উপর যে সমস্ত অন্যায় কর ধার্য্য করিয়াছে—তাহা তুলিয়া দিতে হইবে।

( ২ ) জমিদারীর মধ্যে যে সমস্ত নির্জ্জন যায়গায় ডাকাতি হয় বলিয়া শোনা যায়, সেই সমস্ত যায়গায় জায়গীরদারগণ যেন মস্‌জিদ্, মোসাফির-খানা অথবা জলাশয় তৈয়ারী করে। কারণ, এই সমস্ত স্থানের নির্জ্জনতার সহায় লইয়াই ডাকাতরা উৎপাত করে। একবার সেই সব স্থলে মানবের বস-বাস ও গমনাগমন স্থায়ী করিতে পারিলে—সমাজের একটা মস্ত বড় অকল্যাণ দূর হইবে; যে সমস্ত বস্তুর দ্বারা সেই অকল্যাণ দূর হইবে—তাহাদের দ্বারা অন্য দিক দিয়াও সমাজে প্রভূত কল্যাণ হইবে।

( ৩ ) পথে সওদাগরদের মাল তাহাদের বিনা অনুমতিতে কেহ খুলিতে পারিবে না।

( ৪ ) মৃত ব্যক্তির—সে মুসলমান হউক অথবা নাই হউক—সম্পত্তি তাহাদের ন্যায্য উত্তরাধিকারীর উপর যেন বর্ত্তে। যদি কোনও উত্তরাধিকারী না থাকে, তাহা হইলে সে সম্পত্তি জনহিতার্থে ব্যয়িত হইবে।

( ৫ ) কোনও প্রকারের মাদক দ্রব্য আমার রাজ্যে প্রস্তুত অথবা বিক্রীত হইবে না। আমি আঠারো বৎসর বয়স থেকে আজ আটত্রিশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত এই মাদক-তার অশুভ স্পর্শ ভোগ করিয়া আসিতেছি। যখন আমি প্রথমে পান করিতে আরম্ভ করি তখন প্রতি দিন আলাদা করিয়া প্রস্তুত ডুইবার চোঁয়ান সরাব বিশ পাত্র করিয়া খাইতাম। যখন মাদকতা আমাকে পাইয়া বসিল, তখন আমি প্রাণপণে তাহার গতি রুদ্ধ করিবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলাম। এখন আমি মাত্র চার কিংবা পাঁচ পাত্র খাই এবং তাহাও শুধু ক্ষুধার উদ্রেকের জন্য।

( ৬ ) কোনও লোকের বসত-বাটী কেহ জোর করিয়া অধিকার করিতে পারিবে না।

( ৭ ) শাস্তি দিবার জন্য নাক কাণ কাটিয়া দেওয়া চলিবেনা। আল্লার নিকট শপথ করিয়াছি—কাহারও অঙ্গহানি করিব না।

( ৮ ) রাজপুরুষ অথবা জায়গীরদার জোর করিয়া রায়তের জমি দখল করিয়া তাহাতে চাষবাস করিতে পারিবে না।

( ৯ ) রাজদরবারের নিযুক্ত কোনও কর্ম্মচারী অথবা জায়গীরদার অনুমতি ব্যতিরেকে সেই পরগণার কোনও বালিকাকে বিবাহ করিতে পারিবে না।

( ১০ ) প্রধান নগরে নগরে রাজকোষ হইতে অর্থ লইয়া হাসপাতাল প্রতিষ্ঠিত হইবে এবং বিনামূল্যে সেখানে ঔষধ ও ব্যবস্থা দেওয়া হইবে।

(১১) মহামহিমান্বিত পিতার আদেশ অনুযায়ী আমার জন্মদিন উৎসব উপলক্ষে প্রতি বৎসর আমার জন্মদিন হইতে আমার বয়সের যত সংখ্যা হইবে ততদিন পর্য্যন্ত পশু-হত্যা হইবে না। বৃহস্পতিবার আমি সিংহাসনে অধিরোহণ করিয়াছি বলিয়া এবং রবিবার আমার পিতার জন্মদিন বলিয়া উক্ত দুইদিনও পশু-হত্যা নিষিদ্ধ রহিল।

(১২) পিতার আমলে যে সমস্ত সম্পত্তি রাজ-ভৃত্যেরা

ভোগ করিয়া আসিতেছিল—আমার রাজত্বকালেও তাহারা নির্ব্বিবাদে সেই সমস্ত জমি ভোগ করিতে থাকিবে।

## জেবউন্নিসার প্রণয় কাহিনী

মোগল রাজকুমারী, ভারতের বিদুষী নারী জেবউন্নিসা সম্বন্ধে উর্দ্দু ও হিন্দু উপন্যাসিকগণ আপনাদের সুবিধা মত নানা ঘটনা তৈয়ারী করিয়া জেবউন্নিসার কঠোর নিঃসঙ্গ জীবনের পবিত্রতাকে কুৎসায় পঙ্কিল করিয়া ফেলিয়াছেন। ঐতিহাসিক যদুনাথ সরকার মহাশয় ঔপন্যাসিকের কল্পনার মায়াজালকে ছিন্ন করিয়া সেই সমস্ত কাহিনীর অসম্ভাব্যতা প্রমাণ করিয়া দিয়াছেন।

গত যুগের বাংলা সাহিত্যে দেখা যায় যে মোগল অন্তঃপুরকে কল্পনাবিহারী ঔপন্যাসিকগণ কতকটা রূপকথার পরী-মহলের মত ভাবিতেন; তাই গোপন প্রণয়ের যে সমস্ত উর্ব্বর কল্পনা যখনই লেখকের মনে আসিয়াছে তখনই তাহার ঘটনাক্ষেত্র মোগলের অন্তঃপুরে চলিয়া গিয়াছে এবং এই কল্পনার খেলাকে অবসর-বিলাসীদের নিকট এমন এক সত্যের মুখোস পরাইয়া আনা হইয়াছে যে বাংলার সাধারণ পাঠকের মনে এই সমস্ত তথাকথিত "ঐতিহাসিক" উপন্যাসগুলি ইতিহাসের স্থান অধিকার করিয়া আছে। জীর্ণ কাঁথায় শুইয়া বাঙ্গালী হিন্দু-মুসলমান শূন্য উদারকে এই সমস্ত রাজ-পরিবারের গোপন প্রণয়-কাহিনী দিয়া নিত্য ভরিয়া তুলিতেছে;—আর প্রতিদিনের দুঃখ দৈন্য ও শত লাঞ্ছনা পীড়িত জীবনের চারিদিকে বাদশাজাদীর অপরূপ রূপের মায়া-লোক সৃষ্ট হইয়া ক্ষণিকের উত্তেজনায় মনকে আরও মোহগ্রস্ত করিয়া তুলিতেছে। যে সমস্ত চরিত্র মানুষকে উন্নত করে, যাহাদের চরিত-কথা আলোচনায় জীবনের সমস্যার নব নব সমাধান ঘটে; তাহাদের জীবনকে মিথ্যা কল্পনার রাঙতার মুড়িয়া শুধু মানুষের মোহের খোরাক জোগান—শুধু অন্যায় নয়—পাপ। এই সমস্ত তথাকথিত "ঐতিহাসিক" উপন্যাস সাহিত্যের ও সমাজের সমূহ ক্ষতি করে।

কোনও একজন বিখ্যাত হিন্দু ঔপন্যাসিক জেবউন্নিসাকে শিবাজীর প্রণয়-পাত্রী করিয়াছেন। ইহাতে উপন্যাসের রস জমিয়াছে ভাল। বন্দী অবস্থায় শত্রুর কন্যার প্রেমে পড়া এবং তাহারই প্রেমের সহায়তায় মুক্ত হওয়া—এই সমস্ত চিত্ত-চমৎ-কারী ঘটনা উপন্যাসের মন্দ খোরাক নয়;—কিন্তু সে সমস্ত যখন কাল্পনিক চরিত্রকে আশ্রয় করিয়া আসে—তখন কোথাও রস-সৃষ্টিতে ব্যাঘাত ঘটে না; কিন্তু সে যদি নূতন করিয়া ঐতিহাসিক মানুষকে গড়িতে যায়—তাহা হইলে যে রস উৎপাদন করিবে—তাহা নিতান্ত কটু এবং সমাজ যতই শিক্ষিত হইবে ততই সে রস উপভোগ করিতে ঘৃণা বোধ করিবে। বাংলা ঔপন্যাসিক ছাড়া কোনও ঐতিহাসিক, কি হিন্দু কি মুসলমান, শিবাজীর সহিত জেব-উন্নিসার অদ্ভুত প্রণয় কাহিনীর কথা কোথাও লেখেন নাই; এমন কি শিবাজীর কোনও জীবনী লেখকও না। ইহা শুধু বাঙ্গালী মস্তিষ্কের কল্পনার উর্ব্বরতার প্রমাণ।

আলমগীর-দুহিতা জেব-উন্নিসার জীবন লইয়া অনেক প্রণয়-কাহিনী প্রচলিত আছে এবং এই মিথ্যা কাহিনীগুলির জন্য দায়ী উর্দ্দু ঔপন্যাসিকগণ। জেব-উন্নিসা অসামান্যা রূপসী ছিলেন এবং তাহার উপর ছিলেন একজন বিখ্যাত কবি এবং সর্ব্বোপরি ছিলেন, অবিবাহিতা—সেই তাঁর অপরাধ। কোনও নারীর একাধারে যদি এই তিনটী গুণ থাকে—যে তিনি রূপসী, কবি ও আমরণ-কুমারী, তাহা হইলে জগৎ যেমন করিয়া হ'ক তাঁহার কৌমার্য্যের রহস্য ভেদ করিবেই করিবে—কেহই তাহার কৌতুহলকে প্রতিরোধ করিতে পারিবে না।

### প্রচলিত গল্পটী এইরূপ ঃ—

১৬৬২ খৃঃ অঃ আলমগীর শারীরিক অসুস্থতা নিবন্ধন লাহোরে বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য আসেন। সেই সময় তাঁহার উজীর-পুত্র (?) আকিল খাঁ লাহোরের শাসন-কর্ত্তা ছিলেন (?)। এই আকিল খাঁ ছিলেন অসামান্য রূপবান পুরুষ ও একজন বিখ্যাত কবি। ক্রমশঃ জেব-উন্নিসার রূপ ও কাব্য-প্রতিভার কথা তাঁহার কাণের ভিতর দিয়া মরমে পশিতে লাগিল এবং তিনি জেবউন্নিসার প্রণয়-আকাঙ্খায় উন্মাদ হইয়া উঠিলেন। নগর পরিক্রমণের ছলে তিনি রাজ-প্রাসাদের চারিদিকে রাত্রে পরিভ্রমণ করিয়া বেড়ান—যদি সহসা শুভ-ক্ষণে সেই অপরূপ রূপের আভা চোখে আসিয়া পড়ে। একদিন শুভক্ষণ আসিল। এক ভোরের বেলা জেব-উন্নিসা গৃহ-চুড়ের এক অলিন্দে গুল্-আনার

রঙের বসনে উজীর পুত্রের নিশি-জাগর ক্লান্ত চোখে ধরা দিলেন। কবি উজীর পুত্র কবিতায় বলিলেন, আজ রাজ-প্রাসাদের চূড়ায় রক্ত-রাগে আমার প্রভাতের স্বপ্ন ফুটিয়া উঠিয়াছে। জেব-উন্নিসা ছন্দে উত্তর দিলেন, মিথ্যা অনুনয়, মিথ্যা ক্ষমতা, মিথ্যা ঐশ্বর্য্য, সে স্বপ্ন কখনও ধরা দিবে না।

আকিল খাঁর আহার নিদ্রা নাই। তাঁহার মনের সম্মুখে সেই ভোরের স্বপ্ন দুলিতেছে। একদিন খবর পাইলেন যে জেব-উন্নিসা লাহোরের এক উদ্যানে সখী-সমভিব্যাহারে উদ্যানস্থ প্রাসাদ নির্ম্মাণ দর্শনে যাইবেন। আকিল খাঁ এক রাজ-মিস্ত্রীর ছদ্মবেশে সেই উদ্যানে প্রবেশ করিলেন এবং জেব-উন্নিসাকে লক্ষ্য করিয়া গাহিলেন, "তোমাকে পাবার আশায় আমি তোমার পথের ধূলার সঙ্গে মিশিয়া আছি।" জেব উন্নিসা বুঝিতে পারিয়া তাহার প্রত্যুত্তর দিলেন, "যদিও তুমি বাতাসের সঙ্গে বাতাস হইয়া মিশিয়া যাও—তাহা হইলেও তুমি আমার একটী অলকও স্পর্শ করিতে পারিবে না।" এইরূপে ক্রমশঃ ব্যাপার গুরুতর হইয়া উঠিল এবং গোপনে দুজনার মিলন ঘটিল। আলমগীরের নিকট সংবাদ পৌছিল। একদিন উদ্যানে যখন দুজনে গোপনে মিলিত হইয়াছিল—এমন সময় সহসা পশ্চাতে পদ-ধ্বনি শোনা গেল। বিপদ আশঙ্কা করিয়া জেব-উন্নিসা আপনার মান রক্ষা করিবার জন্য আকিল খাঁকে একটা বৃহৎ ডেকচির মধ্যে লুকাইয়া রাখিল। এমন সময় স্বয়ং আলমগীরের আবির্ভাব। আলমগীর সেই ডেকচির দিকে চাহিয়া বলিলেন, "ওতে কি?" জেব-উন্নিসা বলিলেন, "গরম করিবার জন্য জল আছে।" আলমগীর শুনিয়া বলিলেন, "তাহা হইলে এখনই ঐ জল গরম করা হউক"। প্রেমিক প্রেমের মর্য্যাদা রাখিবার জন্য সেই ডেকচির মধ্যে জীবন বিসর্জ্জন দেয় এবং জেব-উন্নিসা বন্দী হয়। এই হইল কাহিনী। ঔপন্যাসিকের সৃষ্টি।

আগামী সংখ্যায় ঐতিহাসিকের কথা আলোচনা করা হইবে এবং ইতিহাসকারগণ বলেন যে এই বিদুষী রমণীর সত্যকারের জীবনের ঘটনাগুলি এত বিচিত্র যে তাহার উপর রঙ ফলাইবার জন্য কল্পনার সহায়তা লইবার কোনও প্রয়োজন নাই।

( ক্রমশঃ )

---

# মরণ-বধূ

[ মোহাম্মদ গোলাম জিলানী ]

গ্রহের ফেরে তিনি আমার মা। নয়ত সাত সমুদ্র তের নদী পার হয়ে, স্বদেশের খোর্ম্মা খেজুর, বসরার গোলাব-কাননের গন্ধ-বিধুর-সমীরণ, শিরাজ-বুলবুলের শির তারাণা, কাবুল কান্দাহারের সেব-নারাঙ্গী-আপেল-আনার আঙ্গুর বেদানা এত সবের মায়া ত্যাগ করে এই সুদূরে আসব কেন? আমি যে আপন-ভোলা দামাল ছেলে! তাই সারা বিশ্ব তোলপাড় করে, আনন্দের ফোয়ারা ছুটিয়ে, হাসির গররা আর স্ফুর্ত্তির হুল্লোড়ের মধ্য দিয়ে—এই সুদূরে এসে আড্ডা গেড়েছি। তোমরা যদি বল, কেন এলে? তার উত্তরে শুধু এই টুকু বলব যে আসবার ত ইচ্ছা ছিল না তবে কি না, না এসে পারি নাই। প্রাণে যখন আনন্দের বান ডাকে, ঘরে থাকা তখন কি আর সাজে? আমার প্রাণে যে আনন্দের বাণ ডেকেছিল, অসীমের যে বাণী আমাকে পাগল করে তুলেছিল, ইচ্ছা হয়েছিল সারা বিশ্বে তা ছড়িয়ে দেই। আমার জীবনের সফলতা রূপকথার মায়াদণ্ডের ন্যায় অপরের ব্যর্থতাকে সার্থক করে তুলুক। আমি চেয়েছিলাম আমার প্রাণের আলোকের ঝরণাধারায় এই বিপুল বিশ্বের সমস্ত অন্ধকার ধুইয়ে দিতে—জগৎ জ্যোতির্ম্ময় করতে। করেছিলাম ও তাই—ধরণী হয়েছিল পোর-নূর—বসিয়েছিলাম সেখানে খোশরোজ ও নওরোজের মেলা! তুলেছিলাম সেথায় কত আলহামরা, তাজমহল! সারা বিশ্ব ছিল আমার লীলাক্ষেত্র! আর আজ.........?

( ২ )

বিধবা মায়ের সন্তান লীলা তার ললিত অঙ্গের সৌন্দর্য্যের পশরা সাজিয়ে, রক্তিম অধরে মৃদু হাসি, চক্ষে মদির নেশা, আর হস্তে খুশীর সরবৎ নিয়ে চরণ মঞ্জীরে মৃদু গুঞ্জন জাগিয়ে যখন আমার সামনে এসে বীণাবিনিন্দিত কণ্ঠে বলল—"স্বাগতম্, এস বীর, এস পথভোলা, আপনহারা প্রেমিক পান্থ! আমার কুটীর দুয়ার আজ তোমার পবিত্র পাদ-স্পর্শে ধন্য হউক।" তখন কি জানি কিসের মোহে আমার চরণযুগল আপনা হতেই থমকে দাঁড়াল! বিশ্ব-বিজয়ী শাশ্বত সত্যের অগ্রদূতের বিজয়-রথ বনদেবীর মধুবনে অচল হয়ে গেল। প্রকৃতি মধুর কণ্ঠে প্রতিধ্বনি করে উঠ্‌ল 'স্বাগতম্'। সারা বনভূমি প্রফুল্ল কুসুম গন্ধে ভরপুর, পিককুল কাকলিতে মুখরিত। কানন-রাণী শ্যামল-কোমল তৃণাস্তরনের উপর চরণ যুগল স্থাপন পূর্ব্বক দিগন্তব্যাপী লিলায়িত কেশদাম পুষ্পাভরণে সজ্জিত করে মলয় হিল্লোলে নৃত্য করছে! প্রাণে তার কি উল্লাস, মুখে তার কত হাসি, বুকে তার কত প্রেম! মাধবী-কুসুম-কুঞ্জে, প্রকৃতির এই মোহমুগ্ধ আসরে এমনি ভাবেই লীলা তার উন্মুখ-যৌবনের প্রথম প্রেম আমাকে নিবেদন করল। মুখে তার কি মিনতি মাখান। সজল কাজল আঁখি বিস্ফারিত করে যখন সে বলল, "আমি যে তোমারই জন্যে কত যুগ ধরে এমনি ভাবেই এইখানে অপেক্ষা করছি" তখন আমার বুকের ভিতরে রুদ্ধ প্রেম আপনা হতেই বলে উঠল, "তোমার জন্য আমিও এই আপনাকে সুদূর মরুপ্রান্তর হতে বন্দী করে নিয়ে এসে তোমার দ্বারে হাজির করেছি। 'বিধাতা-পুরুষ' কোন অনাদিকাল হতে তোমাদের দুটী হৃদয় এক সূত্রে গেথে দিয়েছেন তা তোমরা না জানলেও আমি জানি। আমিই না দ্বিধা বিভক্ত হয়ে তোমাদের দুইজনের ভিতরে বিরাজ করছিলাম। আজ তোমাদের দুটীকে এক করে আমিও পূর্ণত্ব প্রাপ্ত হলাম।"

লীলাকে বাহু বন্ধনে বন্দী করে অদূরে প্রশান্ত-সলিলা যমুনা তীরে বিটপীমূলে উপবেশন করলাম। মনে হতেছিল কত কালের হারাণ-নিধি সে আমার। আমার প্রেম যেন কতযুগ ধরে তাহারই আশায় পথ চেয়ে বসেছিল। আমার অশ্রু, আমার হাসি, আমার কণ্ঠ, আমার বুকের স্পন্দন, আমার স্পর্শ এ যেন সব তারই। সেদিন না ছিল আমার কথার বিরাম, না ছিল আমার আঁখির পলক! দুজনে মুখোমুখি হয়ে দীর্ঘ বিরহ-বেদনা মিলনের পূর্ণানন্দে সার্থক করে নিচ্ছিলাম।

কখন মা এসে আমাদের পশ্চাতে দাঁড়িয়েছিলেন সে জ্ঞান কি আমাদের ছিল? কণ্ঠে মৃদু অভিযোগের স্বর মিশিয়ে যখন তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "লীলা তুমি এখানে?" তখন লীলার গোলাবগণ্ড জবাফুলের মত লাল হয়ে উঠল, সে লজ্জায় মস্তক নত করল। আমি জিজ্ঞাসা করলাম—"তুমি বুঝি মা?" তিনি বললেন, "তুমি আমাকে মা বলে বৃথা ভুলাবার চেষ্টা করছ। তোমার মাথার ঐ টকটকে টুপির কথা তুমি বিস্মৃত হচ্ছ কেন?"

আমি কিছুই বুঝতে পারলাম না। চুপ করে একদৃষ্টে কেবল তার দিকে চেয়ে রহিলাম। লীলা উঠে মায়ের পদতলে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করে মিনতির স্বরে বলল, "মা ঐ টুপীকে কি তুমি দূরে ফেলতে পার? আমার প্রেম যে ওকে কোন সুদূর থেকে টেনে নিয়ে এসেছে। আমার জন্য তাকে তোমার গ্রহণ করতেই হবে। আজ তোমার সন্তানের মস্তকে যে মুকুট দেখছ ইহাই শত-হিরক বিভায় সমগ্র জগতকে উজ্জ্বল করে তুলবে। তার গৌরব থেকে তুমি আমাকে বঞ্চিত কর না। যাকে আমি স্বেচ্ছায় বরণ করেছি তুমি তাকে কোন প্রাণে দূরে ঠেল্‌বে?

মা বললেন, "দূরে ঠেল্‌তে পারব না, তা তোমার চোখের ভাষায় বেশ বুঝতে পারছি। কিন্তু উপায় ত কিছুই দেখছিনে। তোমার স্বজন-স্বজাতি যুগ যুগ ধরে এত নিষ্ঠার সহিত তোমার চারিপাশে যে লৌহ প্রাচীর খাড়া করেছে সে যেমন তোমাকে আটকেছে তেমনি অপরের প্রবেশ পথও সে রোধ করেছে; তুমি তাকে ভাঙবে কেমন করে?"

আমি বললাম, "ভয় নাই মা, জগতের সকল বন্ধন ছিন্ন করে মুক্তির বিমলানন্দের ফোয়ারা ছোটানই আমার ব্রত। যত পাষাণ-কারা, যত নিষেধের গণ্ডী, যত বাদ বিচার, যত ভেদাভেদ জ্ঞান, আমার সম্মুখেতে কিছুই টিকছে না মা? আজ ভায়ে ভায়ে হবে গলাগলি, প্রাণে প্রাণে হবে কোলাকুলি। মিথ্যার আবরণ ছিন্ন করে, দূরত্বের ব্যবধান তুলে দিয়ে মানুষের পাশে মানুষকে দাঁড় করাতে'

জগতে এসেছি আমি। সাম্যের জয়গানের আমি অগ্রদূত। প্রেম আমার অসি, সত্য আমার ধর্ম্ম, ত্যাগ আমার সম্পদ, নিরঞ্জন আমার সহায়, আমাকে রোধ করবে কে ?"

মা অশ্রু গদগদ-কণ্ঠে লীলার দক্ষিণ হস্ত আমার হস্তে স্থাপন করে বললেন, "ঠিক বলেছ বাবা, তোমার ইচ্ছাকে রোধ করব না। তোমার মত উপযুক্ত সন্তানের হাতেই আমি আমার লীলাকে সমর্পণ করব। তোমাদের শুভ মিলন যেন শাশ্বত হয়, কল্যানের নবোন্মেষের উষারাণী-রূপে—ইহা যেন ধরায় প্রেম ও শান্তি নিয়ে আসে! আজ হতে লীলা তোমার।"

( ৩ )

তারপর শুরু হল দীর্ঘ-জীবনের কামনা-ঘেরা মিলন-রজনী। বিচ্ছেদে, বেদনায় প্রণয়ের যে পাত্রটী ভরপুর ছিল, তার গোলাবী শরাবের মোহিনী নেশায় সুদীর্ঘ অবসর মোহ ঘোরে কেটে গেল। সে শুধু স্বপ্ন, সে শুধু তন্দ্রা, সে কেবল গান-গাওয়া আর পথ-চাওয়া। মাধবীকুঞ্জে, হোলীর উৎসবে, নটীর চরণ নুপুরের উন্মাদনিক্কনে ও মহুয়া-রসের ফেনিল স্রোতে ভাসিয়ে দিয়েছিলাম জীবনের সকল ব্রতের কঠোর তিক্ততা। নিবিড় আনন্দের মত্ততায়, জাগ্রত-স্বপ্নের কোন ঘুম ঘোরে কোন পথ দিয়ে কাল তার রথ চালিয়েছিল, তার সন্ধানও রাখি নাই! এমনি ভাবেই আমার কেটে গিয়েছে কত যুগ।

( ৪ )

বুকের রক্ত দিয়ে সুখের প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়। আমিও করছি তাই। আমার প্রেম, আমার সাধনা যাকে জয় করেছিল; আমার অবসাদ, আমার অবহেলা তাকে হারিয়েছে! প্রেয়সী মদের যে পিয়ালা আমার অধরে ধরেছিল তার নেশা আমাকে অন্ধ করেছিল—আমি তাকে চিনতে পারি নাই। প্রিয়ার চেয়ে তার নেশাই ছিল আমার কাছে বড়। তার রূপ আমার চ'খে চমক লাগিয়েছিল—তাই তার প্রাণের সন্ধান আর করি নাই! পাওয়ার অহঙ্কার আর ভোগের নেশা দাবীর যোগ্যতাকে খাটো করে ফিরে এসেছে। তাই আমার প্রিয়া আমাকে ত্যাগ করেছে!

আজ লীলার শবদেহের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার দিন! তার আত্মীয় স্বজন তাকে আমার নিকট থেকে ছিনিয়ে নেবার জন্য কোমর বেঁধে এসেছে। এদিকে আমার সুদূর পারের সঙ্গীগণও তাকে বিনা আপত্তিতে ছাড়তে রাজি নয়! প্রেম দিয়ে যাকে জয় করেছিলাম, আজ প্রাণ দিয়ে তার প্রায়শ্চিত্ত করছি! যার মিলন ধরায় স্বর্গ এনেছিল, তার বন্ধন আজ মরণের পথে টেনে নিয়ে যাচ্ছে! যে প্রেম মুক্তির আনন্দে বিশ্বের বিস্ময় উৎপাদন করেছিল তাই আজ শৃঙ্খল হয়ে গলায় উঠছে। আমার বেদনা আজ অবাক হয়ে পথের ধারে ডুকরে কাঁদছে! এই কি সেই মরণ-বধুর চরম দান!

---

# নাম-না-জানা মেয়ে

[ জসীম উদ্‌দীন ]

নাম না জানা সে মেয়ে
নীরবে খুলিয়া জানালা তাহার পথ পানে রহে চেয়ে।
মহাকাল নেয়ে পথ নদী ধরি
বছরে বছরে চালাইতে তরী
হেথা এসে তার পাল ভেঙে যায় ছিড়ে যে হালের রসি
কাহার ঝিয়ারী এমন দুপুরে একা জানালায় বসি।

ও যেন অচেনা তারা হতে ভাসা একটী আলোর লেখা,
পথ ভুলে এসে আমার গ্রহেতে এঁকেছে কণক-রেখা।
এপার হইতে দেখা যায় যেন
ওপারের মেঘে রামধনু হেন—
ওপারে রাখাল বাঁশী বাজাইয়া এপারে হানিছে সুর
এপারে ওপারে চেনাচিনি যেন মাঝে অনন্ত দূর।

ওযেন একেলা বনকেতকীর গোপন গন্ধ খানি
মোর আঙিনার উতল হাওয়ায় করিতেছে হানাহানি।
ওযেন অবুঝ বুনোদের ভাষা
আধ বুঝা যায় আধ ভাসা ভাসা
একা জানালায় রহিয়াছে বসি উজলিয়া সব দিঠি
ও যেন এনেছে সারা তনুভরি মোর তরে কোন্ চিঠি।

ওর পানে আমি চেয়েছি গোপনে, দেখেছি সোনার মুখ?
মনে মনে আমি ওর কাছে একা খুলেছি নিরালা বুক?
কেউ যদি বল এটা অপরাধ!
শাস্তিও তার নিতে আছে সাধ,
বহু একাকিয়া কাটিবে রজনী ওর কথা মনে করি—
অনেক অশ্রু ঝরিবে আমার এই অপরাধ ভরি।

# উদ্বাস্তু

[ কে, এ, বসির বি-এ, ]

একাঙ্ক সামাজিক নাটক

[ পূর্ব্ব বাঙ্গালার যে সকল মুসলমান গৃহহীন হইয়া আসাম ও খোলাবান্দা গিয়াছে, তাহাদেরই করুণ কাহিনী স্মরণ করিয়া লিখিত। ]

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ

**পুরুষ**

আমজাদ আলী—জনৈক অশিক্ষিত কৃষক
পিয়ার আলী— ঐ ভ্রাতা
কোরবান আলী— ঐ পুত্র
রমজান আলী— গ্রাম্য যুবক
দয়ালহরি সাহা— ধনাঢ্য কুসীদজীবি
গ্রাম্য মাতব্বরগণ, ষ্টীমারের যাত্রীগণ ইত্যাদি

**স্ত্রী**

হালিমা—আমজাদের মাতা
রোকেয়া—আমজাদের স্ত্রী
আহ্লাদী—পিয়ার আলীর স্ত্রী
আহ্লাদীর মাতা ইত্যাদি

উদ্বোধন-গীতি

গ্রাম্য সুর

খেতের মাঝে পাকা ধান নেয় মহাজনে।
ঋণের দায়ে বঙ্গ চাষী যায় বিসর্জ্জনে॥
কেউ করেনা ধানের চাষ,
সবাই পাট বুনে,
ভাবে, তারা পাটের টাকায় খাবে ধান কিনে॥
ভাগ্য তাদের বেজায় মন্দ,
সন্দেহ কি তায়—
চাষের মালিক দেশের চাষা, দামের বেলায় নাই।
বিদ্যাবুদ্ধি নাইক তাদের,
আন্দাজে চাষ করে,
ফল্‌লে সোণা, নইলে মোনা বেহিসাবে মরে॥
ম্যালেরিয়া, ওলাউঠা,
কালাজ্বরে ভুগে,
মরছে দেশে কত কৃষক নিউমোনিয়া রোগে।
দেশের যারা প্রাণ প্রতিষ্ঠা,
সে কৃষক কোনখানে—
মূর্খ এমন ঋণের দায়ে মরে ভাতবিনে॥
জ্ঞানের আলো জ্বালতে হ'বে
চাষী ভাইয়ের প্রাণে—
হয় না যেন সর্ব্বস্বান্ত সুদ গুণে গুণে।

## প্রথম দৃশ্য

আমজাদের বাটীর প্রাঙ্গণ

হালিমা—বাবা, আমজাদ! এবার আমার পিয়ার আলীর দেখে শুনে একটা সাদী দাও! অনেক দিন বাঁচলুম আর কতদিন বাঁচব! ওকে একটু ঠিক্‌ঠাক্ করে রেখে যেতে পার্লে, আর কোন আপসোস থাকবে না।

আমজাদ—ও আমাদের সংসার ছোট। ওর বে'তে বেশ একটু ধুম্‌ধাম্ কর্ত্তে হ'বে। এ বছর ওর বিয়ে দিতে গেলে মহাজনের ঋণত শোধ হ'বে না, বরং নূতন ঋণ কর্ত্তে হ'বে। ওর এমনই বা কি বয়েস হয়েছে? এইত সতের ও পেরোয়নি।

হালিমা—তা হ'ক্। ও আমার বড় আহ্লাদের। আমি বেঁচে থাকতে থাকতেই ওর সাদী দিয়ে যাব। তুমি একটা মেয়ে দেখ। তোমরা যদি কেউ না দেখ, তাহ'লে মিঞা ভাইএর মেয়ের সঙ্গেই আমি ওর বে দোব। তিনি আর কিছুতেই আমার কথা ফেল্‌তে পার্ব্বেন না।

আমজাদ—অবশ্যই, আপনি মা, আপনি যখন আদেশ কর্চ্ছেন, তখন এর উপর আর আমার কিছু বলবার নেই। তবু একটু ভেবে দেখা উচিত নয় কি? গত দু'বছর মোটে পাটের দাম হয়নি। যা পেয়েছি—মহাজনের সুদ আর সংসার খরচেই নিঃশেষ হয়েছে। এ বছর কয়েক শ' টাকার পাট বেচেছি,—সেটাও পাটের দাম এবৎসর একটু চড়েছিল বলে। এই টাকাটা দিয়ে দয়ালহরি সা'র ঐ চক্রবৃদ্ধিহার সুদের দেনাটা পরিশোধ কর্ত্তে পার্লে, আস্‌ছে বছরে ওর বিয়ের চেষ্টা করা যেত। আল্লার মর্জ্জি এই দেনাটা পরিশোধ হ'লে, আর যা ঋণ থাকবে সেগুলো অমন ঘোড়দৌড়ের মত সুদে বেড়ে যাবে না। তাই বলছি মা, আপনি একটু চেপে গেলে এ বছর পিয়ার আলীর সাদী মওকুফ্ রাখতুম।

হালিমা—চক্রবৃদ্ধি সুদের জন্য তোমার অত ভাবনা কেন আমজাদ? দয়াল হরির একশ' টাকা মাত্র দু'টাকা সুদে নিয়েছিলে। খত বদলে দিয়েছ, এখন আর কিছুদিন থাকলেও ক্ষতি হবে না। পিয়ার আলী আমার দিন দিন কেমন হ'য়ে যাচ্ছে। যেন সংসারের কোন কাজে ওর মন বস্‌ছে না। বিয়ে সাদী হ'লে মন দিয়ে কাজকর্ম কর্ব্বে। তোমার অনেক আসান হ'বে; সে বেঁচে থাকলে এতদিন কবে ওর সাদী দিয়ে দিত। বার বছরের সময় তোমার সাদী হয়।

আমজাদ—মা চক্রবৃদ্ধি সুদটা আপনি যেমন সামান্য মনে কচ্ছেন বাস্তবিক তা' নয়। সুদ আসলে পরিণত হয়ে বেড়ে যেতে থাকে। মানুষ মনে করে কতই আর বাড়বে। এইত সেদিন একশ' টাকার জন্য তিনশ' টাকার খত বদলে দিয়েছি। এ ছাড়া আগেও কি দু' একশ' টাকা সুদ দিই নি? বাল্যবিবাহ করেছিলাম। বাবা, আদর করে বিয়ে দিয়েছিলেন। ফলে যা সুখ হয়েছে তা কি আপনি দেখ্‌ছেন না মা? লেখাপড়া সেই অবধি শেষ হয়েছে। বড় হরফে লিখ্‌ছি পড়ছি।

হালিমা—যাক, আমজাদ! আর শুনতে চাই না। ঢের হয়েছে। যখনই আমি ওর বিয়ের কথা বলি, তখনই তুমি নানারকম আপত্তি উত্থাপন কর। ওর নসীবে থাকে, সাদী হ'বে।

আমজাদ—সামান্য একটু লেখাপড়া শিখেছিলেম। তাই মা আজ বুঝতে পারি আমাদের অভাব কোথায়। নইলে তাও পার্ত্তাম না। তোমাকে অসন্তুষ্ট করা মহাপাপ, আর তাকে সন্তুষ্ট কর্বার যে পথ, সে পথে অগ্রসর হ'লে সর্ব্বনাশ। তুমি তো তা বুঝবে না, মা! এখনই ক্ষেতে যেতে হবে; আমি চল্লুম; তুমি আলীকে একটু বুঝিয়ে বলো— (প্রস্থান)

হালিমা—ও যে বোকা—আর গোঁয়ার—ওকে বোঝাব কি?

(পিয়ার আলীর প্রবেশ)

পিয়ার আলী—দেখ মা, বড় ভাইকে তুমি বলো, আমার বউকে কিন্তু অনেক গহণা দিতে হবে। অন্ততঃ বড় ভাবীর চেয়ে ঢের বেশী দিতেই হবে। জানত মা? এ সংসারের অর্দ্ধেকের মালিক আমি! আমার কেউ খাচ্ছে না। শুধু আমি—তাও খেটে খাচ্ছি, বসে খাইনি।

হালিমা—আচ্ছা হবে। সে না দেয় আমার সব গহনা তোর বউকে দোব।

পিয়ার আলী—সেদিন খুকীর বে' দিয়েছ কত টাকা তাতে ব্যয় হয়েছে। খোকা স্কুলে পড়ছে তাতে কিছু কম খরচ নয়। আমার ত আর ছেলে মেয়ে নেই; আমার আয় বেশী, খরচ কম।

হালিমা—দু' ভাইয়ে এক সঙ্গে রয়েছিস, অত হিসেবে কি হ'বে?

পিয়ার আলী—সে কি বলছ মা? ভাগ হবার সময় আমি সব কড়ায় গণ্ডায় বুঝে নোব।

হালিমা—নিতে পারিস নিস! সে যে পাটের কারবার করে কত টাকা পাচ্ছে, সেটা হিসেব করেছিস? ঐ টাকাতেই ত সেদিন তাঁর আমলের ঋণ শোধ করেছে।

পিয়ার আলী—ওসব আমি জানি না। আমি ত আর ভাইকে দিতে বলিনি? সে দেয় কেন?

হালিমা—দিয়েছে—তাই কি তার দোষ হয়েছে?

পিয়ার আলী—সে আমি বুঝি না। মা, আমি একটা ভাল ষাঁড় কিনব। আমার ষাঁড়টা লড়তে পারে না। সেদিন কাদু চাচার ষাঁড়ের সঙ্গে হেরে গেছেল।

হালিমা—এবার তোর বিয়ে দিচ্ছে। এবার ওসব হ'বে না। কিনতে হয়, আসছে বছর কিনিস্।

পিয়ার আলী—কী!—হ'বে না কি? আমি কিনবই। যদি না আমায় ষাঁড় কিনে দাও, তবে আমি বিয়ে কর্ব্বোনা। আমার ষাঁড় হেরে যাবে, আর আমি সেই অপমান নিয়েও বিয়ে কর্ব্ব। ওসব হ'বে না মা। ষাঁড় আমার চাই-ই।

হালিমা—আমজদ ঠিক বলে, আমি তোর মাথা খাচ্ছি!

পিয়ার আলী—সেটা ভুল। যারা মা তোমার সঙ্গে ঝগড়া করে, সেই সব মেয়ে মানুষেরা সব কথাতেই আমার মাথা খায়। তারা ঝগড়ার গোড়াতেই বলে, তোর পুতের মাথা খাই। দেখ মা, ওরা সব সময় মাথা খায় বলেই লেখাপড়ায় আমার একটুকুও মাথা ছিল না। ওস্তাদজি বলতেন, তোর মাথায় কিছুই নেই।

হালিমা—চুপ কর্ব্বিনি? তা হ'লে আমি চল্লুম।

পিয়ার আলী—তা যাও মা; কিন্তু ষাঁড় আমায় কিনে দিতে-ই হবে। যদি না দাও, তা হ'লে আমি জন্মের শোধ এক দিকে চলে যাব। একদিন ঢেঁকী ঘরে ঢেঁকীর সঙ্গে ফাঁসী দিয়েছিলুম মনে আছে ত?

[ প্রস্থান।

( আমজাদের প্রবেশ )

আমজাদ—মা, তোমার যখন সাধ, তখন আমি মেটাবই। ওর বিয়ের 'পানচিনি' কর্‌তে চল্লুম।

হালিমা—ওধারে তোমার ভাই যে দেশান্তরে যাচ্ছে।

আমজাদ—এর মধ্যে আবার কি হয়েছে? এমন আহা-মক্‌ও আবার কেউ থাকে?

হালিমা—সে বায়না ধরেছে একটা ষাঁড় কিনবে। আমার যদি বাছা হাতে দু'পয়সা থাকত, না হয় একটা ষাঁড় কিনে দিতাম।

আমজাদ—একটা ভাল ষাঁড় কিনতে শ' টাকা চাই। এমন নিত্য নূতন ফরমাস কর্লে আমি কি করে পেরে উঠি।

হালিমা—তোমায় আমি কি বলব বাছা। তুমি কি কর্ব্বে?

আমজাদ—বলুন, কি কর্ত্তে হবে?

হালিমা—ছোট ভাইটী তোমার যখন একটা আবদার কর্চ্চে—না হয় আমার জমিখানা রেহেণ রেখে ওকে একটা ষাঁড় কিনে দাও।

আমজাদ—আপনি যা আদেশ করেন, তাই কর্ব্ব এখন।

হালিমা—মন খারাপ করোনা বাবা, খোদা তোমাকে ধন দৌলত দেবেন। তুমি আমার সুবোধ ছেলে। ও একটা বায়না ধরেছে, ওর বউকে খুব গহণা দিয়ে সাজিয়ে আনতে হবে। বাজী, বন্দুক, লাঠিয়াল এসব ত তুমি আনবেই, সে আর আমি কি বলব। যাই তাকে বলিগে। [ প্রস্থান।

আমজাদ—মুখে এল—একধার থেকে সব বলে গেলেন। কিন্তু এসব কর্ত্তে যে সর্ব্বস্বান্ত হতে হবে। [ প্রস্থান।

———

## দ্বিতীয় দৃশ্য

জনৈক মাতব্বরের বৈঠকখানা

১ম গ্রামবাসী—দেখ, শেখজি! তোমার অত মুরুব্বিয়ানা আমরা চাই না। গ্রামের ছোট বড়, জানানা পুরুষ সব্বাইকে জিয়াফৎ না দিলে আমরা আমজাদকে

সমাজের বন্ধ দোষ। আহ্লাদে ভাইকে শ' টাকার ষাঁঢ় কিনে দিতে পারেন, আর গ্রামের লোককে খাওয়াতে পার্বেন না কেন?

২য় গ্রামবাসী—আলবৎ! ওসব চাল্‌বাজী আমরা খুব বুঝি। ফাঁকী দিতে খুব মজবুত। দেখি ওর ভাইয়ের বে'তে কে যায়।

৩য় গ্রামবাসী—বেসক! আমরা ওকে একঘরে কর্ব্বই।

শেখজি—দেখ, তোমরা আমজাদকে যত ছোট লোক মনে কর্চ্ছ বাস্তবিক সে তা নয়। হাতের টাকা গোপন করে সে তোমাদের খাওয়াবে না, একথা বিশ্বাস কর্ত্তেও ঘৃণা করে।

১ম গ্রামবাসী—হায়দর আলী ছেলের বে'তে আহ্লাদ করে বাজা বাজিয়েছিল, এখন কেমন জব্দ হয়েছে। কাফারা আদায় করে তবে ছেড়েছি। বেটা একটু বেযুত করে উঠিয়েছিল,—বলে তোমরা যে নামাজ পড় না তার কি? আমি অমনি মুখের উপর বলে দিলুম সেটা দেশাচার।

৩য় গ্রামবাসী—তা নয়ত কি? নামাজ রোজা না কর্লে তাদের সঙ্গে বেশ সমাজ চলে। বাজা বাজান যে কত বড় মহাপাপ তা আল্লাকে মালুম।

২য়—সুদখোর কিন্তু তার চেয়েও বেশী গোনাহগার।

৪র্থ—নাউজ-বিল্লাহ! ছিঃ! শেষকালে কি এমন পাপ নাম উচ্চারণ কর্লে! শুনতে পাই ওনাম নিলে গরুর কীড়ে খসে পড়ে।

শেখজি—আচ্ছা ভাই, সুদ দেনেওয়ালার নাম নিলে কি হয়? বোধ হয় কীড়ে খসে না, কিন্তু বাড়ে।

১ম—কি বেকুব! থাকার সঙ্গে পড়ার তুলনা।

শেখজি—তাত নিশ্চয়ই। কীড়ে খসে গেলেত লেঠা চুকেই গেল। বেড়ে গেলে তবেত সর্ব্ব-অঙ্গ খেতে পার্ব্বে। তোমরা সুদ দেবে, পাপী হবে, সর্ব্বস্বান্ত হবে, নিজের ঘরের টাকা দিয়ে অপরকে ধনী কর্ব্বে। কিন্তু গর্ব্ব কর্ব্বে তোমরা সুদখোর নও। সুদ দিয়ে আমরাই তো পাপের প্রশ্রয় দিই।

১ম—উপায় কি? পিছনে যে মরণ এসে চুল ধরে টানছে—আর বিনা সুদেই ঋণ দেবে কে?

৪র্থ—মরণ যদি এসে থাকে তা' হলে ভাই তাকে কি ওদিয়ে ফেরান যাবে। অন্য কোথাও গলদ্ আছে—খুঁজে দেখতে হবে। যাক্—আমজাদ সম্বন্ধে আমাদের কি কর্ত্তব্য ঠিক হল? এখনই যেতে হবে, অনেক কাজ রয়েছে।

১ম—ঠিক হল এই যে, আমজাদ জিয়াফৎ না দিলে তাকে জামাতে রাখা হবে না। এই যে পিয়ার আলী আসছে। ছোকরা নেহাৎ গো-মূর্খ। পিয়ার আলী মিঞা এদিকে কোথায় গেছেলে?

( পিয়ার আলীর প্রবেশ )

পিয়ার আলী—আপনাদের বরযাত্রী যাওয়ার জন্য বলতে এসেছি।

২য়—তোমার বিয়ে নাকি? বিয়েতে নাকি জিয়াফৎ দেবে না? জিয়াফৎ না দিলে তোমার বে'তে আমরা কেউ যাব না।

পিয়ার আলী—আপনারা না গেলে কি করে হবে? ভাইয়ের হাতে টাকা নেই, নইলে অবশ্যই জিয়াফৎ দিতেন।

১ম—ওসব তুমি কি বুঝবে ছোকরা? তার চালাকি তুমি কি করে টের পাবে! তোমার ভাই অনেক টাকা হাত করেছে।

৩য়—নিজের ছেলের বে হলে অবশ্যই সব্বাইকে খাওয়াত। বিয়েতে সব্বাইকে মন খুশী করে না খাওয়ালে মস্তবড় অকল্যাণ হয়।

পিয়ার আলী—তা যা বলেছ ভাই, সত্যি। দাদার ইদানীং আমার প্রতি কি রকম হাত টান হয়েছে। তোমরা যদি না যাও ফূর্ত্তি হবে কেন? জিয়াফৎ না দিলে আমি কিছুতেই বে' কর্ত্তে রাজী হব না।

১ম—তাইত বলি, পিয়ার আলী কি এমন বোকা ছেলে! চল হে এখন যাওয়া যাক। অনেক কাজ অমনি পড়ে রয়েছে। [ সকলের প্রস্থান।

---

## তৃতীয় দৃশ্য

দয়ালহরির বৈঠকখানা

দয়াল হরি—দেখ, বাবা আমজাদ! টাকা অনেক নিয়েছ। এক পয়সা সুদ দিতে পারনি। আজ আবার টাকার জন্য এসেছ। রেহাণ ছাড়া আর এক পয়সাও

ধার দোব না। টাকায় এক আনা হিসাবে সুদ দিতে হবে। সাবেক যে সব সাধারণ তমসুক আছে সে টাকাগুলি এই রেহাণের সামেল কর্ত্তে হবে। আর দেখ, সুদটা যেন চক্রবৃদ্ধিহারে দিলেই ভাল হয়। শ্রীহরি!

আমজাদ—আমার উপর বড্ড জুলুম হ'বে। তমসুকী টাকারও রেহেণি দলিল করে দিতে বলছেন। তার উপর চক্রবৃদ্ধি। একেবারে মারা যাব যে, সা'জি মশায়।

দয়াল হরি—দেখ, আমার ত আর চাষ আবাদ নেই, এই আমার ব্যবসায়। সুদ নিই বলে কত লোকে একটু ঘৃণাও করে। সব আমাদের সহ্য কর্ত্তে হয়। কত লোকে টাকা নিয়ে একেবারে গায়েব করে ফেলে। সুদ পাব দূরে থাক, আসল টাকাটাও ঘরে ফিরে আসে না। তোমাদের সঙ্গে আজ তিন পুরুষ অবধি কারবার। তোমাকে আমি ছেলেবেলা থেকে স্নেহের চোখে দেখি। তুমি এসেছ বলে তোমার খাতিরে আমি একআনা হিসাবে সুদ চেয়েছি। তা না হ'লে এ সময় টাকায় দু'আনার কম সুদে, কখনও টাকা ছাড়তুম না। হরি হে তুমিই সত্য!

আমজাদ—আপনি একটু মেহেরবানী করে থাকেন জানি, কিন্তু আমি বড় বিপন্ন হয়ে এসেছি। গ্রামের সব লোক জুট বেঁধেছে। জিয়াফৎ না দিলে আমাকে এক ঘরে কর্ব্বে। ছোট ভাইয়ের বদ্‌মেজাজির জন্য প্রায় শতখানি টাকায় তাকে একটা ষাঁড় কিনে দিয়েছি। বাজি, বন্দুক, লেঠেল ইত্যাদিতে অনেক টাকা ব্যয় হবে। সুদ কম করে নিতে হবে সাজি মশায়, নইলে আমি মারা যাব। রেহাণ পূর্ব্বে কিছু দিয়েছি, এবার না হয় আর কিছু দোব।

দয়ালহরি—দেখ বাপু, আমি অন্যান্য মহাজনের মত কাউকে সর্ব্বগ্রাস কর্ত্তে ইচ্ছা করি না। তোমাদের কাছ থেকে কিছু কিছু নিয়েই বেঁচে আছি। আচ্ছা তুমি যখন আপত্তি কচ্ছ, তোমাকে আরো আট আনা ছেড়ে নিলুম। তুমি পৌণে ছ' টাকা করে সুদ দিও। গৌরাঙ্গ!

আমজাদ—তা হবে না। আমি তিন টাকার বেশী কিছুতেই দিতে পার্ব্বো না।

দয়াল হরি—অত কমে টাকা দিতে পার্ব্ব না। তুমি অন্যত্র দেখগে।

আমজাদ—বড় বিপদে পড়ে আপনার কাছে এসেছি। ফিরিয়ে দিলে আমার মান-মর্য্যাদা সব যাবে।

দয়াল হরি—পাঁচ টাকার এক আধলা কমেও আমি টাকা দিতে পার্ব্বো না। এর চেয়ে যদি কম দিতে চাও, তবে আমার গলায় ছুরি বসিয়ে দাও।

আমজাদ—গরীবের উপর আর একটু নেকনজর কর্ত্তেই হ'বে। চার টাকার উপর আমি কিছুতেই উঠতে পার্ব্বো না।

দয়ালহরি—কি আর বলব, তুমি পুরাণো খাতক, আচ্ছা স্বীকার কর্চ্ছি। তুমি কাল এস।

আমজাদ—উপকৃত কর্লেন, গরীবের সম্মান বাঁচালেন। আসি তবে। [ প্রস্থান।

দয়ালহরি—সব্বাই বলে আমজাদের জমিগুলি খুব লায়েক। যে ফাঁদ পেতেছি, চাঁদ ধর্ব্বই। জমিগুলি হাত করা চাই-ই। হরি হে, তোমার ইচ্ছা! [ প্রস্থান।

---

## চতুর্থ দৃশ্য

আমজাদের কক্ষ

রোকেয়া—অত টাকা পয়সা খরচ করে ভাইকে সাদী দিয়ে নিয়ে এলে, কিন্তু বউত তোমার কোন উপকারেই এল না। শুনলুম "ছোট মিয়া" নাকি শাশুরবাড়ীতে থাকতে যাচ্ছেন।

আমজাদ—তা যাক। গেলে কি ধরে রাখতে পার্ব্ব? সব দলিলগুলিই আমার নামে লেখা হয়েছে, ঐ যা একটু ভয়। কি কর্ব্ব ভাইয়ের আব্দার আর মায়ের জিদ না রেখে পালুম না। গত বৎসর ওর বিয়ে না দিয়ে ঋণ শোধ কর্লে, এ বৎসর মহাজন টাকা দিতে ইতস্ততঃ কর্ত্ত না। সুদ দিতে পারি নাই, নূতন ঋণ করেছি এ বছর। এ বছর কিছু সুদ দিতে না পার্লে মোটেই টাকা পাওয়া যাবে না। বৎসরের গতিক যেরূপ মন্দ দেখছি শেষকালে না খেয়ে মর্ত্তে না হয়। এখনও সব জমিতে বীজ পড়ল না।

রোকেয়া—তুমি বুঝ সব অথচ কাজে কিছুই কর্ব্বে না। তারা যা বলবে তাই শুনবে। ভাইটিত তোমাকে

ছাড়ব ছাড়ব কর্চ্ছে, ঋণ সব তোমার ঘাড়েই পড়বে। এতদিন এই সংসারে খেটে খেটে আমারও শরীর নষ্ট হ'য়ে গেছে। হ্যা-গা, সর্ব্বশুদ্ধ তোমার ঋণ কত?

আমজাদ—সে হিসেব কল্লে অনেক হ'বে। সুদের কথা শুনলে তুমি চম্‌কে উঠবে। শতকরা মাসিক চার টাকা। বাস্ত ভিটাখানা ছাড়া আর সব রেহেণ রেখেছি। ঋণের পরিণাম হাজার হ'বে।

রোকেয়া—তবেইত সর্ব্বনাশ করেছ। দু' বছর যদি সুদ দিতে না পার তবে সুদে আসলে প্রায় দু' হাজার পুরবে।

আমজাদ—গত বৎসর কিছু দিতে পারিনি। এ বৎসর কিছু দোব আশা করেছিলাম। বৎসরের ভাব দেখে মনে হয় এবার আরো কিছু ঋণ নিতে হ'বে। দয়ালহরি চক্রবৃদ্ধি সুদ লিখতে জিদ ধরেছিল। অনেকবার বলেছি দু'বছর যদি সুদ দিতে না পারি তবে চক্রবৃদ্ধি সুদ দোব।

রোকেয়া—সে কি গো? সুদের আবার নাম থাকে নাকি? অমন নাম ত কখনও শুনিনি।

আমজাদ—শুননি—এই শুনলে। দু'দিন পরে দেখবে সুদটা বৎসরান্তে আসলে পরিণত হ'বে।

রোকেয়া—তা হ'লে তুমি আমাদের ভিটেছাড়া না করে ছাড়বে না?

আমজাদ—ভিটেছাড়া হলেও যে ঋণে ছাড়বে না। খোদাতালা যেন কাউকে ঋণদায়ে না ফেলেন।

রোকেয়া—সবি তার ইচ্ছা! তবে মানুষকেও একটু বুদ্ধি আকেল খাটাতে হয়! আমরা যদি একটু বুঝে চলতে পারি, তবে দেশে এত অকল্যাণ হয় না।

আমজাদ—ঠিক বলেছ রোকেয়া! বাঙ্গালার চাষীদের মধ্যে পৌনে ষোল আনাই মুসলমান আর তার অধিকাংশই নিরক্ষর। নইলে আর কোন দেশেই কৃষকের এমন দুরবস্থা নাই।

রোকেয়া—তুমি হয়ত সব সময়েই মনে কর আমি বুঝেও বুঝি না কেন? তার কারণ এই, আমি যাদের নিয়ে বুঝব, সেই তোমরা হচ্ছ সব অবুঝ।

রোকেয়া—কই আমিত কখনও তোমার অবাধ্য হইনি?

আমজাদ—তা হচ্ছ না। কথা হচ্ছে এই যে, দশজনকে নিয়ে সংসার, সংসার একজনকে নিয়ে নয়। এই দশ জনকেই বুঝতে হ'বে, শিখতে হ'বে।

রোকেয়া—সেত ঠিক বলেছ।

আমজাদ—বল্লেত ঠিক, কিন্তু এসব হয় কই? ঘরে ঘরে মুষ্টিভিক্ষা কর্লে তা থেকে বেশ একটা নৈশ স্কুল কিম্বা মাদ্রাসা খোলা যায়। কৈ এ পোড়াদেশের লোকের মধ্যে সে একতা আছে কি?

রোকেয়া—হ্যাগা এবার ধান বেশী বুনো! ঘরে ধান থাকলে ভাতের অভাব হয় না। জান তাজা থাকে।

আমজাদ—তাত থাকে কিন্তু এখন বেশী জমিতে ধান বুনলে মহাজনের সুদ আর জমিদারের খাজানা দোব কি করে?

রোকেয়া—ধান জন্মাতে যে খরচ, পাট জন্মাতে তার চেয়ে ঢের বেশী খরচ। ধানে যদি বছর খরচ চলে যায়, তা হ'লে পাট যা বুনবে, তা থেকে যতটা সম্ভব মহাজনের সুদ আর খাজানা দেবে। নূতন যদি ঋণ কর্ত্তে না হয় তবে যা দেবে তাই শোধ হ'বে।

আমজাদ—এরকম হিসেব যখন অল্প টাকা ঋণ ছিল তখন কর্লে ভাল হত। এখন ঋণে গলা অবধি ডুবে গেছে। না খেয়ে ভিটেয় পড়ে মর্লেও এখন মহাজনের সুদ আগে দিতে হ'বে। তুমি তবে এখন তোমার কাজ দেখগে, আমি একটু বেরোব।

রোকেয়া—( যাইতে অগ্রসর হইলেন। )

আমজাদ—আর দেখ, পীয়ার আলী এলে সে যেন ডাক্তার-খানায় একবার যায়—মার অসুখটা বাড়ছে মনে হয়।

রোকেয়া—সে তোমার ডাক্তারখানায় যাচ্ছে বলে! ভর গ্রীষ্মকালে পায়ে ইষ্টিকান্ লাগিয়ে, গরম কোট গায়ে দিয়ে সে চলেছে শশুড় বাড়ী।

আমজাদ—আজই, কেন?

রোকেয়া—তার শাশুড়ীর পেটের অসুখ করেছে—না গেলেই না।

আমজাদ—রোকেয়া তুমি মার কাছে যাও—আমি চল্লুম। এই সব দেখে শুনে আমাদের সমাজ সম্বন্ধে ভাবতে এক একবার ভয়ে আমার দম আটকে আসে।

[ প্রস্থান।

———

## পঞ্চম দৃশ্য

দয়ালহরির বৈঠকখানা

আমজাদ—বাবু, আপনাকে মিনতি কচ্ছি। আমি জমি জমা সব বেচে আপনাকে দিচ্ছি, শুধু আমার বাস্তু-ভিটাটুকু ছেড়ে দিন! বাপ পিতামহের আমলের বাস্তুখানা ছেড়ে যেতে বড় কষ্ট হয়।

দয়ালহরি—তা আমি কি কর্ব্ব! তোমার বাড়ী জমি যা' ক্রোক করেছি তাতে আমার সুদেই কুলোবে না। বাকী টাকার কি কর্ব্বে, তাই ভাবগে!

আমজাদ—আপনি দয়াবান। আপনি একটু অনুগ্রহ কর্লেই ভিটেটুকু থেকে যায়। আমরা সর্ব্বস্বান্ত হচ্ছি, এ দেখেও কি আপনার একটু দয়া হচ্ছে না?

দয়ালহরি—দেখ বাপু, অত দয়া দেখাতে গেলে, আর চোখের জলে ভিজে গেলে, মহাজনী ব্যবসায় চলে না, বুঝলে? মহাজনের কাছে দয়া চাওয়া অন্যায়। তারা যে অনুগ্রহ করে টাকা ধার দেন, তাই যথেষ্ট।

আমজাদ—তা অস্বীকার কচ্ছি না। টাকা দিয়েছেন, উপকার করেছেন। উচিত গণ্ডা হিসেব করে বুঝে নেবেন! আমরা যে সেটা বুঝে দিতে পারি না, আমাদেরই অন্যায়।

দয়ালহরি—তবে ত বুঝই বাবা, আমরা বেশী চাই না। উচিত টাকা হিসেব করে নিয়েছ, হিসেব করে দিলেই আমরা উপকৃত হই।

আমজাদ—আপনাদের উপকৃত কর্ব্বার মত শক্তি আমাদের মত গরীবের নাই। বিপদের সময় টাকা ধার দিয়ে বরং আপনারা আমাদের উপকৃত করেন।

দয়ালহরি—তবেত সব বুঝই, আবার বিরক্ত কর কেন?

আমজাদ—ইচ্ছা করে বিরক্ত কর্ত্তে আসি না, খুব বিপদে পড়েই আসি।

দয়ালহরি—এস বেশ কর। এখন যাও আমার স্নানাহার হয়নি।

আমজাদ—অনেকদিন অনেক টাকার সুদ আপনাকে দিয়েছি। আজ একটু সামান্য অনুগ্রহ ভিক্ষা বোধ হয় তত অসঙ্গত হয়নি? আপনি ইচ্ছা কর্লে গরীবের উপকার কর্ত্তে পারেন।

দয়ালহরি—অনুগ্রহ আবার কি? দয়া করে যে এতদিন বাড়ীতে রেখেছি, অনেক আগেই নালিশ করে ভিটে ছাড়া করিনি—তাই যথেষ্ট।

আমজাদ—তবু বেহায়ার মত আবার বলছি, মশায় ভিটাটা ছেড়ে দিন।

দয়ালহরি—তুমি সোজা কথায় বিদায় হ'বে না দেখছি। কি পাপ! আমি যেন জুলুম করে ওর বাড়ী জমি সব নিলেম করাচ্ছি।

আমজাদ—অনেক রোগ ভোগের পর মা সেদিন মারা গেলেন। নানারকমে আমি জড়িয়ে পড়েছি। আমাকে রক্ষা করুন!

দয়ালহরি—আমার কাছে কিছু রক্ষা কবচ নাই। তুমি যা বুঝ করগে। কি আপদ!　　　[ প্রস্থান

আমজাদ—হায়রে, কি নির্ম্মম এই প্রস্থান! কুসীদগিরীর প্রাণ! আজীবন এর সুদ গণেছি। আজ এত টাকার সম্পত্তি ঋণের জন্য ওর হস্তগত হ'চ্ছে, তবু ওর কাছে একবিন্দু অনুগ্রহের প্রত্যাশা নাই। সুদ নেওয়া কেন হারাম আজ তা' বেশ টের পেলুম, জীবনে কখনও এ শিক্ষা ভুলব না।　[ দুঃখিত ভাবে প্রস্থান।

---

## ষষ্ঠ দৃশ্য

পিয়ার আলীর শ্বশুর বাড়ী

আহ্লাদী—দেখ, তোমার মত নানন্দ পুরুষের কোন কথা না শুনলে কি হ'বে? তোমার যা ক্ষমতা তা আর আমার জানবার বাকী নেই। এতদিন অবধি বে' হয়েছে একটা শাড়ী, একটা আর্শি, একটা সাবান, একটা চিরুণী কিছুই দিতে পার্লে না। শশুর বাড়ীর কুত্তা হ'য়ে রয়েছ, সরম করে না?

পিয়াল আলী—তুমি যে কেন আমার উপর এত বিরূপ হ'য়েছ, তা ভেবে পাচ্ছি না। আমিত মোটেই তোমাকে কোন কথা বলি নাই।

আহ্লাদী—তুমি আবার বলবে কি? তোমার তোয়াক্কা কে রাখে? নিজের ভাইয়ে লাথি মেরে তাড়িয়ে দেছে, পরের ঘাড়ে এসে সওয়ার হ'য়েছ—

পিয়ার আলী—কথাটা কি মোটেই বুঝতে পাল্লাম না। তুমি যে কেন আমার উপর এমন রাগ কর্চ্ছ, তা

আমার বুদ্ধিতে কিছুতেই আসছে না। আমি যদি নেহাত তোমার চক্ষুঃশূল হয়ে থাকি, না হয় আমি অন্য কোথাও সরে যাই।

আহ্লাদী—আমাকে ছাড়ান দেবে? অ—মা! তোমার ভেতরে এত শয়তানী কে জানে? অ-মাগো! এমন আজাজিলের হাতে আমায় কেন দিয়েছিলে গো? (ক্রন্দন)

(আহ্লাদীর মাতার প্রবেশ)

আহ্লাদীর মাতা—কি হয়েছে বাছা? এমন করে কি পরের মেয়েকে রোজ মাত্তে হয়? মার খেতে খেতে বাছা আমার দিন দিন শুকিয়ে যাচ্ছে। দেখ বাপু, পরের ছেলে! তুমি রাতদিন আমার বাছাকে এমন জ্বালাতন করো না। তোমার যদি না পোষায় তুমি দেখেশুনে আর একটা সাদী করগে।

আহ্লাদী—তবেরে, পোড়ারমুখো মিন্‌ষে, আমার তুমি তালাক দেবে?

আহ্লাদীর মাতা—কিলা, তালাক দেবে কি?

পিয়ার আলী—আমিত তালাক দোব বলিনি না! আপনি মুরুব্বি আপনি বিচার করে দেখুন!

আহ্লাদীর মাতা—আমি আর কি বিচার কর্ব বাপু? তুমিত রাতদিন ওর পেছনে লেগেই আছ। মেয়ে সাদী দেয় শ্বশুর বাড়ী যাবে বলে। এমন হাড়হাবাতের সঙ্গে বাছার সাদী দিয়েছিলুম যে, হাড় জ্বালিয়ে দিলে। এক পয়সা রোজগার নেই, অমন ভৈষের মত জওয়ান, শুধু বসে বসে খাবে।

পিয়ার আলী—রোজত মাঠে কাজ করি। আজ একটু শরীরটা বেযুত লাগছে বলে মাঠে যাইনি।

আহ্লাদীর মাতা—তুমি যা খাট তা সব্বাই জানি। অত কথার দরকার নাই। তোমার শ্বশুর এলে বলে দূরে সরে যাও। মেয়ে-জামাই দূরে থাকা ভাল, তবু এমন কাছে থেকে হাড় জ্বালান ভাল নয়। [প্রস্থান।

আহ্লাদী—কেমন হয়েছে ত? শ্বশুরবাড়ী থাকতে হ'লে বৌয়ের গোলাম হয়ে থাকতে হয়। অত কথা শিখেছ, এমন সোজা কথাটা শেখনি?

পিয়ার আলী—শিখেছি সব। যা বাকী ছিল আজ তোমাদের মায়ে ঝিয়ে তা শিখিয়ে দিলে। নিজের কাণ নিজে মলছি। শ্বশুরবাড়ী যেন কেউ না থাকে। ভাই, নিজের একমা'র পেটের ভাই যদি দুষমণও হয় তার সঙ্গে থাকা ভাল। তবু শ্বশুরবাড়ীর আদর সোহাগে ভুলে শ্বশুরবাড়ী থাকা ভাল নয়। মায়ের আহ্লাদে বেড়ে উঠেছিলাম। ফেরেস্তার মত বড় ভাই তাকে চিনতে পারিনি। আজ অনুতাপ হচ্ছে, কেন ভাইয়ের পরামর্শ শুনিনি। শুনেছি দয়ালহরির টাকার জন্য বাড়ী-ঘর-দোর সব নিলাম হয়ে গেছে। আজ ভাই আসাম, খোলাবান্দা যাবেন। ভাইয়ের পায়ে ধরে কাঁদব, যদি সে সঙ্গে নেয়। নিজের স্ত্রী এমন উদ্ধত, বেয়াদব হতে পারে কখনও চিন্তাও করিনি। দেখ, আহ্লাদী, যদি কোন দিন আপনি খুঁজে আমার বাড়ীতে যাও, তবে তোমায় গ্রহণ কর্ব্ব, নইলে এই শেষ।

[ বেগে প্রস্থান।

আহ্লাদী—সত্যি, সত্যি, চলে গেল নাকি? [ প্রস্থান

## সপ্তম দৃশ্য

ব্রহ্মপুত্র নদের তীরে ষ্টীমার ষ্টেশন

(ব্রহ্মপুত্র নদ বহিয়া যাইতেছে। বালুকাময় তীরে যাত্রীরা উপবিষ্ট। আমজাদ তাহার শিশুপুত্রকে লইয়া একখানা জীর্ণ মাদুরের উপর বসিয়াছিল। অদূরে তাহার স্ত্রী একটী জীর্ণ বোরাকা পরিধান করিয়া অতিশয় লজ্জিত ভাবে বসিয়া।)

কোরবান—বাবা, রাত হলে আমরা কোথায় থাকব?

আমজাদ—খোদাতালা যেখানে রাখেন, সেইখানে থাকবে বাবা! জাহাজের ডেকে শুয়ে থাকবে, কোন রকমে রাত কেটে যাবে।

কোরবান—জাহাজের লোকেরা থাকতে দেবে? তারা মার্ব্বে না? দয়ালহরি আমাদের তাড়িয়ে দিয়েছে, না—বাবা? এরা যদি তাড়িয়ে দেয় তা হ'লে কি হবে? (একটু বিমর্ষ হইল)

আমজাদ—এরা তাড়াবে না। আমরা ভাড়া দোব।

কোরবান—এরা তাহ'লে দয়ালহরির চেয়ে ঢের ভাল, কি বল বাবা?

আমজাদ—পয়সা দিতে না পার্লে ষ্টীমারেও উঠতে দেয় না। আমরা পয়সা দিয়েছি তাই আমাদের উঠতে দেবে।

কোরবান—আমাদের ত পয়সা নেই বাবা, তুমি পয়সা কোথায় পেলে ?

আমজাদ—তোমার মামা পাঠিয়ে দেছেন। আসামে গেলে দেখবে সেখানে তোমার মামাদের অবস্থা বেশ ভাল হ'য়েছে।

কোরবান—আচ্ছা বাবা, সেখানে স্কুল আছে ? সেখানকার ছেলেরা স্কুলে পড়ে ?

আমজাদ—জানিনা বাবা, হয়ত নেই।

কোরবান—তা হ'লে সেখানে ছেলেরা লেখাপড়া শেখে কোথায় ?

আমজাদ—বলছিত জানি না। না যদি থাকে তবে ক্রমশ: হবে।

কোরবান—স্কুল না থাকলে আমি তোমার কাছে পড়ব। বাবা! দেখ, ঐ লোকগুলো নদীর পানে চেয়ে এক-দৃষ্টে কি দেখছে ?

আমজাদ—ওরা সব যাত্রী। ষ্টীমার আসছে কিনা তাই দেখছে।

কোরবান—আমাদের বাড়ীতে ফিরে চলনা বাবা! ঐ জাহাজ আসছে শুনতেই আমার প্রাণটা বড্ড ঘাবড়াচ্ছে!

আমজাদ—আমাদের কি বাড়ী আছে বাবা, তাই ফিরে যাব। ষ্টীমারে উঠলেই তোমার আনন্দ হবে। এত ভয় কর্ব্বে না।

কোরবান—আমাদের বাড়ী দয়ালহরি নিলে, তুমি তাকে নিতে দিলে কেন ?

আমজাদ—সে মহাজন। তার কাছে টাকা ধার করে-ছিলাম। টাকা দিতে পারিনি তাই সে নিলেম করে নিয়েছে।

কোবান—তুমি টাকা ধার দাওনি কেন বাবা ? তা হ'লে তোমার অনেক টাকা হত।

আমজাদ—আমরা যে গরীব আমরা টাকা কোথায় পাব ?

কোরবান—গরীব হ'লে তাকে আসাম যেতে হয়, না—বাবা ? গরীব হওয়া বড্ড খারাপ।

আমজাদ—আমরা বুঝে চল্লে অত ঋণগ্রস্ত হই না—আমাদের অবস্থাও এত মন্দ হয় না।

কোরবান—ও কিসের শব্দ বাবা ? ওঃ! কি শব্দ! কাণে তালা লেগে যায়!

আমজাদ—ষ্টীমার নিকটে এসেছে তাই ভোঁ দিচ্ছে।

( হাঁফাইতে হাঁফাইতে পিয়ারআলীর প্রবেশ )

পিয়ারআলী—ভাই, তোমার দু'টি পায়ে পড়ি, আমাকে মার্জ্জনা কর। আমাকে তোমার সঙ্গে নাও। আমি না বুঝতে পেরে তোমার অবাধ্য হয়েছিলাম। আর কখনও তোমার অবাধ্য হ'ব না। স্বাধীন হওয়ার মজা খুব টের পেয়েছি।

আমজাদ—কে পিয়ার আলী—এস, ছোট ভাইটি আমার! ( আলিঙ্গন ) আমি তোমাকে কখনও অনাদর করিনি। তুমি আপন ইচ্ছায় আমাকে ছেড়ে গেছলে, আবার আপন ইচ্ছায় ফিরে এসেছ। এতদিন তোমায় না পেয়ে আমি হাতভাঙ্গা হয়েছিলাম। আজ তোমাকে পেয়ে আমার বাহুতে দ্বিগুণ বল হয়েছে। দুটি ভাইয়ে প্রাণ-পাত চেষ্টা কর্লে আবার আমরা অবস্থা উন্নত কর্ত্তে পারব।

কোরবান চাচা! তুমি এতদিন আসনি কেন ?

পিয়ারআলী—এস বাবা, আমার কোলে এস।

কোরবান—চাচা, তুমি আমাদের সঙ্গে যাবে ?

পিয়ারআলী—হাঁ।

কোরবান—চাচা, কোথায় গিয়েছিলে তুমি ?

পিয়ারআলী—বেড়াতে গিয়াছিলাম—পথ ভুলে গিয়ে-ছিলাম—তাই ফিরতে এত দেরী—এখন তো ফিরে এসেছি—

আমজাদ—চল ভাই, এস কোরবান আমরা ষ্টীমারে উঠিগে। ভাই তুমি তোমার ভাবীকে নিয়ে এস। আমি জিনিষ-গুলি নিয়ে উঠি।

পিয়ারআলী—জিনিষ যা আছে আমি নোব। আপনি খোকাদের নিয়ে আসুন।

( ষ্টীমার ছাড়িয়া দিল। ষ্টীমারের রেলিঙ্ ধরিয়া এক কোণে দাঁড়াইয়া শ্যামল তীরের দিকে চাহিয়া আমজাদের চোখ জলে ভরিয়া আসিল )

আমজাদ—হায়, ঘর-ছাড়া হলুম আজ! প্রিয় জন্মভূমি! বাল্যাবধি তোমার কোলে বর্দ্ধিত হয়েছি। বাল্যের সকল স্মৃতি তোমারই বুকে অঙ্কিত। মহাজনের ঋণ আর সুদের উৎপীড়নে তোমায় ছেড়ে যাচ্ছি। তোমায় ছেড়ে যাচ্ছি কিন্তু তোমার স্নেহ কখনও ভুলবনা, ভুলতে পার্ব্বনা। আমি হতভাগ্য নইলে জন্মভূমি ছেড়ে চলে যাব কেন ? বিদায় দিনের শেষ অভিবাদন কি দিয়ে জানাব—মা ? উৎপীড়ন, অত্যাচারে চোখের জল ফুরিয়ে গেছে, তাই জননীকে আজ ভক্তি-উৎসের উষ্ণ, তপ্ত দু'ফোটা নিংড়ানো আঁখির ধারায় অভিনন্দিত কচ্ছি। আর খোদার কাছে প্রার্থনা জানাই যেন আমার এই অশ্রু-জলে গরিব মুসলমান চাষার ভিটের মাটী শ্যামল হয়ে উঠে!

---

# নারী-হরণ

[ পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর ]

[ মোহাম্মদ শাহ্‌জাহান ]

—০০০—

( ১২ )

গোলামী বড় সাংঘাতিক মোহ। ও মোহে যিনি আচ্ছন্ন, তাহার আত্মসম্মান জ্ঞান প্রায়ই থাকে না। আত্ম-মর্য্যাদা জ্ঞানহীন মানুষ মানুষই নয়। কৃতান্ত বাবুও এই হিসাবে মানুষ ছিলেন না। এই একান্ত প্রভুভক্ত জীবটা অবশেষে কন্যার নারী-সম্মানের বিনিময়ে গোলামী পদ আরও সুদৃঢ় করিয়া সত্যই আনন্দিত ছিলেন। কন্যার কলঙ্কিত জীবন অপেক্ষা স্বার্থই ছিল তাঁহার চরম সাধনা। মনিবকে তুষ্ট রাখিয়া কেমনভাবে সেই অভিষ্ট স্বার্থ সিদ্ধ করিবেন—এই ছিল তাঁহার বড় চিন্তা। কিন্তু সমস্ত কাজের যেমন পরিণাম আছে, সেই রকম কৃতান্ত বাবু এই কুৎসিত আচরণ দ্বারা এক দিকে লাভবান হইলেও অন্যদিকে তাঁহার কন্যা উষা অধঃপতনের চরমে পৌছিল। প্রথম প্রথম উষার ইহাতে একটা আনন্দ ছিল। কিন্তু এখন সে বুঝিল, সতীত্বই নারীর সর্ব্বশ্রেষ্ট আনন্দ। ইউরোপে আসিবার পূর্ব্বে ইহা সে কতকটা বুঝিয়াছিল বলিয়াই দেশ পর্য্যাটনে তাহার মত ছিল না। অবশেষে রাজার একান্ত পীড়াপীড়িতে তাহাকে সে মত ত্যাগ করিতে হয়। অথচ গোপন কথাটা কাহাকেও খুলিয়া বলিতে পারিল না। ফলে আজ তাহার অন্য সমস্ত চিন্তা অপেক্ষা নিজের আত্ম-সম্মানের দিকে বেশী দৃষ্টি পড়িয়াছে। কিন্তু এখন আর প্রতিকারের সময় নাই!

কিছু দিন হইতে রাজাবাহাদুর উষার সহিত সমস্ত সংশ্রব ত্যাগ করিয়াছেন। সেই হাসি, সেই আনন্দ, এক দিন যাহা কতই উদ্দাম ছিল; আজ তাহা অত্যধিক বিতৃষ্ণভাবে তাহাদের উভয়ের মধ্যে একটা ঘৃণার-ভেদ রেখা টানিয়া দিয়াছে। যে উষাকে লইয়া রাজা বাহাদুর আনন্দ সাগরে ভাসিয়াছিলেন, যাহার জন্যই এ ইউরোপ অভিযান, সেই উষার বিভৎস পরিণতিতে তাঁহার সাধের আনন্দতরী অভিশাপের সৈকত-ভূমিতে আবদ্ধ হওয়ায় তিনি উষার উপর বিরূপ হইলেন। তাহার একটা কারণও জুটিয়া গেল।

কতিপয় নামজাদা নর্ত্তকী রাজা বাহাদুরকে মাঝে মাঝে আনন্দ দান করিত। তাহাদের মধ্যে মিস্ হেলেনা কোহেন ছিল সর্ব্বশ্রেষ্ট সুন্দরী। মিস্ কোহেনের অসাধরণরূপ ও কলাবিদ্যায় রাজাবাহাদুর একান্তই মুগ্ধ। মাসিক দশ হাজার টাকা মাহিনায় তাহাকে তিনি একেবারেই এক চেটে অধিকারে রাখিয়াছেন। উষার জন্য তাঁহার যে অসুবিধা হইয়াছিল তাহা আর নাই। কএকদিন হইল মিস্ কোহেনের সহিত রাজাবাহাদুর হলাণ্ডে গিয়াছেন, কথা হইয়াছে, উষার প্রসবের পর তাঁহারা প্যারিসে ফিরিয়া আসিবেন। এবং পরে ইউরোপ ভ্রমণের অমৃত লাভ স্বরূপ মিস্ কোহেনকে লইয়া রাজাবাহাদুর সাগর পাড়ী দিবেন।

সে দিন অপরাহ্নে মর্ত্তের নন্দন প্যারিস নগরী যেন হাসিয়া হাসিয়া লুটাইয়া পড়িতেছিল। নন্দনবাসিরা তখন রাস্তায় রাস্তায় অবাধ আলাপে মত্ত। দ্বিতলের বারান্দায় উষা স্তব্ধভাবে বসিয়াছিল। পরিচারিকা আসিয়া বলিল,—"বৈকালিক আহার প্রস্তত।"

উষা বলিল, "ক্ষুধা নেই এখন—কিছু খাব না।" পরি-চারিকা চলিয়া গেল।

প্রত্যহ একবার যে প্রাচীনা আসিয়া থাকেন, তিনি আজও আসিলেন। অভিবাদন জানাইয়া উষা তাঁহাকে বসিতে বলিল। প্রাথমিক আলাপকুশলের পর বৃদ্ধা

"রাজা সাহেব কতদিন পরে ফিরবেন মা" জিজ্ঞাসা করায় উষা বলিল, "আমি লিখ্‌লেই আসবেন। তবে আমার ইচ্ছা নয় যে, তিনি এই সময় আসেন।"

"প্রসবের পরেই স্বদেশে যাচ্ছেন বুঝি ?"

"রাজা বাহাদুর ফিরে আসলেই সে ব্যবস্থা করব। কিন্তু তিনি যত বিলম্ব করেন ততই ভাল।"

"স্বামীর সঙ্গে বুঝি মনান্তর হয়েছে আপনার ?"

"না, তাও হয়নি মা !"

উষার উত্তর শুনিয়া বৃদ্ধা সত্যই চটিয়া গেলেন। যে দেশের পুরুষগুলি নারীর সুখ স্বচ্ছন্দতার জন্য আদৌ দায়ী নহে, তাহাদের প্রতি তিনি মনে মনে অভিসম্পাত করিলেন। তীক্ষ্ণ কণ্ঠে তিনি বলিলেন, "যে স্বামী স্ত্রীর উপর এমন অত্যাচার করে সে স্বামী নহে—ভয়ঙ্কর দস্যু ! আমরা হ'লে অক্ষরে অক্ষরে এর প্রতিশোধ নিতেম। কিন্তু ভারতীয় নারী তোমরা পুরুষের মাত্র সেবিকা, আর কিছু না।"

অন্য দিনের মত যে সম্বোধনে বৃদ্ধা উষার সহিত কথা বলিতেছিল, সে যে তাহা অপেক্ষা কত নিকৃষ্ট জীব—তাহা গোপন রাখা আজ তাহার পক্ষে একান্তই অসম্ভব হইয়া উঠিল। সসঙ্কোচে উষা বলিল, "কিন্তু আমি ত রাজা বাহাদুরের স্ত্রী নই মা ! আমি অভাগিণী।"

বৃদ্ধা সমস্তই বুঝিলেন। কিন্তু উষা যাহা ভাবিয়াছিল তাহা হইল না। উষার ধারণা ছিল, তাহার প্রকৃত পরিচয়ে প্রবীণা না জানি তাহাকে কতই ছোট মনে করিবেন। কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া বৃদ্ধা বলিলেন, "কিন্তু তোমার সর্ব্বনাশকারী তোমাকে ফেলে গেলেও ভগবান তোমাকে রক্ষা করবেন। আমরা পশু নই মা ! আমরাই তোমাকে সাহায্য করব।" বৃদ্ধার কোন কথার উত্তর না দিয়া উষা তাহার দিকে বেদনা ভরা কৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল।

আরও মাস খানেক পরে রাজা বাহাদুর পত্র পাইলেন যে, উষা খুব পীড়িতা। সেই দিনই তিনি হলাণ্ড হইতে রওয়ানা হইলেন।

উষার নিকট যে সামান্য অর্থ ছিল তাহা সমস্তই নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে। কএক দিন হইল পুত্র প্রসব করিয়া সে অর্থাভাবে অনাথ আশ্রমে আশ্রয় লইয়াছে। আশ্রমের অধ্যক্ষই রাজা বাহাদুরকে সমস্ত কথা লিখিয়াছেন।

রাজা বাহাদুর প্যারিসে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া উষার সমস্ত অসুবিধা মোচন করিলেন। উষার সে স্বাস্থ্য সম্পদ আর ছিল না। কিন্তু তাহাতেও সে দুঃখিত নহে। মাতৃত্বের বাস্তব পরিণতিতে তাহার সেই ক্ষীণ তনুর মধ্য দিয়া একটা পরিপূর্ণ আনন্দের লহর খেলিয়া যাইতেছে।

মিস্ কোহেনকে লইয়া রাজা বাহাদুর যে দিন প্রথম মাতিয়াছিলেন, সেদিন উষার মনে বড়ই অভিমান হইয়াছিল, কিন্তু সে যখন বুঝিয়া দেখিল—রাজার উপর ত তাহার কোন অধিকার নাই, তখন হইতে এই অভিমান তাহার নিজের কলঙ্কিত জীবনের উপর আঘাত করিতেছিল। কেমন করিয়া আর সে স্বসমাজে মুখ দেখাইবে ? যদি তাহার সন্তানটী বাঁচিয়া থাকে, তবে সেই নিষ্পাপ শিশুর দুর্ভোগ জীবন কতই না অসহণীয় হইবে, এইরূপ চিন্তাতেই সে বিভোর থাকিত। কিন্তু পুত্রমুখ দর্শনের পর তাহার সে সমস্ত চিন্তা কোথায় উড়িয়া গিয়াছে ! এখন সমস্ত জগৎ তাহাকে ত্যাগ করিয়া যাক, মানব সমাজ তাহার কলঙ্ক-গাথা গাহিয়া ঘৃণা প্রকাশ করুক, কিন্তু সে কিছুতেই পরোওয়া করিবে না। খোদা তাহাকে যে শ্রেষ্ঠ রত্ন দান করিয়াছেন তাহা বুকে করিয়া সে জগৎ সমক্ষে সগর্ব্বে বলিবে, সে আর কিছুই চায় না ! সে চায় একমাত্র ডাক মা—মা—মা !

ঠিক তাই হইল। কয়েক দিন পরে রাজাবাহাদুর পত্র পাইলেন। শীঘ্র দেশে পৌছান আবশ্যক বলিয়া কৃতান্তবাবু পত্র লিখিয়াছেন। যাইবার দিন স্থির হইল।

মিস কোহেনের শোষণ নীতি সমাপ্ত হইতে এখনও বিলম্ব ছিল। রাজা বাহাদুরও তাহার উপর এতই আকৃষ্ট যে, রাজ্য বিনিময়ে এই ইহুদী ললনাকে পাইলেও তিনি সুখী হন। উপযুক্ত বেতনে মিস কোহেন রাজার সহিত ভারতবর্ষে আসিতে সম্মত হইল।

কিন্তু নির্দ্দিষ্ট দিনে উষা দেশে আসিতে অস্বীকার করিয়া বসিল। কথাটা শুনিয়া রাজা বাহাদুর স্তম্ভিত হইলেন। এই সহায়হীন সুদূর বিদেশে একটা অপগণ্ড শিশু লইয়া বাস করা উষার পক্ষে কত বড় অসুবিধার কথা তাহা ভাবিয়া তিনি সত্যই বিমূঢ় হইলেন। বিশেষতঃ তাঁহারই কর্ত্তব্যনিষ্ঠ প্রধান কর্ম্মচারীর কন্যা সে। রাজা বাহাদুর বলিলেন— "সে হয়না উষা ! তোমার জন্য আমি কাশীতে বাড়ী প্রস্তুত ক'রে দেব।"

"আমি কিছুতেই যাব না।"

উষার জেদ্ দেখিয়া রাজা বাহাদুর চিন্তিত মনে বলিলেন, "কিন্তু কৃতান্ত বাবুর নিকট আমাকে বড়ই লজ্জা পেতে হবে, তোমাকে না নিয়ে গেলে।"

"আর ঐ সোণার চাঁদকে দেখ্‌লে তাঁর কোনই লজ্জা হবে না?" বলিয়া অদূরে শায়িত শিশুটীকে দেখাইয়া উষার অভিশপ্ত মন পুলকে ভরিয়া গেল। গদগদ কণ্ঠে সে বলিল—"যে দেশে ঐ সমস্ত প্রাণীর উৎপীড়ন নাই আমি সেখানেই থাক্‌ব।"

উষার শেষ অভিযোগের কোন সান্ত্বনা রাজা বাহাদুর দিতে পারিলেন না। ভারতবর্ষের হিন্দু-বিধবার প্রতিকূল অবস্থা কত শোচনীয়, তাহা তিনি সমস্তই জানেন। যাহারা সংযম রক্ষা করিতে অক্ষম—তাহাদের চিত্ত-চাঞ্চল্য-অপরাধ হইতে মুক্তির মাত্র দুইটী পথ বিদ্যমান সেখানে। হয় ভিন্ন ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ, না হয় ভ্রূণ-হত্যা। কিন্তু রাজা বাহাদুরের মতে এই দুই পন্থাই অতি জঘন্য। তাহার চেয়ে বহির্ভারতে থাকিয়া উষা যদি স্বাধীন জীবন-যাপন করিতে পারে, সে কথাও মন্দ নহে। কিন্তু বিষম সমস্যার কথা এই যে, কৃতান্ত বাবুকে তিনি কি বলিয়া সান্ত্বনা দিবেন! তিনি বলিলেন—"কৃতান্ত বাবুকে আমি কি বল্‌ব উষা?"

"সে চিন্তা আপনার নাই। বাবাকে আমি সমস্তই লিখে দিয়েছি। আমি যে এখানে হিন্দুভাবে বাস কর্‌ব না—শীঘ্রই ব্যাপ্টাইজ হব, সে কথাও তাঁহাকে জানিয়েছি—ওকি অত বিচলিত হলে চল্‌বে না—ভেবে দেখ্‌লাম—আমার ইহা ছাড়া আর গত্যন্তর নাই। কাশীতে কি নবদ্বীপে লুকাইয়া থাকা, অথবা এই অন্তরের আধ-খানাকে হত্যা করা অপেক্ষা খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণই শতগুণে শ্রেষ্ঠ মনে করে আমি এ কর্‌ছি।" কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া আবার সে বলিল, "আপনার নিকট আমি কিছুই চাইনে। এ ভারতবর্ষ নয় যে, এখানে না খেয়ে মানুষ মর্‌বে! কত দিনের নিবিড় পরিচয় আপনার সঙ্গে; অথচ আপনি আমাকে সহজে ফেলে গেলেন! আর এক অপরিচিতা ফরাসী মহিলা আমার জঘন্য জীবনের সমস্ত কথা জেনেও আমাকে মাতৃস্নেহ দান করেছেন। আমি এখান থেকে যাব না।" কিছুক্ষণ পরে উষা আবার বলিল—"পাদ্রী সাহেব সরকারী হাঁসপাতালে আমার চাকুরী ঠিক করেছেন। আমি এখানে বেশ থাক্‌ব। আপনি আমাকে এই ধর্ম্মান্তর গ্রহণ অপরাধে অভিসম্পাত কর্‌তে চান করুন, কিন্তু আমার পক্ষে এই পন্থাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। আমি ব্যাভিচারিনী, আমি অভাগিনী, কিন্তু ও যে আমার পঙ্কজ!" এই বলিয়া উষা ঘুমন্ত শিশুটীকে বক্ষে চাপিয়া ধরিল। তখন নিখিল বিশ্বে যেন উষা ও তাহার পুত্র ছাড়া আর কিছুই ছিল না! রাজা বাহাদুর কোন কথা বলিলেন না, কেবল তাঁহার চক্ষু দুইটী ছল ছল করিয়া উঠিল।

(১৩)

স্বামিজীর সহিত মাখনায় আসিয়া রাজা প্রজার সাক্ষাৎ-সম্বন্ধ-শূন্য সেই দেবজন-বাঞ্ছিত চরণ দর্শন করিয়া দয়াল ঠাকুর সত্যই মানব জনম সার্থক করিলেন! যাঁহার দর্শন পাওয়া একান্তই প্রসন্ন ভাগ্যের কথা, সেই মাখনা-রাজের সহিত দয়াল ঠাকুরের সহজেই আলাপ হইল। কিন্তু এ অমৃতযোগ তিনি নিজগুণে হাসেল করিতে পারেন নাই! স্বামিজীর ঐকান্তিক চেষ্টায় এ মিলন সম্ভব হইয়াছে। সে অনেক দিনের কথা, তখন দয়াল ঠাকুরের নিষ্কর জমিগুলি জমিদার কর্ত্তৃক বাজেয়াপ্ত হইয়া মকবুলের পিতার সহিত বন্দোবস্ত হয়। সেই সময় দয়াল ঠাকুর একবার মাখনায় আসিয়াছিলেন, এবং পনের দিন অবস্থানের পর বহু সাধনাবলে কোন কোন রাজকর্ম্মচারীকে উৎকোচ দিয়া তবে রাজ্য-দর্শন করিতে পারিয়াছিলেন। কিন্তু এবার এ কি পরম সৌভাগ্য তাঁহার।

রাজা বাহাদুরের ইউরোপ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন সংবাদ স্বামীজি কাশীতে প্রাপ্ত হন। সেখান হইতে তিনি সরাসরি মাখনায় আসিয়াছেন।

রাজার সহিত স্বামিজীর কি কথা হইল, তাহা অন্য কেহ জানে না। দিন দয়াল স্বামিজীর প্রত্যেক আদেশ বেদবাক্যের মত মানিয়া যাইতেছেন! গুরুদেবের উপর তাঁহার অগাধ বিশ্বাস! কিন্তু রাজবাড়ীতে তাঁহাদের বেশী বিলম্ব করিবারও সময় ছিল না। নারী-হরণের মোকদ্দমার শুনানী শীঘ্রই আরম্ভ হইবে। তৎপূর্ব্বেই তাঁহাদিগের দরিয়াপুর পৌঁছান আবশ্যক।

স্বামীজির সাক্ষাতে রাজাবাহাদুর দয়াল ঠাকুরের জন্য অনেক আফ্‌সোস করিলেন, এবং মুসলমানের অত্যাচার যেরূপ চরমে উঠিয়াছে, তাহাতে এই সমস্ত মোকদ্দমা পরিচালনা করান একান্তই আবশ্যক, এ অভিমতও জানাই-লেন। স্বামিজীকে তিনি আরও বলিলেন—"মাথনার এলাকায় এত বড় অত্যাচারীর নিস্তার নাই স্বামিজী!" স্বামিজী বলিলেন, "আপনার নিকট হিন্দুসমাজ অনেক আশা করে মহারাজ!"

"আমিও যথাসাধ্য সমাজসেবা কর্‌তে চাই! কিন্তু আপনাদের মত পণ্ডিত ব্যক্তির দ্বারাও যথেষ্ট কাজ হ'তে পারে।"

"আমরা দরিদ্র লোক মহারাজ! আমরা পারি কেবল কায়িক পরিশ্রম কর্‌তে। কিন্তু সমাজ সেবার জন্য অর্থেরও আবশ্যক।"

"আপনি কাজ কর্‌তে থাকুন। টাকা পয়সার দরকার হ'লে আমাকে জানাবেন।"

"উপস্থিত কার্য্যে নগদ টাকার বিশেষ প্রয়োজন নাই। কিন্তু এই দরিদ্র ব্রাহ্মণের মাথা রাখ্‌বার স্থান নেই মহারাজ! বহুদিন হল ষ্টেটের কোন কর্ম্মচারীর দোষে ইহার নিষ্কর জমিগুলি সমস্তই সরকারে বাজেয়াপ্ত হয়। সেই হতে ভদ্রলোকের দুঃখের সীমা নাই। তারপর বাড়ীখানাও পুড়ে গেল।"

"একথা শুনে বড়ই দুঃখিত হল'ম। কিন্তু গত কথায় আর কাজ নেই। ব্রাহ্মণের নিষ্কর জমি সম্বন্ধে আমি শীঘ্রই বিবেচনা কর্‌ছি। কিন্তু আপনি বোধ হয় জানেন না যে, বাড়ীখানার সংস্কারের ব্যবস্থা হয়ে গেছে" বলিয়া রাজাবাহাদুর কিছুক্ষন কি চিন্তা করিয়া বলিলেন,—"ব্রাহ্মণের কন্যাটী স্থানান্তরে থাকাই বাঞ্ছনীয়। মোকদ্দমা অন্তে তাহাকে আপনি এখানে নিয়ে আস্‌বেন্। নিজ আত্মীয়া ভাবেই রাজবাড়ীতে সে থাক্‌তে পাবে।" বলিয়া রাজাবাহাদুর দরবার গৃহ হইতে চলিয়া গেলেন। গদগদ কণ্ঠে স্বামীজি বলিলেন, "দেবতা-দেবতা"—দয়াল ঠাকুর কোন কথা বলিলেন না।

করুণা যে রাজবাড়ীতে স্থান পাইবার যোগ্যা, তাহার একটা কারণ ছিল। অন্দর মহলে হঠাৎ করুণাকে দেখিয়া রাজাবাহাদুর স্তম্ভিত হইয়াছিলেন। একদিন যাঁহার চক্ষে উষা অপ্সরী কিন্নরী বলিয়া বোধ হইত—যিনি রূপের মোহনছবি মিস্ কোহেনকে সাগর-পার হইতে আনিতে পারিয়া ধন্য হইয়াছেন, সেই সৌন্দর্য্য-উপাসক মাথ্‌না-রাজ আজ এই ব্রাহ্মণ-কন্যা করুণাকে দেখিয়া বিস্ময়ে বিমূঢ় হইলেন। এত সুন্দর এই দরিদ্র বালিকা!

( ক্রমশঃ )

---

"ইসলামকে বাঁচাইতে হইলে আজ অভয় সঞ্জীবন-মন্ত্রের প্রয়োজন হইয়াছে। যে প্রেরণা ইসলামের প্রতিষ্ঠাতাকে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল আমরা তাহা ক্রমশঃ হারাইয়া ফেলিতেছি। আজ সকল মানুষের মন একই সত্যের জন্য লালায়িত হইয়া উঠিয়াছে—যে সত্য বিশ্ব-সৃজনের একটা সঙ্গত অর্থ সকলের সম্মুখে উপস্থিত করিতে পারিবে। সেই সত্য সপ্তম-শতাব্দীতে ইসলাম পৃথিবীকে দিয়াছিল। সেই ধর্ম্মই আবার জগতে প্রচারিত হইবার অপেক্ষা করিতেছে।"

—সৈয়দ আমীর আলী

সঙ্কলন
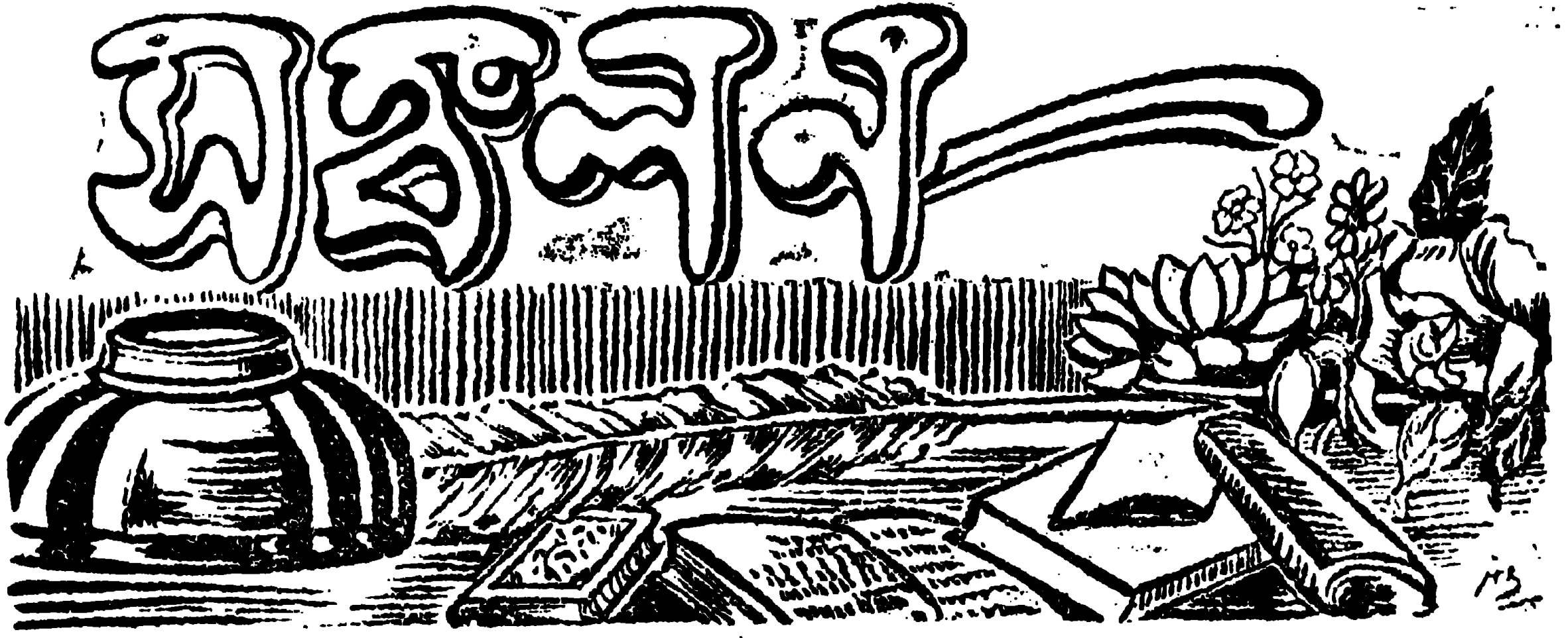
## হিন্দু আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে মুসলমানের দান

জাতীয় জাগরণে আয়ুর্ব্বেদ সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে কবিরাজ শ্রীসরোজকুমার সেন, বি, এ, বৈদ্যশাস্ত্রী মহাশয় হিন্দু আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে মুসলমানের দান সম্বন্ধে ঈষৎ আলোচনা করিয়াছেন। সাধারণ হিন্দুদের ধারণা যে মোগল-ভারত হিন্দুদের সমূহ ক্ষতি করিয়াছিল। কিন্তু তাঁহারা যদি সত্য-বুদ্ধি লইয়া ইতিহাস পড়িতে বসেন তাহা হইলে দেখিতে পাইবেন যে, এমন কি হিন্দু-সাহিত্য ধর্ম্মগ্রন্থ ও চিকিৎসা-শাস্ত্র প্রভৃতি মুসলমান বাদশাহের দানে ও স্নেহে পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে। কোনও বিজিত জাতির ইতিহাসে বিজেতার এতখানি উদারতা দেখা যায় না। আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্র প্রসঙ্গে কৃত-বিদ্য কবিরাজ মহাশয় বলিতেছেন :—

ভাবপ্রকাশ প্রভৃতি প্রসিদ্ধ আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থ মুসলমান নৃপতি-গণের রাজত্বকালে তাঁহাদের উৎসাহেই লিপিত হয়। মুসলমান নৃপতিগণের সাহায্যে যে বহু আয়ুর্ব্বেদীয় দাতব্য চিকিৎসালয় প্রভৃতি স্থাপিত হইয়াছিল, তাহার বিবরণ দিয়া আর প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি করিতে চাই না। আয়ুর্ব্বেদের বহুগ্রন্থে তাহার উল্লেখ আছে। বিভিন্ন মুসলমান দেশের আয়ুর্ব্বেদের সহিত তখন ভারতীয় আয়ুর্ব্বেদ সামঞ্জস্য করিয়া লওয়া হয়। মুসব্বর, অহিফেন প্রভৃতি মহৌষধগুলি মুসলমান রাজত্বকালেই ভারতীয় আয়ুর্ব্বেদে ছন্দবন্ধে সঙ্কলিত হইয়া স্থান পায়। মুসলমান আয়ুর্ব্বেদ পণ্ডিতগণের গবেষণায় ভারতীয় আয়ুর্ব্বেদের কলেবর বৃদ্ধি পায়। আবার ভারতীয় আয়ুর্ব্বেদের অত্যুন্নত জ্ঞানরাশি ভাষা-ন্তরিত হইয়া মুসলমান আয়ুর্ব্বেদের ভিত্তিভূমিতে পরিণত হয় ও হেকিমী চিকিৎসা প্রবর্ত্তিত করে!

আয়ুর্ব্বেদ পণ্ডিতগণকে বৈদ্যোত্তর জমী অধিকাংশই মুসলমান নৃপতিগণ দান করিয়াছিলেন। তখনকার দিনে কবিরাজী ঔষধ—আবগারী, বিস্ফোরক, বা বিষাক্ত ঔষধের অছিলায় আইন করিয়া বন্ধ করা হইত না। শব-ব্যবচ্ছেদ তখন আয়ুর্ব্বেদের অধ্যাপকই করিতেন। তিনি Licenciate medical officer নহেন বলিয়া তাহার হাত হইতে অস্ত্র কাড়িয়া লওয়া হইত না। আর, রাজ-প্রদত্ত বৃত্তি হইতেই তাঁহারা ছাত্রদিগের আহার ও বাসস্থানের সংস্থান করিতেন। আজকাল কবিরাজগণ গঙ্গা যাত্রার ব্যবস্থা দিলে যে ভাবে রাজদ্বারে দণ্ডিত হয়েন তখনকার দিনে সেইরূপ ছিল না। কবিরাজী চিকিৎসায় কাহারও মৃত্যু ঘটিলে আজকাল আইনতঃ সেই মৃতব্যক্তির সৎকার করা যাইতে পারে না। ডাক্তারের সারটিফেকেট চাই। তখনকার দিনে কিন্তু সে কথা উঠিত না। "সুসভ্য ইংরাজগণ আমাদের যাবতীয় শাস্ত্র সংরক্ষণ করিয়াছেন আর অসভ্য মুসলমানগণ আমাদের শাস্ত্র সমূহ ধ্বংস করিয়াছে" ইংরেজ ঐতিহাসিকদিগের এ কথা অন্ততঃ পক্ষে আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র সম্বন্ধে খাটে না। মুসলমানগণের রাজত্বকালে অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদ তন্ত্র দেশের স্বাস্থ্য সম্পদ পূর্ণভাবেই নিয়ন্ত্রিত করিত। চিকিৎসার অছিলায় দেশ শোষণের ব্যবস্থা তখন হইত না। মাদক দ্রব্য নিষেধের ব্যপদেশে আয়ুর্ব্বেদীয় সুতীক্ষ্ণ ঔষধ সমূহ নিষিদ্ধ এবং আয়ুর্ব্বেদীয় যন্ত্রপাতি সরকারে বাজেয়াপ্ত করিবার কোনও প্রবৃত্তিই শাসনকর্ত্তাদের কার্য্যে প্রকাশ পাইত না।

বেশী দিনের কথা নয় সেই দিনও বাঙ্গালাদেশের আধুনিক আয়ুর্ব্বেদের প্রতিষ্ঠাতা কবিরাজ শিরোমণি ৺গঙ্গাধর কর মহাশয় সশিষ্য মুর্শিদাবাদের নবাব সরকার হইতে বৃত্তি ভোগ করিতেন। আর তিনি যে ধাত্রীবিদ্যা, অস্ত্র চিকিৎসা প্রভৃতি অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদতন্ত্র পূর্ণাঙ্গই শিক্ষা দিতেন তাহার বহুনিদর্শন আছে। তাহার অন্যতম শিষ্য বৈদ্যাচার্য্য শ্রীযুক্ত হারাণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয় এখনও জীবিত আছেন। আর, তিনি যে বিশেষ দক্ষতার সহিতই শস্ত্রোপচার করিয়া থাকেন তাহাও অনেকেই জানেন। আর বরিশাল জেলার চাঁদসী গ্রামের চিকিৎসকগণও ধন্বন্তরী বা সুশ্রুতোক্ত বিধানানুসারেই শস্ত্রোপচার করেন এবং নিজেদের ধন্বন্তরী আখ্যাই প্রদান করিয়া থাকেন তাহাও কাহারও অবিদিত নাই।

———

# বিজ্ঞান জগতে অদ্ভুত আবিষ্কার

ভিয়েনা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিকদের সভায় সার জগদীশচন্দ্র বসু তাহার আধুনিকতম আবিষ্কারের যে প্রদর্শনী করিয়াছিলেন তাহাতে "ডেলী এক্সপ্রেস" পত্রিকার জনৈক সংবাদদাতা উপস্থিত ছিলেন। তিনি যাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন তাহা নিম্নে প্রকাশ করা হইল :—

দুইবার ইলেক্‌ট্রিসিটি প্রয়োগে মারিয়া ফেলার ব্যাপার আমি প্রত্যক্ষ করিয়াছি। এই দুই বারে মৃত্যু প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ঘটিয়াছিল। প্রথমবারে পোটাসিয়াম সাইনাইড প্রয়োগের ১০ মিনিট পরেই মৃত্যু, দ্বিতীয় বারে বিষ প্রয়োগে মারিয়া ফেলার পর পুনরায় বিষহর প্রয়োগে জীবন রক্ষা করা হইয়াছে ; আর একটি ব্যাপারে হইয়াছে মৃত-সঞ্জীবন।

## ভিয়েনা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রদর্শনী

ভারতের প্রসিদ্ধ উদ্ভিদতত্ত্ববিদ সার জগদীশচন্দ্র বসু এই জীবন মরণ লইয়া খেলা করিয়াছিলেন। আর এই জীবন মরণ খেলা চলিয়াছিল দুইটি বিলাতী বেগুনের গাছ এবং আর একটি লতা লইয়া। জগদীশচন্দ্রের আধুনিকতম আবিষ্কারের এই প্রদর্শনী হইয়াছিল ভিয়েনা বিশ্ববিদ্যালয়ে বহু কৃতবিদ্য বৈজ্ঞানিকের সমক্ষে।

সার জগদীশ জিজ্ঞাসা করিলেন—আপনারা কি দেখিতে চান? জগদীশের রহস্যপূর্ণ আবিষ্কারের কোনটি তিনি দেখাইবেন, তাহা বাছাই করিয়া লাভ নাই, তাই তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা হইল—সামান্য কয়েকটি কথায় তিনি তাঁহার আবিষ্কারের সার মর্ম্ম প্রকাশ করিতে পারেন কিনা।

## জন্তু উদ্ভিদে ভেদাভেদ নাই

জগদীশ বলিলেন—নিশ্চয়ই, জন্তু এবং উদ্ভিদের মধ্যে যে সীমারেখা টানিয়া দেওয়া হইয়াছে সেই পুরাতন সীমারেখার কোনই অর্থ নাই ; গাছ স্থায়ী জন্তুরূপে একই স্থানে আছে আর জন্তু হইতেছে যাযাবর বৃক্ষ।

একটি ছোট লতানে গাছের ডগা লইয়া জগদীশ তাঁহার একটি যন্ত্রে রাখিলেন। এই যন্ত্র এমন যে অতি সূক্ষ্ম পরিবর্ত্তনও ইহাতে সূচিত হয়। একটি সাঁড়াশীর দ্বারা গাছটির "গলা" ধরা হইল, অপর অংশে পালকের মত পাতলা একটি দাগ রাখা হইল।

সেখানে এমন বন্দোবস্তও ছিল, যাহাতে দেওয়ালে ছায়া ফেলিয়া ঐ গাছের সামান্য কম্পন ও অতি সূক্ষ্ম পরিবর্ত্তনও লক্ষ্য করা যায়।

## গাছের স্পন্দন

তারপর জগদীশ ঐ গাছে বিজলী সঞ্চার করিলেন ; ঐ একই সময়ে ভিয়েনার একজন প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিকের শরীরেও বিজলীসঞ্চার করা হইল। বৈজ্ঞানিক কিছুই বোধ করিলেন না, কিন্তু ছায়ার কম্পন দেখিয়া আমরা বেশ বুঝিতে পারিলাম আঘাত পাইয়া গাছটি কেমন চঞ্চল হইয়া পড়িয়াছে।

## মৃত্যু-সাধন

জগদীশ বলিলেন—"এইবার আমি গাছটির মৃত্যু সাধন করিতেছি।" এই বলিয়া তিনি হতভাগ্য গাছটিকে ৫।৬ বার জোর আঘাত দিলেন। গাছটির মৃত্যু-কাতর চাঞ্চল্য ছায়ায় দুলিয়া উঠিল। তিন সেকেণ্ড মাত্র এইরকম দেখা গেল—তারপর সব স্তব্ধ! বিজলী সঞ্চার পর একবার হইল। তখনও গাছটি সম্পূর্ণ মরে নাই। শেষে একবার সঙ্কুচিত হইয়া ইহা একেবারে নীরব হইয়া গেল!

পরে চার বার বিজলী সঞ্চারেও ইহার আর চৈতন্য ফিরিল না। এই অদ্ভুত ব্যাপার দেখিয়া সকলেই অবাক হইয়া গেল। বৈজ্ঞানিকরা সকলে উঠিয়া জগদীশকে আনন্দে সম্বর্দ্ধনা করিলেন।

## সঞ্জীবন-সাধক

জগদীশের সহকারী তারপর কয়েক ফোঁটা ঔষধ দিতেই একটু পরেই আবার গাছটির সাড়া পাওয়া গেল। কয়েক মিনিটের মধ্যেই আবার গাছটির স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়া আসিল—যেন তাহার ইতিপূর্ব্বে কিছুই হয় নাই। গাছটি মাথা তুলিল এবং পাতাগুলি আবার সজীব হইয়া উঠিল।

এমনি করিয়া বাঁচাইয়া বৈজ্ঞানিক আবার খানিকটা পোটাসিয়াম সাইনাইড ঢালিয়া দিলেন, গাছটির হৃদয়ের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া গেল। পাতাগুলি নত হইয়া পড়িল এবং বিলাতী বেগুনের গাছটি মরিয়া গেল।

জগদীশ তাঁহার রোগীকে ধীরভাবে লক্ষ্য করিতেছিলেন। সহকারীকে তিনি তখন বলিলেন—"থামো, থামো। এইবার বিষহর প্রয়োগ," ইহার পর যেমন জলে-ডোবা লোকের ধীরে ধীরে চেতনা সঞ্চার হয় তেমনি করিয়া ধীরে ধীরে গাছটির আবার হৃদয়ের ক্রিয়া ফিরিয়া আসিতে লাগিল।

## ব্যাঙের জীবন-প্রাপ্তি

এই নব আবিষ্কারের সময় জগদীশ নূতন অনেক ঔষধও বাহির করিয়াছেন। একটা হইতেছে—"আমলা"। তিনি আমাদিগকে একটি ব্যাঙ দেখাইলেন, ইহা মৃত বলিয়াই বোধ হইল। দুই ঘণ্টারও উপরে ইহার হৃদয়ের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। বেঙটির দেহ হইতে হৃদয় বাহির করিয়া জগদীশের আবিষ্কৃত একটি যন্ত্রে রাখা হইল ও তাহার উপর কয়েক ফোঁটা "আমলা" দেওয়া হইল। ইহার ফলে হৃদয়ে আবার কম্পন সুরু হইয়া গেল,—এই মৃত সঞ্জীবন আমরা সকলে প্রত্যক্ষ করিলাম।

---

# ইসলামী শাহ্-নামা

হায়দারাবাদের মহামান্য নিজাম বাহাদুর বর্ত্তমান যুগে ইসলামের পূর্ব্বতন শিক্ষাদীক্ষার গৌরব ফিরাইয়া আনিবার জন্য যে বিরাট চেষ্টা করিতেছেন—তাহা চিরকালের জন্য অক্ষয় অক্ষরে লেখা থাকিবে। ইসলাম-বিষয়ক শিক্ষা-দীক্ষা প্রচারের কল্পে তিনি রবীন্দ্রনাথের বিশ্ব-ভারতীতে যে অর্থদান করিয়াছেন তাহাতে প্রায় বাৎসরিক পাঁচ হাজার টাকা উক্ত বিষয় শিক্ষার জন্য ব্যয় করা যাইবে। সম্প্রতি হায়দারাবাদে তাঁহারই মহিমান্বিত আশ্রয়ে এক তরুণ উর্দ্দু কবি জাগিয়া উঠিতেছেন এবং তিনি এখন যে বিরাট কর্ম্মে ব্যাপৃত আছেন—তাহা শেষ হইলে ইসলাম-সাহিত্যে আর একটী গৌরবের স্তম্ভ প্রতিষ্ঠিত হইবে। সেই প্রসঙ্গে তরুণ কবিকে অভিবাদন করিবার জন্য হায়দারাবাদে এক সভা হয়। "দি ইয়ং মুসলিম" লিখিতেছেন যে,

"সমবেত সকলের জয়ধ্বনির মধ্যে তরুণ কবি হাফেজকে মালা দেওয়া হইল। হাফেজের বয়স অতি অল্প—এখনও ত্রিশএ পৌঁছায় নাই। এই তরুণ মুসলিম ফেরদৌসীর বি্যাত শাহনামার পদ্ধতি অনুযায়ী এক বিরাট গ্রন্থ রচনা করিতেছেন। গ্রন্থটীর নাম "ইসলামী শাহ্‌নামা।" আদম ও ইভের জন্মকাহিনী হইতে আরম্ভ করিয়া আজ পর্য্যন্ত ইসলামের গৌরবের একটা ধারাবাহিক কাহিনী এই তরুণ কবি ছন্দে গাঁথিতেছেন। সভায় পাণ্ডুলিপি হইতে অংশ বিশেষ কবি স্বয়ং আবৃত্তি করিলেন। হাফেজের কবিতার বিশেষত্ব হইতেছে যে তাহার ভাষা এত সহজ যে সহসা শুনিলে মনে হয় তাহা যেন বৃহৎ ভাবের আধার হইতে পারে না। কিন্তু তাহার প্রত্যেকটী কথা গভীরতার সুরে ভরা। তাহার কাব্যে কল্পনার যে প্রসারতা এবং ভাবের সূক্ষ্মতা ও গভীরতা ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহা যে কোনও জ্ঞানীর গৌরবের বস্তু। এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই যে যখন এই গ্রন্থ লেখা শেষ হইয়া যাইবে—তখন ইহা ফেরদৌসী ও বাল্মিকীর রচনার সঙ্গে পাশাপাশি থাকিতে পারিবে।"

---

## বাংলার গরু ও হিন্দু সমাজ

**শ্রাবণ সংখ্যা "প্রবাসী"তে শ্রীযুক্ত অরবিন্দ সিংহ মহাশয় গোজাতির অবনতির জন্য বাঙ্গালী হিন্দুদের মারাত্মক শৈথিল্যের কথা উল্লেখ প্রসঙ্গে বলিতেছেন,**

"হিন্দু ধর্ম্মপ্রাণ জাতি। ধর্ম্ম-প্রাণ হিন্দু মুখে গো-রক্ষা ধর্ম্ম বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকেন, কিন্তু দেশে আজ দুধের দুর্ভিক্ষ, আজ কৃষক ভাল বলদের অভাবে সারা বৎসরের মধ্যে ৭৮ বিঘা জমিও চাষোপযোগী করিয়া কর্ষণ করিতে পারে না।

হিন্দু গরুর পূজা করিয়া থাকে ফুল দিয়া, মন্ত্র পড়িয়া; গরুর বিবাহ দেন গায়ে রঙের দাগ আঁকিয়া। কত হিন্দু গৃহস্থের ঘরে দশ বারটী মা ভগবতী আছেন, কিন্তু গৃহে এক মুঠো ঘাস অথবা এক আঁটি বিচলির সংস্থান নাই। খইল, ভুসি, কুঁড়া প্রভৃতি ত দূরের কথা। সূর্য্যের প্রখর উত্তাপে গ্রামের সমস্ত মাঠ জ্বলিয়া গিয়াছে, আর গৃহস্থের গরু সেই মাঠেই সমস্ত দিন ঘুরিয়া ঘুরিয়া সন্ধ্যার সময় শূন্য পেটে ঘরে ফিরিয়া আসিল। গৃহস্থ সেই গরুর নিকট হইতে যতটুকু পারিলেন দুধ টানিয়া লইয়া বাছুরকে শূন্য বাঁট টানিতে দিলেন। এইরূপে হিন্দু আজ তাঁহার গো-রক্ষণ পালন করিতেছেন। হিন্দু গৃহস্থের ঘরে ঘরে গরু, বাছুর বলদ খাদ্যের অভাবে, যত্নের অভাবে তিলে তিলে মরিতেছে, কিন্তু তাহাতে হিন্দু গৃহস্থের গো-হত্যার পাপ হয় না এবং কোনও হিন্দু তাহার প্রতিবেশী হিন্দুর মাথা কাটায় না। * *

## চক্ষু ও মস্তিষ্কের সম্বন্ধ

প্রত্যেক লোকই মাথা-ধরা নামক ব্যাধিতে প্রায়ই ভুগিয়া থাকেন এবং ইহার যন্ত্রণা ও জ্বালা যে কিরূপ পীড়াদায়ক তাহা সকলেই জানি। কিন্তু আমরা মাথা ধরিলেই মনে করি—মাথারই বুঝি অপরাধ। আসল অপরাধ কিন্তু অধিকাংশ সময় চোখে লুকাইয়া থাকে। মাথা ধরিলেই আমরা মনে করি উহা একটা রোগ বিশেষ হইবে কিন্তু উহা একটা রোগের লক্ষণ মাত্র। শরীরের অন্য কোথাও ব্যাধি দেখা দিয়াছে—মাথাধরা তাহারই প্রমাণ। লিভার ও চোখের পীড়া মাথাধরার অন্যতম কারণ। চক্ষুর অতিরিক্ত পরিশ্রমে মাথা ধরে, তখন চক্ষুর শ্রান্তি দূর করিতে হইবে। অনেক সময় সে জন্য চশমা লওয়ার প্রয়োজন হইতে পারে। সর্দ্দির জন্য মাথা ধরিলে সর্দ্দির চিকিৎসা করিলেই মাথাধরা ছাড়িয়া যাইবে। কিন্তু অধিকাংশ মাথা ধরা চক্ষু পীড়ার ফল। শতকরা ৮০ জন লোকের মাথাধরার কারণ অনুসন্ধান করিলে দেখা যাইবে—তাহার কারণ—চক্ষুর পীড়া। কপালে, দুই রগে, মাথার পশ্চাদ্দিকে অল্পাধিক বেদনা বা যন্ত্রণা চক্ষুপীড়ার ফল। সেই জন্য চক্ষুর ক্লান্তি অনুভূত হইলে, কিছু পড়িতে বা দেখিতে ক্লেশ বোধ করিলে তৎক্ষণাৎ চক্ষুকে বিশ্রাম দিতে হইবে। নচেৎ আয়াস স্বীকার পূর্ব্বক দেখিতে বা পাঠ করিতে চেষ্টা করিলে চক্ষুর স্নায়ু ও তন্তুগুলির অতিরিক্ত ক্লান্তি ও পরিশ্রমবশতঃ মাথা ধরিবেই।

মাথা ধরিলে সর্ব্বপ্রথমে মাথার কোন্ স্থান। ধরিয়াছে, তাহা স্থির করিতে হইবে; কারণ, উহা ভ্রূর উপরে, কপালে, চক্ষুর পশ্চাতে, চক্ষুর পার্শ্বে, মাথার পশ্চাদ্ভাগে—নানা স্থানে হইতে পারে; এবং তাহা প্রায় চক্ষুর অতিরিক্ত শ্রমের ফলেই ঘটে। তবে আধকপালে, একটা ভ্রূর উপরে বেদনা এবং মাথার একপার্শ্বে ব্যথার কারণ চক্ষুর পীড়া না হইতেও পারে—তাহা অন্য কারণে ঘটা অসম্ভব নহে। কর্ণের মধ্যভাগে পীড়া হইলে, মাথার মধ্যে ফোড়া হইলে, চোয়ালে প্রদাহ উপস্থিত হইলে, বাত ব্যাধির জন্য এবং এইরূপ কোন কোন কারণে দ্বিতীয় শ্রেণীর মাথাধরা উদ্ভূত হইতে পারে।

বৈকালে বাজার করিয়া ফিরিয়া, থিয়েটার বা সিনেমা দেখিয়া আসিয়া অনেকে মাথাধরার অভিযোগ করে। ইহা চক্ষুর অত্যাধিক পরিশ্রমের ফল। সুনিদ্রা ইহার সর্ব্বোৎকৃষ্ট চিকিৎসা। ট্রেণে, বাসে ষ্টীমারে বা জাহাজে ভ্রমণ কালেও এই কারণে মাথা ধরিতে পারে। কেবল মাথাধরা নহে—চক্ষুর অতিশ্রমে বমনোদ্রেকও হয়। এই সকল স্থলে চক্ষু চিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহণ করা উচিত।
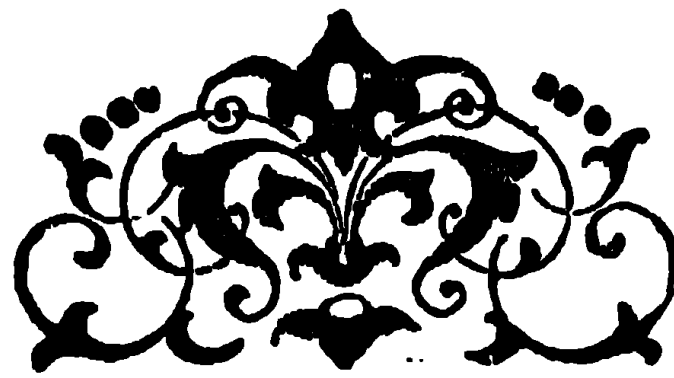
# সৈয়দ আমীর আলী

[ মোহাম্মদ আকবর আলী ]

—∞—

( ১ )

জীবন যাঁহাদের পরিপূর্ণ, মৃত্যুই তাঁহাদের শেষ গৌরব ! ধরণী যখন আর কোনও গৌরব দিয়া তাঁহাদের জীবনকে অলঙ্কৃত করিতে পারে না তখনই বেহেশ্‌ত্‌ হইতে রহমতের ফেরেশতা মৃত্যুর অমৃত-পাত্র হাতে লইয়া স্বার্থক জীবনকে সমাপ্তির সৌন্দর্য্য দিয়া মণ্ডিত করিয়া যান। পৃথিবী বিরহে কাঁদিয়া উঠে—বেহেশ্‌ত্‌ মিলনে উৎফুল্ল হয় !

আজ ভারতের মোসলিম-সমাজের অন্যতম প্রাণ-প্রতিষ্ঠাতা, ইসলামের চির-গৌরব-পতাকাধারী মহামনীষী জ্ঞান-বীর সৈয়দ আমীর আলীর মৃত্যুতে পৃথিবী রিক্ত হইল—সে রিক্ততা পরিপূরণ করিতে পৃথিবীর যুগব্যাপী শ্রম প্রয়োজন। আর ভারতের মোসলিম সমাজ! সে যাহা হারাইল—তাহার শুধু এক সান্ত্বনা আছে যে যাহাকে হারাইল—তাহাকে পাইয়াও ছিল—এই ভাবনায়।

সৈয়দ আমীর আলীর তিরোধানের সঙ্গে সঙ্গে মোসলেম ভারতের জীবন-ইতিহাসের একটী অধ্যায় শেষ হইয়া গেল। একটী শতাব্দীর জাগরণ, নিশি-দিন সংগ্রাম-সংঘর্ষ, আশা-আকাঙ্খার কথা কালের সঞ্চয়াগারে জমা হইয়া গেল।

সে ছিল ভারতে মোসলিম জাগরণের উষা-লোক; বিগত-রাত্রির অন্ধকার তখনও পথ-ঘাট ছাইয়া ছিল; ভোরের পাখীরা তখনও জাগিয়া উঠে নাই; সেই সময়ে যে দুই একটী জ্যোতিষ্ক আলোর অগ্রদূত হইয়া আসিয়াছিলেন—সৈয়দ আমীর আলী তাহার অন্যতম।

( ২ )

জাতির জীবনে মাঝে মাঝে তন্দ্রার ঘোর আসে। এই তন্দ্রার ঘোরে অনেক জাতি বিলুপ্ত হইয়া যায়। জাতির জীবনে এই তন্দ্রার সময় অতি মারাত্মক।

আলমগীরের পর দিল্লীর সিংহাসনের চারি পাশে যে ভাঙ্গন সুরু হয়—তাহাই কালক্রমে ধীরে ধীরে সমগ্র মোসলিম ভারতের চোখে তন্দ্রা আনিয়া দেয়। অবশেষে একদিন গঙ্গার স্নিগ্ধ সমীরণে, পলাশীর আম্র-কানন-ছায়ে মোসলিম-ভারত তন্দ্রায় আতুর হইয়া ঘুমাইয়া পড়ে। সেই ঘুমের ঘোর আজও নিজেদের মধ্য দিয়া আমরা টানিয়া আনিতেছি; তাও পারিতাম না হয়ত, যদি ইহারই মধ্যে কেহ কেহ তন্দ্রার ঘোর কাটাইয়া আমাদের নিশীথ-স্বপ্নাচ্ছন্ন-দ্বারে আঘাত করিয়া হাঁকিয়া না যাইত—

جاگو جاگو سونے والے ! جو سوتا ہے سو کھوتا ہے

উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগের বাঙ্গলার তথা ভারতের দিকে ফিরিয়া চাহিলে দেখা যায় যে সমগ্র হিন্দু মুসলমানের মধ্যে শুধু দুই একটী লোক নিদ্রা-হারা চোখে ঘুমন্তদের মধ্যে জাগিয়া বেড়াইতেছেন। এই দুই একটী লোক জাগিয়া ছিল বলিয়া আমরা আজ জাতির জাগরণের কথা ভাবিতে পারিতেছি। নতুবা বলা যাইতে পারে যে খৃষ্টান-সভ্যতার সেই প্রতিদ্বন্দ্বিহীন প্রসারের দাপটে আজ হিন্দুস্থান অষ্ট্রেলিয়া অথবা কেনাডার মত শ্বেত উপনিবেশে পরিণত হইয়া যাইত।

বিখ্যাত ঐতিহাসিক মেজর বি, ডি, বসু মহাশয়ের Rise of Christianity in India পুস্তক পাঠ করিলে বেশ বোঝা যায় যে, ইংরাজের রাজ-নৈতিক বিজয়ের অন্তরালে খৃষ্টান-মিশনারী আন্দোলন কতখানি কাজ করিতেছিল। বিদেশী সভ্যতার মাদকতায় সেই সময় সমাজের বহু সম্ভ্রান্ত লোক বিদেশী ধর্ম্ম ও সভ্যতার নিকট আত্ম-বিক্রয় করে। আর শিক্ষিত জনসাধারণ অশিক্ষার পঙ্কে নিমগ্ন—যাহা তাহাদের বুঝান হয়—তাহারা তাহাই বুঝে। তাহাদের শিক্ষা দিয়া চালাইবার কোন আয়োজন নাই। এই ঘোর অসহায় অবস্থায় চতুর ইংরাজ রাজনৈতিক

তদানীন্তন শিক্ষিত সমাজের নিকট সুবিধামত ইতিহাস ও ও ধর্ম্মের ব্যাখ্যা করিয়া খৃষ্ট-ধর্ম ও সভ্যতার চরম সার্থকতাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে লাগিলেন। ইসলামের গৌরব ভারতে রাহু-গ্রস্ত হইতে বসিল। আমাদের গৌরবময় অতীত আমরা ভুলিয়া গেলাম।

কিন্তু সকলের চেয়ে আশ্চর্য্য লাগে যে এই রকম সময় খৃষ্টান-সভ্যতায় দীক্ষিত পরিবারের মধ্যে জন্মগ্রহণ করিয়াও আমীর আলী জাতির ও ধর্ম্মের পরিপূর্ণ গৌরবকে শুধু যে অক্ষুণ্ণ রাখিলেন তাহা নয়—তাহাকে আবার সমগ্র জগতের সম্মুখে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া গেলেন। পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক সভ্যতার সহিত তিনি আপনার জীবনে ইসলামের চিরন্তন সত্যের একটা সামঞ্জস্য আনিয়া দিয়াছিলেন—যে সামঞ্জস্য সম-সাময়িক জগতে বিরল বলিলেই হয়। তাঁহার মাতা য়ুরোপীয় মহিলা, তাঁর সহ-ধর্ম্মিণী তিনিও য়ুরোপীয়, য়ুরোপীয় বিদ্যালয়ে তাঁহার অধ্যয়ন সমাপ্ত হয়, য়ুরোপীয় সভ্যতার পারিপার্শ্বিকতার মধ্যে যিনি লালিতপালিত—য়ুরোপীয় বিদ্যায় তিনি অসীম পারদর্শী হন, য়ুরোপীয়ের অধীনে তাঁহার সমগ্র কর্ম্ম-জীবন অতিবাহিত হয়—এবং তাহা অধিকাংশ য়ুরোপেই থাকিয়া—তথাপি য়ুরোপীয় সভ্যতার সামান্যতম গ্লানি তাঁহার চরিত্রে কোথাও ছিল না—ইসলামের যে অনন্ত শিখা তাঁহার অন্তরে বিরাজমান ছিল—তাহাতে বাহিরের সকল জিনিষ আলোকিত হইয়া উঠিয়াছিল। মনে হয় সৈয়দ আমীর আলী য়ুরোপীয় সভ্যতার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পরাজয়ের নিদর্শন। অথচ এত বড় উদার, বৈজ্ঞানিক-বুদ্ধি-সম্পন্ন ব্যবহারজীবি, এত বড় মনীষী ও কর্ম্মবীর এবং একই সঙ্গে এত বড় ধর্ম্ম-বীর বর্ত্তমান জগতে দুর্লভ। সকল সভ্যতার বিভিন্ন ধারাকে তিনি আপনার মধ্য দিয়া এক বিচিত্র উপায়ে আত্মস্থ করিয়া লইয়া আপনার আসল সত্তাকে চিরসমুজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছিলেন। এই খানেই শিক্ষার সার্থকতা!

(৩)

হুগলী জেলার অন্তর্গত চুঁচুঁড়ায় ১৮৪৯ খৃঃ অঃ ৬ই এপ্রিল আমীর আলী সৈয়দ বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পূর্ব্ব-পুরুষগণ সাক্ষাৎ ভাবে পারস্য ও মোগল সাম্রাজ্যের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তাঁহার পূর্ব্ব-পুরুষের মধ্যে মোহাম্মদ সাদিক খাঁ দ্বিতীয় শাহ্ আব্বাসের অধীনে একজন উচ্চ-রাজকর্মচারী ছিলেন। তাঁহারই বংশধর আহ্‌মদ ফাজেল ১৭৩৯ খৃঃ অঃ নাদের শাহের সহিত ভারতবিজয়ে আসিয়া দিল্লীর দরবারে থাকিয়া যান। মারাঠা অভ্যুত্থানের সময় আহ্‌মদ ফাজেলের পুত্র সা'দাৎ আলী অযোধ্যার নবাবের আশ্রয় হইতে বাঙ্গলায় আসিয়া বসবাস করেন। ইসলামের গৌরব আমীর আলী এই সা'দাৎ আলীর ঔরসেই জন্মগ্রহণ করেন।

আমীর আলীর মাতা ছিলেন য়ুরোপীয় মহিলা। ইহা হইতেই বোঝা যায় যে সেই সময়েই এই বংশে পাশ্চাত্য শিক্ষাদীক্ষা যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। আমীর আলীর জীবনের সহিত প্রাচীন হুগলী কলেজের নাম চির-বিজড়িত থাকিবে; এবং তিনিও আজীবন এই কলেজের পুণ্য-স্মৃতিকে বাক্যে এবং কার্য্যে শ্রদ্ধা দেখাইয়া আসিয়াছেন। হুগলী কলেজ হইতেই তিনি বৃত্তি লইয়া প্রবেশিকা-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তাঁহার ন্যায় মেধাবী ছাত্র তাঁহার কলেজে আর ছিল না। ১৮৬৭ খৃঃ অঃ আঠারো বৎসর বয়সে তিনি বি, এ পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হন। তাহার পরের বৎসরেই তিনি ইতিহাস ও রাজনীতি এই উভয় বিষয়েই এম, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। হুগলী কলেজেই তিনি আইন-অধ্যয়ন করেন এবং বৃত্তি লইয়া বি, এল পরীক্ষা সমাপ্ত করেন। এই প্রসঙ্গে বলা যাইতে পরে যে "মহসীন্ ফাণ্ডে"র সাহায্য-প্রাপ্ত তিনিই প্রথম কৃতী ছাত্র।

ওকালতী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি কিছুদিনের জন্য কলিকাতা হাইকোর্টে ওকালতী করেন এবং তাহার পরে ভারত-গভর্ণমেণ্টের নিকট হইতে ষ্টেট স্কলারশিপ পাইয়া আইন অধ্যয়ন শেষ করিবার জন্য ইংলণ্ডে গমন করেন। বিলাতে আইন-অধ্যয়ন ব্যাপারে আমীর আলী অন্যতম সর্ব্ব-প্রথম মুসলমান। তিনি Inner Templeএ যোগদান করেন এবং ১৮৭৩ সালে মাত্র চব্বিশ বৎসর বয়সে তিনি ব্যারিষ্টার হইয়া পুনরায় ভারতে আগমন করতঃ কলিকাতা হাইকোর্টে যোগদান করেন। পরের বৎসরই পঁচিশ বৎসরের যুবক প্রেসিডেন্সী কলেজে মুসলমান আইনের অধ্যাপক নিযুক্ত হন, এবং ক্রমান্বয়ে পাঁচ বৎসর কাল ঐ পদে নিযুক্ত থাকেন। এই সময় হইতেই তিনি গভীরভাবে সমাজের কাজে আত্মনিয়োগ করিলেন। সমাজের প্রত্যেক কাজে বিশেষতঃ শিক্ষাবিস্তারে তিনি পরিপূর্ণ ভাবে আত্ম-নিয়োগ করিলেন। সেই দিন হইতে মৃত্যুর শেষদিন পর্য্যন্ত

মুসলমান সমাজ যখনই তাঁহাকে ডাকিয়াছে তখনই সকল কর্ম্মের উপর তাঁহার সম্মতিধ্বনি বাজিয়া উঠিত। ১৮৭৬ সালে তিনি Central National Mahomedan Association প্রতিষ্ঠা করেন এবং দীর্ঘ পচিশ বৎসর কাল ধরিয়া উহার সেক্রেটারী ছিলেন। এই সমিতির দীর্ঘজীবন সমাজের যে অশেষ কল্যাণ সাধন করিয়াছে তাহার ফল আমরা সকলেই ভোগ করিতেছি। লর্ড ডাফরিনের আমলে এই সমিতি হইতে মুসলমান সমাজের উন্নতিকল্পে যে প্রস্তাব পাঠান হয় তাহা তিনি সসম্মানে গ্রাহ্য করেন। ১৮৭৬ হইতে ১৯০৪ সাল পর্য্যন্ত আমীর আলী হুগলী ইমামবারা সমিতির সভাপতি ছিলেন।

পাঁচ বৎসর কাল আইন ব্যবসায় করার পর ব্যবহার-জীবি হিসাবে তাঁহার সুখ্যাতি চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল এবং ফলে ১৮৭৮ খৃ: অ: তিনি প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেটের পদে বৃত হন। প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেট হিসাবে তিনি অতি অল্প কালের মধ্যে প্রকৃত বিচারকের স্থায়-নিষ্ঠার জন্য প্রসিদ্ধ হন এবং অচিরেই তাঁহাকে অস্থায়ী প্রধান প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেটের পদ দেওয়া হয়। এই পদে বহাল হইবার পর আমীর আলীর স্থায়-নিষ্ঠা ও বিচার-বুদ্ধির প্রগাঢ়তা ও পক্ষপাতশূন্যতা সাধারণ এবং গবর্ণমেণ্ট সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এবং স্থায়ীভাবে ঐ পদে থাকিবার জন্য গবর্ণমেণ্ট আমীর আলীকে আহ্বান করেন। কিন্তু আমীর আলীর চরিত্রের একটী বিশেষ দিক এইবারে পরিস্ফুট হইয়া উঠে। তিনি কোনও দিন বাহিরের কোনও সম্মানের লোভে আপনার অন্তরের স্বাধীনতাকে বিক্রয় করেন নাই। তাই অন্তরের স্বাধীনতা লোপের আশঙ্কায় জীবনের জাগরণের সেই সন্ধিক্ষণে বন্ধু-বান্ধব সকলের মিনতিকে উপেক্ষা করিয়া তিনি এক কথায় সেই বিরাট সম্মানের আসন ত্যাগ করিয়া স্বাধীন ব্যবহার-জীবি হিসাবে আবার হাইকোর্টে প্রবেশ করিলেন। এই চরম স্বাধীনতা-বোধ বহবার তাঁহার জীবনের সন্ধিক্ষণে ক্ষণে দেখা দিয়াছে; আর তখন সেই স্বাধীনতার সম্মান রাখিবার জন্য আমীর আলী কখনও রাজ-ভ্রূকুটীকে ভয় করেন নাই অথবা সাধারণের মনস্তুষ্টির আশ্রয় লন নাই। তাই বৃটীশ সাম্রাজ্যের একজন সর্ব্বোচ্চ অফিসার হইয়াও আমাদের সৈয়দ আমীর আলী আমরণ সৈয়দ আমীর আলীই রহিয়া গেলেন। রাজ-প্রদত্ত কোনও সম্মান তাঁহার স্বেচ্ছা-অর্জ্জিত সম্মানকে অলঙ্কৃত অথবা কলঙ্কিত করে নাই অথবা তিনি করিতে দেন নাই। * সে যুগের রাজনৈতিক হিসাবে তাঁহাকে Moderate বলিলেও এতখানি স্বাধীনতার প্রতি একান্ত প্রেম এ যুগের উদগ্র nationalist দেরও মধ্যে যে নাই—সত্যের খাতিরে এ কথা স্বীকার করিতে কোনও লজ্জা নাই।

পুনরায় আদালতে যোগ দেওয়ার ফলে আমীর আলীর পসার অত্যন্ত বাড়িয়া গেল। সে সময় তাঁহার আর ও সুনাম সকলের উপরে গিয়া উঠিল এবং গবর্ণমেণ্ট ও জনসাধারণ সকলেই তাঁহার দিকে চাহিয়া বুঝিয়াছিল যে বাংলা দেশে আর একটী নূতন লোক আসিয়াছে। তাঁহার কার্য্যক্ষেত্রের সীমা ও বাড়িয়া গেল। বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় তিনি সভ্য বসিয়া মনোনীত হন এবং বাংলার প্রত্যেক শিক্ষিত মুসলমান জানেন যে এই মুমূর্ষু সমাজের কল্যাণের জন্য এই দেশ-প্রেমিক অন্তরে কতখানি নিষ্ঠা ও শক্তির সঞ্চার করিয়া রাখিয়াছিল। আমীর আলীর প্রসিদ্ধি ও জাতি-প্রেম লক্ষ্য করিয়া লর্ড রিপণ তাঁহাকে রাজকীয় ব্যবস্থাপক পরিষদের সভ্য পদে মনোনীত করেন। ১৮৮৪ খৃ: অ: তিনি Tagore Law Professor নিযুক্ত হন। ১৮৯০ সালে আমীর আলী তাঁহার অসামান্য বিচার বুদ্ধি ও ব্যবহারিক শাস্ত্রে অসাধারণ পাণ্ডিত্যের ফলে হাইকোর্টের বিচারপতির আসন অধিকার করেন। লর্ড লান্সডাউন এই নিয়োগের দ্বারা সত্য সত্যই প্রতিভাকে সম্মানিত করিয়াছিলেন। ইহার পূর্ব্বে একমাত্র স্যার সৈয়দ মাহমুদ ব্যতীত আর কোনও মুসলমান হাইকোর্টের বিচারপতির পদ অলঙ্কৃত করেন নাই। যৌবনের প্রথম বিকাশ হইতেই আমীর আলী আইন ও আইন-ব্যবসায় সকল স্তর পর্য্যবেক্ষণ করিয়া অন্তরে এমন একটা ঔদার্য্য ও সমতা-বোধ আনিতে পারিয়াছিলেন যে যাহার ফলে আসামী ও উকিল উভয়কেই তিনি সমান ভাবে দেখিতে পারিতেন। তাঁহার স্থায়-নিষ্ঠার প্রসিদ্ধি এত দূর হইয়াছিল যে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তাঁহার ভীষণ প্রতিদ্বন্দ্বিরাও শতমুখে তাঁহার শ্রেষ্ঠতা স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। ইসলামীয় আইন সম্বন্ধে তিনি আজও একজন শ্রেষ্ঠতম ব্যবহারবিদরূপে জগতে পরিগণিত। ওয়াক্‌ফ

* রাত্র একবার তিনি সি, আই, ই উপাধিতে ভূষিত হন।

সম্বন্ধে একবার বিচারে হাইকোর্টে মহা গণ্ডগোল উঠে। সমস্ত বিচারকদের লইয়া ফুল-বেঞ্চে বিচারের শুনানী হয়। বিচার প্রিভি-কাউন্সিলে যায়। আমীর আলীর আইন-জ্ঞানকে এতখানি শ্রদ্ধা করা হয় যে একধারে ফুল-বেঞ্চের মতামত অপর দিকে একলা তাঁহার মতামতকেই গ্রাহ্য করা হয়!

১৯১৩ সালে ব্যবস্থাপক পরিষদে জিন্নার প্রস্তাব অনুযায়ী যে ওয়াকফ্ বিল পাশ হয়—তাহার মূলে ছিলেন আমীর আলী। বিচারের পর তিনি যে বক্তৃতা দিতেন তাহা একদিকে সাহিত্য অপরদিকে সূক্ষ্ম বিচার-বিজ্ঞানের ভিত্তি এবং তাঁহার ন্যায় ইংরাজী ভাষার উপর দখল খুব কম ভারতবর্ষীয়ের ছিল।

দীর্ঘ চতুর্দ্দশ বৎসর কাল হাইকোর্টে বিচারপতির আসন অধিকার করিয়া থাকিবার পর ১৯০৪ সালে তিনি অবসর গ্রহণ করেন এবং অনেকেই ভাবেন যে এতদিন আইনের জটিলতার ভিতর থাকার দরুণ তিনি যে সাহিত্য-সেবা হইতে বিরত ছিলেন এইবার তাহাতে বিশেষভাবে মনোযোগ দিবেন। কিন্তু তিনি সকলকে বিস্মিত করিয়া ভারতবর্ষ ত্যাগ করিয়া ইংলণ্ডে গিয়া বসবাস করিতে লাগিলেন এবং ইংলণ্ডেই অবশিষ্ট জীবনের স্থায়ী বাসভবন গড়িয়া তুলিলেন। এই ব্যাপারের সুবিধা লইয়া তাঁহার বিরুদ্ধবাদী দলের কেহ কেহ ইঙ্গিত করিয়াছিলেন যে এই ব্যাপারে আমীর আলীর মতামত অপেক্ষা তাঁহার স্ত্রীর মতামত বেশী আছে এবং ইংলণ্ডে থাকার দরুণ হয়ত ভারতবর্ষের মুসলমান সমাজ তাঁহাকে আর সে রকম ভাবে পাইবে না। কিন্তু আজ তাঁহার সমগ্র জীবন আমাদের সম্মুখে পড়িয়া রহিয়াছে এবং ভারতবর্ষে হিন্দু অথবা মুসলমান এমন কেহই নাই যে বলিতে পারে আমীর আলী এক লহমার জন্যও ভারতের মুসলমান সমাজকে ভুলিয়াছিলেন। আজ মনে হয় তিনি দূরে গিয়াছিলেন বলিয়া ভারতের মুসলমান সমাজ তাঁহাকে এত বেশী করিয়া পাইয়াছে; নতুবা এই সামান্য কলহও অন্তর্দ্বন্দ্বের মধ্যে থাকিয়া তাঁহার বৃহত্তর সৃষ্টির প্রেরণা ক্ষণিকের উত্তেজনার খোরাক যোগাইতে ব্যস্ত থাকিয়া যাইত। শিক্ষিত জগতের নিকট ইসলামের গৌরবকে নূতন করিয়া ধরিয়া দিবার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য হয়ত অসমাপ্ত হইয়া থাকিত। তাঁহার সাক্ষাৎ সম্বন্ধের অভাবে ভারতের মুসলমান-সমাজ যতটুকু রিক্ত হইয়াছে তাহা তিনি পরিপূর্ণ মাত্রায় পরিপূরণ করিয়া বৃহত্তর ইসলামের ভাণ্ডারে দান করিয়া গিয়াছেন। দানের ক্ষমতা যাঁহাদের অসীম—স্থানের প্রতিবন্ধক তাঁহাদের নাই। সূর্য্য যতদূরই থাকুক তাহার জ্যোতিতে সমগ্র বিশ্ব আলোকিত হয়।

লণ্ডনের কোলাহল হইতে দূরে বার্কসায়ারের এক নিভৃত অঞ্চলে আমীর আলী তাঁহার নূতন বাসভবন গড়িয়া তুলিলেন এবং এই বাসভবনটী ইংলণ্ডের ইতিহাসে বহুকাল হইতে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়া আসিতেছিল। Pope এর বিখ্যাত Rape of the Lock এর Belinda এই ভবনে থাকিতেন। ইতিহাসে এই বাড়ীটার নাম "Lambdens" আমীর আলীও ঐ নাম বদলান নাই। এই বাস-ভবনটী বার্কসায়ের মধ্যে সব চেয়ে সুন্দর স্থানে অবস্থিত। একদিকে Ulton পর্ব্বতমালা, অপর-পার্শ্বে ইংলণ্ডের দুইটী সুবিখ্যাত রাজোদ্যান। বাড়ীটার নিম্নদেশে একটী নাতিবৃহৎ হ্রদ তাহার সৌন্দর্য্যকে দ্বিগুণ বর্দ্ধিত করিয়াছে। এই ল্যাম্বডেনে আমীর আলীর সুবিখ্যাত পুস্তকাগার ছিল। এই পুস্তকাগারে আরব ও ভারতবর্ষ হইতে সংগৃহীত বহু অমূল্য পুস্তক ও কলাশিল্পের নিদর্শন সঞ্চিত আছে।

ইংলণ্ডে অবস্থানকালে তিনি যে সমস্ত কর্ম্মে আত্ম-নিয়োগ করেন তাঁহার মধ্যে মোসলিম-লীগের কথা সর্ব্ব-প্রথমে বলা কর্ত্তব্য। ইংলণ্ডে মোসলীম লীগের শাখা স্থাপিত হইবার পর তিনি সর্ব্বান্তঃকরণে লীগের কার্য্যে আত্ম-নিয়োগ করিলেন। মোসলীম লীগের সভাপতিরূপে ভারতীয় মুসলমানের দাবী ও প্রাপ্য সম্বন্ধে ইণ্ডিয়া কাউন্সিলে ও লর্ড মর্লীর সহিত তিনি যে অক্লান্ত বচসা ও দ্বন্দ্বে নিযুক্ত হন, তাহারই ফলে ১৯০৯ সালে সংস্কার-আইনে মুসলমানের দাবীকে মানিয়া লওয়া হয়। সংস্কার-আইনে মুসলমানের যোগ্যস্থান প্রাপ্তির জন্য তাঁহার অক্লান্ত চেষ্টা প্রত্যেক মুসলমানের অন্তরে চির-জাগরূক থাকিবে।

যখন ইণ্ডিয়া অফিসে একজন মুসলমান সভ্য লওয়া হইবে কথা হইয়াছিল তখন সকলেই ভাবিয়াছিল যে লর্ড মর্লী নিঃসন্দেহ ভাবে আমীর আলীকেই আহ্বান করিবেন, কেননা তাঁহার অপেক্ষা যোগ্যতর ব্যক্তি মুসলমান সমাজের মধ্যে কে থাকিতে পারে? কিন্তু তাহা যখন হইল না

তখন সকলেই বিস্মিত হইয়াছিল। কিন্তু সেই বৎসরই ২৩শে নভেম্বর আমীর আলী ব্যবহারবিদের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্মান লাভ করেন—তিনি ভারতবর্ষের পক্ষ হইতে প্রিভি কাউন্সিলের সভ্য নিযুক্ত হন। মুসলমানদের মধ্যে তিনি সর্ব্ব-প্রথম ঐ পদ অলঙ্কৃত করেন। সমগ্র বৃটীশ উপনিবেশের মধ্যে প্রিভি-কাউন্সিল হইতেছে সর্ব্ব-শেষ বিচারের স্থান এবং প্রত্যেক সভ্য রাজার ন্যায়-বুদ্ধির সাক্ষাৎ রক্ষক। সমগ্র বৃটীশ রাজত্বের মধ্যে ব্যবহারবিদের পক্ষে ইহাই সর্ব্বোচ্চ সম্মানের আসন। প্রিভি কাউন্সিলের বিচারক হিসাবে তিনি যে শুধু যশ অর্জ্জন করিয়াছিলেন তাহা নয়—তাহার অসীম আইন-শাস্ত্র-জ্ঞান দ্বারা তিনি প্রিভি কাউন্সিলের ও যথেষ্ট সম্মান বর্দ্ধিত করেন।

## ( ৪ )

আমীর আলী কোনও দিন ভারতে কংগ্রেস আন্দোলনের সহিত যোগদান করেন নাই; তৎসত্ত্বেও ভারতের মুক্তির স্বপ্ন তাঁহার অন্তরে চির-জাগ্রত ছিল। আজ পূর্ব্ব-যুগের আন্দোলনের ফলে আমাদের রাজনৈতিক জীবন পূর্ব্বের অপেক্ষা অনেকখানি সহজ হইয়া আসিয়াছে—আজ আমরা যে-সমস্ত কথা অতি সহজ ভাবে বলি, তাহা সে যুগে উচ্চারণ করিলে যাবজ্জীবন কারাবাস অসম্ভব হইত না। তাই এ যুগের মাত্র প্রকাশের সবলতা বা তীক্ষ্ণতা দিয়া আমরা ও-যুগের রাজনৈতিকদের বিচার করিতে গিয়া অনেক সময় ভুল করি।

যখন ইংরাজ রাজনৈতিকরা পরমানন্দে ভাবিত আর বলিত যে, "ভারতবর্ষীয়েরা আমাদের অবতার বলিয়া মানিয়া লইয়াছে—এবং ভয়ে কোনও দিন তাহারা আমাদের সম্মুখে মাথা তুলিতে পারিবেনা"—এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে আত্ম-প্রসাদ লাভ করিত; সেই সময় আমীর আলী বলিয়াছিলেন যে, "ইংরাজরা যদি ভারতবাসীকে আজও এই চোখে দেখে তাহা হইলে ইংরাজরা ভুল করিবে—ভারতবাসী জাগিতেছে এবং সে জাগরণের সাড়ার মধ্যে প্রাণের স্পন্দন আছে।" আজ ভারতবাসী শাসন-তন্ত্রের বহু উচ্চ আসন অধিকার করিয়া আছে কিন্তু এমন সময় ছিল যখন সেই সমস্ত পদে "কালা আদমী"কে বসানর কথা কেহই ভাবিতে পারিত না। আমীর আলী এই ভেদ-বুদ্ধির তীব্র প্রতিবাদ করেন এবং বলেন যে উচ্চপদ এমন কি সৈন্যবিভাগ, পরিচালনেও ভারতবাসীর বুদ্ধি ও ক্ষমতাকে স্বীকার করা কর্ত্তব্য। বস্তুতঃ আমীর আলীর এই বিষয় লইয়া আলোচনা করিবার ফলেই মিন্টো-মর্লি-সংস্কারে উচ্চ-পদ-লাভে কালোর অভিশাপ ঘুচিয়া যায়। ভারতীয় সৈন্য-বিভাগে ভারতবাসীর স্থান থাকার আবশ্যকতা সম্বন্ধে তিনি তীব্রভাবে বলিয়াছিলেন, "Instead of making their military predilections a source of strength, the present policy of the government is driving them into unworthy and unhealthy, not to say dangerous channels."

সে কালের রাজনৈতিক হিসাবে তিনি Montague-Chelmsford স্কিমকে বরণ করিয়াছিলেন—সরল বিশ্বাসেই যে ইহা ভারতের সত্যকার কল্যাণ করিবে। যদি ও তিনি সাম্প্রদায়িক নির্ব্বাচনের পক্ষপাতী ছিলেন, তিনি সর্ব্বান্তঃকরণ দিয়া হিন্দু-মুসলমান মিলনের কথা বিশ্বাস করিতেন।

"Without the growth of that spirit of compromise and mutual toleration on which depends the ultimate success of the reforms, the welfare and progress of the country will be in jeopardy."

"এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে সত্যকারের একটা আপোষ ও সহানুভূতির ভাব না আসিলে সংস্কার আইন কার্য্যকরী হইয়া উঠিবে না এবং দেশের কল্যাণ এবং উন্নতি রীতিমত ভাবে ব্যাহত হইবে।"

ব্যবহারশাস্ত্র এবং রাজনীতির দিক ছাড়া আমীর আলীর চরিত্রের আর একটী বিশিষ্ট দিক আছে এবং সেইটাই তাঁহার চরিত্রের মূলসূত্র এবং ভিত্তি। সেখানে তিনি সাহিত্যিক, সেখানে তিনি কল্যাণের বাণী প্রচারক। সমগ্র সংশয়াবিষ্ট জগতের সম্মুখে আমীর আলী ইসলামের গৌরব ও মহিমাকে—সরল, সবল ও সুন্দর ভাষায় প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন এবং শিক্ষিত য়ুরোপের বহু ভ্রান্ত ধারণার মূলে তিনি কঠোর আঘাত করিয়াছেন। মহসীন্ কলেজের মতওয়াল্লী মৌলভী সৈয়দ কেরামৎ আলীর একখানি উর্দু পাণ্ডুলিপির অনুবাদ হইতে তাঁহার সাহিত্য-জীবন সুরু হয়। লণ্ডনে আইন অধ্যয়নের সময়ই তিনি "A critical Examination of the Life and Teachings of Mahomed" নামক পুস্তক রচনা করেন। যে আদর্শ তিনি পরবর্ত্তী জীবনের অক্লান্ত সাধনা দিয়া পরিপূর্ণ করিয়া যান—এই পুস্তকেই তাঁহার সূচনা হয়। এই পুস্তকই তাঁহাকে লণ্ডনের সাহিত্য-সমাজে পরিচিত করিয়া দেয়।

"The Spirit of Islam" এ তাঁহার নাম জগতের সুধীজনের নিকট সুপরিচিত হইয়া উঠিল। মানব-সভ্যতার ইতিহাসে দেখা যায় যে বহু যুগ যুগ অন্তরে এক একখানি পুস্তক আসে—যাহা পূর্ব্ববর্ত্তী যুগের মানুষের মনের ভ্রান্তি দূর করিয়া সত্যকে নূতনভাবে প্রতিষ্ঠিত করে। এই সমস্ত পুস্তকের মধ্য দিয়া মানুষের সভ্যতার ও মিলনের ইতিহাস পরিবর্দ্ধিত হয়। এক জাতি অপর জাতিকে জানিতে পারে; এক যুগ অপর অতীত যুগকে জানিতে পারে এবং এই উপায়ে কাল ও দেশের পার্থক্যকে তিরোহিত করিয়া এই সমস্ত পুস্তক মানবসভ্যতার অসীম কল্যাণ সাধন করে। আমীর আলীর "The Spirit of Islam" উক্ত পর্য্যায়-ভুক্ত। য়ুরোপের ভ্রান্ত ধারণার সম্মুখে এই পুস্তকে তিনি

দার্শনিকের অবিচলিত মনোভাব লইয়া ইসলামের গৌরবের যে সত্যরূপ ফুটাইয়া তুলিয়াছেন—তাহা সমগ্র মানব-সভ্যতাকেই সমৃদ্ধ করিয়াছে। ভাষা ও ভাবের দিক দিয়া ইহা ইংরাজী ভাষায় ক্লাসিকের স্থান অধিকার করিয়া লইয়াছে। গত যুগ হইতে বেশ লক্ষ্য করা যায় যে য়ুরোপীয় শিক্ষা ও প্রচারের ফলে কয়েকটী লৌকিক আচার অনুষ্ঠানের দোহাই লইয়া ইসলামের গৌরবকে ক্ষুণ্ণ করিবার নিমিত্ত এক মনোভাবের সৃষ্টি হয়। আমীর আলীর সাহিত্য সেই মনোভাবকে বিদ্বেষ-কলুষিত এবং সত্যজ্ঞানস্পৃহাশূন্য প্রমাণ করিয়া দিয়াছে। "The Ethics of Islam"এ ইসলামের মূল-সূত্রগুলি লইয়া বিশেষ ভাবে আলোচনা করিয়া দেখাইয়াছেন যে কোনও ধর্ম্ম জীবন ও ধর্ম্মের সহিত এতখানি বৈজ্ঞানিক যোগসাধন করিতে সক্ষম হয় নাই।

ঐতিহাসিক হিসাবে তাঁহার দান কম নয়। অপর জাতির ইতিহাস লিখিবার সময় য়ুরোপীয় ঐতিহাসিকগণ যে সমস্ত ত্রুটি বিচ্যুতি করেন—সে সমস্ত দেখিয়া তাঁহাদের পাণ্ডিত্যকে শ্রদ্ধা করিলে বলিতে হয় যে সেগুলি ইচ্ছাকৃত। য়ুরোপীয় ঐতিহাসিকের এই স্বেচ্ছাকৃত ভ্রান্তির বোঝা সারাসেনদের গৌরবময় ইতিহাসকে অনেকখানি ম্লান করিয়া রাখিয়াছিল। "The History of the Saracens"এ তিনি য়ুরোপীয় ঐতিহাসিকগণের ভ্রান্তি বিদূরিত করিয়া এই অপূর্ব্ব জাতির উৎপত্তি, বিকাশ এবং পরিণতির একটা ধারাবাহিক এবং নিখুঁত ছবি আঁকিয়াছেন। সারাসেন সভ্যতার দান আজ য়ুরোপ ভুলিয়া যাইতে পারে কিন্তু একদিন য়ুরোপ যে নতমস্তকে এই সভ্যতাকে গ্রহণ করিয়াছিল এবং গ্রহণ করিয়া আপনিই লাভবান হইয়াছিল সে কথা আজ য়ুরোপের স্মরণ করিতে ইচ্ছা না থাকিলেও, তাহা সত্য, ঐতিহাসিকের সত্যানুসন্ধান-স্পৃহার সকল কষ্ট স্বীকার করিয়া আমীর আলী প্রমাণিত করিয়া দিয়াছেন। সর্ব্বশেষে তিনি সারাসেনের শাসন-প্রণালীর সহিত ভারতে ইংরাজ-শাসন প্রণালীর একটী তুলনামূলক সমালোচনা করিয়া দেখাইয়াছেন যে যাহাদের বর্ব্বর বলিয়া য়ুরোপ আজও নাসিকা কুঞ্চিত করে—তাহাদের শাসন-প্রণালীর তুলনায় বর্ত্তমান সুসভ্য য়ুরোপীয় জাতিদের গর্ব্ব করিবার কিছু তো নাই-ই, উপরন্তু শিখিবার যথেষ্ট উপাদান আছে।

জীবনের শেষদিকে তাঁহার বাসনা ছিল যে ভারতে মুসলমান বিজয়ের একটী ধারাবাহিক ইতিহাস লিখিয়া যাইবেন এবং সেই জন্য তিনি বহুদিন ধরিয়া বহু তথ্য সংগ্রহ করিতেছিলেন। খণ্ড খণ্ড ভাবে দুই একটী প্রবন্ধ মাসিক পত্রে বাহির হইয়াছে এবং সেগুলি অনুধাবন করিলে তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্য ও সত্যনিষ্ঠার পরিচয় অক্ষরে অক্ষরে পাওয়া যায়। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য যে "Islamic Culture under the Moguls" এবং "Islamic Culture in India"তে তিনি যে কার্য্য আরম্ভ করিয়াছিলেন তাহা পরিসমাপ্ত করিয়া যাইতে পারিলেন না। এই কাজ সমাপ্ত করিয়া যাইতে পারিলে ইতিহাসের কথা বাদ দিয়া, জাতিয়তার দিক দিয়া ভারতের একটী সুবৃহৎ মঙ্গল সংশোধিত হইত। বিংশ-শতাব্দীর হিন্দু জানিতে পারিত ষোড়শ-শতাব্দীর বিজেতারা উনবিংশ শতাব্দীর বিজেতাদের অপেক্ষা কতখানি উদার ও কর্ত্তব্য-পরায়ণ ছিলেন।

আমীর আলীর রাজনৈতিক জীবন শুধু মুসলিম-ভারতের সহিত সংশ্লিষ্ট নয়; তাঁহার সমস্ত প্রেরণা সমগ্র মোসলেম-জাহানের উষর প্রান্তরের দিকে প্রবাহিত ছিল। ১৯০৮ সালে যখন তুরস্কের নবীন দল বিদ্রোহের আয়োজন করিতেছিল তখন আমীর আলীই নানা বাদ-বিতর্কের মধ্য দিয়া তুর্কীর শেখ-উল-ইসলামকে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন যে এই বিদ্রোহের মধ্যে অনৈস্লামিক কিছু নাই; এবং সেই কারণেই তুর্কীর এই বিদ্রোহ ধর্ম্মেরও অনুমোদন পাইয়াছিল। তুরস্ক-ইতালীয় এবং তুরস্ক-বল্কান যুদ্ধের সময় তিনি সাক্ষাৎ ভাবে Red Crescent সেবা-সৈন্যদের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তাঁহারই উদ্যোগে ও চেষ্টায় আহত সৈন্যদের সেবার নিমিত্ত British Red Crescent দল তুরস্কের উপান্তে প্রেরিত হয়। এবং এই দলের অর্থ সংগ্রহের জন্য তিনি অক্লান্ত ভাবে দেশে দেশে অর্থ-সাহায্য প্রার্থনা করেন এবং সেই যুদ্ধে আহত সৈনিকদের সমস্ত শুশ্রূষার দরুণ একমাত্র তিনি এবং তাঁহার গঠিত British Red Crescent দল দায়ী। যখনি জগতের যেখানে ইসলামের আহ্বান আসিয়াছে--আমীর আলীর মন ও দেহ সকলের আগে তাহার আহ্বানে সাড়া দিয়াছে। যখন পারস্যকে ভাগ করিবার ব্যাপার লইয়া ইংরাজ রাজনৈতিকগণ ব্যস্ত—তখন আমীর আলী পারস্যের সপক্ষে ইংরাজী কাগজে তুমুল আন্দোলন আরম্ভ করিয়া দিলেন। সেদিন পারস্য সম্বন্ধে তিনি জলদ-গম্ভীরস্বরে বলিয়াছিলেন,

"In the matter of Persia's inability to govern herself may I be permitted to ask the British public if a fair or honest chance has been allowed to that poor harried country to recover from the effects of the grinding tyranny of her late ruler or to her distracted people to prove their capacity for government? I venture to affirm, without hesitation, that every effort on their part has been paralysed by outside action."

"পারস্যকে যে আজ নিজেকে শাসন করিতে অক্ষম বলিয়া প্রচার করা হইতেছে—কোনও সময়ে কি পারস্যকে আপনার শক্তি দিয়া আপনাকে গড়িয়া তুলিবার সত্যকারের একটা উপায় বা অবসর দেওয়া হইয়াছিল? যখনই সে

চেষ্টা করিতে গিয়াছে—বাহিরের ব্যাঘাত তখনই তাহার পথ-রোধ করিয়াছে।"

এই একই কথা আজ হতভাগ্য ভারত সম্বন্ধে খাটে না কি?

তুরস্ক যেদিন বিগত মহা-যুদ্ধে যোগদান করে সেই দিন হইতে য়ুরোপীয় রাজনীতির ক্ষেত্রে আমীর আলী গভীরভাবে আত্ম-নিয়োগ করেন; এবং য়ুরোপীয় রাজনীতির, বিশেষতঃ তুরস্কের ভাগ্যের উত্থান পতনের সঙ্গে তাঁহার অন্তর নিশি দিন দুলিত। আমীর আলীর সত্যসন্ধ মন বেলজিয়ামের ব্যথায় সত্যই কাঁদিয়াছিল—তাই তিনি ভাবিয়াছিলেন যে তুরস্ক কখনই মহা-যুদ্ধে জার্ম্মাণীর সহিত যোগদান করিবে না। মহামান্ত আগা খাঁ ও তাঁহার অক্লান্ত চেষ্টার বিরুদ্ধে যখন তুরস্ক গবর্ণমেণ্ট জার্ম্মাণীর সহিত যোগদান করিল, তখন তিনি অন্তরের অন্তরতমে সত্যই আঘাত পাইয়াছিলেন। কিন্তু সে আঘাত তাঁহাকে বিদ্রোহী করিয়া তোলে নাই; বরঞ্চ তুরস্কের মঙ্গলামঙ্গল চিন্তা তাঁহাকে আরও পাইয়া বসে। অসীম তিতিক্ষার সহিত তিনি ইংরাজ-রাজনৈতিক মহলে তুরস্কের ভবিষ্যৎ মঙ্গলের আবহাওয়া বজায় রাখিতেছিলেন। যখন যুদ্ধ শেষ হইয়া গেল তখন ইংরাজ-রাজনীতির আর একরূপ প্রকট হইয়া উঠিল। যে Lloyd George একদিন জোর গলায় বলিয়াছিলেন, "We are fighting not to deprive Turkey of its Capital, nor of the rich and renowned lands of Asia minor and Thrace which are pre-dominantly Turkish in race,"—

যুদ্ধ-অন্তে জয়-দীপ্ত অন্তরে তিনিই তুরস্কের প্রতি প্রতিহিংসা লইবার মানসে থে,স ও এশিয়া মাইনরকে তুরস্ক হইতে বিচ্ছিন্ন করিলেন। এই ব্যাপারে ১৪ই জুন, ১৯১৯ সালে আমীর আলী, মহামান্ত আগা খাঁ ও স্যার আব্বাস আলী বেগের নেতৃত্বে লণ্ডনস্থ মুসলমানগণ ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রীর নিকট নির্ভীক ভাষায় তুরস্কের অখণ্ডতা স্বীকারের জন্য এক পত্র পাঠাইলেন। আমীর আলী নানা কাগজে ইংরাজের এই কার্য্যের তীব্র প্রতিবাদ করিয়া আন্দোলন করিতে লাগিলেন। যদিও তুরস্কের স্বাধীনতার জন্য কামালের অপূর্ব্ব যুদ্ধ-শক্তিই দায়ী, তবুও আজ এ কথা অস্বীকার করিলে অন্যায় হইবে যে, ইংলণ্ডের রাজনৈতিকদের মনোভাবকে উদ্‌ব্যস্ত ও কণ্টকিত করিয়া আমীর আলী তুরস্কের স্বাধীনতার প্রভূত সহায়তা করিয়াছিলেন। যদি এই বচসা মীমাংসা করিবার পূর্ব্বেই ইংরাজ-সৈন্য তুরস্ক ছাইয়া ফেলিত—হয়ত নবীন রণক্লান্ত তুরস্কের জাতীয় দল নূতন করিয়া প্রস্তুত হইবার অবসরও পাইত না। কিন্তু আমীর আলীর অন্তরের সব চেয়ে শোচনীয় আঘাত লাগিল যখন সেই তুরস্ক খিলাফৎকে অস্বীকার করিল। আমীর আলীর অন্তর সংক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল। একান্ত ক্ষুব্ধ ও মর্ম্মাহত হইয়া তিনি লিখিয়াছিলেন,—

"The arrogation by a Muslim State to abolish any of the fundamental institution of Islam is a grave tragedy—the gravest within the last seven centuries. It means the disruption of Islamic unity and the disintregation of the faith as a moral force."

তিনি এবং মহামান্ত আগা খাঁ তৎক্ষণাৎ ইসমেৎ পাশাকে এক পত্র লিখেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় আরও হইল যখন শুনিলেন যে আঙ্গোরা গভর্ণমেণ্ট এই পত্র প্রকাশের জন্য তিনজন সম্পাদককে রাজ-দ্রোহিতার অপরাধে কারারুদ্ধ করিয়াছে। আমীর আলী তৎক্ষণাৎ তাঁহার মনোভাব ব্যক্ত করিয়া আঙ্গোরা গভর্ণমেণ্টকে পত্র লেখেন এবং তিনজন সম্পাদকের মুক্তির জন্য প্রার্থনা করেন। আঙ্গোরার রাজনৈতিক জীবনে অশান্তির উত্থাপন করা তাঁহাদের উদ্দেশ্য ছিল না। তুরস্কের দুইজন আমরণ বন্ধু শুধু ইসলামের বৃহত্তর কল্যাণের দিকে চাহিয়া বন্ধুকে সহায়তাই করিতে চাহিয়াছিলেন।

গৌরবময় জীবনের শান্ত পরিসমাপ্তি ঘটিয়াছে। ব্রকউড সমাধি-ক্ষেত্রে তাঁহার শব সু-সমাহিত করা হয়। পীড়িত শিশুর মুখের দিকে জননী যেমন ব্যাকুল ব্যগ্রতায় চাহিয়া থাকে, তেমনি বহুদিন ধরিয়া তিনি আমাদের এই পীড়িত সমাজের মুখের দিকে চাহিয়া বসিয়াছিলেন। মৃত্যুতে তিনি শুধু ক্ষণিক অবসর খুঁজিয়া পাইয়াছেন। তাঁহার আত্মা তেমনি অতন্দ্রভাবে মোসলিম-সমাজের হৃদ-স্পন্দনের দিকে চাহিয়া রহিয়াছে।

---

দুইএর ফর্ম্মার শেষে "বিদায়-দিনে" নামক কবিতাটী মুদ্রাকর-প্রমাদ বশতঃ গত মাসে ছাপা হওয়া সত্ত্বেও পুনরায় ছাপা হইয়া গিয়াছে। দ্বিরুক্তির বাহুল্য আশা করি রসিক পাঠকবর্গ ক্ষমা করিবেন।

# মুছাফির মঞ্জিল

( আবুল হাশেম বি, এ )

তখনো ধরণী ত্যজে নাই তার তমসার আবরণ
দ্বিধা ভরে পিক ঝঙ্কারে কভু অস্ফুট কুহরণ।
বল্‌খ্‌ প্রাসাদ কূটে
শুধু জেগে রয় ফুটে
নৃপতির দুটি ব্যথিত নয়ন প্রভাত তারকা প্রায়,
করুণ কাতরে কেঁদে কেঁদে ডাকে বিশ্বের বিধাতায়।

সদা কাণে বাজে ফকিরের সেই দারুণ সত্য বাণী,
'পান্থ আবাস ছাড়া কিছু নয় এ বিরাট রাজধানী'।
এক যায় এক আসে
এ চির পান্থাবাসে
পথিকে পথিকে ক্ষণিকের দেখা ক্ষণিকের আলাপন—
কোথা বা তীর্থ, ঘাঁটি পথ কোথা—চঞ্চল হ'ল মন।

তখনো ধরণী ত্যজে নাই তার তমসার আবরণ
দ্বিধা ভরে পিক ঝঙ্কারে কভু অস্ফুট কুহরণ।
সহসা প্রাসাদ চূড়ে,
কে বেড়ায় ঘুরে ঘুরে
চরণের ধ্বনি ভেঙে দিল ধ্যান, কহিল আধম রোষে
"কে হোথা, হারাতে জীবন আপন কর্ম্ম দোষে?"

কহিল সেজন, "পথিক আমিগো হারায়েছে মোর উট
সন্ধানে তার এসেছি হেথায় তোমার প্রাসাদ কূট।"
"মূর্খ পথিক তুমি!
ত্যজিয়া বিজন ভূমি
উষ্ট্র তোমার পাখা ল'য়ে কিগো এসেছে প্রাসাদ চূড়ে?"
নিদারুণ রোষ ধ্বনিত হইল নৃপতি কণ্ঠ সুরে।

কহিল সেজন সংযত অতি শান্ত মধুর স্বরে,
"হে রাজন, তব গর্ব্ব-তপ্ত প্রাচীর অভ্যন্তরে
এত ছোট হ'য়ে আজ
নিখিলের মহারাজ
ধরা যদি দেয়, সেও যদি হয়; কেন বল নাহি হবে
উষ্ট্রের মম আগমন তব প্রাসাদ চূড়ায় তবে?"

চমকি উঠিল বল্‌খের পতি চাহিল সেদিক পানে,
না হেরিল কিছু, শূন্য প্রাসাদ, তবু যেন বাজে কাণে—
"এত ছোট হ'য়ে আজ
নিখিলের মহারাজ
ধরা যদি দেয়, সেও যদি হয়—কেন বল নাহি হবে
উষ্ট্রের মম, আগমন তব প্রাসাদ চূড়ায় তবে?"

খুলি ফেলি দিল অবয়ব হ'তে রাজ-আভরণ যত—
স্বর্ণ-কীরিট নিমিষে হইল ধূলি-অবলুণ্ঠিত।
দীপ্ত-আলোক-জ্বালা
লক্ষ প্রদীপ-মালা
নিমিষে আঁধারে নিভে গেল হায় ছুটে গেল মোহ ঘোর
তপ্ত কপোলে বহিতে লাগিল আকুল নয়ন লো[illegible]

ক্ষণকাল পরে রাজ-প্রাসাদের [illegible]
বিমলিন বেশ দরবেশ এক [illegible]
[illegible] বিষাদ [illegible]
নয়ন [illegible]
তখন ধরণী, ত্যজিল [illegible]
দ্বিধা ত্যজি পিক [illegible]

# চিত্রে সাময়িকী

## বেলুড়ের ট্রেণ দুর্ঘটনা
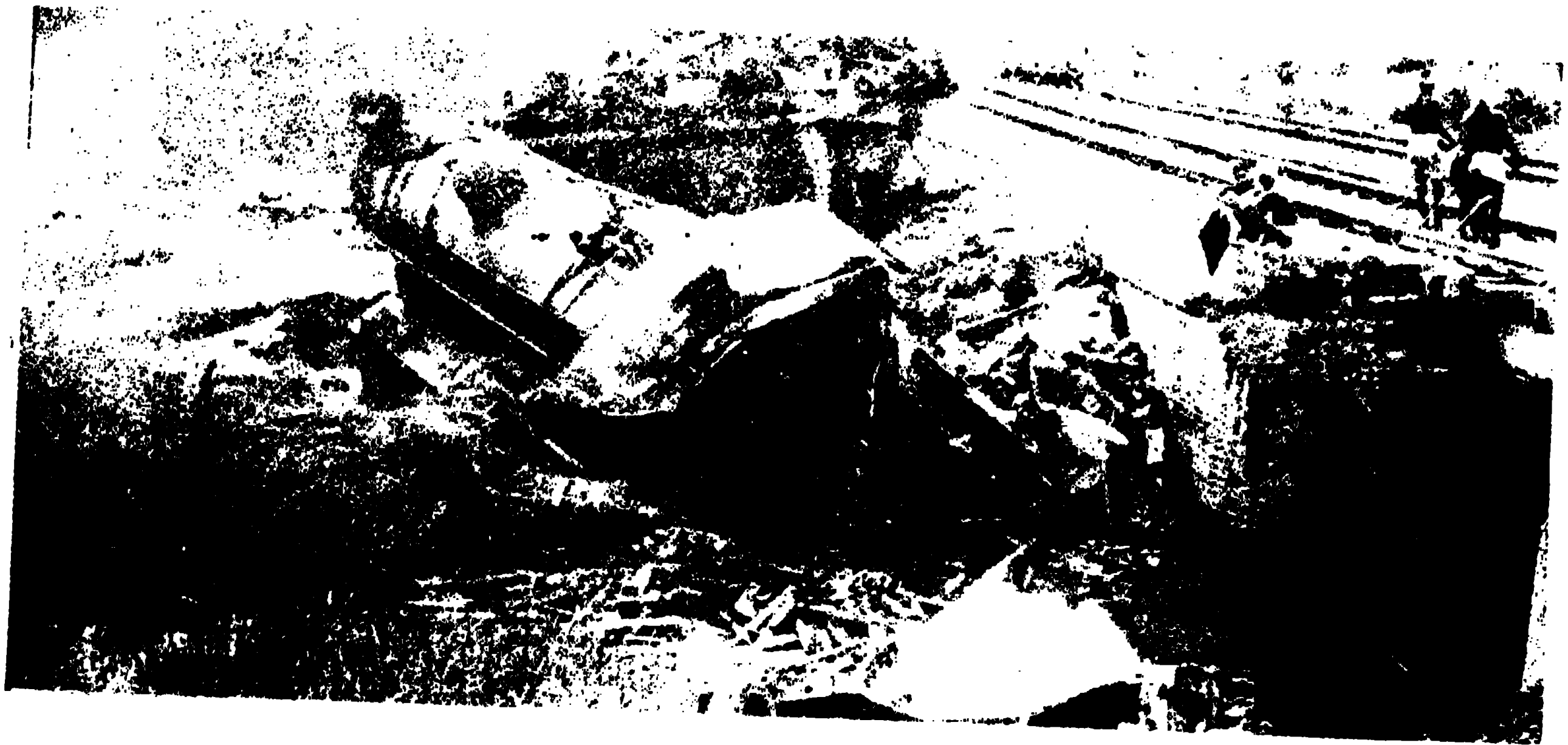
বেলুড়ের নিকট যে ট্রেণ-দুর্ঘটনা হয়—তাহা সকলেই অবগত আছেন। বহু যাত্রীর প্রাণ-নাশ করিয়াও এই ব্যাপার ক্ষান্ত হয় নাই। এই ব্যাপার লইয়া রেলওয়ে কোম্পানী ফরওয়ার্ডের বিরুদ্ধে দশ লক্ষ টাকার মানহানির মোকদ্দমা আনিয়াছেন। উপরে লাইন-চ্যুত ও ধ্বংস-প্রাপ্ত ইঞ্জিনটীর ছবি দেওয়া হইল।
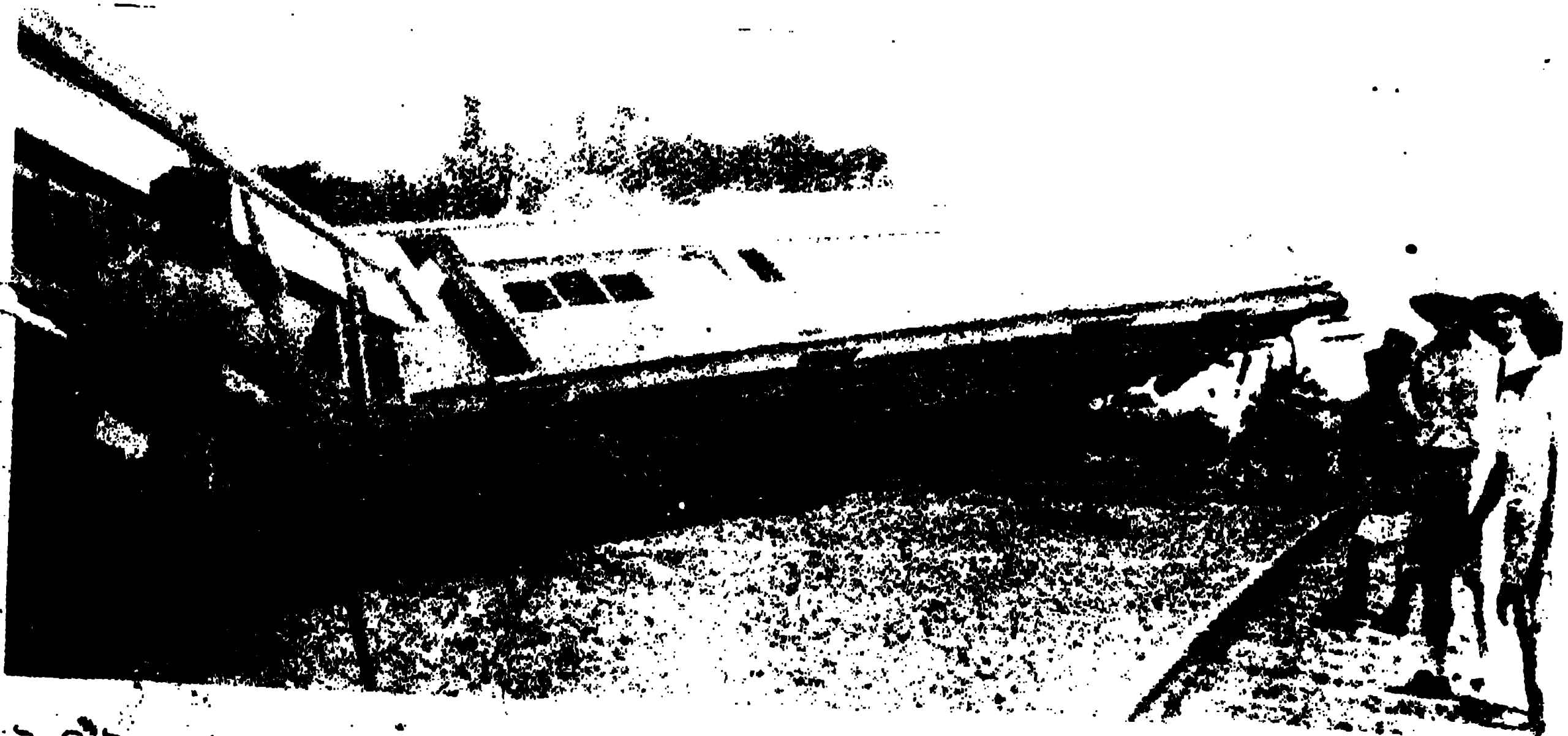
উপরি উক্ত দুর্ঘটনা ঘটিবার সময় যাত্রীর গাড়ী দুই খানি যে ভাবে লাইন-চ্যুত হইয়াছিল—তাহা উপরিস্থিত চিত্র দেখিলেই বোঝা যায়।

উপসনা-রত ইমাম আবদুল মজিদ

বকরিদ উপলক্ষে লণ্ডনের ওকিং মসজিদের ইমাম মোঃ আবদুল মজিদ নামাজ পড়িতেছেন।

ওকিং মসজিদ প্রাঙ্গণে

বক্‌রিদ উপলক্ষে ওকিং মসজিদে নামাজের দৃশ্য

## বিশ্ব-বিজয়ের স্মৃতি-চিহ্ন

শ্রাবণ সংখ্যায় ভারতীয় হকি-দলের ছবি প্রকাশিত হইয়াছিল। উপরিস্থিত ছবিটী এবং তৎপার্শ্ববর্ত্তী ছবিটী অলিম্পিক প্রতিযোগিতার বিজয়ের চিহ্ন-স্বরূপ ভারতীয় খেলোয়াড়গণ যে মেডেল পাইয়াছিলেন—তাহারই প্রতিকৃতি।

মেডেলে খোদিত চিত্র দুইটীতে জয়-দৃপ্ত সবল নর ও নারীর রেখা-সৌন্দর্য্য চমৎকার ফুটিয়া উঠিয়াছে।

## মিঃ এ, জেড, খাঁ

স্বনাম-খ্যাত অতিরিক্ত চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট, মিঃ আনিসুজ্জমান খাঁ গত ৩১শে জুলাই বেলা চার ঘটিকার সময় পরলোক-গমন করিয়াছেন। তাঁহার মৃত্যুতে বাংলাদেশ একজন অতি বিচক্ষণ বিচারককে হারাইল।

## সর্দ্দার বল্লভভাই পেটেল

বারদোলী-সত্যাগ্রহ আন্দোলনের নেতা "সর্দ্দার" বল্লভভাই পেটেল। এতকাল ধরিয়া বারদোলীতে বল্লভভাইএর অধীনে অহিংস ভাবে যে সত্যাগ্রহ ও প্রজা-আন্দোলন চলিতেছিল—তাহা সম্প্রতি মীমাংসায় উপনীত হইয়াছে। কৃষকদের স্থির প্রতিজ্ঞা ও অটল ধৈর্য্যের নিকট অবশেষে স্বৈরাচারকে মাথা নত করিতে হইয়াছে।

## ইরাক সীমান্তে এবনে সাউদ

ইরাকের সীমান্ত প্রদেশ লইয়া আবার ইবনে সাউদের সহিত বৃটিশ-রাজের গণ্ডগোল বাধিয়াছে। ইরাকের প্রতিনিধির সহিত ইবনে সাউদের যে কন্‌ফারেন্স বসিয়াছিল—তাহা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। রয়টারের খবরে প্রকাশ যে সীমান্তে সমরায়োজন চলিতেছে।

# আলোচনা

## মৌঃ আবুল হুসেনের কৈফিয়ৎ

ঢাকার অধ্যাপক কাজী আবদুল অদুদ ছাহেব ও মৌলবী আবুল হুসেন ছাহেবের কতক গুলি প্রবন্ধ লইয়া মোছলেম বঙ্গের শিক্ষিত যুবক দিগের মধ্যে একটা চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। কর্ত্তব্যের খাতিরে তাঁহাদের কোন কোন প্রবন্ধ সম্বন্ধে মোহাম্মাদীতে অল্পবিস্তর আলোচনা করা হইয়াছিল। সে আলোচনা কত দূর সঙ্গত হইয়াছে না-হইয়াছে, শিক্ষিত মুছলমানগণ তাহার বিচার করিবেন। মৌলবী আবুল হুসেন ছাহেব সম্প্রতি ঢাকার "জাগরণ" পত্রে নিজের কৃত-কার্য্যের একটা কৈফিয়ৎ দিয়াছেন। আমরা আনন্দের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে, এই কৈফিয়ৎ পাঠ করিয়া আমরা সন্তুষ্ট হইয়াছি।

মৌলবী ছাহেবের সঙ্গে আমাদের ব্যক্তিগত বিরোধের কোনই কারণ নাই। আমরা মধ্যে মধ্যে তাঁহার লেখা সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছি—কঠোর কর্ত্তব্যের খাতিরে। আমরা এখনও বিশ্বাস করি—ঐরূপ আলোচনায় প্রবৃত্ত না হইলে আমাদের পক্ষে কর্ত্তব্যে অবহেলা করা হইত। কিন্তু আমরা আর সে সব অতীত কথার উল্লেখ করিতে চাই না, মৌলবী আবুল হুসেন ছাহেবের এই কৈফিয়তের পর তাহার পুনরালোচনা করিতে যাওয়া সঙ্গতও হইবে না।

মৌলবী আবুল হুসেন ছাহেব স্পষ্ট ভাষায় বলিতেছেন:—

"বলা বাহুল্য, আমরা কোরাণকে খোদার বাণী বলে স্বীকার ও বিশ্বাস করি এবং আরও বিশ্বাস করি যে, ধর্ম্ম ও নীতি সম্পর্কে কোরাণ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ এবং হজরত মুহম্মদ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম সংস্কারক ও সকল ধর্ম্ম প্রবর্ত্তকের মধ্যে তিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, তাঁর পর কোন ধর্ম্ম প্রবর্ত্তকের আবির্ভাব হবে না অর্থাৎ হবার দরকার হবে না, কারণ তাঁর প্রচারিত ধর্ম্ম ও নীতি কথা মানব সমাজের পক্ষে যথেষ্ট।"

"আমাদের ভাষা হয়ত অনেক স্থলে আমাদের ভাব ও উদ্দেশ্যকে সম্পূর্ণরূপে ফুটিয়ে তুলতে পারেনি। আমরা সে জন্য দুঃখিত ও লজ্জিত।"

জাগরণে প্রকাশিত নিজের 'সাব জাস্তা' প্রবন্ধ সম্বন্ধে মৌলবী ছাহেব বিশেষ উদারতার পরিচয় দিয়া বলিতে-ছেন:—

"এ কথা আমি মাথা নত করে স্বীকার করি যে, আমার ব্যবহৃত কথা বিশেষণ মুক্ত করে উলঙ্গভাবে ধরে অর্থ করলে তার উল্টা অর্থও সম্ভব। সে ত্রুটির কারণ আমার ভাষার দৈন্য। তজ্জন্য আমি লজ্জিত।"

"...আমি ক্ষুব্ধ হয়ে এমন কতক গুলি শব্দ ব্যবহার করে ফেলিছি যাতে হয়ত খুব দূর থেকে remotely. কোরাণের উপর কিছু দোষারোপ আসতে পারে। আমি সে জন্য লজ্জিত।"

এই কৈফিয়তে যুগপৎভাবে মৌলবী ছাহেবের ধর্ম্মপ্রীতি ও উদারতার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। এই কৈফিয়তের পর কোন ন্যায়বান মুছলমানই তাঁহার সম্বন্ধে কোন প্রকার বিরুদ্ধ ধারণা পোষণ করিতে পারেন না। আমরা আজ মৌলবী ছাহেবকে স্পষ্ট করিয়া জানাইয়া দিতেছি যে, কোরআন-হাদিছ মান্য করার পর তাহার ব্যাখ্যা-বিচার সম্বন্ধে তিনি যে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন, নীতির হিসাবে আমরা তাহার সহিত সম্পূর্ণ একমত। এই নীতিকে জীবন্ত ও জাগ্রত করিয়া আলেম সমাজের মন ও মস্তিষ্কের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া দেওয়াই আমাদের

ক্ষুদ্র জীবনের সমস্ত সাধনার অন্যতম লক্ষ্য। অবশ্য এখানে একটা সাময়িক পার্থক্য উপস্থিত হইতে পারে—সেই বিচারের পথ ও পদ্ধতি লইয়া। কিন্তু যারা শাস্ত্র মানে—আর তাহার সঙ্গত ব্যাখ্যা প্রাপ্ত হওয়ার জন্য যুক্তিবাদের আশ্রয় লইতে প্রস্তুত আছে, তাহাদের মধ্যকার এই পার্থক্য অধিকদিন স্থায়ী হইতে পারে না। কারণ, শাস্ত্র ও যুক্তি উভয়ের লক্ষ্য হইতেছে—সত্য, এবং তাহা অভিন্ন। সুতরাং শাস্ত্র-পন্থী যুক্তিবাদীদিগকে—বাস্তবিক যদি তাঁহারা সরল অকপট চিত্তে কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন—অচিরাৎ একই কর্ম্মকেন্দ্রে সমবেত হইতে হইবে। আমরা প্রথম হইতেই ইহার আশা করিয়া আসিতেছিলাম, এবং সেই জন্যই "কুছ নেই জান্তা" ও তাহার অনুরূপ আরও অনেক প্রবন্ধ বহুপূর্ব্বে আমাদের হস্তগত হওয়া সত্ত্বেও আমরা তাহা পত্রস্থ করি নাই। ব্যক্তিগত আক্রমণ করিতে তখনও কোন কসুর করা হয় নাই এবং এখনও হইতেছে না, পক্ষান্তরে তাহার তীব্রতর প্রতিদান করিতে আমরা তখনও অক্ষম ছিলাম না এবং এখনও অক্ষম নই। তবুও এই সব গালাগালির প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করিতে সমর্থ হইয়াছিলাম—কেবল আজিকার এই শুভদিনের আশায়। আনন্দের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে, আমাদের সে আশা আজ সফল হইতে চলিয়াছে। 'বাগরাম আরবী'কে পূর্ব্ববৎ গালাগালি দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে, 'জাগরণের' মাননীয় সম্পাদক ছাহেব ঢাকার 'সাহিত্য সমাজ' সম্বন্ধে নিজেই যে স্বীকারোক্তি প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাই আমাদের পক্ষে যথেষ্ট প্রমাণ। তিনি বলিতেছেন :—

"এই 'সমাজের' কতিপয় সভ্য স্বাধীনতার নামে Licence এর স্রোতে গা ঢেলে দিয়েছেন! সেজন্য 'সমাজের' দুর্ণাম হয়েছে। এজন্য 'সমাজ' নিতান্ত লজ্জিত। সমাজের তরফ থেকে তাঁদের হুশিয়ার করে দেওয়া দরকার। তাঁদের মত Licence প্রিয় সভ্যনিয়ে এ 'সমাজ' কোন কাজই করতে পার্ব্বে না।" আমরাও এই Licence বা স্বেচ্ছাচারেরই প্রতিবাদ করিয়াছি। দুঃখের বিষয়, ছোলতানে কাজী আবদুল অদুদ ছাহেবের পত্র-প্রকাশ হইতে আরম্ভ করিয়া মিঃ নূরর রহমানের মোকদ্দমা পর্য্যন্ত, ঢাকার কাজে ও কলমে পরপর এমন কতকগুলি অপ্রীতিকর ব্যাপার সংঘটিত হইয়া গিয়াছে, যাহাতে সমাজ বিচলিত না হইয়া পারে নাই। ঢাকার বন্ধুগণ যথাসময়ে সতর্কতা অবলম্বন করিলে বোধ হয় ব্যাপারটা এতদূর গড়াইতে পারিত না।

যাহা হউক, ভুল ভ্রান্তি আমাদের সকলেরই হইতে পারে এবং হইয়াও থাকে। উত্তেজনার সময় বিনা কারণেও আমরা অনেক সময় এরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিয়া ফেলি, যাহাতে আমরা নিজেদের উদ্দেশ্যেরই ক্ষতি করিয়া বসি। আল্লার হাজার হাজার শোকর—এ কথাটা বুঝিবার শক্তি তিনি আমাদিগকে দিয়াছেন। সেজন্য, আমাদের যতদূর স্মরণ হয়, মাসিক মোহাম্মদীতে কাহারও প্রতি ব্যক্তিগত আক্রমণ আজ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হইতে পারে নাই। কাজী আবদুল অদুদ ছাহেবের প্রতিবাদে স্থানে স্থানে ভাষার মধ্য হইতে একটু অসংযমের ভাব প্রকাশিত হইয়াছিল বলিয়া, আমরা পরমাসেই দুঃখ প্রকাশ করিয়াছিলাম। আজও আমরা মৌলবী আবুল হুসেন ছাহেবকে মুক্ত অন্তঃকরণে জানাইতেছি—তাঁহার বুঝাইবার অথবা আমাদের বুঝিবার দোষে মোহাম্মদীর কোনও মন্তব্য তাহার মনঃপীড়ার কারণ হইয়া থাকিলে, আমরা সেজন্য আন্তরিক দুঃখ প্রকাশ করিতেছি। তাঁহার কণ্ঠে কণ্ঠ মিশাইয়া আমরাও প্রার্থনা করিতেছি—

اللهم احيينا على الاسلام وتوفنا على الايمان

"আল্লাহ! আমরা যেন এছলামকে অবলম্বন করিয়া বাঁচিয়া থাকি, যেন আমরা ঈমানের সহিত মরিতে পারি! আমীন, আমীন !!

---

## বিবাহ আইনের সংস্কার!

ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার জনৈক হিন্দু সদস্য একটী আইনের পাণ্ডুলিপি উপস্থিত করিয়া এ দেশের বিবাহ প্রথার সংস্কার করিতে চাহিতেছেন। এই আইনটী পাস হইয়া গেলে হিন্দু মুছলমান প্রভৃতি বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীদিগের মধ্যে সর্ব্বপ্রকার বৈবাহিক আদান প্রদান আইন সঙ্গত হইয়া যাইবে। পক্ষান্তরে ১৪ বৎসরের কম বয়সের বালিকার অথবা ১৮ বৎসরের কম বয়সের বালকের বিবাহ দেওয়া আইন অনুসারে দণ্ডার্হ বলিয়া পরিগণিত হইবে। এই আইনের আমল হিন্দু সমাজের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকিলে আমাদের বলার কিছুই ছিলনা। কিন্তু আইন প্রণেতা

মুছলমানদিগকেও তাঁহার প্রস্তাবিত আইনের এলাকায় আনিতে চাহিয়াছেন। এজন্য মুছলমান সমাজে এ সম্বন্ধে একটা ঘোর চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইয়াছে।' ঢাকার স্বধর্ম্ম পরায়ণ জমিদার খানবাহাদুর মৌলবী কাজেমুদ্দিন আহমদ ছিদ্দিকী ছাহেব প্রস্তাবিত আইনের বিরুদ্ধে যথাবিধি প্রতিবাদ করিয়া মুছলমান সমাজের ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। এই আইনের দ্বারা মুছলমানের ধর্ম্মে হস্তক্ষেপ করার চেষ্টা করা হইয়াছে, এবং এরূপ অত্যাচার নীরবে সহ্য করিয়া যাওয়া মুছলমান সমাজের পক্ষে সম্ভবও হইবে না, সঙ্গতও হইবে না।

এই প্রসঙ্গে কয়েকটা অবান্তর বিষয়ের প্রতি চিন্তাশীল মুছলমান পাঠকগণের মনোযোগ আকর্ষণ করিতে চাই। বিবাহ তালাক ইত্যাদি বিষয়ে মুছলমান সমাজে আজ যে জঘন্য অনাচার দেখা দিয়াছে, তাহার মূল কারণ হইতেছে—এছলামের সামাজিক ব্যবস্থার উপর বিধর্ম্মীর হস্তক্ষেপ। এই হস্তক্ষেপের ফলে কাজীর পদ উঠিয়া গিয়াছে এবং তাহারই ফলে, তালাক সংক্রান্ত কোরআনের সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর ব্যবস্থাটা এখন পুরুষের স্বেচ্ছাচারিতার একটা জঘন্য উপকরণে পরিণত হইয়াছে। উপেক্ষিতা উৎপীড়িতা স্ত্রীর জন্য এছলাম যে সব প্রতিকারের ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছে, ইংরাজের আইনে আজ আর তাহার কোন স্থান নাই। কাজীর পদ উঠিয়া যাওয়াতে সে সকল প্রতিকারের পথ এখন একেবারে রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে।' তাহার পর যে "হস্তক্ষেপের" কথা লইয়া আজ আমরা এই আন্দোলন উপস্থিত করিতেছি, ভারতীয় মুছলমানদিগের অধীনতার ইতিহাসে তাহা নূতন কথা নহে। মোছলেম নরনারী ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করিলে তাহাকে উত্তরধিকারের সর্ব্ব প্রকার স্বত্ব হইতে বঞ্চিত হইতে হইবে—ইহা এছলামের স্পষ্ট ব্যবস্থা, দুনয়ার সকল সম্প্রদায়ের সমস্ত মুছলমান ইহা এক বাক্যে স্বীকার করিয়া আসিতেছেন। কিন্তু মুছলমানদিগের খৃষ্টান হওয়ার পথকে সম্পূর্ণ নিষ্কণ্টক করিয়া দিবার জন্য এই ব্যবস্থার [illegible]র্দ করিয়া দেওয়া হইয়াছে এবং ভারতের মুছলমান [illegible] পর্য্যন্ত তাহার বিরুদ্ধে 'টু' [illegible]টাও করে নাই।

[illegible] আমির আলী তাঁহার Mohamadan Law [illegible] উঠাইয়া দিবার বিরুদ্ধে তীব্র মন্তব্য [illegible] কাজীর পদ [illegible] আজ পর্য্যন্ত এ হতভাগ্য প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। [illegible] অনুভব করিলেন না! সমাজের কেহই ব্যাপারটার [illegible] Straite কিছুদিন পূর্ব্বে [illegible] পুনঃ প্রতিষ্ঠিত Settlement [illegible] করিয়াছেন। [illegible]লোনের [illegible] সমাজে বিবাহ ও তালাক সংক্রান্ত ব্যাভিচার [illegible] কিছুদিন হইতে একটা [illegible]নের সৃষ্টি হয়। তাহার ফলে সিলোন গবর্ণমেণ্ট মুছলমানদিগের বিবাহ ও তালাক সংক্রান্ত আইন ও তাহার ফলাফল সম্বন্ধে আলোচনা করার জন্য একটী তদন্ত কমিটী গঠন করেন। সম্প্রতি কমিটীর রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে, এবং তাহার মেম্বরগণ এক বাক্যে বলিয়াছেন যে, তালাক ও বিবাহ সম্বন্ধে এছলামের যে বিধিব্যবস্থা আছে, গবর্ণমেণ্টের আইনে তাহার অধিকাংশ পরিত্যক্ত হইয়াছে। তাঁহারা সকলে সমস্বরে বলিয়াছেন—বিবাহের ও তালাকের জন্য এছলাম যে সকল শর্ত্তকে অবশ্য পালনীয় রূপে নির্দ্ধারণ করিয়াছে, ইহার অনাচার ব্যাভিচার নিবারণ করার জন্য যে সকল প্রতিকারের ব্যবস্থা শরিয়ৎ করিয়া দিয়াছে, ভবিষ্যতে সেগুলিকেও আইনের সামিল করিয়া দিতে হইবে—তাহা হইলে সমস্ত অনাচারের পথ আপনা আপনি বন্ধ হইয়া যাইবে, সমস্ত অভাব অভিযোগের প্রতিকার আপনা আপনিই হইয়া যাইবে। সিলোনের এই সরকারী কমিটীও একবাক্যে বলিয়াছেন যে, এজন্য কাজীর পদ প্রতিষ্ঠা করা ব্যতীত গত্যন্তর নাই।

তালাক ও বিবাহ সম্বন্ধে আমাদের সামাজিক জীবনে যে ঘোর অনাচারের সৃষ্টি হইয়াছে—তাহার জন্য দায়ী ইংরাজের আইন আর মুছলমানের অবহেলা। আমরা বলি, যাহা হইবার হইয়া গিয়াছে, অতীতের কৃতকার্য্যের মাতম করা এখন বিফল। 'আমরা যদি ভবিষ্যতের জন্য সতর্ক হই, বিবাহ ও তালাক সংক্রান্ত শরিয়তের প্রকৃত ও সম্পূর্ণ বিধিব্যবস্থাকে আইনের সামিল করিয়া দিবার চেষ্টা করি, তাহা হইলে এখনও আমরা নিজেদের সমস্ত অভাব অভিযোগের প্রতিকার খুব সহজে করিয়া লইতে পারি।'

---

## বিচার ও আলোচনা

পূর্ণ এক বৎসর কাল মোছলেম বঙ্গের তরুণ সমাজের চিন্তাধারার সহিত বিশেষ ভাবে সংশ্লিষ্ট থাকিয়া এবং নিজেদের সামান্য শক্তি অনুসারে তাহার বিচার বিশ্লেষণে প্রবৃত্ত হইয়া, আমরা ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে যথেষ্ট আশান্বিত হইয়াছি। বর্ত্তমানে আমাদের তরুণ সমাজে দুইটী সম্পূর্ণ বিপরীত ভাবধারা প্রবাহিত হইতে দেখা যাইতেছে। একদল নিজেদের Licence কে, উচ্ছৃঙ্খলা ও স্বেচ্ছাচারকে, অসংযম ও অনাচারকে সমাজের বুকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া দিতে চান। এজন্য তাঁহারা এছলামের—তাহার সমস্ত বিশ্বাস ও অনুষ্ঠানের এবং সেই বিশ্বাস ও অনুষ্ঠানের প্রত্যেক উপকরণ ও অবলম্বনের মস্তকে কুঠারাঘাত করার জন্য সর্ব্বদাই প্রস্তুত। ইঁহাদের না[illegible] শাস্ত্রবচন অর্থাৎ কোরআন ও হাদিছকে তেরশত বৎসরের [illegible] বলিয়া ঘোষণা করিতে, হজরতের নবুয়ৎ স্বীকার করাকে দুনয়ার নিকৃষ্টতম মহাপাতক বলিয়া প্রকাশ করিতে, কোরআন হাদিছের অনুসারীদিগকে "শাস্ত্র-শকুনী" এবং আপনাদিগকে "অবিশ্বাসীর দল" বলিয়া দম্ভ করিতে, শিয়াল কুকুরের আড্ডা বলিয়া মছজিদগুলিকে ধ্বংস করিয়া ফেলার

ফতোয়া জারি করিতে—এমনকি খোদার বুকে পদাঘাত করার প্রগল্‌ভতা প্রকাশ করিতেও এতদিন কুণ্ঠিত হন নাই।

সমাজে আর একদল শিক্ষিত চিন্তাশীল ও সত্যান্বেষী তরুণের আবির্ভাব হইয়াছে। পাশ্চাত্য ভাবধারার সংস্পর্শে আসিয়া এবং এছলামকে যথাযথ ভাবে জানিবার ও বুঝিবার সুযোগ না পাইয়া, ইঁহাদিগের অনেকের মনে নানাদিক দিয়া বিবিধ প্রকার জিজ্ঞাসার উদ্রেক হইয়াছে। আল্লার প্রতি তাঁহাদের অগাধ বিশ্বাস, কোরআনকে তাঁহারা আল্লার সত্যসনাতন বাণী বলিয়া দৃঢ়ভাবে প্রত্যয় করেন, এবং হজরত মোহাম্মদ মোস্তফাকে সত্যনবী ও শেষনবী বলিয়া তাঁহারা অন্তরের সহিত বিশ্বাস করিয়া থাকেন। কিন্তু ধর্ম্মের, ন্যায়ের ও সত্যের যে আদর্শ তাঁহারা গড়িয়া লইয়াছেন—অথবা বিচারের যে ধারাকে যুক্তিবাদের চরম মানযন্ত্র বলিয়া তাঁহারা নির্দ্ধারণ করিয়া লইয়াছেন, এছলামের অন্তর্ভুক্ত কোন কোন বিষয়ের, প্রচলিত বা সাধারণভাবে গৃহীত, ব্যাখ্যার সহিত সেই আদর্শের ও সেই মানযন্ত্রের সামঞ্জস্য অনেক সময় খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। তাই তাঁহারা এই সমস্যার সমাধান করার জন্য আপন আপন জ্ঞান অনুসারে বিচার-আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন।

প্রথম শ্রেণীর সংখ্যা অতি নগণ্য, কিন্তু ইংরাজী শিক্ষিত যুবকদিগের মধ্যে অধিকাংশই শেষোক্ত মত পোষণ করিয়া থাকেন। উপেক্ষার হাসি হাসিয়া ইঁহাদিগকে পরিত্যাগ করা আর জাতির মস্তিষ্ককে উপেক্ষা করা, একই কথা। আমরা—মৌলবী সমাজ—ইহাদিগকে এতদিন কেবল ভর্ৎসনা করিয়া আসিয়াছি, কিন্তু উহাদের অন্তরের আকুল জিজ্ঞাসাকে পরিতৃপ্ত করিয়া দিবার কোন চেষ্টাই আমরা আজ পর্য্যন্ত করি নাই। সব চাইতে মজার কথা এই যে, নাস্তিক বিপ্লববাদী আর আস্তিক যুক্তিবাদী—এই উভয়ের জন্য "সব ভয়ে'স একহি লাঠির" ব্যবস্থা করিয়া দ্বিতীয় দলের খাঁটি মুছলমান যুবকগুলিকে আমরাই প্রথম দলের বেদিন্নাদের গণ্ডীর মধ্যে বলপূর্ব্বক ঢুকাইয়া দিয়া নিজহাতে নিজেদের উদ্দেশ্যের অনিষ্ট সাধন করিয়া আসিয়াছি।

এই সমস্ত ত্রুটির ক্ষতিপূরণের জন্যই মাসিক মোহাম্মদী প্রকাশের আবশ্যকতা তীব্রভাবে অনুভব করিয়াছিলাম। খোদার ফজলে এখন স্রোত ফেরার সমস্ত লক্ষণই দেখা দিয়াছে। ২য় শ্রেণীর শিক্ষিত যুবকদিগের মধ্যে মিঃ ছৈয়দ ওয়াজেদ আলী ছাহেবের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ভাষার উপর [illegible] অধিকার আছে, তাহা বাদে তাঁহার একটা বৈশিষ্ট্য এই যে—না পড়িয়া পণ্ডিত হওয়ার বা না ভাবিয়া কথা কওয়ার মত প্রতিভা বা প্রবৃত্তি তাঁহার মোটেই নাই। তাঁহার "ধর্ম্ম ও সমাজ" শীর্ষক একটী সারগর্ভ প্রবন্ধ এ মাসের মোহাম্মদীতে প্রকাশিত হইল। ইহা আমাদের মাসিক প্রকাশের মূল উদ্দেশ্যের অর্থাৎ আমাদের জ্ঞানান্বেষী সত্যান্বেষী উচ্চ শিক্ষিত যুবকদিগের সহিত আপোষে বিচার ও আলোচনার প্রথম ভিত্তি। উপযুক্ত ও অধিকারী ব্যক্তিগণ এ সম্বন্ধে বিচারে প্রবৃত্ত হইলে যৎপরোনাস্তি সুখী হইব। মিঃ ওয়াজেদ আলীর মতের অনুকূলে ও প্রতিকূলে আমাদেরও দুই চারিটা কথা বলিবার আছে। নিজেদের সামান্য শক্তি অনুসারে আমরাও যথাসময়ে এই আলোচনায় যোগদান করার চেষ্টা পাইব।

---

## মোহাম্মদীর নিবেদন

আগামী আশ্বিন সংখ্যায় "মাসিক মোহাম্মদীর" প্রথম বৎসর শেষ হইবে এবং পুরাতন গ্রাহকদিগের নিকট নববর্ষের (কার্ত্তিক সংখ্যা) মোহাম্মদী ভি, পি, ডাকে প্রেরিত হইবে। বর্ত্তমান সময় সমাজের জন্য মাসিক মোহাম্মদীর দরকার আছে বলিয়া যাঁহারা মনে করেন, মাসিক মোহাম্মদী তাঁহাদিগের নিকট হইতে সর্ব্বপ্রকার সাহায্য ও সহানুভূতি পাওয়ার আশা করে।

মাসিক মোহাম্মদী এই অল্প সময়ের মধ্যে [illegible]চার বিপ্লুত মোছলেমবঙ্গের কোন বিশেষ খেদমত করিতে পারিয়াছে কিনা—সমাজের চিন্তাশীল ব্যক্তিরাই তাহার বিচার করিবেন। ২য় বৎসরের মাসিককে আমরা অপেক্ষাকৃত উন্নত আকার-প্রকারে প্রকাশ করিতে চাই। সে জন্য সমাজের নিকট আমরা উপদেশ প্রার্থনা করিতেছি। বর্ত্তমানে মোহাম্মদীর কি কি দোষ ত্রুটি আছে এবং কি প্রকারে তাহার প্রতিকার হইতে পারে—মাসিক মোহাম্মদীর হিতৈষীবর্গের নিকট হইতে সে সম্বন্ধে উপদেশ ও পরামর্শ জানিতে পারিলে আমরা যাহার পর নাই বাধিত হইব।

## সম্পাদকের নিবেদন

দুর্ভিক্ষের সাহায্য সংগ্র[illegible] কর্ম্মিগণ মুছলমান যে চেষ্টাচরিত্র করিতেছেন, আমা[illegible] সামিল হইতে হইয়াছিল এবং সেজন্য গত এক মাস [illegible] আমার লেখা পড়া[illegible] সমস্ত কাজই বন্ধ হইয়া [illegible] 'সমস্যা ও সমাধান' প্রবন্ধের ভাদ্র [illegible] এই জন্য প্রকাশিত হইতে পারিল না। [illegible] সমস্যা সম্বন্ধে আলোচ[illegible]দের সঙ্গীত গুরুতর এবং নানাদিক দিয়া [illegible] কথা। বিষয়টী অত্যন্ত আছে। বিশেষ[illegible] বলিবার কথা অনেক সাধারণ[illegible] সমাজ সঙ্গীত সম্বন্ধে [illegible]বাহিক আদি[illegible] কোরআন হাদিছের আদেশ [illegible] সামঞ্জস্য নাই বলিয়া [illegible] বৎসরের কম বয়স[illegible] তাহার যথাযথ আলোচনা যথেষ্ট সময় [illegible] সাপেক্ষ। [illegible] কারণে গ্রাহক ও পাঠকগণের নিকট এক মাসের [illegible] প্রার্থনা করিতে বাধ্য হইতেছে।

Printed and Published by Md. Khairul Anam Khan from the "Mohammadi Press,"
20 Upper Circular Road, Calcutta

প্রথম বর্ষ

আশ্বিন, ১৩৩৫ SEPT. & OCT. 1928

দ্বাদশ সংখ্যা

# মাসিক মোহাম্মদী

বার্ষিক মূল্য সডাক তিন টাকা

সম্পাদক
মোহাম্মদ আকরম খাঁ

প্রতি সংখ্যার মূল্য চারি আনা

# মৎস্য, ফুটবল, কাপ, মেডেল ইত্যাদি
# যাবতীয় সরঞ্জাম

ব্যাডমিণ্টন টেনিস, হকি ফুটবল, ক্যারম টেবিল টেনিস লুডো, ক্রিকেট, মাছ ধরিবার সরঞ্জাম ও অন্যান্য গেম। গ্রিপ ডাম্বেল, ডেভেলপার ও অন্যান্য ব্যায়াম যন্ত্রাদি সর্ব্বদা পাওয়া যায়।

হাতে তাজা মুগা সুতা ভরি ২॥০

কাপ ১৫৲

মূল্য তালিকা ও বিশেষ বিবরণ
পত্র লিখিলেও জানান হয়

হুইল ৬৲

মেডেল ৩৲

## এস, রায় এণ্ড কোং লিমিটেড

১১নং এসপ্লানেড ইষ্ট, কলিকাতা

---

# সময়ের দান

আপনি যদি মশক দংশন হইতে আত্মরক্ষা করিতে চান, নিদ্রায় শান্তি লাভ করিতে চান এবং স্বাস্থ্য সুখ উপভোগ করিতে চান, তাহা হইলে আমাদের বিখ্যাত

**মশারি**

একটী ক্রয় করুন।

খুব ভাল জিনিষ অথচ দাম খুব কম।

ব্যবহারে আপনি পরিতৃপ্ত হইবেন, এ কথা আমরা নতশিরে সহিত বলিতে পারি।

**বিভিন্ন মাপের! বিভিন্ন নেটের!!**

| ভাল সাদা ধোলাই করা | চৌকা নেট | গোল নেট |
|---|---|---|
| ফুট ৬ × ৩ × ৪॥০ | ৫॥০ ১টী | ৬৵০ ১টী |
| ,, ৬ × ৪ × ৪॥০ | ৬॥০ ,, | ৭৵০ ,, |
| ,, ৭ × ৩॥০ × ৫ | ৭॥৵০ ,, | ৮৷৵০ ,, |
| ,, ৭ × ৫ × ৫ | ৮৷০ ,, | ৯॥০ ,, |

প্যাকিং খরচ নাই, ডাক ব্যয় স্বতন্ত্র।

অর্ডার দিলে পছন্দ মত প্রস্তুত করিয়া দেওয়া হয়।

ব্যবসায়ীদিগের জন্য বিশেষ দর।

## দি ইউনিয়ন ট্রেডিং কোং

১৬৬ হ্যারিসন রোড (আর-), কলিকাতা।

---

# জলছবি

জীবজন্তু, সাইকেল নানাবিধ ফুল, ফুলের সাজি, মহম্মদ আলী প্রভৃতি প্রতি সীটে ছবি অনুসারে ১৬ হইতে ৬০টী ১২ সীট ১৲ ডাঃ মাঃ ।০ আনা ৩৬ সীট ২॥০ টাকা মাশুল লাগে না।

## চক্রবর্ত্তী এণ্ড কোং

১০নং কলিন ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

---

সকলরকম ব্লক রবার ষ্ট্যাম্প প্রস্তুত কারক ও বিক্রেতা

## রাম সীতা ষ্টুডিও

১।১।১ ফকির চক্রবর্ত্তীর লেন,
গরাণহাটায় কাটলগের জন্য
— পত্র লিখুন —

# সূচীপত্র—আশ্বিন ১৩৩৫

# বিলাতের স্ত্রীলোকেরা বদনাম করিতেছেন

# যে পুরুষেরা কমজোর হইতেছেন

## তাঁহাদের পুরুষত্বহীনতার জন্য এখন আমাদের কর্ত্তব্য তাঁহাদের প্রতি দৃষ্টি রাখা।

# "নামে পুরুষ"

যদি জীবনে আপনি কোন সময় ভুল করিয়া থাকেন, আপনি যদি আপনার স্ত্রীকে সন্তুষ্ট রাখিতে সক্ষম না হন, যদি নিজের বুদ্ধির দোষে নিজেকে নিজে নষ্ট করিয়া দিয়া থাকেন, তবে অদ্য হইতে আমাদের—

# "জীবন-প্রাণ" আনাইয়া

# সেবন করুন।

এই ঔষধ যে কোন ঋতুতেই একবার সেবন করিলে ইহার গুণাগুণ নিশ্চয় বুঝিতে পারিবেন। অতএব প্রত্যেক ঔষধ প্রস্তুত করিবার সময় উহার মূল্য অপেক্ষা অধিক পরিশ্রম ও সাবধানতা অবলম্বন করা দরকার।

## "জীবন প্রাণ" কি!

হাড়, মাংস, খুন, কফ, পিত্ত, বায়ু, মেদা মজ্জা মানব শরীরে সবই প্রজা। ইহাদের শাসনকর্ত্তা একমাত্র বীর্য্য। যদি ইহা কুৎসিৎ সঙ্গদোষে খারাপ হইয়া যায় তাহা হইলে স্বপ্নদোষ, শুক্রতারল্য, প্রস্রাবের পূর্ব্বে কিম্বা পরে বীর্য্যপাত হওয়া, স্ত্রী সঙ্গমের সময় মুহূর্ত্ত মধ্যে বীর্য্য স্খলন হওয়া, শিরোঘূর্ণন, সব সময় অলসতা বদহজমী হওয়ার দরুণ পায়খানা পরিষ্কার না হওয়া, চক্ষুজ্বালা, হাত পা জ্বালা এবং অন্যান্য কুৎসিৎ রোগ জন্মে। ইহা ছাড়াও বাল্যাবস্থায় কুৎসিৎ সঙ্গে মিশিয়া নানারূপ অত্যাচারে—ধাতুদৌর্ব্বল্য, গণোরিয়া, মেহ, প্রমেহ প্রভৃতি রোগ জন্মে। ইহার জন্য শরীর জীর্ণ শীর্ণ হইয়া যায় স্মরণশক্তি হ্রাস পায় শরীরের চঞ্চলতা চেহারার কান্তি, ঢল ঢলে যৌবন অকালেই বিনষ্ট হইয়া যায়। এই সমস্ত কারণে আমরা বহু কষ্টে উপরোক্ত ঔষধ প্রস্তুত করিয়াছি। মূল্য কেবল দুই সপ্তাহ ১।৷০ এক মাস ২।৷০ টাকা। এই ঔষধ সেবনে আপনি সম্পূর্ণ রোগমুক্ত হইতে পারিবেন, শুক্র গাঢ় হইবে, বদনের মনোরম কান্তি পুনরায় ফিরিয়া পাইবেন।

## "স্ত্রী জীবন রক্ষা" কি?

প্রদর নাশক, রজদোষ নাশক, সর্ব্বপ্রকার স্ত্রীরোগে ইহা অব্যর্থ মহৌষধ। মাসিক ঋতু সময়মত না হওয়া, ঋতুপাতের সময় ব্যথা হওয়া রক্ত বন্ধ হওয়া, শরীর ম্যাজম্যাজ করা কোমর এবং পেটে বেদনা উঠা প্রভৃতি নানা প্রকারের রোগ যাহা মাসিক ঋতুপাতে হইয়া থাকে সমস্তই আরোগ্য করে। ইহা সেবনে বন্ধ্যা নারীর সন্তান জন্মে। মূল্য সাত দিনে ১।৷০ ১৫ দিন ২।৷০ এক মাস ৪৲, ডাক মাশুল ও প্যাকিং স্বতন্ত্র।

প্রাপ্তিস্থান :—চড্ডা কেমিক্যাল ওয়ার্কস

পোষ্ট বক্স নং ১১৪৪৪, কলিকাতা।

গ্রামোফোন বিভাগ

সঙ্গীতের আনন্দ প্রদান করিতে

## শ্রেষ্ঠ বন্ধু • • গ্রামোফোন

একটী গ্রামোফোন ঘরে রাখিলে, যখনই হউক অবসর-মত ঘরে বসিয়া নিজের পছন্দ-মত শ্রেষ্ঠ গায়ক বা বাদকের সঙ্গীত উপভোগ করিতে পারেন। গ্রামোফোন রেকর্ডে—গীত, বাদ্য, অভিনয় ও আবৃত্তি—যাঁহার যেরূপ রুচি, সকলই পাইবেন। গ্রামোফোন-সম্বন্ধীয় সর্ব্ব বিষয়েই আমাদের সুদীর্ঘ অভিজ্ঞতার ফল আপনার সাহায্যে নিয়োজিত করিয়া আপনার সন্তোষ সাধন করিবার সুযোগ পাইব কি?

## হর্ণ-মডেল গ্রামোফোন
### নং ৩২, ৩১, ৩৩ ও ২১

নিম্নে যে কয় প্রকার "হিজ্ মাষ্টার্স ভয়েস্"-মার্কা হর্ণ-মডেল গ্রামোফোনের বিবরণ দেওয়া হইল, তাহাদের প্রত্যেকটীই উৎকৃষ্ট প্রণালীতে প্রস্তুত।

**৩২ নং মেশিন—**
চারটী স্প্রিং-যুক্ত মোটর, স্বর বর্দ্ধক টোন্-আর্ম, ৪ নং সাউণ্ড বক্স, সেগুন কাঠের ক্যাবিনেট, ১২" টার্ণ-টেব্‌ল্, ২৩" ধাতু নির্ম্মিত হর্ণ, নূতন ও পুরাতন পিন রাখিবার নিকেলের বাক্স সন্নিবিষ্ট।
মূল্য ১৭৫৲ টাকা
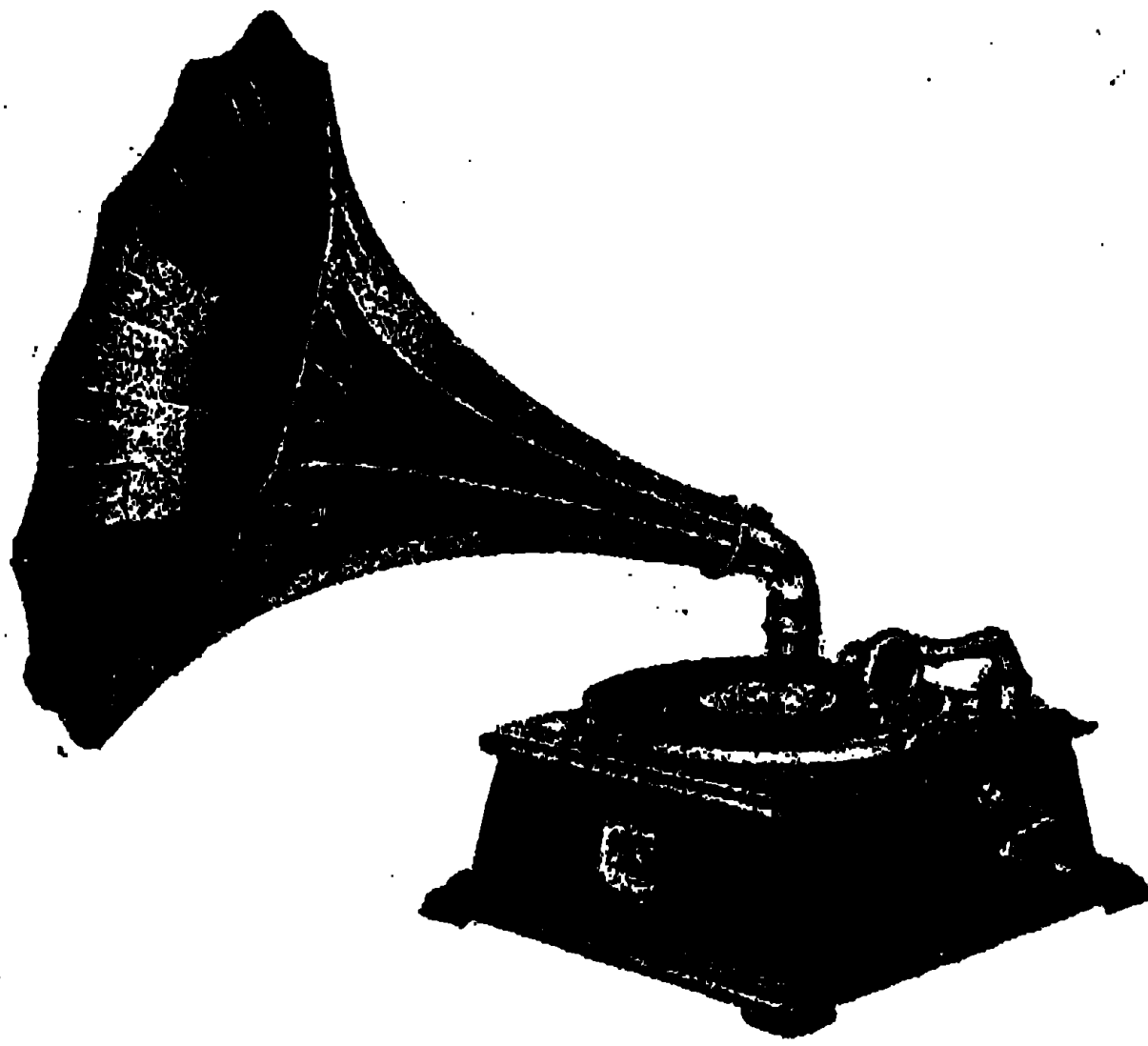
**৩১ নং মেশিন—**
এই মেশিন আকার, গঠন, শিল্প-প্রণালী ইত্যাদি প্রায় সমস্ত বিষয়েই ৩২ নং মেশিনের মত; কিন্তু মূল্যে ইহা অধিকতর সুলভ। ইহাতে ডবল্ স্প্রিং-সংযুক্ত মোটর সন্নিবিষ্ট আছে।
মূল্য ১৪৫৲ টাকা।

উপরোক্ত মেশিন দুইটী হইতে অপেক্ষাকৃত অল্প মূল্যের হর্ণ-মডেল গ্রামোফোন—

**৩৩ নং মেশিন—**
চিত্রপ্রদর্শিত ক্যাবিনেট্, ডবল্ স্প্রিংযুক্ত মোটর, "হিজ্ মাষ্টার্স ভয়েস্" ২নং সাউণ্ড বক্স সমেত।
মূল্য ১১২৷৷৹ টাকা।
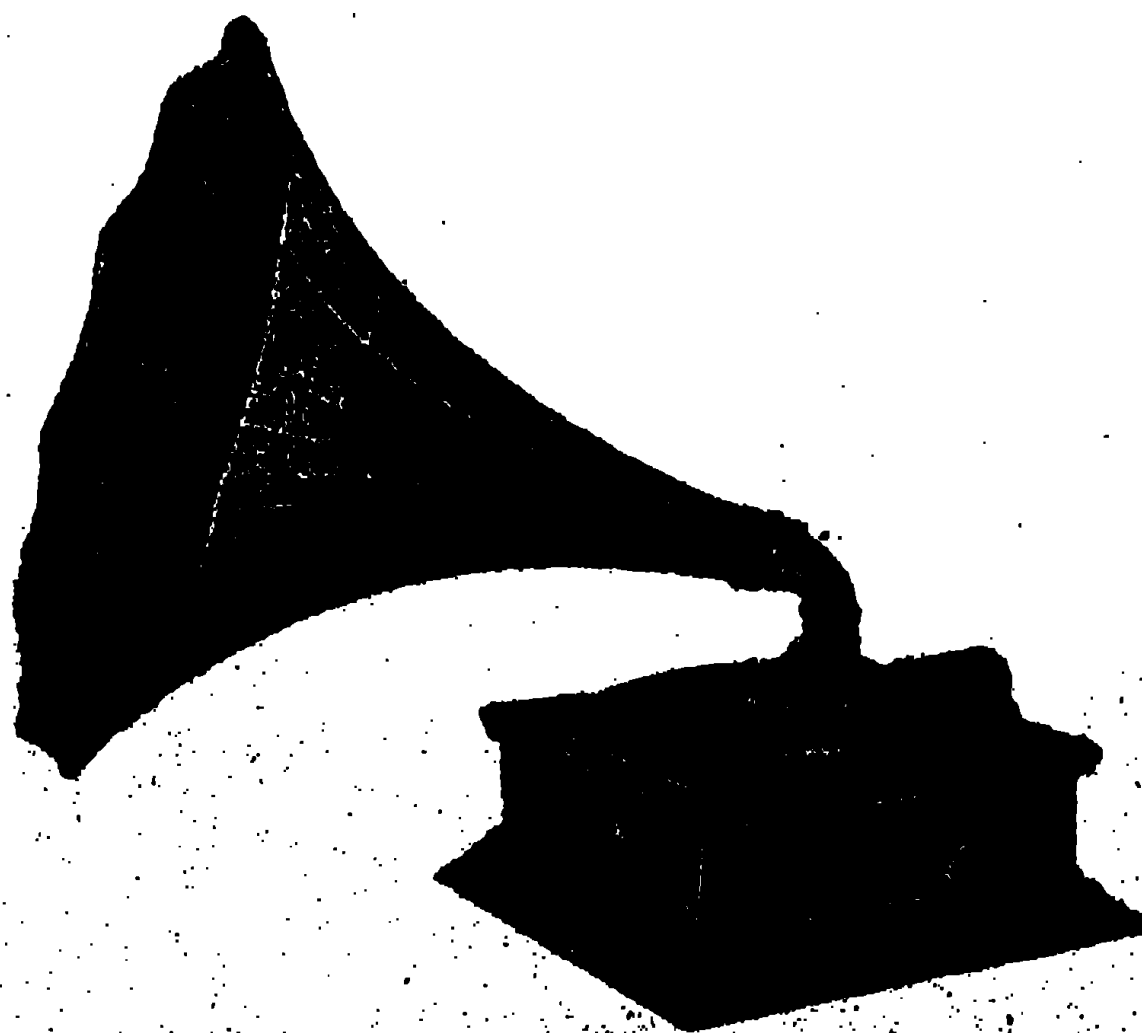
**২১ নং মেশিন—**
এই মেশিন হর্ণ-মডেল গ্রামোফোনের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা সুলভ; একটী স্প্রিং-বিশিষ্ট মোটর ও "একজিবিসন্ সাউণ্ড বক্স" সমেত।
মূল্য ৮৫৲ টাকা।

**— আজই একটী গ্রামোফোন ঘরে রাখিবার ব্যবস্থা করুন —**

70

# বৈকুণ্ঠ রসায়ণ

**সুস্বাদু, তেজস্কর, ক্ষুধা ও বল বীর্য্য বর্দ্ধক পুষ্টিকর মহৌষধ।**

**ইহার শ্রেষ্ঠ উপাদান কি ?**

**আঙ্গুর !**

অত্যধিক মানসিক শক্তির প্রয়োগ বা যৌবন সুলভম অত্যাচারাদি দোষে জীবন্মৃত স্মৃতি শক্তি বিহীন অবসন্ন যুবক বা ছাত্র সমাজের জন্য 'বৈকুণ্ঠ রসায়ণ' অমৃতোপম ঔষধ। কেননা ইহা সেবনে সর্ব্ব শরীরস্থ ধাতু সমূহের সহিত মস্তিষ্কের বিশেষ পুষ্টিসাধন হইয়া থাকে।

সুস্থ শরীরে সেবন করিলে শরীর পুষ্ট ও সবল হয় এবং বল বীর্য্য ও কান্তি বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

বৈকুণ্ঠ রসায়ণ ব্যবহার করুন

আপনিও এইরূপ শক্তিশালী হইবেন

সর্দ্দি, কাসি, হাঁপানী ও ক্ষয় রোগের ইহাই একমাত্র ঔষধ। স্পর্দ্ধা করিয়া বলিতে পারি ইহাতে কাস রোগ আরোগ্য না হইলে আর কোন ঔষধে আরোগ্য হইবে না। মূল্য শিশি ১৲ মাশুল ৷৶৹ আনা ৩শিশি একত্রে ২৷৹ টাকা মাশুল ১৶৹ আনা।

জগদ্বিখ্যাত

ধ্বজভঙ্গের মহৌষধ।

**শ্রীগোপাল মালীশ।**

ইন্দ্রিয় দৌর্ব্বল্যে এই মালীশ ১শিশি ব্যবহারেই ইন্দ্রিয় সঙ্কোচতা পরিহার করতঃ দৃঢ়তার সহিত পুষ্ট ও শক্তি সম্পন্ন হয়। খর্ব্ব ইন্দ্রিয় বৃদ্ধি করিতে ইহাই অদ্বিতীয়। ইহার সহিত আমাদের "রতিবল্লভ মোদক" ব্যবহার অশিতিপর বৃদ্ধও যুবক সদৃশ শক্তিশালী হয়। প্রত্যুত: ইহা স্বপ্নদোষ ও শুক্রতারল্যের অমোঘ ঔষধ। সুস্থ শরীরে দিনান্তে ইহা ১ মাত্রা সেবনে ভোগ বিলাসে অপূর্ব্ব তৃপ্তি লাভ করিবেন। বীর্য্যস্তম্ভ রতি ক্রিয়ার ইহা অদ্বিতীয়। মূল্য মালীশ ১৷৹ আনা, মোদক ১৷৹ আনা। মাশুল ৷৹ আনা। ২টী ঔষধ একত্রে লইলে মাশুল লাগে না। কবিরাজ—শ্রীনগেন্দ্র নাথ কাব্যতীর্থ বিদ্যাভূষণ আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রী। ( বৈকুণ্ঠ আয়ুর্ব্বেদ ভবন ১১।২ হ্যারিসন রোড, কলিকাতা। )

---

## পূজার উপহার গন্ধরাজ তৈল পূজার উপহার

**মস্তিষ্ক শীতল রাখিবার প্রধান উপায়।**

এই মহাসুগন্ধি গন্ধরাজ তৈল যে স্থানে বসিয়া মালিস করা হয়, তাহার নিকটে কোন লোক থাকিলে ইহার মনোমুগ্ধকর গন্ধে মোহিত হইয়া তৎক্ষণাৎ জিজ্ঞাসা করিবে, মহাশয়! এটি কি তৈল ? এ পর্য্যন্ত বহুপ্রকার সুবাসিত তৈল বাহির হইয়াছে, তাহার মধ্যে ইহাই সর্ব্বপ্রধান। শিশির কর্ক খুলিলেই গন্ধে ঘর আমোদিত করিবে, কেশ দীর্ঘ ও ঘন করিতে এই তৈলের অসাধারণ ক্ষমতা। স্ত্রীলোকের ঋতু পরিষ্কার না হওয়ার দরুণ হাত পা জ্বালা প্রভৃতি রোগে এই তৈল মালিস করিলে আরাম হয়, শরীর স্নিগ্ধ থাকে।

আমরা অদ্য হইতে ১৩৩৫ সালের অগ্রহায়ণ পর্য্যন্ত গ্রাহকগণকে নিম্নোক্ত উপন্যাস উপহার দিব। মূল্য ১ শিশি ১৲ মাঃ ।৶৹ আনা উপহার—১খানি সরোজ কুমার। ৩শিশি ২৷৹ মাঃ ৸৶৹ আনা, উপহার—১খানি পারস্য উপন্যাস।

গন্ধরাজ তৈল

**কবিরাজ শ্রীরাজেন্দ্র নাথ সেনগুপ্ত কবিরত্ন।**

**মহৎ আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়।**

**১৪৪।১ নং অপার চিৎপুর রোড, শোভাবাজার, কলিকাতা।**

# সাবধান ! সাবধান !! সাবধান !!!

রবারের জাঙ্গিয়ার মূল্য কেবল ১॥০ টাকা নয় প্রত্যেক সাইজের মূল্য ১৲ টাকা মাত্র। ডাক মাশুল ॥০ আনা। এক ডর্জ্জন একত্রে লইলে ডাক মাশুল লাগে না।

গ্রাহকগণ সত্বর হউন। গুদাম সাবাড় হইয়া আসিল। বিলম্বে হতাশ হইবেন।

বিশেষ দ্রষ্টব্য :—গ্রাহকগণকে ঠকান আমাদের উদ্দেশ্য নয়—আমরা উচিৎ মূল্যে খাঁটী জিনিষ দিয়া থাকি। আজকাল অনেকে বিজ্ঞাপনের মোহে ভুলিয়া অধিক মূল্যে খারাপ জিনিষ ক্রয় করিয়া থাকেন।

## রবারের জাঙ্গিয়া

স্ত্রী পুরুষ বালক বালিকা সকলের জন্য উপকারী। শিশুদিগকে পরাইয়া দিলে মল মূত্রের দ্বারা বিছানা খারাপ হয় না। স্ত্রীলোকের মাসিক ঋতুপাতের সময়, পুরুষেরা নদীতে কিম্বা পুষ্করিণীতে সাঁতার দেওয়ার সময় ইহা খুবই উপযোগী। দেখিতে রেশমের ন্যায়। বালক বালিকাদিগের জন্য ১, ২, ৩নং সাইজ বয়স্কদিগের জন্য ৪ ও ৫নং সাইজ।

ইহাপেক্ষা অধিক আর কি আশা করেন। বিজ্ঞানের অদ্ভুত ক্ষমতা দেখিয়া চমৎকৃত হউন এবং জার্ম্মাণী পকেট ঘড়ি পুরস্কার লউন।

## পুরস্কার ! কেবলমাত্র একমাসের জন্য পুরস্কার !!

গ্রাহকগণ সত্বর হউন। পার্শ্বের ঘড়ির মত অবিকল জার্ম্মাণী রেলওয়ে টাইম পকেট ওয়াচ সুন্দর চেনসহ প্রচারার্থে পুরস্কার স্বরূপ দেওয়া হইতেছে।

# বৈজ্ঞানিক বিজলী কালী

বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে প্রস্তুত—এই কালির বিষয় অবগত হইলে আপনি নিশ্চয় আশ্চার্য্যান্বিত হইবেন—এবং ইহা ব্যবহার করিবার জন্য আকুল হইয়া উঠিবেন। প্রেমিক প্রেমিকার নিকট গোপনে প্রাণের আশা আকাঙ্খা পত্রে জানাইতে হইলে হাসি তামাসা বা কোন গুরু গোপন উদ্দেশ্য কাহাকেও লিখিবার আবশ্যক থাকিলে এই কালি আপনার একমাত্র সহায়। এই কালি দ্বারা আপনার সকল গোপন উদ্দেশ্য নির্ভয়ে সাধিত হইবে। ইহার বিশেষত্ব এই যে আপনি নিজে অথবা আপনি যাহাকে পড়াইতে ইচ্ছা করেন সেই ব্যতীত অন্য কাহারও এই কালির লেখা পড়িবার ক্ষমতা হয় না। ইহার আশ্চর্য্য গুণ দেখিয়া হাজার হাজার লোক চমৎকৃত হইয়াছেন। সকলেই ইহা আনন্দের সহিত গ্রহণ করিতেছেন ইহার বহুল কাটতিই তাহার প্রমাণ। পাঠ করিবার প্রক্রিয়া পার্শ্বেলের সহিত পাঠান হইয়া থাকে। মূল্য ১ শিশি ॥০ ৪ শিশি একত্র লইলে চেন সহ একটী রেলওয়ে টাইম পকেট ঘড়ি পুরস্কার দিয়া থাকি। ডাকমাশুল স্বতন্ত্র।

## দি গ্লোভ নভেলটী কোং

২৬।১।১ বারানসী ঘোস ষ্ট্রীট,

কলিকাতা

মিসর জননী
বেগম জগলুল পাশা

"Mohammadi" Press

মাসিক মোহাম্মদী

| প্রথম বর্ষ | আশ্বিন ১৩৩৫ সাল | ১২শ সংখ্যা |
|---|---|---|

# জয় মোহাম্মদ! জয় মোস্তফা!!

[ মোহাম্মদ আকরম খাঁ ]

صبح امید که بد معتکف پردهٔ غیب

گوبروں آے ! که کار شب تار آخر شد

অদৃষ্টের অন্তরালে ধ্যানমগ্ন যে আশার উষা, স্বর্গ মর্ত্তের সকল কণ্ঠে সকল স্বরে সকল সুরে অভ্যর্থনা করিয়া বল তাহাকে—মারহাবা, স্বাগতম!

কারণ—অন্ধকারের রাজত্ব শেষ হইয়াছে।

প্রেমের পুণ্যপুলকে সকল বিশ্বে অনন্ত শিহরণ জাগাইয়া, সকল কণ্ঠে সকল শব্দে, সকল ভাবে সকল ভাবে অভিবাদন করিয়া বল তাহাকে—শুভমস্তু, স্বাগতম!

কারণ—অশুভের রাজত্ব শেষ হইয়াছে।

দুনয়ার সকল মূকের সকল মৌনের, বিশ্বের সকল আর্ত্তের সকল নিঃস্বের, জগতের সকল ব্যথিতের সকল মথিতের ফরয়াদ-নাদকে অভয় দান করিয়া বল—বিদায়, আজ তাঁহাদের চিরবিদায়!

কারণ—নির্ম্মমতার রাজত্ব শেষ হইয়াছে।

সকল দেশের সকল যুগের, সকল শাস্ত্রের সকল মন্ত্রের, সকল সামের সকল সামগের সকল ঝঙ্কারে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিয়া বল—সকলে নূতন প্রেরণায় জীবন্ত হও! সকলে নূতন চেতনায় জাগ্রত হও!! সকলে নূতন আকর্ষণে সম্মিলিত হও!!!

কারণ—মরণের অচৈতন্যের বিচ্ছেদের রাজত্ব শেষ হইয়াছে।

সকল দাসের সকল হতাশের, সকল বঞ্চিতের সকল লাঞ্ছিতের পর-পদ-দলিত পঞ্জরে পঞ্জরে মহা মঙ্গলের অযুত জয়ধ্বনি জাগাইয়া ঘোষণা কর—শক্তি আসিয়াছে, মুক্তি আসিয়াছে!

কারণ—অসাম্যের রাজত্ব শেষ হইয়াছে।

দেশে দেশে আজ মহাসংহতির মোবারকবাদ, জাতিতে জাতিতে আজ মহা ঐক্যের শুভ সূত্রপাৎ, শাস্ত্রে শাস্ত্রে আজ মহা সন্ধির জয়জয়কার! মহাপুরুষে মহাপুরুষে আজ মহাসম্মিলন, ধর্ম্মে ধর্ম্মে আজ মহা সমন্বয়, বিষম বিশ্বসমস্যার আজ মহা সমাধান! আজ দেশ জাতি ও ধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে বিশ্ববাসীর মহা-উৎসব!

কারণ—তিনি আসিয়াছেন।

সকল সমস্যার সমাধানরূপে, সকল ব্যবধানের সমন্বয়রূপে, সকল মরণের অমৃতরূপে তিনি শুভাগমন করিয়াছেন।

দীর্ঘ ১৪শ শতাব্দী পূর্ব্বে, প্রথম 'রাবীর' শুক্লপক্ষের দ্বাদশী তিথিতে এক শান্ত শুভ্র উষার প্রথম আলোক-লেখার সঙ্গে সঙ্গে, আল্লার এই অনন্ত রহমত মক্কার এক কোরেশ বিধবার পর্ণ-কুটীরে মোহাম্মদরূপে আত্মপ্রকাশ করেন।

আজ সেই মহা প্রকাশের স্মৃতি-উৎসব, সেই রহমত-স্বরূপের জয় বন্দনা—সত্যকারভাবে তাঁহাকে গ্রহণ করার নূতন সঙ্কল্প-সাধনা।

কোটি কণ্ঠে তাঁহার জয়গান করিয়া বল—জয় মোহাম্মদ! জয় মোস্তফা!! ভিতরের বাহিরের সকল অন্যায় অনাচারকে লক্ষ্য করিয়া, সকল অপ্রেম অসাম্যকে লক্ষ্য করিয়া, সকল বিচ্ছেদ-ব্যবধানকে লক্ষ্য করিয়া—

**বল ঃ—জয় মোহাম্মদ! জয় মোস্তফা!!**

**জয় জয় মোহাম্মদ! জয় মোস্তফা!!!**

مرحبا سید مکی مدنی العربی

دل و جان باد فدایت چه عجب خوش لقبی

اللهم صل علی سیدنا محمد —

( সাপ্তাহিক মোহাম্মদী হইতে উদ্ধৃত )

---

# সমস্যা ও সমাধান

[ মোহাম্মদ আকরম খাঁ ]

## সঙ্গীত সমস্যা

( ১ )

সাধারণতঃ লোকের বিশ্বাস এই যে, এছলাম ধর্ম্মে সকল প্রকারের সমস্ত সঙ্গীতকেই নিষিদ্ধ বলিয়া আদেশ দেওয়া হইয়াছে। আমাদের দেশের আলেম সমাজ সাধারণ ভাবে সঙ্গীতের বিরুদ্ধে যে সব কঠোর অভিমত প্রকাশ করিয়া থাকেন, তাহাতেও জন সাধারণের উপরোক্ত বিশ্বাসের যথেষ্ট পোষকতা হইয়া আসিতেছে। কিন্তু, এ সম্বন্ধে যথাসাধ্য অনুসন্ধান করার পর, আমরা এই স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি যে, জনসাধারণের এই বিশ্বাস বা আলেম সমাজের এই অভিমত মূলতঃ এছলামের অর্থাৎ কোরআন হাদিছের দলিল প্রমাণের সহিত আদৌ সমঞ্জস নহে।

এই আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়ার পূর্ব্বে জানিয়া রাখিতে হইবে যে, কোন কাজের সিদ্ধতা ও অসিদ্ধতা সম্বন্ধে তর্ক উপস্থিত হইলে, যাঁহারা সেই কাজকে অসিদ্ধ বলিয়া দাবী করিবেন—প্রমাণের ভার পড়িবে তাঁহাদের উপর। অর্থাৎ তাঁহাদিগকেই সপ্রমাণ করিতে হইবে যে, আলোচ্য কার্য্যটী অমুক আইনের অমুক ধারামতে অপরাধজনক বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছে। হোরমতের বা অসিদ্ধতার প্রমাণ না থাকিলেই তাহা সিদ্ধ বা জাএজ বলিয়া পরিগণিত হইবে। এক্ষেত্রে জওয়াজের বা সিদ্ধতার প্রমাণ উপস্থিত করার জন্য অপর পক্ষকে বাধ্য করা যাইতে পারে না। ফলতঃ সঙ্গীত হারাম বা নিষিদ্ধ হওয়ার সন্তোষজনক প্রমাণ যদি বিদ্যমান না থাকে, তাহা হইলেই বুঝিতে হইবে যে, ইহাই তাহার সিদ্ধতা বা জাএজ হওয়ার যথেষ্ট প্রমাণ।

"অমুক কাজ এছলামে নিষিদ্ধ"—এরূপ দাবী যাঁহারা করিবেন, তাঁহাদিগকে দেখাইতে হইবে যে, কোরআনের অমুক আয়তে বা হজরতের অমুক হাদিছে সেই কাজকে হারাম বা নিষিদ্ধ বলিয়া স্পষ্ট অভিমত ব্যক্ত করা হইয়াছে। এছলামে সকল প্রকারের সঙ্গীত সর্ব্বোতভাবে নিষিদ্ধ—এই দাবী যাহারা করিবেন, তাঁহাদিগকেও ঐ প্রকারে কোরআনের আয়ত বা হজরতের হাদিছ উদ্ধৃত করিয়া স্পষ্টভাবে নিজেদের দাবী সপ্রমাণ করিতে হইবে। আমরা দাবী করিয়া বলিতেছি—ত্রিশপারা কোরআনের মধ্যে এরূপ একটী আয়তও খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না, যাহাতে সঙ্গীতকে নিষিদ্ধ বলিয়া ব্যবস্থা দেওয়া হইয়াছে। পক্ষান্তরে, হজরত রছুলে করিম সঙ্গীত মাত্রকেই নিষিদ্ধ বা না-জাএজ বলিয়া আদেশ প্রদান করিয়াছেন—এরূপ একটীও ছহী হাদিছ আজ পর্য্যন্ত খুঁজিয়া পাওয়া যায় নাই। অধিকন্তু এই প্রকার কোন ছহী হাদিছ বিদ্যমান না থাকার কথা বহু সর্ব্বজনমান্য আলেম ও এমাম একবাক্যে স্বীকার করিয়া গিয়াছেন।

সঙ্গীত নিষিদ্ধ নহে—ইহা প্রতিপন্ন করার জন্য এই টুকুই যথেষ্ট ছিল। কিন্তু, এই আলোচনাকে পূর্ণ পরিণত করার জন্য অধিকন্তু হিসাবে আমরা ইহাও দেখাইব যে, সঙ্গীত নিষিদ্ধ হওয়ার প্রমাণ নাই—শুধু ইহা নহে, বরং হজরতের কাজ ও কথা দ্বারা সঙ্গীতের সিদ্ধতা বা জাএজ হওয়ার posative প্রমাণ বিদ্যমান আছে।

পক্ষান্তরে আমরা ইহাও সপ্রমাণ করিয়া দেখাইব যে, ছাহাবীগণের যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া বিগত শতাব্দীর শেষভাগ পর্য্যন্ত আমাদের এমাম, মোজাদ্দেদ, মোজতাহেদ এবং স্বনাম ধন্য আলেম ও গ্রন্থকারগণের মধ্যে অনেকেই এই অভিমত প্রকাশ করিয়া আসিতেছেন। ফলতঃ আমরা আজ যাহা বলিতে যাইতেছি—তাহা আমাদের আবিষ্কৃত নূতন কথা আদৌ নহে।

আমরা বিশ্বাস করি—এছলাম আল্লার সত্যধর্ম্ম পূর্ণধর্ম্ম

ও শাশ্বত ধর্ম। সকল দেশে সকল যুগে তাহা সমান ভাবে প্রযুজ্য। সুতরাং এছলাম অচল কখনই হইবে না—এছলামের সংস্কারের আবশ্যক কখনও করিবে না। নিজেদের উপেক্ষা অজ্ঞতা ও অন্ধ বিশ্বাসের ফলে আল্লার সেই সত্য সনাতন পূর্ণ ও শাশ্বত ব্যবস্থাকে নানা আবর্জ্জনা পুঞ্জের মধ্যে আচ্ছাদিত করিয়া কার্য্যতঃ তাহাকে অচল করিয়া ফেলিয়াছি আমরাই। সেই আবর্জ্জনাপুঞ্জকে ধৈর্য্যের সহিত অপসারিত করিয়া ফেলাই সংস্কারকের কাজ—তাহা হইলেই তাহার এই বাহিরের অচলতা আপনা আপনিই দূর হইয়া যাইবে।

আলেম সমাজের মধ্যে যাঁহারা সঙ্গীতকে একদম হারাম বলিয়া কঠোরতার সহিত অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন—তাঁহাদের এই নিষেধ-ধারার মূলে মুছলমান সমাজের—বিশেষতঃ তাঁহাদের খলিফা ও আমীরগণের নৈতিক ও সামাজিক জীবনের একটা গুরুতর প্রভাব বিদ্যমান আছে। একটু অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে জানা যাইবে যে, সমসাময়িক যুগের ব্যভিচার ও সীমালঙ্ঘনের প্রতি লক্ষ্য করিয়া অবস্থা গতিকে বৃহত্তর অমঙ্গলের গতিরোধ করার সাধু উদ্দেশ্যেই তাঁহারা ঐ প্রকার ব্যবস্থা প্রদান করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। এই কঠোরতা অবলম্বনের আর একটা কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন—অন্যদিকের চরমপন্থী তথাকথিত ছুফী ও ফকিরগণ। তাঁহাদের অনাচারের ফলে সঙ্গীতকে সকলে ধর্ম্ম এবং সাধনার প্রধানতম অবলম্বন বলিয়া গ্রহণ করিতে লাগিল। পক্ষান্তরে সঙ্গীতের মধ্যবর্ত্তিতায় প্রেম সাধনার নামে অসংযত জনসমাজে নানা কুৎসিত ব্যভিচারের প্রশ্রয় দিন দিন বাড়িয়া যাইতে লাগিল। ফলে এই নিষেধের ব্যবস্থার সহিত উপরোক্ত দুইটী অবস্থার প্রভাব খুবই ঘনিষ্ঠভাবে জড়ীভূত হইয়া আছে। সে যাহা হউক, এখানে আমাদের বক্তব্য এই যে, ইহা এই শ্রেণীর আলেমগণের এজ্‌তেহাদ এবং তাহার সঙ্গতি অসঙ্গতি সর্ব্বদাই প্রমাণ সাপেক্ষ। এই এজ্‌তেহাদ সঙ্গত বলিয়া প্রমাণিত হইলে এবং বর্ত্তমান যুগের জন্য, ব্যাপকতর ও বৃহত্তর অমঙ্গলের গতিরোধ করার উদ্দেশ্যে আবশ্যক হইলে, ধর্ম্মের হিসাবে ও যুক্তির হিসাবে এখনও ঐ ব্যবস্থা সমানভাবে প্রযুজ্য হইতে পারে।

## ( ২ )

সঙ্গীতকে নিষিদ্ধ বলিয়া সপ্রমাণ করার চেষ্টা যে সকল আলেম করিয়াছেন, তাঁহাদের দলিল প্রমাণগুলি অবগত হওয়ার নিমিত্ত আমরা তাঁহাদের বহি পুস্তকের সন্ধান লইতে কোন প্রকার ত্রুটী করি নাই। আমাদের মতে হাফেজ এমাম এবনে যওজীকে এক্ষেত্রে অন্য পক্ষের প্রধান উকীলের পদ দেওয়া যাইতে পারে। এমাম ছাহেব নিজের "তালবিছ-এব্‌লিছ" পুস্তকে ২৩৭ হইতে ২৬৭ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত সঙ্গীত হারাম হওয়ার অনুকূল ও প্রতিকূল প্রমাণগুলি সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। তিনি সঙ্গীত হারাম হওয়ার অনুকূলে কোর-আনের তিনটী আয়ত এবং হজরতের কএকটী হাদিছ প্রমাণ স্বরূপ উপস্থিত করিয়াছেন। আমরা সর্ব্বপ্রথমে প্রতিপক্ষের উপস্থাপিত ঐ সকল দলিল প্রমাণের বিচারে প্রবৃত্ত হইব। নিজদের অন্যান্য বক্তব্যগুলি তাহার পর যথাক্রমে নিবেদন করার চেষ্টা পাইব।

**প্রথম প্রমাণ—**

ছূরা লোকমানের প্রথম রূকুতে বর্ণিত হইয়াছে :—

ومن الناس من يشترى لهو الحديث ليضل
عن سبيل الله بغير علم ' و يتخذها هزوا ' اولئك
لهم عذاب مهين - واذا تتلى عليه ايتنا ولى
مستكبرا كان لم يسمعها كان فى اذنيه وقرا ' فبشره
بعذاب اليم -

এবং কোন কোন লোক এরূপ আছে যাহারা ( লোক-দিগকে ) আল্লার পথ হইতে ভ্রষ্ট করার উদ্দেশ্যে বিনাজ্ঞানে কথার মধ্যকার যাহা বেহুদা তাহাকে ক্রয় করিয়া থাকে এবং আল্লার পথকে হাসি তামাসারূপে গ্রহণ করিয়া থাকে, অপমানজনক আজাব ইহাদিগের জন্যই ( নির্দ্ধারিত ) আছে। এবং আমার আয়তগুলি যখন তাহাদিগের নিকট অধীত হয়, তখন তাহারা অহঙ্কার ভরে ফিরিয়া দাঁড়ায়, যেন তাহারা তাহা শ্রবণ করে নাই, তাহাদের কর্ণদ্বয় যেন বধীর, অতএব তাহাদিগকে ক্লেশদায়ক দণ্ডের সংবাদ শুনাইয়া দাও!

এমাম এবনে যওজী ও তাঁহার স্বপক্ষীয়রা বলিতেছেন—এই আয়তে বর্ণিত لهو الحديث বা বেহুদা কথা অর্থে সঙ্গীত। কারণ, এবনে-মছউদ ও এবনে-আব্বাছ নামক

দুইজন ছাহাবী ঐ পদের ঐরূপ তাৎপর্য্য করিয়াছেন। ইহা ব্যতীত তাঁহারা কএকটা হাদিছ এই প্রসঙ্গে উদ্ধৃত করিয়া বলিতেছেন—গায়ীকা-দাসীদিগের ক্রয় বিক্রয় যে এই আয়ত কর্ত্তৃক নিষিদ্ধ হইয়াছে, তাহা স্বয়ং হজরত রছুলের প্রমুখাৎ খুব স্পষ্টভাবে প্রতিপন্ন হইয়া যাইতেছে।

এই আয়তের তাৎপর্য্য সম্বন্ধে সূক্ষ্ম বিচারে প্রবৃত্ত হওয়ার পূর্ব্বে পাঠকগণকে সম্পূর্ণ আয়তটীর প্রতি মনোনিবেশ করিতে অনুরোধ করিতেছি। তাহা হইলেই দেখা যাইবে যে, লাহওল-হাদিছকে সঙ্গীত অর্থে গ্রহণ করিলেও, উহা দ্বারা সকল সঙ্গীত সকল অবস্থায় কখনই নিষিদ্ধ বলিয়া প্রমাণিত হয় না। তফছিরকারেরা এই প্রসঙ্গে বলিতেছেন—

اللام للتعليل ...... فافاد هذا التعليل انه انما يستحق الذم من اشترى لهو الحديث ليضل المقصد -

অর্থাৎ "ليضل শব্দের লাম তা'লিল বা কারণ ব্যঞ্জক। অতএব উহা দ্বারা জানা যাইতেছে যে, মানুষকে আল্লার পথ হইতে ভ্রষ্ট করার উদ্দেশ্যে যে সব বেহুদা কথা গ্রহণ করা হয়, আয়তে কেবল তাহারই নিন্দা করা হইয়াছে।" এরূপ অবস্থায় গদ্য পদ্য সঙ্গীত অসঙ্গীতের কোনই পার্থক্য থাকে না—অর্থাৎ তাহা নিষিদ্ধ হয় গদ্য বলিয়া বা সঙ্গীত বলিয়া নহে, আল্লার পথ হইতে মানুষকে ভ্রষ্ট করার জন্য তাহাকে উপলক্ষরূপে ব্যবহার করা হয় বলিয়া।

আয়ত দুইটী সরাসরিভাবে পড়িয়া দেখিলেও জানা যাইবে যে, যে সকল ধর্ম্মদ্রোহী ব্যক্তি জনসাধারণকে এছলাম হইতে পরাঙ্মুখ করার জন্য নানাবিধ বেহুদা বাক্যবিন্যাস করিতে অভ্যস্ত ছিল এবং যাহারা কোরআনের আয়তগুলিকে শ্রবণ করিয়া অহঙ্কারভরে তাহার প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করিত, আয়তে তাহাদিগের নিন্দা করা হইয়াছে মাত্র। সঙ্গীত ও অসঙ্গীত লইয়া কোন কথাই এখানে বলা হয় নাই।

পাঠকগণ দেখিতেছেন—মতভেদের মূল হইতেছে, لهو শব্দের তাৎপর্য্য লইয়া। অন্য পক্ষ বলিতেছেন যে, উহার অর্থ সঙ্গীত, এবং ইহার প্রমাণ স্বরূপ তাঁহারা এবনে আব্বাছ ও এবনে মাছউদের উক্তি উদ্ধৃত করিয়াছেন। এ সম্বন্ধে আমাদের প্রথম নিবেদন এই যে, আমরা আবদুল্লাহ এবনে আব্বাছ ও এবনে মাছউদকে, বোজর্গ বলিয়া মান্য করিলেও, নবী ও মাছুম বলিয়া তাঁহাদিগকে গ্রহণ করিতে কখনও প্রস্তুত নহি। সুতরাং তাঁহাদিগের উক্তিমাত্রকে বিনা বিচারে গ্রহণ করা আমরা অসঙ্গত বলিয়াই মনে করিয়া থাকি। কোরআনের তফছির সম্বন্ধে ইঁহাদিগের শত শত কথা আলেম মণ্ডলী কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া আছে। অন্যথায় কএকটা ছুরাকে পর্য্যন্ত কোরআনের অঙ্গ হইতে বাদ দিয়া ফেলিতে হইবে। বিজ্ঞ পাঠকবর্গ বিশেষরূপে অবগত আছেন যে, তফছিরের কেতাবগুলিতে স্বয়ং হজরতের নাম করণে এরূপ শত শত রেওয়ায়ত সন্নিবেশিত হইয়া আছে, বস্তুতঃ যাহা হজরতের হাদিছ কখনই নহে। এ অবস্থায় ছাহাবাগণের নাম করিয়া যে সকল রেওয়ায়ত তফছির গ্রন্থ সমূহে স্থানলাভ করিয়া আছে, তাহার সঙ্কলনে গ্রন্থকারগণ যে কতটুকু সতর্কতা অবলম্বন করিয়াছেন, তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। হজরত এবনে আব্বাছের তফছির বলিয়া যে পুস্তকখানা আমাদের সমাজে চলিয়া যাইতেছে, তাহার বিশ্বস্ততা সম্বন্ধে তদন্ত করিয়া দেখিলেই আমরা অনেক রহস্য অবগত হইতে পারিব। তিনি ইহার একটা বড় প্রমাণ এই যে, এবনে আব্বাছ এরূপ কথা বলেন নাই—স্বয়ং সঙ্গীত শ্রবণ করিতেন বলিয়া প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। (দেখ—আগানী ১—৩১)।

'লাহ্ও' শব্দের অর্থ—সকল প্রকারের খেলা, তামাশা, অনর্থক কাজ কথা বা আনন্দদায়ক ব্যাপার—যাহা মানুষকে গুরুতর বিষয় হইতে বিরত করিয়া রাখে। (রাগেব, মাওয়ারেদ প্রভৃতি)।

'হাদিছ' শব্দের অর্থ কথা। লাহওল-হাদিছ পদের অর্থ اللهو من الحديث (মাজমাউল বেহার) অতএব ঐ শ্রেণীর সমস্ত কথাই উহার অন্তর্ভুক্ত, তা সে সঙ্গীতই হউক বা না হউক। অর্থাৎ যে অবস্থায় যে শ্রেণীর কথা বলা বা শোনা নিষিদ্ধ, যে অবস্থায় যে শ্রেণীর গদ্য পড়া বা শোনা নিষিদ্ধ, যে অবস্থায় যে শ্রেণীর পদ্য পড়া বা শোনা নিষিদ্ধ—সে অবস্থায় সেই শ্রেণীর গান করা ও শোনাও নিষিদ্ধ হইবে। আর যে অবস্থায় যে শ্রেণীর কথাবার্ত্তা সিদ্ধ, সে অবস্থায় সে শ্রেণীর সঙ্গীতও সিদ্ধ। বস্তুতঃ হজরত এবনে আব্বাছের নামকরণে বর্ণিত সমস্ত রেওয়ায়ত একত্র করিয়া আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলেও এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া ব্যতীত গত্যন্তর থাকে না। এবনে আব্বাছ স্পষ্টতঃ বলিতেছেন—

هو الغناء و اشباهه

অর্থাৎ গান ও তাহার অনুরূপ বিষয় সমূহ হইতেছে "লাহ্‌ও।" সুতরাং একমাত্র সঙ্গীতকেই লাহ্‌ও বলা হইতেছে না—তাহার অনুরূপ সমস্ত বিষয়ই ইহার অন্তর্ভুক্ত। সঙ্গীতকে সঙ্গীত বলিয়া হারাম করিলে তাহার জন্য এমন একটা ব্যাপক শব্দ কখনই ব্যবহার করা হইত না। ফলে লহওল-হাদিছের অন্তর্ভুক্ত হইবে যে সকল সঙ্গীত এবং যুগপৎভাবে মুছলমান-দিগকে এছলাম হইতে বিচলিত করার উদ্দেশ্য যে সঙ্গীতকে উপলক্ষরূপে গ্রহণ করা হইবে, এই আয়ত হইতে গৌণিভাবে কেবল সেই শ্রেণীর সঙ্গীতের নিষিদ্ধতা সপ্রমাণ হইতেছে,—যেমন সকল প্রকারের কথাবার্ত্তা এবং ওয়াজ বক্তৃতাও এই পর্য্যায়ভুক্ত হইলে আলোচ্য আয়ত দ্বারা তাহাও নিষিদ্ধ হইয়া যাইবে। এই প্রকারের কোন কোন কথাবার্ত্তা বা কোন কোন ওয়াজ বক্তৃতা এই আয়ত হইতে ঐরূপ ব্যাপক অর্থে গৌণি-ভাবে হারাম বলিয়া প্রতিপন্ন হইতে পারে—এই যুক্তির বলে দুন্‌য়ার সমস্ত নির্দ্দোষ কথাবার্ত্তা বা সঙ্গত ওয়াজ বক্তৃতাকে হারাম বলিয়া ফৎওয়া দেওয়া কখনই উচিত হইবে না।

এমাম এবনে যওজী এই আয়তকে প্রমাণ স্বরূপ উপস্থাপিত করিয়া নিজেদের মতের পোষকতার জন্য কএকটা হাদিছের উল্লেখ করিয়াছেন। এই হাদিছগুলির সারমর্ম্ম এই যে, হজরত রছুলে করিম বলিতেছেন—গায়ীকা-দাসীর ক্রয় বিক্রয় এবং তাহাদিগকে (সঙ্গীত) শিক্ষা দেওয়া হারাম। এই আদেশ প্রচার করার সঙ্গে সঙ্গে হজরত আলোচ্য আয়তের বরাত দিয়াছেন। অতএব এই আয়ত যে গায়ীকা-দাসীদিগের ক্রয় বিক্রয় হারাম করিয়া দিতেছে, তাহাতে আর বিন্দুমাত্রও সন্দেহ থাকিতেছে না। তাহার পর, ইহাও দেখা যাইতেছে যে, গায়ীকা-দাসীর ক্রয় বিক্রয় বন্ধ করিয়া দেওয়ার হেতু হইতেছে তাহার সঙ্গীত, অন্যথায় সাধারণ দাস দাসীর বিক্রয় তখন অসিদ্ধ ছিল না।

এ সম্বন্ধে প্রথম ও শেষ কথা এই যে, বস্তুতঃ ঐ রেওয়ায়তগুলি এতদূর দুর্ব্বল ও অবিশ্বস্ত যে, তাহাকে হজরতের হাদিছ বলিয়া বর্ণনা করা কখনই সঙ্গত হইবে না। এমাম তিরমিজী এই হাদিছের উল্লেখ করিয়া উহাকে "গরিব হাদিছ" এবং উহার রাবী আলী এবনে জএদকে দুর্ব্বল বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন। এমাম হাফেজ এবনে কছির বলিতেছেন—

قلت علی و شیخه و الراوی عنه کلهم ضعفاء -

অর্থাৎ—এই হাদিছের রাবী আলী, তাহার গুরু এবং তাহার শিষ্য সকলেই "দুর্ব্বল"। (তফছির এবনে কছির ৮—৩)। 'এ সম্বন্ধে একটী হাদিছও নির্দ্দোষ নহে' (ফৎহুল বায়ান ৭—২০৯) এই সকল হাদিছের রাবীদিগের দুর্ব্বলতা ও অবিশ্বস্ততার কথা বিভিন্ন চরিত-অভিধানে বিস্তারিত ভাবে আলোচিত হইয়াছে, বিজ্ঞ পাঠকগণকে সেগুলির বিচার করিয়া দেখিতে অনুরোধ করিতেছি।

ফলে এই আলোচনা দ্বারা প্রতিপন্ন হইল যে—

(ক) কোরআনের এই আয়ত হইতে সঙ্গীত মাত্রের নিষিদ্ধ হওয়া কখনই সপ্রমাণ হইতে পারে না।

(খ) ইহার পোষকতার জন্য যে সকল রেওয়ায়ত বর্ণনা করা হইয়াছে, তাহা নিতান্ত দুর্ব্বল ও অবিশ্বাস্য। ঐগুলিকে হজরতের উক্তি বলিয়া দাবী করা কোন মতেই সঙ্গত হইবে না।

( ৩ )

**২য় প্রমাণ—**

ছুরা নজমের শেষ রুকুতে বর্ণিত হইয়াছে—

افمن هذا الحدیث تعجبون ' و تضحکون و لا تبکون ' و انتم سامدون -

তবে কি তোমরা এই (কেয়ামতের) কথায় আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া যাইতেছ? এবং হাসিতেছ—কাঁদিতেছ না, আর তোমরা হইয়া আছ **গাফেল!**

আয়তে আছে ছামেদুন, উহার এক বচন ছামেদ, অর্থ গাফেল। (কবির ৭—৭৭৯)। এবনে-যওজী ও তাঁহার সম মতাবলম্বীরা বলিতেছেন—ছামেদ শব্দের অর্থ সঙ্গীতকারী। কারণ, এবনে আব্বাছ বলিয়াছেন, উহা আরবী ভাষার শব্দ নহে—হেময়রী ভাষায় উহার অর্থ সঙ্গীত।

এ সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য এই যে, হজরত এবনে আব্বাছ ঐরূপ কথা বলেন নাই, বলিলেও তাহা গ্রাহ্য হইতে পারে না। নাফে-এবনুল-আজরকের প্রশ্নের উত্তরে স্বয়ং এবনে আব্বাছ হোজায়লার কবিতা উদ্ধৃত করিয়া উহার আরবী ভাষার শব্দ হওয়া দৃঢ়তার সহিত সপ্রমাণ করিতেছেন (দুররে মনছুর ৭—১৩২) এ অবস্থায় তিনি কি করিয়া বলিতে পারেন যে, উহা বিদেশী ভাষার শব্দ! তাহার পর কোরআনে বিদেশী ভাষার কোন শব্দ স্থান লাভ করিয়াছে

বলিয়া অধিকাংশ এমাম ও আলেমগণ স্বীকার করেন না। (এৎকান দেখ) পক্ষান্তরে আরবী ভাষায় উহার বহুল প্রচলন আছে। "একদা হজরত আলী মছজিদে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন—মুছল্লীরা তাঁহার অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া আছেন। ইহাতে হজরত আলী তাঁহাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—

ما لی اراکم سامدین -

আমি তোমাদিগকে 'ছামেদীন' প্রাপ্ত হইতেছি, ইহার কারণ কি? (কন্‌যুল ওম্মাল ৪—২৫০)। অর্থাৎ বসিয়া জেকের ফেকের ও ধ্যান ধারণায় মশগুল থাকিবে—তাহার প্রতি গফলত করিয়া তোমরা দাঁড়াইয়া আছ, ইহার কারণ কি? অন্যপক্ষের তাৎপর্য্য গ্রহণ করিলে এখানে এই হাদিছের অর্থ এইরূপ দাঁড়াইবে:—মুছল্লীরা হজরত আলীর অপেক্ষায় মছজিদে দাঁড়াইয়াছিলেন—এমন সময় তিনি তথায় উপস্থিত হইয়া বলিলেন—তোমাদের সকলকে গান গাহিতে দেখিতেছি, ইহার কারণ কি?

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ছমদ শব্দের অর্থ যে সঙ্গীত, হজরত এবনে আব্বাছ এরূপ কথা বলিয়াছেন বলিয়া বিশ্বস্তসূত্রে প্রমাণ করা যায় না। এই রেওয়ায়তটী নির্ভর করিতেছে একরামার বর্ণনার উপর। এই একরামার মত অবিশ্বস্ত রাবী খুব কমই খুঁজিয়া পাওয়া যায়। এবনে আব্বাছের নামে বহু মিথ্যা হাদিছ বর্ণনা করার ফলে স্বয়ং তাঁহার পুত্র আলী অবশেসে একরামাকে থামের গায়ে বাঁধিয়া রাখেন। ব্যাপার কি, জিজ্ঞাসা করা হইলে আলী বলেন—

ان هذا الخبيث يكذب على ابى -

এই খবিছটা আমার পিতার নামে মিথ্যা রেওয়ায়ত বর্ণনা করিয়া থাকে। একরামা সম্বন্ধে বিস্তারিত বর্ণনার জন্য মীজানুল—এ'তেদাল ২—১৮৭—৮৯ ও চরিত অভিধান সংক্রান্ত অন্যান্য পুস্তক দ্রষ্টব্য।

এহেন একরামা এবনে আব্বাছের নাম করিয়া যে রেওয়ায়ত বর্ণনা করিয়াছেন, বিশেষতঃ যাহা তাঁহার অন্যান্য রেওয়ায়তের বিপরীত, তাহা কোন মতেই গৃহীত হইতে পারে না। এমাম এবনে যওজীর ন্যায় একজন মোহাদ্দেছ হালাল হারামের বিচার প্রসঙ্গে এই শ্রেণীর রেওয়ায়তগুলিকে যে কেমন করিয়া প্রমাণরূপে উপস্থিত করিতে পারিয়াছেন, বস্তুতঃ আমরা তাহা ভাবিয়া পাইতেছি না।

(৪)

**৩য় প্রমাণ—**

বানি-এছরাইল ছুরায় এবলিছের কথার উত্তরে বর্ণিত হইয়াছে—

و استفزز من استطعت منهم بصوتك -

অর্থাৎ—এবং তাহাদিগের মধ্যকার যাহাকে পার—নিজের শব্দের দ্বারা বিচলিত করার চেষ্টা করিতে থাক। এমাম এবনে যওজী ও তাঁহার সমমতাবলম্বীরা বলিতেছেন—শয়তানের শব্দই হইতেছে সঙ্গীত, কারণ—মোজাহেদ ঐরূপ বলিয়াছেন! এখানে কিন্তু তাঁহারা এবনে আব্বাছের তফছিরকে উপেক্ষা করিতে একবিন্দুও দ্বিধা বোধ করেন নাই।

মোজাহেদ বলিয়াছেন—ছওৎ শব্দের অর্থ সঙ্গীত, আর আরবী সাহিত্যের চিরাচরিত সিদ্ধান্তের, এমন কি কোরআনের ব্যবহারের বিপরীত তাহা সঙ্গীত হইয়া গেল, আর সেই ব্যক্তিগত অভিমতের উপর নির্ভর করিয়া একটা হালালকে হারাম বলিয়া ফৎওয়া দেওয়া হইল, ইহা অপেক্ষা অন্যায় ও অসম সাহসিকতার কথা আর কি হইতে পারে? ছুরা হোজরাতে মোমেনদিগকে সম্বোধন করিয়া বলা হইতেছে:—

لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبى -

তোমরা নিজেদের ছওৎকে নবীর ছওতের উপর উচ্চ করিও না। এখানে ছওৎ শব্দের অর্থ আওয়াজ, স্বর—সঙ্গীত ইহার অর্থ কখন হইতে পারে না। ছুরা লোকমানে و اغضض من صوتك বলা হইয়াছে, এখানে ছওৎ অর্থে সঙ্গীত কি কখনও হইতে পারে? ইহার পরেই বলা হইয়াছে:—

ان انكر الاصوات لصوت الحمير -

ছওৎ শব্দের অর্থ সঙ্গীত হইলে এখানে আয়তের অনুবাদ হইবে—নিশ্চয় সর্ব্বাপেক্ষা ঘৃণিত সঙ্গীত হইতেছে গর্দ্দভের গান! অন্যপক্ষ বলিয়া থাকেন—ছওৎ শব্দের অর্থ যে স্বর শব্দ ও আওয়াজ, তাহা আমরাও মানি। কিন্তু এখানে শয়তানের সহিত সম্বন্ধ হইয়াছে বলিয়া ভাবার্থে উহার তাৎপর্য্য হইবে 'সঙ্গীত। কারণ শয়তান সঙ্গীত দ্বারাই মানুষকে পথভ্রষ্ট করিয়া থাকে! কিন্তু এই সব তাৎপর্য্য

গ্রহণের এবং শয়তান সংক্রান্ত এই অনুমানের কোনও প্রমাণ তাঁহাদিগের নিকট নাই। সূক্ষ্ম শাস্ত্রীয় যুক্তিতর্ক লইয়া যেখানে আলোচনা, সেখানে এই শ্রেণীর বাজে কথার অবতারণা হইতে দেখিলে দুঃখ হয়।

সঙ্গীত নিষিদ্ধ হওয়ার প্রমাণ স্বরূপ অন্যপক্ষ হইতে যে তিনটী আয়ত উপস্থাপিত করা হইয়াছে, উপরে তাহার আলোচনা করিয়া দেখাইয়াছি যে, সঙ্গীত সিদ্ধ বা অসিদ্ধ হওয়ার সহিত ঐ আয়তগুলির বিশেষ কোন সম্বন্ধ নাই। প্রথম আয়তের তাৎপর্য্যের পোষকতার জন্য তাঁহারা যে হাদিছগুলি বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা একেবারে অবিশ্বাস্য ও অকর্ম্মণ্য রেওয়ায়ত, সেগুলিকে হজরতের হাদিছ বলিয়া দাবী করা নিতান্ত অন্যায়। অন্যপক্ষ এই প্রকারের আরও কতিপয় রেওয়াতকে হজরতের হাদিছ আখ্যা দিয়া জনসাধারণের নিকট উপস্থাপিত করিয়া থাকেন, আগামীতে আমরা সে সমস্ত হাদিছের বিস্তারিত আলোচনা করিয়া নিজেদের দাবী সপ্রমাণ করার চেষ্টা পাইব।

উপসংহারে আবার বলিয়া রাখিতেছি—সঙ্গীত সম্বন্ধে আমরা যে কথা বলিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছি, বস্তুতঃ তাহা আদৌ আমাদের কথা নহে, ইহা বর্ত্তমান যুগের কোন অভিনব আবিষ্কারও নহে। আমরা অকাট্যরূপে প্রমাণ করিয়া দেখাইব যে—

(১) হজরত রছুলে করিম স্বয়ং সঙ্গীত শ্রবণ করিয়াছেন ও তাহার অনুমতি এমন কি আদেশ প্রদান করিয়াছেন।

(২) হজরতের বহু ছাহাবী সঙ্গীত চর্চ্চা করিতেন।

(৩) এমাম আবু হানিফা, এমাম মালেক, এমাম শাফেয়ী, এমাম আহমদ-বেন-হাম্বল প্রভৃতি এমামগণ সঙ্গীতকে জাএজ বলিয়া মনে করিতেন এবং নিজেরাও সঙ্গীত শ্রবণ করিতেন। এমাম মালেক ত নিজেই একজন সঙ্গীত শাস্ত্র বিশারদ পণ্ডিত ছিলেন।

(৪) এমাম এবনে হাজম, কাজী ঈছা, এবনুল আরবী, এমাম মাওর্দ্দী, আবু তালেব মক্কী এমাম গজ্জালী প্রভৃতি হইতে আরম্ভ করিয়া এমাম শওকানী, শাহ আবদুল আজিজ, মোল্লা আলী কারী, কাজী ছানাউল্লা পানিপতী, মওলানা আবদুল হক মোহাদ্দেছ দেহলবী, প্রভৃতি শত শত এমাম ও মোহাদ্দেছ একবাক্যে সদ্ভাব পূর্ণ বা নির্দ্দোষ আনন্দদায়ক সঙ্গীতকে সিদ্ধ বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন।

# চতুর্দ্দশ শতাব্দী

[ এ, বি, আমিন উদ্দীন আহমদ্ ]

ক্ষুদ্র এক কবি—
আপনার অন্তরের অন্তহীন আনন্দেতে হেরিতেছে ছবি ;—
চতুর্দ্দশ শত বর্ষ আগেকার ধরণীর তমোময় নিশি,
তারি মাঝে কাঁদে পৃথ্বী মুক্তি-আলো-ভিখারিণী, অন্ধকারে মিশি !
নিত্য জাগে ব্যথা,
ধরণীর আর্ত্তবুকে ; অত্যাচারে অনাচারে মূক মানবতা।
কল্যাণ কামনা ভুলি দিকে দিকে ধ্বজা তুলি জাগিয়াছে পাপ—
ধরণীর মাতৃ-বক্ষে বিষ-বাষ্পরূপে জমে নানা মনস্তাপ।
শত যুগ আগে
হেরিতেছি সেই দিন, নামিয়া আসিলে তুমি সত্য-অনুরাগে,
আলোর নির্ঝর লয়ে মরুর ধূসর বুকে সঙ্গীহীন একা—
হাতে লয়ে মুক্তিদীপ—ভালে তব দীপ্ত রশ্মি শতসূর্য্য-রেখা !
তারপর ধীরে
জাগিয়া উঠিল ধরা এক মহাসত্য লাগি জীবনের তীরে।
কি কথা শোনালে তারে কিরূপ দেখালে তুমি মুগ্ধ হল ধরা—
সেই হতে কণ্ঠ-হার তার শত মুক্তা-মণিরত্ন দিয়ে ভরা !
হে মরু-দুলাল,
জীবনেরে বিলাইয়া জীবন্ত করেছ তুমি মরুর কঙ্কাল !
মন্থিয়া এনেছ তুমি কি যে আবে-কওসর্ স্বর্গলোক হতে
মৃতেরে দানিছ প্রাণ মৃত্যু-ভরা ধরণীর পায়ে-চলা পথে।
হে বীর সেনানী,
সাম্রাজ্য করোনি জয় ; মানব-অন্তর-দেশ দিয়ে প্রেমবাণী
করেছ বিজয় গর্ব্বে ;—কোষবদ্ধ রাখি তব বজ্র তরবারি—
পর্ণ কুটীরেতে থাকি ওগো রাজ-অধিরাজ, কাটালে শর্ব্বরী !
তুমি মহা-ঋষি,
দুরন্ত যৌবন মাঝে জাগাইয়া তুলিয়াছ ধ্যানময় নিশি !
সকল কর্ম্মের মাঝে জাগাইয়া তুলিয়াছ মহা-সমন্বয়
তুমি তাপস-সম্রাট মুক্তকাম বিশ্ব-নবী জয় তব জয় !

হে মহা-মানব,
ধরণীর ধূলিশয্যা ছিলো তব স্বর্ণাসন—কর্ম্ম তব স্তব !
ছিলে না দেবতা তুমি ! আমাদেরই মাঝে তব শয্যাখানি পাতা—
তাই তুমি বুঝেছিলে মানবের বুকে কোথা জ্বলে এত ব্যথা !
হেরিয়াছি তোমা
পিতৃহীন মাতৃহীন—সর্ব্বহারা, রিক্ততার নাহিকো উপমা !
শৈশবে উদার শান্ত—যৌবনে সাধক তুমি, বার্দ্ধক্যে মহান্—
প্রেমময়, মহাবীর, মানবের প্রিয়-বন্ধু হাস্যময় প্রাণ !
দিয়ে গেছ লেখা—
তাই হেরি প্রাণ দিয়ে—যদিও না ভাগ্যে আছে প্রিয়-মূর্ত্তি দেখা ;
তাই পড়ি মন দিয়ে—তারি মাঝে জাগ তুমি প্রেম-মূর্ত্তি প্রিয়,
চৌদ্দ শত সাল পরে স্মৃতির বাসর মাঝে ভক্তি-অশ্রু নিয়ো—
ওগো বিশ্ব-নবী,
জান্নাতে থাকিয়া লহ, সহস্র সালাম করে ক্ষুদ্র এক কবি।

---

# মোগল-সাম্রাজ্যের স্মৃতি

( পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর )

শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

## জেবন-নেসা বেগম *

সম্প্রতি মৌঃ আবদুল লতিফ মহাশয় আলমগীর-দুহিতা জেবন-নেসার জীবন-কাহিনী সম্বলিত একখানি পুস্তক প্রণয়ণ করিয়াছেন। জেবন-নেসার জীবনকে লইয়া কল্পনা-রসিক নানালোক নানাভাবে রূপ দিয়া আসিতেছিলেন ; এবং তাহার ফলে এই অসামান্যা বিদুষী ও গুণবতী রমণীর পূত জীবনের চারিদিকে এক কলঙ্কিত সৌন্দর্য্যের রেখা ফুটিয়া উঠিতেছিল। অবশ্য খণ্ড খণ্ড ভাবে সাময়িক পত্রিকায় ও শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার মহাশয়ের ঐতিহাসিক গবেষণার ফলে এই সমস্ত কাল্পনিক কাহিনীর জঞ্জাল হইতে জেবন-নেসার আসল রূপ সুধীজনের মনে ফুটিয়া উঠিতেছিল। কিন্তু এই সময়ে জেবন-নেসার জীবনকে লইয়া একখানি তথ্যমূলক চরিতকথার একান্ত প্রয়োজনীয়তা ছিল এবং যাঁহারা উপরি-উক্ত পুস্তক পাঠ করিবেন, তাঁহারা স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইবেন যে এই পুস্তক সে অভাব পরিপূরণ করিয়াছে।

ইংরেজী গবেষণামূলক পুস্তকে যেমন গ্রন্থে উল্লেখিত

* জেবন-নেসা-বেগম ( ঐতিহাসিক চিত্র )—আবদুল লতিফ ; প্রকাশক—মোহাম্মদ আফজাল উল হক, মোসলেম পাবলিশিং হাউস্ ; ৩নং কলেজ স্কোয়ার।

প্রসিদ্ধ ব্যক্তি, ঘটনা বা পুস্তকের একটা প্রয়োজনীয় সূচীপত্র থাকে—এই পুস্তকের আরম্ভেই তাহা সংযোজিত হইয়াছে। এই সূচীপত্রের সংগৃহীত নামগুলির দিকে লক্ষ্য করিলে বইখানিকে সমসাময়িক মোসলেম সাম্রাজ্যের স্মৃতি-ভাণ্ডার বলিয়া মনে হয়।

এই বইখানিতে গ্রন্থকার মূল ইতিহাস ও দলিলপত্র হইতে একে একে জেবন-নেসার কাল্পনিক জীবনের সকল অস্তিত্বকে ধ্বস্ত করিয়া দিয়া—উপন্যাসের রোমাঞ্চকর নায়িকার সিংহাসন হইতে নামাইয়া আনিয়া জেবন-নেসাকে মহিমময়ী নারীর গৌরব মুকুট পরাইয়া দিয়াছেন। গ্রন্থকার জেবন-নেসার প্রেম-কাহিনী সংস্পর্কিত এক একটী ঘটনা লইয়া এক একটী পরিচ্ছেদ গড়িয়া তুলিয়াছেন। জেবন-নেসার কল্পিত প্রেম কাহিনীকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়—

(১) তাহার বিবাহ-প্রস্তাব ঘটিত ব্যাপার।

(২) সমসাময়িক ঐতিহাসিক ব্যক্তিদের সহিত গোপন-প্রেম।

বিবাহ-প্রস্তাব পরিচ্ছেদে তিনজন ব্যক্তির সহিত জেবন-নেসার নাম সাধারণত বিজড়িত হয়।

(১) যুবরাজ দারা শেকোহ্‌র পুত্র সোলেমান শেকোহ।

(২) পারস্য-সম্রাট দ্বিতীয় আব্বাসের পুত্র কুমার ফোররোখ।

(৩) আকেল খাঁ।

(১) দারা শেকোহ্‌র ধর্ম্ম-মতের জন্য আরঙ্গজেবের সহিত তাঁহার বিশেষ বিরোধ ছিল এবং ইসলাম-সমর্পিত দেহ-মন আলমগীর কখনও আপনার আদর্শকে ক্ষুণ্ণ করিয়া স্বীয় বিদুষী ও ধর্ম্মপ্রাণ কন্যাকে বিবাহ-সূত্রে দারার পুত্রবধূ করিতে পারেন না। এ প্রস্তাব কখনও তাঁহার মনে আসিতে পারে না। দারা ও তাঁহার ভ্রাতৃগণের মধ্যে কখনও সদ্ভাব ছিল না। সোলেমান শেকোহ্‌র তিনজন পত্নী ছিল। "ঐ তিন তিনটী সপত্নীর বর্ত্তমান স্থলে আওরঙ্গজেবের ন্যায় স্বাধীনচেতা নরপতির, তাঁহার আদরের জ্যেষ্ঠা কন্যা জেবন্‌-নেসাকে সোলেমানের দাসী-বৃত্তি করিতে দেওয়ার প্রস্তাবে সম্মত হওয়া বা জেবন্‌-নেসার ঐ সম্বন্ধ স্বীকার করা ও সেই সোলেমানের শোকে আক্ষিপ্ত ও অনুতপ্ত হইয়া চিরকুমার-ব্রত অবলম্বন করা কতদূর সম্ভবপর ছিল, তাহা সহজেই অনুমেয়।"

(২) এই বিবাহের সম্বন্ধ লইয়া গল্প লেখকগণ বলিয়াছেন যে পারস্য-রাজসভা হইতে দূত আসে এবং স্বয়ং আলমগীর তাহাকে মহাসমারোহে অভ্যর্থনা করেন। সেই সময়কার ইতিহাস—এমন কি প্রতিদিনের ইতিহাস লেখা আছে—কিন্তু তাহার মধ্যে কোথাও পারস্য-রাজ হইতে বিবাহ-প্রস্তাব লইয়া আলমগীরের দরবারে আগত কোনও দূতের রাজ-সমারোহের কথা লেখা নাই। তাহার পর গল্প লেখকগণ যে ভাবে এবং যে সমস্ত কথোপকথনের মধ্য দিয়া কুমার ফোররোখ ও রাজকুমারী জেবন-নেসার মিলন ও আলাপ ঘটাইয়াছেন—তাহা কল্পনা বলিয়া মানিয়া লইলেও অতি কুৎসিৎ কল্পনা এবং তাহারা আপনা হইতে আপনাদের অসত্যতা প্রচার করিতেছে।

(৩) আকেল খাঁর যে পরিচয় দেওয়া হয়—সে আকেল খাঁ কোনও দিন এই পৃথিবীতে ছিল না। যদুনাথ সরকার মহাশয় এ বিষয়ের অসত্যতা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়াছেন।

যে সমস্ত ঐতিহাসিক পুরুষদের সহিত জেবন-নেসার গোপন প্রেমের কাহিনী বিজড়িত তন্মধ্যে আলমগীরের চির-শত্রু শিবাজী অন্যতম। গ্রন্থকার এই পরিচ্ছেদে বাংলা ভাষায় লিখিত জেবন-নেসার কাহিনী সম্পর্কিত সমস্ত পুস্তকের একটী সুন্দর ও সুচিন্তিত সমালোচনা করিয়া দেখাইয়াছেন যে প্রত্যেক লেখকই ঘটনা তৈয়ারী করিয়া উপন্যাসের অথবা গল্পের রস জমাইতে গিয়াছিলেন—ঐতিহাসিকতা কাহারও মনে ছিল না। তাই তাঁহারা জেবন-নেসার চরিত্রকে আপনাদের খেয়ালমত ভাঙ্গিয়াছেন গড়িয়াছেন। এবং সে সমস্ত লেখক অথবা যে সমস্ত পুস্তকে জেবন-নেসার জীবন কাহিনীকে গাঁথা হইয়াছে—তাহা কোনও অপটু হাতের সাময়িক খেয়াল নয়। বাংলা সাহিত্যের ছাত্রগণ এই পরিচ্ছেদে বিশেষ আলোচনার সামগ্রী পাইবেন। নিম্নলিখিত গ্রন্থকার ও গ্রন্থগুলি বিশ্লেষণ করিয়া লেখক অতি স্পষ্টভাবে তাহাদের ভ্রান্তি দেখাইয়াছেন। অনেক সময় রস-রচনার দোহাই দিয়াও সেই সমস্ত বিচ্যুতিকে কিছুতেই ক্ষমা করা যায় না।

(১) শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—রাজসিংহ—উপন্যাস।

(২) শ্রীভূদেব মুখোপাধ্যায়—অঙ্গুরীয় বিনিময়—উপন্যাস।

(৩) শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়—ভারতীয় বিদুষী জীবনচরিত।

(৪) মহারাণী সুনীতি দেবী—The Beautiful Mogul Princess.

(৫) শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—'একটী মেহেদির পাতা'—গল্প।

যুবরাজ আকবরের সহিত ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকার সন্দেহে জেবন-নেসা সলিমগড়ে অবরুদ্ধ হন। কুমারী জেবন-নেসার যে সব চিঠির উপর সন্দেহ করিয়া সেদিন তাঁহাকে রাজনৈতিক কারণে নজর-বন্দী রাখা হইয়াছিল—গ্রন্থকার তাহা প্রয়োজনমত উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন যে তাহাতে পিতৃদ্রোহিতার নাম গন্ধ নাই। বন্দী-দশায় এই বিদুষী মহিলা জ্ঞান-আলোচনায় ও কাব্য-রচনায় দিন অতিবাহিত করিতেন। "দেওয়ানে মখফি" নামক পারস্য গজল পুস্তকটী অনেকে স্থির করিয়া লইয়াছেন যে অবরুদ্ধা জেবন-নেসার লেখা এবং সেই কাব্য হইতেই অনেক বিপত্তি গড়াইয়াছে। মাসিক মোহাম্মদীর সপ্তম সংখ্যায় মূল ঐতিহাসিক গ্রন্থসমূহ হইতে তথ্য সংগ্রহ করিয়া মোঃ কাজী নওয়াজ খোদা সাহেব প্রমাণ করিয়া দিয়াছেন যে—

(১) বিদুষী জেবন-নেসার সহিত "দীওয়ান মুখফীরের" কোন সংস্রব নাই।

(২) খোরাসানের অধিবাসী মুখফীরশতীই দীওয়ানের প্রকৃত রচয়িতা।

গ্রন্থকার গ্রন্থশেষে লিখিতেছেন, "জেবন-নেসা কাব্য বা উপন্যাসের নায়িকা হইলে, অলোকসামান্যা সুন্দরী, চন্দ্রবদনা, প্রভৃতি বিশেষণে ও বিবিধ মহার্ঘ রত্নাভরণে তাঁহাকে সজ্জিত করিয়া পাঠকের সমক্ষে উপস্থিত করা যাইত।...... তৎসমূহের বিনিময়ে ইতিহাস তাঁহার পিতৃভক্তি, স্নেহশীলতা, দয়াপ্রবণতা, দানশীলতা, ক্ষমা, শিল্পানুরাগ, ধর্ম্মানুরাগ, ধর্ম্মানুষ্ঠান, রচনা-দক্ষতা, কবিতা-প্রিয়তা, শাস্ত্র ও সাহিত্যালোচনা, তপোনিষ্ঠা এবং চিত্তসংযম প্রভৃতি কীর্ত্তিরাজি বর্ণনা দ্বারা তদীয় অন্তঃ সৌন্দর্য্যকে সমধিক উজ্জ্বল ও পবিত্রভাবে অঙ্কন করিয়াছে।"

সর্ব্বশেষে গ্রন্থকার যথাক্রমে জেবন নেসার জীবন হইতে উক্ত গুণাবলীর পরিচায়ক এক একটী কাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়া গ্রন্থখানির শ্রী-বৃদ্ধি সাধন করিয়াছেন। এখানে উক্ত পুস্তক হইতে দুই একটী কাহিনী উদ্ধৃত করা হইল।

## জেবন্-নেসার শিল্পানুরাগ

"দেশীয় শিল্পের উন্নতি ও পুষ্টিসাধন পক্ষেও জেবন-নেসার যথেষ্ট আগ্রহ থাকার প্রমাণ পাওয়া যায়। দিল্লীর শিষমহল নামক কাচ প্রাসাদের খবর অনেকেই রাখেন। কাচ সংযোগে স্বচ্ছ প্রাসাদ নির্ম্মিত হইতে পারিলে, অন্য কোন স্বচ্ছ পদার্থ দ্বারা প্রবাসে ব্যবহার্য্য শিবিরও প্রস্তুত করা যাইতে পারে। এই চিন্তায় স্বীয় প্রখর বুদ্ধি নিয়োজিত করিয়া অভ্ররাশি সংগ্রহ করাইয়া ১০৯০ হিজরীতে এক স্বচ্ছ ও সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর বৃহৎ অভ্রশিবির প্রস্তুত করান। লব্ধ-প্রতিষ্ঠ কবি নেয়ামৎ খান আলী ঐ শিবিরের শিল্প-চাতুর্য্য প্রশংসায় ৭টী কবিতা রচনা করিয়া গিয়াছেন।"

## জেবন্-নেসার ক্ষমা

"অন্যান্য দেশের রাজগণের ন্যায় চীন সম্রাট ও আওরঙ্গজেবের রাজ্যলাভে বহুরত্নসম্ভার উপঢৌকন প্রেরণ দ্বারা তাঁহাকে অভিনন্দিত করিয়াছিলেন। সেই উপঢৌকন মধ্যে রত্নরাজি জড়িত একটী দর্পণ ছিল। আওরঙ্গজেব স্নেহপূর্ব্বক উহা জেবন-নেসাকে প্রদান করিয়া তাঁহার সম্বর্দ্ধনা করেন। জনৈক সম্রাটের উপঢৌকন ও পিতার স্নেহের নিদর্শন বলিয়া তিনি উহা অতি যত্নে রক্ষা করিয়া আসিতেছিলেন। কিন্তু উহা এক পরিচারিকার হাত হইতে দৈবাৎ পড়িয়া ভাঙ্গিয়া যায়। এই আকস্মিক দুর্ঘটনায় ভয়ে তাহার অন্তরাত্মা দুরু দুরু করিয়া উঠিল এবং সে ভীত ত্রস্তভাবে কম্পিত কলেবরে জেবন-নেসার সম্মুখে গিয়া করজোড়ে নিবেদন করিল,

"আ আইনায়ে চীনি শেকস্ত" "হায় চীনের আয়নাটী ভাঙ্গিয়া গেল।"

এ সংবাদে জেবন নেসার মুখে রোষ বা অসন্তোষের পরিবর্ত্তে আনন্দ-রেখাই ফুটিয়া উঠিল—তখনই আনন্দ ভরে বলিয়া উঠিলেন,

"খুব শোদ সামানে খোদ্ বীনি শেকস্ত"—"ভাল হইল যে নিজেকে ( বাহ্যরূপ ) দেখিবার উপকরণ ভাঙ্গিয়া গেল।"

---

# নদীর দেশে

## তাহের উদ্দীন আহ্‌মদ

রাত্রি ১টা। হঠাৎ ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। বাহিরে চাহিয়া দেখিলাম সাগর বক্ষে চাঁদ হাঁসিতেছে। বিছানা হইতে উঠিয়া নীচের ডেকে নামিতে হইল। সন্ধ্যা রাত্রিতে নদী-বক্ষে সাগর শোভা দেখিয়াছি। না ছিল চাঁদের আলো না ছিল কিছু। চারিদিকে আঁধার। শুধু একটা ক্ষীণ মসী রেখা টানা ছিল পৃথিবীর গায়।

ক্রমশঃ জলধারা সঙ্কীর্ণ হইয়া আসিতেছে। দুই ধারে সুন্দর বনরাজি—তাহারি মাঝে সঙ্কীর্ণ হেলেস্পন্ট প্রণালী। তটভূমি আর চোখে পড়ে না। দুইকূল বরষার জোয়ারে ছাপাইয়া গিয়াছে—তাহার উপর ভাসিতেছে তরু-দ্বীপ।

প্রশান্ত মেঘনার নিকট হইতে এখনই বিদায় লইতে হইবে। চলিয়া-যাওয়া সাগর শোভা আর একবার নয়ন ভরিয়া দেখিয়া লইলাম। পিছনের ডেকে একা বসিয়া এক অজানা দেশের মধ্য দিয়া যেন ছুটিয়াছি। জাহাজ চলার শব্দ ঠিক জলপ্রপাতের ধ্বনির মত কানে বাজিতেছে। কেবল ছবির পর ছবি দেখিয়া চলিয়াছি। ছায়াচিত্র নয়—এটা প্রকৃতির বাস্তব রঙ্গশালা। যাহা কিছু দেখিতেছি সকলই জীবন্ত ও সত্য।

আর একটা নদী মিশিয়াছে এখানে। কি বিশাল উদারতার পরিচয় পাইলাম। এ সম্মিলন কত সুখকর—জগতের সুমহান বিরাটত্বের পরিচায়ক। পরস্পরে মিলিবার জন্য কত আকুলতা। একে অন্যের মাঝে নিঃশেষ করিয়া বিলাইয়া দিয়াছে আপনার সবটুকুকে। মানুষ যেন মানুষের সাথে এমনি করিয়া মিশিতে পারে, নর যেন নারীর মধ্যে এমনি করিয়া নিজেকে হারাইয়া ফেলে—সন্তান যেন জগতের সব কিছু ভুলিয়া এমনি করিয়া মায়ের কোলে ঘুমাইয়া পড়ে, তবেই জগত নন্দন-কাননে পরিণত হইবে।

নারিকেল ও সুপারি বনের মধ্য দিয়া নদী ছুটিয়াছে। প্রকৃতি যেখানে বাসর ঘরের বধূটীর মত সাজিয়াছে সেখানেই মেঘ আসিয়া মাঝে মাঝে আমার দৃষ্টি আড়াল করিতেছে।

একটা সীমাহীন নিবিড়তার মধ্য দিয়া চলিয়াছি। দুই পারে কেবল বনানী, ইহার আর কোন শেষ নাই। মানুষের জীবনও ঠিক এমনিতর একটা নিবিড়তার পর্দ্দায় ঘেরা। গাঢ় আঁধারে ঢাকা আমাদের জীবন। কোথায় ইহার পরিসমাপ্তি কে জানে। এক বৃদ্ধ ধীরে অতি ধীরে পা টিপিয়া কাছে আসিলেন। মনে হইল ইনি যেন কোন সুদূর কাল হইতে কিসের অভিসারে বাহির হইয়াছেন। বাহিরের ঐ অনন্তের দিকে চাহিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আর কতদূর ?" আমি বলিলাম, "আপনি যেখানে পৌছিয়াছেন সেখানেই কি সীমারেখা শেষ হইয়া যায় নাই ?" বৃদ্ধ বলিলেন, "হাঁ, জীবন অভিনয়ের যবনিকাপাতের সময় হইল বই কি, কিন্তু, তারপর, তারপর কি ? ঐ যে কাল ঘন বন—তার ওপারে কি আছে তাকি আপনি জানেন ? কিন্তু আমার তরী ভিঁড়িবার সময় হইল—চলা আমার এই বন্ধ হইল আর কি ? এ জীবনে কত কি দেখিলাম। আজ যতই অতীতের কথা মনে করিতেছি ততই খেদে আমার বুক ভরিয়া আসিতেছে। পশ্চাতে চাহিয়া দেখিতেছি আমার সুদীর্ঘ ৬৭ বৎসরের হিসাব। এ জীবনের একটা অভিজ্ঞতার কথা তোমাকে বলিয়া যাইতে চাই। সুন্দর এই পৃথিবী ছাড়িয়া যাইতে বড় কষ্ট হয়। কত জনের ভালবাসা—মায়া মমতা স্নেহের বাঁধন আমাকে টানিয়া রাখিয়াছে। জানি এসবই কাটাইয়া সেই দূরের পথে আমাকে রওয়ানা হইতেই হইবে। "যাত্রী আমি ওরে পারবে না কেউ রাখতে আমায় ধরে।" অনেকে এ জীবনকে শিশির বিন্দুর মত ক্ষণস্থায়ী বলিয়াছেন। আমার কাছে এ জীবন আকাশের উল্কার মত, ঝড়ের রাতের বিদ্যুতের মত। চোখের পলকে ইহা মিলাইয়া যায়। দ্রুত উড়িয়া যাওয়া মেঘের মতন মানুষের জীবন। এ জীবন লইয়া কিসের গরব। এখন যে উৎসাহের সঙ্গে উজান বহিয়া চলিয়াছ তখন আর তোমার সে সামর্থ্য থাকিবে না। ভাটায় গা তোমাকেও ভাসাইতে হইবে।

তাই বলিয়া তোমাকে দুঃখবাদী হইবার উপদেশ আমি দিতেছি না। খোদার দেওয়া জীবনকে যতদূর সম্ভব সাফল্য-মণ্ডিত করিয়া যাও। যেন শেষ দিনে আমার মত তোমাকে খেদ করিতে না হয় এই আমার আশীর্ব্বাদ।" বৃদ্ধটী যেমন আসিয়াছিল—তেমনি চলিয়া গেল।

বাংলার নদী সড়কের অনেকগুলিতেই যাওয়া আসা করিয়াছি। বরিশালের পথে শ্রেষ্ঠ শিল্পির যে চরম আর্টের পরিচয় পাইতেছি আর কোন নদীপথে তেমনটি পাই নাই। প্রকৃতি এখানে অপরূপ সাজে সাজিয়াছে। এ পথ চির শ্যামলা। চির সবুজের দেশ এই বরিশাল। বরিশালের মাঠে শরতের শোভা ষড় ঋতু একই ভাবে চলিয়াছে। এখানে আসিলে দৃষ্টিহীনের দৃষ্টি খোলে—সবুজের স্বাস্থ্য নিবাসে থাকিয়া। নয়নের এমন পরিতৃপ্তিকর স্থান আর বুঝি এমন সুন্দর করিয়া কোথায়ও দেখা যাইবে না।

আবার ক্ষণকাল মেঘ মিশিয়া গিয়াছে ওপারের ঐ দূরান্তের কাল দিগন্তের সাথে। মাঝখানে একটা সবুজ চর দেখিতেছি। যেখানে ত্রিবেনীর সঙ্গম সেখান হইতে নদী আবার বিশাল বপু ধারণ করিয়াছে। দুই পারের দিকে ভাল করিয়া চাহিতে এখন সময় লাগে একটু। এখন যেদিকে চাই—সেই দিকেই যেন একটা না একটা জল ধারা মিশিয়া গিয়াছে বড় গাঙ্গের সাথে। দুই পারের তরু-রাজিকে আর চিনিয়া উঠা যাইতেছে না। ঘন কাল আবছায়া রেখা টানা দেখি দুইকুলে।

নদী যত সাগরের আকার ধারণ করিতেছে চারিদিকের তটভূমি ততই অস্পষ্ট ও ক্ষীণ হইয়া আসিতেছে। রাশি রাশি কচুরিপানা ভাসিয়া যাইতেছে। অনেকক্ষণ পরে একটা বসতির সন্ধান পাইলাম। ইহা একটা ছোট বন্দর বলিয়া মনে হয়। একটানা ঢেউ তোলা টিনের ঘরের সারি সগর্ব্বে এখনও কীর্ত্তিনাশার হাত হইতে নিজেকে রক্ষা করিয়াছে। কত নদ নদী কত বন-ভূমি পার হইলাম একটারও পরিচয় সংগ্রহ করা হইল না। আমি তো আর ভৌগলিক নয়—মানচিত্র আঁকাও আমার ব্যবসা নয়। এ অঞ্চলের নদীর গভীরতা বা প্রসারতা কতখানি কোন নদীর কি নাম—সুন্দরবনের চৌহদ্দি কতখানি এ সকলের হিসাব দেওয়া আর আমি দরকার মনে করিলাম না। নিজের চক্ষু জুড়াইলাম ইহাই আমার বড় লাভ।

পাশের কেবিনে এক তরুণী যাইতেছেন। সঙ্গে তাঁহার ছোট একটি ছেলে ও মেয়ে। কোন অভিভাবক নাই সাথে। একটা চাকর মাত্র আছে। খুব সাহসিকা বলিয়া মনে হইল। রাত্রিতে আহার করিবার সময় তাঁহাকেও মুসলমান বাবুর্চ্চির পাক করা খানা খাইতে দেখিলাম। আমার সঙ্গের বন্ধুটি বলিলেন "হিন্দু মেয়েরাও যখন এভাবে মুর্গি খাওয়া ধরিয়াছে তখন আর ইহাদের সঙ্গে পারিয়া উঠা যাইবে না।" তরুণীটির পূর্ণ স্বাধীনতাই আমাকে আকৃষ্ট করিল। মনে পড়ে গোয়ালন্দের স্মৃতি। তখন নন-কোঅপরেশ্যানের যুগ। যমুনার দেশে কালিগঞ্জ ষ্টিমারে চলিয়াছি। ঢাকা মেলে আমার সঙ্গেই একজন ক্ষীণকায় যুবক ঘাটে নামিলেন। আর পাশের ইণ্টার হইতে এক শিক্ষিতা রমণী অবতরণ করিলেন। কোলে তাঁহার একটি সন্তান, মুটের মাথায় বড় একটা ট্রাঙ্ক ও অন্যান্য পুটলা পুঁটলী। ভদ্র মহিলাটি আগে আগে কুলিসহ চলিলেন পিছনে অনুসরণ করিয়া যুবকটী ষ্টিমারের দিকে চলিলেন। আমার সঙ্গেও আমার একজন আত্মীয়া ছিলেন তবে ইনি মহিলা নন ইনি জেনানা। সেকেণ্ড ক্লাশ কেবিনে ইঁহারা দুইজনই উঠিলেন। বলা বাহুল্য হিন্দু রমণীটির তুলনায় আমার সঙ্গের জেনানাকে ষ্টিমারে তুলিতে খুব বেশী বেগ পাইতে হইয়াছিল। যাহা হউক ষ্টিমারে পদার্পন করিয়াই হিন্দু রমণীটি তাঁহার সঙ্গের যুবকটীকে বলিলেন— "তোমরা পুরুষজাতি এমনিতর স্বার্থপরই বটে। সেই শিয়ালদ থেকে উঠেছি রাত দশটায় আর এই দেড়শ মাইলের মধ্যে একবারটি খোঁজ করাও দরকার বোধ করলে না!" যুবকটী খুব শান্ত-স্বভাব হইলেও স্পষ্ট উত্তর করিলেন,— "যুগের হাওয়া উল্টো বইছে। আজকাল তোমরাই তো আমাদের তত্ব লইবে।"

রাত্রি আর দিনের শুভদৃষ্টি যেখানে হইল সেটা উষা নগর। ভোরের আলোকে উদ্ভাসিত একখানি ছোট গ্রাম ভাসিয়া উঠিল বর্ষা প্লাবিত নদীকুলে। নারিকেল সুপারির প্রাচীর—তাহারই মাঝে ছোট ছোট ঘর। ক্রমেই একটা বন্দরের দিকে আসিতেছি বলিয়া মনে হয়। ঢেউ তোলা টিনের ধবল পল্লী-সহর ঐ অদূরে। এখানে ষ্টিমার থামিল। এখানে অনেক যাত্রী নামিয়া গেলেন। ভিঁড় অনেকটা কমিয়া গেল। এত ভিড় হইয়াছিল যে মনে হইতেছিল

এটা কি পূজার ছুটী। গায়ে গায়ে বসিয়া যাইতে হইয়াছিল রেলের তৃতীয় শ্রেণীর মত। নর-নারীর পার্থক্য ছিল না। এখানে কয়েকজন চীনবাসীকে দেখিলাম। শুনিলাম তাঁহারা এখানকার শুপারি কারবারের বড় ব্যবসাদার। কারবারটী একরূপ তাঁহাদের একচেটে। কোন সুদূর চীন হইতে ইহারা আসিয়াছে বাংলার নিভৃত পল্লী অঙ্গনে। ইহারাই জানে টাকা রোজগার কেমন করিয়া করিতে হয়। দুইজন চীনাম্যানকে এ অঞ্চলের সাধারণ লোকদের সঙ্গে খুব আলাপ করিতে দেখিলাম। ষ্টিমার ছাড়িয়া দিলে পরে তাহাদিগকেই আবার ফাষ্ট ক্লাশের এক কেবিনে উপবিষ্ট দেখিলাম। মান অপমানের জ্ঞান ইহাদের নাই। গ্রাম হইতে পয়সা রোজগার যখন করিতে হইবে তখন ভদ্র অভদ্র চাষী জমিদাদের মধ্যে পার্থক্য খুঁজিলে চলিবে না। বিদেশীরা প্রত্যেক অবস্থাতেই নিজেদেরকে মানাইয়া লইতে সক্ষম তাই তাঁহাদের এত দ্রুত উন্নতি।

বন্দরটা ছাড়িয়া খানিকটা পথ চলিয়া আসিয়াছি। আকাশ ভেদ করিয়া এক অতি পুরাতন মন্দির চূড়া হয়ত সেকালের কোন রাজার কীর্ত্তি নয়নপথে উদিত হইল। এখন চারিদিক বেশ আলোকিত হইয়া গিয়াছে। নদী দুই পারকে ছাপাইয়া পল্লীর দিকে চলিয়াছে। দুই কুলে সবুজের চাদর বিছানো দেখিতেছি। জেলেরা নদে মাছ ধরিতেছে। এখানে নারিকেল গাছের সড়ক নদীর মাঝখান পর্য্যন্ত নামিয়া আসিয়াছে। পানের বরোজ কয়েকটা দেখিতে পাইতেছি আর দেখিতেছি "লেগেছে অমল ধবল পালে মন্দ মধুর হাওয়া, দেখি নাই কভু দেখি নাই এমন তরণী বাওয়া?" পাল তুলিয়া চলিয়াছে চাঁদ সদাগরদের বাণিজ্য তরণী।

বরিশাল বাংলার শস্য ভাণ্ডার। দি গ্রেনারি অব বেঙ্গল। বুভুক্ষু বাংলা বরিশালের দিকে চাহিয়া থাকে তার এক মুষ্টি অন্নের জন্য। বরিশালে মোট ১,৪০০,০০০ একর চাষের জমী। ইহার তিন লক্ষ একর ধানের জমীতে বৎসরে দুই ফসল হয়। আউস আর আমন। একর প্রতি গড়ে ১৬ মণ আউস ও ১০ মণ আমন করিয়া ধরিলে বরিশালের ধানের জমীতে বৎসরে ২৫,৪০০,০০০ মণ ধান জন্মে। আজকালকার বাজার দরে ইহার দাম ১৭৫,০০০,০০০ টাকা। বাখরগঞ্জ জেলার লোক সংখ্যা ২৬ লক্ষের কিছু বেশী। ইহাদের ভরণ পোষণ বাদে প্রতি বৎসর ৭,৬৬৬,২৫০ মণ চাউল বাংলার অন্যান্য জেলায় ও বাংলার বাহিরে রপ্তানী করা হয়। ইহার মূল্য ১১ লক্ষ টাকার বেশী হইবে। বরিশালে ধানই সব চাইতে বড় সম্পদ। এ জেলার লোক খুব স্বাস্থ্যবান। তাহারা পেট পুরিয়া খাইতে পায়—জলকষ্ট তাহাদের নাই। ম্যালেরিয়া কাহাকে বলে তাহারা জানে না। বরিশালের কয়েকজন অধিবাসীর নিকট শুনিলাম প্রচুর খাদ্য সংস্থান থাকায় ও অল্প পরিশ্রমে জমীতে ফসল উৎপন্ন করিবার সুবিধা থাকায় বরিশালের লোক দিন দিন কুড়ে হইয়া চলিয়াছে। এবং অনেকে অবসর সময়ে খুন ডাকাতি ও মামলা মোকর্দ্দমায় জড়িত থাকে। বরিশাল সহরের উপর কমসে কম ৯টা মুন্সেফি কোর্ট—তিন জন এডিশনাল ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব—২ জন জজ। বরিশালে এক সময় ১৫ জন ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট থাকিত। মামলা মোকদ্দমা এ অঞ্চলে খুবই বেশী। সহরের উপর তিন শতের উপর উকিল—মোক্তার কত আছে তাহার ঠিকানা নাই। বরিশাল নাকি বাংলার একটা বড় ক্রিমিনাল ডিষ্ট্রিক্ট। জীবনের প্রবাহ এখানে আছে বলিয়া মনে হয়। এখানকার লোক নির্জিব নয় ইহা দ্বারাই প্রমাণিত হয়। এখানকার লোক যে খুব সাহসিক ও ডানপিটে তাহা বাংলার ইতিহাস ও সরকারী দপ্তর সাক্ষ্য দিবে। কেমন করিয়া গুর্খার বন্দুকের গুলির সামনে প্রাণ দিতে হয় তাহাও ইহারা এই সেদিনও প্রমাণ করিয়াছে। বাংলার নব-জাগ্রত যৌবন ও বীরত্ব গাথার ইতিহাসে সেই ১৯ জন সহিদের নাম স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকিবে। জাতি ও ধর্ম্মের জন্য কেমন করিয়া প্রাণ দিতে হয় তাহা ইহারা দেখাইয়াছে।

পোনাবালিয়ার খালের ধারে আসিয়া পৌছিয়াছি। এখান হইতে মুসলিম তীর্থ কুলকাঠি আর বেশী দূর নয়। কুলকাঠির কথা প্রসঙ্গে জনৈক সহযোগী জননেতা বলিলেন, "সত্যকার অনুভূতি পাইলাম না দেশের কাছে; ১৯ জন সহিদের তাজা খুন আমাদের বড় বেশী বিচলিত করিয়া তুলিতে পারে নাই। দেশের হিন্দু প্রতিষ্ঠানগুলি এই ঘটনাতে জাতিয়তার বাহিরে আর কিছু দেখিতে পাইল না। বাংলার এই জালিয়ানওয়ালাবাগের জন্য মুসলমান সমাজও দুই একটা যথারীতি বিশাল জনসভা করিয়াই ক্ষান্ত রহিল। এটা যেন একটা উৎসবের পালা। টাউনহলের বিশাল জন

সভায় কুলকাঠির তদন্তের জন্য বেসরকারী কমিটী নিযুক্ত হইল। তাহা কাগজে কলমেই রহিয়া গেল।"

ষ্টিমারে হিন্দু মুসলমান সমস্যার একদফা আলোচনা হইল। সাম্প্রদায়িক আন্দোলন এতটা প্রসার লাভ করিয়াছে যে, যেখানেই যাইনা কেন সেখানেই এ সম্বন্ধে আলোচনা শুনিতে পাই।

আমার সহযাত্রী জনৈক হিন্দু ভদ্রলোক আমাকে প্রশ্ন করিলেন,—"আচ্ছা বাংলার মাটিতেই আপনাদের জন্ম। ইহার আলো বাতাসেই তো আপনারা বর্দ্ধিত। বাংলার এই বুক ভরা দুঃখ দৈন্যে আপনাদের বুকে কি ব্যথা বাজে না?" আমি ইঁহার বিশ্ব-প্রেমিক উক্তিতে যতটা না বিরক্ত হইলাম তার চাইতে কৃপা করিলাম ইঁহাকে ঢের বেশী। আমি বলিলাম,—"অত মুখবন্ধের প্রয়োজন কি। আপনার সত্যিকার কথাটা বলুন না।" তিনি কথঞ্চিত আশ্বাস পাইয়া আরম্ভ করিলেন, "দেশটা তো মহাশয় ছারখারে গেল। এই যে নারী নির্য্যাতন—রঙ্গপুর, পাবনা, ফরিদপুর—"

"আপনার এই প্রশ্নে আমার হাসা উচিত কিন্তু এ প্রশ্নটা যে কতখানি গভীর তাহা দেশের শিক্ষিত লোকেরা কেহই তলাইয়া দেখিতেছেন না। পৃথিবীর যেখানে, যে কেহ নারী নির্য্যাতন করিয়াছে—তাহারা ঘৃণ্য। এবং এই ঘৃণ্য লোকের দল পৃথিবীর সকল জাতির মধ্যেই আছে হিন্দুর মধ্যে, মুসলমানের মধ্যে। কিন্তু এই সমস্ত ঘটনা প্রায়ই জাতির কোনও বিশিষ্ট অঙ্গের অথবা কোনও বিশিষ্ট ব্যক্তির দ্বারা অনুষ্ঠিত হয়। এই বিশিষ্ট ঘটনাকে ব্যাপকভাবে একটী জাতির ঘাড়ে চাপাইয়া দিয়া জাতিবিদ্বেষ প্রচার করা—শুধু অন্যায় নয়—পাপ। কিন্তু অতীব দুঃখের বিষয় যে, এই নারী নির্য্যাতনের সুবিধা লইয়া আমাদের দেশে শুধু জাতি-বিদ্বেষই প্রচারিত হইতেছে। পুণ্যের যেমন জাতিত্বতা নাই —পাপেরও তেমনি কোনও জাতিত্বতা নাই। সময়ের ফেরে এবং দুষ্ট-লোকের জন্য প্রত্যেক সমাজে কোনও না কোন পাপ অনুষ্ঠিত হইতেছে এবং সেই জন্য যদি কেহ এই সব অন্যায় ঘটনার সুবিধা লইয়া একটা জাতিকে বিশেষ ভাবে চিহ্নিত করিয়া তোলে এবং বিশেষ করিয়া দেশের শিক্ষিত লোকেরা—তাহা হইলে তাহার অপেক্ষা মনস্তাপের বিষয় আর কি হইতে পারে? আর মজার ব্যাপার হইতেছে যে, যে সময়ে হিন্দু মুসলমান মিলনের জন্য দেশবন্ধু রক্ত-পাত করিতেছিলেন—ঠিক সেই সময়ই হিন্দু সমাজের একদিক হইতে নারীরক্ষা সমিতির আবরণে মুসলিম বিদ্বেষ দেশের পথে বিপথে ছড়াইয়া পড়িতে লাগিল। দেশবন্ধু যেদিন বেঙ্গল প্যাক্টের কথা তোলেন—সেই দিন থেকেই ইহার সূত্রপাত। দেশবন্ধুর উদারতা অবশ্য গোটা হিন্দু সমাজের কাছে দাবী করা মূর্খতা। ভারতের ভাগ্যনিয়ন্তাগণের নিকট মুসলমানকে মসী-লিপ্ত করিয়া দেখানই এই আন্দোলনের মুখ্য উদ্দেশ্য এবং এই উপায়ে দেশের রাজনৈতিক একতার সম্ভাবনা বহুদূরে সরিয়া গেল।"

আমি আরও বলিলাম—হিন্দুর সঙ্গে আমাদের মসজিদ, বাদ্য গো জবেহ প্রভৃতি লইয়া কোন বিবাদ নাই। সাম্প্র-দায়িক কলহ ইহা নয়। এ সকল দুই দিনের জিনিষ। আসল সমস্যা—আসল বিবাদ আর্থিক ভাগ বাটোয়ারা লইয়া। যখনই expropriated মুসলমান তাহার ন্যায্য আর্থিক সুবিধা দাবী করে তখনই হিন্দু তাহার মধ্যে কমুনালিজমের গন্ধ পায়।"

ভদ্রলোকটী যেন সন্তুষ্ট হইলেন না; আমিও সেদিকে আর চেষ্টা না করিয়া দূর আকাশের দিকে সহসা ফিরিয়া চাহিলাম। সেখানে দেখি সুপারি গাছের সারি-রেখার পারে আকাশ কখন এক অপূর্ব্ব বৃষ্টি-ভরা কালো মেঘে ভরিয়া গিয়াছে। আকাশ হইতে স্তরে স্তরে তাহার ছায়া গাছের উপর দিয়া, সবুজ মাটীর উপর দিয়া, নদীর জলে নামিয়াছে।

দেখিতে দেখিতে উন্মাদ ধারা নামিয়া আসিল। এক মনে বর্ষার রূপ ভাবিতে ভাবিতে দেখি কখন বর্ষার বারি-ধারা আমাকে সমস্ত জগতের সহিত বিচ্ছিন্ন করিয়া দিয়াছে। মনে হইতেছে আমি যেন প্রথম মানুষ, আমার নাম নাই, গোত্র নাই, জাতি নাই, বৃষ্টি-ধারায় পৃথিবীতে প্রথম পদ-ক্ষেপ করিতে চলিয়াছি।

ভাবিতে ভাবিতে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম—যেখানে আসিয়া জাগলাম সেখানে নদী শেষ হইয়া গিয়াছে।

---

# ফুপুমার কবরে

জসীম উদ্‌দীন

এইখানে সেই ছোট মেয়েটীরে দিয়েছিল তারা বিয়ে
জীবন প্রভাতে ব্যাথার মুকুট মাথায় পরায়ে দিয়ে।
শুনো পথপানে চাহিয়া থাকিত আসে যদি বাপ ভাই,
গেঁয়ো পথিকেরা পথ দিয়ে গেলে চমকে উঠিত তাই।
ভিখারীরে দিয়ে দুই মুঠো চাল কয়ে দিত কানে কানে,
"মায়ের আগেতে খবর কহিও বড় ব্যাথা মোর জানে।
'ডালিম-'গাইছা' বাড়ী আমাদের পূর্ব্ব-দুয়ারী ঘর'
কলার পাতারা দোলায় চামর তাহার মাথার পর।
কাল রাত্তীরে স্বপন দেখেছি রোগে ভুগিতেছে মা—
তালতলী গাঁয়ে দেখে আয় তারে, ভিখারীরে তুই যা।"

স্বামী ছিল তার বদ্ধ পাগল, এ পাড়া ও পাড়া ফিরি
গল্প করিয়া সময় কাটাত না ছিল কাজের ছিরি।
রাগাইলে তারে নিস্তার নাই রক্ত-চক্ষু করি
হাঁক ডাকে তার এক নিমিষেই সারা গ্রাম যেত ভরি।
এমনি স্বামীরে লইয়া তবুও বেঁধেছিল সুখ-হার
রাজার কুমার ছেলে হয়েছিল মেয়ে গুটী তিন চার।
পচা পুকুরের ঘোলা জলে নেয়ে মাটীর কলস খানি
পদ্মের বনে ঢেউ দিয়ে যবে কক্ষে লইত টানি,
জল-কমলের সঙ্গে যে হ'ত স্থল-কমলের দেখা
জলের লক্ষ্মী হাসিত যে তাহা স্থল-লক্ষ্মীরো শেখা।
পঙ্করাণীরে কেউ দেখিত না দেখিত যদি গো কেহ
বেণু লতাগুলি সোহাগে জড়ায় তাহার পাতার গেহ,
তারিতলে জ্বলে মেটো দীপখানি মশা ওড়ে দলে দলে;
সমুখে ঘুমায় গেহের লক্ষ্মী হাতে মুখে ফুল জ্বলে—
এপাশে ছেলেটী, ওপাশে মেয়েরা যেন খোদা বহুরূপী
বিরলে লিখিয়া ভেস্তের ছবি দেখিতেন চুপি চুপি।
হায় মহাকাল কঠোর কৃপাণ কঠিন চরণ ঘায়
দলিয়াছ সেই সোণা মন্দির পথের ধূলার গায়।

সেকি তা জানিত, ছেলে-ধরা কোন মৃত্যু-ধূসর বুড়ী
একে একে তার বাছাগুলি হায় নিয়ে যাবে করি চুরি।

আমরা তাহারে দেখেছি যখন জীর্ণ শীর্ণ দেহ
গেয়ো লক্ষ্মীর ভাঙ্গাবুক ঢাকে ভেঙ্গে পড়া কুড়ে গেহ।
ছেলের মেয়ের শোকে তাপে তার আন-জীবনের ভার
বহিতে বহিতে ভাটিয়া এসেছে মরণ নদীর পার।
আমার বাপের গলাটী ধরিয়া কাঁদিত পাগল-পারা
শাখায় শাখায় দেখা হ'ত যেন গেড়ে এক ডাল যারা।
স্নেহের দুখান বাহু আগলিয়া বাঁধিয়া লইত মোরে
কারে কারে আমি কত ভালবাসি শুধাইত তারপরে।
ভাবিতাম কোন ভেস্তের দেবী এই বন-গেঁয়ো ঘরে
এত যে দরদ কেন বুকে ওর এই অভাগার তরে।

সেবার শুনিনু বৈশাখ মাসে তিন দিনে কোন্ জ্বরে
সেই দরদিয়া ঢলিয়া প'ড়েছে কবর নিঝুম ঘরে।
তারপর গেছে বহু দিন কাটি দুনিয়ায় নানা ঘোরে
কত ব্যথা আর কত কাঁদা আছে কে পারে রাখিতে ধ'রে।
বহুদিন পরে আসিয়াছি আজ তাহার এ বুনো বাড়ী—
বড় সকরুণ ঘুগুরা ডাকিছে খেজুরের পাতা নাড়ি।
কবরে তাহার আবরণ দেছে ঝরা তেঁতুলের পাতা
ঘুমলী মেয়েরে চাদরে ঢেকেছে যেন আদরিণী মাতা।
তারি স্নেহ যেন পাইতেছি আমি এই বুনো তরু-ছায়ে
ঠাণ্ডা হাওয়ায় তাহারি পরশ পুলকি উঠিছে গায়ে।
ভূতের ভয়েতে এই পথে যেতে সরেনা কাহার কথা
রাত্রে কে নাকি আগুণ জ্বালায় মাথায় জড়ায়ে কেঁথা।
আমিও দেখেছি সারাদিন বসে উউ উউ ক'রে কাঁদে
শিথীল বাকল তেঁতুল পাতায় বাতাস দোলার নাদে।
রাত্রি বেলায় এই একা বনে জোনাকী-উজল রথে
ছেলে মেয়েগুলি বক্ষে আগলি কেঁদে যায় পথে পথে,
'ফুপুমা, ফুপুমা, বিদায় বিদায় বেলা বেড়ে গেল যাই,
এই গেয়ো ঘরে যত ব্যাথা তব ভুলি নাই ভুলি নাই।'

---

# একঘরে

আকবর উদ্দীন

অজ পাঁড়াগাঁয়ের ছেলে জালাল যখন কলিকাতায় কলেজে পড়িত ও মাঝে মাঝে সহর হইতে বাড়ী আসিয়া পোষাকে, চুলে, দাড়িতে, আহারে, ধুমপানে ও ব্যবহারে হালফ্যাসান দেখাইত, তখন সকলেই মনে করিয়াছিল যে, সে কিছুদিনের মধ্যেই যা হ'ক একটা বড় রকমের কিছু না হইয়া যায় না।

অবস্থা তাহাদের নিতান্ত মন্দ নয়; বাগান, পুকুর ও জমি হইতে যাহা উৎপন্ন হইত, তাহাতে সুখ না হউক স্বচ্ছলতার অভাব ছিল না, বিশেষতঃ পিতার একমাত্র অবিবাহিত সন্তান ও সংসারে এক বৃদ্ধা মাতা ও ছোট ভগ্নি ভিন্ন আর কেহ তাহার ছিল না।

তখন খেলাফত, অসহযোগ ও মুসলমানের জাতীয় উন্নতির বাণ দুকুল প্লাবিয়া ছেলে বুড়া অনেককেই ভাসাইয়া লইয়া চলিয়াছে; দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, মৌলানা মহম্মদ আলী প্রমুখ নেতৃবৃন্দের ডাক শুনিয়া কলিকাতার কলেজের ছাত্রেরা যখন দলে দলে শিক্ষাগারকে শয়তানের মন্দির বলিয়া ত্যাগ করিল, তখন জালালও হ্যালিডে পার্কে মৌলানা সাহেবের বক্তৃতা শুনিয়া—কলেজ ছাড়িয়া দিন কতক কলিকাতায় রাস্তায় রাস্তায় পিকেটিং করিয়া পনর দিন শ্রীঘরে বাস করিয়া পল্লীগৃহে ফিরিয়া আসিল। নেতৃবৃন্দের Back to the village মন্ত্র সার্থক করিয়া তুলিবার জন্য বিশেষ করিয়া যখন তাহার মনে Charity begins at home প্রবাদটা সুস্পষ্টরূপে জাগিয়া উঠিল, তখন কে যেন তাহাকে দুঃখ দারিদ্র্য পূর্ণ পল্লীগৃহের দিকে ঠেলিয়া দিল।

এই সুদূর পল্লীগ্রামের লোক তখনও মহাত্মা গান্ধী বা মৌলানা মহম্মদ আলী বা দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের নাম শুনে নাই। জালাল যখন খদ্দর পরিয়া ও গান্ধীটুপি মাথায় দিয়া গ্রামে প্রবেশ করিল তখন সকলেই তাহাকে দেখিয়া অবাক হইল; কেবল গ্রামের মোড়ল আবদুল আলী সকলকে বুঝাইয়া দিল যে জালাল স্বদেশী দলে মিশিয়াছে সুতরাং পুলিশে তাহাকে সত্বর গ্রেপ্তার ত' করিবেই, এমন কি, যে তাহার সহিত মিশিবে, তাহাকেও ধরিবে। ব্যাপারটা ঠিক না বুঝিলেও গ্রামবাসীদের মনে মনে কেমন একটা আশঙ্কা জাগিয়া উঠিল।

জালালের মাতা পুত্রের এই অকস্মাৎ প্রত্যাবর্ত্তন ও নূতন বেশ দেখিয়া অমঙ্গল আশঙ্কায় নানা প্রশ্ন করিয়া যখন শেষে শুনিলেন যে, জালাল দেশের কাজ করিবে বলিয়া কলেজ ত্যাগ করিয়াছে, তখন তিনি কথাটা না বুঝিলেও পুত্রকে নিরাপদ দেখিয়া যাহা ভাল হয় তাহাই করিতে কহিলেন, কারণ তাঁহার পুত্র অবুঝ ছেলে ত' নয়ই, বরং সে তল্লাটে বিদ্যায় ও বুদ্ধিতে তাহার সমকক্ষ কেহই নাই।

জালাল বহুদিন মায়ের কোলে ফিরিয়া দুই তিন দিন উত্তমরূপে আহারাদি করিয়া, ঘুমাইয়া ও বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে গল্প গুজব করিয়া কাটাইল; তাহার পর গ্রামের উন্নতিকল্পে উঠিয়া পড়িয়া লাগিল। তাহার সমবয়স্ক আরও কয়েকটী বোম্বেটে বকাটে যুবক জোগাড় করিয়া বাড়ী বাড়ী ঘুরিয়া চরকা কাটিতে, লেখাপড়া শিখিতে উপদেশ দিয়া বেড়াইতে লাগিল। নিজের বাড়ীতে একটা নৈশবিদ্যালয় আরম্ভ করিয়া নিজেই ছেলেদের মাষ্টার হইয়া বসিল।

* * * *

গ্রামে সেবার ওলাওঠা রোগ একটু জোর করিয়া দেখা দিল; প্রত্যহ দুই চারিটী করিয়া মরিতে লাগিল; জালাল নিজের দল লইয়া প্রাণান্ত চেষ্টা করিয়াও রোগের প্রকোপ নিবারণ করিতে পারিল না। তখন গ্রামের সকলে মিলিয়া রোগের প্রকোপ বন্ধ করিবার জন্য পীর মৌলানা সহীদ্ উদ্দীনকে আনিবার উদ্যোগ করিল।

জালাল সকলকে কহিল—আপনারা পীর সাহেবকে আনছেন কেন? এ রোগে তিনি এসে কি ক'রবেন?

জনৈক বৃদ্ধ কহিলেন—আরে বাবা, তোমরা দু'পাতা

ইংরাজী পড়ে খোদার কালাম একেবারে অবহেলা ক'রে উড়িয়ে দিতে চাও। জান না ত' মৌলানা সাহেব ভারি কামেল লোক।

জালাল কহিল—তার মানে ?

বৃদ্ধ কহিলেন—তাঁর দোয়া হ'লে এক মুহূর্ত্তে রোগ দেশ ছেড়ে পালাবে; হাজার হাজার জেন তাঁর মুরিদ; জেব্রায়েল ফেরেস্তা পর্য্যন্ত এসে তাঁর সঙ্গে রাত্রে কথা কন।

জালাল কহিল—এসব আপনারা বিশ্বাস করেন কি ক'রে ?

বৃদ্ধ কহিলেন—ঐ বল্লাম তোমরা একেবারে খৃষ্টান হ'য়ে গেছ; তোমার বাবা বেঁচে থাকলে ওকথা ব'লতে পারতেন না।

—ইহার উপর ত' আর কথা চলে না। জালাল নীরব হইল। পর দিনই মৌলানা সাহেবকে আনিতে লোক চলিয়া গেল।

সন্ধ্যার সময় ফিরিয়া আসিয়া সে দশজনকে সংবাদ দিল যে পীর সাহেব অগ্রিম একশত এক টাকা না হইলে আসিবেন না, কারণ তিনি ওজিফায় বসিয়া জানিতে পারিয়াছেন যে খোদার গজব নাজেল হইয়াছে ও বেহেস্তের ফেরেস্তা আসিয়া তাঁহাকে এখানে আসিতে বারণ করিয়াছেন, তথাপি তিনি দয়ার বশবর্ত্তী হইয়া ও মুসলমান ভাইদের কল্যাণের জন্য খোদার দরবারে বহু মোনাজাত করিয়া আসিবার হুকুম পাইয়াছেন, কিন্তু অল্প মূল্যে খোদার কালাম বিক্রয় করিতে নিষেধও করিয়াছেন।

দূতমুখে সংবাদ শুনিয়া হজরত পীর সাহেবের অসীম দয়ার সমাচারে অনেকের গণ্ড বহিয়া অশ্রুধারা নির্গত হইল।

জালাল বিরক্ত কহিল—আপনারা আমার কথা শুনুন। দু' একদিন আর সবুর করুন, রোগ ক'মে আস্‌ছে; একশত টাকার বদলে আপনারা আমাকে পঞ্চাশ টাকা দিন আমি ঔষধ এনে দিচ্ছি, তাতেই সব রোগ আরাম হ'য়ে যাবে।

একথা শুনিয়া বৃদ্ধরা অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া কহিলেন—বাপুহে, তোমাদের ওসব নাসারা মত আমরা থাকতে চল্‌বে না; আমরা যখন ম'রে যাব, তখন যা হয় ক'রো।

আট দশদিন পর পীর সাহেব আসিলেন পাল্কীতে চড়িয়া। গ্রামের লোক তাঁহার যথোচিত সম্বর্দ্ধনা করিল ও খাসি মুরগী জবেহ করিয়া পোলাও তৈয়ারি করিয়া অপর্য্যাপ্ত রসনাতৃপ্তিকর আহার্য্য প্রস্তুত করিল। পীর সাহেবের থাকিবার স্থান হইল আরমান বিশ্বাসের বাড়ী।

* * * *

সন্ধ্যার পর পীর সাহেবের হুজুরে গ্রামবাসী সকলে উপস্থিত; পিছন দিকের দরজার আড়ালে অনেক স্ত্রীলোক জমায়েত হইয়া হুজুরের মুখ-নিঃসৃত বাণী শ্রবণ করিবার জন্য অপেক্ষা করিতেছিল।

মগরেবের নমাজের পর ঘণ্টা খানেক তসবিহ তেলাওত করিয়া হুজুর যখন উঠিলেন তখন বিশ্বাস সাহেব পরাটা, কোরমা ও জাফরান পেশ করিলেন নাস্তার জন্য। হুজুর একবার চারিদিকে চাহিয়া কহিলেন—এসব কিস্ ওয়াস্তে বাবা!

আরমান কহিল—হুজুর, থোড়া নাস্তা করুন।

পীর সাহেব কহিলেন—আর নাস্তা কেন বাবা; আমার ভুক্ একদম নাই। তার উপর বাবারা সব বসে থাক্‌বে।

গরীবের প্রতি পীর সাহেবের সহানুভূতি দেখিয়া সকলে সমস্বরে কহিল—হুজুরের খাওয়া হ'লেই আমাদের হ'ল।

জনাব পীর সাহেব তখন থোড়া নাস্তা ফরমাইলেন।

নাস্তার পর পীর সাহেব কহিলেন—বাবা, তোমরা আমাকে যে কাজের ওয়াস্তে খবর দিয়েছিলে, তা, আমার আসার খবরেই হ'য়ে গিয়েছে। আমি আস্‌ব শুনেই সয়তান তোমাদের মুলুক ছেড়ে চলে গিয়েছে।

আরমান বিশ্বাস কহিল—তা ত' হুজুর দেখ্‌তেই পাচ্ছি; হুজুরের কেরামতি।

হুজুর কহিলেন—আমি কে বাবা, তামাম আল্লাহতা'লার মেহেরবানী।

আরমান কহিল—তা হ'লেও হুজুরের দোয়ার বরকত না হ'লে কি কিছু হ'ত।

হুজুর কহিলেন—আমি মগরেবের নমাজের পর তেলাওতে ব'সে মোনাজাত করেছি, আল্লাহতা'লার হুকুমে বালা তোমাদের গাঁ ছেড়ে চলে গেছে।

জালাল এক কোণে বসিয়াছিল; সে আর স্থির থাকিতে না পারিয়া কহিল—মৌলানা সাহেব, আপনি যদি দিন পনর আগে আস্‌তেন তাহ'লে বুঝতাম কি করে নাম শুনে রোগ পলায়।

সকলে চতুর্দ্দিক হইতে হাঁ হাঁ করিয়া উঠিল; হুজুরের এত অপমান!

একজন কহিল—ফের যদি তুমি কথা কও; ছুই চড়ে তোমাকে সিধে ক'রে দেব।

পীর সাহেব একটু হাসিয়া কহিলেন—আহা যেতে দাও, ও নাদান।

জালাল মরিয়া হইয়া কহিল—নাদান কি মৌলানা সাহেব! রোগ ভাল হ'য়ে গেলে সবাই এসে ব'লতে পারে আর রোগ হ'বে না।

আবার পাঁচ সাতজন এক সঙ্গে তাহাকে কিঞ্চিৎ শিক্ষা দিতে উঠিল।

পীর সাহেব দুঃখিতস্বরে কহিলেন—আহা, তোমার উপর দেখ্‌ছি সয়তান আসর করেছে।

আরমান কহিল—ঠিক বলেছেন হুজুর। নইলে এমন কথা বলে।

পীর সাহেব কহিলেন—তা নিশ্চয়।

আরমান আবার কহিল—আরও বলে কি হুজুর যে মেয়েদের লেখাপড়া শেখাতে হ'বে।

জালাল এবার কহিল—বলুন ত' মৌলানা সাহেব, মেয়েদের শিক্ষা দেওয়া উচিত কি না।

পীর সাহেব কহিলেন—থোড়া থোড়া দিনী এলেম শিখান ওয়াজেব।

জালাল কহিল—ওয়াজেব কি! এত' ফরজ।

পীর সাহেব কহিলেন—বাবা, ফরজ ছিল এককালে যখন এসলামি বাদশাহি ছিল; এখন আর তা নাই।

জালাল কহিল—কি বল্লেন?

মৌলানা সাহেবের সঙ্গে তর্ক করিবার দুঃসাহসে সকলে তাহার উপর বিরক্ত হইয়া কহিল—হুজুর, ওটার কথায় কান দেবেন না।

পীর সাহেব কহিলেন—না বাবা, নাদানকে তালিম দেওয়া নায়েবে রসুলদের পক্ষে ফরজ। যাক্, খেয়াল কর সকলে, লেড়কিদের দীনি এলেম শিক্ষা দেওয়া ওয়াজেব।

জালাল কহিল—আর বাঙ্গলা?

পীর সাহেব কহিলেন—তওবা, তওবা, উও ত' হিন্দুর জবান।

জালাল কহিল—আমরাও যে বাঙ্গালী।

পীর সাহেব জিব কাটিয়া কহিলেন—আস্তাগফেরাল্লা! আমরা মুসলমান।

জালাল কহিল—আমাদের বাড়ীত' বাঙ্গালা দেশে।

পীর সাহেব কহিলেন—না বাবা, আমার প'রদাদা তসরিফ ফরমান বগদাদ শরিফ থেকে, তোমরা সব কেউ মুঙ্গের থেকে, কেউ দারভাঙ্গা থেকে এসেছ।

জালাল এই অত্যদ্ভুত ঐতিহাসিক তথ্য শুনিয়া নির্ব্বাক হইয়া গেল।

সকলে তখন কহিল—হুজুর, আমরা একটু ওয়াজ শুন্‌ব।

পীর সাহেব কহিলেন—ওয়াজ আর কি কর্‌'ব বাবা। পহেলা বাত এই ইয়াদ রাখ কে, দুনিয়ায় পথ দেখাবার ওয়াস্তে পীর ধর্ত্তে হয়। দোস্‌রা ইয়াদ রাখ, বিবিদের পর্দ্দা; তেস্‌রা সুদ খাওয়া হারাম, সুদখোরের বাড়ী খাওয়াও হারাম—

জালাল বাধা দিয়া কহিল—আমার কিন্তু একটা কথা আছে।

ওয়াজে বাধা দেওয়ায় সকলে ক্রুদ্ধ হইল। পীর সাহেব সকলকে থামাইয়া কহিলেন—কি বল?

জালাল কহিল—আপনি যা'র বাড়ী খাচ্ছেন, তিনি ত মহাজন সুদখোর—

আরমান চীৎকার করিয়া কহিল—না হুজুর, আপনাকে আমি সুদ মিশান পয়সা থেকে খাওয়াই নাই, আলাদা পয়সা থেকে দিয়েছি।

জালাল ব্যঙ্গের স্বরে কহিল—বিশ্বাস সাহেবের তাহ'লে দু'টা তহবিল আছে।

আরমান রাগে লাল হইয়া কহিল—কোথাকার বেহায়া তুই—

পীর সাহেব কহিলেন—আলাহিদা হকের তহবিল থেকে দিলে কোন দোষ নাই।

জালাল কহিল—ন্যায়ের ফাঁকি, অথচ আপনি জানেন যে এ অসম্ভব। যাক্, আর এক কথা। কাজ-গ্রামে আপনার ঢেকি নিকার যে বিবি আছে, সে ত' বাজারে চাউল বিক্রি করিয়া খায়। আপনি ত' বিবির পর্দ্দা করেন না।

পীর সাহেবের গাম্ভীর্য্য অন্তর্হিত হইল। তিনি ক্রোধে

কাঁপিতে কাঁপিতে কহিলেন—কাঁহাকা নাসারা রে, খোদার লানত পড়ে তোম্‌হারা উপার। তোম্ কেয়া মুসলমান হ্যায়, বেইমান, কাফের কাঁহেকা—হারামজাদ—

পীর সাহেব দাঁতে দাঁত ঘষিয়া কহিলেন—তোমাদের গাঁয়ে এসে এত্তা অপমান!

সকলে পীর সাহেবের অপমান দেখিয়া ক্ষেপিয়া উঠিল। জালালকে সকলে চাঁঙ্গা করিয়া চড় চাপড় ঢিল মারিতে লাগিল। বেচারাকে মারিয়া প্রায় আধমরা করিয়া ফেলিত, যদি না তাহার সঙ্গী ভক্ত চার পাঁচজন যুবক তাহাকে রক্ষা করিত।

আরমান চীৎকার করিয়া কহিল—ওকে এখনই একঘরে ক'রব; গাঁ ছাড়া ক'রব।

জালাল বাহিরের উঠানে দাঁড়াইয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে কহিল—তোমাদের যা খুসি কর; কিন্তু শত অত্যাচারেও আমি তোমাদের ভণ্ড পীরের নেতৃত্ব স্বীকার কর্ত্তে রাজী নই। আজ তোমরা বুঝছ না, কিন্তু একদিন আসবে যেদিন মুসলমান বুঝবে এরা তোমাদের কতখানি ক্ষতি করেছে।

আরমান আবার কহিল—ফের কথা—

জালাল কহিল—আমি চলে যাচ্ছি। কিন্তু যাবার আগে আর একবার সাবধান ক'রে যাচ্ছি।

—বলিয়া সে চলিয়া গেল।

পীর সাহেব কহিলেন—বেদিন নাসারা, এরাই এসলামকে নষ্ট ক'রল, কাফের কোথাকার।

তখনই দশজন বসিয়া জালালকে একঘরে করিয়া খাওয়া দাওয়া হুঁকা পানি বন্ধ করিল।

জালাল দেখিল Charity begins at homeএ বিপদ্ আছে প্রচুর—তাই পুনরায় মাতার কাছে বিদায় লইয়া সে শহরের অভিমুখে রওনা হইল—উদ্দেশ্য এই যে সেইখান হইতেই সে মুসলমান সমাজের অন্তর্নিহিত গলদের বিরুদ্ধে তুমুল যুদ্ধ ঘোষণা করিবে। এ গ্রামে আর নয়।

* * * *

---

# সনেট

[ সোহানী মোহাম্মদ রিয়াজ উদ্দিন চৌধুরী ]

কত বার কত ভাবে নিশীথে প্রভাতে
পূজেছি তোমারে প্রিয়া, প্রেমের দেউলে,
ভাসিয়াছি অশ্রুজলে নিদ্রাহীন রাতে
তথাপি চাহনি' হায় কভু আঁখি তুলে!
ব্যথার পরশে মোর ভেঙ্গে দিয়ে বুক
বিফল করে'ছ পূজা চির নিশি দিন,
হে নিঠুর প্রিয়া মোর! রহিয়াছ মূক
পাষাণ-প্রতিমা যথা রহে ভাষা হীন।
হৃদয়-শোণিতে আজ জ্বালি' শেষ-বাতি
নিভৃত কুটীর মাঝে—তপ্ত আঁখি নীরে—
মর্ম্ম বৃন্ত-ছেঁড়া ফুলে শেষ-মালা গাঁথি'
করিব তোমার পূজা। তারপর ধীরে
মরণের শান্তিময় কোলে দিব ঢাকি'
অনন্ত বেদনা-মাখা মোর দু'টী আঁখি।

# বাঙ্গালা-সাহিত্যে মুসলমানের দান

[ মোহাম্মদ মনসুর উদ্দীন, বি, এ ]

সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক প্রমথ চৌধুরী মহাশয় বলেন—"Bengali literature was born in Mahomaden age." বাঙ্গলা সাহিত্যের জন্ম হইয়াছিল মুসলমান যুগে। বাঙ্গালা-সাহিত্যের ইতিহাস আলোচনা করিতে গেলে এই কথাটী বিশেষ করিয়া স্মরণ রাখিতে হইবে। বিশেষতঃ বাঙ্গালা-সাহিত্যে মুসলমানের দান সম্বন্ধে কোন কথা বলিতে হইলে তাঁহার এই উক্তি অবহেলার জিনিষ নয় কারণ এই একটী কথার ভিতরেই বাঙ্গালা-সাহিত্যের জন্ম তত্ত্বের ইতিহাস লুক্কায়িত রহিয়াছে। এই অর্থগর্ভ বাক্যটীই সম্প্রসারিত করিলে আমরা অনেক নূতন তথ্যের সন্ধান পাইব। জাতি-তত্ত্বের সংবাদ না জানিলে—উহার কৌলিন্য কুলজীর ইতিবৃত্ত অজ্ঞাত থাকিলে, উহার লালনপালনের, আদর যত্নের, সেবা-শুশ্রূষার আদ্যোপান্ত না জানিলে বাঙ্গালা-সাহিত্যে মুসলমানের কি কি বিশিষ্ট দান আছে এবং ঐ দানের প্রকৃত মূল্য ও স্থান কোথায় তাহা নির্ণয় করা একেবারে অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইবে। যে গৃহে তাহার জন্ম হইল, যে আবহাওয়ার মধ্যে থাকিয়া সে বর্দ্ধিত হইল এবং যে পিতামাতার সহিত তাহার রক্তের সম্পর্ক তাহাদের কথা না জানিলে সত্য নির্দ্ধারণ কোনও প্রকারেই সম্ভব নয়। বাংলা সাহিত্যের জাতি-তত্ত্বের সহিত ইহাদের গভীর সংযোগ রহিয়াছে।

বাঙ্গলা-সাহিত্য তাহার জন্ম হইতেই সংস্কৃত পণ্ডিত মহলে পড়িয়া শিশুর ন্যায় অবজ্ঞা ও অবহেলা পাইয়া আসিতেছিল, সংস্কৃতের রাজ্যে ক্রীতদাসীর চেয়েও যাহাকে ঘৃণা ও লজ্জা পাইতে হইয়াছিল—সে যে এককালে সংস্কৃত পণ্ডিতগণের স্নেহ-সৌভাগ্য লাভে গৌরবান্বিত হইবে এবং মহিয়সী বলিয়া রাজ-সম্মান ও খেলাত লাভ করিবে কে তাহা ভাবিয়াছিল? সেই স্বপ্নের অগোচর কল্পনা কি প্রকারে বাস্তব মূর্ত্তি লাভ করিয়াছিল তাহা জানিতে পারিলেই আমাদের সকল প্রয়াস সফল হইবে।

সত্যই কি ইহা আশ্চর্য্য মনে হয় না যখন ভাবা যায় যে কোন্ দূরদূরান্ত দেশ হইতে আগত একদল লোক তাঁহাদের রাজনৈতিক ও ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় স্বার্থ-সম্পর্কহীন এই প্রচেষ্টায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন? তাঁহাদের মাতৃভাষা ছিল ফারসী এবং ধর্ম্মভাষা আরবী,—ইহার কোনটার সহিত যাহার সম্বন্ধ নাই এমন একটা ভাষাকে—যে ভাষা সংস্কৃতের দাসী-রূপে শূদ্রের ন্যায় সাধারণের কুড়ে ঘরে পড়িয়াছিল, তাহাকেই তাঁহারা মান-সম্মানের পদবীতে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন! শুধু তাহাই নহে, পথের কাঙ্গালিনীকে ধুইয়া মুছিয়া তাঁহারা এমন করিয়া দিলেন যে একেবারে রাজ-সিংহাসনের পার্শ্বে তাহার স্থান নির্দ্দেশ হইয়া গেল! ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসে ইহা অপূর্ব্ব ও অদ্ভুত। অদ্ভুত হইলেও ইহা ঐতিহাসিক সত্য।

জ্ঞান-সাধনার ইতিহাসে মুসলমান সম্রাটগণের দান অবহেলা করিবার নহে। বাগদাদ-কার্ডোভায়, হিরাট কায়রোয়—মুসলমান খলিফাগণের যে জ্ঞান-সাধনা দেখিতে পাই তাহাই যেন উত্তরাধিকার সূত্রে বাঙ্গালার বাদশাহগণের মধ্যেও চলিয়া আসিয়াছিল। বাঙ্গালা-ভাষা ও সাহিত্যের সৌকার্য্য ও বিকাশ, উন্নতি ও বিস্তৃতির জন্য তাঁহারা রাজকোষ হইতে অর্থ, নিজেদের মূল্যবান সময় ও প্রাণ পর্য্যন্ত নিয়োগ করিয়াছিলেন। উহাতে কোন রাজনৈতিক মতলব বা ধর্ম্ম-প্রচারের ছুতা ছিল না। রাজকর্ম্মচারিগণের কর্ম্ম-সুবিধার জন্য বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষার উদ্দেশ্যে তাঁহারা কোন ফোর্ট উলিয়ম কলেজের প্রতিষ্ঠা—অথবা মুসলমান ধর্ম্ম-প্রচারের জন্য কোন শ্রীরামপুর মিশন প্রেসও স্থাপন করেন নাই। শুধু সাহিত্যের জন্যই তাঁহারা সাহিত্যের আদর ও যত্ন করিয়াছিলেন। শুধু এই কথাটুকু মনে রাখিলেই তাঁহাদের দানের যথার্থ মূল্য বুঝিতে পারা যাইবে।

আর একটী কথা এই প্রসঙ্গে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, এই ধর্ম্মবিধি-নিপীড়িত ও আচার-অত্যাচারিত বাঙ্গালাদেশে

মাতৃভাষার কতখানি সম্মান ছিল এবং বাঙ্গালীর নিকট হইতে সে কি প্রকার আদর পাইয়া আসিতেছিল। সংস্কৃত পণ্ডিত দম্ভ করিয়া পাঁতি দিতেছেন—

অষ্টাদশ পুরাণানি রামস্যচোর তানিচ।
ভাষায়াং মানবঃ শ্রুত্বা রৌরবং নরকং ব্রজেৎ ॥

মাতৃভাষার প্রতি ঈদৃশ বিজাতীয় বিদ্বেষ সভ্য জগতের অপর কোন জাতির ইতিহাসে সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না। শিক্ষিত ও পণ্ডিতম্মন্য দলের এই প্রকার অবজ্ঞা ও তুচ্ছ তাচ্ছিল্যের ভাব বাঙ্গালা ভাষার পক্ষে অত্যন্ত মারাত্মক হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, কারণ উহা অতি সহজেই সমাজের ও দেশের প্রতি অঙ্গে, প্রতি শিরায় সংক্রামিত হইয়া পড়িয়াছিল। তৎকালে শুধু সমাজে নহে, ভাষার রাজ্যেও যে পরকীয়া প্রেমাভিনয় চলিতেছিল এই প্রবচনা উহার প্রমাণ করিতেছে। এই অতি অদ্ভুত ঘটনা বাঙ্গালা দেশেই মাত্র সম্ভব—অন্য কোন দেশে নহে।

সাহিত্য যাঁহারা সৃষ্টি করেন তাঁহারা চিরদিনই সমাজের উচ্চস্তরের লোক। দেশ ও জাতির উন্নতি, উন্নত ও শিক্ষিত সম্প্রদায়ের উপরেই নির্ভর করে। সাধারণ লোকেরা কোন কালেই শ্রেষ্ঠ সাহিত্য সৃষ্টি করিতে পারে নাই। সুতরাং আমাদের প্রতিপাদ্য বিষয়ের গুরুত্ব সম্যক বুঝিতে হইলে এই কথাগুলির দিকে দৃষ্টিপাত করিতে হইবে এবং তৎকালীন সামাজিক আদর্শ ও অবস্থার কথা জানিতে পারিলে ইহা বুঝার পক্ষে অনেক সুবিধা হইবে।

সাহিত্য চিরকাল লোক-সঙ্গীত ও Folk-dance হইতে উৎপত্তি লাভ করিয়াছে। অর্থাৎ আদিম কালের লোকেরা আনন্দ উৎসবে যে গান করিত উহাই সকল দেশের সাহিত্যের বনিয়াদ। আমাদের দেশে প্রাচীনতম সাহিত্যে যাহা পাওয়া যায়, তাহার সকলগুলিই লোক-সঙ্গীত। বৌদ্ধ "ময়ণামতীর গান", "মাণিকচন্দ্র রাজার গান", "গোপীচন্দ্রের গান" ইত্যাদি ইহার সাক্ষী। অবশ্য প্রাচীন কালে এই সমস্ত গান লোকে লিখিয়া রাখিত না, পুরুষানুক্রমে বাঙ্গালার লোক সমাজে মুখে মুখে ইহার আবৃত্তি হইত। এই গান ব্যতীত প্রাচীন সাহিত্যের যে নিদর্শন পাওয়া যায় উহাকে সাহিত্য বলা চলে না, কেন না ডাক ও খনার বচনের মধ্যে এমন কিছুই নাই, যাহা কি প্রাচীন কি আধুনিক কোন কালের সাহিত্যে খাটি সাহিত্য হিসাবে স্থান লাভ করিতে পারে। তবে ইহা সত্য যে ইট পাটকেলের দিন তারিখের মত উহা আমাদিগকে সাহিত্যের প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে যথেষ্ট সাহায্য করে। বাঙ্গালা-সাহিত্যে মুসলমানের দানের পূর্ব্বে উহাই তাহার পুঁজি ছিল এবং উহার মূল্য শুধু নীচ সম্প্রদায় ও সাধারণ স্তরের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। পূর্ব্বে কি ছিল উহা জানা থাকিলে পরে কি আসিল তাহার মূল্য ও স্থান নির্দ্দেশ করা সহজ সাধ্য হইবে। অতএব আমরা এখানে তাহারই কিছু আলোচনা করিব।

আজ যে আমরা বাঙ্গালা সাহিত্যের অপূর্ব্ব ও অলৌকিক যৌবন মাধুর্য্যের সন্ধান পাইতেছি উহার মূলে রহিয়াছে মুসলমানের সহায়তা। মুসলমানেরা যদি অনাদৃত বাঙ্গালা সাহিত্যের দিকে লক্ষ্য না রাখিতেন এবং তাহার পরিপুষ্টির জন্য শক্তি নিয়োগ না করিতেন, তাহা হইলে বোধ হয় আরও এক শতাব্দী পরে আমরা রবীন্দ্রনাথের মত অসামান্য প্রতিভাসম্পন্ন কবির সাক্ষাৎ পাইতাম। রবীন্দ্রনাথ হঠাৎ মাটী ফুড়িয়া বাহির হন নাই, তিনি বাঙ্গালা সাহিত্যের ক্রম বিকাশের অমৃতময় ফল। আরও একটী কথা এ স্থলে বলিলে বোধ হয় অন্যায় হইবে না যে, বাঙ্গালা সাহিত্যের ভিতর দিয়া যেমন বাঙ্গালার renaissance আসিয়াছে—সেই রকম মুসলমানের দানই বাঙ্গালা সাহিত্যে রিনাসাঁস আরম্ভ করিয়াছে। একথা কেহ অস্বীকার করিতে পারিবেন না যে বাঙ্গালা সাহিত্যের নব ও পুরাতন ধারার মূলে রহিয়াছে বাঙ্গালায় অনূদিত রামায়ণ ও মহাভারত এবং এই দুইখানি গ্রন্থ পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষভাবে মুসলমানের প্রসাদেই জন্মলাভ করিয়াছিল। সেই যুগের সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতগণ কিছুতেই বাঙ্গালা ভাষায় রামায়ণ ও মহাভারতের অনুবাদ করিতে সম্মত হইতেন না। বাঙ্গালীর এই যে পরম উপাদেয় ও স্বাস্থ্যকর খাদ্যের ব্যবস্থা মুসলমানেরা করিয়া দিয়াছেন তাহার ফলেই বাঙ্গালী হিন্দুগণের মধ্যে আজ সাহিত্যের দিক দিয়া যৌবন জলতরঙ্গের খেলা আরম্ভ হইয়াছে। একথা বলার উদ্দেশ্য আমার এই নয় যে মুসলমানেরা এদেশে না আসিলে বাঙ্গালা সাহিত্য বিকশিত হইত না এবং বিশেষ করিয়া জাতীয় জীবনের গুরুমন্ত্র-স্বরূপ এই দুইখানি মহাকাব্য অনূদিত হইত না। প্রত্যুত আমার বক্তব্য এই যে মুসলমানেরা ইহার বিকাশে

যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন এবং এমন সময়ে সে সাহায্য করিয়াছেন যে, যে সময়ে অন্য কেহ তদনুরূপ সাহায্য করা ধর্ম্ম বিগর্হিত মনে করিতেন। এই কথাটা গ্রহণ করিলে আমাদের বক্তব্য সহজ হইয়া আসিবে, কেননা ছবির সাফল্য অনেকটা তাহার back-ground এর উপরেই নির্ভর করে।

বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস বাঙ্গালা-সাহিত্যে ধ্রুব নক্ষত্রের মত স্থির ও নিষ্কলঙ্ক। তাঁহাদের দান শুধু আমাদের নহে, যে কোন জাতির সাহিত্যে গৌরবের সামগ্রী। রবীন্দ্রনাথের পূর্ব্বে বাঙ্গালা সাহিত্যকে জগতসভায় ইঁহারাই স্থান দিয়া গিয়াছেন। চণ্ডীদাস বোধ হয় কবি খ্যাতি হইতে গায়করূপেই বেশী প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। বিদ্যাপতি হইতে আরম্ভ করিয়া ভারতচন্দ্র পর্য্যন্ত প্রায় সকল বিখ্যাত কবিই রাজ-অনুগ্রহ পাইয়া আসিয়াছিলেন। পূর্ব্ববঙ্গে গীতিকার গায়কগণের মত তিনি গান গাহিয়া বেড়াইতেন। কাজেই রাজানুগ্রহ লাভের প্রয়োজন তাঁহার হয় নাই। পাঠান সুলতানগণ ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রারম্ভ ভাগ হইতে বাঙ্গলা দেশ শাসন এবং বাঙ্গালীদের সহিত ঘনিষ্টভাবে বসবাস করিতে আরম্ভ করেন। তাঁহারাই প্রথমে রামায়ণ ও মহাভারত বাঙ্গালায় অনুবাদ করার উদ্যোগ করিয়াছিলেন। আমরা যে প্রথম বাঙ্গলা অনুবাদ মহাভারতের সাক্ষাৎ পাই তাহা গৌড়ের বাদশাহের আদেশেই অনুদিত হইয়াছিল। মহাভারতের অন্য একখানি অনুবাদ চট্টগ্রামের পরাগল খাঁর আদেশ অনুসারে শ্রীকার নন্দী সম্পন্ন করেন। মালাধর বসু যে ভাগবতের অনুবাদ করেন তাহাও হুসেন শাহের উৎসাহ ও আদেশের ফল। হুসেন শাহ মালাধর বসুকে গুণ-রাজ খান উপাধি প্রদান করিয়াছিলেন। পরাগল খাঁর পুত্র ছুফী খাঁর আদেশক্রমে শ্রীকর নন্দী মহাভারতের অনুবাদ করেন। এতদ্ব্যতীত আরাকানের মুসলমান পারিষদের মাগন ঠাকুরের নির্দ্দেশ অনুযায়ী মহাকবি সৈয়দ আলাওয়াল হিন্দী হইতে পদ্মাবতী অনুবাদ করেন।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে মুসলমানগণ বাঙ্গলা-সাহিত্যের বিরাট সৌধের জন্য সুদৃঢ় ভিত্তিভূমি স্থাপন করিয়া গিয়াছেন—এই দান অবহেলা করিবার নহে।

শুধু তাহাই নহে, ইহার ফলে পিশাচী বাঙ্গালা ভাষা সংস্কৃত-প্রিয় হিন্দু রাজা ও পারিষদগণের সভায়ও সমাদৃত হইতে লাগিল। দীনেশ বাবু বলেন—"We are led to believe that when the powerful Moslem sovereigns of Bengal granted this recognition to the vernacular literature in their Courts, Hindu Rajas naturally followed the suit" তখন সংস্কৃত-মোহগ্রস্ত পণ্ডিতগণ বাধ্য হইয়া পাঁতি পরিবর্ত্তন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

"The Brahmins could not ignore the influence of this high patronage; they were therefore compelled to favour the language they hated so much" তাঁহাদের ব্যবস্থা আরও অধিকদূর গড়াইল, "Latterly they themselves came forward to write powers and compile works of translation in Bengali." সংরক্ষণশীল ব্রাহ্মণদিগকে মত পরিবর্ত্তিত করিয়া তাঁহাদিগকে তাঁহাদের অবহেলিত বাঙ্গালা ভাষার ও সাহিত্যের সেবায় নিয়োগ করিতে যে কি প্রকার শক্তিশালী প্রভাবের প্রয়োজন হইয়াছিল তাহা সহজেই অনুমেয়। মুসলমান বাদশাহগণের প্রচেষ্টায় যে গৌরবজনক ফল ফলিয়াছে তাহা কেহ অস্বীকার করিতে পারিবেন না। এই সম্বন্ধে দীনেশ বাবুর মত এই, "The patronage and favour of the Mohamedan Emperors and chiefs gave the first start towards recognition of Bengali in the Courts of Hindu Rajas and to establish its claims on the attention of scholars." এই first start-এর ফলে কালে এমন হইয়াছিল যে "The appointments of Bengali poets in the courts of Hindu Rajas grew to be a fashion after the example of the Moslem Chiefs."

এই দৃশ্য জগতের ইতিহাসে বিরল। আমরা জানি না অন্য কোনও বিজয়ী বিদেশী এইরূপ ভাবে বিজিত দেশের মাতৃ-ভাষার উৎকর্ষ সাধনে কখনও পর্য্যাপ্ত শক্তি ও উৎসাহ নিয়োগ করিয়াছেন কিনা?

মুসলমান সম্রাটগণের প্রশংসায় হিন্দু কবিগণ পঞ্চমুখ

ছিলেন। উহা কৃতজ্ঞতার দান স্বরূপ ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে।

একজন কবি জনৈক মুসলমান সামন্ত সম্বন্ধে বলিতেছেন—

"কলিকালে হিন্দু যেন———অবতার।"

বিদ্যাপতি নাসির শাহের খুব প্রশংসা করিয়াছেন, যথা—

"সো নছিরা শাহজানে
যাক হানিলেক মানে বাণে।
চিরঞ্জী রাহুঁ গৌড়েশ্বর
কবি বিদ্যাপতি ভণে।"

বিদ্যাপতি গিয়াসউদ্দিনকে উদ্দেশে বলিয়াছেন, "প্রভু গিয়াসুদ্দিন সুলতান"। বিজয়গুপ্ত, যাঁহার বহিতে মুসলমান অত্যাচারের অনেক কথা পাওয়া যায় তিনিও তাঁহার পদ্ম পুরাণে বলিতেছেন—

"সনাতন হুসেন শাহ নৃপতি তিলক"।

কবীন্দ্র তাঁহার মহাভারতে বলিতেছেন—

"নৃপতি হুসেন শাহ হয় মহামতি"

যশোরাজ খাঁন তাহার একটী গানে গাহিয়াছেন—

"শ্রীযুত হুসেন, জগত ভূষণ সে হি তাইরসজন"

অন্যান্য মুসলমান সম্রাটগণের কথা না বলিয়া শুধু হুসেন শাহ সম্বন্ধে দুই একটী কথা বলা প্রয়োজন, কেন না বৈষ্ণব সাহিত্যে হুসেন শাহের অনেক অত্যাচারের কাহিনী পাওয়া যায়। কালীপ্রসন্ন বন্দোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার গ্রন্থে বলিয়াছেন, "চৈতন্যের সামসাময়িক কালের অত্যাচারের কাহিনী অলীক বলিতে পারি।" হুসেন শাহের রাজত্বকালে হিন্দু-মনস্বিতা বিকাশের সুবর্ণ যুগ।" সাহিত্য ও ভাষা ওত প্রোতভাব পরস্পর পরস্পরের সহিত বিজড়িত। এই উপলক্ষে যদি ভাষাক্ষেত্রে মুসলমানের দান সম্বন্ধে উল্লেখ করি তাহা হইলে বোধ হয় অন্যায় হইবে না। ভাষা যেখানে অদৃশ্য সাহিত্য সেখানে রূপময়; ভাষার শ্রেষ্ঠ পরিনতি সাহিত্যে।

পৃথিবীর ইতিহাস অধ্যয়ন করিলে ইহাই পরিলক্ষিত হইবে যে, প্রত্যেক বিজিত জাতিই বিজয়ী জাতির ভাষা হইতে অবাধে শব্দ গ্রহণ ও সঞ্চয় করিয়াছে এবং বিজয়ী জাতির নিয়ম প্রণালী ও জীবন যাত্রার সহিত যে সমস্ত জিনিষের ঘনিষ্ট সম্বন্ধ রহিয়াছে—তাহা বিজিত জাতি আত্মস্থ করিয়া লয়।

ডাক্তার সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় গণনা করিয়া নির্দ্ধারিত করিয়াছেন যে প্রায় ২৫০০ আরবী ফার্সী শব্দ বাঙ্গলা ভাষা অবলীলাক্রমে গ্রহণ করিয়াছে এবং তাহাদের ব্যবহার এখনও চলিতেছে। তিনি উহার সম্পূর্ণ তালিকা প্রদান করেন নাই, উদাহরণ স্বরূপ কেবল কতকগুলি শব্দ উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছেন মাত্র। সেই সকল শব্দ হইতেও বাঙ্গলা ভাষায় মুসলমানের যে প্রাণের যোগ রহিয়াছে তাহার সন্ধান পাওয়া যায়। যাঁহারা একটু গভীর মনোযোগ সহকারে এই বিষয়ে চিন্তা করিয়াছেন তাঁহারা অবশ্য অবগত আছেন যে জীবন যাত্রার মধ্যে যে সমস্ত শব্দ নিত্য প্রয়োজনীয় উহার প্রায়গুলিই আরবী ফার্সী শব্দ। ইহা সত্যই আশ্চর্য্যের বিষয় বটে যে, আরবী ফার্সী শব্দ এত অনায়াসে বাঙ্গালা ভাষাকে কি প্রকারে জয় করিল?

কাগজ কলম দোওয়াত না হইলে সভ্যতাই পঙ্গু। বাগান, বাজার, দোকান, আসমান, জমিন ব্যতীত কি মানুষ জীবন-ধারণ করিতে সক্ষম? দালান, দরওয়াজা, দেওয়ালগির বালিশ, লেপ, তোষক, জামা, পিরহান ত্যাগ করিলে বানপ্রস্থ অবলম্বন করিতে হইবে। আতর গুলাব ত চির-প্রসিদ্ধিই লাভ করিয়াছে।

সওদাগর না থাকিলে কারবার কেমন করিয়া চলিবে? আইন আদালত, উকীল, মুক্তার, হাকিম মুন্সেফ, দারোগা, চৌকিদার না থাকিলে দেশ অরাজক হইয়া পড়িবে। নায়েব গোমস্তা, পাইক পিয়াদা না হইলে জমিদারী চলিতে পারে না, খাজনা বাকী পড়িবেই পড়িবে।

এই শব্দগুলির দিকে একটু নজর দিলে দেখিতে পাইবেন এইগুলি সভ্যতার জন্য কত প্রয়োজন। এই শব্দগুলি সভ্যতার বহিরঙ্গরূপে নহে, অন্তরঙ্গরূপেই বাঙ্গলা ভাষায় প্রবেশ লাভ করিয়াছে, ঘরের মধ্যের আসবাবপত্র এমন কি বালিশ, লেপ, তোষক পর্য্যন্ত অধিকার করিয়া বসিয়াছে। এই অধিকার লাভ করিতে কি বিপুল শক্তির প্রয়োজন হইয়াছিল তাহা সহজেই অনুমেয়।

ভাষাক্ষেত্রে মুসলমানের দান সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা হয় নাই। উহার আলোচনা হওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয়। আজ যাঁহারা আরবী ফার্সী শব্দকে বাঙ্গালা ভাষা হইতে

বিতাড়িত করিতে চাহিতেছেন তাঁহারা প্রশংসনীয় কার্য্য করিতেছেন সন্দেহ নাই। কারণ তাঁহারা আমাদিগকে আমাদের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে সজাগ করিয়া দিয়াছেন। আমাদের লজ্জার কথা, আত্মবিস্মৃতির কথা আর উল্লেখ করিতে চাহি না। কিন্তু যাঁহারা এখনও তাঁহাদের কান সজাগ রাখিয়াছেন, তাঁহারা জানেন আরবী ফার্সী শব্দ এখনও নিঃশব্দে কাজ করিতেছে। এখনও হকাররা হাকিতেছে, 'খবরের কাগজ! চাই অমৃতবাজার, আনন্দবাজার, মাসিক পত্রিকা কালি কলম!'

সংস্কৃতের পরকীয়া প্রেমিক সাহিত্যিকগণ বলেন যে,—ভারতচন্দ্র সংস্কৃত বাঙ্গলার পূর্ণ বিকাশ! বোধ হয় তাঁহারা ভুলিয়া যান যে কবি গুণাকার যে সমস্ত আরবী ফার্সী শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন তাহা একালের অনেক উচ্চ শিক্ষিত মুসলমানেরও বুঝা দুর্ব্বোধ্য। বিদ্যাপতির 'কীর্ত্তিলতায়' অসংখ্য আরবী ফার্সী শব্দ রহিয়াছে। বৈষ্ণব ধর্ম্মের গোড়া চৈতন্যচরিতামৃতে বহু আরবী ফার্সী শব্দ স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে, বাঙ্গলা রামায়ণ মহাভারতের ত কথাই নাই।

আধুনিক কবি রবীন্দ্রনাথ আরবী ফার্সী শব্দ এমন চমৎকার ভাবে ব্যবহার করিয়াছেন যে, তাহা দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয়।

আরবী ফার্সী শব্দের প্রতি যাঁহাদের বিদ্বেষ আছে, যাঁহারা উহা বাঙ্গলা ভাষায় ব্যবহার করিতে সম্মত নহেন, তাঁহাদিগকে এইদিকে দৃষ্টি করিতে বলি। যাঁহারা আরবী ফার্সী শব্দের মোহে মুগ্ধ তাঁহাদিগকেও আমার বিনীত নিবেদন এই যে, স্থান ও কাল ভেদে অনেক জিনিষের ব্যবহার চলে, ঈসফের গল্পের মুরগীর নিকট মূল্যবান মুক্তার যে দশা হইয়াছিল, তাহা না ভুলিলেই মঙ্গল। শুধু আরবী ফার্সীর প্রতি বাহ্য প্রেম দেখাইলেই চলিবে না। আরবী ফার্সী শব্দ বাঙ্গালা ভাষার মজ্জা ও অস্থির মধ্যে যে প্রবেশ করিয়া রহিয়াছে উহা চোখে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া দিতে হইবে। কেহ কি এই গুরুতর কর্ত্তব্যভার লইতে সম্মত আছেন। যিনি এই ভার লইবেন তাঁহাকে বাঙ্গালা ভাষায় আদিযুগ হইতে বর্ত্তমান যুগ পর্য্যন্ত কোন্ কোন্ আরবী ফার্সী শব্দ কি ভাবে কোথায় সাহিত্যে ব্যবহৃত হইয়াছে তাহার একটী পূর্ণ তালিকা প্রস্তুত করিতে হইবে। এই কার্য্যে পাণ্ডিত্যের প্রয়োজন নাই, ধৈর্য্য ও অধ্যবসায়েরই একমাত্র প্রয়োজন। এই দুরূহ কার্য্য সম্পাদনে যথেষ্ট পরিশ্রমের প্রয়োজন, শুধু বক্তৃতামঞ্চ হইতে চীৎকার করিলেই চলিবে না—উহাতে কোন ফলই হইবে না।

বাঙ্গলা ভাষার ব্যাকরণ এখনও লেখা হয় নাই। বাঙ্গলা ব্যাকরণে মুসলমানের কি দান আছে তাহা প্রকাশ করার ভার কোন উপযুক্ত পণ্ডিত ব্যক্তি লইলেই ভাল হয়। Phonology ও Morphologyতে মুসলমানের কি কি দান তাহা পণ্ডিত ব্যতীত অপণ্ডিতের বুঝিবার সাধ্য নাই।

বাঙ্গলা সাহিত্যে মুসলমানের অপর্য্যাপ্ত দান রহিয়াছে লোক-সঙ্গীতে। ভাবার দিক দিয়া যেমন উহার দান যথেষ্ট, রচয়িতার দিক দিয়াও তদ্রূপ। কাজেই এই লোক-সঙ্গীত সংগৃহীত হইলে মুসলমানের দান সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা করা যাইবে।

ইহা গেল অতীতের কথা। ভবিষ্যতে মুসলমানেরা যাহা দান করিবেন উহার জন্য আমরা আশান্বিত হইয়া রহিয়াছি। বাঙ্গালী মুসলমানের জীবন যে সাহিত্য-সাধনা দ্বারা গৌরবোজ্জ্বল ও সাফল্যদীপ্ত হইবে আমাদিগকে তাহারই অনুসরণ করিতে হইবে—আমাদের জন্য দ্বিতীয় পন্থা নাই, থাকিতে পারে না। দেশ ও জাতির উন্নতির সূচনা সাহিত্যের ভিতর দিয়াই হয়, একথা যেন আমরা—বাঙ্গালী মুসলমানেরা—ভুলিয়া না যাই।

# নারী-হরণ

[ পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর ]

[ মোহাম্মদ শাহজাহান ]

( ১৪ )

মর্ত্ত্যের মানুষ যেমন সময় সময় স্বপ্নযোগে স্বর্গ-লোক দর্শন করিয়া আবার মরজগতে নামিয়া আসে, দিনদয়াল ঠাকুরও তেমনি স্বামীজির অনুগ্রহে যেন স্বর্গপুরী পরিভ্রমণ করিয়া পুনরায় দরিয়াপুরে ফিরিয়া আসিয়াছেন। কিন্তু বাড়ী আসিয়া তিনি আরও চমকিত হইলেন। কোন ঐন্দ্রজালিক বর প্রভাবে তাঁহার দগ্ধীভূত বাড়ীখানা পূর্ব্বাপেক্ষা উন্নত ধরণে প্রস্তুত হইয়া যাইতেছে! ইতিমধ্যে বাজেয়াপ্ত জমিগুলি—যাহা এখনও মকবুলের দখলে আছে, তাহাও তাঁহার স্বাধিকারে পাইবার রাজাদেশ জারি হইয়া গিয়াছে! করুণার জন্যও তাঁহার আর চিন্তা নাই, শীঘ্রই সে রাজবাড়ীর দুর্ভেদ্য নিরাপদতার মধ্যে আশ্রয় পাইবে! সর্ব্বোপরি করুণা-হরণের মোকদ্দমায় মাথ্‌না-রাজ মকবুলকে আশাতিরিক্ত শাস্তি দেওয়াইবার ব্যবস্থা করায় দয়াল ঠাকুরের সমগ্র অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের উপর দিয়া একটা বিপুল আনন্দের ঢেউ খেলিয়া যাইতেছিল। একেবারে এত সুবিধা তাঁহার!

কিন্তু করুণার অন্তরে ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত স্রোত বহিতেছিল। যে দিন চপলা তাহাকে ষড়যন্ত্র-কথা সমস্ত বলিয়া দেয় সেই দিন হইতে যে ব্যথা তাহার প্রাণে মৃদুমন্দ ভাবে বাজিতেছিল, মাথ্‌না-রাজের রক্ষিতার পদপ্রাপ্তির সংবাদে তাহা একটা প্রচণ্ড ঘূর্ণিবাত্যায় পরিণত হইল। অথচ দয়াল ঠাকুর ইহার কিছুই জানিলেন না।

দয়াল ঠাকুর সে সময় বাড়ী ছিলেন না। স্বামীজি করুণাকে তাহার ভবিষ্যৎ কার্য্যপদ্ধতি সম্বন্ধে উপদেশ দিতেছিলেন। তাঁহার কথায় করুণা বলিল, "দোর বন্ধ দেখে আমি অজ্ঞান হই আর জ্ঞান হইলে দেখি আহত মকবুলের সহিত ঘরের বাহিরে পড়িয়া আছি, ইহা ছাড়া অন্য কিছু বল্‌ব না।"

"কিন্তু তাতে সে যে তোমাকে হরণ কর্‌তে এসেছিল, তা প্রমাণ হয় না।"

"না হয় না হোক",

"তুমি আর কিছু বল্‌বে না?"

"না"

"কিন্তু যখন রাজরাণী হচ্ছ দিদি, তখন তোমাকে উঁচুমনা হ'তে হবে। ম্লেচ্ছ যবনের উপর অত উদার ব্যবহার কর্‌তে নেই।"

স্বামীজির কথা শুনিয়া করুণা মুহূর্ত্তে উল্কার মত রঙিন হইয়া তীব্র দৃষ্টিতে তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিল। সে নিষ্পলক চক্ষু হইতে যেন অজস্র উত্তপ্ত শিখা স্বামীজিকে গ্রাস করিতে আসিতেছিল।

স্বামীজি একটু ক্ষুন্ন মনে বলিলেন, "এত অনুগ্রহ তুমি ত্যাগ কর্‌তে পার না।" করুণার বাক্য স্ফুরিত হইল। তীক্ষ্ণ কণ্ঠে সে বলিল—"আমি বেশ্যা নই স্বামীজি! ব্রাহ্মণ কন্যা আমি, আমি কোথাও যাবো না।"

"কি করবে মূর্খ বালিকা! তোমার সাধ্য কি যে আমার অবাধ্য হও? তোমার পিতাকে আমি যা বল্‌ব সে তাই করবে। তোমার কোন কথাই সে বিশ্বাস করবে না। মকবুলের সহিত তোমার যে গুপ্ত প্রণয় আছে, ইহা আমি তাহাকে বলেছি, মোকদ্দমায় তুমি সত্য কথা বল্‌বে না তাহা সে জানে।—তাহার কাছে তুমি আর মানুষ নও!

মুহূর্ত্তে করুণার চেহারা ফ্যাকাসে হইয়া গেল। ঘৃণার

ভাবে সে বলিল, "এত বড় মিথ্যা কথা বাবাকে আপনি বল্‌তে পার্‌লেন ?"

"তুমি যে রকম কেউটে সাপ তাতে ওরকম না বলে পারিনে।"

"সেই জন্য বুঝি তিনি আমার হাতের রান্না খান্ না ?"

"বোধ হয় তাই"—

"আপনি নরাধম" !

"তুমি ছাড়া আর. কেউ তা বলতে পারে না", বলিয়া স্বামীজি মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিলেন।

করুণা তখন থর থর করিয়া কাঁপিতেছিল। তাহার ইচ্ছা হইতেছিল যে, এই দেশদ্রোহী পাষণ্ডের মুখখানা পদাঘাতে চূর্ণ করিয়া দেয়। কম্পিত-কণ্ঠে সে বলিল, "ভণ্ড শয়তান! তোমার সমস্ত ষড়যন্ত্রই আমি ব্যর্থ করে দেব। দেশদ্রোহী দস্যু! তোমার কোন কামনাই পূর্ণ হবে না", বলিয়া করুণা কাঁপিতে কাঁপিতে চলিয়া গেল। স্বামীজি তাহাকে আর কোন মন্ত্রণা দিবার অবসর পাইলেন না।

( ১৫ )

গ্রামে হুলস্থূল পড়িয়া গেল। দয়াল ঠাকুরের কন্যা করুণা বিষ পান করিয়াছে। কথাটা মকবুলও শুনিল। সে মাত্র বুঝিল সর্ব্বসমক্ষে লজ্জিত হইবার ভয়ই করুণার এই আত্মহত্যার একমাত্র কারণ। সে ত জানে না যে, আরও কত গুপ্ত ব্যথা করুণার অন্তরে পুঞ্জীভূত ছিল। নিজেকে এ বিষ পানের মূল কারণ মনে করিয়া সেও ব্যাকুল হইয়া উঠিল। কেন সে আগুনের মধ্যে যাইয়া তাহার অঙ্গ স্পর্শ করিয়াছিল। যে কার্য্য খোদার কাছে ভাল, তাহা সন্দেহশীল মানবের চক্ষে কি বীভৎস আকারেই না পরিণত হইল। আস্তে আস্তে মকবুল দয়াল ঠাকুরের বাড়ী আসিল।

করুণার সেই লাবণ্য-মাখা মূর্ত্তি মৃত্যুর করাল ছায়াপাতে মলিন হইয়া আসিতেছে। শায়িত করুণার দেহের উপর দয়াল ঠাকুরের আঁখিধারা দর দর বেগে ঝরিয়া পড়িতেছে আর পিতার স্নেহ-হস্ত চাপিয়া ধরিয়া করুণা আস্তে আস্তে বিদায়-বেলার চরম-স্মৃতি রাখিয়া যাইতেছে। মকবুলকে দেখিয়া করুণার চোখের জ্যোতিঃ সহসা উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। চোখে চোখের মৌন আলাপান্তে করুণা বলিল, "জীবনদাতা ভাই আমার! এসেছ তুমি ? তোমাকে কএকটী কথা বলে যাবার জন্য হয়ত এখনও বেঁচে আছি। আশঙ্কা ছিল তুমি আস্‌বে না। কিন্তু তুমি যে কি, সে আর কেই না জানুক আমি তা জানি।"

এই মরণ-যাত্রী ব্রাহ্মণ-তনয়া মকবুলকে না জানি কত অভিসম্পাত করিয়া জীবন-নাট্যের যবনিকা পাত করিবে—এই ছিল মকবুলের বড় আশঙ্কা। কিন্তু করুণার কথা শুনিয়া সে বুঝিল, আজ মিথ্যার আবরণ ভেদ হইয়া গিয়াছে। আর্ত্তস্বরে মকবুল বলিল—"এমন সর্ব্বনাশ কেন কর্‌লে করুণা ? আমিই তোমার হত্যার কারণ হয়ে রইলুম। এ পাপভার আমি কেমন করে সইব ?"

মৃদু হাস্যে করুণা বলিল, "অমন কথা বলোনা ভাই! তোমার কোন অপরাধ নেই। তোমরা যে প্রতিজ্ঞা নিয়ে কর্ম্মক্ষেত্রে নেমেছিলে, একটা প্রবল বিঘ্নের মত আমি তোমাদের সেই উদ্দেশ্য সমস্তই ব্যর্থ করে দিচ্ছিলাম। আজ তোমাদের সে সাধন-পথ মুক্ত হয়ে গেল"—বলিয়া করুণা চক্ষু মুদ্রিত করিয়া সকল কথা স্মরণ করিতে লাগিল।

আরও অনেক লোক তখন সেখানে আসিয়াছে। তাহারা ভিতরের কথা কিছুই জানে না। দুইদিন পরে প্রকাশ্য স্থানে করুণার যে সমস্ত ইতিহাস বিবৃত হইবে—তাহা সম্পূর্ণ অসত্য হইলেও তাহাকে কেহই ব্যভিচারিণী ছাড়া বলিবে না এবং সেই কারণেই করুণা যে আত্মহত্যা করিল ইহাই বুঝিয়া সকলে মকবুলকে দেখিয়া অধীর হইয়া উঠিল। একজন বলিল, "ব্রাহ্মণের এমন সর্ব্বনাশ করে তুমি সুখী হ'তে পার্‌বে না।" একথার সঠিক উত্তর দেওয়ার সামর্থ্য মকবুলের তখন ছিল না। সে কেবলই ভাবিতেছিল, সৎকর্ম্মের ভিতর এত বিড়ম্বনা কেন থাকে খোদা! কিন্তু উত্তর দিল করুণা স্বয়ং। ক্রন্দন-রত পিতাকে ডাকিয়া সে বলিল, "তুমি এত কেঁদনা বাবা! তোমার বুকে এমন একটা তীব্র জ্বালার আবশ্যক হ'য়েছিল, তাই ভগবান আমাকে এমন ভাবে নিয়ে যাচ্ছেন। এখন আমার কোন কথা বল্‌তে লজ্জা নেই বাবা! কথাগুলি ধৈর্য্য ধরে শুনে রাখ।—যেদিন তোমার গুরুদেব একটা শনিগ্রহের মত হঠাৎ তোমার একান্ত হিতার্থী সেজে এখানে এসেছিলেন—সেদিন থেকে এ পর্য্যন্ত তুমি মানুষ ছিলে না বাবা! দলাদলি সৃষ্টির জন্যই স্বামীজি যে তোমার এত হিতাকাঙ্ক্ষী তাহাও তুমি জান না। যে অনাচার দূর করার

জন্য একদিন তোমরা কতই না আকুল ছিলে, স্বামীজির কুহকমন্ত্রে সে সমস্তই তোমার অন্তর থেকে অন্তর্হিত হয়ে গেল! তুমি ত জান না বাবা, আমাকে মিথ্যা কথা বলাবার জন্য তোমার গুরুদেব কত আপ্রাণ চেষ্টাই না করেছেন! কিন্তু সে যে কত বড় ষড়যন্ত্র তা তুমি আমার মৃত্যু ব্যতীত আদৌ বুঝ্‌তে না। বাবা! বাবা! তুমি আমাকে কুলটা মনে করেছ! কিন্তু আজ এই মরণ-কালে তোমার পবিত্র অঙ্গ স্পর্শ করে সগর্ব্বে বল্‌ছি,—আমি কলঙ্কিনী নই। মকবুল ভাই, ও তোমার শত্রু নয়। তোমাদের প্রকৃত শত্রু দুরাত্মা মাখনার জমিদার আর তোমাদের ধর্ম্মগুরু স্বামীজি। তাদেরই ষড়যন্ত্রে তোমার গৃহ দাহ হয়, তাদেরই মন্ত্রে আমার প্রাণদাতা হিতৈষী ভাইকে তোমরা জেলে দিচ্ছ!"

সমস্ত লোক স্তব্ধভাবে করুণার মরণ-কাহিনী শুনিতেছিল। স্বামিজী সেই বিষপানের পর হইতে কতকগুলি বন্যলতা পাতা সংগ্রহে ব্যস্ত ছিলেন। ঔষধগুলি সংগ্রহ করিয়া আসিয়া তিনি যে দৃশ্য দেখিলেন, তাহাতে তিনি স্তম্ভিত হইলেন। স্বামিজী দেখিলেন—একান্ত আপনার জনের মত মকবুল করুণার দেহ স্পর্শ করিয়া আছে, আর অঞ্চল দ্বারা করুণা তাহার নয়নবারি মুছাইয়া দিতেছে। স্বামিজীকে দেখিয়া মকবুলের দেহ বারুদস্তূপে অগ্নিসংযোগের মত জ্বলিয়া উঠিল। তীব্রকণ্ঠে সে বলিল, "নরাধম শয়তান! তোমার মনস্কামনা পূর্ণ হয়েছে ত?" মকবুলের জ্বলন্ত চক্ষুর দিকে স্বামিজী চাহিতে পারিলেন না। আনতমুখে তিনিও বলিলেন, "কিন্তু তোমারও কি অসাধারণ ধৃষ্টতা! ব্রাহ্মণ কন্যার অঙ্গ স্পর্শ করে তাহার পরজন্মের সর্ব্বনাশ কর্‌ছ তুমি কোন্ অধিকারে?"

স্বামিজীর ইতর জনোচিত কথার যথাযথ উত্তর দিবার জন্য মকবুল লাফাইয়া উঠিতেই করুণা তাহার হাত ধরিয়া বলিল, "শয়তানের সঙ্গে গোলমাল করতে নেই ভাই!" পরক্ষণে সে অবিচলিত কণ্ঠে স্বামিজীকে বলিল, "কোথায় ছিলে তুমি তখন যখন এই দেহটা জীবন্ত ভস্ম হইতেছিল? হিন্দু-ধর্ম্মের রক্ষক! ছদ্মবেশী শয়তান, শোন! স্পষ্টভাবে শোন—যাকে তুমি মানুষ বলতে চাও না, যার স্পর্শ পর্য্যন্ত তোমার একান্ত অসহ্য, সেই মহাপুরুষ মকবুলই আমার জীবনদাতা বন্ধু—স্নেহশীল ভ্রাতা। আরও শুনবে? যদি কাহাকেও কখনও আমি ভালবেসে থাকি তবে যে একেই বেসিছি। কিন্তু তুমি সে ভালবাসার যে জঘন্য আখ্যা দিবে—এ তা নয়। মকবুল আর স্থির থাকিতে পারিল না। এতক্ষণ সে কোন প্রকারে যাহা বুকের মধ্যে চাপিয়া রাখিয়াছিল, করুণার শেষ কথায় তাহা উদ্দামবেগে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। প্রথম হৃদয়ের এ পুঞ্জীভূত তীব্র ব্যথা গোপন করিবারও উপায় ছিল না। মকবুল মাথা নত করিয়া কাঁদিতে লাগিল।

মকবুলের দিকে কিছুক্ষণ স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া করুণা বলিল, "আমার এই ব্যর্থ-জীবনের বিদায় মুহূর্ত্তে তুমি অমন ক'রে কেঁদ না। ও আমার সত্যই অসহ্য ব্যথা।" পরে মৃদু মৃদু হাসিতে হাসিতে বলিল, "তোমাকে আজ আমি একটা কাজ দিয়ে যাব। বল, আমার কথা রাখবে?"

মকবুল তখনও স্থির হইতে পারে নাই। তখনও তাহার হৃদয়ে সপ্তসিন্ধু গর্জ্জিছিল। সে কিছুই বলিল না।

দয়াল ঠাকুর ততক্ষণ তাঁহার একমাত্র কন্যা করুণার মৃত্যু দৃশ্য পাষাণের মত অবলোকন করিতেছিলেন। হঠাৎ বালকের ন্যায় চীৎকার করিয়া তিনি বলিলেন, "তুই কি সত্যই চলে যাচ্ছিস মা? কিন্তু তোকে আমি যেতে দেব না। তোর জন্য আমি লোকালয় ত্যাগ করব। তুই বেঁচে থাক করুণা!"

অঞ্চল দিয়া পিতার চক্ষু মুছাইয়া দিয়া অপর হস্তে তাঁহার গলা বেষ্টন করিয়া করুণা বলিল, "তোমার অন্তর ত অত ছোট নয় বাবা! যে, নিজের সুবিধার জন্য আমার কলঙ্কিত জীবন তুমি দেখবে! বাবা, এই ভাবে আমার মরণ না হ'লে তোমার ভুল ভাঙ্‌তনা। কিন্তু আমার মরণের পর তোমার সেই পূর্ব্বমূর্ত্তি দেখ্‌তে চাই বাবা! অন্যায় ও পাপের বিরুদ্ধে তোমাকে দাঁড়াতে হ'বে, দুঃখীর দুঃখ মোচন ক'রতে হ'বে।"

"তুই আমার বুক ভেঙ্গে দিয়ে গেলি মা! আমি আর কিছুই পারব না।"

"তুমি আমার পিতা, তোমাকে পারতেই হবে বাবা" বলিয়া করুণা পিতার হাতখানা মাথার উপর চাপিয়া ধরিল

সত্য প্রকাশ হইয়া পড়িবার আশঙ্কায় স্বামিজী অতি মাত্রায় চঞ্চল হইয়া উঠিলেন। কত অসম্ভব কল্পনা তাঁহার মনের স্তরে স্তরে সাজানো ছিল, করুণার আত্মহত্যায় তাহা বাস্তবে পরিণত হইল না।

আর তিলার্দ্ধকাল অবস্থান করা তিনি যুক্তিসঙ্গত মনে করিলেন না। ডাক্তার কবিরাজ আনিবার ভাণ করিয়া এই ভেদ-নীতির অবতার আস্তে আস্তে সরিয়া পড়িলেন।

"বাবা! বাবা!

"কি মা?" বলিয়া দয়াল ঠাকুর করুণার দিকে আকুল নয়নে চাহিলেন। "তুমি আমার ছোঁওয়া কেন খেতে না বাবা! আমি অসতী বলে?"

করুণা পিতার নিকট কোন উত্তর না পাইয়া বলিতে লাগিল, "কিন্তু আমি বেঁচে থাক্‌লে তুমি চিরদিনই এই ভাবে থাক্‌তে বাবা! সে কত অসহ্য ব্যথা আমাকে আক্‌ড়ে থাক্‌ত! অথচ আমার কোন সাফাই তুমি বিশ্বাস করবে না। আমিও কিছুই খুলে বল্‌তে পারতেম না। বাবা কেন তুমি মাথ্‌না-রাজের প্রস্তাবে সম্মতি দিলে? আমি মুসলমানের সংস্পর্শে যেতে পারি এই আশঙ্কায়?"

এবার দয়াল ঠাকুর উত্তর দিলেন। তিনি বলিলেন, "হাঁ মা তাই।"

'কিন্তু আমি ত সতী-মার মেয়ে বাবা!"

"থাক্ মা, আমাকে আর লজ্জা দিস্‌নে! আমিই তোকে হত্যা করলুম করুণা! করুণা—করুনা, মা আমার!" বৃদ্ধ ডাক ছাড়িয়া কাঁদিয়া উঠিলেন।

মকবুল এতক্ষণ চুপ করিয়া করুণার মরণ-ছবি আকুল নয়নে দেখিতেছিল। করুণার এই কথা শুনিয়া সে বলিল, "এ অপরাধ আমাকে দিয়ে যেওনা করুণা!"

মকবুলের দিকে স্নিগ্ধ-দৃষ্টিতে চাহিয়া করুণা বলিল, "তোমার কথা আমি তোমার চেয়েও বেশী জানি। তোমরা বীরজাতি। এখনও তোমাদের গায়ে স্বাধীনতার গন্ধ আছে। তোমার কথা বল্‌ছিনে। আমি বল্‌ছি ভারতের বহুকালের গোলাম জাতির কথা—যাদের অন্তর স্বাধীনতার নামে আতঙ্কিত হয়। তোমার হাতটা দাও।"

দুই হাতে পিতা ও মকবুলের হাত একত্রে চাপিয়া ধরিয়া মৃত্যু জ্বালাকে ভুলিয়া করুণা বলিল, "এমনই ভাবে হিন্দু মুসলমানের মিলন হোক।"

করুণা আর কথা বলিতে পারিল না। একবার শুধু মকবুলের মুখের দিকে আর একবার অস্তগামী সূর্য্যের দিকে চাহিয়া সে ছিন্ন-বৃন্ত ফুলের মত চিরতরে ঘুমাইয়া পড়িল।

বাহিরে তখন রাজ-সমারোহে সন্ধ্যা-গগণ রক্ত-রাগে ভরিয়া দিয়া সূর্য্য অস্ত যাইতেছিল!

সমাপ্ত।

---

# রাজ-মাতার স্বর্গ-প্রাপ্তি

[ রেয়াজ উদ্দীন আহ্‌মদ সাহিত্যরত্ন ]

সে আজ অনেক দিনের কথা।

এক কৈবর্ত্ত তনয় ও এক নাপিত নন্দনের মধ্যে ছিল বড়ই ভাব। তারা একে অপরকে বন্ধু ব'লে ডাক্‌তো।

ক্রমশঃ তারা শৈশব অতিক্রম ক'রে যৌবনে পদার্পণ করল। কিন্তু তবুও তাদের ঐ একই ভাব। প্রথমে তাদের বাপ-মা তাদের বন্ধুত্বে আনন্দ অনুভব করলেও এখন আর ঐ ভাব তাদের ভাল লাগত না। এজন্য উভয়ের পিতা মাতা তাদের বেশ ক'রে ব'কে দিল। অকর্ম্মণ্যকে কে ভালবাসে?

দুই বন্ধুতে পরামর্শ ক'রে ঠিক করলে তারা আর এ দেশে থাক্‌বে না। বিদেশে মনের মতন কোন স্থানে গিয়ে জীবন কাটাবে।

তাদের যে কথা সেই কাজ। তারা একদিন কাকেও কিছু না ব'লে দূরদেশ যাত্রা করল। সে এক আজব দেশ। সেখানে ঘৃত ও সর্ষপ-তৈল, মাংস ও ডাল, দুগ্ধ ও ক্ষীর, রোহিত কাতলা ও চুনোপুটী, সরুবালাম ও আশুধান্যের মোটা চাউল, রেশমী ও সূতার কাপড় সকলেরই একদর।

এই সব না দেখে কৈবর্ত্ত নন্দন ত মহাখুসী। সে ছিল বড় লোভী। আনন্দে বলে উঠলো, "বাঃ! বাঃ!! কি সুন্দর দেশ! এমন দেশ কি আর ছাড়তে আছে?"

নাপিত পুত্র কিন্তু বন্ধুর কথায় সায় দিতে পারল না। সে বল্‌ল, "বন্ধু! এ রাজ্যে ভাল-মন্দর বিচার নেই। চল আমরা অন্য দেশে যাই। এ দেশে থাক্‌লে আমাদের বিপদ অবশ্যম্ভাবী।"

কৈবর্ত্ত তনয় কি আর সে কথা শুনে? সে বল্‌ল, "না বন্ধু, এ দেশ কিছুতেই ছাড়া হবে না। তুমি না থাক, যাও।"

নাপিত পুত্র অনেক কাঁদ্‌ল। বন্ধুকে অনেক বোঝাল। কিন্তু সবই নিস্ফল। অগত্যা সে একাকী সে দেশ ছেড়ে অন্যত্র চলে গেল। যাত্রাকালে বন্ধুকে ব'লে গেল যদি কখনো তার কোন বিপদ হয় তবে যেন সে তার সন্ধান নেয়।

কৈবর্ত্ত পুত্র বিদেশে যাত্রার সময় তার মার নিকট হ'তে গোপনে কিছু টাকা এনেছিল। সে তেলের বদলে ঘি, ডালের বদলে মাংস ও বড় বড় মৎস, দুধের পরিবর্ত্তে ক্ষীর, মোটা চা'লের পরিবর্ত্তে মিহি বালাম খায় আর আনন্দে দিন কাটায়। দুপুরে ঘুমায় আর সকাল বিকাল হাওয়া খায়। তার মজা দেখে কে? এইরূপে সে দিন দিন স্থূলকায় হ'য়ে উঠ্‌তে লাগ্‌ল।

একদা রজনীযোগে সেই দেশের রাজার মালখানার দালানে সিঁদ কেটে তস্করগণ বহু ধনদৌলত নিয়ে গেল। রাজা সংবাদ পেয়ে ডাক্‌লেন পাত্র মিত্র উজীর নাজীরগণকে।

তারা সব দেখে বল্‌ল, "মহারাজ! ডাকা যাক্ নগর-পালকে সে কেমন পাহারার বন্দোবস্ত করেছিল যে মহারাজার বাড়ী চুরী হয়ে গেল?"

আর কি রক্ষা আছে? এক বল্‌তে শতজন সিপাহী নগরপালকে একেবারে শূন্যে শূন্যে নিয়ে হাজির।

রাজা বল্‌লেন, "তুমি কিরূপ পাহারার বন্দোবস্ত করেছিলে যে আমার বাড়ী চুরী হল?"

নগরপাল গললগ্নীকৃতবাসে যোড় হস্তে বলতে লাগ্‌ল, "দোহাই মহারাজ! আমার কোনই দোষ নাই। প্রহরীগণ ত আর সব সময় একস্থানে বসে পাহারা দিতে পারে না। চতুর্দ্দিকে ঘুরে ফিরে দেখ্‌তে হয়। খোদাওন্দ! দোষ যত রাজমিস্ত্রীর। সে নরম করে গাথুনি দিয়েছিল বলেই চোররা তাড়াতাড়ি দেওয়াল কাট্‌তে পেরেছিল। অন্যথা নিশ্চয়ই বিলম্ব হ'তো। ঐ সুযোগে প্রহরীরা অবশ্য তাদের ধ'রে ফেলত।"

রাজা রাজমিস্ত্রীকে হাজির কর্ত্তে হুকুম দিলেন। আন বল্‌তে পঞ্চাশ জন সিপাহী শূন্যে শূন্যে দরিদ্র রাজমিস্ত্রীকে নিয়ে হাজির।

রাজা বল্‌লেন, "কিরে বেটা তুই কেমন করে দালান তৈরী করেছিস যে চোরে তা কেটে আমার ধনদৌলত নিয়ে গেল। তুই বেটা এ চুরীর জন্য দায়ী।"

রাজমিস্ত্রী গলায় কাপড় জড়িয়ে যোড় হাতে বল্‌তে লাগল, "দোহাই ধর্ম্মাবতার! আমার কোনই দোষ নাই। আমি বিশেষ মজবুত করেই দালান গেঁথেছি। যত দোষ মিস্ত্রীর। সে বেটা নরম ইট দিয়েছিল নইলে কি আর চোরে কাট্‌তে পারে?"

রাজা বল্‌লেন "ডাক মিস্ত্রীকে।"

আর কি রক্ষা আছে? অমনি রাজার পাইক বরকন্দাজ-গণ যেয়ে মিস্ত্রীকে ধ'রে নিয়ে এল।

রাজা বল্‌লেন "কিরে বেটা, তুই কেমন নরম ইট তৈরী করেছিলি যে আমার দালান কেটে সব চুরী হ'য়ে গেল।"

মিস্ত্রী বলীর পাঁঠার ন্যায় কম্পিত কলেবরে যোড় হাতে বল্‌ল, "দোহাই মহারাজ! আমার কোনই দোষ নাই। আমি হুজুরের দালানের ইট তৈরী করার জন্য ভাল কোদাল তৈরী ক'রে দিতে কামারকে ব'লেছিলাম। কিন্তু সে খারাপ লোহা দিয়ে কোদাল তৈরী ক'রে দিয়েছিল। সে জন্য শক্ত মাটী কাট্‌তে পারি নাই। তাই ইট নরম হয়েছিল।"

মন্ত্রীগণ সমস্বরে বল্‌লেন, "একথা ঠিক। দোষ যত কামারের।"

অমনি রাজাজ্ঞায় কামার আনীত হ'ল।

রাজার নিকট কর্ম্মকার সমস্ত বিষয় শুনে সভয়ে বল্‌ল, "হুজুর আমার কোন দোষ নাই। আমি হুজুরের দালানের কাজের জন্য কোদাল তৈরী করতে ইচ্ছা ক'রে কারখানার ম্যানেজারের নিকট ভাল লোহা চেয়ে ছিলাম। কিন্তু ম্যানেজার ভাল লোহা না দিয়ে খারাপ লোহা দিয়েছিল। তাই কোদাল খারাপ হয়।"

রাজার আদেশে তৎক্ষণাৎ রাজার নিয়োজিত লোক লস্করগণ শূন্যে শূন্যে ম্যানেজারকে নিয়ে হাজির।

রাজা আনুপূর্ব্বিক সমস্ত ঘটনা বিবৃত ক'রে ম্যানেজারকে বললেন, "এ চুরীর জন্য তুমিই দায়ী "

ম্যানেজার ত শুনে অবাক্। সে আর কি বলবে

তবুও অনেক অনুনয় বিনয় করল। অনেক কাঁদ্‌ল। কিন্তু সবই নিস্ফল হ'ল।

রাজা ম্যানেজারের একেবারে শূলদণ্ডের আদেশ দিলেন। তারিখ নির্দ্দিষ্ট হ'ল দু' সপ্তাহ পরে ম্যানেজারের শূল হবে।

দেখতে দেখতে নির্দ্দিষ্ট দিন এসে দেখা দিল। শূল স্থাপন করা হ'ল।

এদিকে এ কয়দিনের অনবরত দুশ্চিন্তা, অনাহার ও অনিদ্রায় ম্যানেজার শুকিয়ে দড়ির মত হয়ে গেল।

নির্দ্দিষ্ট সময়ে প্রহরী বেষ্টিত অবস্থায় লৌহ শৃঙ্খলাবদ্ধ ম্যানেজার বধ্যভূমিতে নীত হ'ল।

মন্ত্রীগণ বললেন, "মহারাজ! এ শূল যেরূপ মোটা ক'রে তৈরী করা হয়েছে তাতে এ ক্ষীণ ম্যানেজারের সঙ্গে উহা খাপ খাবে না। কোন স্থূলকায় লোক হ'লে মানা'ত বেশ।"

রাজা বল্‌লেন, "তাইত দেখ দেশের মধ্যে সব চেয়ে কে মোটা আছে তাকে নিয়ে এস।"

এদিকে দিনরাত ঘি মাংস খেয়ে খেয়ে কৈবর্ত্ত পুত্র এত মোটা হ'য়ে গিয়েছিল যে ঘরের দরজা দিয়ে বাহির হওয়া মুস্কিল। রাজার নিয়োজিত সিপাহী শান্ত্রীগণ তাহাকে নিয়ে বধ্যভূমিতে হাজির।

সপরিষদ রাজা বল্‌লেন, হাঁ ঠিক হয়েছে।

কৈবর্ত্ত পুত্র দেখ্‌ল প্রমাদ। প্রাণ যায়! তখন তার বন্ধুর কথা মনে পড়ল। সে রাজাকে লক্ষ্য ক'রে বল্‌ল, "দোহাই ধর্ম্মাবতার আমি মৃত্যুর পুর্ব্বে বন্ধুকে একবার জন্মের মত দেখে নেব। আশা করি আমার জীবনের এই সাধ হ'তে আমাকে বঞ্চিত করবেন না।"

রাজা বল্‌লেন, "তাই হোক, দোষ কি ?"

কৈবর্ত্ত পুত্র প্রহরী বেষ্টিত হ'য়ে বন্ধুর সঙ্গে দেখা কর্ত্তে গেল।

সাক্ষাতের পর দুই বন্ধুতে গলাগলি ক'রে অনেক কাঁদ্‌ল।

দুই বন্ধুতে গোপনে বহু পরামর্শ হ'ল।

নির্দ্দিষ্ট দিনে শূলের স্থান লোকে ভরে গেল। রাজা সপরিষদ তথায় উপস্থিত হলেন।

রাজা আদেশ দিলেন, অপরাধীকে শূলে উঠাও।

জল্লাদ তৎক্ষণাৎ তাকে শূলদণ্ডের দিকে নিয়ে চল্‌ল। কৈবর্ত্ত পুত্রের প্রাণ উড়ে গেল।

এমন সময় ভিড় ঠেলে রাখ্, রাখ্, আমি শূলে যাব, আমি শূলে যাব ব'লে জটাজুটধারী সর্ব্বাঙ্গে তিলক কাটা, গৈরিক বসন পরিহিত ত্রিশূল হস্তে এক সন্ন্যাসী তথায় হাজির হ'ল।

সে রাজাকে লক্ষ্য ক'রে বল্‌তে লাগল, "দোহাই মহারাজ! আমি ঐ শূলে উঠ্‌বো।"

পাত্রমিত্র লোকজন সব অবাক্।

রাজা বল্‌লেন, "কেন ?"

সন্ন্যাসী—"হুজুর! দীন দুনিয়ার মালিক!! ঐ শূল মাহেন্দ্রক্ষণে তৈরী হয়েছে। যে উহাতে প্রাণ দিবে তার অনন্ত স্বর্গ লাভ। ও পাপী ও কেন এমন সৌভাগ্য লাভ করবে। আমাকে ঐ শূলে দিন।"

এই না ব'লে সে সাগ্রহে শূলদণ্ডের দিকে চল্‌ল।

রাজা বল্‌লেন, "সাধু সন্ন্যাসী চির জীবন যে স্বর্গের জন্য ধ্যান করে সে সৌভাগ্য কি অপরকে লাভ করতে দেওয়া যায় ? আমিই শূলে উঠবো।"

পাত্রমিত্র উজীর নাজিরগণ সকলে বল্‌ল, "তথাস্তু।"

রাজা স্বয়ং জননী ও স্ত্রীর নিকট বিদায় নিতে চল্লেন।

রাজমাতা পুত্রের মুখে সমস্ত শুনে বল্‌লেন, "বাবা! আমার তিন কাল গেছে এক কাল আছে, আমারই এখন বৈকুণ্ঠে যাওয়া উচিত। এমন সুযোগ হ'তে আমাকে বঞ্চিত করতে চাও ? তুমি ছেলে-মানুষ, ধর্ম্মকাজ করার তোমাদের ঢের সময় আছে। আমিই শূলে উঠ্‌ব।

অবশেষে জননীর আগ্রহ ও অনুরোধে রাজা নিরস্ত হ'লেন।

রাজমাতা ত স্বর্গলাভের নিদারুণ আকাঙ্ক্ষায় শূলে উঠে বসলেন এবং পরমানন্দে মহাপ্রস্থান করলেন।

নাপিত পুত্র ও কৈবর্ত্ত পুত্র ততক্ষণ দৌড়—দৌড়—দৌড়।

বহুকাল আগে এ ঘটনা হয়েছিল। তবে আপনাদের যদি বিশ্বাস যে এ রকম ঘটনা এখন আর ঘটে না—তবে আমি বলব যে সে ধারণা আপনাদের মিথ্যা।

# বাংলা দেশে মৎস্যের চাষ

[ আহমদুর রহমান নিজাম, বি এস সি, আমেরিকা ]

মৎস্যের চাষ বলতে সাধারণতঃ পুষ্করিণী, হ্রদ, ডোবা, নদী ও নানা প্রকার জলাশয়ে মাছ জন্মানোই বোঝায়। বর্ত্তমানে যে সব দেশে বিশেষভাবে মৎস্যের চাষ হচ্ছে, সে সব দেশে প্রায় সকলেই বদ্ধ জলেই চাষের প্রতি অধিক মনোযোগ দিচ্ছে। বিশেষজ্ঞরাও লোনা জলের চেয়ে মিষ্টি জলেই সাধারণ আহারীয় মৎস্যের চাষের অধিক অনুকূল বলে মনে করেন।

যে কোনো প্রাণীর (অস্বাভাবিক ভাবে) চাষ করতে হলে, তার স্বাভাবিক ধর্ম্ম, চরিত্র ও খাদ্যদ্রব্যের প্রতি সর্ব্বপ্রথমে মনোযোগ দিতে হয়। যেমন একটী কাকাতুয়া পুষতে হলে, যতদূর সম্ভব, স্বাভাবিক আহার্য্যের অনুকরণে তার আহার প্রস্তুত ও মুক্ত বাতাসে খাঁচাটী রাখবার ব্যবস্থা করতে হয়, তেমনি মৎস্যের চাষ করতে হলেও তার স্বাভাবিক ও প্রকৃতিগত খাদ্য ও স্থানের ব্যবস্থা করতে হয়। সুতরাং মাছের চাষ বা যে কোনো প্রাণীর চাষে কৃত-কার্য্যতা লাভ করা না করা সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে পুষ্যপ্রাণীর প্রাকৃতিক স্বভাবের অনুকরণের নৈকট্যলাভ ও তার সফলতা নিয়ে। প্রত্যেক প্রাণীর স্বভাব ও প্রকৃতি নির্দ্ধারণ করা কষ্টসাধ্য, তাই একটী প্রাণীর চাষের চেয়ে অন্য প্রাণীর চাষে সফলতার তারতম্য দৃষ্ট হয়।

প্রাণী মাত্রই বায়ু, জল, প্রভৃতি শরীর গঠন ও রক্ষণোপযোগী খাদ্যের উপর নির্ভর করে। তবে বিবিধ প্রাণী বিভিন্নরূপে ও বিভিন্ন মাত্রায় উপরোক্ত দ্রব্যাদি আহরণ করে থাকে। তাই প্রত্যেক প্রাণীর প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির বিশ্লেষণ স্থূলভাবে এক হলেও আকারে প্রকারে অনেক প্রভেদ আছে। আমরা মুক্ত বাতাস হতে অক্সিজন (oxygen) নামক বায়ু সেবন করে বেঁচে থাকি, কিন্তু একটী মাছকে ডাঙ্গায় রাখলে ৫ মিনিটের মধ্যেই তার মৃত্যু হয়। কারণ মাছ মুক্ত বাতাস হতে আমাদের মত অক্সিজন আহরণ করতে পারে না বা উহা ঐ ভাবে সেবন করার উপকরণ তাহার নেই, যা' আমাদের আছে। মাছ, সাধারণতঃ কানের (gills) ভিতর দিয়ে যে জল প্রবেশ করে সে জল হতেই অক্সিজন আহরণ করে। জলীয় প্রাণীর মধ্যে খুব অল্প প্রাণীই বাতাস হতে বায়ু (oxygen) সেবন করে থাকে। উষ্ণ জলে অক্সিজন পরিমাণে অল্প থাকে এবং জল যতই উষ্ণ হতে থাকে অক্সিজনও ততই জল হতে নির্গত হতে থাকে। শীতল জলে উহার মাত্রা অপেক্ষাকৃত বেশী। তবে গভীর জলাশয়ের নিম্নস্তরের জল শীতল হলেও উপরিভাগের জলেই উহা পরিমাণে বেশী থাকে। কারণ উপরিভাগের জলে বাতাস বেশী খেলতে পায় এবং ঐ বাষ্প বাতাস হতে জলে মিশিবার সুবিধা পায় অনেক। জলাশয়ের ধারের সবুজ লতা পাতা, যা' জলে নিমজ্জিত বা অর্দ্ধ নিমজ্জিত ভাবে থাকে—তাদের উপর সূর্য্যের কিরণ পড়লে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় উহা হতে যে অক্সিজন নির্গত হয় তা' জলের সাথে মিশবার সুযোগ পায়। উহা ব্যতীত জলাশয়ের তীরস্থ সবুজ শাক শব্জীর দ্বারা আরো উপকার এই হয় যে—মাছ যখন অক্সিজেন সেবন করে সঙ্গে সঙ্গে কারবনডাই অক্সাইড (carbondi oxide) নামক বায়ুও নির্গত করে থাকে এবং ইহা সবুজ পাতার দ্বারা আকৃষ্ট হয়। পাতা ইহা হতে কারবন (carbon) গ্রহণ করে এবং প্রতিদানে অক্সিজেন প্রদান করে। যে সব পুকুর বা জলাশয়ের ধারে কোনো প্রকারের সবুজ লতা পাতা না থাকে সে সব জলাশয়ে carbondi oxide অধিক মাত্রায় জন্মিবার সম্ভাবনা। এই carbondi oxide প্রাণীর পক্ষে বিষতুল্য। ইহা অত্যধিক মাত্রায় মাছ নষ্ট করে। ইহাতে বুঝতে পারা যায় খোলা বাতাস ও সবুজ লতা পাতা মৎস্যের পক্ষে কেনো এত প্রয়োজনীয়।

আমাদের পানীয় জলের সঙ্গে সংমিশ্রিত লবণ, ধাতুজাত দ্রব্য ও নানা প্রকার বাষ্পের স্থিতি, অনুপস্থিতি বা মাত্রার প্রভেদ নিয়ে কোনো কোনো জল সুস্বাদু ও স্বাস্থ্যকর হয়

আবার কোনটী অস্বাস্থ্যকর ও পানের অনুপযুক্ত হয়। মাছের স্বাস্থ্যরক্ষার জন্যও নির্দ্দিষ্ট অনুপাতে উপরোক্ত দ্রব্যাদি জলের সহিত মিশ্রিত থাকা নেহাৎ প্রয়োজনীয়। এবং এই অনুপাতের তারতম্য হলে মাছের পক্ষেও অহিতকর ও মারাত্মক হয়ে ওঠে। ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় মাছের পক্ষে ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের জলের দরকার। ইহা সকলেই জানেন যে লোনা জলের মাছ যেমন মিষ্টি জলে রাখা যায় না তেম্নি মিষ্টি জলের মাছকেও লোনা জলে রাখা যায় না। অনেক সময় উভয় প্রকারের মাছের পরস্পরের স্বভাবের পরিবর্ত্তন সম্ভব হলেও তা' সময়সাপেক্ষ্য ও কষ্টসাধ্য। স্থলজ প্রাণীর পক্ষে সেবনীয় বায়ুর প্রভাব যেমন, জলজ প্রাণীর পক্ষে জলের প্রভাবও তেম্নি। তাই মাছের চাষের পক্ষে সর্ব্বপ্রথম প্রয়োজন জলের পরীক্ষা করে দেখা।

খাদ্যদ্রব্যের প্রভেদ নিয়ে প্রাণী জগৎ তিন ভাগে বিভক্ত :—মাংসাশী, শাকভোজী এবং মাংস ও শাকভোজী। মৎস্য জগৎ জলের মধ্যে নিবদ্ধ হলেও উপরোক্ত বিভাগত্রয়ও তাদের পক্ষে সম্পূর্ণরূপে প্রযোজ্য। এক পুকুরে অনেক প্রকারের মাছ একসঙ্গে অবস্থান করে বলে সাধারণতঃ মনে করা হয় যে সকল জাতীয় মাছই এক প্রকারের খাদ্য খেয়ে থাকে। কিন্তু তা' সম্পূর্ণ ভুল। এজন্যই বড়শী দিয়া মাছ ধরতে হলে রুই মাছের জন্য পোকা, কেঁচো বা বিস্কুটের আটার টোপ দিতে হয় এবং ভেটকী জাতীয় মাছের জন্য চিংড়ি মাছের টোপের ব্যবস্থা করতে হয়। তবে অনেকগুলি মাছ আছে, তা'রা প্রায় যে কোন প্রকারের খাদ্যই খেয়ে থাকে। নির্দ্দিষ্ট প্রকারের মাছের চাষ করতে হলে নির্দ্দিষ্ট প্রকারের আহার্য্যেরও ব্যবস্থা করতে হয়। প্রত্যেক মাছের আহার্য্য সম্পূর্ণরূপে নির্দ্ধারণ করা সাধারণের পক্ষে সম্ভব না হলেও, মাছের উদর চিরে, তার মধ্যে বিশিষ্টরূপে কি কি রয়েছে পর্য্যবেক্ষণ করলে, তাতে অনেকটা অনুমান করা যায় উক্ত মাছ কি প্রকারের খাদ্য খেয়ে থাকে। তা' বলে কোনো মাছের পেটে একটী দু'আনি পেলে মনে করতে হবে না যে উক্ত মাছ উহা খায় বা উহাই তার খাদ্য। কোনো কোনো মাছের পেটে কাদা দেখতে পাওয়া যায় বলে, অনেক সময় এটাও ভাবা ভুল যে উক্ত মাছ কেবল কাদাই খেয়ে থাকে। কিন্তু দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে পরীক্ষা করে দেখলে সহজেই প্রতিয়মান হবে যে মাছটী ইচ্ছা করে কাদা খায়নি, অন্যান্য জীবাণু বা উদ্ভিদাণু খেতে গিয়ে সঙ্গে সঙ্গে কাদাও খেয়ে বসেছে।

এ সব বিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খরূপ বিশ্লেষণ করে কোন্ জাতীয় মাছের কি প্রয়োজন, তার সঠিক ব্যবস্থা করা প্রকৃত পারদর্শী লোক ছাড়া অন্যের পক্ষে ততো সোজা কাজ নয়। মোটামোটি ভাবে ধরে নিতে হবে যে মাছের চাষের সঙ্গে সঙ্গে আমাদিগকে মাছের খাদ্যেরও চাষ করতে হবে। এবং যা'তে জলাশয়ে মাছের আহার্য্যরূপ জীন, জীবাণু, শাক, সব্জী, ধাতুজাত দ্রব্য ও গ্যাস ( অক্সিজেন, নাইট্রোজেন ও কারবনডাই অক্সাইড ইত্যাদি ) নির্দ্দিষ্ট পরিমাণে থাকে তারও ব্যবস্থা করতে হবে। ইহাই প্রকৃত চাষ এবং যত বাধা বিপত্তি ইহাতেই। যতদিন মাছের আহার্য্যের সমাধান হবে না, ততোদিন তার চাষেও আশানুরূপ ফল পাওয়া যাবে না।

সমুদ্রের মুক্ত জলে বা লোনা জলের চাইতে বদ্ধ পুকুর বা জলাশয়ে বৈজ্ঞানিক উপায়ে উপরোক্ত বিষয়াদির সমাধান করা অপেক্ষাকৃত সহজ। বিরাট সমুদ্রকে করায়ত্ত করা বিজ্ঞানেরও অসাধ্য, তাই লোনা জলে মৎস্যের চাষ সীমাবদ্ধ। অবশ্য অনুপাতে সামুদ্রিক মাছের উপরই বেশীর ভাগ লোক নির্ভর করে। কিন্তু সমুদ্রে ইচ্ছা মতো মাছের চাষ অসাধ্য বলে প্রায় সব দেশেই নদী, জলাশয় ও হ্রদে মাছের চাষ করতে মনোনিবেশ করেছে। তাই বলে, সমুদ্রে মাছের চাষ কেহ করে না এ কথা বলা চলে না, কারণ পরক্ষোভাবে আমেরিকা ও জাপান তা'ও বৃহদাকারে করছে।

বাংলাদেশে মাছের চাষের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে আলোচনা করতে গেলেই প্রথমে নিম্নলিখিত কয়েকটী বিষয়ের দিকে দৃষ্টি দিতে হবে ;—(১) খাদ্যের মধ্যে মাছের স্থান, (২) বাঙ্গালীর খাদ্য কি ? (৩) দেশে উৎপন্ন দ্রব্যের বৃদ্ধি কি করে হয় ? (৪) ম্যালেরিয়া নিবারণের উপায় কি ?

আমাদের শরীর বর্দ্ধন ও স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য খাদ্যের মধ্যে অনুপাতানুযায়ী কারবোহাইড্রেট (Carbohydrate) প্রোটিন (Protein), চর্ব্বি (Fat) ও নানাপ্রকারের ভাইটামিন বিদ্যমান থাকা প্রয়োজন। ইহার মধ্যে যে কোনোটীর অভাব ও অনুপাতে কম হলে কোনো না কোনো প্রকারের রোগ মানুষকে আশ্রয় করে থাকে। এমন কোনো খাদ্যদ্রব্য আজ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয়নি যাতে শরীর-ধারণের নিয়ামক ঐ সমস্ত মালমশলা অনুপাতানুসারে একাধারে সব

পাওয়া যেতে পারে। তাই খাদ্যদ্রব্যের মধ্যে রকমারি জিনিষের সংযোগ করতে হয়, যেমন মাংস, তরি-তরকারী, ঘি, তৈল, চাল, ডাল ও আটা ইত্যাদি। এদের মধ্যে চাল ও আটা কারবোহাইড্রেট ( Carbohydrate ) যোগায়। অবশিষ্ট যা দরকার তা' মাংস, তরিতরকারী, ঘি ও তৈল হতে পাওয়া যায় বলে বিশ্বাস। মাছের মধ্যে একমাত্র কারবোহাইড্রেট ছাড়া অন্যান্য প্রয়োজনীয় সবই আছে বলে প্রমাণিত হয়েছে। অবশ্য মাছ বিশেষে ঐ সবের অনুপাতের তারতম্য হবেই। আবার মাংসের চেয়ে মৎস্য অল্প সময়ের মধ্যে পরিপাক হয়। ইহাও একটী বিশেষ সুবিধা। যে আহার সহজে পরিপাক হয় না, তদ্দ্বারা বিশেষ উপকার পাওয়া কঠিন। যেমন গোমাংস অনেকের পক্ষে পরিপাক কষ্টকর বলে, তাতে প্রায় সকল মাংসের চেয়ে অধিক প্রোটীন থাকলেও ব্যবহারে অনেকটা বাধা।

বাংলাদেশের প্রায় শতকরা ৯৫ জন অধিবাসীর মৎস্যই প্রধান খাদ্য। বাঙালীর খাদ্য মোটামোটী ভাবে চাল, ডাল, তরকারী ও মাছ। কেনো না খুব অল্প সংখ্যক লোকই মাংস খেতে পায় বা খায়। হিন্দুরা কোনো পর্ব্বোপলক্ষে ছাড়া এক প্রকার মাংস খায় না বললেই চলে। মাংসের মধ্যে গরু, ছাগল ও মুর্গীর মাংসই প্রধান। এ সবের মধ্যে কোনোটীই আশানুরূপ সস্তাদরে পাওয়া যায় না বলে, যা'রা অন্ততঃ খেতে ইচ্ছা করে, মূল্যাধিক্য বশতঃ তারাও খেতে না পেরে, ইচ্ছা বা অনিচ্ছা সত্বে মাছের উপর নির্ভর করে থাকে। শহরের চাইতে পাড়াগাঁয়ে মাছ অপেক্ষাকৃত সস্তা কিন্তু পরিতাপের বিষয় আজকাল সেখানেও মাছের মূল্য দিন দিন বেড়েই চল্‌ছে। ইহার একমাত্র কারণ পাড়াগাঁয়ের লোক সংখ্যা যেমন দিন দিন বাড়ছে, তাদের প্রধান খাদ্য মৎস্য তদপেক্ষা দ্রুত গতিতে হ্রাস পাচ্ছে। পল্লীর সাথে যাঁদের একটুও সংস্রব আছে, তাঁরা ইহা স্বীকার করেনই। আবার যে অনুপাতে মাছের আমদানী কমেছে, সে অনুপাতে তাদের উৎপত্তি স্থান, পুকুর, ডোবা, জলাশয় ও নদনদী এখনো কমেনি। গঙ্গা, যমুনা ও ব্রহ্মপুত্র তাদের শাখা প্রশাখা নিয়ে পূর্ব্বে যেমন করে নদী-মাতৃক এ বাংলার বুকে জল সিঞ্চন করত, এখনো তারা অক্লান্ত ভাবে তাই করে যাচ্ছে। তবে পূর্ব্বে যেমন একখানা জাল নিয়ে বের হলে ঘণ্টা খানিকের মধ্যে একটী পরিবারের দু'এক বেলার আহারোপযোগী মাছ ধরে আনা যেত এখন তা বহু কষ্টেও চার পাঁচ ঘণ্টার পরিশ্রমেও হয়ে ওঠে না। পূর্ব্বে যে পদ্মার ইলিশ কলিকাতার সকলেই দু'এক খণ্ড করে খেতে পেত, এখন তা'ও জুট্‌ছে না।

লোকসংখ্যার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বাসস্থান ও জীবন ধারণোপযোগী প্রয়োজনীয় দ্রব্যের উৎপাদনের জন্য প্রত্যেক সভ্যদেশেই অনেক চিন্তাশীল লোক বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ মানব সমাজের সুখ শান্তি ও অভাব অনটনের প্রতিকারের জন্য দস্তুরমতো মাথা ঘামাচ্ছে। দুঃখের বিষয়, এ বিষয়ে আমাদের দেশে কোনোরূপ চেষ্টাচরিত চল্‌ছে বলে মনে হয় না। তার প্রমাণ, এখনো আমাদের দেশে, সাধারণতঃ পুকুর ডোবা ও জলাশয় ইত্যাদিকে অনাবাদী বা "খীলা" জমিই বলা হয়। জাপান ও চীনে এসব "খীলা" ( যে জমিতে কিছুই উৎপন্ন হয় না ) জমিতেই অধিক পরিমাণে মাছের চাষ হচ্ছে। এদেশে পুকুরে যে মোটেই মাছের চাষ হয় না, তা' বলা চলে না। তবে পুকুরের আয়তন, জল ও তন্মধ্যস্থ মাছের খাদ্য দ্রব্যের দিকে লক্ষ্য রেখে কখনো রেণু ছাড়া হয় না। সবদিক বিবেচনা করে পুকুরে রেণু ছাড়লে অন্যান্য আবাদী জমির ন্যায় এ অনাবাদী বা "খীলা" জমিতেও যে আশানুরূপ লাভজনক ফসল পাওয়া যাবে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। পুকুরে আশানুরূপ মাছ উৎপন্ন না হলেও অন্ততঃ তাতে পানীয় জলের অভাব অনেকটা দূর হয়। কিন্তু ডোবা ও অন্যান্য জলাশয়গুলিতে লাভজনক কিছুত জন্মানো হয়ই না পরন্তু তাদের জলও পানের উপযোগী থাকে না। অনেকে হয়তঃ সামান্য টাকার অভাবে পুকুরে রেণু ছাড়তে পারে না। কিন্তু ডোবাগুলিতে মাছের চাষ করতে হলে রেণু ফেলবারও তেমন প্রয়োজন হয় না। ডোবাতে কৈ, মাগুর, শৈল, ভেদা ও পুটী জাতীয় নানাপ্রকারের মাছ আপনা আপনিই জন্মে থাকে। যদি প্রত্যেক বৎসর মাছ ধরবার সময় বাঁধ দিয়ে শুকিয়ে বা বেরী দিয়ে ছোট ও ডিমওয়ালী মাছগুলিকে না ধরা হয়, তবে কিছুতেই ডোবায় মাছ সহজে কম্‌তে পারে না। এতে দেখা যাচ্ছে, যদি পুকুর, ডোবা ও জলাশয় ইত্যাদিতে নিয়মিত ভাবে মাছের চাষের ব্যবস্থা করা হয়, তবে একদিকে দেশের উৎপন্ন দ্রব্যের বাড়্‌তিতে গরীব চাষীরা যেমন লাভবান হবে তেমনি সাধারণ অধিবাসীরাও অল্পব্যয়ে উপাদেয় মৎস্য খাবার সুযোগ পাবে।

তা' ছাড়া, বাংলাদেশের অনাবাদী পুকুর ও ডোবা ইত্যাদির সংস্কার হলে, বাঙালীর জীবনমরণ সমস্যা,—তার মৃত্যুর অগ্রদূত,—কালা আজার ও দুরন্ত ম্যালেরিয়ারও অনেকটা সমাধান হবে। এবং এসব রোগের বাহক ও চাষের মহাশত্রু কচুরী পানা,—যার দুরন্ত প্রকোপ হ'তে দেশকে রক্ষা করবার জন্য সরকারী বেসরকারী চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রই মাথা ঘামাচ্ছেন,—তারও অনেকটা প্রতিকার হয়।

যদি এভাবে আমাদের দেশের সাধারণ অধিবাসীরা তাদের অনাবাদী জমিগুলিকে আবাদ করে,—নিয়মিত ভাবে মাছের চাষ করে, তা হলে মাছের প্রাচুর্য্য বশতঃ গ্রামের বাহিরে বা টাউনেও বিক্রয়ার্থে পাঠাবার ব্যবস্থা করতে হবে। দেশের লোক কই, মাগুর ইত্যাদি "জিয়ল" মাছ মরলে আর কিনতে চায় না। বর্ত্তমানে যে ভাবে স্থানে স্থানে জিয়ল মাছের চালান দেওয়া হয়, তাতে অধিক পরিমাণে পাঠানো অসুবিধাজনক ও ব্যয়সাধ্য। ইহার প্রতিকার করতে হলে, যে সব স্থানে নৌকাযোগে মাছের চালান দেবার সুবিধা আছে, সে সব স্থানে নৌকাতে ছোট (দু'তিনটী ঘোড়ার শক্তি বিশিষ্ট) মোটর যোগ করে দিতে হবে। এতে অল্প ব্যয়ে ও অল্প সময়ে দেশের জনবহুল স্থানে জ্যান্ত মাছ পাঠানো যাবে, আশানুরূপ মূল্যও পাওয়া যাবে। একটী নৌকা চালাতে, সাধারণত তিন চারজন লোকের দরকার হয় কিন্তু এতে মাত্র একটী লোকেই অতি সহজে একখানা নৌকা চালাতে পারবে। বর্ত্তমানে আমেরিকায় নির্ম্মিত এরূপ মোটরের মূল্য ২৫০।৩০০৲ টাকা। জনসন কোং (Johnson & Co) মটরই সুবিধা হবে বলে মনে হয়। ইহা ওজনে ১০।১৫ সেরের অধিক নয়। ব্যবহারও অতি সহজ। সিঙ্গাপুর, পিনাং, বেঙ্কক ও যাভাদ্বীপের নানাস্থানে, অনেক লোক ভাড়াটে সাম্পানেও এই শ্রেণীর মটর ব্যবহার করে থাকে। ইহাতে তৈলও সামান্য খরচ হয়। যেখানে রেলযোগে চালান দেবার সুবিধা আছে সেখানে রেলগাড়ীতে জীয়ল মাছের স্থান বা hold হোল্ড করে নিতে হবে। ইহাতেও তেমন অধিক ব্যয়ের সম্ভাবনা নেই। রেলওয়ে কর্ত্তৃপক্ষ সহজে এতে সম্মত হবে বলে মনে হয়। ইষ্টইণ্ডিয়া ও বেঙ্গল রেলওয়ের কর্ত্তৃপক্ষ যদি মাছ চালানের জন্য কোল্ড-ষ্টোরেজ ভ্যান (Cold-Storage Van) করতে পারে—তবে এ রকমের হোল্ড তৈরি করতেও তাদের বিশেষ আপত্তি হবে বলে মনে হয় না। খুলনা জেলার ও পাবনার এক একটী বিল ৮০০০ একরেরও বেশী বড়। এ ছাড়া, হাতকাটা, বড় মাঠ, বামনডাঙ্গাও নিতান্ত ছোট নয়। এসব বিলে ও রাজসাহী, পাবনা, ফরিদপুর, ঢাকা, ত্রিপুরা শ্রীহট্ট ও আসামের অনেক জেলায় প্রচুর পরিমাণে জীয়ল মাছ পাওয়া যায়। সামান্য কষ্ট স্বীকার করে, অল্প ব্যয়ে এসব স্থানে নিয়মিত ভাবে চাষের ব্যবস্থা করলে, বর্ত্তমানে যে পরিমাণ মৎস্য উৎপন্ন হয় তার চেয়ে যে দশগুণ বেশী উৎপন্ন হবে, তা'তে সন্দেহ নেই। জীয়ল মাছ ক্রমশঃ বৃদ্ধি ও স্থায়ী করতে হলে বেরা, কুয়া ও ছেঁকা প্রভৃতির দ্বারা মাছ ধরা অনেকটা কমাতে হবে। ছোট ছোট মাছগুলি যাতে নষ্ট না হয় তার ব্যবস্থা করতে হবে। যে সময় মাছ ডিম ছাড়ে সে সময় মাছ ধরা বন্ধ রাখতে হবে। এসব বিষয়ে চাই দেশবাসীর উদ্যম ও অধ্যবসায় এবং সরকারের সহানুভূতি ও পৃষ্ঠপোষকতা।

ম্যালেরিয়ার বীজ (Plasmodium Falciparum) এনোফেলেক্স মশার দ্বারাই বিস্তার লাভ করে। তাই এ শ্রেণীর মশা যাতে দেশে কমানো যায়, সেজন্য নানাস্থানে স্বাস্থ্য-বিভাগ জলাশয়ে মশার ডিম নষ্ট করবার জন্য নানাপ্রকার ঔসধ ব্যবহার করছে। কিন্তু আমাদের দেশে এমন অনেক মাছ আছে, যারা অনায়াসে সব মশার ডিম খেয়ে ফেলতে পারে। এতে মাছের আহারের যেমন ব্যবস্থা হবে, ম্যালেরিয়ার বাহক মশাও স্ববংশে ধ্বংস হবে। এ জাতীয় মশার ডিম নষ্ট করতে পারলে দেশে ম্যালেরিয়া বিস্তারের আশঙ্কা অনেকটা কমবে। কৈ, টেকো, চাঁদা, খালিশা, ভেদা, পুঁটী ও দানকোনো মাছ মশার ডিম নষ্ট করবার পক্ষে বিশেষ উপযোগী। এ ছাড়া প্রায় সকল মাছের রেণু ও পোনা মশার ডিম খেয়ে থাকে। মৎস্যের চাষের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দেশ হতে ম্যালেরিয়া তাড়াবার একটী উপায়ও সহজে বের হয়ে পড়বে। মাদ্রাজের মৎস্য-বিভাগ স্বাস্থ্য-বিভাগের অনুরোধে গত বৎসর মশক নিবারণোপযোগী ২৩,০০০ মাছ স্থানে স্থানে ছেড়েছে। বাংলাদেশেও যখন মৎস্য বিভাগ ছিল তখন তারাও এ বিভাগের ভিতর দিয়ে ম্যালেরিয়া নিবারণের জল্পনা কল্পনা করেছিল, দেখা যায়। কিন্তু দুঃখের বিষয় ১৯২৩ সালে, উক্ত বিভাগ বন্ধ হয়ে যায়। এমন প্রয়োজনীয় বিভাগ বন্ধ না হলে, হয়ত এতদিনে

ম্যালেরিয়া নিবারণের অনেকটা উপায় হত। পল্লীগ্রামের যেসবস্থানে স্বাস্থ্যবিভাগ ম্যালেরিয়া নিবারণের জন্য বিশেষ যত্ন নেয় না সে সব স্থানে উপরোক্ত উপায়ে মৎস্যের চাষের দ্বারা দেশের অনেক লোককে মৃত্যুর কবল হতে রক্ষা করা যায়।

পুকুর বা জলাশয়ে যত প্রকার মাছের চাষ বর্ত্তমানে পৃথিবীর নানাস্থানে হচ্ছে, তন্মধ্যে কার্প ( রুই, কাত্‌লা ও গির্গেগ জাতীয় ), ট্রাউট ও অন্যান্য ভেকটী জাতীয় মাছের চাষই প্রধান। মধ্য আমেরিকায় শেষোক্ত তিন প্রকার মাছেরই চাষ হয় বেশী। দক্ষিণাঞ্চলে রুই জাতীয় মাছের চাষ প্রচুর পরিমাণে হয়। আমেরিকার রুই মাছ ঠিক আমাদের দেশের রুইর মত নয়,—আকারে একটু তফাৎ আছে। জাপানেও স্থান বিশেষে মাছ বিশেষের চাষ হয়ে থাকে। তবে রুই ও ট্রাউট জাতীয় মাছের চাষই অধিক পরিমাণে হয়। চীনে প্রায় সকল স্থানেই রুই জাতীয় মাছের চাষ বল্লে অত্যুক্তি হয় না। সকল দেশের রুই মাছের মধ্যে আকারে প্রকারে সামান্য প্রভেদ আছে। জার্ম্মনীতে রুই ও ট্রাউট উভয় জাতীয় মাছের চাষই হয়। তবে রুই মাছের চাষই অধিক প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। যে সকল দেশে আধুনিক প্রণালীতে রুই মাছের চাষ চল্‌ছে, প্রায় প্রত্যেক দেশই অল্প বিস্তর জার্ম্মনীর অনুকরণই করছে। নিম্নে উক্ত নিয়ম প্রদত্ত হল।—

প্রথমতঃ কমপক্ষে তিন চারটী পুকুরের প্রয়োজন। প্রথম পুকুরটীতে প্রতি একরে একটী বা দু'টী মেয়েলী ও তিনটী বা চারটী মদ্দা মাছ ছাড়তে হয়। অবশ্য মাছগুলি পূর্ণবয়স্কই হওয়া চাই। তৎপর পুকুরে কয়েকটী গাছের ডাল ফেলে দিতে হয়, যাতে মাছের ডিমগুলি আটকিয়ে যেতে পারে। যখন রেণু বের হবে তখন পুকুরের জল শুকিয়ে রেণুগুলি ধরতে হবে এবং দ্বিতীয় পুকুরে প্রতি একরে ১২০০০ করে রেণু ছাড়তে হবে। ৬।৭ সপ্তাহ পরে দ্বিতীয় পুকুর হতে তৃতীয় পুকুরে স্থানান্তর করতে হয় প্রতি একরে ৫০০ করে। এসকল পুকুর দেড় হতে দু' ফুটের অধিক গভীর নয়। পুকুরের চারধারে ও তলায় যাতে জলীয় ঘাস ও লতা জন্মিতে পারে তারও ব্যবস্থা করতে হয়। তৃতীয় পুকুরকে বর্দ্ধমান ( Growing ) পুকুর বলা হয়। শীত ঋতুর প্রারম্ভে "বর্দ্ধমান পুকুরে" যদি মধ্যস্থলে গভীর ডোবা না থাকে, রেণু ও পোনাগুলিকে "শীতপুকুরে" ( Winter pond ) রাখা হয়। ইহা সব পুকুরের চাইতে গভীর হয়। বসন্তের প্রারম্ভে শীতপুকুর হতে সব মাছকে পুনরায় বর্দ্ধমান পুকুরে স্থানান্তর করতে হয়। এক বৎসরে সাধারণত একটী মাছ ওজনে আধসের হতে একসের পর্য্যন্ত হয়ে থাকে। শীতকালে "বর্দ্ধমান পুকুর" শুকিয়ে যায় বলে বসন্তের প্রারম্ভে তাতে নানাপ্রকার ঘাস ও লতা জন্মে, তাতে অনেক পোকা, ফড়িং এবং নানাপ্রকার কীটানুকীট আশ্রয় নেয় ও ডিম ছাড়ে এবং এসকলই মাছের খাদ্যে পরিণত হয়। যে পুকুরে পরিমাণে যত বেশী পোকা, ফড়িং ছানা ( Harvac ) জীবাণু ( Protoza ) উদ্ভিদানু ( Diatom ), পচা ও অর্দ্ধপচা লতাপাতা বিদ্যমান থাকে সে পুকুরে ততোধিক পরিমাণে রেণু ছাড়া যায়। আমাদের দেশে শীতপুকুর কোনো প্রয়োজন হবে না। এদেশ গ্রীষ্ম প্রধান বলে শীত প্রধান দেশের চেয়ে বেশী পরিমাণে লতা-পাতা ও জীবানু জন্মে থাকে।

অল্প সময়ের মধ্যে মাছকে বড় করতে হলে, স্বাভাবিক ভাবে পুকুরে যে আহার সে পেয়ে থাকে, তা'ছাড়া, চাল আটা, ভাতের ফেন, শুকনো মাছের গুড়ো, খাবার অনুপযুক্ত অর্দ্ধপচা আলু ও অন্যান্য তরিতরকারী সিদ্ধ করে তাকে খাওয়াতে হয়। এরূপ ভাবে খাওইয়ে মাছকে এক বৎসরে তিন চারগুণ বড় হতে দেখা গিয়েছে। আমেরিকায় টেক্সাসে ও মেক্‌সিকোতে এরূপ ভাবে খাওয়ানোর ফলে এক বৎসরে এক পাউণ্ডের স্থলে চার পাউণ্ড পর্য্যন্ত বড় হতে দেখা গিয়েছে। মাদ্রাজে ৭০ দিনের মধ্যে এক পাউণ্ড ওজনের হয়েছিল বলে সরকারী বিবরণীতে দেখতে পাওয়া যায়। সরকারের অধীনে যতগুলি পুকুর আছে, তা'হতে গত বৎসর ১,১১,০০৫৲ টাকার মৎস্য বিক্রয় করেছে। বর্ত্তমান বৎসর গত বৎসরের চেয়ে আরো অধিক পরিমাণে বিক্রি হবে বলে উক্ত রিপোর্টে দৃঢ়তার সহিত আশা পোষণ করা হয়েছে। মাদ্রাজ সরকারের কয়েকটী আদর্শ পুকুর বা ফারমও আছে। সবার চাইতে আনন্দের বিষয় এই যে সরকারের এসব বিধি ব্যবস্থা দেখে শুনে দেশী লোকও স্থানে স্থানে মৎস্যের চাষের উদ্যোগ আয়োজন আরম্ভ করে দিয়েছে। বাংলাদেশেও এরূপ আদর্শ ফারম বজায় থাকলে, অন্ততঃ পূর্ব্ববঙ্গের দিঘি পুকুর বহুল স্থানের অধিবাসীরা

সরকারের দেখাদেখি মৎসের চাষ করে যে অনেক লাভবান হত, তাতে সন্দেহ নাই।

পল্লীগ্রামস্থ পানীয় জলের পুকুরে মাছ অত্যধিক পরিমাণে বড় না হওয়ার যতগুলি কারণ আছে তন্মধ্যে নিম্নলিখিত কয়েকটীই প্রধান ;—(১) রেণু ফেল্‌বার পূর্ব্বে পুকুর পরিস্কার করা হয় না। বড় মাছের সঙ্গেই ছোট রেণু ছাড়া হয়। ফলে পুকুরস্থ উৎপন্ন আহারাদি বড় মাছগুলি খেয়ে ফেলে—ছোটগুলি বিশেষ কিছু খেতে পায় না বল্‌লেও চলে। তা'ছাড়া ছোট রেণুগুলি অনেক সময়ে বড়দের খাদ্যে পরিণত হয়ে থাকে। (২) পল্লীস্থ পুকুরের গভীরতা ৫৬ ফিটেরও বেশী বলে পুকুরের তলায় মাছের আহার উপযোগী কোনো প্রকারের ঘাস বা লতা জন্মিতে পারে না। (৩) সবুজ লতাপাতার অভাবে অক্সিজেনের মাত্রা হ্রাস পেতে থাকে এবং কারবনডাই অকসাইডের মাত্রা বাড়তে থাকে। এই কারবনডাই অক্সসাইড জলচর প্রাণীর স্বাস্থ্য ও জীবনধারণের পক্ষে উপযোগী নয়। (৪) গরম জলে মাছের পরিপাক শক্তি বৃদ্ধি পায়। জল যে পরিমাণ গরম হলে মাছ সহজে তার আহার্য্য পরিপাক করতে পারে, গভীর পুকুরে জলের পরিমাণ বেশী বলে, সে অনুপাতে জল গরম হতে পারে না। তাই মাছ নিয়মানুযায়ী যা' খায়, তা' সহজে হজম করতে পারে না। (৫) মাছের আহার্য্য জীবাণু ও উদ্ভিদাণুর উৎকর্ষ সাধনের জন্য "বর্দ্ধমান" পুকুরে ( Growing Pond ) গোবর ও গোমূত্র ইত্যাদি নিক্ষেপ করা উচিত, কিন্তু পানীয় জলের পুকুরে তা' দেবার উপায় নেই। (৬) অল্প সময়ের মধ্যে মাছকে বড় করবার জন্য যে সকল পুষ্টিকর খাদ্যের ব্যবস্থা আছে, তাতে পুকুরের জল অপরিষ্কার ও দুর্গন্ধময় হয়ে যায়। সুতরাং পানীয় জলের পুকুরে ইহা দেওয়া যায় না। তা'ছাড়া গভীর জলে অনেক সময়ে অধিকাংশ খাদ্য মাছের নিকট পৌঁছিবার পূর্ব্বেই জলের সঙ্গে মিশে যায়, না হয় সহজে মাছ তা' খুঁজে পায় না। এসব অসুবিধা নিবারণের জন্য আমাদের দেশেও জার্ম্মণীর অনুকরণে মাছের চাষ করলে নিশ্চয়ই সুফল পাওয়া যাবে। আমাদের দেশে বদ্ধপুকুরে "রুই জাতীয়" মাছ ডিম ফুটিয়েছে বলে শোণা যায় না। কোনো কোনো বাঁধে বা ছোট ছোট শাখানদী ও উপনদীর মোহনায় রুই, কাতলা ও মির্গেল ডিম ফুটায় বলে বিশ্বাস। চট্টগ্রামের কর্ণফুলী নদীর উপনদী "হাওলাদার" মোহনায় প্রতি বৎসর বৈশাখ হতে ভাদ্রমাস পর্য্যন্ত হাজার হাজার টাকার রেণু ও পোনা বিলি হয়ে থাকে। রাজসাহী, শ্রীহট্ট ও ফরিদপুর প্রভৃতি জেলাতেও এরূপ প্রচুর পরিমাণে এ জাতীয় মাছের রেণু কিনতে পাওয়া যায় বলে শুনেছি। এ অবস্থায় আমাদের দেশে জার্ম্মণীর প্রথানুযায়ী ৩।৪টী পুকুরের স্থলে মাত্র ২টী পুকুর,—"রেণুপুকুর" ও "বর্দ্ধমান পুকুর" তৈরি করে চাষের কাজ আরম্ভ করাই যুক্তিসঙ্গত। বর্ত্তমানে আমাদের "নার্সারীপুকুর" বা ডিম ফোটাবার পুকুরের দরকার নেই। প্রকৃতিদত্ত রেণ তেই সহজে কাজ আরম্ভ করা যাবে। একটী রেণু পুকুরের জন্য ( আয়তনানুযায়ী ) আধসের হতে এক পোওয়া রেণুই যথেষ্ট, যদি যত্নের সহিত রেণুগুলিকে রক্ষা করা যায়। এ জাতীয় খুব ভাল রেণুর মূল্য প্রতি সের ২০।৩০৲ টাকার বেশী বলে মনে হয় না। সামান্য রকমের কষ্ট স্বীকার করতে হবে "রেণুপুকুর" ও "বর্দ্ধমান পুকুর" তৈরি করতে। শীতঋতুর শেষে পুকুরদ্বয়কে পরিস্কার করে রাখ্‌তে হবে। একেবারে শুকিয়ে ফেলতে পারলে খুব ভাল। কারণ রেণুখাদক মৎস্য ও জলচর প্রাণীর কবল হতে রেণুগুলিকে রক্ষা করবার ইহাই প্রধান উপায়। বাংলাদেশে পল্লী গ্রামস্থ প্রায় মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকদের দু'তিনটী করে পুকুর অনাবাদী অবস্থায় ম্যালেরিয়া ও কালা আজারের বীজানু বুকে নিয়ে পড়ে আছে, দেখ্‌তে পাওয়া যায়। অথচ সামান্য কষ্ট স্বীকার করে, একজনের দ্বারা সম্ভব না হলে, দু'চারজন মিলে যৌথভাবে, সামান্য মূলধন খাটিয়ে অনাবাদী জমিকে সহজে আবাদ করে প্রচুর পরিমাণে লাভবান হওয়া যায়। এরূপ দু'তিনটী পুকুর হতে সমস্ত খরচ বাদ দিয়ে প্রতি বৎসর ৫০০৲ হতে ১৫০০৲ টাকা আয় হবার সম্ভাবনা আছে। এদিকে দেশের কর্ম্মপ্রার্থী বেকার শিক্ষিত যুবকদের দৃষ্টি পড়লে দেশের স্বাস্থ্য ও অন্ন-সমস্যার অন্ততঃ কিছু সমাধান হবে বলে মনে করি। দুঃখের বিষয়, এক আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র ছাড়া দেশের অন্যান্য চিন্তাশীল নেতাকে বাঙালীর অন্ন-সমস্যা সম্বন্ধে অধিক মাথা ঘামাতে দেখা যায় না।

বাংলা দেশে মধ্যবিত্ত ভদ্র লোক ছাড়া সামান্য কৃষকদের পক্ষেও মাছের চাষ করে, এ অর্থ-সঙ্কটের দিনে, আয় বৃদ্ধি করার যথেষ্ট সুবিধা আছে। জাপানে ধানের ক্ষেতে এপ্রিল

মাসের প্রারম্ভে রুই মাছের রেণু ছাড়ে, উহা অক্টোবর মাসের শেষে ১০।১২ ইঞ্চি পরিমাণ বড় হয়। তখন তা' বাজারে বিক্রয় হয়। প্রতি একর ধেনো জমিতে এরূপে ২৫।৩০৲ টাকার মৎস্য উৎপন্ন হয় বলে জাপানি মৎস্য-বিশেষজ্ঞের মুখে শুনেছি। শ্যাম দেশেও আমাদের দেশের ভেদা মাছের মতো এক শ্রেণীর মাছ ধানের ক্ষেতে ছাড়ে। ধান কাটার সময় ঐ মাছও ধরা হয়। তবে প্রত্যেক জমির কোনায় ছোট একটী ডোবা করে তাতে ১০।২০টী মাছ রেখে দিতে হয়। পরের বৎসর বর্ষার প্রারম্ভে সেই সব মাছের পোনা বা রেণুতে সমস্ত জমি ভরে যায়। সুতরাং যে জমিতে একবার ঐ মাছের চাষ করা হয়েছে সে জমিতে নূতন করে রেণু ছাড়তে হয় না। উপরোক্ত উভয় প্রকারের চাষ বাংলা দেশে ধান ও পাটের ক্ষেতে অতি সহজে হতে পারে। সম্প্রতি মালয় দেশে শ্যাম দেশের ভেদা মাছ ধানের ক্ষেতে ছাড়ছে। এরই মধ্যে ক্রমশঃ উন্নতির লক্ষণ দেখা দিয়েছে। আমাদের দেশে যে পর্য্যন্ত শিক্ষিত সমাজ ও গবর্ণমেণ্ট এ বিষয়ে পথ প্রদর্শক না হবে সে পর্য্যন্ত সাধারণ লোক এ বিষয়ে অধিক মনোযোগ দিবে বলে মনে হয় না।

আমাদের দেশে মৎস্যের যেরূপ চাহিদা আছে, তাতে মনে হয় আমেরিকা, জার্ম্মেণী ও জাপানের অনুকরণে, জনবহুল স্থানে, বৃহদাকারে ব্যবসায় খুল্‌লেও অতি সহজে চল্‌বে। তা' ছাড়া মৎস্যের চাষে অন্যান্য ব্যবসায়ের মতো ততোধিক মূলধনেরও প্রয়োজন হয় না। অথচ ইহাতে লাভ সুনিশ্চিত। একমাত্র কয়েকটী পুকুর তৈরী করা ছাড়া তেমন বিশেষ বেশী খরচ নেই। দেশে অনেক ডোবা ও জলাশয় আছে যাতে সামান্য পাড় বেঁধে দিলেই পুকুরে পরিণত করা যাবে। বোধ হয়, এক টাকায় এখনো এক হাজার হতে দু'হাজার রেণু পাওয়া যাবে। যদি রেণুর নাশারী হতে সের হিসাবে ক্রয় করা যায় তাতে আরো সস্তায় পাওয়া যাবে। অন্যান্য দেশের অনুকরণে বৃহদাকারে মৎস্যের ব্যবসায় খুল্‌তে হলে যৌথভাবে খুলে দেশবাসীর সহানুভূতিও লাভ করাও দরকার। অন্যান্য চাষে যে সব জমি ব্যবহার করা যায় না, মাছের চাষ সে সব অব্যবহার্য্য ও অনাবাদী জমিতেই চল্‌বে। বাংলা দেশে তেমন জমির অভাব, বোধ হয়, কোথায়ও হবে না। ব্যবসায়ীকে যে কেবল নিজের জমিতেই চাষ করতে হবে তার কোনো মানে নাই। যাদের সুবিধা মতো পুকুর বা জলাশয় আছে, তাদের সামান্য টাকা দিয়ে ও অন্যান্য উপায়ে সাহায্য করে উৎপন্ন মাছের কণ্ট্রাক্ট করে নিলেও চলে। এ ভাবে বিলের স্বত্বাধিকারীদের সঙ্গেও মাছের কণ্ট্রাক্ট করা যায়। যৌথ কারবার খুল্‌লে অনেক পুকুর ও বিলের স্বত্বাধিকারী আগ্রহের সহিত কোম্পানীর সাথে যোগদানও করতে পারে। তাতে আরো সুবিধা হবে। শুধু মাছ উৎপন্ন করলেই কর্ত্তব্য শেষ হলো না। উৎপন্ন মাছকে চালান দেবার, গুদাম জাত করবার ও সুবিধামতো স্থানে বিক্রয় করবারও আয়োজন করতে হবে। মটর বোট ও কোল্ডষ্টোরেজ ভ্যানের (Coldstorage Van) সাহায্যে বিভিন্ন স্থানে চালান দেওয়া যেতে পারে। গুদামেও কোল্ডষ্টোরেজের ব্যবস্থা করতে হবে। যেখানে ইলেক্‌ট্রিকের অভাব নেই সেখানে অতি সহজে ফ্রিজিডিয়ারের (Frigidiare) সাহায্যে কোল্ডষ্টোরেজ করা চলে। যেখানে মাছ বিক্রি হবে যতদূর সম্ভব সেখানে মাছ ঠাণ্ডাতে রাখা প্রয়োজন। পূর্ব্বে জিয়ল মাছের চালান দেওয়া সম্বন্ধে আলোচনা করেছি। আমার মতে জিয়ল মাছের জন্য বিশেষ বেগ পেতে হবে না। উহা বড় বড় টাবেও সহজে রাখা যায়। ব্যবসায়ীরা পুকুর ও বিলের মাছ ব্যতীত নদী ও সমুদ্রের মাছও কিনে, বাজারে বিক্রয় করে লাভবান হতে পারে। এর জন্য করতে হবে,—সমুদ্রের ও সুন্দরবনের ফেরী ও অন্যান্য স্থানে কোল্ডষ্টোরেজ স্থাপন। সেখান হতে বিভিন্ন স্থানে ইচ্ছামতো চালান্ দেওয়া চল্‌বে। এক কলিকাতা সহরেই কমপক্ষে বার্ষিক ৪০,০০০।৫০,০০০ হাজার টন মাছের প্রয়োজন আছে, তা' ছাড়া ছোট ছোট মফস্বল টাউনেও মাছের বিশেষ চাহিদা আছে। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ফরিদপুরে "মাদারীপুর ফিসারী কোং" ও "ইষ্ট বেঙ্গল এগ্রীকালচারেল ফিসারী কোং" এবং খুলনায় অপর একটী কোম্পানী স্থাপিত হয়েছিল। উপযুক্ত পরিচালকের তত্ত্বাবধানে এ কোম্পানীগুলি পরিচালিত হলে, উন্নতি যে নিশ্চিত তাতে কোনো সন্দেহ নাই। বাংলা সরকারের ভাবগতিক দেখে মনে হয়, সরকার আবার বাংলায় মৎস্য বিভাগ স্থাপন করবেন। এ উদ্দেশ্যে কৃষি বিভাগের ডাইরেক্টর মহোদয়কে "হোমে" যাওয়া আসার পথে মধ্য ইউরোপের, বিশেষ করে জার্ম্মাণী ও অষ্ট্রীয়ার মৎস্যের চাষ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করবার

ভার দেওয়া হয়েছিল। সম্প্রতি তিনি ভারতে প্রত্যাবর্ত্তন করেছেন। বোধ হয় শীঘ্রই তাঁর অনুসন্ধানের ফলাফল সাধারণে প্রকাশ করা হবে।

এ পর্য্যন্ত আমরা মাছকে কেবল আহার্য্যরূপেই দেখে এসেছি এবং সাধারণ আহার্য্যরূপেই ইহার ব্যবসায় চালালে লাভবান হওয়া যায় কিনা, তার আলোচনাই করেছি মাত্র। কিন্তু খাদ্য ছাড়াও ইহার শরীরের অন্যান্য পরিত্যক্ত অংশ দিয়ে পৃথক ব্যবসায় চালিয়ে প্রচুর লাভবান হওয়া যায়। সাধারণতঃ মাছের আঁশ, চামড়া, হাড়, কাণ, ডানা ও পেটি ইত্যাদিকে আমরা পরিত্যক্ত জিনিষরূপেই মনে করে থাকি। কিন্তু এ বৈজ্ঞানিক যুগে এ সব পরিত্যক্ত জিনিষের প্রত্যেকটী হতে এক একটী ব্যবসা চালিয়ে নানা দেশের লোক প্রচুর লাভবান হচ্ছে। একটী উৎপন্ন দ্রব্য হতে মাত্র একটী আয়ের পথকে সম্বল করে ব্যবসায় ক্ষেত্রে অগ্রসর হওয়া অত্যন্ত বিপদ সঙ্কুল। কারণ আশাতিরিক্ত লাভ না হলে এরূপ ব্যবসায়কে দাঁড় করানো কষ্টসাধ্য। একটী জিনিষ হতে যদি ভিন্ন ভিন্ন উপায়ে ভিন্ন আয়ের পথ আবিষ্কার করা যায়, একটীর ব্যবসায়ে লাভ না হলেও অন্যদিকের আয়ের দ্বারা ক্ষতির চোট্‌টা সহজে সামলানো যায়। ভবিষ্যতে মৎস্যের ব্যবসায় সম্বন্ধে, উপরোক্ত প্রত্যেক বিষয় নিয়ে, পৃথক ভাবে আলোচনা করবার ইচ্ছা রইলো।

---

# আফগান কবিদের কথা

[ পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর ]

মুসাফির

## খুশ্‌হাল খাঁ

খুশহাল খাঁর নাম আফগান ইতিহাসে যোদ্ধা হিসাবে একটা বিশেষ স্থান অধিকার করিয়া আছে। মোগল ও আফগানদ্বন্দ্বের সময় খুশহাল খাঁ আপনার সম্প্রদায়ের দলপতিরূপে মোগলদের বিরুদ্ধে যে বিপুল সংগ্রাম করেন—তাহা আফগানরা শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করিয়া থাকে। ১০২২ হিজরীতে তিনি জন্মগ্রহণ করেন এবং তাঁহার পিতা সম্রাট শাজাহানের একজন প্রিয়-পাত্র ছিলেন। সেই জন্যই ১৬৪৫ সালে সোলতান মোরাদ বক্সের সহিত খুশহাল খাঁ সেনা-নায়করূপে উত্তর আফগান অভিযানে যান। সেই সময়কার মোগল-আফগান যুদ্ধের ফলে খুশহালের জীবন অতিশয় তিক্ত হইয়া উঠে। আজীবন পরাজয় হইতে পরাজয়ে, আশ্রয়হীন ভাবে বহুকাল খুশহাল আপনার দলকে লইয়া যুদ্ধ করিয়াছিল। অবশেষে আটাত্তর বৎসর বয়সে ছদ্মবেশে ঘুরিয়া ঘুরিয়া তিনি আপনার দেশের পাহাড়ের মধ্যে আসিয়া দেহ-রক্ষা করেন। খুশহালের এক হাতে তরবারি আর এক হাতে বীণা। সেই সময় য়ুরোপে ও স্কটল্যাণ্ডে এই রকমের একদল কবি জাগিয়া উঠিতেছিল। ইংলণ্ডের সহিত যুদ্ধের অবসরে অবসরে তাহারা আপনাদের শৈল-প্রকৃতির অবাধ জয়গান গাহিয়া গিয়াছে। খুশহাল খাঁরও সেইরূপ আফগানিস্থানের শৈল প্রকৃতির জয়গান গাহিয়াছেন। খুশহাল খাঁর কবিতার মূলে একটা নিরুদ্ধ আবেগের সজীবতা সর্ব্বদাই লক্ষ্য হয়। যখন পড়া যায়ঃ—

"হে বীণাবাদিনী তুমি আরো নিকটে এসো—তোমার বীণার তারে আরো নব নব সুরের ঝঙ্কার তোলো—

বীণাতে সে রাগিনী যদি ঝঙ্কৃত না হয়—তবে নিয়ে এসে রবাব, মুরজ,—অন্য সব তন্ত্রী—"

তখন পরিপূর্ণ প্রাণের একটা উষ্ণ স্পর্শ সহজেই পাওয়া যায়। সেই সময়কার যুদ্ধের দরুণ খুশহালের কবিতায় মোগল-বিদ্বেষ প্রচুর পরিমাণে দেখা যায়।

### চয়ন

( ১ )

যখন তুমি বল, জাগো—এই তো আমি এসেছি—তোমারই জন্য শুধু—

আমি সত্যই জাগিয়া উঠি। লোকে হাসিয়া বলে—"ও ছলনা!"

তাই হ'ক্—তবুও তুমি একবার যাহা বলিয়াছ—ছলনায় ও হ'ক—

তাহাতেই আমি বহু মুহূর্ত্তের জীবনের প্রসাদ পাইয়াছি।

( ২ )

আফগান আফগান হইলেও তাহারা মনোগত ভাবের দিক দিয়া হিন্দুদের মত।

তাহাদের শক্তি নাই—সামর্থ্য নাই। অথচ তাহারা আনন্দে অজ্ঞতায় আর অন্তর্দ্রোহে লিপ্ত আছে।

পূর্ব্বপুরুষদের কথা তাহারা উচ্চারণ করে, মানে না। যদি কোনও লোক মাথা তুলিয়া উঠিতে চায়—তখনই তাহারা সকলে এক হইয়া তাহার মাথাকে মাটীতে টানিয়া ধরে।

তারা সর্ব্বদাই যেন ওৎপাতিয়া আছে; কে কখন কাহাকে আঘাত করিবে।

তারা মৌমাছির মত সংখ্যায় নিত্য বাড়িয়াই চলিয়াছে কিন্তু মধু সঞ্চয় করিতে শিখে নাই।

( ৩ )

যেখানে তুমি তোমার দেহ রাখ—সেইখানেই কুসুম ফুটিয়া উঠে।

তোমার প্রতি চরণ-ক্ষেপে কুঁড়ির বুকে রঙ ধরিয়া উঠে।

দুরন্ত দক্ষিণ বায় যখন তোমার কুঞ্চিত অলক লইয়া খেলা করে—বাতাস তখন কস্তুরীর গন্ধে ভরিয়া যায়।

তোমার কালো চুলের আঁধার-পথে আমার মন হারাইয়া গিয়াছে। একবার তোমার মুখের প্রদীপ তুলিয়া ধর—আমি আমার হারাণো মন খুঁজিয়া দেখি।

## আবদুল কাদের খাঁ

খুশহাল খাঁর সুযোগ্য পুত্র আবদুল কাদের খাঁ পিতার কবিত্ব শক্তির সম্পূর্ণ উত্তরাধিকারী হইয়াছিলেন। তিনি আফগান-কবিতাকে অনুবাদের মধ্য দিয়া শ্রীবৃদ্ধিশালিনী করিয়া যান। জামীর বিখ্যাত কাব্য ইসুফ ও জুলেখা, এবং সাদীর গুলিস্তাঁ ও বোস্তা সমগ্রভাবে অনুবাদ করেন। তাঁহার কবিতায় পারস্য-কবিতার প্রভাব অত্যন্ত বেশী।

### চয়ন

( ১ )

প্রভাতে উঠিয়াই শুনিলাম বুলবুল কাঁদিয়া গাহিতেছে,

"হে গোলাব, তোমার বিকাশের আনন্দে আমার চক্ষু বেদনার জলে ভরিয়া আসিয়াছে—আমার হৃদয়কে দীর্ণ করিয়া তুমি ফুটিয়া উঠিলে। * *

হে পাত্র-বাহক, পেয়ালায় আজ যে সুরা ঢালিবে—তাহার পানে যেন আর চেতনা ফিরিয়া না আসে—* *

চারিদিকে আজ ফুল-উৎসব! বাতাসও যেন তরল-ফুল।

প্রিয়ার তনুখানি আজ ফুলময়—বসন্ত-উৎসবে মাতোয়ারা—

হায়, আমারই হৃদয়ে কেন বসন্ত-শেষের স্মৃতি জাগে!

## আহমদ্ শাহ্ আবদালী

ইতিহাস প্রসিদ্ধ দুরানী বংশের প্রতিষ্ঠাতা আহমদ্ শাহ্ আবদালী নাদির শাহের সামান্য একজন সেনাপতি ছিলেন। নাদির শাহের আকস্মিক মৃত্যুর পর আপনার ব্যক্তিত্বের বলে তেইশ বৎসর বয়সে আহমদ্ আপনাকে আফগানিস্থানের শাহ্ বলিয়া বিঘোষিত করেন এবং কান্দাহারে রাজধানী প্রতিষ্ঠা করেন।

ভারতে আহ্মদ্ শাহ্ বিখ্যাত পানিপথ যুদ্ধক্ষেত্রে মারাঠাদের সহিত যুদ্ধার্থে মিলিত হন এবং মারাঠাদের যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শক্তি হইয়া উঠেন। আহ্মদ্ শাহের রাজত্বকাল আফগান-ইতিহাসের এক অতি গৌরবময় যুগ। আজীবন রণে লিপ্ত থাকিয়াও আহ্মদ শাহ্ জ্ঞান-চর্চ্চায় ও কবিতা-রচনায় তাঁহার সমস্ত অবসর কাল নিয়োজিত করিয়াছিলেন।

### চয়ন

( ১ )

আমার হৃদয় লইয়া কে তুমি এমনি নিষ্ঠুর খেলা খেলিতেছ!

একবার তোমার অবগুণ্ঠন খোলো, তোমাকে দেখিয়া লই!

কতদিন আর এমনি চলিব দরবেশের মত; বারে বারে অশ্রুতে আমার বসন সিক্ত হইয়া আসিল—

তবুও জানিলাম না—তুমি কোথায়—এ পৃথিবীতে—না, ঐ স্বর্গে! * *

# ঘুমটিওয়ালা

## মোহাম্মদ হোসেন

রেলওয়ে লাইনের এক ঘুমটি পাহারা দিত রহিম। তার ঘুমটি থেকে রেলওয়ে ষ্টেশন একদিকে প্রায় দু'মাইল, আর একদিকে আড়াই মাইল। প্রায় আধ মাইল দূরে একটা মস্ত কারখানার পত্তন সুরু হয়েছে, বড় বড় চিমনিগুলি আকাশের দিকে মাথা উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে আছে—যেন তারা আকাশকে শাসাচ্ছে। কারখানা আর ঘুমটি ছাড়া আর বসতি নেই।

রহিম মানুষটি আজ স্থবির, পঙ্গু। বছর নয় আগেও সে এক সাহেবের আর্দ্দালীর কাজ করত। সাহেবের সঙ্গে বনে জঙ্গলে পাহাড়ে পর্ব্বতে ঢের ঘুরেছে। শীত, গ্রীষ্ম অনাহার, অনিদ্রা একদিন সবই তার সহ্য হত। জীবনের কারবারে পরিশ্রম, বিশ্বাস, সততা—সবই তার প্রচুর ছিল কিন্তু সাহেবের স্নেহটুকু ছাড়া ভঙ্গুর দেহটাকে জীইয়ে রাখবার মত লাভের অংশ দুর্ভাগ্যক্রমে তার ঘটে ওঠে নি। লড়াইটা যখন বেশ পেকে উঠল, মানুষ মানুষের রক্তপানের জন্য ক্ষেপে উঠল—দেশের বিদেশী সাহেবগুলি সব যে যার মত লড়াইয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল। রহিমের সাহেবও সে প্রাণের তাগিদ উপেক্ষা করতে পারলে না, লড়াইয়ে চলে গেল। রহিমও তখন বেকার হয়ে দেশে চলে এল। কিন্তু এইখানেই তার দুঃখের জীবনের শেষ হল না। পরের মাসেই বাপজান তার মারা গেল, আরো দিন কয়েক পরে গেল তার চার বছর বয়সের ছেলেটি। স্ত্রী ছাড়া রহিমের আপন বলতে আর কেউ রইল না। সেও একদিন ভেদ বমিতে বিছানা নিল, আর উঠল না। জমিজিরাত বড় বেশী একটা ছিল না, সামান্য যা ছিল, তাই নিয়ে চাষবাসের তেমন সুবিধা হল না। দেহের তাগদটুকু সবই সাহেব শুষে নিয়ে গেছে, এখন বেতো শরীর নিয়ে চাষ করা আর চলে না। রহিম কাজের চেষ্টায় কিছুদিন এখানে সেখানে ঘুরে বেড়াল—কোন ফল হল না।

রেল কোম্পানী নতুন লাইন ফেলছে। রহিম সে কথা শুনে সেদিকে একদিন গেল। রেল কোম্পানীর সাহেবের সঙ্গে রহিমের সাহেবের ছিল খুব ঘনিষ্ট বন্ধুত্ব। রহিম তাকে চিনল, বুকে একটু আশাও হল। সালাম ঠুকে দাঁড়াল।

—এই যে রহিম মিঞা!—সাহেব বল্লে।

—জী হুজুর।

—এখানে কি করে এলে? তোমার সাহেব কোথায়?

রহিম সব বল্লে।

—কোথায় যাচ্ছ এখন?

—জানি নে হুজুর, যেখানে হোক।

—জান না কি রকম?—ক্ষেপে গেছ।

—তা নয় হুজুর! নসিব নাদারৎ, কি করব। কাজের চেষ্টায় ঘুরছি, কোথায় পাব জানি নে।

সাহেব কিছুক্ষণ কি ভাবলে, তারপর বলে, রেলের চাকরি করবে?

রহিম সানন্দে সম্মতি জানাল। কৃতজ্ঞতায় তার দুই চোখ সজল হয়ে উঠল।

সে থেকে রহিম ওই ঘুমটি পাহারা দিচ্ছে।

তার কাজের জন্য যা যা দরকার সবই সে রেল কোম্পানীর কাছ থেকে পেয়েছিল—একটা সবুজ নিশান, একটা লাল লণ্ঠন, একটা হাতুড়ি, একটা বাঁশী—আরো কত কি। প্রথম প্রথম রাত্তিরে তার ঘুম হত না। গাড়ী আসার দু'ঘণ্টা আগে থেকেই সে সবুজ বাতি জ্বালিয়ে বসে থাকত—দূর থেকে গাড়ী আসার শব্দ শুনবার জন্য লাইনে কান পেতে থাকত; গাড়ী এলে সবুজ বাতিটা তুলে ধরত—গাড়ী ভস্ ভস্ করতে করতে অদৃশ্য হয়ে যেত। ওই ছিল তার কাজ।

দিনের বেলায় সবুজ নিশান আর রাতের বেলা সবুজ

আলো তুলে ধরে—গাড়ী চলে যায়। ক্রমে রহিম কাজে বেশ পোক্ত হয়ে উঠল।

দু'মাস এমনি করে চলে গেল। রহিম আশেপাশের ঘুমটিওয়ালাদের সঙ্গে আলাপ পরিচয় করতে সুরু করে দিল। একজন ছিল খুব বুড়ো, তারমত বুড়ো আর কেউ ছিল না ওদের মধ্যে। এর মধ্যে গুজব উঠল, শীগ্‌গিরই নাকি ওকে জওয়াব দেওয়া হবে, কেননা বুড়া নিজে কোন কাজই করতে পারত না, তার স্ত্রীই নিশান হাতে করে তার কাজটা সেরে দিত। ইষ্টিশনের কাছে যে ঘুমটিটায় সে ছিল, সেখানকার ঘুমটিওয়ালা ছিল বেশ মোটাসোটা জোয়ান। রহিম তার সাথে আলাপ করতে গেল।

—আদাব ভাই সাহেব!

লোকটি একবার বাঁকা দৃষ্টি হেনে রহিমকে একবার আগাগোড়া দেখে নিয়ে বল্লে,—আদাব!

তারপর চলে গেল।

যেন আলাপ করবার কোনই ইচ্ছা নেই।

তবু মাসখানেকের যাওয়া আসায় ওদের মধ্যে বেশ একটা ঘনিষ্ঠতা জমে উঠল। নাম ছিল ওর কাদের। বিকেলে রেল লাইনের ধারে বসে ওরা অনেক বিষয়েরই আলোচনা করত; নিজেদের জীবনের কথা, সুখ-দুঃখের বিচিত্র অভিজ্ঞতার কথা আর সাহেবের অন্যায় অবিচারের মর্ম্মন্তুদ কাহিনী ইত্যাদি।

রহিম বলত,—জীবনে দুঃখটা কম পাই নি, এখন খোদাতালার ফজলে কিছু ভাল আছি। খোদাতালাহ্‌ যা-কিছু করেন আমাদের ভালো ভাবেই নেওয়া উচিত।

কাদের নেবানো বিড়িটা ফেলে দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে যেতে যেতে বলে, খোদার ইচ্ছাই সব তবে মানুষ কম চীজ নয়। বাঘ ভল্লুকও মানুষের মত এত বড় নিষ্ঠুর নির্ম্মম নয়। ওরা তো নিজেদের মাংস খায় না কিন্তু মানুষ আর একজনকে একেবারে শুষে নিংড়ে তবে ছাড়ে।......

—না ভাই, বাঘ ভল্লুকও নিজেদের মাংস খায়, তা তুমি অস্বীকার করতে পার না।

—একটা কথা আমার মনে পড়ল, তাই বল্লাম, কিন্তু তবু মানুষের মত এত পিশাচ আর কেউ নয়। বাগে পেলেই নিঃশেষ না করে ছাড়বে না। • সকলেই যেন সুযোগের প্রতীক্ষায় আছে।

রহিম কিছুক্ষণ ভেবে বল্লে—কি জানি ভাই। তাই যদি হয় ত তা আল্লার মর্জ্জি।

—সবই যদি আল্লার মর্জ্জির উপর ছেড়ে দেওয়া যায় তা হলে আমাদের নিজেদের আর বলবার কিছু নেই—বসে বসে শুধু কিল খাওয়াই সার হবে।

কাদের পথ ধরে, রহিম নিজের ঘুমটিতে ফিরে আসে।

মোটের উপর ওরা নিজেদের ভেতর ঝগড়া করে না। আবার দেখা হয়। বেশ লাইনের ধারে বসে বসে ফের আলোচনা করে। কাদেরের ওই একই অভিযোগ—ওই সব লোভী হিংস্র মানুষগুলি না থাকলে আজ কি আর এই স্যাঁৎসেঁতে ঘুমটিতে কাটাতে হয়।

রহিম প্রতিবাদ করে বলে—ঘুমটি এমন কি অপরাধ করেছে! এমন খারাপ ত কিছু নয়!

—তোমার কাছে খারাপ নাও হতে পারে। তুমি আর এর চাইতে বেশী কি বলতে পার! জীবনের বেশীর ভাগই কাটিয়ে দিয়েছ—পাও নি কিছুই। কি যে পাও নি, কতখানি যে পাওনা—তাও জান না। বয়স হয়েছে অনেক কিন্তু জান না কিছুই। গরীবের জীবন যে কি ভাবে কাটে খবর রাখ? ওরা আমাদের পিষে শুষে নেবে, তবে ছাড়বে, শেষ রক্তবিন্দু পর্য্যন্ত; তারপর যখন কাজের বাইরে চলে যাব—ছেঁড়া জুতোর মত দূর করে ফেলে দেবে।......তুমি কত তলব পাও?

—বারো টাকা।

—আর আমি পাই সাড়ে তেরো টাকা। কেন এই পার্থক্য। জান, আমাদের পাওয়ার কথা পনরো টাকা! কে এই ব্যবস্থা করেছে বলতে পার? তা হলেই বুঝতে পারবে—মানুষ কেমন করে বেঁচে থাকে। বুঝতে পারছ ত? দু এক টাকার তফাৎ নিয়ে প্রশ্ন হচ্ছে না, ওরা যদি আমাদের সকলকেই আমাদের নির্দ্দিষ্ট পনরো টাকা করেই দিত, তা হলেও কিছু আসে যায় না। ষ্টেশনে বড় বড় সাহেবেরা আসে, দেখেছো? তাদের ভারী ভারী খেতাব ত আছেই, তার উপর 'ফাষ্ট কেলাস' সেলুন!...কত তাদের মাইনে জান?...যাক, এ নিয়ে আমি সন্তুষ্ট কখনই থাকবো না—এখানে থাকাও তাই আমার পক্ষে আর সম্ভব নয়। যে দিকে দু চক্ষু যায় চলে যাব।

—কোথায় যাবে কাদের, ভাই? ওসব পাগলামী

ছেড়ে দাও। একটা মাথা গুঁজবার আস্তানা পেয়েছো, তার সঙ্গে কিছু জমিও আছে। ব্যস, আর চাই কি, আল্লার নাম করে কাটিয়ে দাও।

—জমি আছে বটে, কিন্তু তাতে ঘাস গজাবারও উপায় নেই। গেল বছর খেটে খুটে কিছু কফি লাগিয়েছিলেম। একদিন ইন্সপেক্টর এসে বলে কাদের, এ সব কি? তুমি দরখাস্ত করেছিলে, হুকুম পেয়েছো?—এক্ষুণি তুলে ফেল সব!......শালা মদ খেয়ে টং হয়ে ছিল। শুধু কি তাই, তার উপর তিন টাকা জরিমানা।

কাদের পকেট থেকে আর একটা বিড়ি বার করে ধরিয়ে বল্লে,—ঘুসি দিয়ে বেটার মাথার খুলি উড়িয়ে দেওয়া উচিত ছিল।

—ঠাণ্ডা হও কাদের, তোমার মাথা গরম হয়েছে।

—না, আমার মাথা ঠাণ্ডাই আছে। আমি সত্যি কথাই বলছি, তুকি কি ভাবো আমি চুপ করেই থাকবো!...

বড় ইন্সপেক্টর লাইন দেখতে এলেন দিন তিনেক পর। জনকয়েক উচ্চ সরকারী কর্ম্মচারী নাকি ওই পথে যাবে, তাই এই পরিদর্শন। ধোয়া মোছা সাফ সুফা হরদম চলেছে। পুরাণো বল্টু বদলে নতুন নতুন বল্টু লাগানো হচ্ছে, পয়েণ্টগুলোতে তেল দেওয়া হচ্ছে, লেভেল ঠিক করা হচ্ছে, স্লিপারগুলো পরীক্ষা করে পোষ্টগুলোতে রঙ দেওয়া হচ্ছে। মোটের উপর কাজের ভারী মরসুম পড়ে গেছে। রহিম খেটেখুটে নিজের ঘুমটির এলাকা ঝকঝকে তকতকে করে রাখল। বড় ইন্সপেক্টর ট্রলি চেপে দেখতে এলেন, আর সেই ট্রলি টানছে তিনটে জোয়ান কুলি।

রহিম সালাম জানিয়ে বল্লে—সবই ঠিক আছে হুজুর।

—এখানে কতদিন আছ তুমি?

—গেল বছর থেকে হুজুর।

—বেশ। একশো ষাট নম্বরে কে থাকে?

ছোট ইন্সপেক্টর জবাব দিলে,—কাদের বক্স।

—কাদের বক্স? গেল বছর যার ফাইন হয়েছিল সেই লোকটা কি?

—হাঁ, সেইই।

—তা বেশ। চলো।

কুলিরা ট্রলি ঠেলে নিয়ে চল্ল।

প্রায় দুঘণ্টা বাদে রহিম সবুজ নিশান হাতে করে বের হল। গাড়ী আসবার সময় হয়ে এসেছে। কিছু দূরে লাইনের উপর একটা লোককে দেখতে পেলে, ভাল করে দেখে বুঝলে—সে কাদের। তার হাতে একটা ছোট্ট পুটলি—মুখে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা।

রহিম চেঁচিয়ে তাকে ডাকল।

—কোথায় যাচ্চো কাদের ভাই!

ওর গালের অনেকটা কেটে গেছে, কথা বলতে চেষ্টা করলে, গলা ভেঙে গেছে। বল্লে—শহরে যাচ্চি, বোর্ডে।

—বোর্ডে? ওঃ, বুঝেছি, নালিশ করতে। কাদের, লক্ষ্মীটি, এবারের মত ভুলে যাও।

—না, তা অসম্ভব। চেয়ে দেখ, কি রকম ঘায়েল করেছে। যতদিন বেঁচে থাকবো, এ আমি কিছুতেই ভুলতে পারব না। সহজে ছাড়ব না শালাকে। না হয় মনিব—আমাদের দেহ কি দেহ নয়?

—আমার একটা কথা আজ রাখ ভাই! যা হয়ে গেছে, তা ত আর ফিরে আসবে না। এবারের মত শুধু চুপ করে থাক।

—কিছু যে হবে না তা আমিও জানি, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত দেখে তবে ছাড়ব। গরীব বলে কি আমাদের জীবনটা এতই সস্তা?

কাদের চলে গেল।

এক দিন, দু দিন, তিন দিন—কাদেরের দেখা নেই।

ছেলে বেলা থেকেই রহিম বাঁশের কঞ্চি দিয়ে সুন্দর বাঁশী বানাতে পারত। এখনো সে বাঁশী তৈরী করে, পরে তা জানা শুনা এক গার্ডের সঙ্গে শহরে পাঠিয়ে দেয়—এক পয়সা করে বিক্রী হয়। অতিরিক্ত রোজগারের এটা বেশ একটা সহজ পন্থা।

সন্ধ্যার গাড়ীটা আসবার কিছু আগে সেদিন বিকেলে রহিম তার ছুরিটা নিয়ে ঘুমটি থেকে বের হল, জঙ্গল থেকে কিছু কঞ্চি কেটে নিয়ে আসবে। প্রায় আধ মাইল দূরে বেশ একটা বাঁশ বন আছে। সেইখান থেকেই সে আগে আগে কঞ্চি কেটে নিয়ে আসত। আজও সেখানে গিয়ে অনেক কঞ্চি কাটল, তারপর পোটলা করে নিয়ে ঘুমটির পথ ধরল। কয়েক পা এগিয়ে এসে সে নানা রকম শব্দ শুনতে পেল। আরো খানিক এগিয়ে সে শব্দটা সে আরো পরিষ্কার শুনতে পেল—যেন রেলের লাইনের উপর

থেকেই আসছে। সে একটু বিস্মিতও হল। ভাবলে কেউ হয় ত লাইনের বল্টু চুরি করছে। সে লাইনের দিকে গিয়ে দেখল একটা লোক লাইনের উপর ঝুঁকে যেন কি করছে। রহিম লোকটার খুব কাছে গিয়ে দেখল সে কাদের। লাইন অনেকটা আলগা করে ফেলেছে, একটা সাবল, একটা হাতুড়ি, একটা কাটারী পড়ে রয়েছে। রহিমের চোখে সব অন্ধকার হয়ে উঠল, গাড়ী আসবারও আর দেরী নেই। কাদের উঠে জঙ্গলের দিকে চলে গেল।

রহিম অনুনয় করে বল্লে, কাদের ভাই, ফিরে এস, সাবলটা আমায় দাও—এসো লাইনটা ঠিক করে ফেলি। কেউ কোন দিন জানতেও পারবে না, এসো লক্ষীটি।

কাদের ভ্রূক্ষেপ না করে চলে গেল। রহিম ভাঙ্গা লাইনের ধারে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। কি করবে কিছুই বুঝে উঠতে পারল না। এক্ষুণি গাড়িটা এসে পড়বে। তারপর...রহিমের চোখের সামনে সব অন্ধকার হয়ে উঠল। তার কাছে একটা নিশানও নেই, ঘুমটি পর্য্যন্ত যাবারও সময় নেই, ততক্ষণ গাড়ী এসে পড়বে।

তবু সে প্রাণপণে দৌড়াতে সুরু করলে।

খানিক্ষণ দৌড়িয়েই সে হাঁপিয়ে পড়ল। দূর থেকে গাড়ীর শব্দও শুনতে পেল হয়ত। তার আর ঘুমটি পর্য্যন্ত যাওয়া হয়ে উঠল না। সে আবার ভাঙ্গা লাইনের দিকে দৌড়াতে লাগল। এই আসন্ন বিপদ থেকে গাড়ীখানাকে কেমন করে বাঁচাবে তার কোন উপায়ই তার মাথায় আসছিল না।

অবশেষে একটা উপায় মনে হল। সে তার গায়ের জামাটা খুলে ফেলল। ছুরিটা হাতের উপর সজোরে বসিয়ে দিল, লাল গরম রক্ত ফিন্‌কি দিয়ে বেরিয়ে এল। জামাটা সেখানে চেপে ধরল। দেখতে দেখতে তার সাদা জামাটা লাল হয়ে উঠল। সে সেটাকে নিশানের মত উঁচু করে ধরল।

গাড়ী তখনো অনেক দূরে ছিল। ড্রাইভার দেখতে পেলে না হয় ত। রহিমের শরীর ক্রমেই অবসন্ন হয়ে আসতে লাগল। তার শুধু ভয় হচ্ছিল সে শেষ পর্য্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকতে পারবে না, ড্রাইভার কিছু বুঝতে না পেরে গাড়ী চালিয়ে চলে যাবে। তার হাত থেকে তখনো রক্ত ঝরছিল, বন্ধ করবার অনেক চেষ্টা করল কিন্তু রক্তের স্রোত বন্ধ হল না। এক একটা মিনিট রহিমের কাছে এক যুগ বলে মনে হচ্ছিল।

ক্রমে তার চোখ দুটো ঘোলা, ঝাপসা হয়ে উঠল, মাথা ঘুরে গেল, নিশানটা তার হাত থেকে খসে পড়ল, মূর্চ্ছিত হয়ে সে পড়ে গেল।

কিন্তু নিশানটা মাটিতে পড়ল না, পিছন থেকে একজন এসে তুলে ধরল। ড্রাইভার লাল ইঙ্গিত দেখতে পেয়ে গাড়ী থামিয়ে দিল। গার্ড ও যাত্রীর দল শঙ্কিত চিত্তে গাড়ী থেকে নেমে এল। দেখল একটা লোক অচৈতন্য হয়ে পড়ে আছে। রক্ত নিশানটা দিয়ে ভাঙ্গা লাইনটা দেখিয়ে কাদের বল্লে—আমাকে বাঁধো—আমিই লাইন খুলে দিয়েছি।

# সংবাদিকা

## টলষ্টয় শতবার্ষিকী

রুষিয়া তাহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষা-গুরুর শত-বার্ষিকী উৎসব করিতেছে। জগতে বিভিন্ন দেশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্য রথীগণ এই উৎসবে যোগদান করিবার জন্য নিমন্ত্রিত হইয়াছেন।

এই মহাপুরুষের জীবনের সহিত আজ শুধু রুষ অথবা য়ুরোপের যোগ নয়—সমগ্র জগতের চিন্তাধারার সহিত আজ সাক্ষাৎভাবে টলষ্টয়ের চিন্তা-ধারার যোগসূত্র চলিতেছে। যে অসিংহ আন্দোলনের প্রভাবে মহাত্মা গান্ধী দক্ষিণ আফ্রিকা হইতে ভারতবর্ষ পর্য্যন্ত এক নব-জীবনের সঞ্জীবতা আনিয়াছিলেন—তাহা তিনি সাক্ষাৎভাবে টলষ্টয়ের নিকট হইতে গ্রহণ করেন। গান্ধী ব্যক্তিগত ভাবে টলষ্টয়ের নিকট হইতে পত্রযোগে উপদেশ ও আদর্শের সন্ধান পাইয়াছিলেন।

সাধারণ কৃষকের বেশে টলষ্টয়

বৈজ্ঞানিক শক্তির মত্ততায় গত শতাব্দীর পাশ্চাত্য সভতা যখন অন্ধ হইয়া নানাদিক দিয়া, নানাভাবে মানবতার মৃত্যু-বীজ ছড়াইয়া চলিয়াছিল, সাহিত্যে, সমাজে, রাষ্ট্রে, ধর্ম্মে যখন তাহারা রূপের বিলাসে অন্তরের সাধনাকে হারাইতে বসিয়াছিল, তখন রুষিয়ার তুহিন-প্রান্তর হইতে এই মহাপুরুষের নির্ভীক তিক্ত-বাণী য়ুরোপের বিলাস-বিজড়িত মনে বজ্রাঘাত করিয়া জাগিয়া উঠিল। য়ুরোপ চমকিয়া ফিরিয়া চাহিল। দেখিল এক বৃদ্ধ—বিচিত্র তাহার জীবন—অগ্নিময় তাহার বাণী—খৃষ্টান সভ্যতার উপর অভিশাপ বর্ষণ করিতেছে। যে বিজ্ঞানকে তাহারা পূজা করে—এই বৃদ্ধ তাহাকে সকল পাপের মূল বলে। যে সাহিত্য তাহাদের চিত্তকে রসে আন্দোলিত করে—এই অগ্নিমূর্ত্তি বৃদ্ধ তাহাকে ক্ষণিকের বিলাসের খেলা বলে। যে রাষ্ট্রকে তাহারা গড়িয়া তুলিয়াছে—এ বৃদ্ধ বলে—তাহা অচিরাৎ ধুলায় মিশাইয়া যাইবে। যে নব-নাগরিক তাহারা গড়িয়া তুলিতেছে—এ বৃদ্ধ তাহাদের কৃমি-কীট বলে। অভিশাপের মধ্যে ব্যর্থ নাই—সুরের মধ্যে কোথাও হ্রাস-বৃদ্ধি নাই। বিংশ শতাব্দীর সভ্যতার অরণ্যে এক ভয়-সঙ্কুল আর্ত্তরব উঠিল। যে সমস্ত আদর্শ য়ুরোপ সযত্নে মানিয়া আসিতেছিল—টলষ্টয় তাহার বিরুদ্ধে দাঁড়াইলেন। প্রথম জীবনে Sevastopolএ স্বয়ং যোদ্ধারূপে যুদ্ধের ভয়াবহ রূপ দেখিয়া টলষ্টয় ভাবিয়াছিলেন যে ইহাই যদি সভ্যতার পরিণাম হয়—তাহার অপেক্ষা বর্ব্বরতাও ভাল। সেইদিন হইতেই তাঁহার মনে অহিংসার চরম বাণী জাগিয়া উঠে। মানব স্থির-বুদ্ধিতে, সকলে মিলিত হইয়া, বাদ্য বাজাইয়া আয়োজন করিয়া পরস্পর পরস্পরকে খুন করিতে পারে—ইহার অপেক্ষা চরম দুর্দ্দৈব মানুষের পক্ষে আর কি হইতে পারে।

ইহার কারণ অনুসন্ধান করিতে গিয়া দেখেন যে সভ্য সমাজ আপনাদের প্রয়োজনকে এমন ভাবে বাড়াইয়া চলিয়াছে যে এখন সে তাহার বিলাসের প্রয়োজনের দাস হইয়া পড়িয়াছে। এই প্রয়োজনের তাগিদ প্রত্যেক জাতিকে লোভী করিয়া তুলিয়াছে। জাতিতে জাতিতে যখনই এই লোভের ও স্বার্থের সংঘর্ষ বাঁধে—তখনই যুদ্ধ অনিবার্য্য হইয়া উঠে। মানুষ মানুষকে খুন করে এবং খুনের কার্য্যে জয়ী হইলে ক্রুশের সম্মুখে গিয়া শান্তির উপাসনা করে। এত বড় মিথ্যা অনাচার মানুষ করিয়া চলিয়াছে। টলষ্টয় প্রচলিত সমাজ-বন্ধনকে আক্রমণ করিলেন। সেখানে তিনি দেখিলেন মানুষ আপনা হইতে দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া যাইতেছে এবং এই দুই ভাগের মধ্যে দাস ও প্রভুর সম্বন্ধ গড়িয়া উঠিতেছে। একদল ধনী—জগতের সমস্ত কিছু তাহাদের অবসর বিনোদনের জন্য, তাহাদের মত করিয়া গড়িয়া তুলিতেছে। তাহাদের বিবেকে আঘাত লাগে এমন কিছুই তাহারা প্রশ্রয় দেয় না। রাষ্ট্রের নায়ক তাহারা; বিজ্ঞান তাহাদেরই বিলাসের জিনিষ উৎপন্ন করিয়া চলিয়াছে; সাহিত্য তাহাদেরই অবসর বিনোদনের সামগ্রী হইয়া উঠিতেছে; ধর্ম্ম তাহাদের অঙ্গুলী ইঙ্গিতে চলিতেছে: নারীরা তাহাদেরই জন্য সুবেশা হইতেছে; শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান তাহাদেরই আশ্রয়ে তাহাদেরই মতন করিয়া তাহাদের ছেলেদের গড়িয়া তুলিতেছে; সর্ব্বোপরি তাহাদের প্রত্যেক কার্য্যকে সমর্থন করিবার জন্য তাহারা এক নূতন দর্শনও আবিষ্কার করিয়াছে। ধর্ম্ম, সমাজ, নারী, রাষ্ট্র, সমস্ত সেই দর্শনের ফাঁকে এক বিলাসীর নরক গড়িয়া তুলিতেছে। টলষ্টয় প্রচলিত জীবনের সর্ব্ব-দিকে বিদ্রোহের বাণী জাগাইয়া তুলিলেন। যে সাহিত্য সমগ্র মানবের কল্যাণের প্রেরণায় না লেখা হয়—তাহাকে তিনি পাপ বলিয়া প্রচার করিলেন। প্রত্যেক সাহিত্যিক যে কথা লিখিবেন—তাহার পিছনে যেন লেখকের পূর্ণ দায়িত্ব-জ্ঞান থাকে যে এই লেখা আর একজন লোকের জীবনে আলোড়ন আনিতে পারে; কল্পনার রঙীন্ খেলা খেলিতে হইলে—এ কথা স্মরণ রাখিতে হইবে যে সে খেলা তাহার একার মধ্যে আবদ্ধ নয়। যাহা চরম কল্যাণ—তাহাই চরম সুন্দর! মানবের লোভের পরিতৃপ্তি নাই এবং এই লোভের ইন্ধন জোগাইতেই মানুষ মানুষকে নিত্য অবমাননা করিয়া চলিয়াছে। জীবনের চারিদিকের বিলাসিতার আবহাওয়াকে ছিন্ন করিয়া তাহা সরল ও সহজ করিয়া আনিতে হইবে। দেহের পরিতৃপ্তি ব্যাপ্তির মধ্যে নাই—সেখানে যাহা থাকে তাহা দেহের বিকৃত ক্ষুধা। সামান্য শাকান্নে, পরিবারের সহজ প্রসন্নতার মধ্যে, নর-নারীর সংযত সম্বন্ধের মধ্যে দেহের পরিতৃপ্তি আছে। এবং মানুষের ব্যাপ্তির প্রয়োজন, তাহার অন্তরের ঐশ্বর্য্যে। বিংশ শতাব্দীর সকল বিষয়ে যে এক কুৎসিৎ যৌন ক্ষুধা বর্ত্তমান—টলষ্টয় তাহার মূল নির্দ্ধারণ করেন যে বিংশ-শতাব্দীর সভ্য মানব যে আবহাওয়ার মধ্যে প্রতিপালিত—তাহাতে তাহাকে যৌন ব্যাধিগ্রস্ত হইতেই হইবে। কৃত্রিম রঙ্, রূপ, সুর, গন্ধ, অনবরত তাহার শিরায় পিপাসা জোগায়। এবং সে দৈহিক শ্রমকে ঘৃণা করে। নিরুদ্ধ পিপাসা অনেক সময় সবল কর্ম্মের মধ্যে নিঃশেষিত হইয়া যায় কিন্তু এ ক্ষেত্রে তাহার কোনও উপায় না থাকার দরুণ মস্তিষ্কের পথ দিয়া এই পিপাসা নানারূপে ছড়াইয়া পড়ে। ইহার জন্য নাগরিক সভ্যতার বিলাস বিভ্রম হইতে দূরে প্রকৃতির অকৃত্রিম রঙ্, রূপ, সুর ও গন্ধের মধ্যে ডুব দিতে হইবে।

অনেকে বলেন যে টলষ্টয় নিজে যে বাণী বলিয়া গিয়াছেন—নিজে জীবনে তাহার প্রতিবাদ করিয়াছেন। ধনীদের তিনি ঘৃণা করিতেন—কিন্তু তিনি নিজে বিশেষ রকম ধনী ছিলেন। কৌমার্য্যের আদর্শ তিনি প্রচার করিবার পরও তাঁহার পুত্র-সন্তান হয়। কিন্তু যাঁহারা টলষ্টয়ের জীবনের সঙ্গে গূঢ়ভাবে পরিচিত তাঁহারা জানেন আজীবন এই লোকটী কি ভীষণ অন্তর্দ্বন্দ্বের জ্বালা ভোগ করিয়া আসিয়াছে। নিজের বাণীর সহিত নিজের জীবনকে এক করিবার জন্য তিনি যে কঠোর শাস্তি আপনার উপর দিতেন—তাহার কথা যাঁহারা জানেন তাঁহারা কখনই ওসব কথা উত্থাপন করিতে পারিবেন না। জীবনের শেষদিন পর্য্যন্ত এই অন্তর্দ্বন্দ্ব তাঁহাকে নিদারুণ ভাবে ভুগিতে হইয়াছিল। বিরাশী বৎসর বয়সের এক বৃদ্ধ একদিন রুষিয়ার শীত-রাত্রে জাগিয়া উঠিয়া আপনাকে প্রশ্ন করিয়াছিল—কেন সে ঘরের আগুণে আনন্দে ঘুমায়—বাহিরে যখন দরিদ্র পৃথিবী শীতে কাঁপিতেছে—

সেদিন সেই অশীতিপর বৃদ্ধ একখানি কাগজে লিখিলেন, "যে প্রশ্ন শৈশব হইতে আমাকে পীড়া দিয়া আসিতেছে—তাহারই সমাধানের জন্য আমি চলিলাম—কেহ যেন আমায় না খোঁজে—"

সেইদিন রাত্রে ছিন্নবাসে এক অশীতিপর বৃদ্ধ তুহিন-পাতের মধ্যে নিরুদ্দেশের পথে বাহির হইয়া পড়িয়াছিল। তুহিনেই তাহার সমাধি হয়।

১৯১০ সালের ১০ই নভেম্বর টলষ্টয় এক নির্জ্জন সরাইখানায় দেহ রক্ষা করেন। এই অন্তর্দ্বন্দ্ব টলষ্টয় জীবনকে আরও মহিমান্বিত করিয়া তুলিয়াছে।

আজ শতবর্ষ পরে, শক্তিহীন ব্যক্তিত্বহীন বাংলার অলস জীবনতট হইতে, বিংশ-শতাব্দীর হে চির-যোদ্ধা পুরুষসিংহ, তোমাকে অভিবাদন করি। বাংলা আজ বড় সকরুণ ভাবে চায় তোমার সবল, তেজস্বী তিক্তবাণী!

## স্বদেশে শহীদুল্লাহ্

ডাঃ মোহাম্মদ শহিদুল্লাহ্

বিদেশের জ্ঞানাধ্যয়ন সাঙ্গ করিয়া বহু ভাষাবিদ্ ডাঃ মৌলবী মোহাম্মদ শহিদুল্লাহ পুনরায় প্রায় আড়াই বৎসর পরে আমাদের মধ্যে ফিরিয়া আসিয়াছেন। প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয় হইতে সংস্কৃত ও তিব্বতীয় ভাষাতত্ব—আলোচনার জন্য ডি, লিট উপাধিতে তাঁহাকে ভূষিত করা হইয়াছে। তাহা ছাড়া তিনি তুলনামূলক ভাষাতত্ব, আবেস্তা, তিব্বতী ভাষা, বৌদ্ধধর্ম্ম ও প্রাচীন পারস্য ভাষা বিষয়ে বিশেষজ্ঞ হইয়া আসিয়াছেন। প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে শব্দমূলক ভাষাতত্বের জন্যও একটি উপাধি দিয়াছে এবং এই উপাধি ভারতবাসীদের মধ্যে তিনিই প্রথম পাইলেন। জার্ম্মানীর ফ্রাইবর্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে ছয়মাস কাল থাকিয়া বৈদিক সংস্কৃত, প্রাকৃত, উত্তর আর্য্য, আরবী ও সেমিটিক ভাষাতত্ব আলোচনা করিয়া বিশেষ সম্মানের সহিত ডক্টর অফ ফিলজফী উপাধি পাইয়াছেন। ভারত মাতার এই সুধী সন্তানের দীর্ঘ ও নিরাময় আয়ু আমরা কামনা করি।

## গৃহ-সংস্কারে আমীর আমানুল্লা

য়ুরোপ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া আমীর আমানুল্লা নূতন ভাবে আফগানিস্থানকে গড়িয়া তুলিতেছেন। আফগানিস্থানের প্রচলিত প্রতিনিধি সভার নাম জিরগা। এই জিরগায় স্থির হইয়াছে যে বর্ত্তমানে যে ভাবে শাসন-পরিষদে সভ্য নির্ব্বাচন হয়—তাহা প্রকৃত গণতন্ত্রের বিরোধী; সেইজন্য শাসন পরিষদের সভ্য নির্ব্বাচনের ভার অতঃপর সর্ব্বসাধারণের নির্ব্বাচনের ও ভোটের উপর নির্ভর করিবে। নূতন পরিষদে ১৫০জন সদস্য থাকিবে এবং প্রত্যেক তিন বৎসর অন্তর পুনঃনির্ব্বাচন হইবে। প্রাচীন কৃষ্ণবর্ণ পতাকার পরিবর্ত্তে নূতন ত্রিবর্ণ পতাকা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ১৭ বৎসর হইতে বিশ বৎসর পর্য্যন্ত প্রত্যেক সমর্থ আফগান যুবককে সামরিক শিক্ষা গ্রহণ করিতে হইবে। শিক্ষা-বিষয়ে পশ্চিমের বিশ্ববিদ্যালয়ের আদর্শে নূতন নূতন বিষয়ের অনুশীলনের জন্য নূতন নূতন বিশ্ববিদ্যালয় গড়িয়া তোলা হইতেছে এবং ষ্টেটের অর্থে বহু আফগান যুবককে বিবিধ বিষয়ে পারদর্শী হইবার জন্য য়ুরোপের বিভিন্ন বিশ্ব বিদ্যালয়ে প্রেরণ করা হইতেছে। প্রায় দুইশত আফগান যুবক রুষিয়ার বিভিন্ন বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিতেছে। নূতন চিকিৎসা ব্যবস্থা প্রবর্ত্তনের জন্য নানাস্থানে য়ুরোপীয় বৈজ্ঞানিক পন্থা অনুযায়ী হাসপাতাল তৈয়ারী করিয়া দিয়াছেন এবং আমীর স্বয়ং নিয়মিত ভাবে সেই সমস্ত হাসপাতালের কার্য্য পরিদর্শন করেন!

আমীর আমানুল্লা

## জগলুলের মৃত্যু-তিথি স্মরণে
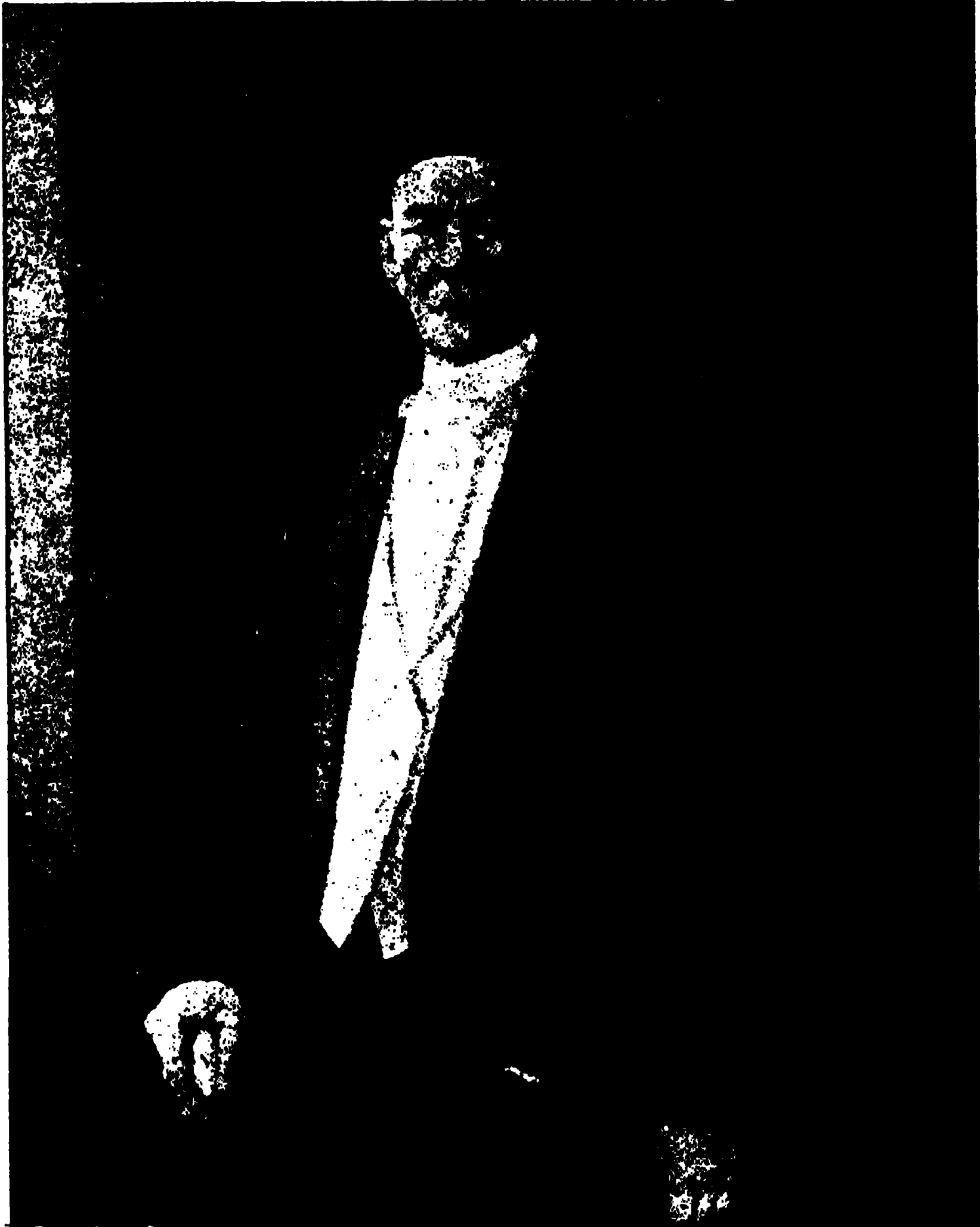
মিসরমণি জগলুল পাশা

আজ একটী পরিপূর্ণ বৎসর অন্তে মিসরের নর-নারী শোকাশ্রুর মধ্য দিয়া তাহার মাথার মণিকে স্মরণ করিতেছে। যে দীপ হইতে মিসরের যুবকেরা তাহাদের অন্তর জ্বালাইয়া লইয়াছিল—তাহা আজ অন্য এক দূরদেশে অনির্ব্বাণ জ্যোতিষ্ক-রূপে জ্বলিতেছে; তাহার অদৃশ্য আলো কিন্তু প্রত্যেক মিসরীয় যুবকের বুকে দহন-শিখা হইয়া জ্বলিতেছে। জগলুল মিসরের যৌবনকে জাগাইয়া দিয়াছেন এবং আজ সেই জাগ্রত যৌবনের মাঝে—তাঁহারই শিখা জ্বলিতেছে। বেগম জগলুল মিসরের স্বাধীনতা আন্দোলনের জননীরূপে জাগরণের সেই বাসনাকে প্রদীপ্ত করিয়া রাখিয়াছেন। তাই সেদিন কায়রোর শোক-সভায় তিনি বলিয়াছিলেন—মিসরকে ছাড়িয়া আমি কোথাও যাইতে পারিব না।

হয়ত জান্নাতে থাকিয়া জগলুলের আত্মা সেই কথারই প্রতিধ্বনি করিয়াছিল।

## ভারতের বাহিরে ভারতের প্রতিনিধি

গত কয়েক বৎসরের রাজনৈতিক ঘটনা পর্য্যালোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে জগতের আন্তর্জাতিক রাজনীতি সভায় ধীরে ধীরে কেমন করিয়া ভারতবর্ষ তাহার স্থান করিয়া লইতেছে। অবশ্য কিছুদিন আগেও য়ুরোপ আন্তর্জাতিক ব্যাপারে ভারতবর্ষকে অস্পৃশ্যদের কোঠায় ফেলিয়া রাখিয়াছিল, কিন্তু ধীরে ধীরে তাহাদের সে ভ্রান্তি বিদূরিত হইতেছে। য়ুরোপের সুধীবর্গ আজ বুঝিয়াছেন যে জগতের যে কোনও ব্যবস্থা করিতে হইলে—তাহাতে ভারতবর্ষের কি অভিমত তাহা জানা একান্ত প্রয়োজন। এতকাল ভারতের বাহিরে ভারতের স্বার্থের প্রতিনিধিরূপে ইংরাজ অথবা প্রভু-ভক্ত কোনও প্রজা নিয়োজিত হইত, এখন দেখা যাইতেছে যে ভারতবাসীই সেই সব সভায় ভারতের দাবীকে লইয়া গিয়া দাঁড়াইতেছে।

মিঃ পি, এন, মিত্র

সেই জন্য য়ুরোপীয় আন্তর্জাতিক সভায় অধুনা ভারতবর্ষকে ডাকিতে য়ুরোপের আর লজ্জা করে না। য়ুরোপে ব্রুসেলস্ শহরে যে বিরাট আন্তর্জাতিক টেলিগ্রাফ সভা হইতেছে—ভারতের পক্ষ হইতে তাহাতে টেলিগ্রাফের সহকারী ডিরেকটার মিঃ পি, এন, মিত্র মহাশয় যোগদান করিবেন। ষ্টেট সেটেলমেণ্টে ঔপনিবেশিক ভারতবাসীদের দাবী লইয়া বহুবার বহু গণ্ডগোল উপস্থিত হইয়াছে। এইবারে ষ্টেট সেটেলমেণ্টের ব্যবস্থা সভায় ভারতীয় ব্যাপারের প্রতিনিধিরূপে সুরাট-অধিবাসী মিঃ হোসেন হাসান আলী আবদুল কাদের, সভ্য নিয়োজিত হইয়াছেন। মিঃ হোসেন ব্যারিষ্টার হইয়া পেনাঙ্গে আইন-ব্যবসায় করিতে যান। আফগানিস্থানে যে নূতন শিক্ষা ব্যবস্থা হইতেছে—তাহাতেও ভারতবর্ষ তাহার স্থান পাইয়াছে। নূতন আফগান শিক্ষাবিভাগ ডাঃ সর্দ্দার আনোয়ারকে আহ্বান করিয়াছে। ইহার পূর্ব্বে তিনি দেরাদুন স্কুলের হেড মাষ্টার ছিলেন।

মিঃ হোসেন হাসান আলী আবদুল কাদের

ডাঃ সর্দ্দার আনোয়ার

# সমসাময়িক ভারত

বিলাতের ও ভারতের ইংরাজ রাজ-পুরুষেরা যখনই ভারতবাসীদের রাজনৈতিক অযোগ্যতার কথা তুলিয়াছেন—তখনই বলিয়াছেন—ভারতের ভাবী শাসন-পদ্ধতি কি হইবে —তাহা কোনও ভারতবাসী ঠিক করিয়া বলিতে পারে না। সেই দম্ভ-বাণীর উত্তর স্বরূপ পণ্ডিত মতিলাল নেহ্‌রুর সভাপতিত্বে নেহরু কমিটি ভারতের ভাবী শাসনপদ্ধতি গড়িয়া তুলিয়াছেন। সকল দিকের সকল কথার বিশেষ বিচার বিবেচনা করিয়া কমিটী সম্প্রতি তাঁহাদের রিপোর্ট প্রকাশিত করিয়াছেন। ভারতের সকল প্রদেশের প্রতিনিধিগণ লক্ষ্ণৌ শহরে সম্মিলিত হইয়া এই রিপোর্টকে সর্ব্ববাদীসম্মত বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে। ডাঃ আনসারী এই সর্ব্বদল-সম্মিলনের সভাপতি ছিলেন। প্রসঙ্গত বলা যাইতে পারে যে এবারকার কলিকাতা কংগ্রেসের সভাপতি রূপে পণ্ডিত মতিলাল নেহরু নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

সর্ব্বদল সম্মিলনের সভাপতি ডাঃ আনসারী

এদিকে যখন ভারতের ভাবী শাসনপদ্ধতি নির্দ্ধারণের জন্য ভারতের মহাপ্রাণ রাজনৈতিকগণ মাথা ঘামাইতেছেন অন্যদিকে সমাজের আর একটী দল সাইমন-কমিশনের কৃপার দিকে চাহিয়া আছেন। এই দলের অগ্রণী হইতেছেন স্যার মোহাম্মদ শফী এবং এই সহযোগিতার তিনি প্রত্যক্ষ ফলও পাইয়াছেন—আমীর আলীর শূন্য সিংহাসনে তিনি প্রিভি কাউন্সিলাররূপে নিযুক্ত হইয়াছেন।

মহামান্য আগা খাঁ

বিচিত্র খবর হইতেছে যে খোজা সম্প্রদায়ের যে সমিতি আছে—তাহার পক্ষ হইতে ট্রাষ্ট সম্পত্তি সম্পর্কে মহামান্য আগা খাঁর বিরুদ্ধে মামলা আনা হইয়াছে।

এবারে অল-ইণ্ডিয়া মুসলিম কনফারেন্সের অধিবেশন কাশ্মীরে হইয়াছিল এবং তাহার সভাপতি ছিলেন বারিষ্টার মিঃ সিদ্দীক হাসান। মিঃ সিদ্দীক হাসান এক সময়ে ব্যবস্থাপক সভার সভ্য ছিলেন এবং এখন লাহোরের মোসলেম ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়ার ডিরেক্টারদের তিনিই চেয়ারম্যান।

বর্ম্মা বহু দিক দিয়া জাগিয়া উঠিতেছে। বর্ম্মার নারীরা খুব দ্রুত জাগিয়া উঠিতেছে। সম্প্রতি কুমারী দ মি থি, বি, এ, বি, এল রেঙ্গুণ হাইকোর্টে বিচারপতির আসন অধিকার করিয়াছেন। ইনিই বোধ হয় ভারতের সর্ব্বপ্রথম মহিলা বিচারপতি।

মিঃ সিদ্দীক হাসান

প্রিভি কাউন্সিলার স্যার মোহাম্মদ শফী

কুমারী দ, মি থি—বিচারপতি

## আফগানিস্থানে নূতন হাসপাতাল
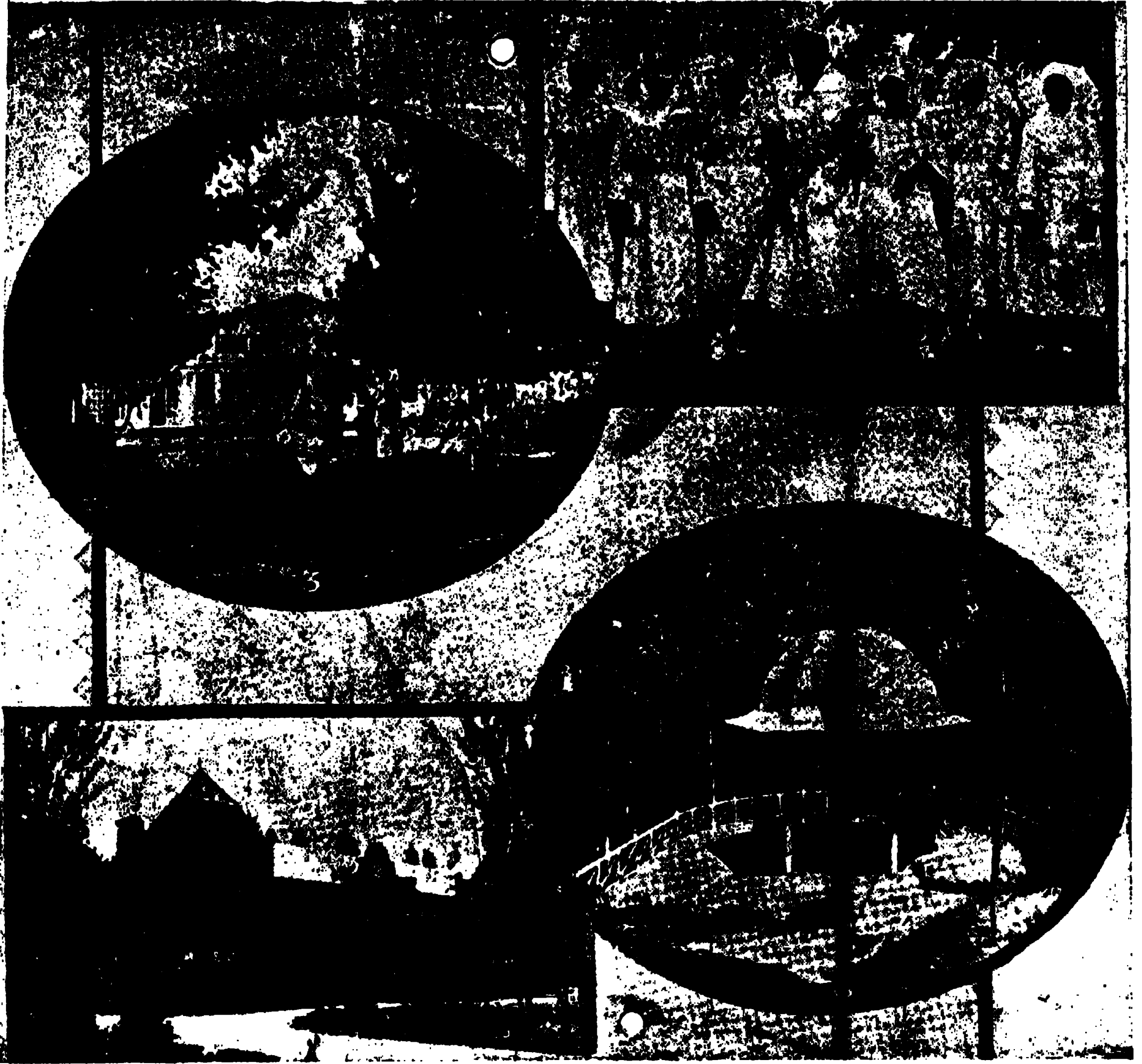
উপরের দিক হইতে—ডাইনে হইতে বামে ;—কাবুলের মহিলা হাসপাতালে স্বাস্থ্য বিভাগের মন্ত্রী সহ উক্ত হাসপাতালের নার্সগণ ; শিশু বিভাগের নার্সগণ শিশুদের লইয়া উদ্যান-ভ্রমণ করিতেছে।

নীচের দিকে ;—হাসপাতালের মধ্যস্থিত রোগীদের বিশ্রাম স্থান ; হালিমা খানম হাসপাতালের বহির্দৃশ্য।

নব-প্রতিষ্ঠিত রাজধানী দারুল-আমানে আমীর আমানুল্লা য়ুরোপীয় বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুযায়ী নূতন নূতন হাসপাতাল ও চিকিৎসা শিক্ষার জন্য নূতন নূতন প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তুলিতেছেন। নারীদের জন্য আলাদা চিকিৎসালয়ের বন্দোবস্ত করা হইয়াছে এবং আফগান ও তুরস্ক নারীদের নার্স করিয়া গড়িয়া তুলিবার জন্য কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। হেরাট গজনী প্রভৃতি শহরে এইরূপ প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তোলা হইতেছে। নবীন রাজধানীকে সভ্য জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নগরীতে পরিণত করিবার জন্য আফগান শাসন বিভাগ সর্ব্বদাই সচেষ্ট রহিয়াছেন। এই সমস্ত অদ্ভুত সংঘটনের জন্য একমাত্র আমানুল্লার অপূর্ব্ব ব্যক্তিত্ব ও কর্ম্মশক্তি দায়ী। সত্যকারের গণশক্তিতে তিনি বিশ্বাস করেন এবং সেইজন্য তিনি স্বয়ং সম্রাটের সমস্ত ঐশ্বর্য্যের আয়োজন পরিত্যাগ করিয়া অতি সাধারণ বেশে আফগান নাগরিকদের সহিত এক হইয়া মিশিতেছেন। পারস্যের রাজধানী তেহেরাণ হইতে কাবুল পর্য্যন্ত দীর্ঘ তিন সহস্র মাইল কখনও:মরুভূমির মধ্য দিয়া,

কখন বন্ধুর পাহাড়ের পথ দিয়া আমীর সাধরণ নাগরিকের মত আপনি মোটর চালাইয়া আসিয়াছেন। পথে তিনবার মোটরের টায়ার নষ্ট হইয়া যায় এবং তিনবারই তিনি আপনি নামিয়া নিজ হস্তে চাকা মেরামত করেন। পথে যেখানে বাজার দেখিয়াছেন স্বয়ং সেই সব স্থলে নামিয়া বাজার করিয়াছেন। শাসক ও শাসিতের মধ্যে এতখানি নৈকট্য যে কোনও জাতিকে জাগিবার একটা তীব্র ও সহজ প্রেরণা আনিয়া দেয়। সৈন্য বিভাগেও তিনি নজর দিয়াছেন। এইবারকার য়ুরোপ যাত্রার সময় তিনি ফরাসী দেশ হইতে ৫০,০০০ রাইফেল ক্রয় করিবার বন্দোবস্ত করিয়া আসিয়াছেন। যে সমস্ত নামের ও খেতাবের মিথ্যা মোহ এতদিন সাধারণ নাগরিকদের শাসকবর্গদের সহিত একটা ব্যবধানের সৃষ্টি করিয়া আসিতেছিল—আমীর তাহা একেবারে তুলিয়া দিয়াছেন। কাহারও কোনও পদবীর বোঝা থাকিবে না—সকলেই এক রাজ্যের প্রজা—ইহার অধিক খেতাব আর কাহারও হইতে পারে না। তবে কোনও মহৎ অথবা জনহিতকর কার্য্যের সম্মান স্বরূপ ষ্টেট হইতে অর্থ অথবা জমি দেবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। একটা জাতি যখন জাগে, তখন এমনি ভাবেই জাগে।

ডাইনে হইতে বামে;—আমীর আমানুল্লা খাঁ নব রাজধানী দারুল আমানের ভিত্তি পত্তন করিতেছেন; কাবুলে মহিলা হাসপাতাল।

আল স্মিথ। আমেরিকা যুক্ত-রাষ্ট্রের
প্রেসিডেন্টের পদ প্রার্থী।

# কর্ম্ম-বীর হেনরী ফোর্ড
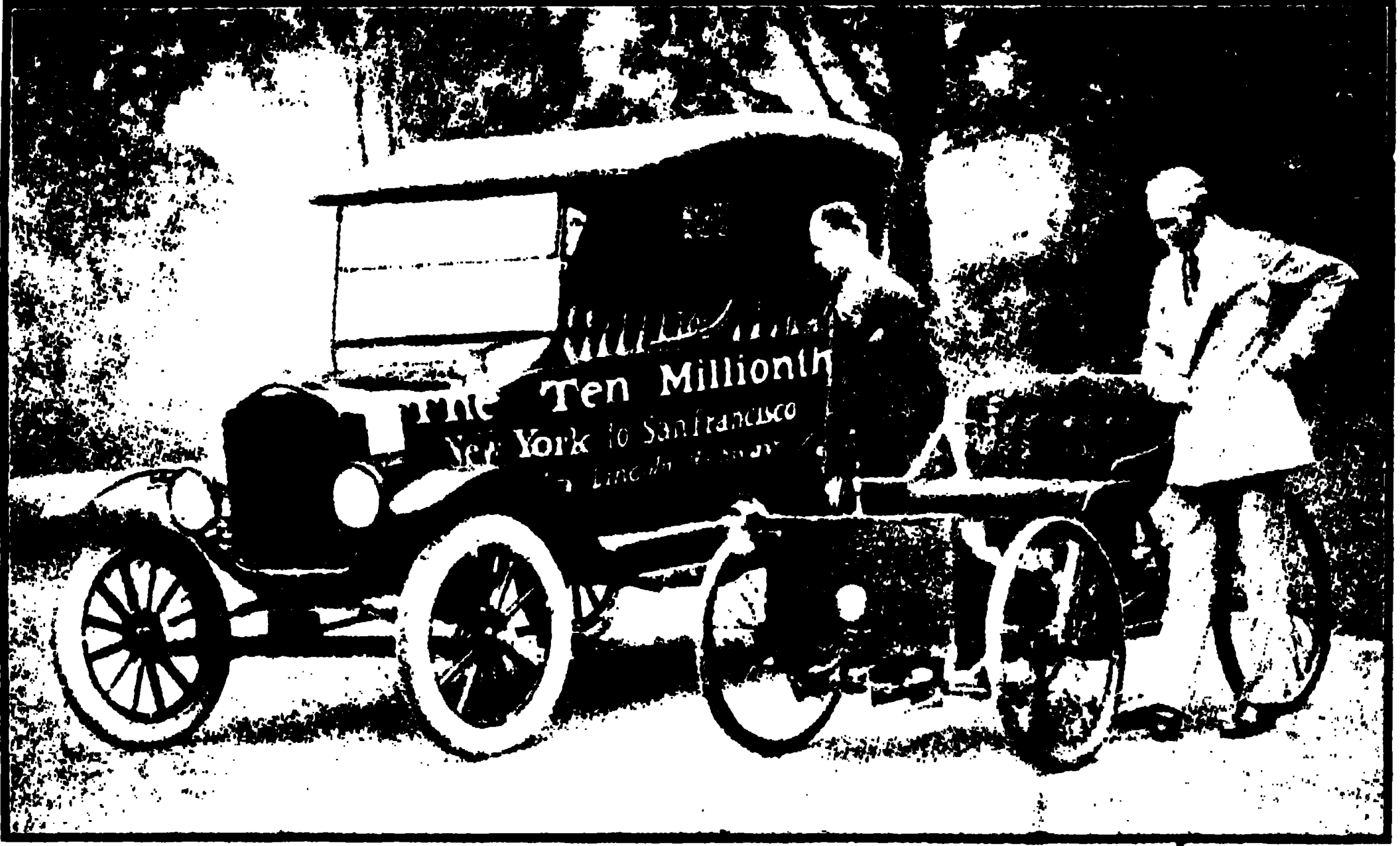
হেনরী ফোর্ড তাঁহার পুত্রের সহিত আপনার সৃষ্ট জীবটীকে লক্ষ্য করিতেছেন। হেনরী ফোর্ড যে মটরটীর গায়ে ভর দিয়া দাঁড়াইয়া আছেন—তাহা তাঁহার প্রথম সৃষ্টি। ছেলেটী—সর্ব্বশেষ ফোর্ড গাড়ীখানিকে ভর দিয়া আছে। তাহার ধারাবাহিক নম্বর ১ কোটী। প্রথম গাড়ী ও শেষ গাড়ির মধ্যে এক কোটী গাড়ী তৈয়ারী হইয়াছে।

ফোর্ড মোটর গাড়ীর সম্পর্কে আমরা সকলে হেনরী ফোর্ডের নাম শুনিয়াছি। হেনরী ফোর্ডের জীবন-কথা ও তাঁহার উন্নতির বিষয়ে ভাবিলে মায়া বলিয়া মনে হয়। সামান্য একজন কৃষকের পুত্র হইতে আজ হেনরী ফোর্ড জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধনী হইয়াছেন এবং তাহা কোনও দৈব উপায়ে নয়—সম্পূর্ণ দেহের ও মস্তিষ্কের শ্রমের দ্বারা। আজ শুধু ধনী বলিয়া নয় হেনরী ফোর্ড সভ্য-জগতের উপর তাঁহার অপূর্ব্ব কর্ম্ম-প্রতিভার বলে রীতিমত প্রভাব বিস্তার করিতেছেন। আজও বার্দ্ধক্যের সীমা-প্রান্তে উপনীত হইয়াও এই লোকটীর কর্ম্ম-প্রতিভার বিন্দুমাত্রও হ্রাস হয় নাই। ফোর্ড গাড়ীর ব্যাপার ছাড়িয়া দিয়া হেনরী এখন তাঁহার বিরাট কারখানাকে জগতের অন্য কোনও নূতন কাজে লাগাইবার জন্য ভাবিতে-ছেন। তিনি প্রচার করিয়াছেন যে নিজে কৃষকের ছেলে হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলাম— ; আজ জীবনের শেষে বিজ্ঞানের সহায়তায় সেই কৃষির কার্য্যকে কি ভাবে সহজে বহুগুণে কল্যাণকর করিয়া তোলা যায়—তাহার চিন্তায় আমি মগ্ন। সম্প্রতি তিনি ঘোষণা করিয়াছেন যে গরু যেমন স্বাভাবিক উপায়ে ঘাস ও তরিতরকারীর সাহায্যে দুধ দেয় —সেই রকম যন্ত্রের সাহায্যে উক্ত বস্তু হইতে দুগ্ধ প্রস্তুত করা যাইতে পারে। এই সমস্ত লোকের কথা শুনিয়া মাঝে মাঝে মনে হয়—ইহারা বিজ্ঞানকে কোথায় লইয়া যাইবে—কে জানে। হেনরী ফোর্ড তাঁহার জীবনের শেষে আসিয়া তাঁহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষাকে রূপ দিতে গিয়া বলিয়াছেন, "প্রত্যেক মানুষ আপনার কর্ম্মের দ্বারা জগতের সব চেয়ে প্রয়োজনীয় সেবা করিয়া যাইতে পারে।" ফোর্ডের দৈনিক আয়ের সম্বন্ধে আমেরিকার নানা কাগজে নানা রকম গবেষণা বাহির হয়। সম্প্রতি একটী কাগজ ঘোষণা করিয়াছে যে, ফোর্ডের দৈনিক আয়—বারো লক্ষ টাকা। ইহা সত্য হইলেও আমাদের অবিশ্বাস হয়।

# 'আরও কিছু আছে ভাই'

মোয়াহেদ্ বখ্ত্ চৌধুরী

অমর হইয়া কাটায়েছে কেহ শুনি নাই কোন-কালে,
মৃত্যু আসিয়া উঁকি মারে নিতি জীবন অন্তরালে।
তবু মোরা গান গাই,
মরণের পর নূতন রকম আরও কিছু আছে ভাই!
মৃত্যু সে চির-আঁধারের সাথী বলিয়াছে বটে কেহ,
সকলেই বলে, 'আছে অগণন আলোক-শোভিত গেহ।
সেথায় যে ফুল একবার ফোটে শুকায়না কভু আর,
নিত্য নবীন জীবন আনিছে মৃদু-বায় অমরা-র।
যৌবন কভু লুপ্ত না হয় নিতি চলে উৎসব-মেলা,
ধরার মানুষ পরীদের সাথে খেলে সেথা কত খেলা।'
সুমুখে চলেছি তাই—
মরণের পর পাইব জীবন অনন্ত পরমাই!
জীবন জুড়িয়া অভাব বিরহ, তবু মুখে ফোটে হাসি;
ধরার বাগানে ফুটাইয়া তুলি পারিজাত রাশি রাশি!
মোদের ক্ষণিকা-প্রিয়ারে জানাই পরাণের ভালোবাসা,
মরণের পর অমর করিয়া পাইব এমনি আশা!
এতখানি স'য়ে যাই,
তমসার পারে ভোগের জীবনে আরও কিছু পাব তাই।

## গরুর দুধের উপকারিতা

সম্প্রতি ইংলণ্ডের কৃষি-বিভাগের মন্ত্রী মহাশয় ইংলণ্ডে অধিকতর গো-দুগ্ধ ব্যবহারের জন্য এক আন্দোলন সুরু করিয়াছেন। সেই প্রসঙ্গে তিনি বলিতেছেন,—

"এই আন্দোলনকে জাতির মঙ্গলকার্য্যে পরিণত করিতে হইলে সর্ব্বশুদ্ধ ১০০,০০০ পাউণ্ড লাগিবে। অন্যান্য দেশের তুলনায় দেখা যায় ইংরাজারা কম দুগ্ধ খায়। আমেরিকা এবং অন্যান্য দেশে প্রতিদিন প্রতি শিশু এক পাইণ্ট করিয়া খাঁটী দুগ্ধ সেবন করে; সে জায়গায় ইংরাজ শিশু এক পাইণ্টের তিন ভাগের এক ভাগ খায়। পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে, যাহারা নিয়মিত আহারের ব্যবস্থার উপর প্রত্যহ এক পাইণ্ট করিয়া বেশী দুধ খাইয়াছে—তাহারা বৎসরে ৭ পাউণ্ড করিয়া ওজনে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে—আর যাহারা দুগ্ধ সেবন করে নাই—তাহারা মাত্র ৩৫০ পাউণ্ড বাড়িয়াছে। শুধু দুগ্ধের সারবত্তার জন্য নয়—"দুগ্ধ বেশী খাওয়ার" এই আন্দোলন চালাইতে পারিলে দেশের কৃষি-বিভাগীয় অন্যান্য শিল্প ও বাণিজ্য দিন দিন উন্নত হইবে।"

আমরা এখানে বসিয়া ভাবি যে আমাদের গরুরাই দু'মুঠা কচি ঘাস ভাল করিয়া খাইতে পায় না—আমরা দুধ খাইব কি?

## আমি কে?

য়ুরোপীয় জাতির স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য য়ুরোপে নানা দিক দিয়া নানা উপায় দেশের চিন্তাবীরেরা উদ্ভাবন করিতেছেন। আমেরিকায় বহু স্বাস্থ্য-সমিতিও স্থাপিত হইয়াছে। এই সমস্ত স্বাস্থ্য-সমিতি হইতে নিয়মিত ভাবে এক প্রকারের স্বাস্থ্য-সাহিত্য লোকের ঘরে ঘরে বিতরণ করা হয়। সম্প্রতি আমরা এই প্রকারের একখানি স্বাস্থ্য-পত্র পাইয়াছি। তাহাতে লেখা,—

"আমি কে বল তো?"

জগতের মধ্যে আমি সকলের চেয়ে সুলভ—এত সুলভ যে আমার দাম নাই বলিলেই চলে।

"কিন্তু আমার সহায়তায়ই মানুষ পাহাড় ভাঙ্গিয়াছে, পাখীর সঙ্গে পাখীর মত উড়িয়াছে; জগতে অসাধ্য সাধন করিয়াছে।"

"সকল সুখের আমি ভিত্তি। আমি না থাকিলে যৌবন শুকাইয়া যায়—বার্দ্ধক্য মৃত্যুমলিন হয়।"

"আমি তোমার নিকট বহুবার আসিতে চাহিয়াছি—তুমিই অবহেলা করিয়া আমাকে ফিরাইয়া দিয়াছ। আমি ক্ষুব্ধ হইয়াছি; কিন্তু একদিন তুমি আবার আমার কাছে ভিক্ষা করিতে আসিবে; কিন্তু একবার অপমানিত হইলে আমি আর ফিরিয়া চাহি না।

"প্রভাতের সূর্য্যালোক আমি! রাত্রির তারায়-ভরা নীল আকাশ আমি!

"জীবনের স্বপ্ন-পুরীর চাবি আমারই হাতে—নিখিলের ঐশ্বর্য্যের আমিই প্রতিভূ!

আমার নাম স্বাস্থ্য!"

---

## অন্ধদের গ্রন্থাগার

অন্ধদের শিক্ষা সমস্যা লইয়া সভ্য জগৎ নানা প্রকারের শিক্ষা বিষয়ক গবেষণা করিতেছে। জার্ম্মাণী এই ব্যাপারে অগ্রদূত। সম্প্রতি অন্ধদের সুবিধার জন্য তাহারা এক প্রকারের বিশিষ্ট কাগজে ডট-ওয়ালা নূতন টাইপ আবিষ্কার করিয়াছে। এই সমস্ত টাইপগুলি কাঠের তৈরী এবং আসল টাইপ বসাইয়া অন্ধদের জন্য তাহারা বিশেষ করিয়া পুস্তক তৈয়ারী করিতেছে। এই প্রকারের বহু পুস্তক হওয়া বিশেষ ব্যয়সাধ্য বলিয়া তাহারা হামবার্গ শহরে এই সমস্ত পুস্তক সংগ্রহ করিয়া একটী স্কুল ও তৎসংলগ্ন একটী গ্রন্থাগার নির্ম্মাণ করিয়াছে। Braille নামক একজন বৈজ্ঞানিক এই টাইপ আবিষ্কার করেন বলিয়া ইহাদের Braille টাইপ বলা হয়। যে সমস্ত লোক জীবনের মধ্যভাগে আসিয়া দৈবদুর্ব্বিপাকে অন্ধ হইয়া গিয়াছে—তাহারা এই গ্রন্থাগারের সহায়তায় তাহাদের জ্ঞানার্চ্চনা যাহাতে অব্যাহত ভাবে চালাইতে পারে তাহারও চেষ্টা হইতেছে।

---

## ভারতবর্ষের সূতা ও কাপড়

ভারতবর্ষের কল কারখানায় বস্ত্রবয়নে সূতা প্রস্তুতের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইতেছে। পাঠকগণ শুনিয়া সুখী হইবেন যে গত মহাযুদ্ধের পূর্ব্বে এবং সেই সময় যে পরিমাণ সূতা প্রস্তুত হইত বর্ত্তমানে তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক সূতা প্রস্তুত হইতেছে। সরকারী ষ্টেটিষ্টিকস হইতে নিম্নে তাহার সবিশেষ হিসাব দেওয়া গেল :—

| | |
|---|---|
| মহা যুদ্ধের পূর্ব্বে | ৬৪৬, ৭৫, ৭০০০ পাউণ্ড |
| " " সময়, | ৬৬৬, ২২, ৭০০০ " |
| " " পর | ৬৬২, ৫১, ০০০০ " |
| ১৯২৫-২৬ সনে | ৬৮৬, ৫১, ০০০০ " |
| ১৯২৬-২৭ সনে | ৮০৭, ১১, ৬০০০ " |

হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে যে গত ৫ বৎসরের প্রতি বৎসরে ভারতবর্ষে ৭২৫০ লক্ষ পাউণ্ড অধিক সূতা তৈয়ার হইয়াছে। ভারতবর্ষের অধিকাংশ কাপড়ের কলই বোম্বাই প্রেসিডেন্সীতে অবস্থিত। কাজেই বেম্বাইতেই বেশী পরিমাণ প্রস্তুত হইয়া থাকে। বোম্বাই এবং ভারতের অন্যান্য প্রদেশে যে পরিমাণ সূতা ও কাপড় তৈয়ারী হয় নিম্নে তাহার হিসাব দেওয়া গেল :—

| | সূতা | কাপড় |
|---|---|---|
| বোম্বাই | ৩,৫০ লক্ষ পাঃ | ৯৫ ক্রোর পাঃ |
| আমেদাবাদ | ৯ ক্রোর " | ৪৫ " " |
| পশ্চিম ভারতের অন্যান্য স্থানে | ১২ ক্রোর " | ৩০ " " |
| উত্তর ভারত | ৬ " " | ১০ " " |
| দক্ষিণ " | ১০ " " | ১০ " " |

---

## কুড়ি হাজার বছরের কঙ্কাল

মঙ্গোলিয়া অভিযানের নেতা ডাঃ চ্যাপম্যান এণ্ডরুজ আবিষ্কার করিয়াছেন যে, প্রায় কুড়ি হাজার বছর পূর্ব্বে মাঙ্গোলিয়ায় অন্ধকার-যুগের মনুষ্য কুলের বাস ছিল। তাঁহারা সেখানে বিরাটকায় সরীসৃপ এবং হস্তী জাতীয় জীবের কঙ্কাল উদ্ধার করিতে সমর্থ হইয়াছেন। নর-কঙ্কালের চিহ্ন সেখানে এত পাওয়া গিয়াছে যে, তাঁহারা তাহা হইতে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, চীনের সীমা হইতে সাইবেরিয়া পর্য্যন্ত সমস্ত ভূখণ্ডে মানুষের বসতি ছিল। তারপর হাজার হাজার পাথরের অস্ত্র, অসংখ্য বাড়ীঘর, চুল্লী এবং পাখী, ভেক ও বন্য গর্দ্দভের অস্থি পাওয়া গিয়াছে। শৃগালের দন্ত নির্ম্মিত কণ্ঠহার, ছিদ্রযুক্ত ঝিনুক এবং বৃহৎ উটপাখীর ডিমের টুক্‌রা ইত্যাদিও পাওয়া গিয়াছে। বাড়ীগুলি সমস্তই শুষ্ক হ্রদের পারে বালুচরের নিকট অবস্থিত। গাছের ডালের উপর চামড়া দিয়া ছাইয়া এই সব গৃহ নির্ম্মিত হইয়াছিল।

এই যুগের পূর্ব্ববর্ত্তী মৌসটেরিয়ান সভ্যতার চিহ্নও কিছু কিছু পাওয়া গিয়াছে।

৯০টি কঙ্কালাবশেষ আবিষ্কৃত হইয়াছে। তন্মধ্যে দুইটি মাথার খুলি এবং একটি পশুর কঙ্কাল। কঙ্কালটি প্রায় ২৫ ফিট লম্বা। একটি বৃহদাকার হস্তীজাতির প্রাণীর মাথা পাওয়া গিয়াছে। ইহার খুলিটি প্রায় ৬ ফিট।

মোট ৫০০০ মাইল ব্যাপিয়া এই অভিযান চলে। ইহারা অনেক স্থানের মানচিত্র লইয়াছেন। স্থানে স্থানে বালুকা-ভূমির মধ্যে ইঁহাদিগকে ঝড়েও পড়িতে হইয়াছে। মঙ্গলিয়া পৌঁছান পর্য্যন্ত এই ঝড় সমানে চলিয়াছে।

---

## জার্ম্মাণীর যুবক আন্দোলন

১৮৯৬ সালে বার্লিনের উপকণ্ঠে ষ্টেগ্‌লিজ সহরে কার্ল ফিসার নামে একজন যুবক একটা যাযাবর ক্লাব গড়িয়া তোলে। সেই ক্লাবে সাধারণতঃ তখন সর্টহ্যাণ্ড শিক্ষা দেওয়া হইত। কার্লফিসার স্কুলের স্থায়ী ঘর হইতে ছাত্রদের লইয়া মুক্ত প্রান্তরে পাহাড়ে পাহাড়ে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। আশে পাশের নগরের ছাত্ররাও এই ব্যাপারের মধ্যে সহসা একটা নূতন জীবনের স্পন্দন পাইল। তাহারাও কার্লফিসারের যাযাবর দলে যোগদান করিতে লাগিল।

তাহারা আপনাদের একটা নাম ঠিক করিয়া লইল। জগতের কাছে তাহারা আপনাদের Wandervogel অর্থাৎ যাযাবর বিহঙ্গম নামে পরিচয় দিল। বদ্ধ জীবনের শত বাধা-নিষেধের নিয়ম-কানুন হইতে প্রকৃতির নিবিড় বাধা-হীনতার মধ্যে আপনাদের জীবনকে পরিপূর্ণরূপে ফিরাইয়া পাইবার জন্য এই দল গড়িয়া উঠে। জার্ম্মাণ-জীবনের কঠোরতার ইহা এক স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া।

কার্ল ফিসার একজন পাকা আদর্শবাদী। ছুটীর সময় ছেলেদের সঙ্গে লইয়া হয়ত দূর পর্ব্বতের দিকে অভিযানে চলিলেন—যেখানে রাত্রি আসিয়া পড়িল, সেইখানে তাঁবু ফেলিয়া বনের কাঠ জ্বালাইয়া পরমানন্দে রান্না চলিল। কুণ্ঠাহীন হইয়া কার্ল ছেলেদের সঙ্গে তাহাদের রঙ্গরসে মাতিয়া উঠিলেন এবং সেই খেলার ছলে আপনার প্রাণের উচ্ছল বেগ সকলের মধ্যে সঞ্চারিত করিতে লাগিলেন। আহারান্তে সকলে মিলিয়া গান ধরে, নাচে, হাসে—প্রকৃতির মাতৃবক্ষে সকলে আবার ঘুমাইয়া পড়ে। পুরাতন ধরা বাঁধা গান প্রথম প্রথম গাহিতে গিয়া দেখা গেল যে, তাহাদের সুরের সহিত এ জীবনের যেন যোগ নাই। যে সমস্ত পল্লীর মধ্য দিয়া তাহারা যাইত—সেখানকার চাষাদের মধ্যে তাহারা এক অভিনব সুরের সাক্ষাৎ পাইল। জার্ম্মাণ লোক সঙ্গীতের সহিত তাহারা পরিচিত হইল। চাষাদের নিকট গান-সংগ্রহ ও শিক্ষা করিয়া তাহারা তাহাদের নূতন গান গড়িয়া তুলিল। এই সমস্ত লোক-সঙ্গীতের সংগ্রহ—পরে তাহাদের অন্যতম দলপতি Hans Breuer প্রকাশিত করেন।

ক্রমশঃ ক্রমশঃ কার্লের আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া জার্ম্মাণীর অনেক পণ্ডিত ও জ্ঞানী ব্যক্তি তাহাদের দলে যোগদান করেন। Janson নামে একজন ধনী ব্যক্তি তাঁহার সমস্ত অর্থ এই দলের সংগঠনের জন্য দান করেন। অবশ্য নানাদিক দিয়া এই নবীন আন্দোলনকে অনেক আঘাত সহ্য করিতে হইয়াছিল।

১৯১৩ সালে লিপজিগ যুদ্ধের শতবার্ষিক উৎসবের দিন আসিল। শতবর্ষ আগে একদিন যৌবন-গুরু ফিক্‌টের প্রভাবে জার্ম্মাণীতে যুবকদের মধ্যে নব জীবনের প্রেরণা জাগিয়াছিল। সেই দিনকে স্মরণ করিবার জন্য জার্ম্মাণীর ছাত্র মহলে চারিদিকে ভীষণ সাড়া পড়িয়া গেল। এই সমস্ত উৎসবে পুরাতন-পন্থী ছাত্রের দল উৎসবের আনন্দকে ফেনিল মত্ততায় পরিণত করিত। তাহাদের বিরুদ্ধে Wandervogel দল Hohen moiss নামক পর্ব্বতে সকলে সমবেত হইয়া এক নূতন দল গঠন করিল। তাহারা আপনাদের নাম দিল Freideutche Jugend স্বাধীন জার্ম্মাণ যুবক। তাহাদের বাণী হইল, "অন্তরের সত্য স্পৃহার প্রেরণায় এবং আপনাদের দায়িত্ব-জ্ঞানের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া নবীন জার্ম্মাণ যুবক তাহার জীবন আপনি গড়িয়া লইবে। অন্তরের এই সত্যচেতনার জন্যই তাহারা সকল সময়েই সকলের সঙ্গে অকুণ্ঠিত চিত্তে মিলিত থাকিবে।"

১৯১৪ সালে রণ-দেবতা জাগিয়া উঠিল—রাইন নদীর তীরের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য তাহারাও সকলে সঙ্গীণ কাঁধে লইল। এই যাযাবরের দল জার্ম্মাণ-সৈন্য-জীবনের উপরেও প্রভূত প্রভাব বিস্তার করে; এমন কি যুদ্ধের সময়ে সাধারণতঃ গীত সঙ্গীতের পরিবর্ত্তে তাহাদের সংগৃহীত বহু সঙ্গীত গ্রহণ করা হয়। জার্ম্মাণ-যুদ্ধের সময় এই যুবকের দল অন্ধ-ভাবে জাতিয়তার নিকট আত্ম সমর্পণ করে নাই। জার্ম্মাণীর যুদ্ধ পিপাসা যখন উদগ্র, তখন তাহাদের এক দলপতি জীবনের মায়া পরিত্যাগ করিয়া প্রকাশ্য ভাবে এক যুদ্ধ সভায় বলে, "তোমাদের পৃথিবীতে আমরা থাকিতে চাই না। আমাদের জীবন দিয়া তোমাদের পাপের বেসাতি ক্রয় করিতে দিব না। আমাদের আত্মাই যদি কলুষিত হইয়া গেল—কি হইবে বিশ্ব ব্যাপী জার্ম্মাণ সাম্রাজ্যে ?" —স্বদেশী বাজার

আলোচনা

## ধর্ম্ম ও সমাজ

মিঃ এস, ওয়াজেদ আলী ছাহেবের "ধর্ম্ম ও সমাজ" শীর্ষক প্রবন্ধ ভাদ্রের মাসিক মোহাম্মদীতে প্রকাশিত হইয়াছে। লেখক এই প্রবন্ধে নব্যতান্ত্রিকদিগের চিন্তার ধারাকে যেরূপ সুন্দর ও সংযত ভাবে প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা বাস্তবিকই তাঁহার পক্ষে খুব গৌরবের কথা। পূর্ব্বেই বলিয়াছি—নব্যতান্ত্রিকদিগের যুক্তি ধারার বিচার মীমাংসার জন্য আমরা এই প্রবন্ধটী সম্পূর্ণভাবে মোহাম্মদীতে প্রকাশ করিয়াছি। এই প্রবন্ধের যুক্তি প্রমাণ ও সিদ্ধান্তগুলির অনুকূলে ও প্রতিকূলে আমাদের বলিবার কথা অনেক আছে—ইহাও আমরা পূর্ব্বে আরজ করিয়াছি।

মিঃ ওয়াজেদ আলী এই প্রবন্ধে এছলাম ধর্ম্মের (১) বৈজ্ঞানিক ও ঐতিহাসিক দিক (২) ব্যবহারিক দিক, এবং (৩) আধ্যাত্মিক দিক সম্বন্ধে অনেকগুলি প্রসঙ্গ লইয়া অল্পবিস্তর আলোচনা করিয়াছেন। ধর্ম্ম শাস্ত্রে বর্ণিত পুরাতন ইতিবৃত্তের আলোচনা তাহাতে আছে, কোরআনে প্রকাশিত বৈজ্ঞানিক প্রসঙ্গের অবতারণা তাহাতে আছে, এজমা ও কিয়াছের বিচার মীমাংসা তাহাতে আছে, এছলামের আধ্যাত্মিক দিকের সাধারণ পরিচয়ও তাহাতে আছে। সুতরাং এই প্রবন্ধের সম্যক ও যথাযথ সমালোচনা যে কিরূপ বিরাট ব্যাপার, তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। বিশেষতঃ সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্য ক্রমে এছলামের ঐ সব ওছুলের সূক্ষ্ম ও সবিস্তার আলোচনা করার সুযোগ যাহাদের ঘটিয়াছে, চোখ বুঁজিয়া তাহার মধ্যকার কোন বিষয়ের অনুকূলে বা প্রতিকূলে হঠাৎ কোন কথা বলিয়া ফেলা, তাহাদের পক্ষে কখনই সম্ভবপর হইয়া উঠে না। এই প্রসঙ্গে আর একটা খুব দরকারী কথা এই যে, সমাজের চিন্তাশীল ও ক্ষমতাশালী লেখকগণকে আমরা এই শ্রেণীর গভীর বিষয়ের আলোচনায় নিবিষ্ট দেখিতে চাই। এই সকল গুরুতর বিষয়ের বিচার ও মীমাংসার জন্য নিজেদের সাধনার ফলগুলি লইয়া তাঁহারা সমাজকে সত্য ও মঙ্গলের পথ দেখাইয়া দিন, তাঁহাদের খেদমতে প্রথমেই এ প্রার্থনা জানাইয়াছি এবং আমরা তাঁহাদের অনুগ্রহের অপেক্ষা করিতেছি।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, "মিঃ ওয়াজেদ আলীর যুক্তিবাদের ধারা এবং তাঁহার কতকগুলি সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে আমাদের গুরুতর আপত্তি আছে।" উদাহরণ স্বরূপ আজ প্রাথমিক অংশের দুই একটা প্রসঙ্গের উল্লেখ করিতেছি।

লেখক মহোদয়ের যুক্তিবাদের ধারা সম্বন্ধে আমাদের একটা বড় আপত্তি এই যে, অনেক স্থলেই তিনি উপমা ও উদাহরণকে প্রমাণের আসনে বসাইয়া দিয়াছেন। আমাদের মতে, দার্শনিক যুক্তি প্রমাণ মাত্রের উপর যে আলোচনার ভিত্তি স্থাপন করা হয়, তাহাতে ঐ শ্রেণীর উপমা-উদাহরণের স্থান হইতে পারে না। এক্ষেত্রে সর্ব্বদাই স্মরণ রাখিতে হইবে, যে আলোচনার এই ধারাটা অধিকাংশ স্থলে বিচারবিভ্রমেরই সহায়তা করিয়া থাকে। অধিকন্তু প্রতিবাদীদিগের পক্ষেও ঐ শ্রেণীর উপমা-উদাহরণ দ্বারা স্বপক্ষ সমর্থনের প্রয়াস পাওয়াও কখন কষ্টকর হয় না।

তাহার পর, ঐ উপমাগুলি সম্বন্ধে একটু গভীরভাবে

চিন্তা করিয়া দেখিলে সহজে জানা যাইবে যে, উপমানের সহিত উপমেয়ের সামঞ্জস্য মোটেই নাই। প্রমাণ স্বরূপ তাঁহার প্রথম ভাগের দুইটা উদাহরণ তাঁহারই ভাষায় উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি :—

"লেখক আত্মপ্রকাশ করেন তার গ্রন্থের মধ্যে। Platoর Republic পড়ে আমরা বুঝতে পারি দার্শনিকপ্রবর এই গ্রন্থের মধ্যে তাঁর সমস্ত প্রাণটাকে ঢেলে দিয়েছেন। অন্য কথায় এই গ্রন্থের মধ্যে পূর্ণরূপে তিনি আত্মপ্রকাশ করেছেন। কিন্তু সমস্যা হচ্চে গ্রন্থের কোন অংশের মধ্যে তিনি আত্মপ্রকাশ করেছেন! গ্রন্থের কাগজগুলির মধ্যে অবশ্য তিনি আত্মপ্রকাশ করেননি, কেননা সেগুলি তৈয়ের হয়েছে তাঁর মৃত্যুর অনেক পরে। সেই রকম গ্রন্থের মলাট, ছাপা, টাইপ প্রভৃতির মধ্যেও তিনি আত্মপ্রকাশ করেননি। অথচ স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে—এই সবকে অবলম্বন করেই তিনি আত্মপ্রকাশ করেছেন। কাগজ যদি খারাপ হয়, সে দোষ প্লেটোর নয়; মলাট যদি খারাপ হয়, সে দোষ প্লেটোর নয়, টাইপ যদি খারাপ হয়, সে দোষ প্লেটোর নয়; আর ছাপা যদি খারাপ হয়, সে দোষও প্লেটোর নয়। এসব জিনিষের মধ্যে প্লেটো নিজেকে প্রকাশ করেছেন বলেই এসবের এত আদর, এত গৌরব। এসবের ক্রটি এবং অসম্পূর্ণতা প্লেটোর গৌরবের কোন হানি করে না।

"সাধারণ জীবন থেকে একটা দৃষ্টান্ত নিন। কোন একটা কোটা বাড়ির কথা একবার ভাবুন। স্থপতি সেই কোটা বাড়ির মধ্যে আত্মপ্রকাশ করেছে। চুণ-সুরকির মধ্যে কিছু তিনি আত্মপ্রকাশ করেন নি। চুণ-সুরকি অন্য লোক তাঁকে সরবরাহ করেছে। কোটা বাড়ির ইট পাথরের মধ্যেও তিনি আত্মপ্রকাশ করেন নি। কেননা ইট পাথরও সরবরাহ করেছে অন্য লোকে। দরজা জানালা, কড়ি, বরগা প্রভৃতির বিষয়ও ঠিক সেই একই কথা বলা যায়। অথচ এই সব উপাদানকে নিয়েই যে শিল্পী আত্মপ্রকাশ করেছেন, সে বিষয়ও আমাদের কোন সন্দেহ নাই। উপাদানগুলির দোষ ক্রটির জন্য শিল্পীর আমরা নিন্দাবাদ করতে পারি না। যে উপাদান তিনি পেয়েছেন তাই ব্যবহার করেছেন! শিল্পী তাদের ব্যবহার করেছেন বলেই উপাদানগুলির গৌরব এবং বিশেষত্ব। তাদের দোষ এবং অসম্পূর্ণতা কিন্তু তাঁকে স্পর্শ করে না।"

এখানে দার্শনিক প্লেটোর আত্মপ্রকাশের যে উদাহরণ দেওয়া হইয়াছে, সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বশক্তিমান আল্লাহতালার আত্ম-প্রকাশের সহিত তাহার তুলনাই হইতে পারে না। একটা মোটা কথা দেখুন, লেখক নিজেই বলিতেছেন—"গ্রন্থের কাগজগুলির মধ্যে তিনি আত্মপ্রকাশ করেন নি, কেননা সেগুলি তৈয়ের হয়েছে তাঁর মৃত্যুর অনেক পরে।" কিন্তু কোরআনে আত্মপ্রকাশকারী আল্লাহ যে অমর চিরজীবন্ত চিরজাগ্রত। প্লেটোর পুস্তক সম্বন্ধে যে 'কেননা' খাপ খাইয়া যায়, আল্লার কোরআন সম্বন্ধে তাহা কি খাপ খাইতে পারে? তাহার পর আমাদের মতে Republic পুস্তকে প্লেটোর যে আত্মপ্রকাশ—তাহার প্রকৃত আধার টাইপ কাগজ বা মলাট নহে। বরং যে সকল ভাব চিন্তা ও বৃত্তান্তকে ঐ পুস্তকে ভাষার মধ্যবর্ত্তিতায় সত্যরূপে প্রকট করিয়া তোলা হইয়াছে, তাহাই হইতেছে প্লেটোর আত্মপ্রকাশের উপকরণ। তাহার মধ্যকার কোন চিন্তা কোন ভাব বা কোন বৃত্তান্তকে যদি আমরা অবাস্তব রূপকথা ও ঠাকুরমার গল্প বলিয়া গ্রহণ করিতে বাধ্য হই, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, দার্শনিক প্লেটো সেখানে ক্রটীহীনরূপে আত্মপ্রকাশ করিতে সমর্থ হন নাই।

লেখকের "কোটাবাড়ীর দৃষ্টান্তটা" আরও স্পষ্টরূপে অসমঞ্জস। এখানে তাঁহার কথা মতেই কোটা বাড়ীর সাজ সরঞ্জাম ইটকাঠ সরবরাহ করিয়াছে—অন্য লোকে। শিল্পী যে উপাদান পাইয়াছেন তাহাই তিনি ব্যবহার করিয়াছেন, এবং এই জন্য উপাদানগুলির দোষ ক্রটীর জন্য আমরা শিল্পীর নিন্দাবাদ করিতে পারি না। বেশ কথা—কিন্তু বিশ্বশিল্পী আল্লাহতাআলা সম্বন্ধে এ দৃষ্টান্তটা ত মোটেই খাপ খায় না।

এখানে ঐ সব উপাদানের শিল্পীও তিনি, তাহার কর্ত্তাও তিনি। অন্য কোন শিল্পীর উপাদানগুলি গ্রহণ করিতে অগত্যা বাধ্য হওয়ার কোন হেতুও তাঁহার নাই। কারণ —তিনি সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বশক্তিমান। অতএব এক্ষেত্রে উপাদানের দোষ ক্রটীর জন্য তিনিই দায়ী। কাজেই উপমেয় ও উপমানের মধ্যে কোন সামঞ্জস্য এখানে নাই।

আলোচ্য প্রবন্ধের আর একটা গুরুতর ক্রটী এই যে, লেখক স্থানে স্থানে নিজের ধারণা মাত্রকে সর্ব্ববাদীসম্মত সত্যরূপে গ্রহণ করিয়া, তাহারই উপর নিজের সমস্ত যুক্তি-

বাঁদের ভিত্তি স্থাপন করিয়াছেন। অথচ সেইটাই হইতেছে প্রথম প্রমাণ সাপেক্ষ ব্যাপার। তিনি ধরিয়া লইয়াছেন যে,—

(ক) কোরআনে এমন কতকগুলি গল্প বা কাহিনীর উল্লেখ আছে—দর্শন বিজ্ঞান বা rationalism এর হিসাবে যে গুলিকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে না। সুতরাং নানী দাদীর কেচ্ছা কাহিনী বা রূপকথা বলিয়া ব্যবস্থা দিয়া কোরআনের সত্যতা আর rationalism এই উভয় কুলকে বজায় রাখিতে হইবে। কিন্তু দার্শনিক সমালোচককে এখানে সর্ব্বপ্রথমে অকাট্যরূপে প্রমাণ করিয়া দেখাইতে হইবে যে, (১) যাহাকে তিনি যুক্তিবাদ বলিয়া উল্লেখ করিতেছেন, বস্তুতঃ তাহা যুক্তিবাদ—বিচার-বিভ্রম নহে। (২) কোরআনের গল্প সম্বন্ধে তাঁহার মনে যে ধারণা বিদ্যমান আছে এবং যে ধারণার বশবর্ত্তী হওয়ার জন্য তিনি ঐগুলিকে রূপকথা বলিয়া, এক সঙ্গে নিজের ধার্ম্মিকতা ও দার্শনিকতাকে বজায় রাখার জন্য ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছেন—প্রকৃত পক্ষে সে ধারণাটা সঙ্গত কিনা? (৩) বস্তুতঃ কোন দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক সত্যের সহিত ঐ উপাখ্যানগুলির কোন বিরোধ আছে কিনা? দুঃখের বিষয় বিচারের এই প্রাথমিক দরকারের প্রতি লেখক আদৌ মনোযোগ প্রদান না করিয়াও, কোরআনে বর্ণিত আদম-হাওয়ার উপাখ্যানকে দর্শন বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদের বিপরীত বলিয়া ধারণা করিয়া লইয়াছেন—এবং এই ধারণা মাত্রের জন্যই তিনি উহাকে রূপকথা বলিয়া স্বস্তি লাভের চেষ্টা করিতে বাধ্য হইয়াছেন। কিন্তু আমরা জোর গলায় দাবী করিয়া বলিতে পারি, অবস্থা ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত। আদম হাওয়ার সৃষ্টিতে অথবা কোরআনের অন্য কোনও উপাখ্যানে এক বিন্দুবিসর্গ অযৌক্তিক কথা নাই। আল্লাহতাআলা শক্তি দিলে সমস্যা ও সমাধান প্রবন্ধের ২য় কিস্তিতে আমরা এ সব কথা অকাট্যরূপে প্রতিপন্ন করিয়া দিতে পারিব।

(খ) মাননীয় লেখক মহাশয় স্থির করিয়া লইয়াছেন যে, ১৪ শত বৎসর পূর্ব্বকার বৈজ্ঞানিক থিউরী অনুসারে এমন কতকগুলি বিষয় কোরআনে বর্ণিত হইয়াছে—এখনকার বিজ্ঞান যাহাকে অসত্য বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছে। কিন্তু ইহাও তাঁহার প্রমাণহীন দাবী মাত্র, দার্শনিক আলোচনা ক্ষেত্রে এখানেও উপরিবর্ণিত পদ্ধতিক্রমে নিজের দাবী বা ধারণাকে যুক্তি প্রমাণের দ্বারা প্রতিপন্ন করা তাঁহার সর্ব্বপ্রথম কর্ত্তব্য ছিল।

বস্তুতঃ কোরআনকে সমর্থন করিতে গিয়া অনিচ্ছা সত্তে তিনি তাহার উপর গুরুতর আক্রমণই করিয়া বসিয়াছেন। দুঃখের বিষয়, লেখক এখানে কোরআনে বর্ণিত ঐ প্রকার কোন অচল বৈজ্ঞানিক থিউরীর একটা নজীরও প্রদান করেন নাই। সুতরাং দার্শনিকতার হিসাবে তাঁহার এই যুক্তিবাদে যে যথেষ্ট ত্রুটী রহিয়া গিয়াছে, এ কথা আমাদিগকে স্বীকার করিতেই হইবে।

দার্শনিক যুক্তিবাদের সূক্ষ্ম মানযন্ত্রে ওজন করিয়া দেখিলে প্রবন্ধের স্থানে স্থানে আরও অনেক দোষত্রুটী দেখিতে পাওয়া যাইবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। ভবিষ্যতে অবকাশ মত ঐ সকল বিষয়ের উল্লেখ করিয়া, প্রবন্ধের গুণভাগের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব।

---

## শিক্ষা-সংস্কার

বাঙ্গালার মুছলমান সমাজের বর্ত্তমান অধঃপতনের মূলে যে কয়টী রাজনৈতিক কারণ ওতপ্রোতভাবে লুকাইয়া আছে, এ দেশের আরবী শিক্ষার উপর বৃটিশ রাজের বিশেষ কৃপা দৃষ্টি তাহার মধ্যকার একটা প্রধান কারণ। এই শিক্ষা প্রণালী এবং তাহার ভিতরকার গূঢ় রহস্যগুলির কথা যতই চিন্তা করিয়া দেখা যায়, ততই ইহার সর্ব্বনাশকর রূপটা চোখের সম্মুখে প্রকট হইয়া উঠিতে থাকে। বস্তুতঃ এক শতাব্দী ধরিয়া এই হলাহল মিশ্রিত শরবৎকে বাঙ্গালার মুছলমান আবেহায়াত মনে করিয়া পরমানন্দে পান করিয়া আসিতেছে। দেশের সাধারণ শিক্ষা প্রণালী সম্বন্ধে আজকাল চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রই একমত—এই বিকৃত শিক্ষা প্রণালীর মূলে যে সব কুটীল রাজনৈতিক অভিসন্ধি প্রচ্ছন্নভাবে কাজ করিয়া আসিয়াছে—এখন তাহা কাগজে কলমে পর্য্যন্ত ধরা পড়িয়া গিয়াছে।

এই সব শিক্ষা প্রণালীর আমূল সংস্কার হওয়া বাঙ্গালার মুছলমান সমাজের পক্ষে বিশেষ করিয়া আবশ্যক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। প্রকৃত পক্ষে এই শিক্ষা প্রণালীই হইতেছে জাতির প্রকৃত জীবনকাটি মরণকাটি। এদিকে অবহেলা করিয়া বাহিরের ফলাফল লইয়া আলোচনা করার বিশেষ কোনও সার্থকতা নাই।

বর্তমান সময়, যে কোন কারণে হউক, দেশে শিক্ষা সংস্কারের একটা প্রস্তাব উঠিয়াছে। মোছলেম বঙ্গের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ যদি এই সময় স্বসমাজের অভিজ্ঞ ও চিন্তাশীল লোকদিগের সমবায়ে একটা তদন্ত কমিটী গঠন করেন, এবং তাহার মধ্যবর্ত্তিতায় যদি নিজেদের শিক্ষা সংক্রান্ত অভাব অভিযোগের কথা ও তাহার প্রতিকারের প্রস্তাব যথাযথভাবে প্রকাশ করিতে পারেন, তাহা হইলে বোধ হয় একটা কাজের মত কাজ হইতে পারে।

'বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলমান শিক্ষা সমিতি'—মরহুমের সেক্রেটারী জনাব মৌলবী ওয়াহেদ হোসেন ছাহেব এ সম্বন্ধে একটু কার্য্যতৎপরতা প্রদর্শন করিলে, ইহাঁর একটা সুব্যবস্থা হইয়া যাইতে পারে বলিয়া আশা করি।

বাঙ্গালার মুছলমান সমাজের সব চাইতে বড় শামৎ এই যে, তাহার আঞ্জমন সমিতি ও কমিটীগুলি বোধোদয়ের পুত্তলিকার ইন্দ্রিয়গুলির মত আসল দিকে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইয়া আছে। এই জন্য কোন কাজের কথা উপস্থিত হইলে মাথায় হাত দিয়া ভাবিতে হয়—কোন দরবারে গিয়া ফরয়াদ করি!

---

## মাসিক-মোহাম্মদী

আশ্বিন-সংখ্যায় মাসিক-মোহাম্মদীর প্রথম বৎসর পূর্ণ হইয়া গেল। দ্বিতীয় বর্ষের প্রথম সংখ্যা যথানিয়মে কার্ত্তিক মাসের প্রথমে বাহির হইবে এবং পুরাতন গ্রাহকগণের মধ্যে যাঁহারা মণিঅর্ডার যোগে ইতিমধ্যে ২য় বৎসরের মূল্য পাঠাইয়া দিবেন—২য় বৎসরের প্রথম সংখ্যা তাহাদিগের খেদমতে যথানিয়মে কার্ত্তিক মাসের প্রথমেই পাঠান যাইবে। মণিঅর্ডার যোগে টাকা পাঠাইলে খরচা অপেক্ষাকৃত কম লাগে—কাগজও যথাসময় পাওয়া যায়। সেইজন্য আমরা গ্রাহকবর্গকে ২য় বর্ষের মূল্য অনতিবিলম্বে মণিঅর্ডার করিয়া পাঠাইতে অনুরোধ করিতেছি। আশ্বিন মাসের শেষ সপ্তাহ পর্য্যন্ত টাকা না পাইলে তাহারা আমাদিগকে ভি-পি যোগে কাগজ পাঠাইবার অনুমতি দিয়াছেন বলিয়া মনে করা হইবে। আশা করি, পুরাতন গ্রাহকগণ এজন্য প্রস্তুত থাকিবেন, এবং যথাসময় ভি-পি গ্রহণ করিয়া আমাদিগকে বাধিত ও উৎসাহিত করিবেন। এ সময় ভি-পি গ্রহণ করা যাঁহাদের পক্ষে সম্ভব হইবে না, তাঁহারা যেন সেকথা অবিলম্বে ম্যানেজার ছাহেবকে লিখিতে ত্রুটি না করেন। অন্যথায় ভি-পি ফেরৎ হইলে আমাদিগকে অনর্থক ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইবে।

গত বৎসর এই সময় মাসিক-মোহাম্মদী প্রকাশে কৃত-সঙ্কল্প হইয়াছিলাম—অবস্থাগতিকে বাধ্য হইয়া। সাময়িক আবশ্যকতার গুরুত্ব অনুভব করিয়া, জীবনের শেষ সাধনারূপে আরব্ধ কার্যটীকেও এ সময়ে এক প্রকার স্থগিত রাখিতে বাধ্য হইয়াছে।

প্রধানতঃ যে উদ্দেশ্যে মাসিক মোহাম্মদীর আবির্ভাব—বিজ্ঞ পাঠকবর্গের তাহা অবিদিত নাই। প্রথম সংখ্যায় এই উদ্দেশ্যের কথা সমাজকে স্পষ্ট করিয়া জানাইয়া দিয়াছিলাম। আজ সেই সর্ব্বসিদ্ধিদাতা রহমানর-রহিমের হুজুরে অশেষ শোকরানা বজায় করিয়া আনন্দের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে, আমাদের শত দোষত্রুটি থাকা সত্ত্বেও, এই একটী মাত্র বৎসরের চেষ্টার ফলে সে উদ্দেশ্যে বহু পরিমাণে সফল হইয়াছে।

দ্বিতীয় বৎসর হইতে মাসিক মোহাম্মদীকে অপেক্ষাকৃত সুষ্ঠু ও সম্পন্ন আকারে প্রকাশ করার যথাসাধ্য চেষ্টা পাইতেছি। সমাজের শক্তিশালী ও লব্ধ প্রতিষ্ঠ লেখকগণ মাসিক মোহাম্মদীর প্রতি অধিকতর স্নেহ প্রদর্শন করিবেন বলিয়া আশা করিতেছি।

বাঙ্গলার প্রত্যেক শিক্ষিত ও সমাজ হিতৈষী মুছলমান ভ্রাতার নিকট মাসিক-মোহাম্মদীর যথেষ্ট সাহায্য ও সহানুভূতি পাওয়ার আশা করিতেছে। আমরা নিজেদের কর্ত্তব্য পালনের জন্য অর্থব্যয়ে ও শ্রম স্বীকারে সাধ্যপক্ষে ত্রুটি করিতেছি না, সমাজও "মাসিক মোহাম্মদী" সম্বন্ধে নিজের কর্ত্তব্য পালনে অগ্রসর হউন—ইহাই আমাদের বিনীত প্রার্থনা।

---

Printed and Published by Md. Khairul Anam Khan from the "Mohammadi Press,"
29 Upper Circular Road, Calcutta.